সম্পাদক

READ
WEEKLY
AMRITA

সংখ্যা] শুক্রবার, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ [মূল্য: ৫০

Friday, 14th June, 1974 শুক্রবার ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩ 50 Paise

সূচীপত্র

হৃদয় বদল প্রসঙ্গে

গত ১৩ বর্ষ ৪৯ সংখ্যায় 'বিজ্ঞানের কথা' প্রবন্ধে হৃদযন্ত্র পুনঃ সংস্থাপন সংক্রান্ত জটিল বিষয়টি সাধারণ পাঠকের পক্ষে সহজবোধ্য করে সুন্দরভাবে লেখা হয়েছে। শল্য চিকিৎসার এই নূতন শাখায় যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছে তাও খুব সহজ ভাষায় লেখা হয়েছে।

কিন্তু লেখা হয়েছে যে, সদ্যমৃত কোন ব্যক্তির হৃদয় তুলে লাগানো হয়। কথাটা ঠিক নয়। মৃত্যু হলে সে ব্যক্তির হৃদয় আর লাগান চলে না। বাঁচার আশা নেই এমন লোকের হৃদয় জীবিত অবস্থাতেই তুলতে হয়। দুজন চিকিৎসক ঘোষণা করেন যে এর আর বাঁচা সম্ভব নয়—তখন সেই মুমূর্ষু ব্যক্তির হৃদয় তোলা হয়।

এদিক থেকে কাজটি অমানবিক ও নিষ্ঠুর। ব্যাপক প্রচলন হলে এ থেকে নানা দুর্নীতির উদ্ভব হওয়া বিচিত্র নয়। সে সম্পর্কে ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নালের একটি সংখ্যায় সমালোচনা করা হয়েছিল। পরে অন্য একটি সংখ্যায় হৃদবদল বর্তমানে গবেষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার উপদেশ দেওয়া হয় এবং মানুষের দেহাংশ বদল কিডনিতে সীমাবদ্ধ রাখতে বলা হয়েছিল। ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের যুক্ত এক সভায় মৃত্যুর সংজ্ঞা বদল করা হয়। আগে নিয়ম ছিল যে সাড়ে ৫ মিনিট হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ থাকলে ও ৫ মিনিট নিঃশ্বাস বন্ধ থাকলে তাকে মৃত বলা হত। ঐ সভায় নিয়ম হল যে দুইবার মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ দিয়ে যদি প্রতিক্রিয়া দেখা না যায় তবে তাকে মৃত বলা হবে। এটাও আপত্তিকর—অনেকটা 'লিগ্যাল সাপোর্ট টু ইল্লিগ্যাল অ্যাক্টের' মত।

কয়েক বছর আগে একদল সোভিয়েট চিকিৎসক ভারতে এসেছিলেন। তাঁরা বলেন যে, তাঁরা বর্তমানে হৃৎ-বদলের বিরোধী, কারণ মানুষের হৃদয় একটি। তাঁরা এখন কিডনি বদল করছেন। এতে ঝুঁকি প্রায় নেই, কারণ মানুষের কিডনি দুটি। একটি অপরকে দিলেও যিনি দিচ্ছেন ও যাঁকে দিচ্ছেন উভয়েই দীর্ঘকাল সুস্থ শরীরে বাঁচতে পারেন। সংযোজনের সাফল্য হৃৎ বদলের মত [illegible] নয়। তাঁরা বলেন যে কিডনি ও অন্যান্য দেহাংশ বদলের বহু পরীক্ষার পর তবেই তাঁরা হৃৎবদলে হাত দেবেন।

বিজ্ঞানের অনেক শাখারই প্রথমে অসাফল্য আসে। তাতে বিজ্ঞান থেমে থাকে না। হৃৎবদলও থেমে থাকবে না। নরম্যান শামওয়ে ও ক্রিশ্চিয়ান বার্ণার্ড প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আমার বক্তব্য কেবল মাত্র যাঁর হৃদয় নেওয়া হচ্ছে তাঁর দিক থেকে।

আমি চিকিৎসক নই। প্রখ্যাত শল্যবিদ ও এমেরিটাস সার্জেন ডাঃ মুরারিমোহন মুখোপাধ্যায় এম এস, এফ আর সি এস, মহাশয়ের একটি বক্তৃতা থেকে তথ্যগুলি সংগ্রহ করেছি।

প্রভাসকৃষ্ণ গোস্বামী
চুঁচুড়া, হুগলী

বৃটেনে ভারতের প্রথম শহীদএর লেখকের চিঠির উত্তর

১৯শে বৈশাখ 'অমৃতে' লণ্ডন থেকে লেখা 'বৃটেনে ভারতের প্রথম শহীদ' এর লেখক বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা আমার চিঠির উত্তর পড়লুম, চিঠিটা পড়ে মনে হোল লেখক মহাশয় এখনও মদনলালে ধিঙড়া কে নন্দলাল ধিঙড়া হিসাবে খাড়া করবার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন, জানিনা আমার এধারণা ভুল কিংবা ঠিক, যাকগে আসল কথায় ফিরে আসি, স্বাধীনতা আন্দোলনের অমর শহীদ বীর বিপ্লবী ধিঙড়া যে সত্যি সত্যি মদনলাল ছিলেন তার সমর্থনে আমি কিছু যুক্তি খাড়া করবার চেষ্টা করছি 'বিপ্লবী নিকেতন' প্রকাশিত 'মৃত্যুহীন' বইটি থেকে কয়েকটা লাইন আমি আমার যুক্তির সমর্থনে ধরে দিয়ে ব্যবহার করছি, এই বইটিতে বিভিন্ন লেখক লেখিকা ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম শহীদের জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন, এবং আমার মনে হয় বিপ্লবী নিকেতন প্রকাশিত এই বইটি ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রামাণ্য দলিল।

বইটিতে ধিঙড়া এবং উধম সিং সম্বন্ধে যৌথভাবে লিখেছেন কণিকা দাশগুপ্তা (২২৬—২২৮ পাতা) শিরোনামাতেই রয়েছে মদনলাল ধিঙড়া এবং উধম সিং ধিঙড়া সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বইটির ২২৮ পাতায় শ্রীমতী দাশগুপ্তা শ্রীঅরবিন্দের 'কর্মযোগিন' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীঅরবিন্দের লেখা শহীদ ধিঙড়া সম্বন্ধীয় কয়েকটি লাইন ব্যবহার করেছেন।

আমি 'কর্মযোগিন' এর লাইনকটি বইটির ২২৮ পাতা থেকে হুবহু বসিয়ে দিলুম। অরবিন্দ লিখেছিলেন, "এখানে দেশ তাঁরই (মদনলাল ধিঙড়ার) পশ্চাতে রয়েছে, তার কৃতকর্মের সকল দায়িত্ব বহন করার সঙ্কল্পে।"

বিশ্বনাথবাবুর লণ্ডন মিউজিয়াম থেকে সংগৃহীত দলিল কিংবা তথ্য থেকে শ্রীঅরবিন্দের লেখা নিঃসন্দেহে প্রামাণ্য এবং যুক্তি সঙ্গত, সুতরাং মাননীয় বিশ্বনাথবাবু দয়া করে স্বীকার করুন স্পষ্ট ভাবে বৃটেনে ভারতের প্রথম শহীদ নন্দলাল ধিঙড়া নয় মদনলাল ধিঙড়া শ্রদ্ধা এবং শুভেচ্ছাসহ।

—দীপঙ্কর রায়, বালী, হাওড়া।

'মাদাম কুরী' প্রসঙ্গে

অমৃতে শ্রীমতী কুমকুম বসুর মাদাম কুরী সম্বন্ধে লেখা একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল।

শ্রীমতী কুমকুম দেবী লিখেছিলেন যে মাদাম কুরীর পূর্বে বা পরে এ পর্যন্ত আর কোন মহিলা বা পুরুষ দুইবার নোবেল পুরস্কার পান নি। মাদাম কুরী ১৯০৩ সালে পদার্থবিদ্যায় এবং ১৯১১ সালে রসায়নবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান। মাদাম কুরীর পূর্বে কোন পুরুষ বা রমণী দুইবার নোবেল পুরস্কার পাননি একথা সত্য কিন্তু তাঁর পরে পদার্থবিদ্যায় দুইবার নোবেল পুরস্কার পান জন বারডিন।

জন বারডিন ১৯৫৬ সালে ট্রানজিস্টার আবিষ্কারের জন্য পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান। অবশ্য জন বারডিনের সঙ্গে ওই একই আবিষ্কারের জন্য উইলিয়াম সকলি এবং ওয়ালটার ব্রাটেনও পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান।

জন বারডিন থিওরি অফ সুপার কনডাকটিভিটি আবিষ্কারের জন্য ১৯৭২ সালে দ্বিতীয়বার পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান। অবশ্য এবারেও এই আবিষ্কারের জন্য আরও দুইজন বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পান—এঁদের নাম ডঃ লিওন এন কুপার এবং ডঃ জন শ্রিয়েফার।

মাদাম কুরী ও জন বারডিন ছাড়াও আরও একজন বিজ্ঞানী দুইবার নোবেল পুরস্কার পান। এঁর নাম ডঃ পাও লিং। ১৯৫৪ সালে রসায়নবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান এবং ১৯৬২ সালে দ্বিতীয়বার নোবেল পুরস্কার শান্তির জন্য পান।

তবে একথা এখনও পর্যন্ত সত্য যে জন বারডিন ছাড়া এখনও কোন বিজ্ঞানী একই বিষয়ে দুইবার নোবেল পুরস্কার পান নি।

বৈদ্যনাথ সিংহ, শান্তিনিকেতন।

এখন কাজ করার সময়

রেল ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হওয়ায় জনসাধারণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। সরকার এবং রেলকর্মিগণও এক বিরাট দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। কুড়ি দিন এত বৃহৎ একটি সংস্থায়, যার কর্মীসংখ্যা পনেরো লক্ষের কাছাকাছি, এক নাগাড়ে ধর্মঘট দেশের যে প্রভূত ক্ষতি করেছে সে বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। সরকার অনুগত কর্মীদের দিয়ে আংশিকভাবে রেল চলাচল চালু রেখেছিলেন এবং শিল্পকারখানার জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় কাঁচামাল বা জ্বালানি এবং অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহ রাখার চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ধর্মঘটের প্রতিক্রিয়া উপেক্ষনীয় ছিল না। তার পুরো হিসাব পাওয়া গেলে বোঝা যাবে এত বড় একটা ধর্মঘট কী নিদারুণ অর্থনৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনে। বিশেষ করে ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে রেলের চাকা বন্ধ হওয়া একটি মর্মান্তিক দুর্ভাগ্য।

সরকার গোড়া থেকেই বলেছিলেন, ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহৃত না হলে কোনোরকম আলোচনাই সম্ভব নয়। রেলকর্মী সংগঠন সরকারের সেই প্রস্তাব গ্রহণ না করে ধর্মঘটের পথে যান। তার ফলে সরকারের সঙ্গে একটা মুখোমুখি সংঘর্ষ শুরু হয়। এই অবাঞ্ছিত সংঘর্ষ এড়াতে পারলে আজ এত সমস্যার সৃষ্টি হত না। শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবী নিয়ে আলাপ-আলোচনার সুযোগ সব সময়েই খোলা থাকা উচিত। কিন্তু এত বৃহৎ একটি জাতীয় সংস্থায় সর্বাত্মক ধর্মঘট ডাকার আগে বহুবার চিন্তা করা উচিত। রেলকর্মী সংগঠনের নেতারা যে বিরাট সংগ্রামের মুখে সাধারণ রেলকর্মীদের ঠেলে দিয়েছিলেন তার ব্যাপক প্রতিক্রিয়া এখন ধীরে ধীরে সকলেই উপলব্ধি করতে পারবেন। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সর্বাত্মক ধর্মঘটে নামার আগে বিবেচনা করে দেখা উচিত ছিল যে, এর দ্বারা সত্যিকারের কল্যাণ আসবে কিনা।

সরকার ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে কোনো শাস্তি ব্যবস্থা নেবেন না। তবে ধর্মঘটের সময়কার বেতন কাটা যাবে। চাকরীতেও ছেদ হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ সমস্ত ব্যবস্থাই চূড়ান্ত হয়তো নয়। কারণ, সরকার সত্যি সত্যিই শ্রমিকদের ওপর প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা নিতে চান, এটা মনে করা কঠিন। আগেকার বহু ধর্মঘটের পরেও সরকার শ্রমিকদের প্রতি উদার ব্যবহার প্রদর্শন করেছেন। কারণ, রেলশ্রমিকরা কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলেও তাঁরা বিনাশর্তে কাজে যোগ দিয়েছেন। সরকার তাদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করবেন তাদের কর্তব্যনিষ্ঠা দেখে। রেলের চাকা যত জোরে চলবে ততই প্রমাণিত হবে আমাদের শ্রমিকদের আনুগত্য তাদের কর্মের প্রতি, তার কোনো ব্যত্যয় ঘটে নি। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে রেলকর্মীদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ধর্মঘটের আগে যেমন ছিল পরেও তাই থাকবে। সুতরাং এই শ্রমিকদের সম্পূর্ণ পরাজিত বা পর্যুদস্ত মনোভাব নিয়ে কাজ করতে দেওয়া নিশ্চয়ই সরকারের লক্ষ্য নয়। ধর্মঘটের তিক্ততার জের যত তাড়াতাড়ি মুছে ফেলা যায় ততই মঙ্গল। এর জন্য সরকারের এবং শ্রমিকদের উভয়ের সহযোগিতা প্রয়োজন। সুখের কথা, রেলকর্মী সমন্বয় কমিটি আবার আলোচনা আরম্ভ করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। আলোচনার পথ সরকার সব সময়েই খোলা রেখেছেন। আলোচনার দ্বারা রেলকর্মীদের দাবী-দাওয়ার একটা সুষ্ঠু মীমংসা হবে এ আশা করা অযৌক্তিক নয়। প্রধানমন্ত্রীও এ আশ্বাস আগেই দিয়েছেন।

এই ধর্মঘটের ব্যাপারে রেলকর্মী ইউনিয়নের বিভিন্ন নেতাদের মধ্যে, বিশেষ করে এ আই টি উ সি এবং অন্যান্য বামপন্থী ইউনিয়নের মধ্যে মতবিরোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বামপন্থী রাজনীতিতে যে বিরোধ শ্রমিক আন্দোলনে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। এর ফলে শ্রমিকদের স্বার্থেরই ক্ষতি হবে। অর্থনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে রাজনীতি জড়িয়ে ফেলা অত্যন্ত মারাত্মক। রেলশ্রমিকরা তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন এবং শ্রমিকদের মধ্যেও পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারে। বামপন্থী নেতাদের এই সত্য উপলব্ধি করা উচিত। বৃটেনে কিছুদিন আগে এত বড় কয়লাখনি শ্রমিক আন্দোলন হয়ে গেল। কিন্তু তাতে রাজনীতির বিতর্ক ছিল না। আজ সরকারের সঙ্গে রেলশ্রমিকদের আলোচনায় বসতে হবে। ঐক্যবদ্ধভাবে ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে আলোচনা চালাতে পারলেই অতীতের সব তিক্ততার অবসান ঘটিয়ে একটা সুস্থ কাজের আবহাওয়া সৃষ্টি হতে পারে। এখন পূর্ণ উদ্যমে কাজের সময়। ধর্মঘটের ফলে কয়েক হাজার কোটি টাকার লোকসান হয়েছে সকল দিক থেকে। জাতীয় অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার কাজে রেলশ্রমিকগণ এবার পুরোদমে কাজ করে যাবেন, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। এবং সরকারও এই শ্রমিকদের ন্যায় বিচারে কুণ্ঠিত হবেন না এ আশাও আমরা করি।

আদিত্য-পুরুষ ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

শুধুই বেরিয়ে পড়া, চলা আর চলা,
কেবলই এগিয়ে চলা—
পাবার তাগিদ নয়, বেগবান হবার তাগিদ
অসীম গহন হতে যেন কোন না-জানা সুহৃদ
বাজায়েছে প্রাণ-বংশী, দেহ-মন হয়েছে উতলা
রাত্রি-দিন
একটি সম্বল শুধু পথ সম্মুখীন।

দূর গিরিগৃহ থেকে বেরিয়ে পড়েছে দেখ ক্ষীণা জলধারা
দিশাহারা
কোথা যাবে জানে না ঠিকানা
কেউ নেই দেবে তাকে পথের নিশানা।
একান্ত চলাই তার একমাত্র গন্তব্য জগতে
পথ হারালেও ফের পথ পাবে পথে
বহমানতাই তার একমাত্র স্থিতি
বিশুদ্ধ প্রতীতি।
ব্যাকুলতা তার মন্ত্রদাতা
উৎসাহ-উদ্গাতা।
অগ্রসর হতে-হতে জলধারা বেগস্ফূর্তা হল নির্ঝরিণী
পার্বতী নটিনী।
উচ্চাবচ পথ ভেঙে প্রতিহত হতে হতে উচলে-উপলে
বঙ্কিমে-সরলে
নির্ঝরিণী নদী হল মত্ত তরঙ্গিনী
বেগ-বিস্ফারিণী।
তারপরে সেই নদী কূলঙ্কষা নির্বারিত স্রোতে
বিস্তারিত হতে-হতে
মিলিল সমুদ্রে এসে
অবশেষে।
এ কি তার সমুদ্রকে পাওয়া
লীন হয়ে যাওয়া ?
না কি তার হয়ে ওঠা সমুদ্র বিপুল ?
এই এক আকৃতি-আকুল
রূপান্তর বিলুপ্তির পথে নয় সম্ভূতি পথে
জ্বলন্তে-জাগ্রতে,
নদীর সমাপ্তি নয়, উদ্বেল উত্থান
সমুদ্রায়িত শ্রী সেই নদী সাহিত্যে ও রাহিত্যে সমান।

আমরা এখানে কেউ প্রতিশ্রুত নহি তো বিশ্রামে
আমাদেরো দিন-রাত্রি আবর্তিত গতির প্রকামে,
বৃহতের ডাকে মোরা চলেছি বৃহৎ হতে মহৎ বিশ্বাসে
আভাসে-প্রভাসে।
এই প্রাণ নবীনায়মান
শুধু এক চেতনার দীর্ঘ অভিযান
প্রোজ্জ্বল চেতনা,
গতি হতে ইতি তার প্রেমের প্রবাহে উদ্দীপনা
প্রেম শুধু পরার্থপরতা
পরার্থই পরমার্থ, পদার্থ-পূর্ণতা।
বন্দী আর নহে মর্তে, স্বল্পে ক্ষুদ্রে নহে,
চলেছি ঈশ্বরায়িত হতে, জড় হতে চিন্ময় বিগ্রহে।
লোকোত্তর চেতনার ভাস্বর প্রত্যূষ
অবর মানুষ হবে দিব্যপ্রাণ আদিত্যপুরুষ।।

[illegible] এই [illegible] হৃৎযন্ত্রের [illegible] স্বাভাবিক [illegible] কাজ [illegible] ইতিহাসে এক যুগান্ত সৃষ্টি হয়েছে। [illegible] হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া স্বাভাবিক করার জন্য [illegible] সঙ্গে লাগানো হয়। [illegible] পারেন [illegible] থেকে [illegible]। চিকিৎসকেরা [illegible] এবং [illegible] পাঁচ দিন পরে [illegible] হৃৎপিণ্ডে [illegible] একটি [illegible]। আশা করা যাচ্ছে যে, এই যন্ত্রের কল্যাণে [illegible] সুদীর্ঘ সুস্থ জীবন ভোগ করবে।

রেলওয়ে কর্মীরা, তাঁদের ধর্মঘট নিঃসর্তভাবে প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর এখন ২০ দিনের এই ধর্মঘটের ময়না তদন্ত হচ্ছে ও ধর্মঘটের পরের সমস্যাগুলি বড় হয়ে উঠছে।

ভারতবর্ষের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাসে এই বৃহত্তম ধর্মঘট অর্থনীতি, রাজনীতি শ্রমিক-পরিচালক সম্পর্ক ইত্যাদি ক্ষেত্রে যেভাবে নাড়া দিয়েছে তাতে এই ঘটনার জের নিশ্চয়ই অনেকদিন পর্যন্ত চলবে।

প্রথমত, প্রায় তিন সপ্তাহের এই রেল ধর্মঘট সারা দেশের অর্থনীতিতে প্রকান্ড আঘাত দিয়ে গেছে।

সরকারি সূত্রে প্রাপ্ত প্রাথমিক হিসাবে প্রকাশ, ধর্মঘটের এই কয়দিনে যাত্রী ও মালের ভাড়ার দরুন রেলওয়ে ২৫ কোটি টাকা হারিয়েছে, রেলওয়ে কর্মীরা বেতন হারিয়েছেন ২৫ কোটি টাকা আর সারা দেশে মোট আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকার অঙ্ক ছাড়িয়ে গেছে।

অন্যদিকে, রেলকর্মীদের জাতীয় সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির হিসাবে এই ধর্মঘটে দেশের মোট আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ১৫০০ কোটি টাকা হবে।

রেল কর্তৃপক্ষ দাবি করেছিলেন, ধর্মঘটের মধ্যে তাঁরা স্বাভাবিক রেল চলাচলের ৪০ শতাংশ চালু রেখেছিলেন। এই হিসাবে ধর্মঘটের মধ্যে মোট ৫২০ কোটি টাকার মত মাল চলাচল করতে পারে নি। এই অঙ্ক যদি ঠিক হয় তাহলে উৎপাদনের মোট ক্ষতির পরিমাণ ১৫০০ কোটি টাকায় পেঁছে যাওয়া কিছু আশ্চর্য নয়।

ধর্মঘট মিটবার দুদিন আগে কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি টি পি সিং এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্বীকার করেন যে, রেলের ধর্মঘটের ফলে দেশের বন্দরগুলিতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য সার ও শিল্পের জন্য অত্যাবশ্যক কাঁচামাল জমে রয়েছে।

ইস্পাতের কারখানাগুলিতে যদিও ধর্মঘটের সময় কয়লার জোগান অব্যাহত রাখা হয়েছিল তাহলেও সেগুলিতে স্বাভাবিকের চেয়ে কম উৎপাদন হয়েছিল। ওয়াগন না পাওয়ায় এই কয়দিনে ইস্পাত কারখানাগুলিতে ১১০ কোটি টাকা মূল্যের ইস্পাত জমে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে যে, দেশে ইস্পাতের অভাব দূর করার জন্য জাপান থেকে ১৪০ কোটি টাকা মূল্যের ৪ লক্ষ ৩০ হাজার টন ইস্পাত আমদানি করা হবে। ব্যাঙ্কগুলি রেলওয়ে রসিদের উপর আগাম টাকা দেওয়া বন্ধ করায় এবং রেজিস্টার্ড ডাক চলাচল বন্ধ থাকায় টাকাপয়সার লেনদেন ব্যাহত হয়েছে এবং পুঁজির অভাবে উৎপাদনের ক্ষতি হয়েছে।

●

রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র বলেছেন, ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হওয়ার পর এখন তাঁদের নীতি হবে যথাসম্ভব বেশি লোককে কাজে লাগিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রেল চলাচল ব্যবস্থায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা। এই উদ্দেশ্যে শুধু যাঁদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কার্যকলাপ, জোরজুলুম, ভীতিপ্রদর্শন স্যাবোটেজ ইত্যাদির অভিযোগ আছে তাঁদের ছাড়া অন্য কোন ধর্মঘটীকে শাস্তি দেওয়া হবে না বলে সরকারি ঘোষণা করা হয়েছে। তবে যাঁরা ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের সকলেরই চাকরিতে ছেদ হবে এবং তাঁরা ধর্মঘটের সময়ের জন্য বেতন পাবেন না।

দেশের বিভিন্ন [illegible] ইতিমধ্যে যেসব খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে কতকগুলি স্থানে অনুগত কর্মীদের সঙ্গে ধর্মঘটীদের বিরোধের ফলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার অসুবিধা হচ্ছে। এই ধরনের সবচেয়ে মারাত্মক খবর পাওয়া গেছে পশ্চিমবঙ্গের খড়াপুর থেকে। সেখানে ৫৫ জন কর্মচ্যুত রেলওয়ে কর্মী বাইরের লোকের সঙ্গে মিলে রেলওয়ে কারখানার প্রায় ৬০ জন অনুগত কর্মীকে উলঙ্গ করেছে, গায়ে রঙ মাখিয়ে দিয়েছে এবং কারখানার চারপাশে ঘুরিয়েছে। যাঁদের এভাবে নিগ্রহ করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে দুজন মহিলা কর্মীও ছিলেন বলে প্রকাশ।

ধর্মঘটের সময় যাঁদের সাময়িকভাবে রেলওয়ের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে অনেকে কোথাও কোথাও স্থায়ী কাজ দাবি করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন বলে সংবাদ পাওয়া গেছে।

রেলওয়ে দপ্তরের উপমন্ত্রী মহম্মদ শফি কুরেশি বলেছেন, রেল চলাচলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতে মাসখানেক সময় লাগবে।

ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক রেলওয়েতে বেশ কয়েক হাজার কর্মী ছাঁটাই হয়ে গেছেন ও কয়েক লক্ষ কর্মীর চাকরির ছেদ ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা [illegible] সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। একমাত্র ওয়েস্টার্ন ও সেন্ট্রাল রেলওয়েতেই

৮৫০০ রেলকর্মীর চাকরি গেছে এবং এক লক্ষ কর্মীর চাকরিতে ছেদ হয়ে গেছে।

•

এদিকে সি-পি-আই-এর সঙ্গে অন্যান্য বামপন্থী দলের এবং অন্যদিকে সি-পি-আই-এর সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই ধর্মঘটের গুরুতর রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

এই ধর্মঘটের নেতাদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ দেখা দিচ্ছিল। সোস্যালিস্ট নেতা মধু লিমায়ের সঙ্গে সি-পি-আই নেতা ও এ-আই-টি-ইউ-সি নেতা এস এ ডাঙ্গের যে পত্রবিনিময় হয়েছিল তাতেই এই মতভেদ বোঝা গিয়েছিল। শ্রীডাঙ্গে ধর্মঘট আর টেনে নিয়ে না গিয়ে তাড়াতাড়ি কাজে ফিরে যাওয়ার একটা রাস্তা খোঁজার উপর যেভাবে জোর দিচ্ছিলেন তাতে ধর্মঘটে অন্যান্য নেতাদের সায় ছিল না। (এ বিষয়ে এমনকি শ্রীডাঙ্গের নিজের দলের শ্রী এস এম ব্যানার্জিও ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন।) শ্রীডাঙ্গের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মঘটী নেতাদের মতভেদের একটি বড় বিষয় ছিল এই যে, শ্রীডাঙ্গের মতে রেলওয়ে কর্মীদের জাতীয় সংগ্রাম সমন্বয় সমিতির ১৩ জন সদস্যের মধ্যে যে পাঁচজন শেষ পর্যন্ত জেলের বাইরে ছিলেন তাঁরাই ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত করতে পারেন কিন্তু অন্যান্য নেতাদের মতে এরকম সিদ্ধান্ত করতে হলে সমিতির সব সদস্যকে মিলিত হয়েই করতে হবে। শ্রীডাঙ্গে বললেন, বিভিন্ন অঞ্চলের ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর রেলকর্মীদের আলাদা আলাদা ভাবে ধর্মঘট তুলে নিতে দেওয়া হোক। সংগ্রাম সমিতি তাতেও রাজি হলেন না। ২৬ মে তারিখে রাষ্ট্রপতি গিরি আবেদন জানালেন যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যেহেতু একটি যুক্তিসংগত বেতন নীতি গ্রহণের কথা বলেছেন এবং যেহেতু বোনাস রিভিউ কমিটির রিপোর্ট অল্প কিছুদিনের মধ্যেই প্রকাশিত হচ্ছে সেহেতু রেলকর্মীরা তাঁদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিন। সংগ্রাম সমিতি রাষ্ট্রপতির এ আবেদন বিবেচনা করতে বসার আগেই জর্জ ফার্নান্ডেজের স্ত্রীর মারফত কারারুদ্ধ নেতাদের কাছ থেকে একটি পত্র পেলেন। সমিতির যে আটজন সদস্য জেলে ছিলেন তাঁরা ঐ পত্রের মারফত ধর্মঘট প্রত্যাহারের প্রস্তাব করে পাঠিয়েছিলেন। (তাঁরা ঐ প্রস্তাব অবশ্য শ্রীগিরির আবেদনের আগেই গ্রহণ করেছিলেন।) কারারুদ্ধ নেতাদের অভিমত জানার পর স্বাভাবিকভাবেই অবসানের বাধা দূর হয়ে গেল। জাতীয় সংগ্রাম সমন্বয় সমিতি সংখ্যাধিক্যে ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত করলেন। রেলওয়ে শ্রমিক নেতা প্রিয় গুপ্ত ও সি-পি-এম নেতা সমর মুখোপাধ্যায় প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিলেন।

শ্রীজর্জ ফার্নান্ডেজ অবশ্য এই ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে দায়ী করেন নি। তিনি বলেছেন, এ-আই-টি-ইউ-সি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত ধর্মঘটীদের সঙ্গে ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও স্বীকার করেছেন যে, এই ধর্মঘট যাঁরা পরিচালনা করছিলেন তাঁরা এক একজন এক এক রকম ভাষায় কথা বলতে থাকায় ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিতে হয়েছে।

সি-পি-এম খোলাখুলিভাবেই এই ধর্মঘট সম্পর্কে সি-পি-আই-এর ভূমিকার সমালোচনা করেছে। সি-পি-এম পলিট ব্যুরোর সভ্য পি রামমূর্তি বলেছেন, রেলওয়ে ধর্মঘটে সি-পি-আই নেতা ডাঙ্গে 'ধ্বংসাত্মক ভূমিকা' গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেছেন, সি-পি-আই সাধারণভাবে কংগ্রেসকে রাজনৈতিক সমর্থন দেওয়ার ও কেরলে কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকারে যোগ দেওয়ার নীতি গ্রহণ করে একটা করুণ অবস্থার মধ্যে পড়েছে।

জনসঙ্ঘের কয়েকজন সদস্যও ধর্মঘটে সি-পি-আই-এর ভূমিকার সমালোচনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, সি-পি-আই বলতে গেলে সরকারের ভূমিকাই গ্রহণ করেছিল এবং ধর্মঘট একরকম স্যাবোটেজই করে দিয়েছিল।

এই ধর্মঘটে কংগ্রেসের সঙ্গে সি-পি-আই-এর সম্পর্কেও টান ধরেছে। এই ধর্মঘট উপলক্ষে সি-পি-আই যেভাবে সমস্ত কংগ্রেস-বিরোধী দলের সঙ্গে একত্র হয়ে সরকার-বিরোধী রাজনীতির মঞ্চে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সেটা কংগ্রেসের অনেকেরই পছন্দ হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে সি-পি-আই-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কয়েকজন কংগ্রেস নেতাও এই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চা জিইয়ে রাখার সার্থকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। অপরদিকে কংগ্রেসের যে 'প্রগতিশীল অংশের' উপর সি-পি-আই এতদিন ভরসা রেখে এসেছে তাঁরাও সরকারের ধর্মঘট দমনের নীতি পুরোপুরি সমর্থন করে সি-পি-আইকে অসুবিধায় ফেলেছেন।

সি-পি-আই-এর এই দোটানার সুযোগ নিয়ে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি ও সোশ্যালিস্ট নেতা মধু লিমায়ে সি-পি-আইকে এবার কংগ্রেসের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে বামপন্থী শিবিরে যোগ দিতে উস্কানি দিয়েছিলেন। কিন্তু সি-পি-আই তাদের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতিতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার পর এই পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেছে। যদিও প্রগতিশীল কংগ্রেসকর্মীরা বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন এবং যদিও কংগ্রেসের বৈষয়িক নীতিতে সুস্পষ্ট দক্ষিণপন্থী প্রবণতা এসেছে তাহলেও বামপন্থী দলগুলি ও প্রগতিশীল কংগ্রেসী সেই সমস্ত বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে একত্রিত করার নীতি পরিত্যাগ করার কারণ সি-পি-আই দেখে না।

রেলওয়ে ধর্মঘট উপলক্ষে যে কংগ্রেস-বিরোধী একতা গড়ে উঠেছিল তার ভবিষ্যৎ কি হবে, বামপন্থী ঐক্যের নতুন কোন চেষ্টা হবে কিনা, কংগ্রেসের সঙ্গে সি-পি-আই-এর যে সীমিত বোঝাপড়া রয়েছে সেটা কতদূর টিকবে, এসব প্রশ্ন এখন ধর্মঘটের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন করে বিবেচিত হবে।

•

ধর্মঘটের পরবর্তী আর একটি প্রশ্ন হল, ভারতবর্ষের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উপর এই ধর্মঘটের প্রতিক্রিয়া কি হবে।

রেল ধর্মঘটের ব্যর্থতার ফলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে ধর্মঘটের ধার যদি ভোঁতা হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ ও বিক্ষোভ প্রকাশের বিকল্প পথটা কি হবে?

কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে সংগঠিত শিল্পের জন্য বেতন নীতি তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁদের আশা, এতে শিল্পবিরোধ কমবে। কারণ, হিসাবেই দেখা যায়, এদেশে যত শিল্পবিরোধ হয় তার ৩৫ শতাংশের পিছনেই থাকে মজুরি সংক্রান্ত বিরোধ।

রাষ্ট্রপতি গিরি ইতিমধ্যে ধর্মঘট ও লক-আউট বন্ধ রাখার জন্য আর একবার শ্রমিক ও মালিকদের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ দূর করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হল, জাতীয় জীবনে শ্রমিকদের ন্যায্য স্থান দেওয়া। সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীরও প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে, উৎপাদন ও উৎপাদনের হার যাতে সর্বোচ্চ স্তরে থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা। উৎপাদন ও উৎপাদনের হার না বাড়িয়ে বেতন বাড়াবার চেষ্টা করলে কোন লাভ হবে না, তাতে বরং মজুরি ও দামের মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্রতর হবে।

অন্যদিকে সি-পি-এম নেতা রামমূর্তি বলেছেন, সরকার যে দৃঢ়তা দেখিয়েছেন তাতে শিল্পে এক ধরনের শান্তি আসতে পারে কিন্তু শ্রমিকদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতা ছাড়া দেশে শিল্পের সুষ্ঠু পরিচালনার আশা দিবাস্বপ্নই হয়ে থাকবে।'

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আমেরিকার 'নিউইয়র্ক' সাপ্তাহিক পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ধর্মঘট প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমরা ধর্মঘটের বিরোধী নই। আমরা মনে করি, ধর্মঘট সংগঠিত শ্রমিকদের সংগ্রামের একটি বৈধ হাতিয়ার। কিন্তু কোন একটি শ্রেণীর স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় দেশের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে।...ধনী দেশগুলি সব সময়েই সুবিধা পেয়ে যাবে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এটা যেমন আমরা ঠিক মনে করি না, তেমনি আমরা মনে করি যে নিচুতলার মানুষকে আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত কতকটা উপরে তুলতে না পারছি ততক্ষণ

পর্যন্ত স্বল্পোন্নত মানবরা তাঁদের দাবি ক্রমাগত বাড়িয়ে যেতে পারেন না।'

এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্নও উঠছে। প্রশ্নটি হচ্ছে, আজকের শ্রমিক আন্দোলনে বাইরের রাজনৈতিক নেতাদের যে আধিপত্য রয়েছে সেটা চলতে দেওয়া উচিত কিনা। কথা উঠেছে যে, যাঁরা মূলত রাজনীতিক তাঁদের হাতে যদি এভাবে রেলওয়ে ধর্মঘটের নেতৃত্ব চলে না যেত তাহলে রাজনৈতিক দলাদলির প্রতিক্রিয়ায় এই ধর্মঘট এমন ক্ষতিগ্রস্ত হত না। ভবিষ্যতের জন্য আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা এমন কোন শিক্ষা গ্রহণ করবেন কিনা সেটা দেখার বিষয় হবে।

•

ভারত তার প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ করার প্রথম দিকে বিদেশে যেসব বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল তার ধাক্কা এখন কতকটা কেটে গেছে এবং এবিষয়ে ভারতের মনোভাবের প্রতি কিছু কিছু সহানুভূতির সুর লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বৃটিশ বামপন্থী সাপ্তাহিক পত্রিকা 'নিউ স্টেটসম্যান'-এ ঐ পত্রিকার সম্পাদক লিখেছেন, 'অধিকাংশ বৃটিশ সংবাদপত্র যেভাবে গলা চড়িয়ে (ভারতকে) তিরস্কার করেছে সেটা অসহনীয়।' তিনি আরও লিখেছেন যে, পারমাণবিক শক্তিহীন দেশগুলি যখন দেখতে পাচ্ছে, পারমাণবিক শক্তিতে যারা সবচেয়ে বেশি শক্তিমান তারাই ঐ শক্তি সংগ্রহ করতে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী তখন তারা কেমন করে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার রোধ চুক্তির আন্তরিকতায় বিশ্বাস করবে? 'আমি যেমন বলি তেমন কর', এই ধরনের কথায় কখনই চিঁড়ে ভেজে নি। 'আমাদের মত তোমরাও (পারমাণবিক অস্ত্র) বাদ দিয়ে চল', এমনতর কথা অন্তত আর কিছুটা বেশি বিশ্বাসযোগ্য হত।

টোরি সাপ্তাহিক 'স্পেক্টেটর'ও ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণে দোষের কিছু দেখেন নি। ভারত যে তার রাজনৈতিক ও সামরিক জাতীয় স্বার্থেই পারমাণবিক শক্তিগোষ্ঠীতে যোগ দিয়েছে সে কথার উল্লেখ করে 'স্পেক্টেটর' লিখেছেন, ভারতের এই কাজ সম্পূর্ণ বোধগম্য ও সমর্থনীয়। এতে ভারত কোন চুক্তিভঙ্গও করে নি। কারণ, সে যদিও পারমাণবিক পরীক্ষা নিষেধ চুক্তির অংশীদার তাহলেও মাটির নিচে সে যে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে তাতে সেই চুক্তির সর্ত লঙ্ঘিত হয় নি। আর, পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার রোধ সংক্রান্ত সর্তগুলি ত সে কখনও মেনেই নেয় নি।

বিশ্বের একজন অগ্রগণ্য রাষ্ট্রনীতিবিদ হিসাবে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যে ক্রমেই অধিক থেকে অধিকতর পরিণতবুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছেন সে কথার উল্লেখ করে 'স্পেক্টেটর' লিখেছেন 'এটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে, তাঁর পিতার ও বান্দুং নীতির নিষ্ফল কালের অবসান হচ্ছে ও ভারত বৃহত্তর বিশ্বের আলোকে বেরিয়ে আসছে।'

যুগোশ্লাভিয়ার সংবাদ সরবরাহ সংস্থা 'তানযুগ'-এর কূটনৈতিক সম্পাদক তাঁর একটি সংবাদভাষ্যে বলেছেন, 'শান্তিপ্রিয় দেশগুলি শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পারমাণবিক শক্তিকে কাজে লাগাবার যে চেষ্টা করছে তাতে ভারতের এই পারমাণবিক বিস্ফোরণ একটি তাৎপর্যপূর্ণ অবদান বলে গণ্য হওয়া উচিত।'

ভারতকে তার এই প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণের জন্য অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানিয়েছে সেনেগল। সেনেগল বলেছে, ভারতের বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের মান যে কত উঁচু তার প্রমাণ এই বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে আবার পাওয়া গেল।

সেনেগলের প্রেসিডেন্ট লিওপোল্ড সেডার সেঙ্ঘর তাঁর নয়দিনব্যাপী ভারত সফর শেষ করে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে যে যুক্ত ইস্তাহারে স্বাক্ষর করলেন তাতে এই প্রথম আফ্রিকার কোন দেশের

পক্ষ থেকে ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণে সমর্থনের কথা জানান হল।

*

ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে বিদেশে যেসব সমালোচনা হয়েছে সেগুলির কিছু কিছু উত্তর ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পারমাণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ এইচ এন সেঠনা ও অন্যান্য সরকারি মুখপাত্র দিয়েছেন।

যেমন :—

আপত্তি (১) ভারতের এই পারমাণবিক বিস্ফোরণ বিশ্বে নতুন অশান্তি ডেকে আনবে।

জবাব :—নিউইয়র্ক পত্রিকার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, ভারত পারমাণবিক বিজ্ঞান আয়ত্ত করলেও সে পারমাণবিক অস্ত্রধারী দেশ নয়। ভারতের কোন পারমাণবিক বোমা নেই এবং পারমাণবিক বিজ্ঞান সম্পর্কে তার জ্ঞান বা পারমাণবিক শক্তিকে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে কাজে লাগাবার ইচ্ছা ভারতের নেই।

আপত্তি (২) এই পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভারত পাকিস্তানের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চাইছে।

জবাব :—পাকিস্তানের উপর আধিপত্য করার উদ্দেশ্য ভারতের নেই। পাকিস্তান সহ সমগ্র উপমহাদেশে আঞ্চলিক সহযোগিতার একটি মজবুত ভিত্তি গড়ে তোলাই ভারতের ইচ্ছা। দুই দেশের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে ভারত পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কে গবেষণায় পাকিস্তানের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজি আছে। পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধবর্জন চুক্তি করতেও ভারত প্রস্তুত। পাকিস্তানই বরং ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে পরাজিত হয়েছে। এই যুদ্ধে ভারতকে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করতে হয়নি। পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে পারমাণবিক ব্ল্যাকমেইল-এর অভিযোগ এনে বরং আমেরিকা বিদেশ থেকে সামরিক এবং সুযোগ হলে পারমাণবিক অস্ত্র সংগ্রহ করতে চাইছে।

আপত্তি (৩) ভারতের মানুষ যেখানে ভরপেট খেতেই পায় না সেখানে পারমাণবিক বিস্ফোরণের পিছনে বিরাট অর্থব্যয় করা নিছক অপচয়।

জবাব :—ডঃ সেঠনা বলেছেন, এই পারমাণবিক বিস্ফোরণে খরচ হয়েছে মাত্র ৩০ লাখ টাকা। মাটির নিচে এই পরীক্ষায় যে টাকা খরচ করা হয়েছে তার সাতগুণ টাকা পারমাণবিক শক্তি কমিশন ব্যয় করে থাকেন কৃষি ঔষধ ও ক্যান্সারের চিকিৎসা সম্পর্কে গবেষণায়।

আর একটি হিসাবে প্রকাশ যে, পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ সমগ্র পারমাণবিক শক্তি কর্মসূচীতে ভারত বছরে মোট পরিমাণ অর্থব্যয় করে সেটা তার বৎসরিক বাজেটের দুই শতাংশেরও কম।

এই পারমাণবিক বিস্ফোরণ ভারত ঘটিয়েছে সম্পূর্ণরূপে তার নিজের শক্তি-সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে। এজন্য এক পয়সারও বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হয়নি।

ভারত গরিব দেশ বলে সে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যায় স্বয়ংনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করতে পারবে না, এটা কোন যুক্তি নয়। অতীতে ভারত যখন ভারি শিল্প স্থাপন করতে গেছে, তখনও পাশ্চাত্যের কোন কোন দেশ থেকে এই ধরনের আপত্তি তোলা হয়েছে। আসলে, গরীবী দূর করার জন্যই ভারত আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্য গ্রহণ করতে চায় এবং এ বিষয়ে নিজেদের চেষ্টায় যতটা অগ্রগতি করা সম্ভব তা করতে চায়।

আপত্তি (৪) কানাডা ভারতকে যে পারমাণবিক চুল্লী তৈরী করে দিয়েছে তা থেকে এই বিস্ফোরণের জন্য প্লুটোনিয়াম সংগ্রহ করে ভারত এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করেছে।

জবাব—ভারত এ বিষয়ে কোন নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে নি। শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে পরমাণুবিভাজনের শক্তিকে কাজে লাগান হচ্ছে কিনা সেদিকে নজর রাখার জন্য ভারত আন্তর্জাতিক পরমাণবিক শক্তি সংস্থার পরিদর্শকের সব রকম তদারকীর সুযোগ দিয়েছে। এ বিষয়ে কোন রকম ভুল বোঝাবুঝি হয়ে থাকলে সরেজমিনে এসে সেই ভুল শোধরাবার জন্য ডঃ সেঠনা কানাডার পারমাণবিক শক্তি বিভাগের প্রধান ডঃ লর্ন গ্রে-কে বোম্বাইয়ে পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শন করে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

*

২৮ দিনে ১৩ বার দামাস্কাস আর জেরুজালেমের মধ্যে যাতায়াত করে মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব ডঃ হেনরী কিসিঞ্জার অবশেষে কূটনীতির একটি নতুন ইতিহাস রচনা করেছেন। মিশর ও ইজরায়েলের মধ্যে সৈন্যাপসারণ সংক্রান্ত চুক্তি হয়ে যাওয়ার পরও গত প্রায় চার মাস ধরে গোলান হাইটস অঞ্চলে সিরিয়া ও ইজরায়েলের মধ্যে লড়াই চলছিল সেই লড়াই বন্ধ করার একটা রাস্তা খুঁজে বের করে আধুনিক কালের ব্যস্ততম কূটনীতিবিদ ডঃ কিসিঞ্জার একটা অসাধ্য সাধন করলেন। রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে গ্রোমিকোও তাঁকে এ বিষয়ে কতকটা সাহায্য করেছেন। জেনিভায় পশ্চিম এশিয়া সংক্রান্ত শান্তি আলোচনায় সিরিয়ার যোগ দেওয়ার পথ এখন প্রশস্ত হল এবং পশ্চিম এশিয়ায় স্থায়ী শান্তির সন্ধানে দীর্ঘ ও কণ্টকময় যাত্রার পথে আর একটি ক্ষুদ্র পদক্ষেপ করা গেল।

সিরিয়া-ইজরায়েল সীমান্তবর্তী এই গোলান হাইটস অঞ্চল নিয়ে দুপক্ষের একটা মীমাংসা করা আদৌ সহজসাধ্য ছিল না। আইনত এই পার্বত্যভূমি সিরিয়ার অধিকারভুক্ত। কিন্তু ইজরায়েল তার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বরাবরই এই অঞ্চলটিকে তার কবজার মধ্যে রাখতে চেয়েছে। এই পার্বত্যভূমি যারই দখলে থাকবে সে বলতে গেলে অন্য দেশের টুঁটিতে হাত রাখতে পারবে। সেই কারণেই এই অঞ্চল নিয়ে দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘ বিরোধ চলে আসছে।

সিরিয়ার দাবী ছিল ইজরায়েল সিরিয়ার মাটি সম্পূর্ণ ছেড়ে চলে যাবে। তার মধ্যে পড়বে ১৯৬৭ সালে ইজরায়েলের দখল করা কুইনেত্রা শহর এবং মাউন্ট হেরমনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পাহাড়ী ঘাঁটি সহ গত অকটোবরের যুদ্ধে দখল করা সমগ্র এলাকা। ইজরায়েল সিরিয়ার কাছে গ্যারান্টি চেয়েছিল যে সে প্যালেস্টাইন গেরিলাদের সংযত রাখবে। শেষ পর্যন্ত যে রফা হয়েছে তাতে স্থির হয়েছে যে ইজরায়েল কুইনেত্রা শহর ও ছয়-সাতটি গ্রাম ছেড়ে আসবে গত অকটোবরের যুদ্ধে দখল করা অঞ্চল সিরিয়াকে ফিরিয়ে দেবে তবে মাউন্ট হেরমনের তিনটি ঘাঁটি নিজেদের দখলে রাখবে। প্যালেস্টাইনী গেরিলাদের সম্পর্কে ইজরায়েল সিরিয়ার কাছ থেকে গ্যারান্টি আদায় করতে পারে নি। সিরিয়ার বক্তব্য প্যালেস্টাইনী গেরিলাদের সমস্যাটা ইজরায়েলেরই সৃষ্টি এবং প্যালেস্টাইনের উদ্বাস্তুদের সঙ্গে এই সমস্যা মিটিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব তেল আভিভকেই গ্রহণ করতে হবে।

চুক্তিতে আরও স্থির হয়েছে যে গোলান হাইটস বরাবর দুই পক্ষেই পরস্পরের কামানের পাল্লার বাইরে সরে যাবে এবং মাঝখানে তৈরী হবে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেনাবাহিনীর প্রহরাধীন একটি মুক্ত অঞ্চল। সিনাইতে মিশর ও ইজরায়েলের মধ্যে যে সৈন্যাপসারণ চুক্তি হয়েছে তাতে অনুরূপ ব্যবস্থা আছে।

এর পর বাকী থাকল পশ্চিম এশিয়ার আর একটি কঠিন সমস্যা। সেই সমস্যা জর্ডান আর ইজরায়েলকে নিয়ে। সেখানে একটি তৃতীয় পক্ষ রয়েছেন। তাঁরা হলেন প্যালেস্টাইনীরা। জর্ডানের অধিকৃত এলাকা থেকে ইজরায়েল যদি সরেও আসে তাহলেও সেই এলাকা কার দখলে যাবে? প্যালেস্টাইনী উদ্বাস্তুদের? অথবা জর্ডানের রাজা হোসেনের? এই প্রশ্নের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত জেনিভা সম্মেলনে জর্ডানের ও প্যালেস্টাইনের প্রতিনিধিদের আসন খালিই থাকবে, আর ওঁদের বাদ দিয়ে পশ্চিম এশিয়ার শান্তির সন্ধান পাওয়ার আশাও সুদূরপরাহত।

৩১-৫-৭৪ পুণ্ডরীক

লোকটি বিচিত্র সুরে কথা বলে লোক জড় করছিল।......

বাইরের মাঠ থেকে ওকে দেখা যায় না। মাইকে গলা শোনা যায়, ভারী সুন্দর, মিষ্টি বলার ভঙ্গি। এই গাজনের মেলায় সর্বত্র,—দোকানপাট, নাগরদোলা এমন কী পশ্চিমের ইস্কুলবাড়ি পর্যন্ত ওর আহ্বান ছড়িয়ে পড়ছে।

জায়গাটা চটের পর্দা দিয়ে ঘেরা। ওরই মধ্যে খেলা দেখানর ব্যবস্থা। দর্শকদের বসবার জন্য বেঞ্চ,...আরো কম পয়সায় মাটির আসন। তাছাড়া খেলার সাজসরঞ্জাম। টেবিল-চেয়ার, ডুগি-তবলা, হারমোনিয়াম তীর-ধনুক ইত্যাদি সব কিছু।

চটের পর্দার বাইরে শালের খুঁটির [illegible] ছোট গেট মতন করা হয়েছে পাশেই টেবিল-চেয়ার পেতে একটি মেয়ে বসে।। সেই টিকিট বিক্রি করছে। কালো রঙের মেয়েটি। স্বাস্থ্যবতী এবং মোটামুটি সুশ্রী বলা চলে। রঙীন কাপড় আর জামা পরনে, চুল বেশ কায়দা করে বাঁধা। পিছনের খোঁপাটা উঁচু আর বড়। চোখে কাজল, কিন্তু দৃষ্টি চঞ্চল, অস্থির।

চটের পর্দার আড়ালে লোকটি তেমনি বিচিত্র সুরে কথা বলছিল। সামনে একটা শালখুঁটির গায়ে এ্যাম্প্লিফায়ারটা বাঁধা রয়েছে। দর্শক আকর্ষণ করে আনবার জন্যই মাইকের ব্যবস্থা। বক্তৃতা শুনে কিছু লোক পায়ে পায়ে এদিকে এগিয়ে আসছে। গেটের পাশে সাজগোজ করা মেয়েটিকে দেখে থমকে দাঁড়াচ্ছে। কেউ টিকিটের পয়সা দিয়ে এটা-সেটা প্রশ্ন করছে। দু-চারজন ভিড় করে শুধু মেয়েটিকে দেখছে, পর্দার ভিতরের খেলার চেয়ে তার আকর্ষণও কিছু কম নয়।

লোকটি বক্তৃতা করছিল,—দেরী করলে এ সুযোগ আপনারা হারাবেন। মাস্টার শম্ভুর এই খেলা শুরু হতে আর বেশী দেরি নেই। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে আমরা আরম্ভ করছি। অল্প কয়েকটি আসন মাত্র ফাঁকা রয়েছে। হ্যাঁ, মনে রাখবেন খেলা শুরু হতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। মাস্টার শম্ভুর শ্রীচরণের খেলা। ভবিষ্যতে এই মেলায় কোনো দিন না আসতেও পারে।'

গেটের ভিতরে ঢুকবার সময় একটি মেয়ে আর একজনকে বলল,—'খেলা দেখায় যে হাতকাটা লোকটা, সে ওই মেয়াটার সোয়ামী। বুঝলি? বরের গলায় রোজ মালা দেয়।'

—তুমি কি করে জানলে?

তরুণী খিল খিল করে হেসে উঠল। শহুরে বাবুদের আমাদের ও তো খেলা দেখাই পয়সা নিয়ে। যে মানুষটা শহরের কথা জানছে, ও হল গিয়ে দলের ম্যানেজার বুঝলে?

টিকিট বিক্রি করতে গিয়ে এক মুহূর্ত থামল মেয়েটি। আড়চোখে তাকাল ওদের দিকে, এক পলকের জন্য। পরক্ষণেই একটা তাচ্ছিল্যের ভাব করে ফের কাজে মন দিল।

খেলা শুরু। মাস্টার শম্ভু এখন দর্শকদের সামনে। পরনে হাফপ্যান্ট আর বুশশার্ট। কোনো দুর্ঘটনায় হাত দুটি কাটা গেছে বেচারীর। হাত নেই, তাই জামার হাত দুটো হাতির কানের মত লটপট করছে। মঞ্চের উপর চেয়ারে মা কালীর ছবি। ছবির গায়ে সিঁদুর মাখানো। কয়েকটি জবা ফুল পড়ে আছে এদিকে সেদিকে।

মাস্টার শম্ভু প্রণাম করল ছবির কাছে এসে। ততক্ষণে গেটের দরজা বন্ধ হয়েছে। পাশে বসে যে মেয়েটি টিকিট বিক্রি করছিল, সে উঠে এল মঞ্চের উপর। মাস্টার শম্ভু হাসল ওকে দেখে। মেয়েটিও হাসল। দর্শকদের মধ্যে পিছনের সারি থেকে কে যেন তীক্ষ্ণস্বরে সিটি বাজাল। তাই শুনে মেয়েদের একজন মাথা ঘুরিয়ে ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠল,—আ মরণ!

মাইকে মুখ লাগিয়ে সেই ম্যানেজার লোকটি তখন বলছিল,—মাস্টার শম্ভুর এই খেলা গ্রামে শহরে বহুজনের প্রশংসা কুড়িয়েছে। ওর খেলা দেখে অনেকে মেডেল দিয়েছেন, টাকা পুরস্কার দিয়েছেন। বাহবা দিয়েছেন। প্রথমে যে খেলাটি আপনাদের দেখানো হবে, সেটা দেখে খুশি হয়ে বাধা-মোহনপুরের জমিদারবাবুর স্ত্রী প্রীতিকণা দেবী একটি সুন্দর শাল দিয়েছিলেন মাস্টার শম্ভুকে।

প্রথম খেলাটি এখন দেখানো হচ্ছে। সেই মেয়েটি এমব্রয়ডারী কাজ করবার জিনিসপত্র এনে রাখল শম্ভুর কাছে। আশ্চর্য কৌশলে সে পায়ের সাহায্যে সুতো পরিয়ে নিল ছুঁচে। তারপর ফ্রেমে বসানো কাপড়ের গায়ে নিপুণভাবে ছুঁচ ফোটাতে লাগল। অল্প কিছুক্ষণ। তারপর মাস্টার শম্ভু দর্শকদের সামনে ফ্রেমে বসানো কাপড়টি

তুলে ধরল। সুন্দর একটি পাখির আকার ফুটে উঠেছে কাপড়ের গায়ে।

—দ্বিতীয় খেলা।' লোকটি বিচিত্র কণ্ঠে ঘোষণা করল। —'এ খেলাটি হল রঙীন কাগজের ফুল তৈরি করা। হাত নেই অবশ্য শম্ভুর। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। সে পা দিয়েই ফুল বানাবে।'

মেয়েটি একটা কাঁচি আর খানিকটা রঙীন কাগজ মাস্টার শম্ভুর পায়ের কাছে এনে রাখল। খানিকটা সরে মঞ্চের এক কোণে সে দাঁড়াল। ম্যানেজার লোকটির দিকে তাকিয়ে ফিক করে হাসল একটু।

অদ্ভুত কৌশল। পায়ে কাঁচি ধরে রঙীন কাগজটাকে নানাভাবে কেটে সুন্দর এক ফুল বানিয়েছে শম্ভু। গ্রাম্য দর্শকের দল বিস্ময়ে থ। পায়ে যাদু আছে নাকি লোকটার? হাত থাকলেও লোকে যা পারে না, দুটো পায়ে মাস্টার শম্ভু সেই ভেল্কি দেখাচ্ছে।

পরের খেলা স্টোভ জ্বালিয়ে চা করে খাওয়া। অবশ্যই পায়ের সাহায্যে। কসরৎ করে পায়ের আঙুল দিয়ে স্টোভে পাম্প দিতে লাগল শম্ভু। কেৎলিটা চাপাল। মিনিট কয়েকের মধ্যেই শোঁ শোঁ। জল তৈরি। তারপর দুধ চিনি মিশিয়ে চায়ের কাপে সে আয়েস করে চুমুক দিল।

মাইকে মুখ রেখে লোকটি বলল,—'এই খেলা দেখিয়ে মাস্টার শম্ভু অনেক জায়গায় পুরস্কার পেয়েছে। বেগমপুর স্কুলের শিক্ষিকা শ্রীমতী প্রভারাণী সরকার ওকে একটি মেডেল দিয়েছিলেন। রুপোর মেডেল। মাস্টার শম্ভুর জামার ডান দিকে সেটি রয়েছে। তাকালেই দেখতে পাবেন।

ছোটখাটো আরো কয়েকটি অনুষ্ঠানের পর শেষের খেলাটি শুরু হল। এটি সব-চেয়ে রোমহর্ষক এবং রীতিমত উত্তেজক। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে ম্যানেজার সাড়ম্বর বর্ণনা দিচ্ছিল খেলার। 'লক্ষ্যভেদ, অর্জুনের লক্ষ্যভেদ। ভাইবোনেরা, মহাভারত নিশ্চয়ই পড়েছেন? অর্জুনের লক্ষ্যভেদের গল্পও শুনেছেন তাহলে। এই খেলায় মাস্টার শম্ভু হলেন গাণ্ডীবধারী পার্থ। লক্ষ্যভেদ তিনি করছেন। তবে তার হাত নেই। শুধু পা দুটি সম্বল। ভগবানের অনেক আশীর্বাদ না পেলে এই অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যায় না। লক্ষ্যভেদের খেলাটি দেখবার সময় আপনাদের বুক হয়তো কেঁপে উঠবে। কিন্তু মাস্টার শম্ভু নির্বিকার। তার কাছে এ ছেলেখেলা, ঢিল ছোঁড়ার মত অনায়াস এবং সহজ।'

আঁটোসাঁটো কাপড়পরা সেই মেয়েটি মঞ্চের মাঝখানে রইল। তার মাথার উপর একটি বড় সাইজের কমলালেবু। সে স্থির ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। নড়াচড়া নয়। ক্যানভাসের গায়ে আঁকা ছবির মত। অবিকল। মাস্টার শম্ভু পায়ে তীর ছেড়ে এই কমলালেবুকে বিদ্ধ করবে। একটু নড়াচড়া হলেই ফ্যাসাদ। তীর কপালে বিঁধতে পারে। কিংবা দেহের অন্যত্র। একটা দুর্ঘটনা অসম্ভব নয়। সেই

আশঙ্কায় দর্শকের চক্ষু স্থির। বুকের কাছে জমাট অস্থিরতা।

—দুঃসাহসিক এই খেলা একমাত্র দুঃসাহসী লোকের পক্ষেই সম্ভব।' মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে ম্যানেজার গ্রাম্য মানুষগুলির নানাভাবে মনোরঞ্জন করছিল। 'হাত থেকেও আমরা যা পারি না, মাস্টার শম্ভু পায়ের সাহায্যে তাই সম্ভব করল। দেখবেন তাঁর কেমন স্বচ্ছন্দে মেয়েটির মাথার কমলা-লেবুটিকে বিদ্ধ করবে। লক্ষ্যভেদ করে অর্জুন লাভ করলেন দ্রৌপদীকে। আর এখানেও লক্ষ্যভেদ হলে এই মেয়েটি হাসি-মুখে মালা পরিয়ে দেবে মাস্টার শম্ভুর গলায়।'

মা কালীর পায়ের জবাফুল ওর মাথায় রাখল লোকটি। ধনুকটা দু-একবার টেনে পরখ করে নিচ্ছে শম্ভু। ওদিকে মেয়েটি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে। মাথায় কমলালেবু। হাতে মালা। সে হাসছে। লক্ষ্যভেদ হলেই শম্ভুর গলায় মালা পরিয়ে দেবে। তার জন্য এখনই তৈরি।

দর্শকেরা স্তব্ধ। মেয়েদের মুখে ত্রাসের রেখা। চোখগুলি বড়। ভয় আর বিস্ময় মিলিয়ে যেমন হয়। মাস্টার শম্ভু পায়ের আঙুলে তীরটা তুলে নিয়ে ধনুকে রাখল। ম্যানেজার লোকটি ফের মাইকে বলল,—'লক্ষ্য ভেদের এই খেলা মাস্টার শম্ভুর সেরা কীর্তি। আপনারা দেখুন, বাড়িতে গল্প করুন। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-কুটুম্ব যারা দেখেনি, কাল তাদের পাঠিয়ে দিন। হ্যাঁ মাস্টার শম্ভু এখন রেডী। ধনুকের ছিলায় টান দিচ্ছে। এইবার এক, দুই—তিন।

আশ্চর্য নিশানা। তীর সবেগে গিয়ে লেবুকে বিদ্ধ করে ছিটকে পড়ল। আর তখনই খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটি। দম দেওয়া পুতুলের মত এগিয়ে এল পা ফেলে। মালা পরিয়ে দিল শম্ভুর গলায়। তারপর কুমারী মেয়ের মত সলজ্জ ভঙ্গিতে এক দৌড়ে পর্দার আড়ালে গিয়ে আত্ম-গোপন করল।

দর্শকদের মধ্যে কে যেন তালি বাজাল। একজন ঢ্যাঙা মতন লোক বলে উঠল—'বাহবা! বলিহারি খেলা মাইরি।' তিন-চার-জন উৎসাহী ছেলে, মেয়েদের মত উলু-ধ্বনি দিল।...

* * *

খেলা শেষ। মঞ্চের উপর বসে হিসেব নিকেশ করছিল ওরা। মাস্টার শম্ভু, দলের ম্যানেজার নিবারণ আর সেই মেয়েটি। এখন অঙ্গের বসন আঁটসাঁটো নয়। অনেক শিথিল। উঁচু খোঁপাটা ভেঙে চুলের রাশ পিঠের উপর ঝোপের মত জড় হয়ে আছে। খেলা শুরুর আগে চোখে কাজল পরেছিল। তার খানিকটা কালি চোখ রগড়ানোর জন্য গালে লেগেছে।

শম্ভু বলল,—'নিবারণদা, সেল কেমন ভালো হয়েছে। কি বল?'

—ভালো বৈকি। তিনশো পেরিয়ে

ছাপ্পান্ন টাকা বারো আনা বিক্রি। খরচপত্র বাদ দিলেও মন্দ থাকে না। তবে আর কয়েকটা দিন।'

মেয়েটি পয়সাগুলো গুনে বাকসে রাখছিল। সে মুখ তুলে বলল,—'মেলার তো আর তিনটে দিন বাকি। এরপর কোথায় যাবে?'

—'কিছুদিন এখন শহরে গিয়ে ডেরা পাততে হবে।'

নিবারণ জানাল। 'ইদিকে আর মেলা-টেলা নেই। দিন দশ বাদে তাড়াতাড়ি গাঁয়ের বুধমেলায় হাজির হচ্ছি। সেখানে সাত দিন। তারপর—'

—'তারপর কোথায় গো?' মেয়েটির কৌতূহলের যেন শেষ নেই।

—'কোথায় আবার?' মাস্টার শম্ভু নিজেই জবাব দিল। 'বৈশাখের শেষে জোড়া-তোড়ে ধর্মরাজের মেলা। তাড়াতাড়ি থেকে সোজা সেখানে গিয়ে উঠব।'

বিক্রির টাকাটার বখরা হয়। খরচপত্র বাদ দিলে যা থাকে তার দশ আনা অংশ শম্ভুর। চার আনা পায় নিবারণ। আর বাকি দু-আনা ঝুমনি,—অর্থাৎ ওই মেয়েটির। নিবারণ অবশ্য তা বলে না। ঝুমনিকে আড়ালে পেলে মস্করা করে। বলে,—বারো আনা তোদের স্ত্রী-পুরুষের। সিকি হল আমার।'

ঝুমনি ফোঁস করে। 'আহা! কথার কী ছিরি। রোজ গলায় মালা পরিয়ে দিচ্ছি। তাই বলে আমি শম্ভুর বউ হয়েছি নাকি?'

কথাটা অবশ্য ঠিক। ওরা স্বামী-স্ত্রী নয়। কিন্তু ভবিষ্যতে তেমন একটা নিশ্চিত সম্ভাবনা আছে। অন্তত মাস্টার শম্ভু তাই জানে। প্রথম যখন খেলা দেখাতে শুরু করে, তখন ঝুমনি দলে ছিল না। দল শুরু দুজনকে নিয়ে। মাস্টার শম্ভু আর নিবারণ। দুজনের দল।

জক্ক্যাডেদের খেলা তখন চালু হয়নি। বক্রেশ্বর গাঁয়ের মেলায় ঝুমনি তাদের দলে এসে জুটল। ঠিক দলে নয়। মা-বাপ মরা অনাথা মেয়ে। খাওয়া-পরা জোটে না। এসে আশ্রয় চাইল নিবারণের কাছে।

নিবারণ বলল,—'মেয়েটা থাকতে চায়। দলের সঙ্গে থাকুক। কি বল শম্ভু?'

শম্ভুর অবশ্য আপত্তি ছিল। 'অত বড় মেয়ে নিবারণদা। দু-বছর বাদে আরো ডাগরডোগর হবে, তখন?'

নিবারণ গায়ে মাখেনি ওর কথা। শেয়ালের মত ধূর্ত চোখ শম্ভুর চেয়ে অনেক বেশী বোঝে। পাকাপোক্ত বুদ্ধি। সে হেসে বলল,—'ডাগর ডোগর মেয়েরও তো দরকার আছে। ভালো করে দ্যাখ দিকি। মেয়েটাকে মনে ধরে?' একটু থেমে আবার বলল—'ওর সঙ্গে বিয়ে দেব তোর। কালী-ঘাটে নিয়ে মালাবদল আর সিঁদুরদান হবে। তোর দেখাশুনো করতে দলে একটা মেয়ে চাই বৈকি। সেবাযত্ন করবে। জামাকাপড় কাচবে। জিনিসপত্র গুছিয়ে দেবে।'

সেই থেকে দলে আছে ঝুমনি। যখন এল, তখন রোগা হাড় জিরজিরে চেহারা। কিন্তু দু-বছর নয়। ছ-মাসের মধ্যেই অন্য মূর্তি। খেয়েপরে বর্ষার ঝোপের মত ফুলে ফেঁপে উঠল শরীর। চোখের দৃষ্টি, ঠোঁটের হাসি,—সব ইস্পাতের ছুরির মতো ধারালো মনে হয়। এখন হাবেভাবে, চলনে-বলনে গাজনের মেলার হ্লাদোদলের রানীর মত গরবিনী ভঙ্গি।

বক্রেশ্বর থেকে কীর্ণাহার। সেখান থেকে জামতোড়। তারপর পুরুলিয়ার রাসমেলায়। বিয়ের কথা মুখেই বলেছে নিবারণ! কাজে এগোয় নি। সময় কই? তবু শম্ভু তুলেছিল কথাটা। 'কালীঘাটে না কোথায় যেন আমাদের নিয়ে যাবে বলেছিলে নিবারণদা?'

ইঙ্গিত বুঝে মুচকি হাসে নিবারণ। বলে,—'দাঁড়া কিছুদিন। মেয়েটা বড়সড় হোক। হাতের কাছে ময়নাপাখি তো রইল। বিয়ে দিতে কতক্ষণ লাগে? ক্যাবলাচন্দরা ঝুমনির দেহটার দিকে তাকিয়ে ফের হাসে।'

আমতা আমতা করে শম্ভু উত্তর দেয়। 'তা এখনই কম বড় কি? বেশী দেরী হলে আবার কোনো দোষের—'

—'কিছু দোষের হবে না।' নিবারণ বাঁকা হাসল। 'তোর দেখছি তর সইছে না শম্ভু।'

শম্ভু লজ্জা পেল। বলল,—'না, তর সইবে না কেন? এমনি মনে হল। তাই বল-ছিলাম।'

নিবারণ সান্ত্বনা দেবার ঢঙে বলে,—'মনে করলেই বউ। বুঝলি শম্ভু, নিজের ভাবলেই পীরিতের রস। নইলে সাত পাকে ঘোরালেও বিয়ে করা বউ আপন হয় না। ঢের দেখলাম।'

খাওয়া দাওয়া শেষ। নিস্তব্ধ মেলা। দোকানপাতি যাদের, তারা ঝাঁপ বন্ধ করে ঘুমোবার উদ্যোগ করছে। চৈত্র মাসের শেষ। বেশ গরম। লোকে বিছানা পেতে বাইরে শুয়েছে। বহুদূরে কোন অপ্সরালোকের উদ্যানে একরাশ উজ্জ্বল নক্ষত্রফুল মাথার উপর ফুটে রয়েছে। আবছা অন্ধকারে ঘুমন্ত গ্রাম,—খড়ো ঘরের সারি সারি চাল অস্পষ্ট চোখে পড়ে।

খেলা দেখানর মণ্ডটার উপর শুয়েছিল শম্ভু। রোজ শোয়। নিবারণের গরম সহ্য হয় না। সে বালিশ আর মাদুর পেতে খড়-চালার সিমেন্টের মেঝের উপর ঘুমোয়।

গরমে ছটফট করছিল শম্ভু। উঠে একটা বিড়ি ধরাবে ভাবল। কিন্তু দেশলাই? পায়ের তলায় মাদুরের নীচে থাকার কথা। কিন্তু নেই। বোধহয় নিবারণ নিয়ে গেছে। দাঁতের সাহায্যে ঠোঁট চেপে শম্ভু একটা বিরক্তিসূচক অশালীন মন্তব্য করল। তারপর বিছানা থেকে উঠে সোজা ভিতরে এল। চটের পর্দা ঘেরা ছোট্ট একটা কামরার মধ্যে।

সেখানে ঝুমানি শোয়া। দুঃসহ গরম। কষ্ট হয় খুব। কিন্তু উপায় কি? ভরা কলসীর মত যুবতী মেয়েমানুষ, ও কি বাইরে মাদুর বিছিয়ে শুতে পারে? অসাড়ে গায়ের কাপড় সরে গেলে কত লজ্জার কথা।

—ঝুমানি, ঘুমিয়েছিস নাকি?' শম্ভু প্রশ্ন করল।

—ঘুম আসে নি।' ঝুমানি ছোট্ট জবাব দিল।

—উঠে দেশলাইটা খুঁজে দে আমাকে।'

—কেন? বিড়ি খাবে নাকি?'

শম্ভু চুপ করে রইল।

দেশলাইটা খুঁজে পেতে সময় লাগল ঝুমানির। ঘরের মধ্যে অন্ধকার। জিনিসপত্রের স্তূপ। হাতড়ে হাতড়ে বেশ কিছুক্ষণ পর দেশলাইটার হদিশ পেল। বেরিয়ে এসে দেখল শম্ভু ফের বিছানায় শুয়ে পড়েছে।

—দেশলাই খুঁজছিলে যে।' ঝুমানি কাছে এসে দাঁড়াল।

—হ্যাঁ। তুই এদিকে আয়। এখানে বস। শম্ভু তেমনি শুয়ে রইল।

বাধ্য মেয়ের মত ঝুমানি এসে বসল। ঠিক বিছানার উপরে নয়। একটু সরে,—একপাশে।

—বিড়িটা মুখে বসিয়ে দে।' শম্ভু আদেশ করল।

ঝুমানি হাসল। 'কেন গো? তোমার তো পা রয়েছে। মাস্টার শম্ভুর শ্রীচরণ।'

—'ঠাট্টা করছিস?' শম্ভু হেসে বলল। 'এই দুটি শ্রীচরণের দৌলতেই তোদের শ্রীহস্তের কাজ চলছে।'

—'তা বটে বাপু।' ঝুমানি ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

দেশলাই জ্বালিয়ে বিড়ির মুখে আগুন রাখল ঝুমানি। শম্ভু বার দুই তিন টেনে ঠিকমত ধরিয়ে নিল। বলল,—'আমার মাথাটা টেপ দেখি একটু। হাত বুলিয়ে দে কপালে। যদি তাহলে ঘুম আসে।'

—'তুমি গরমটায় কেন শোও? নিবারণ-দার সঙ্গে বাইরে গেলে পার। ঠান্ডা হাওয়ায় তাড়াতাড়ি ঘুম আসবে।'

মানুষটাকে ভয় বা অস্বস্তি লাগে না ঝুমানির। হাত দুটো নেই বলেই বোধহয়। হাত-অলা মানুষগুলোর জ্বালা বেশী। সুবিধেমত আওতার ভিতরে পেলেই টানা-টানি করবে। ঝুমানি জানে, শুনেছে কত।

—'আমাদের বিয়ের কথাটা এবার বলব নিবারণদাকে। বুঝলি ঝুমানি?' শম্ভু মৃদু-কণ্ঠে বলল।

ঝুমানি উত্তর দিল না। আগের মতই কপাল টিপতে লাগল।

—'বিয়ের সময় কি গয়না নিবি বল? আমার অনেক টাকা জমেছে। ভাবছি এখন থেকেই গড়িয়ে রাখব।'

ঝুমানি সলজ্জভাবে হাসল একটু। বলল,—'অনেক রাত হল। তুমি ঘুমোও এবার। আমি শুই গিয়ে।'

—'বস না কেনে একটুক।' শম্ভু অনুরোধ করল। হাত থাকলে হয়তো ঝুমানির হাতের আঙুলগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করত। আদর করত। তার উপায় নেই। মুখে বলল,—'তোর হাতটা আমার বুকের উপর রাখত ঝুমানি।'

—'ধ্যেৎ! ভীষণ লজ্জা করে আমার।' ঝুমানি মুখ ফিরিয়ে হাসল।

আরো কিছুক্ষণ পরে শম্ভুর পাশ থেকে সে উঠে এল। বাইরেটা বেশ ঠান্ডা। ফুর-ফুরে একটু বাতাসের ঢেউ তার গায়ে ক্ষণিকের জন্য শীতল স্পর্শ বুলিয়ে গেল। রাত্রির কত হবে কে জানে? একটা কিংবা দুটো হতে পারে। অন্ধকার আকাশে নক্ষত্রের ঠাঁই দেখে সে সময়ের একটা আন্দাজ করবার চেষ্টা করল।

চট দিয়ে ঘেরা নিজের কামরার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল ঝুমানি। গাঢ় অন্ধকারে নিঃশব্দে একটি অগ্নিবিন্দু জ্বলছে। তারই জন্যে প্রতীক্ষা করছে লোকটা। ঝুমানির ভীষণ ভয় করল। শম্ভু যদি এখনও জেগে থাকে।

মুখের বিড়িটা পটকাবাজির মত দূরে নিক্ষেপ করে সে ধীরপায়ে তার কাছে এল। প্রশ্ন করল,—'শম্ভুর কাছে গিয়েছিলি?'

—হ্যাঁ।' ঝুমানি মুখ নীচু করে জবাব দিল। বলল, —দেশলাই খুঁজছিল। আমাকে ডেকে নিয়ে গেল।'

লোকটা হাত বাড়িয়ে তার বাহুমূলে চেপে ধরল। তাকে আকর্ষণ করল। সবলে বুকের সঙ্গে আবদ্ধ করে গালে, ঠোঁটে কয়েকবার চুমু খেল। ঝুমানি প্রথমটা ঝড়ের পাখির মত অসহায়, তারপর এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, —ছি, ছি বেহায়া কোথাকার। শম্ভু জেগে রয়েছে না?'

—শম্ভুকে অত ভয় কিসের?' লোকটা ঈষৎ শ্লেষের সঙ্গে বলল। 'তুই কি ওর বিয়ে করা পরিবার?'

'—হ্যাঁ, পরিবার। তাই হব।' ঝুমানি আহত সাপিনীর মত হিসহিস করে উঠল। বলল,—'তুমি তো ওর সঙ্গে বিয়ে দেবে না আমার। নইলে মালাবদল করে হয়ে রেখে। তোমার মতলব বুঝি না আমি?'

জোঁকের মুখে যেন নুনের ডেলা পড়ল। লোকটা মুহূর্তে চুপ। হার মানল। গলা দিয়ে কথা বেরোল না।

ঝুমানি দেমাক করে শোনাল,—'বিয়েরই কথা শম্ভু বলছিল আমাকে। কি গয়না পছন্দ জানতে চাইছিল। শীগগীর গড়িয়ে রাখবে।'

—'তাহলে গয়নার কথা শুনেই মজেছিস বল?' লোকটা অন্ধকারে একটা হিংসুটে বিকৃত শব্দ করল। বলল—তা শম্ভুর পয়সা হয়েছে। সোনার গয়না গড়াতে পারে বৈকি। তখন তোর মত কত মেয়ে ছিচরণের দাসীবাঁদী হতে চাইবে।'

রাগে ফুলছিল ঝুমানি। কিন্তু সে কোনো কথা বলার আগেই লোকটা দ্রুতপায়ে অন্ধ-কারে মিলিয়ে গেল।

সকালে নিবারণ [illegible] গল্প করছিল। হ্যাঁ, শম্ভুর নাম-ডাক হয়েছে বটে। মেলার লোক ধন্যি ধন্যি করছে। বিশেষ করে তোমার ঐ লক্ষ্যভেদের খেলাটা। বলে কি, শেষ না হওয়া পর্যন্ত বুকের ভিতরটা যেন ধুকপুক করে। খেলার নামে লোকে অজ্ঞান রে ঝুমানি। তুই কি বলিস?

—বাস রে। আমি আবার কি বলব? হাত না থেকে এত নাম-ডাক। থাকলে না জানি কি—মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ঝুমানি খিলখিল করে হাসল।

বিকেলটা মরতে বসেছে। সূর্য ডুবতে দেরি নেই আর। সেনপুকুরের ওধারে প্রকান্ড বটগাছটার পিছনে সূর্য আড়াল হচ্ছে। আর একটু পরেই খেলা শুরু হবে। কিন্তু কি যেন হয়েছে শম্ভুর। মুখ ভার। কেমন কোদালে কোদালে দৃষ্টি। যেন ছাইয়ের আড়ালে চাপা আগুন রয়েছে।

সমস্ত দুপুর তীরের ফলাটা শানপাথরে ঘষছিল শম্ভু। আরো তীক্ষ্ণ, আরো ছুঁচোলো করে তুলছে। ঝুমানি ঠাট্টা করল,—

'অস্ত্র ধরছ কেন? তীর মেরে কাউকে শেষ করতে চাও নাকি?'

কিন্তু শম্ভু চুপ। সে কোনো উত্তর দিল না।

জমজমাট মেলা। হ্যাসাক জ্বলছে দোকানে। একদল সাঁওতাল মেয়ে এসে নাগর-দোলায় বসল। পাক শুরু হতেই ওরা সুর করে গান গাইছে। মনোহারী স্টোরের ছোকরা দোকানী যুবতী বউটির হাতে চুড়ি পরানোর ফাঁকে, তার কাঁচ চলচলে মুখখানা আড়চোখে দেখে নিল। যে লোকটি পাঁপড় বেচছিল, সে হঠাৎ তাকিয়ে দেখল তার ঝুড়ি শূন্য হয়ে এসেছে।

নিবারণ একবার বলল,—'কি হয়েছে রে শম্ভু? শরীরটা খারাপ নাকি?'

—'না, শরীর খারাপ কিসের? বেশ তো আছি।'

—'তবে? শরীর ভাল, ইদিকে মুখ ভার। সেটা কি মনের জন্যে?'

বিরক্ত হয়ে শম্ভু বলল—'মেলা ফ্যাচ-ফ্যাচ করনি বাপু।

নিবারণ রসিকতা করল,—'বিয়ের কথা শুনে মন হল উদাসী। তাই নারে শম্ভু?' ফের বলল,—'আর তো কটা দিন মধ্যে। মেলার শেষ হলেই কলকাতায় যাব। সেখানে কালী-ঘাটে তোদের মালাবদল করে বিয়ে হবে।' নিবারণ যেন ছেলের বায়না মেটাতে মিণ্টি মোয়ার লোভ দেখাল।

খেলা শেষ হয়ে আসছে। শুধু লক্ষ্যভেদ বাকি। তীর ধনুক নিয়ে তৈরি শম্ভু। মালা হাতে ঝুমনি দাঁড়িয়ে। তার মাথায় কমলা-লেবু। আর কয়েক সেকেন্ড। তারপরই লক্ষ্য-ভেদ। তীর মাটিতে পড়বে। ফলার মুখে লেবুটি নিয়ে।

হঠাৎ ভীষণ হৈ চৈ। প্রথম সারি থেকে কে চেঁচিয়ে উঠল। তারপর দ্বিতীয় সারির লোক। শেষে সব দর্শক। অন্য কিছু নয়। লক্ষ্যভেদ করতে পারেনি শম্ভু। তীর ব্যর্থ। কপালের নীচে গলার পাশ দিয়ে চলে গেছে। ঝুমনির অঙ্গ স্পর্শ করেনি, তাই রক্ষে।

নিবারণ অবশ্য ওর বিচিত্র ভঙ্গিতে নানা কথা বলে শান্ত করল সকলকে। ভুল,—নিশানার ভুল। মানুষের চোখ তো। অনেকটা রাত হয়েছে। অন্ধকারও বেশী। হ্যাসাকের আলোটা আজ তেমন পরিষ্কার নয়। কি যেন দোষ হয়েছে বাতিটার। নইলে দশদিন ধরে তো লক্ষ্যভেদ করছে। হঠাৎ আজকের খেলায় নিশানা ভুল হবে কেন?

ঘুটঘুটে অন্ধকার। সম্ভবত অমাবস্যা। মঞ্চের উপর ঘুমিয়েছে শম্ভু। রোজ যেমন শোয়। লম্বা টান টান ভঙ্গি। পাশ ফিরে শুতে পারে না বেচারী। বাহুমূল থেকে দুটো হাত কাটা। তাই চিৎ হয়ে ঘুমোয়। বড় বড় নিশ্বাস নিচ্ছে এখন। বুকটা কামারের হাপরের মত উঠছে, নামছে। অন্ধকারে কখন এসে দাঁড়িয়েছিল ঝুমনি। কী দেখছিল সেই জানে। নিঃশব্দে লঘু পায়ে ফিরে গেল। শম্ভু টের পেল না।

পিঠের উপর কোমল অথচ উষ্ণ একটি হাতের স্পর্শ পেয়ে নিবারণ তাকাল। অন্ধ-কারে ঘুম থেকে উঠে ঠিক বুঝতে পারেনি। তারপর মুখের রেখা, শরীরের ছাঁদ, পরণের কাপড়টার দিকে চোখ পড়তেই সে উঠে বসল।

তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল ঝুমনি। মুখে আঙ্গুল রেখে ইশারায় কথা কইতে নিষেধ করল।

ঠিক নিশিপাওয়া মানুষের মত হাঁটছিল নিবারণ। সামনে ঝুমনি চলেছে। সম্মো-হিতের মত সে পিছনে। গাজনের মেলা ছাড়িয়ে প্রায় গ্রামের বাইরে এসে মেয়েটা থামল।

—'কী মতলব বল দেখি তোর।' নিবারণ ভুরু কুঁচকে তাকাল। শম্ভুরই বা এত রাগ-রোষ কিসের? মিছিমিছি লক্ষ্যভেদের খেলাটা মাটি করল।'

—'রাগ কিসের বুঝতে পারনি?' ঝুমনি হাসল। অন্ধকারের মত দুর্জ্ঞেয় হাসি' ফিসফিস করে বলল—'রাত্তিরে আমার কাছে তুমি এসেছিলে, সে কথা উ জানতে পেরেছে।'

নিবারণ অপরাধীর মত মুখ করে উত্তর দিল—'তা আমি তো বলেছি। মেলাটা শেষ হলে কালীঘাটে যাব। সেখানে মালাবদল করে বিয়ে হবে তোদের। তারপর সিঁদুর দান।'

অন্ধকারে খিলখিল করে হেসে উঠল ঝুমনি। রঙ্গিনী নায়িকার মত, চোখের একটা তেরছা ভঙ্গি করে বলল,—'মালাবদল হবে কেমন করে? শম্ভুর কি দুটো হাত আছে?'

নিবারণ এক দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কি বলতে চায় ঝুমনি? শম্ভুর হাত নেই। রাতদুপুরে এই কথাটা বলতে তাকে এতদূর টেনে এনেছে? নিজে এত চালাক চতুর পাকা শক্ত লোক। কিন্তু এই যুবতী মেয়েটা যেন তার বুদ্ধির অতীত। নিবারণ কিছুতেই ওকে বুঝতে পারছে না।

তবু সাহস করে সে হাত বাড়িয়ে ওকে কাছে টেনে আনল। আশ্চর্য! কাল রাত্তিরে ঝুমনি এক ঝটকায় তার বাহুপাশ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছিল। দেমাক করে শম্ভুর সঙ্গে বিয়ের কথা শুনিয়েছিল। আজ ... একতাল কাদার মত মেয়েটা ... শরীরের সঙ্গে লেপটে আছে। কোনো ... নেই। নিবারণ ওকে ইচ্ছেমত ভাঙতে ... গড়তে পারে।

একটু ইতস্তত করে বলল নিবারণ,—'তুই ভুল করলি বুঝলি। নাই বা হাত থাকল। শম্ভুর কত পয়সা। নাম-ডাক। ওকে বিয়ে করলে সুখে থাকতিস।'

নিবারণের হাত দুটো সাঁড়াশীর মত চেপে বসেছে ওর নরম দেহে। কী জোর দুটো হাতে। যেন লোহার তৈরি। ঝুমনি চোখ বন্ধ করে বলল,—'শম্ভু ঘুমোচ্ছে। চল পালিয়ে যাই এখান থেকে।'

—'পালিয়ে যাব?'

—'হ্যাঁ।' ফিসফিস করে বলল ঝুমনি। 'মানুষটাকে বিশ্বাস নেই। এখন ক্ষ্যাপা বাঘ। আজ ভয় দেখিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু কাল আর নয়। ছিচরণের তীর দিয়ে গেঁথে ফেলবে।'

প্যাট্রিক হোয়াইটের দেশ ও তার সাহিত্য

—আদিত্য ওহদেদার

অস্ট্রেলিয়ার প্যাট্রিক হোয়াইট সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়ে তাঁর দেশ ও তার সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল জাগিয়ে তোলেন।

দেশ ও জাতি হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার পরিচয় অতি অল্পদিনের। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজরা এই দেশের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে। ওরা এর নাম দেয় 'নিউ হল্যান্ড'। কিন্তু ওই পর্যন্ত। দেশের ভেতরে ঢোকা সম্ভব হয় নি, বসবাস তো দূরের কথা। তাদের অভিজ্ঞতায় ওখানকার আদিম অধিবাসীরা ভয়ঙ্কর হিংস্র ও নিষ্ঠুর ঠেকে।

আরো একশ বিরাশি বছর পরে, অর্থাৎ ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে শুরু হয়েছে আজকের অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু তার আরম্ভের ইতিহাসটা কলংকজনক।

১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শৃংখল থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করলে ইংরেজরা যে সব মুস্কিলে পড়ে তার মধ্যে একটা হল এই।— এতদিন দ্বীপান্তর বা দীর্ঘমেয়াদে দণ্ডিত অপরাধীদের আমেরিকায় চালান করা হচ্ছিল। এখন তা আর সম্ভব হল না। অথচ এই রকম অপরাধীর সংখ্যা যথেষ্ট, কারণ তখন ছিল লঘু পাপে গুরু দণ্ডের ব্যবস্থা। দেশের জেলগুলিতে স্থান সংকুলান হয় না। অতএব অন্য উপায় স্থির করার প্রয়োজন দেখা দিল।

ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন কুক নিউ হল্যান্ডের পূর্বদিকের উপকূল ভূমি পরিদর্শন করে এসেছেন। তাইতেই দিশা পাওয়া গেল। গুরুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদের এবার থেকে স্থান হবে ওই নতুন দেশে। প্রথম কিস্তি হিসেবে পাঠানো হল জাহাজ ভর্তি করে ৭৫০ জন অপরাধীকে। সঙ্গে থাকল ৪৩০ জন নাবিক ও অফিসার। আর দেওয়া হল ৭টা ঘোড়া, ২টো ষাঁড়, ৫টা গোরু, ৪৮টা ভেড়া ও ছাগল ৭৪টা শুয়োর, ২৯১টা নানা জাতের মুরগি। আর ৫টা খরগোস।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি এই জাহাজ অচেনা এক মহাদেশের তীরে নোঙর করল। সূত্রপাত হল সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক নতুন দিগন্তের।

যেখানে বসবাস শুরু হল সে জায়গার নাম 'বটানি বে'। এই নামেই গোটা দেশকে তখন চিহ্নিত করা হতে লাগল। নিউ হল্যান্ড নাম স্বভাবতই বাতিল হয়ে গেল।

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন ফ্লিন্ডার্স মহাদেশটির নাম 'অস্ট্রেলিয়া' রাখার প্রস্তাব দেন। সরকারিভাবে এ নাম গ্রহণ করা হয় ১৮১৭ সালে। তবে তা চালু হয় ১৮২০-র দশকে।

অস্ট্রেলিয়ার সৃষ্টি, অতএব ইংরেজদের এক নতুন উপনিবেশ হিসেবে। যারা বাস করতে লাগল—বরং বলতে পারি, যাদের বাস করতে বাধ্য করা হল—তাদের ভাষা ইংরেজি। ইংলন্ডের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের আবহাওয়ায় তারা মানুষ। তারা রাতারাতি বদলে যাবে, এমনটা সম্ভব নয়। তারা এই নতুন দেশে পেল প্রতিকূল জলহাওয়া— কাঠফাটা রোদ, ঘেমো গরম, ঊষর মাটি, ধু ধু মরু ও আধা মরু, ভয়াবহ নির্জনতা। এমন দেশে বসত করতে হল। তার জন্যে যে পরিশ্রম, কষ্টসহিষ্ণুতা এবং তারই সঙ্গে উদ্যম-উদ্ভাবন, জীবনযাপনের নতুন ব্যবস্থা—এ অভিজ্ঞতা স্বদেশে লভ্য ছিল না। তবে তাদের অধিকাংশের কাছে এ অভিজ্ঞতা সুখদ ঠেকে নি। তাদের ভালো লাগে নি এই দেশটাকে। জলের মাছ ডাঙায় থাকার অস্বস্তি ও পীড়ন তারা সারা জীবন ভোগ করছে।

কিন্তু তাদের সন্তান সন্ততি, তাদের উত্তর পুরুষ, এরা অস্ট্রেলিয়াকে চিনল নিজেদের মাতৃভূমি হিসেবে। এবং স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে জেগেছে মাতৃভূমির প্রতি মমত্ববোধ। উপরন্তু, য়ুরোপ তথা অবর ভূখণ্ড থেকে বহু যোজনের দূরত্বজনিত বিচ্ছিন্নতা এই মমত্ব-বোধকে তীব্র করে তুলেছে। দেশের বিশিষ্ট প্রকৃতি এবং সেই প্রকৃতি-নির্ভর জীবন-ধারণ ও ক্রিয়াকলাপ একটা নিজস্বতা, একটা বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করল। একাকী বাইরের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক বিস্তীর্ণ ঊষর দেশে নানা প্রতিকূল অবস্থায় ও ভয়ঙ্কর নির্জনতার মধ্যে বসবাস করতে গিয়ে তারা অর্জন করেছে আত্মনির্ভর প্রত্যয় ও যূথবদ্ধ জীবনচর্চা। এই নিজস্বতা, এই বৈশিষ্ট্য থেকে জন্মেছে অস্ট্রেলীয় জাতিবোধ। ১৮৫০ সাল থেকে এই জাতিবোধ পায় স্বতঃস্ফূর্তি। জাতি-বোধের অনুপ্রেরণা জাগ্রত করল বিরাট কর্মযজ্ঞের উন্মাদনা। চলল সবদিক দিয়ে দেশ গড়ার কাজ। সৃষ্টি হতে লাগল নানা গ্রাম, জনপদ, শহর। কৃষ্টি ও শিল্পের উন্নতি। এই আমাদের দেশ, এখানে আমরা এক নতুন জাতি, আমাদের নতুন রাষ্ট্র— এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হল এখানকার অধিবাসীরা।

কিন্তু একটা বেতালা সুরের জটও রইল। একদল বাসিন্দার কাছে এই দেশটা বিদেশ হয়েই থাকল। তারা এখানে যেন প্রবাসী। তাদের আসল দেশ হল ইংলন্ড। লন্ডন হল তাদের মক্কা। ক্ষীণ হলেও এই সুর আজকের অস্ট্রেলিয়াতেও বর্তমান। এমন অনেকে আছেন যাঁরা ইংলন্ডে বসবাস করতে পারলে মোক্ষলাভের চরিতার্থতা বোধ করেন। কিছু লেখকদের মধ্যেও এই প্রবণতা আছে।

* *

ওপরে যা বলা হল তা অস্ট্রেলিয়ার সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিতির পক্ষে প্রয়োজন। এই সাহিত্যের প্রকৃতি ও পর্ব-পরম্পরা বুঝতে সহজ হয়।

অস্ট্রেলিয়ার সাহিত্যকে মোটামুটি চারটি কালানুক্রমিক পর্ব বা যুগে ভাগ করা যায়।

প্রথম পর্ব হল ১৭৮৮ থেকে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই পর্বের সাহিত্যকে বলতে পারি অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী ইংরেজদের রচিত সাহিত্য। কারণ এই সময়ে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের কোনো নাড়ির টান ছিল না এই দেশের সঙ্গে নতুন একটা দেশে এসে বসবাস করলে যে মেজাজ, যে প্রতিক্রিয়া, কিংবা যে কৌতূহল জাগে তারই বশে রচিত হয়েছে এই সময়কার সাহিত্য। এ সাহিত্যের বেশির ভাগই তাই বাহ্য বিবরণমূলক।

সব দেশের সাহিত্যে যা দেখা গেছে, অস্ট্রেলিয়ার সাহিত্যেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। অর্থাৎ সাহিত্যের প্রথম প্রকাশ ঘটেছে ছন্দোবদ্ধ ভাষায়। যদিও গদ্য তখন সাহিত্যের মাধ্যম হিসেবে রীতিমত প্রবল।

বসবাসের শুরুতেই মাইকেল রবিনসন (১৭৪৭-১৮২৬) নামে এক দণ্ডিত ব্যক্তি যিনি তখন মুক্তিপ্রাপ্ত—প্রতি বছর ইংলন্ডে-শ্বরের জন্মতিথি উপলক্ষে কবিতা রচনা করে আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠ করেন ওখান-কার পুরসভায়। ওগুলি ছাপা হত ওখান-কার 'গেজেট'এ। ১৮১০ থেকে ১৮২১ সাল পর্যন্ত এই ভদ্রলোক এইভাবে কবিতা লিখে অনেকটা যেন রাজকবির ভূমিকা পালন করেন। ঐতিহাসিক দিক থেকে এই কবিতাগুলি হল অস্ট্রেলিয়ার সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন।

তবে বই আকারে প্রথম যাঁর লেখা বার হয় তাঁর নাম ব্যারণ ফীল্ড (১৭৮৬-

১৮৪৬) ইনি ছিলেন প্রথিতযশা চার্লস ল্যান্মের বন্ধু। অস্ট্রেলিয়ায় আসেন সুপ্রিম কোর্টের জজ হিসেবে। তাঁর এই বইটি কবিতাগ্রন্থ। ১৮১৯ সালে সিডনি থেকে প্রকাশিত হয়। বইয়ের নাম, 'অস্ট্রেলীয় কবিতার প্রথম ফসল'। দুটি বড় মাপের কবিতা নিয়ে এই ফসল। প্রথম কবিতার বিষয়বস্তু ওখানকার তরুলতা। দ্বিতীয় কবিতার প্রেরণা ক্যাঙারু। কবির চোখে ক্যাঙারু হল অস্ট্রেলিয়ার প্রতীক।

বইটির দ্বিতীয় সংস্করণে আরো কয়েকটি কবিতা সংযোজিত হয়। একটি কবিতায় ফীল্ড ব্যক্ত করেন যে এ দেশের প্রকৃতি নিতান্তই গদ্যময়, এখানে রঙ নেই, গন্ধ নেই, গান নেই। এর মাটিতে নেই অতীতের কোনো ছাপ। তৎকালে এই দৃষ্টিতে এদেশকে অনেকেই দেখেছেন।

অস্ট্রেলিয়ার কথাসাহিত্যে প্রথম সৃষ্টি হল একটি উপন্যাস। ১৮৩১ সালে তিন খণ্ডে প্রকাশিত। উপন্যাসটি আত্মজীবনীমূলক। হেনরি স্যাভেরি (১৭৯৩-১৮৪২) নামে এক দণ্ডিত ব্যক্তি এর লেখক। স্যাভেরি তাঁর নিজেরই জীবন—তাঁর বাল্যকাল, শিক্ষা, কার্যকলাপ বিবাহ, জালিয়াতি, প্রতারণার দায়ে অভিযুক্ত হওয়া ও তার বিচার—সবই উক্ত উপন্যাসের নায়কের মাধ্যমে বিবৃত করেছেন। সেকালের অপরাধ-জীবন ও তৎসংক্রান্ত দণ্ড-বিচারের ইতিকথা হিসেবে উপন্যাসটির মূল্য আজও আছে।

এই যুগের শেষভাগে যাঁরা সাহিত্যচর্চা করেছেন তাঁদের অনেকেই অস্ট্রেলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। এঁরা হলেন অস্ট্রেলিয়াবাসীদের দ্বিতীয় পুরুষ। এঁদের মধ্যে চার্লস হার্পার (১৮১৩-৬৮) বিখ্যাত। ইনি এদেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং দেশ ছেড়ে এক পাও নড়েন নি। এরই ফলে সম্ভবত জন্মভূমির দৃশ্যাদি ভালো লাগার দৃষ্টিতে দেখতে পেরেছেন। জ্যৈষ্ঠের দুপুরে অস্ট্রেলিয়ার বনভূমি-নামে দীর্ঘ কবিতাটি তাঁর কবিকৃতির নিদর্শন হিসেবে প্রসিদ্ধ। ইনি আজীবন কাব্যচর্চা করেছেন। প্রচুর লিখেছেন। লেখার মানও রসজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা স্বীকৃত। একটি কবিতায় তিনি দেশের চারণ বা জাতীয় কবি হবার আত্মঘোষণা করেছেন। কিন্তু এই আত্মঘোষণায় সাধের সঙ্গে সিদ্ধি মেলে নি। মিলবার কথাও নয়। তখনও দেশে কোনো সংস্কৃতি বা ঐতিহ্য এমন দানা বাঁধে নি যাকে অবলম্বন করে চারণকবি হওয়া সম্ভব। দেশ তখনো মৃন্ময়ী চিন্ময়ী হয়ে ওঠে নি। দেশের অন্তর্লোক গঠিত হয় নি। সুতরাং হার্পারের কাব্যেও অস্ট্রেলিয়ার সত্তা অনুপস্থিত। যা আছে তা হল দেশের ভৌগোলিক বিবরণ। তবে তাঁর কাব্যে পাই আগামী দিনের পদধ্বনি। পরবর্তী যুগ থেকে অস্ট্রেলিয়ার সত্তা ক্রমশ মূর্ত হতে থাকে এবং সাহিত্যে তার প্রকাশ ঘটতে থাকে।

•

পরবর্তী পর্ব হল ১৮৫০ থেকে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ১৮৫০ নাগাত অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পাওয়া গেল সোনা। ফলে দেশের মর্যাদা বহুগুণ গেল বেড়ে। বহু লোক হন্যে হয়ে এখানে এল সোনার খোঁজে। এদের প্রায় সকলেই অস্ট্রেলিয়ার বাসিন্দা হয়ে গেল। যেমন সংখ্যা বাড়ল তেমনি অর্থনৈতিক উন্নতিও হল।

১৮৭০ সাল নাগাত দেশের জনসংখ্যার অধিকাংশ হয়ে গেল তারাই যারা ওখানে জন্মেছে ও মানুষ হয়েছে। এবং এই সংখ্যা ক্রমশই বাড়তে লাগল। এদের কাছে দেশের প্রাচীনত্ব দাঁড়াল প্রায় শতবর্ষের। এই প্রাচীনত্ব লোকচিত্তে একটা ঐতিহ্যবোধ জাগাবার মতো। আর এই ঐতিহ্যবোধ ও তার সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নতি দেশের লোকের মনে জাগাল বিরাট কর্মশক্তি। দেশ গড়ার কাজে লেগে গেল সবাই। নতুন নতুন জনপদ, শহর তৈরি হতে লাগল। আগে সিডনি ছিল সবচেয়ে জনঅধ্যুষিত ও গুরুত্বপূর্ণ শহর। এখন সোনার খনির অঞ্চল সংলগ্ন হওয়ায় মেলবোর্ন শহর রমরমা হয়ে উঠল। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল।

এই সময়কার সাহিত্যচর্চার মূলে প্রেরণা—সাজাত্যবোধ। দেশের ক্রমবর্ধমান উন্নতি সাহিত্যপাঠকের সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান করে তোলে। এই অনুকূল পরিবেশের সঙ্গে তাল রেখেই দেখা দিল একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। নাম 'দ্য বুলেটিন'। সিডনি শহর থেকে প্রকাশিত হতে থাকায় 'সিডনি বুলেটিন' নামে এর প্রসিদ্ধি ঘটে। আমাদের বাংলা সাহিত্যে সংবাদ প্রভাকর কিংবা বঙ্গদর্শনের কথা স্মরণ করলে সিডনি বুলেটিনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তার সার্থকতা, তার মূল্য বুঝতে সহজ হবে। ১৮৭৯ সালে পত্রিকাটির উদ্ভব হয়। শুরু থেকেই এর বিঘোষিত সংকল্প ও নীতি ছিল খাঁটি অস্ট্রেলীয় সাহিত্য-সৃষ্টির পৃষ্ঠপোষকতা করা। এই সাহিত্য রূপ দেবে অস্ট্রেলিয়া দেশ ও অস্ট্রেলীয় জীবনচর্যাকে। দেশে যে নতুন জাতি গড়ে উঠেছে তার ভাবনা-চিন্তা, আবেগ-আর্তিকে। যাদৃশী ভাবনা, তাদৃশী সিদ্ধিও ঘটল। পত্রিকাটিকে ঘিরে অনুপ্রাণিত হওয়া তরুণ লেখকদের এক বিরাট গোষ্ঠী দেখা দিল। এদের লেখায় ইংলণ্ডের কোনো সংস্রব রইল না, একমাত্র ইংরেজি ভাষাটা ছাড়া। তাও সে ভাষায় যথেষ্ট নতুন নতুন শব্দ। বাগধারা ও পুরনো শব্দে নতুন অভিধার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তাকে অনেকটা আলাদা রূপ দেওয়া হল। এ ভাষা এখন ইংরেজের ইংরেজি না হয়ে অস্ট্রেলীয় ইংরেজি দাঁড়াল। একটা ছোট্ট ও প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত দিই। ইংরেজি 'বুশ' শব্দ অস্ট্রেলীয় অর্থে বোঝায় ঘনবসতির বাইরে উন্মুক্ত প্রান্তর যা আবাদ ও বসবাসের যোগ্য করে তোলা হবে বা হচ্ছে।

সিডনি বুলেটিনের অমিত প্রভাবেই প্রকৃত অস্ট্রেলীয় সাহিত্যের প্রথম সম্ভার পাওয়া গেল। এই সম্ভারের সিংহভাগ হল কাব্য। এই কাব্যের রূপ হল ব্যালাড, অর্থাৎ গাথা কবিতা। বিষয়বস্তু 'বুশ'-জীবন—যারা নতুন মাটিতে বসত করেছে তাদের জীবনযাত্রার বিচিত্র কাহিনী। এই গাথা কবিতাগুলি অস্ট্রেলীয় বুশ ব্যালাড নামে প্রসিদ্ধ। এতে আছে লোকসাহিত্যের বলিষ্ঠ স্পষ্টতা — সহজ সুরে সহজ কথা বলার বাস্তবতা। যাঁর হাতে এই জাতের কবিতা সব চেয়ে ভালো উৎরেছে তিনি হলেন এণ্ড্রু বার্টন প্যাটারসন (১৮৬৪—১৯৪১)। ইনি 'ব্যাঞ্জো প্যাটারসন' নামে অশেষ লোকপ্রিয়তা অর্জন করেন। বুশ-জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এঁর ছিল। বুশ-এ তাঁর জন্ম এবং সেখানেই প্রতিপালিত হন। পরে শহরে কাজ করেছেন বটে কিন্তু কাজের ফাঁকে বুশ-এ এসে থেকেছেন। বুশ-জীবনের যে চিত্র তিনি এঁকেছেন তাতে একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, এখানকার লোকদের মধ্যে শহুরের চেয়ে চরিত্রোৎকর্ষ বেশী দেখা যায়। এরা আরো সাহসী সৎ কর্মনিপুণ ও বুদ্ধিধর।

গাথাকাব্যে প্যাটারসনের যে ভূমিকা সেই ভূমিকা হেনরী লসন (১৮৬৭—১৯২২) ছোটগল্পে পালন করেছেন। এক্ষেত্রেও সিডনী বুলেটিনের প্রভাব। এই পত্রিকায় ছোটগল্প লেখকদের খুবই উৎসাহ দেওয়া হত। তবে বলা হত—লেখা হবে ছোট এবং বাস্তবভিত্তিক। এই আদর্শে লসন তাঁর গল্পগুলি লেখেন। অবশ্য তিনি গাথাকবিতা ও উপন্যাসও লিখেছেন। কিন্তু ছোটগল্পের জন্যেই তাঁর খ্যাতি আজও অম্লান। অনেকের মতে তাঁর গল্পগুলি বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাবার যোগ্য। বুশ-জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল প্রত্যক্ষ ও গভীর। লেখাপড়া তেমন ঘটে নি। অত্যন্ত কঠোর জীবনযাত্রার মধ্যে দিয়ে তাঁকে যেতে হয়। কিন্তু তাঁর লেখায় বুশ জীবনের প্রতি অনাবিল প্রেম ও দরদ ফুটে উঠেছে। চরিত্র বৈশিষ্ট্যে তাঁকে অস্ট্রেলিয়ার শরৎচন্দ্র বলতে পারি।

এই যুগের প্রভাবে প্রভাবিত আর একজন কবি বার্নার্ড ওডাউড (১৮৬৬—১৯৫৩)-এর নাম অবশ্য স্মর্তব্য। ইনি হুইটম্যানের আদর্শে কাব্যচর্চা করেছেন। দেশ ও জাতিকে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল তাঁর কাব্য সাধনা। তাঁর 'দা বুশ' নামে বৃহৎ কবিতায় (১৯১২) তিনি অস্ট্রেলিয়ার সত্তাকে উদ্ঘাটিত করেছেন। তার সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের স্বপ্ন এঁকেছেন। তাঁকে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয়তাবাদী কবি হিসেবে সম্মানিত করা হয়।

এই পর্বের উপন্যাস সাহিত্যের কথা বলতে গেলে নাম করতে হয় জোসেফ ফার্ফি'র (১৮৪৩—১৯১২) ইনি 'টম কলিন্স' ছদ্মনামে লেখেন। যদিও ইনি একাধিক উপন্যাস লিখেছেন কিন্তু তাঁর প্রথম উপন্যাসটির জন্যেই তাঁর খ্যাতি আজও অটুট। উপন্যাসটির নাম 'জীবন এই রকম' (১৯০৩)। দেশের রসিকসমাজের অভিমত হল এমন মৌলিক ও প্রাণবন্ত উপন্যাস ওদেশ থেকে আর বেরয় নি। এতে আছে অস্ট্রেলিয়ার আত্মার কথা। সিডনী বুলেটিনের সম্পাদক উপন্যাসটির গুণ বুঝতে ভুল করেন নি। পাণ্ডুলিপি

পরেই এটি মনোনীত করেন। উপন্যাসটিতে কোনো নিটোল, আদি মধ্য অন্ত-এর ছকে বাঁধা কাহিনী বোনা হয় নি। বুশ থেকে হারিয়ে গেছে এমন একটি ছেলের কাহিনী বলা হয়েছে। এবং তা বলা হয়েছে ছেলেটিকে যারা খুঁজছে তাদের ক্রিয়া-কলাপের মাধ্যমে ও ডায়েরির ভঙ্গিমায়।

•

অস্ট্রেলিয়ার সাহিত্যের তৃতীয় পর্ব হল ১৯১৫ থেকে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই পর্বের সাহিত্যকর্ম শহুরে সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত। অর্থনৈতিক কারণে ও শিল্পের উন্নতিতে, যার পেছনে সক্রিয় হয়েছে বিশ শতকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যা, দেশে গড়ে উঠেছে একের পর এক শিল্পসমৃদ্ধ শহর। এই সব শিল্পনগরী পৃথিবীর তাবৎ শিল্পনগরীর অনুরূপ। এখানে লোকের জীবনযাত্রাও একই ধাঁচের। এই নতুন পরিস্থিতিতে এ দেশের সেই বুশ-জীবন তার প্রাধান্য হারাল। বুশ জীবন মূলত গ্রামীণ। আধুনিক যন্ত্রপাতি সেই জীবনযাত্রায় একদা প্রবেশ করে নি। কিন্তু বিশ শতকের বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্প সেই জীবনযাত্রার চেহারা ও চরিত্র পাল্টে দিল। বুশ জীবন যথেষ্ট আধুনিক হয়ে দাঁড়াল।

এ যুগের সাহিত্যচর্চা তাই আর বুশ জীবনকে প্রাধান্য দিল না। তাছাড়া ইতি-পূর্বে বুশ জীবন ও অস্ট্রেলিয়ত্ব নিয়ে যেভাবে লেখালেখি হয়েছে, সিডনী বুলেটিন কাগজের মনোনীত সোচ্চার হয়েছে তা এখনকার লেখকদের মনে বাড়াবাড়ি ও অনাবশ্যক বলে ঠেকল। তাঁরা সাহিত্যের মোড় ঘোরাতে চাইলেন।

মোড় ঘোরানো হল দুভাবে। এক, নগর-কেন্দ্রিক জীবনকে সাহিত্যের বিষয়-বস্তু করে। দুই, দূর অতীতে রোমান্টিক দৃষ্টি মেলে। অর্থাৎ সেই প্রথম দিকে যারা এদেশে বসবাস করতে এসেছিল তাদের ঐতিহ্যময় কাহিনী স্মরণ করে। তাদের সে সব কাহিনী এখন পেয়েছে ইতিহাসের গৌরব ও রোমান্সের রমণীয়তা। অতীতকে বিষয়বস্তু করার প্রবণতা দিল আর এক প্রেরণা—অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের জীবন নিয়ে উপন্যাস রচনা।

এই পর্বের খ্যাতিমান সাহিত্যিক যাঁরা তাঁর প্রায় সকলেই মহিলা। এবং ঔপন্যাসিক হিসেবেই এঁদের নাম। তবে কবিখ্যাতি পেয়েছেন একজন পুরুষ। নাম রবার্ট ফিট-জেরাল্ড (১৯০২)। প্রসিদ্ধ আমেরিকান কবি রবার্ট ফ্রস্ট-এর সঙ্গে এঁর তুলনা করা হয়। ইথেল ফ্লোরেন্স রবার্টসন (১৮৭০—১৯৪৬) যিনি হেনরী হ্যান্ডেল রিচার্ডসন নামে লেখেন—তাঁকে এই সেদিন পর্যন্ত বলা হয়েছে যে তিনি হলেন সর্বজনগ্রাহ্য-ভাবে অস্ট্রেলিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। তিনি চরিত্রের মনোলোকে প্রবেশ করতে পেরেছেন। তাঁর লেখায় বাইরের ঘটনা ততটা প্রধান নয়, যতটা আঁতের কথা। দেশে তাঁর নিজের ছাত্রী জীবন, হোস্টেলে থাকার অভিজ্ঞতা এবং বিদেশে জার্মানীর লাইপজিগ শহরে গান শেখার স্মৃতিকে তাঁর লেখায় খুবই কাজে লাগিয়েছেন। দ্য ফরচুনস অফ রিচার্ড ম্যাহোনি নামে ত্রয়ী উপন্যাসে তাঁর শ্রেষ্ঠ মুন্সিয়ানা প্রকাশ পেয়েছে। একে অনেক সমালোচক ম্যানের বেডেনব্রুকস কিংবা রোলাঁর জাঁ ক্রিস্তফের সঙ্গে তুলনা করেছেন। মাইলস ফ্রাঙ্কলিন (১৮৭৯—১৯৫৪) তাঁর 'অল দ্যাট সোয়াগ্যার' নামে বিরাট উপন্যাসে একশ বছরের কাহিনী বুনেছেন। ১৮৩৩ সালে এক আইরিশ যুবক তার নববধূকে সঙ্গে নিয়ে এদেশে আসে ভাগ্য অন্বেষণে। তাদের এবং তাদের বংশপরম্পরার জীবন অতি-বাহিত হয়েছে এখানে। তারই ইতিকথা রূপায়িত হয়েছে এই এপিকধর্মী উপ-ন্যাসে। শ্রীমতী ইনিশ গান (১৮৭০—১৯৬১) তাঁর দেশের আদিবাসীদের নিয়ে উপন্যাস লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর 'উই অফ দ্য নেভার নেভার' উপন্যাসটির বহু সংস্করণ হয়েছে। প্রসঙ্গত 'নেভার নেভার' কথাটির অস্ট্রেলীয় অর্থ হল ঐ দেশের উত্তরাঞ্চল—যেখানে অস্ট্রেলিয়দের বসবাস নেই।

•

১৯৪৫ থেকে শুরু হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার সাহিত্যের চতুর্থ পর্ব। এবং তা এখনো চলেছে। তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বের ভেদটা খুব স্পষ্ট নয়। তবে বলতে পারি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দুই পর্বকে পৃথক করেছে। ঐ যুদ্ধের পরিণতি ও প্রতিক্রিয়ায় সব দেশেই মানুষের মনোরাজ্যে যে ভাববিপ্লব দেখা দিয়েছে তা থেকে অস্ট্রেলিয়াও স্বভাবতই মুক্ত থাকতে পারে নি। যন্ত্র-শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতিতে যোগাযোগ ও যাতায়াতের ব্যবস্থা অতিসুলভ হওয়ায় অস্ট্রেলিয়াবাসীদের মনে সেই পূর্বেকার বিচ্ছিন্নতা ও একাকীত্ববোধ আর তেমন রইল না। তাছাড়া সমগ্র বিশ্বের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল এমন একটা রূপ নিল যে, তাতে কোনো দেশই বিচ্ছিন্নভাবে একলা থাকতে পারল না। অস্ট্রেলিয়াও নিজের গণ্ডী পেরিয়ে বাইরে এল। অন্যান্য দেশের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটল। বিশ্বের নানা ভাব ও ভাবনার ঢেউ তার মনোলোক স্পর্শ করতে লাগল।

এই পরিস্থিতির প্রভাব যে এখনকার সাহিত্যে পড়বে তা সহজেই অনুমেয়। এই পর্বে যাঁরা লিখেছেন বা লিখছেন তাঁরা সজ্ঞানে হোক আর অজ্ঞানেই হোক, বিশেষ দেশকালে আবদ্ধ যে অস্ট্রেলীয় জীবন শুধু তার ওপরেই কল্পনার আয়না তুলে ধরতে অনিচ্ছুক। তাঁদের কাঙ্খিত আদর্শ হয়েছে তাঁদের রচনাকে দেশকালের গণ্ডী মুক্ত করে সর্বমানবতা, বিশ্বজনীনতার সঙ্গে যুক্ত করা। এই পর্বে যাঁরা উল্লেখ-যোগ্য ও খ্যাতিঅর্জনকারী লেখক তাঁদের লেখায় উক্ত আদর্শের রূপায়ণ কম-বেশী দেখতে পাই। যেমন অ্যালেক ডারওয়েন্ট হোপ (১৯০৭) ও জুডিথ রাইটের (১৯১৫) কবিতা এবং প্যাট্রিক হোয়াইট (১৯১২) হল পোর্টার (১৯১৭) ও পিটার পোর্টারের (১৯১৯) কথাসাহিত্য। পিটার পোর্টার খুবই শক্তিধর লেখক, তবে ইনি লণ্ডন-বাসী এবং এখন এঁকে একজন ইংরেজ লেখক বলেই ধরা হয়ে থাকে। হল পোর্টারের নাম প্যাট্রিক হোয়াইটের পরেই।

প্যাট্রিক হোয়াইট বেশ কিছুকাল আগেই অস্ট্রেলিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার বাইরে একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। এবং নোবেল পুরস্কার পাবার আগেই বর্তমান অস্ট্রেলিয়ার শ্রেষ্ঠতম ঔপন্যাসিক বলে স্বীকৃত। টলস্টয় দস্তয়ে-ভস্কির সঙ্গে তাঁকে তুলনা করা হয়েছে। তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির মধ্যে তাই কোনো বিস্ময়কর আকস্মিকতা আছে এমন কথা বলা চলে না। অন্য লেখকদের চেয়ে তাঁর লেখায় সর্বমানবীয় আবেদন খুব বেশী। তাই বলে তাঁর লেখায় অস্ট্রেলীয় অনুভূতি অনুপস্থিত এমন নয়। তথা-কথিত পুরনো সভ্য দেশের লোক এদেশ ও তার বাসিন্দাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না, এবং এই ঘৃণা বা তুচ্ছ করার মনোভাব অস্ট্রেলীয়দের মনে যে একটা স্পর্শকাতরতা জাগিয়ে রেখেছে তার ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ দেখি হোয়াইটের লেখায়। একটা ছোট্ট দৃষ্টান্ত দিই। তাঁর একটি গল্পের নায়ক, যে হাঙ্গেরী থেকে অস্ট্রেলিয়ায় নবাগত একদিন এই গল্পের অস্ট্রেলীয় নায়িকাকে বললে, এখানে কিছুই মেলে না—কিসসু না। তখন নায়িকা ফোঁস করে উঠল—আমরা অস্ট্রে-লীয়রা একেবারে অতটা অসভ্য নই—বিশেষত এই ১৯৬১ সালে। তারপর এই কথার জের টেনে বলেছে জানো, অস্ট্রেলীয় হলে অনেক জ্বালা [illegible] ঝামেলা। এই তির্যক কথায় আমরা এমন অস্ট্রেলিয়ার অন্তর স্পর্শ করি তেমনি একটা সর্ব-মানবীয় আবেদনও অনুভব করি।

এতক্ষণ অস্ট্রেলিয়ার সাহিত্যের যে পরিচয় তুলে ধরা হল তাতে নাটকের কথা অনুপস্থিত থেকেছে। এর কারণ, অস্ট্রেলিয়ার সাহিত্যে নাটক নেই বললেই চলে। এদেশে কোনো নাট্য আন্দোলন হয় নি। তবে এই শতাব্দীর বিশ দশকে লুই এশন ও ভ্যান্স পামার কিছু উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক নাটক লিখেছেন। এবং চল্লিশ দশকে ডগলাস স্টিউয়ার্ট-এর পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলিতে মুন্সীয়ানা আছে। সাহিত্যের আর যে একটা দিক—প্রবন্ধ সাহিত্য, সেক্ষেত্রে ওয়াল্টার মার্ডকের নাম স্মর্তব্য। এঁর লেখায় আছে সূক্ষ্ম রসিকতা। রচনা-শৈলীতে আছে সহজপটুত্ব। সব রকম ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে তাঁর ব্যঙ্গাত্মক বক্তব্য শাণিত ফলকের মতো ঝলসিয়েছে।

সমগ্র দৃষ্টিতে অস্ট্রেলিয়ার সাহিত্যে পদ্যের চেয়ে গদ্যই বেশী পুষ্ট ও পরিণত। এ সত্য যাচাই হয়েছে প্যাট্রিক হোয়াইটের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে।

ভালবাসা ভালবাসা

আনন্দ বাগচী

উপন্যাস

একে শাড়ি তায় আবার টেরিলিন।

কিছুতেই আর মনের মত করে পরা হচ্ছিল না।

দোতলার ঘরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে অন্তত তিনবার শাড়িখানা খুলল আর পরলো তপতী। স্কুলের জীবনের খোলস খুলে ফেলে এই প্রথম রঙীন প্রজাপতির মত সে পাখা মেলতে যাচ্ছে। স্কার্ট, সালোয়ার ছেড়ে শাড়ি, সে যেন হাজার কিলোমিটার পথ দূরে অন্তত। স্কুল থেকে কলেজ, সেও এক পৃথিবী থেকে যেন অন্য পৃথিবীতে আসা।

তপতী আজ হঠাৎ বড় হয়ে গেছে।

তপতী আজ প্রথম কলেজ যাবে। তাও যে সে কলেজে নয় কোলকাতার এক নাম-করা কলেজে। ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়ে সেখানে। ভর্তি হবার দিন বাবার সঙ্গে গিয়ে সব দেখে এসেছে। তপতীর বাবাও এই কলেজে পড়েছিলেন। পুরোনো দিনের কথা বলতে বলতে তপতীর বাবা কেমন ছেলেমানুষ হয়ে গিয়েছিলেন।

কল্পনা, সনাতনী, শ্রীমতীরা ভর্তি হয়েছে একটা নামী মেয়েদের কলেজে। কিন্তু দুই কলেজে বুঝি গালফ অফ ডিফারেন্স। 'ওদের মনে খুব দুঃখ'। 'এই স্ত্রী স্বাধীনতার যুগেও ওরা কত পরাধীন। এমন কনজারভেটিভ বাড়িতে এক মুহূর্ত আর থাকতে ইচ্ছে করে না ওদের।

ঘড়ির কাঁটার দিকে চোখ পড়তেই আঁতকে উঠলো তপতী। ইস, নন্দিতা, পারমিতা, বন্দনা এক্ষুনি ডাকতে আসবে। রেডি হয়ে থাকতে বলেছিল ওকে! শাড়ি-খানাকে তৃতীয়বার নাকচ করে দিয়ে ব্লাউজ-পেটিকোট পরা অবস্থাতেই কান্না মেশানো গলায় তপতী ডাকে, 'মা! ও মা'

মা পাশের ঘরেই ছিলেন। মেয়ের বস্ত্র-ঘটিত দুরবস্থা অনুমান করে মনে মনে বুঝি হাসছিলেন। হাসি আঁচলে মুছে এবার গম্ভীর মুখে মেয়ের ঘরে উঁকি দিলেন, 'কী? হল কি তোমার? আয়নার সামনে এমন উদোম হয়ে কি করা হচ্ছে?

নাকে কেঁদে মেয়ে জানালো, 'উঁহু, হু মা! মোটেই হচ্ছে না। তুমি পরিয়ে দাও।'

'ছি ছি! এখনো শাড়ি পরতেই শিখলি না, দুদিন বাদে যখন পরের ঘরে যাবি?'

'আহ, তুমি থামবে মা। ওসব বললে কিন্তু সব খুলে ফেলব।'

'তা তুমি পারো বাছা, কিছু বিচিত্র নয়! যা কচিস্য কচি হয়ে উঠছো দিনকে দিন! এখন কোমরে ঘুনসী বেঁধে ঘুরে বেড়ানোই বাকি। আসুক আজ বন্দনারা।'

'ওদের বলে দিলে ভাল হবে না কিন্তু মা!'

মা আর কথা বাড়ালেন না। টাইট প্যাঁচে শাড়ি পরিয়ে দিয়ে গোটা দুই কর্নাসড সেফটিপিন গুঁজলেন মোক্ষম জায়গায়। তারপর মেয়ের উঠতি শরীর আধ নজর খাতিয়ে নিয়ে মনে মনে একেবারে ডিস্টিংশন মার্কস-ই দিয়ে ফেললেন।

'হলো?' মেয়ের দিকে ভুরু তুলে জানতে চাইলেন।

মায়ের দ্রুত এবং দক্ষ হাতের কাজ দেখে তপতী মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এবার উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'কি সুন্দর পরাও তুমি মা! আমায় রোজ কিন্তু এমনি করে পরিয়ে দেবে!'

মনে মনে খুশী হলেও কৃত্রিম মুখ ঝামটা দিলেন মা, হ্যাঁ আমার আবার এই নতুন চাকরি হল! তোমার বাবাকে টাই বেঁধে দেব তোমাকে শাড়ি পরাবো, আমার সুখের আর কমতি কি? যেমন বাপ তেমনি হয়েছে বেটি!'

এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠলো ছোট্ট করে! মা মেয়ে দুজনেই চমকে ঘড়ির দিকে তাকালো।

নিজের ঠোঁটের ওপর আড়াআড়ি করে তর্জনী রাখলো তপতী, ইস্‌স্‌, শুনতে পাবে, লক্ষ্মীটি মা, ওদের কিন্তু তুমি আবার'—

ইসারায় বাকিটুকু সারলো তপতী, চোখে মুখে কাতর অনুনয়।

মা মাথা নেড়ে অভয় দিলেন, 'দূর পাগলী!'

খাতা হাতব্যাগ ড্রেসিং টেবিল থেকে তুলে নিয়ে মায়ের পায়ে আলতো করে একটা প্রণাম সেরে তপতী তরতর করে নিচে নেমে এল। বন্দনাদের চমকে দেবে ভেবে পা টিপেটিপে নিচে নেমে এসে আচমকা দরজাটা খুলে ফেলেছিল এক-টানে, কিন্তু চমকাতে হল তপতীকেই। বন্দনাদের বদলে দোরগোড়ায় এ কে দাঁড়িয়ে আছে

'কাকে চাই?' নিজের গলা নিজের কানেই কর্কশ শোনালো।

মুখে স্থায়ী হাসির ফেস্টুন ঝুলিয়ে যে যুবকটি এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল সে এবার পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তপতী মিত্র কার নাম?'

তপতী শুকনো গলায় একটা ঢোক গিলে প্রশ্ন করল, কেন, কি হয়েছে?'

'বেয়ারিং হয়েছে।' ঠোঁট টিপে হাসলো যুবকটি।

'তার মানে?' রুদ্ধ সন্দিগ্ধ গলায় তপতী আবার জানতে চায়।

'তার মানে, কম টিকিটের একখানা চিঠি আছে আপনার নামে, দশটা পয়সা লাগবে।'

'ওঃ আপনি পোস্টাপিস থেকে—তাই বলুন!'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তপতী হাত ব্যাগ খুলে দশটা পয়সা বের করে দিল। পয়সা দিতে দিতে এই প্রথম লক্ষ্য করল যুবকটির বগলের তলায় একগোছা খাম পোস্টকার্ড রয়েছে। এক মুহূর্ত আগেও একে পিওন বলে ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ হয়নি তার। খাঁকি জামা-প্যান্টের বদলে দিব্যি ধুতি পাঞ্জাবি চড়ানো। অল্প বয়স, চোখ-মুখ উজ্জ্বল ঠোঁটে অপেশাদারী হাসি, ঘাড়ে উস্কো চুল। এত অল্প বয়সের পিওন সে আগে কখনো দেখেনি। বলতে গেলে বিডন স্ট্রীট পোস্টাপিসের উল্টো দিকেই তাদের বাড়ি। ভেতরটা ঘরের জানলায় দাঁড়ালে পরিস্কার দেখা যায়। গণ্ডায় গণ্ডায় পোস্টম্যানকে সে দুবেলা দেখতে পায় কিন্তু এমন সৌখীন ছোকরা পিওন সে আজই প্রথম দেখলো। বলে না দিলে একে দেখে মনে হবে, কলেজের উঁচু ক্লাসের অথবা ইউনিভার্সিটির ছাত্র।

পয়সা হাতে পাবার পর যুবকটি মুচকি হেসে চিঠির গোছার ভেতর থেকে একখানা নীল রঙের খাম টেনে নিয়ে তপতীর দিকে বাড়িয়ে ধরল। তপতী অবাক হয়ে খামখানা নিল। পিওন চলে গেল একটু অর্থপূর্ণ হাসি হেসে। যেন, এই নীল খামে তোমাকে কে চিঠি দিয়েছে তা আমি জানি!

তুমি ছাই জানো! তপতী প্রায় শব্দ করেই কথাটা বলে ফেলল কারণ পিওন ততক্ষণে গলির বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। লোকটা ভারী অসভ্য তো! কেমন মুচকি মুচকি হাসছিল। আরে বাবা, আমি তেমন মেয়ে না, আমার সেসব কেউ নেই যে এমন করে চিঠি লিখবে। বরং বন্দনাকে বলতে পারতে, তার বয়ফ্রেন্ড আছে পারমিতার হবু বর এখন থেকেই ঠিক, সে ফরেন থেকে রেগুলার চিঠি লেখে। বন্দনা পারমিতাকে 'ফ্রকস্ড প্রাইস' বলে ক্ষেপায়। আর নন্দিতার ছালছাঁরি, সে এক দূরসম্পর্কের দাদার সঙ্গেই চিঠি চাপাটি চালাচ্ছে। ওরা তিন-জনই তপতীকে, কেউ নেই জেনে কেমন অনুকম্পার চোখে দেখে। দয়া করে, যেচে ওদের চিঠি-ফিটি তপতীকে পড়াতেও আসে।

তপতী বলে, 'রক্ষে করো, ও আমার মাথায় ঢুকবে না। লেটার রাইটিং-এ চির-কাল আমি গোল্লা খেয়ে এসেছি।'

বন্দনা বয়সে সবচেয়ে বড়, এঁচোড়েও পুরু পাকা। অবিশ্যি এঁচোড়ের বয়স ওর আর এখন নেই। স্কুল ম্যাগাজিনে বরাবর ষড়ীর ক্রস কথা গল্পসল্প লিখে এসেছে। কথাও বলে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে। বন্দনা বলে, 'লেটার রাইটিং-এর দায়িত্ব তো তোকে দেওয়া হয়নি তপ্তি, শুধু রিডিং সে—র‍্যাপিড রিডিং, যাতে গোলমেলে জায়গা-গুলো পত্রপাঠ ভুলে যেতে পারিস।'

তপতীর মনের মধ্যে বুঝি তখনো এক আধতর অভিমান জমে ছিল তাই শক্ত করে ঘাড় নেড়ে বলে, 'আমি পরের চিঠি পড়ি না।'

'ও! নিজের চিঠি তাহলে আসছে বল!'

নন্দিতা বলল, 'তুই ছুঁড়ি একদম নিরামিষ!'

পারমিতা ফোঁড়ন কাটে, 'যা বলেছিস। একটু আঁশ গন্ধ পেলে পোস্টাপিসের ছাপোষা পিওনরা পর্যন্ত খামের মুখ খুলে পড়ে! আর তোর হাতে ধরে সাধছে—এমন পাবি না রে, এমন পাবি না।'

তপতীর সম্বিত আবার নিজের হাতের দিকেই ফিরে আসে, পেটমোটা নীল খাম খানা তখনো হাতেই ধরা আছে। ভাল করে তাকিয়ে দেখে, না ভুল নেই চিঠিখানা তারই। অচেনা হাতের অক্ষরে তার নিজের নাম ঠিকানা দেখে ভেতরটা কেমন শিরশির করে ওঠে। এক মুহূর্তের জন্যে মনে হয়, যদি এমন হয়, খাম খুলেই দেখা যায় কোনো অচেনা মানুষ তাকে একখানা সুন্দর চিঠি লিখেছে? সে চিঠিকে প্রেমপত্র না বলা যাক অন্তরঙ্গ চিঠি বলা যায় অন্তত। কিন্তু ওই হতচ্ছাড়া পিওনটা যদি খাম খুলে গোটা চিঠিটায় চোখ বুলিয়ে থাকে। যদি কেন, নিশ্চয়ই, নইলে যাবার সময় এমন ফচকে হাসি হেসে গেল কেন? পিওন পিওন, তার অত হাসাহাসির কি আছে!

তপতী নিজেই কিন্তু হেসে উঠল পরের মুহূর্তে। হ্যাত্তোরি, এসব আবার কি ভাবছে সে! কেউ তাকে কস্মিনকালেও অমন চিঠি লিখবে না। অচেনা মানুষ তার নাম ঠিকানাই বা জানবে কোত্থেকে। আর চেনা আধচেনা তেমন কেউ তার নেই যারা চিঠির সম্পর্কেও কাছে আসতে পারে। বান্ধবীরা ছাড়া কেউ কখনো তাকে চিঠি দেয়নি তাও সে চিঠি কখনো পোস্টকার্ডের বাউন্ডারী পার হয়নি। খাম এই প্রথম। তবে খামের ওপরে হাতের লেখাটা কখনোই মেয়েলি নয়। তীক্ষ্ণ পুরুষালী অক্ষর। কে হতে পারে? তাদের আত্মীয় কেউ? কলেজে ভর্তির খবর পেয়ে হয়ত অভিনন্দন জানিয়েছেন। এই সম্ভাবনাটা এতক্ষণ পরে মনে আসতেই কেন জানি খামের রংটা ফিকে হয়ে এল।

ভেতরের চিঠির কাগজ বাঁচিয়ে খামের একটা পাশ ছিঁড়ে ফেলল তপতী। ভেতর থেকে বেরোলো মোটা প্যাডের কাগজে পৃষ্ঠা তিনেকের একখানা চিঠি। দ্রুত ধাঁচের বড় বড় অক্ষরে লেখা। যেন খুব তাড়াহুড়ো করে লেখা হয়েছে।

প্রিয় তপতী, আমার তপু,

এক্ষুনি তুমি কলেজ যাবে, নিচে নেমে এসে এই চিঠি পেলে। পেয়ে অবাক কে তোমাকে এমন চিঠি দিল। পাতা উল্টে চিঠির শেষে খুঁজলে, কিন্তু নাম নেই। ভাবছো, এ আবার কি রকম চিঠি তাই না? আমি ইচ্ছে করেই নাম লিখিনি ঠিকানাও না। যে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে তার আবার কি ঠিকানা, নামেরই বা কি প্রয়োজন? দ্যাখো তো ভেবে আমারে তুমি চিনিতে পারো কিনা?

হ্যাঁ তপু, সত্যি। আমি তোমাকে এই মুহূর্তেও দেখছি। এই তুমি এখন চিঠি পড়ছো, তোমার মুখে এখন রঙের খেলা। ভয় লজ্জা, বিস্ময় খেলা করছে তোমার মুখে। আর কিছু আর কোনো রং? যাকে বলে অনুরাগ? বোধ হয় না। যাকে মনে করতেই পারো নি, তাকে মনে ধরবে কি করে?

কিন্তু কি সুন্দর না তোমাকে দেখাচ্ছে! আহা তোমার টেরিলিনের চাঁপা ফুল রং শাড়িখানার সঙ্গে কচি কলাপাতা ব্লাউজ, সেই সঙ্গে কপালে জারুল বরণ টিপ। প্রতিমার মত টানাটানা চোখে মেদুর করে কাজল টেনেছ। অহ, ওয়ান্ডারফুলি বিউটিফুল!...

তপতীর বুকের মধ্যে এইটুকুতেই পেটা-ঘন্টি বেজে উঠেছে। মাথাটা ঝিমঝিম করছে হাতের আঙুলগুলো ঘেমে বরফ। চিঠিটা এখনও শেষ হয়নি, আরও অনেক কি সব লেখা রয়েছে, পড়তে সময় লাগবে। আর এগোতে পারলো না তপতী, আচমকা এই আঘাত সামলানো শক্ত। চিঠিটা মুড়ে খামের ভেতর ভরে ফেলল। তারপর চারপাশ নজর বুলিয়ে নিয়ে চোখের পলকে ব্লাউজের তলায় চালান করে দিল খামখানাকে।

আর ঠিক পরের মুহূর্তেই গলির মুখে তিন মূর্তির উদয় হল, এক সেকেন্ডের জন্যে ওরা দেখতে পেল না। শুধু কি সামনে পিছনে পায়ের শব্দ শোনা গেল এই সময়, ওমা, তুই এখনো যে দাঁড়িয়ে তপু? আমি ভাবছি কখন কলেজ চলে গেছিস—

'এই যাচ্ছি।'

পেভমেন্টে নতুন জুতোর হিল বাজিয়ে তপতী এগিয়ে গেল, গিয়ে প্রিয় বন্ধুদের ঝাঁকে মিশল। তিনটি রঙীন প্রজাপতি কখন চারটি রঙীন প্রজাপতি হয়ে ফিরে গেল। গলি থেকে কলকাকলির ঢেউ তুলে বড় রাস্তায়।

পারমিতার হবু বর পারমিতাকে একটা বিলিতি ফোল্ডিং ছাতা কিনে পাঠিয়ে দিয়েছে সেইটি আজ ওপেন করলো। বন্দনার বয়ফ্রেন্ড অলমোস্ট বেকার তবু কিভাবে একটা রাশিয়ান ঘড়ি কিনে দিয়েছে। দেখে মনে হয় বড়লোকের বাচ্চা। ভাষাটা বন্দনারই। ওর কথাবার্তা এই রকমই। কউকে রেয়াত করে না নিজেকেও না। তপতীর ডিজগাইজড দাদা নেই যে ব্যাগ কিনে দেবে নন্দিতার মত। ও মায়েরটাই নিয়ে বেরিয়েছে কিন্তু ওর আপাদ-মস্তক ম্যাচ হয়েছে অসাধারণ। শাড়িখানা নিশ্চয় দামী। সেটা খুব কায়দা করে পরেছেও।

গল্পেই। হয় না দুর্দিন আগেও ক্লক অন্যে সাজোয়ার অন্যা কিছু জানতো না এই অবধি।

নিজেদের ধূপচর্চার সমালোচনা করতে করতে ওরা কর্ণওয়ালিশ ক্রসিং পার হল। দেবদারু আর কৃষ্ণচূড়ার নিচে কলেজ কম্পাউন্ড তখন জমজমাট। নতুন সিগরেট ফুঁকতে শেখা কচি গোঁফ আর তেড়ি জুলফি ছেলেদের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সিং প্র্যাকটিস করছে। অধ্যাপকরা একজন দুজন করে মাথা হেঁট করে যেন পদচারণায় করতে আসছেন।

ওদের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ থেমে গেল এইখানেই। কিন্তু তপতীর গভীর বুকের কাছে টাটকা গোলাপের কাঁটার মত খামখানা খচখচ করে বিঁধছিল। অনেকবার ইচ্ছে হল কৌশলে চিঠির ব্যাপারটা বন্ধুদের কাছে তোলে এবং দেখায়। ওরা বুঝুক তপতী কারো অনুকম্পার পাত্রী নয় এ ব্যাপারে বরং এই মুহূর্তে একটা চমক লাগানো নাটকের নায়িকা। কিন্তু স্বভাবত লাজুক তপতী শেষ পর্যন্ত বান্ধবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। যে চিঠির সবটা এখনো সে নিজেই পড়ে উঠতে পারেনি, যে পত্রলেখককে নিজেই এখনও আন্দাজ করতে পারছে না, সে চিঠি কাউকে এখনো দেখানো চলে না। বিশেষ করে তারা যদি বন্দনা পারমিতা নন্দিতা হয় স্কুলের অংক স্যার যাদের নাম রেখেছিলেন ত্রিফলা।

অবিশ্যি উড়ো চিঠি বলে এটাকে ওরা উড়িয়ে দিত না নিশ্চয়ই বরং এটার মধ্যে অনেক বেশী রোমান্সের গন্ধ পেয়ে তপতীকেই ছিঁড়ে খেত। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে এই গুপ্ত প্রেমিকের পরিচয় জানতে চেয়ে ওকে উত্যক্ত করে তুলতো। নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরে কাজ নেই, বরং তপতীর এখন কিছুটা নিরিবিলি নির্জনতা চাই চিঠির মানুষটাকে ভাল করে ভাববার জন্যে।

তাই অফ পিরিয়ডে কমনরুমে যখন চেনা জানা কেউ নেই তপতী বুকের কোটর থেকে বের করলো চিঠিটা। বন্দনাদের এখন এ পিরিয়ডে ক্লাস চলছে, কম্বিনেশন আলাদা। তপতী চিঠির পড়া অংশটুকু একবার চোখ ছুঁলো মাত্র পড়ল না। আগে এতক্ষণের দমবন্ধ কৌতূহল মিটুক, তারপরে তারিয়ে তারিয়ে পড়া যাবেখন। এ চিঠি এখন তো তারই, তার একলার সম্পত্তি।

...যাকগে তপু তোমার প্রশস্তি। তোমাকে না হয় অপূর্বই দেখাচ্ছে, তাতে আমার এত মাথা ব্যথার কি আছে, তাই না? যে মানুষকে তুমি মোটেই জানতে পারছো না তার মতামতের দাম কি? দাম হয়ত এই চিঠিটারও কানাকড়ি থাকতো না তোমার কাছে যদি না এর মূল্য দিতে তোমাকে বাধ্য করতাম। দশটা পয়সা তো তোমাকে দিতে হয়েছে এর জন্যে অন্য মূল্য যদি স্বীকার নাই করো। সত্যিই কি আমার এই পাওনা তোমার কাছে, তপু শেষ পর্যন্ত? তাই যদি, তাহলে আবার কেন কমনরুমে চিঠিটা খুলে বসেছ সুন্দরী?...

সত্যি লোকটা সাংঘাতিক এমন সব কথা লেখে যে চমকে উঠতে হয় গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। লোকটা কি ভগবানের মত সব দেখতে পায়, সব বুঝতে পারে আগে থেকে? আরও মুখে আতঙ্ক ভঙ্গিতে ঘাড় ফিরিয়ে তপতী কমনরুমের জানালার দিকে তাকালো। গোয়েন্দা কাহিনীর মত এই বুঝি সাঁ করে একটা উঁকিঝুঁকি মুখকে সরে যেতে দেখবে! না। পত্রলেখক এতদূর অবশ্য শারীরিকভাবে তাকে অনুসরণ করতে পারেনি। নিজেরই অস্বাভাবিক উদ্ভট কল্পনায় এবার নিজে বিরক্ত হল তপতী। চিঠিটায় নজর দিল আবার।

আরও অনেক লাইন একথা সেকথার পরে পত্রপাঠ চিঠিটাকে ছিঁড়ে ফেলার অনুরোধ জানিয়ে চিঠিটা আচমকা শেষ হয়েছে। শেষে কোনো নাম নেই, আগেই দেখেছিল কিন্তু এখন যেন হোঁচট খেয়ে পায়ে নখ উল্টে যাবার মত লাগল। এত তাড়াতাড়ি কথা ফুরিয়ে যেতে মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল তপতীর। হাতে সময় ছিল। বার দুই আগাগোড়া চিঠিখানাকে পড়ে আবার যথাস্থানে রেখে দিল সে। ছিঁড়ে কিন্তু ফেলল না।

মনের মধ্যে এখন ওর একটাই প্রশ্ন, কে এই পত্রলেখক যে তাকে এমন করে জানে, যে তাকে অলক্ষ্যে এমন করে নজরে রাখে? আশপাশের কোনো বাড়িতে সে নিশ্চয় থাকে। খুব দূরের কেউ হতেই পারে না। কিংবা তেমন দূরের যেখান থেকে দূরবীণ চালিয়ে তাদের বাড়ি ছোঁয়া যায়। কি একটা ইংরেজি ছবিতে এরকম ঘটনা যেন দেখেছিল। শরীরের মধ্যে কেমন একটা শিহরণ জেগে উঠল তপতীর।

আশপাশের বাড়িগুলোর জানলা-ব্যালকনি ছাদ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাবল। প্রাপ্ত বয়স্ক সম্ভব অসম্ভব পুরুষ মাত্রকেই সন্দেহের কোঠায় ফেলে মনে মনে ইন্টারভিউ নিল। কবে কোনদিন কি উপলক্ষে পাড়ার কার সঙ্গে কি কথা বলেছে, কাকে কখন দূর থেকে বা কাছে থেকে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছে মনে করে দেখতে চেষ্টা করল। কলেজে বসে মাথা ঠান্ডা রেখে ভেবে দেখা সম্ভব নয়। বাড়ি ফিরে গিয়ে খুব ভাল করে খুঁটিয়ে দেখতে হবে, যদি কোনো ক্লু পাওয়া যায়।

ধাঁধার উত্তরের মত লোকটাকে খুঁজে সে বের করবেই এ তার এক বিরাট চ্যালেঞ্জ!

প্রেমে অনেকেই পড়ে, প্রায় সব মেয়েই সফল হোক বা বিফল হোক স্বল্প মেয়াদী কিংবা দীর্ঘ উভয়ত বা একতরফা অর্থাৎ মনে মনে। কিন্তু এরকম অবস্থায় বোধহয় দ্বিতীয় কেউ পড়েনি। এর চেয়ে বন্দ্রণা-দায়ক এবং অস্বস্তির ব্যাপার আর কি হতে পারে যা হয়েছে তপতীর?

দুটো দিনেই তার অবস্থা কাহিল। এই দুটো দিন শুধু অপেক্ষা, অপেক্ষা আর অপেক্ষা! কাজে অকাজে শুধু চিন্তা, চিন্তা আর চিন্তা। বিশেষ করে কলেজে বেরোনোর মুখে কেবল। মনে হয় যদি আবার আসে! তপতী কলেজ বেরিয়ে গেলেই যদি আসে?

বাড়িতে যতক্ষণ থেকেছে শুধু ছটফটানি। আহারে রুচি নেই, চোখ থেকে ঘুম মুছে গেছে বিলকুল। মায়ের সঙ্গে গল্প করতেও আর ভাল লাগে না। বই খুলে বসলে শুধু চোখের সামনে কালো পিঁপড়ের সারি ঘুরে বেড়ায়। আশপাশের বাড়ির ছাদ-ব্যালকনি-জানলা তদন্ত করা হয়ে গেছে অনেকবার। ঠিক সন্দেহজনক কাউকে পাওয়া যায়নি। কাউকে সঠিক করে ভাবতে না পারলে মনের মধ্যে যে অস্থিরতা জাগে তপতী এখন তাইতে ভুগছে।

নিজে বার কয়েক প্যাডের কাগজে এলোমেলো মনের কথা লিখেছে। লিখেছে আর ড্যালা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে রাস্তায়। নিজের পাগলামি নিজেই পরে হেসেছে খানিক বাদে। অথচ মনকে হাল্কা করার এছাড়া উপায় কি?

চিঠির জন্যে হা পিত্যেশ করছে তপতী। ঘনঘন চিঠির বাকস খুলে দেখছে। কলেজ থেকে ফিরেই মাকে শুধিয়েছিল পরের দিন, আমার কোনো চিঠি এসেছে, মা?'

প্রথম দিন মা শুধু ঘাড় নেড়েছিলেন। দ্বিতীয় দিনে হেসে ফেলে বলেছিলেন, কেন, কোথাও থেকে আসার কথা আছে নাকি রে?

খুব লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল তপতী, সঙ্গে সঙ্গে সামলেও নিয়েছিল, 'না এমনি ভাবছিলাম যদি এসে টেসে থাকে।'

মা একচোট খুব হেসেছেন যেন খুব মজার কোনো কথা বলেছে তপতী। কিন্তু হাসি থামলে সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে থেকেছেন তারপর।

বেনামা চিঠিটা কিন্তু তপতীর মনের মধ্যে প্যাক খেয়েই চলেছে। পরের দিন ক্লাসের পর ক্লাস শুনোমনে বসে থাকলো কোনো অধ্যাপকের লেকচারই আর মাথায় ঢুকলো না। একটা ক্লাসে তো রোলকলের সময় রেসপন্ড করতেই ভুলে গেল। ভাগ্যিস বন্দনা পাশে বসেছিল, সে সঙ্গে সঙ্গে ধরতাই দিল। ও প্রম্পটার প্রক্সি না দিলে বেকায়দায় পড়েছিল আর কি।

'কিরে কি ব্যাপার?' বন্দনা ফিসফিসিয়ে বলে, কোন্ রাজপুত্তুরের প্রেমে পড়ে গেলি, ভাই? কত রোলনাম্বার বল না আমাকে?

ধড়মড়িয়ে সোজা হয়ে বসেছিল তপতী, 'ধ্যাৎ বাজে কথা বলিস না—তুই ভারি অসভ্য আছিস।'

'বাব্বা! দোকলা জুটতে না জুটতেই আমাদের দুষছিস? খুব দেখালি বাবা!' পারমিতা ফোড়ন কাটলো।

'আমরা তো তোর ইয়ের মত প্র্যাকটিক্যাল অসভ্য হতে পারবো না ভাই, তাই দুটো ঠাট্টা তামাশা করেই দুধের সাধ ঘোলে মেটাই।' বন্দনা খুব নিরীহ গলা করে বলে।

'আহ, থামবি তুই, বন্দনা?' তপতী ওর হাতে চিমটি কেটে দেয়।

উঃ! বন্দনা চাপা আর্তধ্বনি তুলে বলে, 'আমাদের ভেজিটেরিয়ানের যে খুব লেগেছে রে!'

নমিতা মুচকি হেসে মশার মত গলায় গেয়ে ওঠে—

'এখনো তারে চোখে দেখিনি
শুধু বাঁশী শুনেছি
(মানে রোলকল শুনেছি)
আহা প্রাণমন যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি'

যে কোনো গানের তৎক্ষণাৎ প্যারডি বাঁধায় নন্দিতার জুড়ি নেই, গলাটাও মোটের ওপর ভালই। কোন স্কুলে যেন গান শিখছে, ফাইন্যাল ইয়ার। দেখলে মনে হয় ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না কিন্তু মিচকে বজ্জাত।

ব্যাপারটা অনেকদূরে গড়াবে ভেবে মনে মনে প্রমাদ গুনছিল তপতী, এমন সময় ঘন্টা পড়লো, ক্লাস ভেঙে গেল। হ্যান্ডসাম ইয়ং প্রফেসার বেরিয়ে যেতে ও যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। নন্দিতাদের কল্পনায় কিছু আটকায় না, মুখ তো আরও বেআগল। এদের কাছে আবার চিঠি দেখাবে ভেবেছিল তপতী। লাইফ হেল হয়ে যেতে আর বাকি থাকতো না।

তৃতীয় দিন সকালে আবার সেই কলিং বেল, ঠিক দশটা বাজতে পঁচিশে। প্রথম দিন যেমন বেজেছিল। মায়ের হাতে শাড়িপরা শেষ করে আজও ফিনিশিং টাচ্ দিচ্ছিল ড্রেসিং টেবিলে। তুরতে। ড্রেসিং আয়নার সামনের গদিমোড়া আসন থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল তপতী। এ সেই হাতের টিপুনি, এ নির্ঘাত সেই ছোকরা পিওনটাই এসেছে। সেদিনও এমনি ছোট্ট করেই বেলটা টিপেছিল, যেন একটা বিন্দু, শব্দের ফুটকি—বা বড়জোর হাইফেন। যেন ভেতরে বাইরে দুটো মানুষকে জুড়ে দেবে। বন্দনারা কিন্তু ঠিক এর উল্টোটি একেবারে দমভর বাজাবে।

পাশের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল মা নেই, বাথরুমে জলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। শাওয়ার খুলেছে।

সিঁড়ি দিয়ে প্রায় উড়ে এসে দোর খুলল তপতী। হ্যাঁ যা ভেবেছে তাই। একেবারে সেদিনের দৃশ্যই। ছোকরা তেমনি সাদা পোষাকে, তেমনি হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে, বগলে চিঠির বান্ডিল।

দশ পয়সা। কৌতুকের গলায় বলল পিওনটি।

আবার বেয়ারিং?

হ্যাঁ আবার চিঠি, আবার বেয়ারিং, দুষ্টু হেসে ছেলেটি বলে একই লোক নাকি?

কোনো জবাব না দিয়ে তপতী খুব গম্ভীর হয়ে গেল। দশটা পয়সা দিয়ে চিঠি ছাড়িয়ে নিল কিন্তু দ্বিতীয়বার পিওনটার দিকে ভুলেও তাকালো না। খামটা সবে ব্যাগে ঢুকিয়েছে এমন সময় খুকখুক কাশির শব্দ শুনে তাকিয়েই চমকে উঠল তপতী। বন্দনারা কখন শিকারী বেড়ালের মত নিঃশব্দে এসে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে আছে। পিওনটা তখনও ওদের পেরিয়ে যায়নি কিন্তু ওরা গা টেপাটেপি অসভ্যতা শুরু করে দিল।

দুয়োর থেকে নেমে তাড়াতাড়ি পা চালালো তপতী। ওদের নিয়ে ঝটপট নিরাপদ দূরত্বে চলে যাওয়া দরকার। নইলে বন্দনার মুখের কোনো তাল-তালা নেই চেঁচিয়ে মেচিয়ে ঠিক একটা কিছু যাচ্ছেতাই রসিকতা করে বসবে। তা যদি করে আর মায়ের কানে যায় তা হলেই হয়েছে।

গলির মোড়ে অদৃশ্য হবার কিছু আগে ছোকরা পিওন একবার বন্দনাদের দিকে মুচকি হেসে তাকালো। লোকটার স্পর্ধা সত্যিই ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কি ভেবেছে ও? তপতীরা কি জুনিয়ার স্কুলের ছাত্রী না ছেলেমানুষ? রীতিমত কলেজে পড়া আধুনিকা মেয়েদের সঙ্গে সমকক্ষের মত ইয়ার্কি দিতে আসে কোন সাহসে?

কিন্তু মনোযোগটা ওদিকে দেওয়া গেল না, বন্দনারা তপতীকে নিয়ে পড়ল। ওদের তিনটের মুখ চাপা দেওয়া কঠিন কাজ। ছি ছি কি লজ্জা! পাড়ার জানাচেনা লোকের কানে গেলেও কেলেঙ্কারী। ব্যাপারটা রংদার হয়ে ঠিক ছড়াবে।

নন্দিতা তখন গলা ছেড়ে গাইছে, বাবুরাম সাপুড়ে কোথা যাস বাপুরে। আরে বাপু পিছে চা দুটো চিঠি দিয়ে যা—

আসলে ছোকরা পিওনটাকেই পাল্টা আওয়াজ দেওয়া ওর উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নেই কিন্তু তপতীর যে আর মান-ইজ্জৎ রইল না। ছোকরাও বজ্জাতের কম ধাড়ি নয়, গলির মাথায় পৌঁছে আর একবার সবকটা দাঁত বের করে ফিরে তাকিয়ে গেল।

আর যায় কোথায়, পারমিতা ছেলেদের ভঙ্গিতে ঝপ করে চেঁচিয়ে উঠল, 'আহারে রাজা আমার!'

দুটি মাঝবয়সী লোক গলির মুখে ভীষণ চমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন, পরে ঠোঁটে হাসি টেনে আবার চলতে লাগলেন। গুটি কয়েক স্কুলের মেয়ে আসছিল তারা খিলখিল হেসে পরস্পর ঠেলাঠেলি করে তপতীদের ক্রস করে গেল। মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছিল তপতীর, মেয়েগুলো ওর চেনা।

'এটা আমার পাড়া!' তপতী চাপা কাঁদো কাঁদো গলায় বলে।

'জানিরে মুখপুড়ি।' বন্দনা বলে, 'কিন্তু মালটা কোন পাড়ার?'

সত্যি বলছি তুই যা ভাবছিস—

ন্যাকামি করিস নে, সখি। ব্যাগের মধ্যে তাঁর লিপিকা আনটাচড্ রয়েছে। কেষ্ট ঠাকুরটি এখনো মনে হয় কেটে পড়তে পারেন নি, বড় রাস্তায় বেরিয়ে ধরে ফেলতে পারব।

কিন্তু যাই বলিস বন্দনা, নমিতা নিবেদন করে নায়ক বড্ড বেরসিক। নইলে মানসীর ঘরের দরজায় কোনো মাল হাতে করে চিঠি দিতে আসে?

এ তোর নিছক অপবাদ নন্দি। রসের কমতিটা দেখলি কোথায়? পারমিতা মিচকে হেসে বলে দেখলি না যাবার সময় আমাদের দিকে কেমন টিপস ঝেড়ে গেল।

চেহারাখানা যাই বলিস ক্যামেরা ক্যাচিং। বন্দনা মন্তব্য করে তাই না?

কি রে, ফিল্মে টিল্মে নাব গলিয়েছে নাকি তোর হবুচন্দ্র? পারমিতার জিজ্ঞাসা।

মরিয়া হয়ে শ[illegible] গলায় তপতী বলে, 'কি দিব্যি গাললে তোরা আমায় বিশ্বাস করবি বল? ওরে বাবা, মা কালীর দিব্যি, ও আমার কেউ নয়, ও জাস্ট পিওন, নতুন পিওন।'

'পি-ও-ন?' বন্দনা প্রায় শিস দিয়ে ওঠা গলায় বলে, 'শালা আমরা কি জন্মে পিওন দেখিনি নাকি, যে পিওন দেখাচ্ছিস? ভাঁওতা মারিস না!'

'পিওনের ওরকম চেহারা।' পারমিতা মুখভঙ্গি করে, 'ওরকম জামাইবাবু পোষাক। মাইরি!'

'অমন দিলবাহার চাউনি, সেটাও বল।' নন্দিতা পয়েন্ট যোগান দেয়।

জল এসে গিয়েছিল তপতীর চোখে ভ্যানিটি ব্যাগের ভেতর থেকে সে নীলরঙের খামখানা টেনে বের করল, 'এই দ্যাখ তোরা, এটা ডাকের চিঠি।'

তপতীর সঙ্গে সঙ্গে সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তিন বান্ধবী ঝুঁকে পড়ে খামের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকল একটুক্ষণ। তাইতো! খামের ওপর নামঠিকানা, ডাকটিকেট, টিকেটে সীলমোহরের ছাপ স্পষ্ট। তিনজনে

মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে সমস্বরে বলল, 'তাই তো!'

এক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বন্দনা বলল, 'এ যে সিপাহীভাণ্ডা অঙ্ক উলটে দিলে, সিসটার! তবে পিওন হলেও রুবাব ছোকরার মধ্যে লাইফ আছে।'

'ওসব থার্ড পার্সনকে যেতে দাও', পারমিতার চোখ খামখানার দিকে যেন জ্বলে উঠল, 'খামটা এখনো হাতেই রয়েছে। অথচ শুধু রঙের খামখানা কি ক্যালন্ডা নাকি, ওটা কি মাগনা এসেছে, দিদি?'

'ওরে থাম্বাজ মেয়ে,' বন্দনা তপতীর হাত চেপে ধরে বলে, 'এখুনি খোল, সব খোলাতাই হয়ে যাবে।'

'আর সিন ক্রিয়েট করিস না, ছাড়!' তারপর চোখের ইঙ্গিত করে দেখায় তপতী, দ্যাখ ওদিকে।'

দুচারজন কৌতুহলী ছেলেছোকরা আড্ডা ফেলে ওদের দিকেই ক্রমশঃ এগিয়ে আসছিল।

পারমিতা সেদিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তি করল, 'অ রে মুখপোড়ারা!'

সামনেই হেদো। তপতীর হাত থেকে ছোঁ করে চিঠিখানা টেনে নিয়ে বন্দনা ...লের মত তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'ভগিনীগণ, ...ল ওই পার্কের মধ্যে গিয়ে এর একটা বিহিত ...রি।'

যে কোনো অবস্থায় স্মার্ট হয়ে ওঠার ক্ষমতা আছে বন্দনার। যে কোনো সিচুয়েশানকে ট্যাকল করতে পারে ও। তবে ...মস্ত ব্যাপারটা তপতীর নাগালের বাইরে ...লে যাচ্ছে ক্রমশঃ। এখন চোরের মত ওদের ...তে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া উপায় নেই। ... চিঠি আর ফিরিয়ে নেবার বা লুকোবার ...টা করা বৃথা। এর ভাগ ওদের দিতেই ...বে। সুতরাং বাড়াবাড়ি না করে সহজে ...য় যাওয়াই ভাল। বরং এ একদিক থেকে ...াই হল। এই রহস্যের ওপর ওরা হয়ত ...টা আলোকপাত করতেও পারে।

...ফয়সালাটা হেদোর মধ্যে গিয়ে হল না, ...জা কলেজে গিয়ে।

'আজ ফার্স্ট পিরিয়ডটা আমরা কাট্ ...বো, চলো কমনরুমে যাই।' বন্দনা বল্লে।

...সেন্সেটিক?' তপতী ক্ষীণ গলায় বলল।

'হু কেয়ার্স ফর এ সিঙ্গাল পি?' পারমিতা এক ঝিলিক শিস দিয়ে বলে, 'ছেলেরা ...ত কামাই করে শুনেছি!'

'তাছাড়া তপতীর অনারে অন্ততঃ প্রথম ...টা গণছুটি উপভোগ করা উচিত আমাদের। ...ন?' নন্দিতা বলে, 'কেন না তপতী আজ ...বেলায় লেটার পেয়েছে!'

নন্দিতার কথায় নন্দিতা ছাড়া সবাই হেসে ...ঠল মানেটা বুঝতে পেরে। নন্দিতা থেকে ...কে এমন এক একটা মজার কথা ছাড়ে যে ...-হেসে থাকতে পারা যায় না।

এসপ্ল্যানেড ফিরতি ট্রামের থেকেও এখন কমনরুম ফাঁকা। কেউ নেই। এক কোণে চার...ন গোল হয়ে বসল বন্দনার নির্দেশমত। বন্দনা ম্যাজিশিয়ানের মত সকলের সামনে খামখানা উঁচু করে ধরে একটা পাশ সযত্ন মার্জনে ছিঁড়তে লাগলো।

ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল, 'জানি না কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোবে কিনা। ফার্স্ট লাভ?' তপতীর দিকে ভ্রূ নিক্ষেপ করে জিগ্যেস করল, 'এই প্রথম পেলে নাকি?'

তপতী গলার স্বর যতটা সম্ভব নিরাসক্ত করে বলল, 'ধ্যুর! লাভ ফাভ কিস্যু নয়। লেটার লেটার।'

কর্ক স্ক্রুর মত দৃষ্টিটাকে ঘুরোলো এবং প্যাঁচালো করে বন্দনা বলল 'হুঁ! এইটেই প্রথম চিঠি নিশ্চয় এখন বলতে চাও না?'

'বলেছি কি?' তপতী গলায় একটু ঝাঁঝ মেশাবার চেষ্টা করল কিন্তু মিশলো না, বরং শেষটা মিনমিনে শোনালো, 'কেউ যদি গায়ে পড়ে আমাকে চিঠি লিখে বসে আমি কি করতে পারি?'

'হুঁ!' বন্দনা আবার সেই কর্ক-স্ক্রু মার্কা চাউনি হেনে হাসল, 'কি পারো? পারো চিঠি রিসিভ করতে, পড়তে, পড়াতে এবং তারপর লাগসই জবাব লিখতে। নাও পড়—'

কথা শেষে কিনার ছেঁড়া খামখানা বাড়িয়ে ধরল তপতীর দিকে।

'আমি?' তপতী যেন আঁতকে ওঠে।

'হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি!' বন্দনা তপতীর গলা নকল করে যেন ওভার-অ্যাকটিং করল।

'কেন তুমি পড়লে দোষ কি?'

'দোষ আছে।' বন্দনা মুখ গম্ভীর করে বলে, 'আমার এথিক্‌স-এ বাধে। পরের চিঠি পড়তে নেই।'

তপতীর মনে হল তারই কোন একদিনের কথা উপলক্ষে ঠুকলো বন্দনা।

'তবে যে ছিঁড়লে খামটা?' যেন লিগ্যাল পয়েন্ট পেয়ে গেছে এতক্ষণে, এমনি লড়ে-যাওয়া গলায় তপতী বলে, 'তবে যে পড়তে বলছ?'

'শুনবো বলে! অন্য কোনো দুরভিসন্ধি নেই, ডার্লিং।' বন্দনা হাসে 'পরের চিঠি শুনতেও নেই এমন কথা কোনো নীতিশাস্ত্রে লেখা আছে কি?'

'তো পারমিতা পড়ুক, নয়তো নন্দিতা। আমি পারবো না।'

কলকলিয়ে হেসে উঠে বন্দনা বলল, 'হুঁ, পথে এসো বাছা আমার।'—তারপর যেন টাইম দিয়ে শাটার টিপছে এমনিভাবে তপতীর দিকে তাকিয়ে আছে তো আছেই—একটা চোখ আর কথই হতে চায় না।

'ধ্যাৎ অসভ্য। কি পেয়েছিস বলত আমাকে যে অমন করছিস?'

'স্যাক্ট্‌ টেস্ট করলাম। ইউ আর প্রেগন্যান্ট প্রেগন্যান্ট উইথ লাভ। তোমার পেটে পেটে প্রেম গজিয়েছে, সিসটার!'

সবাই বুঝলো বন্দনা তার সদ্যপড়া কোনো নভেল থেকে গ্যাড়ানো ডায়ালগ ঝাড়লো। ওর বয়-ফ্রেন্ডের প্রেসক্রিপশান অনুযায়ী আজকাল নাকি খুব ইংলিশ ফিকশান গিলছে। প্রতিদিনের পড়া গল্পের বই থেকে রোজ বাহাদুরি দেখাতে দু-চার লাইন আওড়ানো চাই। বন্দনা অন্য পাড়ায় থাকে, তার বয় ফ্রেন্ডকে কেউ কখনো চোখে দেখেনি কিন্তু কিংবদন্তীর মত সে আছে। সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ তুললে বন্দনা কেন জানি এড়িয়ে যায়। বলে, হবে হবে, ফাইন্যালে দেখবি।'

'কত দেরি তোর ফাইন্যালের?' পারমিতা একদিন শুধিয়েছিল।

'এখন সবে হিট্‌স চলেছে।' বন্দনা মজাদার মুখ করে বলেছিল।

চিঠিটা শেষপর্যন্ত তপতীকেই পড়তে হল। ব্যাপারটা যে তার দিক থেকে কিছু নয় সেটা বোঝাবার জন্যেই। কিন্তু জায়গায় জায়গায় গলা কেঁপে যেতে লাগল। ওরা তিনজনে ভুরু ছোঁড়াছুঁড়ি করে জায়গাগুলো উপভোগ করছিল। চিঠিটায় নতুন কিছু অবশ্য ছিল না। আগের চিঠির মতই এতেও তপতীর রূপের প্রশস্তি আর অস্পষ্টভাবে অনুরাগের প্রকাশ। গত দুটো দিন যে পত্রলেখক অলক্ষ্যে থেকে তাকে ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করেছে তার কিছু প্রমাণ। যেমন কিভাবে গতকাল কর্ণওয়ালিশ ক্রসিং পার হয়েছিল, কিরকম সাজ করেছিল, কেমন দেখাচ্ছিল, ফেরবার পথে তেদোর মধ্যে বান্ধবীদের সঙ্গে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে ফুচকা খেয়েছে ইত্যাদি। সেই সঙ্গে বান্ধবীদের সম্পর্কে দু একটা মুখরোচক মন্তব্য। এই জায়গায় পারমিতা
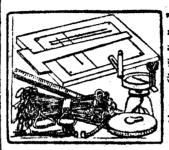
হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে 'ভোলে বাবা পার করেগা' বলে এক চক্কর নেচে নিল। পারমিতার মধ্যে একটি লেডি মাংকি রয়েছে, সে পুরুষের মত বেপরোয়া হয়ে ওঠে থেকে থেকে।

চিঠি শেষ হল। চিঠির শেষে কোনো নাম নেই, তবে প্রথম চিঠির উল্লেখ আছে।

বন্দনা তপতীর কাছ থেকে চিঠিটা চেয়ে নিল, এথিকসে বাধে বলেই বোধহয়। তারপর কি যেন ভাবছে ভঙ্গিতে বসে থাকলো। সবাই চুপ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে বসে আছে, টুঁ শব্দটি করছে না, পাছে বন্দনার মনোযোগ ছিন্ন হয়। সবাই আসলে উদগ্রীব তপতী পর্যন্ত, বন্দনার মন্তব্য শোনার জন্য।

কিন্তু বন্দনা মন্তব্য করল না। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'লেট আস সেলিব্রেট। চল রেস্টুরেন্ট থেকে এক কাপ করে চা খেয়ে স্ফূর্তি করে আসি।'

চায়ের কাপে প্রথম চুমুকটি দিয়ে বন্দনা বলল, 'ভারি সেন্টিমেন্টাল রোমান্টিক!'

'কি?' নন্দিতা জানতে চায়।

'এই চিঠির পরিকল্পনাটা। নায়িকার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন পুনঃস্মরণীয় হয়ে উঠল। নটা বেজে পঁয়ত্রিশ। সবে শাড়ির শেষ প্যাঁচখানা মেরেছে অমনি কলিং বেল। পিং। যেন ছোট্ট করে বুকের বোতাম টিপলো। নায়িকা পড়িমরি করে নিচে নেমে এসে দ্যাখে বন্দনা পারমিতা নন্দিতা নাম্নী ধেড়ে পেঁচি বঁচিরা নয়, একেবারে জলজ্যান্ত কেষ্টকলি মানে কলির কেষ্টঠাকুর, স্বয়ং নায়ক—থুড়ি থুড়ি, নায়ক নয় নায়ক নয়, সরকারী পত্রদূত দরজায় দাঁড়িয়ে, এইখানে ব্র্যাকেটে তোকে জিজ্ঞেস করছি, তপতী ওই ছুছুন্দরকুমারই সেদিন এসেছিল তো? অলরাইট, ওকে। একটা দশপয়সা দর্শনী দিয়ে কাস্টমস থেকে মাল খালাস এবং মাল ফের আন্ডার ব্লাউজ গোডাউনে চালান। কারণ? কারণ গলির মোড়ে তখনই ঝিকলার উদয়—'

'কাট।' নন্দিতা বলল, 'এ যে চিত্রনাট্য আইডিয়া।'

'থ্রি চীয়ার্স ফর তপতী মিশ্র, হুরে হুরে ভীও।' পারমিতা ছোকরাদের গলা নকল করে কেবিন কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। পলকে গুঞ্জন থেমে গেলো রেস্টুরেন্টের ওপরে নিচে, গোটা বসন্ত কেবিন সাইলেন্সার চড়ানো পিস্তলের নলের মত ওদের কেবিনের দিকে গলা বাড়ালো।

'ডোবাবি।' বন্দনা দাঁতে দাঁত চেপে শাসন করল পারমিতাকে। 'স্থানকালপাত্র ভুলে যাস কেন।' তারপর যেন কিছুই হয়নি গলায়, 'দ্বিতীয় দৃশ্য। নায়ক অদৃশ্য। শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করে অ্যাবস্কনড্ হয়ে আছে আর মুচকি মুচকি হাসছে। নায়িকা দৃশ্য, শুধু দৃশ্যগোচর নয়, প্রায় সিন ক্রিয়েট করে ফেলেছে—কম্পিত হৃদয়ে ইনভিজিবল লাভারের প্রেমপত্র পড়ছে—তার কারণ এছাড়া তার আর কিছুই করণীয় নেই।'

'কাট!'

'ভ্যাট!' বন্দনা সঙ্গে সঙ্গে নন্দিতাকে ধমকে দিল। পারমিতা যদি আবার নেচে ওঠে তবে কেলেঙ্কারী হবে। কিন্তু পারমিতা আর চেঁচালো না, শুধু বলল, 'তোর ওপিনিয়ন?'

'কি ব্যাপারে?'

'নায়কের ব্যাপারে।'

'সেয়ানা। খেলবে।'

'ঠিক বলেছিস।' নন্দিতা বলল, 'যদি এতই তোমার চেনা, যদি এতই মনে ধরেছে তপতীকে তবে নাচতে নেমে আবার ঘোমটা কেন, দাদা!'

'নিশ্চয়ই!' পারমিতা ওকে সমর্থন করে, 'বেরিয়ে এসো, প্রেমে লড়ে যাও, ফাইট দাও!'

'আসলে তপতীর মনের ওপরে হাই-প্রেশার দিচ্ছে ইচ্ছে করেই। মতলবটা ঠিক ধরতে পারা যাচ্ছে না। অবিশ্যি,' তপতীকে একচোখ দেখিয়ে বন্দনা বলল, 'সংস্কৃতে কি একটা শ্লোক আছে না, অরসিকাসু প্রেম নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ—'

'কোটেশান ভুল হল।' আপত্তি জানালো নন্দিতা।

'আমাদের তপতীও কিছু বেরসিক নয়, যেভাবে ডুবে ডুবে—' পারমিতা বলে।

'দেন দেয়ার মাস্ট বি সাম আদার রিজন—অন্য কোন কারণ, কিন্তু কি সেটা?' বন্দনা চলচ্চিন্তা প্রকাশ করতে থাকে ধাপে ধাপে, 'চিঠিতে নাম সই করতে ভয় পাচ্ছে? যাক সেটা ভাবা যাবে পরে, এখন এক এক করে দেখা যাক। এক নম্বর, কোনো মেয়ে তপতীকে খেলাচ্ছে না নিশ্চয়। হাতের লেখাই তার প্রমাণ, এ পুরুষের হাতের লেখা। দুই নম্বর, কোন লোফার টোফার পিছনে লাগেনি, তারও প্রমাণ এই সুন্দর হাতের লেখা, ভাষা এবং নির্ভুল বানান। যে লিখছে তার পেটে দুকলম বিদ্যে আছে। তিন নম্বর, অপরিচিত কেউ নয় তাও ঠিক এবং দূরের কেউ নয়। তাহলে? তাহলে আমাদের আবার সেই পুরাতন প্রশ্নে ফিরে আসতে হচ্ছে, নাম সই করতে ভয় পাচ্ছে? না, অন্য কিছু?'

বন্দনাকে ওদের মধ্যে খুব ভারিক্কে দেখাচ্ছিল। কথায় তো বটেই, অভিজ্ঞতায় আর বয়সেও। এই বন্দনা বার দুই স্কুল-ফাইনালে গাড্ডু মেরেছিল ভাবাই যায় না। ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে কখন চোখে বিগ্ জিরো অর্থাৎ গো গো পরে নিয়েছে সে। ম্যাচাবাল কালারে মজানো ঠোঁটদুটো আঠালো। তলায় কালো টিপটি থেকে, তলায় তলায় অতিথি নিয়ন্ত্রণ বিধি লঙ্ঘন করা নেমন্তন্ন চিঠির মত রহস্যময় লাগছে। হয়ত গো-গোর জন্যেও হতে পারে।

ভুরুতে ক্রীজ এবং অ্যান্টিক্রীজ খেলে গিয়ে গো-গোর মেখলা ওপিঠের ল্যান্ডস্কেপ বদলে গেল, কটাক্ষ দিয়ে একটা জিজ্ঞাসার সিগন্যাল পাঠানো হলো তপতীর উদ্দেশে, পরে বলল, 'কে সে? পাড়ার কোনো গণ্যমান্য ব্যক্তি অথবা পারভার্ট বুড়ো-হাবড়া কেউ? নয়তো ইয়ং কিন্তু খুব কুচ্ছিত দেখতে, যে জানে তার দিকে তুই ফিরেও তাকাবি না কখনো। এমন কেউ আছে নাকি তোর ধার ঘেঁষে?'

তপতী উত্তর করতে পারল না। এভাবে সে কখনো এই উড়োচিঠির নায়ককে ভাবে নি। এ ধরনের সম্ভাবনার কথা কল্পনাও করেনি। বন্দনার অ্যানালিসিস হয়তো খুবই রিয়্যাল, যাকে বলে মেটিরিয়ালিস্টিক চোখে খতিয়ে দেখা, কিন্তু তপতীর সব কল্পনার সব স্বপ্ন যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দিচ্ছিল। তপতী উত্তর দিতে পারল না। শুধু মাথা নাড়লো।

বন্দনা যেন সহানুভূতির সঙ্গে তপতীর অবস্থাটা অনুধাবন করল, তারপর মুচকি হেসে বলল, 'এখুনি বলবার দরকার নেই, খুব ভাল করে ভেবে দেখিস।'

'তোকে মাইরি যা লেডি-ডিটেকটিভ লাগছে না!' পারমিতা তেঁতুল খেয়ে তারিফ করার ভঙ্গিতে টাগরায় শব্দ তুলল, 'ফাইন, ফাইন! শুধু ঠোঁটে একটা সিগারেট থাকলে না, মারকাটারি দেখাতো!'

'রিসিভড উইথ থ্যাংকস!' বন্দনা পারমিতার দিকে ঈষৎ মাথা নুইয়ে বলল, 'করঞ্জাক্ষর সঙ্গে থেকে থেকেই আমার যা কিছু! ও এখন দুহাতে ডিটেকটিভ উপন্যাস লিখছে যে—'বলেই হঠাৎ থেমে পড়ল এবং খচাং করে এক কামড়ে জিভ কাটলো।

'থেকে থেকে?' নন্দিতা বন্দনার কথার ভেতর থেকে এক চিমটি নস্যি তুলে নিল যেন, 'কিভাবে থেকে থেকে তোর যা কিছু র‍্যা?' নন্দিতা চোখ ট্যারা করে তাকাল।

বন্দনা এতদিন কখনো ওর বয়ফ্রেন্ডের নাম ওদের সামনে উচ্চারণ করেনি। ও একজন, সে ইত্যাকার সর্বনাম এবং বিশেষণ দিয়ে চালিয়ে যেত, আজ মুখ ফস্কেই বোধহয় বলে ফেলেছে!

পারমিতা সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'লাভলি! লাভলি! আমি যা ডিটেকটিভ গল্প পড়তে ভালবাসি না! বল, বল করঞ্জাক্ষ কোন পত্রিকায় লেখে? পুরো নামটা বল।'

বন্দনা তখন চেয়ারের পিঠে হেলে গিয়েছে। আর একবার জিভ কেটে বলল, 'ইস, ওর বারণ ছিল, একদম ভুলে গিয়েছিলাম। যাকগে, যেনামে ও লেখে সেই ছদ্মনাম তো আর তোদের বলিনি?'

'ছদ্মনাম?' ছিটকে সোজা হয়ে বসল পারমিতা, 'বল, বল আমার মাথার দিব্যি বন্দনা! একে করঞ্জাক্ষ, তার ওপরে আবার ছদ্মনাম সেটাও কম লোমহর্ষক হবে না, কি বলিস নন্দি? উফ তোর বয়ফ্রেন্ড আপাদমস্তক মিস্টিরিয়াস।'

বন্দনা মাথা ঝাঁকাচ্ছে দেখে নন্দিতা বলল, 'আমাদের মধ্যে বলতে দোষ কি! সে তো আর ফেরারী আসামী নয়, মন্ত্র পড়া স্বামীও নয়। তাছাড়া তোর বরের, ওহ্, থুড়ি, তোর বয়ের কানে তো আর যাচ্ছে না, আমাদের মধ্যেই থাকছে।'

'না ভাই, রিকোয়েস্ট করিস না।' বন্দনা শরীরের একটা ঢেউ তুলে বলল, 'আমাকে ভাই আনফেইথফুল হতে বলিস না।'

অগত্যা সেদিনের আসর এইখানেই ভেঙে গেল। তপতীর চিঠির শুনানীও মুলতুবী রইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের সম্বর্ধনা-সভায় তাঁকে মাল্যভূষিত করছেন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)।

ছিয়াত্তরতম জন্মদিনে তুষারকান্তি ঘোষের সম্বর্ধনা

প্রবীণ সাংবাদিক এবং সাহিত্যরসিক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ছিয়াত্তর বছর বয়সে পদার্পণ করেছেন। ঐ উপলক্ষে গত ৩০ মে অপরাহ্নে রবীন্দ্র সরোবরের তীরে 'চক্র-বৈঠক'-এ বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং সাহিত্য-প্রেমীদের উদ্যোগে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হোলো।

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় স্বয়ং তুষারবাবুর গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে স্বরচিত কবিতায় তাঁকে শুভেচ্ছা জানালেন। তিনি বললেন, তুষার-কান্তি পঁচাত্তর অতিক্রম করে ছিয়াত্তরে পড়লেন এটা নিশ্চয়ই সুখবর। আজকের দিনে পঞ্চাশ অতিক্রম করতে গিয়েই লোকে কাত হয়ে পড়েন সেই সময়ে তুষারবাবুর ছিয়াত্তর বছর বয়সেও সক্ষম থাকার নজীর একটা দৃষ্টান্ত হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়। বলাইবাবুর বক্তৃতার মধ্যেও হঠাৎ এক সময় চিকিৎসক বলাইবাবু জেগে ওঠে বললেন: 'ভাই তুষার, বয়েস হয়েছে। বেশী গুরুপাক জিনিস খেও না লক্ষ্মীটি। আর ছুটোছুটিও কর না বেশী। বুড়ো বয়েসে বিশ্রাম দরকার। ইজি চেয়ারে লম্বা হয়ে শুয়ে আড্ডা দিয়ে যাও ক্রমাগত। বুড়ো বয়েসে আড্ডাটা ভারী হিতকারী। বাংগালী মনের পক্ষে এর চেয়ে ভালো টনিক আমার জানা নেই।'

সভাপতি শঙ্করপ্রসাদ মিত্র তাঁর ভাষণে বলেন, 'আমি তুষারবাবুর বিশ্রাম নেওয়ার পক্ষপাতী নই। আমি আশা করি তিনি একশো পঁচিশ বছর বেঁচে থাকুন কর্মময় জীবন নিয়েই।'

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন 'সুন্দর হাসি হাসি মুখ, গল্প কথায় সুরসিক তুষারবাবু আমার বড়ো ভাইয়ের মতো। এই বয়সেও তিনি ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে চলাফেরা করেন। সারা পৃথিবীটি তাঁকে ঘুরতে হয়েছে নানা কাজে। ইংল্যাণ্ডেই গেছেন চল্লিশবার। কিন্তু ইংরেজীভাব ওঁকে মোটেই স্পর্শ করতে পারেনি। উনি খাঁটি বাংগালীই রয়ে গিয়েছেন। অমৃতবাজার পত্রিকার মতো বিশ্ববিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদক নানা সময়েই নানা ঝড়ঝাপটার মধ্যে দিয়ে এগোতে হয়েছে—প্রতিকূলতার সংগে লড়াই করে পত্রিকাগুলোকে বাঁচাতে হয়েছে।'

শ্রীমতী রাধারাণী দেবী বল্লেন, 'ছিয়াত্তর নয় ওঁর বয়স আঠারো থেকে বাইশের মধ্যে। মিছিমিছিই ওঁর বয়েস ছিয়াত্তর বলে হৈ-চৈ করা হচ্ছে।...ওঁর নামও তুষারকান্তি নয়। আমি একটা নাম দিয়েছি। ঘরোয়া নাম। অন্দর মহলের জন্য সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত সেই নামটি হল বিভাবসু।' (তুষারবাবুর স্ত্রীর নাম বিভারাণী ঘোষ)। সম্বর্ধনার উত্তরে তুষারবাবু তাঁর স্বাভাবিক নিজস্ব ভংগীতে বলেন, 'বড়ো লজ্জায় মধ্যে ফেললেন মণীন্দ্র রায় এবং আরও অনেকে।

তুষার-জয়ন্তী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণী দেবী। পাশে রয়েছেন শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র, শ্রীমনোজ বসু ও শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী।

হোত। শুনতেও ভালো লাগত।...আমি সাহিত্যিক কি করে হোলাম জানি না। গান শুনলে যদি গায়ক হওয়া যায় তবে আমিও সাহিত্যিক। কেননা আমি প্রচুর বই কিনি এবং পড়ি। যাঁরা একশো থেকে একশো পঁচিশ বছর আমার আয়ু কামনা করেছেন তা যদি সত্যি হয় তবে সেদিন তাঁরা থাকবেন তো। ভগবানকে বলি স্বাস্থ্য এবং মনের আনন্দ যতদিন বর্তমান থাকবে ততদিনই যেন বেঁচে থাকি। তারপর আর বেঁচে লাভ নেই।'

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষেই একশো পৃষ্ঠার একটি অভিনন্দন গ্রন্থ বেঙ্গল পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশ করা হয়। বইটির নাম তুষার-জয়ন্তী। অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীশংকরপ্রসাদ মিত্র বইখানি তুষারবাবুর হাতে তুলে দেন। অভিনন্দন গ্রন্থটিতে লিখেছেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অন্নদাশংকর রায়, বনফুল প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বিশু মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, সত্যজিৎ রায়, আশাপূর্ণা দেবী, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, রাধারাণী দেবী, সতীকান্ত গুহ, মন্মথ রায় গজেন্দ্রকুমার মিত্র কানন দেবী জরাসন্ধ, মনোজ বসু সুমথনাথ ঘোষ, লীলা মজুমদার ও ভবানী মুখোপাধ্যায়।

তুষার-জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থটি তুষারবাবুর হাতে তুলে দিচ্ছেন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, আশাপূর্ণা দেবী রাধারাণী দেবী, মনোজ বসু, দক্ষিণারঞ্জন বসু, বিশু মুখোপাধ্যায়, ভবানী মুখোপাধ্যায় হরপ্রসাদ মিত্র গোপাল ভৌমিক, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, নবনীতা সেন মণীন্দ্র রায় এবং আরও অনেকে।

'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার' নতুন সংস্করণ দীর্ঘকাল পরে পৃথিবীর অদ্বিতীয় কোষগ্রন্থ 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'র নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হল। এটি এই বিখ্যাত গ্রন্থের পঞ্চদশ সংস্করণ। চতুর্দশ সংস্করণে মোট শব্দ সংখ্যা ছিল ৩,৭০,০০০,০০ আর এবারের সংস্করণে আছে মোট ৪,৩০,০০,০০০ শব্দ। তিনশত ষাটজনের সম্পাদকীয় দপ্তর এই সুবৃহৎ গ্রন্থ সম্পাদনার দায়িত্ব বহন করেন। যাঁরা এই কোষগ্রন্থের জন্য বিভিন্ন নিবন্ধ রচনা করেছেন তাঁরা সংখ্যার দিক থেকে অবশ্য বেশীর ভাগই ইংরেজী ভাষাভাষী, কিন্তু তা ছাড়া পৃথিবীর আরও ১৩১টি দেশের বিদগ্ধ ও সুধী লেখকগণের নামও এর লেখক সূচীতে দেখা যায়। এবারের এই প্রকাশনার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে গোটা কোষগ্রন্থটি তিনটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এবং একটি নতুন নামও দেওয়া হয়েছে: ব্রিটানিকা ৩। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রাক্তন সভাপতি (১৯৩৭-৪৫) উইলিয়াম বেন্টন এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার অধিকাংশ শেয়ারের মালিক ছিলেন; এবারের নতুন সংস্করণ প্রকাশের ব্যয়ভার প্রধানতঃ তিনিই বহন করেন। সাকুল্যে ৩০ খণ্ডের এই 'ব্রিটানিকা-৩'-এর বিক্রয়মূল্য ধার্য হয়েছে ৫৫০ ডলার। এই বিরাটগ্রন্থের রচনা তথা সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন মরটিমার অ্যাডলার। ইনি ইনস্টিটিউট ফর ফিলজফিক্যাল রিসার্চ-এর প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি।

ত্রিশ খণ্ডের এই বিরাট গ্রন্থের তিনটি বিভাগের নাম যথাক্রমে প্রোপাডিয়া, ম্যাক্রোপিডিয়া ও মাইক্রোপিডিয়া।

প্রথম খণ্ডটি প্রোপাডিয়া—পরের উনিশটি খণ্ড ম্যাক্রোপিডিয়া ও পরের ১০টি খণ্ডের মাইক্রোপিডিয়া নাম দেওয়া হয়েছে। প্রথম খণ্ডটি অর্থাৎ প্রোপাডিয়া বাস্তবিকপক্ষে সমগ্র গ্রন্থটির সূচীর স্থান গ্রহণ করেছে। মানবসমাজ, শিল্প, ধর্ম, প্রযুক্তিবিদ্যা মানুষের ইতিবৃত্ত, এবং নানা বিজ্ঞানের বিভিন্ন 'ভাগ' এই খণ্ডে দেখা যায়। তারপরে আছে ৪২টি বিভাগ এবং ১৮৯টি সেকশন ও মোট ১৫০০০ বিষয়। ম্যাক্রোপিডিয়ার ১৯টি খণ্ডে মোট ৪২০৭টি নিবন্ধ আছে। এর বিষয়বস্তু হলো জীবনী ও পৃথিবীর নানা দেশের প্রাকৃতিক পরিচয়। প্রচলিত বর্ণানুক্রমে এই উনিশ খণ্ডের সূচী তৈয়ারী হয়েছে। মাইক্রোপিডিয়ার মোট দশটি খণ্ডে সর্বসমেত ১০২২১৪টি ছোট নিবন্ধ স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে কোনটির দৈর্ঘ্যই ৭৫০ শব্দের অধিক নয়। অ্যাডলারের বিশ্বাস যে আজকের পৃথিবীর কর্মব্যস্ত মানুষের প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে মাইক্রোপিডিয়ার ১০টি খণ্ডই যথেষ্ট। তবে যাঁরা কোনও বিষয় সম্পর্কে কিছু গভীরভাবে জানতে বা বুঝতে আগ্রহী তাঁদের পক্ষে ম্যাক্রো-পিডিয়ার সাহায্য নেওয়া ভিন্ন উপায় নেই। তা ছাড়া ম্যাক্রোপিডিয়া অংশে যে-কোন বিষয় সম্পর্কে আরও পড়াশুনোর জন্য চমৎকার নির্দেশও পাওয়া যাবে। এটি এবারের নতুন সংস্করণের একটা উল্লেখ-যোগ্য বৈশিষ্ট্য বলতে হবে।

ব্রিটানিকা-৩ প্রকাশিত হয়েছে মে মাসের প্রথম দিকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে বেনটন তাঁর অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত এই বিরাট গ্রন্থের সবকটি খণ্ডের প্রকাশনা প্রত্যক্ষ করে যেতে পারেন নি, কারণ, মাত্র দুমাস পূর্বে, গত মার্চ মাসে ৭৩ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

নিঃ ভাঃ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন আয়োজিত রবীন্দ্র-জন্মোৎসব ও বাংলা দিবস পালনের আহ্বান।

গত ১৯শে মে উত্তর কলকাতার ভবতারণ সরকার বিদ্যালয়ে একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে প্রতি বৎসর ১৯শে মে দিনটি রাজ্যে তথা সমগ্র দেশে 'বাংলা দিবস' রূপে পালনের জন্য সর্ব-শ্রেণীর দেশবাসীর নিকট আবেদন রাখা হয়। কারণ, ১৩৬১ সালে এই দিনেই শিলচর-এ ১১ জন বাঙালী মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়ে-ছিলেন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সম্মেলন-এর সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার, প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধিকল্পে তিনি কৃতসংকল্প। মূল প্রস্তাবটি উত্থাপন করে সম্মেলন-এর কলকাতা শাখার সভাপতি খেদের সঙ্গে বলেন যে, "আমাদের মধ্যে এমন সব 'মহামানব' আছেন যাঁরা নিজেদের বাঙালী বলে পরিচয় দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন। সম্মেলন-এর কলকাতা শাখার সম্পাদক শঙ্কর রুদ্র জানান যে, এ বৎসর ২৫শে বৈশাখ থেকে 'বাংলা'কে রাজ্যের সরকারী ভাষা হিসেবে ঘোষণা করবার জন্য সম্মেলন যে দাবী জানিয়েছিলেন সরকার সে দাবীর প্রতি কর্ণপাত করেন নি। কাজেই তিনি বলেন যে, 'এমতাবস্থায় আমরা বাংলার সকল সাহিত্যিককে নিয়ে মহাকরণ অবধি এক মিছিল-পরিক্রমার এবং বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বাধ্য হবো।' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে কবি-প্রণাম জানিয়ে শ্রীঅমিয়-কুমার মজুমদার একটি সারগর্ভ ভাষণ দেন। তিনি বলেন যে রবীন্দ্রনাথ যেন গানের মধ্যেই বাঁচতে চেয়েছিলেন, কাজেই গানই কবি-প্রণামের শ্রেষ্ঠ উপহার। তারপর শ্রীমজুমদার বলেন, 'বিবেকানন্দের মতই তিনিও (রবীন্দ্রনাথ) একক, অসঙ্গ। বিবেকানন্দের মতই তিনিও বলতেন, ভারত বিরোধ বা বৈপরীত্যের মধ্যে ঐক্যের সাধনা করে আসছে।...রবীন্দ্রনাথ বলতেন, আমার প্রতিবেশীকে চেয়ে দেখ। চেন তাদের। তবেই ইতিহাস-পাঠ সার্থক হবে।'

এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুতপা দাস, ঊষা রুদ্র গোপা ভট্টাচার্য, বুলা ভট্টাচার্য এবং গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্য আকাদেমী কর্তৃক প্রেসিডেন্ট সেনঘোর সম্মানিত :

দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে ছোটো-বড়ো পৃথিবীর বহু দেশের কর্ণধারই কখনো না কখনো ভারত ভ্রমণে এসেছেন। এ-তালিকায় আমেরিকা, রাশিয়া, বৃটেন, জার্মানী, চীন, জাপান থেকে সুরু করে ছোটো ছোটো এমন সব দেশ, মানচিত্রে যাদের খুঁজে বের করা সাধারণ মানুষের পক্ষে কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়—সে-সব দেশ থেকেও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ভারত পরিদর্শনে এসেছেন। এ সমস্ত রাষ্ট্রের তুলনায় আফ্রিকার সেনেগাল-এর রাজনৈতিক গুরুত্ব মনে হয় অনেক কম। কিন্তু সেনেগাল-এর প্রেসিডেন্ট সেনঘোর-এর ভারত ভ্রমণ অন্য কারণে বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ। প্রেসিডেন্ট সেনঘোর তাঁর নিজের দেশে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি এবং লেখক হিসেবে খুবই জনপ্রিয়। ভারতের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাঁর দেশের ভাষার সঙ্গে দক্ষিণ

ভারতের তামিল ভাষার যে অনেক তুলনীয় দিক আছে, তা অন্ততঃ এদেশের সাধারণ মানুষ তাঁর ভারত আগমনের পরেই জানতে পারলো। ভাষার সাদৃশ্য যে সংস্কৃতির ব্যাপকতর ক্ষেত্রেও সাদৃশ্যের ইঙ্গিত বহন করে তা অতীতে অনেক প্রাচীন ভাষার গবেষণার ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে। আফ্রিকার সঙ্গে এশিয়ার, বিশেষ করে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের পক্ষে সর্বপ্রধান যে বাধা, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের বিভেদকামী শক্তি, তা আজ অপসারিত, কাজেই আশা করা যায় প্রেসিডেন্ট সেনঘোর-এর মতো জ্ঞানী, গুণী ও উৎসাহী ব্যক্তির সহযোগিতায় আফ্রিকার সঙ্গে ভারতের একটি স্থায়ী সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে। প্রেসিডেন্ট সেনঘোর-এর বিদ্যাবত্তার স্বীকৃতিস্বরূপে আমাদের সাহিত্য আকাদেমী তাঁকে অন্যতম অবৈতনিক সদস্যরূপে বরণ করে নিয়েছেন। তাঁর পূর্বে আর কোন বিদেশী ভারতে এই দুর্লভ সম্মান লাভ করেন নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি সেনেগাল-এর সঙ্গে ভারতের একটি সাংস্কৃতিক চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে।

জার্মান ভাষায় গদ্য রামায়ণ

পূর্ব জার্মানীতে নানা শ্রেণীর কিশোর সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচয়িতা উইলি মেইনচক সম্প্রতি তাঁর একটি অভিনব সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, জার্মান ভাষায় তিনি 'রামায়ণ' অনুবাদ করবেন; তবে পদ্যে নয়, গদ্যে। বলাই বাহুল্য, প্রধানতঃ কিশোর পাঠক সমাজের দিকে লক্ষ্য রেখেই এটি রচিত হবে। এর পূর্বে ভারতীয় রূপকথার একটি সংকলন তিনি অনুবাদ করেছেন বিউটিফুল মদন নামে। বড়োদের উপযোগী তাঁর ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস 'দি ডেডলী সাইলেন্স' এ-বছরের শেষের দিকে প্রকাশিত হবে। ব্রিটিশ রাজত্বকালে রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের সংগ্রামের একটি পর্ব এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু—একথাও মেইনচক জানিয়েছেন।

কাজী আবদুল ওদুদের মৃত্যুবার্ষিকী

নবজাগরণ সমিতির উদ্যোগে সম্প্রতি কাজী আবদুল ওদুদের চতুর্থ মৃত্যু-বার্ষিকী উদযাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদাশংকর রায় সভাপতিত্ব করেন। শ্রীরায় তাঁর ভাষণে ওদুদ সাহেবের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন যে, 'তাঁর সাহিত্যকীর্তি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তাঁর আজীবন সংগ্রামের পরিচয় দেয়।' এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের কলকাতাস্থ ডেপুটি হাই-কমিশনার আবদুল সোভান চৌধুরী, এবং কৃষ্ণ ধর, জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নিরঞ্জন হালদার প্রমুখ অনেকে ওদুদ সাহেবের বহুমুখী প্রতিভার নানা বিশিষ্ট দিকের কথা উল্লেখ করে ভাষণ দেন ও তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

রবীন্দ্র জয়ন্তীতে কবি সম্মেলন

এ বৎসর যতোগুলি রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালনের কথা জানা গেছে, তার মধ্যে একটি বিশিষ্ট আয়োজন হিসেবে রবীন্দ্র সদনে অনুষ্ঠিত কবি সম্মেলন-এর কথা বহুকাল মনে রাখবার মতো একটি ঘটনা। প্রথমতঃ রবীন্দ্রোত্তর যুগের গতায়ু কবিগণের রচনা পাঠ : এ বিভাগে স্থান পেয়েছেন সত্যেন্দ্র-নাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ নিশিকান্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও সুকান্ত ভট্টাচার্য। তারপরে একে একে একুশজন কবি তাঁদের স্বরচিত কাব্যপাঠ করে সকলকে মুগ্ধ করেন। এঁদের মধ্যে অন্নদাশংকর রায়, অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্ত, দীনেশ দাস, কবিতা সিংহ, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও নবনীতা দেব সেন-প্রমুখের কাব্যপাঠ বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। এই প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

জয় ভারত, জয় বাংলা পত্রিকা :

রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম। এই জন্মলগ্নে কোটি কোটি ভারতবাসীর কঠিন শ্রম তথা ত্যাগের কথাও নিশ্চয়ই আজ ইতিহাসের স্বীকৃতি-লাভ করেছে। এবং তাই ভারতের জনগণের সঙ্গে বাংলাদেশের জনগণের এক অভূত-পূর্ব বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এই বন্ধুত্বকে আরও দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী করে তুলবার জন্য ভারত-বাংলাদেশ যুব সঙ্ঘের উদ্যোগে জয় ভারত, জয় বাংলা নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। পত্রিকাটির সম্পাদনা করছেন সঙ্ঘের সভাপতি শ্যামসুন্দর মহাপাত্র এম-পি। অনেক বর্তমান তথা ভূতপূর্ব এম-পি, পত্রিকাটির উপদেষ্টা বোর্ডে আছেন। ভারত ও বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রিদ্বয়, তথা ভারতের রাষ্ট্রপতি, ভারত-বাংলার সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হক—এই কামনা জানিয়ে বাণী পাঠিয়েছেন।

রাজা রামমোহনের দ্বি-শতবার্ষিকী পূর্তি উৎসব :

গত ২২শে মে সন্ধ্যায় মানিকতলায় রামমোহনের পুরনো বাসভবনে সাহিত্য-তীর্থের উদ্যোগে এক স্মরণসভা উদযাপিত হয়। এটি ছিল ভারতপথিক রামমোহনের দ্বি-শতবার্ষিকী পূর্তি উৎসব। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তীর্থপতি বনফুল। সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন যে, আধুনিক বাংলার ইতিহাসে পুরুষসিংহ রামমোহন রায় প্রণম্যপুরুষ। আমরা প্রতি বছর তাঁকে প্রণাম করে সম্মানিত হই। এই অনুষ্ঠানে ডঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, অখিল নিয়োগী, রমেন্দ্রনাথ মল্লিক, জ্যোৎস্নানাথ মল্লিক ও বেলা দেবীও ভাষণ দেন। এই উপলক্ষে রামমোহন লাইব্রেরী হলে ভারতাত্মা রামমোহন নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়।

স্তব্ধ কবির নীরব-জয়ন্তী

এবার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৭৫তম জন্মদিনের নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে একটি অনুষ্ঠান বিশেষ-ভাবে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ২৫শে মে শনিবার সকালে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য সংরক্ষণ সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই জয়ন্তী সমিতির সদস্যরা তাঁদের কার্যা-লয়ের সামনে বড়ো রাস্তায় কবির একটি প্রতিকৃতি ঘিরে মৌন-অবস্থান করেন। প্রতিকৃতিটি ছিল সোনালী ধান দিয়ে তৈরী এবং তাতে যে মালাটি পরানো হয়েছিল তা চাল দিয়ে তৈরী। মৌন-অবস্থান করে সকলে নীরবে কবির রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করেন। পথচলতি অনেকেই ব্যাপারটা দেখে [illegible] হয়ে যান এবং অনেকে স্বেচ্ছায় এই মৌন-প্রার্থনায় যোগদান করেন। নীরব [illegible] প্রতি এই অভিনব পদ্ধতিতে শ্র[illegible] জানাবার জন্য উদ্যোক্তাদের আমরা সাধুবা[illegible] জানাই।

—জয়ৎকার

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাঙলা কথা সাহিত্য (প্রবন্ধ)। ডঃ গোপিকানাথ রায় চৌধুরী। অভী প্রকাশন, ১০ কিরণ-শংকর রায় রোড কলকাতা-১। ষোল টাকা।

প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলালের', রচনাকাল ও প্রকাশ-ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজ থেকে প্রায় দুই দশক আগে বাংলা উপন্যাসের শতবর্ষপূর্তি স্মরণ হয়ে গেছে। এই কিছুদিন আগেও দুর্গেশ-নন্দিনীর একশ বছর পূর্তি আমরা পালন করেছি। মোট কথা বাংলা কথাসাহিত্যের বিবিধ বিচিত্র জয়যাত্রার পথকে আমরা নানা-ভাবে অভিনন্দিত করেছি, এখনো করছিও। বাংলা কথাসাহিত্য তুলনায় অর্বাচীন শাখা হলেও যথেষ্ট পরিণত শিল্প আজ। এই কথাসাহিত্য নিয়ে একাধিক আলোচনা গ্রন্থ ও গবেষণামূলক প্রয়াস হয়েছে, হচ্ছেও। সেই প্রয়াসধারায় ডঃ গোপিকানাথ রায়-চৌধুরীর সদ্য প্রকাশিত 'দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য' গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে উল্লেখ্য।

প্রবন্ধকার জানিয়েছেন, তাঁর ডি-ফিল উপাধি পরীক্ষায় প্রদত্ত গ্রন্থটির 'ঈষৎ পরি-বর্তিত রূপ' আলোচ্য গ্রন্থ। ইতিপূর্বে বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস ধারায় বিভিন্ন পর্ব নিয়ে একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে কোনটি গবেষণা গ্রন্থ

...নটি বা সাধারণ। প্রসঙ্গত বলে রাখি, ...র্তমান গ্রন্থটি সেই সব গতানুগতিক ...লোচনা গ্রন্থ থেকে পৃথক মর্যাদায় দাবী ...খে। গ্রন্থটি বেশ কিছু উপন্যাসের ...হিনীর সংক্ষেপে ও সাধারণ চরিত্র বিচার ...তীয় আলোচনায় সমাপ্তি নয়, সুপরি-...কল্পিতভাবে ১৯১৪ থেকে ১৯৩৯-এর ...ধ্যবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যের কেন্দ্রস্থ ...বণতাকে স্পষ্ট করার প্রয়াস।

পরিশিষ্ট বাদে বিশাল গ্রন্থটির তেরোটি ...রিচ্ছেদ। ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামায় চিহ্নিত ...রিচ্ছেদগুলি দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী-...কালীন কথাসাহিত্য ভাবনাকে একটি ...গ্রথিত চিন্তাসূত্রে ও ঐতিহাসিক ...রম্পর্যে স্পষ্ট করার সহায়ক হয়েছে। ...মথ চৌধুরী' 'ভারতী গোষ্ঠী' কল্লোল ...তনা' যৌবনরাগ ইত্যাদি কয়েকটি অধ্যায়ে ...খক সার্থক গবেষণাধর্মী নিষ্ঠা শ্রম ও ...তা এবং সর্বোপরি মৌলিক মানের ...রিচয় রেখেছেন। কোন কোন মতামতে ...র্কের অবকাশ নিশ্চয়ই আছে কিন্তু ...খকার আপন সিদ্ধান্তকে নিজের মত ... যুক্তিসহ করতে পেরেছেন। ইতিপূর্বে ...া গেছে অধিকাংশ গবেষণা গ্রন্থ ভার-...ী পশুর কাজের তুল্য হয়ে দেখা দিয়েছে ...লোচ্য গ্রন্থটি তা নয়। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ...্যে প্রবন্ধকারের মৌলিকতা নিঃসন্দেহে ...ভিনন্দনযোগ্য। কথাসাহিত্যের মত শ্রেষ্ঠ ...খাটির আলোচনায় যে গদ্যভাষা বর্তমান ...লেখক ব্যবহার করেছেন বিশাল গ্রন্থটির ...হৎ মর্যাদা পাওয়ায় দাবি সেই ভাষার ...হজতা সাবলীলত্ব সাধারণ পাঠকেরও বোধ-...ম্য হওয়ার বৈশিষ্ট্যের কারণের মধ্যেও ...হিত আছে।

বস্তুত ডঃ গোপিকানাথ রায়চৌধুরীর ...র্তমান গ্রন্থটি যে শুধুমাত্র নীরস অ্যাকা-...ডেমিক হয়নি এটাই এর আর এক প্রধান ...ণ। কিন্তু গ্রন্থটি শেষ করার পর ...কয়েকটি মূল প্রশ্ন জাগে যার ফলে ...হৃদয় পাঠকের মনে অভাববোধজনিত ...অতৃপ্তি জেগে থাকে।

কিন্তু সীমাবদ্ধতা মতবিরোধ কোন ...কান আলোচনায় গতানুগতিকতা থাকলেও ...আলোচ্য গ্রন্থে গোপিকাবাবু বাংলা উপন্যাসের ও ছোটগল্পের যে আন্তর ...স্বভাবকে সূক্ষ্ম আলোচনার প্রতিমায় ...শিল্পীত করেছেন তা ইতিপূর্বে প্রকাশিত ...দু-একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নিশ্চিত ...সমকক্ষ।

—বীরেন্দ্র দত্ত

ওরা কজন (উপন্যাস)। মলয় সান্যাল। নব সাহিত্য প্রকাশ ১২১সি সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট কলকাতা-৯। দশ টাকা।

ডায়েরীধর্মী উপন্যাস আঙ্গিকের কোন বৈশিষ্টই নেই অথচ ডায়েরীর ঢঙে উপন্যাস উপহার দিয়েছেন এক নতুন লেখক শ্রীমলয় সান্যাল তাঁর 'ওরা ক'জনে' গ্রন্থে। দুই সন্তানের জননী সুস্মিতার লেখা ডায়েরীই এই গ্রন্থ। কিশোরী অবস্থায় আত্মীয়-সম্পর্কের শচিতাংশু সুস্মিতার দেহ ভোগ করে যৌবনক্ষুধা জাগিয়ে দিয়ে চলে যায়। তারপর থেকে আদিত্য-মাধব ইত্যাদি একাধিক পুরুষের ভোগ্যা হয়ে কাটাবার পর অবৈধ সন্তান নষ্ট করে স্বামীর ঘরে আসে। স্বামী তাকে ভীষণভাবে ভালবাসে আর বিশ্বাস করে, অথচ অতীতের পাপের কথা তাকে বলতে পারে না বলেই তার স্বামী-পুত্র-কন্যার কাছে বিবেকের দংশন। শুধু ভোগ আর তথাকথিত বিবেকের দংশনে পাঠকের সঙ্গে পাত্র-পাত্রীর কোন সহমর্মিতাই তৈরী হয় না। শচিতাংশু অল্প বয়সে যৌবনক্ষুধা বাড়িয়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে বলেই সুস্মিতার অবাধ যথেচ্ছ ভোগের জীবন অপরাধের জীবন সম্ভব হয়েছে—এই যুক্তি ও নায়িকার অন্তিম সিদ্ধান্ত একেবারেই হাস্য-কর। হাস্যকর মেলোড্রমা শচিতাংশুকে হত্যা ও সুস্মিতার আত্মহননও। গভীর মনস্তত্ত্বের ন্যায় ব্যতিরেকে শুধু দেহভোগের বাস্তব চিত্রই যে উপন্যাস হয় না এ বোধ লেখকের থাকা উচিত ছিল। গ্রন্থের মুদ্রনপ্রমাদ সমান পীড়াদায়ক।

প্রেম প্রীতি প্রত্যয় (কাব্য সংকলন) শুদ্ধসত্ত্ব বসু। মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮।১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-৯। তিন টাকা।

শীশুদ্ধসত্ত্ব বসু একজন প্রতিষ্ঠিত আধুনিক কবি। 'প্রাক-কথন' অংশে তিনি জানিয়েছেন, এই গ্রন্থে কিছু হালের কিছু আমার কিশোর কালের রচিত কবিতা স্থান পেয়েছে। কিশোর কালের কিছু কবিতা ও হাল আমলের পরিণত চিন্তার কবিতাগুলি আলোচ্য সংকলনটিতে কবির অন্তরতম সত্তাকে স্পষ্ট করতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। যৌবন, প্রেম, স্মৃতি সময় প্রকৃতি আধুনিক চেতনা—এই সব বিবিধ সূক্ষ্ম ভাবনা ও অনুভূতি কবি শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসুর কবিভাষায় চিত্রের ব্যঞ্জনায় রূপ পেয়েছে। কিছু 'লিরিক' রচনায় কবির স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত ক্ষমতা স্বীকার্য। স্মৃতি বিস্মৃতি কবিকে বেশী নাড়া দেয়। কবি বলেছেন—'চারিদিকে বিস্মৃতির জল, তবু কোন বোধে/স্মৃতি ডোবে'। বলেছেন—'স্থির জল নাড়া খেলে/সব কিছু দুলে ওঠে,/...ফুলের সৌরভ, কিংবা পাখির কাকলি/—সব নড়ে ওঠে, দোল খায় সব।/ এরই নাম স্মৃতি।' জীবন ও সময়-সচেতন কবি। সাম্প্রতিক দ্বিধা সংশয় নিশ্চয়ই এ কবিকে আলোড়িত করেছে কিন্তু কবির উচ্চকণ্ঠ ঘোষণার মত—'জীবনের সব ক্ষেত্র থেকে হেরে-ফেরা/মানুষের কাছে তুমি মূর্তিমতী আশা/অপ্রেমের যন্ত্রণাকে ধুয়ে মুছে/সুরভিত ফুলের উচ্ছ্বাস!' কবির জীবনবোধের ও বিশুদ্ধ কবিসত্তার প্রত্যয়—'সংসার লোকের ভীড় প্রত্যহের গোলামী ও ক্ষুধা/তবু তুমি সময়ের উচ্চসুর নীলাকাশ জীবনের সুধা।' যেমন 'বিস্মৃতির [illegible] বয়া'—এই জাতীয় শব্দগুচ্ছনিহিত [illegible] ভাবনা সহৃদয় পাঠককে যদিও [illegible] পীড়া দেয়, তবু আলোচ্য কবির সামগ্রিক জীবন প্রেম ও ছন্দ চিত্র চিত্রকল্প অতি আধুনিক সপ্রাণ কবি-ভাবনার দোসর হয়েছে।

বর্ষপঞ্জী। ১৩৮১। নির্দেশনায় অরূপরতন ভট্টাচার্য। দাশগুপ্ত অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ। ৫৪।৩ কলেজ স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম তিন টাকা।

এদেশে আগে শিক্ষার একটি অবশ্য পঠনীয় বিষয় ছিল জ্যোতিষ্কচর্চা। রবীন্দ্র-নাথের জীবনস্মৃতিতে দেখা যায়, কিশোর রবীন্দ্রনাথকে তাঁর বাবা দেবেন্দ্রনাথ যত্ন করে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র চেনাচ্ছেন। যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি সেই পৃথিবীকে ভাল করে জানার একটি উপায় হল জ্যোতিষ্কবিদ্যা সম্বন্ধে সচেতনতা। আলোচ্য দিনপঞ্জীর বৈশিষ্ট্য হল প্রতি মাসের আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান সম্পর্কে মানচিত্রের প্রকাশ। চেষ্টাটি অভিনব এবং সমর্থনযোগ্য।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জনক-জননী। নিত্যরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান কথা ও কাহিনী। কোলকাতা বারো। দাম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

আমরা সাধারণতঃ মহাপুরুষদের জীবন এবং তাঁদের বিচিত্র কর্মকাণ্ডেই বেশী আগ্রহী। যে প্রতিবেশের উত্তাপে দিনে দিনে ঐ পুরুষটি মহাপুরুষ হয়ে ওঠেন তাকে জানতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের পিতামাতার কথা এসে পড়ে। মহাপুরুষদের জীবনী নিয়েই আমাদের দেশে যা কিছু আলোচনা যা কিছু পুস্তক রচনা—তাঁদের পিতামাতার প্রসঙ্গটা প্রায় ক্ষেত্রেই গৌণ।

নিত্যরঞ্জনবাবু পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণের জনক-জননী গ্রন্থে তাঁর পিতামাতার কথাই শুনিয়েছেন। সম্ভবতঃ এই পরম-পুরুষের পিতামাতা সম্পর্কে ইতিপূর্বে কোন পৃথক গ্রন্থ রচিত হয় নি। অবশ্য রামকৃষ্ণ বিষয়ক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলিতে এই মহাপুরুষের পিতামাতার প্রসঙ্গ বারবারই এসেছে। নিত্যরঞ্জনবাবুর লেখা সংক্ষিপ্ত অথচ সুলিখিত এই গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে পাঠকদের আকর্ষণ করবে। ছাপা বাঁধাই এবং প্রচ্ছদ পরিচ্ছন্ন।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

বাসন্তী (ফাল্গুন-চৈত্র)—সম্পাদক: ম, মনির-উজ-জামান। সাহিত্য পরিষদ। বাংলা বিভাগ। কুষ্টিয়া সরকারী কলেজ। কুষ্টিয়া। বাংলাদেশ। দাম এক টাকা।

কুষ্টিয়া সরকারী কলেজের বাংলা বিভাগের মুখপাত্র বাসন্তী মননশীল সাহিত্য-পত্রিকা। কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন মুহম্মদ শোয়েব আলী (জীবনানন্দ দাশের আধুনিকতা) ফজলুর রহমান খান (মধু-সূদনের কাব্যে মানবতা), আলেয়া বেগম (পাবলো রুইজ পিকাসো) মুহম্মদ ইদ্রীস আলী (বাঙালী কবি মধুসূদনের আধুনিকতা) মুহম্মদ খোসরু আলম (কবি জসীমউদ্দীন), ম, মনির-উজ-জামান (কথাসাহিত্য

[illegible] প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ। আরো কয়েকটি প্রবন্ধ, কবিতা ও গল্প সংখ্যাটি সমৃদ্ধ।

আন্তর্জাতিক আঙ্গিক (শীত/বসন্ত-কালীন সংখ্যা ১৩৮০)—সম্পাদক: রাধা সরকার। ১৯০ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড। কলকাতা-২৬। দাম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বর্তমান সংখ্যায় বেশ কয়েকটি মূল্যবান আলোচনা বেরিয়েছে। সত্যজিৎ রায়ের জন-অরণ্য' প্রসঙ্গে [illegible]-এর একটি প্রবন্ধ, ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে দেবাশিস দত্তের আলোচনা উল্লেখযোগ্য। কয়েকটি ছবির সম্পর্কে আলোচনা সংখ্যাটির অন্যতম আকর্ষণ।

লেখা ও রেখা (১৮ বর্ষ। ২য় সংখ্যা)—সম্পাদক: ভাস্কর মুখোপাধ্যায়। মিত্রালয়। ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম এক টাকা।

আগেকার সংখ্যাগুলির তুলনায় উল্লেখযোগ্য রচনাসমৃদ্ধ না হলেও বর্তমান সংখ্যায় বেশ কয়েকটি কবিতা, গল্প প্রবন্ধ আছে। বর্তমান কাগজদুর্মূল্যের বাজারে গ্রন্থ প্রকাশ যেখানে দুরূহ হয়ে উঠেছে, সেখানে এই জাতীয় সাহিত্যপত্র-পত্রিকা প্রকাশ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বিশেষ করে 'লেখা ও রেখার' মত উচ্চ মানের পত্রিকার প্রতি পাঠকদের আরও হৃদয়বান হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

কালি ও কলম (৭ম বর্ষ। ৭ম সংখ্যা)—সম্পাদক শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম দেড় টাকা।

বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন সতীকান্ত গুহ, আশা দেবী, কৃষ্ণ ধর, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়, অমলেন্দু ঘোষ, আদিত্য সেন, সুজিতকুমার ভট্টাচার্য, কামাল হোসেন, সৌমেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় এবং সুচরিতা সান্যাল।

সম্প্রতি। সম্পাদক প্রণব মাইতি। অন্ডাল। কন্টাই। মেদিনীপুর। দাম এক টাকা।

মেদিনীপুর জেলার প্রতিনিধিমূলক কবি ও কবিতার অনিবার্য ত্রৈমাসিক 'সম্প্রতি'র এই সংখ্যাতে রয়েছে ছড়া কবিতা এবং আলোচনা। কবিদের মধ্যে প্রায় সকলেই নতুন। কিছু কবিতায় প্রতিশ্রুতির ছাপ আছে। ছাপার ব্যাপারে আরও একটু যত্ন নেওয়া দরকার।

ভাষা (রবীন্দ্রনাথ বিশেষ সংখ্যা) সম্পাদক মৃণাল নাথ। ১ বিধান সরণী, কোলকাতা-১২। দাম আড়াই টাকা।

বাংলাভাষার ভাষাবিজ্ঞান অনুশীলন সমিতির ত্রৈমাসিক মুখপাত্র ভাষার সাম্প্রতিক সংখ্যাটি রবীন্দ্রনাথ বিশেষ সংখ্যা হিসেবে চিহ্নিত। এই সংখ্যার ভাষা সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করেই। প্রতিটি প্রবন্ধই উল্লেখ করার মতো। লিখেছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, প্রবোধচন্দ্র সেন, তারাপদ ভট্টাচার্য, মুহম্মদ আব্দুল হাই এবং আরও কয়েকজন। মুহম্মদ আব্দুল হাই-এর লেখা ভাষাতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ এবং তারাপদ ভট্টাচার্যের লেখা ছন্দ-অতিক্রমী রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ দুটি পাঠককে বিশেষভাবে আকর্ষণ করবে।

মর্মর (কবি প্রণাম)। সম্পাদনা প্রশান্ত রায় এবং হরিপদ দে। ২৮বি সিমলা স্ট্রীট, কোলকাতা-৬। দাম চল্লিশ পয়সা।

সুনির্বাচিত কবিতার তালিকায় অসংখ্য কবির কবিতা আছে। তার মধ্যে বিশেষভাবে ভালো লেগেছে কৃষ্ণ ধর, রাম বসু, তারাপদ রায় এবং সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা। সুপ্রতিষ্ঠিত কবি দীনেশ দাস এবং মণীন্দ্র রায়ের সচিত্র সাক্ষাৎকারটি পত্রিকার বিশেষ আকর্ষণ। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থ আলোচনাটিও উল্লেখ করার মতো। পত্রিকার একমাত্র গল্পটিতে প্রফুল্ল রায় পাঠকদের উৎফুল্ল করতে পেরেছেন বলেই ধারণা হয়। পত্রিকার ছাপা এবং অলংকরণে রুচির ছাপ রয়েছে।

কথা ও সংস্কৃতি। সম্পাদক গণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কোলকাতা নয়। দাম এক টাকা।

'কথা ও সংস্কৃতি'র এই সংখ্যায় বেশ কিছু কবিতা কয়েকটি গল্প এবং দুটি প্রবন্ধ আছে। কবিতাগুলির মধ্যে শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং অমিতাভ দাশগুপ্তের কবিতা ভালো লেগেছে। প্রবন্ধ দুটি লিখেছেন দেবপ্রসাদ সিংহ এবং গণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্য সানাই। সম্পাদক বিশ্বনাথ ঘোষ। সানাই সাহিত্য সংস্থা। রসুলপুর। বর্ধমান। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

সম্পাদককে লেখা নির্বাচনের ব্যাপারে আরও যত্নশীল হতে হবে। অধিকাংশ লেখাই দুর্বল। ভবিষ্যতে পত্রিকার পাতায় প্রতিশ্রুতির ছাপ দেখব এই প্রত্যাশাই রাখলাম।

কৌশিকী। সম্পাদনায় তারাপদ সাঁতরা ও আনন্দ গঙ্গোপাধ্যায়। ৮, মথুরাম কানোড়িয়া রোড। হাওড়া। দাম কুড়ি পয়সা।

পরিচ্ছন্ন পত্রিকাটিতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ আছে। লিখেছেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুকুমার মিত্র। লোকসংস্কৃতি এবং প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ প্রবণতা পত্রিকাটির একটা বিশিষ্ট চরিত্র সৃষ্টি করেছে। এই ধরনের পত্রিকার বহুল প্রচারের প্রয়োজন আছে। পূর্ণেন্দু পত্রীর প্রচ্ছদ সুন্দর। ছাপাও ভাল।

যুগ বিজ্ঞান। সম্পাদনা জওহর ব্যানার্জি এবং প্রভাস মজুমদার। অশোকনগর। ২৪ পরগণা। দাম পনের পয়সা।

পত্রিকাটির নিবেদন : মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রসারের উদ্দেশ্যে জাতীয় অধ্যাপক আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু বাংলার মাটিতে যে বীজ বপণ করেছিলেন, তারই একটি অঙ্কুরিত চারা 'যুগ বিজ্ঞান'। এই চারা একদিন মহীরুহে পরিণত হবে এই কামনাই করি।

অভিযাত্রিক। পঁচিশে বৈশাখের বিশেষ সংখ্যা। সম্পাদক নির্মলেন্দু নাথ। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

অসংখ্য কবিতায় সমৃদ্ধ এই পত্রিকাটির অধিকাংশ কবিতাই ভালো লেগেছে।

স্বতোৎসার। সম্পাদনা চন্দন ভট্টাচার্য। ৪০ নন্দনা পার্ক। কলকাতা-৩৪। দাম চল্লিশ পয়সা।

পত্রিকাটির সর্বত্র চমক সৃষ্টির প্রয়াস কোনো উদ্দেশ্যই সফল করতে পারে নি।

বোম্বাই বিচিত্রা। রেখা দত্ত, মঞ্জুলিকা গঙ্গোপাধ্যায় এবং শার্লট ঘোষ সম্পাদিত। বিচিত্রা কালচারাল এসোসিয়েশন। ফ্ল্যাট ২ প্রদীপ, ওরলি হিল এস্টেট। বোম্বাই ০০০০১৮। দাম তিন টাকা।

বোম্বাই থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা 'বোম্বাই বিচিত্রা'র নববর্ষ সংখ্যাটিতে গল্প, কবিতা, নাটক উপন্যাস ভ্রমণ কাহিনী রম্যরচনা অনেক কিছুই আছে। সুদূর বোম্বাই থেকে সেখানকার প্রবাসী বাঙালী মনটিকে পত্রিকাটি আমাদের সামনে হাজির করেছে। সম্পাদনার দিকে একটু মনোযোগ দিলে পত্রিকাটি ভবিষ্যতে আরও ভালো হবে।

আলোয়া। গৌতমকুমার রায় সম্পাদিত। ২৩ পণ্ডিত হরিনাথ ন্যায়রত্ন লেন হাওড়া। দাম পঁচিশ পয়সা।

সাহিত্য সংখ্যা আলোয়ার কবিতা-গল্পের নির্বাচনের ব্যাপারে মোটেই যত্ন নেওয়া হয় না। তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। এমনি আরো কয়েকটি কবিতা আছে। গৌতম রায়ের গল্পটিও নেহাৎই কাঁচা লেখা। নতুন পত্রিকাই নতুন লেখকদের লেখা প্রকাশের ক্ষেত্র। কিন্তু নতুন লেখকদের লেখার ব্যাপারে নিশ্চয়ই শক্তি সঞ্চয় করতে হবে।

(৭১)

ভারতীয় সঙ্গীতে প্রথম অর্কেস্ট্রা

দক্ষিণাচরণ সেন

যেমন বিরাট তেমনি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। জাঁকজমক আর আড়ম্বরের যেন এক চূড়ান্ত প্রদর্শনী। গড়ের ময়দানে কি সমারোহ সেদিন। ১৯২২ সালের ৫ই জানুয়ারী। সম্রাট পঞ্চম জর্জের কলকাতায় সেই সম্বর্ধনা। ফোর্ট উইলিয়মের ময়দানে পেজেণ্ট শো। কলকাতায় এক অভূতপূর্ব দৃশ্য।

কিছু দিন আগেই (১৯১১) দিল্লীতে বৃটিশ সম্রাটের দরবার হয়ে গেছে। তারপর জয়পুর প্রভৃতি রাজ্য দেখে পঞ্চম জর্জ ও রাণী মেরী এসেছেন কলকাতায়। এখানে ছ' দিনের কার্যসূচী। তার মধ্যে একদিন, ৫ই জানুয়ারী শুক্রবার ময়দানে এই পেজেণ্ট শো হবে। আয়োজন করা হয়েছে এক বিশাল, বিচিত্র অনুষ্ঠান। কলকাতাবাসীদের বৃটিশ-ভক্তির পরাকাষ্ঠা সরকারী মহল দেখিয়ে দিতে চান। কয়েক দিন ধরেই প্রচার হয়েছে তার নানা ধুমধামের কথা।

দুপুর আড়াইটা থেকে আরম্ভ। কিন্তু সকাল থেকেই ময়দানে জনস্রোত দেখা দিয়েছে। দুপুরের অনেক আগেই এ অঞ্চলের সব পথে ভিড়। চতুর্দিকে জনতা। ময়দানে সাধারণের জন্যে সমস্ত জায়গায় লোকারণ্য।

সেই বিপুল জনসমাবেশে বাঙ্গালী মহিলাদের বিশেষ চোখে পড়ে। তার আগে এত অন্তঃপুরিকাদের কোন উপলক্ষ্যে দেখা যায় নি ময়দানে কিংবা কোন প্রকাশ্য স্থানে।

সকলের দৃষ্টি সুদৃশ্য প্যাভিলিয়নের দিকে। সেখানেই পঞ্চম জর্জ ও রাণী মেরীর জন্যে সিংহাসন সাজানো হয়েছে।

ক্রমে বেলা দুপুর হয়ে এল। মাননীয় অতিথিরা তখনো উপস্থিত হন নি সজ্জিত প্যাভেলিয়নে। তবে ব্যবস্থা মতন অনুষ্ঠানের ভূমিকা পর্ব আরম্ভ হল।

মিলিটারী ব্যাণ্ড ঝমঝম শব্দে বেজে উঠল আকাশ বাতাস ভরিয়ে দিয়ে। ময়দানে উৎসবের সাড়া জাগল। শোভাযাত্রায় দেখা গেল—বাহারী পোশাকে সারি সারি ঘোড়া। পেছনে তেমনি সারবন্দী হাতি তাদেরও দেখবার মতন সাজ। হাতীদের মাঝে মাঝে পাগড়ী মাথায় চোপদার। তারপর টকটকে লাল পোশাকে ইংরেজ সেনাদল এবং খাকি সাজে দেশীয় সেপাই। তাদের সঙ্গে নিজেদের ব্যাণ্ড পার্টি। তার পরে এল এক জোড়া ভবনগর রথ। ত্রিপুরার হাতীরা সেই রথ দুটিকে টেনে নিয়ে চলেছে। তাদের পিছনে পিছনে আসছে পাইক বরকন্দাজ, উটের দল ঘোড়ার দল আর অন্য হাতীরা।

কিছুক্ষণ পরে রাজ দম্পতিকে দেখা গেল। তাঁরা রাজকীয় যান থেকে নেমে এলেন প্যাভিলিয়নে। তারপরই অনুষ্ঠান আরম্ভ হল। বিউগল বেজে উঠল উল্লাসের সুরে। আর সেই সব অপূর্ব চলন্ত দৃশ্যাবলী রাজা-রানীর সামনে আসতে লাগল।

তাঁদের সামনে প্রথম এল নওরোজ শোভাযাত্রা। তারপরই আর এক অভূতপূর্ব অনুষ্ঠান। তা একই সঙ্গে যেমন দ্রষ্টব্য তেমনি শোনবার মতন। বিরাট এক ঐকতান বাদনের দল বাজিয়ে চলেছেন। বাদকদের

সংখ্যা একশর কম নয়। সকলেই বাঙালী; আর তাঁদের নেতা দক্ষিণাচরণ সেন। সঙ্গীত জগতের আরো এক আশ্চর্য ঘটনা। সেই ঐকতানের প্রত্যেকটি বাদ্যযন্ত্র দেশীয় বাজছে ভারতীয় সঙ্গীত—কিন্তু ইউরোপীয় রীতির অর্কেস্ট্রা। দক্ষিণাচরণ সেনের বিখ্যাত ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রা তখন ময়দানে মুহুর্মুহু সুরলহরীতে চতুর্দিক প্লাবিত হয়ে গেল। শোভাযাত্রার অন্য সব অংশের মধ্যে এই বিরাট অর্কেস্ট্রা আকৃষ্ট করেছিল পঞ্চম জর্জকে। তিনি আমার তো ভাল করে শুনেতে চেয়েছিলেন। আর পরের দিন লাটপ্রাসাদে শোনবার পর উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন দক্ষিণাচরণকে। সম্রাটের ব্যান্ড মাস্টার মিঃ ব্যাকেনার সে অর্কেস্ট্রার স্বরলিপিও লিখে নেন। ময়দানের প্যাজেন্ট শোতে সেদিন অর্কেস্ট্রার পরে দেখা দিয়েছিলেন উড়িষ্যার পাইক নর্তকদের দল। ময়ূরভঞ্জের রাজার পরিচালনায় ময়ূরভঞ্জের এই কুশলী নৃত্যও দেখবার মতন হয়েছিল।

কিন্তু সেসব বিবরণের এখানে প্রয়োজন নেই। এখন বর্ণনার বিষয়—সেদিনের ভারতীয় সংগীতে পাশ্চাত্য অর্কেস্ট্রা বাদনের কথা।

অমৃতবাজার পত্রিকায় তার পরের দিন (অর্থাৎ ৬-১-১৯১২ তারিখে) প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়:

'Babu Dakshinacharan Sen's band party stood in the middle playing a sweet gal a tune'.

এই তারিখেই Statesman প্রকাশ করে—

'Both processions were headed by Maharaja Tagore's Indian band, which played under the direction of Hon. Superintendent Babu Gopal Chandra Mukherjee and band masters Professor Dakshina Charan Sen and Babu Gopal Chander Banerjee — Indian music resembling in character the chants of Western music. It also played at the end the National Anthem, the effect, in the Indian instruments, being rather world but by no means unpleasing. After heading the processions as roal as the pavlion this band took up the position immediately in front of the thane and played at intervals as the processions passed.

স্টেটসম্যানের এই বিবরণ থেকে পাওয়া গেল যে, দক্ষিণাচরণ প্রমুখের নেতৃত্বে সেই বাদকগোষ্ঠী দেশীয় যন্ত্রে বাজিয়েছিলেন, তাঁরা যে ভারতীয় সঙ্গীত বাজান তা পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ধরণে হয়, তাঁরা শেষে যে National Anthem ব্রিটিশ আমলের সেই 'জাতীয় সংগীত' অর্থাৎ God Save the King Emperor! বাজিয়েছিলেন তাও উপভোগ্য হয়েছিল, তাঁদের সিংহাসনের অর্থাৎ পঞ্চম জর্জ ও মেরির একেবারে সামনেই ছিলেন অর্কেস্ট্রা-বাদকদের দল এবং সাময়িক বিরতির পরে পরে কয়েকবারই তাঁরা শুনিয়েছিলেন অর্কেস্ট্রা।

স্টেটসম্যানের এই বিবরণে সামান্য একটি ভুল আছে। গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদবী হবে চট্টোপাধ্যায়।

অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিবেদনে আরো বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায় যন্ত্রসংগীতের সেই বিরাট অনুষ্ঠানের কথা। কতজন বাদক ছিলেন তার উল্লেখের সঙ্গে কি কি রাগ সেই বৃন্দবাদনে বেজেছিল, কোন্ কোন্ যন্ত্র বাজে তাদের নামও ৬-১-১৯১২ তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়:—

|The ancient Indian band of 100 performers has been equipped and trained under the supervision of Maharaja Tagore. The instruments by the band have all been specially made from ancient models for the present occasion for the Imperial Reception Committee.

1) Ragini Sarang (composed by Maharaja Tagore)
2) Ragini Imon Kalyan (composed by Maharaja Tagore).
3) Ragini Shankara (composed by Professor Sen).
4) Indian March (composed by Professor Sen)

The following Indian musical instruments were used in this band:
1) Banshi—bamboo flute—an ancient wind instrument of the Hindus.
2) Tubri—a pastoral wind instrument with double tubes. Also used by Snake charmers.
3) Juhatnjree (?)....consists of two hollow rings of copper enclosing little bells
4) Kartaul—cymbals.
5) Ghanta—cup-shaped bells.
6) Surmangal (?)—true Hindu origin
7) Jagajhampa 8) Kara, 9) Tichora 10) Dhak, 11) Saringhee 12) Shankha, 13) Mridanga, 14) Nakara, 15) Kartar—of two pieces of wood, 16) Pillagovi or Murali, 17) Nagasvar, 18) Mukh-vina, 19) Moshund or Bazana, 20) Turi bheri, 21) Rabab, 22) Saradiya vina, etc.

উল্লিখিত মহারাজা টেগোর হলেন পাথুরিয়াঘাটার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর। তিনি রাজা সৌরীন্দ্রমোহনের পুত্র এবং মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পোষ্যপুত্র ও উত্তরাধিকারী। তিনি পারিবারিক সূত্রে এবং আবাল্য পরিবেশে সঙ্গীতজ্ঞ হতে পারেন। উক্ত ১০০ জন বাদকের প্রাচীন ভারতীয় বাদনগোষ্ঠী' মহারাজা প্রদ্যোৎকুমারের আনুকূল্যে, অর্থব্যয়ে গঠিত হয় একথাও সত্য। কিন্তু 'মহারাজা টেগোরের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাপ্রাপ্ত' একথা আক্ষরিক অর্থে নেবার প্রয়োজন নেই। সেই একশজন বাদকের শিক্ষা দেন দক্ষিণাচরণ। কারণ তিনিই ছিলেন সেই বিরাট যন্ত্রী সম্প্রদায়ের প্রকৃত সংগঠক, সুরসংযোজক ও শিক্ষাদাতা। প্রদ্যোৎকুমার তেমন ক্রিয়াসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন না। সেখানে অনুষ্ঠিত সারংগ ও ইমন কল্যাণ অংশ দুটির সুরকার বলে প্রদ্যোৎকুমারের নাম মুদ্রিত হলেও সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে একই কারণে। 'শঙ্করা' এবং 'ইণ্ডিয়ান মার্চ'-এর মতন ও দুটিও দক্ষিণাচরণের সৃষ্টি হবারই সম্ভাবনা। সামাজিক কৌলিন্য বা গৌরবে সেকালে একের কৃতিত্ব অপরের ওপর আরোপিত হত। সাহিত্যক্ষেত্রের মতন সঙ্গীত জগতেও তার দৃষ্টান্ত অপ্রাপ্য নয়।

ভারতীয় সঙ্গীতে প্রথম ইউরোপীয় অর্কেস্ট্রা গঠন ও পরিচালনা, সম্পূর্ণ রাগকে (অর্থাৎ যে সমস্ত রাগে বিবাদী বা বর্জিত স্বর নেই) পাশ্চাত্য রীতিতে 'হার্মোনাইজ' করে অর্কেস্ট্রার অনুষ্ঠান, সেজন্যে সম্প্রদায়ের সকল যন্ত্রীকে শিক্ষিত, গঠিত করা —এসবের জন্যে দক্ষিণাচরণ সেনের নামই স্মরণীয়। ভারতীয় রাগের ভিত্তিতে ইউরোপীয় ধরনে Blue Ribbon Orchestra-র প্রবর্তন করে তিনিই এদেশে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলেন। পঞ্চম জর্জের এই পেজেন্ট শো-র প্রায় ৩০ বছর আগে থেকে দক্ষিণাচরণ তাঁর অভিনব অর্কেস্ট্রা বাদন আরম্ভ করেছিলেন। সেই ৩০ বছর যাবৎ তাঁর ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রা অতি প্রসিদ্ধি লাভ করার ফলেই তিনি সেদিন এই বৃহৎ অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পান ময়দানে।

সেদিনকার সমবেত বাদনের জন্যে যে দীর্ঘকালের প্রস্তুতি ছিল, তা ধারণা করা যায়। দক্ষিণাচরণের ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রার অভিজ্ঞতা না থাকলে অকস্মাৎ সেই পেজেন্ট শো-তে ১০০ জন যন্ত্রীর ভারতীয় রাগে, দেশীয় যন্ত্রে ইংরেজদের শোনান সম্ভব হত না হার্মোনাইজ করা এতগুলি গৎ। সম্রাট পঞ্চম জর্জ কিংবা বড়লাটের সামনে অর্কেস্ট্রা বাজিয়েছিলেন এবং প্রশংসিত হয়েছিলেন এ জন্যেই দক্ষিণাচরণের গৌরব নয়। ভারতীয় সংগীতে 'হার্মোনাইজ' করা রীতির বৃন্দবাদনের তিনি প্রবর্তক ছিলেন, শ্রেষ্ঠ গুণী ছিলেন। সুতরাং এ বিষয়ে যোগ্য প্রতিনিধি রূপেই তাঁকে আনা হয় পেজেন্ট শো-তে। তা-ই তাঁর গুণপনার স্বীকৃতি।

ভারতীয় রাগে হার্মোনাইজ করার ব্যাপারে আরো কথা আছে।

দক্ষিণাচরণ পাশ্চাত্য ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রা প্রথম পত্তন করেন ১৮৮৩ সালে। ভারতীয় সঙ্গীতে হার্মোনাইজ করার দৃষ্টান্ত অবশ্য বাংলাদেশে তারও আগে আছে। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় ও ইউরোপীয় সংগীতে ব্যুৎপন্ন হন তরুণ বয়সেই। তিনি ১৮৬৭/৬৮ সালে প্রথম হার্মোনাইজ করেছিলেন। তার নিদর্শন আছে তাঁর Hindusthani Airs Arranged for the Piano Forte পুস্তকে (১৮৬৮ সালে প্রকাশিত)। কিন্তু কৃষ্ণধন কোন অর্কেস্ট্রা গঠন বা প্রবর্তন করেননি। সে গৌরব দক্ষিণাচরণেরই প্রাপ্য। ৪০ বছরব্যাপী তাঁর দীর্ঘ সঙ্গীতজীবন দক্ষিণাচরণ অর্কেস্ট্রা গঠন ও পরিচালনাতেই

অভিবাহিত করেন। ভারতীয় সংগীতে নানা সম্পূর্ণ রাগে তিনি হার্মনাইজ করা এবং তার ভিত্তিতে অর্কেস্ট্রার সাধনাতেই মগ্ন থাকেন আজীবন।

যেদিন মরদানের অনুষ্ঠানে দক্ষিণাচরণ ১০০ জন বাদকদের নিয়ে অর্কেস্ট্রা পরিবেশন করেছিলেন। কিন্তু অন্য সময়ে তাঁর নিয়মিত অর্কেস্ট্রায় তাঁর বাদকদের সংখ্যা থাকত ১১।১২ জন মাত্র। সুতরাং নিখুঁত ইউরোপীয় রীতির নিরিখে তাঁর অর্কেস্ট্রা সম্পূর্ণ আদর্শ নয়, একথা স্বীকার্য। কারণ পূর্ণাঙ্গ পাশ্চাত্য অর্কেস্ট্রা ১০০।১৫০ জন বাদক নিয়ে গঠিত হওয়াই রীতি। পিয়ানো যন্ত্র অপরিহার্য। ৮৮ চাবিযুক্ত ৮ সপ্তকের তার যন্ত্র পিয়ানো ব্যাপকতম সুরের পরিধি নিয়ে পাশ্চাত্য অর্কেস্ট্রার প্রধান ঐশ্বর্য। সেই পিয়ানো দক্ষিণাচরণের অর্কেস্ট্রায় কখনো বাজেনি। কারণ তাঁর সে বহুমূল্য যন্ত্র ক্রয়ের সংগতি ছিল না এবং এদেশে পেশাদারি জীবনে শ্রোতাদের কাছেও ততখানি আনুকূল্য সম্ভব হয়নি। তা ছাড়া, যথার্থ অর্কেস্ট্রার চারটি অংশে (বেস, টেনর আলটো এবং সোপ্রানো) নির্দিষ্ট থাকে বিশেষ বিশেষ যন্ত্র। খাদ থেকে ক্রমে চড়ার দিকে বেস টেনর অলটো ও সোপ্রানো সেই সব ভাগে নির্দিষ্ট যন্ত্রে বাজাবার প্রথা। দক্ষিণাচরণের পক্ষে তেমনি নানা মূল্যবান যন্ত্র এবং উপযুক্ত সংখ্যায় বাজানো সম্ভব ছিল না। সংগতিরও অভাব এবং অত সংখ্যক শিল্পীকেও নির্দিষ্ট যন্ত্রে প্রস্তুত করা অসম্ভব। সে যুগের কলকাতার সাংগীতিক পরিস্থিতিতে ইউরোপীয় রীতির বিরাট আকারের অর্কেস্ট্রা গঠন দক্ষিণাচরণের পক্ষে নানা কারণেই সম্ভব ছিল না। তাঁর পক্ষে যতখানি সাধ্য ছিল তা তিনি করেছিলেন অপূর্ব দক্ষতায়। রাগের শুদ্ধতা অক্ষুণ্ণ রেখে তিনি পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে হার্মনাইজ করেন। আর রচিত 'গীতগুলি' নিয়ে বাজে তাঁর অর্কেস্ট্রা। উপযুক্ত সংখ্যক এবং নির্দিষ্ট সব যন্ত্র বিশেষ পিয়ানো তার ছিল না। তবু তা এই অর্থে অর্কেস্ট্রা যে, যন্ত্রীরা ভিন্ন ভিন্ন অংশ বাজাতেন এক-যোগে। একই সুর সকলের হাতে বাজত না। অর্থাৎ তা কনসার্ট নয়, রীতিমত অর্কেস্ট্রা ছিল সংগীতে। আপাত অমিলের মধ্যে বহু মিল ও স্বরসংগতি যথারীতি বিকশিত হত। ভারতীয় রাগ রূপ শুদ্ধ রাখার বিষয়ে তিনি ছিলেন যেমন নিষ্ঠাবান তেমনি সতর্ক। যে যে রাগে বিবাদী স্বর আছে সেসব রাগ তিনি অর্কেস্ট্রার জন্যে কখনো নির্বাচন করতেন না। তাঁর এই সুচিন্তিত অভিমত ছিল যে, হার্মনাইজ করবার সময় এক প্রকার স্বরান্তরের মধ্যে বর্জিত স্বর এসে পড়তে পারে অসাবধানে। সেই সতর্কতার জন্যে তিনি সম্পূর্ণ রাগ (অর্থাৎ যেসব রাগে সবগুলি স্বর বিদ্যমান) ভিন্ন কখনো অর্কেস্ট্রার জন্যে হার্মনাইজ করেননি।...

বিয়াসিংথ বাদকরূপে দক্ষিণাচরণের বহুমুখী কৃতিত্ব ছিল। বিশেষ করে বেহালা ও বাঁশীতে তিনি ছিলেন অতি কুশলী বাদক। তেমনি ছড়যোগে বাদিত বেহালা অর্থাৎ তত জাতীয় নানা আকারের (চেলো, ডাবল বেস ইত্যাদি) যন্ত্রে তাঁর দক্ষতা ছিল। শুষির জাতীয় অর্থাৎ ফুৎকারের বাদন ক্ল্যারিওনেট, কর্নেট, ইউফোনিয়ম প্রভৃতিতেও অভিজ্ঞ ছিলেন তিনি। এইসব যন্ত্রে বিভিন্ন শিষ্যদের তিনি শিক্ষা দিয়ে অর্কেস্ট্রার জন্যে প্রস্তুত করতেন। তাছাড়া, পিয়ানোতে হাত ছিল তাঁর। সুর রচনা ও সংযোগ অলংকরণের (হার্মনাইজেশন) কার্য তিনি প্রথমে পিয়ানোতেই করে নিতেন। সেই পিয়ানোর সুর থেকেই স্বরলিপি করতেন, ছাত্রদের শেখাতেন নানা যন্ত্রে। আর তাঁর অর্কেস্ট্রার গৎ গড়ে উঠত। আবার সংগীতের ঔপপত্তিক বিষয়ে, বিশেষ ভারতীয় সংগীতে, তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল গভীর। ইউরোপীয় রীতিতেও যে রীতিমত অভিজ্ঞ ছিলেন, একথা বলা বাহুল্য। দুই ধারার সংগীতে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি, চিন্তার মৌলিকতা এবং ব্যবহারিক প্রয়োগ বিষয়ে বহুলাংশ তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীতে সুপ্রকাশ। তাঁর 'ঐকতানিক স্বর সংগ্রহ', গীতশিক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ (১৮৯৩ ও ১৮৯৮),

'সরল হারমোনিয়ম সূত্র' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ (১৯০৬) এ বইয়ের চারটি সংস্করণ শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। তেমনি সংস্করণ ১৯২২) পুস্তকগুলি সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। তেমনি ঔপপত্তিক বিষয়ে তাঁর পরিণত প্রতিভার স্বাক্ষর রাগের গঠন শিক্ষা প্রথম (১৯২৪) ও দ্বিতীয় ভাগ (১৯২৫) অবশ্য পাঠ্য। শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক প্রয়োজনের বিষয়ে তিনি কতখানি সচেতন ছিলেন এবং তা সিদ্ধ করবার বিষয়ে কি ঐকান্তিক ছিলেন তা তাঁরই একটি উক্তি থেকে জানা যায়। 'সরল হারমোনিয়ম সূত্র' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লেখেন 'এ পর্যন্ত গানের স্বরলিপিপূর্ণ বহু পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু ঐ সকল স্বরলিপি দৃষ্টে গান শিক্ষা প্রণালী কোন পুস্তকে লিখিত হয় নাই। এজন্য এই প্রণালী ইহাতে অতি বিস্তৃত ও বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে।' গ্রাম পরিবর্তন করিয়া বাজাইবার প্রণালীও তিনি বর্ণনা করেছেন প্রাঞ্জলভাবে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও তিনি বিজ্ঞানসম্মত আলোকপাত করেন: 'পুস্তক দৃষ্টে সংগীত শিক্ষা করিতে হইলে উত্তমরূপে মাত্রা শিক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।' অথচ মাত্রা শিক্ষা অধিকাংশ পুস্তকে অতি সংক্ষেপে দেওয়া থাকে। সেজন্যে তিনি বিস্তারিতভাবে এবং সহজবোধ্য রীতিতে মাত্রা বিষয়ে আলোচনা করেছেন এই পুস্তকে। এমনি নানা প্রয়োজনীয় এবং সুস্পষ্টিত নির্দেশের জন্যে তাঁর বইগুলি বিশেষ মূল্যবান হয়েছিল। বিশেষ তাঁর দুই খণ্ডে 'রাগের গঠন শিক্ষা' সংগীতের ছাত্র ও জিজ্ঞাসু সকলের পক্ষেই অপরিহার্য বলা যায়। তাঁর সমগ্র সংগীতজীবনের চিন্তা এবং অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ এই গ্রন্থের আরও চারটি খণ্ড রচনার পরিকল্পনা তাঁর ছিল। সেজন্যে উপকরণ সংগ্রহও করেছিলেন উপযুক্তভাবে। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পরই তাঁর মৃত্যু হয়। আর অপূর্ণ থেকে যায় আরব্ধ মহৎ কাজটি।

রাগসংগীতে অভিনব অর্কেস্ট্রা প্রবর্তনের জন্যে কেবল নয়। সংগীত বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্যের জন্যেও সংগীতসমাজে সম্মানিত ছিলেন দক্ষিণাচরণ। পরিণত বয়সে তিনি আচার্যের শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিলেন। সেকালের গণ্ডীবদ্ধ সংগীতচর্চার ক্ষেত্রেও তাঁর জীবিতকালেই কোন পুস্তকের তিনটি চারটি সংস্করণ বিশেষ লক্ষণীয়। সংগীতসেবীদের জীবনে তাঁর প্রভাবের এ এক পরোক্ষ স্বীকৃতি।

মধ্য জীবন থেকেই দক্ষিণাচরণ কৃতী শিষ্যমণ্ডলী গঠন করে সংগীতসমাজে বিরাজমান থাকেন। তাঁর শিক্ষা যাঁরা পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বেশি ছিলেন বৃন্দ বিবন অর্কেস্ট্রার বাদক গোষ্ঠী। তাঁদের অনেককেই দক্ষিণাচরণ একাধিক বাদ্যযন্ত্রে সুগঠিত করেন। তাঁরা প্রত্যেকেই ইউরোপীয় সংগীতে কিছু ব্যুৎপন্ন হন আচার্যের শিক্ষায়। তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য হরিচরণ দাস (বাঙালীদের মধ্যে এমন সুদক্ষ বেহালাবাদক অল্পই ছিলেন), কিরণচন্দ্র মিত্র (দক্ষিণাচরণের পরে যিনি নেতারূপে অর্কেস্ট্রাটিকে ক বছর বাঁচিয়ে রেখেছিলেন), কৃষ্ণচন্দ্র দাস (বেহালা, ইউফোনিয়ম প্রভৃতি বাদক—এঁর কথা পরে বিশেষভাবে জানাবার আছে), শরৎচন্দ্র মিত্র (উক্ত কিরণচন্দ্রের ভ্রাতা,—তাঁদের বিষয়েও পরে আরো বক্তব্য আছে) কৃষ্ণচন্দ্র গুহ ('রাগের গঠন শিক্ষা' প্রভৃতি রচনায় দক্ষিণাচরণের সহযোগিতা করেন) নন্দলাল দাস, কার্তিকচন্দ্র শীল যোগীন্দ্রনাথ দাস, লক্ষ্মীনারায়ণ দাস প্রভৃতি।

দক্ষিণাচরণের বাদকমণ্ডলীতে ছিলেন না এমন শিষ্যদের মধ্যে—শোভাবাজার রাজ না এমন শিষ্যদের মধ্যে—শোভাবাজার রাজগোপালপুরের যতীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী গৌরীপুরের স্বনামধন্য ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রমুখের নাম করা যায়। বাংলার এক স্মরণীয় সুসন্তান ব্রজেন্দ্র কিশোর নানামুখী দেশব্রতী জীবনের মধ্যে তরুণ বয়সে পাখোয়াজ শিক্ষা করেন মুরারিমোহন গুপ্তের কাছে। কিন্তু পরবর্তী জীবনে ব্রজেন্দ্রকিশোর সংগীতজ্ঞরূপে ঔপপত্তিক চর্চাতেই মনোনিবেশ করেন। তাঁর অহোবলের 'সংগীত পারিজাত' মূল গ্রন্থের ব্যাখ্যাসহ অনুবাদ (সংগীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা মাসিকে প্রায় সম্পূর্ণ প্রকাশিত). বিভিন্ন রাগের আলোচনাত্মক প্রবন্ধাবলী, ভারতীয় সংগীততত্ত্ব সম্পর্কে নানা নিবন্ধ তাঁর সংগীত জ্ঞানের সাক্ষ্যস্বরূপ বিদ্যমান। এখানে বক্তব্য এই যে ব্রজেন্দ্রকিশোর বিশেষভাবে সংগীত-তত্ত্ব বিষয়েই শিক্ষা করতেন দক্ষিণাচরণের কাছে। দক্ষিণাচরণের সঙ্গে ব্রজেন্দ্রকিশোরের প্রায় ১৫ বছরব্যাপী শিক্ষার্থীরূপে যোগাযোগ ছিল। আচার্য সেন মহাশয়ের মৃত্যুকালে ব্রজেন্দ্রকিশোরের বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। কিন্তু দক্ষিণাচরণের কাছে তখনো তাঁর ঔপপত্তিক বিষয়ে শিক্ষার বিরতি ছিল না। 'অতিগুণী লোক ছিলেন', দক্ষিণাচরণের নাম করে বলতেন ব্রজেন্দ্রকিশোর। দক্ষিণাচরণের সংগীতবিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধাস্বরূপ তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর পত্নীকে আজীবন ব্রজেন্দ্রকিশোর মাসিক বৃত্তি দিয়ে গেছেন।

দক্ষিণাচরণের একটি শিষ্যা গোষ্ঠীও উল্লেখনীয়। সদাচারী এবং পরম চরিত্রবান বলে দক্ষিণাচরণের অতিশয় সুনাম ছিল। সেজন্যে পরিচিত অপরিচিত নানা গৃহস্থ পরিবারে পুরাঙ্গনাদের সংগীতশিক্ষার ভারপ্রাপ্ত হতেন তিনি। তাঁর সেই অন্তঃপুরিকা সংগীতশিষ্যারা কোন দিন প্রকাশ্যে অনুষ্ঠান করেন নি বটে। কিন্তু তাঁদের সূত্রে সংগীতচর্চা আর একভাবে কিছু প্রসার লাভ করে. একথা বলা যায়।...

দক্ষিণাচরণের জীবন একনিষ্ঠ সংগীত অনুশীলনের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। অখ্যাত পরিবারের এক দরিদ্র সন্তান প্রতিভা, অধ্যবসায় ও ঐকান্তিকতায় সংগীত জীবনে বিপুল প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। আর বাংলার সংগীত ইতিহাসে বিশিষ্ট স্বাক্ষর রেখে যান। দক্ষিণাচরণের জীবনকথা সংক্ষেপে বিবৃত করা হল এখানে।

১৮৬০ সালে তাঁর জন্ম (৯, ফাল্গুন, ১২৬৬)। ২৪ পরগণার বারাসাত মহকুমার মহেশপুর গ্রামে তাঁদের আদি নিবাস। পিতা নীলমাধব সেন কলকাতায় পুলিশ ইন্সপেকটরের কাজ করতেন। একমতে দক্ষিণাচরণের জন্ম মহেশপুরে। অন্য মতে, তাঁর জন্ম পিতার কর্মস্থলের কলকাতা গৃহে। এক বছর বয়স থেকে দক্ষিণাচরণের শোভাবাজারের বাস আরম্ভ হয়। প্রথমে পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা। তারপর ওরিয়েন্টাল সেমিনারী ও কুইন্স কলেজিয়েট স্কুলে। কিন্তু এন্টান্স পরীক্ষা পার হতে পারেন নি। বিদ্যাচর্চায় বাধা হয়েছিল তাঁর সংগীতে একান্ত আসক্তি।

বাল্যকাল থেকেই দক্ষিণাচরণের সংগীতে এই অনুরাগ প্রকাশ পায়। যেখানে গান বাজনার কথা শুনতেন, পাঠ ও খেলা সব ফেলে সেখানে উপস্থিত হতেন। আর তন্ময় হয়ে যেতেন সংগীতে।

কাছেই নন্দরাম সেন স্ট্রীট (এই পথেই ২০ সংখ্যক বাড়িতে স্বনামধন্য টপ্পাচার্য নিধুবাবু অর্থাৎ রামনিধি গুপ্ত ১৮৩৮ সালে মৃত্যু পর্যন্ত বাস করেছিলেন এবং আলোচ্যকালে, ১৮৬৯।৭০ সালে সেই গৃহে তাঁর বংশধরগণ নিবাসী ছিলেন)। সেখানে নন্দরাম স্থাপিত বিরাট রামেশ্বর শিবমন্দির। বালক দক্ষিণাচরণ সেখানে মাঝে মাঝে যেতেন। কারণ মন্দির চত্বরে বাঁশী বাজাতেন রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় নামে একজন বংশীবাদক। তাঁর বাঁশী শুনে দক্ষিণাচরণ মুগ্ধ হয়ে যান।

[illegible] বাস্তুল হয়ে পড়ল বাঁশী শেখবার জন্যে। তখন তার বয়স ৯।১০ বছর। এত আগ্রহ দেখে রাজেন্দ্রলাল তাঁকে বাঁশী শেখাতে লাগলেন। কিন্তু তখনো দক্ষিণাচরণের নিজের কোন যন্ত্র নেই। অনেক চেষ্টায় এক পর্ব উপলক্ষ্যে কিনলেন একটি খেলনার মত বাঁশের বাঁশি। সেই বাঁশিতেই রাজেন্দ্রলালের কাছে সংগীতে তাঁর হাতে খড়ি হল।

সহজাত প্রতিভা এবং অদম্য আগ্রহে সেই খেলনার বাঁশিতেই সুর ফোটাতে লাগলেন ১০ বছরের বালক। ক্রমেই তাঁর আশ্চর্য সংগীতশক্তি প্রকাশ পেতে লাগল। যে কোন বাংলা গান শুনে শুনে বাজাতেন বাঁশিতে।

এমনিভাবের সংগীতচর্চায় কিছুকাল গেল। কিন্তু সেই বাঁশের বাঁশীতে গানের সুরে মন ভরল না বেশি দিন। সংগীতের পিপাসা তাঁর প্রবল হয়ে উঠল। আরো শিক্ষার জন্যে, আরো যন্ত্রের জন্যে অস্থির হলেন মনে মনে। আর উপযুক্ত গুণীর সন্ধান করতে লাগলেন। যেখানে আরো অনেক শিখতে পারা যাবে। শোনা যাবে অনেক কিছু।

দেখতে দেখতে তাঁর বয়সও একটু বাড়ল। পার হলেন স্কুলের গন্ডী। এনট্রান্স পরীক্ষা না দিয়েই লেখাপড়া ছাড়তে হল।

এমন সময় শুনলেন কালিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। তিনি সেতার সুরবাহার আরো কি সব যন্ত্র বাজান। তাঁর বাড়ি আহিরিটোলায় ১৩, গোলোক দত্ত লেনে। শোভাবাজার থেকে বেশি দূরে নয়।

খোঁজ করে দক্ষিণাচরণ চলে গেলেন গোলোক দত্ত লেনে। বৈঠকখানায় বসে তখন কালিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সুরবাহার বাজাচ্ছিলেন। ঘরে ঢুকতে সাহস হল না দক্ষিণাচরণের। জানলার পাশে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন। কি চমৎকার বাজনা।

যতক্ষণ হল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলেন। পরের দিন আবার গেলেন। তারপর প্রত্যহ গিয়ে শুনতে লাগলেন কালিপ্রসন্নের সুরবাহার সেতার, বৈঠকখানার জানলার ধারে দাঁড়িয়ে।

দিনের পর দিন কালিপ্রসন্নের বাজনা শুনেই তাঁকে তৃপ্ত থাকতে হচ্ছিল। কারণ বৈঠকখানায় যাবার সাহস হত না কিছুতেই।

কিন্তু হঠাৎ একদিন কালিপ্রসন্নের দৃষ্টি এদিকে পড়ল—জানলা থেকে একটি ছেলে একমনে বাজনা শুনছে।

তিনি বৈঠকখানার মধ্যে তাকে ডাকলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'ওখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

দক্ষিণাচরণের এবার ভয় ভাঙল। তিনি সাহস করে বললেন, 'আমায় দয়া করে বাজনা শেখাবেন?'

[illegible] [illegible] [illegible] বাজনার বিষয়ে বললেন। বুঝলেন তার সংগীত শিক্ষায় প্রকৃত আগ্রহ। কোন যন্ত্রসংগীতের জন্যে বড় আকুলতা তার।

রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সংগীত-জীবনের সহযোগী কালিপ্রসন্ন। সৌরীন্দ্র-মোহনের অতি আস্থাভাজন। পাথুরিয়া-ঘাটায় তাঁর সংগীত বিদ্যালয় কিছু দিন আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারও একজন ভারপ্রাপ্ত কালিপ্রসন্ন। আপাতত দক্ষিণা-চরণকে তিনি ভর্তি করে দিলেন সেই সংগীত বিদ্যালয়ে। প্রসিদ্ধ বেহালা শিক্ষক বিহারীলাল চক্রবর্তীর শ্রেণীতে দক্ষিণা-চরণের বেহালা শিক্ষার ব্যবস্থা হল।

বিহারীলালের কাছে ঐকান্তিক চেষ্টায় তিনি অতি দ্রুত শিখতে লাগলেন। আর পরীক্ষার সময় অধিকার করলেন প্রথম স্থান। পুরস্কার পেলেন একটি উৎকৃষ্ট বেহালা। তাঁর বয়স তখন ১৮ বছর।

এতদিন পরে সংগীত জগতে তিনি ভালভাবে প্রবেশের সুযোগ লাভ করলেন। কালিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ত পরিচিত ছিলেন আগে থেকেই। এবার সৌরীন্দ্রমোহনের সংগীত গোষ্ঠীর আরো গুণীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলেন। তাঁদের কাছ থেকে পেতে লাগলেন নানা উপদেশ, নির্দেশ। পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর পরিবারের সংগীত দরবার এবং এই সংগীত বিদ্যালয়ের পরিবেশে বিভিন্ন রীতির সংগীত, বহু প্রকার যন্ত্র এবং বিভিন্ন শিল্পীর সংস্রবে এলেন। এখন থেকে প্রকৃত সংগীতজীবনের অভিজ্ঞতা আরম্ভ হল দক্ষিণাচরণের।

বিখ্যাত ধ্রুপদী এবং বঙ্গীয় নাট্যশালায় এক সংগীত পরিচালকরূপেও প্রসিদ্ধ মদনমোহন বর্মনের সঙ্গে তিনি পরিচিত হলেন। ধ্রুপদ রীতিতে মদনমোহন ছিলেন কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ পাথুরিয়াঘাটা গোষ্ঠীর নানা গুণীর গুরুস্থানীয়। তাঁর কাছে দক্ষিণাচরণ লাভ করলেন নানা জ্ঞানগর্ভ উপদেশ। মদনমোহনের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সাঙ্গীতিক যোগাযোগ ঘটেছিল। পরবর্তী জীবনে তিনি যে 'গীতশিক্ষা' দ্বিতীয় ভাগ রচনা করেন তাতে মদনমোহনের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। এই পুস্তকে 'সতী কি কলঙ্কিনী' নামক বিখ্যাত গীতিনাট্যের মদনমোহন কর্তৃক সুরসংযোজিত গীতাবলীর স্বরলিপি প্রকাশ করেন দক্ষিণাচরণ। ভূমিকায় এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন, "ইহাতে 'সতী কি কলঙ্কিনী' গীতিনাট্যের সমুদয় গীতের স্বরলিপি প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত গানগুলির সুর উৎকৃষ্ট। বঙ্গ সংগীত বিদ্যালয়ের পূর্ব অধ্যাপক, সংগীতশাস্ত্র বিশারদ "মদনমোহন বর্মন মহাশয় এই সকল গানে সুর সংযোজনা করেন।...তিনি এই গীতসমূহের স্বরলিপি করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অকালে পরলোকগত হওয়ায় তাঁহার জীবদ্দশায় ঐ স্বরলিপি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হওয়া ঘটে নাই। আমরা তাঁহার নিকট হইতে এ সকল স্বরলিপি যেরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, অবিকল সেইরূপে বিশুদ্ধভাবেই এক্ষণে গীতশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ মধ্যে সন্নিবেশিত করিলাম।"

সেই তরুণ বয়সে পাথুরিয়াঘাটার সংগীত পরিবেশেই দক্ষিণাচরণ পরিচিত হলেন গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। মদনমোহনেরই একজন কৃতী ছাত্র গোপালচন্দ্র ভারতীয় সংগীতের সঙ্গে ইউরোপীয় রীতিতেও বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বাদক হিসাবে গোপালচন্দ্র ছিলেন হার্মোনিয়মে পারদর্শী। তাঁর কাছেই দক্ষিণাচরণ ইউরোপীয় সংগীতে প্রথম জ্ঞানলাভ করলেন। আর একটি বিশাল সংগীত জগতের দ্বার উন্মুক্ত হল তাঁর শিল্পবোধসম্পুটে। পাশ্চাত্য রীতির চর্চায় তিনি নিবিষ্ট হলেন।

ইউরোপীয় সংগীতে বিমুগ্ধ হল তাঁর চিত্ত। বিশেষ অর্কেস্ট্রা তাঁকে পরম বিস্ময়ে আকর্ষণ করলে। তার ব্যাপকতায়, স্বরধ্বনি বৈচিত্র্যে, যন্ত্রসংগীতের সমারোহে এক অপূর্ব উন্মাদনা জাগল তাঁর মনে। সংগীতের এক অভিনব অনুভব। নতুন দৃষ্টিতে তিনি সংগীতকে দেখতে লাগলেন। মেলডির পরিবর্তে হার্মনি। একটি সুর নয়। একযোগে অনেক সুর ও তাদের সমন্বয়। বাহ্যত এবং খণ্ড খণ্ড ভাবে অমিল, কিন্তু সমগ্রভাবে বহু মিল। একই সঙ্গে নানাপ্রকার ধ্বনি নানা যন্ত্রে বাজবে। অথচ রূপ গ্রহণ করবে এক অপরূপ স্বর-

...তারও কত রীতিনীতি। কত ... সংযোগ অলংকরণ—হার্মোনাইজেশন। ... সঙ্গে কি কৌশলে কত বিচিত্র ... যোগাযোগ ঘটানো। কি বিপুল ... মায়াজাল। গোপালচন্দ্র ... এই নতুন পথযাত্রায় দক্ষিণাচরণের প্রথম দিশারী হলেন বটে। কিন্তু তারপরই দক্ষিণাচরণ নিজের পথ রচনা করে নিলেন।

তাঁর শিক্ষাধীনে কিছুকাল ইউরোপীয় সংগীত অনুশীলনের পর উদ্বুদ্ধ হল দক্ষিণাচরণের সৃজনশীল প্রতিভা। আপন মেধা আগ্রহ ও অধ্যবসায়ে তিনি পাশ্চাত্য ধারায় আরো অগ্রসর হলেন। ইউরোপে মুদ্রিত রেখামাত্রা স্বরলিপির নানা piece সে সময় আমদানি হত কলকাতায়। তাতে প্রত্যেক যন্ত্রের harmonypart ছাপানো নির্দেশ সমেত। তিনি সে সব সংগ্রহ করে চর্চা করতে লাগলেন। ক্রমে ঐকান্তিক সাধনায় সে বিষয়ে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত হল। আর একটি অর্কেস্ট্রা দল গঠনের প্রেরণা লাভ করলেন অন্তরে। সে সম্পর্কে উদ্যোগী হয়ে উঠলেন। তারপর কয়েক বছরের প্রচেষ্টায় তাঁর সংগীত-সাধ প্রথম রূপ ধারণ করল। কজন অনুগামীকে নিয়ে গঠিত হল তাঁর Blue Ribbon String Band নামে ব্যান্ড হলেও সূচনা থেকেই তা অর্কেস্ট্রা। কনসার্ট নয়। সব যন্ত্র বা কয়েকটি যন্ত্র একই রকম সুর বাজাবে—অর্থাৎ ঐকতান—তা নয়। আলাদা আলাদা স্বরলহরী এক সঙ্গেই বাজতে থাকবে। অথচ সকলের সহযোগে রূপলাভ করবে একটি বৃহৎ সংগীত-পরিকল্পনা। হার্মোনাইজেশন : সংযোগ অলংকরণের এক জটিল প্রক্রিয়া। কিন্তু নিয়মবদ্ধ রূপায়ন। তবে—আগেই বলা হয়েছে—অর্কেস্ট্রার সব যন্ত্রের উপকরণ দক্ষিণাচরণের ছিল না। তিনি দরিদ্র। তাঁর সংগতির অভাব। দেশবাসীর কাছেও উপযুক্ত আনুকূল্য লাভ অসম্ভব ছিল সে যুগে। ৮ অক্টেভের পিয়ানো তো ছিলই না। অর্কেস্ট্রার চার অংশের —বেস টেনর অল্টো ও সোপ্রানো—জন্যে নির্দিষ্ট সব যন্ত্রও তিনি সংগ্রহ করতে পারেননি। তবু তা কনসার্ট নয়—সাংগীতিক রীতিতে প্রথাগত অর্কেস্ট্রা।

এদেশে দক্ষিণাচরণের আগে তার অস্তিত্ব ছিল না।

দক্ষিণাচরণের অর্কেস্ট্রার আর একটি বিশেষত্ব প্রথম থেকেই সুপ্রকাশ। ভারতীয় সংগীতের ভিত্তিতেই তিনি অর্কেস্ট্রা গঠন ও পরিচালনা করেন। এক একটি সম্পূর্ণ রাগ হার্মোনাইজ করেই তাঁর অর্কেস্ট্রার সুর-রচনা। সেইখানেই তাঁর কৃতিত্ব এবং বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে এমন সার্থকভাবে, এত দীর্ঘকাল যাবত তাঁর পূর্বে অর্কেস্ট্রার সাধন আর কেউ করেন নি। নানা রাগে হার্মোনাইজ করা অর্কেস্ট্রা তাঁরই প্রথম সৃষ্টি। তিনিই এ বিষয়ে আদি দৃষ্টান্ত। এ-ই তাঁর স্বপ্ন আদর্শ ও সাধন ছিল—পাশ্চাত্য ধারার সঙ্গে ভারতীয় সংগীতের একদিকে যোগস্থাপন। রাগ রূপ শুদ্ধ রেখে হার্মোনাইজেশন। সম্পূর্ণ রাগগুলিতে পাশ্চাত্য রীতিতে সংযোগ অলংকরণ। রাগের শুদ্ধতার বিষয়ে এত সজাগ ও সতর্ক ছিলেন যে কখনো ঔড়ব (দুই স্বর বর্জিত রাগ) বা ষাড়ব বা খাড়ব (এক স্বর বর্জিত রাগ) জাতীয় রাগে হার্মোনাইজ করতেন না। বলতেন, 'এ চলবে না। হার্মোনাইজ করবার সময়ে বর্জিত স্বর এসে পড়তে পারে। রাগ নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে।'

কখনো কখনো অবশ্য তিনি পুরো ইউরোপীয় সংগীতের অর্কেস্ট্রাও করতেন। অর্থাৎ রাগের ভিত্তিতে নয়, তা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য রীতির। সেখানে সুর রচনায় রাগের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতেন না।

দক্ষিণাচরণ প্রথম এই ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রা দল গঠন করেন ১৮৮৩ সালে। তাঁর বয়স তখন ২৩।২৪ বছর। তাঁর সম্প্রদায়ের বেশির ভাগ বাদকই তখন সৌখীন অর্থাৎ অপেশাদার। কিন্তু প্রত্যেকেই উপযুক্ত যন্ত্রী। দক্ষিণাচরণই তাঁদের যোগ্য শিক্ষা দিয়ে গঠিত করে নিয়েছিলেন।

তাঁর বাদকগোষ্ঠীর ব্লু রিবন নামেরও একটি তাৎপর্য আছে। সে সময় ব্লু রিবন সোসাইটি বিশেষ কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল ইংলন্ডে এবং সেখান থেকে কলকাতাতেও। সুনীতি প্রচারের আন্দোলনের জন্যেই ওই সংস্থা বিখ্যাত হয়। দক্ষিণাচরণ স্বভাবে বিশেষ নীতিপরায়ণ ধর্মপ্রাণ ছিলেন বলে এই নামকরণ করেন অর্কেস্ট্রার। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল—সকলে যেন জানেন যে তিনি সদলে দুর্নীতিবিরোধী। তাঁর সম্প্রদায়ে কোন মদ্যপ বা নীতিভ্রষ্টের স্থান নেই।

ধার্মিক অন্তরের প্রেরণায় দক্ষিণাচরণের অর্কেস্ট্রার প্রথম অনুষ্ঠান হল নন্দরাম সেনের সেই শিব মন্দিরের বিশাল চত্বরে। এখানেই রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়ের বাঁশী শুনে তাঁরই কাছে বালক বয়সে দক্ষিণাচরণ সংগীতের প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন। আরো একটি তথ্য আছে এ প্রসঙ্গে। পরবর্তী সংগীতজীবনের বহু খ্যাতি ও কর্মব্যস্ততার মধ্যেও প্রতি বছর শিবরাত্রিতে এই মন্দিরে তিনি ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রা বাজিয়ে যেতেন। যেমন তাঁদের অর্কেস্ট্রা হত বেলুড় মঠে, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যেক বার্ষিক জন্মোৎসবে।

ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রা দল গঠনের আগে দক্ষিণাচরণের ব্যক্তিজীবনের একটি কথা এখানে উল্লেখ্য। সাংসারিক অনটনের জন্যে টাঁকশালে তিনি চাকুরি আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু সংগীত তাঁর চিত্তকে অধিকার করেছিল একান্তভাবে। তাই, সংগীতচর্চার অসুবিধা হবে বলে এ সময় সে চাকুরি ত্যাগ করলেন। তখন থেকে সংগীতই তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন। যন্ত্রসংগীত শিক্ষাদানকেই জীবনের বৃত্তি করলেন। অর্থ গ্রহণ করলেও শিক্ষাদান বিষয়ে তিনি ছিলেন অতি উদার, একথা জানা যায়। অনেককে বিনা অর্থেও শিক্ষা দিতেন। এবং ব্লু রিবন স্ট্রিং ব্যান্ড প্রথম পত্তন করেন অপেশাদাররূপে। তেমনি সৌখীনভাবেই Philharmonic Band গঠন করেছিলেন। তারপর যখন ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রা প্রবর্তন করে নানা জায়গায় অনুষ্ঠান করতেন তখন থেকে অর্থ নিতেন অর্কেস্ট্রার জন্যে।

দক্ষিণাচরণের অর্কেস্ট্রার মহড়া এবং অনুষ্ঠান প্রথম দিকে নন্দরাম সেনের সেই শিবমন্দিরেই হত। তারপর একটি স্থায়ী ব্যবস্থা হল বাগবাজারে। তাঁর প্রিয় শিষ্য কৃষ্ণচন্দ্র দাস নিজেদের বাড়িতেই ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রার জন্য স্থান করে দিলেন। সেখান থেকেই আরম্ভ হল দক্ষিণাচরণের সংগীত-জীবনে সফলতার পথে যাত্রা।

যন্ত্রীদল গঠন করবার কিছুদিনের মধ্যেই দক্ষিণাচরণ কৃষ্ণচন্দ্র দাসের সহায়তা নানাভাবে পান। ... জীবনের শেষ পর্যন্তও সেবক ও সহায়ক ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র। দক্ষিণাচরণের প্রথম জীবনের এই সংগীত শিষ্যের ব্যক্তিপরিচয়ও দেবার মতন। সেই সূত্রে সম্মিষ্ট সংগীত প্রসঙ্গের মধ্যে আর একপ্রকার মিষ্টত্বের কথাও এসে যায়। একেবারে মিষ্টান্ন—রসগোল্লা। বাগবাজারের আদি রসগোল্লা। কথা এই যে, রসগোল্লার প্রথম উদ্ভাবক ও প্রচলন-কর্তা নবীনচন্দ্র দাসের একমাত্র পুত্র হলেন উক্ত কৃষ্ণচন্দ্র। বাগবাজারের নবীনচন্দ্রের বাসস্থান এবং তাঁর রসগোল্লা ব্যবসায়ের স্থল বলে 'বাগবাজারের রসগোল্লা' নাম হয় রসগ্রাহীদের মুখে মুখে। নবীনচন্দ্রের (১৮৪৬—১৯২৬) ঊর্ধ্বতন ৪।৫ পুরুষ আগে থেকে এ বংশের বাগবাজারে বাস। তাঁদের গঙ্গাতীরের আদি বাড়ি ৫, কাশী মিত্র ঘাট স্ট্রীটে। নবীনচন্দ্রের পিতামহের সময় থেকে তাঁদের চিনির ব্যবসায় ছিল। বিলাতে চিনি রপ্তানী করতেন তাঁরা। নবীনচন্দ্রই প্রথমে রসে ভাসমান মিষ্টান্ন অর্থাৎ রসগোল্লা প্রস্তুত করেন এবং তারপর থেকে একংশে রসগোল্লার ব্যবসায় সুপরিচিত। নবীনচন্দ্র সংগীতপ্রিয় ছিলেন এবং তাঁর পত্নী বিখ্যাত কবিয়াল ভোলানাথ

পারের (কোলা ময়রা) গোষ্ঠী। নবীনচন্দ্র পৈতৃক কাশী মিত্র ঘাটের বাড়ি থেকে ৭, গোঁসাই লেনে বাস পরিবর্তন করেন। বাগবাজারের এই গোঁসাই লেনের দক্ষিণেই, চিৎপুর রোডে ছিল সেকালের বিখ্যাত পক্ষীর দলের বা পঁচিশ পক্ষীর আখড়া। সেই ৭, গোঁসাই লেনে নবীনচন্দ্রের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রও প্রথম জীবন থেকেই বাস করেন এবং সেখানেই প্রথম অর্কেস্ট্রা গঠন করেন দক্ষিণাচরণ। কৃষ্ণচন্দ্রেরও অল্প বয়স থেকে সঙ্গীতজীবন আরম্ভ। কীর্তনপ্রিয় তরুণ কৃষ্ণচন্দ্র ভাল খোল বাজাতেন, কাটোয়ার খোলবাদক ভগবান দাস বাবাজীর কাছে শিক্ষার ফলে। আর নর্মাল স্কুলে পাঠকালে কৃষ্ণচন্দ্র দক্ষিণাচরণের কাছে বেহালা শিক্ষা করেন। তখন থেকেই গুরু শিষ্যে ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত। তার কয়েক বছর পরে দক্ষিণাচরণ অর্কেস্ট্রা গঠন করলে দাস পরিবারের সেই বাসস্থল ৭, গোঁসাই লেনেই হয় তার ঠিকানা। সেখানেই দক্ষিণাচরণ অর্কেস্ট্রার জন্যে পিস রচনা করলেন, স্বরলিপি লিখতেন, ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। অর্কেস্ট্রার মহড়া ও নিয়মিত বাদনও হত সেখানে। সেই ঠিকানা থেকেই দক্ষিণাচরণ সদলে অন্যত্র অর্কেস্ট্রা বাজাতে যেতেন।

ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রার সেই প্রথম দলে কৃষ্ণচন্দ্র যেমন এক বিশিষ্ট যন্ত্রী (তিনি বেহালা, ওবো, ইউফোনিয়ম ইত্যাদি নানা যন্ত্রের বাদক হতেন প্রয়োজনবোধে, তবে প্রধানত বেহালা বাদক), তেমনি তাঁর চারজন জ্ঞাতিভ্রাতাও। যেমন—হরিচরণ দাস, নন্দলাল দাস, লক্ষ্মীনারায়ণ দাস এবং যোগীন্দ্রনাথ দাস। তাঁদের মধ্যে প্রধানত নন্দলাল বাজাতেন চেলো, এবং অপর তিনজন বেহালা।

দক্ষিণাচরণের যন্ত্রী সঙ্ঘে দুজন অসাধারণ গুণী ছিলেন—হাবু দত্ত ও নান্তুবাবু। বাংলার এক শ্রেষ্ঠ কলাবত, ক্ল্যারিওনেট সুরবাহার এসরাজগুণী (এবং ধ্রুপদীও) হাবু দত্ত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের জ্ঞাতিভ্রাতা। প্রকৃত নাম তাঁর অমৃতলাল দত্ত। তিনি অপূর্ব সুরেলা ক্ল্যারিওনেট বাদক ছিলেন এবং কয়েক বছর ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রার এক প্রধান আকর্ষণ বলে গণ্য হতেন। পরবর্তী জীবনে ক্লাসিক, মিনার্ভা প্রভৃতি নাট্যমঞ্চের ক্ল্যারিওনেট বাদকরূপে খ্যাতনামা হন। তিনি রামপুরে গিয়েছিলেন ওস্তাদ উজীর খাঁর সঙ্গে। বীণকার উজীর খাঁর শিষ্য হাবু দত্ত সেখানে রামপুর স্টেট ব্যান্ডের পরিচালক হয়েছিলেন। আলাউদ্দিন খাঁ প্রথম জীবনে কলকাতায় হাবু দত্তের কাছে একাধিক যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষা করেন দু বছর যাবৎ। দত্তমশায়ের গঠিত রামপুর স্টেট ব্যান্ডও আলাউদ্দিন শোনেন এবং পরে মাইহার স্টেট ব্যান্ড গঠনে সেই দৃষ্টান্ত হয়ত খাঁ সাহেবের কিছু উপকারে আসে।

নান্তুবাবু নামে সুপরিচিত বেহালাশিল্পী পরে দক্ষিণাচরণের অর্কেস্ট্রা ত্যাগ করে নিজের দল গঠন করেন। তাঁর সেই অর্কেস্ট্রা পুরোপুরি ইউরোপীয় পদ্ধতির ছিল (অর্থাৎ রাগের ভিত্তিতে নয়) এবং উচ্চমানের বলে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

দক্ষিণাচরণের অর্কেস্ট্রা ৭, গোঁসাই লেনে ১১।১২ বছর থাকে, কৃষ্ণচন্দ্র দাসের পৃষ্ঠপোষকতায়। আগে বলা হয়েছে তাঁর অর্কেস্ট্রা কখনোই ইউরোপীয় দৃষ্টান্তের তুল্য বৃহৎ আকারের হয়নি, কিন্তু প্রকারে তার স্বগোত্রীয় ছিল। এই পর্বেও তাঁর যন্ত্রীদের সংখ্যা থাকে ১২ জনের অনধিক এবং পরবর্তী পর্বেও তাই। যন্ত্র ছিল—বেহালা, (তার মধ্যে ফার্স্ট ভায়োলিন সেকেণ্ড ভায়োলিন ইত্যাদি প্রকারভেদ অবশ্যই ছিল), ক্ল্যারিওনেট, ভাস, চেলো ডাবল ভাস কর্নেট ইউফোনিয়ম ইত্যাদি।

কৃষ্ণচন্দ্রের গৃহে অর্কেস্ট্রা আরম্ভের পর দক্ষিণাচরণের সঙ্গে প্রমোদকুমার ঠাকুরের সাঙ্গীতিক যোগাযোগ ঘটে। তাঁর জীবনে তা একটি স্মরণীয় ঘটনা। তার ফলে তাঁর সঙ্গীতজীবন, বিশেষ ইউরোপীয় সংগীতচর্চা আরো সমৃদ্ধ হয়েছিল।

প্রমোদকুমার হলেন রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র। প্রতিভার আধার । প্রমোদকুমার প্রথম জীবনেই ইউরোপীয় সংগীতে বিশেষ কৃতী হয়েছিলেন। অল্পায়ু না হলে তিনি [illegible] জগতে স্মরণীয় থাকতেন [illegible] রূপে। সে সময় প্রমোদকুমার [illegible] রাগ অবলম্বনে ইউরোপীয় [illegible] নৃত্যসঙ্গীত রচনা করেছিলেন। [illegible] যেমন Lady Dufferin Valse। [illegible] আর্মিদের ব্যাণ্ডে ও ইডেন [illegible] টাউন ব্যাণ্ডে বাজাবার জন্যে দুটি [illegible] দিয়েছিলেন তিনি। একদিন দক্ষিণাচরণ সেই নৃত্যসঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হন [illegible] আপনার অর্কেস্ট্রায় বাজাবার জন্য প্রমোদকুমারের অনুমতি নেন। তারপর সেই তান ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রায় একদিন পরিবেশিত হল।

সেদিন শ্রোতাদের মধ্যে প্রমোদকুমারের সঙ্গে নানা বিশিষ্ট শ্রোতাও ছিলেন। দক্ষিণাচরণের পরিচালনায় সেই নৃত্যসঙ্গীত শুনে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন প্রমোদকুমার এবং কলকাতার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি। ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রা এবং তার দলপতির জয়যাত্রা আরম্ভ হল।

প্রমোদকুমারের দক্ষিণাচরণের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হলেন। তারপর দক্ষিণাচরণকে তিনি নানা শিক্ষা দেন ইউরোপীয় সঙ্গীতে।

প্রায় ১২ বছর তাঁর অর্কেস্ট্রা ৭, গোঁসাই লেন থেকে পরিচালিত হবার পর কুমারটুলিতে স্থানান্তরিত হয়। ব্লু রিবন অর্কেস্ট্রার এই পর্ব উদযাপিত হত দক্ষিণাচরণের আর এক প্রিয় শিষ্য কিরণচন্দ্র মিত্র-দের গৃহে। কিরণচন্দ্র ও তাঁর ভ্রাতা শরৎচন্দ্র দুজনেই ব্লু রিবনের যন্ত্রী (প্রধানত বেহালাবাদক, অন্যান্য কটি যন্ত্রেও হাত ছিল), দক্ষিণাচরণের ছাত্র এবং কুমারটুলির প্রাচীন মিত্র পরিবারের সন্তান। চিৎপুর রোড—বনমালি সরকার পথের যোগস্থল থেকে পশ্চিম বরাবর অঞ্চল জুড়ে সেকালে মিত্রবংশের বসতি ও অধিকার ছিল কুমারটুলি পার্ক (তখন তা এক বৃহৎ পুষ্করিণী) পর্যন্ত। ট্রাম রাস্তা থেকে বনমালি সরকার স্ট্রীট প্রথমে বামে তারপর দক্ষিণে বাঁক নেবার পরেই

ফটো : অসিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
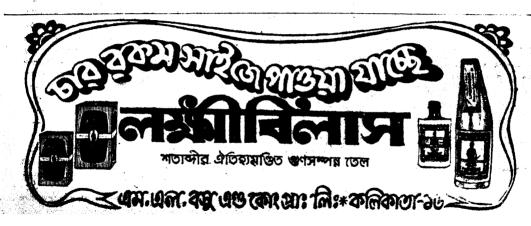
মিত্রদের একতলার প্রশস্ত বৈঠকখানায় ব্রু রিবন অর্কেস্ট্রার আখড়া ছিল। মহড়া, অনুষ্ঠান, অন্যত্র গতি সবই হত এই ঠিকানা থেকে। ১৭।১৮ বছর তাঁর অর্কেস্ট্রার সঙ্গে মিত্রবংশের এই গৃহ অঙ্গাঙ্গী বিজড়িত থাকে। দক্ষিণাচরণের স্বহস্তে লিখিত হার্মোনাইজ করা খাতা-পত্রও এখানে ছিল কিরণচন্দ্রের কাছে। গুরুর পরে কিরণচন্দ্রই হয়েছিলেন ব্রু রিবন অর্কেস্ট্রার দলপতি।

প্রায় ১৮ বছর কুমারটুলির এই মিত্র পরিবারের পর দক্ষিণাচরণের অর্কেস্ট্রার আখড়া হয় ১, নবকৃষ্ণ স্ট্রীটে। এই ঠিকানায় দোতলায় অর্কেস্ট্রা পরিচালিত হয় বছর পাঁচেক। এখানেই দক্ষিণাচরণের অর্কেস্ট্রা জীবনের শেষ পর্ব বলা যায়। কারণ তারপর যে ৪।৫ বছর তিনি জীবিত ছিলেন, অর্কেস্ট্রা পরিচালনা থেকে অবসর নিয়েছিলেন। স্বাস্থ্যভঙ্গও হয়েছিল আর অধ্যাত্ম বিষয়েও অতিশয় আগ্রহী হন দীক্ষান্তে। কিন্তু তাঁর সংগীতজীবনে ছেদ পড়েনি। পুস্তক রচনায়, বিশেষ রাগের গঠন-শিক্ষা' প্রণয়নে ব্যাপৃত থাকেন অন্তিমকাল পর্যন্ত। কৃষ্ণচন্দ্র দাসের নতুন ভবনে সে সময় দক্ষিণাচরণ সারাদিন রাগের গঠন শিক্ষা' রচনায় অতিবাহিত করতেন। সকাল দশটা-এগারটা থেকে রাত আটটা-নটা পর্যন্ত। প্রভূত পরিশ্রমে দু খণ্ড এই পুস্তক সমাপ্ত করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। সেই অত্যধিক শ্রমে শরীর তাঁর ভেঙে যায় একেবারে। দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ ফর্মা প্রেসে দেবার পরই দক্ষিণাচরণের পরমায়ুও শেষ হল (১৯২৫)। বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। 'রাগের গঠন শিক্ষা' পুস্তকের অবশিষ্ট চার খণ্ড অপ্রকাশিত রয়ে গেল।

[illegible] একটি গলিতে দক্ষিণাচরণ শেষ জীবন যাপন করেছিলেন। পরে অন্য একটি পথের নামকরণ হয় 'দক্ষিণাচরণ সেন' তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্যে। কিন্তু সংগীতসমাজে তাঁর স্মৃতি উপযুক্তভাবে রক্ষিত হয়নি...

বাগবাজারের গোঁসাই লেনে এবং কুমারটুলির মিত্র পরিবারে অবস্থানের সময় ব্রু রিবন অর্কেস্ট্রা সুপ্রসিদ্ধ হয় নানাস্থানে অনুষ্ঠানের ফলে। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য—স্টার থিয়েটারে কয়েক বছর এবং কোহিনুর থিয়েটারে এই অর্কেস্ট্রার স্বল্পকালের অস্তিত্ব। স্টার থিয়েটারের প্রেক্ষাগৃহে, মঞ্চের বামদিকে উচ্চ বেদীর আকারে ব্রু রিবন অর্কেস্ট্রার জন্যে বিশেষ স্থান নির্মাণ করা হয়। সেইখানে স্টিক হাতে দীর্ঘদিন অর্কেস্ট্রা পরিচালনা করতে দেখা যেত দক্ষিণাচরণকে।

তাঁর আকৃতি ছিল অতি সাধারণ—নাতিদীর্ঘ, শ্যামবর্ণ একহারা গঠন। বেশবাসও সাধাসিধা। কিন্তু অসাধারণ ছিল দুই চক্ষুতে প্রতিভার দীপ্তি। শান্ত অমায়িক মুখভাবের মধ্যে দীপ্ত চোখ দুটি প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করত। পরে তিনি আকৃষ্ট করতেন মধুর ব্যক্তিত্বে। মানুষ হিসাবে অতি সজ্জন ছিলেন দক্ষিণাচরণ।

তাঁর সকল ছাত্র-ছাত্রী বন্ধু-বান্ধব পরিচিত ব্যক্তিরা আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর স্মৃতিকে বহন করে রাখেন।

কয়েক বছর ধরে তাঁরা পালন করতেন দক্ষিণাচরণের স্মৃতি-বার্ষিকী। সংগীতের অঞ্জলিতে, মনীষীদের ভাষণে তাঁর স্মরণ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হত। তার মধ্যে ১৯২৬ সালের সভা হয় বড় সুন্দর আর দক্ষিণাচরণেরই যোগ্য ভাবে। সেদিন তাঁর একটি সুর-সৃষ্টি দিয়েই তাঁকে স্মৃতিতর্পণ করা হয়।

Dead M[illegible]h in soul অনুসরণে দক্ষিণাচরণ একটি স্বরলিপি করেছিলেন রেখামাত্রা প্রণালীতে।

সেই স্মরণ-সন্ধ্যায় ব্রু রিবন অর্কেস্ট্রার সকরুণ সুরে সেটি বেজে উঠল। বাজালেন তাঁরই হাতে-গড়া ছাত্ররা। আর সে অর্কেস্ট্রার সম্মিলনে কটি বালিকা গাইতে লাগলেন—

বাজ বীণা বাঁশি আজ করুণায়।
কাঁদি কাঁদি কেন হৃদি ব্যথা পায়।।
বাণী পূজা তরে বাদ্য যন্ত্র,
নিত্য ছিল যাঁর জীবন মন্ত্র,
চির হাস্য আস্যে সরল মনে
সুধী শিক্ষা দিত শিষ্যগণে,
মূর্ছিত মন তব তিরোধানে
তারা কাঁদে বিষাদে মৃদু গানে;
দিতে গুরুদক্ষিণা—দক্ষিণা পায়,
বাণী-পদ পানে ধ্যানে চায়।

গানখানি নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসুর রচনা—যাঁর আমলের স্টার থিয়েটারে কতদিন কত রাগের হার্মোনি দক্ষিণাচরণ শুনিয়েছিলেন ব্রু রিবন অর্কেস্ট্রায়।

—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

অলৌকিক জলযান

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

উপন্যাস

(৪৩)

ছোটবাবু তখন ডেকের ওপর ভীষণ জোরে ছুটছে। যাকে সামনে দেখছে তাকেই বলছে বংকু কোথায়। সারেঙ-সাব ছিলেন গ্যালির দরজায় দাঁড়িয়ে, ছোটবাবু সেখানে থেমে গেল, সামান্য দম নিল। বলল, চাচা বংকু কোথায়?

—নিচে তো ছিল। বড়-টিন্ডালকে পাওয়া যাচ্ছে না শুনেছিস!

বড়-টিন্ডালকে পাওয়া যাচ্ছে না, পাওয়া যাবে। গভীর রাতে হয়তো সে ফিরে আসবে একা একা। একজন জাহাজি মানুষ রাতে ফিরে আসে নি, সকালে ফিরে আসবে। সকালে ফিরে না এলেই ভাবনার কথা, কিন্তু মৈত্রদা বংকুর সংগে ছিল, সহসা বংকু দেখেছে, শহরে ভিড়ের ভেতর মৈত্র পালিয়ে গেছে। জাহাজে ফিরে ছোটবাবু এ-সব শুনেছিল।

তারপর আর যা শুনেছে, সেটা ভীষণ ভয়ের। বংকু মৈত্রদাকে হারিয়ে খোঁজা-খুঁজি করছে, করতে করতে আপিয়া শহরের শেষ প্রান্তে দেখেছে ছোট ছোট বালির ঢিবি, সেখানে সব খরমুজের রস পান করছে মেয়েরা, সেখানে মৈত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওর হাতে ছিল বড় মাপের একটা জনি-ওয়াকার। সে সেটা প্রায় বগলদাবা করে হাঁটছিল। ওর বিচিত্র পোশাক দেখে সবাই চোখ ট্যারা করে ফেলেছিল। এই যেমন শরীরে ছিল তার প্লাস্টিকের খেলনা সেপ্টিপিনে আটকানো সব নীল পাথরের মালা, ঝিনুকের পুতুল, হলুদ রঙের পাতার বাঁশি। এবং মাথায় লম্বা টুপি জোকারের মতো। সবাই, যেমন বুড়ো-বুড়িরা, অথবা যুবক-যুবতীরা মৈত্রকে ঘুরে ফিরে দেখছিল। মৈত্র কথা বলছিল সবার সংগে, সামোয়ান নারী পুরুষেরা, অথবা কিছু বিদেশিনী মেয়েরা, যারা খরমুজের রস চেটে চেটে খাচ্ছিল, তারা হাঁ করে দেখছিল।

কিছু ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ওর পায়ে পায়ে ঘুরছিল। সে সবাইকে গুড আফটার-নুন বলছিল। আর কথায় কথায় ম্যাণ্ডেলার গল্প, তার মায়ের গল্প বলছিল। ম্যাণ্ডেলার বাবার জাহাজডুবির গল্প বলছিল। একটা দুটো করে লজেন্স চকোলেট দিচ্ছিল ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের। কাউকে কোলে নিয়ে আদর করতে করতে নীল রঙের পাথরের মালা পরিয়ে দিচ্ছিল।

বংক কোনো কথা বলছিল না। দূরে, আড়ালে দাঁড়িয়েছিল। কারণ জায়গাটা ছিল মেলার মতো। অথবা যা হয়ে থাকে বিকেলে সবাই বালিয়াড়িতে নেমে আসে, সমুদ্রের সাঁ সাঁ গর্জন শুনতে শুনতে—খরমুজের রস খেতে ভারি মনোরম, ওরা রস চেটে খাবার সময় মৈত্রের নাম জিজ্ঞাসা করলে বলেছিল—মি বসন্তনিবাস। বসন্তনিবাস কথাটা ওদের কাছে স্পষ্ট হত না বলে সে আবার বলেছিল, মি, ব...স...ন্ত...নি...বা...স। আন্ডারস্ট্যান্ড।

সবাই প্রায় বাউ করার মতো বলেছিল, ইয়েস ইয়ো বসনতো নি...বা..স। নিবাস।

—ইয়েস মি নিবাস। বংকু সব সময় আড়ালে আড়ালে ছিল। দেখে ফেললেই ফের ছুটে কোথাও মৈত্র পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। গোপনে তাকে কেউ অনুসরণ করছে বুঝতে পারলেই আবার সে ছুটবে।

জাহাজে ফিরে ছোটবাবু এমন সব নানাজনের কাছে শুনেছে। সবাই ডেকে উঠে এসেছে। কেউ বোধহয় নিচে নেই। এবং কি করা যায়, কাপ্তানের কাছে ইতিমধ্যে রিপোর্ট হয়ে গেছে। তিনি ব্রীজে অফিসার-দের সংগে বোধহয় পরামর্শ করছেন। আর ছোটবাবু ঘরে ঘরে খুঁজে বেড়াচ্ছে বংকুকে। বংকুর মুখ থেকে সব শুনতে না পারলে সে স্বস্তি পাচ্ছে না।

—বংক আছিস, বংকু!

মনু বলল, এই তো এখানে ছিল। কোথায় গেল!

আবার সে ডাকল, বংকু। বংকু কোথায়?

ডেক-সারেং বলল, বংকু বোধহয় মেস-রুমে গেছে।

কিন্তু ছোটবাবু ওপরে উঠে দেখল মেসরুম খালি। করিডোরে নানাজনের জটলা। কেউ চেঁচামেচি করছে, হট্টগোল, ওরা জাহাজে থাকবে না এমন বলছে। থাকলে বড়-টিন্ডালের মতো ওরাও পাগল হয়ে যাবে। আসলে বড়-টিন্ডালের কিছু হয়ে গেলে যেন ওরা আরও জোর পাবে। ওদের বিদ্রোহ করতে সুবিধা হবে। ছোটবাবুকে দেখে ফেললে সবাই চুপচাপ—একটা কথা বলছে না। কারণ ছোটবাবু তো আর ওদের সুখ-দুঃখ বুঝবে না। বেশ মজাতে আছে, অফিসার মানুষ, ছোটবাবু ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালে ভীষণ সুবোধ বালক হয়ে যাচ্ছে সবাই।

এ-ভাবে ঘুরতে ঘুরতে ছোটবাবু টের পেল, সবাই ওকে ক্রমে অবিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে। কেউ ওদের উসকে দিচ্ছে, কে দিচ্ছে বুঝতে পারছে না। ডেবিড ভীষণ উত্তেজিত হয়ে আছে, এক বছর আরও জাহাজে থাকতে হবে, সে সবাইকে গোপনে বড়-টিন্ডালকে কেন্দ্র করে উত্তেজিত করে রাখতে পারে। আসলে কেউ সঠিক বলতে পারছে না মৈত্রদার কি হয়েছে।

এবং এ-সময়ে মনে হল, মাস্তুলের নিচে কারা দাঁড়িয়ে সংগোপনে অন্ধকারে সলা-পরামর্শ করছে। ছোটবাবু বলল, বংকু তোকে খুঁজছি। মৈত্রদা কোথায়!

বংকু বলল, জানি না।

—জানি না মানে!

—আমি কি করে জানব ছোটবাবু!

—বংকু! এই প্রথম ছোটবাবু কোনো একজন মানুষকে গম্ভীর গলায় কথা বলল, আর যেন নতুন এক ছোটবাবু সে আর আগের সেই ছোটবাবু নিরহংকারী ছোট-বাবু নয়। যেন কোনো এক যাদুবলে, ছোটবাবু তার আত্মপ্রত্যয় খুঁজে পেয়েছে।

[illegible] বলল, ঠিক ঠিক বল মৈত্রদা কোথায়। [illegible] ওকে : শেষবারের মতো দেখেছিস। [illegible] ছাড়িয়ে সবার মাথা খারাপ করে দিল না।

বংকু বলল, আমি তো তোর কথা মতো ওর সঙ্গেই ছিলাম। তারপর দেখি সে ভিড়ের ভেতর নেই। আমি কি করব?

—আর খুঁজে পাস নি।

—পেয়েছিলাম। ওর বগলে তখন একটা বড় মদের বোতল। সে সামান্য দম নিয়ে বলল, তারপর যা করে। একদল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। সে তাদের নিয়ে পাতার বাঁশি বাজাচ্ছিল। ঘুরছিল ফিরছিল। আড়ালে আড়ালে ওকে লক্ষ্য রাখছিলাম।

—তখন কটা বাজে?

—বিকেল হবে। এই মানে সূর্য সমুদ্রে অস্ত যাচ্ছিল।

—কোথায় তখন তোরা?

সে বলল, বিচটা দেখছিস? বেশ লম্বা বিচ। অনেক দূরে, কাল সকালে দেখা যাবে, সেখানে খুব দূরে একটা পাহাড় ছাদের মতো সমুদ্রে ঢুকে গেছে। অতদূর যেতে হয় না, তার একটু এদিকে, সি-বিচে যারা বেড়াতে এসেছিল তাদের সঙ্গে পাগলামি করছিল মৈত্র। ওরা বেশ মজা পেয়ে ওকে সবাই বসন্তনিবাস বসন্তনিবাস বলে ডাকছিল।

সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বংকু বার বার কথার যে একটা কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছে। চিফ-মেট ডেকে পাঠিয়েছিল বংকুকে। সে তাকে বলে এসেছে। ডেক-সারেঙ তাকে চিফ-মেটের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। যতটা পেরেছে সে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে সবটা বুঝিয়ে বলতে চেয়েছে। ডেক-সারেঙ, আর পাঁচ নম্বর চিফ-মেটকে মাঝে মাঝে বিশদভাবে ব্যাপারটাকে আরো ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছে। চিফ-মেট সব লগবুকে নোট করে নিয়েছে। তারপর সেখান থেকে নেমে আসতেই মেজ-মিস্ত্রি আর্চি প্রায় অন্ধকার থেকে বের হয়ে আসার মতো বলেছে, একে একে তোমরা সবাই যাবে। সেই অশুভ প্রভাব আবার জাহাজে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বুড়ো হিগিনসকে আর মানতে চাইছে না। সংকু ভীষণ ভয় পেয়ে গেছিল কথাটাতে। সে সবুটিকে বলেছে আর্চি বলছে, আমাদের কারো রক্ষা নেই। মৈত্রকে দিয়ে শুরু।

কি শুরু, কোথা থেকে ওরা এভাবে একটা সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছে ছোটবাবু বুঝতে পারছে না। সবারই চোখ প্রায় জ্বলছে। একটা আজগুবি জাহাজে ওরা উঠে এসে বিপদে পড়ে গেছে এমন ভাব মুখে। এনজিন-সারেঙ ভয়ে ভয়ে আছে। সে খুব জোর গলায় এমন কথা বলতে পারছে না। যাদের সে জোর করে বন্দর থেকে জাহাজে তুলে এনেছিল তারা সবাই যেন ক্ষেপে আছে। সবার এক সন্দেহ এখনই [illegible] এনজিন-সারেঙ চুপচাপ ভীতু মানুষের মতো লুকিয়েছিল, ছোটবাবু এতক্ষণে যেন আঁচ করতে পারছে। আর বুঝি এ-ভাবেই জাহাজে কখনও কখনও বিদ্রোহ দেখা দেয়। কোনো কিছু ভাববার তখন আর জাহাজিদের ক্ষমতা থাকে না।

ছোটবাবু প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনছে সব। সে বলল, তারপর তারপর কি?

বংকু বলল, আমি তো জানি আমাকে দেখলেই দৌড়ে পালাবে।

—দৌড়ে পালাবে বুঝলি কি করে?

—মৈত্রকে বললাম, আমার সঙ্গে বের হতে। ছোটবাবু তোমাকে একা বের হতে বারণ করেছে। জবাবে বলল, ছোটবাবু কে। ছোটবাবু বলে কাউকে তো চিনি না; কি করি বল! তুই বলে গেছিস। অনিমেষও বলল, লক্ষ্য রাখা দরকার। কিন্তু কাকে লক্ষ্য রাখব! সোজাসুজি বলে দিল, আমার সঙ্গে কাউকে যেতে হবে না। আমার কিচ্ছু হয়নি।

তারপর বংকু বলল, তুই জানিস, বেশি চেঁচামেচি করলে, হয়তো সারেঙ ঝামেলা করবে, একেবারেই নামতে দেবে না। আটকে রাখবে। ভাবলাম নেমে যাক, পেছনে পেছনে আমিও নেমে যাব। আর নেমে যেই না দেখল, আমি পেছনে আছি কি খিস্তি! যা মুখে আসে। তারপর যেই শহরের একটা গন্ড-গোলে জায়গায় এসে গেছি, দেখি মৈত্র নেই। অনেক দূরে একটা গলির ভেতর দিয়ে দৌড়াচ্ছে। আমি সঙ্গে থাকি কিছুতেই সে রাজি না।

—সঙ্গে থাকলে পাগলামি করবে কি করে! তারপর কেমন চিৎকার করে ছোটবাবু বলল, কোথায় গেল তারপর।

বংকু বলল, সত্যি জানি না। আমার যে কি লোভ হল! ভাবলাম একটু খরমুজের রস খাই। ভাঁড়ে সামান্য খরমুজের রস, তামাটে রঙ, কি যে খেতে সুস্বাদু ছোটবাবু, আর তখন দেখি, একদল লোক চেঁচামেচি করছে, ঐ সে চলে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে! ফিরে দেখি অনেক দূরে একটা লোক পাহাড়ের সেই যে লম্বা ছাদ আছে, তার নিচ দিয়ে সমুদ্রের দিকে ছুটে যাচ্ছে। ছোটবাবু আমি স্পষ্ট কিছু দেখিনি।

—সমুদ্রের দিকে!

—ওদিকে মাইলের পর মাইল সমুদ্রের ভেতরে সব অদ্ভুত বালির ঢিবি আছে। গাছপালা নেই। পাথর নানা রঙের। জোয়ার এলে সব ডুবে যায়।

ছোটবাবু আবার বলল, তখন কটা বাজে?

—আমি ঘড়ি দেখিনি। সূর্য ডুবে গেছে বলে সারা সমুদ্র তখন লাল ছিল ভীষণ।

—তুই বুঝলি কি করে মৈত্রদা গেছে।

—ওরা তো সবাই বলছিল, আরে লোকটার দেখছি একদম মাথা খারাপ। কোথায় যাচ্ছে! এ-সময় ওদিকে কেউ যায় না। ওরা সবাই হা-হা করে কিছুটা ছুটে গিয়ে ফিরে এসেছে। আমিও ভালো কিছু দেখিনি। [illegible] রস খেয়ে তক্ষুনি যেন [illegible]। কেবল দেখেছি ক্রমে বিন্দুর মতো কালো একটা ফড়িং অনেক দূরে সমুদ্রের ওপর নাচছে। ওটা মৈত্র, না একটা ফড়িং কি করে বুঝব।

ছোটবাবু বুঝতে পারল, তারাও এমন একটা ঢিবিতে চলে গিয়েছিল। তার একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। সে আর এক মুহূর্ত দেরি করল না, যদিও জানে জোয়ার হয়তো এসে গেছে, না এলেও আর দেরি নেই। ওরা জোয়ারের আগে ফিরে এসেছে, এবং জোয়ার এলে জাহাজে টের পাওয়া যায়। একবারে যেন জাহাজটা লাফিয়ে অনেক উঁচুতে উঠে যায় এমন মনে হয়। যাই হোক সে লাফিয়ে পার হয়ে গেল ফল্কা। এলিওয়েতে ঢুকে ডেভিডের দরজায় নক করছে, ডেভিড দরজা খোলে না। বোধহয় ভেতরে ডেভিড নেই। সে ওপরে উঠে দেখল স্যালি হিগিনস সবাইকে গালাগাল করছেন। জাহাজে তিনি ছিলেন না, এতক্ষণ সবাই এভাবে চুপচাপ বসে আছে। খোঁজাখুঁজির দায়দায়িত্ব কেউ নিচ্ছে না। যদিও এসব ঘটনায়, স্থানীয় পুলিশ সাহায্য করতে পারে, এবং লাইফ-সেভিং সমিতি। স্যালি হিগিনস এক এক করে সবাইকে ফোনে খবরটা দিয়েছেন—আর বড়-টিন্ডালকে যে জাহাজে রাখা যাবে না, দেশে পাঠিয়ে দিতে হবে, দেশে পাঠিয়ে দেবার কথা মনে হলেই তাঁর মাথাটা সহসা ভীষণ গরম হয়ে যায়। এসব লোকগুলো জাহাজটাকে ভালবাসে না। মিথ্যা পাগলামি করে দেশে ফিরে যেতে চায়। দেশে ফিরে যাবার একটা মোক্ষম অসুখ। আর সঙ্গে সঙ্গে স্যালি হিগিনসের ভীষণ তিক্ত চোখ মুখ। সারেঙকে ডেকে পাঠালেন, বললেন, বড়-টিন্ডালকে জাহাজ থেকে আর নামতে দেবে না। প্রায় লগবুকের ওপর একটা আদেশনামার মতো তিনি কথা বললেন।

তখন মৈত্র জ্যোৎস্না রাতে একটা ঢিবির ওপর বসেছিল। সে লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে এসেছে সব ঢিবি, বালির চর। অনেক দূরে সেই পাহাড়ের ছাদ দুহাত বাড়িয়ে যেন এগিয়ে আসছে ওকে ধরতে! কিছুতেই সে ধরা দেবে না। সে কেবল লাফ মেরে ঢিবি, বালির চর পার হয়ে যাচ্ছিল ক্রমাগত। জ্যোৎস্না রাত বলে অস্পষ্ট সব কিছু চার-পাশে।

ওর পায়ের কাছে সমুদ্র। আর দ্বীপে অজস্র পাথর, লাল লাল পাথর। সে একটা দুটো করে হাতে পাথর নিচ্ছে, আর দূরে ঢিল ছুঁড়ে দিচ্ছে। একটা মাটির ভাঁড়। ভাঁড়ে সে মদ ঢালছে, খাচ্ছে। মাঝে মাঝে একাকী সে সেই খালি ভাঁড় নিয়ে পৃথিবীকে যেন বুড়োআঙুল দেখিয়ে নাচছে। সে ক্রমে মাতাল হয়ে উঠছে সে বসন্তনিবাস। সে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সব পাতার বাঁশি বাজিয়ে দিয়েছে। সে ইচ্ছে করলে বাতাসের ওপর ভেসে যেতে পারে—এই যে সামনে সমুদ্র, অনায়াসে সমুদ্র পার হয়ে যাবে, ওর মাথায় যখন পালক গোঁজা, যখন সে বসন্তনিবাস এবং যদি হাইতিতির কটা বাজাতে বাজাতে থাকে তখন সে কিছু জানে না। সে সাদা জ্যোৎস্নায় এমন একটা নির্জন দ্বীপে বসে অনায়াসে সারারাত মদ খেতে পারে, নাচতে

স্মরণীয় মুহূর্তে!
বিনী জানে আপনি কি চান
তাই আপনার জন্যে টেরীন মিশ্রণে বিনীর আকর্ষণীয় বস্ত্র-সম্ভার— জীবনে বিশেষ কারো মনে রাখার মত মধুর ক্ষণে আপনার ইচ্ছা পূরণে।
বিনী
TERENE®
আমরা অনেক অনেক বদলেছি—

পারে, অমিয় যেসব গান গাইত শুনে গেলে, তার একটা গান, বাবু আমায় কিছু ভাল লাগে না...সে নেচে নেচে গাইছিল।

আর তার মনে হচ্ছিল, সমুদ্র চারপাশে তার ঘুরে ঘুরে নাচছে। সে এখন যেদিকে তাকাচ্ছে, শুধু নীল জল। কেবল ওর টিবিটা উঁচুমতো, এবং মনে হয় নিচে অর্কেস্ট্রা বাজছে। কান পাতলে আশ্চর্য সে মিউজিক শুনতে পাচ্ছে সমুদ্রের নিচে। এবং যা মনে হল সে অদ্ভুত একটা জেলোস বাঁশিসুদ্ধ হয়ে গেছে। কিছুক্ষণের ভেতর সে বাতাসে ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাবে। আসছে, আসছে। ম্যান্ডেলা হাইতিতে বাতাসে ভেসে আসছে। সে এবার মাটির ভাঁড় সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে আর ভাঁড়ে মদ ঢালতে পারছে না। হাত কাঁপছে। ঢালতে গেলে পড়ে যাচ্ছে মদ। হাত তার ঠিক নেই। তার চেয়ে মনে হল, গলায় ঢেলে দেবে সোজা। সে হাঁ করে কিছুটা ঢেলে দিল মুখে। মুখ কুঁচকে গেল। বাঁ হাতের তালুতে মাথা মুছে কাত থাকল চিৎ হয়ে। আকাশে অজস্র নক্ষত্র, এবং জ্যোৎস্না সমুদ্রের জলে সাদা মসলিনের মতো ছড়িয়ে আছে। ওর আর যা মনে হচ্ছিল একটানা শুনতে পাবে বাতাসে ঘণ্টাধ্বনি। সে দেখতে পাবে, একে একে সবাই নিয়ে আসছে ম্যান্ডেলা হ্যান্ডেলার মা, হাইতির এলায়া বা কেলি—সেই [illegible] কালীর নিকে [illegible] এখন [illegible] সেটিং সোনালি চাকা সব ক্রমে নিলামায় হয়ে যাচ্ছে। ওরা সবাই নেমে এলে কোথাও তার যাবার কথা।

বোধহয় সেই মানুষটা জাহাজডুবির পর নির্জন দ্বীপে যে কাটিয়ে পড়েছিল—সে আসছে। সে কি করছে। সে চিৎকার করে বলল, তুমি একা দ্বীপে কি করতে পার? সে বুঝতে পারল মানুষটা এখন বড় বড় গাছ কেটে তার গুঁড়ি কোটে ভেলার মতো বানাচ্ছে। অধিকাংশ সব কচ্ছপ ধরে নিচ্ছে ভেলাতে। নীল সমুদ্র জল নিচ্ছে কলসী থেকে। পাল খাটিয়েছে বড় বড় ইউকল গাছের পাতা থেকে। মানুষটা ফিরে আসছে। ফিরে আসছে। সমুদ্র ঝড় ঝঞ্ঝার ভেতর দিয়ে মানুষটা সমুদ্রের ওপর পাল তুলে চলে আসছে। বড় বড় কচ্ছপের বুক কেটে সে মাংস বের করছে। আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে নিচ্ছে মাংস। সমুদ্রের জলে সামান্য চুবিয়ে খাচ্ছে। কি যে সুস্বাদু মনে হচ্ছে। শরীরের তার পাতার পোশাক। মাথায় পাতার টুপি। মুখে বড় বড় দাড়ি। চুল লম্বা। তার ভেলাটা সমুদ্রে বেশ দোলে-দুলে এগিয়ে আসছে। তারপর কেন যে তার মনে হল, লোকটা আর কেউ নয়। সে নিজে। অন্ধকার রাতে বাড়ি ফিরে দেখছে শেফালী ঘরে নেই। শেফালী বিমলবাবুর স্ত্রী হয়ে গেছে ফের। আর মনে হল ম্যান্ডেলার মতো একটি ছোট মেয়ে জানালা খুলে এমন বুনো একটা মানুষকে দেখে ভয়ে চিৎকার করছে। সে কিছুতেই বলতে পারছে না, আমি বসন্তনিবাস। বিশ্বাস কর ম্যান্ডেলা আমি বসন্তনিবাস। তোমার মাকে ডাকো। তার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

তখন একটা মাছি কোত্থেকে এসে মুখের ওপর বসল। সে ভাল করে হাত নাড়াতে পারছে না। সমুদ্র ফুঁসছে। পাহাড় সমান তরঙ্গমালা ক্রমে এগিয়ে আসছে। তীব্র শিস বাজছে আকাশেবাতাসে। ব্রেকার ভেঙে যাচ্ছে, ফসফরাস পায়ের নিচে জ্বলে জ্বলে নিভে যাচ্ছে। যেন অজস্র জোনাকিপোকা কেউ ছড়িয়ে যাচ্ছে কিনারে, আবার নিচ্ছে যাচ্ছে। সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ ছুটে আসছে আবার, আবার সেই জোনাকি-পোকারা, পায়ের কাছে ক্রমে এত কাছে চলে আসছে, কি করে। এবং মনে হচ্ছে ক্রমে দ্বীপটা ছোট হয়ে যাচ্ছে, ক্রমে মনে হচ্ছে, সে চারপাশে শুধু সমুদ্র দেখছে, সমুদ্রের জল গুলিয়ে উঠছে পেট গুলিয়ে ওঠার মতো। এবং আর সে উঠতে পারছে না। সে শুয়ে শুয়ে এখন সব দেখছে। যেন এবার সে হাত দিলেই সমুদ্রের জল নাগাল পাবে। এবং ওর শেষ বিন্দু সেই মদ্যপানের অন্তিম মুহূর্তে মনে হল, মাছিটা ভীষণ গণ্ডগোল বাঁধিয়ে দিয়েছে। সে বার বার ধরতে চাইছে মাছিটাকে। সে বার বার উঠে দাঁড়াতে চাইছে মাছিটাকে ধরার জন্য। জলের কল্লোল ভীষণ দমকে দমকে চারপাশে এত বেড়ে যাচ্ছে যে অনেক দূরে কে তাকে ডাকছে শুনতে পাচ্ছে না। সে কান পেতে শোনার চেষ্টা করছে, কে ডাকছে। মনে হচ্ছে অনেক দূরে সমুদ্রের তরঙ্গমালায় ভেসে চলে আসছে ডাকটা, মৈত্র...দা তু...মি কোথায়। সে শুনতে পাচ্ছে। ভারি অস্পষ্ট। তবু মনে হচ্ছে ছোট তাকে ডাকছে। তার তখন ভীষণ হাসি পাচ্ছিল। সে ফের উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। বলতে চাইল আমি এখানে ছোটবাবু। সমুদ্র চারপাশে মেতে বেড়াচ্ছে। আমি একটা টিবির ওপর শুয়ে আছি। কিন্তু সে উঠতে পারছে না কেন। চোখে ভাল দেখতেও পাচ্ছে না। এখন যেদিকে হাত দিচ্ছে শুধু জল, জল উঠে আসছে, আবার নেমে যাচ্ছে, জল চারপাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে। সমস্ত শরীরে এখন জলকণা উড়ে এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে তাকে। ঝাপসা মনে হচ্ছে চারপাশটা। আর তখনও দূরে কেউ ডাকছে—টিন্ডাল।

কেউ ডাকছে—মৈত্র।

কেউ ডাকছে—মৈত্রদা তুমি কোথায়।

কেউ ডাকছে—বড়-টিন্ডাল।
কেউ ডাকছে—বসন্তনিবাস।

সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়াল। টিবিটার মাথায় সে দাঁড়িয়ে গেল। সে এক হাতে বোতল বাতাসে উঁচিয়ে ধরল। কোনরকমে টলতে টলতে খালি হাতটা বাড়িয়ে দিল আকাশের দিকে। জড়ানো গলায় বলল, মি বসন্তনিবাস। মনার্ক অফ অল আই সার্ভে। সে লেখবারের মতো জল এগিয়ে আসতে থাকলে সমুদ্রের মাথায় খালি বোতলটা [illegible] ভাবল। তার ভারি ইচ্ছে [illegible] সমুদ্রের মাথায় বড় বয়সের [illegible] ভাঙবে। কতদিন পর সে [illegible] পাচ্ছে ভেবে হা হা করে হেসে উঠল। দিগন্তব্যাপী কালো অন্ধকার এগিয়ে আসছে। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলছিল। তবু বাতাসে উঁচিয়ে রেখেছে বোতলটা। মারবে। কাছে এলেই মারবে। মেরে মাথা ফাটিয়ে দেবে। মাগির ছেনালীপনা বের করবে।

তখনও সেই নিস্তব্ধ সমুদ্রের ভেতরে আর্ত ডাক, মৈত্রদা তুমি কোথায়! অস্পষ্ট সেই স্বর গুন-গুনিয়ে বাজছে মৈত্রের মাথায়। ভীষণ সে উৎফুল্ল হয়ে উঠছে। বেশ প্রতিশোধ নেওয়া যাবে, সে ছেলেমানুষের মতো আনন্দে ফের ছুটে পালাবে ভাবল। ছোটবাবু জ্যোৎস্না রাতে হয়তো তাকে দেখে ফেলেছে। পাহাড়ের ছাদ দু-হাত লম্বা করে যাকে ধরতে পারে নি, তুমি ছোটবাবু তার নাগাল পাবে! আর সেই বোতলটা তখনও ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো হাতে দুলছে। যেন সেই একটা অফ একটা প্রথক, ঘণ্টা বাজাচ্ছে পাহাড়ের মাথায়, এদিকে না, এদিকে না। জল পায়ের পাতা ভিজিয়ে চলে গেল। এখন শুধু জল, আর জল। আর তরঙ্গমালা এবং ক্রমে সেই জলের চারপাশে শুধু ভয়াবহ ঘূর্ণি, অথবা নীল জলে, অতিকায় পাহাড়ের মতো শ্বাপদেরা নিঃশ্বাস ফেলছে। এত বেশি জলকণা উড়ছে যে সে শ্বাস ফেলতে পারছে না।

তখনও দূরে, সমুদ্রের এইসব গর্জনের ভেতর একটা ক্ষীণ ডাক ভেসে আসছিল, মৈত্রদা কাল থেকে আমি তোমার সঙ্গে বের হব। তুমি কোথায়? কাল আ...মি...কোথাও যা...চ্ছি না।

শিশুর মতো সে শুন্যকে বলল, আমি এখানে। সে বোতলে চুমু খেতে খেতে বলল, আমি এখানে ছোটবাবু। আমি ভাল আছি।

জল এবার আরও ওপরে উঠে আসছে। সে আর দাঁড়াতে পারছিল না। সে যে এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, আসুক, এলেই মারবে, কিন্তু এখন সে হাতের বোতল ঠিক বুকের কাছে এনে টলতে টলতে বসে পড়তেই তরঙ্গমালা চলে যেতে থাকল ওপর দিয়ে। নিচে সে ভেসে ভেসে প্রায় সেই উড়ে যাবার মতো এবং শিশুর আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছিল। সমুদ্রের অতলে শিশুরা কাঁদছে। সে আরও জোরে জলের নিচে বোতলটাকে একমাত্র সন্তানের আত্মরক্ষার্থে যেন চেপে ধরল। তারপর শুধু নীল জলের খেলা, অবিমিশ্র জল তার আপন প্রবাহে মত্ত। কোথাকার কে এক বসন্তনিবাস স্রোতের মুখে পড়ে কুটোগাছটির মতো ভেসে যাচ্ছে, তার বিন্দুমাত্র অক্ষেপ নেই।

পাহাড়ের উঁচু মতো জায়গায় তখন ওরা দাঁড়িয়েছিল। নিখুঁতভাবে এ-ভাবে জ্যোৎস্না কখনও [illegible] জলে মিশে যায়, অথবা [illegible] হতে হতে শান্ত সমুদ্রের জলরাশি হয়ে যায় না দেখলে

বিশ্বাস করা যায় না। সমুদ্রের প্রবল গর্জন এ-ভাবে ক্রমে কমে আসতে থাকল। জল উঁচু হতে হতে সেই পাহাড়-ছাদের কাছাকাছি জায়গায় চলে এসেছে। এখন মনে হচ্ছে প্রায় জেটির মতো, অনেকটা সমুদ্রের ভেতরে অনায়াসে হেঁটে যাওয়া যেতে পারে। ওরা সবাই শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে বুঝল, কিছু করার নেই।

পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানাল, জল নেমে না গেলে কিছু করা যাবে না।

সমুদ্রে ভেসে গেলে খোঁজাখুঁজি করে যারা, তাদের দলটা ফিরে এসেছে। এরাও একই কথা বলল।

রাত ক্রমশ বাড়ছে। প্রবল জোয়ারের মুখে জ্যোৎস্না তেমনি ছায়া ফেলে যাচ্ছে। পাহাড়ের মাথায় সব অজস্র মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। অথবা এখন এক খবর এই ছোট্ট দ্বীপের ভেতর, একজন মানুষ সমুদ্রের ছলনায় আবার পড়ে গেছে। কোন খোঁজখবর নেই।

ডেক-সারেঙ এনজিন সারেং সমেত প্রায় জাহাজ খালি করে সবাই চলে এসেছে। ওরা কেউ আর বিন্দুমাত্র উৎসাহ পাচ্ছে না জাহাজে ফিরে যেতে। ছোটবাবুর গলা ভেঙে গেছে ডাকতে ডাকতে। বনি, ছোটবাবুকে বার বার বুঝিয়েছে—এ-ভাবে ডেকে লাভ নেই। কতদূরে, কোথায় আছে বড়-টিন্ডাল! তুমি অযথা ডাকছ।

ছোটবাবুর মন তবু মানছিল না। যেন তার বিশ্বাস, তার আওয়াজ পেলেই মৈত্রদার সব অভিমান ভেঙে যাবে। আবার ফিরে আসবে।

সমুদ্র দেখে এখন মনেই হবে না, কখনও প্রবল তরঙ্গমালায় সে ক্ষেপে যায়। আশ্চর্য শান্ত হয়ে গেছে। চারপাশে সব নীল জল! বিকেলে যা ছিল বেড়াবার জায়গা, যেখানে মানুষেরা বসে খরমুজের রস পান করেছে এখন সব সমুদ্রের অতলে। সকাল হতে না হতেই আবার বালিয়াড়ি জেগে উঠবে। সামোয়ান পুরুষ রমণীদের তখন দেখা যাবে, সমুদ্রের কিনারে ঝিনুক শঙ্খ, স্টার ফিস কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এবং কত রকমের সব বড় বড় ঝিনুকে—ঝিনুকের ভেতর কখনও কখনও ওরা মুক্তো খুঁজে পায়। সকাল হলে আর বোঝা যাবে না, সমুদ্র এখানে গতকাল মাথাসমান উঁচু জলরাশি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

স্যালি হিগিনস একটা কথা বলছেন না। সবার সামনে, একেবারে সেই ছাদের কিনারে দাঁড়িয়ে আছেন। বাতাস আসছে। ওঁর চুল পোশাক সব উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। ওঁর হাতে রুপোলী স্টিক তিনি স্টিকে ভর করে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর শেষ সফরে এমন একটা দুর্ঘটনা নানাভাবে তাকে বিষণ্ণ করে দিচ্ছে। তিনি ভাবছেন, এমন তো হবার কথা না। সমুদ্রে এত দীর্ঘদিনের সফর, কখনও তিনি এমন বিচলিত বোধ করেন নি। এতো প্রায় আত্মহত্যার সামিল। তিনি কি এখন করবেন ভেবে উঠতে পারছেন না।

তবু সব স্থির সিদ্ধান্তের মতো, লাঠি উঁচিয়ে বললেন, আমাদের এখন জাহাজে ফিরতে হবে।

সবাই, স্যালি হিগিনস আর কি বলবেন, ভেবে দাঁড়িয়ে থাকল। কেউ নড়ল না।

তিনি বললেন, বড়-টিন্ডাল এটা ভাল কাজ করল না।

ওরা দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতে পারছে ওরা, স্যালি হিগিনস একটা কথা শেষ করছেন আর মাথা নিচু করে রাখছেন। যেন সমুদ্রের কাছে তিনি পরাজয় স্বীকার করছেন এমনভাবে লাঠিতে ভর করে দাঁড়িয়ে আছেন।

তিনি ফের বললেন, ওকে পেলে আগাপাশতলা চাবকাতাম। তারপর যেমন জিভে দাঁত ঠেলে আবার ঠিক জায়গায় বসিয়ে দেন তেমনি বসিয়ে দিতে দিতে বললেন, স্কাউন্ড্রেল।

তারপর তিনি আর একটা কথাও বললেন না। ঠিক লাঠি সামনে তরবারির মতো উঁচু করে হেঁটে যেতে থাকলেন। কে এল, কে এল না পেছন ফিরে একবার দেখলেন না। সোজা সমুদ্রকে ওঁর লাঠির ঋজুতা দেখিয়ে ছাদের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে থাকলেন। জুতোয় ঠকঠক শব্দ শোনা যাচ্ছে। নীল রঙের জাহাজী পোশাক, পাতলা কদম ছাঁটের চুল এবং সাদা এক মহীয়ান যুবক এখন যেন পাহাড় বেয়ে শীর্ষে উঠে যেতে চাইছে।

প্রথম ডেভিডের হুঁশ হল আরে চলে যাচ্ছে বুড়ো। চলো। সবাই তোমরা দাঁড়িয়ে থাকলে কেন!

সারেঙ তাঁর এনজিন-রুম কর্মীদের প্রায় চুং মুখে বলার মতো হেঁকে বললেন, ফিরে যান সবাই।

ডেক-সারেঙ তার লোকদের বলল, নাসির মিঞা। পেটের দায়ে তোমরা ভাঙা জাহাজে মরতে এসেছ।

ছোটবাবু বলল, সবাই চাচা পেটের দায়ে এসেছে। এখন এ-সব বলার সময় না। প্রায় চিৎকার করে উঠেছিল সে। কেউ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, টুঁটি ছিঁড়ে নিতে পারে এখন, বিন্দুমাত্র আঁচ করতে পারে নি। এবং যেন জাহাজিরা মারপিট সুরু করে দিতে পারে সহজেই। সামান্য কথায় ডেক-সারেঙের অপমান হবে সে বুঝতে পারে নি। ডেক-সারেঙকে অপমান—তার লোকেরা সহ্য নাও করতে পারে। দূরে দাঁড়িয়ে তখন খাটো গলায় শিস দিচ্ছিল আর্চি।

এনজিন-কশপ হাত উঁচিয়ে বলল, লম্বা লম্বা হাত দেশে গিয়ে ঝাড়বে ছোটবাবু।

ছোটবাবু অবাক! সে বলল, কশপ আপনাকে কিছু বলে নি।

বনি বলল, ছোটবাবু চল।

ছোটবাবু এগিয়ে গেল। বলল, কশপ মাথা গরম করছেন কেন? এখন আমাদের মাথা গরম করার সময় না।

ডেভিড বলল, কি বলছে ছোটবাবু?

ছোটবাবু বলল, কিছু না।

এনজিন-সারেঙ বললেন, ছোট তুই ঝামেলায় থাকিস না।

—কিসের ঝামেলা চাচা।

এনজিন-কশপ তখনও বেশ সরগোল করছে। সবাইকে তাতাচ্ছে। ছোটবাবু ডেক সারেঙকে অসম্মান করেছে। কথাবার্তা ঠিক জানে না। বেয়াদপ। এবং কশপ যখন এ-ভাবে চিল্লাচিল্লি করছিল, তখন জ্যাক বলল, ছোটবাবু কি বলছে কশপ।

ছোটবাবু তেমনি নিস্পৃহ গলায় বলল কিছু না।

এনজিন-সারেঙ বললেন, ছোটবাবু তুই চলে আয়। বলে হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন। ওরা কিছু একটা করতে চাইছে, কি চাইছে আমিও ঠিক জানি না। শুধু বুঝতে পারি, ওদের মতলব ভাল না।

ছোটবাবু হাঁটতে হাঁটতে বলল, ওরা কি করতে চায়, আমি সব জানি।

সারেঙ সহসা দাঁড়িয়ে গেলেন। —কি করতে চায়?

—চায়, কিছু একটা করতে চায় চাচা। এখন তোমাকে বলা যাবে না।

—ওরা তোর কোন ক্ষতি করবে না তো!

—তা করতে পারে। তুমি ভেব না।

এনজিন-সারেঙ আর একটা কথাও বলতে পারলেন না। আর্চি পেছনে তার দলবল নিয়ে আসছে। ছোটবাবু বুঝতে পারছে আর্চি ভীষণ গুজব ছড়াচ্ছে জাহাজে। সে জাহাজিদের তার পক্ষে টানছে। তারপর কি কি করতে পারে আর্চি তার সব যেন জানা। সে বলল, মৈত্রদা তুমি থাকলে কত আমার সাহস থাকতো বলতো। সে দু-হাত তুলে চিৎকার করে বলতে পারলে যেন বাঁচত, তুমি ভারি স্বার্থপর মৈত্রদা। কিন্তু কিছু বলতে পারল না। ওর চোখ জলে ভার হয়ে আসছিল। আমার নেই, মৈত্রদা নেই। তিনি নিঃসঙ্গ সে ভীষণ একলা। এত বড় [illegible]দের সঙ্গে কি করে যুঝবে এখন!

(ক্রমশঃ)

অসমাপ্ত বিপ্লব—(২)

বিপ্লব ও যুগান্তর :

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, সব বিপ্লবই অসমাপ্ত। আঠার শতকের ফরাসী বিপ্লব এবং বিশ শতকের রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে যুগান্তকারী ঘটনা বলে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু সত্যিই কি এই দুই বিপ্লবের ফলে যুগান্তর ঘটেছিল বা ঘটেছে? ফরাসী বিপ্লবের দরুন প্রাচীন রাষ্ট্রব্যবস্থা—দ্য আনসিয়েন রেইজীম ধ্বংস হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সমাজ ব্যবস্থায় কি কায়া পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল? বিপ্লবের পর সাধারণ ফরাসী নাগরিক নিজেকে প্রশ্ন করাতে শুরু করেছিল : কি পেলাম? তারপর নিজেই তার উত্তর দিয়েছিল : কিছু না। সে একজন চিন্তাশীল নাগরিক অবশ্য স্বীকার করেছিল : না কিছু পাওয়া গেছে এবং তো হল আইনের সমক্ষে সমতা। কিন্তু এই সমতা যে সম্পূর্ণ অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট —বিপ্লবোত্তর যুগের অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন নাগরিক ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল।

বিপ্লব সফল হলেও অসমাপ্ত বলেই নেপোলিয়নের অধীনে সামরিক নায়কতন্ত্রের উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল। সুতরাং প্রাচীন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পরিবর্তে নতুন রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেও ঠিক যুগান্তর বা অবস্থা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রাচীন চিন্তাশীল সার্থক বিপ্লব বলতে এইরকম যুগান্তরকেই বুঝেছেন।

রাশিয়া ও অন্যান্য দেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলেও যুগান্তর সাধিত হয়নি—অন্তত এখনও নয়। ১৯৩০ সালে সোভিয়েত দেশবাসীদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ উক্তি করেছিলেন : 'ওরা আজ আছেন এখনো পরীক্ষার পর্যায়ে।' এই পরীক্ষা যে আজও শেষ হয়নি তা বিতর্কের ঊর্ধে। ক্রমে সেখানে নায়ক বলপ্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের অবলুপ্তির লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

যাকে 'অর্থনৈতিক বিপ্লব' আখ্যা দেওয়া হয়—বা বাজার-ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে তার সূত্রক থেকে গড়ে উঠতে উনিশ শতকে এসে পরিচিত রূপ পরিগ্রহ করে তাও অসমাপ্ত থেকে গিয়েছিল। এবং এই কারণেই প্রয়োজন হয়েছিল আর এক দফা বিপ্লবের বা বিপ্লবের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবার।

অর্থনৈতিক বিপ্লব :

সংক্ষেপে বলা যায়, মধ্যযুগের ধর্মীয় ও প্রথাগত সকল প্রতিবন্ধককে অপসারিত করে সমাজের উৎপাদিকাশক্তিকে সম্পূর্ণ মুক্ত করাই হল তথাকথিত অর্থনৈতিক বিপ্লব। স্যর হেনরী মেইনের ভাষায়, এ হল অবস্থা থেকে চুক্তিতে উপনীত হওয়া। এই পরিবর্তনের ফলে সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থা যা গতানুগতিকতার ধারা বেয়ে ধীরে ধীরে চলছিল তা হঠাৎ এক শক্তিশালী যন্ত্রে পরিণত হল এবং এর কর্মশক্তির উৎস হিসাবে কাজ করতে লাগল উপার্জন বা লাভের উদ্দেশ্যে উৎপাদন ও বিনিময়।

এই বিপ্লবের ব্যাখ্যা করেন আডাম স্মিথ এবং বিপ্লবকে কতকটা নির্দিষ্ট পথে পরিচালনার প্রচেষ্টা করেন ম্যালথাস ও রিকার্ডো ইউটোপিয়ান সোস্যালিস্টরা এবং তৎপরবর্তী যুগে লর্ড কেইনস এবং তাঁর অনুবর্তীগণ। ইতিমধ্যে অবশ্য কার্ল মার্কস অর্থনৈতিক বিপ্লবের খোলনলচে পাল্টে ফেলে তাকে সম্পূর্ণ নতুন ধারায় পরিচালিত করবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এবং কেইনস ঠিক রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবার আগেই রাশিয়ায় নব প্রতিষ্ঠিত 'শ্রমিক ও কৃষকদের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র' অর্থনৈতিক বিপ্লবের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল সর্বাঙ্গীন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রবর্তন করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অভাবনীয় সাফল্য অর্থনীতি-শাস্ত্রকে এক নতুন মর্যাদা দান করে—কারণ এই সাফল্য প্রমাণিত করল যে অর্থব্যবস্থাকে পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে সুপরিচালিত করলে মানুষের অভাব-অনটনের সমস্যার সার্থক মোকাবিলা অনেকাংশেই সম্ভব।

বিপ্লবে নবপর্যায় :

এই যে প্রতীতি—এ এক যুগান্তকারী ঘটনা সন্দেহ নেই। কিন্তু এই পন্থা সর্বক্ষেত্রে অনুসরণীয় কিনা তা নিয়ে বিশেষ বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বলা হয় অর্থনৈতিক বিপ্লবের এই অধ্যায় স্বাধীনতা-বিলুপ্তিকারী নয়—স্বাধীনতা ব্যক্তিস্বাধীনতাবিহীন নয়। সুতরাং এই পদ্ধতি কোন গণতান্ত্রিক দেশে গ্রহণীয় নয়। অথচ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যে বিশেষ ফলপ্রদায়ী—সে উপলব্ধিও বিশেষ প্রসারলাভ করে। ফলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের অনুকূলে ঐকমত গড়ে উঠতে থাকে. কিন্তু এই পরিকল্পনা যে ভিন্ন প্রকারের হইয়া প্রয়োজন তাও অনুভূত হতে থাকে। এই অসঙ্গতির সামঞ্জস্যবিধানের প্রচেষ্টা থেকে জন্মগ্রহণ করে গণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ধারণা, যাকে অর্থনৈতিক বিপ্লবের আর এক অধ্যায়—নবপর্যায় বলে অভিহিত করা যায়।

বিষয়টির সামান্য ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

'সুন্দর জীবন সম্ভব করবার জন্যেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব'—বহু শতক আগে গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল এই উক্তি করেছিলেন। উক্তিটির তাৎপর্য হল যে সর্বসাধারণের কল্যাণসাধনই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রের এই উদ্দেশ্য মেনে নেওয়া হলে প্রশ্ন ওঠে যে কোন কোন কাজ সম্পাদন করে রাষ্ট্র তার এই মৌল উদ্দেশ্যসাধন করতে পারে? এ সম্পর্কে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধারণা পোষণ করা হয়েছে। অবাধ বাণিজ্যবাদের যুগের পর সমাজবাদে এসে মানুষ এই ধারণায় উপনীত হয় যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কাজ হবে মানুষকে অভাব থেকে মুক্ত করা। অভাব থেকে মুক্তির এই দাবিই পরিকল্পনা-প্রবণতার রূপ নিয়েছে। আমাদের মত স্বল্পোন্নত দেশে অভাব বিশেষ প্রকট বলে সেখানে স্বভাবত পরিকল্পনা-প্রবণতার আধিক্য দেখা যায়।

স্বল্পোন্নত দেশে পরিকল্পনার লক্ষ্য :

'অভাব থেকে মুক্তি' একটি বিশেষ ব্যাপক ধারণা—এর দ্বারা নিম্নতম জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন থেকে থাকে বলে দারিদ্র্য দূরীকরণ বা 'গরীবী হটাও' সবকিছু বোঝাতে পারে। অত্যুন্নত ও উন্নত দেশের লক্ষ্য হল আরও ভালভাবে বাঁচা আরও ভোগ করা; অপরদিকে আমাদের মত স্বল্পোন্নত দেশের প্রাথমিক লক্ষ্য হল 'ন্যূনতম জীবনধারণের মান' (মিনিমাম সাবসিস্টেন্স স্ট্যান্ডার্ড)। এবং একেই বলা যায় দারিদ্র্য দূরীকরণ বা 'গরীবী হটাও'। পরে অবশ্য ন্যূনতম স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের মান 'ন্যূনতম আরামের মান' পেরিয়ে ওয়াল্ট রস্টো যাকে জনসাধারণের পক্ষে বিপুল ভোগের যুগ' বা গণভোগের যুগ

(এক অফ হাই ম্যাসকনজামশান) বলে বর্ণনা করেছেন তাতে পেঁাছোবার লক্ষণও আছে, কিন্তু তা হল উন্নয়ন পরিকল্পনা বা অর্থনৈতিক বিপ্লবের এই পর্যায়ের শেষ কথা। কোন স্বল্পোন্নত দেশই আজ পর্যন্ত এই স্তরে পেঁাছোতে পারে নি। সুতরাং সর্বত্রই বিপ্লবের এই নবপর্যায় সম্পূর্ণ অসমাপ্ত। এবং আমাদের দেশে বিপ্লব বেশীদূর অগ্রসরই হয়নি। রস্তো-নির্দেশিত সম্প্রসারণের তৃতীয় পর্বের উল্লেখ করে বলা যায় যে, আমাদের সম্প্রসারণমূলক অর্থ-ব্যবস্থা 'ভূমিত্যাগ' (টেক-অফ) করতেই সমর্থ হয়নি। প্রমাণ : পঞ্চম পরিকল্পনার খসড়ায় ঘোষিত দুটি মৌল লক্ষ্য—(ক) দারিদ্র্য দূরীকরণ, (গ) অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন। স্মরণ রাখতে হবে, সম্প্রসারণ অর্থনীতি অনুসারে ভূমিত্যাগ পর্বের পরই বিনিয়োগ এত বৃদ্ধি পায় এবং প্রযুক্তিবিদ্যা এত উন্নত হয় যে সম্প্রসারণ সম্পূর্ণ স্বয়ম্ভর হয়ে ওঠে। আমাদের বিগত ২৩ বছরের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টির পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা :

আমাদের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫১-৫৬) ঘোষিত মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দুটি : (ক) যুদ্ধ ও দেশবিভাগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থ-ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা, এবং (খ) জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য উন্নয়নমূলক কর্ম পদ্ধতির গোড়াপত্তন করা। সম্প্রসারণের মাপকাঠিতে লক্ষ্য ছিল মাথাপিছু আয়কে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি দ্বিগুণ করা। কিন্তু ২৩ বছরেও মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হয়নি।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় (১৯৫৬-৬১) উন্নয়নের দ্রুততর গতি ছাড়াও নিয়োগ সম্প্রসারণ ও জাতীয় আয়ের ন্যায্য বণ্টনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই ন্যায্য বণ্টনকেই 'সমাজতান্ত্রিক পক্ষপাত' (সোশ্যালিস্ট বায়াস) বলে অভিহিত করা হয়। জাতীয় আয়ের ন্যায্য বণ্টনের ব্যবস্থা করা এখনও সম্ভব হয়নি, আর কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধিই পাচ্ছে। ১৯৭৩ সালের শেষ পর্যন্ত শুধু রেজেস্ট্রিকৃত কর্মপ্রার্থীর সংখ্যাই ছিল ১ কোটির মত।

তৃতীয় পরিকল্পনায় (১৯৬১-৬৬) জনশক্তির সদ্ব্যবহার, কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধার সম্প্রসারণ এবং আর্থিক বৈষম্য সঙ্কোচনের ওপর আর এক দফা গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এর পর চলে তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৬৬-৬৯) এবং ১৯৬৯ সাল থেকে শুরু হয় চতুর্থ পরিকল্পনা (১৯৬৯-৭৪)। চতুর্থ পরিকল্পনায় জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং জনশক্তিবৃদ্ধি মৌল উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

তা হলে দেখা যাচ্ছে যে ২৩ বছর ধরে ক্রমাগত জীবনযাত্রার মান ও জনশক্তির সদ্ব্যবহারের কথা বলে আসা হচ্ছে, কিন্তু ফল কতটা হয়েছে? পঞ্চম পরিকল্পনার খসড়ায় দাবি করা হয়েছে যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে মাথাপিছু আয় লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, এমন কি অনুন্নত অঞ্চলসমূহেও জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করা হয়েছে যে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সত্ত্বেও মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে রয়ে গেছে। আর দারিদ্র্যসীমার সংজ্ঞা হল ১৯৭২-৭৩ সালের মূল্যস্তর অনুযায়ী মাথাপিছু মাসিক অন্তত ৪০ টাকার দ্রব্যাদি ভোগের ব্যবস্থা।

সর্বভারতীয় গড়ের হিসাবে এখনও যদি জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ দরিদ্র হয় তবে কোন কোন অঞ্চলে এই পরিমাণ যে আর বেশী তাতে কোন সন্দেহই নেই। বেসরকারী সূত্রে বলা হয়েছে শিল্পোন্নত পশ্চিমবঙ্গেই শতকরা ৭০ ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে রয়েছে।

তারপর ধরা যাক বিপুল জনশক্তির সদ্ব্যবহারের কথা। সদ্ব্যবহার দূরের কথা, মোটামুটি ব্যবহারও যে সম্ভব হয়নি তাও সহজে অনুমেয়। হলে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যাবৃদ্ধি এইভাবে ঘটত না, আর জিবিকান্বেষী জনস্রোতও পল্লীঅঞ্চল থেকে শহরে ভিড় জমাত না।

আর্থিক বৈষম্য সঙ্কোচন-ব্যবস্থাতেও যে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়নি তাও অনস্বীকার্য। একথা বিভিন্ন কমিশন, কমিটি ও কর্তৃপক্ষই স্বীকার করেছেন।

অসমাপ্ত বিপ্লব :

সুতরাং সব দিক দিয়ে বিপ্লব শুধু অসমাপ্তই থেকে যায়নি, সার্থকতার দিকে অগ্রগতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কিনা সেইটিই বিচার্য। অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশেও অনেকটা এইরকম হয়েছে। যেমন, ইন্দোনেশিয়ার তৈল সম্পদের দরুন জাতীয় আয় হঠাৎ অকল্পিতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু বণ্টনজনিত বৈষম্যের দরুন দারিদ্র্যও ব্যাপকতর হচ্ছে এবং অসংখ্য কর্মপ্রার্থী সত্ত্বেও উৎপাদন-ব্যবস্থাকে ঠিক কাম্যভাবে সংগঠিত করা সম্ভব হয়নি।

এই রকম পরিস্থিতির দরুন প্রশ্ন উঠেছে যে, সত্যিই কি গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা অর্থনৈতিক বিপ্লবের এক নতুন পর্যায়, না এক ভ্রান্ত আদর্শ? বিসমার্ক একবার জার্মেনীর এক যুব-সম্মেলনে বক্তৃতা দিতে এসে বলেছিলেন : আমি তোমাদের মাত্র তিনটি উপদেশ দেব—কাজ কর, কাজ কর, কাজ কর (ওয়ার্ক, ওয়ার্ক অ্যান্ড ওয়র্ক)। কি করে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের বিপুল জনসংখ্যাকে কাজে লাগানো যায় তাই হল গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান সম্ভব না হলে এ ধরনের বিপ্লব শুধু অসমাপ্ত থেকেই যাবে না বিপরীত বিপ্লবের দিকেও যে কোন দিন মোড় ঘুরতে পারে। তখন হয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, না হয় গণতন্ত্র—যে কোন একটিকে পরিত্যাগ করতে হতে পারে।

—শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়।

চৈতন্যদেব ও সমকালীন বাঙালী সমাজ

মধ্যযুগে বাংলার আকাশ জুড়ে নেমেছিল দুর্যোগের ঘনঘটা। সেদিন তার সমাজ, ধর্ম, জ্ঞান সব কিছুই আচ্ছন্ন ছিল এক অগৌরবের কালিমায়। কৃত্রিম অর্থহীন সংস্কারের বেষ্টনী এবং ঐক্যের শৈথিল্যে হিন্দুসমাজের চলমান গতি হয়েছিল অবরুদ্ধ। অজ্ঞানতা এবং সুপ্তির মধ্যে আমরা তখন একান্ত নিরুপায় এবং অসহায়। এমন সময়ে সেই আত্মবিস্মৃতির অন্ধকারের মধ্যে একটি সমুজ্জ্বল আলোকরেখা দীপ্যমান হয়ে উঠলো। সেই আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে মানুষের চিত্তে সাধারণের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন চৈতন্যদেব। তাঁর স্পর্শে নতুন জীবনীশক্তি লাভ করলো জীর্ণ স্থবির বাঙালী হিন্দুসমাজ।

বাংলার সুলতান হোসেন শাহের রাজত্বে চৈতন্যদেবের অভ্যুদয় ঘটে। ১৪৮৬ সনের ১৮ই ফেব্রুয়ারী নবদ্বীপে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর ডাক-নাম ছিলো নিমাই। তেইশ বছর বয়সে তিনি ঈশ্বর পুরীর কাছে দশাক্ষর কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং এর দু' বছর পরে কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন (১৫১০)। সন্ন্যাস গ্রহণের পরে তিনি অধিকাংশ সময় নীলাচল বা পুরীতেই থাকতেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবন তখন প্রায় জনশূন্য হয়ে কোনোক্রমে টিঁকেছিলো। চৈতন্যদেব আবার এটাকে বৈষ্ণব ধর্মের একটা প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করলেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর পার্ষদশ্রেণীভুক্ত হন। এঁদের মধ্যে ছিলেন শান্তিপুর-নিবাসী প্রবীণ বৈষ্ণব আচার্য অদ্বৈত, বীরভূমের একচাকা গ্রামের হাড়াই ওঝার ছেলে অবধূত নিত্যানন্দ, বৈষ্ণব ধর্মান্তরিত মুসলমান হরিদাস ঠাকুর, নিমাই পণ্ডিতের সহপাঠী এবং চরিতকার মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি। এইসব ভক্তরা নিমাইকে ঈশ্বরের অবতার রূপে ঘোষণা করেন। বৈষ্ণবদের নিকট ভক্তি শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মাধুর্য এই পাঁচটি ভাবের রূপ দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এই মাধুর্য ভাবের প্রতীক কৃষ্ণের

প্রতি গোপীদের এবং রাধার প্রেম। এই প্রেমের উন্মাদনাই চৈতন্যের জীবনে প্রতিভাত হয়েছিলো। রাধাকৃষ্ণের আদর্শ অনুসারী চৈতন্যের সাত্ত্বিক ভাবমেশানো ভগবদ্‌ভক্তির ও প্রেমের তরঙ্গ সারা দেশে জাগিয়েছিলো এক দারুণ সঞ্জীবনী শক্তি।

এদেশে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মহান আদর্শ চৈতন্যের আগে থেকেই চলে এসেছে। কিন্তু তা বহুল পরিমাণে সাত্ত্বিক ভাব থেকে সরে গিয়ে নরনারীর দেহসম্ভোগের অঙ্গ হয়ে উঠেছিলো। কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' এবং চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যগুলিতে দৈহিক সম্ভোগের এক নগ্নরূপ চিত্রিত হয়েছে। চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কাহিনীর মধ্যে সে রূপ প্রকাশ পেয়েছে। কৃষ্ণকীর্তনের নায়ক কৃষ্ণ বারবার রাধাকে বলেছেন যে তার দেহসম্ভোগের জন্যেই তিনি (কৃষ্ণ) পৃথিবীতে অবতার হয়ে জন্মেছেন (অবতার কেবল আছেন তোর রতি আসে)। অবশ্য চণ্ডীদাসের পদাবলীতে এবং অন্যত্র বিশুদ্ধ উচ্চপ্রেমের আদর্শ এবং উচ্চাঙ্গ ভক্তিরসের কথাও আমরা দেখতে পাই। যা-ই হোক, জয়দেব থেকে শুরু করে তিনশো বছর পর্যন্ত রাধাকৃষ্ণের প্রেমের নাম করে কামের নগ্নরূপ আর পরকীয়া প্রেমের মাহাত্ম্য বৈষ্ণব ধর্মকে কলুষিত করেছিলো। এই কলুষতার বিরুদ্ধে শ্রীচৈতন্যের সুস্পষ্ট প্রতিবাদ ধ্বনিত হোলো। তাঁর অজেয় পৌরুষ, পবিত্র সাত্ত্বিক ভাব এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্ব রাধাকৃষ্ণের প্রেমমূলক বৈষ্ণব ধর্মকে এক অতি উন্নত স্তরে তুলে দিলো। পবিত্র ভক্তির প্রকাশ্য উপলব্ধি, প্রাণোন্মাদকারী কীর্তন আর রাধাকৃষ্ণের প্রেমের যে স্বর্গীয় আদর্শ তিনি নিজের জীবনে রূপায়িত করেছিলেন তার স্রোত সমস্ত মলিনতাকে ধুয়ে ফেললো। এ প্রসঙ্গে চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত একটি নিয়ম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর আদেশে নারীর সঙ্গে বৈষ্ণব ভক্তদের কথাবার্তা নিষেধ করে দেওয়া হোলো।

এ ভাবে চৈতন্যের অনুসৃত আদর্শ এবং দৃষ্টান্তে সমাজের নৈতিক মান হোলো উন্নত। বাঙালি হিন্দু যেন এক নতুন জীবন লাভ করলো। নবদ্বীপের একটি ঘটনার মধ্য দিয়েই তা আমাদের চোখে পড়ে। সেখানকার মুসলমান কাজীর হুকুমে যখন চৈতন্যের প্রবর্তিত কীর্তন গান নিষিদ্ধ হোলো আর কীর্তনীয়াদের ওপর দারুণ অত্যাচার শুরু হোলো সে-সময়ে অনেক বৈষ্ণব ভয় পেয়ে নবদ্বীপ ছেড়ে অন্য জায়গায় যাওয়ার সংকল্প করলেন। একথা শুনে প্রতিহিংসাবশত অনেক অবৈষ্ণব বেশ খুশি-ই হলেন। কিন্তু তা চৈতন্যদেবকে একটুকু দমাতে পারলো না। তেজোদ্দীপ্ত হয়ে তিনি ঘোষণা করলেন যে কাজীর আদেশ অমান্য করে এই নবদ্বীপে থেকেই কীর্তন করে [illegible]।

ইতিহাস এই সাক্ষ্য দেয় যে বাঙালি তিনশো বছরের মধ্যে ধর্মরক্ষার জন্যে মুসলমানের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। তারা মন্দির এবং দেবমূর্তি ধ্বংসের অগণ্য লাঞ্ছনা এবং নিদারুণ অপমান সহ্য করেছে নীরবে। এবার চৈতন্য নেতৃত্ব দিয়ে অসম্ভবকে করে তুললেন সম্ভব। তিনি কীর্তনীয়ার দল নিয়ে কাজীর বাড়ির দিকে এগোলেন। কাজী ক্রুদ্ধ হয়ে বাধা দিতে এগিয়ে এলো। কিন্তু মারমুখী এক বিরাট জনস্রোত তার বাড়ির দিকে এগোচ্ছে দেখে কাজী পালিয়ে গেলেন। এর পরে সংকীর্তন নিষেধের আদেশ তুলে নেওয়া হোলো।

চৈতন্যদেব এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে স্ত্রী শূদ্র, মূর্খ ইত্যাদি আচণ্ডালে প্রেম ভক্তি বিতরণ করে তাদের জীবন গৌরবান্বিত করবেন। পুরীতে থাকাকালীন তিনি এই উদ্দেশ্যে অবধূত নিত্যানন্দকে বাংলাদেশে পাঠালেন। চৈতন্য তাঁকে এই কথা বলেছিলেন, 'তুমি যদি শুধু সন্ন্যাসীর জীবনযাপন কর তবে নীচ, পতিত মূর্খ দরিদ্রকে আর কে উদ্ধার করবে।' এই প্রচেষ্টার ফলে জাতিভেদের কঠোর শৃঙ্খল ভেঙে গেল। হিন্দু সমাজের নীচের তলায় যে সমস্ত শ্রেণী এতকাল উপেক্ষা আর লাঞ্ছনার মধ্যে জীবন কাটাচ্ছিলো, তাদের একটা বড়ো অংশ বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হোলো। চৈতন্যের আগে দলে দলে নীচের শ্রেণীর হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছিলো। আবার অন্যদিকে ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে সমাজের নীচের শ্রেণীর প্রাক্তন বৌদ্ধরা মুসলমানদেরই হিন্দুর আরাধ্য দেবতার জায়গায় বসিয়েছিলো। অর্থাৎ সোজা কথায় তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলো। কিন্তু নিত্যানন্দ এবং তাঁর সহচরদের প্রচারের ফলে তা অন্তত আংশিক পরিমাণে বন্ধ হোলো।

চৈতন্যদেব তাঁর প্রেমভক্তিমূলক ধর্মে দীক্ষা দেবার জন্যে যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে এক বৈপ্লবিক ব্যাপার। এর জন্যে তিনি আনুষ্ঠানিক শাস্ত্রবিহিত নিয়ম ইত্যাদি বাদ দিয়ে স্ত্রী পুরুষ এবং উচ্চ নীচ সব শ্রেণীর মানুষকেই এই ধর্মের ছায়াতলে এনেছিলেন। ফলে অনেক শূদ্র এবং সংখ্যায় অল্প হলেও মুসলমানেরাও বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করল। জাতিভেদের ব্যবধান গেলো কমে। তাই দীর্ঘ যবন সংস্পর্শ থাকা সত্ত্বেও হরিদাস ঠাকুরকে অদ্বৈত আচার্য শ্রাদ্ধের অগ্রভাগ দান করেছিলেন। অন্যদিকে ব্রাহ্মণেতর জাতির সাধকেরা বিনা দ্বিধায় ব্রাহ্মণকে মন্ত্র দিতে শুরু করলেন। রঘুনাথ দাস কায়স্থ হয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের নিয়ন্তা ছয় গোস্বামীর মধ্যে স্থান পেলেন। অসংখ্য ব্রাহ্মণ কায়স্থ নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

এই সময়ে নারীদের অবস্থারও উন্নতি দেখা দিলো। কুলবধূরা প্রকাশ্য সংকীর্তনে যোগ দিতে আরম্ভ করলেন। তার সাক্ষ্য পাই বলরাম দাসের কাব্যে। তিনি লিখেছেন, "সংকীর্তন মাঝে নাচে কুলের বৌহারি।" খেতুড়ি মহোৎসবের সময় নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহ্নবী দেবী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বহু শিষ্যকে তিনি মন্ত্রদানও করেছিলেন। অন্যদিকে শ্রীনিবাস আচার্যের মেয়ে হেমলতা ঠাকুরাণীও অনেক শিষ্যকে মন্ত্র দিয়েছিলেন

হোসেন শাহের রাজত্বে বাঙালি বৈষ্ণব ভক্তদের অবস্থার দিকটিও আলোচনা করা প্রয়োজন। আগেই বলেছি, নবদ্বীপের কাজী বৈষ্ণব ভক্তদের প্রতি কিরকম অত্যাচার করেছিলেন এবং চৈতন্যদেব সেই কাজীর বিরুদ্ধে লড়াই করে হরিনাম সংকীর্তন চালু করেন। তাই এ ব্যাপারে ভয় পেয়ে হোসেন শাহের মন্ত্রী এবং পারিষদেরা চৈতন্যদেবকে রাজধানী গৌড়ের সান্নিধ্য ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছিলেন। আর এটাও বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত যে ১৫১০ সনে দীক্ষালাভের পর চৈতন্যদেব চব্বিশ বছর অর্থাৎ ১৫৩৩ সন পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। এর মধ্যে সব মিলিয়ে তিনি পুরো একটি বছরও বাংলাদেশে কাটান নি। এভাবে তিনি বাকি জীবনের বেশির ভাগ সময় তাঁর প্রধান ভক্ত এবং হোসেন শাহের চরম শত্রু ওড়িশার বিক্রমশালী স্বাধীন রাজা প্রতাপরুদ্রের আশ্রয়েই কাটিয়েছেন। অনেক বাঙালি ভক্তও তাঁর অনুগামী হয়েছিলেন। এইসব ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে বাংলার শাসক হোসেন শাহের সুনাম থাকলেও তিনি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ব্যাপারে যথেষ্ট উদাসীন ছিলেন। তাঁদের নিরাপত্তা রক্ষায় তিনি ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন।

অনেক প্রতিকূল অবস্থা পেরিয়ে বাংলায় চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম বিরাট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলো। এর প্রভাবে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ এক বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠলো। বৈষ্ণবভক্ত কবিরা কৃষ্ণলীলাকে আশ্রয় করে অনেক গান বা পদ লিখলেন। এভাবে বাংলার গৌরবময় পদাবলী সাহিত্য সৃষ্টি হোলো। শুধু তা-ই নয়, চৈতন্যদেবের জীবন-চরিত অবলম্বনেও অনেকগুলি বড়ো এবং সুন্দর গ্রন্থ প্রকাশ পেলো। অপরদিকে কৃষ্ণলীলাকে কেন্দ্র করে রচিত হোলো অনেক আখ্যানকাব্য। এইসব রচনাসম্ভার প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং এদের সংখ্যাও অতি বিশাল। বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের এই সমৃদ্ধি বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখাকেও প্রভাবিত করেছিলো। এভাবে চৈতন্যদেবের আশীর্বাদধন্য বাংলার দুই কূল প্লাবিত হোলো এক নতুন প্রাণের জোয়ারে। এ যুগের উদার ধর্মনীতি, নারীপ্রগতি, মহান কাব্যসাহিত্য, মহান সঙ্গীত প্রভৃতি সব কটি দিকেই এক উজ্জ্বল আলোকবন্যা ছড়িয়ে পড়লো। এই উন্নততর সভ্যতার অজস্র ফসল লাভ করে ছিলো আগামী দিনের বাঙালী সমাজ।

—অংশুরঞ্জন সেন

মানসিক—(৩৭)

হিষ্টিরিয়া রোগ সম্বন্ধে মোটামুটি পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এবার আর এক রকমের মানসিক রোগের বিষয় আলোচনা করা যাক। এই রোগটিকে আবেশিক বায়ু-রোগ (অবসেশানাল সাইকো নিউরোসিস) বলা হয়। নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে এটিও বায়ুরোগের পর্যায়ে পড়ে। মানসিক রোগের যে বিভিন্ন নামের তালিকা মানসিক রোগের বিষয় আলোচনা করার প্রথমেই দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে এই আবেশিক বায়ু রোগও এক প্রকারের মানসিক রোগ বলে সেই তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এর আরেক যমজ বোন আছে তার নাম অনুকর্ষী বায়ু রোগ (কমপালশান সাইকো নিউরোসিস) এই দুই রোগকে অনেক সময় যমজের মত সংযুক্ত করে আবেশিক অনুকর্ষী বায়ু রোগ বলা হয়ে থাকে। কাছাকাছি হলেও এদের মধ্যে প্রভেদ অনেক। সেকথা সময় মত বলা যাবে। আগে আবেশিক বায়ু রোগের কথা বলে নিই পরে অনুকর্ষী বায়ু রোগের কথা বলবো।

এই রোগকে আবেশিক বলার প্রধান কারণ হল এই রোগে এমন এক মানসিক আবেশের সৃষ্টি হয় যার ফলে এক বিশেষ রকমের চিন্তা বারে বারে মনে আসতে থাকে। চেষ্টা করেও সে চিন্তাকে মন থেকে দূর করা যায় না। ইচ্ছে করে একটা বিষয় বহুবার চিন্তা করা যায়। কিন্তু এই রোগের বশে যে চিন্তা বা যে কথা বারে-বারে মনে আসতে থাকে তা যেন কোথা থেকে জোর করেই বারে বারে আসতে থাকে। ইচ্ছে করে ভাবা কথা এ নয়, আপনা থেকে মনে এসে জ্বালাতন করতে থাকে। মনে করুন আপনি কাজ করতে বসেছেন তখন বলা নেই কওয়া নেই যদি কেবলই মনে আসতে থাকে 'আজকে সিনেমা যেতে হবে, আজকে সিনেমা যেতে হবে।' তাহলে কি হয়? একই চিন্তা যদি হাজারবার করে আপনার মনে আসতে থাকে তখন কি আপনি কাজ করতে পারবেন? এ অবস্থায় কোনও কাজে পুরোপুরি মন দেওয়া অসম্ভব। আর এই সামান্য কথাটা বারেবারে মনে আসবার ফলে ক্রমে একটা বিরক্তি বোধ জাগতে থাকে, কিন্তু তবু চেষ্টা করেও ঐ চিন্তা মন থেকে দূর করতে পারা যায় না। হয়ত বিরক্ত হয়ে বলে বসবেন—'সিনেমা যেতে হবে তো, তার হয়েছে কি? এখন তার কি? সবে তো বেলা ১১টা, আর সিনেমা সেই বিকেল ৬টায়। এখন ভাবনা কি?' বেশ হিসেব করে সব বুঝে নিয়ে কাজে মন দিতে গেলেন কিন্তু ঘুরে ফিরে ঐ এক কথা কেবল মনে তোলপাড় করতে থাকে। কিছুতেই যেন মন থেকে সে চিন্তা দূর করতে পারা যায় না। বুঝতেই পারছেন এরকম যদি দিনের পর দিন এক একটা বিষয় নিয়ে কিছু না কিছু চলতে থাকে তবে মানুষের মেজাজ ঠিক রাখা কি রকম কঠিন হয়ে পড়বে। যা ভাবতে চাই না মনে করি তাই যদি হাজারবার করে মনে উঠতে থাকে তবে মেজাজ খিঁচড়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই জাতীয় রোগীদের মেজাজ অনেক সময়ই রুক্ষ হতে দেখা যায়।

এই রোগের মধ্যে দু রকম রোগী দেখতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর রোগীর মনে যখন যে কথাটা বসে যায় সেই কথাটাই বারেবারে আসতে থাকে। কখন কবে কোন চিন্তাটা রোগীকে পেয়ে বসবে তার ঠিক নেই। আর অন্য শ্রেণীর রোগীর মনে কোনও বিশেষ একটা বা এক সূত্রে গাঁথা কয়েকটা চিন্তা প্রতিদিন হামেশা মনে পড়তে থাকে, অথবা প্রত্যহ বিশেষ বিশেষ সময়ে বহুবার করে মনে আসতে থাকে। এই দুই রকমের রোগীই মনে করে তারা এসব চিন্তা করতে চায় না—তবু কোথা থেকে এ চিন্তাগুলো এসে যেন তাদের বাধ্য করে ভাবায়, মা হয় মন জুড়ে বসে। কিছুতেই সে চিন্তাকে দূর করতে পারে না। অনেকে রোগী এর হাত থেকে রেহাই পেতে চেষ্টা করে নানা ভাল ভাল চিন্তা কল্পনা করবার চেষ্টা করে, কিন্তু সেসব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে সেই আবেশিক কথাগুলিই তার মনে ঘোরাফেরা করতে থাকে। অসহ্য হয়ে কোনো কোনো সময় রোগীকে আবোল-তাবোল অসম্ভব চিন্তা করবার চেষ্টা করতে দেখেছি। এমন কি নিজের মনে সে চিন্তা করতে না পেরে জোরে জোরে আজে বাজে কথা বকতে থাকে, তাতেও যদি ঐ এক চিন্তার হাত থেকে রক্ষা পায়! কিন্তু বেশীক্ষণ তা পারে না। ঐ এলোমেলো কথা, চিন্তার মধ্যেও মনে সেই আবেশিক চিন্তা-গুলি আনাগোনা শুরু করে দেয়। অতিষ্ঠ হয়ে রোগী তখন ছটফট করতে আরম্ভ করে। রোগের প্রকোপ বেশী বেড়ে গেলে রোগীকে প্রায় উন্মত্ত অবস্থায় নিয়ে যেতে পারে।

বর্ষাকালে আকাশে মেঘ জমাই স্বাভা-বিক। কোথাও কিছু নেই সকালে ঘুম থেকে উঠে আকাশে মেঘ দেখে শুরু হয়ে গেল—'আকাশে মেঘ জমেছে, আজ আকাশে মেঘ জমেছে, আকাশে মেঘ জমেছে।' ঘুরে ফিরে এই কথাই যখন তখন মনে হতে থাকবে। কেন এ কথা তার মনে হয়, মেঘ জমলে কী হয় ইত্যাদি কোনও কথার উত্তর রোগী দিতে পারে না। ক্রমে ঐ কথার চাপেই আতঙ্ক হয়ে ওঠে। সে-দিনের অনেকখানি সময় জুড়ে ঐ চিন্তা তাকে পেয়ে বসে। আবার এক সময় হয়ত সেটা আপনিই মন থেকে দূর হয়ে যায়। ক্লান্ত মনে তখনই যে আরেকটা কোনও কথা চেপে বসবে তার কোনও মানে নেই। হয়ত বেশী খানিকক্ষণ মন স্বাভাবিকভাবে কাজ করে থাকে। কিন্তু আবার কোন চিন্তাটা যে তাকে পেয়ে বসবে তা আগে থেকে কিছু বলা যায় না। রোগী নিজেও জানে না। কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলে দেখা যায় প্রত্যেক রোগীর মনের এক-একটা রকম আছে, যেন এক-একটা ছন্দ আছে। যে রকমটিকে কেন্দ্র করে এক বিশেষ জাতীয় কথা বা চিন্তা তাকে পেয়ে বসে। রোগীর মনের ব্যক্তিগত চিন্তাধারার পরিচয় তার আবেশিক চিন্তার রকম থেকে বুঝতে পারা যায়। এই যে চিন্তার কথা বলা হল দেখা যায়—আবেশিক চিন্তাগুলির

লক্ষণ কিছু না কিছু উৎকণ্ঠা যেন লুকোনো থাকে। আমাদের কোনও স্মৃতি বা চিন্তা আবেশিক বায়ু রোগে পাওয়া যায় না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় কোনও একজন রোগীকেও সে রকম দেখেছি বলে মনে পড়ে না। একটু তলিয়ে দেখতে গেলে বোঝা যাবে সন্দেহ সম্বন্ধে আবেশিক বায়ু রোগ হওয়ার কারণ নেই। অনেক দিন আগে মানসিক রোগের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলাম কোনও একটা উৎকণ্ঠা (অ্যাংজাইটি) যদি না থাকলে কোনও অবস্থাতেই মানসিক রোগ হতে পারে না। উৎকণ্ঠা কিছু না থাকলে তাই মানসিক রোগও হবে না। সুতরাং আবেশিক বায়ু রোগে যে চিন্তা বারে বারে মনে এসে নাড়া দিতে থাকবে তার সঙ্গে কোথাও না কোথাও একটি উৎকণ্ঠা যুক্ত থাকবেই। মনে রাখতে হবে রোগীর নিজ্ঞান মনে যে উৎকণ্ঠা চাপা থাকে বলে রোগী নিজে অনেক সময় রোগ লক্ষণের সঙ্গে কী উৎকণ্ঠা তার মনে যুক্ত রয়েছে তা বুঝতে পারে না। —নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব স্বীকার করবার প্রয়োজনও তা এইখানেই। অনেক বিষয়ের আলোচনা করবার সময় বলা হয়েছে যে, সকল রোগেই যে গোপন উৎকণ্ঠা গোপনই থেকে যায় তা নয়। অনেক সময় রোগ লক্ষণের সঙ্গে একটু রূপ বদল করে হলেও উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেয়ে যায়। এমন রোগও আছে যার প্রধান লক্ষণই হল উৎকণ্ঠা। আমরা এই শ্রেণীর কিছু কিছু রোগের আলোচনা এর আগেই করেছি, উদাহরণ দিয়ে সে রোগাবস্থার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টাও করা হয়েছে।—সেকথা এখন আর নয়।

আবার আমাদের বর্তমান আলোচনায় আবেশিক বায়ু রোগের বিষয়ে ফিরে আসা যাক। দেখা যায় এই রোগ লক্ষণযুক্ত কোনও চিন্তাই তেমন গুরুতর কিছু নয়। সাধারণ চোখে দেখতে গেলে জীবনে সে চিন্তার কোন অর্থই পাওয়া যায় না। কিন্তু রোগীর মনে এই চিন্তার অতি প্রয়োজনীয় কোনও অর্থ গোপনে থেকে কাজ করে বলেই সে এই আপাত অনর্থক চিন্তাকে বাদ দিতে পারে না। মন থেকে কিছুতেই সে চিন্তা দূর করতে পারে না। মনে করুন যে কোনও কাজ করবার আগে যদি এক থেকে শুরু করে দশ পর্যন্ত মনে মনে আওড়ে নিতে হয় তবে অবস্থাটা কেমন দাঁড়ায়। কারও বাড়ী থেকে বেরুবার সময় এক দুই করে দশ পর্যন্ত গুনে তবে পরে বেরুতে হয় তা না হলে বেরুনো সম্ভব হয় না। তাও আবার এমন হতে পারে এক থেকে দুই আবার দুই থেকে তিন গোনবার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধান থাকা অবশ্য প্রয়োজন মনে হয়।

যদি তা হয় তবে সব ভেস্তে যায়। আবার নতুন করে গুনতে হয়। কেউ বা এক নিঃশ্বাসে দশ বা কুড়ি, পঁচিশ পর্যন্ত গুনে নিয়ে তবে নিশ্চিন্ত মনে বাইরে বেরুতে পারেন। তা না হলেই মন অশান্ত হয়ে ওঠে। বাইরে যেতে মন চায় না। 'কী জানি কী যেন ঘটবে' এই রকম একটা মনোভাব রোগীকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। চেষ্টা করেও, এই চিন্তা অযৌক্তিক মনে করেও, কিন্তু এর হাত থেকে রোগী কিছুতেই নিষ্কৃতি পায় না।

একটু খোলা মনে দেখতে গেলে দেখা যাবে আমাদের বিশেষ কোনও সমস্যার সম্মুখীন হতে হলে যতক্ষণ তার একটা সমাধান খুঁজে না পাওয়া যায় ততক্ষণে অনেকেরই মনে সেই সমস্যার কথাটা ঘুরে ফিরে আসতে থাকে। এক সময় হয়ত সে সমস্যার সমাধানের কোনও সূত্র পেয়ে যাওয়া সম্ভব হয় আবার তা সম্ভব নাও হতে পারে। কালের গতিতে মন আস্তে আস্তে তা সয়ে নেয়। এটা মনের স্বভাব বলে আমরা সাধারণত মনে করি। কিন্তু সমস্যা দেখা দিলে তার সমাধানের সূত্র খুঁজে বের করবার জন্য চেষ্টা করায় যে চিন্তা আর সমস্যায় পড়ে সেই সমস্যার চিন্তাতে হাবুডুবু খাওয়া এই দুই অবস্থাকে এক পংক্তিভুক্ত করা যায় না। সমাধানের উপায় খোঁজবার চেষ্টায় চিন্তাকে স্বাভাবিক বলা হবে। কিন্তু সমস্যার কথাটাই যদি বারেবারে মনে আসতে থাকে আর তারই আবেশে মন আচ্ছন্ন হয়ে থেকে অস্বস্তি বোধ করতে থাকে, চেষ্টা করেও যদি সে অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে না পারে, মনের সে অবস্থাকে স্বাভাবিক বলা যাবে না।

এই আবেশিক বায়ু রোগের সঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক জীবনের কিছু কিছু মানসিক আচরণের মিল দেখতে পাওয়া যায়। যেমন ধরুন সকালে ঘুম ভাঙ্গবার পরে প্রথমেই দুর্গা নাম বা অপর কোনও ইষ্টদেবতার নাম নির্দিষ্ট সংখ্যকবার মনে মনে ভেবে নিয়ে পরে বিছানা ছেড়ে ওঠবার অভ্যাস অনেকের আছে। কেউ কেউ ইষ্ট নামের সঙ্গে সেই ইষ্ট দেবতার রূপও মনে মনে কল্পনা করে নিয়ে তারপর অন্যদিকে মন দেন। যদি কোনও কারণে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে যায় তবে মনে অশান্তি দেখা দেয়। মন শংকিত হয়ে ওঠে, কী জানি কী হবে! তাই আবার শুয়ে বা বসে পড়ে আনুষ্ঠানিক চিন্তা ঠিক ঠিকভাবে সেরে নিয়ে পরে অন্যদিকে মন দেন। যে কোনও শুভ কাজে যাবার আগে এই ধরনের নানা রকম মানসিক চিন্তার সামাজিক বিধানও দেওয়া আছে। পরীক্ষা দিতে যাবার আগে ছাত্রছাত্রীদের প্রায় সকলেরই মনে এই রকম কোনও না কোনও চিন্তা আসে। সেই চিন্তানুসারে মন চালিত করতে না পারলে ক্ষতির সম্ভাবনায় মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

আমাদের প্রাত্যহিক স্বাভাবিক জীবনে এ রকম বহু মনোভাব নানা দিকে ছড়িয়ে আছে। বৈজ্ঞানিক বিচারে এদেরও আবেশিক বায়ুর প্রভাবযুক্ত বলা হবে। কিন্তু এ অবস্থাটা নেহাতই সাময়িক অথবা সমাজে প্রায় সর্বজন গ্রাহ্য স্বাভাবিক মনোভাব বলে গৃহীত হওয়ায় এগুলিকে ব্যাধির পর্যায়ে ফেলা হয় না। এখানে আর সেই স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক বা ব্যাধির অবস্থার মধ্যে প্রভেদ সম্বন্ধে যে কথা বেশ কয়েকবার এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে সেই কথাই স্মরণ করতে বলব। যে লক্ষণ স্বাভাবিক সেই লক্ষণই যদি স্বাভাবিকের সীমা ছাড়িয়ে বাড়াবাড়ির পর্যায়ে এসে পড়ে তবেই তা রোগ বলে গণ্য করা হবে। যা স্বাভাবিকের সীমার বাইরে তাই অস্বাভাবিক কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে সব অস্বাভাবিক অবস্থা বা লক্ষণই রোগ নয়। অতিবুদ্ধি অতিজ্ঞানী কোনও বিষয়ে অতিদক্ষ ইত্যাদিদের স্বাভাবিক আর দশজনের সামিল করা যাবে না। কিন্তু তাই বলে এদের ব্যাধিগ্রস্ত বলাও যাবে না। একথার এর আগে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এখন আর তার পুনরুল্লেখ দরকার নেই। একটু যা বলা হল তাতেই আমাদের বোঝবার কাজ চলে যাবে।

বলছিলাম, আমাদের স্বাভাবিক দিন যাপনের মধ্যেও ঐ আবেশিক বায়ুর লক্ষণের সামান্য অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ সামান্যর সীমা ছাড়িয়ে গেলেই তখন সেই লক্ষণই রোগ লক্ষণ হয়ে প্রকাশিত হয়, তখন তাকে রোগ বলে গণ্য করা হয়।

আমরা ধর্মের বা সংশিক্ষা বা সদনুশীলনের নামে যে সব মানসিক চিন্তার অভ্যাস করে থাকি তার প্রায় সবগুলিই এক হিসেবে বৈজ্ঞানিক বিচারে আবেশিক বায়ুর স্বভাবধর্মী বলে গণ্য করা যেতে পারে। তাই বলে এ সবগুলিকেই মানসিক রোগ পর্যায়ে ফেলা যাবে কিনা তা বিশেষ অবস্থায় বিশেষ ব্যক্তিকে বিচার না করে বলা সংগত হবে না। যে চিন্তা না করলে উৎকণ্ঠা বা অনিষ্ট হবার ভয় মনে জাগে সেই সেই চিন্তাকে রোগদুষ্ট বললে ভুল হবে না। আমাদের বহু স্বাভাবিক অভ্যাস আচরণ, ধারণা বিশ্বাস ইত্যাদির সঙ্গে মনের কিছু কিছু অস্বাভাবিক রোগ-লক্ষণও মিলে মিশে থাকে। সেগুলি বাড়াবাড়ি না হয়ে যদি সামাজিক প্রচলিত সীমার মধ্যে থেকে যায় তবে তাদের রোগপ্রকৃতিটা মনঃসমীক্ষণ না করলে সহজে ধরা যায় না।

আবেশিক বায়ু রোগ সম্বন্ধে এই সাধারণ আলোচনাটুকু করেই এবার শেষ করা যাক। পরের বার উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্টতর করবার চেষ্টা করব।

—তরুণচন্দ্র সিংহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মিঃ ওয়াল পাশে এসে দাঁড়িয়ে নীরবে ফ্লাইট এ্যানাউন্সমেন্ট বোর্ডের দিকে আঙুল দিতেই দেখি আর বসে থাকার সময় নেই। দিল্লীগামী এয়ার ইণ্ডিয়ার বিমানের আহার ও বিশ্রাম পর্ব শেষ। শেষ ট্রানজিট লাউঞ্জে বসে যাত্রীদের গল্পগুজব, বিশ্রাম বা দু-এক রাউণ্ড ড্রিংক করার পালা। আমিও আর কোন কথা বললাম না। একবার ওয়াল সাহেবের দিকে তাকিয়ে একটু হেসেই উঠে দাঁড়ালাম।

ছোটবেলা থেকে আমরা চিৎকার চেঁচামেচি হৈ-হুল্লোড় শুনতে অভ্যস্ত। আমরা যখন হাসপাতালের মেটারনিটি ওয়ার্ডে মার পাশে, কোলে শুয়ে থাকি, তখন ডাক্তার-নার্সের কৃপা ভিক্ষার জন্য মার ব্যর্থ আকুল প্রার্থনার পর চিৎকার শুনেই আমাদের শ্রবণ ইন্দ্রিয় সতর্ক হতে শুরু করে। তারপর আস্তে আস্তে বাড়ীতে, রাস্তাঘাটে, স্কুল-কলেজে, ট্রামে-বাসে, অফিস-আদালত কারখানায়—সর্বত্র চিৎকার শুনি। হাট বাজার আর রেল স্টেশন তো চিৎকার-চেঁচামেচি-হৈ-হুল্লোড়ের জন্য বিখ্যাত। লণ্ডনে আসার আগে আমি প্লেনে চড়ি নি। দমদম এয়ারপোর্টেও প্রথম গিয়েছিলাম রঞ্জনকে বিদায় জানাতে, তারপর যেদিন আমি আসি। রেল স্টেশনের মত অত হৈ-হুল্লোড় না হলেও দমদম এয়ারপোর্টেও কম চেঁচামেচি হয় না। চিৎকার, চেচামেচি, হৈ-হুল্লোড়, ঝগড়া-মারামারি না করে বোধ হয় আমরা কোন কাজ করতে পারি না। পুজোর বাড়ীতে, কালীঘাটের মন্দিরে, বিয়ের আসরেও শান্তি নেই। প্রীতির বিয়ের আসরে দুই পুরোহিতের মতভেদ থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত দু পক্ষের মধ্যে কি বিশ্রী তর্ক ঝগড়া হলো! প্রীতি ভয়ে, দুঃখে কাঁপছিল, কাঁদছিল। আমি ওকে জড়িয়ে বসেছিলাম কিন্তু আমিও চোখের জল না ফেলে পারি নি। প্রায় সব বিয়ে বাড়ীতেই কোন না কোন কারণে একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটবেই। এমন কি শবদাহ করবার জন্য শ্মশানঘাটে যাবার সময়ও কি বিশ্রী উল্লাসের সংগে আমরা হরির নাম স্মরণ করি! শান্তিপ্রিয় ভারতে কোন কাজ শান্তিতে, নীরবে হতে পারে না।

ইউরোপে সবকিছুই উল্টো ব্যাপার। ওদের দেশে ভগবান বুদ্ধ বা মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব না হলেও আমাদের মত ওরা চেঁচামেচি, হৈ-হুল্লোড়, মারামারি-কাটাকাটি, দাংগাহাংগামা করে না। ভারতবর্ষের ইতিহাসের চাইতে ওদের ইতিহাসের পাতায় বেশী যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনীও লেখা নেই। আমরা সরব, ওরা নীরব। চিৎকার, না হলে আমরা কিছু শুনতে পাই না। আমি বোধহয় দমদম এয়ারপোর্টের মত লাউড-স্পীকারের চিৎকার করে ফ্লাইট এনাউন্সমেন্ট না হলে এয়ার ইণ্ডিয়ার প্লেনের যাত্রারম্ভের কথা জানতেও পারতাম না। মিঃ ওয়ালকে ধন্যবাদ জানালাম, সো কাইণ্ড অফ ইউ টু রিমেমবার মী।

মিঃ ওয়াল হাসলেন। বললেন, আই এ্যাম স্কটিশ বাই বার্থ। দু রাউণ্ড স্কচ খেয়েই আমার মাথা খারাপ হবে না।

লণ্ডন-দিল্লী-বোম্বে রুটে এয়ার ইণ্ডিয়ার প্লেনে যত যাত্রীদের বৈচিত্র্য দেখা যাবে, বি ও এ সি, প্যান-এ্যাম, স্ক্যাণ্ডে-নেভিয়ান, সুইস এয়ার, টি-ডবলিউ-এ বা অন্য কোন এয়ার লাইনের বিমানের যাত্রীদের মধ্যে এত বৈচিত্র্য দেখা যায় না। ছেলেমেয়ে-বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে অতিসাধারণ মানুষ থেকে জাহাজের খালাসী, কারখানার কর্মী, লণ্ডন ট্রান্সপোর্টের কণ্ডাক্টর আণ্ডার গ্রাউণ্ডের বুকিং ক্লার্ক ছাত্রছাত্রী ব্যারিস্টার ডিপ্লোম্যাট ফিল্ম স্টার ব্যবসাদার মন্ত্রী ছাড়াও আরো কত রকমের যাত্রীকে এয়ার ইণ্ডিয়ার বিমানে দেখা যায় তার ঠিক-ঠিকানা নেই। আসা-যাওয়া দুদিকেই এদের পাওয়া যাবে। আমার প্লেনের যাত্রীদের মধ্যেও বোধহয় এরা সবাই আছেন। আছেন বাঙ্গালী-বিহারী গুজরাটি-মারাঠী পাঞ্জাবী-সিন্ধী আছেন হিন্দু-মুসলমান-শিখ-জৈন-খৃস্টান।

ফ্রাংকফার্ট এয়ার পোর্টের ট্রানজিট লাউঞ্জে বসে থাকার সময় মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক দৃষ্টি ঘুরাতে গিয়ে এদের দেখছিলাম। আশে-পাশের দু-চারজন ছেলেমেয়ের চোখে চোখ পড়তেই একটু হেসেছি ওরাও হেসেছেন। একবার পাশ থেকে বাংলা কথাও শুনেছি। আশ্চর্য হই নি। কলকাতার বাঙ্গালী দুর্গাপুরে বদলী হলে অনশন ধর্মঘট করলেও কিছুকাল হিথরো এয়ার পোর্টের ট্রানজিট লাউঞ্জে কাজ করে জেনেছি সারা পৃথিবীর সমস্ত কোণায় কোণায় বাঙ্গালী ছড়িয়ে আছে। এক কালে আমি নিজেই লণ্ডনের হিথরো এয়ার পোর্টের ট্রানজিট লাউঞ্জে বেশ কিছু কাল কাজ করেছি। আজ ফ্রাংকফার্ট এয়ার পোর্টের ট্রানজিট লাউঞ্জে বসে দু-চারজন যাত্রীর মুখে বাংলা কথা আমার পুরানো দিনের কথা মনে পড়ছে।

সেদিন আমার বিকেলের দিকে ডিউটি। চলবে রাত্রি নটা পর্যন্ত। ডিউটিতে আসার পর পরই ট্রান্স-এ্যাটল্যান্টিক এক দল যাত্রী হৈ-হৈ করতে করতে ট্রানজিট লাউঞ্জে ঢুকলেন। কিছু যাত্রী খুশী কিছু অসন্তুষ্ট। আমি গ্রাহ্য করলাম না। তখন আশে-পাশের অনেক ঘটনাই গ্রাহ্য করতাম না তার কিছুকাল আগেই রঞ্জনকে হারিয়েছি। অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের জন্য প্রথম চাকরি করছি। তাও অত্যন্ত সাধারণ নগণ্য চাকরি। ট্রানজিট লাউঞ্জে বসে হাজার হাজার যাত্রী চা-কফি-স্ন্যাকস খাচ্ছেন ছেলে-মেয়েরা কত রকমের ক্যাণ্ডি চকোলেট খা আরো কত কি খাচ্ছে খবরের কাগজ পড়ছেন। সিগারেট টানছেন। আরো কয়েক-জন মেয়ের সংগে আমি ট্রানজিট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখি।

মাথা নীচু করে আপন মনে আমি [illegible] মাথা ময়লা তুলছি হঠাৎ পাশ থেকে গানের সুর কানে এলো [illegible] আমায় পাগল করে [illegible] চঞ্চল হাওয়ার দল। মুখ তুলে তাকিয়েই হেসে ফেললাম। না হেসে পারলাম না। আমার চোখে চোখ

পড়তেই উনিও হাসলেন। দাঁড়িয়ে গল্প করার অবকাশ নেই। ঘুরে ঘুরে লেংটাং টেবিলের উপর থেকে টুকটাক ময়লা কাগজপত্র পরিষ্কার করছি। একটু পরে প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমার কাছে এগিয়ে এসেছেন। একবার তাকিয়েই দৃষ্টি গুটিয়ে নিলাম। কারণ সুন্দর হাসিখুশী ছেলে দেখলেই তখন আর ভাল লাগে না। বরং ভয় করে। মনে হয় হয়ত এরা সবাই রঞ্জনের মত অভিনেতা বিশ্বাসঘাতক। ছলনা করে আমাকে আবার কোন বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলবে।

'নমস্কার।'

কানে এলো কিন্তু কোন সাড়া দিলাম না। এমন ভাব দেখালাম যেন শুনতে পাই নি, অথবা শুনলেও বুঝতে পারি নি।

'কি হলো? জবাব দিলেন না?'

যাত্রীদের সঙ্গে গল্প করা আমাদের কাজ নয় উচিতও নয়' তবে টুকটাক দুটো-একটা কথা বলা বারণ নয়। কখনও কখনও যাত্রীদের সঙ্গে আমরা কথা বলি বলতে হয় না বলে পারা যায় না। যাত্রীদের প্রতি অসৌজন্য দেখান অন্যায়। তাই বাধ্য হয়ে বললাম আমাকে কিছু বলছেন?

'অফ কোর্স আপনাকে বলছি।'

'বলুন।'

'বিশেষ কিছুই বলার নেই তবে বহুকাল পরে একজন বাঙ্গালী মেয়ে দেখে খুব ভাল লাগছে...

'ধন্যবাদ।'

আমি আর দাঁড়াই না। নিজের কাজে মন দিই। ট্রানজিট লাউঞ্জের অন্যান্য দিকে চলে যাই কিন্তু আবার দেখা হয়। কথা শুনি বলি। সকালবেলার মত যাত্রীর ভিড় নেই। কাজের চাপ কম। তাই মাঝে মাঝে দু-পাঁচ মিনিট গল্প করতে অসুবিধে হয় না।

'আপনাকে দেখেই মনে হয়েছিল আপনি বাঙ্গালী কিন্তু সাহস ভাবতে পারি নি...

'লণ্ডন এয়ার পোর্টের ট্রানজিট লাউঞ্জে একটা বাঙ্গালী মেয়ে এই ধরনের সাধারণ ক্লিনারের কাজ করতে পারে তাই না?'

'আমি জানি এটা ইণ্ডিয়া নয়। কোন কাজই এখানে ছোট নয়।'

আমি জিজ্ঞাসা করি আমাকে দেখে হঠাৎ ঐ গান গাইলেন কেন?

উনি হাসলেন। বললেন কেন গাইলাম জানি না কিন্তু বহুকাল পরে আপনার মত একজন বাঙ্গালী মেয়েকে বড় ভাল লাগল।

আমি বাকেট হাতে করে একটু ঘুরে আসি। আবার একটু পরেই ফিরে আসি। জিজ্ঞাসা করি আপনি যেখানে থাকেন সেখানে বুঝি বাঙ্গালী নেই?

'আমি জামাইকায় একটা টেকসটাইল মিলে কাজ করি। আমাদের ওদিকে বাঙ্গালী নেই বললেই চলে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। তাই তো একটা বাঙ্গালী মেয়ের খোঁজে জামাইকা থেকে কলকাতা যাচ্ছি।'

আমি হাসি।

'হাসছেন? কিন্তু অত দূর দেশে একা একা থাকা যে কি কষ্টকর তা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না।'

কথাটা শুনে কষ্ট হলো। বললাম কিছুটা পারি বৈকি।

'এখানে তো অনেক বাঙ্গালী। সুতরাং আমাদের কষ্ট আপনারা বুঝতে পারবেন না।'

ভদ্রলোকের নাম জানি না পরিচয় জানি না। অথচ গল্প করে যাচ্ছি। 'এখানে কি ফ্লাইট চেঞ্জ করবেন?'

'দুঃখের কথা আর বলবেন না।'...

'কেন? কি হলো?'

'বৃটিশ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এয়ার ওয়েজের একটা স্পেশ্যাল ফ্লাইটে প্যারিস যাচ্ছিলাম। প্যারিস থেকে এয়ার ফ্রান্সের ফ্লাইটে ইণ্ডিয়া যাবার কথা কিন্তু ওরলি এয়ার পোর্টে হঠাৎ স্ট্রাইক হওয়ায় ওরলি এয়ার পোর্ট বন্ধ।'...

'তাহলে?'

'ওরলিতে ল্যাণ্ড করতে না পেরে এখানে এসে ল্যাণ্ড করেছি...

'তারপর?

'অলটারনেট এ্যারেঞ্জমেন্ট হচ্ছে। বোধহয় কাল সকালের দিকে অন্যান্য এয়ার লাইন্সের ফ্লাইটে আমরা রওনা হবো।'

'ট্রাভেল প্ল্যান আপসেট হলে ভারী বিচ্ছিরি লাগে তাই না?'

উনি হাসলেন।

'হাসছেন যে?'

'আমার খারাপ লাগছে না।'

'সে কি?'

'সত্যি।'

'কেন?'

'কিছু মনে করবেন না তো?'

মনে মনে একটু সন্দেহ হলো হয়ত আমার সম্পর্কেই কিছু বলবেন কিন্তু বললাম না না কি আবার মনে করব?

'আপনার সঙ্গে দেখা হবে জানলে এত খরচ করে ইণ্ডিয়ার টিকিট কাটতাম না।'

আমি হাসি। বলি খুব চটপট অনেক কিছু ভাবতে পারেন তো আপনি।

'কিছু ভুল করলাম নাকি?'

'মনে মনে যা ইচ্ছে হয় ভাবুন কিন্তু সে ইচ্ছা পূর্ণ করার দায়িত্ব আমার নয়।'

ছেলেটির নাম আমার মনে নেই। বোধ হয় নবেন্দু। দূরে দেশে নিজের দেশের একটি মেয়ে দেখলে অনেক ছেলেরই মনে অনেক প্রত্যাশা জাগে। হয়ত শিকার করার প্রবৃত্তিও জাগে। মিঃ ওয়ালের পাশাপাশি এগুতে গিয়ে দুটি একটি বাঙ্গালী যাত্রীর মন্তব্য কানে এলো। অশ্লীল না হলেও একটু বেসুরো লাগল। মনে মনে হাসলাম। ভাবলাম ওঁরা তো জানেন না পুরুষের সামান্য সান্নিধ্য বা রোমাঞ্চিত হবার পালা আমার শেষ। হয়ত শেষ আমার আনন্দের দিনগুলি। শ্রীকান্ত আমাকে ভালবাসে আমার নানার জন্য সুখের জন্য কত কি করে কিন্তু যে নির্ভরতা যে সান্নিধ্য আমি চাই তার কথা ও কোনদিন বলে না, বলে নি। সবাই ভাবে শ্রীকান্ত আমাকে বিয়ে করবে। এমন কি বিজয়ারও স্থির বিশ্বাস আমার জীবনে শূন্যতা নেই। শ্রীকান্ত আমাকে পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কিন্তু আমি তো জানি ও কাছে এসেও কত দূরের মানুষ। আমি ওকে কাছে পাই কিন্তু মনের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে পাবার আনন্দ থেকে বঞ্চিতা। এই পৃথিবীতে কিছু কিছু মানুষ শরতের টুকরো টুকরো সাদা মেঘের মত মনের আকাশে উদয় হয়ে বর্ষার শেষ ঘোষণা করলেও তাদের স্থায়িত্ব নেই। এত বড় নীল আকাশের কোলেও ওরা একটু নিজের ঠাঁই করে নিতে পারে না। শ্রীকান্ত এমনি একটি মানুষ। ওকে নিয়ে কি কোন মেয়ের মন ভরাতে পারে?

জানি না।

কেউ না জানলেও আমি জানি ওর উপর অভিমান করেই আমি দিল্লী যাচ্ছি। বিবেকের কাছে যাচ্ছি। পিয়ালীর মত আমি প্রেমে পড়ি নি, কাউকে ভালবাসি নি কিন্তু সব মেয়ের মত স্বামীর স্বপ্ন দেখেছি স্বপ্ন দেখেছি ছেলেমেয়ের। কেন দেখব না? রৌদ্রদগ্ধ পৃথিবীকে শান্ত সবুজ করার জন্যই তো আকাশের বুকে বর্ষার কালো মেঘ দেখা দেয়। যে বর্ষার মেঘে বর্ষণ হয় না, তার কি সার্থকতা? আকাশের কোলে উদয় হবার কি তার অধিকার? অকসফোর্ড স্ট্রীট-বণ্ড স্ট্রীটের বড় বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্সের সামনে উইণ্ডো শপিং করে চোখের

আনন্দ হলেও মনের তৃপ্তি হতে পারে না। হয় না। যৌবনের পসার সাজিয়ে কিছুকাল কিছু পুরুষের মনে চাঞ্চল্য দেখে আনন্দ হলেও আত্মতৃপ্তি নেই। তাই তো স্বামী চাই সন্তান চাই। জগতের আর কোন ঐশ্বর্য পাবার অধিকার না থাকলেও এটুকু প্রত্যাশা সব মেয়েই করে। করতে পারে। এটা আমাদের জন্মগত অধিকার। এই অধিকার প্রকৃতি আমাকে দান করেছে। কারুর কৃপালব্ধ ঐশ্বর্য নিয়ে আমি এই দাবী করছি না।

এই পৃথিবীতে সমাজে একা একা থাকলে কিছু মানুষের বিদ্রূপ উপহাস, অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত মন্তব্য আমাকে শুনতেই হবে। শুনেছি। লণ্ডনে শুনেছি। এই ফ্রাংকফার্ট এয়ার পোর্টেও শুনলাম। আর ভাল লাগে না। শ্রীকান্ত কি এসব বোঝে না? জানে না? বিবেক বুঝবে?

জানি না।

কিছু জানি না। শুধু জানি শ্রীকান্ত আমাকে ভালবাসে। তা নয়ত ঐভাবে কেউ এয়ার পোর্টে ছুটে আসে?

আস্তে আস্তে আবার এয়ার ক্রাফট-এর মধ্যে গেলাম। মিঃ ওয়ালের পাশে বসলাম, কিন্তু মন?

(ক্রমশঃ)

পাণ্ডববিজয়ের অভিনব কবি

(১)

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই সুপ্রাচীন জাতীয় মহাকাব্য অবলম্বনে বহু বাঙালী কবি 'শ্রীরাম পাঁচালী' 'ভারত পাঁচালী' অথবা 'পাণ্ডব বিজয়' অনুবাদ করেছিলেন। এই অনুবাদ কর্ম প্রয়াসের মধ্য দিয়ে বাংলা-ভাষা ও সাহিত্য যে যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্ট হয়ে উঠেছিল, তার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

বাংলা রামায়ণ মহাভারতাদির অনুবাদ-কালে পূর্ব ভারতে একটি ভিন্নধর্মী সংস্কৃতির সংঘাত-সংকট দেখা দিয়েছিল। একদিকে বাংলার তদানীন্তন রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতা, অপরদিকে বহিরাগত ভিন্ন-ধর্ম ও সংস্কৃতির প্লাবনকে হিন্দু সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের দ্বারা নিবারিত অথবা বহু কালানুসৃত সংরক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে সেদিন ব্রাহ্মণেতর সকলের কাছে পুনরুজ্জীবিত করার তাগিদে এই অনুবাদ সাহিত্য-শাখার জন্ম —এ-জাতীয় ধারণা প্রচলিত। সূক্ষ্ম সাল-তারিখের বহু-বিতর্কিত মত ও পথ পরিহার করে মোটামুটিভাবে বলা চলে যে, পঞ্চদশ শতক থেকে ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ-কর্ম সুবিস্তৃত। সুধী পাঠক এ-কথাও জানেন যে, শ্রীরাম পাঁচালী বা ভারত পাঁচালীর অনুবাদ করিয়া সকলেই মহা-কবি বাল্মীকি বা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে কাব্য রচনায় আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেননি। শ্রীরাম পাঁচালীর অনুবাদকরা বৈচিত্র্যের লোভে অথবা মৌলিকত্ব দেখাবার উদ্দেশ্যে মহর্ষি বাল্মীকির পরবর্তীকালের রচিত রামকথা সম্বলিত অদ্ভুত রামায়ণ। অধ্যাত্ম রামায়ণ, ভারত রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ থেকেও কাহিনী আহরণ করে-ছিলেন। অনুরূপভাবে ভারত পাঁচালী অথবা পাণ্ডব বিজয়ের কবিরাও ব্যাস-ভারত ছাড়া জৈমিনি ভারত থেকেও কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করেছিলেন। জৈমিনি ভারতে লবকুশের যুদ্ধ প্রসঙ্গে বর্ণিত রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনেও বহু কবি রামায়ণ রচনা করেছিলেন।

(২)

প্রাবন্ধিক জৈমিনি ভারত অবলম্বনে লিখিত এক অভিনব কবির ভণিতাসম্বলিত ভারত পাঁচালী বা পাণ্ডব বিজয় পুঁথির অশ্বমেধ পর্বের সন্ধান পেয়েছেন নদীয়া জেলার নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত বামুন-পুকুর গ্রাম থেকে। এই কবির নাম-পরিচয় দীনেশ সেন মহাশয়ের বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, শ্রীসুকুমার সেনের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, মণীন্দ্রমোহন বসুর বাংলা সাহিত্য (২য় খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ (১ম ও ২য় খণ্ড), পঞ্চানন মণ্ডল সম্পা-

জয়ন্তকুমার চক্রবর্তী

দিত পুঁথি পরিচয় (১ম ও ২য় খণ্ড) নামক পুঁথি নির্দেশক গ্রন্থে নেই।

এই অভিনব কবির ভণিতা সম্বলিত পুঁথির প্রথম ও শেষের দিকের পৃষ্ঠা নেই। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১।/—৭।৵। অবশ্য মাঝে মাঝে কয়েকটি পৃষ্ঠা নেই। এছাড়া কালের স্থূল হস্তক্ষেপ এবং কীটদষ্ট হওয়ায় জীর্ণ পুঁথির পূর্ণ পাঠ গ্রহণ অনেক স্থলেই সম্ভব হয়নি। কাব্যের রচনাকালজ্ঞাপক পুষ্পিকা অংশ পুঁথির আদি অথবা অন্তেই থাকা সম্ভব। কিন্তু কাব্যের প্রথমে, শেষে বা অন্যত্র কাব্য-রচনার কালজ্ঞাপক নির্দেশ না থাকায় এই কবির সময়কাল অথবা কাব্যের রচনাকাল অনুমাননির্ভর হয়ে ওঠে। কবি কাব্যের ভণিতায় নরহরি দেব, দ্বিজনরহরি অথবা দ্বিজ নৃসিংহ বলে পরিচয় দিয়েছেন। যথা,

১ কৃষ্ণপদে নরহরি দেব বিরচিল।
২ দ্বিজ নরহরি কহে ভাবিত হৈয়া।
৩ শ্রীযুত নৃসিংহ দ্বিজ ভাবিয়া গরুড়ধ্বজ
মধুর সঙ্গীত বিরচিল।

নরহরি বা নৃসিংহ একই ব্যক্তির ভিন্ন নাম। অতএব নরহরি দেব দ্বিজ নৃসিংহেরই ভণিতান্তর বলে গ্রহণ করা চলে। ব্রাহ্মণ-মাত্রেই দেব এবং নৃসিংহ = নরসিংহ = নরহরি। এক নামে পরিচিত কবি অন্য নামে বা অন্য ভণিতায় পরিচিত। এমন নজির বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দুর্লভ নয়। বৈষ্ণব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ভক্তি-রত্নাকর প্রণেতা, পদাবলী সংগ্রাহক ও সংকলক নরহরি চক্রবর্তীর ভিন্ন নাম ছিল ঘনশ্যাম দাস।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এবং বিশেষ করে বৈষ্ণব সাহিত্যে নরহরি, নরসিংহ বা নৃসিংহ নামে বহু কবির পরিচয় পাওয়া যায়।

১ বৈষ্ণব সাহিত্যের আটজন কবিরাজ ও শ্রীনিবাস আচার্যের প্রধান সহচর ও শিষ্যদের মধ্যে এক নৃসিংহ কবিরাজের পরিচয় পাওয়া যায়। (দ্রঃ মণীন্দ্রমোহন বসু—বাংলা সাহিত্য—২য় খণ্ড)

২ রূপ গোস্বামীর হংসদূত কাব্যের অনু-বাদক নরসিংহ দাস বা নৃসিংহ দাস নামে এক কবির পরিচয় পাওয়া যায়। আবার উদ্ধব দূতের অনুবাদক এক দ্বিজ নরসিংহের পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক ডঃ সুকুমার সেনের মতে হংসদূত কাব্যের অনুবাদক নরসিংহ বা নৃসিংহ দাসই দ্বিজ নরসিংহ হওয়া সম্ভব। (দ্রঃ শ্রীসুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড)

৩ নরোত্তম দাসের শিষ্যদের মধ্যে পদকর্তা হিসাবে এক নৃসিংহ দেবের উল্লেখ পাওয়া যায়। (ঐ)

৪ সংস্কৃতে সুবৃহৎ শ্রীচৈতন্য মহাভারত কাব্য রচয়িতা চাটিগাঁবাসী এক নৃসিংহ দেবের পরিচয় পাওয়া যায়। (ঐ)

৫ স্বর্ণ চন্দ্রিকা নামে স্বত্র নিবন্ধের রচয়িতা এক নরসিংহ দাসের পরিচয় পাওয়া যায়। (ঐ)

৬ দামোদরের বানের ছড়া-লেখক এক নরসিংহ দাসের পরিচয় পাওয়া যায়। (ঐ)

৭ নরসিংহ নামে ধর্মমঙ্গল কাব্যের এক কবির পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য এই কবির পদবী ছিল বসু।

(দ্রঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলা মঙ্গল-কাব্যের ইতিহাস)

৮ পদাবলী সংগ্রাহক সংকলক ও বৈষ্ণব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ভক্তি-রত্নাকর ও নরোত্তম বিলাস রচয়িতা ছিলেন নরহরি চক্রবর্তী। নরহরি চক্রবর্তী অবশ্য ঘনশ্যাম দাস নামেও পরিচিত ছিলেন।

(দ্রঃ শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—৩য় খণ্ড)

নরহরি, নরসিংহ বা নৃসিংহ নামে পরিচিত এইসব কবিদের মধ্যে নব আবিষ্কৃত এই কবিকে অভিনব বলেই মনে হয়। কাব্যের এক স্থানে আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে কবি সামান্য যে দু-চারটি কথা বলেছেন তা নিম্নরূপ :

চট্টকুলে রাঘব আচার্য মহাশয়।
অচ্যুত মটুক তিন তাহার তনয়।।
তাহার পত্র শ্রীযুত নৃসিংহ নাম ধরি।
হরিদ্রাপুরেতে শ্যামরায় সেবা করি।।

নরহরি, নরসিংহ বা নৃসিংহ নামে পরিচিত পূর্ববর্তী কোন কবিই চট্টোকুলোদ্ভব ছিলেন না এবং তাঁদের কারো পিতার নাম রাঘব ছিল না। কবি পরিচয়জ্ঞাপক অংশে অচ্যুত দাস নামে তাঁর এক ভ্রাতার উল্লেখ করেছেন। ভাগবতের অনুবাদক এক অচ্যুত দাসের নাম পাওয়া যায়, যাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। ভাগবতের অচ্যুত দাস এবং বর্তমান কবি নৃসিংহ চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতা অচ্যুত দাস উভয়েই একই ব্যক্তি কিনা কে জানে। কবি নৃসিংহ চট্টোপাধ্যায় অভিনব কিনা সে-সম্পর্কে নিঃসংশয়িত হওয়ার জন্য ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের সঙ্গে পত্রালাপ করেছিলাম। তিনি জানিয়েছেন যে, আলোচ্য কবি নৃসিংহ চট্টোপাধ্যায়কে আপাততঃ পাণ্ডব বিজয় বা ভারত পাঁচালীর অভিনব কবি বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

কবির পরিচয় মোটামুটি পাওয়া গেল, কিন্তু কবির সময়কাল বা কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে কিছু জানা গেল না। পুঁথির লিপিকর একস্থানে অনুলিপির যে তারিখটি ব্যবহার করেছেন তা হল, ১৬৭৬ শকাব্দ ২৮শে শ্রাবণ অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি (১৭৫৪ খৃঃ)। লিপিকরের ঠিকানা দেওয়া আছে—সাত-সৈকা পরগণা, ধামাঞি গ্রাম। ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের কাছ থেকে অবগত হয়েছি যে সাতসৈকা পরগণা বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার অন্তর্গত।

কাব্যটি পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত। কাব্যে কয়েকটি রাগ-রাগিণীর উল্লেখ রয়েছে। যেমন—শ্রীরাগ, ধানশী, পাহাড়ী ভাটিয়ারী ও কৌশিক। সুতরাং এটি যে গেয় কাব্য ছিল সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। গেয় কাব্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গায়কের প্রক্ষিপ্ত অংশও এখানে থাকা বিচিত্র নয়।

ভারত পাঁচালী বা পাণ্ডব বিজয়ের এই অভিনব কবি কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব কবি ছিলেন। কাব্যের বিভিন্ন স্থানে ভণিতায় অথবা আত্মপরিচয়জ্ঞাপক অংশে কবির বৈষ্ণব-প্রাণতার পরিচয় মেলে। যথা—

১ কৃষ্ণের চরণ স্বচ্ছন্দ অরবিন্দ মকরন্দ।
পান করি নৃসিংহ রচিল।।

২ কৃষ্ণের কমল পদ হৃদপদ্ম ভাবিয়া।
শ্রীযুত নৃসিংহ রচে তাপিত হৈয়া।।

৩ গোপাল চরণ মজাইয়া চিত।
শ্রীযুত নৃসিংহ ভণে মধুর সংগীত।।

কাব্যের পরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলেছেন :

১ জৈমিনি ভারত মধুর সংগীত
রচিল গোপাল ভাবি।

২ জৈমিনি ভারত দিয়া রচিল সংগীত ভাষা
নরহরি ভাবিয়া প্রভুরে।

৩ শ্রীযুত নৃসিংহ দ্বিজ ভাবিয়া গরুড়ধ্বজ
বিরচিল ভারত কাহিনী।

কাব্য রচনার প্রেরণায় যে-দেবতার স্বপ্নাদেশ ছিল, তার উল্লেখ করেছেন কবি :

নিরন্তর কৃষ্ণকথা গান মহাশয়।
স্বপনেতে বিপ্ররূপে আদেশিল তায় ।।
প্রভুর আদেশ জানি হরিষ অন্তরে।
অন্ধ যেন প্রবেশ করিল বনান্তরে।।

অশ্বমেধ-যজ্ঞ কথা শ্রবণের ফল সম্পর্কে কবি বলেছেন :

অশ্বমেধ ফলপ্রাপ্তি ইহা শ্রবণেতে।।
ইহার কীর্তনে কৃষ্ণদেব তৃপ্ত হয়।
কামীজন ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ পায়।।
নিকামী নির্বাণ পদ পায় কৃষ্ণ অংগ।
বৈষ্ণব জনেতে শুনি এসব প্রসংগ।।

কবি নৃসিংহ চট্টোপাধ্যায়ের ভণিতাসম্বলিত ভারত পাঁচালীর পুঁথি অন্য কোথাও আবিষ্কৃত হয়েছে কিনা জানি না। কি কারণে তিনি ভৌম সংকীর্ণতার মধ্যে বন্দী হয়ে এতদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিলেন তা ভাবতে আশ্চর্য লাগে। কারণ কবির বর্ণনাভঙ্গী, ছন্দ ও অলংকারের প্রয়োগ-দক্ষতা দেখে মনে হয় তিনি এক-জন প্রতিভাবান কবি ছিলেন।

(৩)

এবারে বিষয়বস্তুর প্রসঙ্গে আসা যাক। পূর্বেই বলা হয়েছে এটি জৈমিনি ভারতের অশ্বমেধ পর্বের আদর্শে রচিত। রাজা জনমেজয় কৌতূহলাবিষ্ট হয়ে জৈমিনিকে একের পর এক প্রশ্ন করে চলেছেন এবং জৈমিনি তার উত্তর দিচ্ছেন। এইভাবে প্রশ্ন এবং উত্তরের মধ্য দিয়ে কাহিনীগুলি বিস্তার লাভ করেছে। কাব্য পাঠের আসরে আমরাও যেন জনমেজয়ের মত শ্রোতা এবং জৈমিনি যেন কথক, যাঁর গল্প বলার ক্ষমতায় আকৃষ্ট হয়ে শ্রোতারাও যজ্ঞাশ্ব সমভিব্যাহারে নানা দেশে মানস পর্যটন করে চলেছেন। পুঁথির প্রথম দিকের পৃষ্ঠাগুলি না থাকায় কাহিনীর পূর্ব সূত্রটি জানা গেল না। পুঁথির পৃষ্ঠা যেখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে কামদেবপুরে প্রমীলা বাহিনীর সঙ্গে মেঘ-বর্ণের যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে। যুদ্ধে মেঘ-বর্ণের ও বৃষকেতুর পরাজয় দেখে অর্জুন প্রমীলার প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করবেন। সৃষ্টি রসাতলে যায় দেখে দেবতারা চিন্তিত। অবশেষে দেবতাদের নির্দেশে অর্জুন প্রমীলাকে বিবাহ করলেন। এর পর প্রমীলার জন্ম-রহস্য বর্ণিত হয়েছে। গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ (?) ইন্দ্রের আহ্বানে স্বর্গরাজ্যে গিয়েছেন। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে শচীকান্ত (?) নামে এক দানব চিত্ররথের মূর্তি ধরে তাঁর প্রাসাদে এলেন। এমন সময় চিত্ররথের পুনরাগমন ঘটায় দানব ভীত হয়ে প্রমীলা নামে নারীবেশে ধারণ করে রাজ পুরীর মধ্যে আত্মগোপন করে। অবশেষে প্রমীলার ঐকান্তিক প্রার্থনায় এবং কাম দেবীর বরে প্রমীলা অর্জুনকে লাভ করেন

অতঃপর অর্জুন যজ্ঞাশ্ব নিয়ে সপ্ত দ্বীপ, ব্রহ্মদেশ, দীর্ঘনাশার দেশ পর্যটন করে ভীষণ রাক্ষসের দেশে এলেন। মেঘ বর্ণের সঙ্গে ভীষণের যুদ্ধ হল। যুদ্ধে চিত্ররূপী (?) হনুমানকে দেখে ভীষণ রাক্ষস রণে ভঙ্গ দিল।

অর্জুন বাহিনী তারপর মণিপুরে এলেন। নাগকন্যা উলুপীর সঙ্গে অর্জুনের বিবাহ, গন্ধর্বকন্যা চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে অর্জুনের বিবাহ, অর্জুনের নির্দেশ অমান্য করার জন্য চিত্রাঙ্গদাকে কুমীর হয়ে জলে থাকার জন্য অভিশাপ বভ্রুবাহনের জন্ম গঙ্গার অভিশাপে বভ্রুবাহনের হাতে অর্জুনের মৃত্যু এখানে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে।—

গংগা বলে যে মারিল আমার পুত্রেরে।
অষ্ট মাসে মরিবেক পুত্রের সমরে।।
বাণরূপে জ্বলা আছে বভ্রুবাণ তূণে।
অর্জুনের মৃত্যু হইয়াছে সেই বাণে।।

কৃষ্ণ অর্জুনের পতন জানতে পেরে মণিপুরে গেলেন। বভ্রুবাহন তখন পিতৃহত্যা শোকে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন। অবশেষে কৃষ্ণের প্রবোধদানে এবং মণির স্পর্শে অর্জুন পুনর্জীবন লাভ করলেন। পিতা পুত্রের অদ্ভুত যুদ্ধকাহিনী শ্রবণ করে জনমেজয় বিস্মিত হয়ে জৈমিনিকে জিজ্ঞাসা করেন :

জন্মেজয় শুনি বলে অদ্ভুত কথন।
কভু নাহি শুনি পিতাপুত্রের রণ।।
মুনি বলে মহাবীর বভ্রুবান।
রাম সঙ্গে যেন লবকুশের আখ্যান।।
বভ্রুবাণ রণ কৈল সকল জানিয়া।
লবকুশ যুদ্ধকৈল পিতা না চিনিয়া।।
শুনি জন্মেজয় রাজা বিনয় বিচ বচনে।
করজোড়ে জিজ্ঞাসিল জৈমুনির স্থানে
অপূর্ব কহিলে গোসাঞি
বভ্রুবানের কাহিন
লবকুশের উপাখ্যান কহ ইবে শুনি।।

জৈমিনি তখন রামের অশ্বমেধ প্রসঙ্গে লবকুশের যুদ্ধ সংক্ষেপে বর্ণনা করলে

[illegible] জন্মরহস্য সম্পর্কে বাল্মীকি [illegible] রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ [illegible] বা অদ্ভুত রামায়ণে ভিন্ন [illegible] পরিবর্তিত হয়েছে। রাবণের [illegible] এবং তাঁর বিনাশ সম্পর্কে কবি যে [illegible] পরিবেশন করেছেন তা নিম্নরূপ:

[illegible] অবসানে সুমালী নামে [illegible] দেবতা এবং বিপ্রদের উপর [illegible] করলে নারায়ণ সেই রাক্ষসকে বধ করার জন্য লঙ্কাপুরী গেলেন। রাক্ষস তখন পাতালে আত্ম-গোপন করল এবং তার কন্যাকে বিশ্রবার কাছে পাঠালো। সুমালী-কন্যা বিশ্রবার কাছে প্রার্থনা করে পুত্র লাভ করল। সেই পুত্র [illegible] অর্জনের জন্য তপস্যা করল :

উগ্রতপ দেখি ব্রহ্মা বর দিল তারে।
দেব বিপ্র হিংসা করি মর্ত্যের সংসারে।।
দিকপাল আদি জিনিলেক পুরস্কার।
কান্দিতে কান্দিতে দেব গেল
ব্রহ্মার গোচর।।

ব্রহ্মা বলেন আমি কিছু কহিতে না পারি।
দেবগণ লইয়া গেল যথায় শ্রী হরি।।
করিল অনেক স্তুতি দেব গদাধরে।
শুনিয়া বলেন প্রভু দেবতার তরে।।
কপি ঋক্ষ বংশে সবে জন্ম লভ গিয়া।
আমি জন্ম লভি গিয়া মনিষ্য হইয়া।।
নর-বানরের হাতে রাবণের বিনাশ।
দেবগণে আশ্বাস করিল শ্রীনিবাস।।

এখানে রামচন্দ্রের মনুষ্য জন্মের কারণ সম্পর্কে যে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে তা বাল্মীকি রামায়ণের অনুরূপ কিন্তু মানব-জন্মে শ্রীরামের আত্মবিস্মৃতি সম্পর্কে যে-কথা বলা হয়েছে, তা বাশিষ্ঠ রামায়ণের অনুরূপ। বাশিষ্ঠ রামায়ণে বলা হয়েছে ভগবান নৃসিংহ মূর্তি ধারণ করলে দেব-দত্তের গর্ভবতী পত্নী তাঁকে দেখে ভয়ে প্রাণত্যাগ করেন। তখন ব্রাহ্মণ দেবদত্ত এই অভিশাপ দেন—তুমি যেমন আমাকে স্ত্রী-বিয়োগে কাতর করলে, সেরূপ তোমাকেও কিছুকাল আত্মবিস্মৃত ও স্ত্রী-বিয়োগে কাতর হতে হবে। ব্রাহ্মণ দেবদত্তের শাপেই রামচন্দ্রের গর্ভবতী সীতার সঙ্গে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়েছিল। আলোচ্য কাব্যের কবিও রামচন্দ্রের জন্মরহস্য সম্পর্কে বাশিষ্ঠ রামায়ণকেই অনুসরণ করেছেন বলে মনে হয়। রাবণ কর্তৃক সীতা অপহৃতা হলে রাম সীতাকে খুঁজে পাচ্ছেন না। অথচ তিনি তো 'অখিলের নাথ'। এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন জনমেজয় :

অখিলের নাথ রাম প্রভু নারায়ণ।
[illegible] নিলেক সীতা না জানে কারণ।।
সীতার শোকে ব্যাকুল হৈয়া বেড়াইল।
এই সন্দেহ মোর হৃদয়ে রহিল।।
[illegible] বলে শুন রাজা পূর্ব বিবরণ।
[illegible] না জানে রাম সে সব কারণ।।
[illegible] রাজা অতি দুষ্টাচার।
[illegible] নাশ হেতু প্রভু নৃসিংহ অবতার।।
[illegible] হৈতে নির্গম হৈয়া ঘোরতর।
[illegible] ছাড়িলেন প্রভু গদাধর।।
[illegible] ঘোর নাদে ভুবন কাঁপিল।

গর্ভবতী ব্রাহ্মণীর গর্ভপাত হৈল।।
শুনিয়া ব্রাহ্মণ অতি দুঃখিত হৈয়া।
দিলেক কঠিন শাপ তত্ত্ব না জানিয়া।।
গর্ভপাত হৈল মোর যে জনার রবে।
[illegible] হয় তত্ত্ব আর পাশরিবে।।
জৈমিনি ভারতে আছে রাবণবধ জনিত ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। কিন্তু এখানে কবি রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের অন্য কারণ দেখিয়েছেন। অগস্ত্য মুনির কাছে শ্বেত রাজার করুণ কাহিনী শ্রবণ করে এখানে রামচন্দ্রকে অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করতে দেখি।

যজ্ঞাশ্ব নিয়ে শত্রুঘ্ন, লক্ষ্মণ, ভরত ও রামচন্দ্র একে একে বাল্মীকির আশ্রমে এলে তাঁরা লবকুশের হাতে পরাজিত হলেন। পুত্রদের হাতে শ্রীরামচন্দ্রের পরাজয় সংবাদ শ্রবণে সীতার মনোবেদনা এবং বাল্মীকির আশ্রমে নির্বাসিতা সীতার বেদনাময় দিনগুলি সীতার বারমাস্যার মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। পিতৃহত্যার দুঃখ-বেদনায় লবকুশ নদী-তীরে অগ্নিকুণ্ড করে প্রাণ বিসর্জন দেবে—এই অবস্থার মধ্যে সীতা বারমাস্যার আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে তাঁর মন্দভাগ্য বর্ণনা করছেন। অপরপক্ষে কৃত্তিবাসের সীতার বারমাস্যা অন্য পরিবেশের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। রাবণ বধের পর সীতা অযোধ্যায় চলে এসেছেন। একদিন ঊর্মিলা সীতাকে তাঁর বনবাসের দুঃখ বর্ণনা করতে অনুরোধ করলেন। তখন সীতা বারমাস্যা বর্ণনা করছেন। এখানে বারমাস্যার বর্ণনা বিশেষত্ব বর্জিত। যেমন—

আইল বৈশাখ মাস রবির কিরণ।
খরতেজে পোড়ে পদ হিংগুল বরণ।।
ভাদরে উদর জ্বালা সহিতে না পারি।
দিন গেলে মিলে রামে ফল দুই চারি।।
সেই ফলমূলে মোরা করিতাম ভক্ষণ।
উপবাসে থাকিতেন দেওর লক্ষ্মণ।।
আইল ফাগুন মাস বসন্তের বায়।
ক্ষণে ক্ষণে সীতার প্রাণ বাহির হইয়া যায়।।
অশোকের বন নহে শোকের কারণ।
অভাগী সীতার কেনে না হয় মরণ।।
(দ্রঃ মণীন্দ্রমোহন বসু—বাংলা সাহিত্য
—২য় খণ্ড)

এই বারমাস্যা বর্ণনার তুলনায় আলোচ্য কবি নৃসিংহ চট্টোপাধ্যায় সীতার বারমাস্যা বর্ণনায় অনেক দক্ষতা দেখিয়েছেন বলে মনে হয়। যেমন—

জ্যেষ্ঠ মাস বনবাস প্রভু দিলা অদর্শন।
লক্ষ্মণ রাখিয়া গেলা এই তপোবন।।
নিদাঘ রবির তাপে পোড়ে কলেবর।
পিতৃকর্ম করিল বাল্মিক মুনিবর।।
নিল আপনার ঘরে ২
তোমার কল্যাণ হেতু পূজি মহেশ্বরে।।
আষাঢ়ে নবীন মেঘ সঘন নিনাদে।
ভেক পিক শিখি মত্ত মন নাহি বান্ধে।।
সুখে নিদ্রা যায় যত নরনারীগণ।
কান্দে সীতা চন্দ্রমুখি
শ্রীরামচন্দ্রের মুখে আরোপিয়া আঁখি।।
শ্রাবণ মাসেতে প্রভু দুরন্ত বরিষা।

স্বামী এড়িয়া পুত্রপ্রেক্ষী
নাহি [illegible] [illegible]।।
সুখে বসি থাকে ঘরে নরনারীগণ।
থাক্ শ্রাবণ প্রভু আমার নয়ানে।।
প্রভু তোমার কল্যাণে ২
তিতি ভিজি ফুল তুলি পূজি নারায়ণে।।
শরৎ পূজা হেতু লোক সব [illegible] মাসে।
পরম উৎসব করে রমণি পুরুষে।।
সুখের কারণে খির মধুপান করে।
রাজার কুমারি আমি থাকি অনাহারে।।
আশ্বিন মাসেতে প্রভু দেবীর উৎসবে।
পরম উৎসব লোক করে একভাবে।।
বস্ত্র অলঙ্কারে বিভূষিত নারীগণে
রাজার বহু আরি আমি মুনির ভবনে।।
আমি পূজি ভগবতী ২
বর মাগি কুশলে আকুল প্রাণপতি।।
কার্তিকে শিশির বিছে পাষাণ ভিতরে।
অথে একাকিনী কান্দি বসিয়া বাহিরে।।
অগ্রহণ মাসেতে যত যুবক যুবতি।
সুখশয্যা শয়ন বর্ণয়ে সুখরাতি।।
তাথে নিশিদিশি বসি কান্দি একাকিনী।
কুশপটে শয্যা মোর রাজার ঘরণী।।
জন্ম মোর রাজকুলে ২
জনম অবধি দুঃখ নিজ কর্মফলে।।
পৌষে বিসম শীত বসন বিহুনে।
রবির প্রকাশ নাহি দেখি তপোবনে।।
তপস্বী আচারে তাথে তপস্বিনী সনে।
না যায় কঠিন প্রাণ রহে তে কারণে।।
মাঘে নানা ভোগ লোকে করে উপহারে।
মনে মনে কাম হয় প্রভুর মিলনে।।
সর্ব বিপর্যয় ভেল ২
অভাগী সীতার দুঃখ অধিক বাড়িল।।
বসন্ত উৎসব লোক করে ঘরে ঘরে।
রমণী পুরুষে লজ্জা ছাড়ে সর্বজনে।।
আমি তপস্বিনী তায় ২
ফাগুন মাসের দুখ কখন না যায়।।
শুভ জন্ম দিবস প্রভুর [illegible] মাসে।
বাসন্তী দেবীর পূজা [illegible] দিবসে।।
অখিল আনন্দময় [illegible] রজনী।
ভাবিতে ভাবিতে মোর ব্যাকুল পরাণি।।
মর্দন পত্নীর সংহতি ২
বাসন্তী পূজোর ছলে পূজি জন্মতিথি।।

সীতার দুঃখ প্রকাশের পর সকলে অগ্নি-কুণ্ডে প্রবেশ করবেন এমন সময় বাল্মীকির আগমন। তাঁর যোগবলে রামাদি সকলের পুনর্জীবন লাভ এবং যজ্ঞাশ্ব, সৈন্য ও ভ্রাতা সমভিব্যাহারে রামচন্দ্রের প্রস্থান।

অতঃপর বর্ণিত হয়েছে তাম্রধ্বজ ও তাঁর পিতা ময়ূরধ্বজের কাহিনী। তাম্র-ধ্বজ যজ্ঞাশ্ব বন্দী করে কৃষ্ণার্জুনবাহিনীর বীরগণকে পরাস্ত করেন। কৃষ্ণার্জুন ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধরে ময়ূরধ্বজের রাজ্যে প্রবেশ করে নগরবাসীর কৃষ্ণপ্রাণতা দেখে মুগ্ধ হলেন। বৈষ্ণব দম্পতী তপন ও [illegible]বতীর কাহিনী এখানে বর্ণিত হয়েছে। ছদ্মবেশী কৃষ্ণার্জুন বৈষ্ণব দম্পতীর কথোপকথন শুনলেন :

পতি বলে প্রিয়া তোর খঞ্জন নয়ানে।
তোমারে দেখিলে মোর কৃষ্ণ পড়ে মনে।।
প্রিয়া বলে সাধু সাধু তোমার প্রকৃতি।
এমন সময়ে তব কৃষ্ণ চিত্ত মতি।।

আপনা পাসরে লোক রমণি দেখিলে।
কৃষ্ণ অন্বেষণ তব পরিষ্বঙ্গা কালে।।
বড় ভাগ্যবতী আমি তুমি হেন পতি।
তোমায় দেখিলে মোর পরম পিরিতি।।
যখন কৃষ্ণের গান গাও উচ্চস্বরে।
পরাণ অর্পিয়া থাকি তোমার শরীরে।।

বৈষ্ণব দম্পতীর কৃষ্ণভক্তির পরিচয় পেয়ে—

কৃপায় অবশ কৃষ্ণ রহিতে নারিলা।
অতিথি বলিয়া ডাকি বাকাসথা দিলা।।
অতিথি বচনে সুখময় চিত্ত করি।
বাহির হইল দুহে হাতে রত্নঝারি।।
চরণ পাখালি দিল আসন বসিতে।
বিনয় করিয়া আজ্ঞা মাগে জোড় হাতে।।

কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করেন 'পুত্র-কন্যা না দেখি তোর ঘরে।' উত্তরে তপন বলে :

দুই পুরুষ গোসাঞি মোরা দুইজনে।
দুই পক্ষী পুষি দুহে অপত্য আবেশে।।

কৃষ্ণ তখন অপুত্রকজনের বিড়ম্বিত জীবন সম্পর্কে দম্পতীকে সচেতন করে দেন :

সাংসারিক জনের অপত্য নাহি থাকে।
অন্তে মুক্তি নহে তার মরণ বিপাকে।।
অপুত্রক জনের ভিক্ষা ভিক্ষুক না লয়।
অন্তে সমাচিত দেহ সংস্কার নহে।।

অতএব কৃষ্ণের প্রস্তাব :

এমন সংসারে থাক কোন প্রয়োজন।।
পরমহংস হৈয়া তুমি চল মোর সনে।
কাশিতুল্য ফল মৃত্যু হব সেই স্থানে।।

তপন বলে :

...গোসাঞি কর অবধান।
বৈষ্ণব জনের মৃত্যু জীবন সমান।।
তীর্থসম অঙ্গ যদি জপে নারায়ণ।
কি করিব সংসার পুত্রের তর্পণ।।
সংসার ছাড়িয়া বেড়াইব ভ্রান্ত হৈয়া।
তীর্থসম কার্য গৃহে কৃষ্ণ নাম লৈয়া।।

তপনের কৃষ্ণভক্তির পরিচয় পেয়ে ভগবান আনন্দিত হলেন। তাদের নিষ্কাম জীবন-চর্যা জানতে চাইলেন কৃষ্ণ :

যুবক যুবতী দুহে থাক এক স্থানে।
জন্মাবধি সংসর্গ নাকি কি কারণে।।
একত্রে কেমনে থাক চিত্ত-নিবারণে।

তখন সুধাবতী বলে :

দ্বাদশ বৎসর যবে পিতার মন্দিরে
তথায় গেলেন পতি মোরে আনিবারে।।
সেদিন রহিল মোর পিতার আলয়।
আইনু পতির কাছে শয়ন সময়।।
বলিষ্ঠ দেখিনু পতি যুবক সময়।
আমি কুসঙ্গিনী অতি ভেল মর্মভয়।।
সাত-পাঁচ মনে করি চাহি পালাইতে।
কামেতে আতুর পতি ধরে মোর হাতে।।
বলিনু নিষ্ঠুর বাণী মর্মভয় পাই।
মোরে পরিষ্বঙ্গা কর কৃষ্ণের দোহাই।।
শুনিয়া নিষ্ঠুর বাণী পতি বলে মোরে।
আমি আর পরিষ্বঙ্গ না করিব তোরে।।

কৃষ্ণ-সমর্পিত প্রাণ এই শুদ্ধাচারী দম্পতীর কথা শ্রবণ করে কৃষ্ণ তাদের অভিলাষিত বর দিলেন।

তপনের প্রার্থনা :

পতিতেরে কৃপা করি যদি বর দিবে।
মনের বাঞ্ছা এইরূপে দেখাইবে।।
রাম কৃষ্ণের রূপ যবে কংসের নিধনে।

কৃষ্ণ ভক্তকে বাঞ্ছিত রূপ সন্দর্শন করালেন।

অতঃপর সুধাবতীর প্রার্থনা :

বলে সুধাবতী বিনয় ভারতী
যদি মোরে কর দয়া।
পুরে মন আশ প্রভু শ্রীনিবাস
রাধিকা মাধব হৈয়া।

উভয়ের প্রার্থনা চরিতার্থ করে কৃষ্ণ ময়ূরধ্বজের ভক্তি পরীক্ষার জন্য গেলেন। কপট- পরিচয় দিয়ে তিনি রাজার কাছে দেহার্ধ প্রার্থনা করলেন। রানী কুমুদবতী ও পুত্র তাম্রধ্বজের উল্লেখ দেখে মনে হয় কবি আদর্শ গ্রন্থ সযত্নে অনুসরণ করেছেন। ময়ূরধ্বজ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। তাঁর স্ত্রী ও পুত্র করাত দিয়ে রাজার দেহ দ্বিধা-বিভক্ত করবেন কিন্তু তাতে রাজার একবিন্দুও অশ্রুপাত হবে না। এইভাবে বিভক্ত তাঁর দক্ষিণাঙ্গ এক ব্যাঘ্রের ভোজনের জন্য ব্রাহ্মণরূপী কৃষ্ণকে প্রদান করতে হবে। তখন রানী কুমুদবতী ও পুত্র তাম্রধ্বজ :

নৃপতির মধ্য শিরে অতি তীব্র খরধারে
করাত দিলেক শীঘ্রগতি।
নৃপতি পরম ধীর চিরিয়া আইসে শির
নাসা মধ্যে আইল করাত।
প্রফুল্ল দক্ষিণ চক্ষু সদা হাস তব মুখ
বাম চক্ষে হয় অশ্রুপাত।

কিন্তু অশ্রুপাতের মধ্য দিয়ে সমর্পিত এই দেহার্ধ বিপ্রবেশী কৃষ্ণ গ্রহণ করবেন না। কারণ :

দাতার নাহিক সুখ পরিজনে মহাদুখ
কার্যসিদ্ধি অনেক শকতি।

বিপ্রবেশী কৃষ্ণের কথা শুনে ময়ূরধ্বজ বলেন :

না বুঝিয়া কর রোষ আমার নাহিক দোষ
নিবেদন শুন মন দিয়া।
এই যে আমার অঙ্গ জন্ম লভে এক সঙ্গ
পাপপুণ্যে আছে এক সাথ।
দক্ষিণাঙ্গ দ্বিজে দিল বাম অধঃপাতে গেল
তে কারণে হইল অশ্রুপাত।
দক্ষিণাঙ্গ দেখ দেখি প্রফুল্ল বদন আমি
বাম অঙ্গ কান্দে অভিমানে।
আপুনি বেদন মোর চরণে করিল তোর
বিচার করিয়া বুঝ মনে।

কবির এই বর্ণনার সঙ্গে কাশীরাম দাসের মহাভারতের কোন রচনাগত সাদৃশ্য নেই। কাশীরাম আখ্যায়িকাটি এইভাবে বর্ণনা করেছেন :

মাতাপুত্রে আনন্দিত রাজার বচনে।
চিরিছে মস্তক তার কৃষ্ণ বিদ্যমানে।।
নৃপতির পুরেতে উঠিল হাহাকার।
বামচক্ষে রাজার পড়িল জলধার।।
অন্তর্যামী ভগবান জানেন সকল।
বলেন ঈষৎ হাসি ভকত বৎসল।।
তার অর্ধ অঙ্গে মম নাহি প্রয়োজন।
অশ্রুধার দান আমি না করি গ্রহণ।।
(দ্রঃ মণীন্দ্রমোহন বসু—বাংলা সাহিত্য —২য় খণ্ড)

অতএব কাশীরামের প্রভাব এই কবির উপর পড়েনি। কবি আদর্শ গ্রন্থ অনুসরণ করে স্বাধীনভাবেই কাব্য রচনা করেছেন।

অতঃপর যজ্ঞাশ্ব নিয়ে কৃষ্ণার্জুন-বাহিনী সারস্বত দেশে উপস্থিত হলেন। ঐ দেশের রাজার নাম বীরবর্মা। তাঁর পঞ্চ পুত্র কন্যা মালিনী এবং জামাতা যম। যম কিভাবে বীরবর্মার জামাতা হলেন, সে-কাহিনী এখানে বর্ণিত হয়েছে। বীরবর্মার শিশুকন্যার সহচরী চিত্রবর্ণার সর্পাঘাতে মৃত্যু হলে শোকাকুলা মালিনী—

মায়েরে কান্দিয়া পুছে কোথা গেল সখি।।
প্রাণ স্থির নহে মোর সখি না দেখিয়া।
ঝাট আনি দেহ চিত্রবর্ণারে আনিয়া।।
কন্যা দুঃখ দেখি লীলাবতী দুঃখ মানে।
মরিব তোমার সখি কান্দ কি কারণে।।
মালিনী বলেন মা মরিলে কিবা হয়।
লীলাবতী বললে মেলে যমে লৈয়া যায়।।

মন্ত্রের বোলে শুদ্ধ মালিনী কুমারী।
মৃত্যুঞ্জয় হেতু যম আরাধন করি।।

মালিনীর আরাধনায় যম এলেন এবং মালিনীকে বিবাহ করলেন। তারপর থেকে জামাতা যম বীরবর্মার রাজ্যেই রইলেন। অবশেষে যমের শ্বশুর বীরবর্মার সঙ্গে অর্জুনাদির যুদ্ধ এবং উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হল। বীরবর্মা কৃষ্ণের দর্শন পেয়ে চরিতার্থ হলেন।

তারপর কৃষ্ণার্জুনবাহিনী নেপাল দেশে এলেন। 'সে দেশের কথা অদ্ভুত আখ্যান।' পুরাকালে মান্ধাতা নৃপতি এক সহস্র নারীকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে নিষাদকুমারী লীলাবতীর প্রতি রাজার কোন আসক্তি না থাকায় দুঃখিতা লীলাবতী রাজার প্রণয়ভাজন হওয়ার জন্য শিবপূজা করলেন। শিব লীলাবতীর পূজায় সন্তুষ্ট হলেন এবং রাজাকে বশীভূত করার জন্য লীলাবতীকে বশীকরণের ঔষধ দিলেন। কিন্তু লীলাবতী রাজাকে সেই ঔষধ না দিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলে সমুদ্র নিষাদকুমারীর প্রতি আকৃষ্ট হলেন এবং প্রতি রাত্রে মান্ধাতার বেশ ধারণ করে লীলাবতীর কাছে আসতে লাগলেন। অবশেষে লীলাবতী সন্তানসম্ভবা হলেন। প্রকৃত মান্ধাতা তখন সবকিছু অবগত হলেন। যথাকালে লীলাবতী পুত্র প্রসব করলেন। কিন্তু মান্ধাতা ক্ষেত্রজ কুমারকে স্বীকৃতি দিলেন না এবং তাকে রাজসম্পদ থেকে বঞ্চিত করলেন। লীলাবতী রাজার এই আচরণে দুঃখ পেলেন। একদিন রাত্রে যখন সমুদ্র মান্ধাতার বেশ ধারণ করে লীলাবতীর কাছে এলেন তখন অভিমানিনী লীলাবতী পুত্রকে বিষয়সম্পদ থেকে বঞ্চিত করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। তখন সমুদ্র বললেন, লীলাবতীর পুত্রকে তিনি এমন সম্পদ দেবেন যা কোথাও মেলে না। তিনি বিশ্বকর্মাকে দিয়ে সমুদ্র মধ্যে বিশাল পুরী নির্মাণ করালেন এবং লীলাবতী ও তার পুত্রকে সেই বিশাল রাজত্বের ভার দিয়ে তাঁর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করে তিনি অন্তর্ধান করলেন। লীলাবতীর পুত্রের নাম নেপাল তাঁর নাম অনুযায়ী ঐ দেশের নামও নেপাল। সোমহাস রাজা ঐ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সোমহাসের মৃত্যু হলে তাঁর শিশুপুত্র চন্দ্রহাসের পালনের দায়িত্ব পান রাজপুরোহিত মদন। মদন রাজ্যশাসনের ভার পেয়ে শক্তির দম্ভে এবং আত্মিক লোভের বশবর্তী হয়ে রাজধর্মের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হলেন। একদিন মদনের রাজসভায় এক মুনি এলেন। তিনি শিশু চন্দ্রহাসকে দেখে বললেন :

এই শিশু অতুল সংসারে।
রাজচক্রবর্তী লক্ষণ যত ধরে।।
কপালেতে রাজদণ্ড করে ঊর্ধ্ব রেখা।
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন কর পদে লেখা।।

চন্দ্রহাস সম্পর্কে মুনির এই উক্তি শুনে শিশুর প্রতি মদনের বিদ্বেষ বৃদ্ধি পেল। তিনি চণ্ডালদের সহায়তায় চন্দ্রহাসকে হত্যার চক্রান্ত করলেন। শিশু চন্দ্রহাসের সৌম্যকান্ত চণ্ডালদের কঠিন হৃদয়কে দ্রবীভূত করল। তারা শিশুকে বধ না করে একটি অঙ্গুলি ছেদন করে বনের মধ্যে রেখে গেল। ঘটনাক্রমে দুর্জয় নামে এক ব্যক্তি মৃগয়া করতে এলেন সেই বনে। শিশু চন্দ্রহাসকে জনহীন অরণ্যে ঐ অবস্থায় দেখে অপুত্রক দুর্জয় তাকে নিজের দেশে নিয়ে গিয়ে অপত্য আবেশে পালন করতে লাগলেন। মদন সেকথা জানতে পেরে পথের কাঁটা চন্দ্রহাসকে পুনরায় বিনাশ করার চেষ্টা করলেন। দুর্জয়ের কাছে এসে বললেন, চন্দ্রহাসের মারফত মদন তাঁর পুত্র বিষয়ের কাছে একটি পত্র পাঠাবেন। সেই কূট পত্রে বিষ প্রদানে চন্দ্রহাসের প্রাণবধের নির্দেশ ছিল। চন্দ্রহাস সরল বিশ্বাসে সেই পত্র যথাস্থানে পৌঁছে দেবার জন্য অশ্বারোহণ করল। পথশ্রান্ত তৃষ্ণার্ত চন্দ্রহাস এক সরোবরে এসে জলপান করে এবং বিশ্রাম করতে গিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়। মদনের কন্যা বিষয়া সখি সমভিব্যাহারে সেইস্থানে এসে তন্দ্রাভিভূত চন্দ্রহাসকে দেখে মুগ্ধ হয় :

কন্দর্প জিনিয়া রূপ দেখি পুরুষেরে।
পিত্তচিহ্ন পত্র দেখে পাগের উপরে।।
পাগ হৈতে ধিরি ধিরি পত্র কাড়ি নিল।
চিহ্ন খসাইয়া পত্র পড়িতে লাগিল।
কুটপত্র দেখি কন্যা দুঃখি ভাবে মনে।
কোন দোষে পিতা মোর
বধে হেন জনে।।

এত ভাবি অঙ্গ তার করে নিরক্ষণ।
শরীরে দেখিল মহারাজের লক্ষণ।।
ইহার গুণেতে ইহা বিধি করাইল।
কিবা পত্র বাপ মোর ভুলিয়া লিখিল।।
কিবা মোরে দিতে বাপের মনে আছে।
দৈবঘটিত পত্র দুষ্ট হয় পাছে।।
তেজপুঞ্জ দেখি কিবা পাইল ত্রাস।
কুট পত্র লিখিলেক করিতে বিনাশ।।
বিধি জে করুক আমি বরণ করিব।
জামাতা হৈলে দুহা না হিংসিব।।
এতেক ভাবিয়া বিষমর্মহর স্থানে।
য কারে আকার করে লোচন অঞ্জনে।।

চন্দ্রহাস বিষয়াকে সেই পত্র দেখালে বিষের পরিবর্তে ভগিনী বিষয়াকে সে ভার্যারূপে চন্দ্রহাসের হস্তে প্রদান করে। মদন সমস্ত বিষয় অবগত হয়ে ক্রোধানলে অধিকতর প্রদীপ্ত হয়ে উঠলেন এবং চন্দ্রহাসের জীবননাশে দৃঢ়সংকল্প হলেন। চন্দ্রহাসকে একান্তে ডেকে বললেন দেশাচার এবং কুলাচার অনুসারে তাকে নিশাকালে একাকী চামুণ্ডার মন্দিরে পূজা দিতে যেতে হবে। অপরদিকে এক গুপ্তঘাতককে আদেশ দিলেন ঐ সময় মন্দিরে যে ব্যক্তি প্রবেশ করুক, তাকে যেন হত্যা করা হয়। শ্বশুরের কথা শুনে চন্দ্রহাস মন্দিরে যাওয়ার আয়োজন করছে, এমন সময় শ্যালক বিষয় চন্দ্রহাসকে বলে :

তোমার বদলে আমি পূজিব ভবানী।।
আপুনি বিষয় চলে দেবী পূজিবারে।
বামহস্তে পুষ্প দক্ষিণ হাত ঝারি।।
একাকি বিষয় চলে চামুণ্ডার পুরী।
খড়্গ হস্তে চণ্ডাল আছিল
দেবী ঘরে।।

গতমাত্র ক্ষেপে আসি কাটে বিষয়েরে। মদন সেই দুঃসংবাদ শ্রবণমাত্র প্রাণত্যাগ করলেন। অবশেষে চন্দ্রহাসের প্রার্থনায় চামুণ্ডার বরে মদন ও বিষয় পুনর্জীবন লাভ করলেন কিন্তু দুষ্কর্মের শাস্তিস্বরূপে মদন অন্ধ হয়ে রইলেন। অনুতাপদগ্ধ মদন বললেন :

তব পিতা স্বর্গে গেল
মোরে রাজ্য দিয়া।
তোমা না পালিনু রাজ্য
মদে মত্ত হৈয়া।।
হিংসা আচরণ হৈয়া অজ্ঞান কারণে।
তোমার রক্ষিত কৃষ্ণ মারে কোন জনে।।
যে চক্ষে দেখিয়া তোমা প্রেম না করিনু।
সিংহাসনে তাকাইয়া সে চক্ষু হারাইনু।
এই প্রায়শ্চিত্ত মোর মন ভেল শুদ্ধি।
হৈতে তোমা প্রতি
ঘুচি কুবুদ্ধি।।

অতঃপর মদন চন্দ্রহাসকে রাজ্য এবং সিংহাসন ফিরিয়ে দিলেন।

সেই চন্দ্রহাসের রাজ্যে কৃষ্ণার্জুন যজ্ঞাশ্ব নিয়ে এলে উভয়পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। অর্জুনবাহিনী চন্দ্রহাসকে পেরে উঠলেন না। তখন কৃষ্ণ চন্দ্রহাসের সামনে স্বরূপে প্রকাশিত হলেন :

কৃষ্ণ দেখি চন্দ্রহাস হরিষ অন্তরে।
হাতের ধনুক সব ফেলাইল দূরে।।
রথে হৈতে নামি দণ্ডবত শতে শতে।
প্রদক্ষিণ করি স্তব করে জোড় হাতে।।
ভক্তিযোগে তুষ্ট করিল প্রভুরে।
তুষ্ট হৈয়া প্রভু আলিঙ্গন দিল তারে।।
আমার কারণ জন্ম তোমার ভুবনে।
আমিই আনিয়াছি তোমার কারণে।।
মোর সঙ্গে চল অশ্বমেধ দেখিবারে।

তারপর তাঁরা অশ্ব নিয়ে নেপাল দেশ অতিক্রম করে সমুদ্রের পশ্চিম কূলে উপনীত হলেন। তৃষ্ণার্ত অশ্ব সমুদ্রে জলপান করতে গিয়ে সমুদ্রে তলিয়ে গেল। কৃষ্ণার্জুনও অশ্বের অনুসরণে সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করলেন। সবিস্ময়ে তাঁরা সমুদ্রমধ্যে বিশাল প্রাসাদ প্রত্যক্ষ করলেন। সেখানে তাঁরা এক মুনির (বকদন্ত ?) সন্ধান পেলেন। এই মুনি এতদিন দুর্বাসার অভিশাপে জলের মধ্যে বাস করছিলেন। দুর্বাসা তাঁর শিষ্যদের নিয়ে অনশন ব্রত পালন করছেন। শতবৎসর এইভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন দুর্বাসা শিষ্যদের নিয়ে আহুতি অর্পণ করার জন্য সমুদ্রে এলেন। তৃষ্ণার্ত এই মুনি অকস্মাৎ আচমনের জলে জলপান করলেন। দুর্বাসা তা বুঝতে পেরে তাঁকে অভিশাপ দিলেন :

দশ সহস্র বৎসর রহ জলের ভিতরে।
কৃষ্ণ তুলিব তোরে অশ্বযজ্ঞের কারণে।।

দুর্বাসার ক্রোধ সম্পর্কে এখানে আর একটি কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। তিলোত্তমা নামে এক বিদ্যাধরী সুসজ্জিতা

হয়ে চলেছেন। পথে দুর্বাসাকে দেখে ভীতা তিলোত্তমা অভিশপ্ত হওয়ার আশঙ্কায় দুর্বাসার স্তব করলেন। দুর্বাসা তিলোত্তমার মঙ্গল কামনা করলেন এবং তার পারিজাতের মালাটি গ্রহণ করলেন। তারপর ইন্দ্রের সঙ্গে দুর্বাসার দেখা হল। দুর্বাসা ইন্দ্রকে মালাটি দিলেন। ঐরাবত মালাটি ছিঁড়ে ফেলে। মুনিবর নিজ প্রসাদিত মালার অবমাননা দেখে ইন্দ্রের প্রতি কুপিত হয়ে বললেন—

> স্বর্গসম্পদ মত্ত হৈয়া করে অহঙ্কার।
> আমার প্রসাদে এত অবজ্ঞা উহার।।
> লক্ষ্মীর কারণ এত অহংকার করে।
> ত্রিলোকের লক্ষ্মী নষ্ট হউক উহার।।
> দিলেক দারুণ শাপ অতি বড় কোপে।
> লক্ষ্মীর বিনাশ করিলেন ব্রহ্মশাপে।।

দুর্বাসার শাপে রত্ন-কাঞ্চন রত্নের দীপ্তি ম্লান হল, পৃথিবী হল শস্যহীন। দেবতারা চিন্তিত মনে লক্ষ্মীকে উদ্ধার করার জন্য সাগরে গেলেন এবং সেখান থেকে লক্ষ্মীকে উদ্ধার করলেন।

সিন্ধুকূল থেকে অর্জুনবাহিনী চললেন জয়দ্রথপুরে। সেখানে দুঃশলার পুত্রকে পরাস্ত করে দুঃশলা এবং তার পুত্রকে নিয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে এলেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে এবং আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ, নৃপতিদের অভ্যর্থনা জানালেন।

> আনন্দে মঙ্গল জয় হুলাহুলি দিয়া।
> যজ্ঞাগারে নিল বস্ত্র কুসুম পাতিয়া।।
> পরম হরিষে রাজা কৃষ্ণ দেব লৈয়া।
> চুম্বন করিল শিরে আলিঙ্গন দিয়া।
> পরম হরিষে ভীম আলিঙ্গন দিল।
> নকুল আর সহদেব চরণ বন্দিল।।
> করজোড়ে যুধিষ্ঠির বিনয় বচনে।
> কুশল কারণ জিজ্ঞাসিল নারায়ণে।।
> আমার সম্পদ তেজ-পুঞ্জ-বল তুমি।
> যে কার্য করাহ প্রভু তাই করি আমি।।
> যে কর্ম নিযুক্ত করি গেলে মোরে।
> চিত্রের পুত্তলি সম আনহ যজ্ঞাগারে।।

অতঃপর যজ্ঞ আরম্ভ হল। যজ্ঞান্তে কৃষ্ণের কৌতুক এবং তাঁর লৌকিক আচরণের বর্ণনা উপভোগ্য হয়ে উঠেছে :

> যজ্ঞোৎসব কৌতুক করিতে নারায়ণ।
> আপুনী লইলা করে কুমকুম চন্দন।।
> প্রথমে দিলেন সব মুনির শরীরে।
> অতঃপর দিল সব নৃপতির তরে।।
> তবে রমণীর অঙ্গে ছিটে দূরে হৈতে।
> দ্রৌপদীরে আজ্ঞা প্রভু দিলেন
> ইঙ্গিতে।।
> পরম কৌতুক করে প্রভু নারায়ণ।
> অন্যো অন্যো দেয় গায় কুমকুম চন্দন।।
> হেম কুন্ড ভরি আনি দেয় বৃকোদর।
> কৌতুকে সভার অঙ্গে দেয় যদুবর।।
> লক্ষ লক্ষ মুনি লক্ষ লক্ষ নৃপতিরে।
> কৌতুকে দিলেন প্রভু সভার শরীরে।।
> শেষে এক কুন্ড নিয়া প্রভু যদুরায়।
> সর্বাঙ্গ ঢালিয়া দিল ভীমের মাথায়।
> প্রভুর ইঙ্গিত জানি বীর বৃকোদর।
> সকলি ঢালিয়া দেয় প্রভুর উপর।।
> দেখি যুধিষ্ঠিরের বড় কৌতুক বাড়িল।
> হাসিয়া ভীমের তরে ইঙ্গিত করিল।।
> যজ্ঞ শেষে দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু যত।
> যজ্ঞাগারে কুন্ড ভরিয়াছে শত শত।।
> কলসি ভরিয়া আনি দেয় বৃকোদর।
> কৌতুকে ঢালিয়া দেয় কৃষ্ণের উপর।
> হাসিয়া ইঙ্গিত প্রভু করে সভাকারে।
> যেবা যত পার আনি দেও মোর
> শিরে।।
> যত মুনি যত রাজা কৃষ্ণের ইঙ্গিতে।
> ঘৃত মধু দধি আনি ঢালে শত শতে।।
> ঢালিতে ঢালিতে হৈল কটির অবধি।
> ঘৃত মধু বহে যেন স্রোতস্বতী নদী।।
> কৌতুকে পরমানন্দ অঞ্জলি ভরিয়া।
> সভার গায়েতে প্রভু দেন ছড়াইয়া।।

তারপর ব্রাহ্মণ ভোজন শুরু হল –

> লক্ষ লক্ষ বিপ্রগণ সুখে বসি খায়।
> একা পরিবেশন করেন যদুরায়।।
> অন্ন আন করি প্রভু ডাকে হৃষ্টমনে।
> আনিয়া যোগায় দ্রব্য ভাই চারিজনে।।
> সুখে পরিবেশন করয়ে যদুরায়।
> পরম কৌতুকে বিপ্রগণ বসি খায়।।

এর পর নৃপতিদের ভোজন-দক্ষিণা দিয়ে সকলকে বিদায় সম্বর্ধনা দেওয়া হল। এখানে কবি অশ্বমেধ পর্বের সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন।

অশ্বমেধ যজ্ঞের অবসানে কৃষ্ণ কি করলেন পরবর্তী অংশে তা বর্ণিত হয়েছে। যজ্ঞান্তে অবশিষ্ট ধনভান্ডার কিরূপে ব্যয়িত হবে সেকথা যুধিষ্ঠির জানতে চাইলেন কৃষ্ণের কাছে। কৃষ্ণ বললেন এক মুনি (উদ্ভব মুনি?) অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করছেন। তাঁর ধনসম্পদের প্রয়োজন। রথে করে ধনসম্পদ নিয়ে কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির সেই মুনির কাছে গেলেন। যাত্রাপথে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে কলি-কথা শ্রবণ করালেন। কলি বৃত্তান্ত শ্রবণে যুধিষ্ঠির ভীত হলে কৃষ্ণ কলির অনেক গুণের কথাও উল্লেখ করলেন :

> সত্যযুগে ধ্যান করিতে শুদ্ধাচারে।
> শত সহস্র দিবস থাকিত অনাহারে।।
> ত্রেতায় করিত যজ্ঞ দ্বাপরে পূজন।
> কলি যুগে সেই পূজা
> নাম সংকীর্তন।।
> আর কলি যুগে শুনহ ব্রাহ্মণ।
> পাইব অক্ষয় ফল দিয়া অল্পধন।।
> অশ্বমেধ যজ্ঞ যে করিল প্রাণপণে।
> সে ফল কলিতে পাব
> দ্বিজের ভোজনে।।

তারপর কৃষ্ণ পঞ্চভ্রাতার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। হস্তিনাবাসীরা ব্যথিত মনে প্রভুকে বিদায় জানালেন :

> পরিবার সমেত চলিলা যদুরায়।
> হস্তিনাপুরের লোক কান্দে উচ্চরায়।।
> যতদূরে জানি কৃষ্ণ দৃষ্টিপথ দেখি।
> ততদূরে চাহে লোক অনিমিখ আঁখি।।

কৃষ্ণ দ্বারকায় এসে যদুবংশের দুর্নীতি ও দুরাচার দেখে চিন্তিত হলেন। চিন্তিত হলেন কাকে তিনি সিংহাসনে বসাবেন। পৌত্র বজ্রকে সিংহাসনে বসাবেন ঠিক করলেন কৃষ্ণ। কিন্তু মনে পড়ল তাঁর বংশের প্রতি ব্রহ্মশাপের কথা। অবশেষে বিপ্র শশিধরের পুত্রের আঘাতে বজ্রের রক্তপাত এবং ঐ বিপ্রের আশীর্বাদে বজ্র শাপমুক্ত হয়ে দ্বারকার অধিপতি হলেন :

> যযাতি রাজার শাপ যদুবংশে ছিল।
> মোর আশীর্বাদে তব শাপ দূর হৈল।।
> রাজচক্রবর্তী বাপু তুমি দ্বারিকাতে।
> শাপ বাক্য মুক্ত তুমি হৈলে
> আজি হৈতে।।

অন্ধ বিপ্র শশিধর তারপর নিজের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে দৃষ্টিলাভের জন্য কৃষ্ণের কৃপা প্রার্থনা করলেন।

এই কাহিনী শেষ হওয়ার পর একটি পৃষ্ঠা পাওয়া গেল না। পরবর্তী কয়েকটি পৃষ্ঠায় রাধার প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। মাঝের পৃষ্ঠাটি না থাকায় রাধা প্রসঙ্গের পূর্ব সূত্রটি জানা গেল না। মহাভারতে রাধার প্রসঙ্গ নেই। কবি কি বৈষ্ণবপ্রাণতার ঝোঁকে এখানে রাধার কাহিনী বর্ণনা করেছেন? অথবা এই অংশটি প্রক্ষিপ্ত? যাই-হোক পরবর্তী অংশটি বর্ণনা করছি।

রাধা সন্দর্শনের জন্য ব্যাকুলা সত্যবতী কৃষ্ণকে বলছেন—

> রাধা না দেখিলে মোর প্রাণ নাহি রয়।
> কোথায় দেখিব রাধা বলহ নিশ্চয়।।

সত্যবতীর উত্তরে কৃষ্ণ বলেন :

> রাধারে দেখিতে তুমি চাহ অকারণ।।
> রাধার রূপের সীমা বিধি অগোচর।
> যার তেজ তুল্য দিয়া বর্ণি শশধর।।
> রাধার সহিতে দেখা হবে যেইক্ষণে।
> নারিবে ধরিতে প্রাণ তাহা দরশনে।।
> তুমি মূর্ছা হৈলে মোর কষ্ট হবে।
> তোমা না দেখিলে প্রাণ ধরিতে
> নারিব।।
> মিছা কাজে পরাণ হারাবে মূর্ছিত।
> বিলম্ব না কর চল যাই নিকেতন।।

কিন্তু সত্যবতী রাধাকে দেখবেনই। তখন কৃষ্ণ নিজের মায়ায় সত্যবতীকে রাধিকার রূপ প্রত্যক্ষ করালেন :

> আপনার নিজ মূর্তি দেখাইতে তারে।
> রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা ভিন্ন তনু ধরে।।
> কৃষ্ণকথা শুনি দেবী চাহে পূর্বপানে।
> কৃষ্ণ রাম দেখি রাধা কৃষ্ণের দক্ষিণে।।
> ঊর্ধ্ব মুখে চাহ কহি বলে যদুপতি।
> প্রভুর বচনে ঊর্ধ্বে চাহে সত্যবতী।।
> রাধাকৃষ্ণ দেখে নিল কল্পতরু সনে।
> মূর্ছা সত্যবতী তার অপাঙ্গ
> হিল্লোলে।।
> যোগবলে প্রভু সত্যবতী জিয়াইয়া।
> রমণীমন্ডল মাঝে উত্তরিল গিয়া।।

সত্যবতী এবং অন্যান্য সখীরা তখন কৃষ্ণকে রাধিকার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন :

> রাধা কেমন তেজ পুণ্য গুণ ধরে।
> তোমার আগেতে প্রাণী নাম করে
> তাকে।।
> কাহার কুমারী সে কোথায় বসতি।
> দেখাবে শুনাবে সেই গুণবতী সতী।।

এ বোল বলিয়া সবে বিনয় বচনে।
ধরিয়া রহিল প্রভুর কমল চরণে।।

কৃষ্ণ রাধিকার পরিচয় দিলেন :

প্রভু বলে রাধা মোর অর্ধ অংশ হৈতে।
প্রকাশ পাইয়াছে নিজ রমণ ইচ্ছাতে।।
বেদ অগোচর কথা কেহু নাহি জানে।
গোকুলে প্রকাশ বেহারি বৃন্দাবনে।।
পাথিব আমার প্রিয়া তিন লোক হৈতে।
বৃন্দাবনে রাধা আমি তাহার মধ্যেতে।।
আমি সে রাধারে জানি রাধা মোরে জানে।
গোপিরূপে প্রকাশ নিবাস বৃন্দাবনে।।
দুইজন মর্মকথা বেদ অগোচর।
তিন লোকে আমার নাহিক রাধা পর।।

রাধা সম্পর্কে সখীদের জিজ্ঞাসার শেষ নেই :

গোকুলেতে রাধা আছেন কার ঘরে।
কেমন প্রকারে আছে কিবা কর্ম করে।।
প্রভু বলে রাধা আছে গোপ নিকেতনে।।
আমার ভাবনা যোগ বল অনসনে।।

সখীরা রাধিকার প্রতি কৃষ্ণের নিদয়তার অনুযোগ করেন। বৃন্দাবনে রাধিকা কৃষ্ণ ভাবনায় অনশনাক্লিষ্টা আর কৃষ্ণ এখানে রয়েছেন কেমন করে!

কেমনে আছ তারে চিত্ত নিবারিয়া।
তোমা হেন প্রাণের সখারে না দেখিয়া।।

উত্তরে কৃষ্ণ বলেন :

একত্র কাহার ভক্তি না রহে অন্তরে।
নিকট হৈতে প্রেম শতগুণ ধরে।।
নিরবধি থাকি দর্শ স্পর্শ অভিলাষে।
অন্তরে ভাবনা রূপ ধেয়ানে বিলাসে।।
যে প্রেম পাইয়াছে মোর গোপিকা যুবতী।
এত নাহি হয় মোর কমলার প্রীতি।।
গোপিকা যতেক মোর ভক্তি রসজ্ঞানে।
শিব বিরিঞ্চি তত ভক্তি না পায় ধেয়ানে।।
গোপিকথা শুনি সবে ম্রিয়মান হৈল।
রাধা দেখিবারে অতি প্রয়াস বাড়িল।।

কৃষ্ণ উদ্ধবকে পাঠালেন রাধিকাকে আনবার জন্য। রাধিকা আসবেন, তার জন্য প্রস্তুতি চলছে :

প্রভুর ইঙ্গিত জানি শাম্ব নানা দ্রব্য আনি
নির্মাণিয়া কুসুম রথেতে।
মলয়জ ছিটি পথে কুসুম বাটিয়া তাথে
রাধা নিয়া চলিল বরিতে।

অতঃপর রমণীবৃন্দ রাধা-কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করলেন :

রত্নসিংহাসন পর বসিয়াছে যদুবর
বেষ্টিত রমণীবৃন্দ সাতে।
উত্তরিল গিয়া রাধা রসের মঞ্জরী
কৃষ্ণ মুখাম্বুজ দর্শ পাই।
না করিল জোড় স্তব রাকা প্রাণপাত
চিত্ত পুত্তলিকা সম ঠাই।
দুহা দুহা মুখ হেরি নয়নে সলিল ঝরে
দর্শের বিচ্ছেদ করি মনে।
গোপীরাধা মুখ হেরি কৃষ্ণের যতেক নারী
আপুনি আপনা নিন্দা করে।

দ্বারকাবাসীদের সঙ্গে লীলা করে যদু-বংশের ধ্বংস প্রত্যক্ষ করে বজ্রকে দ্বারকার সিংহাসনে বসিয়ে ব্যাধের শরাঘাতে কৃষ্ণ দেহত্যাগ করলেন। এই সংবাদ শ্রবণে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতাও দ্রৌপদীকে নিয়ে স্বর্গে গেলেন।

কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করার পর জনমেজয় জৈমিনিকে বলছেন :

জ্ঞাতার্থ হৈলাম শুনি কৃষ্ণের কথন।
অতঃপর কহ রাম কুশের মিলন।।

রাজার অনুরোধে মুনি তখন রঘুনাথের রাজধানী প্রত্যাবর্তনের পর অশ্বমেধ যজ্ঞ, বাল্মীকি সমভিব্যাহারে লবকুশের আগমন ও তাদের রামায়ণ গান বর্ণনা করেছেন। পিতাপুত্রের মিলন কাহিনীর পরে আর পুঁথির পৃষ্ঠা নেই। এরপর কি ছিল বলা যায় না। তবে জৈমিনি ভারতে আছে লবকুশের পরিচয় প্রদানের পর রামচন্দ্র পত্নী পুত্রকে গ্রহণ করে সুখে রাজত্ব আরম্ভ করেন। জৈমিনি ভারতে সীতার পাতাল প্রবেশ বর্ণিত হয়নি।

।। ৪ ॥

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বহু অনুবাদক কবির নাম-পরিচয় পাওয়া যায়। এঁরা কেউ পুরো মহাভারত অনুবাদ করেননি। কারণ বিপুল এই সাহিত্য-কর্মকে অনুবাদ করতে হলে যে সামর্থ্যের প্রয়োজন এঁদের সম্ভবত তা ছিল না।

কাহিনীর অভিনবত্বে, ঘটনার ঘনঘটায় জৈমিনি ভারতের অশ্বমেধ পর্ব ব্যাস-ভারত অপেক্ষা অনেক আকর্ষণীয় ও বিস্তৃত হওয়ায় অনুবাদকদের অনেকেই জৈমিনি ভারতের আদর্শে অশ্বমেধ পর্ব রচনা করেছেন অথবা অন্যত্র ব্যাসের আদর্শ গ্রহণ করলেও অশ্বমেধ পর্বটি রচনার কালে জৈমিনি ভারতকেই অনুসরণ করেছেন। মহাভারতের প্রসিদ্ধ কবি কাশীরাম দাস ব্যাস ভারত ও জৈমিনি ভারত এই উভয় গ্রন্থের আদর্শে মহাভারত রচনা করলেও দেখা যায় তাঁর অশ্বমেধ পর্বটি রচনার ক্ষেত্রে জৈমিনি ভারতের আদর্শই গৃহীত হয়েছে।

মহাভারতের অনুবাদকদের মধ্যে অনেকেই বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন। অশ্বমেধ পর্বে কৃষ্ণগুণগানের মধ্য দিয়ে বৈষ্ণব মত, বিশেষত কৃষ্ণচরিত্রাদর্শ বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করেছিল।

কাশীরামের পূর্বে বা সমকালে মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব যাঁরা রচনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে দ্বিজ অভিরাম, রঘুনাথ, রামচন্দ্র খাঁ দ্বিজ হরিদাস, ধনশ্যামদাস, চন্দনদাস দ্বিজ কৃষ্ণরাম, অনন্ত মিশ্র প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য। পরবর্তী কবি শ্রীকরনন্দীও শুধু অশ্বমেধ পর্বেরই অনুবাদ করেছিলেন।

এই সব কবিদের অনুবাদকর্মের পাশে আলোচ্য অভিনব কবি নৃসিংহ চট্টো-পাধ্যায়ের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে বলে মনে করি। অবশ্য এই কবির কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে মধ্যযুগের কয়েকজন শক্তিমান কবির কথা মনে পড়তে পারে। সীতার বারমাস্যা পাঠ করলে স্বভাবতই মনে পড়ে মুকুন্দরামের ফুল্লরার বার-মাস্যার কথা।

চন্দ্রহাসের কাহিনীতে মদনের চরিত্র-টিকে একটি সার্থক ভিলেনরূপে চিহ্নিত করা চলে। চন্দ্রহাসের প্রাণনাশের জন্য মদনের নানাবিধ চক্রান্ত এবং পরিশেষে মদনের অন্ধত্বপ্রাপ্তি ধর্মমঙ্গল কাব্যের মহামদ চরিত্রটিকে স্মরণ করায়। মদনের শঠতা, প্রলোভন ও অন্তর্দ্বন্দ্ব নিম্নাংশে সুন্দর-ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে :

চন্দ্রহাস দেখি রাজা প্রবঞ্চনা করে।
বিষকুম্ভ পয়মুখ সমান উদরে।।
তোমারে দেখিয়া মোর লইলেক অন্তরে।
কন্যা [illegible] লিখিলাঙ বিষয় পুত্রেরে।।
পালিহ দুহিতা মোর বাক্যের পালন।
বিবয়ের যোগে রাজ্য করিহ রক্ষণ।।

কিন্তু পরক্ষণেই মদনের দুশ্চিন্তা :

জামাতা দুহিতা রাজা পাঠাইয়া পুরে।
ভাবিতে ভাবিতে জ্বর হইল অন্তরে।।
রাজ্য দিয়া বিধাতা আমারে বিড়ম্বিল।
কুলগত কন্যা যত দোষ ঘটাইল।।
পরিণাম রাজ্য মোর হাথে না রহিব।
জানিলে শুনিলে নিজ অধিকার লব।।
ভাবিয়া অশেষ দুঃখ অস্থির হৈল।
মুখে বস্ত্র আচ্ছাদিয়া শয়ন করিল।।
জামাতা নিলেক রাজা বসি নৃপাসনে।
স্বপ্ন দেখিয়া উঠে বসিল সে ক্ষণে।।
অধিক চিন্তিত রাজা যুক্তি অনুমানে।
চন্দ্রহাস জামাতারে ডাক দিয়া আনে।।
করে ধরি লৈয়া তারে খাটে বসাইল।
নানা প্রবঞ্চনা করি বলিতে লাগিল।।
তোমারে দেখিয়া আমি না পারি রহিতে।
অতিশয় প্রেম মোর তোমারে দেখিতে।।
এক কার্য আছে মোর দেশ ব্যবহার।
বিভার দিন দেবী পুজা কুলাচার।।
আজিকার দিবস থাকি অনশনে।
নিশাযোগে একা যাবে চামুণ্ডার স্থানে।।

জামাতাকে এই কথা বলে অপর দিকে—

নিভৃতে বসিয়া রাজা বলে চণ্ডালেরে।
আজি নিশি রহ গিয়া চামুণ্ডার ঘরে।।
তীক্ষ্ম খড়্গ লৈয়া থাকিবে সাবধানে।
তৎকালে কাটিবে তথা পাহ জেই জনে।।

নিম্নলিখিত অংশগুলি পাঠ করলে খনার বচনের কথা মনে পড়ে :

১ চলিতে লক্ষ্মণ নানা অমঙ্গল দেখে।
কাক চিল গৃধ্র উড়ি বুলে লাখে।।
দণ্ড প্রসবিয়া ফেরু দক্ষিণ গামিনী।
২ এথা রঘুনাথ দেখে নানা অমঙ্গল।
বাম অংশ উরু চক্ষু সদাই চঞ্চল।।
৩ এথা মদন রাজা চিন্তিত অন্তর।
বাম বক্ষ গণ্ড সচঞ্চল বাম আঁখি।।

কবির রূপ বর্ণনা, ছন্দ ও অলঙ্কার প্রয়োগ দক্ষতাও লক্ষ্য করার মত। যেমন—

১ রাধা-কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা :

উভ করি কেশ কুসুমের বেশ
অলক কুণ্ডল লোলে।
নীল পীত ধটি দুই কটি আটি
মণিময় হার গলে।
অনঙ্গ জিনিয়া দুহার মুরতি
ভুবন মোহনকারী।

রোসুরগণ স্তবন দমন
দনুহে জনু কুলপতি।
নীল কুবলয় তমাল জিনিয়া
রতন মণ্ডল তনু।
শ্যাম তনু মাঝে রাধিকা বিরাজে
নিসুতে তরিত জনু।

কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা ঃ
চতুর্ভুজে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরে।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ মণিময় বক্ষ উড়ে।।
আজানুলম্বিত গলে দোলে বনমালা।
ললাটে তিলক যেন পূর্ণচন্দ্র কলা।।
অভিনব ঘনশ্যাম পীতাম্বরধারী।
খগেন্দ্রবাহন এ ভুবন মনোহারী।।

তিলোত্তমার রূপ বর্ণনা ঃ
রূপের তুলনা তার দিতে নাহি আর।
সর্বদেবরূপ তেজ শরীর তাহার।।
কটাক্ষে মহিতে পারে এ তিন ভুবন।
বিধি সৃষ্টি কৈল তারে সর্ব সুলক্ষণ।।
নানা রত্নে নির্মিত বস্ত্র অলঙ্কার।
পারিজাত মাল্য শোভে গলায় তাহার।।
কবরী বেড়িয়াছে পারিজাত মালে।

প্রমিলার রূপে বর্ণনা ঃ
সকল রমণী মধ্যে প্রমিলা সুন্দরি।
তারাগণ মাঝে যেন চন্দ্রোদয় করি।।

মালিনী ঃ
চির উপবাসে দেবী হইয়াছে দুর্বলা।
খিন তনু যেন দ্বিতিয়ার চন্দ্রকলা।।

সীতা ঃ
গজপতি গতি জিনি রূপগুণবতী সতী
বিদ্যাধরি সুচারু নয়নী।
অতি দীর্ঘ চারু বেণী লাবণ্য বিলাসরাশি
চন্দ্রমুখ তনু সম শ্যাম।

সীতার অগ্নিপরীক্ষা ঃ
কনক প্রতিমা যেন অগ্নির শোধনে।
নির্মল হইয়া ওঠে কান্তি শতগুণে।।
তেমত অগ্নির কোলে জানকী উঠিল।

৮ ভরতের দৃষ্টিতে লব-কুশ ঃ
দুই শিশুরত্ন দেখি রামের সমান।
অমল কমল জিনি অরুণ নয়ান।।
সীতাসম মুখ জিনি পূর্ণ শশধর।
উন্নত নাসিকা কম্বুগ্রিব মনোহর।।
আজানুলম্বিত বাহু দন্ত অনুপাম।
বিক্রম বিশাল সূর্য বংশের সমান।।

৯ শত্রুঘ্নের দৃষ্টিতে লব-কুশ ঃ
উন্নত নাসিকা দেখি শ্রীযুত কপাল।
অতি চঞ্চল ভুরু নয়ান বিশাল।।
লাবণ্য শ্রীরামসম সীতার বদন।

১০ লব-কুশের সঙ্গে রামচন্দ্রবাহিনীর যুদ্ধ প্রসঙ্গে ঃ
প্রাণপণে করি যুঝে সকল বাহিনী।
দুই শিশু চতুর্দিগে ছয় অক্ষোহিণী।।
অরণ্যের মাঝে যেন অনলের শিখা।
তথি ক্ষুদ্র পতঙ্গের নাহি রক্ষা।।
অনল দেখিয়া যেন পতঙ্গের গণ।
নির্বাণ করিতে ধায় হারায় জীবন।।

১১ লব-কুশের যুদ্ধে ভ্রাতার পতন সংবাদে রামচন্দ্রের উক্তি ঃ
সেই ভাই গিয়া রণে পড়িল শিশুর রণে
ভেকে কি গিলিল কালসর্প।

১২
ফেরু কি ধাইতে পারে সিংহপদ গতি।।
শিশু কি ধাইতে পারে মহীধর পার।
অব্দিজল পারমিতে যোগ্যতা কাহার।।
সুমেরু পর্বত কেবা উপাড়িতে পারে।

১৩ কৃষ্ণের বর্ণনা প্রসঙ্গে ঃ
অনাদি নিধন তুমি অখিল ব্রহ্মাণ্ড স্বামী
ত্রিজগতে নাহিক উপমা।
সাগরে তুলনা যেন নাহিক সাগর হেন
মহির তুলনা নাহি মহি।
বায়ুর তুলনা বায়ু মেরু তুল্য নাহি মেরু
তুয়া তুল্য দিতে তুল্য নাহি।

ভারতবর্ষীয় জীবনদর্শন বর্ণনাতেও কবি কম দক্ষতা দেখাননি ঃ

১ সংসার উৎপত্তি প্রভু হয় তোমা হৈতে।
পুনরপি মগ্ন হয় তোমার অঙ্গেতে।।
ফেনার উদ্ভব যেন অব্দির হিল্লোলে।
পুনরপি মগ্ন হয় সেই জলে।।
তোমার মায়ায় যবে নিমগ্ন হইয়া।
মিছা পুত্রপরিজনে থাকে বদ্ধ হইয়া।।
নিমগ্ন হইয়া পাপ পঙ্কের সাগরে।
মিছা বিত্ত সংসার আপন করি মরে।।
জন্ম-মৃত্যু-জরা গুণ গুণ গতাগতি।
গর্ভের যাতনা দুঃখ নরক বসতি।।
দেখি শুনি জন্ম-মৃত্যু সত্য কিছু নয়।
তথাপি বিবেক নহে তোমার মায়ায়।।

২ শুনহ ভকতজন না করিহ হেলা।
সংসার সাগর কৃষ্ণ পাদপদ্ম ভেলা।।
অনিত্য সংসার ভাই নিত্য কিছু নয়।
ভাবি দেখ দারাপুত্র আপন হৃদয়।।
আসিতে যাইতে একা কর্মমাত্র সাথী।
ইহা বুঝি কৃষ্ণপাদপদ্মে দেহ মতি।।

৩ দান এবং সঞ্চয় সম্পর্কে কবির উক্তি ঃ
পাত্র বুঝি দান দিলে পুণ্য অতিশয়।
পাত্রানুরূপেতে পুণ্য পাতক সঞ্চয়।।
যেমন ব্যাধিত লোকে ঔষধ করিলে।
তেমন দরিদ্র জনে ধন দিলে।।
দাতার অধিক কার্য সুখ গ্রহীতার।
যেমন শূন্য নৌকা চাপি হয় অব্দি পার।।
ধনাকাঙ্ক্ষী হইয়া ধনী ধন্য হয়।
ব্যয় না করিয়া করে ধনের সঞ্চয়।।
গ্রহীতা লইয়া যদি ধনকার্য করে।
তবে সে আপনি দাতা তরিবারে পারে।।
সঞ্চয় করিলে হয় অকাট দুস্তার।
গ্রহীতার পাপে পাপ সঞ্চয় দাতার।।
অধিক অকার্য ধন সঞ্চয় করিলে।
পূর্ণ নৌকা চাপি যেন মজি অব্দি জলে।।
দান করি পাত্র অনুরূপ ফল পায়।
বৃষ্টি জল পাতে যেন নানা মত হয়।।
পুণ্য নদীর তপনে পুণ্য জল।
মুক্তির পতনে যেন হয় মুক্তাফল।।
কর্পূর সে জল হয় কদলির পাতে।
সে জল গরল হয় সর্পের মুখেতে।।
সে জল কর্দম হয় ভূমের পতনে।
পাত্রী অনুরূপ ফল এই মন দানে।।

কবির কোন কোন উক্তি প্রায় সূক্তির মত সংহত ও ভূয়োদর্শনজনিত অভিজ্ঞতার পরিপূর্ণ। কবি ব্যবহৃত গাঢ়াঙ্কণ বাক-সংহতি লক্ষ্য করলে স্বভাবতই ভারত-চন্দ্রের এ প্রসঙ্গের কথা মনে পড়ে।

১ শিশুর সমরে জয় কত বড় কাজ।
জিনিলে গৌরব নাই হারিলে যে লাজ।।
২ ক্ষেত্রের প্রধান ধর্ম সদাই সমর কর্ম।
৩ জন্মিলে মরণ হয় মৃত্যুঞ্জয় কেহ নয়।
৪
যে জন আমারে জিনে আমি তারে হারি।
বৈষ্ণবের তরে কিছু করিতে না পারি।
৫ বৈষ্ণব জনের মৃত্যু জীবন সমান।
৬
কারে কেহ সুখ দুঃখ দিতে নারে নারে।
পাপপুণ্য ভোগ করে কর্ম অনুসারে।।
৭ আপনি রাক্ষ কৃষ্ণ কে মারিতে পারে।
৮ এক জনের দোষে ঘটায় আর সকল।
৯ একের দোষেতে হয় আরের বিনাশ।
১০
যে কর্ম করাহ প্রভু তাই করি আমি।
১১
খলজন দোষে সাধুজন পীড়া হয়।
১২
লক্ষ্মীর বিনাশ হয় দেবরাজ দোষে।
যেন যজ্ঞ নাশ হর করে দক্ষ দোষে।।
১৩
প্রলয়ের মেঘ যেন বিপরীত ডাকে।

১৪
তেজবন্ত নদী যেন পঙ্ক নাহি রাখে।
রাজা পুণ্যবান হৈলে পাতক না দেখে।।
ঘরের প্রধান যদি পুণ্যবান হয়।
তার পুণ্যফলে পরিজন পুণ্য সয়।।

কিছু কিছু শব্দ প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। যেমন—

জিজ্ঞাসিলে কথা কহ নানা গদ্য করি।
অসুর কপট মুনি পুত্র বেশ ধরি।।

এখানে 'গদ্য' শব্দটি উপহাস বা পরিহাস রসিকতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ গদ্য শব্দের এই অর্থে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত অন্যত্র রয়েছে। যেমন—

(ক) হেন বুঝি গদ্য মোরে করিল যুবতী
—কবিকঙ্কণ চণ্ডী
(খ) গোপীনাথ গদ্য করে পৌত্রবধূ হেরি
—শিবায়ন

এছাড়া কয়েকটি প্রাচীন শব্দের ব্যবহার এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি—

১ না যায় কঠিন প্রাণ রহে তে কারণে।
২ মো সম অভাগী নাহি সংসার ভিতরে।
৩ মো নাগ পোড়াইল খাণ্ডব দাহনে।

রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন অনুবাদকদের মধ্যে তুলনামূলক বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ রয়েছে। এ-জাতীয় আলোচনা না হলে জানা যাবে না অনুবর্তী কবিরা পূর্বসূরীদের কাছে কি পরিমাণ ঋণী এবং কোনখানেই বা তাঁদের অভিনবত্ব। গবেষকরা এ-ব্যাপারে যত্নবান হলে অনেক নতুন তথ্য উদ্ঘাটিত হতে পারে।*

[*অনেক ক্ষেত্রে উদ্ধৃত অংশগুলিতে প্রাচীন বানানের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে—প্রাবন্ধিক]

অতীতে বহু সাহিত্য-পত্রিকায় সংক্ষেপে বিবিধ 'সাহিত্য-সংবাদ' স্বতন্ত্রভাবে প্রচারিত হত। তৎকালীন সাহিত্য, সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগীদের সম্বন্ধে যেমন বহু কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদাদি 'সাহিত্য-সংবাদের' মধ্যে পরিবেশিত হত, তেমনি সাহিত্য-সংস্থা বা সাহিত্য সম্মিলনের বিভিন্ন সংবাদও বাদ যেত না তার মধ্যে।

'পৃথিবীর ইতিহাস' প্রভৃতি বহু মূল্যবান গ্রন্থের লেখক সুপণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে এবং প্রমথনাথ সান্যালের সম্পাদকতায় 'সাহিত্য-সংবাদ' নামক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হত এককালে। যদিচ উক্ত পত্রিকায় কেবলমাত্র সাহিত্যের সংবাদই প্রকাশিত হত না, অন্যান্য মূল্যবান রচনাও প্রকাশিত হত, তথাচ 'সাহিত্য-সংবাদ' নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগও ছিল পত্রিকাখানিতে। ১৩২১ সালের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত অনুরূপ একটি বিভাগের নিদর্শন যথাযথভাবে এখানে আমরা উদ্ধৃত করে দিলাম। এই উদ্ধৃতির শেষের অংশটি বিশেষভাবে [illegible]। এর মধ্যে লেখকগণ সম্পর্কে এমন কিছু মন্তব্য আছে যা বর্তমান [illegible]।

।সাহিত্য-সংবাদ।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লোকান্তরের দিন স্মরণ করিয়া গত ১৩ই শ্রাবণ বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্মৃতি-সভার অধিবেশন হয়। কলিকাতার কোহিনুর থিয়েটারে ঐ সম্বন্ধে যে সভার অধিবেশন হইয়াছিল, সকল সদনুষ্ঠানে উৎসাহশীল রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ, বি-এল মহাশয় সেই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুনিলাম, ঐ সভায় বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত প্রণেতা শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছিলেন—কখনও কখনও সধবা যুবতীকে আশীর্বাদ করিতে হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন, 'আশীর্বাদ করি তুমি বিধবা হও।' অর্থাৎ, যুবতী বিধবা হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া বিধবা-বিবাহের পোষকতা করিবেন,—ইহাই তাঁহার আশীর্বাদের উদ্দেশ্য ছিল। আমরা আশ্চর্য্য হইলাম—সভাস্থলে একথার কেহ প্রতিবাদ করেন নাই! 'বিদ্যাসাগর' প্রণেতা 'বঙ্গবাসী'র শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয়ও একথা শুনিয়া চুপ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন! সভাপতি মহাশয়ই বা কেমন করিয়া এরূপ প্রলাপ বাক্যে আপত্তি জানাইলেন না, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না।

*

কলিকাতা 'সাহিত্য-সম্মিলনের' উপর্য্যুপরি দুইটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। একটি অধিবেশন কবির দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লোকান্তরে শোকপ্রকাশ উপলক্ষে। কবিবর শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় অধিবেশন 'উপাসনা-তত্ত্ব' বিষয়ক আলোচনার জন্য। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'উপাসনা-তত্ত্ব' বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের স্মৃতি-শাস্ত্রের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দুই অধিবেশনে বক্তৃতা করিয়াছিলেন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম-এ পি-এইচ-ডি শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বসুমতী সম্পাদক), শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদেব শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ কাব্যকণ্ঠ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন মিত্র প্রভৃতি। বড়ই আনন্দের বিষয়, সাহিত্য-সম্মিলনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এল মহাশয়ের প্রযত্নে এবার 'সাহিত্য-সম্মিলনের' কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতেছে।

*

বাঙ্গলা ভাষার সৌভাগ্য যে, আজিকাল দেশের ধনকুবেরগণের দুই একজন বাঙ্গালা-সাহিত্যের আলোচনায় ব্রতী হইয়াছেন। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ অনারেবল স্যর শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহতাব বাহাদুর 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় একটি সঙ্গীত ও একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, এবং নাটোরের মহারাজ 'অনারেবল' শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের একটি প্রবন্ধ (বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির অভিভাষণ) 'মানসী'তে প্রকাশিত [illegible] মহারাজ [illegible] আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুর 'নির্ম্মাল্য' পত্রে শিকার-কাহিনী লিখিয়াছিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালার এই তিনজন মহারাজকে বাঙ্গালা-সাহিত্যের আলোচনা করিতে দেখিয়া আমরা বাস্তবিকই আনন্দিত হইয়াছি। এতৎ প্রসঙ্গে চুঁচুড়ার সাহিত্য-সম্মিলনে 'অনারেবল' মহারাজ শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের অভিভাষণ এবং উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের অভিভাষণ উল্লেখযোগ্য। সে দুই অভিভাষণকে বঙ্গ-সাহিত্যের দুইটি রত্ন বলিলেও বলা যায়।

*

কাহারও কাহারও ধারণা—বাঙ্গালার যে দুই চারিজন লেখক খুব 'নামজাদা' হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারা না লিখিলে সাময়িক পত্র চলিতে পারে না। কিন্তু আমরা তাহা মনে করি না। যে দুই চারিজন লেখকের নাম 'জাহির' হইয়া আছে, তাঁহারা ভিন্ন বাঙ্গালায় যে আর লেখক নাই, তাহা অজ্ঞজনেই বলিতে পারেন। বাঙ্গালায় বীণাপাণির বরপুত্র এমন অনেক আছেন, যাঁহাদের পরিচয় অনেকে অপরিজ্ঞাত, অথচ যাঁহাদের প্রতিভার পরিসীমা নাই।

'সাহিত্য-সংবাদের' লেখকগণের মধ্যে পাঠক-পাঠিকাগণ সেইরূপ অনেক অপরিজ্ঞাত প্রতিভাশালী লেখকের পরিচয় পাইবেন। আজ দুইজনের মাত্র নাম করিতেছি। (১) শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দে মহাশয়। বহু পূর্ব্বে 'নবজীবন' সম্পাদক অনেক যত্নে ইঁহার দুই-চারিটি রচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'অনুসন্ধান' পত্রে ইঁহার কয়েকটি রচনা প্রকাশ পাইয়াছিল। এখন 'সাহিত্য-সংবাদে' মধ্যে মধ্যে ইনি [illegible] লিখিয়া থাকেন। কোনও প্রবন্ধে ইঁহার নাম প্রকাশিত হয়, [illegible] নাম প্রকাশিত হয় না। কিন্তু যে বিষয়েই ইঁহাকে প্রবন্ধ [illegible] ইনি সেই বিষয়েই অত্যুৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে সমর্থ। বিজ্ঞান বলুন, দর্শন বলুন ইতিহাস বলুন সমালোচনা বলুন বিদ্রূপ বলুন—সর্ব্ববিধ রচনায়ই ইনি সিদ্ধহস্ত।

(২) শ্রীযুক্ত জয়কুমার নন্দর্দন রায়। ইঁহার হৃদয় কবিত্বপূর্ণ। রচনাও কবিত্বে ভরা। ইনি যে [illegible] সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, সে সকল [illegible] তুলনা হয় না। ইনি যে সকল উপন্যাস লিখিয়াছেন, তাহার মাধুর্য্যের অন্ত নাই। নিরক্ষর কবিগণের বিবরণী সংগ্রহ করিয়া ইনি বঙ্গ-সাহিত্যে অভিনব সম্পদ প্রদান করিয়াছেন। বিজ্ঞান-দর্শনাদি [illegible] ইঁহার গবেষণার পরিচয় পাই। ইনি নীরবে নিভৃতে বীণাপাণির আলোচনায় ব্রতী ছিলেন। 'অনুসন্ধান' ইঁহার প্রথম সন্ধান পান। 'সাহিত্য-সংবাদে' ইনি নিয়মিত লেখক। 'মুসলমান বীর' প্রভৃতি ইনি যে সকল গ্রন্থ লিখিয়া রাখিয়াছেন, যদি কখনও সে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হয় বঙ্গীয়-সাহিত্যিকগণের মধ্যে ইঁহার আসন কত উচ্চে, বুধমণ্ডলী অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। আজ সংক্ষেপে দুইজনের মাত্র প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম। ইঁহাদের এবং 'সাহিত্য-সংবাদের' অন্যান্য লেখকগণের প্রতিকৃতি সহ বিস্তৃত পরিচয় প্রকাশ করিবার বাসনা আছে।

—[illegible]

সেলিনা জানে না কখন সকাল হয়। ঠিক ঘুম কাতুরে মাটির মতো স্বল্প পানিতে গদগদে স্বভাবের না হলেও ঘুম ভাঙাতে একটু দেরীই হয়। দেরী মানে বেশ কিছুটা। একে সকাল বলা যায় কিনা সে জানে না। কেননা, পূবের আকাশে তখন সূর্যের দিকে তাকিয়ে বর্ণ সুষমার কিছুই দেখা যায় না। তখন যে সূর্যের খুব একটা তেজ থাকে তাও নয়। অথচ তাকিয়ে দেখা যায় না, যেমন যায় না কবীরকে। কবীর যে যুবক তাও নয়। আবার কিশোরও নয়। অনাগত যৌবনের একটা ইচ্ছার ধূর্ততা যেন তার চেহারায়, বিশেষত চোখে সব সময় সকালের আকাশে সূর্যের মত জাগে।

কাজেই সেলিনার যখন সকাল হয়, সদ্য ঘুম ভাঙা আমেজে নিজেকে বিছানায় বিক্ষিপ্ত করে ছড়িয়ে রাখে, তখন একবার ঘাড় কাত করে জানালা গলিয়ে সকালটা দেখার চেষ্টা করে। সূর্য তখন পাশের একতলা বাড়ির কার্ণিশের পাশ দিয়ে তার ঘরে জানালা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে। শুয়ে শুয়েই সে দেখে। অনুভব করে আহা কী সতেজ এক উষ্ণতা তার গায়ে স্পর্শ ছড়িয়ে পাশে বিছানায় এলিয়ে পড়ে পড়ে যেন তার বিছানা দখল করতে পিল পিল করে প্রসারিত হচ্ছে। আর ঠিক তখনই মনে হয় কবীরের চোখ। তাকিয়ে দেখা যায় না। অথচ কেমন যেন কেমন করা ইচ্ছার এক উষ্ণতা ছড়িয়ে দিতে চায়।

এই সময়ই সেলিনা দেখতে পায় পাশের এক তলা বাড়ির ছাদ থেকে কবীর পলকে আড়ালে চলে গেল। যেমন সুড়ুৎ করে কখনো চড়ুই ঈষৎ চমকে দিয়ে চেতনায় ঢেউ তুলে আচমকা ঘরে ঢোকে।

তার চেতনায় অনুপ্রবেশ করে নাকি কবীর। প্রায় প্রতি সকালেই অমনি হয়। এমন অলস অবশ শরীরী ভাঁজাতে পড়ে থাকা সেলিনার বিমূর্ত নির্জনে কবীর আসে। শুধু কবীরই বা কেন? আরো অনেকে যারা হীন, দেহহীন, নামহীন গোত্রহীন পর পর বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত কখনো নিরবচ্ছিন্ন।

কবীর সবে কলেজে ভর্তি হয়েছে। একমাথা কোঁকড়ানো চুল। গোঁফের লোমগুলিতে কেবল কালো রং বর্ণময় ব্যঞ্জনা ধরছে। একহারা গড়ন। বেশ মিষ্টি মিষ্টি চেহারা। একমাত্র চোখ দুটি ছাড়া। সেলিনার মনে হয়, যৌবনের এক ধূর্ততার ইচ্ছার নেকড়ে যেন ওত পেতে আছে ওর চোখের গভীরে। কিসের এক গা-শিরশির করা অনুভূতি জাগায় ওর চোখ। এবং সেলিনাকে দেখলেই ওর চোখ চকচকে ইস্পাতের ছুরি হয়ে যেন ছিঁড়েখুঁড়ে সেলিনার দেহের অপার রহস্য উদঘাটনে উন্মুখ হয়ে ওঠে। তাই সেলিনাকেও অসম্ভব দেখতে চায়। সকালে একলাই সে ছাদে আসে। বেলা বাড়লে বারান্দায় বসে থাকে। অসীম প্রতীক্ষায়।

সেলিনা উপভোগ করে এই প্রতীক্ষা। কেউ কারো জন্য প্রতীক্ষা করছে ভাবতে ভাল লাগে তার। বাল্যের সেই লুকোচুরি খেলার মতো। সে লুকিয়ে থাকবে, তাকে খুঁজে বের করবে কেউ। তখন কি যে আনন্দ। তাকে কেউ আবিষ্কার করছে সে

এসেছে জেগেছে। এই প্রতীক্ষা যেন সেই আবিষ্কার। তিলে তিলে যেন আবিষ্কৃত হওয়ার এই গোপন ব্যাপারকে সেলিনা কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারে না। বরং সে প্রতিনিয়তই একটা প্রশ্রয়ের অন্তরংগতা দিয়ে আহ্বান জানায়।

কাজেই সেলিনা যখন ধীর মন্থর পায়ে পায়ে গর্বিতা রাজহংসীর মত বাইরে বেরুবার জন্য রাস্তায় পা দেয়, তখন চকিত দৃষ্টিতে দ্যাখে কবীর তার আপাদ মস্তক দেখতে দেখতে নেকড়ে হয়ে উঠেছে তখন সেলিনা আরো একটু উন্মোচিত করে নিজেকে। অধরের ঈষৎ বঙ্কিম মনোরম ভংগিতে ক্ষণিক হাসির ছটা উদ্ভাসিত করে তা ছড়িয়ে দেয়, লীলায়িত দেহের সুস্পষ্ট ভাজে ভাজে, উন্মুখ রেখার শিহরে ছন্দিত দেহাবরণে।

সহসা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট মানুষের মত সোজা হয়ে ওঠে কবীর এবং দ্রুত নেমে আসে কম্পিত উত্তেজনায়,.........এই যে লিনা আপা, ভার্সিটি যাচ্ছেন নাকি। রূপালী শিল্পীর দ্রুত লয়ের কাঁপানো কন্ঠের এক দৈনন্দিন জিজ্ঞাসা।

মৃদু সম্মতির মাথা নাড়ে সেলিনা। বলে, তুমি কোথাও যাচ্ছ নাকি?

কলেজে যাবো।

বেশ তো চল। একসংগে বাস স্টান্ড পর্যন্ত যাওয়া যাক। একা হাঁটতে একটু ভাল লাগে না। আবার মোনালিসার হাসি অধরে আনে সেলিনা।

আমারো না। একদম ভাল লাগে না। আতিশয্যে উল্লসিত কবীর পাশ থেকে এক ঝলক দেখে নেয় সেলিনাকে। সেলিনা তখন প্রকান্ড দীঘি। সামান্য চোখ স্নানে তার কাঁই-বা এসে যায়।

কবীরকে পাশে নিয়ে সেলিনা কিছুক্ষণ হাঁটে। কিছু সময় সে দেয় কবীরকে। এই যেমন এই সকালে নিজেকে কবীরের দৃষ্টির পরশে রাখে।

অন্যদিন হলে এতক্ষণ সেলিনা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তো। এবং বিস্রস্ত রাত্রিবাস নিয়েই ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখতো। আত্মমগ্ন অনেকটা সময় কেটে যেতো। এ তো দেখা নয় এ যেন প্রতিবিম্বে বিস্মিত এক নারী। কখনো কলম্বাস। কখনো নার্সিসাস।

এবং তখুনি মনে হতো কেন কবীর তাকে সামনে দেখে সহসা বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়।

কবীর তার কোন অংগে নয়, সামগ্রিকতার কুঞ্জবনে অপরিণত শিকারী। কুঞ্জবনের মোহিনী মায়ার ফাঁদে আটকে পড়ায় বিমুগ্ধ দিশেহারা।

কিন্তু হারুণ-অর-রশীদ, তার সহপাঠী, কখনো আরো ঘনিষ্ঠ, কোন কোন অন্তরংগ মুহূর্তে বাজপাখীর দৃষ্টিতে চকিতে দেখে নেয় তার বুক। সেলিনা সে মুহূর্তগুলিতে অবশ অনুভব করে। তাৎক্ষণিক লজ্জায় যেন তার মুখের রং পরিবর্তিত হয়ে যায়। একটা রক্তিম জড়তা তাকে বিমূঢ় করে তোলে। তবু একদিন তার দৃষ্টি নিজের আয়ত চোখে ধরে রেখে শুধিয়েছিল, কি দেখছো হারুণ।

বাক-চতুর হারুণ-অর-রশিদও সে প্রশ্নে বোবা হয়ে উঠেছিল। এভাবে ধরা পড়ে যাবে ভাবে নি।

এ প্রশ্ন করার আগেই সেলিনা ধরে নিয়েছিল হারুণ-অর-রশিদ এর জবাব দিতে পারবে না। কেউই এভাবে সত্যের মুখোমুখী হতে পারে না। তাই সে নিজেই কৌতুকময়ীর হাসিতে পরিবেশকে সহজ করে তোলার জন্য বলেছিল, হৃদয় দেখছো বুঝি?

হারুণ-অর-রশিদ তখনো কোনো জবাব দিতে পারে নি। লজ্জায় মুখ নীচু করে সিগারেট টানছিলো ঘনঘন।

সেলিনার নিজেরও লজ্জা লাগতো। মনে হতো কি অশোভন এক রূপের স্পর্ধা বুকে নিয়ে তাকে বিব্রত হতে হয়। কি লজ্জা, মনে হতো মরে যাই কি লজ্জা।

এজন্য প্রথম প্রথম সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারতো না। বুক থেকে কি যেন এসে শির শির করে মেরুদন্ডের খাঁজে খাঁজে শিহরণ তুলে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যেত। আর তখুনি চোখমুখ লাল হয়ে উঠতো। মনে হতো, শত শত দৃষ্টির সামনে এ বুক নিয়ে চলবে কি করে। ছি ছি, কি অসভ্যতা।

কি অ[illegible]তা। সমস্যাটি জুতোর কাঁটার ম[illegible]নের মধ্যে খচখচ করে বিঁধতো। পারলে উদ্ধতার এই সুডৌল স্পর্ধাকে গুঁড়িয়ে দিতো। কিন্তু তা পারে নি। তবু যতোটা সম্ভব চেষ্টা করতো।

একদিন, সম্ভবত সহপাঠী লীলাই হবে। বলেছিল, এ মা, তুই কি লিনা, বলতো। ও ভাবে বাঁধতে আছে নাকি। তোর মত আমাদের হলে মাটিতেই পা পড়তো না। দেখিস, এর জন্যই ছেলেদের মধ্যে একদিন কদর বাড়বে তোরই। তখন বুঝবি।

বুঝতে অবশ্যি সেলিনার বেশী দেরী হয় নি। যা ভেবে সে লজ্জায় অধোবদন হয়ে পথ চলতো, পথ চলতে ওসব নিয়ে যে কি করবে ভেবে পেতো না, সেই অশোভন স্পর্ধার জন্যই তার মনে একটা দুরন্ত আবেগ ঝড় তুলছিলো।

কলাবাগান থেকে ফিরছিল সেলিনা। দুপুর অতিক্রান্ত। তবু নির্জনতা ছড়িয়ে আছে এখানে ওখানে। কখনো রিকসা বা দু একজন মানুষ চলে যাচ্ছে। হাঁটতে বেশ ভাল লাগে সেলিনার। শ্লথ অলস গতি, মন্থর পদক্ষেপ শিথিল বেশবাস। একটা তন্ময় আনমনায় চলছিল সে।

হঠাৎ নজরে আসে খুব কাছে দুটি তরুণ। একজন কবীর নাকি। না অন্য কেউ। কিন্তু একি, ওদের দৃষ্টি যে আগ্রাসী অজগরের মত হিসহিস করে আছড়ে পড়ছে তার বুকের ওপর। মাত্র কটি মুহূর্ত। কিন্তু সেলিনা উষ্ণ হয়ে ওঠে, যেন সদ্য জাগা নদীর চর সূর্যালোকে।

আর ঠিক তখুনি কানে আসে ওদের কথা। অশালীন সংলাপ।

অকস্মাৎ ওর কান ঝাঁ ঝাঁ করে। বুকের মাঝে রক্ত নেচে ওঠে। হঠাৎ ছুটে আসা ছোট ঘূর্ণির এক দমকা বাতাসের মতো ভাললাগা ওকে আচ্ছন্ন করে দেয়। অশালীন অথচ নির্ঝরের স্বপ্নভংগের মাধুর্য জাগে। এত ভাললাগা এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিল সেলিনা জানে না। নাকি ঐ উচ্চারিত কথাগুলি ওর বুক জাগিয়ে দিয়ে গেল। স্নায়ু শিরা সব উত্তেজিত করে

ভুললো। কি যেন কিসের এক অস্থিরতা এলোমেলো করে দিলো এতদিনের সাজিয়ে তোলা অনুভবের সংযমী বাগান। এ যেন এমন এক মনের পরিবর্তন, হঠাৎ পাওয়া নতুন খেলনার মতো অনেকটা সময় অনায়াসে কাটিয়ে দেওয়া যায়। কোনদিন এমন অভিজ্ঞতা ছিল না অথচ পুতুল খেলার পুতুল হাতে মেতে ওঠার এক আকণ্ঠ পিপাসা সারা সত্তায় যন্ত্রণা ছড়ায়। যন্ত্রণা অথচ ভাল লাগে।

সেলিনার কাছে কী ভীষণ ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে সব। পবিত্র নাকি এই দেহ। নাকি মন। কি যে পবিত্র ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। যদি তাই হবে, তাহলে এ সব কথা কেন তার কানে আসে। সেই কথা কানে এলে চোখ মুখ রক্তিম হয়। কান ঝাঁ ঝাঁ করে। আর কি আশ্চর্য পুরনো রবীন্দ্রনাথের কথা কেউ ভাবে না। পুরনো ভাবে কথা বলা নাকি আজকাল চরম অসভ্যতা। এ বক্তব্য নিয়ে শেষবর্ষ এম-এ বাংলার আবু শরীফ হামিদুল্লাহ তো এক প্রবন্ধ পাঠ করলো বিভাগীয় সাহিত্য সভায়। সচকিত শাণিত সে প্রবন্ধ—পুরানো রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু, অভ্যন্তকালের জটিলতা এবং আমাদের ভাষা। শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলো সেলিনা। নাকি আবু শরীফ শহীদুল্লার শাণিত চেহারা মুগ্ধ করেছিলো তাকে। ঠিক করে ঠিক বলতে পারে না সেলিনা। তাই যখন প্রথম আলাপেই আবু শরীফ হামিদুল্লাহ বলেছিলো, আরে আপনি তো আমার খুব চেনা। কতদিন আপনার হাঁটার ছন্দ দেখেছি গুনে বলতে পারবো না। আপনার হাঁটাটাই নাচের একটি মুদ্রা। যে মুদ্রা আমাকে মৃত্যুর ডাক দেয়।

অবাক হয়েছিল সেলিনা—মৃত্যু।

আবু শরীফ হেসে জবাব দিয়েছিল, হ্যাঁ—মৃত্যু। মৃত্যুই তো। অবশ্য সুখের মৃত্যু—রক্তের আদিম উল্লাসে চেতনাহীন। তখন কথা বলতে পারেনি সেলিনা। যেমন পারেনি সেদিন নিউমার্কেটে।

বই পাড়া থেকে বের হয়ে আসছিল। সামনের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে এক ছোট দল বৈকালিক মেয়ে দর্শক, রাস্তাবাজ। সবাই ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। কাছে আসতেই মন্তব্য, কানে আসে : কি নেচে নেচে আসছে তাই না।

তবু তার গতি নিরুদ্বিগ্ন অচঞ্চল। সাজিয়ে তোলা ঔদাসীন্যে ভাবলেশহীন।

—দেখ না হাতটা, নাচের মুদ্রার মত করে রাখা। একজনের সরস মন্তব্য।

—কিন্তু হাতটা কোথায় দেখেছিস। আরেকজনের ইংগিতময় ছুঁড়ে দেওয়া কথা।

—তাইতো, ঠিক ধরেছিস। হাতটা ঠিক জায়গায় রেখে হাঁটছে তো বেশ। অন্যজন বলে।

—ওটা নাচ-টাচের মুদ্রা নয়। আসলে ইংগিত। এক যেন বলে।

—ফিল্মের ইঙ্গিত।

—ততক্ষণে দলটিকে অতিক্রম করে এগিয়ে যায় সেলিনা। ফিল্মের ইঙ্গিত শোনার মত মনের অবস্থা ছিল না তার। হয়তো ওরা বলেছিল কিন্তু তা কানে আসেনি। শুধু ওদের সম্মিলিত ফেটে পড়া হাসি শুনতে পেরেছিল। বিশ্রী গা জ্বালানো হাসি। তাতেই সেলিনা অনুভব করতে পেরেছিল ওরা ফিল্মের ইঙ্গিত খুঁজে পেয়েছিল তার হাঁটার অভ্যাস থেকে। তখুনি হাতটি তার এতদিনের চলার অভ্যাসের গড়ে ওঠা সান্নিধ্য থেকে স্থানচ্যুত হয়ে পড়েছিল অজ্ঞাতসারেই।

আসলে হাঁটার সময় হাতটা তার একটা সমস্যা ছিল এতদিন। মঞ্চে সৌখিন আভ-নেত্রীদের মত সে ভেবে উঠতে পারেনি হাতটা নিয়ে কি করবে। কোথায় রাখবে। ডান হাত তো দুলিয়ে চলা যায়। কিন্তু বাঁ হাত। আড়ষ্টতা পেয়ে বসতো তাকে। আর এই দুর্বলতার মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। দুই উরুর মাঝের সুগোল অবস্থানের শাড়ির ভাঁজ সে বাঁ হাতের আঙ্গুল দিয়ে ঈষৎ ধরে হাঁটত।

কিন্তু কি আশ্চর্য, এতদিন সে জানতো না এভাবে হাত রাখার বিশেষ কোন অর্থ আছে। আছে কোন আমন্ত্রণের ইঙ্গিত। বিস্মিত মনে ভাবে সেলিনা। তার দেহ, নিজের এই দেহ নিয়ে কখনো চিন্তা আসেনি। আর দশটা মেয়ের মত সেও ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল, মেয়েদের তো এমনিই একটা দেহ থাকে। সাধারণ এবং পুরুষের চেয়ে আলাদা। এই পর্যন্তই। কিন্তু সেই সাধারণ দেহ থেকে যে, এভাবে একের পর এক আবিষ্কার হবে পুরুষের অবিস্মরণীয় আকর্ষণ এবং নিজের কাছেও কে জানতো। অন্যের চোখ দিয়ে নিজেকে দেখা, হোক না তারা রাস্তাবাজ, রক-বাজ, সহপাঠী বা কবীর, তার ভাললাগা তো একাই উপভোগ করে সকালে সদ্য ঘুম ভাঙ্গা জড়তার আমেজে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার প্রতিবিম্ব তারিয়ে তারিয়ে দেখে। কত মানুষের চোখ দিয়ে যে এত বড় আয়না হয় সেলিনা জানে না। কিন্তু সকালের এই স্নিগ্ধ মনোরম আলোয় মগ্ন হয়ে যখন সে নিজেকে দেখে, মনে হয় অসংখ্য চোখের আয়নায় ভাসছে তার এই পরম রমণীয় দেহ। সেই চোখগুলি যেন খেলছে এই সকালে শিকারে আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে তার দেহের পুতুল। সেই সব আকর্ষণীয় অংশ, যা পথে-ঘাটে বহুল প্রশংসিত, তাকে আবেগে উচ্ছল করে তোলে। হোক না সে ভাষা অশ্লীল, তবু কেমন যেন মধুর।

এই সময় সেলিনা ঘুরে দাঁড়ায়। মরাল গ্রীবার ঈষৎ ভাঁজ তুলে পদ্ম পুকুর থেকে উঠে আসা রাজহংসীর মত [illegible] তাকায়। ভরা পুকুরে প্রস্ফুটিত পদ্ম। পাপড়ি মেলেছে মহীন [illegible] আয়নায় ভাসে কি [illegible] উদ্‌ভাসিত রূপ-রেখা। কাঁধ থেকে নেমে যাওয়া পিঠের মসৃণ ঢল কোমর অবধি। উন্মুক্ত কটিতটের ঢেউ খেলানো উত্তাল তরঙ্গ যেন আছড়ে পড়ছে গুরু নিতম্বের ইশারার ওপর। কই, সে নিজে তো কখনো এমনভাবে দেখেনি। তবে?

ওই চোখগুলি কার আয়নার গভীরে রাতের তারার মতো আটকে আছে। নামহীন গোত্রহীন রাস্তাবাজ, নাকি সহপাঠীদের, নাকি কবীরের। অথবা সবারই। প্রথমে মনে হয়েছিল কবীর এবং তার দল। তার পিছে-পিছে হাঁটছে। হৈ চৈ করছে। মাঝে মাঝে মন্তব্য ছুঁড়ছে। কিন্তু কবির এত দুঃসাহসী হলো কী করে যে, দলবলসহ মন্তব্য ছুঁড়তে সাহসী হয়। মুখচোরা স্বল্পবাক কবীর অপার বিস্ময়ে চোখের সাদা জমিনে একটা উঠতি বয়সের নেকড়ের ইচ্ছা লুকিয়ে রেখে যে তার দিকে শুধু নীরবে তাকায়।

তাইতো পেছন ফিরে তাকাবার কৌতূ-হল দমন করতে পারে না সেলিনা। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গেট পেরিয়ে আনমনে হাঁটছিল। উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় গ্রন্থাগারে দুষ্প্রাপ্য বইগুলি দেখতে যাওয়া। সামান্যই পথ। হাঁটছিল সে। হাঁটতে ভাল লাগছিল। কিন্তু সেই ভাল লাগা যে এভাবে শাণিত ছুরির মত বিক্ষত হবে কে জানতো।

পিছনের ছেলেগুলি মুখ-চেনা। বহু দেখেছে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে।

তাদের কারো সখেদ মন্তব্য: ছন্দটা দেখেছিস।

কিসের? অন্যজন।

সেলিনা চৌধুরীর—।

—কি যে অশ্লীল কথা বলিস। যদি শুনতে পায়।

—শোনার জন্যই তো বলা। যার যা আছে প্রশংসা করা বুঝি অশ্লীল?

—তবু এভাবে বলা।

—শুনলে ও খুশীই হবে। ওর যে এমন একটা জিনিস আছে যা দেখে আমরা মুগ্ধ। নিজের একটা ভাল জিনিস থাকলে কে না খুশী হয়। বিশেষতঃ মেয়েরা।

পুরোপুরি অবিশ্বাস করেনি ছেলেটির কথা। তবে প্রথমে চমকে উঠেছিল এবং তখনই যেন কে তার মুখমণ্ডলে গরম রং ঢেলে দিয়েছিল। ক্ষণিক শূন্যমনে তলিয়ে গিয়েছিল সে। তারপর চেতনা ফিরে পেতেই একটা রিকসা ডেকে বসেছিল। জাতীয় গ্রন্থা-গারে তার যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

দুই অক্ষরের সেই কথাটা তার অশ্লীল মনে হলেও মনে হয়নি। কেমন যেন একটা সুখের শিহরণ এনেছিল অঙ্গে। কেন যে এমন হয় জানে না সেলিনা। তবু হয়।

কথাগুলি বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকবার তার কানে এসেছে। তবে বিচ্ছিন্ন হলেও তাকে সময়ে অসময়ে বেশ ভাবিয়ে তোলে। তার শরীরে এমন কয়েকটি জায়গা আছে, যার উপর অন্যের চোখ আটকে যায়, স্থির হয়ে থাকে, নেকড়ের ইচ্ছার মত জ্বলে এবং অসং-যমী তারুণ্যের মন থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মন্তব্য হয়ে তার কানে আসে। আর যারা মন্তব্য ছোঁড়ে না, তাদের চোখের ভাষা বুঝতেও কোন অসুবিধা হয় না সেলিনার। একই উৎস থেকে উঠে আসা ক্ষুধার বিচিত্র প্রকাশভঙ্গি।

আয়নার সামনে তখনো সেলিনা। স্বল্প-বিভ্রান্ত কাপড়ে শিথিল নির্লিপ্ততায় দাঁড়িয়ে আর একবার আয়নায় চোখ মেলে ধরে। যেন বিছিয়ে ধরে নিজের শরীর নিজের চোখের কাছেই। দেখে যেন দেখা শেষ হয় না। সত্যি দোষ কি কবীরের। কেবল তো ছেলেমানুষ। অপার আগ্রহ—অনেক রহস্য। জামার—যা কিনা একটি মেয়ের শরীরের ভাঁজ থেকে বেরিয়ে আসে অথচ আসে না। এই দুর্বোধ্য অবস্থায় হয়তো কবীরকে সংশয়ে দোলায়। স্পষ্ট করে কিছু ধরা দেয় না তার উপ-লব্ধিতে। তা না হলে সে কি পরশু বিকেলে বলতে পারে, যখন কিনা সেলিনা ঘরে ফির-ছিল। রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিল কবীর। তার পথ চেয়েই হয়তো।

সেলিনা একটু হেসে তাকে অতিক্রম করার পর বুঝতে পারে কবীর তাকে অনু-সরণ করছে।

হঠাৎ একটু দাঁড়িয়ে সে বলে, মাঠে যাও নি কবীর।

—কেন

—খেলা দেখতে, খেলতে।

—খেলা তো দেখছি। খেলতে পাবো কিনা কে জানে?

হঠাৎ দুর্বে… য়ে ওঠে কবীর।

—কোথায় …লা দেখছো? সেলিনা জিজ্ঞাসা করে,

—কোথায়? বলবো? না, থাক। কবীরের চোখে যেন খেলার মাঠের ছায়া পড়ে। চমকায় সেলিনা। এতটা সে আশা করেনি। তবু না বুঝার ভান করে বলে, বল না কোথায়।

—জানেন লিনাপা, খেলতে আমার খুব ভাল লাগে কিন্তু সুযোগই পাই না। তাই দেখি, শুধু দেখি।

—কি খেলতে ভাল লাগে? সেলিনার মুখ থেকে বেরিয়ে যায়।

—খেলা খেলা খেলতে।

—সে আবার কি?

—কিছুই কি বোঝে না লিনাপা। কবীরের চোখ যেন কী বলতে চায়।

—না তো। নিজের অজ্ঞানতা প্রকাশ করে সেলিনা।

—যদি বলেন তো আপনাকে……। ইত-স্ততঃ করে কবীর।

—কী, থেমে গেলে কেন?

—বলবো?

—বলোই না? এত সংকোচ কিসের? সহজ স্বরে বলে সেলিনা।

—শেখাতে পারি আপনাকে।

—বেশ তো শিখিয়ে দিও। অন্তরঙ্গ কণ্ঠ সেলিনার।

আজ শিখবেন! আতিশয্যে বিমূঢ় হয়ে পড়ে কবীর।

—না, আজ নয়, কাল।

—কখন আসবো।

—যখন খুশী।

—রাগ করতে পারবেন না কিন্তু।

—পাগল, তোমার উপর রাগ করতে পারি! প্রশ্রয়ের কণ্ঠে বলে সেলিনা।

—কিন্তু তখন কি জানতো কবীর এতটা দুর্বার হয়ে উঠেছে। প্রচণ্ড দুরন্তও।

এবার আয়নার মুখোমুখি দাঁড়ায়। নাকি কবীরের। না, আয়না নয়। বিশাল দুটি চোখ, যেখানে নিজেকে সম্পূর্ণ দেখা যায়। সেখানে ভাসে সেলিনা। কখনো বসে, কখনো শুয়ে। কখনো নিরাবরণ। বিচিত্র ভাবে, বিচিত্র ভঙ্গিতে। কী বিশাল সুখের অনুভব তার রক্তে, তার উষ্ণতা সুখে সুখে মরে যায় সেলিনা। অথচ কখনো ভাবেনি। আয়নার নাকি চোখে এত সুখ লুকোনো থাকে। কবীর তো ছেলেমানুষ। তবু, ওর চোখের নেকড়ের ধূর্ত ইচ্ছে তখন সুখ হয়ে ছড়িয়ে গেছে কী বিশাল এই আয়নায়।

তখনো সেলিনা দাঁড়িয়ে ছিল এখানে। রাতের প্রসাধন করছিল শুতে যাবার আগে।

হঠাৎ চমকে ওঠে ফিসফিসানো স্বরে, আমি এসেছি। কখনো কখনো হঠাৎ আসা চড়ুয়ের অনধিকার প্রবেশের শব্দের মত। অপ্রতিরোধ্য।

—কে? কম্পিত কণ্ঠে শুধায় সেলিনা।

—আমি কবীর। মৃদু অথচ সুস্পষ্ট। জানালার ফ্রেমে দুটি চোখ।

—এত রাতে?

—বারে, আপনিই তো বলেছেন আসতে।

—আমি, বুকের মাঝে অকস্মাৎ নাচে রক্তধারা, কখন বলেছি এত রাতে আসতে।

—বলেন নি যখন খুশী আসতে। তাইতো চুপিচুপি এলাম। কবীরের কণ্ঠে কুহক মাখানো যেন।

—কখন এসেছো।

—অনেকক্ষণ।

—অনেকক্ষণ। লজ্জিত হয় সেলিনা, জানালায় দাঁড়িয়েছিলে বুঝি।

—ছিলাম।

—অসভ্য।

ঘর থেকে জানালা দিয়ে ছিটকে পড়া আলোয় দুটি চোখ দেখা যায়। মুখ ফিরিয়ে সেলিনা আয়নায় তাকিয়ে শিহরিত হয়। একটা অজানিত বিবশ আবেগ দমন করে বলে, চুপিচুপি এভাবে এলে, কেন?

—বারে, এই তো খেলা। বলেছি না, খেলা শেখাবো আপনাকে।

—অসভ্য।

—শুধু কি অসভ্যতাই দেখলেন আর কিছু কি নেই।

—না। ঈষৎ কঠোর হতে চেষ্টা করে সেলিনা।

—বেশ। তাহলে আমি যাই। ভেজা কণ্ঠ কবিরের।

—এসো।

—আসবো।

—হ্যাঁ এসো।

জানালা থেকে চোখ অন্তর্হিত। বিমূঢ় সেলিনা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে। কবীরকে সে কি প্রশ্রয় দিয়েছে। হয়তো বা। হয়তো নয়। নাই যদি দেবে তাহলে কবীর আসে কি করে। নিশ্চয় তার আচরণে এমন একটা কিছু ছিল বা বুঝতে পেরেছিল যা তাকে এত রাতে এখানে হাজির করেছে। কিন্তু সত্যি কি সেলিনা তাকে মৌন আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। মনে পড়ে না।

দরোজায় ঠক ঠক শব্দ ওঠে। মৃদু টোকা দেওয়ার আওয়াজ। শিহরিত হয় সেলিনা। কেন এ শব্দে বিহ্বল হয়ে পড়ে সে? তবু ফিসফিসিয়ে শুধায়—কে? কে ওখানে?

মৃদু ধ্বনিহীন শব্দে ভেসে আসে, যেন বহুদূর থেকে বাতাসে কাঁসের কেমন যেন আবেগ আছড়ে পড়ছে দরোজার ওপর, দরোজা খুলুন। আমি, খুলুন না।

অগোছালো কাপড় টেনেটুনে ঠিক করে সেলিনা। আয়নার সামনে থেকে দু'পা এগিয়ে যায় দরোজার দিকে। খুলবে নাকি দরোজা? দেখবে নাকি কাঁসের আবেগ কি সে আকৃতি ধরে পড়ছে, আছড়ে আছড়ে পড়ছে কাঠের নীরস বন্ধ পাল্লার ওপর।

আরো দু'পা এগিয়ে সুইচে হাত রাখে সেলিনা। পলকে উজ্জ্বল আলোর উপর দুর্বার বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে সীমাহীন আঁধারের আক্রোশ। তার বুকেও সে আক্রোশ থাবা মারতে থাকে। নিরুপায় যন্ত্রণায় সেলিনা দু'হাত প্রসারিত করে দেয়। এগুতে থাকে। জানালা ধরা অন্ধকার সয়ে আসা চোখে চকচক করে বহু ব্যবহৃত দরোজার ছিটকিনি।

না, আর কতক্ষণ বিছানায় থাকবে সেলিনা। অন্যদিন এতক্ষণ সে বিছানা ছাড়ে। এমনকি নিত্যদিনের আয়নায় দাঁড়ানো, হাত-মুখ ধোওয়া, নাস্তা সবই তো সারা হয়ে যায়। অথচ আজ কিছুতেই তার উঠতে ভাল লাগে না। বিছানার নরম উষ্ণতা, সকালের সূর্যের তীর্যক আলোর সান্নিধ্য, সবই যেন পরম প্রিয়তার পরশ মাখানো এক নতুন আমেজ। এক নতুন অভিজ্ঞতার অনুভূতির দীপ্তিময়তা। কাল রাতে প্রেম ঝড় বয়ে গেছে তার শারীরিক পিপাসার সাজানো বাগানে। সে ফুল ফুল খেলেছে, কখনো বা গোলাপের পাপড়ির অরণ্য লুকোচুরি। অন্য এক লীলার অমোঘ বিধানে খেলেছে সে সারা রাত। সে খেলার সৌরভ-স্বাক্ষর বহন করছে তার রক্তের অণু-পরমাণু। শুভ্র খেলার পুতুল হওয়ার এক পরম আনন্দ মিশেছে তার দেহের প্রাণ উচ্ছলে নিরন্তর। তৃপ্তির সংগে মিশে যাচ্ছে জানালা গলিয়ে আসা এক-ফালি রোদের আভায়। নাকি কারো চোখের নেকড়ে হয়ে ওঠা ধূর্ততার ইচ্ছার আকুতিতে। কে জানে?

কিন্তু জানতে ইচ্ছে করে সেলিনার। তাই সে ঘন চুলের অরণ্যে ডুবে থাকা মরাল গ্রীবা ঈষৎ বাঁকা করে পাশের বাড়ির ছাদের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেয়। এই শীতের সকালে যেখান থেকে একফালি দিশেহারা রোদ তার বিছানায় জানালা গলিয়ে কিছুক্ষণ লুটিয়ে থাকে। উষ্ণতার এক আশ্চর্য কুহক বিস্তার করে তাকে তৃপ্তি জানায়।

পাশের একতলা বাড়ির ছাদ থেকে কে যেন পিছলে সরে যায়। মিলিয়ে যায় তার ছায়া।

সেলিনার মনে হয় কোথায় যেন পড়েছে খুনী বা প্রেমিক একবার না একবার আসেই অকুস্থলে। নীরবে বিজয়ী সম্রাটের মতো নিরীক্ষণ করে তার কীর্তি।

তবে সে কি দেখে গেলো।

এই মুহূর্তে সেলিনার নিজেকে মনে হয় দুঃসহ ভাবাবেগ চঞ্চল মনের কস্তুরীর সৌরভ-স্নাত এক মহান কীর্তি। পরিপূর্ণ নারী।

দশ দিক ছাপিয়ে প্রবল রোল উঠল—হরিবোওল। প্রায় শ'দেড়েক ছেলে ফুলে ফুলে ঢাকা মধুমালীর শবদেহ নিয়ে কলেজ ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে গেল।

সদ্য পাশ করে দূর মফস্বলের একটি কলেজে তখন পড়াতে ঢুকেছি। রোগা, দুবলা মানুষ আমি—ছেলেপিলেরা মাস্টার বলে মানতেই চায় না—রীতিমত গাম্ভীর্য বজায় রেখে পাঞ্জাবির গলার শেষ বোতামটি পর্যন্ত এঁটে কলেজে আসি—যাই।

কলেজের লাগোয়া অধ্যাপকদের একটা মেস-বাড়িতে থাকতাম। এবং জানি না কেন, শীর্ণ, ছোটখাটো, বুড়িয়ে যাওয়া মধুমালী প্রথম থেকেই যেন খানিকটা সুনজরে দেখে ফেলেছিল আমাকে।

দশজনকে ডেকে দেখানোর মত একখানা ফুলের বাগান ছিল আমাদের কলেজে। ঐ প্রতিষ্ঠানের জন্মলগ্ন থেকেই সে বাগানের স্রষ্টা ও তদারকে ছিল মধু। প্রিন্সিপাল গোস্বামী ওর অসাক্ষাতে বলতেন—মধু আমাদের পাথরে গোলাপ ফোটাতে পারে।

মধু ছিল উৎকলবাসী। দীর্ঘকাল পশ্চিমবাংলায় থাকতে থাকতে এক বিচিত্র ধরনের বাংলাভাষা রপ্ত করেছিল সে। বাগানকে বলত 'বাগুনা', গেল বছরকে 'গলা সাল'...এমনি সব আর কি।

আমার ঘর থেকে স্পষ্ট দেখা যেত কলেজের বাগান ও সারাক্ষণ তার পরিচর্যারত মধুকে।

ভোর চারটায় ঘুম থেকে উঠে সারা বাগানে সে অদম্য উৎসাহে জল দিত। তারপর একা হাতে ঝেঁটিয়ে সাফ করত সব নোংরা, ধুলো, ঝরাপাতা। তারপর একটা বকুল গাছের তলে বসে তিনটে ইঁটের উনুনে চা বানিয়ে খেত। চা-পানান্তে খুর্পি নিয়ে লেগে যেত প্রতিটি গাছের গোড়া পরিষ্কার করার কাজে। সে কাজ সাঙ্গ হলে একরাশ সার নিয়ে বসে সেগুলো বাছত, মেশাত। দুপুরে পাশের রাজার পুকুরে চান সেরে এসে ঐ বকুল গাছের তলাতেই ছোট্ট এক মাটির হাঁড়িতে দুটো সেদ্ধ ভাত ফুটিয়ে নিত মধু। তারপর গামছাটা বিছিয়ে করে পাকিয়ে ঘণ্টা দুয়েক লাশ হয়ে পড়ে থাকত গাছের ছায়ায়। পড়ন্ত রোদে মনে হত, রঙে গন্ধে বিভায় এক পুষ্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়েছে।

কলেজের ছেলে-মেয়ে এবং কি অধ্যাপকেরাও বাগানে ঢুকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠত মধু। পাছে কেউ ফুল ছেঁড়ে বা গাছে হাত দেয়—গোয়েন্দার চোখে লক্ষ্য রাখতে থাকত। আমাদের এক সহকর্মী অমল নাগ আগে ঐ কলেজেরই ছাত্র ছিলেন। কেন জানি না, মধু তাঁকে একদম সইতে পারত না। তিনি বাগানে ঢুকলেই সে বলে উঠত—এই অমলদা-র লিখা-পড়া আর শেষ হবার নয়!

অধিকাংশ অধ্যাপকই ছিলেন কলকাতার ছেলে। বিকেলে টিফিন সেরে এসে আমরা জনাচারেক হয়ত একটি ফুলন্ত ডালিয়া-গাছের পাশে বসে গল্প করছি, একপাশে প্রহরারত মধু নিজের মনে বলে উঠত—কাল ঐ গাছটার পাশ থিকে একটা চন্দ্রবোড়া বারাইছিল। ব্যস, ও-টুকুতেই কাজ হত। দু'মিনিটে আমাদের সম্মিলন ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত।

খুবই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, রাশভারী লোক ছিলেন আমাদের প্রিন্সিপাল। কলেজকে ভালোবাসতেন প্রাণ দিয়ে এবং প্রায় একটি একটি করে ইঁট গেঁথে প্রতিষ্ঠানটিকে তিনি সন্তান-পালনের মত করে বড় করেছিলেন। মধুকেও তিনিই এনেছিলেন। অথচ বাগান নিয়ে সব সময়ই মধু একটা চাপা স্নায়ুযুদ্ধ চালাত তাঁর সঙ্গে। প্রিন্সিপাল হয়ত বাগানে ঢুকে তাকে প্রশ্ন করলেন—যে বীজ কেনা হয়েছিল, সেগুলো কোথায় পুঁতেছ? মধু মুখ ঘুরিয়ে অনির্দিষ্ট দিক তাকিয়ে বলে উঠত—দ্যাখ গা। প্রিন্সিপাল আবার জিজ্ঞাসা করতেন—ওগুলো থেকে ফুল বেরিয়েছে কী? মধু বিরস গলায় জবাব দিত—খুঁজে নাও গা। মধুর সব সময় অভিযোগ ছিল যে, তিনি কলকাতা থেকে যে চারা বা বীজ আনাতেন, সেগুলো থেকে কিছু হয় না। আর বাগানের যা কিছু রূপবতী ফুল, সবই নাকি মধু-কর্তৃক 'গলা সালের' সংরক্ষিত বীজ থেকে জন্মায়। প্রিন্সিপাল একবার তো ক্ষেপে উঠে হুকুমই দিয়ে দিলেন—যখন মধুর রাখা বীজ থেকেই ফুল হয়, তখন অত টাকা-পয়সা খর্চা করে শুধুমুধু কলকাতা থেকে ওসব আনার দরকার নেই।

কারো বাগানে কোনো ভালো ফুল, বিশেষত যা কলেজের বাগানে নেই, তা দেখলে মধুর বুক হিংসেয় পুড়ে যেত। আমার ঘরের সামনে যত্ন করে বেশ কিছু উজ্জ্বল ক্যালিফোর্নিয়ান পপি ফুটিয়েছিলাম। মধু সেই ফুল দেখে বলল—এ ফুস ভালো না। আমি বললাম—ঠিক আছে, তোমার কি তাতে? সে আবার বলে উঠল—না, ভালো না, এ তো 'সিংগাল' (এক পত্র-বিশিষ্ট) ফুল! মাসখানেক বাদে দেখি বাগানের দক্ষিণ দিক আলো করে ঐ

'সিংগাল' ফুলই রাশে রাশে ফুটে রয়েছে।

মধুর সঙ্গে পার্মানেন্ট ঝগড়া ছিল কলেজের দারোয়ান চোলাই-এর। চোলাই ছিল পরম বৈষ্ণব। মধু যে লাঠি হাতে বাগানময় দিনরাত ব্যাং, ইঁদুর, হেলে—এসব ফটাফট মেরে বেড়ায়, এই প্রাণীহত্যা চোলাই একদম সইতে পারত না। শীতের এক সকালে বাগানে মোড়ায় বসে রোদ পোয়াচ্ছি, হঠাৎ শুনি দুজনের মধ্যে তুমুল বিতণ্ডা হচ্ছে। চোলাই যথারীতি মধুকে নিয়মিত প্রাণী হত্যার দায়ে অনন্ত নরকবাসের সম্ভাবনার ভয় দেখাতেই ফুঁসে উঠল মধু। বলল—তমারও নরকে যাতে হবে। কম পেরানী মারো তুমি রোজ? রোজ সকালে চান সারি আসি পটাপট পটাপট ফুলগুলার গলা ছিঁড়া নাও না?

দেশে মধুর বউ, ছেলে-মেয়ে সব ছিল। আগে বছরে একবার যেত, পরে তা-ও নয়। মৃত্যুর আগে বছর সাতেক আর যায়-ই নি দেশে। পরণে হলুদে ছোপানো লালপেড়ে শাড়ি, দু হাতে দুটি রূপোর বাজু—তার বউ একবার এসেছিল গাঁয়ের এক লোকের সঙ্গে। মধুকে বাগ মানাতে না পেরে খোদ প্রিন্সিপালের কাছেই অনুরোধ জানিয়েছিল তার 'বুড়া'-কে ছেড়ে দিতে। মধু যায় নি।

ক্রমশ বৃদ্ধ, অশক্ত হয়ে পড়েছিল মধু। প্রায়ই জ্বর হত। চুপচাপ ঘণ্টার পর ঘণ্টা বকুল গাছের তলায় চোখ বুজে শুয়ে থাকত। পাছে তাকে ছাঁটাই করে দেওয়া হয়, তাই প্রিন্সিপালের রিক্সা কলেজে যখন ঢুকত বা বেরোত, সেই সময়টুকুতে একটা খুর্পি নিয়ে বাড়তি ঘাস তোলার ভান করে নিজের অটুট কর্মক্ষমতা প্রমাণ করার করুণ চেষ্টা করত সে। আমাদের ওপর তার দাবি-দাওয়ার অন্ত ছিল না। অনেক ওষুধ-ডাক্তার করেও এক কার্তিকের হিম থেকে শেষ পর্যন্ত বাঁচাতে পারি নি তাকে। ফুলে ফুলে ছেয়ে দেয়া হয়েছিল তার শবাধার। কলেজের ক্রাফ্ট-টিচার খুকুদা কোত্থেকে চারটে বিশাল স্থলপদ্ম এনে তার মাথার কাছে সাজিয়ে দিয়েছিলেন।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

পুরনো অনুষ্ঠান এবার কেমন কাটলো ?

এই সেদিন শিয়ালদার কাছে দাঁড়িয়ে তাজ্জব বনে গিয়েছিলাম। রেল ধর্মঘট। যে কয়খানা ট্রেন চলছিল তারই একটা থেকে এক ভদ্রলোক সপরিবারে অফিস টাইমে নামলেন। ভীড় ঠেলে নেমেই ভদ্রলোক ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সামলাতে হিমসিম খাচ্ছিলেন। বুঝতে পারছিলাম তাঁর কোথাও যাবার একটা বিশেষ তাড়া আছে। সেই ভীড় ঠেলে জনা ছয়েককে সামলাতে সামলাতে তিনি প্ল্যাটফরম থেকে বাসে ওঠার জন্য রাস্তা পার হতে সার বেঁধে দাঁড়ালেন। আমিও এগুচ্ছিলাম। রাস্তা পার হয়ে একই স্টপে এসে ওঁদের সঙ্গে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়ালাম। সেখানে দাঁড়িয়েও ভদ্রলোক বিব্রত অফিস টাইমের ভীড়। তার ওপর মফঃস্বলের ছেলেমেয়ে কলকাতায় চলতে অনভ্যস্ত অথচ কলকাতার ট্রাম-বাস জনসমুদ্রের গতিবেগ দেখে সকলেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ছে শুধু হাল ধরেছেন ভদ্রলোক। বুঝতেই তো পারছেন সে হালের কি দুরবস্থা। একই বাসে ভদ্রমহিলার পাশে দাঁড়িয়ে আমারও যাত্রা শুরু হল।

বাসে উঠে ভদ্রলোক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তিনি বাসের ঝাঁকুনিতে মাক কুঁচকে মালকোঁচা সামলাতে সামলাতে স্ত্রীর সঙ্গে রসিকতা শুরু করলেন' আমি ভদ্রলোকের ধৈর্য এবং রসবোধ দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তিনি হালকা হাসিতে বললেন এতোদিন পর শ্বশুরবাড়ী যাবার একটা সুযোগ পেয়েছি তাতে জামা-কাপড় ভাঁজ ভেঙ্গে যা ছিরি হল...

ভদ্রমহিলা গম্ভীরভাবে রসিকতাটুকু হজম করলেন। এতক্ষণে আমার খেয়াল হল জামাই ষষ্ঠীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে ভদ্রলোক সপরিবারে ক্লেশ স্বীকার করেও গদগদ।

এতো মফঃস্বলের ' জামাই এলেন কলকাতায় বিশেষ এক অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়ে। শহুরে বাবুরাও এ ব্যাপারে কম কিসে। নতুন আর পুরনো সকলেরই বেশ উৎসাহ এই দিনটিকে সুন্দরভাবে উদযাপিত করায়। আমাদের বহু পরিচিত ধীমানদা বিয়ে করেছেন প্রায় বছর তেইশ-চব্বিশ হবে। অথচ এ দিনটিতে তিনি কিছুতেই অফিস যাবেন না। ছেলেমেয়ে সহ বৌকে একদিন আগেই পাঠিয়ে দিলেন পিত্রালয়। তাই নিয়ে পাড়ার লোকেরা মস্করা শুরু করলো। যত মস্করাই হোক না কেন ধীমানদা এসব ব্যাপারে মোটেই মাথা ঘামান না। তিনি পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী গিলে করা পাঞ্জাবী আর ফাইন একখানা ধুতি সংগ্রহ করলেন একদিনের জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য খন্ডন করে সাধ্যি কার। এত প্রস্তুতির পর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেই বেরুলেন অমনি এক পশলা বৃষ্টিতে ধীমানদার ধার করা চকচকে চটির কাদায় ঝকঝকে জামা-কাপড়ের যেই রূপ পাল্টালো তাতে ধীমানদাকে মাঝ রাস্তা থেকে আবার বাড়ী ফিরে আসতে হল। পোষাক-আসাক পাল্টে যখন আবার আধ ময়লা জামা-কাপড়েই ধীমানদা শ্বশুরবাড়ী পৌঁছুলেন তখন প্রায় সকলেরই খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়েছে। তা হলেও ধীমানদার ভাগে কিছু কম পড়েনি। সে ব্যবস্থা গুছিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের বৌদিই পিত্রালয়ে গিয়ে গ্রহণ করেছিলেন।

এবারের জামাই ষষ্ঠীর রূপটা একটু ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। যারা রেলপথের যাত্রী তাঁরা যথাসময়ে নির্দিষ্ট দিনে ঠিকই হাজির হতে পেরেছিলেন কিন্তু যথাসময়ে যানবাহনের অসুবিধায় শ্বশুরবাড়ী ছেড়ে যেতে পারেননি। বাড়তি আরও কয়েকদিন শ্বশুরবাড়ীর আদর উপভোগ করে বাড়ী ফিরেছেন।

জামাইষষ্ঠী আমাদের দেশের এক প্রাচীন অনুষ্ঠান। অন্যসব অনুষ্ঠানের মত এ অনুষ্ঠানেরও বিশেষ এক গুরুত্ব আছে। মেয়েরা বিয়ের পর শ্বশুরকুলের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েন যে ইচ্ছে থাকলেও শ্বশুরবাড়ীর সকলের অনুমতি নিয়ে বাপের বাড়ী যাবার ছাড়পত্র সহজে আদায় করতে পারেন না। এতে সেসব মেয়েদের মনে ক্ষোভ থাকে এবং এতদিন যে পরিবারে লালিত-পালিত হয়ে বড় হয়েছেন তার প্রতি থাকে দুর্বার আকর্ষণ। অথচ সেই আকর্ষণ পূরণ করার পথ খুব সহজ নয়। কিন্তু এই একটি অনুষ্ঠানে পিত্রালয়ে যাবার জন্য মেয়েদের শ্বশুরবাড়ীর অনুমতি আদায় করতে কোন কষ্ট হয় না। উপরন্তু এ অনুষ্ঠানে অক্ষম শ্বশুর-শাশুড়ী যদি তাঁদের জামাতাবাবাজীদের নিমন্ত্রণ করতে না পারেন তবে মেয়েদের শ্বশুরবাড়ীতে কম টিকাটিপ্পনী সহ্য করতে হয় না। সেজন্য অক্ষম পিতামাতার কন্যারা এই দিনটিতে অভিভাবকের যত অর্থনৈতিক কষ্ট হোক না কেন নিজেদের সম্মান রক্ষার্থে সেটুকু একরকম চোখ-বুজে সহ্য করেন।

দূরে পাল্লার মেয়ে-জামাইকে নিয়ে এক শ্বশুর-শাশুড়ীকে অদ্ভুত ভাবনা ভাবতে দেখেছিলাম। রেল ধর্মঘটে আসবে কি করে সেই উপদেশ দিতে তারা জামাতাকে ট্রাঙ্ককল করলেন। বাস, মিনিবাস যে করেই হোক তাদের আসবার জন্য আমন্ত্রণ করে দিন-তিনেক আগে থেকেই রান্না রেফ্রিজারেটারে জমা করে রাখলেন যাতে অনুষ্ঠানের দিনে কোনমতেই রান্নার কোন আইটেম বাদ না পড়ে। আর সত্যি সত্যি অনেক ধকল সয়ে মেয়ে-জামাই ঠিক সময়েই হাজির হয়েছিল। তাই দেখে বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ীর আর পুলক ধরে না। এরা ঠিক আমাদের সমাজের দিন এনে দিন খায় দলভুক্ত নয়— তাই তাদের আয়োজন ও জামাই আদরের ঘটাটা স্বতন্ত্র।

আজকালকার সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের জামাইদেরও অনেকক্ষেত্রে উদারতা কম নেই। তারা শ্বশুরবাড়ীর অর্থনৈতিক অনটনের কথা উপলব্ধি করে স্বেচ্ছায়ই নানা অজুহাতে এ নিমন্ত্রণকে এড়িয়ে যান। মহত্ব সেখানেই টিকাটিপ্পনীকে বাদ দিয়ে সহজ সরলভাবে দু পরিবারের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারলে তবেই প্রকৃত সুখী পরিবার গড়ে ওঠা সম্ভব। এ প্রচেষ্টাতে সফল করতে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। চিরকালের জন্য কোন অনুষ্ঠানে জাঁকজমকের আধিক্য কম থাকলেও সকলের আন্তরিকতায় তা সফল হয়ে ওঠে।

—অঞ্জলি চৌধুরী

বেঙ্গল থিয়েটার সমাচার।

কলকাতার প্রখ্যাত ধনী আশুতোষ দেবের বাড়ীতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে শকুন্তলা নাটকের অভিনয় হয়। আশুতোষবাবুর দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ এই অভিনয়ে শকুন্তলা নাটকে নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেন। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের সংগে শরৎচন্দ্র ঘোষের ছিল বন্ধুত্ব। শকুন্তলা নাটকে বিহারীলাল প্রিয়ম্বদা চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। বিহারীলাল কার্যোপলক্ষে এলাহাবাদে থাকতেন। ন্যাশনাল থিয়েটার যখন সান্যাল ভবনে অভিনয় করছিল— বিহারীলাল তখন কলকাতায় আসেন এবং শরৎচন্দ্রকে নিয়ে সান্যাল ভবনে অভিনয় দেখতে যান। এই অভিনয় দেখে এসেই বিহারীলাল আর শরৎচন্দ্র ঘোষ স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হন। মাইকেল মধুসূদন নানাভাবে এঁদের উৎসাহিত করেন। নিয়মিত নাটক লিখে দিতেও প্রতিশ্রুতি দেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, উমেশচন্দ্র দত্ত পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী প্রভৃতি রইলেন পরামর্শমণ্ডলীর মধ্যে। ৯।৩, বিডন স্ট্রীটে [illegible] মাসিক ২০ ভাড়া নিয়ে মঞ্চগৃহ নির্মিত হলো। নতুন নাট্যগৃহের নাম রাখা হলো 'বেঙ্গল থিয়েটার।' 'লাইসিয়াম' থিয়েটারের গৃহকে অনুকরণ করে নাট্যগৃহটি নির্মিত হলো। কবি মাইকেল মধুসূদনের ইচ্ছায় স্ত্রী-চরিত্রে নারী নিয়োগ করার প্রস্তাব [illegible] তিনি বেঙ্গল থিয়েটারের সংগে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন।

প্রথমে ঠিক হলো মাইকেলের 'মায়াকানন' নিয়ে থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটন করা হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাইকেলের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক ১৬ আগষ্ট, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মঞ্চস্থ করে নাট্যগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করা হয়। এবং চারজন মহিলা অভিনেত্রী গ্রহণ করা হয়। বাংলার পেশাদার রঙ্গমঞ্চের সর্বপ্রথম [illegible] অভিনেত্রী হলেন : ১। এলোকেশী ২। জগত্তারিণী ৩। শ্যামাসুন্দরী ও ৪। গোলাপসুন্দরী।

বেঙ্গল থিয়েটারই সর্বপ্রথম নিজস্ব নাট্যগৃহ নির্মাণ করে নিয়মিত অভিনয় শুরু করেন। বেঙ্গল থিয়েটারেই সর্বপ্রথম স্ত্রী-চরিত্রে অভিনেত্রী নিয়োগ করা হয়। প্রতিষ্ঠা পত্রিকার [illegible] মাইকেলের [illegible] হয়। ২৩ ও ২৮ আগষ্ট শর্মিষ্ঠাই মঞ্চস্থ হয়। ৩০ আগষ্ট মঞ্চস্থ হয় মায়াকানন। ৮ সেপ্টেম্বর 'মোহন্তের এই কি কাজ' অভিনীত হয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে। অকটোবর মাসে রাম-নারায়ণের চক্ষুদান ও জন্মগ্রহণ, ২২ নভেম্বর রামনারায়ণের রত্নাবলী, ২৯ নভেম্বর মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী নাটক মঞ্চস্থ হয়। ২৭ ডিসেম্বর ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী অভিনীত হয়ে অসম্ভব সাড়া জাগায়। জগৎসিংহরূপে শরৎচন্দ্র ঘোষ অশ্বারোহণে মঞ্চে প্রবেশ করে দর্শকদের বিস্মিত করতেন।

অভিনেত্রী নিয়ে অভিনয় করার জন্য নানান মহল থেকে নানান বিরূপ সমালোচনায় বেঙ্গল থিয়েটার কর্তৃপক্ষকে ক্ষতবিক্ষত করা হয়। এমনকি ব্রাহ্ম-মহিলারা বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয় দেখতে গেলে তাদেরও নানাভাবে ভীতি প্রদর্শন করা হয়। অন্যান্য পত্রপত্রিকা এবং ব্যক্তিরা শিল্পীদের 'বারবণিতা' বলে কটুক্তি করেন। কিন্তু মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ এবং তাঁর অমৃতবাজার পত্রিকা কখনও 'বারবণিতা' শব্দটির প্রয়োগ করেননি। অধিকন্তু মহাত্মা শিশিরকুমার ব্যক্তিগতভাবে এবং অমৃতবাজার পত্রিকা বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনেত্রী নিয়ে অভিনয় করাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হিসেবে অভিনন্দিত করেন। অমৃতবাজার পত্রিকায় স্ত্রীলোক সমাজ-পরিত্যক্তা ও ধর্মভ্রষ্টা শব্দগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়, 'বারবণিতা' শব্দ নয়। ১৫ জানুয়ারী ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের অমৃতবাজার পত্রিকায় স্ত্রী অভিনেত্রী নিয়ে অভিনয় করায় বেঙ্গল থিয়েটারকে সমর্থনও আমার মন্তব্যের সাক্ষ্য দেবে।

...১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে দুর্গেশনন্দিনী, কাদম্বরী, লেডী অফ দি লেকের অনুসরণে অপূর্ব কারাবাস, এরাই আবার বাঙ্গালী সাহেব, প্রভাবতী, বিদ্যাসুন্দর যেমন কর্ম তেমন ফল, মালতীমাধব, মা এসেছেন, রুক্মিণী হরণ, উভয় সংকট, পারে-শিক্ষা, আজমীর কুমারী, কেনানীরূপণ বাংগার সাখালসান অশ্রুমতী, মণিমালিনী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বর্ধমানের মহারাজ দুর্গেশনন্দিনী নাটক দেখে মুগ্ধ হয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের পরিচালক মন্ডলীতে যোগদান করেন।

ইন্ডিয়ান ডেইলী নিউজ-এর ২৩ নভেম্বরের একটা সংবাদে পাওয়া যায় যে, বেঙ্গল থিয়েটার বর্ধমান মহারাজের আমন্ত্রণে কালনা গিয়ে অভিনয় করে আসেন এবং মহারাজ নানা ভাবে সম্প্রদায়কে পুরস্কৃত করেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটার মঞ্চে গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা এবং কিছুদিন 'দি নিউ এরিয়ান থিয়েটার' অভিনয় করেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটার সুসংস্কৃত করা হয়।

বেঙ্গল থিয়েটার প্রসংগ এখানে আপাততঃ স্থগিত রেখে আমরা গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের আলোচনা শুরু করছি।

ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনয় দেখতে যেয়ে শরৎচন্দ্র ঘোষ এবং বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ৮ সেপ্টেম্বর বেঙ্গল থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় মোহন্তের এই কী কাজ নাটক। এই নাটকটি তখন অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের ন্যাশনাল থিয়েটারের ধর্মদাস সুর আর হিন্দু ন্যাশনালের মধ্যে অধিকর্তা নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই গড়ে তুলেছিলেন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার। রাজেন্দ্র পালের নেতৃত্বে তৃতীয় পর্যায়ের ন্যাশনাল থিয়েটার যখন সান্যাল বাড়ীতে অভিনয় করছিলেন—তখনই এরা মফঃস্বলে এবং এখানে ওখানে অভিনয় করতে শুরু করেন।

বেঙ্গল থিয়েটারে যখন মোহন্তের এই কী কাজ নাটকটি জনপ্রিয়তার সংগে অভিনীত হচ্ছিল তখন নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মদাস সুর আর ভুবনমোহন নিয়োগী 'মোহন্তের এই কি কাজ' নাটকটি দেখতে গিয়ে টিকিট না পেয়ে অপমানিত হয়ে ফিরে আসেন। ভুবনমোহনবাবুর বাড়ীতেই নীলদর্পণের রিহার্সাল বসতো। ধর্মদাসবাবুর আত্মীয় ছিলেন তিনি এ [illegible] পিতৃ বিয়োগের পর তার হাতে অর্থ এসে পড়েছে। নগেন্দ্রনাথ এবং ধর্মদাসবাবু ভুবনবাবুকে একটু উত্তেজিত করে নিয়েই বললেন, এসো স্থায়ী মঞ্চ বেঁধে আমরাও অভিনয় করি। এভাবে আর অপমানিত হওয়া যায় না।

তাই হলো। ধর্মদাসবাবুর উদ্যোগে ভুবনমোহন নিয়োগীর অর্থে গড়ে উঠলো ৬ বিডন স্ট্রীটে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার। মহেন্দ্রনাথ দাসের জমি ৫ বছরের লীজে মাসিক চল্লিশ টাকায় ভাড়া নেওয়া হলো। সমস্ত মঞ্চগৃহটির পরিকল্পনা করলেন ধর্মদাস সুর। মিঃ গ্যারীক নামক জনৈক ইংরেজকে দিয়ে ড্রপসিন ও আর দু একখানা সিন মাত্র আঁকানো হয়েছিল। বর্তমান মিনার্ভা থিয়েটারটি এই মাটিতেই অবস্থিত।

সোমবার ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মহাসমারোহে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। সভাপতিত্ব করেন নবগোপাল মিত্র। সম্পূর্ণ কাঠ দিয়ে বাড়ীটি নির্মিত হয়। ৩১ ডিসেম্বর ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে কাম্য কানন নাটক দিয়ে নাট্যগৃহ উদ্বোধনের প্রস্তুতি চলে।

২৫ ডিসেম্বর ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের অমৃতবাজার পত্রিকার বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায়, ৫০টি সমবেত কণ্ঠে উদ্বোধনী সংগীত গীত হবে। কাম্যকানন নাটক। পরিসমাপ্তিতে ইয়ং বেঙ্গল প্রহসন। ডি, গ্যারীক অংকিত মনোরম দৃশ্য পট।

ধর্মদাসবাবুর নাম ম্যানেজাররূপে বিজ্ঞাপিত হয়।

৩১ ডিসেম্বর। ১৮৭৩। অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। টিকেট না পেয়ে অনেকে ফিরে গেছেন। বিডন স্ট্রীট লোকে লোকারণ্য! ৫টি দৃশ্য অভিনীত হয়েছে। হঠাৎ "আগুন আগুন" বলে চীৎকারে চতুর্দিক ভরে উঠলো। শেষ পর্যন্ত অগ্নি নির্বাপিত হলেও—একটা আনন্দের রজনী পরম বিষাদে পরিণত হলো। সেই থেকে অগ্নিদেবতার বিশেষ দোষ দেখা যায় এখানকার মঞ্চগৃহকে ঘিরে। অনেকে বলেন—এই অগ্নিসংযোগের মূলে বেঙ্গল থিয়েটারের হস্তক্ষেপ ছিল। ১ জানুয়ারী, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গভেডিয়ারে অনুষ্ঠিত সখের বাজারে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার নীলদর্পণ অভিনয় করেন। ওদিকে নিজেদের নাট্যগৃহটিরও সংস্কার সাধন করে নিয়ে ১০ জানুয়ারী ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বিধবা-বিবাহ নাটক মঞ্চস্থ করেন।

৩১শে ডিসেম্বর ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ উদ্বোধন রজনীতে যাঁরা টিকেট কাটেন, পরবর্তী এক অভিনয়ে উক্ত টিকেটে তাদের নাটক দেখবার সুযোগ দেওয়া হয়।

১৭ই জানুয়ারী মনোমোহন বসুর প্রণয় পরীক্ষা, ২৪শে জানুয়ারী মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী, ৭ই ফেব্রুয়ারী বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা এবং ১১ই জানুয়ারী ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের বাজারের লড়াই মঞ্চস্থ হয়।

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ এবারও গিরিশচন্দ্রকে আবার অভিনয় করতে ফিরিয়ে আনেন। বাজারের লড়াই নাটক তারই সূচনা। ন্যাশনাল আর গ্রেট ন্যাশনাল সম্প্রদায় ১৪ই ফেব্রুয়ারী সম্মিলিতভাবে মৃণালিনীর অভিনয় করেন। গিরিশচন্দ্র পশুপতি চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। ২১শে ও ২৮শে ফেব্রুয়ারীতেও মৃণালিনী মঞ্চস্থ হয় গ্রেট ন্যাশনালে।

৭ই মার্চ বিষবৃক্ষ। ১৮ই মার্চ নবীন তপস্বিনী এই অভিনয়ই ৩১শে ডিসেম্বরের দর্শকরা ওদিনের টিকেটেই দেখবার সুযোগ পান।

৪ঠা এপ্রিল কপালকুণ্ডলা, ১৮ই এপ্রিল হেমলতা এবং ৩০শে মে কুলীন-কন্যা অভিনীত হবার পর সম্প্রদায় বহরমপুরে অভিনয় করতে যায় এবং কলকাতায় প্রায় ৩ মাস অভিনয় বন্ধ থাকে। বেঙ্গল থিয়েটার অভিনেত্রী নিয়ে অভিনয় করাতে গ্রেট ন্যাশনাল প্রতিযোগিতায় কিছুতেই এঁটে উঠতে পারছিল না। তাই গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারও অভিনেত্রী নিয়ে অভিনয় করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। অর্ধেন্দু মুস্তাফী, ধর্মদাস সুর অভিনেত্রী নিয়ে অভিনয় করার বিরুদ্ধে অভিমত ব্যক্ত করেন এবং মতিলাল সুরের নেতৃত্বে ন্যাশনাল থিয়েটার নাম দিয়ে মফস্বলের বিভিন্ন

মে প্রবাহে পরিবৃতে/তাপস সেন ও মহুয়া রায়চৌধুরী

স্থানে অভিনয় শুরু করেন। ধর্মদাসবাবুর স্থানে এবার নগেন্দ্রনাথ সম্প্রদায়ের ম্যানেজার হন।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে 'সতী কি কলঙ্কিনী' নাটকে সর্বপ্রথম ১। রাজকুমারী ২। ক্ষেত্রমণি, ৩। যদুমণি, ৪। লক্ষ্মীমণি, ৫। হরিদাসী এই ৫ জন অভিনেত্রী গ্রহণ করা হয়। ১৭ই সেপ্টেম্বর অমৃতবাজার পত্রিকায় এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যায়। গিরিশচন্দ্র তখন কিছু দিনের জন্য থিয়েটার থেকে দূরে থাকেন। সতী কি কলঙ্কিনী অসম্ভব জনপ্রিয়তার্জন করে।

এরপর থেকে প্রতিটি নাটকেই মহিলা নিয়ে অভিনয় হতে থাকে।

৩রা অকটোবর পুরু বিক্রম, ১০ অকটোবর সতী কি কলঙ্কিনী ও ভারতে যবন, ৩১শে অকটোবর রুদ্রপাল, ১৪ই নভেম্বর আনন্দ কানন, ২১শে নভেম্বর আনন্দ কানন ও কিঞ্চিৎ জলযোগ এবং ২৮শে নভেম্বর ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে অমৃতলাল বসুর সাহায্যে রুদ্রপাল অভিনীত হয়। এবার আবার স্বত্বাধিকারী ভুবনমোহন নিয়োগীর সঙ্গে টাকার অংক নিয়ে নগেন্দ্রনাথের বিরোধ দেখা দিল। তিনি গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কম্পানী প্রতিষ্ঠা করে মফস্বলে কিছুদিন অভিনয় করবার পর বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয় শুরু করেন।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে হরলাল রায় রচিত শত্রু সংহার (বেণী সংহার) ২রা ডিসেম্বর ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে মঞ্চস্থ হয় আর এই নাটকেই নাট্যসম্রাজ্ঞী বিনোদিনীর সর্বপ্রথম মঞ্চাবতরণ। বিনোদিনীর বয়স তখন ১০।১১ বছর হবে। ১২ই এবং ১৯শে ডিসেম্বরও শত্রু সংহার নাটক মঞ্চস্থ হয়। ২৬শে ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হয় বঙ্গের সুখাবসান।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে ২রা জানুয়ারী শরৎ সরোজিনী নাটক মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকেই সুকুমারী চরিত্রে অভিনয় করে গোলাপসুন্দরী সুকুমারী নামে খ্যাতা হয়ে ওঠেন।

ধর্মদাসবাবু নগেন্দ্রনাথের পরে আবার গ্রেট ন্যাশনালে এসে যোগদান করেন এবং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে গ্রেট ন্যাশনালের একটি দল পশ্চিম পরিভ্রমণে যান। আর একটি দল কলকাতাতেই অভিনয় করতে থাকেন। কলকাতার মঞ্চে শরৎ সরোজিনী, রাসলীলা, সধবার একাদশী, জামাইবারিক, নয়শো রূপেয়া সজ্জনদর্পণ নন্দনকানন প্রভৃতি নাটক মে মাস পর্যন্ত অভিনীত হতে থাকে। ধর্মদাসবাবু সম্প্রদায় নিয়ে পশ্চিম যাত্রা করলে মহেন্দ্রলাল বসু কলকাতা মঞ্চের ম্যানেজার রূপে কাজ করতে থাকেন। কলকাতার মঞ্চে ১৭ই জুন ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে অমৃতলাল বসুর হীরকচূর্ণ, ৩রা জুলাই পদ্মিনী প্রভৃতি মঞ্চস্থ হয়।

ভুবনবাবু থিয়েটার ব্যবসায় বেশ লোকসান খাচ্ছিলেন। ধর্মদাসবাবু সদলবলে পশ্চিম থেকে প্রত্যাবর্তন করলে ভুবনবাবুর সঙ্গে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। ভুবনবাবু তখন কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার মঞ্চ লীজ দেন। নতুন বিধিব্যবস্থায় ৭ই আগষ্ট ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে মঞ্চস্থ হয় পদ্মিনী। আগষ্ট সেপ্টেম্বর অকটোবর এই তিন মাস কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় থিয়েটার চালান। তিনিও ঋণভারে জড়িত হয়ে পড়াতে থিয়েটার ছেড়ে দেন এবার আসেন উপেন্দ্রনাথ দাস পরিচালক হয়ে। ম্যানেজার হন নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু। নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেট ন্যাশনাল পরিত্যাগ করে গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা নাম নিয়ে একটা সম্প্রদায় গড়ে মফঃস্বলে অভিনয় করবার

পর বেঙ্গল থিয়েটার মঞ্চে অভিনয় করতে থাকেন। এবং পরে বেঙ্গল থিয়েটারে সাদরে আত্মপ্রকাশ করেন। বেঙ্গল থিয়েটারে ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে নগেন্দ্রনাথের গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা সতী কি কলঙ্কিনী অভিনয় করেন। এবং ৬ই মার্চ, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে মাইকেলের মেঘনাদ বধ নাটক অভিনয় করেন। মেঘনাদ, দুর্গেশনন্দিনী, মলহররাও গাইকোয়াড়, মৃণালিনী প্রভৃতি নাটক বেঙ্গল থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে মতবিরোধ হবার ফলেই অমৃতলাল গ্রেট ন্যাশনালে যোগদান করেছিলেন।

বেঙ্গল থিয়েটার মঞ্চে গ্রেট ন্যাশনাল অপেরার 'দি নিউ এরিয়ান থিয়েটার' ১৪ই আগষ্ট ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে উপেন্দ্রনাথ দাসের সুরেন্দ্র বিনোদী প্রথম মঞ্চস্থ করে। ২১শে ও ২৮শে অগষ্টও সুরেন্দ্র বিনোদিনী অভিনীত হয়।

৪ঠা সেপ্টেম্বর বীরনারী, ১১ই সেপ্টেম্বর রমেশ দত্তের বঙ্গ বিজেতা, ১৮ই সেপ্টেম্বর বঙ্গবিজেতা ও মাকাল ফল, ২৫শে সেপ্টেম্বর কবি নবীনচন্দ্র সেনের পলাশীর যুদ্ধ মঞ্চস্থ হয়। এই সময় বেঙ্গল থিয়েটার সুসংস্কৃত করা হয়। আর উপেন্দ্রনাথ দাস ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে পরিচালক রূপে যোগদান করেন।

কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর নতুন পরিচালনায় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার পরিচালিত হতে থাকে। নতুন পরিচালনায় ৫ই ডিসেম্বর ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বৃত্র সংহার, ২৫শে ডিসেম্বর হীরকচূর্ণ, ২৬শে ডিসেম্বর সরোজিনী মঞ্চস্থ হয়।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী প্রকৃত বন্ধু মঞ্চস্থ হয়। তারপর সরোজিনী, বিদ্যাসুন্দর, সতী কি কলঙ্কিনী, গজদানন্দ প্রহসন, হনুমানচরিত, কর্ণাটকুমার অভিনীত হবার পর ১লা মার্চ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে মঞ্চস্থ হয় সুরেন্দ্র বিনোদিনী। ৪ঠা মার্চ সতী কি কলঙ্কিনী ও উভয় সংকট অভিনীত হবার কথা। সতী কি কলঙ্কিনী অভিনীত হচ্ছে এমন সময় পুলিশ গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে থিয়েটারে উপস্থিত হয়।

৪ঠা মার্চ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ভুবনমোহন নিয়োগী, উপেন্দ্রনাথ দাস, অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, রামতারণ সান্যাল প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করে এবং ৫ই মার্চ আদালতে চালান দেওয়া হয়। সুরেন্দ্র বিনোদিনী নাটকের অশ্লীলতার বিরুদ্ধে আসামীদের অভিযুক্ত করা হয়। শেষ পর্যন্ত আসামীরা মুক্তি পেলেও ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ লর্ড লিটন 'দি ড্রামেটিক পারফরমান্স এ্যাক্ট' অনুমোদন করেন। বাংলা নাট্যশালার বুকের ওপর জগদ্দল পাষাণের মত চেপে বসলো 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন'।

ভুবনমোহন নিয়োগী সর্বস্বান্ত হলেন। উপেন্দ্রনাথ বিলেত যাত্রা করলেন। অমৃতলাল বসু কিছুদিনের জন্য আন্দামান চলে যান। নাট্যশালার সঙ্গে জড়িত থাকলে কন্যাদের বিবাহাদিতে বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে আশঙ্কায় নগেন্দ্রনাথও মঞ্চের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করলেন। নানান হাঙ্গামার মধ্যে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ২রা ডিসেম্বর, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে পারিজাত হরণ ২০শে ডিসেম্বর আদর্শ সতী মঞ্চস্থ হয়।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৭৬। চার বছরও পূর্ণ হয় নি বাংলার সাধারণ নাট্যশালার। এই চার বছরে নানান দলাদলির মধ্য দিয়েও ২টি স্থায়ী মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু অকস্মাৎ বিরাট এক ঝড় বয়ে গেল সাধারণ নাট্যশালার ওপর দিয়ে। মনে হলো তার প্রাণটুকু বহির্গত হয়ে গেল। কিন্তু না তা গেল না। সেই নিঃসীম অন্ধকারের সামনে মাভৈঃ মন্ত্র নিয়ে নতুন [illegible] নতুন করে আবির্ভূত হলেন নটগুরু গিরিশচন্দ্র। গ্রেট ন্যাশনাল মঞ্চে ন্যাশনাল থিয়েটার-এর কর্ণধার রূপে এলেন তিনি।

বাংলার সাধারণ নাট্যশালার প্রতিষ্ঠার মূলে যে জটিলতা আছে তারই জট খুলে তুলে ধরতে চেয়েছি বর্তমান আলোচনা পর্যন্ত। যেসব ব্যক্তিদের নামের সঙ্গে ইতিমধ্যেই পাঠক সাধারণ পরিচিত হয়েছেন— আগামী সংখ্যা থেকে সেই সব স্মরণীয় পূর্বসূরীদের সঙ্গে পাঠক সাধারণকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে পুনরায় আমরা ধারাবাহিকভাবে নাট্যশালার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করবো। (ক্রমশঃ)

কালীশ মুখোপাধ্যায়

'হঠাৎ দেখা পথের মাঝে
কান্না তখন থামে নাম'—

অমৃত পত্রিকা ও থিয়েটার সেন্টারের যুগ্ম উদ্যোগে পরিবেশিত 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে একটি সন্ধ্যা' অনুষ্ঠানটিতে ঠিক এই অনুভবটি হোল। বাংলার সংস্কৃতি-লোকে প্রেমেন্দ্র মিত্র একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, প্রতিদিনের নানা ঘটনার মধ্যে এই সংবাদটিও স্রোতের মত প্রবহমান হলেও অনুভূতির ধার যেন ক্ষয় গিয়েছিলো। সেদিন সন্ধ্যায় প্রেমেনবাবু রচিত নানা গান, (কোনোটি ছায়াচিত্রের কোনোটি নাটকের কোনোটি শুধু অকারণ পুলকের) কবিতা নাটক নতুন করে আলোকপাত করল তাঁর নানামুখী ব্যক্তিত্বের বিচিত্র দিকগুলির প্রতি। এ যুগের মানুষ নতুন করে চিনল কল্লোল-যুগের সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রকে, তাঁর সতীর্থরা নতুন করে হাত মেলালেন যেন জীবনের ঊষা লগ্নের প্রথম প্রতিজ্ঞার সঙ্গে, অনুজ কবি সাহিত্যিকরা তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর নিরিখে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালেন অগ্রজ স্রষ্টার প্রতি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে একটি সন্ধ্যা' যেন এক মধুর মিলন লগ্ন, পরিচিতজনাকে প্রতিদিনের ধুলোর আবরণ সরিয়ে নতুন করে পাওয়া—যে পাওয়ার স্থায়িত্বকে দীর্ঘ করতে ইচ্ছে করে।

অনুষ্ঠান শুরু হোলো সমবেত কণ্ঠে তুরু বছর আগের লেখা 'বেনামী বন্দর

তুষার-জয়ন্তী অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করছেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়

কবিতাটির সঙ্গীতরূপ দিয়ে। এ গানে পেলাম কবির তরুণ মনের বিদ্রোহী আবেগকে যে আবেগের প্রচণ্ডতার আড়ালে আজ শ্রমিকের প্রাণান্তকর শ্রমের জন্য একফোঁটা চোখের জল। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সবিতাব্রত, গীতশ্রী দীপান্বিতা রায়, মৃদুলা মজুমদার আরো অনেকে।

এরপর সাহিত্যিক শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় প্রেমেনবাবুর উপন্যাস ও গল্প নিয়ে আলোচনা করেন এবং বই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন 'পাঁক' উপন্যাসটির—যেখানে সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের দুঃখ-বেদনাকে রূপ দেওয়া হয়েছে সহজ ও হৃদয়-ছোঁওয়া ভাষায়।

তৃতীয় অনুষ্ঠানে প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত এবং পরিচালিত ছায়াছবি 'যোগাযোগ' চিত্রে কানন দেবীর গাওয়া 'হারা-মরুনদী' গানটি গেয়ে শোনালেন শ্রীমতী গীতশ্রী। এ অনুষ্ঠানে পেলাম গীতিকার, চিত্রকার ও নাট্যকার প্রেমেন্দ্র মিত্রকে। আর একটি উপভোগ্য দৃশ্য গীতশ্রীর কণ্ঠে নিজের গাওয়া গানটি শুনে করতালি দিয়ে শিল্পীকে অভিনন্দিত করেছেন সামনের সারিতে বসা স্বয়ং কানন দেবী।

এ ছাড়াও একদা 'সাহসিকা' ছায়াচিত্রে সুপ্রভা সরকার গীত 'নয়নে মোর নাই শুকালো' গানটি পরিবেশন করলেন শ্রীমতী মৃদুলা মজুমদার। 'ডাকিনীর চর' চিত্রে সত্য চৌধুরী পরিবেশিত 'অন্ধকারের অতল তলে' গানটি শোনা গেল সবিতাব্রত দত্তর কণ্ঠে। বর্তমানের পটভূমিকায় ক্ষণিকের জন্য অতীত মূর্ত হয়ে একটি ভিন্ন পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিলো।

কবি মণীন্দ্র রায় তাঁর প্রগতিশীল দৃষ্টির আলোয় মেলে ধরলেন প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিকৃতিকে। সুন্দর সুললিত ভাষণের কয়েকটি উপমায় হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতই প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিসত্তা মূর্ত হয়ে উঠল। যেমন খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে-উঠতে হঠাৎ পাওয়া একটি পাইন গাছের তলায় বিশ্রাম করার কোমল অনুভূতি অথবা কঠিন বরফের মাঝখান দিয়ে ঊর্ধ্বে তরঙ্গিত বেগুনী পুচ্ছ-গুচ্ছের স্বপ্নের মর্তে মধুর মানব-প্রেমিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা। 'এ্যান এস্কেপ ফ্রম পার্সোনালিটি'।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছখানি কবিতা পড়ে শোনালেন শম্ভু মিত্র। মানুষের জীবনের ক্লান্তি, স্পন্দন বিদ্রোহ গ্লানি ও এসবের থেকে উত্তরণের টুকরো টুকরো আবেগ ও মন্দ্রসুর থেকে আর্তির উঁচু সুরে উঠে আবার মুহূর্তের বাঁধানছাড়া উপলব্ধিকে সংবৃত্ত মধ্যগ্রামে নামিয়ে এনে কবির ভাবনার দোলা, প্রতিটি কথার সুর—কবিতার আড়ালের অনামী রাগিনীকে যেভাবে শ্রোতাদের হৃদয়ে নাড়া দিয়েছিলো তাকে শম্ভু মিত্রর সৃষ্টি বলব না প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শম্ভু মিত্রের মিলিত সৃষ্টি বলব?

অমৃত পত্রিকা ও থিয়েটার সেন্টারের উদ্যোগে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে একটি সন্ধ্যা/তুষার-কান্তি ঘোষ উপহার তুলে দিচ্ছেন প্রেমেন্দ্র মিত্রের হাতে।　　ফটো: সুকুমার রায়

উৎসবের প্রথমার্ধের মধুর পরিসমাপ্তি ঘটল শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের সরস, মধুর ভাষণ দিয়ে। কোনো ভারী কিছুর মধ্যে না গিয়ে কয়েকটি হাল্কা হাসির রঙীন ভেলা উৎসবের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে যেন ইনি সারা পরিবেশকে আনন্দে মুখর করে তুললেন।

উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে কবি, চিত্রকার ঔপন্যাসিক ও গীতিকার প্রেমেন্দ্র মিত্রের হাতে একটি টেপ রেকর্ডার উপহার দিলেন শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। পরিশেষে তরুণ রায় পরিচালিত 'ওরা থাকে ওধারে' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

অনুষ্ঠান পরিবেশনার পরিকল্পনায় অভিনবত্ব লক্ষ্য করবার মতই। মঞ্চের একপাশে দেবরাজ রায় বসে প্রতিটি অনুষ্ঠান ঘোষণা করে বেশ একটি বৈঠকী, ঘরোয়া পরিবেশ সৃষ্টি করেন। ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার মঞ্চ ধীরে ধীরে আলোকিত হওয়ার আইডিয়াটিও সুন্দর।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে একটি সন্ধ্যার উদ্যোক্তারাই জাতীয় কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছেন।

—চিত্রাঙ্গদা

সন্ন্যাসী রাজা/উত্তমকুমার
পরিচালনা : পীযূষ বসু। ফটো : অমৃত

জীবন রহস্য চিত্র সমালোচনা

প্রযোজনা : তপেশ ঘোষ ও জয়ন্ত দেব। পিকচার্স। কাহিনী ও পরিচালনা : সলিল রায়। চিত্রনাট্য : তপেশ ঘোষ। সঙ্গীত : অভিজিৎ ব্যানার্জি। সম্পাদনা : শিবসাধন ভট্টাচার্য। চিত্র গ্রহণ : বিমান সিনহা (পুণা) কণ্ঠসঙ্গী : বাণী দত্ত ও অতুল চট্টোপাধ্যায়। গান : পুলক ব্যানার্জি। শব্দ, পুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়। অভিনয়ে : প্রাণ, মাধবী মুখার্জি, শুভেন্দু চ্যাটার্জি, কল্যাণী মণ্ডল, দিলীপ রায় কমল মিত্র, জ্ঞানেশ মুখার্জি, তরুণকুমার, হরিধন নীলাদ্রি বসু, শ্রীকুমার, পদ্মা দেবী অর্পণা দেবী, সীমা সরকার মায়া রায় বীরেন চ্যাটার্জি প্রভৃতি। বিগত ৩১শে মে মাধুরী ডিস্ট্রিবিউটার্সের পরিবেশনায় উত্তরা পূরবী চিত্রগৃহে মুক্তি লাভ করেছে। ১লা জুন, রকসী মিনিয়েচারে চিত্রখানি আমরা দেখে এসেছি।

ধনীর ছেলে প্রশান্ত। সংসারে মা ও স্ত্রী রমাকে নিয়ে সংসার। সংসারে অভাব নেই। বছর খানেকের বেশী রমার বিয়ে হয়েছে। হঠাৎ রমার এক অসুখ দেখা গেল। ৬টা থেকে ৬-৩০টা পর্যন্ত অজ্ঞান হয়ে থাকে। গৃহচিকিৎসক ডাঃ বোস কিছুতেই এই রোগ সারাতে পারছেন না। ধনী পিতার একমাত্র মাতৃহীন সন্তান রমা। তাই তার বাবা মিঃ রায় চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি স্থির করলেন সুইজারল্যান্ডে যাবেন, মেয়ের চিকিৎসা করাতে। ইতিমধ্যে ডাঃ বোস তাঁর পরিচিত মনস্তত্ত্ব বিশেষজ্ঞ ডাঃ কোলকে একবার দেখাবার অনুরোধ করলেন। ডাঃ কোলকে আনানো হলো। তিনি এসে রমা প্রশান্ত এবং মিঃ রায়কে এককভাবে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু কোন সদুত্তর পেলেন না। রমার জীবনে কোন অতীত আছে কিনা তাই ডাঃ

কৌল জানতে চেয়েছিলেন। রমা ভাল সঙ্গীতশিল্পী। একটি গানের স্কুলে সে বিয়ের আগে সংগীত শিক্ষা দিত। এই সূত্র ধরে ডাঃ কৌল গানের স্কুলে আসেন। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের সঙ্গে যখন কথা বলছিলেন রমার বিষয়ে—তখন মেয়েরা বাইরে এসে ভিড় করাতে জানতে পারেন যে, একটি ট্যাকসী ৬টা বাজতে না বাজতেই সংগীত বিদ্যালয়ের সামনে এসে দাঁড়ায়। ৬-৩০টা অবধি সম্মোহিত হয়ে থেকে আবার চলে যায়। ডাঃ কৌল ট্যাকসী চালকের কাছ থেকে গানের স্কুলের সূত্র ধরে রমার অতীত জীবনের রহস্যোদ্ঘাটন করে রমাকে সুস্থ করে তোলেন। রমার বাবার ব্যবসা ঠিক সহজ পথে পরিচালিত হতো না। চোরাই মালের কারবার ছিল তাঁর। এ বিষয়ে তাঁর দক্ষিণ হস্ত ছিল বন্ধুর ছেলে রঞ্জন। বস্তিতে থাকতো। দলের মস্তান ছিল। লেখাপড়া জানতো না। এক পিসীমার কাছে থাকতো রঞ্জন। রমা রঞ্জনকে পছন্দ করতো না। ওর বাবাও এ নিয়ে অনুযোগ করতেন। গানের স্কুল থেকে আসবার সময় একদিন রমা ট্যাকসীর জন্য দাঁড়িয়েছিল—হঠাৎ রঞ্জন তার বন্ধু অর্জুন সিং-এর ট্যাকসী নিয়ে সেখানে হাজির হয় এবং রমাকে বাড়ী পৌঁছে দেয়। সেই থেকে প্রতিদিন অর্জুন সিং-এর ট্যাকসীতে রঞ্জন নির্দিষ্ট সময়ে গানের স্কুল থেকে রমাকে নিয়ে এখানে ওখানে ঘুরে বাড়ীতে পৌঁছে দিত। দুজনে ধীরে ধীরে দুজনের প্রণয়াসক্ত হয়। রঞ্জন রমার অনুপ্রেরণায় বাড়ীতে লেখাপড়া শিখতে শুরু করে। ভদ্র-জীবন যাপন করার জন্য চাকরীর সন্ধানে থাকে এবং লরী চালনার একটি চাকরীও পেয়ে যায়। মিঃ রায়ের কাজ করতে অস্বীকার করে। মিঃ রায় রঞ্জনের সঙ্গে তাঁর মেয়ের মেলামেশা জানতে পারেন, এ বিষয়ে মেয়েকে হুঁশিয়ার করে দিয়েও কোন ফল পান না। তখন রঞ্জনের এক সাকরেদকে কাজে লাগান এবং তাঁকে রঞ্জনকে মেরে ফেলায় প্ররোচিত করেন। রঞ্জনের সহকারীর চক্রান্তে রঞ্জনের লরী ব্রেক বিগড়ে যাওয়াতে একটি লোক চাপা পড়ে—রঞ্জনকে শেষ পর্যন্ত পুলিশের ভয়ে অর্জুন সিংহের ঘরে পালিয়ে থাকতে হয়। রঞ্জনের প্রতি তাদের বস্তির একটি মেয়ে প্রণয়াসক্ত ছিল। রঞ্জনের সাকরেদ তাকে চক্রান্ত করে বারবণিতার জীবনযাত্রায় ঠেলে দেয়। রঞ্জন জানতে পেরে তাকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করে। এই নিয়ে সাকরেদের সঙ্গে তার মন-কষাকষি আরো বৃদ্ধি পায়। মিঃ রায়ের প্ররোচনায় সাকরেদ দ্বারা রঞ্জন নিহত হয়।

ডাঃ কৌলের বিবৃতিতে সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটিত হয়। প্ল্যানসেট দ্বারা রঞ্জনের আত্মার সঙ্গে ডাঃ কৌল যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং এ বিষয়ে বস্তির মেয়ে ময়নাকে মিডিয়াম করা হয়। অর্জুন সিং আর রমার ওপর রঞ্জনের আত্মা ঐ নির্দিষ্ট

মঞ্জু দে প্রযোজিত-পরিচালিত : শজারুর কাঁটা। সতীন্দ্র ভট্টাচার্য-বাসবী নন্দী

[illegible]/শেখর চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময় [illegible] এবং রত্না [illegible]

[illegible]/অপর্ণা সেন
পরিচালনা : দীনেন গুপ্ত। ফটো : অমৃত

সময়ে ভর করতো। তাই ওরা সম্মোহিত হতো। ডাঃ কোলের অনুরোধে অশরীরী আত্মা রমাকে ছেড়ে যায় এবং রমা সুস্থ হয়ে ওঠে। গল্পটির মধ্যে নতুনত্ব আছে। সারা পৃথিবীতে 'প্লানচেট' নিয়ে যে মত্ততা দেখা যায়—তাকেই বৈজ্ঞানিক ভাবে একজন চিকিৎসকের মধ্য দিয়ে প্রয়োগ করা হয়েছে। আত্মার অবিনশ্বরতা এবং ভৌতিক জগতের অবস্থিতি সম্পর্কে যাদের বিশ্বাস আছে, বর্তমান ছবিটি তাদের ভাল লাগবে। মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা পার্থিব আকর্ষণে মুক্তি পায় না। বিশেষ করে যাদের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। এরা অদেহী হয়ে বিচরণ করে এবং প্রিয় ব্যক্তিদের মধ্য দিয়ে মাঝে মাঝে নিজেদের অস্তিত্বের প্রকাশ করে। হিন্দু ধর্মের বিশ্বাসানুযায়ী এইসব আত্মার মুক্তির জন্য পিণ্ড দান ও অন্যান্য শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের বিহিত আছে। এই বিশ্বাসই চিত্রকাহিনীর রহস্যোদ্ঘাটনের মধ্য দিয়ে প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

খুব সহজ এবং সাধারণভাবে পরিচালক সলিল রায় চিত্রটির পরিচালনা করেছেন। অনেকের কাছে তিনি বাহবা না পেতে পারেন, কিন্তু নোংরামিবর্জিত একখানি চিত্রোপহার দেবার জন্য পরিচালককে ধন্যবাদ দেই। সবচেয়ে বড় কথা তিনি টেকনিকের মারপ্যাচ দেখান নি। ছবিটি দেখে দর্শকেরা খুশী হবেন।

অভিনয়ে বম্বের প্রাণ-এর কথাই সর্বাগ্রে বলতে হয়। আগাগোড়া অপূর্ব দক্ষতায় তিনি ডাঃ কোল-এর চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন। মিঃ রায় চরিত্রে কমল মিত্র, ডাঃ বোস এবং প্রশান্ত চরিত্রে যথা-

কোরাস/প্রীতি সেন, স্নিগ্ধা মজুমদার
এবং [illegible]। [illegible] : [illegible] সেন

পশ্চিমবঙ্গের সমবায় ও সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী ডঃ জয়নাল আবেদীন রাজ্য সরকার কর্তৃক হুকুমে নিউ থিয়েটার্সের ২নং স্টুডিও অধিগ্রহণ উপলক্ষে প্রিন্স আনোয়ার শা' রোডে এক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

ক্রমে তরুণকুমার ও দিলীপ রায়, নায়ক রঞ্জন চরিত্রে শুভেন্দু, অর্জুন সিং রূপে জ্ঞানেশ মুখার্জি এবং রঞ্জনের সহকারীর চরিত্রাভিনেতাকেও প্রশংসা করবো। রমা চরিত্রে মাধবী চরিত্রানুযায়ী অভিনয় করেছেন। ময়না চরিত্রে শ্রীমতী কল্যাণী মণ্ডলের সম্ভাবনার পরিচয় পেয়েছি। উপযুক্ত পরিচালকের হাতে পড়লে শ্রীমতী উন্নতি করবে।

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গীত পরিচালনা ভাল লাগবে। চিত্র গ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে নিন্দনীয়। পুণা ইনস্টিটিউট থেকে বিমান সিনহা কি শিখে এসেছেন বুঝতে পারলাম না। কলেবর কমানো উচিত ছিল। পরিচালক, প্রযোজক সবাই নতুন। বাংলা ছবির এই দুর্দিনে চিত্রখানির যান্ত্রিক দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও জীবন রহস্যকে পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য দর্শকদের অনুরোধ করি। ছবি দেখে তাঁরা খুশী হবেন।

ইসলামিয়া হাসপাতালের সাহায্যে

মেরে গরীব নওয়াজ/হিন্দী

পরিচালনা : জি ঈশ্বর। সংগীত : কাজাল রাজস্থানী। অভিনয়ে : সতীশ কয়োল্ল, নাজনীন, নাজির হোসেন, বীণা, আশা পুকরী প্রভৃতি। বিগত ৩১শে মে জ্যোতি সিনেমায় মুক্তি লাভ করে। সঙ্গীতবহুল এই রঙিন হিন্দী চিত্রখানি মুসলমান পরিবারের কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে। নায়ক একজন কবি। তাঁর কবিত্ব শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে নায়িকা ভালবাসে এবং তার নির্বাক প্রেম বিবাহবন্ধনের মধ্য দিয়ে সার্থক হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এক দুর্ঘটনায় নায়িকা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং নায়ক অতি আধুনিকা আর একজন নারীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। নায়কের জীবন বিষময় হয়ে ওঠে। মূল নায়িকাও নানান দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে পুনরায় নায়কের সঙ্গে মিলিত হন।

সহজ সরল ভাবে পরিচালক চিত্র কাহিনী তুলে ধরেছেন। মুসলিম পরিবারের নিয়ম নিষ্ঠার রূপায়ণ চিত্রটির আকর্ষণ। অভিনয়ে নাজনীনকে ভাল লাগবে। হিন্দি চিত্র জগতের কয়েকজন পুরোন শিল্পীদের অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য। চিত্রখানি সংগীত-বহুল এবং হিন্দি ছবির দর্শকদের ভাল লাগবে। আমাদের কাছে মাঝে মাঝে ক্লান্তিকর মনে হয়েছে। যান্ত্রিক কলাকুশলতা প্রশংসনীয় নয়। উগ্র এবং চোখের পীড়াদায়ক।

চিত্রখানির প্রথম প্রদর্শনীর অর্থ ইসলামিয়া হাসপাতালের উন্নয়ন তহবিলে প্রদান করা হয়েছে জেনে স্থানীয় পরিবেশক সংস্থাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। ইসলামিয়া হাসপাতালের সভাপতি পশ্চিমবংলা সরকারের ক্ষুদ্র শিল্পমন্ত্রী ডাঃ জয়নাল আবেদীন বিগত ২৭শে মে, সন্ধ্যা ৬-৩০টায় ইসলামিয়া হাসপাতালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন। পঁয়তাল্লিশ বছরের এই হাসপাতালের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক জনাব এ এইচ হাফিজ জোহা এবং অতিরিক্ত সম্পাদক মহম্মদ শহীদও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন। ইসলামিয়া হাসপাতাল নাম হলেও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী দরিদ্র জনসাধারণ এখানে চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে থাকেন। হাসপাতালের সুপারিন্টেন্ডেন্ট হলেন ডাঃ কে এম দে। ৪৫ জন চিকিৎসকের মধ্যে ২৫ জন বিনা পারিশ্রমিকে হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত। জনসাধারণের দান এবং সরকারী সাহায্যের ওপরই হাসপাতালটি নির্ভরশীল। হাসপাতালের সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এ জন্য ডাঃ জয়নাল আবেদীন জনসাধারণের কাছে আবেদন জানান। সভাপতি হিসেবে হাসপাতালটিকে একটি প্রথম শ্রেণীর হাসপাতালে রূপান্তরিত করার জন্য ডাঃ আবেদীন যে চেষ্টা করছেন, সরকার এবং জনসাধারণের সহযোগিতায় তা সার্থক হয়ে উঠুক।

—শীলভদ্র

নায়ক—পরিচালক আজিমের 'টাকার খেলা' সম্প্রতি এখানে মুক্তি পেয়েছে।

ছবিটি এখন এখানে হুটিয়ে ব্যবসা করছে।

কিন্তু সংগে সংগে আজিমের কপালেও জুটেছে হাজারো অখ্যাতি। নিন্দা ও বদনাম।

দর্শক, চলচ্চিত্রসমালোচক ও চিত্রামোদীদের অভিযোগ, 'টাকার খেলা' ছবিটি মূলতঃ বোম্বের হিট ছবি 'বানারসী বাবু'র 'ভু-কপি' অর্থাৎ ওটা হিন্দীতে আর এটা বাংলায় চিত্রায়িত হয়েছে। পরিচালক নজরুল আলাদা আলাদা। অভিনেতা অভিনেত্রীও ভিন্ন ভিন্ন। 'বানারসী বাবু'র নায়ক ছিলেন দেবানন্দ। 'টাকার খেলার' নায়ক আজিম। 'বানারসী বাবু'র নায়িকা ছিলেন রেখা ও যোগীতা বালী এবং 'টাকার খেলা'র নায়িকা হলেন সুজাতা ও অলিভিয়া।

আজিম ছবিটা থেকে এখন দু হাতে টাকা লুটছেন বটে, কিন্তু ফলাফল ?

যেখানে বাংলা ভারতের মধ্যে চলচ্চিত্র লেন দেন আজ বাদে কাল শুরু হতে যাচ্ছে, সেখানে আজিমের এই পুকুর চুরি বা সাগর চুরি অথবা আকাশ চুরি (পুরো ছবিটাই চুরি, প্রতিটি শট পর্যন্ত) সত্যিই নিন্দনীয়, তা বলাই বাহুল্য।

আপনজন/রাজ্জাক ও সুজাতা

বশীর হোসেন

বশীর হোসেন একজন দক্ষ চিত্র সম্পাদক হিসেবে পরিচিত।

সম্প্রতি তিনি একটি ছবি নির্মাণের কথা ভাবছেন বলে জানা গেছে। তবে তিনি সে ছবি নিয়ে পরিচালনা না করে স্থানীয় একজন দক্ষ পরিচালকের উপর সে দায়িত্ব অর্পণ করবেন বলেই জানা গেছে।

উল্লেখ থাকে যে, অনেকদিন আগে 'পনেরো নম্বর ফেক ওস্তাগার লেন' ও 'আপন-পর' নামে দুটি ছবি তিনি পরিচালনা করেন। এরপর দীর্ঘদিন তিনি ছবি পরিচালনা থেকে বিরত থাকেন।

খান আতাউর রহমান

'আবার তোরা মানুষ হ'র নির্মাণের পর খান আতাউর এবার 'সুজন সখী' তৈরী করছেন। ছবির কাহিনী ও সংলাপ লিখেছেন আমজাদ হোসেন। ছবির কাহিনী হলো 'গ্রাম বাংলার প্রেম গাঁথা।' খান আতা নিবেদিত আর একটি ছবির নাম 'ত্রি-রত্ন'। এর কাহিনী ও সংলাপ লিখেছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। ছবিটি পরিচালনা করছেন প্রমোদকার।

শিবলী সাদিক

শিবলী সাদিক তার 'জীবন নিয়ে জুয়া' ছবির সুটিং নিয়ে এখন ভীষণ ব্যস্ত রয়েছেন। এ ছবির নায়ক 'অংগীকার' খ্যাত বুলবুল। নায়িকা ববিতা, শিবলী সাদিক জানালেন, অংগীকার চিত্রমেলায় যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছে।

ইবনে মিজান

ইবনে মিজান পরিচালিত 'ডাকু মনসুর' এখন মুক্তির দিন গুণছে। এ ছবির নায়ক ওয়াসীম। নায়িকা শাবানা, অন্যান্য চরিত্রে আছেন ফতেহ লোহানী, জসিম, সুচরিতা ও জবা চৌধুরী প্রমুখ।

চাষী নজরুল ইসলাম

বাংলাদেশের যুদ্ধ ভিত্তিক ছবি 'ওরা এগারোজন' ও 'সংগ্রাম' খ্যাত তরুণ পরিচালক চাষী নজরুল ইসলাম এখন মনে মনে 'বাজীমাৎ' করার ইচ্ছা পোষণ করছেন। উল্লেখ থাকে যে তার পূর্বের দুটো ছবি বাজার না পাওয়ার ফলেই তিনি এখন বাজীমাৎ করে আগের সব আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেবার চেষ্টায় আছেন। জানা গেছে, এ ছবিতে নায়ক চরিত্রে অভিনয় করবেন নায়ক রাজ রাজ্জাক।

রাজ্জাক

রাজ্জাক নিবেদিত 'বেঈমান' আগামী মাসে মুক্তি পাচ্ছে। ছবির নায়ক রাজ্জাক, নায়িকা কবরী, অন্যান্য চরিত্রে আছেন সুজাতা খলিল, আলতাফ খান জয়নুল শর্বরী ও বাবর প্রমুখ।

ছবির পরিচালক রুহুল আমিন। সংগীত পরিচালক জাহিরুল হক।

সাইফুল আজম

'অন্তরালে'র নায়ক নায়িকা জাফর ইকবাল ও ববিতা। ছবিটির পরিচালক সাইফুল আজম, ছবির অন্যান্য চরিত্রে আছেন সুচন্দা, নাওকত আকবর, আনিস প্রমুখ।

ছবিটি খুব সম্ভব,

আলী কাওসার

'ভাইবোন' ছবিটি এখন শেষ পর্যায়ে রয়েছে বলে জানা গেছে। এ ছবির পরিচালক আলী কাওসার। কাহিনী সংলাপ ও চিত্রনাট্য লিখেছেন আলী মনসুর, রূপায়ণে আছেন রাজ্জাক, শাবানা, মেহফুজ খান জয়নুল, আনোয়ারা, রবিউল প্রমুখ। ছবির সঙ্গীত পরিচালক খান আতাউর রহমান।

—আনওয়ার আহমেদ

কাজির বিচারে দণ্ড হ্রাস

ময়দানের সেই কলংকিত অধ্যায়ের য়কে মহানুভব রাজ্য ফুটবল সংস্থা আই এফ এ) নিজগুণে ক্ষমা করেছেন। কল্যাণ ঘোষদস্তিদার এখন মুক্ত। কল্যাণ ঘোষদস্তিদার ১৯৭৩ সালের ৪ই আগস্ট ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের লীগ খেলা সাঙ্গ হওয়ার অব্যবহিত পর জার চল্লিশেক লোকের সামনে সংশ্লিষ্ট ফরী শ্রীবিশ্বনাথ দত্তকে মারাত্মক াঘাতে পঙ্গু করে দিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন লবাহানার পর মোহনবাগানের এই লোয়াড়টিকে আই এফ এ সাসপেন্ড রেন।

অপরাধীর শাস্তি হওয়ায়, সেদিন নেকেই ভেবেছিলেন : 'হ্যাঁ এতদিন আই ফ এ কঠোর হয়েছে, শক্ত হয়েছে'। কিন্তু খন কি কেউ জানতেন যে সাসপেন্ডের মস্ত ব্যাপারটাই স্রেফ একটা ধোঁকা মাত্র? শ কিছুদিন চুপচাপ থাকার পর ক্ষমা য়ে মোহনবাগানের সুকল্যাণ ঘোষ-স্তিদার আই এফ এর কাছে আবেদন নালেন যে ১৪ই আগস্টের গর্হিত জের জন্য তিনি গভীরভাবে অনুতপ্ত, াই ক্ষমাপ্রার্থী। বলা বাহুল্য মুষ্টি-ান্ধা ফুটবল খেলোয়াড়ের এই কাতর াবেদনে আই এফ এর নরম মন গললো। কল্যাণ রাজ্য ফুটবলের অধিকতর ংকারের জন্য মাঠে নামার ছাড়পত্র পেয়ে লেন দণ্ড হ্রাসের ফলে। কাজির বিচারে কল্যাণ মুক্ত।

ইতিমধ্যে কত কাণ্ডই না ঘটে গেল য়দান মঞ্চে এবং মঞ্চের অন্তরালে, পর্দার পছনে। মুরুব্বি ও আড়কাঠিদের ৎপরতা বাড়লো। সুকল্যাণ এবং তার ই সহযোগী নঈম-কান্নন গ্রেপ্তার হলেন, াড়া পেলেন, জখম রেফারী অভিযোগ ত্যাহার করলেন মামলা উঠে গেল। সব পারটাই পুরোদস্তুর প্ল্যান মত সাজানো। কজন খেলোয়াড় তো পুলিশের হাত কে ছাড়া পেয়েই ছুটলেন দমদম। দেশে ন গেলেন হাওয়াই জাহাজে চেপে। খের জলে বিমানঘাঁটির রানওয়ে ভিজে ল। যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের ডেকে লও গেলেন : 'এনাফ অব ইট, নো মোর টবল এ্যাট মিস্ট ইন ক্যালকাটা' (যেষ হয়েছে বাবা, কলকাতায় আর খেলছি না)। মিঞা সাহেবের প্রতিজ্ঞা অবশ্য ধোপে টেঁকে নি। আবার তাকে সেই কলকাতায়ই আসতে হয়েছে, মাঠে নেমে খেলতে হচ্ছে।

রাজ্য মহিলা ভলিবল লীগের চূড়ান্ত পর্বের খেলায় নৈহাটি এ সি'র তপতী মণ্ডলের একটি 'স্ম্যাস' বিজয়ী সংঘের পূরবী চৌধুরী জালের ধারে লাফিয়ে উঠে দু-হাত বাড়িয়ে সামাল দিচ্ছেন। চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এবার বিজয়ী সংঘ।

ব্যক্তিগতভাবে কারও প্রতি আমার বিদ্বেষ নেই। উপরন্তু একজন খেলোয়াড় টপ ফর্মে থাকার সময় মাঠের বাইরে পড়ে রইবে এজন্য আমার দুঃখই হচ্ছিল। কিন্তু যে খেলোয়াড় নিয়মশৃঙ্খলা, সহবৎ এবং খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তিকে সাড়ম্বরে অশ্রদ্ধা দেখিয়ে রেফারী ঘায়েল করে পার পেয়ে যাবে—এটাও বা কেমন কথা? দিল্লী-বোম্বাইয়ে তো ইতিমধ্যেই ঠাট্টা চালু হয়ে গেছে কলকাতার রেফারী ঠ্যাঙানো নিয়ে। খেলার মাঠে, কাফে রেস্তোরায় ঠাট্টাটি প্রায়ই শোনা যায়। 'আরে ইয়ার, রেফারী পিটনে-সে হোতা কুছ থোড়াই? স্রেফ অফ সিজন মে ছ' মাহিনা সাসপেন্ড, ব্যস'।

কিন্তু আর নয়। দণ্ডদান ঠিক হয়েছিল কি হয়নি, দণ্ড হ্রাস ঠিক হয়েছে কি হয়নি তার বিচারক ক্রীড়ামোদী জন-সাধারণ। আমি শুধু রেফারি নিগ্রহ সম্পর্কে বাইরের একটি নজীর আপনাদের সামনে সবিনয়ে তুলে ধরছি।

২৯শে মে তিউনিস থেকে সংবাদ সংস্থা এ এফ পি জানাচ্ছেন :

'রেফারীকে মারধোরের অপরাধে তিউ-নিসিয়ার ফুটবল খেলোয়াড় মহম্মদ গাউচিকে (২৩) ছ মাস জেল খাটতে হবে। ফাউল করে খেলার জন্য রেফারী গাউচিকে মাঠ থেকে বার করে দিয়েছিলেন। এরই বদলা নেবার সংকল্পে গাউচি রেফারীর মুখে সজোরে এক ঘুঁষি বসিয়ে দিয়ে-ছিলেন। ঘুঁষির জোর ছিল এতই যে রেফারীর মুখমণ্ডলে চার জায়গায় সেলাই করতে হয়।

ত্রিনিদাদের কার্নিভাল মাঠে লাঞ্ছিত ইংরেজ কাউন্টি দলের বিখ্যাত খেলোয়াড় মহম্মদ গাউচির বিচার চলল সম্প্রতি এক আদালতে এবং বিচারক গাউচিকে ৪ মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। রায় দেওয়ার কালে বিচারক বলেন: কর্তব্যকর্মে নিযুক্ত থাকার সময় একজন কর্মকর্তাকে আক্রমণ ও নিগ্রহ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে আক্রান্ত মেকারী পেশায় ছিলেন একজন পুলিশ।

সফরে প্রথম জয়

একটানা দশটি খেলা অমীমাংসিত রাখার পর ইংলেণ্ড সফরকারী ভারতীয় ক্রিকেট দল অবশেষে জয়ে আনন্দ উপভোগ করেছে গত ৬/১লে মে সারে কাউন্টিকে দশ উইকেটে হারিয়ে। তৃতীয় দিনে খেলা শুরু হওয়ার দু ঘণ্টার মধ্যেই জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। ভারতীয় দলের সুনীল গাভাসকার খেলার প্রথম দিনেই সেঞ্চুরী করেন (১৩৬)। চলতি সফরে এটি তাঁর দ্বিতীয় সেঞ্চুরী। সাত উইকেটে ৩১৭ রান তুলে ভারত প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলে প্রথম দিনের শেষে সারে এক উইকেটে ১৭ রাণ করে। দ্বিতীয় দিনে মিডিয়াম পেস বোলার আবিদ আলীর দাপটে মাত্র ৮৫ রাণেই সারের প্রথম ইনিংসের ইতি ঘটে এবং ফলো-অনে বাধ্য হয়। আবিদ আলী মাত্র ২৩ রানে সারের হাওয়ার্ড রুপ ওয়েন-টমাস জ্যাকম্যান ইন্তিখাব আলম ও পোককের উইকেট পান। প্রথম ইনিংসে আবিদের বোলিংয়ের হিসেব হচ্ছে ১৬-৮-২৩-৬ এবং চন্দ্রশেখরের ৩'২-১-৫-২। দ্বিতীয় ইনিংসে সারে ব্যাটিংয়ের অনেক উন্নতি করে ২৬৫ রান তোলে। গ্রাহাম রুপ ৬৯ ইন্তিখাব আলম ৫৬ সকনর ৪২।

সংক্ষিপ্ত স্কোর : ভারতীয় দল : ১ম ইনিংস : ৭ উইঃ ৩১৭ ডিঃ (সুনীল গাভাসকার ১৩৬), **সারে : ১ম ইনিংস :** ৮৫ (এডওয়ার্ডস ৩১ ইন্তিখাব আলম ২০ আবিদ আলী ২৩ রানে ৬ মদনলাল ৬৩ রানে ১ চন্দ্রশেখর ৫ রানে ২ বেদী শূন্য রানে ১), **সারে ২য় ইনিংস :** ২৬৫ (এডওয়ার্ডস ২৩ গ্রাহাম রুপ ৬৪ ইন্তিখাব আলম ৫৬, চন্দ্রশেখর ৬২ রানে ৪ ভেঙ্কটরাঘবন ৪৬ রানে ২ মদনলাল ৩৭ রানে ২), **ভারতীয় দল : ২য় ইনিংস :** বিনা উইকেটে ৩৭।

সুধীরের সেঞ্চুরী

সারের আগে এসেক্সের সঙ্গে খেলা ছিল ভারতীয় ক্রিকেট দলের। বলা বাহুল্য চেমসফোর্ডে অনুষ্ঠিত তিন দিনব্যাপী এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি জয়-পরাজয়ের মীমাংসা না হলেও এসেক্সের বিরুদ্ধে ভারতের সুধীর নায়ক সকলের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছেন সেঞ্চুরী করার সূত্রে। সুধীর নায়েক প্রথম ইনিংসে পুরো একশো রান করেন। মদনলালও ৬৪ রান করে অপরাজিত থেকে যান।

সংক্ষিপ্ত স্কোর : এসেক্স : প্রথম ইনিংস : ২৭৮ (আর কুক ৭৭ আর ইস্ট ৫৭ অপরাজিত, বিষেণ সিং বেদী ১২২ রানে ৫), **ভারতীয় দল : প্রথম ইনিংস :** ৭ উইঃ ২৮১ ডিঃ (সুধীর নায়েক ১০০ ওয়াদেকার ৫৭ মদনলাল ৬৪ অপরাজিত, ম্যাকফিলন্ড ৪৯ রানে ৩), **এসেক্স : ২য় ইনিংস :** ৮ উইঃ ২০৫ ডিঃ (হার্ডি ৭৪ টার্ণার ৭৬, বেদী ৩০ রানে ৩ আবিদ আলী ৫২ রানে ২ সোলকার ১৮ রানে ২), **ভারতীয় দল : ২য় ইনিংস : ১ উইঃ ১১৮** সুধীর নায়েক ৭২ অপরাজিত ওয়াদেকার ৫৮ অপরাজিত, টার্ণার ১ রানে ১)।

ভারতীয় দলের পরের পরের খেলা ডার্বিশায়ারের সঙ্গে।

লয়েড দলনেতা

আসন্ন ভারত সফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন ক্লাইভ লয়েড। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল পাকিস্তান ও শ্রীলংকাও সফর করবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সহকারী অধিনায়ক মনোনীত হয়েছেন উইকেট রক্ষক ডেরেক মারে।

লয়েডের নেতৃত্বাধীন ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ভারতে পাঁচটি টেস্ট ম্যাচ (২২—২৭ নভেম্বর বাঙ্গালোর, ১১—১৬ ডিসেম্বর দিল্লীতে, ২৭—১লা জানুয়ারী কলকাতায় ১১—১৬ জানুয়ারী মাদ্রাজে এবং ২৩—২৮ জানুয়ারী বোম্বাইয়ে) খেলবে।

ধীরে চলো—একটি রেকর্ড

১৪২ মিনিটে ৪ রান! কথাটা কেমন যেন অবিশ্বাস্য শোনালেও, ঘটনাটি কিন্তু ষোল আনা খাঁটি। মন্থরগতিতে রান তোলার ঐ রেকর্ডটি করেছেন কাউন্টি চ্যাম্পিয়ানশিপের খেলায় সেদিন (২৪ মে) এসেক্সের ওপেনিং ব্যাটসম্যান ব্রায়ান হার্ডি। চার রানের মধ্যে প্রথম তিনটি রান তুলতেই হার্ডির সময় লেগেছে ১২০ মিনিটেরও বেশী। কি অসাধারণ ধৈর্য! চার রান তুলতে ১৪২ মিনিট লাগিয়ে হার্ডি ৪৪ বছর আগে প্যাট্রিক কোরালের (লিস্টারশায়ার) নজিরটিকে কাবু করে দিয়েছেন। কোরালেও ৪ রান করতে ১৪২ মিনিট সময় নিয়েছিলেন কিন্তু ঐ পিচ ছিল ব্যাটসম্যানের সহায়ক।

মহামেডান হেরেছে

কলকাতার সিনিয়ার ডিভিসন লীগ ফুটবলের দুই বড় শরিক ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের অগ্রগতি এখনও অব্যাহত রয়েছে কিন্তু তৃতীয় প্রধান মহামেডান স্পোর্টিং অপ্রত্যাশিতভাবে কালীঘাটের কাছে এক গোলে হার স্বীকার করে। মহামেডান বনাম বি এন আর-এর খেলাটি শেষ হয়েছে গোলশূন্যভাবে। ইস্টবেঙ্গল ভ্রাতৃ সংঘকে ২-০ গোলে এবং খিদিরপুরকে ২-০ গোলে হারিয়েছে। মোহনবাগান রাজস্থানকে ২-০ গোলে এবং জর্জ টেলিগ্রাফকে ৫-১ গোলে পরাজিত করে। মহামেডান এ পর্যন্ত চার পয়েণ্ট, মোহনবাগান এক পয়েণ্ট (ইস্টার্ণ রেলের ভণ্ডুল খেলাটি না ধরে) এবং ইস্টবেঙ্গল এক পয়েণ্ট নষ্ট করেছে।

বিজয়ী সংঘ বিজয়ী

এবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা ভলিবল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বিজয়ী সংঘ। গত শনিবার (১লা জুন) গড়ের মাঠে ফেডারেশন লীগের চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় বিজয়ী সংঘ গতবারের চ্যাম্পিয়ন নৈহাটি এ সিকে ১০-১৫ ১৫-৫ ১৫-১০ ও ১৫-১১ পয়েণ্টে পরাজিত করে। আগের চ্যাম্পিয়ন : ১৯৬৭—৭০ টালিগঞ্জ সুভাষ সংঘ ৭০-৭১ বিজয়ী সংঘ ৭১-৭২ সুভাষ সংঘ ৭২-৭৩ নৈহাটি এ সি।

লেক ক্লাব চ্যাম্পিয়ান

প্রথম রাজ্য নৌ বাইচ প্রতিযোগিতায় মোট ৪৮ পয়েণ্ট সংগ্রহের সূত্রে লেক ক্লাব গত ১লা জুন চ্যাম্পিয়ানশীপ অর্জন করেছে। রানার্স আপ হয়েছে ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাব (২৩ পয়েণ্ট)। শেষ দিনে আটটি বিভাগের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওয়ার পর রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াসের সভাপতিত্বে শ্রীমতী ডায়াস পুরস্কার বিতরণ করেন।

—বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

লক্ষ লক্ষ লোক আজ
সাধনা দশন ব্যবহার করেন
কারণ অতি উৎকৃষ্ট
দাঁতের মাজন ব'লে
এর সুনাম ও জনপ্রিয়তা
উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।
অতুলনীয় গুণাবলীর জন্য
সাধনা দশন বহুদিন ধরে
দেশের সর্বত্র প্রচুর সমাদর
লাভ করে আসছে।
সাধনা টুথ পেস্টও বহুগুণ-
বিশিষ্ট বিশেষ ফলপ্রদ ও
উপকারী। যাঁরা পেস্ট পছন্দ
করেন তাঁদের অনুরোধেই
প্রস্তুত করা হয়েছে।

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ.,
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ.সি.এস, (লণ্ডন)
এম.সি.এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম,বি,বি,এস, (কলিঃ)
আয়ুর্বেদাচার্য

SD.5/70

Cookme

Fresh & Good Cooking Medium

CURRY POWDER
CONTAINING HALDI

হ'লো সেই আসল জিনিষ যার পেছনে রয়েছে ১২৫ বছরের অভিজ্ঞতা

১। সর্বাধুনিক মশলা প্রযুক্তি বিস্তার ফল নতুন প্যাকে আরও উন্নত ধরনের কুকমী গুঁড়া মশলা।

২। এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের গবেষণা।

৩। বাজারের অন্যান্য পাঁচটা গুঁড়া মশলা থেকে কুকমী গুঁড়া মশলা সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের ও গন্ধে ভরপুর।

আমাদের অন্য কোন ব্র্যান্ড ও ব্রাঞ্চ নেই

প্রস্তুতকারক কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
(স্পাইস পাউডার ডিভিশন)
২০৩, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭

KCB-74

অমৃত

সম্পাদক • শ্রীতুষার কান্তি ঘো

[১৪ বর্ষ, ৭ সংখ্যা] শুক্রবার, ৬ আষাঢ় ১৩৮১ বঙ্গাব্দ [মূল্য ৫০

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দ্ব-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা স্থানাভাবেই ফেরত পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা [illegible]।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণি-অর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫·০০	টাকা ৩০·০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১২·৫০	টাকা ১৫·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬·২৫	টাকা ৮.০০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১, আনন্দ চাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
(ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১৪শ বর্ষ

৭ সংখ্যা
মূল্য ৫০ পয়সা

"ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ন নিউজ
পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 21st June, 1974 শুক্রবার ৬ আষাঢ়, ১৩৮১ 50 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা বিষয়	লেখক

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

সুপ্রীম কোর্টের অভিমত অন্তত এইটুকু নিশ্চিত করে দিল যে শ্রী ভি ভি গিরির কার্যকাল শেষ হওয়ার আগে তার উত্তরাধিকারী নির্বাচনের পথে কেউ কাঁটা দিতে পারবে না। সেটা খুব কম স্বস্তির কথা নয়। এই নির্বাচন শেষ করতে হবে আর দেড় মাসের মধ্যে। তার আগে যদি এই বিষয়ে সংবিধানগত কূটপ্রশ্ন ওঠে তবে বড় রকমের রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। গুজরাট বিধানসভা বাতিল হয়ে যাওয়ার ফলে সেই ধরনের প্রশ্নই ওঠে। সংসদ এবং বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভার সদস্যেরাই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকারী। একটি বিধানসভা বাতিল হয়ে থাকলে নির্বাচনমণ্ডলীতে বড় রকমের ফাঁক থেকে যায়। এই অবস্থায় নির্বাচন হলে কি তা সংবিধানের দৃষ্টিতে বৈধ বলে গণ্য হবে? সংবিধান-শাস্ত্রীরা এই প্রশ্ন তোলেন। সংসদেও বিরোধী পক্ষের কণ্ঠে অনিবার্যভাবে এই প্রশ্ন শোনা যায়। কোনো রকম গড়িমসি না করে কেন্দ্রীয় সরকার যে বিষয়টি সুপ্রীম কোর্টের অভিমতের জন্যে পাঠিয়ে দেন তার মধ্যে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় মেলে। কারণ দেশের সর্বোচ্চ আদালতের অভিমত পাওয়ার ফলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মধ্যে শুধু সাংবিধানিক জটিলতা নিয়ে সন্দেহেরই নিরসন হলো না। সেই সঙ্গে এই প্রশ্ন নিয়ে বিরোধীরা জল ঘোলা করবেন এমন সুযোগও এখন রইলো না।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্পর্কে সংবিধানে যে সময়তালিকা নির্দিষ্ট আছে তা মেনে চলতেই হবে এই ছিল আদালতের সামনে সরকার পক্ষের যুক্তি। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে সুপ্রীম কোর্টের বিশেষ বেঞ্চ সেই যুক্তি মেনে নিয়েছেন। কোনো অবস্থাতেই এই সময়সূচীর রদবদল করা যাবে না এমন কি নির্বাচকমণ্ডলীর কোনো আসন শূন্য থাকলেও নয়। ইতিপূর্বে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় কোনো আসন যে শূন্য থাকে নি তা নয়। কিন্তু লোকসভা অথবা কোনো বিধানসভার এক বা একাধিক আসন শূন্য থাকার ফলেই সেই শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এই ধরনের শূন্যতা যাতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই ১৯৬১ সালে সংবিধানের একাদশ সংশোধন সংসদে গৃহীত হয়। সেই সংশোধন যাঁরা রচনা করেছিলেন তাঁরা এর দ্বারা একটি গোটা বিধানসভা বাতিল হয়ে থাকার সম্ভাবনার আকাঙ্ক্ষা করার কথা ভাবেন নি। কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের বর্তমান অভিমত ঐ সংশোধনের এক্তিয়ারের ব্যাপকতর করে দিল। তার ফলে গুজরাট বিধানসভা বাতিল হয়ে থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠানে কোনো বাধা থাকছে না।

কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের এই অভিমতের ফলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন শেষ হয়ে যাওয়ার পর সে-বিষয়ে কোনো মামলা মোকদ্দমা হবে না এমন কথা বলা চলে না। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরোধ অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্ট তাঁদের অভিমত জানিয়েছেন মাত্র কোনো রায় দেন নি। সেই অভিমতও কেন্দ্রীয় সরকার যে নির্দিষ্ট ছ'টি প্রশ্ন তুলেছিলেন তার সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ। তার বাইরে কোনো প্রসঙ্গ বিবেচনায় সুপ্রীম কোর্ট সংগতভাবেই সম্মত হন নি। এমন কি সরকার-উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর মধ্যে যে-সব 'তথ্য' স্থান পেয়েছে সেগুলোর সত্যাসত্য নির্ধারণের দায়ীও বিচারপতিরা প্রত্যাখ্যান করেছেন। বেশ কয়েকটি বিধানসভা বাতিল হয়ে থাকলে কি অবস্থা হবে, অসদুদ্দেশ্য নিয়ে যদি কোনো বিধানসভা বাতিল করা হয় অথবা অসদুদ্দেশ্য নিয়ে যদি ঐ বিধানসভার পুনর্নির্বাচন স্থগিত রাখা হয় তা হলেই বা কী অবস্থা হবে—এই সব দরকারী প্রশ্ন সম্পর্কেও আদালত কোনো অভিমত দেন নি। কারণ আপাতত এগুলো হয় কাল্পনিক অথবা 'অপ্রাসঙ্গিক' প্রশ্ন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর সুপ্রীম কোর্টে যদি মামলা ওঠে তখন দেশের সর্বোচ্চ আদালত অবস্থা অনুযায়ী অন্য রকমের রায়ও দিতে পারেন। কারণ তখন বিচারপতিরা একটি বাস্তব অবস্থার বিচার করবেন এবং সরকার-উত্থাপিত একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার চৌহদ্দির মধ্যেও বাঁধা থাকবেন না।

দুর্ঘটনার পরের রাত্রি

অশোককুমার সেনগুপ্ত

অফিসে সুধীনের টেলিফোন পাওয়ার পর হাতে মাত্র চল্লিশ মিনিট সময়। এখন সাড়ে চার। পাঁচটা দশে কোলফিল্ড এক্সপ্রেস ছাড়বে। এখন থেকে ষ্টেশন পেঁছাতে সময় লাগার কথা বড় জোর বিশ মিনিট। কিন্তু বাস যদি ঠিকঠাক না পাওয়া যায়, রাস্তা জ্যাম থাকে, হাওড়া ব্রীজে সারিবন্দী গাড়ী যদি প্রদর্শনী বসায়, তবে কতখানি সময় লাগবে তার হিসাব করা দুষ্কর। তবে কিনা, হাঁটা যেতে পারে। কিন্তু অসম্ভব ভিড় রাস্তায়। গাড়ী মানুষ ফুটপাথে দোকান। পা ঠিকঠাক ফেলে আরও শরীর বাঁচিয়ে চল্লিশ মিনিট লাগবেই। কিংবা তারও বেশী।

সুধীনের আমাকে টেলিফোন করার কি দরকার ছিল জানি না। হড়হড় করে কথা-গুলো বলে গেল। শুনতে শুনতে আমি সীতানাথের জন্যে ভয়ংকর উদ্বেগে এমনই আচ্ছন্ন যে সমগ্র ব্যাপারটা হজম করে যাওয়ার অসুবিধার কথা তোলাই গেল না।

আসানসোল থেকে গাড়ী নিয়ে আসছিল। দুর্গাপুরের কাছে দুর্ঘটনা ঘটেছে। ওখানেই হাসপাতালে ওকে ভর্তি করা হয়েছে। মারাত্মক আঘাত নয়। পরিষ্কার জ্ঞান আছে। গাড়ীর মালিক সুবোধ রায় নিজে এসে খবরটা নমিতার কাছে দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু শোনার পর নমিতা ভীষণ অধৈর্য হয়ে উঠেছে। সুধীনের বাড়ী গিয়ে তাকে ধরেছে দুর্গাপুর নিয়ে যাওয়ার জন্যে সুধীন সান্ত্বনা দিয়েছে, আশ্বস্ত করেছে তেমন কিছু হলে সুবোধ রায়ই যে নিয়ে যেতেন তাও বুঝিয়েছে। নমিতা কোন কথাই শুনতে চায় না। তাকে নিয়ে হাওড়া ষ্টেশনে হাজির হয়েছে। সুধীনের ইচ্ছে আমিও চলি। বন্ধুর বিপদ। আমাদেরই দেখা কর্তব্য। শুধু তাই নয় ও জানিয়েও দিল টিকিট নিয়ে 'প্লাটফর্ম' টিকিটের কাউণ্টারের সামনে সে দাঁড়িয়ে আছে আমি যেন এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ি।

সীতানাথের কি হল আমি এখন ভাবছি না। বের হবার আগে থেকেই ক্লান্তি অনুভব করছি। নিজেকে প্রস্তুত করার কোন সুযোগই নেই। আজ আবার টিউশনিতে কামাই হবে। অথচ ব্যাপারটা এমন কোন" ক্রমেই এড়ান যায় না। সঙ্গে টাকাও নেই। পকেটে মাত্র এক টাকার দু খানা নোট।

সুধীন অবশ্য ওদিকে প্রস্তুত হয়ে নিশ্চয় বেরিয়েছে।

অসম্ভব বিরক্তি এবং একরাশ ক্লান্তি নিয়ে বড়বাবুর কাছে গেলাম। সম্ভবতঃ দুর্ঘটনা বলেই তিনি আগামীকালের ক্যাজুয়েল লিভ সমেত আজ এখনই ছুটি দিতে কুণ্ঠিত হলেন না। অফিস থেকেই রামকৃষ্ণ জুয়েলার্সে ফোন করলাম। ফোন আছে ওদের। পাশেই আমাদের বাড়ী। জানলাম, অনুগ্রহ করে বাড়ীতে একটা খবর

দেবেন, জরুরী কাজে দুর্গাপুর যেতে হচ্ছে।

হাওড়া স্টেশনগামী বাসে ওঠার মুহূর্তে দেখলাম বার মিনিট সময় ব্যয় হয়েছে। অর্থাৎ হাতে এখনও আটাশ মিনিট সময় আছে। ব্রেবোর্ণ রোড কি বড়বাজারের মুখে কি হাওড়া ব্রীজ জ্যাম হলে আর ট্রেন ধরতে হচ্ছে না। সুধীনকে বলা চলবে, রাস্তা জ্যাম, আমি কি করতে পারি। চাই কি কাল সীতানাথের বাড়ী গিয়ে তল্লাসও করতে পারি। বাড়ীতে কেবল ওর বিধবা মা আছেন।

দীর্ঘ ছ মাস আমার সীতানাথের সঙ্গে দেখা হয়নি। আসলে এখন আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। বেকার জীবনের সেই অঢেল সময় আর নেই। দিন এখন কর্মব্যস্ততায় অত্যন্ত ছোট। তবে যোগসূত্রটা আমাদের ছিঁড়ে যায় নি। আগেকার মত টানটান নয় কিন্তু আলগা সুতোয় ঝুলে আছে ঠিকই। গত পরশুই গোপীর সঙ্গে নাকি দিন চারেক আগে দেখা হয়েছে ওর। নমিতাকে নিয়ে সিনেমা যাচ্ছিল। দিবাকরের স্টেশনারী দোকানের সীতানাথ নাকি প্রায়ই আসে।

আমরা প্রত্যেকেই মোটামুটি চাকরী পেয়েছি। দিবাকর অবশ্য স্টেশনারী দোকান করেছে। সীতানাথের টিউশনিই সম্বল ছিল। হঠাৎ সব কটি টিউশনিই ও ঝটপট ছেড়ে দিল। আমরা খবরটা জানার পর ভীষণ অবাক হয়েছিলাম। চাকরী না পাওয়ার ক্ষোভ এবং অবসাদ থেকে এটা হয়েছে, তাই অনুমান করেছিলাম। তারপরই জানতে পারলাম মোটর ড্রাইভিং শিখে ফেলেছে। লাইসেন্সও পেয়েছে। চাকরী পেতেও দেরী হল না। সুবোধ রায় নামে একজন মোটা ব্যবসায়ীর গাড়ী চালানর কাজ জুটিয়ে ফেলল। তারপরই বিয়ে করল নমিতাকে।

সীতানাথ বরাবরই চাপা স্বভাবের। তার উপর অত্যন্ত অন্যমনস্ক টাইপের। আমাদের সঙ্গে মিশলেও কখনই ওকে উচ্ছল হতে দেখিনি। আমরা ওকে মাস্টারমশাই বলতাম। ড্রাইভিং শেখাটাও আমরা একদিনের জন্যেও টের পাইনি। ড্রাইভারের চাকরী জোটানর সংবাদটা দিতেই আমরা পরস্পরের দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে ছিলাম। এবং আড়ালে গোপী বলেছিল, জানিস, ওর অন্য কিছু মতলব আছে। দিবাকর বলেছিল, কি আর করবে। চিরকাল পরের গাড়ী ঠেলবে। সত্য বলেছিল, টিউশনির চেয়ে ঢের ভাল। আমি মন্তব্য করেছিলাম, সীতানাথ গভীর জলের মাছ। ওকে বোঝাই কঠিন।

যাইহোক দেড় বছরে আমাদের অবাক করার মত সীতানাথ অবশ্য কিছুই করতে পারে নি। সেই সুবোধ রায়েরই গাড়ী চালাচ্ছে।

চমৎকার রাস্তা। আর ট্রাফিক পুলিশের ব্যবহার আরও চমৎকার। হাত তুলে থামল না। সময় নষ্ট করল না। এদিকে বাসখানায় যেন পাখা বসান। হু হু করে ছুটে চলল।

হাওড়া ব্রীজখানাও যেন ভদ্রতার চূড়ান্ত দেখাল। নিজেকে সাফসুফ করে রেখেছে যেন আমার জন্যেই পনের মিনিট সময় হাতে দিয়ে বাসখানা স্টেশনে থামল। এর পর আর দেরী করা যায় না। ভিড় ঠেলে সুধীনের কাছে আসতে কয়েক মিনিট ব্যয় হল। নমিতাকে দেখতে পেলাম না। ঘাড় উঁচু করে সুধীনই আমাকে খুঁজছে।

সামনে যেতেই সুধীন বলল, নমিতাকে গাড়ীতে বসিয়ে রেখে এসেছি। সিট আগলে আছে। পকেট থেকে সিগারেট বের করে একখানা বাড়াল আমার দিকে। তারপর ফস করে দেশালাই জ্বালিয়ে ধরান হতেই ব্যস্ত স্বরে বলল, চল। চল। বড্ড নার্ভাস হয়ে পড়েছে নমিতা। গুম হয়ে বসে আছে। বলছি ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু যদি বোঝে।

—কি ভাবে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে? গাড়ীতে আর কে ছিল?

সুধীন বলল, কি জানি! নমিতাও জানে না। ভদ্রলোক এসে শুধু খবরটা দিয়েছেন। কালকেই সীতানাথকে কলকাতায় নিয়ে আসবেন তাও জানিয়েছে। কিন্তু মেয়ে পাগল। আজই যাবে।

পাশাপাশি হেঁটে আমরা প্লাটফর্মে ঢুকলাম। ডান দিকে প্লাটফর্মে একখানা সবুজ সাদা লোকাল গাড়ী এসে দাঁড়াল। পিলপিল করা মানুষ। পাশাপাশি হাঁটা গেল না। কথাও হল না। একটা জানলার সামনে সুধীন দাঁড়াতে এগিয়ে গেলাম। ততক্ষণে নমিতা মুখ [illegible] ড়িয়েছে। মাথায় ঘোমটা। সাধারণ এ[illegible] শাড়ী। থমথম করছে মুখখানা। [illegible] ফোলা। আমাকে দেখে সামান্য কাঁ[illegible]ল। মুহূর্তের মধ্যে সবরকমের অসুবিধা এবং বিরক্তি আমার ফিকে হয়ে গেল। সীতানাথকে ব্যাণ্ডেজবাঁধা অবস্থায় দেখে[illegible] কি হবে জানি না, নমিতাকে দেখে কিন্তু বুকের উপর ভারী পাথরের চাপ টের পেলাম।

সুধীন আমাকে তারপরই যা জানাল তাতে তপ্ত হবারই কথা। সে যাবে না! আজ সকালেই ওর বাবার স্ট্রোক হয়েছিল। অফিস কামাই করেছে তাই। আমাকে একলাই নিয়ে যেতে হবে। সে পঁচিশ টাকা আমার হাতে ধরাল। নমিতার কাছেও নাকি চল্লিশ টাকা আছে। দুখানা টিকিটও আমার পকেটে গুঁজে দিল।

—আমি—আমি একলা যাব। তার মানে। হতাশ এবং কিঞ্চিৎ রুদ্ধগলায় আমি বলে উঠলাম।।

কেন তুমি কি খোকন নাকি যে একলা যেতে পার না। ওঠ। ওঠ। গাড়ী ছেড়ে দেবে।

গাড়ী ছাড়ল। সুধীনকে আর দেখা গেল না। তবে গাড়ীচলার তালে তালে আমার ভেতরের রাগ ক্ষোভ এবং ওর চালাকিতে

কলার ধরে. চল তোকেও যেতে হবে, বলতে না পারার কণ্ঠটা কেমন যেন কেটে যেতে থাকল। নমিতা শোকে এমনই আচ্ছন্ন জানালা দিয়ে নির্বাক তাকিয়েই আছে কেবল।

শব্দ করে গাড়ী চলল। লাইন বদলানোর আওয়াজ উঠছে। গতি এখনও তীব্র হয়নি। দু পাশেই এখনও শহর। দিনের রোদ পড়ে রয়েছে বাড়ীগুলোর গায়ে। তারপর কিছুটা সময় কাটতেই গাড়ীর গতি বাড়ল। শহরতলী পড়ল। সবুজেরও দেখা মিলল। রোদ ঝকমকে ভাব ক্রমশঃ হারাতে থাকল। পুকুর গাছগাছালি দূরে অদূরে শস্যভূমিতে শেষ বিকেলের ঢল নামতে থাকল।

জিজ্ঞাসা করলাম কখন আপনি খবর পেলেন?

নমিতা বাইরে থেকে চোখ সরিয়ে আমার উপর ফেলল, দুপুরে। সুবোধবাবু নিজেই এসেছিলেন।

অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কিভাবে?

—আমি কিছুই জানি না। নমিতা কপালের চুল সরাল। নড়েচড়ে বসল, শুনেই আমি কাঁপতে সুরু করেছি। কি যে হয়েছে ভগবান জানেন। এখনও তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

—সাংঘাতিক নিশ্চয়ই নয়। আর কালই তো ওকে কলকাতাতে সুবোধবাবুরা নিয়ে আসবেন।

নমিতা উত্তর করল না। আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। বেশ কিছুটা পর নমিতা আবার কথা সুরু করল। সীতানাথের কথাই। আমিও যোগ দিলাম। শুনলাম এই মোটর ড্রাইভিংটা নমিতার বরাবরই অপছন্দ। এ নিয়ে সে ঝগড়াও করেছে।

আমার পাশের ভদ্রলোক বোধকরি আমাদের কথাতেই কান পেতে ছিলেন। গলা বাড়িয়ে দুর্ঘটনার ব্যাপারটা জানলেন। বেশ মোটাসোটা চেহারা বড় মুখ, কালো গায়ের রং ধবধবে সাদা সার্ট গায়ে। ঘন ঘন বিড়ি খাচ্ছেন। কেন বুঝলাম না আমাদের ব্যাপারে বেশই আগ্রহী। তিনি গাড়ীর ভিড় অ্যাকসিডেন্ট তো এখন জলভাত থেকে জি টি রোডের ওপর তাঁর দেখা এক লরি দুর্ঘটনার ছবিও তুলে ধরালেন। ড্রাইভার ভদ্রলোক নাকি থেঁতলে গিয়েছিল। মানুষ বলে চেনা যাচ্ছিল না।

পাশেই নমিতা। এ সব শুনে না আরও নার্ভাস হয়। ঝামেলা তো আমাকেই পোহাতে হবে। সুতরাং কথা ঘোরালাম. আচ্ছা দুর্গাপুর কখন গাড়ী পৌঁছাবে বলতে পারেন?

—প্রায় আটটা ধরুন। ভদ্রলোক বললেন. ফাস্ট ক্লাশ গাড়ী মশাই। লেট প্রায় করেই না।

বেশ কিছুটা সময় চুপচাপ কাটল। তারপর গলার স্বর নামিয়ে নমিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম কোন হাসপাতালে আছে? ঘাড় নাড়ল নমিতা। অর্থাৎ জানে না।

—খুঁজব কেমন করে রাত্রিতে? আর রাত্রে হাসপাতালই বা রোগী দেখাবে কেন? আমার গলায় উদ্বেগ ফুটল।

নমিতা সাড়া দিল না। বাইরে চোখ রাখল।

গাড়ীখানা এখন বেশই গতি পেয়েছে। একটানা একটা শব্দ লাইনে চাকার ঘর্ষণের এবং কম্পার্টমেন্টগুলোর নাচানাচি করার বেজে চলেছে। রোদের রঙ আর নেই। দুপাশের প্রকৃতি এবং নীল আকাশ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। তবে কেমন যেন ম্লান আভা। দূরে অপসৃয়মান গাছগাছালি ক্ষেতখামার এবং পুকুরডোবা ঘরবাড়ীও দেখা যাচ্ছে।

আমার চোখে অবশ্য সবই কেমন যেন ধোঁয়া ধোঁয়া। আমি বেশ বুঝতে পারছি দুর্গাপুরে গিয়ে অসুবিধায় পড়ব। সুধীন তো বেশ ছিলে। ভাবল না দুর্গাপুরে পৌঁছাতে রাত্রি হবে। সীতানাথকে দেখা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। আগে আমিও তো একথা ভাবলাম না।

নমিতাকে নামিয়ে অনায়াসে হাওড়া স্টেশনে টিকিট রিটার্ন দেওয়া যেত। ঠোঁট কামড়ে একটা আফশোষকে আমি হজম করার চেষ্টা করতে থাকলাম। দুর্গাপুরে হাসপাতাল একটা নয়। কোথায় আছে আছে সীতানাথ। তারপর দুর্গাপুরের কাছে অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে। কাছে মানে ঠিক কোন জায়গায়? অণ্ডাল ওয়ারিয়া পানাগড় কোনদিকে? ওসব জায়গার হাসপাতালে থাকাও অসম্ভব নয়।

সারাটা রাস্তাই নীরব রইলাম। আমার কেবলই নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করল। ক্রমে সন্ধ্যা এবং রাত্রি নামল। কম্পার্টমেণ্টের আলো জবলে উঠেছে: বাইরে দূরে অদূরে আলো জবলছে। ঝটঝট করে সরে যাচ্ছে এক একটা স্টেশন। বর্ধমানে পাশের ভদ্রলোক নেমে গেলেন। নমিতাকে অসুবিধার কথা তখন না বলে পারলাম না।

নমিতা বলল চলুন না ঠিক খুঁজে নেব। অ্যাকসিডেণ্টের কথা বললে ঠিকই চিনতে পারবে। নইলে থানায় যাব। দুর্গাপুরে নেমে নমিতা ট্যাকসি করার কথা বলল। সামনের হাসপাতালে প্রথমে পরে সবগুলোতে খোঁজ করবে। একজন ট্যাকসি-ড্রাইভারকে সব কথাই বললাম। ভদ্রলোকের ব্যবহার অত্যন্ত ভাল। অ্যাকসিডেণ্টের ব্যাপারটাও দেখলাম জানেন। বললেন একটা কালো রংয়ের অ্যামবাসাডর তো। ভেতরে ড্রাইভার ছাড়া কেউই ছিল না। পিছন থেকে একটা লরি ধাককা দিয়েছে। রাস্তা থেকে ছিটকে একটা গাছে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে গাড়ীটা। না ড্রাইভার ভদ্রলোক বেঁচে গেছেন। তবে শোনা কথা তাঁর। নিজে দেখেন নি। কোন হাসপাতালে আছেন তাও জানেন না।

ভাগ্য ভাল প্রথম হাসপাতালেই আমরা খোঁজ পেলাম সীতানাথের। দেখা হল না। দূরের মানুষ বলেই বোধকরি খবরটুকু পেলাম। এখন ঘুমুচ্ছে। ভয় পাবার মত কিছু নেই। কাল না হোক পরশু বোধহয় কলকাতায় শিফট করা যেতে পারে।

আবার ট্যাকসিতে উঠলাম। বললাম, কি করবেন? কলকাতা ফেরার গাড়ী তো সেই শেষরাতে।

নমিতা বলল, কলকাতা ফিরব কেন। দেখেই যাব। আজ থাকব এখানে।

—কোথায়?

—কোন স্টেশনের ওয়েটিংরুমে।

নমিতার মুখের ভাব কেটেছে। হাসপাতালের ডাক্তারের কথা শুনেই বোধকরি। চোখের ছলছলানিও নেই। আমি নীরব। স্টেশনে এসে কাছেরই একটা হোটেলে আমরা খাওয়া-দাওয়া করলাম। বিনিদ্র রজনীই কাটাতে হবে। তার আগে অকারণে বেড়ানর জন্যে স্টেশন প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ালাম। কিছুটা হাঁটাহাটি করে যদি মাথার ভার লাঘব করা যায়।

প্রায় জনশূন্যই স্টেশন। রাত্রি দশটা নাগাদ দূরগামী ট্রেন হাওড়া থেকে আসবে। এদিকে হাওড়া ফেরার কোন গাড়ী শেষরাতের আগে নেই। আমরা অবশ্য ফিরছি না। ওভারব্রীজ পার হয়ে ওদিককার ডাউন প্ল্যাটফর্মের দিকে গেলাম। আলোকিত স্টেশন চত্বর। অন্ধকার দূরে অদূরে। আলো জবলছে ইতস্ততঃ। কোথাও ম্লান, কোথাও উজ্জ্বল। ওধারে বাজারপত্র। এখনও যেন সরগরম। আমরা প্ল্যাটফর্ম ধরে পশ্চিমে হেঁটে চললাম। গোল ঘরে ফুলে গাছ সবুজ ঘাস।

—আচ্ছ দুর্গাপুরে আপনার চেনা-জানা কেউ নেই?

—না। আর থাকলেও যাবার কি দরকার। নমিতা জোরে শ্বাস ফেলে বলল, আপনার খুব অসুবিধা হল না?

বললাম বিপদ তো অসুবিধারই সৃষ্টি করে। সীতানাথ সুস্থ হলে এই অসুবিধাই আমার অহংকার হবে।

—সুধীনবাবু আমার সঙ্গে জুড়ে দেওয়াতে আপনার খুব রাগ হয়েছিল না?

—মিথ্যে বলব না। খানিকটা উষ্ণ হয়েছিলাম বৈকি। তবে তার ছিটেফোঁটাও এখন আর নেই। এখন ভাবছি সীতানাথ তাড়াতাড়ি সুস্থ হোক।

—হ্যাঁ। কতদিনে যে হবে। নমিতা আমার দিকে তাকাল না। হু-হু করে বাতাস দিচ্ছে। মাথায় ঘোমটা নেই। কানের রিং জবলজবল করছে। ঘাড় ঘোরাতেই চোখে পড়ল গলায় সরু হার চিকচিক করছে। স্বাস্থ্যের একটা উজ্জ্বলতা আছে নমিতার। আলোয় সেটা আরও বেড়েছে। কিংবা হয়ত আমার এই চোখেই বলল, আমি তো ভেবে কোন কূলকিনারা পাচ্ছি না, কি করে যে চলবে। জানেন সব ঘরেই কিছু সঞ্চয় থাকে। আমাদের কিচ্ছু নেই। ভাল হওয়ার পর ওর যদি কাজ করবার কোন ক্ষমতা না থাকে?

—আপনি ওসব ভাবছেন কেন? আপনি তো বি এ পাস করেছে। ঘরে কোচিং করেও চালাতে পারে।

—সে ক্ষমতাও যদি না থাকে।

—বাজে চিন্তা ছাড়ুন তো। এত অল্পে ভেঙে পড়লে আজকের দিনে বাঁচা যায় না। নমিতা কোন উত্তর দিল না। পাশাপাশি হাঁটতে থাকল আমার। বাতাস লেগে শাড়ীর আঁচল গায়ে লাগছে। শিরশির করছে গা। একটু পর থমকে ঘাড় ঘোরাল আমার দিকে, আমি যে কেন ভয় পাচ্ছি আপনি ঠিক বুঝবেন না। আসলে - আসলে আমি জন্মেছিই দুর্ভাগ্য নিয়ে। আচ্ছা আপনাদের বন্ধু তো বলেনি কেমন করে আমার সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছে।

আমি দ্রুত ঘাড় ঘোরালাম। বিয়ের পর বৌভাতে আমরা নিমন্ত্রিত হয়ে-

রাগও হয়েছিল সীতানাথ আমাদের বর-যাত্রী যেতে বলেনি বলে। তবে ভেতরে কোন একটা কাণ্ড আছে বলে আমরা ভাবিনি।

—জানেন, আমি খিদে একেবারে সহ্য করতে পারি না। বাবা মারা যাওয়ার পর দাদার সংসারে শুধু ওই পেটের জন্যেই পাঁচ বছর পড়েছিলাম। সব কথা ভৎর্সনা তাচ্ছিল্যও সহ্য করতাম। বড়-দিদির বিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন মা। সে সুখী হয়নি। মাতালস্বামী। আমাদের সঙ্গে সম্পর্কও রাখত না। মা তো আগেই চলে গিয়েছিলেন। ফলে যাবার জায়গা আমার কোথাও ছিল না। বৌদির কাছে ভাল হবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। পারি নি। সুন্দরী নই। বিয়ে এমনি হবে না আমি জানতাম। বৌদি বোধহয় আরও ভাল করে জানত। তবে সবেরই তো একটা সীমা আছে। সহ্য করে করে কেন জানি না আমি পাথর হতে পারিনি। আত্মহত্যার কথাও মনে হয়নি। আচমকাই মনে হয়েছিল নিজের আশ্রয় খুঁজে নেবার একটা চেষ্টা করব। বৌদি যা বলতেন তা খুঁটিনাটি না বললেও বুঝতে নিশ্চয়ই পারছেন একজন যুবতীকে কি ধরনের কথা বিরক্ত গলগ্রহ পোষার যন্ত্রণায় মেয়ে-মানুষ বলতে পারে। দুপুরে তাই এক-দিন সেজেগুজে এসপ্লানেডে এসে দাঁড়ালাম। গা দরদর করে ঘামছে। অত মানুষ ভিড় গাড়ী শব্দ কিছুই আমাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে না ভেতরে ভেতরে ভীষণ রকমের কাঁপছি। ফিরে যাবার কোন ইচ্ছা নেই। অথচ সামনেও এগুতে পারছি না। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকিনি। চারপাশ ঘুরেছি। খিদেয় পেটের নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ছে। আর জানেন ওই খিদেই আমাকে সাহসী করল। ট্রামস্টপে দাঁড়িয়ে থাকা এক ভদ্রলোককে সরাসরি বলে বস-লাম আমাকে কিছু খাওয়াবেন। ভীষণ খিদে পেয়েছে। ভদ্রলোক বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে তাকালেন। তারপর একটা রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেলাম। গোগ্রাসে আগে খেলাম। তারপর সব কথা বললাম। ওই ভদ্রলোকই আপনাদের বন্ধু। নমিতা গায়ের কাপড় ভাল করে জড়াল।

আমি নিস্পন্দ। নমিতার দিকে তাকাতে পারছি না তাকালেও অন্ধকারে আমি ওর মুখ দেখতে পাব না। আশ্চর্য! এত বড় কাণ্ডটা আমরা জানি না। সীতানাথ চাপা স্বভাবের। আমাদের বলেনি।

কিন্তু নমিতাকে এখন আমি কি বলতে পারি? কি?

কি হল! ভাগ্যটা আমার তো দেখছেন।

সীতানাথ আমাদের কিছুই বলেনি।

নিজের স্ত্রীকে কে লজ্জায় ফেলতে চায় বলুন। নমিতা দীর্ঘশ্বাস ফেলল আমিও বলতাম না। কিন্তু কেন জানি না হঠাৎ ইচ্ছে করল বলে ফেলি। আমি তো কাঁদতে ভুলেই গিয়েছিলাম। আপনার বন্ধু কাঁদতে আবার শিখিয়েছিল। এখন জানেন আপনার কাছে বলে বেশ হাল্কা বোধ করছি। কাঁদলেও এমন হাল্কা বোধ করতাম।

এরও কোন উত্তর দেওয়া যায় না। দুঃখের পর সুখ এলে আকাশে লাল মেঘ দেখেও আগুনের কথাই মনে হয়। নমিতাকে দোষ দেওয়া যায় না। ক্ষীণ দুর্বলতায় ও এসব কথা বলে ফেলল।

আমার এখন সীতানাথকে মস্ত বড় মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। অথচ আশ্চর্য এই সীতানাথরাই দুর্ঘটনায় পড়ে। আমি কিভাবে যে নমিতাকে এ সময় সান্ত্বনা দিই।

সীতানাথের স্ত্রী নমিতাকে প্রকৃত-পক্ষে এই আমার প্রথম দেখা। বিয়ের সময় দেখেছি কনের সাজে। রোগাটে চেহারা হলেও মুখের শ্রী ছিল। তারপর একবার ওদের বাড়ীও গিয়েছি। কথা হয়নি বিশেষ নমিতার সঙ্গে। সীতানাথের সঙ্গেই কথা বলেছি। তবে তখনই দেখেছিলাম বিয়ের জল লাগা শরীর ও লাউয়ের সবুজ ডগার উজ্জ্বল প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। সংসারে প্রাচুর্য নয় একটু ছিমছাম ভাব এসেছে। সুন্দরী হয়নি তবে শরীরের রেখায় আকর্ষণের মাদকতা দেখেছিলাম। এবং অনায়াসেই অনুমান করতে পেরেছিলাম দাম্পত্য জীবনে ওরা সুখী।

—কি আশ্চর্য আপনি যে চুপ করে গেলেন। নমিতা মুহূর্তে যেন বদলে ফেলল কণ্ঠস্বর। বলল. কথা বলুন। নিন আর দুঃখের কথা বলব না।

পাশাপাশি হেঁটে আমরা একেবারে প্রান্তে এসে পড়েছি প্লাটফর্মের। সামনে অন্ধকার। দূরে সিগন্যালের লাল আলো। বাস যাতায়াতের শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু নমিতা হঠাৎ বদলে গেল কেন? দুর্ভাবনা কি কেটে গেল ওর? ঘাড় ঘুরিয়ে আমি ওর মুখ দেখতে পেলাম না। অন্ধকারে ঢেকে আছে।

—নিন আপনার কথা বলুন। নমিতা বলল।

—আমার কথা?

—হ্যাঁ। বলুন বিয়ে করেননি কেন?

মুহূর্তে ছেলেমানুষ হয়ে ওঠা নমিতার চপলতাভরা গলা শুনে হাসলাম সুযোগই পেলাম না।

—আহা। নমিতা মুখে শব্দ বাজাল তারপর চাপা গলায় বলল, অন্য কিছু ব্যাপার আছে নিশ্চয়।

—থাকলে যে কি খুশী হতাম আমি। অতীত এবং সীতানাথের কথা ভুলে আমিও নমিতার কথার খেলায় মাতলাম। মাথা নাচিয়ে নমিতা বলল তার চেষ্টা করুন।

—চেষ্টা করলেই কি হয়। সীতানাথ তো পারেনি। তাই আপনাকে নিয়ে এসেছে।

নমিতা বলল, ও একটা বোকা। দেখছেন না......।

কথা ধরে নিয়ে বললাম আমাকে দেখে কি খুব চতুর বলে মনে হয়।

—না। না। নমিতা শব্দ করে হাসল। শরীর ভাঙল। বলছি চতুর বলছি না। কিন্তু আপনার যা চোখ না। না না খারাপ কথা বলছি না। আপনার চোখ ভারী মিষ্টি। যে কোন মেয়েই প্রেমে পড়বে।

আমার আমূল কেঁপে উঠল নমিতার কথায়। এই স্টেশনের শেষপ্রান্ত নির্জন জনহীন। নমিতাকে পরিষ্কার দেখা যায় না। এক যুবতীশরীর আলো-আঁধারে মাখা বড্ড রহস্যময়। তার শ্বাসের শব্দ কানে বাজে। শরীরের ঘ্রাণ উঠে আসে নাসাগ্রে। শব্দেরা যেন মায়াঘন হয়ে বসে থাকে চারিদিকে শরীর হয়ে ওঠার অপেক্ষায়।

অদূরে শহর, বনজঙ্গল কিছু অট্টালিকার আলো এবং অন্ধকার বড় মায়াবী হয়ে ওঠে। এবং ঐ সময় সীতানাথের স্ত্রী নয় আমার কি যে হয় শরীরে মৌচু হয়ে যাই। কেন নমিতা হঠাৎ কথায় এমন সুর আনল? কেন? কেন আমি সায় দিয়ে কথার খেলা চালাতে দিলাম? সীতানাথ হাসপাতালে বেড়ে এখন ঘুমন্ত আগামীকালের উদ্বেগ আমাদের মধ্যে চেপে অন্ধকার করে রাখার কথা। আশ্চর্য। কি চমৎকার আমরা এক-জোড়া যুবক যুবতী এখন অন্ধকারে...। একটা সর্পিল হিমস্রোত আমার শরীরে স্পন্দে কেঁপে ছোটাছুটি করে। হঠাৎ বদলে যাওয়ার নমিতার রহস্য টের পাই না।

নমিতা কি টের পায় আমাকে! বলে ওঠে কলকাতা ফিরে তো আপনার দেখাই পাব না। অথচ আপনারাই ভরসা। ধরুন ও বিছানায় পড়ে থাকল।

দম বন্ধ করে বললাম আমরা তো রয়েছি।

—জানি। নমিতা এক পা সামনে বাড়িয়ে ঘাড় ভাঙাল আপনাকে আমার বিশ্বাস হয়।

অন্ধকারের মধ্যে কি নমিতার চোখের মধ্যে দপ করে নক্ষত্র জ্বলে উঠল। বললাম চলুন। এখানে লোকজন নেই। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। রাত্রি বাড়ছে।

—কেন?

—বিপদ হতে পারে। দিনকাল তো ভাল নয়। হয়ত কেউ...। আমি কথা শেষ করিনি।

—আপনি তো আছেন।

—আমি।

—হ্যাঁ। রক্ষা করতে পারবেন না? নমিতা ঘাড় উঁচু করে আমার দিকে তাকাল।

আমি বুঝে উঠতে পারি না। দুর্ভাবনায় কি নমিতার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? শক্ত গলায় বলে উঠলাম ছেলেমানুষী করবেন না চলুন।

নমিতা খলখল করে হেসে উঠল, আপনি ভয় পেয়েছেন। আপনার গলা কাঁপছে। ভাবছেন আপনি যদি নিজেই বিপদ ডেকে বসেন। হাসি থামল না। তারপর গলার স্বরে যে কি আনল কিসের মায়া আমি দেখতে পাচ্ছি না তবু টের পেলাম চোখের তারা নাচল সারা মুখ-মণ্ডল তীব্র আলোয় ঝলকে উঠল এবং যুবতীর সেই আদিম শাণিত অস্ত্রের ঝলকানি ফুটে উঠল ঠোঁটে হ্যাট তাই আবার হয়। আর যদি বা হয় ধরুন হয়ত আপনি আমাকে —।

অনায়াসে নমিতা আর আমি তো এই অন্ধকার নির্জন প্লাটফর্মের শেষ প্রান্তে আর একটা গল্প তৈরি করতে পারি। কিন্তু তখনই মনে হয় নমিতা সীতানাথের বিছানায় পড়ে থাকাকালীন সময়ের ভূমিকা তৈরী করছে। সঙ্গে সঙ্গে হিম বৃষ্টি শুরু হয়ে যায় আমার উপর। সব উত্তাপ নিবে যায়। আমি স্পষ্ট দেখতে পাই এসপ্ল্যানেডের উপর দাঁড়িয়ে নমিতা আর এক সীতানাথকে খুঁজছে। কি মারাত্মক বিশ্বাস জানি না একবার পেয়েছে বলেই ওটা সত্য নয়। পৃথিবীতে সীতানাথদের সংখ্যা বড্ড অল্প। নমিতারা এসপ্ল্যানেডে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের পিচ্ছিলতায় কেবলই গড়িয়ে পড়ে।

আমি একটা শক্ত কথা বলতে গিয়েও থমকে যাই। ঝট করে কানে বাজে নমিতার কথা। জানেন আমি খিদে একেবারে সহ্য করতে পারি না। কি ছেলেমানুষ। শুধু টের পাই কর্তব্য আজ রাত কি আগামী-কালই আমার শেষ হয়ে যাচ্ছে না।

প্রধান বিচারপতি এ এন রায়ের নেতৃত্বে সুপ্রীম কোর্টের সাতজন বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত সাংবিধানিক বেঞ্চ ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্পর্কে সরকারের অনুকূলে রায় দিয়ে একটা বড় রকমের সাংবিধানিক অনিশ্চয়তার সম্ভাবনা দূর করলেন।

গুজরাট বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়ার সময় থেকেই প্রশ্নটা উঠেছিল। প্রশ্নটা হল, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় যদি এক বা একাধিক বিধানসভা বাতিল অবস্থায় থাকে তাহলে বিদায়ী রাষ্ট্রপতির কার্যকাল উত্তীর্ণ হওয়ার আগে ঐ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে কিনা অথবা কোন একটি বা একাধিক বিধানসভা বাতিল হয়ে থাকলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের কোন বাধা সৃষ্টি হয় কিনা।

আগামী ২৪ আগষ্ট রাষ্ট্রপতির পদে শ্রী ভি ভি গিরির কার্যকাল শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। তার আগে সংবিধানের এই প্রশ্নের একটা চূড়ান্ত মীমাংসা হওয়ার প্রয়োজন ছিল।

সুপ্রীম কোর্টের সংবিধান বেঞ্চের রায়ে সেই প্রয়োজন পূর্ণ হল। ২৭ পৃষ্ঠাব্যাপী এই রায়ে সংবিধানের নির্দেশ ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই পরবর্তী রাষ্ট্রপতির নির্বাচন অবশ্য সম্পূর্ণ করতে হবে, সে সময়ে কোন রাজ্যের বিধানসভা যদি বাতিল অবস্থায় থাকে তাতেও কিছু আসে-যায় না।

রাষ্ট্রপতির আদেশে গুজরাট বিধানসভা বাতিল হয়ে যাওয়ার পর যখন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের উপর এই বাতিল আদেশের সাংবিধানিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা হচ্ছিল তখন গত এপ্রিল মাসে সোস্যালিস্ট পার্টি ও জনসংঘের কয়েকজন সদস্য সংসদে প্রশ্নটি তোলেন। আইনমন্ত্রী শ্রীএইচ আর গোখলে এই প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, সংবিধানের একাদশ সংশোধনের দ্বারা ৭১ নম্বর অনুচ্ছেদের সঙ্গে নতুন যে ৪ নম্বর উপ-ধারাটি যোগ করা হয়েছে তাতেই বলা আছে যে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের নির্বাচকমণ্ডলীতে কোন আসন শূন্য থাকলে তাতে ঐ নির্বাচনে কোন বাধার সৃষ্টি হবে না। শ্রীগোখলে মন্তব্য করেন যে, কোন বিধানসভা বাতিল হয়ে থাকলেও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যে কোন বাধা হবে না ৭১(৪) অনুচ্ছেদের মধ্যেই তার ব্যবস্থা রয়েছে। তবুও, শ্রীগোখলে ঘোষণা করেন যে, এবিষয়ে সব সংশয় দূর করার জন্য সংবিধানের ১৪৩(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের অভিমত জানতে চাইবেন। সংবিধানের ১৪৩(১) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতিকে প্রয়োজনবোধে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের অভিমত গ্রহণ করার অধিকার দেওয়া আছে।

সুপ্রীম কোর্টের রায়ের পর এখন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রস্তুতিপর্ব শুরু করার পথ খোলা হয়ে গেল। এইবারই প্রথম আমাদের দেশে এমন এক সময়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হতে চলেছে যখন একটি বিধানসভার সদস্যরা (একমাত্র স্পীকার বাদে) এই নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন না। ভারতবর্ষে এর আগে যে পাঁচবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয়েছে তার মধ্যে কোনবারই কোন রাজ্য বিধানসভা বাতিল অবস্থায় ছিল না। ১৯৫৭ সালে দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রাককালে হিন্দু মহাসভার প্রাক্তন সভাপতি ডঃ এন বি খারে ও পাঞ্জাবের শ্রীরামনাথ কালিয়া সুপ্রীম কোর্টে এই মর্মে আপত্তি তুলেছিলেন যে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের যে তারিখ ঘোষিত হয়েছে সে তারিখের মধ্যে হিমাচল প্রদেশ থেকে [illegible] চারটি আসনে ও পাঞ্জাব থেকে লোকসভার দুটি আসনে নির্বাচন সম্পূর্ণ হবে না। সুপ্রীম কোর্টের ঐ মামলার আবেদনকারীদের বক্তব্য ছিল, যেহেতু এই ছয়টি নির্বাচন [illegible] না হলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের নির্বাচকমণ্ডলীর গঠন সম্পূর্ণ হবে না সেহেতু এই অসম্পূর্ণ নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন বৈধ হবে না। সুপ্রীম কোর্টের রায়ে সে সময়ে ঐ প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়নি। কিন্তু ঐ মামলার কথা মনে রেখেই ১৯৬২ সালে তৃতীয়বার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রাককালে সংবিধানের একাদশ সংশোধন গৃহীত হয়েছিল।

এবার সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম বিচার্য বিষয় ছিল গুজরাট বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়ার পর ঐ বিধানসভার সদস্যদের বাদ দিয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা হলে ঐ নির্বাচন একাদশ সংশোধনের আওতায় আসবে কিনা। সুপ্রীম কোর্টের সংবিধান বেঞ্চের সিদ্ধান্ত হল হ্যাঁ, তা আসবে। বেঞ্চের রায়ে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সকল বিধানসভার সদস্যরা অংশ গ্রহণ করতে পারলে উত্তম কিন্তু যদি তা সম্ভব না হয় তাহলেও ক্ষতি নেই, নির্বাচনের সময় যেসব বিধানসভা চালু থাকবে সেসব বিধানসভার সদস্যরা ও সংসদের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যরাই ভোট দিয়ে রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করতে পারবেন।

গুজরাটের পর বিহারেও বিধানসভা ভেঙে দেবার দাবীতে যখন আন্দোলন চলছে তখনই সুপ্রীম কোর্টের এই রায় পাওয়া গেল। এতে শুধু যে সংবিধানের একটা সম্ভাব্য সংকট এড়ান গেল তাই নয় সম্ভবত এই রায়ের একটা রাজনৈতিক তাৎপর্যও রয়েছে। গুজরাটের পর বিহার বিধানসভা বাতিল করার জন্য যেসব দল আন্দোলন চালাচ্ছে তারা যদি শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে একটা সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এটা করে থাকে তাহলে সুপ্রীম কোর্টের এই রায়ের পর এখন তাদের ব্যাপারটা ভেবে দেখতে হবে। গুজরাটের পর বিহার, বিহারের পর উত্তরপ্রদেশ—এভাবে ক্ষটন রি-অ্যাকশন [illegible] শেষকালে [illegible] দিল্লীতে আঘাত করার কোন পরিকল্পনা কারুর থাকলে তাকে সেই পরিকল্পনা এখন শিকেয় তুলে রাখতে হবে। কারণ সুপ্রীম কোর্ট দেখিয়ে দিয়েছেন যে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হতে আর যেটুকু সময় বাকী আছে তার

মধ্যে আরও গোটা কয়েক বিধানসভা ভেঙে দেওয়া গেলেও তাতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আটকে থাকবে না।

*

এমনিতেই অবশ্য দেখা যাচ্ছে যে, বিহারে বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার আন্দোলন গুজরাটের মত এমন উচ্চগ্রামে উঠছে না। শুধু তাই নয়, এ ব্যাপারে বিভিন্ন অকংগ্রেসী দলের ভিতরে বিরোধ দেখা দিচ্ছে এবং বিধানসভা ভাঙতে গিয়ে কয়েকটি দল নিজেরাই ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। বিধানসভা ভেঙে দিতে নয়াদিল্লিকে বাধ্য করার জন্য কয়েকটি দল নিজেদের সদস্যদের বিধানসভা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বলেছে। ঐসব দলের অনেক এম-এল-এ-ই এখন দলের নির্দেশ মানতে অস্বীকার করছে। জনসংঘের নির্দেশে ঐ দলের ২৪জন সদস্যের মধ্যে ১২জন বিধানসভা থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। যে ১২জন দলের নির্দেশ মানেন নি তাঁরা বিধানসভা না ছেড়ে দলই ছেড়ে দিয়েছেন। সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টির ১৭জন এম-এল-এ'র মধ্যে মাত্র ৬জন দলের নির্দেশ মেনে পদত্যাগ করেছেন। জনসংঘের মত সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টিও এই প্রশ্নে ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। সোস্যালিস্ট পার্টি এখন আর তাদের সদস্যদের বিধানসভা থেকে পদত্যাগ করতে বলছে না, তার বদলে তারা সাময়িকভাবে বিধানসভা বয়কট করার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। সংগঠন কংগ্রেস এখন আর তাদের সদস্যদের পদত্যাগ করার জন্য পীড়াপীড়ি করছে না।

নিজের নিজের দলের যেসব সদস্য পদত্যাগ করতে রাজী হচ্ছেন না তাঁদের সংগে কথা বলার জন্য সোস্যালিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান জর্জ ফার্নান্ডেজ ও সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টির নেতা রাজনারায়ণ পাটনায় গিয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও সুবিধা হয়নি। বিহার সংগঠন কংগ্রেসের সভাপতি সত্যেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বলেছেন, তাঁর দলের ২৩জন সদস্যের অধিকাংশই বিধানসভা থেকে পদত্যাগ করতে অস্বীকার করেছেন।

ইতিমধ্যে 'পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র রক্ষার জন্য ও ভারতীয় সংবিধানের মর্যাদা রক্ষার জন্য বিহারে একটি অরাজনৈতিক 'বিহার গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' গঠিত হয়েছে। বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে এই ফ্রন্ট গঠিত হয়েছে। ফ্রন্টের মুখপাত্র বলেছেন, সাংবিধানিক উপায়ে দুর্নীতি দূর করার প্রয়োজনীয়তার কথা তাঁরা সরকারকে ও জনসাধারণকে বোঝাবেন। মুখপাত্র বলেন যে, হিংসা ও বিশৃঙ্খলার পথে অথবা বিধানসভা ভেঙে দিয়ে রাজ্যের সমস্যাগুলি দূর করা যায় বলে তাঁরা মনে করেন না।

বিধানসভা ভাঙার আন্দোলন থেকে বিরত হয়ে বর্তমান শাসনব্যবস্থার গলদগুলি দূর করা সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য ও এইসব গলদ দূর করার উপায় খুঁজে বের করার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উমাশংকর দীক্ষিত ও কংগ্রেসের এগারজন এম-পি এর মধ্যে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের কাছে দুটি পৃথক আবেদন জানিয়েছেন। কংগ্রেস এম-পিরা বলেছেন, জয়প্রকাশ যেভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন সেভাবেই যদি তিনি আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন তাহলে ফ্যাসিজম ও প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলি বর্তমান অবস্থার সুযোগ নিতে প্রলুব্ধ হবে।

সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ অবশ্য পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী বিধানসভার অধিবেশন উদ্বোধনের দিন বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার দাবীতে পাটনা শহরে বিরাট মিছিল বের করেছেন। এই দাবীতে তিনি ৫০ লক্ষ মানুষের স্বাক্ষরযুক্ত একটি স্মারকলিপি রাজ্যপাল আর ডি ভাণ্ডারেকেও দিয়ে এসেছেন।

অন্যদিকে এর আগের দিন শ্রী এস এ ডাঙ্গের নেতৃত্বে সি পি আই বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার দাবীর বিরোধিতা করে পাটনায় একটি বিরাট জমায়েৎ করেছে।

*

১০ জুন থেকে ইসলামাবাদে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যে আলোচনা আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল পাকিস্থান একতরফাভাবে সেই আলোচনার প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছে। এই বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে ডাক, টেলিফোন টেলিগ্রাফ প্রভৃতির যোগাযোগ ও যাতায়াতের সুযোগসুবিধা সম্পর্কে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল।

ইসলামাবাদে একটি সরকারী ঘোষণায় বলা হয়েছে, ১৮ মে ভারত যে পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ করেছে তাতে পাকিস্থানের মানুষ 'মর্মাহত' হয়েছে। এই সরকারী ঘোষণায় আরও বলা হয়েছে যে, 'পাকিস্থান তার নিজের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নিশ্চয়তা' পেলে পর এবং 'অনুকূল পরিবেশ তৈরি হওয়ার পর পাকিস্থান ভারতের সংগে তার আলোচনা আবার আরম্ভ করতে পারে, তার আগে নয়।

পাকিস্থানের এই একতরফা অস্বীকৃতির পর ১৯৭২ সালের আগষ্ট মাসে সম্পাদিত সিমলা চুক্তি অনুযায়ী দুই দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার কার্যক্রম সম্পূর্ণ বানচাল হয়ে গেল।

নয়াদিল্লীতে একজন সরকারি মুখপাত্র বলেছেন যে, পাকিস্থান এই আলোচনায় কখনই উৎসাহী ছিল না। এখন সে একটি অছিলা খুঁজে বের করে এই আলোচনা বাতিল করে দিল। শ্রীমতী গান্ধী গত ২২ মে ভুট্টোকে চিঠি লিখে যে আশ্বাস দিয়েছেন তারপর ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণ সম্পর্কে পাকিস্তানের কোন আশংকা থাকা উচিত নয়।

সিমলা চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্তানের সংগে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ভারত অতীতে যখনই কথা তুলেছে তখনই পাকিস্থান কোন না কোন অজুহাতে আলোচনা এড়িয়ে গেছে।

সিমলা চুক্তির অব্যবহিত পরেই ভারত আলোচনার কথা তুললে পর পাকিস্তান ওজর তুলল, আগে পাকিস্তানের মাটি থেকে ভারতীয় সৈন্যদের সরিয়ে আনা হোক।

ভারতীয় সৈন্য পাকিস্থানী এলাকা ছেড়ে দিয়ে চলে এল ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে। ১৯৭৩ সালের জানুয়ারিতে শ্রীমতী গান্ধী ভুট্টোকে চিঠি দিলেন। সে সময়ে পাকিস্তান বলল, যুদ্ধবন্দীদের প্রশ্নে সেদেশের জনমত ক্ষুব্ধ হয়ে আছে, এই প্রশ্নের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আলোচনা সম্ভব নয়।

এরপর হল দিল্লি চুক্তি। ১৯৭৩ সালের আগস্ট মাস থেকে পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের দেশে ফিরিয়ে দেওয়া হতে থাকল। যুদ্ধবন্দীদের ফিরিয়ে দেওয়ার কাজ যখন চলছিল তখন ভারত আবার পাকিস্তানের সংগে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়ে আলোচনার কথা তুলল।

পাকিস্তান তখন অজুহাত দিল, যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত ১৯৫ জন সহ সকল যুদ্ধবন্দীকে মুক্তি দেওয়ার আগে কোন কথাবার্তা হতে পারে না।

পাকিস্তান সরকার সে সময়ে সিমলা চুক্তির তৃতীয় অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত একমাত্র ডাক ও তারের যোগাযোগ ব্যবস্থা সংক্রান্ত আলোচনা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করল।

এর পরের ঘটনা হল, গত এপ্রিল মাসে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ভারত, পাকিস্থান ও বাংলাদেশের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক আলোচনা। ১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিল তারিখে ভারত-পাকিস্থান যুক্ত ঘোষণায় বলা হল, ডাক ও তারের যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা, বিশেষ করে তীর্থযাত্রীদের চলাচলের সুযোগসুবিধা প্রবর্তনের বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আলোচনা হবে। ঐ ঘোষণায় আরও বলা হল যে, সিমলা চুক্তির তৃতীয় অনুচ্ছেদে উল্লেখিত অন্যান্য বিষয়গুলিতেও আলোচনার সূত্রপাত করার জন্য ক্রমে ক্রমে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

এই ঘোষণার পর থেকে গত কিছুকাল যাবৎ আলোচনার সম্ভাব্য তারিখ নিয়ে নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদের মধ্যে বার্তা বিনিময় হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় যে, ১০ জুন ইসলামাবাদে দুই দেশের প্রতিনিধিরা বৈঠকে বসবেন।

এবারও পাকিস্তানই আলোচনা থেকে পিছিয়ে গেল। এবারকার অজুহাত রাজস্থানের মরুভূমির নিচে ভারতের পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ। এই বিস্ফোরণের অব্যবহিত পরেই ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং প্রকাশ্যে পাকিস্তানকে এই বলে আশ্বাস দেন যে, শান্তিই ভারতের কাম্য এবং সে সিমলা চুক্তি মেনে চলবে।

এই পারমাণবিক বিস্ফোরণের চার দিন পরে, ২২ মে তারিখে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভুট্টোকে একটি পত্র পাঠিয়ে

পাকিস্তানকে মনে করিয়ে দিলেন যে,, সিমলা চুক্তি অনুযায়ী উভয় দেশ অতীতের সংঘাতের ইতিহাস থেকে বেরিয়ে এসে দুই দেশের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক ও স্থায়ী শান্তির বিকাশ ঘটাতে কৃতসংকল্প হয়েছে। শ্রীমতী গান্ধী পাকিস্তানকে আশ্বাস দিলেন যে, ভারত এ চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্তানের সঙ্গে তার সব বিভেদ দ্বিপাক্ষিক আলোচনার দ্বারা মিটিয়ে নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আছে।

শ্রীমতী গান্ধী তাঁর ঐ পত্রে আরও বলেন যে, ভারত পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য একটি পরীক্ষা করেছে বলেই আলাপ-আলোচনার এই কল্যাণকর পথ পরিত্যাগ করতে হবে, এমন কোন কথা নেই।

•

পাকিস্তান ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণের অজুহাতে সিমলা চুক্তি বানচাল করেই ক্ষান্ত হয় নি, বিষয়টি নিয়ে ভারতকে বিব্রত করার ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির জল ঘোলা করার সাধ্যমত চেষ্টা করছে। তার সর্বশেষ চেষ্টা হল, ভারত মহাসাগর সংক্রান্ত রাষ্ট্রসংঘ কমিটিতে প্রসংগটি তোলা। সেখানে পাকিস্তানের বক্তব্য হল, ভারত পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানর ফলে ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী দেশগুলিতে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। পাকিস্তান এই সুযোগে মার্কিণ নৌবহরকে ভারত মহাসাগরে ডেকে এনে এই মহাসাগরকে 'শান্তির এলাকায়' পরিণত করার প্রস্তাব বানচাল করে দিতে চাইছে বলে মনে হচ্ছে।

•

গত ২ জুন সকালে ভারতের প্রতিবেশী রাজ্য ভুটানে ১৮ বৎসর বয়স্ক রাজা জিগমে সিংগে ওয়াংচুক আনুষ্ঠানিকভাবে 'ড্রুক গিয়ালপো'র (ড্রাগন রাজা) পদে অভিষিক্ত হলেন। জিগমে সিংগে ওয়াংচুক হলেন ভুটানের বর্তমান রাজবংশের চতুর্থ রাজা।

দু বছর আগে পিতা জিগমে দোরজি ওয়াংচুকের মৃত্যুর পর রাজা হয়ে জিগমে সিংগে ভুটানের শাসনভার গ্রহণ করেন। পরলোকগত রাজা জিগমে দোরজি আধুনিক ভুটানের স্রষ্টা হিসাবে পরিচিত। তিনি তার দেশের একজন জনপ্রিয় নেতা ছিলেন।

এই অভিষেক অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ভারত ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিরাও উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে ভুটানের তরুণ রাজা তাঁর পরলোকগত পিতার নীতি অনুসরণ করার ও ভারতের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক বজায় রেখে চলার আশ্বাস দিয়েছেন।

অভিষেকের প্রাক্কালে ভুটানের রাজাকে হত্যা করার ও রাজ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করার এক চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গেছে বলে রাজধানী থিম্পু থেকে ঘোষণা করা হয়েছে। এই চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে যে ৩০জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন স্বরাষ্ট্র বিভাগের উপ-মন্ত্রী, ভুটান সরকারের তিব্বতী শরণার্থী সংক্রান্ত অফিসার, রাজকীয় পুলিশ বাহিনীর একজন কম্যান্ডান্ট ও 'তোরতোলা' নামে পরিচিত একজন ভুটানী নাগরিক।

ধৃত ব্যক্তিদের কাছ থেকে নাকি প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র, গুলিবারুদ, হাতবোমা ও বিষ পাওয়া গেছে এবং তারা নাকি তাশিজং দুর্গ পুড়িয়ে ফেলার, ব্যাপক গুপ্তচরবৃত্তি চালিয়ে সারা দেশে আতংক ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির ষড়যন্ত্র করেছিল।

সরকারি সূত্রে এই ষড়যন্ত্রের যে কাহিনী প্রচার করা হয়েছে সেটা হল এই যে, এই ষড়যন্ত্রের মূলে রয়েছেন ইয়াংকি নামে ভুটানের অধিবাসিনী একজন তিব্বতী মহিলা। এই মহিলা ভুটানের পরলোকগত রাজা জিগমে দোরজি ওয়াংচুকের একজন প্রিয়পাত্রী ছিলেন বলে প্রকাশ। এই ইয়াংকির বাবার নাম কালাইভু। ১৯৭২ সালের জুন মাসে এই কালাইভুর সঙ্গে যোগাযোগ হয় লোবসং ইয়েশে নামে আর এক ব্যক্তির। ভুটানের বর্তমান রাজাকে হত্যা করে ইয়াংকির ছেলেকে রাজ সিংহাসনে বসান হবে বলে দুজনের মধ্যে নাকি সে সময়ে একটি গোপন চুক্তি হয়। এই লোবসং ইয়েশের মুরুব্বি হলেন গিয়ালো থোনডুপ। গিয়ালো থোনডুপ একজন সুপরিচিত তিব্বতী শরণার্থী, থাকেন দার্জিলিং-এ। তোরতোলা নামে যে ভুটানী নাগরিকটিকে এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তিনি নাকি স্বীকার করেছেন যে, ...১৯৭৩ সালের জানুয়ারী মাসে দার্জিলিং-এ এই ষড়যন্ত্র তৈরি হয়েছিল, তার পিছনে মাথাটা ছিল গিয়ালো থোনডুপের এবং তাশিছো জং পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য তোরতোলাকে লাখ খানেক টাকা দিতে চাওয়া হয়েছিল।

এই বছরের গোড়ার দিকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিকসন 'ওয়াটারগেট নিয়ে বছরখানেক ধরে যা হয়েছে তাই ঢের', একথা বলে ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারী ঝেড়েমুছে ফেলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৭৪ সালের গোড়ার কয়েক মাসেই ওয়াটারগেটের জল তাঁকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছে যে, তিনি কম্বলকে ছাড়তে চাইলে কি হবে, কম্বল তাঁকে ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না। সাধারণভাবে 'ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি' নামে পরিচিত যেসব অপকর্মের সন্দেহ প্রেসিডেন্ট নিকসনকে ঘিরে ধরেছে সে সম্পর্কে নিকসনের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধাজনক সর্বশেষ ঘটনাটি হল, মার্কিণ সুপ্রীম কোর্টে জবাবদিহির দায় এখন তাঁর উপর এসে পড়েছে।

প্রেসিডেন্ট নিকসন যখন ইমপিচমেন্টের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন তখন সুপ্রীম কোর্ট এই ব্যাপারে জড়িয়ে যাওয়ায় নিকসনের বিপদ আরও বাড়ল।

সুপ্রীম কোর্ট যে প্রশ্নটি বিচার করতে সম্মত হয়েছেন সেটি হল, কেলেঙ্কারি চাপা দেওয়ার দায়ে অভিযুক্ত সহকারীদের বিচার সম্পর্কে যেসব তথ্য আদালতে দাখিল করার জন্য প্রেসিডেন্টকে সাপিনা করা হয়েছে প্রেসিডেন্ট 'বিশেষ অধিকার' দাবি করে সেসব তথ্যপ্রমাণ উপস্থিত করতে অস্বীকার করতে পারেন কিনা।

সুপ্রীম কোর্ট এই প্রশ্নের কি উত্তর দেন এবং নিকসন মার্কিণ কংগ্রেস ও সে-দেশের জনগণের মধ্যে কোর্টের রায়ের কি প্রতিক্রিয়া হয় তার উপর নির্ভর করবে নিকসন প্রেসিডেন্ট হিসাবে তাঁর কার্যকাল শেষ করে যেতে পারবেন কিনা, অথবা তার আগেই সরে যেতে বাধ্য হবেন।

প্রেসিডেন্ট নিকসন সম্প্রতি আদালতে ও আইনসভায় আইনের লড়াই চালিয়ে শেষ বিচারের দিনটি বিলম্বিত করার যে কৌশল গ্রহণ করেছিলেন সুপ্রিম কোর্ট জরুরি প্রশ্ন হিসাবে প্রেসিডেন্টের 'বিশেষ অধিকার' সংক্রান্ত আপত্তি বিচার করে দেখতে রাজি হওয়ায় প্রেসিডেন্টের সেই কৌশল এখন অনেকটা অকেজো হয়ে গেল।

ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি চাপা দেওয়ার অভিযোগে নিকসনের সাতজন প্রাক্তন সহকারীর বিরুদ্ধে জেলা জজ জন জে সিরিকার আদালতে যে ফৌজদারি মামলা চলছিল সেই মামলার প্রসিকিউটর লিওন জাওরস্কি হোয়াইট হাউসের কতকগুলি টেপ রেকর্ড চেয়েছিলেন। টেপ রেকর্ডগুলি আদালতে হাজির করার জন্য বিচারপতি সিরিকা প্রেসিডেন্টের উপর সাপিনা জারি করেন: প্রেসিডেন্ট সেই সাপিনা মানতে অস্বীকার করেন। প্রেসিডেন্টের কৌঁসুলি সেন্ট ক্লেয়ার আদালতে আইনের প্রশ্ন তোলেন। বিচারপতি সিরিকা সেন্ট ক্লেয়ারের আপত্তি অগ্রাহ্য করে দেন। প্রেসিডেন্ট নিকসনের কৌঁসুলী বিচারপতি সিরিকার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সারকিট কোর্ট অব অ্যাপীলসে আপীল করলে প্রসিকিউটর জাওরস্কি তড়িৎগতিতে পাল্টা চাল দিয়ে বিষয়টি একেবারে সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে গেছেন, যাতে প্রেসিডেন্ট একটার পর একটা আইনের প্রশ্ন তুলে সময় কাটিয়ে দিতে না পারেন।

এখন সুপ্রিম কোর্ট হয় বিচারপতি সিরিকার সাপিনা আদেশ খারিজ করে দেবেন অথবা ঐ আদেশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট টেপ রেকর্ডগুলি আদালতে উপস্থিত করতে প্রেসিডেন্ট নিকসনকে নির্দেশ দেবেন।

সুপ্রিম কোর্টের রায় যদি প্রেসিডেন্ট নিকসনের বিরুদ্ধে যায় তাহলে তাঁকে অবধারিতভাবেই কঠিন সংকটের মধ্যে পড়তে হবে। হয় তিনি সুপ্রিম কোর্টের রায় অমান্য করার দরুন মার্কিন কংগ্রেসে ইম্পিচমেন্টের কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াবেন অথবা টেপ রেকর্ডগুলি তাঁকে ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির সঙ্গে আরও জালভাবে জড়াবে।

প্রেসিডেন্ট নিকসন ইতিমধ্যেই যে ৪৬টি কথোপকথনের টেপ প্রকাশ করেছেন (যেগুলি অনুলিখনের পর এক হাজার পৃষ্ঠারও বেশি ফাইল তৈরি হয়েছে) সেগুলির মধ্য থেকেই নাকি সিনেটের জুডিসিয়ারি কমিটি কিছু আপত্তিকর তথ্য-প্রমাণ উদ্ধার করেছেন। যেমন গত ২১ মার্চ তারিখের একটি কথোপকথনের রেকর্ড শুনে কমিটির এই নিশ্চিত ধারণা হয়েছে যে, ই হাওয়ার্ড হান্ট নামে যে দাগী লোকটিকে ওয়াটারগেট বিল্ডিংয়ের ভিতর লুকিয়ে চুরিয়ে ঢুকতে পাঠান হয়েছিল ঘুষ দিয়ে তার মুখ বন্ধ করার বিষয়ে প্রেসিডেন্ট নিকসন তাঁর প্রাক্তন কৌঁসুলি জন ডীনের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন।

এভাবে দেশের ভিতর যখন প্রেসিডেন্ট নিকসনের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ক্রমেই অন্ধকার হয়ে আসছে তখন তিনি তাঁর পররাষ্ট্র-সচিব ডঃ হেনরি কিসিঞ্জারের সাম্প্রতিক শান্তিদৌত্যের সাফল্যের সুযোগ নিয়ে পশ্চিম এশিয়ায় সফর করার একটি কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এর পরে তাঁর রাশিয়ায়ও যাওয়ার কথা আছে।

•

দেশে যখন সারের অভাব তখন বিচিত্র যুক্তিতে আমরা সার উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপাদান ন্যাপথা বিদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছি। দেশের সার কারখানাগুলিতে উৎপাদন ঠিকমত না হওয়ায় তেল শোধনাগারগুলিতে সার জমে যাচ্ছিল। তারা ন্যাপথা উৎপাদন কমিয়ে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছিল। এদিকে জাপান আমাদের ন্যাপথার জন্য ভাল দাম দিতে চাইল। জমে-থাকা ন্যাপথা বিক্রি করে দিয়ে যদি তেল শোধনাগারগুলির সমস্যার সুরাহা করা যায় আবার সেই সঙ্গে যদি কিছু বৈদেশিক মুদ্রাও উপার্জন করে নেওয়া যায় তাহলে মন্দ কি?—এই যুক্তিতে ভারত সরকার জাপানে ন্যাপথা রপ্তানি করতে শুরু করেছেন। সেখানে ইতিমধ্যে ৪০ হাজার টন ন্যাপথা পাঠান হয়েছে। প্রকাশ, জাপান আরও চেয়েছে এবং ভাল দাম দিতে প্রস্তুত আছে।

অথচ ন্যাপথা বিক্রি করে ভারত এখন বিশ্বের চড়া বাজারের যতটুকু সুযোগ পাবে সেই তুলনায় তার অনেক বেশি দাম দিয়ে তাকে বিদেশ থেকে সার আমদানি করতে হবে। ভারতে এখন যে সার তৈরি হয় তাতে তার চাহিদার অর্ধেক মাত্র পূরণ হয়। কৃষিমন্ত্রী ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ বলেছেন, এই বছর ভারতকে ২০ লক্ষ টন রাসায়নিক সার বিদেশ থেকে আমদানি করতে হবে।

বেশি দাম পাওয়ার আশায় যখন আমরা বিদেশে ন্যাপথা পাঠাচ্ছি তখন দেশের ভিতর আমদানির খরচ উশুল করার জন্য ভারত সরকার সারের জন্য ব্যবহৃত ন্যাপথার দাম ও সারের দাম চড়িয়ে প্রায় দ্বিগুণ করে দিয়েছেন।

•

বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট একটি অভিনব বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন। তাঁদের গবেষণার বিষয় হল, বলদে-টানা গাড়ির উন্নতি করা যায় কি করে।

মোটামুটি [illegible] হিসাব নিয়ে দেখা গেছে, ভারতে প্রায় দেড় কোটি জানোয়ারে-টানা গাড়ি আছে, এই গাড়িগুলিতে প্রায় ৩০০০ কোটি টাকা লগ্নি করা আছে এবং এই গাড়িগুলি থেকে ছুতোর, কামার ইত্যাদি সহ মোট ১৬ লক্ষ মানুষের জীবিকার সংস্থান হচ্ছে।

অথচ ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টের ডিরেকটর অধ্যাপক রামস্বামী এই বলে আক্ষেপ করেছেন যে, উন্নত ধরনের গাড়ি বানিয়ে সেগুলি থেকে গ্রামের মানুষের আয় বাড়ান যায় কিনা সেই প্রশ্ন নিয়ে আমাদের দেশের তিন লক্ষ ইঞ্জিনীয়ার মাথা ঘামান নি।

শ্রীরামস্বামী বলেছেন যে, এখন এক-একটি গরুর গাড়িতে আধ টন থেকে এক টন পর্যন্ত মাল বহন করা যায়, কিন্তু গাড়িগুলির সামান্য কিছুটা আধুনিকীকরণ করতে পারলে প্রতিটি গাড়িতে দু টন মাল বহন করা খুবই সম্ভব।

৫-৬-৭৪ পুণ্ডরীক

ওস্তাদের ওস্তাদ

(১২)

কি মিষ্টি হাত। অথচ যন্ত্রের মতন নিখুঁত সব আঙুল আর কব্জির কায়দা। নিভুল অঙ্কের মাত্রায় তবলা বাঁয়া বেজে চলেছে। কিন্তু কি মিঠে আওয়াজে বোল উঠছে অনর্গল। আর সেই সঙ্গে পঞ্চমে বাঁধা তবলা থেকে একটানা সুরের রেশ—কানি-র টাং টাং ধ্বনি। তারই মধ্যে ফুটছে অফুরন্ত বোলের বাহার।

হারমোনিয়মে নামমাত্র সঙ্গত হচ্ছে। ঘুরে ঘুরে বেজে চলেছে শুধু গতের মুখটি। কারণ তবলাই এখানে মুখ্য। তবলচীই প্রধান আকর্ষণ। হারমোনিয়ম বাদকের দিকে কারো দৃষ্টি নেই। শ্রোতাদের সকলকে আকৃষ্ট করে রেখেছেন তবলা-শিল্পী। ওস্তাদ আবেদ হোসেন—লক্ষ্ণৌ ঘরাণাদার খলিফা।

সেদিন ভবানীপুরে সঙ্গীত সম্মিলনীতে আসর বসেছে।

পঞ্চাশ বছরেরও আগেকার কথা।

সে আসরে তাঁর বাজনা শুনতেই এসেছেন বেশির ভাগ শ্রোতা। তাঁর একক বাদন ধারা—তবলা লহরা।

লক্ষ্ণৌর তবলা ঘরাণার তখন শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি আবেদ হোসেন। উত্তর ভারতের এক শ্রেষ্ঠ গুণী। তাই খলিফা বলা হত তাঁকে। বাইজীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা নর্তকী যেমন চৌধুরান বাই। কলকাতাতেই থাকতেন ত সেই চৌধুরান। লক্ষ্ণৌ থেকেই সে বাইজী কলকাতায় আসেন। লক্ষ্ণৌ কত্থক ঘরাণার বিন্দা দীনের কাছে তালিম তাঁর। দুজনেই লক্ষ্ণৌর বলে আবেদ হোসেনের সঙ্গে চৌধুরাণের সাঙ্গীতিক যোগাযোগ ছিল। চৌধুরান বাইজী ও তাঁর কনিষ্ঠা আজমৎ বাই—নানুয়া বাছুয়া নামে প্রসিদ্ধা দুই ভগিনীর কত্থক নাচের সঙ্গে কত আসরে বাজিয়েছেন আবেদ হোসেন। লক্ষ্ণৌ তবলা ঘরানার কদর ছিল নাচকরণ সঙ্গতের জন্যে। কত্থক নৃত্যের যোগ্য বাদন-শৈলী নাচকরণেও আবেদ হোসেন খলিফা ছিলেন। চৌধুরান বাইজীর ভাই আলী কদরও ভাল তবলচী। কিন্তু বড় আসর হলে সুযোগ থাকলে আবেদ হোসেন অনেক সময় তাঁদের কত্থক নৃত্যের সঙ্গে নাচকরণ বাজাতেন। চৌধুরান আর আজমৎ বাই শুধু কলকাতায় নয় বাংলার বাইরেও মুজরো করতে যেতেন পশ্চিমের নানা আসরে দরবারে। আবেদ হোসেন কলকাতায় এলে চৌধুরান বাইয়ের বাড়িতেই মেহমান (সম্মানিত অতিথি) হয়ে থাকতেন।

আবেদ হোসেনের জ্যেষ্ঠ মুন্নে খাঁও ছিলেন খলিফা। মুন্নে খাঁর মৃত্যুর অনেক পরে বংশের সেই শূন্য পদ তিনি পূরণ করেছেন। কঠিন সাধনায় যোগ্য করে তুলেছেন নিজেকে। দৈনিক ১৫।১৬ ঘণ্টা রিয়াজে প্রস্তুত হয়েছেন। তারপর সংগীত জগতে আত্মপ্রকাশ করেছেন লক্ষ্ণৌ ঘরাণার উত্তরাধিকারী রূপে। খলিফার সম্মান পেয়েছেন।

আবেদ হোসেনের জন্ম (১৮৬৭) লক্ষ্ণৌর মামুদপুরে। বেশি থাকতেন লক্ষ্ণৌতেই। মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন। তাঁর অনেক গুণগ্রাহী ছিলেন এ শহরে। নানা আসর মুজরো করতেন। লহরা শোনাতেনও কোথাও। কখনো সঙ্গতকার। এখানে তাঁর কৃতী শিষ্যও হন। অমনি নানাভাবে সে যুগের কলকাতায় বিখ্যাত ছিলেন খলিফা আবেদ হোসেন।

সেদিন ভবানীপুরে সঙ্গীত সম্মিলনীতে তিনিই অতিথি শিল্পী। তাঁর লহরার জন্যেই এত বড় আসর হয়েছে।

ঝাঁপতালে লহরা বাজাচ্ছিলেন খাঁ সাহেব। অসমান বিভাগের এই তাল। দোলায়িত ছন্দ তার।

সেই ছন্দে আবেদ হোসেন লহরা বা লহর শোনাচ্ছেন। তা হল একক তবলা বাদনের—তাল লয় ছন্দের এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া-পদ্ধতি। কত বোলের বিস্তার হয়ে চলেছে কত তালের বৈচিত্র্য। তার মধ্যে অটুট আছে সিলসিলা। এক এক অংশের পর মূল ছন্দের দোলা যথারীতি ফিরে আসছে। বাদ্যধারার ছন্দে ছন্দে দোলায়মান হয়ে উঠছে শ্রোতাদের অন্তর।

আবেদ হোসেনের তন্ময় নিমীলিত দৃষ্টি। আত্ম-সমাহিত তিনি। ছন্দ-লোকে ভূলোক চিত্ত। শ্যামবর্ণ কৃশ শরীর মাঝারি আকার তাঁর। প্রৌঢ় বয়স। পরনে চুড়িদার পায়জামা পাঞ্জাবী। মাথায় লক্ষ্ণৌ টুপি। তার পাশে পিছনে বাবরি-কেশে শাদা কালোর মিশ্রণ।

দরবারি আসনে জানু পেতে তিনি বাজিয়ে চলেছেন। হাত দুটি শুধু চঞ্চল গতিময়। আর সারা শরীর স্থির অকম্প। সুদীর্ঘকালের নিয়মনিষ্ঠ হস্ত সাধন-কৌশলের ফল।

আবেদ হোসেনের বাম হাতে বাজছে তবলা। আর ডান হাতে বাঁয়া। ছিম ছাম মিঠে আওয়াজে অজস্র বোল উঠছে। লক্ষ্ণৌ ঘরাণার ধেরেকেটে বোলের প্রাচুর্যে বিশেষতঃ শ্রোতারা বিমুগ্ধ।

সংগীত সম্মিলনীর আসর খলিফার লহরায় তখন জমজমাট।

এমন সময় নতুন একজন শ্রোতার আবির্ভাব হল।

আবেদ হোসেনেরই ধরনের চেহারা তাঁর। শ্যামবর্ণ মেদবর্জিত নাতিদীর্ঘ শরীর। তবে বয়সে আরো প্রবীণ। তিনিও বাঙালী নন। কালো টুপীর দু পাশেই পক্ব কেশের আভাস। অঙ্গে কোট শার্ট এবং ধুতি। আর ধুতি সত্ত্বেও বোঝা যায় পশ্চিমাঞ্চলের লোক।

তিনি মঞ্চের দিকে আবেদ হোসেনের কাছে এগিয়ে গেলেন।

তাঁকে দেখে একটু চাঞ্চল্য জাগল শ্রোতাদের মধ্যে। তাঁরা বেশির ভাগই সঙ্গীত সম্মিলনীর সদস্য। আর তিনি

হলেন এখানকার সর্বমান্য সঙ্গীতাচার্য। রীতিমত শিক্ষাদানের জন্যে সম্মিলনীতে একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় আছে। তিনি তার ভারপ্রাপ্ত। তা ছাড়া এখানে জলসায় তিনি হন আসর-পতি। সম্মিলনীর যাঁরা সদস্য সম্মিলনীর আসরে যাঁরা আসেন তাঁরা সকলেই তাঁকে চেনেন। তাই শ্রোতাদের মধ্যে শোনা গেল একটি অস্ফুট গুঞ্জরন : লছমী ওস্তাদ।

অর্থাৎ লছমীপ্রসাদ মিশ্র। তিনি খাঁ সাহেবের তবলা লহরা শুনতে এসেছেন।

আবেদ হোসেনও জানতেন তাঁকে। এখন সামনে দেখে দস্তুরমত খাতির জানালেন। কারণ লছমী ওস্তাদ শুধু মহামান্য গুণী নন। বয়োজ্যেষ্ঠ। তাঁর চেয়ে ৭।৮ বছরের বড়। আর এমন নানামুখীন গুণের ওস্তাদ সারা ভারতে কজন আছেন? তিনি শুনতে এসেছেন বাজনা। তাই খাঁ সাহেব দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে সম্মান জানালেন।

লছমী ওস্তাদ হাসিমুখে আলিঙ্গন করলেন আবেদ হোসেনকে। তারপর সামনেই আসন নিলেন। আর লছমীজীর অনুরোধে খাঁ সাহেব শুরু করলেন লহরা। হারমোনিয়ম বন্ধ ছিল না। তাই তখনি লয় ধরে নিলেন। দেখতে দেখতে আবার জমে উঠল লহরা।

লছমী ওস্তাদ মাথা দুলিয়ে তারিফ করতে লাগলেন 'বহোৎ আচ্ছা বহোৎ আচ্ছা।'

খলিফা শিরোধার্য করে নিলেন ওস্তাদজীর আন্তরিক প্রশংসা। স্মিতমুখে বাজাতে লাগলেন। সমঝদার সেই মুখমণ্ডলে বিচ্ছুরিত হল অকৃত্রিম আনন্দের আভা। লছমী ওস্তাদের দিলখোলা তারিফ। আবেদ হোসেন তার কদর বোঝেন বৈকি।

তাঁর লহরের ছন্দ ওস্তাদজীর উপস্থিতিতে আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। শ্রোতাদের অনেকেই তা অনুভব করলেন।

আসর মাৎ করে আবেদ হোসেনের লহরা শেষ হল এক সময়ে। লছমী ওস্তাদই তাঁকে সবচেয়ে সাবাস দিলেন। আর লক্ষ্ণৌয়ি বিনয়ে সেলাম জানালেন খাঁ সাহেব।

তারপর ওস্তাদজী আর এক রকমের তারিফ করলেন। বললেন যে এমন চমৎকার বাজনা শুনে বাজাবার উদ্দীপন জেগেছে তাঁর মনে।

'আপকা ঝাঁপতাল সুন্‌কর মেরা মেজাজ আ গয়া।'

আবেদ হোসেন খুশি হয়ে জানালেন বাঃ বাঃ এ তো ভাল কথা। ওস্তাদজীর বাজনা শোনা যাবে।

সামনেকার শ্রোতারাও শুনতে পেলেন কথাটা। আর একটা আসরের জন্যে সবাই আশা করে রইলেন।

কিন্তু লছমী ওস্তাদ নিজের তবলা আনেননি ত?

ওস্তাদজী আবেদ হোসেনের অনুমতি নিয়ে তাঁর তবলা বাঁয়া কাছে নিলেন। সুর একটু নেমে গিয়েছিল। ঠিকঠাক করে নিলেন ছোট্ট হাতুড়িটা দিয়ে। ডান হাতে তবলা ধরলেন। বাঁ হাতে বাঁয়া।

ওই ঝাঁপতালের লহরাই আরম্ভ করে দিলেন। অমনি এক মাত্রায় একটি স্বর দিয়ে হারমোনিয়মের গৎ-ও বাজতে লাগল। খলিফা আবেদ হোসেনের মিষ্টি দুরস্ত হাতে এইমাত্র বেজেছিল ঝাঁপতাল। আসরের হাওয়ায় এখনো তার ছন্দ ভরপুর হয়ে আছে। খাঁ সাহেবও সামনে বসে। এখনি ঝাঁপতাল ধরা হঠকারিতা হল না ত?

কোন কোন শ্রোতার মনে জাগল বৃদ্ধ ওস্তাদের সম্পর্কে এই আশঙ্কা। কেউ আবার সন্দেহ করলেন আবেদ হোসেনের সঙ্গে উনি লড়তে চান নাকি? না হলে একই তাল ধরলেন কেন?

কিন্তু আবেদ হোসেনের মনে হয়ত সে ভাব হয়নি। লছমী ওস্তাদকে দেখে বোঝা যায় শিল্পীপ্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত বাদনের আবেগ। তাঁরই বাজনা আর এক শিল্পীর মনে ছন্দোবন্ধের প্রেরণা দিয়েছে। অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই বাদকের।

শ্রোতাদের সব সন্দেহ আশঙ্কা ওস্তাদজী নস্যাৎ করে দিলেন। দস্তুরমত লহরার কাজ দেখাতে লাগলেন একেবারে তৈরী হাতে। তাঁর বাজনার বহর দেখে বয়সের কথা আর কারুর মনে হল না। অনেকে আবার অবাক হলেন তাঁকে তবলা বজাতে দেখে। কারণ তাঁরা তাঁকে গায়ক বলেই জানতেন। আর শুধু বাজানো নয় তবলাতেও যে একেবারে সাধা ওস্তাদী হাত।

রীতিমত উঠান দিয়ে লছমী ওস্তাদ লহরা আরম্ভ করেছিলেন। তারপরেই ধরলেন ঠেকা।

অভিজ্ঞ শ্রোতারা লক্ষ্য করছিলেন। ওস্তাদজী [illegible] দেখাচ্ছেন নানারকমে। কিন্তু সিলসিলা ঠিক রেখেছেন। উঠান আর ঠেকার পর শোনালেন ফরাসবন্দী। লহরার যেমন পারম্পর্য থাকা নিয়ম ঠিক পর পর বাজতে লাগল। অসমান বিভাগের এই ঝাঁপতালে লছমীজী দেখাতে লাগলেন কত ছন্দ চাতুর্য। অথচ যথাবিধি বাদন। ফরাসবন্দীর পর পেশকার দেখালেন। কায়দা বাজালেন। গৎ টুকরা সব নিয়মমাফিক। তারপর টুকরার পরে [illegible] এমন এক [illegible] চক্রদার তেহাই দিলেন যে আসর উল্লসিত হয়ে উঠল সমে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু চক্রদার তেহাই মেরেও লছমীজী শেষ করলেন না। চক্রদার দিয়েই সমাপ্ত করেন অনেক লহরা বাদক। তিনি তারপরেও বাজালেন—রেলা। আবার রেলার পর লগ্‌গি।

এবার আবেদ হোসেনের সাবাস দেবার পালা। তিনি তা ভাল করে দিলেনও।

ঝাঁপতালের লহরায় যত ছন্দবৈচিত্র্য আর লয়কারী দেখানো সম্ভব সবই করলেন লছমী ওস্তাদ। আর মাৎ করা আসরকে নতুন করে মাতিয়ে দিলেন। বাজনা শেষ হতেই প্রশংসার উচ্ছ্বাস জানালেন অনেক শ্রোতা। আর বোদ্ধারা একটা ব্যাপার ঠিক বুঝলেন। আবেদ হোসেনের অমন বাজনার ছাপও মুছে গেছে লছমী ওস্তাদের লহরায়। এ যে কতখানি কৃতিত্ব তার ব্যাখ্যা সকলের কাছে করা যায় না। অথচ কোন লড়াইয়ের ভাব দেখা দেয় নি। আবেদ হোসেনেরও মনে জাগেনি কোন ক্ষোভ। না কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রকাশ নয় লছমী ওস্তাদের বাজনা। পারস্পরিক সৌহার্দ্যের মধ্যেই আসর শেষ হল।

লছমীজীর প্রতিভার একটিমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় সঙ্গীত সম্মিলনীতে। কিন্তু তাঁর সঙ্গীতজীবন অসামান্য বহুমুখীন। এবং তাই তাঁর লোকোত্তর বৈশিষ্ট্য। তেমন উদাহরণ আসরে বিশেষ দেখা যেত না।

সেদিন সঙ্গীত সম্মিলনীতে লছমী ওস্তাদ তবলা লহরা শুনিয়েছিলেন। তেমনি কোন আসরে হয়ত তুলতেন বীণার ঝঙ্কার। সিদ্ধ বীণকার বেশে ভারী ভারী রাগের আলাপচারি বাজাতেন। তারপরও শোনাতেন সেরা পাখোয়াজীদের সঙ্গতে। আবার কোন আসরে নিপুণ হাতে সেতার বাজাতেন। আলাপ গত তোড়া ঝালায় সম্পূর্ণ তাঁর সেতার বাদন।

কণ্ঠসঙ্গীতের আসরে আরো বিচিত্রগামী লছমীজী। একাধারে ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা টপখেয়াল গায়ক ছিলেন তিনি। আর সেই সব বিভিন্ন রীতির সৌন্দর্য ও বাণীর জ্ঞানে গুণী। ধ্রুপদীরূপে যেমন তাঁর রাগবিদ্যায় পাণ্ডিত্য তেমনি গায়নক্ষমতা ছিল। যে দরবারী কানাড়ায় অধিকার গুণপনার পরীক্ষা সেই সে রাগে তিনি ছিলেন সিদ্ধ। নানা রাগেই যোগ্য মর্যাদায় তিনি আসরে ধ্রুপদ গাইতেন। সর্ব-অলঙ্কারে সমৃদ্ধ [illegible] তাঁর ধ্রুপদ গান।

ধামারও তিনি শোনাতেন উপযুক্ত ঠাটের [illegible] সহযোগে।

লছমী ওস্তাদের সঙ্গীত কণ্ঠও ভালই ছিল। বেশ দরাজ গলায় গান গাইতেন আসরে। তান কর্তবে কিছু কমতি ছিলেন না।

আর টপ্পা ত তাঁদের ঘরে বিশেষ চর্চার বস্তু ছিল। যত রাগে টপ্পা গান গাওয়া সম্ভব সে সবই ছিল তাঁর সংগ্রহে। আসরেও তিনি টপ্পা গাইতেন। টপ্পার নানা সুন্দর খুলত তাঁর গলায়।

তা ছাড়া আরো কয়েক রীতির গানের সংগ্রহ ও অভিজ্ঞতা তাঁর যথেষ্ট ছিল। যেমন হোরি দাদরা ও ঠুংরি। এসব গান তিনি আসরে গাইতেন না। কিন্তু কেউ শিখতে চাইলে শেখাতেন ভালভাবে।

আর টপখেয়াল রীতি ছিল তাঁর বড় প্রিয়। তানের সঙ্গে টপ্পার অলঙ্কার চমৎকার শোনাতেন। তাঁর টপ-খেয়াল ছিল খাম্বাজ পিলু ভৈরবী থেকে ইমন শাহানা ইত্যাদি নানা রাগে।

লছমী ওস্তাদের টপ-খেয়ালের উত্তরাধিকার তাঁর পুত্র হরিদাসও পেয়েছিলেন। আর হরিদাসের এক ছাত্রী হন কৃষ্ণভামিনী। বাংলার একজন শীর্ষস্থানীয়া টপ-খেয়াল গায়িকা বলে কৃষ্ণভামিনী বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর গ্রামোফোন রেকর্ডের বাংলা গান বেশীর ভাগই টপ-খেয়াল অঙ্গের। মনে হয় কৃষ্ণভামিনীর টপখেয়াল চালের উৎস ছিলেন তাঁর অন্যতম ওস্তাদ হরিদাস মিশ্র যিনি তাঁর পিতা লছমী ওস্তাদের কাছেই এই রীতির তালিম পান। কৃষ্ণভামিনীর দৃষ্টান্তে এই ধারা এসেছিল কালিপদ পাঠক পর্যন্ত।

সেকালের সঙ্গীতজগতে এক বিস্ময় ছিলেন লছমীপ্রসাদ মিশ্র। একাধারে এত বিভিন্ন যন্ত্রে ওস্তাদী হাত এবং নানা রীতির সঙ্গীতে দিকপাল গায়ক সর্বকালেই দুর্লভ। কারণ ভারতীয় সঙ্গীত এক এক রীতিতে বিশেষজ্ঞ হয়েই সাধনার বস্তু। অর্থাৎ এক এক গুণী সচরাচর একেকটি যন্ত্র কিংবা একটি রীতির মাধ্যমেই চর্চায় সাধনায় জীবন অতিবাহিত করে দেন। একাধিক মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না—এমন গভীরতা ও বিস্তার রাগ সঙ্গীতের। একটি মাধ্যমেই সেই বিচিত্র ঐশ্বর্যের সন্ধানী হতে দেখা যায়। কিন্তু সকল নিয়মেরই আছে ব্যতিক্রম। লছমী ওস্তাদ সেই ব্যতিক্রমের একটি আদর্শ উদাহরণ। তাঁকে যখন যে রীতির গায়ক বা যে যন্ত্রের বাদকরূপে দেখা যেত শ্রোতার মনে হত তিনি এই গানে কিংবা এই যন্ত্রসঙ্গীতেই একান্ত সাধন করেছেন। কলকাতার আসরে আসরে ওস্তাদী দেখিয়ে গেছেন বটে লছমীপ্রসাদ। কখনো ধ্রুপদী কখনো খেয়াল বা টপ্পা বা টপ-খেয়াল গুণী। কোথাও বীণকার কোথাও সেতার শিল্পী কোথাও তবলাবাদক। তাঁর এক একটি রূপ পরিচয়কেও ওস্তাদ আখ্যা দেওয়া যায়। কারণ তাঁর তুল্য গায়ক কিংবা বীণকার কিংবা সঙ্গতকার হয়েও ওস্তাদ নামে পরিচিত হতে পারতেন যে কোন গুণী। লছমীপ্রসাদকে শুধু শব্দমাত্র ওস্তাদ বললে যেন পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। তিনি ওস্তাদের ওস্তাদ। সঙ্গীতের এক অবতার বিশেষ।

ঘরেও এমনি বিচিত্রের সাধকরূপে তাঁকে দেখা যেত। কখনো ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা কিংবা টপ-খেয়ালের চর্চায় নিমগ্ন। কখনো বসেছেন বীণা নিয়ে। কখনো ধরেছেন সেতার। কখনো তবলা বাজাচ্ছেন। সঙ্গীতের নিরলস সাধন জীবন তাঁর।

লছমীজীকে শিক্ষকরূপেও পাওয়া যেত সামগ্রিকরূপে। বিভিন্ন রীতির কণ্ঠসংগীতে ও পৃথক যন্ত্রসঙ্গীতে তাঁর শিষ্যমণ্ডলী গঠিত হয়েছিল। তিনি বীণায় তালিম দিয়েছিলেন (সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পৌত্র) ক্ষেমেন্দ্রমোহন ঠাকুর ও পুত্র ছবিলালকে। তাঁর কাছে তবলা শিখে শ্যামাচরণ মিশ্র ও বদ্রি মিশ্র (ওস্তাদ গৌরীশঙ্করের জ্যেষ্ঠ ও চতুর্থ অনুজ) ওস্তাদ তবলাবাদক হয়েছিলেন। খগেন্দ্রনাথ পাল (পচা পাল নামে সুপরিচিত) তাঁর আর এক কৃতী তবলিয়া শিষ্য। দিনরাত তিনি গুরুর কাছে থেকে তাঁর সেবা করে উৎকৃষ্ট তবলাবাদক হয়েছিলেন। বাংলার স্বনামপ্রসিদ্ধ গুণী অনাথনাথ বসুও অনেক বছর তবলায় তালিম পান লছমীজীর কাছে। পরে অনাথনাথ দিল্লীর নূর মহম্মদ ও মীরাটের মহম্মদ সফির কাছেও তবলা শিখেছিলেন বটে। কিন্তু লছমী ওস্তাদের ৭।৮ বছরের তালিমই বেশী ছাপ রাখে অনাথনাথের তবলাবাদনে। লছমীজী সেতারে পূর্ণিয়ার রাজা নিত্যানন্দ সিংকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

ধ্রুপদে তাঁর উপযুক্ত শিষ্য হন হরিদাস। লছমী ওস্তাদের এই একমাত্র পুত্র যে কত বড় কলাবত হয়েছিলেন তা দেখা যায় আহিরীটোলার সে আসরে। সেদিন পাখোয়াজী মদনমোহন মিশ্র—

ঘটনাটা শেষে বলা যাবে। এখন লছমীজীর আরও শিষ্যদের কথা আছে।

সুপরিচিত খেয়াল-গায়ক অনাথনাথ বসু যত বছর তাঁর কাছে তবলা শেখেন তত বছর খেয়ালও শিখেছিলেন। লছমীজীর বহু খেয়াল শিক্ষা ও সংগ্রহ করেছিলেন অনাথনাথ। আর সেই সঙ্গে কিছু টপ-খেয়ালও যদিও আসরে কখনো টপখেয়াল গাইতেন না।

ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (ধ্রুপদীরূপেই পরিচিত এবং ধ্রুপদে মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী প্রমুখের শিষ্য) টপ্পায় তালিম নিয়েছিলেন লছমী ওস্তাদের কাছে।

বড়বাজারের বিনায়ক মিশ্র ছিলেন তাঁর আর এক শিষ্য। লছমী ওস্তাদের কাছে তিনি খেয়াল ও টপ্পার তালিম নিয়েছিলেন।

হাওড়া-রামকৃষ্ণপুরের শ্যামাচরণ বসুও ছিলেন তাঁর খেয়াল টপ্পায় শিষ্য।

গ্রে স্ট্রীটের যোগেশচন্দ্র ঘোষ ওস্তাদজীর কাছে খেয়াল শিখতেন।

পাঁচগোপাল অর্ণব এবং বাঁশতলা লেনের মদনমোহন মিশ্রও তাঁর সঙ্গীত-শিষ্য ছিলেন।

বিখ্যাত সারেঙ্গবাদক ওস্তাদ গৌরীশঙ্কর মিশ্রও লছমী ওস্তাদের কাছে উপকৃত ছিলেন নানা রীতির গানের জন্যে।

তা ছাড়া ভবানীপুর সঙ্গীত সম্মিলনীতে দীর্ঘকাল তিনি ছিলেন অধ্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষক। আর প্রতিভা দেবী পরিচালিত সঙ্গীত সঙ্ঘেরও এক বিশিষ্ট শিক্ষক এবং পরীক্ষার বিচারক। এই দুই সংস্থাতেই তিনি নানা প্রকার কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতে বহু ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

যেমন নানামুখীন প্রতিভাধর গুণী তেমনি কৃতী শিষ্যগোষ্ঠী গড়েছিলেন লছমীজী। কলকাতার সঙ্গীতক্ষেত্রে এই যুগে বহু মানের আসন তাঁর ছিল। গায়ক ও যন্ত্রীরা সকলেই তাঁকে মান্য করতেন সঙ্গীতাচার্য বলে।

কিন্তু কোন বিরাট প্রতিভা অকস্মাৎ সৃষ্টি হয় না। তা বিকশিত হয় সে প্রতিভার আধারের দীর্ঘকালের নিরলস সাধনায় ও শ্রমে। সেই সঙ্গে অনেক সময় অদৃশ্য পশ্চাৎপটে পূর্ব সংস্কারও ক্রিয়া করে যায়। এই দুই ধারার সম্মিলনে গঠিত হয় লছমী ওস্তাদের সঙ্গীত জীবন।

একথা মিথ্যা নয় যে অক্লান্ত অধ্যবসায় ও শিক্ষায় তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেন। তেমনি সত্য—তিনি ছিলেন এক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। সুপ্রসিদ্ধ প্রসন্দু মনোহুর ঘরাণাদার এবং বংশানুক্রম লছমীপ্রসাদ মিশ্র।

বিভিন্ন ধারায় সঙ্গীতচর্চা এবং তালাধ্যায়ে মুন্সিয়ানা নানা প্রকার যন্ত্রসঙ্গীত ও কণ্ঠসঙ্গীতের একাধারে সাধনা এই ঘরাণাকে বিশিষ্ট বিখ্যাত করেছিল। উত্তর ভারতের এটি এক শ্রেষ্ঠ ও বহুপরিচিত ঘরাণা। তার কিছু ইতিবৃত্ত এখানে দেওয়া যায়।

বারাণসীর এক কথক ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান মনোহর ও হরিপ্রসাদ মিশ্র। হরিপ্রসাদ সংক্ষেপে প্রসন্দু নামে কথিত হতেন। দুই সহোদর তাঁরা। মনোহর জ্যেষ্ঠ। দুজনের সঙ্গীতচর্চা এমন এক ধারা প্রবর্তন করে যে দুই ভ্রাতার যুগল পরিচয়ে একটি ঘরাণার নাম হয়ে যায়। অনুজ প্রসন্দুর নাম প্রথম স্থান নেয় বেশী প্রতিভাবান ও

প্রসিদ্ধতর হওয়ার জন্যে। তাঁদের কনিষ্ঠতম ভ্রাতা বিশ্বেশ্বরের নাম এই ঘরাণায় যুক্ত নেই।

কাশীতে এ বংশের আদি নিবাস ছিল ২৬ সেনপুরার কোঠিতে। মনোহর ও হরিপ্রসাদের পিতা ঠাকুরদয়ালও গায়ক ছিলেন। ঠাকুরদয়ালের পিতামহ দিলারাম মিশ্র এই বংশের বাস পত্তন করেন বারাণসীতে। দিলারাম তাঁর আদি নিবাস বৃন্দাবন থেকে কাশীবাস করতে এসেছিলেন। তাহল আঠারো শতকের প্রায় মাঝামাঝি সময়ের কথা। তখন থেকেই এ পরিবারের বারাণসীতে বাস।

দিলারামেরও কয়েক পুরুষ আগেকার নাম পাওয়া যায় এবং তাঁরা সকলেই ছিলেন সঙ্গীতসেবী। কিন্তু অত পূর্ব বৃত্তান্তের এখানে প্রয়োজন নেই। শুধু বক্তব্য—দিলারাম তাঁর পুত্র জগমন এবং জগমনের পুত্র ঠাকুরদয়াল এই তিন পুরুষও ছিলেন গায়ক।

দিলারামের পৌত্র ঠাকুরদয়ালের তিন পুত্র। মনোহর হরিপ্রসাদ (প্রসন্দু) এবং বিশ্বেশ্বর। গায়ক ঠাকুরদয়াল তিন পুত্রকেই সঙ্গীতশিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু কনিষ্ঠ বিশ্বেশ্বরের নাম স্থায়ী হয়নি। সঙ্গীত-জগতে।

শোনা যায় দিল্লীর কোন কলাবন্ত সেতারীর কাছে তিনি শিখেছিলেন সেতার। বিশ্বেশ্বরের কণ্ঠসঙ্গীতের কথা বিশেষ জানা যায় না। মিশ্র বংশে সেতারের চর্চা এই প্রথম তবে তাঁর কাছে এ বংশে কেউ সেতার শিক্ষা করেন কিনা জানা যায় নি। বিশ্বেশ্বর পরে বিষয়-সম্পত্তির ভারপ্রাপ্ত হন এবং মনোহর, হরিপ্রসাদ আত্মনিয়োগ করেন সঙ্গীতে। এই দুজনের নামই অসামান্য সঙ্গীতগুণের গৌরবে স্মরণীয় হয়ে আছে। প্রসন্দু মনোহরের নাম কীর্তিত হয়েছে একটি পৃথক ঘরাণায়।

মনোহর ও হরিপ্রসাদের সঙ্গীতজীবন অনেক সময়েই অঙ্গাঙ্গী ছিল। তাঁদের যুগ্ম সঙ্গীতচর্চার কথা একসঙ্গে বর্ণনীয়। কিন্তু স্থানাভাবে এখানে তা সম্ভব নয়। প্রসন্দুর বিবরণ দেওয়া হবে শিব পশুপতির অধ্যায়ে। এখানে মনোহরের ধারা প্রসঙ্গ। কারণ এই অধ্যায়ের নায়ক লছমীপ্রসাদ হলেন মনোহরের পৌত্র।

১৭৯৪ সালে বারাণসীতে মনোহরের জন্ম আর মৃত্যু হয় ১৮৭৪ সালে ৮০ বছর বয়সে। তিনি নেপালের প্রধানমন্ত্রী স্যার জং বাহাদুরের দরবার ও পাতিয়ালা মহারাজার দরবারে অনেক দিন সসম্মানে ছিলেন। নবাব ওয়াজেদ আলীর লক্ষ্ণৌ দরবারেও থাকেন কিছুদিন।

মনোহর মিশ্র পরিণত বয়সে কলকাতায়ও বাস করেছিলেন। তখন থেকেই তাঁর বংশের সঙ্গে কলকাতার সম্পর্ক। জোড়াসাঁকো অঞ্চলে বলরাম দে স্ট্রীটে মনোহর ছিলেন কিছুকাল। পরে তাঁর পুত্র রামকুমারও এখানে থাকেন। লছমী ওস্তাদও দীর্ঘকাল বাস করে গেছেন এই অঞ্চলেই।

মনোহর মিশ্রের সময় থেকেই এ বংশের সঙ্গে বাঙালী সঙ্গীতশিল্পীদের যোগাযোগেরও সূত্রপাত। যদু ভট্টের সঙ্গীতগুরু এবং কলকাতার আদি ধ্রুপদী গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের (জন্ম ১৮০৮) সঙ্গে মনোহরের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। এই সম্পর্ক স্থায়ী হয় তাঁদের বংশানুক্রমে। মনোহরের পুত্র রামকুমারের শিষ্য হয়েছিলেন গঙ্গানারায়ণের পৌত্র তুলসীদাস চট্টোপাধ্যায় (বেহালাবাদক ও গায়ক)। রামকুমারের দ্বিতীয় পুত্র কেশবদাসের সঙ্গেও তুলসীদাসের সাঙ্গীতিক যোগাযোগ ছিল।

মনোহর অস্থায়ীভাবে বাস করেন কলকাতায়। কিন্তু তাঁর পুত্র অনেককাল এ শহরে বাস করেছিলেন। তারপর লছমী ওস্তাদ তাঁর সঙ্গীতজীবনের সুদীর্ঘকাল আমৃত্যু ছিলেন কলকাতা নিবাসী। তেমনি এই ধারায় গোবিন্দদাস কেশবদাস হরিদাস সকলকেই কলকাতাবাসী বলা যায় কাশীর সঙ্গে সম্পর্ক সত্ত্বেও।

মনোহর ধ্রুপদী ছিলেন বংশের ধারায়। কিন্তু তার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকুমার ধ্রুপদের সঙ্গে খেয়াল এবং টপ্পারও সাধনা করেন। উপরন্তু বীণাবাদনও। মনোহরের সময় থেকে নেপাল দরবারের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ। সেই সূত্রে রামকুমারও ১৪ বছর নেপালে ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর পুত্র জেনারেল মুখিয়ার সঙ্গীতসভায় থাকেন রামকুমার তারপর পরিণত বয়সে কাশীতে কিছুকাল বাসের পর কলকাতায় স্থায়ী হন। এখানে জীবনের শেষ পর্যন্ত কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের সঙ্গীতসভায় নিযুক্ত ছিলেন রামকুমার। বছরের পর বছর তিনি সম্মানিত ওস্তাদ হয়ে কলকাতায় বসবাস করেন। আর ফলে এখানে গড়ে ওঠে তাঁর কিছুট শিষ্যমণ্ডলী। বাংলার সঙ্গীত-জগতে রামকুমার মিশ্রের দান কতখানি তা তাঁর শিষ্যদের নাম থেকেই ধারণা করা যায়। (এখানে উল্লিখিতদের কেউ কেউ অন্য ওস্তাদের শিক্ষাও অবশ্য পেয়েছিলেন যেমন হয়ে থাকে)।

রামকুমারের কাছে শেখেন—চন্দননগর-গোন্দলপাড়ার কিন্নরকণ্ঠ টপ্পাগায়ক মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় মহেশ ওস্তাদ নামে সুপরিচিত টপ্পাগুণী মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বহুমুখী প্রতিভা লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজী (ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা ঠুংরি গায়ক এবং বীণা পাখোয়াজ তবলা ইত্যাদি যন্ত্রের বাদক) ভাগলপুরের খেয়াল ও টপখেয়াল গুণী সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাংলার শ্রেষ্ঠা বাইজীদের দুজন সুরমা ও কিরণময়ী গঙ্গানারায়ণ-পৌত্র তুলসীদাস চট্টোপাধ্যায় শ্যামনগরের চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গোয়াবাগানের নিবারণ কথক পাথুরিয়াঘাটার কালিপ্রসন্ন ঘোষ গ্রে স্ট্রীটের যোগীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি। তা ছাড়া জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গেও সঙ্গীতাচার্যরূপে রামকুমার মিশ্রের যোগাযোগ ছিল। মহর্ষির তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভা দেবী ও পুত্র হিতেন্দ্রনাথের নামও রামকুমারের শিষ্য তালিকায় গণনীয়।

কলকাতার সঙ্গীতসমাজে আচার্যস্থানীয় রামকুমার গায়ক হিসাবেও ছিলেন অতিসুকণ্ঠ। তাঁর শেষ জীবন পরম গৌরবে কলকাতাতেই অতিবাহিত হয়।

রামকুমারের তিন পুত্র — গোবিন্দদাস কেশবদাস ও লছমীপ্রসাদ। প্রথম দুজনও গায়করূপে কৃতিত্ব পরিচয় দেন। তবে কনিষ্ঠ লছমীপ্রসাদই স্বনামধন্য হন বহুমুখী প্রতিভার।

বারাণসীতে ১৮৬০ সালে লছমীর জন্ম। তিনি যখন শিশু তাঁর পিতা রামকুমার দীর্ঘকালের জন্যে নেপালে যান।

লছমী বাল্যজীবনে কাশীতেই বাস করতেন। রামকুমার এক আত্মীয়কে পুত্রের সংগীতশিক্ষার ভার দিয়েছিলেন।

১৪ বছর নেপাল বাসের সময় মাঝে মাঝে তিনি কাশীতে আসতেন। তখন লক্ষ্য রাখতেন লছমীর তালিম কেমন হচ্চে। লছমী তখন নেহাৎ বালক। তবু এই ছেলের ওপরেই রামকুমার আশা রেখেছিলেন। বংশের নাম রাখবে-ই। লছমীকে তাঁর নিজের কাছে রেখে শেখাবারই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু নেপালের সেই প্রচণ্ড শীতে, তার ওপর বিদেশে ছেলেমানুষকে রাখা বড়ই অসুবিধা। তাই লছমীকে এক আত্মীয়ের তালিমে কাশীতে রেখেছিলেন। গলাটা এ সময়ে তৈয়ারী হোক। তারপর ভাল করে গড়ে নেবেন আর একটু বড় হলে। এই ভেবেছিলেন। এমনিভাবে কয়েক বছর গেল।

রামকুমার সেবার এলেন কবছর পরে। লছমীকে ডেকে তার গান শুনলেন। পরীক্ষা করলেন তার কণ্ঠ। কিন্তু একেবারেই হতাশ হলেন। কি আশ্চর্য। গলা সাধা ত কিছুই হয়নি। ছেলেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনে নিলেন তালিমের সব কথা। বুঝতে পারলেন, যাঁকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি আপনার জন হয়েও ফাঁকি দিয়েছেন। হয়ত ইচ্ছা করেই ঠিক রীতিতে সাধাননি লছমীকে।

রামকুমার সে জ্ঞাতিকে আর কিছু বললেন না। সেবার বেশ কিছুদিন রয়ে গেলেন কাশীতে। আর প্রত্যহ ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিজে শেখাতে লাগলেন লছমীকে। তাও সেনপুরার সে বাড়িতে নয়। ছেলেকে নিয়ে সকাল বিকাল কোঠি থেকে বেরিয়ে যেতেন। অনেক দূরে। একেবারে লোকালয় পার হয়ে জঙ্গলের ধারে। গলা খুলে লছমীকে সেখানে সাধতে হত। দস্তুরমত নিয়মে কণ্ঠসাধনা করতেন। ধ্রুপদের আলাপচারি শেখাতেন রামকুমার। তা ছাড়া, পাল্টা ইত্যাদিও অক্লান্তভাবে রিয়াজ করতেন। তালিম দিতেন লয়কারীর পদ্ধতি।

এতদিনে লছমী ঠিক পথ পেলেন। সহজাত প্রতিভা তাঁর। এবার দ্রুত শিখতে লাগলেন। আরো কিছুদিন পরে রামকুমার যথাবিধি নির্দেশ দিয়ে চলে গেলেন নেপালে। কিন্তু সেখানে আর রইলেন না। বয়সের সঙ্গে অত শীতও আর সহ্য হচ্ছিল না।

কনিষ্ঠ পুত্রকে তৈরি করেও দিতে হবে। এইসব কারণে জেনারেল মুখিয়ার দরবারী ওস্তাদের কাজ ত্যাগ করে ফিরে এলেন কাশীতে। লছমীকে উপযুক্ত করে গড়ে নিতে লাগলেন। গানের সঙ্গে আরম্ভ করলেন বীণের তালিম।

দিন রাতের অধিকাংশ সময় লছমীর রিয়াজে চলে যায়। একই সঙ্গে ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পার সাধন। আবার বীণা আর তবলার সঙ্গে সেতারও। সব শিক্ষা সাধনা একযোগে চলতে লাগল। বিকশিত হতে লাগল লছমীপ্রসাদের বহুমুখী প্রতিভা।

রামকুমার কাছে রেখে তাঁকে শেখাতে লাগলেন। লছমীপ্রসাদ যেমনি মেধাবী তেমনি পরিশ্রমী। পিতার নির্দেশ অনুসারে অক্লান্ত সাধনা করতে লাগলেন। এমনিভাবে পিতা-পুত্রের দিন অতিবাহিত হতে লাগল কাশীতে। যথাসময়ে লছমী ঠিক তৈরি হয়ে উঠলেন, যেমনটি রামকুমারের আশা ছিল। ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা সবরকম গানেই উপযুক্ত হলেন। আর পিতার মতন বীণায় বিশেষ দক্ষ।

রামকুমার বিবেচনা করলেন, লছমী এবার পেশা আরম্ভ করতে পারে। নির্ভরতার জন্যেও তা প্রয়োজন। আর চর্চারও তাতে শ্রীবৃদ্ধি।

এইভাবে পুত্রের শিক্ষা অগ্রসর করে নিয়ে রামকুমার কলকাতায় স্থায়ী হলেন।

লছমীপ্রসাদ প্রবেশ করলেন পেশাদারী জীবনে। কাশীর নিকটেই জৌনপুরের দরবারে প্রথমে নিযুক্ত হলেন। জৌনপুরের রাজা দরবারী শিল্পী বলে বড়ই সমাদর করতেন লছমীকে। এখানেই তিনি প্রথম স্বর্ণপদক পুরস্কার পান।

জৌনপুরে কবছর থেকে লছমীপ্রসাদ যোগ দিলেন পূর্ণিয়ার দরবারে। পূর্ণিয়ার রাজা নিত্যানন্দ সিংহ তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। গুরুর মর্যাদাও এরাজ্যে প্রথম পেলেন লছমীজী। পূর্ণিয়া-রাজই তাঁর কাছে সেতার শিখতে লাগলেন।

পূর্ণিয়ায় কয়েক বছর বাসের পর লছমীজী পশ্চিমাঞ্চল ত্যাগ করলেন। সংগীতচর্চাকে জীবনের বৃত্তি ও অবলম্বন করতে হলে কলকাতার কথা মনে আসেই। সংগীতের এত শিক্ষার্থী এমন আনুকূল্য সংগীতসেবীদের এত পৃষ্ঠপোষকতা উত্তর ভারতে আর কোথায়? লছমীপ্রসাদেরও কলকাতায় সংগীতজীবন যাপন করার কথা মনে হল স্বভাবতই। তা ছাড়া পিতা রামকুমার মিশ্র এখানে ক্ষেত্র রচনা করে রেখেছিলেন। তিনিও এখন বিগত। পেশাদার জীবনযাপন করতে লছমীপ্রসাদ এলেন কলকাতায়।

পরিণত যৌবনেই লছমীজী কলকাতায় সংগীতসমাজে এসে যুক্ত হলেন। রামকুমার মিশ্র যে কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের সংগীতসভায় নিযুক্ত ছিলেন, সেখানে আশ্রয় পেলেন তিনিও। আর জোড়াসাঁকো অঞ্চলেই সেই বলরাম দে স্ট্রীটের পাশে সাগর ধর লেনে বাস করতে লাগলেন।

গুণের কদর করে কলকাতা। এত বড় গুণী লছমীপ্রসাদ, কলকাতাতেই প্রতিভার যোগ্য ক্ষেত্র পেলেন। নানা জন এলেন শিক্ষার্থী হয়ে। আসরের পর আসরে মুজরো করতে লাগলেন। কোথাও ধ্রুপদ গাইতেন। কোথাও খেয়াল টপ্পা টপ খেয়াল। কখনো বীণকাররূপে দেখা দিতেন। কখনো সঙ্গত করতেন তবলায়। সব রীতির গানে আর বীণায়, তবলায় সেতারে ছাত্রছাত্রীদের শেখাতেন।

কলকাতায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ আসরেই লছমী ওস্তাদ যোগ দিতেন। বিশেষ করে উত্তর কলকাতায় সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দরবারে হরেন্দ্র শীল ভবনে, হর-কুটীরে, সঙ্গীত-বিদ্যালয় প্রভৃতি আসরে। দক্ষিণ কলকাতায় তাঁর আসর সবচেয়ে বেশি ভবানীপুর সঙ্গীত সম্মিলনীতে হত। তারপর সঙ্গীত সঙ্ঘে।

কলকাতায় নিয়মিত আসর ও সংগীত-চর্চার বনিয়াদী সংস্থা ভবানীপুর সংগীত সম্মিলনী। সেখানকার সংগীত শিক্ষাদানের অধ্যক্ষ ছিলেন। বিখ্যাত সংগীত সঙ্ঘের বিশিষ্ট শিক্ষক ও পরীক্ষার বিচারকও হতে হয় তাঁকে।

কলকাতায় প্রথম বেতার প্রতিষ্ঠান আরম্ভ হল সেই ১৯২৭ সালে। আর লছমী ওস্তাদের বীণাবাদন বেতার শ্রোতারা তখন থেকেই শুনতেন।

কলকাতার সঙ্গীতসমাজের সঙ্গে লছমীজী একাত্ম হয়ে বিরাজ করতেন। শান্ত মধুর ব্যক্তিত্বের জন্যেও সকলের প্রিয় তিনি। নম্র, নির্বিরোধী, গরিমাবর্জিত বলেই সকলে তাঁকে জানতেন। স্বভাব চরিত্রের জন্যে সবার শ্রদ্ধাভাজন। বাঙালীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশতেন। প্রায় সব শিষ্যসেবকই তাঁর বাঙালী। পৃষ্ঠপোষকরাও বেশির ভাগ বাঙালী। আর যৌবনকাল থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত বাঙালী সমাজের মধ্যেই কলকাতায় বাস করেছিলেন। এইসব সূত্রে তিনি বাংলা বেশ শিখেছিলেন। বাংলা ভাল বলতে যেমন পারতেন, তেমনি পড়তেও। এমনকি বাংলা স্বরলিপি ইত্যাদি লিখতেনও।

কলকাতার সংগীতজীবনের সব দিকে লছমী ওস্তাদের যোগাযোগ ছিল। ১৯২৪ সালে যখন 'সংগীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা' মাসিকপত্র প্রকাশ আরম্ভ হল তাঁর নাম মুদ্রিত থাকত তার তত্ত্বাবধায়কদের শীর্ষে। তাঁর পরে গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটোর মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়, দিলীপকুমার রায়, ক্ষিতীন্দ্র-নাথ ঠাকুর প্রভৃতির নাম তালিকায় দেখা যেত। তাঁর নাম বরাবরই 'সংগীতাচার্য লছমীপ্রসাদ মিশ্র' বলে প্রকাশিত হত 'সংগীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা'য়। এই পত্রিকার সংগে প্রথম থেকেই তিনি আন্তরিকভাবে যুক্ত ছিলেন। 'প্রবেশিকা'-র লেখক-লেখিকা-গণের মধ্যেও থাকতেন 'শ্রীযুক্ত লছমীপ্রসাদ মিশ্র সংগীতাচার্য'। তাঁর সঙ্গীতবিষয়ক লেখাও এই পত্রিকায় দেখা যায়।

'সংগীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা'র ১৩৩২ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'সংগীতাচার্য লছমীপ্রসাদ মিশ্র মহাশয় প্রদত্ত ইমনতিমা তেতলা।' এই স্বরলিপি রচনার সঙ্গে লছমী ওস্তাদের স্বাক্ষরে একটি নিবেদন থাকে—'এই সংখ্যায় কণ্ঠ ও যন্ত্র-সংগীত কিরূপ সহজে আয়ত্ত করা যাইতে পারে তদসম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতানুযায়ী আলোচনা করিতে একান্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ভগবানের কৃপা না হইলে মানুষ ইচ্ছামত কার্য করিতে পারে না। শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন ক্ষুদ্র একটি স্বরলিপি ব্যতীত বর্তমান সংখ্যায় অন্য কোন বিষয় লিখিতে পারিলাম না। সে কারণে দুঃখিত আছি। শ্রীলছমীপ্রসাদ মিশ্র।'

বাংলার সঙ্গীত সমাজে এক বহুমানী আচার্য হয়েই তিনি ছিলেন। আরো একটি সংবাদ পাওয়া যায় এ বিষয়ে। ১৯২৮ সালের ৫ই মে তারিখে খড়দায় বেশ বড় একটি সংগীত সম্মেলন হয়। তার উদ্দেশ্য ছিল খড়দায় একটি সংগীত সমাজ স্থাপন। সেখানে বিগত যুগের সংগীতজ্ঞদের স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। প্রতিষ্ঠা করা হবে একটি সংগীত বিদ্যালয়, ইত্যাদি। সেদিনের আসরে কলকাতা থেকে নানা প্রসিদ্ধ গায়ক বাদক যোগ দিয়েছিলেন। যেমন, সরদী আমীর খাঁ, সারংগী ছোটে খাঁ, গায়ক-তবলা-বাদক অনাথনাথ বসু, টপ্পাগায়ক রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ধ্রুপদী বিনোদ গোস্বামী টপ্পা-গায়ক বিজয়লাল মুখোপাধ্যায় এলাহি বক্স প্রভৃতি। লছমীপ্রসাদও গিয়েছিলেন। আর অধিবেশনে তিনিই হন সভাপতি।

সেই 'খড়দহ সঙ্গীত সমাজ'-এর উদ্বোধন ১৯২৯ সালের ৫ই জানুয়ারি হল। এবারের স্থান—গোকুলচন্দ্র বড়ালের বাগান। সেদিনের অনুষ্ঠানেও বহু গুণী সমাগম হয়। আর মৃদঙ্গাচার্য দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রস্তাবে সভাপতি হলেন লছমী ওস্তাদ।

যশ সম্মান প্রীতি সবই তিনি জীবনে পেয়েছিলেন। আর সাধাসিধা অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা। অর্থলোভও ছিল না তাঁর। সাধারণ সাংসারিক প্রয়োজন সবই মিটে যেত। তিনিও থাকতেন সন্তুষ্টচিত্ত।

কিন্তু শেষের কয়েক বছর ওস্তাদজীর মানসিক শান্তি একেবারেই ছিল না। সংগীতচর্চা করে যেতেন, তালিম দিতেন, আসরেও যোগ দিতেন গাইতে বাজাতে। কিন্তু নিদারুণ শোকে বিপর্যস্ত ছিল তাঁর মন। তবে ধীর স্থির স্বভাবের জন্যে বাইরে তার প্রকাশ ছিল না। শুধু ঘনিষ্ঠ পরিচিতেরা জানতেন তাঁর বেদনাময় অন্তরের কথা।

একমাত্র পুত্র হরিদাস। আবাল্য তাকে নিজের হাতে গড়ে তোলেন। কি গুণী হয়েছিলেন হরিদাস। পিতার অতিযোগ্য উত্তরসাধক। পূর্ণ পরিণত যুবক ৩০ বছর পার হয়েছিলেন। বৃদ্ধ ওস্তাদের সকল রকমের আশা ভরসাস্থল।

সেই হরিদাসের মৃত্যু হল।...

আঘাত সে মহাশোক সহ্য করলেন লছমীজী। কিন্তু শরীর ভেঙ্গে পড়তে লাগল। আগে থেকেই শরীর বিশেষ সুস্থ ছিল না। কষ্ট পেতেন হাঁপানিতে। সে রোগ ক্রমেই বাড়তে লাগল।

চিকিৎসাও চলল কবিরাজী ইত্যাদি। কিন্তু কোন ফল দেখা গেল না। জীর্ণ দেহেই সংগীতচর্চা হতে লাগল যথারীতি।

বাড়ীতে শিষ্যরা আসতেন। শেখাতেন তাঁদের। আসরেও যেতেন। সংগীতের মধ্যেই শোক সংবরণের চেষ্টা করতেন ওস্তাদজী।

ওদিকে হরিদাসের মৃত্যুর পর থেকে শিব পশুপতি বিশেষ করে আসতেন। তাঁরা লছমীজীর আত্মীয়। শিব পশুপতির পিতামহ হরিপ্রসাদ বা প্রসন্নু এবং লছমী ওস্তাদের পিতামহ মনোহর—দুই সহোদর। শিব পশুপতি তাই লছমীজীর সবচেয়ে নিকট জ্ঞাতি।

শিব পশুপতি ভ্রাতারাও কলকাতায় সংগীতজীবন যাপন করতেন। লছমীজীর সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ, সামাজিকতা আগে থেকেই ছিল এখানে। কিন্তু এখন তাঁরা লছমী ওস্তাদের কাছে বিশেষ উদ্দেশ্যে উপস্থিত হতেন। লছমীজীর একমাত্র পুত্র হরিদাসের মৃত্যুতে শিব পশুপতির মনে একটি ইচ্ছা জেগেছিল। একটি আশা। তাঁদের কোন পুত্রকে লছমীজী যদি পোষ্যপুত্র হিসেবে নেন!

পশুপতি অপুত্রক। কিন্তু শিবসেবকের তিন পুত্র—রামকিষণ, ভবানী ও বিষ্ণু। তাঁদের একটিকে ত পোষ্য নিতে পারেন লছমীজী। এঁরা একই বংশের। সংগীতচর্চাও একই ধারায়। নিলে লছমীজীরও ত এ বয়সে একটা অবলম্বন হতে পারে।

শিব পশুপতির মনে এই আশা স্বাভাবিক যে কাউকে পোষ্যপুত্র নিলে লছমী ওস্তাদ তাঁর সংগীতবিদ্যাও তাকে দান করবেন।

তাঁদের মনের এই ইচ্ছা বা আশার কথা তাঁরা জানিয়েও ছিলেন লছমীজীকে।

কিন্তু তিনি কোন উত্তর দেননি। হয়ত তাঁর ভাল লাগেনি শিব পশুপতির এই প্রস্তাব বা ইচ্ছা। একথায় লছমীজীর মনে পুত্রশোকের দাহ হয়ত নতুন করে জাগত।

তবে তিনি কিছু প্রকাশ করতেন না মুখে। শিব পশুপতি আসতেন। বসে বসে চলে যেতেন। কিন্তু এবিষয়ে মৌন থাকতেন লছমীজী।

আর শেষ পর্যন্তও তিনি কাউকে পোষ্যপুত্র নেননি।

ক্রমে শরীর তাঁর আরো জীর্ণ হল হাঁপানির পীড়নে। চিকিৎসায় কিছু হয় না দেখে আত্মীয়স্বজন সেবকরা সাধুদের শরণাপন্ন হলেন। সেবার কয়েকজন শক্তিসম্পন্ন সাধু এসেছিলেন গঙ্গাসাগর তীর্থ করতে। লছমীজীকে সুস্থ করবার আশায় তাঁদের কাছে প্রার্থনা জানানো হল।

সাধুরা বললেন শান্তি স্বস্ত্যয়নের অনুষ্ঠান করতে হবে।

সেই মতন সব ব্যবস্থা হল লছমীজীর বহুদিনের বাসস্থান সেই ১২ সাগর দত্ত লেনে।

সেখানে সকালবেলা সাধুরা অনেকক্ষণ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করলেন। শান্তি স্বস্ত্যয়ন হল ওস্তাদজীর নিরাময় কামনায়।

অনুষ্ঠানের শেষে সাধুরা বললেন সন্ধ্যার পর গান শুনবেন। এত বড় ওস্তাদ—গানের আসর যেন হয়।

অনেকে এসেছিলেন তাঁর শান্তি স্বস্ত্যয়ন দেখতে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই সংগীতজ্ঞ। সুতরাং সন্ধ্যাতেই সকলে আসরেরও আয়োজন করলেন।

সেই বাড়ীতেই আসর হল। লছমীজীর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব শিষ্য-গায়ক বাদক অনেকেই এলেন আসরে। শিব পশুপতি গৌরীশঙ্কর কালী ওস্তাদ শ্যামাচরণ বুন্দি শামু সহায় প্রভৃতি।

লছমীজীও কষ্ট করে এসে সকলের সঙ্গে বসলেন।

সাধুরা এসে প্রথমে লছমীজীরই গান শুনতে চাইলেন।

কিন্তু সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন ওস্তাদজী। আসরে গান গাইবার ক্ষমতা তাঁর আর নেই।

জীবনে এই প্রথম সংগীতে অক্ষম হলেন লছমীপ্রসাদ।

তখন অন্যদের গান হল। শিব পশুপতি জুটিতে গাইলেন খেয়াল। অনাথনাথ বসুও খেয়াল শোনালেন। আরো কেউ কেউ গাইবার পর শেষ হল গানের অনুষ্ঠান।

সংগীতের আসরে লছমীজীর সেই শেষ উপস্থিতি তাও বিনা সংগীতে।

তারপর আর কদিন মাত্র বেঁচেছিলেন।

অবশেষে ৭ই ডিসেম্বর ১৯২৯ চিরনীরব হয়ে গেলেন লছমী ওস্তাদ। বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।...

তাঁর মৃত্যুতে সংগীতজগতে এক বিচিত্র শূন্যতার সৃষ্টি হল। কারণ উত্তরাধিকার ত চলে যায় পূর্বেই।

প্রতিভাদীপ্ত হরিদাস মিশ্র। বংশগত বিদ্যার কি যোগ্য অধিকারীই সেই বয়সে হয়েছিলেন।

তার একটু পরিচয় একদিন পাওয়া যায় সংগীত মিত্রালয়ে।

আহিরীটোলার ভূতনাথ মিত্রের বাড়ির সেই আসর। সংগীত মিত্রালয়। মিত্র ভবনের সে আসরের কথাও বলবার মতন। এমন দরাজ আসর সেকালেও আর হয়ত ছিল না। সমস্ত বড় বড় কলাবতদের গান-বাজনা ত সেখানে হতই। সরোদী কোকব খাঁ ও করামতুল্লা খাঁ, সারেঙ্গী ছোটে খাঁ ও গৌরীশঙ্কর মিশ্র, ...রী এমদাদ খাঁ ও সরোদী আমীর খাঁ লছমী ওস্তাদ ও শিব পশুপতি ওস্তাদ বিশ্বনাথ রাও ও সংগীতকার নগেন্দ্রনাথ এবং আরো অনেক গুণীরই আসর হয়েছে সেখানে। কিন্তু সেজন্যে কথা নয়। শ্রেষ্ঠ গায়ক বাদকদের নিয়ে কলকাতায় ত আরো নানা বাড়িতেই আসর হত। কিন্তু শ্রোতাদের জন্যে সংগীত মিত্রালয়ে ছিল ঢালাও ব্যবস্থা। আর এ বিষয়েই আহিরীটোলার সেই মিত্র বাড়ির জুড়ি মেলা ভার। সেখানে কোন কোন আসর পর পর দু দিন ধরেও চলত। সে জন্যে শ্রোতাদের গান-বাজনা শোনার জন্যে আহার থেকে বিশ্রাম পর্যন্ত ব্যবস্থা থাকত সব কিছুরই। প্রথম দিনে ত সারা রাত আসর হল। তারপর চলে গেলেন গায়ক-বাদকরা। কিন্তু নিমন্ত্রিত শ্রোতারা রইলেন। কারণ পরের সন্ধ্যায় আবার বসবে আসর। তাই তাঁদের সারা দিনের বিশ্রাম আহার জলযোগ ইত্যাদির যাবতীয় ব্যবস্থা। এমন কি বাথরুমে প্রত্যেকের জন্যে কোঁচানো কাপড়ও প্রস্তুত। গান-বাজনা শুনতে এসেছেন।...থাকুন আরাম

করুন আহার করুন বিশ্রাম নিন। নিজের বাড়ির মতন ভাববেন। অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি হলে বলবেন। আবার সন্ধ্যার পর শুনবেন আর এক দলের গান-বাজনা। ইচ্ছে হলে সে রাতেও থেকে যাবেন। সব আয়োজন করা আছে সে জন্যে।

মিত্র মহাশয়ের জলসাঘরে শোনবার জন্যে যাঁরা নিমন্ত্রিত হন তাঁদেরও গুণ আছে। তাঁরা কেউই হুজুগের শ্রোতা নন। প্রত্যেকে রীতিমত বোদ্ধা। গুণীর গুণ-পনা বোঝেন। ধরতে পারেন অল্পবিদ্যার ফাঁকি। রাগের ঠিক-বেঠিক জ্ঞানও তাঁদের আছে। উপযুক্ত সময়ে তারিফ করতে জানেন। কুট তান সমে এসে পড়লে মাথা তাঁদের ঠিক নড়ে ওঠে ঝোঁকের মুখে। তাঁরা দস্তুরমত সমঝদার আসরের প্রাণ। এমন শ্রোতাদের না পেলে আসর জমে না। কলা-বতদের মেজাজ আসে না। সঙ্গীত মিত্রা-লয়ের তাই অন্তরের মিত্র তাঁরা। এখানে তাঁদের বড় খাতির।...

সেদিনও ভূতনাথ মিত্র বড় আসর করেছেন। জলসাঘর ভরে উঠেছে শ্রোতার দলে। কলাকাররাও উপস্থিত। বাইরে থেকে এসেছেন দুর্ধর্ষ প্রবীণ পাখোয়াজী মদন-মোহন মিশ্র। স্বনামধন্য কদৌ সিংহের উপযুক্ত শিষ্য তিনি। এসেছেন লছমী ওস্তাদ সরোদী আমীর খাঁ সারঙ্গী ছোটে খাঁ প্রভৃতি। নবীনদের মধ্যে আছেন হরি-দাস অনাথনাথ বসু এমনি কজন।

সেদিন আসরে আসবার আগে পিতা-পুত্রে কথাবার্তা হয়ে ছিল।

এ আসরে একজন বড় পাখোয়াজী আসবেন তা শুনেছিলেন হরিদাস। আর বাড়িতেই বলেছিলেন 'বাবা আপনি নাই-বা গেলেন। আমি আজকের আসরে ধ্রুপদ গাইব।'

লছমীজীর ঠিক সন্দেহ হয়। পুত্রকে তিনি স্পষ্ট বলেন, 'না, আমিও থাকব। দেখ, হরিয়া, মদন-মোহনজী বড় গুণী আদমি। তাঁর কদৌ সিংয়ের তালিম। কিন্তু এখন অনেক বয়েস হয়েছে। সামলে গাইবি। ও'র সঙ্গে লড়াই বাধাস নি যেন।'

সেদিন আসরে কিন্তু তা-ই হল

প্রথমেই গান আরম্ভ করলেন হরি-দাস। তাঁর ধ্রুপদের সঙ্গে মদনমোহনজীই পাখোয়াজ নিয়ে বসলেন।

সামনের সারিতে আছেন লছমীজী, আমীর খাঁ প্রমুখ। শ্রোতাদের মধ্যে ভূতনাথ মিত্র রয়েছেন।

অতি সুরেলা দরাজ কণ্ঠে গান ধরলেন হরিদাস। যথাবিধি আলাপচারিতে রাগের রূপ দেখালেন। সুরের সুন্দর আবহ সৃষ্টি হল আসরে। আলাপের পর হরিদাস স্থায়ী গাইতে শুরু করলেন।

মদনমোহন পাখোয়াজের সুর তান-পুরার আর একবার মিলিয়ে নিলেন।

হরিদাস চৌতালে গান আরম্ভ করলেন ঠাস লয়ে।

কিন্তু স্থায়ী কলির মধ্যেই গোলযোগ বাধল। গায়কের সঙ্গে পাখোয়াজীর অমিল। সংগত মিলছে না গানের তালে।

শ্রোতারা কৌতূহলী উৎকর্ণ হলেন। উপেজের শেষে কি ঠিক পৌঁছতে পারছেন না পাখোয়াজী? নাকি হরিদাস সমে পড়বার আগে মাঝপথে ছেড়ে দিচ্ছেন?

উৎকণ্ঠ হলেন প্রবীণ মদনমোহন। গাওয়াইয়ার লয়কারী সতর্ক হয়ে অনুধাবন করলেন। হাঁ। উপেজ ত শেষ করছেন না।

তারপর বললেন হরিদাসকে, 'এ কেয়া? বিচ্‌মে রোক্‌তা কাহে?'

সপ্রতিভ গায়ক জানালেন, 'আপ্‌কা ইন্তজার্‌কো ওয়াস্তে। উপেজ পুরা করলে আপনি ধা লাগাতে পারবেন না।'

কি, এত বড় কথা?

চালিয়ে ত দেখ তুক্‌!'

মদনজীর কথা মত্তম উপেজ শেষ করে হরিদাস স্থায়ীতে ফিরে এলেন। কিন্তু আসরের সবাই দেখলেন—আশ্চর্য, এত বড় পাখোয়াজী পৌঁছতে পারলেন না উপেজের শেষে। মদনমোহন যেন স্তম্ভিত বোধ করলেন।

এবার হরিদাস বললেন, 'মিশিরজী, ঠিক কিজিয়ে।'

মিশ্রজী যেন শেষ শক্তিতে হাঁকলেন, 'ঔর এক দফে।'

কিন্তু একবার নয়, একাধিকবার একই ব্যাপার ঘটল। উপেজের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত এসে পড়তে অক্ষম হলেন মদনমোহন। কি বিষম কূট লয়কারি? বৃদ্ধ পাখোয়াজীর মস্তিষ্ক আলোড়িত হয়ে উঠল। চৈতন্যলোক চমকিত করে জাগতে লাগল বহুদিন আগের একটা স্মৃতি। অনেককালের এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। লেকিন তাজ্জব! ঠিক সেই জিনিসের পুনরাবৃত্তি এখানে কেমন করে হল?

মদনমোহন কোল থেকে পাখোয়াজ নামিয়ে রাখলেন। হরিদাসের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, 'আপ্‌ কোন্‌ হ্যায়?'

অর্থাৎ কি আপনার বংশ ধারার পরিচয়—ঘরানা?

হরিদাস লছমীজীর দিকে দেখালেন, 'মেরা পিতাজী।'

'আপকা দাদা?'

'রামকুমার মিশির।'

'বেনারস্‌কা?'

'জী হাঁ।'

মদনমোহনজী আস্তে আস্তে বললেন, 'অব্‌ পাত্তা মিলা।'

গান বাজনা ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শ্রোতারা অনেকেই অবাক হয়ে শুনছিলেন এঁদের অদ্ভুত কথাবার্তা। এখন তাঁরা আরো কৌতূহলী হলেন। আর বহুদিন আগেকার আর একটি আসরের নাটকীয় বর্ণনা আরম্ভ করলেন বৃদ্ধ পাখোয়াজী। লছমী ওস্তাদ আর সকলেই মদনমোহনের কাহিনী শুনতে লাগলেন।

'সে পুরাণা জমানার কথা। আমি তখন তোমারই মতন জওয়ান। বেনারসের এক আসরে রামকুমার মিশিরজী গাইছেন। আমি সংগত করছি। আমার তখন কম বয়সের দাপট। গানকে আমার পাখোয়াজের সঙ্গে কেবল টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছি। এমন সময় রামকুমারজী গান থামিয়ে বললেন, 'সাথ্‌ সাথ্‌ চলো। সুস্থ হোকে মিঠা করকে বাজাও, ভাই। লড়াই করছ কেন?' কিন্তু বুড়োমানুষের কথায় আমি কান দিলুম না। রক্ত গরম তখন। কেবল তেড়ে বাজাবার আর গাওয়াইয়াকে বেকায়দায় ফেলবার দিকে ঝোঁক। আর মনে এই অহঙ্কার—আরে এত শিখেছি, এসব বাজাব না? তখন আর খানিক গেয়ে তোমার দাদা এমন একটা লয়কারী করলেন—ঠিক এই তোমার মতন—যে আমার হাত একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। কোনদিকে রাস্তা নেই। আমি আর কিছুতেই তাঁর গানের সঙ্গে ধা লাগাতে পারলুম না। বে-ইজ্জতের একশেষ। পাখোয়াজ থেকে হাত উঠিয়ে নিতে হল সকলের চোখের সামনে। এখন আমার যা বয়েস সেসময় তোমার দাদারও হয়ত তেমনি বয়েস হয়েছিল। তিনি তারপর আমায় বললেন, 'সঙ্গতীয়া এদিক সেদিক করতে গেলে নিজেই বেকায়দায় পড়বে। মনে রেখো, আমাদের ঘরে যা আছে এসব জিনিসের সঙ্গে কিছুতেই বাজাতে পারবে না। পরেও এই অবস্থায় পড়বে।' আজকের এই লয়কারীও ঠিক সেদিনের মতন। আমি ত আর কিছুদিন পরেই মরে যাব। কিন্তু আজো এ জিনিসের সঙ্গে বাজাতে পারলুম না। সেদিনও যেমন আজো তেমনি আমায় অপদস্থ হতে হল আসরে। তোমার দাদার সেই পুরাণা জমানার কথাই ঠিক ঠিক ফলে গেল।'

বিমর্ষ বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ফেলে নীরব হলেন। আসর শুদ্ধ লোক তাঁর এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কথা শুনছিলেন এতক্ষণ।

শেষে লছমী ওস্তাদই জলসাঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন। অল্পকথার শান্ত মানুষ তিনি। সংবেদনশীল, প্রাজ্ঞ।

হরিদাসকে সংক্ষেপে শুধু বললেন, 'হরিয়া, গান সুরু করো।' আর মদনমোহন মিশ্রের দিকে ফিরে তাঁকে বাজাতে অনুরোধ করলেন।

এবার হরিদাসের গানের সঙ্গে মদন-মোহনজীর সঙ্গত মিলতে লাগল ঠিক ঠিক। আর কোন গোলমাল নেই। লড়াইয়ের পর সংগীত আরম্ভ হল আসরে।......

লছমী ওস্তাদের সাঙ্গীতিক [illegible] সেদিন সঙ্গীত মিত্রালয়ের [illegible] পেয়েছিল।

—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

চতুর্দশপদী গদ্যকবিতা

দিনেশ দাস

।। গ্রীষ্মে ।।

আকাশের উপর দিয়ে মশাল নিয়ে ছুটেছে পদাতিক সূর্য ঃ
প্রচণ্ড ঋতু গ্রীষ্ম আসে। হৃদয়ের দরজা সশব্দে বন্ধ হয়।
আমার দেহের উপর নিঃশব্দে মধ্যাহ্নের সূর্য জ্বলে;
আমার শরীরে কেউ যেন অবিরত ধারাল ছুঁচ ফোটায়।
তীরন্দাজ সূর্য একটানা আলোর তীর ছুঁড়ে চলেছে,
শুকনো পাতাগুলি পুরোনো শব্দের মত ঝ'রে পড়ে,
বিবর্ণ পাতা যেন গ্রীষ্মের হলুদ রঙের প্রতিধ্বনি।

পৃথিবী তার চিত্র-বিচিত্র ঋতু নিয়ে খুশিমত চলে.
সময় একটা বিরাট ফাঁদ যে-ফাঁদে আমরা সকলেই বাঁধা ঃ
এক একটি দিন চোখের ভিতর দিয়ে মগজে প্রবেশ করে,
আমার কানের ভিতরে তরল আগুন মুখে আগুনের ফুলকি ঃ
আমি রুমাল দিয়ে আগুনের গুঁড়োগুলো মুছে ফেলার চেষ্টা করি,
আমার মৃত্যু হয় না বটে তবে আমার কিছুটা ম'রে যায়;
মৃত্যুর ব্যাকরণ কি আর নতুন ক'রে লেখা হবে না?

।। পথ ।।

পথটি চলেছে সোজাসুজি একটি শূন্যতার দিকে,
এই পথের উপর দিয়ে আমি প্রত্যহ হাঁটি ঃ
এ পথ সূর্যের জন্যে প্রতিদিন অধৈর্য হ'য়ে ওঠে,
ভোরের আলোয় এর মসৃণ কাঁধ চকচক করে.
সূর্যের উত্তপ্ত আলিঙ্গনে এর দেহ গ'লে যায় ঃ
আবার সন্ধ্যার অন্ধকারে সঙ্কুচিত হ'য়ে আসে—
ট্রামলাইনের উপর এই পরিচিত পথটি আমি ভালবাসি।

দীর্ঘ প্রার্থনার মত আমার একটানা পথ-চলা ঃ
দিনগুলি এখানে গলিত পিচের ওপর ম'রে যায়,
ধুলো. বালি জঞ্জাল. জীবাণু বিস্মরণে ভরা এই পথ।
অনেক সময় এর লেন বাই-লেন ফুটপাথ ঢেকে মৃত্যু আসে,
অস্থির পথটির ধারে ঘাসেরাও ঘুমুতে পারে না ঃ
তবু এই চিরপরিচিত রাজপথ আমার প্রিয়.
আমি যতই হাঁটি না কেন, পথটি ঠিক আমার পিছনেই আসে।
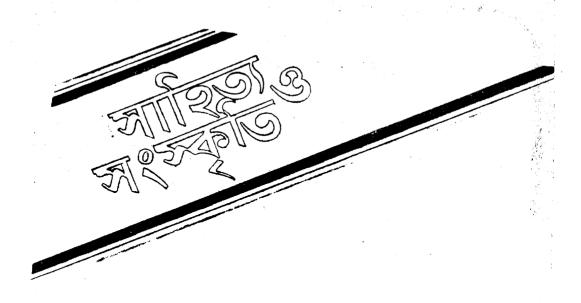
রুশ ভাষায় 'রামায়ণ' ও মহাভারতের পূর্ণাঙ্গ কাব্যানুবাদ

সোভিয়েত সরকার 'বিশ্ব সাহিত্য গ্রন্থাগার' নামে গোটা পৃথিবীর চিরায়ত সাহিত্য প্রকাশের একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই উদ্যোগের প্রথম দুখানি গ্রন্থ হোমরের 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি'। তারপরেই প্রকাশিত হলো চিরায়ত ভারতীয় মহাকাব্য 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'। সোভিয়েত দেশে ভারতবিদ্যা-বিশারদ একটি গোষ্ঠীর সহযোগিতায় অনুবাদক এস লিপকিন ও ভি পোতাপোভা রামায়ণ ও মহাভারতের কাব্যানুবাদ করেছেন। প্রথম সংস্করণে মহাকাব্য দুখানি ৩ লক্ষ কপি করে মুদ্রিত হয়েছে। এই গ্রন্থ দুখানির প্রকাশ উপলক্ষে রুশ সাহিত্যের স্বনামধন্য সমালোচক পি নিনতুসে লিখেছেন : "সোভিয়েত পাঠক সাধারণ এখন তাঁদের অত্যন্ত আদরণীয় ভারতীয় সংস্কৃতির মূল দু'খানি উৎসের পূর্ণাঙ্গ স্বাদ পাবেন। সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই প্রাচীন মহাকাব্য দুটিতে মানবসভ্যতার যে বাণী উচ্চারিত হয়েছে, তা দেশকালের গণ্ডী পার হয়ে বিশ্ব সংস্কৃতি ভাণ্ডারের এক অমূল্য সম্পদ হিসেবে পরিগণিত।"

বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্ন সময়ে আমরা যে সংবাদ পেয়ে থাকি তাতে দেখা যায় যে, সোভিয়েত দেশে বিভিন্ন ভাষায় বিশেষ করে রুশ ভাষায় প্রাচীন তথা আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য পাঠের জন্য সে-দেশের জনগণের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য প্রবণতা দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি আমরা জেনেছি যে, রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কাব্য রুশ দেশে যা প্রচারিত হয়েছে তার সংখ্যা কোটীর ঊর্ধ্বে। ও-দেশের ব্যাপক সাক্ষরতা তথা আর্থিক স্বচ্ছলতা যে এর প্রধান দুটি কারণ সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবু একথা বললে মনে হয় অন্যায় হবে না যে নিজে কিনে বই পড়ার প্রতি রুশ জনগণের প্রবণতা ভারত ত দূরের কথা, খাস পশ্চিম ইয়োরোপেরও অনেক জনগোষ্ঠী অপেক্ষা অধিক।

সাহিত্য অকাদেমির উদ্যোগে অনুবাদের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা

গত ১১ই মে শনিবার সাহিত্য অকাদেমির পূর্বাঞ্চলীয় দপ্তরের উদ্যোগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙা হলে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার বিষয় ছিল অনুবাদের নানা সমস্যা। এই আলোচনা সভা পরিচালনা করেন শ্রীমতী লীলা রায়। সর্বশ্রী অন্নদাশঙ্কর রায়, সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র ও জ্যোতিরিন্দ্রমোহন জোয়ারদার প্রমুখ এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। আলোচিত প্রসঙ্গগুলি প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে : ১। অনুবাদ সাহিত্য প্রকাশনা সাহিত্য অকাদেমির কর্মসূচীর অন্তর্গত বলে অকাদেমির পূর্বাঞ্চলীয় দপ্তর একটি 'অনুবাদক সূচী' প্রকাশ করবেন। এই অনুবাদক সূচীতে অনুবাদকের নাম, ঠিকানা, বয়স, পেশা, মাতৃভাষা কোন ভাষা থেকে কোন ভাষায় তিনি অনুবাদে আগ্রহী, প্রকাশিত অনুবাদের বিবরণ, অনুবাদে অভিজ্ঞতা কোন অনূদিত পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত আছে কিনা সে তথ্য সবকিছু বিশদভাবে থাকবে। বাংলা ব্যতীত পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য ভাষা, যেমন, ওড়িয়া, মণিপুরী ও অসমীয়া প্রভৃতি ভাষার অনুবাদকদের সম্পর্কেও সমস্ত তথ্য এই অনুবাদকসূচীতে থাকবে। এই সূচী তৈরি হবার পরে প্রকাশক সংস্থাগুলির নিকট তার প্রতিলিপি পাঠানো হবে। যাতে তাঁরা প্রয়োজনবোধে যে কোনও নির্বাচিত গ্রন্থের অনুবাদের জন্য উপযুক্ত অনুবাদককে বেছে নিতে পারেন। ২। প্রকাশন সংস্থাগুলির সুবিধার জন্য অনুবাদ কর্মের [illegible] প্রকাশে অকাদেমি নানাভাবে [illegible] করবেন যেমন, পাণ্ডুলিপি নির্বাচন [illegible] যথাযোগ্য সম্পাদনা। এ ব্যাপারে [illegible] তাঁদের বিশেষজ্ঞগণকেও প্রয়োজন [illegible] কাজে লাগাবেন। ৩। অনুবাদ সাহিত্য প্রকাশে আগ্রহী প্রকাশন সংস্থাগুলিকে অকাদেমি যোগ্য অনুবাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেবার দায়িত্ব নেবেন অকাদেমির তরফ থেকে একটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের কথাও কমিটি ভাবছেন ৪। অনুবাদের কাজে সুবিধার জন্য পূর্বাঞ্চলের দুটি বা তিনটি ভাষার একখানি অভিধান প্রণয়ন করা উচিত বলে উপস্থিত সকলে মনে করেন। এ উদ্দেশ্যে শীঘ্র তাঁরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।

—শ্রীজরৎকারু

তাভের্নিয়ের ভারত ভ্রমণ। অনুবাদ—সুধা বসু। নবভারত পাবলিশার্স, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। ষোল টাকা।

তাভের্নিয়েরের ভ্রমণবৃত্তান্ত একটি অসাধারণ গ্রন্থ। সাধারণ পাঠকের কাছে যেমন সুখপাঠ্য, ইতিহাসের ছাত্রের কাছে তেমনই মূল্যবান। জাঁ বাতিস্ত তাভের্নিয়ে ছিলেন ফরাসী ব্যবসায়ী, মণিমুক্তার কারবার করতেন। ব্যবসায় উপলক্ষেই তিনি পাঁচবার ভারতবর্ষে আসেন। সপ্তদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের বহু বিচিত্র বর্ণনা তার 'সিক্স ভয়েজেস' গ্রন্থটিতে পাওয়া যায়। ফরাসী ভাষায় তাভের্নিয়ে গ্রন্থটি লেখেন (১৬৭৬ খৃঃ), তারপর ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থটি বারবার অনূদিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় সম্প্রতি (১৯৭৩ খৃঃ) শ্রীমতী সুধা বসু গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন। তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

তাভের্নিয়েরের ভ্রমণ বৃত্তান্তে সপ্তদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা ব্যবসা-বাণিজ্য, পথঘাট ও যানবাহন ব্যবস্থা, সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মানুষ্ঠান ইত্যাদির বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। ঔরঙ্গজেব থেকে শুরু করে মীরজুমলা ও শায়েস্তা খাঁ পর্যন্ত ভারত বিখ্যাত বহু ব্যক্তির সঙ্গে তাভের্নিয়েরের সাক্ষাৎ ঘটেছে, রত্নবণিক হিসাবে তিনি কারো কাছ থেকে ভালো ব্যবহার পেয়েছেন, কেউ তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে। ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ যারা সে যুগে ভারতবর্ষে বাস করতো তাদের সম্বন্ধেও তিনি বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন। তবে অধিকাংশ বিবরণ [illegible] আকারে বর্ণিত, ফলে ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে ঘটনাগত পারম্পর্য নেই। তাভের্নিয়ে ঐতিহাসিক ছিলেন না, তিনি ব্যবসায়ী পর্যটক মাত্র—সেই কথা জেনেই তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত পড়া উচিত।

বাংলা অনুবাদটি নানা কারণেই প্রশংসার যোগ্য। শ্রীমতী সুধা বসু এই দীর্ঘ গ্রন্থটি অনুবাদ করতে প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। এই ধরনের অনুবাদ যতই প্রকাশিত হয় ততই আনন্দের কথা। শ্রমসাধ্য অনুবাদের কাজে সাধারণতঃ বাঙালীর আগ্রহ নেই। অথচ অনুবাদের মধ্য দিয়েই বিশ্ব-সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ঘটে, বাংলাভাষা এবং সাহিত্যও সমৃদ্ধি লাভ করে। আশা করি 'তাভের্নিয়েরের ভারত ভ্রমণ' গ্রন্থটির যথোচিত সমাদর হবে। এবং শীঘ্রই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন ঘটবে।

ভবিষ্যৎ সংস্করণে অনুবাদটিকে ত্রুটি-হীন করে তোলা এবং সম্পূর্ণতা দেওয়ার প্রয়োজনে কয়েকটি কথা বলি। গ্রন্থের ভূমিকায় বর্ণিত তাভের্নিয়েরের জীবন-বৃত্তান্তটি অত্যন্ত অসম্পূর্ণ, কয়েকটি তথ্যও সংশোধন করা প্রয়োজন, যেমন তাভের্নিয়ে প্রথম প্রাচ্য দেশ পর্যটনে আসেন ১৬৩১ খৃীষ্টাব্দে (১৬৩৬ নয়)। চতুর্থবার ভারতবর্ষে আসেন ১৬৫২ খৃীষ্টাব্দে ('চতুর্থ যাত্রায় পদক্ষেপ করেন' কথার মানে বোঝা যাচ্ছে না)। স্যামুয়েল শাপুজো এই ভ্রমণ বৃত্তান্তের অনুলেখক, একথা সম্ভবত সত্য নয়, অন্তত শার্লে জোরেত-এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গ্রহণ করলে। জোরেত-এর উল্লেখ ভূমিকায় একাধিকবার করা হয়েছে, তা থেকে মনে হয় লেখিকা জোরেত-এর বইয়ের সঙ্গে পরিচিত (যদিও তিনি সর্বত্র 'এম জোরেট' কেন লিখেছেন জানি না, সম্ভবত বল্-এর ভূমিকায় মঁসিয়ে জোরেত-এর এটি সংক্ষিপ্ত রূপ, [illegible] লেখা উচিত ছিল ঁস জোরে[illegible]

বাংলা অনুবাদের ভূমিকায় জানানো হয়েছে, 'তাভের্নিয়েরের ভ্রমণবৃত্তান্ত' বইটি ভি বল্-এর 'ট্রাভেলস ইন ইণ্ডিয়া' (দুই খণ্ড, ১৮৮৯) গ্রন্থের (বইটির নাম Tavernier's Travels নয়) 'পূর্ণাঙ্গ অনুদিত রূপ'। প্রথমেই মনে হয় ফরাসী থেকে অনুবাদ করতে পারলে অনুবাদ অনেক স্বচ্ছন্দ ও সহজ হতো। তবে বল্-এর সংস্করণটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য পাঠ-সম্বলিত ও টীকা-টিপ্পনী সংযোজিত হওয়ায় এক হিসাবে অনেক বেশী মূল্যবান

আরো বই

যুবনাশ্বের নেরুদা—কবিকণ্ঠ প্রকাশনী। ১০/১ ইব্রাহিমপুর রোড। কলকাতা ৭০০০৩১। দাম পাঁচ টাকা।

চিলির সামরিক জান্তার হাতে নিহত কবি পাবলো নেরুদার নাম প্রগতিশীল মানুষ মাত্রেরই প্রিয়। তাঁর কবিতা দীর্ঘদিন ধরেই সুপরিচিত এ দেশের মানুষের কাছে। সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তরুণ কবিরা নেরুদার কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেছেন অনেক। বেশ কয়েকটি সংকলনও বেরিয়েছে।

যুবনাশ্ব ছদ্মনামের আড়ালে শ্রীমনীশ ঘটক দীর্ঘদিন আগেই নেরুদার কয়েকটি কবিতা অনুবাদ করেছিলেন। পরবর্তীকালে আরো কিছু কবিতা অনুবাদ করেন। সমস্ত অনূদিত কবিতা একত্রিত করে বেরিয়েছে বর্তমান সংকলন। অনুবাদক স্বয়ং একজন কবি। অনুবাদে মূল কবিতার মেজাজকে অক্ষুণ্ণ রেখেও তাকে মৌলিক বাংলা রচনার কাছাকাছি টেনে এনেছেন আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে। শোনা যায়, যুবনাশ্বের সঙ্গে নেরুদার ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল। তার ভিত্তিতে একটি আলেখ্য গ্রন্থভুক্ত হলে, বাঙালী-মাত্রেই গৌরব বোধ করতেন।

জন্মে প্রতি জন্মে (কাব্য সংকলন)—আশিস সান্যাল। বাক সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩, কলেজ রো, কলকাতা-৯। দাম চার টাকা।

প্রতিষ্ঠিত তরুণ কবি শ্রীআশিস সান্যালের 'জন্মে প্রতিজন্মে' কাব্য গ্রন্থটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য কাব্য সংকলনের প্রধান দুটি ভাগ—জন্মে প্রতিজন্মে ও হে স্বদেশী ফুল। দ্বিতীয় অংশটিতে মোট ছয়টি কবিতা সংকলিত এবং প্রত্যেকটিই অনুবাদ কবিতা। অনূদিত কবিতাগুলি প্রতিবেশী ভারতীয় কবিতারই অন্তর্ভুক্ত। প্রভাকর মাচওয়ে, নীলমণি ফুকন, নবকান্ত বড়ুয়া, শচীরাউত রায় মায়াধর মানসিং ও নলরাজ কোমল—এই মোট ছয়জন কবির কবিতা অনুবাদ করেছেন শ্রীসান্যাল। হিন্দী ও অসমীয়া কবিতাগুলির অনুবাদে একেবারে মূল থেকে অনুবাদ করেছেন কবি ও অনুবাদ বাস্তুবিক অর্থে প্রশংসার যোগ্য।

জন্মে প্রতিজন্মে অংশে কবি আশিস সান্যালকে তাঁর পূর্ববর্তী কবিতা থেকে বেশ কিছুটা প্রাগ্রসর চিন্তার অধিকারী হতে দেখি। আলোচ্য কবি সহজে আশাহত হন না। তাই কি দেশপ্রেমের কবিকে ভালবাসা বা দুঃখ ভাবনার অনুভূতিকে—সব দিকেই এক স্থির নিশ্চিত আশাকেই আলোর মত ধরে রেখে সগর্বে এগিয়ে যেতে ভালবাসেন। 'আবার দিগন্ত জুড়ে অবিরাম প্রতিশ্রুতিময়। স্বাগত নবীন জন্ম প্রতিজন্ম—। স্বাগত হে রূপাশ্রিত চেতনার দীপ্র বরাভয়। তোমার মুখের থেকে। জেবলে দেবো প্রত্যাশার শ্রদ্ধেয় মহিমা। অন্ধকার উপবনে।' বা 'তোমরা যেদিকে খুশি চলে যাও। আমি এই প্রান্তরের তারা ভরা রাতে।......দেখবো দু'চোখ মেলে মমতায় পরিপূর্ণ সেই সব আশ্চর্য মোহিনী,—ইত্যাদি পংক্তি রচনা করে শ্রীসান্যাল তাঁর পূর্বেকার কবিভাবনা থেকে কিছু চেতনার উত্তরণের সংবাদ দিয়েছেন। শব্দ ছন্দ, চিত্রের অভিজ্ঞতায় শ্রীআশিস সান্যাল অকারণ জটিলতাকে পরিহার করে বরং সমস্ত কাব্যিক অভিজ্ঞতাকে যে জীবনের মমতাময় অস্তিত্বের প্রতীক-প্রতিম করে তুলতে অভ্যস্ত, জন্মে প্রতিজন্মের কবিতাগুলি তা প্রমাণ করে।

প্রিয় সব কিছুকেই চিতায় (কাব্য সংকলন)—প্রশান্ত দাস। সিন্ধু সারস প্রকাশন, ৫০ কাটাপুকুর থার্ড বাইলেন, হাওড়া ১। তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

কবি প্রশান্ত দাস যে কবিতার নামে গ্রন্থের নামকরণ করেছেন সেখানে বলেছেন, আমাকে তোমরা কেউ কুশল জিজ্ঞাসা কোরো না: কারণ তাঁর সমস্ত 'ক্রমান্বয় ইচ্ছার শব'

মনে হতে পারে। কিন্তু বল্-এর সংস্করণের 'পূর্ণাঙ্গ' অনুবাদ হয়তো অসম্ভব, হয়তো অপ্রয়োজনীয়, অন্তত বল্-এর সংস্করণটি পাশে রেখে মেলাতে গিয়ে দেখছি কিছুই মিলছে না। ভাভেরন্নিয়ের গ্রন্থের মূল্যবান উৎসর্গ পত্রটি অনুবাদকালে পরিত্যক্ত হয়েছে, 'ডিজাইন অফ দি অথর' অংশটিও অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় অনুবাদ করা হয় নি। বল্-এর গ্রন্থটির সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ গ্রন্থান্তর্ভুক্ত টীকাটিপ্পনী এবং পরিশিষ্টগুলি। বাংলা অনুবাদে সেগুলি আদৌ ব্যবহার করা হয়নি। সবচেয়ে বড়ো কথা, মূল পাঠ যথেচ্ছভাবে সংক্ষেপ করা হয়েছে, অনুবাদও কোথাও মূলানুগ নয়। অনুবাদ কর্ম অত্যন্ত দুরূহ ও শ্রমসাধ্য জানি, কিন্তু তবু মনে হয় এ ব্যাপারে আর একটু সতর্কতা প্রয়োজন ছিল। ভূমিকায় বলা হয়েছে, 'ইহাতে মূলগ্রন্থে বিধৃত কিছু সংখ্যক স্থানের মধ্যে দূরত্ব ব্যতীত আর কোনও অংশ বর্জিত হয়নি। সব বিষয়ই পূর্ণাঙ্গরূপে স্থান পেয়েছে।' বলাবাহুল্য, এ ধরনের দাবী না করাই ভালো ছিল। অন্তত 'বর্জিত' স্থানগুলির কথা অনুবাদে উল্লেখ করা উচিত ছিল। এছাড়া এই জাতীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে একাধিক মানচিত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন, বাংলা অনুবাদ-গ্রন্থে একটিও মানচিত্র বা পথনির্দেশ নেই!

—অলোক রায়

অমৃতপুরুষ যীশু (জীবনী)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। সাহিত্য সদন, ৬৫-এ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। ষোল টাকা।

শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বাংলা সাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর কথাকারদের মধ্যে আর নতুন করে পরিচয়ের অপেক্ষা রাখেন না, কিন্তু তাঁর সম্প্রতি কয়েক বছরের মধ্যে প্রকাশিত জীবনী গ্রন্থগুলি নিশ্চয়ই তাঁকে আর এক ক্ষমতাধর সাহিত্যিকরূপে চিহ্নিত করেছে। জীবনী রচনার একটি নির্দিষ্ট ধারা স্পষ্ট হয়েই ছিল কিছুকাল আগে পর্যন্ত। শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সেই ধারায় যেনবা নতুন বারি নিষিক্ত করেছেন —পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ ইত্যাদির মত গ্রন্থ রচনা করে। সম্প্রতি প্রকাশিত অমৃতপুরুষ যীশু সেই ধারায় একটি মূল্যবান জীবনী গ্রন্থ।

যীশুর আবির্ভাব বাইবেলের ছত্রে ছত্রে মনোরম করে বর্ণিত আছে। আলোচ্য গ্রন্থকার সেখান থেকে বিষয়বস্তু নিয়ে যীশু সম্পর্কিত বিভিন্ন মত, ধারণা ও আলোচনাকে ভিত্তি করে বর্তমান গ্রন্থ রচনা করেছেন। অচিন্ত্যকুমারের ভাষায় —যীশু ঈশ্বরের মৃত্যুহীন উচ্চারণ। যীশু ঈশ্বরের উচ্চারিত শাশ্বত বাক্য। যীশুই ঈশ্বরবাণীর শরীরী রূপ। এর পর লেখক জেনেসিসের কথা সেন্ট জনের মন্তব্য উল্লেখ করে ঈশ্বর, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, স্বরূপ ও যীশুর মধ্যে [illegible] ঈশ্বর ভাবনার একাত্মতা প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা [illegible] যীশুর জীবন ও বাণীকে নতুন ধরন[illegible] জীবনী গ্রন্থের আঙ্গিকে পরিবেশন ক[illegible]ছেন।

জুডিয়ায় রাজা হেরডের নিঃসন্[illegible] পুরোহিত দম্পতি জ্যাকারিয়াস ও এলি[illegible]বেথ বয়সের শেষ প্রান্তে উপনীত। স্বর্গ[illegible] গ্যাব্রিয়েলের বাণীর পরিণতিতে এই বয়[illegible] এলিজাবেথের সন্তান হল—নাম জন। [illegible] ওদিকে গ্যালিলির ন্যাজারেথ শহরে [illegible] ডেভিডের বংশের ছেলে জোসেফের স[illegible] বিবাহের অঙ্গীকারে আবদ্ধ কুমারী মে[illegible] গর্ভে গ্যাব্রিয়েলের কথামতই জন্মালেন যী[illegible] রোম সম্রাট সিজার অগস্টাস, ইজরায়ে[illegible] অধিবাসী—এ সবের কাহিনীর মধ্যে জন্ম যীশুর জীবন কাহিনীকে মনোরম ক[illegible]পূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন জীবনীক[illegible] কোথাও তথ্য প্রমাণ বিচ্যুত নয়, অথচ [illegible] একজন কথাকারের সুনিপুণ কাহিনী [illegible] কৌশলের মধ্যেই এই বিরাট জীবনকাহি[illegible] শেষ হয়েছে। এ জীবনকাহিনী নীরস[illegible] কথাসাহিত্যের মতই পাঠ্য, উপভোগ্য, [illegible] এক মহাপুরুষের জীবন ও বাণীকে গভী[illegible]ভাবে উপলব্ধি করার যথার্থ সহায়[illegible] অমৃতপুরুষ যীশুর সাহিত্যিক প্রসাদ[illegible] অনবদ্য।

[illegible] চিন্তায় তুলে দিয়েছেন। কবি তরুণ এবং আধুনিক মন ও মননের অধিকারী। এ সময়ের অধিকাংশ কবিকেই যেমন সময় সচেতনা জ্বালা ধরায়, হতাশ করে, ইচ্ছা-অনিচ্ছা আশা-নিরাশা সব কিছুই একটা নির্দিষ্ট সমে-র দিকে এগোয়, প্রশান্ত দাসের কবিতায় তা আছে। 'আহত অপার্থিব অনুভূতি এবং আমি' নামের শেষ গদ্য কবিতায় তা স্পষ্ট এবং স্বাগত ভাষণে দীর্ণ। কবির শব্দ প্রয়োগ, ছন্দ ব্যবহার তাঁর অন্তর্নিহিত আবেগের অনুগত।

ঝুলবারান্দা—চিত্রভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্বজ্ঞান টেমার লেন। কলকাতা-৯। দাম চার টাকা।

লেখকের প্রথম গ্রন্থ, গল্পগ্রন্থ—বিভিন্ন স্বাদের মোট আটটি রচনার একটি পরিচ্ছন্ন সংকলন।

পাঠকের সহজ কৌতূহল আকর্ষণের জন্য গল্পকারের যেটুকু মুন্সিয়ানা থাকা দরকার চিত্রভানু বন্দ্যোপাধ্যায় সেই মুন্সিয়ানার স্বাক্ষর রেখেছেন। যদিও মূলত কাহিনীধর্মী গল্প তিনি লিখতে চান নি। সহজ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষায়ও তিনি যত্নবান। তবু পরিচিত ও প্রচলিত বৃত্তের বাইরে যেতে তাঁর দ্বিধা আছে। এতে সাধারণ গল্পরসিক পাঠকের কিছু লাভ হয়েছে, ফানুস, আসমান জমিন, দূরের জানালা ও আরো অন্তত একটি—বিভিন্ন স্বাদের কয়েকটি গল্প পাঠের মনোরম অভিজ্ঞতা হয়েছে।

সংকলনের শেষ রচনা ঝুলবারান্দায় লেখক সময়কে ছুঁতে চেয়েছেন, কিন্তু গল্প-কল্প এই বিশেষ নামে রচনাটিকে চিহ্নিত করার তাৎপর্য পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হয় না। তবে নিঃসন্দেহে ঝুলবারান্দা লেখকের একটি সফল প্রয়াস।

মানবমন (এপ্রিল-জুন) ১৯৭৪—[illegible] ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। [illegible] বিধান সরণী, কলকাতা-[illegible]। [illegible] পঁচাত্তর পয়সা।

মনোবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান [illegible] বিজ্ঞানের এই ত্রৈমাসিকের বর্তমান [illegible] বেশ কয়েকটি মূল্যবান রচনা স্থান পেয়ে

কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রসঙ্গে

অমৃতে প্রকাশিত বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত হাশয় লিখিত কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর শশালা ও নাটক প্রবন্ধ পড়লাম। ঐ বন্ধে বিশ্বরঞ্জনবাবু হুতোম প্যাঁচার কশার রচয়িতা হিসাবে কালীপ্রসন্নকে চিহ্নিত করেছেন। স্মরণ হয় বেশ কিছু-ল আগে কোনো এক বাংলা সাপ্তাহিকে তোম প্যাঁচার নকশার সঠিক রচয়িতা লীপ্রসন্ন কিনা এ-বিষয়ে আলোচনা বং বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। বেশ কজন খ্যাতনামা প্রবন্ধকার ও লেখক লীপ্রসন্নের বিপক্ষে তাঁদের মতবাদের বতারণা করেছিলেন সমসাময়িক কালের না ঘটনা ও তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে। দের মনে পড়ে হুতোম প্যাঁচা নকশার সল স্থপতি হিসেবে এই বিপক্ষকারীরা কমল ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখ করে-লেন। কৃষ্ণকমল নাকি, নানাভাবে কালী-সন্নর আর্থিক সহায়তার ওপর নির্ভর-ল ছিলেন। তাই ঐ নকশাখানি কালী-সন্নর নামে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করে জ্ঞতার পরিচয় দেন। আবার কারো রো মতে হুতোম প্যাঁচার নকশা সমকালীন কালের কোনো এক ছদ্মবেশী বা লেখক দ্বারা রচিত এবং কালী-সন্ন সেটা কিনে নিজের নামে প্রকাশের বস্থা করেন।

যাই হোক এ-বিষয়ে পণ্ডিতের লাই-ই হয়েছে আসল রচনাকারীর খোঁজ মেলেনি। সুতরাং কাগজে-কলমে যতক্ষণ প্রমাণিত না হয় হুতোমের আসল লেখক কে ততক্ষণ অবশ্য কালীপ্রসন্নকেই রচনাকারী হিসেবে স্বীকার করে নিতে হবে।

প্রমথেশ ভট্টাচার্য,
উড়িষ্যা।

রবীন্দ্রনাথ ও রোদেন স্টাইন প্রসঙ্গে

সাহিত্য সংখ্যা 'অমৃতে' 'রবীন্দ্রনাথ ও রোদেনস্টাইন' সম্পর্কিত উজ্জ্বল মজুমদারের সুচিন্তিত ও তথ্যবহুল আলোচনাটি পড়লুম, পড়ে কিছু নতুন খবরও জানা গেল তবে সম্প্রতি মার্কিন দেশের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ ও রোদেনস্টাইনের এযাবৎ অপ্রকাশিত যে পত্রগুচ্ছ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে তার উল্লেখ ও আলোচনা থাকলে লেখাটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারতো: রোদেনস্টাইন পরিবার ও বিশ্ব-ভারতীর সৌজন্যে প্রায় দু'শো পত্র সংগ্রহ করে ঐ সুসম্পাদিত গ্রন্থে স্থান দেওয়া হয়েছে এছাড়া ঐ বইটিতে পাওয়া যাবে রোদেনস্টাইন, তাঁর পরিবার-পরিজন ও বন্ধুবর্গকে উপহার দেওয়া বিশ্বকবির অপ্রকাশিত বেশ কয়েকটি কবিতা। গীতাঞ্জলির ইংরাজি অনুবাদ সম্পর্কে এতকাল অজানা অনেক খুঁটিনাটি খবরও ছড়িয়ে রয়েছে ঐ পত্রাবলীতে। শিল্পী-ভাস্কর রোদেনস্টাইনের সহযোগিতা ও প্রণোদনায় তরুণ রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন বিলাতের গুণীজন সমাজে এবং সাহিত্য-সভায় কিভাবে প্রবেশের ছাড়পত্র লাভ করেছিলেন, কিভাবে কবি-মহলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তার অনেক অজ্ঞাতপূর্ব সংবাদও পাওয়া যাবে ঐ স্বাদু মর্মস্পর্শী আন্তরিক ও ব্যক্তিগত পত্রগুচ্ছে। তাই রোদেনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সখ্য কতটা নিবিড় ছিল তা জানা ও জানানোর জন্যে ঐ গ্রন্থের উল্লেখ অপরিহার্য।

তারা মুখোপাধ্যায়,
২৪ পরগণা

দেশী বিদেশী সংগীত প্রসঙ্গে

আপনাদের ক্রীড়া-বিনোদন সংখ্যা ১৩৮০ পত্রিকায় রকমারি বিষয়বস্তুর সন্নিবেশের জন্য ধন্যবাদ জানাই। এই সংখ্যায়ই সলিল চৌধুরীর সাক্ষাৎকার পড়তে গিয়ে শিল্পীর বক্তব্য ও কার্যক্রমে বৈসাদৃশ্য দেখে চিঠি না লিখে পারলুম না। সলিল চৌধুরী সুরকার হিসেবে ব্যতিক্রমধর্মী সন্দেহ নেই। তাঁর সুর আমাদের ভাল লাগে। আর লাগবেই না কেন? সুরকে তিনি প্রথমেই যে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করেছেন, তার স্বীকৃতি সাক্ষাৎকারেই মেলে, এক জায়গায় বলেছেন : বাবাই বিস্তর সিম্ফনীর রেকর্ড কিনতেন। জ্ঞান হওয়া অবধি সেসব শুনে শুনে অর্কেস্ট্রেশনের উপর একটা সংস্কার মনের মধ্যে গড়ে ওঠে। তার মানে সংগীতে অর্কেস্ট্রেশনের জন্য তিনি পাশ্চাত্য রীতি-নীতির কাছে বহুলাংশে ঋণী। অথচ তিনি বাংলা গানে পাশ্চাত্য সংগীতের ঢং আনছেন—এই অভিযোগটা অস্বীকার করে বলেছেন, বাংলার সংগীতের ঐশ্বর্যলোক এমনই পূর্ণ যে বিদেশীর কাছে আমাদের হাত পাততে হবে কেন? কিন্তু কে না জানে সলিলবাবু এখানে মোটেই সঠিক কথা বলেননি? যেমন তাঁর সুরে 'ছায়া' চিত্রের গানটি (গানের প্রথম লাইন দুটি Itna Na Mujhse Tu Pyar) -এর গ্যাপ মিউজিক মোৎসার্টের বিখ্যাত এক সিম্ফনীর সঙ্গে মিলে যায় হুবহু। এমন আরো বহু গানের বেলাও ঘটেছে। সলিলবাবু যদি এ-ব্যাপারে কোন ধারণা দেন বাধিত হব।

নাদিরা মজুমদার
বাংলাদেশ

অলৌকিক জলযান

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

উপন্যাস

(৪৪)

ছোটবাবু সারারাত ঘুমোতে পারল না। আবার মাথার ভেতরে সেই ঘণ্টাধ্বনি। ঘণ্টা-ধ্বনি হলে ভীষণ অস্বস্তি। কনকনে ঠান্ডা পায়, হাত পা এবং শরীরে কেমন অস্থিরতা, যেন এক অসহ্য দাহ নিয়ত মাথার ভেতরে কখনও ঘণ্টাধ্বনির মতো, কখনও রেল-গাড়ির চাকার মতো ঘড় ঘড় করে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে চলে যাচ্ছে।

ছোটবাবু চুপচাপ বোট-ডেকে দাঁড়িয়েছিল। পাশে ডেভিড। ডেভিডের যা স্বভাব, সে নানাভাবে ছোটবাবুকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। ছোটবাবু ডেভিডের একটা কথা শুনতে পাচ্ছে না। এত জোরে মাথার ভেতরে ঘণ্টা-ধ্বনি হলে কিছু শোনা যায় না। ছোটবাবু দু'হাতে রেলিঙ চেপে দাঁড়িয়ে আছে। দেখলে মনে হবে, ওর দু হাতের পেশিতে এত বেশি শক্তি প্রায় মড়মড় করে লোহার রেলিং গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলবে যেন। সে দূরের সমুদ্রে কেবল গর্জন শুনতে পাচ্ছে। জোয়ারের জল বোধ হয় ধীরে ধীরে নামছে। এবং এ-কারণে যা হয়ে থাকে, কখনও কখনও মৈত্রদার মুখ সমুদ্রের গভীরে নীল জলের ভেতরে দেখে ফেলে। যেন মানুষটা গভীর নীল জলে এখন একটা মাছ হয়ে সাঁতার কাটছে। এবং পাশে কোনো দ্বীপটিপ আছে কিনা খুঁজছে। তারপর যা হয়ে যায় সে দেখতে পায় দূরে দাঁড়িয়ে দ্বীপের মাথায় মৈত্রদা ডাকছে। —এই ছোটবাবু, আমাকে ফেলে তোরা চলে যাচ্ছিস আমাকে নিবি না! সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় মৈত্রদা সাঁতার কেটে জাহাজে উঠে আসার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কেউ তাকে নিতে চাইছে না। তারপর আশ্চর্য সে দেখতে পাচ্ছে মৈত্রদা ডুবে যাচ্ছিল সমুদ্র আর তার অতিকায় সব ঢেউ মিলে মৈত্রদাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আর্চি যেন জাহাজে তখন বিউগল বাজাচ্ছে। ছোটবাবু তখন কেমন ভ্যাবাচেকা খেয়ে সামান্য অবলম্বন ডেভিড সদিবিডকে বলে ফেলল ডেভিড তোমার কী মনে হয়?

ডেভিড বুঝতে পারল না ছোটবাবু কী বলতে চাইছে।

ছোটবাবু বলল তুমি কী বিশ্বাস কর জাহাজ কোনো অশুভ প্রভাবে পড়েছে!

ডেভিড বলল সে তো ছোটবাবু জাহাজটার আজন্ম একটা রোগ। এ-নিয়ে তুমি এখন ভাবছ কেন!

—আচ্ছা ডেভিড তোমার কি সত্যি মনে হয় মৈত্রদা সমুদ্রে ভেসে গেছে। সমুদ্রে ডুবে গেছ। আসলে কেউ তো ঠিক ঠিক দেখেনি

—কিছু তো বলা যাবে না। হয়তো দেখা যাবে সকালে বাঁশি বাজাতে বাজাতে জাহাজঘাটার বড়-টিণ্ডাল ফিরে আসছে। সে যা একখানা মানুষ!

ছোটবাবু বলল ডেভিড তোমাকে তবে পেট ভরে মদ খাওয়াব।

—ঠিক।

—ঠিক ডেভিড।

তারপর আবার ছোটবাবু কেন যে দেখে ফেলে আর্চি ক্রমে তার দলবল ভারি করে এগিয়ে আসছে। প্রথমে আর্চি পরে পাঁচ নম্বর এবং পরে এভাবে ডেক-সারেঙ, এনজিন-কশপ মার্চ করে যাচ্ছে বোট-ডেকে। ওরা প্রথমে বিউগল বাজাচ্ছিল। তারপর সবাই কেমন বন্দুকের নল উঁচু করে দাঁড়ায়। এবং ক্রমে সে দেখতে পায় সার সার ওরা তিনজন—ক্যাপ্টেন স্যালি হিগিনস বনি এবং সে। অর্থাৎ একটা রহস্য জড়িয়ে আছে জাহাজে এটা পাপ কার্গো। সিপে মেয়েমানুষ রাখা পাপ। এবং একটা উন্মত্ততা তখন চারপাশে নেচে বেড়াচ্ছিল। প্রায় উলঙ্গ করে দেবার মতো বনিকে আর্চি সবার সামনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। এই আপনাদের জ্যাক। কাপ্তানের শয়তান ছেলে। ছেলে না মেয়ে? বলুন। জ্যাকের শরীর মাস্তুলে ঝুলিয়ে রোগে এমন বলতে গেল আর্চি।

আর ছোটবাবু [illegible]

হুল্লোড় জাহাজে। সবাই এগিয়ে আসছে গন্ধ শুঁকে। যেন সবাই পাঁইপাঁই ছুটে যাচ্ছে। আসছে। মাথা উঁচিয়ে দেখা সবাই। আবার ছুটে আসছে। মুহূর্তে প্রায় সেই হুল্লোড় বনিকে বগলদাবা ক[illegible] তুলে নিচ্ছে যেন। এবং ছোট ছোট মাংসে স্লাইস মুখে পুড়ে জিভ দিয়ে চেটে চে[illegible] খাচ্ছে। বনি চিৎকার করছে ছোটবা[illegible] বাঁচাও।

মাথায় এভাবে ঘণ্টাধ্বনি হলে সে কি করে। সে ডেভিডের সঙ্গে আর এক কথা বলতে পারছে না। ওর [illegible] জ্বলছে। আর্চির দলবল সহজেই জাঁক[illegible] যেতে পারে—সে শুধু বলে দেবে [illegible] সিতে তোমাদের আমি মাদু দেখাব [illegible] নাবিকগণ। তোমরা তো জানো [illegible] পুরানো ভাঙ্গা—এক বছরের [illegible] এনে তোমাদের জলেস্থলে [illegible] দু বছর রেখে দিচ্ছে। তারপর আর [illegible] বছর রাখবে কে জানে—দেশে [illegible] ভেবে ভেবে তোমরা পাগল হয়ে [illegible] কিন্তু আমি তোমাদের দেখাতে [illegible] এক আশ্চর্য নারী সুধা পারাবার। [illegible] চেটে চেটে সে প্রায় ক্ষুধার্ত [illegible] ভেতর বনির শরীর ফেলে দিচ্ছে [illegible]

জ্যাক তখন পাইনে এসে বলল, ছোটবা[illegible] তুমি এখনও জেগে আছ?

ডেভিড বলল কিছুতেই মিয়ে [illegible] পারছি না।

ছোটবাবু জ্যাককে দেখে কেমন [illegible] গেল। বলল এত রাতে তোমার এখানে দরকার! তুমি কি করতে বের হয়েছ!

জ্যাক বলল তোমরা কথাবার্তা [illegible] আমার কানে আসে।

ছোটবাবুর তারপর মনে হল সে জ্যা[illegible] বনিকে আগের মতো মর্যাদা দিচ্ছে না[illegible] বনিকে বরং ভারি অসভ্য এবং [illegible] মনে হচ্ছে। বনির জন্য এভাবে তার [illegible] এক আশ্চর্য মায়া। এতটুকুতেই সে খ[illegible] [illegible] বিচলিত হয়ে পড়ছে! সে বলে যাচ্ছে।

বনি বলল, যাচ্ছি না। এক্ষুনি যাবে। ছোটবাবু আর দাঁড়িয়ে থাকার সাহস পেল না। দূরে শহর, শহরের আলো সমুদ্রের বাতাস তেমনি বইছে এবং সব কিছু ঠিকঠাক কেবল একজন জাহাজি কিন্তু জাহাজে ফেরেনি। অথবা সমুদ্রের তীরে সে শুয়ে আছে। সে কিছুতেই ...দের মতো ভাবতে পারছিল না। ...শাল হলে সে মৈত্রদাকে দেখতে পাবে ...ড় দাঁড়িয়ে আছে। পাতার বাঁশি বাজাচ্ছে।

বনি বলল ডেবিড তুমি ওকে নিয়ে ...।

ডেবিড বলল সেই কখন থেকে তো ...।

ছোটবাবু বুঝতে পারল ওর জন্য ...ই বিব্রত হয়ে পড়ছে। সে ডেবিডকে ...ল, চল।

বনি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকল। ...ক্ষণ সিঁড়ি ধরে ছোটবাবু নিচে নেমে যাবে ততক্ষণ সে এভাবে যেন দাঁড়িয়ে ...বে। দরজা থেকে নড়বে না। ডেবিড ...গে আগে নামছে। ছোটবাবু পেছনে ...নে নেমে যাবার সময় সিঁড়ির মুখে ...য়ে দেখল বনি তখনও দাঁড়িয়ে আছে। ...বলল এই তুমি দাঁড়িয়ে থাকলে কেন। ...য়ে যাও।

বনি এবার আর দাঁড়াতে পারল না। দরজা বন্ধ না করলে যেন নিশ্চিন্ত ...ত পারছে না ছোটবাবু। সে ঢুকে দরজা ...করে দিল।

ছোটবাবু তখন নামছে। নিচে নেমে ...জা খুলে চুপচাপ বিছানায় বসে থাকল। ...র্ট-হোল খোলা। গরম পড়েছে ভীষণ। ...জোরে পাখা চালিয়ে দিল। মৈত্রদার ...ই একটা কথা তার মনে হচ্ছে—তাহলে ...ই জাহাজের ছোটবাবু। মৈত্রদা ...হাজের কোলবয়দের ছোটবাবু বলে ...ত। ছোটবাবু নামটা মৈত্রদার দেওয়া। ...সে অতীশ দীপঙ্কর ভৌমিক যেন গলা ...চিয়ে বললেও কেউ আর বিশ্বাস করবে ...। এ-জাহাজে সে ছোটবাবু হয়ে গেল। ...দা তাকে এ-জাহাজে ছোটবাবু বানিয়ে ...জে দেশে সটকে পড়ল। আর সা হয় এ-সব ...া মনে হলেই চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। ...সই করতে পারে না মৈত্রদার সঙ্গে ...র আলাপ পুরো এক বছরও হয়নি ...চ মানুষটা ছিল তার সব যেন। এবং ...া দুঃখে সে বলল কাল যদি তোমাকে ...দেখি সকালে পাড়ে দাঁড়িয়ে পাতার ...শি বাজাচ্ছ তবে কাপ্তানের মতো আমিও ...োমাকে আগাপাশতালা চাপকাব। তুমি ...বেছ কি!

ডেবিড বেশ ভেবে খুশি তখন—বড় ...জোর বা একখানা মানুষ এত সহজে ...রে ভেসে যাবে বিশ্বাস করা যায় না। ...তো সত্যি সে সকালে ঘুম থেকে উঠে ...বে তার দলবল নিয়ে জেটিতে বেলুন ...চ্ছে বাঁশি বাজাচ্ছে তখন বিকেলে সে ...টবাবুর পয়সায় পেট ভরে মদ খাবে। ...র হচ্ছিল সকাল হলে সে আর ...টবাবু সঙ্গে না হয় বড়-টিণ্ডালকেও নেওয়া যাবে তারপর মদ্যপান ল্যারে ল্যারে গান গলায় ওরা যে অন্য গ্রহে তাদের সব কিছু রেখে এসেছে তখন আর মনেই হবে না। ডেবিড আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। ছোটবাবু সহজে শুয়ে পড়তে পারল না। আলো নেভাতে ইচ্ছে হল না। পোর্টহোলে দাঁড়িয়ে থাকল।

ওপরেও এভাবে বনি দাঁড়িয়ে আছে। তারও ঘুম আসছিল না। ছোটবাবুর সঙ্গে এনাক্সন-কশপের কিছু একটা হয়েছে। এনাক্সন-কশপের কথা ছিল দু নম্বর হবার। কিন্তু সে হতে পারেনি। ওর রাগ স্বাভাবিকভাবে ছোটবাবুর ওপর থাকবে। ছোটবাবু এনাক্সন-কশপের সঙ্গে বাংলায় কথাবার্তা বলছিল। সে কিছুই বুঝতে পারেনি। ছোটবাবুকে সে বলেছিল কি হয়েছে! ছোটবাবু বলেছিল কিছু না। এই পর্যন্ত। তারপর সেও ছোটবাবুকে কেন জানি দ্বিতীয়বার আর কিছু বলতে সাহস পায়নি। ছোটবাবুর মুখ ভীষণ থমথম করছিল। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় যতটা ছোটবাবুর গোপন কষ্টকে সব সে বুঝতে পেরেছে ছোটবাবুর মাথায় আবার সেই ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে। বাবা তাকে ঠিকই বলেছিলেন, বনি ছোটবাবুর মাথায় কিছু হচ্ছে না তো! সেই যে ক্রোজ-নেস্ট থেকে পড়ে গেছিল ছোটবাবু, মাথায় চোট থেকে যাওয়া এবং পর পর সব দৃশ্য মনে হলে সে স্থির থাকতে পারে না। সে কিছুতেই আজ বলতে পারেনি ছোটবাবুর চোখ মুখ দেখে তুমি যতই অস্বীকার কর তোমার ছোটবাবু কিছু হচ্ছে না কিন্তু আমি বলছি মাথায় তোমার কিছু হচ্ছে। তুমি আমাকে সব গোপন করছ।

আর বনি আশ্চর্য হয়ে গেছে আগের মতো ছোটবাবু নেই। কেমন ক্রমে গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। আগের মতো সহজেই জেদ বজায় রাখতে পারে না বনি। অন্য সময় হলে সে কি করত জানে না কিন্তু আজ যখন 'কিছু না' বলে এড়িয়ে গেল তখন অপমানে দিনের পর দিন কথা না বলে থাকতে পারত। অথচ সে মনে মনে ভীষণ খুশী। ছোটবাবুকে তার সমীহ করতে ভাল লাগছে। ছোটবাবু তাকে সব বললেই বোধহয় খাটো হয়ে যেত।

ছোটবাবু তখন নিচে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারছে বনি ঘুমোয়নি। মাথার ওপর বনির কেবিন। হাঁটাহাঁটি করলে টের পাওয়া যায়। জাহাজ নোঙর ফেলে রাখলে এত বেশি নির্জনতা যে বনি কাঠের পাটাতনে নেমে কার্পেটের ওপর কিভাবে কোনদিকে হেঁটে যাচ্ছে তা পর্যন্ত ধরা যায়। বনি এইমাত্র পোর্ট-হোলে দাঁড়িয়েছিল, এখন হেঁটে সে তার বাংকে এসে বসেছে। আর কোন শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। বোধহয় বনি এবার শুয়ে পড়ল।

ছোটবাবু এভাবে পোর্টহোলে দাঁড়িয়ে দূরের শহর দেখছে। আর মক্ষমালার মতো ঝিকমিক করছে শহরের আলো। যেন হাজার জোনাকিপোকা আকাশের গায়ে স্থির হয়ে আছে। আর দূরে তেমনি সমুদ্রগর্জন। অবিরাম সমুদ্র দ্বীপটার চারপাশে ফুঁসছে। জ্যোৎস্নায় দ্বীপের উঁচু পাহাড় অথবা টিলাতে ঘরবাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে না। রাস্তার আলো ঘুরে ঘুরে ওঠে গেছে। আর কি বিস্ময় কখনও মিনারের মতো অথবা গম্বুজের মতো মনে হচ্ছে ছোট ছোট পাহাড়গুলোকে। আলোগুলো গম্বুজের গায়ে মীনাকরা মণি-মুক্তার মতো। এমন সব সুন্দর পৃথিবী ফেলে মানুষের চলে যেতে ইচ্ছে হয় কেন বুঝতে পারে না।

আবার মনে হল মাথার ওপর কাঠের পাটাতনে কেউ হাঁটছে। বনি তবে ঘুমোতে পারছে না। বনি আবার পোর্ট-হোলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ওর ইচ্ছে হচ্ছে এক্ষুনি ওপরে উঠে দরজায় দাঁড়িয়ে বলে বনি কী হচ্ছে! তোমার জন্য আমি ঘুমোতে পারব না! এভাবে দাপাদাপি করলে নিচে কারো ঘুম হয়!

আর তখনই মনে হল কোথায় যেন বনির ওপর সে অধিকার পেয়ে গেছে। বনি হয়তো নিজেই অধিকারটুকু অজান্তে তাকে দিয়ে দিয়েছে। অথবা বোধহয় এমনই হবার কথা। সে তো বনির পায়ের শব্দ প্রথম থেকেই মাথার ওপর শুনতে পেত। সে তো কখনও এভাবে ভাবেনি বরং বনির পায়ের শব্দ মাথার ওপর না হলে ওর যেন ঘুম আসত না। কাপ্তানের ছেলে সামান্য দাপাদাপি হুল্লোড় করবে না তো কে করবে! তার তখন মনেই হত না ওপরে কেউ হেঁটে বেড়াচ্ছে। তার ঘুম ঠিক চলে আসত। আর এখন সে শুনতে পাচ্ছে বনি খুটখাট করে কিছু কাটছে বনি তারপর খুব জোরে পোর্ট-হোলের কাচ ঠেলে দিচ্ছে এবং স্ক্রু এঁটে দিচ্ছে তার শব্দ পর্যন্ত কান পাতলে শোনা যাচ্ছে। বনি কি সারারাত ঘুমোবে না!

সে এবার দরজা খুলে ওপরে উঠে ডাকল বনি।

বনি দরজা খুলে বলল, কী।

—ঘুমোচ্ছ না কেন। কেবল খুটখাট শব্দ করছ।

বনির শরীরে রাতের পোশাক। বনি কী বলেই চোখ নামিয়ে নিয়েছে। আর যেন ছোটবাবু এক অধিকারের সাম্রাজ্য পেয়ে গেছে। এখানে সে খুশিমতো বিচরণ করবে। তার চোখে মুখে ভীষণ অহংকার। সে বলল ঘুমোচ্ছ না কেন?

—ঘুম আসছে না ছোটবাবু।

ছোটবাবু বলল তুমি না ঘুমালে আমার ঘুম আসবে না বনি। আমাকে তোমরা সবাই এত কষ্ট দাও কেন!

বনি বলল ঘুমোতে যাচ্ছি। বনি আর কিছু বলল না। বনি অধীরতায় ডুবে যাচ্ছে। সে কিছুতেই সোজাসুজি ছোটবাবুর দিকে তাকাতে পারল না। ছোটবাবু আজ সারাদিন তাকে ধমকের ওপর রেখেছে। অভিমানে তার কান্না পাচ্ছিল। সে দরজা বন্ধ করে দেবার সময় বলল

ছোটবাবু, আমি আর খুটখাট শব্দ করব না। আমি ঠিক এবার ঘুমিয়ে পড়ব।

ছোটবাবু নিচে এসে আর ওপরে কোন শব্দ শুনতে পেল না। ওপারের কেবিনটা নিথর। এতটা নিথর যেন ভয়ের। কেবল এখন কেন জানি মনে হচ্ছিল, বেশ তো ছিল বনি। যেন সে এবং বনি পৃথিবীতে শুধু জেগেছিল। বনি ঘুমিয়ে পড়েছে, কি চুপচাপ শুয়ে পড়েছে, পাশ ফিরছে না, শ্বাস জোরে ফেলছে না—পাছে তার ঘুমে ব্যাঘাত ঘটে বুঝতে পারছে না। এতটা সে না করলেই পারত। ওপারে উঠে ওকে ভর্ৎসনা না করলেও চলত। ভর্ৎসনা শব্দটিই মনে আসছিল ঘুরে ফিরে।

এই জাহাজ, বনি, পাশে দ্বীপ-মালা, এবং আরও ওপরে আছেন স্যালি হিগিনস, তিনি কি করছেন। আর্চি কি করছে। কারা যেন ওর এলি-ওয়ে ধরে ছুটে গেল। এবং ডানপাশের এলি-ওয়েতে কয়েকজন মানুষ একসঙ্গে সন্তর্পণে হেঁটে গেলে যেমন একটা রহস্য থেকে যায় তেমনি রহস্য। আর্চি কি জেগে রয়েছে। অথবা জাহাজের কোনো অন্ধকারে সবাইকে নিয়ে সলাপরামর্শ করছে। ওর কিছুতেই ঘুম আসছিল না। একবার সে দরজা খুলে ডেক ফল্কা সব ঘুরেও দেখে এল। কেউ জেগে নেই। গ্যাংওয়েতে কোয়ার্টার-মাস্টার ঝিমুচ্ছে। গভীর রাতে সে একা আবার ফিরে এল কেবিনে। দরজা বন্ধ করে ফের শুয়ে পড়ল।

খুব ভোরে জাহাজে সোরগোল উঠে গেল। ছোটবাবু দরজা খুলেই শুনল, বড়-টিন্ডালের লাশ পাওয়া গেছে।

•

ছোটবাবু যেন কথাটা ভীষণ নতুন শুনছে। তা হলে সকালে পাড়ে দাঁড়িয়ে মৈত্রদা পাতার বাঁশি বাজাচ্ছে না। সে কেমন বিহ্বলপ্রায় দাঁড়িয়েছিল। এক পা নড়তে পারল না। মনে হয় ওর কিছু আর করণীয় নেই। কোথায় কে কিভাবে বসন্তনিবাসের মৃতদেহ আবিষ্কার করেছে তার জানার যেন কোন আগ্রহ নেই। কেবিনের দরজায় চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। ওর সামনে দিয়ে হেঁটে গেল বাটলার মেস-রুম-বয় থার্ড অফিসার। ওরা সবাই ডেকে ছুটে যাচ্ছে। সে যাচ্ছে না। সে পোর্ট-হোলে গিয়ে পর্যন্ত দাঁড়াচ্ছে না। সে যেন এখন চুপচাপ হাত মুখ ধুয়ে এক কাপ চা খাবে, কাজের পোশাক পরে তেলের টিন বাকেট নিয়ে যেমন রোজ টুইনডেকে চলে যায় তেমনি যাবার কথা। বড়-টিন্ডাল কে সে তাকে চেনে না। চোখ মুখ দেখলে বিশ্বাসই হবে না, বড়-টিন্ডাল বলে কাউকে চিনত।

ডেভিড এসে দেখল, ছোটবাবু চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। ডেভিডকে দেখে একটা কথা বলছে না।

এনজিন-সারেঙ ছুটে এসেছেন।—ছোট তুই যাবি না?

—কোথায়!

—বড়-টিন্ডালের লাশ পাওয়া গেছে।

ছোটবাবু বলল, তোমরা যাও, আমি যাব না।

ডেভিড এবং রেডিও-অফিসার যাবে। স্যালি হিগিনস, বনি গ্যাঙওয়েতে চলে গেছে। মোটর-বোট সিঁড়ির কাছাকাছি অপেক্ষা করছে।

সারেঙ বললেন, তুই না হলে হবে কেন?

—আমার কি দরকার। আপনারা যান।

—কি বলছিস ছোট! ওর কাজ কামে কি দরকার হবে আমরা কি করে জানব।

—আমি তো কিছু জানি না কি কি করতে হবে।

ডেভিড এবার যেন ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে। —ছোটবাবু, সবাই তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। স্যালি হিগিনস, আর্চি চিফ-মেট সবাই। ছোটবাবু তবু কথা বলছে না। সে ভেতরে ঢুকে গেল। তারপর ছোটবাবু পোশাক পাল্টে বের হয়ে এল। সারারাত সে ঘুমোয় নি বলে চোখ ফোলা। সে বাইরে এসে দেখল নিচে বোটে সবাই উঠে গেছে। ওর জন্য বোট ছাড়ছে না। ওকে ধরেবেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

সে বোটে উঠে গেল। সে সমুদ্রের দিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। ওকে কেউ দেখুক সে যেন চায় না। দূরে সেই বেলাভূমিতে একেবারে শহর ভেঙে সব লোক নেমে এসেছে। সেই বিচিত্র মানুষটি জোয়ারের জলে ভেসে গেছিল, আবার সমুদ্র তাকে ঠেলে দিয়ে গেছে কিনারায় এবং শহরের সর্বত্র তখন একই খবর, জাহাজের সেই বিচিত্র মানুষ বসন্তনিবাস মারা গেছে। তখন সকালের রেডিওতে আবহবার্তা, তখন রেডিওতে এ-ছোট্ট খবরটাও ছিল, বেলাভূমিতে একজন বিদেশী মানুষের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। জাহাজ সিটি-অব-ব্যাংকের নাবিক। মানুষজন ছুটছে সেই বিদেশী মানুষের মৃতদেহ দেখতে।

ওরাও সবাই সেই পাহাড় ছাদের নিচে চলে এসেছে। কে বলবে গতকাল রাতে দশটায় জল ছিল এখানে তাদের সমান। এখন বেলাভূমি শুকনো, সারা শংখ, ঝিনুক সংগ্রহ করতে এসেছিল, তারা দেখছে, একজন মানুষ উপুড় হয়ে পড়ে আছে। একটা বড় মাপের জনি-ওয়াকারের বোতল পাশে। সন্তানকে আদর করার মতো বুকের কাছে জড়িয়ে রেখেছে। এই সব মানুষেরা ছুটে ছুটে খবর দিয়েছে সব শহরবাসীদের, সেই লোকটা, বিকালে সে লোকটা মেলায় ঘুরে বেড়িয়েছিল বেলুন ইত্যাদি-ছিল বাতাসে, লজেন্স, চকোলেট সব শিশুদের বিতরণ করেছিল—সে সাধারণ পাজামা দাড়ি সাজিয়ে চলেছিল কি সমস্ত নিবাস সেলর—মারা গেছে। সমুদ্রের জলে ডুবে মারা গেছে।

সবাই মিলে পথ করে দিলে ওরা ভিতরের দিকে গেল। ছোটবাবু বাচ্চা ছেলের মতো পাশে বসে পড়েছে। পাস আদর করার মতো মুখ [illegible] পাশ দিয়ে দেখছে। সে যা কাঁদছে কাউকে [illegible] দিচ্ছে না।

স্যালি হিগিনস [illegible] মাথার দিকে দাঁড়িয়ে আছেন। [illegible] দেখছেন। [illegible] বললেন, তুমি আমার ভারি বদনাম করলে হে ছোকরা।

তিনি চিফ-মেটকে বললেন, চিফ জলদি বোট আনো। বোটে করে ওকে জাহাজে নিয়ে যেতে হবে। অনেক কাজ। আপনারা এখান থেকে সরে যান মা-মাসিরা। এই যে ছেলে-ছোকরারা তোমরা যাও বাপু। এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের লোকেরা ভিড়টা সরিয়ে দিচ্ছে। স্যালি হিগিনস বললেন আমি আপনাদের বড়কর্তার সঙ্গে একটু কথা বলব। বলে পুলিশের কাছ থেকে ঠিকানা নিলেন। তারপর ডাকলেন ছোটবাবু তুমি আবার ঝুঁকে বসে আছো কেন? ওঠো ওঠো।

হঠাৎ স্যালি হিগিনস ভীষণ চটপটে এবং ব্যবহারে ভীষণ যাদুকরের মতো মুখ, একজন জাহাজি এভাবে বেলাভূমিতে শুয়ে আছে, তিনি যেন লাঠি উঁচিয়ে বলবেন। এক দুই তিন ওঠো। জাহাজে চলো। তারপরই বড়-টিন্ডাল উঠে দাঁড়াবে। জাহাজের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করবে। এমনই মনে হচ্ছিল স্যালি হিগিনসকে দেখে।

—এই ছোটবাবু এখনও তুমি বসে আছ। ওঠো। ওকে তুলে নাও। দেখছ না লেগে সব ভিজে যাচ্ছে আমাদের।

সকালের সমুদ্র তেমনি শান্ত এবং প্রবাহমান। ছোট ছোট ঢেউ এসে ওদের সবার জুতো মোজা ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। [illegible] পাহাড়ের মতো বড়-টিন্ডাল শুয়ে আছে। ছোট ছোট ঢেউ এসে জল ওর চারপাশে জমিয়ে যাচ্ছে। ছোটবাবু এবার দু হাতে পাঁজাকোলে তুলে বলল, কোথায় নিয়ে যেতে হবে স্যার?

—ওপরে তুলে নিয়ে যাবে। জলে ভিজে তো নোংরা হয়ে যাচ্ছে।

মৈত্রদা ভীষণ ভারি। এমন জবরদস্ত মানুষটাকে সে সহজেই কাঁধে ফেলে নিতে পেরেছিল। পরপর পাঁজাকোলে তারপর কাঁধে ফেলে নিল [illegible] কাজে তড়-তড় করে। এবং প্রায় [illegible] ছোটবাবু দেখল সবাই ওকে [illegible] দেখছে। এত বড় মানুষটাকে [illegible] কাঁধে ফেলে নিল [illegible] ছোটবাবু। [illegible] আর্চির গলা [illegible] সে বলল, স্যার আমরা জাহাজে ফিরে যাচ্ছি।

স্যালি হিগিনস বললেন না।

আর্চি বোধ হয় অসম্মানে ফেটে পড়েছিল। সে দাঁড়িয়ে গেল। —বোট [illegible]। স্যালি হিগিনস [illegible] ছোটবাবু [illegible] কাঁধে [illegible] [illegible] বললেন না [illegible] [illegible] বোট আসছে কিনা। —সারেঙ এনজিন-সারেঙ।

এনজিন-সারেঙ ছুটে এলেন। —তুমি কি বলছ?

এনজিন সারেঙ বললেন [illegible] তো আজ [illegible] ওরা স্যার লাশ জমা দেবে না।

—তা হলে কি কি করতে হবে ঠিকঠাক করে ফেল। আমরা দেরি করব না।

স্যালি হিগিনস দেখলেন, ছোটবাবু লাশ কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবার চেয়ে

ছোটবাবু বলল, ভীষণ এক মানুষ, আগুন ভয়ের অসুখ সামান্য। সব ঠিক হয়ে যাবে। দাঁড়িয়ে থাকতে দাও।—এই যে ডেক-সারেঙ আসছে। ডেক-সারেঙ সাফিয়ে সাফিয়ে কাছে চলে গেল। বলল, আদাব স্যার।

স্যালি হিগিনস বললেন, আদাব। বড়-টিণ্ডাল কেন মরল বলত?

—জানি না স্যার।

—তুমি ডেক-টিণ্ডাল?

—জানি না স্যার!

—তুমি তুমি!

বনি বলল, ছোটবাবু কতক্ষণ লাশ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। ওকে নামাও।

স্যালি হিগিনস ডাকলেন, বনি দ্যাখো তো বোট আসছে কিনা!

আর্চি বলল, ঐ যে আসছে স্যার। আসছে। সে আর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। বোটের কাছে ছুটে গেল। স্যালি হিগিনস সামান্য হাসলেন। বললেন, ছোটবাবু এবার ওকে নামাও।

ছোটবাবু বলল, নামিয়ে কি হবে? বরং স্যার বোটে তুলে দি।

বোট কিছুটা দূরে। ডেভিড বলল, ছোটবাবু ওকে নিচে রাখ। আমরা লাশ ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছি।

ছোটবাবু কিছু বলল না। এগিয়ে যেতে থাকল। বোটে সে একেবারে মৈত্রদাকে শুইয়ে দেবে। বোধহয় ছোটবাবুর ভীষণ ঘাম হচ্ছিল, এবং এত ভারি ওজনের মানুষটাকে কাঁধে ধরে রাখা যাচ্ছে না। এক হাতে দু পা, কাঁধে শরীর এবং ডান হাতে আর একটা হাত, আহত কোন সৈনিকের মতো ছোটবাবু তার মৈত্রদাকে নিয়ে যাচ্ছে। বোধ হয় সে মৈত্রকে কোনো মৃত মানুষের মতো ভাবতে পারছে না। ফলে মরা মানুষেরা কখনও কখনও বেঁচে ওঠে—হয়তো বোটে নিয়ে যেতে যেতে মৈত্রদা ফিক করে হাসবে, কিরে ছেলে না মেয়ে? এমন যখন হতে পারে তখন তাকে একজন আহত সৈনিকের মতো সে নিয়ে চলল। বেঁচে গেলে যেন বলতে না পারে, দেখ বাপ তোরা তো আমাকে মেরেই ফেলেছিলি। এবং এভাবে ছোটবাবু মৈত্রকে শুইয়ে দেবার সময় বোটের চারপাশে সবাই জড় হতে থাকল। একটা মাত্র বোট ঠিক থাকল বাকি সবাই হেঁটে যাবে জাহাজে। বোটে ছোটবাবু ডেভিড বংকু ... বনি উঠতে চেয়েছিল ছোটবাবু বলল নো। তুমি হেঁটে যাও।

আর এখন ওই যে একজন সমুদ্র-মানুষের শেষ কাজ, শেষ কাজ বলতে ওরা মানুষকে দূরে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে আসতে পারে—একজন সমুদ্র-মানুষের সমাধি এভাবে হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বংকু অনিমেষ নির্ভীক নাগরিকের মতো চোখ মুখ করে রেখেছে। বহুদিন পর মনে হয়েছে ওরা জাতিতে হিন্দু, ওদের ধর্মে নানারকম সব অনুশাসন আছে, তীরের কাছাকাছি কোথাও একটা দাহ করার জায়গা খুঁজে বের করতে হবে। ওরা ছোটবাবুকে বলল, ছোটবাবু তুমি কিন্তু কিছুতেই রাজি হবে না।

বনি আবার বলল ছোটবাবু আমাকে নাও। আমি যাব।

ছোটবাবু বলল, উঠে এস। বলেই ওরা বোট ছেড়ে দিল। ওদের অনেকটা পথ ঘুরে যেতে হবে, ছোটখাটো সব দ্বীপমালা ভেসে রয়েছে। জাহাজটা আছে সামনে মনে হয় কাছাকাছি কিন্তু এই সব দ্বীপমালা চার-পাশে। অনেক ঘুরে ঘুরে যেতে হবে। মোটর বোটে ওরা ভেসে যাবার সময় দেখল মৈত্রদা নিরীহ স্বভাবের মানুষ, ঘুমিয়ে আছে মতো। শরীর এখনও শক্ত হয়নি। দুটো একটা প্লাস্টিকের খেলনা জামায়, ছোট পুঁতির মালা। পকেটে হাত দিয়ে দেখল ছোটবাবু সামান্য কটা চকোলেট। এবং জামাটা ওপরে উঠে গেলে ছোটবাবু অবাক পেটে পিঠে অদ্ভুত সব নীল চাকা চাকা দাগ। সামান্য দুর্গন্ধ। জামা ওঠে এলে সবাই কেমন চোখ মুখ কুচকে দেখল শরীরে মানুষটার কিছু ছিল না। এনজিন সারেঙ বললেন ছোট সর্বনাশ তুই ঘটাচ্ছিস। তোর রক্ষা থাকবে না।

ছোটবাবু জেদি বালকের মতো ভারি নরম হাতে জামা টেনে দেখল। বনি আছে নয়তো সে প্যান্ট খুলে দেখত কোথায় কোথায় মানুষটা শরীরে এমন বিচিত্র অসুখ নিয়ে বেঁচেছিল। বনি আছে বলে সে ফের জামা টেনে বলল, বংকু কাঠ পাবি কোথায়?

বংকু বলল ছোটবাবু তুমি কিন্তু আমাদের কথার বাইরে যাবে না। গেলে হাতাহাতি হবে।

অনিমেষ বলল, আমরা মৈত্রকে আগুনে পোড়াব। মাটির নিচে কিছুতেই চাপা দেব না। ধর্মাধর্মের ব্যাপারটা তুমি অবহেলা করবে না।

ডেভিড বলল বড় টিণ্ডালের এত বড় অসুখ ছোটবাবু তুমি জানতে না,

ছোট কি বলবে! সে বলল, না। সে সোজাসুজি মিথ্যা কথা বলল।

—তোমরা ছোটবাবু মরবে।

ছোটবাবু বলল, ডেভিড আমার কিছু করার ছিল না।

এবং ভীষণ চিন্তিত দেখাল ডেভিডকে। ডেভিড বলল লোকটা ঘায়ের জ্বালায় পাগল হয়ে গেল। আর তোমরা চুপচাপ দেখে গেলে!

ছোটবাবু ভারি লজ্জায় পড়ে গেছে মতো মাথা নিচু করে রেখেছে।

এখন বনি বলল, ডেভিড বড়-টিণ্ডালের শরীরে ওসব কি!

ছোটবাবু সহসা চিৎকার করে উঠল বনি!

এবার ছোটবাবু ডেভিডের দিকে না তাকিয়েই বলল, ডেভিড এসব কথা আর কেউ যেন না জানে। মৈত্রদার ইচ্ছে নয় যে, কেউ জানুক। আমরা কখনই না হয় জানলাম মৈত্রদা একটা খারাপ অসুখে মরে গেল। আর তখনই ছোটবাবুর মুখটা ভারি বিষন্ন হয়ে যায়। যেন মনে হয় ওর উচিত ছিল ডেভিডকে সব খুলে বলা। মৈত্রদার ভয়ে সে এটা করেনি। মৈত্রদা তা হলে হয়ত বেঁচে যেত। সে বলল, ডেভিড আমি জানতাম। মৈত্রদার ভয়ে বলিনি। এখন মনে হচ্ছে আমি সত্যি মানুষটাকে মেরে ফেললাম। বুঝতে পারছি আমার আরও সাহসী হওয়া দরকার।

ডেভিড বলল, ছোটবাবু জাহাজে মানুষ এভাবেই বাঁচে। তোমার দুঃখ করার কিছু নেই। নসিবে আছে মরবে—তুমি কিছু করতে পার না।

বংকু তখন আবার বলছে, ছোটবাবু আমরা কিন্তু মৈত্রকে পোড়াব।

ছোটবাবু বলল, পোড়াবি তো পোড়াবি। বার বার বলার কি আছে!

—তুমি যা ... । ভালো মানুষের মতো রাজি হয়ে ... আমাদের কথা কেউ তখন শুনবে না

ওরা ছজন মানুষ মাঝখানে লম্বা হয়ে পড়ে আছে নগ্ন ... মিবাস। আকাশ ভীষণ মেঘলা। সমুদ্রের জল তেমন নীল নয় আর। কেমন ঘোলা দেখাচ্ছে। ওরা দুটো-একটা দ্বীপের পাশ দিয়ে জাহাজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বোটের মানুষটার কাছে আশ্চর্য লাগছে, কোথাকার মানুষ কোথায় এসে মরে গেল। লোকটার স্ত্রী, ছেলেমেয়েরা কোথায় থাকে জানার খুব ইচ্ছে। সেও দুটো একটা কথা বলছে।

দু এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল এ-সময়। ওদের বোট এখন জাহাজের নিচে ভিড়ে গেছে। সিঁড়ির কাছে বোট বেঁধে ছোটবাবু ও বংকু ওপরে উঠে গেল। কিভাবে কি হবে ওরা কেউ এখনও জানে না। জাহাজে মাল খোলাই হবার কথা সকাল থেকে। কিন্তু সকালে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেলে সব বন্ধ হয়ে গেল। জাহাজে মাল খোলাই হবে না। একজন মৃত জাহাজীর সম্মানে সব কাজ-কর্ম বন্ধ। ছোটবাবু ডেভিড এনজিন-সারেঙ হেঁটে যাচ্ছিল। অন্য সব জাহাজিরা এখন সবাই রেলিঙে ঝুঁকে আছে। বড়-টিণ্ডালের লাশ দেখছে। ভীষণ হতাশা মুখে এবং আর্চি তেমনি জাহাজিদের পাশে পাশে হেঁটে যাচ্ছে। মুখে সে চুরুট রেখে, জাহাজের মাস্তুলে নানাবিধ দুর্ঘটনার ছবি প্রত্যক্ষ করছে। সেও বেশ ঝুঁকে দেখছে।

তখন স্যালি হিগিনস ব্রীজ থেকে হাঁকলেন কোয়ার্টার মাস্টার।

কোয়ার্টার মাস্টার এলে বললেন, ছোট-বাবুকে ডাকো।

ছোটবাবু প্রায় দৌড়ে ওপরে উঠে গেলে হিগিনস বললেন, দাহ করা যাবে না। স্থানীয় মানুষে আপত্তি করছে।

ছোটবাবু বলল, কেন স্যার?

—ভারি বীভৎস ব্যাপার বলছে। ফোনে কথাবার্তা বললাম, কিছু করা গেল না। শহরের মেয়র রাজি হচ্ছে না। গণ্ডগোল বেঁধে যেতে পারে।

সে বলল, যদি দূরে এই ধরুন দশ-বারো মাইল দূরে কোনো ছোট দ্বীপে নিয়ে যাই।

—দেখি তবে।

তিনি ফোন করে ফের সব খবরাখবর নিলেন। বললেন, হবে। তাহলে তোমরা বোট নিয়ে ভেসে পড়।

দুটো বোট ভাড়া করেছে চিফ-মেট। এখন কে কে যাবে? স্যালি হিগিনস বললেন, ছোটবাবুকে জিজ্ঞাসা কর কে কে যাবে?

কাছে কোথাও ছোটবাবু ছিল না। সে তখন জাহাজের পাশে ছোট্ট বোটটাতে নেমে গেছে। তীরে সব মানুষজনের জটলা। সূর্য ক্রমে সমুদ্র থেকে ওপরে উঠে আসছে। দলে দলে সব সাদা রঙের পাখি জাহাজটার মাথায় উড়ছিল। ছোটবাবু বড়-টিণ্ডালের জামা প্যান্ট খুলে ফেলছে। বনি উঁকি দিলেই ঢাকছে। এই তোমার এখানে কি! যাও ভেতরে যাও। বনি মুখ ব্যাজার করে [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] ভাবছে—আর যাবে না। সারাক্ষণ ধমকের ওপর রাখছে কার [illegible] ঠিক থাকে।

এনজিন-সারেঙ অবাক, জ্যাক ছোটবাবুকে কবে থেকে এত মান্য করতে শিখল। তিনি একেবারে হাঁ। সব দেখে-শুনে এখন ইচ্ছে হচ্ছে তাকেও ছোটবাবু কিছু বলুক। কিছু এই যেমন সামান্য চন্দন কাঠ কোথায় পাওয়া যাবে। সামান্য ঘি ষ্টোর রুমে পাওয়া যাচ্ছে—কাঠের জন্য বঙ্কু আর ডেভিড চলে গেছে। ছোটবাবু তাকেও পাঠালে পারত। জব্বর মন্দ, বাদশা মিঞা চুপচাপ বড়-টিণ্ডালের পাশে বসে রয়েছে। এবং যা হয়ে থাকে সবাই নিজের নিজের সুখ দুঃখ অর্থাৎ এই মৃত্যু মানুষের কোন দূরবর্তী আকাঙ্ক্ষার মতো মৃত্যু তাদের যেন অনেক বড় করে দিয়েছে। কিন্তু তেই ওরা আর ছোট কাজ করতে পারবে না একজন জাহাজি মানুষ নানা কারণে পৃথিবীর অন্য সব মানুষের চেয়ে আলাদা। মৃত্যুতে তার অহংকার আছে বড়-টিণ্ডালের মুখ দেখে ওরা এমন ভাবছিল।

বোট ছাড়ার সময় হয়ে যাচ্ছে। যারা যারা যাবে হাত তুলে ছোটবাবু ইশারায় ডাকছে। যেমন যাচ্ছে ছোট-টিণ্ডাল এনজিন-সারেঙ, বড়-টিণ্ডালের ওয়াচের তিনজন ফায়ারম্যান, দুজন কোলবয়, স্যালি হিগিনস নিজে। ডেভিড বঙ্কু অনিমেষ। বনি লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে। বেচারার মতো জাহাজের ওপরে দাঁড়িয়ে হাঁকছে ছোটবাবু আমি যাব। ছোটবাবুর তাকাবার পর্যন্ত সময় নেই। হাত তুলে সে ইশারায় না করেছে। স্যালি হিগিনস নেমে আসার সময় দেখতে পেলেন বনি কেবিনের দিকে ব্যাজার মুখে ফিরে যাচ্ছে। তিনি বললেন, বনি যাবে? [illegible]।

বনি বলল। না বাবা আমি যাব না।

বনি বোধ হয় মানুষের এই নিষ্ঠুর পরিণতি দেখতে সাহস পাচ্ছে না।

আর একটা বোট নিয়ে ফিরছে বঙ্কু ও ডেভিড। ওরা কাঠ মেটে হাঁড়ি এবং নতুন সাদা কাপড় এনেছে। এবং বাঁশ লম্বা মতো দুটো কিছু শুকনো ডাল আর সব চন্দন কাঠ। পাট কাঠি পাওয়া যাচ্ছে না তার চেয়ে নরম ঘাসের কাণ্ড যা পাট কাঠির মতো জ্বলবে। তারপর দুটো বোট সমুদ্রে ক্রমে একটা দ্বীপ খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে বেশ পাঁচ-ছ মাইলের মাথায় একটা আশ্চর্য নীল রঙের পাথরের দ্বীপ পেয়ে গেল। দূর থেকে দ্বীপ বলে চেনা যায় না। সমুদ্র যেন সহসা ঢেউ তুলে স্থির হয়ে গেছে। ঢেউটা আর নড়ছে না। উঁচু নিচু সব ঢেউ আর তার উপত্যকা। ওরা কাছে গেলে বুঝতে পারল বেশ ছোট্ট দ্বীপটা। ফার্লং-এর মতো দ্বীপটা পাশে লম্বায় এবং উচ্চতায় সমান। ওরা চারজন ডেভিড বঙ্কু সামনে অনিমেষ ছোটবাবু পেছনে উঠে যেতে থাকল।

মাচানের ওপর শুয়ে আছে বড়-টিণ্ডাল। পেছনে আসছে সবাই মাথায় করে তুলে আনছে কাঠ বাঁশ। এবং স্যালি হিগিনসের হাতে চন্দনের কাঠ। সারেঙের হাতে ঘি-এর টিন। সব দেখে উঁচু একটা জায়গা দেখে ওরা উঠে যাচ্ছে। চারপাশে শুধু সমুদ্র আর তার তরঙ্গমালা নীল পাহাড়ের মাথায় সেই এক অগ্নিকাণ্ডের আয়োজন। ডেভিড এবং স্যালি হিগিনস দূরে দাঁড়িয়ে [illegible] কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন। মানুষের শরীর আগুনে পুড়ে যায়—জীবনেও ওঁরা দেখেন নি। কেমন ভয়ে কৌতূহলে ওঁরা সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে দেখছেন।

ছোটবাবু সমুদ্র থেকে হাঁড়িতে জল তুলে আনছে। জলে স্নান করানো হচ্ছে বড়-টিণ্ডালকে। বড় একটা পাথরের ওপর বসন্ত-নিবাস শুয়ে আছে ঘড়া ঘড়া জল ঢালা হচ্ছে। একে একে সবাই জল এনে ওর শরীরে ঢেলে দিল। তারপর সাদা নতুন কাপড় এবং কাঠ সাজিয়ে রাখা হচ্ছে সূর্য ঠিক তখন সমুদ্রে অস্ত যাবার মুখে। ছোটবাবু মৈত্রদার মুখে আগুন দেবার সময় বলল, বঙ্কু তোরা হরিবোল দিলি না! সবই যখন হল এটা বাদ যাবে কেন?

এবং এই এক শব্দ পাহাড়ের মাথায় আর সেই দিগন্তে এখন সমুদ্র জয় করে অথবা আকাশ বাতাস জয় করে ছুটে যাচ্ছে। ওরা সাতবার চিতা প্রদক্ষিণ করল। ছোটবাবুর সেই ঠাকুর্দার চিতায় দহন এবং পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া কি যে ভয় ছিল তখন এখন সে সাহসী মানুষের মতো অথবা বলা যায় অভিভাবকের মতো কাঠের নিচে আগুন দিয়ে পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকল। আগুন ক্রমে প্রবল হয়ে উঠছে। কাঠের ফাঁকে ফাঁকে আগুন ক্রমে আকাশ ছুঁয়ে দিতে চাইছে।

আর আগুনের ভেতর ছোটবাবু সহসা কেন যে বনির মুখ দেখে ফেলল। জাহাজে বনি একা। স্যার হিগিনস পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে মানুষের সৎকার দেখছেন। কোনো হুঁশ ছিল না তার। ছোটবাবু পাশে দাঁড়িয়ে ডাকল স্যার।

—কিছু আমাকে বলবে?

—অনেক রাত হবে। আপনি বরং স্যার ফিরে যান একটা বোটে। সে ডাকল চাচা। সারেঙ পাহাড়ের মাথায় উঠে [illegible] [illegible] আপনারা ফিরে যান। আমরা [illegible] [illegible] হয়ে গেলে ফিরব। আমাদের একটা বোট হলেই চলবে।

হিগিনস জাহাজে এবার মুখে দেখালেন বনি [illegible] [illegible] দাঁড়িয়ে [illegible]। [illegible] [illegible] সাদা জ্যোৎস্না সমুদ্রে। বোট থেকে বনিকে আবছা দেখা যাচ্ছে। বনির কাছে গিয়ে বললেন, ওদের ফিরতে রাত হবে বনি।

—ওরা কতদূর গেছে?

তিনি এবার দূরে অন্ধকার জ্যোৎস্নায় দেখালেন নক্ষত্রের মতো সমুদ্রের বুকে আগুনটা জ্বলছে। —ঐ যে [illegible] দেখতে পাচ্ছ না যাকে মনে একটা [illegible] নক্ষত্রের মতো আগুন আকাশে [illegible] [illegible] দপ দপ জ্বলছে আবার নিভে [illegible] দেখতে পাচ্ছ।

—হ্যাঁ বাবা।

—ওখানে ওরা একটা দ্বীপে [illegible] টিণ্ডালকে আগুনে পুড়িয়ে দিচ্ছে। [illegible] এবার বললেন, ভয় করলে [illegible] [illegible] বসতে পার।

এবং তখনই হঠাৎ ওপরে কোয়ার্টার মাস্টারের গলা। স্যার ফোন। সে [illegible] বলতে নেমে আসছে। ওপরে উঠে [illegible] বললেন, ইয়েস ক্যাপ্টেন স্যালি হিগিনস বলুন। তারপর চুপচাপ। আবার বললেন ইয়েস ইয়েস। কিন্তু এটা কেন হচ্ছে। বনি দেখল বাবার মুখ ক্রমশ মুচড়ে যাচ্ছে।

ফোনে তিনি চিৎকার করে উঠলেন হোয়াট।

—স্যার রিচার্ড কেলের এমনি নির্দেশ আছে।

—নো নো। আমি পারব না। বলতে বলতে উত্তেজনায় তিনি থরথর করে কাঁপছেন। তারপর কেমন স্তিমিত গলায় বললেন, আসবেন। নিশ্চয়ই আসবেন। তারপর বসে পড়লেন। কেমন রক্তশূন্য হয়ে গেছেন সহসা। সাদা ফ্যাকাশে মুখ। বনির দিকে তাকিয়ে আছেন। আর চোখ নামাচ্ছেন না। বনি সাহস [illegible] ভাউমাউ করে কেঁদে উঠল বাবা কি হয়েছে! বাবা। বাবা!

স্যালি হিগিনস ভীষণ নিথর। উনি যেন জীবনে আর একটা কথাও বলবেন না।

(ক্রমশ)

ভারতের ডাকটিকিট

বিশ্বের মানচিত্রে পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারতের স্থান অতি সুচিহ্নিত। স্বাধীনতা লাভ করার পরবর্তী অধ্যায়ে ভারত বেশির ভাগ রাষ্ট্রের কাছ থেকে মর্যাদা ও বন্ধুত্ব লাভ করেছে। সেইজন্যে বিদেশে ভারতের অন্যান্য চারু ও কারু-শিল্পের মত ভারতীয় ডাকটিকিটের কদরও বেড়ে গিয়েছে এবং স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে যেসব ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছে সেগুলির অধিকাংশই অন্যান্য দেশের সংগ্রাহকদের মনোহরণ করেছে।

১৯৭৩ সাল অবধি স্বাধীন ভারতে প্রায় চারশো ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে দেশের সুসন্তানদের সম্মানে এবং স্মরণীয় ঘটনাকে কেন্দ্র করে টিকিট মুদ্রিত হয়েছে। এছাড়া বিশ্বের কয়েকজন মনীষী ও কয়েকটি বিশেষ ঘটনা আশ্রয় করেছে বেশ কিছু ডাকটিকিট। তার পূর্ণ তালিকা দীর্ঘতর করে তুলবে বর্তমান নিবন্ধ।

ভারতের জননেতা সাহিত্যিক দেশপ্রেমী শিল্পী বিজ্ঞানীদের মধ্যে রয়েছেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, বিবেকানন্দ, এ্যানি বেশান্ত, সুভাষচন্দ্র, আশুতোষ, অরবিন্দ, জহরলাল, চিত্তরঞ্জন, অবনীন্দ্রনাথ, আবুল-কালাম আজাদ, রবি বর্মা, সেন্ট টমাস, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, সি ভি রমণ, শিবাজী, রামকৃষ্ণ, ভাতখণ্ডে, পালুসকর প্রভৃতি। স্মরণীয় ঘটনাগুচ্ছের তালিকাও বিস্তৃত। এদের মধ্যে এভারেস্ট বিজয়, সিপাহী বিদ্রোহ, হকি বিজয়ী, সাধারণ নির্বাচন, ভারত-ছাড় আন্দোলন, গণ-বিপ্লব, জালিয়ানওয়ালাবাগ, বিশ্ব শ্রমিক সংস্থা, বুদ্ধ জয়ন্তী, জন-গণনা, স্বাধীনতার স্বর্ণ জয়ন্তী, শহীদ তর্পণ, জয় বাংলা, ডাক-টিকিট প্রদর্শনী ইত্যাদি অন্যতম।

বিশ্বের বরেণ্যদের মধ্যে আছেন ম্যাডাম কুরি, লিঙ্কন, লেনিন, গোর্কী, রেডক্রশের হেনরী ডুন্যান্ট, ডাঃ মন্টেসরী, বিটোভেন, ডাক ব্যবস্থার অন্যতম পথিকৃৎ সাইরাস, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, কোপারনিকাস প্রভৃতি। বিশ্ব

ঘটনাকে সূচিত করে যে কয়টি ডাকটিকিট প্রচারিত হয়েছে তার মধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস, মানব অধিকার আন্তর্জাতীয় দূরে সংবাদ সংঘ শতাব্দী, বিশ্ব সহযোগিতা বৎসর, বিশ্ব পর্যটন, চাঁদে পদার্পণ, বিশ্ব ডাক সংঘের নূতন কার্যালয় সংযুক্ত রাষ্ট্র-সংঘের পঁচিশ বর্ষপূর্তি ইত্যাদি।

বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ডঃ ডি কে কার্ভে ও খ্যাতনামা রাষ্ট্রবিদ ডাঃ এম বিশ্বেশ্বরাইয়ার জীবিতকালে তাঁদের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ভারতে ডাকটিকিট মুদ্রিত হয়েছিল। বোধহয় পৃথিবীর ডাকটিকিটের ইতিহাসে এর দ্বিতীয় নজীর নেই। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চ আদালতগুলির শতবর্ষপূর্তিতে যেসব ডাকটিকিট এঁদের স্মরণার্থে প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে অন্ততঃ এটুকু আত্মশ্লাঘা অনুভব করা চলে যে শিক্ষা ও আইনের ক্ষেত্রে আমরা অন্যান্য অগ্রসর দেশ থেকে পিছিয়ে নেই। দুরন্ত শিকারীদের হাতে পড়ে, ভারতের বন্য-জন্তুরা ক্রমশঃ বিলুপ্তির পথে চলেছে। এ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে নানা রকম আইনের নিষেধাজ্ঞা ছাড়াও, বন্য-জীবন সপ্তাহ পালন করে এই সব বন্যপশুদের সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা চলেছে, তা থেকে ডাক বিভাগও পিছিয়ে নেই। ভারতের বাঘ, হাতী সিংহ, গণ্ডার প্রভৃতির রঙীন ডাকটিকিট প্রচারিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। ভারতীয় পক্ষীকুলও অবহেলিত নয় ভারতের ডাক-টিকিটে। নীলকণ্ঠ, কাঠঠোকরা ইত্যাদির বহুবর্ণ টিকিট চালু হয়েছে বেশ কিছুদিন আগেই। ভারতীয় চিত্রশিল্পের যে প্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে, তার পরিচয় তুলে ধরেছে ভারতীয় চিত্রকলা পর্যায়ের ডাকটিকিটগুলি। এখানে রাজপুত ও মোগলযুগের কয়েকটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সম্প্রতি ভারতীয় মুখোসের ওপর কয়েকটি টিকিট প্রকাশিত হয়েছে। মুখোস যেহেতু লৌকিক সংস্কৃতির অন্তর্গত, তাই এগুলির মুদ্রণ গুরুত্বপূর্ণ। অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় নৃত্য ও বাদ্য-যন্ত্রের ওপর বেশ কয়েকটি ডাকটিকিট প্রচারে ডাক বিভাগের আগ্রহ রয়েছে।

নির্দিষ্ট ক্রমের ডাকটিকিট যেগুলি দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্যে পরিকল্পিত সেগুলির মুদ্রণেও মুন্সিয়ানা লক্ষ্য করা যায়। ১৯৪৯ সালে প্রথম যে সিরিজটি প্রকাশিত হয় সেখানে ভারতের প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন রয়েছে। তার মধ্যে বিখ্যাত কোনারকের ঘোড়া এ্যালিফ্যান্টা গুহার ত্রিমূর্তি সাঁচী স্তূপ, বুদ্ধগয়া ও ভুবনেশ্বরের মন্দির, বিজাপুরের গোল গম্বুজ অজন্তার ভাস্কর্য, অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দির চিতোরের বিজয়স্তম্ভ দিল্লির লালকেল্লা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় নির্দিষ্ট ক্রমের ডাকটিকিটে (১৯৫৬) স্থান পেয়েছে পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা। জনচিত্তে পরি-কল্পনার গুরুত্ব পৌঁছিয়ে দেবার জন্যেই এদের প্রচার সেদিন বাঞ্ছনীয় ছিল। ভারতীয় টাকার দশমিক মুদ্রায় রূপান্তরিত হওয়ার জন্যে তৃতীয় নির্দিষ্ট ক্রমের ডাকটিকিটের প্রয়োজন অনুভূত হয় ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে। এগুলি ভারতের মানচিত্র সম্বলিত বিভিন্ন রং ও দামে মুদ্রিত হয়েছিল, সেকথা সবারই জমা। এবং একথা স্বীকার করতেই হবে যে এগুলিতে কোনো বৈচিত্র্য ছিল না যা মনকে আকর্ষণ করে। কারণ এগুলি অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে প্রস্তুত হয়েছিল। তাই, অনেকদিন ধরে আর একটি সিরিজের প্রয়ো-জন বোধ হলেও, ডাক বিভাগ চতুর্থ ক্রম প্রকাশে অত্যন্ত গড়িমসি করে। বস্তুতঃ দীর্ঘ চার বছর ধরে (১৯৬৫—৬৮) বর্তমান সিরিজটির প্রকাশ ঘটে। স্বভাবতই এগুলিতে আগের মত কোনো একক ভাব বা বিষয় গ্রহণ করা হয়নি। এখানে বিচিত্র বস্তুর সমাবেশ ঘটেছে, প্রত্নতত্ত্ব, হস্তশিল্প পশু, চা, আম, কফিফল, বাঁধ ইঞ্জিন বিজ্ঞান আণবিক চুল্লী প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় এগুলিতে স্থান পেয়ে নতুন কৌতূহল জাগিয়েছে।

স্বাধীনতা আন্দোলনে অগ্রণী শহীদ ও যোদ্ধাদের ওপর ডাকটিকিট প্রকাশ করে যেমন তাঁদের প্রতি যোগ্য কৃতজ্ঞতা ও সম্মান জানানো হয়েছে; তেমনি মুক্তির বাণী প্রচারে অগ্রগণ্য অমৃতবাজার পত্রিকার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে (ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮) ডাকটিকিট মুদ্রিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মহাত্মা শিশির-কুমার ঘোষের (১৮৪০—১৯১১) নাম স্বতই এসে পড়ে। ইনি প্রথম জীবনে নীল-বিদ্রোহে জড়িয়ে পড়েন এবং চাষীদের দুর্দশার কথা প্রকাশ করেন হিন্দু পেট্রিয়ট নামক পত্রিকায়। পরে সাংবাদিকতার বৃত্তি গ্রহণ করে অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশ করেন ১৮৬৮ সালে। কয়েক বছর পরে দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র আইন এড়াবার জন্যে এটিকে ইংরেজী সাপ্তাহিকে পরিণত করেন। তার-পর অমৃতবাজার পুরোপুরি ইংরেজী দৈনিকে পরিবর্তিত হয়। দেশের মুক্তি আন্দোলনে শিশিরকুমারের দান অনস্বী-কার্য। সাহিত্য ক্ষেত্রেও এঁর অবদান উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। আশা করব কোনো এক সুযোগে ডাক বিভাগ টিকিট মুদ্রিত করে শিশিরকুমারের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবে।

পরিশেষে আরও একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করি। ডাক বা ডাকটিকিটের ওপর বাংলা ভাষায় তেমন কোনো গ্রন্থ রচিত হয়নি। ১৯৫৪ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালায় নরেন্দ্রনাথ রায় লিখিত সচিত্র সুখপাঠ্য গ্রন্থ ডাকের কাহিনী প্রকাশ করে (১১৪ সংখ্যক গ্রন্থ মূল্য আট আনা)। পরবর্তীকালে (১৯৫৮) শ্রীশচীবিলাস রায় চৌধুরী অনেক পরিশ্রম করে ডাকটিকিটের জন্মকথা গ্রন্থনা করেন। দুঃখের বিষয় বর্ত-মানে উক্ত দুটি পুস্তকই পাওয়া যায় না। পশ্চিমবঙ্গে ডাকটিকিট সংগ্রাহকের সংখ্যা যেহেতু ক্রমবর্ধমান সে কারণে বাংলা ভাষায় ডাকটিকিট সংক্রান্ত পুস্তকও প্রয়োজন।

পুষ্পেন্দু লাহিড়ী

আর্থিক প্রসঙ্গ

নবম, না নব সংস্করণ ?

সংগ্রহের ইতিবৃত্ত : দিবানিদ্রা আমার অন্যতম বিলাস আর প্রতি বছর গ্রীষ্মের ছুটির মরসুমে এর সুযোগও বরাতে জুটে যায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন-এক জীবনীতে যেন পড়েছিলাম যে তিনিই এই ছুটির প্রবর্তন করেছিলেন অবশ্য তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তখনকার বিজলী-বাতি পাখাবিহীন দিনে প্রাণ [illegible] ছাত্রদের (শিক্ষা তখনও বিশেষ সীমাবদ্ধ [illegible] মধ্যেই সীমাবদ্ধ) গ্রীষ্মের নিগ্রহ থেকে রক্ষা করা।

একবার একদিন [illegible] দুপুরের দিকে সংস্কৃত কলেজের কোন এক ক্লাসে ঢুকে বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখেন যে ছেলেরা দরদর করে ঘামছে জামাকাপড় ভিজে একেবারে জবজবে। এ অবস্থায় পড়ায় মন দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না [illegible] সিদ্ধান্ত। গ্রীষ্মের ছুটির ব্যবস্থা করাতে [illegible] পর্যন্ত সংস্কৃতকে [illegible] করলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। [illegible] এই ব্যবস্থা [illegible] আমাদের [illegible] না [illegible] [illegible] এবং এই কারণে ঐ [illegible] আমার কাছে [illegible] নয় [illegible]—বিশেষ করে গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে—স্মরণীয়।

আমার শয়নকক্ষেই টেলিফোন। আগে আমি নিদ্রাসুখে ব্যাঘাত যাতে না ঘটে তার জন্যে মধ্যাহ্নকালীন শয্যা গ্রহণের ঠিক আগেই ক্র্যাডল থেকে টেলিফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রাখতাম। এর দরুন একদিন নিজেরই একটা ক্ষতি হয়—একটা জরুরী খবর পৌঁছোয় না। সেই থেকে রিসিভার আর নামিয়ে রাখি না তবে আশঙ্কা নিয়েই ঘুমোই কখন ঘণ্টি বেজে উঠবে—রং কলও হতে পারে।

সেদিন সবে চোখ দুটো জুড়ে এসেছে এমন সময় টেলিফোনের ঘণ্টি। বিরক্ত হয়ে সাড়া দিতেই অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এল : নমস্কার স্যার আপনার বই এসে গেছে।

বিরক্তি প্রশমিত হল না কারণ ভুলেই গিয়েছিলাম কোন বই। তবুও খানিকটা সংযত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : কোন বই-এর কথা বলছেন ?...

—কেন স্যামুয়েলসানের নাইন্থ এডিসান। আপনিই তো অর্ডার...

আর শোনার দরকার ছিল না ওখানেই থামিয়ে দিয়ে বললাম : রেখে দেবেন সুবিধেমত গিয়ে নিয়ে আসব।

—রেখে দিতে পারব না স্যার মাত্র বার কপি পেয়েছি পুস্তক বিক্রেতা জানালেন,—আজ বিকেলেই নিয়ে যাবেন। আর স্যার ক্রেডিটে দিতে পারব না।

শুধু অপমানকর নয় কিঞ্চিৎ দুঃসংবাদও বটে কারণ মাসের শেষ। মনের ভাব যথাসাধ্য গোপন করে জিজ্ঞাসা করলাম : কত নিয়ে যেতে হবে ?

—পঞ্চাশ টাকা।

পুত্রকন্যা-পত্নীর কাছ থেকে ঋণের মাধ্যমে ঘাটতি পূরণ করে পঞ্চাশ টাকাই নিয়ে গিয়ে বইখানা সংগ্রহ করলাম। মোটা স্বচ্ছ কাগজে প্যাক করা। দোকানে আর প্যাকেট খুললাম না। বাড়ী এসে খুলে নাড়াচাড়া করে দেখলাম সংস্করণটি সম্বন্ধে যা শুনেছি সবই সত্যি—মোটেই অতিশয়োক্তি নয়।

কি শুনেছিলাম ?

প্রশ্ন-গঠনে বোধহয় একটু ভুলই হল। শোনার চেয়ে পত্রপত্রিকা পাঠের মাধ্যমে জেনেছিলাম আরও জেনেছিলাম অধ্যাপক স্যামুয়েলসানের নিজস্ব বিবৃতিমূলক রচনা এবং একটি বিশেষ সাক্ষাৎকার থেকে। অতএব কি জেনেছিলাম ? —এই প্রশ্ন করলেই বোধহয় ঠিক হত।

জেনেছিলাম এই নবম সংস্করণে অধ্যাপক স্যামুয়েলস আর্থিক কল্যাণের এক নতুন মাপকাঠি নির্দেশ করেছেন বাণিজ্যচক্র (বিজনেস সাইকলস) সম্বন্ধে তত্ত্বের ধারণার বেশকিছু সংস্কারসাধন করেছেন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার নতুন প্রকার-পদ্ধতির কল্পনা করেছেন। মার্কসীয় অর্থনীতিতে যে উপেক্ষা করা উচিত নয়—সে সম্বন্ধে সূক্ষ্ম অভিমত প্রকাশ করেছেন আর যেসব সমস্যা আজ অর্থনীতিবিদদের বিভ্রান্ত করছে—যেমন উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি (কস্ট-পুস ইনফ্লেশান) ও বদ্ধাবস্থায় মূল্যস্ফীতি (স্ট্যাগফ্লেশান), জনসংখ্যা বৃদ্ধির শূন্য হার (জেড পি জি), সম্প্রসারণের শূন্য হার (জেড ই জি), দূষিত পরিবেশের দরুন রোজ-কেয়ামতের ভয় জাতিগত কারণে ও স্ত্রীপুরুষভেদে পক্ষপাত বহুজাতীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উদ্ভবের দরুন উদ্ভূত বিবিধ সমস্যা, আন্তর্জাতিক অর্থবিনিময় ব্যবস্থার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি। পরিশেষে আছে অর্থনৈতিক [illegible] ক্রমবিকাশের ওপর সম্পূর্ণ একটি নতুন

অধ্যায় যাতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অর্থনীতি থেকে নয়া বাম ও তরুণ মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী এবং শ্রেণী-সংঘর্ষ ও সমাজজীবনের গতিপ্রকৃতির সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হয়েছে।

যা জেনেছিলাম নবম সংস্করণ থেকে তা মিলিয়ে ঠিক চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন নয় পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ফারাক দূর করলাম। তাও আবার একদিনেও নয় বেশ কদিন ধরে সংস্করণটি নাড়াচাড়া করে। এখন এই লব্ধ জ্ঞানেরই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার আগে পটভূমিকা হিসেবে গ্রন্থখানির কিছুটা পরিচয় দেওয়া যাক।

আলোড়ন-সৃষ্টিকারী পাঠ্যপুস্তক :

১৯৭০ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির অধ্যাপক পল অ্যান্টনী স্যামুয়েলসনের (জন্ম ১৯১৫) গ্রন্থখানি একখানি পাঠ্যপুস্তক মাত্র তাও আবার স্নাতক শ্রেণী যা মার্কিনীরা যাকে বলে গ্রাজুয়েট স্কুল পর্যায়ের জন্যে। তবে এ রকম আলোড়ন-সৃষ্টিকারী পাঠ্যপুস্তক বড় একটা প্রকাশিত হয় নি। স্যামুয়েলসনের নিজের বিবৃতি অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রাজুয়েট স্কুলসমূহের অর্থনীতির ছাত্রদের অন্তত ৫০ শতাংশ তাঁর এই পাঠ্যপুস্তক পাঠ করে থাকে। ইংরেজী ভাষাভাষী সব দেশেই পাঠ্যপুস্তকখানি ঐ হারে না হলেও বিশেষ জনপ্রিয়। (গ্রন্থখানি আমাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস ও কমার্স কোর্সের জন্যে মনোনীত পাঠ্যপুস্তক। সুতরাং স্বীকৃত গ্রন্থ। তবে ছাত্রছাত্রীদের শতকরা একজনও পাতা উল্টে দেখে কিনা সন্দেহ।)

পাঠ্যপুস্তক হিসেবে গ্রন্থখানিকে ব্যাকরণ বা অভিধান বলে অভিহিত করা যায়। কোন বিষয় নেই এতে? অন্যভাবে বলা যায় পুস্তকখানি আগাগোড়া পাঠ করলে অর্থনীতির সব কিছুর সঙ্গে মোটামুটি পরিচয় হয়ে যায়। আধুনিক নাগরিকের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিশ্বজনের জানা এই পরিচয় যে অপরিহার্য তা অল্পবিস্তর চিন্তাশীল সকলেই স্বীকার করবেন। সম্প্রতি অর্থনীতিকে নাগরিকের অবশ্য পাঠ্য প্রধানতম শাস্ত্র বলে অভিহিত করা হচ্ছে। ট্রামে বাসে হাটেবাজারে সরকার ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে সবজান্তার ভাব নিয়ে সমালোচনা করলেই চলবে না কারণ সচেতন নাগরিকতা ব্যতিরেকে গোষ্ঠী বদল হলেও রীতিনীতি-পদ্ধতি পরিবর্তিত হবে না। তখন আবার মোহমুক্ত নাগরিক-সম্প্রদায় নবাহুতে সরকার ও কর্তৃপক্ষের সমালোচনা শুরু করবে। শিক্ষিত বেকারদের ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত যদি গৃহীত হয় এবং এর জন্যে যদি আমার পকেটে হাত পড়ে তবে আমি কি করব? দ্বিতীয় হুগলী ব্রীজ নির্মাণ কলকাতা-আমতা রেল লাইন ইত্যাদি নিশ্চয়ই দরকার কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা কি? কলকাতায় পাতাল-রেলও নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই প্রকল্প অর্থনীতি ও পরিবহন-ব্যবস্থায় বর্তমান অবস্থায় অগ্রাধিকার পেতে পারে কি? নাগরিককে এইসব প্রশ্নের যথাযথ বিচার করে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। নচেৎ, অর্থনীতি কিছুতেই ঠিকমত পরিচালিত হবে না এবং তখন হয়ত মৌলিক সমস্যা—খেয়ে পরে বেঁচে থাকার সমস্যা—মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। অ্যাডাম স্মিথ উক্তি করেছিলেন : সমৃদ্ধির চেয়ে নিরাপত্তা অনেক বেশী কাম্য। এখন প্রশ্ন নিরাপত্তার প্রয়োজনে সমরসজ্জাকে কতদূর সমর্থন করা যেতে পারে? ভূতপূর্ব মার্কিন রাষ্ট্রপতি হুভার সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে মূল্যস্ফীতি স্টালিনের চেয়েও ভয়ংকর—ইনফ্লেশান ইজ ওয়ার্স দ্যান স্টালিন, তা কতদূর গ্রহণীয়? মূল্যস্ফীতি কি একনায়কতন্ত্রের চেয়েও অকাম্য না মুদ্রাস্ফীতির ফলে শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা ব্যবস্থার উদ্ভব হয় যা একনায়কতন্ত্রের চেয়েও ভয়াবহ?

অধ্যাপক স্যামুয়েলসন অর্থনীতিকে সামাজিক শাস্ত্রসমূহের সম্রাজ্ঞী আখ্যা দিয়েছেন। এই সম্রাজ্ঞী বা রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয় না থাকলে তাঁর রাজত্বে নাগরিক হিসেবে বাস করা অসম্ভব।

বৃদ্ধি ও বিকিরণ :

বর্তমান সংস্করণে গ্রন্থখানির নাম শুধু ইকনমিকস বা অর্থনীতি। পূর্ববর্তী সংস্করণসমূহে নাম ছিল ইকনমিকস—অ্যান ইন্ট্রোডাকটরী অ্যানালিসিস বা অর্থনীতি—একটি উপক্রমণিকামূলক বিশ্লেষণ। বর্তমান সংস্করণে (১৯৭৩) পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯১৭; ১৯৪৮ প্রকাশিত প্রথম সংস্করণে পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৬০০-র মত। সুতরাং বিগত ২৫ বছরে (১৯৪৮—১৯৭৩) এবং নটি সংস্করণে গ্রন্থখানির আকার ৫০ শতাংশের মত বৃদ্ধি পেয়েছে। (প্রশ্ন উঠতে পারে : সাধারণ নাগরিকের পক্ষে এই বিপুলাকার গ্রন্থখানি আগাগোড়া পাঠ করা কি সম্ভব আর আমাদের দেশের ছাত্ররা কি আকার দেখে স্বতই ঘাবড়িয়ে যাবে না?)

এই আকারবৃদ্ধির কারণ হল অর্থনীতির পট-পরিবর্তন। অধ্যাপক স্যামুয়েলসন নিজেই বলেছেন : ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণে অন্যতম প্রধান রশ্মিকেন্দ্র ছিল কেইনসের জেনারেল থিয়োরী। তারপর অর্থনীতির ক্ষেত্রে অনেক নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে এবং সারা বিশ্ব এইসব সমস্যা নিয়ে আজ মাথা ঘামাতে বাধ্য হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ উৎপাদন-হার সঙ্কোচনের মূল্যস্ফীতি এবং বন্ধ্যাবস্থার মুদ্রাস্ফীতির উল্লেখ করা যায়। কাজেই পদ্ধতি-পরিবর্তন করতে হয়েছে। [illegible] অর্থনীতি [illegible] কখন পরিস্থিতি [illegible] কিন্তু ঐ শব্দ সবার মুখে মুখে। বেকার-সমস্যা তখনও ছিল কিন্তু পূর্ণ নিয়োগের দাবিতে লোকে তখন সোচ্চার হয়ে ওঠেনি।

স্যামুয়েলসন আরও বলতে পারতেন যে সম্প্রসারণ অর্থনীতির ধারণা তখনও ঠিক দানা বাঁধেনি, জনবিস্ফোরণ ম্যালথুসীয় তত্ত্বকে পুনরুজ্জীবিত করেনি, পরিবেশ দূষিত হওয়ার প্রশ্ন ওঠেনি দারিদ্র্য বা গরীবি সম্বন্ধে ধারণা পরিস্ফুট হয়নি ইত্যাদি ইত্যাদি।

যাহোক নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভবের ফলে অর্থনীতিবিদদের—বিশেষ করে যাঁরা অর্থনীতিকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন বা প্রফেশনাল ইকনমিস্ট ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং বৃত্তিও হয়ে উঠেছে উত্তেজনাপূর্ণ। "যদি আমরা সব সমস্যারই সমাধান করে ফেলতে পারতাম তাহলে জগৎটা কি একঘেঁয়ে হয়ে উঠত না?" প্রশ্ন করেছেন অধ্যাপক স্যামুয়েলসন।

যত মত তত পথ :

অর্থনৈতিক সমস্যা কি সমাজতান্ত্রিক দেশেও নেই? যখন যুগোস্লাভিয়া হাঙ্গেরী পোল্যান্ড বা চেকোশ্লোভাকিয়া মোটামুটি বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে বাধ্য হয় তখন তারা অ-কমিউনিস্ট অর্থ-ব্যবস্থার মতই সমস্যার সম্মুখীন হয়—তখন নিয়োগ-সংস্থান ও নিয়োগ-প্রার্থীদের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করা কঠিন হয়ে পড়ে কিংবা ভোগ্যপণ্যক্রেতাদের (কনজিউমারস) মোট ব্যয় এবং মোট ভোগ্যপণ্যের মধ্যে সমতা হারিয়ে যায়। অ-কমিউনিস্ট জগতে অর্থব্যবস্থার প্রকৃতি অভিন্ন না হলেও সমস্যার প্রকৃতি কিন্তু এক। যেমন সুইজারল্যান্ড অনেকাংশে স্বাতন্ত্র্যবাদী এবং সুইডেন বহুলাংশে সমগ্রবাদী। অথচ গত ২৫ বছরে এই দুই দেশের সম্প্রসারণ-হার ছিল মোটামুটি এক। অতএব মত ও পথ এক না হলেও একই লক্ষ্যে কিন্তু পৌঁছোনো সম্ভব।

এইভাবে অধ্যাপক স্যামুয়েলসনের জ্ঞানবৃদ্ধি ঘটেছে বিগত ২৫ বছরে এবং এই জ্ঞানই তিনি বিকিরণ করছেন তাঁর অর্থনীতির নবম সংস্করণে। ফলে সংস্করণটি হয়ে দাঁড়িয়েছে একরকম নব সংস্করণ।

স্থানাভাবে আজ এখানেই থামতে হল। নব সংস্করণে বিকীর্ণ নতুন বিষয়গুলো সম্বন্ধে আলোচনা করব পরবর্তী সংখ্যায়।

শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

সেই লোকটি

আমার বন্ধু ভক্তিমাধব সেই লোকটির নাম দিয়েছিল 'জো-কুড়ে'। তা হদ্দ কুঁড়েই বটে। ভদ্রলোকের নাম বিজনবিহারী দত্ত। থাকতেন আমার আস্তানার ঠিক উল্টো দিকে প্রায় একটা ডোবার পেটের মধ্যে। খুব নীচু জমির ওপর ছিল তাঁর চাঁচ-বেড়ার কুলো একখানা ঘর—যার অসংখ্য ফাঁক-ফোকর দিয়ে রোদ-বৃষ্টি অক্লেশে ভেতরে ঢুকে পড়ত। একটু জল হলেই ঘর-বারান্দা জমি সব থই থই করত। চারপাশে লক-লকিয়ে উঠত আগাছা, শোলাকচুর জঙ্গল, এমন কি কচুরিপানা। অমন এক সৃষ্টি-ছাড়া আশ্রয়ে একটি অতিজীর্ণ তক্তপোশের ওপর বসে বসে হাঁপানী রুগী বিজনবাবু দিনভর বাপ-মা তুলে সমানে খিস্তি করে যেতেন বিশ্ব-দুনিয়ার মানুষকে। সাদা কাগজের মত ফ্যাকাশে আর শীর্ণ। তাঁর স্ত্রী বন-বাদাড় ঘুরে অষ্টপ্রহর সংগ্রহ করতেন কচু, শাক, কচুর গোড়া, এখান থেকে ওখান থেকে যা পাওয়া যায় সামান্য তরি-তরকারী। বিজনবাবুর বড় মেয়ে জলির আবার ছিল যোগাযোগ। এ বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে চেয়ে-চিন্তে খেত, পয়সাও আদায় করত। এবং সেই পয়সা জড়ো করে চার নম্বর গুমটির হাট থেকে কিনে আনত পারা-চটা আয়না, সস্তাদরের একশিশি পাউডার, চুলের রুপোলি ফিতে, কাজল এমন কি, লিপস্টিক। কলোনির কিছু স্নেহপ্রবণ দাদা সে সময় ধরে ফেলেছিল অচিরাৎ। এবং তাতেও না পোষানোতে সে অতঃপর সরাসরি ঢুকে গিয়েছিল দূর দূর পাল্লার বেসরকারী বাসের ড্রাইভার-কন্ডাক্টার-হেল্পারদের নৈশ ছাউনির ভেতরে। কিছু দিনের মধ্যেই আসন্ন সর্বনাশের মত এক অপরিমেয় লাবণ্যের ঢল নেমেছিল তার ষোড়শী শরীর দিয়ে।

বিজনবাবুর কালী নামে ছোটো মেয়েটি হয়েছিল ছিঁচকে চোর। রোগা প্যাকাটি দেহ, পাটের ফ্যাঁসার মত চুল উড়ছে, হলুদ হলুদ চোখ। কালী দ্যাখ-না দ্যাখ যে কোনো বাড়িতে ঢুকে গিয়ে কিছু না কিছু হাত-সাফাই করে আনত। এই ছিল মাসনলাই-বাড়ির বিজনবিহারী দত্তের সংসার।

কুটোটি নাড়তেন না ভদ্রলোক। কিভাবে কি হচ্ছে, চোখ মেলে দেখতেন না। মাঝে মাঝে তাঁর তরাস দিয়ে জ্বর আসত। একটা ছেঁড়া কানি গায়ে শরীরে ভাদ্দুরে কুকুরের মত একঘেয়েভাবে তখন কুঁই কুঁই করতে থাকতেন। একটু সুস্থ থাকলে বাইরে এসে একটা সজনে গাছের তলে বসতেন। তাঁর সারা শরীরে ছিল অসহনীয় রুগ্নতা ও ও দারিদ্র্যের ছাপ। স্ত্রী ও কন্যাদের সর্বদাই 'অশিক্ষিত' বলে সম্বোধন করতেন। প্রতি-দিন আমার খবরের কাগজটি চেয়ে এনে আদ্যোপান্ত পড়তেন। বিশ্ব রাজনীতি, ভারতীয় অর্থনীতি, রুশ মার্কিণ সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়গুলি সর্বদাই তাঁকে উদ্বিগ্ন করে রাখত। সেই উদ্বেগ অতিশয় প্রবল হয়ে উঠলে হঠাৎ হঠাৎ আমার ঘরের দরজায় এসে ডাক দিতেন, 'অমৃতবাবু'। আমি বেরিয়ে এলে যেন একটা একান্ত প্রয়োজনীয় কথা বলছেন, এইভাবে প্রায় কানের ওপর মুখ এনে বলতেন 'ভুট্টোকে নিয়ে তো মহা মুশকিলে পড়া গেল মশাই', কিংবা, 'চোদ্দটা ব্যাংক যে সরকার নিয়ে নিল, এটা কি ভালো হল—ইত্যাদি। পাড়ার উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক—যাঁরাই রাস্তা দিয়ে যেতেন, তাঁদের কাউকে না কাউকে ঝাড়া আধ ঘন্টা ঠায় দাঁড়িয়ে বিজনবাবুর দুশ্চিন্তার অংশ নিতে হত। কোনো হীনম্মন্যতা ছিল না তাঁর। সবার কাছ থেকেই রাজার প্রতি রাজার মত আচরণ প্রত্যাশা করতেন।

তাঁর রোগা স্ত্রী কাঠকুটো জড়ো করে তিনটে ইঁটের উনুনে আগুন জ্বালাতেন, মাটির হাঁড়িতে রাঁধতেন শাক-পাতা সেদ্ধ। কুয়ো বা পাইখানা বলতে তাঁদের বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে কিছু ছিল না, মহিলাটি ধুঁকতে ধুঁকতে হাজারবার জল টেনে আনতেন এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে। সেই জল দিয়ে মহা আয়েসে চান সারতেন বিজনবাবু, অসংখ্যবার কচলে কচলে হাত পা ধুতেন। অতিরিক্ত জল খরচ করার দরুন স্ত্রীর মৃদু প্রতিবাদ শুনে তিনি বলতেন, 'জলির মা, তুমি তো অশিক্ষিত মানুষ, তাই বুঝলে না, স্বাস্থ্য না থাকলে আর কিছুই থাকে না।' তাঁর ঘরের অনতিদূরেই থাকতেন তাঁর এক সম্পন্ন সহোদর রাসবিহারী দত্ত। অভাবী দাদাকে মাঝে-মধ্যে সাহায্য করতে চাইতেন। অথচ এর ফলে বিজনবাবু এতই খাপ্পা হয়ে উঠেছিলেন ভাইয়ের ওপর যে, ভুলক্রমেও তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করতেন না। পিতৃদত্ত বেশ কিছুটা লাগোয়া জমি ছিল তাঁর কুটির ঘিরে। পাড়ার এক ভদ্রলোক ঐ জমিটুকু কেনার প্রস্তাব নিয়ে বিজনবাবুর কাছে এলে রীতিমত অপমান করে তিনি তাড়িয়ে দিয়ে-ছিলেন তাঁকে। সর্বাংশে নিঃস্ব অথচ অমন ডাঁটিয়াল লোক আমি জীবনে দেখি নি। আমার বন্ধু ভক্তিমাধব বলত, 'বিজনবাবু একটা প্যাথলজিক্যাল কেস মাষ্টার।'

গাঁয়ে কয়েক বিঘে জমি ছিল বিজন-বাবুর। সেখানে গিয়ে অনায়াসে মোটামুটি ভালোভাবেই থাকতে পারতেন স্ত্রী কন্যাদের নিয়ে ঐ জমি নেড়ে-চেড়ে শুধু গ্রাসাচ্ছাদনই নয়, উদ্বৃত্ত ফসল বেচে কিছু টাকা-পয়সাও করতে পারতেন হয়তো। কিন্তু সে পাত্রই ছিলেন না তিনি। দুজন ভাগ-চাষী রেখে কাজ করাতেন। নিজে কস্মিনকালেও যেতেন না জমিতে। ফলে গাঁ থেকেও ধান-চাল প্রায় কিছুই এসে পৌঁছত না তাঁর কাছে। কালেভদ্রে যদি বা দশ-বিশ সের ধান দিয়ে যেত ভাগ-চাষীরা, [illegible] ঝাড়াইবাছাইয়ের শব্দে, হাঁকডাকে [illegible] পাড়া সন্ত্রস্ত হয়ে উঠত। গাঁয়ে গিয়ে সপরিবারে বাস করার জন্য একদিন তাঁকে প্রস্তাব দিতে তিনি ফুঁসে উঠলেন আমার মুখের ওপর, 'অমৃত-বাবু, আমরা হলাম টাউনের লোক, ঐ গেঁইয়া অশিক্ষিতদের সঙ্গে কি আমাদের থাকা পোষায়?'

আমাদের চোখের ওপর খেটেখেটে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মারা গেলেন বিজনবাবুর সর্বংসহা সহ-ধর্মিণী। বড় মেয়ে জলি চমৎকার উড়তে শিখেছিল—একদিন একেবারে ভোঁ পাখা উড়েই গেল। ছোটো মেয়ে কালীই যা হোক চেয়ে-কুড়িয়ে চুরি-চামারি করে খাওয়াত বাপকে। হাড়ের ওপর চামড়ার চাদর-পরিহিত বিজনবাবুকে দেখলে বস্তুত তখন ভয় করত। ভয় করত, যখন তিনি তাঁর কঙ্কালসার ডান হাতটি আমার মুখের ওপর নাড়িয়ে বলে উঠতেন, 'নিক্সন এই কাজটা কিন্তু ভালো করল না, অমৃতবাবু'!

—অমিতাভ দাশগুপ্ত

ভালবাসা ভালবাসা

আনন্দ বাগচী

উপন্যাস

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তপতীদের গলির খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিল ওরা এমন সময় নন্দিতা বলল, ওরে দ্যাখ দ্যাখ তপু, বকেয়াদের টনক নড়েছে —কেমন ঘাড় লম্বা করে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে দ্যাখ!'

তপতীদের পাশের গলির মুখে একটা হোলটাইম রক আছে সেখানে সর্বক্ষণ কতকগুলো বিশ্ববখা বসে থাকে আর মেয়েদের লক্ষ্য করে টীকা-টিপ্পনী রানিং কমেন্টারী ছাড়ে। তপতী দুচোক্ষে দেখতে পারে না এই ইয়াংবেঙ্গলদের। এরাই নাকি দেশের ভবিষ্যৎ।

তপতী তাকায় না, ভ্রূ কুঁচকে বিরক্ত গলায় বলে, তোর সাধ না মিটে থাকে তুই দ্যাখ, আমার বমি পায় ওদের দেখলে। এত অসভ্য!

আহা অমন বলিস না। বন্দনা বলে, ওরা বড় দুঃখী, বড় হতভাগা। ওদের কেউ দেখে না কেউ বোঝে না কেউ ভাবেনা, ওদের কথা তাই ওরা অমন। যতটা খারাপ আমরা ভাবি ততটা নয়।

নন্দিতা বলে, তাই আমি নাম দিয়েছি বকেয়া। যা পড়ে থাকে। দ্যাখ না ওদেরই নাকের ডগা দিয়ে ওদের মানসপ্রতিমা বেপাড়ায় পাচার হয়ে যায়, ওরা শুধু ফ্যালফ্যাল করে বেপাড়ার বরের বারফাট্টাই দ্যাখে। বড় জোর দুচারটে ফাজে কার্মে কোমরে গামছা বাঁধার চান্স পেয়ে বর্তে যায়—নইলে ওদের জীবনভর শুধু ম্যারাপ বাঁধা আর ম্যারাপ খোলার ইতিকথা।

সবাই নিজেদের মধ্যে হেসে উঠল। বন্দনা বলল, দেখিস নন্দিতা, তুই আবার কারো মানসপ্রতিমা হয়ে ড্যাং ড্যাং করে চলে যাস না। বড় দাগা পাবে।

পারমিতা আর একবার সামনের রকের দিকে তাকিয়ে বলে, কিন্তু যাই বলিস মাইরী, এই রক ফেলোরা না থাকলে আমাদের পথচলার আনন্দও আধখানা হয়ে যেতো। ওই কাস্টমাস চেকিং।

কাস্টমস চেকিং বল নন্দিতা ওকে শুধরাই দেয়।

ওই হল স্মাগলড্ ব্যাপার। পারমিতা ওদের কাছাকাছি আসার আগেই নিজের কথাটা শেষ করে নিতে চাইছিল বলে একটু বিরক্ত হল, প্রেরণা-ফেরনা না থাকলে আমাদের দুনিয়া নিরামিষ হয়ে যেত। আমি তাই ওদের নাম দিয়েছি এন ভি এফ।

এন ভি এফ? বন্দনা গোগোর মধ্য দিয়ে গোল গোল চোখে তাকায়, সেটা কি বস্তু পারু?

সেটা অতি জনহিতকর বস্তু। ন্যাশনাল ভ্যাগাবণ্ড ফোর্স।

ওই হল। নন্দিতা ওরই গলা নকল করে বলে, ওই হল। বকেয়া পার্টি।

তা ওরা যদি আমাদের দেখে একটু শিস্ ফিস্ দিয়ে আনন্দ পায় হোয়াট হার্ম। বন্দনা বেশ ভারিক্কী চালে উপসংহার টানে, পাখিও তো শিস দেয়। আমার বাপু একটু মিউজিক ফিউজিক ভালই লাগে।

তপতী চাপা গলায় বলে, থাম তো তোরা। কানে গেলে আরো বেড়ে যাবে।

তুই আজ ওদের চাঁদমারি তপু। নন্দিতা নিচু গলায় বলে সবকটা যুবশক্তি তোকেই টার্গেট করছে।

তা তপতী আমাদের মধ্যে বেস্ট লুকিং একথা অস্বীকার করতে পার না।

রক পার হয়ে বন্দনা বলল কথাটা। কিন্তু রক থেকে এক মূর্তি লাফিয়ে নেমে ওদের পিছু পিছু আসছে বন্দনাও খেয়াল করেনি। হঠাৎ পিছনে পায়ের শব্দ আর গলার স্বর শুনে নন্দিতা চমকে তাকাল। তারপর তপতীর গায়ে খোঁচা দিয়ে বলল, তোকে ডাকছে তপতী।

থাম! অতখানি সাহস ওদের এখনো হয়নি। চলতে চলতে তপতী বলে।

মুমি, অ্যাই মুমি, একবার শোননা—

এইবার তপতীর কানে গেল পিছুডাক। সঙ্গে সঙ্গে স্তম্ভিত হয়ে গেল, নিজের কানকে যেন বিশ্বাস হয় না। এ নাম এখানে কারো জানবার কথা নয়।

তোর নাম মুমি নাকি? কই কখনো তো বলিস নি? পারমিতার স্থানকালপাত্র জ্ঞান একটু কম, সে জোরে জোরেই কথা বলে।

তপতী থেমে শক্ত হয়ে দাঁড়ালো তীর গতিতে। পিছনে যে আসছিল সে টাল সামলাতে না পেরে একেবারে গায়ের ওপর এসে পড়লো। মাথায় ঝুপড়ি চুল মোটা জুলপি, কোমরে অস্বাভাবিক চওড়া বেল্ট। টেনিস কোর্টে যে মোটা নীলচে কাপড়ের স্ক্রীন ব্যবহার করা হয়, তাই দিয়ে চোঙা প্যান্ট যেখানে সেখানে অন্ততঃ গুটি ছয়েক পকেট পায়ে ক্যানভাস বুট।

সার্টের কলার চেপে ধরতে গিয়ে তপতী চমকে গেল, কে?

আমাকে চিনতে পারলে না? ছেলেটির ভাঙা ভাঙা গলা একটু করুণ শোনালো এরই মধ্যে ভুলে গেলে আমাকে?

তুমি পনু! তুই, এখানে কি করে? তপতীর মুখখানা ঈষৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

যাক চিনেছিস তাহলে? ভয় পাসনি তো!

না ভয় কি? একটা ঢোক গিলে বলল, তোকে আমার ভয় কি! তবে একটু হাসবার চেষ্টা করে তপতী চেহারাখানা ভয় পাওয়ানোর মতই করেছিস।

আমি কি আর করেছি? হয়ে গেছে! অনেক তো গেল......যাক হাসল ছেলেটি, যাক বাদ দে ওসব, তোর কথা বল। কলেজ থেকে ফিরছিস? ওঃ কদ্দিন বাদে তোর সঙ্গে দেখা—

এদিক ওদিক তাকিয়ে তপতী ফিসফিস করে বলল, ওরা তোকে ছেড়ে দিয়েছে? না পালিয়েছিস?

ছেলেটা হঠাৎ উন্মাদের মত গলা ফাটিয়ে হেসে উঠল। পথের লোক চমকে গেল। তপতী ভীতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। মুখে জল নিয়ে গাগর্ল করার ভঙ্গিতে পিছনে মাথা হেলিয়ে হাসছিল পনু। একটু পরে হাসি থামলে বলল নাথিং ম্যাটার্স নাও। আমরা শেষ হয়ে গেছি। ফিনিশড্। হাসির দমকে কাশি এসে গিয়েছিল। কাশির চোট সামলে বলল এখন হাউ তোকে দেখে খুব আনন্দ হল।

কোথায় এসেছিস? তপতীর কেমন যেন মায়া হয় পনুর ভাঙা দুমড়ানো চেহারার দিকে তাকিয়ে। খুব রোগা হয়ে গেছে ছেলেটা। দুচোখের গড়ানে ছায়া জমেছে,

চোয়ালের হাড় যেন উঁচু আর শক্ত। মুখের লালিত্য মুছে গেছে, ঠোঁটে একটা কাটা দাগ এখনো পুরোনো হয়নি। কথা বলতে গেলে ওপরের পাটির একটা দাঁতের অনুপস্থিতি চোখে পড়ে। তপতী মনে মনে ভাবল শরীরের ওপর দিয়ে ওর অনেক ঝড়ঝাপটা গেছে তা সত্যি। সামুদ্রিক ঝড় পাড়ি দিয়ে যখন জখম জাহাজ কূলে এসে পৌঁছায় বুঝি এই রকমই দেখায়।

আমি এপাড়াতেই কদিন হল আছি। মাসীমা মেসোমশাই সবাই ভাল?

তপতীর এতক্ষণে বন্দনাদের কথা স্মরণ হয়. ফিরে তাকিয়ে দেখে ওরা খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটা দোকান থেকে কিছু কিনছে। তপতীকে তাকাতে দেখেই সীঅফের ভঙ্গিতে হাত নাড়লো বন্দনা। পারমিতা হাতের রুমালটাই নেড়ে দিল পতাকার মত করে। ওদের চোখ মুখ দেখে মনে হল ওরা খুব মজার খোরাক পেয়েছে।

তোর বন্ধুরা? পুনু কৌতুক মেশানো গলায় বলল তোকে মনে হচ্ছে খরচের খাতায় লিখে বসে আছে। যা শালা—

ওরা ওরকমই করে। তপতী আবার পুনুর মুখের দিকে তাকালো তোর কথা বল শুনি। কতকাল পরে তোকে এভাবে... সত্যি—

আমার কোনো কথা নেই। পুনু কেমন বিচিত্র মুখভঙ্গি করলো আমি পুনেশচ নই, আমি এখন ইতি। কেমন ডায়লগ রে? পকেট থেকে চারমিনারের তোবড়ানো প্যাকেট বের করে গলায় কেমন শব্দ তুলে তুলে হাসলো।

তুই এসব ধরেছিস? তপতী ঠোঁট নাক কুঁচকে বলল।

অনেক কিছুই ধরেছি, ফস করে সিগারেট ধরিয়ে ফেলে বলল আবার ছেড়েছিও।

তোর মা কেমন আছেন? বুলু বলেন এখন কি করছে রে?

তার মনে আছে? গড়িয়ার কথা ভাবিস এখনো?

মাঝে মাঝে। ভাল আছে সব? রাঙামাসীমা আমার কথা বলেন?

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পুনু একমুহূর্ত অন্যমনস্ক হয়ে যায়, তারপর সম্বিতে ফিরে এসে কেমন ঝাঁকি দিয়ে বলে, লীভ ইট মুন্নি, লীভ ইট। যাঃ শালা—

অপ্রসন্ন আহত মুখে এক লহমা চুপ করে থেকে তপতী বলে, আচ্ছা চলি। আমরা ওই পাশের গলিতে, জিনের একের বি কলিং বেল আছে, আসিস না একবার। সব কথা হবে—

আচ্ছা। কিন্তু কি আর কথা হবে, কোনো কথা নেই আসলে বুঝেছিস।

বুঝেছি! তপতী শ্লেষ মিশিয়ে বলে, বাক বুলুকে অন্ততঃ বলিস। ওকে আমি কদিন আগে স্বপ্ন দেখেছি।

বুলু নেই।

নেই' মানে?

পুনু আর দাঁড়ালো না, যাঃ ভাগ।

একটা পা কেমন টেনে চলে পুনু। ও আবার রকের আড্ডায় ফিরে চলল। একটু যেন কেমন কুঁজো হয়ে গেছে। রকে আর দুটো ওর বয়সী ছেলে বসে আছে। তারা এতক্ষণ এদিকে একবারও তাকায় নি, এইবার দুজনেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। বোধহয় পুনুর পায়ের শব্দ ওদের কানে গেছে।

কেমন যেন অদ্ভুত হয়ে গেছে পুনু। কেমন যেন ক্রুয়েল। বুলু নেই, কথাটার মানে কি? বুলু কি বাড়ি থেকে পালিয়েছে না বেঁচে নেই? ওর কথা থেকে কিছুই স্পষ্ট বোঝা গেল না। রাঙামাসীমার কথাটাও কেমন চাপা দিল পুনু। এই পরিবর্তন তপতীর কাছে খুব শকিং। বুলুর ব্যাপারটা অকল্পনীয়। পুনুও আর সে পুনু নেই। স্তম্ভিত তপতী অন্ততঃ সিকিমিনিট নিঃস্পন্দ দাঁড়িয়ে থেকে যখন পিছু ফিরলো বন্দনাদের আর কোথাও দেখতে পেল না।

বাড়িতে ঢোকার আগে গলি থেকেই তপতী টের পেল বৈঠকখানায় আড্ডা জমেছে। তার মানে তপতীর বাবা আজ বাড়িতে। এবং তিনি বাড়িতে থাকলে বাড়ি সরগরম হয়ে উঠতে বিলম্ব হয় না। অমিতাভ মিশ্র, তপতীর বাবা ভয়ংকর আড্ডাবাজ লোক। হৈচৈ হাসিতামাশায় এবয়সেও তাঁর জুড়ি মেলা ভার। অবশ্য বয়স এখনও পঁয়তাল্লিশ পেরোয় নি, চেহারায় বয়স আরো বছর আটেক ছাঁটাই হয়েছে। চোখে চশমা নেই চুল নির্ভেজাল কুচকুচে কালো, কোঁকড়ানো ঘনবুনোন বাবুইবাসার মত। ঠোঁটে নন-বেঙ্গলী গোঁপ, আর ঝুলো জুলপি। সব মিলিয়ে শ্লিম ফিগার অমিতাভ মিশ্রকে আর যাই হোক বাবা মনে হয় না। মনে হয় তপতীর দাদাটাদা কেউ। এমন চঞ্চল, অস্থির, হুজুগবাজ মানুষ বাঙালী সমাজে হাজারে একটি আছে কিনা সন্দেহ।

বাড়িতে তিনি কমই থাকেন। মাসের মধ্যে গোটাচারেক ট্যুর এবং তৎসহ ব্যক্তিগত আউটিং। শিকার, শ্যুটিং, মাছ ধরতে যাওয়া, পর্বত অভিযান, সাইট সিয়িং ইত্যাদি ইত্যাদি। একটা মানুষের পক্ষে যত রকমের বাই-বায়না ধরা চলে, অমিতাভ আছেন তার মধ্যেই। এক কথায় বলা যায় তিনি একাই একশো টাইপের মানুষ। অগাধ খেয়ালী, খামখেয়ালী, পয়সাকড়ির ওপরে মায়া মমতা নেই। দুহাতে রোজগার দুহাতে ব্যয়। বলেন, 'খরচের জন্যে মাত্র দুখানা হাতে কুলায় না। আমার যদি বাড়তি আরো দুখানা হাত থাকতো!'

তপতীর মা মহামায়া ভ্রূকুটি ভর্ৎসনা করে বলেন, 'হয়েছে থাক। দুহাতেই দেউলে হতে আর বেশী বাকি নেই। আমাকে পথে বসিয়ে যাবে, সে তো জানিই'—

'থোড়াই জানো।' অমিতাভ হাসেন, আমি তোমাকে প্রাণ থাকতে বিধবা হতে দেব ভেবেছ। সে গুড়ে বালি।' অফিসে বরাবর লেট হয়ে এসেছি, ওপারেও লেট হবো। যাকে বলে লেট হতে লেট হওয়া। নামের আগে চন্দ্রবিন্দু আমার একদম ধাতে সয় না।"

মহামায়া রেগে বলেন, 'সব বিষয়েই শুধু জানা আছে ঠাট্টা।'

'বিধবা হতে না পেরে এত রেগে যাচ্ছ কেন ডার্লিং। ঐ অবস্থা এমন কিছু সুখের নয়, তার চেয়ে বরং'—

'তার চেয়ে একটু মুখটুখ সামলাতে শেখ!' মহামায়া সশব্দে উঠে যান। আসলে তপতীর সামনে, এ রকম লঘু ভাষণ মহামায়া সইতে পারেন না। তিনি নিজেও ধীর-স্থির, যথাসম্ভব মেপেজুকেই কথা বলেন, মেয়েকেও সেইভাবেই মানুষ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাপের আদরে-আদিখ্যেতায় তা আর হয়ে উঠবে বলে মনে হয় না।

তপতীকে এই বয়সেও কোলে টেনে নিতে নিতে অমিতাভ তাঁর বন্ধু হীরেনকে লক্ষ্য করে বলেন, 'বুঝলে হে হীরের টুকরো, আমার এই ছোট পরিবার সুখী পরিবারের বাইরের ভঙ্গীটাই আসলে ওরকম। ওসব রাগফাগ কিছু নয়, দ্যাখোগে হয়ত রান্নাঘরে গিয়ে গুনগুন করে গান গাইছে আর দোসা বানাচ্ছে, আজকের আড্ডার প্রথম কীর্তি!'

হীরেন অমিতাভের বন্ধু হলেও সম্পর্কে শ্যালক, সুতরাং সে দু-তরফেই আছে। ঠাট্টা করে তাই ওকে হীরের টুকরো বলেন। কৃত্রিম দুঃখ করেন, আস্ত হীরে যখন আমার বরাতে নেই তখন আমার এই টুকরো হীরেই বহুৎ আচ্ছা।

হীরেন হেসে ফেলে বলেন, 'বৌদি এখানে নেই তাই বেঁচে গেলে ও-রকম কথা বলে।'

'আহা আমি যেন, বেঁটে পরিবার সুখী পরিবার বলেছি।' হো হো করে হেসে শেষে যোগ করেন, 'তা তোমার দিদি একটু শর্টকাট এ তো আর অস্বীকার করতে পারো না। বিলো ফাইভ বুঝলে? হোয়ার অ্যাজ মাই ডটার, মুন্নি এখনই পাঁচ তিন। ওর দিল অনেক বড়ো হবে দেখিস। কি রে মুন্নি?'

তপতী আরক্ত হয়ে ওঠে। স্বভাবে সেও মায়ের মতই কিঞ্চিৎ লাজুক, আর চাপা স্বভাবের। তাছাড়া বাবার সামনে সে সম্পূর্ণ সহজ হতে কেন যেন পারে না। আসলে মাকে যেমন দেখলেই মা-মা মনে হয়, বাবাকে দেখলে কিন্তু কিছুতেই কমপ্লিট বাবা মনে হয় না। যদিও বাবাকে মনে মনে সে ভীষণ লাইক করে, ভীষণ ভালবাসে। আজকেও বৈঠকখানায় হল্লাহাসি শুনে খুব খুশী হল। কারণ অনেকদিন পরে বাবা আজ বিকেলে বাড়িতে আছেন। আর যে-দিন বিকেলে বাবা বাড়িতে থাকেন, সেদিন আর তিনি বাইরে কোথাও বেরোন না। বাবা না থাকলে বাড়িটা বড্ড খালি খালি লাগে। এত বড় বাড়িতে মাত্র আড়াইজন মানুষ কিছুই নয়। দাদু মারা যাবার পরে ওরা পাকাপাকিভাবে এ-বাড়িতে চলে আসে গড়িয়ার বাড়িটা ভাড়া দিয়ে। এ-বাড়িটা দাদু দিয়ে গেছেন মাকে। কিন্তু সে জন্যে নয়। বছর তিনেক আগে তখন ও অঞ্চলটা মারাত্মক হয়ে উঠেছিল। মানুষ

প্রাণ হাতে করে পথে বেরোতো। দু-পাঁচটা খুনোখুন নিত্য লেগেই ছিল। উঃ সে কি দিন গিয়েছে। ঘরের দরজা বন্ধ করেও শান্তি ছিল না, নিশ্চয়তা ছিল না। বিশ্বাস ছিল না কাউকেই। চেনা ছেলেগুলো পর্যন্ত কি রকম হয়ে গিয়েছিল। চোখের চাউনি, মুখের রেখা এমন পাল্টে গিয়েছিল যে অনেক সময়ই অচেনা লাগতো। কোমরে ছোরা, পাইপ গান আর পকেটে পিস্তল নিয়ে ঘুরতো ক্ষুদে নেকড়ের দল। কসাই-খানার চেয়েও নিষ্ঠুর। এই পুনশ্চই শি হয়ে গিয়েছিল। আজকের মত সহজ হয়ে কথা কওয়া যেত নাকি তখন।

বাব্বা! এ পাড়ায় চলে এসে খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছিল তপতীরা। পাশের বাড়ির মজুমদার জ্যেঠু খুন হলেন সাত দিনের মধ্যে। বাবার বন্ধু ছিলেন উনি। গড়িয়ার জমিটা উনিই কিনে দিয়েছিলেন। কে জানে বাবারও কোন্ দিন বিপদ আপদ কিছু ঘটে যেত কিনা।

'এই যে, মুন্নি মা। এসো ভেতরে এসো'—

বৈঠকখানায় উঁকি দিয়েই পালাতে যাচ্ছিল তপতী হীরেনমামা ডেকে বসলেন। আসলে আজ ঘরের মধ্যে অচেনা মুখ দেখেই সে দোতলায় পালাচ্ছিল পা টিপে টিপে। কিন্তু হীরেনমামার চোখ সাংঘাতিক, তার ক্যাচ এড়ানো শক্ত।

বইখানা বুকের কাছে ধরে লাজুক পায়ে তপতী ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। ঘরে তখন উচ্চ হাসির রোল চলছিল। মুহূর্ত আগে তপতীর বাবা কি একটা হাসির কথা বলেছেন তারই প্রতিক্রিয়া। হীরেনমামাও হাসছিলেন তবে বেঘোরে নয়। তপতীর মা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুলে ফুলে হাসছিলেন। এবং তাঁর পাশে বসে একজন মধ্যবয়স্কা মহিলা সোফার ওপরে প্রায় গড়িয়ে পড়ছিলেন আর এক একবার দম নিয়ে শুধু বলছিলেন, 'হাউ ফ্যানি, হাউ টেরিবলি ফানি, অমিতাভ!'

তপতী লক্ষ্য করল মহিলার বয়স চল্লিশের কাছাকাছিই হবে। গায়ের রং ধবধবে সাদা প্রায় মেমসাহেবা। চুল বব করা, ঠোঁটে হাল্কা রং চোখে ধারালো চশমা। সর্বাঙ্গে প্রাজ্জ্বল প্রসাধনের পালিশ। পোষাকেও আভিজাত্য আছে।

উল্টোদিকের সোফার কোণে পাকা কাশের ক্ষেতের মত একমাথা চুল নিয়ে একজন অপরিচিত ব্যক্তি হাসি থামিয়ে তপতীকে লক্ষ্য করছিলেন, এবার হীরেনমামাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'এই অমির মেয়ে?'

'এবং একমাত্র মেয়ে।' তপতীর বাবাই জবাব দিলেন, 'মুন্নি, তোর ফরেনসিক বিশুখুড়োকে প্রণাম কর। বিশ বছর বিলেতে কাটিয়ে দেশে ফিরেছেন, বীতশ্রদ্ধ হয়ে আবার বোধহয় ফিরেই যাবেন। মাথার চুল দেখে ভুলিস নি মা, আমরা এক বয়সীই প্রায়। তবে উনি সায়েবদের গায়ের রং শিরোধার্য করে বুড়ো সেজেছেন।'

তপতী নিচু হয়ে প্রণাম করছিল, উনি বাধা দিলেন, 'থাক থাক মা। ওদেশে থেকে থেকে প্রণাম জিনিসটা এখন অস্বস্তিজনক লাগে। তুমি বসং ও'কে'—অপরিচিতা মহিলার দিকে ইঙ্গিত করলেন।

'বাই দি বাই। মুন্নি ও'কে তুমি চেন না, কারণ আগে কখনো দ্যাখো নি। উনি তোমার ফক্কা মা, আই মীন হতে হতে ফস্কে যাওয়া মা। শ্রীমতী কার্লেকার' অমিতাভ ভদ্রমহিলাকে সম্বোধন করে একটি ক্ষুদ্র প্রশ্ন জুড়ে দিলেন, 'কি, ঘটনাটা তাই তো?'

'কমিক পেলাতে তুমি চার্লিকেও বোধহয় ছাড়িয়ে গেলে, অমিতাভ! ঘটনা কি দুর্ঘটনা জানি না, তবে প্রত্যেক বড় আর্টিস্টেরই একটা করে ফস্কা গেরো থাকে বলে শুনেছি।'

মুখে হাসছিলেন, কিন্তু ভদ্রমহিলার কথাগুলো হাস্যকর মনে হল না তপতীর। কেমন যেন স্বার্থবোধক একটা খোঁচা আছে। তপতী পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। বিশ্বনাথের মত কার্লেকার কিন্তু বাধা দিলেন না, বরং যেন প্রণামের স্পর্শটুকু মনে মনে উপভোগ করলেন। তারপর চিবুক ছুঁয়ে এদেশীয় সনাতনী রীতিতে চুমু খেয়ে আশীর্বাদ করলেন, 'মনস্কামনা পূর্ণ হোক মা।' পরে তপতীর বাবার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন, 'একেবারে তোমার মুখ যেন বসানো! কি ভাই না ভাই?' ফিরে তাকিয়ে মহামায়ার সমর্থন খুঁজলেন যেন।

'হাউ ন্যারোলি এসকেপড। ওহ্ এক চুলের জন্যে বেঁচে যাওয়া একেই বলে!'

অমিতাভ অতি নিরীহ মুখ করে কথাটি বলেই সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে থাকলেন। সবাই জোকটা অনুমান করে হেসে উঠল। মহামায়াও হাসলেন, 'তা আমার মত মুখ পেলে মেয়ে বর্তে যেত তোমার'—

'এবার রিডাইরেকটেড টু শ্রীমতী, ইউ আর ন্যারোলি এসকেপড। ভাগ্যিস আমাকে বিয়ে করো নি, তাহলে বুঝতে ঠ্যালাখানা কারে কয়।' অমিতাভ চুরুট কেস বের করলেন, 'তাহলে কোথায় ছিল তোমার কাউন্সিলের মিটিং প্রাদিশংকরের বাড়ি আর বাগে প্র্যাকটিস করা। হেসেলে ঠেলতে ঠেলতে সতী পতিব্রতা হয়ে যেতে। আফটার অল আমার ফচুরার কাছ থেকে বারোমাস্যাটা শুনে নিয়ো এক ফাঁকে।' হাসি চেপে স্ত্রীর দিকে চোখের ইঙ্গিত করলেন।

এতক্ষণ সমস্ত ব্যাপারটার আউট লাইন বুঝে নিয়েছিল তপতী। মায়ের সঙ্গে বাবার বিয়ে হওয়ার আগে একটি মেয়ের সঙ্গে বাবার খুব ভাবসাব নাকি হয়েছিল। ব্যাপারটা বিবাহের দিকেই গড়াচ্ছিল, হঠাৎ কী কারণে যেন সব ভেঙে যায়। মেয়েটি অন্য একজনকে বিয়ে করে বাইরে চলে যায়। মায়ের মুখেই একদিন শুনেছিল কাহিনীটা। মা শুনেছিল বাবার কাছে। বাবার কিন্তু রাখ-ঢাক নেই মনটা কাচ কাগজের মত পরিষ্কার ভাঁজে ভাঁজে গোপন লিখন নেই।

তপতী যাচাই-চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। শ্রীমতী কার্লেকার, ফর্সা হতে পারেন মুখে রূপের ধার থাকতে পারে, কিন্তু কখনোই মায়ের মুখের মিষ্টত্ব নেই। মা তার সুন্দরী। শ্রীমতীর মুখে বয়স ধরা পড়েছে, মাথার চুলে অনেক রূপোলি আঁচড় পড়েছে। বাবার পাশে কখনো মানায় না। ও'কে মা ভাবতে বুকের ভেতরটা কেমন করে। বাবা ঠিকই বলেছেন, হাউ ন্যারোলি এসকেপড। বাবা আপনি খুব বেঁচে গিয়েছেন। ও'কে বিয়ে করলে এই লাইফ আপনার থাকতো না আপনি অন্য অনেকের বাবার মত বুড়ো হয়ে যেতেন।

মা বলল, 'তপু যাও জামাকাপড় ছেড়ে আমাদের চায়ের তাদারকি করে এসো এই আসর ছেড়ে আমার আর উঠতে ইচ্ছে করছে না।'

অমিতাভ বিশ্বনাথ ঘোষাল— এবং হীরেনকে চুরুট অফার করে নিজেও একটা মুখে গুঁজে ছিলেন। এরকম লম্বা এবং সরু টাইপের চুরুট দেখতে ভাল লাগে তপতীর মানুষকে অনেক স্মার্ট দেখায়। কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই যেন মারোয়াড়ী মার্কা চুরুটের ভক্ত। ইয়া ঢাউস আর বেঁটে, মুখের হাঁ বন্ধ করার কর্ক যেন। কি বোকা-বোকাই না দেখায়। যেন চুষিকাঠি চুষছেন বুড়ো খোকারা।

সিগারে অগ্নি-সংযোগ করে অমিতাভ বললেন, 'মায়া তুমি একে আসর বললে!'

'তবে কি বলব?' মহামায়া শ্লেষের হাসেন।

'বলবে বাসর। আমাদের বিবাহ স্মৃতি-বাসর!' অমিতাভ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, শ্রীমতী তোমার মনে আছে তোমার প্রেমে আমি কেমন ব্লাইণ্ড হয়ে গিয়েছিলাম, তখন ভাবতাম তোমাকে না পেলে সুইসাইড করব। তারপর শিবু সদাগর আচমকা দিলে সতরঞ্চ উল্টে আমিও বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়লাম।' বলে আড়ে আড়ে একবার স্ত্রীর দিকে তাকালেন।

মহামায়া ও'র মুখের দিকে তাকিয়েই ছিলেন গোড়া থেকে বললেন, 'দিয়ে বেঁচে গেছ।'

ওঃ শিওর। শিওর! নির্ঘাত বেঁচে গেছি। আজকের দিনের একদম বাঘিনী জেনানাদের হাতে পড়লে লাইফ হেল হয়ে যেত।'

'আমার হাতে পড়লেও তোমার দশা কিছু ভাল হত না।' শ্রীমতী উচ্চ হাস্যে জানালেন। অমিতাভ তাঁর কথা লুফে নেবার ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়লেন 'দিস ইজ ফর মাইসেলফ, আম রিপিটিং থার্ড টাইম—ভেরি ন্যারোলি এসকেপড!'

সবাই উচ্চ হাস্যে ফেটে পড়লেন, তপতী একটু অপ্রস্তুত বোধ করে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে একটা অদ্ভুত নাটকের মত বোধ হচ্ছিল। খানিকটা যেন শকিং—কিছুও কমিক লাগে। ভালবাসা এবং বিবাহ দুটো ব্যাপার কেমন যেন গোলমেলে পরস্পর-নিরপেক্ষ জিনিস নয়। একটাকে ছাড়াই আর একটা অক্লেশে চলে যায়।

নিজের ঘরে এসে বইখাতা রেখে কাপড় বদলাবার আগে একবার অ্যাকোরিয়ামের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ভেতরের আলোটা জেলে দিয়ে নানা রঙের মাছের জলকেলি দেখল কয়েক মুহূর্ত। কৃত্রিম জলাধারে ভেতরে নুড়িপাথরের পাহাড় গুহা জলজ শ্যাওলা। কেমন স্বচ্ছ তরতরে জীবন কিন্তু কঠিন নিষেধ চারপাশে কাঁচের প্রাচীর ঘিরে রেখেছে সব স্বপ্নকে ছোট্ট একটা মুঠোর মধ্যে ... বাইরে শুষ্কতা আর শূন্যতা, ... বাইরে আকাশকুসুম ঝরে গেছে। কিন্তু সব দেখা যায় নজর করলে। অ্যাকোরিয়ামের মধ্যে সঞ্চরমান মাছগুলি কি একবারও দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখে তাদের জগতের এই নিদারুণ অসঙ্গতি।

কাঁচের জলাধারের সামনে থেকে সরে গিয়ে দ্রুত পোষাক পাল্টাতে লাগলো তপতী। একেই কি ভালবাসা বলে? বাবা নিশ্চয় একদিন শ্রীমতীকে ভীষণ ভালবাসতেন। শ্রীমতীকে ছাড়া একদিন হয়ত সত্যিই তাঁর জগৎ অন্ধকার হয়েছিল। সেই অনুভূতি সেই বেদনা কি এককণাও মিথ্যে ছিল? বোধ হয় ছিল না। নিজের জীবন দিয়ে তপতীর যা কিছু অভিজ্ঞতা ভালবাসা কখনই মিথ্যে বেদনা নয়। অনেক অনেক ব্যথাবেদনার চেয়ে তীব্র এবং সত্যি। শরীরের যন্ত্রণা ওষুধে আরোগ্য হয়, ঘা সেরে যায় মাথাধরা একটি ট্যাবলেটে মন্ত্রের মত ছেড়ে যায়। কিন্তু মনের অস্থিরতা, অসুখ কোনোদিনই কি একেবারে সেরে যায়? স্বামী, স্বচ্ছলতা অন্য পরিবেশে জীবনের চরিতার্থতা খুঁজে পেয়েও শ্রীমতী কার্লেকার কি প্রকৃত সুখী। সেন্ট পার্সেন্ট হ্যাপী? তিনি কি সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে পেরেছেন অতীতের জীবন? স্মৃতি কি গাছের ডালের পাখি যে তাকে হুশ করে উড়িয়ে দেওয়া যায়! শ্রীমতীর মনের মধ্যে কোথাও একটা কিছু আছে। এত হাসি এবং মেদের তলায় তা একেবারে চাপা পড়েনি। তপতী পর্যন্ত বুঝতে পেরে গেছে। নইলে এতদিন বাদে পথ খুঁজে খুঁজে পুরাতন প্রেমিকের বাড়িতে হানা দেবেন কেন। এও এক ধরনের নস্টালজিয়া। যে অতীত নষ্ট, সেখানে আমরা সবাই ফিরতে চাই। রোমান্টিসিজম বোঝাতে প্রফেসর মুখার্জি বলেছিলেন কথাটা। ইংরেজিতে পড়াতে পড়াতে মাঝেমধ্যে এক-আধটা বাংলা লাইনের এরকম পাঞ্চিং বেশ শুনতে লাগে। ও'র মানে শ্রীমতীর বাবার ভাষায় হতে হতে ফস্কে যাওয়া মায়ের কথাগুলোও সিগনিফিকেন্ট। একটা আণ্ডার মিনিং আছে, একটা গভীর অর্থ। কথাগুলো ঝনঝন করে এখনো তপতীর কানে বাজছে— ঘটনা কি দুর্ঘটনা জানি না, তবে প্রত্যেক বড় আর্টিস্টেরই একটা করে ফস্কা গেরো থাকে বলে শুনেছি। কথাটা কি বাবাকে লক্ষ্য করেই বলা নয়? তারপরে আশীর্বাদের ভাষাটাই বা কি রকম! তপতী তো চমকেই

উঠেছিল প্রথম কথাটা শুনে। মনস্কামনা পূর্ণ হোক মা। আশ্চর্য। তা হলে কি নিজের মনস্কামনা একদা পূর্ণ হয়নি? মা নিশ্চয় ব্যাপারটা তার থেকেও ভাল আঁচ করেছে। তাই চায়ের যোগাড় দেখতেও উঠলো না। মাকে খুব চেনে তপতী। মা যতই হাসুক, আজ রাতে বাবার সঙ্গে শিওর ঝগড়া করবে। বাবা অবশ্য এত খোলামেলা হয়েও কেমন ঝাপসা ঠিক বোঝা যায় না সব সময়। মনে হয় কিছু একটা রহস্য আছে। ম্যাজিশিয়ান যেমন সকলের সামনে তাঁর হাতের মুঠো ঝোলাঝুলি ঝেড়ে দেখান কিছু নেই অথচ ঠিক তখনই একটা বড় রকমের কিছু বিস্ময় লুকোনো থাকে সেই খুলে দেখানো হাতের মধ্যে ঝোলায় কিংবা পকেটে। বাবাও আজ কত সহজে কত অনায়াসে সবকিছু খোলে দেখালেন নিজের পূর্বজীবন নিয়ে ঠাট্টা করলেন কিন্তু তাতেই কি সব মুছে গেল।

শাড়ির বদলে শালোয়ার পরে নিয়েছিল তপতী। এমন সময় বাড়ির তলায় গাড়ির শব্দ হল, একটা অদ্ভুত মিঠে হর্নও শোনা গেল। ছুটে গিয়ে জানলায় উঁকি দিয়ে অবাক হলো তপতী। একটা দুধের মত সাদা বিলিতি গাড়ি এসে দাঁড়ালো ওদের দরজায় আর তা থেকে লাফিয়ে নামলো বাইশ-তেইশ বছরের একটি যুবক। ঠিক যেন হিন্দী ছবির হীরো। নেমেই চোখ থেকে গগলস খুলে হাতে নিয়ে ওপর দিকে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে চোখাচোখি হল দুজনের। তপতীর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল কেমন একটা অজানা আশংকায়। অমন জীবন্ত নীল চোখ হ্যাঁ চোখের তারা দুটো নীল দোতলা থেকেও স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে তপতী, অমন ভুরু, অমন ঠোঁট বাঁকানো হাসিটি ঝট করে কোথায় যেন লেগে যায়।

আর একটু দেখতে ইচ্ছে করছিল কে ছেলেটি। তাদের বাড়িতেই এল বোধ করি কিন্তু লজ্জাবশত তাড়াতাড়ি সরে এল তপতী। বাবা সিনেমায় নামতে যাচ্ছেন কয়েকদিন আগে শুনেছিল কথাটা। বাবার বন্ধু ছবি করছেন তাঁর ইচ্ছে বাবা একটা পার্ট করেন। একটা স্মৃতি থেকে যাবে। বাবা শেষ অবধি রাজী হয়েছেন। এ হয়ত সেই ছবিরই নায়ক টায়ক কেউ হবে না কি প্রোডিউসার?

তপতী তাড়াতাড়ি নিচে নামল, রান্নাঘরে গজমোহন কি করছে কে জানে। চা-জলখাবার তাড়াতাড়ি পাঠানো দরকার। আর একটা ডিশ বোধ হয় বেশি করবে।

হাতের ইসারায় অনীতা তপতীকে ডাকল।

একটু অবাক হল তপতী। অনীতা আবার ফিরে এসেছে জানতো না। কয়েক মাস আগেও বাড়ি থেকে পালিয়েছিল। ওর বাড়ির লোক অবশ্য অন্য কথা বলত, পালানোর কথা স্বীকার করেনি। কিন্তু জানতে কারোই আর বাকি থাকেনি। কারণ এই পাড়ারই এক ছোঁড়ার সংগে ঘর ছেড়েছিল অনীতা। পাড়ায় এই কেচ্ছা নিয়ে অনেকদিন মেয়েমজলিস বেশ জমে উঠেছিল। কারো কারো মত পালানোটা পরের কথা আসল ব্যাপার অবস্থা নাকি এতদূরে গুরুতর হয়ে উঠেছিল যে অনীতার পা ঢাকা দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। কথাটা প্রথম যখন শুনেছিল মানেটা ঠিক বোঝেনি, পরে কদর্থটা বোধগম্য হতে কানটান লাল হয়ে উঠেছিল।

আসলে পাড়ায় অনীতার যতই নিন্দে হোক তপতী ওকে খুব বেশী দোষ দিতে পারে না। মেয়েটা সরল মেয়েটা বোকা মামাবাড়িতে গলগ্রহ হয়ে রয়েছে। পড়াশোনার খুব ইচ্ছে ছিল মেয়েটার কিন্তু মামী বাজে খরচ করতে নারাজ তাই ক্লাস নাইনেই স্কুলের পাঠে ইতি হয়ে গেছে কয়েক বছর হল। মুখ বুজে সংসারের খাটুনি খাটে, কিন্তু তবু কারো কাছে ভাল মুখ পায় না। এদিকে মামীর একটি লক্কা ভাই আজ তিন বছর ধরে মেডিকেলে রগড়াচ্ছে। সেও এ বাড়িতে থেকেই পড়ে। মামা অম্লান বদনে তার সমস্ত খরচ-খরচা আর আবদার বহন করে চলেছেন। শ্যালক বলে কথা! আসলে গোটা পরিবারটাই অশিক্ষিত। মামাও বেশিদূর লেখাপড়া শেখেননি কিন্তু ডানলপ ফ্যাক্টরিতে বেশ ভাল মাইনের চাকরি করেন। কি শনিবারে বিলিতি জল পান করে অধিক রাতে বাড়ি ফেরেন। কোনো কোনো রাতে মামা-মামীতে কুরুক্ষেত্রের মহড়া হয়।

ছাদের আলসের দিকে যেতে যেতে তপতী শুধোয় তুমি এ ছাদে ? কবে ফিরলে ?'

তপতীদের পিঠোপিঠি বাড়ি ধীরাবৌদিদের। তাদের ছাতেই দাঁড়িয়ে ছিল অনীতা। বিকেলের আলো মরে এসেছিল। কাছে যেতে তপতীর চোখে পড়লো অনীতার সিঁথিতে সিঁদুর। আরও শারীরিক পরিবর্তন চোখে পড়লো। মনে হল কথাটা যা রটেছিল ঠিকই তাহলে।

অনীতা মুচকি হেসে বলল, 'দিন সাতেক হল ফিরেছি, আবার শিগগীরই চলে যাব।'

'কোথায়?'

'কেন শ্বশুরবাড়ি। আমার যে বিয়ে হয়ে গেছে গো। ওমা জান না?'

তপতী সত্যিই জানতো না। পাড়ায় তারা কারো সংগে বড়একটা মেশেও না। সাত-পাঁচ কোনো কথায় থাকেও না। মা খুব অপছন্দ করে এসব। তাই মায়ের কানে যদি পৌঁছেও থাকে তো মা কখনোই তপতীকে জানানো প্রয়োজন মনে করেনি। ঝি লক্ষ্মীর মা এবাড়ি থেকে বিদেয় হতেই পাড়ার গেজেট বন্ধ।

'খুব খুশী হলাম অনীতা। তোমার বিয়ে হয়ে গেছে জেনে খুব খুশী হলাম। বর কি করে?'

বরের কথায় অকারণেই মাথায় কাপড় টেনে দিল অনীতা। একটু যেন লজ্জা পেল কেমন যেন আড়ষ্ট বোধ করলো। হাতের নখ খুঁটতে খুঁটতে বলল, 'ধানবাদে কিসের কোনি ব্যবসা আছে। ঘর ঠিক করেই আমাকে নিয়ে যাবে বলেছে।'

'বেশ, বেশ। একদিন তোমার বরের গল্প শোনাবে আমাকে, কেমন?'

অনীতা ঘাড় কাত করে বলল, 'একদিন যাবো তোমাদের বাড়ি মাসীমাকে প্রণাম করে আসবো। ভাল কথা, তোমাদের বাড়িতে নাকি ফিলিমের লোক এয়েচে?'

'ফিল্মস্টার? দূর বোকা, কে বলল?'

ধীরাবৌদি বলেচে? বলনা সত্যি, কে এসেছে? আমি কাউকে বলব না!'

'আমার সম্পর্কে এক মাসীমা, আর তাঁর ছেলে। ওঁরা কস্মিনকালেও সিনেমার কেউ নন। কিন্তু ধীরাবৌদি কোথায়? তিনি এতসব কোথা থেকে জানলেন?'

'ধীরাবৌদি সব জানতে পারেন গো সব জানতে পারেন। এই যে আমার—' বলেই হঠাৎ সামলে নিয়ে কয়েক সেকেন্ড চুপ মেরে থেকে কথাটা মাথা খাটিয়ে সামলে নিল অনীতা, 'ভুল হয়ে গেল বলতে ধীরাবৌদির কি হয়েছে কিছু জানো না?'

ধীরা বৌদিদের বাড়ি অনীতাদের লাগোয়া, পিঠোপিঠি হলেও কিছু দেখা যায় না। একমাত্র ছাদে উঠলেই তবে মুখ দেখাদেখি নইলে দুটো বাড়িই পরস্পরের দিকে পিঠ ফেরানো। এক বাড়ির সদর এ গলিতে অন্য বাড়ির ওপাশের রাস্তায়। ঠিক কলকাতার পথের মানুষের মত, গায়ে গায়ে লেপ্টে আছে তবু কেউ কারো মুখ দেখছে না, কথা বলা দূরের বিষয়।

'কই না! কি হয়েছে?' তপতীর চোখ কেমন ভীত বিস্ময়ে গোল হয়ে ওঠে।

'উনি তো মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছেন। গায়ে আগুন লেগে গিয়েছিল।

এখন একটু ভাল, তবে শয্যাশায়ী। ডাক্তার কবিরাজেরা বারণ করে গিয়েছে। গল্প করার লোক নেই তাই আমাকে ডেকে পাঠান যখন তখন।'

'বলো কি! আগুন লাগলো কি করে, স্টোভ ব্লাস্ট করে নাকি উনুন থেকে?'

অনীতা গলা লম্বা করে বাড়িয়ে স্বর নামিয়ে বলল, 'খোকোনদার সিগরেট-লাইটার থেকে সে অনেক কথা, পরে বলবখন।' পিছনে ঘাড় ফিরিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'যাই!' তারপর চোখের একটা ইসারা করে তপতীকে জানালো, টনক নড়েছে! চলি। একবার এসো না হয়?'

অনীতা ছাদ থেকে নেমে গেল। তপতী একা হতেই নানা চিন্তা তাকে কুয়াশার মত ঘিরে ফেলল। বাইরের দৃশ্য এবং শহরের কোলাহল মৃদু থেকে মৃদুতর হতে হতে কখন মিলিয়ে এল। একটু আগের ঘটনাগুলোই ভাবছিল তপতী।

বাল্যকালের খেলার সাথী পনু হঠাৎ এখানে এপাড়ায় কেন! কদিন থেকে তাকে নাকি লক্ষ্য করে যাচ্ছে। একথার অর্থই বা কি। তাকে দেখেছে তো ডেকে কথা বলেনি কেন? এপাড়ার গাড়াকা দিয়েই বা রয়েছে কেন? বলু কি মারা গেছে? অমন সুস্থ সবল সুন্দর ছেলেটা কি করে মারা গেল। পনুকে তো শুনেছিল অ্যারেস্ট করেছে। তাহলে এত তাড়াতাড়ি ছাড়াই বা পেল কি করে? তাকে যে অলক্ষ্যে থেকে পত্রাঘাত করে যাচ্ছে তার সঙ্গে পনুর কোনো সম্পর্ক নেই তো? কথাটা ভাবতেই কেমন সর্বাঙ্গে শিহরণ খেলে গেল। আপন মনেই সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে দৃঢ় প্রতিবাদ জানালো, না না। এ হতেই পারে না। সঙ্গে সঙ্গে অন্য দৃশ্যে মনোযোগ ঘুরে গেল ধীরাবৌদি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল কেন? খোকনদার সিগারেট লাইটারটাই বা তাঁর কাছে কেন এল! খোকনদা। ইয়েস খোকনদা। হি ম্রে বি খোকনদা বন্দনা। একটা দিনের স্মৃতি কাঁচা ঘায়ে চোট লাগার মত ছিলছিলিয়ে উঠলো। ধীরাবৌদিদের ছাদের সিঁড়িতে ঠিক একটা শিকারী বেড়ালের মত খোকনদা ওৎ পেতে ছিল।

মনটা কেমন হঠাৎ তেতো হয়ে গেল তপতীর। তপতী জানে না, বড় হতে গিয়ে সব মানুষেরই এইরকম এক-আধটা লজ্জা ঘৃণা তিক্ততার জংলে চিহ্ন থেকে যায় ভেতরে ভেতরে। অনেক কথা ভুল হয়ে যায়, অনেক বড় বড় ঘটনাও একদিন ভ্যানিশ হয়ে যায় কিন্তু এইসব ক্ষুদে ক্ষত চিহ্নগুলি মোছে না। এরা জীবনভোর অচল পয়সার মত মানুষের পকেটের তলায় পড়ে থাকে।

মানুষের মন কোনো স্থির ছবি দেখতে পায় না এই যা রক্ষে, কোনো একটা ছবির সামনে স্থিরজ্ঞানু হয়ে সে কখনো বসে না। চলচ্চিত্র নিয়ে তার কারবার। তপতীর মনেও ছবি পাল্টালো। চা দিতে গিয়ে অতনুকে সে প্রথম মুখোমুখি দেখলো। তা সত্যি, রূপোলি পর্দার নায়ক হবার যোগ্যতা অতনু রাখে। অমন সুন্দর ঢেউখেলানো চুল, লালচে কপাল ছড়ানো গড়ানো, গোঁফ কামানো কিন্তু ঝুলফি ধারালো অস্ত্রের মত ঝুলে আছে, সেই সঙ্গে ওর নাক, ঠোঁটের ধার, এবং চোখে নীল আকাশের ছায়া বুকের ভেতরটা কেমন মুচড়ে দেয়। অতনুকে চা দিতে গিয়ে তপতী চা ছলকে ফেলল। খাবারের ডিশ হড়কে গিয়ে হাতে হাত ছোঁয়াছুঁয়ি হল। লজ্জা পেয়ে তপতী দ্রুত পালিয়ে এল, পালিয়ে সোজা ছাদে।

তপতীর মনের ভেতরটা কেমন গুনগুন করে উঠলো। আহা তার পত্রলেখক যদি অতনু হত, অন্ততঃ অতনুর মত কেউ, তাহলে বেশ হত। কিন্তু বাস্তবে কি সব সময় মনস্কামনা পূর্ণ হয়? বরং যা চাওয়া যায় তার ঠিক উল্টোটাই হয়। হয়ত দেখা যাবে বন্দনার কথাই ঠিক। যে চিঠি নিয়ে তারা তোলপাড় করছে, যে চিঠি তার চোখের ঘুম আর মুখের গ্রাস কেড়েছে। তার পিছনে নিতান্তই অ্যান্টিরোমান্টিক ব্যাপার। এমন মুখ যা মুখোসের থেকেও কুৎসিত। ওর কথাগুলো যেন এখনো কানের মধ্যে জ্বলছে পারভার্ট বুড়োহাবড়া কেউ নয়ত ইয়ং কিন্তু খুব কুচ্ছিত দেখতে, যে জানে তার দিকে তুই ফিরেও তাকাবি না কখনো!

আচমকা পিছন থেকে কে যেন তপতীর চোখ টিপে ধরল।

এই নির্জনে একা একা আপন মনে নানা কথা ভাবছিল তপতী তাই বুঝি পায়ের শব্দ টের পায় নি। অথবা যে এসেছে, খুবই পা টিপে টিপে এসেছে, তপতীকে অবাক করে দেওয়াই তার উদ্দেশ্য।

হঠাৎ বলে কেমন একটু ভয়ই পেয়ে গিয়েছিল ও। তাই কাঁপা কাঁপা গলায় চেঁচিয়েই উঠেছিল, 'আরে একি হচ্ছে!'

যে চোখ টিপেছিল সে ছাড়ল না, ধরেই থাকল।

'কে?' তপতীর গলার স্বর স্থির এবং কঠিন। ভয়ের ধাক্কা কেটে গিয়েছে। এবাড়িতে চোখ টিপে ধরবার কেউ নেই। অনীতা হতে পারতো, সে এইমাত্র নেমে গেল। ধীরাবৌদি অসম্ভব ছিল না, কিন্তু তিনি শয্যাশায়ী। বন্দনারা বাড়ি ফিরে গেছে এত তাড়াতাড়ি আবার আসা সম্ভব নয়, কেনই বা আসবে।

তবে! সে নয় তো। রক্তোচ্ছ্বাসে মুখটা গরম হয়ে উঠলো। এত অচেনা, এখনো যে ভাল করে আলাপই হয় নি, তার পক্ষে কি ছাদে উঠে আসা সম্ভব? আরও এলেও এরকম আচরণ, ছি ছি! ঘাড়ের ওপর কবোষ্ণ নিঃশ্বাস এসে পড়ছে। তপতী নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল, পারল না। হাত দিয়ে ছুঁয়ে চেনবার চেষ্টা করল। যে ধরেছে সে পুরুষ, তপতীর চেয়েও মাথায় লম্বা হাতে শুধু মোটা কোঁকড়া লোম। বালা, কিম্বা ঘড়ি কিছু নেই, অতনু নয়, পনু নয়, অতএব?

এবার ভীষণ ভয় পেয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো 'ওঃ মাগো!'

চোখ মুক্ত হয়ে গেল তপতীর। ছাদ ফাটিয়ে হেসে উঠলো লোকটা।

'এত সহজেই ভয় পাস তুই। কলেজে ঢুকেও জুজুর ভয় গেল না দেখছি—'

হঠাৎ চোখ খুলেই আলোর ধাঁধা লেগে গিয়েছিল, ভাল করে চোখের পাতা মেলতে পারছিল না তপতী তবু মানুষটাকে চিনতে আর [illegible] ছিল না। ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পা[illegible] যার কথা, সেই ওকে আচ্ছাসে [illegible] করে ছেড়েছে। আশ্চর্য মানুষ! [illegible] হায়ার সেকেন্ডারী টেস্ট পরীক্ষার সময় উধাও হয়েছিল আর এই।

তপতী হেসে ফেলল 'ভূত কোথাকার! এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিলি কি বলব! বলি, ছিলে [illegible] চুলোয় এতদিন? একখানা চিঠিও তো দাও নি। একটুও যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে তোমার, ভবদা! বাবা-মা কত চিন্তা করে তোমার জন্যে তা তো আর জানো না?'

ছাদের আলসের ওপর লাফিয়ে উঠে বসেছিল ভবনাথ, আর হাসছিল পরিতৃপ্তির হাসি। একমুখ দাড়ি, চুলে জট পড়েছে, কটে গেছে। পরনে একটা আধময়লা ধুতি আর নতুন কেনা হাফসার্ট। দুগ্ধধবল শার্টের সঙ্গে আধময়লা নীলাভ ধুতিখানা চোখে লাগে। কিন্তু ভবদা নির্বিকার। সে বরাবর ওই রকমই। খাওয়াপরা শোওয়া নিয়ে মাথা ঘামায় না। সংসারে থেকেও সংসারের বাইরে। কোনো লৌকিকতার ধার ধারে না। কে কি ভাববে, কে দুশ্চিন্তায় থাকবে এসব ভবনাথের হিসেবের বাইরে। ম্যাগনিফায়িং গ্লাসের মত তীক্ষ্ণ লেন্সের চশমার ভেতর দিয়ে সে তার পছন্দমাফিক জিনিস দেখে।

'কি হাসলেই ফুরিয়ে গেল, না?' তপতী ভুরু কুঁচকে ধমক লাগায়, 'বলি ছিলে কোন্ চুলোয়? কোথায় ছিলে, আঁ?'

এ বাড়িতে বোধ হয় এই একজনের কাছেই কাবু ভবনাথ। সামান্য খুনসুটি, সামান্য ঠাট্টাতামাসা বা গল্পস্বল্প এক তপতীর সঙ্গেই। নইলে ঘরে দোর দিয়ে নয়ত দোর ভেজিয়ে রাতদিন অঙ্ক কষছে, নতুন নতুন থিওরী ফাঁদছে, রাশি রাশি বিচিত্র সব বই পড়ছে। দিন গড়িয়ে রাত আসছে হুঁশ নেই। রাত দুটো তিনটের সময় উঠেও কত রাতে তপতী ভবদার ঘরে আলো দেখেছে। চুপি চুপি উঁকি দিয়ে দেখেছে, উস্কোখুস্কো চুলে উবু হয়ে বসে ভবদা দিস্তে দিস্তে কাগজে কি সব

লিখছে। আবার সকাল সাড়ে দশটায় স্কুলে বেরোনোর মুখে কোনোদিন দেখেছে খানতিনচার থান ইট সাইজের বই মাথায় দিয়ে ভবদা ভোঁসভুঁসিয়ে ঘুমোচ্ছে। ভবদা ওই রকমই। আবার বাড়িতে আছে আছে উধাও। কোথায় সাত দশ পনের দিন কাটিয়ে ফিরে এল কাঁধে শুধু কাপড়ের ঝোলা ব্যাগ একটা।

বাবা বলেন, 'ছোঁড়ার মাথায় গোলমাল নইলে অমন ব্রিলিয়ান্ট স্কলার কি আর ভেরেণ্ডা ভেজে বেড়ায়!'

তা সত্যি! ভবনাথ এম-এসসি-তে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হয়েছিল। কি হল একবার দুম করে আমেরিকা ঘুরে এল কিন্তু তারপর আর কোনো প্রোগ্রেস নেই খাচ্ছে দাচ্ছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাল ভাল চাকরির ইন্টারভিউও পেয়েছে, কিন্তু সিলেকশন বোর্ডের প্রশ্নের উত্তরে এমন সব কথাবার্তা কয়ে এসেছে যা সেইসব দিকপালেরা বাপের জন্মে শোনেন নি। আসলে ভবনাথ হয়ত চাকরি করতে চায় না হয়ত কিছু করতেই চায় না। হয়তো কোনো অদ্ভুত ফিলজফির ভূতে তাকে কিলোচ্ছে। তার ধারণা মানুষের কিছু করার নেই। সংসার, সফলতা, উন্নতি-ফুন্নতি সব হাস্যকর। মনুষ্যজীবন ব্যাপারটাই হাস্যকর। তাই সে নিজেই হাস্যকর।

ছোটবেলায় তপতী বলতো, 'তোমার ইস্কুরুপ ঢিলে আছে, ভবদা।'

ভবনাথ হাসতো, বলতো, 'হতেই পারে, আমার সব প্যাঁচ কেটে গেছে যে—'

ওর কথাগুলো ওই রকম, আপাত সরল কিন্তু কোথায় যেন বাইপাস আছে। একটা গভীর কিছু, একটা আলাদা কিছু। যা তপতী সেই বয়সে, হয়ত এই বয়সেও ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। অসহিষ্ণু চোখে তাকিয়ে থাকল তপতী, তার প্রশ্নের কোনো উত্তর দিচ্ছে না ভবনাথ।

'ইলেকট্রিক চুল্লিতে নিশ্চয় নয়,' ছাদের আলসের ওপর বিপজ্জনকভাবে বসে আর একচোট হাসতে থাকে ভবনাথ, 'সংসারের সব চুলোই এখন নেভানো বুঝলি, তপশে। শুধু গায়ে মাথায় ছাই মাখামাখি হয়।'

'তুমি নামবে ওখান থেকে, মশাই? নাকি একটা কেলেঙ্কারি ঘটাবে!'

তপতীকে এক সময় তপশে মাছ বলে খেপাতো ভবনাথ। আজ তপতী খেপলো না, বরং ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে গেল ভবনাথের দিকে, তারপর হাত ধরে টানলো 'নামো। পাঁচিলের ওপর থেকে নেমে দাঁড়াও, ভবঘুরেদা। সারাদিন খাওয়া হয় নি নিশ্চয়? চা খাবে? দাঁড়াও আমি চা জলখাবার আনছি নিচে থেকে।'

ভবনাথ লাফিয়ে নামতে নামতে বলল ওয়াণ্ডারফুল বলেছিস। ভবঘুরেদা! বিস্ময়কর গেছোদাদার পরে মানুষের এই আর একটা রিমার্কেবল নামকরণ হল। কি যেন কথাটা, ভবঘুরেদা? রিয়্যালি ওয়াণ্ডারফুল! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—'

ভবনাথ হেসেই অস্থির, হেসে চলেছে তো হেসেই চলেছে। এই কথাটার মধ্যে এত হাসির গিরকিরি কোথায় লুকিয়ে ছিল তপতী ভেবে পেল না।

কৃত্রিম বিরক্ত গলায় বলল, 'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কন্টিনুয়াস হাসো, হাসতেই থাক, যাতে লোকে তোমাকে পাগল ঠাওরায়—'

'ওহ, তপশে! এই সংসারে কে পাগল নয় বলতে পারিস? তোদের রবিঠাকুর কি বলে গেছেন মনে নেই? পাগল যে তুই কণ্ঠ ভরে জানিয়ে দে তাই জানিয়ে দে.. কি, গানটা শুনেছিস কখনো? আসলে দুই জাতের লোক আছে এই দুনিয়ায় দেয়ার আর ব্যাড ম্যান অ্যাণ্ড ম্যাড ম্যান। কেউ যদি আমাকে পাগল ভাবে আমি গর্বিত হব—'

'তা হয়ো এখন তার আগে কিছু সলিড ফুড নিয়ে আসি খাও। নিশ্চয় সারাদিন খেয়াল করে খাওয়াই হয় নি। কি খাবে বলো?'

মন্দ বলিস নি—

'কি খাবে বলো, ভবদা, তপতী উল্লসিত হয়, 'তোমার ফেভারিট চাণ্ডা আনবো না চা-কেক খাবে, না অন্য কিছু?'

ভবনাথ এক সময়ে চায়ের সঙ্গে ডিম খুব পছন্দ করতো। তপতী তার মাকে দেখেছে ডিমের নানারকম ভ্যারাইটি করে খাওয়াতো।

'দুনিয়ায় ক্ষিদে ব্যাপারটাই আসল, খাওয়া ব্যাপারটা কিছু না! কথাটা অবিশ্যি তুই ঠিক ধরতে পারবি না। বড় হলে—'

তপতী হঠাৎ ক্ষেপে গেল এই কথা শুনে, 'আমি কি কচি খুকীটি নাকি! তোমরা সব সময় যে বড় হলে বড় হলে—বলো। আমি তোমাকে...তোমাদের সব চালাকি ধরে ফেলেছি। আমার চোখে তোমরা কেউ ধুলো দিতে পারবে না!'

কথার কথা হিসেবেই কথাটা বলতে শুরু করেছিল তপতী কিন্তু শেষটায় যেন তার মনের মধ্যে উড়ো চিঠির ব্যাপারটাও উঁকি দিল। তাকে নিয়ে এই খেলা আর বেশিদিন চলবে না, সব ষড়যন্ত্র জাল ছিঁড়ে আসল মানুষটাকে তপতী টেনে বের করে আনবে। এনে এই লুকোচুরির উচিত শাস্তি দেবে।

ভবনাথ আর এক ঝাঁক ছররা হাসি হেসে বলল, 'হুঁ। বড়োত্বের সব লক্ষণ-গুলোই তোর মধ্যে ইদানীং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে রে। তুই আলবত বড়ো হয়েছিস নইলে চালাকি শিখলি কি করে। সব কিছুকে দেখামাত্র সন্দেহ করা, সেও বড়-মানুষীরই লক্ষণ। তবে তুই যেটাকে ষড়যন্ত্র ভেবে চলেছিস সেটা আদতে তা নাও হতে পারে।'

তপতী চমকে ভবনাথের চোখের দিকে তাকালো কিন্তু সে চোখ তখন দুর্ভেদ্য। বিকেলের আলো অনেকক্ষণ মরে গিয়েছিল, তবু সন্ধ্যার আভা ভবনাথের চশমার লেন্স দুটোর ওপর পড়ে ঠিক ফিল্ড গ্লাসের মত দেখাচ্ছিল। পিছনে আদিগন্ত ছাদের কলকাতা প্রসারিত কবরখানার মত অস্পষ্ট আলোর নিচে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। ভবনাথের দাড়ি জমানো মুখখানা সেই ব্যাক-গ্রাউণ্ডে ধাতুময় শিলুয়েট মূর্তির মত লাগছে।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তপতী বলল, 'নাঃ প্যাঁচ তোমার কাটে নি, ইস্কুরুপ আছেই।'

'আছেই।' ভবনাথ হাসলো, 'অ্যাণ্ড ইট লজড্ ইন মাই হার্ট। বুলেটের মত বহির্জগত নিক্ষিপ্ত, কিন্তু ইস্কুরুপটি অন্য লোকের মত আমার মগজবাসী নয়।'

'হৃদয়বাসী।'

'হ্যাঁ। মফস্বলী।'

'এবং একটু ঢিলে, তাই না?'

'ফেয়ারী টেলস টু ফায়ারী কোশ্চেন!' 'কি বলকে মাস্টার মশায়।'

'কুছ নেহী, তুম অন্দর বালিকা, খাঁ করকে খানা লে আও।'

বলেই আকাশ ফাটিয়ে হাসতে লাগলো ভবনাথ। ভবনাথের একটানা হাসিকে স্লাইসড রুটির মত কয়েক খণ্ড করে গাড়ির হর্ণ বাজলো গলির মধ্যে। তপতী তার হাল্কা শরীর নিয়ে ছাতের কিনারে ছুটে গিয়ে ঝুঁকে পড়লো। নিচে সে কি দেখতে পেল কে জানে ফিরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল 'আজ শুধু গেস্ট আর গেস্ট। বাব্বা আমাদের বাড়িখানা আজ গেস্ট হাউস হয়ে গেছে। কি দিনেই যে তোমার আবির্ভাব ঘটলো ভবদা মা-বাবা কেউ বোধহয় খবর জানেই না এখনো তাই না?'

কিন্তু যাকে লক্ষ্য করে বলা সে তখন ছাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সমাধি হওয়া সাধকের মত সাইলেন্ট হয়ে গেছে। গভীরতা এবং নীরবতা যেন একসঙ্গে জমাট বেঁধেছে। দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে সে কি যেন বলছিল। কিছু শোনা যাচ্ছিল না শুধু ঠোঁট নাড়াটাই চোখে পড়লো তপতীর।

কি ভেবে তপতী ভবদাকে আর ডাকলো না। যতদূর সম্ভব শব্দহীন পায়ে ছুটে নিচে নেমে গেল। যাবার সময় ছাতের দরজায় ওপিঠ থেকে খিল তুলে দিতে ভোলে ভুলল না।

(ক্রমশঃ)

মুখোশ নৃত্য গম্ভীরা

প্রদ্যোত ঘোষ

বকনৃত্য

বাংলাদেশের দার্জিলিং, ঢাকা, ময়মনসিংহ, পুরুলিয়া, চট্টগ্রাম ও মালদহের বিভিন্ন উৎসবকে কেন্দ্র করেই মুখোশ শিল্পধারার যাত্রা। এর মধ্যে গম্ভীরার মুখোশ বোধ করি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। হাজার বছরেরও বেশী এই শিল্পের আজ নাভিশ্বাস দেখা দিয়েছে। সে শিল্পধারার পুনরুজ্জীবনের জন্য চাই তার ব্যাপক গঠনমূলক প্রচার।

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবের গাজনোৎসব গৌড়বঙ্গের মালদহে এসে 'গম্ভীরা' নাম নিয়েছে।

'গম্ভীরা' শব্দটির অর্থ সুস্পষ্ট নয়। যদিও 'গম্ভীরা' শব্দের অর্থ—নিভৃত প্রকোষ্ঠ, মণ্ডপ বা দেবালয়। দেবাদিদেব মহাদেব দেবালয়ে থাকেন বলে শিবের পূজাকে বলে 'গম্ভীরা' এ অর্থ করা হলেও 'গম্ভীরা' পূজা উন্মুক্তস্থানে উৎসব উপলক্ষে মণ্ডপ নির্মাণ করেই হয় অনুষ্ঠিত, সুতরাং ঐ অর্থ নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া চলে না। চৈতন্যযুগে 'গম্ভীরা' শব্দটির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে নিভৃত প্রকোষ্ঠে শিবের অবস্থান থেকে গম্ভীরা অর্থে শিবপূজা—এ অর্থ নির্দিষ্ট হয়েছে। আবার শিবের অন্য নাম গম্ভীরদেব। তাঁর পূজাকে বলে গম্ভীরাপূজা। এ অর্থ করা গেলেও শেষ পর্যন্ত টেঁকে না। কারণ শিবপূজা বাংলার অন্য কোনস্থানে গম্ভীরা নাম না নিয়ে কেবলমাত্র গৌড়ে বা মালদহেই বা হলো কেন? এ সম্পর্কে সঠিক গবেষণার আজও আছে প্রয়োজন।

'গম্ভীরা' সম্পর্কে আজকে যে অর্থ প্রতিষ্ঠিত সেই অর্থ অর্থাৎ শিবপূজা তা নিয়েই তার মুখোশশিল্প সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। যুগপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী গম্ভীরাপূজা ও উৎসবের সঙ্গে সম্পৃক্ত 'সঙ্গীত' ও 'মুখোশনৃত্য'। মুখোশনৃত্যের আলোচনায় যাবার প্রাক্-লগ্নে গম্ভীরাপূজা ও উৎসবের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে।

আদিতে চৈত্রসংক্রান্তির আগের চারদিনের শিবের পূজাই 'গম্ভীরাপূজা'। উৎসব চারদিনের। ইদানীংকালে তিনদিনের, দুদিনের, কোন কোন স্থানে বা এক দিনের।

প্রথম দিন—ঘটভরা
দ্বিতীয় দিন—ছোটতামাসা
তৃতীয় দিন—বড়তামাসা
চতুর্থ দিন—আহারা (বোলবাই বা বোলাই)

গম্ভীরাপূজার সঙ্গে যুক্ত দুটি বিষয়, (১) গম্ভীরা সঙ্গীত, (২) গম্ভীরা নৃত্য।

এগুলি লোক-ঐতিহ্যানুসারী সঙ্গীত ও নৃত্য। গম্ভীরা গানে আদিতে শিবের নিকট কৃষিকাজ ও সম্বৎসরের খবরাখবর (রিপোর্ট বলে কথিত) গীত হতো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তাতে সামাজিক ও বিশেষ করে রাজনৈতিক বিষয়বস্তু প্রবেশ করে তার আবেদন হলো ব্যাপক। ধর্মের বন্ধনমুক্তির জন্য বাংলায় লোকসঙ্গীতের মধ্যে গম্ভীরা গানের আবেদন ব্যাপক।

দ্বিতীয়—'মুখোশনৃত্য'। মালদহের ভাষায় তাকে বলে 'মুখ-নাচ'। মুখ্যতঃ পৌরাণিক বিষয়কে কেন্দ্র করে মুখোশনৃত্য হওয়ায় স্বভাবতই তার সঙ্গীতযন্ত্র কেবলমাত্র ঢাক ও কাঁশি। কোন গান এখানে নেই। নৃত্য অংশ এখানে প্রধান, অন্যদিকে গম্ভীরা সঙ্গীতে গানই মুখ্য। 'বন্দনা' ও 'চারইয়ারী' অংশে কিছু কিছু নৃত্য আছে বটে, কিন্তু সে নৃত্য গৌণ। গম্ভীরা নৃত্য বলতে যাতে বিভ্রান্তি না ঘটে সে কারণ গম্ভীরার অন্য নৃত্যগুলিও 'মুখা-নাচের' অন্তর্গত।

পুরাণভিত্তিক চরিত্র এ নৃত্যে থাকলেও সেই জায়েই সে দাঁড়িয়ে থাকেনি। পরবর্তী পর্যায়ে সে গ্রামীণ পরিবেশের বহু উপাদানের দ্বারা তার নৃত্যের আকার ও প্রকারকে করেছে পল্লবিত। তার চোখে পড়েছে বকের দল, টাপা করে মাছ ধরার আনন্দ, মহিষ-রাখাল নৃত্য, চাষা-চাষাবৌ-এর ছবি। ধর্ম ছাড়াও লোকায়ত জীবনের প্রতি ঐকান্তিকতা এই নৃত্যধারাকে নিয়ে এসেছে জনগণের মধ্যে।

গম্ভীরার নৃত্য পরিপূর্ণ মুখোশ-নৃত্য নয়। কিছু মুখোশ, কিছু মুখোশহীন, কিন্তু সাজসজ্জাযুক্ত। একক ও যৌথ এই দু ধরনের নৃত্যই এখানে বর্তমান। সবগুলি নৃত্যে মুখোশ ব্যবহৃত না হলেও ঢঙে তারা মুখোশ নৃত্যেরই অন্তর্গত। তবে পইরী (পরী) ইত্যাদি নৃত্য দে[illegible], সেগুলিতে যে এক-সময় মুখোশ [illegible] হয়ত হত তা সহজেই অনুমেয়।

বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে গম্ভীরার মুখোশ-নৃত্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ—

(ক) পৌরাণিক—বাণ, কালী, বাশুলী, গৃধিনীবিষাণ, চামুণ্ডা, নারসিংহী, উগ্রচণ্ডা ঝাটাকালী, মহিষমর্দিনী, কার্তিক, গণেশ লক্ষ্মী, সরস্বতী, রাধাকৃষ্ণ রাম-লক্ষণ হিরণ্যকশিপু বধ, তারকাসুর বধ, শিবদুর্গা নৃত্য ইত্যাদি।

(খ) গ্রামীণ বা লোকায়ত চিত্র—বক, টাপা (জেলেদের বাঁশের কাঠি দিয়ে এক রকম মাছ ধরার পাত্র), গরুর দুধ দোহা, সাঁওতাল, কলসী কাঁখে বধূ ইত্যাদি নৃত্য।

(গ) প্রাণী সম্পর্কিত—সর্প, ব্যাঘ্র, হরিণ মহিষ ইত্যাদি নৃত্য।

(ঘ) সামাজিক—মাতাল, মেম সাহেব, বুড়াবুড়ি ইত্যাদি নৃত্য।

(ঙ) অন্যান্য—পইরী (পরী), বংশ (রণপায় আরোহণ করে নৃত্য), শব, যাদুকর চালি ইত্যাদি নৃত্য।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা স্মর্তব্য যে বিভিন্ন সময়ে এই নৃত্যগুলি এই মুখোশ-নৃত্যের ভিতরে অনুপ্রবেশ করেছে। কিন্তু

অনুপ্রবেশ করলেও তারা গম্ভীরার লোক-নৃত্যের ঢঙকে সার্থকভাবে রূপায়িত করতে বেগ পায়নি। লোকমানসকে সে তৃপ্ত করে হয়েছে ধন্য।

'টোটেম-স্মৃতি' বাংলায় সকল লোক-শিল্প বিশেষ করে মূর্তি ও মুখোশশিল্পকে প্রভাবিত করেছে। তার প্রকাশ প্রাণী সম্পর্কিত গম্ভীরার মুখোশেও। আদিতে সমস্ত মুখোশই ছিল নিমকাঠের। এখন কাঠ ছাড়াও অন্য উপাদান দিয়ে মুখোশ হয় তৈরী। শোলা, পোড়ামাটি এমন কি প্লাস্টার অফ প্যারিশ' কাপড়ের উপর পাতলা করে দিয়ে মাটি রঙ বা বার্নিশ করা হয়। তবে মালদহে পুরুলিয়ার মত মুখোশশিল্প বিশেষ গড়ে ওঠেনি। চিত্র-বিচিত্র জামাকাপড় চরিত্রভেদে তৈরী হয়। কালের পরিবর্তনে সাজ-সজ্জারও হয়েছে পরিবর্তন। কালী নারসিংহী, বাশুলী, উগ্রচণ্ডা, চামুণ্ডা ইত্যাদির মুখোশ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বৃহৎ।

ঢাকের বোল পাঁচ প্রকার। দেবদেবীর নৃত্য বিশেষতঃ কালী, চামুণ্ডা, নারসিংহী ইত্যাদি নৃত্যে এগুলি ব্যক্ত। এগুলিকে বলে সূত্র।

প্রথম সূত্র—আবাহন
দ্বিতীয় সূত্র—পূজাবাদ্য
তৃতীয় সূত্র—অঙ্গপ্রত্যঙ্গচালন
চতুর্থ সূত্র—লহরা
পঞ্চম সূত্র—বিদায়।

পাঁচ প্রকার সূত্র সাত প্রকার নৃত্যে প্রকাশ। পরে 'ল' দ্বিতীয় 'পরণ', তৃতীয় 'বিদায় বাদ্য' দিয়ে শেষ করা হয়। পৌরাণিক নৃত্যকে বলে বাণনৃত্য। মাধ্যমিক নৃত্য —ঝাটাকালী, শিবভাগবতী, কার্তিক লক্ষ্মী-সরস্বতী বুড়াবুড়ি সর্প ব্যাঘ্র টাপা মাতাল ইত্যাদি।

কয়েকটি বোল উপস্থিত করা যেতে পারে—

কালীনৃত্য—আবাহন :—
ধিং ধিং ধিধিং নাতিং
ধিন্ ধিনা তিং, ধিধিং নাতিং
ধিংনা ধিংনা, ধিধিং নাতিং
ধিং ধিনাধিং ধিধিং ধিনা
ধিনা ধিধিং

পূজা (ধুপধুনা দেওয়া হয় ও পূজা)—
ধিং ধিনা ধিনাক্ ধিধিং
ধিং ধিনা তিং নাতিং,
নাতিং ধিনাক্ ধিধিং ধিংনাতিং
নাতিং নাতিং নাতিং তিনাক্।

২। টাপা নৃত্য—
ধিনাধিং, নাক্ ধিনাধিং (টাপা ফেলে মাছ ধরাকালীন)
—তিনাক নাতিং তিনাক নাক ধিক ধিনাতিং তিনা, (পরে উগ্র হবে তারপর) গুড়় গুড়় গুড়় গুড়় করে মাছ ধরা ও বিদায়

ধ্রুপদী নৃত্যে 'অঙ্গহার' ও 'করণ' বর্তমান। গম্ভীরার এ নৃত্য লোকনৃত্য হওয়ায় ধ্রুপদীনৃত্যের বিশিষ্ট অঙ্গহার ও করণ সুস্পষ্টভাবে ধরা না পড়লেও মিশ্র-

কালীনৃত্য

নৃত্যের ঢঙে নিজস্ব এক প্রাণবান লোক-রীতিতে সে প্রতিষ্ঠিত। এ নৃত্যে 'সিংহপদ' ও 'ব্যাঘ্রপদ' লক্ষণীয়।

গম্ভীরার মুখোশনৃত্য আচারভিত্তিক হলেও তাতে কিন্তু কাহিনীরও অভাব ঘটেনি। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে কাহিনীকেও গ্রহণ করেছে বৈচিত্র্যসৃষ্টির জন্য যা একান্তই লোকঐতিহ্যানুসারী। কাহিনী কখনও বা নাট্যিক আবেদনে ঋদ্ধ। মূকাভিনয় হয়ত বা মুখোশনৃত্যের প্রাক-পর্বের সৃষ্টি। সেটিও এখানে বর্তমান। ছন্দোময় গতির ভাষা দিয়ে তৈরী হয়েছে গম্ভীরার নৃত্যের অনেক লোকায়ত ছবি। গম্ভীরা পূজা ও উৎসব উচ্চবর্ণের হিন্দু অপেক্ষা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা বেশী অনুষ্ঠিত হয়। রাজবংশী, পুণ্ড্রক্ষত্রিয়, জেলে-মালোরাই এ উৎসবের প্রধান অংশ-গ্রহণকারী। কোন কোন পূজা ও উৎসব পুরোপুরি তাদের দ্বারাই হয় অনুষ্ঠিত। গম্ভীরা উৎসব সুপ্রাচীন উৎসব। স্বভাবতই মুখোশনৃত্য ও সংগীতও সেই সময়েই জন্মলাভ করেছে। হিউ-এন-সাঙের বিবরণে গৌড়ে গম্ভীরার ন্যায় এক উৎসবেরও আছে উল্লেখ। রাজা শশাঙ্ক গম্ভীরা উৎসবে যোগ দিতেন। পালরাজারা ছিলেন এর পৃষ্ঠপোষক। সূর্যপূজা পরবর্তী পর্যায়ে ধর্মপূজা—শিবপূজা অর্থাৎ গম্ভীরায় রূপান্তরিত হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। সূর্যোৎসব এবং শিবোৎসবকে কেন্দ্র করেই মুখোশনৃত্যধারায় যাত্রা। সূর্য জীবনের উৎস বলে। জীবনের উজ্জ্বল অভিব্যক্তি ঘটে এ উৎসবাদিতে।

হাজার বছরেরও প্রাচীন গম্ভীরাপূজা এবং তার নৃত্য অনেক পরিবর্তনের পথ-পরিক্রমা করে আজও চলেছে। লোক-সংস্কৃতির এক অমূল্য নিদর্শন 'গম্ভীরা'।

বাংলার লোকনৃত্যের এক মূল্যবান নিদর্শন গম্ভীরার মুখোশনৃত্য দ্রুত নিশ্চিহ্ন হচ্ছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটে। ঐতিহ্যপ্রেমী সংস্কৃতিবান মানুষের তাই তার পুনরুজ্জীবনের জন্য সচেষ্ট হওয়ার দায়িত্ব আছে বলে আমার বিশ্বাস।

পুনশ্চ

পুনশ্চ

পুনশ্চ

দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী—অভাব বা দারিদ্র্য মানুষের সমূহ গুণেরই বিনাশসাধন করে, সমস্ত সদগুণকেই নিগুণ করে দেয়। দারিদ্র্য মানসিক সাহসকে অবদমিত করে, করে ভীতি উৎপাদন। বহু শিক্ষিত সৎ ব্যক্তির জীবনও অভাবের তাড়নায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে লাঞ্ছিত হয়েছে। কোন সাহিত্যকার্য অভাবে স্বচ্ছলতা বা প্রাচুর্যের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্পন্ন হতে পারে। অভাব অনটন বা দারিদ্র্যের পেষণে তা যে সম্ভব নয় এ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। প্রতিভা থাকলেও তা যে অস্বচ্ছলতার মধ্যে স্ফুরিত হতে পারে না একথা অবিসংবাদী সত্য। কোনাটিনাম্মাখা কুসুমও যেমন জলা-ভূমের নির্বিশেষে দৃষ্ট হতে পারে না কোরকের মধ্যেই তার বিনাশ ঘটে সুবাস বিচ্ছুরিত হবার সুযোগ পায় না তেমনি অর্থাভাব দুঃখ-কষ্ট ও দুরবস্থার নিষ্পেষণের মধ্যেও কোন প্রতিভা বিকশিত হবার সুযোগ পায় না।

এই দারিদ্র্য জীবনের সর্বক্ষেত্রকেই কলুষিত করে থাকে—মানুষের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে। সে কারণ যে কোন প্রগতিশীল রাষ্ট্র সর্বকালেই মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করার জন্য সর্বদাই তাদের জন্য প্রযত্নবান। হন এবং তাকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। অপর দিকে দারিদ্র্য মানুষের মধ্যে যেমন হীনতাভাব এনে দেয় তেমনি তার বহু গুণ থাকা সত্ত্বেও সে সকলও যেন তেমনভাবে সাধারণ্যে স্বীকৃত হয় না এই দারিদ্র্য দোষের জন্য।

বিশেষ করে সাহিত্যসেবীদের ক্ষেত্রে এই উপমার নিদর্শন প্রকটভাবে চোখে পড়ে। অনেক শক্তিধর কবি ও সাহিত্যিককে দেখা গিয়েছে, যাঁদের সাহিত্যকার্য অভাবের তাড়নায় ব্যর্থ হয়েছে—অকালে জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছে। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে প্রতিভার বিকাশ ঘটেনি এমন নিদর্শনেরও অভাব নেই।

স্বাধীনতা লাভের পর দেশে সাহিত্যিক-দের জন্য বিভিন্ন সরকারী পুরস্কার ব্যতীত কয়েকটি সংস্থা থেকেও কিছু কিছু সাহিত্য-পুরস্কারের ব্যবস্থা হয়েছে বটে, কিন্তু তার সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। সাহিত্যিকদের জন্য মাসিক সরকারী ভাতারও কিছু ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তাও পর্যাপ্ত নয় এবং এমন ধরাবাঁধা মুষ্টিমেয় মানুষের জন্য বিধিবদ্ধ যে, তার সুযোগ গ্রহণ করা যথার্থ প্রয়োজনীয় ব্যক্তির পক্ষে দুঃসাধ্য বললেও অত্যুক্তি হয় না।

এখানে আমরা এই সমূহ উক্তির পরিপ্রেক্ষিতেই 'সাহিত্য-সংবাদ' নামক মাসিক পত্রিকার ১৩২০ সালের ভাদ্র সংখ্যা হইতে দারিদ্র্য ও প্রতিভা নামক একটি নিবন্ধ এস্থলে উদ্ধৃত করে দিলাম। দুঃখের বিষয় নিবন্ধটির সঙ্গে লেখকের নাম না থাকায় এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হল না।

দারিদ্র্য ও প্রতিভা

প্রতিভার পূর্ণচন্দ্র দারিদ্র্য-রাহুগ্রাসে হীনপ্রভ হয়। বাঙ্গালার বহু প্রতিভা-কুসুম উপযুক্তরূপ উৎসাহ-বারি সেচনের অভাবে মলিন হইয়া আছে। আমরা পুনঃ পুনঃ এ কথা কহিয়া আসিতেছি, পুনঃ পুনঃ এতদ্বিষয়ে সহৃদয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আসিতেছি। কিন্তু অনেক সময়ে অনেকে এতদ্বিষয়ে আমাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন—'প্রতিভা আপনিই প্রস্ফুটিত হয়, সে কোন সাহায্যের অপেক্ষা করে না।' কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা কি দেখিতে পাই? উপযুক্ত জলসেক ভিন্ন বীজ কচিৎ অঙ্কুরিত মুকুলিত ফলপুষ্পসমন্বিত হয়। আশ্রয় অবলম্বন না পাইলে প্রতিভা কখনই প্রস্ফুট হইতে পারে না। সাহিত্যের ইতিহাস— সাহিত্যসেবীগণের জীবনবৃত্ত— আলোচনা করিয়া দেখ, দেখিবে—দারিদ্র্যের দাবদাহে পড়িয়া কখনও কোনও প্রতিভা-কুসুম প্রস্ফুটিত হয় নাই।

বিলাতের 'রয়েল লিটারেরি ফণ্ডের' ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম সাম্বৎসরিক অধিবেশনে এই কথার আলোচনা হইয়াছিল। পূর্ব্ববর্তী অধিবেশনে লর্ড রোজবেরি বলিয়াছিলেন, 'দারিদ্র্যের মধ্য হইতেই সাহিত্যের অত্যুৎকৃষ্ট সম্পৎ প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু ধনৈশ্বর্য্যে প্রতিভা খর্ব্ব করে।" অর্থাৎ যে সাহিত্যসেবী যত দরিদ্র হন, তাঁহার রচনা তত মনোহারিণী হইয়া থাকে। এ বৎসরের অধিবেশনে ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড কার্জ্জন রোজবেরির মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন। লর্ড কার্জ্জন দেখাইয়াছেন, দারিদ্র্যের মধ্যে পড়িয়া কখনও কোন প্রতিভা বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই। তিনি একে একে বায়রণ বার্ন্স চসার চ্যাটারটন গোল্ড স্মিথ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'বায়রণের প্রতিভা অবিসম্বাদিত; কিন্তু তিনি 'পিয়ার' বা ধনবান ছিলেন। বার্ন্স যদিও কৃষিকার্য্যে জীবনাতিপাত করেন; কিন্তু অর্থসম্পত্তি-শালী পর হইতেই তিনি সুলেখক মধ্যে গণ্য হন। চসারের অবস্থা শোচনীয় ছিল বটে, কিন্তু যে সময় তাঁহার পরিবর্ত্তন হয় তখনি তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। নিঃসম্বল অবস্থায় অনেক সময় অনাহারে দিন কাটাইতে হইয়াছিল বলিয়া চ্যাটারটনের প্রতিভার স্ফুরণ হয় নাই। গোল্ডস্মিথ মৃত্যুকালে দুই সহস্র পাউণ্ড ঋণগ্রস্ত ছিলেন বটে, কিন্তু যখন তাঁহার অবস্থা ভাল ছিল, তখনই তাঁহার অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থসমূহ রচিত হইয়াছিল। সেক্সপিয়ার মিলটন এডিসন সুইফট, পোপ ড্রাইডেন বার্ক মেকলে শেলি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ডিকেন্স টেনিসন—কাহাকে রাখিয়া কাহার কথা বলিব? ইঁহাদের কেহই দারিদ্র্যের নিপীড়নে নিপীড়িত হন নাই। [illegible]

দ্র ছিলেন না। সকলেরই অবস্থা সচ্ছল ল। কেহ কেহ বা অতুল ধনসম্পদের ধিকারী ছিলেন। হোরেস, ভার্জিল, গেটে, ন্তে—কাহারও দারিদ্র্যের পরিচয় পাওয়া য় না। ভল্টেয়ার প্রথমে দরিদ্র ছিলেন টে: কিন্তু লটারীতে বহু অর্থ প্রাপ্ত হন। স্য-ব্যবসায়ে এবং সৈন্যদলের রসদাদি রবরাহে তিনি বহু অর্থ উপার্জন করিয়া-ছলেন। সেই হইতেই তাঁহার প্রতিভার স্ফূর্তি। ধনকুবেরগণ সাহিত্য-সংসারে প্রবেশ রেন না—তাহার কারণ, তাঁহাদের চিত্ত ন্য দিকে প্রধাবিত হয়। নচেৎ তাঁহারা চেষ্টা করিলে, সাহিত্যের বহু উপকার াধিত হইতে পারে।'

লর্ড কার্জ্জন পাশ্চাত্য দেশের যে দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন, আমাদের দেশেও সে দৃষ্টান্ত জাজ্জ্বল্যমান দেখিতে পাই। এদেশের কোনও কবি, কোনও লেখক নিরন্ন অবস্থায় কেবল প্রতিভার প্রভাবে, কখনও যশের জয়মাল্য লাভ করিতে পারেন নাই। শাস্ত্র গ্রন্থ মধ্যেও এবম্বিধ দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। রাজর্ষি জনকের আশ্রয় লাভ করিয়া তাঁহার উৎসাহ-বারি-নিষেকে কত প্রতিভা-কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। ১ সেই দূর অতীতের অন্ধতমাচ্ছন্ন গহ্বর হইতে এতদ্দৃষ্টান্ত অনুসন্ধান করিবার আবশ্যক নাই। লোকলোচনের অন্তর্ভুক্ত ইতিহাস এ সম্বন্ধে কি সাক্ষ্য দিতেছে? প্রতিভার মধ্যাহ্ন-তপন কালিদাস দরিদ্র ছিলেন। কিন্তু রাজচক্রবর্তী বিক্রমাদিত্যের আশ্রয় লাভ করিয়াই তাঁহার প্রতিভা পরিস্ফুট হয়। ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, বেতালভট্ট শঙ্কু, ঘটকর্পর, বরাহমিহির, বররুচি—রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসদাষ্টক সাহিত্য-সংসারে কিরূপ খ্যাতি—প্রতিপত্তিসম্পন্ন, কে না তাহা অবগত আছেন? বিক্রমাদিত্যের অনুগ্রহলাভ না করিলে তাঁহারা কি এ সংসারে স্মরণীয় স্মৃতি রাখিয়া যাইতে পারিতেন!

মহাকবি ভবভূতি—কান্যকুব্জরাজ যশোবর্ম্মার অনুগ্রহ-লাভে নাট্য-সাহিত্যে অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। শিলাদিত্য হর্ষবর্ধন—শ্রীহর্ষ নামে সাহিত্য-সংসারে প্রতিষ্ঠান্বিত। তিনি কান্যকুব্জের অধীশ্বর ছিলেন। অশেষ ধনসম্পদে পরিবৃত থাকিয়াও তিনি সাহিত্যে 'রত্নাবলী' রত্ন রাখিয়া গিয়াছেন। আর তাঁহারই আশ্রয়-তরুতলে থাকিয়া বাণভট্ট 'কাদম্বরী', 'হর্ষ-চরিত' প্রভৃতি রত্নাবলীতে ভাষাসুন্দরীকে সাজাইয়া গিয়াছেন। রাজচক্রবর্তী লক্ষ্মণ-সেনের এবং পুরুষোত্তমের অধিপতি রাজা আনন্দদেবের উৎসাহ না পাইলে জয়দেব-কুসুম কি কদাচ প্রস্ফুটিত হইত? মিথিলাধিপতি শিবসিংহের আশ্রয়ে বিদ্যাপতির বিদ্যাবত্তা প্রকাশ পায়। মহাকবি কৃত্তিবাসের অবস্থাও অসচ্ছল ছিল না। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ 'রাজা' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। গৌড়েশ্বরের নিকট শ্লোক ভেট দিয়া তিনি গৌড়েশ্বরের কৃপা-লাভ করিয়াছিলেন। উৎকলের অধিপতি রাজা নরসিংহ দেব, মহাকবি কাশীরাম দাসের এবং তাঁহার ভ্রাতা 'জগন্মঙ্গল'—প্রণেতা গদাধরের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আড়রা-ব্রাহ্মণভূমির রাজার সাহায্যে কবি-কঙ্কণ চণ্ডীকাব্য রচনা করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় পাইয়াই রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র প্রতিষ্ঠান্বিত। —

দৃষ্টান্ত কত উল্লেখ করিব? আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যে যাঁহারা যশের মুকুট লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন; দেখিবেন—কেহই নিরন্ন অবস্থায় প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নাই। দরিদ্র যদি সে পরিচয় দিতে সমর্থও হয়, সংসার তাহা কখনই স্বীকার করে না। বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, দীনবন্ধু, নবীনচন্দ্র এক-একটি প্রতিভার মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু ইঁহাদের প্রত্যেকেরই পশ্চাতে পদগৌরবের ও অর্থ-সম্পদের প্রভাব ছিল। কেহ ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, কেহ ডাক-বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন কেহ বা উকীল-সরকার ছিলেন। ইঁহাদের কেহ যে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া যশের জয়মাল্য লাভ করিয়াছিলেন কখনই বলিতে পারি না। দ্বিজেন্দ্রলাল কবিবর বলিয়া প্রতিষ্ঠান্বিত। তাঁহারও বংশ মর্যাদার কথা স্মরণ করুন, তাঁহারও পদ-সম্ভ্রমের বিষয় আলোচনা করুন। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশে-বিদেশে সর্ব্বত্র যশোসম্মান লাভ করিতেছেন। তিনি ধনকুবের। অর্থসম্পদে পরিবৃত থাকিয়া তিনি বীণাপাণির সেবা করিয়াছিলেন; অন্য পথে তাঁহার চিত্ত প্রধাবিত হয় না। তাই তাঁহার খ্যাতি পৃথিবী-পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। রমেশচন্দ্র দত্ত—জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে বিভাগীয় কমিশনর এবং পরিশেষে বরোদার গাইকোয়ারের মন্ত্রীপদ লাভ করিয়াছিলেন। সাহিত্য-সেবায় কখনই তাঁহাকে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হয় নাই। পূর্ব্ববঙ্গের গৌরবভাস্কর রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর সি-আই-ই ভাওয়ালাধিপতি রাজা রাজেন্দ্র-নারায়ণের আশ্রয় লাভ করিয়াই সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালার প্রধান কবি মাইকেলের দৃষ্টান্ত দিতে চাহেন? কিন্তু কাব্যসুন্দরী যখন তাঁহার গলে বরমাল্য প্রদান করিয়াছিলেন মহারাজ যতীন্দ্রমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি তখন তাঁহার দারিদ্র্য-দুঃখ নিবারণ করেন নাই কি? অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় আদি ব্রাহ্মসমাজের ঠাকুর পরি-বারের আশ্রয় পাইয়া বঙ্গভাষার পরিপুষ্টি-কল্পে সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। দারিদ্র্যের মধ্য হইতে তাঁহার গ্রন্থরত্ন উদ্ভূত হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া যাঁহারা কখনও কখনও মস্তকোত্তোলনের প্রয়াস পাইয়াছেন, সমবেদনাশূন্য সমাজের কষাঘাতে তাঁহাদিগকে প্রায়ই ক্লেশমুণ্ড জীবনযাপন করিতে হইয়াছে। কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় কত অনুপম রত্নালঙ্কারে মাতৃভাষাকে সুসজ্জিত করিয়া গিয়াছেন। সে অবশ্য তাঁহার সুসময়ের ফলই বটে; কিন্তু তিনি দরিদ্র ছিলেন বলিয়া প্রখ্যাত সাহিত্যিকগণের মধ্যে এখন কচিৎ তাঁহার নামোল্লেখ হইয়া থাকে। কবি কৃষ্ণচন্দ্র দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া অর্দ্ধাশনে জীবন ত্যাগ করিয়াছেন। দরিদ্র ছিলেন বলিয়া এখন ভ্রমেও কেহ তাঁহার নামোল্লেখ করেন না। 'স্বর্ণলতা'র ন্যায় সামাজিক উপন্যাস বাঙ্গালায় দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গ্রন্থ-রচনার সময় লেখকের উন্নতির দিন ছিল। কিন্তু তিনি বিশেষ কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই; সুতরাং এখন কচিৎ তাঁহার নাম শুনিতে পাই।

এইরূপ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যাঁহারই যখন যে রচনা সৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহারই তখন অবস্থায় কিছু সচ্ছলতা ছিল। পদগৌরব এবং অর্থসম্পদ থাকিলে সে রচনার প্রভাবেই তিনি সমাজে খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। যাঁহার অর্থসম্পৎ নাই, যিনি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত নহেন, তাঁহার সাহিত্যচর্চা বিড়ম্বনা মাত্র। তিনি মাতৃভাষাকে অমূল্য রত্নালঙ্কারে সুশোভিত করিতে সমর্থ হইলেও যশোমুকুট কখনও তাঁহার মস্তকের শোভাবর্দ্ধন করিবে না। বাঙ্গালায় এমন অনেক কবি, এমন অনেক সুলেখক আছেন—যাঁহাদের রচনা প্রতিষ্ঠান্বিত কবি-লেখকগণের রচনার তুলনায় কোনও অংশে ন্যূন নহে। কিন্তু তাঁহাদের জয়ঢাক নাই, বাজাইবার লোক নাই। তাই তাঁহাদিগকে একান্তে মুখ লুকাইয়া থাকিতে হইয়াছে। তৈলাক্ত মস্তকেই লোকে তৈলসেক করে। মুকুলেই—রুক্ষ অবস্থায়ই লয়প্রাপ্ত হয়।

—রূপদক্ষ

১। রাজর্ষি জনক প্রভৃতির আশ্রয়ে সাহিত্যসেবীগণ কিরূপ উৎসাহ-প্রাপ্ত হইতেন 'পৃথিবীর ইতিহাস' গ্রন্থের (দুর্গা-দাস লাহিড়ী লিখিত) ১ম খণ্ডের, ৭৩-৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
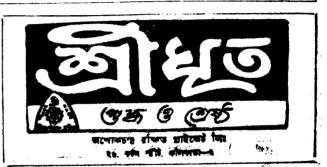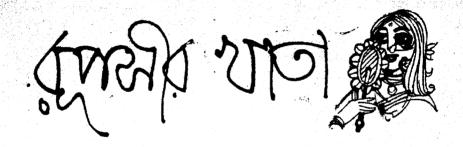
'আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশী' নিজের রূপে নিজে মুগ্ধ হয়েছিলেন চিত্রাঙ্গদা—মুগ্ধ করেছিলেন ব্রহ্মচারী অর্জুনকে। রূপের জয় সর্ব দেশে সর্ব কালে। তাই তন্নত যুগ যুগ ধরে রমণীকুল নিজেদের রমণীয় কমনীয় করে তোলার জন্য নানা উপকরণ খোঁজেন। পুরাকালে ফুলের কুঁড়ি গাছের রংবাহার পাতা ইত্যাদি দিয়ে ওঁরা ঠোঁট রাঙাতেন, হাত পায়ের নখের সৌন্দর্য বাড়াবার চেষ্টা করতেন। প্রদীপের শিষের কালি চোখে মদির আবেশ সৃষ্টি করতো, এমনি আরো কতো কি?

কিন্তু আজকের বিজ্ঞানের অবদান এই রূপচর্চার সামগ্রীর ওপরেও কম প্রভাব বিস্তার করেনি। তবে একটা কথা। ধনী কন্যারা যা যা ব্যবহার করেন তা আমাদের সবার করা সম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে মলিন মুখ করে বসে থাকার কিছু নেই। সাধারণের জন্য বহু ব্যবস্থা আছে—শুধু একটু জানতে হয়। আমি যে সব প্রসাধনসামগ্রীর কথা বলব সেগুলি সহজলভ্য এবং দামও কম। এছাড়াও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, শুধুমাত্র প্রসাধনই নয়, এর সঙ্গে কতকগুলি সাধারণ ব্যায়াম করতে হয়। সে ব্যায়াম কেবলমাত্র শরীরের ভারী অংশগুলির জন্য নয়, সূক্ষ্ম ছোট অংশেরও হয়। যেমন চোখ গাল চিবুক ইত্যাদি।

প্রসাধনের আরম্ভে সবার প্রথম যে কথা মনে রাখতে হবে তা হল, রূপচর্চা একটি বিশেষ সুকুমার শিল্প। তাই এর বিকাশের জন্য বিশেষ যত্ন প্রয়োজন। প্রথমে দেখতে হবে কোন কাল? গ্রীষ্ম কি শীত। সত্যি বলতে এ দুটি কালই প্রধান। তারপর আসছে সময়। অর্থাৎ সকাল, বিকাল, সন্ধ্যা কি রাত? তারপর বয়স। এইসব দিক ভেবে দেখতে হবে। আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান তাই আমাদের সাজসজ্জা প্রসাধন সব বিদেশীদের চেয়ে যে আলাদা হবে তা বলাই বাহুল্য। যেমন—বিদেশী এমন অনেক প্রসাধনসামগ্রী আছে যা আমরা ব্যবহার করে বিপরীত ফল পাই। তার সবচেয়ে বড় কারণ আমাদের আবহাওয়া। সেইজন্য আমাদের আলোচনা একটু ভিন্নধর্মী হবে।

প্রকৃতির অকৃপণ ঐশ্বর্য নিয়ে অনেক নারী জন্ম নেয়। রূপ, লাবণ্য, রঙের চমক সব নিয়ে। কিন্তু সেসব বাঁচিয়ে রাখাও একটা বিশেষ কাজ। যাঁর কম রূপ আছে, তাঁর কাজ স্বল্প জিনিসকে বিকশিত করা, যাঁর আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে কিছু নেই, তাঁকে খুঁজে নিতে হবে নিজের সার্থকতা। কোথায় কতটা করলে তাঁকে অপরূপা লাগবে, আবিষ্কার করতে হবে তাঁকে। এইসব সমস্যার সমাধানে আমি সাহায্য করার চেষ্টা করব। রূপবতী হওয়ার মধ্যে লজ্জা নেই। রূপ রমণীর গৌরব ও ঐশ্বর্য। এই ঐশ্বর্য পৃথিবীশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা শিল্পকারদেরই শুধু পাগল করে রাখার জন্য নয়, বাগানে সদ্য ফোটা ফুলের মতন, সংসারকেও সুন্দর করে রাখার জন্য দরকার।

আজকের আলোচনা শুরু করব ত্বক নিয়ে। কারণ শরীরের প্রথম আবরণই এটা। ভাল মসৃণ উজ্জ্বল ত্বকের উপর, চেহারা ও দেহের কমনীয়তা ও সুশ্রী চকচকে ভাব সব চেয়ে বেশি নির্ভর করে। আজকের দিনে সময়ের অভাব, তাই মনে হয় রূপ চর্চার অবসর কই? কিন্তু আমার বিশ্বাস, ইচ্ছা যদি থাকে তাহলে এর মধ্যে সময়ও খুঁজে পাওয়া যায়। আর না পাওয়া গেলেও যেটুকু আমরা করি সেটুকুও ঠিক মতন করলে কোন ঝামেলাই থাকে না।

প্রথমে আমরা শুরু করব শীত কালের নিয়মগুলি নিয়ে। কারণ আগেই বলেছি আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান। সুতরাং সেই সময়ের আলোচনা একটু বেশী বিশদ ও দীর্ঘ হবে। শীতের কথা চটপট সেরে নিয়ে গ্রীষ্মে এগোব।

শীতকালে শুষ্ক হাওয়ার জন্য চামড়ার টান ধরে, চামড়া ফেটে যায়, পায়ের গোড়ালী ফাটে এবং তাতে ময়লা জমে খুব কুৎসিত দেখায়। মুখের মধ্যে ঠোঁট নাকের ডগা ইত্যাদি ফেটে কালো ছোপ ধরে। এর কারণ অনেক। প্রথমতঃ ঠাণ্ডার ভয়ে জল সাবান দিয়ে হাত মুখ পরিষ্কার রাখা সাধারণতঃ একটু কমই হয়। তাছাড়া হাত মুখ না ধুয়েই তার উপর ক্রীম ও পাউডার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দুটোই খারাপ অভ্যাস। কীভাবে ত্বক মসৃণ রাখা যায় দেখা যাক তাহলে।

সাধারণতঃ আমরা সাবান বেশী মাত্রায় ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু সাবানের জন্য যে আমাদের মুখের চামড়ার ক্ষতি হয় তা খেয়াল রাখি না আমরা। মুখে তাই যথাসম্ভব কম সাবান ব্যবহার করা উচিত। তারপর মনে রাখতে হবে যে সাবান আমরা ব্যবহার করব, সেইটাই বরাবর করব। তাছাড়া সাবান বাছার সময় বিশেষ যত্ন নেওয়াও দরকার। শীতকালে যে সাবানে গ্লিসারিন জাতীয় জিনিস মেশান আছে তা ব্যবহার করলে ভালো, কিংবা দেশী বা বিদেশী কোন উচ্চ মানের সাবান ব্যবহার করা উচিত। তাছাড়া সারা দিনের পর রাতে বিছানায় শোবার আগেও একটু গরম জল দিয়ে সাবানের সাহায্যে মুখ ধুয়ে নিতে হয়। তারপরই ঠাণ্ডা জল দিয়ে মুখে ও গলায় ঝাপটা দিয়ে ধুতে হয়। এইভাবে বার দুই শুধু গরম ও ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা মুখে ও গলায় দেওয়া উচিত। এর ফলে ময়লা ধুয়ে যায় ও লোমকূপ ভাল ভাবে খুলে যায়। ত্বকের নিশ্বাস প্রশ্বাসের মতন এই লোমকূপগুলি দিয়ে বায়ু সঞ্চালন হয় এবং সেইজন্য রক্ত চলাচলও হয়। রঙের মলিনতা তাই সহজেই দূর হয়ে যায়। হাত পাও এইভাবে গরম জলে সাবান দিয়ে ধুয়ে নিতে হয়। তারপর 'চার্মিস' ক্রীম (সাধারণের জন্য) বেশ করে সর্বাঙ্গে মেখে

তে হয়। ময়েশ্চ ক্রীম, বা যে কোন কিছু খাবার সময় একটা কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে দুই হাতের আঙ্গুলের ডগা দিয়ে গলা থেকে উপর দিকে টানতে হবে, থুতনী চোয়াল পর্যন্ত। তারপর নাকের দু-পাশ থেকে শুরু করে গোল করে গালের উপর দিয়ে নীচ থেকে ঘুরিয়ে উপরের দিকে টানতে হবে। এইভাবে অন্তত ৫ থেকে ১০ মিনিট করলে মুখের চামড়ায় সহজে বয়সের দাগ পড়ে না ও চামড়া ঝুলে যায় না। কপালে, ঠিক নাকের উপরে মাঝখান থেকে শুরু করে কানের উপর পর্যন্ত টানতে হবে।

একটা বাটি বা গোল পাত্রে গরম জল নিয়ে তাতে হাতের নখ ও পাতা ডুবিয়ে রাখতে হবে। পরে বাচ্চাদের নরম দাঁত মাজার ব্রাশ দিয়ে নখ পরিষ্কার করতে হবে। এরপর ভাল বিলাতি হ্যাণ্ড ক্রীম কিম্বা চাম-

কারণেই পা ফাটবে না। অবশ্য বেড়াতে যাওয়ার সময় নিশ্চয়ই না। একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে যে শীতকালে শরীর ফাটার দুটি প্রধান কারণ—এক ময়লা জমে, দুই, শরীরে তৈলাক্ত ভাব কম থাকলে। দ্বিতীয়টি আমরা ক্রীম তেল ইত্যাদির সাহায্যে বন্ধ করতে পারি।

তাহলে এবার সকাল থেকে শুরু করে একটা রুটিন তৈরির চেষ্টা করি। ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে দুধের সর, কমলালেবুর খোসা বাটা আর পরিষ্কার সামান্য ময়দা একসঙ্গে ফেটিয়ে একটা ক্রীম জাতীয় জিনিস তৈরী করতে হবে। তাই দিয়ে আগে যেমন বলেছি ঠিক সেই একই ভাবে মুখের উপর আঙুল দিয়ে লাগিয়ে মিনিট ১০ পরে ঘষে তুলে ফেলতে হবে। এইটি যে চামড়ার পক্ষে কতো ভাল তা দিন সাতের মধ্যেই আপনারা বুঝতে পারবেন। এতে

তারা মনে রাখবেন ক্রীম মেখে রোদে গেলে মুখের পাতলা ত্বকে কাল দাগ পড়ে যায়। তবে বাইরে যাওয়ার সময় কি ভাবে ও কি ব্যবহারে প্রসাধন করা যেতে পারে তা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা পরে হবে— যথায় প্রতিটি অঙ্গ এবং মুখের প্রতিটি অংশ নিয়ে আলাদা করে আলোচনা করা হবে। প্রথমেই ত্বক নিয়ে বলছি এই কারণে যে ত্বক যদি ভাল না হয় তাহলে কোন প্রসাধনই ঠিক মতন ফল দিতে পারে না।

হ্যাঁ আবার আমরা রুটিনের ব্যাপারে ফিরে আসি। বিকেলে বা সন্ধ্যাবেলায় যারা বাড়ীতেই ছিলেন, তারা মুখটা শুধু জল দিয়ে একবার ধুয়ে হাল্কা হাতে মুছে নেবেন, তারপর 'বোরোলিন' সামান্য নিয়ে আস্তে আস্তে মেখে তারপর প্রসাধন করবেন। যারা কাজের পর বা বাইরের থেকে

ড়াস ক্রীম বেশ করে দুই তালুতে ঘষে মেখে নিতে হবে। যাদের পায়ের গোড়ালী ফাটে তাঁদের বিশেষ করে যত্ন নিতে হবে পায়ের। মেয়েদের পায়ের সৌন্দর্যের একটা লক্ষ্মীশ্রী থাকে যা প্রতিটি রমণীর মনে রাখা উচিত। অল্প গরম জলে পা ডুবিয়ে সাবান ও ব্রাশ দিয়ে পা প্রথমে ধুতে হবে। তারপর বিলিতী বা দেশী অলিভ তেল এক চামচ নিয়ে তাতে একটু লেবুর রস মিশিয়ে গরম করে নিতে হবে। পরে তাই দিয়ে পায়ের গোড়ালী ও পাতা বেশ করে ঘষে নিতে হবে। তারপর ঠান্ডা জলে মিনিট পনেরো বাদে হাত-পা ধুয়ে ক্রীম মেখে শুয়ে পড়া উচিত। এই ভাবে রোজ করলে গোড়ালী কখনও ফাটবে না। এছাড়াও যে মহিলারা বাড়ীতেই থাকেন তারা যদি সারা দিন মোজা পরে থাকেন—তাহলে কোন

ত্বক মসৃণ আর সেই সঙ্গে খুব উজ্জ্বল দেখায়। এতে মুখের লাবণ্য বিশেষ বৃদ্ধি পায়। দেশী বা বিদেশী যে কোন অলিভ তেল শীতকালে মাখা সবচেয়ে ভাল। তবে যদি আমাদের সামর্থ্যে না কুলোয় তাহলে নারকেল তেল একটু গরম করে মাখা উচিত। সাধারণতঃ আমরা সরষের তেল ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু ভেজাল সরষের তেলের মতন ক্ষতিকর আর কিছুই নেই। —তারপর স্নানের সময় একবার ঠান্ডা ও একবার গরম জল দিয়ে মুখে ঝাপটা দিতে হবে। মুখ মোছার ব্যাপারেও একটা কথা মনে রাখতে হবে যে গামছা অথবা খরখরে জাতীয় কোন কাপড় ব্যবহার করা উচিত নয়, নরম তোয়ালে দিয়ে মুখ মোছা উচিত। দুপুরে ক্রীম ব্যবহার করা একেবারেই উচিত নয়। বিশেষ করে যারা বাইরে যান

ফিরছেন, তাঁরা একটু গরম জলে মুখটা ধুয়ে, ভাল কোন বিদেশী কোম্পানীর তৈরী অথবা এখানকার দেশী কোম্পানীর ভাল ক্লিনসিং মিল্ক দিয়ে তুলোর সাহায্যে মুখটা মুছে ফেলবেন। তাহলে ত্বকের উপরের সব ময়লা উঠে আসবে। এরপরে 'বোরোলিন' মেখে কোন প্রসাধন ব্যবহার করা উচিত হবে সেই সম্বন্ধে পরে আলোচনা হবে।

শীতকালে এইভাবে ত্বকের যত্ন করলে রমণীয়তা তো বাড়বেই, সেই সঙ্গে লাবণ্যময়ী করে তুলবে প্রতিটি রমণীকে।

এবার আমরা আসি গ্রীষ্মকালীন পরিচর্যায়।

ত্বকেরও প্রকার ভেদ আছে প্রসাধনকলার দিক থেকে ত্বক তিন রকম। ১)

তৈলাক্ত ত্বক, ২) শুষ্ক ত্বক, ৩) সাধারণ ত্বক। সুতরাং আমরা যখনই ত্বকের পরিচর্যার কথা ভাবব তখনই আমাদের দেখে নিতে হবে যে ত্বক কোন জাতীয়। সেই বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথমে আলোচনা শুরু করা যাক তৈলাক্ত ত্বক নিয়ে। নিয়ম মতন মুখে সাবান ব্যবহার যতো কম করা যায় ততই ভাল। কিন্তু আমাদের দেশে এতো বেশী গরম ও ঘাম হয় যে সাবান না ব্যবহার করে পারা যায় না। তৈলাক্ত ত্বকে সাবান দিনে, খুব বেশী প্রয়োজনে তিন বার, তবে সাধারণত দুইবারই করা ভাল।

সকালে স্নানের সময় একবার সাবান ব্যবহার করা, তারপর মুখে কিছু না দেওয়া। বাইরের রোদে বেরুলে বিদেশী বা ভাল দেশী কোম্পানীর এক রকমের মেডিকেটেড লোশান পাওয়া যায় তার একটুখানি হাল্কা করে মুখে ও গলায় মেখে বেরুনো উচিত। তার ফলে ময়লা ত্বকের উপরে জমতে পারে না, আর রোদে রং পুড়ে যায় না। বাড়ী ফিরে তুলো দিয়ে ঠাণ্ডা জলে আস্তে আস্তে মুখ মুছে ফেলেই ত্বক আবার পরিষ্কার হয়ে যায়। সাধারণত আমাদের ধারণা গায়ে মাখার পাউডার মুখে ব্যবহার করা ভাল। কিন্তু তা নয়। বডি পাউডার মুখে ব্যবহার করা ভাল নয়। এছাড়া নানা ধরনের যে সব রঙিন পাউডার মুখে মাখার জন্য পাওয়া যায় সেগুলি কোন কারণেই মাখা উচিত নয়। এতে মুখের পাতলা ত্বক খসখসে হয়ে যায়। আমি আপনাদের বারবার করে এই অনুরোধই করব—ত্বক ভাল রাখতে হলে মুখে পারতপক্ষে পাউডার ব্যবহার করবেন না।

বিকেলে বা সন্ধ্যায় কোন প্রসাধন ব্যবহার করার আগে আবার সাবান দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলতে হবে। তারপর সপ্তাহে একদিন করে মুখে লেবুর রস একটু জলে মিশিয়ে লাগিয়ে রাখতে হবে মিনিট দশেক। পরে মুখ ধুয়ে ফেলতে হবে। রাত্রে শোবার আগে মুখ ধুয়ে ক্লিনসিং মিল্ক দিয়ে মুখ মুছে ফেলা উচিত।

শুষ্ক ত্বকের জন্যও এইসব নিয়মই মানতে হবে। শুধু রাত্রে শোবার সময় মুখ ধুয়ে, বোরোলীন অথবা ক্রীম (সামান্য) মেখে শুতে হবে।

সাধারণ ত্বকেরও মোটামুটি এই একই ব্যবস্থা। এসব ছাড়াও আর কয়েকটি বিষয়ে

বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। সেটা হল খাদ্য-তালিকা। ত্বক মসৃণ, দাগহীন গোটাহীন রাখতে হলে সবচেয়ে প্রথমে পেট পরিষ্কার রাখতে হবে। প্রতিদিন সকালে এক গেলাস ঠাণ্ডা অথবা গরম জলে একটি পাতিলেবুর রস খাওয়া প্রয়োজন। যাঁদের ত্বক তৈলাক্ত তাঁরা বেশী তেল ঘি-এর রান্না খাবেন না। চিনি চা ও কফি বেশী খাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তাঁদের সালাড (শশা, পিঁয়াজ, বিন, গাজর কড়াইশুঁটি লেটুস-পাতা) দুধ ছানা চর্বিহীন মাংস মাছ এবং সবার উপরে প্রচুর পরিমাণে জল ও ফল খাওয়া উচিত। মাঝে মাঝে ভাইটামিন ট্যাবলেট প্রতিদিন একটি করে খেলে ভাল ফল পাওয়া যায়। সবুজ সব্জি শাক-পাতা মুগের ডাল ইত্যাদি অল্প মশলা দিয়ে রান্না করে খেলে ত্বকের অবিশ্বাস্য উপকার হবে।

সাতদিন অন্তর হাতের পাতা ও আঙুল একটু অলিভ তেল গরম করে তাতে ভিজিয়ে রাখলে হাতের চামড়া কুঁচকোয় না, আর হাতের সৌন্দর্য বেড়ে যায়। হাতের তেলো মেয়েদের বয়স বলে দেয়। হাত কথা বলে, হাতের স্পর্শে প্রেম হয়, হাতের কমনীয়তায় মাধুর্য আসে—হাত আকর্ষণ করে সুতরাং সেই হাতের কদর অনেক। তাকে সুন্দর করে, সতেজ সজীব করে রাখার মূল্য অনেক। জানি, হাত দিয়ে আমাদের সংসারের ও বাইরের নানা রকম কাজকর্ম করতে হয় তবুও তার মধ্যেই হাতের যত্ন নিতে হবে। বলতে গেলে হাত দিয়েই তো হাতে করি আমরা সৌন্দর্য-লোকের চাবিকাঠিও।

—বরবর্নিনী

পিকাডিলী সার্কাস

নিমাই ভট্টাচার্য

উপন্যাস

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)
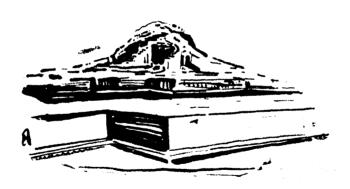
লণ্ডন থেকে ফ্রাঙ্কফার্ট। আগে ভাবতাম কত দূর। এখন জানি এ কোন দূরত্বই নয়। কলকাতা থেকে মোগলসরাই। বোধহয় তার থেকেও কিছু কম। মাত্র চারশ একত্রিশ মাইল। সাতশ' একচল্লিশ কিলোমিটার। দিল্লী মেল বা বোম্বে মেলে এক রাত্রি কাটিয়ে মোগলসরাই পৌঁছতে হয়। এক্ষুনি এই দূরত্ব পার হলাম ঘন্টাখানেকের মধ্যেই। রেল বা মোটরগাড়ীর গতি বেশি নয় বলে সব সময় মাইলের হিসাব করা হয় কিন্তু আধুনিক বিমানের গতি এত দ্রুত যে কোন বিমানযাত্রী দূরত্বের হিসাব নেবার প্রয়োজন মনে করেন না। টাইমস বা ডেইলি টেলিগ্রাফ পড়তে না পড়তেই এক দেশের রাজধানী থেকে অন্য দেশের রাজধানীতে পৌঁছনর মধ্যে বিমানযাত্রীরা চাঞ্চল্যবোধ করেন না। তাদের কাছে দু-এক রাউণ্ড স্কচের পর লাঞ্চ শেষ করতেই এক মহাদেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বা এক রাত্রের কয়েক ঘন্টার ঘুমের ফাঁকে দুটি মহাদেশ অতিক্রম করে তৃতীয় মহাদেশের অর্ধেকটা পার হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার।

আমি বিমানযাত্রী হয়েও দূরত্বের হিসাব না করে পারছি না। আমি শুধু একটির পর একটি দেশ পাড়ি দিচ্ছি না, দেব না, পাড়ি দেব একটি জীবনবৃত্তে। সার্কেল অফ লাইফ। এই এয়ার ইণ্ডিয়ার বিমানে ভারতবর্ষের মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার জীবনের একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হবে। ডারউইনের শিষ্যদের ভাষায় জন্ম থেকে মৃত্যুই একটি জীবন-বৃত্ত কিন্তু নিউটন-ডারউইনের তত্ত্ব অবলম্বন করে তো মানুষের জীবন চলে না। বিশেষ করে আমার মত সাধারণ ভারতীয় মেয়েদের জীবন গতিপথ কখন কোথায় মোড় ঘুরে দাঁড়াবে কেউ বলতে পারে না। নতুন জীবনের প্রশস্ত রাজপথে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই কত হতভাগিনীর চলার পথ শেষ হয়ে যায়। দিল্লীতে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার পথের শেষ। পথের শেষে নতুন পথের হদিশ, নতুন জীবনের ইঙ্গিত পাব কিনা জানি না। খেয়াঘাটে পৌঁছেই কি সবাই পারাপারের খেয়া পায়?

আমি আমার যাত্রাপথের দূরত্বকে অগ্রাহ্য করতে পারছি না। এয়ার হোস্টেসের এনাউন্সমেন্ট শুনে জানছি কত দূরে এসেছি হিসাব করছি সামনের পথের দূরত্ব।

লণ্ডন থেকে ফ্রাঙ্কফার্ট আসতে এত অল্প সময় লাগল যে ঐ সময়ের মধ্যে এ্যাপিটাইজার হিসেবে দু-এক রাউণ্ড ড্রিংক সার্ভ করা গেলেও লাঞ্চ দেওয়া যায় না যাত্রীদের। এই ফ্রাঙ্কফার্ট থেকে রোমের দূরত্বও বেশী নয়। ছ'শ সাতচল্লিশ মাইল, এক হাজার একচল্লিশ কিলোমিটার। দেড় ঘন্টা সময়ও লাগবে না। এবার যাত্রীদের লাঞ্চ দেওয়া হবে। আমি এখানে বসেই দেখতে পারছি স্টুয়ার্ট-এয়ার হোস্টেসরা মিল সার্ভিসের তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছেন। আমার সামনে পিছনে যত যাত্রী আছেন তাঁরা লাঞ্চের পর কফি কফির পর একটি সিগারেট শেষ করলেই পাবলিক এ্যাড্রেস সিস্টেমে এয়ার হোস্টেসের কণ্ঠস্বর শুনতে পাবেন উই উইল বী সর্টলি ল্যাণ্ডিং এ্যাট রোম......

আর আমি? অন্যান্য সবার মত লাঞ্চ খাব, কফি খাব ঠিকই কিন্তু মনে মনে কোথায় যে চলে যাব, কত কি ভাবব, তার ঠিকঠিকানা নেই। কত সুখের স্মৃতি, দুঃখের ইতিহাস, ব্যর্থতা ও বেদনার টুকরো টুকরো ঘটনা রোমন্থন করার পর আমি রোম পৌঁছব, তা জানি না। দু-এক রাউণ্ড স্কচ বা জিন এ্যাণ্ড টনিক বা বিয়ার শেষ করতেই সবাই লণ্ডন থেকে ফ্রাঙ্কফার্ট পৌঁছে গেলেন আর আমি সেই অবসরে আকাশ-পাতাল ভেবে ভেবে মরলাম। কখনও কখনও মনে হয় আর ভাবনা-চিন্তা করব না। যা হবার তাই হোক। লণ্ডনে থাকলে খাওয়া-পরার অভাব হবে না। সরকারের ভাণ্ডারে যা জমা দিই তার বিনিময়ে অসুস্থ হলে সুচিকিৎসা নিশ্চয়ই পাব। হঠাৎ কোন কারণে বেকার হয়ে গেলেও যা ভাতা পাব তা দিয়েও আমার দিন কেটে যাবে। মাঝে মাঝে খবরের কাগজে পড়ি অমুক ইণ্ডিয়ান তমুক পাকিস্তানীকে কোন রেস্তোরাঁ বা হোটেলে ঢুকতে দেওয়া হয়নি বা অফিস-কারখানায় কোন সাহেব কালা-আদমী বলে ন্যায্য অধিকার উপভোগ করতে দেয়নি। অথবা এই ধরনেরই অন্য কিছু। এসব ঘটনা ঘটে না—এমন নয় কিন্তু কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, বিশেষ বিশেষ কারণে এমন ঘটনা ঘটে। মোটামুটি একটু শিক্ষিত ও ভদ্র হলে এসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না।

এইসব সমস্যার কথা মনে পড়লেই আমার ব্রাডফোর্ডের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। অনেক কান্নাকাটি ঝগড়াঝাটির পর হঠাৎ একদিন রঞ্জন এয়ার কানাডার একটা টিকিট কিনে আনলো। বুঝলাম নাটকের পঞ্চম অঙ্ক শুরু। টিকিটটা এনে এমনভাবে টেলিফোনের পাশে রাখল যে সঙ্গে সঙ্গেই আমার চোখ পড়ল কিন্তু কোন প্রশ্ন করলাম না। ও টয়লেট থেকে ঘুরে আসতেই আমি টেবিলে দুজনের খাবার দিলাম। সাইলেন্ট মুভির মত আমাকে একটি শব্দ উচ্চারণ করতে হলো না। ও খেতে বসল। আমিও খেতে বসলাম। খাওয়া শেষ হবার পরই ও বড় বড় দুটো সুটকেশ সাজাতে শুরু করল। পঞ্চম অঙ্কে নাটক একটু দ্রুত গতিতেই এগিয়ে চলে। চলল। আমি কিচেনের কাজকর্ম শেষ করে এসেই শুয়ে পড়লাম। জানলার দিকে মুখ করে কাত হয়ে শুয়ে থাকলেও বেশ বুঝতে পারছিলাম রঞ্জন চলে যাবার উদ্যোগ আয়োজন করছে। ঘুম আসছিল না, জেগেই ছিলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি তা বুঝতেই পারিনি। অনেক রাতে শুয়েছি বলে অন্যান্য দিনের মত ভোরবেলায় ঘুম ভাঙেনি। ঘুম ভাঙাল রঞ্জনের ডাক, রুণা! একটু উঠবে?

ওর ডাক শুনে আমি বিছানাতেই উঠে বসলাম। দেখি ও তৈরী। ঘরে বড় বড় সুটকেশ দুটোও দেখতে পেলাম না। মনে হলো বোধহয় নীচের ল্যাণ্ডিং-এ রেখে এসেছে।

'আমি যাচ্ছি।'

আমি দু হাঁটুর উপর মুখ রেখে চুপ করেই বসে রইলাম। কোন কথা বললাম না, বলতে পারলাম না।

ইসলাম সাহেবকে দু মাসের ভাড়া দেওয়া আছে। তোমার বাকলে ব্যাংকের চেক বই টেবিলের ড্রয়ারে থাকল আর......

রঞ্জন থামল।

আমি সারা রাত্রির বিশ্রামের পর বিছানায় বসে থাকলেও অনিদ্রা, অনাহারক্লিষ্টদের মত হঠাৎ মাথা ঘুরতে শুরু করল। দুটো চোখ জলে ভরে গেল। গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে, হাতের উপর হাঁটুর উপর। ভীষণ ইচ্ছা করছিল একবার ওর মুখের দিকে তাকাতে কিন্তু পারলাম না।

রঞ্জনই হঠাৎ আমার কাছে এগিয়ে এসে দু-হাত দিয়ে আমার মুখখানা তুলে ধরতেই দেখলাম ওর দুটো চোখ দিয়েও জল গড়িয়ে পড়ছে। কতক্ষণ ও আমার মুখখানা দু-হাত

দিয়ে ধরেছিল, কতক্ষণ আমার দিকে তাকিয়েছিল, আমি ওকে দেখছিলাম, তা জানি না। বোধহয় এক মিনিট বা দু মিনিট। হয়ত বা তারও বেশী। দুজনের কেউই কোন কথা বলতে পারলাম না। তারপর হঠাৎ রঞ্জন ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ভেবেছিলাম ওকে একটা প্রণাম করব কিন্তু সে ইচ্ছা পূর্ণ করার সুযোগ পেলাম না।

আজও সেই কথা ভেবে কষ্ট পাই। খুব খারাপ লাগে। হাজার হোক স্বামী। চির-দিনের মত তার কাছ থেকে মুক্তি নেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। প্রায় অসম্ভব। মৃত্যুশোক সহ্য করা যায় কিন্তু বিচ্ছেদ বেদনা অসহ্য। স্বামীর মৃত্যুর পর বৈধব্য সহ্য করা যায়। করতেই হয়। সবাই সহ্য করে কিন্তু স্বামী বেঁচে থেকেও তাকে হারালে সত্যি অসহ্য। রঞ্জন আমাকে প্রতি পদক্ষেপে ঠকিয়েছে। ও মিথ্যাবাদী, অশিক্ষিত। লম্পট। চরিত্রহীন। তবুও ও আমার স্বামী। সেই সর্বনাশা দিনের সকালবেলায় ওর জলভরা চোখদুটি দেখে মনে হয়েছিল ও আমাকে ভালবাসে, আমাকে চায়। প্রাণ মন দিয়ে চায়।

আমি কি ওকে ভালবাসতাম?

নিশ্চয়ই।

এখনও কি ওকে ভালবাসি?

বড় কঠিন প্রশ্ন। চট করে জবাব দেওয়া মুস্কিল। ওকে ঘেন্না করি, ওর উপর রাগ হয়। ভীষণ রাগ হয়। আমার বর্তমান জীবনের জটিলতার জন্য, এই অনিশ্চিত জীবনধারণের জন্য একমাত্র রঞ্জনই দায়ী। কি দরকার ছিল আমাকে বিয়ে করার? আমাকে লন্ডনে টেনে আনার? আমাকে বিয়ে করার মত একটি ছেলেও কি কলকাতায় পাওয়া যেত না। একটা কেন, একশ'টা ছেলে পাওয়া যেতো। একটু চেষ্টা করলেই পাওয়া যেতো কিন্তু কে চেষ্টা করবে? বাবা বেঁচে থাকলে কোন কথা ছিল না। বড়লোকের দুলালীকে বিয়ে করার পর দাদা আর আমাকে সহ্য করতে পারত না। বিধবা মা কি করবেন? ছেলের কথার উপর আর কিছু বলতে পারলেন না। রঞ্জনের সঙ্গে আমার বিয়ে হলো। কলকাতার একটি শিক্ষিত ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলেও আমি বেশ সুখে থাকতে পারতাম। কেন পারব না? আমার তো কিছু পিছুটান ছিল না যে স্বামীকে ভালবাসতে পারব না। কলকাতায় জন্মেছি, বড় হয়েছি, সুতরাং বিয়ের পর কলকাতায় থাকলে বেশ আনন্দেই থাকতাম। চার-পাঁচটা টাকা হলেই দেশপ্রিয় পার্কের কোনায় গিয়ে একটা ব্লাউজ কিনতে পারতাম অথবা দুজনে মিলে উজ্জলায় সিনেমা যেতাম। রবিবার সকালে বসুশ্রীতে কত ভাল ভাল গানের অনুষ্ঠান হয়। রবীন্দ্র সদনে তো নিত্যই কিছু না কিছু হচ্ছে। লন্ডনে আসার পর বাংলা খবরের কাগজ দেখার সুযোগ হয় না। একমাত্র জয়ন্তীদির বাড়ী গেলে রবিবারের কাগজ দেখতে পাই অনেকদিন পর একটা বাংলা কাগজ হাতে পেলেই সব চাইতে আগে সিনেমার বিজ্ঞাপন পড়ি। লন্ডনে পৃথিবীর কত বিখ্যাত শিল্পীর অভিনীত সিনেমা-থিয়েটার হচ্ছে। মাঝে মাঝে দেখি। শ্রীকান্তর জন্য দেখতেই হয়। ভাল লাগে, খুব ভাল লাগে কিন্তু তবুও উত্তমকুমারের একটা বই দেখার জন্য মনটা ছটফট করে। শ্রীকান্তকে আমার খুব ভাল লাগে। বোধহয় ভালবাসি। মাঝে মাঝে ওকে নিয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি। শেষপর্যন্ত আমি যদি আবার লন্ডনে ফিরে এসে ওকে বিয়ে করি, তাহলে আশ্চর্য হবো না। ওর সবকিছুই আমার ভাল লাগে, শুধু একটি বিষয়ে ওর সঙ্গে আমার দারুণ মতবিরোধ। ও সৌমিত্র চ্যাটার্জির ভক্ত উত্তমকুমারকে বিশেষ পছন্দ করে না। উত্তমকুমার সম্পর্কে আজেবাজে কথা শুনলে আমার মেজাজ ঠিক থাকে না। উত্তম ইজ উত্তম। অদ্বিতীয়! অনন্য। অতুলনীয় সিনেমা হলের পর্দা জুড়ে যখন উত্তমের মুখখানা দেখি তখন আমার বুকটাও ভরে যায়। কলকাতায় লন্ডনের মত সুখ না থাকলেও বাংলা সিনেমা তো আছে, উত্তমকুমারকে তো দেখা যায়। আমার মত সাধারণ বাঙ্গালী মেয়ে তাতেই খুশী। (ক্রমশঃ)

সুন্দরী তোমার মনের মতো
আশ্চর্য নতুন সাবান
LUX
LUX
SUPREME

প্রদর্শনী

প্রদর্শনী

প্রদর্শনী

মিউজিয়ম অফ মডার্ণ আর্ট-এর গ্রাফিক প্রিন্ট-এর প্রদর্শনী

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল থেকে সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন গ্রাফিক মাধ্যমে শিল্পচর্চার একটা ঢেউ এসেছে। গ্রাফিক মাধ্যমে শিল্পচর্চা প্রসারের একটা সামাজিক-তথা নৈতিক প্রেক্ষাপট আছে। তিরিশের দশকের ধনতান্ত্রিক পৃথিবীব্যাপী আর্থিক বিপর্যয়ের পর থেকে তেলরঙের ছবি ও জলরঙের ছবির বাজার-দর চড়তে চড়তে এমন এক জায়গায় এসে ঠেকেছে যেখানে পৌঁছতে পারা মার্কিন দেশের স্বচ্ছল মধ্যবিত্তের পক্ষেও দুষ্কর। পিকাসো মাতিস মিরো শাগাল প্রমুখ বিখ্যাত শিল্পীদের ছবির কথা ছেড়েই দিলাম, এ্যান্ডি ওয়ারহোল বা ফ্রাঙ্ক স্টেলার মতন মার্কিন চিত্রকরদের ছবি কেনাও মার্কিন উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার। অথচ শিক্ষা এবং স্বচ্ছলতা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এসব সম্পন্ন দেশে শিল্পকলাবস্তুর চাহিদা বেড়েছে। শিল্পী-হাতের স্পর্শে তৈরী মূল শিল্পবস্তু সম্পর্কে এ-চাহিদা সম্পূর্ণ যন্ত্রে তৈরী কমার্শিয়াল প্রসেস প্রিন্ট দিয়ে মেটা সম্ভব নয়।

গ্রাফিক মাধ্যমগুলির যে-কোন একটিতে তৈরী প্রিন্টের সঙ্গে কমার্শিয়াল প্রসেস-প্রিন্টের প্রধান পার্থক্য কমার্শিয়াল প্রসেস-প্রিন্ট একটি অন্য মাধ্যমে সৃষ্ট সম্পূর্ণ শিল্প-বস্তুর নকল এবং গ্রাফিক প্রিন্ট একটি ছাঁচে তৈরী নকশার একাধিক ছাপ হওয়া সত্ত্বেও নকল নয়। কারণ ছাঁচটি সম্পূর্ণ শিল্পবস্তু নয় প্রিন্টগুলিই সম্পূর্ণ শিল্পবস্তু। দ্বিতীয়তঃ কমার্শিয়েল প্রসেস প্রিন্টে যেখানে তেল-রঙ জল রং বা ফ্রেস্কোর ছবির নকল ছাপা হয় সেখানে না থাকে মূল চিত্র-মাধ্যমের দৃশ্যানুভূতি না থাকে শিল্পীর হাতের স্পর্শের অনুভূতি। গ্রাফিক মাধ্যমে চিত্রসৃষ্টির মূলেই যেহেতু ছাপার একটি প্রধান ভূমিকা থাকে, সেহেতু ছাপার বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়েই এ-জাতের ছবি তৈরী হয়। ফলতঃ মাধ্যমের দৃশ্যানুভূতি ছবিতে সজীব থাকে। এবং শিল্পী যেহেতু স্বহস্তে ছাঁচের উপর নকশা রচনা করে থাকেন সেহেতু চিত্রে সেই হাতের স্পর্শ অনুভূত হয়। এইসব কারণে গ্রাফিক প্রিন্ট শিল্পীর হাতে তৈরী মূল শিল্পবস্তুর সম্মান পায় যা কমার্শিয়েল প্রসেস-প্রিন্ট সঙ্গত কারণেই পায় না। অথচ, একটিমাত্র নকশা থেকে যেহেতু বহু গ্রাফিক প্রিন্ট পাওয়া সম্ভব এবং কাগজের উপর হবার দরুন প্রতিটি প্রিন্টের পিছনে যে ব্যয়সংকোচ সম্ভব তা অন্য যে-কোন মাধ্যমে অকল্পনীয়। ফলে গ্রাফিক প্রিন্ট অন্য সব মাধ্যমে নির্মিত শিল্পবস্তুর তুলনায় সুলভ। একটিমাত্র ছাঁচ থেকে যেহেতু বহু প্রিন্ট পাওয়া সম্ভব সেহেতু দুর্লভতার মূল্যে প্রিন্ট কখনও অতিরিক্ত দামী হয়ে ওঠে না। এইসব কারণে পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিণ দেশে গ্রাফিক প্রিন্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। পূর্ব-ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এবং ভারতের মতন পশ্চাদপট দেশগুলিতে যেখানে শিল্পবস্তুর বাজার একান্তই সংকীর্ণ এবং যে-সব দেশে শিল্পীদের বলার কথাও অনেক এবং অনেকের মধ্যে সে-কথা প্রচার করা আবশ্যক, সেখানে গ্রাফিক মাধ্যমগুলিই এমন মাধ্যম যাতে সৃষ্ট শিল্পবস্তু অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে বহুজনের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। এইসব কারণেই পৃথিবীব্যাপী গ্রাফিক শিল্পচর্চার একটা জোয়ার এসেছে।

নিজেদের বেঁচে থাকার জন্য শিল্পের বাজারের এবং শিল্প রসাস্বাদনের ক্ষমতা প্রসার সকল শিল্পীরই কাম্য। তা-ছাড়াও প্রতিটি সত্যিকারের শিল্পী তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে অনেকের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করতে চান, অন্যকে ছুঁতে চান সেই অনেক বা অন্যের সংখ্যাবৃদ্ধিও কাম্য। গ্রাফিক মাধ্যমগুলিতে সৃষ্ট বস্তুর এ-কাজগুলি করার ক্ষমতা অন্যান্য মাধ্যমে সৃষ্ট শিল্পবস্তুর চেয়ে কিঞ্চিৎ অধিক। এ-ছাড়াও প্রতিটি শিল্পীর মধ্যে একটি কারিগর-সত্তা সুপ্ত থাকে। প্রতিটি শিল্পীই তাঁর সৃষ্ট শিল্পবস্তুতে খানিকটা কারিগরী দক্ষতা প্রকাশ করতে চান। এ-ব্যাপারে গ্রাফিক-মাধ্যমগুলি শিল্পীদের যে সুযোগ দেয় ফ্রেসকো এবং হয়তোবা টেম্পেরা ছাড়া অন্য কোন চিত্র-মাধ্যম সে সুযোগ দেয় না। বিশেষীকরণ-সম্পৃক্ত কারিগরী দক্ষতা বিংশ

শতাব্দীর শিল্পোন্নত দেশগুলিতে যেভাবে পুরস্কৃত হচ্ছে, তা ইতোপূর্বে পৃথিবীতে কখনও কেউ দেখেনি। এমতাবস্থায় যিনি যেখানে আছেন, সেখানে তাঁর কাজের বিশেষত্বকে কারিগরী দক্ষতা দিয়ে প্রমাণ করতে তৎপর হয়েছেন। এ-সব কারণে সারা পৃথিবীতে গ্রাফিক মাধ্যমে শিল্পচর্চার একটা জোয়ার এসেছে।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন কমার্শিয়াল প্রসেস-প্রিন্টিং আবিষ্কৃত হয়নি তখন গ্রাফিক মাধ্যমের কাজ ছিল অন্য মাধ্যমে সৃষ্ট শিল্পবস্তুর নকল তৈরী করা। ইউজিন দেলাক্রোয়া তাকে বিপ্লবের বাণীবহ করলেন ফ্রান্সিসকো গোইয়া, ওঁরে দ্যোমিয়ে এবং হোগার্থ তাঁদের সমাজ-সমালোচনামূলক বক্তব্যকে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য এই মাধ্যমগুলির শরণাপন্ন হলেন, আর তুলুজে লোত্রেক লোকররঞ্জনমূলক শিল্পের লোকরঞ্জনী ক্ষমতার উৎসসন্ধানে লিথোগ্রাফের শরণাপন্ন হলেন। তার পরে আসরে এলেন পিকাসো মাতিস, ব্রাক শিল্পে গড়ে তুলতে চাইলেন বহির্জাগতিক জগতের এক সমান্তরাল জগত। সে-জগত কি দিয়ে কেমন ভাবে গড়া হয়, তার ঘনিষ্ট পরিচয় নেবার জন্য যে কর্মকাণ্ড শুরু হল তাতে কোন মাধ্যম, কোন রীতি কোন পদ্ধতি কোন প্রকরণ বাদ গেল না। প্রতিটি গ্রাফিক মাধ্যম নিয়ে তাঁরা নাড়াচাড়া শুরু করলেন। এঁদের কাজের ফলেই এলো বিংশ শতাব্দীতে গ্রাফিক মাধ্যমে শিল্পচর্চার নতুন জোয়ার।

বিংশ শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধে পশ্চিম ইউরোপ এবং আমেরিকায় গ্রাফিক মাধ্যমে শিল্পচর্চার মূল ধারাগুলির সঙ্গে ভারতবাসীর পরিচয় ঘটানোর জন্য নিউ ইয়র্কের মিউজিয়ম অফ মডার্ণ আর্ট-এর আন্তর্জাতিক কমিটি এবং ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ কালচারাল রিলেশনস-এর যৌথ উদ্যোগে সম্প্রতি একটি গ্রাফিক প্রিন্টের প্রদর্শনী ভারতের বিভিন্ন শহরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস এবং বিড়লা অ্যাকাডেমি অফ আর্টের সহযোগিতায় প্রদর্শনীটি কলকাতায় ঘুরে গেল।

কলকাতায় বসে পিকাসো, মাতিস ব্রাক শাগাল ম্যাসন লেজের জাঁ আর্প উইলিয়ম হেটার, লুচিও ফন্তানা লেনার্ড বাসকিন জাঁ দুবুফে ফ্রিডনারখ হুন্ডের্টভাসসের, সেবাস্তিয়ান মাত্তা হোয়ান মিরো, হান্স হারটুঙ পিয়ের সুলাজ আন্তনি তাপিয়ে উইলেম ডি-কুনিঙ, রবার্ট রস্তশেনবার্গ অ্যান্ডি ওয়ারহোল ভিক্টর ভাসারেলি, যোসেফ আলবের্স প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীদের ছবি সচরাচর দেখা যায় না। এত নামী শিল্পীদের মূল শিল্পকর্মের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেবার জন্য উদ্যোক্তারা 'অনন্ত ধন্যবাদার্হ'। তবে একথা নিশ্চয় বলব না যে প্রতিটি বিখ্যাত শিল্পীর প্রদর্শনীতে স্থানপ্রাপ্ত প্রতিটি ছবিই তাঁদের শিল্পকর্মের প্রতিনিধিত্বমূলক নিদর্শন। আমাদের দেশের ছাপের ছবি নির্মাতাদের কাছে প্রদর্শনীটি অন্য একটি কারণে একাধিক বার দর্শনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। প্রদর্শনীটিতে প্রায় প্রতিটি গ্রাফিক মাধ্যমে রচিত শিল্পবস্তু স্থান পেয়েছিল। তার মধ্যে যেমন এনগ্রেভিঙ ড্রাই পয়েন্ট এচিং একোয়াটিন্ট সফট গ্রাউন্ড লিফট গ্রাউন্ড মেজোটিন্ট প্রভৃতি সহজ সরল ইনতাগ্লিও প্রিন্ট, লিথোগ্রাফ এবং অফসেট-এর প্লেনোগ্রাফিক প্রিন্ট, উড-কাট উড-প্রিন্ট লিনোকাটের মতন রিলিফ-প্রিন্ট এবং সিল্কস্ক্রিন ও পোশেয়ারের মতন স্টেনসিল প্রিন্ট-এর যেমন সহজ-সরল ব্যবহার দেখা গেল, তেমনি নানা মাধ্যমের নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক ও যৌগিক ব্যবহার দেখা গেল। সব সময়েই যে এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক ব্যবহারগুলি নান্দনিক অর্থে সার্থক হয়েছে এমন নয়। অনেক সময়েই এ-ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক মাধ্যম ব্যবহার কারিগরী দক্ষতায় প্রদর্শনীতে পায়ণত হয়েছে।

প্রদর্শনীটি দেখে বর্তমান সমালোচকের মনে হয়েছে, প্রদর্শনীটি গঠিত হয়েছে একটা বিশেষ বিশেষ দেশের কয়েকটি বিশিষ্ট রীতির শিল্পকে তুলে ধরার জন্য। বলা বাহুল্য দেশটি য়্যুনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা এবং বিশিষ্ট রীতিগুলির নাম, পপ আর্ট অপ আর্ট ও মিনিম্যাল আর্ট। য়্যুরোপীয় শিল্পীদের কাজের থেকেও সে-ধরনের বস্তু প্রদর্শনীর জন্য সংগৃহীত হয়েছে—যা পপ আর্ট অথবা অপ আর্ট বা মিনিম্যাল আর্ট-এর অগ্রাধিকারকেই প্রতিষ্ঠিত করে, অথবা নিজের দৈন্য দিয়ে মার্কিণ শিল্পীদের শ্রেষ্ঠতার স্বীকৃতি দেয়। প্রদর্শনীতে যে ধরনের কাজ দেখা গেল মাতিসের নিশ্চয়ই তার চেয়ে অনেক ভাল মাতিসীয় লিথোগ্রাফ এবং মিরোর অনেক ভাল এচিং ছিল।

এই পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে গ্রাফিক মাধ্যমগুলিতে রচিত বিখ্যাত শিল্পীদের কাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল মানব-জীবন সম্বন্ধে তাঁদের ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণার সরাসরি প্রকাশ। যার রেশ এখনও পিকাসো দুবুফে, বাসকিন রস্তশেনবার্গ প্রমুখ শিল্পীদের কাজে দেখা যায়। কিন্তু সমস্ত প্রদর্শনীটি দেখবার পরে মনে হয় প্রদর্শনী-সংকলকের উদ্দেশ্য এই দেখানো যে শিল্পবস্তু অন্যনির্ভর নয়, শিল্পবস্তু স্বয়ং স্বরাট। শিল্পী শুধু শিল্পের উপাদান দিয়েই শিল্পবস্তু নির্মাণ করেন।

অথচ আমরা জানি সমগ্র পূর্ব ইয়োরোপ এমনকি খোদ মার্কিনদেশেও গ্রাফিক মাধ্যমে শিল্পচর্চার এমন কতিপয় ধারা রয়েছে যাতে গ্রাফিক মাধ্যমে শিল্পচর্চার আদি এবং অকৃত্রিম কমিউনিকেশন ফাংশানই সযত্নে রক্ষিত হচ্ছে। তার কোন পরিচয় এ প্রদর্শনীতে পাওয়া যায় না।

তবু প্রদর্শনীটিতে যা পেয়েছি তা কম কি? পিকাসোর অনবদ্য লিনোকাট ও লিথোগ্রাফ, আঁদ্রে মেসনের লিথোগ্রাফ হানস হারটুঙ-এর লিথোগ্রাফ, লেনার্ড বাসকিনের উড-কাট, স্ট্যানলি উইলিয়ম হেটারের এনগ্রেভিং-সফটগ্রাউন্ড এচিং-অফসেট, রবার্ট রস্তশেনবার্গ-এর লিথোগ্রাফ ও জাঁ দুবুফের লিথোগ্রাফ মনে রাখার মতন।

—প্রণবরঞ্জন রায়

মানসিক রোগ (৩৮)

আবেশিক বায়ু রোগের যে দুটো রকম আছে এবারে কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে আগের বক্তব্যটা একটু পরিষ্কার করে বোঝাবার চেষ্টা করবো। আর কিছু এখন বলবার দরকার হবে না।

(১) ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশ পার হয়েছে। কানের পাশের চুলে একটু একটু পাক ধরেছে। আমুদে লোক দিনের বেলায় আপিস করেন—সরকারী চাকুরে—সন্ধ্যার বাড়ী এসে একটু বাদে ক্লাবে গিয়ে গল্প-গুজব বা কোনো কোনোদিন একটু আধটু তাস খেলেন। ছুটির দিনে ছেলেমেয়েসহ সস্ত্রীক বেড়াতে যান, সিনেমা দেখেন ইত্যাদি। কলেজে ভাল ছাত্র বলে নাম ছিল। বই পড়ার একটু ঝোঁকও আছে। একদিন একটা ইংরাজী উপন্যাস পড়তে পড়তে তাতে এক চরিত্রের বয়স হয়ে যাচ্ছে বলে তার যে অস্বস্তির বিবরণ দেওয়া ছিল—সেটা তাঁকে কেমন যেন একটু নাড়া দিয়ে যায়। আর সেইদিনই ক্লাবে একজন তাঁকে দেখে বলেন, 'আরে রামবাবু এরকম করেই জীবনটা বুঝি কাটিয়ে দিলেন। একটু জীবনপাত্রে চুমুকও একদিন দিলেন না? আপনি বড্ড নিরেমিষ লোক মশায়। ওদিকে চুলে যে পাক ধরেছে মেয়াদ তো শেষ হয়ে এলো। দিন সময় থাকতে ভিড়ে পড়ুন।' তখনকার মত রামবাবু ঠাট্টা করে কথাটা কাটিয়ে দিলেন। কিন্তু বাড়ী ফেরবার সময় তাঁর কেবলই মনে হতে থাকলো 'চুলে পাক ধরেছে, মেয়াদ তো ফুরিয়ে এলো!' সে রাত্রে খেতে বসে অন্যদিনের মত হাসি-গল্প করতে চেষ্টা করলেন কিন্তু জমলো না। মনের কোণে ঐ কথাগুলোই কেবল খচখচ করতে লাগলো, 'চুলে পাক ধরেছে, মেয়াদ তো ফুরিয়ে এলো।' বিছানায় শুয়েও সে রাত্রে বহুবার ঐ একই কথা মনে পড়তে লাগলো। একবার উঠে গিয়ে মাথায় হাতে মুখে জল দিয়ে আবার শুয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ পরে হাল্কা ঘুম হলো। কিন্তু তার মধ্যে নানারকমের হিজিবিজি কী সব স্বপ্ন দেখেছেন তা কিছুই তাঁর মনে নেই। সকালে বিছানা থেকে উঠতে ইচ্ছে হল না কোথা থেকে যেন আকাশছাওয়া ক্লান্তি নেমে এসেছে। বেলা করে উঠলেন, শরীর খারাপ কিনা জানতে চাইলে স্ত্রীকে উত্তর দিলেন 'বয়স হয়েছে এখন তো শরীর ভাঙবেই। দেখছো না চুলে পাক ধরেছে। এতো হবেই—এ যে বয়সের ধর্ম।' রোজদিনকার মতই কাজে বেরুলেন, বাড়ী এলেন ক্লাবে গেলেন, কিন্তু সে রামবাবু আর নেই। এ যেন এক নতুন আর কেউ রামবাবু। বাড়ীর লোকেরা এ হঠাৎ পরিবর্তনের কারণ বুঝতে না পেরে শরীরে কিছু হয়েছে মনে করে ডাক্তার দেখাতে বলে, রামবাবু বলেন, 'ডাক্তারে কি করবে? আমার তো কোনও ব্যারাম নেই! বয়স হয়েছে? তাতো সবারই হয়।' বারে বারে ঐ বয়সের কথা বলতে থাকায় তাঁর স্ত্রীর মনে সন্দেহ হয় হয়ত বা ঐ বয়স বেড়ে যাচ্ছে বলেই মনে কোনও ভয় দেখা দিয়েছে তাই অমন হাসিখুশী মানুষটা রাতারাতি পালটে গেল। অনেক করে স্বামীকে উৎসাহ দেবার চেষ্টা তিনি করে চলেন। ছেলেমেয়েরা এসে তাঁকে এখানে ওখানে নিয়ে যেতে বলে। তিনি সঙ্গে যান কিন্তু তাদের সঙ্গে আনন্দে যোগ দিতে পারেন না। কেবলই মনে হতে থাকে, 'চুলে পাক-ধরেছে, মেয়াদ তো ফুরিয়ে এলো'। এই রকম করেই বেশ কিছুদিন কেটে গেল। তাঁর হঠাৎ ধাক্কা খাওয়া মনটা যেন অনেকটা সামলে নিতে পেরেছে। আবার কিছু কিছু করে হাসি-খুশি ভাবটা ফিরে এসেছে কিন্তু তা হলে কী হবে। এই চুলে পাক ধরার কথা, মেয়াদ ফুরিয়ে আসবার কথা বারে বারে মনে আসতে থাকে। তিনি নিজের মনেই বলেন, 'এতো আচ্ছা জ্বালাতন হল! চুলে পাক, ধরেছে তো কী হয়েছে? মেয়াদ কি আমার একারই ফুরোবে। সবারই তো ফুরোয়। বুড়ো হব বেশ হবে। তাতে কী।' তবু কিন্তু ঐ কথাগুলি তিনি ভুলতে পারেন না। এক সময় বলতেন, 'আমার মনের পেছনে কেউ লেগেছে।' অস্থির হয়ে উঠতেন ঐ কথা বারে বারে মনে পড়ায়। এক এক সময় মাথার চুলে দুহাতের আঙুল দিয়ে মুঠো করে ধরে টান দিতেন, বলতেন, 'জ্বালাতন!' কিন্তু কমলী তাকে ছাড়ে না। যখন তখন ঐ কথা মনে হতে হতে তাঁকে ক্লান্ত করে তুলতো। তারপর আরও কিছুদিন পরে থেকে তিনি ক্রমে বলতে থাকলেন, 'আমি সত্যেন বোস হতে চলেছি।' ক্রমে চুল পাকা আর মেয়াদ ফুরোনোর কথা আর মনে আসে না। কিন্তু মধ্যে মধ্যেই অধ্যাপক সত্যেন বোসের চেহারাটা তাঁর মনে পড়ে যায়। তাও বাড়তে বাড়তে এমন হল যে একসঙ্গে বসে কাজ করতে পারেন না বই পড়তে পারেন না—বেড়াতে গেলেও কেমন বাধো বাধো ঠেকে। ঐ চেহারাটাই কেবল মনে পড়তে থাকে। একদিন একজনের সঙ্গে গল্প করতে করতে হঠাৎ কথা বন্ধ করে মনের সেই ছবিটাতে একেবারে নিবিষ্ট হয়ে যান। যে কথা শুনছিল সে ওঁকে হঠাৎ এমন চুপ হয়ে যাওয়ায় মনে করলো হয়ত কিছু অসুবিধে হচ্ছে—তাই তাড়া-তাড়ি উঠে পড়ে পরে একদিন আসবেন বলে চলে গেলেন। রামবাবু অপ্রতিভ হলেন কিন্তু কিছু করবার রইল না। এইভাবে বেশ কয়েক মাস গেল। তারপর আবার পট পরিবর্তন হল—ছেলের বাৎসরিক পরীক্ষার আগে ছেলের পড়া-শোনা ঠিকমত হচ্ছে কিনা কোনও অসুবিধা হচ্ছে কিনা—এই নিয়ে ছেলেকে বারে বারে প্রশ্ন করতে লাগলেন। স্ত্রীকে নানা অজুহাতে মনে করিয়ে দিতে লাগলেন—'ছেলের পরীক্ষা এসে গেছে ওকে দেখো কোনও যেন অসুবিধে না হয়। পড়াশোনা ঠিকমত হচ্ছে তো? নজর রেখো। ওর পরীক্ষা এসে গেছে কিনা—ভাল করে নজর দিও' ইত্যাদি। সময়ে অসময়ে কেবলই ঐ ছেলের পরীক্ষার চিন্তা তাঁকে উদব্যস্ত করে তুলতে লাগলো। তারপরে ব্যস্ততা আর রইলো

না—কেবল 'ছেলের পরীক্ষা' এই কথাটাই বারে বারে মনে পড়তে থাকলো। এমন হত যে নিজেই বলতেন—'আঃ এতো আচ্ছা জুটে গেলো। ছেলের পরীক্ষা তো আমি কি করবো—ছেলে দেবে পরীক্ষা। তা আমার ভাবনা কেন? বত্তসব।' তিনি সে-চিন্তা ছাড়তে চান কিন্তু ঐ ছেলের পরীক্ষা এই কথাই কেবল মনে ঘুরে ঘুরে আসে। এক এক সময় নিজেই বলতেন—'এ যে আচ্ছা পাগলামিতে পেয়েছে। নাও তোমরা এর চিকিৎসা করাও। আর পারা যায় না। ক'বছর হয়ে গেল কেবল এই একটা-না-একটা মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। আর পারিনে। একী পাগলামি বলতো। হতে হতে চিকিৎসা করানোই ঠিক হল। কিন্তু তখনও তাঁর লজ্জা—এরকম আজেবাজে কথা যার কোনও মানে নেই—তিনি নিজেই তা বোঝেন তবু ছাড়তে পারেন না। এসব কথা এ-বয়সে ডাক্তারের কাছে বলবেন কি করে। যখন আর কিছু উপায় রইলো না তখন একদিন চিকিৎসা করানোর জন্য হাজির হলেন। রামবাবু কয়েকদিন চিকিৎসা করিয়ে কিছু হবে না মনে করে মনঃসমীক্ষণ চিকিৎসা ছেড়ে দেন। মাস-তিনেক পরে তিনি আবার ঠিকমত চিকিৎসা করাবেন স্থির করে ফিরে আসেন। —এই তিন মাস তিনি নানারকম চিকিৎসা করিয়ে মনে স্বস্তি পাননি। তাই আবার ফিরে আসেন। দীর্ঘ প্রায় দু বছর চিকিৎসা করিয়ে তিনি এখন সুস্থ হয়ে আবার হৈ-চৈ করে খেলে বেড়িয়ে আনন্দে আছেন।

বুড়ো হওয়া সম্বন্ধে তাঁর ভয় হঠাৎ তাঁকে একেবারে কাবু করে ফেলে। প্রথম যৌবন থেকেই তাঁর মন নিজের উপযুক্ত পুরুষশক্তি সম্বন্ধে একটু দ্বিধা ভাব ছিল। কিন্তু পুরুষ হয়ে জন্মে নিজের পুরুষশক্তিতে কম হওয়া অত্যন্ত গ্লানি-কর মনে করে তার হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে নিয়মিত ব্যায়াম করা খেলা-ধুলো করা হৈ-চৈ করা আনন্দ করা—এই নিয়েই নিজেকে মাতিয়ে রাখতে—অর্থাৎ এই দিয়েই নিজের দুর্বলতাকে ঢেকে রাখতে চেষ্টা করে এসেছেন। তারপরে যখন উপন্যাস পড়ে মনে আবার ধাক্কা লাগলো তখন সব কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল। না পারলেন বার্ধক্যের সঙ্গে দুর্বলতার বোধকে সহ্য করতে না পারলেন অন্য কোনও উপায় বের করে নিজেকে রক্ষা করতে। এই দ্বন্দ্বে পড়ে তাঁর অহং এক পাকচক্রে ঘুরতে থাকে। তারপর সেই অহং এক এমন বন্ধকে আশ্রয় করলো যিনি স্বনামধন্য শ্রেষ্ঠ মানুষ। এ-বাঁধও টিকলো না—যখন ছেলের পরীক্ষার সময় এগিয়ে এলো। তখন ছেলের সঙ্গে একাত্মতার ফলে আবার নিজের ক্ষমতা-অক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দিল। এই-ভাবে একের পর এক মনে ধাক্কা যতো এলো রামবাবুর মন ততো টলে যেতে লাগলো। মনঃসমীক্ষণের ফলে তাঁর নানা অবস্থার উৎকণ্ঠার ভাব দূর হয়ে গিয়ে অহমের শক্তি বেড়ে যাওয়ায় তাঁর স্বাভাবিক সুস্থ মানসিকতা ফিরে আসে। নিজের সে আর যেসব জটিল ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর এই মানসিক রোগ যুক্ত হয়েছিল—সে আলোচনা এখানে করা সম্ভব নয়। সাধারণভাবে বিষয়টি বোঝবার জন্যে এত জটিলতার মধ্যে যাবার প্রয়োজন হত না।

(২) এক মধ্যবয়স্কা মহিলার আবেশিক বায়ু রোগের লক্ষণ ছিল অন্য এক সমস্যার সঙ্গে যুক্ত। বিবাহের প্রথম বৎসরেই সন্তান সম্ভাবনার লক্ষণ দেখা দেওয়ায় নানা কারণে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ইচ্ছানুসারে সে-ভ্রূণ নষ্ট করে দেওয়া হয়। তারপর প্রায় ১৫।১৬ বছর কেটে গেছে—তাঁদের আর কোনও সন্তান হয়নি। ভবিষ্যতে সন্তান হবার আশাও তাঁরা ত্যাগ করেছেন সন্তান তাঁরা চান কিন্তু আর সন্তান হবে না—এই ধারণায় জন্য মনে দুঃখ বোধ আছে। মহিলার মনে দৃঢ় ধারণা হয়েছে—প্রথম সন্তান নষ্ট হওয়ার ফলেই অভিশাপাত লেগেছে ঐ ভ্রূণের আর দেবতার। তাই সন্তান আর তাঁদের হবে না। স্ত্রীর এই বিশ্বাসের কথা শুনে শুনে স্বামীরও মনে সংশয় দেখা দেয়। মহিলাটি আস্তে আস্তে লক্ষ্মীপূজো ষষ্ঠীপূজো নিরাকুল ব্রত মঙ্গলচণ্ডী করে একে একে অনেক পূজো মানত নিয়ে সময় কাটাতে শুরু করলেন। পরিচিতদের মধ্যে আলোচনা হতো—ছেলেপুলে না হওয়ায় ধর্ম নিয়ে সময় কাটায় সে ভালই। কোল ভরলো না তাই মনও ভরলো না। সেখানে দেবদেবীর আসন পেতে মন ভরে নেবার চেষ্টা চলেছে। কিন্তু এতে মন ভরলো না। সমস্যা দেখা দিল—যে দেবতার রূপ তিনি কল্পনা করতে চান সে-রূপের বদলে অন্য দেবতার রূপ অস্পষ্টভাবে মনে জাগে। কিছুতেই তাঁর বাঞ্ছিত দেবতার রূপ মনে আনতে পারেন না। নিজের পাপের ফল মনে করে প্রায়শ্চিত্ত করবার কথা ভেবে পণ্ডিতের মত চাইলে পণ্ডিত তাঁকে যে দেবতার রূপ আপনা থেকে মনে আসে সেই দেবতার ধ্যান করতে উপদেশ দেন। কিন্তু তাও সম্ভব হয় না। তিনি যে দেবতার ধ্যান করতে চান তা বদল করতে তাঁর মন সরে না। হতে হতে অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে সময়ে-অসময়ে একটা অস্পষ্ট রূপ তাঁর মনে আসতে লাগলো। কোন্ দেবতার রূপ সেটা তাও তিনি ধরতে পারেন না। মনে অসহ্য এক অশান্তির অবস্থা সৃষ্টি হল। কিন্তু সেই ছায়ারূপ তাঁর মন থেকে কিছুতেই তিনি দূর করতে পারেন না। এই দুর্বোধ্য অবস্থায় পড়ে মনে মনে তিনি অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে যান। ক্রমে একটা মানসিক অবসন্নতা ও দৈহিক ক্লান্তি নেমে আসে। তিনি আর মন দিয়ে পূজাও করতে পারেন না। সেই অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি কেবলই তাঁর মনে জাগতে থাকে। এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে তিনি পূজো ছেড়ে দিলেন। একজনের পরামর্শে ফুলের বাগান করতে চেষ্টা করলেন। সময় কাটে—গাছ হয় ফুল হয়—একটু ভাল লাগে কিন্তু মনটা যেন সবটুকু ভরে না। জোর করে বাগান করতে লেগে রইল। ক'দিন পরে এখানেও অসুবিধে দেখা দিল। যখন যে ফুলের কথা মনে করতে চান তা মনে আসে না। এখানেও একটা অস্পষ্ট কী ফুল যেন মনে আসে। সে ফুলের আকারটা তার রং ইত্যাদি কোনটাই স্পষ্ট হয় না। ক'দিনের মধ্যেই এবারও সেই একই অবস্থা হল—সেই অস্পষ্ট ফুল তাঁর হাজার বার মনে আসতে লাগলো। নাম জানেন না। জানা কোনও ফুলের সঙ্গে যেন মেলে না। এই অপরিচিত ফুল চেনা-জানার বাইরে থেকেই তাঁকে সর্বদা পীড়া দিতে থাকে। রোগের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলেন। প্রায় দু' বছর চিকিৎসা চলে। এই সময়ের মধ্যে এক সময় সেই অস্পষ্ট অচেনা দেবতার ছায়ারূপ আর এক সময় সেই অস্পষ্ট অচেনা ফুলের আভাস কিছুদিন করে পালাক্রমে তাঁর মনে ঘোরাফেরা করতে থাকে ধীরে ধীরে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। এখন তাঁর আত্মরক্ষার অসহ্য তাগিদে পূজো বা বাগান কোনোটাই আর করতে হয় না। দুটোই কিছু কিছু এখনও আছে—ভাল লাগে বলে। তিনি বলেন—'ঘাড়ের ভূত নেমেছে। রক্ষে পেয়েছি।'

কোথা থেকে কিসের তাগিদে তাঁর এ-রোগ তা সব খুলে বলা যাবে না। শিশুকালের অশোধিত কামনা ভেতরে বাসা বেঁধে থাকে। তার সঙ্গে বাধার ফলে আক্রমবৃত্তিও জড়িয়ে পড়ে পথের জটিলে সমস্যার সৃষ্টি করে—এটা হল মানসিক রোগ সম্বন্ধে সাধারণ কথা। পায়ুকামের সঙ্গে আক্রমবৃত্তি ও অধিশাস্তার (সুপার ইগো) শাসন জড়িয়ে গিয়ে সমস্যা জটিল করে তুলে আবেশিক বায়ু রোগের সৃষ্টি করে। এই মূল কাঠামোর উপর প্রত্যেক রোগীর নিজস্ব কতকগুলি কামনা-বাসনার দ্বন্দ্ব মিলে বিশেষ বিশেষ লক্ষণের সৃষ্টি করে। প্রত্যেক রোগীরই রোগ সৃজনে এবং বিশেষ করে রোগের লক্ষণ সৃজনে নিজের মনের বৈশিষ্ট্য কাজ করে থাকে। রোগীর লিবিডো পরিণতির বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে চলে আসবার সময় অহং যে বিশেষ গঠন নিয়ে গড়ে উঠতে থাকে তার অবদান রোগলক্ষণের মধ্যে ধরা দিয়ে তার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়। প্রত্যেক মানসিক রোগীর রোগলক্ষণ তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি। তাই রোগের নাম এক হলেও সেই একই রোগের রোগী প্রত্যেকেই পৃথক—স্বতন্ত্র।

—তরুণচন্দ্র সিংহ

রাজেশ খান্না
হেমামালিনী

প্রেক্ষাগৃহ

মহানগরীতে বহু বর্ণ - বৈচিত্র্যের কয়েকটি ছবি এসেছে। হিন্দী ছবি 'প্রেমনগর' তারই একটি। ইস্টম্যানকালারের বর্ণাঢ্য এই ছবিটির প্রযোজক ডি রামা নাইডু। নির্দেশক কে এস প্রকাশ রাও। সুর সংযোজনা শচীনদেব বর্মণের।

ভারতের ছবির জগতের বিশেষ করে হিন্দী চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় তারকা রাজেশ খান্না আর হেমা মালিনী ছবিটির নায়ক-নায়িকা। সঙ্গে অন্যান্য সহ-চরিত্র চিত্রণে আছেন—অশোককুমার, প্রেম চোপরা, রমেশ দেও, আগা, জেভিড, নাজির হোসেন, কামিনী কৌশল, সুলোচনা, মীনা টী এবং আরো অনেকে।

আনন্দনগরের ছোট-জমিদার কুমার করণ সিং বংশের ধারা প্রবাহের বাইরে যেতে পারেন নি। ধন-দৌলত, মদের নেশা আর তার লাগোয়া মেয়েদের পিছু ছোটা-ছুটির জীবন। সেই উচ্ছৃঙ্খল জীবনের গতিকে থমকে দাঁড়াতে হলো। মধ্যবিত্ত ঘরের একটি মেয়ে কুমার করণ সিং-এর রাশ টেনে দাঁড় করিয়ে দিল। মেয়েটি এসেছিল ছোট-কুমার সাহেবের ব্যক্তিগত সচিব হয়ে। মা (রাজমাতা) বড়-কুমার আর তাঁর স্ত্রী জমিদার পরিবারের অন্যান্য মুখ্য-কুশীলব। ছোট-কুমারের সবই আছে, সবাই আছে—তবুও জীবনের শূন্যতা দিনে দিনে বেড়ে উঠেছে। তারই প্রতিক্রিয়া গিয়ে পৌঁছোয় মদের গ্লাসে নিত্য-নতুন মেয়েমানুষের মোহময়ী নৃত্যলাস্য উপভোগ করতে গিয়ে। লতা—একান্ত সচিবের জীবন-ব্রত হলো ছোট-কুমার সাহেবকে উচ্ছৃঙ্খলতার আবর্ত থেকে সরিয়ে আনা। সে চেষ্টায় লতা সফল হলো। ছোট-কুমারের জীবনের গতি বুঝিবা ফিরলো। অবস্থাটা ভাল চোখে দেখলো না বড়-কুমার। ছবির এক ক্রূর, খল চরিত্র এটি। এদিকে ভাইকে ফাঁকি দিয়ে সম্পত্তি হাত করার হীন প্রয়াস, লতার সান্নিধ্য থেকে ছোট-কুমারকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা ছাড়াও অত্যাচারী জমিদারের মূর্ত চরিত্র নিয়ে বড়-কুমার ছোট-কুমারের আর্ত মনের একটি কনট্রাস্ট। রাজমাতা ভায়ে ভায়ে পারিবারিক দ্বন্দ্ব দেখেন, শোনেন, মীমাংসাও করেন জমিদারী কেতার মাধ্যমে। অন্তরের স্পর্শ দিয়ে ছোট-

কুমারকে কাছে টানার কোন চেষ্টা করেন না। ফলে ছোট-কুমারের বিদ্রোহী মনে তুফান ওঠে। মনের বিদ্রোহ তার শিশু কাল থেকে। বিলাসিনী মা আভিজাত্য সম্বল করে দিন কাটিয়েছেন। শিশু করণ সিং গড়ে উঠেছে আয়ার স্নেহে। সেই আয়াকে মায়ের নির্দেশে গুলী করে মেরে ফেলা হলো। কিশোর করণ সিং সেই দিন থেকে বিদ্রোহী মন নিয়ে চলাফেরা করেছে। সামনে দেখেছে তার বাবা তার মায়ের অবহেলার দিনে দিনে পানাসক্ত হয়ে নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলেছেন। মদের নেশায় স্পৃহাও তার তখন থেকেই। মদ আর মেয়েমানুষ—করণ সিং-এর কাছে এছাড়া যেন আর কোন জগত ছিল না। লতা সেই জগতে প্রীতি আর প্রেমের স্পর্শ দিয়ে মেঘ আনিয়েছে, ঘটনা পরম্পরায় ঝরা বাদলে ছোট-কুমারের কাছে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। দুর্দান্ত নেশাগ্রস্ত একটা মানুষকে এক অনাবিল স্বচ্ছ-জীবনের পথে টেনে এনেছে। ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে লতা-করণ সিং-এর জীবনে প্রেমনগরের, স্বপ্ন ভেসে উঠলো। করণ সিং কয়েক লক্ষ টাকায় বিরাট এক সুরম্য হর্ম্য বানালো এবং তার নাম দিলো—প্রেমনগর। খল-নায়ক বড়-কুমার চরিত্র অপবাদ দিয়ে লতাকে প্রকাশ্য নির্যাতনে এগিয়ে এলো। ছোট-কুমার নিগ্রহ থেকে লতাকে রক্ষা করলো বটে, কিন্তু তাকে আর কাছে ধরে রাখতে পারলো না। রাজমাতাও ঐ ঘটনায় কিছুটা উত্তাপ সৃষ্টি করে দিলেন। লতা ঘরে ফিরে গেল। সেখানে হঠাৎ-বড়লোক দাদা-বৌদির সংসারে মা, বাবা, ভাই-বোনদের নিয়ে এক অসহায় জীবন যাপন করতে লাগলো। দাদা-বৌদির নিত্য-নতুন উপদ্রবে বিয়ে করতে রাজি হতে বাধ্য হলো। বিয়ের বাসরে বর-বরযাত্রী উপস্থিত। ওদিকে পানাসক্তি থেকে নিজেকে মুক্ত করায় ছোটকুমার অসুস্থ হয়ে পড়লো। ডাক্তারের বিধান ওষুধের মাত্রায় সামান্য পান প্রয়োজন। লতার কাছে প্রতি-শ্রুতিবদ্ধ ছোটকুমারের তা সম্ভব নয়। লতার বিয়ের চিঠি পেয়ে অসুস্থ কুমার বিয়ে বাড়ি এসে নির্জনে লতাকে আশীর্বাদ করলো। দূরে থেকে বরের মা তা প্রত্যক্ষ করলেন। ফলে যা ঘটার তাই ঘটলো। বরকে বিয়ের পিঁড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া হলো। কুমার করণ সিং তখন প্রেমনগরের পথে। অসহ্য যন্ত্রণা, শারীরিক আর মানসিক দুই নিয়ে বিব্রত, জীবনের ইতি করা ছাড়া তখন যেন তার কাছে আর কোন লক্ষ্য নেই। এদিকে রাজমাতার জীবনেও টনক নড়ে। তিনি ছুটে যান লতার বাড়িতে। ছোট-কুমারের অসুস্থতার কথা জানাতে এসে দেখেন লতাও তখন আরো অসহায়। বিয়ে না করে বর চলে গেছে। দাদা-বৌদির গঞ্জনা চরমে। লতা সব শুনে ছুটলো প্রেমনগরে। সেই সুরম্য হর্ম্যে করণ-লতার আবার মিলন হলো।

—চিত্ররথ

ওঁরা বলেন

ঃ সময়ে-অসময়ে 'আলো আছে আলো নেই' অবস্থায় আপনার অভিজ্ঞতা কেমন?

—ওঃ সে-কথা আর বলবেন না। বাড়ীতে যখন থাকি তখন না হয় যেমন-তেমন, কিন্তু ধরুন স্টুডিওয় শুটিং করছি। একটা বেশ ড্রামাটিক ইমোশনাল সিন আছে। অনেকক্ষণ প্রিপারেশন করে নিজেকে তৈরী করলাম। ফাইনাল টেক হবে। অমনি এক-তুড়িতে গেল সব নিভে। মুডও গেল চলে। বুঝুন তখন কি অবস্থা। তবে এখন এটা তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে।

'বিবি' দেখেছেন? কেমন লাগলো?

—না দেখা হয়নি। ঠিক ছিল, আমার এক প্রিয়জনের সঙ্গে ছবিটা দেখব। দুর্ভাগ্যবশত সে আমাকে চিরদিনের মত ছেড়ে চলে গেছে। তাই ঠিক করেছি—ঐ ছবিটা দেখবো না।

ঃ হিন্দী ছবির কোন্ নায়ক আপনার প্রিয়?

—রাজেশ খান্নাকে তো ডিম্পল নিয়ে নিয়েছে, এখন ধর্মেন্দ্র আর সঞ্জীব কুমার।

ঃ ভারত-ইংল্যাণ্ড টেস্ট সিরিজের ফলাফল কি হতে পারে?

—আশা তো রাখি আমরাই জিতব।

ঃ ফুটবল লীগে মোহনবাগানের বিপর্যয় আপনার কেমন লাগছে?

—খু-উ-ব খারাপ লাগছে। আমি মোহনবাগানের সাপোর্টার। ভাবতেই পারছি না, ভ্রাতৃসংঘের মত দলের কাছে কি করে হারল মোহনবাগান।

ঃ অভিনেত্রী না হলে ভবিষ্যতে আপনার অন্য কোন লক্ষ্য ছিল কি?

—আমি তো ভেবেছিলাম হয় মিলিটারী ডাক্তার হবো নইলে ঘরকন্না করব। মাঝখানে কিছু নয়। কিন্তু ভাগ্যের ফেরে কি হয়ে গেলাম দেখতেই পাচ্ছেন।

ঃ ঘরকন্না করতেন বললেন, তা সাংসারিক কাজকর্ম, রান্নাবান্না জানেন?

—জানি বৈকি, জানি না মানে। তেল-কই, চিংড়ী মাছের মালাইকারী, ইলিশ মাছের ঝাল এমন রাঁধব না অচ্ছা রাঁধুনীও পারবে না।

ঃ ফেলে-আসা জীবনটার কথা ভাবেন কখনও, কেমন লাগে?

—অভিনেত্রী হয়েছি বলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় খুব একটা পার্থক্য আমি করিনি। যতখানি সম্ভব সকলের সঙ্গে আগের মতই মিলেমিশে হাসিখুশি মেজাজেই থাকি। তবুও বাইরের যে বাধা-নিষেধগুলো আমার আচরণে পাই—সেগুলো না রাখলেও চলে না। মাঝে মাঝে মনে হয় ভেঙে ফেলি সব বাধানিষেধ। তাই আগের জীবনটার কথা ভাবলে একটু হিংসেই

সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়

হয়। মনে হয় অনেক স্বাধীন, অনেক প্রাণময় ছিলাম তখন।

ঃ এত কাজ আনন্দ আর লোকের মধ্যে থেকেও আপনার কখনও একা মনে হয় নিজেকে?

—(একটু হেসে) মনে হয় কখনও-সখনও। কি কারণে সঠিক বলতে পারবো না, নিজেও বুঝতে পারি না বুকটা মুচড়ে ওঠে মাঝে মাঝে।

ঃ স্কুল বা কলেজ জীবনে কোন পরীক্ষায় কখনও ফেল করেছেন?

—না না কখখনও করিনি বরং এক-বার ডবল প্রমোশন পেয়েছিলাম। ক্লাস এইট থেকে একেবারে টেন-এ উঠেছিলাম।

ঃ খবরের কাগজ নিশ্চয়ই পড়েন, কোন্ পাতাটা আপনার সবচাইতে প্রিয়?

—খবরের কাগজ হাতে নিয়ে সবার আগে আমি সিনেমা পাতাটাই খুলি—নতুন কি ছবি আসছে জানবার জন্য।

ঃ স্টার সিস্টেম-এর আপনি পক্ষে না বিপক্ষে এবং কেন?

—বিপক্ষে নিশ্চয়ই। কারণ নতুনেরা নইলে তো সুযোগ পাবে না। স্টার

সিস্টেম থাকার কিছু সুবিধে আছে ঠিকই কিন্তু নতুন তরুণদের সুযোগ না দিলে ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিই বা এগোবে কি করে? জানি নতুন শিল্পীদের নিয়ে কাজ করায় আর্থিক ঝুঁকি অনেক—তবুও বলব এই সিস্টেম ভাঙার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। দরকার হলে একটু বেশি দায়িত্ব কাঁধে নিয়েও।

ঃ ফিল্মে অভিনয় করার প্রধান যোগ্যতা কি হওয়া উচিত?

—অনুভূতি। অনুভূতি না থাকলে অভিনয় করা কখনই সম্ভব নয় তা সে সিনেমাই হোক বা থিয়েটার। 'আমি যা নয়' সেই কাজ যখন করতে হবে তখন অনুভূতি ছাড়া চরিত্রটিকে বুঝব কি করে জানব কি ভাবে?

ঃ দিনের শেষে শুটিং থেকে ফিরে এসে আপনি কি করেন?

—শারীরিক ক্লান্তির জন্য কিছুক্ষণ রিল্যাকস করতে হয়। রিল্যাকস করতে করতেই ভাবি সারাদিনে কি কাজ করলাম। কতটুকু ভালো হলো, কতটুকু মন্দ হোল। কাজ খারাপ হলে মাঝে মাঝে মনে হয় যদি আমার প্রচুর টাকা থাকত, পরিচালককে বলতাম খারাপ জায়গাগুলো বাদ দিয়ে আবার শুটিং করতে। পয়সা আমি দিতাম। কিন্তু সে আর পারছি কই।

—আলাপচারী

বায়োস্কোপিক

অনুমতি করুন, তাহলে পটলকে নিয়েই শুরু করা যাক। পটল একটা চরিত্র। বায়োস্কোপের জগতের বাইরে এমন চরিত্র কিন্তু বাস্তবিক দুর্লভ। জানবেন—আর্ট লাইনে যাঁরা, ও মতই অস্বীকার করুক, মাথায় তাদের কিঞ্চিৎ ছিট থাকতেই হয়। না হলে খুঁজুন এই অনিশ্চিত লাইনে কে আর তার জীবন যৌবন উৎসর্গ করে বসে?

যাহোক, পটলকুমার ছবির জগতে প্রোডাকশন ম্যানেজারী করতে একদিন, কথা নেই বার্তা নেই, হুট করে ঢুকে পড়েছিল। আর তাই, নিয়ে বোঁদে মিত্তিরের কি রাগ। বললে, মরতে এ লাইনে কেন এয়েচ? এ্যাঁ?... বায়োস্কোপের লাইনে বেশীর ভাগ মানুষ আসে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার জন্যে? কিন্তু তোমার মতলব কী?

ফিল্ম লাইনে মোষ? শুনে পটলের খ। অবস্থা। —হ্যাঁ বোঁদেদা, এখানেও মোষ? তখন বোঁদে মিত্তিরের কি বক্তৃতা। সে জীবনে পোড় খাওয়া অভিজ্ঞ মানুষ।—হ্যাঁ এখানেও। কেন, ফিল্ম লাইনে মোষ থাকতে নেই বুঝি? এই যে তুমি ফাঁকতালে ঢুকে পড়লে, তুমিই তো একটি আস্ত মোষ!

একদিন বোম্বের সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্টে এসে দেখি পরিচালক হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ও কলকাতা যাচ্ছেন। সহাস্যে বললেন, ভালই হল। বেশ গল্প করতে করতে।... আর সেদিনই আকাশে বর্ষার আহা কি চমৎকার আয়োজন। কখনও ইলসে গুঁড়ি। কখনও কাংলা-গুঁড়ি। নাগপুরের মাথায় যেতে সেটা যে ইতিমধ্যে ভয়ংকর হয়ে উঠেছে—স্পষ্ট বোঝা গেল। বোয়িং প্লেন টাল-মাটাল। দুচারজন হুড় হুড় করে বমি করে সামনের সীটের প্যাসেঞ্জারদের কৃতার্থ করলেন মনে হল। বেগতিক দেখে অনেকে যেমন ভীড়ের বাসে দাঁড়ায়, এইভাবে ডিং মেরে দাঁড়িয়ে উপস্থিত বিপদটা পাশ কাটালেন। হৃষিবাবু তখন বললেন, অঃ ভুলে গেছলাম গল্পটা।... দো বিঘা জমিন ছবির সময় আমরা বম্বেতে। সবাই ওখানে অপরিচিত। কোন গতিকে ছবিটা করা হচ্ছে। বোম্বের শহরতলীর একটি মাত্র ঘরে আমরা সবাই মানে বিমল রায়, সুধেন্দু রায়, সলিল চৌধুরী, নবেন্দু ঘোষ, অসিত সেন আমি—পুরো ইউনিট-ই থাকি। দিনের বেলা কাটে আন্ধেরীর মোহন স্টুডিওতে, রাত্রে শুধু এখানে শোয়া। খাওয়া-দাওয়া বাইরে। রাত্তে চোখে ঘুম থাকে না। কারণ নবেন্দু বাবু গোটা রাত এত জোরে নাসিকা-ধ্বনি (গর্জন?) চালিয়ে যান আমরা কয়েকজন কুপোকাৎ। একদিন আমি অসিত সেনকে বললাম, মশাই, এর যে একটা ব্যবস্থা করতেই হয়—

সোৎসাহে অসিত সেন—অবিলম্বে করুন, আমি আছি।

হৃষিবাবু বললেম, ঠাকুমা দিদিমার মুখে শোনা, ঘুমন্ত ব্যক্তির কানে বার বার তিনবার মোষ পোড়া খা বললে নাকি ম্যাজিকের মত নাক ডাকা বন্ধ হয়ে যায়। একবার দেখবেন নাকি?

অসিত সেন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার নিদ্রিত লেখককে দেখে নিয়ে বললেন—বলছেন।

—হ্যাঁ বলছি।

—তবে তাই হোক—বলে অসিত সেন নবেন্দুবাবুর কানের গোড়ায় বেশ জোরে তিনবার মোষ পোড়া খা—মোষ পোড়া খা—মোষ পোড়া খা বললেন। তারপর মাত্র এক সেকেন্ডের বিরতি, নিদ্রিত লেখক তৎক্ষণাৎ ওই অবস্থাতেই বলে উঠলেন তুই খা—তুই খা—তুই খা।

বোঁদে মিত্তির অতএব ফিল্ম লাইনে মোষের অস্তিত্ব বিনা গবেষণায় ধরে ফেলেছে—এমন বলাটা উচিত হবে না। কিন্তু পটলকে মোষ বলাটা হয়ত ঠিক হয়নি তার। পটল ক্ষুব্ধ হয়েছিল।

এই পটলকে একবার সিনেমার নায়িকা খুঁজে বের করার জন্য কমিশনড করা হয়েছিল। নায়িকার অভাবে ছবিটি বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে দেখে সে এহেন অসমসাহসিক কাজের দায়িত্ব নিতে বাধ্য হয়েছিল। পটল ট্রামে-বাসে বহু সুন্দরী তরুণী দেখে দেখে ভেবেছিল—এ এমন একটা কিছু গুরুতর ব্যাপার নয়। তখন বোঁদে মিত্তিরের মন্তব্য ছিল—তাহলে এবার তুই মলি।

পটল কাট-টু দক্ষিণ কলকাতার এক গার্লস কলেজের সামনে। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে ভঙ্গীতে। ইদানীং বোঁদে মিত্তিরের ঠাট্টা তার সহ্য হয় না।

বিখ্যাত নায়ক এরল ফ্লিন তাঁর আত্মজীবনী 'মাই উইকেড উইকেড ওয়েজ' গ্রন্থে এমন সব ব্যক্তিগত ঘটনার উল্লেখ করেছেন যে পড়লে ইয়ে হয় মানে থাবড়ে যেতে হয়। এর ফ্লিনের শো-ম্যানশিপের বাস্তবিক তুলনা হয় না। চেহারার জোরে ব্যক্তিত্বের জোরে তৎ-

লোক সে-যুগের বিখ্যাত, কুখ্যাত সুন্দরীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেছেন, গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে তার স্বীকারোক্তি আছে।

তারও পর পড়েছি চার্লি চ্যাপলিনের বিখ্যাত মাই অটোবায়োগ্রাফী গ্রন্থ। এক কথায় অসাধারণ। চলচ্চিত্রের সেই পৃথিবী-খ্যাত ভবঘুরে একদিন যেভাবে ক্যামেরার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, কেউ নিশ্চিত ভাবে বলতে পারেনি, মশাই এক সপ্তাহ অপেক্ষা করুন, এই লোকটি নিশ্চিত দিগ্বিজয়ী হবে। কিন্তু সময় প্রমাণ করেছে —এই শো-ম্যানশিপ তুলনাহীন। চার্লি চ্যাপলিনের কিছু স্বীকারোক্তি আছে। তবে বড় বেদনাদায়ক। এবং রোমাঞ্চহীন।

পটল এই দুয়ের মাঝামাঝি একটা প্রতিষ্ঠা চেয়েছিল। পেতে বাধা কোথায়? যে ভদ্রলোক তাকে উত্তেজিত করে একটা জায়গায় পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছিল পটল যতই বিরূপ মন্তব্য করুক তার অবদান পটল তার জীবনে অস্বীকার করতে পারে না। পারা সম্ভবও না।

কাট-টু-কাট কলেজের ছুটির সময় পটল বহু হবু নায়িকা দেখেছে। কিন্তু তার পছন্দ হচ্ছিল না। সে প্রায় রোজই বিরক্ত বীতশ্রদ্ধ মুখে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকত। তার ধারণা—সে মেয়েদের দিকে নজর রাখছে। কিন্তু অলক্ষ্যে পাড়ার ছেলেরা যে তাকেও নজরে রাখছিল—এটা সে বুঝতে পারেনি।

পটলের সহকারী সুনীলের জবানীতে শুনুন শেষ পর্যন্ত কি হলো। সুনীল একদিন বললে—দাদা পটলদার কীর্তি আর কি বলব। একদিন আমায় বললে সুনীল চল, আজ একটা মেয়ে দেখেছি, দারুণ, রাজী করাতে পারলে ও অনেকের ছুটি করিয়ে দেবে—

সুনীল অগত্যা গিয়েছিল। ছবি বন্ধ হলো বিপদটা তারও। দাদা, কলেজের সামনে গিয়ে পটলদা বললে, ছুটির সময় সবাই হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়ে। দুটো তো মাত্র চোখ। সবাইকে তো আর নজরে বেঁধে রাখা যায় না। আজ তুই হাফ আমি হাফ—তারপর হঠাৎ দেখি চারটে ছেলে দৌড়ে এসে পটলদাকে চেপে ধরেছে। পটলদা পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে। শুনলাম, একটি ছেলে বলছে—

সোনার কেল্লা : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়/সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়। —ফটো : অমৃত

রোজ রোজ এখানে কী করা হয় মশায়ের?

পটল অকুতোভয়—কেন বলুন তো?

—আগে আমাদের প্রশ্নের জবাব দিন—তারপর আপনারটা—

—এই ইয়ে মানে—

—বলে ফেলুন বলে ফেলুন..

পটলদা যে প্রাণ করবে সে উপায় কোথা, ওরা যে কাঁধ চেপে দেয়াল ঠেসে দাঁড় করিয়েছে—আরে আপনারা ঠিক বুঝতে পারছেন না—আমি হিরোইন খুঁজতে—

—এ-পাড়ায় হিরোইন খোঁজা হচ্ছে? পটলের কথা শেষ না হতেই ওরা—আস্পর্দ্ধা আপনার কম নয় তো...

সহকারী সুনীল বললে—আমি লুকিয়ে পড়েছিলাম ভাগ্যিস নইলে উঃ—সুনীল শিউরিতে—পটলদাকে ওরা পার্কের পেছন দিকটায় নিয়ে বুকে হাটু দিয়ে—

একটি ছেলে বললে—গুরু, সার্ভিস আমরা দু রকমই জানি, ইন্ডিয়ান, ওয়েস্টার্ন

—এখন বলুন কোনটা আপনার পছন্দ—

এরপর সুনীল আর দাঁড়ায়নি। চলন্ত একটা বাস ধরে ঝুলে পড়ে সোজা স্টুডিওয়। পরিচালক ভদ্রলোক আঁৎকে উঠে—এ্যাঁ, কি সর্বনাশ—চল চল চল—

অকুস্থানে পৌঁছে জানা গেল, হাঁ সবই ঠিক, তবে তিনি হসপিটালে।

সব শুনে পাড়ার ছেলেরা খুবই দুঃখিত। আরে ছিঃ ছিঃ—তা বলবেন তো যে উনি বায়োস্কোপের জন্যে খুঁজছেন—আমরা ভাবলাম উনি বোধহয় পার্সোনাল হিরোইন...

পটল বাঙালী কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ আত্মবিস্মৃত নয়, আমার মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে ও আত্মজীবনী লিখবে। যাতে গুছিয়ে লিখতে পারে তাই আপাততঃ এটা আমি লিখে দিলাম, পরের গুলো আশা হয় সহজেই ও লিখে ফেলবে।

—রঞ্জন মজুমদার

স্টুডিও সংবাদ

সমকালীন বাংলা ছবিতে 'হিরো' শুধু 'হিরো' নয়—'ক্যারেকটার হিরো'। এই চরিত্রের ধরণ সম্পর্কে সাধারণ দর্শকদের ধ্যান-ধারণা ক্রমশ বদলাচ্ছে। আগে একটা সময় ছিল যখন 'হিরো' বলতে বোঝাত ভাল মানুষ। লালটু চেহারার খুব কদর ছিল। পৃথিবীর যাবতীয় ভালো কাজ করতে হত। চরিত্রের সাধুতাই ছিল প্রধান। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবোধ পরিবেশ এবং পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়েছে। 'হিরো' এখন আর দেবতুল্য ব্যক্তি নন। তিনি দোষেগুণে মিলে মানুষ। তার মুখে ন্যাকা ন্যাকা কথা কমেছে বোকা বোকা হাসি মিলিয়ে গিয়েছে। ভাল ও মন্দর সংমিশ্রণে বিশ্বাস-যোগ্য হয়ে পর্দার বুকে ফুটে উঠছেন। ভাবতে পারেন সাম্প্রতিক একটা ছবিতে 'হিরো' চরিত্র আদ্যন্ত দুশ্চরিত্র।

লোকটাকে দেখুন। ভালো করে দেখুন। পরনে ফিনফিনে ধুতি গরদের পাঞ্জাবি চোখে গোল্ডেন ফ্রেমের ঝকঝকে চশমা। চশমার কাঁচের মধ্য দিয়ে চোখ দুটি স্পষ্ট। অত্যন্ত ধীর স্থির প্রকৃতির। নির্মম অথচ নির্লিপ্ত। লোকটা এমন অসহায়ভাবে মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন তার পায়ের তলায় মাটি সরে যাচ্ছে। সে চলে যাচ্ছিল! পিছু ডাকলো সতেরো-আঠারো বছর বয়েসী একটি ছেলে। হ্যাঁ ওরই ছেলে। দীর্ঘদিন পর এসেছে, কলকাতা থেকে। এসেছে এখানে এই বাড়িতেই। জায়গাটার নাম ধরে নিতে হবে রানীপুর। বাড়ি নয়, বলা যেতে পারে এটা একটা প্রাসাদ। নিজের হাতে ঘর সাজিয়েছে লোকটা। সবই নাকি ছেলের জন্য।

জন্মের পর থেকে যে ছেলে ঘরের বাইরে সেই ছেলে আজ ঘরে। কত আনন্দের ব্যাপার। কিন্তু লোকটার অন্তরে বাইরে কোনোরকম প্রকাশ নেই। ছেলে উপলব্ধি করতে পারে। কিছুক্ষণের মধ্যে হাঁপিয়ে ওঠে। দ্রুত এই পরিবেশ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চায়। স্পষ্ট বলে : 'আমি কালই ফিরব।'

লোকটা অনুনয় বিনয় করে : পনেরো বছর পর আমার কাছে এলি শুধু একটা রাতের জন্য। তোকে নিয়ে আমার অনেক আশা ছিল রাজু।...রাজু শোন তোকে যে জন্য রানীপুর আনিয়েছি সে শুধু মুখে বললে তুই বুঝতে পারবি না। অনেক কিছু দেখতে হবে শুনতে হবে...।

ছেলেটি যত দেখবে যত শুনবে অবাক হবে। দর্শকরাও। কারণ ছেলেটির পারস-পেক্টিভ-এ দর্শকরা দেখবেন : লোকটা ভয়ানক স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক হিংস্র কুটিল এবং নিষ্ঠুর। অর্থের পেছনে ছুটছে। এর জন্য কত খারাপ কাজ করতে পারে—নিজের ছেলেকেও ঠকাতে পারে।

অনেকেই বলবেন দুশ্চরিত্র 'ভবেশ'-এর খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসে 'হিরো' উত্তম-কুমার বললেন : বহুদিন পর একটি চরিত্র পাওয়া গিয়েছে। এই চরিত্র রূপায়ণে যে কি পরিমাণ পরিমিতি বোধ থাকা দরকার তা প্রত্যক্ষ করা গেল তাঁর সপ্রতিভ অভিনয়ে। তিনি চরিত্রটিকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে আতিশয্য পুরোপুরি পরিহার করেছেন। চলনে বলনেই চরিত্রের মর্মের রহস্য প্রকাশিত হচ্ছে। বাস্তবায়িত হচ্ছে ভবেশ, রক্তমাংসের মানুষ। তা সে যতই খারাপ কাজ করুক না কেন।

প্রফুল্ল রায়ের 'প্রথম তারার আলো' থেকে এসেছে এই লোকটা ভবেশ। এসেছে এ এম ফিল্মসের বাঘবন্দী ছবিতে। চিত্র-নাট্যকার-পরিচালক পীযূষ বসু বিগত সপ্তাহে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে শুটিং শুরু করেছেন। রাজুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন পার্থ মুখোপাধ্যায়। প্রধান দুই নারী চরিত্রের শিল্পী : সুপ্রিয়া দেবী ও মহুয়া রায়চৌধুরী।

অসীমা ভট্টাচার্যের নিবেদন এই ছবির আলোকচিত্রশিল্পী : গণেশ বসু। শিল্প-নির্দেশক : সূর্য চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদক : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়।

•

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পের উন্নতিকল্পে পঁচিশ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করেছেন এ-খবর তো পুরোনো হয়ে গিয়েছে। এখন জানবেন কিছু টাকা ব্যয় করা হবে নতুন ছবি নির্মাণে। কয়েকজন টাকা পাচ্ছেন। শোনা যাচ্ছে মাধবী দেবী টাকা পাচ্ছেন। ছবি প্রযোজনা করবেন। আশাপূর্ণা দেবীর 'সুবর্ণলতা' অবলম্বনে হবে এই ছবি। পরিচালনা করবেন : গুরুদাস বাগচী। বলা বাহুল্য প্রধান নারী চরিত্রে রূপদান করবেন মাধবী দেবী। প্রধান পুরুষ চরিত্রে খুব সম্ভবতঃ অনিল চট্টোপাধ্যায়।

অপরাজিতা/রাজশ্রী বসু ও তনিমা বিশ্বাস

এই সূত্রে আর যে কজনের নাম কানে আসছে—তাঁরা হলেন ঃ মঞ্জু দে পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পার্থপ্রতিম চৌধুরী। শ্রীমতী দে বনফুল রচিত 'আগুন জ্বালো' চলচ্চিত্রায়িত করবেন। পলাশ—তারাশংকরের বিখ্যাত গল্প 'প্রতিমা' এবং পার্থপ্রতিম 'কৃষ্ণপক্ষ'-র শ্যুটিং পুনরায় শুরু করবেন।

কলকাতায় হিন্দি ছবি তৈরীর পরিকল্পনাটি নতুন নয়। এখানকার ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির সংকট মোচনের জন্য এই একটি প্রকৃষ্ট উপায়ের কথা অনেকেই ভাবছেন। সম্প্রতি রাজ্য সরকারও এই প্রস্তাবটি বিবেচনা করে দেখছেন। ইতমধ্যে প্রযোজক-পরিচালক দয়াশংকর সুলতানিয়া এবং সুখেন দাস কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। শ্রীসুলতানিয়ার অবদান যথেষ্ট। পরিবর্তন ছবিটি তিনি এখানেই নির্মাণ করেছেন। আবার নতুন ছবি শুরু করেছেন 'কিতনে পাশ কিতনে দূর'। এ-ছবিতে গল্প দুটি। প্রথম পর্বের কাজ প্রায় শেষ। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন ঃ সমিত ভঞ্জ ছায়া কৌসর রবি ঘোষ চিন্ময় রায় অজয় বন্দ্যোপাধ্যায় হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়। দ্বিতীয় পর্বে প্রধান চরিত্রে রূপদান করবেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। মোটামুটি একইভাবে সুখেন দাস 'অচেনা অতিথি'র হিন্দি চিত্ররূপ দানে ব্রতী হয়েছেন। হিন্দিতে নামকরণ করা হয়েছে 'অনজানে মেহমান'। কল্লারে তোলা হচ্ছে। যথারীতি যুগ্ম পরিচালক ঃ জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় এবং সুখেন দাশ। ভূমিকালিপিতে কিছু অদলবদল হয়েছে। প্রধান চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন সমিত ভঞ্জ। নায়িকা কে হবেন তা এখনো স্থির হয়নি। তবে বোম্বে থেকে কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে রূপ দিতে আসছেন ঃ ড্যানি ওমপ্রকাশ পদ্মা খান্না অথবা জয়শ্রী টি। শ্যুটিং শুরু হয়ে গিয়েছে। চিত্রগ্রহণে আছেন ঃ কে এ রেজা। সংগীত পরিচালনার ভার নিয়েছেন ঃ অজয় দাশ।

অদূর ভবিষ্যতে কলকাতায় একাধিক হিন্দি চিত্র নির্মাণের কাজ শুরু হচ্ছে। পরিচালক তপন সিংহ মঞ্চসফল 'মল্লিকা' হিন্দীতে রূপায়িত করবেন। নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় সঞ্জীবকুমার-শর্মিলা ঠাকুরের নাম শোনা যাচ্ছে। অরুন্ধতী দেবী গৌরকিশোর ঘোষের 'তলিয়ে যাবার আগে' ডাবল ভার্সানে তুলতে উদ্যোগী হয়েছেন। কলকাতাতেই সমস্ত শ্যুটিং হবে। দুই ভার্সানেই শত্রুঘ্ন সিনহার কাজ করার কথা আছে। নায়িকা চরিত্রে শর্মিলা কাজ করতে পারেন।

কলকাতায় ... হচ্ছে না এমন মন্তব্য করা ঠিক নয়। নতুন ধরনের ছবি করার সাহস এখানে ...। তবে এই সৎসাহস বিস্তার লাভ ...নি। কতিপয় তরুণ পরিচালক সচেষ্ট ... অনেক বাধা-বিপত্তির মধ্যে তাঁরা এগিয়ে ...ছেন। যেমন নীতিশ মুখোপাধ্যায়। '... দিন সূর্য'র পর নতুন ছবির পরিকল্পনা শুরু করেছেন। এবারেও সুনীল দাশের কাহিনী থেকে। 'কাল মধুমাস'. সম্পূর্ণ আউটডোরে তোলা হবে। লোকেশন অনেক দূরে—ভুটান সীমান্তের কাছাকাছি কোথাও। পূর্ণেন্দু পত্রী 'ছেঁড়া তমসুক' ছবির কাজ শেষ করে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আত্মপ্রকাশ' চলচ্চিত্রায়িত করবেন এই মনস্থ করেছেন। বিপ্লব রায়চৌধুরী 'বর্ণবিবর্ণ'-এর কাজ শেষ করে নতুন ছবি শুরু করার চেষ্টায় আছেন।

অতি সম্প্রতি মধ্য কলকাতার একটা বাড়িতে শ্যুটিং হচ্ছিল। বাড়ির ছাদে চিলেকোঠায়। নামকরা নায়িকা। খবরটা ছড়িয়ে পড়তেই রাস্তায় ভিড়। বেলা বাড়তে ভিড় বাড়তে থাকে। তারপর একসময় জনতার দাবী—নায়িকাকে নীচে নেমে আসতে হবে। সকলে তাঁকে নিকট দূরত্বে দেখতে চান। নায়িকা, অতএব নীচে এলেন। এসে দাঁড়ালেন জনসমক্ষে। মাপা হাসি হাসলেন। জনতা পুলকিত হলেন। প্রশ্ন করে উত্তর পেলেন। সুতরাং প্রশ্নের পর প্রশ্ন। শেষ প্রশ্ন ঃ আমরা কি আপনার গায়ে হাত দিয়ে একটু দেখতে পারি?

নায়িকা তখন চোখে সর্ষে ফুল দেখছেন।

স্টুডিও সংবাদদাতা

বাঙলাদেশের যুদ্ধ ও

যুদ্ধভিত্তিক ছবি

একাত্তরের ২৫শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত যাঁরা বাংলাদেশে ছিলেন ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছেন এবং পরবর্তীকালে স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে নির্মিত 'যুদ্ধভিত্তিক ছবির' দর্শক হয়েছেন তাদের প্রশ্ন, এইসব পরিচালক ছবি তৈরীর জন্য এতো কিছু থাকতে কেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ভিত্তি করে ছবি তৈরী করতে গেলেন?

তাঁদের প্রশ্ন, এই সব পরিচালক নিজেরা যুদ্ধভিত্তিক ছবি তৈরী করার আগে বিদেশে নির্মিত ও এদেশে ইতিমধ্যে একাধিকবার, অসংখ্যবার প্রদর্শিত কোন যুদ্ধভিত্তিক ছবি দেখেছেন কি?

এবং আরো প্রশ্ন, যুদ্ধের নয় মাস অর্থাৎ ২৫শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এইসব পরিচালক কোথায় ছিলেন? বাংলাদেশে ছিলেন কি? যদি বাংলাদেশে থেকে থাকেন তাহলে এই নয় মাসের যুদ্ধ তাঁরা কিভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন? একজন নিরুপায়, মৃত্যুভয়কাতর, সদাশংকিত বাঙালী হিসেবে কি?

কিন্তু কেন এসব প্রশ্ন?

প্রশ্ন এই জন্য যে, বাংলাদেশের নয় মাসের যুদ্ধ ও যুদ্ধপরবর্তীকালে নির্মিত যুদ্ধভিত্তিক ছবি কয়টিতে মিলের চেয়ে অমিল ও গরমিল দর্শকের হৃদয়ে শুধুই দুঃখ বেদনা ও হতাশার জন্ম দেয়।

ইতিহাস সাক্ষী দেয়, যে কোন যুদ্ধ, বিশেষতঃ মুক্তিযুদ্ধ, সে দেশের চলচ্চিত্রের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন, বৃটিশ, সোভিয়েত, ফরাসী এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের চলচ্চিত্রে যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে, তাতে স্বাভাবিকভাবেই আমাদেরও আশা ছিল, এ দেশের নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ (মুক্তিযুদ্ধ) এ দেশের চলচ্চিত্রের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তারে সহায়ক হবে।

কিন্তু হা হতোস্মি!

আমাদের আশা, স্বাধীতার এই তিন বছর পরেও দুরাশাই রয়ে গেল।

ত্রিশ লক্ষ জীবন, এক নদী রক্তের বিনিময়ে, দীর্ঘ নয় মাস ধরে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর, যে স্বাধীনতা আমরা অর্জন করলাম, স্বাধীনোত্তর নির্মিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছবিগুলোতে তার সত্যিকারের ছাপ কোথায়?

আর তাই বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক নির্মিত ছবি কয়টির কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার, সংলাপ রচয়িতা ও পরিচালকদের প্রতি বাংলাদেশের দর্শকদের উপরোক্ত প্রশ্নাবলী।

আমরা জানি, যুদ্ধের নয় মাস বেশ কজন প্রখ্যাত পরিচালক বাংলাদেশে ছিলেন না। তাঁরা বাংলাদেশ ছেড়ে প্রাণভয়ে লক্ষাধিক শরণার্থীর সঙ্গে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

আমাদের জানামতে এইসব পরিচালকদের মধ্যে যেমন ছিলেন জহীর রায়হান, আলমগীর কবির, সুভাষ দত্ত, আবদুল জব্বার খান, তেমনি ছিলেন নারায়ণ ঘোষ, মিতা, মোমতাজ আলী ও হাসান ইমাম প্রমুখ।

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস এইসকল পরিচালক ভারতে বসে কি করেছেন তা আমাদের জানা নেই। তবে জহীর রায়হান সেখানে গিয়ে যে চুপচাপ বসে ছিলেন না, তার প্রমাণ যুদ্ধ চলাকালে জহির রায়হান সেখানে মোট চারটি প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ করেছেন, যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে রাতারাতি বিশ্ববিবেকের বন্ধ-দুয়ারে অত্যন্ত সার্থকভাবে আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছিল এবং বিশ্বজনমত আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে জোরালো করতে সহায়ক হয়েছিল।

জহীরের এই চারটি প্রামাণ্যচিত্র সে-সময় আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে কতটা এগিয়ে নিয়ে গেছে, তা নিশ্চয় আজ আমাদের সবার কাছে স্পষ্ট। জহীর নির্মিত প্রামাণ্য ছবি চারটি হল (ক) স্টপ জেনোসাইড (খ) বার্থ অব এ নেশন (গ) লিবারেশন ফাইটার্স ও (ঘ) ইনোসেন্ট মিলিয়নস। অবশ্য অস্বীকার করার উপায় নেই, উল্লেখিত চারটি প্রামাণ্য চিত্র, যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সাক্ষাত দলিল, তা বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর চলচ্চিত্র দর্শক আজও দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেন নি।

কিন্তু জহীর রায়হান আজ আর আমাদের মাঝে নেই। যে স্বাধীনতার জন্য তাঁর এতো ত্যাগ, এতো কষ্ট স্বীকার, সেই স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশ হানাদারমুক্ত ও শত্রুমুক্ত মাটিতে, সবার চোখের সামনে এবং প্রকাশ্য দিবালোকে (বাহাত্তরের ৩০শে জানুয়ারী) জহীর রায়হান নিতান্তই অলৌকিকভাবে নিখোঁজ হলেন।

[illegible]
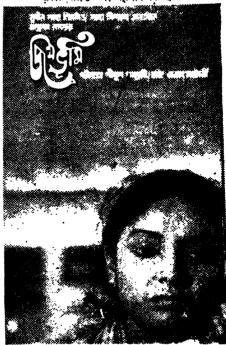
অতঃপর বাহাত্তর গেল। তিয়াত্তর গেল। এটা চুয়াত্তর। কিন্তু জহীর আর ফিরে এলেন না। হয়ত তিনি চিরকালের জন্যই আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেলেন ও নিখোঁজ হয়েই রইলেন।

আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়-বস্তু 'বাংলাদেশের যুদ্ধ ও পরবর্তীকালে বাংলাদেশে নির্মিত যুদ্ধভিত্তিক ছায়াছবি' সম্পর্কে। অতএব জহীরের প্রসংগ এখানে অপ্রাসংগিক নয়—বরং প্রসংগক্রমেই আসছে।

কথা হল, জহীর রায়হান একদা ছিলেন। তার প্রমাণ অবরুদ্ধ পাকিস্তান আমলে জহীর 'জীবন থেকে নেয়ার' মত ছবি তৈরী করে পাকিস্তানের শাসকদের মনে একদা ভীতি সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

জহীর একদা আমাদের মাঝে ছিলেন। আর তাই স্বাধীনতার আগে তিনি 'লেট দেয়ার বি লাইটের' মত একটি আন্তর্জাতিক ছবি নির্মাণে দৃঢ়পায়ে ও অকুতোভয়ে এগিয়ে এসেছিলেন।

এবং জহীর যে একদা বাংলাদেশের মানুষ ও মাটিকে সত্যিই ভালোবেসেছিলেন, তার প্রমাণ হল, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভারতে গিয়েও তিনি অন্য অন্যান্য খ্যাত অখ্যাত পরিচালকদের মত নিষ্ক্রিয় না থেকে পরপর চারটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চিত্র তৈরী করেছিলেন।

অথচ আজ যে জহীর আমাদের মাঝে নেই, তাও আমরা দিবালোকের মত, চাঁদ তারা সূর্যের মতোই সর্বক্ষণ অনুভব করছি।

যে জহীর অবরুদ্ধ পাকিস্তান আমলে 'একুশে ফেব্রুয়ারী'র উপর ছবি তৈরী করতে চেয়েছিলেন যে জহীর শত সহস্র বাধা বিপত্তিকে বৃদ্ধাঙগুলী দেখিয়ে 'জীবন থেকে নেয়া' তৈরী করেছিলেন এবং 'লেট দেয়ার বি লাইট' নির্মাণে হাত দিয়েছিলেন, যে জহীর যুদ্ধের নয় মাসে সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায় পরপর চারটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ করেছিলেন, সেই জহীর যদি আজ আমাদের মাঝে থাকতেন, ছবি নির্মাণ করতেন, তাহলে হয়ত আজ আর আমাকে এ আলোচনা লেখার জন্য কলম ধরতে হতো না এবং বাংলাদেশের চলচ্চিত্র দর্শকদেরকেও আজ আর আশাভঙ্গের বেদনায় মুষড়ে পড়তে হতো না।

যা বলছিলাম, জহীর নেই। কিন্তু জহীর যদি আজও বেঁচে থাকতেন, তাহলে জহীর আমাদেরকে 'যুদ্ধভিত্তিক' এক বা একাধিক সার্থক ছবি উপহার দিতে পারতেন, এমন আশা আমরা নিশ্চয় করতে পারি।

জহীর নেই কিন্তু অন্য অন্যান্য শতাধিক প্রবীণ নবীন চিত্র-পরিচালক তো আজও বেঁচে আছেন এবং তাঁরা ছবিও একটার পর একটা তৈরী করেছেন ও করছেন। অথচ 'এক জহীর' যা পারতেন 'শতাধিক প্রবীণ ও নবীন পরিচালক' তা কেন যথাযথভাবে করতে পারছেন না?

অবশ্য স্বাধীনতার পর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছবি যে বাংলাদেশে একেবারেই তৈরী হয়নি, তাও নয়। হয়েছে এবং বেশ কয়েকটিই হয়েছে।

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক এইসব ছবি নির্মাতাদের মধ্যে যেমন রয়েছেন সুভাষ দত্ত, খান আতাউর রহমান, নারায়ণ ঘোষ মিতার মত প্রবীণ পরিচালক, মোমতাজ আলী, আলমগীর কবির, আনন্দ আলমগীর কুমকুমের মত অভিজ্ঞ পরিচালক, তেমনি আছেন চাষী নজরুল ইসলামের মত স্বাধীনোত্তর সদ্যজন্মপ্রাপ্ত (আগে সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন) পরিচালকও।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ভিত্তি করে মূলতঃ এইসব প্রবীণ ও নবীনদের মধ্যে দস্তখান 'অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী' মোমতাজ আলী 'রক্তাক্ত বাংলা' আনন্দ [illegible]

অন্তরালে/ববিতা ও জাফর

বাঙ্গালী' এবং চাষী নজরুল ইসলাম 'ওরা এগারোজন' ও 'সংগ্রাম' নির্মাণ করেন।

এ ছাড়া আলমগীর কবিরের 'ধীরে বহে মেঘনা' ও আলমগীর কুমকুমের 'আমার জন্মভূমিতেও মুক্তিযুদ্ধ এসেছে। তবে ছায়া হয়ে। সম্পূর্ণ কায়া হয়ে নয়।

অন্যদিকে খান আতাউর রহমান তাঁর 'আবার তোরা মানুষ হ' এবং নারায়ণ ঘোষ মিতা তাঁর 'আলোর মিছিলে' যুদ্ধ নয়, যুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশ, বাংলাদেশের মানুষের মন মেজাজ ও সমাজের রূপ দিয়েছেন এবং দিতে চেষ্টা করেছেন।

এ ছাড়াও 'বাংলার ২৪ বছর' ও 'বাংলার মুখ' নামে দুটি ছবি নির্মিত হচ্ছিল এবং অজ্ঞাত কারণেই আজও মুক্তি পায়নি।

'জল্লাদের দরবার' নামেও একটি ছবি একদা নির্মাণের কথা পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবরে জানা যায়। জানি না বর্তমানে ছবিটি কেন 'কোল্ড স্টোরেজে' বন্দী হয়ে রয়েছে এবং আদৌ আগামীতে নির্মিত হবে কিনা?

এখন মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ও ইতিমধ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলো নিয়ে আলোচনায় আসা যাক।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর ভিত্তি করে নির্মিত ও মুক্তিপ্রাপ্ত মোট চারটি ছবির মধ্যে আনন্দের 'বাঘা বাঙ্গালী' ও মোমতাজ আলীর 'রক্তাক্ত বাংলা' মোটেও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছবি নয়। বরং উক্ত ছবি দুটিতে পরিচালকদ্বয় পাক হানাদার বাহিনীর হাতে এ দেশের মা-বোনদের উপর ধর্ষণকে ডিভায়ণের মাধ্যমে 'ট্রু-পাইস' আয় করার চেষ্টা করেছেন। ছবি দেখে স্পষ্টতঃ তা প্রমাণিত হয়। এ ছাড়া উক্ত ছবি দুটির পরিচালকদ্বয়ের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর বাস্তব যে কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না, তাও এ-দেশের যে কোন দর্শকের কাছে লজ্জাকরভাবেই ধরা পড়েছে। ছবি দুটির কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ—সবই বাস্তব বিবর্জিত ও প্রায় মনগড়া। বিশেষতঃ 'বাঘা বাঙ্গালী'তে নাচগান ইত্যাদি যেভাবে জুড়ে দেয়া হয়েছে—তাতে ছবিটি এককথায় নিতান্তই নিম্নমানের ও রুচি-বহির্ভূত।

সুভাষ দত্ত আমাদের চলচ্চিত্রের একজন প্রবীণ পরিচালক। একাত্তরের ২৬শে মার্চ তাঁকে পাক-বাহিনীর লোকেরা তাঁর বাসা থেকে চোখ বেঁধে গাড়ীতে করে সাবেক গভর্ণর হাউসে নিয়ে যায় এবং সেখানে তিনি একটা অন্ধকার কুঠরীতে একদিন ও একরাত বন্দী ছিলেন। পরে একজন ভদ্র পদস্থ মিলিটারী অফিসার তাঁকে চিনতে পেরে গাড়ীতে করে তাঁর বাসায় পৌঁছে দেয়। পরদিন অবাঙ্গালীরা তাঁর বাসায় আক্রমণ চালায়। তখন প্রাণভয়ে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে দত্তবাবু পাশের বাড়ীর এক গোয়ালঘরে আশ্রয় নেন এবং সেদিনই তিনি ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। অতঃপর যুদ্ধের নয় মাস তিনি ভারতে থেকে বাংলাদেশ বেতারকেন্দ্র থেকে নিয়মিত অনুষ্ঠান করেন।

বাঘবন্দী : উত্তমকুমার/পার্থ চট্টোপাধ্যায়

অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস বাংলাদেশের জনগণ কিভাবে বেঁচে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন পাক-হানাদার বাহিনী এখানে কিভাবে অত্যাচার চালিয়েছে এবং মুক্তিযোদ্ধারা কিভাবে হানাদার বাহিনীর সংগে যুদ্ধ করেছেন, তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দত্তবাবুর নেই। আর তাই, তাঁর 'অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষীতে' মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকারের চেহারা এমন করুণভাবে অনুপস্থিত এবং দুঃখজনক হলেও সত্য আগের ছবি দুটোর মতো এ ছবিতেও 'ধর্ষণ' রয়েছে। ধর্ষণজনিত 'জারজ সন্তান'কে নিয়ে সমস্যা—এ ছবির মূল বিষয়বস্তু।

অথচ আমরা, এ দেশের চলচ্চিত্র দর্শক-সমাজ, দত্তবাবুর কাছ থেকে আরো সার্থক ও বাস্তব একটি ছবি আশা করেছিলাম। কিন্তু দত্তবাবু আমাদেরকে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ হতাশ করেছেন।

অপরপক্ষে চাষী নজরুল ইসলামের মত একজন সদ্যজন্মপ্রাপ্ত তরুণ পরিচালক এ দেশের চলচ্চিত্রের ইজ্জত রক্ষা করেছেন। এ দেশের দর্শক সমাজকে সম্পূর্ণ হতাশ না করে কিছুটা আশার আলো দেখালেন এবং কিছুটা সান্ত্বনার বাণী শোনালেন।

চাষী নজরুল পরিচালিত 'ওরা এগারোজন' এ দেশে মুক্তিপ্রাপ্ত প্রথম মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছবি। আর তাই এ ছবিতে কিছু কিছু অবাস্তবতা—কমেডীর নামে কিছু ভাঁড়ামী চিত্রায়িত হলেও এবং চিত্রনাট্যে কমবেশী দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও স্বীকার করতেই হবে, পূর্বে আলোচিত ছবি তিনটির তুলনায় এ ছবিটি অনেক বেশী মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ও বাস্তব।

চাষী নজরুলের দ্বিতীয় পরিচালিত ছবি 'সংগ্রাম' তাঁর প্রথম পরিচালিত ছবি 'ওরা এগারোজনের' চেয়ে অনেক বেশী পরিণত ও সফল এবং মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক। এ ছবিতে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবেই চিত্রায়িত হয়েছে এবং এ দেশের দর্শকসমাজের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছবির আকাঙ্ক্ষা পূরণে বেশ কিছুটা সক্ষম হয়েছে।

অবশ্য একটা যুদ্ধ, বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ, যা এদেশে দীর্ঘ নয় মাস চলেছে, ত্রিশ লক্ষ জীবন, এক নদী রক্ত নিয়েছে, এ দেশের লক্ষাধিক লোককে চলে যেতে, ঘর-ছাড়া করতে বাধ্য করেছে— সে যুদ্ধকে সার্থকভাবে চিত্রায়িত করা এমন কিছু সহজ-সাধ্য ব্যাপার নয়। বিশেষত দেশের সরকারের সক্রিয় ও উদার সাহায্য ব্যতিরেকে এমন একটা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও বাস্তবনিষ্ঠ ছবি তৈরীর কাজ এ দেশের কোন পরিচালক বা

প্রযোজকের একার পক্ষেই সম্ভব নয় এবং তা রীতিমতো আকাশকুসুম স্বপ্নমাত্র।

বিদেশের অন্য অন্যান্য দেশে এ ধরনের ব্যয়বহুল কাজে সরকার সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেন। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতও তেমন নজীর বহুবার রেখেছেন। (সম্প্রতি সত্যজিৎ রায় পরিচালিত নির্মীয়মান ছবি 'সোনার কেল্লার' জন্য ভারত সরকার বেশ মোটা টাকার আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করেছেন।)

কিন্তু আমাদের দেশের সরকার এ-সব ব্যাপারে আজও নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছেন।

এমন কি এ ধরনের ছবি যা ব্যবসায়িক সফলতা অর্জনে সহায়ক নয়, তেমন নিরীক্ষামূলক ও পরীক্ষামূলক ছবির জন্য এ দেশে 'ট্যাকস রিলিফ'-এর কোন ব্যবস্থা আজও হয়নি। অথচ ভারতে তেমন ব্যবস্থা হয়েছে।

প্রসঙ্গত প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে 'ফিল্ম ফাইনান্স কর্পোরেশন' অর্থসাহায্য দেন। কিন্তু এদেশে তেমন ব্যবস্থা আজও চালু হয়নি।

এমনকি ভারতের মত এখানে 'বাৎসরিক নগদ আর্থিক পুরস্কারের'ও কোন ব্যবস্থা চালু নেই।

ইত্যাদি কারণেই এ ধরনের ব্যয়বহুল মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছবি নির্মাণে আমাদের পরিচালকরা স্বভাবত সাহসী নন এবং সে কারণেই এ দেশের মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধের বিবিধ ঘটনাবহুল অভিজ্ঞতাভিত্তিক ছবি নির্মাণের পরিকল্পনা বা ঘোষণা ইদানিং আর শোনা যাচ্ছে না।

প্রথমেই বলেছি, একটি যুদ্ধ, বিশেষত মুক্তিযুদ্ধ যে দেশের চলচ্চিত্রের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু বাস্তবে আমাদের দেশের চলচ্চিত্রে এ সত্য আজ আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

তবে কি যুদ্ধের ভয়াবহ স্মৃতি এ দেশের চলচ্চিত্র থেকে চিরতরে হারিয়েই যাবে?

কিন্তু তাই যদি সত্য হয়, তবে তা হবে আমাদের জন্য রীতিমতো 'আত্মহত্যার' সামিল।

দেশের সরকার, এ দেশের চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শত-সহস্র চিত্রকর্মী এবং দেশের অগণিত বুদ্ধিজীবী ও জ্ঞানীগুণী ব্যাপারটা দয়া করে ভেবে দেখবেন কি?

—আনওয়ার আহমদ

(৬)

নাট্যুকে রামনারায়ণ তর্করত্ন

দীনবন্ধু মিত্রের নাটক নিয়েই শুরু হয়েছিল ন্যাশনাল থিয়েটারের জয়যাত্রা। তবু রামনারায়ণ তর্করত্নকে নিয়ে ব্যক্তি-পর্যায়ের আলোচনা শুরু করার গুরুত্ব আশা করি সুধী পাঠকসমাজ অস্বীকার করতে পারবেন না।

বাংলার সাধারণ রঙ্গশালা বা 'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে বাংলা নাটক লিখে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেন, তাঁদের মধ্যে রামনারায়ণ তর্করত্নের নাম সর্বপ্রথমেই মনে আসে। নাট্যশালার ইতিহাসে রামনারায়ণ প্রথম নাট্যকার হিসেবে কীর্তিত। সাধারণের কাছে রামনারায়ণ পরিচিত না হলেও নাটক বা নাট্যশালা

সম্পর্কে যাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ আছে—রামনারায়ণকে তাঁরা সব সময়ই সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করে থাকেন। রামনারায়ণ তর্করত্ন সর্বপ্রথম যে নাটক রচনা করেন এবং যে বাংলা নাটকখানি জাতীয় নাট্যান্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে—সে নাটকখানি হলো 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটক।

'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের পূর্বেও বাংলা নাটক লিখিত ও অভিনীত হবার সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বাংলা নাটক ও নাটকাভিনয়ের যে আন্দোলন দেখা যায়—তার মূলে রামনারায়ণের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটক তাই অনেকে কুলীন কুলসর্বস্বকে এই সময়ের প্রথম অভিনীত সার্থক নাটক বলে যেমন মনে করেন—তেমনি রামনারায়ণকে সর্বপ্রথম সার্থক নাট্যকার বলে অভিনন্দিত করেন। তিনি 'নাট্যুকে রামনারায়ণ' নামেই সর্বাধিক খ্যাত হন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে কলকাতার পার্শ্ববর্তী হরিনাভি গ্রামের এক বিখ্যাত পণ্ডিত বংশে রামনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন।

রামনারায়ণের পিতা পূজ্যপাদ রামধন শিরোমণি ছিলেন একজন সুপণ্ডিত। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সারা দেশে ব্যাপ্তি লাভ করেছিল। রামনারায়ণের পরিবারটি যেমন বিদ্যার গৌরবে প্রখ্যাত হয়ে উঠেছিল—তেমনি পরিবারের দারিদ্র্যের খ্যাতিও কম ছিল না। লক্ষ্মী-সরস্বতীর চিরন্তন বিবাদ যেন পরিবারটিকে কেন্দ্র করে নতুন করে ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল। দারিদ্র্যের অসহনীয় জ্বালা রামনারায়ণের পিতা রামধন শিরোমণিকে যেমন পীড়িত করতে পারেনি, তেমনি পারেনি তাঁর পুত্রদের বিভ্রান্ত করতে।

রামনারায়ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পণ্ডিত প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতিও কম ছিল না। পূজ্যপাদ পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদর্শেই রামনারায়ণ গড়ে ওঠেন। বাল্য কালেই বিদ্যাচর্চায় তাঁর উল্লেখযোগ্য ধীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। হরিনাভি গ্রামের সুপণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতির কাছে রামনারায়ণের বাল্যশিক্ষা। ব্যাকরণ, স্মৃতি, কাব্য ও অন্যান্য বিষয়ে মধুসূদন বাচস্পতি প্রাণ ঢেলে তাঁর এই প্রিয় ছাত্রটিকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলেন।

মধুসূদন বাচস্পতির কাছে শিক্ষা সমাপ্ত করে রামনারায়ণ ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য পূর্বদেশে গমন করেন। ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে রামনারায়ণ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। শেষ পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক পদে বৃত হন।

সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় বহু নাটক কাব্য ও বিভিন্ন পুস্তক রচনা করে রামনারায়ণ খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। রামনারায়ণের

কবিত্বশক্তিও উপেক্ষণীয় নয়। রামনারায়ণ রচিত 'দক্ষযজ্ঞ' সংস্কৃত কাব্যপাঠে সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত কাউল সাহেব তাঁকে কবি-কেশরীতে ভূষিত করেন। রামনারায়ণের কাব্যের আলংকারিক ঝংকার কবি কালিদাসের মতই অপূর্ব বলে তদানীন্তন পণ্ডিত সমাজ মন্তব্য করেন।

প্রহসন, সামাজিক নকশা পৌরাণিক ও একাধিক সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করেছেন রামনারায়ণ।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে রচিত 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকে তখনকার কৌলিন্য প্রথা ও অন্যান্য সামাজিক ব্যবস্থার একটা ছবি পাওয়া যায়।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে চড়কডাঙ্গার জয়রাম বসাকের বাড়ী কুলীন কুলসর্বস্ব নাটক সর্ব-প্রথম অভিনীত হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কম্পানীর বড়বাবু রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে বসাক বাড়ীতে একটি মঞ্চ নির্মিত হয়ে নাটকটি অভিনীত হয়।

অভিনয়ে ছিলেন : কুলপালক : মহেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পেটুক ঘটক : রাধাপ্রসাদ বসাক। পণ্ডিতনন্দ : জগৎদুর্লভ বসাক ও রাজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। বেঙ্গল থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় জনৈকা স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। চারবার এখানে নাটকটি অভিনীত হয়। ১২ বছরের বালক গিরিশচন্দ্র এখানেই 'কুলীন-কুলসর্বস্ব' নাটকের অভিনয় দেখেন বলে প্রকাশ। রংপুর জেলার কুণ্ডিগ্রামের জমিদার স্বর্গত কালীচরণ রায়চৌধুরী মহাশয়ের এক ঘোষণায় 'পতিব্রতোপাখ্যান' নাটক রচনা করে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে রামনারায়ণ ৫০ টাকা পুরস্কার লাভ করেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে গৌরীশংকর ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'ভাস্কর' এবং 'রংপুর বার্তাবহ' পত্রিকায় কৌলিন্যপ্রথার সমস্যা নিয়ে নাটক রচনার জন্য ৫০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকটি লিখে রামনারায়ণ এই ঘোষণামতও ৫০ টাকা পুরস্কার লাভ করেন। ভাস্কর পত্রিকায় বাংলা ১২৭১ সালে নাটকটির সমালোচনা প্রকাশিত হয়। স্বর্গতঃ গুণেন্দ্রনাথ ও গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘোষণামত 'বিধবা বিবাহ' নাটক লিখে রামনারায়ণ দুশ' টাকা পুরস্কার লাভ করেন। নাটকটি সর্বপ্রথম ঠাকুরবাড়ীতে অভিনীত হয়।

জয়রাম বসাকের বাড়ীর অভিনয়ের পর গদাধর শেঠের বাড়ীতে 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই অভিনয়ে উপস্থিত থাকেন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই চুঁচুড়ার নরোত্তম পালের বাড়ীতে 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটক অভিনীত হয়। তখনকার প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী রূপচাঁদ পক্ষী নাটকের সুর-সংযোজনা করেন।

জাতীয় নাট্যশালার ইতিহাসে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নাম স্বর্ণাক্ষরেই লিখিত আছে। তাঁর অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহে বাংলার জাতীয় নাট্যান্দোলন নানা-দিক দিয়ে পরিপুষ্টি লাভ করে। রামনারায়ণের পরম উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন যতীন্দ্রমোহন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন পাইক-পাড়া রাজাদের ছিলেন পরমহিতৈষী বন্ধু। যতীন্দ্রমোহনের সংগে ঈশ্বরচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র 'শকুন্তলা' নাটকের অভিনয় দেখেই অনু-প্রাণিত হন। কিন্তু 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের অভিনয় সংবাদই তাদের বেলগাছিয়া থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করে।

যতীন্দ্রমোহনের পরামর্শেই তারা সংস্কৃত 'রত্নাবলী' নাটকের অনুবাদ রচনার দায়িত্ব রামনারায়ণের ওপর অর্পণ করেন। চার মাস কেটে যায় 'রত্নাবলী'র অনুবাদে। ৩১ জুলাই ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে রত্নাবলীর সর্বপ্রথম অভিনয় অনু-ষ্ঠিত হয়। এই অভিনয়ে রাজাদের দশ হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। বেলগাছিয়া থিয়েটারে রত্নাবলীর ছটি অভিনয় সংবাদ পাওয়া যায়। অভিনয়ে বহু ইংরেজ রাজ-পুরুষেরা নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তাদের সুবিধার জন্য 'রত্নাবলী' নাটকের কাহিনীর সারাংশ ইংরেজীতে অনুবাদ করে প্রকাশ করা হয়। ইংরেজী অনুবাদ করেন কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। 'রত্নাবলী' নাটকের অনুবাদ করতে বসেই নাটক রচনায় মাইকেল উদ্বুদ্ধ হন।

—কালীশ মুখোপাধ্যায়

শুভেন্দু/সোমা দে

মধ্যবিত্ত সংসারের কর্তা ব্রজবাবু, স্ত্রী, চার পুত্র এবং চার কন্যা নিয়ে কায়ক্লেশে দিন কাটাচ্ছেন। বড় ছেলে নিত্য করনিকের কাজ করে, মেজ ছেলে সন্দীপ প্রথম শ্রেণীতে অনার্স নিয়ে বি, এস-সি পাশ করে জার্মানীতে আরো উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করবার জন্যে যাওয়া স্থির করে। ব্রজবাবুর বিরোধিতা এবং আর্থিক অবস্থার চাপ ওঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে কোনভাবেই প্রতিহত করতে পারে না। নিত্য ভাইএর বিদেশ ভ্রমণের জন্যে চড়া সুদে টাকা ধার করে এবং ওর স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রী করে। আর সন্দীপের প্রণয়ী মল্লিকা তাঁর বাবার কাছ থেকে ২৫০০ টাকা এনে ওঁর হাতে তুলে দেয়। মল্লিকার বাবাও তাঁর মেয়ের ভবিষ্যৎ এবং হবু জামাইয়ের উচ্চশিক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করতে দ্বিধা বোধ করেন না। এইভাবে মধ্যবিত্ত পরিবারে প্রত্যেকেই ভাবে সন্দীপ বিদেশ থেকে মান, সম্মান ও অর্থ নিয়ে ফিরবে। কিন্তু জার্মানীতে গিয়ে সন্দীপ উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে বিলাসবহুল জীবনধারায় অভ্যস্ত হয়ে সেখানকার মোহ কাটাতে না পেরে প্রায় দশ বছর পরে মার একান্ত অনুরোধে দেশে ফিরে আসে মাকে

প্রফুল্ল রায়ের সার্থক উপন্যাসের
শোভন চিত্ররূপ

দেখবার জন্যে। তবে কল্পনা আর বাস্তবে যে আকাশ ও পাতাল প্রভেদ তা জার্মানী থেকে ফিরে এসে সন্দীপের আচরণে স্পষ্টই বোঝা যায়। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার চোখ ধাঁধানো আলোয় সন্দীপ হারিয়ে ফেলে তার পূর্বসত্তা। সংসারের প্রতি তার দায়িত্ব আছে—সেটা মানতে সে অপারগ। তার অতীত হারিয়ে যায় স্বার্থপর বর্তমানে। এদিকে বিগত দশ বছরে ব্রজবাবুর সংসারে নেমে এসেছে একের পর এক দুর্যোগ। সন্দীপের জন্যে ঋণগ্রস্ত নিত্য আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। তার বড় দিদিকে, তাঁর স্বামী ডাইভোর্স করায় তাকেও এই দুঃখকষ্টে-জর্জরিত সংসারে আশ্রয় নিতে হয়, সন্দীপের মা ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। অর্থাৎ এই দীন-দরিদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারের একমাত্র ভরসা কেবল মল্লিকা। আজ সে ভীরু প্রেমিকা নয়, সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই অসহায় সংসারকে বাঁচাতে। সন্দীপের দুই ভাই জড়িয়ে পড়েছে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে। সকলের একমাত্র সান্ত্বনা তাই মল্লিকা, এবং সম্বল তার সামান্য চাকরি। এই পরিস্থিতিতে দশ বছর পরে সন্দীপ যখন দেশে ফিরে আসে তখন পরিবারের সকলেই নতুন

সোনিয়া সাহনী/শুভেন্দু/শ্যামল ঘোষাল

করে বাঁচবার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু সন্দীপ সংসারের দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে চায় না, কারণ সদা জার্মানী ফেরৎ নতুন নতুন কল্পনা তার চোখে। হঠাৎই একদিন ধনী বাল্যবন্ধু তাপসের সংগে তার দেখা হয়ে যায়, আর তার একান্ত অনুরোধে সন্দীপ ওদের বাড়ীতে যায়। আলাপ হয় ওঁর আধুনিকা বোন রিনির সঙ্গে। রিনির অনুরোধে প্রায়ই ওদের দেখা সাক্ষাৎ হয়। রিনিও সন্দীপের মধ্যে হয়তো তার ভবিষ্যৎ প্রণয়াস্পদকে খুঁজে পায়। কিন্তু মল্লিকা বহুবার স্মরণ করিয়ে দেয় সন্দীপকে সংসারের প্রতি তার দায়িত্বের কথা। সন্দীপ সেদিকে তবু বিশেষ নজর দেয় না। ওদিকে ছোট ভাইয়ের জেল হয়েছিল। অন্য ভাইও রাজনৈতিক কারণে গৃহত্যাগ করেছে। মাকে অপারেসানের জন্যে ক্যান্সার হাসপাতালে ভর্তি করা হয় অপারেশানের পরও জ্ঞান ফিরে আসে না। হঠাৎই এক মাসের ছুটি ফুরিয়ে যাওয়ায় সন্দীপ জার্মানীতে ফিরে যেতে চায়।

সঙ্গী হয় রিনি, সে লণ্ডনে যাবে উচ্চ শিক্ষার জন্যে। এদিকে মল্লিকার চাকুরী চলে যাওয়ায় সে ছুটে যায় এয়ারপোর্টে, সব কিছু জানিয়ে সন্দীপকে ফিরিয়ে আনার জন্যে। শেষ মুহূর্তে সন্দীপকে তার কর্তব্যের কথা— নিজের আত্মত্যাগের কথা জানিয়ে মল্লিকাই তাকে আবার জন্মভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

অভিনয়ে ব্রজবাবুর চরিত্রে কানু বন্দ্যোপাধ্যায় এক কথায় অসাধারণ। মল্লিকার চরিত্রে নবাগতা সোমা দে মধ্যবিত্ত সমাজের দুঃখ, দৈন্য ও কষ্টের প্রতিটি মুহূর্তকে যেমন ফুটিয়ে তুলেছেন, তেমন ছবির গোড়ার দিকে প্রণয়ভীরু তরুণীর চরিত্রেও উনি অপূর্ব অভিনয় করেছেন। শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় (সন্দীপ), অসিত-বরণ (মল্লিকার বাবা) শমিতা বিশ্বাস (নিতার স্ত্রী), মৃণাল মুখার্জি (নিত্য), তরুণকুমার (জামাইবাবু), অপর্ণা দেবী (মা), সোনিয়া সাহনি (রিনি), শ্যামল ঘোষাল (তাপস) এবং কণিকা মজুমদার (বড়দি) প্রত্যেকেই চিত্রনাট্য অনুযায়ী ভাল অভিনয় করবার চেষ্টা করেছেন।

পূর্ববর্তী তিনটি ছবির চেয়ে পরি-চালক পীযূষ গাঙ্গুলী 'জন্মভূমি'কে আরো বাস্তবসম্মত ও আকর্ষণীয় করবার চেষ্টা করেছেন কয়েকটি দৃশ্যের চিত্র-কল্প রচনা অতুলনীয়, আর সোমা দের অভিনয় তুলনাহীন। উনি সত্যিই অতুলনীয়া।

[৪]

ফির ওহি দুনো লেড়কা ছোড় দেও

ন্যাশনাল থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'সীতার বনবাস' নাটকের অভিনয় যেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করে, নাটকটিও তেমনি সুধীজনের প্রশংসায় অভিনন্দিত হয়। লবকুশের অভিনয় মাতিয়ে দিয়েছিল সকলকে। এই অভিনয় দেখতে একাধিকবার অনেকেই থিয়েটারে আসতেন। ন্যাশনাল থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী তখন প্রতাপ জহুরী। তিনি একদিন গিরিশচন্দ্রকে বললেন : বাবু, যব দোসরা কিতাব লিখগে, তব ফিন ওহি দুনো লেড়কা ছোড় দেও।'

গিরিশচন্দ্র শেষ পর্যন্ত তাই করলেন। প্রতাপ জহুরীর অনুরোধেই লবকুশের সংযোজনার জন্য লিখলেন লক্ষ্মণ বর্জন নাটক।

পুরাতনে হতাদর

কোন একটী নাটক নতুন যখন অভিনীত হয়—তখন শিল্পীরা অতি যত্নের সংগে অভিনয় করে থাকেন। নাটকটি যতই পুরনো হতে থাকে—ততই যেন সকলে গা ছেড়ে দিয়ে অভিনয় করেন। বর্তমানের মত তখনও এমনি অবস্থা ছিল। পলাশীর যুদ্ধ তখন খুব জমিয়ে নিয়েছে। ব্রজবিহারী ঘোষ নামে গিরিশচন্দ্রের জনৈক প্রতিবেশী ও বন্ধু নাটকটি দেখে মুগ্ধ হন। ব্রজবাবু একজন সাব জজ ছিলেন। পূজোর ছুটিতে বাড়ী এসে 'পলাশীর যুদ্ধ' নাটকের বিজ্ঞপ্তি দেখে পুনরায় তিনি অভিনয় দেখতে যান। দ্বিতীয় বারের অভিনয় দেখে পূর্বের মত তিনি পরিতৃপ্ত হতে পারলেন না। তখন গ্রীণরুমে গিয়ে গিরিশচন্দ্রকে বললেন : পুরাতনে হতাদর কথাটি দেখছি তোমাদের অভিনয়ের বেলায়ও খেটে গেল?

গিরিশচন্দ্র বললেন : কি রকম?

ব্রজবাবু উত্তর দিলেন : প্রথমবার 'পলাশীর যুদ্ধ' দেখে এতই মুগ্ধ হয়েছিলাম যে, এবারও দেখতে এলাম। তখন রাশি রাশি মৃত সৈনিকদের মধ্যে গোলার আঘাতে ভগ্নপদ মোহনলালকে দেখে মন কেঁদে উঠেছিল। এবার একটী ঢালের ওপর মাথা রাখা অবস্থায় মোহনলালকে দেখে করুণা হলো। হায় মোহনলাল! থিয়েটারেও তোমার এত হতাদর।

সবাই হেসে উঠলেন।

হু কামস দেয়ার

অর্ধেন্দু শেখরের বহু প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কথা শুনতে পাওয়া যায়। এমারেল্ড থিয়েটার সম্প্রদায় একবার নৌকো করে মফঃস্বলে অভিনয় করতে যাচ্ছিলেন। সন্ধ্যা হয় হয়। দেখা গেল একখানি ছিপ সম্প্রদায়ের নৌকো অনুসরণ করে ছুটে আসছে।

মাঝিরা বলে উঠলো : ডাকাতের নৌকো! সবাই আতংকিত হয়ে উঠেছে। শিল্পীরা ভয়ে হাউ-মাউ কাউ কাউ করে উঠলেন। অর্ধেন্দুশেখর ধমক দিয়ে সকলকে চুপ করে থাকতে বললেন। তারপর বেশকারকে ডাকলেন। পোশাকের বাক্স থেকে সাহেব আর কনেষ্টবলদের সব পোশাক বের করে সকলকে সাজিয়ে দিতে বল্লেন। বেশকার তাই করলেন। অর্ধেন্দুশেখর সাহেব সেজে নকল বন্দুক হাতে নিয়ে নৌকোর সামনে এসে দাঁড়ালেন। সাহেব কনেষ্টবল সেজে অন্যান্যরা অর্ধেন্দুশেখরের নির্দেশমত তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালেন। ডাকাত দলের ছিপটি একটু কাছাকাছি আসতেই বন্দুক বাগিয়ে সাহেবী গলায় অর্ধেন্দুশেখর বলে উঠলেন : হু কামস দেয়ার?

ডাকাতেরা মনে করলো নিশ্চয়ই জলপুলিশের নৌকা। তারা মুহূর্তে ছিপের গতিপথ পরিবর্তন করে অদৃশ্য হয়ে গেল। সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

টিকি টেনে বৈষ্ণব পরীক্ষা

গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্য লীলা' তখন অসম্ভব সাড়া জাগিয়েছে। বহু বৈষ্ণব এবং পন্ডিতদের আমন্ত্রণ জানিয়ে নাটক দেখানো হতো। আবার অনেকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নাটক দেখতে আসতেন। শেষে এমন হলো অনেক বাজে লোক দেখে যেতে লাগলেন। একবার পরচুলা মাথায় দিয়ে এক টিকিধারী নকল পন্ডিতকে হাতে হাতে ধরা হয়। নকল পন্ডিত আর বৈষ্ণবদের থিয়েটার দেখার হিড়িকে সবাই অস্থির হয়ে পড়ে। প্রখ্যাত অভিনেতা প্রবোধচন্দ্র ঘোষ একদিন বললেন : এবার থেকে টিকি টেনে পরীক্ষা করে দেখবো কে আসল আর কে নকল বৈষ্ণব?'

অবশ্য গিরিশচন্দ্র আর টিকি টেনে আসল নকল পরীক্ষা করবার অনুমতি দেন না। তিনি বলেছিলেন : নকলরা কিছুক্ষণ আসলের ভাব নিয়ে থাকছে তো?

শেয়াল কুকুরে কাঁদছে

মিনার্ভা থিয়েটারে 'আবুহোসেন' নাটকের অভিনয় চলছে। রক্ষীরা আবুহোসেনকে বন্দী করে পাগলা গারদে নিয়ে যাচ্ছে। আবুর মা ওরে বাপরে—আমার কি হলোরে বলে কান্নাকাটি করছে।

কয়েকজন দর্শক কান্নার সুরে সুর মিলিয়ে কেঁদে উঠলেন।

অর্ধেন্দুশেখর মঞ্চ থেকে বিদায় নিতে নিতে দর্শকদের লক্ষ্য করে মায়ের দিক চেয়ে বললেন : মা, আর কাঁদিস না। দেখনা তোর কান্না দেখে শেয়াল কুকুর কাঁদছে।'

সমস্ত নাট্যগৃহ হাসিতে ফেটে পড়লো।

রসরাজের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে রসরাজ অমৃতলাল বসুর হীরকচূর্ণ নাটক অভিনীত হচ্ছে। নাটকটিতে রঙ্গমঞ্চে প্রথম রেলগাড়ী দেখানো হয়েছিল। মঞ্চে হুইসল দিতে দিতে রেলগাড়ীর প্রবেশে নাট্যামোদিরা চমৎকৃত হতেন। এই রেলগাড়ীটি তৈরী করেন প্রখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার যোগেন্দ্রনাথ মিত্র। তিনি ড্রাইভার সেজে গাড়ী চালাতেন। সবুজ নিশান হাতে নিয়ে অমৃতলাল গার্ড সেজে পেছনে থাকতেন। একদিন যথারীতি যোগেনবাবু ট্রেন চালিয়ে চলেছেন। হঠাৎ কলকব্জা বিকল হওয়াতে ট্রেন বন্ধ হয়ে গেল। দর্শকদের মধ্যে হাসির রোল পড়ে গেল। নানান বিদ্রুপাত্মক ধ্বনি উঠলো। অমৃতলাল তাড়াতাড়ি সবুজ নিশান সরিয়ে লাল নিশান উড়িয়ে দিলেন। ড্রপ পড়লো। পরে ট্রেনটি সরিয়ে নিয়ে পরীক্ষা করা হলো।

অমৃতলালের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে নাট্যামোদিরা খুশী হলেন।

দ্বারী সিং মানে উপস্থিত

বেঙ্গল থিয়েটারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অশ্রুমতী' নাটকের অভিনয় হচ্ছে। জনৈক অভিনেতা দূতের ভূমিকায় মঞ্চে প্রবেশ করে বললেন : মহারাজ মানসিংহ দ্বারে উপস্থিত।

কিন্তু ভয়ে সব গুলিয়ে ফেলে তিনি বললেন : দ্বারসিংহ মানে উপস্থিত।'

সবাই হো-হো করে হেসে উঠলেন।

এলো এলো একপাল যুধিষ্ঠির

স্টার থিয়েটারে দক্ষযজ্ঞ নাটকে গিরিশচন্দ্র দক্ষের চরিত্রে অভিনয় করতেন। একে একে দূতেরা এসে যজ্ঞ ধংসের সংবাদ দিত। সংবাদ পাওয়া মাত্র গিরিশচন্দ্রের ভীষণ মূর্তি আর রক্তচক্ষু দেখে দূতবেশী শিল্পীরা ভয় পেয়ে ঠকঠক করে কাঁপতেন। অনেকের সংলাপ মনে থাকতো না। নেপথ্যে 'হর-হর ধ্বনিতে সমগ্র রঙ্গগৃহ কম্পিত হয়ে উঠতো। হর-হর ধ্বনির ভীষণতায় দক্ষরূপী গিরিশচন্দ্র যেন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতেন। অভিনয় চলছে। প্রথম দূত এসে বলবে :

মহারাজ, প্রাণ যদি চাও, পালাও পালাও—এলো এলো ব্রহ্মদৈত্য ভৈরব বেতাল।'—ইত্যাদি। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের মূর্তি দেখে দূতরূপী অভিনেতা অভিনয়াংশ ভুলে বলে বসলেন :

মহারাজ এলো — এলো—একপাল — একপাল রাজা যুধিষ্ঠির।

অবস্থা শোচনীয় দেখে যিনি প্রম্পট কচ্ছিলেন দূতবেশী অভিনেতাকে ভিতরে আসবার জন্য বললেন : আরে আয়—পালিয়ে আয়!' কিংকর্তব্য বিমূঢ় অভিনেতা প্রমটারের কথাই পুনরাবৃত্তি করলেন : মহারাজ, পালিয়ে আয়—পালিয়ে আয়।

এদিকে হাসির রোলে মঞ্চগৃহ ফেটে পড়ছে।

ড্রপসিন পড়লো। ভিতরে বাইরে তখনও হাসির রোল।

এঁরা চারজন

তরুণ ফুটবলাররা ময়দানের কোন্ দলে প্রথমে যেতে চায়? এ প্রশ্নের সরাসরি জবাব—এরিয়ান্সে। হ্যাঁ, শিশির গুহ দস্তিদারও ময়দানে এসে ১৯৬৯ সালে প্রথম কলকাতা সিনিয়র ডিভিসন লীগে খেলতে নামে এরিয়ান্সের জামা গায়ে পরে। দ্রুতগতি আর নির্ভুল নিশানায় তীব্র সটের জন্য দর্শকদের নজর কাড়তে শিশিরের খুব বেশী দেরী হয়নি। মাঠের নিয়মিত যাত্রীরা অনেকদিন পরে আবার একজন গোলদাতার দেখা পেলেন। এই দলেরই ডি ব্যানার্জির পর ঠিক-নিশানার ফরওয়ার্ডের সংখ্যা ক্রমে কমে আসছে। কলকাতার দর্শকরা অনেক চোখজুড়ানো গোল দেখার সুযোগ পেয়েছেন গত দু-এক দশক আগে। আর সেই সব গোলদাতার নামও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে—হাফেজ রসিদ, ডি ব্যানার্জি, সোমানা নায়ার ধনরাজ মেওয়ালাল। আরও আগের যুগের সামাদের কথা এখন কিংবদন্তী। এরিয়ান্সে এসেই শিশির পরপর কয়েকটি ম্যাচে গোল করে দর্শক-মনে আবার পুরোনো আশা জাগিয়ে তোলে। এখনকার পদ্ধতি অনু-

শিশির গুহ দস্তিদার

যায়ী শিশির খেলে স্ট্রাইকার হিসাবে, ভিতর দিকে। মাঠে মাঠে আক্রমণ রচনার সময় বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে চকিতে সতীর্থ ইন বা লিংক-হাফের সঙ্গে জায়গা বদল করার দ্রুত তৎপরতা শিশিরের একটা বাড়তি গুণ।

শিশিরের ফুটবল খেলা সুরু চব্বিশ পরগণা জেলা দলের হয়ে। ওর বাড়ী হালিশহরে। সর্বভারতীয় স্কুল ক্রীড়ার আসরেও বাংলা দলে স্থান পেয়েছিল। এরিয়ান্স থেকে মহামেডান স্পোর্টিং দলে। দীর্ঘ একহারা চেহারার এই সবল গতিচঞ্চল খেলোয়াড়টিকে পেয়ে মহামেডান দল গত ক'বছর জোর দাপটে কলকাতা লীগে জাঁকিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়েছিল। তবে, শিশিরের খেলা সবচেয়ে উৎকর্ষ লাভ করেছিল এরিয়ান্সে থাকতে। এ বছর ও এসেছে মোহনবাগান দলে। শিশির জাতীয় জুনিয়র ফুটবলে বাংলাদলে খেলেছে। এশীয় যুব ফুটবলেও স্বদেশের দলে সে স্থান পেয়েছিল। সব ক্ষেত্রেই শক্ত মজবুত শরীর আর দ্রুতগতির জন্য দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

শিশির এখনও অবিবাহিত। চাকরী করে ডাক ও তার বিভাগের অফিসে।

মোহনবাগানে শিশিরের খেলা সম্পর্কেও বলা যায় যে, নতুন দলে ও এখনও ঠিক মানিয়ে নিতে পারছে না। তবে দলগতভাবে অনুশীলন ঠিকমত চললে অদূরে ভবিষ্যতেই শিশিরের খেলায় চমক ফিরে আসবে। ফিরে আসবে ওর গোল করার সন্ধানী সট।

●

ফুটবলে এক একজন খেলোয়াড়ের বেলায় দেখা যায়, সে প্রথমে যে পজিশনে খেলা সুরু করে, পরে সে পজিশন পরিবর্তন করলে তার খেলার উৎকর্ষ বাড়ে, বই কমে না। তবে এই সঠিক জায়গাটি খুঁজে স্থির করে দিতে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকরাই পারেন।

ইস্টবেঙ্গলের লেফট স্টপার ব্যাক শ্যামল ঘোষের বেলাতেও এই ব্যাপার ঘটেছে। কলকাতা ফুটবল লীগে শ্যামল খেলা আরম্ভ করে ১৯৬৯ সালে—খিদিরপুর ক্লাবে। প্রথম দিকে ছিল স্ট্রাইকার। তারপর সরে আসে হাফব্যাকের জায়গায়। প্রশিক্ষক অচ্যুত ব্যানার্জি আর প্রবীণ ল্যাংচা মিত্রের উপদেশে চলে আসে একেবারে ব্যাকের জায়গায়। ১৯৭১ পর্যন্ত শ্যামল খিদিরপুর ক্লাবেই ছিল। কলকাতা ময়দানে প্রথম

শ্যামল ঘোষ

ডিভিশনে প্রথম ম্যাচ খেলে মহামেডান স্পোর্টিং-এর বিরুদ্ধে। সেই খেলায় খিদিরপুরের জয় হয় এক গোলে। সেদিন তার মনে আনন্দের আর সীমা ছিল না।

৭২ সালে শ্যামল আসে মোহনবাগানে। পরের বছরই ডাক পড়ে ইস্টবেঙ্গলে।

শ্যামলের জন্ম ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বরে, কসবায়। ছেলেবেলা থেকেই ফুটবলের ওপর ঝোঁক দেখে মেজদা রণজিৎ ঘোষ ছোট ভাইটিকে নানাভাবে উৎসাহ দেন। শ্যামলরা পাঁচ ভাই, এক বোন, বাবা স্বর্গত। বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। শ্যামল হল চতুর্থ পুত্র। শ্যামলের সবচেয়ে আনন্দ হল, তার মা-ই তাকে খেলার ব্যাপারে সব থেকে বেশী উৎসাহ দেন। বিশেষ করে মায়ের প্রেরণা শ্যামলের ফুটবল খেলার প্রধান মূলধন। এখনকার দিনের মা-বাবা যদি আরও বেশী মাত্রায় তাঁদের ছেলেমেয়েদের খেলাধুলায় উৎসাহিত করেন, তাহলে দেশের ছেলেমেয়েরা আরও সপ্রতিভ, আরও সবল, আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে। শ্যামল বলে, বাড়ীতে মায়ের এই প্রেরণার সঙ্গে মেজদার উৎসাহ মিলে আমার খেলার আগ্রহ, বড় খেলোয়াড় হবার আগ্রহ বহুলে পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছে। বাড়ীর পরিবেশ ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া-খেলাধুলার অনুকূলে হলে ক্রমে সমাজেও সুস্থ-সবল চিন্তা ও মননশীলতা বৃদ্ধি পায়।

কসবারই চিত্তরঞ্জন হাইস্কুল থেকে পাশ করে শ্যামল বিজ্ঞান নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে পড়ছে।

কুশলী ফুটবলার হিসাবে নাম ওর ছড়িয়ে পড়তে দেরী হয়নি। জাতীয় জুনিয়র ফুটবলে বাংলাদলে স্থান পেয়েছে পরপর দু বছর। ১৯৭০এ তো শ্যামলের নেতৃত্বেই বাংলাদল ঐ আসরে চ্যাম্পিয়ান আখ্যাও অর্জন করেছে।

কুশলতার সর্বভারতীয় স্বীকৃতি লাভে শ্যামলের বেশী দেরী হয়নি ভারতীয় জুনিয়র ফুটবল দলেও স্থান পেয়েছে ৭০ ও ৭৩ সালে। শেষবার, অর্থাৎ গতবার তেহেরানে অনুষ্ঠিত এশীয় জুনিয়র ফুটবলে স্বদেশের অধিনায়কত্বের গুরুদায়িত্বও পালন করেছে শ্যামলই। ঐ বছর কোচিনে অনুষ্ঠিত জাতীয় ফুটবলের আসরেও শ্যামল বাংলা দলে স্থান পেয়েছিল।

ব্যাকের পজিশনে খেলতে পেরে শ্যামলের কিছুটা বাড়তি সুবিধা হয়েছে। একদিকে সে স্ট্রাইকারের মত দ্রুত সট নিতে পারে, আবার অন্যদিকে পূর্ব অভিজ্ঞতার কল্যাণে লিঙ্ক হাফের মত সামনের স্ট্রাইকারদের বল এগিয়েও দিতে পারে। তাছাড়া প্রতিপক্ষকে দ্রুত ট্যাকলিংয়েও শ্যামল খুব তৎপর। ওকে চট করে ফাঁকী দেওয়া সহজ নয়।

অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক প্রদীপ ব্যানার্জির উপদেশ, আর বড় আসরে আরও বেশী নামার সুযোগ পেলে শ্যামলের ক্রীড়াকৃতি যে আরও পাকাপোক্ত হয়ে উঠবে, তা বেশ জোরের সঙ্গেই বলা যায়। কারণ, সবচেয়ে আশার কথা ২১ বছর বয়স্ক এই তরুণের ক্রীড়াকুশলতা এখন বাড়তির মুখে। ছেলেটি যে দুএক বছরের মধ্যেই বাংলা তথা ভারতীয় দলের একজন নির্ভরশীল ব্যাক হয়ে উঠবে সে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়

অসঙ্কোচে। খেলায় উৎকর্ষসাধনের সঙ্গে চেষ্টা আছে ওর মধ্যে এবং এ ব্যাপারে সে যে খুবই আন্তরিক, শ্যামলের সঙ্গে খেলা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করলেই বোঝা যায়। খেলা শেখার ব্যাপারে প্রশিক্ষক অচ্যুত ব্যানার্জির প্রতি এই সপ্রতিভ তরুণটি খুবই কৃতজ্ঞ। অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গল-ক্লাবের শিক্ষক প্রদীপ ব্যানার্জির ওপর শ্যামলের শ্রদ্ধাও অগাধ।

বলা বাহুল্য, শ্যামল এখনও অবিবাহিত। ফুটবল খেলাই তার কাছে এখন ধ্যানজ্ঞান। একদিকে বাড়ীতে মা আর দাদার উৎসাহ আর অন্যদিকে মাঠে প্রশিক্ষকের সস্নেহ নির্দেশে শ্যামল ঘোষ আগামী দিনে ভারতীয় দলে স্থায়ীভাবে নিজের স্থান করে নিতে পারবে বলেই আশা করা যায়।

•

গতবারের লীগ, শীল্ড ও রোভার্সের বিজয়ী এবং ডুরাণ্ড কাপের রানার্স-আপ ইষ্টবেঙ্গল দলের সফল অধিনায়ক স্বপন সেনগুপ্ত এবার মোহনবাগান দলে চলে এসেছে।

এই স্বল্পবাক বিনয়ী ছেলেটি কলকাতার প্রথম ডিভিশন লীগে প্রথম খেলতে সুরু করে খিদিরপুর ক্লাবের পক্ষে। ইস্টবেঙ্গলের বিচক্ষণ খেলোয়াড়সন্ধানীরা ছেলেটির মধ্যে প্রতিভার ছাপ দেখেই চিনতে পারেন। বুঝতে তাঁদের দেরী হয়নি যে, এ ছেলে কেবল প্রতিভাবান নয়, ফুটবলের সনিষ্ঠ সাধকও বটে।

স্বপন সেনগুপ্ত

ছেলেবেলা থেকে ফুটবলই স্বপনের ধ্যান জ্ঞান। নিখিল ভারত স্কুল ক্রীড়ায় তরুণ স্বপন বাংলার ফুটবল দলে খেলার সুযোগ পায়। এছাড়া এশীয় যুব ফুটবলে ও ভারতীয় দলে নিজ যোগ্যতায় স্থান করে নিয়েছিল।

স্বপন সাধারণত খেলে রাইট উইংয়ে। শক্তসমর্থ সপ্রতিভ গতিতে বল নিয়ে ধার ঘেঁষে যখন ছোটে, তখন প্রতিপক্ষ রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের পক্ষে ওর নাগাল পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। স্বপনের খেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বল ধরেই ও সরাসরি আক্রমণ চালায়। প্রতিপক্ষ রক্ষণভাগ তছনছ করার ঝোঁকই সবচেয়ে বেশী। বল পায়ে দ্রুতগতিতে দৌড়ে স্বপন প্রতিপক্ষকে কাটাতে ওস্তাদ। আগেকার দিনে মহামেডানের ছোট নূর বা মোহনবাগানের মানা গুঁই ও নির্মল চ্যাটার্জি, কিংবা ইস্টবেঙ্গলে দুলালের বিশেষভাবে এই গুণটি ছিল। প্রতিপক্ষ খেলোয়াড় কাছাকাছি এলে বল এগিয়ে দিয়ে তারপর দ্রুগতিততে সেই প্রতিপক্ষকে ব্যবধানে ফেলে বল নিয়ে যাওয়ার মত কষ্টসাধ্য, সাধনালব্ধ গুণ নির্মল চ্যাটার্জির পর অনেক দিন কলকাতার মাঠে দেখা যায়নি।

স্বপন সেই গুণটি আয়ত্ত করেছে। ওর যেমন গতির দ্রুততা আছে তেমনি আছে সটের তীব্রতা। বল পেয়েই সট নিতে পারে স্বপন। দু পায়েই সমান সট থাকায় স্বপন লেফট উইংয়েও খেলতে পারে।

বাংলা তথা ভারতের শীর্ষস্থানীয় ইষ্টবেঙ্গলের মত একটা প্রথম শ্রেণীর দলের অধিনায়কের দায়দায়িত্ব বড় কম নয়। একদিকে যেমন দরকার ক্রীড়াকুশলতা, অন্যদিকে তেমনি নিভাঁজ ব্যক্তিত্ব। ২৪ বছরের যুবক স্বপন এই দুটি গুণেরই অধিকারী। আজকালকার খেলায় দলের সাফল্য কোন একটি মাত্র খেলোয়াড়ের সাফল্যের ওপর নির্ভর করে না, তা সত্যি। কিন্তু দলগত সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখতে বা খেলোয়াড়দের মনে জয়ের অনুপ্রেরণা যোগাতে দলনায়কের আচার-আচরণের গুরুত্ব যে অনেক, একথা খেলাধুলা কেন, জীবনের সব ক্ষেত্রেই স্বীকার না করে উপায় নেই। গণতন্ত্রের যুগেও না।

স্বপনেরই নেতৃত্বে গত বছর ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কলকাতা ফুটবল লীগ আই এফ এ শীল্ড এবং রোভার্স কাপ বিজয়ী এবং ডুরান্ড কাপে রানার্স-আপ হয়েছে। এ এক অনন্য কৃতিত্ব। একজন অধিনায়কের পক্ষে এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কি থাকতে পারে? কিন্তু এতবড় সাফল্যের পরও স্বপনের আচরণে বা কথাবার্তায় কোন রকম অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায়নি। সে নিজের স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের সঙ্গেই বলেছে, 'ব্যক্তিগতভাবে আমার হয়ত তেমন কোন মস্ত অবদান ছিল না, প্রশিক্ষক এবং সতীর্থরা এই সব খেলায় আপ্রাণ পরিশ্রম করেছেন। তবে আমার দিক থেকেও চেষ্টার ত্রুটি ছিল না।'

হ্যাঁ, স্বপন বড় ক্লাবের অধিনায়কের গুরুভার সার্থকভাবেই বইতে পেরেছে। স্বপনের প্রতিভা আছে। বড় হবার স্বপ্ন দেখতে পারে। স্বপনের সাধনায় টান পড়বে না।

স্বপনের পৈতৃক বাস ছিল বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায়। স্বাধীনোত্তর পূর্ব পাকিস্থানের অন্য অনেকের মতই স্বপনের পরিবারের সবাই জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে এপার বাংলায় চলে আসেন। মা-বাবা আছেন। সম্প্রতি সে বিবাহিত। এখন থাকে ব্যারাকপুরে। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় কল-

জন্য তথা সর্বভারতীয় আসরে কুমিল্লার ফুটবলারদের অবদান শ্রদ্ধার সংগে উল্লেখ করার মত। অতীতে ময়দানের বহু কুশলী ও কৃতী ফুটবলার এসেছেন এই স্বর্ণ-প্রসবিনী কুমিল্লা থেকে।

সে যাই হোক, যৌবনচঞ্চল স্বপন যে তার ক্রীড়াপ্রতিভার মূলধনে আরও বড় আসরে যেতে পারবে, সে আশা করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

•

কলকাতার দর্শকরা ময়দানে নানা দলে অনেক তরুণ এবং প্রায়-কিশোরকে খেলতে দেখেছেন। কিন্তু লীগে প্রথম ডিভিশনে নামী দলের গোলরক্ষার দায়িত্ব বিশ্বজিতের মত কোন তরুণের ওপর পড়েছে বলে জানা যায় না। ইস্টবেংগল ক্লাবের নবাগত গোল-রক্ষক বিশ্বজিৎ দাস ইংরেজীতে যাকে বলে এখনও 'টিন এজেড'। বর্তমানে কলকাতা ফুটবল লীগে সম্ভবত বিশ্বজিৎই তরুণ-তম খেলোয়াড়।

বিশ্বজিৎ এখনও স্কুলের ছাত্র। এ বছরই এসেছে টালিগঞ্জ অগ্রগামী থেকে ইস্ট-বেংগলে। কলকাতা ময়দানে খেলা সুরু করেছে বলতে গেলে মাত্র ১৩ বছর বয়সে। ৩০-৪০ দশকে এরিয়ান দলে সেন্টার-ফরোয়ার্ড সোরেন দে মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে প্রথম ডিভিশনে খেলার সুযোগ পায় বলে

বিশ্বজিৎ দাস

জানা যায়। কিন্তু তারপর বহুদিন হল সবেমাত্র কৈশোর পার হয়েই প্রথম শ্রেণীর খেলায় সুযোগ পাওয়ার নজীর বড় একটা দেখা যায় না। তাই বলছি বড় ক্লাবের ইতি-হাসে বিশ্বজিতই তরুণতম গোলরক্ষক।

কলকাতায় ১৯৫৭ সালে বিশ্বজিতের জন্ম। বাবা শ্রীপান্নালাল দাস ম্যাকিন্টস বার্ন কোম্পানীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী। মাও জীবিত। এরা সাত ভাই আর দুই বোন।

বিশ্বজিৎ পরম শ্রদ্ধাভরে বলে তার ক্ষেত্রেও ফুটবল খেলার প্রাথমিক উৎসাহ আসে তার দাদাদের কাছ থেকে তবে তাকে ময়দানে সব প্রথম নিয়ে আসেন বিগত দিনের প্রখ্যাত ব্যাক পরিতোষ চক্রবর্তী। অভিজ্ঞ প্রবীণ পরিতোষ চক্রবর্তী যেন মানস চক্ষে দেখেছেন এই ছেলেও একদিন কে দত্ত, ওসমানের সমগোত্রীয় কুশলী হয়ে উঠবে।

১৯৭০ সালে সাদার্ণ সমিতির পক্ষ হয়ে কলকাতা লীগের তৃতীয় ডিভিশনে বিশ্বজিৎ-এর খেলার আরম্ভ। পরের বছরই ও চলে যায় দ্বিতীয় ডিভিশনের সুবাবান ক্লাবে। ওখানে তার ক্রীড়াচাতুর্য পর্যবেক্ষণ করে টালীগঞ্জ অগ্রগামী নিয়ে আসে প্রথম ডিভিশনে খেলাবার জন্য। নিজের খেলার ক্রম-উৎকর্ষের জন্য বিশ্বজিতের মোহন-বাগানের প্রাক্তন কুশলী সাত্তার ও প্রশিক্ষক প্রদীপ ব্যানার্জির প্রতি কৃতজ্ঞতা অফুরন্ত।

কলকাতার ভেটারেন্স ক্লাবের বিচারে খেলার কুশলতা এবং মাঠে ও মাঠের বাইরে খেলোয়াড়ী আচরণের জন্য বিশ্বজিৎ এবার শ্রেষ্ঠ স্কুল ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছে। তরুণ খেলোয়াড়ের পক্ষে এ এক অনন্য সম্মান ও ক্রীড়াচাতুর্যের স্বীকৃতি।

বিশ্বজিতের খেলার ধার যে ক্রমেই বাড়ছে, তার প্রমাণ ৭৩ সালেই ছেলেটি জুনিয়র বাংলা দলে স্থান পায়। এর আগে ৭২ ও ৭৩এ নিখিল ভারত স্কুল ক্রীড়ার আসরে বিজয়ী বাংলাদলে বিশ্বজিৎ ছিল। ৭২এ মণিপুরে খেলার পর ৭৩এ ইন্দোরে আয়োজিত এই ক্রীড়ার আসরে বাংলা দলের নেতৃত্বও করেছে বিশ্বজিৎ।

বিশ্বজিৎ রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভবনের ছাত্র। এ বছরই হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা দিয়েছে কমার্স বিষয়ে।

গত বছর কলকাতা ফুটবল লীগে টালীগঞ্জ অগ্রগামী বনাম মোহনবাগানের খেলার কথাই বিশ্বজিতের সবচেয়ে বেশী করে মনে পড়ে। সেদিন তার দল মোহন-বাগানের সংগে ১-১ গোলে খেলা শেষ করে নামী দলের কাছ থেকে মূল্যবান পয়েন্ট ছিনিয়ে নিয়েছিল। গোল করার জন্য মোহনবাগান আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিল। ফলে রক্ষণভাগের ওপর যে প্রবল চাপ এসে-ছিল, তার মোকাবিলা করতে দলের সমগ্র রক্ষণভাগের সংগে তাল রেখে গোলে বিশ্ব-জিৎ কি অপূর্ব দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিল, তা সেদিনের আসরের দর্শকদেরও মনে থাকবার কথা। ঐ দিনের ক্রীড়াপ্রতিভা দেখে অভিজ্ঞ ক্রীড়ামোদী বা ক্লাব পরিচালকদের মনে নতুন আশা উঁকি দিয়েছে। তাই বিশ্বজিতের ডাক পড়েছে আরও বড় ক্লাবে, আরও বড় আসরের প্রস্তুতির জন্য। এত কম বয়সে প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে গোলরক্ষকের গুরুদায়িত্ব পালন করতে আর কোন তরুণের ডাক পড়েছে কিনা জানা যায় না।

—অময়

ঐ সফরের প্রতিবাদে আফ্রিকার সুপ্রিম স্পোর্টস কাউন্সিল বৃটেনের সঙ্গে ক্রীড়া সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রস্তাব নেয়। বৃটিশ বাস্কেটবল সংস্থার বিশ্বাস আফ্রিকার প্রস্তাবের সমর্থনেই চীন শেষ পর্যন্ত সফর বাতিল করেছে।

ইউরোপে নতুন টেনিস সংস্থা

যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব টিম টেনিস সংস্থার প্রতিদ্বন্দ্বী একটি টেনিস সংস্থা ইউরোপেও গড়ে উঠছে।

আগামী নভেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ সম্ভবতঃ ইতালী ফ্রান্স স্পেন পশ্চিম জার্মানী, বৃটেন এবং সুইডেনে এই সংস্থার খেলোয়াড়দের আসর বসবে। বিজ্ঞাপন হিসাবে ক্রীড়াসূচীতে অস্ট্রিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়ার নামও এদের তালিকায় আছে। এই সংস্থা কোন খেলোয়াড়ের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবে না। বিজয়ী খেলোয়াড়দের আর্থিক পুরস্কার দেবে।

ইতালীয় ওপেন টেনিসের মহিলা সিংগলসে বিজয়িনী হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের তরুণী ক্রিশ ইভার্ট। ইনি ফাইনালে চেকোশ্লোভাকিয়ার মার্তিনা নাভরাতিলোভাকে হারান ৬—৩ ৬—৩ সেটে। পুরুষ সিংগলসের ফাইনালে সুইডেনের তরুণ বিয়রন বর্গ সরাসরি ৬—৩ ৬—৪ ৬—২ সেটে রুমানিয়ার ইলি নাস্তাসেকে হারিয়ে সকলকে চমৎকৃত করেন। বর্গের বয়স মাত্র ১৮ বছর।

কলকাতা ফুটবল লীগ

কলকাতার ঘরোয়া লীগ ফুটবল নিয়ে গড়ের মাঠ এখন সরগরম। চ্যাম্পিয়নশীপের লড়াইও রীতিমত জমে উঠেছে। গত চার বারের একটানা চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গলের অগ্রগতি অব্যাহত থাকলেও অন্য প্রধান মোহনবাগান এখন কিছুটা কোণঠাসা। কোণঠাসা মহামেডান স্পোর্টিংও।

ইস্টার্ণ রেলওয়ে বনাম মোহনবাগানের ভণ্ডুল খেলাটিতে আই এফ এ দু পক্ষকেই এক পয়েন্ট করে ভাগ করে দিয়েছে। ভণ্ডুল হওয়ার সময় খেলার ফলাফল ছিল ১—১ গোল। মোহানবাগান টালিগঞ্জ অগ্রগামীর সঙ্গে ১—১ গোলে খেলা অমীমাংসিত রেখে আবার পয়েন্ট হারিয়েছে। ইস্ট বেঙ্গল স্পোর্টিং ইউনিয়নকে ৩—০ গোলে এবং কুমারটুলিকে ২—০ গোলে পরাজিত করে। মহামেডান স্পোর্টিং গত সপ্তাহে বাটার কাছে ১—০ গোলে এবং তার আগে কালীঘাটের কাছে পরাজয় বরণ করার ফলে লীগের লড়াইয়ে এখন প্রায় কোণঠাসা। ইস্টবেঙ্গল এ পর্যন্ত পয়েন্ট নষ্ট করেছে একটি। মোহানবাগান তিনটি এবং মহামেডান স্পোর্টিং সাতটি।

সিনিয়র ডিভিসন লীগ কোঠায় যাদের অবস্থিতি এখন তলার দিকে তারা ইতিমধ্যেই উঠে পড়ে লেগেছে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য। গড়ের মাঠের ফুটবলের বিচিত্র গতিবিধির সঙ্গে যাদের পরিচয় রয়েছে তাঁদের সকলেরই জানা আছে যে, এই অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য প্রকাশ্যে এবং নেপথ্যে কত কাঠখড়ই না পোড়ে, কত নোংরা ষড়যন্ত্রই না হয়। বলা বাহুল্য এবারও সে সব জিনিস ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে এবং লীগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কলকাতা ময়দানের নেপথ্য নায়করা সক্রিয় থাকবে।

প্রমীলা বাস্কেটবল

সিওলে আয়োজিত পঞ্চম এশীয় মহিলা বাস্কেট বল প্রতিযোগিতায় ভারত যোগ দেবে। এই উপলক্ষে ১৫ জন খেলোয়াড়কে ইতিমধ্যেই নির্বাচন করা হয়েছে। পরে তিনজনকে নির্বাচনের কথা রয়েছে। নির্বাচিত ১৫ জনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের লিন্ডা ফার্টাডো, শিরিন কন্ট্রাক্টর, ত্রিলোচন কাউর এফ কার্ণরো ও রাধা আয়েঙ্গারও রয়েছেন।

নির্বাচিত পনের জনের নাম ঃ কিরণ গ্রেওয়াল, কিরণ কাপুর, পুনম সাব্বেওয়াল ও ললিতা সিং (দিল্লী) লিন্ডা ফার্টাডো, শিরিন কন্ট্রাকটর, ত্রিলোচন কাউর, এফ কার্ণরো, রাধা আয়েঙ্গার (বাংলা), গ্লোরিয়া জনসন (অন্ধ্র) রেখা সুদ (পাঞ্জাব) বলবীর কাউর (হরিয়ানা), নীনা শ্রীনিবাসন, মেরি অ্যানজেল ও তারা (কর্ণাটক)।

সাগর অভিযানে

আগামী নভেম্বর মাসে এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের উদ্যোগে ওড়িশার পারাদ্বীপ থেকে ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপ পর্যন্ত পাল তোলা নৌকা বেয়ে যাবেন ভারতীয় তরুণ অভিযাত্রীরা। নৌকাটির নাম দেওয়া হয়েছে 'চাঁদ সদাগর'। সম্প্রতি গার্ডেনরীচ রাজাবাগান ডক ইয়ার্ডে ঐ নৌকাটি তৈরী শুরু হয়েছে। নৌকা তৈরীর উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় জাহাজ দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীপ্রণব মুখোপাধ্যায়। নৌকাখানি লম্বা হবে ৩৯ ফুট ৯ ইঞ্চি, চওড়া ১০ ফুট ৬ ইঞ্চি।

খেলাধূলা ঃ অত্র, অন্যত্র

তেহেরাণে ভারত আমন্ত্রিত

জুলাইয়ের তৃতীয় সপ্তাহে তেহেরানে যে ইরানীয় জাতীয় অ্যাথলেটিক ক্রীড়া দল গঠনের জন্য আগামী ২০, ২১ জুন ভারতকে আমন্ত্রণ জানান হয়েছে। ভারতীয় দল গঠনের জন্য আগামী ২০, ২১ জুনে ব্যাঙ্গালোরে প্রাথমিক বাছাই প্রতিযোগিতার আসর বসবে। জানা গেছে যে, মেয়েদের পেন্টাথলনে যোগদানের জন্য দুজন ভারতীয় এথলীটকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানান হয়েছে।

সফর বাতিল

চীনা বাস্কেট বল দল বৃটেন সফর বাতিল করে দিয়েছে। কথা ছিল চীনা দল ঐ সফরে সাতটি ম্যাচ খেলবে। চীন অবশ্য কোন কারণ না দেখিয়েই সফর বাতিল করেছে তবে ওয়াকেফহাল মহলের বিশ্বাস যে আফ্রিকাকে সমর্থন করার উদ্দেশ্যেই চীনের এই সিদ্ধান্ত। বৃটিশ লায়ন্স রাগবী ইউনিয়ন বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকা সফররত।

ববি ফিসারের প্রতিদ্বন্দ্বী কে ?

বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ান মার্কিন খেলোয়াড় ববি ফিসারের বিরুদ্ধে খেলার যোগ্যতা অর্জনের জন্য রুশ গ্র্যান্ড মাস্টার আনাতোলি কারপভ স্বদেশের ভিক্টর কর্চনয়ের সঙ্গে চূড়ান্ত বাছাই পর্বে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এই খেলাটি হবে মস্কোয় আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর।

আলি-ফোরম্যান লড়াই

এবার মুষ্টিযুদ্ধে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশীপ আখ্যার লড়াইয়ের আসর বসছে আফ্রিকার জায়রে (প্রাক্তন কঙ্গো)। এখানে আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ান জর্জ ফোরম্যান লড়বেন প্রাক্তন বিশ্ববিজয়ী তথা বহুখ্যাতি-অখ্যাতির ধারক মহম্মদ আলী ওরফে ক্যাসিয়াস ক্লের সঙ্গে।

লড়াই হবে জায়রের রাজধানী কিনসাসায়। এখানে এই লড়াই আয়োজনের জন্য একটি সুইস ব্যাংক ১ কোটি ১০ লক্ষ

ডলার গ্যারাণ্টি দিয়েছে, এছাড়া বসে লড়াই দেখার টিকিট বিক্রি থেকেও কম করে ১৪ লক্ষ ডলার পাওয়া যাবে বলে উদ্যোক্তাদ্বয় হ্যাঙ্ক সোয়াটন ও বব আরুম প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আরুম এখন আলীর ম্যানেজার ও একটি টেলিভিশন কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট।

গুলাগং বাতিল

প্যারিসের এক খবরে প্রকাশ, অস্ট্রেলিয়ার কুশলী মহিলা টেনিস তারকা প্রাক্তন উইম্বলডন বিজয়িনী ইভন গুলাগং এবং যুক্তরাষ্ট্রের খেলোয়াড় জিমি কোনর্সকে এবার ফরাসী আন্তর্জাতিক টেনিসে খেলতে দেওয়া হবে না। এর কারণ, তাঁরা বিশ্ব টিম টেনিস সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ এবং ঐ সংস্থার পরিচালিত আন্তঃ শহর লীগ-টেনিসে খেলেন।

কুমারী গুলাগং এবং কোনর্স ফরাসী টেনিস ফেডারেশনের এই নির্দেশের বিরুদ্ধে প্যারিসের আদালতে যে মামলা করেছিলেন সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট তা খারিজ করে আদেশ দিয়েছেন যে তাঁদের আবেদন মামলার বিষয় বহির্ভূত।

জান কোদেসের ফ্যাসাদ

উইম্বলডন টেনিসে গতবারের সিঙ্গলস বিজয়ী চেক খেলোয়াড় জান কোদেস তাঁর মাথা গরমের ফলে খুব ফ্যাসাদে পড়েছেন। ইতালীর ওপেন টেনিসের সিঙ্গলসে দ্বিতীয় রাউন্ডে ইতালীর আন্তোনিও জুগারেল্লির সঙ্গে খেলবার সময় লাইন-বিচারকের এক নির্দেশের প্রতিবাদে তাঁর সঙ্গে তর্কবিতর্ক জুড়ে দেওয়ায় এবং তাঁকে দুবার ধাক্কা মারায় বিচারক তাঁকে মাঠ থেকে বহিস্কার করেন। উপরন্তু অভব্য আচরণের অপরাধে ঐ আসরের ডাবলস বিভাগ থেকেও কোদেসের নাম বাতিল করা হয়। কোদেস সিঙ্গলসে দ্বিতীয় বাছাই-এর সম্মান পেয়েছিলেন।

মাথা গরমের অপরাধের শাস্তি এখানেই শেষ হয় নি। ২৮ বছর বয়স্ক এই কুশলী খেলোয়াড়কে হয়ত আসন্ন ফরাসী ওপেন টেনিসেও খেলতে দেওয়া হবে না। ১৯৭০এ তিনি এই আসরে সিঙ্গলসে বিজয়ী। আন্তর্জাতিক লন টেনিস সংস্থা হয়ত তাঁর বিরুদ্ধে আরও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে।

ভার্জিনিয়াও চটেছেন

বৃটেনের ভার্জিনিয়া ওয়েডও ইতালীয় ওপন টেনিসে দক্ষিণ আফ্রিকার প্যাট প্রেটোরিয়াসের সঙ্গে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার সময় বিচারকের এক নির্দেশে চটে গিয়ে চিৎকার করে ওঠেন। পরে, এলোমেলো বল মেরে ৫—৭ ৩—৬ সেটে হেরে যান।

বিজয় ও আনন্দের হার

প্যারিসে আয়োজিত ফরাসী টেনিস চ্যাম্পিয়নশীপে সিঙ্গলসের তৃতীয় রাউন্ডে ভারতের বিজয় অমৃতরাজ গত ৮ই জুন ২—৬ ২—৬ ও ২—৬ গেমে ইয়ান কোড়েসের কাছে হেরে গেছেন। এর আগের দিন ডাবলসের প্রথম রাউন্ডের খেলায় বিজয় ও আনন্দ অমৃতরাজ ২—৬ ৬—৩ ও ৮—১০ গেমে জন কোডেস ও জেডানিকের হাতে পরাজয় বরণ করেন। সিঙ্গলসের খেলায় বিজয় ৭—৬ ৩—৬ ও ৬—৩ গেমে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাকনেইরকে হারিয়ে ছিলেন। প্রখ্যাত স্ট্যান স্মিথ প্রথম রাউন্ডেই হেরেছেন জাপানের কামিওয়াজুমির কাছে ৬—৩ ৪—৬ ও ৬—৮ গেমে।

বিশ্ব কাপ ফুটবল

আগামী ১৩ই জুন থেকে ফিফা বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ঘটছে (চূড়ান্ত পর্যায়)। তিন সপ্তাহ ধরে পশ্চিম জার্মানীর বিভিন্ন শহরে ১৬টি দেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশীপ অর্জনের জন্য। যে কটি শহরে এই খেলার ব্যবস্থা হয়েছে তা হোল—বার্লিন, হামবুর্গ, ফ্রাঙ্কফার্ট ডর্টমুন্ড গেলসেনকিরসেন ডুসেলডর্ফ, হ্যানোভার মিউনিখ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে এবারের বিশ্ব কাপের বাছাই পর্বে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে মোট ৯৭টি দেশ। বিশ্ব কাপ ফুটবলে আর্জেন্টিনা ১৯৩০ সালে রাণার্স আপ হয়েছে। ব্রাজিল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ১৯৫৮, ১৯৬২ ১৯৭০ সালে। রাণার্স আপ ১৯৫০ সালে। তৃতীয় স্থান পেয়েছে ১৯৩৮ সালে। চিলি ১৯৬২ সালে তৃতীয় স্থানাধিকারী হয়েছে। ১৯৫৪ সালে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পশ্চিম জার্মানী. রানার্স আপ ১৯৬৬। তৃতীয় স্থান ১৯৩৪ ও ১৯৭০। চতুর্থ স্থান ১৯৫৮। ইতালী বিজয়ী হয়েছে ১৯৩৪, ১৯৩৮ সালে। রাণার্স আপ ১৯৭০ সালে। ১৯৫৮ সালে রাণার্স আপ হয়েছে সুইডেন। তৃতীয় হয়েছে ১৯৫০ এবং চতুর্থ ১৯৩৮ সালে। ১৯৩০, ১৯৫০ সালে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে উরুগুয়ে। চতুর্থ হয়েছে উরুগুয়ে ১৯৫৪ ও ১৯৭০ সালে। যুগোস্লাভিয়া ১৯৩০ সালের সেমি ফাইনালিস্ট। ১৯৬২ সালে লাভ করেছে চতুর্থ স্থান।

টেস্টের আগে দুটি জয়

ম্যানচেস্টারে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলার আগে ভারতীয় ক্রিকেট দল পর পর দুটি কাউন্টি ম্যাচে জিতেছে। বলা বাহুল্য ভারতীয় দলের এই জয়ে খেলোয়াররা অনুপ্রেরণা পাবেন। একাদিক্রমে দশটি ম্যাচ অমীমাংসিতভাবে শেষ করার পর সারে কাউন্টি দলকে ভারত হারায় দশ উইকেটে। আলোচ্য খেলায় গাভাসকার নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার অবকাশ পেয়েছেন। সারের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ভারতীয় দল ৭ উইকেটে ৩১৭ রান তুলে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দেয়। ঐ ৩১৭ রানের মধ্যে গাভাসকারের ব্যক্তিগত সংগ্রহ ১৩৬। ব্যাটে যেমন দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন গাভাসকার ঠিক তেমনি বলে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন আবিদ আলি।

—বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সাধনা
আমলা
সুবাসিত আয়ুর্বেদীয় কেশ তৈল

হ'লো সেই আসল জিনিষ যার পেছনে রয়েছে ১২৫ বছরের অভিজ্ঞতা

১। সর্বাধুনিক মশলা প্রযুক্তি বিস্তার ফল নতুন প্যাকে আরও উন্নত ধরনের কুকমী গুঁড়া মশলা।

২। এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের গবেষণা।

৩। বাজারের অন্যান্য পাঁচটা গুঁড়া মশলা থেকে কুকমী গুঁড়া মশলা সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের ও গন্ধের অনুপম।

আমাদের অন্য কোন ব্র্যাণ্ড ও ব্রাঞ্চ নেই

প্রস্তুতকারক কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

(স্পাইস পাউডার ডিভিসন)

২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭। ফোন : ৩৩-৫৫৩৫ ... —কাশীপুর

.../KCD-74

অমৃত

সম্পাদক
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

[১৪ বর্ষ, ৮ সংখ্যা] শুক্রবার, ১৩ আষাঢ় ১৩৮১ বঙ্গাব্দ [মূল্য ৫

শৈলেশ দে'র বহু প্রতীক্ষিত গ্রন্থ

আমি সুভাষ বলছি তৃতীয় খণ্ড ২০-০০

এই পর্যায়ের ১ম খণ্ড (৫ম সংস্করণ) ১৫·০০ এবং ২য় খণ্ড (২য় সংস্করণ) ১৫·০০
যথারীতি পাওয়া যাচ্ছে

প্রবাসী সাহিত্যিক অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সুবর্ণশিরি ২০·০০

শক্তিপদ রাজগুরুর উপন্যাস

নয়া বসত ৬·০০

প্রখ্যাত চিত্র-নির্মাতা শক্তি সামন্ত বাংলা ও হিন্দী উভয় ভাষাতেই বইটি চলচ্চিত্রে রূপ দিচ্ছেন। হিন্দীতে নাম হয়েছে "অমানুষ"—উভয় ভাষারই নায়ক মহানায়ক উত্তমকুমার

শংকু মহারাজের অনবদ্য ভ্রমণ-কাহিনী

মধু-বৃন্দাবনে মহানপর্ব ১০·০০

এই পর্যায়ের ব্রজপর্ব (২য় সং) ১০·০০ এবং বনপর্ব ১০·০০
যথারীতি পাওয়া যাচ্ছে

শ্রীহংস-এর নতুন উপন্যাস

লাস্ট ওয়ার্ড ৮·০০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি

নীলাঙ্গুরীয় ১২·০০

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়ের

ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব ২৫·০০

ফণিভূষণ ভট্টাচার্যের জ্বলন্ত অবদান

নৌ-বিদ্রোহের ইতিকথা ৮·০০

নারায়ণ সান্যালের অভাবনীয় উপন্যাস

আবার যদি ইচ্ছা কর ১২·০০

ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ভ্রমণ-কাহিনী

রূপসী প্রতিবেশী (নেপাল ভ্রমণ) ১২·০০

নিখিলচন্দ্র সরকারের নতুন উপন্যাস

দুঃখে সুখে বাঁচা ১০·০০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের গল্পগ্রন্থ

আকাশের আয়না ১০·

আবদুল জব্বারের নতুন গ্রন্থ

জনপদজীবন ৮·

ফণিভূষণ আচার্যের উপন্যাস

পঞ্চকন্যা ১২·

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

আর এক সাজে ৬·

নরেশচন্দ্র শর্মাচার্যের উপন্যাস

পিছু ডাকে ৫·

নীলকণ্ঠের গল্পগ্রন্থ

নীলকণ্ঠ বিচিত্রা ১০·

পরিতোষ মজুমদারের

অগ্নিলতা ৬·

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাস

বিশ্বাসের বাইরে ৫·

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রহস্য-কাহিনী

অনেক রক্ত মাড়িয়ে ৯-০০

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের উপন্যাস

যুগ স্বাক্ষর ১০·

সুনীলকুমার ঘোষের উপন্যাস

কারা প্রাচীর ১০·

অমরেন্দ্র দাসের উপন্যাস

অন্য তরঙ্গ ৮·

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস

নিঃসঙ্গ পদাতিক ৮·

নিগূঢ়ানন্দের উপন্যাস

হৃদয়ে নাবিক ৮·

রবীন্দ্র লাইব্রেরী ১৫/২, শ্যামচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ॥ ফোনঃ ৩৪-৮৩৫৬.

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরত পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণি-অর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫·০০	টাকা ৩০·০০
ষান্মাসিক	টাকা ১২·৫০	টাকা ১৫·৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬·২৫	টাকা ৮·০০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২০১ (১৪ লাইন)

১৪শ বর্ষ

৮ সংখ্যা
মূল্য ৫০ পয়সা

'ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন' নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

Friday, 28th June, 1974 শুক্রবার, ১৩ আষাঢ়, ১৩৮১ 50 Paise

সূচীপত্র

পৃথিবীর সর্বপ্রথম ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার বার

সুপার ৭৭৭

পয়সা বাঁচান, বেশী সাদা করুন

সুপার ৭৭৭ বার—দুনিয়াতে এর জুড়ি নেই। এটি একটি নতুন ফর্মূলা। এতে রয়েছে বেশী কাপড় অনেক বেশী সাদা করার, অনেক বেশী পরিষ্কার করার ক্ষমতা—এমনকি যে জলে সাধারণত একবারেই ফেনা হয় না, তেমন জলে-ও। সাধারণ বার সাবানের তুলনায় দাম-ও কম।

এখন থেকে ব্যবহার করতে শুরু করুন নতুন ধরণের বার—সুপার ৭৭৭ ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার বার!

shilpi hpma 6A/73 BEN

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক

সম্পাদকীয়

ভারত-বাঙলাদেশ মৈত্রী

ভারতের রাষ্ট্রপতির সাম্প্রতিক বাঙলাদেশ সফর নানাদিক দিয়েই খুব তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রথম ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান বাঙলাদেশ সফর করলেন এবং বাঙলাদেশের জাতীয় সংসদে ভাষণ দেবার সম্মান পেলেন। আমাদের দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার জন্য রাষ্ট্রপতির সফর ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করবে সন্দেহ নেই। এখনও আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় এমন অশুভ শক্তি কাজ করছে যারা ভারত ও বাঙলাদেশের মধ্যে মৈত্রী সম্পর্কে ফাটল ধরাতে চায়। এরাই বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল। সেদিন ভারত বিরাট ঝুঁকি নিয়ে এই মুক্তিসংগ্রামীদের পাশে না দাঁড়ালে ইতিহাসের গতি অন্য পথে মোড় নিত। বস্তুত বাঙলাদেশের রাষ্ট্রপতি জনাব মহম্মদুল্লাহ মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাঙলাদেশের প্রতি ভারতের অকুণ্ঠ সহায়তার সপ্রশংস উল্লেখই শুধু করেননি, বাঙলাদেশের পুনর্গঠনে ভারতের সহযোগিতাকেও তিনি অভিনন্দিত করেছেন। রাষ্ট্রপতি গিরি এই সহযোগিতার ওপরই সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন। দুটি সার্বভৌম দেশের নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সম্পূর্ণ অধিকার রক্ষা করেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠতম সহযোগিতা করতে পারে। রাষ্ট্রপতি গিরির এই উক্তি আমাদের দুই দেশের মৈত্রী বন্ধনের ওপরেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করে আজ বাঙলাদেশ রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ লাভ করেছে। এই স্বীকৃতি বাঙলাদেশের বীরত্বপূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সার্থক পররাষ্ট্রনীতিরই স্বীকৃতি। ভারতবর্ষ প্রথম থেকেই বাঙলাদেশের পাশে আছে এবং রাষ্ট্রসংঘে তার সদস্যপদ লাভের জন্য জনমত সৃষ্টি করে আসছিল। যারা বাঙলাদেশের বিরোধিতা করেছে এতকাল আজ তাদের নীতির ব্যর্থতা সুস্পষ্ট। বাঙলাদেশকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। ইতিহাসের ঘটনাবলী তা বারবার প্রমাণিত করেছে।

এই উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভারত ও বাঙলাদেশের যৌথ উদ্যোগ ব্যর্থ করার জন্য পাকিস্তান সক্রিয়। কিন্তু শান্তির স্বার্থে আমাদের দুই দেশ যতদূর যাওয়া সম্ভব এবং যতখানি উদারতা দেখানো সম্ভব তা দেখিয়েছে। পাক যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিদান এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করে বাঙলাদেশ নতুন আন্তর্জাতিক নজীর স্থাপন করেছে। শান্তির জন্য বাঙলাদেশের এই আগ্রহ স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ভারতবর্ষ সব সময়েই বাঙলাদেশের পাশে রয়েছে। রাষ্ট্রপতি গিরি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে কৃত্রিম ফাটল সৃষ্টির কোনো চক্রান্ত বরদাস্ত করা হবে না। আমাদের মৈত্রী দিনে দিনে শক্তিশালী হবে। বাঙলাদেশের রাষ্ট্রপতি ভারতের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির প্রশংসা করেছেন। শান্তিপূর্ণ কাজে পরমাণু বিস্ফোরণ নীতিরও অনুমোদন করেছে বাঙলাদেশ। পারস্পরিক সহযোগিতায় আমাদের দুই দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে উভয় রাষ্ট্রপতি যে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন তা ভারত ও বাঙলাদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষারই অভিব্যক্তি।

ভারত ও বাঙলাদেশের বহু সমস্যাই প্রায় এক ধরনের। আমাদের আদর্শেরও রয়েছে মিল। গণতান্ত্রিক পন্থায় সমাজের পরিবর্তন এবং তার বৈষয়িক উন্নয়নে আমরা বিশ্বাসী। আজকের দুনিয়ায় পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত। সম-আদর্শে বিশ্বাসী আমাদের দুই দেশ বহু ক্ষেত্রেই সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ। বাঙলাদেশের পুনর্গঠনে সহায়তা দিয়ে যার সূত্রপাত সর্বাঙ্গীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় তার ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হবে, এ বিশ্বাস আমরা রাখি। বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের দ্বারা আমরা নিকটতর হব এবং রাজনৈতিক আদর্শের সমতায় এই বন্ধন হবে অচ্ছেদ্য।

ঝরণার জন্যে

কুমার মিত্র

'কেন, তোর ভাল লাগছে না?'

'খুব বাজে। এক চিলতে ঝিরঝিরে জল, এর নাম ঝরনা? একটা শব্দ পর্যন্ত নেই।'

অলকা বাড়িয়ে বলেনি কিছু। সত্যি এর নাম ঝরনা হলে আরশোলাও পাখি। সরু নিঃশব্দ একটা জলের ধারা নেমে আসছে ওপর থেকে। তার না আছে বেগ, না ভাষা। চারপাশটা আঁধার সূর্যের আলো পড়েনা। ঝরনার দেহে সূর্যালোক প্রতিফলিত না হলে রামধনুর সাতটা রঙের রোশনাই ঝিকিয়ে ওঠে না। অন্ততঃ এই রকম ঝরনা দেখতে পাঁচ মাইল টাঙায় চড়ে সাত সকালে ছুটে আসার কোন মানে আছে মনে করে না অলকা।

'তাহলে তুই বোস। আমি ওদিকটায় ঘুরে আসি।' বলে তিলকা চলে গেল দলের সঙ্গে যোগ দিতে। অলকা দুহাত গালে ঠেস দিয়ে বসে রইল।

অলকা বরাবরই ঝরনা দেখতে ভালবাসে। ঝরনা মানেই পাহাড়, গাছগাছালি, প্রজাপতি পাখীর ডাক। ঝরনার কলভাষা শুনে বুকে ওর খুশীর স্রোত উছলে ওঠে। পাহাড়ের কোন দুর্নিরীক্ষ্য গভীরতা থেকে একটা বিরতিহীন স্রোতোধারা নেমে আসছে—তার গতির মধ্যে খুশীর চপলতা তার গায়ে লাখো লাখো অভ্রকুচির ঝিলিক—তারপর ছটফটে পতঙ্গের মতো লাফ কেটে নীচে লাফিয়ে পড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠছে একরাশ ফেনা—বেশ লাগে দেখতে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই আনন্দধারার ধারে বসে থাকতেও তার অরুচি আসে না। তাই বন-পাহাড়ের দেশে বেড়াতে গেলেই অলকা খোঁজ করে আশপাশে কোথাও ঝরনা আছে কিনা। তার সাধ মেটাতেই যেন ঝরনা মিলেও যায় কাছেপিঠে। তারপর একদিন দল বেঁধে ঝরনাতলায় যাওয়া। পিকনিক, গান গল্প-গাছা। অলকা সব তাতেই আছে, আবার নেইও।

তার এই স্বভাব নিয়ে হাসি-মস্করাও বড় কম হয় না। এমন ঝর্না-পাগল মেয়ে সত্যিই কেউ দেখেনি কখনও। না ওর তিলকাদি না নিজের বন্ধু-বান্ধবরা না দাদার বন্ধুরা। তবু অলকার স্বভাব বদলায় না।

সেবারে রাজগীরে গিয়ে ওকে নিয়ে কি বিপদেই না পড়েছিল সকলে। কার্তিকের শেষ, বৃষ্টি-বাদলের দিন নয়। কিন্তু হঠাৎ আকাশ কালো করে বাদল নামল। বৃষ্টি হল শুধু একদিন। কিন্তু তাতেই বৈভারে বিপুলাচলে, রত্নগিরি আর শোনগিরিতে যেন হাজার ঝরনার দরজা খুলে গেল। পাহাড়ী বর্ষা আগে কখনও দেখেনি অলকা। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। একটা ঝরনা নয়, অগুনতি ঝরনা রাতারাতি গজিয়ে উঠেছে পাহাড়ে। বৃষ্টির পর একনাগাড়ে তিনটে দিন আর ঝিরঝিরি স্রোত থামে না। অলকাকে সামলানো মুস্কিল। যতগুলো পাহাড়ী জল-ধারা আচমকা দেখা দিয়েছে তাদের সবার সঙ্গে তার দেখা সাক্ষাৎ যেন না হলেই নয়। রাজগীরে যেটুকু কোডাক ফিল্ম ছিল তার সবটুকু সে একাই খরচ করে ফেলল। তার আর কি, বাকি সবার ওপর দিয়ে ঝামেলা গেল বড় অল্প নয়। এই রকমই পাগল মেয়ে অলকা। বরাবর।

এবার খুরনাতে বেড়াতে এসেও বাইশ বছরের মেয়েটা কচি খুকীর মতো বায়না

ঝরল—ঝরনা দেখব। পাওয়া গেল খোঁজ। মাইল চার পাঁচ গেলেই বন-পাহাড়ের অঞ্চল। সেখানে হলদীবরণ বলে চমৎকার একটা পিকনিক স্পট আছে। সেই সঙ্গে ঝরনাও পাওয়া যাবে। আলো দেখে মথের যেমন আনন্দ হয় তেমনি অলকাও নেচে উঠল ঝরনার কথায়। কিন্তু তার মনের সবটুকু আলো নিভে গিয়েছে ঝরনা দেখে।

ভাবুক মনের মানুষ অরণ্যের মধ্যে বেশীক্ষণ দুঃখী থাকতে পারে না। অলকার বিষাদ আস্তে আস্তে খানিকটা কেটে এল। এই সবে ফাল্গুনের শুরু। অশান দুধকী কেন্দুর পাতা ঝরতে শুরু করেছে। দক্ষিণ সমুদ্র হাওয়া পাঠিয়ে দিচ্ছে সমতল ভূমিতে। অরণ্যের মধ্যে এইরকম আলোঝরা বাতাসভেজা ফাগুনের সকাল ভালই লাগতে লাগল অলকার।

অনেকক্ষণ দলটার কোন সাড়াশব্দ নেই। ওরা সম্ভবত গাছপালার আড়ালে ঢাকা পড়েছে। কথাবার্তার শব্দও কানে আসছে না। হয়তো একটু দূরে চলে গিয়েছে। দলের মধ্যে আছে তিলকা মেজদা বরুণ এবং ওর দুই বন্ধু নিশীথ আর অরুণ। বাবা-মা আসেননি। খুরনাতেই রয়ে গিয়েছেন। ওঁদের বয়স হয়েছে দৌড়ঝাঁপ আর পোষায় না।

নিশীথরা আলাদা করে বেড়াতে এসেছিল শিমুলতলায়। একদিন খুরনার রাস্তায় দেখা। সেই থেকে যখন তখন আসে ওদের বাসায়। হলদীবরণে পিকনিকে আসার প্রস্তাব দিতেই এক কথায় রাজী হয়ে গেল। অলকার কেমন যেন মনে হয়েছিল ওদের উৎসাহের আসল কারণ ওরা দুবোন, বিশেষ করে সে। হয়তো এতে দোষের কিছু নেই, এটাই স্বাভাবিক। তবু অলকার ভাল লাগেনি। নজরধরা মেয়ে দেখলেই যেসব ছেলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে তাদের বড়ো অগভীর মনে হয় তার। ছেলেদের চরিত্রে অলকা কিছু গভীরতা আশা করে। এই সংসারে কোন কিছুই মনের মতো মেলে না, এটাই বোধহয় স্বাভাবিক। তাই আজ পর্যন্ত তার নিজেকে কারো কাছে সঁপে দেওয়া হল না।

সবাই অলকাকে ভুল বোঝে, কাঠোর বলে জানে। কিন্তু তাই কি? কোন কোন নির্জন মুহূর্তে বাড়ীর লাইফ সাইজ আয়নাটায় নিজের দীর্ঘচ্ছন্দ উজ্জ্বলকান্তি শরীরের প্রতিচ্ছায়া দেখতে ভালই লাগে অলকার। পাতলা ফুরফুরে এক জোড়া ঠোঁট, সমান নিভাঁজ মাপসই কপাল, তুলির টানের মতো ভুরু, নির্মল কাজলকালো চোখ জোড়ার দিকে তাকিয়ে নার্সিসাসের কাহিনীটা মনে পড়ে যায় তার। তারপরই দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

বন্ধুরা বলে, 'তোর এত ঝরনা দেখার সখ অথচ মনের ভেতর কোন ঝরনা নেই কেন?' অলকা উত্তর দেয় না। উত্তর দিতে পারে না। বন্ধুরা জানে যে তার মনোভূমিতে আজো ভালবাসার ফুল ফোটেনি। তবে প্রশ্নটা তাকে চিন্তিত ও আনমনা করে বৈকি। সত্যিই কি তার বুকের ভেতরটা খাঁ-খাঁ বালিয়াড়ীর উপমা? সেখানে কোন ঝরনা নেই? তার মন বলে—আছে আছে। বুকের ভেতর চোখ মেলে দেখতে পায় সেখানে নিঃসাড়ে বয়ে যাচ্ছে এক রুপোলি ঝরনা তাতে সপ্তরঙের লীলাখেলা, ঢেউয়ের কাঁপন। কেবল সেই ঝরনা কারো চোখে পড়ে না, তার শব্দ কেউ শুনতে পায় না।

অলকার নিশীথ এবং অরুণের ভাবনা মনে এল এই মুহূর্তে। কেন এল সে নিজেই জানে না। হয়তো নির্জনতা বস্তুটা গোপন মনোরহস্যের দরজা খুলে দেয় বলেই। ওরা দুজনেই বড়ো এযুগের ছেলে। চেহারা ভালই মোটের ওপর, অবশ্য ভাল দেখানোর চেষ্টা থেকেই বেশী ভাল দেখায়। পাঞ্জাবি পরে না, ওতে নাকি স্কুলমাস্টারের মতো দেখায়, তাই সার্ট-ট্রাউজার পরে। ঘন ঘন সিগারেট খায়। সিগারেট ধরার মধ্যে আঙুলের কায়দা আছে। আকাশের দিকে নাক তুলে ধোঁয়া ছাড়ার মধ্যেও কায়দা। বিজলি বলে, 'এরকম করে সিগারেট খেলে ছেলেদের নাকি বেশ স্মার্ট লাগে।' তা হবে। একথা বলতে পারে বিজলি। কারণ কাফে রেস্তোরাঁয় একরাশ ধোঁয়া ওড়ানো ছেলের মাঝখানেই যে সর্বক্ষণ বসে থাকে বিজলি। কদিন ধরেই নিশীথ আর অরুণকে দেখছে অলকা। দেখেছে আর মনে মনে হেসেছে। দুজনেই ঠোঁট-চেপে কথা বলে। কেমন গম্ভীর গলায় বলে, আর শব্দগুলোকে অনর্থক জটিল করে। কাল সন্ধ্যায় রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে ভুল সুরে রবীন্দ্রসংগীত গাইছিল নিশীথ। ঠিক বিদেশী গানের মতো লাগছিল। অরুণ বাংলা ছায়াছবির আলোচনা করতে করতে মাঝে মাঝেই চ্যাপলিন ত্রুফো, আন্তোনিওনি এই ধরণের নামগুলো আলটপকা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছিল। রবিশঙ্করের সেতারও তার আলোচনা থেকে বাদ যাচ্ছিল না। সব মিলিয়ে ভয়ানক হাস্যকর।

অথচ এসব না করলেও ওদের দাম কমত না। ওদের কারোরই বিদ্যে-বুদ্ধি কম নয়। নিশীথ ডবল্ বি-সি-এস পাশ করে ভাল মাইনের সরকারী চাকুরে। অরুণ একটা প্রাইভেট ফার্মে ওপরতলার পোস্ট দখল করে আছে। সমাজের চোখে ওরা ঈর্ষার পাত্রই। অলকার জন্যে তার বাবা-মা এদের চেয়ে উঁচু ডালের ফল পেড়ে দিতে পারবেন না নিশ্চিতই। কিন্তু আশ্চর্য এরা এসে তার এখানকার মুহূর্তগুলোকে রঙীন করে তুলতে পারল না।

অলকা আবার ঝরনার জন্যে দুঃখ বোধ করল। কি মনে করে সে উঠে দাঁড়াল। তারপর পায়ে পায়ে উঠে এল ছোট্ট ঝরনাটার ধারে।

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ সে ঝরনাটার দিকে চেয়ে রইল অপলক চোখে। তিরতির করে নেমে আসছে জলধারাটা। কোন শব্দ নেই। চারপাশে আলোর ছড়াছড়ি। কিন্তু ওপরে কিছু ছায়াতরু থাকাতে ঝরনার ওপর ধূসর তরল অন্ধকার। অলকা বৃথাই জলকণার মধ্যে রামধনু খুঁজল। তার মন জলস্রোতটার ভেতর শব্দ সন্ধান করছিল। ঘাড় নীচু করে পাশের পাথরটার গায়ে কান লাগিয়ে সে উৎকর্ণ হল। খুব মিহি সুরেলা একটা গুঞ্জন শুনতে পেল সে যা নৈঃশব্দেরই অন্য নাম। অলকা কান ভরে, নিজের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে, নৈঃশব্দ্য উপভোগ করতে লাগল।

'একি, আপনি এখানে কি করছেন?'

অলকা চমকে ঘাড় ফেরাল। নিশীথ। অলকার মুখে একরাশ রক্ত ছড়িয়ে গেল। লজ্জা পেয়েছে।

'অমন করে কান পেতে কি শুনছিলেন?'

'শব্দ।'

'শব্দ।' নিশীথ অবাক, ঝরনার?

'হ্যাঁ।'

'আশ্চর্য তো!'

'আশ্চর্য কিসের?'

'অমন করে ঝরনার শব্দ বুঝি কেউ শোনে?'

'আমি শুনি। ভাল লাগে।'

নিশীথ হতাশার ভংগীতে হাত ওল্টাল। তারপর বলল, 'আমরা কত ঘুরলাম বনের ভেতর। বেশ চমৎকার জায়গা। ছবিও তোলা হল। ছবির ভেতর আপনি রইলেন না। আপনাকে আমরা আশা করেছিলাম। গেলেন না কেন?'

'ভাল লাগছিল না।'

'মানে ঝরনা ছেড়ে যেতে মন সরছিল না। কিন্তু এই ঝরনাটার ভেতর দেখার মতো কি আছে?'

'অনেক কিছু।'

নিশীথ ঠোঁট কামড়াল হতাশ ভংগীতে, 'কি জানি। আপনার ব্যাপারটা কেমন একরকম।'

অলকা নিশীথের অভিযোগের উত্তর দিল না। ঝরনার জলে তার চোখ স্থির।

'এখানে একা একা দাঁড়িয়ে কি করবেন? চলুন ঘুরে আসি।'

জল থেকে চোখ তুলে নিশীথের দিকে তাকাল। নিশীথের মুখে একটা প্রত্যাশা থমকে আছে। তার জবাব শোনার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে নিশীথ। কেমন বোকাটে দেখাচ্ছে তাকে। অলকা কথা বলল না। ঘাড় ফিরিয়ে নিল।

'কি কথা বলছেন না যে?'

অলকা কথা বলল, কিন্তু সেটা নিশীথের প্রশ্নের জবাব নয়, 'ওরা সব কোথায়?'

'বরুণ একটা কাঠুরের সঙ্গে গল্প করছে। বোটানির ছাত্র তো। তাই গাছগাছালি নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। তোমার দিদি আর অরুণ—'

'কি?'

নিশীথ অস্ফুট হাসল, 'কি আর। এই বনেরই কোথাও গাছপালার ছায়ায় বসে আছে। কিন্তু আমার কথার জবাব মিলল না যে!'

অলকা ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'আমার ভাল লাগছে না।'

'ভাল লাগছে না!' নিশীথ কেমন বিড়-বিড় করে বলল, 'কিন্তু কেন ভাল লাগবে না! এমন পাহাড় ছায়া রোদ, বাতাস, পাখীর ডাক—ভাল না লাগার কি আছে?'

'নিশীথবাবু আপনি যান। আমি একটু একলা থাকতে চাই।'

এরপর আর কথা চলে না। নিশীথ ঘাড় নীচু করে আস্তে আস্তে চলে গেল।

চলে যাওয়ার কথাটা কি আর একটু নরম করে বললে হত? মনে মনে ভাবল অলকা। কিংবা ওকে কি তাড়িয়ে দিতেই চেয়েছিল অলকা? বোধহয় না। অলকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঝরনার কাছ থেকে সরে এল।

অনেক রাতে বিছানায় শুয়ে গল্প করছিল তিলকা। জানলাপথে আসা জ্যোৎস্নার আলোয় বিছানা মাখামাখি। হলদীবরণের জংগলে আজ সকালের মুহূর্তগুলোরই গল্প করছিল তিলকা। তার গলায় খুশীর আমেজ। তার গলার স্বরে অরুণ নামটা এমন সরস হয়ে ফুটছিল যে মনে হচ্ছিল সে যেন নামটাকে জপ করছে। শুনতে শুনতে অলকার গলার মধ্যে কি যেন বেধে যাচ্ছিল।

গল্প থামিয়ে হঠাৎ তিলকা শুধোল, 'অরুণ ছেলেটাকে তোর কেমন মনে হয় রে?'

'ভালই তো।'

'আহা কেমন ভাল? তোর কথাগুলো আলগা আলগা।'

'বেশ ভাল। চেহারা মন্দ নয়, বিদ্যে আছে মোটা চাকরি করে। আর কি চাই?'

'বাস বাস। তা নিশীথের তো আছে ওই সব। ওকে অমন করে তাড়ালি কেন?'

'বলেছে বুঝি?'

'বলবে কেন? মুখ দেখে বোঝা যায় না বুঝি। আমরাই যে ওকে পাঠিয়েছিলাম তোর কাছে। আমি আর অরুণ। বেচারা বড়ো দুঃখ পেয়েছে। তাড়ালি কেন? ও কি তাড়িয়ে দেবার মতো ছেলে?'

'কি জানি কেন সহ্য করতে পারলাম না।'

'নিশীথ তোকে ঠিকই বুঝেছে?'

'কি বুঝেছে?'

'তোর বুকের মধ্যে কোন ঝরনা নেই বলছিল নিশীথ। সত্যিই তোর বুকের মধ্যে কোন ঝরনা নেই অলকা।'

রাত বাড়ছিল। পরিপূর্ণ তৃপ্তির আবেশ নিয়ে তিলকা কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। তার জ্যোৎস্নামাখা নরম মুখটার দিকে তাকিয়ে মনে হবে এক রাজকন্যা তার প্রিয় রাজকুমারের স্বপ্ন দেখছে বিভোর হয়ে। বাইরে রাতপাখীর ডাক পাতার শিরশির এবং বাতাসের উচ্ছ্বাস মধ্যরাত্রি ঘোষণা করছিল। কিন্তু অলকার চোখে ঘুম এল না। দিদির কথাটা তার মনে পড়ছিল। সত্যিই কি তার বুকের ভেতর কোন ঝরনা নেই? না সবাই তাকে ভুল বুঝেছে। তার দিদি নিজের বন্ধুরা নিশীথ অরুণ সবাই। তার হৃদয়কে ব্যক্ত করে নিরন্তর বয়ে চলেছে এক জোরাল ঝরনা। তার বেগ আছে কলধ্বনি আছে বর্ণচ্ছটা আছে। কেউ সেটা শুধু টের পায় না এটাই আশ্চর্য। আর টের পেলেও সেটার ধ্বনি বর্ণ মাধুর্য কেউ ভোগ করতে পারে না কেন? কেন পারে না?

নিজের বুকের মধ্যে এই আশ্চর্য ঝরনার কলধ্বনি শুনতে শুনতে অলকার কেমন কান্না পেয়ে গেল।

সেকালের সঙ্গীতগুণী

বাংলায় সরদ বাদন ও সরদী আমীর খাঁ

দরবারভাঙ্গার সরদী আমীর খাঁ। বয়স তখন তাঁর ৩০।৩২ বছর। ভাগ্যের সন্ধানে কলকাতায় চলে এলেন।

তাঁকে আশ্রয় দেবার মতন কেউ ছিল না এ শহরে। তাঁর জানাশোনাও তেমন কেউ নেই।

আমীর খাঁর আত্মীয়-স্বজনরাও সব পশ্চিমাঞ্চলবাসী। কলকাতায় তাঁরা কেউ আসেন নি। কিন্তু আমীর খাঁ অনেকের মুখেই শুনেছিলেন বাংলাদেশের কথা, বাঈজীদের কথা। কলকাতার কথা। বাংলায় ওস্তাদদের কদর আছে। আর গান-বাজনার খুব আদর। কলকাতায় আর অন্য নানা জায়গায় আছে সঙ্গীতের অনেক দরবার। বহু রইস লোক আছেন যাঁরা আসরের জন্যে, কলাবতদের জন্যে বিস্তর খরচ করেন। পয়সা দিয়ে শোনেন গান-বাজনা। ওস্তাদদের বাঁচিয়ে রাখেন। তালিম দিয়েও বেশ রোজ-গার করা যায় বাংলাদেশে।...

আমীর খাঁর বরাত ভাল। সেই সময় ললিতমোহন মৈত্রও কলকাতায় এসেছিলেন। রাজশাহী জেলার তালন্দের জমিদার ললিত-মোহন মৈত্র। কলকাতায় তিনি মাঝে মাঝে আসতেন। ললিতকলার নানাদিকে তাঁর সখ। নাট্যপ্রিয় তিনি। গিরিশচন্দ্র প্রমুখের অভিনয় দেখতেন রঙ্গমঞ্চে। আর সঙ্গীতপ্রেমী শুধু নন। সঙ্গীতচর্চাও কিছু কিছু করতেন। ওস্তাদ আতা হোসেনের কাছে তবলা শিখতেন ললিতমোহন। বিখ্যাত তবলিয়া আতা হোসেন কলকাতার চেয়ে পূর্ববঙ্গেই বেশী থাকতেন। ঢাকা-ভাওয়ালে তাঁর শিষ্য ভাওয়ালরাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়। আর কলকাতার নামী শিষ্য ছিলেন অবনীন্দ্র গাঙ্গুলী। রাজশাহী তালন্দের ললিতমোহন মৈত্রও আতা হোসেনের একজন সৌখীন শিষ্য হয়ে তবলা শিখছিলেন।

তবলা চর্চার জন্যে ললিতমোহনের একজন বাদকের প্রয়োজন ছিল। কোন ওস্তাদ সঙ্গী—যাঁর সঙ্গে তবলা রিয়াজ করবেন নিয়মিত। গায়ক বাদকদের যেমন সঙ্গত-কারের দরকার, তেমনি সঙ্গতিয়ার অর্থাৎ তবলচি বা পাখোয়াজীরও দরকার যন্ত্রী-গায়কের। তাই ধনী সঙ্গতকাররা অনেক সময় তবলাচর্চার সুবিধার জন্যে, রিয়াজের জন্যে পেশাদার গায়ক বাদককে নিযুক্ত রাখতেন।

সেই সময় আমীর খাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটল মৈত্র মশায়ের।

তালন্দেই তিনি থাকতেন। কখনো কখনো কলকাতায় আসতেন মাত্র। সেজন্যে আমীর খাঁকে তিনি দেশে নিয়ে যেতে চাইলেন। তালন্দেই থাকবেন খাঁ সাহেব। তাঁর সরদের সঙ্গে রিয়াজ করে নেবেন তিনি। আর তাঁর সরদও নিয়মিত শুনবেন।

আমীর খাঁর কোন আপত্তি হল না এই নিয়োগের প্রস্তাবে। কলকাতায় তাঁর অন্য কোন আশা ভরসা ছিল না। ললিতমোহনের এই আশ্রয় তাঁর পক্ষে তখন যথেষ্ট। কলকাতায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্যে সংগ্রাম করার চেয়ে অনেক ভাল। পেশার পক্ষে কলকাতার ক্ষেত্র খুবই দরকার বটে। কিন্তু আমীর খাঁর তখনকার সম্পূর্ণ অপরিচিত অবস্থায় এখানে নিরাপত্তা নেই। তাই তিনি তালন্দে চলে গেলেন ললিতমোহনের সঙ্গে এবং সেখানেই বাস করতে লাগলেন।

ললিতমোহনের কলকাতার সঙ্গীতজগত ও নাট্যজগতের সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল। বিখ্যাত যন্ত্রী অমৃতলাল দত্ত বিশেষ পরি-চিত ছিলেন তাঁর। হাবু দত্ত নামে সুপরি-চিত এই গুণীর তুল্য ক্ল্যারিওনেট বাদক সেযুগে আর বিশেষ ছিলেন না। তা ছাড়া, তিনি এসরাজ ও সুরবাহারেও একজন সুদক্ষ শিল্পী। স্বামী বিবেকানন্দের জ্ঞাতিভ্রাতা হাবু দত্ত একদিকে রামপুর ঘরাণার স্বনাম-ধন্য উজীর খাঁর শিষ্য রাগসঙ্গীতের কলা-কার। তাঁর সঙ্গীত জীবনের আর একদিকে তিনি রঙ্গমঞ্চের সুরকার। নাট্যাচার্য গিরিশ-চন্দ্রের কয়েকটি নাটকের সঙ্গীত পরিচালক। ক্ল্যারিওনেট বাদকরূপেও তিনি ক্ল্যাসিক, [illegible]

ইত্যাদি মঞ্চে ব্যস্ত ছিলেন। (তাঁর বিস্তারিত সংগীত-জীবনের পরিচয় 'আসরের গল্প' ৮৩-১০৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত)।

এখানে হাবু দত্তের প্রসঙ্গ এই জন্যে যে, তাঁর মধ্যস্থতায় ললিতমোহন মৈত্র একবার গিরিশচন্দ্রকে সদলে নিয়ে যান তালন্দে। সেখানে স্থায়ী নাট্যমঞ্চে গিরিশচন্দ্র প্রমুখের নিয়মিত অভিনয়ের আয়োজন তিনি করেছিলেন। তার বিবরণ জানবার মতন। গিরিশচন্দ্রের প্রামাণিক জীবনী গ্রন্থ থেকে সে বৃত্তান্ত এখানে উদ্ধৃত করা হল :—

সুপ্রসিদ্ধ ক্ল্যারিওনেট-বাদক এবং সংগীতাচার্য স্বর্গীয় অমৃতলাল দত্ত (হাবুবাবু) মহাশয়, রাজশাহী-তালন্দের জমিদার স্বর্গীয় ললিতমোহন মৈত্র মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহ এবং যত্নে তাঁহার রামপুর বোয়ালিয়ার প্রাসাদতুল্য ভবনে মধ্যে মধ্যে গিয়া অবস্থান করিতেন। ললিতমোহনবাবু যেরূপ গীত-বাদ্য প্রিয়, সেইরূপ নাট্যানুরাগী ছিলেন। কলিকাতার সাধারণ নাট্যশালার ন্যায় রামপুর বোয়ালিয়ার একটি সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সময়ে সময়ে তিনি বিশেষরূপ উৎসাহিত হইয়া উঠিতেন।

'গিরিশচন্দ্র যে বৎসর (১৩০৪ সাল, ফাল্গুন) ষ্টার থিয়েটার পরিত্যাগ করেন, সে বৎসর কলিকাতায় প্রথম প্লেগ দেখা দেয়। প্লেগের আতঙ্কে ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় কলিকাতা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, আবালবৃদ্ধবনিতা দলে দলে শহর ত্যাগ করিয়া যাইতেছে, ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার বন্ধ বলিলেই হয়,—সে দৃশ্য যিনি দেখিয়াছেন তিনি তাহা জীবনে বিস্মৃত হইবেন না। এই সময়ে ললিতমোহনবাবু সুযোগ বুঝিয়া হাবুবাবুর সাহায্যে কলিকাতার সাধারণ নাট্যশালা হইতে অভিনেতা ও অভিনেত্রী সংগ্রহ পূর্বক রামপুর বোয়ালিয়ায় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন।

'হাবুবাবু স্বয়ং গুণী ছিলেন, তাহার উপর গুরুভ্রাতা বিবেকানন্দ স্বামীর পরম আত্মীয় বলিয়া গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। ললিতবাবুর আগ্রহাতিশয্যে হাবুবাবু আসিয়া গিরিশচন্দ্রকে রামপুর বোয়ালিয়ায় লইয়া যাইবার জন্য ধরিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, 'ললিতবাবু আপনার সম্মান ও উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদানে সম্মত, এবং এ সময় আপনার কলিকাতা পরিত্যাগও বাঞ্ছনীয়।

'ষ্টার থিয়েটারের সহিত গিরিশচন্দ্র তখন সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন, কলিকাতাতে এই হুলস্থূল ব্যাপার -গিরিশচন্দ্র অগত্যা এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং তিন সহস্র মুদ্রা বোনাস স্বরূপ পাইয়া রামপুর-বোয়ালিয়ায় গমন করিলেন। স্বর্গীয় নীলমাধব চক্রবর্তী, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু), ভূষণকুমারী সুশীলাবালা প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণও যথাযোগ্য বেতন এবং অল্পাধিক বোনাস পাইয়া ইতিপূর্বে রামপুর-বোয়ালিয়ায় যাত্রা করিয়াছিলেন।

'ললিতমোহনবাবু উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই রঙ্গালয় নির্মাণ-কার্য শেষ করিয়া আনিলেন। এদিকে গিরিশচন্দ্র দল সুগঠিত করিয়া কয়েকখানি উৎকৃষ্ট নাটক অভিনয়ার্থে প্রস্তুত করিলেন। থিয়েটারের নামকরণ হইল—মার্ভাল (Marval) থিয়েটার।

'প্রথম রাত্রে বিল্বমঙ্গল নাটক অভিনয় হয়। অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্বে গিরিশচন্দ্র কর্তৃক রচিত নিম্নলিখিত কবিতাটি পঠিত হয় :—

'ইতিহাস করে গান রাজশাহী রাজস্থান
সুজলা সুফলা শ্যামা সুন্দরী প্রদেশ;
নব রস বর্ণচিত সুধীবৃন্দ বিরাজিত
মরাল-স্বভাব-গুণ - আকর অশেষ;
বিকাশ নটের প্রাণ, সহৃদয় বিদ্যমান
অমানীর মানদাতা সম্মান-পয়োধি;

• • •

সবিনয়ে নিবেদন জানায় হে অকিঞ্চন—
বহু আশে আসিয়াছি—করো না বঞ্চন।"

'খ্যাতনামা অভিনেতৃগণ সম্মেলনে অভিনয়ও যেরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছিল,—দর্শকগণের ভিড়ও সেইরূপ অসম্ভব হইয়াছিল। পরম আগ্রহে বহুদূর হইতে বহু গ্রামের দর্শকগণ আসিতে থাকে—সমস্ত দেশে একটা হুলুস্থূল পড়িয়া যায়।

'অল্পদিন অভিনয়ের পর ললিতমোহনবাবুর অভিভাবকগণ বুঝিলেন যে ক্ষুদ্র শহরে টিকিট বিক্রয় করিয়া লাভবান হওয়া দুরাকাঙ্ক্ষা মাত্র। তাঁহারাই উদ্যোগী হইয়া থিয়েটার বন্ধ করিয়া দেন। এদিকে কলিকাতায় তখন প্লেগের আতঙ্ক অপেক্ষাকৃত কমিয়া গিয়াছে। সম্প্রদায় নিভয়ে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। সহৃদয় ললিতমোহনবাবুর যত্ন এবং সদ্ব্যবহারে সম্প্রদায় পরম আনন্দে তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন।"

(গিরিশচন্দ্র ২৩২-২৩৫ পৃষ্ঠা—অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়)।

আমীর খাঁ তালন্দে আসবার কয়বছর আগেকার ঘটনা মার্ভাল থিয়েটার। তা হল ১৮৯৮ সালের প্রথম দিকের কথা। ললিতমোহনের তখন ২৫।২৬ বছর বয়স। তবলা-চর্চা আরম্ভ করেছিলেন তার অনেক পরে। তারও পরে আমীর খাঁকে তালন্দে নিয়ে আসেন।

এখন আমীর খাঁ ও পশ্চিমের অন্য যে সরদগুণীরা বাংলায় প্রথম আসেন, তাঁদের বাঙালী শিষ্য গঠনের প্রসঙ্গ, প্রথম যুগের বাঙালী সরদী ইত্যাদি বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করে নেবার আছে। কারণ বাংলায় সরদ চর্চার ইতিহাস আমীর খাঁ প্রমুখের বাংলায় আসার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এই আলোচনায় মন্দ তাঁদের উল্লেখও করতে হবে। আমীর খাঁর সংগীতজীবনের পরিচয় দিতেও এসব প্রসঙ্গের প্রয়োজন। প্রথমে আমীর খাঁ ও কোকব খাঁর কথা।

আমীর খাঁকে ললিতমোহন কোন্ সালে রাজশাহীতে এনেছিলেন তা সঠিক জানা যায়নি। তবে আনুমানিক ১৯০৭-৮ সালে হতে পারে।

আমীর খাঁর তালন্দে নিযুক্ত হবার তারিখটি এক হিসেবে মূল্যবান। কারণ বাংলাদেশে সরদবাদন প্রচলনের সঙ্গে তাঁর ও কোকব খাঁর (আর তাঁর জ্যেষ্ঠ করামৎ-উল্লা খাঁরও) অঙ্গাঙ্গী সংবন্ধ আছে।

বাংলায় তাঁদের অবস্থান সরদের মাধ্যমে সংগীতচর্চা, সরদে বাঙ্গালী শিষ্য গঠন ইত্যাদি কারণে সরদযন্ত্রের প্রবর্তন [illegible] এ-অঞ্চলে। তাঁদের কাছে শিক্ষার ফলেই বাঙ্গালী সরদীরা সংগীতজগতে দেখা দেন। তাঁরাই প্রথমে সরদের [illegible] তালিম দিয়েছিলেন বাঙ্গালী শিষ্যকে।

তবে তার মধ্যে অগ্রপশ্চাতের প্রশ্ন আছে। কোকব খাঁ বাঙ্গালী শিষ্যদের সরদ শিক্ষা দেন আগে। [illegible] ১০।১২ বছর পরে আমীর খাঁর বাঙ্গালী শিষ্যরা সরোদ চর্চা আরম্ভ করেন। এ-বিষয়ে সন-তারিখের সাক্ষ্য কিছু বর্তমান। তা উল্লেখ করবার আগে তাঁদের বংশ বা ঘরাণার একটু উল্লেখ করে নেওয়া যায়।

বাংলায় তাঁরা দুটি ভারতপ্রসিদ্ধ [illegible] নিয়ামৎ উল্লার ঘরের—তাঁর দুই পুত্র আসাদুল্লা খাঁ কোকব ও করামতুল্লা খাঁ। আর গোলাম আলীর ঘরের আমীর খাঁ। তাঁর ঘরাণার পরিচয় কথা পরে আসবে।

কোকব খাঁ নামে পরিচিত আসাদুল্লা ১৯০৭ সালে কলকাতায় আসেন। এখানকার সংগীতসমাজে সুখ্যাতি ও সম্মানের সঙ্গে তিনি অবস্থান করেন ৮ বছর। সেই সময়ে সেতার সুরবাহার এসরাজ যন্ত্রে যেমন বাঙ্গালী শিষ্য গঠন করেন, তেমনি [illegible] মধ্যে এক প্রতিভাবান ধীরেন্দ্রনাথ বসু [illegible] পরবর্তীকালে ধীরেন্দ্রনাথ বাংলায় এই স্তরের একজন যথার্থ প্রবক্তা বলে গণ্য [illegible] কোকব খাঁর কাছে সরদ শিক্ষা আরম্ভ করেন ১৯০৯-১০ সালে। কোকব খাঁর ১৯১৫ সালে কলকাতায় মৃত্যু হয়। তার কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর করামৎ উল্লা আনীত হন [illegible] করবার জন্যে। তখন কোকবের অন্য শিষ্যদের সঙ্গে ধীরেন্দ্রনাথও করামতুল্লার তালিম নিতে থাকেন। করামৎ বাংলায় ছিলেন ১৫-১৬ বছর। তারপর ১৯৩১ সালে লক্ষ্ণৌতে তিনি পরলোকগত হন। এই [illegible] নাথ বসু সম্বন্ধে বাংলায়ও প্রথম [illegible] খাঁর কথাও আছে। সে-আলোচনার আগে আমীর খাঁর [illegible]

আমীর খাঁ বাংলায় [illegible] সময় আনুমানিক ১৯০৭-৮ বলা হয়েছে। যদিও নয়, তবু ধরা যাক তারও দু-এক বছর আগে তিনি এসেছিলেন। কিন্তু সরদে শিষ্য তৈরি করতে থাকেন অনেক পরে। যতদূর জানা যায়, ১৯২০-২১ সালের আগে আমীর খাঁর বাঙ্গালী সরদী শিষ্য দেখা দেননি। বাংলায় স্থায়ী বাস আরম্ভ করবার এত পরে কেন তিনি শিষ্য করেন তার কারণ বোঝা যাবে তাঁর সংগীতজীবনের কথায়।

তার আগে আলাউদ্দিন খাঁর প্রসঙ্গ একটু আলোচনা করে নেওয়া যায়। কারণ তিনিও বহু বিখ্যাত বাঙ্গালী সরদী। এ-বিষয়ে তাঁকে প্রাচীনতম মনে করতেও কেউ কেউ পারেন। কারণ, তাঁর বয়স নিয়ে প্রচারিত হয়েছে অনেক অতিশয়োক্তি ও অতিরঞ্জন। অপ্রাসঙ্গিক বলে সে সম্পর্কে পর্যালোচনার অবকাশ এখানে নেই। শুধু সংক্ষেপে বলা যায় যে, তাঁর জন্ম ১৮৮০ সালের আগে নয় এবং তিনি সরদবাদন আরম্ভ করেন সংগীতজীবনের পরিণত কালে। উজীর খাঁর কাছে তাঁর সরদশিক্ষার সূচনা ১৯১০ সালের (অর্থাৎ ধীরেন্দ্রনাথ বসুর শিক্ষারম্ভের) অনেক পরে। তার আগে, দিনাজপুর দরবারে সরদী আহম্মদ আলীর কাছে আলাউদ্দিনের সরদশিক্ষা তাঁর নিজের সাক্ষ্যেই উল্লেখনীয় নয়। [illegible] ১৯১০ সালের পূর্ববর্তী কিনা প্রমাণ সাপেক্ষ।

আমীর খাঁ ও কোকব খাঁর প্রসঙ্গে দুটি সরদী ঘরাণার নাম করা হয়েছে। তাঁরা দুজনে ছিলেন যথাক্রমে গোলাম আলী ও নিয়ামৎ উল্লার ঘরের। গোলাম আলী নিয়ামতেরই সমসাময়িক ছিলেন তার একজন সরদী এনায়েৎ হোসেন। তাঁরও একটি সরদবাদক বংশধারা প্রবর্তিত হয় এবং তিনি বাংলাদেশেই তাঁর সংগীতজীবনের অনেকাংশ অতিবাহিত করেন। এনায়েৎ হোসেন ছিলেন ভাওয়াল-রাজ রাজেন্দ্রনারায়ণের দরবারী বাদক। কিন্তু এনায়েৎ হোসেন কোন বাঙ্গালী সরদী শিষ্য গঠন করেননি বলে তাঁর বা তাঁর ঘরাণার কথা উল্লেখ করা হয়নি। ঢাকার সুপরিচিত সেতারী ভগবান দাস কিছু কিছু শেখেন অনেক ওস্তাদের কাছে। তাঁদের মধ্যে একজন সরদী এনায়েৎ হোসেন। কিন্তু ভগবান দাস ছিলেন সেতারবাদক। এনায়েৎ হোসেন শুধু তাঁর পুত্র সাখায়েৎ হোসেনকে সরদ তালিম দিয়েছিলেন। আরো একটি কথা জানানো যায় এপ্রসঙ্গে। এনায়েৎ হোসেনের বংশ পরে নিয়ামতুল্লার ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। কারণ, সাখায়েৎ-পুত্র [illegible] বিবাহ করেন কোকব খাঁর কন্যাকে। আর তার পরের পর্যায়ে [illegible] পুত্ররা কোকব-[illegible] করামৎ উল্লার তালিমও পেয়েছিলেন। সেসব প্রসঙ্গের এখানে প্রয়োজন নেই।

এনায়েৎ হোসেন ভাওয়াল দরবারে নিযুক্ত হবার অনেক বছর পরে কলকাতায় [illegible] কোকব খাঁ ও আমীর খাঁ। তাঁরা [illegible] সময় এ-প্রদেশে এসেছিলেন, দেখা গেছে।

তাঁদের মধ্যে কোকব খাঁ রয়ে গেলেন কলকাতায়। আর আমীর খাঁ ললিতমোহন মিত্রের সঙ্গে রাজশাহীতে চলে এলেন। একরকম স্থায়ীভাবেই তালন্দে বাস করতে লাগলেন আমীর খাঁ।

তালন্দের রম্য প্রাকৃতিক পরিবেশ। ললিতমোহনের এখানে বিস্তৃত এলাকা। তার অন্যান্য সদনের মধ্যে দেবসেবার মন্দির, অতিথি সেবার আবাস ইত্যাদিও যথাযোগ্য আছে। আমীর খাঁর বসবাসের ব্যবস্থা হল অতিথিশালায়। কোন অভাব নেই। আমীর খাঁ স্বচ্ছন্দে নিশ্চিন্তে এই নতুন পরিবেশে দিনযাপন আরম্ভ করলেন।

এখানে সংগীতচর্চা হত ললিতমোহনের বৈঠকখানায়। তাঁর তবলার সঙ্গে কখনো আমীর খাঁ বাজাতেন। কোন সময় রাগালাপ করতেন সরোদে। বৃহত্তর সংগীতজগতের সঙ্গে এখানে কোন যোগ ছিল না। তাহলেও ছিল একটি সাঙ্গীতিক পরিবেশ। আর আমীর খাঁও সন্তুষ্টচিত্ত, শান্তিপ্রিয় স্বভাবের মানুষ। সেজন্যে তালন্দে তাঁর সুখেই কালাতিপাত হতে লাগল।

এইভাবে কয়েক বছর কাটল। আমীর খাঁ সেখানে নিজের সংগীতচর্চাও করে যেতে লাগলেন, বড় আসর কিছু না হলেও। ললিতমোহন তাঁর কাছে কখনো সরদ শিক্ষা করেননি। তাঁর সংগত-সংগ্র বাজাবার সখ। তবলা ভিন্ন অন্য কিছু শেখেননি তিনি। কিন্তু রাজশাহীতে আমীর খাঁর অপর দু-একজন শিষ্য হয়েছিলেন সে-সময়ে।

এ-কথাও স্মরণ করা যায় যে, এই সময়ের আগেই কলকাতায় ধীরেন্দ্রনাথ বসু সংগীতচর্চা আরম্ভ করেছিলেন কোকব খাঁর শিক্ষাধীনে। কলকাতার সংগীতসমাজে তখন কোকব খাঁ বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছেন।

সে-সময় আমীর খাঁর কাছে রাজশাহীতে যারা শেখেন তাঁরা সংগীতজগতে সুপরিচিত হননি। তবু আমীর খাঁর প্রথম শিষ্যরূপে তাঁদের নাম দেওয়া হল এখানে। একজন হলেন অক্ষয়কুমার মৈত্র—বিখ্যাত ঐতিহাসিক-গবেষক ইনি নন। ইতিহাস গ্রন্থলেখক অক্ষয়কুমার মৈত্র ছিলেন ভিন্ন ব্যক্তি। আমীর খাঁর শিষ্য অক্ষয়কুমার মৈত্র [illegible] কাছে সরদ শিক্ষা করেননি। শিখেছিলেন এসরাজ। আর একজন রাজশাহীতে সরদ শেখেন আমীর খাঁর কাছে। তাঁর নাম [illegible] গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি কর্মসূত্রে রাজশাহী-নিবাসী ছিলেন। তিনি [illegible] সংগীতজগতে। সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস নেন। তিনি [illegible] [illegible] স্বামী নামে সাধনরত হন পরবর্তীকালে।

রাজশাহীর [illegible] আমীর খাঁর কাছে আর কেউ শিক্ষা করেননি।

উল্লেখ করবার মতন কিছু নয়, তবে নিশ্চিন্তে দিন অতিবাহিত হতে লাগল আমীর খাঁর। বৃহত্তর সংগীতজগৎ থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়েই তালন্দে রইলেন।

এইভাবে ললিতমোহন মৈত্রের আশ্রয়ে আমীর খাঁ ছিলেন ১৯১৫ সাল পর্যন্ত। আরো হয়ত থাকতেন, কিন্তু একপ্রকার বিপত্তি ঘটল।

এই সময়ে অনেকখানি পরিবর্তিত হয়ে গেল মৈত্র মহাশয়ের জীবন। একটি মৃত্যুতে তিনি বড় মানসিক আঘাত পেলেন। তার ফলে আগেকার অনেক সখ ও আনন্দের বিষয় ত্যাগ করলেন একে একে। শুধু তবলা নয়, সংগীতের বৈঠকও বর্জিত হয়ে গেল। আগে থেকেই ললিতমোহন ছিলেন বৈষ্ণবীয় ভাবের মানুষ। এবার ধর্মকর্ম তাঁর প্রায় সারাদিনের অবলম্বন হল। রাধাবল্লভ জীউ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে সঙ্গে রাখতেন সর্বদা। তাঁরই ধ্যানে বেশির ভাগ সময় তাঁর অতিবাহিত হয়ে যেত। এই অবস্থায় আমীর খাঁর সঙ্গে তাঁর সংগীতচর্চাও বন্ধ হল।

তবে আমীর খাঁ যেসব সুখ-সুবিধা ভোগ করে আসছিলেন তাঁর বেতন, বসবাস ইত্যাদি বিষয়ে যেমন ব্যবস্থা ছিল, সবই রইল। কিন্তু আমীর খাঁর সঙ্গে সংগীতের বৈঠক শুধু বন্ধ হল না তাঁর বাজনা শোনার আগ্রহও চলে গেল তাঁর। ওস্তাদজীর করণীয় বিষয়ে শুধু একটি নির্দেশ ললিতমোহন দিলেন। কুলদেবতা মদনমোহনের মন্দিরের দ্বারে বাজনা শোনাবেন আমীর খাঁ।

মৈত্রমশায় তাঁকে বলেছিলেন, 'মন্দিরে কেবল ঠাকুরের আরতির সময় বাজিয়ে দেবেন।'

কদিন সেই দেবালয়ে তিনি সরদ বাজিয়েও ছিলেন। কিন্তু এভাবে দিনযাপন অসম্ভব হল খাঁ সাহেবের পক্ষে। সংগীতের পরিবেশ তালন্দে এখন আর একেবারেই নেই। মৈত্রমহাশয়ের বৈঠকে সংগীতের যেটুকু আবহ ছিল তাও লুপ্ত হয়েছে। এখন শুধু বিগ্রহের সামনে একা বসে কিছুক্ষণ বাজানো।

এই অবস্থায় আর আমীর খাঁ থাকতে পারলেন না। কিন্তু ললিতমোহন পাছে অমত করেন, তাই তাঁর অজ্ঞাতেই আমীর খাঁ তালন্দ ত্যাগ করলেন।

এ-সময় শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ সহায়তা পান আমীর খাঁ। পরবর্তীকালের সুপরিচিত এসরাজবাদক শীতলচন্দ্র। ময়মনসিংহ গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর আনুকূল্যে বহু ওস্তাদের সঙ্গলাভে তিনি সংগীতগুণী হয়েছিলেন। আমীর খাঁর তালন্দবাসের শেষদিকে শীতলচন্দ্র ছিলেন এই এস্টেটের এক কর্মচারী এবং সংগীত বিষয়ে আগ্রহী। আমীর খাঁ তালন্দ ত্যাগ করবার [illegible] ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন। তা হল ১৯১৬ সালের কথা।

আমীর খাঁর তখন স্থায়ী আশ্রয়ের প্রয়োজন। কলকাতায় সংগীত ক্ষেত্রের সঙ্গেও তাঁর কোন যোগ নেই। এই পরিস্থিতিতে শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁকে নিয়ে আসেন ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর কাছে।

পরবর্তীকালে মুক্তহস্ত সংগীতপ্রেমী সংগীত-সেবক ব্রজেন্দ্রকিশোরের দরবার বিখ্যাত হয় বহু গুণী সমাগমে। কিন্তু সেই ১৯১৬ সালের আগে তাঁর তেমন কোন নিয়মিত সংগীতসভা গড়ে ওঠেনি। স্বস্থান গৌরীপুরেও নয়, কলকাতায় আমহার্স্ট স্ট্রীটের অস্থায়ী আবাসেও নয়। বলতে গেলে, ব্রজেন্দ্রকিশোরের সংগীত দরবারের পত্তন হয় আমীর খাঁকে নিয়ে এবং ১৯১৬ সালে। এ ব্যাপারে শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উল্লেখ্য ভূমিকা আছে। আমীর খাঁর মতন সুরশিল্পীদের নিযুক্ত করে, নিয়মিত সংগীতসভার অনুষ্ঠানে তিনিই খানিকটা উদ্বুদ্ধ করেন ব্রজেন্দ্রকিশোরকে। আমীর খাঁর পরে আরো নানা কলাবতকে ব্রজেন্দ্রকিশোর যে বিভিন্ন সময়ে নিযুক্ত করেছিলেন তা অনেকখানি শীতলচন্দ্রের তৎপরতার ফলে। তিনি এইসব যোগাযোগ করা এবং দূর থেকে নানা গুণীর কাছে সাংগীতিক সংগ্রহের জন্যে গৌরীপুর এস্টেটের ভারপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। অবশ্য এই ধরনের কাজের জন্যে কালিচরণ রায় নামে আর একজন সর্বক্ষণের কর্মীকেও নিযুক্ত করেন ব্রজেন্দ্রকিশোর। আমীর খাঁকে নিযুক্ত করায় ব্রজেন্দ্রকিশোরের সংগীত জীবনে আর এক বিষয়েও উপলক্ষ্য হন শীতলচন্দ্র। ব্রজেন্দ্রকিশোর প্রথম জীবন থেকেই সংগীতে আগ্রহী হলেও তাঁর কেবল তালবাদ্য বা সংগতযন্ত্রে প্রবণতা ছিল। মুরারিমোহন গুপ্তের শিক্ষায় পাখোয়াজ বাজাতেন তিনি। কণ্ঠসংগীতে ও সুরযন্ত্রের শিল্পীদের কাছ থেকে সংগীতবিদ্যা আহরণ করার দিকে তাঁর যে উদ্যম মধ্যজীবন থেকে দেখা যায়, শীতলচন্দ্র তার মূলে অনেকখানি ছিলেন। আর আমীর খাঁকে নিযুক্ত করা থেকেই তার সূত্রপাত। ব্রজেন্দ্রকিশোরের এসরাজ চর্চাও তার পরের কথা। অবশ্য আমীর খাঁকে নিয়মিত সংগীতসভা আরম্ভের আগেও ব্রজেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে কোন কোন গুণীর সাংগীতিক যোগ ছিল। যেমন, অমৃতলাল দত্ত (হাবু দত্ত), কিংবা দক্ষিণাচরণ সেন। কিন্তু তিনি সংগীত ক্রিয়া তাঁদের কাছে শিখতেন না। হাবু দত্তের ক্ল্যারিওনেট প্রভৃতি যন্ত্রসংগীত উপভোগ করতেন। দক্ষিণাচরণের সঙ্গে আলোচনায় উপকৃত হতেন সংগীততত্ত্ব বিষয়ে। লালচাঁদ বড়ালএর সঙ্গে ব্রজেন্দ্রকিশোরের বন্ধুত্ব ছিল। তাঁর গানের সঙ্গে সংগতও করতেন লালচাঁদের গৃহে। আমীর খাঁকে নিযুক্ত করবার আগে ব্রজেন্দ্রকিশোরের এই ছিল সাংগীতিক পরিচয়।

ওদিকে আমীর খাঁর সংগীতজীবনেও তখন একটি পালা বদলের কাল বলা যায়। কারণ তারপর থেকে তিনি ক্রমে যুক্ত হতে থাকেন বাংলার বৃহত্তর সংগীত সমাজের সঙ্গে। কলকাতার সংগীতক্ষেত্রে তাঁর পরিচিতি আরম্ভ হয়। কারণ ব্রজেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে তিনি গৌরীপুরে অল্পই অবস্থান করতেন। বেশির ভাগই থাকতেন কলকাতায় আমহার্স্ট স্ট্রীটের ভবনে ব্রজেন্দ্রকিশোর তখন বাস করতেন। বাংলার তৎকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে প্রকাশ্যে, গোপনে যুক্ত ছিলেন ব্রজেন্দ্রকিশোর। সেই সূত্রে নানা মান্যগণ্য ব্যক্তির সঙ্গেই তাঁর যোগাযোগ ছিল। তাঁদের অনেকে উপস্থিত হতেন তাঁর গৃহে। আমীর খাঁরও কলকাতায় পরিচিতি লাভের আরম্ভ তখন থেকে।

সে যুগের ব্রজেন্দ্রকিশোরের পরিচয়ও এখানে একবার স্মরণ করা যায়। স্বদেশী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ দেশসেবক তিনি প্রথম যৌবন থেকেই। তাঁর নানামুখী কর্মযোগ সেই মূলে জাতীয়তাবোধেরই প্রকাশ। বিপ্লবী আন্দোলনের আদি পর্ব থেকেই তিনি আনুকূল্য করেন। সেজন্যে গুপ্ত সংগঠনের ও অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখের তিনি একজন নেপথ্য সহায়ক। যাদবপুরে সুপ্রসিদ্ধ 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' (যার পরিণত রূপ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) সংস্থার প্রতিষ্ঠায় এক প্রধান উদযোগী। ক্রীড়াজগতে টাউন ক্লাবের অন্যতম স্থাপনকর্তা। হিন্দুস্থান ইনস্যুরেন্সেরও একজন প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম কোষাধ্যক্ষ। অন্যদিকে ব্রজেন্দ্রকিশোর ভারত সংগীত সমাজের অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য ও নাট্যশিল্পী। মৃদঙ্গাচার্য মুরারিমোহন গুপ্তের এক শিষ্যরূপে পাখোয়াজ বাদক, নানা সংগীতজ্ঞের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ, ভারতীয় সংগীতের তত্ত্ববিষয়ে আগ্রহী ইত্যাদি।

এমন সময়ে শীতলচন্দ্রের জন্যে তাঁর সঙ্গে সরদী আমীর খাঁ পরিচিত হলেন। খাঁ সাহেবকে নিয়মিতভাবে নিযুক্ত করবার প্রস্তাব করলেন শীতলচন্দ্র।

ব্রজেন্দ্রকিশোর সম্মত হলেন। বললেন, 'তা বেশ। গৌরীপুরে আমার এখন বাঁধা কেউ গুণী নেই। আমীর খাঁকে রাখব।'

শুধু গৌরীপুরে নয়। ব্রজেন্দ্রকিশোরের কাছে নিযুক্ত হয়ে আমীর খাঁ কলকাতাতেই বেশি থাকতেন।

ব্রজেন্দ্রকিশোরের তখনকার সেই বাসস্থল ছিল রামমোহন রায়ের আমহার্স্ট স্ট্রীট ভবনের ঠিক বিপরীত দিকে। পশ্চিমমুখী এই বৃহৎ গৃহটিও রামমোহনের তৎকালীন বংশধর প্যারীমোহন রায়ের ছিল। ১৯০৭ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এখানে বাস করেন ব্রজেন্দ্রকিশোর। এই দীর্ঘকালে তাঁর যাবতীয় কার্যধারার কেন্দ্রস্থল ছিল আমহার্স্ট স্ট্রীটের সেই বাসভবন।

আমীর খাঁর কলকাতায় প্রথম আসরও সেই বাড়িতে হত। তাঁর সংগীতজীবনের এই পরিবর্তনের সময় আরো দু-একটি সংবাদ উল্লেখ করবার মতন। যেমন,

আমীর খাঁ যখন জালন্ধর থেকে চলে যান, প্রায় তখনই কলকাতায় কৌকব খাঁর আকস্মিক (৪৫।৪৬ বয়সে) মৃত্যু হয়। প্রায় আমীর খাঁ যখন ব্রজেন্দ্রকিশোরের আশ্রয় লাভ এবং কলকাতায় বাস আরম্ভ করেন, তার সমকালেই কৌকবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা করামতুল্লাও স্থায়ী হন এই শহরে। কৌকবের ধীরেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ শিষ্যরা করামৎউল্লার তালিমও তখন থেকে নিতে থাকেন।

আমীর খাঁ গৌরীপুরে বা কলকাতায় শুধু আসরই করতেন না ব্রজেন্দ্রকিশোরের সংগীতসভায় খাঁ সাহেবের কাছে ব্রজেন্দ্রকিশোর রাগবিদ্যা শিক্ষা ও সংগ্রহ আরম্ভ করলেন। একটি এসরাজ যন্ত্র তাঁর ছিল বটে। কিন্তু হাতে সংগীতক্রিয়ার বিষয়ে তিনি উৎসাহী ছিলেন না। তাঁর লক্ষ্য ছিল—বিভিন্ন রাগ সংগ্রহ। রাগের রূপ ও গঠন, আলাপচারী ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করে নিতেই তিনি আগ্রহী ছিলেন। আমীর খাঁর কাছে তিনি বহু রাগের তত্ত্ব সংগ্রহ করেছিলেন দীর্ঘকাল যাবৎ। আমীর খাঁকে তিনি নিয়মিত বেতনে নিযুক্ত রেখেছিলেন। সেজন্যে আমীর খাঁর দেওয়া বহু রাগের আলাপ, গৎ ইত্যাদি ব্রজেন্দ্রকিশোর ও তাঁর পুত্র বীরেন্দ্রকিশোরের সংগ্রহে থাকে কয়েকটি খাতায় নথিভুক্ত হয়ে। ব্রজেন্দ্রকিশোরকে এই দিক থেকে আমীর খাঁর অন্যতম শিষ্য বলা যায় এবং একজন আদি শিষ্য।

আমীর খাঁ নিযুক্ত থাকাকালেই আরো অনেক কলাবত্ত বিভিন্ন সময়ে ব্রজেন্দ্রকিশোরের দরবারে ছিলেন। যেমন এনায়েৎ খাঁ, মহম্মদ আলী খাঁ, হাফেজ আলী আবদুল্লা খাঁ (আমীরের পিতা) করামতুল্লা প্রভৃতি। তাঁদের সকলের কাছেই তিনি (ও তাঁর পুত্র বীরেন্দ্রকিশোর) এইভাবে সংগ্রহ করেন। পরে বীরেন্দ্রকিশোর আমীর খাঁ ছাড়াও উক্ত ওস্তাদদের কাছে শিক্ষা করেছিলেন নানা সময়ে—আলাউদ্দিন খাঁর কাছেও। বীরেন্দ্রকিশোর সংগীতচর্চা আরম্ভ করবার আগে শীতলচন্দ্র আমীর খাঁ প্রমুখ কলাবতদের কাছে রাগ সংগ্রহ, লিপিকরণ ইত্যাদি করতেন ব্রজেন্দ্রকিশোরের পক্ষে। বাল্যকাল থেকেই সংগীতশিক্ষার্থী, আলাউদ্দিন খাঁর প্রথম জীবনের অন্তরঙ্গ সহযোগী শীতলচন্দ্র পরে গুণী এসরাজবাদকরূপে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি নানা ওস্তাদদের কাছে সংগ্রহ, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ ইত্যাদির ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন গৌরীপুর এস্টেটে। সেই সূত্রে সব কলাবতদের কাছে, ব্রজেন্দ্রকিশোরের আনুকূল্যে শিক্ষার সুযোগও শীতলচন্দ্র পান। তার সদ্ব্যবহারও করেন। শীতলচন্দ্র আমীর খাঁরও সেই প্রথম যুগের একজন শিষ্য। তবে তিনি সরদবাদক হননি। এসরাজ যন্ত্রেই আহরণ ও চর্চা করেছিলেন আমীর খাঁর বিদ্যা। শীতলচন্দ্র গৌরীপুরে বা কলকাতায় ব্রজেন্দ্রকিশোরের নিযুক্ত ওস্তাদদের কাছেও থাকতেন। আবার তাঁর পক্ষে দূরেও যেতেন রাগাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। শীতলচন্দ্র যাঁদের কাছ থেকে সঙ্গীতবিদ্যা আহরণ করে এনেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন গয়ার বিখ্যাত বর্ষীয়ান কলাবত হনুমানদাসজী। খেয়াল ও এসরাজের একটি বিশিষ্ট ধারা-প্রবর্তক, গয়ালী সঙ্গীতকেন্দ্রের আচার্য-স্থানীয় হনুমানদাস। তাঁর কাছ থেকে সংগ্রহ ও লিপিবন্ধ করতে শীতলচন্দ্র গয়ায় যাতায়াত করতেন। তেমনিভাবে তিনি যান দ্বারভাঙ্গাতেও। আমীর খাঁর পিতা আবদুল্লা খাঁকে ব্রজেন্দ্রকিশোরের পক্ষে শীতলচন্দ্র কলকাতায় এনেছিলেন। কলকাতায় আবদুল্লা বেশিবার আসেননি এবং বেশিদিনও থাকেননি। তিনি তখন অশীতিপর বৃদ্ধ। হাত তখন আর তাঁর স্ববশে তেমন ছিল না। কিন্তু ধ্রুপদ অঙ্গে তখনো অসাধারণ গুণী ছিলেন আবদুল্লা খাঁ। দ্বারভাঙ্গা থেকেও তাঁর নিকটে শীতলচন্দ্র তাঁদের ঘরের কিছু সংগ্রহ এনেছিলেন।

বিভিন্ন ঘরাণার বিদ্যা সংগ্রহে আগ্রহী ছিলেন ব্রজেন্দ্রকিশোর। সেজন্যেই নানা কলাবতদের নিযুক্ত করতেন। আর দূরে থেকেও প্রয়োজন হলে, সংগ্রহ করতে যেতেন শীতলচন্দ্র।

আমীর খাঁ ও আবদুল্লা খাঁও একটি বিখ্যাত ঘরাণাদার ছিলেন। আমীর খাঁকে নিযুক্ত করবার পর ক্রমে তাঁদের সঙ্গীত-পরিষদের কথা জেনেছিলেন ব্রজেন্দ্রকিশোর। আমীর খাঁকে রাখবার কয়েক বছর পরে তাঁর পিতা আবদুল্লার সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করেন। এই সরদী পরিবারের কেন্দ্র তখন ছিল দ্বারভাঙ্গায়। দ্বারভাঙ্গা মহারাজার দাক্ষিণ্যে এ বংশের একাধিক গুণী তখন প্রতিপালিত হতেন। যথা মুরাদ আলী, আসঘর আলী, আবদুল্লা খাঁ প্রভৃতি। আমীর খাঁও সেখান থেকেই কলকাতায় এসেছিলেন।

আমীর খাঁ এই ঘরাণার প্রথম পুরুষ গোলাম আলী আগেই বলা হয়েছিল—ভারতে তিনটি সরদের ঘরাণা ছিল বিখ্যাত। সেই তিন ঘরাণার প্রবর্তক হলেন নিয়ামৎ খাঁ, গোলাম আলী এবং এনায়েৎ হোসেন খাঁ। তাঁরা তিনজন সমসাময়িক ছিলেন। আর ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গীতকেন্দ্রে হলেও সরদ-চর্চা তাঁরা আরম্ভ করেন প্রায় একই সময়ে। তাঁদের তিনজনেরই পূর্বপুরুষ কাবুল-নিবাসী ছিলেন। বংশের ধারায় কাবুলি সরদবাদক থেকে তাঁরা ভারতে, ভারতীয় সংগীতের সরদবাদকে পরিণত হন উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। কথিত আছে, তাঁদের মধ্যে সরদের বর্তমান আকার-প্রকারের প্রবর্তন করাতে নিয়ামৎউল্লার প্রতিভা সব চেয়ে কার্যকর হয়েছিল।

এই তিনটি ঘরাণারই আদি কিংবা পরের কোন পর্যায়ে সেনী ঘরের সংস্পর্শ ছিল। অর্থাৎ তাঁদের সংগীতবিদ্যা লাভ হয় তানসেনের কোন না কোন বংশধরের তালিমে বা সহায়তায়।

আমীর খাঁর ঘরাণার আদিপুরুষ গোলাম আলীও তার ব্যতিক্রম নন। গোলাম আলী প্রথম জীবনে ছিলেন রেবা-রাজ বিশ্বনাথ সিংহের দরবারে। বিশ্বনাথের ওস্তাদরূপে তানসেনের পুত্রবংশীয় জাফর খাঁ, প্যার খাঁ ভ্রাতারা অবস্থান করতেন। তাঁদের কাছ থেকে পরোক্ষে লাভ করেছিলেন গোলাম আলী, এমন প্রসিদ্ধি আছে। গোলাম আলী এই বংশে যেমন প্রথম সরদ আরম্ভ করেন, তেমনি গৎ তোড়া বাজাবার ঢঙ ইত্যাদিও অনেকখানি বেঁধে দেন। গোলাম আলীর বাঁধা গৎ এসে পৌঁছেছিল আমীর খাঁর হাতেও। আমীর খাঁ ছিলেন গোলাম আলীর সম্পর্কে প্রপৌত্র।

গোলাম আলীর তিন পুত্র। হোসেন খাঁ মুরাদ আলী ও নান্নে খাঁ। জ্যেষ্ঠ হোসেন খাঁ পিতার শিক্ষার চেয়ে লক্ষ্ণৌর গোলাম মহম্মদের তালিমে গঠিত হন। গোলাম মহম্মদ ছিলেন তানসেনের কন্যাবংশীয় ওমরাও খাঁর প্রথম সুরবাহার বাদক শিষ্য।

গোলাম আলীর দ্বিতীয় পুত্র মুরাদ আলী। তিনি পিতার শিক্ষা ছাড়াও রামপুর দরবারের (উক্ত ওমরাও খাঁর পুত্র) আমীর খাঁর বিদ্যা অনেক আদায় করেন। মুরাদ আলী ছিলেন অতি গুণী সরদবাদক। আলাপে, বিশেষ বিলম্বিত আলাপচারিতে নিপুণ শিল্পী বলে তাঁর সুনাম ছিল। কিন্তু মুরাদ আলী ছিলেন অপুত্রক। আবদুল্লা খাঁ তাঁর পোষ্যপুত্র। আবদুল্লার অল্পবয়সে মুরাদ আলী তাঁকে লক্ষ্ণৌতে পেয়েছিলেন। সেখান থেকেই সঙ্গে নিয়ে আসেন। পোষ্য নিয়ে লালন পালন করেন, তালিম দেন যথাবিধি। আবদুল্লার নিজের পূর্বপুরুষের কথা কিছু জানা যায়নি।

গোলাম আলীর কনিষ্ঠপুত্র নান্নে খাঁ ছিলেন সরদী হাফেজ আলীর বি-পিতা। কিন্তু হাফেজ আলীর তালিম নান্নে খাঁ ভিন্ন রামপুর দরবারের উজীর খাঁর কাছেও হয়েছিল।

গোলাম আলীর [illegible] পুত্র হোসেন খাঁর একমাত্র পুত্র আসঘর আলী এই ঘরাণার এক শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন। আসঘর পিতার শিক্ষার চেয়ে বেশি পান বীণকার রহিম খাঁর তালিম। রহিম খাঁ ছিলেন তানসেনের কন্যাবংশীয় এবং রামপুর ঘরাণার আমীর খাঁর কনিষ্ঠ সহোদর।

এইভাবে দেখা যায় এই ঘরাণাতেও প্রায় প্রতি পর্যায়ে তানসেনের কোন না কোন বংশধরের কাছে বিদ্যালাভ হয়েছিল।

আমীর খাঁ যথার্থই বলতেন, 'যে যা বলুক, আমাদের বংশ সেনীদেরই শুনে শুনে মানুষ হয়েছে। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।'... ...

গোলাম আলীর দ্বিতীয় পুত্র মুরাদ আলীর সময় থেকে তাঁদের দ্বারভাঙ্গায় বসবাস। তাঁর পোষ্যপুত্র আবদুল্লা খাঁ হলেন আমীরের পিতা।

মুরাদ আলীও আবদুল্লার মতন দীর্ঘজীবী ছিলেন। পৌত্র আমীর খাঁকেও ভাল তালিম দেন মুরাদ আলী। আমীর খাঁ পিতার চেয়ে মুরাদ আলীর কাছেই বেশি শিখেছিলেন।

আবাল্য এই আবহে দ্বারভাঙ্গায় বর্ধিত হন আমীর খাঁ। পিতা আবদুল্লা এবং পিতা-

মহম্মদ আমীর কাছে অল্পবয়স থেকেই নিয়মবদ্ধ শিক্ষালাভ করেন। সেই সঙ্গে নিরলস রিয়াজ। এইভাবে আমীর খাঁর সংগীতজীবন গড়ে ওঠে। যৌবনেই তিনি হন সুদক্ষ সরদবাদক।

কিন্তু দ্বারভাঙগায় তারপর তাঁর বাসের আর ইচ্ছা হল না। মহারাজার দরবারে যুক্ত হবার সুযোগ বিশেষ নেই। কেননা, জ্ঞাতি-ভ্রাতা আসঘর আলী তখনো দরবারের সরদী। তাছাড়া আবদুল্লা খাঁও সক্ষমভাবে বর্তমান। আরো একটি পারিবারিক কারণ ঘটল। দ্বিতীয়বার নিকা করলেন আবদুল্লা খাঁ। এমনি নানা ঘটনায় আমীর খাঁ আর দ্বারভাঙগায় বাস করলেন না।

তিনি ভাগ্যান্বেষণে চলে এলেন কলকাতায়।

তারপর ললিতমোহন মৈত্রের সঙ্গে যোগাযোগে তাঁর ভালদের পর্ব আরম্ভ হল। সেখানে কয়েক বছর বাসের পরে ১৯১৬ সাল থেকে ব্রজেন্দ্রকিশোরের আশ্রয়ে এলেন আমীর খাঁ।

তারপর থেকে তিনি বৃহত্তর সঙ্গীতসমাজে পরিচিত হতে লাগলেন। তার সূত্রপাত হল তাঁর এখনকার পৃষ্ঠপোষক ব্রজেন্দ্রকিশোরের আনুকূল্যে। আগে বলা হয়েছে, কলকাতায় আমীর খাঁর প্রথম আসর ব্রজেন্দ্রকিশোরের সেই আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাসস্থানেই হত। সে বাড়ির তখনকার ঠিকানা ছিল ৫৩, আমহার্স্ট স্ট্রীট এখন হয়েছে ১, মহেন্দ্র শ্রীমানী রোড।

আমীর খাঁ কলকাতাতে তখন থেকেই স্বতন্ত্র বাসায় থাকতেন। ব্রজেন্দ্রকিশোরের কাছে তিনি একান্তভাবেও নিযুক্ত ছিলেন না। অর্থাৎ পেশাগত স্বাধীনতা ছিল খাঁ সাহেবের। তিনি অন্যত্র মুজরো করতে পারতেন অন্য শিষ্য গঠনেও কোন বাধা ছিল না তাঁর। ব্রজেন্দ্রকিশোরের কাছে নিযুক্ত হওয়ার পর, আমীর খাঁ ১৯১৬ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত প্রায়স কলকাতায়ই ছিলেন।

সেজন্যে কলকাতায় বাস আরম্ভ করবার পর থেকে ক্রমে আমীর খাঁর পেশাদার জীবনও আরম্ভ হয়। কয়েক বছরের মধ্যে এখানে তাঁর শিষ্যগোষ্ঠীও গড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু ব্রজেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল বরাবর। তিনি গৌরীপুর থেকে কলকাতায় উপস্থিত হলেই খাঁ সাহেব তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। ব্রজেন্দ্র-কিশোরের ইচ্ছানুযায়ী সংগ্রহের কার্যও চলত আমীর খাঁর কাছে।

খাঁ সাহেবের গৌরীপুর এস্টেটের সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত ছিল। তাঁর ১৯৩৪ সালে মৃত্যু পর্যন্ত মাসে ৪০ টাকা ব্রজেন্দ্রকিশোর তাঁকে বৃত্তি দিতেন। আমীর খাঁর আমৃত্যু একজন পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন তিনি।

খাঁ সাহেবের কাছে ব্রজেন্দ্রকিশোর ও শীতলচন্দ্রের সংগ্রহ এবং শিক্ষার কথা আগেই বলা হয়েছে। তারপর ১৯২১।২২ সাল থেকে আমীর খাঁর কাছে শিক্ষা আরম্ভ করেন বীরেন্দ্রকিশোর। প্রথম থেকেই রাগালাপ শিক্ষা ও চর্চার দিকে বীরেন্দ্র-কিশোরের প্রবণতা ছিল। সেজন্যে আমীর খাঁর কাছে বেশি শিখতেন নানা রাগের আলাপচারি। আমীর খাঁ রাগের রূপ পরিচয় প্রদর্শন করতেন সরদে। বীরেন্দ্র-কিশোর সঙ্গে সঙ্গে স্বরলিপি করে নিতেন। কখনো শীতলচন্দ্রও সেসবের স্বরলিপি করতেন।

এ কার্যে গৌরীপুরের আর একজন কর্মচারী সহায়ক ছিলেন কালিচরণ রায়। তিনি সর্বক্ষণের জন্যে নিযুক্ত থাকতেন। শুধু স্বরলিপির জন্যে নয়। বিভিন্ন সংগীত-কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে রাগালাপ ইত্যাদি সংগ্রহ করে আনতেন। ওস্তাদদের নিয়ে আসতেন ব্রজেন্দ্রকিশোরের পক্ষে। কালি-চরণ নিজেও কিছু সংগীতচর্চা করতেন, বিশেষ সরদ যন্ত্রে। সরদী করামৎ উল্লার কাছে তিনি সরদবাদন কিছুদিন শিক্ষাও করেন। তখন থেকে ৩।৪ বছর বীরেন্দ্র-কিশোর শিখেছিলেন আমীর খাঁর কাছে।

প্রথম দিকে তিনি বীরেন্দ্রকিশোরকে ইমনের ভাল করে তালিম দেন। তারপর ক্রমে পূরিয়া, ইমন কল্যাণ, তোড়ি ভৈরোঁ দরবারী কানাড়া ইত্যাদি। আলাপচারিতেও তখন খাঁ সাহেবের ঝোঁক ছিল এবং শেখাতেনও।

আমীর খাঁ গৌরীপুরে নিযুক্ত থাকার সময়ে এবং বীরেন্দ্রকিশোর তাঁর কাছে শিক্ষাকালেও আরো গুণী সমাগম তাঁদের দরবারে হয়। সেজন্যে কোন অসুবিধা হয় নি আমীর খাঁর দিক থেকে। তিনি যেমন শান্তিপ্রিয়, গুণগ্রাহী ছিলেন, তেমনি বিরূপ মনোভাবও পোষণ করতেন না অন্যদের সম্পর্কে। সকলেরই প্রশংসা করতেন। ঈর্ষাহীন চিত্ত ছিল আমীর খাঁর, যেকথা অনেক ওস্তাদ সম্পর্কেই বলা যায় না। সেজন্যে তাঁর অবস্থিতিকালেই একের পর এক বিখ্যাত কলাবতেরা যুক্ত হয়েছেন গৌরীপুর দরবারে। যেমন রবাবী-ধ্রুপদী মহম্মদ আলী খাঁ, সেতারী-সুরবাহারী এনায়েৎ খাঁ, সরদী করামৎ উল্লা খাঁ সরদী আলাউদ্দিন খাঁ, সরদী হাফেজ আলী প্রমুখ। তাঁদের কাছে সংগ্রহ করা হয়েছে ব্রজেন্দ্রকিশোরের পক্ষে। তাঁদের তালিম নিয়েছেন বীরেন্দ্রকিশোর। কিন্তু অসূয়া রহিত অনাবিল মন আমীর খাঁ সকলের সঙ্গেই মানিয়ে চলেছেন। এবিষয়ে দুর্লভ উদারচিত্ত ছিল তাঁর।

আমীর খাঁ কলকাতায় অন্যান্য শিষ্যদের ১৯২০।২১ সাল বা তার কাছাকাছি সময়ে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন।

রাজশাহীর সেই অক্ষয়কুমার মৈত্র, পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় (উমানন্দ স্বামী) এবং পরে ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর আমীর খাঁর কাছে শিক্ষার কথা এ পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে।

এখন খাঁ সাহেবের অন্যান্য শিষ্যদের প্রসঙ্গ। তাঁরা প্রায় সকলেই কলকাতায় তাঁর কাছে শিখেছিলেন। আর, আমীর খাঁর এই শিষ্যরা—শুধু সেতারী মুস্তাক আলী ও বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী ভিন্ন—সবাই ছিলেন সরদবাদক। তাঁদের তালিকা এখানে দেওয়া হল।

কলকাতার আশুতোষ কুণ্ডু খাঁ সাহেবের একজন কৃতী ও পুরানো শিষ্য।

পরবর্তীকালের সুপরিচিত অর্কেস্ট্রা পরিচালক ও সুরকার তিমিরবরণ ভট্টাচার্য প্রথম জীবনে আমীর খাঁর অন্যতম প্রিয় শিষ্য ছিলেন। খাঁ সাহেবের কাছে তিনি শেখেন প্রায় ৭ বছর। তারপর তিমিরবরণ আলাউদ্দিন খাঁর শিক্ষা নিতে যান মাইহারে।

বাগবাজারের বাণীকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় আমীর খাঁর শিক্ষায় সুমিষ্ট হাতের, নিপুণ সরদবাদক রূপে পরিচিতি লাভ করেন।

শোভাবাজার রাজবংশের দৌহিত্র সন্তান নীরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্রও ছিলেন খাঁ সাহেবের এক বিশিষ্ট শিষ্য। তিনি খাঁ সাহেবের কাছে প্রায় ১০ বছর শিখেছিলেন। তাঁর কাছে ওস্তাদের সংগীত সম্পদের ভাল সংগ্রহ ছিল এবং তিনি তা প্রকাশও করেন পুস্তকাকারে। নীরেন্দ্রকৃষ্ণের সেই বৃহৎ গ্রন্থ 'শরদ রসচন্দ্রিকা'-র (প্রকাশ ১৯৪০ সালে) আখ্যা-পত্রে আছে—'ওস্তাদ আমীর খাঁ কৃত ২৮৯ প্রকার রাগ-রাগিণীর গৎ সহ তান ঝালা ঠাট রূপ ও রস শিক্ষা করিবার একমাত্র সহজ পুস্তক।' 'রাগ সংগ্রহ' ('সকল রকম বাদ্যযন্ত্রের উপযোগী...সহজ পুস্তক, ১৯৩২-এ প্রকাশিত) ও 'সংগীত সোপান' প্রথম ভাগ (১৯২৬) নামে তিনি অন্য দুটি গ্রন্থেরও লেখক ছিলেন। আমীর খাঁর জন্যে তিনি শোভাবাজার রাজবাড়িতে একদিন যে আসর করেছিলেন তা বলবার মতন। তার কথা পরে বলা যাবে।

সুপরিচিত সেতারী মুস্তাক আলী খাঁ অনেক বছর শেখেন আমীর খাঁর কাছে। কাশীর সেতারবাদক আসিক আলীর পুত্র মুস্তাক আলী। অল্পবয়সেই (১৭। ১৮ বছরে) মুস্তাক আলী পিতার কাছ থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। আমীর খাঁর কাছে দস্তুরমত গান্ডা বেঁধে তালিম নিয়েছিলেন তিনি, অবশ্য সেতার যন্ত্রে। আমীর খাঁর কাছে শেখবার সময় অনেকদিন মুস্তাক আলী বাণীকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের আশ্রয়ে থাকেন।

সেতারবাদক বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী এনায়েৎ খাঁর শিক্ষা পাবার আগে আমীর খাঁর কাছে শিখেছিলেন কয়েক মাস।

আমীর খাঁর শিষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োকনিষ্ঠ হলেন রাধিকামোহন মৈত্র। কিন্তু উত্তরকালে তিনিই হয়ত সরদে তাঁর ওস্তাদের নাম সবচেয়ে বাঁচিয়ে রাখেন। যে ললিতমোহন মৈত্রের আশ্রয় আমীর খাঁ লাভ করেছিলেন প্রথম জীবনে, রাধিকামোহন তাঁরই পৌত্র। ললিতমোহনের মৃত্যু হয় ১৯২৪ সালে। তার ৪।৫ বছর পরে আবার আমীর খাঁর সঙ্গে মৈত্র পরিবারের যোগা-যোগ ঘটে। ফলে রাধিকামোহন ১৯২৯

থেকে ১৯৩৪ সালে আমীর খাঁর তালিম পেয়েছিলেন ভালভাবে। পূর্বতন পৃষ্ঠপোষকের বংশধর বলে খাঁ সাহেব তাঁকে স্নেহভরে বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন। আমীর খাঁর মৃত্যুর পরে রাধিকামোহন দবীর খাঁর কাছে শেখেন প্রধানত রাগালাপ। সরদবাদক রাধিকামোহনের বাজনায় নিবদ্ধ অংশে আমীর খাঁরই ছাপ থেকে যায়।......

খিদিরপুরের সুবলচন্দ্র দে, আন্দুলের রাজ পরিবারের জগন্নাথ মিত্র প্রভৃতি আরো কজন আমীর খাঁর শিষ্য ছিলেন। সকলের নাম এখানে দেওয়া গেল না, সবার কথা জানা যায় নি বলে।

এখানে একটি স্মরণীয় বিষয় আছে। বাংলার সরদ বাদনের ইতিহাসে আমীর খাঁর এই বিশেষ দানটির কথা। তাঁর অধিক সংখ্যায় শিষ্য গঠনের ফলে বাংলায় সরদ চর্চা বেশি প্রসার লাভ করেছিল। কৌকব-করামতুল্লার পরে আমীর খাঁ শেখাতে আরম্ভ করেছিলেন বটে। কিন্তু তাঁর হাতেই অনেক বেশি বাঙালী শিষ্য গঠিত হয়েছিলেন, একথাও সত্য। তার ফলে বাঙালীদের মধ্যে সরদবাদনের সমধিক প্রচলন হয়।

বৃহৎ শিষ্যগোষ্ঠী ছিল খাঁ সাহেবের। এ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ গায়ক ও সঙ্গতকার অনাথনাথ বসুর নামও করতে হয়, যদিও তিনি আমীর খাঁর শিষ্য ছিলেন না। খাঁ সাহেবের কলকাতা বাসের মধ্যে ১০।১১ বছর বসু মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর ছিল নিবিড় সাঙ্গীতিক যোগ। অনাথনাথ তখন উদীয়মান খেয়াল ঠুংরির গায়ক এবং তবলাবাদকও। আমীর খাঁর সরদ বাদনের সঙ্গে নানা আসরে সে সময় তিনি সঙ্গত করতেন। আমীর খাঁ যে রেকর্ডটি করেন কাফি ও পাহাড়ীতে তাতেও তবলাসঙ্গত করেছেন অনাথনাথ। আর খাঁ সাহেবের কাছে তিনি গায়করূপেও উপকৃত। ২০ বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ আমীর খাঁর সঙ্গে অনেক দিনের আসরে, বৈঠকে গান বাজনায় আলোচনায় অনেক জানবার সুযোগ তিনি পেয়েছেন। শুধু তাই নয়। বেশ কিছু গানও (বিশেষ ঠুংরি) তিনি সংগ্রহ করেন খাঁ সাহেবের কাছে। আমীর খাঁর অনেক স্থায়ী অন্তরা জানা ছিল। তাছাড়া, এবিষয়ে তাঁর ঘরেও ছিল সঞ্চয়। আমীর খাঁর দ্বিতীয় বিবি ছিলেন লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত গায়ক ছোটে দুলি খাঁর কন্যা। সেইজন্যে আমীর খাঁর বিবির অনেক গানের বন্দেশ জানা ছিল।

অনাথনাথ আমীর খাঁর কাছে গান সংগ্রহের সময় তার পরিচয় পেতেন মাঝে মাঝে।

এমন হত—হয়ত কোন গানের মুখটা খাঁ সাহেবের মনে পড়ছে না। কিংবা ভুলে গেছেন অন্তরা।

বলতেন, 'আচ্ছা কাল দেব।'

প্রথম প্রথম অনাথনাথ জিজ্ঞেস করতেন, 'কাল কোথা থেকে পাবেন?'

'ঘর থেকেই জেনে নেব।'

কিংবা কোনদিন হয়ত বাসায় বলতেন, 'এখনই বোকে অন্দর থেকে এসে বলছি।'

এই বলে বিবির কাছে জেনে এসে গানটা দিতেন। এমনিভাবেই জানা যায় দুলি কন্যার সঙ্গীতজ্ঞতার কথা।

আমীর-বিবির ভাই লছমন খাঁ ছিলেন উৎকৃষ্ট ঠুংরির গায়ক। লছমন খাঁ কলকাতাতেই থাকবেন। চমৎকার আদেশ সব ঠুংরি তিনি গাইতেন মিঠে গলায়। টালার তবলাবাদক চুনীলালবাবুর বৈঠকে লছমন খাঁ প্রায়ই গাইতেন। কলকাতায় এঁর কজন বাঙালী শিষ্যও হয়েছিলেন। একজন অতি সুকণ্ঠ ঠুংরির গায়ক হিসেবে আমীর খাঁর এই শ্যালকের নাম মনে রাখবার মতন।

বিখ্যাত সারেঙ্গী ছোটে খাঁর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা ছিল আমীর খাঁর। তখনকার কলকাতায় ও কাছাকাছি অঞ্চলের নানা আসরে মজলিসে তাঁরা একসঙ্গে মুজরো করতে যেতেন। তখনকার সংগীতজগতে আমীর খাঁ ছোটে খাঁর নাম কয়েক বছর ধরে চেনা হয়ে যায় সকলের।

সরদী আমীর খাঁ, সারেঙ্গী ছোটে খাঁ, গায়ক লছমন খাঁ—একটি ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠী যেন। আর তাঁদের মধ্যে তখন একটি যোগসূত্র—তরুণ তবলাবাদক অনাথনাথ বসু। কত আসরে তিনি আমীর খাঁ, ছোটে খাঁ প্রভৃতির পাশাপাশি বসে গান গেয়েছেন। আবার তবলাসঙ্গত করেছেন তাঁদের বাজনার সঙ্গে। অনাথনাথকে আমীর খাঁ এজন্যে 'পেয়ার' করতেন।

পরিণত বয়সে আমীর খাঁ কলকাতার বিখ্যাত সরদবাদক হয়েছিলেন। বাংলার সঙ্গীতক্ষেত্রে একাত্মও হয়ে যান তিনি। মুস্তাক আলী ভিন্ন তাঁর সমস্ত শিষ্যই বাঙালী। বাংলাদেশেই তাঁর যাবতীয় উত্তরাধিকার দিয়ে যান তিনি। পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গীতক্ষেত্রের সঙ্গে তাঁর কোন যোগ আর থাকে নি। জন্মস্থান শাহজাহানপুরেও তাঁর যাতায়াত প্রায় ছিলই না। কলকাতারই বাসিন্দা হয়ে যান ১৯১৬ সালের পর থেকে ১৯৩৪ সালে মৃত্যু পর্যন্ত। মেছুয়াবাজার অঞ্চলে ১১, সদরুদ্দিন লেনে তাঁর বাস ছিল শেষের ক বছর।

তখনকার সংগীতসমাজে আমীর খাঁ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকেন ১৯২০-২২ সাল থেকে। তাঁর সমকালে কলকাতায় স্থায়ীভাবে ছিলেন ওস্তাদ করামৎ উল্লা খাঁ। তিনি ভিন্ন ঘরানার, দুর্ধর্ষ স্বভাবের এবং পেশাদার হিসাবে আমীর খাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীও বলা যায়। সরদী করামৎ উল্লার (ও কৌকব খাঁর) সরদী শিষ্য ধীরেন্দ্রনাথ বসু আমীর খাঁর শিষ্যদের পূর্বেই সরদচর্চা আরম্ভ করেন, একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বক্তব্য এই যে, কলকাতায় করামৎ উল্লা খাঁর প্রবল অবস্থানের সময়েই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন আমীর খাঁ। বয়োজ্যেষ্ঠ সরদী করামৎ উল্লা খাঁ এ শহরে ১৯১৬ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত বিরাজিত ছিলেন। সুতরাং আমীর খাঁর কলকাতার সংগীত-জীবনও তাঁর সমকালীন। কলকাতায় তাঁর বৃহৎ শিষ্যমণ্ডলী গঠন, বিভিন্ন সংগীত মজলিসে যোগদান সবই হয়েছিল সেই সময়ে। তাঁর সংগীতজীবনের শ্রেষ্ঠ পর্ব সেটি। তখন করামৎ উল্লার পাশাপাশি একই অঞ্চলে তিনিও প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন। আমীর খাঁর সংগীতগুণের এও এক প্রোজ্জ্বল পরিচয়।

আর করামতুল্লার দাম্ভিক ও সংগ্রামী চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলেন আমীর খাঁ। তিনি নিরহংকার, শান্তিপ্রিয়, শান্ত-ভাষী, সন্তুষ্টচিত্ত। দীর্ঘকাল বাঙালী সমাজের সঙ্গে মেলামেশা, বাঙালী ছাত্র ও পৃষ্ঠপোষকদের সঙ্গে কথাবার্তা ব্যবহারের ফলে আমীর খাঁ রীতিমত বাংলাভাষীও হয়েছিলেন। পরিষ্কার বাংলা বলতে পারতেন স্বচ্ছন্দে। এমনকি, উচ্চারণে কোন পশ্চিমা টান ছিল না।

সরদ শিল্পীরূপেও আমীর খাঁ ছিলেন চিত্তাকর্ষক। তাঁর সুমিষ্ট সুনিপুণ হাতের বাজনায় শ্রোতারা মুগ্ধ হতেন। মনোহারী ছিল তাঁর গৎগুলির বন্দেশ। বিলম্বিত চালের নয় এবং বেশি দ্রুত লয়েরও নয়। তাঁর গৎ মধ্য লয়ের হত চমৎকার সুরের বাঁধুনিতে। ঈষৎ ধীর সুরের চালচিত্রে রাগের রূপ-প্রতিমা প্রতিষ্ঠা। আর বিস্তারেও খাঁ সাহেব দুরস্ত ছিলেন।

বহু রাগের সংগ্রহ ছিল আমীর খাঁর। তাঁর প্রিয় রাগ বলে ইমন কল্যাণ, আড়ানা বাহার, দরবারি কানাড়া, নট মল্লার এমনি কয়েকটি ছিল ভারি চালের মধ্যে। হাল্কার মধ্যে পাহাড়ী, কাফী ইত্যাদি তাঁর বেশি পছন্দ ছিল। তাঁর গ্রামোফোন রেকর্ডও আছে এই দুটিতে।

আমীর খাঁর পারিবারিক জীবনের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। দুলি খাঁর কন্যা তাঁর দ্বিতীয়া বিবি। তার আগেও আর একবার আমীর খাঁ নিকা করেছিলেন। তবে দুপক্ষেই তিনি ছিলেন নিঃসন্তান।

তাঁর শ্যামবর্ণ মাঝারি আকারের এবং মাঝামাঝি গঠনের শরীর ছিল। কিন্তু স্বাস্থ্যবান ছিলেন না তেমন। অনেক-দিনের হাঁফানির অসুখ তাঁর ছিল। মাঝে মাঝেই কষ্ট পেতেন হাঁফের পীড়নে।

আমীর খাঁ দীর্ঘজীবীও ছিলেন না। মৃত্যু হয়েছিল ৫৮ বছর বয়সে। হাঁফানিতেই তাঁর কাল হয়েছিল বটে। কিন্তু তার আগে শরীর এমন বিশেষ অসুস্থ কিছু হয়নি। শেষের ক্ষণ এসেছিল প্রায় আকস্মিক।

আমীর খাঁ যতদিন ছিলেন, সকলে তাঁর সুখ্যাতিই করতেন। অন্য কলাবন্ত-দের সঙ্গেও তাঁর বিরোধ ছিল না। তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণও করতেন না কেউ।

তবু দু'একজন তাঁর নিন্দুক ছিলেন। ওই, একই পেশার মানুষ তাঁরা। কিন্তু আমীর খাঁর নিন্দা করতেন তাঁরা বাজনার জন্যে নয়। কোন সাঙ্গীতিক ত্রুটিও দেখাতে পারতেন না। দুর্বাক্য বলতেন তাঁর স্বভাবের কোন কোন বিচ্যুতি নিয়ে।

আমীর খাঁ অহিফেন সেবন করতেন। আরো দু-একটি আনুষঙ্গিক ছিল। ......

interpub/BB/46/74 ben
স্মরণীয় মুহূর্তে
বিনী জানে আপনি
কি চান
তাই আপনার
জন্যে টেরীন মিশ্রণে
বিনীর আকর্ষণীয় অর্ঘ্য-
সম্ভার—জীবনে বিশেষ
করে মনে রাখার মত
মধুর লগ্নে···আপনার
ইচ্ছা পূরণে।
বিনী
TERENE ® ব্লেণ্ডস
আমরা অনেক অনেক বদলেছি-
আপনার মতই!

পথে এবং কোন কোন ধূম্রপথেও তুরীয়-লোকে যাতায়াত করতেন বটে তিনি। সে সব সময় কেমন ঝিম হয়ে থাকতেন। আপনাতে আপনি মগ্ন। তেমন অবস্থায় আসরে বাজিয়েছেনও যথারীতি। বাজাবার সময় হয়ত হাত থেকে জবা খসে পড়ে গেছে। চটকা ভেঙে তখনি জবা তুলে নিয়ে আবার বাজিয়ে গেছেন ঠিক। শ্রোতাদের বুঝতে দিতেন না।

তা ওই সব আনুষঙ্গিক নিয়েই সেই দু-একজন ওস্তাদ আমীর খাঁর নিন্দাবাদ করতেন। তাঁকে নয়। ব্যঙ্গ বিদ্রুপের কথা শোনাতেন তাঁর এক প্রিয় শিষ্য নীরেন্দ্র-কৃষ্ণকে। শোভাবাজারের দেব পরিবারের অর্থাৎ রাজা নবকৃষ্ণ বংশের এক দৌহিত্র তিনি। ১৪, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটেই তাঁর বাস ছিল। নীরেন্দ্রকৃষ্ণ তাঁর পোশাকী নাম। তাঁকে নিতাইবাবু বলেই সবাই বেশি জানতেন।

আমীর খাঁর সেই নিন্দুকেরা হাতের কাছে নিতাইবাবুকে পেয়ে ঠাট্টা তামাসা করতেন। অতি সস্তা গণ্ডার বাজার তখন। অল্পে তুষ্ট খাঁ সাহেব হয়ত কাউকে শিক্ষা দিয়েছেন সুলভে। তাই নিয়েই তাঁরা নিতাইবাবুকে শুনিয়ে দিতেন 'আরে আপকা ওস্তাদকা গৎ আঠ আঠ আনামে বিকাতা হায়।' আট আট আনায় তাঁর গৎ বিক্রি হয়—ইত্যাদি।

মুখে কেবল নিন্দাবাদ করেই তাঁরা ক্ষান্ত হলেন না। আমীর খাঁর একটি বড় আসর করবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন নিতাইবাবুকে। খাঁ সাহেবের ওই আনুষঙ্গিক নিয়েই তাঁদের আশা ছিল। তাঁরা ভেবেছিলেন বড় আসরে এসে অপদস্থ হবেন আমীর খাঁ। কারণ তাঁর মনমেজাজের কোন ঠিকঠিকানা নেই। আর এই সম্ভাবনায় নিতাইবাবু যদি তাঁর ওস্তাদের আসর না করেন, তাও লজ্জার কথা।

নিতাইবাবুরও সেকথা ভেবে আমীর খাঁর আসর করতে ঠিক সাহস হচ্ছিল না। কি জানি যদি অপ্রস্তুত হতে হয় আসরের সামনে।

কিন্তু নিন্দুকদের বাক্যবাণে নিতাই-বাবুকে রাজি হতে হল। বরাত ঠুকে আসরের বন্দোবস্ত করলেন। খাঁ সাহেবও এক কথায় সম্মত—হাঁ হাঁ বাজনা হবে। সময়ও নির্দিষ্ট করা হল তাঁর সঙ্গে।

সেদিন দেব পরিবারের ঠাকুরবাড়িতেই আসরের ব্যবস্থা হয়েছে। ঠাকুরদালানের নীচে বিশাল প্রাঙ্গণ। সেকালের অনেক বড় বড় সভা, আসর অনুষ্ঠান হত এখানে। বহু দর্শক শ্রোতা সমাগমের উপযুক্ত স্থান। সেদিনও শ্রোতার সংখ্যা যথেষ্ট দেখা গেল।

সেই নিন্দুকেরা উদ্যোগী হয়ে নিয়ে এসেছেন নান্নু সহায়কে। বেনারসের বিখ্যাত তবলা ঘরানার রামসহায় বংশেরই গুণী তবলিয়া। কাশীর কবীর চৌরার বলদেও সহায়ের (কণ্ঠে মহারাজের ওস্তাদ) পুত্র দুর্গাসহায় — ডাকনাম নান্নু। বাল্যকাল থেকেই পিতার কাছে নান্নুর শিক্ষা আরম্ভ হয়েছিল। তারপর দশ বছর বয়সে বসন্তে চক্ষু হারান। সেই থেকে তবলা ভিন্ন জগতে আর কিছু ছিল না নান্নুর। একান্ত সাধনায় যৌবনেই হয়েছেন মহাগুণী। তিনি বাংলাদেশে থেকেছেন। কলকাতায় এসেছেন, বাজিয়ে-ছেন ভবানীপুর সঙ্গীত সম্মিলনী ও অন্য অনেক আসরে। ময়মনসিংহের মহারাজা শশিকান্ত আচার্য চৌধুরী তাঁকে আপন দরবারে নিযুক্ত ক'বছর রেখেছেন। স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করেছেন। কাশীতেই ১৯২৬ সালে তাঁর মৃত্যু হয় মাত্র ৩৪ বছর বয়সে। শোভা-বাজার রাজবাড়ির এই আসর তার ক'বছর আগেকার কথা।

আমীর খাঁর সেই নিন্দুকেরা নিতাই-বাবুকে বলেছিলেন, নান্নুসহায় এখন কলকাতায় রয়েছেন। তাঁকে আনলে হয় এই আসরে।'

নিতাইবাবু রাজি হয়েছিলেন, বেশত, তিনিই বাজাবেন খাঁ সাহেবের সঙ্গে।'

তাঁরা নান্নুকে যথাসময়ে আসরে নিয়ে এলেন। এ ব্যাপারেও তাঁদের আশা ছিল—এমন তৈয়ারি তবলিয়ার সঙ্গে বাজাতে আমীর খাঁ আরো বে-ইজ্জৎ হবেন ঠিক।...

এদিকে ঠাকুরবাড়িতে অনুষ্ঠান আরম্ভ করবার সময় হল। অনেক শ্রোতা উপস্থিত। শিল্পীদের জন্যে সাজানো আসরে বসেছেন নান্নুজী। তাঁর মাথায় পাগড়ি। গায়ে লম্বা পিরান। কাছে তাঁর তবলা আর ঝকঝকে তামার বাঁয়া।

শ্রোতাদের সামনের সারিতে কজন নামকরা গায়ক বাদক রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন শিবসেবক পশুপতিসেবক প্রভৃতিও।

দেখতে দেখতে নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল।

কিন্ত এখনো আমীর খাঁর দেখা নেই। বিষম দুশ্চিন্তা নিতাইবাবুর মনে। তিনি চঞ্চল হয়ে একবার ফটকের সামনে দেখতে যাচ্ছেন। আবার ফিরে আসছেন আসরে। বিশিষ্ট শ্রোতারা অনেকেই প্রশ্ন করছেন। নিতাইবাবু তাঁদের আশ্বাস দিচ্ছেন—এই আসবেন এবার। অনেকটা রাস্তা। রিকসা করে আসবেন......

কিন্তু প্রমাদ গুনছেন মনে মনে। আবার ফটকের কাছে দেখতে যাচ্ছেন।

আরো খানিকক্ষণ কাটল এইভাবে। অবশেষে ঠিং ঠিং শব্দে ঘণ্টা বাজিয়ে একটি রিকস আসতে দেখা গেল। তার মধ্যে আমীর খাঁ কাৎ হয়ে বসে। নিতাইবাবু ফটকেই ছিলেন। খাঁ সাহেব যে এসে পড়েছেন এই যথেষ্ট। রিকস থেকে যন্ত্র ও তাঁকে নামিয়ে আসরে নিয়ে এলেন।

তারপর সরদের তারগুলি সুরে বাঁধা, তবলাকে তার সঙ্গে মেলানো ইত্যাদি হল। বাজনা আরম্ভ করলেন আমীর খাঁ। সেই নিন্দুকে দুজন মজার আশায় তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন।

তরফের তারে একবার ঝঙ্কার দিয়ে খাঁ সাহেব ধরেছিলেন আড়ানা বাহার। একটু ঢিমা লয়ে জমিয়ে আলাপচারি শুরু করলেন। সাধারণ আসরে তিনি আলাপ বিশেষ বাজাতেন না। এখানে বাজাতে লাগলেন সম্পূর্ণ অঙ্গের আলাপ-চারি। এখন আসরে আমীর খাঁ অন্য সব দিক তুচ্ছ। রাগের রূপের সঙ্গে নিজের শিল্পীপরিচয়ও বিকশিত করতে লাগলেন। আসর ভরে উঠতে লাগল সরদের বড় আওয়াজে। অনিবন্ধ থেকে নিবন্ধ অংশ। তার মাঝে জোড়ের কাজ। সবিস্তারে আলাপের ক্রমপদ্ধতি আমীর খাঁ বাজাতে লাগলেন। আলাপ থেকেই মুগ্ধ হলেন শ্রোতারা। আলাপ শেষ করেই শিল্পী গৎ আরম্ভ করলেন। আড়ানা বাহারের মধ্য লয়ে চমৎকার বন্দেশ। আসর তখনি বেশ জমে গেছে। মধ্য লয়ের এমনি মনোহারী গতেই আমীর খাঁর বেশি মুন্সিয়ানা। সুন্দর সুরের আল্পনা যেন। সেই সঙ্গে তানেরও বৈচিত্র্য। নান্নুসহায়েরও বড় ভাল লাগছিল বাজনা। তিনিও প্রেমসে সঙ্গত করতে লাগলেন। মাঝে মাঝেই সমঝদারদের মুখে শোনা যেতে লাগল—'বহুৎ আচ্ছা।'

অনেকক্ষণ ধরে আমীর খাঁ আড়ানা বাহার বাজালেন। দেড়ঘণ্টা পার হয়ে গেল কখন। তারপর সরদী দুখানি হালকা চালের গৎ পর পর শোনালেন। আসর একেবারে মাৎ করে, কোল থেকে যন্ত্র নামালেন আমীর খাঁ। দুঘণ্টারও বেশি তাঁর সরদ শুনে শ্রোতারা পরম পরিতৃপ্ত হলেন। আরো বেশি তৃপ্তিলাভ করলেন নিতাইবাবু।

বাজনা শেষ হতেই নান্নুসহায় আমীর খাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগলেন। দাঁড়িয়ে উঠে তিনি হাত বাড়িয়ে সন্ধান করতে লাগলেন—'আমীর খাঁ কাঁহা, আমীর খাঁ?'

নিতাইবাবু খাঁ সাহেবকে নান্নু-সহায়ের নাগালের মধ্যে নিয়ে এলেন।

দৃষ্টিহীন সঙ্গতীয়া সরদশিল্পীকে আলিঙ্গন করলেন বুকে নিয়ে। দুজনেরই আনন্দের অশ্রু ঝরতে লাগল।

নিতাইবাবুর হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল সেই নিন্দুকদের দিকে। মুখ কালো করে তাঁরা একদিকে তখন নিঃশব্দে বসে আছেন।

—দিলিপকুমার মুখোপাধ্যায়

জয়প্রকাশ এবং আবদুল্লা

শেখ আবদুল্লা ও জয়প্রকাশ নারায়ণের রাজনীতিতে কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষণীয়। তাঁদের কেউই আনুষ্ঠানিকভাবে কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত নন, অথচ ব্যক্তিগতভাবে উভয়েরই যথেষ্ট রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। শেখ আবদুল্লা এক সময় জওহরলাল নেহরু সমেত কংগ্রেস নেতাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী সময়ে সরকারকে যথেষ্ট বেগ দিয়েছেন। জয়প্রকাশ নারায়ণও এক সময়ে নিজেই প্রথম সারির একজন কংগ্রেস নেতা ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গেও নেহরুর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। শেখ আবদুল্লার মত এতটা না হলেও, জয়প্রকাশও বিভিন্ন সময়ে কঠোর সমালোচনার দ্বারা সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছেন। শেখ আবদুল্লার প্রতি সরকারের বিরূপ নীতিরও একজন সমালোচক ছিলেন জয়প্রকাশ।

অথচ, ঘটনার যোগাযোগে, শেখ আবদুল্লার সঙ্গে নয়াদিল্লির ব্যবধান দূর করার যখন আর এক দফা চেষ্টা হচ্ছে তখনই নয়াদিল্লির সঙ্গে শ্রীনারায়ণের ব্যবধান যেন বাড়ছে বলে মনে হচ্ছে।

*

বিহারে শ্রীনারায়ণ ও কংগ্রেস পরস্পরের বিরুদ্ধে ক্রমেই অধিকতর অনমনীয় মনোভাব অবলম্বন করছেন। শ্রীনারায়ণ এখন বিহার বিধানসভা ভাঙ্গার আন্দোলনে পুরোপুরি নেমে পড়েছেন। বেরোজগারি, মাঙ্গাই অউর ভ্রষ্টাচার-এর বিরুদ্ধে ছাত্রদের বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল শ্রীনারায়ণ এখন সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে এমন একটি কর্মসূচী রেখেছেন যার সঙ্গে গান্ধীজী কর্তৃক পরিচালিত সর্বাত্মক আইন অমান্য আন্দোলনের তুলনা করা চলে। গুজরাটের মত বিহারেও তিনি বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। কিন্তু তিনি শুধু দাবি জানিয়েই ক্ষান্ত হননি, বিধানসভার সদস্যরা যাতে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন সেজন্য তাঁর অনুগামীরা বিধানসভা ভবনের সামনে ধর্ণা দিচ্ছেন এবং এম-এল-এ'দের বাড়ি ঘেরাও করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। তাঁর আন্দোলনের কর্মসূচীতে সরকারী ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করার কথা বলা হয়েছে। তিনি ছাত্রদের এক বছরের জন্য স্কুল-কলেজ যাওয়া বন্ধ রেখে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার পরামর্শ দিয়েছেন। পুলিশদের প্রতি তাঁর পরামর্শ, উপরওয়ালাদের হুকুমমত তারা যেন আন্দোলনকারীদের উপর অত্যাচার না করেন। ইতিমধ্যে শ্রীনারায়ণ পাটনা শহরে একটা মিছিল বের করেছেন এবং রাজ্যপালের কাছে পাঁচ লাখ মানুষের স্বাক্ষরিত একটি স্মারকলিপি দিয়ে বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়ার দাবি জানিয়ে এসেছেন।

নয়াদিল্লি থেকে সর্বশেষ ইঙ্গিত পাওয়া গেছে, শ্রীনারায়ণের এই বৃহৎ রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের সামনে কোনরকম নতিস্বীকার না করে সমস্ত সরকারী শক্তি প্রয়োগ করে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারকেও এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে প্রকাশ।

বিহারের নারায়ণী আন্দোলন সম্পর্কে এই আপাতপ্রতীয়মান সরকারী দৃঢ়তার অন্তরালে কিন্তু কংগ্রেস দলের মধ্যে একটা গভীর দ্বিধাসংশয় রয়েছে। শ্রীনারায়ণের রাজনৈতিক চরিত্র সম্পর্কে ও তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের স্বরূপ সম্পর্কে কংগ্রেস দলের মধ্যে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্নমত রয়েছে।

সি-পি-আই-এর মত কংগ্রেসের একাংশ মনে করেন যে, শ্রীনারায়ণের রাজনীতি প্রতিক্রিয়াশীল, তাঁর আন্দোলনের দ্বারা দক্ষিণপন্থীদেরই সুবিধা করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এই আন্দোলনের পিছনে বিদেশী চরদের উস্কানিও থাকতে পারে বলে সন্দেহ প্রকাশ করে এই আন্দোলন কঠোরভাবে দমন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেস এম-পি কৃষ্ণকান্ত বলেছেন, জয়প্রকাশের আন্দোলনের বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট পার্টির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে সামিল হওয়া উচিত। বিহার বিধানসভার কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে যাঁরা গফুরের বিরুদ্ধে রয়েছেন তাঁরা সাধারণভাবে জয়প্রকাশের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী। বিহার বিধানসভায় যেসব কংগ্রেস সদস্য শ্রীনারায়ণের কার্যকলাপের সমালোচনা করেছেন, তাঁর নেতৃত্বাধীন বিহার রিলিফ কমিটির টাকাপয়সার হিসাব সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন ও বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার আন্দোলনের সংগে বড় ব্যবসায়ীদের আনন্দমার্গের ও ও সি-আই-এ'র সংস্রব থাকার অভিযোগ এনেছেন তাঁরা কংগ্রেসের এই জয়প্রকাশ-বিরোধী অংশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। প্যাটনার মিছিলের উপর 'ইন্দিরা ব্রিগেড'-এর সশস্ত্র আক্রমণ জয়প্রকাশ ও তাঁর আন্দোলন সম্পর্কে এক শ্রেণীর কংগ্রেসকর্মীদের চূড়ান্ত অসহিষ্ণুতার প্রকাশ। অন্যান্যদের মধ্যে বিহার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সীতারাম কেশরীও দিল্লিতে গিয়ে জয়প্রকাশের আন্দোলনের বিরুদ্ধে দৃঢ় নীতি গ্রহণের পরামর্শ দিয়ে এসেছেন।

কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে আর একটি অংশ আছেন যাঁরা জয়প্রকাশের সংগে সম্মুখ সমরে নামার পক্ষপাতী নন। তাঁদের যুক্তি হল, শ্রীনারায়ণ দুর্নীতি দমনের ও নির্বাচনের গলদ দূর করার যে প্রশ্ন তুলে ধরেছেন তার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি আছে। এই প্রশ্ন কংগ্রেসেরও অনেকের মধ্যে রয়েছে। শ্রীনারায়ণকে জনসঙ্ঘ ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হাতে সম্পূর্ণ ঠেলে না দিয়ে বরং দুর্নীতিদমন ও নির্বাচনবিধি সংস্কারের ব্যাপারে তাঁর সংগে পরামর্শ করাই কংগ্রেসের পক্ষে বিচক্ষণতার কাজ হবে। তাঁর মত সম্মানিত একজন নেতাকে একেবারে সম্পূর্ণরূপে সরকারবিরোধী নেতা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যেতে দিলে তাতে কংগ্রেসেরই লোকসান।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উমাশংকর দীক্ষিত সর্বশেষ যখন পাটনায় এসেছিলেন তখনও যে তিনি জয়প্রকাশের সংগে আলোচনার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী আবদুল গফুর এখনও যে জয়প্রকাশ সম্পর্কে কোন কঠোর মন্তব্য না করে শুধু তাঁকে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছেন, জয়প্রকাশকে গ্রেপ্তার করার প্রস্তাব যে বিহার মন্ত্রিসভায় অনুমোদন লাভ করেনি — এইসব ঘটনা থেকেই বোঝা যাচ্ছে, জয়প্রকাশের সংগে বোঝাপড়ার রাস্তা খোলা রাখার জন্য দলের মধ্যে কিছুটা আগ্রহ অবশিষ্ট রয়েছে।

দিল্লির একটি সংবাদে প্রকাশ যে, ইতিমধ্যে কিছু কিছু মধ্যস্থ ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সংগে জয়প্রকাশ নারায়ণের একটা বোঝাপড়া করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তাঁদের প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে, গত মার্চ মাসে ভুবনেশ্বরে শ্রীমতী গান্ধীর একটি বিবৃতিকে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে যে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল তা দূর করা। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী শতপথী অবশ্য পরে একটি বিবৃতি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, শ্রীমত গান্ধী জয়প্রকাশের ব্যক্তিগত সাধুতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলেন নি। জয়প্রকাশ চিকিৎসার জন্য ভেলোরের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে শুভেচ্ছাবাণী পাঠিয়েছেন এবং লোকসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উমাশংকর দীক্ষিত শ্রীনারায়ণকে 'বিবেকবান মানুষ' বলে অভিহিত করেছেন নয়াদিল্লির সঙ্গে শ্রীনারায়ণের ব্যবধান যাতে আর না বাড়ে, সেই প্রচেষ্টার পরিচয় এইসব ঘটনার মধ্যে দিয়ে পাওয়া যাচ্ছে।

মধ্যস্থদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে, নির্বাচনবিধি সংস্কার ও উপরতলার দুর্নীতি দূর করার উপায় সম্পর্কে উভয় নেতার মধ্যে একটা সংলাপের সূত্রপাত করা।

আপোষকারীদের এই চেষ্টা অবশ্য অদূর ভবিষ্যতে সফল হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। তার প্রথম কারণ হচ্ছে, নয়াদিল্লি বলেছেন, জয়প্রকাশের তরফ থেকে অনুকূলে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। জয়প্রকাশ নাকি বলেছেন যে, তিনি যে ছয়দফা প্রস্তাব দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার সে সম্বন্ধে কোনরকম উচ্চবাচ্য না করায় এখন আর আলোচনার রাস্তা খোলা নেই। (নয়াদিল্লিতে শ্রীনারায়ণের এরকম কোন প্রস্তাবই নাকি খুঁজে পাওয়া যায়নি।) আলোচনা-সাপেক্ষে আন্দোলন বন্ধ রাখতেও শ্রীনারায়ণ রাজি নন। তিনি বলেছেন, 'আন্দোলন আমার পকেটের জিনিস নয় যে, আমি ইচ্ছামত বের করতে পারি আর ইচ্ছামত ঢুকিয়ে রাখতে পারি।'

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারের ধারণা, বিহারে জয়প্রকাশের আন্দোলন বেশিদূর এগোবে না। তাঁরা এটা আশার সংগে লক্ষ্য করেছেন যে, বিহার গুজরাটকে হুবহু নকল করতে রাজি হচ্ছে না। গুজরাটের মত বিহারে বিধানসভার সদস্যদের মধ্যে পদত্যাগের হিড়িক পড়ে যায়নি। বিহার বিধানসভার বিরোধী সদস্যদের একটা বড় অংশ নিজেদের দলের নির্দেশ অমান্য করে বিধানসভায় যোগ দিচ্ছেন। এই প্রশ্নে এমনকি জনসঙ্ঘের মত সুশৃংখল দলও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে এবং শ্রী বি পি মন্ডলের মত বিহারের ডাকসাইটে বিরোধী নেতাও বিধানসভা থেকে ইস্তফা দেওয়ার ডাক উপেক্ষা করেছেন। বিধানসভার মোট ৭০জন বিরোধী সদস্যের মধ্যে এখন পর্যন্ত মাত্র ২৫ জন পদত্যাগ করেছেন, এই ঘটনা থেকে কংগ্রেস নেতারা ভরসা করছেন যে, গুজরাটের মত বিহারে অন্তত এম-এল-এ'দের পদত্যাগ করিয়ে বিধানসভার ইচ্ছামৃত্যু ডেকে আনা যাবে না।

কংগ্রেস নেতারা আরও আশা করছেন যে, সর্বোদয় আন্দোলনে জয়প্রকাশের সহকর্মীরাই তাঁকে সংযত করতে সমর্থ হবেন। আচার্য বিনোবা ভাবে ইতিমধ্যে জয়প্রকাশের আন্দোলনের সমালোচনা করেছেন এবং বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য সর্বোদয় কর্মীদের একটি বৈঠক আহ্বান করছেন।

সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে নয়াদিল্লি হয়ত এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন যে, আর কয়েকদিন পরে শ্রীনারায়ণ যখন নিজেই তাঁর আন্দোলনের সম্ভাবনা আরও ভালভাবে বুঝতে পারবেন তখনই তাঁর সংগে আলোচনা আরম্ভ করলে বরং বেশি কাজ হবে। আপাতত তাঁর সংগে নরমগরম আচরণ করাই ভাল।

*

পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং দুদিনের জন্য শ্রীনগরে গিয়ে শেখ আব্দুল্লার সংগে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা করে এসেছেন। এই আলোচনার শেষে কোন সুস্পষ্ট ঘোষণা করা হয় নি, আলোচনা ঠিক কি বিষয়ের হল তাও সরকারিভাবে জানানো হয় নি, শুধু পরে আবার আলোচনা হবে বলে জানান হয়েছে।

একটি প্রশ্নের উত্তরে স্বরণ সিং বলেন যে, তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের শক্তি সংহত করার উপায় সন্ধান করছেন এবং যেহেতু শেখ আবদুল্লা ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের একজন প্রধান প্রবক্তা ও সম্প্রতি এবিষয়ে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে সেহেতু তাঁর সাহায্য চাওয়া হচ্ছে।

স্বরণ সিংয়ের এই বক্তব্য সম্পর্কে শেখ আব্দুল্লাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন 'ওরা চান, আমি একটা ভূমিকা গ্রহণ করি। কিন্তু এই ভূমিকা গ্রহণের উপযুক্ত উপায়গুলি আমার হাতে থাকা চাই।' আর ঠিক ঐ জিনিসটাই এইসব আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে [illegible] করার চেষ্টা হচ্ছে।

শেখ আব্দ[illegible] মূল দাবি হচ্ছে, ১৯৫৩ সালের ৯ আ[illegible] তাঁকে গ্রেপ্তার করার আগে কাশ্মীরের যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থায় ফিরে যেতে হবে। এই মূল দাবির ভিত্তিতেই এখন ভারত সরকারের সংগে [illegible] আলোচনা হচ্ছে। শেখ আব্দুল্লার এই দাবি কতটা মেনে নেওয়া যায় তা বিবেচনা করতে গিয়ে ভারত সরকারকে ভেবে দেখতে হচ্ছে। গত ২১ বছরে যেসব পরিবর্তন হয়েছে তার সংগে আবদুল্লার এই দাবিকে কতটা খাপ খাওয়ান যায় এবং কাশ্মীরের জন্য একটা বিশেষ ব্যবস্থা মেনে নিলে নাগাল্যান্ড বা তামিলনাড়ুর মত রাজ্যে তার কি প্রভাব পড়তে পারে।

কারণ ১৯৫৩ সালের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার মানে হচ্ছে প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ বৈদেশিক সম্পর্ক ও মুদ্রা —এই কয়টি বিষয় ছাড়া অন্য সব বিষয়ে কাশ্মীরের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার মেনে নিতে হবে এবং গত দুই দশক সময়ের মধ্যে কাশ্মীরে ভারতের সাংবিধানিক এক্তিয়ারের যে প্রসার ঘটেছে তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে হবে। এই দুই দশকের মধ্যেই কাশ্মীরে সুপ্রিম কোর্ট পরিকল্পনা কমিশন নির্বাচন কমিশন

অডিটর জেনারেল কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন ইত্যাদির এক্তিয়ার প্রসারিত হয়েছে। শেখ আব্দুল্লার দাবি মেনে নেওয়ার অর্থ হচ্ছে এই সব ব্যাপারেই কেঁচে গণ্ডুষ করা।

শেখ আবদুল্লা যে কাশ্মীরকে কেন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতরভাবে যুক্ত করার যেকোন প্রস্তাবেরই বিরোধী তা নয় কিন্তু তাঁর বক্তব্য হচ্ছে ভারত সরকার একতরফাভাবে তাঁর রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার খর্ব করতে পারেন না।

যদিও কেন্দ্র ও শেখের মতামতের মধ্যে সামঞ্জস্য করা কঠিন তাহলেও শেখ আব্দুল্লার সঙ্গে কংগ্রেসের যে বোঝাপড়া হতে চলেছে তার একটা ইঙ্গিত পাওয়া গেল সম্প্রতি কাশ্মীরের গুলমার্গ কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনে। সেখানে প্রার্থী ছিলেন মীর কাশিম মন্ত্রিসভার সদস্য ও শেখ সমর্থক মুবারক শাহ। ঐ নির্বাচনে কংগ্রেসের লোক-জন ও শেখের অনুগামীরা একযোগে মুবারক শাহের হয়ে নির্বাচন প্রচার অভিযান চালিয়ে তাঁকে জয়ী করেছেন।

গণভোট ফ্রন্টের যে সভা আগামী ২২ জুন তারিখে হওয়ার কথা ছিল সেটা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে এটাও একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই সময়ে ফ্রন্টের সভা হলে সেখানে ভারত সরকার ও কাশ্মীর সরকারের বিরুদ্ধে যেসব সমালোচনা হত তাতে শেখ আব্দুল্লার সঙ্গে নয়াদিল্লির আলোচনার পরিবেশ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

গত প্রায় চার বছর ধরে মধ্যে মধ্যেই নয়াদিল্লির সঙ্গে শেখ আব্দুল্লার আপোষ আলোচনা চলছিল। এর আগে শ্রীমতী গান্ধীর প্রতিনিধি হিসাবে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য জি পার্থসারথি শেখ আব্দুল্লার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন। এখন যেসব কারণে শেখ আব্দুল্লার সহযোগিতা লাভ করা কেন্দ্রের বিবেচনায় জরুরি হয়ে পড়েছে সেগুলি হল :— (১) কাশ্মীরের রাজনীতিতে শেখ আব্দুল্লার অবিসম্বাদিত মুখ্য স্থান গ্রহণ করতে পারেন এমন দ্বিতীয় আর একজন নেতা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। শেখ আব্দুল্লারও বয়স হয়েছে। এখনও তাঁর সঙ্গে আপোষ না করা গেলে পরে কাশ্মীরে স্থায়ী মীমাংসার সব আশাই হয়ত নষ্ট হয়ে যেতে পারে। (২) ভারতের রাজনীতিতে মুসলিম লীগের ক্রমবর্ধমান প্রভাব খর্ব করার জন্য শেখ আব্দুল্লার মত প্রতিপত্তি-শালী একজন মুসলিম নেতার সাহায্য পাওয়া প্রয়োজন। (৩) পাকিস্তান সম্প্রতি আবার কাশ্মীর নিয়ে জল ঘোলা করার জন্য যেভাবে উঠে পড়ে লেগেছে এবং গণভোটের কথা বলে যেভাবে কাশ্মীরীদের উস্কানি দিচ্ছে তাতে শেখ আব্দুল্লার সঙ্গে মিটমাট করার প্রশ্নটি জরুরি হয়ে উঠেছে।

রাষ্ট্রসংঘে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য হওয়ার পথ অবশেষে পরিষ্কার হল। সাধারণ পরিষদের কাছে এবিষয়ে সুপারিশ করে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। প্রস্তাবটি বিনা ভোটেই নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত হিসাবে গৃহীত হয়েছে বলে জানান হয়েছে। এভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে চীন আপত্তি করে নি অথবা ভোট নেওয়ার দাবিও জানায় নি।

প্রস্তাবটি পাকা হতে এখন শুধু সাধারণ পরিষদের অধিবেশন হতেই যা বাকি। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে ঐ অধিবেশন হওয়ার কথা আছে। তার পরই বাংলাদেশ ১৩৬তম সদস্য হিসাবে রাষ্ট্রসঙ্ঘে তার প্রাপ্য স্থান গ্রহণ করবে বলে আশা করা যায়।

নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাবটি আলোচনার সময় চীনা প্রতিনিধি চুয়াং ইয়েন এই বলে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন যে রাষ্ট্রসঙ্ঘ উপমহাদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে যেসব প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল সেগুলি রূপায়িত করা হচ্ছে। তিনি আরও বলছেন "আমরা আশা করি যে উপমহাদেশের রাষ্ট্রগুলি বিদেশী হস্তক্ষেপ দূর করবে এবং সমতা ও সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তুলবে।

গতমাসে ভুট্টোর পিকিং সফরের সময় চীনা উপপ্রধানমন্ত্রী তেং সিয়াও পিং যা বলেছিলেন তার প্রতিধ্বনি করে নিরাপত্তা পরিষদে চীনা প্রতিনিধি বলেছেন দক্ষিণ এশিয়ার যেসব দেশ 'সাম্প্রসারণবাদ ও আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে চীন তাদের সাহায্য করবে।

তবে লক্ষ্য করার বিষয় যে ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণ নিয়ে পাকিস্তান যে সোরগোল তুলছে চীনা প্রতিনিধি তাতে সায় দেন নি।

এর আগে বাংলাদেশকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে ন্যায্য স্থান দেওয়ার চেষ্টা চীনের ভিটো প্রয়োগের ফলে বানচাল হয়ে গেছে। পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের দেশে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রস্তাব সম্পূর্ণ কার্যকর হয়ে যাওয়ায় এখন আর চীনা ভিটো প্রয়োগের কোন অজুহাত নেই।

ওয়াটারগেট এবং মার্কিন সংকট

প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিকসন সম্প্রতি বলেছেন ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারিকে যতই টেনে বড় করা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ততই টেনে নিচে নামান হচ্ছে। এই কেলেঙ্কারির জাল ছড়ালেও এতদিন প্রেসিডেন্ট নিকসনের ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের মধ্যে একজন এই জালের বাইরে ছিলেন। তিনি হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রসচিব ডঃ হেনরি কিসিঞ্জার এই কারণে তাঁকে মিস্টার ক্লিন নামও দেওয়া হয়েছে। ডঃ কিসিঞ্জার শুধু যে ওয়াটার কেলেঙ্কারী থেকে নিজে মুক্ত ছিলেন তাই নয় তিনি তাঁর একটার পর একটা কূটনৈতিক সাফল্যের দ্বারা প্রেসিডেন্ট নিকসনকে এই কেলেঙ্কারির ধুলোকাদা কতকটা ঝেড়েমুছে দাঁড়াবার সুযোগ করে দিচ্ছিলেন। যেমন সম্প্রতি ডঃ কিসিঞ্জারের মধ্যস্থতায় সিরিয়া ও ইজরায়েলের মধ্যে সৈন্যাপসারণ চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরই প্রেসিডেন্ট নিকসন মার্কিন প্রেসিডেন্টের পরিপূর্ণ মহিমা নিয়ে বিদেশযাত্রায় বেরোবার ও এই সুযোগ অন্তত সাময়িকভাবে ওয়াটারগেটের অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে অব্যাহতি লাভের ফুরসৎ পেয়েছেন। এই যাত্রায় তাঁর সোভিয়েট রাশিয়া সফরেও যাওয়ার কথা আছে।

কিন্তু অবশেষে সেই পরিচ্ছন্ন ডঃ কিসিঞ্জারেরও প্রকারান্তরে ওয়াটেরগেট কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। মার্কিন সংবাদপত্রগুলিতে অজানা সূত্রের সংবাদ উদ্ধৃত করে ও কিছু নথিপত্রের উল্লেখ করে অভিযোগ করা হচ্ছে যে নিকসন

প্রশাসনের আমলে সন্দেহভাজন সরকারী কর্মচারী ও বাছাইকরা কয়েকজন সাংবাদিকের টেলিফোনে আড়িপাতার ব্যাপারে ডঃ কিসিঞ্জারের ভূমিকাটি সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিল না এবং এবিষয়ে তিনি সিনেটের কমিটিতে যে সাক্ষ্য দিয়েছেন তাতে তিনি সত্য গোপন করে গেছেন।

এই অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ করে ডঃ কিসিঞ্জার বলেছেন যে এই ধরনের অপবাদের বোঝা মাথার উপর নিয়ে তিনি আমেরিকার পররাষ্ট্রসচিবের দায়িত্ব পালন করতে বিশেষ করে বিদেশে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করতে পারবেন না। হয় সমগ্র বিষয়টি বিবেচনা করে তাঁকে এই অপযশ থেকে মুক্ত করা হোক আর তা নাহলে তিনি পদত্যাগ করবেন। প্রেসিডেন্ট নিকসনের সহযাত্রী হিসাবে পশ্চিম এশিয়ার সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে অস্ট্রিয়ার সালজবুর্গ শহরে তিনি যখন এই ঘোষণা করছিলেন তখন সাংবাদিকের বিবরণ অনুযায়ী ডঃ কিসিঞ্জার যেরকম ক্রোধ প্রকাশ করছিলেন এবং তাঁর চোখ যেরকম অশ্রুসিক্ত হয়ে আসছিল সেরকম উত্তেজিত অবস্থায় এর আগে আর কখনও তাঁকে দেখা যায় নি।

টেলিফোনে আড়িপাতার ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা ডঃ কিসিঞ্জার অবশ্য পুরোপুরি অস্বীকার করেন নি। তাঁর নির্দেশে বা সুপারিশে আড়িপাতা হয়েছিল একথা ঠিক নয়। তাঁর দপ্তরও এ ব্যাপারে জড়িত ছিল না। আড়িপাতার সিদ্ধান্ত হয়েছিল প্রেসিডেন্ট নিকসনের সঙ্গে তৎকালীন অ্যাটর্নি জেনারেল জন মিচেল ও ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের তৎকালীন ডিরেক্টর এডগার হুভারের এক বৈঠকে এবং সম্ভবত প্রেসিডেন্ট নিকসনের নিজের নির্দেশে। তবে একথা ঠিক যে, জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ গোপন সরকারি দলিল ফাঁস হয়ে যাওয়ায় তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন এবং এটা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। আড়িপাতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শুধু এইটুকু যে জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে যাদের উপর নজর রাখা দরকার তাঁদের একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীবদ্ধ তালিকা রচনা করতে তিনি সাহায্য করেছিলেন। তাঁকে সে সময়ে বলা হয়েছিল, জাতীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনে টেলিফোনে আড়িপাতা বেআইনী কাজ নয়। এবং ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের আমল থেকেই মার্কিন সরকার এটা করে আসছেন। তাঁর দপ্তরের কর্মচারী ডেভিড ইয়ংকে এরলিখমানের দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল একথা ঠিক। কিন্তু তাঁকে জানিয়ে এই বদলি করান হয় নি, এবং ইয়ংকে দিয়ে ঠিক কি কাজ করান হয়েছে তাও তিনি জানেন না। টেলিফোনে আড়ি পেতে পরস্ত্রীদের সঙ্গে প্রেমালাপ ও অশ্লীল আলোচনা রেকর্ড করে রাখা হত এবং সে সব রসাল বিবরণ ডঃ কিসিঞ্জারের দপ্তরে (ডঃ কিসিঞ্জার সে সময়ে জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়ে প্রেসিডেন্ট নিকসনের বিশেষ সহকারী ছিলেন।) পাঠান হত এ কথাও তিনি অস্বীকার করেছেন।

ডঃ কিসিঞ্জার বলেছেন, সিনেটের কমিটিতে তিনি এই সব কথাই বলেছেন কোন কিছু গোপন করেন নি।

সালজবুর্গের সাংবাদিক সম্মেলনে ডঃ কিসিঞ্জার বলেছেন আমি এ কথাই ভাবতে চাই যে, ইতিহাস স্মরণ করবে (আমার চেষ্টায়) সম্ভবত কয়েকটি জীবন রক্ষা পেয়েছে ও কয়েকজন মাতা কতকটা স্বস্তি লাভ করছেন। কিন্তু আমি এই বিচারের ভার ইতিহাসের উপর ছেড়ে দিতে চাই না সেটা হল জনজীবনে আমার চাই। যেটা আমি ইতিহাসের উপর ছেড়ে দিতে সুনাম নিয়ে আলোচনা।

পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ যে, ডঃ কিসিঞ্জারের পদত্যাগের হুমকিতে কাজ হয়েছে। তাঁর অনুরোধ অনুযায়ী সিনেটের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটি আড়িপাতার ব্যাপার তাঁর ভূমিকা ভালভাবে বিবেচনা করে দেখতে সম্মত হয়েছেন। কমিটির সভাপতি ফুলব্রাইট বলেছেন, ডঃ কিসিঞ্জার পদত্যাগ করে গেলে আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনায় অসুবিধা হবে। সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা মাইক ম্যানসফিল্ড ডঃ কিসিঞ্জারকে পদত্যাগ না করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন, কারণ তাঁকে দিয়ে দেশের প্রয়োজন আছে।

•

সুপ্রিম কোর্টের সামনে আইনের লড়াইয়ের প্রথম বাজিতে পরাজিত হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট নিকসন ইতিমধ্যে আরও একটি আইনের লড়াইয়ে হেরে গেছেন। তাঁর এই হার হয়েছে ফেডারেল ডিস্ট্রিক্ট জজ গেরহার্ড জেসেল-এর আদালতে। সেখানে প্রেসিডেন্ট নিকসনের প্রাক্তন সহকারী জন এরলিখম্যানের বিরুদ্ধে একটি মামলা চলছিল। এরলিখমান তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য হোয়াইট হাউসের কিছু নথিপত্র ও টেপ চেয়েছিলেন। প্রেসিডেন্টের কৌঁসুলি জেমস সেন্ট ক্লেয়ার এসব কাগজপত্র ও টেপ দিতে অস্বীকার করেন। তিনি প্রস্তাব দেন যে, আসামী কাগজপত্র ও টেপগুলি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন তারপর তাঁর কোনগুলি দরকার তা বললে হোয়াইট হাউস ঐ অনুরোধ বিবেচনা করে দেখবেন।

বিচারপতি জেসেল প্রেসিডেন্টের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন যে প্রেসিডেন্ট নিকসন তাঁর একজন সহকর্মীর ন্যায়বিচারের পথে বাধা দিচ্ছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এরলিখম্যানের মামলা চলার অবস্থাতেই প্রেসিডেন্ট নিকসন এই বিচারপতি জেসেলকে ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের ডিরেকটর করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বিচারপতি জেসেল এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

এরলিখম্যানের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে ডঃ এলসবার্গ নামক স্যানফ্রান্সিস্কোর একজন মানসিক রোগের চিকিৎসকের চেম্বারে গোপনে হানা দেওয়ার অভিযোগ সম্পর্কে। রাজনৈতিক গোয়েন্দাগিরির উদ্দেশ্য নিয়ে এই হানা দেওয়া হয়েছিল।

•

বিহারে রাজনৈতিক ডামাডোলের সংবাদের নিচে আর একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ যে এতদিন বেমালুম চাপা পড়ে গিয়েছিল সেটা টের পাওয়া গেল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি রিপোর্ট থেকে। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, বসন্ত রোগে মৃত্যু সংখ্যার দিক থেকে এ বছর বিহার বিংশ শতাব্দীর বিশ্বরেকর্ড করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাবে এ বছরের গোড়া থেকে মে মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বিহারে মোট ১৭০০০ বসন্ত রোগী মারা গেছে। আরও কয়েক হাজার বসন্ত রোগী অন্ধ হয়ে গেছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই লজ্জাজনক রিপোর্টে আরও প্রকাশ পেয়েছে যে, ১৯৭৪ সালের প্রথম পাঁচ মাসে সারা পৃথিবী থেকে মোট ৭৬,৩৮৩ জনের বসন্ত রোগে আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গেছে। তার মধ্যে ৬১,৪৮২টি আক্রমণের সংবাদ পাওয়া গেছে ভারত থেকে। এই সময়ের মধ্যে সারা পৃথিবীতে মোট যে ৩০ হাজার বসন্তরোগী মারা গেছে তাদের মধ্যে ২৬ হাজার জন অর্থাৎ ৮৭ শতাংশ হচ্ছে ভারতীয় আর ১৭ হাজার অর্থাৎ ৫৭ শতাংশ হচ্ছে বিহারী।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে অবশ্য বলা হয়েছে যে, এবার মহামারীর প্রকোপ এমন বেশী মনে হওয়ার অন্যতম কারণ হল। বিহারে এখন সেখানে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাবের সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা আগের তুলনায় অনেক উন্নত হয়েছে। তবে, সংস্থার কর্তৃপক্ষ এই মহামারী দমনে সময়মত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি বলে সরকারের কঠোর সমালোচনা করেছেন।

রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় বিহারের, ঢিলেপলা প্রশাসনব্যবস্থা আরও শ্লথ হয়েছে এবং বিহারের এবারকার মহামারী যে সেই শ্লথতারই একটা পরিণতি তাতে সন্দেহ নেই। এর উপর আবার বিহার সরকারের ২২ হাজার ডাক্তার ও টিকাদার সহ স্বাস্থ্য বিভাগের অন্যান্য কর্মচারীরা বেতনের অসঙ্গতির প্রতিবাদে পাইকারীভাবে ইস্তফা দেওয়ার অথবা ধর্মঘট করার হুমকি দিয়ে রাজ্য সরকারকে আরও বিব্রত করে তুলেছেন।

সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ যে, বিহারের এই বসন্ত মহামারী এখন উত্তর প্রদেশের পার্বত্যাঞ্চলে ও বিহারের সীমান্ত-সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গে ছড়াচ্ছে।

১২-৬-৭৪

—পুণ্ডরীক

নজরুল প্রসঙ্গে

গত ১০ই জ্যৈষ্ঠের 'অমৃতে' প্রকাশিত ডঃ শিবদাস চক্রবর্তীর লেখা 'বিদ্রোহী কবি নজরুল' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়লাম।

লেখক তাঁর এই প্রবন্ধে কবি নজরুলের সঙ্গে বৈষ্ণব কবি, রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের যে প্রসংগ তুলেছেন এবং পরে তাঁর প্রবন্ধটিকে যেভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন ও শেষ করেছেন, তার ফলে অনেকের মনে এই ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক যে, রণতূর্যবাদনই কবি নজরুলের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু যে কবিতার জন্য বাংলা সাহিত্যে কবি নজরুল আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, সেই বিখ্যাত কবিতা বিদ্রোহীর মধ্যেই তিনি বলেছেন—'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতূর্য'। সুতরাং রণতূর্যবাদনই কবির একমাত্র লক্ষ্য নয়, বাঁশের বাঁশরীতে প্রাণের গোপন বাণীকে বাজিয়ে তুলতেও তিনি সমান উৎসাহী। সেই যে বাজনা তা তিনি বাজিয়েছেন অত্যন্ত দরদ দিয়ে তাঁর প্রেম ও প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতায় যার সংখ্যা বড় একটা কম নয়। তাঁর অজস্র গানে এই বাঁশীর সুরে আমরা সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের অতি পরিচিত কণ্ঠকে শুনতে পাই। বলতে দ্বিধা নেই যে, কবি নজরুল হলেন একজন যথার্থ কবি, তিনি কেবল প্রচারক নন। বিদ্রোহীর গানে আমরা কবির যে ভৈরব মূর্তি দেখতে পাই, সেইটাই তাঁর যথার্থ স্বরূপ নয়। তাঁর কবিমনসের দুটি দিক। এর একদিকে আমরা দেখি উল্লাসের করতালি আর অন্যদিকে দেখি ব্যথার রাগিণী—একদিকে কঠিন বাস্তবের প্রত্যক্ষ কায়া অন্যদিকে মনের গহনে সজল মেঘের মায়াই তাঁর কবিত্ব, তাঁর অকৃত্রিম সৌন্দর্যসৃষ্টির পূর্ণ পরিচয় আমরা পাই তাঁর গজল গানগুলিতে। এ ছাড়া তাঁর বহু কবিতায় ফুটে উঠেছে প্রকৃতির সৌন্দর্যময় রূপের মধ্যে মদিরাপানে উন্মত্ত রূপপিপাসীর অসহ্য তৃষ্ণাতুরতা। এই প্রসংগে তাঁর একটি কবিতার এখানে উল্লেখ না করে পারলাম না, যা থেকে আমরা এই সত্যে উপনীত হতে পারি যে, রণতূর্যবাদনই কবির একমাত্র লক্ষ্য নয়—ভাবে, ভাষায়, কোমলতায় ছন্দোবৈচিত্র্যেও তাঁর কাব্য সমৃদ্ধ।

'ঐ নীল গগনের নয়ন পাতায়
নামলো কাজল কালো মায়া।
বনের ফাঁকে চমকে বেড়ায়
তারি সজল আলো ছায়া ॥

ঐ তমাল তালের বুকের কাছে
ব্যথিত কে দাঁড়িয়ে আছে
দাঁড়িয়ে আছে ॥
ভেজা পাতায় ঐ কাঁপে তার
আকুল চল চল কায়া ॥

• • •
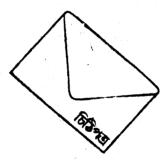
ওকার ছায়া দোলে অতল কালো
শাল পিয়ালের শ্যামলিমায়!
আমলকী-বন থামলো ব্যথায়
থামলো কাঁদন গগন-সীমায়।
আজ তার বেদনাই ভরেছে দিক,
ঘর-ছাড়া হায় এ কোন্ পথিক
এ কোন্ পথিক?
একি সজল তারি আকাশ-জোড়া
অসীম রোদন-বেদন ছায়া ॥'
(সজল বাদল)

বারিদবরণ ঘোষ,
চুঁচুড়া।

ছৌনাচ প্রসঙ্গে

সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় ১৪শ বর্ষ ৪ সংখ্যায় 'পুরুলিয়ার ছৌনৃত্য নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন অচিন্ত্যবাবু। এজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। কিন্তু কতকগুলি লক্ষ্যণীয় বিষয় আমাকে গভীর ভাবে আলোড়িত করেছে।

(১) নাচটির নাম ছৌনা ছো? ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত লোকশ্রুতি পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যায় বেড়দা গ্রামের যে সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তাতে ছোর উল্লেখ পাচ্ছি (অকটোবর, ১৯৬৮)। দি ফোক ডান্সেস অফ ইন্ডিয়া (কিতাবিস্তান, এলাহাবাদ) গ্রন্থে এবং ফোক ডান্সেস অফ ইন্ডিয়া (পাবলিকেশন ডিভিশন গ্রন্থেও 'ছো' (ছো) শব্দের উল্লেখ দেখি। ডঃ সুধীর করণের মতে না ছৌনয়, কোন কারণেই ছৌনয় নিছক ছ-এ ওকার। (দেশ, ১৩ই কার্তিক ১৩৭৮)। বহুদিন আগেও ডঃ করণ ছৌ-ছর বিরোধিতা করে তাই লিখেছিলেন, ...সীমান্ত বাংলায় যেহেতু এই নাচ শুধু 'ছো' সেইজন্য শব্দটিকে অন্যত্র যাই হোক না কেন, এ ক্ষেত্রে তা অবিকৃত রাখাই উচিত। (দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৯৭৩)। জুন ১৯৭০ সালে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে মেদিনীপুর জেলার বাঁশপাহাড়ী গ্রাম সমীক্ষাকালে তিনটি দলের নৃত্য লক্ষ্য করি। দেখেছি সূত্রধার গান গেয়ে বোল দেবার সময় বলে 'ছো'। অকটোবর ১৯৭২ সালে বোড়দা গ্রাম সমীক্ষাকালে আমি নিজে শুনেছি গম্ভীর সিং-এর মুখে (যিনি কিছুদিন আগে ইউরোপে ছো নাচের দলপতি হয়ে গিয়েছিলেন) শব্দটি হল 'ছো', তা ছাড়া লক্ষ্য করেছি এদের এক ধরণের নাচের নাম 'বাবুছো'। পশুপতিপ্রসাদ মাহাত মহাশয় তাই গভীর আপশোষের সঙ্গে বলেছেন, '...পুরুলিয়ার জনমানুষের মধ্যে আমিও একজন, তাই জনমতের কথাটাই বলি—কথাটা 'ছো' (সমতট প্রকাশন, ১৮তম সংখ্যা) পৃঃ ১৩৭)। তাই আমার সিদ্ধান্ত—উৎপত্তি যে কোন শব্দ থেকে হোক না কেন নাচের নাম যে 'ছো' এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

(২) সেন্সাস রিপোর্টস সহ সকলেই বলে থাকেন গ্রামের নাম বাঁড়দা কিন্তু আমি সমীক্ষাকালে শুনেছি 'বোড়দা।'

(৩) ১৯৭২ সালে বোড়দা গ্রাম সমীক্ষাকালে আমি এই গ্রামের মুখোশ শিল্পী নকুলচরণ দত্তের কাছ থেকে শুনেছি তাঁদের বর্ধমান থেকে আগমনের কাহিনী। ডিস্ট্রিক্ট সেনসাস হ্যান্ড বুক ১৯৬১ পুরুলিয়া থেকেও জানতে পাচ্ছি।

"....the local 'Sutradhars (carpenters) .... were reported to have been brought from 'Bartal Para' of Burdwan town by Rara of Baghmundi...."

অচিন্ত্যবাবু কোন তথ্যের ভিত্তিতে দাবী করেছেন, "সম্ভবত মেদিনীপুর জেলার কোন স্থান থেকে এসে তাঁরা বসবাস করেন বাঘমুণ্ডি রাজের আনুকূল্যে," বুঝতে পারলাম না।

যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা-৩৭

সেকালের সংগীতগুণী

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত সেকালের সঙ্গীত গুণী শিরোনামায় মনোজ্ঞ রচনাগুলি খুব আগ্রহ সহকারে পাঠ করছি। আশা করবো—তাঁর লেখনী থেকে এই পর্যায়ের আরো লেখা অমৃতের পৃষ্ঠা অলংকৃত করবে।

কলাবতী কৃষ্ণভামিনী সম্পর্কিত দশম রচনাটিতে কিছু তথ্যগত ভ্রান্তি রয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। রচনাটির শেষাংশে লেখক কৃষ্ণভামিনীর ব্যক্তি জীবন সম্বন্ধে কিছু বলতে গিয়ে লিখেছেন যে, কৃষ্ণভামিনীর জীবনে এক পুরুষের আবির্ভাব ঘটে। "ইনি ছিলেন উত্তর বাংলার এক বিরাট জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজার।" কিন্তু ইনি ম্যানেজার ছিলেন না, নিজেই এস্টেটের মালিক ছিলেন। রংপুর শহর থেকে ৮।১০ মাইল দূরে এক গ্রামে তাঁর নিবাস। তৎকালীন মুদ্রার মূল্যমান হিসেবে তাঁর জমিদারীর বার্ষিক মুনাফা ছিল আনুমানিক লক্ষাধিক টাকা।

—মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

প্রত্যাশা

হরপ্রসাদ মিত্র

সকল কথা হয়নি বলা;
না হোক বলা,—তাতে
যতিপতন-দুঃখ নেই অথবা সন্তাপে
মরিনি কেউ; তবে,
প্রত্যাশার অন্ত নেই,
বিষ্টি হবে কবে?

বিষ্টি হলে ফুলেশ্বরী কামিনী দেবে বাস!
আরো সবুজ হবে আমার বাগানে শ্যামা ঘাস।

বাগান হায়, বাগান হায়,—বাগান ছিল মনে;
বৃক্ষ-লতা রূপের ধূপ খেয়েছে ভাই-বোনে—
আগুন আর হাওয়া,
সারাজীবন সবারই শুধু সেদিকে সরে যাওয়া।

সহজ কথা বেঁকিয়ে বলা ব্যসন যার,—তাকে
একশ' হাত দূরে রেখেই এ কী কঠিন বাঁকে
এসে গেলুম সরলা, ওগো সরলা ভানুমতী,
বুঝি না এ কি লাভ না এ কি ক্ষতি?
পোড়ায় সব কোমল ত্বক ওড়ায় তার ছাই।
প্রত্যাশার অন্ত নেই, বিষ্টি হবে কবে!

গর্ভিণীর স্তনের মতো গাঢ় মেঘের রঙে
খাঁ খাঁ আকাশ ভরছে কেউ ভানুমতীর ঢঙে।
জ্যৈষ্ঠে যাকে যায় না দেখা শ্রাবণে সে-ই সব
সকল কথা হয়নি বলা। বোঝা তো সম্ভব!

(৪৫)

তখন সমুদ্রের পাড়ে পাড়ে সব সামোয়ান নর-নারীদের ভিড়। ওরা জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে দূরবর্তী পাহাড়ের মাথায় আগুন জ্বলতে দেখছে। অতি-উৎসাহী মানুষেরা বোট-ভাড়া করে চলে যাচ্ছে। কি করে যে একজন মানুষকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়! এবং পাহাড়ের চারপাশে ওদের দেখে ছোটবাবু এবং—বোটে সব মানুষেরা এসে হাত নাড়ছে নিচে। ওপরে ওরা উঠে আসতে চায়। দেখতে চায়।

ছোটবাবু না বললে যেন কেউ উঠতে পারছে না। সে বলল, আসুন। এবং ওদের কেউ কেউ মানুষের সেই আধ-পোড়া শরীর দেখে কেমন ঘাবড়ে গেল। ডেভিড খুব বেশি সময় কাছে থাকতে পারে না। ও পাশের ছোট একটা পাহাড়ের মাথায় সে শুয়ে আছে। ওর শরীর গোলাচ্ছে। ছোটবাবু ওকে ওদিকে রেখে এসেছে। কারণ মানুষের মাংসের সেই উৎকট পোড়া গন্ধে ছোটবাবুও ঠিক ছিল না। বরং, অনিমেষ খুব সাহসী মানুষের মতো কাজ করে যাচ্ছে। ছোটবাবু মাঝে মাঝে আগুন কমে গেলে উসকে দিচ্ছে, কাঠ ফেলে দিচ্ছে। কাঠের নিচে শরীর ঢেকে সে সব সময় সবটা পারছে না দেখে থাকছে।

যারা এসেছিল বোট-ভাড়া করে, বেশি বয়সের কেউ কেউ কম বয়সের। বেশ নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ের মাথায় বলে একসঙ্গে বেশি লোক উঠতে পারছে না। পাঁচ সাতজনের একটা দল উঠে আসছে, আবার ওরা নেমে গেলে আর একদল উঠে আসছে।

অনিমেষ বলল, বেশ বেটা মরে গিয়ে এখানে অমর হয়ে থাকল।

আসলে বোধহয় এই দ্বীপবাসীদের এটা একটা খবর—যেন দিন কাল মাস কেটে যাবে, বছরের পর বছর কেটে যাবে, তবু খবরটা ওরা বয়ে বেড়াবে আজীবন। বাংলাদেশের নাবিক বনর্তানবাস এখানে সমুদ্রে ডুবে মরেছিল। ঐ যে দেখছ পাহাড়টা, সমুদ্র থেকে খাড়া উঠে গেছে, ঠিক আকাশের নিচে, তার মাথায় সারারাত আগুনটা জ্বলেছিল। একজন মানুষের শরীর প্রায় সারারাত পাহাড়ের মাথায় জ্বলেছিল—বড় দুঃসাহসিক ঘটনা।

সুতরাং প্রথমে মনে হয়েছিল, একজন মানুষের শরীর আগুনে পোড়ালে দ্বীপ-বাসীরা সহজে মেনে নিতে নাও পারে। পরে মনে হয়েছে, যেন এই দ্বীপবাসীদের জীবনে এটা একটা নতুন রোমাঞ্চ। কারণ সমুদ্রের পাড়ে পাড়ে হাজার হাজার এখন মানুষ। জ্যোৎস্নায় দিগন্তে নক্ষত্রের মতো আগুনের সামান্য ফুলকি দেখছে। আগুনের সেই ফুলকি নিভে না গেলে ওরা বুঝি কেউ ঘরে ফিরবে না। একজন ঘরছাড়া মানুষের মৃত্যুতে ওরা বেদনা বোধ করছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোক প্রকাশ করছে। দেখে মনে হচ্ছে মেয়রকে ধরে হয়তো এ-বছরের বাজেটে পাহাড়ের মাথায় সামান্য একটা এপিটাফের জন্য খরচ রাখবে, যেন আগামী বছরের জুন-জুলাইর ভেতরে সেই এপিটাফের নির্মাণ কার্য শেষ হয়ে যায়। এই সব মানুষেরা যখন বাড়িতে, সমুদ্রের ধারে ধারে এবং পাহাড়ী উপত্যকায় দাঁড়িয়েছিল তখন একটা এপিটাফ নির্মাণ সামান্য ঘটনা। সেই সাদা জ্যোৎস্নায় ছায়া ছায়া সব মানুষের মিছিল। আর আগুন নিভে নিভে শেষ হয়ে আসছে।

চারপাশে সমুদ্র তেমনি ফুঁসছে। সমুদ্র পাহাড়টার চারপাশে মাথা কুটে মরছে। ওরা ডেভিডকে ডেকে নিয়ে এল। এখন সমুদ্র থেকে জল তুলে আনতে হবে। চিতা নিভিয়ে দিতে হবে। ছোটবাবু জল এনে চিতার ওপর ঢেলে দিল। বলল—দাদা, তোমাকে এখানে রেখে গেলাম। সুখে থেকো।

অনিমেষ বলল, থাক শালা। সুখে থাক।

বঙ্কু বলল, তুমি তো থাকলে বড়-টিন্ডাল। তোমার বৌকে আমরা ফিরে গিয়ে মুখ দেখাব কি করে!

ডেভিড জল ঢেলে দিল।

জব্বার এবং অন্য সবাই জল ঢেলে তারপর নেমে এল নিচে। সমুদ্রে ওরা ডুবে স্নান করল। তারপর ভেজা জামা-কাপড়ে বসে থাকল বোটে সবাই। কেউ একটা কথা বলছে না। আকাশে নক্ষত্রমালা তেমনি জেগে আছে। পাহাড়টা ক্রমে জ্যোৎস্নায় অস্পষ্ট হয়ে গেল। ক্রমে ওরা তীরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এবং জাহাজের আলো, মাস্তুলে তেমনি লম্বা জ্বলছে, ওরা বোট ভিড়িয়ে ওপরে উঠে যেতে থাকল।

তখন গ্যাংওয়েতে কোয়ার্টার-মাস্টার বললে, আল্লা মুবারক।

ছোটবাবু বলল, আল্লা মুবারক।

কোয়ার্টার মাস্টার হাত টেনে বলল, কাপ্তানের শরীর ভাল না।

—কি হয়েছে! ডেভিড শুনছ?

—কী!

—কাপ্তানের শরীর ভাল না।

কোয়ার্টার মাস্টার বলল, ফিটে ফিটের ব্যামো।

ছোটবাবু এবং ডেভিড এক মুহূর্ত দেরি করল না। জব্বার আর বঙ্কুকে বলল, তোরা যা। ভিজে জামা প্যান্ট পরে বেশিক্ষণ থাকিস না। এবং ছোটবাবু নিজের কেবিনে এসে তাড়াতাড়ি পোশাক পাল্টে নিল। পাশের কেবিনগুলো বন্ধ। সবাই ঘুমিয়ে আছে হয়তো। রাত গভীর। কোন সাড়া শব্দ নেই। সে ওপরে উঠে বনির কেবিনে টোকা মারল। সাড়া শব্দ এখানেও কিছু নেই। বনির কাছে জানতে পারত কি হয়েছে। ও-পাশের পোর্ট-হোলে উঁকি মেরে দেখল, বনি কেবিনে নেই। সে এবার সিঁড়ি ধরে আরও ওপরে উঠতে থাকল। চার্ট-রুমের পাশে কাপ্তানের খাস-কামরা। দরজা খোলা। ভেতরে আলো জ্বালা। সে উঁকি দিয়ে দেখল, পায়ের কাছে বনি বসে আছে। মাঝে মাঝে চিক-মেট। কাপ্তানের শরীর দেখা যাচ্ছে। কাপ্তানের শরীর দেখে চিনতে সে বুঝতে পারল।

চিফ-মেট ছোটবাবুকে উঁকি দিতে দেখে বলল, কাম-ইন!

স্যালি হিগিনস বললেন, কে?

—ছোটবাবু।

—কাম-ইন কাম-ইন। যেন প্রাণ পেয়েছেন হাতে। এবং মুখে সরল বালকের মতো হাসি।

ছোটবাবু ভেতরে ঢুকলে বললেন, বোস। মুখ এত গোমরা কেন! আরে, আমার কিছু হয় নি! বড়-টিন্ডাল। ওটা একটা আহাম্মক। ওর জন্য কষ্ট পেয়ে লাভ নেই।

ছোটবাবু কখনও কাপ্তানের খাস-কামরায় আসে নি। একটা সবুজ রঙের আলো জ্বলছে। তিনি শুয়ে আছেন। বুক পর্যন্ত সাদা চাদরে ঢাকা। দাঁতের দু পাটি খোলা। খুব বুড়ো এবং শীর্ণকায় মনে হচ্ছে স্যালি হিগিনসকে। এবং কেন জানি মনে হল মানুষটা প্রাচীন মানুষের মতো অথবা ভীষ্মের শরশয্যায় যেন শুয়ে আছেন। সে পাশে বসে বলল, কেমন আছেন।

—খুব ভাল। জ্যাক তুমি শুতে যাও। কতক্ষণ এ-ভাবে বসে থাকবে।

এবং ছোটবাবু দেখল, জ্যাক মাথার কাছে বসে আছে। তার দিকে তাকাচ্ছে না। অথবা সে যে কেবিনে এসেছে একেবারে যেন বুঝতে পারে নি, জ্যাক কি যে চুপচাপ এবং সেও কেন জানি আর একটা কথা বলতে পারল না। এমন একটা সুন্দর কেবিন, ঠিক মাথার কাছে যীশুর মূর্তি। নিচে ছোট্ট গোল টেবিল। ফুলদানিতে কিছু বনা ফুল। হুকে জাহাজি টুপি ঝুলছে। লকার অতিকায়। দুটো পোর্ট-হোল দু দিকের দেয়ালে। তিনি বুকে দু-হাত প্রার্থনার মতো রেখেছেন। ছোটবাবুর কেমন ভাল লাগছে না। ডেভিড এখনও আসছে না কেন।

তখন স্যালি হিগিনস বললেন, বেশ সময় লেগে গেল তোমাদের।

ছোটবাবু বলল, হ্যাঁ স্যার। ডেভিড এখনও আসছে না কেন! সে দরজার দিকে বার বার তাকাচ্ছে।

হিগিনস বললেন, বড়-টিন্ডালের বাড়িতে কে আছে?

—ওর স্ত্রী।

—আর কেউ নেই?

—আর কে আছে জানি না।

—কালই খবরটা পাঠিয়ে দিতে হবে।

চিফ-মেট বলল, আপনি চিন্তা করবেন না। আমরা তো আছি।

ডেভিড ঝড়ের মতো ঢুকে প্রথমে পালস দেখল কাপ্তানের। তারপর চোখ টেনে দেখল। দেখি জিভ। বের করুন। ছোটবাবু উঠে দাঁড়িয়েছে। ওরা দু'জন প্রায় এখন যেন সমবয়সী মানুষ। ওরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে স্যালি হিগিনসকে দেখছে। জ্যাক বসে রয়েছে মাথার কাছে। একটা কথা বলছে না। জ্যাকের পোশাক আরও ঢিলে-ঢালা। আর্চি আড়চোখে জ্যাককে দেখছে। এবং এ-কেবিনে সে বসে রয়েছে। এই যে মেয়ে জ্যাক, এবং এই যে সুগন্ধ মেয়ের চার-পাশে—কেমন তীব্র আকর্ষণ। সে সারারাত জেগে যেন বসে থাকতে পারবে। জ্যাক বসে থাকলে রাত জেগে বসে থাকতে এতটুকু কষ্ট হবে না তার।

ডেভিড বলল, আপনি ঘুমোন স্যার।

স্যালি হিগিনস বললেন, আমার ঘুম আসছে না ডেভিড।

—না ঘুমোলে তো চলবে না। এই জ্যাক, তুমি আর বসে থাকবে না। যাও। শুয়ে পড়ো গে। স্যার, সে চিফ-মেটের দিকে তাকাল।

চিফ-মেট বলল, যাচ্ছি।

ডেভিড এবার আর্চির দিকে তাকিয়ে বলল, কি ব্যাপার তোমার ঘুম পায় না। এস। সে প্রায় সবাইকে নিয়ে বাইরে বের হয়ে এল। একজন কোয়ার্টার-মাস্টার শুধু জেগে বসে থাকল বাইরে। আলো নিভিয়ে দেওয়া হল। ওকে এ-ভাবে জাগিয়ে রাখা ঠিক হয় নি। পালসের বিটে সামান্য গন্ডগোল এখনও আছে। ওরা বোট-ডেকে নেমে গেল। জ্যাক বলল, ফোনে কথা বলার সময় অজ্ঞান হয়ে যান। ডাক্তার বলে গেছেন, ভীষণ চিন্তা ভাবনায় এমন হয়েছে।

জ্যাক আবার বলল, বাবা ফোনে কথা বলতে বলতে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েন।

—কার সঙ্গে কথা বলছিলেন? ডেভিড রেলিঙে দাঁড়িয়ে এমন বলল।

—বুঝতে পারলাম না। কেবল শেষে বলতে শোনলাম, আসবেন। তারপরই বসে পড়লেন। আর আমার দিকে ভূত দেখার মতো তাকিয়ে থাকলেন ডেভিড।

বোধহয় মধ্যযামিনীতে ওরা এভাবে বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে ভীষণ চিন্তাভাবনার ভেতর কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। জাহাজ সম্পর্কে নতুন কিছু কি খবর এসেছে! চিফ-মেট পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। বয়সে প্রবীণ মানুষটি রাতের পোশাক পরে আছেন। মাথার ওপর সেই নিরবধিকালের আকাশ আর তার নক্ষত্রমালা। ওপরে কাপ্তান, জাহাজের সবচেয়ে দামী মানুষটা বুকের কাছে করজোড়ে হাত রেখে শুয়ে আছেন। বার বার জিজ্ঞাসা করেও ওরা ফোনে কি কথা হয়েছে জানতে পারে নি। এমন কি নতুন দুঃসংবাদ রয়েছে এই প্রাচীন জাহাজকে কেন্দ্র করে। এমন শক্তসমর্থ মানুষটা পর্যন্ত বিচলিত বোধ করছেন! ওরা কেউ আর কথা বলতে পারল না। নিঃশব্দে যে যার কেবিনের দিকে হাঁটতে থাকল।

সকালে যে যার মতো ঘুম থেকে উঠেছিল, যে যার মতো চা খেয়ে ডেকে উঠে এসেছিল। পাহাড়ের মাথায় সেই আগুনের শিখা আর নেই। সূর্য লাল বলের মতো পাহাড়ের মাথায় জেগে উঠছে। এই সমুদ্র, দ্বীপের নারকেল গাছ অথবা অন্য গাছের জঙ্গল দেখতে দেখতে কে বলবে, গত রাতে ওরা ও-পাশের একটা পাহাড়ে একজন মানুষকে রেখে এসেছে। সকালের সব কাজ-কর্মের ভেতর বড়-টিন্ডালের দামী একটা কথা এবং নানাবর্ণের দুঃখ অথবা শোক সন্তাপ, এবং একটা ভুতুড়ে ওরা কাজ করে যাচ্ছিল। ফল্কা থেকে ত্রিপাল খুলে ফেলা হচ্ছে কাঠ ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে। ডেরিক নামিয়ে তোলা হচ্ছে। মাল বোঝাই হবে বলে সবাই এক দণ্ড দাঁড়াতে পারছে না। বড় বড় সব টাগ-বোট এগিয়ে আসছে ক্রমশ। বড় বড় পিপে ভর্তি ফসফেট। এবং সামোয়ান মানুষেরা টাগ-বোট জাহাজের কাছে নিয়ে এসে হাঁকছে—হাড়িয়া।

আর এ-ভাবে যখন জাহাজে হাড়িয়া হাফিজ শব্দ, কাঠ ফেলার শব্দ ঘর ঘর করে বড় বড় পিপে উঠে যাচ্ছে ডেরিকে, নিচে অনেক নিচে খাদের মতো জাহাজের তলায় নেমে যাচ্ছে পিপেগুলো—তখনই দেখা গেল, একটা সাদা রংয়ের বোট জাহাজের দিকে ভেসে আসছে। দু'জন মানুষ, একজন বেঁটে মতো, একজন লম্বা মতো, সাদা পোশাক শরীরে, দাঁড়িয়ে আছে বোটে। ওদের একজনের হিপপকেটে ছোট্ট মতো একটা হাতুড়ি। জাহাজটাকে দেখেই বেঁটে মতো মানুষটা হাওয়ার ওপর হাতুড়িটা দোলাচ্ছে।

আর সেই হাতুড়িটা দোলাতে দোলাতে লোকটা লাফ মেরে সিঁড়িতে উঠে এল। তারপর সিঁড়ি কাঁপিয়ে সে আরও ওপরে উঠে আসছে। পেছনে সেই লম্বা মতো মানুষ। ওরা দু'জন প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে জাহাজের সেই শেষ তলায় উঠে যাচ্ছে। গোলগাল মানুষটা যে প্রস্থে দৈর্ঘ্যে সমান— যার শরীর বেঢপ, যার মুখে স্মিত হাসি এবং হাসলে কান পর্যন্ত নড়তে থাকে, সে কেমন মাঝে মাঝে দুষ্টু ছেলের মতো বালকেডে হাতুড়ি ঠুকে দেয়াল ঘেঁষে কি শুনছে! তখন সেই মানুষের চোখে মুখে কি অপার বিস্ময়। যেন সেই শব্দ লোহার অভ্যন্তরে ঢুকে নানারকমের খেলা, প্রায় লুকোচুরি খেলার মতো অথবা হৃৎপিণ্ডের শব্দ শোনার মতো কান পেতে শুনছে [illegible] ভাব শিরা উপশিরা কতটা ঠিক আছে।

[illegible] সাহেব [illegible]-রুম থেকে উঠে আসার [illegible] দেখলেন, অদ্ভুত দেখতে একটা লোক [illegible]লের গাড়িতে উবু হয়ে আছে। সে [illegible] পাশে উবু হয়ে কি দেখছে! তারপরই মনে হল উবু হয়ে দেখছে না, কান পেতে কি শুনছে! হাতুড়িতে দু'বার ঠুকেই কান পেতে বড় সন্তর্পণে শুনছে কিছু। চোখে মুখে দুষ্টু বালকের মতো ছবি। মুখে সরল হাসি। খুশিতে তার প্রাণ ভরে যাচ্ছে। হাতুড়িটা আনন্দে বাতাসে ছুঁড়ে আবার লুফে নিচ্ছে।

আর তখন লম্বা মতো মানুষটি হাতের ইশারায় ডাকল তাকে। বড় বেশি তোমার বাপু নেশা! জাহাজে উঠেই কাজকাম আরম্ভ করে দিয়েছ! এস দেখি জাহাজের বুড়ো কর্তা কি বলে। কাল ফোনে যা তেড়ে উঠেছিলেন, এখন হাতে হাতুড়ি দেখলে ঘাড় ধরে নামিয়ে দেবেন।

—ভিতরে আসতে পারি?

চিফ-মেট বলল, কাকে চাই?

—ক্যাপ্টেন স্যালি হিগিনস। বলে সে একটা লম্বা কাগজ চিফ-মেটের নাকের ডগায় তুলে ধরল।

লোকটার সাহস আছে! বলা নেই কওয়া নেই একেবারে বাঁকে উঠে এসেছে। কিন্তু কাগজটা পড়ে সে বুঝতে পারল—হেড-

অফিসের খোদ কর্তার লোক—সুতরাং যা হয়ে থাকে, আদর আপ্যায়নের শেষ থাকে না। —আপনারা বসুন। দেখছি। ক্যাপ্টেন কাল থেকে সামান্য অসুস্থ। দেখি—বলে সে সিলকরা খাম হাতে নিয়ে ঢুকে গেল ক্যাপ্টেনের ঘরে। তিনি বেশ উঠে বসেছেন—এবং ফলের রস খাচ্ছেন। জ্যাক সব হাতের কাছে এগিয়ে দিচ্ছে।

চিফ-মেট বলল, স্যার দুজন লোক এসেছে। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

স্যালি হিগিনস গ্লাস রেখে দিলেন। —তা হলে ওরা এসে গেছে। ফলের রস মাত্র সামান্য খেয়েছেন।

জ্যাক বলল, তুমি খেয়ে নাও না বাবা! ওরা তো বসছে। ওরা তো চলে যাচ্ছে না।

চিফ-মেট বলল, স্যার ওদের ভেতরে নিয়ে আসব।

—না। ওদের চার্ট-রুমে বসতে বল, আমি যাচ্ছি।

—কিন্তু স্যার, আপনার এ-শরীর নিয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে!

—কিছু হবে না। ওদের বসতে বল।

জ্যাক বলল, বাবা!

—কী!

—তুমি যাবে না। ওদের এখানে আসতে বলি।

স্যালি হিগিনস ডাকলেন, চিফ-মেট! সেই হাঁক করে ডাক। একেবারে আগের মতো স্বাভাবিক। এতটুকু বিচলিত বোধ করছেন না।

—আজ্ঞে কিছু বলছেন স্যার?

—আমার শরীর ভাল না, এ-সব আবার বল নি তো।

চিফ-মেটের চোখ মুখ শুকিয়ে গেল। সে তো আগেই বলে দিয়েছে। চিফ-মেট বলল, স্যার!

—তোমাদের কবে যে কান্ডজ্ঞান হবে! যাও। তিনি এবার বেশ সহজভাবে নেমে এলেন বাংক থেকে। যেন সেই যৌবনে ফিরে যাচ্ছেন। প্রথমে তিনি তাঁর দু পাটি দাঁত মুখে পুরে দিলেন। একেবারে যুবকের মতো মুখ হয়ে গেল। তিনি তাঁর ইউনিফরম পরে নেবেন। কাপ্তান-বয় হাজির সামনে। আর জ্যাক অগত্যা কি করে—সে চুপচাপ বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থাকল। বড় বড় পিপে সব ওপরে উঠে যাচ্ছে, নিচে নেমে যাচ্ছে। ছোট-বাবু মাথায় টুপি পরে তেলের টব আর বালতি নিয়ে এক একটা উইনচের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকছে, মাল ওঠা-নামা, অর্থাৎ গিয়ার, লিভার এবং সবকিছু ঠিক-মতো চলছে কিনা দেখে আবার অন্য উইনচে ছুটে যাচ্ছে। দড়ি-দড়া বেয়ে উঠে যাচ্ছে সব মানুষেরা। কুলিরা সব হাঁকডাক করছে। ওরা হাত তুলে বলছে হাড়িয়া, মাল নেমে যাচ্ছে। ওরা বলছে হাফিজ, খালি পিপে উঠে ভেসে যাচ্ছে বাতাসে।

জ্যাক পরেছিল নীল রঙের ট্রাউজার। হাঁটু পর্যন্ত গোটানো। মাথায় সেও টুপি পরেছে। এবং চারপাশে ফসফেটের গুড়ো, কুয়াশার মতো উড়ছে বলে, সে একটা নিরিবিলি জায়গায়, অর্থাৎ ট্যাঙ্ক টপে শরীর এলিয়ে দিয়ে সামনের রেলিঙে পা রেখে দূরের সমুদ্রে গভীর এক নীল নির্জনতা দেখতে পাচ্ছে। সে বুঝতে পারছে না ফোনে বাবাকে লোকটা কি বলেছিল। যারা দেখা করতে আসছে তারা কি সেই লোক। বাবাকে সে দেখেছে, যখন ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েন তখন সব কিছু তাঁর বেশি ঠিকঠাক চাই। কারো তিনি তখন সামান্য ত্রুটি সহ্য করতে পারেন না। মার্জনা করা তো দূরের কথা। সে বুঝতে পারছিল, বাবা ভেতরে ঠিকঠাক নেই। সে দমে গেল ভীষণ।

তখন স্যালি হিগিনস পুরোপুরি ক্যাপ্টেন স্যালি হিগিনস। চকচকে সাদা জুতো, সাদা মোজা, সাদা প্যান্ট সাদা হাফ সার্ট, সোনালী স্ট্রাইপ কাঁধে চার চারটা। মাথায় এংকোরের সোনালী ছবি আঁকা কাপ্তানের টুপি। ফিটফাট এবং ভীষণ রাশভারি মানুষ দেখাচ্ছিল তাঁকে। ভেতরে ঢুকলে ওরা দুজন উঠে দাঁড়াল। পাশে চিফ-মেট আজ্ঞাবহনকারী মানুষের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

লম্বা মতো মানুষটি ঝুঁকে সামান্য হাত বাড়াল, নাম বলল।

বেঁটে মতো মানুষটি ঝুঁকে নাগাল পাচ্ছিল না ক্যাপ্টেনের হাত। পেট ভীষণ মোটা। টেবিলের ও-পাশে পেটের চর্বি থকথক করছে। জামার ওপরে পেট ভেসে রয়েছে। মোটা বেল্ট। বেল্ট খুলে ফেললেই প্যান্ট হুড় হুড় করে পড়ে যাবে। স্যালি হিগিনস আরও বেশি ঝুঁকে হাত বাড়ালেন। বললেন, ইউ দেন মিস্টার ইয়াদু ওসাকা।

—ইয়েস ইয়েস ওসাকা। ইয়াদু ওসাকা।

—বসুন।

ওরা বসে পড়ল। তিনি বললেন, কফি।

চিফ-মেট মুখ বাড়াল দরজায়। কাপ্তান-বয় সোজা দাঁড়িয়ে আছে। সে হুকুমের প্রতীক্ষায় আছে।

—কফি।

স্যালি হিগিনস মাথা থেকে টুপি খুলে পাশের হুকে ঝুলিয়ে দিলেন। খুব সতর্ক চোখ মুখ। তিনি জানতেন, এরা কি বলবে। তিনি বললেন, কবে এসেছেন এখানে।

—সকালের ফ্লাইটে।

—মিঃ ফেল কেমন আছেন?

—ভাল।

—তাঁর স্ত্রী।

—ভাল আছেন।

—তাহলে সবাই ভাল আছে। দেখি আপনাদের কাগজপত্র। মিঃ হ্যামিলটন আপনাকে আগে কোথাও দেখেছি?

—না স্যার।

—মুখটা খুব চেনা চেনা।

মিঃ হ্যামিলটন ভীষণ লম্বা আর রোগা। দালাল লোকেরা দেখতে যেমন হয়ে থাকে—এবং পৃথিবীতে সব দালাল লোকদের মুখই বুঝি এমন হয়। মিঃ হ্যামিলটনকে বুঝি তাই খুব চেনা চেনা লাগছিল। ফাইল থেকে সিলকরা খাম বের করে আলোতে দেখে ছিঁড়ে ফেললেন। এবং চিফ-মেটকে বললেন, তুমি আসতে পার। কাছাকাছি থাকবে। ডাকলে সাড়া দেবে।

তিনি খামের ভেতর থেকে লাল রঙের প্যাডে দেখলেন সেই সমনের নোটিশ। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠছে।

—তারপর ইয়াদু ওসাকা, জাহাজটা একবার দেখবেন বলছেন।

—ইয়েস স্যার। পুরানো জাহাজ। একটু যাচিয়ে নিতে হবে। বলেই সে তার হিপ-পকেট থেকে ছোট্ট একটা হাতুড়ি বের করে প্রায় কানের ভেতর গুঁজে ফেলল। যেমন স্বর্ণকারদের হাতুড়ি পাতলা চকচকে এবং দামী ইস্পাতের তৈরি হয়ে থাকে অথচ ভারি মনোরম, কানের ভেতর পেনসিল গুঁজে রাখার মতো এমন একটা ভারি হাতুড়ি লোকটা অনায়াসে কানে গুঁজে রেখে দিল। সারাজীবন সে এ-কাজটাই করেছে। পুরানো জাহাজ কেনা বেচার কাজ। জাহাজের ইস্পাতে ঠুকে ঠুকে দেখে নেবে কতটা কি মাল আছে জাহাজে। কানে এখন লোকটা পেনসিল গুঁজে রাখার বদলে হাতুড়ি গুঁজে রাখে। কানের পাশে কড় পড়ে গেছে। কানটা ভারি হয়ে গেছে।

স্যালি হিগিনস দেখলেন, কফি এসে গেছে। তিনি কফি ঢালতে ঢালতে বললেন, জাহাজটা দেখে আপনাদের কিছু মনে হচ্ছে না।

—জাহাজটা তো স্যার অনেকদিন দেখার ইচ্ছে ছিল। এত শুনেছি। এখন দেখে তো আর দশটা জাহাজের মতোই লাগছে। ইয়াদু ওসাকা ঢোক গিলল বলতে বলতে।

—তাই তো হওয়া উচিত।

মিঃ হ্যামিলটন বলল, মাঝখানে শোনলাম আপনাদের জাহাজের কোনো খবর নেই।

—মাঝে মাঝে থাকে না। খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন স্যালি হিগিনস। এতদিনের একটা বিশ্বাস এরা ভেঙে দিতে এসেছে।

—যাক ভালোয় ভালোয় শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন।

—ভারি বিশ্বাসী জাহাজ।

ইয়াদু ওসাকার শুধু মুখটা দেখা যাচ্ছে। গলা পর্যন্ত টেবিলে ঢাকা। শুধু মুখটা দেখতে পাচ্ছেন স্যালি হিগিনস। হাঁড়ির মতো মুখ। চুল কালো। সজারুর কাঁটার মতো চুল খাড়া। সব সময় স্মিত হাসি। হাসলে দুটো কান নড়তে থাকে। লোকটা কেন যে হাসছে। কান নড়তে থাকলে ভীষণ অস্বস্তি। এবং মনে হচ্ছিল ইয়াদু ওসাকা একটা পিপে থেকে গলা বের করে কথা বলছে। কান মলে কান মাড়া বন্ধ করে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে।

ওসাকা বলল, খুব গলে গেছে। মতো বলল, ভারি ইচ্ছে ছিল, ঠিক ইচ্ছে না বরং স্বপ্ন বলতে পারেন সিউল ব্যাঙ্ক জাহাজ আমার হাত দিয়ে পাস্ হবে।

স্যালি হিগিনসের সত্যি ইচ্ছে হল কান ধরে বের করে দেবেন। কিন্তু তিনি দাঁত ঠেলে দিলেন ওপরে—বয়েস হয়েছে আমারও ইয়াদু ওসাকা। সত্যি মিথ্যা যা খুশি শুনে

এটাকে স্ক্র্যাপ করার জন্য পাগল হয়ে গেছি। তারপর তিনি কেমন জেদি বালকের মতো ভাবলেন, আসলে জাহাজকে ভয় তারও কম নয় এতদিন তিনি তাকে বাগে রেখেছিলেন, জাহাজ এখন শেষ সফরে তাঁর হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। তিনি বললেন, জাহাজ তো আপাতত জিলং যাচ্ছে।

—তা যাক। হ্যামিলটন বললেন। আপনাদের চুক্তি শেষ না হলে এটাকে ভাগাড়ে নিয়ে যাচ্ছি না। মিঃ ফেল, সব খুলে আমাদের বলেছেন।

স্যালি হিগিনস বললেন, যদি এর ভেতর কিছু হয়ে যায়।

—চুক্তিপত্র সে-ভাবেই করা আছে। একটু থেমে হ্যামিলটন চোখ বড় বড় করে বলল, কিছু হবে বলে কি আপনার মনে হচ্ছে?

—না না। এমনি বললাম। সব কথাবার্তা খোলামেলা থাকা ভাল।

—আপনি তো শুনেছি জাহাজটাকে সব অশুভ প্রভাব থেকে রক্ষা করে আসছেন।

—এ-সব গল্পগাথা। জাহাজ ঠিকই আছে। গুজব বলতে পারেন।

—আমরা তো জাহাজটা সম্পর্কে এত শুনেছি স্যার, উঠেই মনে হয়েছিল, আমাদেরও কিছু একটা হয়ে যাবে।

স্যালি হিগিনস হা হা করে হেসে উঠলেন।

ইয়াদু ওসাকা মুখ ভার করে ফেলল। এই প্রথম স্যালি হিগিনস দেখলেন, ইয়াদু ওসাকার মুখে কোন কথা নেই। বিমর্ষ। সে বলল, আমরা তো শুনেছি ক্যাপ্টেন লুকেনার নিজের তদারকে জাহাজটা বানিয়েছিলেন।

—তা হয়তো হবে।

ওসাকা বলল, স্যার সব খবরাখবর নেবার জন্য হামবুর্গে কিছুদিন থেকে গেলাম। রেজিস্টার খাতা, সাল তারিখ, সব জাহাজের নাম ঘেটে দেখলাম কোথাও এর কোন রেকর্ডস নেই।

—আছে কোথাও। সব দেখা তো আপনার পক্ষে সম্ভব নয়।

—তা ঠিক বলেছেন স্যার। তবে হামবুর্গ শহরের বাইরে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। সে কেবল বলল, সিউল-ব্যাংক, জাহাজের নাম নয়। অন্য নাম ছিল জাহাজটার। ক্যাপ্টেন লুকেনারকে সে চিনত। কাউন্ট পরিবারের ছেলে তিনি। বাবার নাম—কি যেন ফ্রাক গে ভুলে গেছি। তিনি শেষ পর্যন্ত আর ক্যাপ্টেন লুকেনার ছিলেন না। তাঁকে সি-ডেভিল বলা হত। সমুদ্রে একটা জাহাজ আর একটা মানুষ—অনেক কীর্তি কাহিনী আছে। সে একটা রোমহর্ষক ঘটনা স্যার। বলে ফ্যাক করে হাসতে গিয়ে কেমন চেপে গেল সব কথা।

স্যালি হিগিনস ছাড়বেন কেন! ক্যাপ্টেন লুকেনার সম্পর্কে লোকটা কিছু খবর রাখে হবে। তিনি বললেন, জাহাজের কি নাম ছিল আপনি জানেন? ক্যাপ্টেন লুকেনার যে জাহাজটা চালাত তার নাম আপনার মনে আছে?

ওসাকা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। বসে থেকে সে স্যালি হিগিনসকে যেন ভালভাবে দেখতে পাচ্ছে না। ক্যাপ্টেন লুকেনার কিংবদন্তির মানুষ, আর এ-যেন আরও বড়। তাকে ভাল করে দেখতে না পেলে যেন ঠিক জমছে না। ওসাকা দাঁড়িয়ে বেশ স্বাভাবিক বোধ করছিল। স্যালি হিগিনস তাকে কি বলেছেন ভুলে গেছেন। উল্টে সে বলল, জার্মান ইমপেরিয়াল সার্ভিসে তিনি লেফটেনান্ট কমান্ডার ছিলেন।

—ওর জাহাজটার নাম জানেন? স্যালি হিগিনস বিরক্ত মুখে কথাটা বললেন!

—হ্যাঁ স্যার। সেড্লার। কেউ বলল, সিজলার। কেউ বলেছে সিজালার। সঠিক কি হবে জানি না! হ্যাঁ স্যার বাপের নাম মনে পড়েছে—বাপের নাম গ্রাফ ফেলিকস ভন লুকেনার।

স্যালি হিগিনস কাগজপত্র দেখছেন। ওর দিকে তাকাচ্ছেন না। সে কি পরীক্ষা দিচ্ছে। সে কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, ওটা বাপের নাম না ছেলের নাম মনে নেই স্যার।

স্যালি হিগিনস এবার কাগজপত্র একটা পেপার ওয়েটে চাপা দিলেন। তারপর কেমন হাই তুলে বললেন, লুকেনার সম্পর্কে এত আপনার কৌতূহল কেন?

ওসাকা বলল, স্যার জাহাজটা সম্পর্কে শুনেছি কি যেন, সত্যি যদি অশুভ প্রভাব থাকে যদিও এ-সবে আমার বিশ্বাস নেই তবু কি হয় জানেন স্যার, মন তো মানুষের দুর্বল, দুর্বল মুহূর্তে সবই সত্যি মনে হয়। সেজন্য কিছু খোঁজখবর নেওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল। সবই পেয়েছিলাম—ওদের পারিবারিক মর্যাদা—ওর ঠাকুরদার বাপের খবর। সে একটা ইতিহাস। ওর ঠাকুরদার বাপ শুনেছি স্যার ঘোড়ার ঘাস কাটত।

হ্যামিলটন জানেন ওসাকা খুব মজার লোক। স্যালি হিগিনস হেসে ফেলেছিলেন, কিন্তু লোকটা যদি জোরে হাসলে ঘাবড়ে যায়, তিনি সামান্য হাসলেন। হ্যামিলটন জোরে হাসল।

ওসাকা বলল, বিশ্বাস করুন। ঘোড়ার ঘাস কাটতে কাটতে লোকটা অশ্বারোহী সৈন্য হয়ে গেল। নিজে সৈন্যদল গড়ে তুলল। তখন তো স্যার রাজারা সব ভাড়াটে সৈন্যদল রাখতেন। তখন ওর ঠাকুরদার বাপের বয়স বিশ হয় নি। তের বছরে ঘর ছেড়েছিল, ঘোড়ার ঘাস কাটার কাজ নিয়েছিল, তখন তো স্যার প্রুসিয়ান ওয়ার চলেছে। প্রুসিয়ান আর্মিতে সে তার সৈন্যদল নিয়ে ভিড়ে গেল। এবং ফ্রেডারিক দা গ্রেটের আন্ডারে একজন তখন সে জাঁদরেল জেনারেল। এক নিঃশ্বাসে এতটা বলে সে ভোঁস করে শ্বাস নিল।

হিগিনস বললেন, আপনি দেখছি অনেক খবর রাখেন!

—রাখব না স্যার। ওর ঠাকুরদার বাপের তো শেষ পর্যন্ত গিলোটিন হয়েছিল। বলে চোখ গোল করে ফেলল ওসাকা।

—গিলোটিন। যেন কত স্বাভাবিক কথা। স্যালি হিগিনস বললেন, শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন লুকেনারের কি হয়েছিল বলতে পারেন!

—সে তো ঘুরে ঘুরে জেনেছি অনেক। কিন্তু একটার সঙ্গে আর একটার কোনো মিল নেই স্যার।

স্যালি হিগিনস বললেন, মিল পাওয়া খুব কঠিন।

ওসাকা বলল, স্যার এক গ্লাস জল খাব।

স্যালি হিগিনস জল আনতে বলে কাগজের ওপর সামান্য ঝুঁকে পড়লেন। দুবার তিনবার কটা লাইন বার বার পড়লেন। —এখানে তো দেখছি আপনাদের বিক্রি বাটা দর দাম সব কথাবার্তা শেষ। জাহাজ বেঁচে দিয়েছে তবে!

—হ্যাঁ স্যার।

—তবে আর দেখবেনটা কি!

হ্যামিলটন আমতা আমতা করতে থাকল।

ওসাকা বলল, এতদূর থেকে উড়ে এলাম স্যার, একবার ঘুরে সবটা দেখে যাব না! দেখে না গেলে ঘুম হবে! আপনার হুকুম স্যার বলুন! তাছাড়া অনেক সইসাবুদ আছে। দেখিয়ে দেব, বলে সে প্রায় ঝুঁকে টেবিলের ওপর লাফ দিয়ে উঠে আসতে চাইল! —তাছাড়া কোথায় কি কি আছে...!

—ঠিক আছে আপনি বসুন।

ওসাকা ভালো ছেলের মতো বসে পা নাড়াতে থাকল।

হিগিনস বললেন, গিলোটিন হয়েছিল

ওসাকা খুব বিনীত ছাত্রের মতো আবার দাঁড়িয়ে গেল। সে মুখস্থ বলে যাবার মতো বলল, সে স্যার ফ্রেডারিক দা গ্রেট মহা পাজি লোক ছিল। [illegible] ঠাকুরদার বাপ যুদ্ধ জয়ের পর পাওনা [illegible] মিটিয়ে নিতে গেল, বললে, পাওনা গ[illegible]ক, দেশের জন্য যুদ্ধ করেছ, কিচ্ছু [illegible] না। রাগে দুঃখে সব তকমা রাজার পায়ে রেখে সোজা প্যারিসে। তখন স্যার ফরাসী বিপ্লব চলছে। বিপ্লবে যোগ দিয়ে বেশ রাজার বিরুদ্ধে লড়ছে। ভালই লড়ছিল। কাল হল সেই এক পাওনা গন্ডা নিয়ে। সে প্যারিসে ফিরে তার দাবীর কথা বলল। তার সৈন্যদলের মাইনে বাকি পড়েছে কতদিন না দিলে চলছে না। ওরা বলল, তোমার বাপু গিলোটিন। একজন লোককে টাকা পয়সা না দিয়ে গিলোটিন করা কত সহজ বলুন। বলে আবার ফ্যাক করে হেসে দিল।

স্যালি হিগিনস শুধু বললেন, খুব সহজ। তারপর দ্বিতীয় আর কোনো কথা না শুধু বললেন, কোথায় কোথায় সই করতে হবে বলে দিন। সব কাগজপত্র পড়ার আর তাঁর ধৈর্য নেই। এখনই হয়তো তিনি হাই তুলে ফের চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দেবেন।

ওসাকা ঢক ঢক করে সব জলটা খেয়ে ফেলল তখন। বলল, স্যার এখানে। বলে সে ঘুরে স্যালি হিগিনসের প্রায় ঘাড়ের কাছে চলে এল। হাতের চেটোতে মুখ মুছে একটা একটা পাতা উল্টে যেতে থাকল,

আর স্যালি হিগিনস সই করে যাচ্ছেন। হাত কাঁপছিল সই করতে, বোধ হয় ভীষণ দুর্বল শরীর। একবার মাংকি-আয়ল্যান্ডে উঠে গোটা জাহাজটা দেখার ইচ্ছে হয়েছিল। তারপর ভেবেছেন কি হবে দেখে! একটা জীবন এ-ভাবে বাজি রেখেছিলেন একটা জাহাজের পেছনে, এখন তাও শেষ হয়ে যাচ্ছে। তিনি বললেন, ওসাকা পুরানো জাহাজ সম্পর্কে খোঁজ খবর করায় তোমার বোধ হয় একটা নেশা আছে।

—তা আছে স্যার। পৃথিবীর সব প্রাচীন জাহাজ কবে কোথায় কিভাবে বিক্রি হয়েছে বলে দিতে পারি।

—তা যখন পার সিউল-ব্যাঙ্ক কত পুরোনো নিশ্চয়ই বলতে পারবে।

—পারি না।

—কেন?

—খোঁজ খবর কেউ শেষ পর্যন্ত সঠিক দিতে পারে নি।

—তার মানে।

—মানে স্যার এও হয় ওও হয়।

স্যালি হিগিনস বললেন, তুমি বেশ মানুষ হে ওসাকা।

ওসাকা বলল, এখানে একটা সই বাদ যাচ্ছে স্যার। এত সব কথার ভেতরেও ওসাকার হিসেব ঠিক আছে। ভুলে কিছু বাদ যাচ্ছে না।

স্যালি হিগিনস বললেন, তাহলে সিজালারকে কিনে নিয়ে যাচ্ছ ভাবছ।

আমার তো মনে হয় তাই। তবে কি জানেন স্যার! এখন আর পাতা ওলটাচ্ছে না সে। পনের বিশ পাতার একটা ডিড। প্রতিটি পাতায় প্রতিটি অক্ষরের প্রতি ওসাকার নজর ঠিক আছে। চোখে মুখে যতটা বোকা বোকা, কাজে কর্মে তার বিপরীত। বরং ওসাকা ভীষণ ধূর্ত স্বভাবে। সে বলল সিজালারের সি-ডোভিলের কি হয়েছিল কেউ ঠিক বলতে পারেনি। কেউ বলেছে জাহাজটা ডুবে গেছে বলসোভিক সমুদ্রে। কেউ বলেছে, প্রথম মহাযুদ্ধে তিনি প্রাণ হারিয়েছেন। ইংরেজদের হাতে জাহাজটা চলে যায়। আবার কেউ বলে থাকেন স্যার জাহাজটা ডুবেও যায় নি, কেউ ধরেও নিয়ে যায় নি। তিনি নিজে জলদস্যু হবার জন্য মিথ্যা প্রচার করে সরে পড়েছেন। এখনও নাকি লুকেনারকে দেখা যায় কোনো নির্জন দ্বীপে তিনি পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন। কেউ বলে থাকে তিনি কোনো কোনো বন্দরে পর্যন্ত মাঝে মাঝে ছদ্মবেশে চলে আসেন। তাঁকে একা একা হাঁটতে দেখা যায়। সমুদ্রের পাড়ে পাড়ে তিনি তিনি হেঁটে যাচ্ছেন। মনে হয় তিনি আমাদের ভেতরেই আছেন স্যার। এরা কখনও মরে যায় না। আমাদের ভেতরেই বেঁচে থাকে।

স্যালি হিগিনস এবার উঠে পড়লেন। তিনি যে নিজে গিলোটিনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন কথাবার্তায় এতটুকু বোঝা যাচ্ছে না। সামান্য একটা ডিড সই করার মতো সব কাজ সেরে বললেন তাহলে চলুন জাহাজটা আপনাদের দেখিয়ে দি। কোথায় কি আছে, রিপোর্টের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পাবেন। কিন্তু আবার এদিক ওদিক বিক্রি হয়ে গেলে আপনাদের সত্যি ক্ষতির কারণ ঘটবে।

—তা স্যার ঠিক।

স্যালি হিগিনস ওঠে টুপি টেনে নিলেন। মাথায় পরে তারপর কিছু যেন ভাবছেন এমনভাবে দাঁড়িয়ে চুপচাপ নিজেকে ঠিক করে নিলেন। পাছে ভেঙে পড়েন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন গত রাতের মতো—ঠিক না। বনি কাছে কোথাও নেই। থাকলে হয়তো সত্যি তিনি ভেঙে পড়তেন। অন্যমনস্ক থাকার জন্য বললেন, ফানেল আমরা পাল্টেছি বছর পনের আগে। ওসাকা ফানেলে দুবার হাতুড়িতে ঘা মেরে দেখল। স্যালি হিগিনসের কথার সত্যাসত্য যাচাই করে সে খুশী হল। সিঁড়ি ধরে ক্রমে বয়লার-রুমে—এই তিনটে বয়লার। বাঁ দিকে স্টার-বোর্ডে ঢুকে গেল ওরা। দুটো জেনারেটর রেসিপ্রাকটিঙ এনজিনের কলকব্জা, কনডেনসার পাম্প পাইপের নাম এবং প্রপেলার স্যাফট প্রপেলার স্যাফটের মাথায় চড়ে বসেছে ওসাকা। সে হাতুড়িতে ঘা মারছে, আর চোখে মুখে এক অতীব বিস্ময়। যেন ভেতরে শুধু স্টিল পোরা নেই, অন্য কিছু ধাতু, সোনাদানা নেইতো! স্যালি হিগিনসের এমনই মনে হতে থাকল। একটা কসাইর মতো চোখ মুখ ওসাকার। লোভে লালসার চোখ মুখ অধীর। ওসাকা বলল স্যার শুনতে পাচ্ছেন?

স্যালি হিগিনস বললেন, কী?

—আসুন। কান পেতে শুনুন। বলে সে হাতুড়ি দিয়ে ঠং ঠং করে ক'বার ঘা মারল।

স্যালি হিগিনস কান পেতে তেমন কিছু শুনতে পেলেন না।

—শুনতে পাচ্ছেন না আওয়াজটা অনেক দূরে পর্যন্ত স্যাফটের গা বেয়ে চলে যাচ্ছে। যেন এখানে আঘাত করলে সারা জাহাজটা কাঁপছে। সারা জাহাজটা ঝনঝন করে বাজছে। মিরাকল, সামথিং মিরাকিল স্যার সে বলতে পারত। কিন্তু ভীষণ বোকামির কাজ হয়ে যাবে, পরে যদি জাহাজডুবির খবর দিয়ে বিক্রিদাতার ডিড অচল করে দেয়। সে যে খুশীর চোটে কি সব করতে যাচ্ছিল! সে ঝুলে স্যাফট থেকে নেমে পড়বে ভাবল, নামার সময় মনে হচ্ছে, এত নিচে সে নাগাল পাবে না। ধপাস করে পড়ে যেতে পারে। সে হেঁটে হেঁটে কিছুটা দূরে গেলে স্যাফট জয়েন্টে নামার ধাপ পাবে। ততটা হেঁটে গেলে নেমে যেতে পারবে। কিন্তু সে হাতুড়ি দুলিয়ে ডাকল, মিঃ হ্যামিলটন আসুন। ওর কাঁধে এক হাত রেখে প্রায় শরীর বেয়ে নিচে নেমে এল ওসাকা। বলল, কেনাবেচাতে সামান্য লাভ লোকসান থাকে স্যার। এ নিয়ে আর ভেবে লাভ নেই। চলুন ওপরে ওঠা যাক।

স্যালি হিগিনস দেখলেন টানেলের দরজায় চিফ-মেট ডেভিড, ছোটবাবু সবাই অপেক্ষা করছে।

এ-শরীর নিয়ে কি যে নামার দরকার নিচে, ওরা ভেবে পেল না! আর এ-দুটো লোক সেই থেকে এত কি কথা বলছে! এত কি দেখলে! লোকটার হাতে সেই হাতুড়ি। কানে গুঁজে রাখছে ফের। ওরা স্যালি হিগিনসকে খুঁজতে এসেছে এখানে। শরীর ভাল না। কি যে করছেন!

স্যালি হিগিনস ওপরে উঠে বললেন, মিঃ ফেলকে আমার অভিবাদন থাকল। বলবেন, আমরা ভাল আছি।

ওসাকা বোটে ওঠে হাওয়ায় হাতুড়িটা দুলিয়ে বলল বলব আপনারা ভাল আছেন। তারপর ওসাকা দেখল, সিউল-ব্যাংক জলে ভেসে আছে। যত দূরে বোট চলে যেতে থাকল তত জাহাজটা ক্রমে ছোট হবার পরিবর্তে চোখের ওপর বড় হয়ে যেতে থাকল। ভয়ে ওসাকার শরীরে কেমন জ্বর এসে গেল। মাথা ঘুরছে।

(ক্রমশঃ)

বাংলাদেশ সাহিত্য ও সংস্কৃতি আলোচনা চক্র ও পুস্তক প্রদর্শনী

পশ্চিম বাংলা ও বাংলাদেশ—রাজনৈতিক ভূগোলের বিচারে এই দুই ভূখণ্ডের মধ্যে তফাৎ অনেক, গত তিন চার বছরের মধ্যে এ দূরত্ব অনেকটা কমেছে বটে, কিন্তু তবু দূরত্ব যে আছে তা বলাই বাহুল্য। এ-কথা অনস্বীকার্য যে, এই দুই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ একই মাতৃভাষার প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও আন্তরিক মমতাবশতঃ রাজনৈতিক ব্যবধান অগ্রাহ্য করেই পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ করে নিচ্ছেন। এটা একান্ত স্বাভাবিক। দীর্ঘ দুই যুগ পরে এই স্বাভাবিক মেলামেশা সবে শুরু হয়েছে। দু-দেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণে এবং আমাদের মাতৃভাষার উত্তরোত্তর উন্নতির উদ্দেশ্যে এই মেলামেশা ক্রমশঃ আরো ঘনিষ্ঠ হতে থাকবে—সমস্ত শ্রেণীর বাঙ্গালীই এই আশা করবে।

সম্প্রতি (৯ই জুন) কলকাতার রবীন্দ্র সদনে বাংলাদেশ সাহিত্য ও সংস্কৃতি আলোচনা চক্র ও পুস্তক প্রদর্শনীর উদ্বোধনের দিনে এই প্রয়োজনীয়তার কথাই উভয় দেশের সাহিত্যিক ও সুধীবৃন্দের ভাষণে ও আলোচনার মধ্যে সোচ্চার ছিল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সাহিত্যিকগণের মধ্যে পশ্চিম বাংলার অন্নদাশংকর রায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, তুষারকান্তি ঘোষ, মনোজ বসু ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং বাংলাদেশের মুস্তাফা নূরুল ইসলাম, আলাউদ্দীন আল আজাদ, সৈয়দ সাহাবুদ্দিন, শামসুজ্জামান খান, লায়লা সামাদ ফজলে রাব্বি বেগম জোবেদা খানম বেগম খোদেজা খাতুন ও কামরুল হক-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ তাঁর ভাষণে বলেন : দু-দেশের মৈত্রী দৃঢ় করতে বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের মুক্তির পর দু-বছর কেটে গেছে অথচ দু-দেশের মধ্যে এই আদানপ্রদান এখনও সহজ নয়। এ-ব্যাপারে বিদেশী মুদ্রার প্রশ্নে বাধা থাকা উচিত নয়। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, পশ্চিম বাংলার লেখকরা বাংলাদেশের মানুষদের আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে লিখবেন এবং বাংলাদেশের লেখকগণও পশ্চিম-বাংলার মানুষদের সম্পর্কে লিখবেন। এই-ভাবেই ক্রমশ দুই দেশের মানুষদের মধ্যে প্রকৃত অন্তরের সম্পর্ক গড়ে উঠবে। বাংলাদেশে প্রকাশিত পুস্তকাবলী ক্রমশঃ ভারতে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে দেখে শ্রীঘোষ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

অন্নদাশংকর রায় তাঁর ভাষণে আশা প্রকাশ করেন যে, বর্তমানের এই আলোচনা-চক্র বাংলা সাহিত্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। প্রবোধকুমার সান্যাল মনোজ বসু ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও সভায় ভাষণ দেন।

বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতা মুস্তাফা নূরুল ইসলাম বলেন : দুঃখজনক ব্যাপার যে, উভয় দিকের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও দু-দেশের মধ্যে বইয়ের আদানপ্রদান সহজ হয়ে উঠছে না। এ-সম্পর্কে সর্ব-প্রকার বাধা দূর করবার জন্য তিনি এ-রাজ্যের সাহিত্যিক ও সাংবাদিকগণের নিকট আবেদন জানান। তাঁর ভাষণে জানা গেল যে, বাংলাদেশের বাংলা একাদেমি ও জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র এ-ব্যাপারে চেষ্টা করে চলেছেন। উভয় দেশের মধ্যে মুদ্রিত বইয়ের আদানপ্রদানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এ বিভাগে আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি। বাংলাদেশ দু বছর স্বাধীন হয়েছে—তবু এখনো কেন দু-দেশের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের প্রধানতম মাধ্যম—বইয়ের আদানপ্রদান, তা যে কেন সম্ভব হচ্ছে না তা বোঝা যাচ্ছে না।

এই উপলক্ষে যে পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে এ-পারের সাহিত্য-রসিকদের তা বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে।

নানা দেশে বন্দী ও নির্যাতিত শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক

উগান্ডার রাজধানী কাম্পালা থেকে সম্প্রতি সাংবাদিক ডাগলাস টরগারসন-এর এক বার্তায় বুদ্ধিজীবী নির্যাতনের এক ভয়াবহ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এই সংবাদে জানা যায় যে, সে দেশের স্বল্প-শিক্ষিত একনায়ক ইদি আমিন তাঁর স্বেচ্ছা-চারিতা প্রকাশ্যে সমর্থনে অনিচ্ছুক ব্যক্তি-মাত্রেই নির্বিচারে খতম করে ফেলছেন। এঁদের মধ্যে লেখক, সাংবাদিক কবি শিক্ষক অধ্যাপক সকলেই আছেন। এই শ্রেণীর অন্ততঃ পঞ্চাশ জনকে বিগত দেড় বছরের মধ্যে খতম করা হয়েছে বলে জানা গেল।

আর একটি সংবাদে জানা যায় যে, এমনেসটি ইন্টারন্যাল-এর পরিচালিকা মিস এমেলিয়া অগসটাস রাষ্ট্রপুঞ্জের কর্তৃপক্ষের নিকট পৃথিবীর ৩১টি দেশে বন্দী ১৭৬ জন কবি সাহিত্যিক নাট্যকার ও সাংবাদিক-গণের প্রতি মানবিক অধিকার রক্ষার দাবী জানান। এই সংস্থার তালিকায় দেখা যায়, এই ধরনের বন্দীর সংখ্যা ইন্দোনেশিয়াতে ৩৭, চিলিতে ২৬, তুরস্কে ২০ সোভিয়েত রাশিয়ায় ১৮ তাইওয়ান ও মালয়ে ৮ জন করে, গ্রীস ও দক্ষিণ কোরিয়ায় ৫ জন করে, কিউবাতে ৪ জন মরক্কো তানজানিয়া ও বাংলাদেশে ৩ জন করে, তাহিতি, ব্রাজিল স্পেন সিঙ্গাপুর ও উত্তর ভিয়েতনামে ২

ান করে পাকিস্তান ক্যামবারনস ইকোয়া-ডার গয়াতেমালা পানামা পেরু ফিলি-পাইনস দক্ষিণ আফ্রিকা দক্ষিণ ভিয়েতনামের . জন করে।

লক্ষণীয় এই তালিকায় ভারতের কোনও াম দেখা যায় না।

ালকাতায় পুশকিন-এর ১৭৫তম জন্ম-াবস পালন

রুশ কবি ও ঔপন্যাসিক আলেক-ান্দার পুশকিনও জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৬শে মে। এ-বৎসর তাঁর ১৭৫তম বর্ষ ূর্ণ হলো (জন্ম ১৭৯৯)। বাঙালী াঠকের কাছে পুশকিন-এর পরিচিতি ধানতঃ ডটার অব দি কমানডান্ট উপন্যাসের য়িতা হিসেবে। পুগাচেভ-এর বিদ্রোহকে ন্দ্র করে রচিত এই উপন্যাসখানাই পুশ-নকে আন্তর্জাতিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে তষ্ঠা এনে দেয়। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে দ রাশিয়াতে তিনি প্রধানত কবি সেবেই পূজিত। পুশকিন স্মরণে কল-তায় ৪ঠা জুন একটি অনুষ্ঠান হয়ে য়েছে। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি লেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ংবাদিক বিশ্বজিৎ রায় পুশকিনের বতার অনুবাদ পাঠ করে সকলকে নন্দ দেন। কলকাতার সোভিয়েট তাবাসের ভাইস কন্সাল ওয়াই মরোজভ ুশকিন সম্পর্কে ভাষণ দেন।

ুর ভ্রাতৃদ্বয় ও গঁকুর সাহিত্য পুরস্কার

গত ২৬শে মে তারিখে পৃথিবীর অনেক শরই শিল্পী সাহিত্যিক মহলে এডমণ্ড ুর-এর স্মরণে নানা সভা-সমিতি হয়ে ছ। খাস ফ্রান্সের গঁকুর আকাদেমি ভিন্ন ার্মানী স্পেন এবং ইতালীতেও বিভিন্ন হত্য সমিতির উদ্যোগে এই ধরনের সভা ং গঁকুর ভ্রাতৃদ্বয়ের সম্পর্কে আলোচনা থাকে কিছুটা ব্যাপকভাবে; অন্যান্য ণ অপেক্ষাকৃত কম। এডমণ্ড গঁকুর ুদন গঁকুর ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। তাঁর । ১৮২২ খৃষ্টাব্দ। ছোট ভাই জুলের । হয়েছিল আট বছর পরে ১৮৩০ াব্দের ৭ ডিসেম্বর। দুই ভাই-ই তঃ শিল্পী ছিলেন। স্বদেশের তথা দেশের, বিশেষ করে জাপানী চিত্রশিল্প র্কে ব্যক্তিগত নোট-বইতে সুকুমার শিল্প. না, প্রেম-প্রীতি দয়া করুণা অপত্য —অর্থাৎ মানব প্রবৃত্তির নানা ধারা র্কে তাঁরা যে নোট রাখতে আরম্ভ ন, তা-ই পরবর্তীকালে শিল্পের সঙ্গে । সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁদের প্রতিষ্ঠা এনে । এই সাফল্যের পরে তাঁরা যখন থর করলেন যে, উপন্যাস রচনা করবেন, তাঁরা একটি অভিনব উপায় উদ্ভাবন লেন। সাধারণত ঔপন্যাসিকগণ যেমন ঠিক করে লিখতে আরম্ভ করেন, তাঁরা করতেন না। শিল্পীর দৃষ্টি দিয়ে দেশের নানা ঘটনা দৃশ্য তথা ব্যক্তি-চরিত্র র মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো, তাই লিপিবদ্ধ করে রাখতেন তারপর সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাগুলি তাঁরা একটা প্লটের সূত্রে গেঁথে দিতেন। তাঁদের প্রায় প্রতিটি উপন্যাসই এইভাবে রচিত বলে সে-সব উনিশ শতকের ফ্রান্সের মানুষের মনের তথা সামাজিক অবস্থায় নিপুণ চিত্র হয়ে উঠেছিল।

ছোট ভাই জুলে মারা যান মাত্র ৪০ বছর বয়সে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু এডমণ্ড তার পরেও ২৬ বছর বেঁচে ছিলেন। দু-ভাই একত্রে যে উপন্যাসগুলি রচনা করে গেছেন, তা বাদ দিয়েও দু-ভাই পৃথকভাবে দুখানা বই রচনা করেছিলেন—জুলের পত্রাবলী এবং এডমণ্ডের ৯ খণ্ডের জার্নাল। এড-মণ্ডের একটি উইল অনুসারে ফ্রান্সের গঁকুর আকাদেমি গড়ে ওঠে, যার প্রধান উদ্দেশ্য হলো স্বদেশে তথা বিদেশে উপন্যাস রচনায় যোগ্য ব্যক্তিদের প্রেরণা যোগানো। গঁকুর সাহিত্য পুরস্কার নামে যে পুর-

আর্থিক প্রসঙ্গ

নবদিগন্ত

ইয়োর এক্সেলেনসী, এবার আপনার দেশে জনবিস্ফোরণ সম্বন্ধে আপনি কি ভাবছেন তা দু-চার কথায় বলুন। উগাণ্ডার রাষ্ট্রপতি জেনারেল ঈদি আমিনকে (বিগ ড্যাডি বা বড় বাবা নামেও খ্যাত) অনুরোধ করলেন ফরাসী তথ্য চলচ্চিত্রের পরিচালক বাবে'ট স্কোডার।

—জনবিস্ফোরণ বলতে কি বলতে চাইছেন—জানি না—আমিন উত্তর দিলেন, আমার নিজেরই ত বারটি ছেলে আর ছটি মেয়ে। হ্যাঁ আমি বেশ ভালই লক্ষ্যভেদী। (আই এ্যাম এ ভেরী গুড মারকসম্যান। ইয়েস)। তবে সবারই কি অতসংখ্যক সন্তান-সন্ততির জনক হবার ক্ষমতা বা সঙ্গতি আছে? তাছাড়া আমাদের জনবল যে বাড়ানো দরকার। নইলে কাজ করবে কে? যারা আমাদের দেশকে শোষণ করছিল সেই এশিয়ানদের ত তাড়ান হয়েছে...

আমিন বড় তাড়াতাড়ি বলছিলেন আর নাটকীয় ভঙ্গীতে এদিক-ওদিক ঘুরছিলেন। ফলে ক্যামেরাম্যান বা শব্দযন্ত্রী—কারও পক্ষেই তাল রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। সুতরাং বাধ্য হয়েই পরিচালক মহাশয়কে বলতে হল : ইয়োর এক্সেলেনসী। অত জলদ নয়।

শিশুর মত মুখে (আমিনের চেহারাখানা বিরাট হলেও মুখ নাকি সত্যিই শিশুর মত) আকর্ণবিস্তৃত হেসে আমিন থামলেন, তারপর ধীরেই বলে চললেন : জনবিস্ফোরণ একটা রোগ — সাম্রাজ্যবাদীদের গড়া রোগ। আমি ও নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না, আমার মাথা ঘামাবার আরও অনেক বিষয় আছে।...

ম্যালথুসীয় তত্ত্ব :

ঘটনাটি এই মাসেরই প্রথম দিকের। উগাণ্ডা ও তার রাষ্ট্রপতি ঈদি আমিনের তথ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করছিলেন উক্ত ফরাসী পরিচালক। যাক সে কথা। আমাদের প্রসঙ্গ হল জনবিস্ফোরণ। দেখা গেল যে অন্যতম স্বল্পোন্নত (না, অনগ্রসর?) দেশের রাষ্ট্রপ্রধান—যেখানে জনবিস্ফোরণ ঘটছে বলে অনেকের ধারণা—তাঁর দেশে জনবিস্ফোরণে বিশ্বাস করেন না। অধ্যাপক পল অ্যান্টনী স্যামুয়েলসনও করেন না তবে মাত্র স্বল্পোন্নত দেশসমূহের নয় সারা বিশ্বের ক্ষেত্রে। স্যামুয়েলসনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল : আপনি কি মনে করেন, বর্ধমান জনসংখ্যার পক্ষে পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদ পর্যাপ্ত? আর বর্তমানে পর্যাপ্ত—হলেও কতদিন তা থাকবে বলে আপনার ধারণা? স্যামুয়েলসনের উত্তর তাঁর নিজের ভাষাতেই (অবশ্য অনুবাদের মাধ্যমে) দেওয়া যাক : আমাদের নিজেদের ছটি ছেলেমেয়ে। তেমনি পৃথিবীর যদি সব দম্পতির সন্তান-সন্ততি ছয় হত তবে পৃথিবীর সম্পদ-সামর্থ্যের ওপর নিশ্চয় টান পড়ত এবং জীবনযাত্রার মান দিন দিন নিম্নাভিমুখী হত। কিন্তু আমার মনে হয় না যে আমাদের ছটি ছেলেমেয়ের প্রত্যেকের সন্তান-সংখ্যা গড়ে ছয় হবে। বস্তুত, জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্তন হচ্ছে। বলা যায় বিভিন্ন উন্নত দেশে গতি হবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির শূন্য হারের (জেড্ পি) দিকে।

—তবে কেন জনবিস্ফোরণের আতঙ্ক সারা বিশ্বব্যাপী ছড়ানো হচ্ছে?

স্যামুয়েলসনের উত্তর ছিল, ভালই করা হচ্ছে। অনেক সময় বেচবার জন্যে খুব বেশী রকম ঢাকঢোল, পেটাতে হয়—আতঙ্কের সৃষ্টি করতে হয়। নইলে লোকে কিনবে কেন? নব্য ম্যালথুসীয় তত্ত্বের প্রচারকরা জনবিস্ফোরণের দরুন যে রোজ-কেয়ামতের আতঙ্ক প্রচার করে বেড়াচ্ছিলেন তা একদিন ম্যালথুসীয় তত্ত্বের মতই ভ্রান্ত প্রমাণিত হবে। বিজ্ঞানকে যদি ঠিকমত মানুষের উপকারে লাগাতে পারি তবে মাত্র এই বিশ শতকেই না, একুশ শতকেও আমরা রোজ-কেয়ামতকে কলা দেখাতে পারব। যাই হোক, বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ—এ-ব্যাপারে একেবারে গা এড়িয়ে না দিয়ে এ-নিয়ে কিছুটা ভাবা ভাল।

অতএব বিশ্বে জনবৃদ্ধি সম্বন্ধে অধ্যাপক স্যামুয়েলসনের ধারণা সম্পূর্ণ আশাবাদের দ্যোতক। তবে বক্তব্য হল যে তিনি বিষয়টির আলোচনা করেছেন উন্নত দেশসমূহেরই পরিপ্রেক্ষিতে। কোন স্বল্পোন্নত দেশই যে শূন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির দিকেই এগোচ্ছে না — তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সম্প্রসারণের হার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করারও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এবং এর জন্যে আতঙ্কের সৃষ্টিও যে অপরিহার্য তাও বলা বাহুল্য। স্যামুয়েলসনের ভাষায় : পারহ্যাপস ইউ শ্যাল হ্যাভ টু ওভারসেল ইন অর্ডার টু সেল।

দা নিউ :

স্যামুয়েলসনের অর্থনীতির নবম সংস্করণ হাতে আসবার অনেক দিন আগেই অমৃতেরই এক সংখ্যায় 'দা নিউ' বা নীট আর্থিক কল্যাণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম। সুতরাং বর্তমানে সংক্ষেপেই তার পুনরুল্লেখ করছি।

মোট জাতীয় উৎপন্ন (ইংরেজীতে গ্রোস ন্যাশানাল প্রডাকট বা সংক্ষেপে জি এন পি) অন্যতম অর্থনৈতিক ধারণা। কিন্তু অর্থনীতি পাঠ না করেও অনেকে ধারণাটির সঙ্গে—অন্তত এর নামের সঙ্গে পরিচিত। সংক্ষেপে মোট জাতীয় উৎপন্ন হল প্রতি বছর দেশে উৎপন্ন দ্রব্যাদির (বস্তুগত দ্রব্য ও সেবামূলক কার্য) অর্থমূল্যের সমষ্টি। একে উৎপন্নের সমষ্টি হিসেবে জাতীয় আয়ও (ন্যাশানাল ইনকাম অ্যাজ ন্যাশানাল প্রোডাকট) বলা হয়।

এতদিন পর্যন্ত এই মোট জাতীয় উৎপন্নকেই আর্থিক কল্যাণের মাপকাঠি বলে গণ্য করা হত। ফলে মোট জাতীয় উৎপন্ন যত বৃদ্ধি পেত, দেশ তত সমৃদ্ধি লাভ করছে—আর্থিক কল্যাণের পথে চলছে বলে ধরে নেওয়া হত। সম্প্রতি কিন্তু কয়েকজন অর্থনীতিবিদ পরিমাপের প্রতি অন্ধ ভক্তির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এঁদেরই একজনের উক্তি হল : জি এন পি বা গ্রোস ন্যাশনাল প্রডাকটের কথা আর আমাকে

বলবেন না। আমার কাছে জি এন পির অর্থ হল গ্রস ন্যাশনাল পল্যুশান। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন অধ্যাপকের মতে, আর্থিক কল্যাণ এত বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, একে পরিসংখ্যানবিদদের হাতে ছেড়ে দিয়ে মোট জাতীয় উৎপন্নের মাধ্যমে মাপলেই চলবে না—মোট জাতীয় উৎপন্নকে পরিশোধিত করে নীট আর্থিক কল্যাণের হিসেব করতে হবে। এই নীট আর্থিক কল্যাণ বা নেট ইকনমিক ওয়েলফেয়ারকেই সংক্ষেপে নিউ বলা হয়। নিউ-এর পরিমাণে আধুনিক নগরজীবনের সবকিছু অ-মনোরমতা (ডিস অ্যামিনিটিজ) ও অসুবিধা যেমন দূষিত বায়ু, জনাকীর্ণ জনপথ, কর্ণবিদারক শব্দসমন্বয় ইত্যাদি। অপর দিকে আবার যে সব কাজকর্ম বিনামূল্যে সম্পাদিত হয়—যেমন আমাদের গৃহস্থালীতে স্ত্রীলোকদের কাজকর্ম—তাদের ধরতে হবে, যা মোট জাতীয় উৎপন্নের হিসেবের মধ্যে ধরা হয় না। ধরলে আমাদের মত দেশের জাতীয় উৎপন্ন অনেক বাড়বে আর উন্নত দেশের জাতীয় উৎপন্ন কমবে।

এখন প্রশ্ন, নিউ-এর অনুসরণে কি সম্প্রসারণ বা মোট জাতীয় উৎপন্নের বৃদ্ধির ধারণাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে হবে? অধ্যাপক স্যামুয়েলসনের মতে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করার প্রয়োজন নেই, তবে সম্প্রসারণকে নিয়ন্ত্রণ করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে নিউ-এর দিকে নজর রেখে এবং উন্নত দেশের উন্নতি থেকে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশসমূহের সম্প্রসারণে সাহায্য করতে হবে।

শিল্পোন্নয়ন ও পরিবেশ :

শিল্পোন্নয়নের ফলে পরিবেশ কিছুটা দূষিত হবেই কিন্তু এ নিয়ে আতঙ্কিত হবার কারণ এর মধ্যেই ঘটেছে বলে মনে হয় না—এই হল অধ্যাপক স্যামুয়েলসনের অভিমত।

সত্যিই দেখা যাচ্ছে যে পরিবেশ নিয়ে অধিকাংশ দেশ এখনও মাথা ঘামাচ্ছে না। ১৯৭২ সালে স্টকহোম সম্মেলনে অনেক দেশই ঘোষণা করেছিল যে, পরিবেশ কিছুটা দূষিত হয় হোক আমাদের শিল্পোন্নয়ন চাই। পরিবেশ দূষিত হওয়ার আতঙ্ক হল ধনীদের ব্যাধি। তাঁরা আরও বেশী দিন বাঁচতে চান। সুতরাং বাতাস কতটা দূষিত হল তা নিয়ে তাঁদের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। অন্তত পরিবেশজনিত কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলো সম্প্রসারণের পথে থেমে যেতে পারে না। থেমে যেতে দিলে ভুলই করা হবে।

স্বল্পোন্নত দেশ ও সম্প্রসারণ :

—কেন ভুল করা হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে স্যামুয়েলসন বলেছেন : দেশের মধ্যে যেমন বণ্টনের—বৈষম্যের সমস্যা রয়েছে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তেমনি রয়েছে উন্নত ও স্বল্পোন্নত ব্যবধানের সমস্যা। এ সমস্যার মোকাবিলা করতেই হবে—আয়ের স্তরে বৈষম্য হ্রাস করা অপরিহার্য। অবশ্য আগের চেয়ে অনেক দেশের অবস্থাই ভাল। তবে প্রত্যাশা আরও বেশী। ভারত বা ল্যাটিন আমেরিকার লোকে যখন টেলিভিশনের মাধ্যমে মার্কিনী জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচয় লাভ করে তখন তারা মোটেই খুশী হয় না বরং তাদের দেশের উন্নয়নের মন্থর গতিতে বিরক্তই হয়। সুতরাং ব্যবধানকে সংকুচিত করা দরকার এবং এই কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নে উৎসাহ দিতেই হবে।

বৈদেশিক সাহায্য :

উৎসাহ দেবার জন্যে যে সাহায্য করা প্রয়োজন তা দ্বিপক্ষীয় হবে, না তাকে আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে প্রবাহিত করা হবে? স্যামুয়েলসনের অভিমত হল যে এই ধরনের বৈদেশিক সাহায্যের বণ্টন-ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমেই করা ভাল। নচেৎ এর মাধুর্য নষ্ট হয়ে যায়। আর তা ছাড়া রাজনৈতিক কারণে পক্ষপাতের প্রশ্নও আছে।

কৃষি বনাম শিল্প :

এই সাহায্য প্রধানত কৃষির না শিল্পের উন্নয়নে হবে তা নির্ভর করবে উন্নয়নের স্তরের ওপর। তবে কৃষির ওপর অন্ধ ভক্তি না থাকাই ভাল, কারণ দেখা গেছে যে, শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকের উৎপাদন কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন থেকে বেশী। অপর দিকে আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থাইল্যান্ড কোরিয়া প্রভৃতি দেশ কৃষির অকল্পিত উন্নতিসাধন করেছে। সুতরাং এটা ঠিক কৃষি বনাম শিল্পের প্রশ্ন নয়, উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধানেরই সমস্যা। দু-একটি শিল্পই অবশ্য সমৃদ্ধির সূচক নয়—একটা ইস্পাত কারখানা বা বিমান সংস্থা থাকলেই দেশ উন্নত হয়ে ওঠে না। ধনীরা চুরুট খায় কিন্তু আপনি যদি একটা চুরুট কিনে টানতে শুরু করেন তা হলেই আপনি ধনী বলে পরিচিত হবেন না। অতএব একটা ইস্পাত কারখানাই যথেষ্ট নয়।

মূল্যস্ফীতি :

মূল্যস্ফীতির প্রকার ভেদ ঘটেছে—বলা যায় এক নতুন ধরনের মূল্যস্ফীতির উদ্ভব ঘটেছে। একে বলা যায়, উৎপাদক-ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি / বা বিক্রেতার মূল্যস্ফীতি (কস্ট-পুস্ বা সেলার্স ইনফ্লেশান)। এই ধরনের মূল্যস্ফীতির সময় সম্প্রসারণ ও নিয়োগসংস্থান স্থিতিশীল বা বদ্ধাবস্থায় থাকতে পারে। এই অবস্থাকে স্ট্যাগফ্লেশান—বদ্ধাবস্থায় মূল্যস্ফীতি বলা যায়।

বিক্রেতার মূল্যস্ফীতির কারণ হল পুনর্নিয়োগ অনিয়ন্ত্রিত বাজার এবং স্থির মূল্যস্তরের মধ্যে স্বাভাবিক সামঞ্জস্য-বিহীনতা। বস্তুত কোন দেশই আজ পর্যন্ত এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করতে সমর্থ হয়নি।

এ পর্যন্ত উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি বা কস্ট-পুস ইনফ্লেশানের জন্যে শ্রমিক-সংঘ গুলোকেই দায়ী করা হত। এখন দেখা যাচ্ছে, শুধু শ্রম-বিক্রেতারাই নয়, সকল ধরনের বিক্রেতাই দায়ী। মোট জাতীয় উৎপন্নকে যদি ১০০ শতাংশ মনে করা হয় তবে উৎপাদকরা এই ১০০ শতাংশই পেতে পারে। এর বেশী যদি তারা পায় তবে মূল্যস্ফীতি বা বিক্রেতাদের মূল্যস্ফীতি (সেলার্স ইনফ্লেশান) না ঘটে পারে না। অন্যভাবে বলা যায়, উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটে যদি (বিক্রেতাদের পুস্ বা ধাক্কার দরুন) শুধু যদি দামই বৃদ্ধি পায় তবে মূল্যস্ফীতি না ঘটে পারে না। এই রকম মূল্যস্ফীতি একটা স্তরের পর মন্দার সূচনা করতে বাধ্য।

মন্দা :

কেইনসের পরবর্তী যুগে বাণিজ্যচক্র ঠিক অতীতের বস্তুতে পরিণত হয়নি—তবে মহামন্দা আর ঘটছে না। এমনকি অবনতি (রিসেসানও) হলে দাঁড়িয়েছে স্বল্পকালীন এবং সংখ্যায় অত্যল্প। তবুও তা ঘটছে এবং এর অন্যতম কারণ হল বিক্রেতার মূল্যস্ফীতি।

পথনির্দেশ :

এই সব ব্যাপারে অর্থনীতিবিদ শুধু কি বিশ্লেষণ করেই ক্ষান্ত থাকবেন না পথনির্দেশও করবেন। অধ্যাপক স্যামুয়েলসনের মতে, নিরপেক্ষ থাকার দিন চলে গেছে। সুতরাং মূল্য-বিচারের কাজও হাতে নিতে হবে। দরকার হলে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে তত্ত্ব ও বিশ্লেষণকে কাজেও লাগাতে হবে।

উপসংহার :

অধ্যাপক স্যামুয়েলসন বিশ্লেষিত উপরি-উক্ত তত্ত্ব ও ধারণার অধিকাংশই ব্যাপ্তির দিক দিয়ে বিশ্বজনীন প্রকৃতির। সুতরাং আমাদের দিক দিয়েও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে আমি মাত্র একটি বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এবং তা হল বিক্রেতার মূল্যস্ফীতি বা সেলার্স ইনফ্লেশান। বিক্রেতারা মূল্যস্ফীতিকে যে স্তরে নিয়ে যাচ্ছেন তাতে শেষ পর্যন্ত শুধু মন্দার নয়—অন্যান্য আশঙ্কাও রয়েছে। সুতরাং এখন থেকেই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। সরকারের পক্ষে এ-ব্যাপারে প্রচারকার্য চালানোর বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে।

—শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

বিজ্ঞানের কথা

মহাকাশ গবেষণায় ও উপগ্রহের সাহায্যে শিক্ষামূলক প্রচারে ভারত

উচ্চতর পদার্থবিদ্যা ও মহাকাশ-গবেষণার জন্যে ভারতে বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ হয়েছে ও বহুমুখী প্রয়াস চলেছে। ভারতের প্রথম গবেষণামূলক উপগ্রহ উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে এ বছরের শেষদিকে, সোভিয়েত বুস্টার রকেটের সাহায্যে। এ খবর জানিয়েছেন সোভিয়েত ইন্টারকসমস কাউন্সিলের সভাপতি বোরিস পেত্রোভ। সোভিয়েতের এই কাউন্সিল মহাকাশ-গবেষণায় যুগ্ম প্রকল্পের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

মহাকাশ-গবেষণার কেন্দ্র ছড়ানো রয়েছে সারা ভারতে। ১৯৭২ সালে পৃথকভাবে গঠিত হয়েছে মহাকাশ গবেষণা সংগঠন এবং এই সংগঠনকে ভারতের মহাকাশ-গবেষণার কর্মসূচী রূপায়ণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তার আগে পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করত পারমাণবিক শক্তি বিভাগ। ভারতে মহাকাশ গবেষণার কয়েকটি প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে থুম্বায় বিষুবীয় রকেট উৎক্ষেপণ স্টেশন ত্রিবান্দ্রাম রাষ্ট্রসংঘ-প্রবর্তিত সাউন্ডিং রকেট রেঞ্জ ও তার কাছাকাছি একটি মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা কেন্দ্র, তদুপরি থুম্বায় একটি রকেট-চালন ও রকেট নির্মাণ প্লান্ট আমেদাবাদে উপগ্রহের সাহায্যে যোগাযোগের জন্যে ভূমি-স্টেশন, হায়দ্রাবাদে বেলুন-উৎক্ষেপণ ব্যবস্থা ও গুলমার্গে অতি-উচ্চতায় স্থাপিত একটি গবেষণাগার।

সোভিয়েট রকেটের সাহায্যে যে গবেষণামূলক উপগ্রহটি উৎক্ষিপ্ত হবার কথা তা নির্মিত হচ্ছে ভারতে। সোভিয়েত মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা এ-কাজে যতোটুকু সাহায্য করবেন তা অতি সামান্য। এই উপগ্রহের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করা হবে সৌর ব্যাপার, পৃথিবীর আয়নোস্ফিয়ারের প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে তার সম্পর্কে ও বাইরের মহাকাশ থেকে এক্স-রে বিকীরণ। পরে ভারতে তৈরি হবে আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক সম্পদ পর্যবেক্ষণের উপযোগী উপগ্রহ। এই উপগ্রহ থেকে আগে থেকেই যেমন জানা যাবে ঝড়-ঝঞ্ঝা পঙ্গপালের আক্রমণ সম্পর্কিত খবর তেমনি প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের সংকেতও।

প্রধানত আবহ-পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রেই ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এতোদিন সহযোগিতা করে এসেছে। ১৯৭১-৭২ সালে উভয় দেশের উদ্যোগে থুম্বা থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে ৩২টি রকেট। সংগৃহীত তথ্যের প্রাথমিক বিশ্লেষণ সম্পন্ন হয়েছে রকেট-স্টেশনে স্থাপিত সোভিয়েত মিনস্ক-১১ কম্পিউটারে এবং বিশ্লেষণের ফলাফল রকেট-উৎক্ষেপণের এক সপ্তাহের মধ্যেই মস্কোতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আমেরিকার ন্যাসা-র সঙ্গে সহযোগিতায় ১৯৭৪ সালে আরো একটি উচ্চলক্ষ্যসম্পন্ন উপগ্রহ উৎক্ষেপণের কর্মসূচী ভারতের ছিল। সেটির নাম দেওয়া হয়েছিল শিক্ষামূলক উপগ্রহ টেলিভিশন পরীক্ষাকার্য (স্যাটেলাইট ইনস্ট্রাকশনাল টেলিভিশন এক্সপেরিমেন্ট, সংক্ষেপে সাইট)। এই উপগ্রহের (আমেরিকান এটিএস উপগ্রহ) সাহায্যে ভারতের বিভিন্ন এলাকায় ৫০০০ গ্রামে শিক্ষামূলক টেলিভিশন প্রোগ্রাম প্রচারিত হবার কথা ছিল।

গত ৩০শে মে তারিখে আমেরিকার কেনেডি স্পেস কেন্দ্র থেকে এই উপগ্রহটি উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। এজন্যে খরচ পড়েছে সাড়ে কুড়ি কোটি ডলার অর্থাৎ দেড়শ কোটি টাকারও অধিক। আমেরিকাকে এক-একটি অ্যাপোলো অভিযানে চন্দ্রে মানুষ পাঠাতে যে-পরিমাণ খরচ করতে হয়েছে তার প্রায় অর্ধেক খরচ হয়েছে এই একটি উপগ্রহকে পৃথিবীর আকাশে তোলার জন্যে। একটিমাত্র উপগ্রহ আকাশে তোলার জন্যে এমন বিপুল পরিমাণ খরচের দৃষ্টান্ত এই প্রথম।

উপগ্রহটিকে এমন এক উচ্চতায় তোলা হয়েছে যাতে পৃথিবীকে একবার পাক দিতে তার সময় লাগে চব্বিশ ঘণ্টা। এদিকে পৃথিবীও এই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নিজের অক্ষের চারদিকে পাক খাচ্ছে। দুয়ের পাক খাওয়া যদি একই সময়ের মধ্যে ঘটতে থাকে তাহলে তার ফল কী দাঁড়ায়? তখন পৃথিবী থেকে তাকিয়ে মনে হতে থাকে উপগ্রহটি যেন পৃথিবীর আকাশে স্থির। এমনি একটি সমতার অবস্থা ঘটাতে হলে উপগ্রহকে ৩৬,০০০ কিলোমিটার উচ্চতায় তোলা দরকার। প্রয়োজনীয় উচ্চতায় স্থাপিত এটিএস এমনি একটি স্থির উপগ্রহ।

প্রথমে (১৯৭৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত) উপগ্রহটি থাকবে গ্যালাপাগোস দ্বীপের আকাশে। এই অবস্থানে উপগ্রহের আওতায় এসে পড়ে গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তখন উপগ্রহ থেকে প্রচারিত টেলিভিশন প্রোগ্রাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে-কোন এলাকা থেকে ধরা সম্ভব।

তারপরে, ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে, বেতার-নির্দেশে উপগ্রহটিকে সরিয়ে আনা হবে আফ্রিকার কাছাকাছি ভারত মহাসাগরের আকাশে (তার মানে, ৩৬,০০০ কিলোমিটার উঁচুতে পৃথিবীর কক্ষে স্থাপিত হবার পরেও উপগ্রহের সঙ্গে যুক্ত থাকছে উপগ্রহকে নির্দিষ্ট দিকে ঠেলা দেবার একটি ব্যবস্থা বা কোনো এক ধরনের রকেট)। এটি এমন এক অবস্থান যেখান থেকে গোটা ভারতবর্ষ নজরে এসে যায়। এক বছর এই অবস্থানে রেখে উপগ্রহটিকে ব্যবহার করা হবে ভারতের (বিহার, ওড়িশা মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক ও রাজস্থানের) গ্রামাঞ্চলে শিক্ষামূলক প্রচারের উদ্দেশ্যে। ভারতের পাঁচ হাজার গ্রামে সমসংখ্যক টেলিভিশনের মাধ্যমে এই শিক্ষামূলক কর্মসূচী প্রচারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ভারতের পক্ষে এ এক অভিনব পরিকল্পনা।

অনুষ্ঠান-সূচী রচিত হবে ভারতে, এ ব্যাপারে অন্য কারও কোনো কর্তৃত্ব থাকছে না। রচিত অনুষ্ঠান-সূচী উপগ্রহে প্রেরিত হবে আমেদাবাদের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র থেকে। ভারতের আকাশবাণী ও মহাকাশ গবেষণ সংগঠনের সহযোগিতায় এই কর্মসূচী রূপায়িত হবে।

এশিয়ায় ভারতই প্রথম দেশ যেখানে শিক্ষামূলক প্রচারের জন্যে আধুনিকতম উপগ্রহের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

উপগ্রহটিতে আরো একটি ব্যবস্থা রয়েছে যার সাহায্যে আবহাওয়ার পূর্বাভাসও জানা সম্ভব হবে।

ট্রাইবোলজি

কথাটা নতুন শোনাচ্ছে, এ এক নতুন বিজ্ঞানের নাম। ব্রিটেনে এই বিজ্ঞান প্রযুক্ত হচ্ছে হৃদপিণ্ডের ভালভের শল্যচিকিৎসা থেকে শুরু করে ভারী শিল্প পর্যন্ত ব্যাপক ক্ষেত্রে; তার ফলে ব্রিটিশ শিল্পে এখনো পর্যন্ত যে-পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি বাঁচানো গিয়েছে তার মূল্য প্রায় ১০ কোটি পাউন্ড।

বলা হচ্ছে, ঘষা খাওয়া বা গড়ানো বা হড়কানোর দরুন প্রতি বছর যে শিল্প-দক্ষতা খোয়া যায় তার মূল্য ৫০ কোটি পাউন্ড। এই নতুন বিজ্ঞানের সাহায্যে এই অপচয় বন্ধ করা যাবে, দাবি করা হচ্ছে।

। এই বিজ্ঞান ১৯৬৬ সালে প্রবর্তিত। উদ্দেশ্য ছিল, 'আপেক্ষিক গতিসম্পন্ন পরস্পর-ক্রিয়াশীল তল এবং সম্পর্কিত বিষয় ও ক্রিয়ার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি' অনুশীলন। বর্তমানে তিনটি কেন্দ্রে এই অনুশীলন চলেছে—বিষয়, যন্ত্রপাতির ঘর্ষণ ও লুব্রিকেশন ও অ-স্থিতিশীল অংশের ক্ষয়ক্ষতি।

শুধু শিল্প নয়, চিকিৎসা ক্ষেত্রেও এই বিজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটছে—বিশেষ করে হৃদ্‌পিণ্ডের ভাল্‌ভের শল্যচিকিৎসায় ও হাড়ের জোড় সম্পর্কিত সমস্যায়। চিকিৎসার এই বিশেষ ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞানের প্রয়োগ থেকে উল্লেখযোগ্য সুফল পাওয়া গিয়েছে।

আট বছর আগে প্রবর্তিত এই বিজ্ঞান ইতিমধ্যেই প্রমাণ দিয়েছে যে এই বিজ্ঞান প্রয়োগ করে অল্প সময়ের মধ্যেই প্রচুর আর্থিক সুবিধা লাভ করা যায়।

আঙুল মটকালে আওয়াজ হয় কেন ?

ঘটনাটা সাধারণ, আঙুল মটকালে প্রায় একটা মিনি-পটকা ফাটার মতো আওয়াজ ওঠে। শুধু আঙুল কেন, কনুই, হাঁটু, ঘাড় এমনকি কোমর পর্যন্ত মটকানো চলে এবং প্রতি ক্ষেত্রেই কম-বেশি আওয়াজও পাওয়া যায়। সাধারণভাবে বলা চলে, মানুষের শরীরে যেখানেই হাড়ে-হাড়ে জোড় তৈরি হয়েছে সেখানেই মটকানোর প্রক্রিয়াটি সম্ভব। আর এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজও। কিন্তু কেন?

এই প্রশ্নের সঠিক জবাবটি দিয়ে একজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী সম্প্রতি পুরস্কৃত হয়েছেন। বিজ্ঞানীর নাম ডঃ অ্যানটনি উনসওয়ার্থ, লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়ো-ইঞ্জিনিয়ারিং-এর লেকচারার। ট্রাইবোলজির রৌপ্যপদকে তাঁকে পুরস্কৃত করেছেন মেক্যানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের প্রতিষ্ঠান।

এই বিজ্ঞানী মনে করেন, আঙুলের জোড়ের (বা শরীরের অন্য কোনো অংশের জোড়ের) এক অংশকে যখন জোরের সঙ্গে অন্য অংশ থেকে টেনে ধরা হয় বা পৃথক করার চেষ্টা হয় তখন সেখানে আংশিক ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি হতে থাকে এবং এই ভ্যাকুয়াম পূরণ করে এক জাতীয় গ্যাসের বুদ্‌বুদ। আওয়াজটি ওঠে গ্যাস ধাবিত হওয়ার দরুন।

এই গ্যাস আসে কোথা থেকে? মানুষের শরীরে প্রত্যেকটি জোড়ে আছে এক রকমের লুব্রিকেটিং তরলপদার্থ — সাইনোভিয়াল ফ্লুইড। প্রত্যেকটি জোড়ে বিন্দুমাত্র ঘর্ষণজনিত বাধা বোধ না করে মানুষ যে এত সহজে অঙ্গচালনা করতে পারে তা এই লুব্রিকেটিং তরলপদার্থটি থাকার জন্যে। উল্লিখিত গ্যাস উদ্ভুত হয় এই তরলপদার্থ থেকে।

আর এই লুব্রিকেটিং ব্যবস্থা যদি ভেঙ্গে পড়ে তাহলেই বাত বা আর্থ্রাইটিস রোগ দেখা দেয়। আশা করা হচ্ছে, ডঃ উনসওয়ার্থের গবেষণার ফলে বাত বা আর্থ্রাইটিস রোগের চিকিৎসায় নতুন আশার খবর পাওয়া যেতে পারে।

উপগ্রহের সাহায্যে শিক্ষাদানে ভারতের নিরক্ষরতা দূর হবে

একথা বলেছেন খোদ ভারতীয় বিজ্ঞানীরা, যাঁরা এটিএস উপগ্রহটির উৎক্ষেপণ দেখার জন্যে কেপ ক্যানাভেরালে উপস্থিত ছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের মতে ভারতীয় অর্থনীতিতেও এই উপগ্রহের সুফল নিশ্চিতরূপেই পাওয়া যাবে। এই বিজ্ঞানীদের বক্তব্য একটু বিস্তৃতভাবে শোনা দরকার।

একজন হচ্ছেন ভারত টেলিভিশনের সহকারী অধিকর্তা পি ভি কৃষ্ণমূর্তি। তিনি বলেছেন,

'সবচেয়ে বড়ো কথা, সময়। ভারতের পক্ষে অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। গোরুর গাড়ির গতিতে ব্যাপারটা চলুক, একথা এখন আর ভাবা যায় না। নতুন ধ্যান-ধারণাকে অগ্রসর করে নিয়ে যাবে নতুন বাহন...উপগ্রহের মাধ্যমে টেলিভিশন।

যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে আমাদের সামনে রয়েছে তিনটি বৃহৎ সমস্যা। এক, সরাসরি উপস্থিত হতে না পারা। দেশটা এত বড়ো যে সেটাই আমাদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। দূরে দূরে এলাকার সঙ্গে সংযোগ গড়ে তোলা খুবই শক্ত। কাজটা যদি আমরা তাড়াতাড়ি করতে চাই তাহলে উপগ্রহের কথা ভাবতেই হয়।

দুই, নিরক্ষরতা। আমাদের দেশের শতকরা সত্তরজন মানুষ না পারে পড়তে না পারে লিখতে। ছাপার হরফ তাদের কাছে অর্থহীন। এই বাধা কাটিয়ে ওঠা যেতে পারে টেলিভিশনের ছবি ও কথার সাহায্যে।

তিন, সাবেক মানুষের অভাব। আমাদের চাই এমনি মানুষের বিরাট এক বাহিনী। টেলিভিশন ব্যবহার করে আমরা এই মানুষদের গড়ে তুলব, সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদেরও।

ভারতকে যদি দ্রুত উন্নত করতে হয় তাহলে উপগ্রহের পথই হচ্ছে একমাত্র পথ।

আমরা তাদের শেখাব দুটি শিষ ফলিয়ে তুলতে, যেখানে আগে হত একটি।

টেলিভিশনের প্রোগ্রাম এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন তা বিশ্বাসযোগ্য হয়, এটা ভীষণ জরুরি কথা। যেমন, কৃষকের নিজের জমি নিয়েই আমরা টেলিভিশনের ফিল্ম তুলতে পারি। তাকে দেখাতে পারি উন্নত পদ্ধতি কিভাবে তার জমির ফলন উন্নত করে তোলে।

তেমনি ধরনের ফিল্ম মানুষকে দেবে [illegible] গোঁজামিলের স্থান নেই। ব্যাপারটা সত্যি হওয়া চাই। মানুষ বিশ্বাস করবে, এটা জরুরি কথা।

ভারতের শিশুদের টেলিভিশনের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে পারলে বিরাট রকমের ফল পাওয়া যাবে। ভারতের শতকরা চল্লিশ জন শিশুও ক্লাশ ফাইভ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, তার আগেই তাদের লেখাপড়ায় ইতি ঘটে যায়।

তার একটি কারণ, আমাদের দেশের স্কুলগুলো আকর্ষণহীন একঘেয়ে, নিরানন্দ। কোনো রকম খেলা নেই, কোনো রকম মজা নেই। শুধু মুখস্থ বুলি আউড়ে তারা লেখাপড়া শেখে। শিক্ষকরা নাকালের একশেষ হয় অনেক সময়ে যোগ্যতাহীনও। উপগ্রহের মাধ্যমে শিক্ষাদানে শিক্ষকদের সাহায্য করা হবে আর ছেলেমেয়েদের কাছে লেখাপড়া শেখার ব্যাপারটা হয়ে উঠবে অনেক বেশি আকর্ষণীয়। শিশুরাই হবে টেলিভিশনের সবচেয়ে বড়ো দর্শক ও শ্রোতা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিশুদের কাছে টেলিভিশন তো নেশার মতো। আমরাও কেন-না এটাকে কাজে লাগাই ও তার ফলভোগ করি? আমাদের স্কুল ব্যবস্থার ওপরে তার প্রভাব পড়বে প্রচণ্ড রকমের।

টেলিভিশনের মাধ্যমে শিক্ষাদানে আমাদের দেশের মেয়েদের ক্ষেত্রেও বড়োরকমের ফল পাওয়া যাবে। কথায় বলে—একটি পুরুষকে শিক্ষা দিলে শিক্ষিত করে তোলা হয় একজন ব্যক্তিবিশেষকে কিন্তু একজন স্ত্রীলোককে শিক্ষা দিলে শিক্ষিত করে তোলা হয় একটি প্রজন্মকে। আমাদের দেশে কৃষির শতকরা ষাট ভাগ কাজ করে মেয়েরা। লাঙল দেওয়ার কাজটুকু বাদে আর সবই তারা করে। নতুন ধ্যান-ধারণাকে আরো বেশি গ্রহণীয় করে তোলার জন্যে মেয়েদের শিক্ষার আওতায় আনতেই হবে।

মেয়েরা ও শিশুরা ভারতের চেহারা বদলে দিতে পারে।'

আরেকজন হচ্ছেন ভারত স্পেস গবেষণা সংগঠনের স্পেস প্রয়োগ কেন্দ্রের অধিকর্তা যশপাল। তিনি বলেছেন—

উপগ্রহ শেষ পর্যন্ত শিক্ষার গোটা প্যাটার্নটাই বদলে দেবে। লক্ষ লক্ষ মানুষকে জাতীয়তার বোধ [illegible] অংশের সঙ্গে একাত্মতা এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দেওয়াটা খুবই জরুরি।

এটিএস এমন একটি ব্যবস্থা যা থেকে জানা যাবে ভারত যোগাযোগের

এটি একটি স্থির আবহ উপগ্রহ। ব্রাজিলের উপকূলের কাছাকাছি বিষুবরেখার ওপরের আকাশে এটিকে এমন এক উচ্চতায় (৩৬০০০ কিলোমিটার) পৃথিবীর কক্ষে স্থাপন করা হয়েছে যার ফলে উপগ্রহটি পৃথিবীকে পাক দিচ্ছে ২৪ ঘণ্টায় একবার। পৃথিবী থেকে তাকিয়ে মনে হয় উপগ্রহটি যেন স্থির। এ ধরনের স্থির বা সিনক্রোনাস উপগ্রহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এই প্রথম। উপগ্রহটির নাম এস্‌এম্‌এস—১ ইনফ্রা-রে ক্যামেরা-সমন্বিত। উপগ্রহ থেকে প্রতি ত্রিশ মিনিটে একবার করে পশ্চিম গোলকের মেঘের ছবি তোলা হচ্ছে। উপগ্রহের অন্যান্য যন্ত্রে সংগৃহীত হচ্ছে পরিবেশ-সংক্রান্ত নানা খবর। আশা করা হচ্ছে উপগ্রহটির সাহায্যে এই এলাকায় আবহাওয়ার পূর্বাভাস নির্ভুলভাবে দেওয়া সম্ভব হবে। উল্লেখ করা চলে প্রথম বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও আলাস্কায় এবং দ্বিতীয় বছরে ভারতের শিক্ষামূলক প্রচারের জন্যে যে এটিএস উপগ্রহটি গত ৩০শে মে কেপ কেনেডি থেকে আকাশে তোলা হয়েছে সেটিও এমনি ধরনের একটি স্থির বা সিনক্রোনাস উপগ্রহ।
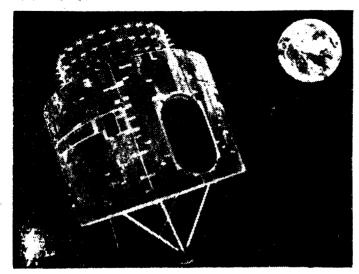
ক্ষেত্র বড়োরকমের সম্মুখগতি অর্জন করতে পারে কিনা এবং দূরে-দূরে এলাকায় যথাসম্ভব শীঘ্র যেতে পারে কিনা।

উপগ্রহের জন্য ভারতকে অর্থব্যয় করতে হবে - ফলদায়কভাবে ব্যবহার করতে হলে যে অর্থের প্রয়োজন তার মাত্র ১০ থেকে ২০ শতাংশ।

চিরাচরিত ধরনের লেখাপড়া শেখার চেয়ে আরো বেশি জরুরী প্রয়োজন হচ্ছে কারিগরী জ্ঞান।

আরো অনেক জরুরি ভিত্তিতে করা দরকার এমন বিষয় প্রচুর রয়ে গিয়েছে। সেখানে নিরক্ষরতার প্রশ্নটি অবান্তর হয়ে যায়।

আমাদের দেশের একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী একটি কথা প্রায়ই বলে থাকেন —আমাদের এখন চাই সাক্ষরতা ততোটা নয় যতোটা না কারিগরী জ্ঞান। অর্থাৎ কারিগরী বিষয়ে সাক্ষরতা। আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদনের পঞ্চাশ শতাংশই হচ্ছে কৃষি। কৃষিকে সাহায্য করলে গোটা অর্থনীতিকেই সাহায্য করা হয়। সবচেয়ে জরুরী সমস্যা হচ্ছে খাদ্য। অর্থনীতির উন্নতির জন্য আমাদের চাই কৃষির উন্নতি।

লক্ষ লক্ষ মানুষ চোখের দেখায় আরো ভালোভাবে শিখতে পারে। বড়ো বড়ো কথার কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদের দেশের কৃষক খুবই রক্ষণশীল কেননা শত শত বছর ধরে সে তার কাজ করে এসেছে বিশেষ কতকগুলো উপায়ে। তার কাজ সে কখনোই অন্যভাবে করতে রাজী হবে না যতোক্ষণ না সে দেখবে যে অন্যভাবে করাটা মঙ্গলজনক।...চাষের উপায়ের উপরেই নির্ভর করে তার গোটা জীবন।"

অপর একজন হচ্ছেন অধ্যাপক ই ভি চিত্রনিত্র—ভারতীয় স্পেস গবেষণা সংগঠনের পক্ষ থেকে শিক্ষামূলক উপগ্রহ টেলিভিশন পরীক্ষাকার্যের প্রোগ্রাম ম্যানেজার। তিনি বলেছেন—

'আমাদের জাতীয় উন্নতি ও আমাদের সমগ্র অর্থনীতির পুনর্গঠনের জন্য আমরা প্রস্তুত। আর তা করার জন্যে আমাদের দেশে লিখতে ও পড়তে পারে শতকরা ত্রিশজনের বেশি নয় কাজেই অনেক মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করার কোনো পথ নেই।

ভারতে জনসংখ্যা ৫৪ কোটি আর সারা ভারতে টেলিভিশন সেট আছে বড়-জোর পঞ্চাশ হাজার।

গ্রামের অধিকাংশ মানুষের টেলিভিশন দেখা এই প্রথম। গণ-প্রচারের মাধ্যম তাদের প্রায় স্পর্শ করেনি বলা চলে। আমাদের চাই এমন একটি মাধ্যম যার জন্যে পড়তে বা লিখতে জানার দরকার নেই

ভারতের পরিকল্পনা—পাঁচ বছরের মধ্যে অধিকাংশ গ্রামে পৌঁছে যাওয়া।

তার মানে—১৯৮১ সালের মধ্যে ভারতের বৃহৎ অংশকে আমাদের আওতায় আনতে পারব এবং প্রত্যেকটি গ্রামে অন্ততপক্ষে একটি করে টেলিভিশন সেট বসাতে পারব। তবে টেলিভিশন বসাতে পারলেই সঙ্গে সঙ্গে সমস্যাগুলো উঠে যাবে তা নয়। ভালো প্রোগ্রাম দেওয়া চাই। মানুষজনকে বক্তৃতা শোনানো নয়, চাই তাদের অংশভাগী করে তোলা। গোড়াতেই প্রকাণ্ড পরিবর্তন ঘটে যাবে এই যদি আশা করি তাহলে বলতে হবে—নিজেদের আমরা ধোঁকা দিচ্ছি। সময় লাগবে। কিন্তু মানুষকে যদি আমরা বোঝাতে পারি বসন্তরোগটা খারাপ কিছু নয়, চিকিৎসার ব্যাপার—তা হলেই মস্ত কাজ করা হয়। যদি তাদের শেখাতে পারি সুষম পাকিস্তি কী, পরিবার পরিকল্পনা কেমন করে পরিষ্কার থাকা যায় কিভাবে জল বিশুদ্ধ রাখতে হয় কেমন করে—তাহলেও মস্ত কাজ করা হয়।

এই মানুষদের আমাদের দিতে হবে আরো আত্মবিশ্বাস এবং নিজেদের কাজে আরো গর্ববোধ।

উপগ্রহের সাহায্যে শিক্ষাদান কৃষিকে সাহায্য করবে এবং তার ফলে অর্থনীতিকেও। আমাকে এটি হবে অতীব গতিশীল একটি ব্যাপার।"

অপর একজন হচ্ছেন ভারতীয় স্পেস গবেষণা সংগঠনের প্রোজেক্ট ম্যানেজার প্রমোদ কালে। তিনি বলেছেন—

'আশা করা হচ্ছে—এটিএস উপগ্রহ চালু থাকার প্রথম বছরে দশ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছতে পারা যাবে।

এটিএস উপগ্রহ ভারতে শুরু করবে নতুন যোগাযোগ ব্যবস্থা ও শিক্ষার এক নতুন বিবর্তন। এই প্রথম আধুনিক শিক্ষা ও কৃষিকে আমরা নিয়ে যেতে পারব গ্রামের এলাকায়।"

এটিএস উপগ্রহটিকে প্রথম বছর ব্যবহার করবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আলাস্কা—স্বাস্থ্য ও শিক্ষামূলক প্রচারের জন্যে। এক বছর পরে এটিকে ভারত মহাসাগরের আকাশে সরিয়ে আনা হবে এবং এক বছরের জন্যে ঋণ দেওয়া হবে ভারতকে। শক্তিশালী প্রেরকযন্ত্র সমন্বিত এই উপগ্রহ থেকে সরাসরি সংকেত পৌঁছবে সারা ভারতের পাঁচ হাজার গ্রামের বিশেষ টেলিভিশন সেটে।

ভারতের নিজস্ব শিক্ষামূলক উপগ্রহ উৎক্ষিপ্ত হবার কথা ১৯৭৭ সালে।

—অরুন্ধতী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মাসখানেক আগে জয়ন্তীদির বাড়ীতে বাংলা কাগজে দেখলাম রবীন্দ্র সদনে মানবেন্দ্র মুখার্জির নজরুল সঙ্গীতের আসর হচ্ছে। এসব বিজ্ঞাপন দেখলে মন খারাপ হয়ে যায়। 'ভরিয়া পরাণ শুনিতেছি গান' আর 'নীলাম্বরী শাড়ী পরে কে যায়' গান দুটো শুনতে পেলেই আমি টিকিটের পয়সা উঠিয়ে নিতাম। আনন্দের জন্য লন্ডনে আসার দরকার নেই, বরং আমাদের আনন্দের সবকিছুই কলকাতায়। লন্ডনে উপভোগ করা যায় কিন্তু মন প্রাণ ভরে আনন্দের সুযোগ নেই।

কলকাতায়, বিয়ে হলে বেশ সুখে থাকতাম কিন্তু রঞ্জন আমার জীবনটাকে লণ্ডভণ্ড করে দিল। সব সময় রঞ্জনের কথা ভাবি না। ভাবতে চাই না ভেবে লাভ নেই। আমার জীবনে ওর আর কোন ভূমিকা নেই কিন্তু হঠাৎ যখন সবকিছু মনে পড়ে, মনে পড়ে বিয়ের কথা, বাসরের কথা, কলকাতার কটা দিনের কথা, আমার লন্ডন আসার কাহিনী, ওকে সব কিছু উজাড় করে দেবার স্মৃতি থেকে শুরু করে কানাডায় ওর বিয়ের কথা, স্ত্রী পুত্রের কাহিনী এবং শেষপর্যন্ত আমাদের বিচ্ছেদের দিনের শুনানীর জবানবন্দীর কথা মনে পড়ে তখন ওকে সত্যি অসহ্য মনে হয়। মনে হয় হাতের কাছে একটা রিভলবার পেলে হয়ত ওকে গুলী মেরেই শেষ করে দিতাম।

আবার আমার মন, মানুষের মন কি বিচিত্র তা ভেবেও অবাক হই। রঞ্জন বলেছিল ইসলাম সাহেব বড় ভাল লোক। যতদিন লণ্ডনে আছো, এখানেই থেকো।

ও বোধহয় ভেবেছিল আমি ওর যাবার কিছুদিন পরেই ইন্ডিয়ায় ফিরে যাবো। তাই ইসলাম সাহেবের বাড়ী ছাড়তে বারণ করেছিল। ও ভাবেনি আমি একলা একলাই লণ্ডনে থেকে যাবো। আমি সত্যিই ইসলাম সাহেবের বাড়ী ছাড়িনি। ছাড়তে পারিনি। ইসলাম সাহেব পাকিস্তানী মুসলমান কিন্তু [illegible] আমার সাথে কোন পাকিস্তানী মুসলমানের সঙ্গে মিশি নি। খবরের কাগজ পড়ে পড়ে ওদের সম্পর্কে অত্যন্ত খারাপ ধারণা করতাম। কোন মতেই, কোন কারণেই ওদের ভাল [illegible] বন্ধুভাবে ভাবতে পারতাম না কিন্তু এখানে এসে আমার পুরানো ধারণা একেবারে বদলে গেল।

আমি কলকাতা থেকে হিথরো এয়ারপোর্টে এসে ল্যান্ড করার পর রঞ্জন আমাকে এই ইসলাম সাহেবের বাড়ীতেই নিয়ে এলো। বাড়ীর সামনের ছোট্ট টেরেসে ইসলাম সাহেব সপরিবারে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন কিন্তু সেদিন ঠিক ভালভাবে আলাপ-পরিচয় হলো না। কয়েক দিন পরেই উনি আমাদের দুজনকে ডিনারে নেমন্তন্ন করলেন। ইসলাম সাহেবের বিবিকে একটু রক্ষণশীলা মনে হলেও ওর একটা কথা আমি ভুলতে পারি না। ইসলাম সাহেব আর রঞ্জন ড্রইং রুমে হুইস্কীর বোতল নিয়ে বসলে উনি আমাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। ঘর-সংসারের টুকিটাকি অনেক কথার পর বললেন, এটা কিন্তু হিন্দুস্তান বা পাকিস্তান নয়। এখানে আমি তোমার দিদি, তুমি আমার ছোট বোন আর ইসলাম সাহেব তোমার বড় ভাই।

ইসলাম সাহেবের বিবি আমার মত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে যোগদান করার পর ইউনিভার্সাল আর্ট গ্যালারীর স্টুডিওতে ফটো তোলেন নি কিন্তু উনি সহজ সরলভাবে, আপন মাধুর্যে যেভাবে আমাকে আপন করে নিলেন তা দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। তবু মনে মনে বিশ্বাস করতে পারি নি। ভেবেছিলাম বোধহয় আমাকে খুশী করার জন্যই আমাকে ঐ কথাগুলো বললেন।

দিনে দিনে, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা শরৎ-হেমন্ত পার হবার পর, বুঝলাম, আমরা শিক্ষিতেরা অন্যকে খুশী করার জন্য কথা বলি কিন্তু যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব-বিদ্যার গরল পান করেন নি, তারা শুধু মনের কথা, প্রাণের কথা, বিশ্বাসের কথাই বলেন।

ওর আরো একটা কথা আমার মনে হয়। সকাল বেলায় রঞ্জন কানাডা রওনা হবার পর আমি বিছানায় বসে বসেই কাঁদছিলাম। দুপুরের দিকে মিসেস ইসলাম এসে আমাকে অনেক সান্ত্বনা জানাবার পর বললেন, রেণু, ওঠো, খাওয়া-দাওয়া করে নাও। রাগ করে বসে থেকো না।

আমি অত্যন্ত দুঃখের মধ্যেও একটু হেসে উঠলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, এমনভাবে প্রতারিত হবার পরও রাগ করব না?

মিসেস ইসলাম আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, আমাদের দেশ থেকে আসার পর প্রায় সব পুরুষেরই এ রোগ দেখা দেয়। ইসলাম সাহেবও এ রোগে বেশ কিছুকাল ভুগেছেন। তবে ভাই এসব রোগ বেশীদিন থাকে না, ভাইসাবেরও থাকবে না...

আমি হাসলাম।

'সত্যি বলছি রূপু, এ রোগ বেশীদিন থাকতে পারে না। তোমারও এ রাগ থাকতে পারে না। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মিসেস ইসলামের কথাটা আমার মাঝে মাঝেই মনে হয়। ভাবি, সত্যিই কি সব ঠিক হয়ে যাবে? কিন্তু কি করে? ওর আগের স্ত্রী ডিভোর্স করলেও অতীত ইতিহাস তো মুছে যাবে না। তাছাড়া ওর ছেলের কি হবে? এসব প্রশ্নের জবাব জানি না, অনেক চেষ্টা করেও খুঁজে পাই না। তবু মনে হয়। মনে হয় মিসেস ইসলামের কথা সত্যি হলে বোধহয় ভালই হতো।

রঞ্জন চলে যাবার মাসখানেক পরে এক শনিবার সকালবেলায় ইসলাম সাহেব এসে হাজির, বহিনজী!

'আসুন, আসুন।' ইসলাম সাহেবকে বসতে দিলাম।

ইসলাম সোফায় বসেই বললেন, একটা কথা বলব ভাবছিলাম কিন্তু......

আমি হাসলাম, বলুন কি বলবেন। অত চিন্তা বা দ্বিধা করার তো কারণ নেই।

'আমার মনে হয় এভাবে চুপচাপ বসে না থাকাই ভাল। তাতে শরীর আর মন দুইই খারাপ হবে।...

'কিন্তু কি করব ভাইসাব?'

'আমি সাধারণ মানুষ; খুব সাধারণ কাজের ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারি কিন্তু...

'আবার কিন্তু?'

ইসলাম সাহেব হাসলেন। বললেন, বহিনজী, আপনি বি-এ পাশ করেছেন। এসব সামান্য কাজের কথা বলতেও আমার লজ্জা লাগে। তবে এ দেশে সব কাজেরই মর্যাদা আছে।

ইসলাম সাহেব হিথরো এয়ারপোর্টেই হেভী ডিউটি লরী চালান। ওরই চেষ্টায় আমি হিথরো এয়ারপোর্টের ট্রানজিট লাউঞ্জে কর্মজীবন শুরু করলাম।

রঞ্জন দু মাসের ভাড়া দিয়ে গিয়েছিল। এরপর আমি যখন প্রথম উইকের আট পাউন্ড ভাড়া দিতে গেলাম তখন ইসলাম সাহেব আমাকে ছোট্ট একটা কথা বলেছিলেন, বহিনজী, আমি নিজে প্রত্যেক উইকে ফর্টি এইট পাউন্ড মাইনে পাই। তারপর তিনজনের কাছ থেকে বাড়ী ভাড়া পাই। এরপর বহিনজীর কাছ থেকে ভাড়া না নিলেও আমার সংসার ভালভাবেই চলবে।

এ দেশে কেউ কৃপা দেখায় না, কেউ প্রত্যাশাও করে না। তাই সঙ্গে সঙ্গে উনি বললেন, ভাড়া তো আমি ছেড়ে দেবো না। ভাইসাবের কাছ থেকেই আমি ভাড়া আদায় করে নেব।...

'ভাইসাবকে পাচ্ছেন কোথায়?'

ইসলাম সাহেব হাসলেন। বললেন, আমার ভাড়া ফাঁকি দেবার ক্ষমতা ভাইসাবের নেই।

উনি বোধহয় ভেবেছিলেন রঞ্জন দু'চার মাসের মধ্যেই ফিরে আসবে কিন্তু ছ'মাস পরেও যখন ও এলো না তখন থেকে ভাড়া নেওয়া শুরু করলেন। তবে আমি ইচ্ছামত সুবিধা মত ভাড়া দিই, উনি কোনদিন ভাড়ার কথা বলেন না। আমি যখন কমিউনিটি রিলেসান্সের চাকরি নিয়ে ব্রার্ডফোর্ডে ছিলাম তখনও এ বাড়ী ছাড়ি নি। প্রত্যেক উইক-এন্ডে এসেছি, থেকেছি। এখনও ওবাড়ী ছাড়ি নি। ইসলাম সাহেবের জন্য ছাড়তে পারি না। তাছাড়া আমি ছাড়তে চাইলেই কি ইসলাম সাহেবের মেয়ে সুরাইয়া যেতে দেবে?

ঐ বাড়ী না ছাড়ার এসব কারণ সবাই জানে। বিজয়া জানে, শ্রীকান্ত জানে, আরো অনেকে জানে। কিন্তু ওবাড়ী না ছাড়ার আরো একটা কারণ আছে। সেকথা কেউ জানে না, আমিও জানাই না। কিছুতেই জানাতে পারি না। আমি জীবনে খুব বেশী দিন আনন্দ করার সুযোগ পাই নি। আনন্দের জোয়ার আসতে না আসতেই ভাটার টান এসে গেল। আমার ছোট্ট সবুজ দ্বীপটি মরুপ্রান্তরের রুক্ষতায় ভরে গেল। যেটুকু মিষ্টি স্মৃতি আমার মনের মধ্যে লুকিয়ে আছে, তার সবকিছুই ঐ দুটি ঘরকে কেন্দ্র করে। ঐ দুটি ঘরের সবকিছুর মধ্যেই রঞ্জনের একটা গন্ধ পাই, স্পর্শ অনুভব করি। আমি ভীষণ ভীতু। একা একটা ঘরে থাকতে পারি না কিন্তু এই বাড়ীতে একলা থাকতে ভয় করে না। ঘুমের মধ্যে, অবচেতন অবস্থায়, মনে হয় রঞ্জনের বলিষ্ঠ বাহু দুটোর মধ্যেই তো রয়েছি, ভয় কি? পুরানো দিনের ঐটুকু মিষ্টি স্মৃতি, হারিয়ে যাওয়া রঞ্জনের উপর ঐটুকু নির্ভরতা কিছুতেই বিসর্জন দিতে পারি না। সাহস হয় না। ভয় লাগে।

আপন মনেই হেসে উঠলাম। চরিত্রহীন স্বামীর কথা ভাবতে ভাবতে কোথায় ভেসে চলেছি?

'একসকিউজ মী! সীট বেল্টটা খুলবেন না?' মাঝখানের হ্যান্ড রেস্টের উপর কনুই রেখে একটু বেশী নিবিড় হয়ে মিঃ ওয়াল কথা বলতেই সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি 'নো স্মোকিং" সাইনের লাল সংকেত উধাও হয়ে গেছে। তার মানে পাঁচ-দশ মিনিট আগেই ফ্রাংকফার্ট থেকে টেক অফ করেছি। কতটুকু দূরত্বই বা পাড়ি দিয়েছি! অথচ এরই মধ্যে আমার জীবন পথের কত দীর্ঘ ও জটিল পথ পরিক্রমা করলাম! কত অলি-গলি থেকে কত প্রশস্ত রাজপথ পরিভ্রমণ করলাম।

কোমর থেকে সীট বেল্ট খুলতে খুলতে ওয়াল সাহেবের দিকে তাকিয়ে একটু হাসতে হাসতে ধন্যবাদ জানালাম।

মিল সার্ভিস শুরু হয়ে গেছে। এয়ার হোস্টেসরা লাঞ্চ ট্রে নিয়ে আইল দিয়ে ছুটাছুটি করছেন। মিঃ ওয়াল মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললেন, নো মোর ড্রিমিং! এক্ষুণি লাঞ্চ খেতে হবে।

'আই নো।'

'বাই দ্য ওয়ে, ডু ইউ ইট মীট?'

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, আই এ্যাম এ ম্যান-ইটার।

ইন্ডিয়ানরা ম্যান-ইটার হলেও সব সময় মীট-ইটার হয় না।'

আর কথা বলার অবকাশ পেলাম না। এয়ার হোস্টেস দুটো লাঞ্চ ট্রে হাতে করে একটু ঝুঁকে পড়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, একসকিউজ মী ম্যাম। ভেজ অর নন-ভেজ?

আমি উত্তর দেবার আগেই মিঃ ওয়াল্স বললেন, সী ইজ এ ম্যান-ইটার।

এয়ার হোস্টেস হাসতে হাসতে খুব ভাল করে আমাকে একবার দেখে নিয়ে লাঞ্চ দিয়ে গেলেন।

লাঞ্চ খেতে খেতে মিঃ ওয়াল্স বললেন, এই লাঞ্চের লোভেই আমি সব সময় এয়ার ইন্ডিয়া প্রেফার করি।

'অন বিহাফ অফ সিকস হানড্রেড এ্যান্ড ফিফটি মিলিয়ন পিপল অফ ইন্ডিয়া আমি কি আপনাকে ধন্যবাদ জানাব?'

'আই ওন্ট ডিসলাইক দ্যাট!'

দুজনেই হাসি। হাসতে ভালই লাগে। বরাবর। স্কুলে, কলেজে, বন্ধুবান্ধব; আত্মীয়-স্বজন মহলে আমার হাসির খ্যাতি ছিল ও আছে। বিজয়া তো বলে, তোমাকে হাসতে দেখলে মনেই হয় না তোমার মনের মধ্যে কোন দুঃখ জমে আছে। এই হাসির জন্যই ফাদার জোনস বিজয়ার অনুরোধে আমাকে কমিউনিটি রিলেসান্স অফিসে চাকরি দিয়েছিলেন। উনি বলেছিলেন, মাই চাইল্ড, তুমি বিজয়ার বন্ধু তারপর এমন প্রাণ খুলে হাসতে পারো। ইউ মাস্ট গেট এ জব।

ইংরেজদের অনেক দোষ কিন্তু এমন কিছু গুণ আছে যা আমাদের মধ্যে দুর্লভ। ফাদার জোনস আসামের চা বাগানে, দার্জিলিং'এর পাহাড়ে অনেক কাল কাটিয়েছেন। বিজয়া যখন দার্জিলিং'এর স্কুলে পড়ে তখন থেকেই ফাদার জোনস'এর সঙ্গে ওর পরিচয়। তারপর লেক ডিস্ট্রিক্ট থেকে লন্ডন ফেরার পথে ট্রেনে দুজনের আবার দেখা হয়। বয়স হলেও চুপ করে বসে থাকতে পারেন না ফাদার জোনস। ইয়র্কশায়ারের লোক। লীডস'এ লেখাপড়া করেছেন। ছোট্ট একটা ফার্ম আর রেস রিলেসান্সের কাজ করেই বুড়ো বয়সে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন। কোন দরকার ছিল না কিন্তু তবু এশিয়া-আফ্রিকা-ওয়েস্ট ইন্ডিজের কালো মানুষগুলোর কল্যাণের জন্য কিছু না করে শান্তি পান না। এই ফাদার জোনস'এর জন্যই আমি হিথরো এয়ারপোর্টের ট্রানজিট লাউঞ্জের কাজ ছেড়ে ব্রাডফোর্ড কমিউনিটি রিলেসান্স অফিসে চাকরি নিয়ে লন্ডন ছাড়লাম।

(ক্রমশঃ)

মানসিক রোগ-(৩৯)

আরেক রকমের আবেশিক বায়ু রোগের উদাহরণ দিয়ে এই রোগের আলোচনা শেষ করব। আগের বারে যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা গেছে এক এক রকমের চিন্তা রোগীর মনকে বেশ কিছুদিনের জন্য এমনকি কয়েক মাস বা কয়েক বছরের জন্য, পীড়িত করতে থাকে। তারপরে সে চিন্তা ক্রমে কমে আসতে আসতে এক সময় তা রোগীর মন থেকে দূর হয়ে যায়। কিন্তু সে চিন্তা দূর হলেও আবার আর এক চিন্তা এসে তাকে চেপে ধরে অস্বস্তি ঘটাতে থাকে। অনেকেই আছেন যাদের মধ্যে এই রকম রোগ লক্ষণ কিছু কম মাত্রায় দেখা দেয়। বিশেষ এক একটা কথা বহুবার করে তাদের মনে আসতে থাকে। আবার এক সময় তা থেমে যায় তার জায়গায় অন্য এক সময় আর একটা চিন্তা জ্বালাতন করতে থাকে। কিছুতেই যেন মন আর থামতে চায় না। এ রকম মানুষের দেখা অনেকেই পেয়েছেন। একটু লক্ষ্য রেখে চললে সকলের পক্ষেই এই লক্ষণ কিছু কিছু লোকের মধ্যে দেখতে পাওয়া কঠিন হবে না।

এখন আমরা যে রকম আবেশিক বায়ুর লক্ষণ বলব তারও স্বভাব একই। অর্থাৎ সেই একই কথা বারে বারে মনে আসে। কেবল প্রভেদ এই যে, এ রোগীর ক্ষেত্রে একই কথা বারেবারে মনে আসে অথবা বিশেষ সময় বিশেষ রকমে আসে আর এই লক্ষণ হয়ত সারা জীবন ধরে চলতে থাকে। কিছুতেই মন থেকে সে ধরনের চিন্তা দূর করতে পারে না, রোগী মনে মনে এক এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে, নিজের মনেই বলে 'আর পারি না' কিন্তু কিছুতেই মন থেকে সে চিন্তা দূর করতে পারে না। বেশ কয়েক বছর আগে এক শিক্ষিত যুবকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কয়েকজনে বসে নানা গল্প হচ্ছে। কি কথায় আর এক সময় দশভূজার নাম উল্লেখ করি। যে যুবকটির কথা বলছিলাম সে তৎক্ষণাৎ বলে উঠলো 'আঃ আপনি এটা কি করলেন!' আমি তার কথা বুঝতে না পেরে তাকেই প্রশ্ন করি—সে কি বলতে চায়। সে বলে 'আপনি আবার এই নামটা করতে গেলেন কেন?' আমি তখনও বুঝতে পারিনি ঐ নাম করাতে আপত্তির কারণ কি থাকতে পারে। মনে সন্দেহ হয়েছিল, নিশ্চয় কিছু একটা এ নামের সঙ্গে জড়িত আছে যার ফলে ওর এত আপত্তি উঠেছে। আবার তাকে প্রশ্ন করতে করতে শেষ পর্যন্ত জানতে পারা গেল—প্রতিদিন বিছানায় শুয়ে সে কয়েকটি দেব দেবীর নাম মনে মনে উচ্চারণ করে আর সেই সঙ্গে তাঁদের রূপও কল্পনা করে থাকে। প্রথমতঃ দুর্গানাম মনে আসতো। তারপর এই দুর্গানাম বেশ কয়েকবার করে মনে আনতে হতো। আরও পরে নামের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গা প্রতিমার ছবি মনে আনতে হতে লাগলো। যতক্ষণ এতে তার মন তৃপ্ত না হতো ততক্ষণ বারে বারে এই প্রক্রিয়া মনে চলতে থাকতো। তারপরে কবে এক সময় শিব গণেশ কৃষ্ণ ইত্যাদি করে পর-পর নয়টি দেব দেবীর নাম তার মনে এসে জুটেছে। আমার সেই দশভূজা নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হয়েছে আর একটা নাম তার তালিকায় যুক্ত হয়ে গেল। আর সে নাম সে ভুলতে পারবে না—তখন থেকে রোজ তার অন্যান্য দেবদেবীর নামের তালিকার সঙ্গে এই দশভুজা নামও নিতে হবে। তা না হলে সে স্বস্তি পাবে না। কিছু দিন পরে তার সঙ্গে আবার অন্যত্র দেখা হয়েছিল। সকলের আড়ালে ডেকে এনে তাকে জিজ্ঞেস করে জেনেছি—তার আগের সন্দেহই ঠিক হয়ে গেছে। তার তালিকায় দশভূজার নাম এসে গেছে। এখন রোজ তাকে সে নাম নিতে হয়। আরও জেনেছি যে কোন দেবতার পরে কোন দেবতার নাম মনে আসবে তার একটা বিশেষ ক্রম আছে। যদি তা না হয় তবে আবার প্রথম থেকে সুরু করতে হয়। প্রায়ই কোনও না কোনও ভুল হয় অথবা তার মনে সন্দেহ হয় যে, ঠিকমত ক্রম রক্ষা করে নাম নেওয়া হয়নি—তখন আবার তাকে সে নাম বলতে হয় আর তাদের রূপ সঙ্গে সঙ্গে তার মনে আনতে হয়। যদি সে ছবি স্পষ্ট না হয় তবে আবার মুস্কিল বাধে। কেন স্পষ্ট হল না—তাই নিয়ে কোথাও ভুল হয়েছে মনে করে আবার মনে মনে প্রথম থেকে তার সেই তালিকামত দেব দেবীর রূপ একের পর এক আনতে থাকে। এক একদিন এমনও নাকি হয় যে, শোবার পরে দু'তিন ঘণ্টা সময় কেটে যায় তার সে মানসিক চিন্তা তবু শেষ হতে চায় না। কখনও বা বিছানা ছেড়ে উঠে মাথা হাত পা ভাল করে ধুয়ে এসে আবার শান্ত মনে ধীরে আস্তে নাম মনে আনতে থাকে। মনে যখন বাধা, সন্দেহ ইত্যাদি বোধ জাগতে থাকে সে চঞ্চল হতে থাকে। এমনকি অস্থির হয়ে এ পাশ ওপাশ না হয় একবার বসা একবার শোওয়া এই করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এ সবে কীযে লাভ হয় তা সে জানে না—কিন্তু ভাবনা তাকে ছাড়ে না। সে নিরুপায় হয়ে এই মানসিক অশান্তি ভোগ করতে থাকে। বাড়ীর লোক তাকে শোবার আগে পুজোর ঘরে বসে একমনে কোনও নাম জপ করতে বলে কিন্তু সে তা পেরে ওঠে না। তার মনে ঐ তালিকার নামই কেবল আসতে থাকে। প্রায় ১৬।১৭ বছর পরে তার সঙ্গে আবার দেখা। চেহারা অনেক পালটে গেছে। রোগা কেমন দড়ির মত পাক খাওয়া, রুগ্ন ক্লান্ত চেহারা হয়েছে—চোখ গর্তে বসে গেছে—কেমন মনে হয় সে চোখ দিয়ে সে যেন বাইরের কিছু দেখতে পাচ্ছে না—কেমন আতঙ্কগ্রস্ত ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। জামা কাপড়ের দিকে কোনও নজর নেই। আলুথালু পরিচ্ছদ—এলোমেলো চলন ভঙ্গী। অনেক কথা হল—সেই একই অবস্থা—একই চিন্তা তাকে পাগল করে দিয়েছে। আগে খালি রাতে শোবার সময় মনে আসত, এখন নাকি বিশেষ কাজে ব্যস্ত থাকলেও হঠাৎ কখনও সেই তালিকার নাম মনে এসে তাকে ক্ষেপিয়ে তোলে। কাজে মন দিতে পারে না। মন থেকে সে চিন্তা দূর করে দেবার জন্যে মাঝে মাঝে জোরে মাথা ঝাঁকাতে থাকে, কখনও বা দু-হাতে মাথা থাপাতে থাকে। তবু সব সময় চিন্তা থামে না। এই এক জ্বালায় তার জীবনের সব সুখ আনন্দ নষ্ট হয়ে গেছে। বাড়ীর অবস্থা ভাল, পারিবারিক জীবনেও অন্য কোনও অসুবিধা কিছু নেই কিন্তু ঐ এক চিন্তা, সে [illegible] তার দেহের সব রস শুষে নিচ্ছে, সব শান্তি লোপ করেছে। তার আর বাঁচবার ইচ্ছে নেই। দু একবার নাকি আত্মহত্যা করবার চেষ্টার কথাও ভেবে ঠিক করেছিল। সফল হতে পারেনি। এটা যে মানসিক রোগ তা সে এখন বুঝতে পারে কিন্তু চিকিৎসা করিয়ে আর কিছু হবে না—এ তার নিয়তি, ভাগ্য, কর্মফল ইত্যাদি বলে সে যন্ত্রণা নিয়েই দিন কাটায়। এই সত্রে একটা কথা বলে রাখা ভাল। এই সব রোগী একদিক থেকে মানসিক যন্ত্রণা যেমন ভোগ করে আরেকদিকে এ ধরনের যন্ত্রণা ভোগ করতেও চায়। কথাটা বোধহয় বড়ই অবাস্তব মনে হতে পারে। কিন্তু তবু কথাটা সত্য। অনেকেরই নিজ্ঞানে বিশেষ রকমের অন্যায় বা পাপ বোধ থাকতে পারে। সেই পাপ বোধ যদি জীবনের কোনও এক সময় অন্য কোনও কারণে নাড়া খেয়ে প্রবল হয়ে ওঠে, তবে সে পাপবোধের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে শাস্তি পাবার ইচ্ছা জাগে। এই শাস্তির ইচ্ছা থেকেই মানুষ রোগ ভোগ করতে চায়। হয়ত বা নিজের অজান্তে, কখনও বা জেনে বুঝেই সে দুঃখকষ্ট নিজের পাপের কর্মফল বলে ধরে

নিয়ে শাস্তি পেতে থাকে। কেবল যে এই আবেশিক বায়ু রোগের ক্ষেত্রেই একথা সত্য তা নয়। অন্য অনেক মানসিক হয়ত সব মানসিক রোগ, এমন কি শারীরিক রোগের বেলাতেও এই রকমের মানসিকতা কাজ করতে দেখা যায়। এর ঠিক বিপরীত রকমের রোগীদের মধ্যেও এই মানসিকতা কাজ করছে এমন দেখতে পাওয়া যায়। সামান্য কিছু হলেই অতিমাত্রায় উৎকণ্ঠা দেখা দেয়, আর ঘটা করে চিকিৎসা করতে উঠে পড়ে লেগে যায়। সামান্য শারীরিক গ্লানিতেই মনে মনে অস্থির হয়ে ওঠে এমন রোগী নেহাৎ কম নেই। নিজের মনে যে পাপবোধ লুকোনো থাকে—অসুস্থ হলে, সে অসুখকে পাপের শাস্তি বলে মনে করে বলেই, নিজে যে পাপী নয় এইটা নিজের কাছে, অপরের কাছেও প্রমাণিত করবার জন্যেই যেন চটপট রোগ সারাতে তৎপর হয়ে ওঠে। অবশ্য ইচ্ছে করে রোগ ভোগ করাটা কখনই মানসিক সুস্থতার পরিচায়ক নয়। তেমনই রোগের নামে আঁৎকে ওঠাটাও সুস্থতার লক্ষণ নয়। পাপবোধ লুকোতে চাইলে, বা লুকোনো আছে যা তা বাইরে প্রকাশ পাবার বয়ান বুঝলেই তাকে বিশেষ করে চাপা দেবার চেষ্টায় নানা রকম প্রক্রিয়া মনে চলতে থাকে। দেখা যাচ্ছে রোগ ভোগ করবার ইচ্ছে এবং রোগ সারানোর জন্য বিশেষ তৎপরতার—এই দুয়ের মধ্যেই লুকোনো পাপ বোধ কাজ করতে পারে। একটাতে পাপের শাস্তি হিসেবে মেনে নেওয়া হয় অপরটাতে পাছে নিজের পাপ বোধ ধরা পড়ে যায় সেই ভাবনায় যেন মন ঢাকা দেবার চেষ্টা চালাতে থাকে।

নির্জ্ঞান মনের বিশেষ কোনও ভোগবৃত্তির পরিপূরণের চাপ ও তার রোধের চেষ্টা এই দুই মানস ক্রিয়ার সামঞ্জস্যপূরণ মীমাংসা কিছু যদি মন খুঁজে না পায়, তবে সেই সমস্যায় পড়ে যে বিকৃত সমাধানের পথে তখন মন চলতে থাকে—তাকেই মানসিক রোগ বলা যায়। আর সেই বিকৃত চলার পথে যে সব চিন্তা বা ক্রিয়াদি মন করে চলে, তাকেই মানসিক রোগ লক্ষণ বলা হয়।—একথা, বহু আগে এই সব আলোচনার প্রথম ভাগে মনের গঠন ও ক্রিয়া সম্বন্ধে বলতে নিয়ে বলা হয়েছে যে মনের রোগ হলেই যে পুরো মনটাই অসুস্থ হয়ে যায়, সে মন আর কোনও চিন্তা, বিচার ইত্যাদি বা কোনও মানসিক ক্রিয়াই যে সুস্থ আর দশজনের মত করতে পারে না তা নয়।—মনের বহু ক্রিয়া ও প্রকরণের মধ্যে যে বিশেষ ক্রিয়া প্রকরণের মধ্যে রোগ দেখা দেয় মূলতঃ কেবল সেই মানসিক ক্রিয়া সঙ্গে যুক্ত বিষয়েই রোগ লক্ষণ সাধারণত দেখা দিয়ে থাকে। তবে একথাও ঠিক যে কোনও বিশেষ মানসিক ক্রিয়া প্রকরণে যদি রোগ দেখা দেয় তবে তার সঙ্গে যুক্ত বা আনুষঙ্গিক ক্রিয়াদিতেও কম বেশী রোগ দুষ্টী দেখা দিতে পারে। বিশেষ ক্ষেত্রে এক প্রকরণ থেকে মনের অন্য প্রকরণে রোগ লক্ষণ প্রভাবিত হতে বা সঞ্চালিত হতেও দেখা যায়। এমনও হয় যে প্রথম অবস্থায় যে রোগ লক্ষণ নিয়ে রোগ দেখা দেয় ক্রমে তা বদলে গিয়ে অন্য লক্ষণ যুক্ত এক ভিন্ন মানসিক রোগে তা রূপান্তরিত হয়ে যায়। এ সব গেল মানসিক রোগ সম্বন্ধে সাধারণ দু একটি কথা। আবার আমাদের আলোচ্য বিষয়ে ফিরে আসা যাক।

আবেশিক বায়ু রোগের উদাহরণ আর বেশী দিয়ে লাভ নেই। আর একটি রোগীর কথা বলে এ আলোচনা শেষ করব।

এক কলেজ পাশ করা শিক্ষিতা যুবতী—বয়স ২৩।২৪ বৎসর হবে। মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। মোটামুটি ছোট সুখী পরিবার। এম-এ পরীক্ষার দু তিন মাস আগে আকাশবাণীতে কলকাতার আবর্জনা জমে উঠে কী অস্বাস্থ্যকর নোংরা পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়ে কিছু খবর প্রচারিত হয়। পরীক্ষার পড়া তৈরী করতে করতে রোগীটির কানে সে খবর আসে। তখন কিছু তার মনে হয়নি। কলকাতার নোংরা পথে সে তো কতদিন কতবার চলাফেরা করেছে তাতে নূতন আর কী আছে। সে আবার পড়ায় মন দেয়। হঠাৎ তার মনে হল ঐ সব নোংরা যদি তার গায়ে এসে লাগে, নাকে মুখে ঢুকে যায়, বাতাস তো দূষিত! তাতেও তখন তার কিছু আর মনে হয়নি। এতদিন যদি ওতে কিছু না হয়ে থাকে তবে আর ভাবনার কি আছে। আছে তো আছে। কি আর হচ্ছে! সেদিনের মত পড়া হয়ে গেল। সবই স্বাভাবিকভাবেই চলল। ক'দিন পরে রাস্তায় চলতে গিয়ে মনে হল—না জানি কত নোংরা নাকে দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে, গায়ে লাগছে। ক্রমে এই বোধটা একটু একটু করে বাড়তে থাকে। নোংরা কথাটা মধ্যে মধ্যেই তার মনে আসতে থাকে। জোর করে সে তাড়াতে চায়, এক এক সময় সফল হয় আবার কখনও সে চিন্তাটা তাড়াতে পারে না। বেশ কিছুক্ষণ তার মনে ঘুরপাক খেতে থাকে। সে ভাবতে চেষ্টা করে নোংরা রয়েছে তা সকলের নাকেই যদি ঢোকে তবে তারও ঢুকবে—তাতে হয়েছে কি। কী যে হবে সে কথা তার মনে স্পষ্ট করে আর আসে কিছু। কেবলই মনে হতে থাকে নোংরা খারাপ, নোংরা ভাল না, নোংরা নোংরা। পড়াশোনায় বাধা পড়তে থাকে। সময়ে অসময়ে ঐ এক কথা মনে আসে নোংরা। কোথায় কোনটা নোংরা আর তাতে কী তার হবে সে সব কথা তার কিছু মনে আসে না। নোংরা হলেই খারাপ। কী খারাপ তা ঠিক জানে না। বিচার বিবেচনা করলে বলতে পারে আসুখ করতে পারে, নোংরা তো ভাল না। ইত্যাদি সামান্য একটু যা তার অনেক চেষ্টায় মনে আসে তাও সাধারণত তার মনে আসে না। কেবলই মনে হয় নোংরা তার পথ চলা তাতে বন্ধ হয়নি, কিন্তু পথ চলতে চলতে বহুবার ঐ নোংরা শব্দটাই মনে এসে তাকে আনমনা করে দেয়। এক এক সময় এত বেড়ে যায় যে রাস্তায় গাড়ী চলাচলের দিকে তার খেয়ালই থাকে না। রাস্তায় বড় রকমের বিপদ ঘটতে ঘটতে অন্যের সাহায্যে সে কয়েক বার বেঁচে গেছে। এক সময় নিজেই বুঝতে পারল ওটা তার মনের ব্যারাম। বাড়ীতে বলতে লজ্জা পায়—কিন্তু কিছুদিন রয়ে সয়ে শেষে মাকে বলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়ে নেয়। সে বছর তার এম-এ পরীক্ষা দেওয়া হল না। এই মনের অস্বস্তি নিয়ে কোনও দিকেই তার পক্ষে মনোনিবেশ করা অসম্ভব হয় নি। প্রায় এক বৎসর চিকিৎসা করানোর পর তার মনের স্বস্তি ফিরে আসে। পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে। কয়েক মাস আগে তার বিয়ে হয়েছে। এখন আর মনের সে সব দুশ্চিন্তা কিছু নেই। মাঝে মধ্যে এখনও সে কিছু কথা বলতে আসে। ভাল আছে। নির্জ্ঞানে সে ইচ্ছা তাকে বারে বারে নাড়া দিত, তাকে সে খারাপ বলে অবদমিত করে রাখতে চেষ্টা করে—কিছুটা সফলতাও লাভ করেছিল। পরীক্ষার আগে মনে প্রক্ষোভ উৎকণ্ঠা যখন বেশী বেড়ে গেল তখন তার আগেকার সাজানো বাঁধ—আংশিক ভেঙ্গে পড়ে ঐ নোংরা শব্দটাকে আশ্রয় করে তাকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। সে আরও বেশী করে তার অবদমিত কামনাকে দমন করবার চেষ্টায় বারে বারে নোংরা শব্দটা মনে জাগিয়ে তুলে যেন আরও সতর্কতা নিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছিল। মনঃসমীক্ষণের ফলে তার অবদমিত ইচ্ছা ক্রমে তার কাছে প্রকাশ পেল, তখন তার মনের অস্থিরতা কিছু বেড়ে গিয়েছিল। তারপরে তার স্বাভাবিক স্বরূপ যত সে অনুভব করতে পারলো, যত সে সেই বৃত্তির স্বরূপ বুঝে নিজের পথ বিচার করে বেছে নিতে পারল ততই তার সুস্থতা ফিরে এলো। অজানা শত্রুই বেশী ভয়াবহ, শত্রুর স্বরূপ জেনে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে আত্মরক্ষা, আত্ম নিশ্চিন্ততা গড়ে তুলতে পারলে মানসিক স্বাস্থ্য ফিরে আসে, বজায় থাকে।

—তরুণচন্দ্র সিংহ

সেই লোকটি

স্রেফ বেড়াতে গেছিলাম চাকুলিয়ায়। ঝাড়গ্রাম গিধনি জঙ্গল এড়িয়ে খিপ্ৰমাটির দেয়াল তোলা হঠাৎ হঠাৎ বাড়ি আর শান্ত বনরেখা পেরিয়ে কাঁধে রুকস্যাক, জুতোয় রাজ্যের লাল ধুলো নিয়ে এসে উঠেছিলাম পাবলিক ওয়ার্কস-এর ছিমছাম ডাকবাংলোয়। চৌকিদারের হাতে রান্না মুরগির ঝোল-ভাত খেয়ে তক্তপোষের ওপরে বসে তুখোড় মেজাজে চার্মিনার ধরিয়েছি, দরজায় একটি দীর্ঘ ছায়া এসে পড়ল। বাজখাঁই গলা জেগে উঠল, 'ভেতরে আসতে পারি।'

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই বিশদৃশ রকমের লম্বা এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক ঢুকে পড়লেন ঘরের ভেতর। কদম-ছাঁট চুল, চৌকো চোয়াল, বিশাল খাঁচা শরীরের, পরনে হাফ-শার্ট ও খয়েরি ট্রাউজার্স—সব মিলিয়ে বেশ দশাসই চেহারার মালিক। বাঙালী কিন্তু কথায় এক অদ্ভুত ধরনের হিন্দী টান আছে। চেয়ার দখল করে বললেন, 'আমার নাম বিমান মিত্তির। এখানে সবাই আমাকে দাওয়াইবাবু বলে চেনে। গাঁয়ে-গঞ্জেও ওষুধপত্র বিক্রি করে পেট চালাই আর কি। দেখলাম, নতুন লোক, একা বসে আছেন তাই সেধে খানিকটা আলাপ করতে এলাম।' লক্ষ্য করলাম বিমানবাবুর ওপরের পাটির মাঝখানের একটি দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।

অনর্গল অনায়াসে কথা বলতে পারেন ভদ্রলোক। কথা বেচা তাঁর পেশা হলেও সংলাপকে মোটামুটি শিল্পে ঢেলে সাজানোর দুর্লভ গুণ তাঁর রপ্ত। একটা ওষুধের ফার্মের ক্যানভাসার তিনি—তাঁর এলাকা হল বিহারের দেহাত এলাকা-গুলো, কোন-মুপাঁচ। বউ ছেলেপুলে কলকাতায় থাকে ওঁর সারাজীবন ভিনদিশি ঘাট-মাঠ-জঙ্গল শোকাশুঁকি করেই গেল।

প্রায়োন্মাদ কলকাতা ছেড়ে সুট করে বেরিয়ে পড়েছিলাম কাছে-পিঠে ফাঁকা জায়গায় বুক ভরে দম নেব বলে। দুদিনেই জমে গেল বিমানবাবুর সংগে। তিন দিনের দিন কাকভোরে কোত্থেকে এক জীপ জুটিয়ে এনে তিনি বললেন—চলুন ধলভূম-গড় ঘুরে আসি।

অফুরান অরণ্যের পেটকেটে আঠার-উনিশ মাইলব্যাপী রাস্তা যেন লহমায় উজিয়ে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বাংলোয় এসে উঠলাম। বিশ্রাম নিচ্ছি, বিমানবাবু কোত্থেকে নিজের হাতে বয়ে নিয়ে এলেন মৌড়ির তেলে ভাজা আধ ডজন সিংগাড়া। তাঁর পেছনে পেছনে সিঁটকে চেহারা এক ছোকরা কলাইয়ের গেলাসে করে দুপাত্র ধোঁয়া ওগড়ানো চা রেখে গেল। শাল-সেগুন আর প্রহরীর মত দণ্ডায়মান অসংখ্য কাজু বাদামের গাছের মাথায় লাল রিবন পড়াতে পড়াতে সাঁঝ মামা যখন পাটে গেলেন কিছু চুনো চিংড়ি ভাজা আর দু বোতল অবশ-করা গন্ধের মহুয়া নিয়ে বিমানবাবু ডগোমগো মেজাজে এসে আসীন হলেন। বললেন, 'আসুন একটু তামসিক হওয়া যাক।' কাঁধের ঝোলা থেকে দুখানি মাটির গেলাস ও এক বাণ্ডিল চুট্টা বের করে টেবিলে বিছিয়ে দিয়ে ফের বললেন শুভস্য শীঘ্রম। শুরু করা যাক।'

এমনিতেই বেশি কথা বলেন বিমানবাবু, দু পাত্তর পেটে পড়তেই একেবারে ভকভকিয়ে যাকে বলে খাস বাত—তাই বেরোতে থাকল। পোখরাজের মত ঘামের দানায় ভরে গেল তাঁর রক্তিম মুখ অসম্বরণীয় আবেগে বলে যেতে লাগলেন তাঁর বিচিত্র জীবনের কাহিনী। কি করেননি বিমানবাবু। ইঁটের খোলার তদারকি করেছেন বেনাচিতিতে, ডুয়ার্সে নিয়েছেন গাছ কাটার ইজারাদারের কাজ, ধলভূমগড়ে কণ্ট্রাকটারি করেছেন বেশ কয়েক বছর, রাস্তা বানানোর কাজে কামিন খাটিয়েছেন সাঁওতাল পরগণার মহল্লায় মহল্লায় শেষমেশ ওষুধ ফিরি করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সারা বিহার। স্ত্রীপুত্র পরিবারকে কখনো কাজের জায়গায় আনেননি, তাঁর ছেলেমেয়েরা বছরে এক-আধবার তাঁকে চর্মচক্ষে দেখতে পায়। ফলে বিমানবাবু ও তাঁর স্বজনদের মধ্যে এক দূরত্বের অর্ধ পরিচয়ের পাঁচিল পাকাপাকিভাবে গড়ে উঠেছে—যে যার পথে ইচ্ছেমত হেঁটেছে। বনে-জঙ্গলে-পথে-বিপথে নানা ঝড়-ঝাপটার মধ্যে এতগুলো বছর কাটিয়ে এক অদ্ভুত ধরনের ভায়োলেন্স স্থায়ী হয়ে আসন গেড়েছে তাঁর চাল-চলন জীবনযাত্রায়। যদিও জন্ম নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসী নন বিমানবাবু, যদিও ঠাসবুনোট কাজের ফাঁকে ফাঁকে কলকাতায় গিয়ে এ যাবত আটটি সন্তান উপহার দিয়ে এসেছেন তাঁর স্ত্রীকে তবু সদরে দেহাতে অক্লান্ত দক্ষতায় নারী-মৃগয়া চালিয়ে যাওয়াটাই তাঁর সবচেয়ে বড় নেশা 'মেইয়াছেলে'—বেশ রসিয়ে রসিয়ে উচ্চারণ করেন তিনি। শব্দটির গা চেটে চেটে। আর সুরা। ধলভূমগড়ে সাঁওতাল কামিনরা নাকি তাকে ডাকতই 'বোতলবাবু' বলে।

রাত ঘন হয়ে আসছিল। বাংলোর আলো হীরের পলকাটা দ্যুতি ছড়াচ্ছিল তাঁর ওপরের পাটির খাঁটি সোনা বসানো দাঁতে। হঠাৎ আমার কাঁধের ওপর একটা চাপড় মেরে বললেন, 'ইয়ংম্যান, ডোন্ট ম্যারি বি ফ্রি অ্যাজ এয়ার।' কেন, বিয়ে করেও আপনি নিজেই তো যথেষ্ট ফ্রি আছেন—' গলায় কৌতুক মিশিয়ে বললাম। উত্তর দিলেন না বিমানবাবু। বেশ খানিকক্ষণ গুম মেরে বসে রইলেন। তারপর মাথা নুইয়ে আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন 'দেখুন, জীবনে কম পয়সা রোজগার করিনি আমি। টাকা আমার হাতের ময়লা বৈ নয়। যখনই সুযোগ পাই, বাড়িতে এন্তার টাকা পাঠাই। তাতে বেশ ভালোভাবে ঠাঁটবাট বাবুয়ানি বজায় রেখে গিন্নি ছেলেমেয়ে-দের চলে যায়। কয়েক বছর আগে একটা ভকসল গাড়ি কিনি, সেটি এখন আবার জ্যেষ্ঠ বত্যাটিই চালায়। ওপরে ওপরে ভারি ডিসেণ্ট সফিষ্টিকেটেড হয়েছে তারা। আপনার বৌদি মেচেতা

পরা মুখে রং বুলিয়ে প্রায় সন্ধেয় মারকেটিং-এ যান, বড় মেয়ে-দুটি ট্রিংকার জাম সেখানে যায় বেল-বটম দুলিয়ে, ছেলেরা একেবারে মজেল সেভেণ্টি-ফোর। আমি বাড়ি গেলে ওদের অস্বস্তির শেষ থাকে না যেন চীনে মাটির বাসনের দোকানে এক বুনো ষাঁড় এসে ঢুকে পড়েছে। ফোন, ফ্রিজ রেকর্ড প্লেয়ার ঝকঝকে ড্রইং রুম থেকেও যেন শব্দ উঠতে থাকে 'তুমি যাও। চলে যাও।' দু-চারদিন থেকেই ফিরে আসি। আবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ি। দিন যায় খাটুনিতে, সন্ধ্যা মহুয়ার নেশায়, রাত দেহাত ঝুপড়িতে ঝুপড়িতে। তাই বলছিলাম—'ডোন্ট ম্যারি বি ফ্রি অ্যাজ এয়ার।'

—অমিতাভ দাশগুপ্ত

ভালবাসা ভালবাসা

আনন্দ বাগচী

উপন্যাস

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

কিছুতেই ঘুম আসছিল না।

অথচ অন্য দিনের তুলনায় সকাল সকাল আলো নিভিয়েছে তপতী।

আর আলো জেলে শুধু শুধু বসে থেকেই বা লাভ কি যদি ছাপা অক্ষরের একটা লাইনেও দন্তস্ফুট করতে না পারা যায়। কোনো কথাই যদি মাথায় না ঢোকে। যতবার পড়তে আরম্ভ করে আধ মিনিটও বুঝি পার হয় না ট্রামগাড়ীর মত যত্রতত্র লাইনচ্যুত হয়ে থেমে যায়। কখন থেমে পড়ে অন্য কথা ভাবতে শুরু করে দেয় নিজেরই খেয়াল থাকে না।

শোবার ঘরেই তপতীর রাতের পড়ার টেবিল। সেখানে বসে অনেক রাত অবধি পড়াশোনা করে ক্লান্ত লাগলে সামান্য সময়ের জন্য পাশের অ্যাকোরিয়ামের দিকে তাকিয়ে মৎস্য কেলি দেখে। বা সোজা বিছানায় চলে যায়। শিয়রে ঠিক খাটের মাপে একটা ছোট্ট টেবিল আছে তার ওপরে একটা উল্টে পড়া পদ্মের মত রঙীন টেবিল ল্যাম্প আর খানকয়েক গল্পের বই সব সময় সাজানো থাকে। পাশেই দামী কাঠের ছোট্ট রিভলভিং শেলফে ইংরেজি বাংলা আরও কিছু সংগ্রহ রয়েছে হাত বাড়ালেই পেতে পারে।

বেডস্যুইচ টিপে সিলিং-এর আলো নিভিয়ে টেবল বাতি জ্বালিয়ে নিয়ে তখন গল্পের বই পড়ে। বই, মানে গল্পের বই তপতীর একমাত্র অনিবার্য নেশা। বই পড়তে পেলে সে বিশ্বদুনিয়া ভুলে যেতে পারে। প্রতিদিন বই পড়তে না পেলে তার ঘুম আসে না। মনে হয় কি কাজ যেন করা হল না কি কর্তব্য যেন অসম্পূর্ণ থেকে গেল। আধপেটা খাওয়ার মত, কেমন যেন খালি-খালি লাগে ভেতরটা।

আজও বিছানায় এসেছিল পড়ার টেবিল থেকে; বড় আলো নিভিয়ে ছোট পরিধির অন্তরঙ্গ আলোয়। জমজমাট একটা রহস্য অ্যাডভেঞ্চারের বইও টেনে নিয়েছিল হাতে। কিন্তু এই প্রথম গল্পের বই তার বিস্বাদ লাগলো। কোনো চার্ম পেল না। নিজেই অবাক হল এবং চিন্তিতও। জীবনে যা কখনো হয় নি তা কেন হল। তবে কি সে অসুস্থ অথবা কোনো কঠিন রোগে আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আক্রান্ত হতে যাচ্ছে! বিরক্ত হয়ে এক আঙুলের খোঁচায় আলো নিভিয়ে দিয়ে বইটা রেখে দিল টেবিলের ওপর।

বইয়ের পাতা শুধু নয় চোখের পাতাও বোজালো। জানলা দিয়ে রাস্তার একাধিক আলো ঘরের মধ্যে এসে পড়েছিল—তপতী চোখ বন্ধ করে সেটাকেও রুখলো। কিন্তু রুখতে পারল না অন্ধকারে প্রায় এক্সপ্রেসগতিতে ছুটে-আসা চিন্তাগুলিকে। যতক্ষণ আলো জ্বলছিল ততক্ষণ তারা স্পষ্ট করে দেখা দেয় নি। নেপথ্যে কোথা থেকে হয়ত ছুটে আসছিল আসন্ন গাড়ীর মত শুধু তার ঘন্টা শোনা গিয়েছিল প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। কিন্তু এবার একেবারে সে হুড়মুড়িয়ে যেন ঘাড়ের ওপর এসে পড়লো। প্রায় ঝড়ের মত ধুলো-শালপাতা উড়িয়ে আলো অন্ধকারের অল্টারনেট ফ্ল্যাশ দিতে দিতে পিসটনের দাঁত ঘসটানি চাকার চর্বন হুইসেল আর ফিসপ্লেটের কাতরানি মিশিয়ে কম্পার্টমেন্টে কম্পার্টমেন্টে ভাগ হয়ে যোগ হয়ে জানলায়-জানলায় অসংখ্য মুখ আর মুহূর্তে টুকরো টুকরো হয়ে গল্পের মত উপন্যাসের মত আজকের দিনটা আজকের ঘটনায় ঘটনায় ঘনঘটা দিনটা তপতীর মগজের উপকূলে এসে আছড়ে পড়ল।

আজকের সামান্য একবেলার মধ্যে তপতীর বয়স যেন কয়েক বছর বেড়ে গিয়েছে। কদিন আগে প্রথম দামী শাড়ী পরে কলেজ যেতে গিয়ে তপতীর মনে হয়েছিল সে হঠাৎ বড় হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সে বড় হওয়া তার শরীরকে জড়িয়ে। এবং কল্পনাকে মিলিয়ে। কিন্তু আজ বিকেল থেকে সন্ধ্যেরাতের মধ্যে তপতীর জীবনে যেন যবনিকার পরে যবনিকা উঠেছে। পর্দার পর পর্দা সরে গিয়ে একটা না-দেখা স্টেজের অনেকখানি হঠাৎ আবিষ্কার করে বসেছে। শুধু স্টেজ নয়, যেন স্টেজের অন্তঃপুরের গ্রীণরুম পর্যন্ত। যেখানে ছলনায়িকা আর ছলনাময়ীরা নিজে হাতে মেক-আপ নিতে এবং খুলতে বসে। আজ হঠাৎ যেন এক রাজ্যের সীমান্ত পার হয়ে সম্পূর্ণ অন্য রাজ্যে ঢুকে পড়েছে। এই রাজ্য পুরুষের রাজ্য। এখানে ঢোকার ছাড়পত্র হচ্ছে গোপন অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতার চেয়ে উত্তেজক আর কিছু নেই। অভিজ্ঞতাই মানুষকে পাল্টে দেয়, জাগিয়ে দেয় বড় করে দেয়। বয়ঃসন্ধির চেকপোস্ট পার করে দেয়। তপতী আজ একই সঙ্গে কৈশোর এবং যৌবনকে অনুভব করতে পারল। এই অনুভবে বড় বেদনা।

পুনশ্চ, পুনুকে প্রথম যখন ঘরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেয়েছিল মুখোমুখি দাঁড়ানো সত্ত্বেও চিনতে পারে নি। আচমকা এবং অপ্রত্যাশিত বলে নয় পুনু আপাদমস্তক বদলে গেছে বলে।

শুধু বয়সের জন্যে নয় নিশ্চয়। তিন বছরে মানুষের বয়স আর কতটা বাড়ে? তিন বছরের বেশী বাড়তে পারে না নিশ্চয়! বয়স তাকে হয়ত মাথায় কিছুটা ঢ্যাঙা করেছে মাখনের মত মসৃণ নরম গালে ঠোঁটে কিছুটা আবর্জনা জমিয়েছে কিন্তু পাল্টাতে পারে নি জলজ্যান্ত মানুষটাকে গুম করে দিতে পারে নি। অথচ যে কিশোর পুনুকে বাল্যকাল থেকে জানতো তপতী সে কই? সে আজ আর কোথাও নেই হারিয়ে গেছে উবে গেছে ইহদুনিয়া থেকে। মুখের কঠিন রেখায় চিবুকের এক গুঁয়েমীতে আর চোখের বরফ-শীতল চাউনিতে পুনু এখন আর একজন গড়িয়ার পুনশ্চ দাশগুপ্ত এমনি সাইজের ভিন্ন মানুষ।

পুনু কবে ভেতরে ভেতরে বড় হয়ে গেছে, বদল হয়ে গেছে কেউ জানে না। বয়স নয়, অভিজ্ঞতাই পুনুকে এমন পাল্টে দিয়েছে। কি অভিজ্ঞতা এত পুনুর এই বয়সে? তার থেকে দু বছরের বেশী বড় হবে না ও। অথচ এরই মধ্যে পুনু এমন কিছু দেখেছে জেনেছে ভেবেছে এবং হাতে-কলমে করেছে যা তাকে রাতারাতি বদলে দিয়েছে। কি সেটা, তপতী জানে না। আতঙ্ক? আক্রোশ? হত্যা? তপতী জানে না।

পুনুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল প্রায় দশ বছর আগে, গড়িয়ার মাঠে। তপতীর

স্পষ্ট মনে আছে। দিনটা ছিল রবিবার, শীতের সকাল। গড়িয়া তখনও এতটা জমে ওঠে নি। ঠাসবুনোন বাড়ীঘরে তার ফাঁকা জায়গা সব ঢাকা পড়ে যায় নি। পথঘাট পাকা হয় নি। এত মানুষ এত সাইকেল এত রিকসা তখন পথে চলতো না। এত আলো, দোকান বাজার এত বাস এবং বাসের এত ভিড় ছিল না। সরকারী বাস এ পর্যন্ত আসতো, বুড়ী ছুঁয়ে চক্কর দিয়ে ফিরে যেত। আসতো খালি যেতোও প্রায় খালি। খাল পানাপুকুর বাঁশের সাঁকো খেতখামার গাছপালা ঝোপ-ঝাড় শেয়ালের পাল সব নিয়ে সেদিনের পাড়াগাঁ গড়িয়া সম্পূর্ণ গড়ে ওঠে নি। দেশ-হারানো সব-খোয়ানো মানুষ ইতি-উতি জায়গা নিয়েছে; সরকারী সাহায্য নিজের চেষ্টায় কাঁচা বসতী বেঁধে বসেছে। হেথা হোথা বড় বাড়ী পাকা বাড়ী দোতলা তেতলা নিশ্চয় ছিল। ফটক বাগান কুকুর হইতে সাবধান, গ্যারাজের গুমোর বাড়ানো হাল মডেলের গাড়ী অবশ্য অবশ্যই ছিল। কিন্তু সে বলতে গেলে ছিটে-ফোঁটা এখনকার তুলনায়। এই দশ বছরে আলাদীনের দৈত্য স্বয়ং বুঝি গড়িয়া রাজ্যের কনট্রাক্ট নিয়ে রাতকে দিন করে ছেড়ে দিয়েছে।

সেই ঝিঁঝি সেই প্রহরে প্রহরে ঘড়ি-মেলানো শেয়ালের ডাক আর শোনা যায় না, অন্ধকারে জোনাকীর ঝাঁক আর নেচে বেড়ায় না। আর আসে না সেই অজস্র রং-বেরংয়ের পাখি, রকম-বেরকমের পাখি। অথচ এই পাখি নিয়েই প্রনুর সঙ্গে তপতীর আলাপের সূত্রপাত। শীতের সকাল, বারটা রবিবার স্পষ্ট মনে আছে তপতীর। পাখি ধরারা পাখি ধরতে এসে-ছিল ওদের পাড়ায়। তপতী তাই ছুটে বেরিয়ে এসেছিল পড়া ফেলে। লোকগুলো জাতে বেদে বোধ হয় বাংলাদেশে অনেক-কাল থেকে থেকে বাঙালী বনে গেছে। তাদের সঙ্গে খাঁচায় কয়েক রকমের পাখি ছিল। তিতির ময়না টিয়া। ওদের পিছনে পিছনে ছোট ছেলে-মেয়ের ভিড় লেগে গিয়েছিল। ওরা বার বার ছোটদের কথা বলতে নিষেধ করছিল। দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে বলছিল।

তন্ময় হয়ে দেখছিল তপতী হঠাৎ ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে কেউ ফিসফিস করে বলল, 'আমাদের বাড়ীতে যাবে? একটা মজা দেখাবো।'

তাকিয়ে দেখে ওরই মাথায় মাথায় একটি ফুটফুটে ছেলে, মাথায় একরাশ কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, ডাগর চোখ, মাখনের দুটো ডেলার মত গাল। ঠিক যেন প্রমাণ-সাইজের একটা ভাল পুতুল। তপতীর মনে পড়লো ছেলেটাকে সে খেলার মাঠে আগে দেখেছে। খুব লাজুক টাইপের ছেলে, কথা বলতে এই প্রথম শুনলো।

তপতী অবাক হয়ে বলল, 'পাখি? তোমাদের বাড়ীতে পাখি আছে?'

'হ্যাঁ আমি ধরেছি।' সলজ্জ হেসে ছেলেটা বলে, 'এই কাছেই আমার বাড়ী।'

তপতী ওদের বাড়ীতে গিয়ে তো অবাক। একতলা বাড়ীর ছাদের ঘরে একটা আধ-ছেঁড়া মশারী টাঙানো। চার পাশে আধলা ইঁট দিয়ে চাপা দেওয়া। আর তার মধ্যে কিচির মিচির করছে কয়েকটা রং-বেরংয়ের পাখি। মশারীর মধ্যে নানা রকমের খাবার গাছের কচি পাতা আর মাটির ভাঁড়ে জল রেখে দেওয়া হয়েছে। পাখিগুলো ওদের দেখেই খুব ঝটাপটি আর ওড়াউড়ি শুরু করলো।

'পাখি নেবে?' ছেলেটা ওর হাতটা চেপে অনুনয়ের ভংগীতে 'নাও না ভাই?'

'কোন পাখিটা?' তপতীর ইচ্ছে হয় কিন্তু বিশ্বাস হয় না ও সত্যি সত্যি দেবে।

'সবকটা তোমাকে দিয়ে দেব। নেবে?'

একটু আড়ষ্ট হয়ে থেকে তপতী ঘাড় নাড়ে, 'না। তোমার পাখি আমাকে দেবে কেন? আমি তোমার পাখি কেন নেব!'

'তুমি নিলে আমি রোজ ওদের দেখতে পাব।' ছেলেটার চোখে জল 'বাবা আজই ওদের উড়িয়ে দেবে বলেছে।'

সকালের প্রথম চা প্রতিদিন তপতী নিজের হাতে করে। নিজে হাতে ঘরে ঘরে পৌঁছেও দিয়ে আসে।

গজমোহন শুধু দাঁত বের করে হাসে আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দিদিমনির গিন্নীপনা দেখে। আর থেকে থেকে মুখের ধমক খায়। ফাইফরমাস খাটে।

রবিবার হলে চায়ের সঙ্গে টাও থাকে। তপতীর মর্জিমত ব্রেকফাস্ট সপ্তাহে সপ্তাহে বদলায়। মা আড়ালে বলেন মেয়ের তোমার হেঁসেলের হাতেখড়ি হচ্ছে।

অমিতাভ হাসেন আর বলেন, 'আমারই আত্মজা তো! কিন্তু যাই বলো মায়া, ওর হাতের চা না খেলে আমার ঘুমই কাটে না। পয়লা চুমুকেই আমি ধরতে পারি, কে চা করেছে।

অমিতাভ লেট রাইজার। সকলের শেষে বিছানায় যান, সকলের শেষে ওঠেন। তাই তপতীর চা ও'র কাছে যখন পৌঁছায় তখন সে চা বেড-টী। উনি পাশ বালিশ আঁকড়ে এক্সট্রা টাইম নিচ্ছেন, পাশের টিপয়ে চা জুড়োতে থাকে। তপতীর দ্বিতীয় দফা তাগাদায় উনি চোখ খোলেন হাত বাড়ান, আধ শোওয়া হয়েই চায়ের কাপে চুমুক দেন।

'আঃ! জুড়িয়ে গেল বলে মুখে একটা রাজসিক শব্দ করেন।

'জুড়িয়ে যাবে না তো কি! কুম্ভকর্ণের মত ঘুমোবে—'

'ওগো মগজ ঝাড়াও। মগজ বাড়াও। এ জুড়োনো সে জুড়োনো নয়—'

'ঢং!' মহামায়া এই অছিলায় ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

আজকে তপতী বাবা মাকে চা দেবার পর ট্রেতে খাবার আর চা নিয়ে দোতলার কোনের ঘরটার সামনে এসে দাঁড়ালো। এই ঘরটায় আগে দাদু থাকতেন, এখন একটা ভবদার। ছোট্ট ঘর, কিন্তু স্বয়ং সম্পূর্ণ। এ্যাটাচড্‌ বাথ আছে এক চিলতে। এখানে সেখানে কমার্শিয়াল প্লাগ পয়েন্ট। হিটার চালাও, জলগরম করো, ইস্ত্রী করাও ইলেকট্রিক শেভিং লাগাও। দাদু ছিলেন শৌখিন মানুষ। এখন যিনি আছেন তিনি বাউন্ডুলে দি গ্রেট, অগোছালোর রাজা। ঝকঝকে করে গুছিয়ে দিয়ে যাও, দুঘন্টার মধ্যে আবার যে কে সেই। ওটা মেঝেয় গড়াচ্ছে, সেটা খাটের তলায়। যার আলনায় থাকবার কথা সে বিছানায়, যার বিছানায় জায়গা সে টেবিলে কিংবা চেয়ারে। সব কিছু উল্টেপাল্টে একে-বারে লণ্ডভণ্ড। লোকটার কাছে সব সমান যা হাতের কাছে পায় প্রয়োজন ফুরোলে ছুঁড়ে ফেলে। দামী দুর্লভ বলে কোনো যত্ন নেই।

ভেজানো দরজা শব্দ করে হাট খুলে ভেতরে ঢুকলো তপতী। হাতের ট্রেটা রাখ-বার জায়গা নেই, চেয়ারের ওপরে একগাদা বই। টিপয়ের ওপর অর্ধেক ছাপা কাগজ ভরা মিনি টাইপরাইটার, তার পাশে এঁটো জলের গেলাস। ওদিকে লেখার টেবিলে জায়গা নেই। জামা প্যান্ট ড্যালা পাকানো পড়ে আছে, কিছু ম্যানাস্ক্রিপ্ট, ক্যাপ খোলা কলম গোটা দুই হাতঘড়ি খানদুই লং প্লেয়িং রেকর্ড অ্যাশট্রে, একটা মাইক্রোসকোপ উল্টে পড়ে আছে। খানদুই থানইট সাইজের বই খোলা বিড়ির বান্ডিল, গ্যাসলাইটার, ক্যামেরা। দিশি বিদেশী জিনিসের যেন অকশন সেল।

জানালা-দরজা ভেজিয়ে ঘর অন্ধকার করে ঘুমোচ্ছিল ভবদা, পরনে ট্রাউজারস আর গেরুয়া পাঞ্জাবী। মাথায় বালিশ অর্ধেকটা খাটের বাইরে নেমে গেছে চাদরটা মাটিতে উল্টো থাকা খড়মজোড়ার পাশে তপতী এক থাক বইয়ের মাথায় ট্রেটা নামিয়ে ওপাশের জানলাটা শব্দ করে খুলে দিল। এক ঝলক রোদ আর একরাশ আলোয় ঘর ভরে গেল। ভবদা জেগে গিয়েছিল। দিনকানা প্রাণীর মত পিটপিটিয়ে তাকালো। সম্ভবতঃ কিছুই দেখতে পেল না। বালিশের তলায় হাতড়াতে লাগলো আর বলতে থাকলো, 'কে? ঘরে কে এসেছে? আমার চশমাটা কোথায় গেল?

ভবদার চোখ খুব খারাপ। সব সময় একজোড়া হাই-পাওয়ারের চশমা পরে। চোখে চশমা না থাকলে দিনে আধকানা রাতে পুরো।

তপতী একদিন গম্ভীর মুখ করে জিগ্যেস করেছিল, 'আচ্ছা ভবদা তুমি স্বপ্ন দেখ?'

ভবদা হেসে উঠেছিল সঙ্গে সঙ্গে 'ওসব স্বপ্ন-ফপ্ন আমার নেই। ওসব তোদের জন্যে।'

অবাক হয়েছিল তপতী, 'এই যে এত ঘুমোও, স্বপ্ন দ্যাখো না একদিনও? সেকি?'

'ওঃ সেই স্বপ্ন। হ্যাঁ দেখি, অনেক সময়েই দেখি।'

'কিন্তু স্বপ্ন কি করে দ্যাখো, ভবদা?'

'টেকনিকাল সাইডটা জানতে চাস? তাহলে তোকে সাবকনসাস মাইন্ড—'

'ফ্রয়েড-টয়েড রাখো। চশমা ছাড়া কি করে দ্যাখো, তাই বলো'—

'ওরে ডেঁপো মেয়ে!' হাসিতে ফেটে পড়তে পড়তে ভবনাথ ওর কানটি ধরে

একটা আদরে চড় মেরেছিল গালে।

ভবদা এইরকম। অতি অল্পে তার হাসির বাঁধ ভেঙে যায়। প্রায় হিস্টিরিয়ার রুগীর মত হাসতে থাকে। সামান্য খাবার পেলেই যাকে বলে একেবারে স্প্যাড। চেটে-পুটে পরিতৃপ্তির সঙ্গে খায়। তাই ভবদার সঙ্গে কথা কয়ে সুখ, খাইয়ে সুখ।

ভবদার চশমা খুঁজতে আজ হিমসিম খেয়ে গেল তপতী। বালিশ বিছানার চাদর উল্টে বইখাতা সরিয়ে খাটের তলা তন্ন-তন্ন করে কোথাও পেল না। হাওয়া হয়ে গেছে চশমা একেবারে ভ্যানিশ।

'যাক অন্ধ নাচার হয়েই ব্রেকফাস্ট সেরে নাও। চা-খাবার জুড়িয়ে যাচ্ছে।'

হাতড়ে হাতড়ে মুখ-হাত ধুয়ে এল ভবনাথ। ততক্ষণে তপতী বিছানাটাকে টেনেটুনে একটু ভদ্রস্থ করার চেষ্টা করতে গিয়েই বালিশের ওয়াড়ের ভেতর থেকে খোয়ানো চশমা পেয়ে গেল। ঘুমোবার আগে কখন বালিশের তলায় রাখতে গিয়ে পিলো-কভারের মধ্যে গুঁজে বসে আছে ভবনাথ।

তপতী ভবনাথের হাতে চিমটি কেটে বলল 'তুমি একটা যাচ্ছেতাই লোক ভবথুরেদা। যদি বিয়ে করো বৌদি তোমাকে পরপাঠ ডাইভোর্স করে বাপের বাড়ি চলে যাবে।'

ভবনাথ ওর মাথায় একটা আন্দামানিক গাট্টা কষিয়ে বলল, 'তুই খুব পেকেছিস তপু। দিনে ক'খানা করে বাংলা নবেল গেলা হচ্ছে ইদানীং?'

বাইরের লোকের কাছে তপতীর লাজুক মুখে কথা ফোটে না সব সময়, কিন্তু ভবদাকে ও থোড়াই কেয়ার করে। ওর যা-কিছু ওস্তাদি ভবদার ওপরে খাটায়। বিদ্যায় বয়সে ভবনাথ যত বড়ই হোক আসলে সে একটি অপ্রকৃতিস্থ শিশু।

'বাংলা উপন্যাস তো আর পড়লে না জীবনে' তপতী মুখ ভেংচে বলে 'প্রোটিন আর মিনারেলস দিয়ে ভরপুর। এক-আধটু চাখলেও তোমার স্বাস্থ্য ভাল হয়ে যেত মশাই। এই নাও আর পেঁচার মত পিটপিটিয়ে তাকিও না তোমাকে আমি উপনয়ন দিচ্ছি—'

চোখে চশমা পরিয়ে দিতেই ভবনাথ মোটা গলায় অ্যালসেশিয়ানের মত হাউ-হাউ করে ঢেউতোলা হাসিতে কাতরাতে লাগল। কোন কথায় যে ভবনাথের অন্তরে ভয়ংকর কাতুকুতু লাগবে আর সে দমফাটা হাসি হাসবে কেউ আগে থেকে বলতে পারে না। তপতীর মনে হয় এই হাসি দেখে মনে হয় ভবনাথ পুরোপুরি স্বাভাবিক মানুষ নয় কোথায় যেন অ্যাবনরম্যালিটি রয়ে গেছে।

এক সময় হাসি থামলে ভবনাথ তপতীর পিঠ চাপড়ে বলে, 'সাবাস তপতী! ইউ আর এ টকিং বিউটি! কিন্তু এটা আমার উপ নয়, আসল নয়ন এক নম্বর চোখ। এর ভেতর দিয়েই আমরা

দুনিয়া দেখছি অল হিউম্যান ব্লাইন্ড কাচের ভেতর দিয়েই তাকিয়ে আছি। লুকিং ইন অ্যান্ড আউট থ্রু এ লুকিং গ্লাস'—চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলে 'পরে বুঝবি, আমি যখন থাকবো না তখন আমার কথাগুলো বুঝবি।'

'তুমি থাকবে না মানে! ইয়ার্কি নাকি?'

'ইয়েস, ইটস এ জোক এ ভেরি প্র্যাকটিক্যাল ওয়ান। তারপর অতি ভারিক্কি স্বরে এক চামচে খাবার মুখে পুরে বলে 'আমি কি চিরকাল থাকবো বলে এসেছি? দূর পাগলী!'

কথাটা বলে ভবনাথ খাবারের ডিশে তন্ময় হয়ে গেল আর তপতীর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল।

ভবদা যে এ-বাড়ির রক্তসম্পর্কের কেউ নয় সে-কথা শুধু তপতী কেন, ওর মা বাবা সবাই ভুলে গিয়েছিলেন। অথচ ঘটনাটা খুব বেশী দিনের নয়। খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় সেদিন সচিত্র হয়ে বেরিয়েছিল দুর্ঘটনার খবরটা। বছর দশেক আগের কথা। দমদম থেকে রওনা হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে বিমানখানা রহস্যজনকভাবে ভেঙে পড়ে। আরোহীদের কেউই আর বাঁচেনি। অমিতাভ মিত্র এয়ারপোর্টে বন্ধু আর বন্ধুপত্নীকে সী-অফ করে তখনও বুঝি গাড়িয়ার বাড়িতে ফিরে আসতে পারেননি। এরই মধ্যে ঘটে গেছে দুর্ঘটনা। রাতের খবরে সংবাদটা শোনার পর থেকেই অমিতাভর ঘুম ছিল না। পরদিন সকালের কাগজে বিস্তারিত সংবাদ পড়ে চুল ছিঁড়তে বাকি রেখেছেন। দেবনাথ মৈত্র তাঁর সহোদর ভাই-এর চেয়েও আপনার। শিশু বয়স থেকেই একসঙ্গে মানুষ হয়েছেন। দেবনাথের বাবা ছিলেন সে-যুগের নামকরা হেডমাস্টার। স্বদেশী যুগের দেশসেবী। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আর অরবিন্দ একসঙ্গে যেন। অমিতাভর বাবা মারা যাওয়ার পরে তিনি ওকে নিজের কাছে এনে রেখেছিলেন। সেই অবধি ধমজ ভাইয়ের মত মানুষ হয়েছেন অমিতাভ আর দেবনাথ। কোথাও একতিল তারতম্য, এক চুল ফারাক ছিল না দুজনের ক্ষেত্রে। পরে জীবন আর জীবিকার ক্ষেত্র আলাদা হয়ে গেলেও দেবনাথ ডাক্তারী করে বিত্তশালী হয়ে উঠলেও দুজনের যোগসূত্র অটুট ছিল। ঘরে বাইরের শলা-পরামর্শে পরস্পর পরস্পরকে খুঁজতেন। সেই দেবনাথ আর তার স্ত্রী—দুজনকে দগ্ধাবস্থায় সনাক্ত করে এসে কিছুকাল অমিতাভ কেমন হয়ে গিয়েছিলেন। ভবনাথ তখন সায়েন্স কলেজের ছাত্র। নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে কৃতিত্ব দেখিয়ে ভবনাথ আমেরিকা চলে যায়। অনেক আশা করেছিলেন অমিতাভ কিন্তু ভবনাথের রক্তের মধ্যে কি করে এক অস্থিরতার বীজাণু বাসা বেঁধে বসেছে। কেমন এক অনাসক্তির অসুখে সে তখন আক্রান্ত। গবেষণার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে দেশে ফিরে এল। অনেকের চোখেই সে তখন হাফ ম্যাড। দেবনাথের বিষয় আশয় আগলে রেখেছিলেন অমিতাভ, এবার তার উত্তরাধিকারীর হাতে প্রত্যার্পণ করে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। ভবনাথ নিরাসক্ত। পৈতৃক বাড়িটা বিক্রী করে দিল। কিছু টাকা খেয়াল খুশি মত খরচ করে বিলিয়ে নষ্ট করে অবশিষ্ট টাকার শেয়ার সার্টিফিকেট আর ব্যাঙ্কের বই কাকাবাবুর হাতেই ফেলে দিয়ে বলল আমাকে বাঁচান। টাকায় বড় কষ্ট। আমি একটু শান্তিতে থাকতে চাই। সেই থেকেই এ বাড়িতে রয়ে গেছে ভবনাথ। একটা ঘর এ-বাড়িতে ভবনাথের জন্য পাকা। কিন্তু ভবনাথ খেয়াল-খ্যাপা বোহেমিয়ান, কোথাও যেন বাঁধা পড়ে না। থাকে থাকে হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে যায় পথের টানে ভেসে বেড়ায়। প্রথম প্রথম চিন্তা হত, এখন এটাই নিয়ম হয়ে গেছে।

ভূগোলের স্যার একরকম পাখির গল্প বলেছিলেন, তারা মাইগ্রেটরী বার্ড। হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে তারা কিসের টানে ভেসে আসে বছর বছর। সমুদ্র মহাসমুদ্র পার হয়ে হিমালয়ের মত তুষার পর্বত ডিঙিয়ে কেউ চলে যায় হাওয়াই দ্বীপে কেউ চলে আসে ভারতবর্ষে। সেখানকার নদীতে জলাশয়ে শীতের সময়ে তাদের মরশুমী বসতী তৈরি হয়। নিশ্চিন্ত বিহার চলে। মনে হয় না, এদের আবার বাঁধন কাটবে, বন্দরের কাজ শেষ হবে সমুদ্রের ডাক আসবে রক্তের মধ্যে।

ভবদাও এই অতিথি পাখির মতই। ঠিকই বুঝেছে, এখানে এ-বাড়িতে চিরদিন থাকতে সে আসেনি। একদিন হঠাৎ চলে যাবে হয়ত বরাবরের জন্যেই চলে যাবে। তার নিয়মিত ফিরে ফিরে আসা থেমে যাবে একদিন।

প্লেট সাফ করে ভবদা গুনগুন করে গাইছিল ঃ পরবাসে রবে কে—

'তুমি বাপু কাল রাতে খুব জ্বালিয়েছ আমাকে' কাল রাতের কথা মনে পড়ে গেল তপতীর 'সারারাত ব্রহ্মদৈত্যের মত চষে বেড়িয়েছ আমার ঘরের ছাদ। বাব্বা আবার হিপিদের মত খড়মে চড়বার সখ হলো কেন বলো তো?'

ভবদা একটু লজ্জিত হাসি হাসলো, 'ইস তুই বুঝি ঘুমোতে পারিসনি?'

তপতী ঝাঁঝের সঙ্গে বলল 'কি করে পারবো! তুমি আমার ঘুমটুম খড়ম পায়ে মাড়িয়ে চুরমার করে দিয়েছ। কি হয়েছিল তোমার কাল?'

'একটু নেশা হয়েছিল।' বলেই ভবদা আড়মোড়া ভেঙে শুয়ে পড়লো আবার। শুয়ে ঝকঝকে শিশুর মত হাসতে লাগলো।

পাঞ্জাবীটা সরে গিয়েছিল কোমরের কাছ থেকে ট্রাউজারের ওপরে পেটটা বেরিয়ে পড়েছিল ভবদার। অদ্ভুত ফর্সা মাখনের মত মসৃণ অথচ একতিল মেদ নেই কোথাও। কেন যেন খুব ভাল লাগে দেখতে। একজন ইন্টেলেকচুয়াল মানুষের পেট বুঝি এমনই হবে। একমুখ দাড়ি, দীর্ঘ ছাঁদের দেহ ঠোঁটের মোচড়ে নাকের খাড়ায় এবং শাণিত চোখে যেন একটা নিঃশব্দ হাসি উদ্যত হয়ে আছে। তপতী আবিষ্ট হয়ে দেখছিল।

এমন সময় গজমোহন এসে দরজায় দাঁড়ালো তার পানের রসে ছোপানো দাঁত বের করে 'রাঙা দিদিমণিরে মা ডাকিতেছেন।

রবিবারের সকাল হলে কি হবে, হাতিবাগান দিয়ে যেন হাঁটা যায় না।

সিনেমার টিকেট কিনে তবু তপতী ট্রামে-বাসে না উঠে হেঁটে হেঁটেই ফিরছিল। মানুষের অলস ব্যস্ততা দেখতে বেশ ভাল লাগে। সপ্তাহের ছটা দিনই মানুষ যেন নিজের দিকে তাকাতে পারে না। প্রতিদিনের উর্ধশ্বাস চড়াই-উৎরাই, যন্ত্রের মত অন্ধের মত দিন-দৌড় জীবন বিপন্ন করে হ্যান্ডেল ধরে ঝোলা ফুটবোর্ডের সূচাগ্র মেদিনী নিয়ে দিনদাঙ্গা। সারভাইভ্যাল ফর দি ফিটেস্ট। মাথায় ভিজে চুল পাট করা, সদ্য ভাঁজ ভাঙা সার্ট ট্রাউজার্স ধুতি-পাঞ্জাবী হরত সোমবার। পান চিবুচ্ছে চোখে ভাবলেশ হীন ছাগলের দৃষ্টি। নয়ত এসে-পড়া বাসের সামনে শেষ সিগারেট-টান। চেনা মানুষের সঙ্গে কারো বা মিয়োনো হাসি, কিংবা অফিস-আদালত সংক্রান্ত ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট দু-চারটে কথা।

কিন্তু আজ?' ছুটির দিন শুধু নয় চিরচেনা দিন। হিসেবের বাইরে নয় বাজেটের ঘাটতি বাড়তি নয় একেবারে হাতের পাঁচ যাকে বলে। তবু এর রঙ আলাদা। কেমন ঢিলেঢালা সহজ। প্রৌঢ় কর্তারা কেউ কেউ এত বেলায়ও সিল্কের আপত্তিজনক লুঙ্গি আর ফতুয়া পরে হাতে ট্রামের মান্থলি আর মানিব্যাগ নিয়ে বাজার যাচ্ছেন-আসছেন। থলিতে ফুলকপিটা মুলোটা বেগুনটা উঁকি দিচ্ছে। কেউ কেউ সিনেমার হলে হলে ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছেন মর্ণিং-শোর কার্টপিস দেখতে। কেউ চায়ের দোকানে অলস আঙুলে দেশলাই জ্বালছে। লৌকিকতা সারতে বেরিয়েছে কেউ কেউ যাবে কালীঘাটে পুজো দিতে সঙ্গে পরিবার সমগ্র।

তপতী হাঁটতে হাঁটতে হাতিবাগান বাজারের কাছে এসে পড়েছিল। রবিবার সকালে এখানে পাখির হাট বসে। রঙ-বেরঙের পাখি পায়রা গিনিপিগ রঙীন মাছ গাছগাছড়া সবই বেচাকেনা হয়। নর্থ ক্যালকাটা এক আজব চিড়িয়াখানা। এখানকার জীবনসংস্কৃতি বিচিত্র। এত দারিদ্র এবং এত বড়লোক এত বনেদী এবং এত ভুঁইফোড় বোধহয় একসঙ্গে আর কোথাও নেই। ভবদার কাছেই শোনা। আহিরীটোলা নাথের বাগান জোড়াবাগান শ্যামবাজার শোভাবাজার বাবু মার্কেটলি হচ্ছে উত্তরের খাস চেহারা। এখানে সবরকম দিশির খানদান। পাড়ায় পাড়ায় ছাদের ওপরে বাঁশের মিনার বা ব্যোম। খাড়া-বাঁশের ওপরে হাল্কা মাচা বাঁধা। এগুলো কবুতরী এয়ারপোর্ট। আকাশে ডিগবাজি কারসাজি দেখিয়ে উড়ে বেড়ানো নোটন লক্কা গেরবাজরা এখানে থেকে থেকে ল্যান্ড করে। কিছু লোক চৌপহর আকাশমুখী এই পারাবতচর্চায় মসগুলে হয়ে আছে।

ভিড়ের পাশ কাটাতে কাটাতে তপতী একটা ফটো স্টুডিওর সামনে এসে পড়েছিল। শো-উইন্ডোতে বড় বড় এনলার্জ কত ভঙ্গির কত ঢঙের। পাড়ার একটি মেয়ের ছবি দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল তপতী। মেয়েটা স্কুলে পড়ে এখনো চেনা। কিন্তু যেরকম পাকামী করে ফটো তুলিয়েছে তাতে মনেই হয় না ওর কিছু বাকি আছে।

দোকানের ভেতর থেকে সম্ভবত দোকানের মালিক কাম ক্যামেরাম্যান তপতীকে ডাকল, 'আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন। এখানে একবার ছবি তুললেই আবার...আরে একি তপু নাকি, অ্যাঁ! অবিশ্বাস।' বলতে বলতে একজন মধ্য-বয়সী সৌখীন ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। চোখে অটোমেটিক লেন্স চশমা, আঁধারে স্বাচ্ছ আলোয় কালো হয়ে রং বদলায়। একটা অদ্ভুত সবুজ রঙের হাতের তাঁতের মোটা পাঞ্জাবী। তাতে কলার আছে, বুকে বো-টাইএর মত মোটা ফিতে বাঁধা, পরণে টাইট পাজামা পায়ে নাগরা। তপতী এবার চিনতে পারলো ভল্টুবাবু। খোকনদার ইয়ার ছিল এক সময়, রকে বসে আড্ডা দিত। এক নম্বরের ভ্যাগাবণ্ড ছিল লোকটা। কাঁধে ক্যামেরা নিয়ে সব সময় ঘুরতো। সুযোগ পেলেই মেয়েদের ছবি তুলে নিতো। ভারী অসভ্য ছিল। একবার রাস্তার কলে কার স্নানকরা ছবি তুলে খুব ফ্যাসাদে পড়েছিল। সে কি কেলেঙ্কারী।

তারপর এপাড়া ছেড়ে চলে গেছে অনেককাল। দেখাও হয়নি, মনেও ছিল না।

ভল্টুবাবু খুব আবেগের সঙ্গে বেরিয়ে এলেন, 'মাই গুডনেস, তপতী! তুমি যে রীতিমত লেডি হয়ে গেছ, তা এদিকে কোথায়? আহা বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ভেতরে এস কদ্দিন পরে দেখা। দাদা কেমন আছেন, বউদি?'

'ভাল আছেন।' তপতী দায়সারা গোছের উত্তর দিলো, 'এসেছিলাম সিনেমার টিকেট কাটতে, চলি।'

তপতী পিছু ফিরতেই ভল্টুবাবু ক্ষিপ্র পায়ে এগিয়ে এসে খপ্ করে ওর একটা হাত ধরে ফেললেন, 'আরে পাগলী নাকি? দরজা থেকে শুধু মুখে ফিরে যাবে'—

তপতীর বুকের ভেতরটা কেমন কেঁপে উঠল। সে সভয়ে ফিরে দাঁড়ালো, 'আঃ লাগছে ছাড়ুন।'

'মাসখানেক হল এই স্টুডিও খুলেছি বুঝেছ?' হাত না ছেড়েই ভল্টুবাবু আবেগের সঙ্গে বলে চললেন, 'এরই মধ্যে কিন্তু মিথ্যে বলব না, নাম করেছে ডেইলি নীরব। নামটা কেমন দিয়েছি? ভাল? এসো ভাই, একটু চা খেয়ে তবে তোমার মুক্তি'—

হাত ছেড়ে দিয়েছিলেন।

তপতী ঘাড় নেড়ে জানালো, 'আমি চা খাই না।'

'অল রাইট তাহলে রসগোল্লা আনাচ্ছি একটু মিষ্টি মুখ করে যাও।'

'ওমা, না, না। শুধু শুধু রসগোল্লা কেন খাবো,' অস্বস্তির হাসি হাসল ও, 'আপনার তো আর মিষ্টির দোকান নয়।'

'নয়?' কেমন ধারা হাসলেন ভল্টুবাবু, 'বেশ মানলাম। কিন্তু মিষ্টি মুখের দোকান তো? তোমাদের মত মিষ্টি মিষ্টি মুখ যাদের, তারা এই দোকানে নিজেকে নতুন করে দেখতে আসে। বাইদি বাই, তুমি কখনো নিশ্চয় ছবি তোলাও নি?'

'কেন বলুন তো?' একটু ঝাঁঝের সঙ্গে কথাটা বলতে বলতে তপতী ভেতরে ঢুকে উদ্ধত ভঙ্গিতে কাউন্টারে কনুই রেখে দাঁড়াল। ফটোগ্রাফার তপতীর মেজাজ গায়েই মাখলেন না, কথাটাও তাঁর কানে গেছে এমন মনে হল না। তিনি আপন মনেই, স্টেজের কোনারে দাঁড়ানো অন্যমনস্ক অভিনেতার মত স্বগতোক্তি করে চললেন: 'না তুললেই বা কি আয়নায় তো রোজ মুখ দেখ নিজের। এ ক্লাস মুখ তোমার, যাকে বলে পারফেক্ট ফটোজেনিক ফেস। অবিশ্যি নিজের ফেস ভ্যালু খুব কম লোকেই নিজে বুঝতে পারে। ফিল্ম স্টাররা পর্যন্ত'—

কাউন্টারের ভেতরে টুলের ওপরে তেরো-চোদ্দ বছরের একটি ছোকরা বসে ছিল। তিনি তাকে বললেন, 'যা তো বাবা, সত্য-নারায়ণ থেকে এক টাকার রসগোল্লা নিয়ে আয়। ছুটে যাবি দৌড়ে আসবি।'

ছেলেটি কথার খেলাপ করল না। তপতী বাধা দেবার আগেই ছুটে বেরিয়ে গেল দোকান থেকে।

'তারপর, টিকেট পেলে?' ভল্টুবাবু অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গে এলেন, 'কোন হল, ম্যাটিনী?'

তপতী গম্ভীর হয়ে বলল, 'না ইভনিং শো। মা যাবেন।'

ভল্টুবাবু অমায়িক হাসলেন, 'কখনো সিনেমার টিকেট পেতে এ পাড়ায় অসুবিধে হলে তুমি আমাকে জানাবে। এরা সবাই আমার চেনা। তারপর কলেজ কেমন চলছে তোমার?'

তপতী আর একবার চমকালো। দু বছরের ওপর দেখা নেই, লোকটা তার কলেজের খবর কি করে জানলো। আরো আশ্চর্যের কথা, কোনো দিন পাড়ায় থাকতে ভল্টুবাবুর সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলেনি তপতী। অথচ তাকে এই শাড়ী পরা অবস্থাতেও চিনতে পেরেছে। শুধু মুখ চেনা নয়, নামটি পর্যন্ত দিব্যি মনে রেখেছে দেখো!

শুকনো গলায় তপতী বলল, 'ভাল। এবার আমি যাই।'

'বারে তোমার জন্যে মিষ্টি আসছে আর তুমি পালাবে কি রকম?' তারপর হাঃ হাঃ করে হাসলেন, 'ওহো ভাই বলো। তুমি মনে মনে ভাবছ আমি তোমার জন্যে এরকম করছি কেন? একটু বুঝি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, তাই না?'

তপতী লজ্জিত হয়ে বলল, 'আজ্ঞে না না, তা কেন ভাববো।'

'ভাববে বইকি।' ভল্টুবাবু হঠাৎ মুখের হাসিটাসি মুছে গম্ভীর হয়ে গেলেন, 'আর বাড়াবাড়ি সত্যিই হচ্ছে, হয়ে যাচ্ছে. অস্বীকার করবো না। কিন্তু কেন জানো?'

তপতী আরক্ত মুখে বলল, 'ছি ছি আপনি একথা কেন বলছেন, আমি তো তা ভাবিনি। আপনি চেনা লোক, খোকনদার বন্ধু সেই হিসেবে—'

'না, সেই হিসেবে না।' বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগলেন, 'আমি শিল্পী মানুষ, সুন্দর মুখকে আরো সুন্দর করে ফোটাতে ভালবাসি, কিন্তু সে জন্যেও না।' ভল্টুবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে রাস্তায় ট্রামবাস দেখতে লাগলেন। মনে হল কোথায় যেন বড় রকমের একটা ব্যথা আছে লোকটার। তপতীর ধারণা যেন একটু একটু পাল্টাচ্ছে।
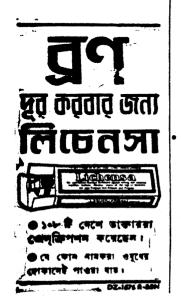
মানুষের বাইরের চেহারার সঙ্গে ভেতরের রূপ সব সময় মেলে না। বাইরের চেহারা, বাইরের ব্যবহার, বাইরের কথাবার্তা মানুষকে অনেক সময়ই ভুল বোঝায়। খোকনদার সঙ্গে দহরম মহরম ছিল বলেই ভল্টুদাকে এক সময় খারাপ ভাবতো, পাড়ায় কানাকানি শুনে অসভ্য ভাবতো। কিন্তু আজ এখন, এই মুহূর্তে যেন মনে হচ্ছে লোকটা খোকনদা-মার্কা নয়।

'আসলে নিজের স্বার্থেই তোমাকে খাতির করছি, তপতী, স্রেফ নিজের স্বার্থে'। মুখের বিষণ্ণ গাম্ভীর্য মুছে ফেলে আবার হাসির মেকআপ তুলে নিলেন ভল্টুদা, 'তোমরাই হচ্ছ আমার ভরসা। তোমরা বন্ধু-বান্ধব মিলে এখানে আসবে, ছবি তুলবে, আমার স্টুডিওর পাবলিসিটি করবে নানান জায়গায়—তবেই তো ডেইলি মাইরি জমে উঠবে। হাঃ হাঃ কি বলো। তবে হ্যাঁ, তোমার খানকয়েক মারাত্মক ছবি তুলে দেবো দেখো, লোকে ট্যারা হয়ে যাবে। এই ফেস, এই ফিগার পেলে আমি দমকল ডাকিয়ে ছাড়তে পারি। এসো এ পিঠে এসো—মিষ্টি খেয়ে যাও।'

সত্যনারায়ণ ফেরত ছোকরা ছুটতে ছুটতে মিষ্টির ভাঁড় নিয়ে হাজির হল।

ভল্টুদার স্টুডিও থেকে বেরিয়েই একটা ফাঁকা ট্রাম পেয়ে গিয়ে উঠে পড়ল তপতী। চিৎপুরের ট্রাম, গ্রে-স্ট্রীট-সেন্ট্রাল এভিনিউ ক্রসিং-এ নেমে সামান্য গলিপথে হাঁটলেই বাড়ি পৌঁছে যাবে।

গেটের মুখে একটু ভিড় ছিল, বেশ কয়েকজন মেয়ে-পুরুষ নামবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তারা নেমে যেতেই ফাঁকা ট্রামে তিন মূর্তিমতীকে প্রথম দেখতে পেল। দেখে যেমন চমকালো তেমনি খুশি হল তপতী। আজ দিনচারেক বন্দনাদের সঙ্গে দেখাই হচ্ছে না ওর।

দু দিন কলকাতার মাথার ওপর দিয়ে যে সাইক্লোন গেছে, যে ঝড়জল, তাতে গা বাঁচিয়ে ছাতা বাঁচিয়ে বেরোনো অসম্ভব ছিল। গলিতে বড় রাস্তায় জল জমে গিয়ে আরও বিতিকিচ্ছি অবস্থা। সুতরাং কলেজের কথা চিন্তাই করা যায় নি। আর শনিবার মানে গতকাল আকাশ পরিষ্কার ছিল ঠিকই কিন্তু কলেজ ছিল না। শনিবার তাদের অফ ক্লাস থাকে না। ভেবেছিল বন্দনারা যদি বেড়াতে আসে, এক-এক দিন হৈ হৈ করে যেমন চলে আসে, কিন্তু কই কেউ আসে নি। আজ দেখা না হলে হয়ত তপতীই যেত এক ফাঁকে।

ওরা কিন্তু তপতীকে তখনো দেখতে পায় নি। পাশাপাশি সীটে তিনজন, না তিনজন নয়, সঙ্গে আরও একটি অপরিচিত মেয়ে আছে, কলরব করতে করতে চলেছে। বন্দনা আর পারমিতার বগলে অনেকগুলো কাগজের প্যাকেট, রীতিমত মার্কেটিং করে এল বলে মনে হয়।

ওদের সিটের পেছনে দাঁড়িয়ে তপতীর মুখ ফসকে একটা রসিকতা বেরিয়ে গেল কি করে, 'এই যে ত্রিফলার চাটনি কোথায় চলেছ, পুজোমার্কেটিং সেরে?'

এক মুহূর্তের জন্য কলরব থামিয়ে ওরা ঘাড় ফিরিয়েছিল, তারপর তপতীকে দেখতে পেয়ে তিনজনে একসঙ্গে এমন হৈ-হৈ করে উঠলো যে কণ্ডাকটার কি হয়েছে দেখবার জন্যে ছুটে এল। ড্রাইভার তার পিছনের জানলার ফোকর দিয়ে বিস্মিত মুখে উঁকি মারল।

তপতী ভীষণ নার্ভাস হয়ে ওদের থামাবার চেষ্টা করল, 'আঃ, কি হচ্ছে, গাড়ির মধ্যে?'

'গুলি মারো তোমার গাড়ির মধ্যে।' পারমিতা ছোকরা কায়দায় একটা অসভ্য ভঙ্গী করল, 'আমরা যেখানে আছি, সেখানে আছি।'

'তা পোস্টবক্স দিদি, তোমার তলে-তলে লিটরেটার কেমন চলছে?' নন্দিতা উস্কে দেবার চেষ্টা করল পারমিতাকে। জানে, একটা খেই ধরতে পারলে হয়, পারমিতাকে তখন কনট্রোল করে কার সাধ্যি।'

পারমিতা লাফিয়ে উঠে তপতীর হাত ধরে টানলো, 'এসো সুন্দরী, ডাঁড়িয়ে কেন আমার পাশে এসো একটু সুলেডে সিটিং হয়ে যাক।' প্রত্যেকটা স-কে ইংরেজি এস-অক্ষরের মত উচ্চারণ করল, 'তুই সুষমা, ও পাশের সীটে যা আমার ফিয়াঁসে এখানে বসবে।'

অন্য মেয়েটি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো।

তপতী বলল, 'না না, তুমি বসো, আমি এখানেই নামবো। এই সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে।'

'অনেক নেমেছ সখী, আর না।' পারমিতা তপতীর হাত ছাড়লো না, 'চল আমাদের সঙ্গে এস্পার ওস্পারে চল। বাসর জমাতে হবে না?'

একটা স্টপে এসে ট্রাম থেমেছিল। একজন আধবয়সী পা সঙ্গা এতক্ষণ বোধ হয় ওদের রংগর [illegible] দেখছিল গেটের কাছে দাঁড়িয়ে। এবার [illegible]ড় থেকে নেমে ওদের জানলায় এসে মুখ বাড়ালো, 'এইযে মারকাটারী দিদিরা, একটু বাঁধকে শেষে অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যাবে—'

পারমিতা মুখিয়ে উঠেছিল লাগসই জবাব দেবার জন্যে, নন্দিতা ওকে টিপে দিল, নিচু গলায় বলল 'যেতে দে দেখছিস না রঙে আছে। সকাল বেলায়ই চড়িয়েছে'—

লোকটার জড়ানো গলার স্বরে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল লোকটি প্রকৃতিস্থ নেই। গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল, পারমিতা তবু জানলায় ঝুঁকে পড়ে প্রতিশোধ নিল 'আচ্ছা দাদু টাটা, হাঁটি হাঁটি পা-পা করে বাড়ি যান'—

টলমল পায়ে লোকটা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু ট্রাম স্পীড নিয়েছে তখন। জড়িত গলায় হাতের মুঠো শূন্যে তুলে কিছু একটা বলল, গাড়ীর শব্দে শোনা গেল না। ট্রামের অন্য যাত্রীরা মুখ টিপে হাসছিল অনেকেই। দু-একজন পাঁচন-গেলা মুখ করে বাইরের দৃশ্য দেখছিলেন। ভঙ্গিটা এমন, তাঁরা সম্ভবত ইহলোকে নেই।

বন্দনা বলল, 'বোস, বোসে পড তপতী। বাড়ীতে ফিরতে না হয় ঘন্টা

দেড়েক দেরী হবে, কি আর রাজকার্য ফেলে এসেছিস। বলিস তো আমি মাসীমার কাছে যাবোখন ফেরার সময়।'

অগত্যা তপতী সুষমা নাম্নী মেয়েটির পরিত্যক্ত আসনে বসে পড়ে বলল 'আরে না, না। মা কিছু বলবে না, বারোটার মধ্যে পৌঁছলেই যথেষ্ট। কিন্তু তোমরা দলবেঁধে কোথায় চলেছ তাই এখনো জানতে পারলাম না।'

'পারবে সিসটার পারবে। তোমার বারোটা বাজার আগেই আমরা ছেড়ে দেব।' পারমিতা ওর পাশে ধপ করে বসে পড়তে পড়তে বলল।

'আমরা একটা রিয়্যাল অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়েছি।' নন্দিতা কেষ্টনগরের পুতুলের মত হাওয়ায় মাথা দুলিয়ে বলল 'রেসকিউ অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন পার্টি না কি যেন বললি, বন্দনা? বন্দনার ঘাড় নাড়া লক্ষ্য করে বলল 'তুইও এই পার্টির মেম্বার হলি। চল অনেক আগাম অভিজ্ঞতা হবে।'

'আগাম অভিজ্ঞতা?' সুষমার গলাটা খুব সুরেলা, এতক্ষণে সে মুখ খুলল 'অভিজ্ঞতার আবার আগাম কি ভাই?'

'হয় হয় জান্তি পারো না' নন্দিতা কমিক গলায় বলে, 'মানুষের পনের আনা অভিজ্ঞতাই এক অর্থে অপচয় নিজের কাজে লাগে না। সুতরাং সেগুলো তামাদি, কিন্তু বাকী এক আনা পোস্টডেটেড চেকের মত ভবিষ্যতের সম্বল।'

'সে তো নিখরচায়, মানে পরের খরচায়। সুষমা বলে।

'ঠিক তাই।' নন্দিতা বলে, 'খুঁটে পুড়লে তবেই না গোবরের আগাম অভিজ্ঞতা!'

বন্দনা হেসে উঠলো 'নন্দিতার ফিলসফি খুব লাগসই, তপতী। তুমি রিয়্যালি এক গোবরকে দেখতে পাবে। এমন গোবেচারা বরকে সচরাচর খুঁজে পাওয়া যায় না।'

'শুধু গো বলিস নি' পারমিতা বলল, 'ওনার হেড়ে- রীতিমত চন্দ্রবিন্দুও আছে।'

'মানে?' নন্দিতা জানতে চায়।

'মানে, গোঁ। খুব গোঁ আছে।' পারমিতা বলে 'আরিশ্যি মানুষে যখন বরবর হয় তখন একটু গোঁ ধরেই থাকে।'

বন্দনা নন্দিতা সুষমা তিনজনেই খোলা গলায় হেসে উঠল। তপতী প্রসঙ্গটা ঠিক ধরতে না পেরে হাসল না। শুধু ওদের মুখের দিকে ঘুরে-ফিরে তাকালো।

কিছু কিছু বনেদী বাড়ী তার খোলনলচে এখনো ফেলতে পারে নি।

ভেতরে ভেতরে সব গেছে অথচ। বাড়ীর কর্তাবাবাদের সঙ্গে সঙ্গে ভদ্দজ্ঞান জমিদারী হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। কোম্পানীর কাগজ একদিন শুকনো তেজপাতার মত শুধু স্মৃতিটুকু আঁকড়ে লাজকে হয়েছে। শরীকী মামলায় ফোঁপড়া হয়েছে ব্যাঙ্কের আমানত। লাসবাতি [illegible] একের-পর-এক লাভের ব্যবসায়ে।

বোতলের ভূতে আর মাঠের ঘোড়ার কিম্বা দামী মেয়েমানুষে একে একে খেয়েছে স্থাবর সম্পত্তি। বাগানবাড়ী ল্যান্ডো ফিটন অনেক আগেই অদৃশ্য হয়েছিল, পরে থেমে থেমে গেছে কলকাতার শহরের ওপরের ভাড়া বাড়ীগুলো।

শেষ বসত বাড়ীটা তবু দশাসই চেহারায় রয়েই গেছে। বাইরে মেরামতির অভাবে সময়ে সময়ে চুনবালির আস্তর খসে পড়ে, রঙ বিবর্ণ হয়ে বিদ্রুপমূর্তি ধারণ করে। সব জানলায় অ্যাস্ত কাঁচ নেই এমন কি উপযুক্ত পর্দা পর্যন্ত জোটে না। কিন্তু তবু ভেতরে যে সব আসবাবপত্র ঝাড়বাতি অয়েল পেন্টিং মানুষ প্রমাণ ঘড়ি পশু মুণ্ড সাজানো আছে, যে ছ ইঞ্চি পুরু গালচে পাথরের কাজ আর বেলজিয়াম গ্লাসের ঝলকানি তা একমাত্র যাদুঘরকেই মনে পড়িয়ে দেয়।

মনে হয় এ আর একটা যুগ আর এক ইতিহাস যাকে আর কোনো দিন ছোঁয়া যাবে না। আজকের দিনের মানুষে এসবের পাশে আর মানায় না।

এখানে যেন সব সম্ভব, আটপৌরে শাড়ী জোটে না হাজার টাকা দামের মর্শলিন বেনারসী পরে অগত্যা পুঁইচচ্চড়ি রাঁধেন বাড়ীর প্রৌঢ়া গৃহিণী।

ওরা যখন পাঁচজনে হৈ-চৈ করতে করতে এ বাড়ীর মধ্যে ঢুকলো তখন তপতীর মনে এই রকম ভাবই ক্রমশ যেন দানা বাঁধছিল। এটা কাদের বাড়ী কেন যাচ্ছে এখানে কি দরকার কিছুই জেনে বলে নি ওরা। ইচ্ছে করেই তপতীকে যেন সাসপেন্সে রেখে দেওয়া। যেন চূড়ান্ত অবাক করার জন্যেই।

প্রকাণ্ড হলঘরের মধ্যে ওদের বসিয়ে রেখে বন্দনা ভেতরে চলে গেল। তপতী যে

সোফাটায় বসেছিল সেখান থেকে দেওয়ালের ছ ফুট লম্বা ডিমের আকৃতির দামী আয়নায় ভেতর মহলের বেশ কিছুটা দেখা যাচ্ছিল। এক প্রস্থ শ্বেত পাথরের সিঁড়ি দোতলার দিকে উঠে গেছে। বন্দনা লাফাতে লাফাতে সেই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। তার চটির আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই সুষমা তার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, ইস! আমার বুকটা কেমন ঢিপ ঢিপ করছে।'

পারমিতা ভ্রূ কুঁচকে জিগেস করল কেন?'

'এতক্ষণে বোধ হয় ওদিকে আউট হয়ে গেছে।'

'আরে গুলি মার! পাখি তো হাওয়া, তার আর পাত্তা পেতে হচ্ছে না।'

নন্দিতা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল পৌনে দশটা বাজে। নাঃ, আরো দুটি ঘণ্টা অন্তত সুধু ভুজঙ্গবাবু মোহিনীর ওয়েটিং রুমে বিড়ি ফুঁকবে শার্সি থেকে থেকে আধ ঘণ্টা কাচের মধ্য দিয়ে শ্রীলতার ব্যাকসাইড ইলিউশান দেখবে।'

মোহিনী হচ্ছে উত্তর কলকাতার হাল-ফ্যাশানের অঙ্গরুচির দোকান। 'যোগাযোগ যেমন মডার্ণ প্রজাপতি অফিস মোহিনীও তেমনি আধুনিক কনে সাজানোর কেন্দ্র। মেয়েরা এখান থেকে সেজে যায়। তপতী নামটা শুনেই চিনতে পারলো। তার পিস-তুতো দিদির সঙ্গে একবার গিয়েছিল। চুল বাঁধার কত ছাঁদ, কত ভঙ্গিমা। চোখের কত সূক্ষ্মকারিগরী। অ্যালবাম দেখলে মাথা ঘুরে যায়। রং বদল, ঢং বদল শুধু নয়, নেগেটিভকে পজিটিভ বানাতেও মোহিনীর জুড়ি নেই।

নন্দিতাই ভাংলো রহস্যটা এতক্ষণে। শ্রীলতা বন্দনাদের বাল্যবন্ধু। ইদানীং ওর বাপের কিছু উটকো পয়সাকড়ি হয়েছে। বাপ লোকটা ভালই ছিলেন কিন্তু দ্বিতীয়বার বিয়ে করে একেবারে পাল্টে গেছেন। শ্রীলতার সৎমায়ের পরামর্শে হঠাৎ ওর বিয়ের ব্যাপার পাকা করে ফেলেছেন। শ্রীলতার হবু বর রূপে-গুণে রামছাগল। তবে টাকা আছে অঢেল। সাদা-কালো দু রকমেরই। বয়সের গাছ-পাথর নেই। বিবাহিত জীবনের টেস্ট প্রটেস্ট দুই-ই হয়ে আছে। অর্থাৎ আনকোরা বলে শ্রীলতাকে দুঃখু করতে হবে না। ভাবল ডিভোর্স দু দবার আইনসম্মতভাবে গাঁটছড়া ছিঁড়েছেন।

শ্রীলতার মত ঠাণ্ডা ভালমানুষ মেয়ে এ বিয়ে হলে নির্ঘাৎ গলায় দড়ি দেবে। যারা গাড়ি ফ্রিজ রেডিওগ্রাম আর জড়োয়া গহনা নিয়ে খেলাঘর বাঁধে ও সে-টাইপের মেয়ে নয়। তাই রেসকিউ অ্যাণ্ড রিহ্যাবিলি-টেশন পার্টি একটি দুঃসাহসিক অ্যাণ্ড ভেঞ্চারে নেমে পড়েছে। আজ শ্রীলতার পিতৃদত্ত বিবাহ। কার্ড ফার্ড বিলি হয়ে গেছে, ম্যারাপ বাঁধা কমপ্লিট, কনের খোঁপাবাঁধা চলছে। মানে চলবার কথা। কিন্তু মেয়ে সেখান থেকে ভ্যানিশ। সাউথ ক্যালকাটার যূথিকা সেখানে বসে প্রক্সি দিচ্ছে। ফেসকাট অনেকটা একরকম বলে বন্দনার দিদি চন্দনাদি ওকে রিক্রুট করে-ছেন। হিন্দুস্থান স্টীলের রিসেপশানিস্ট যূথিকা শক্ত মেয়ে। ওকে সবাই স্টেইনলেস যূথিকা বলে ডাকে। একই রকম কাপড় জামা পরে ও তৈরি হয়ে অপেক্ষা কর-ছিল। শ্রীলতার নতুন মা নিজে সরকার মশাই কাম শ্রীর বাপের বডিগার্ড ভুজঙ্গ বাবুসহ ওকে মোহিনীতে নিয়ে গিয়ে নিজে অ্যালবাম দেখে খোঁপা পছন্দ করে দিয়ে অন্য কাজে বেরিয়ে গেছেন। পাহারা বসিয়ে রেখে গেছেন ভুজঙ্গবাবুকে, কারণ কনে সাজাতে বহু সময় লাগবে, অতক্ষণ তাঁর বসে থাকার সময় নেই। নির্দিষ্ট আসনে বসার পরই কনে বদল হয়ে গেছে। যূথিকা কনে সাজছে যূথিকার নকল অভিভাবকরাও সেখানে তৈরি। বোরখা পরে শ্রীলতা বেরিয়ে এসেছে চন্দনাদির সঙ্গে এবং যথাস্থানে পৌঁছেও গেছে। শ্যামবাজার পোস্ট অফিস থেকে ফোন করে সব ও-কে জেনেই আমরা আসছি' নন্দিতা বেশ রসালো করে ব্যাপারটা তপতীকে জানালো।

বন্দনা ওপর থেকে ছুটতে ছুটতে নেমে এল এই সময়। পারমিতা আর নন্দিতা ওকে দেখেই উলু দিতে গিয়ে আচমকা থেমে গেছে। বন্দনার মুখ-চোখ কি রকম পাল্টে গেছে। ও এসেই গদির ওপরে ধপ করে বসে পড়লো। মুখে কথা নেই।

নন্দিতা ভীত গলায় প্রশ্ন করল, 'কি হয়েছে রে বন্দা?

কয়েক সেকেণ্ড কথা কইতে পারল না বন্দনা। শেষে ধরা গলায় বলল, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে ভাই। পাখি উড়েছে।'

ঘরে বাজ পড়ার পরে যেন স্তব্ধতা নেমে এল। সবাই বোবা হয়ে গেল কিছু-ক্ষণের জন্যে।

'সে কি! একটু আগেও তো টেলি-ফোনে—পারমিতা সম্পূর্ণ করে না কথাটা।

বেশীক্ষণ কাৎ হয়ে থাকবার মেয়ে বন্দনা না। সে ইতিমধ্যে একটু সামলে নিয়েছে কথা শুনে বোঝা গেল। বলল 'বিহঙ্গী নয় বিহঙ্গ। সন্তুদা পালিয়েছে।

'অ্যাঁ!' নন্দিতার ফেণ্ট হবার অবস্থা।

'তাহলে কি হবে!' সুষমার গলা দিয়ে আর্তনাদ বেরোলো।

'রেজিস্ট্রারের সঙ্গে কাঁটায় কাঁটায় এগারোটায় অ্যাপয়েন্টমেণ্ট। ওরা পৌঁছে যাবে সাক্ষীসাবুদসহ। তারপর বিয়ে-বাড়িতে অনুষ্ঠান। সব ম্যাসাকার হয়ে গেল, নন্দি।'

'কেন পালালো? কোথায় পালালো?' পারমিতা জানতে চায়।

দু'হাত তুলে কাঁধ নাচিয়ে বলল 'ঈশ্বর জানেন! বুড়ী পিসি ঠাকুরঘরে সুতরাং তিনি এখন অস্পৃশ্য। ঝি মানদা বলতে নারলো। শুধু উপযুক্ত ভৃত্য ঘণ্টেশ্বর বলল, 'দাদাবাবু বাইরে গেছেন ভোর সকালে, বোধহয় দু-তিনদিনের মধ্যে ফিরছেন না। এই চিঠি দিয়ে গেছেন।'

হাতের মুঠো খুলে বন্দনা একচিলতে কাগজ দেখালে ওদের। তাতে ঝরঝরে অক্ষরে দু-লাইন লেখা। সবাই ঝুঁকে পড়ে লেখাটা পড়ল।—

আমি খুব শোক আর সিক ফিল করছি। আমি কিছুতেই মনস্থির করতে পারছি না। আমাকে তোমরা ক্ষমা করো। সন্তোষ

'এ বলে কি রে?' পারমিতা চেঁচিয়ে উঠলো, 'একজনের লাইফ নিয়ে তামাশা হচ্ছে।'

নন্দিতা বিমর্ষভাবে মাথা দোলালো, 'কাল রাত দশটার সময়ও ফাইনাল ছিল। সব প্ল্যান পাকা। তখন তো ঘুণাক্ষরেও শোকিনেস বুঝতে দাওনি, বাবা।'

'নিশ্চয় কেউ ভাংচি দিয়েছে। ইস কি হবে। লোকটা এমন শয়তান ভাবতেই পারিনি।'

বন্দনা চিরকুটটা ফিরিয়ে নিয়ে ভাঁজ করে ব্যাগে রাখছিল, বলল, 'শয়তান না—অপদার্থ, কাপুরুষ কাউয়ার্ড। ইডিয়েট পালাবে কোথায়? আই শ্যাল ড্রাগ ইউ আউট! আই মাস্ট! আমার নাম বন্দনা বসুরায়। আমিও বদ্যির বাচ্চা। আচ্ছা—'

পারমিতা গ্রীক কায়দায় বন্দনার কব্জি ধরলো, 'আমি আছি তোমার সঙ্গে।'

'আমরাও।' নন্দিতা বেম বাকি সকলের হয়ে কথা দিল, 'হয় এস্পার নয় ওস্পার।'

(ক্রমশঃ)

অঙ্গনা

মহিলা সাহিত্য আসর

সম্প্রতি 'ছন্দিতা' পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীমতী হেনা চৌধুরী একডালিয়া রোডে মহিলাদের একটি সাহিত্য আসরের আয়োজন করেন। এই ঘরোয়া আসরে সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতী বাণী রায়। এখানে বর্তমান সাহিত্য জগতে মহিলাদের অগ্রগতি ও অনগ্রসরতার বিভিন্ন কারণ ও প্রতিকারের কিছু কিছু বিষয় আলোচিত হয়। মহিলা কবিদের কবিতা বিশেষ করে আধুনিক কবিতাকে পৃথক এক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করা হয় এ-রকম এক অভিযোগ তুলেছেন শ্রীমতী বিজয়া মুখোপাধ্যায়। তিনি অতীত ও বর্তমানের মহিলা কবি ও সাহিত্যিকদের কবিতা ও সাহিত্যের উৎকৃষ্টতা আলোচনা করেন এবং বলেন যে কোন সৃষ্টিকেই তার উৎকর্ষতার জন্য মূল্যায়ন করা হোক— স্রষ্টা হিসাবে স্ত্রী-পুরুষে কোন ভেদাভেদ না করে। শ্রীমতী এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও মহিলাদের অনগ্রসরতার কথা আলোচনা করে বলেন, প্রবন্ধ লেখার ব্যাপারে যদি লেখিকারা এগিয়ে আসেন তবে তাঁদের অনেকেরই লেখা উচ্চ শ্রেণীর রচনা হিসেবে মর্যাদা পেতে পারে।

প্রবন্ধ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে উপস্থিত কেউ কেউ বিশেষ করে যাঁরা মাসিক অথবা ত্রৈমাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করেন তাঁরা বলেন পত্রিকাকে বাজারে চালু রাখার জন্য নানা বিষয়কেই প্রাধান্য দিতে হয়। তাতে যদি প্রবন্ধকেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় একমাত্র নামী পত্র-পত্রিকা ছাড়া সাধারণ পত্রিকা বাজারে সচল রাখাই দুরূহ ব্যাপার। আমাদের দেশে প্রবন্ধের পাঠক-পাঠিকার সংখ্যা স্বল্প ও সীমাবদ্ধ পাঠক-পাঠিকার চাহিদার ওপরে নির্ভর করেই সাধারণ পত্রিকার প্রাণ স্পন্দন ও আয়ু নির্ধারিত হয়। দীপালি ধর এষা মুখোপাধ্যায় ও অন্য অনেকে অবশ্য একথা স্বীকার করলেও বলেন প্রবন্ধের পাঠক পাঠিকা সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উচ্চমানের প্রবন্ধের চাহিদাও আছে। প্রবন্ধ পড়ার জন্য একদল পাঠক-পাঠিকা সব সময়ই ব্যগ্র।

বর্তমান তরুণ সাহিত্য সেবিকাদের মধ্যে গল্প বা উপন্যাস লেখার প্রবণতা খুব বেশী দেখা যায় না, লেখা হলেও তার মান অনেক লেখকদেরই সমকক্ষ নয় এ-রকম এক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন শ্রীমতী এষা মুখোপাধ্যায়। এ প্রসঙ্গে শ্রীমতী বাণী রায় বলেন, মেয়েদের দেখা বা জানার জগত স্বল্প, সুযোগও অনেক কম সে তুলনায় পুরুষেরা অনেক বেশী সুবিধার অধিকারী। যে কারণে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাশক্তি মহিলাদের তুলনায় অনেক বেশী প্রসারিত। অবশ্য শ্রীমতী রায় একথাও বলেন, মেয়েদের এবং পুরুষদের উপলব্ধির গভীরতাতে পার্থক্য নেই, কিন্তু অভিজ্ঞতা সংগ্রহে আছে অনেক তফাৎ। তাই আমাদের দেশে লেখক সমরেশ বসুর মত সমমানের লেখিকা এখনও চোখে না পড়লেও সাহিত্য-সৃষ্টিতে মেয়েদের প্রতিভা পুরুষদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়— পৃথিবীর সাহিত্যে নজর বোলালেই একথা প্রমাণিত হয় যে স্রষ্টা হিসেবে মহিলারাও কত উচ্চে স্থান পেয়েছেন। মেয়েদের যে কোন জিনিসে উপলব্ধির গভীরতা কম না থাকলেও অভিজ্ঞতার অভাব বোধেই বোধহয় বর্তমানে নবীন লেখিকাদের উপন্যাস বা গল্প ততটা উচ্চ মানের নয়।

একথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে উৎকৃষ্ট সাহিত্য, কবিতা এবং প্রবন্ধ সৃষ্টি করতে হলে তার জন্য যে পরিশ্রম ও দীর্ঘ সময় ব্যয় করার প্রয়োজন হয় মহিলাদের পক্ষে সে শ্রম ও সময় শুধুমাত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যয় করা সম্ভব নয় কারণ মহিলারা সংসারের কাজে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত বা নির্বিকার থাকতে পারেন না। সংসারের কাজের ফাঁকে ফাঁকে বা অবসরের সময়টুকুতে তাঁদের সাহিত্য সাধনা করতে হয়।

একডালিয়ার ঘরোয়া সাহিত্য আসর উপস্থিত সকলকেই বেশ আনন্দ দিয়েছে। এ ধরনের সাহিত্য অসরের আয়োজন হয় না বললেই চলে। অথচ খোলাখুলি আলোচনা, পরস্পরের চেনাশোনা, মতামতের বিনিময় প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই এ-রকম আসরের গুরুত্ব অনেকখানি। মাঝে মাঝে এ ধরনের ঘরোয়া আসরের আয়োজন করতে পারলে সকলেই তাতে উপস্থিত হয়ে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করে পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় করতে সক্ষম হবেন।

সাহিত্য বা শিল্প সৃষ্টিতে পুরুষ বা মহিলার মধ্যে কোন রকম ভেদাভেদ না থাকাই বাঞ্ছনীয়। মহিলার সৃষ্ট জিনিস যদি তা সাংসারিক কর্মভুক্ত না হয় তবে অনেক পুরুষ মানুষই তা উপেক্ষা কিংবা করুণার চোখে দেখেন। অথচ যে কোন সৃষ্টিই হয় স্রষ্টার আবেগ, কল্পনা ও সৃজনী শক্তির দ্বারা—তিনি নারী বা পুরুষ যাই হোন না কেন? সেখানে আমাদের প্রধান বিচার্য বিষয় হবে না তা কার দ্বারা সৃষ্ট? উৎকৃষ্ট সৃষ্টি তার মানের দ্বারাই আদরণীয় হয়।

বর্তমানে নারী-প্রগতির যুগে মেয়েরা যে কোন কঠিন কাজই যখন পুরুষের মতো সমানভাবে করতে এগিয়ে যাচ্ছেন সেখানে নারী-পুরুষে ভেদাভেদের কোন যুক্তি আছে কি? দৈহিক শক্তিতে মেয়েরা পুরুষের চেয়ে দুর্বল এবং সেই দুর্বলতার জন্যই কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁরা হয়তো বিশেষ কিছু কিছু সুবিধা দাবী করেন যেমন ট্রাম-বাস-ট্রেনে সীট বসা বা টিকিটের লাইনে পৃথক সারিতে দাঁড়ানো। জীবন যুদ্ধে যখন নারী-পুরুষের কোন তফাৎ নেই তখন সৃষ্টির ক্ষেত্রেও এ পার্থক্যের কোন মূল্য নেই। অথচ আমাদের দেশে এ মূল্য নির্ধারণ করতে গিয়ে মেয়েরা শুধু মেয়ে হয়ে জন্মাবার অভিযোগেই অনেকে যোগ্যতা সত্ত্বেও ঈপ্সিত কর্মে স্থান পাচ্ছেন না।

—অঞ্জলি চৌধুরী

(২)

ত্বকের পর আমরা প্রথমে মুখের বিশেষ অংশগুলি নিয়ে একে একে আলোচনা করবো। সবচেয়ে প্রথমে চোখ:

কালো তা সে যতই কালো হোক—

আমি দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ।

সজীব সতেজ চোখের দৃষ্টির ছাতিয়ার দিয়ে কতো বীর হৃদয় জয় করেছে রমণী-কুল। চোখ এক মস্ত সম্পদ। চোখের কালো তারায় ফুটে ওঠে ব্যক্তিত্ব মানসিক গঠন। কথায় বলে চোখ মনের আয়না। সেই আয়নাকে ঝকঝকে সুন্দর করে না রাখলে সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ বিকাশ হবে কি করে?

চোখ সুন্দর করে সাজাবার আগে সবচেয়ে প্রথম বিচার করে দেখতে হবে, চোখটি কেমন? অর্থাৎ কতোটা সম্পদ তার আছে, আর কতটুকু কম। সেই বুঝে প্রসাধনের ব্যবস্থা।

আপনারা হয়ত শুনলে আশ্চর্য হবেন যে চোখেরও ব্যায়াম হয় এবং তা নিয়মিত করা উচিত। চোখ যেমনই হোক এই ব্যায়াম সবার জন্য। ঘুম থেকে ওঠার সময় থেকে রাতে শুতে যাওয়া পর্যন্ত কতকগুলি বিশেষ নিয়ম সবারই পালন করা ভাল।

ঘুম থেকে উঠে যতক্ষণ সম্ভব ঠান্ডা জলের ঝাপটা দিয়ে চোখ ধুতে হবে। এ নিয়ম সব কালের জন্য। চোখে গরম জল একান্ত কোন রোগ ছাড়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। চোখ মিনিট তিনেক বেশ করে ধোয়ার পর বড় করে সোজা চাইতে হবে। তারপর ডানদিকে (মাথা সোজা রেখে) চোখের মণি ঘুরিয়ে চাইতে হবে এবং পরে বাঁদিকে। এই ভাবে বার দশেক করার পর দুটি মণিই ডান দিক থেকে ওপরে তারপর বাঁদিক এবং বাঁদিক থেকে ওপর তারপর ডান দিকে; এই ভাবে গোল করে মিনিট ২।৩ ঘোরানোর পর এক মিনিট চোখ বন্ধ করে রাখতে হবে। তারপর দিনের কাজ সুরু। আরও একটা খুব সুন্দর কাজের দ্বারা চোখের জ্যোতি বাড়ান যায় ও চোখ সুন্দর করা যায়—তা হল ভোরবেলা নতুন সূর্যের লাল আভা ছড়ানো পূবে আকাশের দিকে তাকিয়ে সূর্য প্রণাম করা। প্রথমে সোজা তাকাতে হবে, তারপর আস্তে আস্তে চোখ সহজভাবে বড় করে প্রাণ ভরে লাল আভা দেওয়া উদীয়মান প্রথম সূর্যকে দেখতে হবে। এরপর ঠান্ডা জলে চোখ ধোয়া ও ব্যায়াম। যাঁরা এতো ভোরে উঠতে পারেন না—তারা করবেন না।

এরপর সারাদিনের নিয়মিত কাজ চলবে। স্নানের সময় চোখে সাবান তেল কোন কিছু যাতে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। যাঁরা বাইরের কাজে যান তাঁরা বাড়ী ফিরে অন্তত মিনিট ৫।১০ চোখ বন্ধ করে রেখে চোখের বিশ্রাম নেবেন। সেই সময় তুলো ভিজিয়ে গোল করে দুই চোখের পাতার উপর দিয়ে রেখে দেবেন। এরপর বেরোবার সময় চোখের প্রসাধন হবে। রাতে শোয়ার সময় আবার ঠান্ডা জল দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ চোখ ধুয়ে শোয়া দরকার, তবে সেই জলে গোলাপ জল মেশান থাকলে তা চোখের পক্ষে আরও উপকারী হবে।

এতো গেল চোখকে সুস্থ রাখার মোটা-মুটি আলোচনা এছাড়া খাদ্য সম্বন্ধেও কিছু জানা ভাল। কাঁচা পেয়াজ, কডলিভার তেল, তাজা ছোট চুনো মাছের মাথা চিবিয়ে খাওয়া ও সবুজ তাজা সব্জি—চোখের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। তবে এ বিষয়ে ডাক্তারদের মতা-মতই বেশি মূল্যবান। আমার আসল বক্তব্য চোখের প্রসাধন।

চোখের বহু রকমের প্রসাধন সামগ্রী আজকালকার আধুনিক রূপসজ্জার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। কাজল আইলাইনার আই শ্যাডো নকল চোখের পাতা চোখের পাতাকে শক্ত ও বড় দেখাবার জন্য ব্যবস্থা, সবই আছে। কিন্তু যে কোন সামগ্রী ব্যবহার করার আগে সবচেয়ে প্রথম দেখতে হবে চোখটা কোন জাতের। অর্থাৎ বড় না ছোট। টানা কিম্বা গোল। ভেতর দিকে বসা না কপালের দিকে ঠেলে আসা। এর পর চোখের রঙ কালো খয়েরী ঘোলাটে নীলচে বেড়াল চোখ কোন রকমের? এবং যে কোন প্রসাধনের আর একটি বিশেষ দিক যা লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন তা হল বয়স। কোন বয়সে কি ধরনের প্রসাধন মানাবে সেটা খুবই যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে হবে। এছাড়া অনেকের বিশেষ কোন চোখের ব্যাধি থাকতে পারে সে কারণে হয়তো তার কোন রকম প্রসাধনই করা যুক্তিযুক্ত হবে না। সেই সব ক্ষেত্রে নিজেদের ডাক্তার দেখিয়ে জেনে নেওয়া ভাল।

সাধারণ আক[illegible] ও রঙের চোখের জন্য যে কতকগুলি প্র[illegible]ন সামগ্রীর দরকার তার সবই অন্যান্য ধর[illegible] চোখের জন্যও প্রযোজ্য। তবে ঠিক কতট[illegible]হার করতে হবে আর কিভাবে করতে [illegible] সেইটাই বোঝার ও জানার।

রাত্রে শোবার সময় ঘরে তৈরি কাজল খুব হাল্কা ও সরু করে চোখে দিয়ে রাখা ভাল। দিনের বেলা বিশেষ করে গ্রীষ্মকালের দুপুরে চোখের উপর কোন রকম রং বা লাইনার ব্যবহার না করাই যুক্তিসংগত। তবে শীতের দুপুরে বেড়াতে গেলে হাল্কা হাতে চোখের ওপরের পাতায় লাইনার দিয়ে সরু রেখা টানা যায়। যাঁদের চোখ ছোট, তাঁরা নাকের পাশ থেকে—অর্থাৎ চোখের সুরু থেকে তুলি দিয়ে ঠিক চোখের পাতা ঘেঁষে মোটা করে কালী টেনে শেষের অংশ একটু তুলে দিতে পারেন। তারপর নিচেও ঠিক তেমনি করে চোখের পাতা ঘেঁষে সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত টানা উচিত—তাতে করে চোখ বেশ বড় ও জলজলে দেখায়। ওপরে তুলে দেওয়া রেখার সঙ্গে নিচের রেখা যাবে না কিন্তু, এটা মনে রাখা দরকার।

যাঁদের চোখ চীন দেশীয়দের মতন চাপা ও তেরছা তাঁরা চোখ আঁকার সময় ওপরের তুলির টান প্রথম বারের মতনই দেবেন তবে শেষ অংশ সোজা চোখের ভাঁজের সঙ্গে একটু বাইরের দিকে টেনে দেবেন। তারপর নিচের পাতায় মাঝামাঝি

অংশ থেকে সোজা টেনে নেবেন, ওপরের রেখার সঙ্গে সমতা রেখে। এতে করেও চোখ বড় আর সোজা দেখাবে।

যাঁদের চোখ বেশ বড় ও ভাসা ভাসা তাঁরা নিচের অংশে তুলি দিয়ে আঁকবেন না, তাহলে চোখ মুখের তুলনায় বেশী বড় দেখাবে। আর ওপরের পাতা ঘেঁষে যে তুলির টান দেবেন তা খুব সরু হওয়া ভাল। ছোট চোখের ওপর একটু মোটা রেখা হবে, কিন্তু বড় বড় চোখের ওপর তা হবে না।

একেবারে গোল আকারের বা মাঝারি ধরনের চোখের জন্য আই-লাইনার ব্যবহার একটু বিশেষ কায়দায় করতে হবে। চোখের পাতার ধার ঘেঁষে তুলি দিয়ে রেখা টেনে শেষ অংশে একটু নজর দিতে হবে। শেষ অংশ চোখের নিজস্ব রেখা ছাড়িয়ে তার একটু ওপর দিয়ে সোজা সামান্য টানতে হবে। নীচের অংশেই ঠিক তেমনি করে নিচে থেকে শেষ অবধি এসে তারপর জুড়ে না দিয়ে ওপরের অংশের সঙ্গে সমতা রেখে সোজা টেনে দিতে হবে। এর ফলে চোখের চেহারাটা অনেকটা মাছের মতন দেখাবে। যার শেষ অংশটি মাছের ল্যাজের মতন মনে হবে। এর ফলে শুধু যে চোখ দেখতে ভাল লাগে তা নয়, চোখের দৃষ্টিতে একটা মাদকতা জাগে।

এতক্ষণ গেল 'আই-লাইনার' ব্যবহারের কথা। এবারে আসব 'আই শ্যাডো' অর্থাৎ চোখের ওপরের ঢাকনীর (আইলীড) ওপর যে সব রঙ ব্যবহার হয় তার কথা। এর আগে একটা কথা আলোচনা করতে ভুলে গিয়েছি, তা হল কোটরগত বসা চোখের কথা। এমন চোখের নিচের অংশে কালো রেখা টানা কোন মতেই উচিত নয়। ওপরের অংশেও খুব সরু করে ম্লান রেখা দেওয়া চলতে পারে। এর জন্য অন্য ব্যবস্থা যা পরে আলোচনা করবো।

'আইশ্যাডো' ব্যবহার করার সময় একটা কথা বিশেষ করে মনে রাখা প্রয়োজন, তা হল কি ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য সাজ, আর কোন সময়ের জন্য। সকালে বা দুপুরে আমাদের দেশে 'আইশ্যাডো' ব্যবহার? নৈব নৈব চ। সন্ধ্যাবেলাতেও ভাবতে হবে। যদি উৎসবের জায়গায় খুব বেশী তেজের আলো থাকে বা বিলিতি কায়দার উৎসব হয় তাহলে ব্যবহার করা চলবে। এখন ভাবতে হবে কোন রঙ। সাধারণত শাড়ীর রংয়ের সঙ্গে মিলিয়ে চোখের ওপরের রঙ ব্যবহার করা হয়। তবে এর মধ্যেও একটা বিষয় ভাববার আছে—যেমন গায়ের রং খুব কালো হলে সব রং চলবে না। সেই ক্ষেত্রে কোন রঙই ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত হবে না। আবার যাঁদের চোখ ছোট, বা গোল আকারের তাঁরা রঙ ব্যবহার করলে খুব হাল্কা হাতে চোখের ওপরের মাঝখান থেকে সরু করে ব্রাশ দিয়ে হাল্কা টানে টেনে দিতে হবে ভুরুর নিচ পর্যন্ত। 'আইশ্যাডো' সব সময়েই খুব হাল্কা আর মসৃণ করে দেওয়া উচিত। রঙের আভা থাকবে তবে তেজ থাকবে না, এটাই হল সাজার বিশেষত্ব।

এবার আসা যাক আরও আধুনিক ব্যবস্থায়। আজকাল চোখের সঙ্গে আঠা দিয়ে নকল পাতা লাগানর রেওয়াজ খুব বেশী। এই নকল পাতা লাগানর ব্যাপারটিও অনুষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল। ছোট ও বসা চোখে নকল পাতা লাগালে তা একটু বড় দেখাবে। নকল পাতার মাপ ও রঙ নিজের অঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে ব্যবহার করা উচিত। অনেকে যাঁরা নকল পাতা ব্যবহার করতে চান না তাঁরা 'মাসকারা'র সাহায্যে চোখের পাতাকে শক্ত ও বড় দেখাতে পারেন। 'মাসকারা' এক ধরনের কালো ক্রীম জাতীয় জিনিষ যা ব্রাশ ও জলের সাহায্যে গুলে নিয়ে চোখের পাতার নিচে ধরে আস্তে আস্তে ওপরের দিকে টানা উচিত। তাহলে পাতা-গুলি ঘুরে ওপরের দিকে ওঠে, আর শক্ত হয়ে বড় দেখায়।

এই জিনিষ কিন্তু 'মাসকারা' ছাড়াও হয়। বাচ্চাদের ব্যবহারের দাঁত মাজার ব্রাশ দিয়ে জলে ভিজিয়ে রোজ চোখের পাতার নিচ থেকে ওপরের দিকে ঘুরিয়ে টানলে চোখের পাতা বড় হয় ও সুন্দর হয়। তবে একটা কথা আমাদের সর্বদাই মনে রাখা দরকার যে, চোখের প্রসাধনের জিনিষগুলি যে কোন কোম্পানীর ব্যবহার করা উচিত না, তার ফলে চোখ খারাপ হতে পারে। প্রসাধন সামগ্রী কেনার আগে বিদেশী বা দেশী যেগুলি নামকরা ও ভাল সেগুলি দেখে শুনে কেনা ভাল। আর নিজের চোখের রঙ গায়ের রং সব বিচার করে রংয়ের শেড্ কেনা একান্ত প্রয়োজন। হয়তো রংয়ের মিল না হলে পুরো সাজটাই ব্যর্থ হতে পারে।

—বরবর্ণিনী

বুঝিবা খুনের গল্প / গৌতম গুহ

একটা ছোট্ট খুনের গল্প বলি। এদিকে আসুন, একটু এপাশে। নাঃ, আরও বেশি নির্জনতা দরকার। চলুন ফাঁকা কোথাও যাই। আসলে কি জানেন, ব্যাপারটা এত নিভৃতে জানাতে চাই যে চেনা শোনা আপনজনদের থেকে অনেক দূরত্বে না গেলে এই গভীর নিষ্ঠুরতার কাহিনীটা জানাতে বুকে বল পাওয়া যায় না।

আপনি নিশ্চয় চমকে উঠলেন। এই লোকটা—কিছুটা পরিচিত, কেমন জানি না দেখলে ভাল লাগে, আলাপ করে সুখ আছে, এর হঠাৎ কি হল? নিষ্ঠুরতার এমন কি হল যে মাঝরাতের মাতালের মত দুঃখ টলতে টলতে চলেছে। আপনি ভেবে চলেছেন এইরকম। আরও ভাবছেন—খুন টুন কেউ করতে গিয়েছিল নাকি? বা করতে চেয়েছিল? —কি চেয়েছিল নাকি?

—ঠিক ধরেছেন। খুন করতে চেয়েছিল। বলতে কি খুনই করেছিল। স্রেফ বুকের উপর ছোরাটা—। আর কে জানেন? আমার বন্ধু। ছোটবেলার বন্ধু। খুব ভালবাসতাম ওকে। বাচ্চাও খুব ভালবাসত আমাকে। টিফিনের কৌটো থেকে একটা মিষ্টি রোজ আমাকে খাওয়াতো। পয়সা ছিল ওদের। পিপুলের পয়সা বাচ্চাই দিত।

বাচ্চা কিন্তু আমাকে কখনো বলেনি ও নিজেও মৃদুলাকে ভালবাসে। আমি জানিয়েছিলাম। জানিয়েছিলাম ওকে—আর কাউকে অবশ্য নয়।

বিকেলের রোদ শালগাছের পায়ের তলায় রেশমী রুমালের মতো ছড়িয়ে। আমি আর বাচ্চা হাসতে হাসতে খেলার মাঠে যাচ্ছি। তেমন কেউ নেই রাস্তায়। দু-একটা সাঁওতাল কখন নিঃশব্দে চলে যাচ্ছে নজরেও পড়ে না। ঠিক এরকম একটা সময়ে বলেছিলাম ব্যাপারটা। বুকের মধ্যে যে কী এক অভূতপূর্ব আনন্দ এসে ভর করেছিল, এখন মনে হয় সেই আনন্দটাকে কাচের বাক্সে ভরে রেখে কোন সর্বভারতীয় প্রদর্শনীতে দেওয়া যেত। দেশের সব লোক এসে দেখে যেত ভালবাসার আনন্দ কাকে বলে, ভালবাসা কাকে বলে।

বাচ্চা কিন্তু কিছু বলল না। খুব ফর্সা ছিল বাচ্চা আর চোখ দুটো কটা কটা। পাশাপাশি হাঁটছিলাম, চোখ দেখতে পারছিলাম না। কেবল আনত মুখের একটা পাশ দেখা যাচ্ছিল। কী রকম একটা গাম্ভীর্য আর ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ণতা, যে তীক্ষ্ণতাকে বিশ্বাস করা কঠিন এ দুয়ের সম্মিলিত একটা মিশ্রভাব ফুটে উঠেছিল ওর মুখে। মনে হচ্ছিল একটা শয়তান ওর মনে কোথাও জন্ম নিচ্ছে। কিন্তু ও আমার বন্ধু, আমাকে খুব ভালবাসে। পর্যবেক্ষণ আর চিন্তা এ দুই নিষ্ফল কর্মই ঝেড়ে ফেললাম মন থেকে।

অনেকক্ষণ পর বাচ্চা বলল—যাঃ, কি যা তা বলছিস। এত চেনাশোনা সব, এক পাড়ায় থাকি।

বুঝতে পারছিলাম মৃদুলার প্রতি ওর মনও দুর্বল। কিন্তু সে কথা ও প্রকাশ করল না। কিন্তু তারপর থেকে যা একান্ত স্বাভাবিক তাই হল। ওর আমার মধ্যে কোথাও একটা চিড় ধরতে শুরু করল। এছাড়া, আমি যখন মৃদুলার সঙ্গে কথা বলি ও দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। মৃদুলা আমার সম্পর্ককে ও সমর্থন করে না, তাই ও যখন পিছনে দাঁড়িয়ে থাকে, দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের কথাবার্তা ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করে, তখন কেমন ভয় হয় আমার। বুঝি বাচ্চার দিকে মুখ ফেরালেই দেখব বাচ্চার মুখের বদলে অপরিণত শয়তানের কেমন একটা অস্পষ্ট মুখ তৈরী হয়েছে যা আমাকে

গোপনে আক্রমণ করতে চাইছে, শাসিয়ে দখল করতেও চাইছে।

মৃদুলাও বাচ্চার দিকে একবার তাকিয়ে ভয়ে দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে নিল দেখলাম।

এই মানিকপাড়া অঞ্চলে কেবল একটাই দ্রষ্টব্য বস্তু ছিল। সেটা একটা বাগানবাড়ি। ছাদ সমান উঁচু ঘন ঘন অনেকগুলি ঝাউ-গাছের মাঝে লাল টালির বাংলোটা দেখা যেত। বাড়ির মালিক মতিবাবু বছরে একবার আসতেন। কিন্তু তিনি আমাদের খুব ভাল-বাসতেন। দেখা হলেই মাথায় হাত রেখে বাবা মার কুশল জানতে চাইতেন, আর বাচ্চার বেলা বাচ্চার বিধবা দিদির। তিনি কিন্তু তার বাগানে আমাদের খেলবার অনুমতি দিয়ে গিয়েছিলেন।

আমরা খেলতাম। বাচ্চা একদিন ফুটবল নিয়ে এসেছিল। আমি কিক্ করে সেটা বাগানের অনেক ভিতরে ফেলে দিলাম। কারণ সহজেই অনুমেয় ফুটবল খেলায় মৃদুলাকে নেয়া যায় না। বয়স হিসাব কিছু বেমানান হলেও নাম-পাতাপাতি জাতীয় মেয়েলি খেলায় ভিড়ে পড়তাম। খেলার সময় ওর একটু ছোঁয়া পাওয়া যেত (বাচ্চাও পেত)। সেটুকু ক্ষীরের আস্বাদের মত লাগত। মৃদুলার বাবা ব্যাড-মিণ্টন খেলার জন্য দুটো গোলাপী উলের বল কিনে দিয়েছিলেন। মৃদুলা তার একটা আমায় তৎক্ষণাৎ দিয়ে দিলে বাচ্চা মোরামের পথের উপর এমন সজোরে পা দাপাতে দাপাতে চলে গেল আমার ভয় হল ওর না পা ফুটো ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়।

কিন্তু সে বছর পুজোয় খুব জব্দ হয়ে গেলাম। মৃদুলাদের বাড়ি কলকাতা থেকে অনেক লোক এল। তাদের মধ্যে হলুদ আর লাল মেশানো ডোরা কাটা জমকালো জামা পরা আমার সমবয়সী একটি ছেলে মৃদুলাকে নিয়ে সর্বদাই ঘুরে বেড়ায়। মৃদুলার সঙ্গ-লাভের ব্যাপারে আমাদের প্রাপ্য অংশে অনেক ঘাটতি পড়ে যায়। ছেলেটি মৃদুলাদের বাড়ি থাকে, তায় কলকাতা থেকে এসেছে, তায় আত্মীয় (সম্ভবত)। ছেলেটির অগ্রাধি-কার অস্বীকার করবার উপায় নেই। মৃদুলাও খুব একটা যেন কাছ ঘেঁসে না। কিন্তু ঐ আগন্তুক সম্ভাব্য প্রেমিকের অগ্রাধিকারের যুক্তিগুলি চিন্তা করে মৃদুলার সাম্প্রতিক অনুৎসাহ—ক্ষমা করি।

বাচ্চা এসে ছেলেটির গল্প করে। ছেলেটি নাকি দারুণ বল খেলে। আমি গোলে খেলতাম, ছেলেটি এমন এক শক্ত কিক করল যে বল মুখে লেগে মুখে রক্ত উঠে এল। মাথা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল আমার। গালের খানিকটা ছড়েও গেল। ছেলেটি কাছে আসতে পরম নির্লিপ্তের সঙ্গে প্রচণ্ড এক হাই কিক্ করলাম। যেন মুখে বল লাগে নি, পাউডার পাফ লেগেছে।

কিন্তু পরের কিকেও ও আমাকে গোল দিল।

বাচ্চা খুব হাসছিল। পরে খেলার শেষে মুখ উঁচু করে ছেলেটির সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে অকারণে অপ্রযোজ্য অনেক স্তুতি বন্দনা করল। আমার দিকে মুহূর্তের জন্য ফিরেও তাকাল না।

এদিন বাচ্চা অস্পষ্ট স্বরে মেয়েলি ঢঙে ইনিয়েবিনিয়ে জানাল—ওর সঙ্গে নাকি মৃদুলার পরে বিয়ে হবে। আমি বললাম—বাঃ তাই হয় নাকি। ওরা তো আত্মীয়।

—উঁহু আত্মীয় নয়, মৃদুলার দাদার শ্বশুরবাড়ির সম্পর্ক। কী সম্পর্ক, আদৌ সম্পর্ক কিনা শুনলাম না। কিন্তু বুঝলাম ছেলেটি মৃদুলার আত্মীয় নয়।

কিন্তু ছেলেটি চলে গেল। গরমের ছুটিতে এসেছিল, ছুটি ফুরোতে সবাই চলে গেল। মৃদুলা আবার খেলতে এল। আহত পৌরুষে খেলা এবার আমি ফুটবল দিয়েই শুরু করলাম। মৃদুলাকে গোলে দাঁড় করিয়ে দিলাম। বাচ্চা দেখি খেলা ছেড়ে দিয়ে কেবল মৃদুলাকেই দেখে। বাচ্চাকে পিছন থেকে খেলতে খেলতে আচ্ছা করে একটা কিক্ ঝাড়লাম। ওঃ বাপ রে! বলে বাচ্চা মাটিতে বসে পড়ল।

বাগানে একদিন একটা সুন্দর প্রজাপতি উড়ছিল, ধরে এনে মৃদুলার মাথায় ছেড়ে দিলাম। সেটা মৃদুলার মাথা ছেড়ে উড়ে কাঞ্চন ফুলের ঝোপের উপর গিয়ে বসলে মৃদুলা খুশীতে হাততালি দিয়ে উঠল। আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এমনভাবে আনন্দ প্রকাশ করছিল যে আমার ইচ্ছে করছিল মৃদুলাকে জাপটে ধরি। এত ভাল লাগছিল ওকে।

বাচ্চাকে দেখলাম হিংসায় মুখ বেঁকে গেল।

এরপর বাচ্চা আর আমাকে পিপ শো কিংবা ট্যাপারি খাবার পয়সা দিল না।

কিন্তু ওর একটা বদভ্যেস তৈরী হল। নতুন যা কিছু দেখে তাই মৃদুলাকে দেখায়। মৃদুলা ও আমি মুখ ঘুরিয়ে দেখি হয় সেটা বুনো ফুল নয় কোনো বিচিত্র আকৃতির মামুলি পাথর, নয় তো স্রেফ সিগারেটের রাংতা। কিছুদিন পর ও কিছু দেখাতে চাইলে আমি মুখ ফেরাতাম না, মৃদুলা তখনো ফেরাত। না ফেরালে আমার প্রতি মৃদুলার পক্ষপাতিত্ব বেশি করে ধরা পড়ে যায় এই ভয়ে হয়ত।

মতিবাবুর বাগানে আমাদের খেলা শেষ হয়ে গেছে সেদিন। কিছু তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে গেল। মৃদুলা খেলতে আসে নি। বাচ্চা খেলে শেষে পায়ে জুতো গলাচ্ছে। এমন সময় অত্যন্ত সুন্দর একটা পাখি ঝাউ গাছের মাথায় এসে বসল। অসাধারণ পাখি-টার সৌন্দর্য। এমন পাখি আমি জীবনে দেখিনি। মনে হল যেন রূপকথার জগত থেকে উড়ে এসেছে। গায়ের কী রঙ, গলার কাছটা ময়ূরের রঙের, ডানা দুটো উজ্জ্বল নীল, সবুজ হলুদ আর গাঢ় লাল রঙের খেলা সারা শরীরে এমন সুন্দরভাবে সাজানো, মনে হচ্ছিল যেন কোনো চিত্রকর ওকে রাঙিয়েছে। এমন একটি দুর্লভবস্তু দর্শন করে বিস্ময়ে আনন্দে আমি অভিভূত, বিমূঢ়। বাচ্চা দেখি গেইট পার হয়ে বড় রাস্তায় উঠে গেছে। আমি দৌড়ে গেলাম মৃদুলার বাড়ি। মৃদুলা আর আমি ঊর্ধ্ব-শ্বাসে দৌড়ে ফিরে এলাম যখন দেখি পাখিটা তখনও বসে।

বিকেলের আলো কমে এসেছে ইতিমধ্যে। আলোয় রোদ চলে গিয়ে সন্ধ্যার হাল্কা নীল মিশেছে। পাখিটা আরও নিচু ডালে বসেছে দেখে আরও খুশী হলাম। আমি মৃদুলাকে পাগলের মত দেখাচ্ছি পাখিটার সব কিছু, মুখ, ডানা, বুকের বিচিত্র রঙের ঐশ্বর্য। উচ্ছ্বসিত বলে চলেছি কত সুন্দর পাখিটা। এমন সময় পিছন থেকে 'যাঃ যাঃ' করে হাততালি দিয়ে উঠতে পাখিটা উড়ে গেল। ফুরুৎ করে উড়ে বাগানের ভিতরে গিয়ে বসল তারপর কোথায় হারিয়ে গেল কে জানে।

ফিরে দেখি বাচ্চা। মুখ গোঁজ করে মাটির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ইচ্ছে করছিল বাচ্চার গলা টিপে ধরি তৎক্ষণাৎ। কিন্তু শত্রু হলেও ও আমার বন্ধু, পারলাম না। পাখিটার জন্য অস্থির হয়ে চতুর্দিকে দৃষ্টি ঘোরাতে লাগলাম। আমার প্রাণের মানুষটাকে কত ভাল করে ঐ অপার্থিব বস্তুর সৌন্দর্য দেখাচ্ছিলাম, কিন্তু তা অসমাপ্ত রয়ে গেল। মনে হল বাচ্চা যেন আমাকে খুন করল। মৃদুলাকে কোনদিনও আমার ভালবাসার কথা জানাতে পারিনি, কেবল আজ যেন চেষ্টা করছিলাম। আমার প্রাণ মন সত্তা—সর্বকিছু, ওর নিকটতম সান্নিধ্যে পৌঁছে যাচ্ছিল বারবার। পাখিটা দেখতে দেখতে দুজনার ভিতর কতবার অমৃততুল্য সুধারস বিনিময় হচ্ছিল, দৃষ্টিতে দৃষ্টিতে কত কি জানাজানি হচ্ছিল, একটা কিছুকে কেন্দ্র করে আমরা মিলিত হচ্ছিলাম, একান্তভাবে ঘনিষ্ঠ হচ্ছিলাম। প্রেমের শিহরণ এমন রোমাঞ্চকর হয় কখনো অনুভব করিনি এর আগে। কিন্তু বাচ্চা পূর্ণ প্রতিশোধ নিয়ে নিল নাটক যখন দারুণ জমে উঠেছে ঠিক তখন ক্রুদ্ধ হাতে যবনিকা টেনে দিয়ে। আমার আড়ালে, আমার পিছু পিছু গোপন হিংসুকের মতো এক সময় স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে নিষ্ঠুর ব্যাধ এসে দাঁড়াল আমারই প্রিয়তম অনুভূতিকে শিকার করতে সে যে আমারই বন্ধু, হতে পারে এ কথা আগে স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।

এ ছাড়া মৃদুলাকে আমি যা উপহার দিতে চেয়েছিলাম সেই অলৌকিক সৌন্দর্যের দর্শন তা কি আর পুনর্বার সম্ভব। আপনিই বলুন?

সমূহ সুমিষ্ট ফলের মধ্যে আম আমাদের দেশে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফল হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। শুধু আমাদের দেশ কেন, এই অমৃত ফল আজ ইউরোপ মধ্য এশিয়া ও আমেরিকার মানুষকেও অসাধারণভাবে আকৃষ্ট করেছে। লক্ষ লক্ষ টাকার আম আজ ভারত থেকে বহির্ভারতের নানা দেশে রপ্তানি হয়ে চলেছে। এর মধুর গন্ধ ও স্বাদু স্বাদে বিদেশীয়রা এমনই অভিভূত হয়েছেন যে, সে দেশের মাটিতে এই ফল ফলাবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা চালিয়েছেন তাঁরা।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও আম্রলেহ, আম্রকুঞ্জ, চ্যুতমঞ্জরী আম্রাসার ও আম্রবন প্রভৃতি আম সম্বন্ধীয় বহু শব্দের প্রচলন দেখা যায়। নববর্ষের সূচনা থেকেই আম্রমুকুলের সুরভিতে এদেশের আকাশ-বাতাস ছেয়ে যায় মধুপের আনন্দ-উল্লাস আর মধুগুঞ্জনে মুখর হয়ে ওঠে মুকুলিত বৃক্ষসমূহ। তারপর গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই ফলের সমারোহ দেখা দিতে থাকে গ্রামাঞ্চলে, গঞ্জে-নগরে। নানা-বর্ণের আমের প্রাচুর্য দেশে-ঘরে ছেলে-বুড়ো সবার মনেই আনন্দের দোলা জাগায়, জিবে জল এনে দেয়। বর্ষার প্রায় শেষ পর্যন্ত জোরদার চলতে থাকে এই অমৃত ফলের আস্বাদন ও মাহাত্ম্যকীর্তন।

এই আম নিয়ে বাংলায় নানা প্রবাদ-প্রচলন আছে। যেমন—'আম শুকোলে আমসী বয়স গেলে চামসী', 'আম না হতে আমসত্ত্ব', 'আমে ধান তেঁতুলে ধান' 'আমে দুধে এক হয় আদাড়ের আঁটি প'দাড়ে রয়'—প্রভৃতি। এই আম থেকেই আবার নানাপ্রকার টক-ঝাল-মিষ্টি আচার, আমসী আমচুর, আমসত্ত্ব কাসুন্দী প্রভৃতি মুখরোচক জিনিস তৈরি হয়ে থাকে। এই আম্রফল বাংলার প্রধান অবদান হলেও, বিহার মধ্যপ্রদেশ মাদ্রাজ উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও আম জন্মে থাকে। বোম্বাইয়ের [illegible]
মহীশূরের চিত্তুর, বাদামী মল্লমাণ্ড প্রভৃতির প্রসিদ্ধি তো আছেই তাছাড়া গোয়াতেও প্রচুর আম হয়ে থাকে। ফার্ণ্ট কোল্লেকা ও টিম্বার প্রভৃতি গোয়ার নামকরা আম।

মূলতঃ পশ্চিমবাংলার যে পরিমাণ নানাবিধ আম ফলে থাকে সে ধরনের স্বাদ, সাইজ ও রূপ-রঙের ভ্যারাইটি আর কোথাও দেখা যায় না। একমাত্র মুর্শিদাবাদ ও মালদার আমই আছে শতাধিক নামের। তার কিছু পরিচয় এখানকার পুনঃমুদ্রিত 'আম্র' নামক প্রবন্ধটি থেকে পাঠকরা অবগত হবেন। কেবলমাত্র আম গুলির নামই নয়, এই ফল ও ফলের গাছ সম্বন্ধে বহুবিধ জ্ঞাতব্য তথ্য, এবং এই ফল ফলাতে হলে, তার স্বাদ বৃদ্ধি ও ফলন বৃদ্ধি করাতে হলে যে শিক্ষা আছে, গাছের প্রয়োজনীয় পরিচর্যা আছে সে সকল বিষয়ও রচনাটির মধ্যে অভিজ্ঞ লেখক—মুর্শিদাবাদ নবাব বাহাদুরের

উদ্যানসমূহের ভূতপূর্ব - তত্ত্বাবধায়ক প্রবোধচন্দ্র দে এফ আর এইচ এস (লন্ডন), যেভাবে আলোচনা করেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। উক্ত প্রবন্ধটির অংশবিশেষ এখানে 'সঞ্জীবনী পত্রিকা' (২রা আষাঢ়, ১৩০২) থেকে প্রকাশিত হল।

। আম্র ।

আম্র যে কেবল বাংলাদেশেই জন্মিয়া থাকে তাহা নহে। শীতপ্রধান দেশ ব্যতীত ভারতের সর্বত্র ইহা জন্মে। ভারত মহাসাগরস্থিত সিংহল ও যবদ্বীপ এবং চীন ও ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি অনেক দেশে আম্র জন্মিয়া থাকে।

কথিত আছে যে, হনুমান যখন সীতা উদ্ধারার্থ লঙ্কায়—আধুনিক সিংহলে গমন করেন তখন তথাকার সুমিষ্ট আম্র-ফল ভক্ষণ করিয়া তাহার বীজ ভারতে নিক্ষেপ করায় এদেশে আম্রের উৎপত্তি হইয়াছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণে এ কথার উল্লেখ থাকিলেও সংস্কৃত বাল্মীকি রামায়ণে কিন্তু তাহার কোন উল্লেখ নাই। কৃত্তিবাসের কথায় নির্ভর করিলে রামায়ণের পূর্বে ভারতে আম্র ছিল না, বিশ্বাস করিতে হয়। কিন্তু বেদে আম্রের উল্লেখ থাকায় আমরা বলিতে পারি যে রামায়ণের অনেক পূর্ব হইতেই ভারতে আম্রগাছ জন্মিত। বেদ, রামায়ণ অপেক্ষা অনেক প্রাচীন গ্রন্থ; সুতরাং তাহাতে যখন আম্রের উল্লেখ দেখা যায় তখন বৈদিক সময়েও যে ভারতে আম্র ছিল এবং আর্য ঋষিগণ যে তাহা জানিতেন, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। অতএব আম্রের জন্য ভারতবর্ষ লঙ্কার নিকট ঋণী নহে।

ভারতের নানাস্থানে আম্র জন্মে কিন্তু তন্মধ্যে দাক্ষিণাত্যে বোম্বাই, মহীশূরে এবং বাঙ্গালার মধ্যে মালদহ ও মুর্শিদাবাদে যে সমুদায় আম্র জন্মে তাহাই উৎকৃষ্ট। মুর্শিদাবাদে যে নানারূপ উৎকৃষ্ট আম্র প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে তাহা অপর সাধারণে অবগত নহে। তাহার কারণ এই যে, ঐ স্থানের আম্রগাছ স্থানান্তরে সহজে যাইতে পারে না। বাগিচা সম্বন্ধে ইংরাজি অথবা বাংলা ভাষায় যে সমুদায় পুস্তক এ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কোনখানিতেই মুর্শিদাবাদের আম্রের বিষয়ে কোন উল্লেখ দেখা যায় না। এই জন্য সাধারণেও তাহার বিষয় জানেন না। 'ঢুনখালির আঁব' নামে যে আম্র কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে চালান হয়, তাহা খাস মুর্শিদাবাদের আম্র বটে কিন্তু তাদৃশ ভাল জাতীয় নহে। তাহার কারণ এই যে, স্থানীয় ধনী ও ভদ্রলোকদিগের যে সমুদায় বাগান আছে তাহার অপকৃষ্ট জাতীয় আম্রগুলিই কলিকাতার ফল-ব্যবসায়ীগণ খরিদ করিয়া আনিয়া বিক্রয় করে। বাগান মধ্যে ভাল ও নামজাদা গাছে যে আম্র থাকে, তাহা উদ্যানস্বামীগণ বিক্রয় না করিয়া স্ব স্ব ব্যবহারের জন্য রাখিয়া থাকেন। মালদহ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের অনেক উৎকৃষ্ট জাতীয় আম্র আজকাল অনেক স্থানে দেখা যায় এবং গাছ-ব্যবসায়ীগণও বিক্রয় করিয়া থাকেন, কিন্তু মুর্শিদাবাদের শতাধিক উৎকৃষ্ট জাতীয় আম্র মুর্শিদাবাদেই অবরুদ্ধ আছে।...মুর্শিদাবাসিগণ যদিও স্থানীয় আম্রকে একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, তথায় উহার যথাবিধি পাট হয় না এবং দেখা যায়, সকল গাছের সঠিক নাম নাই। একই গাছ অন্য বাগানে নামান্তরপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা উদ্যানস্বামীগণ ইচ্ছাপূর্বক না করিয়া থাকিলেও নামের প্রতি ঔদাসীন্য যে তাহার কারণ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আশার বিষয় এই যে, অনেক স্থানীয় শিক্ষিত ভদ্রলোক আজকাল নানা প্রকার স্থানীয় আম্রের একত্র আবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ...য় বন্ধু বাবু মহেশ নারায়ণ রায় তথাকার নানাবিধ উৎকৃষ্ট আম্রের গাছ সংগ্রহ করিয়া স্বীয় বাগানে রোপণ করিয়া কেবল যে নিজের উদ্যানকে মূল্যবান করিয়াছেন তাহা নহে তদ্দ্বারা তিনি মুর্শিদাবাদেরও একটি স্থায়ী উপকার করিয়াছেন। সাবেক সংগ্রহের মধ্যে নিজামতের 'হুমায়ুন-মঞ্জিল' ও 'রাজা-সাহেবের বাগান'* এবং কাটরাস্থিত রায় লছমীপত সিং বাহাদুরের বাগানকে উৎকৃষ্ট বলা যায়।

মুর্শিদাবাদের মধ্যে যে সকল আম্র আছে, তন্মধ্যে কালাপাহাড় কহিতুর রোশন বিমলী নাজিম-পছন্দ মিছরিকন্দ লম্বা ভাদুড়ে তোতা (হরিগঞ্জের) আনানাস এনায়েত-পছন্দ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ও প্রথম শ্রেণীর আম্র। একাল পর্যন্ত যে সকল আম্র তথায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা ব্যতীত আরো অনেক আম্র আছে যাহাদের যথাবিধি পাট হইলে উন্নত হইতে পারে এবং যত্ন করিলে রকমের সংখ্যাও বৃদ্ধি করিতে পারা যায়।

মুর্শিদাবাদে ও মালদহে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আম্রের বাগান আছে এবং প্রতি বৎসর এই দুই স্থানে যে আম্র জন্মায়, তাহার অধিকাংশ বিক্রয় হইয়া দেশান্তরে চালান হয়। এক মুর্শিদাবাদেই আধহের

লক্ষ টাকার আম প্রতি বৎসর বিক্রয় হয় এবং তাহা 'চুনাখালির আঁব' নামে বাজারে প্রচলিত।

বীজ, জোড়-কলম ও গুটি-কলমে আমের চারা হইয়া থাকে। বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিতে হইলে জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে ভাদ্র মাস মধ্যে যে-কোন সময়ে অল্প ছায়াবিশিষ্ট স্থানে হাপোরে বীজ রোপণ করিতে হয়। বীজকে আঁটিও বলিয়া থাকে। সুপক্ক ফলের আঁটি না হইলে ভাল চারা হয় না।...

হাপোর হইতে চারাকে স্থানান্তর করিবার কালে উহাকে 'খাসি' করিয়া দিলে গাছের আকার লম্বা না হইয়া বিস্তৃত হইয়া থাকে। চারার মূলে শিকড়কে কাটিয়া দেওয়াকে 'খাসি' করা কহে। লম্বা গাছ অপেক্ষা বিস্তৃতায়তনবিশিষ্ট গাছে অধিক ফল হয়. এই জন্য গাছকে শেষোক্ত প্রকারের আয়তনবিশিষ্ট করিতে হইলে চারাকে খাসি করিয়া দিতে হয়। খাসি করিবার কার্য্য অতি সূক্ষ্ম এজন্য কৃতি মালী ভিন্ন অনভিজ্ঞ বা শিক্ষানবিশের দ্বারা এই কার্য্য সুশৃংখলে নির্বাহিত হওয়া আশঙ্কার কথা।

জোড়-কলমের প্রণালী অতি সহজ হইলেও, সকলে কিন্তু সুচারুরূপে কলম বাঁধিতে পারে না। চারা বা গাছের শাখা ঈষৎ কাটিয়া বা চাঁচিয়া দুইটি বাঁধিয়া দিলেই জোড় কলমের কার্য্য সম্পন্ন হইল সত্য কিন্তু ইহার মধ্যে যে নিয়মগুলি আছে. তাহা জানা না থাকায় অধিকাংশ সময়ই উহাতে নানবিধ ব্যাঘাত ঘটে এবং সেই কাটা স্থান জুড়িয়া গেলেও তাহার স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা থাকে না।

আষাঢ় মাস হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত আমের জোড়-কলম বাঁধিলে চারা ও শাখায় জোড় লাগিতে অনেক বিলম্ব হয় না। পূরা বর্ষা থাকিলে এবং চারা ও শাখা কোমল থাকিলে ২০।২৫ দিনের মধ্যে জোড় লাগে. কিন্তু বর্ষার অভাব হইলে জোড়ের স্থানের রস শুষ্ক হইয়া যায়. সুতরাং জোড় লাগিতে বিলম্ব হয়। এতদ্ব্যতীত শাখা ও চারা যত স্থূলে হয় সেই অনুসারে জোড় লাগিতেও বিলম্ব হয়। চারা ও শাখার বয়ক্রম এক বৎসর হইলে আমের জোড়-কলম বাঁধিবার সুবিধা হয়।

•

বীজোৎপন্ন গাছে ৫।৬ বৎসরে এবং কলমের গাছে ৩ বৎসরে ফল ধরে। ইহার পূর্ব্বে যদি গাছে মুকুল আইসে, তাহা হইলে সেই মুকুল নষ্ট করিয়া দিলে ভাল হয়। তাহার কারণ এই যে নিতান্ত চারা গাছে ফল ধরিতে দিলে গাছ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

কার্ত্তিক মাসের প্রথম ভাগে আমগাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিতে হয় এবং সেই অবস্থায় দুই সপ্তাহ রাখিয়া তৎপরে উহাতে নূতন মাটি বা সার দিতে হইবে। গাছে মুকুল আসিলে, গোড়ায় প্রচুর পরিমাণে জল সেচন করা আবশ্যক। মাটি নিস্তেজ ও সারহীন হইলে অথবা মাটি রসহীন হইলে মুকুল ও ফল ঝরিয়া যায়। গাছের তলায় জঙ্গল জন্মিলে গাছ রুগ্ন হইয়া পড়ে এবং অতিশয় কম ফল ধরে। ইহাতে ফলের আস্বাদনও খারাপ হইয়া যায়।..বর্ষাকালে গাছের গোড়ায় আল বাঁধিয়া দিলে তলার মাটি অনেক দিবস সরস থাকে এবং বৃক্ষগণও ধীরে ধীরে সে রস আহরণ করিয়া সতেজ হইয়া থাকে।

আম পাকিতে আরম্ভ হইলে তাহা প্রতিদিন সংগ্রহ করিতে হইবে এবং গৃহমধ্যে মাচা বা তক্তায় রাখিয়া সুপক্ক করিতে হইবে। গাছ হইতে আম পাড়িবার জন্য 'জালতি' বা ঠুলি' ব্যবহার করা ভাল। বিনা 'জালতিতে' ফল পাড়িলে উহা মাটিতে পড়িয়া ছেঁচিয়া যায় এবং তাহাতে আমের আস্বাদন খারাপ হয়। গাছ হইতে আম সদ্য পাড়িয়া খাইলে তাদৃশ সুমিষ্ট লাগে না. বরং তাহাতে আটার গন্ধ বাহির হয়। সুপক্ক হইলেও অন্ততঃ ৯।১০ ঘণ্টা গৃহে না রাখিয়া খাওয়া উচিত নয়।

আম ফলে দুই জাতীয় পোকা জন্মে —এক জাতীয় কৃমিবৎ ও অন্য জাতীয় পাখাবিশিষ্ট। নদীয়া যশোহর প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলে উভয় প্রকারের এবং কলিকাতার দক্ষিণ রাজপুর, জয়নগর-মজিলপুর প্রভৃতি স্থানে শেষোক্ত প্রকারের কীট জন্মে। কৃমিবৎ পোকা আম মধ্যে কোথা হইতে জন্মে তাহা ঠিক করিয়া কেহ বলিতে পারে না. তবে কেহ কেহ অনুমান করেন যে গাছের গোড়ায় পোকা লাগিলে ফলও পোকাবিশিষ্ট হয়। গাছের গোড়ায় পোকা লাগিলে ফলে পোকা ধরে—এ-কথা প্রথমতঃ অসংগত বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহা ঠিক যে গাছ নিরোগ হইলে ফলও নিরোগ হয়। দ্বিতীয় প্রকার যে পোকার কথা বলা গিয়াছে, তাহা বাহির হইতে ফলে প্রবেশ করে। অনেক সময় দেখা যায় যে ফলের গাত্রে কোন ছিদ্র নাই, অথচ ভিতরে পোকা আছে। এই পোকা বারমাসই থাকে। বাগানের মধ্যে যে স্থানে জঞ্জাল বা ইষ্টকের কাঁড়ি থাকে. উহারা তাহারই মধ্যে বাস করে এবং আমগাছে মুকুল আসিলে ফুলের কোরকে প্রবেশ করে। ফুল গর্ভবতী হইলে সেই পোকা আর বাহিরে আসিতে না পারিয়া তাহারই মধ্যে বাস করে এবং ফল যত বাড়িতে থাকে সে কীট তত পরিপুষ্টি লাভ করে ও ফলের ভিতরে ডিম্ব প্রসব করিয়া স্বীয় জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এই জাতীয় পোকার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য কয়েকটি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। প্রথমতঃ উদ্যান মধ্যে কোন স্থানে জঙ্গল বা আবিস থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। দ্বিতীয়তঃ, গাছে যখন মুকুল হয় তখন হইতে বাগানের মধ্যে গাছের তলায় স্থানে স্থানে আগুন ও গন্ধক জ্বালাইয়া দিতে হয়। এতদ্ব্যতীত প্রকৃষ্ট কোন উপায় দেখা যায় না।

মুর্শিদাবাদের বিশেষ বিশেষ আমের তালিকা

অমৃতভোগ, অনুপান বা অনুপম আবুসরা (নাগিনাবাগ), আলি-পসন্দ, আলিবকস, আতা-পসন্দ, আনানাস অফিঙ্গা আষাঢ়িয়া আমীর-পসন্দ আসমানতারা আমরুদ আনারদানা আণ্ডনা-বাহার ইমামবকস উমদা-খাসা এনায়েত-পসন্দ এলাচদানা কালাপাহাড় কাকাতুয়া কহিতুর কাউগুলিয়া কালুয়া কাকুচিয়া করঞ্জা কালামেঘ কমকারিয়া কুদ্রকখাসা কাঞ্চন-কষা খীসাপাতি খরমুজা খাজা গোলাব-জামন গোরজিৎ গুলেকন্দ খানম-পসন্দ গরমামর্দ্দন গোরিয়া গোলাবী গঙ্গাপ্রসাদ চাপিট চারখাসা চরকীচাপা চুণনী চাম্পা টিয়াকাটা ভোত (হরিগঞ্জের) তুলাম তোতামুখী তুলখাসা তরমুজা তরদ-পসন্দ দাউদ-ভোগ নাজুক-বদন নাজির-পসন্দ নওনেছ্‌জ (চুনাখালির) নওরাম-পসন্দ পুলবলিয়া পিয়ারাফুলি পুতলা-পসন্দ পিপাড়োখাসা (লালকুঠি) পেপিয়া পাতা খোদাবকস ফারদোস-পসন্দ বকসা-জাল বাদসা-পসন্দ বারমেসে বাতাসা বাতাসী বেলা বনারনী বেগম-পসন্দ বিমলী ভবানী-চৌরস মিয়া-পসন্দ (রৈইসবাগ) মতিয়া মর্ত্তমান মজলিস-রওসন মোসাহেব মোলামজাম মোহন-ভোগ মিঠি মাকি-পসন্দ মির্জারকজ মধু-বিগাস মাদ্রাজী ময়লা মনিয়া-খাসা মোকসরি মিরজা-পসন্দ রানী-পসন্দ রাহুপেটী রামতনুখাসা রৈইস-পসন্দ (রৈইসবাগ) রতনকেওয়া রামগতি-খাসা লাড়ুয়া লাবাদ শিপিয়া শিরাদার শরদা সাগা সাদেক-পসন্দ সিন্দুরিয়া সারেঙ্গা সবুজা সান্তালু সোর সাহেবের বোম্বাই সা-দৌলা সমবতী সুলতান-পসন্দ সা-তাঁত সোকাটিয়া হীরালাল-বোম্বাই হোসেন-বকস হোজিবকসর হাসনুয়া-দুলদুল।

•

সকল আমগাছই এক সময়ে ফল ধারণ করে না বা এক সময়ে ফল পাকিয়া উঠে না। কোন জাতি বৈশাখে, কোন জাতি জ্যৈষ্ঠে কোন জাতি আষাঢ়ে, কোন জাতি শ্রাবণে আবার কোন জাতি ভাদ্রে পাকিয়া থাকে। বৈশাখ মাসে যে সমুদয় আম পাকিয়া উঠে, তাহাদিগকে এক শ্রেণী, জ্যৈষ্ঠ মাসে যে সকল আম পাকিয়া উঠে তাহাদিগকে এক শ্রেণী, এইরূপে যে যে আম যে যে মাসে পাকিয়া থাকে তাহা পূর্ব্বেই জানিয়া তাহাদিগকে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করিয়া রোপণ করিলে এক সময়েই সকল জাতীয় গাছের পাট করিতে হয় না। জাতি নির্বিশেষে সকলগুলির এক সময়ে সমান পাট করিলে যে জাতির ফলের সময় উপস্থিত তাহার উপকার হয় কিন্তু অপর জাতির তাহাতে অনিষ্ট হয়।

* কলিকাতাস্থ শোভাবাজারের রাজা প্রসন্ন-নারায়ণ দেব বাহাদুর পূর্ব্বে নিজামৎ-সরকারের দেওয়ান ছিলেন। সচরাচর লোকে তাঁহাকে রাজাসাহেব বলিত। এই বাগান তাঁহার ছিল এজন্য উহাকে সকলে রাজাসাহেবের বাগান কহিত।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

'অঘটন আজো ঘটে'—হঠাৎ অফিসপাড়ায় এলো ভীষণ বর্ষা. রাস্তায় অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে ভিজলো নীলিমা আচমকা এসে দাঁড়ালো একটা গাড়ি তার সামনে। সাহেবী পোশাক পরা একজন বয়স্ক ভদ্রলোক (সব্যসাচী) পরিচিত আত্মীয়ের মতোই নীলিমাকে লক্ষ্য করে গাড়ীর দরজা খুলে দিলেন। দ্বিধা করেও বৃষ্টির ভয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠলো নীলিমা. আর বেচারা রঞ্জন ও'র জন্যে অপেক্ষা করে ফিরে গেল। নীলিমা পরে রঞ্জনকে সব্যসাচী ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলাপ থেকে গাড়ীতে লিফট পাওয়া সব কিছুই খুলে বললো। এরপর সে তার ফেলে আসা সানগ্লাস আনতে গিয়ে সব্যসাচীবাবুর বাড়িতে যে সব কাণ্ডকারখানা দেখে এল সে এক চাঞ্চল্যকর অভিজ্ঞতা। সব কিছুই রঞ্জনকে বলবার জন্যে নীলিমা উন্মুখ হয়ে রইলো। কিন্তু রঞ্জনকে পাওয়া যায় না। সে সব সময় থিয়েটার নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

রঞ্জনের বন্ধু শুভেন্দুর মাধ্যমেই আলাপ হোল ভদ্রমহিলার সঙ্গে। তিনি থিয়েটারেরই ব্যাপারে রঞ্জনের মতো একজন তরুণকে চেয়েছিলেন নায়কের ভূমিকায়। কিন্তু রঞ্জন বুঝতে পারলো না, কেন এই ভদ্রমহিলা (অনিন্দিতা) এক বড় ফ্ল্যাট বাড়ীতে দোতলায় একা থাকেন।।

কাজল গুপ্ত

একই বাড়ীতে একতলায় থাকেন শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারী সব্যসাচী ভট্টাচার্য। তিনি এই ভদ্রমহিলার খামখেয়ালিপনাকে প্রশ্রয় দিতে না পেরে অনেক সময় রুখে যান তাঁর অতি আধুনিকতা চালচলনকে বাধা দেবার জন্যে।

ক্রমশ রঞ্জনের বন্ধু শুভেন্দুর মাধ্যমে উপরের তলার অনিন্দিতা দেবী এবং নিচেরতলায় সব্যসাচী ভট্টাচার্যের মধ্যেকার সম্পর্কের জট খুলে ফেলা হল। ও'রা এক সময়ে স্বামী ও স্ত্রী ছিলেন আর ছিল ও'দের একটি ছেলে—যে বিদেশের পথে পাড়ি দেবার সময় বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছে। সব্যসাচীবাবু নিজের স্ত্রীর স্বেচ্ছাচারিতা এবং 'আধুনিকতা'কে বরদাস্ত না করে তাঁকে ডিভোর্স করেছিলেন। কিন্তু তবুও একই ফ্ল্যাটে তাঁরা নিজেদের মত ও পথ নিয়ে মেতে থাকে। আর তাঁদের দুজনের পাল্লায় পড়ে নীলিমা এবং রঞ্জন দুজনকে ভুল বোঝে, ও'দের মধ্যেকার ভালবাসার সম্পর্কেও ফাটল ধরে। আবার অন্যদিকে অনিন্দিতা দেবীর সহানুভূতি পেয়ে ভদ্রবেশী এক অসৎ ব্যক্তি তাঁর স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তাঁকে ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা করে এবং পুলিশে মিথ্যা ডায়েরী করে যে উনি মেয়েদের নিয়ে নাচ ও গানের স্কুল করবার নামে অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করছেন। ফলে পুলিশ আসে। এবং সব্যসাচীবাবু নীলিমা এবং রঞ্জন সবাইকেই পুলিশ শাসিয়ে যায়—এইসব ভণ্ডামি ও অসৎবৃত্তি বন্ধ করবার জন্যে।

অবশেষে রঞ্জনের বন্ধু শুভেন্দু এবং রঞ্জনের অক্লান্ত চেষ্টায় সব কিছু ভালোয় ভালোয় মিটে যায়। সব্যসাচীবাবুর সঙ্গে অনিন্দিতা দেবীর মধ্যেকার বিরোধ মিটিয়ে ও'রা আবার পুনর্বিবাহ করতে রাজী হন। আর নীলিমা এবং রঞ্জনও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সকলের মুখে হাসি ফোটে চারিদিকে আনন্দ আর উৎসবের বান বয়ে যায়।

খ্যাতনামা সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শেখর চট্টোপাধ্যায়। ছবিটির সঙ্গীতের দায়িত্ব নিয়েছেন সুধীন দাশগুপ্ত।

পরিচালক দীনেন গুপ্ত তাঁর বলিষ্ঠ এবং বাস্তব দৃষ্টি-ভঙ্গীর মাধ্যমে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর হাসির ছবি উপহার দেবার চেষ্টা করেছেন। আলোকচিত্রগ্রহণে—বিশেষ করে ফ্লাশব্যাক—বিভিন্নরূপে তিনি যেভাবে নায়ক এবং নায়িকাকে উপস্থিত করেছেন সেই সব দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ খুবই প্রশংসনীয়। শিল্প-নির্দেশনা এবং সম্পাদনার কাজ পরিচ্ছন্ন। সংগীতপরিচালক কয়েকটি গানের সুর রচনায় তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

অভিনয়ে নীলিমার ভূমিকায় সুমিত্রা, রঞ্জনের ভূমিকায় সৌমিত্র এবং সব্যসাচীর ভূমিকায় বসন্ত চৌধুরী ভাল অভিনয় করবার চেষ্টা করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় কাজল গুপ্ত (অনিন্দিতা), অনুপকুমার (শুভেন্দু), রবি ঘোষ, শমিতা বিশ্বাস, চিন্ময় রায়, রত্না ঘোষাল এবং শেখর চট্টোপাধ্যায় চিত্রনাট্যের দাবী মিটিয়েছেন।

সোনালী প্রোডাকসনের এই ছবিটির জনপ্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা।

—চিত্রদূত

অনুপকুমার

সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়

ওঁরা বলেন

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

ঃ সারা পৃথিবী জুড়ে যে ঘটনাটা আজ সকলের মুখে মুখে সেই পারমাণবিক বিস্ফোরণ সম্পর্কে আপনি কিছু ভাবছেন কি?

—আমি এ ব্যাপারটাকে খুব একটা ইমপরট্যান্স দিচ্ছি না, অবশ্য এটাকে যদি দেশের উন্নতির কাজে লাগানো হয়, তাহলে আলাদা কথা। কিন্তু আমাদের দেশের ইকনমি যে গতিতে যে দিকে যাচ্ছে তাকে অ্যাটমিক শক্তি কি রোধ করতে পারবে? কোনো দেশের ইকনমি বিচার করা যায় সেখানকার ওয়েজেস ও প্রোডাক্ট দিয়ে। কোটি কোটি লোকের বেকারত্ব এবং ক্রমবর্ধমান ইনফ্লেশন আটকাতে অ্যাটমিক শক্তির খুব একটা দান আছে বলে আমার মনে হয় না। তার আগে অনেক কিছু করার আছে।

ঃ কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে—এই স্লোগান সম্পর্কে আপনি কি বলেন?

—স্বপ্ন দেখার মত অনেকটা, ইসপস ফেবলস্-এর সেই বাসনওয়ালার গল্পটা মনে পড়ে। 'ভয় হয় কবে না লাথি মারিয়া নিজের একমাত্র মূলধন বাসন-গুলিই না ভাঙিয়া ফেলি।'

ঃ পাহাড় না সমুদ্র, কোনটা বেশী ভালো লাগে আপনার এবং কেন?

—পাহাড় বেশী ভালো লাগে। সিমলা-দার্জিলিং - কাশ্মীরের পাহাড় নয়। পাহাড় দেখতে হলে আরও ইন্টিরিয়রে যাওয়া দরকার। পায়ে হাঁটা পথে তিন চার দিন গেলেই তবে পাহাড়ের সৌন্দর্য যে কি মনোরম তা ফিল করা যায়। আমি 'বিগলিত করুণা' ছবির স্যুটিং এর সময় গিয়েছিলাম গোমুখ পর্যন্ত। এখনও সময় সুযোগ পেলে হিমালয়ের দিকেই চলে যাই। পাহাড়ের আসল সৌন্দর্য তার শান্ত সমাহিত গাম্ভীর্যে যাকে ঠিক ভাষা দিয়ে বোঝাতে পারব না আমি।

ঃ আপনি তো ডাক্তার মানুষ, বলুন তো আমাদের দেশের এই ট্রপিকাল আব-হাওয়ায় কোন্ কোন্ রোগ কখনই সারবে না?

—ডিসেন্ট্রি মানে আমাশয়, আমার নিজেরই আছে ভাই। ওষুধপত্তর খেলে কিছুদিন চাপা থাকে, আবার হয়। আসলে ব্যাপারটা হোল—আমাদের এখানকার, বিশেষ করে কলকাতার জলে এমন কতগুলো জিনিস আছে যেগুলো আমাশয় হবার পক্ষে খুবই কার্যকরী। সুতরাং জল খেলেই আমাশয় নিশ্চয়ই। ডাক্তারী বিদ্যে আর কি করবে?

ঃ 'ডাক্তারবাবুরা গ্রামে চলুন'—এ সম্পর্কে একজন ডাক্তার হিসাবে আপনার কি স্ট্যান্ড?

—ভারতবর্ষ গ্রামপ্রধান দেশ, ডাক্তার-বাবুরা নিশ্চয়ই গ্রামে যাবেন। কিন্তু তারও আগে দরকার আধুনিক চিকিৎসার সকল সাজ-সরঞ্জাম ওষুধপত্র গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দেওয়া। নইলে ডাক্তারবাবুরা গ্রামে গিয়ে কি করতে পারেন? রোগীদের তো আর জলপড়া মাদুলী দিয়ে ভালো করতে পারবেন না।

ঃ কলকাতার পেশাদারী থিয়েটারের অগ্রগতি সম্পর্কে আপনি কি খুব আশাবাদী?

—না, মোটেই না। কলকাতার পাবলিক বোর্ডে নাটক নিয়ে কিছু হচ্ছে না, হবার সুযোগও নেই। যা হচ্ছে তা সবই অ্যামেচার গ্রুপগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

ঃ তাহলে আপনি স্টেজে যোগ দিলেন কেন?

—প্রথমত স্টেজ আমার ভালো লাগে। দ্বিতীয়ত দেখলাম চরিত্রটাও বেশ ভালো। তৃতীয়ত মাস গেলে নিশ্চিত কিছু আয়ও হবে।

ঃ আপনি কি নিজেকে ধার্মিক মনে করেন?

—ধর্ম কথার অর্থ যা ধারণ করা হয়—তাই তো! আমার ধর্ম অভিনয় করা সেদিক থেকে আমি আপ্রাণ ধার্মিক। কিন্তু

ধর্ম বলতে যদি হিন্দু ধর্ম-মুসলমান ধর্ম ইত্যাদিকে বোঝান হয়ে থাকে, বাকি সব কর্তব্য ব্যতিরেকে সেই অর্থে অবশ্যই আমি ধার্মিক নই।

ঃ ভারত তো প্রথম টেস্টে ইংল্যান্ডের কাছে হেরে গেল, পরবর্তী খেলাগুলোর ফলাফল সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?

—দেখো ভাই, দল হিসাবে কিন্তু ভারত ইংল্যান্ডের তুলনায় খুব একটা নিকৃষ্ট নয়। তবে গত সফরে ভারতে যে ইংল্যান্ডের টিম এসেছিল তার চাইতে এবার ইংল্যান্ড অনেক বেশী শক্তিশালী। তাছাড়া আমাদের স্পিনাররা কেউই প্রায় কিছুই করতে পারছেন না, আবহাওয়াও অনুকূল নয়। এ অবস্থার পরিবর্তন না হলে পরের দুটো টেস্টে জয়ের আশা অল্পই!

ঃ আসছে পুজোয় টি ভি তো কলকাতায় এসে গেল মনে হচ্ছে! বাংলা ছবির অবস্থা কি আরও অবর্ণনীয় হবে না? সব দেশেই যা হয়েছে শোনা যায়—টি ভির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে সিনেমা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। এখানে কি তার ব্যতিক্রম হতে পারে?

—এ ব্যাপারে আমার পাল্টা প্রশ্ন আছে। টি ভি তো আসছে! সেই টি ভি চলবে কিসে—কেরোসিনে না গোবর গ্যাসে? অতএব আমরা যেখানে আছি সেখানেই থাকছি। এগোচ্ছি না, পেছোচ্ছিও না। তাছাড়া মুষ্টিমেয় যে ক'জন লোকের টি ভি কিনে ঘর সাজাবার ক্ষমতা আছে তাঁরা বাংলা ছবির দর্শক নন।

ঃ ডাক্তারীকে পেশা হিসাবে নিলে আপনি যে আর্থিক প্রতিষ্ঠা পেতেন, অভিনয় করেও কি সেই একই রকম স্বচ্ছলতা এসেছে আপনার? এবং আফশোষ করেন কি সেজন্য?

—না, তা নিশ্চয়ই আসে নি। তবে আর্থিক ব্যাপারে আমার চাহিদা খুবই কম। খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারলেই হোল। এখনও অব্দি তার অভাব হয় নি। তাছাড়া আমি তো জেনেশুনেই এসেছি এ লাইনে। সুতরাং আফশোষ করব কেন?

ঃ হাল ফ্যাশনের পোষাক পরিচ্ছদ কি আপনি পছন্দ করেন?

—ব্যক্তিগতভাবে পোষাক নিয়ে সম্পর্কে আমার বলার কিছু নেই। তবে এইসব মড্ ড্রেসগুলো নিয়ে কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় যে রকম বাহারী রঙিন আলোচনা হয় তা থেকে এই পোষাক আবিষ্কারক এবং পত্রিকাওলাদের সম্পর্কে দুটো ধারণা আমি করে নিয়েছি। এক নম্বর—পয়সা কামানোর উদ্দেশ্যে এগুলো করা হয়, দু নম্বর—খুব সমাজকে বিপথে চালিত করার জন্যও বটে। আত্মিক উন্নতিই যদি কিছু না হোল তাহলে মড্ ড্রেস পরে পার্ক স্ট্রীটের বিপথগামী বাউন্ডুলে দিশী হিপি ছাড়া আর কি হতে পারি আমরা?

ঃ পাকিস্থানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কি কোনদিনই বদলাবে না—আপনার কি মনে হয়?

—ভারতের প্রতি পাকিস্থানের অ্যাটিচ্যুড কখনই ভালো হবে না। কারণ এই দুটো দেশেরই জন্ম হয়েছিল দেশী বিদেশী রাজনৈতিক শক্তির লাভ-লোকসান আর ক্ষমতার হিসেব নিয়ে। সুতরাং উভয় দেশের মধ্যে শান্তি প্রায় অসম্ভব। একমাত্র তখনই সম্ভব যখন দুটো দেশের পলিটিক্যাল স্বার্থ এক ইডিওলজির তলায় একত্রিত হবে, নচেৎ নয়।

ঃ বাংলা ছবিতে শিল্পীদের মধ্যে পেশাগত কোনো প্রতিযোগিতা আছে কি?

—পেশাগতভাবে প্রতিযোগিতা কোন্ ক্ষেত্রে নেই? সব জায়গাতেই আছে। নিজেকে এস্ট্যাবলিস করার প্রতিযোগিতা তো থাকবেই। তবে আমাদের এখানে প্রতিযোগিতায় কোনো নোংরামি নেই, অন্তত পক্ষে আমার তেমন কোনো অভিজ্ঞতা হয় নি।

—নির্মল ধর

পিনাকী মুখোপাধ্যায়/মলিনা দেবী/দীপঙ্কর দে

সেদিন সকাল থেকে আকাশের মুখ-ভার। মেঘলা গাম্ভীর। আর সেই সঙ্গে ভ্যাপসা গরম। সেদিনই একটা ছবির আউটডোর শুটিং হবার কথা ছিল কলকাতার হর্টিকালচার গার্ডেনে। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে ইউনিটের সবাই লোকেশানে এসে পৌঁছেছিল। আকাশের ওই অবস্থা দেখে তো সবার মাথায় হাত। ক্রমে শিল্পীরাও এলেন লোকেশানে। এখন কী করা? বিব্রত পরিচালক বললেন, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখা যাক। সূর্য-দেব যদি সদয় হন তো ভালই নইলে এই ডাল আবহাওয়াতেই আমায় শুটিং করতে হবে। আর কোন বিকল্প নেই—

অপর্ণা সেন তখন দীপঙ্কর দে-কে বললেন—আসুন, ওই গাছের তলায় বসে কিছুক্ষণ গল্প করা যাক—

দীপঙ্কর বললেন, মন্দ নয়।

গাছের তলায় মোড়া পেতে ও'রা মুখোমুখি বসলেন গল্প-গুজব করতে। দেখাদেখি আরও কয়েকজন এগিয়ে এলেন।

দীপঙ্কর দে সম্প্রতি ফিল্মে এসেছেন। আর এই অল্প সময়ের মধ্যে নিজের ব্যবহারের গুণে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। ফিল্মে যোগ দেবার আগে উনি কলকাতার এক নামজাদা বিজ্ঞাপন সংস্থার বেশ ভাল পজিশনে একটা চাকরী করতেন। কিন্তু দু' নৌকায় পা রাখা সম্ভব নয় বলেই দীপঙ্কর চাকরীটা ছেড়েছেন, ফিল্মটা ধরেছেন।

আর এমনই যোগাযোগ, সেইদিনই দীপঙ্করের প্রথম ছবিটি রিলিজ হওয়ার কথা। বেচারি, পাশ থেকে কে যেন বললে, ভাবনা-চিন্তায় ওর রাতের ঘুম গেছে। দর্শকরা যদি ও'র অভিনয় পছন্দ করে তো অলরাইট নইলে অবস্থা কি দাঁড়াবে, দীপঙ্করের আগাম দুর্ভাবনা। খুবই স্বাভাবিক।

—কি ভাবছেন? হঠাৎ অপর্ণার প্রশ্ন।

—উঁ?...না না, কিছু না।

রিলিজ ছবিটির কথা অপর্ণা সম্ভবত জানতেন। সহাস্যে প্রশ্ন করলেন—আজ রিলিজ?

সামান্য ইতস্ততঃ ভঙ্গী দীপঙ্করের—হ্যাঁ হ্যাঁ আজই রিলিজ—।

—উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক।

—থ্যাংক য়্যু অপর্ণা।

—ভেবে আর কি হবে।...যা হবার তা হবেই।

দীপঙ্করের ... হেসে সায়।—হ্যাঁ, তা তো বটে

—তাছাড়া আপনার রিস্ক আর কি? ব্যাচেলার মানুষ—

এতক্ষণে হাসির বোমাটা ফাটল। সবাই হৈ-হৈ করে উঠলেন।

অপর্ণার যেন সামান্য অপ্রস্তুত ভঙ্গী—না না, ব্যাপারটা কি? এতে হাসির ব্যাপারটা কোথায়?

হাসিটা সুনু রায়চৌধুরীর-ই বেশী। উনিও কনফার্মড ব্যাচেলার। বললেন, তোমায় কে বলেছে ও বিয়ে করেনি?

পরিচালক পিনাকী মুখার্জি বললেন—আরে দীপঙ্কর রীতিমত বিবাহিত। তোমার কাছে বোধহয় চেপে গেছে...।

দীপঙ্কর ভীষণ লজ্জিত। বিব্রত। দু' হাত তুলে বললেন—না না পানুদা, এটা লেগ পুলিং হচ্ছে। আমি আবার কবে চেপে গেলাম?

অপর্ণা সুরসিকা। এসব শুনে মিটি-মিটি হাসি।—গেছেনই তো চেপে। কই, কবে বললেন আপনি বিয়ে করেছেন। উল্টে সব সময় একটা ভঙ্গী রেখেছেন—বিয়ে-টিয়ে করেননি। ইস্, এখন কী হবে?

পিনাকী মুখার্জি কৃত্রিম আশাভঙ্গে ঠাঁশ ঠাশ মাথা চাপড়ালেন—বটেই তো, এ রীতিমত হার্ট-ব্রেকিং সংবাদ। কত হিরোইন তোমায় দেখে আবার নতুন আশায় বুক বেঁধেছিল, তাদের এখন কী হবে ভাই?

দীপঙ্কর হাসবে না কাঁদবে স্থির করতে পারছিল না।

বললাম—যাকগে যা হবার হয়ে গেছে। তা তোমার শ্বশুরবাড়ী কোথায় ভাই?

দীপঙ্কর আর মুখই খুলতে চায় না। সবাই পীড়াপীড়ি করতে বললে, ইয়ে দিল্লীতে।

—বটে বটে। তা গিন্নী বাঙালী তো?

—উঁহু।

আতঙ্কিত প্রশ্ন—তাহলে?

—মহারাষ্ট্রীয়ান—

—লাভ?

আর দীপঙ্কর সহজে মুখ খুলতে চায় না। কিন্তু অপর্ণা সেন ওঁর নাম। ইচ্ছে করে যখন খুনসুটি করেন তখন ওঁর জুড়ি খুঁজে পাওয়া ভার। সহাস্যে বললেন—আরে বলুন-ই না। এখন তো আর কেউ ব্যাগড়া দিচ্ছে না। আমিও তো প্রেম করে বিয়ে করেছি। নাথিং আনইউজুয়াল—

অগত্যা অগত্যা একটা সময় বলতেই হয়। মজার আড্ডা। সুনন্দা তারই মধ্যে গাড়ি পাঠিয়ে কয়েক কাপ কফি আনিয়ে ফেলেছেন। এক কাপ দীপঙ্করের হাতে ধরিয়ে—আরে নাও ভাই নাও, কেন রাগ করছো। আর দাও তোমার একটা সিগ্রেট দাও। এ-রকম একটা আড্ডায় কফি-টফি না হলে আবার মানায় না...

দীপঙ্কর যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ছাত্র। এম-এ ডিগ্রী করে সোজা দিল্লী চলে গিয়েছিল একটা চাকরী করতে। সেখানে ওর সঙ্গে নায়িকার মোলাকাৎ।

—তোমার স্কুটার ছিল?

দীপঙ্কর অবাক। স্কুটার? কেন, স্কুটার কেন থাকতে হবে?

পিনাকী মুখার্জি সাংঘাতিক একটা নিরীহ মুখভঙ্গী করে বললেন—দিল্লীর প্রেমে শুনেছি স্কুটার নাকি থাকতেই হয়। মানে নায়িকাকে নিয়ে ফতেপুর সিক্রি ট্রাভেল-ইন-ট্যাকসি শুনেছি বেশ কস্টলী।

দীপঙ্কর হেসে অস্থির—উদ্ভট কথা। একেবারে উদ্ভট। তবে আমার গাড়ি ছিল —অফিসের।

অফিসের কাজে দীপঙ্করকে প্রায়ই দিল্লীর আর একটা অফিসে যেতে হতো বাপিট ওখানে—

আর একটা সোরগোল—গিন্নীর নাম—

কাট-টু দীপঙ্কর, ক্রুদ্ধ ভঙ্গী—হ্যাঁ, বাপিট—

—আহা চটে যাচ্ছেন কেন?

সুনন্দা সমবেদনায় একখানা হয়ে তৎক্ষণাৎ—আহা বেচারি ক্রমে একটা রোমান্টিক পরিণতির দিকে যাচ্ছে, ওকে মাঝখানে বাধা দেওয়া কেন বাপু?

অপর্ণা ফিক ফিক।—যতসব বেরসিক। হ্যাঁ তারপর—

দীপঙ্কর এখন আর স্মরণ করতেই পারল না যে, কে আগে অ্যাগ্রেস করেছিল। একবার বললে মনে হচ্ছে যেন বাপিট-ই, না না না, ভুল হচ্ছে আমি আমিই; সেকি আজকের কথা, সরি আমার ঠিক স্পষ্ট মনে পড়ছে না—

অপর্ণা হেসে কুটিপাটি—নাঃ, আপনি কিন্তু এড়িয়ে যাচ্ছেন। এসব দিনের কথা কেউ কি কখনও ভুলতে পারে? মানুষের জীবনে একবারই আসে। আর সারাজীবন আমাদের স্মৃতিতে সেই আনন্দের বিষাদের উত্তাপের মুহূর্তগুলি থেকেই যায়......

হঠাৎ কি যেন হলো, দীপঙ্কর সামনের দিকে লম্বা করে তাকাল। মুখে মৃদু-মধুর হাসি। কিছু বলল না। আসলে আর কিছু ওর বলারও ছিল না। পিনাকী মুখার্জি, সুনীল রায়চৌধুরী তখন পড়লেন সহকারী পরিচালক শ্যামল চক্রবর্তীকে নিয়ে। শ্যামলের বিয়ের দিন দ্রুত ঘনিয়ে আসছে। বেচারি বাইরে যতই স্মার্টনেস দেখাক—অপর্ণা বললেন আসলে শ্যামল কিন্তু ভেতরে-ভেতরে প্রচণ্ড নার্ভাস। সুখের তীব্র টানাপোড়েন সবই ওই নার্ভের মধ্যে......

* * *

মলিনা দেবীর সঙ্গে আজকাল আমাদের দেখা খুবই কম হয়। কিন্তু দেখা হলে মুহূর্তে আন্তরিকতার যে স্নিগ্ধ আবহাওয়া উনি অনায়াসে সৃষ্টি করেন, তার জন্যে আমরা অনেকেই ওঁর কাছে কৃতজ্ঞ। এই লেখা প্রসঙ্গে ওঁর কথা মনে হল। আমি ওঁর সঙ্গে ইদানীং কাজ করেছি 'বনপলাশীর পদাবলী' ছবিতে। এই বয়সে এত পরিশ্রম যে উনি কিভাবে করেন বুঝতে পারি না। প্রায় প্রতি রাত্রে-ই ওঁর থিয়েটার প্রোগ্রাম থেকে থাকে। সারারাত জেগে উনি এসেছেন ছবির আউটডোর শুটিং করতে, সবাই অবাক। কয়েকদিন পর পর এই ব্যাপারটা হতে উত্তমকুমার একদিন বললেন আপনি অসম্ভবকে সম্ভব করলেন, এটা আমি কোনদিন ভুলব না।

'মহাপ্রস্থানের পথে' তখন সিনেমায় উঠছে। উনি ছবির সন্ন্যাসিনীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন। পরে জানা গেল—একটা চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করলেন উনি। কেউ সম্ভবত এই চরিত্রে মলিনা দেবীর নির্বাচনকে কটাক্ষ করে থাকবে। সেটা ওঁর কানে পৌঁছেছিল। আর যায় কোথা। যে-কদিন শুটিং করেছেন—দিনে একবার মাত্র স্বপাক আহার হবিষ্যি করেছেন, রাত্রে শুয়েছেন বিচালির ওপর কম্বল বিছিয়ে, মাথায় তেলের অভাবে চুল রুক্ষ হয়েছে জট পাকিয়েছে। পরেছেন গৈরিক বসন। থেকেছেন খালি-পা। হয়নি চরিত্র? আলবৎ হয়েছে। ছবি রিলিজ হবার পর ওঁর অভিনয় দেখে সবাই চমকে গেছেন। তারপর 'রানী রাসমণি' ছবি। কি অসাধারণ ব্যক্তিত্বপূর্ণ চরিত্র। মলিনা দেবী দেখুন সে-চরিত্রের কি মহিয়সী রূপ দিয়েছেন পর্দায়। অন্তরালে ঘটেছে : উনি শুটিং করতে এসেছেন, প্রোডাকশন ম্যানেজার জানতে এসেছিল আজ লাঞ্চে উনি কি খাবেন, মলিনা দেবী নিঃশব্দে মাথা নেড়েছেন, আজ উপবাস। তারপর যতদিন ও-ছবির শুটিং করেছেন প্রতিদিনই উপোস, প্রতিদিন পুজো-অর্চনা। প্রচণ্ড গরমে একফোটা জল পর্যন্ত খাননি। প্রশ্ন করতে আমায় একদিন বললেন, ভাই, অভিনয়টা আমার কাছে সাধনা।

আর একটা ঘটনা স্মরণ হচ্ছে, পার্থপ্রতিম চৌধুরীর 'জাহ্নবী' ছবির শুটিং হচ্ছে। সেদিন ক্যামেরার সামনে অভিনয় করছিলেন শর্মিলা ঠাকুর আর মলিনা দেবী। নিজের হতকুচ্ছিত মেয়ে ঘেঁটু (ফলে, যে-ফুলে শিবপুজো হয় না). কোথায় কি একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে এসেছে না কি টাকা চুরি-ফুরি একটা কিছু ঘটেছে। সবার ধারণা—ওটা ঘেঁটুরই কীর্তি। ঘেঁটু যেই মায়ের মুখোমুখি হয়েছে আর যায় কোথা, রাগে দুঃখে ক্ষোভে মা তখন থর-থর করে কাঁপছেন কারণ যে সন্তানকে কেউ চায় না, সেই ঘেঁটুকে মা সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন আজ তার বিশ্বাস চলে গেছে—এগিয়ে এসে তিনি ঠাশ-ঠাশ করে মেয়ের গালে দুটি চড় মেরে কান্নায় ভেঙে পড়ছেন—এই হচ্ছে সমগ্র দৃশ্যটা।

রিহার্সাল হলো। মলিনা দেবী তো উড়িয়ে দিলেন। তবে চড়টা তখন মারলেন না—ওটা টেকের সময় করব। শর্মিলা বললেন, আপনি কিন্তু খুব জোরে মারবেন। তা নঃ হলে আমার রি-অ্যাকশানটা কিন্তু ভাল হবে না...। মলিনা দেবী সহাস্যে ঘাড় নেড়েছিলেন।

টেক।

থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে মা এগিয়ে আসছেন, শেষ পর্যন্ত তুই চোর হলি চোর! ছি ছি ছি আজ আমি তোকে —আমি আমি মেরে ফেলব—

ঘেঁটু বলছে—মা তুমি বিশ্বাস কর আমি চুরি করিনি—

মা এগোচ্ছেন—ওরা বলেছে তুই চোর —তুই চোর, তোকে আমি...মা সপাটে মারবেন বলে হাত তুলেছেন। ঘেঁটু আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করছে না। এই মা তাকে মারবে এটা সে বিশ্বাস করতে পারছে না—

হঠাৎ কি হলো। উদ্যত হাত নেমে যাচ্ছে, মলিনা দেবী কাঁদতে কাঁদতে ফ্লোরে বসে পড়ছেন। চারিদিকে একটা কনফিউশ্যান। কাট কাট। ক্যামেরা বন্ধ হলো। আলো নিভে গেল। শর্মিলা বিব্রত। পরিচালক অপ্রস্তুত। মলিনা দেবী কাঁদতে কাঁদতে বলছেন—না, আমি রিনকুকে কিছুতেই চড় মারতে পারব না, কিছুতেই না......

জানতে চাওয়া হয়েছিল, কেন কি হলো? উনি ভগ্নকণ্ঠে জানালেন, চড় মারতে গিয়ে আমি আমার মেয়ের মুখ দেখছি ওখানে। আমি পারব না।

—রঞ্জন মজুমদার

বিদেশী ছবি

অভাসিটি

অডাসিটি-র দৃশ্য

এ সপ্তাহের অন্যতম আকর্ষণ রাশিয়ান ছবি 'অডাসিটি' গতকাল থেকে এলিট চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধভিত্তিক কাহিনী-টিতে দেখানো হয়েছে, কিভাবে রাশিয়ার ভূখণ্ডে একদল স্বদেশপ্রেমিক তরুণ মুক্তিযোদ্ধা নাৎসীদের বর্বরতা থেকে নিরীহ দেশবাসীকে রক্ষা এবং হিটলারের মারণযজ্ঞ বন্ধ করবার জন্যে 'নাৎসী'দের ছদ্মবেশে গিয়ে গোপন তথ্যের পাচার বন্ধ করলো. ছবির পরিচালক গেয়র্গী ইয়ংভ্যাড হিলকোভিচ একটি সাসপেন্স-ধর্মী রহস্য কাহিনী পরিবেশন করবার চেষ্টা করেছেন। চলচ্চিত্রের আঙ্গিক, বিশেষ করে আলোকচিত্র গ্রহণের কাজ উচ্চাঙ্গের। অভিনয়ে ভ্যালেনটিনা ভল্ডামির ও নিকোলাই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

গ্লোব চিত্রগৃহে ইতিপূর্বে প্রদর্শিত ৭০ মিঃ মিঃ'র বিখ্যাত ক্লিওপেট্রা (পরিচালক জোসেফ ম্যাকনেওয়াইস) ছবিটি পুনঃপ্রদর্শিত হচ্ছে। নামভূমিকায় এলিজাবেথ টেলরের মরমী অভিনয় ভুলবার নয়। অন্যান্য ভূমিকায় চরিত্রা-নুযায়ী অভিনয় করেছেন রেক্স হ্যারিসন, রিচার্ড বার্টন।

স্টুডিও সংবাদ

সম্প্রতি টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে পরী আর প্রেমিকদের মেলা বসেছিল। সর্ব-সাকুল্যে তিনজন পরী আর ছ'জন প্রেমিক। এক-একজন পরীর সঙ্গে দু'জন করে প্রেমিক—গড়ে তাই তো দাঁড়ায়। এখন অবশ্য পরীরা সব এক জায়গায় প্রেমিকরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে। আমি, টিনের চাল ধসের দেওয়াল ময়লা মশারি দেখতে দেখতে পরীদের রাজ্যে চলে এসেছি। বেশ বড়-গোছের একটা ফ্রেমের মধ্য দিয়ে দেখতে পাচ্ছি—ছোটটি, পায়ের ওপর পা তুলে চাটনী খাচ্ছে। মেজো সেলাই-ফোঁড়াই করছে। আর বড়? সে সেজেগুজে বেরবার উদ্যোগ করছে। ক্যামেরা ট্রলিতে, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। শেষে স্থির হয়ে দাঁড়ায় বড়জনের মুখে। পরিচালক দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বারকয়েক রিহার্সাল দেখ-লেন। এবার টেকিং। আলোকোজ্জ্বল মুহূর্তে নিশ্চুপ। মেক-আপম্যান ফিনিশিং টাচ দিচ্ছেন। মাথা কাৎ করে হাঁটুর ওপর

আবিষ্কার
রাজেশ খান্না ও শর্মিলা ঠাকুর

ভর দিয়ে বসেছিলেন পরিচালক। মনে হচ্ছিল যুদ্ধযাত্রার আগে নিঃশব্দ প্রস্তুতি। হঠাৎ তিনি ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে গেলেন। 'সোমা তোমার ডায়লগটা আরেকবার বল তো।' একটি তন্বী মেয়ে নড়েচড়ে উঠলো। মিষ্টি চেহারা। নিজে যা, ও নিজে যা হতে চাইছে মেয়েটি পাশ ফিরে দ্বিধা, বিশ্বাস ভয় এবং ভরসায় মুখ তুলে তাকাল। তারপর ডাগর ডাগর চোখ দুটি প্রসারিত করে বললো 'আমি ভাই আমারটা নিয়ে আছি সাত চড়েও রা নেই।'...

ঘুরেফিরে কথাগুলো যখন তৈরী হল ঠিক তখনই শটটা টেক করলেন পরিচালক দিলীপ। বয়সে তরুণ, স্বভাবে উদ্যমী। এই প্রথম তাঁর কাহিনী চিত্র-পরিচালনা। আগে ভাগে সে খান দুই ছোট ছবি করেছে। প্রথমটি সুনকীর সুবচনী —শিশু মনস্তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ছবিটা ম্যানহাইম চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হয় প্রচুর প্রশংসা পায়। দ্বিতীয় দলিল চিত্র সাইলেন্ট রেভোলিউশন --ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর উপর। তৃতীয় ছোট ছবি 'স্ট্রীট ট্যালেণ্টস', আজকের ছন্নছাড়া যুব-সমাজের চেহারা তুলে ধরার চেষ্টায় আছেন, শুটিং এগিয়ে চলেছে। এ কথা সে কথার মধ্য দিয়ে আমি যা বুঝলাম, দিলীপ অত্যন্ত সহজভাবে সরলভাবে প্রকাশ করতে চায়, সে যা বলতে চায়। জীবনের জটিলতার মধ্য থেকে উত্তরণ চায়। কোনো রকম চালবাজি নেই যেটুকু বোঝে ঠিক সেটুকুই প্রকাশ করতে দ্বিধা নয়। ফিল্ম একটা প্রচণ্ড শিল্প-মাধ্যম যার সাহায্যে শুধু দিলীপ নয়, দিলীপের মতো সহস্র তরুণ কমিউনিকেট করতে পারে দর্শকদের কাছে পৌঁছে যেতে পারে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প নিয়ে ফিল্ম সম্ভবত সম্পূর্ণ হয়নি। চেষ্টা হয়েছিল। এই প্রথম সম্পূর্ণ হতে চলেছে। সেইদিক থেকে 'তিন পরী ছয় প্রেমিক' নির্মীয়মাণ ছবির তালিকায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। স্ল্যাপস্টিক কমেডি ফর্মে ভাবা হয়েছে এ-ছবির চিত্রনাট্য। চিত্রনাট্যকার পরিচালক নিজেই। তিন পরী যথাক্রমে : জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়শ্রী রায় এবং নবাগতা সোমা মুখার্জি। ছয় প্রেমিক : অনুপ-কুমার, তিলক চক্রবর্তী নবাগত সন্দীপ ভট্টাচার্য, বসন্ত চৌধুরী, সত্য বন্দ্যো-পাধ্যায় এবং পার্থ মুখোপাধ্যায়। তিন পরীর বাবা সেজেছেন বিকাশ রায়। অন্যান্য চরিত্রের শিল্পী : মনি শ্রীমানী জহর রায়, শ্যামল রায়চৌধুরী এবং সমীর মুখার্জি। সমীর প্রোডাকসন্সের এ-ছবির চিত্রশিল্পী দীপক দাস। শিল্পনির্দেশক : রবি চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদক : গঙ্গাধর নস্কর। সংগীত পরিচালক : প্রবীর মজুম-দার। নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী : মান্না দে, আরতি মুখোপাধ্যায় এবং তৃপ্তি মুখার্জি।

স্টুডিও সংবাদদাতা

বিদ্রোহী নাট্যকার কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত

মাদ্রাজে থাকাকালীন সময়ে মাইকেল ক্যাপটেন লেডী রচনা করেন। তখন পর্যন্তও বন্ধুবান্ধবের সীমাবদ্ধ পরিধির বাইরে কলকাতায় মাইকেল খুব বেশী পরিচিত ছিলেন না। বন্ধুদের মধ্যে গৌরদাস বসাকের কথাই সর্বাগ্রে মনে আসে। মাইকেলের আর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন তখন বাংলার নাট্যান্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তি। ইংরেজী নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে বাংলা নাট্যাভিনয়েও তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। অভিনেতা হিসেবে কেশব গঙ্গোপাধ্যায়ের সমকক্ষ অভিনেতা তখন খুব কমই ছিলেন। নাট্যপরিচালনা অভিনয় শিক্ষা ও সংগঠনী শক্তিও ছিল কেশবচন্দ্রের অদ্ভুত।

বেলগাছিয়ার রাজারা যখন রামনারায়ণ তর্করত্নের রত্নাবলী নাটকের অভিনয় আয়োজন করেন- তখন কেশবচন্দ্রকেও তাঁরা আমন্ত্রণ জানান। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে কেশববাবু রত্নাবলী অভিনয়ের সর্ববিষয়েই পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেন।

শনিবার, ৩১শে জুলাই, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে রাত ৮-৩০টা থেকে ১২-৩০টা পর্যন্ত রত্নাবলীর প্রথম অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। কেশব গঙ্গোপাধ্যায় বিদূষক চরিত্রে অভিনয় করে সকলকে চমৎকৃত করেন। যৌগন্ধরায়ণ চরিত্রে অভিনয় করেন গৌরদাস বসাক। রত্নাবলীর অভিনয় দেখবার জন্য বহু ইংরেজ রাজপুরুষ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। এঁদের কথা মনে করেই পাইকপাড়ার রাজারা ইংরেজীতে রত্নাবলীর সারাংশ মুদ্রণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কেশব গঙ্গোপাধ্যায় এবং গৌরদাস বসাক উভয়েই মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্পর্কে এ বিষয়ে অবহিত করেন এবং মাইকেলকে এনে রাজাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

'রত্নাবলী'র ইংরেজীতে সারাংশ রচনার দায়িত্ব মাইকেলের ওপর অর্পণ করা হয়। অনুবাদের পারিশ্রমিক বাবদ মাইকেলকে দেওয়া হয় নগদ ৫০০্ টাকা।

রত্নাবলী নাটকের অনুবাদ করতে এসেই নাটক রচনায় মাইকেল অনুপ্রাণিত হন। তবে চিরবিদ্রোহী মাইকেল সংস্কৃত নাটকের চিরাচরিত গঠন-শৈলী মেনে নিতে পারলেন না। ইংরেজী নাটকের সহজ অভিনয়-ধারার পদ্ধতিতে নাটক রচনায় ব্রতী হলেন। অবশ্য সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের কাব্যঝংকার ও লালিত্যকে অস্বীকার করতে পারলেন না। বরং নতুন করে কালিদাসের নাট্য-সম্ভারে আত্মমগ্ন থাকবার তথ্যও পাওয়া যায়। শর্মিষ্ঠা নাটকের কাহিনী নির্বাচনের মূলে মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটকের প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না। ইংরেজী নাট্যশালা ও নাটকের প্রভাবে আমরা পাশ্চাত্যঘেঁষা বলে আমাদের একদল মাইকেলকে নায়ক হিসেবে উপস্থিত করতে চান। তাঁদের মতে মাইকেল সম্পূর্ণ ইংরেজী ছাঁচে বাংলা নাটকের রূপ দিলেন। বিদ্রোহী মাইকেল পুরাতনের সব কিছু ভেঙেচুরে তছনছ করে দিলেন। কথাগুলি শুনতে বেশ লাগে। কিন্তু এর মূলে কোন সত্য নেই। মাইকেলের নাটকাবলীই তার প্রমাণ। মাইকেল সংস্কৃত সাহিত্য থেকেই তাঁর বেশীর ভাগ নাটক এবং কাব্যের উপকরণ গ্রহণ করেন। মাতৃভাষা এবং দেশমাতৃকাকে নতুন করে মাইকেল আমাদের দেখিয়েছেন বললেও ভুল হবে না।

মাইকেলই 'জাতীয় নাট্যশালার' প্রথম উদ্ভাবক। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে মাইকেলের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক প্রকাশিত হয়।

রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ এবং ঈশ্বরচন্দ্র সিংহই মুদ্রণের সমস্ত ব্যয় বহন করেন। শর্মিষ্ঠা নাটকের ভূমিকায় মাইকেল রাজাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে যেয়ে লেখেন : ভারতের মাটিতে অদূর ভবিষ্যতে যেদিন আবার নাট্য-ধারা উৎসারিত হয়ে উঠবে—সেদিন কেউই এই উচ্চহৃদয়ের দুই মহৎ ব্যক্তির কথা বিস্মৃত হবে না। 'জাতীয় নাট্যশালার' উন্মেষ-মুহূর্তে এঁরাই ছিলেন তার পরম বন্ধু।

বেলগাছিয়া থিয়েটারের অভিনয় প্রথম থেকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন মাইকেল। বেলগাছিয়া নাট্যশালার মঞ্চ, সঙ্গীত, অভিনয়—নাটক সব কিছু জাতীয় ভাব-ধারারই ছিল পরিপূরক।

বাংলা ১২৬৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে শর্মিষ্ঠা নাটকের রিহার্সাল শুরু হয়। বাংলা ৩রা ভাদ্র ১২৬৬ সালে ইংরেজী ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে শর্মিষ্ঠা নাটকের প্রথম অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। শর্মিষ্ঠা নাটকের অভিনয়াংশে ছিলেন : যযাতি—প্রিয়নাথ দত্ত পরে যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়।। মাধব্য—(বিদূষক)—কেশব গঙ্গোপাধ্যায়। শুক্রাচার্য—দীননাথ ঘোষ। কপিল—বেঙ্গল থিয়েটারের শরৎচন্দ্র ঘোষ। বকাসুর—রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ। ঈশ্বরচন্দ্র ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে আহত হলে পরে অভিনয় করতে পারেন না। বকাসুর চরিত্রে তখন অভিনয় করেন তারাচাঁদ গুহ। দেবযানী—হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শর্মিষ্ঠা—কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়। পারিষদবর্গের মধ্যে ছিলেন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্রিয়নাথ শেঠ। মাইকেল শর্মিষ্ঠা নাটকের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছিলেন : সোজা কথায় বলতে হয় চমৎকার। সমস্ত দর্শক মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে অভিনয় দেখেছে।'

হিন্দু কলেজের বৃদ্ধ অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্র অভিনয় দেখে মাইকেলকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বাসিত অভিনন্দন জানান। পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের বিরূপ সমালোচনা করেন। এবিষয়ে গৌরদাস বসাককে এক পত্রে মাইকেল লেখেন : ওঁরা অর্থাৎ পণ্ডিতরা আমার সব কিছুতে বৈদেশিক গন্ধ পেয়ে থাকেন। সংস্কৃত নাটকের দাসত্ব ছিন্ন করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

সংস্কৃত নাটকের দাসত্ব ছিন্ন করে মাইকেল কিন্তু ইংরেজী নাটকের দাসত্বকে বরণ করে নেননি। নাটকের উদ্বোধন সংগীতও মাইকেলই রচনা করেন। তাছাড়া এবারও ইংরেজী সারাংশ রচনা করেছিলেন মাইকেল। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরও একটি গান রচনা করেন।

শর্মিষ্ঠা নাটকের ৬টি অভিনয় সংবাদ পাওয়া যায়। বিশ্বকোষ-এর মতানুযায়ী ৮।১০টি নয়। সর্বশেষ অভিনয় ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়। বাড়ীর এবং পরিচিত আত্মীয়-স্বজনদের মেয়েদের জন্য একটি অভিনয়ও করা হয় বিশেষভাবে।

শর্মিষ্ঠা নাটক যেখানে অভিনীত হয়েছিল—এখনও সে স্থান উন্মুক্তই পড়ে আছে। একটি দেয়ালের চিহ্নই আছে। নাট্যশতবার্ষিকীতে পশ্চিমবঙ্গ সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সংস্থার' সভারা ঐস্থানে মাল্যার্পণ করেন। কুমার জগদীশ সিংহ এবিষয়ে বহু তথ্যও আমায় সরবরাহ করেন।

শর্মিষ্ঠা নাটকের পর মাইকেল বেলগাছিয়া থিয়েটারের জন্য পদ্মাবতী নাটক রচনায় ব্রতী হন। কিন্তু ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুতে বেলগাছিয়া থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়। পদ্মাবতী আর এখানে অভিনীত হয় না। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে পদ্মাবতী রচিত হয়।

পদ্মাবতী নাটকের উল্লেখযোগ্য অভিনয় সংবাদ পাওয়া যায় ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে। বৌবাজারের রাজেন্দ্র দত্তের গৃহে এই অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। অভিনয় অপেরাধর্মী ছিল এবং জনপ্রিয়তার্জন করে।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর চিৎপুরের পাঁচকড়ি মিত্রের উদ্যোগে অভিনীত 'পদ্মাবতী' বিশেষ সাড়া জাগায়। আরো কয়েকটি অভিনয় এখানে হয়। এই অভিনয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ইন্দ্রনীল চরিত্রে অপূর্ব অভিনয়-কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। পদ্মাবতী চরিত্রে ছিলেন শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। স্থূলকায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ বা ন্যাদার গেরিশ চারটি চরিত্রে অভিনয় করেন। ন্যাশনাল থিয়েটারের শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও এঁদের সংগে জড়িত থাকেন। পদ্মাবতীর চরিত্রাভিনেতা আর তিনি এক লোক নন। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ছিলেন নাট্য-শিক্ষক। পদ্মাবতী নাটকে 'কলি'র মুখেই মাইকেল তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দ সর্বপ্রথম সংযোজনা করেন বলে অনেকের বিশ্বাস। মাইকেল একাধিকবার এখানকার অভিনয়ে উপস্থিত থাকেন।

সিমলার শুঁড়ীপাড়ার জনার্দন সাহার বাড়ীতে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে পদ্মাবতীর অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। এই অভিনয়ে ন্যাশনাল থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাদনদল নিয়ে যুক্ত হয়ে পড়েন। তাছাড়া পদ্মাবতী নাটকে কঞ্চুকী চরিত্রে সর্বপ্রথম তাঁর অভিনয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর পাথুরিয়াঘাটায় জনৈক ধনীগৃহে পদ্মাবতী নাটকের অভিনয় সংবাদ ১১ই ডিসেম্বরের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকায় পাওয়া যায়।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বাগবাজারের বখাটে ছেলেরাই গিরিশচন্দ্র আর উমেশচন্দ্র চৌধুরীর নেতৃত্বে অভিনয় করলেন মাইকেলের "শর্মিষ্ঠা"। শর্মিষ্ঠা নাটকের যাত্রা রূপায়ণ ও কয়েকখানা গীত রচনা করেন গিরিশচন্দ্র। শর্মিষ্ঠার পরবর্তী প্রচেষ্টাই বাগবাজার এমেচার থিয়েটার প্রতিষ্ঠা। মাইকেলের শর্মিষ্ঠা এবং পদ্মাবতী বাংলার নাট্যান্দোলনকে কীভাবে সাগরসঙ্গমে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে—আমার মনে হয় যে কোন নাট্যামোদী তা স্বীকার করবেন।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মাইকেল উপহার দিলেন তার 'কৃষ্ণকুমারী'। কথিত আছে মাত্র এক মাসের মধ্যে এই নাটকটি মাইকেল শেষ করেন। অর্থাৎ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগাস্ট নাটকটি লিখতে শুরু করেন আর সমাপ্ত করেন ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ৭ই সেপ্টেম্বর। নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে।

কৃষ্ণকুমারী ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত। বিদগ্ধজনের মতে শ্রেষ্ঠ নাটকের মধ্যে অন্যতম। মাইকেলের একেই কি বলে সভ্যতা এবং বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ প্রহসন দুটি শর্মিষ্ঠা নাটকের পরই রচিত। শেষ জীবনে লেখেন মায়া কানন।

মাইকেল অভিনয়ের জন্যই নাটক লিখতেন। তাঁর মেঘনাদ বধ কাব্যও নাটকায়িত হয়ে অভিনীত হয়েছে।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে গণেন্দ্র ও গুণেন্দ্রনাথের উদ্যোগে যখন অভিনয় অনুষ্ঠিত হয় তখন প্রথমে বিভিন্ন আবৃত্তির সংগে মাইতেলের 'কৃষ্ণকুমারী নাটকের দৃশ্যাভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়।

মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা প্রহসন দিয়ে শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিকাল সোসাইটির দ্বারোদ্ঘাটন করা হয় ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই। অভিনয়ে রাজবাড়ীর বিভিন্ন কুমারেরা অংশ গ্রহণ করেন। দেবীকৃষ্ণ বাহাদুরের একতলার একটি গৃহে মঞ্চ নির্মিত হয়েছিল। দিগম্বর মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতিরা প্রথম অভিনয়ে উপস্থিত থাকেন।

প্রতি মঙ্গল শুক্র ও রবিবার এখানে নাট্যাভ্যাস হতো।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই কৃষ্ণকুমারী নাটকের ড্রেস রিহার্সাল হয়। প্রকাশ্য অভিনয় নিয়ে বহু মতান্তর আছে। ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণকুমারীর প্রথম প্রকাশ্য অভিনয় তারিখই সঠিক বলে বেশীর ভাগ মনে করেন। অভিনয়ে ভীম সিংহ চরিত্রে আত্ম-প্রকাশ করেন বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। কৃষ্ণকুমারী—রাজেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর। ধনদাস—মণিমোহন সরকার। বলেন্দ্র সিংহ—প্রিয়মাধব বসু।

গিরিশচন্দ্র বিহারীলালের ভীম সিংহ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কৃষ্ণকুমারীর অভিনয় সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রথমে এদের নাট্যমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন। পরে পদত্যাগ করেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আরপুলি নাট্যসমাজ শকুন্তলা নাটকের সঙ্গে মাইকেলের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসন অভিনয় করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল শিবপুর লোকনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে কৃষ্ণকুমারী নাটক অভিনীত হয়।

গিরিশচন্দ্রের সংগে তার বন্ধুদের বিরোধের কথা আমরা জানি। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষই গিরিশচন্দ্রকে পুনরায় ন্যাশনাল থিয়েটারে নিয়ে আসেন। ন্যাশনাল থিয়েটারের পরিচালকেরা পরবর্তী অভিনয়ের জন্য মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী নাটক নির্বাচন করেন। কিন্তু ভীম সিংহের চরিত্রে অভিনয় করবার মত কোন অভিনেতা ছিল না। মহাত্মা শিশিরকুমারের অনুরোধে গিরিশচন্দ্র যেমন পরিচালক-রূপে যোগদান করেন—তেমনি ভীম সিংহ চরিত্রেও অভিনয় করতে স্বীকৃত হন। তবে 'এ ডিসটিংগুইসড এমেটিয়াররূপে' তাঁর নাম প্রচার করা হয়। শনিবার ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ন্যাশনাল থিয়েটারে যেমন সর্বপ্রথম মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী মঞ্চস্থ হয়—তেমনি ন্যাশনাল থিয়েটারে ভীম সিংহ চরিত্রে গিরিশ-চন্দ্রেরও সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ।

৮ই মার্চ অবিভক্ত ন্যাশনাল থিয়েটারে সান্যাল বাড়ীতে মাইকেলের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' অভিনীত হয়।

'সাধারণ নাট্যশালা' প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে বাংলার নাট্যান্দোলনে মাইকেলের অবদান সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় পাঠক সাধারণকে অবহিত করতে চেয়েছি। সাধারণ নাট্য-শালায় কবে কখন মাইকেলের নাটকাবলী মঞ্চস্থ হয়েছে, সে বিষয়ে যেমন সাধারণ আলোচনার মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে তেমনি ভবিষ্যতের আলোচনায়ও তুলে ধরা হবে।

মাইকেল সম্পর্কে আরো যে কথা বিশেষভাবে বলবার আছে—তাহলো মাইকেলের উৎসাহ অনুপ্রেরণাতেই গড়ে ওঠে বেঙ্গল থিয়েটার।

বেলগাছিয়া নাট্যশালা থেকে বহু নাট্যাভিনয়ে মাইকেলের বিভিন্ন নাটকে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় অভিনয় করে মাইকেলের প্রিয়জনদের অন্যতম হয়ে ওঠেন। শরৎচন্দ্র ঘোষ সম্পর্কেও ঐ একই কথা বলা চলে।

ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হবার পর শরৎচন্দ্র এবং বিহারীলালকে বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় মাইকেলই বেশী উৎসাহিত করেন। তখন অভিনয়ের উপযোগী ভাল নাটক পাওয়া যেত না। মাইকেল এ বিষয়ে তাঁদের প্রতিশ্রুতি দেন যে বেঙ্গল থিয়েটারের জন্য তিনি নিয়মিত নাটক লিখবেন। বেঙ্গল থিয়েটারের পরি-চালকমণ্ডলীতেও মাইকেল যোগদান করলেন।

মাইকেল পরামর্শ দিলেন, স্ত্রী চরিত্রে অভিনেত্রী নিয়োগ করতে। পণ্ডিত ঈশ্বর-চন্দ্র বিদ্যাসাগরও পরিচালকমণ্ডলীতে ছিলেন। মাইকেল-প্রতিভারই তিনি অনুরাগী ছিলেন না—মাইকেলকে স্নেহও করতেন অনেকখানি। কিন্তু মাইকেলের স্ত্রী চরিত্রে অভিনেত্রী নিয়োগের প্রস্তাব

পরিচয় নাটকে
শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং শর্মিতা বিশ্বাস

বিদ্যাসাগর সমর্থন করতে পারলেন না। তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলেন।

বেঙ্গল থিয়েটারের জন্য মাইকেল দুখানা নাটক লিখতে শুরু করেন। মায়া কানন দিয়ে নাট্যশালাটির উদ্বোধন করা হবে বলে স্থিরিকৃত ছিল। কিন্তু মাইকেলের আকস্মিক মৃত্যুতে শেষ পর্যন্ত তাঁর শর্মিষ্ঠা নাটক দিয়েই ১৬ই আগস্ট ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটন করা হয়। মাইকেলের ইচ্ছামত শর্মিষ্ঠা নাটকের বিভিন্ন নারী চরিত্রে যে চারজন অভিনেত্রী সর্বপ্রথম পেশাদার রঙ্গশালায় আত্মপ্রকাশ করেন—তাঁরা হলেন এলোকেশী. জগত্তারিণী শ্যামাসুন্দরী ও গোলাপসুন্দরী।

মাইকেলের মৃত্যুর পর ৩০শে আগস্ট ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মায়া কাননের অভিনয় সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু অভিনয় জমে না। মাইকেলের অসম্পূর্ণ বিষ বা ধনুর্গুণ নাটকের অভিনয় সংবাদ পাওয়া যায় না।

মাইকেলের মৃত্যুর পর তদানীন্তন কালের প্রতিটি নাট্যশালাই মাইকেলের সন্তান-সন্ততিদের জন্য বিশেষ অভিনয়ানুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

মাইকেলের জীবনী নিয়ে প্রখ্যাত সাহিত্যিক 'বনফুল'ই সম্ভবত প্রথম 'শ্রীমধুসূদন' নাটক রচনা করেন। তার কলকাতায় এই নাটকটি বহুবার অভিনয় করেছেন। পেশাদার রঙ্গশালায় নিতাই ভট্টাচার্য রচিত মাইকেলের জীবনচরিত নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর প্রযোজনায় এবং পরিচালনায় শ্রীরঙ্গম রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ হয়ে বিদগ্ধজন থেকে সর্বসাধারণকে বিমুগ্ধ করেছিল। কবি মাইকেল চরিত্রে নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের অভিনয় কোনদিনই নাট্যামোদীরা ভুলতে পারবেন না।

নট ও নাট্যকার পরিচালক মহেন্দ্র গুপ্ত রচিত মাইকেলের আর একটি জীবন-নাট্য নটসূর্য মহীন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনায় রঙমহল রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ হয়ে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। মাইকেল চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন নটসূর্য। আচার্যের অভিনয়ের পাশে সূর্যের দীপ্তি অনেকখানি নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে।

চলচ্চিত্রে মাইকেলের জীবনী মণি গুহের প্রযোজনায় চিত্রায়িত হয়। চিত্রখানি পরিচালনা করেছিলেন স্বর্গত মধু বসু। মাইকেল চরিত্রে অভিনয় করেন উৎপল দত্ত। যাত্রানাটকে মাইকেল চরিত্রে রূপদান করেন স্বপনকুমার। মাইকেলের মৃত্যু শতবার্ষিকী আমরা অতিক্রম করেছি। পশ্চিমবাংলার পেশাদার নাট্যশালা মাইকেলকে স্মরণ করবার মত অবকাশ পায়নি বলে দুঃখ হয়।

নাট্যশালার সঙ্গে জড়িত শিল্পী. সাংবাদিক নাট্যকার ও কর্মীদের জন্য কলকাতায় যে কোন হাসপাতালে মাইকেলের নামে একটি শয্যা সংরক্ষণের পরিকল্পনা নিয়ে একটি প্রতিনিধি দল স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন বলে শুনেছিলাম। কিন্তু এ বিষয়ে কতখানি ফলপ্রসূ হয়েছে তা আর জানা যায়নি।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন মাইকেল মধুসূদন দত্ত পরলোক গমন করেন—১৯৭৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসও বিদায় নিতে চলেছে। এ বিষয়ে আমাদের কী কোন কর্তব্য নেই? প্রাদেশিক সরকার এবং পশ্চিম বাংলার প্রতিটি নাট্য সংস্থা ও নাট্যানুরাগী জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এ বিষয়ে। মাইকেলের জাতীয় নাট্যশালা গিরিশচন্দ্রকে ভাবিয়ে তুলেছিল। গিরিশচন্দ্রের ভাব-ভাবনাকে রূপ দিতে অগ্রসর হয়েছিলেন দেশবন্ধু এবং তাঁর প্রিয় শিষ্য সুভাষচন্দ্র। তাঁদের স্বপ্ন সফল হয়নি। দেশবন্ধুর আর এক শিষ্য বিধানচন্দ্রও পারেন নি জাতির দীর্ঘদিনের স্বপ্নকে সফল করে তুলতে।

দেশবন্ধু দৌহিত্র সিদ্ধার্থশংকর নতুন করে জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হয়েছেন।

জাতির ভাব-ভাবনা নিয়ে গড়ে উঠুক জাতীয় নাট্যশালা। আর সেই সংগে গড়ে তোলা হউক জাতীয় নাট্য-গবেষণালয়। বর্তমান ও ভাবীকালের গবেষকেরা নতুন করে নতুন কথা শোনাবেন আমাদের মাইকেল এবং আরো নাট্যরথীদের সম্পর্কে।

—কালীশ মুখোপাধ্যায়

রাজা
পরিচালনা : তপন সিংহ
আরতি ভট্টাচার্য / দেবরাজ রায়

মঞ্চাভিনয়

পরিচয় / নাট্যসমালোচনা

প্রযোজনা : শ্রীরণজিৎমল কাংকারিয়া। স্টার থিয়েটার। নাটক : কুশাল মুখার্জি। পরিচালনা : বঙ্কিম ঘোষ। সংগীত : তিমিরবরণ। আলো : তাপস সেন। মঞ্চ : সুরেশ দত্ত। সহ-মঞ্চ : সন্তোষ সরকার। অভিনয়ে : শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শমিতা বিশ্বাস, হরিধন মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, বঙ্কিম ঘোষ, তপন বসু, কার্তিক চ্যাটার্জি, সুশীল বসু, রবীন বসু, গোপাল সিংহরায়, অমর মুখার্জি, শিশির চক্রবর্তী, শ্যামল রায়চৌধুরী, শান্তি, শৈলেন, কানু, বীরেন, সুষমা, মন্দিরা, গীতা ও অনামিকা সাহা প্রভৃতি।

৩১ মে শুক্রবার মঞ্চস্থ হয়েছে স্টার থিয়েটারের নতুন নাটক 'পরিচয়'। সাধারণত খুন-খারাপী ও বিভিন্ন অপরাধমূলক কাহিনী নিয়ে রহস্য-নাটক গড়ে ওঠে। কিন্তু স্টার থিয়েটারের বর্তমান নাটক উঠেছে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী এক রহস্য নিয়ে। একজন উদীয়মানা লেখিকার রচনা কিভাবে আর একজন খ্যাতনামা লেখককে প্রখ্যাত করে তুললো, তারই সন্ধান পাওয়া যাবে বর্তমান নাটকে। অথচ খ্যাতনামা সাহিত্যিক এ বিষয়ে কোন শঠতা বা প্রবঞ্চনার সাহায্য নেননি। বরং বলা চলে পরিস্থিতির চাপে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই খ্যাতির বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে।

অতীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক। বহুজনের মধ্যে একজন উদীয়মানা লেখিকাও তাঁর অনুরাগিণী ছিলেন। অতীন্দ্রনাথের এক দূরসম্পর্কের বোন ছিল লেখিকার বান্ধবী। বান্ধবীর মারফৎ লেখিকা তার 'পরিচয়' নামে একটি উপন্যাস অতীন্দ্রনাথের মতামতের জন্য পাঠিয়ে দেয়। পাণ্ডুলিপিতে লেখিকার নাম ঠিকানা ছিল না। অতীন্দ্রনাথের সমস্ত বই প্রকাশ করতেন তার বন্ধু প্রকাশ। প্রকাশবাবু 'পরিচয়'-এর পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে প্রকাশ করে দেন। এই নতুন উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার সংগে সংগে পাঠক মহলে অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। অতীন্দ্রনাথকে নতুন খ্যাতিতে ভূষিত করে। শেষ পর্যন্ত 'পরিচয়' উপন্যাসের জন্য অতীন্দ্রনাথ জাতীয় পুরস্কার পান।

অতীন্দ্রনাথ কিন্তু ভিতরে ভিতরে মোটেই খুশী ছিলেন না। তিনি লেখিকার সন্ধানে ছিলেন। তাঁর দূর সম্পর্কের বোনটি মারা যাওয়াতে সন্ধানের যোগসূত্রও যায় ছিন্ন হয়ে। ধনীর একমাত্র উত্তরাধিকারী অতীন্দ্রনাথ। বিলাসব্যসনে কাটিয়েছেন। সংসারে পিতৃতুল্য ভৃত্য হরি ছাড়া আর কেউ ছিল না। অন্তর্দ্বন্দ্বে জ্বলে পুড়ে শেষ পর্যন্ত সেনা বিভাগে কাজ নিলেন।

সেখানে নন্দিতা বলে একটি মেয়ের সংগে অতীন্দ্রনাথের পরিচয় হয় এবং আকস্মিকভাবেই দুজনে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। অতীন্দ্রনাথের সেনাবিভাগের

পাপ আন্ডার পুলো
শর্মিলা ঠাকুর

ছাউনী ছিল দার্জিলিং-এর কাছাকাছি সীমান্তে। স্ত্রীকে পরিচিত পত্র দিয়ে তিনি দেশে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। আর প্রকাশবাবু এবং হরির কাছে বিয়ের সংবাদ জানিয়ে নন্দিতার দুখানা ছবি দিয়ে দিলেন। চিঠি দুটি তাড়াতাড়ি পৌঁছানোর জন্য ওদের কর্নেল মিঃ লাহিড়ীকে সমস্ত বিষয় জানিয়ে পোস্ট করে দিতে অনুরোধ জানালেন। একটি হোটেলে ওদের কথাবার্তা হচ্ছিল। অতীন্দ্রনাথ নন্দিতাকে নিয়ে হোটেল থেকে বেরোনোর সংগে সংগে বম্বিং শুরু হয়। অতীন্দ্রনাথ এবং নন্দিতা বিস্ফোরণে মারা যায় বলে সেনা বিভাগ থেকে প্রচার করা হয়। কর্নেল লাহিড়ীও আহত হয়ে মিলিটারী হাসপাতালে ছিলেন। এখানেই নার্সের কাজে ছিলেন 'পরিচয়' উপন্যাসের মূল লেখিকা। কর্নেল লাহিড়ী তারই হাতে চিঠি দুটি পোস্ট করতে দেন। পরে তিনিও মারা যান। চিঠির খামে অতীন্দ্রনাথের বাড়ীর ঠিকানা দেখে মেয়েটি চিঠি দুটি খুলে ফেলে। সমস্ত বিষয় জানতে পারে। দুটি খুলে ফেলে। সমস্ত বিষয় জানতে সেনা বিভাগ থেকেও খবর পায় অতীন্দ্রনাথ এবং তার স্ত্রী নন্দিতা মারা গেছে। তখন প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছায় চিঠি দুটির মধ্যে নিজের দুখানি ছবি ভরে দিয়ে নিজের বৈধব্যের কথা জানিয়ে দেয় এবং লিখে দেয়, সে একাই শ্বশুরগৃহে আসছে।

যথানির্দিষ্ট দিনে লেখিকা অতীন্দ্রনাথের গৃহে এলো নন্দিতার পরিচয় নিয়ে। শোকের মধ্যেও কিছুটা সান্ত্বনা পেলো সবাই। প্রকাশবাবু এবং তাঁর স্ত্রী এসেও

দেখা করে সান্ত্বনা দিয়ে গেলেন। বেশ কিছুদিন কেটে গেল। লেখিকার আর একটি উপন্যাস অতীন্দ্রনাথের শেষ লেখা বলে তার পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশের হাতেই দিয়ে ছিলেন লেখিকা। 'শেষ রচনা' নামে অতীন্দ্রনাথের এই পুস্তকটিও প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অসম্ভব জনপ্রিয়তা [illegible]। ইতিমধ্যে ধূমকেতুর মত হঠাৎ একদিন সশরীরে, অতীন্দ্রনাথ এসে উপস্থিত হলেন। অতীন্দ্রনাথ বিস্মিত। তিনি প্রচার করেন এই মেয়েটি তার স্ত্রী নন্দিতা নয়। নন্দিতা প্রচার করে তাঁর [illegible]।

পুলিশ আসে। উকিল আসে। কিন্তু [illegible] সকলেই [illegible]। শেষ পর্যন্ত নিজেকে নকল নন্দিতাকে নিয়ে অতীন্দ্রনাথ মুখো[illegible] [illegible] জানতে চান। জানতে চান কীভাবে নকল নন্দিতা আসল নন্দিতারূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পেল। নকল নন্দিতা সমস্ত কাহিনী বিবৃত করে সমস্ত রহস্যোদ্ঘাটন করে বিদায় নিতে চাইলো। অনুতপ্ত অতীন্দ্রনাথ তাকে বুকে জড়িয়ে নিলেন।

নাটকটির পরিসমাপ্তি ঘটলো। [illegible] অভিনয় [illegible] মাধ্যমে পরিচালনার [illegible] এবং দৃশ্যপটের [illegible] [illegible] থিয়েটারের বর্তমান

নাটকে ভিন্নধর্মী আকর্ষণ নিয়ে মঞ্চস্থ হয়েছে।

অভিনয়ে নায়িকাচরিত্রে শ্রীমতী শমিতা বিশ্বাস আগাগোড়া আবেগসিক্ত অভিনয়ে নায়িকা চরিত্রটিকে রূপায়িত করে তুলেছেন। অতীন্দ্রনাথ চরিত্রে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ও পাল্লা দিয়ে অভিনয় করেছেন। সমগ্র নাটকে এঁরাই প্রধান। প্রবীণ হরিধন এবং নবীন তপন দুটি চরিত্রে হাসির হুল্লোড়ে নাট্যমোদীদের মাতিয়েছেন। বঙ্কিম ঘোষ পুরনো চাকর হরিদা চরিত্রে ভিন্নধর্মী অভিনয়ে নিজের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। জনপদবধূ নাটকের মাদ্রাজী ভদ্রলোকের চরিত্রাভিনেতাকে তাঁর চরিত্রের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। যতীন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রকাশ যথাযথ। সমস্ত। বলাই মুখার্জী, সুশীল বসু, কার্তিক চ্যাটার্জী, রবীন বসু, শিশির চক্রবর্তী গোপাল সিংহরায় পঞ্চানন ভট্টাচার্য এবং অন্যান্যরা স্ব স্ব চরিত্রানুযায়ী অভিনয় করেছেন। পুলিশ অফিসারের চরিত্রে অমর মুখার্জির বাচনভঙ্গীর ক্ষিপ্রতা প্রশংসনীয়। কিন্তু জবানবন্দী গ্রহণের দৃশ্যে তার ছটফটানি দৃষ্টিকটু। নতুন মেয়ে অনামিকা সাহার প্রশংসা করব। অন্যান্য মহিলাশিল্পীরা কোন ছাপ আঁকতে পারেন নি। দৃশ্যপট রচনায় সুরেশ দত্ত বর্তমান নাটকে যেন আলোর যাদুকর তাপস সেনকেও ছাড়িয়ে গেছেন।

'পরিচয়ে'র সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে টিমওয়ার্ক। বহু নতুন শিল্পীদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে—তাঁরা সবাই সুযোগের মর্যাদা রেখেছেন। এজন্য, অভিনেতা পরিচালক বঙ্কিম ঘোষকে এবং সমগ্র শিল্পীদেরই অভিনন্দন জানাই। জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী অলোক বাগচীর কণ্ঠমাধুর্য নাটকের অন্যতম আকর্ষণ। সবচেয়ে বড় কথা একসঙ্গে এক পরিবারের সকলকে নিয়ে দেখার মত নাটক 'পরিচয়'। এদিক থেকে রণজিৎমল কাংকারিয়া স্টারের ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন বলে ধন্যবাদ জানাই।

আনন্দময়ের জামাই বারিক

আঠারোশো বাহাত্তরে দীনবন্ধু মিত্র যে রঙ্গ ব্যঙ্গ সৃষ্টি করেছিলেন, তার রসবস্তু আজও অম্লান দেখা গেল ২০ মে রংমহলে অভিনীত আনন্দময়ের জামাই বারিক নাটকে।

বাংলার রঙ্গরস বলতে যা বোঝায় তা এ-সংস্থার প্রযোজনায় স্বতন্ত্র রূপে দেখা গেল। সংলাপ অভিব্যক্তির সঙ্গে দেহের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমভাবে গুরুত্ব প্রয়োগের নজির সত্যিই বিরল। এ-নাটক দেখতে বসে যেমন দমফাটা হাসিতে রঙ্গালয় ভেঙে পড়ে তেমনি এর গান-ছড়া দিয়ে আসে দর্শকদের মনে-খুশির মেজাজ।

অভিনয় প্রসঙ্গে জমিদার বিজয়বল্লভের চরিত্রে রঞ্জন ব্যানার্জি প্রথম দৃশ্যেই নাটকে প্রাণসঞ্চার করেন। তাঁর চালচলন এক কথায় অনবদ্য। এরই পাশে দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেন রাম্মা চাকরের ভূমিকায় অনিল চৌধুরী। জমিদার-কন্যা কামিনীর চরিত্রে ছন্দা চ্যাটার্জি প্রাণবন্ত। এছাড়া উল্লেখযোগ্য চরিত্রে সুঅভিনয় করেন [illegible] [illegible] বাণী ব্যানার্জি [illegible] মিত্র [illegible] দাস অভয় সিনহা ও এস [illegible]।

সোনাই দীঘি অভিনয়

[illegible] নাট্যসংস্থা [illegible] নাট্যসংসদ [illegible] স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন। এঁদের অভিনীত যাত্রা নাটকে যে [illegible] লক্ষ্য করা যায় তা গতানুগতিক অভিনয়-ধারা থেকে মুক্ত।

২৬ মে রবিবার যাদবপুরের কে এস রায় হাসপাতাল কটেজ [illegible] আরোগ্যকামী কল্যাণ সমিতির আমন্ত্রণে ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র 'সোনাই দীঘি' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করে এঁদের দক্ষতা ও কুশলতার আবার পরিচয় দিয়েছেন।

শুরু থেকে শেষ ঘাত-প্রতিঘাত ও দ্বন্দ্বমূলক সকল দৃশ্যই মনোগ্রাহী হয়েছে, দলগত সংহতি ও প্রয়োগরীতি মনে রাখার মত।

অভিনয়ে [illegible] ভাবনা কাজী [illegible] মাধব সাধব [illegible] আগ্রাবাসী [illegible] নিশাচর-বাচস্পতি প্রভৃতি চরিত্রে সোনাই কেতকী মুক্তকেশী মল্লিকা প্রভৃতি চরিত্রে রূপদান করেন [illegible] দীনেশ চক্রবর্তী প্রদীপ ব্যানার্জি নিখিল দাস শশাঙ্ক চ্যাটার্জি দক্ষিণা দেব মধুসূদন ঘোষ মনোজ বসু শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য সুরেশ ঘোষ বেলা সরকার [illegible] দে [illegible] ব্যানার্জি সুধা সরকার প্রভৃতি সংসদের কুশলী শিল্পীগণ। [illegible] ঘোষ ও নাট্য পরিচালনায় ছিলেন শ্রীধীরেন চক্রবর্তী। আরোগ্যকামী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে [illegible] বিশ্বাস ও এঁদের সদস্যগণ অকৃপণ সহযোগিতার দ্বারা সমস্ত অনুষ্ঠানটিকে সফল করে তোলেন।

বিবিধ সংবাদ

মিনার্ভা থিয়েটারে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের সম্বর্ধনা

দেশবরেণ্য সাংবাদিক অগ্রজ তুষারকান্তি ঘোষ ৭৫ বছর অতিক্রম করে ৭৬ বছরে পদার্পণ করলেন। দেশের সাহিত্যিক-সাংবাদিক থেকে বিভিন্ন জনপ্রতিষ্ঠান এই উপলক্ষে নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তাঁর প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। তুষারকান্তির বিভিন্নমুখী প্রতিভার আলোচনায় মুখর হয়ে উঠেছেন। তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করেছেন। একটি স্মারক গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে তুষারকান্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন আলোচনা নিয়ে। পশ্চিম বাংলার শিল্পী-সাহিত্যিক ও বিদগ্ধজনের আলোচনার মধ্য দিয়ে তুষারকান্তিকে আমরা নতুন করে

জানতে পেরেছি। কিন্তু ৯ জুন, রবিবার সন্ধ্যায় মিনার্ভা থিয়েটারে অগ্রজ তুষারকান্তির সম্বর্ধনা ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

মিনার্ভা থিয়েটার আয়োজিত তুষারকান্তির সম্বর্ধনা আসরে নট ও নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্তের স্বাগত ভাষণে মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ এবং তাঁর একমাত্র পুত্র তুষারকান্তি ঘোষের নাট্যশালার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবদানের কথা জানবার সুযোগ পাওয়া গেল--। তাই এই সম্বর্ধনাকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছে।

মঞ্চে এনে বসানো হল তুষারকান্তিকে, শিল্পী সোমা গাঙ্গুলী চন্দন পরালেন, শঙ্খধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল মিনার্ভা থিয়েটার।

কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে গৌরীশঙ্কর ব্যানার্জি মালা দিলেন। বরণ করলেন শাস্ত্রীয় প্রথামত ধুতি চাদর ও মিষ্টি দিয়ে।

তুষারকান্তিকে স্বাগত জানিয়ে প্রখ্যাত নাট্যকার পরিচালক এবং প্রবীণ অভিনেতা মহেন্দ্র গুপ্ত বললেন ঃ ৭৬ বছরে পদার্পণ করলেন আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় তুষারকান্তি ঘোষ। তাঁর সম্পর্কে নতুন করে আমাদের বলার কিছু নেই। কিন্তু তিনি যে একান্তভাবে আমাদের, অর্থাৎ মঞ্চলোকবাসীদের আপনজন বলতেই আজকের এই ঘরোয়া অনুষ্ঠান। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় ছিলেন অন্যতম স্তম্ভ স্বরূপ। নানান সক্রিয় উপদেশে উদ্যোক্তাদের সঠিক পথে পরিচালনা করেছেন। যখনই কোন বিপদ এসেছে তিনি তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। গিরিশচন্দ্র প্রথমে যোগদান করেন নি বন্ধুদের সঙ্গে। গিরিশচন্দ্রকে ছাড়া ন্যাশনাল থিয়েটার যখন অচল হবার উপক্রম, মহাত্মা শিশিরকুমারই গিরিশচন্দ্রকে ফিরিয়ে আনলেন এবং নিজেও ন্যাশনাল থিয়েটারের পরিচালক পদ গ্রহণ করলেন। শিশিরকুমারের নাটক ও অভিনীত হয়েছে। থিয়েটারে অভিনেত্রী নিয়ে অভিনয় করার বিরুদ্ধে যখন প্রতিবাদের ঝড় উঠলো অমৃতবাজার পত্রিকা সব সময় নাট্যশালাকে সমর্থন জানিয়েছেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, তাঁর স্নেহ ছায়ায় নাটশালাকে ঢেকে রেখেছেন। শিশিরকুমারের একমাত্র পুত্র তুষারকান্তিও পিতার পথ অনুসরণ করে চলেছেন।

শিল্পী ও কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দিয়ে তুষারকান্তি তাঁর স্বাভাবিক রহস্যপ্রিয়তায় সকলকে মুগ্ধ করেন। তারপর শুরু হয় মহেন্দ্র গুপ্ত পরিচালিত মিনার্ভা থিয়েটারের চলতি নাটক 'প্রজাপতি'র অভিনয়। অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত সাংবাদিক দক্ষিণারঞ্জন বসু, নির্মলকুমার ঘোষ, প্রফুল্ল রায়, তুলসীকান্তি দে বিশ্বাস, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীশ মুখোপাধ্যায়, অনিমা ব্যানার্জি, প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র পান্নালাল দাস আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

প্রমীলা জগৎ
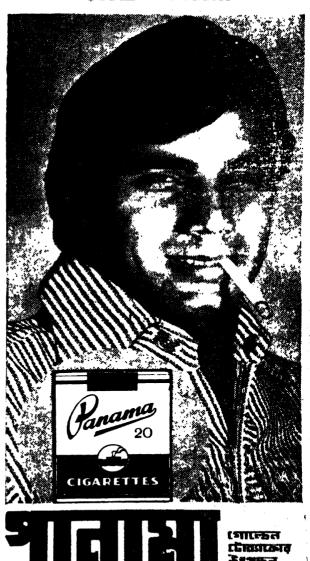
শ্রীরূপা চ্যাটার্জি

শ্রীরূপা চ্যাটার্জি

শ্রীরূপা চ্যাটার্জির এখন একমাত্র আকাঙ্ক্ষা জাতীয় এথলেটিক দলে স্থান পেতে হবে। স্বল্পপাল্লার দৌড়ে, বিশেষ করে একশ আর দুশ মিটার বিভাগে, শ্রীরূপা একে একে সাফল্যের সোপান অতিক্রম করছে। সেদিন এক সাক্ষাৎকারে পূর্ব রেলের কয়লাঘাট অফিসের চারতলায় গিয়ে উপস্থিত হলাম শ্রীরূপার টেবিলের সামনে। স্মিত মুখে বসতে বলে শ্রীময়ী মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল 'কি জানতে চান, বলুন।'—

কথায় কথায় জানালো, বাড়ী খোড়দহে, বাবা রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি রেলের গার্ড। গ্রামের খেলাধুলোয় ছোট্ট মেয়েটির সপ্রতিভ আচরণ আর ক্রীড়াকুশলতা দেখে প্রশিক্ষক মধুসূদন ভট্টাচার্য ওকে নিয়ে আসেন কলকাতায় এরিয়ান্স ক্লাবে। সেটা ১৯৬৮ সাল। সেই বছরই স্বীয় কৃতিত্বের মূলধনে শ্রীরূপা স্কুল ক্রীড়ায় বাংলার প্রতিনিধিরূপে হায়দরাবাদে যায় এবং একশ ও দুশ মিটার দৌড়ে প্রথম হয়। এছাড়া ৭২ সাল থেকে বার কয়েক এশীয় প্রশিক্ষণ শিবিরে তার ডাক পড়েছে। এবারও যাবে ব্যাঙ্গালোরে এশীয় ক্রীড়ার প্রস্তুতি শিবিরে। ৭৩-৭৪এ জয়পুরে আয়োজিত জাতীয় ক্রীড়ার আসরে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করে শ্রীরূপা। এই আসরে একশ মিটার দৌড় ১২·২ সেকেন্ড সময় নিয়ে শ্রীরূপা জাতীয় রেকর্ড স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে নতুন মিট রেকর্ডও করেছে।

শ্রীরূপা এখন চাকরীর সূত্রে পূর্বরেল এথলেটিক দলের হয়ে ক্রীড়ার আসরে নামে। রেলের প্রশিক্ষক সুজিত সিনহার প্রশিক্ষণে তার অনুশীলন চলে। সকালে শ্রীরূপা নিয়মিত অনুশীলন করে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে। গত বছর ভারত রুশ শুভেচ্ছা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় শ্রীরূপা একশ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করে নতুন সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছে।

প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরূপা জানাল, ওরা চার বোন, পরের বোন শ্রীলতাও ওরই মত একশ ও দুশ মিটার দৌড়ের আসরে নামে। চাকরী পেয়েছে, তাই করছে, চাকরী করার ইচ্ছা তেমন নেই। এথলীটরূপেই পরিচিত হতে চায়।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে দেশের মেয়েদের ক্রীড়মানের কথা উঠলে শ্রীরূপা বললো, এ-ব্যাপারে অন্যান্য রাজ্যের মান প্রায় কাছাকাছি বলেই তার মনে হয়েছে।

বাড়ীর সকলের উৎসাহ শ্রীরূপার ক্রীড়া চর্চায় বাড়তি অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। তাই ছোট থেকে ওর পক্ষে ধাপে ধাপে নানা আসরে যোগ দিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ রয়েছে। আসন্ন এশীয় ক্রীড়ার বাছাই উপলক্ষে ব্যাঙ্গালোরের প্রশিক্ষণ অনুশীলন শিবিরে সুব্রতার মত শ্রীরূপারও ডাক পড়েছে। বাছাই প্রতিযোগিতায় সফল হবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে বলে জানালো শ্রীরূপা।

—অময়

এঁরা চারজন

শম্ভু মৈত্র

আজ আমি শম্ভু মৈত্র। ফুটবল মাঠে অল্পবিস্তর সবাই আমায় জানে, চেনে। দুঃখের কালো মেঘ এখন হয়তো খানিকটা কেটে গেছে কিন্তু ফেলে-আসা শৈশব-কৈশোরের দিনগুলি মনে পড়লে আজও ভয় হয়।'

'কিন্তু ওসব কথা থাক। খেলার কথাই বলি। জন্মেছিলাম ১৯৪৮ সালের ২রা অকটোবর ঢাকুরিয়ায়। আমাদের আদি নিবাস পাবনার সাহাজাদপুর। হ্যাঁ বাংলাদেশের সেই সহাজাদপুর যেখানকার নব ইতিহাস লিখেছে শত-সহস্র মুক্তিফৌজ, মিত্রবাহিনী বুকের রক্ত দিয়ে। বাবা রিফিউজি শ্রীসুধাংশু মৈত্র অধুনা লাটে ওঠা পূর্ব পাকিস্থান থেকে কলকাতায় এসে একটা চাকরীতে ঢুকেছিলেন। হাইকোর্টের গায়ে অকল্যান্ড রিফিউজি রিলিফে। চার ভাইয়ের মধ্যে আমি মেজ তাই ভবিষ্যৎ দায়িত্বের কথা ভেবে বাঘা যতীন স্কুলে যেতে সুরু করলাম। 'যেতে' কথাটা ইচ্ছে করেই বলেছি তার কারণ স্কুলে পড়তে হলে তো বই লাগে, খাতা লাগে, পেন্সিল লাগে মাইনে লাগে। পাবো কোথায়? কে দেবে?'

আমি নিজেও রেফিউজি। তাই রেফিউজি পরিবারের সমস্ত দুঃখ কষ্ট সমস্ত লাঞ্ছনা, প্রতারণার করুণ ইতিহাস আমার জানা, আমার পড়া। তাই একমনে শম্ভুর কথা শুনে যাচ্ছিলাম। দি উয়ারার নোজ হোয়্যার দ্য স্যু পিনচেস। আমি অনুভব করতে পারি শম্ভুর দুঃখের গভীরতা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সাহাজাদপুরের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শম্ভু মৈত্র আবার জীবনকথা সুরু করলেন: 'বাঘা যতীন স্কুলে যখন আসছি যাচ্ছি, সনটা যতদূর মনে পড়ে ১৯৬২ই হবে, ক্লাস এইটে পড়ি রবীন্দ্র-সরোবর স্টেডিয়ামে প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় শ্রীসুশীল ভট্টাচার্য আমায় কাছে টেনে নেন। ৬৪ সালে বাংলা স্কুল দলে চান্স পেয়ে গেলাম। গেলাম সর্বভারতীয় স্কুল ক্রীড়ায়

উদয়পুরে। ১৯৬৫ সালে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায়ও বরাত জোরে উৎরে গেলাম। ঠিক এই সময় একদিন বাঘাদা (শ্রীতেজেস সোম) এলেন বাড়ীতে।

আরে বাপ্‌রে বাঘাদা। কোথায় যে বসতে দিই। কালক্রমে বাঘাদা আমাদের ঘরের লোক হয়ে গেলেন। বাঘা আর আমি, যেন বাপ-ছেলে। বাঘা ধরে নিয়ে গেলেন ইস্টার্ন রেলের তৎকালীন জনসংযোগ অধিকর্তা শ্রীকল্যাণকুমার দাসের কাছে। দাস সাহেব মানুষ তো নয়—দেবতা। তাঁরই কৃপায় ১৯৬৮ সালে ইস্টার্ন রেলে চাকরী হোল। ইতিমধ্যে ৬৬, ৬৭ এবং ৬৮ সালে জুনিয়ার রাজ্য দলে খেলে ফেলেছি। ছেষট্টি সালে এশীয় যুব ফুটবলে যোগদানকামী ভারতীয় দলের ট্রেনিং শিবিরে ডাক পড়েছিল কিন্তু কপাল খারাপ বাদ পড়ে গেলাম। গড়ের মাঠে প্রথম খেললাম ১৯৬৮ সালে উয়াড়ীর জার্সি গায়ে চাপিয়ে।

৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ সালে উয়াড়ীতেই খেলেছি। ৭২ সালে ডাক এলো ইস্টবেঙ্গল থেকে। গেলাম। কিন্তু খুব ভাল লাগলো না। খেলতেও পারলাম না তেমন। তার ওপর অতো বড় ক্লাব। আবার উয়াড়ীতে ফিরে গেলাম। ৭৪ সালে এলাম মহামেডান স্পোর্টিংয়ে।

প্রদীপ দত্ত

'ক'দিন কলকাতা মাঠে খেলতে পারবো ঈশ্বরই জানেন। পরীক্ষা দোর গোড়ায় কড়া নাড়ছে। উৎরে যেতে পারলে চাকরী-বাকরী তো যা হোক একটা কিছু জোগাড় করতে হবে। কলকাতায়ই যে চাকরী হবে এমন নিশ্চয়তা কোথায়? বাইরে যেতে হলেই তো ব্যস, ফুটবল ফিনিস।'

কথার সুরে প্রদীপের একটা ভরাট অনিশ্চয়তার ছাপ। প্রদীপ অর্থাৎ এরিয়ান্স-এর প্রদীপ দত্ত ক্লাব লনে বাতাপি লেবু-গাছ তলায় বসে বসে ঐ অনিশ্চয়তার কথাই বলছিলেন আমাকে। স্বচ্ছল ঘরের ছেলে

প্রদীপ। কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারের ডিগ্রিটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এখনও বছর-খানেক বাকী, কিন্তু ভবিষ্যতের চিন্তায় প্রদীপকে এখনই রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে। কিন্তু প্রদীপ ফুটবল মাঠের স্ট্রাইকার। সংসারের মাঠেও সে লক্ষ্যভেদ করবে।

শক্ত সমর্থ চেহারা প্রদীপের। খাটতে পারে, প্রতিপক্ষকেও খাটাতে পারে। পারে সুযোগের তাৎক্ষণিক সদ্ব্যবহার করতে। সময় বুঝে শট নিতে ওস্তাদ। যতক্ষণ মাঠে থাকবেন অস্তিত্ব হবে উজ্জ্বল। কিন্তু এতোটা উজ্জ্বল হতে তাকে কি কম মেহনত করতে হয়েছে। সেই এতটুকু থেকে যে সাধনা সুরু হয়েছে, তা এখনও নিরবচ্ছিন্ন। ওর বিশ্বাস সাধনা এর অনুশীলনের বিকল্প নেই। যে কোন একটায় টান পড়লেই নির্ঘাৎ পতন। আর পতন মানেই—'গুড বাই ফুটবল।'

সব চেয়ে বড়ো কথা অহং ভাবটি একেবারে নেই। মনে মনে এখনও শিক্ষার্থী। অন্ততঃ আমার তো তাই মনে হয়। অংকে লেটার নিয়ে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে ঢোকার আগেই প্রদীপের ফুটবলের হাতেখড়ি হয়েছিল মিশনের সুশীল ভট্টাচার্য প্রশান্ত গিরি এবং ননী ভট্টাচার্যের কাছে। তারপর এলো বিরাট গড়ের মাঠে। প্রথম ডেরা উয়াড়ী তাঁবুতে। উয়াড়ীতে বাঘাদার (শ্রীতেজেশ সোম) হাতে প্রদীপের পরিচর্যা হয়েছে অনেক দিন। তারপর থেকে পরিক্রমা সুরু হোল ফুটবলের পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়াবার জন্য। উয়াড়ী থেকে স্পোর্টিং ইউনিয়নে, সেখান থেকে খিদিরপুরে।

'খিদিরপুরে পেয়ে গেলাম কোকোদাকে। স্নেহে যত্নে পরিশ্রমে কোকোদা (অচ্যুত ব্যানার্জি) আমাকে 'মানুষ' করার জন্য কি

কষ্টই না করেছেন। কিন্তু হঠাৎ লোভে পড়ে গেলাম। ১৯৭৩এ চলে এলাম মোহনবাগানে। অরুণ সিংহ আমার পেছনে কি পরিশ্রমই না করেছিলেন। কিন্তু সিজনটা আমার একেবারে ডাল গেলো। আটটা ম্যাচ খেললাম বটে কিন্তু চাটগাইয়া আমি কেমন যেন মইয়ে গেলাম। ভেবেছিলাম ৭২ সালে ব্যাংককে এশীয় জুনিয়ার ফুটবলে যখন ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরেছি তখন মোহনবাগানেও নাম করতে পারবো। কিন্তু তখন কি জানতুম যে বেশীর ভাগ দিনই ফালতু হয়ে মোহনবাগান মাঠে বা ইডেন গার্ডেনে সাইড লাইনের পাশেই বসে থাকতে হবে।'

'বুঝতেই পারছেন মনের কি অবস্থা তখন? পাড়াপড়শীরা একসঙ্গে আর্টিস্ট বলে ঠাট্টা করে। দূর ছাই বলে ফুটবল হয়তো একেবারে ছেড়েই দিতুম। দিইনি বাড়ীর লোকজনের জন্য। বাবা, মা কাকা অন্য পাঁচভাই-বোনের (প্রদীপ মেজো) জন্যে। আমি যখন প্রায় ভেঙে পড়ছিলাম ওরা সাহস দিলেন, উৎসাহ দিলেন। ফলে আমার ফুটবল ছাড়া হোল না।' এরিয়ান্সে চলে এলাম এবার। এখন আমি কেয়ার অফ নন্টেদা এবং শচীনদা।

লতিফুদ্দিন

'আব্বাজানের সংগে আপনি তো আমাদের বাড়ী গেছেন বারকয়েক। আব্বাজান, আপনি, মান্নাদা প্যাট্রিক ইউসুফ হাকিম এবং আজমচাচা বসে বসে কত রাত পর্যন্ত গল্প করতেন। আমার কিন্তু সব মনে আছে।'

ইলিয়ট রোডের মহামেডান স্পোর্টিং মেসের দোতলায় নিজের বিছানার ওপর বসে সদ্য চোট-খাওয়া একটা পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে অধিনায়ক লতিফুদ্দিন স্মৃতিচারণ করছিলেন। দেখলাম সবই হুবহু মনে আছে। হায়দরাবাদে সন্তোষ ট্রফি চলার সময় আমার আবিদ রোডের আস্তানা থেকে বেরিয়ে, তাজমহল হোটেলকে বাঁয়ে রেখে একটু গলির ভেতর ঢুকে লতিফুদ্দিনের আব্বাজান ভারত-বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় মঈন সাহেবের বাড়ী বারকয়েক গেছি বৈকি।

একটু গুছিয়ে বসে মেস-বয়কে চায়ের অর্ডার দিয়ে লতিফুদ্দিন আবার মুখ খুললেন—'আমাদের হায়দরাবাদের সৈয়দ ফ্যামিলি হচ্ছে পুরোপুরি—ফুটবল ফ্যামিলি। ইচ্ছে হলে যে-কোন সময় আমরা একটা ভাল টিম খাড়া করতে পারি। আমার বাবা মঈনুদ্দিন ১৯৫২ সালে হেলসিংকি বিশ্ব অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, আমি জন্মেছি তার এক বছর বাদে, নভেম্বর মাসে। ভাই সওকত খেলেন সাউথ সেন্ট্রাল রেলে।

'আচ্ছা লতিফ, কোলকাতা তোমায় টানলো কেমন করে?'

'সে-কথা আর বলবেন না। আজমচাচা (হাবিব, আকবরের দাদা) আর

প্রখ্যাত প্রশিক্ষক মহম্মদ আব্বাজানকে বোঝালেন যে, কলকাতার মাঠে ফুটবল না খেললে ফুটবল খেলাই হোল না। মা গোড়ার দিকে কান্নাকাটি করলেও, হায়দরাবাদের পুলিশ ইনসপেকটর আব্বাজানের অনুরোধে রাজী হয়ে গেলেন।

ছোটবেলায় আব্বাজানই আমাকে হাত ধরে ফুটবল মাঠে নামিয়ে দেন। তখন আমি সিটি কলেজিয়েট স্কুলের নীচু ক্লাসের ছাত্র। সীটে বসলে মাথাটা হাইবেঞ্চ পর্যন্ত উঠতো না। ছোটবেলার কথা বলতে বলতে লতিফুদ্দিন হঠাৎ যেন ছোট্টটি হয়ে গেল। চলে গেল আবার ঘরের কথায়। নিজের মায়ের কথায়।

'কি যেন বোলছিলাম?' লতিফুদ্দিনের প্রশ্ন। ১৯৭১ সালে খেললাম মহামেডান স্পোর্টিংয়ে। ৭২-এ গেলাম ইস্টবেঙ্গলে। পরের বছর আবার ফিরে এলাম পুরোনো ক্লাবে। এখনও আছি। ১৯৭৩ সালে কোচিনে জাতীয় সিনিয়ার ফুটবল প্রতিযোগিতায় (সন্তোষ ট্রফি) বাংলা দলে নির্বাচিত হয়েছিলাম। গিয়েছিলামও। ১৯৭৪ সালে ব্যাংককে এশীয় যুব ফুটবলে যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। ফাইনাল খেলাটি আমার এখনও চোখের সামনে ভাসছে। ওঃ কি থ্রিলিং। খেলার কি মেজাজ। প্রথমে নেমেই ইরাণ গোল দিলে। শোধ করলাম আমি। বাড়তি সময়ে সাবির আলির গোলে আমরা এগিয়েও গেলুম কিন্তু নসিব খারাপ। খেলা ভাঙার দেড় মিনিট থাকতে বকেয়া গোল ইরাণ শোধ করে দিলো। আমরা যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন হলেও এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে, ইরাণী ছেলেদের স্ট্যান্ডার্ড আমাদের চেয়ে অনেক অনেক ভাল। যেমন ট্যাকলিং রিসিভিং, পাসিং কভারিং, তেমনি সুটিং। গায়ে-গতরে আমাদের সংগে ওদের তুলনাই হয় না। কি চেহারা, কি স্ট্যামিনা।'

অণু চৌধুরী
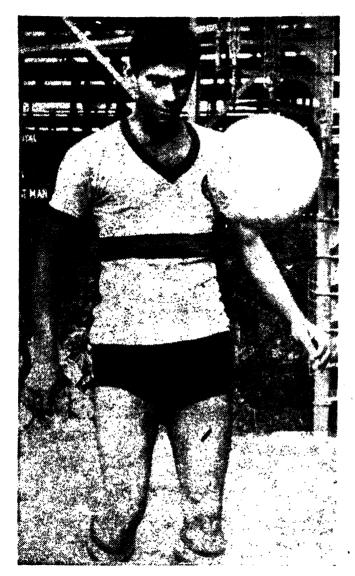
'রং বদলাবার মরশুমে হঠাৎ আমরা যে রকম ভারী ইজ্জতওয়ালা পুরুষ (ভি আই পি) বনে যাই, সারা জীবন নয়, গোটা কয়েক বছর একটানা যদি তাই থাকতে পারতুম! আঃ আরাম, কি আপ্যায়ন। সবাই মিলে কত আদর, কত খাতির। অণু কি খাবি বল, অণু কি পরবি বল, চিয়ার আপ মাই বয়। আরও কতো কি?'

'কলকাতা ময়দানের সাম্প্রতিক হালচালের ছবি এঁকে অণু যেন বোঝাতে চেষ্টা করছিল, রঙ্গমঞ্চ বা ছায়াছবির নায়ক-নায়িকার মত ফুটবল খেলোয়াড়ও একদিন কা সুলতান। দলের স্বার্থ ষোল আনা পূরণ করতে পারলে তুমি রাজা, রাজ-রাজেশ্বর। না পারলে?'

না পারলে কি? পরিষ্কার করেই বলুন না? কিছু যেন গোপন করতে চাইছেন? মনের ভেতর কিছু যেন গুমরোচ্ছে থেকে থেকে। অভিযোগ কার বিরুদ্ধে? আমি শুধোই। না না কারও বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই, কোন অনুযোগ নেই—জানায় অণু চৌধুরী।

অণু চৌধুরীকে গড়ের মাঠে আজ কে না চেনেন? কালো, লম্বা, শক্ত-সমর্থ স্ট্রাইকার। সাম্প্রতিক ডেরা এরিয়ান্সে। মাঠে নেমে পরিশ্রমে ফাঁকি দেন না, যেটুকু শিখেছেন বিশ্বস্ততার সঙ্গে সেটুকু কাজে লাগাবার চেষ্টা করেন। চেষ্টা করেন নিজে খেলতে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পাশের আর সবাইকে খেলাতে। স্ট্রাইকার হওয়ার মত পায়ে সট আছে, আছে প্রচণ্ড ড্যাসও। সুতরাং কাল অথবা পরশু অণু চৌধুরী যদি ফুটবলের শিরোনাম হন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না—বরঞ্চ সেটাই হবে একান্ত প্রত্যাশিত।

অণু গড়ের মাঠের হালচাল, গতিবিধি দেখে খুব খুশি না হলেও এখনও যথেষ্ট আশাবাদী। অণুর বক্তব্য: 'ফাঁকি দিয়ে তো কলকাতার মাঠে এসে দাঁড়াই নি। কষ্ট করেছি, খেলা শেখার চেষ্টা করেছি এবং করছি, সুতরাং পরিশ্রম আর নিষ্ঠার ফল একদিন না একদিন পাবোই। আমি আশাবাদী, কিছুটা স্বপ্নাদর্শীও বলতে পারেন।'

সহজ, সরল, সবল ছেলে অণু। এত সারল্যকে যে এখনও জিইয়ে রাখতে পেরেছে তা বোধহয় গাঁয়ের ছেলে বলেই। হঠাৎ কথা বললে কেমন যেন একটু রুক্ষু রুক্ষু মনে হয়, কিন্তু কিছুক্ষণ কাছে থাকলেই ধরা পড়ে অণুর মনটা একেবারে কাদার মত নরম।

কলকাতা সিনিয়ার ডিভিসন ফুটবলে অণুর প্রথম প্রকাশ উয়াড়ীর মাধ্যমে। বলা বাহুল্য উয়াড়ীতে থাকার সময় সে বাঘাদার পালিশ পেয়েছে, পরিচর্যা পেয়েছে সত্য সোমের। উয়াড়ী থেকে পোর্ট কমিশনার্সে। সেখানে নিখিলদার কোচিং, তারপর বি এন আর-এ দেবু ঘোষ, বলরাম ও অরুণদার ট্রেনিং। অণু জানান: 'দেবুদা বলরামদা, নিখিলদা, অরুণদার প্রশিক্ষণে ফুটবল সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা হোল আমার। বি এন আর থেকে রাজস্থানে। সেখানে প্রশিক্ষক হিসেবে পেলাম ফেনকে। বড্ড ভালমানুষ। ডিফেন্সের প্লেয়ার হলে হবে কি, অফেন্সের স্ট্র্যাটিজি ওঁর নখদর্পণে। রাজস্থানে থাকার সময়ই সুযোগ পেয়ে গেলাম জাতীয় ফুটবলে অংশগ্রহণকারী বাংলাদলে গত বছর। বেড়ালের ভাগ্যে অবশ্য শিকে ছেঁড়েনি, খেলতে পাইনি একদিনও কোচিনে। অবশ্য না পাওয়ার কারণ আছে। যাঁরা খেলেছেন তাঁরা সব্বাই নিঃসন্দেহে যোগ্যতর।

এবারে খেলছি এরিয়ান্সে। তরুণ বাঙ্গালী ছেলেদের নিয়ে এরিয়ান্সের লড়াই করার ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। এরিয়ান্সে এসে অনেক আনন্দ পেয়েছি। নন্টুদা (অশোক মিত্র), শচীনদা, বীরেনদা, রামদা আর কান্টিদার (এস দে) কাছ থেকে ছোটভাইয়ের স্নেহ, ভালবাসা, যত্ন পাচ্ছি। উৎসাহও পাচ্ছি সব সময়।

অণুর শেষ কথা: 'অনেক ক্লাব, অনেক তাঁবু ঘুরেছি। আর তাঁবু পাল্টাতে মন চাইছে না। রং আর নাই বদলালাম। নাই বা হোলাম একদিনের রাজা?'

বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

দর্শক

ভারত বনাম ইংল্যাণ্ড

প্রথম টেস্ট ক্রিকেট

ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে ভারত বনাম ইংল্যাণ্ডের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ইংল্যাণ্ড ১১৩ রানে জিতে ১৯৭৪ সালের টেস্ট সিরিজে ১—০ খেলায় এগিয়ে রইলো। এই নিয়ে ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে ভারত-ইংল্যাণ্ডের ৬টি টেস্ট খেলার ফলাফল দাঁড়াল : ইংলণ্ডের জয় ৩ এবং খেলা ড্র ৩। বর্তমানে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে এই দুই দেশের টেস্ট খেলার ফলাফল : মোট খেলা ২৩, ইংল্যাণ্ডের জয় ১৬, ভারতের জয় এবং খেলা ড্র ৬।

ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক মাইক ডেনেস টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার দান নেন। বৃষ্টির জন্যে প্রথম দিন পুরো সময় খেলা হয়নি। মাত্র ৬৯ ওভার খেলা হয়েছিল। প্রথমদিনের খেলায় ইংল্যাণ্ড ৪টে উইকেট খুইয়ে ১১৬ রান সংগ্রহ করেছিল। মাত্র ২৮ রানের মধ্যে আবিদ আলী ইংল্যাণ্ডের দুটো উইকেট নিয়ে ইংল্যাণ্ডকে কোণঠাসা করেছিলেন। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে এ্যামিস এবং ডেনেস ৬২ রান তুলে সাময়িকভাবে দলের পতন রোধ করেন।

দ্বিতীয় দিনে ইংল্যাণ্ড তার ১ম ইনিংসের ৩২৮ রানের (৯ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। কিথ ফ্লেচার ১২৩ রান করে অপরাজিত থাকেন। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ফ্লেচারের এটি ৪র্থ সেঞ্চুরী এবং ভারতের বিপক্ষে ২য় সেঞ্চুরী। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ফ্লেচার এবং গ্রেগ ১০৪ রান এবং নবম উইকেটের জুটিতে ফ্লেচার এবং উইলিস ৬৩ রাণ সংগ্রহ করেন। দ্বিতীয় দিনের বাকি ৩৫ মিনিটের খেলায় ভারতের দুটো উইকেট পড়ে মাত্র ২৫ রান ওঠে। ফলে খেলায় ইংল্যাণ্ড যথেষ্ট প্রাধান্য বিস্তার করে।

তৃতীয় দিনে ভারতের ১ম ইনিংস ২৪৬ রানের মাথায় শেষ হয়—ইংল্যাণ্ডের ১ম ইনিংসের ৩২৮ রানের (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) থেকে ৮২ রান কম। ভারতের পক্ষে পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়েছিলেন গাভাস্কার (১০১ রান), বিশ্বনাথ (৪০ রান) এবং আবিদ আলী (৭১ রান)। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে গাভাস্কার এবং বিশ্বনাথ ৭৩ রান এবং ৮ম উইকেটের জুটিতে গাভাস্কার এবং আবিদ আলী ৮৫ রাণ তুলে দেন। গাভাস্কার নিজস্ব ১০১ রানের মাথায় রানআউট হন। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁর এটি ৫ম সেঞ্চুরী এবং ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১ম সেঞ্চুরী। বিশ্বনাথ তাঁর ১ম ইনিংসের ৪০ রানের মধ্যে ৩৮ রান করে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁর হাজার রান পূর্ণ করেন। তাঁকে নিয়ে ১৯জন ভারতীয় খেলোয়াড় টেস্ট ক্রিকেটে ১০০০ রান পূর্ণ করেছেন। আবিদ আলীর আক্রমণাত্মক ব্যাটিং খেলার যথেষ্ট প্রাণ সঞ্চার করেছিল। তৃতীয়দিনের বাকি সময়ের খেলায় ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসের একটা উইকেট খুইয়ে ১৮ রান সংগ্রহ করেছিল।

চতুর্থ দিনে চা-পানের ২০ মিনিট আগে জোর বৃষ্টি পড়ায় খেলা বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় ইংল্যাণ্ডের ২য় ইনিংসের রান ছিল ২১৩ (৩ উইকেটে)। এইদিন বৃষ্টির দরুন খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি। জন এডরিচ ১০০ রান করে অপরাজিত থাকেন। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁর এটি একাদশ সেঞ্চুরী। অপরদিকে

ভারত বনাম ইংল্যাণ্ডের প্রথম টেস্টের চতুর্থ দিনে আবিদ আলীর বলে ডেরেক আণ্ডারউড উইকেটরক্ষক ফারুক ইঞ্জিনীয়ারের হাতে ধরা পড়েছেন।

ভারতের বিপক্ষে প্রথম সেঞ্চুরী। অপর ৩য় উইকেটের জুটিতে এমিস এবং এডরিচ দলের ৭৪ রান তুলেছিলেন এবং অসমাপ্ত ৪র্থ উইকেটের জুটিতে এডরিচ (১০০ রান) এবং অধিনায়ক মাইক ডেনেস (৪৫ রান) ১০৫ মিনিটে দলের ১০৯ তুলে দেন। তাঁরা ভারতীয় স্পিন বোলারদের বল পিটিয়ে ছাতু করে দিয়েছিলেন।

পঞ্চম অর্থাৎ খেলার শেষদিনে ইংল্যান্ড তাদের ২য় ইনিংস খেলতে নামেনি। আগেরদিনের ২১৩ রানের (৩ উইকেটে), মাথায় তারা খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। খেলায় জয়লাভের জন্যে ৬ ঘন্টায় ২য় ইনিংসে ভারতের ২৯৬ রান করার প্রয়োজন ছিল। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই কিন্তু ভারতের ২য় ইনিংস ১৮২ রানের মাথায় শেষ হয়। ফলে ইংল্যান্ড ১১৩ রানে জিতে যায়। শোচনীয় ব্যাটিং বিপর্যয়ই ভারতের এই পরাজয়ের কারণ। ভারতের ২য় ইনিংসে গাভাস্কার (৫৮ রান) এবং বিশ্বনাথ (৫০ রান) যা খেলেছিলেন। ভারতের পক্ষে এই খেলা অন্ততঃ ড্র করা মোটেই শক্ত ছিল না। ভারতের স্পিন বোলিংয়ের ধারও যথেষ্ট কমে গেছে। প্রধানতঃ এই স্পিন বোলিংয়ের দৌলতেই [illegible] নিকটে ভারত উপর্যুপরি তিনটি টেস্ট সিরিজে বাবার জয়ী হয়—১৯৭০-৭১ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১—০ খেলায় (ড্র ৪), ১৯৭১ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১—০ খেলায় (ড্র ২) এবং স্বদেশের মাটিতে ১৯৭২-৭৩ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২—১ খেলায় (ড্র ২)। উপর্যুপরি এই তিনটি টেস্ট সিরিজে বাবার জয়ের সূত্রেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আসরে ভারত প্রথম সারিতে আসন পেয়েছিল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ইংল্যান্ড : ৩২৮ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ডেনিস অ্যামিস ৫৬ কিথ ফ্লেচার অপরাজিত ১২৩ এবং টনি গ্রেগ ৫৩ রান। আবিদ আলি ৭৯ রানে ৩, মদনলাল ৫৬ রানে ২, বেদী ৮৭ রানে ২ এবং চন্দ্রশেখর ৫৫ রানে ২ উইকেট)।

ও ২১৩ রান (৩ উইকেটে ডিক্লেঃ। জন এডরিচ অপরাজিত ১০০ ডেনিস অ্যামিস ৪৭ এবং মাইক ডেনেস অপরাজিত ৪৫ রান। আবিদ আলী ৩১ রানে ১, সোলকার ২৪ রানে ১ এবং বেদী ৫৮ রানে ১ উইকেট)।

ভারত : ২৪৬ রান (সুনীল গাভাস্কার ১০১ বিশ্বনাথ ৪০ এবং আবিদ আলি ৭১ রান। উইলিস ৬৪ রানে ৪ এবং হেনড্রিক ৫৭ রানে ৩ উইকেট)।

ও ১৮২ রান (গাভাস্কার ৫৮ এবং বিশ্বনাথ ৫০ রান। ক্রিস ওল্ড ২০ রানে ৪ এবং গ্রেগ ৩৫ রানে ৩ উইকেট)।

বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা

পশ্চিম জার্মানীতে দশম বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা গত ১৩ জুন আরম্ভ হয়েছে। ১৬টি বাছাই দেশ নিয়ে পশ্চিম জার্মানীর ৯টি শহরে এই চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলার আসর বসেছে। ফাইনাল খেলা হবে ৭ই জুলাই মিউনিখ শহরের অলিম্পিক স্টেডিয়ামে। পশ্চিম জার্মানীতে ১০ম বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার এই চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা তিনটি রাউন্ডে হবে—১ম ও ২য় রাউন্ডের খেলা হবে লীগ প্রথায় এবং ৩য় রাউন্ডের খেলা নক-আউট প্রথায়। প্রথম রাউন্ডের লীগের খেলায় ১৬টি দেশ চারটি গ্রুপে সমান ভাগ হয়ে খেলবে এবং প্রতি গ্রুপের ১ম ও ২য় স্থান অধিকারী দেশ পরবর্তী ২য় রাউন্ডে খেলবার যোগ্যতা লাভ করবে। দ্বিতীয় রাউন্ডের লীগের খেলায় ৮টি দেশ দুটি গ্রুপে সমান ভাগ হয়ে খেলবে এবং এই দুই গ্রুপের ১ম স্থান অধিকারী দেশই ফাইনালে খেলবে। প্রতিযোগিতার ৩য় ও ৪র্থ স্থান নির্ণয়ের জন্যে এই দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলায় ২য় স্থান অধিকারী ২টি দেশের মধ্যে খেলা হবে।

১৯৭৪ সালের এই ১০ম বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী দেশের সংখ্যা ছিল ৯৮। এর মধ্যে ১৯৭৪ সালের প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা পশ্চিম জার্মানী এবং গতবারের বিশ্ব ফুটবল কাপ বিজয়ী ব্রাজিল প্রতিযোগিতার প্রথামত সরাসরি পশ্চিম জার্মানীর চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। কিন্তু বাকি দেশগুলিকে তাদের ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী বাছাই পর্বের আঞ্চলিক লীগের খেলায় অংশ গ্রহণ করতে হয়েছিল। এই বাছাই পর্বের আঞ্চলিক খেলায় শেষ পর্যন্ত এই ১৪টি দেশ পশ্চিম জার্মানীর চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে : ইউরোপীয় অঞ্চলের পূর্ব জার্মানী ইতালী পোল্যান্ড, স্কটল্যান্ড যুগোশ্লাভিয়া হল্যান্ড সুইডেন এবং বুলগেরিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের উরুগুয়ে আর্জেন্টিনা এবং চিলি; উত্তর মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান দ্বীপ অঞ্চলের হাইতি, আফ্রিকা অঞ্চলের জাইরে এবং এশিয়া-ওশেনিয়া অঞ্চলের অস্ট্রেলিয়া। এই ১৪টি দেশের মধ্যে চারটি দেশ অস্ট্রেলিয়া, পূর্ব জার্মানী, [illegible] এবং জাইরে বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ে এই প্রথম খেলছে। এই চূড়ান্ত পর্যায়ে সর্বাধিকবার খেলার রেকর্ড (দশবার) ব্রাজিলের। এপর্যন্ত এই [illegible] দেশ বিশ্ব ফুটবল কাপ জয়ী হয়েছে— ব্রাজিল তিনবার, উরুগুয়ে দুবার, ইতালী দুবার পশ্চিম জার্মানী একবার এবং ইংল্যান্ড একবার। এই পাঁচটি বিশ্ব ফুটবল কাপ বিজয়ী দেশের মধ্যে ১৯৭৪ সালে চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠেছে এই চারটি দেশ, ব্রাজিল উরুগুয়ে ইতালী এবং পশ্চিম জার্মানী। ১৯৬৬ সালের বিশ্ব ফুটবল কাপ বিজয়ী ইংল্যান্ড চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় উঠতে পারেনি। ইউরোপীয় জোনের ৯নং গ্রুপে চ্যাম্পিয়ান রাশিয়া বনাম দক্ষিণ আমেরিকার চিলির খেলা উপলক্ষ করে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক আসর বেশ সরগরম হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত এনিয়ে জল বেশীদূর গড়ায়নি। রাশিয়া রাজনৈতিক কারণে চিলির মাটিতে খেলতে রাজী হয়নি। তারা চিলি ছাড়া অপর কোন দেশের মাটিতে খেলতে চেয়েছিল, কিন্তু আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশন রাশিয়ার এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করায় রাশিয়া [illegible] খেলতে আসেনি। ফলে চিলি ওয়াক-ওভার পেয়ে পশ্চিম জার্মানীর চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলবার অধিকার লাভ করে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সম্পাদক ◎ তুষারকান্তি ঘোষ

অমৃত

[১৪ বর্ষ ১ সংখ্যা] শুক্রবার, ২০ আষাঢ়, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ [মূল্য ৫

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরত পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মনিঅর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫.০০	টাকা ৩০.০০
ষান্মাসিক	টাকা ১২.৫০	টাকা ১৫.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬.২৫	টাকা ৮.০০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১৪শ বর্ষ

৯ সংখ্যা
মূল্য ৫০ পয়সা

"ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ন নিউজ
পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 5th July, 1974 শুক্রবার, ২০ আষাঢ়, ১৩৮১ 50 Paise

সূচীপত্র

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক

সম্পাদকীয়

সিকিমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

সিকিমের চোগিয়াল দেশের গণতান্ত্রিক সংবিধান গ্রহণের পথে বাধা দেবার চেষ্টা করে ভুল পথে নিজেকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। সিকিম ভারতের আশ্রিত কিন্তু অঙ্গরাজ্য নয়। তার জনসাধারণের ভালমন্দ দেখার দায়িত্ব ভারতের। তার নিরাপত্তার পূর্ণ দায়িত্বও। সিকিমের ভৌগোলিক অবস্থান এই দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। গত বৎসর এপ্রিলে সিকিমে জনগণের এক বিরাট অভ্যুত্থান হয়। সেই অভ্যুত্থান ছিল সিকিমের রাজতন্ত্রের অগণতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে। সিকিম কংগ্রেস ছিল তার সংগঠক। সেই অভ্যুত্থানের সময় চোগিয়ালের আমন্ত্রণেই ভারত সরকার সিকিমের আইন ও শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব নিজের হাতে গ্রহণ করেন। সিকিমের চোগিয়াল রাজী হন শাসন সংস্কারে। জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী রচিত হয় সিকিমের প্রথম গণতান্ত্রিক সংবিধান। চোগিয়াল এই সংবিধানে সম্মতি দেন। কিন্তু সিকিম বিধানসভার প্রথম অধিবেশনে যখন সংবিধান গ্রহণের কথা সে সময় তিনি তাঁর প্রাসাদরক্ষীদের নিয়ে অধিবেশনে বাধা দেন। বলা বাহুল্য তিনি সফল হননি। কিন্তু তাঁর এই বাধা দেবার চেষ্টার পেছনে যে মানসিকতা কাজ করছিল তা নিঃসন্দেহে মারাত্মক এবং নিন্দনীয়। তিনি অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়েও কার পরামর্শে কিংবা কী দুরাশায় এমন কাজ করতে গেলেন বোঝা দুষ্কর।

ভারত সরকার স্বভাবতই এতে উদ্বিগ্ন। সিকিমের জনগণ অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছেন। বিধানসভার বত্রিশটি আসনের মধ্যে একত্রিশটি আসন সিকিম কংগ্রেসের দখলে। এই সংবিধান তাঁরা একবাক্যে অনুমোদন করেছেন। জনসাধারণের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে চোগিয়াল যদি কিছু করতে যান তাহলে তিনি প্রকাণ্ড ভুল করবেন। সংবিধানে তাঁকে নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তাঁর মানমর্যাদা ও ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা কোনোটার ওপরেই হাত দেওয়া হয়নি। বিধানসভায় গৃহীত বিল তাঁর কাছেই যাবে অনুমোদনের জন্য। যদিও সে বিল একবারের জন্য তিনি পুনর্বিবেচনার জন্য বিধানসভায় পাঠাতে পারবেন না দ্বিতীয়বার গৃহীত বিল অনুমোদন তাঁর পক্ষে আবশ্যিক। কোনো বিল তিনি ভারত সরকারের বিবেচনার জন্য পাঠাতে পারেন। এ ক্ষেত্রে ভারত সরকারের সিদ্ধান্তই হবে শেষ কথা। ভারত সরকারের ওপর সিকিমের জনসাধারণ আরও অনেক ক্ষমতা অর্পণ করেছে। ভারত সরকার মনোনীত চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসারই হবেন সর্বময় কর্তা। বিধানসভার স্পীকারের দায়িত্ব পালন করবেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্য অনুমোদনের ক্ষমতাও তাঁরই। স্পষ্টতই বোঝা যায় সিকিমের জনসাধারণ ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কের পক্ষপাতী। ভারতের গণতান্ত্রিক সমাজের অংশীদার হতে চায় তারা। সামন্ততন্ত্রের নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসার এই আগ্রহ নিঃসন্দেহে অভিনন্দনীয়।

সিকিম বিধানসভার প্রথম অধিবেশনে সংবিধান অনুমোদিত হবার পর সদস্যরা ভারতের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সিকিমকে যুক্ত করার দাবি জানিয়ে প্রস্তাব নিয়েছেন। ভারতীয় নাগরিকদের সমান অধিকার তাঁরা চান। ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকার সিকিমে প্রবর্তনের দাবিও জানিয়েছেন তাঁরা। সিকিমের জনগণের এই গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার প্রতি ভারতের জনসাধারণের পূর্ণ সমর্থন ও শুভেচ্ছা রয়েছে। হিমালয়ের বুকে এই রাজ্যটি এতকাল ছিল লোকচক্ষুর আড়ালে। তার প্রতিবেশী ভূটান আজ এগিয়ে চলেছে। সেখানকার রাজতন্ত্রও জনগণের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে যুগের দাবি মেনে নিয়েছে। সিকিমের অগ্রগতিতে আজ ভারতের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল। যাঁরা এখনও সিকিমের এই গণতান্ত্রিক পরিবর্তন মেনে নিতে দ্বিধা করছেন তাঁরা আশা করি নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে নিরস্ত থেকে বিরত হবেন। সিকিমের জনসাধারণ বহু সংগ্রামের পর যে অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে তার ওপর হস্তক্ষেপ তারা কোনো রকমেই সহ্য করবে না। ভারত সরকারকে এই গ্যারান্টি দিতে হবে।

জননী

শান্তনু দাস

ঠিক সময়ে ট্যাক্সি পাওয়া এবং এই হরিবল জ্যাম পেরিয়ে ট্রেন ধরা একটা ভিক্টরী। রাবিশ। সারা পৃথিবীর উপর বিরক্তি নিয়ে ভদ্রলোক এক সময় ঘাড়ে গলায় মুখে ঘাম ঘষার মতো রুমাল বোলালেন। এই ফাল্গুনের গরমেই ভদ্রলোক ঘেমে নেয়ে অতি কষ্টে এ কামরায় সস্ত্রীক সেঁধিয়ে যেন আমাদেরই অপরাধী করে তুললেন। এই সময় বসন্ত উৎসবের ভিড়, জায়গা পাওয়া যায়? কিন্তু দেখেছি পৃথিবীতে এক ধরনের মানুষ আছেন, যাঁরা ঠিক সময় ঠিক মতোনই এসে যান, জায়গাও পেয়ে যান, আবার সমস্ত পৃথিবীকে অবজ্ঞাও করেন। ভদ্রলোককে দেখে সে রকম এক-জনই মনে হল।

নিখুঁত পোশাকের এই জুটি সম্বন্ধে অনেকেই শশব্যস্ত হল। মিথ্যে বলবো না আমিও যে একেবারে নিশ্চুপ ছিলুম, তাও নয়, বিশেষ করে ভদ্রমহিলার বুকে লেপ্টে থাকা ফুটফুটে এই এইটুকু একটা ছেলের জন্যে, কতই বা বয়স হবে, জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না। তবে মাস দুয়েকের বেশী তো নয়ই? নিশ্চয়ই না। এই এতটুকু একটা বাচ্চা নিয়ে কেউ বেরোয়? কি জানি, হয়তো এমন কিছু জরুরী কাজ আছে। কামরার এই গরমে ভদ্রমহিলা এবং বাচ্চাটির চোখ-মুখ লাল।

ট্রেন চলেছে শান্তিনিকেতনে।

বেশীর ভাগ যাত্রীই বসন্ত উৎসবের। আমিও। কলকাতার হাজার কাজকর্মের ঝামেলা মিটিয়ে সব সময় চলে আসা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই এভাবেই কোনো না কোনো কাজের অছিলায় প্রায় পালিয়ে আসতে হয়। যেন লুকোচুরি খেলা। ভালোই

মাঝে মাঝে এই খেলায়। এবার একটু ...ন্তি হয়ে যাচ্ছি, তাই মনটাও হালকা ...কর মতো। আকাশ বাতাস সব কিছুই ...য়ে দুপুরেও মনে হচ্ছে ছুটি ছুটি।

সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য জানিনে, ভদ্রলোক ...বলার জন্যে আমাকেই নির্বাচিত ...ন। তার মানে এই কামরার মধ্যে আমি ...একজন ঈর্ষণীয় পুরুষ। এই ভাগ্য ...কাউকে দিতে পারলে পরম নিশ্চিন্ত ...করতুম কিন্তু উপায়হীন। ক্রমাগত ...কের প্রশ্নবাণে আমি জর্জরিত। ভদ্র-...া পুরোপুরি শাহরিক বলে মনে হচ্ছিল ...কারণ স্লিভলেস, লোকাট জামা, বা ...ল ধরনের ঢিলেঢালা শাড়িটাড়ী শরীরে ...লেও হাতে গয়নাগাঁটির সঙ্গে একটা ...কে ঘড়ি দেখে মনে হল, ভদ্রমহিলা ...া খানিকটা পৌঁছেছে আছেন। তবে ইনি ...ী-গর্বে বেশ গর্বিতা। এবং এই ভদ্র-...ক ও উপর্যুপরি সেই রকম গর্ব করার ...কথা আমায় শুনিয়ে যাচ্ছিলেন। ...শ থেকে চোখ নামালাম মাটিতে। ...রম ভদ্রমহিলা সুন্দরী, অন্তত আমার ...খ তো তাইই মনে হল। ও'কে আরো ...সুন্দরী করেছে ও'র বুকে লেপটে-...া এই শিশু। টুকটুকে লাল জামা গায়ে। ...লের উপরে রাখা আলতো করে ছোঁয়ানো ...চুল। কপালে ছোট্ট এক টিপ। কাজলের। ...লোক ওর গায়ে ঠেসে ঠুসেই বসে ...ছেন। হাতে একটা দুধভর্তি ফিডিং বোতলের ব্যাগের সঙ্গে রেকসিনের ঝোলানো হাতব্যাগ। সবকিছু সামলে-সুমলে পকেট থেকে প্যাকেট বের করে ফস করে একটা সিগ্রেট জ্বালিয়ে ঠোঁটের কোনায় আলতো করে ঝুলিয়ে আমার দিকে ধোঁয়া ছুঁড়ছি-লেন, সেই সঙ্গে শব্দ। ইচ্ছে করছিল না মোটেই উত্তর দিতে। তবু ভদ্রতা করতে হল। শুনলুম—ভদ্রলোকের শ্বশুরালয় বেলপুরে। স্ত্রীকে বেশ কিছুদিনের জন্যে রেখে দিতে যাচ্ছেন। এই ফাঁকে বসন্ত উৎসবটাও দেখে আসা যাবে। ওটা নাকি এর আগে কখনো দেখা হয়ে ওঠেনি। ইচ্ছে করছিল উত্তর না দিতে। জানালার ওপারে তাকালুম, চোখ ছড়িয়ে দিলুম সমুদ্রের দিকে। দেখছিলুম—কেমন করে অজস্র জনতার উত্তাল ঢেউ ঝুপঝাপ করে বারবার আছড়ে পড়ছে কামরার দরজায়। তার সঙ্গে পানকৌড়ির মতো ফেরিঅলার মাথাগুলো ডুবে ভেসে, ডুবে ভেসে একসময় কখন টুপ-টাপ করে মিশে যাচ্ছে। ট্রেন এখনো শেডের তলায়। সময় অনেক পেরিয়ে গেছে। এমনতো হয় না। আলো, অন্ধকার গরম, ঘাম আর চীৎকার, অসহ্য ভ্যাপসা ভিড়ের মধ্যেও কখনো জানলা গলে ছুঁয়ে যাচ্ছে রোদ্রের গন্ধ নিয়ে বাতাস। শিশুটি সে স্বাদ পাচ্ছে না, পাবার কথাও নয়, কারণ আগাপাছ-তলা তার ঢাকা। অসহ্য আড়মোড়ায় বারবার তার শরীর দুলে উঠছে। ভদ্রমহিলাও যেন ক্লান্ত। হয়তো কতো রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি ওর চোখের পাতায়। বাইরে থেকে পোশাক আসাক পেলে আর কতটুকুই বা ঢাকা যায়।

ভদ্রমহিলাও তার অসোয়াস্তির কথা বুঝতে পারছেন, কিন্তু কিছু করার নেই, বারবার ছেলের দিকে একান্ত মনোনিবেশ ছাড়া। একসময় জিজ্ঞেস করলেন—কটায় ছাড়ার কথা। ভদ্রলোক এবার অসহিষ্ণু, বারবার মণিবন্ধে বাঁধা সময়ের দিকে চোখ রাখছেন। ফস করে ধোঁয়া ছেড়ে বাইরে তাকাচ্ছেন, আর আমায় জিজ্ঞেস করছেন। হাজার অভিযোগ। আমার কিই বা করার আছে। একটু হেসে বললুম—কখন ছাড়বে, সে কি ঈশ্বরও বলতে পারেন? আর ট্রেনতো! গড়িমসি করার মধ্যে যেন একটা অহঙ্কার লুকিয়ে আছে।—সত্যি কি সিস্টেমের মধ্যে যে আমরা বাস করছি, বলেই আবার সিগ্রেটে সুউপ করে একটা টান দিলেন। ধোঁয়াটা খানিকটা গলায় গিয়ে বাকিটা হুড়হুড় করে নাক দিয়ে বেরিয়ে এলো।

ডাঁই করা মাছের গাদার মতো মানুষ নিয়ে অবশেষে ট্রেন ছাড়লো। গরম যেন বাষ্প হয়ে ঢুকছে, বেরুচ্ছে। একবার মনে হল এ ট্রেনে না এলেই যেন হত। বরঞ্চ রাতের ট্রেনটা আরো ভালো ছিল। ভদ্র-লোকও উত্তরোত্তর চটছেন। চটছেন গরমের বিরুদ্ধে, সিস্টেমের বিরুদ্ধে, সময়ের বিরুদ্ধে। ভদ্রমহিলার সমস্ত ক্লান্তি চোখ-মুখ শরীরে ভর করেছে। টুকটুকে শিশুটিকে এপাশ ওপাশ করছেন বারবার।

আর ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিয়মিত রুটিনে—বিমলদার চানাচুর লজেন্স হজমী পেন থেকে শুরু করে দাঁতের মাজন, চ্যবনপ্রাশ, ধূপের বাণ্ডিল—চীৎকার করে উঠলো একই সঙ্গে কামরার বুকে।

এবং এই সময়ে কামরার ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এলো পাগলী ভিখিরীটা। ক্রমশঃই ভিড় বেড়ে চলেছে। বাচ্চাটার চোখমুখ লাল। ওকে একটু শুদ্ধ বাতাস দেয়া দরকার। পৃথিবীতে একটুও বাতাস নেই? ভদ্রমহিলা হয়তো তাই ভাবছেন।

ঠিক এমন সময় এই ভিখারিণী কাঁখে ছেলে নিয়ে হাত পাতলো ভদ্রলোকের দিকে। —ওবাবা, তোমার দুটো পায়ে পড়ি বাপ, দশটা নয়া দে রে, কাল থেকে বাচ্চাটা কিছু খায়নি। দুটো মুড়ি খাবো।

ঃ মাফ করো।

—ও বাবা, দশটা পয়সা দে বাপ।

ঃ যা শাল্লা ভাআগ্...। ভিখিরী নড়লো না। উবু হয়ে পায়ের জুতো ধরলো।—যা শালা, যাঃ।

—ও বাবা। এবার উবু হয়ে ভিখিরী ভদ্রলোকের পাটভাঙ্গা ধবধবে প্যান্টশুদ্ধ পাটা জড়িয়ে ধরলো। শাদা প্যান্টে ভিখিরীর প্যাঁচ-প্যাচটা আঙুলের আলতো ছাপ।—শাল্লা শুয়োরের বাচ্চা। যা ভাআগ।

—ও বাবা, তোকে ভগবান দেখবে রে। ভিখিরীর কথার শেষটুকু শেষ হওয়ার আগেই উবু শরীটাকে পা দিয়ে সজোরে সরিয়ে দিলেন ভদ্রলোক। অতজোর সইবার ওর শক্তি কোথায়। ছেলেকে নিয়েই হুমড়ি খেয়ে পড়লো সিটের আরেক পাশে। এটা এমন কিছু ব্যাপার নয়। ভিড়ের কেউ কেউ একবার আড়চোখে তাকালেও এই ছোটলোকের সপক্ষে মন্তব্য করার প্রয়োজন মনে করলো না। হাত দিয়ে গায়ের ধুলো ঝেড়ে প্রতিবাদহীন জননী একবার তাকালো শুধু মা বাচ্চাটার দিকে, তারপর কখন করিডরের মধ্যে মিশে গেল।

ট্রেন চলেছে শান্তিনিকেতনে।

বাইরে গরম, কামরায় ভিড়, স্টেশন একের পর এক পেরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। বর্ধমান আসবার কিছু আগে এগিয়ে একটা ছোট স্টেশনে ট্রেনটা হঠাৎ থেমে একটা বিরাট বুনো জন্তুর মতো হাঁপাতে লাগলো। কি ব্যাপার? কি হল? এখানে তো ট্রেন থামে না। কচ্ছপের মতো সার সার মুণ্ডুগুলো জানলা দিয়ে ঢুকছে বেরুচ্ছে। শোনা গেল কোন এক লোকোকর্মী নাকি এক কর্মচারীর ব্যাপারে ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত এ লাইনের সমস্ত ট্রেনের চাকা বন্ধ। জঙ্গলে, তাহলে কি হবে। কোথায় যাবো, কিভাবে যাবো, কখন মিটবে......? হাজারো শব্দ ট্রেনের ছাদে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসতে লাগলো। এক পাও এগুলো না ট্রেন। জন্তুটাও এখানে কাঁফাতে খানিকটা বিশ্রাম নিচ্ছিল। ভিড় ঠেলাঠেলি, দরজায় যাওয়া-আসা, অসহ্য চীৎকার, ঘাম গরমে ভদ্রমহিলা কখন এক সময় নিস্তেজ হয়ে ঢলে পড়লেন। হাত থেকে খালি ফীডিং বোতলটা আছড়ে পড়লো কামরায়। ভাগ্যি ভালো, ভদ্রলোকের চোখে পড়েছিলো। বাচ্চাটাকে উনি ধরে ফেললেন। ভিড় দ্রুত খানিক জায়গা করে দিল আমারই আসনে, জানলার ধারে। কিন্তু এতক্ষণ বাচ্চাটাকে কেউ লক্ষ্য করেনি। হঠাৎ ভদ্রলোক সমস্ত বেশবাস, আভিজাত্য ছিঁড়ে চীৎকার করে উঠলেন—সোনা। সোনামনি বাপী। ততক্ষণে বাচ্চাটা আরো নিস্তেজ, ঘন ঘন আড়মোড়া ভাঙছে চোখমুখ লাল নিঃশ্বাস দ্রুত। দ্রুততর।

ভিড় হটান, মশাই জানলাটা ছেড়ে দিন......।

লোকজন খুব একটা সরছে না, বরঞ্চ ভিড় বাড়ছে। ভদ্রলোক এখন কি করবেন, কি করা উচিত এখন। হঠাৎ কোলের দিকে তাকিয়ে অসহায়ের মতো চীৎকার করে উঠলেন—সোনা...। সোনা তার বাবার বুকে ঢলে পড়েছে। জল...একটু জল ছিটিয়ে দিন ...এখানে কি কেউ ডাক্তার আছেন? হাওয়া ছাড়ুন......, এই দুধের বাচ্চাকে নিয়ে কেউ বেরোয়? ভদ্রলোক কোল ঝাঁকিয়ে ক্রমাগত বলেই চলেছেন, সোনা সোনা, সোনামনি।

কেউ দেখেনি সে ভিখিরীটা ঠেলে কখন সামনে এসে পড়েছে। চোখ পড়ার আগেই নিজের বাচ্চাটাকে পায়ের সামনে রেখে হিংস্র দুহাতে তা ঠেলে ভদ্রলোকের কোল সোনাকে দুহাতে ছিনিয়ে ওয়েয় রেখে কাপড় উদোম সবার সামনেই স্তনের বোঁটাটা দিলেন শিশুর মুখে। সোনা একটু উঠে পরম তৃপ্তিতে মায়ের বুকে রাখলো। গভীর স্নেহে মাথায় বুকে ত হাত বুললো ম্যাডোনা মা।

আর ভিড়েরই গা ঘেঁষে পরম হয়ে আরেক ভিক্ষুকের মতো ত রইলেন একজন। ভদ্রলোক।

পাগল মেয়েটির কোনো ভ্রূক্ষেপ সে তখনো পাগলের মতো শিশুকে জড়িয়ে বলেই চলেছে—সোনা, সোনামনি।

সেকালের সঙ্গীতগুণী

জুড়ির তানপুরা

(১৭)

নের আসরে যেমন দেখা যায়। ষান া, তার দুপাশে কিংবা পিছনে জানপুরা। দুজন সেই দুটি রায় একটানা সুর ছাড়ছেন। নিখুঁত সুরে বাঁধা তানপুরা। একই সঙ্গে সুরের গুঞ্জন তোলে। আর গানের নীরবও হয়ে যায় একসঙ্গে। গানের শুধু নয় নিজেরাও দুটিতে ী। পৃথক অস্তিত্ব তাদের নেই। নপুরা দুটিতে কখনো আলাদা গুঞ্জরণ ওঠে না। আলাদা বাজে রা। আলাদা থামেও না। জুড়ির রা।

ক তেমনি তাঁরাও। শিব ও তি। দুই সহোদর। সবাই বলে— শুপতি। কেউ আবার অসাবধানে করে—শিবা পশুপতি। যেন মরই নাম। যেন জুড়ি তানপুরা। জনের সঙ্গীতজীবন এক হয়ে মিলে আছে। ছেলেবেলা থেকে সঙ্গীতচর্চা ন একসঙ্গে। বড় হয়েও তাই। ও সচরাচর লোকে তাঁদের একই দেখে। দুভাই জুটিতে গান গাইছেন । সুন্দর স্বাস্থ্যবান পুরুষ । দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ রূপ। মুখের ভাব। কিন্তু দুর্ধর্ষ সংগ্রামী । দরবারী পোশাকে আসরে ন থাকেন। অঙ্গে রেশমী নকসাদার পিরান। মাথায় জরিদার টুপি। রই চোখে চশমা। একই বৃন্তে দুটি ন। স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। সঙ্গীতের থেকে ঘর সংসারে পর্যন্ত।

আসরে দুভাই নানা রীতির গান । ধ্রুপদ কিংবা হোরি ধামার। কিংবা টপ্পা। বেশি সময় পেলে আসরে গান সবরকম। না হলে ও ধ্রুপদ, হোরি ধামার। কোন আসরে আর টপ্পা। সব গানই তাঁদের যুগলবন্দী। একই ধরনের কণ্ঠ। এক ই গায়নরীতি। একই চালের গান। পশুপতির আসরকে সবাই এমনি- জানে।

ধু যন্ত্রসঙ্গীতের আসরে পশুপতি বীণা, সুরবাহার আর সেতারবাদক । বিশেষ সেতার বাজান অতি নৈপু । আসরে পশুপতি একক সেতারী ন তার সঙ্গে শিব থাকেন না। যন্ত্রী নন শিব, যদিও কোন কোন যন্ত্রে হাত আছে। কিন্তু তা ঘরোয়াভাবে। সেতারও তিনি পিতার কাছেই শেখেন বাল্যবয়সে। তবে আসরে পশুপতির সঙ্গে বাজাতেন না।

তাঁদের গানের আসরই বেশি হত আর বেশি বিখ্যাত ছিল। শিব পশুপতির আসর বলতে সবাই জানত তাঁদের যুগলবন্দী গান।

শিবসেবক মিশ্র ও পশুপতিসেবক মিশ্র। শিবসেবক কিন্তু প্রায় তিন বছরের কনিষ্ঠ। উচ্চারণের সুবিধার জন্যেই তাঁর নামটি লোকের মুখে আগে এসে যেত।

পশুপতিসেবক ও শিবসেবক হলেন লছমী ওস্তাদেরই বংশ। তাঁর জ্ঞাতিভাই তাঁরা। সেই বিখ্যাত প্রসদ্দু মনোহর ঘরাণার দুই ধারা। মনোহরের পৌত্র লছমীজী। আর প্রসদ্দু বা হরিপ্রসাদের পৌত্র পশুপতিসেবক ও শিবসেবক।

প্রসদ্দু মনোহর ঘরাণার দুটি বৈশিষ্ট্য। তালাধ্যায়ে অর্থাৎ তাল লয়ে মুন্সিয়ানা এবং একযোগে নানা রীতির গান, যন্ত্রসঙ্গীতের চর্চা। যেমন লছমী ওস্তাদের তেমনি শিব পশুপতিরও বহুমুখী প্রতিভা। তবে লছমীজীর তুল্য বড় গুণী তাঁরা দুভাই নন। শিল্পের মানে, ললিতকলার তুলনায় তাঁদের দুজনের স্থান নিচে। লছমী ওস্তাদের মতন সঙ্গীতরস শিব পশুপতির গানে ছিল না। মাধুর্য কিংবা রসসৃষ্টির দিকে তাঁদের ঘাটতি। তবে তালাধ্যায়ে অতি দুরন্ত তাঁরা। তাঁদের বিশেষ করে তাল লয়েরই সাধন। লয়কারীর কূট কৌশল নিয়েই শিব পশুপতি মত্ত থাকতেন। আসর মাৎ করবারও চেষ্টা করতেন মাত্রার নানা সূক্ষ্ম আঙ্কিক খেলায়। অনেক সময় সেই তাল লয়ের লড়াই চালাতেন সঙ্গত-কারের সঙ্গে। অনেক পাখোয়াজী তবলচীকেই তাঁরা বিপাকে ফেলতেন। অনেক সঙ্গতীয়ার ত্রাসের পাত্র ছিলেন তাঁরা।

পশুপতির সেতার বাজনাতেও গুণপনা ওইদিকে বেশি দেখা যেত। সুরের চেয়ে ছন্দ লয়কারীই বেশি। তাঁর হাতে ছিল অসাধারণ তৈরী। তানের বৈচিত্র্যও অসাধারণ। তার বাজনায় কলাবতী নৈপুণ্য বহু শ্রোতাকেও দেখাতেন। কিন্তু সুরের যন্ত্রের রসসৃষ্টি হত না তেমন। বোল, লয়ের কারদার দিকেই তাঁর আসল ঝোঁক। এ বিষয়ে অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাতেন আসরে। আর দস্তুরমত চমক সৃষ্টি করতেন।

শ্রোতাদের বলতেন, 'ফরমাইয়ে, কোন্ মাত্রাসে কৌন ছন্দ্ কি তান উঠায় গা।'

বাস্তবিক, ফরমায়েস মতন ওঠাতেনও তা। যে কোন মাত্রা থেকে যে কোন ছন্দের তান তোড়া তুলতেন। অবাক করে দিতেন সকলকে। কারণ এ তানকারি বড় কঠিন।

শুধু পশুপতির সেতারেই নয়। খেয়াল গানেও শিব পশুপতি দুজনেই ওরকম কাজ করতেন। অতি সূক্ষ্ম হিসাব ছিল তাঁদের মাত্রাজ্ঞানের। আধ মাত্রা পোনে একমাত্রারও চুলচেরা দখল ছিল। মাত্রার ভাঙ্গচুর করতেন তাঁরা অবলীলায়। লয়কারির এইসব তালিম ছেলেবেলা থেকেই পেয়েছিলেন। আর দুরস্ত করেছিলেন তেমনি। তাল লয়ের অতি জটিল প্রক্রিয়া তাঁদের কাছে জলবৎ ছিল। সঙ্গতকারদের তটস্থ করে রাখতেন তাল লয়ে সিদ্ধ শিব পশুপতি। শিব-সেবকের যদি কখনো একা আসরে গান হত তখনো দেখা যেত তাঁর ধ্রুপদ ও খেয়ালে অতি কঠিন বাঁট ও তানের কাজ। অল্প সঙ্গতকাররাই হাত খুলে তাঁদের সঙ্গে বাজাতে পারতেন।

তাল লয়ের নানা কূটকার্যের জন্যেই তাঁদের নামডাক ছিল বেশি। আর দুজনেরই প্রতিভা বহুমুখী। এই ঘরাণার যা বৈশিষ্ট্য তার লছমী ওস্তাদ যার চূড়ান্ত দেখিয়েছিলেন।

কলকাতার সঙ্গীতক্ষেত্রে লছমী ওস্তাদের সমকালেই ছিলেন শিব পশুপতি। লছমীজী এখানে আগে থেকেই ছিলেন। তার বেশ কিছু বছর পরে আসেন এঁরা দুভাই। লছমী ওস্তাদের পরিণত বয়সেই এঁরাও কলকাতায় নিজেদের আসন করে নিয়েছিলেন।

লছমীজীর অনেক বয়োকনিষ্ঠ শিব পশুপতি। পশুপতিসেবক তাঁর চেয়ে ২১ বছরের এবং শিবসেবক ২৪ বছরের ছোট। কিন্তু লছমী ওস্তাদের তুলনায় তাঁরা দুজনেই অল্পায়ু বলা যায়। লছমীজী গত হন ৬৯।৭০ বয়সে। আর পশুপতি ৫০ ও শিব ৪৯ বছর বয়সে।

লছমীজীর মৃত্যুর ৩ বছরের মধ্যে তাঁদেরও জীবনাবসান ঘটে। সেজন্যে লছমীজীর সঙ্গেই তাঁদের সংগীত-জীবনের উদযাপন হয় কলকাতায়। আর তাঁর সমমানের না হলেও তাঁরা দুজনেই বড় ওস্তাদ বলে মান্য হতেন। লছমীজীর মতনই তাঁরা একাধারে কণ্ঠে ও যন্ত্রে কলাবৎ। নানা রীতির গানে সিদ্ধ গায়ক।

লছমী ওস্তাদ এবং শিব পশুপতি তো একই ঘরাণাদার। আর সেই প্রসন্দু মনোহর ঘরাণার একটি বৈশিষ্ট্য—বহু-বৈচিত্র্য। নানা মাধ্যমে রাগসংগীতের সাধন। একাধারে কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতের চর্চা। শিব পশুপতির বিভিন্নমুখী প্রতিভাও লছমী ওস্তাদের সঙ্গে তাঁদের যুক্ত ঘরাণার দান। আপন বংশের উত্তরাধিকার। কয়েক পুরুষের সেই বিদ্যার ভিত্তি। সেই সময়েই ওপারেই তাঁরা গড়ে ওঠেন।

লছমীজীর সংগীতজীবনের কথায় তাঁর পিতামহ মনোহরের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। মনোহরের পিতৃ পিতামহ ঠাকুরদয়াল, জগমন মিশ্র প্রভৃতির উল্লেখও আছে। তাঁদের কথা নতুন করে বলবার প্রয়োজন নেই। এখানে মনোহরের মধ্যম অনুজ হরিপ্রসাদ বা প্রসন্দুর পরিচয় দিয়ে আরম্ভ করা হল শিব পশুপতির ধারা। কারণ প্রসন্দু হলেন শিব পশুপতির পিতামহ।

প্রসন্দু মনোহর নাম দুটিও একত্র উচ্চারিত হত। তাঁদের দুজনকে নিয়েই ঘরাণার নামকরণ হয়ে যায়। তবে হরি-প্রসাদের প্রতিভা ছিল বৃহত্তর সেজন্যে কনিষ্ঠ হলেও প্রসন্দুর নামই আসে সামনে। মনোহর ও প্রসন্দু দুজনেই পিতার শিক্ষায় সংগীতজীবন আরম্ভ করেন। একই সঙ্গে তাঁদের পেশাদারী জীবনেরও সূত্রপাত। কিন্তু তখন থেকেই প্রসন্দু প্রতিভার দীপ্তিতে সামনে এসে পড়েন। আসরে আসরে বরণীয় কলাকার। প্রসন্দুর নামও মনোহরের আগে উচ্চারিত হতে থাকে।

প্রসন্দুর জন্ম হয় বারাণসীতে, ১৮০২ সালে। বাল্য থেকেই পিতার কাছে তাঁর সংগীতশিক্ষা আরম্ভ হয়ে যায়। জ্যেষ্ঠ মনোহরের সঙ্গে শিখতেন তিনি। তারপর প্রথম যৌবনেই দুজনে গায়ক হয়ে দেখা দিলেন।

এমন সময় সেই বিরাট জলসা হল পাতিয়ালা রাজ্যে। পাঞ্জাবের এই রাজ দরবারে। কিন্তু তা শুধু সংগীত সম্মেলন নয়। এক প্রকাণ্ড প্রতিযোগিতা।

পাতিয়ালা দরবারে ৪০ দিন ব্যাপী সেই প্রতিযোগিতা চলে। তখনকার সব ঘরাণায় নিমন্ত্রণ পাঠানো হয় তাঁদের পাঠাবার জন্যে। বহু কলাবত পাতিয়ালায় উপস্থিত হন। আর দিনের পর দিন চলতে থাকে প্রতিযোগিতা। বিচারকমণ্ডলী প্রতিদিনের অনুষ্ঠানে কলাকারদের বিচার করেন। ৪০ দিনের শেষে সাব্যস্ত হয়—

ত গায়ক বারাণসীর হরিপ্রসাদ মিশ্র। ন প্রথম স্থান অধিকার করলেন। তিয়ালার মহারাজার নানা মূল্যবান রস্কার পেলেন প্রসন্দু।

সেই পাতিয়ালার দরবার থেকেই ন্দুর নামডাক আরম্ভ। পাতিয়ালা রাজার অনেক পুরস্কারই শুধু লেন না। তিনি নাভা, কর্পূরথালা জকোট ইত্যাদি দরবারেও আমন্ত্রিত ন সঙ্গীতগুরুকে সম্মানে। পাতিয়ালা রেই তাঁর রীতিমত শিষ্যকরণ হল। ও সেই প্রতিযোগিতারই পরে। কালু ও লালু মিঞা নামে দুই কলাবিদ ন্দুর শিষ্য হয়েছিলেন। তাঁরা দুই নাকি ছিলেন বিখ্যাত গায়ক আলিয়া ত্তুদের আত্মীয়।

পাতিয়ালা দরবার থেকে প্রসন্দু ও াহর কাশীতে ফিরে এলেন। বিশ্রাম লেন কিছুদিন। তারপর প্রসন্দু আরো বিখ্যাত দরবারে গেলেন। যোগ দিলেন াবকেশরী রণজিৎ সিংহের দরবারে। খানে কিছুদিন থাকবার পর নাগপুরে লেন। রইলেন ভোঁসলের সঙ্গীত বারে। প্রত্যেক দরবার থেকেই প্রভূত এবং অর্থ লাভও করলেন।

তারপর উনিশ শতকের মাঝামাঝি ন্দু আমন্ত্রিত হলেন নেপালে। এই শের সঙ্গে নেপাল দরবারের সেই প্রথম যোগ। আর সেই থেকে পুরুষানু- ম তাঁদের নেপালে বাস আরম্ভ। তাঁর ত্র রামসেবক, পৌত্র পশুপতি সকলেই ক এক সময়ে নেপালের দরবারি শিল্পী কেন। তার সূচনা করেন প্রসন্দু। পালে মহারাজার দরবার এবং প্রধান- ত্রী রাণার দরবার—এই দুই সঙ্গীত ভার সঙ্গেই প্রসন্দু যুক্ত ছিলেন। তিনিই থম কাশী থেকে নেপালের দরবারে যোগ লেন। আর মনোহর এলেন কলকাতায়। াহরবংশের সঙ্গে কলকাতারও সেই থম সম্পর্ক। তাঁর পরে তাঁর পুত্র কুমার ও শেষে লছমীপ্রসাদ সেই বন্ধ আরো নিবিড় করেছিলেন।

প্রসন্দু অনেক বছর থাকেন নেপাল জো। তাঁর সঙ্গীতজীবনের অধিকাংশই খানে কেটে যায়। মহারাজা মাতবর সিং থাপা এবং প্রধানমন্ত্রী স্যর জঙ্গ বাহাদুর রাণা দুজনেই ছিলেন প্রসন্দুর পৃষ্ঠপোষক।

প্রসন্দু থেকেই এই ধারায় নানা রীতির গানের চর্চা আরম্ভ। তিনি ছিলেন ধ্রুপদ খেয়াল ও হোরি গানের সুদক্ষ কলাবত। টপ্পাও তিনি এ বংশে শুরু করেন বলে জানা যায়। বিখ্যাত টপ্পাগুণী ছামদুনের ঘর ছিল এই বংশের টপ্পা গানের উৎস। এমনিভাবে প্রসন্দু শুধু কণ্ঠসংগীতের সাধনা করেছিলেন। কোন যন্ত্রবাদনের চর্চা করেন নি তিনি। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র রামসেবক বংশে যন্ত্র- সঙ্গীতের ধারা পত্তন করেছিলেন। শুধু সুরের যন্ত্র নয়। একই সঙ্গে তালের যন্ত্র সাধনাও করেন রামসেবক মিশ্র।

১৮৬৮ সালে প্রসন্দুর মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর দুই পুত্র। শিবসহায় ও রামসেবক। জ্যেষ্ঠ শিবসহায় ছিলেন কৃতী গায়ক। ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা ইত্যাদি রীতির গান বংশের ধারায় চর্চা করতেন। তার মধ্যে খেয়াল বিশেষ টপ্পায় বেশি গুণী হন তিনি। কলকাতায় অনেক বছর শিব- সহায় বাস করেছিলেন। তাঁর যোগ্য শিষ্যও হয় এই শহরে। বাংলার দুই প্রসিদ্ধ টপ্পা গায়ক মহেশচন্দ্র মুখো- পাধ্যায় ও মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন শিবসহায়ের দুজন শ্রেষ্ঠ শিষ্য। অবশ্য মহেশ ওস্তাদ এবং মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনেই লছমীজীর পিতা রামকুমারের কাছে কিছুদিন শিখেছিলেন।

শিবসহায়ের পুত্র নারায়ণদাস কিন্তু হন সেতারবাদক। তিনিও কলকাতায় ছিলেন। তিনি সেতার শেখেন বোধহয় রামসেবকের কাছে। শিবসহায়ের ধারার কথা অল্প কিছু জানা যায়।

প্রসন্দুর নাম রেখেছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র রামসেবক। তার জন্ম ১৮৪৫ সালে। বাল্যকাল থেকেই তাঁর নেপালে বাস। আর পিতার কাছে সঙ্গীতশিক্ষাও সেখানেই পেয়েছিলেন। প্রসন্দুর প্রায় যাবতীয় বিদ্যালাভ করেন রামসেবক। ধ্রুপদ ধামার খেয়াল টপ্পা সব রীতির গানই তিনি পিতার কাছে শিখেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর রামসেবকও হন নেপাল মহারাজার দরবারী গায়ক। তারপর থেকে আরম্ভ হয় তাঁর যন্ত্রসঙ্গীতের পর্ব: বিশেষ সুরের যন্ত্র। তিনি যখন নেপাল দরবারে, তখন ক'জন দিকপাল কলাবৎ-ও সেখানে ছিলেন দরবারী শিল্পী হয়ে। তাঁদের একজন হলেন স্বনামধন্য বড়কু মিঞা। তানসেনের পুত্রবংশের সুরশৃঙ্গার- যন্ত্রী। নেপালে বড়কু মিঞার কাছেই রামসেবক যন্ত্রসঙ্গীতের শিক্ষা পেয়ে- ছিলেন। তিনি যে পরে সেতার সুরবাহার- বাদকও হয়েছিলেন তা বড়কু মিঞার কাছে সেই তন্ত্রবিদ্যা লাভের ফল। তাছাড়া রামসেবক তবলাচর্চাও ভালভাবে করেছিলেন। তবলাবাদনের শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর তবলা-সিদ্ধ মাতুল প্রতাপ মিশ্রের কাছে। তবলা বিষয়ে হিন্দীতে একটি গ্রন্থও লেখেন রামসেবক। 'তবলা প্রকাশ ঔর তবলা বিজ্ঞান'।

নেপালের রাজদরবারে তাঁর বিশেষ মর্যাদার স্থান ছিল। দরবারে তিনি ছিলেন সঙ্গীত বিভাগের প্রধান সচিব এবং অবৈতনিক দোভাষী। নেপালে বীর হাই- স্কুলের প্রতিষ্ঠায়ও তিনি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

এমনি নানা গুণে সঙ্গীতবিশারদ ছিলেন রামসেবক মিশ্র। নেপাল মহারাজা পৃথ্বী বীর বিক্রম সিং অতি সম্মান করতেন তাঁকে। কাঠমণ্ডুর হিটি প্রাসাদে তিনি একটি সঙ্গীতবিদ্যালয় স্থাপন করে- ছিলেন। তার কার্যাধ্যক্ষ করেন রাম- সেবককে।

সেকালের কলাবতদের মধ্যে তিনি বিদ্যার চর্চাও বেশ করেছিলেন। তিনি এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন কাশীর কুইনস কলেজ থেকে। তাছাড়া একদিকে সংস্কৃত, হিন্দী অন্যদিকে ফারসি আরবী উর্দু আবার বাংলা ভাষারও চর্চা তিনি করতেন।

স্বরলিপির সাহায্যে শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টাও একসময়ে করেছিলেন রামসেবক।

শেষজীবনে তিনি আর নেপালে থাকেননি। সেখানকার প্রচণ্ড শীত সহ্য হত না তাঁর বৃদ্ধ বয়সে। রামসেবক তখন স্বদেশে ফিরে আসেন। তারপর থেকে বেশির ভাগ ছিলেন তাঁদের পূর্ব নিবাস বারাণসীতে। তার মধ্যে কয়েক বছর তিনি বাস করেন কলকাতায়। এখানে শৌরীন্দ্র- মোহন ঠাকুরের সঙ্গীতবিদ্যালয়ে শিক্ষক- তাও করেছিলেন। সে-সময় তাঁর তবলা- বিষয়ক বইখানি প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে। একেবারে অন্তিম পর্বে রামসেবক ছিলেন কাশীতে।

তাঁর দুই পুত্র। পশুপতিসেবক ও শিবসেবক। দুজনেরই জন্ম নেপালে। রামসেবক তখন দরবারী শিল্পী হয়ে সেখানে বাস করছেন। দুজনেরই সঙ্গীত- শিক্ষা প্রধানত হয় পিতার কাছে। আর নিতান্ত বাল্যকাল থেকে। তাঁদের মধ্যে তাঁর কাছে পশুপতি শেখেন বেশি।

পশুপতিসেবকের জন্ম ১৮৮১ সালে: অল্প বয়সেই পিতার শিক্ষা তিনি পেতে থাকেন কণ্ঠসঙ্গীতে। পদ্ধতিগত কণ্ঠ- সাধনার সঙ্গে নানা রীতির গান। ধ্রুপদ হোরি খেয়াল টপ্পা—সবই পশুপতিকে শেখাতে লাগলেন রামসেবক। একাদিক্রমে কয়েক বছর। দিন-রাতের অধিকাংশ সময়ে সাধন। তার ফলে প্রথম যৌবনে সুদক্ষ গায়ক হন পশুপতি। তারপর পিতার কাছেই তাঁর যন্ত্রসংগীতের শিক্ষা আরম্ভ হয়। সেতার ও সুরবাহারও তেমনি অক্লান্ত পরিশ্রমে শিখতে থাকেন। পশু- পতি পিতার মৃত্যুর পরে বংশের অতিরিক্ত শিক্ষাও পান মহম্মদ হুসেনের কাছে। বাঁস বেরিলির বীণকার মহম্মদ হুসেন। তাঁর কাছে পশুপতি বীণাবাদন শেখেন।

বীণা তিনি বিশেষ বাজাতেন না পরে। কিন্তু বীণার এই তালিম তাঁর সুরবাহার ও সেতার বাদনে প্রয়োগ করেছিলেন। বিশেষ আলাপাচারি অংশে।

প্রথম জীবনে পশুপতি সঙ্গীত-শিক্ষার সঙ্গে বিদ্যাচর্চাও করতেন। নেপাল বীর হাই স্কুল থেকে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এন্ট্রান্স পরীক্ষা। তারপর অবশ্য কলেজে আর পাঠ করতেন না। সঙ্গীতেই আত্ম-নিমগ্ন হন একান্তভাবে। পেশাদার সঙ্গীতজীবনের জন্যে পিতার শিক্ষায় নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকেন। বহুমুখী সঙ্গীতসাধনাই হয় তাঁর জীবনের লক্ষ্য।

পিতার মতন পশুপতি নেপাল দরবারে দীর্ঘকাল নিযুক্ত থাকেননি। রাম-সেবকের মৃত্যুর কিছুকাল পরে তিনি বিদায় নেন নেপাল থেকে। তারপর উত্তর ভারতের নানা দরবারে তিনি যোগ দিতেন। একাধারে গায়ক ও বাদক বলেই সুনাম হয় তাঁর। বিশেষ করে তিনি সেতার ও সুরবাহার বাদক হিসেবে অতি প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। যেমন তৈরি হাত, তেমনি তানের বৈচিত্র্য। বাজনায় অতি দক্ষতায় নানা অলঙ্কার দেখাতেন। আর সেই লয়কারির মুন্সিয়ানা। ছন্দের জটিল ও চমকপ্রদ কাজ সব। যে-কোন মাত্রা থেকে যে-কোন ছন্দের তান তোড়া ওঠানো। প্রথম জীবন থেকেই তাল-লয়ের এমনি কারুকর্মে পশুপতি আসর মাৎ করতেন। আর নানা দরবারে বিখ্যাত হতে থাকেন লয়কারির গুণে। এসব নৈপুণ্য যেমন সেতারে দেখাতেন তেমনি গানেও। কয়েকটি দরবার থেকে স্বর্ণপদক লাভ করেন গুণপনার জন্যে। প্রথম জীবনের বিভিন্ন সময়ে তিনি দরবারী শিল্পী হয়ে সঙ্গীতচর্চা করেছিলেন। তারপর আসেন কলকাতায়।

কলকাতার সঙ্গে সংস্রব তাঁর পিতার সময় থেকে। রামসেবক এখানে শৌরীন্দ্র-মোহনের সঙ্গীতবিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর 'তবলা প্রকাশ' গ্রন্থটিও প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে। তখন থেকেই কলকাতায় তাঁদের বংশের কথা সঙ্গীতসমাজের জানা। রামসেবকের জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবসহায়ও অনেক দিন কলকাতায় সঙ্গীতসমাজে বাস করেছিলেন। শিব-সহায়ের প্রধান শিষ্যরাও বাঙালী। তাছাড়া তাঁদের জ্ঞাতিদের ধারা ত এ-শহরে আরো অনেক পরিচিত। রামসেবকেরও অনেক আগে আসেন তাঁর জ্যেষ্ঠতাত মনোহর মিশ্র। তারপর মনোহরের পুত্র রামকুমার; কলকাতায় রামকুমারের অনেক বাঙালী শিষ্য হয়েছিলেন। রামকুমারের বিখ্যাত পুত্র লক্ষ্মী ওস্তাদ পশুপতির আগে থেকেই এখানে রয়েছেন আচার্যের সম্মানে।

এমনিভাবে অনেকদিন আগে থেকে অনেক সূত্রে মিশ্র বংশের সঙ্গে কলকাতার যোগ। তাই পেশাদার জীবনের পরিণতিতে পশুপতি কলকাতায় এলেন। আর স্থায়ী-ভাবেই রয়ে গেলেন বাংলার সঙ্গীত-জগতে। কনিষ্ঠ শিবসেবকও তাঁর সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলেন। এখানে প্রথম থেকেই অঙ্গাঙ্গী তাঁদের সঙ্গীতজীবন। তখন থেকেই একসঙ্গে শোনা যায়—শিব পশুপতি—এই দুটি নাম।

শিবসেবক পশুপতির চেয়ে তিন বছরের ছোট। তাঁরও জন্ম নেপালে, ১৮৮৪ সালে। প্রায় শিশুকাল থেকেই শিব পিতার কাছে শিখতে আরম্ভ করে-ছিলেন। বংশের ধারায় বিধিবদ্ধ তালিম। কিন্তু পশুপতির মতন করে শিবকে শেখাননি রামসেবক। পশুপতি প্রথমে বছরের পর বছর কন্ঠসঙ্গীতে শিক্ষা পেয়েছিলেন। তারপর শেখেন যন্ত্রসঙ্গীত। শিবসেবককে কিন্তু একই সঙ্গে কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত শেখানো আরম্ভ হয়। এক-যোগে নাদ তন্ত্র ও বাদ্য। রামসেবক দেখতেন, শিবের স্বভাবে আছে চিন্তা আর অভিনিবেশ। অল্প বয়স থেকেই অসাধারণ মেধা। তাই ভালভাবে তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। ধ্রুপদ খেয়াল, হোরি টপ্পা সব রীতির গান শেখাতে লাগলেন। আর সেই সঙ্গে সেতারও।

শিবসেবকের প্রথম জীবন নেপালেই কেটে যায়। তিনি ছিলেন সঙ্গীতশিক্ষায় অক্লান্ত পরিশ্রমী। দৈনিক ১৪ ঘণ্টা তাঁর সাধনা চলত। আর তাও সেই বালক বয়স থেকেই।

তখন তাঁকে দেখে মহাপ্রশংসা করতেন প্রধানমন্ত্রী বীর সমশের জঙ্গ। বলতেন 'এ বালক দিগ্বিজয়ী হবে সঙ্গীতে।'

শিবসেবকের কঠোর শ্রম দেখে নেপাল দরবার থেকে আলাদা এক ব্যবস্থা হয়ে-ছিল। তাঁর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আটটি দুগ্ধবতী গাভী দেওয়া হয় রামসেবককে। বালক বয়স থেকেই শিবের গান শুনে রাজাও সুখ্যাতি করতেন। অবসরকালে প্রায়ই শুনতে যেতেন সুকণ্ঠ কিশোরের গান।

এমনি সমাদরের পরিবেশে শিবসেবক নেপালে বড় হতে থাকেন। সঙ্গীত দ্বিতীয় সত্তা হয়ে ওঠে তাঁর জীবনে। দেখা যায়, সঙ্গীতের অতি কঠিন শিক্ষাও তিনি সঠিক ধারণ করতে পারেন। তাল লয়ের কূট কৌশলও আয়ত্ত করতে থাকেন দুর্লভ ক্ষমতায়।

রামসেবক তাঁর উত্তম শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন। ৫ বছর বয়সে শিবসেবক পেয়ে আরম্ভ করেন পিতার তালিম। আর ২৬ বছর বয়স পর্যন্ত তা পেয়েছিলেন। তারপরই কিন্তু পিতাকে হারান শিব। তাঁর শিক্ষাপর্বের শেষ দিক থেকেই রাম-সেবকের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তিনি সযত্নে শেষ পর্যন্ত তালিম দেন শিবকে। নানাপ্রকার গানের সঙ্গে তবলা ও সেতারের শিক্ষাও দিয়েছিলেন। তবে

শিবসেবকের যন্ত্রসঙ্গীতের চেয়ে গানেই প্রবণতা ও চর্চা ছিল বেশি। রামসেবক তাঁকে বহু অপ্রচলিত রাগও দেন যা দুর্লভ ছিল অন্যত্র। এই সঞ্চয় তাঁকে (এবং পশুপতিকেও) পরের গায়ক-জীবনে বেশ মর্যাদা দিয়েছিল।

আর শুধু এই ২১ বছরের শিক্ষা নয়। পিতার মৃত্যুর পর তিনি পশুপতির কাছেও শিখেছিলেন। পশুপতি একাধারে তাঁর শিক্ষক এবং সঙ্গীতচর্চার সহযোগী। ঘরে এবং আসরে শিবসেবকের বাল্যকাল কতদিন পশুপতির সঙ্গেই চর্চা করতেন। পিতার নির্দেশে দুই সহোদরের হত একত্র সাধনা। তারপর শিক্ষা সময় থেকেই পশুপতির সঙ্গে আরম্ভ হল ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা। পরস্পরনির্ভর এক বিচিত্র সঙ্গীতজীবন গড়ে উঠল। ভাবের আদান-প্রদানে, সহ অনুভব ও সম শিল্প-ভাবনায় গড়া তাঁদের মিলিত সঙ্গীত জীবন। সেই যুগ্ম পরিচয়েই তাঁরা সঙ্গীতসমাজে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ হন। আর মৃত্যু পর্যন্ত তা ছিল অটুট অম্লান।

কলকাতাকেও সেই সম্মিলিত সঙ্গীত জীবন নিয়েই শিব পশুপতি এসেছিলেন। এখানকার শ্রোতারা প্রথম থেকেই দেখেছিল জুড়ির তানপুরা।

কলকাতার আগে শিবসেবকের আর একটি কথা আছে। তাঁর শিক্ষাজীবনের আর একটি প্রসঙ্গ। পশুপতির কাছে শিক্ষা ছাড়াও তাঁর আর একটি তালিম। শিবেরও বংশের অতিরিক্ত শিক্ষার কথা জানা যায় পশুপতির মতন।

বেরেলির বিখ্যাত গায়ক ছিলেন এনায়েৎ হোসেন খাঁ। তিনি একদিকে গোয়ালিয়রের খেয়াল-গুণী হুদ্দু খাঁর জামাতা। অন্যদিকে শা শোয়ান ঘরাণাদার। এনায়েৎ হোসেন বিশেষ টপ-খেয়াল রীতির জন্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এমনকি টপ-খেয়াল গানের এক আদি প্রচারকও বলা হয় তাঁকে। নেপাল দরবারেও বহুকাল নিযুক্ত থাকেন এনায়েৎ হোসেন। তখন থেকেই রামসেবক পরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। তারপর ৭৫ বছর বয়সে এনায়েৎ হোসেন নেপাল দরবার থেকে অবসর নিয়ে কাশীতে আসেন। দেড় বছর পরে তাঁর মৃত্যুও হয় কাশীতে। তিনি যখন নেপালে ছিলেন, সে-সময়েই তাঁর কাছে শিবসেবক শিখেছিলেন। তা হল রামসেবকের মৃত্যুর পরের কথা। এনায়েৎ হোসেনের কাছে নেপালে বেশ কিছুদিন শেখেন শিবসেবক। পশুপতিও বংশের অতিরিক্ত শিক্ষা পান যে বীণকার মহম্মদ হোসেনের কাছে তিনিও শা শোয়ান ঘরাণাদার। এইভাবে একই শা শোয়ান ঘরাণার দুজনের কাছে পশুপতি ও শিব বংশের বাইরে তালিম পেয়েছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর পশুপতি কিছুদিন থাকেন নেপাল দরবারে। কিন্তু শিবসেবক এ-দরবারের নিযুক্ত শিল্পী হননি। পেশাদার জীবনের প্রথম থেকেই তিনি ভ্রমণ করেন নানা সঙ্গীত-কেন্দ্রে। বিভিন্ন দরবারে আসরে গুণপনার পরিচয় দেন। সে-সবই তাঁর সাময়িক অবস্থান। অবশেষে কলকাতায় এসেই তিনি স্থায়ী হন। তখন তাঁর পরিণত যৌবনকাল।

পশুপতিরও তখন থেকেই এই শহরে বাস আরম্ভ।

যতদূর জানা যায়, তাঁরা দুজনে কলকাতার সঙ্গীতসমাজে যোগ দেন ১৯১৮-১৯ সালে।

শিব পশুপতি। এই সঙ্গীত-নগরীতে তখন থেকে তাদের সঙ্গীতজীবন আরম্ভ হল। আর আসরে আসরে তাঁদের যুগলবন্দী রূপ দেখা গেল। দুই সহোদরে অঙ্গাঙ্গী সঙ্গীতজীবন। আবাস থেকে আসরে। সর্বত্র তাঁদের একই সঙ্গে দেখা যেত। জুড়ির তানপুরা যেন করে তান পুরায় গুঞ্জরণের চেয়ে বহুগুণে সমৃদ্ধ। কারণ তানপুরায় মাত্র চারটি বাঁধা স্বরের নিরন্তর পুনরাবৃত্তি। কিন্তু শিব-পশুপতি বহু বিচিত্র সুরে ঐশ্বর্যময়। ছন্দ-চাতুর্যের নিত্য রূপকার।

তাঁরা দুজনে যখন এলেন, কলকাতা তথা বাংলার সঙ্গীতজগতে তখনো ধ্রুপদের যথেষ্ট সমাদর। খেয়াল টপ-খেয়াল টপ্পার চর্চা বৃদ্ধি পেয়েছে বটে। কিন্তু সঙ্গীতাসরে ধ্রুপদের মর্যাদা অনেক বেশি। ধ্রুপদ ভিন্ন কোন আসরের উদ্বোধন হয় না। তারপরে পরিবেশন করা হয় খেয়াল টপ-খেয়াল ইত্যাদি গান। উনিশ শতকের জের হিসেবে তখনো কলকাতার নানা ধনী-গৃহে সঙ্গীতসভা মুখর। সেখানেও ধ্রুপদের বেশি কদর। কোন নবাগত কলাবতের গুণ-পরীক্ষা ধ্রুপদের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। এখানে তখন ধ্রুপদাচার্য রয়েছেন লছমী ওস্তাদ (খেয়াল টপ্পা টপ-খেয়াল ইত্যাদির গায়ক হলেও) বিশ্বনাথ রাও, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী (খেয়াল অঙ্গের গায়কও) প্রমুখ। সদ্য বিগত হয়েছেন মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অমরনাথ ভট্টাচার্য, রামপ্রসন্ন ও গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ধ্রুপদীরা আত্মপ্রকাশ করেছেন। এমন সময়ে প্রধানত ধ্রুপদ গায়করূপেই এলেন শিব পশুপতি নানা রীতির গানে গুণী তাঁরা। একাধিক যন্ত্রসঙ্গীতেও অভিজ্ঞ, বিশেষ পশুপতি। তবু বাংলার সঙ্গীতসমাজে শিব-পশুপতি ধ্রুপদীরূপেই দেখা দিলেন। প্রসিদ্ধ মনোহর ঘরাণার ধ্রুপদের যুগলবন্দী গায়ক ভ্রাতৃদ্বয় বলেই তাঁদের জানলেন বাংলার শ্রোতারা।

এই ঘরাণারই লছমী ওস্তাদ তখন রয়েছেন কলকাতায়। বাংলার সঙ্গীত-সমাজে একাত্ম হয়ে আচার্যের আসনে বিরাজ করছেন। বাঙ্গালী গুণীদের সঙ্গে আত্মজন হয়েই মিলে গেছেন লছমীজী।

কিন্তু তাঁরাই এই দুই আত্মীয়ের বিষয় সে-কথা বলা যায় না। শিবপশুপতির কলকাতায় সঙ্গীতজীবন আরম্ভ হল বিরোধের মধ্য দিয়ে। কারণ তাঁদের দুজনের মধ্যেই এক সংগ্রামী মনোভাব ছিল। আর সঙ্গীত বিষয়ে এক প্রকট আত্মাভিমান। তাঁদের ঘরাণা যে তালাধ্যায়ে অদ্বিতীয় তাঁরা যে লয়কারিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কে এমন বাঙ্গালী পাখোয়াজী, যিনি তাঁদের গানে সঙ্গত করবেন সমযোগ্য হয়ে? ইত্যাদি মনোভাব শিব-পশুপতির ছিল তখন।

এখানে তাই তাঁদের প্রথম আসরেই সংঘর্ষ বেধে গেল।

সেকালের কলকাতায় সঙ্গীত সমাজের একটি পরিবেশ ছিল। অর্থাৎ সঙ্গীত বিষয়ে একটি সামাজিক বোধ। সঙ্গীত-সেবীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ ভাবের আদান-প্রদান। নবাগতদের নিজেদের মধ্যে বরণ করে নেওয়া ও গুণ বিচার করবার আগ্রহ। শিব-পশুপতি তখন প্রথম কলকাতায় এসেছেন। তাঁরা এক বিখ্যাত ঘরাণাদার এবং অবস্থান করলেন এখানকার সঙ্গীতক্ষেত্রে। অতএব সেই সঙ্গীতসমাজ তাঁদের বিষয়ে কৌতূহলী হল। আর সেই সঙ্গে জাগল দায়িত্ববোধ। নবাগত এই কলাবত ভ্রাতাদের গুণপনা ও বিদ্যাবত্তা কেমন? তার পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন।

অতএব শিব পশুপতির গুণ বিচারের জন্যে একটি আসরের ব্যবস্থা হল। তাঁরা বিদ্যার পরিচয় দিলেন কলকাতার গুণীজনের সমক্ষে। তার জন্যে ঠিকমত বিচারক মন্ডলী হল ওস্তাদ বিশ্বনাথ রাও সঙ্গীতমনীষী ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রভৃতিদের নিয়ে। মিশ্র ভ্রাতারা এ-ব্যবস্থায় সম্মত হলেন।

কর্ণোয়ালিস স্ট্রীটের ভারত সঙ্গীত-সমাজে সেই জলসা সেদিন আয়োজিত হয়েছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আসরে প্রস্তুত হয়ে বসেছেন পশুপতিসেবক ও শিবসেবক। জুড়িতে তাঁরা ধ্রুপদ গাইবেন। তাঁদের পাশে আসন নিয়েছেন পাখোয়াজী সতীশচন্দ্র বাগচী। বিখ্যাত সুরকার দেবকণ্ঠ বাগচীর ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনিই সঙ্গত করবেন।

বিশ্বনাথ রাও ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী প্রমুখ বিচারকরাও উপস্থিত। বহু সঙ্গীতজ্ঞ, সুধী রয়েছেন শ্রোতাদের মধ্যে। সামনেই পাখোয়াজ-গুণী নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ বসেছেন।

সঙ্গীতসমাজের বৃহৎ বৈঠকখানা, সামনেকার বারান্দা সর্বই শ্রোতায় পরিপূর্ণ।

এবার গান আরম্ভ করলেন শিব-পশুপতি। জুড়িতে তাঁদের আলাপচারি যথারীতি হ'ল এবং নির্বিঘ্নেই।

কিন্তু চৌতালে গান আরম্ভ হতেই গোলযোগ বাধল। প্রথম আবর্তের শেষে পাখোয়াজে ধাঁ মারলেন সতীশচন্দ্র। অমনি শিব পশুপতি প্রতিবাদ করে উঠলেন।

শ্রোতাদের দিকে চেয়ে, সতীশচন্দ্রের উদ্দেশে তাঁরা বললেন, 'বাবুজীকা ধাঁ মোকামসে পোঁছতা নেহি।'

সতীশচন্দ্র শান্ত, নিরীহ স্বভাবের মানুষ। কিন্তু তবু এ অপমান তিনি সহ্য করলেন না। মাত্রার হিসেব দেখিয়ে যুক্তি দিয়ে বললেন, 'আমার ধা ঠিকই পোঁছেচে।'

গায়করা কিন্তু মানলেন না তাঁর কথা।

তখন 'ধা'-র পর 'ধা' নিয়ে মতান্তর হতে লাগল পাখোয়াজী ও গায়কদের মধ্যে।

সতীশচন্দ্র অসহায়ভাবে বিচারকদের দিকে চাইলেন। কিন্তু তাঁরা কোন মতামত দিলেন না তখনি।

ক্রমে শিল্পীদের মধ্যে তর্কাতর্কি থেকে বিবাদ আরম্ভ হয়ে গেল। গান ত বন্ধই হয়েছে। এবার অনেক শ্রোতাই এঁদের কলহ দেখতে লাগলেন কৌতূহলী হয়ে। কার ভুল? কে সঠিক? কেন মতান্তর ঘটল?

সতীশচন্দ্র কেবলই বিচারকদের দিকে তাকাচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন কোন মতামত না দিয়ে।

ওদিকে বচসার স্বর ও সুর ক্রমেই তীব্র হচ্ছে।

তখন নগেন্দ্রনাথ ও দুর্লভচন্দ্র এগিয়ে এসে বললেন, 'সতীশবাবুর সংগীত শাস্ত্র অনুযায়ীই হয়েছে। বাংলায় এই রীতি প্রচলিত। এই প্রণালীর সঙ্গে কাশীর শিব-সহায় মিশ্র, কান্তাপ্রসাদ প্রভৃতি বড় বড় ধ্রুপদীরা গেয়ে গেছেন। কখনো আপত্তি করেননি।'

শিব পশুপতি প্রবলভাবে জানালেন, 'আমরা নেপাল দরবার, কাশী প্রভৃতি পশ্চিমের প্রথা অনুসারে গাইছি। সম বিসম অতীত অনাঘাতের সব দস্তুরমত দেখাচ্ছি। ইয়ে ঠেকা মে গল্দ্ হ্যায়।'

সতীশচন্দ্র পুনরায় বিচারকদের দিকে চাইলেন রায়ের জন্যে। কিন্তু বিচারকমণ্ডলী তখনো নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে চলে-ছেন। কোন রায় দিচ্ছেন না এই অভিযোগের ব্যাপারে।

ওদিকে কলহ ও গোলমাল বিষম বাড়তে লাগল। বিবাদ এবার সংক্রামিত হল শিল্পী-দের আসর থেকে শ্রোতাদের মধ্যে।

হঠাৎ একজন শ্রোতা পাখোয়াজীর প্রতি একটা অসম্মানকর কথা শুনিয়ে দিলেন। তখনি কয়েকজন উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন গায়ক-

... সভা। তার বিসম্বাদ আরম্ভ হয়ে গেল। আর একটা প্রতিপক্ষ খাড়া হল ... দিকে।

সঙ্গীতের সভা ভাগ হয়ে পড়ল দুটি বিরুদ্ধ দলে। পরস্পরের ভাষার প্রচণ্ডতা এমন দাঁড়াল যে মৌখিক থেকে মুষ্টিযোগের পরিবেশ সৃষ্টি হল।

কিন্তু বিচারকমণ্ডলীর পরামর্শ তখনো শেষ হচ্ছে না। হয়ত দুই বিবদমান দলকে সন্তুষ্ট করবার উপযুক্ত রায় দিতে তাঁরা অসমর্থ।

এমন সময় দুটি প্রচণ্ড প্রতিপক্ষের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন এক বিরাট দেহী ব্যক্তি। মল্লবীর যতীন্দ্রচরণ গুহ। কিন্তু সে নামে কলকাতার অল্প লোকই তাঁকে জানে। তাঁর পরিচয়—গোবরবাবু। অনেকেই তাঁকে জানেন মহাশক্তিধর কুস্তিগীর বলে। এবিষয়ে দেশের গৌরব গোবরবাবু। সেকালের বিশ্ববিখ্যাত বাঙালী পালোয়ান। সমাজের একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি তিনি। সেই আমেরিকায় লাইট হেভিওয়েট বিশ্ব প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন। উনিশ শতকের বিখ্যাত মল্লবীর অম্বু গুহের বংশধর। মসজিদবাড়ি স্ট্রীটের বনিয়াদী গুহ পরিবারের সন্তান গোবরবাবু পারিবারিক পরিবেশে সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। কৌকব খাঁ ও করামতুল্লা খাঁর শিক্ষায় সেতারচর্চাও করতেন তিনি। ৫২ বীডন স্ট্রীটের বাড়িতে গোবরবাবুর আসর নানা গুণীর অনুষ্ঠানে প্রায়ই মুখর হত। তখনকার কলকাতার সঙ্গীত সমাজের একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি তিনি। সেই হিসেবেই মল্লবীর সেদিন ভারত সঙ্গীত সমাজে এসেছিলেন।

এখন আসরের বিসদৃশ অবস্থা দেখে এগিয়ে এলেন দুটি বিরোধী দলের মাঝখানে। শরীরের তুল্য বলিষ্ঠ তাঁর ব্যক্তিত্বও।

স্বল্পভাষী গোবরবাবু। সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করলেন—নৈর্ব্যক্তিকভাবেই— 'এটা গানের আসর না লড়াইয়ের আখড়া?'

সভার কলরোল তখন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু গোবরবাবুকে উত্তর দিতে শোনা গেল না কাউকে, সকলেরই দৃষ্টি তাঁর পাহাড়বৎ অবয়বের দিকে।

অল্পক্ষণ গোবরবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন। আর তাঁর মুখ চোখ থেকে সর্বাঙ্গে ফুটে উঠল একটি অভাবিত প্রশ্ন : কে কে লড়াই করতে ইচ্ছুক, এগিয়ে আসুন।

না, না। গোবরবাবুর আকারপ্রকার নিরীক্ষণ করে আর কারুর সে সাধ নেই। যাঁরা হৈ চৈ করে আসরের দিকে বিক্রম প্রকাশ করছিলেন, স্বস্থানে ফিরে এলেন শান্ত সুবোধ বালকদের মতন।

যেন যাদুদণ্ডে নিস্তব্ধ সভা।

গোবরবাবু মৌন ভঙ্গ করে শুধু বললেন, 'এবার আমরা গান শুনব।'

আর কোন মতান্তর নেই। চৌতালে আবার আরম্ভ হল শিব পুশুপতির গান এবং প্রভাতী বাগচীর সঙ্গত।

এবার যা ঠিক ঠিক মোকামে পৌঁছতে লাগল। আর কোন আপত্তি বা প্রতিবাদে আসর মাটি হল না।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন বিচারকমণ্ডলী আর সেই সঙ্গে সঙ্গীতপ্রিয় শান্তিপ্রিয় শ্রোতারাও।

শিব পশুপতির আরো একটি আসরেও অশান্তি বেধেছিল। তবে অতদূর নয়। এবারে তাঁদের তাললয়ের কুটযুদ্ধের সামনে দাঁড়ান দুর্ধর্ষ পাখোয়াজী দুর্লভচন্দ্র। পাখোয়াজের বোলে আর 'ধা'-র প্রয়োগে তিনিই সে আসর বাঁচিয়েছিলেন। (তার বিবরণ 'সঙ্গীতের আসরে' ২০৩-২০৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

এমনি অশান্তির মধ্যে শিব পশুপতির সঙ্গীতজীবন কলকাতায় আরম্ভ হয়েছিল। তবে তা শান্ত হয়ে আসে কালক্রমে।

কলকাতার সঙ্গীতসমাজে বাস করতে করতে বাঙালী গুণীদের সঙ্গে মেলামেশায় তাঁরা ঘনিষ্ঠ হতে থাকেন। আসরে আসরে যোগ দিয়ে এখানকার সঙ্গীতসমাজের অঙ্গীভূত হয়ে যান স্বাভাবিকভাবেই। বাঙালী গুণগ্রাহী পৃষ্ঠপোষক লাভ করেন। বেশির ভাগ বাঙালীদের নিয়েই গড়ে ওঠে তাঁদের শিষ্যমণ্ডলী।

তারপর জীবনের শেষপর্যন্ত তাঁরা কলকাতারই স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। দুই সহোদরের অটুট আত্মীয়তা ছিল বরাবর। একসঙ্গেই বাস করতেন তাঁরা, উত্তর কলকাতার দর্জিপাড়া অঞ্চলে। কেবল কিছুদিন শোভাবাজার রাজবাড়িতে পশুপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। অনেকসময় একই শিষ্যকে শিক্ষা দেন দুজনেই। যেমন—সুধীন্দ্রনাথ মজুমদার। আর পশুপতি সেতার সুরবাহার বাদক বলে আলাদা সেতারে শিক্ষা দিতেন। তাঁর শিষ্য সেতারবাদক বিজয়দাস পাকড়ে। সুধীন্দ্রনাথ ও বিজয়দাস ভিন্ন তাঁদের অন্যান্য শিষ্যদের নাম এখানে একত্র উল্লেখ করা হল—সতীশচন্দ্র দে, ললিতমোহন দাস ডঃ সুধাময় বসু অভয়পদ চট্টোপাধ্যায় অনিলকৃষ্ণ রায়, লক্ষ্মীকান্ত উপাধ্যায় পশুপতি রায়চৌধুরী গোপালচন্দ্র লাহিড়ী দুর্গাচরণ বিশ্বাস সীতাংশুকান্ত আচার্য চৌধুরী প্রভৃতি।

কলকাতায় শিব পশুপতির প্রতিষ্ঠালাভের জন্যে শোভাবাজার রাজবাড়ির রাধাকৃষ্ণ দেব, সৌম্যেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব অনেক আনুকূল্য করেছিলেন। তাঁরা দুজনেই কলকাতার সঙ্গীতসমাজভুক্ত হয়ে থাকেন জীবনের শেষ পর্যন্ত। এবং বংশানুক্রমে। পশুপতি ছিলেন নিঃসন্তান। কিন্তু শিবসেবকের তিন পুত্র রামকিষণ, ভবানীসেবক ও বিষ্ণুসেবকও বাংলানিবাসী হয়ে যান। তাঁরা তিনজনেই বংশের যোগ্য উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। রামকিষণের শিক্ষা পিতার চেয়ে জ্যেষ্ঠতাত পশুপতির কাছেই হয় বেশি। তাছাড়া, বাল্যকালে পিতামহ রামসেবকের তালিমও তিনি ক'বছর পেয়েছিলেন। রামকিষণ ও ভবানীসেবক কলকাতার সঙ্গীতসমাজে সুপরিচিত গায়ক ছিলেন আমৃত্যু। কনিষ্ঠ বিষ্ণুসেবক পরিণত বয়সে আজো বর্তমান আছেন।

পশুপতি ও শিবসেবক ১১।১২ বছর কলকাতায় ছিলেন। নিয়মিত নানা আসরে যোগ দিয়ে বহু বাঙালী শিষ্য গঠন করে বাংলার রাগসঙ্গীত প্রচারে সহায়ক হয়েছিলেন তাঁরা। শিবসেবকের দ্বিতীয় পুত্র, প্রতিভাবান ভবানীসেবক অল্পায়ু ছিলেন। তাঁর অপর দুই পুত্র রামকিষণ ও বিষ্ণুসেবকের ছাত্ররাও বাঙালী। এইভাবে দেড়শ বছরের প্রাচীন সেই প্রসিদ্ধ মনোহর ঘরাণার উত্তরাধিকার বাংলায় এসে যায়।

এই ঘরের লয়কারির একটি দর্শন ছিল। এ ঘরাণার একজন যে গুণী খেয়ালগায়করূপে প্রসিদ্ধ রামকিষণ মিশ্র সেই দর্শনের ব্যাখ্যা করতেন এইভাবে—লয়ের জন্যেই সুরের অস্তিত্ব থাকে।—সুরে প্রাণ সঞ্চার করে—লয়। রাগ শুদ্ধ রেখে তার ভাবরসকে ফুটিয়ে তোলে। লয়ের সব কঠিন কাজ রাগের রস বিকশিত করবার অলঙ্কার ভিন্ন আর কিছু নয়। লয়ের দুরূহ কারুকর্মে শ্রোতারা বিরক্ত হবেন কেন? যদি তাঁদের বিরক্তি আসে, তাহলে গায়কের অপটুত্বই দায়ী—লয়কারী নয়। একটি সুরে অনেকক্ষণ স্থিত হলে একঘেয়ে ভাব আসে। সুরকে প্রাণবন্ত করে তার গতি, তার বিক্ষেপ। মন্দ গতি দ্রুত গতি। কখনো একটি সুর থেকে গানের শ্রুতি দ্রুত স্পর্শ করে চলা। অর্থাৎ মীড় দিয়ে গানের সৌন্দর্য ফোটানো। লয়কে বাদ দিয়ে কিছু করা যায় না।......

সেই লয়কারীর কলাবত ছিলেন শিব পশুপতি। কলকাতার সঙ্গীতসমাজে লয়ের এমন সূক্ষ্ম কারুকর্ম তাঁরা দেখিয়ে গেছেন যা তাঁদের দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। অবশ্য তা-ই তাঁদের একমাত্র সাঙ্গীতিক পরিচয় নয়। তাঁদের শুদ্ধ রাগরূপের সাধনায় রাগসঙ্গীতের নানা রীতির চর্চায় পদ্ধতিগত শিক্ষাদানে, একনিষ্ঠ সঙ্গীতসেবায় সমৃদ্ধ করে যান বাংলার সঙ্গীতক্ষেত্র। তাঁরা যতদিন জীবিত ছিলেন সঙ্গীতজগতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিলেন। তাঁদের মৃত্যুতে একটি শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ ঠিক সমযোগ্য হননি তাঁদের কোন উত্তরসাধক।

তাঁরা প্রথম যখন এসেছিলেন দুজনেই বেশ স্বাস্থ্যবান ছিলেন। কিন্তু দীর্ঘায়ু লাভ করেননি কেউই। পঞ্চাশও অতিক্রম করতে পারেননি। প্রথমে বিগত হলেন পশুপতি।

সেই শোকে শিবসেবক বিহ্বল হয়ে পড়লেন। ক্রমেই হারিয়ে ফেললেন আসরে আসরে যোগ দেবার স্পৃহা। প্রিয় ভ্রাতা, শিক্ষক, সঙ্গীতের আজীবন সহযোগী, বহুদিনের বহু অভিজ্ঞতার সুখদুঃখের একান্ত সঙ্গী চলে গেলেন। এই মনস্তাপ আর সহ্য করতে পারলেন না শিবসেবক। হতাশায় ক্রমে শয্যাশায়ী হলেন। আর দেড় বছরের মধ্যেই তাঁর সব দুঃখের অবসান ঘটে গেল সেই ৭১।১ কালিপ্রসাদ দত্ত স্ট্রীটের বাড়িতে।

একটি তানপুরা ১৯৩১ সালের শেষ দিকে স্তব্ধ হয়েছিল। আর একটি নীরব হল ১৯৩৩ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি।

—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

পারমাণবিক বিস্ফোরণ

ভারতের প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণের এক মাস পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্স ও চীন একই দিনে পারমাণবিক বোমা ফাটিয়েছে। ফ্রান্স তার বোমা ফাটিয়েছে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের মরুরোয়া দ্বীপে আর চীনা বোমা ফাটান হয়েছে সে দেশের পশ্চিমে লপ নর অঞ্চলে। ফরাসী বোমার বিস্ফোরণ ক্ষমতা আনুমানিক ২০ কিলোটন (২০ হাজার টন টি এন টির বিস্ফোরণ ক্ষমতার সমান) আর চীনা বোমার বিস্ফোরণ ক্ষমতা আনুমানিক ১ মেগাটন (দশ লক্ষ টন টি এন টির বিস্ফোরণ ক্ষমতার সমান)। ফরাসী পারমাণবিক বোমা ফাটাবার প্রথম খবর পাওয়া গেছে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী গাফ হুইটলাম ও নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী নরমান কার্কের কাছ থেকে। চীনা বোমা ফাটাবার প্রথম সংকেত ধরা পড়েছে ভারতে পারমাণবিক শক্তি কমিশনের মনিটরিং স্টেশনগুলিতে।

ফ্রান্স বা চীন কেউই ভারতের মত মাটির নিচে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায় নি। ভারতের মত তারা কেউই প্রতিশ্রুতি দেয় নি যে, তারা শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে পারমাণবিক বিস্ফোরণের ক্ষমতা ব্যবহার করবে না। ফ্রান্স এবার নিয়ে নয়বার ও চীন এই নিয়ে ১৬ বার পারমাণবিক বোমা ফাটাল। অন্যান্য বারের মত এবারও তারা উভয়েই বায়ুমন্ডলে বোমা ফাটিয়েছে এবং তার ফলে বাতাস দূষিত হবে বলে জাপান অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশ অবশ্য প্রতিবাদ জানিয়েছে। কিন্তু ভারতের পোখরান বিস্ফোরণে যে সব দেশ মহাসোরগোল তুলেছে তাদের কেউ কেউ যে ফরাসী ও চীনা বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে, সেটা লক্ষ্য না করে পারা যায় না।

* * *

সবচেয়ে লক্ষণীয় হল পাকিস্তানের আচরণ। বায়ুমন্ডলে ও খোলাখুলিভাবেই সামরিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত চীনা পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে ইসলামাবাদ থেকে কোন রকম বিরূপ মন্তব্য শোনা যায় নি, অথচ ভারত তার শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যের কথা বার বার ঘোষণা করা সত্ত্বেও পাকিস্তান পোখরানের বিস্ফোরণ সম্পর্কে সারা পৃথিবীতে জল ঘোলা করে চলেছেই। পাকিস্তান এখনও ভারতের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র ও দেশরক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আজিজ আহমেদ সম্প্রতি জাতীয় পরিষদে বলেছেন, 'ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে নতুন করে আলোচনা আরম্ভ করার আগে ভারতকে এই মর্মে শুধু গ্যারান্টি দিতে হবে যে সে সামরিক উদ্দেশ্যে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করবে না।'

আহমেদ বলেছেন, ভারত শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে বলে যে দাবি করেছে পাকিস্তান সেই দাবি মেনে নিতে পারে না।

আজিজ আহমেদ সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, বৃটেন ও ক্যানাডায় গিয়ে ভারতের নামে নালিশ করে এসেছেন এবং ভারতের পারমাণবিক পরাক্রম থেকে পাকিস্তানকে রক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য কাঁদুনি গেয়ে এসেছেন।

একই উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের বৈদেশিক বিভাগের সেক্রেটারি আগা শাহী পিকিংয়ে ঘুরে এসেছেন।

* * *

ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণ সম্পর্কে ইতিমধ্যে বিদেশে যেসব প্রতিক্রিয়া হয়েছে সেগুলি খতিয়ে দেখার একটা সুযোগ সম্প্রতি পাওয়া গেছে। আমাদের বৈদেশিক দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত পার্লামেন্টের মন্ত্রণা কমিটিতে বিবৃতি

নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আলোচনায় কমিটির সদস্যরা এই বলে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন যে, পারমাণবিক প্রয়োগকৌশলে বৃহৎ শক্তিবর্গের একচেটিয়া অধিকার খর্ব হওয়ায় এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি ও জোটনিরপেক্ষ দেশগুলি খুশি হয়েছে। কমিটির সদস্যরা সন্তোষের সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করেছেন যে, পশ্চিমের অনেক দেশও ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণের বিরোধিতা করে নি এবং এটা এক রকম মেনেই নিয়েছে যে, ভারতকে তার নিজের কর্মসূচী অনুযায়ী পারমাণবিক প্রয়োগকৌশল আয়ত্ত করতে দিতে হবে।

বৃটেন্ ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণে আপত্তি করে নি। রাশিয়ার সংবাদপত্রে এই বিস্ফোরণ সম্পর্কে ভারতের বক্তব্য সমর্থন করে প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের প্রতিক্রিয়াও প্রথমে যতটা বিরূপ হবে বলে মনে হয়েছিল শেষ পর্যন্ত ততটা হয়নি। জাপান ও ক্যানাডার প্রতিক্রিয়া যে এতটা তীব্র হয়েছে সেটা একটু বিস্ময়কর। তবে এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে, ক্যানাডা এখন তার সুর কতকটা নরম করছে।

সংবাদে প্রকাশ যে মন্ত্রণা কমিটির ঐ সভায় দুজন প্রাক্তন মন্ত্রী দীনেশ সিং ও বলিরাম ভগৎ বলেছেন পোখরানের বিস্ফোরণ সম্পর্কে ভারতের আমতা-আমতা করার বা জবাবদিহি করার প্রয়োজন নেই। সারা পৃথিবীকে বার বার বলা হয়েছে যে, ভারত পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার করতে চায়। তবে এই ধরনের শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পারমাণবিক বিস্ফোরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দেশের মানুষকে আগে থেকে সচেতন করে রাখতে সরকার যে ব্যর্থ হয়েছেন, শ্রীসিং ও শ্রী ভগৎ তার সমালোচনা করেছেন।

শ্রীহীরেন মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য কয়েকজন সদস্য শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার সীমিত রাখা সম্পর্কে সরকারী ঘোষণায় বিশেষভাবে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন বলে জানা গেছে।

রাজ্যসভার মনোনীত সদস্য ডঃ ভি পি দত্ত নাকি পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার রোধ চুক্তির বিশেষ সমালোচনা করে সরকারকে এই বলে সতর্ক করে দেন যে, অন্যান্য পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলির উপর প্রযোজ্য নয় এমন কোন নিষেধাবিধি যেন মেনে নেওয়া না হয়।

ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণ সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির বিরূপতা যে কতকটা কমেছে সম্প্রতি তার একটি প্রমাণ পাওয়া গেছে প্যারিসে ভারতের সাহায্যকারী দেশগুলির গোষ্ঠীর সভায়। এই সভায় সাহায্যকারী দেশগুলি ১৯৭৪—৭৫ সালে ভারতকে ১৩৫ কোটি ডলার (প্রায় ৯৮৫ কোটি টাকা) দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। গত বছর তাদের প্রতিশ্রুত সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৯০ কোটি ডলার (৬৫৭ কোটি টাকা)। যে সব দেশ ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে সবচেয়ে জোরালো প্রতিবাদ জানিয়েছে তাদের মধ্যে জাপান ও ক্যানাডা বাদে আর সকলেই গত বছরের তুলনায় এ-বছর ভারতকে বেশি সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যে সুইডেন ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করেছে সেই সুইডেনও এবার ভারতকে প্রতিশ্রুত সাহায্যের পরিমাণ গতবারের তুলনায় দেড়গুণ করতে স্বীকৃত হয়েছে।

এই সভায় অবশ্য পারমাণবিক বিস্ফোরণের জন্য ভারতের কৈফিয়ৎ তলব করা হয়েছিল। ভারতের প্রতিনিধি বলেছেন, এই বিস্ফোরণে যে সামান্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে তাতে ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনার কোন ক্ষতিই হয় নি। পারমাণবিক শক্তি খাতে ভারত কোনদিনই তার মোট বাজেটের ১-৫ শতাংশের বেশি খরচ করেনি। তাছাড়া ভারত তার শান্তির পথ থেকে একটুও বিচ্যুত হয় নি।

* * *

আমেরিকা যখন একদিকে ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণের সমালোচনা করছে এবং ভারতের শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যের ঘোষণা

মেনে নিতে রাজি হচ্ছে না তখন অন্যদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিজেই তাঁর সাম্প্রতিক মিশর সফরকালে সে দেশকে পারমাণবিক জ্বালানি ও পারমাণবিক চুল্লি সরবরাহ করার অঙ্গীকার করে এসেছেন। প্রেসিডেন্ট নিকসনের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এডওয়ার্ড কেনেডি, ফ্র্যাংক চার্চ স্টুয়ার্ট সাইমিংটন জ্যাকব জাভিটস প্রভৃতি সিনেটরগণ সমালোচনা করেছেন। সিনেটর জাভিটস বলেছেন, পশ্চিম এশিয়ার বারুদ-স্তূপে পারমাণবিক অস্ত্র যোগ করার বিপদ সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সতর্ক হওয়া উচিত।

কোন কোন সমালোচক বলেছেন, ভারত তার প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ করার পর এত অল্প সময়ের মধ্যেই মিশরকে পারমাণবিক জ্বালানি ও চুল্লি যোগাবার চুক্তি সারা পৃথিবীতে একটা মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে ও পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসারের পথ খোলা হয়ে যাবে।

এই সমালোচনার উত্তরে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সহকারী রোনাল্ড জিগলার ও [illegible] মার্কিন পদাধিকারীরা বোঝাবার চেষ্টা করছেন যে, এ ব্যাপারে ভারতের সঙ্গে মিশরের কোন তুলনায় হয় না। কারণ, [illegible] নাকি পারমাণবিক বোমা বানাবার ফিকিরে আছে আর মিশরের উদ্দেশ্য নাকি একেবারেই শান্তিপূর্ণ।

কিন্তু মার্কিন সরকারী মুখপাত্রদের এই বিবৃতির কালি শুকোতে না শুকোতেই মিশরের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ইসমাইল ফাহমি বলেছেন, মিশর পারমাণবিক অস্ত্র বানাবার ক্ষমতা রাখে এবং ইজরায়েল যদি পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা করে যেতে থাকে তাহলে মিশরও পারমাণবিক অস্ত্র তৈরী করবে।

মিশর পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার রোধ সংক্রান্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর দিলেও আনুষ্ঠানিকভাবে এই চুক্তি অনুমোদন করেনি। এই কথা জানিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রী ফাহমি বলেছেন ইজরায়েল পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার রোধ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর ও অনুমোদন না করা পর্যন্ত মিশরও এই চুক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন করবে না।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি গিরি

ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি পাঁচদিনের জন্য বাংলাদেশ সফর করে এসেছেন। বাংলাদেশের মুক্তির পর ভারতীয় রাষ্ট্রপ্রধান এই প্রথম সেদেশে সরকারী সফর করতে গেলেন।

শ্রীগিরিকে এই উপলক্ষে বাংলাদেশে বিপুল সম্বর্ধনা জানান হয়। ঢাকার সংবাদপত্রগুলিতে বিশেষ প্রবন্ধাদি প্রকাশ করে তাঁকে স্বাগত জানান হয়েছিল। শ্রীগিরি ঢাকায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মহম্মদুল্লা, প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন ইত্যাদির সঙ্গে কথা বলা ছাড়াও, সে-দেশের জাতীয় সংসদে বক্তৃতা দিয়েছেন এবং কাপতাইয়ে গিয়ে সে-দেশের নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে এসেছেন।

এই সফরে শ্রীগিরির সঙ্গে অন্যান্যদের মধ্যে তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী সরস্বতী গিরি ও ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সুরেন্দ্রপাল সিং ছিলেন।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের একটা বিশেষ অধিবেশনে বক্তৃতা করতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি গিরি ভারত ও বাংলাদেশের সহযোগিতার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এই সহযোগিতা ইতিমধ্যে বাণিজ্য, পরিবহণ ও যোগাযোগ থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তারিত হয়েছে। এই ধরনের পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া উভয় দেশ বিকাশ লাভ করতে পারে কিনা, সেই প্রশ্ন তুলে শ্রীগিরি বলেন, "আমরা দুটি পৃথক সার্বভৌম দেশ বলেই কি দুই দেশের মধ্যে কৃত্রিম প্রাচীর তুলব।"

শ্রীগিরি আরও বলেন যে, বাংলাদেশ শুধু ভারতের বন্ধু ও প্রতিবেশী বলেই ভারত তার সাফল্যে আনন্দিত নয়, যেহেতু আমাদের দুই দেশ একটা স্থায়ী আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে একই নীতি অনুসরণ করে চলছি' সেহেতুও ভারত বাংলাদেশের সাফল্যে খুশী।

ভারতের রাষ্ট্রপতির এই সফরের শেষে যে যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে দুই দেশের রাষ্ট্রপতি তাঁদের এই 'গভীর প্রত্যয়' ঘোষণা করেছেন যে, সম-আদর্শ সার্বভৌম সমতা ও পারস্পরিক মর্যাদাবোধ থেকে জাত দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হবে।

ইস্তাহারে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ও মুক্তির পরে সে-দেশের জাতীয় পুনর্গঠনের কাজে ভারতের সরকার ও ভারতীয় জনগণ যে 'মূল্যবান সহায়তা' দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট মহম্মদুল্লা তার সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশের সরকার ও সে-দেশের জনগণ ভারতের প্রতি বন্ধুত্বের যে আবেগপূর্ণ মনোভাব পোষণ করেন, সে-কথাও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ভারতের রাষ্ট্রপতিকে জানিয়ে দিয়েছেন।

গণতন্ত্রের আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে বৈষয়িক ও সামাজিক ন্যায়-বিচার লাভের উদ্দেশ্যে ভারত বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যা ও শিল্পের ক্ষেত্রে যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে, মহম্মদুল্লা সেজন্য ভারতের প্রশংসা করেছেন।

বাংলাদেশের প্রতি ভারতের সরকার ও জনগণের গভীর প্রীতি ও বন্ধুত্বের মনোভাবের কথা রাষ্ট্রপতি গিরি জানিয়ে দিয়ে এসেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের জনগণের 'বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগ'-

এর জন্য শ্রীমতীর গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন এবং সামাজিক ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য বাংলাদেশ যে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে তাতে তিনি সে-দেশের প্রশংসা করেছেন।

মন্তব্য

কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড সূত্রে থেকে জানান হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোরচা থেকে বেরিয়ে বিরোধী দল হিসাবে কাজ করার যে সিদ্ধান্ত করেছে, তার প্রতিক্রিয়ায় অন্য রাজ্যগুলিতে কংগ্রেস ও সি পি আই-এর সম্পর্কের কোন পরিবর্তন ঘটবে না।

ঐ সূত্র থেকে বলা হয়েছে যে, কংগ্রেস যেমন কেরলের যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দিয়ে সেখানকার শ্রীঅচ্যুত মেননের সরকারকে সরাবে না, তেমনি অন্যত্র সি পি আই-ও কংগ্রেসের সঙ্গে বর্তমান বোঝাপড়া ভাঙবে না বলে কংগ্রেস আশা করে।

যেমন ওড়িশায় শ্রীমতী নন্দিনী শতপথীর সরকারকে টিঁকে থাকার জন্য কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থনের উপর নির্ভর করতে হয়। ওড়িশা বিধানসভার ১৪৬ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৬৯ জন কংগ্রেসের। সি পি আই-এর সদস্য-সংখ্যা সাত।

উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় অবশ্য শ্রীবহুগুণের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে, কিন্তু এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা খুব সামান্য—৪২৫ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ২১৬ জন। সেখানে সি পি আই-এর সঙ্গে কংগ্রেসের কোন আনুষ্ঠানিক বোঝাপড়া না থাকলেও বিধানসভায় মোট ১৬টি কম্যুনিস্ট ভোট যে-কোন সময়ে কংগ্রেসের পক্ষে বেশ মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে।

কংগ্রেস সভাপতি ডঃ শঙ্করদয়াল শর্মা একটি প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্ট করে বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে পি ডি এ-র সঙ্গে সি পি আই-এর বিচ্ছেদের ফলে কেরলে কোন ওলটপালট হবে না।

ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লীগের সভাপতি সুলেমান সাইৎ-এর চেষ্টায় কেরলের মুসলিম লীগের বিবাদের মীমাংসা হওয়ায় সেখানকার সরকারের অনিশ্চয়তার আর একটি কারণ দূর হয়ে গেছে।

* * *

ভুটানের রাজার বিরুদ্ধে চক্রান্ত সম্পর্কে ইয়াংকি নামে যে তিব্বতী মহিলাটির নাম করা হয়েছে তিনি এখন ভারতের নৈনিতালে আছেন। একজন সাংবাদিক সম্প্রতি সেখানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ও তাঁর সম্পর্কে অন্যান্য খোঁজখবর নিয়ে মহিলাটির বিষয়ে ও ঐ চক্রান্তের অভিযোগের পটভূমি সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পরিবেশন করেছেন।

থিম্পুর সরকারী মহল থেকে ইয়াংকির পরিচয় দিয়ে বলা হয়েছিল, তিনি ছিলেন ভুটানের ভূতপূর্ব রাজার রক্ষিতা। ইয়াংকি দাবি করেছেন তিনি 'বড়ে মহা-রাজা'-র অর্থাৎ ভুটানের ভূতপূর্ব রাজা জিগমে দোরজি ওয়াংচুকের বিবাহিতা পত্নী ও ছোট রানী ছিলেন। রাজা তাঁর জন্য ভারত-ভুটান সীমান্তের কাছে কোলপুতে একটি প্রাসাদ তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন, নৈনিতালে 'সুখনিবাস' নামে একটি বিরাট বাংলো-বাড়িও রাজা তাঁর জন্য কিনেছিলেন। এছাড়া থিম্পুতেও রানী ইয়াংকির একটি প্রাসাদ আছে।

ইয়াংকি এখন ঐ সুখনিবাস-এ উঠবেন বলেই নৈনিতালে রয়েছেন। লেকের ধারে ১৮ একর জমির উপর অবস্থিত বাড়িটি এখন তাঁর ও তাঁর সঙ্গের লোকজনদের থাকবার জন্য নতুন করে সাজানো-গোছান হচ্ছে। বছর চারেক আগে একবার থিম্পু থেকে ১৮টি ট্রাক বোঝাই করে আসবাবপত্র নিয়ে এসে সুখনিবাস-এ তোলা হয়েছিল। কিন্তু বছর দুয়েক আগে সব জিনিসপত্র ভুটানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই থেকে 'সুখনিবাস' খালি পড়ে আছে।

ভুটানের রাজার অভিষেকের কয়েক দিন আগে ইয়াংকি ভুটান থেকে পালিয়ে আসেন। সে-সময়ে তিনি ভারতের সীমান্তের এক কিলোমিটার দূরে কোলপুতে ছিলেন। দার্জিলিং ও দিল্লি হয়ে তাঁরা এখন নৈনিতালের একটি হোটেলে বাস করছেন।

ইয়াংকির সঙ্গে যাঁরা আছেন, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন ভুটানের স্বরাষ্ট্র বিভাগের প্রাক্তন উপমন্ত্রী এস তেনজিং। তিনি এখন রানীর সেক্রেটারি হিসাবে কাজ করছেন। অন্যান্যদের মধ্যে তাঁর সঙ্গে রয়েছেন দুই ছেলে ও দুই মেয়ে, বৃদ্ধা মা, ছোট বোন ও ছোট বোনের সন্তানেরা।

ভুটান থেকে আসার সময় ইয়াংকি চারটি আমদানি-করা বিদেশী গাড়ি ও একটি জিপ গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন। গাড়িগুলি ম্যালের উপর তাঁর হোটেলের বাইরে দাঁড় করান আছে। চারজন ড্রাইভার অবশ্য ভুটানে ফিরে গেছেন।

দুজন নিরাপত্তা রক্ষী ইয়াংকির হোটেলের ঘরের বাইরে অষ্টপ্রহর পাহারা দিচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে যে-কেউ দেখা করলে এমনকি তাঁর সেক্রেটারির দেখা করলেও নিরাপত্তা রক্ষীরা সামনে হাজির থাকেন।

ইয়াংকি এই ভারতীয় সাংবাদিকের সঙ্গে ভুটানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার উপস্থিত হওয়ায় তিনি পিছিয়ে যান। তবে, তাঁর সেক্রেটারি সাংবাদিককে বলেন যে বর্তমান রাজা খুব ভাল লোক ও ইয়াংকিকে মা বলেই মনে করেন। তাঁর আশেপাশের কিছু লোক ইয়াংকি সম্পর্কে তাঁর মন বিষিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। প্রাক্তন রাজার আমলে এই লোকগুলিকে ভুটান থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল। তারা নেপালের সীমান্তে গিয়ে একটা জুয়ার আড্ডা তৈরি করেছিল। এখন তাদের ভুটানে ফিরে আসতে দেওয়া হয়েছে। ফিরে এসে তারা এই ধারণা ছড়াবার চেষ্টা করছে যে, ইয়াংকির পরামর্শ মতই তাদের ভুটান থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।

* * *

ইতিমধ্যে হংকং-এর একটি খবরে বলা হয়েছে চীন ও ভুটানের মধ্যে একটি নতুন বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপনের পথ উন্মুক্ত হয়েছে বলে চীনের সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান মন্তব্য করেছেন।

ভারতে অবস্থিত চীনের রাষ্ট্রদূত সম্প্রতি ভুটানের রাজার অভিষেক উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

কিছু আগে আর একটি খবরে বলা হয়েছিল, ভুটান সরকার এই উৎসবে চীনা প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ করবেন না বলে নয়াদিল্লিকে কথা দিয়েছিলেন। পরে ভারত সরকারকে না জানিয়েই এই আমন্ত্রণ পাঠান হয়েছিল।

পঞ্চম যোজনার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত একটি খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। এই পরিকল্পনায় পঞ্চম যোজনার পাঁচ বছরে মোট ২৩৫০ কোটি টাকা ব্যয় করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

এই পরিকল্পনার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, বলদে-টানা গাড়িসহ সর্বপ্রকার যানবাহনের উন্নতির কথা বলা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি সাম্প্রতিক খবর হল বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেণ্ট আধুনিক উন্নত ধরনের বলদে-টানা গাড়ি তৈরির বিষয়টি অনুশীলন করে দেখছেন।

ইনস্টিট্যুটের হিসাবে আমাদের দেশে মোট দেড় কোটি জানোয়ারে-টানা গাড়ি আছে। এই গাড়িগুলিতে মোট লগ্নির পরিমাণ অনুমান ৩০০০ কোটি টাকা। এই গাড়িগুলি থেকে ছুতোর, কামার গাড়োয়ান ইত্যাদিসহ প্রায় ১৬ লক্ষ মানুষের জীবিকা নির্বাহ হয়।

ইনস্টিট্যুটের ডিরেকটর অধ্যাপক রামস্বামী এই বলে আক্ষেপ করেছেন যে আমাদের দেশে যদিও ত্রিশ হাজার ইঞ্জিনীয়ার আছেন, তাহলেও উন্নততর বলদে-টানা গাড়ির জন্য নতুন ডিজাইন উদ্ভাবনের দিকে কেউ তেমনভাবে নজর দেননি। দু'চাকার গাড়ির বদলে চার চাকার গাড়ি ব্যবহার করলে রবারের টায়ার, ব্রেক বল-বেয়ারিং ইত্যাদি ব্যবহার করলে, বলদে টানা গাড়িগুলি থেকে আরও বেশি আয় করা যায়, রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণে সুবিধা হয় এবং ভারবাহী পশুগুলিরও কষ্ট লাঘব হয়।

ইনস্টিটিউট খোঁজ করে দেখেছেন, তামিলনাড়ু ও হরিয়ানায় উন্নত ধরনের বলদে-টানা গাড়ি তৈরি করা হয়েছে। তবে আরও উন্নত ডিজাইন উদ্ভাবনের সুযোগ রয়েছে।

—পুণ্ডরীক

১৯-৬-৭৪

ঘোষপাড়ার মেলা ও কর্তাভজা সম্প্রদায় সম্পর্কে

আমি অমৃতের একজন নিয়মিত পাঠক। গত ১৩ বর্ষ ৫০ সংখ্যা 'অমৃত' পত্রিকায় 'ঘোষপাড়ার মেলা ও কর্তাভজা সম্প্রদায় সম্পর্কে' রচনাটি প্রকাশের জন্য আমি 'অমৃত' সম্পাদকমণ্ডলীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। রচনাটি সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে। বিশেষ করে লেখকের উক্ত রচনাটির মধ্যে বেশ কিছু তথ্যে ত্রুটি ধরা পড়েছে, সেই হিসেবে কিছু বলতে চাই। প্রথমতঃ লেখক লিখেছেন, ঘোষপাড়া গ্রামটি গোবিন্দপুরের ঘোষ পরিবারের জমিদারিতে অবস্থিত। আমি ঘোষপাড়া ঐতিহাসিক অঞ্চলের কাছাকাছি থাকি বলেই ঐ ভুলের সূত্র ধরতে পেরেছি। ঘোষপাড়া আসলে নদীয়া জেলার কল্যাণীতে অবস্থিত।

দ্বিতীয়তঃ রাজ্য সরকারের কাছে নীলামে ইজারা নিয়ে মেলাটি বসানো হয়। মেলায় সমাগত ভক্তদের মধ্যে নরনারীর সংখ্যা—বিধবার সংখ্যা বেশী। শুধু তাই নয় রচনাটিতে লেখক লিখেছেন মেলাটি নাকি তিনদিনের। লেখকের উক্ত বিবরণ ঠিক নয়।

তৃতীয়তঃ—লেখক আউলচাঁদ প্রথম বাইশ জন যে ফকিরের তালিকাভুক্ত করেছেন তা থেকে রামশরণের নাম বাদ দিয়েছেন। আবার লেখক আউলচাঁদের যবন প্রীতি হরিজন সেবা, পংক্তিভোজনের কথা উল্লেখ করেছেন তাও সঠিক নয়। এ ক্ষেত্রে লেখকের লৌকিক ঐতিহ্যের কথাটি বিশেষ করে স্মরণ রেখে চিন্তা করা উচিত ছিল।

সবচাইতে আশ্চর্যের কথা, লেখক এক জায়গায় লিখেছেন—ঘোষপাড়ার মেলা ও কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হওয়া আজ দরকার। কিন্তু ইতি-মধ্যে ঐ বিষয়ে যে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা তার গবেষণা শুরু হয়ে গেছে সেটা হয়তো তিনি নিজেই জানতেন না। ঐ প্রসঙ্গে ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণা ও গবেষণা-মূলক প্রবন্ধাদির কথা এবং অধ্যাপক রতন নন্দীর সামগ্রিক কর্তাভজা সম্পর্কে গবেষণার কথা উল্লেখযোগ্য। কিছুদিন আগে আকাশ-বাণী মারফত ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়ের ঘোষ-পাড়ার মেলা ও কর্তাভজা সম্পর্কে গবেষণা মূলক একটি বিবৃতি প্রচারিত হয়। শুধু তাই নয় এঁদের গবেষণার ফলে এরই মধ্যে বহু মৌলিক তথ্যাদি উদ্ঘাটিত হয়েছে তা আমরা সংবাদপত্রে লক্ষ্য করেছি। যাই হোক ঘোষপাড়ার মেলা ও কর্তাভজাদের সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি তাতে মনে হয় লেখকের রচনায় বেশ কিছু ভুল তথ্য রয়েছে।

—অনুপম মিত্র, কাঁচরাপাড়া।

(২)

'ঘোষপাড়ার মেলা ও তার প্রাণভোমরা' (অমৃত ১২ বৈশাখ, ১৩৮১) শীর্ষক প্রবন্ধে মেলার 'প্রাণভোমরা'টির পরিচয় পেয়ে আমরা আনন্দিত। লেখক বাংলার সামাজিক ও আর্থনীতিক তদানীন্তন কাঠামোর পটভূমিতে সমগ্র বিষয়টি বিচার করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই প্রয়াস কৃতিত্বের দাবী রাখে। লেখকের সঙ্গে যে কোন সমাজবিজ্ঞানী একমত হবেন যে, কোন ধর্মচিন্তা সমাজ-নিরপেক্ষ নয়'। তাই, তিনি 'আমাদের সমাজ-জীবনের নিরন্তর প্রক্রিয়ার মধ্য থেকেই এ সম্প্রদায়গুলির উদ্ভব হয়েছে।' বলে যে মন্তব্য করেছেন, তা বাস্তব সত্য এবং তিনি 'সমগ্র সমাজ-জীবনের চলমান প্রেক্ষাপটে' 'কর্তাভজা'দের কিছুটা পরিচয় দিতেও চেষ্টা করেছেন। এ-পদ্ধতিতে 'পরিচয় দেওয়াটার প্রকৃত কাজের' প্রতি তিনি আলোকপাত করে ধন্য-বাদের পাত্র হয়েছেন। তবে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের বিষয়বস্তু আশা করা বৃথা।

এ সম্পর্কিত 'ঘোষপাড়া কর্তাভজা সম্প্রদায়' (অমৃত, ২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮১) নামক প্রকাশিত একটি পত্র পড়ে যুগপৎ বিস্মিত ও দুঃখিত হয়েছি।

বিস্মিত এই জন্যই যে, মানিকবাবুর প্রবন্ধের ইতিবাচক দিকগুলি অনুল্লেখিত রেখে পত্রলেখক কেবল প্রবন্ধ লেখক সম্পর্কে ত্রুটি, ভুল, সঠিক নয়, প্রয়োজন সম্ভবত সব পড়েন নি, অসঙ্গতি, অজ্ঞতাজনিত...... অনুল্লেখ, অবহিত নন প্রভৃতি নেতিবাচক দিক যে উপায়ে তুলে ধরেছেন, তাতে অন্ততঃ পাঠকবর্গের কাছে সঠিক অবগতি বা বিষয়বস্তুর প্রকৃত মূল্যায়নের গঠনাত্মক উদ্দেশ্য পত্রলেখকের লেখায় ধরা পড়েনি। বরঞ্চ উক্ত পত্রের অনেক অনুচ্ছেদের শেষে 'উচিত ছিল' শব্দটি এবং উল্লিখিত উক্তি-গুলির ব্যবহারে উন্নততর অনুজের প্রতি জ্যেষ্ঠভ্রাতার ঈর্ষাপ্রসূত অঙ্গুলিহেলন সূচিত করে। এটা অভিপ্রেত নয়, পীড়া-দায়ক!

দুঃখিত এই জন্যই, আমরা পাঠকেরা প্রকৃতপক্ষে ভজকর্তা-মতে অনুপ্রাণিত নই। কোন জন বেশী জ্ঞানাধিকারী কার কিছু কম পুস্তক পড়া আছে এবং তারই জন্য ব্যঙ্গাত্মক উপদেশারোপ, সর্বোপরি বেশী পড়া কোন গবেষকের নামের অনুল্লেখে উপদলীয় কোন্দল—এই সবের মধ্যেই আমরা পীড়া অনুভব করি। স্বভাবতই যে-কোন লেখার যে কোন প্রশংসনীয় মৌলিকতা আমাদের আকর্ষণ করে। এক্ষেত্রে ছাপা-ঙ্কিত গবেষকগণেরই মৌলিক রচনার অধি-কারী—একথা স্বীকৃত নয়। প্রবন্ধকার-লিখিত কয়েকটি শব্দ যথা 'তথ্যনির্ভর ক্ষেত্র অনুসন্ধান' ইত্যাদি ব্যবহারে ছাপা-ঙ্কিত গবেষকের শিউরে ওঠার 'বাধ্যতা' কোথায়? বস্তুতঃ মানিকবাবু লিখিত লোকসংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধান্তরেও আমরা বৈজ্ঞানিক আবেদন দেখেছিলাম।

পত্রলেখক কর্তৃক উল্লিখিত অধ্যাপক রতন নন্দীর কোনও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে কিনা, তা জানি না। কিন্তু কর্তাভজা সম্প্র-দায় সম্পর্কে আলোচনায় ডঃ তুষার চট্টো-পাধ্যায়ের নামকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে পত্র-লেখক ঠিকই করেছেন।

কোনও লেখায় কোন স্বীকৃত নামের অনুল্লেখকে অন্যভাবে বিচার না করাই ভাল। কারণ নামোল্লেখের কি শেষ আছে? আমাদের দেশ সুধীজনধন্য। ডঃ সুধীর চক্রবর্তী ও শ্রীবিমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের নাম এই প্রসঙ্গে বর্তমানে আমার মনে আসছে। পত্রলেখকের পত্রে তো এই নামের উল্লেখ নেই, এটা কিছু ঔচিত্য অতিক্রম করার অপরাধ নয়।

অবশ্য কোনও প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতি নিজের উক্তির মত ব্যবহার করা অপরাধ। এই প্রসঙ্গে খুবই দুঃখের সঙ্গে বলছি—তুষার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কিন্তু তাঁর 'লালশশী' সম্পর্কিত বিষয়ে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে পূজ্যপাদ মনুলাল মিশ্রের একটি ভাষ্যকে গ্রহণ করে তাঁর নামোল্লেখ করেন নি। অনু-রূপ ঘটনা শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়ের ক্ষেত্রেও মনে হয় ঘটেছে। উল্লেখ্য 'সবিশেষ গবেষকের ঐ প্রবন্ধে প্রদত্ত বাইশ ফকিরের নাম সম্বলিত পদ্যে রামশরণ পালের নাম নাই।

সর্বশেষে বলতে চাই, 'আকর গ্রন্থ' কোনটি আর কোনটি নয়, তা জানি না। কিন্তু গুণীজন কর্তৃক গুণীজনের প্রতি গুণীজনোচিত ব্যবহার ও মন্তব্যই আমরা সাধারণেরা আশা করি। আর চাই গঠনাত্মক সহৃদয় আলোচনা।

লীলা মুখোপাধ্যায়
কৃষ্ণনগর, নদীয়া

যদি প্রশ্ন করতেই হয় ॥

রাম বসু

আমি শুধু এই কথাই বলি ঃ
যদি কোন প্রশ্ন করতে হয়
সময়কে কর
সমুদ্রকে কর
আমি কিছুই জানি না

পাংশুপ্রভ আলোয় দেখেছি
হাতের তালুর জটিল জঙ্গল থেকে লাফ দিল ক্ষুধার্ত নেকড়ে
এক কামড়ে আমার কণ্ঠনালী ছিঁড়ে নিয়ে পালিয়ে গেল
বালিয়াড়ির ধারে প্রায়-লুপ্ত জলধারার মতো ভাগ্যরেখা
কয়েকটি মৃত পাখি, নুড়ি আর কাচপোকা বুকে নিয়ে বসে আছে
আমি শুধু জানি আমাদের অন্ধ ইতিহাস
কুয়ায় পড়া মহিষের মতো আর্দ্র অন্ধকারে ডেকেই চলেছে

আমার মরা-পাথুরে কপালের ধারে রিক্ত সন্ধ্যার আলো
একদা অনাগতের ইংগিতবহ শরীর এখন নষ্ট বাতিঘর
দিগভ্রান্ত জাহাজের সাইরেন কটু কুয়াশায় হন্যে কুকুর
পৃথিবীর শেষ লাবণ্যের কবর খোঁড়া হচ্ছে
ঠিক আমার বুকের ভিতর, আমার বুকের ভিতর

বলবে কি জীবনের নিষ্ঠুর পরিহাস?—বল; ক্ষতি নেই
আমি আমার ভূমিকা জেনে গেছি
আমি এখন দুই কাঁধ প্রসারিত করে দিয়েছি
যেন হতচ্ছাড়া কালপুরুষ—নৈঃশব্দ্য একটু জিরিয়ে নিতে পারে
বিশ্বাসঘাতকতার বাঘনখে খোবলানো তার দেহে, বিষণ্ণ নক্ষত্র
মাখিয়ে দিতে পারে বনরেণু ওষধি
যেন তাকে মুড়ে দিতে পারে লতাপাতার সান্ত্বনায়

আমার ভূমিকা আমি জেনে গেছি
আমাকে আর কোন প্রশ্ন করো না
যদি করতেই হয়
সমুদ্রকে কর
সময়কে কর।

অলৌকিক জলযান

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

উপন্যাস

(২৬)

—স্যার!

স্যালি হিগিনস পাশে চোখ ফেরালেন।

—ওপরে চলুন স্যার।

—ওপরে? আচ্ছা।

—স্যার!

—যাচ্ছি।

বনি একটা কথা বলছে না। চোখ মুখ তার ভারি বিষণ্ণ। সে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। ছোটবাবু বনিকে নানাভাবে বোঝাচ্ছিল। সামান্য সাহসী হতে বলছে। বনি যেন ছোটবাবুর একটা কথাও বুঝতে পাচ্ছে না।

ডেভিড এবং চিফ-মেট বুঝতে পারছে না কি করবে। আবার বলল, স্যার আপনি সেই কখন থেকে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন। ওরা তো চলে গেছে। আর দেখা যাচ্ছে না। ওপরে চলুন এবার। শরীর আপনার ভাল নেই।

স্যালি হিগিনস বললেন, চল।

ওরা পোর্ট-সাইড ধরে এবার হেঁটে যেতে থাকল। সোজা ছোটবাবুর কেবিনের ও-পাশে হেঁটে গেল।

তিনি ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভাঙতে থাকলেন। খুব সতেজ এবং কিছু হয় নি মতো উঠে যাচ্ছিলেন। কেউ আর একটা কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না। লোক দুটো কে, ওরা কেন এসেছিল! বেঁটে মতো লোকটা ভারি অদ্ভুত। অকারণ যেখানে সেখানে হাতুড়ি ঠুকছিল।

ডেভিড চিফ-মেটের কানের কাছে মুখ এনে বলল কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে স্যার।

—কি ঘটবে মনে হয়। চিফ-মেট সিঁড়ি ধরে ওঠার সময় এমন বলল।

ডেভিড ভীষণ ফিস ফিস গলায় কথা বলছিল।

—কিছু একটা ঘটবে। ঠিক ঘটবে। ওঁর মুখ দেখে আপনি বুঝতে পারছেন না স্যার!

—কি ঘটবে! কি ঘটতে পারে!

ওরা ততক্ষণে দুজনই বোট-ডেকে উঠে এসেছে।

চিফ-মেট সামান্য কি ভেবে বলল, কিন্তু এটা ঠিক না। এমন শরীরে জাহাজের অতলে নেমে যাওয়া ঠিক না। এতটা ওঠা-নামা করা তাঁর উচিত হয় নি। কিছু একটা সত্যি ঘটে গেলেও ঘটে যেতে পারে।

স্যালি হিগিনস সিঁড়ি ধরে আরও ওপরে উঠে যাচ্ছেন তখন। মনে হচ্ছে না গতকাল তিনি অসুস্থ ছিলেন, সংজ্ঞা হারিয়েছিলেন। বেশ স্বাভাবিক গলায় না তাকিয়ে ডাকলেন—চিফ-মেট।

চিফ-মেট ডেভিডকে বোট-ডেকে ফেলে ওপরে প্রায় দু-লাফে উঠে গেল।

বনি আর ছোটবাবু আরও পেছনে আসছে। বনি দেখল, বাবা চিফ-মেটকে নিয়ে চার্ট-রুমে ঢুকে যাচ্ছেন।

ডেভিড জ্যাককে পেছনে আসতে দেখে বলল, তুমি জানো জ্যাক, এরা কারা?

—না ডেভিড। এরা কারা জানি না।

জাহাজে তেমনি ফসফেটের গুঁড়ো উড়ছে। টাগ-বোট সব আসছে যাচ্ছে। টাগ-বোট থেকে তেমনি বড় বড় ফসফেটের পিপে সব হাঁড়িয়া হাপিজ হচ্ছে। তেমনি কোলাহল জাহাজে। উইনচের প্রচণ্ড শব্দ। তেল কালি বার্নিশের গন্ধ। আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ। ঠিক বাংলাদেশের গ্রীষ্মের রোদ আর বাতাসের মতো আবহাওয়া। দাঁড় দড়া, রঙের টব, জাহাজ সমুদ্র এবং দ্বীপমালার ভেতর তেমনি আছে তার ছোটবাবু। তবু সব কেমন বর্ণহীন। সে কিছুতেই কেন জানি ভাল করে সাড়া দিতে পারছে না। এই তো পাশে তার ছোটবাবু হাঁটছে—তবু কি যে এক ভয়!

ছোটবাবুর কাজ পড়ে আছে উইনচে। সে এক্ষুনি হয়তো নেমে যাবে। ডেভিডও থাকবে না। সে তখন এই বোট-ডেকে আরও একাকী হয়ে যাবে। অথচ সে বাবাকে কিছু বলতে না পারলে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। চিফ-মেট এখনও বের হচ্ছে না। বের হলে সে ঠিক দেখতে পাবে। এবং যখন বের হয়ে এল চিফ-মেট এক দণ্ড সে আর দাঁড়াল না। লাফিয়ে ওপরে উঠে গেল। ভেতরে ঢুকে ডাকল, বাবা!

স্যালি হিগিনস মাত্র টেবিলে মাথা রেখেছেন। বনি জাহাজে আছে তাঁর যেন মনেই ছিল না। মাথার ভেতরে সোরগোল উঠে উঠে জট পাকিয়ে যাচ্ছে—ঘূর্ণির মতো অথবা রথের চাকার মতো বন বন কেবল ঘুরছে। তিনি তখন আর চারপাশে কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। বনি এই যে তাঁকে এসে ডাকল কতদূরে থেকে যেন সেই ডাক বাবা তুমি এমন হয়ে যাচ্ছ কেন! যেন চিনতে সময় লেগে যাচ্ছে তাঁর—বনি তাঁর আত্মজা, রক্তে মাংসে বনি তাঁর আত্মার চেয়ে প্রবল অস্তিত্বে বেঁচে আছে—কিছুতেই মনে করতে পারছিলেন না এতক্ষণ। বনিকে চিনতে কত যে সময় লেগে যাচ্ছে তাঁর।

বাবা কেবল তাকে দেখছেন। একটা কথা বলছেন না! সে ভয় পেয়ে ফের ডেকে উঠল, বাবা তোমার কি হয়েছে!

তিনি স্মিতমুখে গলায় বললেন কিছু হয় নি তো!

—লোক দুটোর সঙ্গে তুমি এনজিন-রুমে নেমে গেলে কেন?

—ওরা জাহাজটা দেখতে এসেছিল।

—চিফ-মেটকে পাঠালে পারতে। ডেভিড ছিল। তুমি নেমে গেলে কেন?

—তাতে কি হয়েছে! সেই সমুদ্র বালকের মতো, অথবা বনির এমন যে সুন্দর লাবণ্যময় শরীর, যেন প্রায় তার মতো, অথবা কোনাছুর শৈশবে তিনি এমনই ছিলেন দেখতে—এবং সংগে সঙ্গে যেন প্রবল বেঁচে থাকার ইচ্ছে সারা শরীরে—তিনি সাহসী বালকের মতো উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, তোমার সঙ্গে আমি আজ যাব বনি। তারপর ঠিক আগের মতো দরজার বাইরে গলা বাড়িয়ে— হাঁকলেন, কোয়া...র্টা...র মা-স্টা-...র।

কোয়ার্টার-মাস্টার এলে বললেন, ক্যাপ্তান-বয়।

ক্যাপ্তান-বয় এলে বললেন, জ্যাকেব কেবিনে আমি খাব। ডাইনিং হলে জানিয়ে দেবে। তারপর বনির বড় বড় চুল এলো-মেলো করে দিয়ে বললেন, তাহলে আমরা একসঙ্গে খাচ্ছি।

বাবাকে সহসা এত খুশী দেখে সে কেমন অবাক হয়ে গেল। ঠিক সেই চিরদিনের এক স্নেহময় পিতার মুখ, সে কি আর বলবে, সে যে ভেবেছিল অনেক কিছু বলবে, বলবে, বাবা, তুমি এত ভাবো কেন? তোমার তো বাবা বেঁচে থাকার মতো সব আছে। একটা ভাঙ্গা জাহাজ নিয়ে তোমার এত কি দায়! তুমি কেন বলতে পার না, জাহাজ আর চলবে না। তোমার এমন কি দাসখত দেয়া আছে, ভাঙ্গা জাহাজ চালিয়ে নিতেই হবে! কিন্তু বাবার হাসিখুশী মুখে এখনও এত বেশি ছেলেমানুষী থাকে যে সে আর রাগ করতে পারে না।

সে আর কিছু বলতে পারল না। নিচে নেমে গেল। বাবা নিমেষে তার সব দুর্ভাবনা দমকা বাতাসের মতো উড়িয়ে নিয়ে গেলেন। সে সহজেই নিচে নেমে বাথরুমে ঢুকে গেল। এবং বাথরুমের সাদা টবে সব দামী সুগন্ধ ছড়িয়ে জলের ভিতর একটা সোনালী মাছ হয়ে ভেসে থাকল চুপচাপ। ছোটোবাবুর কথা ভেবে বার বার জলের ভেতর ডুবে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

খাবার টেবিলে বনি বলল, বাবা ওরা জাহাজটার কি দেখতে এসেছিল?

—ওরা জাহাজটার সব ইস্পাত দেখতে এসেছিল।

—ইস্পাত!

—জাহাজটা ওরা কিনতে চায়।

—এই পুরোনো ভাঙ্গা অচল জাহাজ ওরা কিনে কি করবে!

এখনও এর যা আছে বনি...যেন জাহাজটা ভাঙ্গা পুরোনো বললেই তিনি ক্ষেপে যান ভেতরে ভেতরে। তিনি কফি খাচ্ছিলেন, আর চুরি করে বনির মুখ দেখছিলেন। বনি জাহাজটাকে পুরোনো ভাঙ্গা বলছে, বনির এমন কথাবার্তা তাঁর একেবারে পছন্দ না। বনির কাছে তিনি কিছুতেই মুখ ভার করতে পারেন না। এই যে তিনি বনির সঙ্গে খেলেন, বনিকে নানাভাবে উৎসাহ দিচ্ছেন—যেন বনি কিছুতেই তার দুর্ভাবনার কথা টের না পেয়ে যায়, পেয়ে গেলে তিনি জানেন মেয়েটা সারাক্ষণ জাহাজে মুখ গোমড়া করে রাখবে। তিনি সারাক্ষণ ভাবতে চেষ্টা করছেন, গতকাল এমন কিছু তাঁর হয় নি। এবং দুর্ভাবনা এত বেশি প্রবল যে বার বার মুখের ওপর একটা ঘন কালো ছায়ায় ঢেকে গেলে তিনি প্রায় জোরে হেসে দেবার চেষ্টা করেছেন, আর তখন কিনা বনি বলছে, ভাঙ্গা পুরোনো জাহাজ—যেন তিনি এখন জোরে চিৎকার করে উঠতে পারতেন, বনি পৃথিবীতে সবাই জাহাজটাকে নিয়ে উপহাস করছে, আমি সহ্য করে গেছি। কিন্তু তুমি কর না। তুমি জাহাজটাকে ভাঙ্গা অচল বললে আমি আমার সব সাহস হারিয়ে ফেলব।

বনি দেখল, বাবা মুখ মুছে ধীরে ধীরে বের হয়ে যাচ্ছেন। জাহাজটা অচল বললে বাবা ভীষণ ক্ষেপে যান। সে কেন যে এমন বলতে গেল! দরজার বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখল, ওপরে তিনি চুপচাপ ব্রীজে দাঁড়িয়ে আছেন। কাচের ভেতর অস্পষ্ট ছায়া দেখা যাচ্ছে। বনির মনটা আবার ভার হয়ে গেল।

তখন স্যালি হিগিনস যেন, এই সামনে যা কিছু আছে কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। কেবল দেখতে পাচ্ছেন একটা জাহাজ সেই কবে থেকে তিনি তার যাত্রী, জাহাজটা তাকে নিয়ে নিরবধিকাল সমুদ্রে ভেসে চলেছে। আর তখনই তাঁর সদর্পে বলতে ইচ্ছে হয়, আসলে বনি, জাহাজটা লুকেনারের হাড় দিয়ে তৈরি। সমুদ্রে সে কখনও-ডুবে যেতে পারে না। তারপর তাঁর কি যে হয়ে যায়, দু-হাত ওপরে তুলে আকাশ ছুঁয়ে দেবার মতো ইচ্ছে। বলার ইচ্ছে চিৎকার করে—সি...জা...র। জাহাজের আসল নাম সি...জা...র। প্রায় আর্কেমেডিসের সূত্র আবিষ্কারের মতো তিনি যেন কতদিন পর, প্রায় দীর্ঘকাল বলা চলে এবং এই শেষ সফরে জেনে ফেলেছেন—অতি প্রাচীন জাহাজ এই সিউল-ব্যাংক। তার বয়সকাল নির্ণয় করা অর্থহীন। এবং এখন আর যা তাঁর মনে হয়, জাহাজের ভেতরেই আছে সেই এক ঐশী শক্তি। বনি তুমি সব অবহেলা করতে পার, কিন্তু তাকে তুমি পার না। দোহাই বনি, এসব বলে তুমি তার কোপে পড়ে যেও না।

আর সঙ্গে সঙ্গে সেই কঠিন দুর্ভাবনা। জাহাজের গিলোটিন হয়ে গেল। কিংবদন্তির মতো যে ছিল তাঁর কাছে অজর অমর, কলমের এক খোঁচায় সে শেষ হয়ে গেল। এখন তাঁর ইচ্ছে করছে যদি পারতেন জাহাজ, নিয়ে সমুদ্রে পালিয়ে বেড়াতেন। গিলোটিনের হাত থেকে বাঁচাবার তার কাছে আর কোনো পথ নেই। তারপর বুঝতে পারেন সব অর্থহীন—মিঃ ফেলের ব্যক্তিগত চিঠি এবং কিছু তার বাক্যাংশ মাথা কুরে কুরে খাচ্ছে। দুর্বলতা ভেবে যত চেয়েছেন সব কিছু ভুলে থাকবেন, তত সেই বাক্যাংশ কঠিন সংশয়ের ভেতর নিক্ষেপ করছে। তিনি কিছুতেই এই অতিশয় অভিনয়ের ভেতর আর নিজেকে গোপন রাখতে পারছেন না। মূর্ছা যাবার ভ কেবিনে ঢুকে টেবিলে মাথা রেখে কেবল স পড়লেন।

বিকেলে সবাই দে ব্রীজের ডেক-চেয়ারে স্যালি হিগি মাথা এলিয়ে দিয়েছেন। বাইবেল ছেন। পাতার পর পাতায় কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তিনি একটা পাতায় এসে আটকে গেলেন। তিনি পড়লেন, হ্যাভ কনফিডেনস ইন দ্য লর্ড, ইন অল দাই ওয়েজ থিংক অন হিম, এ্যান্ড হি উইল ডাইরেকটর দাই স্টেপস: ঈশ্বর আর কোথায় কি বাইবেলের পাতায় নির্দেশ রেখেছেন বসে বসে দেখছেন। পাগলের মতো পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছেন। এবং এখন দেখে মনে হয় একজন আত্মমগ্ন মানুষ তিনি। ভীষণ ঝুঁকে পড়েছেন বাইবেলের ওপর। এত যে জাহাজের চারপাশে ব্যস্ততা, ঘড় ঘড় শব্দ এবং অতিকায় শব্দের ভেতর সব কর্মপ্রণালী ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে তিনি যেন তা একেবারে শুনতে পাচ্ছেন না। বাইবেলের পাতার শব্দের ভেতর বার বার তিনি ভিকটিস শব্দটি আবিষ্কার করে অতিশয় মর্মান্তিক চোখ মুখ করে রেখেছেন। এবং এ-ভাবে বার বার শেষবার, শেষবারে তিনি নিজে তার শিকার। মিঃ ফেলের ধূর্ততা চোখের ওপর চশমার কাচে জ্বল জ্বল করছে। —আপনি আমাদের আজীবন সহযোগী। মিঃ হিগিনস আপনার ওপর আমরা নানা কারণে নির্ভরশীল। বোর্ড আপনাকে পরিচালক-

বর্গের অন্যতম করে নিয়েছেন। এতে আমরা সম্মানীত বোধ করছি। আপনার অধিকারের ভেতরেই আছে সে। অধিকার শব্দটির দ্বারা কিছু অর্জন করা বোঝায়। অর্জন করেছেন তিনি, জাহাজের বিশ্বাস অর্জন করেছেন। আর বিশ্বাস শব্দটির সঙ্গে গিলোটিন শব্দটি বার বার চোখের ওপর আগুনের রিং হয়ে যেতে থাকল। তিনি চোখ মুছে ফের চশমা পরে নিলেন। চোখের ওপর তিনি কি যে সব ভেসে উঠতে দেখেন! এবং মনের এ দুর্বলতা তিনি কিছুতেই পরিহার করতে পারছেন না কেন। আর তখনই বাইবেলের ভেতর সেই সব শব্দ, যেন কোনো দেবদূত পাথরের গায়ে বড় বড় শাবলে রোপণ করে যাচ্ছেন—নাথিং ক্যান বি কমপেয়ারড টু এ ফেথফুল ফ্রেন্ড, এ্যান্ড নো ওয়েট অফ গোলড এ্যান্ড সিলভার ইজ এবল টু কাউন্টারভেল দ্য গুডনেস অফ হিজ ফাইডেলিটি। তিনি ভীষণ ঘামছেন। খালি গা তাঁর। সাদা রংয়ের হাফ-প্যান্ট। মুখ চোখ ক্রমশ আবার লাল হয়ে যাচ্ছে। সেই সব শব্দ পাহাড়ের গায়ে এত বেশি বড় হয়ে যাচ্ছে, এত বেশি কাঁপছে এবং ক্রমে এগিয়ে আসছে যে তিনি আর বসে থাকতে পারছেন না। যেন বার-বার সেই সব শব্দ বিশ্বাসভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত করছে তাঁকে। সহসা আবার সব পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা লেখা সব মুছে গেল। যেন সেখানে ডেভিল তার শাবলে বড় বড় অক্ষরে ফের রোপণ করে যাচ্ছে নতুন সব শব্দ বাই দ্য এনভি অফ দ্য ডেভিল, ডেথ কেম ইনটু দ্য ওয়ার্ল্ড। ডেথ, একাকী গোপনে দু-বার উচ্চারণ করার সময় তিনি কেঁদে ফেললেন। দোহাই আপনার, তিনি যেন বাতাসে তাঁকে ছুঁতে চাইলেন। বনিকে ছাড়া আমি আর কিছু ভাবতে পারি না। দোহাই, আপনি তাকে রক্ষা করুন।

তারপর আর যা মনে হয়, তিনি পাগল হয়ে যাচ্ছেন না তো! নিজেকে অকারণ কেন বার বার বিশ্বাসভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত করছেন! সাধারণ একটা জাহাজকে কেন বার বার ভাবছেন তার প্রতিটি বিশ রক্ত-মাংসের। কেন ভাবছেন এক্ষুনি জাহাজের হাড় পাঁজরে বিদ্যুৎ খেলে যাবে! আর তিনি এ-সব কি দেখছেন চোখের ওপর। —সত্যি সারা ডেকে বিদ্যুৎপ্রবাহ, সেই কোনো মরুভূমির মরীচিকার মতো তিনি দেখতে পাচ্ছেন বনি আতঙ্কে চিৎকার করছে, লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। তিনি ব্রীজে যেন ঝুঁকে পড়েছেন। চিৎকার করে ডাকছেন, বনি, ওদিকে না। এদিকে চলে এস। হায় বনি কিছুতেই এদিকে চলে আসতে পারছে না। অক্টোপাসের মতো বিদ্যুৎপ্রবাহের বেড়াজালে আটকা পড়েছে। মেয়েটা শোনালী লতায় ক্রমশ ঢেকে যাচ্ছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফের বোধহয় না পেরে হাতের বাইবেল ছুড়ে দিতেন; ছুড়ে দিলেই সব বিদ্যুৎপ্রবাহ ঈশ্বরের অমোঘ বাণীতে ছাই হয়ে যাবে,

তখনই মনে হল অনেক দূরে সমুদ্রে অথবা বাতাসের গায়ে কেউ রোপণ করে যাচ্ছে আশ্চর্য সব অভয় বাণী—কল আপন মি ইন দ্য ডে অফ ট্রাবল, আই উইল ডেলিভার দি, এ্যান্ড দাউ শ্যালট গ্লোরিফাই মি।

তারপর সব আবার ঠিকঠাক। জাহাজটা যেন একেবারে আর দশটা জাহাজের মতো। এতক্ষণ তিনি কেবল জাহাজটা দেখতে পাচ্ছিলেন, আর কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না। বনি ডেকে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, আর কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না। তিনি নিজে ব্রীজে দাঁড়িয়ে আছেন—আর কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না। এখন তিনি আবার সব দেখতে পাচ্ছেন। চারপাশে টাগ-বোট মাল খালাস করে চলে যাচ্ছে। একজন খালাসী রং করে ফিরছে। ফলগুলো থুলে পাশে রেখে গোপনে সিগারেট খাচ্ছে। বড় বড় কাঠে নাবিকেরা ফল্কা ঢেকে দিচ্ছে। ডেরিকের দড়িদড়া তুলে নিয়ে যাচ্ছে ডেক-কশপ। ছোটবাবু উইনচের নিচ থেকে মাথা বের করে রেখেছে। এবারে সে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে আসবে। বনি বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে ডেবিডের সঙ্গে গল্প করছে।

আবার এ-ভাবে পৃথিবীতে আর একটা দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে পাহাড়ের মাথায়। সমুদ্রে সব পাখিদের ছায়া। ওরা দ্বীপে ফিরে আসছে। লেডি-এ্যালবাট্রস কোথাও হয়তো আছে, অথবা সমুদ্রের গভীরে নীল জলে এখন মাছ ধরে যাচ্ছে। সে বোধহয় তার পুরুষপাখিটার কথা একেবারে ভুলে গেছে। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সময় কত স্মৃতি, কত এবং এইসব ছবির শব্দমালা আর যায় না, পৃথিবীর অন্ধকারে অথবা জগতের সেই প্রবাহমান ধারায় মিশে কত ক্ষুদ্র, কত সামান্য এ-সব মনে স্যালি হিগিনস এ-সব ভেবে বোধহয় দুর্বলতা পরিহার করতে চাইছেন হতে না পারলে তিনি ডুবে যাবেন। হয়ে যাবেন।

কোয়ার্টার-মাস্টার জাহাজের সব জেবলে দিচ্ছে তখন। ফোর-মাস্টের জেবলে, দু-পাশের সব আলো জ্ব জবালতে সে ছুটছে। মেন-মাস্টে আলো জবালতে হবে। জাহাজের যা কিছু অন্ধকার সে দু-হাতে এখন দিচ্ছে। সব আলো জেবলে, সব পতাকা নিয়ে যাবে সে। তারপর হয়তো বিছিয়ে খোলা ডেকে উদার আকাশের সারাদিন কেটে গেলে পৃথিবীর মহিমময়ের কাছে সামান্য নতজানু বাই দা এনভি অফ দ্য ডেভিল, [illegible] ইনটু দ্য ওয়ার্ল্ড। মানুষের [illegible] হয়ে উপায় নেই। পাপ এবং [illegible] জন্য মানুষের নতজানু না হয়ে নেই। এবং এ-সব মনে হলেই তিনি ভেতরে দুর্বল হয়ে পড়েন। তাঁর সব নিমেষে উবে যায়। তিনি তখন করবেন ঠিক করতে পারেন না। তিনি পাতার পর পাতা না দেখে বাই সব স্তবক আবৃত্তি করে যান। কখনও তিনি কোনো স্পিরিচুয়েল সং ছেড়ে গাইতে চান—পারেন না। হাতে

তে করুণা ভিক্ষার মতো গলা ছেড়ে ভীষণ ভাল লাগে ভাবতে তিনি হন—আই এ্যাম অন মাই ওয়ে। অথবা ও আই এ্যাম অন মাই ওয়ে টু না-ল্যান্ড। তারপরই মনে হয় নাড়ির থেকে গলার স্বরে ভেসে আসবে ঈশ্বরের জন্য প্রতীক্ষা—গ্লোরি হ্যালে-, আই এ্যাম অন মাই ওয়ে। আমি নার কাছেই যাচ্ছি। কোনো উপতারার অথবা কোনো দ্বীপমালার ভেতর যেতে যেতে, অথবা সব সবুজ গাছের, দূরবর্তী নক্ষত্রের মতো ঘুরে ঘুরে তে করুণা ভিক্ষার মতো তিনি যেন যাচ্ছেন, গ্লোরি হ্যালেলুজা, আই অন মাই ওয়ে।

—স্যার!

স্যালি হিগিনস মুখ তুলে তাকালেন।

—ডাক্তার নিচে দাঁড়িয়ে আছে।

—ডাক্তার আবার কেন! আমি তো ম আছি। বেশ ভালো। এখানে তাকে এস।

—ভিতরে গেলে ভাল হত না স্যার।

—তোমরা ভারি জ্বালাতন কর চিফ। কে নিয়ে হঠাৎ তোমাদের কেন যে এত বনা বুঝি না। বলে, তিনি উঠে লেন। সমুদ্র থেকে জোর হাওয়া উঠে ছে। তিনি ইচ্ছে করলে তাঁর পোশাক পুরি পরে নিতে পারেন। আর বে তিনি প্রায় এ-রকমের। ধরাচুড়ো তিনি একেবারে এখন ক্যাপ্টেন স্যালি নস। ভেতরে ডাক্তার এলে হাত বাড়িয়ে ড-স্যাক করলেন। বললেন, তোমার কি মনে হয় ডাক্তার, এ-বয়সে তুমি আর আমার কিছু করতে পার?

—না স্যার।

—তবে এসেছ কেন!

ডাক্তার এর ওর মুখের দিকে তাকাতে থাকল। তখন বনি বলল, তুমি শুয়ে পড়তো বাবা।

আর একটা কথা বলতে পারলেন না। একেবারে ভীতু বালকের মতো শুয়ে পড়লেন। বনি যতক্ষণ পাশের কাছে আছে আর বোধহয় তিনি একটা কথাও বলতে পারবেন না। সামান্য দুষ্টুমি করার ইচ্ছে ছিল ডাক্তারের সঙ্গে। বনির জন্য তাও হল না। চুরি করে মাঝে মাঝে মেয়ের মুখ দেখছেন। বনি ডাক্তারের মুখ দেখছে। ডেবিড ডাক্তারকে নানাভাবে সাহায্য করছে। কতটা রক্ত-চাপ শরীরের দেখছে এবং কানে নল লাগিয়ে বুক দেখছে। বনি প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ডাক্তার কি বলবে শোনার জন্য চোখের পলক পড়ছে না।

ডাক্তার সব ব্যাগের ভেতর ভরে নেবার আগে, জিভ দেখল, চোখ দেখল, পেট টিপে দেখল। দুটো একটা প্রশ্ন। বনি অথবা চিফ-মেট কখনও ডেবিড জবাব দিচ্ছে। এবং সকালে জাহাজের এনজিন-রুমে নেমে গেছিলেন এ-সবও যখন বলা বাদ গেল না আর যখন ডাক্তার বলল, ভাল আছেন, কোনো ভয় নেই, তখন স্যালি হিগিনস হা হা করে হেসে দিলেন।

—তবে! বলেই স্যালি হিগিনস একেবারে সোজা উঠে বসেছিলেন।

—তবে আপনার এ-বয়সে যত বিশ্রাম নেবেন তত ভাল।

স্যালি হিগিনস সহসা গলা ছেড়ে গান গেয়ে উঠেছিলেন বুঝি—হাত তুলে বলার ইচ্ছে—আই এ্যাম অন মাই ওয়ে, আই এ্যাম এ ফলিং এ্যান্ড এ রাইজিং, বাট আই এ্যাম অন মাই ওয়ে।

স্যালি হিগিনস সহসা বললেন, ডাক্তার তুমি গান জানো?

ডাক্তার মানুষটি সামান্য না হেসে পারল না। কাপ্তান সত্যি মজার মানুষ। অথচ সে দেখেছে, অফিসাররা কেমন ভীতু মুখ করে সবাই দাঁড়িয়ে আছে পাশে। যমদূতের মতো ভয় স্যালি হিগিনসকে। সে এবারে বলল, জানি স্যার।

—তোমরা?

চিফ-মেট অবাক। স্যালি হিগিনস রাশভারী কর্তব্যপরায়ণ এবং স্থির ধীর কাপ্তান। নিয়মনিষ্ঠের মতো তার জীবন। এবং যেহেতু দীর্ঘদিন একটা অচল জাহাজ চালিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন, তিনি আর দশজন কাপ্তানের মতো একেবারে শুধু কলকব্জার ওপর নির্ভরশীল নন, এবং জাহাজ চালাতে গেলে একটা স্থির বিশ্বাস থাকা বাঞ্ছনীয়, মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করা যত যায় তত মঙ্গলজনক এবং তিনি যখন এ-ভাবে একজন সফল কাপ্তান তখন গলা ছেড়ে গান গাওয়া খুব একটা মর্যাদার ব্যাপার নয়—কিন্তু কি বলবে সে, ক্যাপ্টেন ওর দিকে এখনও তাকিয়ে আছেন। সে বলল, গলা মেলাতে পারব।

—তা হলেই চলবে। তুমি ডেবিড।

ডেবিড মাথা ঝাঁকাল।

—ছোটবাবু কোথায়? ছোটবাবুকে ডাকো। আমরা সবাই এখন গলা ছেড়ে গাইব, গ্লোরি হ্যালেলুজা, আই এ্যাম অন অন মাই ওয়ে। আই হ্যাভ হাড হাড টাইম বাট আই এ্যাম অন মাই ওয়ে। হ্যাড এ মাইটি হার্ড টাইম, গ্লোরি হ্যালেলুজা, আই এ্যাম অন মাই ওয়ে। ডাক্তার এবং সবাই মিলে পায়ে তাল দিয়ে গাইছে। যেন জাহাজে এখন পিয়ানো থাকলে, বনি পিয়ানো বাজাতে পারত। অথচ ছোটবাবু বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। সে কোনোদিন কোনো গানের সঙ্গে ঠিকমতো গলা মেলাতে পারে না। আর এ তো বিদেশী গান, এবং গলা চিরে যাচ্ছে—এ-ভাবে অসুস্থ কাপ্তানের কি যে মর্জি, হয়তো ভেতরে একটা গন্ডগোল ঘটে গেছে সবার, সবাই এখন এইসব স্পিরিচুয়েলসের ভেতর সামান্য অবলম্বন খুঁজছে। মানুষ এ-ভাবে দীর্ঘদিন সমুদ্রে ভেসে বেড়ালে মাথা ঠিক রাখতে পারে না।

স্যালি হিগিনস খুশীর চোটে ডাক্তারকে পরদিন লাঞ্চে নেমন্তন্ন করে ফেললেন, তুমি বেশ গাও হে ছোকরা। তোমার গলা ভারি দরাজ। আমিও এক সময় খুব গলা ছেড়ে গাইতে পারতাম। এখন পারি না।

বনির ভয় লাগছিল, বাবা হয়তো এবার বলবেন, আর একটা। সে তাড়াতাড়ি বাবাকে বলল, বাবা, তুমি আমার রেকর্ডগুলো শুনবে?

স্যালি হিগিনসের যেন সহসা বাঁধ ভেঙে গেছে। তিনি বনির কথা একেবারে শুনতে পেলেন না। বুড়ো মানুষটা বাঁধানো দাঁতের জন্য ভাল গাইতেও পারেন না—অথচ ডাক্তারের গলায় এবং সকলের গলায় গানটা আশ্চর্য এক স্বর, কখনও উঁচু লয়ে, কখনও নিচু স্বরে কখনও ফিসফিস গলায় আবার কখনও লম্বা যেন সরু,
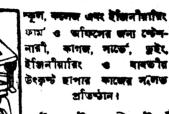
রেখার মতো ক্রমে জাহাজের বাঁশি বেজে উঠেছে। তিনি ফের বললেন ধরো হাত তুলে এই ছোট্ট কেবিনের ভেতর, ঠিক ছোট্ট কেবিনে কুলচ্ছে না বলে তিনি প্রায় হাত তুলে গাইতে গাইতে ব্রিজে উঠে যাচ্ছেন—হোললার, হে ওম্যান হে গার্ল ডোনচ্ ইউ হিয়ার মি, কলিঙ ইউ, মাই ওম্যান সো সুইট সো সুইট!

বনি ডাকল বাবা। তুমি এত জোরে গাইবে না!

স্যালি হিগিনস হাত সরিয়ে দিয়ে একেবারে স্থির হয়ে গেছেন।

সবাই এ-ভাবে স্থির। আর মনে হচ্ছিল বাবা সারাদিন এ-ভাবে কি যে সব করে যাচ্ছেন! কোনো মাথামুণ্ডু নেই। সে ডাকল বাবা! বাবা! বাবাকে ধরে ফেলল।—তুমি থামো বাবা। তারপর যেমন চিৎকার করে বলল, আপনারা থামুন। বাবা বাবা!

স্যালি হিগিনস একেবারে ধপাস করে বসে পড়লেন। খুব জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছেন। তারপর ঢোক গিলে বললেন বুঝলে এখন আর সত্যি পারি না। আমার ভীষণ প্রিয় গান এটা। পারি না আর পারি না।

বনি এবার বাবার পাশে বসে বলল, বাবা আবার যদি তুমি গাও, আমি কিন্তু ভীষণ কান্ড করব।

স্যালি হিগিনসের মনে হল, মেয়েটা তাহলে এখনও তাঁর বেঁচে আছে। তিনি বললেন, আর গাইব না। আমার আর কি গাইবার আছে!

আর তখন আর্চি জাহাজের অন্ধকারে পায়চারি করছিল। কতদিন সে ডাঙ্গায় নামতে পারে নি। ডাঙ্গায় নামতে পারলে তার ভেতরের অসুখটা নিরাময় হত। সাময়িক নিরাময় তাকে হয়তো ক্রমে এ ভাবে এক কঠিন নিয়তির দিকে এত সহজে ঠেলে দিত না। সে ডাঙ্গায় নামতে পারলে কোন সুন্দরী রমণী, অথবা কি যে হচ্ছে পৃথিবী থেকে সে প্রায় আছে নির্বাসনের মতো এবং যে কোনো বন্দরে নেমে গেলেই যুবতীরা যেন তার কাছ থেকে আত্মরক্ষার্থে পালাতে চায়। কোথাও সে দেখেছে, শিশুরা তাকে নিয়ে তামাসা করতে ভালবাসছে। ভয়ে সে আর জাহাজ থেকে নামতে পারছে না। আয়নায় যত নিজের মুখ দেখছে তত ক্রমে সে ভয় পেয়ে যাচ্ছে নিজেকে। এবং অন্ধকারে সে এখন বেশি থাকতে ভালবাসছে। ডাইনিং হলে সে যাচ্ছে না। মেস-রুম-বয় তার খাবার কেবিনে দিয়ে আসছে। এ-ভাবে সে ঠিক বড়-মিস্ত্রির মতো ক্রমে অন্ধকারের জীব হয়ে যাচ্ছিল। আর তখন জাহাজে বালিকা যুবতী হচ্ছে। জাহাজে বালিকা...বালিকা, প্রায় রেকর্ডের বাজনার মতো বালিকা যুবতী হচ্ছে।

এবং এ-ভাবে আর্চি দেখেছে, বরং সে এখন আলো দেখলে ভয় পেয়ে যায়। কেউ মুখ দেখুক তা সে চায় না। যতটা পারে সে মুখ লুকিয়ে রাখে। জ্যাককে দেখলে সে আর আগের মতো দৌড়ে যেতে পারে না। কারণ জ্যাক এমন কদর্য মুখ দেখলে ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। ক্যাপ্টেনের ঘরে গতরাতে সে কিছুক্ষণ বসেছিল, উঠতে ইচ্ছে করছিল না, জ্যাক ওর দিকে একবারও ভয়ে তাকাচ্ছিল না। সে লোভের ভেতরে পড়ে যাচ্ছিল, রক্তপ্রবাহ সারা মুখে এবং সে ভেতরে ভেতরে নিষ্ঠুর হয়ে যাচ্ছিল। সে কেবিনে ফিরে দু-হাতে এইসব কদর্য ডোরা কাটা কাটা দাগ, মুছে দিতে চেয়েছে। যতবার মুছে দিতে চেয়েছে, ততবার সে দেখেছে দাগগুলো আরও প্রকট, আরও গভীরে—কি যে কালো আর কুৎসিত হয়ে যাচ্ছে এবং পাশে পাশে সাপের মতো নীলাভ সাদা রং স্বাভাবিক চামড়ায়—সে উইচ, আফ্রিকায় ঘন অরণ্যের ভেতর কোনো অরণ্য সর্দারের যুবতী কন্যার চামড়া তুলে নিচ্ছে। সে একটা উইচ, সে একটা উইচ!

আসলে এ-জাহাজে যত রাত বাড়ছিল তত সে ঘুমোতে পারছিল না। মাঝে মাঝে সে ক্ষেপে যায়—শরীরে আশ্চর্য লোভ লালসা, কোনো বালিকা যুবতী হবার মুখে শুয়ে আছে, তার চুলে সমুদ্রের গন্ধ, শরীরে কি যে নরম আস্বাদন, মাংস খুবলে নিতে ইচ্ছে করছে বার বার, জংঘায় তার রয়েছে চমৎকারীত্ব—যেন হাতের পেশী সেই চমৎকারিত্ব সব লুণ্ঠন করে নেবে। সে এ-ভাবে ক্রমে যখন অমানুষ হয়ে যায় আর পারে না, চুপি চুপি একটা শ্বাপদের মতো উঠে যায়। গভীর রাতে সে দেখেছে কখনও কেউ না কেউ বালিকার মাথার ওপরে সতর্ক পাহারায় থাকে—কখনও লুকেনারের প্রেতাত্মা, লেডি-এ্যালবাট্রস কখনও সমুদ্রের অগ্নিকান্ড, কখনও বজ্রপাতের মতো কিছু অধিভৌতিক শব্দ আকাশের অভ্যন্তরে বাজতে থাকে। বার বার সে ভয়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে আসছে। এবং যা হয়ে থাকে, আবার দু রাত পার হয় না, কেবল জ্যাকের কেবিনের চারপাশে খাঁচায় পোরা বাঘের মতো এ-পাশ ও-পাশ করা, কখনও শুঁকে শুঁকে যাওয়া, জ্যাক যেখানে বসেছিল, যেখানে দাঁড়িয়ে গল্প করেছিল সেখানে শুঁকে শুঁকে সে কুকুরের মতো ঘ্রাণ নিতে নিতে অমানুষ হয়ে যায়। তখন ঘুম আসে না, মদ খেতে ভাল লাগে না, ভাঙ্গা আয়না আরও ভেঙ্গে দুমড়ে সে একটা অতিকায় মনস্টার যেন। আর অন্ধকার তার বড়

ঙ্গটা লাগবে। তখন সহসা
যতে পাচ্ছেন! ঠিক মেন-
প্রিয়। সে সন্দাঁড়িয়ে আছে। তার
কখনও ডেক-সারে এবং ক্রমে ছায়াটা
কম্প এবং অন্য হুতে হতে প্রায়
আধি-ভৌতিক ঘটনায় ক্ষে আসছে।
দেখতে। আর
সহজেই সে উসকে দিতে জাহাজের
একমাত্র সম্বল এইসব নিরীহ পারছেন
জাহাজিরা। সবাই তার হাতে রাতে
জাহাজে বিজয় লাভ করতে সময় লাগেই
না। তখন সে যুবতী হবার মুখে
সব কিছু চমৎকারিত্ব লুন্ঠন করে

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তার মনে হল মিছিলের মতো কারা এগিয়ে আসে যেন বাতাসে ভর করে প্রথমেই এ দাঁড়াচ্ছে, ছোটবাবু। সে সজোরে ছোটবাবু পেটে ঘুসি বসিয়ে দিল এবং দেখা ডেক-সারেং দাঁড়িয়ে আছে মেন-মাস্তে নিচে। সে ছোটবাবুর গলায় দড়ি পরিয়ে দিচ্ছে। এবং উইনচ চালিয়ে সোজা মাস্তুলে লটকে দেওয়া হচ্ছে। আ হাততালি। তা ক্রুরতা ক্রমে এভাবে কবে যে সফল হবে

আর্চি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে পায়চারি করছে। এদিকটায় কেউ আসে না। কারণ এখানে বড়-মিস্ত্রি থাকতে একবার ভূত দেখেছিল। অথবা কেউ কেউ জাহাজে রাতের গভীরে কোনো যুবতীর ছায়া দেখেছে। আর কি যেন আছে এদিকটাতে নানা কারণেই সব সময় এ জায়গাটায় কেউ আলো জ্বালিয়ে দেয় না—অথবা মনে হয় যতবার আলো জ্বালানো হয়েছিল ক্যাপ্টেন কোথাও অন্ধকার রাখতে যত বারণ করেছেন তত সে মাঝে মাঝে এদিকটা লাইন অকেজো করে রাখে। এবং যেহেতু তার হাতে মেরামতের দায়-দায়িত্ব কে আর ভাবে—কোথায় আলো কিভাবে জ্বলবে। এবং এই অন্ধকারে সে দেখতে পেল বাতাসে ভর করে এসে দাঁড়িয়েছে, স্যালি হিগিনস। আর্চি হা হা করে হেসে উঠল, বলল, স্যার আপনাকে আমরা কিছু করব না। সামনের দ্বীপটাতে আপনাকে [illegible] রেখে চলে যাব। আলেকজান্ডার [illegible] হা-হা-হা!

জ্যাক তুমি কি দেখছ। তোমার [illegible] অনিষ্ট করব না। তোমার শুধু [illegible] লুন্ঠন করে নেব। তোমার [illegible] আমি প্রবেশ করে যাব জ্যাক। তোমার একটা সুন্দর নাম রাখব। পদ্মের [illegible]

তোমার খাতা থেকে কেটে দেব। আর কিছু করব না। সত্যি বলছি, আর কিছু করব না।

তখন স্যালি হিগিনস সিঁড়ি ধরে নামলেন। তিনি চার্ট-রুমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। কিছু কাজকাম বাকি। গতকাল থেকে অদ্ভুত একটা দুর্ভাবনায় সময় কেটেছে। কোন কাজ করতে পারেন নি। কেবল মনে হয়েছে যে-কোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। ভবিতব্য ভেবে মাথা পেতে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।

এখন সময় যত চলে যাচ্ছে তত তিনি হালকা বোধ করছেন। বার বার দুবারের মতো তিনবারের মাথায় কিছু ঠিক ঘটবে, এবং ভয়ংকর সেই ঘটনার মুখোমুখী হতে হয় পাচ্ছিলেন—প্রথমবার থিও ফেল নিজে, দ্বিতীয়বার রিচার্ড ফেলের একমাত্র জাতক উইলিয়াম ফেল। তখন রিচার্ড ফেল গাড়ি ঘুরিয়ে নিচ্ছিলেন। হুডখোলা গাড়ি। বারান্দার পাশ থেকে সেই প্রাসাদের মতো বাড়ির রাস্তায় চলন্ত গাড়িতে ধপাস করে কিছু এসে পড়েছিল। সব কিছু ঠিকঠাক। কেবল কাগজপত্রে সই সাবুদ—তারপর সিউল-ব্যাংককে আর দশটা পুরোনো ভাঙা জাহাজের মতো নাকে দড়ি দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে—তারপরই ঠিক ছিল উৎসব প্রাসাদে, এতবড় একটা আজীবন উদ্বেগ শেষ হয়ে গেল বলে যখন উৎসবের আয়োজন ঠিকঠাক তখন হুডখোলা গাড়িতে একমাত্র জাতকের মৃতদেহ। দোতালার রেলিং টপকে কেউ তার বালকপুত্রকে নিচে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। রিচার্ড ফেল দেখলেন ঘাড়টা বেঁকে গেছে, মনে হয় ঘাড় মটকে ছুঁড়ে দিয়েছে নিচে। এবং রিচার্ড ফেল পাগলের মতো নেমে গেছিলেন। উন্মাদের মতো চিৎকার করছিলেন সিঁড়ি ধরে ওপরে ছুটে যাওয়ার সময়—সব শেষ! তারপর তার গলার স্বর ভয়ংকরভাবে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল।—দা সি-ডেভিল। যেন খবর পাঠাবেন মাঝসমুদ্রে নিয়ে সিউল-ব্যাংককে পুড়িয়ে দাও। পেট্রোল ঢেলে জ্বালিয়ে দাও। সে আমাদের সব কেড়ে নিচ্ছে। তিনি তারপর কিছুতেই তৃতীয়বার জাহাজ স্ক্র্যাপ করার আদেশপত্রে একটা কথা লিখতে সাহস পান নি।

আসলে দৈব-দুর্ঘটনার সঙ্গে যদি অকারণ কিছু হয়ে যায় তবে তার কি দোষ! অযথা সিউল-ব্যাংককে দোষারোপ করার অর্থ হয় না।

সামান্য জড়পদার্থ এই জাহাজ। শুধু কলকব্জায় চলে। কোনো অনুভূতি থাকতে পারে না। অথচ বার বার একে দোষারোপ করে অতিকায় ভীতির ভেতর পড়ে যাচ্ছে সবাই। কাল রাতে সেই পুনরাবৃত্তির কথা ভেবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, অথচ মুখে বলা যায় না, ভারি হাস্যকর ব্যাপার—এবং কেউ গালগপ্প ভেবে একজন বনেদী কাপ্তানের এতদিনের ঐতিহ্যে কলঙ্ক লেপে দেবে স্থির করেছিলেন, সব তিনি ঠান্ডা মাথায় করে যাবেন। যতই ভাবুন সবকিছু ঠান্ডা মাথায় করে যাবেন শেষপর্যন্ত আর তিনি খুব ঠান্ডা মাথায় ছিলেন না। তিনি সারাক্ষণ বনিকে ভুলে থাকার জন্য একটা না একটা অস্বাভাবিক কিছু করে গেছেন। এ-সব মনে হলেই বুঝতে পারেন দীর্ঘদিনের অতীব এক বিশ্বাস ভেতরে বাসা বেঁধে আছে। তার হাত থেকে তিনি কিছুতেই নিষ্কৃতি পাচ্ছেন না। এবং মাঝে মাঝে এই যে বনিকে ডেকে পাঠাচ্ছেন, ডেকে বলছেন, আচ্ছা বনি তোমার শরীর ভাল তো। এবং এ-সব প্রশ্নে তিনি দেখেছেন, বনি বড় বড় চোখে ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। কিছু বলে না। বড় বেশি অবাক হয়ে যায়। তিনি যখন নিজের দুর্বলতার ধরতে পেরে কেমন শুকনো গলায় বলেন জাহাজ তো খুব একটা ভালো জায়গা নয়। সাবধান থাকলে ক্ষতি কি!

তখনই আবার মনে হয় সেই ভয়াবহ বজ্রপাতে কেউ মারা যাচ্ছে। পৃথিবীতে কত লোক বজ্রপাতে মারা গেছে অথচ সেই নির্দিষ্ট খবরে তিনি স্থির থাকতে পারবেন না কেন! এটা তিনি কাকতালীয় ভাবতে পারছেন না কেন! এবং এটা কাকতালীয় ব্যাপার ভাবলেই তাঁর বেশি ভাল লাগা উচিত। রিচার্ড ফেলের শ্রীমান তো ভীষণ চঞ্চল ছিল স্বভাবে। পরিচারকদের সব সময় দুর্ভাবনায় অস্থির করে রাখত। সে ভেবে সহজ পথ ভেবে রেলিং টপকে পালাতে চায়নি এবং নিচে পড়ে যায় নি কে বলবে! তিনি মাথা থেকে অহেতুক দুর্ভাবনা সরিয়ে দেবার জন্য হাজার রকম ব্যাখ্যা করতে থাকলেন সবকিছু। নতুন করে আবার সব ভাবছেন। না ভাবলে তিনি পাগল হয়ে যাবেন।

তবু রক্ষে দুর্ঘটনা ঘটে যাবার আগেই কাগজপত্র সব ঠিকঠাক করে দিয়েছেন। এটা একটা তাঁর বড় রকমের জয়লাভ। তিনি সিঁড়ি ধরে এক ধাপ নামলেন, আর হিজিবিজি সব চিন্তা তাঁর মাথায়। সহজে তরতর করে নিচে নেমে যেতে পারছেন না। অনেক উঁচু থেকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন মহিষীর মতো সিউল-বাংক ভেসে আছে সমুদ্রের জলে। তার দুটো বড় মাস্তুলে তেমন লক্ষ জ্বলছে। হাওয়ায় তার দড়িদড়া তেমনি বাতাসে দোল খাচ্ছে। কোনো কিছুতে যেন তার আসে যায় না। শুধু মনে হল বনিকে বলে দিতে হবে, বনি তুমি কিন্তু রেলিং ঘেঁসে কখনও দাঁড়াবে না। নিচে ঠেলে ফেলে দিলে তো কিছু করার থাকবে না। তখন যত দোষ হবে সিউল-ব্যাংকের। মনে হবে সত্যি কিছু একটা অশুভ প্রভাব এ-জাহাজে আছে।

স্যালি হিগিনস চার্ট-রুমে ঢুকে বললেন, তোমার ঘড়িতে কটা বাজে চিফ-মেট?

চিফ-মেট ভারি অবাক! মাস্টার তাকে জিজ্ঞেস করছেন কটা বাজে! সময় মেলাচ্ছেন ঘড়িতে। সময় তো তাঁর ভুল হবার কথা না। সময় ঠিকঠাক থাকার কথা। চিফ মেট বলল, নটা বাজে স্যার।

—আমার ঘড়িতেও ঠিক নটা। ভীষণ কারেকট সময়। দ্যাখো দ্যাখো সেকেন্ড এবং মিনিটের কাঁটা ঠিক দুজনের এক জায়গায় দেখে স্যালি হিগিনস ভীষণ পুলকিত হয়ে পড়লেন। তাঁর হাতের ঘড়ি কোনো অশুভ প্রভাবে পড়ে যেতে পারে। কিন্তু চিফ-মেটের ঘড়ি এবং যেখানে যতরকমের সময় নির্ধারণের ব্যাপার আছে সর্বত্র দেখে দেখে বুঝতে পারলেন কোনো ভুল-ত্রুটির ভয় নেই—সময় ঠিক—বারো ঘন্টা পার হয়ে ছত্রিশ মিনিট। এবং এভাবে তিনি বসে বসে কেবল দন্ড পল দেখে যাচ্ছেন! মিনিটের কাঁটা একবার ঘুরে গেলেই সেই শৈশবের মতো প্রায় লাফিয়ে উঠছেন—এক দুই তিন গুনে যাচ্ছেন। যত সময় পার হয়ে যাবে তত তার রোষ কমে আসবে। রোষের মুখে একরকম সময় পার হয়ে গেলে অন্যরকম।
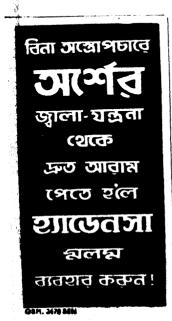
সারারাত তিনি ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো এভাবে চিন্তাভাবনায় দুলেছেন। পায়চারি করেছেন। ঘুমোতে পারেন নি। মাঝে মাঝে পোর্টহোলে দাঁড়িয়ে দেখেছেন, সর্বত্র শুধু নক্ষত্রেরা ভেসে যাচ্ছে আকাশে। কখনও তিনি সিঁড়ি ধরে নেমে এসেছেন নিচে। বনি, দরজা খুলে যদি কোথাও চলে যায়! কোনো অশুভ শক্তি তাকে যদি আকর্ষণ করে, মাথায় তো তখন কিছু থাকে না। বোকার মতো দরজা খুলে হেঁটে যেতে পারে। বার বার এভাবে নিচে ওপরে, কখনও মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, কখনও ঠিক বনির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভেবেছেন, কেবিনের ভেতর বনি নেই, ফাঁকা ঘর তিনি পাহারা দিচ্ছেন তখনই বুকটা কেঁপে ওঠে, মুহূর্তমাত্র তার আর অপেক্ষা করার সময় থাকে না—বনি বনি তুমি কি করছ! বনি!

বনি দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে বলেছে, কি হল বাবা? এত রাতে? তুমি এখনও ঘুমোও নি! চল ওপরে।

—আরে না। তুমি ঘুমোও। আমি ঠিক উঠে যেতে পারব। আচ্ছা শোনো, দরজা খুলবে না। কেমন? জাহাজ তো ভাল জায়গা না। কেউ ডাকলে দরজা খুলবে না। দরজাটা ভাল করে লক করে দাও। কি দিয়েছ?

—হ্যাঁ দিয়েছি। তবু ঠেলে দেখলেন একবার। রাতটা কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। সেই এলিসের মৃত্যুর দিনের মতো। প্রত্যেকটা মিনিট ঘন্টার চেয়েও বেশি লম্বা হয়ে যাচ্ছে। আর তাঁর ঘুম আসছে না। ঘুম এলেও তিনি ঘুমোতে যাচ্ছেন না। ক্রমে রাত এভাবে বাড়ছে। তিনি আর কেবিনের ভেতরও থাকতে পারছেন না। যেন কেউ বনিকে অসতর্ক মুহূর্তে বের করে নিয়ে যাবে। তিনি চার্ট-রুমের রেলিঙে চলে এলেন। এখানে দাঁড়ালে বনির দরজা দেখা যায়। উইংসের আলো এসে পড়েছে দরজায়। সামান্য শব্দ হলে তিনি ঠিক টের পাবেন। এবং সমুদ্র থেকে যত প্রবল হাওয়া আসুক, দরজা খোলার শব্দ ঠিক শুনতে পাবেন। বনি কোথাও দরজা খুলে চলে যেতে চাইলে তিনি ঠিক টের পাবেন!

নিশীথে নক্ষত্রেরা তখনও তেমনি আকাশে এবং দিগন্তে পারাপারহীন অসীমতায় কিরণ দিচ্ছে। সামনে শহরের সব আলো ঘর বাতি। কোথাও কুকুরের ছায়া। জাহাজে কোথাও কোনো এতটুকু শব্দ নেই। একেবারে শব্দহীন অন্তহীন যাত্রার মতো তিনি দাঁড়িয়ে আছে ওপরে। গোপনে পাহারা দিচ্ছেন। কোনোরকমে রাতটা পার করে দিতে পারলেই দুর্ভাবনার অনেকটা লাঘব। তখন সহসা যেন দূরে কিছু দেখতে পাচ্ছেন! ঠিক ফ্রেম-মাস্টের গোড়ায় কেউ দাঁড়িয়ে আছে। তার ছায়া বড় হয়ে যাচ্ছে ক্রমে এবং ক্রমে ছায়াটা লম্বা হয়ে যাচ্ছে। লম্বা হতে হতে প্রায় বনির কেবিনের কাছাকাছি চলে আসছে। তিনি কাঠ হয়ে গেছেন দেখতে দেখতে। আর সন্তর্পণে সে এগিয়ে আসছে। জাহাজের অস্পষ্ট আলোতে তিনি বুঝতে পারছেন না, এভাবে টলতে টলতে এই গভীর রাতে বোট-ডেকে কে উঠে আসছে। তিনি কিছুতেই আর স্থির থাকতে পারলেন না। রেলিঙে ঝুঁকে চিৎকার উঠলেন কে? কে ওখানটায়! ঠিক বনির দরজার কাছে এসে গেছিল। এখন পালাচ্ছে। মুখটা ভীষণ নিচু করে রেখেছে। ওপর থেকে দেখা যাচ্ছে না। তিনি বললেন, কে? কে আপনি। সঙ্গে সঙ্গে চোখের ওপর থেকে টুপ করে ডুবে গেল। বনির দরজার সামনে ঠিক নিচে নামার সিঁড়ি। সিঁড়িতে ছায়াটা অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন সেই মধ্য-যামিনীতে হাহাকার শব্দে, স্যামি হিগিনসের কণ্ঠস্বর গমগম করে বেজে উঠল, কে? কে আপনি! আপনি কি জাহাজের সেই অশুভ প্রভাব। আপনি কি ক্রমে আবার প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়ে উঠছেন!

(ক্রমশঃ)

নঃ ভাঃ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

িব্বশ পরগণা শাখার বার্ষিক অধিবেশন

গত ১৬ জুন রবিবার বারাসাত-এর রান সিনেমা হলে নিখিল ভারত বঙ্গ হিত্য সম্মেলন-এর চব্বিশ পরগণা শাখার থম বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হয়েছে। এই ম্মলনে সভাপতির ভাষণে সাহিত্যিক ংবাদিক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ বলেন: ম্ভাবনাপূর্ণ নতুন সাহিত্যিকদের রচনা ং বিস্মৃত সাহিত্যিকদের সে-যুগের দ্র জাগানো সাহিত্য নতুন করে ছেপে ার করা দরকার।' তিনি আক্ষেপ র বলেন যে: 'সাহিত্যের সভা-সম্মেলনে ত্তা এবং পিকনিকই বেশী হয় সাহিত্য না।'

সম্মেলনের প্রধান অতিথি শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র লন: 'চরম সংকট প্রতিকূল অবস্থার খে সত্যভ্রষ্ট না হয়ে যা সত্য তা নিয়ে ড়াতে পারলেই সাহিত্যিকের কর্তব্য পালন া হবে।' তারপর শ্রীমিত্র বলেন যে খিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন-এর ধান সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ-এর চেষ্টায় বর্তমান সংস্থা আশা করা যায় দূর ভবিষ্যতে নিখিল বিশ্ব বঙ্গ সাহিত্য ম্মলন-এ পরিণত হবে।' সম্মেলনের লোচনা চক্রের উদ্বোধন করে আশাপূর্ণা ী বলেন: 'যা সত্য যা ঘটছে অর্থাৎ বনের সত্য প্রতিবিম্বিত হয় সাহিত্যে।.. ূল্যমান অবক্ষয়ের কারণ অনুসন্ধান এবং থেকে উদ্ধারের পথ দেখাতে হবে হিত্যিককে। শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু তাঁর ষণে বলেন: 'জীবনে সুন্দর ও অসুন্দর ই-ই আছে অসুন্দর থেকে সুন্দরে উত্তরণই হিত্য।' অধ্যাপক হরিপদ ভারতী তাঁর ভাষণে বলেন: আদর্শবাদী সাহিত্যিকের কাছে সমাজ আনন্দবার্তা শোনবার পথভ্রষ্ট মানুষ কল্যাণের পথ পাবার আশা রাখে।'

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হেমচন্দ্র ঘোষ তাঁর ভাষণে ধর্ম সাহিত্য রাজনীতি ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে চব্বিশ পরগণা জেলার অবদানের কথা স্মরণ করেন। সম্মেলনের চব্বিশ পরগণা শাখার সভাপতি ডঃ শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সম্পাদক বারিদবরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। শ্রীহিরণ্ময় গুপ্ত সমবেত সুধীবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সারা বাংলা কবি সম্মেলন

পয়লা আষাঢ় (১৬ জুন) মুর্শিদাবাদ থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রবাহ-এর উদ্যোগে কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে একটি কবি সম্মেলন ও স্মরণীয় কাব্যালোচনা অনুষ্ঠান হয়ে গেল। প্রথম অধিবেশন হয় বেলা ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় অধিবেশন বেলা দুইটা থেকে রাত্র আটটা পর্যন্ত। প্রথম অধিবেশনে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন কবি ও সাহিত্যিক শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন কবি শ্রীমণীন্দ্র রায়। এই সম্মেলনে 'আধুনিক কবিতা কোন পথে' শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন সভাপতি প্রধান অতিথি এবং শুদ্ধসত্ত্ব বসু ও তরুণ কবি ধ্রুব মুখোপাধ্যায় ও চন্দন সিংহরায়।

অচিন্ত্যকুমার তাঁর ভাষণে যাবতীয় সংস্কার ভাঙ্গার ও বন্ধন মুক্তির জন্য বর্তমানের এবং আগামী দিনের কবি সমাজের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। কবি মণীন্দ্র রায় তাঁর সীমিত ভাষণে কবিদের স্মরণ করিয়ে দেন সমাজের প্রতি দেশের সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁদের কর্তব্যের কথা। কবি শুদ্ধসত্ত্ব বসুর ভাষণে ফুটে ওঠে আধুনিক কবিতার উদ্দেশ্যহীনতা বা স্থির লক্ষ্যের অভাবের কথা।

দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রবীণ ও তরুণ কবিদের অনেকেই স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। কবি দীনেশ দাশ এবং শিল্প সমালোচক নির্মলকুমার ঘোষকে সম্বর্ধনা জানান হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত লিটল ম্যাগাজিনের বিরাট প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রবীণ সাংবাদিক কালীপদ বিশ্বাস। রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন বাণী ঠাকুর এবং আবৃত্তিতে অংশ নেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। বিক্রয় কেন্দ্র থেকে তার শতাধিক লিখার পত্রিকা ও কবিতা গ্রন্থ কেনেন উপস্থিত কবিরা। এই ধরনের সম্মেলন খুব কমই দেখা যায়।

রবীন্দ্র অনুধ্যান

'রবীন্দ্র অনুধ্যান আমাদের নিত্যদিনের কর্তব্য। সেজন্য বিশেষ দিনক্ষণ চিহ্নিত করার প্রয়োজন নেই। রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করতে হলে কেবলমাত্র সংগীত ও নৃত্যকলার উপর জোর দিয়ে রবীন্দ্র চর্চা সীমাবদ্ধ করা উচিত নয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় উপরোক্ত উক্তিটি করেন ১৫ জুন কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে তিন দিনের রবীন্দ্র অনুধ্যান অনুষ্ঠান উদ্বোধন করতে এসে। রবীন্দ্র জীবনদর্শনের উপর আলোচনার সূত্রপাত করে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেন: 'রবীন্দ্রনাথের ভিত্তিভূমি মানবতা কোন ক্ষুদ্র স্বার্থ তাঁকে টলাতে পারেনি। তাঁর জগৎ বিশ্বমানবের জগৎ।' অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায়ও এদিন ভাষণ দেন। দ্বিতীয় দিন রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন প্রসঙ্গে ভাষণ দেন প্রমথনাথ বিশী শচীন গাঙ্গোপাধ্যায় ও অমিয়কুমার মজুমদার। তৃতীয় দিনের আলোচ্য বিষয় ছিল ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের গানের গতি-প্রকৃতি। এ আলোচনায় অংশ নেন সর্বশ্রী শান্তিদেব ঘোষ দক্ষিণারঞ্জন বসু ও অমিতাভ চৌধুরী প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে সাধারণত যেতো অনুষ্ঠান হয়ে থাকে—এই অনুষ্ঠানটি নিঃসন্দেহে তার মধ্যে একটি ব্যতিক্রম।

শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্য রচনার জন্য পুরস্কার

লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিশু ও কিশোর সাহিত্য

রচয়িতা শ্রীরবিদাস সাহা রায় শিশুসাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করেছেন। এ পুরস্কারটি দিয়ে থাকেন ভারত সরকার। এ বছর শ্রীসাহা রায় এ পুরস্কারটি লাভ করেছেন তাঁর 'আমাদের ভারতরত্ন ইন্দিরা' শীর্ষক বইটির জন্য। এ পুরস্কারের সম্মান-মূল্য ১০০০ টাকা। বইখানার প্রকাশক দেব-সাহিত্য কুটীর।

বাংলা দেশ-এর বইয়ের প্রদর্শনী

রবীন্দ্র-সদনে বাংলা দেশ-এর সাহিত্যের ওপর যে আলোচনা সম্প্রতি হয়ে গেলো সে সম্পর্কে আমরা আগেই বলেছি। এবার বই-এর প্রদর্শনীর কথা বলছি। কয়েক হাজার বই বাংলা দেশ থেকে এই প্রদর্শনীর জন্য আনা হবে শুনেছিলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল এসেছে মাত্র ৪০০ খানা বই। সংখ্যার দিক থেকে এ প্রদর্শনী খুব উল্লেখযোগ্য না হলেও, বিষয় বৈচিত্র্যের জন্য এ প্রদর্শনী এ-পার বাংলারও অনেক লেখক, গবেষক এবং প্রকাশকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সাধারণ অভিধান থেকে বিশেষ বিশেষ বিষয় সম্পর্কে অভিধান বা কোষগ্রন্থ যা বাংলা দেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে তা খুবই উল্লেখযোগ্য। আঞ্চলিক ভাষার অভিধান (শহীদুল্লাহ সাহেব সম্পাদিত) প্রকৃতই একখানা অসাধারণ বই। বাংলা লেখ্য ভাষার ও কথ্য ভাষার মধ্যে তফাৎ অনেক। লেখ্য ভাষার রূপ প্রধানতঃ দুটি, কিন্তু কথ্য ভাষার চেহারাটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। বলতে গেলে, প্রতি ২ কি ৩ হাজার বর্গ মাইল অন্তর বাঙালীর কথ্য ভাষা একটি ভিন্ন রূপ নিয়ে থাকে। পূর্ব বঙ্গের সঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের যে তফাৎ বা পূর্ব ও পশ্চিমের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের যে তফাৎ তা সহজেই বোঝা যায়, কিন্তু এক পূর্ববঙ্গের মধ্যেই বরিশাল, ত্রিপুরা চট্টগ্রাম ঢাকা নোয়াখালী প্রভৃতির যে তফাৎ, তা বিশেষ বিশেষ শব্দের অর্থভেদের জন্য যতোটা, তার প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যের জন্য ততোধিক। কাজেই, বিশেষজ্ঞের সহায়তা ভিন্ন তা অন্ততঃ সাধারণের পক্ষে বোধ্য নয়। এদিক থেকে 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' অনেকদিনের একটা অভাব পূরণ করলো। এ-বইখানা ব্যতীত, বাংলা-উর্দু অভিধান, দর্শন-কোষ বিশ্বকোষ এবং প্রাচীন বিজ্ঞানের ইতিহাস এ প্রদর্শনীর উল্লেখযোগ্য বই। আলোচনা ও সমালোচনা জাতীয় বইয়ের বেশীর ভাগই মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে কেন্দ্র করে।

পেপার ব্যাক বইয়ের প্রদর্শনী

বইয়ের বিবর্তনের ক্ষেত্রে পেপারব্যাকের যুগ চলছে। পৃথিবীর সব দেশেই আজকের দিনে পেপার ব্যাক বই প্রকাশিত হচ্ছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেই সর্বপ্রথম এই পেপারব্যাক বইয়ের প্রচলন হয়েছিল, এবং পেপারব্যাকের মধ্যেও যে কতো রকমফের হয় বা হতে পারে তার নিত্যনতুন নিদর্শন দেখা যায় মার্কিণ দেশের প্রকাশকগণের প্রকাশনায়। সম্প্রতি এই ধরনের দুটি প্রদর্শনী হয়ে গিয়েছে কলকাতায়—একটি নেহরু চিলড্রেন্স মিউজিয়মে এবং অন্যটি আমেরিকান ইউনিভার্সিটি সেন্টারে 'ওয়ার্লড অব পেপারব্যাকস' নামে এই প্রদর্শনীটির উদ্যোক্তা ছিলেন ইউ এস আই এস ও ৭০টি বিভিন্ন মার্কিণ প্রকাশক প্রতিষ্ঠান। পাঁচ শতাধিক পেপারব্যাক বইয়ের এই প্রদর্শনীতে যেমন ১৫০-২০০ পৃষ্ঠার হাল্কা বই আছে, তেমনি ৭০০-৮০০ কি ১০০০ পৃষ্ঠার ভারী ভারী বইও দেখা যায়।

লণ্ডনে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন-এর প্রস্তুতি

বৃটেনের প্রবাসী বাঙালী সমাজ আগামী ২০শে জুলাই লণ্ডনে বাংলা সাহিত্যের একটি সম্মেলনের আয়োজন করেছেন। লণ্ডনে এ ধরনের প্রচেষ্টা এই প্রথম। এই অনুষ্ঠানে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন-এর সভাপতি স্বনামধন্য সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ভাষণ দেবেন। তা ছাড়া আশা করা যায় যে, ভারত ও বাংলা দেশ থেকে আরো কয়েকজন কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকও এই সম্মেলনে যোগদান করবেন। সাহিত্য আলোচনা ব্যতীত এই সম্মেলনে বিশিষ্ট শিল্পিগণের নাচ গান আবৃত্তি ও অভিনয়েরও আয়োজন করা হয়েছে। তা ছাড়া এই উপলক্ষে একটি মেলার আয়োজনও করা হয়েছে। এই মেলায় বিভিন্ন বাংলার কারিগরি শিল্প, গানের রেকর্ড, বই ও ছবিও প্রদর্শিত হবে। কেউ যদি এই সাংস্কৃতিক মেলায় কোন দ্রব্য বিক্রয় বা প্রদর্শনের জন্য পাঠাতে চান তা হলে ২১নং ক্যাথারিন স্ট্রীট লণ্ডন ডবলিউ-সি—এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

ওয়ারেন হেস্টিংস্‌-এর স্মৃতিকথা

ইংলণ্ডের নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলে ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৫০ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন সাধারণ কেরাণী হিসেবে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তারপর ঘটনা-স্রোতের দ্রুতগতি ও স্বীয় বুদ্ধিমত্তার গুণে এক সময় তিনি এদেশে সর্বক্ষমতাসম্পন্ন রাজপুরুষের পদ অধিকার করেছিলেন। বলাই বাহুল্য যে ঐ ঘটনাস্রোত নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে হেস্টিংসের নিজের কৃতিত্বও ছিল যথেষ্ট। তাই, কথায় বলে যে 'কলকাতা একটা কাউন্টিং-হাউস থেকে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যের ক্যাপিট্যাল হয়ে উঠেছিল'—কলকাতার এই রূপান্তরে হেস্টিংসের অবদান একক হিসেবে বোধকরি অগ্রগণ্যই ছিল। ভারতের কার্যভার থেকে অবসর গ্রহণের পরে স্বদেশে ফিরে গেলে বার্ক শেরিডান ও ফক্স প্রমুখ বাগ্মী ও আইনজীবীগণ যেভাবে হেস্টিংসের সমালোচনা করেছিলেন এবং নানা কুকার্যের দায়ে অভিযুক্ত করেছিলেন ইংরেজী ভাষায় অলঙ্কারপূর্ণ বক্তৃতা হিসেবে আজও তা অক্ষয় হয়ে আছে। কিন্তু তবু একথা সত্য যে, পরবর্তী অনেক ইংরেজ রাজপুরুষের তুলনায় হেস্টিংস ভারত তথা এ দেশের জনগণের প্রতি বন্ধু-ভাবাপন্ন না হলেও অন্ততঃ অনেক কম শত্রু-ভাবাপন্ন যে ছিলেন এ-কথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। হেস্টিংস বাংলার গভর্ণরের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন ১৭৮৫ সালে। তারপর তিনি স্বদেশ যাত্রা করেন। স্বদেশের পথে জাহাজে তিনি এই স্মৃতিকথার বেশীর ভাগটা রচনা করেন। অবসর গ্রহণের পূর্বেই হেস্টিংস মোটামুটিভাবে জানতে পেরেছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে কি ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করা হবে, তাই স্মৃতিকথায় প্রধানতঃ এই সমস্ত সম্ভাব্য অভিযোগের বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য প্রয়াস পেয়েছেন। কোম্পানী সরকারের অর্থ অপচয় করা, বিভিন্ন ভারতীয় শক্তির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে শক্তির অপব্যবহার করা এবং কোন কোন ভারতীয় রাজপরিবারের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অহেতুক হস্তক্ষেপ করা—মোটামুটিভাবে এগুলিই ছিল হেস্টিংস-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ। ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের একেবারে গোড়ার দিকে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী আর্থিক দায়িত্ব প্রধানত বাংলা সরকারকেই বহন করতে হতো—বিস্তারিতভাবে সেকার সরকারী খরচপত্রের হিসেব দিয়ে হেস্টিংস অর্থ অপচয়ের যে অভিযোগ তার কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। এ সমস্ত অভিযোগের কৈফিয়ৎ অপেক্ষা সাধারণ পাঠক হেস্টিংসের স্মৃতিকথার যে অংশ পড়ে আনন্দ পাবেন, তা হলো দুর্বল অথচ মান ভারতীয় রাজশক্তির লজ্জাকর দুর্বলতার মধ্যে এককভাবে মারাঠাগণের সংগ্রাম। বহুকাল পরে হেস্টিংস-এর স্মৃতিকথা 'মেময়ার্স রিলেটিভ টু দি স্টেট অব ইণ্ডিয়া' পুনঃ প্রকাশিত হয়েছে ফেড্রা ও আই বি এইচ পাবলিশিং হাউসের যৌথ উদ্যোগে।

—শ্রীজয়ন্ত

বই আর বই

একখানা বই হাতে এসেছে। প্রায় ক্ষীণ কলেবর। কোনো নামী প্রকাশকের সদ্য সংযোজন। বইটা হাতে নিয়ে দাম দেখে আমার চক্ষুস্থির। সাত আট মাস আগেও যে বইয়ের দাম তিন টাকা কি বড় জোর টাকায় বেশি ভাবা যেত না আজ দাম টাকা।

হ্যাঁ, সাত সাড়ে সাত ফর্মার বই টাকা। বই যাঁরা ভালবাসেন এবং কেনেন এই চটি বই হাতে নিয়ে দাম দেখামাত্র তাঁদের বাক্ হবার কথা। আমারও তাই হয়েছিল। পরে কৌতূহল সেই প্রকাশকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। এবং দাম নিয়ে সরাসরি অভিযোগ করেছি।

দেখলাম ওই নামী প্রকাশনের কর্তাব্যক্তিরাও বিষম চিন্তাচ্ছন্ন। বাজারে এ-রকম দমদামের বই চালালে হার কি-রকম হবে ভেবে তাঁরাও চিন্তিত। এতটাই দাম বাড়ার প্রয়োজন আছে কিনা খোঁজ নিতে তাঁরা একটা হিসেব দাখিল করলেন। কাগজের দাম এর মধ্যে ডবলেরও বেশি বেড়েছে। তাও অনায়াসে মেলে না, চাহিদার মুখে অনেক সময় ব্ল্যাকে কিনতে হয়। এর পর কালির দাম, ছাপার দাম ব্লকের দাম আর বিজ্ঞাপনের দাম অল্প সময়ের মধ্যে শতকরা কত বেড়েছে তাও বিশ্লেষণ করে দেখালেন তাঁরা। আর নিঃসংশয়ে ঘোষণা করলেন, আগের মজুত কাগজ অথবা ছাপার সরঞ্জাম যাদের হাতে নেই তাঁরা এই দাম-করণের সংকটে ঝাঁপ দিতে বাধ্য। আর মজুত যাঁদের আছে তাঁরাই বা কতদিন যুঝবেন? নৈমিত্তিক প্রকাশনা সচল রাখতে হলে মজুত থাকেই বা কেমন করে?

এই সংকটের একটা সুদূরপ্রসারী চিত্র মনে আসা স্বাভাবিক। প্রথমত দুর্মূল্যের দরুন নতুন বইয়ের চাহিদাতেই টান ধরে যাবে। তারপর নিঃশেষিত সংস্করণের বই পুনর্মুদ্রণের ব্যাপারে প্রকাশকদের আগ্রহ আরো কমবে এবং ফলে অনেক ভালো বইও ক্রমশ পুনরুজ্জীবনের মুখ দেখবে না। সাহিত্য ক্ষেত্রে নতুন বৈচিত্র্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধ হচ্ছে—আরো হবে। প্রকাশকরা মুষ্টিমেয় গুটিকতক নামী লেখকের পিছনে শুধু ছোটাছুটি করছেন এরই মধ্যে, সংকট আরো বিস্তৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-দরবারে নতুন লেখক, নতুন চিন্তা নতুন প্রতিভার প্রবেশপথ আরো সংকীর্ণতর হবে।

এই অমোঘ সংকট ত্রাণের হাতিয়ার সরকারের হাতে কি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রকাশকদের মিলিত শক্তির হাতে আমার জানা নেই। হয়তো দুটি শক্তিরই সুচিন্তিত সহযোগিতার ওপর নির্ভর। আমার বক্তব্য, এক একটি ভালো বই সময়ের মহাসমুদ্রে এক-একটি চির-ভাস্বর আলোক-স্তম্ভের মতো। এই আলো নিভতে দিলে আমাদের জীবনের প্রতিচ্ছবি অন্ধকারে মগ্ন হবে।

—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

ভাল বই সত্যিই কি কম দামে দেওয়া যায় না?

ইউনেস্কোর 'পুস্তকে ক্ষুধা' নামক থেকে বর্তমান পৃথিবীর প্রকাশিত গ্রন্থের তথ্যসমৃদ্ধ বিশদ বিবরণ পেয়েছি। ভারতবর্ষে বিভিন্ন ভাষায় প্রতি বছর প্রকাশিত হয় 'বোম্বাই স্টেট অব কালচার' এই জাতীয় একটি বস্তু-বিজ্ঞানসম্মত সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। সেই খতিয়ান থেকে জেনেছি, '৭২—৭৩ সালে প্রকাশিত ভারতীয় গ্রন্থের তালিকায় ১২০০ প্রকাশিত হয়ে বাংলা বই চতুর্থ স্থান দখল করেছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও স্থান অধিকার করেছে ইংরেজী, ও তামিল গ্রন্থ, সংখ্যা—যথাক্রমে ৩১০০ ও ২২০০, মোটমুটি অবশ্য এটি পাঠ্যতালিকা বহির্ভূত বাংলা বই প্রকাশিত হচ্ছে কত কম, একথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু কেন কম ছাপা হচ্ছে, একথা কি আমরা স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করে দেখেছি! বই ছাপা হয় কার জন্য?

পৃথিবীতে যত পুস্তক ছাপা হয়, তার পাঁচ ভাগের চার ভাগ প্রকাশিত হয় আমেরিকা, রাশিয়া ও জাপান থেকে। শুধু তাই নয়, মিনিটে একটি করে বই প্রকাশিত হলেও, পৃথিবীর তিন ভাগের দু-ভাগ লোকের যত গ্রন্থ প্রয়োজন, তার অর্ধেক মাত্র আমাদের হাতে আসে। আমাদের দেশে তথা পশ্চিমবঙ্গে এ অবস্থা নিদারুণ শোচনীয়, তা বলাই বাহুল্য, যদিও আমাদের জনসংখ্যা তুলনায় অনেক বেশী। অথচ আমরা জানি, আদিম-কাল থেকে মানুষের জ্ঞান-পিপাসা জাগ্রত, সে জানতে চায়, শিখতে চায়। গ্রন্থই সেই জানাশেখার, মানুষের মহৎ চিন্তার মহা-মূল্যবান ও অবশ্য প্রয়োজনীয় 'কাগজের মোড়ক' যা শত ব্যবহারেও নষ্ট হয় না, উপরন্তু জ্ঞান বিস্তারে যথেষ্ট সহায়তা করে। শত শত শ্রেষ্ঠ মানুষ, তাঁদের যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত জ্ঞান, পুঞ্জীভূত ভাবা, চিন্তার ফসল, চিরস্থায়ীভাবে রেখে গেছেন বা যাচ্ছেন, অসংখ্য ছোট-বড় গ্রন্থের পৃষ্ঠায়। অথচ অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, সে-সব বই আমাদের পড়া হয় না, ততোধিক ছাপা হয় না, ফলে বিক্রীও আশাতীত নয়।

কিন্তু এ অবস্থা কেন? মানুষের জ্ঞানের পরিধি, মুদ্রাযন্ত্র, বহু ভালো গ্রন্থ—এ সবই দিনকে দিন ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। স্বাভাবিকভাবেই অসংখ্য পুস্তক-রাশির মধ্যে কোনটা পড়ব আর কোনটা বাদ দেব, সে প্রশ্ন আসে। বলা বাহুল্য সারা জীবনেও সমস্ত পুস্তক পড়া সম্ভব নয়,

প্রয়োজনও নয়। সে জন্যেই গ্রন্থ নির্বাচনের কথা এসে পড়ে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বহু ভালো বই প্রকাশিত হয়েছে। যদিও দেশে স্বাক্ষরের সংখ্যা ৩০% নয় (অর্থাৎ ৭০ জনেরও বেশী নিরক্ষর) এবং অনুমান করা যায়, ওর মধ্যে উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা এক চতুর্থাংশ, বাদবাকী সবাই মধ্য বা স্বল্প শিক্ষিতের পর্যায়ভুক্ত যার জন্য বই বেশী বিক্রী হয় না। স্বীকার করলাম। কিন্তু লজ্জার বিষয়, বহু ভালো বা পুরস্কার প্রাপ্ত বই-এর মূল্য দিন দিন বেড়ে চলেছে, অনেক প্রকাশকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির ফলে (লেখকদের সম্মতিতেই?)। গ্রন্থ মানব সভ্যতার নিদর্শন দেশের বা সমাজের অজ্ঞতা দূর করার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। আমাদের দরিদ্র দেশের গরীব জনসাধারণের পক্ষে ইচ্ছামতো বই ক্রয় করে জ্ঞান বৃদ্ধি করা (অধিক মূল্যের গ্রন্থগুলির কথা বাদ-ই দিলাম) নিতান্ত-ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার এতদ্রূপ অসম্ভবই বলা চলে তা আমরা ভালোভাবেই জানি।

বন্ধু প্রকাশকরা (লেখকরা!) মূল্য-বৃদ্ধির ব্যাপারে তাঁদের স্বপক্ষে নিশ্চয়ই বক্তব্য রাখবেন—বিদ্যুৎ বিভ্রাট, কাগজের অগ্নিমূল্য ও দুষ্প্রাপ্যতা; প্রেসের বিভিন্ন চার্জ ইত্যাদি অত্যধিক বেড়েছে সেকথা জানিয়ে। নিশ্চিতভাবে সত্যি কথা এবং আমরা তা বিলক্ষণ জানি। তবে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করছি, একথা কি সত্যি নয়, একটা বই বাজারে প্রকাশিত হবার পর, প্রতিটি বই-পিছু যে মূল্য ধার্য করা হয়, তার অর্ধেকের সামান্য বেশী টাকা খরচ হয়, প্রতিটি বই-এর জন্য? অর্থাৎ ১০ টাকা মূল্যের বই-এর জন্য ৬ টাকা মতো ব্যয় হয়! তর্কের খাতিরে একথা বাদ দিলেও খুবই বিস্মিত হই এ কারণে—ভালো বা পুরস্কার প্রাপ্ত বইগুলি, যা প্রায় দশ-বিশ হাজারের উপর বিক্রী হয়েছে বা হচ্ছে, সেই গ্রন্থগুলিই দিনের পর দিন দরিদ্র আগ্রহশীল পাঠক-পাঠিকার চাহিদার সুযোগ নিয়ে, ক্রমশঃ মূল্যবৃদ্ধির মধ্য দিয়ে, সাহিত্য মনোবৃত্তিকে স্বচ্ছন্দে অবহেলা-উপেক্ষা করে, অপরাধমূলক ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির পরিচয় দিচ্ছেন না কি? সহজ কারণেই দারুন ইচ্ছা-থাকাসত্ত্বেও বহু উৎসাহী পাঠক-পাঠিকা ক্রমশঃ মূল্যবৃদ্ধির জন্য বইগুলি কিনতে পারেন না জ্ঞানভাণ্ডার পুষ্ট করতে পারেন না। যেহেতু ভালো বইগুলি প্রচুর বিক্রী হয়, সেজন্যে পূর্ব নির্ধারিত মূল্য হ্রাস হওয়াটাই স্বাভাবিক, অথচ মজার ব্যাপার উল্টো ব্যাপারটাই হচ্ছে। আপনাদের জ্ঞাতার্থে দৃষ্টান্তস্বরূপ এখনি মনে পড়ছে এমন কতগুলি গ্রন্থের লেখকের নামোল্লেখ সহ কয়েক বছর পূর্বের এবং বর্তমানের দাম কিভাবে বেড়েছে তা জানাচ্ছি।

লেখক	বই	পূর্ব দাম	বর্তমান দাম
বিমল মিত্র	কড়ি দিয়ে কিনলাম	৩০˜ (১৬+১৪)	৩৮˜ ২০+১৮)
আশাপূর্ণা দেবী	প্রথম প্রতিশ্রুতি	১৪˜	১৮˜
কালকূট	অমৃতকুম্ভের সন্ধানে	৭˜	১১˜
মনোজ বসু	জল জঙ্গলে	৫˜	৮-৫০
গজেন্দ্র মিত্র	পৌষফাগুনের পালা	১৫˜	১৮˜
শঙ্কর	চৌরঙ্গী	১০˜	১২-৫০
মনোজ বসু	চীন দেখে এলাম	৩-৫৫ (২য় খণ্ড)	৬˜
সমরেশ বসু	বাঘিনী	৭-৫০	১০˜
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	আরোগ্য নিকেতন	৮˜	১১˜
”	গণদেবতা	৮˜	১০˜
”	পঞ্চগ্রাম	৮˜	১০˜
”	হাঁসুলী বাঁকের উপকথা	১০˜	১২˜
সুবোধ ঘোষ	ভারত প্রেমকথা	৬˜	৮˜
সৌরীন সেন	কঙ্গো থেকে ফেরা	৮˜	১০˜

উপরিউক্ত পুস্তকগুলি ছাড়াও, যতদূর জানি, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইছামতী,' মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা,' সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী', রমাপদ চৌধুরীর 'বনপলাশীর পদাবলী', যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত', অজয় বসুর 'ব্যাটে বলে ক্রিকেট' ও 'মাঠ থেকে বলছি', বিষ্ণু দে-র 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' প্রভৃতি পুস্তকগুলির মূল্য দু-টাকার কাছাকাছি বা তারও অধিক বেড়েছে! অনুমান, এ লেখা প্রকাশিত হওয়ার সময় হয়তো আরও দাম বাড়তে পারে?

ভালো গ্রন্থের প্রতি সরকারের (জনসাধারণেরও) দৃষ্টি দেওয়া সবিশেষ প্রয়োজন। এ ব্যাপারে আমাদের একটি পরামর্শ, সরকারের বিবেচনার উদ্দেশ্যে নিবেদন করছি। বাছাই করা 'ভালো গ্রন্থ' দশখানা বা আরও অধিক বিশেষভাবে দরিদ্র লেখকের, সরকার এক লাখ ছাপালেন। এবং ঐ এক লাখ গ্রন্থ প্রত্যেক স্কুল থেকে স্নাতক শ্রেণী অবধি, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবশ্যিক পাঠ্যরূপে গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হল। প্রতিটি গ্রন্থের দাম মাত্র এক টাকা করা হল অর্থাৎ এক লাখ বইএর দাম এক লাখ টাকা। এক লাখ টাকার ২৫ হাজার টাকা ছাপতে, ২৫ হাজার লেখককে, ২৫ হাজার বিজ্ঞাপন ইত্যাদি (খরচা) এবং ২৫ হাজার টাকা সরকারের লাভ। দরকার হলে 'ন্যাশনা[ল] বুক করপোরেশন' মতো করে, এ কাজের দায়িত্বভার তাঁদের উপর অর্পণ করা চলে যদিও ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট আছে, কিন্তু তাঁদের দ্বারা কি এ জাতীয় কাজ সত্যি আশা করা যায় না?

আমরা বই পড়ি জ্ঞানার্জনের জন্য আনন্দ পাওয়ার জন্য, মনকে সুস্থ, সর[ল] করে গড়ে তোলার বা বিচারবুদ্ধি বৃদ্ধি[র] জন্য। বই পড়ার মধ্যে দিয়ে এ সবে[র] কোনোটিই যদি না হয় অর্থাৎ তড়িঘড়ি করে লোক-দেখানো বা লোক-শোনানো পড়াই যদি হয়, তার সার্থকতা কোথায় অনেক পড়ে কিছু না জানা অপেক্ষা, ক[ম] পড়ে কিছু শেখাও অনেক ভালো।

ভালো বই সম্পর্কে আমাদের দুর্বল[তা] চিরকালের। লেখক মৃত্যুবরণ করলেও ত[াঁর] 'সেই গ্রন্থ' পাঠকের অন্তরলোকে চি[র] বিরাজিত, চিরমৃত্যুঞ্জয়। শহরবাসী থেকে সুরু করে সুদূর গ্রামাঞ্চলেও, মানুষে[র] চিত্তসংযমের একটি প্রধান উপায়ও ভালো গ্রন্থ। ভালো বই মানুষের জীবনদর্শ[ন] স্বরূপ—যা চিরকালের জন্য যত্নসহকা[রে] সংরক্ষিত মহামূল্যবান ধন। তাই মনে প্র[শ্ন] জাগে, ভালো বই সত্যিই কি কম দা[মে] দেওয়া যায় না?

—প্রবীর ঘোষ

[illegible] সাহানা—উপন্যাস, লেখক দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। এম সি সরকার এন্ড [illegible] প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম—[illegible] টাকা।

[illegible] কথাটা গোড়াতেই স্বীকার করা [illegible]।

[illegible] এই যে নীতিপরিচিত নতুন কোনো [illegible] কোনো বই হাতে পড়লে ঠিক [illegible] তখনি পড়বার জন্যে সর্বদা ব্যস্ত [illegible] উঠি না। পড়তে শুরু করার আগে [illegible] দ্বিধাসংশয় যে মনের মধ্যে জাগে সে [illegible] গোপন করলে সত্যের অপলাপ হবে।

নবীনতার আকর্ষণ ও অজানার সম্বন্ধে [illegible] কৌতূহল যে একেবারে থাকে না [illegible] নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে একটু আশঙ্কার [illegible]ও অনুভব করি। আশঙ্কাটা যথার্থ [illegible] সম্বন্ধে নিশ্চয়ই নয়। সেটা সেই নকল [illegible] সেই আস্ফালন সম্পর্কে সস্তা [illegible] বেশী মূলধন যার নেই।

নতুন যা কিছু লেখা হচ্ছে তা সবই এই [illegible] জাতের অবশ্য নয়। শুধু ভঙ্গি দিয়ে [illegible] ভোলাবার সওদা নিয়েই বর্তমান [illegible] কারবার চলছে না। [illegible] হুজুগে যারা নির্বিচারে গা ভাসাচ্ছে, [illegible] ভিড়েও এক আধটা লক্ষণীয় ব্যতিক্রম [illegible] মাঝে দেখা যাচ্ছে না এমন নয়।

'মিশ্র সাহানা' এমনি একটি প্রীতিপ্রদ [illegible]। লেখক শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়কে [illegible] একরকম নবাগতই বলা উচিত। [illegible] দু'চারটি গল্প ও উপন্যাস ইতিমধ্যে [illegible] দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও সাহিত্য [illegible] সুপরিচিত বলতে যা বোঝায় তা [illegible] এখনো ঠিক হয়ে ওঠেন নি।

তাঁর সে অবশ্য প্রাপ্য স্বীকৃতি 'মিশ্র [illegible]'ই এনে দেবে বলে আমি বিশ্বাস [illegible]।

যে সব কারণে 'মিশ্র সাহানা' উপন্যাসটি [illegible] স্মরণীয় ও সার্থক তার মধ্যে [illegible] হল লেখকের সেই দুর্লভ ক্ষমতা যা [illegible] কাহিনীর ভেতর দিয়ে সম্পূর্ণ [illegible] যথার্থ নিজস্ব একটি জগৎ [illegible] করে তোলে।

'মিশ্র সাহানা'র পটভূমি বর্তমান [illegible] [illegible] নির্দিষ্ট অঞ্চল। কিন্তু তার মধ্যে বহু [illegible] বংশগতির ধারার বিচিত্র জটিল [illegible] সমস্ত দেশের ইতিহাস ভূগোলকেই [illegible] জীবন্ত করে তুলেছে।

[illegible] প্রকাশিত উপন্যাসেই বিরাট এক [illegible] এই বেগ ও বিস্তার নিপুণ হাতে [illegible] করা বড় কম কৃতিত্ব নয়। বইটির [illegible] মুদ্রিত লাইনে যে চিরজীবদার দেখা [illegible], তার বিস্ময়কর জীবন-কথা শাখায় [illegible] পত্রে পল্লবে শুধু নয়, সুদূর অতীতের বংশধারার মূলগত বৈচিত্র্যে একটি স্বতন্ত্র বাস্তব পরিমণ্ডলের মধ্যে আমাদের নিবিষ্ট করে রাখে।

সেখানে অসংখ্য চরিত্রের আনাগোনা। বহু বিস্তৃত কাহিনীর অজস্র খেই। সেই সব নিয়ে বিরাট সূচীচিত্রের নকশার নিয়মে কখনো গোচর কখনো অগোচর টানাপোড়েনে একান্ত ঠাসবুনোন যে 'ট্যাপেস্ট্রী' সেখানে পরিকল্পিত, সব সাময়িক হুজুগের ঊর্ধে একাল সেকালের উপন্যাস-সাহিত্যের কাছে তাই এখনো এক বিশেষ সার্থকতার পরাকাষ্ঠা।

উপন্যাসের যিনি কেন্দ্র আর যার জবানিতে কাহিনীটি বলা সেই চিরজীবদা আর সুনন্দ বাদে মার্গারেট মেহের আলি অজয় মল্লিকা অতনুদা, বৌদি বিভূতিবাবু, জিম আইরিন, রাধা 'মিশ্র সাহানার' কয়েকটি মাত্র চরিত্রের নাম। বেশ দীর্ঘ উপন্যাসটি শেষ করবার পর বিষণ্ণ মধুর স্মৃতিতে জড়ানো এই সমস্ত চরিত্রকে ছেড়ে যেতে যে মন চায় না, তাদের সঙ্গ ফিরে পাবার জন্যে পেছনের পাতা অনেকবার যে ওল্টাতে হয় 'মিশ্র সাহানা' সম্বন্ধে সেইটা সবচেয়ে বড় প্রশংসা মনে করি।

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

বিচ্ছিন্ন অবিচ্ছিন্ন। পবিত্র মুখোপাধ্যায়। ভারবি। ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। কলকাতা বারো। দাম পাঁচ টাকা।

সাম্প্রতিক কালে কবিতাপত্রে কবিতার ভাবনা নিতান্ত বিরল নয়। তবু ভাল বই হাতে এলে উৎসাহ বোধ করতেই হয়। এই রকম একখানা বই হোল পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের 'বিচ্ছিন্ন অবিচ্ছিন্ন'। তাঁর কবিতার মতই পরিপক্ক পৌরুষ এবং প্রজ্ঞার ছাপ রয়েছে [illegible]। কবিতাকে পবিত্রবাবু একটা শব্দবিলাস ভাবতে চান না। মানবিক এবং বৌদ্ধিক অনুভূতির প্রগাঢ়তায় তাই তাঁকে বলতে শুনি 'কবিতা এখন অন্তরাল-বর্তী দর্পণ'।

'বিচ্ছিন্ন সময়ের ব্যক্তিগত চিন্তা' বইয়ের বারোটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধের মধ্যে কবিতার যে সন্ধিকাল চিহ্নিত হয়েছে তা রবীন্দ্র উত্তর কালের চল্লিশ থেকে প্রায় ষাট পর্যন্ত বিস্তৃত। জীবনানন্দ বিষ্ণু দে সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উত্তর সুরীর পরবর্তী কালান্তরে পবিত্র মুখোপাধ্যায় নিজেকেও অনুসন্ধান করেছেন।

প্রবন্ধগুলোকে তথ্য ভারাক্রান্ত না করে কোনো তত্ত্বের দিকে না ঝুঁকে একটা 'ইমপ্রেশনের' দিক থেকে কবিতাকে বুঝতে চাওয়া হয়েছে।

জীবনানন্দ আত্মার সংকটের কবি; তাঁর কবিতার প্রতি ছত্রে 'পাপ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও আরোগ্য' মানুষের একটা 'ক্রাইসিস' হয়ে রক্তাক্ত হৃদয়ের লিপিতে জ্বলজ্বল করছে। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর অসবর্ণতা। রবীন্দ্রনাথ শোভন সুষম ছন্দোময়—তাঁর শেষতম বিপর্যয়ের কবিতাতেও আশাবাদের কেতনটিকে তিনি প্রতিকূল বাতাসে অবনত করেননি, জীবনানন্দ এসবের বিপরীত—তবে রবীন্দ্রনাথের জন্মজয়ন্তীর সঙ্গে জীবনানন্দের নিরানন্দক্লিষ্ট প্রতিভা দূরবর্তিতার প্রসংগ পবিত্রবাবু না আনলেও পারতেন। কারণ রবীন্দ্রনাথের জন্মলগ্নে জাতীয় উচ্ছ্বাসের কারণ স্বতন্ত্র—সেখানে কবির ব্যক্তিত্ব যা কবিতায় অতিরিক্ত একটি সৃষ্টি করে নেওয়া 'ইমেজ' রয়েছে যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্বাদেশিকতা বঙ্গ-ভঙ্গ নোবেল প্রাইজ শান্তিনিকেতন সৃষ্টি ও গান রচনা।

রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দে যত পার্থক্যই থাক গীতিধর্মের দিক থেকে একটা সাদৃশ্য ছিল। এই গীতি প্রবণতা নিছক পদলালিত্য না হতে পারে [illegible] সেটাকে 'ব্যাকুমনের কুহক' বললেও সব সময় ভাবা চলে না। রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ সত্ত্বেও আমরা সব সময় স্বীকার করি না যে জীবনানন্দে 'সিরিনিটি'র অভাব আছে। তাঁর প্রশান্তি তাঁর অক্ষর বৃত্ত—[illegible] প্রধানের আশ্চর্য মন্দ্রময়তায়। তাঁর রূপকল্পগুলির মধ্যে একটা প্রবহমান 'ট্রানসেনডেন্টালিজম' ছিল যেটা সুধীন্দ্রনাথ কি বিষ্ণু দের মধ্যে সুলভ নয়। অপরাংশে জীবনানন্দের [illegible] মধ্যে সে আপাত বিরোধের বিভ্রম রবীন্দ্রনাথে অনুপস্থিত।

মহাকবিতা বিষয়ে ও কাব্যভাষা সম্পর্কে পবিত্রবাবু কিছু নতুন কথা বলেছেন। মহাকাব্যের এক অংশ যেমন উপন্যাসের বিকল্পে তেমনি আর এক অংশ মহাকবিতার মধ্যে সার্থক হয়ে উঠতে চাইছে। মহাকবিতা রচনার দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেছেন—মহাকবিতার বহুতর বিভক্ত জটিল ল্যাবিরিনথই বেছে নিতে হয় কবিকে। 'কবিতার ভাষা' এবং 'গদ্য পদ্য সীমান্ত'-এর সমস্যা নিয়ে পবিত্রবাবুর ব্যাপক সমীক্ষা যে কোনো কাব্য পাঠকের ভাল লাগবে। একদিকে রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা আর একদিকে জীবনানন্দের 'কনভেনশন' ভেঙে বাংলা কবিতাকে এক নতুন দিগন্তে পৌঁছে দেবার চেষ্টা এবং পোয়েটিক ডিকশনের অভিনব উপলব্ধি দুয়ের মধ্যেই আধুনিক বাংলা কবিতার একটা পালাবদল ঘটে গেছে। পবিত্রবাবু তার কয়েকটি স্তর সযত্নে মাপিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।

—[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়

আরো বই\পত্র পত্রিকা

আমি সোনা এবং—হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় অধুনা সাহিত্য। দাম চার টাকা।

'আমি সোনা এবং' হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের ১৯৬৪-৭৩ এই দশ বছরে লেখা মোট বারোটি গল্পের সংকলন। তিনটি পর্যায়ে গল্পগুলি সাজানো হলেও লেখক স্বয়ং প্রায় প্রতিটি গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। এর ফলে একদিকে যেমন নতুন স্বাদ কিছুটা পাওয়া যায় অন্যদিকে তেমনি কিছুটা একঘেয়েও মনে হয় কোনো কোনো গল্প।

এই সংকলনের গল্পগুলি পড়লে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে হৃষীকেশবাবু মানসিক দিক থেকে ষাট দশকের তরুণতর লেখক গোষ্ঠীরই একজন। কাহিনী বক্তব্য ইত্যাদি তথাকথিত দায়িত্ব কিছুই স্বীকার করেন নি লেখক। কিন্তু তৈরি করেছেন নিজস্ব এক অনুভূতির জগৎ। 'সেই লোকটা' গল্পের টেনশন ক্রমশ পাঠকের মনেও সংক্রামিত হয়। তুলনায় 'ছাপ' 'শুকরী' গল্পগুলি সম্পূর্ণ প্রথামুক্ত হতে পারেনি। 'আমরা বসে থাকছিলাম' কী রকম বাংলা? অথবা 'ভরা শ্রাবণে জল থৈ থৈ পল্লীমাঠের বুকে চার-পাশের দুশোর নিথর প্রতিবিম্বের মতো অবিচল রাণী—ভাষার বোমাবাজি ছাড়া কী? এদিকে লেখক আর একটু মনোযোগ দেবেন আশা করি। যাঁরা ভিন্ন স্বাদের গল্প পাঠে উৎসাহী সংকলনটি তাঁদের ভাল লাগবে। বিদীর্ণ অবশেষে আরও কোনো কোনো গল্প তরুণ লেখক হিসেবে হৃষীকেশ বাবুর পরিচিতি নিশ্চিত করবে।

অমিতাভ দাশগুপ্তের নির্বাচিত কবিতা (কাব্য সংকলন)—অনুক্ত প্রকাশনী ২২, বর্নফিল্ড লেন কলকাতা—১। পাঁচ টাকা।

প্রতিষ্ঠিত তরুণ কবি শ্রীঅমিতাভ দাশগুপ্ত তাঁর কবিখ্যাতির জন্য নতুন করে কোন পরিচিতির অপেক্ষা রাখেন না, তবু তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত নির্বাচিত কবিতার সংকলন গ্রন্থটি হাতে আসার পর আমাদের মনে হয়েছে, কবি অমিতাভ দাশগুপ্তের কবিতা আরও নতুনভাবে আলোচনা হওয় দরকার।

যতদূর মনে পড়ে অমিতাভ দাশ-গুপ্তের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সমুদ্র থেকে আকাশ'। তারপর এক এক করে 'মৃত শিশুদের জন্য ট্রফি' 'মধ্যরাত্র ছুঁতে আর সাত মাইল' গ্রন্থ দুটি প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান নির্বাচিত সংকলনটি উপরোক্ত গ্রন্থাদি থেকে ব্যতিক্রম এই কারণে যে, কবি অগ্রন্থিত বহু কবিতা এতে সংকলিত করেছেন। প্রকাশিত তিনটি গ্রন্থের সামান্য ক'টি কবিতা ছাড়া বাকি সব কবিতাই পত্রিকায় প্রকাশিত হতে পারে কিন্তু গ্রন্থভুক্ত হয়নি আজও।

অমিতাভ দাশগুপ্তের দীর্ঘ আয়াসলব্ধ কাব্যচর্চার বোধহয় সোনার ফসলই এতে আছে! তিনি কখনো সস্তা রোমান্টিকতায় ভেসে যান নি, বা তাকে নিয়েই কাব্য ভাবনায় নিমগ্ন থাকেন নি। তিনি বলিষ্ঠ চেতনার বাস্তববাদী কবি। প্রকাশ নির্বাচিত কবিতার প্রায় সব কবিতাতেই আছে, সবচেয়ে উল্লেখ্য বোধহয় গ্রন্থের প্রথম কবিতাই—ওকে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ছিঃ। বাস্তব জীবন ও সমাজচিত্রে মনবিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে বৈষম্য ও অপমানকে নিয়ে এমন তীব্র ব্যাঙ্গের কবিতাটি সার্থক কবির মর্যাদা দেয়। 'ছাতি ফাটার মাঠ। হা হা খিদে দিচ্ছে ঝাঁট। মুখে মুখোশ এঁটে নিস। হিস হিস হিস হিস। জিভ জিরেতে জ্বালিয়ে ধা ধা। কাল কেউটের বিষ!'—এমন ক্ষিপ্র লঘু ছন্দের আড়ালে ব্যঙ্গ ও মমতার স্রোত কবিকে এক কথায় আপন করে দেয়।

অমিতাভ দাশগুপ্ত নিছক শহুরে কবি নন, তাঁর অভিজ্ঞতা সাহস আকাঙ্ক্ষা বাসনা সুখ-দুঃখ অনুভূতি বাংলার জনজীবনকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে কাব্যে উপস্থাপিত। তাই তাঁর প্রতীক প্রয়োগ শব্দনির্মাণ ছন্দভাবনা ও সর্বোপরি বস্তু-সত্তাকে অত্যাদ্ভুত কাব্যময় করার দুর্লভ ক্ষমতা তাঁর ১৯৬৮-র পর প্রকাশিত কবিতাগুলিতে চিরকালীন শিল্পের সত্তায় জীবন্ত হয়েছে।

দেশকে ভালবাসে কবি ভালবাসেন তার প্রকৃতি ও মানুষকে। কিন্তু তা কোন রোমান্টিক কবির নিছক বিলাস নয়, তার অর্থ তিনি করেছেন সর্বকালের মানুষকে ভালবাসার প্রেক্ষিতেই। বহু কবিতায় কবির দ্বন্দ্ব আছে দ্বন্দ্ব থেকে উত্তরণের জন্য বাসনার তীব্রতাও সেখানে কম নয়। মানুষের কাছে থেকে গায়ে গায়ে মিশে মিশে কবিভাষা ব্যবহার করতে অভ্যস্ত বলেই আলোচ্য কবি যথার্থ অর্থে আধুনিক ও রিয়ালিস্ট। অমিতাভ দাশ-গুপ্তের কবিতায় সমকালের জীবন সমাজ মানুষ অত্যাচারী ও অত্যাচারিতদের যেভাবে চিরকালের প্রেক্ষাপটে 'শাণিত' ক'... এই তরুণ সপ্রাণ কবিকে চিরকালের আধুনিক অভিধায় চিহ্নিত করে।

'রোদের মধ্যে যেতে যেতে'—দেবীপ্রসাদ মৈত্র। অধুনা সাহিত্য। আড়াই টাকা।

'রোদের মধ্যে যেতে যেতে' খুব সম্ভব দেবীপ্রসাদ মৈত্রর প্রথম কবিতার বই। ... কবিতাগুলি সাজানোর কোনো নিয়ম মানা হয়নি। কিন্তু কবিতাগুলি পড়ার পর মনে হয় নির্বাচনেরও কোনো নিয়ম তিনি মানেননি। কারণ অধিকাংশ কবিতাতেই দেবীপ্রসাদবাবু ভালো আবেগ ও ভাবালুতার স্তর অতিক্রম করতে পারেননি। 'কান্না গেল থেমে রাত্রি এলো নেমে'... (গোলাপ কুঁড়ি মাত্র) অথবা সময়কে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল লোকটা' (এই পথে) ইত্যাদি পংক্তি হাস্যকর ও পীড়াদায়ক। অবশ্য শব্দ-প্রতিশব্দ রোদের মধ্যে যেতে যেতে' 'আকাশটা চাঁদ ইত্যাদি কবিতায় এক ধরণের অন্তর্গত-নিয়মের কলার্ট কিছুটা পাওয়া যায় তবু সমস্ত সংকলনটি থেকে এটাই পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে কবিতায় নিজস্ব মেজাজ উচ্চারণ ও প্রকাশ-ভঙ্গি আয়ত্ত করতে হলে দেবীবাবুকে এখনো রোদের মধ্যে অনেকটা পথই যেতে হবে।

নীল সমুদ্র সোনাজল (কাব্য সংকলন)। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। নব সাহিত্য প্রকাশ ১২১।সি সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট কলকাতা-৯। তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'নীল সমুদ্র সোনা জল' কাব্য গ্রন্থটিতে মোট ঊনিশটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। পুরনো আমলের বিষয় ও ছন্দরীতিতে লেখা কবিতাগুলি পড়তে মোটামুটি ভালই লাগে কিন্তু মনে কোনো দাগ রাখে না। রাজবাংলার কথা সুন্দরবনের কথা—কবি ছন্দে সুরে বলতে চেষ্টা করেছেন। ছন্দজ্ঞান আরও পরিশীলিত হওয়া উচিত ছিল। কোন কোন স্তবক বা চরণের কোন অর্থই খুঁজে পাওয়া যায় না।

সাহিত্য কল্প। সম্পাদক অসিতবরণ হালদার। সাঁইপালা। বসিরহাট। এক টাকা।

সাম্প্রতিক বাংলার রবীন্দ্রসঙ্গীত নিবন্ধটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণ হলেও সময়োপযোগী। লেখক যে সব শিল্পীর গান শুনে মনে করেন যে তাঁরা সুর সাগরে ডুব দিয়েছেন সেই শিল্পীদের তালিকার পুরোভাগে পঙ্কজ মল্লিক শান্তি-দেব ঘোষ সন্তোষ সেনগুপ্ত এবং রাজেশ্বরী দত্তের সশ্রদ্ধ উল্লেখ নিশ্চিত প্রয়োজন ছিল।

আলোয়। সম্পাদক মোহনলাল কাপড়ী। কানাইপুর বাটুল। বাগনান। হাওড়া। দাম এক টাকা।

পরলোকগত বুদ্ধদেব বসু এবং পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ করেছেন দক্ষিণা-রঞ্জন বসু এবং বনলতা সেন। এছাড়া 'জীবনানন্দের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ' নিবন্ধটি উল্লেখ করার মতো।

বা। সম্পাদক ঋতীশ চক্রবর্তী। প্লট ১৬৬ ডঃ বি সি রায় কো-অপারেটিভ কলোনী। বিধান পার্ক। কলকাতা-৫০। দাম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

করতোয়া। দীনেশচন্দ্র পাল ও মোঃ করিম দাদ সম্পাদিত। করতোয়া। পঞ্চগড়। দিনাজপুর। দাম এক টাকা।

সেই লোকটি

বহুদিন ননীকে দেখি না। হঠাৎ হঠাৎ স্মৃতির ভেতরে চিতল মাছের মত ঘাই দিয়ে ওঠে ওর মুখ।

আমার দাদামশায়ের ছোট ভাই ছিলেন প্রভু জগদ্বন্ধুর পয়লা সারির ভক্ত। তাঁকে আমরা ডাকতাম সাধুদাদু বলে, ভক্তরা বলতেন—হরিবোল ব্রহ্মচারী। ফরিদপুরে মহাকালী পাঠশালার একপাশে সাধুদাদুর একটি ভারি সুন্দর আশ্রম ছিল; মায়ের দিদার হাত ধরে বহুবার সেখানে গেছি ছোটোবেলায়। কীর্তনে, ধর্মালাপে, শাস্ত্রপাঠে সব সময় রমরম করত ঐ ছোট্ট নিকোনো আশ্রমটি। আমার লোভ ছিল ঠাকুরের প্রসাদের ওপর।

দেশভাগ হয়ে যাওয়ার পর সাধুদাদু সেই আস্তানা ছেড়ে তাঁর একটি চ্যালাকে নিয়ে এসে উঠলেন টালায় আমার মামাবাড়িতে। এই চ্যালাটির নামই ননীমাধব ভদ্র বা চলতি ভাষায় ননী।

মাথায় পাঁচফুটও নয়। রোদে জ্বলা গায়ের রং। হাড়-জিরজিরে কেষ্টর জীবের মত চেহারা। কামানো মাথায় একটি পুরুষ্টু টিকি। ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। একটি আটহাতি ধুতি মালকোঁচার মতন করে কোমরে সাঁটা। নগ্ন পদ। দেখার মত তবু ওর আয়ত চোখ দুটি। সব সময় মনে হত কাজলটানা।

ননী কথা বলে অসম্ভব দ্রুতলয়ে। কি বলে, বহুকাল শোনার অভ্যেস না করলে বোঝা অসম্ভব। অধিকাংশ সময় একটা কম্বল পেতে সাধুদাদুর পায়ের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকে। এবং সারাক্ষণ ওর মুখে শোভা পায় জ্বলন্ত বিড়ি। যদি কোনো জায়গায় একসঙ্গে দশ-বিশটি পোড়া বিড়ির টুকরো পড়ে থাকতে দেখেন বুঝবেন, এখানে একটু আগে ননী ছিল।

ও ছিল বয়সচোর। তেইশ থেকে তেতাল্লিশ—যা খুশি বলে ওকে চালানো যেত। দিদিমা, মা, মামীমা—সবাই ওকে ননী বলতেন আমরা ভাইবোনেরাও ওকে ননী বলেই ডাকতাম। দাদুর ওপর ওর ভক্তি বা আসক্তি ছিল নাছোড়বান্দা স্প্যানিয়েলের মত। সব সময়ই জাঁক করে শোনাতো আমাদের 'সাধুর ছিচরণের তলায় থাকি তাঁর পায়ের ধুলো আমারও গায়ে লাগে।'

ভয়ঙ্কর অলস প্রকৃতির ছিল ননী। সারা সকাল দুপুর শুয়ে শুয়ে বিড়ি টানত, দুপুরে কোনক্রমে উঠে আন্দাজ থেকেই সাধুদাদুর মালসা ভোগে ভাগ বসাত। দাদুরও হয়েছিল ভরত রাজার অবস্থা। ব্রহ্মচারী মানুষ কিন্তু অবলা পশুর তুল্য ননীর ওপর তাঁর মায়া-মমতার তুলনা ছিল না। বকতেন, শাসন করতেন কম নয় কিন্তু দুদণ্ডের জন্য ননীকে চোখের ওপর না দেখলে ভয়ংকর উদ্বিগ্ন হয়ে যেতেন। ননীকে কেউ কিছু বললে মনে মনে অসন্তুষ্টও হতেন খুব। আর ননী ছিল বিপজ্জনক রকমের স্পষ্টবক্তা। স্থান-কাল-পাত্র-অধিকার বিচার না করে যাকে যা খুশি বলে দিত। বলা বাহুল্য, এর দরুন বাড়িশুদ্ধ সবাই বেশ বিরক্তই থাকত ওকে নিয়ে। দাদুর জন্য সরাসরি কেউ কিছু বলতে সাহস করত না বটে কিন্তু হাবেভাবে বুঝিয়ে দিতে কসুর করত না যে কতখানি গলগ্রহ হয়ে ঝুলছে ননী।

শেষে ননীর জন্যই সব কিছু সামলে-সুমলে মামাবাড়ি [illegible]

কয়েকজন ভক্ত ছিলেন, তাঁরাই উদ্যোগী হয়ে একটা ছোট্ট আশ্রম গড়ে দাদুকে স-ননী সেখানে নিয়ে গেলেন। দাদুর দুর্ভাগ্য সেখানে গিয়ে ঐ ভক্তদেরই ওপর ননীর দাপট ও অত্যাচার চারগুণ বেড়ে গেল। সময়ে-অসময়ে তাঁদের বাড়ি ঘেরে ঢুকত, ঢুকেই বলত 'ছোটো সাধু আইলাম সেবা লাগাও।' যখন তখন তাঁদের কাছ থেকে দাদুর নাম করে নিয়ে যেত তরি-তরকারী ফল-ফলারি, টাকাটা-সিকেটা। ননী তার কথাবার্তা, আচরণ দিয়ে সব সময়ই সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা করত যে সে একটি ক্ষুদে ভগবানবিশেষ দয়া করে তাদের কৃতার্থ করার জন্য মর্তধামে নেমে এসেছে।

বেশ কয়েক বছর কেটে গেল। আমরা ডাঁটো হয়েছি, বে-থা করে ছেলে-পুলে সমেত সংসারী-ও। মাসে একবার করে ননী আসত কাঁচড়াপাড়া থেকে কলকাতায় আমাদের আত্মীয়স্বজনের বাড়ি বাড়ি ঘুরে দাদুর খরচের জন্য যার-যার মাসিক বরাদ্দের টাকা নিয়ে যেত। এর মধ্যে ওর পলকা শরীর আরো ভেঙে গেছে, সারা গায়ে খড়ি মুখময় খোঁচা খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি মাথায় নোংরা গামছা বাঁধা, পা থেকে হাঁটু অবধি সাত হাটের-ঘাটের ধুলো—এক অসম্ভব চেহারা হয়েছে তার।

সত্তর-একাত্তরের সেই ভয়াবহ সন্ত্রাস আর গণহত্যার দিনগুলিতে কলকাতার অলি-গলিতে স্পাই সন্দেহে ছোকরাদের হাতে ধরা পড়ে অন্তত বার দুয়েক প্রভুর কৃপায় প্রাণে বেঁচে যায় ননী। ভ্রূক্ষেপ ছিল না ওর। গলা খুলে 'হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু, মহাউদ্ধারণ/চারিহস্ত চন্দ্রপাত্র হা-কীটপাতন' গাইতে গাইতে ঠিক মাসান্তে এসে হাজির হত আমার বাড়ি ঘরে ঢুকেই মেঝেতে গা এলিয়ে দিয়ে আমাকে বলত, 'দুধ-মুড়ি খামু। জলদি সেবার টাহা দাও। বিড়ির পয়সা দাও।'

একদম ঝাঁঝরা দুটো ফুসফুস নিয়ে দাদুর আশ্রম থেকে টি বি হাসপাতালের বেডে একদিন চালান হয়ে গেল ননী। দাদু মা-কে চিঠি লিখলেন। মা কান্নাকাটি শুরু করলেন—শত হলেও গুরুভাই তো বটে! একদিন কাজে কামাই দিয়ে মা-কে নিয়ে গেলাম কাঁচড়াপাড়ায়। দুপুরে খানিকটা বিশ্রাম করার পর দাদুই আমাদের নিয়ে গেলেন হাসপাতালে। বিছানায় একেবারে চাদরের মত লেপ্টে গেছে ননী। সারা শরীরে মরণের একচ্ছত্র ছায়া। কেবল জ্বলন্ত দুটো কাঠকয়লার মত ধকধক জ্বলছে দুচোখ। দাদুকে দেখে হাত বাড়িয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিতে গেল। তারপর মুখে অবর্ণনীয় কষ্টের সব কটি রেখা ফুটিয়ে আমাকে বলল, 'আমি তো চললাম। সাধুরে দেইখো কিন্তু।'

—অমিতাভ দাশগুপ্ত

ভালবাসা ভালবাসা

আনন্দ বাগচী

উপন্যাস

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

ওবাড়ির ভেতর থেকেও বন্দনা বেরিয়ে এসে ঘাড় নাড়লো। অর্থাৎ এখানেও নেই।

আবার ট্যাক্সি ছুটলো। এ রাস্তা ও রাস্তার গোলোক-ধাঁধা ঘুরে আবার অন্য পাড়ায়, অন্য ঠিকানায়। ড্রাইভারের পাশের সীটে বন্দনা বসেছে, সেই নিয়ে যাচ্ছে রাস্তা দেখিয়ে।

গত আধ ঘণ্টা যাবত এই হচ্ছে। যেন কোনো উগ্রপন্থীর খোঁজে গ্রেপ্তারী তল্লাসী চলছে। বন্দনা এখন অন্য মেয়ে অন্য মানুষ। তার মুখের রেখা কঠিন, চোয়াল শক্ত। ড্রাইভারের সঙ্গে ছাড়া সে একটি কথাও বলছে না কারো সঙ্গে। শুধু প্রয়োজন বোধে আভাসে ইসারায় কথা হচ্ছে তাদের মধ্যে। পিছনের সীটে তপতী, পারমিতা আর নন্দিনী। সুষমা এ যাত্রায় বাদ গেছে, তাকে পাঠানো হয়েছে অন্য কাজে। চন্দনাদিকে খবর পৌঁছাতে গেছে সে।

যে সব জায়গায় সন্তোষের পক্ষে যাওয়া সম্ভব বন্দনা জানে। সেই সব ডেরাগুলিই রেড করা হচ্ছে অভিনব কৌশলে। কখনো সঙ্গে নন্দিনীকে নিচ্ছে, কখনো একাই। একবার তপতীকেও যেতে হয়েছিল। যেখানে মনে হয়েছিল অচেনা মুখ কাজ করবে। কিন্তু বন্দনার এত চেষ্টা বোধহয় ব্যর্থই হয়। কোথাও সন্তোষ সেনের সম্পর্কে একতিল খবরও মেলেনি এ পর্যন্ত।

এতক্ষণ পরে পারমিতাই প্রথম কথা বলল, 'তবে কি সত্যিসত্যিই বাইরে পালালো!'

বন্দনা কোনো কথা বলল না, শুধু ঘাড় ফিরিয়ে কঠিন দৃষ্টিতে কয়েক পলক ওর দিকে তাকিয়ে থাকলো, ব্যস পারমিতা টাইট, একেবারে এয়ার টাইট, মুখে আর টুঁ শব্দটি নেই। বন্দনার সিদ্ধান্তের ওপরে কথা বলা তার ঠিক হয়নি। বন্দনার চেয়ে ভাল করে সন্তোষ সেনকে কেউ চেনে না। বন্দনা তাকে হাড়ে মাসে চেনে। সন্তোষ হচ্ছে বন্দনার যাকে বলে ফ্রেন্ড, ফিলসফার ভাই অ্যান্ড মুখাপেক্ষী। সন্তোষের ব্যঙ্গচিত্রের কলায় নন্দিনীর ক্যাপশান এটা।

সন্তোষ কি রকম নার্ভাস, কি রকম ভালনারেবল, কোনো কিছুতে স্থির হয়ে থাকতে পারে না, হঠাৎ হঠাৎ মত বদলায়, বন্দনা তা জানে। নিজের অফিস আর বাড়ির বাইরে সে অসহায়। কোথাও বাইরে যাবার কথা হলে মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। আসলে নাম্বার ওয়ান রেল-ভীতু। ট্রেনে চাপতে হবে, স্টেশনে যেতে হবে শুনলেই সন্তোষের আমাশার ভাব হয়। ঘনঘন বাথ-রুমে ছোটে। এ একটা টাইপ! অথচ এই সন্তোষ একবার দু-জন কুখ্যাত গুণ্ডাকে একা শায়েস্তা করেছিল। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা ঘরের মধ্য থেকে ওদের একজন আত্মীয়াকে বের করে নিয়ে এসেছিল নিজের জীবনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে। একটা গোখরো সাপকে স্রেফ রুলকাঠ দিয়ে পিটিয়ে মেরেছিল সেবার চন্দননগরের বাগানবাড়িতে।

আসলে সন্তোষ ডেসপারেট, ডেয়ারিং, সবকিছুই—কিন্তু সে তাৎক্ষণিক, ক্ষণিক লহমার জন্যে। আচমকা যে কোনো পরিস্থিতিতে ফেলে দাও সন্তোষ তার মোকাবিলা করবে, যে কোনো বিপদের বাহ কেটে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু তাকে এক রাত সময় দাও কোনো বিষয়ে ভেবে দেখার, কয়েক ঘণ্টা আগে তাকে কোনো দায়িত্ব বুঝিয়ে দাও, ব্যস সন্তোষের হয়ে গেল। সে তখন ভীতুসা ভীতু, বিলকুল নারাজ, পিছুহটা মানুষ। অতি সামান্য সাহসের কাজও তখন তাকে দিয়ে হবে না। এত জেনেও এই ভুলটাই বন্দনারা করেছে। সন্তোষকে আগে থেকে ইলোপের গল্প শুনিয়েছে কি রকম ঝুঁকি নিয়ে সব কাজগুলো করে যেতে হবে সেই প্ল্যানপ্রোগ্রাম ডিটেইলস ওকে বাতলেছে। তার ফল এই। এটা বন্দনাদের আগে থেকেই ভাবা উচিত ছিল।

যাই হোক, এবার বন্দনার ভুল হবার নয়। সন্তোষ একা কোথাও বাইরে বেরিয়ে পড়বে, দূরে কোথাও গিয়ে দিন দুচার কাটিয়ে আসবে, এ অসম্ভব। সুতরাং রবিবার সকালে মনস্থির করেই সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণের সঙ্গী পাওয়া শক্ত। অতএব সে কলকাতা ছাড়েনি, এই শহরেই কোথাও গা ডুবিয়ে বসে আছে।

অন্ততঃ এ বেলার মধ্যে তার স্টেশন লীভ করা হচ্ছে না। বন্দনা নিশ্চিত।

আরও গুটি তিনেক বাড়িতে হানা দিয়ে বন্দনা যখন ট্যাক্সিতে এসে উঠলো তখন তার চোখেও হতাশা। বোধহয় শেষরক্ষা হল না। কত তদবির করে একমাস আগের ব্যাকডেট দিয়ে ম্যারেজ নোটিশ ইস্যু করিয়ে দিয়েছিলেন চন্দনাদি। আজ খাতায় কলমে বিয়েটা সেরে ফেলতে পারলে মেয়ের পিতৃপক্ষ পাত্রপক্ষ দু তরফকেই ডোন্টকেয়ার, তখন আনুষ্ঠানিক কাজকর্ম অনেকটা নির্ভয়ে সারা যাবে। নইলে অতবড় লোকের বিয়ের অনুষ্ঠান স্যাবোটেজ করা এবং মেয়েকে অপহরণ করে সরিয়ে আনার অপরাধে পুলিশ কেসে ফেঁসে যেতে হবে। কেলেঙ্কারির কেলেঙ্কারি, এবং সেই সঙ্গে মেয়েটির লাইফও হেল হয়ে যাবে, বাঁচানো যাবে না। বন্দনার মুখটা শুকিয়ে গিয়েছিল সেইজন্যে। সেই সন্তোষের সঙ্গে বিয়ের ইনিসিয়েটিভ নিয়েছিল। তারাই বলতে গেলে মানুষটার সর্বনাশ করেছে এখন কলে এসে ভরাডুবি হলে আর মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না।

উত্তেজনা আর হতাশা ছড়িয়ে পড়েছিল সকলের মনের মধ্যেই। ব্যাপারটা এখন আর প্রেস্টিজ ফাইট নয়, কোশ্চেন অব লাইফ অ্যান্ড ডেথ। অথচ সমস্ত ব্যাপারটা এখন যেন আর কোনো মানুষের হাতে নেই। নিয়তি এখন এই ব্যাপারটার গতি নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। সন্তোষকেই এখনো পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া গেল না, পেলেও কি হবে বলা শক্ত। বন্দনা তাকে বাগাতে পারবে কিনা কে জানে। পারমিতা পুরুষালি মেয়ে, ডনা, চঞ্চল ডানপিটে। তবু তারও চোখে যেন জল এসে গিয়েছে। জানুর ওপরে তার হাত দুটো একবার মুষ্টিবদ্ধ হচ্ছে, একবার খুলেছে। শুধু শিখ ড্রাইভারের মুখে কোনো ভাবান্তর নেই। সে কি ভাবছে কেউ জানে না। কতটুকু বুঝেছে তাও অনুমানের বাইরে। তবু কেমন মনে হয়, সেও এই অভিযানের সামিল হয়ে গেছে বুঝি। একটা প্রশ্ন করছে না একবার ঘাড় ফেরাচ্ছে না কারো দিকে, জীবন্ত পুতুলের মত শুধু সজাগ বসে আছে।

স্টিয়ারিং হুইলে। জটিল, শব্দহীন যন্ত্রের মত।'

অনর্গল কলকাতার বিশৃঙ্খল পথ দিয়ে সে যেভাবে তলোয়ারের মত বিদ্যুৎ গতিতে এঁকেবেঁকে পাশ কাটিয়ে, প্রতি মুহূর্তের ঝুঁকি নিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে তাতে তপতীর কেবলই মনে হচ্ছে লোকটা নিছক অটোমোবাইল মন্দ না, তারও একটা প্রমাণ-সাইজের হৃদয় আছে। সেও আজ এই অপারেশনের অংশীদার।

'শালা, যদি ছেলে হতাম, আমিই ওকে বিয়ে করতাম।'

সবাই চমকে তাকালো পারমিতার দিকে। না পারমিতা রসিকতা করেনি, কারো দিকে তার ভ্রূক্ষেপও নেই। এই কথা-ভুলে-যাওয়া ট্যাক্সির খোলের মধ্যে সে যেন একা, হঠাৎ আপন মনে কথাটা বলে উঠল; এটা হাসির কথা নয়। কেউ হাসল না। শুধু বন্দনা পাশে বসে সামনের সীটের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে ওর হাঁটুর ওপর হাত রেখে সস্নেহে একটু চাপ দিল। কেউ কোনো কথা বলল না। ভেতরে ভেতরে যেন অন্তর বিনিময় হয়ে গেল।

'এই শেষ। ছিপুদার বাড়ি দেখা হয়ে গেলেই আমাদের আর কিছু করার থাকবে না।' বন্দনা সামনে রাস্তার দিকে তাকালো। গাড়ি রকেটের মত ছুটে চলেছে। পথের মাঝখানে একটা মন্দিরকে পাশ কাটিয়ে কেওড়ে যাওয়া [illegible] মত গাড়ি বেরিয়ে গেল। মন্দিরের ভেতরটা একনজর দেখা গেল কিন্তু ভেতরটা অন্ধকার আবার, মূর্তি চেনা গেল না। কালী হতে পারেন, শিবলিঙ্গও হতে পারে, কিংবা শীতলা; নন্দিতা হাতজোড় করে কপালে ঠেকালো। অন্যেরাও হয়ত মনে মনে।

ছিপুদা কিন্তু গণেশ চট্টরাজের কস্মিন কালেও নাম নয়। নন্দিতার মনে পড়লো। গণেশদার বয়স হয়েছে, প্রায় পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই। কিন্তু এখনো পঁচিশ বছরের যুবকের মত দৌড় ঝাঁপ করে বেড়ান। হুজুগের শেষ নেই, নেশার জন্যে তাঁর অদেয়ও কিছু নেই। লোকের ছিট থাকে, ওঁরও আছে, একেবারে ছিপপাগল মানুষ। সব সময় যেন বঁড়শি বগলে করে আছেন। দেশ বিদেশের বঁড়শি সুতো আর হুইলছিপের এমন সংগ্রহ কলকাতার শহরে আর কারো আছে কিনা নন্দিতারা জানে না। এই মৎসক্ষ্যাপা মানুষটা কিন্তু ব্যাচেলার নন, রীতিমত সংসারী। কিন্তু সংসারের সঙ্গে তাঁর থোড়াই যোগাযোগ, কাতলার দিকে ছাড়া তাঁর আর কোনো দিকে মনোযোগ নেই। এ নিয়ে সংসারে ক্ষণিক অশান্তি লেগেই আছে, কিন্তু এ গণেশ ওল্টা-বার নয়। তিনি গভীর জলের কারবারী, তিনি শুধু অসূর্যম্পশ্যাদের টোপ গেলাতেই ব্যস্ত। বন্দনা একদিন রগড় করে বলেছিল, আমাদের ছিপুদা, অকৃতদার নন, উনি বিক্রীদার। বউদিকে উনি বেচে দিয়ে বসে আছেন।

রবিবার ছিপুদাকে বাড়িতে পাওয়া যাবে [illegible]। তবু বাড়িতে গেল, কিছু তথ্য সংগ্রহের জন্যে। এই রবিবারে ছিপুদা কোথায় চার ফেলেছেন সেটা জানা প্রয়োজন। এবং সেই সঙ্গে তাঁর সহযাত্রী কারা কারা হয়েছেন যদি জানা যায়।

কিন্তু বউদি মানুষটা ইংরেজিতে যাকে বলে কঠিন বাদাম, তাই। বাতে পঙ্গু প্রায়, অন্তত সেই রকমই ভান করেন। বেশির ভাগ সময়েই খাটে শুয়ে শুয়ে ঝি চাকর ঠাকুর খাটাচ্ছেন। কখনো কখনো মেজাজ মর্জি ভাল থাকলে গুজরাতী কায়দায় ঝোলানো চতুর্দোলায় বসে সুপুরি কাটেন কিংবা মশলাপাতি বাছেন। কখনো কখনো কেসেট সেট ট্রানজিস্টারটা নিয়ে দোল খান। কখনো সাপ্তাহিক কোনো সিনেমা ম্যাগাজিন চাখেন। কিন্তু ছিপুদার সম্পর্কে কিছু জানতে গেলে ঝিনুকটি নট। অনর্গল কথা বলে গেলেও এক লাইন জবাব মিলবে না। মেয়েদের বিশেষ করে সন্দেহের চোখে দেখেন। তাঁর স্বামীর মত একটি নাবালক মানুষকে এইসব নৈসর্গিক ছেনালি থেকে বাঁচানো যেন তাঁর কর্তব্য। মনে মনে হাসে বন্দনা ছিপুদার বিক্রীদার শুধু নয়, বিক্রেদারও বটে।

ছিপুদার অ্যাপার্টমেন্ট বাড়িতে সবাইকে নিয়ে ঢুকে পড়ল বন্দনা।

ভেতরের বারান্দায় বৌদি একলা দোলনায় চেপে উল্টোরথ ওল্টাচ্ছেন আর নির্লিপ্ত ভারতীয় বিজ্ঞাপনে আড় পেতে আছেন। বাড়ি নির্জন। ছিপুদা যেমন জানা গিয়েছিল নেই। ছেলে দুটি নেমন্তন্ন খাওয়ায় কিংবা ম্যাটিনি শোয়ে ঢুকেছে। মেয়ে গান শিখতে গেছে। বৌদি একা। একপাল মেয়েকে কলবল করতে করতে বাড়িতে ঢুকতে দেখে বৌদির বোধ করি পিলে চমকিয়ে গিয়েছিল। হাত থেকে উল্টোরথখানা মাটিতে পড়ে গেল। মেয়ে মাত্রকেই বৌদির মহাভয়।

'কে তোমরা? কী ব্যাপার? অমন হুটোপাটি ঘরের মধ্যে...ওঃ তাই বলো, বন্দনা এলি, তাই বল...'

'তুমি ভেবেছিলে একপাল মেয়েডাকাত এসেছে? না বৌদি হাসি নয়, আজকাল কামেশা মেয়েরা ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে।'

'তা তুইও কিছু কম যাস না মেয়ে। বুঝলে গো তোমরা, ভালকথা, কে যেন তোমরা, বন্দনার মত ডাকাতে মেয়ে আমি চক্ষে দেখিনি।'

'দু চোক্ষে দেখতে পার না তাই বলো।'

'ছি ছি তাই কখনো হয়!' বলেই জিজ্ঞাসু কুটিল চোখে নন্দিতা পারমিতা তপতীর দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

'এই দ্যাখো কি ভুলো মন আমার। যে জন্যে এসেছি', বন্দনা বৌদিকে জিভ ভেঙিয়ে দিল, 'তাই ভুলে গেছি আর এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিতেও ভুলে গেছি। অবিশ্যি এই নন্দিতা চৌধুরীকে তুমি একবার দেখেছ, আলাপও হয়েছিল, তবে পারমিতা দত্ত আর তপতী মিত্রকে আজই প্রথম এবং সম্ভবত শেষ দেখছো—'

শেষ দেখার কথায় কেমন একটু নরম হলেন বৌদি, 'আহা ষাট ষাট মেয়েরা, শেষ কেন?'

হেঁট হয়ে সিনেমা পত্রিকাখানা কুড়োতে গিয়ে চোখ মটকে ইসারা করল বন্দনা, 'ওরা দুজনেই খুব শিগগির ফরেন চলে যাচ্ছে। বঁড়শি শিল্প নিয়ে দুজনেই বিলেতে গিয়ে গবেষণা করবে। তাই ভাবলাম ছিপ... ছি...ছি...ছিপ দেখিয়ে নিয়ে যাই গণেশদার বাড়ি থেকে। মাছ শিকার সম্বন্ধে কিছু মূল্যবান পয়েন্ট-ফয়েন্ট যদি পাওয়া যায়...'

বন্দনা মুখ ফসকে আর একটু হলেই কেলেঙ্কারী করে ফেলেছিল, ছিপ দিয়ে তো চাপা দিলেও বৌদি সন্দিগ্ধ চোখে বন্দনার মুখের সততা পরীক্ষা করলেন কয়েক সেকেণ্ড। তারপর বললেন, 'কিন্তু বড় দুর্দিনে এলে ভাই— তোমার দাদা তো—'

পাশের ঘরে উঁকি মেরে বন্দনা বলল, 'মাছ ধরতে গেছেন তো?'

'তাছাড়া আর কোন চুলোয় যাবেন!' বন্দনার হাত থেকে উল্টোরথ ফেরত নিতে নিতে জানান।

'দেখনা আজ রোববারের বাজার হয়ত মাত করে দেবেন দশ পনের সেরী রুইকে একটা গেঁথে। একাই না সঙ্গী আছে আর কেউ? টিকেট কেটে না কোনো বাগান-বাড়িতে গেছেন, গণেশদা? বড় মাছ পেলে কিন্তু বৌদি আমাকে খবর দেবেন। তাজা মাছ উল্টেপাল্টে খেয়ে যাব।'

গণেশবৌদি লেখাপড়া বিশেষ জানেন না, কিন্তু সূক্ষ্মবুদ্ধি তাঁরও কিছু কম নেই। বটকালাগা চোখে বন্দনার ধোয়া তুলসীপাতা মুখখানা নিরীক্ষণ করলেন। পরে বললেন, 'তোমার দাদার নয়েরই হোক আমাকে বলে গেছে। একাই তো গ্যারাজ থেকে গাড়ি বের করলেন দেখলুম। মেয়ে টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার ভরে দিল—'

'তাহলে বোধ হয় টালিগঞ্জের দিকে—'

'হতে পারে, আশ্চর্য নয়।'

'উঁহু টালিগঞ্জে বোধ হয় না', বন্দনা আপন মনেই বলল, 'এর আগের রোববারেই তো ওদিকে গিয়েছিলেন। এবার আমার মনে হয় মধ্যমগ্রাম, কিংবা বিরাটির বাগান-বাড়িতে—'

বৌদির মুখে চমক, 'না মধ্যমগ্রাম যায়নি বিরাটিও না। বাঁশদ্রোণী নামটাই শুনেছিলাম যেন। কেন তোমরা যাবে নাকি?'

'আপনি কি ক্ষেপেছেন বউদি! আয় কি আর করবি—দাদার আমিষ ঘরখানাই এক নজর তোরা দেখে যা। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে দাদা ছিপ আনিয়েছেন, সুতো আনিয়েছেন, বঁড়শি আনিয়েছেন। মাছ ধরার সমস্ত সরঞ্জাম তোমরা দেখতে পাবে, আর পাবে মৎস্য বিষয়ক দেশবিদেশের বই আর জার্নাল। একটা ওয়ান্ডার—' বন্দনা বোঝায়, 'আর এর পিছনে বৌদির ইনসপিরেশন না থাকলে গণেশদা কখনো অ্যাতোদূর এগোতে পারতেন না। তোমরা যদি ভেবে থাক, বৌদি দাদার ফিশিং হবি একদম লাইক করেন না, তাহলে একটি মারাত্মক ব্লান্ডার করবে—। আসলে বউদি মুখেই ওরকম—'

'তুই থামতো ডেঁপো মেয়ে!' গণেশ-বৌদির মুখটা কিন্তু উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, 'ঘর দেখতে চাস, দেখ। তার জন্যে আর গ্যাস দিতে হবে না।'

দোলা থেকে বৌদি নেমে পড়লেন। একটা পায়ে একটু দোষ আছে, কেমন খুঁড়িয়ে হাঁটেন। চাবি দিয়ে পাশের ঘরটা খুলে দিলেন। ঘরটা সত্যিই দেখার মত করে সাজানো। কিন্তু বন্দনা তা দেখছিল না, সে শুধু স্টক মেলাচ্ছিল। হুইল রাখার র‍্যাক, ছাতার আলনা, ফ্লাস্ক আর টিফিন ক্যারিয়ারের আলমারি তার চোখ হাঁটকে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ ঘরের মাঝখানের সেন্টার টেবিলে অ্যাশট্রের ওপর তার চোখ পড়লো। একটা আধ-খাওয়া চুরুট সেখানে নামানো অনেকটা ছাই লম্বা হয়ে মুখে লেগে আছে। তার পাশেই হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের সান্ডে উইকলিখানা, আজকের তারিখের। বন্দনার চোখ জ্বলে উঠলো। এই চুরুট তার খুব পরিচিত। হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের ম্যাগাজিনখানাও কোথা থেকে এসেছে সে জানে। বড় টিফিন ক্যারিয়ার, দুটো ফ্লাস্ক উধাও হয়েছে, গোটা চারেক ছিপ। সুতরাং উনি একা গেছেন একথা বলার বিশেষ কারণ অবশ্যই আছে।

'দেখলি তো তোরা? চল এবার ফেরা যাক,' বন্দনা বলে, 'বাই দি বাই, একটা টেলিফোন করতে পারি বউদি?'

'কর।' বউদির মুখখানা হঠাৎ কেমন বিস্বাদ হল, 'কিন্তু কলনম্বরটা খাতায় লিখে দিয়ে যেতে ভুলো না। নইলে তোমার দাদা আবার রাগ করেন।'

'থ্যাংক ইউ বৌদি। নিশ্চয় লিখে দিয়ে যাব। আচ্ছা তোরা ততক্ষণ বৌদির সঙ্গে গল্প কর, আমি ফোনটা সেরে নিই।' বন্দনা গণেশবাবুর বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে তপতীকে চোখের ইসারায় ডেকে নিল। বাইরের ঘরের দরজায় ওকে পাহারায় মোতায়েন রেখে ঘরের ভেতরে ঢুকে বন্দনা দ্রুত হাতে ডায়াল ঘোরালো।

'কে, সুষমা? কতক্ষণ? হ্যাঁ সব বলব, দিদিভাইকে দে।'

টেলিফোন কানে ধরে অপেক্ষা করতে করতে একবার ঘুরে তাকালো বন্দনা। চোখের আভাসে গণেশ-বৌদির অবস্থিতি জেনে নিয়ে আবার টেলিফোনে মন দিল। টিপয়ের ওপরের খাতাটা নাড়তে নাড়তে কথা বলল, 'দিদিভাই? সব শুনেছ? সার্পেনটাইন লেন থেকে। হ্যাঁ মনে হচ্ছে পেয়েছি। সকালে ছিপুদার এখানে এসেছিল, একসঙ্গেই বেরিয়ে গেছে। না জানা গেল না। হান্ড্রেড পার্সেন্ট বুঝলি। ছিপুদার ওপরে তিনকাঠি। কিছু স্বীকারই করল না। উনি নাকি একা গেছেন। অথচ আমি ক্লু পেয়েছি। হ্যাঁ শিওর। কথায় কথায় অনুমান হল দমদম বা বিরাটির দিকে কোনো...এই দিদিভাই, দাঁড়া...মনে হচ্ছে পেয়েছি, আচ্ছা ধরে থাক এক সেকেণ্ড' বন্দনা কল-রেকর্ডের খাতার ওপর ঝুঁকে পড়লো। বন্দনার চোখমুখের চেহারা দেখে তপতীর মনে হল লটারীর প্রাইজলিস্টে ওর টিকেটের নম্বর দেখতে পেয়ে গেছে।

'হ্যালো দিদিভাই! পেয়েছি রে, পেয়ে গেছি! ওরা মনে হচ্ছে সন্তোষের বন্ধুর জ্যাঠা বসুচৌধুরীর বাড়িতে, হ্যাঁ মধ্যমগ্রামে, না ভুল নেই, কলবুকে আমি ওর নিজের হাতের লেখা দেখলাম। না না, তার দরকার নেই, আমরাই পারবো। আমি যেমন করে পারি ধরে আনবোই দেখিস। না, ট্যাক্সি ছাড়িনি। এক্ষুনি বেরিয়ে যাচ্ছি, আছে, মার্কেটিং-এর বাকি টাকা তো আমার কাছেই, হ্যাঁ যথেষ্ট। নম্বর, দাঁড়া হ্যাঁ মনে আছে ডাবলিউ বি টি ছয় ছয় নয় নয়, পিকিউলিয়ার তাই না, না ভাল লোক। হ্যাঁ তুই বরং ম্যারেজ অফিসারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা ঘণ্টা তিনেক পিছিয়ে দে, হ্যাঁ সাফিসিয়েন্ট...ও-কে? ছেড়ে দিচ্ছি কিন্তু—'

ফোনটা নামিয়ে রেখে খাতায় নম্বর লিখতে লিখতে বন্দনা নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকালো। তারপর লেখা শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে স্মিতমুখে তপতীকে একচোখ দেখিয়ে দিল মনের আনন্দে।

'ভয় পাস না, তপু। এখন এগারটা বাজতে দশ। উইদিন টেন মিনিটস তুই বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছিস। তার মানে, ওয়ার্ড ইজ ওয়ার্ড, তোকে আর ভোগাবো না। বাবুরাটা বাজার নটা এক ঘন্টা আগেই তোদের বাড়ির দোরগোড়ায় ড্রপ করে দিয়ে আমরা থ্রি মাস্কেটিয়ার্স উত্তমমধ্যমগ্রামের দিকে স্ট্রেট বেরিয়ে যাচ্ছি। কী? অমন করে চেয়ে আছিস কেন? আমাকে জাস্ট দিস মোমেন্ট লেডি শার্লক হোমস মনে হচ্ছে কিনা বল!'

বন্দনার কথা শেষ হতে না হতেই বউদি এসে পড়লেন। তাকে নন্দিতা আর পারমিতা বেশিক্ষণ ভুলিয়ে রাখতে পারেনি।

'কি রে বন্দি, কোথায় এত মনোযোগ দিয়ে টেলিফোন করা হলো!'

বন্দনা গ্রাম্য মেয়ের মত লজ্জিত ভঙ্গি করে বলল, 'যাঃ বউদি, তুমি ভারী অসভ্য।'

'অ্যাঁ, তাহলে ঠিকই ধরেছি? ওরে মেয়ে কলেজে ঢুকেই ডুবে ডুবে জল খেতে শুরু করেছ।' একটা নিঃশ্বাস ফেলে বউদি ফের বলেন, 'তা তোদেরই তো দিন।'

'নিচে হর্ন দিচ্ছে।' নন্দিতা পিছন থেকে বলল।

'কি দিচ্ছে? বৌদি বেতো শরীর নিয়েই নন্দিতার দিকে বোঁ করে ঘুরে গেলেন।

'হর্ন! ট্যাক্সি হর্ন দিচ্ছে।' পারমিতা অস্বাভাবিভাবে হর্ন দেওয়া দেখাচ্ছে। সে ভেতরে ভেতরে ফুলছিল।

বউদি আবার বন্দনার দিকে ফিরলেন, 'তা তোমরা কি ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে'— ওঁর চোখের দৃষ্টি সরু আর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো সন্দেহে।

বন্দনা জিভ কাটলো বউদির দিকে। আসলে ও নির্ঘাত বউদিকে জিভ ভেঙালো।

'ইসস্। ট্যাক্সিটাকে ছেড়ে দিয়ে আসতেই ভুলে গেছি। হাঁ করে দেখাছিস কি, চ, শিগগির চ, মীটারে কত উঠেছে কে জানে! ইসস্, এমন ভুলো মন'—

গতির শূন্যে লহমার জন্যে দাঁড়িয়ে জঙ্গী বিমান যেমন করে প্যারাশুট নামিয়ে দিয়ে যায়, বন্দনাদের ট্যাক্সিটা তেমনি করেই গলির মুখে তপতীকে নামিয়ে দিয়েই চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল। এতক্ষণ তপতী যেন একটা রুদ্ধ নিঃশ্বাস ঘূর্ণির মধ্যে আটকে ছিল, এবার সেই ছুটন্ত চক্র থেকে ছাড়া পেল। তার মাথাটা টলছিল যেন, তখনও ভারসাম্য ফিরে পায়নি দেহটা। প্রকাণ্ড প্যারাশুটের ছাতা মাথায় দিয়ে নিক্ষিপ্ত মানুষটা যেমন করে দোলে দুলে নিচের দিকে নামতে থাকে, নামতে নামতে একসময় কঠিন বাস্তবের ঘা খেয়ে পায়ের তলায় স্থির মাটিকে আবিষ্কার করে, তপতীও তেমনি গলির মুখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নিজের প্রকৃত পরিমণ্ডল খুঁজে পেল।

নিজেকে কেমন ছোট আর অসহায় মনে হল। আষ্টেপৃষ্ঠে সে যেন জালমানুষী দিয়ে বাঁধা আছে। তার চারপাশে নিষেধ আর নিয়ম। কোথাও স্বাধীনতা নেই। তার জগৎ ছোট একটা গণ্ডীর মধ্যে বন্ধ। প্রতিটি পদক্ষেপ মাপা, প্রতিটি কাজ রুটিনমাফিক। বন্দনার মত সে পারে না খুশীমত ছুটে যেতে অনিয়ম করতে, অনিশ্চিত আর উত্তেজনার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে। সে কত ছোট, জীবনের কতটুকু সে জানে? কলকাতার কটা মানুষকে সে জানে, কটা পাড়া সে চেনে, কটা রাস্তার অলিগলি সে দেখেছে? বন্দনার মত ছাতুবাবুর বাজার থেকে হাতীবাগান গিয়ে টিকেট কেটে আনতে পারে।

আজ ওদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত সে তো পারলো না ছুটে যেতে। কেননা মা ভাববে, বাবা চিন্তা করবে। নির্দিষ্ট সময় পার হলে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে যাবে থানায় খবর যাবে, কান্নাকাটি পড়ে যাবে। কারণ তপতীর জলে মাপা জীবন, নির্দিষ্ট জীবন হিসেবের জীবন। তার চারপাশে সন্দ বই আর ঘরের দেওয়াল, রেডিওর শিশুমহল আর অ্যাকোয়ারিয়াম। সে নাকি শান্ত মেয়ে, লক্ষ্মী মেয়ে, ভাল মেয়ে। কিন্তু ভাল মেয়ে হয়ে তপতীর শেষ পর্যন্ত কি লাভ হল।

তপতীর জীবন স্রোত নেই, ঘূর্ণি নেই তাই, মতুনত্ব নেই। এমন মসৃণ এমন স্বচ্ছ জীবন কে জানে হয়ত তারও কাম্য নয়। প্রতিটি দিন ছককাটা, প্রতিটি রাত মাপা টানা। ঘুম থেকে জাগা, জাগরণ থেকে ঘুম—

এই দুটো মলাটের মধ্যে যেন কতকগুলো বছর কতকগুলো সাদা পাতা বেঁধে রাখা হয়েছে। সেই শূন্যপাতায় কিছু লেখা হয়নি। উল্টোপাল্টা বিস্ময়কর আপত্তিকর কিছু যদি লেখা হত তাহলে কি খুব খারাপ হত। কিছু উত্তেজনার পুঁজি, কিছু খাওয়া-পড়া-শোওয়ার জীবনের বাইরের কথা কিছু নিষিদ্ধ অনুভব জমা হলেও তপতীও নিজেকে বিত্তবান মনে করতে পারতো।

তার বাবা, তপতী ভাবলো জমজমাট আড্ডাবোজ মানুষ, কিন্তু সেই ঘরোয়া আড্ডারও একই চেহারা, তাতে গতি আছে কিন্তু সে গতি লাট্টুর মত নিজেকেই কেন্দ্র করে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা যায়, ভালও লাগে, কিন্তু তার স্পীড কাউকে কোথাও নিয়ে যায় না, নিজেকেও না। বাইরে তিনি কাজ তাড়ুয়া মানুষ, সেখানে তিনি আরও আবদ্ধ, আরও ফ্ল্যাট, ডাইমেনশন হারানো ছবির মত কৃত্রিম। টুরে-কনফারেন্সে, ফাইলে আর ইনস্পেকশনে বাঘবন্দী। আর মা এখন শুধু পটেলেখা গোছের শুধু গৃহিণী ড্রয়িংরুম বেডরুমের মাঝখানের কিচেন করিডোর। গল্পেপটেপে ভরা পুরনো মাসিক পত্রিকার সঙ্গেই মাকে মেলানো যায় অলস অবসরের পাতা উল্টে সময় কাটানোর। তপতীও এই জীবনই মকশো করে আসছে, তপতীও একইভাবে বড় হচ্ছে, তপতীও একই ভাবে ফুরিয়ে যাবে। স্কুল ফুরিয়ে গেছে, কলেজও দেখতে দেখতে ফুরোবে, তারপর অনতিবিলম্বে একদিন সানাই বাজবে, উলু পড়বে। এক অন্তরাল থেকে তপতী আর এক অন্তরালে চলে যাবে, তপতীকে আর কেউ দেখতে পাবে না।

মুখের ভেতরটা কেমন তেতো লাগছিল। তপতী আর দাঁড়ালো না, ক্লান্ত পায়ে ধীরে ধীরে বাড়িতে গিয়ে ঢুকলো। রবিবারের সকালেও বাড়িটা কেমন পোড়ো বাড়ির মত নির্জন। সদর বন্ধ করে দিলে কোথাও কোনো শব্দ নেই, নিশ্চুপ। ঠিক নিশ্চুপ নয় বোবা।

দোতলার সিঁড়ির দিকে অন্যমনস্ক পায়ে এগোচ্ছিল, হঠাৎ মায়ের গলা শুনে চমকে গেল।

'মুন্নি শোন।' বৈঠকখানার সোফায় বসে মা রবিবারের কাগজখানা নাড়াচাড়া করছিল, পর্দাটা অনেকখানি টানা থাকায় তপতী মাকে লক্ষ্য করেনি। থমকে দাঁড়িয়ে তপতী অবাক হল। এ সময়ে একতলার বৈঠকখানায় মা কোনোদিন একা বসে থাকে না।

ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসু চোখে মায়ের দিকে তাকালো। সামনে সেন্টার টেবিলের ওপরে দুটো এঁটো কাপ মুখোমুখি বসে আছে। কিছুক্ষণ আগে হয়ত কেউ এসেছিল। অন্যদিন হলে তপতী হৈ-চৈ করে উঠতো মাকে দেখে, সাতটা প্রশ্ন করে বসতো আদুরে গলায় কিন্তু আজ তার মনটা কেমন অবসন্ন। কিছুটা অন্যমনস্ক।

ওকে ডাকার পর মা আবার খবরের কাগজে মাথা নামিয়ে থেমে আছে দেখে শুধু বলল, 'কী?'

'হ্যাঁ', মা কাগজখানাকে মুড়ে সেন্টার টেবিলের নিচের থাকে চালান করে দিতে দিতে ওর দিকে তাকালেন 'টিকিট পেয়েছিস?'

'পেয়েছি।'

'শুধু টিকেট কিনে আনতেই এত দেরি?'

'না। এক জায়গায় গিয়েছিলাম।'

ঈষৎ কাঁপা কঠিন গলায় মা শুধোলেন, কোথায়?'

'বন্দনাদের [illegible]।'

'আর [illegible]?'

'না। হ্যাঁ, ভোল্টুবাবুর স্টুডিয়োতে।'

'ভোল্টুবাবু কে?' ভ্রূ কুঁচকে এক পলক তাকিয়ে নিজেই ফের বললেন, 'ওঃ সেই ক্যামেরাম্যান লোকটা!'

'হ্যাঁ, খোকনদার বন্ধু, ওয়েসিসে আগে'—

'হয়েছে। সেখানে কেন গিয়েছিলে, কি দরকার ছিল তোমার? যাবার আগে কই বলে যাওনি তো আমাকে?' মায়ের গলা থমথমে অপ্রসন্ন।

'হঠাৎ গিয়েছিলাম।' তপতীর গলাও ক্ষুণ্ণ, 'যাবো বলে তো আর বেরোইনি। ফিরছিলাম দেখা হল, ডাকলেন তাই গেলাম। একটুক্ষণের জন্যে। ছাড়লেন না, মিষ্টি খাওয়ালেন কিছুতেই খাব না—

'বেশ করেছ।' তপতীর মা মেয়ের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন, 'বসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

'কাপড় ছাড়বো না?'

'তাড়া নেই। বসতে বললাম, বসো।'

অভিমানে তপতীর চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল। সে একটু শব্দ করেই সোফার ওপরে বসে পড়ল। তার মনে হল, এই মা এখন অন্য মা। তার সৎ মা। বরফের মত ঠাণ্ডা এবং কঠিন। গলার স্বর, কথার ভঙ্গি, সব কেমন আচমকা বদলে ফেলেছেন। তপতীর মা এই রকমই। বরং কখনো কখনো আরও বেশী নিষ্ঠুর। বাবার সঙ্গে মায়ের দু-একটা সেরকম দৃশ্য তপতীর চোখে কানে এসেছে। মায়ের সেই দীর্ঘমেয়াদী কোল্ড-নেস বাবাও ভয় করেন, এড়িয়ে চলেন সাধ্যমত।

'এই তোমার সভ্যতা শেখার বয়স, বাপের কাছে তো কিছুই শিখলে না।'

এবার যেন শুধু অভিমান নয়, তাপ জমছিল তপতীর মনের ভেতরে। কি ভেবেছে তাকে মা? কচি খুকি না,, কাণ্ডজ্ঞানহীন শিশু? কি অপরাধই বা হয়েছে তার। বেলা গড়িয়ে বাড়িতে ফেরেনি, কলেজ কামাই করেনি। রবিবারের সকাল, এখন মাত্র এগারটা বেজে তের, তাও দেওয়ালঘড়িটা ফাস্ট আছে মিনিট পাঁচেক। হ্যাঁ, ঠিক পাঁচ মিনিট। নিজের হাতঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পেল। তা তুমিই তো পাঠিয়েছিলে সিনেমার টিকেট কাটতে, আমি তো আর যেচে যেতে চাইনি। হঠাৎ বিদ্যুতচমকের মত একটা আশঙ্কা তপতীর মনের মধ্যে খেলে গেল। তার লুকিয়ে রাখা চিঠিখানা মায়ের হাতে পড়েনি তো! অবশ্য মায়ের ওরকম স্বভাব নেই। তার ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র ঘাটে না মা। শুধু আজ বলে নয়, কোনদিন

থেকে তার শোবার ঘর আলাদা করে দিয়েছে সেদিন থেকেই ওইটুকু স্বাধীনতার মর্যাদা তাকে মা দিয়েছে। তার- তোরঙ্গ-দেরাজ-এ কখনো ভুলেও হাত দেয়নি, বা উঁকি মারতে আসেনি। না ডেকে ঘরে ঢোকেনি। হয়ত তাকে শিক্ষা দেবার জন্যেই, হয়ত সত্যিই মা এটাকে অনধিকার প্রবেশ, অনধিকার চর্চা মনে করে।

তবু বলা যায় না। তার হালের হালচাল লক্ষ্য করে যদি সন্দেহ জেগে থাকে। সন্দেহের বশবর্তী হয়ে যদি মা ঘরে ঢুকে কিছু খুঁজে পেতে দেখে থাকে। ডায়েরী? না, ডায়েরীতে সে স্পষ্ট করে এ বিষয়ে কিছু লেখেনি। যা লিখেছে তা পড়ে কেউ কিছু অনুমান করতে পারবে না। কিন্তু চিঠিগুলো হাতে পড়ে থাকে যদি, যদি কেন, বোধহয় তাই পড়েছে। নিশ্চয়ই! নইলে এই সামান্য সময়ের মধ্যে প্রায় অকারণে মায়ের এমন অপ্রসন্ন আর কঠিন হবার কথা নয়।

ফ্যাকাসে মুখ তুলে তপতী ভয়ে ভয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকালো। ভয় এবং লজ্জা। কান ঘাড় পিঠ কেমন জ্বালা করছিল। মায়ের মুখ দেখে কিছু বোঝা গেল না।

'ও এসেছিল।' মা আচমকা বলে ফেলল।

তপতীর বুকের ভেতর যেন একটা পেটা ঘণ্টা নিঃশব্দে ঝোলানো ছিল আচমকা তাতে এক ঘা হাতুড়ি পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা হেঁট করল ও।

সে কি! তপতীর মাথাটা ঘুরে গেল যেন। এরকম সম্ভাবনার কথা কখনো মনে হয়নি ওর চিঠি পড়ে। অবশ্য আজ কয়েক-দিন যাবত চিঠি নেই। এই নীরবতা অস্বাভাবিক লাগছিল তার। কেন জানি না আশঙ্কিত হচ্ছিল মনের মধ্যে। শান্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলতে কি! তবে কি সোজা দেখা করতে এসেছিল? মাকে ওর পরিচয় দিয়েছে নিশ্চয়! না কি ওই ছেলেটাই? ওকে দেখলে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট ছাড়া কিছু ভাবা যায় না। হয়ত এম-এর সঙ্গে ল-টাও পড়ছে। হয়ত লীভ ভেকেন্সিতে টেম্পোরারী ঢুকেছে শখ করে। হয়ত তপতীকে কোনো সূত্রে চিনতো, তাই তপতীর জন্যেই এ পোস্টাপিসে কাজটা নিয়েছে। ও হতেই পারে। কারণ কাল এমন একটা জিনিস আবিষ্কার করেছে তপতী—

'ওকে তুমি এ বাড়িতে আসতে বলেছিলে?'

'আমি!' তপতী মায়ের মুখের দিকে তাকাতে পারে না, শুকনো মোছা মোছা গলায় বলে, 'আমার সঙ্গে ওর দেখাই হয়নি!'

'মিথ্যে বলতেও শিখেছ? সেদিন ছাদে দাঁড়িয়ে তোমরা গল্প করেছ ও বলল।'

'আমি!' তপতী যেন ন্যাড়া ছাদের একেবারে কিনারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল খেয়াল না করে।

'ওরকম ছেলের সঙ্গে মেলামেশা আমি পছন্দ করি না। মনে থাকবে?'

বাব্বাঃ মনে আবার থাকবে না। খুব থাকবে। তপতী তার বাবার বলা কথাটাই ঘুরিয়ে মনের মধ্যে উচ্চারণ করল, ভেরী ন্যারোলী এসকেপড! বাইরে ঘাড় নেড়ে তপতী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এইবার উঠবে কিনা ভাবছে এমন সময় আবার মায়ের গলা শুনে তপতী মুখ তুলে তাকাল।

'হ্যাঁ ভাল কথা, গড়িয়ার পুনুর সম্বন্ধে একটু সাবধান থাকবে। তুমি বোধ হয় জানো না ও কোন দলে আছে! তোমার অবশ্য জানবার কথা নয়, ও নিজে হাতে দু-তিনটে মার্ডার করেছে।'

তপতী মায়ের মুখের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়েই থাকলো। সে ব্যাপারটা ধরতে পারছিল না। মা কি করে পুনুর খবর পেয়ে গেল? কেউ কি লাগিয়েছে মায়ের কাছে এসে।

তপতীর মুখ দেখে মা কি ভাবলেন বোঝা গেল না, তবে মায়ের মন যে আবার নরম হয়েছে তা অনুমান করতে অসুবিধে হল না। মা যখন সহজ, বেশীর ভাগ সময়ই মা অত্যন্ত সহজ, তখন ওকে তুমি বলে না, তুই সম্বোধন করে।

'অবিশ্যি মনে হয় না তোকে জ্বালাবে। আজ যা আচ্ছা করে শুনিয়েছি, যদি মানুষ হয় এ বাড়ীমুখো আর কখনো হবে না।' মা থেকে কি সব ভাবল, তারপর বলল, 'ছোঁড়াটার নিশ্চয় কোন মতলব ছিল। কিন্তু আমাদের অ্যাড্রেস কোত্থেকে জোটালো সেইটেই চিন্তার কথা। সেদিন নীচে থেকে মাসি মাসি বলে চেঁচাচ্ছিল। কারেন্ট ছিল না, হয়ত কিছুক্ষণ কলিং বেলও টিপেছে। আমি ডাক শুনে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়েই চমকে গেলাম। একেবারে ভাবতেও পারিনি কিনা। না চেনার ভান করে বাড়ী নেই বলে জানলা বন্ধ করে দিলাম। তুই তখন বাথরুমে ছিলি।'

তপতী কথা বলতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল, মা একখানা আস্ত ছুরি তার বুকে বসিয়ে দিয়েছে ভুল করে। বুকের ভেতরে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। হাঁ করে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া তার কিছু করার ছিল না। বেচারা পুনু। ও যে কত দুঃখী, আঘাতে আঘাতে ও যে কি রকম চুরমার হয়ে গেছে কেউ জানলো না। সকলে ওকে গুণ্ডা ভাবে, খুনী ভাবে, বিপজ্জনক ভাবে। ওকে দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয়, কপাট বন্ধ করে দেয়। কিন্তু ও যে পথ খুঁজছে, ও যে বাঁচতে চাইছে কেউ জানে না। আঃ পুনু তুই আমাকে ক্ষমা করিস পুনু, তুই ঠিক এসেছিলি তিনের একের বি-র কলিং বেল ছুঁয়ে কথা রেখে গেছিস, অথচ এই কদিন আমি তোকে মনে মনে মিথ্যে দোষী করেছি, ভুল বুঝেছি। মায়ের হয়ে আমি তোর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। ক্ষমা করিস ভাই।

'মনে পড়ছে না ছেলেটাকে?' মা তপতীর দিকে ঝুঁকে বসে বলল, 'গড়িয়ায় আমাদের পাড়ায় সেই নারকোল গাছ-অলা টিনের বাড়ীতে থাকতো। ছেলেবেলায় তোর সঙ্গে খুব ভাব ছিল। ফর্সা পুতুল-পুতুল চেহারা ছিল এখন একদম চোয়াড়ে, দেখলেই মনে হবে ওয়াগন ব্রেকার কিম্বা ঐ ধরনের কিছু। কথাবার্তাও কাটা কাটা, চোয়াড়ে ধরনের। তা উপযুক্ত শাস্তিও পেয়েছে। মজুমদার-বৌদির সঙ্গে সেদিন কালীঘাটে দেখা হয়েছিল, উনিই বললেন। পুনুর মা এখন বদ্ধ পাগল, দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে বাড়ীতে। ছোট ছেলে বলুকে কারা মায়ের সামনেই দু টুকরো করে দিয়ে গিয়েছিল। ভাবলে অবিশ্যি কষ্টও হয় —মায়ের প্রাণ তো।'

তপতী আর পারছিল না, উঠে দাঁড়িয়েছিল। এখানে বসে থাকলে তার দম বন্ধ হয়ে আসবে। মা-ও উঠে পড়লেন 'যা, ভয়ের কিছু নেই। যা বলার আমি বলেছি। রাস্তায় দেখা হলে কথা বলিস না তাহলেই হবে। তবে মনে হয় না, আজকের ঘটনার পর..যা এবার স্নানটান করে নে।'

তপতী প্রায় ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

* * *

ওপরে গিয়ে তপতী নিজের ঘরে খিল দিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকলো কিছুক্ষণ।

এ বাড়ীর সব কিছু তার ছোট লাগছিল, আরও ছোট। নিজেকে এই প্রথম আলাদা মনে হল। বাড়ীর কারো সঙ্গে যেন তার আত্মিক যোগ নেই। তার শিকড় যেন আলগা।

মায়ের সঙ্গে একটু আগের ছোট্ট সাক্ষাৎকার তার চিরদিন মনে থাকবে। মা, তার এত আপনার মাকেও কেমন অচেনা লেগেছে। মা এত চাপা, মা এত নিষ্ঠুর মা এত অন্ধ কেন?

পুনু তার কেউ নয়, পুনুর পক্ষ নিয়ে সে ওকালতী করছে না। সেদিন পথে দেখা না হলে তার কথা ধীরে ধীরে ভুলেই যেত। অতি কদাচিৎ কখনো হয়ত বাল্যস্মৃতির অনেক ভিড়ের মধ্যে একটি দুর্বোধ্য কিশোরের মুখ ভেসে উঠতো। কিন্তু সে পলকের জন্যেই।

সেদিন রাস্তায় দেখা হয়ে যাওয়ার পর পুনুকে নতুন করে আবিষ্কার করেছে। এই বিরাট পৃথিবীতে তার মতই পুনুও একা। কিন্তু পিছু হটতে হটতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলেও পুনু কারো কাছে মাথা নোয়ায় নি। সে মার খেয়ে যাচ্ছে। হাড় ভেঙে গেছে, কিন্তু হয়ত এখনো হেরে যায় নি। তাকে কেউ না বুঝুক তপতী বুঝেছে। তপতী যে বুঝেছে সেকথা বুঝি পুনুও বুঝেছিল। বুঝেছিল তাই দুবার করে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। কিন্তু মা আশ্চর্য এমন ব্যবহার করল ওর সঙ্গে, অপমান করে তাড়িয়ে দিল।

তপতীর বুকের ভেতরটা কেমন খাঁ খাঁ করছিল।

আশ্চর্য মায়ের ব্যবহার। সেদিন যে পুনু এসেছিল ঘুণাক্ষরেও কই তপতীকে বলে নি তো মা। বললে কি ক্ষতি হত? একবার দেখা হলেই বা এ বাড়ীর কি ক্ষতি হতো?

তপতী হঠাৎ বালিশে মুখ চেপে কাঁদতে লাগলো।

বন্দনারা এল না।

কাল ওদের যা গেছে, আজ আসতে পারবে খুবই সন্দেহ ছিল তপতীর। কাল শেষ পর্যন্ত কি হল কে জানে। গণ্ডগোল কদ্দুর পর্যন্ত গড়ালো শেষ রক্ষা হলো কিনা শেষ পর্যন্ত বলা শক্ত। যা ঝোঁকের মাথায় কাজ করে মেয়েগুলো, যে রকম বেপরোয়া ডানপিটে তপতীর ভয়ই করে। তবে ওদের দলটা বিরাট এবং বহু কানেকশন আছে। বন্দনারাই তো সাত বোন ভাই নেই যদিও। কিন্তু প্রত্যেকেই চোখে পড়ার মত। বিশেষ করে চন্দনাদিকে ভুলতে পারে না। অমন টল ফিগার, অথন পার্সোন্যালিটি অমন মধুর ব্যবহার রেয়ার। ওদের বাড়ীতে গেলে সামান্য দু-চারটে কথা হয়েছে কখনো কিন্তু তাতেই মনে গেঁথে আছেন।

শ্রীলতার জন্যে কষ্ট হচ্ছিল তপতীর, যদিও মেয়েটিকে চোখেও দেখে নি সে শুধু গল্পই শুনেছে। আর মজা লাগছিল, রিয়্যাল গোবেচারা সন্তোষ সেনের এপিসোডটা ভেবে। কাল মায়ের সঙ্গে সিনেমা দেখতে বসেও ওদের কথাই ভেবেছে অবুলো। নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়েও। কালও অনেক রাত অবধি ঘুম আসে নি। ভবদা আবার কাল খুব জ্বালিয়েছে। কোথা থেকে এক জোড়া সেগুনের বল লাগানো খড়ম কিনে এনেছে। সেইটে পরে রাতে অন্তত দশবার ছাতে উঠেছে নেমেছে, পায়চারী করেছে। পায়চারি করার জায়গাটা আবার ঠিক তপতীর ঘরের ওপরের ছাদটুকুতে।

প্রথম দিন তো ভয় পেয়েই গিয়েছিল। মাঝ রাতে ছাদের ওপর খড়ম পায়ে কেউ চলে বেড়ালে যার কথা ফার্স্ট রাউণ্ডেই মনে পড়ে তিনি বিখ্যাত ব্রহ্মদৈত্য। ধবধবে ফর্সা নধরকান্তি, পোর্টফোলিওর মত পেটের কাছে বেশ সংরক্ষিত একটা ভুঁড়ি, খালি গায়ে বেলের আটা দিয়ে মাজা এক গাছা মজবুত পৈতে। আজ দিনের আলোয় এমন মজাদার ভাবনা এলেও কাল বেশ কিছুক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে শুয়ে ছিল।

পরে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ আর একটা চেনা ক্লাসিক্যাল গানের রমরমে মহড়া শুনেই খড়মবাহন নায়ককে চিনে ফেলেছে। সত্যি ভবদা ইদানীং তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। নিছক ক্ষ্যাপা বলে তাকে রিজেকট করা যাচ্ছে না।

বই খাতা গুছিয়ে নিয়ে নিচে নামতে নামতে তপতীর কেমন কষ্ট হল। প্রায় সপ্তাহ পুরে এল, কিন্তু চিঠি আর এল না। এই মুহূর্তে যদি কলিং বেলটা একবিন্দু শব্দ করে বেজে উঠতো? আঃ, বুকের ভেতর কেমন ধক করে উঠল। কবে যেন ওয়েসিসে সেই সৌখিন পিওনটাকে আড্ডা দিতে দেখেছিল ভাবতে চেষ্টা করলো। মনে পড়ল না এই মুহূর্তে। কাল সকাল থেকে এত ঘটনা ঘটেছে যে সব কিছু যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

চিঠির বাকসটার ভেতর অবধি দেখা যাচ্ছিল কাচের পকেট দিয়ে। তবু একবার

[illegible] তপতী। না, একেবারে [illegible] আছে ব্যাপারটা। বুকের ভেতরে কেমন যেন [illegible] হতে [illegible]। [illegible] আশা করেছিল এই কদিনে একখানা চিঠি অন্তত আসবেই। গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে পর্দার মধ্যে [illegible] দোকানে ওয়েসিসের ভেতরটা একবার চোখ চালিয়ে নিল। মনের মধ্যে হয়ত একটা ক্ষীণ আশা ছিল পল্লব যদি থাকে। নেই।

খোকনদারা এখন আর ওখানে বসে না। এখন ওখানে নেকস্ট জেনারেশনের আড্ডা তারাই পাড়ার উঠতি মস্তান। ঠিক যেন সিংহাসনের উত্তরাধিকার। রকেই বলো আর চায়ের দোকানেই বলো একই ব্যাপার। এক দল আসে রাজত্ব করে আবার চলে যায়। আবার নিউ ব্লড নিউ থট, নিউ ফেস। পাড়ায় দেখছে। এখানে পাড়ায় পাড়ায় দেখছে। যেন অলিখিত নিয়ম। একেবারে স্ট্যাম্পড কাগজে মর্মে মর্মে সই করা।

আজ কেউ নেই ওয়েসিসে। কেবল মালিক ক্যাশবাক্স আগলে বসে ঘামাচি মারছে। আর এক কোণে এপাড়ার উঠতি নাট্যপরিচালক কুমারীদা দুটি মেয়ের সঙ্গে গল্প করছেন, হাতে ফাইল। আচ্ছা, তপতী ভাবলো, মস্তান কথাটা এলো কোত্থেকে? মস্ত থেকে মস্তান এসেছে? হাতি অনেক সময় মস্ত হয়, বইতে পড়েছে। তাদের সেই নিঃসঙ্গ ক্ষিপ্ত অবস্থার সঙ্গে কি কোনো মিল আছে এই মস্তানদের?

পাশের গলির রকটা এসে পড়েছিল। বুকের ভেতরটা আবার কেমন ধক্ করে উঠল। নাঃ হার্টটা বোধ করি উইক হয়ে গেছে। একটুতেই আজকাল এমন চমকে ওঠে, বুকের ভেতরটা এমন লাফাতে থাকে যে সামলাতে সময় লাগে। সেদিন এখানেই, ওই রকেই পল্লব বসেছিল। তপতী সেদিন দেখতে পায়নি। আজ কাছে গিয়ে ঠিক দেখে নেবে ও আছে কিনা। কিন্তু থাকবে কি!

এক দঙ্গল ছেলে রকের ওপর মৌরসী-পাট্টা জমিয়ে হিন্দী গানা ভাঁজছিল আর সিগারেট ফুঁকছিল। কেউ একজন জোরালো গলায় শিস্ বাজিয়ে চলেছিল এবং আর একজন লাইব্রেরীর বইয়ের বাঁধানো মলাটে তবলার ঠেকা দিয়ে চলেছিল। কিন্তু কাছে গিয়ে আর চোখ তুলে দেখা হল না তপতীর। রকের কাছে পৌঁছোবার আগেই সব গান-বাজনা হঠাৎ থেমে গেল। কেউ চাপা গলায় বলল, এই বল্টা, সেই রোমান্টিক মহিলা!

সঙ্গে সঙ্গে নিঃশ্বাস বন্ধ নীরবতা। কথাটা যে তাকে লক্ষ্য করে তপতী চোখ না তুলেও বুঝতে পারলো। মুখচোখ গরম হয়ে উঠেছিল, পায়ের চাল দ্রুত করে দিল তপতী। পল্লব নিশ্চয় নেই দলের মধ্যে। থাকলে এধরনের মন্তব্য হতো না নিশ্চয়ই, ওই থামিয়ে দিত। সেদিন কেউ টিটকিরি করেনি। কিন্তু পল্লব কি হল? দেখা করবে বলেছিল কিন্তু কই কদিনের মধ্যে তার সময়ই হল না। অথচ এত কাছেই রয়েছে। বুকের মধ্যে আবার সেই পুরোনো

কষ্টটা ফিরে আসছিল এমন সময় রকে নতুন গানের কলি শোনা গেল: তোলো তোলো ওমুখো তোলো কেন লাজে নীরব হলে—

তপতীর ইচ্ছে হল শুধু মুখ নয় জুতোও তোলে পা থেকে, খুলে নিয়ে। যেমন রোগ তেমন দাওয়াই, যেমন কুকুর তেমন মুগুর প্রয়োজন। কিন্তু তপতীর মা তপতীকে সাবধান করে দিয়েছে। পথঘাট দিনকাল ভাল না। কোনো দিকে তাকাবে না, কোনো কথা গায়ে মাখবে না, সোজা যাবে, সোজা আসবে। মন্দ মানুষ চিরকালই গায়ে পড়ে গণ্ডগোল পাকাতে আসবে, কিন্তু তাদের ইগনোর করাই সবচেয়ে উপযুক্ত জবাব। একদিন দুদিন তিনদিন খুড়জোর, তারপরে দেখবি নিজেরাই থেমে গেছে। তা ঠিক উত্তেজিত হলেই মানুষ আরও পেয়ে বসে। তপতী ভাবল। ভাবতে ভাবতে রক পার হয়ে গেল, হাসি টিটকিরি গান পিছনে মুছে গেল। তপতী হনহনিয়ে যেমন হাঁটছিল, তেমনি হেঁটেই চলল।

একটু পরেই তপতী আবার চিন্তিত হল। একজোড়া জুতোর শব্দ যেন পিছন পিছন আসছে, দ্রুত, প্রায় পাল্লা দিয়ে। যেন তাকে ধরে ফেলতে চায়, নয়ত তাকে ওভারটেক করে এগিয়ে যেতে চায়।

'আপনার চিঠি ছিল।'

তপতী একেবারে চমকে গেল। কথাটা তাকেই নিশ্চয়। থেমে, পাশ ফিরে তাকালো। এবং যাকে মুহূর্তের জন্যেও কল্পনা করে নি, সেই! সেই লম্বা পিওনটা, আজকে আবার টেরিলিন হাঁকিয়েছে। চোখে গগলস।

'বেয়ারিং?' তপতী স্বাভাবিক গলায় কথা বলতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল বুকের ভেতরের পিংপং বলটা অবাধ্যের মত আবার লাফাতে শুরু করেছে। খামখানা হাতে করে পিওনটা কেমন হাসল, 'না, বেয়ারিং করতে ভুলে গেছেন বোধহয়।'

লোকটার স্পর্ধা সত্যিই অবাক করে দেয়। তপতী খামখানা হাতে নিতে নিতে কটমটিয়ে তাকালো, 'আপনি অনেক দূরে যাচ্ছেন।'

একখানাই চিঠি ছিল লোকটার হাতে। সেখানা ডেলিভারী দিয়ে সে যেন মুক্তি পেল। তপতীর চাউনি সে ভ্রূক্ষেপই করলো না। কথাটার অর্থ বুঝলো কিনা কে জানে। অত্যন্ত ভালমানুষের মত মুখ করে বলল, 'তা হ্যাঁ খানিকটা দূরে নিশ্চয়ই। এই আপনার হেদো পর্যন্ত যাবো, চলুন এক-সঙ্গেই যাওয়া যাক।'

রাগে বিরক্তিতে মুখ-নাক লাল হয়ে গেল পলকে। কী বলবে, কিছু একটা বলবে আচ্ছা করে কিন্তু ভেবে না পেয়ে শেষে কর্কশ গলায় বলল, 'আমি কলেজ যাচ্ছি বুঝেছেন?'

'হ্যাঁ, আমি জানি।' লোকটা হাসল, নির্লজ্জের বেহদ্দ, গণ্ডারের চামড়া ছাড়া মানুষ এমন বেহায়া হতে পারে না 'আজ

ওনারা এলেন না? খাম্বার ফোর ফরটি সেভেন্ট এক একটি!'

চিঠিটা হাতে পাবার পর তপতী দাঁড়ায় নি, হাঁটা দিয়েছিল। লোকটিও নাছোড়। সত্যিই পাশাপাশি আসছে। যেন কতকালের ফ্রেন্ডশীপ। কেউ দেখলে কি ভাববে ছিঃ ছিঃ। সনাতনীরা দেখে ফেললে ভাববে তপতী এরই মধ্যে জুটিয়েছে। চুটিয়ে প্রেম করছে রাস্তায় রাস্তায়। রঙ ফলিয়ে বলেও বেড়াবে। প্রেম করতে বয়েই গেছে আমার। তপতী ভাবল, আমি তেমন মেয়ে না। তোরা কলেজে ঢুকে ওরকম হয়ে গেছিস, সব কিছুর মধ্যেই রঙ দেখতে পাস।

একটা স্টেশনারী দোকান দেখে দাঁড়িয়ে পড়লো তপতী। যেন হঠাৎ কিছু কেনার কথা মনে পড়েছে। আসলে লোকটাকে কাটাতে। কিন্তু কি কিনবে ভেবে না পেয়ে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে খাঁরেসখেশ পয়সা বের করতে করতে আড় চোখে দেখলো লোকটিও দাঁড়িয়েছে তার পিছনে এসে। তপতীর পিত্তি জ্বলে গেল। গায়ে পড়া পুরুষ সহ্য করা যায় না।

'আপনার কী চাই?' মারমুখো তপতী ঘুরে দাঁড়ালো এবার।

'না, না, আপনি কেন, সে আমি নিজেই কিনবো?' বিগলিত মুখভঙ্গি করে তাকাল।

'হ্যাঁ তাই কিনুন।' বেশ ঝাঁজের সঙ্গে তপতী কথা বলেই আর দাঁড়ালো না, জিনিসও কিনলো না, পেভমেন্টের ওপরে রাগী রাগী পা ফেলে হাঁটতে শুরু করল। বেশ কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো লোকটা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তখনো।

• • •

পাশের মেয়েটির আঙুলের খোঁচা খেয়ে তপতীর ঘুম ভেঙে গেল।

অন্যমনস্কতার [illegible] জেগে জেগেই ঘুমোচ্ছিল সে।

'এই ফিফটি এইট দাঁড়া, স্যার তোকে ডাকছেন।'

তপতীর দৃষ্টি স্পষ্ট হল। প্রফেসার লেকচার থামিয়ে ওর দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। পাশে ডায়াসের নিচে বেয়ারা দাঁড়িয়ে আছে। হাতের চিরকুটে চোখ বুলিয়ে প্রফেসর বললেন, 'রোল ফিফটি-এইট, তপতী মিশ্র তোমার নাম?'

তপতী থড়বড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঘাড় নাড়লো।

'এক্ষুনি অফিসে যাও। তোমার বাড়ি থেকে ডাকতে এসেছে।'

বাড়ি থেকে ডাকতে এসেছে! বোঁ করে ঘুরে গেল তপতীর মাথাটা।

কোনো খারাপ খবর নয় তো? আজ সকালে মায়ের শরীরটা যেন খারাপ দেখে এসেছিল। তবে কি মায়ের শরীরই বেশী খারাপ হলো? আজকাল হার্টের তো বয়স বিচার নেই, মেয়েপুরুষ ভেদ নেই, যে-কেউ যেকোনো সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হচ্ছে—!

কিংবা যদি অন্য কিছু হয়? তার বাবা আজ গৌহাটি রওনা হয়ে গেছেন প্লেনে করে। মোস্ট আনফেইথফুল ভেহিকল—বাবাই একদিন বলেছিলেন কথাটা। ছেলেবেলার একটা স্মৃতি শিউরে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। সকালবেলার কাগজে সেদিন একটা বিধ্বস্ত এরোপ্লেনের ছবি বেরিয়ে গোটা বাড়িকে কেমন নিথর করে দিয়েছিল, আজও মনে আছে।

দমদেওয়া পুতুলের মত নিষ্প্রাণ ভঙ্গিতে তপতী অফিসঘরের বারান্দায় এসে মা কিংবা ভবদা কাউকেই দেখতে পেল না। শুধু বন্দনা গম্ভীর মুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। ওকে দেখতে পেয়েই চোখের ইসারায় বাইরে ডাকলো। বাইরে হেদুয়ার দিকে একটা কালো অ্যামবাসাডার পার্ক করা ছিল। বন্দনা এগিয়ে গিয়ে গাড়ির দরজা খুলে ধরলো, 'ভেতরে গিয়ে বোস।'

ভেতরে আগে থেকেই তিনটি মূর্তি থমথমে মুখে বসেছিল। তারা নন্দিতা, পারমিতা, সুষমা। সমস্ত আবহাওয়াটাই এমন অস্বাভাবিক যে তপতীর জিভ শুকিয়ে কাঠ। বুকের ভেতরে যেন ঢেঁকির পাড় পড়তে লাগলো। পারমিতা আর নন্দিতাকে কখনো এভাবে বোবার মত বসে থাকতে দেখেনি। ওরা কেউ তপতীর মুখের দিকে তাকাচ্ছে না, তপতী টের পেল।

পা দুখানা থরথর করে কাঁপছিল, কোনোরকমে গুটি গুটি ভেতরে গিয়ে বসল। দরজা বন্ধ করে দিয়ে বন্দনা শোফারের পাশে গিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'পার্ক স্ট্রীট।'

গাড়ি সঙ্গে সঙ্গে গড়াতে শুরু করল। শুকনো গলায় তপতী শুধোয়, 'পার্ক স্ট্রীটে কেন যাচ্ছ?

গাড়ির ভেতরে যেন হঠাৎ হাসির বোমা ফাটলো, যেন অনেকগুলো নানা জাতের পাখি একসঙ্গে ডানা মেলে উড়ে পালাবার চেষ্টা করল। এতক্ষণের ছদ্মগাম্ভীর্য ছিঁড়ে ফেলে পারমিতা আর নন্দিতা এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে লুটিয়ে লুটিয়ে হাসতে লাগলো। হাসির তোড় একটু ধরলে বন্দনা বলল, 'আজ হচ্ছে আমাদের বিজয়া, মানে বিজয়োৎসব। পার্ক স্ট্রীটের উঁচু রেস্তরায় একটু ফুর্তিফাত্তা করতে যাচ্ছি।'

'এই গাড়ি পারমিতার জামাইবাবুর' নন্দিতা বলল, 'বেলা তিনটে পর্যন্ত আমাদের কব্জায় ছেড়ে দিয়েছেন।'

ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল তপতীর কিন্তু নার্ভের অবস্থা, বুকের ঢিবঢিব স্বাভাবিক হতে সময় লাগলো। দম ফুরনো গলায় ও প্রশ্ন করল, 'কাল পেলি গণেশবাবুকে ওখানে?'

বন্দনা ওস্তাদের হাসি হাসলো, 'কার্তিক গণেশ দুজনকেই ধরলাম। চার ফেলে বসেছিলেন জানেন না নিজেরাই বঁড়শিতে গেঁথে আছেন। গিয়ে সেন্টু সন্তোষের কলার ধরলাম।''

'ওঃ বন্দনার সে মারমুখো মূর্তি যদি দেখতিস,' নন্দিতা হাসির ধাক্কা সামলাতে সামলাতে বলে, 'দুই মৎস্য শিকারীরই পিলে চমকে গিয়েছিল দেখে। তার ওপরে পারমিতা এমন ক্ষেপচুরিয়াস হয়ে উঠেছিল যে গোবেচারা সন্তোষ সেনের লেজেগোবরে অবস্থা। ওকে ডিফেন্স দিতে গণেশচন্দর এবং রায়বাহাদুরের নাতি প্রত্যুষকান্তি যাহা মুখ খুলেছিল অমনি বন্দনা একখানা ফোটো ওঁদের নাকের ডগায় ছুঁড়ে দিয়ে একেবারে বেয়োনেট চার্জ করে বসল, আপনারা কি চান এ মেয়ে এই বয়সে বিধবা হোক? আপনারা গ্যারান্টি দিতে পারেন ওই মিয়োনো ছোকরার এর ধারেকাছে যেতে পারে এমন মেয়ে জুটবে কোনোদিন? বর্ণ-দামড়া সন্তোষকে লাইফভর শুধু পরের বিয়ে বাড়িতে শালপাতা চিবিয়ে বেড়াতে হবে দেখে নেবেন! এমনিধারা একের পর এক পয়েন্ট তুলে বন্দনা ওদের একেবারে স্ম্যাসড করে দিয়েছে। ওঃ তপু আর সুষমা যদি সে সীনে থাকতিস'—নন্দিতা স্মৃতিচারণ করে হাসতে থাকে।

'সন্তোষ ব্যাটার বি-কমপ্লেকস শালা, তবু কি ফুটো হবার জিনিস! ওঃ বি-কমপ্লেকসই জানিস না?' পারমিতাকে নাইস দেখাচ্ছিল, 'তুই মাইরী সিসু, সিসু। বিয়ের কমপ্লেকসকে বি-কম বলে।'

বন্দনা ওকে ধমক লাগায়, 'অ্যাই ছুকরী, কি হচ্ছে। সন্তোষ আমার রিলেটিভ ভুলে যাস না, ও আমার ভাই হয়!'

নন্দিতাও বন্দনার পক্ষে, বলে, 'তোর মুখের জন্যে কোনদিন লটকে যাবি, মিতে, সত্যি বলছি। টেক কেয়ার অব ইয়োর টাং! ইস কাল মধ্যমগ্রামে কি কেচ্ছাটাই না করলি।'

'বেশ করেছি বলেছি, ও কেন ওরকম বলল,' পারমিতা ঝাঁঝিয়ে ওঠে 'কেন বলল, চিনি না জানি না একটা মেয়েকে দুম করে বিয়ে করে কি করব—আমার মাথায় সঙ্গে সঙ্গে রক্ত চড়ে গেল।'

'তাই বলে তুই মুখ খারাপ করবি?'

'কি বলেছিল মিতা?' সুষমা ওপাশ থেকে জিগেস করে।

'বিয়ে করে আপনি কি করবেন সেকথা আমাদের জানবার দরকার করে না,' নন্দিতা পারমিতার কথাগুলো হুবহু বলার চেষ্টা করে, 'আপনি সন্তোষদা সত্যি বলব একটু ক্লাস ওয়ান থার্ড লোক আছেন। একটি মেয়ের সর্বনাশ ঘটিয়ে এখন ভিজে বেড়াল সাজছেন। ওসব ভড়কি আমার কাছে চলবে না। শ্রীলতার সঙ্গে আপনার বিয়ে হওয়া আপনার চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি। শ্রীলতার যদি কিছু হয়, আপনার লাইফও হেল করে দেব আগে থেকে বলে রাখছি।'

বন্দনা বলল, 'মিতেটা একেবারে মার্ভেলাস হয়ে গিয়েছিল। ছিপুদাকেও রামটাইট দিয়েছে—'

'যাক শেষপর্যন্ত তাহলে রাজী করানো গিয়েছিস?' তপতী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে।

'ও রাজী না হয়ে কোথায় যাবে!' বন্দনা বলে, 'দিদিভাইও গিয়ে হাজির এই গাড়ি নিয়ে। সঙ্গে নন্দিতার জামাইবাবু। উনি এখন হাওড়ার ডি-এম, জানিস তো। তারপর সবাই মিলে হৈ-হৈ করে রেজিস্ট্রীর কাঠগড়ায়, সেখানে সই আর শপথ পর চুকিয়ে ওয়ান্স বিয়ে পরীক্ষায় ছাঁদ তলায়। দিদিভাই একহাতে সব সামলেছে অবিশ্যি মেড ইন 'মোহিনী' স্টেইনলেস

মুর্শিদাবাদিও কম খান্টেন। বাসর ঘরের অফিসার-ইন-চার্জ তো সেই ছিল।'

গাড়ি চৌরঙ্গী দিয়ে চলছিল। তপতী বলল, তোমরা কোথায় যাচ্ছ ভাই আমার কিন্তু ভয় করছে। এভাবে কলেজ পালিয়ে ......ঘুরছি জানতে পারলে—'

'ব্যাগেৎশ্যালি!' পারমিতা সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, 'বাড়ি বাড়ি করে তোরা খুব বাড়াবাড়ি করিস, এটা ভাল নয়। আমরা কেউ কচি খুকিটি নেই। আমাদের মা-ঠাকুমারা এই বয়সেই ছোট পরিবার—সুখী পরিবারের কোর্স কমপ্লিট করে ফেলেছে।'

বন্দনা একটা এয়ার-কন্ডিশনড রেস্টুরেন্ট-বারের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বলল, 'চল সামান্য একটু মুখশুদ্ধি করে আসি। ভাই জিন দু-সিপ্ টেনে দ্যাখ কেমন মৌজ হয়।'

তপতী বিদ্রোহ করে বললো এইসব খেলে সে কিছুতেই ভেতরে ঢুকবে না, এক্ষুনি বাসে চেপে বিদেয় হবে। ছি ছি শেষপর্যন্ত মদ। শব্দটা উচ্চারণ করতেই রুচিতে বাধে। বন্দনার এতদূর উন্নতি হয়েছে জানা ছিল না তো!

বন্দনা ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'সতী তপতী, আমি তোমাকে ওয়ার্ড দিচ্ছি তোমার ধম্ম নষ্ট করবো না। নংসে, এ শুধু তোমাকে ছলনা করছিলাম মাত্র। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তুমি আমাকে প্রীত করেছ, ভবিষ্যতে তোমার বর পাওনা হয়ে থাকল।'

সবাই একচোট হেসে নিল। তপতী হাসলো না, কেমন বোকা বোকা লাগলো। সত্যি এখনো সে বন্দনাদের পাশে দাঁড়াবার যোগ্য নয়।

ঠান্ডা ঘরের মধ্যে ঢুকে একটা কোণের টেবিল বেছে নিয়ে বন্দনারা বসলো। বাইরে এখন প্রখর রোদ কিন্তু ঘরের ভেতরে এখানে ছায়া-ছায়া। সুন্দর করে সাজানো টেবিলগুলো। হালফেশানের চেয়ার দিয়ে ঘেরা। পায়ের নিচে কার্পেট। কাউন্টারের কাছে রেডিওগ্রামে বিদেশী গান বাজছে। এখানে ওখানে কিছু দম্পতি, কিছু প্রেমিক-প্রেমিকা, কপোতকপোতীর মত বসে আছে। উঠতি অফিসার অবাঙালী বিজনেসম্যান, হয়ত সিনেমার সঙ্গে জড়িত কেউ কেউ, দল বেঁধে কিংবা একা বসে কেউ চুমুক চালাচ্ছেন কেউ চিবোচ্ছেন।

চিকেন দো-পিঁয়াজির অর্ডার দিয়ে বন্দনা বলল, 'নিজেকে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। আমার ব্যাগে আজ খানদুই গরম নোট আছে, তার খানিকটা দরিদ্রনারায়ণী সেবায় লাগাবো।'

নন্দিতা চোখ বড় বড় করে বলল, 'তার মানে একশো টাকার নোট? এতটাকা তুই পেলি কোথায়?'

'অর্থের উৎস কখনো সন্ধান করতে নেই। মানি ইজ নেভার এ কোশ্চেনেবল থিং। দেখিস না দুনিয়ায় শুধু টাকা না থাকারই কৈফিয়ত যোগাতে হয়। তবে জেনে রাখ এটা জেনুয়াল মানি। থাকগে মরুকগে, পারু, তোর আলেখ্য দর্শন এবার হয়ে যাক।'

পারমিতাকে বন্দনারা কখনো মিত্রা কখনো পারু বলে ডাকে। বলে, এখন কাট-পিসের যুগ। অতবড় নাম এখন মুখে রোচে না।

পারমিতা তার ব্যাগ খুলে বলে, 'ফটোর সঙ্গে কিন্তু একখানা সাড়ে তিন পাতার রম-রমে চিঠিও ছিল, তপতী লজ্জা পাবে বলে সেখানা আর খুলছি না, পরে হবে।'

'তাছাড়া এথিক্স-এর একটা কোশ্চেনও আছে।' বন্দনা তপতীর দিকে কটাক্ষ করে বলে।

... 'তাছাড়া পরপুরুষের চিঠি। আরও নিষিদ্ধ।' নন্দিতা ফোড়ন দেয়।

জিভ দিয়ে আপশোসসূচক চুকচুক শব্দ করে বন্দনা বলে, 'উঁহুঁহুঁ, পারুর হবু বরকে পরপুরুষ বলা যায় না।'

সুষমা মেয়েটা ভিজে বেড়াল। চুপচাপ থাকতো, মুখে প্রায় রাটি নেই কিন্তু সময়ে সময়ে এমন ঝাঁপতালে ঠেকা দেয় যে চমকে উঠতে হয়। ও বন্দনার কথা ছুঁয়ে বলল 'আরে বর না হওয়া পর্যন্ত সব প্রেমিকই হবু তোর, আমার, নন্দির কিংবা তপতীর কার না হবু নয়?

'আর হবুরাই বিয়ের পর গবু হয়ে যায়।' নন্দিতা জানায়।

'আবার তপতীকে টানা কেন? ও ভাল মেয়ে।' পারমিতা সুষমাকে বলে।

'বাঃ রে, ও তো এখন গেজেটেড প্রেমিকা। ওর অ্যানোনিমাস লাভ লেটার-এর কেস গল্প তোদের মুখে শুনেছি, তারপরেও ওকে বাইরে রাখবো।'

বন্দনা বলে, 'আরে আমার কথাটা বোঝ, আমি বলতে চেয়েছিলাম, যুবতী-শাস্ত্রমতে পুরুষ নামক এই মানুষিক স্পেসিমেনটির দুটো টাইপ—পর-পুরুষ আর বর-পুরুষ।'

সবার হাসির কোরাসের মধ্যে পারমিতা তাস সাফল করার মত এক প্যাকেট পোস্টকার্ড সাইজের কালার ফটো টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলো। লন্ডনে আছে পারমিতার বাকদত্ত স্বামী, দেশে ফিরে এলে মন্ত্রপূত হবে: সে পাঠিয়েছে তার কয়েকটি উইকএন্ডের স্ন্যাপশটস। খ্যাত বিখ্যাত জায়গা, দ্রষ্টব্য-বিশেষ দ্রষ্টব্য তো রয়েছেই, সেইসঙ্গে আছে শ্বেতাঙ্গিনী পরিচিতা-অপরিচিতার সৌজন্য চিত্র। ছবিগুলি সত্যিই অপূর্ব, দামী ক্যামেরায় তোলা, দামী কাগজে প্রিন্ট করা—এখানকার অনেক স্টুডিওর ছবিকে অক্লেশে হার মানায়। বিশেষ করে ল্যান্ডস্কেপ কালারে যা খোলে। তপতীর মনে পড়লো ডেলি-মিররের ভল্টুবাবুকে। তিনি প্রফেশন্যাল হয়েও এ ছবির তারিফ না করে নিশ্চয় পারবেন না।

'ভাক্তার ছোকরা দিব্যি আরামেই আছে দেখা যাচ্ছে।' বন্দনা বলল, 'ছুটির দিন-গুলো খুব একটা স্ত্রীভূমিকা বর্জিত এমন তো মনে হচ্ছে না। তুমি বাছা একটু পত্রযোগে মিতালী এবং মাথার দিব্যি চালাও। নইলে আবার তারিখে পড়ে যেতে পারে।'

বন্দনার মুখে অচেনা কোনো শব্দ শুনলেই নন্দিতা ঠিক জিজ্ঞাসা চিহ্নের মত করে গলাখানাকে লম্বা বাড়িয়ে দেয় আর বন্দনাও তার ডায়ালগে নতুন কোনো শব্দ যোজনা করলেই ওই জলজ্যান্ত জিজ্ঞাসার দিকে তাকায়। আজও চোখে চোখেই প্রশ্নের আদানপ্রদান হয়ে গেল।

'আজকাল ওদেশে ডেটিং চলেছে। কেষ্টঠাকুরের দেশের লোকের ওপরে আবার মহাশ্বেতাদের বড্ড টান। তাই বলছিলুম। সাবধান হ পারু কে জানে তরুণ এফ-আর-সি-এস গাছেরও খাচ্ছে তলারও কুড়োচ্ছে কিনা।'

পারমিতার ঠোঁটে অবজ্ঞার হাসি, 'নাগালে এলে বাছাধনকে আমি ঠিক করে দেব।'

এই নতুন জায়গায় এসে তপতীর যেমন ভাল লাগছিল তেমনি মনের মধ্যে অস্বস্তিও লেগে ছিল। বাবার পরিচিত কেউ যদি দেখে ফেলেন তাহলে কি ভাববেন তপতীকে। দূরের চেয়ারে কারো প্রোফাইল কিংবা পিছনদিকটা চেনা লাগলেই কেমন আড়ষ্ট আর সঙ্কুচিত বোধ করছিল। দ্বিতীয়বার সেদিকে তাকাতে ভয় করছিল যদি চোখাচোখি হয়ে যায়। অথচ চোখ ফিরিয়েও নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না।

'আমার ভাই ভয় করছে।' তপতী তার মনের কথা পাড়ে।

'ভয়? লাভারের চিঠিতেই ভয়? দ্যাখ তো পারু আমাদের কত স্টেডি। সেন্টার ফরোয়ার্ড কিরকম বেপরোয়া খেলছে।' বন্দনা তারিফের চোখে একবার পারমিতার দিকে তাকালো, তারপর কথা বলতে গিয়েই থেমে গেল। বেয়ারা এসে কাঁটা-চামচ জলের গ্লাস, ন্যাপকিন সসের বোতল বেশ কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে মঞ্চস্থ করে যেতে [illegible]। তারপরে এলো একটা প্লেটে নান [illegible], রস টুম্বুর দো-পিঁয়াজী। পরিবেশকের প্রস্থানের পর বন্দনা তার ছেঁড়া সুতোয় গিঁট দিল 'যে ল্যাং খেতে ভয় পায় না, সেই ল্যাং দিতেও পারে। ওর বর স্বয়ংবর নয় বাড়ি থেকে পাকা-পাকি করা সম্বন্ধ, ফিরে এলেই চতুষ্পদ হবে কিন্তু তলায় তলায় প্রেম কেমন ঘনিয়েছে দেখলি তো, দেখে শেখ। নিজের চেষ্টায় জনসংযোগ করতে না পারলে কেউ করে দেবে না।'

'আঃ না বুঝেই তুই বড্ড লেকচার দিস, বন্দনা। আমি কি চিঠির কথা বলছি নাকি?'

'তবে কিসের কথা বলেছ?'

'চেনা কেউ যদি দেখতে পেয়ে যায় কি ভাববে?'

'ভাববে নয়া জমানার দেবদাসী। হয়েছিস, দেবদাসের স্ত্রীলিঙ্গে দেবদাসী। বিরহের জ্বালায় বারে ছুটে এসেছিস পেগ পেগ ঢেলে আগুন নেভাবার জন্যে। তারিফ করবে।' নন্দিতা বলে।

বন্দনা হাসে, 'যিনি লেখবেন তিনিও তো ঐ কর্মেই এয়েচেন? নাকি চণ্ডীপাঠ করতে বারে ঢুকেছেন? লজ্জা ঘৃণা ভয়, তুই এই ত্রিগুণান্বিতা হয়েই বসে আছিস সুতরাং তোর হবে না। প্রেম করা আর যারই হোক তোর কর্ম নয়। ভাল কথা হপ্তা পেরিয়ে গেল, তোর রাইটারের খবর কি?'

'রাইটার?' তপতীর মগজে সত্যি সত্যিই ঢোকেনি ব্যাপারটা 'সে আবার কে?'

'তোমার লেটার-রাইটার গো। বলি আর দিল?'

• • •

প্রিয়তমাসু,

কি বলে সম্বোধন করি বুঝি না তপু। নাঃ আমার তপুই ভাল। তপতী নামটার সত্যিই গভীরতা আছে। কেমন তাপসী তাপসী লাগে শুনতে। তপের দ্বারা যে তপ্ত আহা! মনে হয় আমি যেন ধ্যানমগ্ন ধূর্জটি, লোকচক্ষুর আড়ালে ছাইভস্ম মেখে বসে আছি। আর তুমি কায়মনোবাক্যে করছ তপ আমারই জন্য। অথচ জানো না, আমারও এই নেপথ্য জগতে বসে ধ্যান সেও তোমারই জন্য।

খুব কবিত্ব হয়ে গেল, তাই না? হাসছো? হাসবে বৈকি। কারণ ফ্যাক্ট হচ্ছে এই আমার জন্যে তপ করতে তোমার বয়েই গেছে। তুমি বরং সেই সময়টা সিনেমা দেখছো, বন্ধুদের সঙ্গে হুল্লোড় করে বেড়াচ্ছ গল্পের বই পড়ছো। আর কি করছ? আমাকে ভোলার চেষ্টা করছ। তাই না? কিন্তু—

একবার তোরে দেখেছি যখন
কেমনে এড়াবি মোরে?
চাও নাহি চাও, ডাক নাহি ডাক
কাছেতে আমার থাক নাই থাক
যাব সাথে সাথে, রবো পায় পায়
রবো গায় গায় মিশি—

চিনতে পারো লাইনগুলোকে? এ আমার রাহুর প্রেম। ফিরে আসি আগের কথায়।

কিন্তু তপতীর সঙ্গে মুক্তি? কিসে আর কিসে? সত্যি বলছি, নামটা আমার মোটে পছন্দ নয় তোমার তুমিকে যেন অনেকখানিই খাটো করে দেয়। তোমার নাম নিয়ে আমি কত ভাবি দেখছো তো? কিন্তু তুমি কি ভাবো আমার নাম নিয়ে। মনে মনে তুমি আমাকে কি নামে ডাকো? তপতী, আমি তোমাকে খুব জ্বালাচ্ছি তাই না? তুমি তো আদৌ আমাকে ভালোবাসো না পছন্দ করো না, আমি জেনে ফেলেছি সে কথা। কেউ যদি গায়ে পড়ে আমাকে চিঠি লিখে বসে আমি কি করতে পারি, তাই না? কিন্তু আমাকে কি তুমি এখনো চিনতে পারোনি তপতী? না কি, এত কাছে রয়েছি বলেই অবহেলা করছ?

তপতী কেন জানি মনে হচ্ছে এবার আমার সঙ্গে যাবার সময় হয়েছে। গায়ে পড়ে ভালবাসতে যাওয়ার চেয়ে বিড়ম্বনার আর কিছু নেই। আমি তো হিন্দী ছবির নায়ক প্রতিনায়ক কেউ নই আমি মূক আমি নিঃশব্দ আমি ছায়া। আমি কারো সঙ্গেই আমার চেহারা দিয়ে, স্মার্টনেস দিয়ে আর্থিক ক্ষমতা দিয়ে ডুয়েল লড়তে পারবো না। লড়তে আমি ঘৃণা করি। ভালোবাসায় লড়াই চলে না। এ নিয়ে যারা ষাঁড়ের লড়াই চালায়, তারা আর যাই হোক আমি নই। আমি কে তপতী?

নন্দিনী চিঠি পড়া শেষ করে বন্দনার দিকে তাকালো। পারমিতা যাত্রার নটের গলা নকল করে বলল, 'আমি কে তপতী? আমি বাংলা বিহার উড়িষ্যার'—

বন্দনা ধমক লাগালো, 'থামতো। স্থানকালপাত্রী ভুলে যাস তোরা। একটা সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে এরকম করা— চিঠিটা শেষ কর আগে?'

'চিঠি শেষ ত হয়ে গেছে।' নন্দিতা জানায়।

'সেকি এইখানে শেষ? দেখি দেতো আমাকে—বন্দনা হাত বাড়ালো 'অ ই মা! তাইতো ভেবেছিলাম ইয়ার্কী করছিস। হুঁ'...বন্দনা কি খানিকটা চিন্তা করলো 'এ একেবারে শর্ট স্টোরির মত শেষ করেছে যে রে।' বন্দনার মুখের ওপর একটা অস্পষ্ট ছায়া ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল।

'হ্যাঁ।' পারমিতা ধুয়ো ধরে, 'শেষ হয়ে হইল না শেষ'—

'আর অন্তরে অতৃপ্তি?'' নন্দিতা তপতীর বুকের মাঝখানে আঙ্গুল দিয়ে একটা খোঁচা দিয়ে হঠাৎ নিচু সুরে গেয়ে ওঠে 'যেতে যেতে দুয়ার হতে কি ভেবে ফিরালে মুখখানি মনে...

বন্দনা গম্ভীর গলায় বলে, 'গান ফান রাখো নন্দিতা কেস খুব জটিল। চিঠির ভাষা লক্ষ্য করেছ? একেবারে সেন্ট পার্সেন্ট লাভ লেটারের ভাষা। মানে নায়ক খেলাতে খেলাতে নিজেই গেঁথে গেছে। তপতী ও রিয়্যালি তোর প্রেমে পড়ে গেছে রে।'

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে ওরা ভিকটোরিয়া মেমোরিয়্যালের মাঠে গাছের ছায়ায় গিয়ে বসেছিল। ফ্রীজ থেকে বেরিয়ে যেন ফ্রীডমে। মাথার ওপর আকাশ যেন সচল ফ্রেস্কো চারপাশ উজ্জ্বল রোদ্দুরে জীবন্ত। পায়ের তলায় মখমল ঘাস ইতস্তত ফুলঝোপ। একটা ঘূর্ণি গাছের মাথায় চিল চিৎকার দিয়ে উঠল। বিকেল হয়ে আসছে। গায়ে মাথায় হাত দিয়ে চমকে দিয়ে যাচ্ছে দুষ্টু হাওয়া। থেকে থেকে।

তপতী কোনো কথা বলছিল না। আজ অনেকটা যেন স্বাভাবিক। একটা ঘাসের ডাঁটি ছিঁড়ে নিয়ে কটকট করে সেটাকে দাঁতে কাটছিল আর কি যেন ভাবছিল। চিঠিটার মধ্যে সত্যিই আজ কিছু আছে। মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়। একটা গভীর কান্না কান্না ভাব জাগছে। কেন ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ওদের কারো কথাই তপতীর মনে অস্বস্তি জাগাচ্ছে না। একটা শীতল শূন্যতার মধ্যে অন্যমনস্ক তপতী কেবলই পাক খাচ্ছিল।

বন্দনা তপতীর কাঁধ ধরে নাড়া দিল, 'কি রে অমন মনমরা হয়ে গেলি কেন? না কি ধ্যান করছিস?' বন্দনার গলার স্বরেও আজ কি যেন আছে, ঠিক ধরা যাচ্ছে না।

ধীরে ধীরে চোখ ফেরালো তপতী 'ধ্যান? কাকে?'

'যে কেবল পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায় ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে—তার।' নন্দিতা বলে।

'কিছু অনুমান করতে পারছিস? তেমন কাউকে খুঁজে পেলি?' বন্দনা প্রশ্ন করে।

তপতী ম্লান হাসে।

'পেয়েছিস?'

সকলকে চমকে দিয়ে তপতী বলে 'পেয়েছি।'

পারমিতা নন্দিতা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। বন্দনা চোখ থেকে কালো চশমা খুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর কি রকম ফেঁসে যাওয়া গলায় প্রশ্ন করে, 'সত্যি বলছিস? কে সে? নাম বল।'

তপতী শুনতে না পাওয়ার ভঙ্গিতে কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে বসে থাকে। তারপর হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ঘাসের ওপর থেকে বই খাতা তুলে নিতে নিতে বলে 'এখনো মন স্থির করতে পারিনি। পরে বলব।'

'আঁ। বলিস কিরে।' পারমিতা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে।

'আমাদের বলতে যদি মন সায় না দেয় পরেও নাই বললি।' বন্দনা খানিকটা অভিমানের স্বরে বলে। বন্দনার আজ কিছু হয়েছে। ওর দিকে না তাকিয়েও তপতী বুঝতে পারে।

'তা নয়।' তপতী একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'চল বাড়ি যাই দেরি হয়ে যাচ্ছে।' রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা কালো অ্যামব্যাসাডার হর্ন দিল।

ওরা আর কোনো কথা বলে না, নিজের নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে পড়ে।

(ক্রমশঃ)

প্রদর্শনী

কলকাতার ম্যাকস ম্যুলার ভবনের উদ্যোগে আকাদেমি অব ফাইন আর্টস গ্যালারীতে হাপ গ্রিয়েশাবের নামে একজন জর্মন শিল্পীর ৫৮টি উড্‌কাট প্রিন্টের একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল। গ্রিয়েশাবের-এর জন্ম ১৯০৯ সালে এবং বহুদিন ধরে উড-কাট মাধ্যমে ছাপের ছবি রচনা করে আসছেন, অর্থাৎ তিনি একজন প্রবীণ শিল্পী। ছবি তো দূরস্থান আমরা তাঁর নামের সঙ্গেও পরিচিত ছিলাম না।
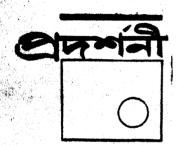
উড-কাট প্রাচীনতম গ্রাফিক মাধ্যম। চীনদেশে নবম শতাব্দী থেকে এই মাধ্যমে শিল্পচর্চা শুরু হয়। জর্মনীতে বিশেষ করে এই মাধ্যম অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং আলব্রেখট্‌ ড্যুরের ও লুকাচ ফন এগনচ-এর হাতে অত্যন্ত সমৃদ্ধি পায়। যেসব জর্মন শিল্পীরা শিল্পে মানবিক অবস্থা সম্বন্ধে কোন মনোভাবকে জোরালো ভাষায় ব্যক্ত করেছেন এবং মানবিক বাণীকে বহুজনের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন তাঁরাই কোন-না-কোন সময়ে এই মাধ্যমের শরণাপন্ন হয়েছেন। এই শতকের গোড়ার দিকে এমিল নোলডে, এরিক হেকেল কার্ল শ্মিড-রোটলুফ অটো ম্যুয়েলর আর্নস্ট লুডভিগ ক্রিশনার ক্রিস্টিয়ান রোহলফস ফ্রানজ মার্ক ম্যাকস বেকম্যান আর্নস্ট বারলাখ এবং কাঠে কোলভিৎসের মতন জর্মন একসপ্রেসনিস্ট শিল্পীরা উড-কাট মাধ্যমে সার্থকভাবে মানুষের দুঃখ দুর্দশা বিষাদ ক্ষোভ ভীতি যন্ত্রণার ছবি এঁকেছেন।

এক অর্থে গ্রিয়েশাবের জর্মন একসপ্রেশনিস্টদেরই উত্তরসূরী। একসপ্রেশনিস্টদের মতনই তিনি প্রাতিস্বিক রূপবন্ধকে ছবিতে সরলীকৃত করেন, নবরূপায়ণ ঘটান কোন একটি বিশেষ ভঙ্গি কোন একটি বিশেষ ইঙ্গিতকে বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর করে কোন একটি বিমূর্ত ভাবনাকে বা মনোভঙ্গিকে অভিব্যক্ত করার জন্য। বিভিন্ন বহির্জাগতিক রূপবন্ধ বা মোটিফের যে পারস্পরিক তারতম্য গ্রিয়েশাবের ছবিতে ঘটান, তাও একই উদ্দেশ্যে। কিন্তু গ্রিয়েশাবেরকে পুরোপুরিভাবে একসপ্রেশনিস্ট বলে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। একসপ্রেশনিজমের অন্যতম প্রতিজ্ঞা হল চিত্রবস্তু চিত্রোত্তর কোন বিমূর্ত ভাবনার সংকেতবাহী এবং চিত্রস্থ রূপ গৌণ। দ্বিতীয়তঃ এই বিমূর্ত ভাবনাসকল অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভীতি বিতৃষ্ণা হতাশা বিষাদ ক্ষোভ যন্ত্রণা ইত্যাদি অনুভূতি সম্পৃক্ত। গ্রিয়েশাবের-এর ছবি কিন্তু কোন বিমূর্ত ভাবনা বা অনুভূতির সংকেত রেখে রূপগতভাবে গৌণ হয়ে যাবার অনুপাতে অনেক বেশী অলঙ্কারধর্মী। অর্থাৎ গ্রিয়েশাবেরের ছবির আলঙ্কারিতা তাদেরকে একসপ্রেশনিস্টদের ছবির ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত সত্তা দেয় না। দ্বিতীয়তঃ তার ছবিতে মানুষ পশু পাখী গাছ ফুল লতা পাতা স্নেহ বাৎসল্য সম্পর্কে শৈশবকালীন অভিজ্ঞতার মুগ্ধ স্মৃতিচারণ এবং সেই ফেলে আসা জগৎ সম্পর্কে একটা নস্টালজিক বিষাদবোধ থাকলেও ভীতি হতাশা ক্ষোভ যন্ত্রণা ইত্যাদি বয়স্ক অনুভূতির প্রকাশ নেই।

শিশুশিল্পীরা যেভাবে কোন বহির্জাগতিক রূপবন্ধকে চিত্রে রূপায়ণের কালে, তার নিজের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়া রূপবন্ধটির কোন বিশিষ্ট ভঙ্গি বা বিশিষ্ট রূপটিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য রূপবন্ধটিকে সরলীকৃত করে বিশিষ্ট ভঙ্গিটিকে সরব করে তোলে, গ্রিয়েশাবেরও মূলতঃ তাই করেছেন। শিশুশিল্পীরা যে-ভাবে অভিব্যক্তির প্রয়োজনে চিত্রস্থ রূপবন্ধের পারস্পরিক আয়তনের তারতম্য ঘটিয়ে চিত্রতলে বিন্যস্ত করে গ্রিয়েশাবেরও মূলতঃ তাই করেছেন। একই সঙ্গে শিশুশিল্পীরা যেভাবে রূপবন্ধসকলের সীমারেখাকে আলঙ্কারিক প্রবণতা দিতে সচেষ্ট হন গ্রিয়েশাবেরও তাই করেছেন। কারণ গ্রিয়েশাবের শৈশবের সেই মুগ্ধতাকে বিষণ্ণ-চিত্তে স্মরণ করেছেন। পঞ্চদশ, সপ্তদশ শতকের ছোটদের বইয়ের এবং রূপকথার ইলাস্ট্রেটররাও ঠিক একই ধরণের চেষ্টা করেছেন ঐ একই মাধ্যমে। ফলে গ্রিয়েশাবের-এর ছবি কোথায় সেই আলঙ্কারিক অথচ অলঙ্কার-সর্বস্ব নয় সেইসব ইলাস্ট্রেশনকে মনে পড়িয়ে দেয়।

গ্রিয়েশাবের-এর ছবি একান্তভাবে দ্বিমাত্রিক। যেখানে তিনি ত্রিমাত্রিক তল দেখিয়েছেনও সেখানে বিভাজিত তলগুলি উপরে নীচে স্থাপিত না হয়ে পাশাপাশি সাজানো হয়েছে। ওঁর রূপবন্ধগুলি পুঙ্খ প্রধান এবং বিস্তারসম্পন্ন, অথচ তারা আকারে একান্ত রেখামাত্রিক। পুঞ্জ সংস্থান একান্তই স্থানু। রেখার ব্যবহার তাঁর ছবিতে অপ্রতুল নয়। রেখা আকার-অভ্যন্তরস্থ বিন্যাস প্রকাশে এবং আবয়বিক ভঙ্গির গতিপ্রকাশের কাজে অথবা ছবির ছন্দ স্পন্দমান করে তোলার কাজে ব্যবহৃত। স্থানু পুঞ্জের সঙ্গে, সজীব সচল জান্তব ছন্দ সমন্বিত রেখা ছবিতে একটা টেনশন তৈরী করে। সেই টেনশনই শেষপর্যন্ত ছবির অভিব্যক্তি সঞ্চার করে।

কাঠ কাটায় এবং রঙিন প্রিন্ট তোলায় শিল্পীর দক্ষতা অনস্বীকার্য। ছবিগুলি আকারে বৃহৎ। শোনা গেল জর্মনীর তরুণদের মধ্যে গ্রিয়েশাবের-এর প্রিন্টের জনপ্রিয়তা অসাধারণ। শুনে অত্যন্ত আশ্বস্ত হওয়া গেল। গ্রাফিক শিল্পের জন্মকাল থেকেই গ্রাফিক শিল্প মানবিক অভিজ্ঞতা প্রকাশের এবং সর্বজনগ্রাহ্য ভাষায় তা উপস্থাপনের বাহন হিসাবে কাজ করে এসেছে। আজ যখন শিল্পের নিজস্ব রূপের দাবীর অগ্রাধিকার দিতে শিল্পীরা ভাষার সর্বজনগ্রাহ্যতার দাবীকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে শিল্পকে অন্য-অভিজ্ঞতা শূন্য নিরাবলম্ব বস্তুতে পরিণত করেছেন, তখন জর্মন তরুণরা এমন এক শিল্পীকে সম্মান দিচ্ছেন যিনি গ্রাফিক শিল্পের মূল সর্ত বিস্মৃত নন।

এছাড়াও গ্রিয়েশাবের-এর কাজ থেকে আমাদের শিল্পীদের শিক্ষণীয় অনেক কিছু আছে। যাঁরা ছাপের ছবি করেন তাঁদের কাছে উড-কাট এখনও নিম্নমানের মাধ্যম বলে পরিগণিত হয়। যারা অন্য মাধ্যমে ছবি আঁকেন তাঁদের অনেকের কাছে গ্রাফিক মাধ্যমগুলিই নিম্নমানের মাধ্যম বলে মনে হয়। ফ্রেমে বাঁধানো ইজেল পেনটিং-এর অভ্যুদয়-এর সঙ্গে ধনতান্ত্রিক ব্যক্তি-ক্রেতার অভ্যুদয়ের প্রশ্ন জড়িত। ছবি সেখানে বহুজনের জন্য নয়। গ্রাফিক প্রিন্ট অনেকের জন্য। আমাদের দেশে যত না ধনিক ব্যক্তি আছেন ফ্রেমে বাঁধানো ছবি তৈরী হয় তার চেয়ে বেশী। এই ধরনের ছবি আঁকাও ব্যয়সাধ্য। বেশীরভাগ ব্যয়টাই অতএব বাজে খাতে খরচ। আমাদের দেশে শিল্পানুরাগ তৈরী করতে গেলে করতে হবে তাঁদেরই মধ্যে যাঁদের দামী অয়েল পেনটিং কেনার ক্ষমতা নেই। অতএব গ্রাফিক প্রিন্ট ছাড়া গতি নেই। উড-কাট, লিনোকাট, উড-এনগ্রেভিং ছাড়া অন্যান্য গ্রাফিক মাধ্যমে ছবি তৈরী করতে হলে ছাপার যন্ত্র দরকার, ধাতু-নির্মিত প্লেট দরকার। সবই ব্যয়সাধ্য এবং দাম ক্রমশ বাড়ছে। এমতাবস্থায় উড-কাট, লিনোকাট এবং উড-এনগ্রেভিং-এর প্রসার বাঞ্ছনীয়।

—প্রণবরঞ্জন রায়

অত্‌ীতে, বিগত এই জ্যৈষ্ঠ মাসে
িমবাংলার যে সকল মনীষী সাহিত্য-
ী ও বিদ্বজ্জনের তিরোভাব ঘটেছে,
দের মধ্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায় দ্বিজেন্দ্র-
াল রায়, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
াপচন্দ্র মজুমদার অক্ষয়কুমার দত্ত,
ীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রজনীকান্ত
ত্তর নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ে।

পুণ্যশ্লোক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের
াপ্রয়াণ ঘটে ১৩০১ সালের ১লা
্ঠ। ১৩২০ সালের ৩রা জ্যৈষ্ঠ
লোকগমন করেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।
র আশুতোষের তিরোভাব ঘটে
৩১ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ।
১৩ সালের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ প্রতাপচন্দ্র
ুমদার অক্ষয়কুমার দত্ত ১২৯০ সালের
ই জ্যৈষ্ঠ, সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর
১১ সালের ২২শে জ্যৈষ্ঠ এবং ১৩০৭
ের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ রজনীকান্ত গুপ্তের
। ঘটে। বৎসরগুলির মধ্যে প্রভূত
তেমা থাকলেও জ্যৈষ্ঠ মাসের এই
গুলি আমাদের কাছে বিশেষভাবে
ণীয় হয়ে আছে।

এবার বর্তমান চলতি আষাঢ় মাসের
বলি। এই আষাঢ় মাসে যাঁরা
লোকগমন করেছেন, তাঁদের মধ্যে
্রগণ্য পুজ্য ব্যক্তি হলেন স্বামী
কানন্দ। ১৩০৯ সালের ১৯শে আষাঢ়
ভারতবর্ষের জনগণকেই নয়
বীর বহুজনকেও শোকসাগরে
জ্জত করে তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে। এবং
আষাঢ় মাসের ২রা তারিখেই সর্ব-
ীয় ক্ষেত্রে শোকের ছায়া নেমে আসে
ন্দ্রের তিরোধানে। ঘটনাটি ঘটে
২ সালে। এতদব্যতীত এই আষাঢ়
ই হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ
এবং কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদও
রণ করেন। কর্মজীবনের বৈশিষ্ট্য
ায়ী এঁরা সকলেই আমাদের
য় ও বরণীয়।

লেখক অমরেন্দ্রনাথ রায় শিশির-
মিত্র সম্পাদিত 'সচিত্র শিশির'
ার শারদীয় সংখ্যায় (১৩৩৩), তাঁর
-তর্পণ' রচনার মধ্যে এঁদের সম্পর্কে
কিছু আলোচনা করে গিয়েছেন।
া উক্ত আলোচিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে
ন ক্ষেত্রে বহু আলোচিত স্বামীজী
শিবন্ধু সম্পর্কীয় রচনা দুটি বাদ
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ
ও কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ সম্বন্ধে
রচনাগুলি এখানে সাধারণের
তর জন্য উদ্ধৃত করে দিলাম। আশা
ভবিষ্যৎ জীবনী-অভিধানিকরা। এই
থেকে কিছু নূতন তথ্যের সন্ধান
বে—উপকৃত হবেন।

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(মৃত্যু : ১লা আষাঢ় ১২৬৮)

এখনকার পাঠকরা হরিশচন্দ্রের নাম-টুকু ছাড়া তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন না। কিন্তু ছিল একদিন, যখন তাঁহার গুণের ও তেজের কথা বাঙ্গালীর মুখে মুখে আলোচিত হইত। বাঙ্গালার অনেক গানে, কবিতায় ও পাঁচালীতে তাঁহার নাম অমর হইয়া আছে। একজন লিখিয়াছিলেন—

'নীল বানরে সোনার বাংলা
করলে এবার ছারখার।
অসময়ে হরিশ মলো—
লংএর হলো কারাগার।।'

আর একজনের গান আছে—

'নীলে নীলে সব নিলে
প্রজার বল ভাই কে রেখেছে।
তাই নিয়ে যায় যায়,
লিখে লিখে হরিশ মরেছে।।'

এইরূপ গান আরও অনেক আছে, বাহুল্য ভয়ে সে-সব উদ্ধৃত করিলাম না। হরিশচন্দ্রের মৃত্যুতে দেশবাসী যে কিরূপ ক্ষতিবোধ করিয়াছিলেন, তাহারই একটু পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যে এই কয় ছত্র উদ্ধৃত করিলাম। যাঁহারা এই শোক করিয়াছিলেন তাঁহারা যদি আজ জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে আজিকার দিনেও তাঁহারা পাবনার কথা শুনিয়া হরিশ-চন্দ্রের অভাববোধে রোদন করিতেন। তখনকার দিনে চিত্তরঞ্জন ছিলেন না সত্য কিন্তু হরিশচন্দ্রের শূন্য আসন যে এতদিনেও পূর্ণ হইল না তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হইয়া সম্পাদক জীবনের যে আদর্শ তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা এখনও এদেশে অতুলনীয় হইয়া আছে। ১৮৬০ হইতে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত—অর্থাৎ সবেমাত্র এই কয়েক বৎসরকাল তিনি সম্পাদকের পদে ব্রতী ছিলেন। কিন্তু এই স্বল্পকাল মধ্যে তিনি যে কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা শুধু অতুলনীয় নহে, অসামান্যও বটে। ভারতের বহু স্মরণীয় ঘটনার সহিত তাঁহার স্বল্প সম্পাদক-জীবনের কীর্তি বিজড়িত আছে। সনন্দ পত্রের পুনঃ সংস্কার অযোধ্যাকে অধিকার-ভুক্তকরণ, সিপাহী বিদ্রোহ নীলকরগণের

অত্যাচার, রাজহস্তে রাজ্য-শাসন-ভারের পরিবর্তন ও বিশ্ববিদ্যালয়-সংস্থাপন প্রভৃতি ঘটনা এই সময়েই ঘটিয়াছিল।

হরিশচন্দ্রের নির্ভীকতা ও নিরপেক্ষতা ঐ সকল ঘটনার ভিতর দিয়া 'হিন্দু পেট্রিয়টে' তখন প্রতিনিয়তই আত্মপ্রকাশ করিত। সিপাহী বিদ্রোহের উপশান্তি ঘটিলে পর একদিন কলিকাতার বড়লাটের প্রাসাদ হইতে হরিশচন্দ্রের ভবানীপুরের বাসবাটীতে এক চিঠি যায় যে, 'আপনি কোনদিন সময় করিয়া কখন লর্ড ক্যানিঙের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন। বড়লাট বাহাদুর আপনার সহিত শাসন-নীতি সম্বন্ধে আলাপ করিতে চাহেন।' হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অমনি সদা সদ্য উত্তর লিখিয়া দিলেন, 'আমি দরিদ্র সাধারণ ব্যক্তি আমার পক্ষে বড়লাট দর্শন শোভন হইবে না। তিনি এদেশে ব্রিটিশ রাজের প্রতিনিধি; ব্যক্তিগত এবং পদ-গত অতি প্রবল মহিমার দ্বারা আমার মতন দরিদ্রের মন আচ্ছন্ন এবং বিমুগ্ধ হইতে পারে। পাছে বিমূঢ় অবস্থায় আমি বাজে কথা কহিয়া ফেলি, সেই ভয়ে আমি লাট-প্রাসাদে যাইব না। দরিদ্রের প্রতিনিধি আমি, আমার জাতির ও দেশের সম্বন্ধে 'হিন্দু পেট্রিয়টে' আমি যাহা লিখিয়া থাকি তাহাই আমার বক্তব্য। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লর্ড ক্যানিঙ যখন নিয়মিত পাঠ করিয়া থাকেন, তখন আমার তাঁহাকে নূতন কিছু বলিবার নাই। আমার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথা অভাব-অভিযোগের কথা আমি বড়লাট বাহাদুরকে শুনাইতে চাহি না। অতএব আমি তাঁহার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না।'

এ তেজস্বিতা, এ আত্মমর্যাদা জ্ঞান সকল দেশে সকল সময়েই সুদুর্লভ। আধুনিক নেতাদের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায় যে প্রাতঃস্মরণীয় হরিশচন্দ্র কত বড় তেজস্বী—কত বড় দৃঢ়চেতা পুরুষ ছিলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি শুধু আমাদিগের গুরু নহেন, সর্বপ্রধান গুরুও বটেন। তাঁহার স্মরণ-স্তম্ভে যাহা লিখিত আছে তাহাই তাঁহার কীর্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইলেও প্রকৃত পরিচয় পাঠক-সাধারণের অবগতির জন্য এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

স্বর্গীয় হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

যিনি 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক ও 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান' সভার অধিনায়ক ছিলেন এবং সমকালে বহুবিধ বিষয়ের আন্দোলন প্রসঙ্গে দক্ষতা তাঁহার সময় ও নিঃস্বার্থভাবে বিচার-বিতর্ক দ্বারা স্বদেশের প্রভূত কল্যাণসাধন করিয়াছিলেন।

যিনি অসামান্য সাহস, সত্যনিষ্ঠা ও স্বাধীনতার সহিত অন্যায় পক্ষের পরাজয়ে প্রবৃত্ত হইতেন ও ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করিতেন;

যিনি বিদ্রোহসঙ্কুল সঙ্কট সময়ে রাজপুরুষগণকে সৎপরামর্শ দিয়াছিলেন ও রাজনীতির প্রকৃত অভিপ্রায় সাধারণের গোচর করিয়াছিলেন;

যিনি উৎপীড়িত দীন-দরিদ্রের পিতৃস্বরূপ ছিলেন এবং তাহাদের সহায়তা করিতে সাধ্যপক্ষে কখনই বিমুখ হইতেন না;

যিনি স্বীয় জীবনের স্বার্থত্যাগ ও কর্তব্যপরায়ণতার উজ্জ্বল আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন;

যিনি একবার প্রজাবৃন্দের শরণ্য পক্ষ-পোষক ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবলুপ্তির স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন;

সেই মহাপুরুষের স্মৃতিচিহ্ন

এই কীর্তিস্তম্ভ

তদীয় চিরকৃতজ্ঞ স্বদেশবাসিগণ কর্তৃক সাধারণের প্রদত্ত অর্থদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইল।

কলিকাতা ভবানীপুরে সন ১২৩১ সালে তাঁহার জন্ম ও সন ১২৬৮ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

চন্দ্রনাথ বসু

(মৃত্যু : ৬ই আষাঢ়, ১৩১৭)

পৃথিবীতে একটির অধিক দুইটি চন্দ্র নাই; এক চন্দ্রেই সমস্ত জগত আলোকিত। কিন্তু বাঙ্গালায় সাহিত্য-চন্দ্রের সংখ্যা অগণিত না হউক—অত্যধিক বটে। ভারতচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া শরৎচন্দ্র পর্যন্ত বহুচন্দ্রের আলোক-সম্পাতেই এ সাহিত্যাকাশ সমুজ্জ্বল। ভারতচন্দ্রের পূর্বে কোন চন্দ্রের কথা মনে পড়ে না এবং তাঁহার সমকালে তিনিই বোধ হইতেছে 'একচন্দ্র' ছিলেন, কিন্তু তারপর আর একটি মাত্র চন্দ্র নহে—এক সঙ্গে দুই দিক হইতে দুইটি চন্দ্র উদিত হইয়া বাঙ্গালার সাহিত্যাকাশকে আলোকিত করিয়াছিল। সে আলোক-সৌন্দর্য্য ৬০।৬৫ বৎসরের পুরাতন হইলেও এখনও মলিন হয় নাই, এখনও তাহা আমরা সানন্দে উপভোগ করিয়া থাকি। গুপ্ত কবি ঈশ্বরচন্দ্র ও বিদ্যাসাগরকে বিস্মৃত হইবে কে?

ঐ দুই চন্দ্রোদয়ের পর বাঙ্গালা সাহিত্যাকাশে চাঁদের হাট বসিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র ও চন্দ্রশেখরের উ... ঘটিয়াছিল। এই অষ্টচন্দ্রের সহিত চ...

নামের নামও আমরা উল্লেখ করিতে পারি। শোভায় ও প্রভায় এই কয়টি 'চন্দ্র' সমতুল্য না হইলেও ইহাদের কেহই উপেক্ষার যোগ্য নহেন। এ যুগের বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস যদি কখনও লিখিত হয় এবং সে ইতিহাসে ঐ কয়টি চন্দ্রের মধ্যে কোনও একটি যদি বাদ পড়ে, তবে সে ইতিহাস অসম্পূর্ণ হইবে।

চন্দ্রনাথের অনেক লেখা হয়ত অনেকের নিকট এখন ভাল লাগে না, কিন্তু যাঁহারা দেশের ও সাহিত্যের পূর্ব্বাপর অবস্থা মনে রাখিয়া তাহার সাহিত্য-সাধনার আলোচনা করিবেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, চন্দ্রনাথ যাহা দিয়া গিয়াছেন তাহা প্রচুর না হইলেও তাহার দ্বারা সাহিত্যের পুষ্টি ও পাঠকের উপকার হইয়াছিল। এখনকার সাহিত্য-রথীরা আলোচনা হিসাবে যাহা লিখিয়া থাকেন তাহার অধিকাংশেই বদহজমের দুর্গন্ধ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। বিলাতী লেখকদের মতামত ঠিক মত না বুঝিয়া ইহারা কেবল কালির আঁচড় পাড়িয়া থাকেন। কিন্তু চন্দ্রনাথ এরূপভাবে কখনও আত্ম-প্রবঞ্চনা করেন নাই, বরং ও কাজটাকে আন্তরিক ঘৃণার চক্ষেই দেখিতেন। নিজে যাহা চিন্তা করিতেন, যাহা ভাল বলিয়া বুঝিতেন, তাহাই তিনি পরিষ্কার ভাষায় নির্ভীকতার সহিত বলিয়া যাইতেন। সে আলোচনার ফলে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার এককালে ঘোর বিচার-বিতণ্ডা ঘটিয়াছিল—সাহিত্যক্ষেত্রে সে সজীবতা এখন নাই। মাসিক রাজ্যে কেবল ছুঁচো বাজিরই খেলা চলিতেছে।

গোড়ায় চন্দ্রনাথ ইংরাজী-য়ানার ও ইংরাজী ভাষার ঘোর পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার সে সময়কার কথা বলিতে গিয়া তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন যে, 'বাঙ্গালা লিখিতে অপ্রবৃত্তি হইয়াছিল তখন ইংরাজী লিখিয়া বড় সুখ হইত।'—কিন্তু এ সুখ-বোধ বেশীদিন তাঁহার স্থায়ী হয় নাই। যেদিন বঙ্কিমচন্দ্রের প্ররোচনায় তিনি 'শকুন্তলা-তত্ত্ব' লিখিতে আরম্ভ করেন, সেইদিন হইতে তাঁহার মনের গতি আর একরূপ হইয়া যায়। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন যে 'শকুন্তলা-তত্ত্ব' লিখিবার পর সরকারী কার্য্যের জন্য ভিন্ন আর ইংরাজী লিখি নাই—লিখিতে আর ইচ্ছাও হয় নাই। লিখিতে হইলে মাতৃভাষার ন্যায় অন্য কোন ভাষা লেখা স্বাভাবিক ও সুখকর নয়। যখন বাঙ্গালায় লিখি তখন যাহা লিখি তাহা সম্মুখে দেখি, যখন ইংরাজীতে লিখি, তখন যাহা লিখি তাহার এবং আমার মনশ্চক্ষুর মধ্যে যেন একখানা পর্দা বিলম্বিত দেখি।'—এমন অকপটতা, এমন সত্যবাদিতা, মাতৃভাষার প্রতি এমন মমত্ববোধ এদেশে সত্যই কি দুর্লভ নয়?

চন্দ্রনাথ ছাত্রজীবনে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন, তাহা অনন্যসাধারণ হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না। কারণ দেশের ও দশের হিত-সাধনের সহিত সে কৃতিত্বের সম্বন্ধ নাই। তাঁহার সমসাময়িক স্বর্গীয় কালী বাঁড়ুজ্যে ও কালীপদ গুপ্ত—ইঁহারা উভয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন কিন্তু চন্দ্রনাথের তুলনায় ইঁহাদের স্মৃতি আজ কতটুকু উজ্জ্বল হইয়া আছে? চন্দ্রনাথ শকুন্তলাতত্ত্ব 'ত্রিধারা' ও 'সাবিত্রী-তত্ত্ব' না লিখিলে তাঁহার কথাও লোকে ভুলিয়া যাইত। ঐ কয়খানি গ্রন্থই তাঁহার নামকে আজিও বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

(মৃত্যু : ২০শে আষাঢ় ১৩১৪)

'হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ'—এই বাক্যকে মূলমন্ত্র করিয়া যিনি 'হিতবাদী' পত্রিকার পরিচালনা-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আজ ষোল বৎসর হইল [এখনকার হিসাব মত ৬৭ বৎসর] তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন।

'হিতবাদী' কালীপ্রসন্নের কীর্ত্তি-স্তম্ভ। তাঁহার রচিত ভাল ভাল গান ও কবিতা অনেক আছে, তাঁহার সম্পাদিত 'বিদ্যাপতি' বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক।

তিনি একজন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ নির্ভীক সম্পাদক ছিলেন। ন্যায় হউক, অন্যায় হউক তিনি যাহা ভাল বলিয়া বুঝিতেন, তাহা প্রকাশ করিতে কখনও সংকোচ বোধ করিতেন না। কোনও প্রকারে ভয় বা কোন প্রকারের প্রলোভন, তাঁহাকে কখনও কর্ত্তব্য-পথ হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই।

মাতৃভূমি তাঁহার একমাত্র উপাস্য দেবতা ছিল। তিনি অন্য কোন দেবতা মানিতেন না। প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষে বসিয়া তিনি মৃত্যুর পূর্ব্ব দিবসেও জন্মভূমির উদ্দেশে এই কবিতাটি লিখিয়াছিলেন—

'এই কি জীবন শেষ? জীবন-রজনী!
কোথা প্রিয় জন্মভূমি?
কোথা আমি? কোথা তুমি?
পড়িল কি যবনিকা সহসা এখনি?
*　　*　　*
তোমার মহিমা গা'ব, ওমা জন্মভূমি!
লাঞ্ছিত তোমার নাম,
দেখে তবু চলিলাম
এ দীর্ঘ জীবন বৃথা—দেখিলে ত তুমি!
এ দুঃখ রহিল মনে,
তোমার সন্তানগণে
না দেখিয়া সমাদৃত,—শমন সদনে
যেতে হল—মনসাধ রহিল মা মনে।

এ স্বদেশ-প্রেম সর্ব্বত্রই দুর্লভ। মাতৃভক্ত কর্ম্মবীর জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি স্বদেশের কথাই ভাবিয়াছিলেন।

—রূপদক্ষ

সোনা-সৌন্দর্য এবং বর্তমান

অলঙ্কারের সৌন্দর্যে পুরাকালের মত আজকের মেয়েরাও মুগ্ধ। দিনকালের তারতম্যের জন্য অলঙ্কার ব্যবহারের মাত্রা বা পরিমাণের পরিবর্তন হলেও বিরাট কিছু পরিবর্তন হয়নি। হয়নি খুব সম্ভবতঃ অলংকার বা গয়নার দিকে মেয়েদের সহজাত প্রবণতা বা প্রীতির জন্য।

সদ্য একটি বিয়েবাড়ী আর জন্মদিনের উৎসবকে কেন্দ্র করে এ ধারণা আরও বদ্ধমূল হল। গয়না ব্যবহার করা এখন এক ভয়াবহ ব্যাপার। তাই শোনা যায় গয়না তৈরির দিকে মেয়েদের ঝোঁক কমে যাচ্ছে। তারওপর সোনার দাম সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের লোকেদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। ইচ্ছে থাকলেও গয়না গড়াবার সামর্থ্য সাধারণ লোকেদের নেই—এ অবস্থা জানা বা শোনার পরেও গয়নাপ্রীতি মেয়েদের কমে নি।

এক ধরনের মহিলা আছেন যাঁদের এ ব্যাপারে কোন স্পৃহা নেই তাঁরা অল্পে বা অনেক পেলেও যতটুকু ব্যবহার না করলেই নয় ততটুকুই করবেন।

অলঙ্কার ব্যবহারে মেয়েরা আরও শ্রীমণ্ডিত হয়ে ওঠেন একথা যতটা সত্য আবার অত্যধিক বেশী ভারী ভারী, জবড়জং গয়নায় স্বাভাবিক সৌন্দর্যটুকু অন্তর্হিত হয়। আছে বলেই যেমন-তেমন একটার পর একটা চাপিয়ে উৎসবের বাড়ীতে উপস্থিত হলে সম্পদকে প্রচার করা সম্ভব হলেও সৌন্দর্যপ্রকাশে অক্ষমতা আর রুচির দীনতাকেই জাহির করে।

নামী পরিবারের এক মহিলা যিনি গাড়ী বাড়ী ঝি-চাকর বেষ্টিতা হয়ে থাকেন বুঝতেই পারছেন যাঁকে এই দুর্দিনের বাজারে শরীর না নাড়িয়ে পায়ের ওপর পা তুলে দিন কাটাতে হয় তিনি যখন উৎসবের বাড়ী বা অন্য কোথাও নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হাজির হবেন তাঁর সর্বাংগ প্রায় ঢাকা থাকে চোখ ধাঁধানো অলংকারে। এই দুর্দিনেও যে তিনি এত অলঙ্কার বেষ্টিতা হয়ে বাইরে বেরুতে সাহসী হোন সেটাই সবচেয়ে আশ্চর্যের তারপর রুচিবোধের তো একটা প্রশ্ন আছে। সেকালে গয়নায় সাজানো বা সাজা একটা সাধারণ ব্যাপার ছিল। সেকালে ঐশ্বর্য প্রদর্শনের দম্ভ ছিল। কে কাকে টেক্কা দিয়ে কত বেশী সোনা গায়ে চাপাতে পারেন সেরকম প্রতিযোগিতা প্রায়ই প্রকাশ পেতো। সে প্রতিযোগিতার দিন ফুরিয়েছে, সে ক্ষমতাও মানুষের আর নেই। যার যতটুকু আছে, সেটুকু কত যত্নে গোপনে রাখতে পারেন তারই প্রচেষ্টা চলছে।

আসল জিনিষকে গোপনে সরিয়ে রাখার প্রচেষ্টা চললেও গয়না ব্যবহারে কিন্তু কোন কমতি নেই। তাঁরা আসল জিনিষ ব্যবহার না করে নকল জিনিস ব্যবহারে মনের সখ-আহ্লাদ মেটাচ্ছেন। অনেক বাড়ীর অভিভাবকরা তাঁদের বাড়ীর মেয়েদেরও নকল গয়না পরতে উৎসাহিত করেন। খানিকটা আর্থিক সঙ্গতির অভাব, খানিকটা দুর্দিনের তাগিদে। তাই বাজারে হরেক রকম নকল গয়না উঠছে যা দেখলে আসল-নকলে সন্দেহ জাগে। নকল গয়নার দৌলতে ভারী গয়নার চলনটা একেবারেই উঠে গেছে বললেই হয়। তারপর রুচির পরিবর্তন হয়েছে। এখনকার মেয়েরা আর চওড়া ভারী জিনিস ব্যবহার করতে পছন্দ করেন না। ছিমছাম রুচিসম্মত জিনিসে যতদূর নকল কম বোঝা যায় সেরকম জিনিসটাই ব্যবহার করেন।

আসল গয়নার চলন কমে গিয়ে নকল গয়নার বাজার ছেয়ে গেলে বা মেয়েরা ব্যবহার করলেও কিন্তু একটা জায়গায় নকল গয়নার এখনও চলন হয়নি সে উৎসবে আসল গয়নাটি হিসেব মত ঠিকঠিক চাই-ই চাই, সে হচ্ছে আমাদের বিবাহ নামক উৎসবটি। সে উৎসবে এখন গয়না নিয়ে সকলে নিক্তির ওজনে না মাপলেও আকার ইঙ্গিতে জেনে নেবেন মেয়ের বাবা মেয়েকে গয়না কম করেও কতটা দিচ্ছেন। ছেলে বিয়ে দেবার সময় ছেলের বাবা বা অভিভাবক প্রায়ই ভুলে যান নিজের মেয়ের বিয়েতে তিনি কটা অলঙ্কারে মেয়েকে সাজিয়ে দিয়েছন বা ভবিষ্যতে দেবেন। ছেলের বিয়েতেই তাঁর অন্য চেহারা। সবচেয়ে দুঃখের লেখাপড়া শিখে আমাদের দেশের অনেক ছেলেদের এখনও সে বলিষ্ঠতা আসেনি তাঁরা কিন্তু এ ব্যাপারে পিতামাতার একান্ত বাধ্য।

দিনকয়েক আগে এক বিবাহ বাসরে কন্যার পিতা হবার অপরাধে এক ভদ্রলোক সব মান-সম্মান বিসর্জন দিলেন। বিয়ে শুরু হবার কিছু বাকি পাত্রপক্ষের একজনের হঠাৎ নজরে পড়লো মেয়ের গায়ের গয়নায়। গয়নার ডিজাইন চওড়া হলেও ওজনে হালকা এটা তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য করলেন ও অন্যদের লক্ষ্যে আনলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাত্রপক্ষের সকলের মধ্যে একটা গুঞ্জন চলতে লাগলো। এ গুঞ্জনের রেশ ক্রমে ক্রমেই এসে পৌঁছুলো পাত্রীপক্ষের সকলের কাছে। প্রমাদ গুনলেন কন্যার পিতা। তিনি আতঙ্কিত হলেন। কোনরকমের গন্ডগোল পাকাবার আগেই তিনি অত্যন্ত বিনীতভাবে পাত্রের পিতাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন এবং বারবার অনুরোধ করলেন এ নিয়ে যেন কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। নিজের স্বল্প সাধ্যের কথাও জানালেন। উপরন্তু বাঙ্গালী পরিবারের মেয়েদের ভাগ্যে এসব ঘটনায় যে দুর্ভাগ্য ঘটে থাকে তা যেন না ঘটে সেজন্য অনুরোধ জানালেন। এ অনুরোধে মন ভোলে না আমাদের মত হতভাগ্য দেশের অনেক পাত্রের পিতাদের। তিনি অবশ্য অতটা অনমনীয় বা দৃঢ়তা নিয়ে পাত্রকে বিবাহবাসর ত্যাগ করতে বাধ্য করবেন সেকথা বললেন না কিন্তু তিনি কঠিনস্বরে জানিয়ে দিলেন তাঁর মত সদাশয় লোক বলেই এ যাত্রা বেঁচে গেলেন। উপরন্তু আক্ষেপ করলেন এ ধরনের মেয়েদের বাবাদের সঙ্গে বিয়ের আগেই সোনা-দানা অর্থাৎ পাওনা-গন্ডার ব্যাপারটি পাকাপাকি সেরে নেওয়াই উচিত ছিল।

পাত্রীর পিতা কথাগুলো শুনে মরমে মরে গেলেন, তবুও প্রতিবাদ করার উপায় নেই। তিনি এই দেশের অভাগা মেয়েদের একজন পিতা। যা হোক, ভয়ানক কিছু না ঘটলেও ঘটনাটি যে মর্মস্পর্শী আজকের দিনে আমরা সবাই অন্ততঃ এটুকু উপলব্ধি করতে পারবো আবার এ ঘটনাও বিরল নয় এই ব্যক্তিটিই যিনি কন্যার বিয়ে দিতে গিয়ে মান-অপমান সব কিছু মুখ বুজে সয়ে কন্যাদায় থেকে মুক্তি পেলেন তিনিই আবার হয়তো নিজের ছেলের বিয়ে দিতে গিয়ে পাত্রের পিতা হিসেবে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি করবেন।

আমাদের বেঁচে থাকবার জন্য সমস্যার অন্ত নেই। সেসবের অনেক কিছু দূর করবার ক্ষমতা আমাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় আমরা অনেক সমাজ সংস্কারকের কাজ করতে পারি। একটু উদার মনোভাব নিয়ে পরস্পরকে বিচার-বিবেচনা করলে অনেক কিছু ভুল বোঝাবুঝি, অনেক কিছু অঘটনের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারি। বিয়ের আসরে পণের নির্দিষ্ট টাকা, সোনা-দানা নিয়ে বিরোধ এখনও লেগেই আছে, সোনার দাম যতই বাড়ুক পাত্রের পিতা হলে সেকথা বিস্মৃত হওয়া খুব সাধারণ ঘটনা।

—অঞ্জলি চৌধুরী

রূপসীর খাতা

চোখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে বা পরিপূর্ণ করতে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করে ভুরু। অনেক সময় সুসজ্জিত একটি মুখের দিকে চেয়ে মনে হয় কি যেন নেই—কিম্বা কি যেন বেশী আছে—তখন বেশ নজর করে দেখলে বোঝা যায়, তা ভুরু। কারুর ভুরুর নামমাত্র রেখা দেখা যায়, তাতে যথেষ্ট চুল না থাকায় কপালটা বড় দেখায় আর চেহারায় ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠে না। সেই সব ক্ষেত্রে ভাল ভুরু আঁকার পেনসিল দিয়ে কিম্বা 'মাসকারার' তুলি দিয়ে ভুরুর ওপর হাল্কা রেখা আঁকা উচিত। তবে মাসকারার বা পেনসিলের রং বেছে নেওয়ার সময় যত্ন নিতে হবে। সাধারণত কালো রং নেওয়া উচিত। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে যেখানে চোখ কটা সেখানে দেখতে হবে কালো রংটা যেন কুচকুচে কালো না হয়, একটু তামাটে হয়। যাদের ভুরু খুব মোটা তাদের যদি কপাল চওড়া হয় তাহলে ভুরুর অতিরিক্ত চুলগুলি উঠিতে দিতে হবে। প্রথমে ভুরু দুটির ওপর কালো পেনসিল দিয়ে গাঢ় করে এঁকে নিতে হবে যতোটা রাখলে ভাল হয় সেই মতন তারপর সেই রেখার বাইরে চুলগুলি ভুরুর চুল তোলার সন্না দিয়ে তুলে ফেলতে হবে। তবে এটা সর্বদা মনে রাখা উচিত, মোটা ভুরু সরু করা ভাল, কিন্তু ঘন ভুরুতে আবার পেনসিল দেওয়া ভাল দেখায় না। চুল তোলার সময় একটু ক্রিম লাগিয়ে নেওয়া ভাল। তবে প্রথম প্রথম একটু লাগে, কিন্তু পরে কোন কষ্টই হয় না।

অনেকে ভুরুর যেখানে শেষ তারপর পেনসিল টেনে ভুরু লম্বা করে থাকেন। সেটা খুবই খারাপ দেখতে হয়। একটা কথা প্রসাধনের সময় মনে রাখতে হবে যে, প্রসাধনের মধ্যে একটা ন্যাচারাল লুক থাকা দরকার। তাতে অনেক বেশী ভাল দেখায় ও বুদ্ধিদীপ্ত মনে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে বেশীর ভাগ মহিলা প্রসাধন করার সময় এটা ভুলে যান, কিম্বা মনে করেন যে প্রকটভাবে প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবহার দেখাতে পারলে ভাল হয়। এসব ধারণা ভীষণ ভুল।

যাঁদের জোড়া ভুরু তাঁরা নাকের ওপরের জোড়া অংশ ওই একই নিয়মে তুলে দিতে পারেন। ভুরু যেখানে শেষ তারপর কোন বাড়তি রেখা টানা উচিত নয়। তবে খুব ছোট হলে ভুরুর শুরু থেকেই রেখা টানতে হবে এমন সূক্ষ্ম হাতে যার ফলে বাড়তি রেখাটা বিশেষ নজরে না পড়ে। অনেক চেহারায় ছোট ভুরু বেশী মানায় যেমন যাদের ছোট কপাল আর চোখ একটু ভেতরের দিকে ঢোকা। ভুরুর সঙ্গে চোখ ও কপাল-এর আকার বিশেষভাবে জড়িত। তাই ভুরু আঁকার সময় বা ভুরু তৈরী করার সময় সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। যাঁদের কপাল চওড়া, বড়, তাঁরা ভুরু বেশী সরু করবেন না। তাছাড়া ভুরুর শেষ ভাগ একটু নিচের দিকে নামিয়ে দেবেন। যাঁদের খুব ছোট কপাল আর কপালের দুপাশ ঘেঁষে চুল তাঁদের ভুরু ছোট গোল আর সরু করতে হবে। মোটামুটি ভুরুর সম্বন্ধে এই আলোচনাটুকুই যথেষ্ট। তবে প্রয়োজন বোধে আরও আলোচনা করা যেতে পারে।

এরপর নাক, কান, গাল, চিবুক চোয়াল ইত্যাদির মাঝে আসা যাক। তবে এগুলি আলাদাভাবে আলোচনা না করে মুখের প্রসাধনের সঙ্গে সঙ্গে করা হবে। আমি আগেও বলেছি, আবার বলছি, প্রসাধনের আগে কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন—বয়স সময় কাল ও কি ধরনের উৎসবের জন্য সাজ।

শীতকাল দিয়েই শুরু করছি। মুখের ত্বক ভাল রাখার জন্য কি করতে হবে তা আগেই আলোচনা করেছি। তবে প্রসাধনের আগে কি কি করা ভাল সে সম্বন্ধে আলোচনা করবো প্রথমে। শীতকালে আমাদের চামড়ায় টান ধরে আর তৈলাক্ত ভাব নষ্ট হয়। সেইজন্য প্রসাধনের সময় মুখের ওপর তৈলাক্ত ভাব আনা সবচেয়ে প্রথম কাজ। একেবারে দেশীমতে, কমলালেবুর খোসা বেটে দুধের সর আর সামান্য অলিভতেলের সঙ্গে বেশ করে ফেটিয়ে নিতে হবে। তার-পর সেটা মুখে মেখে রেখে মিনিট ১০-১২ পরে আঙুলের ডগা দিয়ে ঘসে ঘসে

ডুলে দিতে হবে। এতে মুখের ত্বকে ময়লা জমতে পারে না ও মসৃণ হয়। এইভাবে রোজ সকালে করতে পারলে খুবই ভাল, আর সময়ের অভাব হলে ২।১ দিন অন্তর। এছাড়া কাঁচা হলুদ বেটে মাখলেও ভাল। এরপর একবার ঠান্ডা ও একবার গরম জলে উল্টো-পাল্টা করে ধুয়ে নিলে খুব উপকার হয়। আগেই বলেছি—সাবান না মাখাই সবচেয়ে ভাল। কেবল মাত্র রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে সাবান গরম জল দিয়ে মুখ ধোয়া যায়।

এবার আসা যাক ঠিক প্রসাধনের আগে কি করা উচিত। যদি কোন উৎসব থাকে রাতে, বেশী আলোর মাঝে, তাহলে প্রসাধন-এর রং একটু চড়া হবে। মুখ প্রথমে তুলো আর ভাল ক্লিনজিং মিল্ক দিয়ে মুছে ফেলতে হবে। মুখে সব কিছু করার সময় মনে রাখতে হবে যে, আঙুল চলবে নিচ থেকে ওপরের দিকে। প্রথমে গলার নিচ থেকে চোয়াল ও থুঁতনী পর্যন্ত উঠবে। তারপর নাকের পাশ থেকে আঙুলের ডগা গোল করে ঘুরিয়ে গালের ওপর দিকে টানতে হবে। তারপর নাকের দুপাশ থেকে ভুরুর কাছ পর্যন্ত দুই দিক থেকে টানতে হবে। এইভাবে মুখ পরিষ্কার হবে। ঠিক সেই-ভাবে মুখের ওপর সব রকম প্রলেপ দিতে হবে।

প্রথমে হাতের তেলোতে চারমিস ক্রিম একটু নিয়ে তার সঙ্গে ফাউন্ডেশান মেলাতে হবে। তারপর সেইটা মুখের ওপর বেশ করে সমানভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। গলা কান ঘাড় সব জায়গায় সমানভাবে মাখতে হবে—যাতে রঙের সমতা থাকে। এরপর লিপস্টিক ডান হাতের আঙুলের ডগায় লাগিয়ে গালের ওপর লাগাতে হবে। কিন্তু এই লাল রং ওই একই পদ্ধতিতে গালের ওপর ঘুরিয়ে লাগাতে হবে। যাদের গাল বেশী ফোলা বা একটু নিচের দিকে ঝোলা তাঁরা লালরং খুব হাল্কা করে যথাসম্ভব কম দেবেন। ফাউন্ডেশানের শেড বাছার সময় বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। সাধারণত ভুল করা হয় যে, যাঁদের রং শ্যামলা বা একটু চাপা তাঁরা ন্যাচারাল রং ব্যবহার করেন। কিন্তু তা উচিত নয়। তাঁদের শেড একটু চড়া হওয়া উচিত। যেমন সান ট্যান, গোল্ডেন ট্যান ইত্যাদি। যাঁরা খুব ফর্সা বা রং যাঁদের ফর্সার দিকে তাঁদের ন্যাচারাল শেড ব্যবহার করা ভালো। গালের রং লাল না রেখে গোলাপী ব্যবহার করা উচিত। যাঁদের নাক ছোট তাঁদের নাকের দুপাশে ওপরের দিকে লাল লিপস্টিকের টান দিয়ে আস্তে আস্তে মিলিয়ে দিতে হবে। তার ফলে নাক উঁচু দেখাবে। ক্রিমের বদলে বোরোলীন দিয়েও ফাউন্ডেশান লাগালে ভাল হয়। এরপর তুলো দিয়ে আস্তে আস্তে সারা মুখের ওপর থুপে দিলেই মুখের প্রসাধন শেষ হবে। এর সঙ্গে চোখ ও ভুরু তো হবেই। শীতকালে দিনের বেলা বেরুলে মুখে ক্রিম মাখা চলবে না। আর গালে রংও ভাল লাগে না। বাড়ীতে ফিরে মুখ আগে বলে দেওয়া পদ্ধতি অনুসারে পরিষ্কার করে ঠান্ডা জলে তুলো ভিজিয়ে মুখের ওপর থুপে থুপে দিতে হবে। এতে চামড়ায় ব[illegible]কার ছাপ পড়ে না।

গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যেবেলা বেরোবার সময় কতকগুলি বিষয় খেয়াল রাখা প্রয়োজন। যাঁরা খুব বেশী ঘামেন তাঁরা সাজবার আগে বেশ কিছুক্ষণ ঠান্ডাজলে তুলো দিয়ে মুখের ওপর থুপে হাওয়ায় বসে মুখ শুকিয়ে নেবেন, তারপর প্রসাধন। বোরোলীন বা ক্রিম নামমাত্র ব্যবহার করা ভাল। আর সব শেষে পাউডারের পাফ-এর মধ্যে সামান্য প্যাউডার দিয়ে থুপে থুপে আলগোছে মুখের ও গলার ওপর দিতে হবে। এছাড়া ক্লিনজিং মিল্ক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে তুলো লোশন-এ ভিজিয়ে মুখে মাখিয়ে রাখাটা গ্রীষ্মকালে বিশেষ উপকারী। তার-পর প্রসাধন শুরু করা ভাল।

গ্রীষ্মকালের দিনের বেলা মুখে গালে কিছু না মাখাই সবচেয়ে ভাল। শুধু মাত্র মুখ পরিষ্কার করে বেরোন যুক্তিযুক্ত। প্রসাধন সব সময় সব কালে চলে না। শুধু তাই নয়। অনেক সময় প্রসাধনের মাত্রার ভুলে সুন্দর চেহারাও কুৎসিত দেখায়। চড়া প্রসাধন একমাত্র শীতকালেই চলে।

—বহ্নিবর্ণিনী

মাদুরে গা এলিয়ে চুপচাপ একটানা
ড়ে থাকতে লীলার ভালো লাগে না। কেমন
ন্বস্তি হয়। নিঝুম দুপুরটা ভারী হয়ে
গে বসতে থাকে বুকের মধ্যে, যেন দম
ধ করে আনে। দরমার বেড়ায় চিকরি-
টা জানালা দিয়ে তেমন হাওয়া আসে না,
ন্য দরজা হাট করে খোলা। মিঠে হাওয়া
লা দরজা দিয়ে ঢুকে ঘরময় লুটোপুটি
র, লীলার শরীর তবু জুড়োয় না। সে
রবার পাশ বদলায়, তার সারা গা ঘামে
জব করতে থাকে। ছটফটিয়ে ওঠে সে।

একপাশে মা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ছোটো
ই দুটোর পাত্তা নেই—কোন মতে দাওটা
খে দিয়ে ওরা উধাও হয়েছে বহুক্ষণ।
ষালদের আমবাগানে গেছে হয়তো, দল-
জুটিয়ে গাছতলায় হুটোপাটি করছে।

নিঃসঙ্গ দুপুর বড় মন্থর, দীর্ঘ মনে
। ক্লান্তি আসে। লীলা হাই তোলে।
ট কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খায়। তারপর
র শুয়ে পড়ে। একা একা শুয়ে থাকতে
কতে লীলা হাঁপিয়ে ওঠে।

আসলে দুপুরবেলা শোয়ার অভ্যেস
নেই লীলার। এ রকম সময়ে বাড়িতেই
থাকে না ও। রোজই অনেক ভোরে বেরোতে
হয় ওকে। ফার্স্ট ট্রেন ধরে দশ দশটা ইস্টিশান
পার হয়ে ও যায় আমতলির বাজারে।
ওখানে চাল নিয়ে বসে। সারাটা দিন চালের
বেলাক কবে যে দুটো পয়সা উপায় করে
লীলা তাই দিয়ে কোনমতে ওদের সংসার
চলে। দুপুরে বাড়ি আসা হয় না লীলার,
আমতলির বাজারেই চা-পাউরুটি বা যা-হোক
কিছু খেয়ে নেয়। একেবারে বিকেলের বিক্রি
বাটা সেরে সন্ধ্যের পর বাড়ি ফেরে।

লীলা আজ যায়নি। রোজকার মতই
ভোর রাতে মা ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু
লীলা ওঠেনি। আবার পাশ ফিরে শুয়েছিল।
বলেছিল, আজ যাব না, শরীরটা ভাল নয়।

ব্যস্ত হাত কপালে ঠেকিয়ে মা বলে-
ছিল, কই, গা তো ঠাণ্ডা।

লীলা বলেছে—জ্বর নয়, মাথার কষ্ট।
যন্ত্রণা হচ্ছে খুব।

লীলার শরীর একটু বেচাল হলেই মা
খুব অস্থির হয়ে পড়ে। লীলাই এখন এ
সংসারের একমাত্র ভরসা। ওর পাশে বসে
কোমল হাতে মা ওর মাথাটা আস্তে আস্তে
টিপে দিয়েছিল। অনেকক্ষণ। কিন্তু লীলার
অস্বস্তি হচ্ছিল। শরীর খারাপ না কিছু
না, খামোখা এভাবে বিছানায় পড়ে থাকার
জন্যে তার মন খুঁত খুঁত করছিল। একটা
দিনের বিক্রি-বাটার রোজগার তাদের মত
গরীবের সংসারে নেহাত হেলাফেলা করবার
মত নয়। কিন্তু আমতলির বাজারে যাওয়ার
কথা ভাবলেই লীলার বুকের মধ্যে গুড়গুড়
করে উঠছিল। ভয়ে।

গতকাল সন্ধ্যের সময় বিশু আচমকা
যে কাণ্ডটা করেছিল সেকথা মনে আসার
সঙ্গে সঙ্গেই লীলার শরীরটা লজ্জায় ভয়ে
আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। কাল কী যে হয়েছিল
বিশুর কে জানে, কিন্তু ও যে কোনো দিন
এমন করতে পারে লীলার ধারণায় ছিল না।
মাজিনাদি অবশ্য অনেকদিন আগে একবার
সাবধান করে দিয়েছিল ওকে, পুরুষ মানুষ-

এর সঙ্গে অত মিশতে যাস নে লীলা, বিপদ হবে।

লীলা ইঙ্গিতটা বুঝেছিল। কিন্তু গায়ে মাখেনি উড়িয়ে দিয়েছিল। হেসে বলেছিল, বিশুদা সে রকম ছেলে নয় মলিনাদি।

ঠোঁট বেঁকিয়ে মলিনাদি বলেছিল, ও রকম ঢের বিশুদা দেখেছি আমি, তুই আর আমাকে পুরুষ মানুষ চেনাস নে লীলা। গোড়ায় গোড়ায় সবাই অমন ভিজে বেড়ালের মত থাকে।

—পুরুষ জাতটার ওপর তোমার খুব রাগ, না মলিনাদি?

কালো কোলো কুঞ্চিত চেহারা মলিনাদির। ওর স্বামী ওকে নেয় না, বাপের বাড়িতে ফেলে রেখেছে 'আজ কত বছর হয়ে গেল। লীলার কথায় দপ করে জ্বলে উঠেছিল মলিনাদি। বলেছিল, আমার তো আছেই,' তোরই বা রাগ থাকবে না কেন? নিজের দিদির কথা ভুলে গেলি এরই মধ্যে?

দিদির কথা মনে পড়ে যায় লীলার। সেও লীলার মতই চাল বেচতে যেত উল্টো-ডিঙ্গি বাজারে। তারপর একদিন ট্রেনে কাটা পড়ল। লোকে বলে, কাটা পড়ে নয়—লীলার দিদি মরেছে ইচ্ছে করেই। ওর না কি পেটে বাচ্চা ছিল। কুমারী মেয়ে ট্রেনের তলায় পড়ে নিজেকে লজ্জার দায় থেকে বাঁচিয়েছে।

লীলার বয়েস তখন তের। ভাই দুটো একেবারে ছেলেমানুষ, সুতরাং রোজগারের ভারটা লীলার ওপরই এসে পড়ল। দিদির জন্যে শোক ছিল দুঃখ ছিল, কিন্তু পেটের খিদে এক ভয়ঙ্কর সর্বনাশা বস্তু। রোগ শোক দুঃখ কিছুই মানে না সে। সব তার কাছে তুচ্ছ। খিদের জ্বালায় শোক মাথায় উঠল। প্রায় রাতারাতিই চালউলি বনে গেল লীলা। প্রথম প্রথম দিন কতক মা সঙ্গে ছিল। পরে আর পারেনি। চাল বেচাকেনার ঝক্কিটা তো আর সহজ নয়। দৌড়ঝাঁপ, হাঙ্গামা হুজ্জুত অনেক। রীতিমতো গতরের জোর চাই। কিন্তু মার শরীর বরাবরই বেজুত। এত পরিশ্রম এত ধকল মার সইল না। অল্প দিনেই একেবারে কাহিল হয়ে পড়ল। তারপর থেকে লীলা একা একাই চাল নিয়ে আমতলির বাজারে যায়। যেতে হয়।

বিশুর সঙ্গে লীলার আলাপ ওই আমতলি বাজারেই। প্রায় বছরখানেক আগে। আচমকাই আলাপটা হয়ে গিয়েছিল। সেদিনটাতেও পুলিশের হামলা এসেছিল। প্রায়ই যেমন আসে তেমনি। একটু বেলার দিকে। পুলিশের কালো গাড়িটা এসে থামতেই হুড়োহুড়ি পড়ে গেল চাল-বেচা মানুষগুলোর মধ্যে। যে যেদিকে পারল হন্যে হয়ে ছুটল। মলিনাদি কোথায় ছিটকে গেল কে জানে। উর্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে লীলাও বাজারের ভিতরে একটা সরুমত গলিতে ঢুকে পড়েছিল। অল্পদূর এসেই বিভ্রান্তের মত ও দাঁড়িয়ে গেল হঠাৎ। সামনে পথ বন্ধ, এটা যে কানাগলি আগে বোঝা যায়নি—ওদিকে পিছনে পুলিশের ভারী বুটের আওয়াজ। কী করবে বুঝতে না পেরে দিশেহারার মতন সামনের দোকানটাতেই ঢুকে পড়েছিল লীলা।

দরজির দোকান। অল্পবয়েসী জোয়ান একটি ছেলে সেলাই মেশিনের ওপর ঝুঁকে কী একটা সেলাই করছিল আপনমনে। হঠাৎই একটি যুবতী মেয়েকে ঝড়ের মতো তার ঘরে ঢুকে পড়তে দেখে চমকে উঠেছিল সে। অবাক চোখে খানিকটা সময় লীলার দিকে তাকিয়ে থেকেছিল। চেয়ে থাকতে থাকতেই ব্যাপারটা ধরে ফেলেছিল তারপর। লীলার পায়ের কাছে নামিয়ে রাখা চালের ছোটোখাটো বস্তাটা চোখে পড়তেই বুঝতে আর কিছু বাকি থাকেনি তার।

নিঃশব্দে মেশিন ছেড়ে উঠে পড়েছিল জোয়ান ছেলেটা। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে রাস্তার এদিক-ওদিক দেখেছিল বারকয়েক। তারপর লীলার কাছে এসে বলেছিল, নাঃ আর ভয় নেই, ফিরে গেছে পুলিশটা।

লীলা তখনো কাঁপছে। ঘামছে দরদরিয়ে। ছেলেটার কথা শোনার পর কাঁপা-হাতে আঁচলের কোন দিয়ে মুখ মুছল সে। তারপর সারা ঘরটায় চোখ বোলাল।

ঘরের একপাশে সেলাই মেশিন, পিছনে বসার জন্যে উঁচু টুল। অন্য পাশে একটা তক্তপোষ। তার ওপর বিছানা, একধারে গোটানো।

তক্তপোষের দিকে আঙুল দেখিয়ে ছেলেটা বলেছিল, বোসো না ওখানে। জিরিয়ে নাও একটু।

তক্তপোষের একধারে লীলা বসেছিল। জড়োসড়ো হয়ে। বসে বারবার ঠোঁটে জিভটা বোলাচ্ছিল সে। অনেকটা পথ দৌড়তে হয়েছে তাকে। পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল তার। অনেকটা সংকোচের সঙ্গে শুকনো গলায় লীলা বলেছিল, জল আছে?

—জল খাবে, দাঁড়াও দিচ্ছি, বলে ছেলেটা নিজেই ঘরের এক কোণে রাখা কুঁজো থেকে কাচের গেলাসে জল গড়িয়ে লীলার দিকে বাড়িয়ে ধরেছিল। বলেছিল, একটু চা হলে বোধহয় ভাল হত। খাবে?

সঙ্কুচিত গলায় লীলা বলেছিল, না না চায়ের দরকার নেই।

—আরে, অত লজ্জা করছ কেন, এ সময় তো আমি নিজেও চা খাই একবার। তুমি খাও এক কাপ, গরম চা খেলে শরীর কেমন ঝরঝরে লাগে দেখো।

পায়ে চটি গলিয়ে ছেলেটা বেরিয়ে গিয়েছিল। দু হাতে ছোটো ছোটো দুটো কাচের গেলাসে চা নিয়ে ফিরে এসেছিল একটু বাদে। একটা গেলাস নিজে নিয়ে অন্যটা লীলাকে দিয়েছিল।

ছেলেটার ব্যবহারে রীতিমতো অবাক হয়েছিল লীলা। ওর দরদ, ওর আন্তরিকতায় মুগ্ধ না হয়ে পারেনি সে। চাল বেচা-কেনা করতে গিয়ে অনেক রকম মানুষের সংস্পর্শে এসেছে লীলা। কত লোক ওর ওপর দরদ দেখিয়ে মিশতে চেয়েছে ওর সঙ্গে। কিন্তু তাদের আসল মতলব বুঝে ফেলতে দেরি হয়নি লীলার। ওর মনে হয়েছিল, এ ছেলেটা সে-রকম নয়। বয়সে ছেলেটা জোয়ান অথচ এখনো একটা সংকোচ কোমলতায় উজ্জ্বল ওর মুখ-চোখ। সেখানে কোনো মতলবের ছায়া দেখতে পেল না লীলা।

চা খেতে খেতে টুকটাক কথাবার্তা চলতে লাগল। সংকোচ কাটিয়ে আস্তে আস্তে লীলাও সহজ হয়ে উঠল। তারপর আলাপটা জমে উঠল এক সময়। ছেলেটা নিজের নাম বলেছিল। বিশু। বিশ্বনাথ কর্মকার। সবাই বিশু বলে ডাকে। সংসারে দাদা-বৌদির সঙ্গে বনিবনা হয়নি। একা থাকে। দোকানে শোয়, এখানেই নিজে রেঁধে বেড়ে খায়। যেদিন হাঁড়ি ঠেলতে ইচ্ছে করে না, হোটেলে খেয়ে নেয়। লীলার কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিয়েছিল বিশু। লীলা কোথায় থাকে, ওর সংসারে কে কে আছে, কীভাবে চলে ইত্যাদি। দিদির কথা উঠেছিল। কীভাবে দিদির মৃত্যুটা হয়েছে বলতে গিয়ে লীলার চোখ দুটো ছলছল করে উঠেছিল। বিশু তখন আর লীলার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারেনি চোখ দুটো নামিয়ে নিয়েছিল। সেই মুহূর্তেই লীলার জানা হয়ে গিয়েছিল, বিশুর ভিতরে মায়া বস্তুটা একটু বেশি।

প্রথম আলাপের দিন থেকেই বিশুর দোকানে চাল রাখার বন্দোবস্তটা পাকা হয়ে গিয়েছিল। প্রস্তাবটা দিয়েছিল বিশু নিজেই। এতে অনেক সুবিধে হয়েছিল লীলার। সবটা চাল রোজ বিক্রি হয় না, প্রায়ই বেশ কিছুটা বেঁচে থেকে যায়। সন্ধ্যের পর বাড়তি চালটা বস্তাবন্দী করে বিশুর দোকানে রেখে নিশ্চিন্তে ঝাড়া হাত-পায়ে বাড়ি ফিরে যায় লীলা। এভাবেই দিন গড়িয়ে যায়, একটার পর একটা মাস কাটতে থাকে। বিশুর সঙ্গে মেলামেশা বাড়ে, আস্তে আস্তে বিশু জীবনের সঙ্গে অনেকটা জড়িয়ে যায় লীলার। সাধারণ পরিচয়ের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে নি... ক্রমশ এগোতে থাকে। প্রথম আলাপের পর দিন কয়েক যেতে না যেতেই বিশু বলেছিল, তুই তো অনেক সকাল-সকাল আসিস লীলা —তা এসে স্টোভটা ধরিয়ে একটু চা করে

তো পারিস। আমিও ঘরে বসে চা-টা পাই; তোরও খাওয়া হয়।

কোনো কোনো দিন সকালে লীলার আসতে দেরি হয়ে যায়। ট্রেন লেট থাকে কিংবা লীলা সময়মতো একেবারে ভোরের গাড়িটা ধরতে পারে না। এরকম হলে বিশু বলে, এখন পর্যন্ত চাই খাইনি জানিস, হা-পিত্যেশ করে বসে আছি তোর জন্যে। কী যে অভ্যেস হয়েছে তুই আসার পর থেকে দোকানের চা আর মুখে রোচে না রে লীলা —কী চমৎকার চা করিস না তুই।

ভ্রুভঙ্গি করে লীলা বলেছে থাক আর গুণ গাইতে হবে না। ও সব বুঝি—খালি কাজ করিয়ে নেবার ফিকির।

শুধু চা নয়, মাঝে-মধ্যে লীলাকে দিয়ে রান্নাটাও করিয়ে নেয় বিশু। লম্বা হাই তুলে এক-একদিন বলে, ইস, কত বেলা হয়ে গেছে—কখন রাঁধব বল দিকি লীলা? তুই দিবি একটু ভাতে-ভাতটা চড়িয়ে—আমি ততক্ষণে চানটা সেরে আসি।

পুরুষ মানুষ—শুধু ভাতে-ভাত দিয়ে পেটের ভাত খাবে ভাবতে লীলার খারাপ লাগে। আনাজ-পত্তর যা থাকে, তাই দিয়েই চটপট একটা তরকারি বানিয়ে দেয় সে। খেতে বসে তরকারীটা মুখে দিয়েই বিশু লীলার রান্নার তারিফ করে। প্রায়ই বলে, বাঃ ঝাল হয়েছে। একদিন একটু মাংস রেঁধে খাওয়া না রে লীলা।!

লীলাও বলে, এনো।

তারপর একদিন সত্যি সত্যিই মাংস আনে বিশু। বেশ অনেকটা মাংস। লীলা বলে, এত কি হবে?

—দুজনে খাব এটুকু না হলে হবে কি করে?

—দুজনে মানে—আমি কিন্তু খাব না আগেই বলে দিচ্ছি।

—তোর বড্ড ঢং লীলা! বিশু রেগে যায়, থমথমে গলায় বলে — না খাস তো রাস্তায় ফেলে দে কুকুরে খাক।

অগত্যা লীলাকেও সেদিন খেতে হয়: বিশুর সঙ্গে একই সময়ে। পরে খাব বললে বিশু শোনে না, চান করে এসে চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকে। যতক্ষণ লীলা না বসে ততক্ষণ ভাতের থালায় হাত দেয় না।

খাওয়া-দাওয়ার পর দোকান থেকে দু খিলি পান নিয়ে আসে বিশু। এক খিলি লীলাকে দিয়ে অন্যটা নিজের মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে বলে সিনেমায় যাবি লীলা? চ না—খুব ভালো একটা বই এসেছে অজন্তা টকীজে।

লীলার লোভ হয়। কিন্তু কী ভেবে নিজেকে সামলে নেয় সে। বলে অন্য একদিন যাব আজ থাক। গা-টা কেমন গুলোচ্ছে।

এভাবেই বিশুর সঙ্গে মিষ্টি-মধুর অন্তরঙ্গ দিনগুলি কাটাচ্ছিল লীলার। নিজেকে আর শুধু চালউলি মনে হয় না তার। সেও স্বপ্ন দেখতে সুরু করে। ভিন্ন এক জীবনের ছবি প্রতিমার পিছনকার চালচিত্রের মতই বর্ণময় হয়ে ওঠে তার চোখের সামনে। যেন ঘোর লেগে যায় লীলার। তারপর হঠাৎ-ই কেমন একটা ছন্দপতন ঘটে গেল গতকাল। সন্ধ্যে নাগাদ বিশুর দোকানে ফিরে লীলা চালের বস্তাটা সবে নামিয়েছে বিশু বলল—তোর জন্যে একটা জিনিস করেছি নিবি?

লীলা কৌতূহলী চোখে ওর দিকে তাকাতে একটা আকাশী রঙের ব্লাউজ বাড়িয়ে ধরে বিশু বলেছিল নে এটা গায়ে দে—দেখ ঠিক ঠিক হয়েছে কী না!

বলে বিশু দোকান থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়েছিল বাইরে থেকে।

বিশু ফিরে এসেছিল বেশ কিছুক্ষণ বাদে। ততক্ষণে লীলা নতুন ব্লাউজটা পরে ফেলেছে। ঘরে ঢুকে বিশু কয়েক মুহূর্ত অপলকে লীলাকে দেখেছিল তারপর বলেছিল—চমৎকার লাগছে তোকে। আসলে কি জানিস, এই রঙটাতেই তোকে বেশি মানায়—ওসব লাল-কালো আর পরিস না তুই।

—কেন?

—বিচ্ছিরি দেখায়। তোর যা গায়ের রং তাতে এই সব রঙের শাড়ি-ব্লাউজেই তোকে ভালো মানায়।

লীলা মুখ ভার করেছিল। থমথমে গলায় বলেছিল বুঝেছি—তার মানে আমি কালো, কুচ্ছিত।

—অমনি রাগ করলি তুই কী বলতো লীলা! বিশু এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ খপ করে লীলার একখানা হাত চেপে ধরে বলেছিল তোকে আমি কত সুন্দর দেখি তুই কী বুঝিস না।

লীলা শিউরে উঠল। কেমন যেন হচ্ছে তার। কী এক নেশায় চোখ ঢুলে আসছে, শরীর এরকম এলিয়ে আসছে কেন? আচমকা দিদির কথা মনে এল। সর্বনাশের সুরু কী এইভাবেই হয়? দিদিরও কী এমনি হয়েছিল? লীলা ভয় পেয়ে যায়। এক ঝটকায় বিশুর হাত থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নেয় সে। তারপর বিশুকে হতভম্ব করে দিয়ে হন হন করে বেরিয়ে যায় দোকান থেকে।

কাছাকাছি কোথায় একটা চিল ডেকে উঠল আচমকা। তীক্ষ্ণ তীব্র গলায়। নীরব দুপুরটাকে স্বরের করাত দিয়ে চিরে দিল যেন। লীলার সংবিত ফিরল। পাশ ফিরে দেখল মা কখন উঠে গিয়েছে। হয়তো এঁটো বাসনের গাদা নিয়ে মাজতে বসেছে পুকুর ঘাটে।

বিশু কী করছে কে জানে। লীলা সকালে যায়নি দেখে নিশ্চয়ই খুব মন খারাপ করছে ওর। হয়তো খাওয়া-দাওয়া না করে কাজ-কর্ম ফেলে বসে আছে চুপচাপ। লীলারই কী ভাল লাগছে কিছু? বিশুর সঙ্গে দেখা করার জন্যে খানিকক্ষণ কথা-টথা বলার জন্যে তার ভিতরটাও তো ছটফট করছে সেই কখন থেকে। কিন্তু উপায় কী? লীলাকে কাল বড় ভয় পাইয়ে দিয়েছে বিশু। ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াবার সাহসটাই হারিয়ে ফেলেছে লীলা। তার কেবলি মনে হয় বিশু যদি আজও আবার...।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ-ই একটা মতলব মাথায় আসে লীলার। মাদুরের বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে ও। পরনের শাড়িটা অল্প-স্বল্প ছেঁড়া। সেটা পাল্টাবার জন্যে টিনের তোরঙ্গ খুলে একখানা ধোয়ানো শাড়ি বের করে আনে চটপট।

পুকুর থেকে ধুয়ে-আনা বাসনপত্তর নিয়ে মা ঘরে ঢোকে। লীলাকে শাড়ি বের করতে দেখে বলে তুই কী বেরোচ্ছিস না কি রে লীলা? ভাঁজ খুলে শাড়িটা গায়ে জড়াতে জড়াতে লীলা বলল, হুঁ।

—তুই যে বললি শরীর খারাপ...তারপর যদি পথে-ঘাটে মাথা ঘুরে পড়ে যাস তুই!

—না না শরীর এখন ঠিক আছে মা।

আপন মনেই হাসল লীলা। তারপর বিশুর দেওয়া আকাশী রঙের ব্লাউজটাই পরল ও। বিশু খুশি হবে।

আপ কি কসম

প্রেক্ষাগৃহ

প্রখ্যাত ধনী ব্যারিস্টারের একমাত্র কন্যা সুনীতা, আর গরীবের ছেলে কমল। কিন্তু সে উচ্চাভিলাষী। ওর ইচ্ছা একদিন আরো বিখ্যাত হয়ে দেশের ও দশের মুখোজ্জ্বল করবে। ওরা দুজনেই একই কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং দুজন দুজনকেই ভালবাসে। কিন্তু ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে প্রভেদ দুস্তর, সুতরাং প্রেম বা প্রণয়ও খুব বেশী দিন টিকে থাকে না। যা হোক শেষ পর্যন্ত সুনীতার বাবা এবং কমলের বাবা রাজী হলেন বিয়ের ভেতর দিয়ে ও'দের ভালোবাসার স্বীকৃতি দিতে। বিয়ের পরে সংসারের দায়িত্ব নেবার জন্যে কমলের প্রয়োজন একটা ভালো চাকুরীর। ইঞ্জিনীয়ারিং-এর উঁচু ডিগ্রী থাকায় এবং বন্ধু মোহনের অক্লান্ত পরিশ্রমে কমল একটা বৃহৎ ব্যবসায়িক সংস্থায় চাকুরী পেল। কমল ও সুনীতা দুজনেই এবার ওদের পুরনো বাড়ী ছেড়ে দিয়ে, কোম্পানীর দেওয়া নতুন কোয়ার্টারে এসে উঠল।

বন্ধু মোহন একই সংস্থায় উচ্চপদস্থ কর্মচারী হয়েও বিবাহিত জীবনে ব্যর্থ। কমল ও সুনীতার মতো সুখী হতে পারে নি সে আধুনিকা স্ত্রীকে নিয়ে। মোহনের অফিসের বাইরের জীবন অভিশপ্ত, কারণ অফিসের পর তার স্ত্রীকে সে খুব কমই পায়। সম্ভবতঃ ওর স্ত্রী সে সময় ওর অন্য বন্ধুকে নিয়ে যত্রতত্র রোমান্স করতে ব্যস্ত। বাধ্য হয়ে অফিসের পরে মোহন কমলের স্ত্রী সুনীতার কাছে এসে তার কাছ থেকে একটু স্নেহ-মমতা পেতে চায়—যে স্নেহ বা মমতা ওর বোনের কাছ থেকেই পাওয়া উচিত ছিল। যাই হোক, এইভাবে ছুটির পরে, বা কোন দিন ছুটির আগেও, কমলের বাড়ীতে আসাই ওর কাজ হোল। কারণ কমলের মনে ধীরে ধীরে ঈর্ষা এল, যে মোহন মনে-প্রাণে নিশ্চয়ই সুনীতাকে ভালবাসে, আর সে জন্যেই মোহন ওদের বাড়ীতে যাতায়াত করে। অথচ মোহন সুনীতাকে নিজের বোনের মতোই ওকে স্নেহ করে বলেই তার কাছ থেকে স্নেহ বা মমতা আশা করে। কিন্তু কমল ও সুনীতার দাম্পত্য কলহ সুনীতাকে বাধ্য করলো তার বাবার কাছে সব ঘটনার কথা বলতে। উনিও কমলকে ডেকে সব ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে ফেলতে বললেন। কিন্তু কমল সুনীতা ও মোহনকে ভুল বুঝলো। ওর ধারণা হোল, মোহন স্ত্রীর স্বেচ্ছাচারিতা ও অসহযোগিতার জন্যই সুনীতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে—নিয়মিত সুনীতার সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই কমলদের বাড়ীতে যাতায়াত করছে। সুতরাং ঈর্ষাই কমলকে ভুল পথে ঠেলে দিল। সুনীতার পিতার অনুরোধ না মেনে ও সুনীতাকে ডিভোর্স করলো। অথচ কমল একবার ভেবে দেখলো না যে সুনীতা 'মা' হতে চলেছে; তারই সন্তান তার গর্ভে। সুনীতার 'পিতা

তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আবার তাঁকে বিবাহ করতে বাধ্য করলেন এক তরুণের সঙ্গে। ধীরে ধীরে মোহনের কাছ থেকে সব কিছু জানবার পর, তার নিজের ভুল বুঝতে পারলো কমল, কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। কারণ সুনীতা তখন অন্যের ঘরণী, আর তারই মেয়ে তখন এক বিবাহোপযোগী তরুণী। ফলে কমল শোকে দুঃখে পাগলের মতো পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। মোহনের কাছ থেকে খবর পেয়ে ছুটলো সুনীতার কাছে। কারণ আজ তার মেয়ের বিয়ে। আর শুভ দিনেই ঘটলো অঘটন—হঠাৎ বিবাহবাসরে লাগলো আগুন। বিধ্বংসী আগুন থেকে নিজের 'আত্মজা'কে বাঁচাতে গিয়ে কমল আগুনে পুড়ে মারা গেল। সকলেই হায় হায় করলো। কিন্তু এইভাবেই বোধ হয় কমল তার নিজের জীবন দিয়ে সব বিরোধ মিটিয়ে গেল।

কমলের ভূমিকায় রাজেশ খান্না তাঁর অভিনয় জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনয় করেছেন বললে অত্যুক্তি হবে না। সুনীতার ভূমিকায় মুমতাজ এবং মোহনের ভূমিকায় সঞ্জীব-কুমার ভালো অভিনয় করেছেন। মোহনের স্ত্রীর ভূমিকায় লোলিতা চাটার্জী, সুনীতার ও কমলের পিতার ভূমিকায় যথাক্রমে এ কে হাংগল ও রেহমানের অভিনয় প্রশংসনীয় এবং দীনা পাঠক, রুবি মুখোচনা, রণজিৎ ও আসরানী চিত্রনাট্যের দাবী মিটিয়েছেন।

কাহিনীর অতি বাস্তবতা ও নাটকীয়তাকে বাদ দিলে, প্রযোজক জে ওমপ্রকাশ প্রথম চিত্র পরিচালক হিসাবে প্রয়োগ-নৈপুণ্য প্রদর্শনে ব্যর্থ হননি। সংগীত পরিচালনায় আর ডি বর্মণও পরিবেশানুযায়ী সঙ্গীত রচনা করেছেন, 'আপ কী কসম' ও 'জিন্দেগী কী সফর গুজর যাতে হৈ' অচিরেই অনেকের মুখে মুখে ফিরবে। আলোকচিত্র গ্রহণে ভি বাবাসাহেব এবং শিল্প নির্দেশনায় সুধেন্দু রায়-এর কাজ প্রশংসনীয়।

—চিত্রদূত

রাজেশ খান্না মমতাজ

দেবব্রত বিশ্বাস

জলসা
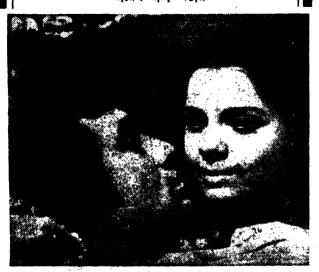
রবীন্দ্র সদনে এবারের সেরা শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস

রবীন্দ্রসদন আয়োজিত প্রায় এক মাস-ব্যাপী রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবের মধ্যে চারটি দিন নির্দিষ্ট ছিলো রবীন্দ্রসঙ্গীতের জন্য। আকর্ষণীয় কোনো শিল্পীই বাদ যাননি। তবে নবীন শিল্পীদের নির্বাচনে আরও বিচক্ষণতার প্রয়োজন ছিলো। রণো গুহঠাকুরতার মত দীপ্তিমান তরুণ শিল্পীর নাম এঁদের মনে পড়েনি, এটা একটা আশ্চর্য ঘটনাই বলব—এবং এমন অনেকেই গেয়েছেন যাঁরা এ আসরে গাইবার উপযুক্ত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিলো। আর একটি কথা। অধিকাংশই মহিলাশিল্পী—পুরুষশিল্পীরা কি সঙ্গীতচর্চা ছেড়ে দিলেন?

এবার চারদিনব্যাপী সঙ্গীতোৎসবের অবিসংবাদিত নায়ক হলেন শ্রীদেবব্রত বিশ্বাস। সম্প্রতিকালে শ্রীবিশ্বাসের গান নিয়ে বিতর্ক ও বিরোধী মনোভাবাপন্ন কিছু শ্রোতার সমালোচনার উত্তর এলো শিল্পীর গানে, গানে। শিল্পসুন্দর শুধু নয়, স্পর্শ-কাতর শিল্পীচিত্তের অভিমানের ছোঁয়ায় মধুরও। প্রথম গানটি ছিলো 'কেন তোমরা আমায় ডাক'। প্রবল কণ্ঠকে মৃদুমধুর করে নিয়ে তাঁর সেই অনুপম ভঙ্গির আবেগসিক্ত প্রশ্নে যেন শ্রোতা ও শিল্পীর মধ্যে মন দেওয়া নেওয়া চলল। ঘুরে ফিরে

বার বার এসে একটি বিশেষ চরণে যখন থামছিলেন 'দাওনা ছুটি, ধর ত্রুটি'—সারা প্রেক্ষাগৃহ একটা জমাটলময় নীরবতায় যেন থমথম করছিলো।

দ্বিতীয় গান 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী'—ধরার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের শ্রোতারাও যেন পূর্ণ প্রাণে তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। এর পরই তিনি গান শেষ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নীচে থেকে ওপর অবধি প্রতিটি শ্রোতার তুমুল অনুরোধের ধ্বনিতে শিল্পীকে আবার আসন গ্রহণ করতে হোলো। নতুন করে অনুভব করলাম সকল শ্রেণীর শ্রোতা তাদের জর্জ বিশ্বাসকে কতখানি ভালবাসেন? শিল্পীর হৃদয়েও বুঝি লেগেছিলো এ অনুভবের দোলা। তাঁর অভিমান-কঠিন চিত্ত যেন চোখের জলের ধারায় নির্গলিত হোলো যখন তিনি গাইলেন **'তুমি যে আমারে চাও আমি তা জানি'**—তারপর একে একে 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি' 'আমার বেলা যে যায়' এর নানা ভাবের পর্যায় অতিক্রম করে যখন থামলেন 'যারা বিহানবেলায় গান এনেছিলো' তখন 'সাঁঝের বেলায় ছায়া' উদাসী বিষণ্ণতার গৈরিক আলোর রং লাগে শ্রোতাদের চিত্তে।

দেবব্রত বিশ্বাসের নির্বাচিত গানের ভাবসংহতি এবং বিরামবিহীন গতিতে এক পর্যায় থেকে অপর পর্যায়ে যাবার অনুসরণীয় ঢংটি আমীর খাঁ সাহেবের পরিবেশনা শৈলীকে মনে করিয়ে দেয়। স্বর্গত ওস্তাদ বিনা যতিতে একই সেন্টি-মেন্টের বিভিন্ন পর্যায় ধীরে চলতেন—তার বিভিন্ন রূপ, গতি ও প্রকাশ-ভঙ্গীর ওপর আলোকপাত করতে করতে।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তাঁর নিজস্ব উচ্চ মানেই সগৌরবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মবিশ্বাসের গভীরতা ধ্বনিত হোলো 'কোথায় তুমি, আমি কোথায়'—মায়ার খেলার সেই সুবিখ্যাত গান 'যেওনা ফিরে'। আর সর্বশেষে কৌতুক বন্যায় সারা সভা প্লাবিত করে তিনি গাইলেন 'স্বর্গে তোমায় নিয়ে যাবে উড়িয়ে' চিরকুমার সভার সেই সরস গানটি—যে গান অশোকবাবুই জনপ্রিয় করেছেন।

সুবিনয় রায় তাঁর শান্ত ধ্রুপদী মেজাজের গানে যেন পুজোর পরিবেশ রচনা করেন।

প্রসাদ সেনের 'এই ত ভালো লেগে-ছিলো'—ভালো লেগেছে।

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, সাগর সেন, অরবিন্দ বিশ্বাস, শৈলেন দাস স্ব স্ব মানে প্রতিষ্ঠিত।

তরুণেতর শিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যে এবারের সেরা শিল্পী হলেন অর্ঘ্য সেন। কণ্ঠমাধুর্য্য অনুভব-নিবিড়তা এই দুয়ের সম্মেলনে তাঁর গানকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিলো। গৌতম মিত্রও আস্তে আস্তে নিজের জায়গা করে নিচ্ছেন।

স্বপন গুপ্তের এবারের গান আরো পরিমার্জিত। বিধান-[illegible]

সাধু যুধিষ্ঠিরের কড়চা : জয়া ভাদুড়ী ও রবি ঘোষ। পরিচালনা : একলব্য।
ফটো : অমৃত

'যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা'—ভাল লেগেছিলো স্বরের লালিত্য ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশনার কারণে।

মহিলা শিল্পীদের মধ্যে নীলিমা সেন, কমলা বসু, নীতা সেন, মায়া সেন তাঁদের খ্যাতিতে অম্লান। বিশেষ উল্লেখযোগ্য মায়া সেনের 'বড় বিস্ময় লাগে।'

তরুণ শিল্পীদের মধ্যে সুমিত্রা সেন, ঋতু গুহঠাকুরতা ও বনানী ঘোষ শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন। সুমিত্রার সংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ গতি ('কেউ দিল জীবনে মম') ঋতুর মাত্র কণ্ঠের আবেগ ঢালা পরিবেশনা 'দিন ফুরালো' বনানীর কণ্ঠে কণিকার অলংকার-গুঞ্জিত ধ্বনি তার নিজের আবেগের রং-এ রঞ্জিত হয়ে বেজেছে 'দিন ঐ বুঝি বাঁশী বাজে'।

বাণী ঠাকুরের কণ্ঠে সুচিত্রার প্রভাব তাঁর গায়কীকে সমৃদ্ধ করেছে 'খেলার সাথী গো বিদায় দ্বার খোলো'—গানটি সেই পরিচয়ই বহন করে।

গীতা ঘটক তাঁর সচল উজাড় করা ভঙ্গিতে গানের বক্তব্যকে প্রাঞ্জল করেছেন। ডঃ চিত্রলেখা সুতালে গেয়েছেন সেই গানটি যে গান অধিকাংশ সময় বিনাতালে শ্রুত হয় 'কে বসিলে মম'।

পূরবী মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা মুখো-পাধ্যায় দুজনের গানেই মুন্সিয়ানা ছিলো। পূর্বা দাস, সুমিত্রা রায়, স্বপ্না ঘোষাল অদিতি সেনগুপ্ত, কৃষ্ণা গুহঠাকুরতা ভালই গেয়েছেন।

সেতারী মণিলাল নাগের অনুষ্ঠান

বিশিষ্ট সেতারী মণিলাল নাগ দক্ষিণ কলকাতার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান নব ফাল্গুনী

মাসিক অধিবেশনে তিলককামোদ রাগে আলাপ জোড় ও ঝালা বাজিয়ে শোনান। পরে তিনি দেশ রাগে গৎ বাজান তিনতালে। অনিল ভট্টাচার্য তাঁর সঙ্গে তবলায় সঙ্গত করেন। এই দুটি রাগেই শ্রীনাগ তাঁর অশেষ প্রতিভার পরিচয় দেন। শেষে তিনি **কিরোয়ানী** রাগটি বাজিয়ে শ্রোতাদের **প্রচুর আনন্দ** দান করেন।

প্রাক্তন ও নবনীবরণ

একটি বিশেষ আসরে সেই সব শিল্পীদের রবীন্দ্র সদনের পক্ষ থেকে সংবর্ধিত করা হয় রবীন্দ্র-সংগীতের জনপ্রিয়তা সৃষ্টিতে যাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এঁরা হলেন জ্যোতিরিন্দ্র মিত্র, সন্তোষ সেনগুপ্ত, অমিয়া ঠাকুর কানন দেবী। গান গেয়ে শোনান প্রথম তিনজন। এঁদের মধ্যে সন্তোষবাবুর গাওয়া 'দিনান্তে বেলায়' এবং অমিয়া ঠাকুরের 'আর কেন—এক বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি করে। সকলকে চমকে দিয়ে আসরে এলেন অরুন্ধতী দেবী। এঁর পরিবেশিত তিনখানি গানের মধ্যে 'পথে যেতে যেতে জমেছিলো বেশী।

দ্বিতীয়ার্ধে অনেক নবীন নবীনাদের গান শোনা গেলো। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গান গেয়েছেন কৃষ্ণা মিত্র, উজ্জয়িনী সেন, সুবিদ ঠাকুর, সত্যজিৎ বসু।

এই আসরেই সকলকে অবাক করে দিয়ে সোভিয়েট শিল্পী তিতিয়ান মোরোজ জোড়া নিখুঁত সুরে এবং প্রায় নির্ভুল উচ্চারণে সুন্দর করে গেয়েছেন 'কে দিল দরজা খুলে' বলে। এঁকে আবিষ্কারের কৃতিত্ব ডঃ তপতী মুখোপাধ্যায়ের।

—চিত্রাঙ্গদা

আরতি ভট্টাচার্য

: আপনি কি ঈশ্বর মানেন?

—মানব না মানে নিশ্চয়ই মানি। একে আপনি সংস্কার বা কুসংস্কার যাই বলুন। আমার কাছে ঈশ্বর একটা অদৃশ্য শক্তির মত। অসহায়ের একমাত্র সহায়।

: হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে আপনার কি মত?

—ধর্ম সম্পর্কে আমি কি-ই বা জানি। এ ব্যাপারে বলতে গেলে তো প্রচুর পড়াশুনোর দরকার। তবে কিছু ঘটনা দেখে মাঝে মাঝে মনে হয় আমাদের ধর্মে সংকীর্ণতার ছোঁয়া একটু বেশী। এটা সত্যি যে, হিন্দু ধর্মের প্রবর্তকগণ নিশ্চয়ই এই সংকীর্ণতাকে আনেন নি, এনেছে পরবর্তীকালে কিছু ধর্মের ব্যবসায়ী-রাই।

একটা ঘটনা বলি। একবার পুরীর মন্দিরে কয়েকজন আমেরিকান বৈষ্ণবকে কিছুতেই পাণ্ডারা ঢুকতে দিল না। তাঁদের কপালে তিলক, পরণে গেরুয়া পোষাক। আমি নিজে সেখানে তখন উপস্থিত। এই সব দেখে মনে হয় আমাদের ধর্মে বেরোবার পথ আছে, কিন্তু ঢোকা বড় শক্ত।

: ফ্যাশন বলতে আপনি কি বোঝেন? ফ্যাশনের আধুনিক জোয়ারে আপনিও কি গা ভাসিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী?

—ফ্যাশন মানে যুগের সঙ্গে মানিয়ে চলা। শুধুমাত্র পোষাক-আশাকে নয়, মনেও। পোষাকের ফ্যাশনের কথা যদি বলেন তাহলে বলব বেল বটস পরলেই আধুনিক হওয়া যায়, শাড়ী ব্যাক ডেটেড, তা আমি মনে করি না। শাড়ীকেও ফ্যাশনেবল করে তোলা যায়। আর ভাসিয়ে দেওয়ার কথা যে বললেন না, আমি নিজেকে কখনই কোনো কিছুর সঙ্গে হারিয়ে যেতে দিতে রাজী নই। তবে আমি তো অভিনেত্রী। শো ব্যাপারটা দর্শকরা খুব কাউন্ট করে। তাই আধুনিক ফ্যাশনের পোষাক আমি নিশ্চয়ই পরি, পরবও। কিন্তু এটা মনে রাখবেন 'মডার্ন পোষাক' 'মডার্ন পোষাক' বলে আমরা আপনারা যতই চেঁচাই না কেন ঘুরে-ফিরে শেষ পর্যন্ত শাড়ীতে এসেই আটকে যেতে হয় সবাইকে।

: দূরে কোথাও যেতে হলে কোনটা পছন্দ করেন বেশী—ট্রেন অথবা প্লেন?

—ছবির কাজে যখন যেতে হয়, তখন সময় বাঁচাবার তাগিদ থাকে, সেক্ষেত্রে প্লেনে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু যখন বাড়ীর আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে কোথাও যাই তখন ট্রেন ছাড়া ভাবতেই পারি না। দেশটাকে ঘুরে ঘুরে আর কতটুকু দেখতে পারি! ট্রেনে গেলে দু পাশের খোলামেলা সবুজ দেখে মনটা তবু কিছুটা হাল্কা হয়। প্রকৃতিকে দেখার ওটা একটা মস্ত সুযোগ।

: স্ত্রী স্বাধীনতায় কি আপনার আপত্তি আছে?

—স্বাধীনতা যদি স্বেচ্ছাচারিতা বা উগ্র শাসন না হয়ে ওঠে তাহলে স্ত্রী

স্বাধীনতার পক্ষপাতী আমি। মেয়েরা শিক্ষা-দীক্ষায় এখন এগিয়েছে অনেক। পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে সব কাজে। আমার কয়েকজন বন্ধু তো এখন ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ছে যাদবপুরে। মেয়েদের আর চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী রাখা যাচ্ছে না যাবে না।

: আপনি কি তাহলে স্ত্রী-শাসিত সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম হোক—এটাই চান?

—না। তা কখখনোই চাই না। স্ত্রী-শাসিত সমাজে শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হয় না। যেমন হয় না স্ত্রী-শাসিত সংসারে। আমার মনে হয় শাসন করার কাজটা পুরুষকেই মানায় ভালো। তবে পুরুষ যদি শুধুমাত্র শাসক হতে চান তাহলেও মুশকিল। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এর প্রয়োজন। শাসন তো চোখ রাঙিয়ে হয় না, স্নেহ-ভালবাসা-প্রীতিরও প্রয়োজন আছে।

: ভবিষ্যতে কি আপনি পুরোপুরি সংসারপ্রিয় গৃহিণী হতে চান?

—সেটা কোন্ মেয়ে না চায় বলুন? জীবনের পরিপূর্ণতা তো সংসারে। মেয়েদের তো বটেই। তবে এই মুহূর্তে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুব একটা কিছু ভাবছি না। অভিনয় করছি। শিল্পী হবার স্বপ্ন আছে মনে। আগে চেষ্টা করে দেখি সেই স্বপ্ন বাস্তব হয় কিনা! তারপর সংসার-টংসার।

: শাড়ী না গয়না—আপনি কোনটা বেশী ভালবাসেন?

—এক কথায় শাড়ী। গয়না আমার কোনদিনই ভাল লাগে না। এই দেখুন না—আমি কোনো গয়নাই পরে নেই। কোথাও গেলেও পরি না। মা বড্ড বকেন আমাকে এজন্য। আর শাড়ী পেলে কথা নেই (একটু নিরাশার সুরে) রিসেন্টলি শাড়ীর যা দাম বেড়েছে! বাব্বা। শাড়ীর সখও যাবে বুঝি।

: মেয়েদের ধূমপান সম্পর্কে আপনার কি মত? ইউরোপের সকলেই তো এ ব্যাপারে অভ্যস্ত।

—ব্যক্তিগতভাবে আমি ধূমপানের ঘোর বিরোধী। সিগারেটের ধোঁয়া আমি একদম সহ্য করতে পারি না। তাছাড়া ধূমপান এবং ড্রিঙ্ক করা দুটো কাই কিন্তু অভিনয়ের ক্ষতি করে। ভয়েস মোটা হয়ে যায়, দাঁত ঠোঁট কালো হয়ে যায়। বলুন না সেগুলো কি ভালো? আমার মতে মেয়েদের কোনো নেশা না থাকাই সব থেকে ভালো।

: সি এম ডি এ সম্পর্কে সাধারণ লোকের অভিযোগের তো শেষ নেই। আপনি কি বলেন?

—আমিও সবার সঙ্গে একমত। সি এম ডি এ'র কাজে নিষ্ঠার বড় অভাব। বর্ষা তো এসে গেল, এবার সবাই টের পাবে। আর আমি যেখানে আছি, সেখানে তো (ফুলবাগান) দুর্গতির শেষ নেই। একটু জল হলেই মনে হয় এক নির্জন দ্বীপে বসে আছি যেন

: অভিনয় ক্ষমতা কি জন্মগত প্রতিভা, না চেষ্টা করেও দক্ষ অভিনেতা হওয়া যায়?

—প্রতিভা ব্যাপারটাটু তো জন্মগত। অনুশীলনের মাধ্যমে তাকে রূপ দিতে হয়। আমার বিশ্বাস প্রত্যেক মানুষের অবচেতনে একটা শিল্পী মন আছেই। সেটাকে স্ফুরণের জন্য চেষ্টার দরকার। শুধুমাত্র চেষ্টা দিয়ে শিল্পী হওয়া যায় না। আমি অভিনয় করি, কেউ আঁকেন, কেউ লেখেন। সবার মধ্যেই সেই শিল্পী মনটা কাজ করছে।

: আপনার অভিনেত্রী হবার পেছনে কার দান সবচাইতে বেশী বলে আপনি মনে করেন?

—অভিনেত্রী কি আমি হয়েছি এখনও? নিজে এখনও বুঝতে পারছি না। আগে অভিনেত্রী হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাই তারপর ভাবব কার দান কতটুকু?

: প্রচন্ড দুঃখ বা মানসিক আঘাত পেলে আপনি কি করেন?

—দুঃখ হলে আমি খুব কাঁদি। কেঁদে কেঁদে মনটাকে হাল্কা করে নিই। তারপর একা কিছুক্ষণ চুপচাপ ঘর বন্ধ করে বসে থাকি। কখনও বা রেডিওটা আস্তে করে চালিয়ে দিই। সে সময় যদি কেউ সান্ত্বনা দিতে আসে ভয়ানক রাগ হয়। কারও কাছ থেকে সমবেদনা পেতে আমি চাই না। নিজেই নিজের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজে নিই।

: সম্প্রতি বাংলাদেশের একখানা ছবিতে তো কাজ করে এলেন, সেখানকার ছবি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

—ছবি আমি বেশী দেখতে পারি নি। কাজ নিয়েই তো সব সময় ব্যস্ত থেকেছি। ওখানকার ছবির মান খুব-একটা ভালো নয়। তবে অনেকে ভালো কিছু করার চেষ্টা করছেন শুনলাম।

: বিশেষ ধরনের কোনো চরিত্রের প্রতি আপনার দুর্বলতা আছে?

—শিল্পী হিসাবে সব ধরনের চরিত্র করা—এমন ইচ্ছে তো আছেই তবুও একটু বেশ জটিল—সিরিয়াস চরিত্র হলে খুউব ভালো লাগে। যেমন লাগছে তপন সিংহের রাজা ছবির রমলাদি চরিত্রটা। খুব ভালো চরিত্র। আপাতঃ দৃষ্টিতে চরিত্রটা কেমন-একটু মনে হতে পারে কিন্তু চরিত্রটার একটা বেদনাদায়ক অতীত আছে। যাই হোক, গল্পটা বলছি না। দেখবেন রমলাদি কেমন হয়?

: কোন লোকের উপকার করেছেন—আবার তার কাছ থেকেই আঘাত পেয়েছেন এমন কোন ঘটনা ঘটেছে আপনার জীবনে?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ বহুবার ঘটেছে। এই ফিল্ম লাইনেই ঘটেছে একাধিকবার। কেউ বিপদে পড়ে আমার কাছে আসতেই আমি না করতে পারি নি। নিজের অসুবিধে সত্ত্বেও এগিয়ে গিয়েছি তাদের কাছে। কিন্তু আঁচিয়েই তার পুরস্কার পেয়েছি একেবারে বিপরীত ব্যবহারে। কি আর করি বলুন। চুপচাপ সহ্য করেই গেছি। আর করবই বা কি।

: স্ত্রী ছবির অমন সুপার সুপার হিট সাফল্যের পর আপনার অভিনয়ের যেমন চাহিদা হওয়া উচিত ছিল সেটা হয় নি কেন?

—এ ব্যাপারটা আমিও মাঝে মাঝে ভাবি—কেন এমন হলো? তবে স্ত্রী ছবির পর আমার কাছে অফার আসে নি এটা বলবো না। আমি সেগুলো অ্যাকসেপ্ট করি নি বা করতে পারি নি। সেই সব ছবির ভবিষ্যতের কথা ভেবে তার ওপর ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক সময় যে নোংরা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকেন্দ্রিক রাজনীতি চলে তার মধ্যে নিজেকে আমি জড়াতে চাই না—এ ঘটনাটাও কাজ করেছে। প্রোডিউসারদের সঙ্গে তেমনভাবে হয়তো কো-অপারেট করতে পারি না, সে কারণেও হয়তো কেউ অ্যাভয়েড করতে পারেন। আমি ঠিক কারণটা বলতে পারব না। তবে রিসেন্টলি বেশ কিছু ছবি করছি, এটা আমার কাছে খুব আনন্দ সংবাদ।

: শুনেছিলাম আপনার বাবার ভয়ানক ইচ্ছে ছিল আপনাকে ডাক্তারী পড়ানোর—সে লাইনে গেলেন না কেন?

—ছোটবেলা —স্কুলজীবন কেটেছে আমার জামসেদপুরে। যখন ডাক্তারীতে ভর্তি হবার কথা হোল তখন জামসেদপুরে ভালো মেডিক্যাল কলেজ নেই। ...নে একটা হয়েছে একটু দূরে। সেটা ...বার কো-এডুকেশন শুনে বাবা ...আর রাজী হলেন না। আর্টস নি... তাই ভর্তি হয়ে গেলাম কলেজে। এখন এই ফিল্ম লাইনের অনিশ্চয়তার মধ্যে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে মনে হয়, ডাক্তার হলেই বুঝি ভালো হতো। নিজেকে এস্ট্যাবলিস করার একটা অধিকার থাকত। এখানে তো সব সময় অন্যের ভরসায় থাকতে হয়।

: সৌন্দর্যই সম্পদ, বিশেষ করে অভিনেত্রীদের। সেই সৌন্দর্য রক্ষার জন্য আপনি কি করেন?

—নিয়মিত যোগ ব্যায়াম করি ম্যাসাজও করাই নিয়মিত। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও রেসট্রিকটেড। মাঝে মাঝে বিউটি পারলারেও যাই।

: ছবি দেখেন নিশ্চয়ই। কোন ছবি বেশী দেখেন?

—ইংরেজী ও বাংলা। হিন্দী খুব কম। ভালো ছবি শুনলে তবেই দেখতে যাই।

—নির্মল ধর

বায়োস্কোপিত

ফিল্ম লাইনে প্রচুর গাধার গল্প আছে।

এর একটা গল্প আমার অন্তত বিস্মরণ হবার কথা নয়। একবার আমরা 'হীরের প্রজাপতি' নামে একটা ছবির শুটিং করতে কিছুদিন মাইথনে গিয়েছিলাম। ছবিটি পরিচালনা করছিলেন বিখ্যাত তথ্যচিত্র নির্মাতা শান্তিপ্রসাদ চৌধুরী। দারুণ রাশভারী মানুষ! দীর্ঘদিন বিলেতে কাটিয়েছেন। ওখানে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে দেশে ফিরে ফিল্ম তৈরী করছেন। যাইহোক আমরা উঠেছিলাম ডি ভি সির ইন্সপেকশান বাংলোয়। খাশা ব্যবস্থা।

শুটিং হচ্ছে হচ্ছে হঠাৎ শান্তিবাবু একদিন আমায় ডেকে বললেন—এবার যে একটি গাধা চাই।

আমি ভাবলাম উনি ঠাট্টা করছেন। হেসে বললাম—পেয়ে যাবেন। কবে চাই?

—কাল, পরশু।

ব্যাপারটা মজার। তৎক্ষণাৎ প্রোডাকশন ম্যানেজার মহাদেব সেনকে ডেকে বললাম—ওহে একটি গাধা চাই।

ও ভাবল—ঠাট্টা। মুচকি হেসে বললে—মাত্তর একটা! তা কখন চাই?

—কাল সকালে। শুটিং-এ লাগবে। ডিরেকটারের অর্ডার।

—অ।...পুরুষ্টু?

—হ্যাঁ।

—বেশ পাবে।

সেদিন আর বেশী কথা হলো না। দিন দুয়েক পর শান্তিবাবু আবার ডেকে পাঠালেন।

—পেয়েছো?

—কী?

—গাধা?

—গাধা?!?

তারপর এসব ক্ষেত্রে যা হয়, কেশে গলা সাফ করে আমতা আমতা—ইয়ে অর্থাৎ—ওটা বাস্তবিক ছবিতে লাগছে তাহলে?

শান্তিবাবু অবাক। —লাগছে মানে নিশ্চয় লাগছে! তুমি ঠাট্টা ভাবলে নাকি?

এরপর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকার কোনো অর্থ হয় না। আমি ধাঁ। আরেঃ রামচন্দ্র। কেলেঙ্কারী আর কাকে বলে। এক ছুটে মহাদেব সেন—এই যে মাস্টার, সেই গাধার ব্যাপারটা সেদিন বলেছিলাম তার কি হলো?

তখনও ওর ধারণা এটা ঠাট্টা একগাল হেসে আমায় কিছু বাক্য দেবার উদ্যোগ করতেই—আরে না না, ব্যাপারটা সিরিয়াস। গাধা লাগবেই। শান্তিবাবু তো জোর করলেন এখন একটা ব্যবস্থা করো।

—সত্যি সত্যি গাধা লাগছে।

—হ্যাঁ ভাই।

মহাদেবের মাথায় হাত। ওর সন্দেহ এ তল্লাটে গাধা বোধহয় নেই। থাকলে নিশ্চয় একটা দুটো চোখে পড়ত। মহাদেব একটা ব্যাকুব ভঙ্গী করে বললে—দেখছি খুঁজে—

রাত্রে বললে, অসম্ভব গোটা মাইথন চষেছি, এখানে গাধার 'গা' নেই। ও বাপু আমি পারব না। তুমি শান্তিবাবুকে বলে দাওগে।

'একটা গাধা খুঁজে বের করতে পারলে না' ফিক ফিক হাসির ভোজে চড়ানো এই কথাটা শোনার জন্যে কার ইচ্ছে আর শান্তিবাবুকে গিয়ে 'ওটা মশায় পাওয়া গেল না' বলে।

আমাদের হন্তদন্ত ভঙ্গী দেখে অনুপকুমার জানতে চাইলেন, কী ব্যাপার, তোমাদের প্রবলেমটা কী? মহাদেব ফস করে বললে—গাধা। ডিরেকটারের রিকুইজিশান শটে গাধা দেখাবেন অথচ.....

অনুপকুমার আমায় জনান্তিকে ডেকে বললেন একদম চেপে যা। আমায় যা বলেছিস বলেছিস, আর কেউ শুনলে তোদের লাইফ হেল করে ছাড়বে। গাধা একটা খোঁজার জিনিস হলো? এ্যাঁ?

তখন যাওয়া হলো মাইথনের এক সবজান্তা ভদ্রলোকের কাছে। তাঁকে এটা সেটা নানা বাক্য দিতে দিতে সুযোগ বুঝে জিগ্যেস করা হলো হ্যাঁ মশায়, একটা গাধার সন্ধান দিতে পারেন?

এক লহমা চুপচাপ। তারপর হঠাৎ ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে আইসক্রীম গলায় বললেন, মশায় বয়সটা আপনাদের চাইতে আমার কিঞ্চিৎ বেশী-ই। আর আমার বৈঠকখানায় বসে আমার সঙ্গে এয়ার্কি—এটা একটু বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে। আপনারা এক্ষুনি কেটে পড়ুন—

—মানে ব্যাপারটা .....

—নো নো নো কিছু শোনাশুনি নেই... কি আসপদ্দা আমার কাছে গাধা খুঁজতে এয়েচে গেট আউট গেট আউট—

রাস্তায় পড়ে মহাদেব আমাকে দু'-দুবার হত্যা করার ব্যর্থ চেষ্টা করল। তোমার জন্যে এই হেনস্থা—

এরপর রাস্তায় লোক ধরে ট্রাই করা হলো। তারা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমাদের দেখে-টেখে সরে পড়ল। কিছু বললই না। বটগাছের তলায় এক সাধু বসে নানা কেরামতি করছিলেন, তাঁকে প্রশ্ন করতে তিনি বললেন, এখানে পাবে না বাপু, আমি সব খবর রাখি। তোমরা বরং আসানসোলে যাও। বাজারের পেছনে ধোপাদের একটা বস্তি আছে ..

ডি ভি সির একটি ভ্যান আমরা সারাক্ষণের জন্য ভাড়া নিয়েছিলাম। ড্রাইভারটি স্থানীয় লোক। নাম ইয়াকুব শান্তশিষ্ট ধরনের লোক। কাট-টু আসানসোল। অনেক খুঁজে পেতে শেষে ধোপাদের আস্তানাটা পাওয়া গেল। তখন সবে সন্ধ্যে হয়েছে। ঘরের সামনে একটি লোক বসে হুঁকো খাচ্ছিল। অভ্যাগতো সাহেবকে দেখে সে অবাক—কি চাই আইজ্ঞা?

—তোমার নাম ধলা রজক?

—হুঁ আইজ্ঞা।

—তোমার গাধা আছে?

—গাধা? হুঁ আইজ্ঞা।

—ওটা আমাদের চাই।

বলতেই ধলা রজকের চোখ কপালে।

—কেনে? গাধাটো আপনাদের চাই কেনে?

বুঝিয়ে বলা হলো, গাধা বায়োস্কোপে নামবে আহা কি কপাল ব্যাটার —ধলা রজক আফশোষ করলে—ও পারবেক নাই বাবু, শালা বড় ঢেঁটিয়া, হুঁ হুঁ হুঁ চিল্লাই বাবু গাঁ-টা মাৎ করবেক, মনে লিচ্ছে কাজটা ও পারবেক নাই—

সে দায়িত্ব আমাদের, আমরা বুঝিয়ে বললাম, তবে মাগনায় নয় হে টাকা কিছু সেই সঙ্গে আমরা দেব; খোরাকী রাহা খরচা। শুনে ধলা রজক সামান্য চিন্তা করল। ততক্ষণে সেখানে একটা ছোটখাটো ভিড় জমে গেছে। সবার চোখে মুখে কৌতূহল। গাধা সিনেমায় নামবে—এ কল্পনারও অতীত। তারপর কিঞ্চিৎ প্রাপ্তিযোগ আছে। কেউ কেউ বলেই ফেলল গাধাটো কেমে আইজ্ঞা, আমাদেরকেই কেন কেনে নামায়ে। তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে একচোট বিতণ্ডা। আমরা বললাম, না, গাধাটা চাই।

শেষে ধলা রজক একটা প্রশ্ন তুলল—ও'য়াকে কবে চাই আইজ্ঞা?

—কাল ভোরবেলায়। সামান্য একটু কাজ। দুপুর নাগাদ আমরা ওকে বিদায় করে দেব।

ধলা রজক বললে যে তার গাধাটা বড় হতচ্ছাড়া। পোয়াটেক পথ বড়জোর হাঁটবে, তার বেশী নয়। অতএব আমরা বললাম ঠিক আছে, আমরা ভ্যানে চাপিয়ে ওকে লোকেশানে নিয়ে যাচ্ছি যেমন তেমনি পৌঁছে দেবার ব্যবস্থাও হবে। দুখানা দশ টাকার নোট হাতে পেয়ে ধলা রজক খুব উল্লসিত। ভোঁ করে দৌড়ে গিয়ে গাধাটাকে ধরে বললে—লিয়ে যান এজ্ঞে।

আমরা গাধা নিয়ে চলেছি আর পাড়া ভেঙ্গে লোক চলেছে আমাদের পেছন পেছন। সবাই মজা পেয়েছে এই ঘটনায়। ভ্যান ড্রাইভার ইয়াকুবকে খুঁজে পাওয়া গেল না। জ্যোতি রায় বললেন, সে হবেখন। আগে গাড়িতে মাল লোড করো।

সে এক কাণ্ড। গাধা গাড়িতে আর উঠতে চায় না। গলায় দড়ি বেঁধে হেইয়ো হেইয়ো টানাটানি কিন্তু ব্যাটা নড়েচড়ে না। বাজারের মুখোমুখি এই কাণ্ড দেখে লোকের কি প্রচণ্ড ভিড়। নানা মানুষের বিভিন্ন মন্তব্য শুনতে শুনতে মহাদেব সেন তো ক্ষেপে লাল। এমন সময় ইয়াকুব এসে হাজির। পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, সেখান থেকে পান চিবুতে চিবুতে এসে এই কাণ্ড দেখে তার চক্ষু স্থির। হাউমাউ করে ভিড় ঠেলে সে এসে বললে—একি করছেন, একি করছেন?

মহাদেব তখনও ক্ষিপ্ত।—দেখতেই তো পাচ্ছো। নাও, একটু ঠেলে তোলো ব্যাটাকে।

দু পাশের ঠেলায় গাধা ততক্ষণে তার কণ্ঠ দিতে শুরু করেছে। হুঁ হুঁ করে কি বিকট আওয়াজ তার। সবার কান ঝালাপালা হবার দাখিল। ইয়াকুব হাতজোড় করে বললে—বাবু আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।

—কেন কেন? তোমার আবার কি হলো?

ইয়াকুব বললে—কি সব্বোনাশা কাণ্ড করছেন আপনারা বুঝতে পারছেন না স্যার। আমার চাকরী চলে যাবে। এই ভ্যানে গাধা যদি সওয়ারী হয় তো আমার লাইসেন্স বাতিল হবে। কেউ রুখতে পারবে না।

জ্যোতি রায় বললেন—আঃ তুমি একদম কথা বলো না। বলে দুখানা দশ টাকার নোট তার হাতে গুঁজে দিলেন। বাস, সব ঠাণ্ডা। উল্টে ইয়াকুব গিয়ে গাধাটাকে ভটাভট কষে দুটো লাথি—এঃ ব্যাটা যেন রাজার ছেলে, কোলে করে গাড়িতে তুলতে হবে। চল—

স্থানীয় লোকেরা গাধাটাকে যথেষ্ট অপমান করল। একচোট মুষ্টিযোগও দেওয়া হলো। তারপর ধলা রজক এসে কি সব ট্রিক করল ব্যাটা সুড় সুড় করে গাড়িতে উঠে সটান শুয়ে পড়ল প্লাটফর্মে। আমরা বাসুদেবপুরে গিয়ে পৌঁছালাম মাইথনে।

সেই গাধা নিয়ে আমরা পুরো একটা দিন শুটিং করেছিলাম। এখন ভেড়াভুড়োন হয়েছে কি ওর আওয়াজ রেকর্ড করা হয় নি। কলকাতায় ফিরে ছবির প্রোজেকশান দেখে শান্তিবাবু বললেন—সব ঠিক আছে, কিন্তু গাধাটার সাউণ্ড কোথায়? শটের মধ্যে যে চেঁচিয়েছে, সব বোঝা যাচ্ছে—

অতএব আবার গাধার ডাক রেকর্ডিং। মহাদেব সেন শুনেই চাকরী ছেড়ে দিয়ে হাওয়া দিল। আমি প্রধান সহকারী। আমার সরে পড়ার রাস্তা নাই। দিন দুয়েক কলকাতার বিভিন্ন রজক পাড়ায় পেট্রোল পুড়িয়ে খুব ঘোরাঘুরি হল কিন্তু গাধা আর পাওয়া গেল না। ধাপা অঞ্চলের রজকরা বললে, এই মাগ্গি-গণ্ডার বাজারে কে আর গাধা রাখে। তাই আমরা ঠেলায় করে মোট বয়ে যাচ্ছি।

অগত্যা ডাকা হলো কিছু হরবোলাকে। স্টুডিওতে একদিন সবাইকে ডেকে মাইক্রোফোনের সামনে লাইন করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলা হল একে একে ডেকে যান ভাই। একটা মনিটার করতেই রেকর্ডিস্ট প্রায় উন্মাদ। কিন্তু সে-ডাক শান্তিবাবুর পছন্দ হলো না। আমরা ছবিতে শেষ পর্যন্ত গাধার ডাক না দিয়েই রি-রেকর্ডিং করে দিলাম।

কিছু দিন আগে 'আবদাল্লা মর্জিনা' ছবিতে কিছু গাধার প্রয়োজন পড়েছিল। এই বস্তু তো আর ভাড়ায় পাওয়া যায় না। অতএব দীনেন গুপ্ত দূর-দূরান্তের এক বাজার থেকে না কোত্থেকে দুটি গাধা কিনে এনেছিলেন। ওরা স্টুডিওতেই থাকত। ছবির কাজ শেষ হবার পর দীনেন গুপ্ত স্থির করলেন—বেচে দিতে হবে। কিন্তু ক্রেতা? কেউ আর গাধা কিনতে চায় না। দু একজন রজককে পটিয়ে-পাটিয়ে আনা হয়েছিল। তারা এমন দর দিল যে দীনেন গুপ্ত হেসে অস্থির। হাজার টাকার মাল মাত্র বিশ টাকায় বিক্রি! কাটো ভাই, সোজা কেটে পড়। তারপর দীনেন গুপ্তের অর্ডার ওদের মুক্তি দিয়ে দাও। অ্যাদ্দিন ঘরের খেয়েছে এবার চরে খাক। ওদের বাঁধন কেটে দেওয়া হল। কিন্তু কিছুতেই স্টুডিও ছেড়ে যেতে চায় না। দুপুরে খাবার সময় হলে হুঁ হুঁ করে বিকট চেঁচায়। শুটিং-এ বিঘ্ন হয়। রেকর্ডিস্ট ভদ্রলোক থান ই ... ছুঁড়ে মারেন রাগের চোটে। তবুও ... চায় না। এত বেহায়া! প্রমাদ গুণে ... না গুপ্ত শেষ পর্যন্ত গাধা দুটিকে একজন শান্তশিষ্ট ক্রেতাকে বিনামূল্যে গছিয়ে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

'বিলাত ফেরৎ' ছবিতে একটি গাধার দরকার পড়ায় গাধা কেনা হয়েছিল। একদিন রাত্রে বালিগঞ্জে শুটিং। সেখানে গাধার প্রয়োজন পড়ল। প্রোডাকশন ম্যানেজারের মুখ শুকিয়ে চুন, কি করে লোকেশ্যানে নিয়ে যাবে? দেরী হলে কেলেঙ্কারী: পরিচালক তাড়াতাড়ি নিয়ে যেতে অর্ডার দিয়েছেন। বেচারা। করলো কি একটা অ্যাম্বাসেডার গাড়ি ভাড়া করে তার ড্রাইভারকে ডবল টাকা কবুল করে গাধাকে ঠেলে তুলল গাড়িতে। তাতে তার কি বিকট চীৎকার। ছবি শেষ হবার পর গাধাটিকে নিয়ে বেধেছিল একই সমস্যা। পরে একজন অনিচ্ছুক রজকের কাঁধে চাপিয়ে তবে সকলের রেহাই। ব্যাটা পাড়ার লোকের ঘুম মাটো করছিল বলে দ্রুত অভিযোগ উঠছিল।

—রঞ্জন মজুমদার

স্টুডিও সংবাদ

বৈদ্যুতিক গোলযোগের জন্য সেদিন, রাজা তার মো-সায়েবদের নিয়ে ফ্লোরের বাইরে গাছের ছায়ায় বসেছিলেন।' কথোপ-কথনে ব্যস্ত ছিলেন। ক'দিন হল গরমটা এত চেপে পড়েছে, রাজার গরদের পাঞ্জাবি ক্রমশ ভিজে যাচ্ছে, মুখের মেক-আপ উঠে যাচ্ছে—ফলে তিনি উশখুশ করছিলেন: কিন্তু উপায় ছিল না। যদিও ফ্লোরের মধ্যে তখন বিয়ে বাড়িতে হ্যাজাক জ্বলছে। হ্যাজাক জ্বালিয়ে তো আর শুটিং করা যায় না। শুটিং হচ্ছে না বলে বিয়ে বন্ধ। বিয়ে অবশ্য আগেই বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল, যদি না ঘটনাস্থলে সময়মত রাজা এসে উপস্থিত হতেন। গ্রাম্যবালার বিয়ে হবে না, পাত্রপক্ষ পাওনাগন্ডা বুঝে পাননি এই অজুহাতে—খবরটা শোনামাত্র দয়ালু রাজা তাঁর মোসায়েবদের নিয়ে ছুটে এসেছেন। বিয়ে হবে না মানে, আলবাৎ হবে। পাওনা-গন্ডা বুঝিয়ে দিতে যাবেন ঠিক এমন সময় আলো গেল। চিত্রনাট্যে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা স্থান পেলে পাত্রীপক্ষের কপাল পুড়ত। এখন পুড়ছে প্রযোজকের। চার-পাঁচ ঘণ্টা অতি-বাহিত তবু তার দেখা নেই।

এখন আর এসব ঘটনার বিশেষ প্রতি-ক্রিয়া হয় না। হাসি হাসি মুখে বেশ মেনে নিয়েছেন সবাই। বলা বাহুল্য মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। কেননা তাবড় তাবড় লোক-জনদের অনুরোধেও বিশেষ কাজ হচ্ছে না। অথচ প্রতিদিন কত লোকের ভাগ্য জড়িয়ে যাচ্ছে। স্টুডিওর খেটেখাওয়া মানুষগুলো গরমে ঘেমে নেয়ে একশা হয়ে খুক খুক করে কাশে আর বলে 'এভাবে কতদিন চলবে কে জানে।' এ'দের আপনারা চেনেন না। শিল্পীদের পেছনে থাকাই এ'দের কাজ। আলোর আড়ালে, অন্ধকারে। অবজ্ঞায়, শ্রান্তিতে।

হঠাৎ সকলে যেন হাতে পেয়ে গেলেন আকাশের চাঁদ। অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে কাজ শুরু হয়ে গেল। বন বন করে এয়ার সার্কু-লেটর ঘুরতে লাগল। কয়েক মিনিটের মধ্যে ভরে উঠল বিয়ে বাড়ি। গ্রামের বিয়ে বাড়ি যেমন হয়। ছেলেমেয়ে মিলিয়ে জনাপঞ্চাশেক একস্ট্রা'। পাত্র পক্ষের প্রধান মণি শ্রীমানী পাত্রী পক্ষের সীতেশ চক্রবর্তী, পাত্র জনৈক, পাত্রী কল্যাণী মন্ডল—যে যার পজিশনে গিয়ে দাঁড়ালেন। অনতিবিলম্বে রাজা সেজে শুটিং জোনের মধ্যে প্রবেশ করলেন উত্তম-কুমার। তাঁর সঙ্গে কয়েকজন মো-সায়েব—তরুণকুমার প্রভৃতি।

ছবির নাম 'সন্ন্যাসী রাজা'। জনান্তিকে শুনেছি ভাওয়ালের রাজার কেস হিস্ট্রি নিয়ে এ ছবির গল্প তৈরী করা হয়েছে। চিত্র-নাট্যকারে রূপ দিয়েছেন পরিচালক পীযূষ বসু। শ্রীবসু বর্তমানে টালিগঞ্জের অন্যতম [illegible] যাঁর দুখানি ছবি ফ্লোরে দুখানি

সন্ন্যাসী রাজা/উত্তমকুমার এবং পরিচালক পীযূষ বসু। ফটো : অমৃত

ছবি রেডি ফর রিলিজ। ফ্লোরে এই ছবি এবং বাববন্দী। রিলিজ করবে শিগগিরি 'ভোরের ফুল' এবং 'সব্যসাচী'। চলতি সপ্তাহেই 'সন্ন্যাসী রাজা'র শুটিং শুরু হয়েছে উষা ফিল্মসের পতাকাতলে। প্রযোজক অসীম সরকার। নায়িকা সুপ্রিয়া দেবী। অন্যান্য চরিত্রের শিল্পী : রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসরাজ চক্রবর্তী, তরুণ মিত্র, কল্যাণী অধিকারী এবং এককালের নামকরা অভিনেত্রী প্রমীলা ত্রিবেদী।

শরৎচন্দ্রের ছেলেবেলা নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনী চিত্রের নির্মাণ সুরু হয়েছে। ছবির নাম রাখা হয়েছে 'ছেলেবেলায় শরৎচন্দ্র'। গত মাসে একপ্রস্থ শুটিং হয়েছে রামপুরহাটের অনতিদূরে কুরুম্ব গ্রামে। নয়দিন ধরে বহিদৃশ্য গ্রহণ করা হয়। শরৎচন্দ্রের ছেলেবেলা রূপায়িত করছে মাস্টার অরিন্দম। অন্যান্য চরিত্রের শিল্পী—সন্ধ্যারাণী, ভারতী দেবী, জোছন দস্তিদার, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, রবি সিনহা এবং মাণিকা মিত্র। এক সাক্ষাৎকারে এ ছবির পরিচালক শচীন সেনগুপ্ত বিস্তারিত জানালেন। জানা গেল, কাহিনী রচয়িতা, চানক সেন। চিত্রনাট্যকার দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। আলোক চিত্রশিল্পী : শৈলজা চট্টোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালক : অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। গান রেকর্ড করা হয়ে গিয়েছে, কণ্ঠদান করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, হৈমন্তী শুক্লা এবং মনোজ রায়। পরবর্তী পর্যায়ের শুটিং টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে জুলাই মাসের মাঝামাঝি থেকে।

বিশেষ সংবাদ : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ (নিউ থিয়েটার্স দু নম্বর)এর কর্তৃত্বভার গ্রহণ করলেন গত তেসরা জুন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সমবায়মন্ত্রী ডঃ জয়নাল আবেদিন। সরকার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন নিখিল ভারত যুব কংগ্রেসের সভাপতি, সংসদ সদস্য প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। এ ছাড়া ছবির জগতের ঋত্বিক ঘটক, অনিল চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত চৌধুরী সমিত ভঞ্জ চিন্ময় রায় সুব্রত সেনশর্মা বিমল দে প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সরকারের এই সুদৃঢ় পদক্ষেপকে উপস্থিত সকলেই স্বাগত জানান

—স্টুডিও সংবাদদাতা

প্রেমের ফাঁদে/শেখর চট্টোপাধ্যায় ও রবি ঘোষ

শতবর্ষের স্মরণীয়

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র

নদীয়া জেলার চৌবেড়িয়া গ্রামে বাংলা
৩৮ সালের চৈত্র মাসে, ইংরেজী ১৮৩০
ষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন নাট্যকার দীনবন্ধু
। পিতার নাম ছিল কালাচাঁদ মিত্র।

গ্রামের পড়াশুনা শেষ করে দীনবন্ধু
কাতার হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। এখান
ক হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন।
ছেলেবেলা থেকেই মেধাবী ছাত্র ছিলেন।
দু কলেজে বৃত্তি পেয়েই পড়াশুনা
ন। রচনা শক্তিতেও বাল্য বয়স থেকেই
বন্ধুর প্রতিভার উন্মেষ পরিলক্ষিত হয়।
দু কলেজের শিক্ষা অসমাপ্ত রেখেই
বয়সে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে দীনবন্ধু ভারত
কারের ডাক বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন।
ম পাটনায় পোস্ট-মাস্টারের পদে বহাল
। এখানে ছয় মাসের মধ্যেই দক্ষতার
চয় দেন এবং পদোন্নতি হয়। উড়িষ্যা
াগের পরিদর্শকের পদলাভ করেন।
ষ্যা থেকে বাংলাদেশে বদলী হন।
য়া ঢাকা কৃষ্ণনগর মাগুরা—অবিভক্ত
ার বিভিন্ন স্থানে—দার্জিলিং আসাম
র উড়িষ্যা ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের
সর্বত্র দীনবন্ধু কর্মজীবনে পরিভ্রমণ
ছেন। কৃষ্ণনগরে অনেক দিন অতিবাহিত
ন এবং এখানে বসবাসের জন্য একখানি
ও ক্রয় করেন। কয়েকজন মিলে একটা
যন্ত্রেরও প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগর পরিত্যাগ
কলকাতায় 'সুপারনিউমরারি ইনস্পেকটিং
ট-মাস্টার' পদে বৃত হন। পোস্ট-
ার জেনারেলকে সাহায্য করাই ছিল এই
ের দায়িত্ব। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে লুশাই
দ্ধের ডাকের বন্দোবস্ত করতে দীনবন্ধু
কাছাড় প্রেরিত হন এবং কয়েক মাস
পুনরায় কলকাতায় ফিরে আসেন।
বন্ধু মিত্র রায়বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত

বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছেন : বাঙ্গালা
ত্যে চারিজন রহস্যপটু লেখকের নাম
যাইতে পারে—টেকচাঁদ, হুতোম, ঈশ্বর
এবং দীনবন্ধু। সহজেই বুঝা যায়
ইহার মধ্যে দ্বিতীয় প্রথমের শিষ্য এবং
তৃতীয়ের শিষ্য। টেকচাঁদের সহিত
তোমের যতদূর সাদৃশ্য ঈশ্বর গুপ্তের
গ দীনবন্ধুর ততদূর সাদৃশ্য না
ক অনেক দূর ছিল। প্রভেদ এই যে,
র গুপ্তের লেখায় ব্যঙ্গ (উইট) প্রধান,
বন্ধুর লেখায় হাস্য প্রধান। কিন্তু ব্যঙ্গ
হাস্য উভয়বিধ রচনায় দুইজনেই
[illegible] পটু ছিলেন না। হাস্যরসে
[illegible] দীনবন্ধু [illegible] সমকক্ষ নহেন।"
বয়সে রচনা শক্তির যে উন্মেষ—হেয়ার

স্কুলে অধ্যয়নকালে তারই বিকাশ। এই
সময়ই কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংস্পর্শে
আসেন। দীনবন্ধুর কবিতা অনুপ্রাস
বহুল। যেমন :

যে নয়নে রেণু অণু অসি অনুমান।
বায়সে হানিবে তায় তীক্ষ্ণ চঞ্চু বাণ।।

ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত 'সাধু রঞ্জন'
সাপ্তাহিকে দীনবন্ধুর প্রথম রচনা 'মানব-
চরিত্র' প্রকাশিত হয়। দীনবন্ধুর সুরধুনী,
দ্বাদশ কবিতা জামাই-ষষ্ঠী কমলে-কামিনী
প্রভৃতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
দীনবন্ধুর প্রথম নাটক নীলদর্পণ। নীল-
দর্পণং নাম নাটকম্ঃ ঢাকা থেকে ১৮৬০
খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। নবীন তপস্বিনী
ঢাকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর লিখিত।
১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরের মুদ্রাযন্ত্রে
মুদ্রিত। 'সধবার একাদশী' আর বিয়ে পাগলা
বুড়ো ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। নবীন
তপস্বিনীর পরই সধবার একাদশী রচনা
করেন দীনবন্ধু। কিন্তু প্রকাশিত হয় বিয়ে
পাগলা বুড়োর পর। লীলাবতী ১৮৬৭
জামাই বারিক ১৮৭২ এবং কমলে কামিনী
মৃত্যুর পূর্বে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে
প্রকাশিত হয়।

কর্মজীবনে অত্যন্ত সৎ প্রকৃতির লোক
ছিলেন। কোন প্রকার দুর্নীতির প্রশ্রয়
দিতেন না। ডাক বিভাগের প্রভূত উন্নতি
সাধন করেছিলেন তিনি। ব্যক্তিজীবনে
দয়ালু পরোপকারী বন্ধুবৎসল হাস্যপ্রিয়
আড্ডাবাজ লোক ছিলেন। ডাক বিভাগের
পরিদর্শকের চাকরীর জন্য দীনবন্ধু মিত্রকে
বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করতে হয়েছে।
এজন্য বিভিন্ন জনের সংস্পর্শে এসে প্রচুর
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। ঢাকায়
অবস্থানকালে চাষীদের ওপর নীলকর
সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচার তাঁর
প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতা জাতির
দৈহিক শক্তির মূলে চরম আঘাত হানলেও—
এই ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে উন্মেষ হলো আত্মিক
শক্তির। সাহিত্যে—কাব্যে—সাংবাদিকতায়—
নাটকে—সমাজ সংস্কারে জাতীয়তাবাদের যে
প্রকাশ ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক থেকে
পরিলক্ষিত হয়—তার প্রস্তুতির বীজ নীল-
দর্পণের মধ্যে নিহিত ছিল বললেও
অত্যুক্তি হবে না।

'নীলদর্পণ' রচনাকালের একটা ঘটনা
অনেকেরই জানা আছে। বঙ্কিমচন্দ্রই ঘটনাটি
লিপিবদ্ধ করে যান। ঢাকায় অবস্থানকালে
ডাক বিভাগের পরিদর্শন কার্যে দীনবন্ধুকে
নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থান নৌকা-
যোগে পরিভ্রমণ করতে হতো। নৌকায় বসে
তিনি অনেক সময় নীলদর্পণ রচনা করতেন।
একবার নীলদর্পণ লিখতে লিখতে তিনি
মেঘনা পার হচ্ছিলেন। এপার থেকে ওপারের
দিকে নৌকাটি দু' ক্রোশ দূরত্ব অতিক্রম
করেছে। হঠাৎ দেখা গেল নৌকোয় জল
উঠছে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়ত
জলমগ্ন হয়ে যাবে। যারা সাঁতার জানতেন
নেমে পড়লেন। দীনবন্ধু সাঁতার জানতেন
না। তিনি নীলদর্পণের পাণ্ডুলিপি হাতে
নিয়ে নৌকোতেই বসে রইলেন। সাঁতার কেটে
যারা অগ্রসর হচ্ছিলেন, কিছুক্ষণ বাদে তারা
মাটি পেলেন। তখন নৌকো টেনে নিয়ে সেই
চরে উঠানো হলো। জলে নৌকো তলিয়ে
গেল। দীনবন্ধু আধভেজা নীলদর্পণের
খাতা হাতে নিয়ে চই-এর উপরে উঠলেন।
তখন নদীতে ভাঁটা ছিল, তাই চরে নৌকো
ঠেকিয়ে সাময়িকভাবে রক্ষা পাওয়া গেল।
জোয়ার যখন আসবে তখনকার কথা চিন্তা
করে সবাই আতঙ্কে উঠলেন। এমনি সময়
দূরে দাঁড়ের নৌকোর শব্দে সবাই বাঁচাও
বলে চীৎকার শুরু করলেন। নৌকোটি এসে
সকলকে রক্ষা করলো।

নীলদর্পণ প্রকাশিত হবার পর সারা
দেশে আলোড়ন দেখা দিল। নীলদর্পণ
নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে
শাণিত কৃপাণের মতই ঝলসে উঠলো। দেশ-

বিদেশে পেীছে দিল ইংরেজ কুঠিয়ালদের অত্যাচারের কাহিনী। নীলদর্পণ ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। পাদ্রী লং সাহেব ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। লং সাহেবের ১০০০ টাকা জরিমানা ও এক মাস কারাদণ্ড হয়। জরিমানার টাকা দিয়েছিলেন মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ। মামলার খরচও তিনি বহন করেন বলে প্রকাশ। সীটনকার সাহেবও নানাভাবে সহায়তা করার জন্য ইংরেজ মহলে ধিকৃত হন। বাংলা বা ইংরেজী অনুবাদে নাট্যকারের নাম ছিল না। অনুবাদকেরও নয়। তাই সরাসরি তাদের ওপর হামলা না হলেও
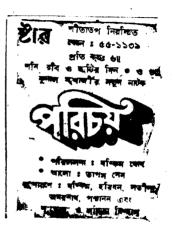
ঢাকায় পূর্ববঙ্গ-রঙ্গভূমি নামে একটি প্রতিষ্ঠান ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই অভিনয়াদি নিয়ে কর্মতৎপর ছিলেন। এখানে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দেই সর্বপ্রথম নীলদর্পণ অভিনীত হয়।

পরোক্ষভাবে তাঁরাও রেহাই পাননি।

নবীন তপস্বিনী সর্বপ্রথম অভিনীত হয় ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই। এই অভিনয় 'গোয়াড়ে বঙ্গ নাট্যাভিনয়' সভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রবৃন্দ অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ দীনবন্ধু মিত্র অভিনয়ে উপস্থিত থাকতে পারেন না। তিনি অভিনয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০০ টাকা সাহায্য করেন। রামতনু লাহিড়ী মশায় এই অভিনয়ে উপস্থিত থাকেন। দীনবন্ধু মিত্রের যে তিনটি নাটক বাংলার সাধারণ রঙ্গশালা প্রতিষ্ঠার মূলে জড়িয়ে আছে—সে তিনটি নাটক হলো সধবার একাদশী, নীলদর্পণ ও লীলাবতী।

তখন ধনীদের গৃহে গৃহে নাটকাভিনয়ের রেওয়াজ উঠেছে। সব অভিনয়ই ছিল ব্যয়বহুল আর সাধারণ লোকেদের পক্ষে সে অভিনয় দেখবার সুযোগও ছিল কম। তাই মদনমল আর শর্মিষ্ঠা নাটকের যাত্রাভিনয়ের পর বাগবাজারের যুবকেরা নাটকাভিনয়ের জন্য গড়ে তুললেন 'দি বাগবাজার এমেচার থিয়েটার।' কিন্তু ব্যয়বহুল নাটকাভিনয়ের উপযোগী তাঁদের অর্থসামর্থ্য ছিল না। তাই তাঁদের নেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটক নির্বাচন করেন। দীনবন্ধুর নাটকে কোন প্রস্তাবনা ছিল না। গিরিশচন্দ্র প্রস্তাবনা লিখলেন। তাছাড়া তিনিই ছিলেন নাট্যশিক্ষক। নিমচাঁদ চরিত্রে দীনবন্ধুর নাটকেই গিরিশচন্দ্রের সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ।

নীলদর্পণ যেমন বাংলার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করলো—'সধবার একাদশী' তেমনি উদ্বুদ্ধ করলো সাধারণ রঙ্গশালা প্রতিষ্ঠায়।

সধবার একাদশী নাটকের মধ্য দিয়েই আমরা পরবর্তী কালের নটগুরুকে যেমন লাভ করি, তেমনি নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, ধর্মদাস সুর, রাধামাধব কর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিও পরবর্তীকালের নাট্যান্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন।

সধবার একাদশী নাটক দেখে সবাই

রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে (প্রযোজনা বহুরূপী) নাটকে শাঁওলী মিত্র ও উদয় সিংহ

যেমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন তেমনি রেভারেণ্ড লালবিহারী দে 'ফ্রেণ্ডলি রিভিউ' পত্রিকায় বিরূপ সমালোচনা করেন। অবশ্য 'জামাই বারিক'-এ বেং দেকে ব্যঙ্গ করে টোতারাম ডাস্ট' লিখে উত্তর দিয়েছিলেন। চতুর্থ অভিনয়ে সধবার একাদশীর সঙ্গে বিয়ে পাগলা বুড়োও অভিনীত হয়।

বাগবাজার এমেচার থিয়েটারই অবৈতনিক ন্যাশনাল থিয়েটার নাম নিয়ে দীনবন্ধুর লীলাবতী নাটক অভিনয় করেন। ১৮৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে মহেশপুর গ্রামে লীলাবতীর অভিনয় হয়। চুঁচুড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকারের উদ্যোগে লীলাবতীর অভিনয় খুবই সুনাম অর্জন করে। কিন্তু নাটকের কিছু পরিবর্তন করা হয় বলে দীনবন্ধু মিত্র চটে যান। পরে অবশ্য সব মিটমাট হয়ে যায়। চুঁচুড়ার আর অবৈতনিক ন্যাশনাল থিয়েটার কর্তৃক লীলাবতীর অভিনয় বেশী খ্যাতি লাভ করে। লীলাবতীর অভিনয়ের সময়ই বাগবাজার এমেচার থিয়েটার সম্প্রদায় ন্যাশনাল থিয়েটার নাম গ্রহণ করে। অনেকে টিকেট বিক্রী করে অভিনয় করার প্রস্তাব দিলে, গিরিশচন্দ্র বিরোধিতা করেন। অবৈতনিক ভাবেই লীলাবতীর অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।

এরপর দীনবন্ধু মিত্র গিরিশচন্দ্রকে নীলদর্পণ অভিনয়ের প্রস্তাব দেন। নীলদর্পণ নির্বাচিত হয়। গিরিশচন্দ্র রিহার্সেলও দেন কিছুদিন। কিন্তু টিকেট কেটে অভিনয় করার প্রস্তাবে বেশীর ভাগ সভ্য অভিমত ব্যক্ত করলে গিরিশচন্দ্র কয়েকজন অনুগামী সহ দলত্যাগ করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর সান্যাল বাড়ীতে

ন্যাশনাল থিয়েটার টিকেট বিক্রী করে অ
করলেন নীলদর্পণ। শনিবার ১৪ই ডি
১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ন্যাশনাল থিয়েটার
বারিক অভিনীত হয়।

১১ই জানুয়ারী ন্যাশনাল থি
লীলাবতীর অভিনয় হয়। ১৬ই জা
বিয়ে পাগলা বুড়ো, ১৮ই জানুয়ারী
তপস্বিনী অভিনীত হয়। এই সময় ন্য
থিয়েটারে আভ্যন্তরীণ গোলমাল
যায়। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ গির
সহ ন্যাশনাল থিয়েটারের পরিচালকমণ্ড
যোগদান করেন। কিন্তু কিছুদিন
পুনরায় সম্প্রদায় হিন্দু ন্যাশনাল
ন্যাশনাল থিয়েটারে দ্বিধা বিভক্ত হয়

দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যাবার পর ধ
সুরের নেতৃত্বে রেজিষ্ট্রিকৃতন্যাশনাল থি
২৯শে মার্চ, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে নেটিভ
পাতালের সাহায্যে টাউন হলে নী
অভিনয় করেন। গিরিশচন্দ্র উড সা
চরিত্রে অভিনয় করে প্রভূত খ্যাতি
করেন।

টাউন হলে ৫ই এপ্রিল, ১৮৭৩ খৃ
সধবার একাদশী, ১৯শে এপ্রিল রা
দেববাহাদুরের বাড়ীতে নীলদর্পণ অ
হয়। ন্যাশনাল ও হিন্দু ন্যাশনাল ক
হাওড়া, ঢাকা ও মফঃস্বলের বিভিন্ন
দীনবন্ধু মিত্রের বিভিন্ন নাটক অ
করেন।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের অকটোবর
দীনবন্ধু মিত্র বিস্ফোটক কর্তৃক আ
হয়ে শয্যাশায়ী হন। এবং ১লা ন
১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মারা যান। দীনবন্ধ
৮টি সন্তানের জনক ছিলেন। তাঁ
পতিপরায়ণা ও স্নেহশীলা ছিলেন।

মৃত্যুর পূর্বে দীনবন্ধু মিত্রের
কামিনী সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়।

২০শে ডিসেম্বর ১৮৭৩ খৃ
ন্যাশনাল থিয়েটারে দীনবন্ধু মিত্রের
কামিনী অভিনীত হয়।

দীনবন্ধু মিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা
ন্যাশনাল থিয়েটার, ৩রা জানুয়ারী
খৃষ্টাব্দে নীলদর্পণ নাটকের অভিনয়
দীনবন্ধু মিত্রের নাটকাবলী পরবর্ত
বহুবার অভিনীত হয়েছে। সাধারণ
শালার শতবার্ষিকী বর্ষে এবং তার
বহু সৌখীন সম্প্রদায় নীলদর্পণ
করেছেন।

নীলকর সাহেবদের অমানুষিক
চারের বিরুদ্ধে দীনবন্ধুর নী
হাতিয়ার রূপে কাজ করেছিল।
চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল নানাভাবে।
পরাধীন জাতিকে তার স্বাধীনতার স
উদ্বুদ্ধ করে তোলায় যেমন নীলদ
অস্বীকার করা যায় না—তেমনি অত
শোষকের বিরুদ্ধে শোষিত ও নিপী
প্রতিবাদ গণচেতনায় যথেষ্ট কা
রূপেই দেখা দেয়। সর্বোপরি
সাধারণ রঙ্গশালার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল
দর্পণ নাটক দিয়ে।

—কালীশ মুখোপ

আমি লুঙ্গি পরেই যাবো

নীলদর্পণ তখন প্রচণ্ড আলোড়ন
ল সমগ্র দেশে। ন্যাশনাল থিয়েটারে
গের অভিনয় হচ্ছে। পুলিশের
ট কমিশনার 'জাইলাম' সাহেব একদিন
পণ নাটকের অভিনয় দেখতে
। সকলেরই আতঙ্ক। একটা কিছু
হয়ে ধরে নিয়ে যাবে যাকে পাবে
সবাই কম্পমান। মতিলাল সুর
তখনকার দিনের একজন প্রখ্যাত
ন্তা। তোরাপের চরিত্রে অভিনয়
তিনি খুবই খ্যাতি লাভ করেন।
পর রূপ-সজ্জা নিয়ে লুঙ্গি পরেই
আছেন তিনি। সকলের আতঙ্কিত
দেখে তিনি লাফালাফি করতে
না। বলতে লাগলেন সাহসের সঙ্গে :
নিয়ে যাবে যাক। আমি লুঙ্গি পরে
সেজেই যাবো।" মতিলালবাবুর
দেখে সবাই যেন বল পেলেন।
নের চেয়েও সবাই যেন কোমর বেঁধে
য় করলেন।

দ্দু বিবরটি পুলিশ সাহেবের কানে
তে দেরী হলো না। তিনি মনে মনে
। তারপর এক ফাঁকে উঠে গেলেন
। এদিকে ত অনেকের আত্মারাম

ওরে গিয়ে তোরাপের সন্ধান
। অমনি গুঞ্জন উঠলো। মতিলাল
কেন্দ্র করে।

সাও বাহির দেখাও। লুঙ্গি পরেই
ও এবার!

তিলালবাবু লুঙ্গি পরেই সামনে
সাহস করে আরো অনেকেই

লিশ সাহেব তখন বললেন, ভয় নাই
নর। আমি ধরিতে আসি নাই।
দেখিতে আসিয়াছি। দীনবন্ধুবাবু
বন্ধু। তাঁরই অনুরোধে আসিয়াছি।
ভালো হচ্ছে। স্ফূর্তিতে অভিনয়
বলে হাসতে হাসতে আবার তাঁর
এসে অভিনয় দেখতে বসলেন।
বান্দের নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

মী আর জমাদার দুই হয়ে দাঁড়াও

শনাল থিয়েটারে দীনবন্ধু মিত্রের
টী নাটকের অভিনয় চলছে।
সবাবুর বৈঠকখানায় জাল অরবিন্দ-
নিয়ে মহা হুলস্থূল। হরবিলাস
অভিনয় করছেন অর্ধেন্দুশেখর
।

বিলাসবেশী অর্ধেন্দুশেখরের সং-
দীনানাথবাবু, তুমি পাপাত্মার
ই কর, তারপর কপালে যা থাকে,
ে।

নাদ বললেন, : আপনি ব্যস্ত হবেন
না। এখনি পুলিশ ইন্সপেক্টর আসবে।
এলেই তাতীর শ্রাদ্ধ হবে। এমন সময়
পুলিশ ইন্সপেক্টর, যজ্ঞেশ্বর, হেমচাঁদ ও
দুইজন কনেস্টবলের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করার
কথা। সকলেই এলো। কিন্তু যজ্ঞেশ্বর
আসছে না। দর্শকেরা পরম আগ্রহে অপেক্ষা
করছেন। যজ্ঞেশ্বরের দেখা নেই। অর্ধেন্দু-
শেখর বুঝতে পারলেন, একটা কিছু অঘটন
ঘটেছে। তখন পুলিশ ইন্সপেক্টরকে লক্ষ্য
করে বললেন : জমাদার সাহেব, তোমার
আসামী সটকেছে। এখন তুমিই আসামী
আর জমাদার দুই হয়ে দাঁড়াও। আমাদের
কাজ চলুক। (দর্শকদের দেখিয়ে) বাবুরা
সব বসে আছেন। আবার গোসা করবেন।
দর্শকেরা অর্ধেন্দুশেখরের রসিকতায়
হো-হো করে হেসে উঠলেন।

আমার নন্দাই

নগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়ের স্বত্বাধি-
কারিত্বে তখন মিনার্ভা থিয়েটার পরিচালিত
হচ্ছিল। এই সময় একদিন দীনবন্ধু মিত্রের
নবীন তপস্বিনী নাটক অভিনীত হচ্ছে।

সলোমন সাহেব নামক এক ইহুদী
সাহেব তখন প্রায়ই থিয়েটার দেখতে
আসতেন। সামনের আসনের টিকেট
কাটতেন। তাঁর হাতে থাকতো একটা ফুলের
বাসকেট। তাতে ফুলের তোড়া, মালা, কুচো
ফুল থাকতো। যেসব শিল্পীদের অভিনয়
সলোমন সাহেবের ভাল লাগতো—তিনি
তাঁর বাসকেট থেকে তাঁদের উদ্দেশ্যে ফুল-
মালা-তোড়া ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতেন।
সলোমন সাহেবের নাট্য-প্রীতি শিল্পীরা
প্রীতির চোখে দেখতেন।

সেদিন জলধর চরিত্রে অর্ধেন্দুশেখর
মুস্তফী আর তার স্ত্রী জগদম্বা চরিত্র
অভিনয় করছেন গুলফন হরি।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাংশ স্বামী-
সন্দিগ্ধা জগদম্বা মুড়ো ঝাঁটা হাতে রঙ্গ-
মঞ্চে প্রবেশ করে বলছেন, আজ তোমারি
একদিন, কি আমারি একদিন।......আমি
ঘোমটা দিয়ে চুপ করে বসি, যদি ধরতে
পারি, আজ মালতী মল্লিকাকে মা বলিয়ে
নেব, তবে ছাড়বো।

এমনি সংলাপ বলে গুলফন হরি
(জগদম্বা) যখন ঘোমটা দিয়ে স্বামীকে
ধরবার জন্য লুকিয়ে থাকতে যেতেন, তখন-
কার অভিব্যক্তি দেখে প্রতিজন দর্শকই মুগ্ধ
হতেন। সলোমন সাহেব গুলফন হরির
অভিনয়-চাতুর্যে মুগ্ধ হয়ে তার উদ্দেশ্যে
এক ছড়া ফুলের মালা ছুঁড়ে মারলেন।
গুলফন হরি মালাটা কপালে ঠেকিয়ে
গলায় দিয়ে বসে রইলেন। সারা নাট্যগৃহ
করতালি ধ্বনিতে তাঁকে অভিনন্দন
জানালো। জলধররূপে অর্ধেন্দুশেখর
গুলফন হরি অর্থাৎ স্ত্রীর হাতে ত
নাস্তানাবুদ হলেন।

স্বামীর প্রতি মারমুখী হবার সময়
গুলফন হরি ঘোমটা ফেলে দিয়েছেন। তার
গলার মালাটা দেখা যাচ্ছে। অর্ধেন্দুশেখর
এরই সুযোগে দর্শকদের একটু আনন্দ
দিতে স্ত্রীকে বললেন : "আমার তো কথায়
কথায় সন্দেহ করো—বলি এই যে গলায়
বাহারের মালা দুলছে, বল এ মালা
দোলালো কে? বল কে দিলে মালা?"—
স্ত্রীর প্রতি রুখে উঠলেন। স্ত্রীও যেমন
তেমন অভিনেত্রী নন—গুলফন হরি! সঙ্গে
সঙ্গে বলে উঠলেন : শুনবে কে দিয়েছে!
পরপুরুষ দেয় নি। দিয়েছে আমার
নন্দাই! ঐ তো বসেই আছে। জিজ্ঞাসা কর।"
বলে সলোমন সাহেবকে দেখিয়ে দিলেন।
সারা নাট্যগৃহ ফেটে পড়লো। গ্রীন রুমে
এসে রসচূড়ামণি তাঁর সহ-অভিনেত্রীকে
তারিফ করতে লাগলেন।

বিবিধ সংবাদ

রাত্রি যাদের দিন : রবিবার ২৩শে
জুন সকাল ১০টায় ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে
ত্রিণয়নী চিত্রমের প্রথম চিত্রার্ঘ্য 'রাত্রি যাদের
দিন'এর শুভ মহরৎ অনুষ্ঠান সম্পন্ন
হয়। ছবির কাহিনীকার ও পরিচালক
শ্রীরবি ভট্টাচার্য। সভায় সভাপতিত্ব করেন
মাননীয় মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ। তিনি
বাঙ্গালীকে চিত্র ব্যবসায়ে ব্যবসায়িক
দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আত্মনিয়োগ করতে
আহ্বান জানান। সংস্থার পক্ষ থেকে
প্রযোজক সুভাষ রায় চলচ্চিত্র করার পথে
বিভিন্ন বাধা বিপত্তির কথা বলেন। অনু-
ষ্ঠানে ডঃ মজহারুল হক, ভারতস্থ গণপ্রজা-
তন্ত্রী বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনার
জনাব আবদুস সোবহান খান চৌধুরী,
দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রিডার ডঃ
অরুণ মুখোপাধ্যায়ও ভাষণ দেন। মহরৎ
শিল্পী ছিলেন নায়ক সৈকত মুখোপাধ্যায়
ও ছায়া দেবী, ক্ল্যাপস্টিক দেন চন্দ্রাবতী
দেবী ও সুইচ অন করেন শ্রীমতী যমুনা
বড়ুয়া। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন
বিধানসভার সদস্য শ্রীগৌতম চক্রবর্তী।

রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা : পশ্চিমবঙ্গ
সরকারের ইন্টেলিজেন্স মিনিস্টিরিয়াল কর্ম-
চারী সমিতি সমূহের যৌথ উদ্যোগে গত
১৩ জুন ১৯৭৪ তারিখে ১১ নং লর্ড

সিনহা রোডস্থিত শ্রীশিক্ষায়তন মঞ্চে এক মনোজ্ঞ রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক শ্রীমনোরঞ্জন বর্ধন তাঁর ভাষণে সমিতিসমূহের পক্ষে এই ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদযাপনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে ইন্টেলিজেন্স বিভাগের কর্মচারী হিসেবে তাঁদের বাস্তিক সমাজ জীবন থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করতে হয়। এই ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ তাঁদের সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন এবং বৈচিত্র্যহীন দিন যাপনের গ্লানি কিছু পরমাণে লাঘব করতে পারে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ ফজলে হক ইন্টেলিজেন্স বিভাগের মিনিস্টিরিয়াল কর্মচারীদের সামাজিক সমস্যার কথা স্বীকার করেন। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের আই জি পি রঞ্জিত গুপ্ত, কোলকাতার পুলিশ কমিশনার সুনীল চৌধুরী ডি আই জি আই বি সত্য বসু। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, মায়া সেন চিরপ্রিয় মুখোপাধ্যায় এবং দিলীপ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বনশ্রী সেনগুপ্ত।

স্বীকারোক্তি/সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়
ফটো :

বাঙলাদেশে নাট্য আন্দোলন ক্রমশঃ গড়ে উঠছে

নাটক আজকের আবিষ্কৃত কোন শিল্প নয়। আজকের নাটকের শরীরে রয়েছে প্রায় দুশ বছরের প্রাচীন ঐতিহ্য।

স্যার মন্মথ সরকারের ভাষায় 'আজ আমরা নাটক সম্পর্কে যাহা বুঝি, তাহা উনবিংশ শতাব্দীর সৃষ্টি।'

কিন্তু অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার হলো বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখা যথা কবিতা, গল্প প্রভৃতির যে হারে উন্নতি হয়েছে, ঠিক সে হারে নাট্য সাহিত্য বা মঞ্চ নাটকের উন্নতি হয়নি।

এর কারণ নানাবিধ। তবে মূলতঃ এর জন্য যে কারণ দায়ী, তাহলো সাবেক পাকিস্তান আমলে বা স্বাধীনতার পর অদ্যাবধি এদেশে মঞ্চ নাটকের জন্য কোন স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ তৈরী হয়নি।

অথচ অনস্বীকার্য সত্য হল, গণসংযোগের একটি প্রধান মাধ্যম হলো নাটক এবং জনগণকে আনন্দ বিতরণের ও বিনোদনের একটি প্রধান মাধ্যম এই নাটক।

সম্প্রতি অবশ্য একটা সুলক্ষণ আমাদের জন্য 'শুভ সংবাদ' বহন করছে। স্কুলে, কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পাড়ায় পাড়ায় জেলায় জেলায়, এক কথায় এখানে সেখানে সর্বত্র বেশ দুচার দশ বিশটা নাটক অহরহ মঞ্চস্থ হচ্ছে।

এবং আরো আশার কথা আমরা যারা ইদানিং নাটকের দর্শক হচ্ছি, তারা রীতিমতো 'দর্শনীর' বিনিময়ে নাটক দেখছি।

অথচ, সামান্য কিছুদিন আগেও নাটক দেখার মত 'বিনি পয়সার দর্শকও' এখানে পাওয়া যেত না।

এর কারণ, আগে যে সব নাটক মঞ্চস্থ হতো এবং এখন যে সব নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে—এ দুয়ের মাঝে রয়েছে বিস্তর ব্যবধান এবং তা আধুনিকতায়, চিন্তাধারায় ও অভিনয়ের গুণে।

আজকের মঞ্চস্থ বিভিন্ন নাটকে যেমন 'নতুনত্ব' এনেছে, তেমনি আজকের দর্শক নাটকের প্রতি আগের চেয়ে অনেক আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।

এটা অবশ্য প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অনেক দিন থেকেই এবং অনেক বেশী করেই লক্ষ্য করা গেছে ও যাচ্ছে। সেখানে এক একটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। কাগজে কাগজে ও দর্শক মনে ঝড় তোলে এবং শত শত রজনী হাউস ফুল থাকে এবং থাকছে।

আমাদের এখানে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নেই। আর তাই এখানকার নাট্যামোদীরা তাঁদের ইচ্ছাকে সর্বদা বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে অহরহ হাজারো সমস্যার মুখোমুখি হন ও হচ্ছেন।

এতদসত্ত্বেও এখানে এখন প্রায়ই নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে এবং দর্শক মন জয় করতে সক্ষম হচ্ছে।

এ ব্যাপারে ঢাকার 'নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় 'পালাপার' ও 'থিয়েটার গোষ্ঠীর ভূমিকা সবচেয়ে অগ্রণী।

নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের (ক) বাকি ইতিহাস (খ) বিদগ্ধ রমণীকুল ও তৈল সংকট (গ) রুস পারপাস (ঘ) এই নিষিদ্ধ পল্লীতে। পারাপারের (ক) পোস্টার (খ) জনে জনে জনতা (গ) তারপর হব ইতিহাস এবং থিয়েটার গোষ্ঠীর সুবচন নির্বাসনে (প্রথম নাটক—এখনও চলছে)। আমাদের আজকের নাট্য আন্দোলনকে দ্রুতপথে ক্রমশঃ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং দর্শক মনকে নাটকের প্রতি ক্রমশঃ আরো আগ্রহী করে তুলছে।

তবে এখানে যদি স্থায়ী র তৈরী হয় তাহলে আমাদের নাটক এগিয়ে যেতে পারবে এবং আমাদের আন্দোলন আরো শক্তিশালী উঠবে, তা বলাই বাহুল্য।

এখানে এখন যেসব মঞ্চে নাটক হয় ও হচ্ছে—সেগুলো হল টি এ (ছাত্রদের জন্য সীমাবদ্ধ) মহিলা স ওয়াপদা, বৃটিশ কাউন্সিল বাংলা একাডেমী, কারিগরী মিলনায়তন প্র এসব মঞ্চের ভাড়া অত্যাধিক। আর এসব মঞ্চে নাটক মঞ্চস্থ করা সে নাট্যগোষ্ঠীগুলোর জন্য রীতিমতো ভীতি ব্যাপার।

আর তাই, বিনা পয়সায় বা পয়সায় নাটক মঞ্চস্থ করা ঢাকার প্রায়ই অসম্ভব ব্যাপার। ফলাফল নাট্যগোষ্ঠী আজ চিন্তিত এবং কেউ ইতিমধ্যে নাটক মঞ্চস্থ ব্যাপারে বেশ পিছিয়ে পড়েছেন।

আর এ কারণেই এখানে যাতে পয়সায় নিরীক্ষাধর্মী নাটক মঞ্চস্থ পারে, তার জন্য অবিলম্বে একটি প্রয়োজন।

সরকার, দেশের শিক্ষিত স এবং জনগণ—সবাইকে এ ব্যাপারে লক্ষ্যে এগিয়ে আসতে হবে। তাব আমাদের আজকের নাট্য আ সফলতার পথ খুঁজে পাবে।

—আনওয়ার আ

মাঠের নায়ক

'কি ঝঞ্ঝাট বলুন তো দাদা? নির্ভেজাল বাঙালী আমি, আত্মীয় স্বজন বেবাক বাঙালী। বাংলায় ভাবি, বাংলাতেই স্বপ্ন দেখি। তবু বন্ধুবান্ধব সবাই বলে কিনা, চন্দন তুই বিহারী।'

'হ্যাঁ বলতে পারেন মাতৃভাষাটা একটু আমার টাইক আছে। জানেন তো অনভ্যাসে বিদ্যানাশ। জন্মেছি যেখানে, বড় হয়েছি যেখানে, লেখাপড়া যেখানে, সেখানকার প্রভাব তো অস্বীকার করা যায় না? তাই বাংলা বলার স্রোতটা একটু কমতি, হলেও একেবারে আগমার্ক বাঙালী আমি।'

মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মেসে লতিফুদ্দিনের বিছানার ওপর বসে বসে চন্দন গুপ্তের সঙ্গে আলাপ চলছিল। চন্দনের তাড়া ছিল অফিসে যাওয়ার। চাকরী ফার্টিলাইজার কর্পোরেশনে। নতুন চাকুরে তাই বোধ হয় এখনও হাজিরার সময়টা ঠিক রাখার চেষ্টা করে। চন্দনের দু পায়েই সট আছে। ভাল লিংকম্যান। দরকারে স্ট্রাইকারও হতে পারে। পজিসন জ্ঞানও রীতিমত ভাল। সব চেয়ে বড় হাতিয়ার চন্দনের আত্মবিশ্বাস। বড় ম্যাচে বড়ো মেজাজ।

মেজাজ যে বড়ো তার প্রমাণ তো এই সেদিন ইস্টবেঙ্গল মহামেডান স্পোর্টিংয়ের খেলার দিন হাতেনাতে পাওয়া গেল। বলতে গেলে একা চন্দনই তো সেদিন পেছনে পড়ে ঠেকিয়ে রাখল ইস্টবেঙ্গলকে। সুভাষ, সুরজিৎ, আকবর আর হাবিবকে কতবার যে কতভাবে বিমুখ করেছে তার কি হিসেব আছে? মাথায় ছোট, গায়ে-গতরে মাংস একটু বেশী (ফুটবলারের পক্ষে এত চর্বি বোধ হয় ভাল নয়)। কিন্তু চেহারা যা-ই হোক পজিশন জ্ঞান আর পরিশ্রমের বিনিময়ে চন্দন সমস্ত ঘাটতি পুষিয়ে নিচ্ছে। চন্দনের জন্ম ৫৩ সালের

সালের ২৬ শে ফেব্রুয়ারী, পাটনায়। বাবা দামোদরপ্রসাদ গুপ্ত বিহার পুলিশের সি-আই-ডি ইন্সপেক্টর। পাঁচ ভাই (চন্দন মেজ) দু বোন, মা-বাবা মিলে চন্দনের সুখী পরিবার।

১৯৬৮ সালের সুব্রত কাপ জয়ী পাটলিপুত্র হাই স্কুল দলে চন্দন গুপ্ত ছিলেন সব চেয়ে চোখে পড়া 'মিনি' ফুটবলার। পাটনা বি এন কলেজে পার্ট ওয়ান (কলা) পড়ার সময় দুটি লোকের চোখে পড়ে যান চন্দন। প্রথমজন কলেজের শরীর শিক্ষক মহম্মদ জাফর হোসেন এবং দ্বিতীয় জন খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড় চন্দ্রেশ্বরপ্রসাদ। ৬৯ সালে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে পূর্বাঞ্চলীয় আসরে পাটনার প্রতিনিধিত্ব করার পর চন্দ্রেশ্বরপ্রসাদ চন্দনকে ধরে নিয়ে এলেন কলকাতায়। ঐ ৬৯ সালেই পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল দলের অধিনায়ক ছিলেন চন্দনের বড়ভাই রঞ্জন গুপ্ত।

পাটনা ফুটবল ক্লাবের নামকরা খেলোয়াড় চন্দন গুপ্ত কলকাতায় এসে গড়ের মাঠের চেহারা, গ্যালারীর দর্শক আর সমর্থকদের মেজাজ দেখে খানিকটা চকচকিয়ে গেলেও কয়েকদিনের মধ্যেই সব কিছু ম্যানেজ করে নিলেন।

আড়চোখে একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে চন্দন বললেন : ১৯৭০ সালে প্রসাদদা তো এনে তুললেন মোহনবাগান ক্লাবে। তিন বছর একটানা থাকলুম। বলতে ভুলে যাচ্ছিলাম এর ভেতর পাটনার ছাপ নিয়েই ১৯৬৮ সালে ভারতীয় স্কুল দলে স্থান পেলাম। খেললাম শ্রীলংকার বিরুদ্ধে (তখন বলা হোত সিংহল)। ১৯৭১ সালে টোকিওয় আয়োজিত এশীয় যুব ফুটবল প্রতিযোগিতায় আমিই হোলাম ভারতের অধিনায়ক। বলতে পারেন : খোদা যব দেতা—ছপ্পর ফোঁড় কর দেতা। ৭২ সালে ব্যাংকক এশীয় যুব ফুটবলেও গিয়েছি ভারতের সহ-অধিনায়করূপে। ঐ বছর হংকং টুরে হোল। ভারতীয় ফুটবল দল গেল জাকার্তায় আমন্ত্রণমূলক ফুটবল (কিংস কাপ) খেলতে। আমিও গেলাম। ১৯৭২-এ আমি জাতীয় ফুটবলে বাংলার হয়েও খেলেছি কিন্তু ফাইনালে খেলা বরাতে জোটে নি। বাংলাদেশের জন্মের পর খেলতে গেছি ঢাকায়। ৭৩ সাল ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের হয়ে হংকং সফরও করেছি।

চন্দনের কলকাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা অপরিসীম। কেননা এই কলকাতাই আজ তাঁকে সম্মান দিয়েছে, দিয়েছে স্বীকৃতি। কৃতজ্ঞ সে শৈলেন মান্নার কাছে, কোচ লতিফ, প্রদীপ ব্যানার্জি এবং মেওয়ালালের কাছে। এঁরা সযত্নে তাকে মানুষ করেছেন। ত্রুটি শুধরেছেন। ধমক দিয়েছেন আবার আদরও করেছেন। প্রেমসে ফুটবল খেলে যাচ্ছি দাদা সংসারে ঝামেলা নেই, বিয়ে থা করিনি কবে করবো তাও এখনও ভাবিনি। প্রেমসে চল যাচ্ছে আমার—কলেই চন্দন দে ছুট। অফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে।

'আমার বাড়ী মুন্সীগঞ্জ: ঐ মুন্সিগঞ্জেই আমার জন্ম। গোটা ভারত তখন উথাল পাথাল। ইংরেজের পাততাড়ি গুটোবার ঘণ্টা বেজেছে। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত উত্তেজনা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় গোটা দেশ ক্ষতবিক্ষত। এরই মাঝখানে ১৯৪৭ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী আমি পৃথিবীতে এলাম।'

"আমাদের বাড়ী নবদ্বীপ। গৌরাঙ্গদেবের নাম শুনেছেন তো সেখানে। খেলায় স্কুলে পড়ার সময় সবাই ভেবেছিল যে আমি ভবিষ্যতে অ্যাথলীট হয়েও ছিলাম কিন্তু অ্যাথলেটিকসে থাকতে পারলাম না। চলে এলাম মাঠে।"

বলে কেন এলে'—এই প্রশ্নের উত্তরে রেলওয়ের স্ট্রাইকার প্রকাশ বিশ্বাস সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে ঐ রাখলেন। প্রকাশ হাফলিফল গড়ের- শ নাম করেছেন। ভাল খেলোয়াড় প্রকাশকে আজকাল অনেকেই দিয়ে দেখিয়ে দেয়। প্রকাশ মনে ফুটবল না খেললে আজ হয়তো চিনতো না। কোথায় হয়তো মধ্যে হারিয়ে যেতাম।

জী খেলোয়াড় প্রকাশ। পরিভাষায় লে মুডি। খেললেন যেদিন সব হয়ে গেল সেদিন। যে দিন মুড , সে দিন প্রকাশে আর গ্যালারীর কোন ফারাক থাকে না। প্রকাশ এই ভূমিকা সম্পর্কে দেখলাম তুর সজাগ। প্রকাশ বিশ্বাসের কথা হচ্ছিল ময়দানে ইস্টার্ণ রেল- াথলেটিক এসোসিয়েশনের তাঁবুর নের ওপর বসে বসে।

ধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে প্রকাশ। সত্যাশরণ বিশ্বাসও রেলের চাকুরে মত। বর্তমানে পোস্টিং কাঁচড়া- (বুকিং ক্লার্ক)। ওখানকার হালেট লেই প্রকাশের পড়াশুনা। বাবা, মা, াই, চার বোন নিয়ে রীতিমত বড় । একা বাবার আয়ে সংসারের চাকা য় চলে না বলেই অল্প বয়সেই র ধান্দায় বেরুতে হয়। বুঝতেই পারছেন ঘরের বড় ছেলে আমি। তো দায়িত্ব রয়েছে। ছোটবেলায় কে আমি মোটেই ভালবাসতুম না। সতুম অ্যাথলেটিকস।

কাতার মাঠে নামি প্রথম অ্যাথলীট । আমি ট্রিপল জাম্প করতাম ইস্ট- ক্লাবের হয়ে। পর পর চার বছর আমি পশ্চিমবঙ্গে ট্রিপল জাম্প চ্যাম্পিয়ন ছিলুম। আঠারো বছরের নিম্ন বয়স্কদের ট্রিপল জাম্পের রাজ্য রেকর্ডটি এখনও আমার। চণ্ডীগড়ে ৬৩।৬৪ সালে জাতীয় অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় আমি বাংলার হয়ে ট্রিপল জাম্পে নেমে থার্ড হয়েছিলুম।'

অ্যাথলীটের পরিচিতি নিয়েই ১৯৬৫ সালে চাকরী পেলাম বাটায়। ফুটবলটাও একটু একটু চলতো অ্যাথলেটিকসের ফাঁকে ফাঁকে। ৬৬।৬৭ সাল কাটলো বাটার চাকরীতে। ইস্টার্ণ রেলে চাকরী নিয়েছি ১৯৬৮ সালে। সত্যি কথা বলতে কি অ্যাথলেটিকসই ছিল এক সময় আমার জীবনের ধ্যানজ্ঞান। ফুটবলকে তাই গোড়ায় সিরিয়াসলি নিইনি। কিন্তু ভাগ্যের এমনই খেলা যে শেষ পর্যন্ত ঐ ফুটবলকেই আঁকড়ে ধরতে হোল। এখন ভাবছি ছেলেবেলা থেকে ফুটবলকে সিরিয়াসলি নিলে হয়তো এখন আর একটু ভাল খেলতে পারতুম।'

'যাক সে কথা। ফুটবলের কথাই বলি। ৬৬ সালে খেললাম বাটায়। ৬৭ সালেও ঐ বাটায়। ৬৮তে রেলে এলাম চাকরী নিয়ে। ৭১ সালে জাতীয় ফুটবলে সর্ব ভারতীয় রেলওয়ে দলে স্থান পেলাম। রেল সেবার মাদ্রাজে আয়োজিত সন্তোষ ট্রফিতে রাণার্স আপ হোল। বাংলার কাছে হারলাম ৪—১ গোলে। রেলের একমাত্র গোলটি করেছিলাম আমিই। তারপর ৭২-এ গোয়ায়, ৭৩-এ কোচিনেও সন্তোষ ট্রফির আসরে রেলের প্রতিনিধিত্ব করেছি। কোচিনে কেরালার কাছে ফাইনালে আমরা ৩—২ গোলে হেরে গেলেও কেন জানি না (বিনয়?) সকলেই আমাকে তারিফ করলেন।'

এর ভেতর ৭১ সালে জাকার্তায় কিংস কাপে ভারতের হয়ে খেলেছি। দলে একমাত্র বাঙ্গালী ছিলাম আমিই। কোরিয়ার বিরুদ্ধে একদিন একটা গোলও করে ফেলেছিলুম। তেহরানে আয়োজিত এশীয় ক্রীড়ায় যোগদানকামী ভারতীয় দলের ট্রায়ালেও ডাক পেয়েছি অন্য বত্রিশ জনের মত। ঈশ্বর জানেন—ভাগ্যে কি আছে।

বিপুল [illegible]

খেলার জগতে মেয়ে

সুব্রতা দেবনাথ
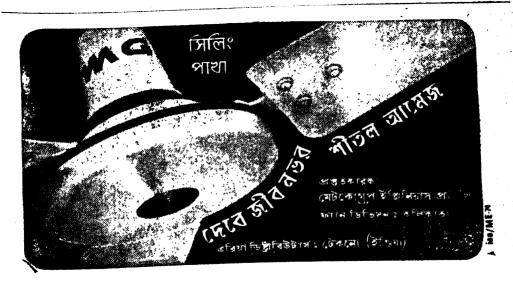
বিবাহিতা মেয়েরাও যে চেষ্টা ক
খেলাধুলোর আসরে সাফল্য অর্জন ক
পারে শ্রীমতী সুব্রতা দেবনাথ তার দৃ
সৃষ্টি করতে সঙ্কল্পবদ্ধ। সেদিন দুপু
দিকে সুব্রতার সঙ্গে দেখা হল, তার
অফিস সেন্ট্রাল একসাইজের এক
পূর্বরেলের চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে সু
দেবনাথ এখন এখানেই ইন্সপেকট
পদে যোগ দিয়েছে।

কথায় কথায় বলে উঠল সুব্রতা—এ
স্বামীর খুব ইচ্ছা, আমি আমার সটপুট
ডিসকাস ছোঁড়ার চর্চা অর্থাৎ আমার
খেলা চালিয়ে যাই।' অথচ নিজের
রক্ষণশীলতার জন্য ছেলেবেলায় স্কুলে এমন
কলেজে এসেও সে খেলাধুলো চর্চার সু
পায়নি। ১৯৬৮ সালে ভিকটোরিয়া ইনি
টিউশনের কলেজ স্পোর্টসে সুব্রতা
যোগ দেয়। সুব্রতার কথায়—দেখলুম অ
মেয়ে যোগ দিচ্ছে, তাই আমিও নেমে
লুম' কতকগুলো বিভাগে সফলও হল
কলেজ কর্তৃপক্ষ আমায় আন্তঃ ক
স্পোর্টসে নামার ব্যবস্থা করে দিলেন।
বছরই জব্বলপুরে আন্তঃ বিশ্ববিদ্য
ক্রীড়ার আসরেও কলকাতার প্রতিনিধিত্ব ক
সুযোগ হল সুব্রতার।

প্রথম প্রথম বাড়ীর বাধা ছিল। কিন্তু
দাদা দিলীপ পালের উৎসাহে সুব্রত
আসরে নামার প্রেরণা পায়। ১৯৬
যে বাধা বাড়ী থেকে এসেছিল, দাদার চে
পরের বছর সে বাধা আর রইল না। সু
সেবারই মাদ্রাজে জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগি
আসরে বাংলাদলে স্থান পেল সটপুট অ
ডিসকাস বিভাগে। সটপুটের দিকেই সুব্র
লক্ষ্য বেশী। তবে সে ডিসকাস ছোঁড়া
পরে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ক
জীবনে বার্ষিক ক্রীড়ার আসরে সুব্রতা
দলেও থেকেছে।

সুব্রতা বলে, সটপুট আর ডিসক
নিক্ষেপে তাকে প্রথম পাঠ দেন
পাড়ার সুনীল চ্যাটার্জি। পরে নেতাজ
[illegible] জাতীয় ক্রীড়া শিক্ষায়তনের প্রশিক্ষ

জ্ঞ কে মেননের কাছ থেকে সুব্রতা পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ লাভ করেন।

সুব্রতার স্বামী হলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ব্যাক ও ভারত বিখ্যাত ফুটবলার বিক্রমজিৎ দেবনাথ। খেলাধুলোয় স্বামীর প্রেরণার কথা সুব্রতা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করে, বলে, 'উনি চান আমি খেলাধুলোয় এক নতুন নজীর সৃষ্টি করি যা দেখে দেশের অন্য মেয়েরা আরও বেশী সংখ্যায় এগিয়ে আসবে এবং ফলে আমাদের দেশে মেয়েদের খেলাধুলোর মান আরও উন্নত হবে।' প্রশ্নোত্তরে সুব্রতা বলল, ১৯৬৭-৬৮-তে যখন প্রতিযোগিতায় নামতুম তখন ৩।৪ জনের বেশী প্রতিদ্বন্দ্বীর দেখা পেতুম না। এখন অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এখন রীতিমত জোরালো প্রতিযোগিতা করতে হয় অনেক মেয়ের সঙ্গে। সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে।

সুব্রতা ধাপে ধাপে এগিয়েছে। ১৯৬৮-তে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়ায় যোগ দেয় সুব্রতা। সেই বছরই মাদ্রাজে যায় জাতীয় ক্রীড়ার আসরে। ৭০-এ কটকে জাতীয় ক্রীড়ায় ডিসকাস নিক্ষেপে প্রথম স্থানাধিকার করে। ৭১-৭২-এ আমেদাবাদে জাতীয় আসরে সটপুট ও ডিসকাস দুবিভাগেই শীর্ষস্থান পায়। এর আগেও জাতীয় প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিয়েছে সুব্রতা। ১৯৭৩-৭৪-এ আন্তঃ রাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সটপুটে নতুন রেকর্ডও করেছে। এবার এশীয় ক্রীড়ায় যোগদানের জন্য বাঙ্গালোরে যে বাছাই-প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হবে, তাতেও সুব্রতার ডাক পড়েছে।

সুব্রতার মা নেই। বাবা আছেন, আর আছেন তিন ভাই ও এক বোন। ছেলেমেয়েদের মধ্যে সুব্রতাই সবার ছোট। দীর্ঘকায়া সুগঠনা এমন একটি সুস্থ সবল বাঙ্গালী মেয়ে চট করে চোখে পড়ে না। নিজের সম্পর্কে নম্র বিনয়ের সঙ্গে সংকল্প দৃঢ় একটা প্রত্যয়ের ছাপ সুব্রতার সমস্ত ব্যক্তিত্বকে ঘিরে রয়েছে।

খেলাধুলোর প্রতি তার নতুন অফিসের কালেকটর এন এন রায় চৌধুরী এবং এ কে দাসের উৎসাহের কথাও সুব্রতা উল্লেখ করে বলল, শ্রীরায় চৌধুরী নিজে এককালে স্পোর্টসম্যান ছিলেন। বর্তমানে অফিসের কর্মচারীদের মধ্যে যাতে খেলাধুলোর দিকেও আগ্রহ বাড়ে, সে দিকে তাঁর চেষ্টা আছে। তাই তিনি কিছু কিছু ক্রীড়াকুশলীকে চাকরীতে অগ্রাধিকার দিতে আগ্রহী। সুব্রতার বিশ্বাস সুযোগ সুবিধা পেলে অন্যান্য দেশের মত বাংলার কুমারী এবং বধূরাও এথলেটিকসে খ্যাতির চূড়ায় উঠতে পারবে।

—অজয়

ক্রিস ওল্ড
২১ রানে ৫ উইকেট

ডেনিস অ্যামিস
১ম ইনিংসে ১৮৮ রান

মাইক ডেনেস
১ম ইনিংসে ১১৮ রান

দর্শক

ভারত বনাম ইংল্যান্ড

দ্বিতীয় টেস্ট খেলা

ঐতিহাসিক লর্ডস মাঠের দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ইংল্যান্ড এক ইনিংস ও ২৮৫ রানে ভারতকে হারিয়ে ভারতের বিপক্ষে ১৯৭৪ সালের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে ২-০ খেলায় রাবার জয়ী হয়েছে। বরাদ্দ পাঁচ দিনের এই টেস্ট খেলা চতুর্থ দিনের ৭০ মিনিটের মাথায় শেষ হয়। বর্তমান টেস্ট সিরিজের শেষ ৩য় টেস্ট খেলা বাকি। তবে এই ৩য় টেস্ট খেলার ফলাফল কোন ভাবেই ইংল্যান্ডের এই **রাবার** জয়ের পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না। এখানে উল্লেখ্য, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ভারত উপর্যু-পরি দুটি টেস্ট সিরিজে (১৯৭১ ও ১৯৭২-৭৩) রাবার জয়ী হয়ে আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে প্রথম সারিতে যে আসন পেয়েছিল তা আজ নড়বড়ে হয়ে গেল। বর্তমানে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের ফলাফল দাঁড়াল : টেস্ট সিরিজ ১২, ইংল্যান্ডের **রাবার** জয় ৮, ভারতের **রাবার** জয় ২ এবং সিরিজ অমীমাংসিত ২। এই নিয়ে লর্ডস মাঠে ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে যে ৮টা টেস্ট খেলা হল তার ফলাফল : ইংল্যান্ডের জয় ৭, ভারতের জয় ০ এবং খেলা ড্র ১।

এবারও ইংল্যান্ডের অধিনায়ক টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার দান নিয়েছিলেন। প্রথম দিনের খেলায় ইংল্যান্ডের মাত্র ১টা উইকেট পড়ে ৩৩৪ রান উঠেছিল। এই দিনের খেলায় অপরাজিত ছিলেন ডেনিস

টনি গ্রেগ
১ম ইনিংসে ১০৬ রান

জিওফ আরনল্ড
১৯ রানে ৪ উইকেট

অ্যামিস (১৮৭ রান) এবং জন এডরিচ (৯৩ রান)। অ্যামিস এই নিয়ে তাঁর টেস্ট খেলায় ৭টা সেঞ্চুরী করলেন ভারতের বিপক্ষে প্রথম সেঞ্চুরী। অসমাপ্ত ২য় উইকেটের জুটিতে অ্যামিস এবং এডরিচ ২১৮ রান তুলে ভারতের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের হয়ে ২য় উইকেট জুটির রেকর্ড রান করেন। আগের রেকর্ড ছিল ১৬৪ রান (জিওফ পুলার এবং কেন ব্যারিংটন, দিল্লী ১৯৬১-৬২)। জন এডরিচ আজ ১০ রান সংগ্রহ করে তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনে ৪০০০ রান পূর্ণ করেন। তিনি এই সাফল্য লাভ করেন তাঁর ৬১টি টেস্টের ১০২তম ইনিংসের খেলায়। টেস্টের এক ইনিংসে তাঁর সর্বোচ্চ রান ৩১০ নট আউট (বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড, লিডস ১৯৬৫)।

দ্বিতীয় দিনে ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংস ৬২৯ রানের মাথায় শেষ হয়। ইংল্যান্ডের এই ৬২৯ রান ভারত বনাম ইংল্যান্ডের টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় উভয় দেশের পক্ষে আজ সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড পরিগণিত হয়েছে। এ বিষয়ে আগের রেকর্ড ইংল্যান্ডেরই ৫৭১ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ওল্ড ট্রাফোর্ড, ১৯৩৬)।

প্রথম দিনের অপরাজিত খেলোয়াড় অ্যামিস এবং এডরিচ দ্বিতীয় দিনে মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যে খেলা থেকে বিদায় নেন। এডরিচ তাঁর ৯৬ রানে এবং অ্যামিস তাঁর ১৮৮ রানের মাথায় আউট হন। এবং ২য় উইকেটের জুটিতে ২২৮ মিনিটে ২২১ রান তুলেছিলেন। লাঞ্চের সময় ইংল্যান্ডের রান দাঁড়ায় ৪ উইকেটে ৪৪৫। খেলায় অপরাজিত ছিলেন অধিনায়ক ডেনেস এবং গ্রেগ। লাঞ্চের পর ৫ম উইকেটের জুটি ডেনেস এবং গ্রেগ বীরবিক্রমে খেলে শেষ পর্যন্ত সেঞ্চুরী করেন। ৫ম উইকেটের জুটিতে গ্রেগ এবং ডেনেস ১১৮ মিনিটে দলের ২০২ রান তুলেছিলেন। গ্রেগ তাঁর ১০৬ রানের মাথায় আউট হন। এটি তাঁর ৫ম টেস্ট সেঞ্চুরী। অপর দিকে ডেনেস তাঁর ১১৮ রান করে আউট হন। টেস্ট খেলায় ডেনেসের এটি প্রথম সেঞ্চুরী। দ্বিতীয় দিনের বাকি ৬৫ মিনিটের খেলায় ভারত ১ম ইনিংসের কোন উইকেট না খুইয়ে ৫১ রান তুলেছিল। খেলায় গাভাস্কার ১৭ রান এবং ইঞ্জিনীয়ার ৩৩ রান তুলে অপরাজিত ছিলেন।

ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংসের পাহাড় প্রমাণ ৬২৯ রানের উত্তরে তৃতীয় দিনে ভারতের ১ম ইনিংস ৩০২ রানের মাথায় শেষ হয়। ১ম উইকেটের জুটিতে গাভাস্কার এবং ইঞ্জিনীয়ার ১৩১ রান তুলে দিয়েছিলেন। ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংসের ৬২৯ রানের থেকে ভারত ৩২৭ রানের পিছনে পড়ে ফলো-অন করে এবং ২য় ইনিংসের কোন উইকেট না খুইয়ে ২ রান সংগ্রহ করে। খেলার গতি ইংল্যান্ডের অনুকূলে সম্পূর্ণ ঘুরে যায়।

বিশ্ব ফুটবল কাপের ফাইনাল

বছর	বিজয়ী	রানার্স-আপ	গোল
১৯৩০	উরুগুয়ে	আর্জেণ্টিনা	৪—২
১৯৩৪	ইতালী	চেকোশ্লোভাকিয়া	২—১
১৯৩৮	ইতালী	হাঙ্গেরী	৪—২
১৯৫০	উরুগুয়ে	ব্রাজিল	৫—৪
১৯৫৪	পঃ জার্মানী	হাঙ্গেরী	৩—২
১৯৫৮	ব্রাজিল	সুইডেন	৫—২
১৯৬২	ব্রাজিল	চেকোশ্লোভাকিয়া	৩—১
১৯৬৬	ইংল্যান্ড	পঃ জার্মানী	৪—২
১৯৭০	ব্রাজিল	ইতালী	৪—১

দ্রষ্টব্য : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দরুন ২ বার (১৯৪২ ও ১৯৪৬ সালে) বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর বসেনি। ১৯৫০ সালে লীগ প্রথায় খেলা হয়।

চতুর্থ দিনের ৭০ মিনিটের খেলায় ভারতের ২য় ইনিংস মাত্র ৪২ রানের মাথায় শেষ হলে ইংল্যান্ড এক ইনিংস ও ২৮৫ রানের ব্যবধানে জিতে যায়। ভারতের এই ২য় ইনিংসে ক্রিস ওল্ড ২১ রানে ৫টা এবং জিওফ আর্নল্ড ১৯ রানে ৪টে উইকেট নিয়ে ভারতের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছিলেন। ভারতের এই ৪২ রানই যে কোন দেশের বিপক্ষে তার টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় সর্বনিম্ন রানের রেকর্ড পরিগণিত হল। আগের সর্বনিম্ন রানের রেকর্ড ছিল ৫৮ (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া ব্রিসবেন, ১৯৪৭ এবং বিপক্ষে ইংল্যান্ড ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫২)।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ইংল্যান্ড : ৬২৯ রান (ডেনিস অ্যামিস ১৮৮, জন এডরিচ ৯৬, মাইক ডেনেস ১১৮ এবং টনি গ্রেগ ১০৬ রান। আবিদ আলী ৭৯ রানে ২, বেদী ২২৬ রানে ৬ এবং প্রসন্ন ১৬৬ রানে ২ উইকেট)

ভারত : ৩০২ রান (গাভাস্কার ৪৯, ইঞ্জিনীয়ার ৮৬ এবং বিশ্বনাথ ৫২ রান। ওল্ড ৬৭ রানে ৪ এবং হেনড্রিক ৪৬ রানে ৩ উইকেট)

ও ৪২ রান (সোলকার নটআউট ১৮ রান। ওল্ড ২১ রানে ৫ এবং আরনল্ড ১৯ রানে ৪ উইকেট)

ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দল

১৯৭৪ সালের ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দল এ পর্যন্ত (জুন ২৪) ১৬টি প্রথম শ্রেণীর খেলায় অংশ গ্রহণ করেছে। তাদের এই ষোলটি প্রথম শ্রেণীর খেলার ফলাফল : ভারতীয় দলের জয় ৪, খেলা ড্র ১০ (উপর্যুপরি) এবং হার ২ (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১ম ও ২য় টেস্ট)। ভারতীয় দলের জয় ৪ : সারে কাউন্টি দলকে ১০ উইকেটে, ডার্বিসায়ার কাউন্টি দলকে ৮ উইকেটে, সম্মিলিত অকসফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় দলকে ৫৯ রানে এবং ল্যাঙ্কাশায়ার কাউন্টি দলকে ৫ উইকেটে।

বিশ্ব ফুটবল কাপ

বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার সূচনা ১৯৩০ সালে। প্রতি চতুর্থ বছরে এই প্রতিযোগিতার আসর বসার কথা। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দরুন ১৯৩৮ সালের পর দু'বার (১৯৪২ ও ১৯৪৬ সালে) এই প্রতিযোগিতার আসর বসেনি। ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ৯ বারের প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলকে 'জুলে রিমে কাপ' দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছে। ১৯৭৪ সাল থেকে বিজয়ী দলকে 'জুলে রিমে কাপের পরিবর্তে 'ফিফা কাপ' দেওয়া হবে। কারণ ব্রাজিল মোট ৩ বার (১৯৫৮, ১৯৬২ ও ১৯৭০) বিশ্ব ফুটবল চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভের সূত্রে 'জুলে রিমে কাপটি চিরদিনের মত হস্তগত করেছে। ১৮ ক্যারেট সোনা দিয়ে তৈরী 'ফিফা কাপে'র দৈর্ঘ্য ৩৬ সেন্টিমিটার এবং দাম ২০ হাজার ডলার (মার্কিন)। আগের আইনের পরিবর্তনের ফলে কোন দলেরই পক্ষে চিরদিনের মত এই 'ফিফা কাপ' জয় সম্ভব নয়।

পশ্চিম জার্মানীতে যে ১০ম বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর বসেছে তার

প্রথম রাউণ্ডের লীগ পর্যায়ের খেলা শেষ হয়েছে। এই প্রথম রাউণ্ডের লীগের চারটি গ্রুপে লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ হওয়ার সঙ্গে দ্বিতীয় রাউণ্ডের লীগ পর্যায়ে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে এই ৮টি দেশ—১নং গ্রুপের পূর্ব জার্মানী ও পশ্চিম জার্মানী, ২নং গ্রুপের যুগোশ্লাভিয়া ও ব্রাজিল, ৩নং গ্রুপের হল্যাণ্ড ও সুইডেন এবং ৪নং গ্রুপের পোল্যাণ্ড ও আর্জেন্টিনা। এই ৮টি দেশের মধ্যে ইউরোপের ৬টি এবং দক্ষিণ আমেরিকার ২টি। বিশ্ব ফুটবল কাপ বিজয়ী পাঁচটি দেশের মধ্যে ১৯৬৬ সালের বিজয়ী ইংল্যাণ্ড ইউরোপীয় জোনের প্রাথমিক বাছাই পর্বের খেলায় বিদায় নিয়েছিল, পশ্চিম জার্মানীতে খেলবার সুযোগ পায়নি। পশ্চিম জার্মানীতে প্রথম রাউণ্ডের লীগ পর্যায়ে যে ১৬টি দেশ খেলেছিল তাদের মধ্যে বিশ্ব ফুটবল কাপ জয়ী দেশ ছিল এই চারটি—ব্রাজিল, পশ্চিম জার্মানী, ইতালী এবং উরুগুয়ে। এই চারটি বিশ্ব কাপ বিজয়ী দেশের মধ্যে পরবর্তী দ্বিতীয় রাউণ্ডের লীগ পর্যায়ে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে ব্রাজিল এবং পশ্চিম জার্মানী। উরুগুয়ে ৩নং গ্রুপে সর্বনিম্ন স্থান এবং ইতালী ৪নং গ্রুপে ৩য় স্থান লাভ করেছে। এখানে উল্লেখ্য, ইতালী ১৯৩৪ ও ১৯৩৮ সালে এবং উরুগুয়ে ১৯৩০ ও ১৯৫০ সালে বিশ্ব ফুটবল কাপ জয়ী হয়েছিল। ইতালী ১৯৭০ সালে রানার্স-আপও হয়েছিল।

প্রথম রাউণ্ডে ২নং গ্রুপের লীগ খেলায় যুগোশ্লাভিয়া, ব্রাজিল এবং স্কটল্যাণ্ড—এই তিন দেশেরই ৪ পয়েন্ট করে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত গোল এভারেজের ভিত্তিতে যুগোশ্লাভিয়া এবং ব্রাজিল যথাক্রমে ২নং গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ হয়েছে। তিনবারের (১৯৫৮, ১৯৬২ ও ১৯৭০) বিশ্ব ফুটবল কাপ বিজয়ী ব্রাজিলের খেলায় আগের মত জৌলুষ এবং বিক্রম নেই। ২নং গ্রুপের সর্বনিম্ন স্থানাধিকারী নবাগত জাইরকে যেখানে যুগোশ্লাভিয়া ৯—০ গোলে হারিয়েছে সেখানে ব্রাজিল জিতেছে ৩—০ গোলে। যুগোশ্লাভিয়া এবং স্কটল্যাণ্ডের বিপক্ষে ব্রাজিল গোলশূন্যভাবে খেলা ড্র করেছে। প্রথম রাউণ্ডের লীগ পর্যায়ের খেলায় সর্বাধিক গোলে জিতেছে যুগোশ্লাভিয়া—জাইরের বিপক্ষে ৯—০ গোলে এবং সমস্ত খেলাতেই জিতেছে একমাত্র পোল্যাণ্ড (৪র্থ গ্রুপে)।

প্রথম রাউণ্ডের লীগ

চূড়ান্ত তালিকা

১নং গ্রুপ

	খে	জ	ড্র	হার	স্ব	বি	প
পূঃ জার্মানী	৩	২	১	০	৪	১	৫
পঃ জার্মানী	৩	২	০	১	৪	১	৪
চিলি	৩	০	২	১	১	২	২
অস্ট্রেলিয়া	৩	০	১	২	০	৫	১

২নং গ্রুপ

	খে	জ	ড্র	হার	স্ব	বি	প
যুগোশ্লাভিয়া	৩	১	২	০	১০	১	৪
ব্রাজিল	৩	১	২	০	৩	০	৪
স্কটল্যাণ্ড	৩	১	২	০	৩	১	৪
জাইর	৩	০	০	৩	০	১৪	০

৩নং গ্রুপ

	খে	জ	ড্র	হার	স্ব	বি	প
হল্যাণ্ড	৩	২	১	০	৬	১	৫
সুইডেন	৩	১	২	০	৩	০	৪
বুলগেরিয়া	৩	০	২	১	২	৫	২
উরুগুয়ে	৩	০	১	২	১	৬	১

৪নং গ্রুপ

	খে	জ	ড্র	হার	স্ব	বি	প
পোল্যাণ্ড	৩	৩	০	০	১২	৩	৬
আর্জেন্টিনা	৩	১	১	১	৭	৫	৩
ইতালী	[illegible]	১	১	১	৫	৪	৩
হাইতি	৩	০	০	৩	২	১৪	০
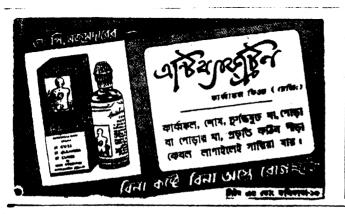
২য় রাউণ্ডের লীগ-তালিকা

দ্বিতীয় রাউণ্ডের লীগের খেলায় নীচের ৮টি দেশ দুটি গ্রুপে সমান ভাগ হয়ে খেলবে এবং এই দুই গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান দেশ নিয়ে ফাইনাল খেলার আসর বসবে। প্রতিযোগিতায় ৩য় ও ৪র্থ স্থান নির্ণয়ের জন্য দুই গ্রুপের রানার্স-আপ দলের মধ্যে খেলা হবে।

এ গ্রুপ : পূর্ব জার্মানী, হল্যাণ্ড ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনা

বি গ্রুপ : যুগোশ্লাভিয়া, পোল্যাণ্ড পশ্চিম জার্মানী এবং সুইডেন

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

গত সপ্তাহে (জুন ১৭—২২) প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় যে ১৪টা খেলা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত ফলাফল : জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি ৮ এবং খেলা ড্র ৬। মোহনবাগান গত সপ্তাহের খেলায় (বিপক্ষে স্পোর্টিং ইউনিয়ন এবং ইস্টবেঙ্গল) যোগদান করেনি।

গত চার বছরের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল অপ্রতিহতগতিতে উপর্যুপরি পাঁচবার লীগ জয়ের পথে এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে ইস্টবেঙ্গল ১৫টা খেলায় ২৯ পয়েন্ট সংগ্রহ করে লীগ তালিকার শীর্ষস্থান দখল করে আছে। এখানে উল্লেখ্য, এ বছরের লীগের খেলায় একমাত্র ইস্টবেঙ্গলই এখনও কোন খেলায় হার স্বীকার করেনি। তারা চিরকালের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিং [illegible] থেকে অনেক পয়েন্টের ব্যবধানে [illegible] আছে।

মোহনবাগান আলোচ্য সপ্তাহে কোন খেলায় যোগদান করেনি। খিদিরপুরের বিপক্ষে তাদের খেলা কেন্দ্র করে যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে এবং ক্লাব সম্পত্তির বিপুল ক্ষতি হয়েছে তার জন্য ক্লাব কর্তৃপক্ষ এক অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেছেন। বর্তমানের এই অবস্থায় ২৯শে জুন পর্যন্ত লীগের খেলায় তাদের যোগদান করা সম্ভব নয় জানিয়ে খেলা স্থগিত রাখার জন্য মোহনবাগান আই এফ এ-র কাছে এক আবেদন করেছিল। তাদের এই আবেদন অগ্রাহ্য হয় এবং মোহনবাগানও তাদের খেলায় যোগদান থেকে বিরত থাকে। খিদিরপুরের বিপক্ষে তাদের পরিত্যক্ত খেলার আগে মোহনবাগানের ১২টা খেলায় ১৯ পয়েন্ট ছিল।

এরিয়ান্সের বর্তমানে পয়েন্ট দাঁড়িয়েছে ৮টা খেলায় ১৩ পয়েন্ট। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ১২টা খেলায় ১৫ পয়েন্ট। ইস্টবেঙ্গলের পর এরিয়ান্স কম পয়েন্ট নষ্ট করেছে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

লক্ষ লক্ষ লোক আজ
সাধনা দশন ব্যবহার করেন
কারণ অতি উৎকৃষ্ট
দাঁতের মাজন ব'লে
এর সুনাম ও জনপ্রিয়তা
উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।
অতুলনীয় গুণাবলীর জন্য
সাধনা দশন বহুদিন ধরে
দেশের সর্বত্র প্রচুর সমাদর
লাভ করে আসছে।
সাধনা টুথ পেস্টও বহুগুণ-
বিশিষ্ট বিশেষ ফলপ্রদ ও
উপকারী। যাঁরা পেস্ট পছন্দ
করেন তাঁদের অনুরোধেই
প্রস্তুত করা হয়েছে।

সাধনা
টুথপেস্ট

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ,
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (লণ্ডন)
এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম.বি.বি.এস. (কলি)
আয়ুর্বেদাচার্য

SD.5/70

নতুন
ফরমূলায়
সুন্দর প্যাকে

কুকমী
গুঁড়া মশলা

হ'লো সেই আসল জিনিষ যার পেছনে রয়েছে ১২৫ বছরের অভিজ্ঞতা

১। সর্বাধুনিক মশলা প্রযুক্তি বিদ্যার ফল নতুন প্যাকে আরও উন্নত ধরনের কুকমী গুঁড়া মশলা।

২। এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের গবেষণা।

৩। বাজারের অন্যান্য পাঁচটা গুঁড়া মশলা থেকে কুকমী গুঁড়া মশলা সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের ও খাদ্যপ্রাণে ভরপুর।

আমাদের
অন্য কোন ব্র্যাণ্ড ও
ব্রাঞ্চ নেই

প্রস্তুতকারক **কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ**
(স্পাইস পাউডার ডিভিসন)
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭। ফোন: ৩৩-০৯৯৫ ফ্যাক্টরী—কাশীপুর

ICB/KCD-74

অমৃত

সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ

বর্ষ ১০ সংখ্যা] শুক্রবার ২৭ আষাঢ়, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ [মূল্য ৫০ পয়সা]

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মনি-অর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫.০০	টাকা ৩০.০০
ষাণ্মাষিক	টাকা ১২.৫০	টাকা ১৫.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬.২৫	টাকা ৮.০০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১, আনন্দ চাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১৪শ বর্ষ

১০ সংখ্যা
মূল্য ৫০ পয়সা

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রকাশ বিভাগ

Friday 12th July, 1974 শুক্রবার ২৭ আষাঢ় ১৩৮১ 50 Paise

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

ভুট্টোর বাংলাদেশ সফর

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টোর বাংলাদেশ সফর বাস্তব পরিস্থিতিরই স্বীকৃতি। কিন্তু তাঁর অনমনীয় মনোভাবের জন্যই এই সফর ব্যর্থ হল। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় শাসনতান্ত্রিক আলোচনা ভেঙে দিয়ে তিনি রাত্রির অন্ধকারে করাচী ফিরে গিয়েছিলেন। তারপর শুরু হয়েছিল ইয়াহিয়া খানের জঙ্গীবাহিনীর তাণ্ডব। সেদিন যদি জুলফিকার আলি ভুট্টো বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিদের ন্যায্য দাবী মেনে নিতেন তাহলে লক্ষ লক্ষ বাঙালীর রক্তে পাকিস্তানী জঙ্গী শাসকরা হাত কলঙ্কিত করতে পারত না। এই উপ-মহাদেশে নেমে আসত না আরেকটি যুদ্ধের বিভীষিকা। বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের উদারতায় পাকিস্তান তার নব্বুই হাজার যুদ্ধবন্দীকে অক্ষত অবস্থায় স্বদেশে ফিরে পেয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদেরও বাঙালী জাতি মার্জনা করেছে। ইতিহাসে এই উদারতার তুলনা নেই।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে পাকিস্তান সহজে স্বীকার করে নেয় নি। ভুট্টোর ঢাকা সফরের সময়েও পাকিস্তান বাংলাদেশকে দেয় নি কূটনৈতিক স্বীকৃতি। বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান ভুট্টোকে সসম্মান অভ্যর্থনা জানিয়ে আরেকবার তার মহৎ হৃদয় ও উদারতারই পরিচয় দিয়েছেন। পাকিস্তানের সঙ্গে সহজ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তিনি তিনটি শর্তের উল্লেখ করেছিলেন। প্রথমত, বাংলাদেশে যে সমস্ত পাকিস্তানী রয়েছে তাদের ফিরিয়ে নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, অবিভক্ত পাকিস্তানের বিষয়-সম্পত্তি ও দায়-দায়িত্ব ভাগাভাগির প্রশ্ন মীমাংসা করতে হবে। এবং তৃতীয়ত, উপমহাদেশের বৃহত্তর স্বার্থরক্ষায় দুই দেশের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে পারস্পরিক বিশ্বাস ও বন্ধুত্বের পরিবেশ। ভারতবর্ষও চায় উপমহাদেশের স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে পাকিস্তান তার বৈরিতা ও অন্ধ বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে এগিয়ে আসুক। দুঃখের বিষয় পাকিস্তানের তীব্র ভারত-বিরোধিতার অবসান ঘটে নি। কুয়ালালামপুরে ইসলামী সম্মেলনে ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণ নিয়ে আতঙ্ক ও বিদ্বেষ সৃষ্টির অপচেষ্টা সে করেছিল। বাংলাদেশের দৃঢ়তায় সেই অপচেষ্টা তার সফল হয় নি। কিন্তু এর থেকে পাকিস্তানের দৃষ্টিভঙ্গীর সংকীর্ণতা ও অন্ধতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও অচ্ছেদ্য মৈত্রী বন্ধনে পাকিস্তান আতঙ্কিত। দুটি সার্বভৌম দেশ নিজেদের মধ্যে কি সম্পর্ক গড়ে তুলবে এবং তা বজায় রাখবে সে বিষয়ে পাকিস্তানের মাথা ঘামানোর কোনো অর্থ হয় না। বাংলাদেশের মানুষের ওপর বর্বর অত্যা-চারের জন্য পাকিস্তান দায়ী। ভুট্টো বলতে চেয়েছেন এই শোচনীয় ঘটনা ও হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী পাকিস্তানী জঙ্গীতন্ত্র। তিনি একবারও নিজের দায়িত্ব স্বীকার করেন নি কিংবা তার জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করেন নি। বাংলাদেশের জনগণ সে কথা ভুলতে পারে না।

বঙ্গবন্ধু তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জনগণকে যে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা সহ্য করতে হয়েছে তা সহজে ভোলা যায় না। বাংলাদেশ তা ভুলতেও রাজি নয়। তবু বৃহত্তর শান্তি ও মানবিক কল্যাণের স্বার্থে দুই দেশের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনে বাংলাদেশ আগ্রহী। ভারতবর্ষও তাই চায়। ভারত আশা করে বাস্তব অবস্থা স্বীকার করে নিয়ে পাকিস্তান ভারতের সঙ্গেও স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করতে আগ্রহ দেখাবে। গত দিল্লী চুক্তির সময় এই প্রতিশ্রুতিই পাকিস্তান দিয়েছিল এবং এই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই বাংলাদেশ পাকিস্তানী বন্দীদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে। পাকিস্তানকে বুঝতে হবে বিরোধ জিইয়ে রেখে সে তার জনগণের স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে না। বাংলাদেশ একটি জোটনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। তার আদর্শের সংগে ভারতের আদর্শের মিল। পাকিস্তানের সঙ্গে এই আদর্শের দুস্তর ব্যবধান। এই উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের জন্য তা সত্ত্বেও ভারত ও বাংলাদেশ যে যৌথ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান যদি তাতে ঐকান্তিকভাবে সাড়া দিত তাহলে এই ব্যবধান অতিক্রম করা কঠিন হত না। বাংলাদেশের সংগে আলোচনা ব্যর্থ করে দিয়ে ভুট্টো আবার এক অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দিলেন দুই দেশের সম্পর্ক। এই ব্যর্থতার দায়িত্ব তাঁরই।

নয়ন নেই। তিন বছরের নয়ন চার ঘণ্টা আগে মারা গেছে।

হাসপাতালের লোকজন সাধারণভাবে মৃত্যু সম্বন্ধে উদাসীন। সেটা যে খুব বেমানান, এমন বলা যায় না। যেখানে প্রতিদিনই কেউ-না-কেউ মরছেই (জন্মাচ্ছেও) সেখানে মৃত্যু সম্বন্ধে লোকে যদি সামান্য নির্বিকার হয়ই তবে তা খুব অস্বাভাবিক নয়। দৃষ্টিকটুও না। তবু যে-নার্স খবরটা দিল, সে খুব পোড়-খাওয়া নয়, বয়েসটা কম ফলে খবরটা দেবার মুহূর্তে তার মুখটা সামান্য বিষণ্ণ হল। অথচ রমা আর প্রকাশ, নয়নের মা-বাবা, আজ কিছুটা নির্ভয়ে হাসপাতালে এসেছিল। কারণ গতকাল সন্ধ্যায় বাহাত্তর ঘণ্টার 'ক্রিটিকাল আওয়ার' পেরিয়ে গিয়েছিল এবং এই নার্সটিই 'যান্ত্রিক সহানুভূতির সঙ্গে বলেছিল—'আপনারা এখনো বসে আছেন কেন, চলে যান না।' এবং ওরা কাল কতকটা স্বস্তিতে রাত কাটিয়েছিল। দু রাত্রির নিরংকুশ অনিদ্রার পরে কাল রাতে ওদের সামান্য ঘুমও হয়েছিল।

ফলে আজ ওরা মৃত্যু সংবাদের জন্য তৈরী ছিল না। কথাটা এক অর্থে হয়তো অবান্তরও বটে। কারণ কোন মানুষই মৃত্যু সংবাদের জন্য কখনো তৈরী থাকে না। বস্তুতঃ মৃত্যুকে কোন অবস্থাতেই কেউই আমরা মেনে নিতে পারি না। অথচ মৃত্যুর মত অনিবার্য অবধারিত আর কী-ই বা আছে? আঘাতের তীব্র আকস্মিকতায় ওরা কয়েক মুহূর্ত বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর রমার দু-হাত সামনের কাঠের দরজার ওপরে পিষ্ট পড়ে তার, ভেঙে-পড়া শরীরের ভার বহন করবার শক্তি যেন [illegible] যাচ্ছে। আর প্রকাশ স্থির চোখে নার্সের সাদা ধোয়ামোছা [illegible]বিভর দিয়ে চলে-যাওয়া দেখে। তারপর তার উদ্ভ্রান্ত হাত দুটিও দরজার ওপরে গিয়ে পড়ে।

দরজার ওপাশেই মৃত্যু। মৃত নয়ন এখন শুয়ে আছে এই বন্ধ-ঘরেই।

বাবা মার মধ্যে কে প্রথম কাঁদল এটা খুব বেশী উল্লেখযোগ্য ব্যাপার কিছু নয়। তবু প্রকাশই আগে কাঁদল সশব্দে আকুল হয়ে। শোকবিহ্বলতায় সে ভুলে গেল স্থানকালের কথা। এই তার প্রথম পুত্র-শোক। নয়ন ছিল তার প্রথম এবং একমাত্র সন্তান।

একমাত্র বা প্রথম সন্তান না হলেও সে কাঁদত। কারণ এক্ষেত্রে কান্নাই স্বাভাবিক। কিন্তু রমা কাঁদল না। কাঁদতে পারল না। কিম্বা তার কান্না এল না। এটা খুব স্বাভাবিক নয়। কিন্তু কেন তার কান্না পায় না কে জানে। হাসি-কান্না ভয় বা আনন্দের কার্যকারণ সম্বন্ধ বড় দুর্বোধ্য, জটিল। পরন্তু সে খুব স্পষ্ট করে প্রকাশের কান্নার শব্দও শুনতে পেল না। কারণ একটা তীব্র নিরবচ্ছিন্ন গুঞ্জন ধ্বনি—যা টেলিগ্রাফ পোস্টে কান পাতলে শোনা যায়—তেমনি একটা

বহুদূরাগত এবং বহুদূরেগামী শব্দতরঙ্গ তার সমস্ত চেতনা তখন মথিত করে দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। ঝিম ঝিম ঝিম ঝিম যেন গভীর পাহাড়ী খাদের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝরনার শব্দস্রোত তার চেতনা অবচেতনায় মিলে মিশে তাকে নিস্পন্দ নির্বোধ করে দিচ্ছিল। অথচ রমা মূর্ছা যায় নি। এ রকম অবস্থাকে ঠিক সংজ্ঞাহীনতাও বলা যায় না।

অবিকল এ রকম ঘটনা রমার জীবনে আরেকবার ঘটেছিল। নয়নকে জন্ম দেবার সময়ে। সেদিনও কান্নাকাটি করে নি সে। শুধু শরীরের পক্ষে অসহ্য যন্ত্রণায় সে সংজ্ঞা হারাবার আগের মুহূর্ত অবধি চীৎকার করেছিল। আজ সে চীৎকারও করতে পারছে না। অথচ চীৎকার করতে পারলে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য সে নয়নের ভাবনা থেকে খানিক নিষ্কৃতি পেতে পারত।

রমা এখন ভাবছে নয়ন আর কোনদিন তার পাশে শোবে না কিম্বা কান্নাকাটি করে তাকে জ্বালাতন করবে না কিম্বা আর কোনদিন তাকে মা বলে ডাকবে না অথবা তার কোলে উঠেই ক্ষিপ্র হাতে তার নাক খামচে ধরবে না। আর তখন কৃত্রিম ক্রোধে রমা তাকে 'হাউ' করে কামড়ে দেবার ভঙ্গি করলে খলখল করে নয়ন আর হেসেও উঠবে না।

রমার ভেঙে-যাওয়া বুকে কান্না ওথলায় না—রাগ উঠে আসে, হয়তো বা অভিমান—এমন অকালে মরে গেল কেন নয়ন?

অকাল ছাড়া কী? যে শিশু সবে বছর তিনেক এসেছে পৃথিবীতে যে কিছু চিনল না বুঝল না ভোগ করল না সে অমনি অমনি মরে যাবে? তবে আর অত জাঁক করে আসা কেন? এই তো যেন সেদিন তাকে বেহুঁশ করে দিয়ে গভীর রাতে জন্ম নিয়েছিল নয়ন এই হাসপাতালেই। আর গতকাল রাত শেষ হবার আগেই সে চলে গেল এই হাসপাতাল থেকেই। রমার অজ্ঞান হতে ইচ্ছা করে অন্ততঃ কাঁদতে। কিন্তু কেন যে কান্নাও পায় না?

শুধু শরীর বিবশ লাগে আর কানের মধ্যে টেলিগ্রাফের তারের বহুদূরাগত এবং বহুদূরেগামী একটানা ঝিম ঝিম শব্দ শুনতে পায়।

তার দুহাতে দরজার পাল্লা বেয়ে নেমে যেতে থাকে, শরীরের অসহ্য ভার ক্রমাগত নীচে টেনে নামায়।

প্রকাশ তার কান্নাহীন নিষ্পন্দ নিস্পন্দ ঘামে ভেজা ফ্যাকাশে মুখটা দেখে, সামনে ঝুঁকে আবেগে তাকে দু-হাতে বুকে টেনে নেয়, শোকাহত গলায় বলে—'আমাদের নয়ন আর নেই।'

তার গলায় যতটা শোক রমাকে কাঁদাবার ইন্ধন তারো চেয়ে বেশী। রমাকে দেখে তার ভয় হয়। তবু রমা কাঁদে না। শুধু একটা হাত সে আলতো করে প্রকাশের কাঁধের ওপর তুলে দেয়। মাথা হেলায় তার বুকে, তার দু' চোখ আধবোজা যেন তার বড় ঘুম পেয়েছে, এখুনি হয়তো বা সে ঘুমিয়েও পড়তে পারে এমন অসাড় তার দু চোখের ভারী পাতা।

তারও চেয়ে অনেক বেশী নিঃসাড় তার দুটি পা। নয়নের দুটো পায়ের মত হয়ে যাবে নাতো তার পা দুটো? দুটো অসাড় পা নিয়েই জন্মেছিল নয়ন, তিন বছর বয়েসেও উঠে দাঁড়াতে পারত না। হামা দিয়েও এগোতে পারত না। কখনো কখনো উবু হয়ে থাকত। সারাক্ষণ বসে বসেই তার কেটে যেত। পা দুটি পাট-কাঠির মত এমন সরু ছিল সহসা দেখলে মনে হত ও দুটি তার শরীরের অংশ নয়। রমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। প্রকাশ আরো জোরে কাঁদে সকালের কোমল আলো সামনের সবুজ লন কিম্বা নিমগাছটা কিছুই তার চোখে পড়ে না। তার দুচোখ সজল। রমার নির্জলা চোখ, তবু সেও কিছুই দেখে না। শুধু তার বোজা চোখে বসে বসে মেঝে থেকে মুড়ি খুঁটে-খাওয়া নয়নের উবু হওয়ার ভঙ্গি স্পষ্ট হয়। নয়নের মুখাগ্নির প্রয়োজন হয় না। কারণ এতটুকু শিশুর শব দাহ করবার রীতি নেই। প্রকাশের ভাই বিকাশ ও তার নন্দ-রোম্বার গঙ্গার গভীর জলে নয়নকে ভাসিয়ে দিয়ে স্নান করে উঠে আসে। প্রকাশও।

রমাকে কলতলায় দাঁড় করিয়ে মিনু বালতি বালতি জল ঢালে তার গায়ে। মিনু রমার ননদ। পশ্চিমে হেলেপড়া সূর্যের ধারালো রোদ রমার মুখে এসে পড়ে। তার দুচোখ বন্ধ। বালতির জলছাড়া অন্য কোন জল নেই তার চোখে। অবাক প্রতিবেশীরা ঘিরে দাঁড়িয়ে তাকে দেখে। এমন মেয়েমানুষ যে ছেলে মরে গেলেও কাঁদে না নিঃসন্দেহে সে বিশেষ দ্রষ্টব্য। টালির চালে কাক ডাকে। স্নান হয়ে গেলে মিনু তার হাত ধরে ঘরে নিয়ে আসে। মিনু এই প্রথম রমার হাত ধরল এরকমভাবে। বিয়ের পরে শাশুড়ি তাকে বরণ করে এরকমভাবে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

শাশুড়ি বারান্দায় আলুথালু হয়ে তুমুল কান্নাকাটি করছে। কান্না দিয়ে যদি শোকের পরিমাপ করা যায় তাহলে তার শোক সবচেয়ে বেশী। প্রকাশের চেয়েও, রমার তো প্রশ্নই ওঠে না।

প্রকাশের বাবা বলে—নিয়তি বুঝলে নিয়তি। সবই তাঁর ইচ্ছা। যার যখন ডাক পড়বে তাকে তখন যেতেই হবে। কান্নাকাটি করলে কি নয়ন ফিরবে? ষাট বছরের বুড়ো মানুষ ফোকলা মুখে জড়ানো জিভে তোতলায়। মুখে সাই বালুক, তার ছানি-পড়া চোখেও জল গড়ায়। সে এমন বুড়ো মানুষটা যার আর না বাঁচলেও চলে—সে দিব্যি পড়ে রইল আর তিন বছরের নাতিটা কিনা হুট করে চলে গেল। বেবুঝ নিয়তির ওপরে তার রাগ হয়।

ঘরে তক্তপোষে আড় হয়ে রমা শুয়েছিল। সে স্থির চোখে নয়নের স্তূপ করে রাখা কাঁথাগুলো দেখছিল, সে সহসা চমকে ওঠে।

নিয়তি—নিয়তি—কথাটা হঠাৎ কানের ঝিমঝিম শব্দতরঙ্গকে ভেদ করে তীক্ষ্ণ পেরেকের মত গিয়ে আমূলে তার মগজে বিঁধে যায়। মাথার ভেতরে যেন রক্তপাত সুরু হতে থাকে। আর সে রক্তের ধারা বেয়ে পুরনো কিছু ম্লান স্মৃতি টপ টপ করে ঝরতে থাকে বুকের ভেতরে। বুকের বাঁদিকে গভীর শূন্যতা হা হা করে। বিহ্বল চোখে সে চৌখুপী জানলাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। মগজের ফাটোফাটা গলে গলে জমানো কিছু কথা তির তির করে নামতে থাকে সূক্ষ্ম ধারার মত।

'কপাল, পোড়া কপাল আমার!' শাশুড়ির খেদোক্তি মনে পড়ে—'কপাল না পুড়লে এমন হয়?'

বুড়ো শ্বশুর তখনো বলত—নিয়তি, বুঝলে নিয়তি। জন্ম মৃত্যু বিয়ে।

এসব ছেঁদো কথায় শাশুড়িকে কেউ কখনো ভোলাতে পারে না। শাশুড়ি বলেছিল—ভগবানের দোষ ধরো না, দোষ হচ্ছে পেটের।

যে পেটে বিকলাঙ্গ ছেলে জন্মায় সে পেটটার দোষ প্রমাণের জন্য নিয়তির প্রয়োজন হয় না। বিশেষ করে পেটটা যার সে যে কতবড় পাপী—সেটাই প্রমাণ করে।

'আমরাও তো পেটে ধরেছি?' শাশুড়ির এরকম প্রশ্ন কোন উত্তরের আশায় নয়, শুধু এটাই নিশ্চিত প্রমাণের জন্য যে তার পেট নিষ্কলুষ। 'আগের জন্মের পাপ না থাকলে এমন শাস্তি হয়?' —অকাট্য যুক্তি। এরপরে আর কোন কথা চলে না।

কিন্তু পাপ যেমন আছে তা খণ্ডাবার পথও আছে। শাশুড়িই বিধান দেয়—বাবার থানে গিয়ে দণ্ডী কাটো বউ মাদুলি নাও, দেখ যদি বাবার কৃপা হয়?'

রমা শাশুড়িকে যে খুব মান্য করে তা না। কিন্তু নয়ন তো তার পেটের ছেলে। এবং বিকলাঙ্গও বটে। ফলে সে দণ্ডী কেটেছিল বাবার থানে গিয়ে, মজামজা পুকুরে স্নান করে সাষ্টাঙ্গে ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়েছিল, বেলপাতার মাদুলি করে নয়নের কোমরে পরিয়েছিল। আর বিয়ের পরে সেদিনই প্রথম সে কেঁদেছিল, যখন সে গত জন্মের পাপের জন্য মার্জনা ভিক্ষা করছিল প্রায়ান্ধকার খুপরিতে ফুল-বেলপাতায় ঢাকা শিবলিঙ্গে দুধ ঢালতে ঢালতে।

এতে জন্মজন্মান্তরের পাপ কতটা ধুয়ে মুছে গিয়েছিল জানা নেই, কিন্তু মাদুলি দেখে ডাক্তার যে আগুন হয়েছিল সেকথা রমা ভোলেনি।

'এতেই যদি সারবে তবে আমার কাছে আসা কেন? যা যা বলেছিলাম খাইয়েছিলে? সিংমাছের ঝোল রোজ একটি করে ডিম অন্ততঃ একসের দুধ? ওষুধও তো খাওয়াও না ঠিকমত।'

প্রকাশ বলেছিল—'রবি ডাক্তারের খালি বড়লোকী চাল। ওর কাছে গেলেই খালি খাওয়ার ফর্দ দেবে। আসলে শালা ডাক্তারি জানে না, শ্রেফ ভুজুং ভাজুং দিয়ে টাকা খায়।'

'যত ডাক্তারি তুমি জানো?' রমা এরকম একটা কথা বলেছিল।

'আমি যদি জানব তবে শালা এই চামারটার কাছে যাই?'

'যদি যাওই তবে যা করতে বলে তাই কর।'

'তাই কর? আমি কী লাটসাহেবের বাচ্চা? রবি ডাক্তার জানে না?' সে যে রাইটার্স বিল্ডিংএর ক্লাশ ফোর স্টাফ রবি ডাক্তারের একথা জানা ছিল কিনা রমা তা জানে না।

প্রকাশ এক নিঃশ্বাসে বলেছিল—'আসলে ব্যাটা নিজেও পেটুক, খালি গেলাবার ধান্দা। তোমার যখন পেটে বাচ্চা এসেছিল তখনো ও একটা এমনি ফর্দ দিয়েছিল। দেয়নি?'

রমা অস্বীকার করতে পারে নি। এবং রমা বলতে চেয়েছিল—'আমাকে যা যা খেতে বলেছিল সেরকম ঠিক ঠিক খেলে নয়ন এরকম হয়ে জন্মাত না।' এটা অবশ্য তার কথা না ডাক্তারেরই কথা। তবু সে বলেনি কারণ তাহলে শাশুড়ির বিরুদ্ধতা করা হয়। অবশ্য তাতেও সে ভয় পায় না, ভয় পায় পাছে বাড়িতে কুরুক্ষেত্র হয়। এরকম কুরুক্ষেত্র হয়েছিল—নয়ন আসার আগে এবং একপোয়া দুধ নিয়ে।

ডাক্তার বলেছিল দিনে অন্ততঃ দেড় সের (এবং সেই সঙ্গে ডিম কলা মাংস মাছ যেমন সাধারণত সে বলে) সে খেয়েছিল এক পোয়া।

'আমরা কী আর ছানাপোনা পেটে ধরিনি? আমরা কি ঘি দুধ ডিম খেয়েছি? বাড়ির লোকে গেল, চা খায় দুবেলা তা কী চোখে পড়ে না? লজ্জা ঘেন্নাও নেই এমনি দিনকাল পড়েছে।'

শাশুড়ির এসব কথার ঝাঁঝালো উত্তর রমা দিতে পারত, দেয়নি। কারণ বিয়ের আগে তার একটু ছিঁচকাঁদুনে স্বভাব ছিল। এবং সেদিনও তার হঠাৎ কান্না পেয়ে গিয়েছিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সে কাঁদেনি। কী কৌশলে কে জানে, তীব্র উত্তেজনার মুহূর্তে তার শরীরের যন্ত্রপাতি-গুলো যেন মুহূর্তে দ্রুত সেলাই মেশিনের মত খট খট করে তার বুকের ভেতরে মগজে কী সব জোড়াতালি দিয়ে দিল, সে না কেঁদে হাসি মুখে শাশুড়িকে বলল—'মা, আপনাকে দুধ দিয়ে চা করে দেব?' এরপরে যদি কুরুক্ষেত্র হয়ই তবে তার জন্যে কে দায়ী, শাশুড়ি না রমা? আর তারপরে বাড়িতে যদি একপোয়া দুধ বন্ধ হয়ই তবে তার জনাই বা কে দায়ী? নিয়তি না রমা?

ঠিক এসময় ট্যারাধ্যাঁকা সিমেন্টের মেঝেতে পায়ের পাতায় শব্দ তুলে মিনু এসে দাঁড়াল তার সামনে, মমতাময় ভঙ্গিতে, বলল—'বৌদি, একটু দুধ খেয়ে নাও।'

তার হাতে কাঁচের গ্লাস, তার চোখ লাল এবং ফোলা। একটু আধটু না কাঁদলে লোকে নিন্দে রটায়, তাছাড়া মানুষের বিশেষ করে মেয়েমানুষের প্রাণে মায়ামমতা থাকা নিতান্ত দরকার। উপরন্তু মিনুর বিয়ের বয়েস হয়ে গেছে। ফলে সে কেঁদেছে এবং তা লুকোয়নি।

ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে রমা কাঁচের গ্লাসে সাদা দুধ দেখে। জল মেশানো নীলচে সাদা। নয়নের জন্য একপোয়া বাঁধা। সে দুধ আজো এসেছে।

'কদিন নাওয়া খাওয়া নেই, ঘুম নেই। দুধটা খেলে শরীর চাঙ্গা হবে।' মিনু রমার একটা হাত ধরে যেন তার নির্বিকার অন্য-মনস্কতা ভেঙে দিতে চায়।

শরীর চাঙ্গা হলে কী তার কান্না পাবে? সারা শরীরের যন্ত্রাংশগুলো কেমন যেন মুচড়ে রয়েছে, বুক দমচাপা, বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রমা।

তারপর আস্তে বলে—'নয়নের দুধ, না?'

আঁচল দিয়ে মিনু নিজের শুকনো দুচোখ মোছে, বলে—'গরম থাকতে থাকতে খেয়ে নাও।' রমার দুটো ঠোঁটই কাঁপে, এবং এমন তেরছাভাবে বাঁকে সহসা মনে হয় বুঝি রমা হাসবে, পরিষ্কার গলায় রমা বলে—দুধ দিতে বারণ করে দাওনি কেন? কাল থেকে আর দিতে হবে না, বিকেলে গোয়ালাকে বলে দিও।'

বাইরে সেমুহূর্তে শাশুড়ির নিভে-আসা কান্না ফের হাওয়ার দাপটে আগুনের মত লক লকিয়ে ওঠে। এতে অনুমান করা যায় প্রকাশ ফিরল, সেটা আরো স্পষ্ট হল সহসা প্রকাশের একটা ধমকে। যেন খানিকটা জল পড়লো, সব আগুন নিমেষে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। প্রকাশের গলা—'রমা এখনো কাঁদেনি?' শাশুড়ির স্তিমিত প্রত্যুত্তর এবং আরো কিছু অস্পষ্ট আলোচনার চিন্তিত গুঞ্জন রমার কানের ঝিমঝিমানি আরো বাড়িয়ে তুলল। পূর্ব প্রসঙ্গের জের টেনে মিনু বলে—'তোমাকে অত ভাবতে হবে না, তুমি দুধটা খেয়ে নাও তো।' প্রকাশ ঘরে ঢোকে, সন্দিগ্ধ চোখে রমাকে দেখে, তারপর মিনুকে বলে—'দুধ দিচ্ছিস? ভালই। ডাক্তারও তাই বলল—তা দুধের সঙ্গে এই ওষুধটা গুলে দেত।' প্রকাশ একটা পুরিয়া এগিয়ে দেয়।

রমা নিষ্পলক চোখে প্রকাশের উদ্বেগা-কুল মুখ দেখে। রুগ্ন স্তিমিত গলায় বলে—'ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ আনলে?'

প্রকাশ উৎসাহে কাছে এগিয়ে এসে বলে—'হ্যাঁ রবি ডাক্তার দিল। দুধটা খেয়ে নাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

হঠাৎ প্রকাশকে আমূল চমকে দিয়ে অপ্রত্যাশিত তীক্ষ্ণতায় প্রচণ্ড চীৎকার করে ওঠে—'কেন আনলে ওষুধ?' তার দুচোখ টকটকে, গলা আর কপালের শিরা টান টান। উত্তেজনায় ওঠে বসে রমা।

আতঙ্কে উদ্বেগে প্রকাশের শরীর কেঁপে ওঠে। বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে থাকে সে যেন বজ্রাহত। সহসা শাশুড়ি দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়—বিস্রস্ত তার বেশবাস, দুচোখের কোলে শুকিয়ে-যাওয়া জলের দাগ অনুনয়ের গলায় বলে—'দুধটা খেয়ে নাও বৌ? অত ভেঙ্গে পড়লে চলে? শরীরটা তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে।'

প্রকাশের চেয়েও বিমূঢ় রমার ভঙ্গি, তার দুচোখ স্থির, শাশুড়ির দিকে সে এত দীর্ঘ সময় ধরে তাকিয়ে থাকে, মনে হয় তার কোনদিন তার চোখের পলক পড়বে না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত চোখেও পলক পড়ে এবং সকলকে অবাক করে দিয়ে তার চোখের পাতা ভিজে যায়, ভিজে যেতে থাকে; তখন কে জানে কেমন করে তার দু চোখ ক্রমাগত জলে ভরে যেতে থাকে। সে হাত বাড়িয়ে দুধের গ্লাসটা নিয়ে নেয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে মাথা নীচু করে ডুকরে কেঁদে ওঠে।

হয়তো তার তখন সেই এক পোয়া দুধের কুরুক্ষেত্রের কথা মনে পড়ল কিম্বা হয়তো তখন তার অন্ধকার খুপরিতে দাঁড়িয়ে নিজের পাপের জন্য মার্জনা ভিক্ষার কথা মনে পড়ল, অথবা হয়তো তখন তার মনে হল নয়ন জন্মের আগে পরে তাকে যা দিতে পারে নি, মরার পরে সেই তাকে এতগুলো লোকের ভালবাসা দিয়ে গেল, এবং হয়তো এসব কারণেই সহসা তার কান্না পেল কিনা কে জানে, হাসি কান্নার কার্য কারণ সম্বন্ধ বড় দুর্বোধ্য জটিল।

এবং দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ সমস্ত কান্না এক সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত হওয়ায় রমার দু-হাত সমস্ত শরীর এমন দুলে উঠল যে তার দুধ খাওয়া হল না, কিন্তু তবু তো সে শেষ পর্যন্ত নয়নের জন্য কাঁদল। আর যাই হোক সে মা-তো; তাকে তো কোন না কোন সময়ে পুত্রশোকে কাঁদতে হতই।

ওয়াঞ্চু কমিশন

এই বাংলার খবর বলতে এই মুহূর্তে অবশ্যই ওয়াঞ্চু কমিশন। খবরের কাগজের পাতাতেও যেমন, লোকের মুখে-মুখেও তেমনই। পশ্চিম বাংলার মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির এলোপাথাড়ি অভিযোগের ইতি ঘটাবার জন্যে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় একটি তদন্ত কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করেন সেই জুন মাসের আট তারিখে। ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি কৈলাসনাথ ওয়াঞ্চু যে এই কমিশনের সভাপতি হবেন, সে-কথা ঘোষণা করতেও বেশি সময় লাগে নি। কিন্তু এই লেখা লেখার সময় পর্যন্ত কমিশন সরকারিভাবে গঠিত হয় নি।

গোটা আশি অভিযোগ রাইটার্স বিল্ডিংস হতে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের স্পেশাল অফিসার বিশ্বরূপ মুখোপাধ্যায়ের হাত দিয়ে দিল্লীতে বিচারপতি ওয়াঞ্চুর হাতে পৌঁচেছে। তিনি সেগুলো পরীক্ষা করে দেখছেন। পরীক্ষা করে তিনি যদি মনে করেন যে অভিযোগগুলো (অথবা সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি) আপাতদৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য তবে সে-কথা তিনি জানাবেন। তারপর সেই সব অভিযোগের ধরন অনুসারে তৈরি হবে কমিশনের বিচার্য বিষয়। তারপর তৈরি হবে কমিশন।

সাধারণত যেভাবে কমিশন তৈরি হয়, এই পদ্ধতিটার সঙ্গে তার মিল নেই। কমিশনের বিচার্য বিষয় স্থির করা, কমিশনের সভাপতি নিয়োগ করা, তারপর কমিশনের কাছে অভিযোগ পেশ করা—এইভাবেই কাজ এগোয়। ওয়াঞ্চু কমিশন সম্পর্কে যে বিপরীত পদ্ধতি গৃহীত হচ্ছে তাতে অনেক মহলে সন্দেহ দেখা দিয়েছে যে এই পদ্ধতি আইনসিদ্ধ হবে কিনা।

ইতিমধ্যে প্রস্তাবিত কমিশনকে কেন্দ্র করে তিনটি ব্যাপার ঘটেছে। প্রথমটি হলো তদন্ত কমিশন সংক্রান্ত আইন সংশোধন। ফৌজদারি আইনের কোনো মামলায় কেউ যদি মিথ্যে সাক্ষ্য দেন তবে সংশ্লিষ্ট আদালত তাঁকে সাজা দিতে পারেন। এতদিন তদন্ত কমিশন আইনে এই ব্যবস্থা ছিল না। তদন্ত কমিশনের সামনে হলফ করার পর কেউ যদি মিথ্যে সাক্ষ্য দিতেন তবে তাঁকে সাজা দেওয়ার জন্যে পৃথক মামলা দায়ের করতে হতো। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী গোড়াতেই ঘোষণা করেন, প্রস্তাবিত দুর্নীতি তদন্ত কমিশনের সামনে যদি কেউ মিথ্যে সাক্ষ্য দেন তবে তাঁকে যাতে ঐ কমিশনই সাজা দিতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হবে।

কিন্তু তদন্ত কমিশন সংক্রান্ত আইনটি হলো কেন্দ্রীয় সরকারের আইন। তাই এই আইন সংশোধনের জন্যে দিল্লীর সম্মতির দরকার ছিল। সংশোধনের খসড়া রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে পাঠানো হয় কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রণালয়ে। ঐ মন্ত্রণালয় এবং রাষ্ট্রপতির আনুষ্ঠানিক সম্মতির পর পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল ২৪ জুন একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে আইনটি সংশোধনের ব্যবস্থা করেন।

দ্বিতীয় ঘটনাটি রাজনৈতিক স্তরের। তদন্ত কমিশন গঠিত হওয়ার পর স্থানীয় একটি ইংরিজি দৈনিকে খবর বেরোয় যে, কংগ্রেস নেতা বিজয়সিং নাহার বলেছেন, এই কমিশন গঠন মুখ্যমন্ত্রীর একটা স্টান্ট মাত্র। বিজয়বাবু সত্যিই এই ধরনের কোনো কথা বলেছেন কিনা তা জানার জন্যে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অরুণ মৈত্র তাঁকে একটি চিঠি দেন। চিঠিটা "শো কজ" নোটিশ বলে প্রথমে রটেছিল, কিন্তু পরে জানা গেল যে, প্রদেশ কংগ্রেসের তরফ থেকে শুধু ঐ মন্তব্যের সত্যাসত্য যাচাইয়েরই চেষ্টা করা হয়।

এই চিঠির উত্তরে বিজয়বাবু অবশ্য অস্বীকার করেন নি যে, তিনি ঐ "স্টান্টের" কথা বলেছেন। বরং তিনি বলেছেন, যা বলেছি তা সত্য বলেছি। দেশ ও দলের স্বার্থেই বলেছি। মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি কোনো কটাক্ষ করতে চাই নি। ওয়াঞ্চু কমিশন গঠিত হলেই বোঝা যাবে আমি যা বলেছি তা ঠিক কিনা।

তৃতীয় ব্যাপারটি হলো বিভিন্ন জেলার কংগ্রেসী এম এল এদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর দফায় দফায় আলোচনা। এই আলোচনা নিতান্তই নিরুত্তাপ বা নিয়মরক্ষার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় নি। ওয়াঞ্চু কমিশনের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসী এম এল এদের কাছ থেকে সমর্থন পেয়েছেন। এমন কি তাঁর নেতৃত্বের প্রতি নতুন করে আস্থা জানিয়ে তাঁরা সইও দিয়েছেন। কিন্তু তার আগে তাঁদের অনেকে নানা প্রশ্নও তুলেছেন।

প্রশ্নগুলোর মধ্যে কয়েকটি : দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী নিজে কোনো তদন্ত না-করে একটা কমিশন নিয়োগ করতে গেলেন কেন? এই ধরনের তদন্ত কমিশন নিয়োগের দ্বারা কি কংগ্রেসের সুনাম ক্ষুণ্ণ হবে না? ওয়াঞ্চু কমিশন কি আসল রোগ, অর্থাৎ দলাদলির কোনো দাওয়াই দিতে পারবেন? শুধু মন্ত্রী কেন, কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র নিয়েও তদন্ত হবে না কেন?

মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে, শুধু তদন্ত কমিশন নিয়োগের দ্বারা কংগ্রেসের দলীয় শৃঙ্খলার সমস্যা মিটবে না। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি এ-কথাও বলেছেন, যে-কেউ যা-ইচ্ছে বলে যাবে, এমন অবস্থা তিনি মেনে নিতে পারেন না। অভিযোগ পাল্টা-অভিযোগের আবহাওয়ায় সরকারের কোনো কাজই হতে পারে না। তিনি নিজে কোনো অভিযোগের বিচার করেন নি তার কারণ তিনি কোনোরকম পক্ষ নিতে চান না। একটা কমিশন কোনো অভিযোগের বিচার করলে কারো মনে কোনো সন্দেহ থাকবে না। কমিশনের রায়ের পরে যদি কোনো মন্ত্রীকে চলে যেতে হয় তা হলেও সংগঠন জোরদার হবে। কারণ তখন কংগ্রেসীরা বলতে পারবেন যে, তারা নিজেদের বিরুদ্ধে অভিযোগেরও তদন্ত করিয়েছেন।

তদন্ত কমিশন নিয়ে যেমন অনেক খবর পাওয়া যাচ্ছে, তেমনই অনেক গুজবও রটছে। মুখ্যমন্ত্রী এই সব গুজবকে বলেছেন "আষাঢ়ে গল্প"। এই সব গালগল্পের অধিকাংশই হলো গোপন বৈঠক আর সলা-পরামর্শের। অন্যান্য মন্ত্রী বা কংগ্রেস নেতাদের নিয়ে তো বটেই, গুজব রটছে খোদ মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়েও। একটি গোপন বৈঠক প্রসঙ্গে সিদ্ধার্থবাবুর টিপ্পনী : "যে-মন্ত্রীর ঘরে কুলুপ এঁটে বৈঠক হয়েছে বলছেন আমি সে-ঘরে গিয়ে দেখলাম সেখানে কোনো কুলুপই নেই।"

জেলায় অবস্থা ভয়াবহ

বিভিন্ন জেলার কংগ্রেসী এম এল এদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের প্রধান উদ্দেশ্য অবশ্যই ওয়াঞ্চু কমিশন প্রসঙ্গে কথাবার্তা বলা। কিন্তু এই যে বিধানসভার সদস্যেরা একে একে কলকাতায় এলেন, রাইটার্স বিল্ডিংসে বসে আলাপ-আলোচনা করলেন তার মধ্যে দিয়ে অন্য একটা উদ্দেশ্যও সাধিত হলো। বিধানসভার অধিবেশন এখন হচ্ছে না। তাই সদস্যেরা তাঁদের নিজের নিজের এলাকার অবস্থার কথা সরকারের সামনে তুলে ধরতে পারছেন না। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগটাকে তাঁরা এই কাজে লাগালেন।

যে ক'টি জেলার ছবি পাওয়া গেল তার মধ্যে বাঁকুড়া আর পুরুলিয়ার অবস্থাই সবচেয়ে ভয়াবহ দেখা গেল। খবরের কাগজে বিক্ষিপ্তভাবে যে-সব খবর বেরুচ্ছিল বিধানসভার সদস্যদের কথাবার্তা থেকে তারই সমর্থন পাওয়া গেল। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া দুই জেলাতেই রীতিমতো খাদ্যাভাব। বাঁকুড়ায় দশজন না-খেয়ে মারা গেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। বাজারে চালের কিলো তিন টাকা, অথচ রেশনের বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। কী করে যে বাঁকুড়াকে খাদ্যশস্যের দিক দিয়ে উদ্বৃত্ত এলাকা বলে ঘোষণা করা হলো তা অনেকেই বুঝতে পারছেন না। এ-বছর এখন পর্যন্ত তেমন বৃষ্টি হয় নি। ফলে অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে উঠেছে। আর অভাব যে শুধু খাদ্যদ্রব্যের তা নয়, জামা-কাপড়েরও তীব্র অভাব। অনেক জায়গায় মহিলাদেরও উলঙ্গ বা অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় দিন কাটাতে হচ্ছে বলে বিধানসভার সদস্যদের মধ্যে কেউ কেউ অভিযোগ করেন। বাঁকুড়া থেকে নির্বাচিত মন্ত্রী গুরুপদ খাঁ দাবি জানান যে, এখনই দু লাখ ক্ষেতমজুরের কাজের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী সব কথা শোনার পর তখনই দশ লাখ টাকা সাহায্য হিসেবে মঞ্জুর করতে চান। কিন্তু বিধানসভার সদস্যেরা মনে করেন নগদ টাকার চেয়ে চাল-গম-কাপড়চোপড় দেওয়ার ব্যবস্থা করলেই দুর্গত মানুষের উপকার হবে বেশি।

২৪ পরগণা এবং বর্ধমান থেকে নির্বাচিত সদস্যেরা অবশ্য তেমন কোনো ভয়াবহ অবস্থার কথা বলেন নি, কিন্তু তাঁরাও জানান যে তাঁদের এলাকার সাধারণ মানুষের অবস্থা তেমন সুবিধের নয়। ২৪ পরগণাকে এখন মাসিক যে-পরিমাণ খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে তার পরিমাণ দু গুণ করার জন্যে দাবি ওঠে। ত্রাণের কাজ আরো ব্যাপকভাবে চালাবার জন্যেও সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়। সদস্যদের মতে, বর্ষায় টেস্ট রিলিফের কাজ হবে না, তাই এখন গ্র্যাচুইটাস রিলিফ চালু করা দরকার। বর্ধমানের এক সদস্যের অভিযোগ হলো, তাঁর জেলা থেকে লরি করে চাল-গম-চিনি অন্য রাজ্যে পাচার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু পুলিশ এব্যাপারে নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে আছে।

এম এল এদের মুখ্যমন্ত্রী একটা কথা মনে করিয়ে দেন। রাজ্যের মানুষের অভাব-অনটন আছে। কিন্তু তারা এখনও কংগ্রেসের প্রতি আস্থা হারায় নি। এই আস্থা আছে বলেই বিরোধীরা কোনো সুবিধে করতে পারছে না। কিন্তু কংগ্রেসের আসল সমস্যা হলো নিজেদের মধ্যে দলাদলি। সে-বিষয়ে সাবধান হতে হবে।

ছোট রেল বড় হবে—সত্যি

হাওড়া জেলার মানুষের কাছে সুখবর, এই জুলাই থেকে মার্টিন রেলকে ব্রডগেজ করার কাজ সুরু হবে। রেলমন্ত্রী ললিতনারায়ণ মিশ্র কলকাতায় এই কথা ঘোষণা করেছেন। ছোট রেল চালানো ক্রমেই অলাভজনক হয়ে উঠছিল বলে মার্টিন রেল বন্ধ হয়ে যায় সেই ১৯৭০ সালের শেষে। তার কিছু দিন পরেই আসে লোকসভা আর বিধানসভার নির্বাচন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী সেই সময় নির্বাচনী সভায় প্রতিশ্রুতি দেন যে, নতুন করে মার্টিন রেল চলাচল শীঘ্রই সুরু হবে এবং সরকারই সব দায়িত্ব নেবেন। কিন্তু তারপর তিন বছর পার হয়ে গেলেও কিছুই হয় নি।

রেলমন্ত্রী এখন জানাচ্ছেন, জুলাই মাসে ব্রডগেজ লাইন তৈরির কাজ সুরু হবে এবং বছর দুয়েকের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে ব্রডগেজ করার জন্যে অতিরিক্ত জমি দরকার। তা নিয়ে যে-অসুবিধে দেখা দিয়েছিল এখন নাকি তা আর নেই। টাকার ভাবনাও নেই। কারণ প্রয়োজনীয় দশ কোটি টাকার সবটাই আসবে দিল্লী থেকে।

টেলিভিসন পুজোয় নয়

কলকাতায় টেলিভিসন অনুষ্ঠান প্রচার সুরু হওয়ার প্রতিশ্রুত দিনটি আবার পিছিয়ে গেল। আগামী মহালয়ার পুণ্য দিনে মহানগরীর কিছু সৌভাগ্যবান মানুষের ঘরে টেলিভিসন সেটের পর্দা আলোকিত হয়ে উঠছে না। কবে হবে তাও এখনও ঠিক নেই। তবে আগামী মার্চের আগে নয়।

টেলিভিসন অনুষ্ঠান প্রচার সুরু করার প্রধান দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। তবে রাজ্য সরকারেরও কিছু করার আছে। যেমন টেলিভিসন স্টুডিওর জন্যে জায়গার ব্যবস্থা করা। যেখানে অস্থায়ী টেলিভিসন সেন্টার হচ্ছে সেই রাধা স্টুডিওর দখল রাজ্য সরকার আগেই নিয়েছেন। বাকি কাজ (যেমন প্রয়োজনীয় মেরামতি, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ) শেষ করতে আর বড় জোর মাসখানেক লাগার কথা। তবু কেন মহালয়ায় অনুষ্ঠান প্রচার সুরু করা যাবে না? যাবে না কারণ টেলিভিসন টাওয়ার তৈরির কাজ ঐ সময়ের মধ্যে শেষ হবে না। ঐ টাওয়ার তৈরির দায়িত্ব আকাশবাণীর ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার ওপর। পুজোর মধ্যে তো নয়ই, মার্চের মধ্যেও হবে কিনা তা এখন ঠিক নেই।

কেন্দ্রীয় তথ্য মন্ত্রী ইন্দরকুমার গুজরালের কলকাতা সফরের সময়ে এই খবর জানা যায়। শ্রীগুজরাল জানান, কলকাতার টেলিভিসন কেন্দ্র থেকে পার্শ্ববর্তী ষাট মাইল এলাকায় অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা হবে। একটি টেলিভিসন টাওয়ার স্থাপিত হবে আসানসোলে। দ্বিতীয়টি কোথায় হবে তা এখনও ঠিক হয় নি। তবে উত্তরবঙ্গে টেলিভিসন চালু হতে সময় লাগবে। ভবিষ্যতে রাজ্যের প্রতি গ্রামে একটি করে টেলিভিসন সেট রাখার ব্যবস্থা হবে বলে শ্রীগুজরাল জানান।
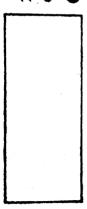
২৯।৬।৭৪ দেব দত্ত

সেকালের সঙ্গীতগুণী

আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশি বাজায়

(১৫)

মঞ্জুলিকা বাই উৎফুল্ল হয়েছিলেন। এ যেন একটি আবিষ্কার। এক অভাবিত আনন্দের আস্বাদ। হঠাৎ কি আশ্চর্য কণ্ঠের সন্ধান পেয়েছেন। আর তাঁর মন ভরে উঠেছে আনন্দে। এক শিল্পীপ্রাণে আর এক শিল্পীসত্তার সংবেদন।

ছাত্রটি ঘরে আসতেই তাকে রেকর্ড-খানি বার করে দেখালেন মঞ্জুলিকা বাই। জিজ্ঞেস করলেন, 'শুনা নেহি ত ইয়ে গানা?'

'কি গান?'

'দরবারি কানাড়া কি এক বাংলা গান।' বাই সাহেবা উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, 'লেকিন গলেমে কেয়া জোয়ারি!'

তারপর একটু থেমে এমনি মন্তব্য করলেন. কলকাতায় এমন গাইয়ে আছেন? আর তুমি এতদূরে এসেছ গান শিখতে?' শেষে বললেন, 'আচ্ছা এখন দরবারিটা শোন।'

চোঙ্গা-ওয়ালা গ্রামোফোনের পাশে বসলেন মঞ্জুলিকা বাই। যন্ত্রের সবুজ বনাতের চাকতিতে রেকর্ডখানি ঘুরিয়ে দিলেন। তার ওপরে সাবধানে ধরালেন সাউন্ড বকস।

দরবারি কানাড়ায় বাংলা ছোট খেয়াল আরম্ভ হয়ে গেল।

'আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশি বাজায়...

যেমন দরাজ তেমনি সুরেলা কণ্ঠ। আর কি মনোরম মিড়ের কাজ।

জায়গাটি কাশীর প্রায় এক প্রান্ত। গঙ্গার ধারে নিরিবিলি একটি ছোট দোতলা বাড়ি। হরিশচন্দ্র ঘাটে যে পথটি সদর রাস্তা থেকে এসে পড়েছে, তারই পাশে। দোতলায় মঞ্জুলিকা বাইয়ের একখানি ঘর। সামান্য কিছু আসবাব। আর একদিকের দেয়ালে টাঙানো দুটি তানপুরা। তার নিচে একজোড়া তবলা। মেঝেতে সতরঞ্চ। সেখানেই বাইজী গ্রামোফোনে রেকর্ডটি বাজাচ্ছিলেন।

আর চোঙ্গার সামনে বসে শুনছেন তাঁর বাঙালী ছাত্রটি—

'আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশি বাজায়,
সুরে বেদন বাজে গোপন হিয়ায়।'

গানের উপযুক্ত জায়গায় তারিফ করছেন মঞ্জুলিকা বাই। ছাত্রকে যেন চিনিয়ে দিচ্ছেন, বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

'গলার জোয়ারি দেখছ? মিড়ের কাজ ভাল করে শুনে নাও। বোল তানের মতন ধরণ দেখ, কি সুর, কি আওয়াজ।'

রেকর্ড বেজে চলে—

'সুখ স্মৃতি সাথে ওই সুর মায়ায়,
কত দুঃখ মেশে যেন আলোতে—ছায়ায়।
আজি নিশীথ রাতে জাগি তারার সাথে,
তারি স্মৃতিটি নিয়া নীরব ব্যথায়।
আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশি—বাজায়...

সেই গভীর সুরেলিতে ঘরখানি ভরে গেল।

কণ্ঠস্বর একই সঙ্গে গম্ভীর ও মধুর।

গানের শেষে মঞ্জুলিকা আর একবার তারিফ করলেন, 'এ তানপুরার গলা।'

অর্থাৎ এই গায়ক তানপুরায় দস্তুর-মত কণ্ঠ সাধনা করেছেন, হারমোনিয়মে নয়।

তখন রেকর্ডখানি হাতে নিয়ে বাঙালী ছাত্রটি গায়কের নাম দেখলেন—জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী।

কে ইনি?

গায়কের আরো পরিচয় দিতে মঞ্জুলিকা রেকর্ডের আর এক পিঠ বাজালেন—

'আমায় বোলোনা ভুলিতে বোলোনা...

মর্মস্পর্শী বেহাগ গান ধরবার সঙ্গেই মূর্ত হয়ে উঠল। মিছরির দানার মতন উচ্ছ্বসিত হতে লাগল রাগের স্বর-লহরী—

আমায় বোলোনা ভুলিতে বোলোনা।
সে কি ভুলিবার মন রমণী মোহন
হেরিবারে করি কত সাধনা।।

একেবারে বন্দেশী হিন্দী খেয়ালের ছক। স্থায়ী কলিতেই জমজমাট সুর।

চাহিনা অন্যে চাহি বনমালী
সে পদে দিয়াছি মন-প্রাণ ডালি
নহি সখি আমি পথের কাঙালী
শ্যাম ভিখারিণী ললনা।।
কলঙ্কেরি কথা হতাশেরি ব্যথা
কতই লাঞ্ছনা গঞ্জনা—
করি সোহাগের হার পরেছি গলায়
ভুলিবারে পাই কত যাতনা।।

কাশীর হরিশচন্দ্র ঘাটের সেই সাদা-মাঠা বাড়ি। তার এক ধারে মঞ্জুলিকা বাইয়ের ছোট ঘরখানি। সেদিন দুখানি বাংলা গানের সুরে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। বাংলায় কি চমৎকার ছোট খেয়াল। কি জোয়ারিদার সুরেলা গলা! সেদিন এক অচেনা বাঙালী গায়ককে অনেক দূর থেকে বড়ই সমাদর করলেন পশ্চিমাঞ্চলের এক সুরশিল্পী।

মঞ্জুলিকা বাই। আগের যুগের কলাবতী খেয়াল গায়িকা তিনি। তাই গুণীর কাছেই গুণীর কদর হল।

তখন তিনি বর্ষীয়সী। আসরে আর গান শোনান না। এ রকম অবসর নিয়েছেন গায়িকা জীবন থে[illegible] কারণ তৈয়ারি গান আর শোনাতে [illegible]রেন না। অনেকদিন নিযুক্ত ছিলেন [illegible]পুর দরবারে। এখন অবসর নিয়েছেন। কাশীবাস করছেন হরিশচন্দ্র ঘাটের এই বাড়িটিতে।

কিন্তু সংগীতসমাজ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নন মঞ্জুলিকা বাই। কাশীর গুণী-জন তাঁকে জানেন। সম্মান করেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগও আছে কোন কোন গায়ক-গায়িকার। বারাণসীর প্রবীণ ধ্রুপদী হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় যেমন। তিনিই ত এই ছাত্রটিকে তাঁর কাছে এনে দেন। ছেলেটি কলকাতা থেকে কাশীতে আসেন ভাল করে গান শিখতে। এতদিন হরি-নারায়ণের কাছে ধ্রুপদ শিখেছেন। গলা সেধেছেন। তারপর ইচ্ছে হয় খেয়াল শেখবার।

তখন হরিনারায়ণ বলেন, 'ভাল খেয়াল শিখতে চাও ত মঞ্জুলিকার কাছেই শেখো। তিনি এখন কাশীতে রয়েছেন।'

নিজেই তিনি ছাত্রকে সঙ্গে করে এনে ছিলেন।

মঞ্জুলিকা তাই যত্ন করে শেখাচ্ছিলেন ছেলেটিকে। এমন সময় সেই আশ্চর্য গলার সন্ধান পান একটি রেকর্ডে।

বাঙালী ছাত্রটিকে তখনই সে গান শুনিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন, 'কলকাতায় এমন গাইয়ে থাকতে তুমি এত দূরে এসেছ গান শিখতে?'

মঞ্জুলিকা বাই নিজে অমন খেয়াল গায়িকা সেটা যেন কিছু নয়। অজানা গায়ককে সম্মান জানাতে বাই-সাহেবা এমন বিনয় দেখালেন।

ছাত্র কিন্তু তখন কাশীতেই রয়ে গেলেন। এই গায়িকার কাছে যেমন খেয়াল শেখা চলছিল, তেমনি চলতে লাগল। কিন্তু মঞ্জুলিকা বাইয়ের সেই কথা ফলে গিয়েছিল—তবে তা অনেক পরে।

তার আগে কাশীতে একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। সেই শোচনীয় প্লেগের মড়ক। কত মানুষ প্রাণ হারাল, কতজন যে ক্ষীণ-দৃষ্টি স্বাস্থ্যহীন হয়ে পড়ল তার হিসেব নেই। কাশীর বাঙালীটোলা অঞ্চলে আর বাঙালীদের মধ্যেই ক্ষতি হল বেশি, তবে হিন্দুস্থানীদেরও বিয়োগ-পঞ্জী যে ছিল না তা নয়। সেই করাল গ্রাসে, অনেকের সঙ্গে বারাণসীর এক মূল্যবান শিল্পী-প্রাণও হারিয়ে গেল।

একদিনের সেই কালব্যাধিতে গতায়ু হলেন মঞ্জুলিকা বাই। তার মাত্র একদিন আগে বাঙালী ছাত্রটিকে তিনিই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এলাহাবাদে। না হলে তাঁর ভাগ্যে কি হত, কে জানে।

কিন্তু সেসব কথার সঙ্গে সেই দরবারি কানাড়া গায়কের কোন সম্পর্ক নেই।

মঞ্জুলিকা বাই যখন সেই রেকর্ডটি প্রথম শোনেন, কলকাতায় সে গায়ক তার আগে থেকেই বেশ পরিচিত নাম। ধ্রুপদ ও খেয়াল গায়ক জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী। সঙ্গীতাচার্য রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং তাঁরই স্নেহধন্য শিষ্য।

উৎকৃষ্ট গান যাঁরা ভালবাসেন, সুকণ্ঠের যাঁরা আদর করেন এ নামটি তাঁদের কাছে তখনই খুব প্রিয়। গ্রামোফোন রেকর্ডের শ্রোতারাও জ্ঞানেন্দ্র-প্রসাদকে আগে থেকে জানেন। 'নিঝুম রাতে'রও আগে থেকে। এই দরবারি কানাড়ার আগেও তাঁর অন্য রেকর্ড হয়েছিল। তখন থেকেই উদীয়মান এ নবীন শিল্পী রেকর্ডের গানে জনপ্রিয়।

কি জমাটি সুরের এক একটি খেয়ালাঙ্গ গান তাঁর। বাংলায় ছোট খেয়াল। হিন্দী খেয়ালেরই ছকে এক একটি গান গড়া—বেশ বোঝা যায়। তা হোক। শুনতে বড়ই ভাল লাগে। আলাদা, ছাড়া ছাড়া তান ত বেশি করেন না। গানের ভাষার মধ্যেই মিলে থাকে তান। রাগের ডৌলটি ঠাসবুনানিতে পাওয়া যায়। আর মুগ্ধ হয়ে যান সাধারণ শ্রোতারা, কারণ রাগসঙ্গীতের সার বস্তু, এক একটি রাগের সংক্ষিপ্ত রূপ তাঁরা পান। আর কি অপরূপ এই গায়কের স্বর-ধ্বনি। সেজন্যেই এমন চিত্তাকর্ষক হয়। মাধুর্যমণ্ডিত অথচ দৃপ্ত পুরুষকণ্ঠ। তার তুলনা বিশেষ ছিল না তখন। 'নিঝুম রাতে'র আগেও সেই রাগ গানের আশ্চর্য বাঁশি রেকর্ডে আরম্ভ হয়ে যায়।

যেমন তাঁর মালকোষের সেই গানখানি—

এ কি তন্দ্রা বিজড়িত আঁখি পাত
এ কি স্বপন ঘোর মোর দিবস রাত।।

ঠিক এর ছকেরই মূল হিন্দী গান একাধিক আছে। 'মুখ মোর মোর মোস কাঁহাতো যাতা' ইত্যাদি। কিন্তু এখানে শুধুই ভাষান্তরের অনুকরণ নয়। চির নতুন রাগ-সঙ্গীতের এ এক নব রূপায়ণ। গায়কের নিজস্ব অনুভবে উপস্থাপনায় পরম উপভোগ্য সামগ্রী। সুর যেন আপন প্রাচুর্যে উপচিয়ম্লান। সেজন্যে হিন্দী গানের বন্দেশ পরিপাটিভাবে বাংলা গানেও মানিয়ে গেছে। কথার মধ্যেই তান, কোথাও বা গমকের ধরণ। কিছুই বেমানান নয় সেই অপূর্ব কণ্ঠে। মালকোশের ঘন-বন্ধ রূপ শ্রোতাদের কানে ভেসে আসে—

কুহকী নিদয় বঁধুয়া যাদু জানে
স্বপন আড়ে যেন টানে মায়া টানে
চলে আকুল মন তাহারি সাথ।।
এ কি তন্দ্রাবিজড়িত আঁখি পাত...

সেই রেকর্ডেরই আর একদিকে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ শুনিয়েছিলেন—

'বরষ বরষ থাকি চাহিয়া...'

গৌড়সারঙ্গের সেই মনোরম গানখানি—

তোমারি মিলন আশে
আশা পথ পানে
দখিন সমীরণে উদাস আনমনে
হৃদয় আসন মম পাতিয়া।।
বরষ বরষ থাকি চাহিয়া .....

অল্প অল্প তানে, সুরের ঈষৎ বিস্তারে, গানের ভাবকে বহতা রেখেছেন গায়ক। গৌড়সারঙ্গের উদাস করা সুরের মায়ায় শ্রোতারা মুগ্ধ হয়েছেন। এমন সুর কি সুলভ? শোনা যায় কি ইচ্ছা মতন?

এই মালকোশ (এ কি তন্দ্রাবিজড়িত আঁখিপাত) ও গৌড়সারঙ্গ (বরষ বরষ থাকি চাহিয়া) গান দুখানি নিয়েই বোধহয় জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের প্রথম রেকর্ড হয়েছিল। গ্রামোফোনে তার পরে তাঁর গান ওই দরবারি কানাড়া (আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশি বাজায়) ও বেহাগ (আমায় বলো না ভুলিতে বলোনা)।

প্রথম গান থেকেই রেকর্ড জগতে তাঁর জয়যাত্রা আরম্ভ হয়ে যায়। ব্যবসায়ের ভাষায় যাকে বলে 'হিট সঙ', তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি গানই তাই। শ্রোতাদের হৃদয় দুয়ারে ঘা দিয়ে দিয়ে ব্যবসায়িক দিকেও সফল হয়েছিল। কারণ ছোট বাংলা খেয়ালকে, বাংলাভাষায় রাগসঙ্গীতকে চিত্তাকর্ষকভাবে পেয়েছিলেন বাঙালী শ্রোতারা। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের গানে এক একটি রাগ সুপরিচিত হয়ে উঠত সাধারণ শ্রোতাদের মনে। আর একটি পরিপূর্ণ সঙ্গীতরসের আস্বাদ পেতেন শ্রোতৃবৃন্দ। তাঁর প্রায় প্রতিটি গানের জমাটি বন্দেশ অতি উপভোগের বস্তু ছিল, তাঁর তৃতীয় রেকর্ড বোধহয় 'উজ্জ্বল কাজল দুটি নয়নতারা'। এমন মধুর মালগুঞ্জে বাংলা গানের রেকর্ডে আগে শোনা গিয়েছিল কি?

উজল কাজল দুটি নয়ন তারা,
আকুল চঞ্চল কারে খুঁজিয়া সারা।।

আঁধিলে কে পাশে,
লাজে মুদিয়া আসে,
পিয়াসী সদা ফেরে কার দরশ আশে।

দখিনা বাতাসে কুসুম সুবাসে,
কারে মনে পড়ে বহে নয়নে ধারা।।

সেই রেকর্ডেরই আর একদিকে জয়জয়ন্তীর লীলা রূপে—

দামিনী দমকে যামিনী আঁধার গো,
জাগিয়ে একাকী আশে তোমার গো।।

কেঁদে ফেরে বনে বাদল বায় হায়
তারি সনে কাঁদে প্রাণ আমার।।

এমনিভাবে প্রতি গানে তিনি শ্রোতাদের আকৃষ্ট করতে লাগলেন। নট রাগে 'ছন্দে ছন্দে নাচে নন্দদুলাল, শিখী পাখা শিরে বাঁকা গলে বনমাল' ইমনে 'যা সখি আন তারে মোর সনে ফিরায়ে', জৌনপুরীতে 'মম মধুরে মিনতি শুন ঘনশ্যাম', কাফিসিন্ধুতে 'বিশ্বজননী ভাগীরথী মাতঃ গঙ্গে', ভৈরবীতে 'মন বলে তুমি আছ ভগবান' কৌশিকী কানাড়ায় 'শ্মশানে জাগিছে শ্যামা', পরজে 'গোপাল গোপাল প্রাণে মোর', বাগেশ্রীতে 'অনিমেষ আঁখি আমার', কাফিসিন্ধুতে 'আমার শ্যামা মায়ের কোলে', ছায়ানটে 'শুনো এ সুরে পাখি মোর ফিরে আয় ফিরে আয়' এইসব গানই সুরের আবেশে মন আকুল করে রাখে।

রেকর্ড তাঁর আরো হয়েছিল। যেমন—'বাজে মৃদঙ্গ বীণা', 'মুরলির ধ্বনি কার বাজে', 'মঞ্জু রাতে আজি তন্দ্রা নিমীল কেন' ইত্যাদি। প্রত্যেক গানই শোনবার মতন এবং জনপ্রিয় হয়েছিল, তা ছাড়াও টপ্পা গানের রেকর্ড করেছিলেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ। কিন্তু তাঁর গানের পূর্ণ তালিকা এখানে দেওয়া সম্ভব হল না।

গ্রামোফোন রেকর্ডগুলি জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদকে খুবই প্রসিদ্ধি দিয়েছিল বটে। কিন্তু তা তাঁর প্রতিভার সঠিক পরিচায়ক নয়। তাঁর সঙ্গীতকৃতির একটি অংশ মাত্র। তিন মিনিটের এক একটি গানে কোন রাগের পূর্ণ রূপ দেখানো যেমন অসম্ভব, তেমনি গায়কেরও। রাগের বিস্তারবিহীন ঢোকাটি মাত্র এমনি ছোট খেয়ালে গায়ক দেখাবার সময় পান। সাধারণ শ্রোতারা অবশ্য সন্তুষ্ট থাকেন রাগের এই সংক্ষিপ্ত রূপে। গায়কের অসাধারণ কণ্ঠসম্পদ তাঁদের চিত্তাকর্ষণ করে থাকে, মুগ্ধ করে রাখে রাগসঙ্গীতের সুরের বাঁধুনি ও বিন্যাস। কিন্তু তা-ই সব নয়।

সৃজনশীল শিল্পীদের মতন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের প্রতিভা আসরেই পূর্ণভাবে স্ফূর্ত হত। সঙ্গীতাসরেই তাঁর যথার্থ পরিচয়। সম্পূর্ণ রীতির গায়ন-শিল্পী তিনি। ধ্রুপদ ও খেয়ালের নিষ্ঠাবান গায়ক। পদ্ধতিগত শিক্ষা যেমন পেয়েছেন, আসরেও তা পরিবেশন করতেন। নিয়মনিষ্ঠ চর্চার সঙ্গে যুক্ত হয় তাঁর লোকোত্তর সুর-কণ্ঠ।

পিতৃব্য রাধিকাপ্রসাদের হাতেগড়া শিষ্য তিনি। ধ্রুপদ ও খেয়ালের তখনকার ভারতের এক শ্রেষ্ঠ কলাবত রাধিকাপ্রসাদ। তাঁর পুরো তালিম ভ্রাতুষ্পুত্র জ্ঞানেন্দ্র পেয়েছিলেন। বাল্যকাল থেকে আরম্ভ করে একাদিক্রমে ১৮ বছর যাবত—রাধিকাপ্রসাদের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত শিখেছিলেন তিনি। অন্য কোন বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানেন্দ্র করেননি। সঙ্গীতবিদ্যার সাধনই তাঁর ছিল একান্ত। ধ্রুপদ ও খেয়ালের পূর্ণ শিক্ষা রাধিকাপ্রসাদের কাছে তিনি পান। তাঁরই নির্দেশে হয় তাঁর বিধিবদ্ধ কণ্ঠসাধনা। সেই সঙ্গে যুক্ত হয় তাঁর সহজাত অনুপম সঙ্গীত-স্বর। তাঁর সেই দুর্লভ জোয়ারিদার সুরেলা কণ্ঠ।

একাধারে বীর্য ও মাধুর্য—জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গীত ও কণ্ঠের এই বৈশিষ্ট্য। এই অনন্যতার জন্যেই তিনি চিহ্নিত হন, প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং স্বাক্ষর রেখে যান সঙ্গীতচর্চার ইতিহাসে। সাধারণ শ্রোতৃবৃন্দ থেকে শ্রেষ্ঠ কলাবতদের পর্যন্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র হন। আসরে আসরে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায়, অনুরাগে অভিষিক্ত হয় তাঁর সঙ্গীতজীবন।

সঙ্গীতরসেই পরিপূর্ণ ছিল তাঁর সত্তা, তাঁর জীবন। সদা সুরে ভরপুর। যৌবনকাল থেকেই সঙ্গীতজগতের নানা দিকে তিনি দেখা দিয়েছেন। সুরের অঞ্জলি নিবেদন করেছেন পরম আনন্দে। আপনি সার্থক হয়েছেন, চরিতার্থ করেছেন শ্রোতাদের। ছোট বড় নানা ঘরোয়া আসরে, বৃহৎ সঙ্গীত সম্মেলনে, গ্রামোফোন রেকর্ডে, বেতারকেন্দ্রে—সর্বত্র। প্রাদেশিক এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে।

সর্বক্ষণ সুরে পূর্ণ জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ। আসরে আসরে গানের মেজাজে তাঁর সদা প্রস্তুত। সুরে সুরে যেমন নিজে মেতে থাকতেন, তেমনি মাতিয়ে দিতেন শ্রোতাদের। তাঁর কোন আসর ব্যর্থ হত না তাই। কি ধ্রুপদের আসর, কি খেয়ালের আসর—তাঁর প্রতিটি অনুষ্ঠান শ্রোতাদের আশা পূরণ করত। পরিতৃপ্ত হয়ে ফিরতেন তাঁরা।

ধ্রুপদ ও খেয়াল দুই রীতির ভাজি নিয়েই জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ সঙ্গীতক্ষেত্রে এসেছিলেন। ক্রমে ধ্রুপদের আসর কমে আসে তাঁর। তার একটি কারণ—১৯৩২/'৩৪ সাল থেকে কলকাতায় ধ্রুপদের আসরে ভাটা পড়তে থাকে। ধ্রুপদের আসর তারপর স্বল্পতর হয়ে আসে ক্রমে ক্রমে। অন্য কারণ—খেয়াল গানে তিনি উত্তরোত্তর স্ফূর্তি লাভ করতে থাকেন। তাঁর প্রতিভা খেয়ালের তান বিস্তারে ও সুরবিহারে আকৃষ্ট হয় বেশি। আমন্ত্রিত হলে ধ্রুপদ তিনি সঙ্গীতজীবনের শেষ পর্যন্ত গেয়েছেন বটে। কিন্তু খেয়াল গানই তাঁর প্রতিভার প্রধান বাহন হয়েছিল। তবে ধ্রুপদের গাম্ভীর্য তিনি চমৎকারভাবে মিশিয়ে নিয়েছিলেন তাঁর খেয়ালে। যেমন, গমকের ধরনে কোন কোন তান তাঁর খেয়ালের অঙ্গে মানিয়ে দিতেন। ওজস্বিতার সঙ্গে মধুরতা। যেমন তাঁর কণ্ঠে তেমনি গানের অবয়বে।

সেই মাধুর্য তিনি মিছরির দানার মতন গানে গানে ছড়িয়ে দিতেন। আর আসরে আসরে মাৎ হয়ে যেতেন শ্রোতারা। কলকাতার আসর থেকে সেকালের অখণ্ড বাংলার নানা জেলার সম্মেলনে, নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন থেকে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে।

তার কয়েকটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যায়।

সেবার চট্টগ্রাম সঙ্গীত সম্মেলনে বাইরে থেকে যে কয়েকজন শিল্পী এলেন। তাঁদের একজন ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ। প্রথম দিন অন্যদের সঙ্গে তাঁরও গান হল। তাঁর গানে সে কি উদ্দীপনা জাগল আসরে! শ্রোতারা এক অপূর্ব অভিজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

আর একটি সনির্বন্ধ অনুরোধ এল শ্রোতাদের পক্ষ থেকে—'আমরা একদিন আশ মিটিয়ে শুধু জ্ঞান গোস্বামীর গান শুনব।'

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ সম্মত হলেন সানন্দে। তখন সম্মেলনের উদ্যোক্তারাও সে ব্যবস্থা করলেন।

সেদিন সকলের সে আশা পূরণ করেছিলেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ প্রায় তিন ঘণ্টা গান শুনিয়ে চট্টগ্রামবাসীদের তৃপ্তি দিয়েছিলেন।

একবার রাজশাহী সম্মেলনেও গিয়েছিলেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ। শ্রোতাদের মধ্যে সেখানে মনীষী সঙ্গীতজ্ঞ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের

গানে সাড়া পড়ে যায় সম্মেলনে। ধূর্জটি-প্রসাদও আন্তরিক প্রশংসা করেছিলেন।

সদাই সুরে ভরপুর থাকতেন তিনি। আর শ্রোতাকে যেমন সেই সুরে উদ্দীপিত করতে পারতেন তেমনি নিজেও সুরের পরশে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতেন। সেবার ভবানীপুর সঙ্গীত সম্মিলনীতে যাদবকৃষ্ণ বসুর স্মৃতিবার্ষিকী অনুষ্ঠান। সম্মিলনীর এটি বড় আসর। বহু শ্রোতা এসেছেন। শিল্পীদের মধ্যে আছেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ। এবার তাঁর গানের পালা। তাঁরই এক শিষ্য হারমোনিয়মে সংগত করতে বসেছেন পাশে। হারমোনিয়মে বেলো করে চাবিতে হাত দিতেই তাঁর প ম প-তে আঙ্গুল ছুঁয়ে গেল। শিষ্য কোন রাগের কথা ভেবে প ম প পর্দায় আঙ্গুল দেন নি, আপনা থেকেই পড়ে যায় হাত। অমনি জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের মনে কেদারার আভাস জেগে ওঠে। অন্য রাগ তিনি গাইবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু কেদারার একটু ছোঁয়াচ মনে লাগতেই ধরে নিলেন কেদারা। কোমল মধুরে কেদারায় মেজাজ এসে গেল, এমন চমৎকারভাবে কেদারার পকড় দেখিয়ে গান ধরলেন যে মনে হল এই রাগের জন্যেই প্রস্তুত হয়ে এসেছেন আসরে। তখন প্রাণের আরামে কেদারা গাইতে গাইতে তিনি আসর একেবারে জমিয়ে দিলেন। তাঁরই মতন তন্ময় হয়ে গেলেন শ্রোতারা। বিরাট কক্ষ ভরে গিয়ে জানালার সামনে বারান্দায় পর্যন্ত লোক দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন, গায়কের কণ্ঠে যেন সুরের নির্ঝরিণী। কেদারার এত বিস্তার করতে লাগলেন যা সচরাচর এই রাগে শোনা যায় না। গান থামবার পরেও মনে হল সে প্রস্রবণের বিরাম নেই। শ্রোতারা কেউ ধারণাও করতে পারতেন না—এই রাগের উদ্দীপন শিল্পীর মনে জেগেছিল গান আরম্ভ করবার আগের মুহূর্তেই হারমোনিয়মে কেদারার আকস্মিক আভাস পেয়ে।

রাগের রূপ কি মহিমায় প্রতিমা হয়ে উঠত তাঁর সেই অপরূপ সুরেলা কণ্ঠে। সেবার নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনেও তার একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন। ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ পরিচালিত এই সম্মেলন সেবার হয়েছিল সেনেট হলে। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ বাগেশ্রী গেয়েছিলেন—'কোন গত ভৈ...'। এক কথায় বলতে গেলে আসরে সেদিন সাড়া পড়ে যায়। আসরে তখন ছিলেন স্বনামধন্য সুরসাধক আবদুল করিম খাঁ। তিনি গায়কের কণ্ঠের বড় তারিফ করেছিলেন। আর তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করেন, পরিচয় নেন বর্ষীয়ান মহাগুণী। খাঁ সাহেব তারপর যে কদিন কলকাতায় ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর কাছে যেতেন। আবদুল করিম সাদরে কিছু গানও দিয়েছিলেন তাঁকে। খাঁ সাহেবের সেই একবারই কলকাতায় সঙ্গীত

সম্মেলনে আসা। তার কিছুদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। যদি তিনি আরো কিছুকাল জীবিত থাকতেন এবং পরে কলকাতায় আসতেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ থেকে যেত। কারণ তাঁর কণ্ঠ-মাধুর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন আবদুল করিম খাঁ।

বহু রাগেই জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ পারদর্শী ছিলেন। নানা রাগই শুনিয়েছেন আসরে আসরে। সংগ্রহ তাঁর প্রচুর ছিল। রাধিকাপ্রসাদের বিপুল সঞ্চয় তিনি পেয়েছিলেন অনেকখানি আর তাঁর কাছে শিক্ষার ভিতও ছিল পাকা। তাই রাগবিদ্যা তাঁর খুব বিস্তৃত হলেও বিভিন্ন রাগরূপের জ্ঞান তাঁর যথাযথ ছিল। কোন রাগের বিকৃতি তাঁর নিজেরও যেমন ছিল না, তেমনি সহ্য করতে পারতেন না অন্যেরও। সিদ্ধ স্বরের জন্যে যেমন, শুদ্ধ রাগ পরিবেশনের জন্যেও গুণীজনের স্বীকৃতি তিনি বরাবর পেয়েছেন, শুধু বাংলায় নয় পশ্চিমাঞ্চলেও। আগ্রার সেই আসরের কথাও এখানে বলা যায়। সেবার কত সর্ব-ভারতীয় কলাবত এসেছিলেন আগ্রায়। নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনের সেই আগ্রা অধিবেশনে,

তাঁদের সামনে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ ছায়ানটে গাইলেন—

পল পল্‌ছিন্ শোচ বিচার কর যায়,
কাহে প্রীতম অবহু নাহি আয়ে।।

ভোর ভৈ সব আয়ে পিয়ার বা
তুম সোহন কে ক্যার বসায়ে।।

তখন সমবেত সব ওস্তাদেরাই অভিনন্দন জানিয়েছিলেন এই বাঙালী শিল্পীকে। তাঁর সংগীত কণ্ঠ তাঁর রাগ-রূপায়ন তাঁর দরদী গায়নভঙ্গী—সব কিছুরই তাঁরা তারিফ করেছিলেন।

এমনি নানা প্রশংসাধন্য আসরে তাঁর সংগীতজীবন সার্থক ছিল পরিপূর্ণ ছিল। এ বিষয়ে আর বেশী উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন।

রাগের কথায় বলা যায় যা তিনি গাইতেন সবই হত অতি উপভোগ্য। তবু তাঁর সেই উদাত্ত কণ্ঠে দরবারী কানাড়া ইমন কল্যাণ বাগেশ্রী ছায়ানট এই ধরনের রাগের যেন তুলনা ছিল না। তিনি টানা সুরের আন্দোলন কি হৃদয়স্পর্শী হত তাঁর দরাজ মাধুর্যময় স্বরলহরীতে। যাঁরা সে সব শুনেছিলেন, সংগীতের এক এক শ্রেষ্ঠ আস্বাদ লাভ করেছিলেন।

'গোল্ডেন ভয়েস' যাকে বলে তাই জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের ছিল। নানা শ্রেষ্ঠ কলাবন্তের প্রীতির পাত্র তিনি হন সেই গুণে। যেমন আবদুল করিম খাঁ তেমনি বিষ্ণু-দিগম্বর পালুসকর কিংবা ফৈয়াজ খাঁরও। অমৃতকণ্ঠ গায়ক সংগীতাচার্য বিষ্ণু দিগম্বর কয়েকবার কলকাতায় এসে-

ছিলেন। প্রতিবারই অতিথি হন সংগীত-প্রেমী ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষের পাথুরিয়াঘাটা ভবনে। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদও সে গৃহে দীর্ঘকাল বাস করেছিলেন। সেখানেই তিনি পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বরের সঙ্গে পরিচিত ও তাঁর স্নেহধন্য হন। পণ্ডিতজী তাঁর সংগীতকণ্ঠে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং রাগ-বিদ্যা কিছু শিক্ষাও দেন তাঁকে।

ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁও জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের সংগীত কণ্ঠের দস্তুরমত তারিফ করতেন। বলতেন 'ওঃ জ্ঞান তুমারা ক্যেয়া আওয়াজ!'

আর ওই গলার জন্যে ভালবেসে তালিমও তাঁকে দিতেন। খাঁ সাহেবও সে সময় আতিথ্য স্বীকার করতেন ভূপেন্দ্র-কৃষ্ণের। সেখানেই ফৈয়াজ খাঁর কাছে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ শিক্ষা সংগ্রহ করেন। তা ছাড়া একবার খাঁ সাহেবের কাছে সেজন্যে বরোদাতেও গিয়েছিলেন কিছুদিন। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভাল। জ্ঞানেন্দ্র-প্রসাদ পুরো তালিম রাধিকাপ্রসাদেরই পেয়েছিলেন। পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর বা ফৈয়াজ খাঁর কাছে যে সময় কিছু কিছু নেন তার আগেই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং প্রতিষ্ঠিত গায়ক। আবদুল করিম খাঁ সম্পর্কেও একই কথা।...

অনিন্দ্যকণ্ঠে ধ্রুপদ খেয়ালেও যে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ রসসৃষ্টি করতেন শিল্পী রূপে সেই তাঁর যথার্থ পরিচয় ছিল। সেই গুণেই অত জনপ্রিয় হয়েছিলেন তিনি।

আসরে রীতিসম্মত খেয়াল ও ধ্রুপদ গাইতেন গ্রামোফোন রেকর্ডে ও বেতার কেন্দ্রে বাংলা খেয়াল শোনাতেন। কিন্তু তা ছাড়া অন্যান্য বাংলা গানও গাইতেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ। অবশ্য সবই রাগাত্মক সংগীত। সে সমস্ত বাংলা গানেও তাঁর অন্তরের দরদে রসসৃজন ঠিকই হত।

বাংলা টপ্পা চমৎকার গাইতেন তিনি। নিধুবাবুর টপ্পা গান তাঁর রেকর্ডও হয়েছিল। টপ্পা তিনি শোনাতেন নিতান্ত ঘরোয়া আসরে। সেজন্যে বাইরে অনেকের সেকথা জানা ছিল না। কিন্তু গুণীজনেরা অবহিত ছিলেন সে বিষয়ে। বাংলার দুই টপ্পাশিল্পী কালিপদ পাঠক ও বিজয়লাল মুখোপাধ্যায় সে জন্যে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদকে যথেষ্ট সমাদর করতেন। দুজনেই তাঁর চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও আসতেন তাঁর কাছে। গান শুনে সম্মান জানাতেন।

'দিন যাবে মা কথাই রবে,

মা তোর নামে কি এমনি ধারা..'

এই টপ্পাটি অপূর্ব গাইতেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ। সিন্ধু কাফির সকরুণ সুরে গায়কের ভক্তি ভাব অতি মর্মস্পর্শী হত মধ্য লয়ের দোলনে। দানাভরা কথার তান গুলি সেই অনুপম কণ্ঠ থেকে মিছরির দানার মতন ঝরে ঝরে পড়ত। আর তার সঙ্গে শিল্পীর অশ্রুপূর্ণ সুনয়ন পরিপূর্ণ করত সেই ভাবের দ্যোতনা।

তাঁর গান ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষের বাড়ীতে সবচেয়ে বেশী শোনা যেত। সেকাল একালের সন্ধি যুগের বাংলায় রাগসংগীত প্রচারের সুপরিচিত মুখপুরুষ ছিলেন ঘোষ মহাশয়। উচ্চ মানের সেই নিখিল বঙ্গ সংগীত সম্মেলন এবং সংগীত প্রতিযোগিতার তিনি প্রধান হোতা ছিলেন বলে কেবল নয়। তাঁর পাথুরিয়াঘাটা-ভবন সুপরিচিত হয় বহু উল্লেখ্য আসরেরও জন্যে। আর জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ সেখানে বছরের পর বছর বাস করার জন্যে কত গানের আসরই সেখানে হয়ে গেছে। সে সব তো সদরের সেই দোতলায় বৃহৎ জলসাঘরের কথা। আরো ঘরোয়াভাবে ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় জ্ঞান বা জ্ঞেনুর গান এক-একদিন শুনতেন। আর সে সব অন্তরঙ্গ অনুষ্ঠানেও তাঁর গান হত প্রথম শ্রেণীর শিল্পকর্ম। কারণ অন্তর তাঁর নিত্যই সংগীত রসে নিষিক্ত থাকত। শুধু আবাহনের অপেক্ষা। উপযুক্ত উদবোধন হলেই দেখা দিত সে সুরধুনির ধারা।...

গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যা হয়ত উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ এসে বসেছেন সদরের দোতলা ছাদে। মন্ত দখিনা বাতাসে তখন আকাশ মনোরম হয়ে উঠেছে। একটু দূরের ঘরে ঘরে বিজলী আলো। কিন্তু ছাদে শুধু মৃদু জ্যোৎস্নাকিরণ ঢালা।

পাশের কাউকে ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বললেন জ্ঞেনু কোথায়? ডাকো তো। একটু গান হলে বেশ হয়।

জ্ঞানেন্দ্রকে হয়ত পাওয়া গেল সদরের সেই তেতলা থে। দোতলার ছাদে তিনি এলেন ভূপে ঞ্চের কাছে। সরঞ্জামের মধ্যে শুধু টি হারমোনিয়ম আনা হল।

এবার একটু গান শোনাও জ্ঞেনু' বলে বাবু।

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ জানেন এই পরিবেশে কি গান মানায়। কোন ধনের গান ভূপেন্দ্র-কৃষ্ণের অন্তরের প্রিয়। তা-ই তিনি ধরলেন রবীন্দ্রনাথের গভীর ভাবের আবেগ-বিধুর ধ্রুপদাঙ্গ গান।

জ্যোৎস্না রাতের উন্মুক্ত ছাদ। দক্ষিণের হাওয়া লুটিয়ে বয়ে চলেছে। রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর কাছেই এই পাথুরিয়াঘাটা ভবন।

ভূপেন্দ্রকৃষ্ণের একটি প্রিয় গান জ্ঞানেন্দ্র আরম্ভ করলেন—

নিশীথ শয়নে ভেবে রাখি
মনে ওগো অন্তরযামী,
প্রভাতে প্রথম নয়ন মেলিয়া
তোমারে হেরিব আমি,
ওগো অন্তরযামী।।

বাগেশ্রীর হৃদয় মথিত করা স্বর বিস্তার, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের উদাত্ত-মধুর কণ্ঠ রবীন্দ্রনাথের বন্দনীয় বাণী—এক যোগে মায়াজাল রচনা করতে লাগল গ্রীষ্ম রাতের সেই মুক্ত আকাশ তলে। আর জাগাল বৃহৎ লোকের প্রেরণা—

জাগিয়া বসিয়া শুভ্র আলোকে
তোমার চরণে নমিয়া পুলকে

মনে ভেবে রাখি দিনের কর্ম,
তোমারে সর্পব স্বামী,
ওগো অন্তরযামী।।

দিনের কর্ম সাধিতে সাধিতে
ভেবে রাখি মনে মনে,

কর্ম-অন্তে সন্ধ্যাবেলায়
বসিব তোমারি সনে।

দিন-অবসানে ভাবি বসে ঘরে
তোমার নিশীথ-বিরাম সাগরে
শ্রান্ত প্রাণের ভাবনা বেদনা
নীরবে যাইবে নামি,
ওগো অন্তরযামী।।

স্তব্ধ হয়ে শুনে ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বললেন, 'এবার সেই ছায়ানট'

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গাইতে লাগলেন তন্ময় হয়ে—

অল্প লইয়া থাকি
তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়।

কণাটুকু যদি হারায় তা লয়ে
প্রাণ করে 'হায় হায়'।।

নদীতটসম কেবলই বৃথাই
প্রবাহ আঁকড়ি রাখিবারে চাই,

একে একে বুকে আঘাত করিয়া
ঢেউগুলি কোথা যায়।।

যাহা যায় আর যাহা কিছু থাকে
সব যদি দিই সঁপিয়া তোমাকে

তবে নাহি ক্ষয়, সবই জেগে রয়
তব মহা মহিমায়।।

তোমাতে রয়েছে কত শশী ভানু,
হারায় না কভু অণু পরমাণু

আমারই ক্ষুদ্র হারাধনগুলি
রবে না কি তব পায়।।...

রবীন্দ্রনাথের এই গানখানি জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের নিজেরও অতি প্রিয় ছিল। এটি রেকর্ড করাবারও ইচ্ছা ছিল তাঁর। কিন্তু বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অনুমতি তাঁকে দেন নি। অগত্যা ওই গানেরই ছক হুবহু অনুকরণে কাজী নজরুলকে দিয়ে রচনা করে রেকর্ড করেছিলেন ছায়ানটে—

'শূন্য এ বুকে পাখি মোর
ফিরে আয় ফিরে আয়...'

এখানে বলা যায় জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ যেসব বাংলা খেয়াল অজোর গান রেকর্ড করেন তার বেশীর ভাগই নজরুলের রচনা। শুধু, আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশী বাজায় ও উজল কাজল দুটি নয়নতারা তাঁর জন্যে লিখে দেন অভিনেতা-নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী।...

সুরের বরপুত্র জ্ঞানেন্দ্র তাঁর জীবন কথা আদ্যোপান্ত সঙ্গীতেরই প্রসঙ্গ শুধু, শোকের একটি অধ্যায় ভিন্ন। তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী এখানে দেওয়া হল।

সঙ্গীত কেন্দ্র বিষ্ণুপুরে ১৯০২ সালের শুভ বড়দিন (১০ই পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩০৯। ২৫ ডিসেম্বর) তাঁর জন্ম হয়। গোঁসাইপাড়ার এই গোস্বামী পরিবার সঙ্গীতচর্চার জন্যে বিখ্যাত ছিলেন বিষ্ণুপুরে। আর এক কারণেও তাঁদের প্রসিদ্ধি ছিল, তাঁরা শ্রীনিবাস আচার্যের বংশধর। শ্রীচৈতন্য পরবর্তী বাংলার বৈষ্ণব সমাজের ত্রয়ী নেতা নরোত্তম শ্রীনিবাস শ্যামানন্দের অন্যতম শ্রীনিবাস ঠাকুর। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের জন্মের তিনশ বছরের আগে থেকে বিষ্ণুপুরে এবং এই বংশে বৈষ্ণব ধর্মচর্চার প্রবর্তন হয়েছিল। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের জীবনকালেও বৈষ্ণব আচার্যের বৃত্তি দেখা যায় তাঁদের পরিবারে। সিমলাপালের রাজা মদনমোহন সিংহ প্রমুখ তাঁদের অনেক শিষ্য বিষ্ণুপুর

অঞ্চলে ছিলেন। তাঁদের সেখানে পরিচিতি ছিল গোঁসাই বংশ বলে। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের মনেও বৈষ্ণব সংস্কার ভালভাবে ছিল। তাঁর জীবনের সেই সংকটময় পর্বে দেখা গিয়েছিল যার তীব্র প্রতিক্রিয়া। সে ঘটনা অনেক পরের কথা।

তাঁর জন্মের অনেক আগে থেকে এ বংশে সঙ্গীতচর্চা হত। তাঁর পিতা-পিতামহ-পিতৃব্যরা প্রত্যেকেই সংগীত-সেবী। তাঁদের মধ্যে রাধিকাপ্রসাদ ত ভারতবিখ্যাত।

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের পিতামহ জগৎচাঁদ গোস্বামী ছিলেন বিষ্ণুপুরের সবচেয়ে নামী পাখোয়াজী। বিষ্ণুপুরের আদি ধ্রুপদাচার্য রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের পুত্র ও শিষ্য রামকেশব ভট্টাচার্য রামশঙ্করের আর এক শিষ্য কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী প্রভৃতির গানের সঙ্গে জগৎচাঁদ সঙ্গত করতেন। যদু ভট্ট কখনো বিষ্ণুপুরে এলে (বেশীর ভাগই তিনি বিষ্ণুপুরের বাইরে থাকতেন) তাঁর গানের সঙ্গেও পাখোয়াজ বাজাতেন জগৎচাঁদ। তাঁর পাঁচ পুত্রের সকলেই সংগীতসেবী। প্রথম কীর্তিচাঁদ পিতার শিক্ষায় পাখোয়াজী হয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিপিনচন্দ্র এসরাজ (এবং তার ময়ূরমুখী সংস্করণ তাউস যন্ত্রের) বাদক ছিলেন—পাঠকপাড়ার নীলমাধব চক্রবর্তী তাঁর গুরু। তৃতীয় রাধিকাপ্রসাদ বাল্যকাল থেকেই বিষ্ণুপুরে গান শিখতেন। তারপর ১৫ বছর বয়সে কলকাতায় রীতিমত সংগীতশিক্ষা আরম্ভ করেন। বেতিয়া ঘরাণার বিখ্যাত গায়ক ভ্রাতৃদ্বয় শিব-নারায়ণ ও গুরুপ্রসাদ মিশ্রের কাছে দশ বছরেরও বেশী শিক্ষার পরে প্রতিষ্ঠিত হন কলকাতা তথা বাংলার সংগীতক্ষেত্রে। জগৎচাঁদের চতুর্থ পুত্র লোকনাথও গায়ক হয়েছিলেন এবং শান্তিনিকেতনে নিযুক্ত থাকেন তাঁর অল্পায়ু জীবনে। সর্বকনিষ্ঠ নকুড়চন্দ্র একাধারে ধ্রুপদ খেয়াল গায়ক এবং সেতার সুরবাহার বাদক হয়েছিলেন তিনি ধ্রুপদ ও খেয়াল শেখেন রাধিকা-প্রসাদের কাছে এবং সেতার সুরবাহারে হন নীলমাধব চক্রবর্তীর শিষ্য। নকুড়চন্দ্রও শান্তিনিকেতনে সংগীতশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

জগৎচাঁদের দ্বিতীয় পুত্র এস্রাজ-বাদক বিপিনচন্দ্র হলেন জ্ঞানেন্দ্রের পিতা। বিপিনচন্দ্রের সংগীতজীবন সম্বন্ধে এখানে আর একটু যোগ করা যায়। এস্রাজ (ও তাউস) বাদক হলেও তিনি একজন গায়কও ছিলেন। বিষ্ণু-পুরের সংগীত-সমাজে। তিন পুরুষের এই সংগীতচর্চার অন্তরঙ্গ পরিবেশে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ লালিত হন। আর শৈশব থেকেই স্বভাবের প্রেরণায় প্রকাশ পায় তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠ। তাঁর গায়ন প্রতিভা লক্ষ্য করে একেবারে বালক বয়সেই তাঁর সংগীত শিক্ষা আরম্ভ করা হয়। বিদ্যা-শিক্ষার পরিবর্তে সংগীতের পাঠ দেওয়া হত তাঁকে। পিতৃব্য লোকনাথ জ্ঞানেন্দ্র-প্রসাদের ৬ বছর বয়স থেকে সংগীতশিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। শান্তিনিকেতনের সংগীতশিক্ষক ছিলেন লোকনাথ। জ্ঞানেন্দ্রের সংগীতশিক্ষা আরম্ভের দু বছর পরে ৪০ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

তারপরই রাধিকাপ্রসাদের কাছে জ্ঞানেন্দ্রের সংগীতশিক্ষার সূত্রপাত। তাঁর বয়স তখন ৮ বছর মাত্র। তা হল ১৯১০ সালের কথা। রাধিকাপ্রসাদ তখন মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর সংগীত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হয়ে বহরমপুরে বাস করছেন। তার পাঁচ বছর আগে (১৯০৫) বিশুদ্ধ সংগীত শিক্ষাদানের জন্যে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন মণীন্দ্রচন্দ্র। কলকাতার সংগীতক্ষেত্রে তখনই খ্যাতনামা হয়েছেন রাধিকাপ্রসাদ। তাঁকেই মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র প্রথম থেকে এই বহরমপুরে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত করেন।

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ বহরমপুরে শিক্ষা পেতে থাকেন রাধিকাপ্রসাদের কাছে। পিতৃব্যের কাছে তিনি তখন থেকেই বাস করতেন এবং বিধিবদ্ধভাবে সংগীতশিক্ষা আরম্ভ করেন। বিদ্যাশিক্ষা বা অন্য করণীয় কিছু ছিল না তাঁর। একান্তভাবেই রাধিকাপ্রসাদের নির্দেশে তাঁর কণ্ঠসাধনা ও শিক্ষা অগ্রসর হতে থাকে। সহজাত সুকণ্ঠ তাঁর ছিল। সেই সঙ্গে যুক্ত হল রাধিকাপ্রসাদের উপযুক্ত শিক্ষা। দিন-রাতের অধিকাংশ সময়ই জ্ঞানেন্দ্রের সংগীতের সাধনে অতিবাহিত হত। রাধিকাপ্রসাদ বহরমপুর থেকে যখন কল-কাতায় আসতেন কিংবা বিষ্ণুপুরে তখনো সঙ্গে থাকতেন ভ্রাতুষ্পুত্র। রাধিকাপ্রসাদের সঙ্গে নানা সংগীতাসরেও উপস্থিত হতেন। এইভাবে গঠিত হতে থাকে জ্ঞানেন্দ্রের সংগীতজীবন।

তারপর রাধিকাপ্রসাদ বহরমপুরের সংগীত বিদ্যালয় থেকে অবসর নেন। স্থায়ী হন কলকাতায়। তা সম্ভবত ১৯১৯ সালের কথা। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদও তাঁর সঙ্গে থাকেন।

রাধিকাপ্রসাদ এবার কলকাতা নিবাসী হন ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষের আতিথ্যে। তাঁর পাথুরিয়াঘাটা আবাসের সদর মহলে তিন-তলায় রাধিকাপ্রসাদের বাসের জন্যে স্থান নির্দিষ্ট ছিল, তখনো তাঁর সঙ্গে থেকে নিয়মিত সংগীতশিক্ষা করতেন জ্ঞানেন্দ্র-প্রসাদ। ধ্রুপদ ও খেয়াল দুই অঙ্গেরই সাধক ও গায়ক ছিলেন রাধিকাপ্রসাদ। ভ্রাতুষ্পুত্রকেও প্রথম থেকেই ধ্রুপদ ও খেয়াল শিক্ষা দিতেন।

ওই ১৯১৯ সালেই রাধিকাপ্রসাদের প্রধান শিষ্য ধ্রুপদী মহীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। তারপর মহীন্দ্রের শিষ্যরা—ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ আসেন রাধিকাপ্রসাদের কাছে। তাঁর শিক্ষাধীনে সংগীতচর্চা করতে থাকেন। তাঁদের মধ্যে আর একজন ছিলেন মহীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ-পুত্র ললিতচন্দ্র, পিতার সুযোগ্য শিষ্য এবং অতি মধুরকণ্ঠ ললিতচন্দ্রও রাধিকা-প্রসাদের কাছে শিখতে থাকেন। শুধু ধ্রুপদই গাইতেন ললিতচন্দ্র। তাঁর চেয়ে চার বছরের কনিষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ তখন শিক্ষার্থী হলেও আসরে গাইবার উপযুক্ত হয়েছিলেন। রাধিকাপ্রসাদের জীবিত-কালেই ললিতচন্দ্র ও জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ যুগল-বন্দী ধ্রুপদ গাইতেন আসরে, গুরুভ্রাতার সেই সাংগীতিক সম্পর্ক তাঁদের মধ্যে দীর্ঘ-কাল ছিল। এই দুই মাধুর্যময় কণ্ঠের জুটিতে ধ্রুপদ গান পরম উপ-ভোগ্য হত সেকালে। দুজনের মৃত্যুও হয় এক বছর আগে পরে। ১৯৪৪ সালে ললিতচন্দ্র বিগত হন ৪৬ বছর বয়সে।

রাধিকাপ্রসাদ জ্ঞানেন্দ্রকে নিয়ে ক'বছর পাথুরিয়াঘাটায় বাস করেছিলেন। তারপর ভূপেন্দ্রকৃষ্ণেরই মসজিদ বাড়ি স্ট্রীটের এক বাড়িতে ছিলেন কিছুদিন। সে সময় তিনি সপরিবারে কলকাতাবাসী হন, সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদও থাকেন। তারপর ১৯২৪ সালের ডিসেম্বরে লক্ষ্ণৌ নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনে যোগ দিতে যান রাধিকাপ্রসাদ সেই বাড়ি থেকেই। আর লক্ষ্ণৌ থেকে ফেরবার পরই ১৯২৫ সালের জানুয়ারিতে পরলোকগত হন। ইন্দ্রপতন যায় বাংলার সংগীত-সমাজে।

তাঁর কাছে ১৯১০ থেকে সেই ১৯২৪ সাল পর্যন্ত ১৪ বছর একাদিক্রমে গান শিখেছিলেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ। রাধিকা-প্রসাদের পুরো তালিমে তিনি গঠিত হয়েছিলেন, প্রিয় শিষ্য মহীন্দ্রের মৃত্যুর পর গোঁসাইজীর শ্রেষ্ঠ উত্তরসাধক হন তাঁর এই একান্ত স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্র। ভূপেন্দ্রকৃষ্ণের ভবনে প্রথম যখন আসেন রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে বলেন জ্ঞেনুর হবে। ওকে এখানে রাখব।

তাঁর আদরের জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের হয়ে-ছিল ঠিকই। সার্থকতায় শ্রীমণ্ডিত হয়ে-ছিল তাঁর সংগীতজীবন। রাধিকাপ্রসাদের মৃত্যুকালে তিনি ২১ বছরের যুবক ও পূর্ণ বিকশিত সিদ্ধ ধ্রুপদ-খেয়াল গায়ক। সংগীতসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যে তাঁকে বিশেষ কষ্ট পেতে হয় নি। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি সংগীতগুণে লাভ করেছিলেন যশ ও সম্মানের আসন।

তাঁর সঙ্গীতজীবনের প্রথম থেকেই ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষকে তিনি এক প্রধান পৃষ্ঠপোষকরূপে পেয়েছিলেন। তাঁর আনুকূল্যে এবং গৃহেই পরে তিনি পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বর ও ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর কাছে শিক্ষার সুযোগ পান কয়েকবার। রাধিকাপ্রসাদের মৃত্যুর পরও কয়েক বছর জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ বাস করেছিলেন তাঁর পাথুরিয়াঘাটা ভবনে। আর তাঁর নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের শিল্পীরূপে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ প্রথম থেকেই যুক্ত থাকেন। রাধিকাপ্রসাদের মতন তাঁর সঙ্গীত-জীবনেও অচ্ছেদ্য ছিল ভূপেন্দ্রকৃষ্ণের উদার হৃদয়ের সহযোগিতা ও আনুকূল্য। পাথুরিয়াঘাটা থেকে পরে তিনি কলকাতায় বিভিন্ন স্থানে বাস করেছিলেন, কিন্তু ভূপেন্দ্রকৃষ্ণের গৃহে যাতায়াত ও সঙ্গীত-জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাঁর বিদ্যমান থাকে জীবনের শেষের পর্ব পর্যন্ত। ভূপেন্দ্র-কৃষ্ণের উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র মন্মথনাথ রাধিকপ্রসাদের সঙ্গীতশিষ্য ছিলেন বলে তাঁর সঙ্গেও জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের আন্তরিক প্রীতির সম্বন্ধ ছিল।

ভূপেন্দ্রকৃষ্ণের গৃহে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ ১৯২৮।২৯ পর্যন্ত ছিলেন। তারপর উত্তর কলকাতার নানা জায়গায় থাকেন অস্থায়ীভাবে। আমহার্স্ট স্ট্রীটে মহাকালী পাঠশালায় ঘোষ লেনে চাচার হোটেলে ইত্যাদি হয়ে শেষ বছর দুয়েক তাঁর মহারাণী হেমন্তকুমারী স্ট্রীটে। এটি পুঁটিয়া রাজবংশের কলকাতা আবাস এবং এখান থেকেই জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ বিষ্ণুপুরে শেষবার যাত্রা করেছিলেন।

কলকাতায় জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ পেয়েছিলেন নানা গুণমুগ্ধ অনুরাগী। যেমন পুঁটিয়ার রাজবাড়ি কিংবা পাথুরিয়াঘাটার ভবন, তেমনি বাগবাজারের পশুপতিনাথ বসুর গৃহ প্রভৃতিতেও তাঁর সাদর স্থান ছিল। পশুপতিনাথের বংশধর অনাথনাথ তাঁর সঙ্গীত-গুণের জন্যে ছিলেন এক দরদী পৃষ্ঠপোষক।

ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ছাড়া কলকাতায় আর যে সব আসরে জ্ঞানেন্দ্রনাথের গান বেশী হত তা হল—জোড়াবাগান স্ট্রীটের দেবীপ্রসাদ ঘোষের বাড়ি, রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীটের বিশ্ব-নাথ সান্যালের বাড়ি বাগবাজারের কালিবাবু নামে সুপরিচিত উক্ত অনাথনাথ বসুর বাড়ি ভগবতীপ্রসাদ খাঁ চৌধুরীর অর্থাৎ পুঁটিয়ার রাজবাড়ি বাগবাজারের বলরাম মন্দির ভবানীপুর সঙ্গীত সম্মিলনী প্রভৃতি। কলকাতার বাইরে মহিষাদল রাজ-বাড়িতে তাঁর আসর বহুবার হয়েছে।

তা ছাড়া সঙ্গীতই ত ছিল তাঁর জীবনের বৃত্তি ও অবলম্বন। সেজন্যে কলকাতা ও আশে-পাশের নানা আসরে তিনি মুজরো করতে যেতেন। যথেষ্ট নাম-ডাক তাঁর হয়েছিল সঙ্গীতজগতে। কিন্তু তখনকার আর্থিক মান অনুযায়ী তাঁর মুজরো ছিল এক আসরের জন্যে ত্রিশ টাকা মাত্র। তবে সেসব তাঁর কাছে বাহ্য ছিল। সন্তুষ্টচিত্ত থাকতেন তিনি সুরের ধ্যানে আবাহনে পরিবেশনে। সরল মন সত্যকার শিল্পী-প্রাণ। সুরে নিমগ্ন থাকতেই শ্রেষ্ঠ আরাম বোধ করতেন। কল-কাতারই বাসিন্দা থাকতেন বেশীর ভাগ সময়। তখন উপার্জনের সব অর্থ এক ছাত্রের কাছে গচ্ছিত রাখতেন। আসরের মুজরো গ্রামোফোনের আয় বেতারের রোজগার ইত্যাদি। আর প্রয়োজন মতন নিতেন। হিসেব চাইতেন না কখনো। সে ছাত্র আবার অতিদরিদ্র। কিন্তু তাঁর নিষ্ঠা দেখে বিনামূল্যে তিনি তাঁকে শেখাতেন।

আবার এক একদিন শিষ্যের মুখ লক্ষ্য করে বলতেন এমন শুকনো শুকনো কেন দেখাচ্ছে রে? খাওয়া হয় নি নাকি?

'আজ্ঞে না, ঘরে কিছু নেই।'

গুরু ধমক দিয়ে উঠতেন, 'বলেছি না, যখনই দরকার পড়বে ওই টাকা থেকে নিবি?'

হাত জোড় করে শিষ্য বলতেন 'আপনার কত সময় নষ্ট করে, এমনি আমায় দয়া করে গান শেখান। আর কি আপনার ঋণ বাড়াতে পারি?'

বিষম রেগে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ জানাতেন ফের যদি কোনদিন জানতে পারি যে না খেয়ে আছিস, তোকে গান শেখানো বন্ধ করে দেব।'

শিষ্য কিন্তু কোনদিন জানতে দেন নি নিজের অনাহারে থাকবার কথা। আর কখনো গুরুর উপার্জিত অর্থ স্পর্শও করেননি। সঙ্গীতশিক্ষাও পেতে থাকেন অবাধে।

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গীতশিষ্য মধ্যে কয়েকজনেরই নাম করা যায়। যেমন— নীলমচন্দ্র মালাকর, ধীরেন্দ্রনাথ ঘটক, জয়-কৃষ্ণ সান্যাল, সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল চক্রবর্তী-

চরণ খাঁ চৌধুরী (পুণ্টিয়া), ওঙ্কারনাথ চট্টোপাধ্যায় (বাঁকুড়া) প্রভৃতি।

এঁদের মধ্যে একজন হলেন কাশীর সেই মজলিকা বাইয়ের ছাত্রটি। মজলিকা বাইয়ের মৃত্যুর অনেকদিন পরে হঠাৎ তার কথা ফাঁসে গেল।

সেদিন গানের আসর বসেছে বীডন স্ট্রীটে শ্রী জে সি ব্যানার্জীর বাড়িতে। এক তরুণ গায়ক গান আরম্ভ করেছেন। বিলম্বিত লয়ের বন্দেশী একখানি ইমন কল্যাণের খেয়াল। এমন সময় আসরে একটুখানি চাঞ্চল্য জাগল। গায়ক দেখলেন—এক সুপুরুষ ব্যক্তি এলেন আসরে। তাঁর দিকে চেয়েই শ্রোতাদের মধ্যে গুঞ্জন জেগেছিল। ভদ্রলোক এসে সরাসরি বসলেন গানের জায়গাতেই।

তারপর গান একটুখানি শুনেই মজলিসী ঢঙে বলে উঠলেন 'বাঃ বাঃ ভাই!'

আর গানের ক্ষণিক বিরতির সময় গায়ককে বললেন, 'বেশ হচ্ছে। চমৎকার চাল ত। আমিও সঙ্গে গাই, কেমন? গানটা বড় গাইতে ইচ্ছে করছে।'

বলেই ধরে নিলেন গানখানি। আর দরাজ গলায় সুর একেবারে ছাপিয়ে পড়তে লাগল।

তরুণ গায়কটি সংকোচে গান বন্ধ করতে ভদ্রলোক বললেন, 'থামলে কেন? গাও।'

শেষ পর্যন্ত গাওয়ালেন নিজের সঙ্গে। এমন অযাচিতভাবে এবং এক অখ্যাত গায়কের সঙ্গে জুটিতে গাওয়া—অথচ নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের লেশমাত্র চেষ্টাও নেই। এমন নিরভিমান অকৃত্রিম আত্মভোলা সুর-পাগল। কে এই অসাধারণ গায়ক-শিল্পী?

তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন তরুণ গায়কটি। আর শ্রোতাদের অস্ফুট গুঞ্জন শুনলেন—'জ্ঞানবাবু। জ্ঞান গোস্বামী।'

সেই কাশীতে মজলিকা বাইয়ের ঘরে শোনা জ্ঞান গোস্বামী? সেই 'নিধুম জাগে'-র দরবারি কানাড়ার জ্ঞান গোস্বামী? কি আশ্চর্য! এতদিন পরে যোগাযোগ ঘটে গেল তাঁর সঙ্গে।

সেই জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীই তখন তাঁকে বলছিলেন, 'তোমার গলাটি ত বেশ ভাই! আর এমন সুন্দর হিন্দুস্থানী উচ্চারণ কি করে করলে? পশ্চিমে গান শিখেছ নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ! কাশীতে মজলিকা বাইয়ের কাছে কিছুদিন [illegible]

'তোমার নাম কি?'

'শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘটক।'

'আমার কাছে শিখবে?'

'যদি দয়া করে শেখান।'

সেই আসরের পর থেকেই জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের তিনি শিষ্য হলেন।

আরো একজন শিখতে চান জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের কাছে। তিনি তাঁকে শেখাতে আরম্ভও করেন। একমাত্র ছাত্রী তাঁর। তরুণী হলেও গ্রামোফোন রেকর্ডের উদীয়মানা গায়িকা। হালকা চালের গান—কিন্তু বড়ই সুকণ্ঠী। পর পর ২৮ খানি গান তাঁর রেকর্ড হয়ে যায়। রেকর্ড জগতের এক সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা হন......

কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের পক্ষে কি সুখের হত এ ছাত্রীর সংসর্গ না হলে! জীবন-যাত্রায় প্রকাশ্য রাজপথেই স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করে যেতে পারতেন। হয়ত অন্য রূপ নিত তাঁর জীবনের পরিণাম! তবে তা আরো পরের কথা। পরেই বলা হবে।......

সংগীতজীবনে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ তখন খ্যাতির শীর্ষে উঠেছেন। গ্রামোফোন রেকর্ডে, বেতারে, আসরে সম্মেলনে—সকলের মুখে মুখে তখন উচ্চারিত একটি সুনাম—জ্ঞান গোস্বামী! তখনকার হিসেবে অর্থ ভাগ্যই বা মন্দ কি? কারণ সেই উপার্জনেই তিনি ত সন্তুষ্টচিত্ত।

গ্রামোফোন রেকর্ডের জন্যে কাজী নজরুলের সঙ্গে তথা তাঁর বেশ হৃদ্যতা হয়েছে। একদিন হৈ হৈ করে নজরুল তাঁর হাত টেনে নিয়ে ভাগ্য বিচার করতে বসলেন। আর উল্লাসে চীৎকার করে উঠলেন 'ওঃ কি ভাগ্যই করেছেন। কাউকে যদি জুতো পেটা করেন সেও আপনার পায়ে ধরবে।'

হায়! ভাগ্য ত অ-দৃষ্ট! সেদিন নজরুলের ভবিষ্যদ্বাণীতে ভাগ্যদেবতা হয়ত অলক্ষ্যে হেসেছিলেন!

কিমাশ্চর্যম্!

সেই সরল মুক্ত-স্বভাব ভাব-পাগল শিল্পী! তাঁর সে একান্ত সঙ্গীতময় জীবন কি জটিল হয়ে উঠল শেষে। কত কূট গ্রন্থিতে বদ্ধ হয়ে গেল। আর তিনি সেই সব গ্রন্থি-ছেদ করতে গেলেন কি শোচনীয় উপায়ে।

বিভিন্ন রকমের দুর্দৈব। অকল্পনীয় পরিস্থিতি।

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের সুরের প্রাণ এসবের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। তিনি ক্লিষ্ট হতে হতে লাগলেন বিরূপ পরিবেশে।

প্রতিকূলতা দৃঢ়তর এবং ক্রমবর্ধমান হতে লাগল। ঘনিয়ে এল নানা সংকট। আর সেই সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ল তাঁর ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি। একটির পর একটি কিংবা একাধিক একই সঙ্গে, তা বলা যাবে না। তার প্রয়োজনও নেই। সময়টা হয়ত ৩।৪ বছর হতে পারে। সবই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল। সেই যখন থেকে সভ্যতার অনেক মূল্যমান একেবারে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

সেই সময় আসরের শিল্পী জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ লক্ষ্য করলেন শ্রোতাদের মন কিরকম তরল হয়ে পড়ছে। খাটো হয়ে যাচ্ছে গানের [illegible], আসরের মর্যাদা। অযোগ্যের [illegible] ধাগরূপে ব্যভিচার নিষ্ঠা উধাও সম্পূর্ণ কিস্তিমাৎ। অথচ আসরে যেতেও হয়। কারণ এ-ই অবলম্বন এবং জীবনের নিঃশ্বাস বায়ু। কিন্তু সাঙ্গীতিক আদর্শ ও রুচিকে ত বিসর্জন দেয়া যায় না।

তাই নিজের গান হয়ে গেলেই অস্থির হয়ে ওঠেন। শিষ্য সঙ্গীদের বলেন, এখনি ট্যাক্সি ডাক। পালাই। কান ঝালাপালা হয়ে গেছে রে।'

তখন গান নিয়ে বেসাতি পুরোদস্তুর আরম্ভ হয়ে গেছে। বহুজনের কাছ থেকে পয়সা রোজগারের মাধ্যম দেখা দিয়েছে—সবাক সচিত্র। ইতর রুচির চাহিদা শুধু পূরণ হচ্ছে না। দুষ্ট ব্যবসায়ী বুদ্ধিতে অপ-রুচি সৃষ্টি করাও চলেছে। সেজন্যেই সুরের জগতে এসেছে বিকট নৈরাজ্য! জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের শিল্পী-চিত্র বিপর্যস্ত বোধ করতে লাগল। কিন্তু নিরুপায়। অথচ কানে আসে সবই।

বস্তু মতলবের পেশাদারই তখন দেখা দিচ্ছেন। ওই আবোল-তাবোল সুরের কারবারী হয়ে বরাত ফেরাতে চান এমন কেউ কেউ আবার শিখতেও আসেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের কাছে। এখান থেকে কিছু আদায় করে পয়সা রোজগারের ধান্দায় যদি কাজে লাগে।

স্পষ্টবক্তা জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ তাঁদের মুখের ওপর বলে দেন, 'ওই সব দিকেই থাকুন। শাঁস আছে ওখানে। এসব শিখতে বড় খাটুনি। আর আপনাদের গলা দিয়ে এরকম কাজ বেরুবে?' বলে, একটু তানবনীর দেখিয়ে দিলেন। তখন পালিয়ে বাঁচলেন আধুনিক গানের সুরকারেরা।

তাঁরা না হয় গেলেন। কিন্তু সঙ্গীত জগতে আরো ভয়ংকর দুর্দিন ঘনিয়ে এল যে। মহাযুদ্ধের মধ্য পর্যায়ে কলকাতার বুকে অন্ধকার নামল। সন্ধ্যার পর থেকে শহর নিষ্প্রদীপ। বিমান আক্রমণের আশংকা এবং তার প্রতিরোধের মহড়া। সমস্ত পথ থেকে আলো বর্জিত হল। আলোকিত বাড়ি-ঘরের

সব জানলা বন্ধ। লেশমাত্র আলোক যেন বাইরে না আসে। কিন্তু সংগীতের জগত আলোর জগত,, মুক্ত প্রাণের আরাম ক্ষেত্র। এই শ্বাসরোধকর পরিস্থিতিতে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের এবং সকল গুণীরই সংগীতজীবন হয়ে উঠল দুর্বিসহ। আসর ক্রমে স্বল্পতর হতে লাগল। যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও বিলুপ্ত হল বোমার আতঙ্কে। ক্রমবর্ধমান শহরত্যাগীদের ফলে কলকাতা প্রায় জনশূন্য মূর্তি ধারণ করল। সংগীতের আসর সেই অদ্ভুত অবস্থায় যেন হাসির কথা।

হতাশ জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ ছাত্রদের বললেন 'আর ও কলকাতায় থাকা যায় না। দেশেই ফিরে যাব। কিন্তু গানের কি হবে রে? আর আসর এমন ঘুচে গেলে আমি বাঁচব কি নিয়ে?'

সেই থেকেই তাঁর দেশে অর্থাৎ বিষ্ণুপুরে যাওয়া থাকা অনেক বেশি আরম্ভ হল। আগে কখনো বিষ্ণুপুরে থাকতেন না এতদিন করে।

জনহীন আলোহীন সুরহীন কলকাতা। এতদিনের সংগীতজীবনের অন্তরঙ্গী কলকাতার সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের বিচ্ছেদ ঘটতে লাগল। এই বিধ্বস্ত নাগরিক—জীবনে তাঁর সাঙ্গীতিক অস্তিত্বের ক্ষতি হ্রাস অবর্ণনীয়।

আর অন্তর্জীবনে সেই বিপর্যয়। রেকর্ড জগতের সেই তরুণী গায়িকা। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের সংগীতকণ্ঠে মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাছে গান শিখতে আরম্ভ করেন। আর সংগীত শিক্ষা শুরু করে ক্রমে রূপমুগ্ধা হলেন তাঁর সুদর্শন পুরুষকান্তিতে।

সমাজ নামক বস্তুটি তখনো কিছু ছিল। সেই নিরিখে গায়িকার পরিচয় দিতে হয়—তিনি সমাজ-বহির্ভূতা। তবে নিম্নকোটির নন। শালীন, পরিশীলিত। সেই স্বাধীনা অর্থশালিনীর কাছে সব সমাজ বিধি লোকাচার নস্যাৎ হয়ে ছিল। আর এত বড় শিল্পীর গানে মুগ্ধা,, রূপমুগ্ধা। সেই চিরন্তন 'নারীর ললিত লোভন লীলা'—আর অজস্র ছলাকলা।

তবু জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ হয়ত অটল থাকতেন। কিংবা চরিত্রচ্যুতির সম্ভাবনায় বিচ্ছিন্ন করে আনতেন নিজেকে। কিন্তু গায়িকা মধুরকণ্ঠী হয়েই সুরশিল্পীর কাল হল। সুর-পাগল সুমিষ্ট কণ্ঠের পাগল জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ ক্রমে আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন কিন্নরীতে।

তখন তিনি অতিপ্রসিদ্ধ গায়ক। সুতরাং কলকাতার সংগীত ক্ষেত্রে সংবাদটি প্রচারিত হয়ে গেল। অনেক বাঙ্গালী চরিত্র পরিতৃপ্ত হল এই মুখরোচক খবরে। কিন্তু অনেকে দুঃখ পেলেন। কেউ বা মর্মাহত হয়ে মন্তব্য করলেন 'জ্ঞানবাবু এ কি করলেন। এমন গলাটি যাবে!'

কিন্তু না। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ সে মনোরম মোহপাশ ছিন্ন করেছিলেন কিছুদিনের মধ্যেই। তাঁর অন্তরের সংস্কারই তাঁকে রক্ষা করেছিল। কিন্তু তাঁর মনে অতিশয় তীব্র হয়েছিল এই দুর্গতির প্রতিক্রিয়া। গায়িকা সংসর্গকে তিনি পদস্খলন বলেই গণ্য করতেন এবং তাঁর মর্মযন্তনার সীমা ছিল না। বাইরের সমাজে প্রকাশ পায়নি তাঁর অন্তর্দাহের কথা। কিন্তু ঘনিষ্ঠ মহল তা জানতেন।

অন্তরঙ্গ বন্ধুজনের কাছে তিনি সে সময় বলতেন, 'শ্রীনিবাস ঠাকুরের বংশে জন্মে এসব দুর্মতি আমার।'

হয়ত কোন অনুরাগী বন্ধু গৃহে অতিথি হয়েছেন। রাত্রে শয়ন করেছেন এক কক্ষে। মাঝরাতে আচমকা ঘুম ভেঙে বন্ধু দেখেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ শয্যায় নেই। ঘরে আলো জেলেছেন, দাঁড়িয়ে আছেন আয়নার সামনে। একদৃষ্টে নিজেরই প্রতিবিম্ব দেখছেন আর গালে চিবুকে হাত দিয়ে বিড় বিড় করছেন—'এই আমি: এই আমি...'

অনেকে বলতেন যে, তাঁর বায়ুরোগ শেষ জীবনে খুব বৃদ্ধি পায়। তার সূত্রপাত হয় ওইভাবে।

প্রায়ই নিজেকে ধিক্কার দিতেন। আর সেই অনুশোচনা থেকেই গোপাল-আরাধনার ভার তাঁর মনে জাগে নতুন করে।

বংশের অনেকদিনের সংস্কার সজাগ হয়ে ওঠে। এবং আতিশয্য দেখা দেয়। যেখানে সেখানে যার তার সঙ্গে কথায় গোপালের প্রসঙ্গ আনেন। ক্রমে লোকে এটি মস্তিষ্ক পীড়া বলে গণ্য করতে থাকে। বাইরে ত প্রকাশ পায় না কার্যকারণের মানসিক গূঢ় সূত্র।

তবে গোপাল ভক্তির এই আধিক্যটা তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত থেকে যায়। এই প্রেরণায় প্রকাশ পায় তাঁর ভক্তি-ভাবের গান রচনা। যেমন, কাজী নজরুলের রচিত যে গান তিনি নট রাগে রেকর্ড করেছিলেন তারই অনুকরণে—

নাচে নাচে আমার গোপাল,
আঁখি প্রেমে ঢলঢল গলে বনমালা।।

যশোদার ননীচোরা ওই ননী-চোর
যাদুভরা আঁখি দুটি করেছে বিভোর।
আঁখিতে করেছে আলো জগৎ
বিশাল।।

নিজের এই গানটিও নট রাগে নিজে গাইতেন। আর একটি একতালার বিলম্বিত খেয়াল রাগ করেন—'জগতের তুমি মা জননী ভবানী...।'

সর্বক্ষণ জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের গোপাল-ভাব কিংবা বায়ু ব্যাধি থেকে শেষে আরো জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু তা ছাড়াও তাঁর অন্য প্রসঙ্গে আছে জীবনের সেই অকাল-অন্তিম অধ্যায়ে।

কোন সংকট আগে বা পরে তাঁর জীবনে সেসময় আসে, সেকথা জানা যায়নি। হয়ত সবই সমকালীন। কেউ তা সম্ভবত জানে না। শুধু শোনা যায় নানা বৃত্তান্ত। সবই যুদ্ধের সেই নিষ্প্রদীপ সময়ের কথা।

তিনি একবার দেশে যাবার সময় এক ছাত্রকে বললেন, 'গান বাজনা ত শেষ হবার দাখিল। ভাবছি এবার কাঠের ব্যবসা শুরু। যুদ্ধে সাপ্লাই করব।'

তারপর একদিনের কথা। যুদ্ধ তখনো চলেছে।
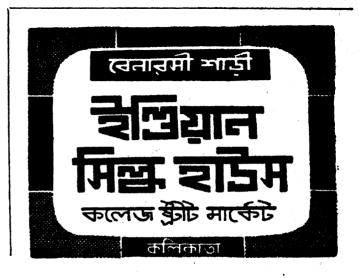
দুপুরবেলা। সংগীতজগতের সঙ্গে পরিচিত দুজন যাচ্ছিলেন ধর্মতলার মোড়ে। ট্রাফিক পুলিশ একদিকের গাড়ি বন্ধ করে দিয়েছে। সেই দুজনের একজন হঠাৎ দেখলেন—পাশে একটি মোটর থেমে রয়েছে। তার ড্রাইভারের পেছনের সীটে বসে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ।

'এ কি, জ্ঞানদা যে। গাড়িতে কোথায় যাচ্ছেন?'

'আরে ভাই আমি যে এখন মিলিটারিতে সাপ্লাই করি।' দরাজ কণ্ঠে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ জানালেন। আর ভদ্রলোককে দেখে যেন তাঁর সংগীতজগতের পূর্বস্মৃতি জেগে উঠল। বললেন, 'সারাজীবন গান গেয়ে যা না রোজগার করেছি, এক মাসে তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা পেয়েছি।'

ট্রাফিক পুলিশ হাত দেখাতেই সাঁ করে বেরিয়ে গেল তাঁর গাড়ি।

মিলিটারিতে কাঠ, বাঁশ এসব সরবরাহ করেছিলেন তিনি। যুদ্ধের প্রায় শেষদিক তখন। তবে গান বন্ধ হয়নি। কলকাতায় অবস্থা ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। কিন্তু সম্পূর্ণ মানসিক সুস্থতা কিংবা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসেনি তাঁর। এরই মধ্যে সেবার রাঁচিতে একটি বড় আসর হল: সেখানে মুজরো পেলেন তিনি। আর এমন গান শুনিয়ে এলেন যে রাঁচীতে সাড়া পড়ে গেল। উদ্যোক্তরা তখনি স্থির করলেন, আবার আসর করলেই তাঁকে আনতে হবে।

অথচ সেই সময়েও কেমন যেন হয়ে থাকতেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ। আসরেও আসেন রেডিওতেও গান ছাত্রদেরও শেখান। কিন্তু কি রকম যেন। একেবারে আগেকার সেই সদা সুরে ভরপুর আত্মতৃপ্ত প্রশান্ত হাস্য-মুখ প্রাণোচ্ছল জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ আর নেই। অন্যমনস্ক উদাসীন হয়ে থাকেন অনেক সময়। কলকাতায় আবার আসা-যাওয়া করছেন। কিন্তু ফিরতে পারেননি পূর্বজীবনের পূর্ণ রূপে। জীবনে যেন বীতস্পৃহ।

এক স্নেহাস্পদের বাড়িতে হয়ত আহারে বসেছেন। হঠাৎ হাত গুটিয়ে নিলেন। পাশে কেউ জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হল, খাবেন না?'

'লুচিগুলো কাঁচা।'

'কাঁচা? না, না এই ত আমি খাচ্ছি। ভালই ভাজা হয়েছে।'

'কাঁচা নেই?' অন্যমনস্ক জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ বললেন, 'তা হবে।'

কখনো আবার কাউকে এমন ধরণে কথা বলেন যেন আর বেশিদিন বাঁচবেন না। নানা প্রকার মানসিক বিপর্যয়ে শরীর একটু খারাপ হয়েছিল বটে। কিন্তু জীবনের আশঙ্কার মতন কিছু নয়। সেকথা কারুর কল্পনায়ও আসেনি। তখনো থাকতেন ওঁর মহারাণী হেমন্তকুমারী স্ট্রীটে। কলকাতার বা অন্যত্র আসরে গানও গাইতেন। রেডিওতেও মাসে মাসই গাইতে যেতেন। এখান থেকেই যাতায়াত করতেন বিষ্ণুপুরে। নিঃসন্তান ছিলেন। কিন্তু স্ত্রী ছিলেন সেখানে। ভাইয়েরাও থাকতেন সপরিবারে একান্নবর্তী।

সেবার রেডিওতে গান গেয়ে দেশে চলে গেলেন। যেমন যেতেন মাঝে মাঝেই।

তার কিছুদিন পরে রাঁচী থেকে সেই সম্মেলনের উদযোগীরা কলকাতায় এলেন। সন্ধান করে তাঁরা এসেছেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের এক ঘনিষ্ঠ শিষ্যের কাছে। গোস্বামী মশায়কে আবার রাঁচীতে নিয়ে যেতে চান।

'সেবার রাঁচীতে যা গেয়ে এসেছেন, সবাই আবার তাঁর গান শোনবার জন্যে পাগল। হাতে আর সময় নেই। আজই তাঁকে নিয়ে যেতে এসেছি আমরা।'

'তা কি করে হবে? তিনি ত কলকাতাতেই নেই। বিষ্ণুপুরে আছেন। তাঁকে সেখানে খবর দিয়ে আনাতে সময় লাগবে কদিন।'

'তাহলে আপনি চলুন। আপনি ত গুরুর স্টাইলেই গান। সবাই চিনতে পারবে। আমাদেরও মুখ রক্ষা হবে। একেবারে খালি হাতে আমরা মুখ দেখাতে পারব না রাঁচীতে। পরের বারে জ্ঞানবাবুকে যে করে হোক নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হবে।'

অগত্যা জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের শিষ্য সে রাত্রে রাঁচী যাত্রা করলেন।

তার তিন দিন পরের কথা। রাঁচীতে অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। তিনি ট্রেনে ফিরে আসছেন কলকাতায়।

ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে মুরি জংশনে।

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের শিষ্য চা খেতে প্ল্যাট-ফর্মে নেমেছেন। হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল সামনে বুক স্টলে কাগজের ওপর। বাংলা সংবাদপত্র এসেছে। আর তার প্রথম পাতায় মুদ্রিত সংবাদ—'পরলোকে বিখ্যাত গায়ক জ্ঞানেন্দ্র-প্রসাদ গোস্বামী।' মৃত্যুর দিনক্ষণ—২১ অকটোবর, ১৯৪৫। বাংলা সন ১৩৫২, ১২ কার্তিক, বৃহস্পতিবার, প্রত্যুষে।

নির্বোধের মতন তিনি চেয়েই রইলেন কালো কালো অক্ষরগুলির দিকে। তারপর ট্রেনের ঘন্টা বাজতে উঠে পড়লেন গাড়িতে।

কলকাতার সংগীত সমাজও এমনি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। রেডিওতে শুনে আর খবরের কাগজে দেখেও বিশ্বাস করতে মন চায়নি কারুর। কিন্তু বিশ্বাস করতেই হল। চিরবিদায় নিয়েছেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ। আর কোনদিন তাঁর সামনে বসে সেই কণ্ঠে গান শোনা যাবে না!...

অভাবিত শোকের প্রথম আঘাত ক্রমে স্তিমিত হয়ে গেল। তখন কলকাতায় তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচিতদের মনে বিষম বিস্ময় জাগল—মাত্র ৪৩ বছর বয়সে অমন সুগঠিত স্বাস্থ্যবান শরীর কালগ্রাসে পড়ল কি করে, এমন অকস্মাৎ। (হৃদরোগের তখন এমন প্রাদুর্ভাব হয়নি এবং তাঁরও সে ব্যাধি ছিল না)। মানসিক অসুখের ফলে শরীরের যে অসুস্থতা তার জন্যে জীবননাশ ত হতে পারে না! মৃত্যুর কারণ কি?

অনুসন্ধানের ফলে নানা ধরণের কথা শোনা যেতে লাগল। মৃত্যুর পূর্বদিন নাকি সুস্থ ছিলেন সন্ধ্যার পরেও। তিনি নিজেই নাকি এই মর্মান্তিক পরিণতির জন্যে দায়ী। কিন্তু কিছুকাল ধরেই তিনি নানা অশান্তি ও চাপের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন।

কোথায়ও শোনা যায় বিভিন্ন বৃত্তান্ত।

কেউ বলেন, সেই কাঠের ব্যবসায়ে বেশ ভাল রকম সঞ্চয় তিনি করেছিলেন। কিন্তু তা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত না রেখে এক নিকট আত্মীয়ের কাছে রাখেন। সেই ব্যক্তি আর তা ফেরত দেননি তাঁকে। তারই ফলে মানসিক বৈকল্যের শেষে...

আবার কেউ বলেন—না। সে ব্যক্তি ওই টাকা আত্মসাৎ করেননি। পাছে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ 'গোপাল, গোপাল' ভাবের আতিশয্যে সে সম্পদ ঘুচিয়ে দেন সেজন্যে সেই অর্থ গায়কেরই আরো নিকটের মানুষকে দিয়েছিলেন।

আবার শোনা যায়—না। তাঁর সে টাকা কেউই নেননি। তবে বার বার তাঁকে অনুযোগ করা হত সঞ্চিত অর্থ দিয়ে দেবার জন্যে। অভিমানী ভাবপ্রবণ জ্ঞানেন্দ্র-প্রসাদ তাই সমস্তই হস্তান্তর করে দেন—নাও নাও। আমার চেয়েও টাকাই বড় হল ত! বেশ, আমায় আর জীবনের প্রয়োজন কি!...

কে জানে কোন বৃত্তান্ত সঠিক। কারণ সবই শোনা কথা। তার থেকে সত্য উদ্ধারের পথ কোথায়?

তবে সকল বিবরণের একটি বিষয়ে কি দ্বিমত নেই? অতি অল্প দিনে উপার্জিত—সারা সংগীতজীবনের আয়ের চেয়েও অধিক সেই অর্থই তাঁর চরম অনর্থের মূল হয়েছিল!

অদৃষ্টের কি পরিহাস। জীবনে আগে যিনি টাকায় আসক্ত ছিলেন না এই উপার্জনও করেছিলেন ঘটনাচক্রে লোভের বশে নয়—তাই হল তাঁর কাল?

কে জানে। মৃত্যু ত চির রহস্যময়। অমৃতকণ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের মৃত্যুও হয়ত রহস্যাবৃতই রইল।

এত বড় গায়ন শিল্পী এমন অকালে প্রয়াণ করলেন এই সত্য! তার কারণ সন্ধানে আর কি ফল!

স্মরণ মননের শুধু কিছু চিহ্ন রয়ে গেল। সেই বীর্য মাধুর্যে মেশানো সুরে কয়েকটি রাগের তিন মিনিটের রেশ—বেহাগ মালকোশ গৌড়সারংগ জয়জয়ন্তী পরজ ভৈরবী সিন্ধু কাফি বাগেশ্রী মাল-গুঞ্জ ইমন নট কৌশিকী কানাড়া জৌনপুরী ছায়ানট...দরবারি কানাড়া...

মুগ্ধ শ্রোতার কানে কোন সুদূরের সুর
ভেসে আসে—

আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশি বাজায়...

—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

সাম্প্রতিক সিকিম

হিমালয়ের ক্রোড়ে লালিত ভারতের আশ্রিত রাজ্য ক্ষুদ্র সিকিমে ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে চোগিয়াল নতুন অশান্তি ও উত্তেজনার সৃষ্টি করছেন।

সিকিমের প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচনের দ্বারা নির্বাচিত আইনসভা যখন সেই দেশকে তার সামন্ততান্ত্রিক শাসনের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে লোকায়ত্ত গণতান্ত্রিক শাসনের পথে নিয়ে যেতে উদ্যোগী হয়েছে ঠিক সেই সময়ে চোগিয়াল ও তার সমর্থকরা এই সার্থক বিবর্তনের পথরোধ করে দাঁড়িয়েছেন। ফলে গত বছর এপ্রিল মাসে যে গণবিক্ষোভের সম্মুখীন হয়ে সিকিমের রাজাকে নতিস্বীকার করতে হয়েছিল তার অনুরূপ অথবা তার চেয়ে তীব্রতর গণবিক্ষোভে সেই পার্বত্য রাজ্য উদ্বেল হয়ে উঠেছে। সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ যে, চোগিয়াল যখন ভারত সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য রাজ্য ছেড়ে দিল্লিতে পাড়ি দিয়েছেন তখন রাজার স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাবার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার হাজার মানুষ এসে গ্যাংটকে জড় হচ্ছেন। রাজায়-প্রজায় এই বিরোধ ভারত সরকারের পক্ষে তফাতে দাঁড়িয়ে দেখা সম্ভব নয়। কারণ, প্রথমত, ১৯৫০ সালের চুক্তি অনুযায়ী সিকিমকে ভারত আশ্রিত রাজ্যরূপে গ্রহণ করেছে এবং সিকিমের শাসনব্যবস্থা ও সে রাজ্যের জনগণের মঙ্গলামঙ্গল সম্পর্কে ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব রয়েছে। দ্বিতীয়ত, সিকিমের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছেন যে, সিকিম ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপন করতে উৎসুক।

তুলনা করলে বলা যায়, সিকিম যেন দর্পণে কাশ্মীরের প্রতিবিম্ব। কাশ্মীরের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আদিতে নির্দিষ্ট হয়েছিল সেখানকার মহারাজার অভিপ্রায় অনুযায়ী। সিকিমের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নির্দিষ্ট হয়েছে সেখানকার জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী। এই জনগণের অধিকাংশ নেপালী সম্প্রদায়ভুক্ত। আর সিকিমে সংখ্যা-লঘু বলতে যাঁদের বোঝা যায় সেই লেপচা-ভুটিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়েন চোগিয়াল পরিবারও। কাশ্মীরের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ক্রমে ঘনিষ্ঠতর হয়েছে পার্লামেন্টের অভিপ্রায় অনুযায়ী। আর সিকিমের সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য যোগাযোগ দৃঢ়তর করার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন সেখানকার নির্বাচিত আইনসভা।

আসলে, গত এপ্রিল মাসে চোগিয়ালের যে শিক্ষা হয়েছিল সেটা যদি তিনি ও তাঁর সমর্থকরা এর মধ্যে ভুলে না যেতেন তাহলে এই বিভ্রাট হত না। চোগিয়াল নেপালী ও লেপচা-ভুটিয়াদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ জাঁইয়ে রেখে জনগণের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ঠেকাবার যে চেষ্টা করে আসছিলেন তার বিরুদ্ধে সেসময়ে সিকিমের জনসাধারণ প্রবল প্রতিবাদ করেছিলেন। চোগিয়াল আইনসভায় উভয় সম্প্রদায়ের সমসংখ্যক প্রতিনিধি রেখে নিজের অধিকার সুনিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। অপরপক্ষে, সিকিম কংগ্রেসের নেতৃত্বে সিকিমী জনগণ চেয়েছিলেন, সকলের ভোট তুল্যমূল্য, এই ভিত্তিতে নির্বাচন হোক। বিব্রত চোগিয়াল সেসময়ে সিকিমের আইন ও শৃঙ্খলার ভার ভারত সরকারের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।। ভারত সরকারের মধ্যস্থতায় তিনি সিকিম কংগ্রেসের সঙ্গে একটা সমঝোতায় এসেছিলেন। মাথাপিছু এক ভোটের ভিত্তিতে তিনি সিকিমে নির্বাচন করতে রাজি হলেন। সেই নির্বাচন গত এপ্রিল মাসে হয়ে যাওয়ার পর দেখা গেল, আইনসভার ৩২টি আসনের মধ্যে ৩১টিই পেয়েছেন সিকিম কংগ্রেসের প্রার্থীরা। প্রমাণ হল, সিকিম কংগ্রেসের পিছনে শুধু সংখ্যাগুরু নেপালী সম্প্রদায়েরই সমর্থন নেই, সংখ্যালঘু লেপচা-ভুটিয়া সম্প্রদায়েরও ব্যাপক সমর্থন রয়েছে। এই সিকিম কংগ্রেসের নেতা কাজী লেনডুপ দোরজি নিজেই ভুটিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ। ৭২ বছর বয়স্ক এই নেতা পরাধীন ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির প্রজা আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং ঐ আন্দোলনের কারারুদ্ধও হয়েছিলেন।

এই নির্বাচিত আইনসভায় গৃহীত একটি প্রস্তাব অনুসারে চোগিয়াল ভারত সরকারকে তাঁর দেশের জন্য একটি সংবিধান প্রস্তুত করে দিতে অনুরোধ করেছিলেন। সেই অনুরোধ অনুযায়ীই ভারত সরকারের আইন বিভাগের একজন প্রাক্তন সেক্রেটারি সিকিমের জন্য একটি সংবিধান তৈরি করেছিলেন। এই সংবিধানের দ্বারা সিকিমের জন্য একটি ত্রিপক্ষীয় শাসনব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছিল। এই তিন পক্ষ হচ্ছেন—

চোগিয়াল, ভারত সরকার ও নির্বাচিত আইন সভা। ঐ সংবিধানের মূল ধারাগুলি হল :—

সিকিমে চোগিয়ালের স্থান হবে সকলের উপরে এবং এতদিন যাবৎ তিনি যে সম্মান, মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে আসছিলেন সেসবই অব্যাহত থাকবে।

২৫ বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সের প্রতিটি অধিবাসীর এক ভোটের ভিত্তিতে সিকিমের আইনসভার সদস্যরা নির্বাচিত হবে। এই নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য ভারত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তিকে চোগিয়াল নির্বাচন কমিশনার হিসাবে নিযুক্ত করবেন।

আইনসভায় গৃহীত কোন বিল অনুমোদন না করে চোগিয়াল আইনসভার পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরৎ পাঠাতে পারেন। তবে দ্বিতীয়বার বিধানসভায় গৃহীত হয়ে গেলে সেই বিল চোগিয়ালকে অনুমোদন করতেই হবে। ইচ্ছা করলে চোগিয়াল কোন বিল ভারত সরকারের বিবেচনার জন্য পাঠাতে পারেন। এব্যাপারে ভারত সরকারের অভিমতই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ভারত সরকার কর্তৃক মনোনীত ও চোগিয়ালের দ্বারা নিযুক্ত একজন প্রধান প্রশাসক সিকিম প্রশাসনের প্রধান হবেন। এই প্রধান প্রশাসক আইনসভার স্পীকারের দায়িত্ব পালন করবেন। এই প্রধান প্রশাসকের পরামর্শ অনুযায়ী চোগিয়াল একজন মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করবেন। মন্ত্রিসভার নাম হবে কার্যনির্বাহক পরিষদ। কার্যনির্বাহক পরিষদকে আইন-সভায় জবাবদিহি করতে হবে।

এই সংবিধানের খসড়া যে চোগিয়ালের মনঃপূত হয় নি সে কথা জানাবার জন্য তিনি সম্প্রতি দিল্লীতে গিয়েছিলেন। কিন্তু দিল্লি তাঁকে খোলাখুলিভাবে জানিয়ে দেয় যে, এই সংবিধানের কোন বড় রকমের পরিবর্তন করা যাবে না। দিল্লি থেকে ফিরে যাওয়ার আগে তিনি নাকি ভারত সরকারকে এই ধারণাই দিয়ে যান যে, আইনসভায় এই সংবিধান অনুমোদনের পথে বাধা দেবেন না।

এই সংবিধান অনুমোদন করার জন্যই ২০ জুন সিকিম আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করা হয়েছিল। চোগিয়াল এই অধিবেশনে বক্তৃতা করবেন বলেও কথা ছিল। ১৮ জুন তারিখে সিকিম কংগ্রেস দল সংবিধান অনুমোদন করে প্রস্তাব গ্রহণ করল। অধিবেশনের জন্য নির্দিষ্ট দিনে দেখা গেল, রাজপ্রাসাদের রক্ষীরা সহ চোগিয়ালের সমর্থকরা আইনসভা ভবন ঘিরে ফেলেছেন এবং সদস্যদের ভিতরে যেতে দিচ্ছেন না। যারা এভাবে আইন-সভার অধিবেশন বানচাল করে দেওয়ার চেষ্টা করেন তাঁদের মধ্যে পিয়ন থেকে আরম্ভ করে চীফ সেক্রেটারী পর্যন্ত সকল স্তরের রাজকর্মচারী ও তাঁদের পরি-বারবর্গ ছিলেন বলে প্রকাশ। এদিকে আইনসভার সদস্যরা ও তাঁদের সমর্থকরাও জড় হতে থাকেন। একটা বিশ্রী রকমের গোলযোগের আশংকা দেখা দেওয়ায় কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। শেষ পর্যন্ত বেশি রাত্রিতে মিলিত হয়ে আইনসভার সদস্যরা নতুন সংবিধান অনু-মোদন করেন এবং ভারতের সঙ্গে সিকিমের ঘনিষ্ঠতর যোগ স্থাপনের জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করেন। আইনসভার এই প্রস্তাবে ভারতের পরিকল্পনা কমিশন, জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ, ব্যাংক, জীবন-বীমা কর্পোরেশন প্রভৃতি আর্থিক সংস্থা ইত্যাদির কাজের পরিধিব মধ্যে সিকিমকেও যুক্ত করতে বলা হয়েছে, ভারতে সিকিমীদের জন্য কর্মসংস্থানের দাবি জানান হয়েছে এবং লোকসভায় সিকিমী জনগণের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা রাখার কথাও বলা হয়েছে।

চোগিয়ালের এই আকস্মিক মতি-পরিবর্তনের সংবাদে সিকিমে যখন রাজ-তন্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে সে সময়ে পুরোহিতদের সঙ্গে পরামর্শ করে শুভ দিন বেছে চোগিয়াল রাজধানী গ্যাংটক ছেড়ে দিল্লিতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। উদ্দেশ্য, প্রজাদের সঙ্গে এই বিরোধে ভারত সরকার তাঁকে কতটা সাহায্য করতে পারবেন, তার একটা আন্দাজ নেওয়া।

ইতিমধ্যে ব্যাপারটা গিয়ে কোন কোন মহল ভারত সরকারকে নিন্দামন্দ করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। বৃটেনের 'অব-জারভার' পত্রিকায় লেখা হয়েছে, ভারত সিকিমকে গ্রাস করতে চাইছে এবং সেখান-কার সঠিক সংবাদ প্রকাশিত হতে দিচ্ছে না। ভারত সরকার এই ভিত্তিহীন অভিযোগের প্রতিবাদ করেছেন এবং মুষ্টিমেয় একদল নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিদের কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে বলেই যে এই বিরোধ পাকিয়ে উঠছে সে কথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে।

*

গত ১৮ মে পোখরানে ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে তামাম দুনিয়ায় নালিশ জানিয়ে ভারতকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার ও নিজেকে একান্ত বিপন্ন নিরীহ মেষ শাবকরূপে প্রতিপন্ন করার যে চেষ্টা করেছিল তাতে বিশেষ [illegible] কাজ হয় নি। পাকিস্তানের স্যাঙাত [illegible] এ ব্যাপারে তার সঙ্গে গলা মেলাতে রাজি হয় নি, উপরন্তু ১৭ জুন তারিখে [illegible] মরুভূমি অঞ্চল থেকে ভারতের একশ গুণ শক্তিশালী তাপ-পারমাণবিক (হাইড্রোজেন) বোমা বায়ুমন্ডলে বিস্ফোরিত করে পাকিস্তানের নালিশের ধার কমিয়ে দিয়েছে। যে ইরানের সঙ্গে পাকি-স্তান একদা সামরিক মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করেছিল সে দেশের শাহ্ চাঁছাছোলা ভাষায় বলে দিয়েছেন, ভারত যদি পাকিস্তানকে শায়েস্তা করতে চায় তাহলে তার সে জন্য পারমাণবিক বোমার প্রয়োজন হবে কেন? ভুট্টোর প্রতিনিধিরা দেশে দেশে গিয়ে ভারতীয় পারমাণবিক বোমার বিপদ থেকে মাথা বাঁচাবার জন্য যে সামরিক ছত্রছায়ার আশ্রয় চেয়েছিলেন, সেই আশ্রয়ও তাকে দিতে কেউ এখন পর্যন্ত রাজি হয় নি। সেন্টোতে পাকিস্তানের তরফ থেকে এই প্রসঙ্গ তুলবার চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেছে। পারমাণবিক বিস্ফোরণের অজুহাতে বিদেশী সাহায্যদাতারা ভারতের জন্য বৈদেশিক সাহায্য ছাঁটাই করে দেবে, পাকিস্তানের এই আশাও সার্থক হয় নি। সংযুক্ত আরব

আমিরতন্ত্রের উপ-রাষ্ট্রপতি সম্প্রতি ভারত সফরে এসে ভারতের সঙ্গে বৈষয়িক সহ-যোগিতার চুক্তি করে গেছেন, ইসলামাবাদের পক্ষে এটাও একটা কূটনৈতিক পরাজয়।

সম্প্রতি কুয়ালালামপুরে ইসলামি রাষ্ট্র-গুলির পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে পাকি-স্তানের এই পরাজয়ের গ্লানি গভীরতর হল। এই সম্মেলনে পাকিস্তানী প্রতিনিধি দলের নেতা সে দেশের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আজিজ আহমেদ ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণকে তার প্রতিবেশী ইসলামি রাষ্ট্রগুলির পক্ষে বিপদ হিসাবে গণ্য করার জন্য সম্মেলনে যে আবেদন জানিয়েছিলেন সেই আবেদনে সম্মেলনের অধিকাংশ প্রতিনিধি কর্ণপাত করেন নি। রুদ্ধ দ্বার কক্ষে পাকিস্তানী প্রতিনিধি যে আজগুবি অভিযোগ এনে ভারতের বিরুদ্ধে আরব রাষ্ট্রগুলিকে ও দুনিয়ার কৃষ্ণাঙ্গদের খেপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন সে কথাও গোপন রাখা যায় নি।

এই সম্মেলনে পাকিস্তানের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে যারা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম হলেন বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের নেতা ডঃ কামাল হোসেন। তিনি সম্মেলনকে বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেন যে, ভারতের এই পারমাণবিক বিস্ফোরণের উদ্দেশ্য যে শান্তিপূর্ণ সে কথা ভারত বার বার ও স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, উপমহাদেশে যখন শান্তি ও আপোস-মীমাংসার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তখন পাকিস্তানের পক্ষ থেকে এই ধরনের কথা বলা অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

আফগানিস্তান, মালয়েশিয়া, লেবানন প্রভৃতি দেশও পাকিস্তানের ভারত-বিরোধী প্রস্তাবে যোগ দিতে রাজি হয় নি। এ-ব্যাপারে যারা পাকিস্তানের সঙ্গে সায় দিয়েছিল তাঁদের মধ্যে ছিল সৌদি আরব, লিবিয়া, জর্ডান, তানজানিয়া প্রভৃতি।

অধিকাংশ প্রতিনিধির কাছ থেকে উৎসাহ না পেয়ে পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত ভারতীয় পারমাণবিক বিস্ফোরণে ইজরায়েলের সহযোগিতার একটি গাঁজাখুরি কাহিনী প্রচার করে বাজার মাৎ করার চেষ্টা করে। এই পারমাণবিক বিস্ফোরণে ভারত ইজরায়েলের সহযোগিতা লাভ করেছে। একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আজিজ আহমেদ আরও যোগ করেন যে, এর পর ইজরায়েল এবং দক্ষিণ আফ্রিকাও পারমাণবিক বোমা বানাতে উৎসাহিত হবে। স্পষ্টতই পাকি-স্তানী প্রতিনিধির উদ্দেশ্য ছিল, আরব দেশগুলির সঙ্গে ও কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকার দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের ভিতর ফাটল ধরান। কিন্তু এই কৌশলেও কাজ হয় নি। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানকে সাধারণ-ভাবে পারমাণবিক অস্ত্রধারী দেশগুলির বিপদের ছায়া সম্পর্কে একটি প্রস্তাবেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

১৯৭০ সালের এপ্রিল মাস থেকে ইসলামি রাষ্ট্রগুলির পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন হয়ে আসছে। এবার নিয়ে পাঁচ-বার ঐ পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা সম্মেলনে মিলিত হলেন। কুয়ালালামপুরের এই অধিবেশনে এবার ৩৭টি দেশের প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিলেন। এই সম্মেলনকে শুধু ইসলামি রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বিশ্বের সকল দেশের মুসলিম অধিবাসীদের রাজনৈতিক সমস্যা আলোচনার মঞ্চে পরিণত করার জন্য এবার যে চেষ্টা হয়েছিল তাতে অন্যান্যদের সঙ্গে পাকিস্তানও যোগ দিয়েছিল। সম্মেলনের সেক্রেটারি-জেনারেল তোহামি, লিবিয়ার প্রতিনিধি প্রভৃতি কয়েকজন এ ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তাঁরা এই সম্মেলনে অমুসলমান দেশগুলির মুসলিম সংখ্যা-লঘুদের প্রতিনিধি পাঠাবার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে উৎসুক ছিলেন। তাঁদের আরও প্রস্তাব ছিল, ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের মুসলিম অধিবাসীদের সাহায্য করার জন্য সম্মেলনের যে বিশেষ তহবিল রয়েছে তার অর্থ সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারগুলির মারফৎ না পাঠিয়ে সরাসরিই ঐসব মুসলমান অধিবাসীদের পাঠান হোক। কিন্তু মালয়েশিয়া ইন্দো-নেশিয়া প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তাঁরা বলেন যে, এটা করার অর্থ হবে অন্য দেশের সার্বভৌম অধিকারে হস্তক্ষেপ করা। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী তুন আবদুর রজাক বিশেষ করে এই বলে হুঁশিয়ার করে দেন যে, অমুসলমান রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে মুসলিম রাষ্ট্রগুলির সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হয় এমন কিছু করা উচিত হবে না।

পাকিস্তান ও বাংলাদেশ

গত ফেব্রুয়ারী মাসে লাহোরে পাকি-স্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে সরকারি স্তরে প্রথম যে যোগাযোগ হয়েছিল সেটা হয়েছিল ইসলামি রাষ্ট্রগুলির শীর্ষ সম্মেলনের পরিপ্রেক্ষিতে। তার চার মাস পরে ঢাকায় প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ভুট্টোর যে দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার ঘটছে সেটা ঘটছে কুয়ালালামপুরে ইসলামি রাষ্ট্রগুলির সম্মেলনের অব্যবহিত পরে। ঘটনার এই যোগাযোগ সম্ভবত সম্পূর্ণ পরিকল্পনাহীন নয়। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষতির ধারণায় উদ্বেগে পাকি-স্তান যে তার সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক ইসলামি সংহতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইবে, এটা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়।

কিন্তু পাকিস্তান যে চেষ্টাই করুক না কেন এবং বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনে উৎসুক হলেও সদ্য অতীতের স্মৃতি যে এত তাড়াতাড়ি ভোলা যায় না সেকথা এবার ভুট্টোর বাংলাদেশ সফরের প্রাক্কালে মনে করিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশের সরকারী রেডিও ও টেলিভিসন এবং সেখানকার সরকারি দল কর্তৃক পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি। বাংলা-দেশে ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীর বর্বর অত্যাচার যখন শুরু হল সেই ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের অন্ধকার রাতে ভুট্টো যেভাবে ঢাকা ছেড়ে পাড়ি দিয়েছিলেন, করাচী বিমান বন্দরে নেমে কিভাবে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'যাক, পাকিস্তান বেঁচে গেল।' সে সব কথাও মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভুট্টোর সফরের প্রাক্কালে বাংলাদেশের প্রচার মাধ্যমগুলি থেকে এভাবে পুরান কথা মনে করিয়ে দেওয়ায় পাকিস্তানের পক্ষ থেকে কিছুটা উষ্মা প্রকাশ করা হয়েছিল। এমনও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল যে পাকিস্তান এই সফরের প্রস্তাব বাতিল করে দিতে পারে। যাই হোক শেষ পর্যন্ত ভুট্টো ঢাকায় এসেছেন এবং এসে আনুষ্ঠানিক সম্বর্ধনা লাভও করেছেন।

*

ভুট্টোর বাংলাদেশ সফরের সময় পাকি-স্তান হয়ত নতুন করে আবার বাংলাদেশকে ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণের বিপদ সম্পর্কে বোঝাবার চেষ্টা করতে পারেন। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যাতে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে পাকিস্তান বাংলাদেশের সঙ্গে পারমাণবিক গবেষণার ক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রস্তাব দিতে পারে। কয়েকজন কৃতী বাঙালী পরমাণু বিজ্ঞানী পাকিস্তান ছেড়ে চলে আসায় পাকি-স্তানের পারমাণবিক গবেষণার ক্ষতি হচ্ছে। এইসব বিজ্ঞানীর মধ্যে আছেন ইসলামা-বাদের পরমাণু বিজ্ঞান সংস্থার প্রাক্তন প্রধান ডঃ আনওয়ার হোসেন এবং করাচীর

পারমাণবিক চুল্লির প্রাক্তন প্রধান মহম্মদ ইয়ুসুফ। পাকিস্তান বাংলাদেশের সংগে কোন রকম সহযোগিতার চুক্তি করে এইসব বিজ্ঞানীকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারে।

পারমাণবিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সহযোগিতার জন্য গত এপ্রিল মাসে একটি চুক্তি হয়েছে। এই চুক্তি অনুযায়ী ভারত বাংলাদেশের রূপপুরে একটি এক মেগাওয়াটের পারমাণবিক গবেষণা চুল্লি নির্মাণে সাহায্য করবে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পারমাণবিক শক্তির বিস্তার সম্পর্কে সাম্প্রতিক অন্যান্য কয়েকটি খবর হল:—

(১) বৃটেনে প্রধানমন্ত্রী উইলসন ঘোষণা করেছেন যে, কয়েক সপ্তাহ আগে আমেরিকার নেভাডা মরুভূমির মাটির তলায় বৃটেন একটি পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ করেছে। এই সংবাদে বৃটিশ শ্রমিক দলের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দিয়েছে।

(২) ইরাণের শাহ ফ্রান্সে সফর করতে গেছেন। সেখানে তিনি একটি পারমাণবিক গবেষণাকেন্দ্র ও একটি পারমাণবিক উৎপাদনকেন্দ্র দেখতে যাবেন। ইরাণ পাঁচটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন সম্পর্কেও তিনি ফরাসী কর্তৃপক্ষের সংগে কথা বলবেন।

এই সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে ইরাণের শাহ সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, ইরাণ পারমাণবিক অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করবে না। তবে তাঁর আশংকা আছে, ভারতের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ছোটখাট অনেক দেশই পারমাণবিক পরাক্রম সংগ্রহের চেষ্টা করতে পারে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র মিশর ও ইজরায়েলকে পারমাণবিক প্রযুক্তিবিদ্যার ভাগ দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তারও পরিণাম অন্য দিকে যেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে ইরাণ পারমাণবিক অস্ত্র সংগ্রহ সম্পর্কে তার নীতি পুনর্বিবেচনা করতে পারে।

(৩) কূটনৈতিক সূত্রের সংবাদে প্রকাশ যে, মস্কোতে রুশ-মার্কিণ শীর্ষ আলোচনার সময় ভূগর্ভে পারমাণবিক বিস্ফোরণ সংক্রান্ত পরীক্ষার উপর আংশিক নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগের বিষয়ে একটা সমঝোতার চেষ্টা হতে পারে।

রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল ডঃ কুর্ট ভাল্ডহাইম বলেছেন "সম্প্রতি অনেক দেশ যেসব পারমাণবিক পরীক্ষা করেছে সেগুলি 'গুরুতর ব্যাপার'। তিনি বলেছেন, এই সব বিস্ফোরণের পর মনুষ্যজাতির টিকে থাকার স্বার্থে এই সব পরীক্ষার উপর আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য আমাদের নতুন করে চেষ্টা করতে হবে।"

ভারত ঃ খাদ্য

এবারকার খরিফ খন্দে খাদ্য উৎপাদন বাড়াবার জরুরি পরিকল্পনার তত্ত্বাবধান করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। ঐ কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন খাদ্যমন্ত্রী ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ, দুজন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী জগজীবন রাম ও সি সুব্রহ্মণ্যম এবং যোগাযোগমন্ত্রী ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি। মাসখানেক আগে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী এই জরুরি কমিটি গঠিত হয়েছে।

দেশের অর্থনৈতিক সঙ্কট নিরসনের জন্য খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যসূচীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে এবং রাজ্যগুলিতে মুখ্যমন্ত্রীদের সভাপতিত্বে এই ধরণের জরুরি খাদ্যোৎপাদন কমিটি গঠনের সুপারিশ করেছিলেন।

খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির পথে এখন প্রধান কয়েকটি অসুবিধা হল সার বিদ্যুৎ ও ডিজেলের অভাব। এই অবস্থায় যেটুকু রাসায়নিক সার পাওয়া যাবে তার যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার যাতে হয় রাসায়নিক সারের অভাব যাতে জৈব সারের দ্বারা যথাসাধ্য পূরণ করা যায়, সেচের নলকূপের জন্য ডিজেলের সরবরাহের উপর যাতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এসব দিকে লক্ষ্য রাখাই উচ্চ পর্যায়ের এই সব কমিটির কাজ হবে।

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বেঁটে ও আধবেঁটে জাতের প্রচুর ফলনশীল বীজের ব্যাপক চাষের উপর জোর দিচ্ছেন ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের ডিরেকটর জেনারেল ডঃ এম এস স্বামীনাথন। তিনি সম্প্রতি একাধিকবার বলেছেন প্রচুর ফলনশীল জাতের আধুনিক বীজের চাষের জন্য সারের ব্যবহার অপরিহার্য অথবা এই সব বীজের রোগ পোকার দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার স্বাভাবিক প্রবণতা আছে এগুলি ভুল ধারণা। বিশেষ করে সম্প্রতি কেরলের 'গোলাঘর' বলে পরিচিত কুট্টনাদ এলাকায় এক [illegible] শ্যামাপোকার আক্রমণে আই-আর-৩৬ জাতের ধানের বিরাট ক্ষতি হয়ে যাওয়ায় এইসব নতুন বীজ সম্পর্কে চাষীদের মনে একটা আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আগামী খরিফ ফসলে ধানের উৎপাদন বাড়াতে হলে চাষীদের এই আশঙ্কা দূর করতে হবে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সুপারিশে গঠিত একটি কমিটিতে সেদিকে নজর দিতে হবে।

অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে যথাসম্ভব অধিক ফল লাভের জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আর একটি সুপারিশ করেছেন। সেটা হল এই যে, দেশের যেসব স্থানে নদী-উপত্যকা পরিকল্পনাগুলির কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আনুষঙ্গিক পরিকল্পনার অভাবে পুরোপুরি সুফল পাওয়া যাচ্ছে না সেসব ক্ষেত্রে আঞ্চলিক উন্নয়নের উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা কমিশন দেশের বিভিন্ন স্থানে মোট যে ৫৩টি 'কম্যান্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্রোজেকট' চিহ্নিত করেছেন সেগুলির চাহিদার দিকেও নজর রাখা এইসব উচ্চ পর্যায়ের কমিটির কাজ হবে।

২৭।৬।৭৪ —পুণ্ডরীক

অলৌকিক জলযান

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

উপন্যাস

(৪৭)

ছোটবাবু ফিস ফিস গলায় ডাকল, বনি।

বনি বলল, বাবা আমাকে জাহাজ থেকে আর নামতে দেবে না ছোটবাবু।

ছোটবাবু বলল, কেন নামতে দেবে না! ডেভিড যাচ্ছে।

—বাবা কিছুতেই রাজী হচ্ছে না।

ছোটবাবু সন্ধের পোশাক পরে ওপরে উঠে এসেছে। সারাদিন ভীষণ খাটুনি গেছে। সে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে স্নান করেছে ভাল করে। এ কদিন মন ভাল ছিল না। মৈত্রদার মৃত্যুর পর সে কেমন নিঃসঙ্গ বোধ করছিল। বিকেলে তার কোনোদিন জাহাজ থেকে নামতে ইচ্ছে হয়নি। সকাল থেকে আজ ডেভিড বারবার ওর কাছে এসেছে। তাকে নিয়ে কিনারায় নেমে যাবে। শহরে ঘুরবে। কোনো পাবে বসে সামান্য ড্রিংকস। এভাবে একটু উৎফুল্ল হওয়া। তখনই মনে হয়েছে গেলে মন্দ হয় না। সে বনি আর ডেভিড। বনির সঙ্গে কতদিন যেন একা একা শহরের রাস্তায় অথবা সমুদ্রের ধারে সে হেঁটে যায়নি। সে বলেছিল বনিকে আমরা বিকেলে কিনারায় যাব।

বনি বলেছিল আমিও যাব।

কিন্তু এখন বনি কেমন নিঃস্পৃহ তার কোনো ইচ্ছে নেই যাবার। সে চুপচাপ জাহাজের ডেক-চেয়ারে বসে আছে। কিছু বই একটা টিপয়ের ওপর। খুশিমতো যে কোন বই তুলে দুটো একটা পাতা ওল্টে দেখছে আবার রেখে দিচ্ছে। আসলে তার কিছু ভাল লাগছে না। বাবা দিন দিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছেন। সে বলল জানো ছোটবাবু বাবা রাতে একেবারে ঘুমোয় না।

ছোটবাবু পা জড়িয়ে পাশে বসে পড়ল। বলল, কেন কি হয়েছে?

—বাবা মাঝে মাঝে আমার দরজায় নেমে আসেন।

—কেন নেমে আসেন? কি করে টের পাও তিনিই নেমে আসছেন!

—আমি বুঝতে পারি ছোটবাবু। বাবা সিঁড়ি ধরে নেমে এলেই বুঝতে পারি। মাঝে মাঝে বাবা নেমে এসেও নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না। ডাকেন। আমি জেগে থাকলে সাড়া দেই। বাবা কেন যে এমন হয়ে যাচ্ছেন।

ছোটবাবু বলল, বুড়োর শেষ সফর। আর সমুদ্রে আসতে পারবেন না। সমুদ্রের জন্য বুড়োর শোক উথলে উঠছে।

—তা এভাবে আমার কেবিনের দরজায় সেজন্য দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন!

—ভাল লাগে না ঘুম আসে না। নিজের বলতে পৃথিবীতে এখন শুধু তুমি। সারাক্ষণ তোমাকে কাছে কাছে রাখতে চায়।

—আরে না। তা ঠিক না। পরশু রাতে কি হল তুমি তো জান না!

—কী হয়েছে!

—আমার ঘুম আসছিল না। কেন যে ছোটবাবু ঘুম আসে না! যখন আর পারছিলাম না, ভাবলাম গোপনে তোমার কেবিনে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকব! জাহাজে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কে টের পাবে বল! দরজা খুলে দেখি বাবা ওপরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন। একা। ব্রীজের সব আলো নিভিয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন। কার সঙ্গে কথা বলছেন যেন। বাবাকে আমি এভাবে কখনও দেখিনি! সন্তর্পণে দরজা খুলেছিলাম। সামান্য গলা বাড়াতেই দেখেছি বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। মনে হল বাবা টের পান নি, দরজা বন্ধ করে দেব ভেবে আবার যেই সরে গেছি তখনই বাবা ডাকলেন, ভাল করে দরজা লক করে দাও। এত রাতে আবার উঠেছ কেন?

ছোটবাবু বলল, ঠিক একটা কেলেংকারী করবে বনি। তুমি কেন এত রাতে দরজা খুলতে গেলে। মাথায় তোমার কি চাপে!

বনি ভীষণ দমে গেল। ছোটবাবু পর্যন্ত তিরস্কার করছে। কেউ তাকে বুঝতে পারে না। সে আর একটা কথাও বলল না। বইয়ের পাতা উল্টাতে থাকল।

ছোটবাবু তখন আরও ক্ষেপে যায়। না, না, বনি এটা তুমি ঠিক করনি। তুমি বুঝতে পারছ না কেন তোমার এভাবে বের হওয়া ঠিক না।

আমি কি করব ছোটবাবু। পারি না, দুবার তোমার দরজায় পর্যন্ত অন্ধকারে নেমে গেছিলাম। তুমি বকবে বলে দরজায় গিয়েও ডাকতে পারি নি। আবার ফিরে এসেছি। তুমি ভারি নিষ্ঠুর ছোটবাবু।

ছোটবাবুর মাথায় এখন কিছু শব্দ বার বার ঘুরপাক খাচ্ছে—স্যালি হিগিনস ঠিক অনুমান করেছেন, বনি পালিয়ে কোথাও যেতে চায়। বনি পালিয়ে ছোটবাবুর কেবিনে যেতে চায়। সে কেমন এবার শাসনের গলায় বলল, পোর্ট-মেলবোর্নে তোমাকে ঠিক নামিয়ে দিতে বলব।

বনি বলল, কেউ আমাকে নামাতে পারবে না ছোটবাবু।

—কেউ দেখে ফেললে কি হবে বলতো! বুড়ো মানুষটাকে আমরা মুখ দেখাব কি করে বল তো। আর ভাবছ সবাই চুপচাপ থাকবে! আর্চি তখন পেয়ে বসবে না তোমাকে। বনি, দোহাই ছেলেমানুষী কর না।

বনি তাকাল না পর্যন্ত। ভীষণ ভারি মুখ। বয়সী যুবতীর মতো মুখ গম্ভীর করে রেখেছে। বই-এর পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছে। মুখ তুলে ছোটবাবুকে একবারও দেখছে না। ছোটবাবু পাশে বসে আছে, থাকুক। ছোটবাবুর তো কেবল এখন তিরস্কার করার স্বভাব। ছোটবাবু, তুমি এত স্বার্থপর কেন—যেন ছোটবাবুর এই স্বার্থপরতাকে কিছুতেই সে সহ্য করতে পারছে না। পারলে সে এখন উঠে চলে যেত। কিন্তু ছোটবাবু যা একখানা মানুষ! অপমান জ্ঞান ভীষণ। হয়তো তারপর দিনের পর দিন কথা বলবে না। যেন বনি বলে সে কাউকে কখনও চেনে না। তার বলার ইচ্ছে হল, ছোটবাবু তুমি নিজেকে ছাড়া আর কিছু ভাব না। কিন্তু কিছু বলতে পারল না। তোমার তো ছোটবাবু ভীষণ খুশী হওয়ার কথা। আমি তোমার জন্য এত করতে পারি, তুমি আমার জন্য এটুকু সহ্য করতে পারবে না!

ছোটবাবু কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। বনি কথা না বললে তার মাথায় এখন আরও বেশি রক্ত উঠে যায়। সে বলল, নামিয়ে না দিলে তোমার ঠিক শাস্তি হবে না।

—বললাম তো কেউ পারবে না ছোটবাবু। মরে যাব, তবু কেউ তোমরা পারবে না।

ছোটবাবু সহসা ভীষণ দমে গেল। চুরি করে বনির মুখ দেখল। ভীষণ থমথম করছে। সারা মুখে রক্তচাপ। বোধহয় মেয়েটার অপমানে চোখ জ্বালা করছে। ছোটবাবু বলল, বনি, আমি তোমার ভালর জন্য বলছি। তোমাকে নিয়ে বনি আমার ভারি ভয়।

সহসা বনি এবার ভীষণ জ্বলে উঠল। ওর দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে বলল, কেন তুমি জাহাজে উঠে এলে ছোটবাবু! তোমার সঙ্গে আমার দেখা না হলে কি ক্ষতি ছিল। তুমি যেন আমার সব এভাবে চুরি করে নিয়েছ! কেন কেন। এখন তুমি তামাসা দেখছ! কিছু হলে তোমার কলঙ্ক হবে বলছ। তুমি ভীষণ ছোট, তুমি ভীষণ স্বার্থপর ছোটবাবু। তুমি ভাল না, তুমি খারাপ। বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

ছোটবাবু বলল, এই বনি, ছিঃ কি হচ্ছে! বনি প্লিজ এমন করে না। শোনো। বনি প্লিজ, ডেবিড উঠে আসছে।

বনি তাড়াতাড়ি বই দিয়ে মুখ ঢেকে দিল।

ডেবিড কাছে এসেই টুইঁ-চুঁই বাঁধিয়ে দিয়েছে। —কি ব্যাপার তোমরা এখানে! মেজাজকে বসে আছি, পাত্তা নেই তোমাদের, এই জ্যাক চল। তুমি যাবে বলছ। তো চল! দুষ্টুমি করবে না। আরে তুমি চলে যাচ্ছো কেন। যাবে না।

ছোটবাবু দেখল, বনি মুখ আড়াল করে কেবিনের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। সে তাকিয়ে থাকল, তারপর কেবিনের ওপাশে চলে গেলে বলল, জ্যাক যাবে না। ওর শরীর ভাল নেই বলছে।

—কি হল অবার?

—কি জানি কে জানে! ছোটবাবু বলতে বলতে ভারি অন্যমনস্ক হয়ে গেল! সে কিছু দেখছে না মতো হেঁটে যাচ্ছে ডেক ধরে। ডেবিড পেছনে পেছনে যাচ্ছে। ছোটবাবু বোটে উঠেও একটা কথা বলল না ডেবিডের সঙ্গে। ডেবিড দড়ি খুলে দিল। ছোটবাবু তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। ও পরেছে কালো প্যান্ট হাওয়াইন সার্ট—পায়ে সাদা মোজা আর কালো জুতো। ওর দিন দিন চুল ঠিক জ্যাকের মতো বড় হয়ে যাচ্ছে। এবং কি যে সুমহান চোখমুখ হয়ে যাচ্ছে ক্রমে! দাড়ি সেই নীলভ রঙের পাতলা, ক্রমে ঘন হচ্ছে। চোয়াল ভীষণ ভারি। এবং নাকের কিছুটা অংশ এখন দেখা যাচ্ছে—শরীরে সবুজ ঘাসের মতো কখনও রঙ, কখনও মনে হয় ঘাড়ে মসৃণতা অত্যধিক। হাতের পেশি শক্ত, ভীষণ শক্ত। ডেবিডের কেমন ভয় ভয় করতে থাকল। বলল, ছোটবাবু তুমি এমন গুম মেরে আছ কেন!

ছোটবাবু বলল, কৈ না তো!

—তোমার কিছু হয়েছে ছোটবাবু?

—কি হবে?

—কি হয়েছে জানি না। কিছু হয়েছে এটুকু বলতে পারি।

—আরে না। কিচ্ছু হয়নি। ছোটবাবু ডেবিডের পেছনে চলে এল। দাড় টানবে বলে বসে পড়ল। ওর মুখে অজস্র রেখা তৈরি হচ্ছে—নানারকমের সংশয়। এবং আর্চি সারা রাত আবার জাহাজে বোধহয় জেগে থাকছে!

সে নুয়ে দাঁড় টানছে। ক্রমশ আর্চি চারপাশে নেচে বেড়াচ্ছিল। স্যালি হিগিনস, আর্চি, পুরনো জাহাজ, এই যুবতী মেয়ে আর সব নানারকম সংশয় ক্রমে ছোটবাবুকে অস্থির করে ফেলছে। সে একটা কথা বলতে পারছে না। মনে হচ্ছে জাহাজ সমুদ্রে ভেসে গেলেই ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে। এসব ভাবনার ভেতর জ্যাকের মুখ বড় বেশি হারিয়ে যাচ্ছিল। তখন ইচ্ছে হচ্ছিল, একবার গোপনে পেছনে তাকায়। যদি জ্যাক জাহাজে কোথাও দাঁড়িয়ে থাকে, তাকে সে বোট থেকে দেখবে।

এবং তখনই কি যে হয়ে যায়, পোর্ট-হোলে সেই মুখ দাঁড়িয়ে আছে। সে ফিরে তাকাতেই ধীরে ধীরে হাত নাড়ছে—আমি আছি ছোটবাবু, ভয় নেই। আমি পোর্ট-হোলে দাঁড়িয়ে তোমাকে দেখছি। তুমি যত দূরেই যাও আমি আছি সঙ্গে। ছোটবাবু মনে মনে বলল, আমিও আছি বনি। সে দাঁড়িয়ে হাত নাড়তে থাকল। বনি হাত নাড়ছে। সহসা এক আশ্চর্য সুখানুভূতিতে ছোটবাবুর মনটা ভরে গেল। চোখ ঝাপসা হয়ে গেল বনির কথা ভেবে।

ছোটবাবু বলল, ডেবিড আমি কিন্তু বেশি খাব না। আমাকে তাড়াতাড়ি জাহাজে ফিরতে হবে। বনিকে জাহাজে একা ফেলে সে একদন্ড কোথাও আর থাকতে পারছে না।

আর যা মনে হল ছোটবাবুর, বনি জাহাজে না থাকলে সেও ঠিকঠাক যেন জাহাজে বেঁচে থাকবে না। ডেবিডকে নিয়ে সে বেশি সময় কিনারায় থাকল না। বালিয়াড়িতে সে এবং ডেবিড কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল। সন্ধ্যা হয়ে গেলে ওরা দুজন পাশাপাশি বসল। আভা ঘাসের মদ খেল দুজনে। কিছু খাবার। ডেবিড ওর সঙ্গে ফিরে এল না। সে একা ফিরে এল জাহাজে।

এবং এভাবে আর কখনও ছোটবাবুকে নেমে যেতে দেখা গেল না। সারাদিন কাজের পর সে বোট-ডেকে জ্যাকের সঙ্গে বসে থাকত। গল্প করত। ডেবিড বারবার এসে ফিরে গেছে। ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেনি। সূর্যাস্তের সময় ছোটবাবু রেলিং-এ দাঁড়িয়ে থাকলে ডেবিড বুঝতে পারত, যেভাবে ছোটবাবু জাহাজে উঠে এসেছিল এখন আর সেভাবে ছোটবাবু বেঁচে নেই। কেমন ধীরস্থির এবং চরিত্রের দৃঢ়তা ছোটবাবু জাহাজে বড় হতে হতে পেয়ে গেছে। ছোটবাবু কথা বললে মনে হয়, অনেক দূর থেকে কথা বলছে। ছোটবাবুকে আর আগের ছোটবাবু কিছুতেই ভাবা যাচ্ছে না।

মাসাধিককাল জাহাজ এ বন্দরে থেকে গেল। ফসফেট ডোরিকে বোঝাই হচ্ছে। ক্রেনে যত সহজে একটা জাহাজ বোঝাই হতে পারে, ডোরিকে তত সহজে হয় না। সময় লেগে যায়। এখন জাহাজ বোঝাই হয়ে গেলে ফের যাত্রা। জাহাজ আপাতত যাবে জিলঙে। পোর্ট-মেলবোর্ন পার হয়ে মাইল চল্লিশ দূরে ছোট্ট বন্দর। সব মাল সেখানে খালাস করা হবে। স্যালি হিগিনসের কাজকর্ম এবং অফিসার্সদের সব দেখাশোনা শেষ। বন্দর ছাড়ার আগে সেই এক নিশান উড়িয়ে দেওয়া। সবাইকে বলে দেয়া চব্বিশ ঘন্টার ভেতর জাহাজ আবার ছাড়ছে। বয়লার রুমে সব বয়লারের স্মোক বক্স একেবারে পরিষ্কার করে নেয়া হয়েছে। ক্রস-বাংকারে কয়লা লেভেলিং হচ্ছে। কোনো কারণে উঁচু নিচু পড়ে থাকা কয়লায় গ্যাস হতে পারে। আগুন লেগে যেতে পারে জাহাজে। কোথাও কোনো কারণে গাফিলতি থেকে না যায়। প্রায় বিশদিনের মতো জাহাজ ফের সমুদ্রে ভেসে চলবে। মে মাসের মাঝামাঝি সফর। দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ুর গতিবেগ ক্রমশ এখন বাড়ছে। সমুদ্রের আবহাওয়া খুবই খারাপ থাকার কথা। ঝড় বৃষ্টিতে জাহাজটা ভেসে চলবে সমুদ্রে। ফল্কার ওপরে কাঠ, কাঠে ত্রিপাল এবং চারপাশে কিল এঁটে সবকিছু ধোয়ামোছা শেষ। কোথাও কিছু পড়ে নেই ডেকে। ঝড়ের দরিয়ায় পড়ে গেলেও কিছু ভাসিয়ে নিতে পারবে না। কোথায় কি রঙ চটে গেছে, খুঁজে খুঁজে দেখছে ডেক-টিন্ডাল। রং-এর টব কোমরে ঝুলিয়ে জাহাজিরা ছোটাছুটি করছে। নিচে এনজিন

ভেতরে বাইরে এভাবে রঙ করে নেয়া হচ্ছে—সব ডেরিক নামিয়ে দেয়া হচ্ছে। এবং মজবুত সব গিঁটের সাহায্যে বাঁধাছাঁদা শেষ। উইচনগুলোতে ত্রিপলের ঢাকনা পরিয়ে দেয়া হচ্ছে। জাহাজের লাব্‌বাস লাইন নিচে পড়ে আছে। জাহাজ চলতে আরম্ভ করলেই দাঁড়ির রিঙে ছোট্ট একটা ডালিমের মতো গুলি ঘুরতে থাকবে অনবরত। জাহাজের গতি মাপার জন্য এটা ঠিকঠাক করে নেয়া দরকার।

জলের ট্যাংকগুলোতে কত জল আছে, জাহাজের ড্রাফট ঠিক থাকল কিনা, ভাংগা জাহাজ চলে খুশিমতো দু-এক ফুট ড্রাফট এদিক-ওদিক হওয়ার উপায় নেই। কম হলে ক্ষতি নেই। বেশি হলে বোধহয় জল এবং কয়লার ওপর দিয়ে যাবে। জল কম হলে রেশনিং করে দেয়া যেতে পারে। কাজেই সব চার্ট, সব স্টক জাহাজের, কোথায় কি কতটা থাকবার দরকার সব এক এক করে বুঝে নিচ্ছেন স্যালি হিগিনস। তিনি সবাইকে নিয়ে ঘুরে দেখছেন, যেমন প্রত্যেকবার জাহাজ ছাড়ার আগে দেখে নেন। বন্দরে তিনি দুবার বোট-মাস্টার করিয়েছেন—যদিও বন্দরে বোট-মাস্টার করা কোনো জরুরী ব্যাপার থাকে না। জাহাজের লাইফ-বয়াগুলো সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিচ্ছেন। শেষ সফরে তিনি ভীষণ সতর্ক। লাইফ বয়া, লাইফ জ্যাকেট দুটো বড় বড় কাঠের পাটাতন, সবই যেখানে যেভাবে থাকে ঠিকঠাক আছে দেখতে পেলেন। লাইফ-বোটের শুকনো খাবার, জল, তেল লণ্ঠন সি-এংকোর সব ঠিকঠাক আছে। বোটের ওপরে ত্রিপালে ঢাকা। পুরোনো কোথাও ফুটোফাটা। দুটো মোটরবোটেই দেখলেন, লাইফ-বোট ট্রানসমিটার সেট নেই। ও দুটো চার্ট রুমে থাকে। বোট-মাস্টারের সময় রেডিও-অফিসার হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে এসেছিল, আবার তুলে রেখেছে বোধহয় চার্ট-রুমে। ঝড়জলে ও দুটো আবার সময়-মতো যদি নষ্ট হয়ে যায়। রেডিও-অফিসার তার বুঝতে পারছে, স্যালি হিগিনসের কাছে ফাঁকি দেবার উপায় নেই। দরকারমতো হাতের কাছে আসল ত্রাণকর্তা ট্রানসমিটার সেটটি বিকল—তখন মাথা চাপড়ানো ছাড়া অন্য উপায় আর থাকবে না। চার্ট-রুমে রেখে ভালই করেছে।

এভাবে জাহাজে পর পর সব কাজ হয়ে গেলে, গ্যাংওয়ে থেকে সিঁড়ি টেনে তোলা হতে থাকল। এটাই সবার শেষের কাজ। জাহাজের সঙ্গে ডাঙার শেষ যোগসূত্র এভাবে উঠে এলেই মনে হবে চারপাশে সর্বত্র যেন কেউ সেই বিউগিল বাজিয়ে দিচ্ছে ফের। সমুদ্র, অসীম অশান্ত সমুদ্রে জাহাজ সিগুল-ব্যাঙ্ক তার বিশ্বাস অবিশ্বাস আর কিংবদন্তি নিয়ে ভেসে চলেছে। মনের ভেতরে তখন যার যত দুর্বলতা সব এক এক করে দেখা দিতে থাকে। মৃত্যু এবং বেঁচে থাকা পরম আত্মীয়ের মতো মনে হয়। শেষ চিঠি তারা পৌঁছে দেয় এজেন্টের

ঠিক একই দৃশ্য আবার, জাহাজ যত সমুদ্রে এগিয়ে যায় ডাঙা যত দূরে সরে যায়, জাহাজিদের মন তত খারাপ হতে থাকে। স্বভাব যে কি মানুষের—ডাঙা যত-ক্ষণ দেখা যাবে কেউ নড়বে না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে সেই দ্বীপ এবং দ্বীপের বর্ণমালা দেখতে দেখতে ঠিক স্বদেশের মতো কষ্ট বুকে। যে-কোনো ডাঙাই তখন তাদের দেশ মনে হয়। ঐ দ্বীপটাতেই যেন বেঁচে রয়েছে তার স্ত্রী পুত্র অথবা মা এবং মনে হয় কোনো সবুজ শস্যক্ষেত্র পার হলেই সে তার ছোট্ট কুটির দেখতে পাবে। যুবতী স্ত্রী দরজায়। চোখ তুলে বলছে, তাহলে এলে! সফরে বের হলে ঘরে ফেরার নিশ্চিত সম্ভাবনা বুঝি মানুষের থাকে না।

ওরা সেই দ্বীপটার পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। মৈত্রকে এ দ্বীপটায় রাখা হয়েছে। এখনও কাঠ-কয়লা কিছু পোড়া কাঠের অংশ ভাঙা হাঁড়ি দেখা যাচ্ছে। সমুদ্রের এই দ্বীপে যেন বেশ তাকে মানিয়ে গেছে। অশান্ত তরঙ্গমালার ভেতর আশ্চর্য দ্বীপটা। নির্জনতা প্রবল। হা হা করে বাতাস সারাক্ষণ বয়ে যাচ্ছে আর দ্বীপে মৈত্রের সব অস্তিত্ব ছড়িয়ে আছে। দ্বীপটা এখন মৈত্রদার। বোধহয় কোন সফরে যদি আবার সে ফিরে আসে দেখতে পাবে বসন্ত-নিবাসের নামে কেউ এখানে একটা এপিটাপ গেড়ে দিয়ে গেছে। ছোটবাবু দ্বীপটার কোথায় কিভাবে মৈত্রদাকে পুড়িয়ে দিয়েছিল এক এক করে বলে যাচ্ছে—এবং সেই যে জাহাজে ওঠার সময় সবু ভরসা ছিল মৈত্রদা সেই মানুষ তার নাম দিয়েছিল জাহাজে ছোটবাবু এসব বলতে বলতে শেফালীবৌদির গল্প এবং কখনও যে মৈত্রদা স্বপ্ন দেখত একটা বড় পাইন গাছে, কেউ ঝুলিয়ে রেখেছে বড় একটা তিমি মাছের কংকাল নিচে মৈত্রদা দাঁড়িয়ে আছে—এসব কথা সে বলতে বলতে দেখল বনি হা করে তাকে দেখছে। ছোটবাবু বলল, বনি তুমি কি দেখছ! দ্বীপে মনে হচ্ছে না মৈত্রদা আমাদের হাত তুলে টা টা করছে!

বনি বলল, শুনছ।

—কী!

তুমি শুনতে পাচ্ছ না!

—না!

—বাবা আবার সেই গানটা বাজাচ্ছেন!

ছোটবাবু ওপরে তাকাল। ব্রীজে ডেবিড পায়চারি করছে। পাশে হুইলের সামনে তিন নম্বর কোয়ার্টার-মাস্টার। মাথায় টুপি। মুখ প্রায় টুপিতে ঢাকা। সে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে আদিগন্ত সমুদ্রের জলরাশি খেলাচ্ছলে যেন অসীমে ভেসে যাচ্ছে অথচ সেই সংগীত ঠিক সংগীত বলা যাবে না, আশ্চর্য মেলডি বোধ হয় যখন কোনো জাহাজি সমুদ্রে থেকে যায় স্যালি হিগিনসের দুঃখবোধ বাড়ে। কিংবা স্যালি হিগিনস এখন কোথায়? সে বলল, তিনি তো কোথাও নেই বনি?

বনি বলল, বাবা ঠিক ঘরে বসে বাজাচ্ছেন! এবং বনি ঠিক বুঝতে পারছে না বাবা আবার এত দুঃখের ভেতর ডুবে যাচ্ছেন কেন। বাবা যখন সব কিছুর ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন, এমন কি তাঁর ঈশ্বরের ওপর তখন তিনি এ গানের ভেতর, এমন একটা সুরের ভেতর ডুবে যান। বাবা, মা চলে যাবার পর, এভাবে গান বাজিয়ে বাঁচার মতো আশ্রয় খুঁজেছিলেন। আবার কি বাবা এমন একটা দুঃখের ভেতর পড়ে গেছেন, যেন কোনো তার অতীব আপন কিছু, শেষ অবলম্বন হারিয়ে ফেলছেন! শেষ অবলম্বন বলতে বনি জানে সে নিজে এবং বাবাকে এভাবে ভায়োলিন বাজাতে শুনে কেমন শঙ্কা বোধ করল।

ওরা দুজনই ভীষণ ঝুঁকে ছিল সমুদ্রে। ছোটবাবু দ্বীপটা দেখছে দূরে সরে যাচ্ছে। দ্বীপটা দেখতে দেখতে কোড-এ্যালবাট্রসের কথা মনে পড়ছে। এখনও দিগন্তে ওকে দেখা যাচ্ছে না। যত জাহাজ সমুদ্রে ঢুকে যাচ্ছে তত ভাবছিল পাখিটা দিগন্তে কোথাও উড়ে উড়ে আসছে। কাছে এলে সে ঠিক দেখে ফেলবে। অথচ পাখিটা নেই, দ্বীপটা দূরে সরে যাচ্ছে। বনি এখন বোটে হেলান দিয়ে বসে আছে। ওর চোখ কেমন স্থির। সে খুব নিবিষ্ট হয়ে যাচ্ছে যেন। একটা পা সে তুলে দিয়েছে রেলিঙে। প্যান্ট গোটানো হাঁটুর কাছাকাছি। পায়ে পাতলা চাঁদমালার জুতো। খালি পা, মোজা পরেনি বলে ভারি মনোরম। ছোটবাবু বোধ হয় চুরি করে বনির খালি পা এবং আরও কিছু, এভাবে কি সব ভাবছিল—লোড-এ্যালবাট্রসের কথা মনে আসছে। প্রিয় পাখিটার কথা পর্যন্ত সে বনির খালি পা এবং সৌন্দর্য দেখতে দেখতে ভুলে যাচ্ছে—

আর এ সময়ে বনির কি দরকার ছিল এমন একটা উদ্ভট পোশাকে নেমে আসার। মাথায় তালপাতার টুপির ভেতর জাফরিকাটা হলুদ রং, বাঁ-হাত ঘাড়ের কাছে, আর ডান-হাত বুকের কাছে। লাল রঙের জ্যাকেট পরেছে। মোটা বেল্ট আর পোশাকের অদ্ভুত এক আবরণের ভেতর শরীরের ভাঁজ যেন ফুটে বের হচ্ছে! এত সাহস বনির কি করে হচ্ছে! সে জানে খুব কাছে তার কেবিন, সে বুকের ওপর ইচ্ছে করলে ন্যাপকিন ফেলে সব একেবারে গোপন করে ফেলতে পারে—কিন্তু এখানে যদি এখন ডেভিড চলে আসে! সে কেউ একেই সামনাসামনি দাঁড়ালে টের পাবে, যেন জ্যাক মেয়ে। অথচ সে জানে এমন করে ওকে কেউ দেখে ফেললেও বিশ্বাস করবে না সে মেয়ে। কারণ সে জানে, এটা একটা আজগুবি কথা কার্গো-শিপে মেয়ে। কারণ এ জেন আর যাত্রি বহন করে না, অথবা কোনো কার্গোশিপে দশ-বারোজন যাত্রির ব্যবস্থা কখনও কখনও থেকে যায়। কিন্তু সিডল-ব্যাংক যাত্রি নেবে দূরে থাক দামী কার্গো পর্যন্ত সে পায় না। আর সেখানে মেয়ে যাত্রি, মেয়ে! সবাই যায় না হতে তুমি মেয়ে মেয়ের মতো থাকো কেউ ভাববে না তুমি মেয়ে! তুমি মেয়ে সেজে সবাইকে লোভে ফেলো দেখ এমন ভাববে! আর তখনই মনে হল, কেবল আর্চি, আর্চি জানে, আর্চি জানে জ্যাক বনি। আর্চি জ্যাককে কেবিনে টেনে নিতে চেয়েছিল। সে কেমন ভেতরে ভেতরে গোলমালের ভেতর পড়ে যাচ্ছে। সে বনিকে কি বলবে বুঝতে পারল না। তখনও ভায়োলিন বাজাচ্ছে স্যালি হিগিনস। সে বলল, জ্যাক দিন দিন তোমার খুব সাহস বাড়ছে।

—সাহস?

—হ্যাঁ। তুমি কি পরেছ!

—কেন পুরুষের পোশাক!

—ভাল দেখাচ্ছে না। সব বোঝা যাচ্ছে। এত আঁট বিশ্রি দেখাচ্ছে।

—যা!

—হ্যাঁ সত্যি বলছি।

—তুমি জানো বলে বুঝতে পারছ।

আচ্ছা বনি, ছোটবাবু পাশে বসল, বলল, আর্চি তবে টের পেল কি করে?

জ্যাক সব বলল। 'হউ নটি গার্ল' থেকে সে যে একদিন কেবিনে ব্যালেরিনার মতো পোশাক পরে নাচছিল এবং এমন কি সে যে একদিন ডেকে মাতাল ছোটবাবুকে গভীর রাতে কেবিনে দিয়ে আসার নামে বারবার গোপনে চুমো খেয়েছিল সব বলে গেল। সে আর মাথা উঁচু করে যেন কথা বলতে পারছে না। সে বলল, আমি আর্চির কাছে নিজের দোষে ধরা পড়ে গেছি ছোটবাবু!

—আর্চি সবাইকে যদি বলে দেয়?

—দিতে পারে।

—দিলে কি হবে বুঝতে পারছ?

—জানি ছোটবাবু। বাবাও বোধ হয় অনুমান করতে পারছেন সব।

—তুমি অহেতুক বুড়ো মানুষটাকে ভাবনার ভেতর ফেলে দিয়েছ।

—কি করব ছোটবাবু। আমার কপাল।

ছোটবাবু বলল, আর্চি এখনও বলছে না।

—বলছে না কি করে জানো?

—ঠিক খবর চলে আসবে। বন্ধু অমিয়েছ জব্বার এখনও আছে জাহাজে।

—আর্চি ধূর্ত ছোটবাবু। সে একা মজা লুটতে চায়। সে কাউকে সহজে বলবে না।

তারপর ওরা কেউ আর কথা বলতে পারল না। চুপচাপ পাশাপাশি বসে থাকল। সূর্য অস্ত গেছে। সমুদ্রে অন্ধকার। এবং অনেক রাতে চাঁদ উঠবে আকাশে। ফ্যাকাশে সমুদ্রে তখন জাহাজের শুধু কলকব্জার শব্দ। আর হয়তো সারারাত স্যালি হিগিনস ভায়োলিন বাজাবেন। ছোটবাবু বলল, কি তিনি বাজাচ্ছেন বনি?

বনি বলল,

নোবডি নোজ ডি ট্রাবল আই সি
নোবডি নোজ বাট জেসাস
নোবডি নোজ ডি ট্রাবল আই সি
গ্লোরি হ্যালেলুজা।

ছোটবাবু বলল, সত্যি আমরা জানি না কি ঘটবে। এনজিন-রুমে মাঝে মাঝে আজকাল আর্চির ঘরে খুব আসছে।

এবং রাতে কেউ ঘুমোতে পারল না। ছোটবাবু বারবার বোট-ডেকে উঠে এসেছে। আই সি। স্যালি হিগিনস বারবার একই গান বাজিয়ে যাচ্ছেন। এবং সে বুঝতে পারছে না—কিভাবে জাহাজে তিনি আছেন, সামটাইমস আই এ্যাম আপ সামটাইমস আই এ্যাম ডাউন ও ইয়েস লর্ড, আরও কি যেন আছে—তিনি গোপনে ভাঙা জাহাজ নিয়ে ফ্যাকাসে সমুদ্রে ভেসে চলেছেন। চার-পাশে সমুদ্রের হাহাকারের ভেতর তিনি ক্রমে ঢুকে যাচ্ছেন। ভেতরে তাঁর অতীব যাতনা। কি এখন করণীয় ছোটবাবু বুঝতে পারছে না। নিরিবিলি আকাশ আর সমুদ্রে তিনি ফ্যাকাশে এক অন্তহীন করুণা ঈশ্বরের ধরতে পেরে কেমন বিচলিত। এবং সে তখন বুঝতে পারছিল এলবা জাহাজের পাশাপাশি কোথাও আছে। ওর পাখার শব্দ এইমাত্র কোথাও যেন দ্রুত ভেসে আসছে। সে বোট-ডেক ধরে নিচে নেমে গেল। আলোগুলো জাহাজের বিরামহীন জ্বলে যাচ্ছে। ফ্যাকাশে সমুদ্রের ভেতর চাঁদের নিভৃত আলো বড় বেশি ভীতিময়। ছায়া ছায়া একা বিশ্বচরাচরে ওরা ভেসে বেড়াচ্ছে। এলবা মাস্তুলের ওপর বসে আছে—সে দেখতে পেল। পাখিটাও বুঝি বুঝতে পারছে সব। ঠোঁট গুজে যতবার সে ঘুমোবে ভেবেছিল ততবার সে জেগে যাচ্ছে। আর বাতাসে পাখা মেলে সমস্ত হতাশা সরিয়ে, দিতে চাইছে বুঝি। সে দাঁড়িয়ে থাকল মেন-মাস্টের নিচে। পাখিটাকে ফিসফিস করে ডাকল, এলবা তুমি তো সমুদ্রে আবহমান-কাল এভাবে বেঁচে আছো। তুমি কি বুঝতে পারছ, আমরা এ-ভাঙা জাহাজে কোথায় যাচ্ছি!

তখন স্যালি হিগিনস বাজাচ্ছেন—ওভার মাই হেড আই হিয়ার ট্রাবল ইন দ্য এয়ার, দেয়ার ইজ এ হ্যাভেন সাম হোয়েয়ার—আপ ওভার মাই হেড, এ্যান্ড আই নো, ইয়েস আই নো দেয়ার ইজ এ হেভেন সাম হোয়েয়ার...।

তারপর গম গম করে বাজছে—ভায়োলিনে তিনি দ্রুত ছড় টেনে যাচ্ছেন বুঝি—

জোয়ি,
টিম্বার, টিম্বার!
লর্ড ডিস টিম্বার গটা রোল
টিম্বার টিম্বার...।

বনি শুয়ে শুয়ে সব শুনতে পাচ্ছিল। ওপরে উঠে যেতে ইচ্ছে করছে। বাবাকে নিরস্ত করা দরকার। কিন্তু দরজা খুলতে সে সাহস পাচ্ছে না। দরজার কাছে সে এখন দাঁড়িয়ে আছে। সে বুঝতে পারছে বাবার সব গান তাঁর ঈশ্বরের কাছে লিপি পাঠানোর মতো। এখন তিনিই তাঁর সব। তাঁর উদ্দেশ্য এবং বিধেয়। অর্থাৎ তিনি নিমিত্ত মাত্র। বাবা তাঁর জীবনের সব সুখ-দুঃখ করুণাময় ঈশ্বরের পায়ে সমর্পণ করছেন। বনি বুঝতে পাচ্ছে বাবার আর কোনো অবলম্বন নেই। বাবা এখন বিধ্বস্ত মানুষের প্রতিচ্ছবি। সে এখন কি করবে...

মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও সাহিত্য

মলিয়ের-এর একখানা নাটকে দেখা যায়, একটি চরিত্র রীতিমতো অবাক হয়ে যাচ্ছে যখন অপর একজনের কথায় সে জানতে পারলো যে সারাজীবনে সে যে ভাষায় কথা বলে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছে, তাকেই 'বিশুদ্ধ গদ্য' বলে। উক্তিটির মধ্যে যে হিউমার আছে, তা আমাদের জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সাহিত্যের সম্পর্কে মনস্তত্ত্ব এমনি একটি বিষয়। নাটক-নভেল-কাব্যের সাধারণ একজন পাঠক বা পাঠিকা যাঁদের হামেশাই দেখা যায় ট্রামে-বাসে বসতে না পারলেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই অনেক লেখকের সারাজীবনের সাধনা ও পরিশ্রমের ফসল মাস্টার পিসগুলি 'ফিনিস' করে দিচ্ছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই সাহিত্য প্রসঙ্গে মনস্তত্ত্ব বা সমাজতত্ত্বের কথা কানে তুলতে নারাজ হবেন। কারণ সাধারণের মধ্যে এরকম একটা ধারণার চলন হয়ে গিয়েছে যে বিজ্ঞান মানেই জটিলতা বা যন্ত্র বা অংক—সুতরাং শত হস্তেন...। কিন্তু না, বাস্তবিক তা নয়। কোন বিজ্ঞানই আমাকে বা আপনাকে, অর্থাৎ সাধারণ মানুষকে বাদ দিয়ে নয়। বা একটু চেষ্টা করলে আমরা বুঝতে পারবো না, এমনও নয়। বরং প্রকৃত বিজ্ঞানী, অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানী বা সমাজ-বিজ্ঞানী সব সময়েই আশা করে থাকেন যে তাঁদের বিশ্লেষণের সহায়তায় সাধারণ পাঠক অসাধারণ বিষয় সম্পর্কেও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করবে।

কিন্তু এ কথা মনে রাখা দরকার যে মনস্তত্ত্ব বা সমাজতত্ত্বের মতো নবীন বিজ্ঞান ত দূরের কথা, সমস্ত রকমের বিজ্ঞানের ধারণার পূর্বে মানুষ সাহিত্যে প্রেরণা অনুভব করেছে এবং তার সৃষ্টিতে আত্ম-নিয়োগ করেছে। সাধারণ যে-কোনো মানুষ সর্বক্ষণ তার হৃদয়ে যে স্নেহ-প্রীতি-প্রেম-ঈর্ষা দ্বেষ আশা-আকাঙ্ক্ষা-ঘৃণা দয়া-সহমর্মিতা বোধ করে থাকে কিন্তু একটা কাহিনীর সুতোয় গেঁথে দিলে তাই গল্প-উপন্যাস বা নাটক হয়ে দাঁড়ায়। সাহিত্যের সম্পর্কে মনস্তত্ত্ব ঠিক এই সমস্ত মানবিক প্রবৃত্তিগুলিকেই বুঝবার চেষ্টা করে বিশ্লেষণের মাধ্যমে। যে-কোন সাধারণ পাঠক শেকস্‌পীয়রের নাটকের চরিত্র সম্বন্ধে হ্যামলেট বা কোলরিজের আলোচনা পাঠ করলে ঐ সব নাটকের রসগ্রহণ তাঁর পক্ষে পূর্ণতর হয়ে ওঠে সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি।--যদিও তাঁদের আলোচনাগুলিই সাহিত্য, মনস্তত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্বের একটা মিশ্রণ—বিশুদ্ধ সাহিত্য নয়, পুরোপুরি মনোবিজ্ঞান নয়, সমাজ-তত্ত্ব ত নয়ই।

আজকের দিনের সাহিত্যের দুর্বোধ্যতা সম্পর্কে অনেক পাঠকই অনেক সময় অভিযোগ করে থাকেন। এ অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন এমন কথা বললে সত্যের অপলাপই করা হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে এবং সঙ্গে সঙ্গে যে কথাটা না বলে পারা যায় না, তা হলো এই যে, আজকের মানুষের জীবনযাত্রাও আর আগের মতো সহজ সরল নেই আজকের দিনে কেবল একজন অপরের কাছে নয় দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছি আমরা, এ কথা কি আমাদের বেশীর ভাগ সাধারণ মানুষের পক্ষেই সত্য নয়? কাজেই আমাদের নিয়ে যে সাহিত্য সৃষ্টি হবে তা খুব সহজ সরল কি করেই বা হতে পারে, হলেই বরং তা হবে অবাস্তব এবং অস্বাভাবিক।

মনস্তত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্বের পট-ভূমিকায় সাহিত্য বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য নিয়ে সম্প্রতি "বাংলা সাহিত্য সমীক্ষা পরিষদ" নামে একটি সমিতি গঠিত হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন এই সমিতির পৃষ্ঠ-পোষক এবং বাংলা বিভাগের প্রধান ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোবিজ্ঞানের প্রধান ডঃ রামগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপিকা শ্রীমতী বেলা দত্তগুপ্ত এ সমিতির পরিচালক নিযুক্ত হয়েছেন। এধরনের উদ্যোগ আমা-দের দেশে সম্ভবতঃ এই প্রথম। আমরা সংস্থাটির সর্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

পরলোকে হিন্দী নাট্যকার শেঠ গোবিন্দ দাস

গত ১৮ জুন প্রবীণ সংসদ সদস্য শেঠ গোবিন্দ দাস ৭৭ বছর বয়সে পর-লোকগমন করেছেন। সংসদীয় রাজনীতিতে অর্ধ শতাব্দী পূর্তি উপলক্ষে গত বৎসর তাঁকে একটি বিশেষ মানপত্র দেওয়া হয়। রাজনীতি ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে গোটা ভারতে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু এটাই সব কথা নয়। তাঁর জীবনের অন্য একটি উল্লেখযোগ্য দিকও ছিল। তিনি আধুনিক যুগে হিন্দী সাহিত্যস্রষ্টাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছিলেন। হিন্দী ভাষায় তাঁর রচিত নাটকের সংখ্যা প্রায় একশ। তা ছাড়া তিনি ৫ খানা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, ১ খানা উপন্যাস ও তিন খণ্ডে সুবৃহৎ আত্মজীবনী রচনা করে হিন্দী সাহিত্যে স্থায়ী আসন সৃষ্টি করে গিয়েছেন। হিন্দী ভাষার প্রসার ও প্রচারের প্রচেষ্টার সঙ্গে এক সময় তিনি এমনভাবে যুক্ত ছিলেন যে অহিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলে তাঁর সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত ভ্রান্তধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। বাস্তবিক পক্ষে শেঠ

বই আর বই

১৯২২ সাল। সদ্য সদ্য একখানা বই ছাপা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে হৈ-হৈ রৈ রৈ। সব গেল সব গেল রব উঠল—এমন একখানা নীতিবোধশূন্য অশ্লীল বইকে প্রকাশের আলোর আড়ালে না সরালে সর্বনাশ হয়েই গেল। ফলে সেই বই গাদা করে পোড়ানো হতে থাকল আয়ারল্যাণ্ডে কানাডায়। ইংলণ্ডের কাস্টমস বিভাগ পোড়ালো পাঁচশ বই, ইউনাইটেড স্টেটস পোস্টাল বিভাগও তাই। কোর্ট থেকে বইখানার মুদ্রণ নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

মজার খেলা শুরু তারপরেই। প্রত্যেক প্রকাশকদের [illegible] তারা যে যার খুশিমতো কাট-ছাঁট করে নানা জায়গা থেকে [illegible] বই ছেপে বিক্রী করতে লাগল। তাদের তহবিল পুষ্ট হতে লাগল একটি পয়সার মুখ দেখলেন না শুধু সেই বইয়ের লেখক।

বইখানার নাম ইউলিসিস। লেখক জেমস জয়েস। তাঁর তখন নিদারুণ অর্থাভাব এবং দৃষ্টিশক্তিও দ্রুত হারাচ্ছেন তিনি।

এর বছর কয়েকের মধ্যেই আবার এক ঘটনা। ১৯২৮ সাল সেটা। একখানা বইয়ের ফ্লোরেনটিন এডিশন ছাপা হয়েছে মাত্র হাজার কপি। দাম দু' গিনি করে। প্রকাশক না পেয়ে লেখক তাঁর শেষ সম্বল খুইয়ে সেই বই ছাপিয়েছেন। বাজারে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বই মুড়ি-মুড়কির মতো উবে গেল, পরের কটা সংস্করণও তাই। তারপরেই সেই গেল গেল রব। [illegible] বিভাগ ঝাঁপিয়ে পড়লেন বইখানার ওপর।

আর সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থস্বত্বাপহারক দলের ঈগলের ছোঁ পড়তে লাগল। নানা জায়গা থেকে এ-বইয়েরও নতুন নতুন সংস্করণ ছাপা শুরু হল। লেখক গলদঘর্ম হয়েও এর কোনো ব্যবস্থা করতে পারলেন না।

এ-বইয়ের নাম লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার। লেখক ডি এইচ লরেন্স। তিনিও মৃত্যুপথযাত্রী তখন।

গ্রন্থস্বত্ব অথবা কপিরাইট অ্যাক্ট কতটা [illegible] তখন স্মরণ নেই। ওই দুটো স্মরণীয় ঘটনার পর বাহান্ন আর ছেচল্লিশ বছর কেটে গেছে। লেখকদের নিরাপত্তার বনিয়াদ এখন নিশ্ছিদ্র বলেই সকলের ধারণা। আজকের সভ্য দুনিয়ায় 'পাইরেটেড' এডিশন প্রকাশকদের আর অস্তিত্ব নেই ভাবাটা অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? খোঁজ করলে এখনো দেখা যাবে বহু নামী আর অনামী লেখকের ভালো ভালো বই লেখকের বিনা অনুমতিতে অন্য রাজ্যে অথবা অন্য রাষ্ট্রে যেমন-তেমন ভাবে ছাপা হচ্ছে ভাষান্তরিত হচ্ছে। এগুলোর নাম কি দেব? অজ্ঞতাবশতঃ আমাদেরও অনেক লেখক হয়তো একখানা বিদেশী ভালো-লাগা বই অনুবাদ করে বসলেন, আর অনেক ছোটখাট প্রকাশক চোখকান বুজে তাই ছেপে ফেললেন। এও প্রবঞ্চনার সমতুল্য অপরাধ। ভারতের বাইরে কোনো জায়গায় বাঙালী পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য অনেক নামী লেখকের ভালো ভালো বই বিনা অনুমতিতে ছাপা হয়ে যাচ্ছে। বলা বাহুল্য অবৈধ লাভের অংকটাই এসব প্রকাশকদের আসল লক্ষ্য। এরকম খানকতক বই আমার হাতে এসেছে। সেগুলোর ছাপা বাঁধাই আর বানান ভুল দেখে চোখে জল আসার উপক্রম।

আন্তর্জাতিক স্বার্থ আর সংস্কৃতির মুখ চেয়ে অচিরে এই সমস্যা প্রতিকার কাম্য মনে করি। মিল্টনের ভাষায়, এ গুড বুক ইজ দি প্রেশাস লাইফ-ব্লাড অফ এ মাস্টার স্পিরিট—এমনি এক-একখানি সৃষ্টির ওপর যে-কোনো অবিচার ওই মাস্টার স্পিরিটের বুকে অপরিমেয় ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিতে বাধ্য।

—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

ভাষার প্রতি অবিবেচিত কিছু করেন নি। বরং বহুভাষাভাষীর দেশ ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীকে বুঝবার আন্তরিক আগ্রহে বেশ পরিণত বয়সেই তিনি তিনটি অন্য ভারতীয় ভাষা (বাংলা, গুজরাটি ও মারাঠী) শিক্ষা করেছিলেন। তা ছাড়া ইংরেজী এবং সংস্কৃত ভাষার উপরও তাঁর দখল ছিল অসাধারণ। রাজনীতি ক্ষেত্রে শেঠজী প্রবেশ করেছিলেন ২২।২৩ বছর বয়সে কিন্তু তাঁর সাহিত্য সাধনার সুরু হয়েছিল ১৪ বছর বয়েস থেকেই। সাহিত্যসেবা, শিক্ষার প্রসার তথা দেশসেবার স্বীকৃতি-স্বরূপ শেঠ গোবিন্দ দাসকে ১৯৬১ সালে পদ্মভূষণ উপাধি দেওয়া হয়। আমরা তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাই।

রাজ্য সরকার কর্তৃক শরৎচন্দ্রের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনের আয়োজন

আগামী বছর অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্যাপনের [illegible] করছেন। শরৎ স্মৃতি সমিতির একটি প্রতিনিধিদল সম্প্রতি রাজ্যের তথ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তাঁর কথায় এ সম্পর্কে জানা যায়। প্রথমতঃ লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে রাজ্য সরকার শরৎচন্দ্রের জীবনকাহিনী নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্যচিত্র নির্মাণ করবেন বলে জানা গেল। দ্বিতীয়তঃ রাজ্য সরকার শরৎচন্দ্রের গ্রন্থের স্বত্ব সংগ্রহ করার চেষ্টা করছেন। তা পাওয়া গেলে শরৎচন্দ্রের সমস্ত গ্রন্থের একটি সুলভ সংস্করণ রাজ্য সরকার প্রকাশ করতে চেষ্টা করবেন। শরৎচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকী উদযাপনের জন্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়ের সভাপতিত্বে যে কমিটি গঠিত হয়েছে, তারা শীঘ্রই কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীগুজরালকে অনুরোধ জানাবেন সর্বভারতীয় স্তরে অমর কথাশিল্পীর জন্ম-শতবার্ষিকী উদবাপনের জন্য।

ভারতীয় বার্তাজীবী সংঘের ৫৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

ভারতীয় বার্তাজীবী সংঘের ৫৩তম প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উদ্যাপিত হয়েছে। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাংবাদিক প্রফুল্লরঞ্জন গাঙ্গুলী। প্রবীণ ও নবীন সাংবাদিকদের এই মিলিত সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে স্বনামধন্য সাংবাদিক ও সাহিত্যিক দক্ষিণারঞ্জন বসু সর্বশ্রেণীর সাংবাদিকদের ঐকান্তিকভাবে সমাজের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। বর্তমানে নিউজপ্রিন্টের যে সংকট চলছে সে জন্য তিনি সরকারী নীতিকেই দায়ী করেন। সঙ্ঘের ঐতিহ্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে ভাষণ দেন সর্বশ্রী ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপদ বিশ্বাস, অজিত ঘোষ ও ব্রজকিশোর সিং প্রমুখ সাংবাদিকগণ। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও বেতার দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীধরমবীর সিংহও এ সভায় বক্তৃতা করেন।

চারজন বিজ্ঞানসাধক পরলোকে

গবেষকের জন্য যে সম্মানসূচক আর্থিক পুরস্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা জেনে এ-দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতিকামী ব্যক্তিমাত্রেই খুশী হবেন। কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান গবেষণাগারের এই চারজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অর্থের প্রয়োজনে যেন গবেষণা বন্ধ করে দিয়ে চাকরী খুঁজতে বাধ্য না হন বিশেষ করে সেই জন্যই এই পুরস্কার। গবেষণাগারের বেতনভুক বিজ্ঞানীরা যে-হারে বেতন পেয়ে থাকেন, এই চারজন গবেষক বিজ্ঞানীও এখন থেকে সেইরকম বেতন পাবেন। এই চারজন বিজ্ঞানীর প্রথম জন হলেন দিল্লীর ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটারীর ডাঃ এ পি মিত্র। ডাঃ মিত্র পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে তাঁর মৌল গবেষণার জন্য ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। বিশেষ করে বেতার ও টেলি-কমিউনিকেশন সম্পর্কে তাঁর গবেষণা বিদেশের প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানীদেরও প্রশংসা পেয়েছে। দ্বিতীয় বিজ্ঞানী হলেন বাঙগালোরের এরোনটিক্যাল লেবরেটরীর ডাঃ এন রামেশন। তৃতীয় ও চতুর্থ বিজ্ঞানী হলেন যথাক্রমে ডাঃ এ বি কর এবং ডাঃ নিত্যানন্দ। এঁরা দুজনেই লক্ষ্ণৌয়ের সেণ্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষক।

মহারাষ্ট্রে হরপ্পার শিল্প-নিদর্শন প্রাপ্তি

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে মাহারাষ্ট্র রাজ্যের আমেদনগর জেলার শ্রীরামপুর তালুকের দাইমাবাদে খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়ের চারটি ব্রোঞ্জ-ফলক পাওয়া গেছে। এর ফলে দক্ষিণ দেশে হরপ্পার শিল্প-ঐতিহ্যের সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেলো বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করছেন। হাতি মোষ, গণ্ডার ও সারথিসহ একটি রথ—এই চিত্রগুলি ব্রোঞ্জফলকগুলির ওপর খোদাইকরা অবস্থায় পাওয়া গেছে।

আচার্য নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণসভা :

গত ১৫ জুন প্রখ্যাত স্বদেশব্রতী, শিক্ষাবিদ ও লেখক আচার্য নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবতিতম জন্মদিবস উপলক্ষে রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অব কালচার-এর শিবানন্দ হলে একটি স্মরণ-সভা হয়ে গেছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নৃপেন্দ্রচন্দ্রের প্রাক্তন ছাত্র স্বনামধন্য ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। এই উপলক্ষে আচার্য নৃপেন্দ্রচন্দ্রের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'আট দি ক্রশ-রোডস'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। এই স্মরণ-সভায় অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী, প্রাক্তন বিচারপতি ফণিভূষণ চক্রবর্তী, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ আচার্য নৃপেন্দ্রচন্দ্রের প্রাক্তন ছাত্র বক্তৃতা দেন। সমস্ত বক্তাই আচার্য নৃপেন্দ্রচন্দ্রের ইংরেজী আত্মজীবনীর বাংলা অনুবাদ

মেঘদূত উৎসব

বঙ্গীয় কবি সম্মেলন ও কলকাতার সাহিত্যিকগণের যৌথ উদ্যোগে গত ১ আষাঢ় উত্তর কলকাতার সরস্বতী বালিকা বিদ্যালয়ের সভাকক্ষে মেঘদূত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। চপলাকান্ত ভট্টাচার্য উৎসবের উদ্বোধন করে কালিদাসের মেঘদূত ও অন্যান্য কাব্যে বর্ষা ও অন্যান্য ঋতুর বর্ণনার বিষয় উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডঃ উমা রায় তাঁর ভাষণে রবীন্দ্রনাথের উপর কালিদাসের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক কালীকিংকর সেনগুপ্ত।

লেখক সমবায় সমিতির গ্রন্থ বিপণির উদ্বোধন

গত ১৭ জুন কলকাতায় কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে লেখক সমবায় সমিতির গ্রন্থ বিপণির শুভ উদ্বোধন হয়ে গেছে। বিশিষ্ট লেখকবৃন্দ তথা সমবায়ী মনোভাবাপন্ন শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সংগঠিত 'লেখক সমবায় সমিতি'র বয়স যদিও পনেরো বছর হয়ে গেছে, কিন্তু এতকাল তাঁদের নিজস্ব কোন বিপণন কেন্দ্র ছিল না। রাজ্য সরকারের সমবায়মন্ত্রী ডাঃ জয়নাল আবেদিন এবং ঐ বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী অতীশচন্দ্র সিংহও এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সমিতির সভাপতি কবি ও সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র। এই উপলক্ষে বিপণির অদূরে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়াম হলে একটি প্রীতি সম্মেলন-এর আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনে ভাষণ প্রসঙ্গে শ্রীমিত্র বলেন : 'এ-কাজে পাঠক সাধারণের অকুণ্ঠ সহানুভূতি ও সহযোগিতা পাবার আশা আমরা তো করিই সেই সঙ্গে আমাদের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী না হলে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতাও আমাদের বাঞ্ছিত। সমবায় রাষ্ট্রমন্ত্রী অতীশচন্দ্র সিংহ সমবায়ী ভাবনা সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বিশেষ দানের উল্লেখ করে সীমিত হলেও সুন্দর একটি বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে : 'জাতিগঠনমূলক সাহিত্য রচনা ও প্রকাশনের ক্ষেত্রে সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যরসিকদের মিলন ক্ষেত্র হলো এই সমবায় সমিতি।' এই সম্মেলনে বহু বিশিষ্ট লেখক এবং সাহিত্যরসিকজনকে স্বাগত জানিয়ে সমিতির সম্পাদক জ্যোৎস্না সিংহরায় বলেন : 'সমিতির গ্রন্থবিপণিকে আর পাঁচটি বইয়ের দোকান থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুলতে আমরা আগ্রহী। সেজন্য গ্রন্থ-বিপণি সংলগ্ন একটি পাঠাগার স্থাপন এবং স্বকীয় উদ্যোগে পুস্তক প্রকাশে অভিলাষী গ্রন্থকারদের বিভিন্নভাবে সহায়তা করাও আমাদের পরিকল্পনার অঙ্গ।

এই সমিতির উদ্যোগে এখন পর্যন্ত ১১খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

—অলংকার

পলাশের রং (নাটক)। জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়। লিপিকা ৩০।১ এ কলেজ রো কলকাতা-৯। চার টাকা।

শ্রীজ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায় একজন প্রতিষ্ঠিত নাট্যকার। সম্প্রতি প্রকাশিত পলাশের রং নাটকটিতে তাঁর দীর্ঘকালের নাট্যশিল্প ভাবনার আর এক পরিণত রূপ পাওয়া গেল। মোট তিনটি দৃশ্য। একটি মাত্র সেট-গৌর রেস্টুরেন্ট, যেটি স্টেশন সংলগ্ন একটি টিনের চালায় নির্দিষ্ট আর মোট এগারো-বারো জন চরিত্রের সংঘটনা ও মনস্তাত্বিক সম্পর্কের কেন্দ্রেই নাটকটির গতিময়তা দেখা দিয়েছে। দিনে রেস্টুরেন্ট রাতে শুঁড়িখানা —এখানেই সমাবেত হয় পলাশ অজয় কিশোর ইত্যাদি কয়েকজন যুবক। একটা আদর্শে যুবকরা প্রাণিত। রেস্টুরেন্টে কাজকরা বেণুর দিদির সঙ্গে মালিক গৌরহরির

প্রেমের খেলার পিছনেও যে সামাজিক ও অর্থবণ্টনবৈষম্যের সত্য—তাকে স্পষ্ট করেছেন নাট্যকার। পলাশ, অজয়, কিশোরের মধ্যে শিখার অস্তিত্বকে নাট্যকার যথেষ্ট ক্ষমতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। শিখার আত্মহনন, অসিত রায়ের পলাশের হাতে মৃত্যু ঘটনা নাট্যমূল্যে সার্থক।

দিশারা (উপন্যাস)। গোপালদেব চট্টোপাধ্যায়। নব সাহিত্য প্রকাশ, ১২১-সি সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৯। দশ টাকা।

সুলতা, অবনী মনীষা, অপরিমেয়, পারিজাত, হেমেন বকসী, লিসা উষা দিগীনবাবু—এরকম অজস্র চরিত্র ও ঘটনা এনে লেখক গোপালদেব চট্টোপাধ্যায় তাঁর দিশারা উপন্যাসটি পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। কিন্তু উপন্যাসে তেমন কোন ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেন নি। অবনী এর নায়ক. সুলতার সঙ্গে প্রেম ব্যর্থতা মনীষার সঙ্গে আঙ্কে যোগ করে মন্ত্রী দিগীনবাবুর স্ক্যাণ্ডাল রটনা কোর্টে কেস, উষার গৌণ কাহিনী—এসবই ক্লান্তিকর, সহৃদয় পাঠকদের আদৌ ধরে রাখে না; কারণ সংলাপে বেশী বলার চেষ্টা বক্তৃতা দেওয়া কথা বলার মধ্যে কৃত্রিম বানানো ভঙ্গি কাহিনীর মেলোড্রামাটিক সিচুয়েশন সবই উপন্যাসটিকে শুধুমাত্র গল্প বলার শিল্পেই টেনে রাখে তার বাড়তি কিছু নেই। বাঁকুড়ার ঝাঁটিপাহাড়ী স্কুল বর্ধমানের মেমারি অঞ্চল কলকাতা শহর—নানা জায়গায় নায়ককে ঘুরিয়েছেন। উপন্যাস তাই দীর্ঘ। যে কথা বলতে চেয়েছেন লেখক অবনীর সেই নিরাসক্ত মানসিকতা—তাতে এত দরকারই পড়ে না। শেষে উত্তর প্রদেশের আলমোড়ার আশ্রমের দিকে অবনীর ব্রহ্মচর্য জীবনযাপনের ইঙ্গিত দিয়ে লেখক চরিত্রের অস্তিত্ব ন্যায়ও নষ্ট করেছেন। কেবল গল্প পড়তে যাঁদের ভাল লাগে দিশারা তাঁদের ভাল লাগতেও পারে।

গল্প (সংকলন)। মদন দাশ, প্রভাসকান্তি ভদ্র, রত্নেশ্বর বর্মণ। লিপিকা, ৩০।১-এ কলেজ রো কলকাতা-৯। পাঁচ টাকা।

মদন দাশের—শুধু একা একা গত্যন্তর নৃগাতিক এবং ও বিসর্জন, প্রভাসকান্তি ভদ্রের তার লাল ত্রিকোণ সংসার বেঁচে থাকা, সুব্রত শতাংশ ও যথারীতি, রত্নেশ্বর বর্মণের ক্ষুধাবিদ্ধ বাঁশ ও সোনার হরিণ, বীথি চলে গেছে, তিন পকেটমার ও বিলাসী এবং জীবন যে রকম—এই গল্পগুলি গল্প নামের সংকলনটিতে একত্র করে প্রকাশিত হয়েছে। তিন গল্পকারই তরুণ ও নবীন। নিশ্চয়ই গল্পের মধ্যে কোথাও কোথাও কাঁচা ভাব আছে—তা বিষয়-ভাবনায় যেমন উপস্থাপনারীতি ও গদ্যভাষাতেও তেমনি, কিন্তু প্রত্যেকের রচনায় প্রতিশ্রুতি আছে। আরও কিছু ঘষা-মাজা করলে কয়েকটি গল্প নিটোল শিল্প-বন্ধন পেতো। গল্পের বিষয়ে যুবকের বেকারীত্ব ভাবনা, প্রেম আধুনিক জীবন সমস্যা স্পষ্ট। মদন দাশের হাতে বেকার নায়ক, উত্তমপুরুষ নায়কের ও তার প্রেমিকা মমতার বা রাজ্যমন্ত্রী বংশীচরণ এবং তার সংসারচিত্র মন্দ নয়। কিন্তু বর্ণনার অতিরেক ও অপ্রাসঙ্গিক ক্লান্তিকর। এ দোষ প্রভাসকান্তি ভদ্র ও রত্নেশ্বরের থাকলেও তুলনায় কম। রত্নেশ্বর বর্মণের বীথি চলে গেছে গল্পটি ভাল লাগল। জীবন যে রকম গল্পটিতে ক্ষমতার পরিচয় আছে। প্রভাসকান্তি ভদ্রের পর্যবেক্ষণ শক্তি প্রবল। তাই বিষয় ও চরিত্র-ভাবনায় তার চমৎকার পরিচয় পাওয়া গেলেও গল্প কথনে আরও সংক্ষেপ হওয়ার দরকার এঁর। মোটকথা তিন গল্পকারই বিষয়ে ও প্রকাশরীতিতে আধুনিক এবং যথেষ্ট প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন। এঁদের কাছে ভবিষ্যতে আরও ভাল গল্পের আশা রাখি।

অনাঘ্রাত কবিতার স্বাদ (কাব্য সংকলন)। সম্পাদক—মিহির চৌধুরী। ৩৬।১১ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা-৯। দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

গ্রামবাংলার একুশজন কবির প্রত্যেকের একটি কি দুটি কবিতা নিয়ে এই সংকলন। প্রত্যেক কবির আলোকচিত্র ও সংক্ষিপ্ত জীবনী এতে ছাপা হয়েছে। কোন কোন কবির কবিতায় কবিক্ষমতার কিছু পরিচয় আছে যদিও তবু কবিতা নির্বাচনে কবি ও সম্পাদকের আরও যত্ন নেওয়া উচিত ছিল। অনেক কবিতায় ছন্দের ভুল স্পষ্ট। সম্পাদকের দীর্ঘ ভূমিকার সঙ্গে সংকলনের যোগ তেমন বোঝা গেল না। ছাপার ভুল অজস্র। তবে তরুণ ও প্রবীণ এই কবিদের সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ উদাম—বিশেষ করে মফঃস্বল থেকে নিশ্চয়ই প্রশংসার্হ।

পত্র-পত্রিকা

গঙ্গোত্রী—সম্পাদক : শান্তনু দাস। ৪।১ আফতাব মসজিদ লেন। কলকাতা-২৭। দাম দু টাকা।

কবিতা ও কবি বিষয়ের পত্রিকা গঙ্গোত্রীর বর্তমান সংখ্যাটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। মেদিনীপুর বিহার পুরুলিয়া বর্ধমান মালদা অঞ্চলের কবিদের সমীক্ষা সম্পূর্ণ অভিনব। এই জাতীয় প্রয়াস বিশেষ চোখে পড়ে না। বুদ্ধদেব বসুর কয়েকটি চিঠি ছাপা হয়েছে। কবিতা লিখেছেন গোপাল ভৌমিক শৈলেনচন্দ্র ভট্টাচার্য গৌরাঙ্গ ভৌমিক, সত্য গুহ এবং আরো কয়েকজন। শুভপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের আঁকা প্রচ্ছদটি আকর্ষণীয়।

নতুন পরিবেশ—(কার্তিক-পৌষ) সম্পাদক : ধনঞ্জয় দাশ ও সতীন্দ্রনাথ মৈত্র। ৩০ রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, ব্লক-ই। ফ্ল্যাট—১৮। কলকাতা—৫৪। দাম দুই টাকা।

তিনটি প্রবন্ধ লিখেছেন নেপাল মজুমদার (যুদ্ধ ও ফ্যাসি-বিরোধী সঙ্ঘ) এবং রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য (বস্তুবাদের সংজ্ঞা ও ইতিহাস) এবং সুকুমার মিত্র (আমরা ও আমাদের প্রতিবেশী)। অনেকদিন পরে কবি রাম বসুর একটি পূর্ণাঙ্গ একাঙ্ক নাটক প্রকাশের কৃতিত্ব এই পত্রিকাগোষ্ঠীর। একটি গল্প লিখেছেন অমল দাশগুপ্ত এবং কাব্য-নাটক প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন সুবিনয় মুস্তাফী। কয়েকটি সুনির্বাচিত কবিতা এবং পুস্তকসমালোচনা সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ করেছে।

প্রান্তিক—সম্পাদক পরিমল চক্রবর্তী। ৬৫ সি বারিক লেন। কলকাতা-

লিখেছেন [illegible]রেশ ঘোষ, কৃষ্ণ ধর পরিমল চক্রবর্তী নিখিলরঞ্জন কুণ্ডু প্রদীপ বসু অমিয়নাথ ব্রহ্ম দ্বিজেন রায় এবং আরো অনেকে। ছোট আকারের পত্রিকা হলেও অনেককেই আকৃষ্ট করবে।

সূর্যবীজ—সম্পাদক : সুমিত মৌলিক। ৯।এইচ।৮ অভয় গোহ লেন, কলকাতা—৪। দাম চল্লিশ পয়সা।

সুভাষ দত্তের লেখা বীরভূমের কথাভাষার কবিতাটি ভাল লাগল। প্রচ্ছদ সুন্দর। সম্পাদনার ব্যাপারে যত্নবান হলে পত্রিকাটি সমাদৃত হবে।

ঝাঁক—সম্পাদক : শিবরতন বন্দ্যোপাধ্যায়। ৬৫ রায় বাহাদুর রোড। কলকাতা—৩৪। দাম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

গল্প কবিতা প্রবন্ধ লিখেছেন অমিয়বন্ধু সিংহ, কৃষ্ণ ধর, কবিতা সিংহ দুর্গাদাস সরকার রণজিৎ দাশগুপ্ত এবং আরো অনেকে।

জিগীষা। সম্পাদনা রাণা চট্টোপাধ্যায় এবং স্বজিত ভাদুড়ী। ৩৭।এ ডঃ দেওয়ান রহমান রোড। লেক গার্ডেন্স। কলকাতা-৪৫। দাম এক টাকা।

রাণা চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা কবিতার রূপান্তর প্রসঙ্গে নিবন্ধ এবং অশোক দত্তচৌধুরীর কাব্য নাটক ঘুম ভাঙো লাগল।

আর্থিক প্রসঙ্গ

গৃহহীনে গৃহ

রবিনসন ক্রুসো হয়ত মেয়েই ছিলেন, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের বিখ্যাত ছোট গল্পটি পড়ে এ-সন্দেহ আমার এবং বোধহয় অনেকেরই হয়েছিল। কিন্তু চার্লি চ্যাপলিন যে সংস্কৃত জানতেন সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই নেই। নইলে তাঁর স্বর্ণমৃগয়া (গোল্ড রাশ) চলচ্চিত্রের শেষ দৃশ্যের আইডিয়াটা পেলেন কোথা থেকে? যদি বলেন ও ত' এক চিরন্তন আইডিয়া—বিভিন্ন দেশের সাহিত্যেই সদৃশ ধারণার সন্ধান পাওয়া যায় তবে অবশ্য সামান্য জ্ঞান নিয়ে আমার পক্ষে প্রতিবাদ করা কঠিন হয়ে পড়ে। সত্যিই তো বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে আমার যৎসামান্য পরিচয়—ইংরেজীতে যাকে বলে নডিং অ্যাকোএইনট্যানস—নেই! তবুও চ্যাপলিনের চলচ্চিত্রের ঐ শেষ দৃশ্যটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি আপনারাই বিচার করে দেখুন।

স্বর্ণখনি আবিষ্কারের পর নায়ক আজ ধনী—কোটিপতি। স্বতই তাঁর জীবনযাত্রায় অকল্পনীয় পরিবর্তন এসেছে। জাতে ওঠার পালায় তড়াক করে একসঙ্গে অনেক ধাপ অতিক্রম করার বিড়ম্বনাও তাঁকে পদে পদে ভোগ করতে হচ্ছে। এক মহাসমুদ্রগামী জলযানে নায়ক ইউরোপে বেড়াতে যাচ্ছেন। পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পূর্ণ নিখুঁত পদক্ষেপও সুদৃঢ়—সম্পূর্ণভাবে নবার্জিত আভিজাত্যের দ্যোতক। শারীরিক দিক দিয়ে প্রয়োজন না হলেও ছড়ির ওপর ভর দিয়ে হাঁটছিলেন নায়ক। পশ্চাতে তাঁর একজন সহচর। গ্যাংওয়ের মুখে এসে থমকে দাঁড়ালেন নায়ক। ব্যাপার কি? পাশে এক পরিত্যক্ত চুরুটখন্ড পড়ে, তখনও তা থেকে ধূম নির্গত হচ্ছে। চকিতে চুরুটখন্ড তুলে নিয়ে টানতে শুরু করলেন নায়ক। তা দেখতে পেয়ে সহচরটি পেছন থেকে ছুটে এসে চুরুটখন্ডটি কেড়ে নিয়ে আবার মাটিতে ফেলে দিলেন, এবং তারপর নিজের পকেট থেকে চুরুট-কেস বের করে নায়কের সামনে খুলে ধরলেন। নায়ক ততক্ষণ সম্বিৎ ফিরে পেয়েছেন। একবার সহকারীর মুখের দিকে এবং একবার চুরুট-কেসের দিকে চেয়ে বললেন : থ্যাঙ্ক ইউ। ঐ দৃশ্যে নায়কের—চ্যাপলিনের মুখে যে ভাব ফুটে [illegible]

তখনই মনে প্রশ্ন উঠেছিল : নায়ক তাঁর সহচরকে ধন্যবাদ দিলেন কিসের জন্যে—চৈতন্য ফিরিয়ে দেবার জন্যে না একটা গোটা চুরুট অফার করার জন্যে?

সংস্কৃতের গল্পটি তো সকলেরই জানা, এবং গল্পটির হিতোপদেশ বা মরাল হল : সারমেয়কে সিংহাসনে বসালে সে ঐ সিংহাসনে বসেই উপানৎ চর্বণ করে।

চিরকাল রাস্তা থেকে বিড়ি-সিগারেটের টুকরো কুড়িয়ে টানা যার স্বভাব সে যদি হঠাৎ স্বর্ণখনির মালিক হয় তাহলে বেশ কিছুদিন সে ঐ অভ্যাসেরই দাস হয়ে থাকবে, অথবা জীববিশেষকে সিংহাসনে বসালেও সে তার জাতিধর্ম সহসা পরিত্যাগ করতে পারবে না—এই ধারণা বা হিতোপদেশ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে পারবে না—এই ধারণা বা হিতোপদেশ সম্পূর্ণ মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু জানতাম না যে ত্যাগীরা ছাড়াও অন্যান্য লোকে ভোগের সুযোগ পেয়েও তা প্রত্যাখ্যান করে—ফুটপাত যাদের আশ্রয় তারা অনেক সময় আচ্ছাদিত আশ্রয়ের চেয়ে ঐ ফুটপাতকেই পছন্দ করে। এই জ্ঞান আহরণ করলাম সি-এম-ডি-এ বা বৃহত্তর কলকাতা উন্নয়ন সংস্থার সাম্প্রতিক প্রতিবেদন থেকে।

জনপথ :

ফুটপাথ হল রাজপথের জনপথ। রাজপথ রাজারাজড়ার জন্যে পথ নয়, শকটাদির জন্যেই নির্দিষ্ট পথ, আর জনপথ হল পেডেস্ট্রিয়ান বা পদযাত্রীদের জন্যে। ধরে নেওয়া যেতে পারে, যারা শকটাদিতে ভ্রমণ করে তারা রাজারাজড়ার সমান না হলেও পদযাত্রীদের থেকে ভিন্ন জাতের লোক। তাই প্রথম শ্রেণীর জন্যে রয়েছে রাজপথ, আর দ্বিতীয় শ্রেণী—জনসাধারণের জন্যে জনপথ। (মার্কিনীরা অবশ্য জনপথকে একটু বোধহয় মর্যাদা দানের উদ্দেশ্যে ফুটপাথ বা পায়ে হাঁটার পথ না বলে পেভমেন্ট—শান-বাঁধানো পথ বলে।

কলকাতার জনপথ—একটি প্রতিবেদন :

কলকাতার অধিকাংশ জনপথ বা ফুটপাথ (হিন্দি ভাষাভাষীদের অনুকরণে আজকাল লোকে ফুটপাতকে শুধু 'ফুট' বলতেও শুরু করছে) যে আর পায়ে-হাঁটার পথ নয় এ-অভিজ্ঞতা একপ্রকার সর্বজনীন। জনবহুল রাজপথের জনপথ আজ স্থায়ী ও ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ীদের দ্বারা মোটামুটি অধিকৃত, আর অপেক্ষাকৃত জনবিরল অঞ্চলে জনপথে বাসা বেঁধেছে এক গৃহহীন বা গৃহত্যাগী জনগোষ্ঠী। এরা মাত্রেই যাযাবর বা ভ্রাম্যমাণ মানবগোষ্ঠী নয়, জীবিকার সন্ধানে এরা দূর-দূরান্তরের পল্লী অঞ্চল থেকে মহানগরে এসে শেকড় গেড়েছে। এদের অনেকে হয়ত দিল্লী বা বোম্বাই যেতে পারত। সুতরাং কলকাতায় আসাটা মোটামুটি একটা আপতন, এর মধ্যে ঠিক কোন পরিকল্পনা নেই। কলকাতার জনপথে অধিষ্ঠিত এই মানবগোষ্ঠীর কথাই বলা হয়েছে কলকাতা মহানগরী বা বৃহত্তর কলকাতা উন্নয়ন সংস্থার (সি এম ডি এ) প্রতিবেদনে।

প্রতিবেদন অনুসারে ২ লক্ষ লোক কলকাতার জনপথে বাস করে, আর এই সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বোম্বাই-এ নাকি জনপথে বসবাসকারীদের সংখ্যা এর প্রায় ৫০ শতাংশ বেশী বা ৩ লক্ষের মত। কিন্তু সেখানে গৃহহীন মানবগোষ্ঠীর বসবাস-পদ্ধতি কিছুটা অন্য ধরনের বলে সংখ্যাটা অত বেশী মনে হয় না। তারাও জনপথে বাস করে কিন্তু জনপথ ঠিক দখল করে নিতে পারেনি। ফলে বোম্বাই কলকাতার মত এখনও চটের থলির শহর বা স্যাক-টাউন হয়ে ওঠে নি।

প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে যে, কলকাতার জনপথে আশ্রয়গ্রহণকারীরা শুধু যে বিহার-উড়িষ্যার মত পার্শ্ববর্তী রাজ্য থেকে এসেছে তাই নয়, অনেকেই এসেছে সুদূর উত্তরপ্রদেশ ও গুজরাট এবং অন্ধ্র প্রদেশ ও তামিলনাড়ু থেকে। গুজরাট থেকে বোম্বাই-এর এবং উত্তরপ্রদেশের অনেক অঞ্চল থেকে দিল্লীর দূরত্ব কম, তবুও তারা কিন্তু বোম্বাই-দিল্লী না গিয়ে কলকাতাতেই এসেছে। কারণ? কারণ কলকাতা মহানগরীর উন্নয়ন সংস্থার প্রতিবেদনে ব্যাখ্যা করা হয়নি।

জীবিকার সন্ধানেই তারা কলকাতাতে এসেছে এবং অনেকেই জীবিকার সন্ধান

করে নিয়েছে। তারা রিক্সা চালায়, মাথায় বা ঠেলাগাড়ী করে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য পণ্য ফেরি করে বেড়ায় জঞ্জাল ঘেঁটে ছেঁড়া ন্যাকড়া পুরোনো কাগজ প্রভৃতি সংগ্রহ করে এবং সুযোগ হলে দিনমজুর হিসেবেও খাটে। যারা এমন কিছু করতেই সমর্থ হয়নি ভিক্ষাবৃত্তিই তাদের অবলম্বন। তবে অনেকেই সম্পূর্ণভাবে ভিক্ষাবৃত্তির ওপর নির্ভরশীল নয়—যাহ অবসর সময়েই ভিক্ষার মাধ্যমে উপার্জন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করে থাকে। প্রতিবেদনটিতে দৃষ্টান্তও দেওয়া হয়েছে।

একটি স্ত্রীলোক তার পুত্র ও কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় এসেছিল জীবিকার সন্ধানে। সকালে বিকেলে মা ও মেয়ে গৃহ-পরিচারিকার কাজ করে এবং সন্ধ্যের পর পার্ট টাইম কাজ হলো ভিক্ষে করা। এই-ভাবে উপার্জন করে স্ত্রীলোকটি তার ছেলেকে স্কুলে পাঠাতে সমর্থ হয়েছে। এই পরিবারটি একটি পুলিশ থানার অনতি-দূরেই বাস করে।

এই গৃহহীন জনপথবাসীদের সকলেই নিঃস্ব বা সর্বহারা নয়। অনেকেই তাদের উপার্জনের এক মোটা অংশ সঞ্চয় করে নিয়মিতভাবে গ্রামের বাড়ীতে পাঠিয়ে থাকে, এবং এদের মধ্যে অনেকে দৈনিক ২৩-৩০ টাকা করে উপার্জন করে।

নিঃস্ব যখন নয় তখন তাদের পক্ষে গৃহে—আচ্ছাদনের মধ্যে বাস করার ইচ্ছে হওয়াই স্বাভাবিক। কলকাতার জনপদ-বাসীরা নাকি এই নিয়মের ব্যতিক্রম বলেই পরিগণিত—অর্থাৎ তারা ফুটপাত ছেড়ে স্থায়ী আচ্ছাদনের মধ্যে যেতে চায় না। কারণ বোধহয় এর জন্যে যে ব্যয়ের সম্ভাবনা তা সামান্য হলেও তার জন্যে তারা প্রস্তুত নয়। অবশ্য অন্য কারণও থাকতে পারে—খোলামেলা জনপথ ছেড়ে খুপরির মত ঘরে গিয়ে তারা হাঁপিয়ে উঠতে চায় না। সি-এম-ডি-এ'র প্রতিবেদনে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট কিছু বলা হয়নি—শুধু যে তারা ফুটপাথ ছেড়ে স্থায়ী বাসস্থানে যেতে অনেক সময়ই নারাজ তার ওপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

আর এক মানবগোষ্ঠী :

কলকাতার জনপথে অধিষ্ঠিত মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে এক উপগোষ্ঠী আছে, তাদের বিবরণও প্রতিবেদনটিতে বিশেষ স্থান পায়নি। এরা হল পশ্চিমবঙ্গেরই লোক—অন্যান্য রাজ্য থেকে কর্মের সন্ধানে আগত জনগোষ্ঠী নয়। অবশ্য এরাও এসেছে উদরান্নের সংস্থান করবার জন্যে, কিন্তু ঠিক বোধহয় প্রচলিত অর্থে রুজিরোজগারের উদ্দেশ্যে নয়। কারণ, এরা নিজেদের নিয়োগযোগ্যতাহীন বলেই মনে করে।

এই গৃহহীন মানবগোষ্ঠী বা উপ-গোষ্ঠী হল পূর্বতন পশ্চিমবঙ্গের পূর্বতন কৃষি-শ্রমিক বা ক্ষুদ্র গ্রামীণ কারিগর। কৃষির জাত দ্রব্যের চাহিদা হ্রাসের দরুণ গ্রামীণ অর্থ-ব্যবস্থায় এদেরও প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেয়েছে। তাই দিন গুজরান করা কঠিন বলে তারা এই মহানগরে এবং এর আশে-পাশে আস্তানা গেড়েছে।

ফুটপাত রেল-স্টেশন, পুলের তলায় আশ্রয় গ্রহণ করলেও অর্থাৎ গৃহহীন হলেও গৃহের প্রতি সহজাত আকাঙ্ক্ষা এদের আছে। তাই সুযোগসুবিধা পেলেই ইঁটকাঠ কুড়িয়ে ছেঁড়া থলে-কাপড় জোগাড় করে বাগবাজারের খালধারের মত বেওয়ারিশ জমির সন্ধান পেলেই তাতে তারা আস্তানা গড়ে তোলে। আচ্ছাদনের মধ্যে বাস করতেই তারা অভ্যস্থ—নীল আকাশের নীচের মোহে এখনও ঠিক পড়েনি। তাই সুযোগ পেলেও জনপথ ছেড়ে নির্মিত বাসস্থানে যেতে চায় না—এই ধারণা বোধহয় পশ্চিম-বঙ্গের গ্রামীণ অর্থ-ব্যবস্থা উৎখাত এই মানবগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তবে ঐ বাসস্থান ভিক্ষাক্ষেত্রের কাছাকাছি হওয়া চাই, কারণ ভিক্ষাই যে তাদের প্রধান উপ-জীবিকা।

মহানগরের বস্তি :

বৃহত্তর কলকাতার বস্তি অঞ্চলে বাস করে ২২ লক্ষ লোক বলে সি এম ডি-এর উক্ত প্রতিবেদনে জানান হয়েছে। এও অতি পীড়া-দায়ক তথ্য। কিন্তু বস্তিতে যারা বাস করে তাদের অবস্থা নিশ্চয়ই যারা সম্পূর্ণ গৃহ-হীন যারা তথাকথিত বেওয়ারিশ জমিতে অনিশ্চয়তার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে তাদের চেয়ে ভাল। কারণ সমাজবিদ্যায় ন্যূনতম বলে নির্দিষ্ট খাদ্য পরিচ্ছদ বাসস্থান ও সেকস—চারটেই তারা কিছু না কিছু পেয়ে থাকে, যদি বা গুণগত তারতম্য যথেষ্টই আছে। সেইজন্যে মনে হয়, বস্তি উন্নয়নের আগে এই সম্পূর্ণ গৃহহীনদের সমস্যার মোকাবিলা করা প্রয়োজন।

গৃহহীনদের সমস্যার মোকাবিলা :

অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম সূচক হল নগরীকরণ বা আরবানাইজেশন। নগরীকরণ-পদ্ধতিতে সামঞ্জস্য না থাকলেই নগরাঞ্চলে গৃহহীনদের সমস্যার উদ্ভব ঘটে। অর্থাৎ, নগরাঞ্চলের অর্থ-ব্যবস্থা যদি গ্রামীণ অর্থ-ব্যবস্থার চেয়ে আকর্ষণীয় হয় তবে গ্রাম ছেড়ে লোকে নগরাঞ্চলের দিকে আসতে চাইবেই। এর ওপর আবার যদি গ্রামীণ অর্থ-ব্যবস্থার দিন দিন অবনতি ঘটতে থাকে, তবে এই ক্ষেত্রে যে গতিবৃদ্ধি ঘটবে তাও সহজে অনুমেয়। আমাদের মত অন্যান্য উন্নয়নশীল (এখন আর 'অনুন্নত' শব্দটি বিশেষ চালু নয়) দেশ এই সমস্যায় পড়েছে।

এই সমস্যার সমাধানে ইন্দোনেশিয়ায় গ্রামাঞ্চল থেকে নগরাঞ্চলে আগমনকে বিশেষ-ভাবে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করে নগরাঞ্চলের অধিবাসীদের পরিচয়পত্র দেওয়া হয় এবং পরিচয়পত্রবিহীন ব্যক্তিদের আবার গ্রামাঞ্চলে থেকে জানা যায় যে এতে বিশেষ ফল ফলেছে। কিন্তু প্রশ্ন হল : অন্য ধরনের রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় ইন্দোনেশিয়ার পক্ষে যা সহজসাধ্য, আমাদের পক্ষে তা কি কোনমতেই সম্ভব? ঘোষিত নীতি সত্ত্বেও কলকাতার ফুটপাত থেকে বেআইনী দখলিকার ব্যবসায়ীদের সরিয়ে জনপথ পদযাত্রী জনসাধারণের জন্যই সংরক্ষিত করা সম্ভব হচ্ছে না কেন, মহা-নগরীকে যত্নে সাজাবার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম? কারণ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক।

সুতরাং আমাদের ক্ষেত্রে অন্যভাবে সমস্যার সমাধানে অন্যভাবে অগ্রসর হতে হবে। চূড়ান্ত সমাধান হল অবশ্য গ্রামীণ অর্থ-ব্যবস্থাকে আকর্ষণীয় করে তোলা এবং দেশের অর্থব্যবস্থায় আঞ্চলিক ভারসাম্য-হীনতা দূর করা। কিন্তু এই দুই-ই দীর্ঘ-কালীন উন্নয়নের প্রশ্ন। ততদিন জনপথে গৃহহীন মানবগোষ্ঠীর অস্তিত্ব পাশবিক বৈষম্যেরই পরিচয় প্রদান করে চলবে। সুতরাং আশু কিছু করা দরকার।

আশু যা কিছু করা যেতে পারে তা হল বস্তিতেই এই গৃহহীনদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা। এর জন্যে কিছুটা বলপ্রয়োগ—রাজনীতির ভাষায় পুলিশী জুলুম বলে অভিহিত হলেও—প্রয়োজন হলে করতে হবে। চিকিৎসায় রোগী অনেক ক্ষেত্রেই রাজী হয় না, দরদী আত্মীয়স্বজনও হয়ত সমর্থন করে না। তবুও তা করার প্রয়োজন হয়। সেই রকম গৃহহীনরা গৃহে বাস করতে না চাইলেও বাস করাতে হবে।

জানা যায়, এ ব্যাপারে সরকার অগ্রণী হয়েছেন এবং ইকাফের একটি বিশেষজ্ঞ দল ভারতের বিভিন্ন মহানগরে তথ্যানুসন্ধান করে বেড়াচ্ছে। এই মাসেরই (জুন) দ্বিতীয় সপ্তাহে দলটি কলকাতায় এসেছিল। দলটির কাছ থেকে আন্তর্জাতিক সাহায্যের প্রতি-শ্রুতি পাওয়া গেছে।

উপসংহার :

এইভাবে আন্তর্জাতিক সাহায্যের মাধ্যমেই এই বিরাট সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে সাহায্য, পরিকল্পনা ইত্যাদি এক কথা এবং পরি-কল্পনাকে সুষ্ঠু রূপায়িত করা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। পরিকল্পনা শুধু যেন প্রচারমুখী ও চিত্তাকর্ষক প্রকল্পে শেষ না হয়।

আরও একটা কথা। অর্থনৈতিক দিক থেকে যে-কোন গোষ্ঠী-জীবনকে খণ্ড খণ্ড-ভাবে দেখা যায় না। সুতরাং গৃহহীন গৃহ দেবার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে যে তারা যেন শেষ পর্যন্ত ঐ গৃহে বস-বাস করতে পারে। অর্থাৎ পূর্ণ অর্থে পুনর্বাসনের—রুজিরোজগারের সম্ভাবনা সহ পুনর্বাসনের—ব্যবস্থা করতে হবে। নচেৎ ঠেক অন্ন বা ভূমি ত্যাগের পর আবার অব-তরণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।

২৪ পরগণা জেলা সাহিত্য সম্মেলন

১৪ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় চিঠিপত্র বিভাগে প্রবীর ঘোষের পত্রটি পড়লাম। প্রবাসী বাঙ্গালী আমরা—তাই ২৪ পরগণা জেলা সাহিত্য সম্মেলনে আমাদের প্রত্যক্ষ কোন অভিজ্ঞতা নাই। অমৃত-এর পাতায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন সম্বন্ধে কিছুটা যা জানতে পেরেছি। সুতরাং তার ভুল-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় এবং এই পত্রে সেটা উদ্দেশ্যও নয়। আমি শুধু এই চিঠিতে শ্রীঘোষের পত্রের একটি পংক্তির তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এক জায়গায় তিনি প্রশ্ন রেখেছেন,—...'কয়েকজন অপেক্ষাকৃত নামীদের পরিচয় দু তিন লাইনে (......) অথচ কমনামীদের বেশী লাইনে কেন?'

আমার প্রতিবাদ এখানেই। কমনামীদের জন্য স্যুভেনিয়রে বেশী লাইন খরচা করাটা শ্রীঘোষের মতে অপচয়। তাই নামীদের জন্য বেশী লাইন বরাদ্দ না হওয়ায় তিনি ক্ষুব্ধ। আমাদের দেশে জনগণের প্রায়টি স্তরেই 'তেলা মাথায় তেল দেওয়ার' রীতিটি মজ্জাগত। শ্রীঘোষই বা তার ব্যতিক্রম হবেন কেন? এই স্বাভাবিক কারণেই নামীদের জন্য উনি ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ। অথচ যারা উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের জন্ম দিতে পারে, সেইসব বর্তমানের কম নামীদের জন্য তাঁর কোন সহানুভূতি নেই।

নামী, দামী ও প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের জন্য অপর্যাপ্ত সুযোগ ও সুবিধা রয়েছে। এ ধরনের নতুন কোন অনুষ্ঠান বা কর্মতৎপরতার জন্য তাঁদের পরিচিতির খ্যাতি অপেক্ষা করে না। তাঁরা ইতিমধ্যেই সাহিত্যরসিক মহলে স্বস্থান উপযুক্ত যোগ্যতায় অধিকার করে আছেন। অথচ নতুন বা কমনামী লেখকগণ তাঁদের উজ্জ্বল প্রতিভা ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ থাকা সত্ত্বেও সামান্য একটু পরিচিতি বা পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে অকালে ঝরে যাচ্ছে। আমরা যারা সাহিত্যকে ভালবাসি, তাদের কি কর্তব্য নয় এমন সব নবীন প্রতিভাকে ঝরে যেতে না দেয়া? এর জন্য বাংলার সাহিত্যিক সমাজের কি সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট হওয়া উচিত নয়?

২৪ পরগণা জেলা সাহিত্য সম্মেলনের স্যুভেনিয়র দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তবে সত্যি যদি স্যুভেনিয়র কর্তৃপক্ষ কম-

বাঙ্গালীর আন্তরিক শুভ কামনা রইল তাঁদের জন্য। সেই সঙ্গে প্রার্থনা রইল, তাঁদের মত বাংলার সাহিত্য-রসিক মাত্রই এগিয়ে আসুন, যাতে এইসব কমনামী লেখক এবং এদের সৃষ্টির আধার ছোট পত্রিকাগুলিকে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

—এলা রায়
ভেইকল এস্টেট, জব্বলপুর
মধ্যপ্রদেশ

'সেকালের সংগীতগুণী' প্রসঙ্গে

'সেকালের সংগীতগুণী' পর্যায়ে ভারতীয় রাগসংগীতের ক্ষেত্রে একদা বিখ্যাত অধুনা প্রায় বিস্মৃত বিভিন্ন গুণী শিল্পীর জীবনকাহিনী তথা সংগীতসাধনার অনবদ্য কাহিনী অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে পড়েছি। এই পর্যায়ে লেখকের 'বাইজীপর্ব' বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। কারণ একদা কোলকাতার সংগীতরাজ্য বিশেষভাবে বাইজী অধ্যুষিত ছিল এবং অতীতের সেই সব কিন্নরকণ্ঠ, সুরলক্ষ্মীর আশীর্বাদধন্যা বাইজীদের সংগীতসাধনা এবং পরিবেশনা কোলকাতাকে সংগীততীর্থে পরিণত করেছিল আর সে গৌরবের ধারা আজও চলেছে। লেখক সেইসব গুণী বাইজীদের সাংগীতিক জীবনের কথা কালের অতল থেকে উদ্ধার করে এক দুরূহ কর্তব্য করেছেন। এজন্য তিনি বাংলার সংগীত-সমাজের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা-ভাজন।

গত ৩১ মে ১৯৭৪ তারিখের অমৃত (৪র্থ সংখ্যা) পত্রিকায় লেখা সংগীতগুণী ঠুংরী সম্রাট মোজুদ্দিনের জীবনী পড়ে অনেক আনন্দ পেয়েছি এবং অনেক নতুন

মোজুদ্দিন সম্বন্ধে আরও অনেকের মত আমিও এর আগেও পড়েছি এবং বর্ষীয়ান গুণীদের মুখে শুনেছি তাঁর অসাধারণ সংগীতনৈপুণ্যের কথা। লেখক মোজুদ্দিনের অনেকগুলো বিখ্যাত ঠুংরীর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার মধ্যে অত্যন্ত বিখ্যাত এবং প্রায় ঐতিহাসিক 'বাজু বন্দ খুলু খুলু যায়' এই ঠুংরীটির কথা বলেন নি। আমি এই বিখ্যাত ঠুংরীটির অত্যন্ত সার্থক এবং প্রায় একক শিল্পী হিসেবে মোজুদ্দিনের কথাই এতদিন জানতাম। কিন্তু দিলীপবাবুর এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ না থাকায় আমার দীর্ঘদিনের বিশ্বাস কিছুটা দুর্বল হয়েছে। আমি অনেকদিন আগে কোথাও পড়েছি অথবা কোন জ্যেষ্ঠ গুণীর কাছে এই ঠুংরী এবং মোজুদ্দিনের কথা শুনেছি। এই প্রসঙ্গেই এক বর্ষীয়ান সংগীতগুণীর কাছেই শুনেছি যে গোয়ালিয়রের ভারতবিখ্যাত খেয়ালগায়ক ওস্তাদ রহমৎ খাঁ মোজুদ্দিনের অসাধারণ সংগীতকৃতিত্বের কথা শুনে তাঁর গান শোনার জন্য স্ব-শিষ্য বেনারসে আসেন। ইতিপূর্বেই রহমৎ খাঁর মস্তিষ্কবিকৃতির সামান্য লক্ষণ দেখা দিয়েছে তবে তার তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। মোজুদ্দিনের গান বিশেষত তাঁর 'বাজু বন্দ খুলু খুলু যায়' শুনে রহমৎ খাঁ স্তব্ধ সমাহিত এবং ভাবে আবিষ্ট হয়ে আত্মহারা হন। আর শোনা যায়, এর থেকেই নাকি তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতি পূর্ণতা পায়—তিনি সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে যান। মোজুদ্দিনের গানের অলৌকিক সুরৈশ্বর্য রহমৎ খাঁ সহ্য করতে পারেন নি।

দিলীপবাবু এ সম্বন্ধে আলোকপাত করলে বিশেষ বাধিত হবো।

মণি সেন
জব্বলপুর, মধ্যপ্রদেশ

প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রসঙ্গে

১৪ জুন অমৃতের 'জলসা' বিভাগে চিত্রাঙ্গদা প্রেমেন্দ্র মিত্রর আলোচনা প্রসঙ্গে এক জায়গায় লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত এবং পরিচালিত ছায়াছবি যোগাযোগ ছিলে কানন দেবীর গাওয়া হারা মরু নদী গানটি গেয়ে শোনালেন শ্রীমতী গীতশ্রী। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে যোগাযোগ ছবিটির উক্ত গীতের রচয়িতা প্রেমেন্দ্র মিত্র হলেও ছবিটির পরিচালনা তিনি করেননি। ছবিটির পরিচালক ছিলেন যতদূর মনে পড়ে সুশীল মজুমদার।

প্রমথেশ ভট্টাচার্য
কল্পনা এরিয়া

মৃত্যু ও দুঃখের গভীরে ॥

আরতি দাস

অনেক মৃত্যুকে জানি, গভীর রাত্রির
সকল উৎকণ্ঠা শেষ, নক্ষত্রেরা চুপ
নিরর্থ মমতা কাড়ে মৃতকল্প শরীর
সম্পূর্ণ শীতল: দূরে শোকার্ত স্বজন
কেবলই অপেক্ষা করে, সাহস করে না:

হাওয়ায় কপাট নড়ে,
কুকুরটা কেঁদে ওঠে বাহির দুয়ারে,
অনেক মৃত্যুর পরে
আর একটি মৃত্যু আসে জীবনের নদীর কিনারে।

অনেক দুঃখকে জানি
পরিপূর্ণ আনন্দের দিনে
স্মৃতিকে সম্পূর্ণ বিঁধে, উৎসব আসরে
মনে পড়ে সে আসেনি,
কঠিন দুর্বাক্য শুনে
ঘরছাড়া, কে জানে কোথায়!

—

দুঃখ জানি, মৃত্যু জানি
সে পত্র পাঠায় জানি বিশ্বস্ত সময়,
অথচ—
সকল মৃত্যু, সকল দুঃখের
গভীরে কখন প্রেম জন্ম নিল
কেউ তা জানি না।

বয়স ॥

মৃণাল বসু চৌধুরী

স্বপ্নে আমার ঘর ছিল না শাদা তুলো—
মেঘের সঙ্গে হাওয়ায় শুধু উড়ে বেড়ায়;
স্বপ্নে যখন কেউ থাকে না বেড়াল ডাকে—
অনুকূল জলের টানে ঘর ভেসে যায়।

স্বপ্নে আমার ঘর ছিল না মেঘে হাওয়ায়
শরীর এবং শরীর শুধু ইস্তাহারে—
কাঠের ঘোড়া দৌড়ে বেড়ায় আজ—কাল
ঘুমের মধ্যে নিরন্তর বয়স বাড়ে।

কার্ডিওগ্রাম ॥

অমিয়কুমার হাটি

অনিয়মে হঠাৎ চলে হৃদ্‌স্পন্দন।
শঙ্কিত মন,
স্বপ্ন মাখা কান্না আঁকা খেলা
ফুরাবে এই বেলা?

অলিন্দ আর নিলয় যখন বন্ধ করে নিয়ম মানা,
স্তব্ধ হবে তখন হৃদয়?
কেমন করে যায় যে জানা?

তাই তুলেছ কার্ডিওগ্রাম—
PQRST?
এই কি হৃদয় মহলের দাম?
কিসের মধ্যে খবর মেলে কি?

যন্ত্রণা কি যায় হে মাপা?

পিকাডিলী সার্কাস

নিমাই ভট্টাচার্য

উপন্যাস

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শুধু চাকরির জন্য ব্রাডফোর্ড গেলাম না। রঞ্জন চলে যাবার পর লন্ডনে থাকতে ভাল লাগছিল না। মাঝে মাঝে অসহ্য লাগত। তাই ব্রাডফোর্ডে যাবার সুযোগ পেয়ে ভালই লাগল। সকাল আটটায় কিংস ক্রশ থেকে ট্রেনে চড়ে দুশো মাইল পথ পাড়ি দিয়ে ঠিক সাড়ে দশটায় লীডস পৌঁছলাম। প্রায় কলকাতা-হাওড়ার মতই লীডস আর ব্রাডফোর্ড পাশাপাশি শহর। ব্রাডফোর্ডেই নাইনটিনথ সেঞ্চুরী ভিকটোরিয়ান ব্রিটেনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হলো। সসারের মত শহরের চার ধারে পাহাড়, মাঝখানে লেক। সেন্ট্রাল ক্যালকাটার মত ব্রাডফোর্ড শহরের মাঝখানে পুরানো দিনের অনেক স্মৃতি চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। হঠাৎ এক নজর দেখলেই স্পষ্ট বুঝা যায় মহারাণী ভিকটোরিয়ার অনুপ্রেরণায় যে শিল্প বিপ্লবের জন্য এরা গর্ব করে, তার জন্য এই ব্রাডফোর্ড শহরের অবদান নগণ্য নয় কিন্তু লন্ডন থেকে এসেই ঠিক ভাল লাগল না। মনটা খারাপ হয়ে গেল। মনে হলো বোধহয় ভুল করলাম। পরিচিত পরিবেশের একটা মোহ থাকে। কলকাতা ছেড়ে বাইরে যাবার সময় ভাল লাগত না। কলকাতা ছাড়া দিল্লী, বোম্বে, মাদ্রাজকে ভালবাসার কোন সুযোগ পাই নি। দেখিও নি। কলকাতা ছাড়া লন্ডনেই থেকেছি, ভালবেসেছি। আমি অটোয়া, ওয়াশিংটন নিউইয়র্ক রোম প্যারিস কায়রো টোকিওতে থাকি নি। তবে যারা ওসব শহরে থেকেছেন তাদের বহুজনকে চিনি, জানি। লন্ডনে তাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। সবাই এক বাক্যে স্বীকার করেন সব রকমের সব মানুষের এমন মিলন মেলা, আনন্দবাজার পৃথিবীর আর কোন শহরে দেখা যায় না। ফরাসী সভ্যতা—সংস্কৃতির পরিবেশে যারা জীবন কাটিয়েছেন, প্যারিস শুধু তাঁদের কাছেই মক্কা। লন্ডনের মত

বি-বি-সি ক্যান্টিনে আড্ডা দিচ্ছিলাম। ঐখানেই বি-বি-সি টেলিভিশনের একজন ক্যামেরাম্যান মিঃ গর্ডনের সঙ্গে আলাপ হলো। মিঃ গর্ডনের জন্ম সাউথ আফ্রিকায়। কৈশোর-যৌবন কাটিয়েছেন ইজিপ্টের সুয়েজ শহরে। কর্মজীবন শুরু করেন ক্যানবেরায়। তারপর রোম। প্রৌঢ় বয়সে এলেন লন্ডনে। বি-বি-সি'র কাজে সারা পৃথিবী চক্কর দিয়েছেন একাধিকবার। ডু ইউ নো আই হ্যাভ ভিজিটেড ক্যালকাটা টেন টাইমস?

বলেন কি?

হোয়েনএভার আই গো টু ক্যালকাটা প্রত্যেকবার আমি কোলুটোলা থেকে কুর্তা পারচেজ করি। দে আর লাভলি!

আমরা হাসি।

'হাসছেন? আমার বাড়ীতে এসে দেখবেন আমি ঐ কলুটোলার কুর্তা বাড়ীতে পরি।'

'রিয়েলি?'

'যখন টেগোরস শান্তিনিকেতনে টু উইকস ছিলাম তখন তো আমি ঐ কুর্তা আর পায়জামাই পরতাম।...

সুভাষ জিজ্ঞাসা করল, আপনি শান্তিনিকেতনেও থেকেছেন?

মিঃ গর্ডন হাসতে হাসতে বললেন, কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না? আই হ্যাভ সীন চিত্রাংগদা এ্যাট শান্তিনিকেতন...

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, তাই নাকি?

মিঃ গর্ডন সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি চিত্রাংগদা দেখেছেন?

'দেখেছি।'

'অ্যাট শান্তিনিকেতন?'

'না, কলকাতায়।'

'দেন ইউ হ্যাভ নট সীন রিয়েল চিত্রাংগদা। আমি কলকাতাতেও দেখেছি

আমরা চুপ করে থাকি।

উনি একটু পরেই আবার বললেন, চাইনীজ লোটাস ডান্স, সোভিয়েট ব্যালে, শান্তিনিকেতনের চিত্রাংগদা, সেকসপিয়রের নাটকে স্যার লরেন্স অলিভার আর পল রবসনের গান! আমি জীবনে ভুলব না।

ঐ গর্ডন সাহেব বলেছিলেন, দেয়ার আর টু সিটিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড—লন্ডন এ্যান্ড ক্যালকাটা!

শুধু গর্ডন নয়, আরো অনেকের কাছে শুনেছি লন্ডন ও কলকাতার মত প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা শহর আর নেই। সেই কলকাতা সেই লন্ডন ছেড়ে ব্রাডফোর্ড!

মার্লবোরো রোডে কমিউনিটি রিলেসান্স কাউন্সিলে আমার অফিস। থাকি আরো উত্তরে ওক এভিনুতে। ছোট্ট অফিস, মাত্র চারজন কর্মচারী। অফিসের বড় সাহেব সি আর ও কমিউনিটি রিলেসান্স অফিসার। বৃদ্ধ না হলেও প্রবীণ। জাতিতে ইংরেজ। আমি ভারতীয়। মীর্জা পাকিস্তানী। মিস দেশাই ব্রিটিশ পাসপোর্টধারিণী পূর্ব আফ্রিকার গুজরাটি। এক কথায় মিনি কমনওয়েলথ। কালা আদমীদের উপর কোন অবিচার বা অত্যাচার হলে তার প্রতিকার করাই কাউন্সিলের সব চাইতে বড় কাজ। দ্বিতীয় নম্বর কাজ হলো সোস্যালিস্টভাবে ব্রিটেনের অর্থ-

নৈতিক ক্ষেত্রে ইমিগ্রান্টদের অবদান ও প্রয়োজনীয়তার পটভূমিকায় এদের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ইংরেজ সমাজকে সচেতন করা। এছাড়া আরো একটি কাজ আছে। কালা আদমীদের যেসব সন্তান ব্রিটেনেই জন্মেছে ও বড় হচ্ছে তাদের গায়ের রং কালো হলেও ব্রিটিশ নাগরিক এবং সেজন্য শিক্ষায়-দীক্ষায় তাদের উপযুক্ত করে তোলা।

প্রথম দিন চারখানি ঘরে চারজনের অফিস দেখে আমার হাসি পেয়েছিল। ভেবেছিলাম এই ছোট্ট অফিস আর মাত্র চারজনের দ্বারা ব্রাডফোর্ডের প্রায় লক্ষাধিক কালা আদমীর কি উপকার হবে। তাছাড়া চারটি বিভিন্ন সভ্যতা সংস্কৃতি ও দেশের মানুষের দ্বারা কি একসঙ্গে কাজ করা সম্ভব? আস্তে আস্তে আমার মন থেকে এসব সন্দেহের মেঘ কেটে গেল। ভাল লাগল অফিসকে, ভাল লাগল সহকর্মীদের। ভাল লাগার কারণ ছিল। প্রথম দিনই মীর্জা আমাকে বললো দিদি আমি কিন্তু আপনাদের জামাই।

আমি চমকে উঠলাম, তার মানে?

মীর্জা হাসল। বললো, আমি বাঙ্গালী মেয়ে বিয়ে করেছি।

শুনেই ভাল লাগল। 'আপনিও তো বাঙ্গালী?'

মীর্জা আবার হাসল। বললো, বাংলায় কথা বলতে পারলেই কি বাঙ্গালী হওয়া যায়? আমি ওয়েস্ট পাঞ্জাবের......

'কিন্তু আপনার বাংলা শুনে তো বুঝা যায় না।'

'লেখাপড়া তো ঢাকাতেই করেছি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'ঐ ঢাকায় থাকার সময়ই বুঝি বিয়ে করেছেন?'

মীর্জা পকেট থেকে সিগারেট-লাইটার বের করতে করতে বললো, বিয়ে ঢাকাতেই হয়েছে কিন্তু তার পরদিনই আমরা এখানে পালিয়ে আসি।

'কেন?'

মীর্জা সিগারেট ধরিয়ে একটু মুচকি হাসল। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো আমার বাবা বাঙ্গালীদের সহ্য করতে পারেন না। তাই ঢাকায় থাকলে কি যে হতো বলা যায় না।

আমি চুপ করে রইলাম।

মিস দেশাই কয়েকটা টাইপ করা কাগজ হাতে নিয়ে মীর্জার ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল। 'সরি...টু ডিস্টার্ব ইউ!'

আমি বললাম নট এ্যাট অল।

মিস দেশাই একবার মীর্জাকে দেখে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললো, ওর ধারণা সারা পৃথিবীর সব বাঙ্গালীই ওর আত্মীয়।

আমি হাসি। কোন কথা বলি না।

মিস দেশাই মাথা দোলাতে দোলাতে বললো, রিয়েলি বিলিভ মী! আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না। যখন ওকে কোথাও টেলিফোন করে পাবেন না তখন জানবেন মিঃ মীর্জা কর্ণওয়াল এরিয়ার কোন বাঙ্গালীর বাড়ীতে বসে আড্ডা দিচ্ছেন।

আমি কিছু বলার আগেই মীর্জা বললো তুমি হাফ ইংরেজ হয়ে আর ন্যাকামি করো না।

'হোয়াট?'

'হোয়াট হোয়াট করো না। তুমি আড্ডার কি বুঝবে হে ছুকরী?'

'ডোন্ট টক ইন বেঙ্গলী। স্পীক ইন ইংলিশ।'

মীর্জা ওর কথা গ্রাহ্য না করে আমাকে বললো, মেয়েটাকে দেখতে কি সুন্দর অথচ স্কার্ট-ব্লাউজ পরে এলেই মনে হয় খাই খাই করছে।

মীর্জার কথা শুনে হাসি পায় কিন্তু হাসতে পারি না।

মীর্জা এবার ওর দিকে তাকিয়ে বললো, হোয়াই ডোন্ট ইউ উয়্যার শাড়ী? শাড়ী পরলে তোমাকে খুব ভাল মানাবে।

'আমি কি পরব না পরব তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার তো দরকার নেই।'

'তুমি এসব ড্রেস পরে এলে আই ফিল একসাইটেড।'

মীর্জার কথা শুনে আমি স্তম্ভিত। ভাবলাম মিস দেশাই ভীষণ রাগ করবে কিন্তু করল না। হাসতে হাসতে বললো, জলি গুড নিউজ। ডিভোর্স ইওর বেঙ্গলী ওয়াইফ এ্যান্ড দেন ম্যারি মী।

মীর্জা গম্ভীর হয়ে বললো, কচু পোড়া খাও।

মিস দেশাই এক হাত দিয়ে মীর্জার গলা জড়িয়ে ধরে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, আমার সঙ্গে ঝগড়া করলেও ছেলেটা ভাল কিন্তু ওর স্ত্রী বীণা আরো অনেক ভালো।

সত্যি বীণা বড় ভাল মেয়ে। যেমন দেখতে তেমন স্বভাব। আমি ব্রাডফোর্ডে বেশী দিন থাকি নি কিন্তু ঐ সামান্য কয়েক মাসের মধ্যেই বীণার সঙ্গে আমার দারুণ বন্ধুত্ব হয়েছিল, অনেক দিন পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল ও হিন্দুর মেয়ে। কল্পনা করতে পারি নি বাঙ্গালী হলেও মুসলমান পরিবারের মেয়ের নাম বীণা হতে পারে। একদিন এ্যালবামে ওদের বাড়ীর ছবি দেখতে দেখতে জিজ্ঞাসা করলাম তোরা হিন্দু না?

বীণা হাসল। 'না, আমরা মুসলমান।'

'তাহলে তোমার নাম বীণা হলো কি করে?'

'তোমরা তো আমাদের দেশের খবর রাখো না তাই জান না এখন মেয়েদের নাম বা পোশাক দেখে বুঝতে পারবে না কে হিন্দু, কে মুসলমান।'

'তাই নাকি?'

'ইস্ট পাকিস্তান বলতে যে ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, সে ইস্ট পাকিস্তান আর নেই।'

আমি কোনকালেই রাজনীতি করিনি। রাজনীতির বিশেষ খবরও রাখি না। তাই জিজ্ঞাসা করলাম, তার মানে?

'বাঙ্গালী জাতি আর বাংলা ভাষা ছাড়া আমাদের ওখানে আর কিছুর অস্তিত্ব তুমি শুনবে না দেখবে না।'

আমি কলকাতার মেয়ে। বাড়ীর পাশেই ঢাকা কিন্তু সেই পাশের বাড়ীর খবর পেলাম বেপাড়ায় এসে।

শুধু বীণা নয়, ব্রাডফোর্ডে এসে পাশের বাড়ীর আরো বহু লোকের সঙ্গে পরিচয় ও হৃদ্যতা হলো। মীর্জার সঙ্গে সঙ্গে আমিও কর্ণওয়াল এরিয়ায় সিলেটি-দের আড্ডাখানায় যাতায়াত শুরু করলাম। হক সাহেবের দোকানে বসে বসে চা আর পাঁপর ভাজা খেতে খেতে গল্প করি, লোকজনের আসা-যাওয়া কেনা-কাটা দেখি। মনসুর আলি সাহেব দোকানে ঢুকেই আমাকে দেখে বললেন, দু'দিন আপনার অফিসে গেলাম কোন দিনই দেখা হলো না।

'কবে গিয়েছিলেন?'

'লাস্ট উইকের বুধবার গিয়েছিলাম। মীর্জা সাহেব আপনাকে আমার কথা বলেন নি?'

'কই না তো। কোন দরকার ছিল?'

'তেমন কিছু না তবে ভেবেছিলাম একটা এ্যাপ্লিকেশন দেখিয়ে নেব।'

'কিসের এ্যাপ্লিকেশন?'

'বড় সাহেব ছুটি মঞ্জুর করার পর ছোট সাহেব হুকুম দিলেন এখন ছুটি মঞ্জুর করা যাবে না। মনসুর আলি সাহেব হঠাৎ গলার স্বর একটু চড়িয়ে বললেন, ছুটি হবে না বললেই কি আমি ছেড়ে দেবার পাত্র! সঙ্গে সঙ্গে 'স আর' ও সাহেবের কাছে একখানা দরখাস্ত দিয়ে দিলাম.,..।...

'ঐ দরখাস্তই আমাকে দেখাতে......

পাঁচ বছর পর মনসুর আলি সাহেব বিবির কাছে যাবেন বলে বেশ উত্তেজিত। আমাকে কথাটা শেষ করার সুযোগ না দিয়েই আসল কথাটা বলে দিলেন, মন যখন একবার উড়ু উড়ু হয়েছে তখন আর কি কেউ আমাকে ঠেকাতে পারে দিদি?

কর্ণওয়াল অঞ্চলে পূর্ববাংলার মানুষেই ভর্তি। বিশেষতঃ সিলেটের। নোয়াখালি কুমিল্লা চট্টগ্রামের লোকও আছেন তবে কম। বরিশাল ঢাকা ফরিদ-পুরের লোক নেই বললেও চলে। এককালে এরা দু মুঠো অন্ন আর এক টুকরো কাপড়ের জন্য হাহাকার করেছেন, তারপর একদিন কলকাতা আর চট্টগ্রাম বন্দরে নাম লিখিয়ে পাড়ি দিয়েছেন সাত সমুদ্র তেরো নদী। শেষ পর্যন্ত ঘুরতে ঘুরতে, ব্রাড-ফোর্ডে। যে ইংলিশ টুইডের জন্য সারা পৃথিবীর সৌখীন ও রুচিবান মানুষ উদগ্রীব, যে সব সুটিং-এর কোট-প্যান্ট তৈরী করে অকসফোর্ড স্ট্রীট—বণ্ড স্ট্রীট রিজেন্ট স্ট্রীটের শত সহস্র দোকান দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়ে সুনাম অর্জন করেছে, সেসব আরো অনেকের সঙ্গে সঙ্গে এদের হাতেই তৈরী হয়। ইঞ্জিনীয়ারিং কার-খানাতেও অনেকে কাজ করেন। আয় অনেক। সপ্তাহে তিরিশ চল্লিশ পাউণ্ড। টাকার হিসেবে সাড়ে পাঁচ শ থেকে সাড়ে

সাত শ—আট শ। অত্যন্ত সাধারণ জীবন যাপন করেন সবাই। আয়ের অর্ধেকও ব্যয় করেন না। দু-এক মাস পর পর ব্যাংক মারফত দেশে মোটা টাকা পাঠিয়েও বেশ কিছু নিজেদের কাছে রেখে দেন। চার-পাঁচ বছর পর যখন এরা দেশে যান তখন সব চাইতে আগে আসেন হক সাহেবের দোকানে।

'দিদি ডজনখানেক জাপানী নাইলনের শাড়ী বাইছ্যা দ্যান তো।'

বিবির জন্য নাইলনের শাড়ী-ব্লাউজ পোলাপানদের জন্য কোট-প্যান্ট, স্কার্ট-ব্লাউজ ছাড়াও ডজনখানেক নাইলনের লুঙ্গি চাঁদপুর কলেজে যে ভাই-ব্যাটা বি-এ পড়ে তার জন্য রীফ কেস, লং কোট' মাউন্টেন পেন ছাড়াও কতজনের জন্য এরা কত কি কেনেন।

আমি হক সাহেবের দোকানে বসে বসে দেখি আর ভাবি। ভাবি কত দীর্ঘদিন নির্বাসনে থেকে বরফ ঝরা শীতের রাতে মেশিনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পরিশ্রম করে এরা অর্থ উপার্জন করেন কিন্তু নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিলাস-ব্যসনের প্রতি কি নিশ্চিন্ত উপেক্ষা। তিলে তিলে সঞ্চয় করেন চারপাশের সব আত্মীয়-পরিজনের সুখের জন্য। শুধু ওদের মুখের হাসি দেখার জন্য কি আত্মত্যাগ।

'গণ্ডা চারেক লণ্ঠন দাও।'

হক সাহেব লণ্ঠন আনতে ভিতরে গেলেই আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করি লণ্ঠন! এখান থেকে লণ্ঠন নিয়ে যাবেন?

মনসুর আলি সাহেব হাসেন।" বলেন, দিদি, আমাদের গেরাম তো আর বিলাতের গেরাম নয়। লণ্ঠন ছাড়া কি কাম চলে?

'তা তো বুঝলাম কিন্তু এখানে কি লণ্ঠন তৈরী হয়?'

'এ'তো জার্মান লণ্ঠন!'

ব্রাডফোর্ডের কর্নওয়াল প্লেসের হক সাহেবের দোকানে না গেলে আমি জানতাম না জার্মানীতে লণ্ঠন তৈরী হয়। আরো অনেক কিছু জানতাম না। জানতাম না ঐ লণ্ঠনের আলোয় শুধু মনসুর সাহেবের ঘর আলো হবে না, আলোয় আলোয় ঝলমল করে উঠবে ওর মন, ওর বিবির অন্তর।

এই পৃথিবী চলার পথে এগুতে গিয়ে মানুষের কাছেই দুঃখ পেয়েছি, আঘাত পেয়েছি কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কাছেই ভালবাসা পেয়েছি। মুগ্ধ হয়েছি তাদের আন্তরিকতায়। বেশী দিন ব্রাডফোর্ডে থাকি নি। বিজয়ার চাপে নতুন চাকরি নিয়ে আবার লণ্ডন ফিরে এসেছি। তা হোক। ব্রাডফোর্ডের ঐ কালো কালো মানুষগুলোকে কাছ থেকে দেখার, জানার তাদের ভালবাসা পাবার দরকার ছিল আমার। বঞ্চনের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারাতে বসেছিলাম কিন্তু মানুষের প্রতি আস্থা, বিশ্বাস না থাকতে তো এই সংসারে কেউ টিকতে পারে না। আমিও পারতাম না। ব্রাডফোর্ডের মীর্জা, বীণা মিস দেশাই আর কর্নওয়াল এরিয়ার ঐ মানুষগুলো আমাকে আবার মানুষকে বিশ্বাস করার, ভালবাসার ক্ষমতা ফিরিয়ে দিল। ওদের সঙ্গে আমার আর কোনদিন দেখা হবে কিনা জানি না কিন্তু পুরানো দিনগুলোর কথা মনে হলেই একটু পিছন ফিরে তাকালেই ওরা সবাই ভিড় করে আসে।

'এক্সকিউজ মী, ইউ উইল হ্যাভ কফি আর টি?'

কানের কাছে এয়ার হোস্টেসের কথা শুনেই জানলা থেকে দৃষ্টিটা ভিতরে এনে বললাম, টি।

সঙ্গে সঙ্গে আমার কাপে চা আর দুধ ঢেলে দিলেন এয়ার হোস্টেসটি। মিঃ ওয়ালাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই উনি কাপ এগিয়ে দিলেন। চায়ে ভরে গেল কাপ।

চায়ের কাপ মুখে দেবার আগেই কমাণ্ডার অফ দ্য এয়ার ক্রাফট যাত্রীদের উদ্দেশ্যে বললেন, আই হোপ ইউ হ্যাভ ইওর লাঞ্চ এ্যান্ড মাস্ট বী ডিলাইটেড টু নো দ্যাট উই উইল বী ওভার ফ্লোরেন্স ইন টু মিনিটস! অর্থাৎ আমরা এখন রোম থেকে মাত্র একশ আশী মাইল উত্তরে।

কমাণ্ডারের ঘোষণা শুনেই চমকে উঠলাম। তাহলে তো আধ ঘণ্টাও দেরী নয়। আধ ঘণ্টা পরেই রোম। ইউরোপ শেষ। এর পরই মধ্যপ্রাচ্য, বেইরুট। মাত্র একটা হল্ট। তারপরই তো দিল্লী! ঝড়ের বেগে ঘড়ির কাঁটা ঘুরে যাবে। যাচ্ছে। সকালে লণ্ডন, মধ্যাহ্নে রোম, সন্ধ্যায় বেইরুট, রাত্রির অন্ধকার শেষ না হতেই দিল্লী!

'হ্যাভ ইউ ভিজিটেড রোম?' মিঃ ওয়ালা চা খেতে খেতে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

'আই এ্যাম সরি......

'রোম দেখেন নি?'

'না।'

এনি ডোম বর ফ্রেণ্ড উড হ্যাভ বট ইউ হিয়ার।'

'ইউ থিংক সো?'

'সার্টেনলি।'

'আপনি আপনার গার্ল ফ্রেণ্ডকে নিয়ে এসেছেন?'

'আই ডিড বাট......

'আবার বাট কেন?'

'যাকে নিয়ে এসেছিলাম তার সঙ্গে আমার আর বন্ধুত্ব নেই।'

'খুব স্বাভাবিক।'

'খুব স্বাভাবিক কেন?'

'আই মীন ইট ইজ ভেরী কমন এ্যামংস্ট ইউ পিপুল...

মিঃ ওয়ালা চা শেষ করে আমার দিকে একটু ঝুঁকে বললেন, আমি প্রতিজ্ঞা করতে পারি আপনার মত একজনকে জীবনে পেলে —

'আমরা রোমে ব্রেক-জার্নি করব?'

'কেন?'

'তাহলে সেণ্ট পিটার্সেই আমাদের বিয়ে হতে পারে।'

মিঃ ওয়ালা হাসি সামলাতে পারলো না। ওর সঙ্গে সঙ্গে আমিও হাসতে শুরু করলাম।

'মে আই হ্যাভ ইওর এ্যাটেনশন প্লীজ! উই উইল বী সর্টলি ল্যাণ্ডিং এ্যাট রোম।...

সঙ্গে সঙ্গে আণ্ডার-ক্যারেজ খোলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি এয়ার ক্রাফট রোমের উপর এসে গেছে।

(ক্রমশঃ)

নিউইয়র্কে ১৯৫৯ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম কোয়ান্টাম ইলেকট্রনিকস সম্মেলনে (বাঁ থেকে) জে পি গর্ডন, এন জি বাসভ, এইচ জে ৎসাইগার, এ এম প্রোখোরভ ও সি এইচ টাউনেস। বাসভ প্রোখোরভ ও টাউনেস মেসার উদ্ভাবনায় তাঁদের কৃতিত্বের জন্যে ১৯৬৪ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন।

বিজ্ঞানের কথা

লেসার

কলকাতার একটি ইংরেজী দৈনিকের খবর থেকে জানা যায়:

'কলকাতায় বিজ্ঞানচর্চার ভারতীয় সমিতিতে (ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অব সায়েন্স) সম্প্রতি একটি লেসার ইউনিট স্থাপিত হয়েছে। শহরে এ-জাতীয় ইউনিট এই প্রথম এবং এটি ব্যবহৃত হবে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার উদ্দেশ্যে। আর্গন আয়ন লেসার ইউনিটটি আমদানীকৃত কিন্তু সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাকার্যের আয়োজন তৈরি হয়েছে বিজ্ঞানচর্চার ভারতীয় সমিতিতে।

'লেসার (লাইট অ্যাম্পলিফিকেশন বাই স্টিমুলেটেড এমিসন অব রেডিয়েশন'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। হচ্ছে ১৯৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে উদ্ভাবিত অপটিকস-এর একটি নতুন ক্ষেত্র। প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে একটি একক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকের অত্যন্ত ঘনসম্বদ্ধ রশ্মি, যার ফলে এই রশ্মি এই অসাধারণ গুণ লাভ করে যে দীর্ঘ দূরত্ব পার হতে গিয়েও যথেষ্ট মাত্রায় ছড়িয়ে পড়ে না। শিল্পে লেসার-এর বহু ব্যবহার শুরু হয়েছে এবং বহু ক্ষেত্রে তার নতুন নতুন প্রয়োগের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। এ-কারণে ভারতের মতো উন্নতিশীল দেশের পক্ষে লেসার রশ্মির সাহায্যে গবেষণা খুবই প্রয়োজনীয় হতে পারে।

'বিজ্ঞানচর্চার ভারতীয় সমিতির ইউনিটটি ব্যবহৃত হবে আণবিক পরিকীর্ণতা অনুশীলনের জন্যে। এ থেকে বস্তুর গঠন ও ধর্ম সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে সহায়তা হবে। লেসার কমিউনিকেশনের সম্ভাবনা অনুশীলন করে দেখার একটি প্রস্তাবও রয়েছে। তত্ত্বগত দিক থেকে লেসার-এর একটি একক রশ্মির মধ্যে বিশ্বের তাবৎ বেতার টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন কমিউনিকেশন অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।'

'বিজ্ঞানচর্চার ভারতীয় সমিতির অপটিকস বিভাগে ইতিমধ্যেই একটি হিলিয়াম-নিয়ন লেসার ইউনিট নির্মাণের পরিকল্পনা শুরু করা হয়েছে। লেসার ইউনিটের সবচেয়ে পরিশীলিত (সফিসটিকেটেড) অংশ হচ্ছে দুটি অংশ—এ দুটি উৎপন্ন হবে বাঙ্গালোরের একটি কারখানায়। ইউনিটটি স্থাপিত হবার পরে এই বিভাগ শহরের ও পশ্চিমবাংলার অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতায় লেসার-এর বিভিন্ন ব্যবহার নিয়ে গবেষণা চালাবার আশা রাখে।'

(খবরে অতঃপর বলা হয়েছে কলকাতায় লেসার ইউনিটটি স্থাপিত হবার পরেও গবেষণার উদ্দেশ্যে চালু করা যাচ্ছে না—কারণ যখন-তখন বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়া। ইউনিটটি চালু থাকার সময়ে যদি আচমকা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে গোটা ইউনিটটি ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা।)

* * *

বিজ্ঞানের অগ্রগতির একটি আধুনিকতম নিদর্শন হচ্ছে লেসার। যেমন অপর কয়েকটি নিদর্শন হচ্ছে—নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ ইলেকট্রনিক কম্পিউটার (গণকযন্ত্র) ও রকেট। বস্তুতপক্ষে অনেক বিজ্ঞানী বলে থাকেন যে বর্তমান যুগটি হচ্ছে পরমাণু-শক্তি ইলেকট্রনিক কম্পিউটার ও রকেটের (অর্থাৎ মহাকাশ গবেষণার) যুগ। এই সঙ্গে যদি বলা হয় লেসার-এর যুগও তাহলে লেসার-এর গুরুত্বকে অযথা বাড়ানো হয় না।

আজকের দিনে খবরের কাগজের পাঠকরাও লেসার শব্দটির সঙ্গে কম-বেশি পরিচিত। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে লেসার হচ্ছে এমন এক অসাধারণ রশ্মি যা দূরে যেতে যেতে ব্যাপ্ত হয় না বা ছড়িয়ে পড়ে না (যেমন ব্যাপ্ত হয় বা ছড়িয়ে পড়ে টর্চের আলো বা মোটরের হেডলাইটের আলো ইত্যাদি)। যদি কল্পনা করা হয় আলোকের একটি রশ্মি ফলকের মতো আকার ধারণ করে সিধে যেখানে চলেছে, সেতো দূরেই যাক, এমন কি চার লক্ষ কিলোমিটার (আড়াই লক্ষ মাইল) পার হয়ে চাঁদে এসে পৌঁছলেও আকার সেই ফলকের মতো ব্যাপ্ত হয়নি বা ছড়িয়ে পড়েনি—তাহলে লেসার-এর সবচেয়ে অসাধারণ ধর্মটি সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব। এই বিশেষ ধর্মটি থাকার জন্যে অতি ব্যাপক ও বিচিত্র ক্ষেত্রে লেসার-এর ব্যবহার হতে পারে হচ্ছেও। এমনকি বলা হয়ে থাকে লেসার-এর সাহায্যে মিসাইল পর্যন্ত ঠেকানো যায়। সামরিক ক্ষেত্রে লেসার-এর আরো নানা ব্যবহারের কথা শোনা যাচ্ছে। তবে সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যবহারটি সম্ভবত ঘটতে চলেছে শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশেষ করে চক্ষুর রেটিনাটি যদি কোনো কারণে স্থানচ্যুত হয়ে যায় তাহলে তার 'ঝালাইকার্য' সম্পাদনে।

এমন যে লেসার তা কিভাবে ঘটানো হচ্ছে? উচ্চতর পদার্থবিদ্যার গবেষণার এই বিষয়টি যথাসম্ভব সাধারণ ভাষায় উপস্থিত করার একটা চেষ্টা করা যাক।

* * *

১৯৫৪ সালের ১লা জুলাই তারিখের 'ফিজিক্যাল রিভিউ' পত্রিকায় ছোট একটি ঘোষণা প্রকাশিত হয়েছিল। তিনজন বিজ্ঞানীর নাম—জে পি গর্ডন, জে এইচ ৎসাইগার ও সি এইচ টাউনেস। তার শিরোনাম এইরকম: এমন একটি পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা নির্মিত ও চালু হয়েছে যেটি ব্যবহৃত হতে পারে অত্যন্ত উচ্চ বিশ্লেষণ ক্ষমতাসম্পন্ন স্পেকট্রোমিটার (বর্ণালী-যন্ত্র) মাইক্রোওয়েভ অ্যাম্প্লিফায়ার (অতি ছোট মাপের তরঙ্গকে

পদ্মরাগ মণির সাহায্যে নির্মিত প্রথম লেসার
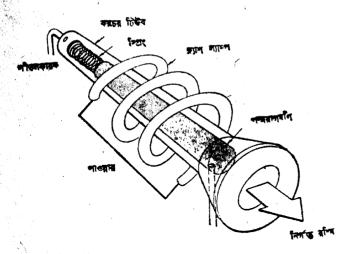
বাড়িয়ে তোলার যন্ত্র) ও অত্যন্ত সুস্থির অসিলেটর (দোলন সৃষ্টির যন্ত্র) হিসেবে। এই ব্যবস্থাটির নাম দেওয়া হল 'মেসার'। এটিও একটি সংক্ষেপিত রূপ পুরো নাম 'মাইক্রোওয়েভ অ্যামপ্লিফিকেশন বাই স্টিমুলেটেড এমিশন অব রেডিয়েশন'। গোড়ার এই মেসার-কে আগে বোঝা দরকার, তারপরে লেসার। দুয়ের মধ্যে তফাৎ সামান্যই, মেসারে মাইক্রোওয়েভ আর লেসারে লাইট। এটুকু বাদ দিলে বাকিটা অভিন্ন: উভয় ক্ষেত্রেই অ্যামপ্লিফিকেশন বা পরিবর্ধন বা আরও সহজ ভাষায় বাড়িয়ে তোলা। কোন উপায়ে? না স্টিমুলেটেড এমিশন বা বাংলায় বলা যেতে পারে উদ্দীপিত নিঃসরণ। কিসের নিঃসরণ? না, রেডিয়েশন বা বিকীরণের। শব্দগুলোর অর্থ বলা হল মাত্র, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কী? পরিবর্ধন ও বিকীরণ যদিও বা বোঝা যায়, কিন্তু উদ্দীপিত নিঃসরণ? অথচ এটাই আসল ব্যাপার। কি মেসার কি লেসার দুটিতেই উদ্দীপিত নিঃসরণটাই মূল বিষয়।

মূল আলোচনায় যাবার আগে 'মাইক্রো-ওয়েভ' ও 'লাইট' শব্দ দুটি পরিষ্কার করা দরকার। সূর্যের আলোর বর্ণালী যখন আমরা দেখি তখন সাতটি রং আমাদের চোখে পড়ে—বেগুনী থেকে লাল পর্যন্ত। কিন্তু এইটুকুই সব নয় এই দৃশ্যমান অংশের দুদিকেই থেকে গিয়েছে বিরাট অদৃশ্য অংশ—একদিকে আলট্রাভায়োলেট বা অতিবেগুনী এবং একস-রে, অন্যদিকে ইনফ্রারেড বা অবলোহিত এবং রেডিও তরঙ্গ। শেষোক্ত তরঙ্গের অতি ছোট মাপের অংশকে (প্রায় অবলোহিত পর্যন্ত প্রসারিত ৩০ সেঃ মিঃ থেকে ১ মি মি পর্যন্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্য) বলা হয় মাইক্রোওয়েভ। আর দৃশ্যমান অংশ হচ্ছে লাইট।

মূলনীতিটা এক। বিকীরণের উদ্দীপিত নিঃসরণ। এই উপায়ে বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে মেসারের বেলায় মাইক্রোওয়েভকে ও লেসারের বেলায় আলো-কে।

উদ্দীপিত নিঃসরণের ব্যাপারটি বুঝতে হলে পরমাণুর আভ্যন্তরিক চিত্রটি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকা দরকার। সকলেই জানেন পরমাণুর যে আভ্যন্তরিক চিত্র বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড উপস্থিত করেছিলেন সেখানে পরমাণুর কেন্দ্রে রয়েছে নিউক্লিয়াস ও তাকে ঘিরে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন (অনেকটা সূর্য ও গ্রহমন্ডলের মতো)। নিউক্লিয়সের পজিটিভ চার্জ ইলেকট্রনের নেগেটিভ চার্জের সমান অতএব স্বাভাবিক অবস্থায় পরমাণু বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ। রাদারফোর্ডের সঙ্গে কাজ করতে এসেছিলেন ডেনমার্কের তরুণ বিজ্ঞানী নীলস বোর। তাঁর কাছে পরমাণুর এই আভ্যন্তরিক চিত্রটি গোল-মেলে বোধ হল। তা এই কারণে: ইলেকট্রনে রয়েছে নেগেটিভ চার্জ, যদি কোনো বৈদ্যুতিক চার্জ দোলে বা কাঁপে তাহলে বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। যে কণিকা থেকে এই তরঙ্গ নিঃসৃত হয় তার এনার্জি বা তেজ তার ফলে খোয়া যেতে বাধ্য। ইলেকট্রনের বেলাতেও এমনি ব্যাপার চলা উচিত। ফলে যে ব্যাপারটি হওয়া উচিত তা হচ্ছে ক্ষয়িত-তেজ ইলেকট্রনের ঘুরতে ঘুরতে ক্রমেই নিউক্লিয়সের দিকে সরে যাওয়া ও শেষ পর্যন্ত নিউক্লিয়াসে পতিত হওয়া। কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে না। অতএব বোর বললেন, প্রচলিত বলবিদ্যার নিয়ম পরমাণুর অভ্যন্তরে খাটে না। তখন তিনি নির্ভর করলেন প্লাঙ্ক ও আইনস্টাইনের ওপরে যাঁরা বলেছিলেন আলোর তরঙ্গ হচ্ছে পৃথক পৃথক কম্পমান আলোর কোয়ানটামের গুচ্ছ (বিষয়টি নিয়ে আগের একটি সংখ্যায় আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি)। [illegible] ব্যাখ্যা করার জন্যে বোর [illegible] করলেন। একটি সূত্রে বলা হ[illegible] ইলেকট্রন এক কক্ষ থেকে অপর কক্ষে 'লম্ফ' দিতে পারে। লাফ দেওয়ার ব্যাপারটি ঘটা মানেই গতির অবস্থা ভিন্ন হয়ে যাওয়া—তার মানে তেজের ভিন্নতাও। এই তেজ নিঃসৃত হয়ে থাকে প্লাঙ্ক আইনস্টাইন আলোর একটি কোয়ানটামের আকারে।

মোট কথাটি এই যে পরমাণুর অস্তিত্ব থাকতে পারে পৃথক পৃথক তেজের অবস্থায় এবং তেজের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় উত্তরণ ঘটলে সুনির্দিষ্ট কম্পনের আলো বিকীরিত হয়।

দুটি ব্যাপার ঘটা সম্ভব। নির্দিষ্ট কম্পনের বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের আকারে পরমাণু থেকে তেজ নিঃসরণ। কিংবা নির্দিষ্ট কম্পনের বিদ্যুৎচৌম্বক তরঙ্গ থেকে একই পরিমাণ তেজ বিশোষণ। প্রথম ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত নিঃসরণ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিশোষণ।

আরো একটি ব্যাপার ঘটা সম্ভব, কৃষ্ণ বস্তুর বিকীরণ নিয়ে তত্ত্বমূলক গবেষণা করতে গিয়ে আইনস্টাইন যা দেখালেন। তা হচ্ছে বিকীরণের উদ্দীপিত নিঃসরণ। স্বতঃস্ফূর্ত নিঃসরণ থেকে এটি সুস্পষ্ট-ভাবে পৃথক।

উদ্দীপিত নিঃসরণ ঘটে যখন নির্দিষ্ট কম্পনের বিদ্যুৎচৌম্বক বিকীরণ এসে পড়ে উচ্চমাত্রার তেজের অবস্থায় একটি পরমাণুর ওপরে। পরমাণুটি তখন উদ্দীপিত হয়ে বিকীরণ করতে শুরু করে। পরমাণু থেকে যখন উদ্দীপিত বিকীরণ নিঃসৃত হয় তখন মুক্তিপ্রাপ্ত তেজ যুক্ত হয় উদ্দীপক তরঙ্গের তেজের সঙ্গে। মূল তরঙ্গটি এইভাবে পরিবর্ধিত হয়ে থাকে এবং মূল তরঙ্গের কোহিয়ারেন্স বা সংসক্তি বজায় থাকে।

এই হচ্ছে মেসারের মূলগত বিষয়।

১৯৫১ ও ১৯৫২ সালে জনকয়েক বিজ্ঞানী পৃথক পৃথক ভাবে মেসার ব্যবস্থার জন্যে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব করার দিকে অগ্রসর হতে পারলেন। তাঁরা হচ্ছেন নিউ-ইয়র্ক কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সি এইচ টৌনেস এবং মস্কো লেবেদভ ইনস্টিটিউটের এন জি বাসভ ও এ এম প্রোখোরভ। এই তিনজন বিজ্ঞানী তাঁদের এই কৃতিত্বের জন্য ১৯৬৪ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৫১ সালে টৌনেস দেখালেন এক ধরনের অণুর স্থিতিস্থাপকতাকে এমনভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে যে উচ্চতর তেজের অবস্থায় অণু অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। তারপরে অণুগুলোকে চালান করা যেতে পারে একটি গহ্বরের (ক্যাভিটি) মধ্যে, গহ্বরটি বাঁধা থাকে তেজের স্তর থেকে স্তরে উত্তরণের দোলনের সঙ্গে। অণুগুলো এখানে একটি সংকেতের দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে তেজ নিঃসরণ করে এবং এমনিভাবে সংকেতটি পরিবর্ধিত হয়।

অণুর সংখ্যা যদি যথেষ্ট অধিক হয় তাহলে গহ্বরের বিকীরণ এমন একটি স্তরে বজায় রাখা যেতে পারে যেখানে গহ্বরের ক্ষতি অণুর তেজের দ্বারা

এটি একটি পরীক্ষামূলক অপটিক্যাল কম্পিউটর মেমোরি। ধারণক্ষমতা প্রচলিত কম্পিউটরের মতোই কিন্তু বেগ হাজার গুণ অধিক। লেখা, মজুদ করা পড়া ও মুছে ফেলার জন্যে এই কম্পিউটরে লেসার রশ্মি ব্যবহার করা হয়। আমেরিকার রেডিও কর্পোরেশনে এটি তৈরী। আগামী দিনের কম্পিউটরের এটি একটি নিদর্শন।

পূরণ হয়ে যায়। অর্থাৎ ব্যবস্থাটি অবিরাম দোলনের অবস্থায় আসতে পারে।

পরে ১৯৫৩ সালের শেষদিকে টোনেস ও তার দুই গবেষক ছাত্র গর্ডন ও ৎসাইগার সাফল্যের সঙ্গে একটি মেসার চালু করতে পারলেন।

অন্যদিকে মস্কো লেবেদেভ ইনস্টিটিউটের বাসভ ও প্রোখোরভ প্রথম উপস্থিত করলেন অ্যামোনিয়া অণুর রেডিও তরঙ্গ অসিলেটর। এই আশ্চর্য ব্যবস্থায় সবকটি অ্যামোনিয়া পরমাণু হুবহু একই দৈর্ঘ্যের বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ বিকীরণ করেছিল। দোলনের কম্পনের এমন এক বিস্ময়কর স্থিরতা বজায় ছিল যে এই নীতিতে প্রস্তুত ঘড়ি হাজার হাজার বছর ধরে নির্ভুল সময় নির্দেশ করতে পারত।

তারপরে ১৯৫২ সালে এই দুজন রুশ বিজ্ঞানী টোনেস প্রবর্তিত মেসার ব্যবস্থার প্রায় অনুরূপ একটি ব্যবস্থার তত্ত্ব উপস্থিত করলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই কঠিন অবস্থার মেসার তৈরি হয়ে গেল। অণুর ঝাঁকের চেয়ে কঠিন অবস্থার মেসারে একটি সুবিধে এই যে তাতে দোলনের মাত্রা একটি মাত্র মাপে বাঁধা থাকে না বিভিন্ন মাপে বাঁধা চলে। পদ্মরাগ-মণির স্ফটিক ব্যবহার করে যে কঠিন অবস্থার মেসার নির্মিত হয় সেটি কৃত্রিম উপগ্রহের বার্তা-প্রেরণ ব্যবস্থায় পরিবর্ধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

১৯৫৮ সালের ডিসেম্বরে টোনেস ও অপর একজন বিজ্ঞানী এমন এক মেসারের পরিকল্পনা উপস্থিত করলেন যা দৃশ্যমান আলোর এলাকায় বা অবলোহিতের কাছাকাছি এলাকায় সক্রিয় হতে পারে। এই বিশেষ মেসারের নাম দেওয়া হল অপটিকাল মেসার বা লেসার।

ফিজিক্যাল রিভিউ পত্রিকার ডিসেম্বর ১৯৫৮ সংখ্যায় টোনেস ও ডঃ আর্থার শাভলভের লেখা একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হল। নিবন্ধটির নাম 'ইনফ্রারেড ও অপটিকাল মেসার'। এই নিবন্ধে তাঁরা দেখালেন কিভাবে মেসারকে দৃশ্যমান আলোর এলাকায় বা অবলোহিতের কাছাকাছি এলাকায় চালু করা চলে। এ জন্যে গহ্বরটিকে তারা গঠন করতে চাইলেন পরস্পরের সমান্তরাল এক জোড়া আরশি দিয়ে। পরিবর্ধনকারী মাধ্যমকে স্থাপন করতে হবে এই দুই আরশির মধ্যে। স্বতঃস্ফূর্ত নিঃসরণ ঘটার ফলে এই মাধ্যম আলোক উৎপন্ন করবে এবং সেই আলোক সকল দিকে গতিশীল হবে। ভিতরে থাকবে একমাত্র সেই আলোক যার গতি সমান্তরাল আরশির অক্ষরেখা বরাবর, বাদবাকি অন্য সমস্ত আলোক বারকয়েক প্রতিফলিত হবার পরে কিংবা একবারও প্রতিফলিত না হয়ে বাইরে চলে যাবে। ভিতরে থেকে যাওয়া আলোক দুই আরশিতে অনবরত প্রতিফলিত হয়ে অবিরাম চলাফেরা করে চলবে—তার মানেই অব্যাহত একটি দোলন।

প্রথম অপটিকাল মেসার বা লেসার নির্মিত হয়েছিল রুবি বা পদ্মরাগমণির সাহায্যে। এই মণিতে আছে স্ফটিকাকার অ্যালুমিনিয়ম অক্সাইড ও অল্প পরিমাণ ক্রোমিয়াম অক্সাইড। ক্রোমিয়ামের অস্তিত্ব ত্রিগুণ চার্জবিশিষ্ট আয়নের আকারে যে কারণে পদ্মরাগমণিতে আলোর ঝিলিক ওঠে। এই পদ্মরাগমণির ওপরে তীব্র আলোর ঝলক ফেলে ঈপ্সিত ফললাভ করা গেল। লেসারে মণির আকার একটি নলের মতো—দৈর্ঘ্য ৪ সে মিঃ, ব্যাস ০-৫ সে মিঃ। দুই প্রান্ত আয়নার মতো পালিশ করা। দণ্ডটিকে ঠাণ্ডা করা হচ্ছে মাইনাস ১৯৬ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেসের তরল নাইট্রোজেন দিয়ে। আলোর ঝলক ওঠে ফ্ল্যাশ ল্যাম্পে এবং তার স্থায়িত্ব এক সেকেণ্ডের হাজার ভাগের এক ভাগ। ফলে নির্গত রশ্মির স্থায়িত্বও অনুরূপ খণ্ডিত হয়ে থাকে।

পরবর্তীকালে তৈরি হয়েছে গ্যাস লেসার হিলিয়াম-নিয়ন ইত্যাদির সাহায্যে। গ্যাস লেসারের নির্গত রশ্মি খণ্ডিত নয়, অবিরাম।

থেকে নির্গত আলো কোহিরা-রেণ্ট একথা আগে বলেছি। বাংলায় বলা যেতে পারে, সম্বন্ধ ও সুসংগত। কেননা, এই আলো সুশৃংখল ও অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গে গঠিত। সাধারণ আলোর বেলায় একথাটি বলা চলে না তা সে তারারই হোক বা মোমবাতিরই হোক বা ইলেকট্রিক বাতিরই হোক। সাধারণ আলো ইনকোহিয়ারেন্ট। বিজ্ঞানীরা এই আলোকে [illegible] থাকেন হট্টগোল। তার মধ্যে কোনো [illegible] শৃংখলা নেই।

লেসার এই কমিউনিকেশনের [illegible] এত গুরুত্বপূর্ণ। কমিউনিকেশন ইঞ্জি-নিয়াররা চান ফ্রিকোয়েন্সির সীমানায় একটি ফাঁক হট্টগোল থেকে মুক্ত। এমনি একটি ফাঁক পাওয়া গেলেই তাকে ভর করে কমিউনিকেশনের অজস্র চ্যানেল তৈরি হতে পারে। এবং তার চেয়ে নিখুঁত আর কিছু হতে পারে, বিজ্ঞানীরা এখনো পর্যন্ত তা কল্পনা করতে পারেন না। সোভিয়েত ইউনিয়নে ইতিমধ্যেই লেসার কমিউনিকেশনের কাজ শুরু হয়ে গেছে।

—অয়স্কান্ত

ভূস্বর্গ কাশ্মীর আজ নানা রাজনৈতিক কারণে সমগ্র পৃথিবীতে যে ভাবে প্রসিদ্ধিলাভ করেছে, তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও অনন্য শিল্পকার্যও যেন তার কাছে নিষ্প্রভপ্রায়। যদিও ভারত সরকারের অর্থানুকূল্যে স্থানীয় সরকার বিভিন্ন বিষয়, যথা—শিক্ষা পর্যটনকারীদের যাতায়াত এবং ঘাটতি খাদ্যাদি পূরণ করে, জনসাধারণকে উন্নত জীবনধারণের পক্ষে নানাভাবে সাহায্যাদি করে আসছেন তথাচ কাশ্মীরে বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব অসন্তোষ ও অশান্তির কারণও যে মধ্যে মধ্যে ঘটে না থাকে তা নয়।

এই কাশ্মীরে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অধিক। কিন্তু একদা হিন্দু রাজার প্রভাবই ছিল এখানে সমধিক এবং কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ নানা শাস্ত্রবিদ্যায় যেমন পারঙ্গম ছিলেন, তেমনি অতীতে সেখানে শাস্ত্রচর্চার প্রতিষ্ঠানও ছিল প্রচুর। স্বয়ং শঙ্করাচার্য এক সময় দিগ্বিজয়ে বহির্গত হয়ে কাশ্মীরে এসে অবস্থান করেন এবং সে কারণ আজও শ্রীনগরের সন্নিকটে 'শঙ্করাচার্যের পাহাড়' নামে একটি পর্বত নামাঙ্কিত হয়ে আছে।

হিন্দুরাজগণের প্রভাবে যখন কাশ্মীর সম্পূর্ণভাবে প্রভাবান্বিত ছিল তখন কাশ্মীরে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের শাস্ত্রচর্চা কিরূপ ছিল এবং যে সকল পণ্ডিতগণ বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থাদি এখানে রচনা করেছেন সে-সম্বন্ধে বহু স্থানে উল্লিখিত আছে। কাশ্মীর সম্রাটদের ইতিহাস বিষয়ক 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থের রচনাকার কহ্লন-এর (১০৭০ শক) নাম যেমন বিদ্বজ্জন সমাজে পরিচিত, তেমনি কাশ্মীর সম্রাট অনন্তদেবের রাজত্বকালে 'কথা-সরিৎসাগর' গ্রন্থের রচনাকার সোমদেবভট্টের নামও সর্বজনপরিচিত।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে চতুষ্পাঠী ও আশ্রমে শাস্ত্রচর্চার নিদর্শন যেমন ছিল অপর্যাপ্ত তেমনি কাশ্মীরেও সেই শাস্ত্রচর্চা যে ভারতেরই অনুরূপ ছিল তার নিদর্শন পাওয়া যায় ১৩২৫ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'অর্চনায়' প্রকাশিত নিম্নোক্ত রচনাটি থেকে। এই

রচনাটির নাম 'কাশ্মীরে শাস্ত্রচর্চা' এবং লেখকের নাম ব্যাকরণোপাধ্যায় হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী।

কাশ্মীরে শাস্ত্র-চর্চা

কাশ্মীর দেশ প্রাকৃতিক শোভাসম্পদে যেরূপ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ এক সময়ে জ্ঞান-গৌরবেও সমুজ্জ্বল ছিল। ন্যায়, বেদান্ত কাব্য ইতিহাস তন্ত্র ব্যাকরণ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই কাশ্মীরদেশীয় পণ্ডিতগণ অনন্যসাধারণ প্রতিভা প্রকাশ করিয়া জগতে অক্ষয়-কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সেই সকল গ্রন্থ এক্ষণে অনেকাংশে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কথিত আছে, জয়াপীড় নামক প্রবল পরাক্রান্ত কাশ্মীরনৃপতি নেপাল আক্রমণ করিয়া তথায় শত্রুহস্তে বন্দী হন। রাজার অনুপস্থিতিকালে রাজ্ঞী রাজকার্য পরিচালনা করিতেছিলেন। এই অবসরে সুযোগ বুঝিয়া রাজার শ্যালক কাশ্মীর আক্রমণ করেন। ভ্রাতার নিকট রাজ্ঞীর প্রেরিত সৈন্য পরাজিত হয়। পতিব্রতা রাজ্ঞী পতির শত্রু স্বীয় ভ্রাতার অধীনতা স্বীকার না করিয়া খুব সাধারণভাবে কতিপয় বিশ্বাসী পরিজন সঙ্গে লইয়া রাজধানী হইতে পলায়ন করেন এবং এক গ্রামে ছদ্মবেশে সামান্যভাবে বাস করিতে থাকেন। রাজ্ঞী অলোকসামান্য রূপবতী ছিলেন। সেই গ্রামের কোন ব্রাহ্মণ যুবা রাজ্ঞীর রূপলাবণ্যে অত্যন্ত বিমোহিত হন; অবশেষে মানসিক উৎকট চাঞ্চল্যবশতঃ তিনি কঠিন পীড়ায় অভিভূত হইয়া পড়েন। অনেক চিকিৎসা করিয়াও ঐ পীড়ার কিছুমাত্র উপশম হইল না, ব্রাহ্মণ যুবা উত্তরোত্তর অধিকতর অবসন্ন হইয়া পড়িলেন অবশেষে মৃত্যুর করাল ছায়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

এই ব্রাহ্মণ যুবা এক বিধবার একমাত্র পুত্র ছিলেন। অনাথা বিধবা অনেক চেষ্টায় পুত্রের পীড়ার কারণ সবিশেষ অবগত হইলেন। রাজ্ঞীকে তিনি রাজ্ঞী বলিয়া জানিতেন না; পরন্তু এক সুশীলা মহীয়সী মহিলা বলিয়া জানিতেন। তিনি রাজ্ঞীর নিকট উপস্থিত হইয়া একান্তে তাঁহাকে সকল কথা জানাইয়া উপস্থিত বিপদে কাতর ভাবে তাঁহার দয়া ভিক্ষা করিলেন। মহীয়সী রাজ্ঞী তাঁহাকে মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা দিয়া বিদায় করিলেন এবং পরদিন আসিতে বলিয়া দিলেন। তাহার পর পরদুঃখকাতরা জয়াপীড়-মহিষী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের নিকট ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন যে যদি কোন ব্রাহ্মণের প্রাণ রক্ষার্থ কোন নারী নিজের পাতিব্রত্য খণ্ডিত করে তবে তাহার শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত কি?

পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দিলেন যে, এরূপস্থলে তুষানলই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। ধর্মপরায়ণা রাজ্ঞী সেই অনাথা বিধবার প্রাণরক্ষা করিয়া অবশেষে তুষানলে প্রাণ বিসর্জন করিলেন। এদিকে জয়পীড় কৌশলে কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নিজের সৈন্যসকল একত্র করিলেন এবং অতুল বিক্রমে নেপাল আক্রমণ করিয়া পদদলিত ও লুণ্ঠিত করিলেন। তাহার পর বিজয়ী সৈন্য লইয়া কাশ্মীরের দিকে প্রধাবিত হইলেন। তাঁহার শ্যালক তাঁহার পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া কাশ্মীর ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন।

জয়াপীড় কাশ্মীরে উপস্থিত হইয়া পত্নীর শোচনীয় পরিণাম অবগত হইয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তাঁহার পত্নীর এরূপ শোচনীয় পরিণামের কথা সাধারণে জানিত না, রাজাও প্রচার করিলেন না। এক সময়ে তিনি রাজ্যের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া পূর্বোক্ত বিষয়ে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন।

এই পণ্ডিতেরা তুষানলের ব্যবস্থা দিলেন না, দান ও অন্যরূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিলেন। রাজা মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, পরন্তু বাহিরে মনের ভাব কাহাকেও জানিতে দিলেন না, যথোচিত সম্মানের সহিত পণ্ডিতবর্গকে বিদায় করিলেন। ইহার পর রাজা মন্ত্রীগণকে আদেশ করিলেন যে, আমার শাস্ত্রগ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে; আমার রাজ্যে যাহার নিকট যত শাস্ত্রগ্রন্থ আছে, সমস্ত সংগ্রহ করিতে হইবে। ঘোষণা করা হউক যে, শাস্ত্রগ্রন্থের বিনিময়ে গ্রন্থের স্বামী তুল্য পরিমাণ সুবর্ণ মুদ্রা পাইবেন।

রাজার আদেশানুসারে এইরূপ ঘোষণা করা হইলে প্রজাবৃন্দ দলে দলে আসিয়া স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে শাস্ত্রগ্রন্থ সকল রাজ-ভাণ্ডারে প্রদান করিতে লাগিল। রাজকোষ শূন্য হইল, সেখানে স্বর্ণমুদ্রার শূন্যস্থান গ্রন্থরাজির দ্বারা অধিকৃত হইল। এইরূপে যখন গ্রন্থ-সংগ্রহ সমাপ্ত হইল তখন এক-দিন অকস্মাৎ জয়াপীড় শুষ্ক কাষ্ঠস্তূপের সহিত অমূল্য গ্রন্থরাজি সজ্জিত করাইয়া দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ইহার পূর্ব্বে মন্ত্রী ও প্রজাবর্গ কেহই তাঁহার অভিপ্রায় বিন্দু-মাত্র জানিতে পারে নাই। এইরূপে পত্নী-শোকে উন্মত্তপ্রায় রাজা জয়াপীড়ের ক্রোধের ফলে অসংখ্য শাস্ত্রগ্রন্থ ভস্ম হইয়া গেল।

এই ঘটনা 'তবারিখ কাশ্মীর' নামক পারস্য ভাষায় লিখিত—কাশ্মীরের ইতিহাসে বর্ণিত আছে। কহ্লন পণ্ডিতের রাজতরঙ্গিণীতে এ কথার কিছুমাত্র উল্লেখ না থাকায় অনেকেই ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া থাকেন (১)। পাঠান রাজগণের সময় বহু শাস্ত্রগ্রন্থ 'ডল' নামক হ্রদে নিমজ্জিত করা হইয়াছে; এমন কি সেই সময়ে 'ডালের' অন্তর্গত একটি পথ শাস্ত্র-গ্রন্থের সমবায়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল ইহা অদ্যাবধি জনশ্রুতি ঘোষণা করিতেছে। শ্রীনগরের নিকটবর্ত্তী 'বিচার নাগ' ও 'পণ্ডিতপুর' নামক দুইটি গ্রাম বিদ্যাপীঠ-রূপে প্রসিদ্ধ ছিল। পাঠান রাজগণের প্রথম আক্রমণের সময় এই দুই স্থানের অধিবাসী-গণ বহু শাস্ত্রগ্রন্থ ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া-ছিলেন। ঐ সকল গ্রন্থ কেহ আর উদ্ধার করিতে পারেন নাই সমস্তই পৃথিবীর সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

এইরূপ ধ্বংসলীলা প্রবলভাবে চলিলেও কাশ্মীরের গ্রন্থ সম্পত্তি এখনও যতটুকু পাওয়া যায়, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে কাশ্মীরে একদিন শারদার প্রিয়তম লীলা-নিকেতন ছিল। কাশ্মীরদেশীয় জয়ন্ত ভট্ট প্রণীত 'ন্যায়মঞ্জরী' অতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। এই গ্রন্থ এক সময়ে পঠন-পাঠন অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। 'ন্যায়' রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গোপাধ্যায় 'তত্ত্বচিন্তামণি' গ্রন্থে জয়ন্তভট্টের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বেও কাশ্মীরে এই গ্রন্থের পঠন-পাঠন প্রচলিত ছিল।

একজন বয়োবৃদ্ধ কাশ্মীরক পণ্ডিত আমাকে বলিয়াছিলেন, তিনি গুরুর নিকট 'ন্যায়মঞ্জরী' গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন। জয়ন্তভট্ট যেমন নৈয়ায়িক, তেমনই অসাধারণ কবি ছিলেন। তিনি বহুস্থলে অতি নিগূঢ় দার্শনিক বিচার সকল সুললিত পদ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ন্যায়দর্শনের অনেক বিষয়ে জয়ন্তভট্ট নিজের স্বতন্ত্র মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থ পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় 'গংগাধর শাস্ত্রী সি আই ই মহোদয়ের সম্পাদকতায় কাশীতে 'ভিজিয়ান গ্রাম সংস্কৃত সিরিজে' মুদ্রিত হইয়াছে।

কাশ্মীর-সদানন্দ প্রণীত অদ্বৈত ব্রহ্ম-সিদ্ধি বেদান্তের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। 'যোগবাশিষ্ট রামায়ণ' অদ্বৈতমতের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহা বাল্মীকি-রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও, ইহার রচনাপদ্ধতি ও রামায়ণের রচনাপদ্ধতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার শাস্ত্রী মহোদয় ইহার রচনা-পদ্ধতির সমালোচনা করিয়া এই গ্রন্থ কোন কাশ্মীরী পণ্ডিতের রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মুকুন্দরাম শাস্ত্রী মহাশয় পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন। যোগবাশিষ্ট রামায়ণ অদ্বৈতমতের অত্যন্ত পোষক গ্রন্থ, পরন্তু আচার্য শংকর কোন স্থলেই যোগবাশিষ্ট রামায়ণের কোন শ্লোক প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করেন নাই অথবা কোন প্রসঙ্গে যোগবাশিষ্টের নাম কোথাও করেন নাই—ইহাও চিন্তা করিবার বিষয়।

'প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন' কাশ্মীরের অনন্য-সাধারণ সম্পত্তি। তন্ত্রশাস্ত্রের তিনটি আম্নায় প্রসিদ্ধ—কাশ্মীর আম্নায় গৌড় আম্নায় ও কেরল আম্নায়। কাশ্মীর আম্নায়ের তন্ত্রসকল আমাদের বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ নাই। এই কাশ্মীর আম্নায়ের তন্ত্রকে অবলম্বন করিয়া কাশ্মীর দেশে 'প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন' প্রচারিত হইয়াছে। জৈমিনির পূর্ব্ব মীমাংসায় যেরূপ বেদের কর্ম্মকাণ্ডের মীমাংসা করা হইয়াছে, বাদ-রায়ণের উত্তর মীমাংসায় যেরূপ উপনিষদের মীমাংসা করা হইয়াছে, এই 'প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শনে' সেইরূপ তন্ত্রের মীমাংসা করা হইয়াছে। এই 'প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন' শৈবদিগের দর্শন। এই দর্শনের মত শংকর-দর্শনের সহিত অনেকাংশে একরূপ। কাশ্মীরের পুরাতত্ত্ব বিভাগ হইতে সম্প্রতি 'শিবসূত্র-বিমর্শিনী', 'ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞা' এবং 'প্রত্যভি-জ্ঞাহৃদয়ম' নামে তিনখানি 'প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শন' সম্বন্ধীয় গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

—ক্ষপণক

১। এই ঘটনা আমরা কাশ্মীরের পুরা-তত্ত্ব বিভাগের প্রধান পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মুকুন্দরাম শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি।

সেই লোকটি

দুঃখে-সুখে এক পাড়ায় একই গলির ঘনত্বে পাশাপাশি বড় হয়েছি, ঘুরে-ফিরে জলের বৃত্তের মত আবার কাছাকাছি এসেছি। বড় হয়ে পর্যন্ত দেখেছি, অনিল সেই শান্ত, ভেতরগুমো, সাত চড়ে রা না-কাড়া সেই সাবেক অনিলই। খুব নিয়মিত জীবনযাত্রা। পরিবারে সাকুল্যে তিনটি মানুষ—অনিল, অনিলের মা ও স্ত্রী। বছর দেড়েক মাত্র বিবাহ হয়েছে অনিলের। দিব্যি লক্ষ্মীপনা মুখের বউ। অনিলের বাবা কিছু কোম্পানীর কাগজ ও হাজার কয়েক টাকা ঘরকুনো-ছেলের জন্য রেখে চোখ বুজেছিলেন, তা ছাড়া দাদামশায়ের আমলের টালা একতলা বাড়ী—এ সব নেড়েচেড়ে আর কাস্টমস অফিসে কনিষ্ঠ কেরানীর কাজ করে তা মোটামুটি বেশ আঁচবিহীন জীবনই যাচ্ছিল স-পরিবারে অনিলের। তবে হঠাৎ কেন এই ভূমিকম্প, এই বিস্ফোরণ মাথার ওপর শান্ত ছাদে অসংখ্য ফাটলের সঞ্চার?

আমার ছোটবোন বুড়ি একদিন বলল, 'বড়দা, মাসিমা তোমাকে বিকেলে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।' মাসিমা মানে অনিলের মা। পরম অপেক্ষা নিয়ে মাসিমা বিকেল থেকে রাস্তার ধারের জানালার জালে চোখ পেতে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি যেতেই বললেন, 'পা টিপে টিপে একেবারে ছাদে চলে যা বাবা—আমি এক্ষুনি আসছি।'

সন্ধের অন্ধকার একটু গাঢ় হলে মাসিমা এসে মাদুর বিছিয়ে বসলেন। একপাশে আমি। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ তিনি আমার হাত দুটো ধরে বললেন, 'অনিলকে বাঁচা তুই!' তারপর, আমাকে কোন কিছু বলতে না দিয়েই ঝর্ণাধারার মত অনর্গল বয়ে গেল তাঁর বেদনাবিদ্ধ কথামালা। এলোমেলো একরাশ যা তিনি বললেন, তার মোদ্দা কথা হল, অনিল একেবারে পাল্টে গেছে। প্রায়ই অফিস যায় না। বালিশে বুক দিয়ে ঘন্টার-পর-ঘন্টা শুয়ে-শুয়ে পা নাড়াতে থাকে। কারো সঙ্গে কথা বলে না। স্ত্রীকে বলে দিয়েছে মায়ের সঙ্গে শুতে। কখনো কখনো প্রচণ্ড চেঁচামেচি করে—এমন কি রাগের চোটে এটা-ওটা ভাঙেও—যা আদতে অনিলের একেবারেই স্বভাববিরুদ্ধ। কোনো কোনো দিন বাসি জামাকাপড় আর গালে একঝোপ দাড়ি নিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে যায়—অবর্ণনীয় শরীরের অবস্থা ও দু চোখ করমচার মত লাল করে দু-তিন দিন বাদে বাড়ী ফেরে। খাওয়া-দাওয়ার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। আমি যেহেতু তার আবাল্য-সুহৃদ, তাই ছেলেকে বোঝার সব আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে এহেন অবস্থার একটা কিছু সুরাহা করার জন্য তিনি আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন।

আমি মনস্থির করে নিলাম। কারণ মাসিমা আর অনিলের সদ্য-পরিণীতা বউটার মুখের দিকে আমি তাকাতে পারছিলাম না। পরের দিনই কলেজে গিয়ে দিন কয়েকের ছুটির জন্য আবেদন করলাম। সন্ধেবেলা অনিলদের বাড়ি গিয়ে দেখি, ও শুয়ে শুয়ে কড়িকাঠ গুনছে। আমাকে দেখে বসতেও বলল না। আমি প্রায় মরীয়া গলায় বললাম, 'তৈরী হয়ে থাকিস। কাল সকালে দুজনে মিলে হপ্তাখানেকের জন্য বেরিয়ে পড়ব।' প্রস্তাব শুনে যেন কিছুটা খুশী-খুশী দেখাল ওকে। ম্লান হেসে বলল, 'তা যাব?'

পরের দিন সকালে রাউরকেলা এক্সপ্রেস ধরে সোজা এসে নামলাম চক্রধরপুরে। ট্রেন থেকে নেমেই দেখি রাঁচি বা হাজারীবাগের চমৎকার তকতকে বাস দাঁড়িয়ে। আমার মতলব ছিল অন্য। হাত দেখিয়ে একটি চলন্ত লরি থামালাম। টেবো ছাড়িয়ে গভীরতর জঙ্গলের পেটের ভেতর ঢুকে হিরনি জলপ্রপাতের কান ঘেঁষে সোংরা স্যাংচুয়ারী পেরিয়ে খাঁই-খাঁই দুপুর মাথায় নিয়ে হেসাডি পি ডবলু বাংলোর দরজায় এসে নামলাম। চারপাশে পাহাড়, নানা রেখায় নদী আর পাহাড়ী জুমচাষের ফলন্ত শোভার ভেতরে শাল সেগুন মহুয়ার গন্ধে মাতাল বাতাস বুকে টানতে টানতে ঢুকলাম বাংলোর ভেতরে। দূর থেকে মাদলের বোল ভেসে আসছিল। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল কাঠুরেদের হরেক মাপের গোলপাতার ছাউনি।

দুপুরে টানা ঘুম দিয়ে যখন উঠলাম, তখন বাংলোর চারপাশে অরণ্যের লম্বা লম্বা ছায়ারা এসে দাঁড়িয়েছে। মাদলের বোল আরও আরও খরতর হতে হতে যেন বা হৃৎপিণ্ডের শব্দ হয়ে যাচ্ছে। একটা টেমি জ্বালিয়ে রেখে গেল কীপার।

কিছুক্ষণ পর অনিল হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'তুই কেন নিয়ে এসেছিস এখানে আমাকে? মা বলেছেন বুঝি' ... আমার উত্তরের তোয়াক্কা না করেই সে বলে যেতে লাগল, আমিও অনিল বলতে যে মানুষটাকে তোরা এতদিন চিনতিস, সে একটা ফাঁপা মিথ্যে পরিচয়ের মানুষ। কি যা তা বকছিস—দুর্বল গলায় প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলাম। ঠিকই বলছি, ফসফরাসের মত দু চোখ জ্বলে উঠল অনিলের, 'আমি যে সমস্ত কিছু জেনে গেছি! আমার নাম অনিল রায় নয়, প্রভঞ্জন রায় আর বিমলা দেবী আমার বাপ-মা নন। যে শৈলেনকাকাকে ছোটবেলা থেকে তোরা আমাদের বাড়ী আসতে দেখতিস, আমি সেই শৈলেন বিশ্বাসেরই ছেলে। তাঁর স্ত্রী মানে আমার মা আমাকে জন্ম দিতে গিয়ে মারা যান। আমার নকল বাপ-মা আসল সেজে এতকাল জগতের সামনে মিথ্যে পরিচয় দিয়ে মানুষ করেছেন আমাকে। মাস দুয়েক আগে মৃত্যুর মুহূর্তে প্রবল বিকারের ঘোরে শৈলেনকাকা আমাকে সব কিছু জানিয়ে গেছেন। যে আমি-কে শুধু তোরা নয়, আমিও জানতাম, এক লহমায় সেই মানুষটা মিথ্যে হয়ে গেছে। এখন আমার চাল্লিশ বছর বয়েস। এই চাল্লিশ বছর-বয়ে বেড়ানো মিথ্যে মানুষটা আজ কোথায়, কার কাছে কি নিয়ে দাঁড়াবে, বলতো অমিত?' দু হাতে মুখ ঢেকে টেবিলে মাথা দিয়ে বালকের মত কাঁদতে লাগল অনিল। আর, এক ভয়াবহ নিষ্ঠুর সত্যের সামনে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র উলঙ্গ মানুষের মত আমি পাথর হয়ে বসে রইলাম।

—অমিতাভ দাশগুপ্ত

ভালবাসা ভালবাসা

আনন্দ বাগচী

উপন্যাস

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ছাত্রীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বন্দনা তার রাশিয়ান ঘড়িতে যেন মুখ দেখতে চেষ্টা করল।

জয়ন্ত প্রথম যেদিন ঘড়িটা তাকে উপহার দেয় এই চমৎকার উপমাটাও সেদিনই দিয়েছিল। বলেছিল তোমাকে এই অটোমেটিক আয়নাটা হাতে পরিয়ে দিলাম, এতে তুমি সময়ের মুখ দেখতে পাবে। জয়ন্ত কবি-সাহিত্যিক, নাটকে এবং পাগল, প্রেমে পাগল অবশ্য। সে ঘড়ির ডায়ালে হয়ত সময়ের সুন্দর মুখশ্রী দেখতে পায়, কিন্তু বন্দনার পক্ষে তা সম্ভব নয়। সে এর ফ্লুরেসেন্ট ডায়ালে রোজ রাত্রিরে একজনেরই মুখ দেখতে পায় যাকে সে শেষবারের মত বিশ্বাস করেছে। কিংবা বলা ভাল বাজী ধরেছে।

সাদার্ণ অ্যাভেনিউ-এর এই সোনার খনির মত টিউশানীটার সন্ধান দিয়েছিল সন্তোষ। বলতে গেলে তার বলাকওয়াতেই বন্দনা কাজটা পেয়ে গেছে। বিলেত ফেরত একজোড়া মেয়েকে সে বাংলা শেখায়। সপ্তাহে তিন দিন, কিন্তু দক্ষিণা দুশো টাকা। টিউশানীটা পেয়ে বন্দনা যেন বেঁচে গেছে। তাই এখানে সে কাঁটায় কাঁটায় ঘড়ি ধরে আসে, অবশ্য কাঁটায় কাঁটায় ছাড়াও পায়। কিন্তু আজ ছাত্রীরা পড়লো না। দিদি জামাইবাবু এসেছেন, সন্ধ্যায় পার্টি আছে। আগে থেকে জানতে পারলে বন্দনা আসতো না, এসে এমন ত্রিশঙ্কুর দশা হত না।

কব্জি ঘড়িতে সময়টা দেখে বন্দনার মেজাজটা একটু খারাপই হয়ে গেল। হাতে এখনো নীট সওয়া ঘন্টা সময়। হাজরার মোড়ে জয়ন্ত থাকবে সাড়ে ছটায় পাংচুয়াল সে রকম হিসেব করেই বাসে ওঠে বন্দনা বাঁদিকের যেকোনো একটা সীটে বসার চেষ্টা করে। জায়গা না পেলে জানালায় ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকে। জয়ন্ত প্রতিটি বাসে লক্ষ্য রাখে স্টপে দাঁড়িয়ে। ওকে দেখলেই উঠে পড়ে। বাড়ির কাছের স্টপ থেকে ওঠে বলেই এই সাবধানতা। তারা দুজনে চলে যায় এসপ্ল্যানেডে। চাটা খায়, ময়দানে বেড়ায় কিংবা বসে গল্প করে। কোনো দিন অ্যাকাডেমি কি রবীন্দ্রসদনে ঢোকে।

কিন্তু আজ এই সওয়া পাঁচটা থেকে সাড়ে ছটা পর্যন্ত বন্দনা একা একা কিভাবে কাটাবে? এ পাড়ায় না আছে কেউ চেনা যেখানে কিছুটা সময় কাটিয়ে নেওয়া যায়। বন্দনা বাসস্টপের দিকে অনিশ্চিত পায়ে এগোতে এগোতে হাতের ফুলের তোড়াটার দিকে নজর দিল। যমজ দুবোনে মিলে দিদিমণিকে এই উপহার দিয়েছে আজ। গোলাপের মাঝখানে ভ্যারাইটি দিয়ে তোড়াটা সাজানো। বন্দনার খুব ভাল লাগলো। আজ জয়ন্তকে সারপ্রাইজ দেবে। বন্দনা মনে মনে জয়ন্তর দুষ্টুমিভরা মুখ দেখতে পেল। কথার প্যাঁচ খেলাতে যা ওস্তাদ, ঠিক বলবে, এ কি রি-প্রোজেকশন মানে পুনরুপহার?

বন্দনা মুখের কাছে ফুলের গন্ধ ভরে ঘ্রাণ নিচ্ছে এমন সময় কে যেন প্রায় ঘাড়ের কাছে মুখ নিয়ে কানেকানে গলায় গেয়ে উঠল, 'গোলাপ মোরে বল তুই ফুটিবি সখি করে—'

চমকে গিয়েছিল, হাত থেকে ফুলের তোড়াটা পড়ে যেতে যেতে রয়ে গেল। পুরুষের গলা ঘাড়ের ওপরে নিঃশ্বাসের ছোঁয়া লেগেছিল পর্যন্ত। কিন্তু ওই মুহূর্তের মধ্যেই জোরে টাল সামলে [illegible] পেরেছিল বন্দনা। এ কখনই জয়ন্ত নয় জয়ন্তর গলা নয়। চমকে দিতে ওর জুড়ি না থাকলেও। জয়ন্ত ভুলেও কখনো গান গায় না। বাথরুমেও নাকি কখনো গুনগুন করে না। তাছাড়া জয়ন্ত এখন এখানে অকল্পনীয়। পাড়ার একটি ক্লাবে সে এখন নতুন নাটকের মহলা দিচ্ছে আর আড়ে আড়ে ঘড়ির দিকে নজর রাখছে।

ঘুরে যাকে দেখল সেও কিন্তু অকল্পনীয়ই ছিল। তাকে দেখা আর ভূত দেখা একই ব্যাপার। সে অনেক দূরের অতীত, সে মৃত আজ বন্দনার কাছে। তার স্মৃতি পর্যন্ত বন্দনা কবে কবরে দিয়েছে।

কী? খুব চমকে গেলে মনে হল? নিখুঁত স্যুটপরা টাই ঝোলানো, চকচকে চৌরি, প্রায় 'হ্যালো কি খবর' ভঙ্গিতে তার প্রদর্শনীর যোগ্য কেতাবী দাঁতগুলো বের করে হাসলো, 'রসভঙ্গ করলাম না তো?'

বন্দনার ভ্রূ এবং চিবুক কঠিন হল, সে হাসলো না, প্রশ্নের জবাবও দিল না। শুধু নীরেট নীরস নুড়ি গড়িয়ে দেবার মত একটা শব্দ দাঁতের ফাঁকে উচ্চারণ করল, 'অ!'

আমি কিন্তু ভূত নই।

হলেও ক্ষতি ছিল না।

মানে?

নাথিং ম্যাটার্স।

কিন্তু একদিন—

যেতে দিন। একদিনের কথা অন্য মেয়েরা ভাবুক। দ্যাট চ্যাপটার ইজ ক্লোজড।

অফ্ কোর্স! অফ্ কোর্স! আমি সেজন্যে আসিনি। পকেট থেকে সিগারেট কেস বের করে।

তবে কি কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলতে? বন্দনার গলায় বারুদ। লোকটা গায়ে মাখলো না।

তুমি তো আমাকে দেখেও না দেখার ভান করছিলে—

পথে বেরিয়ে উটকো পুরুষ দেখে বেড়ানো আমার প্রফেশন নয়।

বাঃ। —ফিল্টার টিপড একটা কিং সাইজ ঠোঁটে চেপে গ্যাসলাইটার জ্বালল, স্মার্ট হবার চেষ্টা করলো কয়েকটা রিং ছেড়ে, 'বাঃ তুমি আজকাল বেশ ইংরিজি বল!'

আমি মুখ্যু মানুষ ইংরেজি বলে একটু মুখ খারাপ করি।

তুমি খুবই রেগে আছ দেখছি।

রাগ? বন্দনা কঠিন গলায় বলে কার ওপরে?

আমার।

আপনি কে?

আমি? আমি সঞ্জয় গাঙ্গুলী। লোকটা ফিল্ম স্টারের মত সপ্রতিভ ভঙ্গিতে কাঁধ নাচিয়ে তৎসহ জুড়ে দেয়, হয়ত মানুষ!

হয়ত! বন্দনা চলে যেতে চায়।

বনু। লোকটা হাত বাড়িয়ে ওর হাত ছোঁয়।

ছোঁবেন না।

ফরগিভ অ্যান্ড ফরগেট, বনু। ক্ষমা কি এতই অপাপা।

বন্দনার হাতের পিঠটা জ্বলে যাচ্ছিল। একটু চুপ করে থেকে বলল ক্ষমা বলে পৃথিবীতে কিছু নেই। মানুষ কিছুই ভুলতে পারে না।

বন্দনা কোনো উত্তর দিল না। হাঁটতে শুরু করলো। সঙ্গে সঙ্গে লোকটাও। লোকটার কোনো নাম নেই, এই মাত্র উচ্চারণ করলেও। বন্দনা মুছে ফেলেছে। বন্দনা সব মুছে ফেলেছে। তবু কিছুই ভোলা যায় না। পুরনো কথা মনে পড়ে। পুরনো কথা মনে পড়লে মাথা গরম হয়ে ওঠে, কান ঝাঁ-ঝাঁ করে। বন্দনা চলছিল। লোকটা সঙ্গে সঙ্গে, বন্দনার পাশে পাশে আসছিল। বন্দনা কিছুই দেখছিল না, কিছুই শুনছিল না। নিশিতে পাওয়া মানুষের মত সে হাঁটছিল। লোকটা যেন কি বলছিল, কিন্তু বন্দনার কানে আসছিল না। অথবা আসছিল, কিন্তু কথাগুলোর কোনো অর্থ হচ্ছিল না। অর্থহীন শব্দের মত কথাগুলো কানে বাজছিল শুধু। চারপাশে মানুষের অসংখ্য টুকরো কথা, গাড়ির শব্দ থামার চলার ব্রেককষার কত রকমের চলে যাওয়ার ফিরে আসার গাছে মাথাভর্তি সান্ধ্য পাখির কিচির মিচির কুকুর ডেকে উঠলো কোথায় [illegible] শব্দ কোথায় যেন কে, কারা হাসছে, গলা ফাটিয়ে হাসছে ডাকছে কলিং বেল আরও কি, কি যেন...আবহ সঙ্গীতের মত... সব কিছু মাড়িয়ে দুপায়ে মাড়িয়ে বন্দনা হাঁটছে হাঁটছে, হাঁটছে...যেন কতদিন দিনান্তর, রাত রাতগুলি...বর্ষা বসন্ত শীত গ্রীষ্ম, কত ঋতুর ফুল বদল পাতা বদল মাস বছর যুগ যুগান্তর পার হয়ে বন্দনা যেন আর এক জীবনে অন্য জগতে পৌঁছে গেছে। সামনের ল্যান্ডস্কেপ গাছ গাছালি মাটির ঢং মাটির রং বাড়ির ছাঁদ মানুষের চলন সব বদলে যাচ্ছে। সামনে সারি সারি কোয়ার্টারস বাগান পিছনে রাস্তা মাটির [illegible] ধানের জমি খোয়াই পেরোলো পিচ-পিচ্ছিল বানওয়ের মত ছুটে গেছে দিগন্তের দিকে উটের পিঠের মত উঁচু নেমে, চারপাশে গাছের [illegible] দেখতে দেখতে [illegible] কোথাও [illegible] কোথাও [illegible] [illegible] আলোর জ্যোৎস্না [illegible] ধীরে [illegible] [illegible] ...

[illegible] ... [illegible] কি যেন [illegible] কি যেন [illegible] [illegible] নেই [illegible] [illegible] পর্যন্ত খুব চেনা [illegible] ...

বন! কে যেন চিৎকার করে উঠে ওকে টানলো দুহাত দিয়ে যেন ছিঁড়ে আনলো এই আজগুবে স্বপন-স্বপন ঘুম আর জাগার সীমানা থেকে। বন্দনা ফুটপাথের ওপর ছিটকে এল কার বুকের মধ্যে বলিষ্ঠ বাহুর ঘেরের মধ্যে অপরিচিত বিশ্বাসের মধ্যে। তার পা থেকে একপাটি জুতো খুলে গেছে ফুলের তোড়াটা আর হাতে নেই আঁচলটা কাঁধ থেকে খসে গিয়ে মাটিতে আর সঙ্গে সঙ্গে গরম ধুলো বাতাসের ঝাপটা দিয়ে ঝড়ের মত কি যেন গা ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল, এক ঝাঁক ভীত কোলাহল মোটা দমবন্ধ জাহাজের বাঁশির মত হর্ন উড়ে বেরিয়ে গেল বন্দনার পিঠ ছুঁয়ে।

কয়েক সেকেন্ড ওরা কেউ নড়লো না, কথা বলল না, শুধু পরস্পর সংবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। বন্দনার বুকের ধক ধক সংকম্পন বুকের দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন এই শব্দটা তার নয় দেওয়ালের ওপিঠ থেকে আসছে, এসে তার বুকের ওপর ভেঙে পড়ছে ঢেউয়ের মত।

বন্দনা ধীরে ধীরে মুক্ত হল পথের ওপর থেকে আঁচলটা তুলে নিয়ে শাড়ি ঠিক করল, আর তখনই জুতোর কথা মনে পড়ল। একপায়ে জুতো আছে এক পায়ে নেই। জুতো খুঁজতে পিছন ফিরলো। ফুটপাথের কিনারে পিচ রাস্তার ওপর চাপা পড়া সাদা পায়রার মত তার জুতোর পাটি পড়ে আছে থেঁতলানো, রক্তাক্ত। কাছে গিয়ে তুলতে গিয়ে দেখে রক্ত নয়, রজনীগন্ধার তোড়াটি একদলা রক্তের মত পিচের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে আছে। এদিকে জুতোর অবস্থা খুবই খারাপ, স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে এক পাশের গোড়ালি [illegible] বেরিয়ে এসেছে। এ জুতোয় আর পা গলানো চলে না, চলা তো দূরের কথা।

'ইস জুতোটা গেল।'

'তুমিও গিয়েছিলে।'

বন্দনা হতবুদ্ধির মত কয়েক পলক জুতোটার দিকে তাকিয়ে থাকল। জুতোর যে দশা হয়েছে মুচি দিয়ে আর মেরামত করানো যাবে না। এখন এই খালি পায়ে কি করবে ভেবে পেল না বন্দনা।

'তোমার নবজন্ম হল বলতে গেলে।' লোকটা নরম গলায় আবার বলল, 'চলো রাস্তার ওপারে যাই।'

'কেন?' মুখ তুলে তাকালো লোকটার দিকে।

'তোমার জুতো কেনা প্রয়োজন। যেখানে যাচ্ছিলে খালি পায়ে সেখানে যেতে পারবে না।'

'কোথায় যাচ্ছিলাম?' অপ্রসন্ন গলা বন্দনার।

লোকটা জবাব দিল না, শুধু হাসল কেমন সবজান্তা হাসি। তারপর আবার সিগারেট কেস বের করল।

বন্দনা কঠিন গলায় লোকটিকে খোঁচালো, 'কী! জবাব দেওয়া হচ্ছে না কেন? আমার সম্বন্ধে দেখছি অনেক খবরই রাখা হচ্ছে!'

'তা হচ্ছে।' এক মুখ ধোঁয়া টেনে নাক দিয়ে ছাড়তে ছাড়তে ও বলল।

হঠাৎ বন্দনা এক মুহূর্ত কি ভাবল, 'এখানে কেন আসা হয়েছিল?'

'তোমাকে বাড়িতে পেলাম না বলে।'

'ও। বাড়িতেও যাওয়া হয়েছিল! এতকাল পরে [illegible] বছর পরে। কেন? কেন?

'দেখা [illegible] বো বলে। ক্ষমা চাইব বলে। সান্ত্বনা [illegible] বোন কত বড় হয়ে গেছে চিনতে [illegible] নি ভেবে ছিলাম তুমি। সেই ভাবে কথা বলতে গিয়েছিলাম। ওঃ কি আশ্চর্য সিমিলারিটি! তোমার যে চেহারা আমার মনে ছিল, অবিকল সেই চেহারা। সত্যি আমি একটু লজ্জায়ই পড়েছিলাম।'

'তোমার বোধ হয় মনে ছিল না গঙ্গায় অনেক জল বয়ে গেছে। ভেবেছিলে আমি সেই আছি। ভেবেছিলে কিছুই বদলায় নি?' একটা টানা নিশ্বাস ফেলল বন্দনা, চোখের পাতা ঘনঘন কয়েকবার ফেলল তারপর আবার বলল 'দেওয়ালের ক্যালেন্ডারও বছরে বছরে পাল্টায় আর মানুষ পাল্টায় না?'

বন্দনা নিজের হাতব্যাগটা খুলে সম্ভবত পয়সা-কড়ির পরিমাণটা দেখলো, তারপর ফের বন্ধ করে রাস্তা পার হবার জন্য দাঁড়ালো।

'সান্ত্বনাই আমাকে এখানকার ঠিকানা দিয়েছে।'

'কিন্তু এখানে আসা উচিত হয় নি।'

'তা হবে। কিন্তু আমার সময় ছিল না। তাই আসতেই হল। আজই বাসে রেলে দুর্গাপুরে ফিরে যেতে হবে আমাকে।'

বন্দনা শীতল গলায় বলল, 'ফিরে আপনাকে যেতেই হবে।'

'সান্ত্বনা কিন্তু তোমার থেকে অনেক ভাল ব্যবহার করেছে আমার সঙ্গে।'

'সান্ত্বনা আপনাকে কতটুকু জেনেছে।'

'তুমি অনেকখানিই কিন্তু ভুল জেনেছ।' হাতের সিগারেটটার দিকে তাকিয়ে, 'বেশ তো আগের মত 'তুমি' চলছিল আবার আপনি ধরলে কেন?'

বন্দনা শেষ কথাটুকুকে উপেক্ষা করে বলল, 'আপনার দেরী হয়ে যাচ্ছে।'

লোকটা কথাটাকে আমল দিল না বলল 'তুমি চলে আসবার পরে আমি খান তিনেক চিঠি দিয়েছিলাম। কোনো উত্তর পাই নি।'

'আপনার জবাব নেই।' বন্দনার গলায় একটু হাল্কা শ্লেষ মিশল। পরে একটু থেমে সমান গলায় বলল, 'চিঠিগুলো আমি পড়ি নি। খুলি নি পর্যন্ত। খাম শুদ্ধ ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।'

(ক্রমশঃ)

অঙ্গনা

গোঁড়ামি আর নয়

জনমত শোনা যায় পাত্রীহিসেবে চাকুরীজীবী মেয়েদের স্থান সর্বাগ্রে। তাই পত্রপত্রিকায় অধিকাংশ স্থলে বিজ্ঞাপনদাতারা পাত্রীর বিভিন্ন গুণাবলীর সঙ্গে চাকুরীর কথাটা উল্লেখ করতে ভোলেন না। ভোলার কোন যুক্তি নেই। তার জন্য আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামো দায়ী। বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে অধিকাংশ পুরুষই একার আয়ে সংসার চালাতে নির্ভরশীল নন। সুতরাং অর্ধাঙ্গিনী হিসেবে স্ত্রীকে চাকুরী করতে দিতে তাঁরা বাধ্য ইচ্ছাই হোন আর অনিচ্ছাই হোন। তার ওপর অর্থের এক মোহিনী শক্তি আছে যা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই যাদুবলে স্তব্ধ করে দেয়। তাছাড়া দৃষ্টিভঙ্গি পালটেছে—কেউ কেউ অত্যন্ত উদারভাবেই স্ত্রীর উপার্জনকে সমর্থন করেন। সেখানে স্ত্রীদের কোন ক্ষোভ নেই তাঁরা সহজ, সরল ও স্ফূর্তিতে ঘর এবং বাইরের কাজ যথাসাধ্য করেন। সুতরাং আমাদের দেশের বর্তমান বিবাহযোগ্য পুরুষেরা সচেতনভাবেই চাকুরীজীবী মেয়েদের স্ত্রীহিসেবে নির্বাচন করছেন।

মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও স্বাধীনভাবে উপার্জন করে নিজেদের দায়িত্ব নিজেরাই বহন করতে চাইছেন। তার ওপর সংসারের দায়দায়িত্বের বোঝাও তাঁরা এই অর্থ দিয়ে বহুাংশে পূরণ করছেন। অবিবাহিতা অবস্থায় মুষ্টিমেয় কয়েকজন মেয়ে ছাড়া চাকুরী করবার ছাড়পত্র অধিকাংশ মেয়েই পেয়ে থাকেন। পরিবারে তাঁদের অর্থের প্রয়োজন না থাকলেও এ ব্যাপারে তাঁদের ওপর বিধিনিষেধের কড়াকড়ি কম, আর যাঁদের উপার্জনে সংসার চলে তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁরা প্রয়োজনে আজকাল যে কোন বৃত্তি গ্রহণেই সম্মত। শিক্ষাদীক্ষা ছাড়া অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মেয়েরা এখন অনেক স্বাধীন। এই স্বাধীনতা নিয়েও বিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশের মেয়েদের বিরুদ্ধে অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করেন (যদিও অন্যান্য দেশের মেয়েরা বিমান, ট্রাকটর চালনা করছেন)। এই ক্ষোভ প্রকাশের অগ্রভাগে প্রবীণদের সংখ্যাই বেশী, কিছু কিছু নবীনরাও এই প্রবীণদের অভিমতে স্বাগত জানান। আমাদের আলোচ্য বিষয় স্ত্রীর চাকুরীকে উপলক্ষ্য করে প্রবীণ-নবীনদের [illegible] কেন্দ্র করে পরিবারে নবাগতার [illegible] কোথায় পৌঁছায় এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে পরিবারের দীর্ঘদিনের জোট কেমন করে শিথিল হয়ে যাওয়ার মূলে নববধূকে দায়ী করা হয়?

শ্বশুর-শাশুড়ী এবং পাত্র ভিন্ন পরিবারের অল্পবয়সী শিক্ষিত ছেলেরা বধূ বা ভ্রাতৃবধূ নির্বাচনের ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষিতাদের বরণ করেন। সেখানে প্রচ্ছন্নভাবে কিছু অহংকারও থাকে। শ্বশুর মহাশয় সগর্বে বলতে পারবেন পুত্রের বিয়ের জন্য তিনি উচ্চশিক্ষিতা মেয়ে নির্বাচন করতে সক্ষম হয়েছেন। সেই দম্ভের জোরেই পারলে লেখাপড়া জানা মেয়ের সঙ্গে চাকুরীকে যুক্ত করেই পাত্রী নির্বাচন করেন। এই নির্বাচনে মনে মনে স্থির করেন বিয়ের পর পুত্রবধূকে সংসারের কাজে লিপ্ত করে চাকুরী হতে অব্যাহত দেবেন। কিন্তু সেই চাকুরী থেকে অব্যাহতি দিতে গিয়েই যত গোল বাধে। তাঁরা পুত্রবধূকে বাইরে কাজে পাঠাতে সম্মানহানিকর মনে করেন। পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন সকলের কাছে তাঁদের আভিজাত্য রক্ষা করাই দুরূহ হয়ে ওঠে। ট্রামে-বাসে ঠেলাঠেলি করে বাড়ীর বৌকে বাইরে চাকুরী করতে যেতে হবে এটা তাঁরা কল্পনাই করত পারেন না। এটা আর কিছু নয়—আভিজাত্য, অর্থ নিয়ে অযথা দম্ভ। কিন্তু এই দম্ভের ঘোর কাটাতেই বধূদের অবস্থা শোচনীয়। তাঁরা রাতারাতি পরিবারে অপ্রিয় হয়ে ওঠেন। গোঁড়া ব্যক্তিদের ধারণা আগেকার দিনের মত ছেলেরা বিয়ের পর নববধূকে মায়ের পায়ে সঁপে দিয়ে বলবেন 'মা তোমার জন্য দাসী নিয়ে এলাম।' সুতরাং বধূ নামক সেই নবাগতা দাসীটি সংসারের সব দায়দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে বাইরের জগতকে ভুলে যাবেন। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এমন কি নিজেদের পছন্দ-অপছন্দ সম্বন্ধে কোনরকম মতামত প্রকাশের ক্ষমতা তার থাকবে না। স্বামীও স্ত্রী সম্বন্ধে নির্বিকার থাকবেন। বিয়ে করে সন্তান উৎপাদনের শক্তি যুগিয়েই তিনি খালাস—স্ত্রীর অন্য কোন স্বাচ্ছন্দ্যতার দিকে নজর দিতে পারবেন না। স্বাচ্ছন্দ্য জোগাবেন প্রবীণেরা নিজেদের মতামত অনুসারে। ভাবছেন বিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে যেখানে আমরা আধুনিক বলে গলাবাজী করছি সে যুগে এই প্রাচীন ঘটনার পুনরাবৃত্তি কেন করছি? আমরা মুখে মুখে আধুনিক বলে যত গলাবাজীই করি না কেন আধুনিক হতে আমাদের এখনও অনেক দেরি।

গোঁড়া পরিবারে স্বামী ভদ্রলোকটি যদি পরিবারের আর সকলের সঙ্গে সুর মেলাতে না পারেন তাহলে নবাগতার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে ওঠে। তিনি স্ত্রীর চাকুরীকে যতটা সমর্থন করেন, অর্থের প্রয়োজন তার চেয়েও বেশী উপলব্ধি করেন। তিনি এতদিন পিতামাতার একান্ত অনুগত ছিলেন, এবার বাড়ীর অভিভাবকদের সঙ্গে তাঁর চলে ঠান্ডা লড়াই। একসময় সে ঠান্ডা লড়াই হয়তো—কঠিন লড়াইয়ে পরিণত হয়। অভিভাবকেরা মনে করেন পুত্র বড় হয়েও এতদিন যে নীরবতা পালন করেছে আজ হঠাৎ বৌ-এর আগমনে তার মূর্তি এত কঠিন হল কেন? তখনই তাঁদের ধারণা ছেলেকে অতিক্রম করে ছেলের বৌ-এর দিকে পড়ে। আসলে নবাগতা বৌটি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব। সে না পারে স্বামীর কথা ফেলতে না পারে গুরুজনদের অবহেলা করতে। তাই সে মৌন থেকেই সব কাজ করে যায়, অবশ্য মনে মনে সে অর্থ উপার্জনকেই সমর্থন করে। এতদিনের অভ্যাস তার ওপর অর্থের প্রয়োজনীয়তা দুটোকেই সে উপলব্ধি করে। বাইরের জগতে এত দিনের শিক্ষাদীক্ষার বিকাশ হবারও একটা সুযোগ থাকে। পুত্র এবং পুত্রবধূ পরিবারের আর পাঁচজনের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে মিশতে চেষ্টা করলেও পরিবারের সকলেই তাদের আলাদা নজরে দেখেন। সব দোষের ভাগই দেন পুত্রবধূকে। অনেক চেষ্টা করেও তিনি পরিবারের কারোরই মনোরঞ্জন করতে পারেন না। যেহেতু অফিস টাইমের ভাত খেয়ে তাঁকে বাইরে বেরুতে হয়, সেজন্য টিকা-টিপ্পনীর অন্ত নেই। ক্রমে ক্রমে এ টিকা-টিপ্পনীর ফল অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করে। পুত্র হয়তো পুত্রবধূকে নিয়ে একসময় আর পাঁচজনকে ফেলে আলাদা হয়ে যেতে বাধ্য হন।

মেয়েরা লেখাপড়া যতই শিখুক অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যতক্ষণ না তাঁরা ভোগ করেন ততদিন তাঁরা পরাধীনই থাকেন। অর্থই বল, ভরসা, সম্মান সব জোগায়। পরিবারে যে মহিলা উপার্জনক্ষম তাঁর ভাল-মন্দ কথা সকলেই শুনতে রাজি। প্রবীণরা যদি তাঁদের গোঁড়ামি কাটিয়ে পুত্রবধূদের আপন করে নিতে পারেন তবে সংসার সকলের কাছেই সুখের।

রূপসীর খাতা

পুরাকালে পানের রস, ফুল পাতার রস দিয়ে ঠোঁট রাঙানো হতো। রাঙা ঠোঁট আর জলে ভরা ভেজা ঠোঁটের চাহিদা কাব্যের থেকে সুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সবারই আছে। জন্মগত যে আকার, রং আর বিশেষত্ব নিয়ে মহিলারা জন্মায়, তার ওপরই বুদ্ধি আর সরঞ্জাম দিয়ে তৈরী করে নিতে হয় চাওয়ার মতন দেখার মতন রূপ। জন্মগত ঠোঁটের রং অনেকের কালো হয়, শুকনো হয়। সে ক্ষেত্রে কতকগুলি সহজ উপায় আছে, যেগুলি নিয়মিত করলে ভাল হয়। তুলো সামান্য দুধে ভিজিয়ে ঠোঁটের মাঝে চেপে রাখতে হবে ৫।৭ মিনিট রোজ রাতে শোবার আগে। তারপর তুলো ফেলে দিয়ে ঠাণ্ডা জলে মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়তে হবে। এই উপায় হল সাধারণ। ছোট বয়স থেকেই লিপস্টিক ব্যবহার করা ভাল না, বিশেষ করে খারাপ কোম্পানীর।

কিন্তু এই লিপস্টিক ব্যবহার করার পদ্ধতি ঠোঁটের আকার ও প্রকারের সংগে সংগে বদলায়। প্রথমত ঠোঁটকে বিশেষ কতকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করা যাক। যেমন ১। পাতলা কাটা কাটা ঠোঁট, ২। পুরু ভারী ঠোঁট, ৩। উপরের অংশ পাতলা নীচের অংশ পুরু ও মোটা, ৪। নীচের ঠোঁট ভেতরের দিকে ঢোকা, ৫। হাঁ মুখ বড়, ৬। খুব ছোট বেমানান হাঁ মুখ। সাধারণত এই সব ধরনের ঠোঁটই বেশী দেখা যায়। এবার একে একে আলোচনা করা যাক—

১। এইসব সুন্দর পাতলা কাটা কাটা ঠোঁটের জন্য কোন চিন্তা থাকে না। তবে লিপস্টিক লাগানোর সময় দেখতে হবে ঠোঁটের ধার ঘেঁষে সমানভাবে ওপর ও নীচে লাগান হয়েছে কিনা। প্রথমে লিপস্টিক লাগিয়ে নরম রুমাল দুই ঠোঁটের মাঝে রেখে চেপে ধরতে হয়, তাতে খানিকটা রং উঠে যায় আর হাল্কা করে রং লেগে থাকে। এরপর আবার লাগাতে হয় অন্তত দুবার। এই নিয়ম লিপস্টিক লাগানোর সময় সব রকম ঠোঁটেই প্রযোজ্য। আরও একটা জিনিস মনে রাখতে হবে। সব চেয়ে প্রথমে লিপস্টিকের ধার দিয়ে ঠোঁটের ধার ধরে রেখা টেনে নিতে হবে, তারপর সব জায়গায় লাগানো উচিত।

২। পুরু ভারী ঠোঁটে রং দেবার সময় প্রথমে দেখে নিতে হবে, যে ঠোঁট ফোলা আর উঁচু কিনা—। যদি তাই হয় তাহলে লিপস্টিক হাল্কা করে লাগাতে হবে। শুধুমাত্র রঙের আভা থাকবে আর ঠোঁটের স্বাভাবিক রেখার একটু নীচ থেকে লিপস্টিকের রেখা টানতে হবে। এক সুতো কিম্বা দুই সুতো তফাৎ থেকে।

৩। উপরের অংশ পাতলা হলে রং বেশি প্রলেপে একটু বেশি গাঢ় করে দিতে হবে। নীচের পুরু অংশে পাতলা করে দিতে হবে।

৪। নীচের ঠোঁট ভেতরের দিকে ঢোকা হলে নীচের অংশের রং গাঢ় হবে।

৫। হাঁ মুখ বড় হলে টুকটুকে লাল রং কখনও চলবে না—তাছাড়া ঠোঁটের দুই কোণ [illegible] রং দিতে হবে। অর্থাৎ লিপস্টিকের কাটি ঠোঁটের শেষ অংশ পর্যন্ত যাবে না। একটু দূরে শেষ করতে হবে। এটা কোথায় শেষ হবে সেটা খানিকটা নিজের বুদ্ধি ও খানিকটা আলোচনা সাপেক্ষ।

৬। খুব ছোট হাঁ-মুখের জন্য ঠিক উল্টো নিয়ম অর্থাৎ ঠোঁটের শেষ কোণা পর্যন্ত রং যাবে। তাছাড়া ঠোঁটের স্বাভাবিক রেখার বাইরে রেখা টেনে বড় করতে হবে।

এ তো গেল ঠোঁটের আকারের সংগে কী ভাবে রং লাগান হবে তার আলোচনা। এবার আমরা কোন্ রং কখন কি ভাবে ব্যবহার করতে হবে সেটা দেখি।

মুখের প্রসাধনের ওপরই ঠোঁটের রং নির্ভর করে। প্রসাধন কড়া হলে ঠোঁট ও সেই রকমই হবে। সাধারণ ধারণা যে যাঁদের রং কালো বা শ্যামলা তাঁরা কখনও গাঢ় রং ব্যবহার করবেন না এবং আজকালকার হাল্কা শাদাটে গোলাপী রং ব্যবহার করবেন। এই ধারণা ভীষণ ভুল। রং যাঁদের ফর্সা কিম্বা উজ্জ্বল শ্যাম তাঁরা হাল্কা রং ব্যবহার করতে পারেন—কিন্তু কালো বা শ্যামলা রঙে তা ভাল লাগে না। 'কফি' রং, খয়েরী রং, কিম্বা কমলার রং গোলাপীর সঙ্গে মিশিয়ে মাখতে পারেন। লাল রং কালোরা বা শ্যামলারা মাখতে পারেন, তবে খুব উজ্জ্বল পোশাক ও সাজ হলেই।

আরও একটা কথা জানিয়ে রাখছি। লিপস্টিক শুধুমাত্র একটি রং ব্যবহার করার চেয়ে দুই রং ব্যবহার করা ভাল। যেমন প্রথমে গাঢ় রংটি ব্যবহার করে রুমাল বা পাতলা কাপড় দিয়ে দুই ঠোঁটের মাঝে চেপে নিতে হবে। তাতে করে বেশ কিছুটা রং উঠে যাবে। তখন নতুন করে আবার এই রং পাতলা করে দিয়ে তার ওপর একটা প্রলেপ লাগাতে হবে। এতে রংও সুন্দর হয়, আর রং থাকে বহুক্ষণ।

লালের সংগে খয়েরী, কফি রং-এর সংগে গোলাপী কমলা রং-এর সংগে গোলাপী কিম্বা কফি লালের সংগে গোলাপী ও শাদা-মুক্ত রং ইত্যাদি বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

এরপর বিচার করতে হবে—শাড়ীর রং। যদি অবশ্য সাজ নিখুঁত ও বিশেষ আকর্ষণীয় করতে হয়। নীল, কালো, লাল গাঢ় সবুজ ইত্যাদি গাঢ় রংয়ের সঙ্গে লাল খয়েরী কমলা ইত্যাদি লিপস্টিক চলে ভাল। শাদা গোলাপী হাল্কা নীল হাল্কা [illegible] বা হাল্কা রং হলে বিচার করতে হবে সময়। সকাল হলে হাল্কা রং ঠোঁটে দিতে হবে। যেমন গোলাপী মুক্তোশাদা কফি খয়েরী ইত্যাদি। রাত্রে হলে রংয়ের একটু হেরফের হবে। শাদাশাড়ীর ক্ষেত্রে ব্লাউজের রং ধরে সাজতে হবে।

তবে এইসব লিপস্টিক কেনার সময় খুব নজর রাখতে হবে যে, কোন কোম্পানীর এবং কোন শেডের। ভাল লিপস্টিকের একটা জ্বলজ্বলে আভা থাকে, তা ঠোঁটের সৌন্দর্যকে আরও অপূর্ব করে তোলে।

শীতকালে লিপস্টিক মাখার পর খুব হাল্কা হাতে একটু ভেসলিন দিয়ে দিলে খুব ভাল লাগে। দিনের বেলায় স্নানের আগে দুধের সর ঠোঁটে মেখে কিছুক্ষণ থাকা ভাল। এছাড়া স্নানের আগে এক চামচ অলিভ তেলের সংগে এক ফোঁটা ব্র্যাণ্ডি দিয়ে তা মুখে ও ঠোঁটে মেখে রাখলে খুবই ভাল হয়। এসব বিষয়ে কোন প্রশ্ন থাকলে এই বিভাগের নামে লিখে জানালে আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব।

ঠোঁটের সংগে থুতনীর যোগ খুব বেশি। থুতনী অনেক সময় ছুঁচোলো কিম্বা বসা ও ছোট হয়। সেই সব বেমানান ক্ষেত্রে কিছু কিছু উপায় আছে। যেমন বসা ও ছোট থুতনী হলে থুতনীতে একটু লাল রং মোলায়েম করে মেখে রাখতে হবে। তার ফলে বসা ভাবটা কম দেখায়। যাদের ছুঁচোলো ও লম্বাটে তাদের থুতনী একটু শাদা রাখা দরকার, আর ঠোঁটের রং বেশী কড়া হওয়া উচিত।

এই হল মোটামুটি মুখের বিভিন্ন অংশের সংগে মুখের যোগাযোগ ও সেই হিসাবে প্রসাধন। প্রসাধন যে অংশেরই হোক, গোটা মুখের সঙ্গে মিলিয়ে তার সৌন্দর্য নির্ভর করে। সেই জন্য সাজবার আগে সব সময় মনে রাখতে হবে, সময়, কাল, উপলক্ষ্য এবং সবচেয়ে আসল নিজের গায়ের রং। পোশাকের রংও বহু ক্ষেত্রে সাজকে ম্লান কিম্বা আরও সুন্দর করতে সাহায্য করে। তাই সাধারণ বুদ্ধি ও সাজার ঠিক ঠিক সরঞ্জাম ব্যবহার করে তবেই সাজসজ্জা সুন্দর হয়, রূপের জোয়ার আসে। এতে নিজের মনও খুশী হয়, অন্যকেও খুশী করে।

—[illegible]

শাসন

সুনী ঘোষ

(দিন)

দিবাকর পতো পতো করে মুখ থেকে ধোঁয়ার বল শূন্যে ছুঁড়েছিল। তারপর বাঁ কনুইয়ে ভর রেখে ধারে বাঁকে বসলো, গ্লোব। ইউ-পি-র সুবোধ মাস্টার ভূগোল বোঝাতে গিয়ে গ্লোব দেখাতো। একপাশে বাতি জ্বালিয়ে অন্য পিঠে আঙুলে রেখে বলতো, কি দেখছো তোমরা? সুবোধ আমাদের বুঝিয়ে ছিল না আমাদের এখানে যখন দিন আমেরিকায় তখন রাত!

কথাটার কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। দিবাকরের বলার পেছনে সেরকম কোনো প্রত্যাশাও ছিল কি? আমরা তিনজনে ধোঁয়ার রিঙ দেখছিলাম। এবং শূন্যে একসময় ফেটে মিলিয়ে যেতেও দেখলাম আমরা। দিবাকরের কথাটা আমাদের কাছে খুবই বাসি ছিল। বোধহয় সেই হেতু বাসি গন্ধটা ভেসে বেড়াচ্ছে। বিস্বাদ যেন। আমার গলার ভেতরে আলজিভও যেন তেতো-নিঃসৃত ফল—ঝুলে আছে।

দিবাকর ওরফে ডকটর ডি পাল—অংকন

লেখা রয়েছে। এই হোমিও হলের ওপরে একটা হাস্কিং মেশিন, মাঝ দিয়ে পাঁচের রাস্তা বরাবর লম্বা হয়ে আছে। হাস্কিং মেশিনটা অনেকক্ষণ হলো বন্ধ হয়ে গেছে। ওর শেষ শব্দটা এখনো আমার কানে আটকে —ধক্ ধক ধকাস—যেন শেষবেশ মস্তো একটা দম মেরে সব ঠান্ডা করে দিয়েছে। খানিক আগেও পায়ের তলায় মাটি থির থির কাঁপছিল, এখন আর নেই। কানের মধ্যে ঐ শব্দটা আটকে দিয়ে কেউ যেন নিপুণ হাতে কাঁপুনিটা তুলে নিয়ে গেছে। গেছে বেশ করেছে। আমি তাই ভাল করে দেখতে পাচ্ছি দিবাকরকে। না, ভুল বললাম দিবাকরকে না। ডকটর ডি পালকে। তাও না, আসলে আমি দেখতে চাইছি খোচড় দিবাকরটাকে, এবং শীতুটাকে।

দিবাকরের বউয়ের নাম তনু—তনিমা। আড়াই বছরের বিয়ে, দেড় বছরের মেয়ে। মেয়ের নাম মোমো। নামটা দিয়েছি আমি। সবে তখন আমি কারেন্টে ঢুকেছি, অর্থাৎ কিনা অবরো বসে ডাঁশ মারছি। দিবাকরটা লিখে পাঠালে :

> তনু কাল রাত্তে বড্ডো কষ্ট পেয়েছে। জিব বেরিয়ে গেছিল। আর রক্ত। রক্ত আর কষ্টের ভেতর দিয়ে হুস করে একটা কান্না নাবিয়ে দিয়েই তনু খুশী হয়ে গেল।......

চিঠির শেষে তনুরও উদ্ধৃতি ছিল :

> মেয়েটা তোর মতন দেখতে হয়েছে।
>
> একটা নাম পাঠিয়ে দিস। আর এসে
>
> একদিন দেখে যাস।......

ব্যস, পত্রপাঠ হৈ হৈ করে ছুটে এলো ঐ নামটা।

তারপর থেকে আমার এই প্রথম মোমোকে দেখতে আসা। সঙ্গে অবিশ্যি ইভুও এসেছিল —ক'দিন আগে তনিমার সঙ্গে দেখা করে গেছে ইভু, আমি জানি সেটা ওর নেহাৎ ফর্মালিটি। মোমোকে দেখতে এসে একটা ব্যাঙ্কের কাগজ দিয়েছে ও। আসলে দেখতে আসার ছুতোয় ইভু সেদিন তনিমার মুখের ওপর ঐ কাগজটা ছুঁড়ে দিয়েই গেছে। এই ইভুর ব্যাপারে এখন আর আমার কিছু করার নেই। মন আর দেহটার মধ্যে বিয়োগের মতন ইভু আর আমি বর্তমান আছি।

বইটার মলাটের ছবিতে একটা গুঁফো বেড়াল একটি ফুটফুটে মেয়ের মুখে হাসি দিচ্ছে। শীতুর মুখটা দেখলেই আমার সেই গুঁফো বেড়ালটার কথা মনে পড়ে যায়। ওর গোঁফের ডগায় শিশিরের মতন জলের গুঁড়ো বহুবার আটকে থাকতে দেখেছি। ওকে দেখে এখন আমার মোমোর সেই বেড়ালটার কথা মনে পড়ছিল।

কিন্তু কথা হচ্ছিল বল নিয়ে। দিবাকর তার মধ্যে কোথা থেকে যে দুম করে গ্লোব ছুঁড়ে দিলে! বল আর গ্লোব কি এক? আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। দিবাকর বলতে চাইলো গ্লোব বোধহয় গোলাকার... বল যেমন গোলাকার...গ্লোব...আর বল... তাহলে দিবাকর কী বলতে চাইল?

শীতুর ঠ্যাং আমার দাবনায় মাংসে ক্রমাগত চাপ খাচ্ছে। যেন এই ধরনের পীড়নে শীতুর কোনো মজা রয়েছে। কোনো মজার খেলা। যেমন সাটার, ফ্লাশ বা বোতলে-এই সব খেলায় শীতু শাদা-দাড়ি-ঈশ্বরের মতন নির্বিকার। একপাশে তাসগুলো ছিটিয়ে রয়েছে। আর কিছু খুচরো পয়সা। কিছুক্ষণ আগেও আমাদের খেলা চলছিল। আমি তনু আর ওদিকে শীত-দিবাকর বসেছিল। কিন্তু একঘেয়ে এই খেলায় তেমন উত্তেজনা নেই। ডাক্তার বলে ওটিই আসল, না থাকলে কিসসু জমে না। সবই তো সেরেফ ফককা হে। আমি ডকটর ডি পাল লন্ডমারিজ করেছি, আমার [illegible] নাম [illegible] [illegible]। আমার মেয়ের নাম মোমো,—সেই আমি বলছি, এসব আনন্দ-টানন্দ বুজরুকি। ছেঁদো কথা সব। আসল, আসল ঐ একসাইটমেন্ট।

শীত বলে, হায়াই-এর মতো সিদে [illegible] উঠে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চৌচির হয়ে যা, ব্যস। এর আগেও কিছু নেই পরেও নেই, গাইবি, মা কালীর দিব্যি।

কিন্ত একঘেয়ে হলেও খেলাটা একক্ষণ চলছিল। কারণ, তনু ছিল। তনু নির্মল হাসতে পারে। তনু হাসলে হয় কি তখন আমাদের দৃষ্টি সেই বলটার ওপর থেকে কিছুক্ষণের জন্যে সরে যায়, সরে যেতে বাধ্য হয়। আমরা তখন সর্বাঙ্গ দিয়ে তনুকে দেখতে পাই। আমার এ সময় মনে পড়ে জাপানিজ তানকার কথা, তনু কি রকম বাঁশ গাছে গাছে হয়ে যায়! শীতু ওর অভ্যাস মতো তনুর কোলের ওপর পা তুলে দেয়। দেখে মনে হয় শীতুর পা মাঘের রোদে পিঠ রেখে শুয়ে আছে। তখন টেককা-বিবি তাসের মতনই তনুরও কোনো ভাবান্তর দেখি না। অথচ সময়ে টাল খেয়ে কাতও হয় শীতু, সাফে করে পা টেনে নিয়ে একখানা হাত ঝান্ডা করে ওপরে তুলে দেয়। দিবাকর এ সময় পরাজিত সৈনিক, যেন তনুর দিকে সেই-ভাবে এগিয়ে আসে। আসলে সে চুমোই খায়। কিন্তু ছবিটা ফুটে ওঠে অন্য রকম, দিবাকর যেন কুকুর হয়ে গিয়ে তনিমার মুখের কাছে থাবড়ে দেয়। এইভাবেই চলছিল খেলাটা।

উঠে গেছে।

দিবাকর বড্ডো বেশী সিগারেট খাচ্ছে। আমি অতোটা পারি নে। বেশী সিগারেট খেলে আমার আবার পাঁজরে কোটরে এক ধরনের পেন-টেন মতন কি যেন হয়। আর মনে হয় গলার মধ্যেটায় আমার বুঝি ক্যানসার বেধে গেল।

দিবাকর সুন্দর করে ধোঁয়া ছাড়ছে। এখন আর ওকে কেউ ডিসটার্ব করতে আসবে না। হোমিও হলের দরজার ওপরে 'নো এনট্রি' বোরড ঝুলছে। তনুর মতে ওটা হওয়া উচিত 'আউট অব অরডার'—লিফটের দরজায় যেমন ঝোলে, তেমনি। কথাটা খাঁটি বলেছে তনু, আমারও তাই মনে হয়।

দিবাকর বললো, সুবোধের হাতে গ্লোবটা ঘুরতো [illegible] দিকেও ঘুরতো বাঁ দিকেও ঘুরতো [illegible] অথচ পৃথিবীর বেলায় এরকম স্বেচ্ছাচার নেই। তার গতি কেবল একদিকেই নির্দিষ্ট রয়েছে।

তার মানে দিবাকর বলছে, সুবোধ মাস্টারের গ্লোব আর এই পৃথিবী এক নয়। অর্থাৎ কিনা তনুর কথাই ঠিক, দিবাকর এখন অরডারে নেই। ওর নিশ্চয় এখন পেট-টেট গরম, সিগারেটের বদলে দিবাকরকে এখন যদি মিলক অব ম্যাগনেসিয়া দেওয়া যেত!

শীতু ছড়ানো তাসের পাশ থেকে খুচরো পয়সাগুলো দিবাকরের দিকে ঠেলে দিল। তারপর ঠোঁট উলটিয়ে। এক রকম মুখভঙ্গি করে।

—পৃথিবীর গতি কোন দিকে নির্দিষ্ট [illegible] আন্টি [illegible] চায়না-ম্যারিকা রাশিয়া অ্যাটম বনাম ইন্ডিয়া?

ফোত ফোত করে শীতু, হেসে গড়িয়ে যায়...আহ...আহ...আহ...

যেদিকে খুশী গতি হোক। কোন দিকে [illegible]—এসব নিয়ে আমার কি হবে! হঠাৎ ইন্ডিয়া কথাটা আমার মাথার মধ্যে ঢুকে দপ দপ করতে থাকে। মগজে কিছুক্ষণ ঘুরেও বেড়ালো। কোন বাবু চাকিছেন ক্ষমণে হে!

আমি দুম করে বলেই ফেললুম,

—দিবাকর তুই পান খা।

—পান!

—পান!

—কেন খাব?

—ওটা খেলে ভিখিরিকে পর্যন্ত কিন্তু সুখী মনে হয়। দেখিসনি সব খাওয়া-দাওয়া সারা হয় পান দিয়ে, বউগুলো কেমন তাদের অফিসগামী মরদদের ঠোঁটে পান ধরিয়ে দেয়?

শুনে দিবাকর আমাকে একটা লাথি মারে। আসলে মজা পেয়েছে ও।

শীতুটা এ সময় লাফিয়ে উঠেছে। নাটস দি আইডিয়া। —তনু—তনু—দাঁড়ু চিৎকার শুরু করে দিয়েছে শীতু।

দিবাকর বললো, যা বলছিলুম, ওই গ্লোবটা। পৃথিবী তো একদিকেই ঘোরে কিন্তু সুবোধের হাতে দুদিকেই ঘুরতো গ্লোব। কিন্তু কেন ঘুরতো?

পর্দা ঠেলে তনিমা ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। যেন নৃত্যের ভঙ্গিমা ওর পদক্ষেপে। মসৃণ হাত দুটি নেড়ে ও যেন নাচের মুদ্রাই গড়ে তোলে। বলে,—কি রে গাধার মতন চেল্লাচ্ছিস যে।

শীতাংশুকুমার হাসে না, কেমন এবার গম্ভীর হয়ে যায়। বলে বোস, কথা আছে।

তনিমা শীতুর দিকে এগিয়ে যায়। ও এবার শীতুর পাশে বসবে। এখন ইচ্ছে হলে তনু শীতাংশুকে পেটাতেও পারে। ওর কান-টান টেনে, নাক খামচে কিম্বা স থাতেও পারে। যা ইচ্ছে তাই পারে। দিবাকর কিম্বা শীতুর মতো তনুর পায়েও যথেষ্ট জোর আছে, আমার পশ্চাৎদেশে সে-পরখটিও করে নিয়েছে তনু। অথচ মুশকিলটা আমার! ছেলেবেলায় ফুটবল খেলতে গিয়ে ডান-পা-টা কানা করেছি। এখনও তেমন জোর পাইনে। তেমন কিছু করতে গেলেই ভয় হয়। একটা প্যানিকও রয়ে গিয়েছে। লাথি খেয়ে লাথি ফেরত দিতে পারিনে বলে আমার একটা ব্যক্তিগত দুঃখও রয়েছে। সে দুঃখ আমার কেউ বোঝে না।

তনিমার আঁচল কোমরে জড়ানো। টাইট-বাঁধুনিটা আরও স্পষ্ট হয়েছে তাতে। ওর ভারি বুক, গম্ভীর নিতম্ব, আর সাধারণভাবে হেঁটে গেলেও তনুর ক্লাসিক হিপের দুলুনি-টুকু একেবারে অমোঘ। তবু যেভাবে মুটিয়ে যাচ্ছে তনু, আর বছর খানেকের মধ্যেই নিশ্চিত ওর একটা গলকম্বল নামবে। ভাগ্যিস এখন পর্যন্ত তনু কিছু খিতিকিচ্ছিরি না। এক সময় রীতিমতো সুন্দরীই ছিল, যখন আমরা এম-এ পড়ছি সেই সময়টার কথা। পড়াশোনার ব্যাপারে তনু তেমন মনস্ক ছিল বলা যায় না। বেশীর ভাগ সময়ই ও নাচ নিয়ে পড়ে থাকতো। সেবার ভারসিটির মডার্ণ ইণ্ডিয়ান ল্যাংগুয়েজের গোল্ডেন জুবিলি হলো পনের দিন ধরে নাগাড়ে। তাতে বাংলা-উর্দু মোশায়েরা থেকে নাটক, নৃত্য, সংগীত, আলোচনা-সমালোচনা—সে এক এলাহি ব্যাপার। হয়েছিল মহাজাতি সদনে। একক নৃত্যে অংশ নিয়েছিল তনু। শীতুর গানের সংগে তনুর সেই নাচ, আমার মতো যারা দেখেছে তারাই জানে মহাজাতি সদনের সেই রাত কীরকমভাবে উপচে উঠেছিল! তনুর দক্ষতার সংগে ওর তন্বী রূপসী শরীরও তাতে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল—একথা রাম-গড়ুরের ছানা দিবাকরও সেদিন প্রকাশ্যে স্বীকার করেছে। সেই শরীর এখন আর নেই তনুর। নাচ-ফাচ ওসব বালাই ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে তনু এখন শরীরে মেদ পুষছে।

শীতুর কাছে কোল ছুঁয়ে বসে তনু বললো, কি কথা?

—বেড়ে একটা আইডিয়া দিয়েছে ভাদু, বলে শীতু আমার দিকে আঙুল বাড়ালো।—ওর মতে পান খেলে ভিখিরিদের পর্যন্ত সুখী সুখী দেখায় আর তুই কিনা দিবা-করকে এখনো পানখাওয়া ধরালি না! তুই কেমন বউরে?

কথাটা এমন করে বললো শীতু, ইয়ার-কির মাত্রা ছাড়িয়ে পরিবেশটায় কেমন বাষ্প লেগে গেল। তনুও কেমন চুপ করে রইলো!

শীতু আবার বললো, এই প্রসঙ্গে আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল। আমার চাকরিটার পেছনে

একটা রহস্য আছে তোদের বলিনি বোধহয়। বলিচি?

হাই উঠলো আমার।

শীতু বলতে লাগলো, হাওড়া থেকে ফিরছি। ট্রেনটা শেওড়াফুলি স্টেশনে থেমেছে। এমন সময় শুনলুম পাশের কমপারটমেনটে কিসের যেন একটা গণ্ডো-গোল বেধেছে। দৌড়ে গেলুম। জন্য পাঁচছয় রাগী ছোকরা কাকে যেন টানা-হ্যাঁচড়া করছে, ট্রেন থেকে নাবিয়ে পেটাবে। ভেতরে ঢুকতেই দেখি তাজু মিত্তির; ওকে নিয়েই এই হুজ্জোত! তখন ও পার্টির ক্যাডার। বুঝতে পারলুম পার্টি সংক্রান্তই কিছু, সহজে ছোড়া ছাড়ান পাবে না। এদিকে আমি-শালা কী করি, একই স্কুলে পড়িচি তার ওপর ক্লাস ফ্রেণ্ড! তাজু মার খাবে আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখবো?

তনু বললো, আমাদের তাজু মিত্তির? ইনটারেসটিং!

—আমি ততক্ষণে ওদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। ওরাও পিটোচ্ছে আমিও পেটাচ্ছি। এমন সময় ভাগ্যিস ট্রেনটা ছেড়ে দিল তাই রক্ষে। কিন্তু তাজুর মার তো ঠেকালুম, এদিকে আমার তখন শারট-ফাট ছিঁড়ে-ফেড়ে একাকার। মুখের ওপর দু-এক জায়গায় রক্তের দাগ। এতক্ষণে তাজু মিত্তিরের তড়-পানি দ্যাখে কে! একেবারে গুষ্ঠি উদ্ধার করে দিচ্ছে। তারপর নরম গলায় আমাকে সে কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কি বলবো তোদের।

ডাক্তার বললো, ভূমিকাটা বড্ড বড় হয়ে যাচ্ছে। তোর চাকরির রহস্যের কি হলো?

—আরে শোন না শালা। পলিটিক্যাল গন্ডায় তখন পশ্চিমবঙ্গের খোয়াব ছুটে যাচ্ছে। তারপর ইলেকশান হলো। দেখা গেল তাজু মিত্তিরের টোপ লেগে গেছে। খবর শুনেই আমি তখন বগল বাজিয়ে দৌড়েছি, এবার নিশ্চিত আমার একটা হিল্লে হয়ে যাবে। এদিকে দিন যায়, বছর যায়—আমার আর হয় না কিছুই। ঘোরাঘুরিরও শেষ নেই। ঘরের খেয়ে কাঁহাতক আর হুকুম তামিল করি। পায়ের সুতোও ছিঁড়ে যেতে বসেছে। এদিকে বেশ বুঝতে পারছি তাজু মিত্তিরের কাছাকাছি আর পৌঁছুতে পারছি না। তাজু ক্রমেই দূরের মানুষ হয়ে উঠছে। তখন তো ও এম-এল-এ হয়ে গেছে কিনা। যাই হোক একদিন ও আমাকে খুব জ্ঞানফ্যান দিল। বাঙালীর ছেলেরা বোগাস। চাকরি ছাড়া আর কথা নেই...তাছাড়া পারটির ওয়ারকার হিসেবে এ-রকম সুবিধে নেওয়াটাও নাকি অন্যায়। ওর পক্ষে এরকম অন্যায় করাটা সম্ভব না। ...এদিকে আমার মাথায় তখন আগুনে হলকা মারছে। তবু কি আর করা। চেপেচুপে রইলুম। তারপর অকটোবর এলো—পুজো। দশমীর দিন ভাবলুম, যাই তাজু মিত্তিরের সঙ্গে বিজয়ার কোলাকুলিটা সেরে আসি। ওই সঙ্গে ফিজিক্যাল একজিসটেন্সটাও যদি কাজে লাগে—তা গোসামেও। একসঙ্গে যদিও একদিন খিস্তিখেউড় করেছি কিন্তু এখন ও এম এল এ—অত সহজে কি আর এখন বুকের মধ্যে সাপটা-সাপটি করা যায়? তাজু মিত্তির কিন্তু সুযোগটা ছাড়ল না। পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করলো। সিল্কের লুঙ্গির সামনেটা খানিক তুলে ধরে আমার সামনে দুটি চরণ বার করে এবং ছড়িয়ে এসে দাঁড়াল। এই ভঙ্গির মধ্যে যাঁর কোনো কার্পণ্য ছিল না—এ আমি দিব্যি নিয়ে বলতে পারি। আমার দ্বিধা ওকে বুঝতে না দিয়ে অগত্যা যা করার তাই-ই করে ফেললুম। আমি মাথা নত করে ওর পায়ে হাত ছোঁয়ালুম। আমি শালা যেন আমার বাপ-ঠাকুরদা-চোদ্দপুরুষের পিণ্ডদান করছি, এমন নিষ্ঠা!

কিন্তু তাজু একবারও আমাকে বাধা দেবার চেষ্টা করলো না। বরং ওর ভঙ্গি দেখে মনে হলো ব্যাপারটাকে শালা একদম [illegible] পকেটে চলে এল। একেবারে ইন মাই পকেট— বলেই একটু হাসলো। হাসলো, না ভেংচিকাটলো। শীতু?

হ্যাঁ, তাই বলছিলুম—তনুর হাতের চুড়ি নিয়ে খেলা করতে করতে শীতুই বললো, দিবাকরের জন্যে যখন পান সাজবি

আর শস্য অকাশান বেশ। করে সাজস কিন্তু।...

তনুর কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে দিয়ে দম ফাটিয়ে হাসছে, সে কী হাসি শীতুর। তনুর কোলের মধ্যে শীতুর মাথা। তনু ওর মাথার ওপর থমথমে শিখার মতন ঝুঁকে আছে।
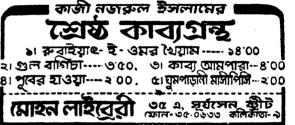
ঘরের মধ্যে এক অস্বোয়াস্তিকর নৈঃশব্দ। আমার মনে হচ্ছে কানের পর্দা ছাড়িয়ে মগজের ভেতরে কি প্রচণ্ড একটা চাপ পড়ছে। এ সময় কি হাসাকিং মেশিনটা হঠাৎ চলতে পারে না? যদি চলতো!

দিবাকর বললো, ধ্যুস সাল্লা।...

ভেতরে এসময় টেলিফোন বেজে উঠেছে। কিরিরিং...কিরিরিং ... টেলিফোন বাজছে। পর্দা দুলিয়ে তনু ভেতরে চলে গেল। খানিকপরেই তনিমা ফিরে এল, ইভা—ইভু করেছে।

দিবাকর বললো, ইভু! ইভু কেন?

তনিমা আমার দিকে তাকিয়ে বললো ও কোথায় যেন বেরুচ্ছে। তুই এখানে আছিস শুনে ইভু এখানেই আসতে চাইছিল। আমি না করে দিয়েছি। আজ আর কারোকে আমি দলে নিতে চাইনে। ইভু এলে আমি কিন্তু হিংসের মরে যেতাম।

তারপর আরও কৌতুক করে তনু তার মোহনভুরু মটকে দিল আমাকে।

তনু হাসছে। ওর হাসি দেখে আমার উলটো রকমের হাসি পায়। বলি, ইভু এলে আমার আরও খারাপ লাগতো।

—সত্যি?

—তাই-ই। ওর কাছে আমার আর কোনো আনন্দ নেই।

—সে কি রে! নেই-ই-ই?

—ইভুটা আজকাল ভীষণ স্বার্থপর হয়ে গেছে।

কথাটা যে কোনো অপ্রিয় প্রসঙ্গের দিকে চলে যাচ্ছে সে বোধহয় আঁচ করতে পেরেছে তনু। তাই চট করে ও বলে উঠলো, আর দেরী করে লাভ নেই। লাইট কিছু ফুড নিয়ে নে। তোদের খাবার বোধহয় হয়ে গেছে। কি নিবি জিন না হুইস্কি?

দিবাকর বললো, দেনো। পিওর কালী-মার্কা মাদাম।

মেঝের ওপর তনুর ছায়া; হাসির ঝিলিক যেন, ডানা ঘুরিয়ে স্বচ্ছন্দ চলে গেল।

(রাত)

ঝিলের একদিকটা এখনো যথেষ্ট খোলামেলা, তেমনই নির্জন রয়েছে। আমাদের ছেলেবেলা অর্থাৎ আমার শীতুর আর দিবাকরের; অজস্র ছড়ানো রয়েছে এখানে। মাঝে-মধ্যে দু-একটা ভারী ট্রাক হাইওয়ের ওপর দিয়ে বেঘোরে বেরিয়ে যাচ্ছে, দু-একটা রিকসোর হুড়ে ঝড়ঝড় আওয়াজ। এখান থেকে হাইওয়েটা বেশ দেখাচ্ছে, যেন পথের দুপাশে কেয়ারি করা বাবলার সারি। হালকা চাঁদ ঝুলেছে আকাশে, আর বাবলার বনে ফাঁকে ফাঁকে আকাশ, চকচকে আকাশ ধরা আছে। নিসাড় যেন থমকে রয়েছে হাইওয়ে। এবং বাতাসে হিম, ধানক্ষেত ভরে এখন শিশির পড়ছে।

শীতু এখন গলা ছেড়ে হিন্দি ধরেছে। তনুর কোমর দুলছে। এমন রাতে, এই হাইওয়ের পাশ থেকে বলা যায় এখন আর কোথাও কারো শত্রু নেই। আবিশ্বে এখন আর কেউ কারো শত্রু নয়। কেউ কারো মিত্র নয়। অথবা এখন আর শত্রু-মিত্র বোধই নেই। শিল্পের এই সংসারে ওসব তুচ্ছ হয়ে গেছে। এখন যদি তনিমা অই নির্জন নিসাড় পথের ওপর দিয়ে রুপোলি মাছের শরীর নিয়ে হেঁটে যায়, ওর মায়াবী পোষাক ঝিলের জলে ছায়া ফেলে সাঁতরে বেড়ায় বাতাসে, কিম্বা নরম এই জ্যোৎস্নার ভেতর ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে তনুর দেহ যদি শূন্যে ভেসে বেড়ায়—তাহলেও যেন অবাক হবার কিছু নেই।

তবু শহর যে রকম বাড়ছে এসব আর বেশিদিন থাকবে না। একদিন, হয়তো দু-বছর—পাঁচ বছর বড় জোর—তারপরই সব গিলে নেবে। ইতিমধ্যেই আমি মোমোকে একদিন এখানে নিয়ে আসবো। মোমোকে এসব দেখানো দরকার! ওকে তো আমি এই প্রথম দেখছি—মোমোর জন্মের পর এই প্রথম দেখা। ওকে আমার কিছু দেওয়া দরকার। শীতু ওকে ছবির বই দিয়েছে। আমি মোমোকে আমাদের ছেলেবেলাটা উপহার দেবো। কারণ বল গড়িয়ে যাচ্ছে...যাকেই...

এবং আমি ইভুর উল্লাস দেখেছি। বিবাহ সন্তান—ওসব পছন্দ করে না ইভু। বিয়েটা ওর কাছে একটা ট্যাবু, রদ্দি সেন্টিমেন্ট রাবিশ। ও পিল নিয়ে ঘোরাফেরা করে। তবু আমাকেই কেন পছন্দ করে ইভু। আমি জানি নে, আমাকে নিয়ে ও যে কি করতে চায়! যে-কটা দিন আমি এখানে থাকবো ইভুর হাত থেকে আমার আর নিস্তার নেই। ও আমার দুর্বলতার খবর রাখে। ওর যে কী শক্তি! আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঠিক সম্মোহিতের মতন ও আমাকে টেনে নিয়ে যায়। তারপর আমাকে নিয়ে পাগলের মতো উল্লাসে ফেটে পড়ে। আসলে ইভু আমাকে নির্যাতন করে। কারণ ইভু আমার কষ্টের কথা বোঝে না, বুঝতে চায় না। ও শুধু বোঝে আমার একটা পা ভাঙা এখন আর আমার কিছু করার নেই। ইভু! ইভুটা এমন স্বার্থপর।

এই সময় আমি মোমোকে, আমার মোমোই মাকে—আমার ছেলেবেলাটা দিয়ে দিতে চাই। কেননা আমি এখন বয়স্ক, এর যোগ্য নই। মোমোই এখন এর যোগ্য উত্তরাধিকারী। হঠাৎ দিবাকরের সেই চিঠির কথা মনে পড়ে আমার—তনুর ঠাট্টাঃ মেয়েটা তোর মতন দেখতে হয়েছে। একটা নাম পাঠিয়ে দিস...তনু কি তাহলে আমাকে ব্যঙ্গ করেই এসব লিখেছে? উপহাস করে? আমাকে?

মাথার মধ্যে ঝিমুনি, পা টলছে আমার। তিনটে শরীর আমার চোখের সামনে দুলছে। তিনটে ছায়া মাটির ওপর আমোদে গড়াগড়ি খাচ্ছে। জড়িয়ে জড়িয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে। আবার আলাদা হচ্ছে। তনিমা নাচছে, শীতাংশু নাচছে দিবাকর নাচছে।

কি নাচ নাচছে ওরা!

একি আমার চেনা?

এ নৃত্যের নাম কি!

যেন চেনা, বহুকালের চেনা। কিন্তু কি নাম কিছুতেই মনে করতে পারছি নে। অথচ আমার ভাল লাগছে। তনিমার দেহ দুলে উঠছে, পড়ছে। দিবাকর এবং শীতু তনিমার দুদিক ঘিরে উত্তাল সমুদ্রে যেন ঢেউ খাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছি, চূড়ান্ত আত্ম-নিবেদনের মধ্যে ওরা হারিয়ে যাচ্ছে। মাটির ওপরে তিনটি অধীর ছায়া-শরীর অন্ধ হয়ে গেছে। অদৃশ্য কোনো সঙ্গীতের তালে তালে এই নৃত্যের পদবিন্যাস বা মুদ্রা মুখর হয়ে উঠছে। আমার করতল জুড়ে হৈ হৈ শব্দ উঠে আসছে।...বল যাক...

যেমন যাবার যেদিকে যাবার...

চুলোয় যাক।...কিন্তু আমার মুঠোর মধ্যে গোলাব, যেমন সুবোধের মুঠিতে ছিল যেমন সুবোধের হাতে গোলাব উলটো দিকে ঘুরলেই মানাতো?

আমি করতালি দিয়ে উঠি। আমার ভাঙা পা শূন্যে লাফিয়ে উঠে নৃত্যের অভিমুখে ধেয়ে যায়। এক প্রাণ থেকে এমনি করেই আর এক প্রাণ জন্ম নেয়। যেমন মোমো জন্মেছে এবং মোমোরা জন্মাবেই। অথচ প্রাণের থেকেও বড় হলেন তিনি—নিয়ম স্বভাবে উদাত্ত, শিয়রে বসে আছেন বসে থাকেন তিনি। তাকে অস্বীকার করিস নে মোমো। এই দ্যাখ কতো সহজে আমি বেজে উঠি।

'পাপ আউর পুণ্য' ছবিতে শশীকাপুর এবং শর্মিলা

পাপ আউর পুণ্য

যমজ দুই ভাইয়ের দুঃসাহসিক অভিযানকে কেন্দ্র করে ইতিপূর্বে একাধিক হিন্দী ছবি নির্মিত হয়েছে। নিশান, রাম অউর শ্যাম, সীতা অউর গীতা প্রভৃতি ছবির মূল কাহিনী একটি বিদেশী কাহিনীর ভারতীয় সংস্করণ। আর পাপ অউর পুণ্য এই বিদেশী কাহিনীরই সর্বাধুনিক সংস্করণ। এই ছবির মাধ্যমে পরিচালক ছাটাই, বেকারী, দারিদ্র্য ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নানা সমস্যার সঙ্গে ব্ল্যাকমেল এবং ভণ্ডামীর বিভিন্ন বাস্তব দৃশ্য দেখাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কাহিনী ও চিত্রনাট্যের দুর্বলতার জন্যে সব কিছুই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, দানা বাঁধে নি।

দুই যজম ভাই গঙ্গা ও জওলা সিং, ওদেরই এক কাকা সিংহাসন এবং রাজ্যের ধন-সম্পত্তি অধিকার করবার জন্যে নিজের বড় ভাইকে হত্যা করতে দ্বিধা বোধ করল না। কিন্তু যে সিংহাসনের লোভে এবং মহারাজা হবার জন্যে নিষ্ঠুরতার কাজ করল সম্ভবত সেই পাপের ফলেই নিজের পুত্র সন্তানকে হারাতে হল তাকে। অথচ ধারণা ছিল সে বড় ভাইয়ের সন্তানকেই হত্যা করছে। সিস্টার মার্গারেট পূর্বেই প্রাক্তন মহারাজের দুই যমজ ভাইয়ের মধ্যে একজনকে তার নিজের মায়ের কাছে রেখে অপর জনকে কুচক্রী ছোট ভাইয়ের হাতে তুলে দিয়েছিল কুচক্রী মহারাজের সন্তান হিসাবে। পরে সেই দুই যমজ শিশু জওলা সিং এবং গঙ্গা সিং নামে পরিচিত হোল।

গঙ্গা রাজকুমার হয়েও ভালবাসে এক যোধপুরী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রূপসী তরুণী যুগনীকে। আর জওলা কায়ক্লেশে বস্তিতে থাকে মায়ের কাছে, এক ফ্যাক্টরীতে চাকরী করত সে, কিন্তু ছাটাইয়ের ফলে বেকার হয়ে পড়ে। নিজের স্ত্রী এবং কন্যা পিঙ্কীর ভরণপোষণ করবার ক্ষমতাই নেই তার। দারিদ্র্য থেকে এবং ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে অবশেষে সে টাইগার নামে স্মাগলার-এর দলে যোগ দেয় এবং পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে এক পুলিশ অফিসারকে হত্যা করে ফেলে এবং পুলিশের হেপাজত থেকে পালিয়ে জওলার আশ্রয় গঙ্গার রাজপ্রাসাদে। এদিকে গঙ্গাও এই রাজপ্রাসাদ থেকে পালিয়ে যেতে চাইছিল তার যোধপুরে ফেলে আসা প্রিয়তমা যুগনীর কাছে। সুতরাং জওলাকে গঙ্গা সাজিয়ে নিজে জওলা সিং সেজে প্রাসাদ ত্যাগ করল গঙ্গা। কারণ ধনী কন্যা মালাকে বিবাহ করে নিজেকে সংসারের যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়ার চেয়ে যুগনীর কাছে ফিরে যাওয়া অনেক বেশী কাম্য হয়েছিল তার কাছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কুচক্রী মহারাজা জানতে পারল সে গঙ্গা ও জওলা সিং দুজনেই যমজ ভাই আর গঙ্গা ওঁর নিজের সন্তান নয়, ওঁর সন্তান বড় ভাইয়ের সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। এবারে সে নিজ মূর্তি ধারণ করে রাজ্যের হীরা জহরৎ নিয়ে পালাতে চাইল। সে প্ল্যান করলো, পালাবার আগে জওলা সিংকে পুলিশে দিয়ে গ্রেপ্তার করিয়ে গঙ্গাকে হত্যা করাবে। কিন্তু কথায় আছে—পাপ করলে শাস্তি পেতে হবে, সুতরাং কুচক্রী মহারাজাকেও কয়েদখানায় যেতে হল, আর তার সঙ্গে গেল জওলা সিং কারণ সে একবার জেল থেকে পালিয়ে এসেছিল। আর গঙ্গা সিং যুগনীকে নিয়ে সুখের সংসার গড়ে তুললো।

ওঁরা বলেন

: আপনাকে ছবিতে দেখে তো সবাই হাসে, আপনি নিজে কখনও নিজের ছবি দেখে হাসেন?

—না, আমি নিজের ছবি দেখে মোটেই হাসিনা। বরং অনেক সময় অস্বস্তি-বোধই করি। কারণ সব সবসময় তো ভালো কাজ করতে পারি না। ক্যামেরার সামনে কাজ করার সময় যে ত্রুটিগুলো আমি বুঝতে পারি না, পর্দায় সেগুলো পরিষ্কার হয়ে ধরা পড়ে। তখনই খারাপ লাগে। আর

আনন্দ হয় তখনই যখন দেখি দর্শকরা ঠিক ঠিক জায়গায় রিঅ্যাকট করছে!

: যদি কোনদিন গুন্ডার আড্ডায় পড়েন, হাসির অস্ত্রে তাদের বশ করতে পারবেন?

—হ্যাঁ, পারবো। অবশ্য গুন্ডারা যদি তথাকথিত হিন্দী ছবির গুন্ডা হয়।

: হাসানোর ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ কোনটা—অভিনয়, না অভিনেতার চেহারা?

—অভিনয়টাই আসল জিনিস। শুধুমাত্র চেহারা দিয়ে আর কতদিন চলে। তবে অভিনয়ের সঙ্গে চেহারা এবং সাজ-পোষাকও কম গুরুত্বপূর্ণ বলবো না।

: ভাঁড়ামো আর হাসির মধ্যে তফাৎ কি?

—এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত রুচিবোধের ব্যাপার। শুধুমাত্র অভিনেতারই নয়, দর্শকেরও। যে কাজটা শুধুমাত্র একটু চোখের ইশারায় করলে যতখানি মজা পাওয়া যায়, কোনো অভিনেতা হয়তো সেই মজা আনার জন্য একটা ডিগবাজি খেয়ে ফেললেন। এক্ষেত্রে ডিগবাজি খাওয়াটাই ভাঁড়ামোর পর্যায়ে পড়ছে। তবে সেই সঙ্গে দর্শকরা দৃশ্যটাকে আবার কিভাবে গ্রহণ করছেন সেটাও বিচার্য বিষয়।

: প্রেমে পড়েছেন কখনও?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, হরদমই পড়ছি। সুন্দর জিনিস দেখলেই আমি কেমন প্রেমে পড়ে যাই।

: আর যদি নারী-প্রেমের কথা বলি...

—ও ব্যাপারটা সবাইকে না জানালে কোনো ক্ষতি আছে?

: আজকের এই অর্থনৈতিক সামাজিক বিপর্যয় সম্পর্কে আপনার কিছু বলার আছে?

—বলার আছে অনেক কিছু। সব বললে আপনাদের পত্রিকায় ধরবেও না। ছোট্ট করে একটা কবিতা দিয়ে বলি, কেমন—

জমাট একটা ব্যথা কণ্ঠনালীতে
বাসে ট্রামে মৌমাছির চাকের মতো
ঝুলন্ত জনতাকে
হাওড়া শেয়ালদা স্টেশনে
ক্ষুধার্ত মানুষকে
অশালীন চলচ্চিত্র পোস্টারে
অমুকের নগ্ন ঠ্যাং দেখে
ব্যথা হয় ঢোক গেলার কাজটাতে।
অজস্র পশুদের বিজ্ঞাপনে
প্রচারের এ-বি-সি-ডি ভিটামিনে
কিছুতেই কমে না বা সারে না
জমাট ব্যথা গেলার কাজটাতে।

: তাহলে আজকের এই ভেঙে-পড়া জন-জীবনে হাসির কিছু [illegible] বলতে চান?

—আমার তো [illegible] হয় নেই। সত্যি কথা বলতে কি আশেপাশে যা চলছে-টলছে তাতে হাসির কোনো কারণ তো আমার চোখে পড়ছে না! তবুও যদি কেউ এসব ভুলে প্রাণ-খোলা হাসি হাসতে পারেন সেটা খারাপ নয়। হাসি তো আর কিছু না হোক শরীর ও মনের পক্ষে ভয়ানক স্বাস্থ্যকর।

: আপনি নিজে খুব হাসেন কি?

—চারদিকে নানারকম উল্টোপাল্টা ব্যাপার দেখে কার না হাসি পায় বলুন। যেখানে প্রচণ্ড, রাগ হওয়া দরকার সেখানে হাসি দিয়ে রাগ চাপা দিতে হচ্ছে। বাস্তব থেকে পালাবার আর উপায় কি?

: আগে নিশ্চয়ই বাসে ট্রামে ঝুলে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে—এখন ট্রামে করে যেতে কেমন লাগে?

—ভালোই লাগে। বেশীর ভাগ সময় তো প্রোডিউসারের পয়সায় ট্যাক্সি-

বাজি করি। তবে বাসে ঝুলতে না পারার জন্য বেশ কষ্ট হয়। কষ্ট হয় এই ভেবে যে, বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি তো প্রায় কাউকেই বেশী দিন গাড়ী চড়বার অবস্থায় রাখে না। তারও পর ট্যাক্সির মিটার যেভাবে চড়ছে—বাসে তো কিছুদিন বাদে ঝুলতেই হবে। অনভ্যাসে তখন পারব কিনা ভাবি।

: দেশের ভয়ানক বেকার সমস্যা সমাধানে আপনার কি প্রস্তাব?

—এসব খুব সিরিয়াস ব্যাপার। আমার একার ভাবনায় আর কি হবে।

: আর যদি আপনি ঘটনাচক্রে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে পড়েন—তাহলে?

—না-না, কখ্খনো না। মন্ত্রী হওয়া-টওয়া আমার সইবে না। ভয়ানক খাটতে হয়, বক্তৃতা দিতে হয়।

: জীবনে বিশ্বাস করে ঠকেছেন কখনও?

—হাঁ হাঁ সে আর বলতে! জীবনে ঠকেনি এমন কেউ আছে নাকি? তবে ঠকার পাশাপাশি ঠকাতেও হয়েছে কাউকে কোন সময়।

: কলকাতার ফুটবল খেলা সম্পর্কে আপনি কি বলবেন? আপনি কি নিয়মিত মাঠে যান?

—না দাদা, মাঠে আমি নিয়মিত যাই না, বছরে একদিনই যাই—শীল্ড ফাইনাল দেখতে। তাছাড়া আজকাল মাঠে গিয়ে কি খেলা দেখবো! দর্শক রেফারী হচ্ছে, রেফারী দর্শক। পুলিশ দমাদম গোল দিচ্ছে। আর বেচারী গোলকিপার পুলিশের ঢালের বাহে প্রাণ নিয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে। এসব দেখেশুনে খেলা দেখার আর আগ্রহ নেই।

রাত্রি বারোর দিন ছবির শুভ মহরৎ অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন শিল্প বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ এবং কাহিনীকার ও পরিচালক রবি ভট্টাচার্য

: দ্বিতীয় টেস্টে তো গো-হারান হারলো ভারত। আপনার কিরকম লাগছে?

—ক্রিকেট ভালো বুঝি না দাদা আমি। তবে ইন্ডিয়া হেরেছে—এটা শুনে এক ধরনের গাইয়া ফিলিং হয়।—'আমরা হারছি। এ-সব তো হয়েই।

: অভিনয়ে আপনি কাউকে গুরু বলে স্বীকার করেন?

—গুরুবাদ-টুরুবাদ আমি মানি না। আমার গুরুও কেউ নেই। আমাদের দেশের ইন্দু মুখার্জিকে খুব ভালো লাগতো। ইদানীংকালে রবি ঘোষের মার্জিত অভিনয় আমার খুবই ভালো লাগে। আর বিদেশে চ্যাপলিনকে অস্বীকার করার সাহস আমার নেই।

: আপনার অভিনয়-জীবন কি কৌতুক চরিত্র দিয়েই শুরু হয়েছিল?

—না। বরং উল্টোটাই। '৪২' নাটকে মিঃ মুখার্জি—একটা ভিলেন চরিত্র আমার অভিনয়ের হাতেখড়ি।

: স্টেজ না ফিল্ম—কোনটায় কাজ করে আপনি বেশী আনন্দ পান?

—না না চরিত্রই আমায় আনন্দ দেয়—তা সে স্টেজ বা ফিল্ম যাই হোক না কেন দুটো একেবারে আলাদা মিডিয়ম। কাজেই চরিত্রটা আমার কাছে মেইন ক্রাইটেরিয়ান।

: কলকাতায় পাতাল রেলের কাজ তো শুরু হয়েছে, দ্বিতীয় সেতুরও কাজ চলছে—এ-ব্যাপারে আপনি কি বলেন?

—এসব ঘটনায় আমি আর রিঅ্যাক্ট করি না এখন। উৎসাহিতও হই না। ছোটবেলায় যে বয়সটাতে মোরা দেখে ভুলতাম—এখন তো আর সে বয়স নেই। এখন নির্লিপ্তই থাকি।

: আর্থিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনি কিছু ভাবেন কখনো?

—কখনোই না। আপার ডিভিশন কেরানীর সিকিউরিটি নিয়ে বাঁচতে পারলেই বর্তে যাবো। তার আর ভাববোটা কি?

—নির্মল ধর

অন্য দিন অন্য রাত জয়া ভাদুড়ী

একদিন জয়শ্রী রায়ের সঙ্গে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে আমাদের তুমুল আড্ডা হয়ে গেল। জয়শ্রী আড্ডা দিতে ভালবাসেন। ও'র বক্তব্য, আড্ডা না দিতে পারলে কাজ করার মেজাজ আসে না।

একজন নবাগতা নায়িকাকে নিয়ে আমাদের বেশ কৌতুহল আছে। তিনি নাকি এখন গভীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন। অবিবাহিতা কুমারী মেয়ে স্ক্রীনে সবে নাম-টাম করেছেন—অতএব প্রেমে পড়বেন—এ আর কি এমন আশ্চর্য কথা। কিন্তু যার সঙ্গে তিনি প্রেমে পড়েছেন বলে বাজারে কথা চালু হয়েছে, মুস্কিল বেধেছে তাঁকে নিয়েই। ছেলেটি খুব বুদ্ধিমান। নায়িকার সঙ্গে হুট করে প্রেমে পড়ার মত ছেলে নন তিনি। নায়িকার সঙ্গে প্রেমে পড়লে অনেক হুজ্জুৎ অনেক হ্যাপা। সে-সব সামলে প্রেম চালিয়ে যাওয়া, উঁহু, মনে হয় না তাতে উনি রাজী হবেন।

জয়শ্রীকে প্রশ্ন করতে উনি মিটি মিটি হেসে বললেন, ওসব আমি জানি না বাপু। কে কার সঙ্গে প্রেমে পড়ল—তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।

জয়শ্রী বললেন বটে, কিন্তু কথার ভঙ্গীতে বোঝা গেল মাথাব্যথা খুব আছে। আমি আরও ন্যাড়া করে কিছু কূট প্রশ্ন করতে—

—আঃ, ভাল্লাগে না এসব কথা—

সবাই চুপ। চুপ কিন্তু মিটিমিটি হাসি। ভাবখানা, সবাই জানি সবাই বুঝি অতএব...

জয়শ্রী রায় সুন্দরী মেয়ে। কনভেন্টে পড়া মেয়ে। একবার এক বিউটী কনটেস্টে 'মিস ক্যালকাটা' হয়েছিলেন। হাসলে ও'র গালে সুন্দর টোল পড়ে। হাসলে মুখশ্রী আরও স্নিগ্ধ হয়। থেমে থেমে চাপা নরম ভঙ্গীতে কথা বলেন। আর হ্যাঁ, যত বলেন তার চেয়ে বেশী মনোযোগ দিয়ে শোনেন। দু হাঁটুর ওপর থুতনী রেখে, একদৃষ্টে সাগ্রহে শোনার যদি তেমন ইন্টারেস্ট পান।

সেদিন টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওর মাঠে বসে আমরা, ওদিকে লোড শেডিং চলছে, একজন বিখ্যাত কমেডিয়ান হেঁটে যাচ্ছিলেন, বিরক্ত ভ্রূকুঞ্চিত মুখ, আমি হেঁকে—
—কোথায়?

—শুটিং-এ।

—কি ছবি?

—তিন পরী ছয় হুলো—বলে তিনি ধাঁ করে অদৃশ্য হলেন ওই প্রকাশ্য দিবালোকে। আর জয়শ্রী হেসে হেসে হেসে অস্থির। হাসির গমকে তার শরীর কেঁপে কেঁপে কেঁপে, একজন ভাগ্যিস 'হ্যাচ্চো' দিয়েছিল, জয়শ্রী ব্রেক কষার মত থেমে শেষবারের মত—তিন পরীর কথা বুঝলাম, আমি একজন পরী, কিন্তু ছয়—

বাকিটা বলা হতেই পারে না কারণ ঐই হাসি হাসিটা এতই দুরারোগ্য ব্যাধি, বড় বড় ডাক্তারও ফেল পড়ে যায়। আর সুন্দরী মেয়েরা হাসলে তারা বেশী করে ফেল পড়ে। বিশেষ করে সেই সুন্দরী মহিলা যদি [illegible] ফিল্মের নায়িকা হয়...। বলা বাহুল্য, উল্লেখ্য ছবিটির নাম 'তিন পরী ছয় প্রেমিক'।

জয়শ্রী বললেন, আমরা পিকনিকের আউটডোরে গিয়ে একবার একটা মজা করেছিলাম। আমরা ছিলাম তিনজোড়া। আমি, আরতী, অর্চনা (বোম্বের বাঙালী নায়িকা ডাক নাম বলো)। আর ছেলেদের ভেতর ছিল রঞ্জিৎ মল্লিক, সমিত ভঞ্জ, ধৃতিমান চ্যাটার্জি।

পিকনিক ছবির আউটডোর হচ্ছিল বিহারের তোপচাঁচী লেকে। পরিচালক ইন্দর সেন। একটানা প্রায় পঁচিশ দিনের আউটডোর। ফলে সবাইকে মানিয়ে নিয়ে ওখানেই থাকতে হয়েছিল। ডাকবাংলো ছাড়া ঝরিয়া ওয়াটার ওয়ার্কসের দু-একটি খালি বাড়ি এ-বাবদ নিয়ে নেওয়া হয়েছিল। জয়শ্রীরা সবাই ছিল বাংলোতে, ছেলেরা কিছু দূরের একটি কোয়ার্টার্সে। আর ছবির দৃশ্যে দৃশ্যে যারা [illegible] করবে, প্লে-ব্যাক গানে ঠোঁট মিলিয়ে গান করবে, হাসবে কাঁদবে ঝগড়া করবে এবং সবশেষে ভালবাসার জোয়ারে উহুঁ, উহুঁ.... প্রতিদিন শুটিং-এর পর যখন বিকালের পড়ন্ত আলোয় পথ চিনে পাখীরা কুলায় ফিরবে, দেহাতি মানুষেরা যখন পাহাড় টপকে নিজেদের বস্তিতে ফিরে যাবে, তোপচাঁচীর

ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় | জয়শ্রী রায় | সমিত ভঞ্জ

আকাশ ছেয়ে যখন মসলিন অন্ধকার ক্রমে ক্রমে গাঢ় কালো মখমল হয়ে যাবে, তখন? নায়ক-নায়িকারা মুখের রং ধুয়ে-মুছে নিশ্চয়ই মুখোমুখি বসবে—দু দন্ড আলাপের বনলতা সেন হয়ে, না কি জয়শ্রী?

জয়শ্রী বললেন—সে আর বলতে। মেক-আপ তুলে ছবির কস্ট্যুম ছাড়তেই যেটুকু সময়, তারপর তাড়াতাড়ি সামান্য একটু চা-খাবার খেয়েই ওরা দুটিতে রোজই উধাও—

—এ্যাঁ? ওরা বলতে কারা?

—বুলা আর ধৃতিমান।

—আরেব্বাস, তাই নাকি?

জয়শ্রী হেসে বললেন, ব্যাপারটা প্রথমে খুবই মামুলী ছিল। ওরা শুটিং-এর সময় একটু বেশী যা গল্প-সল্প করতো। আমরা ভাবলাম, একটা কিছু তো করতে হবে। তাই ওদের দুজনকে টার্গেট করা হলো। যখনই দেখা হয়, মিষ্টি করে হেসে—ইয়ে, এই যে ধৃতিমান বুলা কোথায়?

—বুলা? ধৃতি অবাক।—কেন, ওই তো লোকেশানে বসে আছে। শট দিচ্ছে।

—অ!......তা একলাটি বসে আছে কেন? একটু কম্পানী দিন। বেচারি মুষড়ে পড়েছে মনে হচ্ছে। দেখছেন না—স্লাইট বিরহিনী ভঙ্গীতে তাকাচ্ছে। আপনাকে খুঁজছে বোধ হয়—

ধৃতিমান প্রথমটা ব্যাপারটা ধরতে পারে নি। পরে যখন—

—এই যে বুলা—

—উঁ?

একা একা কেন ভাই—আরতিই প্ল্যান ভেঁজে নিয়ে হয়ত পেছনে লাগল, ওদিকে ধৃতি যে ছটফট করছে—

—ধ্যাৎ ধ্যাৎ—সলজ্জ ভঙ্গীতে জবাব দিয়েছে বুলা।

অথচ এই করতে করতে ওরা যখন বাস্তবিক ফিল্ডিং-এ নেমে পড়ল, তখন সবাই চুপ।—আরে যাঃ, সত্যিই ওরা প্রেমে পড়ল নাকি?

আরতি তখন মুখ ঠোঁট ফুলিয়ে—পড়লই তো। যেমন লেগেছিলে পেছনে। আমার পেছনে লাগলে হয়ত আমিও—

বয়সটাই এমন প্রেমে প্রেমে প্রেমে ভেসে ভেসে ভেসে হাল্কা মেঘে মেঘে মেঘে—পড়তেই চায় প্রাণ। বেশীর ভাগ ফিল্ম তো ওই নিয়েই। বেশীর ভাগ দর্শক ওই নিয়েই। সব পাঠক-পাঠিকাও ওই নিয়ে। জয়শ্রী বললেন, উঃ, আমাদের কি মজা। প্রবীর এসেছিল লোকেশানে (জয়শ্রীর স্বামী) সব শুনে সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে মন্তব্য করল—তোমরা ডেস্পারাস। জয়শ্রীর ভ্রুকুটি—কেন ডেস্পারাস কিসে? তুমি প্রেম করো নি আমার সঙ্গে? দিনের পর দিন ঘোরো নি আমার জন্যে?

প্রবীর তৎক্ষণাৎ রণেভঙ্গ। বাই বাই করে সটান কলকাতার পথে নিজের গাড়িতে। জয়শ্রী হেসে বন্ধুদের বললে—পালিয়ে বাঁচল প্রবীর।

এবার টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে আমি মানে রঞ্জন মজুমদার বললাম, বাবু, এবার একটা সলিড গল্প বলো। পাঠক-পাঠিকাদের শোনাই। গোঁজিয়ে যাচ্ছে যে—

জয়শ্রী বললে বাজে কথা জমিয়ে লিখতে না জানলেই বরং সে ভয়টা থাকে। যাকগে, এবার মূল কাহিনীতে আসা যাক। প্রতিদিন শুটিং শেষ হবার পর আমরা সব গল্প করতে বসতাম। দেখতাম, ধৃতি আর বুলা প্রতিদিন একটু একটু দূরে সরে যাচ্ছে। শেষটায় ওরা পাহাড়ের নীচের দিকে নেমে যেতে আরম্ভ করল। আমাদের চোখের সম্পূর্ণ আড়ালে। আমরা তখন ওদের থেকে নজর সরিয়ে সামনের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে নানা মজার গল্পে ডুবে যেতে থাকতাম। এই রকমই একদিন, আমি আরতি সমিত প্রবীর গোল হয়ে বসে আছি, মাদোল আওয়াজ মশগুল, অনেকক্ষণ সময় কেটে গেছে, ধৃতিরা এখনও ফেরেনি অন্ধকার ঘুট ঘুট করছে, হঠাৎ আমার নজর পড়ল সামনের পাহাড় থেকে শাদা পোশাক পরা লম্বা মত একটি মানুষ নেমে আসছে নীচের দিকে। আমার খটকা লাগল। এই অন্ধকারে জঙ্গল মাড়িয়ে লোকটা নামছে কি করে? আলো না নিয়ে? আমি প্রবীরকে খোঁচা দিতে সে আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে তৎক্ষণাৎ তাকাল। সে-ও অবাক। ব্যাপারটা সকলের নজরে পড়ে গেছে। সমিত অবাক। আমার দিকে সপ্রশ্নে তাকাল। আমি ভ্রু-ভঙ্গী করে আমার অজ্ঞানতা বোঝালাম। মানুষটি নামছে ঠিক যেন সিনেমার শ্লো-মোশানে। হাঁটছে না, বাতাসে ভাসছে। কাছে আসছে, কিন্তু একটা মানুষের শরীরের আউট-লাইন ছাড়া অবয়বটা পরিষ্কার হচ্ছে না আমাদের চোখে। হয়ত গাঢ় অন্ধকারের জন্যেই। কি জানি। লোকটা রাস্তায় নেমে বাঁ দিকে ঘুরে ব্যারেজের দিকে নামতে আরম্ভ করল। আমরা সবাই তীক্ষ্ণ নজরে সেদিকে তাকিয়ে। আরে, ওর কি মাথা খারাপ? অত উঁচু থেকে নেমে আবার কোথায় চলেছে? উত্তেজনায় সমিত ভড়্ তো ঠেলে উঠেই দাঁড়াল, ইয়েস, লোকটা ব্যারেজের দিকে ওই রকম শ্লো-মোশানে যেন হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে নেমে যাচ্ছে। আমরা হতভম্ব। হঠাৎ উল্টোদিক থেকে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। অন্ধকার ভেদ করে ধৃতি আর বুলা দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে। উত্তেজিত ভঙ্গী।

—তোমরা এতক্ষণ এখানে ছিলে সবাই?

ধৃতির জবাবে আমি বললাম—হ্যাঁ, কেন?

সামান্য ইতস্ততঃ করে ধৃতি বললে—দেখ, একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখলাম। আমাদের প্রায় গা ঘেঁষে একটি লম্বা মত লোক, মুখটা দেখতে পেলাম না, নীচে ব্যারেজের দিকে নেমে গেল। আমাদের ডাকে সাড়া পর্যন্ত দিল না। ব্যাপারটা কেমন আনক্যানি লাগছে। তাই তাড়াতাড়ি চলে এলাম—

আমরা সমস্বরে বললাম, আমরাও দেখেছি, তোমরা যেদিকে ছিলে, ওই দিকেই যাচ্ছে—

বুলার সুন্দর মুখে নিমেষে ভয়ের ছাপ।

ধৃতিমান পুরুষ মানুষ। হেসে ব্যাপারটাকে হাল্কা করবার চেষ্টা করে বললে—নিশ্চয় স্থানীয় কোন লোক। তবে লোকটার সাহস আছে স্বীকার করতেই হবে। ব্যারেজের ওপাশের কোন গ্রামে যাচ্ছে বোধ হয়।

কাট-টু পরের দিন সেই একই সময়। ধৃতিরা যথারীতি প্রেম করতে ব্যারেজের দিকে অদৃশ্য হয়েছে। আমরা কজন বসে আছি পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে। অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে ক্রমশঃ।

মুখ ফুটে না বললেও সবার মনের মধ্যে আগের রাত্রের ব্যাপারটা খচ্‌খচ্‌ করছে। দেশলাই জ্বালিয়ে সমিত সিগারেট ধরাচ্ছে। প্রবীর সেই আগুনে নিজেরটা ধরাবে বলে সেই ঝুঁকেছে—

আরতি হঠাৎ যেন মৃদু আর্তনাদ করল। আমরা যন্ত্রচালিতের মত সামনের দিকে তাকিয়েই রোমাঞ্চিত; লোকটা নামছে। সেই শাদা পোশাক, সেই শ্লো মোশান, সেই সবকিছু অবিকল গত রাত্রের মত।

সমিত বরাবরই ডানপিটে। হাতের সিগ্রেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অস্ফুট কি যেন উচ্চারণ করতে করতে উঠে দাঁড়াল।

তারপর আমরা বাধা দেবার আগেই লোকটাকে অনুসরণ করে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল। আমরা তিন গজের মধ্যে দুজনকে দেখতে পাচ্ছি। সমিত দ্রুত পা চালাচ্ছে লোকটাকে পেছন থেকে ধরবে বলে, কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি অসম্ভব। দুজনেই সমান দূরত্ব থেকেই যাচ্ছে। সমিত চেঁচাচ্ছে —কোন হ্যায়। ঠ্যাহর যাও—। লোকটি দাঁড়াচ্ছে না। একই গতিতে, যেন ভাসতে ভাসতে ব্যারেজের দিকে নামছে। এক সময় সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এবার সমিত ফিরছে। হেঁটে নয়, যেন দৌড়ে। —ওরা কোথায়? ধৃতি, বুলা? ওরা কোথায়?

দূর থেকে ওদের আওয়াজ পাওয়া গেল। ওরাও ছুটছে।—এই যে আমরা, বুবুই আর হিয়ার—

ধৃতি অন্ধকারের ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল। পরিষ্কার ভয় পাওয়া মানুষের চেহারা। বুলা আমার শরীর ঘেঁসে দাঁড়াল। কাঁপছে।

সমিতের বেবু। কণ্ঠে প্রবল উত্তেজনা। বললে, এক মুহূর্ত আর এখানে নয়। লেটস গো ব্যাক—

আমরা এতগুলো মানুষ, এক রকম ছুটতে ছুটতে ডাকবাংলোয় ফিরে এলাম। সবাই হাঁফাচ্ছে। সবাই সবায়ের দিকে তাকাচ্ছে, কিন্তু কেউ কোন কথা বলছে না। আসলে বলার মত পরিস্থিতিও নয়।

ধৃতিমান অনেকক্ষণ পরে বললে—এখন যে যার ঘরে চলে যাওয়াই ভাল। কাল কথা হবে। গুড নাইট।

কাট-টু-কাট পরদিন আমাদের শুটিং-এর শেষ দিন। ইন্দরকে আমরা কিছু বলিনি। কি হবে বলে? দিনের আলোয় পাহাড়, লেক রাস্তা, ঘাট সব পরিষ্কার রাতটা যেন দুঃস্বপ্ন ফরগেট-ফরগেট।

ইন্দর বলল, ভাই আজ নাইট শুটিং-ও করতে হবে। ডে-নাইট প্রোগ্রাম করে লোকেশান শুটিং করতে পারলে তবে এখানা আউটডোর শেষ হতে পারে। তোমাদের সকলের সহযোগিতা চাই —

সবাই একবাক্যে রাজী হয়ে গেল। দীর্ঘ দিন বাইরে থাকার ফলে এখন কলকাতা সবাইকে আকর্ষণ করছে। সবাই এবার বাড়ি ফিরতে চাইছে।

কিন্তু রাত্তিরবেলা? আবার সেই বিভীষিকা? ইন্দরকে বলি-বলি করেও বলা হয়নি কথাটা। সেদিন আবার পূর্ণ অমাবস্যা। কে যেন কথাটা শুনিয়ে দিল। রঞ্জিৎ মল্লিক ডাকবাংলোর চৌকিদারকে প্রশ্ন করেছিল—এটা কি ব্যাপার। চোখের বিভ্রম নয়ত? সে লোকটা স্পষ্ট জবাব দেয়নি। তা-না-না-না করে পাশ কাটিয়েছে। রাত্রে শুটিং হবে জেনে জয়শ্রী নিজেই চৌকিদারকে ডেকে পাঠাল। প্রথমে লোকটা কিছুতেই বলতে চায় না। পীড়াপীড়ি করতে শেষ পর্যন্ত কবুল করল, ব্যারেজের পেছনে যে-দর সেখানে বেশ কিছু দিন আগে একটি লোক আত্মহত্যা করেছিল। নিশ্চয় কোন পারিবারিক ব্যাপার ছিল। চৌকিদার স্বীকার করল, তারপর থেকে নিয়ম করে এটা হচ্ছে। অবশ্য কারো ক্ষতি করে না।

—গভীর রাতে দরজা ঠেলাঠেলি জানলায় ঠক্ ঠক্?

—ওরই কীর্তি।

—না কোন মতলববাজ লোক?

চৌকিদার সভয়ে বললে, নেহি মেমসাহাব, সন্ধ্যার পর লেকের এই অঞ্চলটা জনমানবশূন্য হয়ে যায়। আপনারা আছেন বলে আমি সাহস করে এখানে থাকছি। আপনারা চলে যাবেন, আমিও তালা এঁটে দিয়ে সরে পড়ব। কারণ খতরনাক জায়গা। এখানে বদমাশলোক আসতেও সাহস পাবে না।

তো অমাবস্যার রাত্রে সেদিন আমরা যে কী ভাবে শুটিং করেছি আমরাই জানি। আমি পারমিতা বুলা এবং সমিত ধৃতি—সবাই গা ঘেঁসাঘেঁসি করে থেকেছি। রাস্তার ওপর হাজার হাজার ক্যান্ডেল পাওয়ারের আলো জ্বালিয়ে শট নেওয়া হয়েছে, কিন্তু সাহস করে আমরা কেউই সামনের পাহাড়ের দিকে তাকাতে পারিনি।

—তবে বুলা?

—মানে?

—মানে ধৃতিমান, বুলা এরা তাকায়নি?

জয়শ্রীর কি হাসি।—হ্যাঁ তাকিয়েছে, ফাঁকে ফাঁকে নিজেদের দিকে যতটুকু তাকানো যায়। প্রেমের গল্প আর ভূতের গল্প পাশাপাশি চলতে সব সময়ই পারে। এ আর কি এমন একটা বড় কথা!

—রঞ্জন মজুমদার

এই যাঃ, সিগারেটটা শেষ হয়ে গেল যে...এখন কি হবে? মুখ কাচুমাচু করে অভিনেতা চিন্ময় রায় যা বিস্তারিত করলেন তা হল এই আজ সকাল থেকে এ পর্যন্ত নিদেনপক্ষে বিশটা কিং সাইজ সিগারেট টানা শেষ হয়েছে। আরও কখানা টানতে হবে তা একমাত্র ঈশ্বরই বলতে পারেন। এমনসময় হাসি হাসি মুখে এগিয়ে এলেন পরিচালক দীনেন গুপ্ত। বললেন : এ তো বেশ ভাল কথা একটা ওয়ার্ল্ড রেকর্ড সৃষ্টি হতে চলেছে। আপনি তো মশাই হাসছেন এদিকে আমার গলা যে শুকিয়ে এলো। জল দাও.....জল...... জল দাও। অমনি তৎপর প্রোডাকসন ডিপার্টমেন্ট হাজির করলেন কয়েক গ্লাস জল। ঢক ঢক করে মেরে দিয়ে চিন্ময় [illegible] [illegible] বাক্রণ পাকানো চেহারা একুশতম সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলেন। অমনি হাততালি যেন সুনীল গাভাসকার চার মেরে অর্ধশত রান পূর্ণ করলেন। অনেকটা সেইরকমই বটে!

চেহারাতেই মালুম হয় সিগারেটের সঙ্গে চিন্ময়ের যোগাযোগ বহুদিনের। তখন হাফ প্যান্ট হাফ শার্ট মেনে হাফ টিকিট এবং আজকের তুলনায় সেই বয়সটা হয়তো হাফ: তা আজ পর্যন্ত সব সাকুল্যে কত সিগারেট ফুঁকেছেন?

চিন্ময় কিঞ্চিৎ বিব্রত। বড় বিপদে ফেললেন, ইয়ে মানে আমি তো কোনোদিন আর কি কখনও হিসেব করে দেখিনি। আন্টাজটি হিসেবে আসে, এক লক্ষ কয়েক হাজার। এই যে শরীরটা দেখছেন এটা বলতে গেলে সিগারেটের ওপরেই আছে।

আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া গেলে যে অবস্থা হতে পারে সেই অবস্থা মুখে চোখে বিলক্ষণ ফুটিয়ে তুলে চিন্ময় একটা কিং সাইজের সিগারেট দু আঙুলের ফাঁকে নাচাতে নাচাতে এসে দাঁড়ালেন ক্যামেরার সামনে, শুটিং জোনের মধ্যে। এখনই ধরাবেন না প্লিজ সতর্ক করে দিলেন প্রধান সহকারী পরিচালক সুজিত। চিন্ময় মোটেই অখুশী হলেন না। বরং খুশী হলেন এই ভেবে যে পুরো শটটা একটা সিগারেটের ওপর দিয়েই যাবে। ওঁর আনন্দের কারণ বউকে একা ঘরে পাওয়া গিয়েছে। এ ছবিতে বউ সেজেছে রত্না ঘোষাল। স্বামীকে বাড়িতে ফেলে বাপের বাড়িতে সে বেশ মজায় আছে। স্বামী চিন্ময়, সহ্য করতে না পেরে ছুটে এসেছেন। আর এসেই তিনি ঘরে বউকে একা পেয়ে গিয়েছেন। তাতে কি হয়েছে? তাই বলে কি তিনি বউ-র কতৃত্ব সহ্য করবেন। কখখনো নয়। দু' চার কথা শোনাবেনই। শুরু করলেন এই ভাবে : দিব্যি আছো। বাবা মা-র আদর খাচ্ছো। মাছের মাথা খাচ্ছ। আর আমাকে সঁপে দিয়ে এসেছো পাঁঠার মার হাতে। রোজ ঐ পাজা এক রান্না—উচ্ছের কালিয়া, উচ্ছের চচ্চড়ি আর বেগুনের সুপ।

: বেশ তো ভালই, স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে।

কথা বলতে বলতে সিগারেট ধরাতে হবে। ধরানো হয়েছে। কোথায় জোর করে সুখটান দেবে সিধেশ্বর—তা নয়, এখন তাকে শ্বশুর মশাইর সঙ্গে বকতে হবে। 'সিধু' 'সিধু' ডাকতে ডাকতে তিনি যে একেবারে সটান ঘরে এসে উপস্থিত হলেন

হাতে রইল তিন/মহরতে পরিচালক সরিৎ বন্দোপাধ্যায় সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় এবং রঞ্জিত মল্লিক।
ফটো : [illegible]

পাগলাবাবা/মহরতে উত্তমকুমার মহুয়া রায়চৌধুরী এবং বিশ্বজিৎ। ফটো : [illegible]

[illegible] মেয়ে/দীপঙ্কর দে ও রাজশ্রী বসু।　　ফটো : অমৃত

সেটা কল্পনাতেও আসেনি। তাহলে এখন কি উপায়? হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, মুখে এক-রাশ ধোঁয়া—এর কি হবে? চট করে মাথার বুদ্ধি খেলে গেল সিধুর। শ্বশুর মশাইকে প্রণাম করার অজুহাতে ঝুপ করে বসে পড়ল। মুহূর্তে সিধুর মাথা শ্বশুর মশাই-র পায়ের ওপর।

: আরে কর কি, কর কি—তিনি শশ-ব্যস্ত পা দুটো সরাবার চেষ্টা করেন, পারেন না। সিধু একবার যা ধরে তা সহজে ছাড়ে না। দুবুদ্ধি ওর মাথার মধ্যে খেলা করে। ততক্ষণে কম্মো সারা। হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। ধোঁয়ার সুব্যবস্থা হয়েছে। আপাততঃ শ্বশুর মশাই-র লুঙ্গির মধ্যে প্লেস করা হয়েছে। ভাবা হয়নি পরিণতির কথা।

: কি খবর কখন এলে?...কি কথা বলছো না যে, শরীর খারাপ নাকি?......হুঁ হাঁ করে এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়া যায় না। এতক্ষণ কোনোক্রমে ঠেকিয়ে রেখেছিল সিধু। উঠে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত সিগারেট গার্ড করে ভেরী স্মার্টলি উত্তর দেয়ঃ

আমি ভাল......বেশ ভালই আছি।

: মোটেই ভাল নয়। এত শুকনো শুকনো লাগছে কেন? হাতটা দেখি—

হাত দেখতে চাইছেন মানে পালস দেখতে চাইছেন—মরে গেছি। জ্বলন্ত সিগারেট, কোথায় ফেলি! ফেলা যাবে না। কতক্ষণ আর ডান হাত বাঁ হাত করা যাবে। সিধু ঘেমে নেয়ে অস্থির হয়ে ওঠে। তাকে ভীষণ অসহায় দেখায়। অগত্যা সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল আর বলে চলল : না, না, আমার কিছু হয়নি......আমি বেশ ভাল আছি।

সিধু যে একদম ভাল নেই সেটা বেশ বুঝতে পারছিলেন শ্বশুরমশাই। তাই তো তিনি কোনোরকম আপত্তি গ্রাহ্য করলেন না। খপ্ করে চেপে ধরলেন একটা হাত, সেই হাতেই...উফ্ ......আগুন...... পুড়ে গেল আমার হাত......

সিধু দমে যাবার পাত্র নয়। এর পরেও ম্যানেজ করার ধান্দা করে। না, না, ওটা পুড়ে যায়নি, সেটে গেছে। আমার হাতের নখগুলো......দ্যাখ শিখা তোমাকে আমি আগেই বলেছিলাম নখগুলো কেটে দিতে। বাবার হাতটা কেটে গেল......

শিখা গাছ থেকে পড়ল। শিখার বাবা শ্বশুরমশাই হাতের কোন অংশ কেটে গেল দেখায় ব্যস্ত—ইত্যবসরে সিধু কাজের কাজ করে ফেলে। জানলা অনেক দূরে। তাই খাটের এক পাশে ফেলে রাখে। অত্যন্তর নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে সিধু শ্বশুর-মশাইর হাত জলে দেয় আর যতই বোঝাবার চেষ্টা করে পুড়ে যায়নি কেটে গিয়েছে ততই তাঁর বদ্ধমূল ধারণা হয়—না, ক্যাটেন পুড়েই গিয়েছে।

আসলে কপাল পুড়েছে সিধেশ্বরের, এ বাড়ির জামাইর। একটা বিপদ কাটিয়ে উঠতে না উঠতে আরেকটা বিপদ ফেস করতে হয়। কোত্থেকে শ্বাশুড়ী এসে বসলেন খাটে তাঁর শাড়ীর আঁচল লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। শাড়ীর আঁচল আর জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। এই দৃশ্য দেখে স্থির থাকতে পারে না সিধু। তার গলা থেকে অদ্ভুত এক স্বর বেরিয়ে আসে 'ই'।

: কি হল?

না কিছু না। (মনে মনে) গেল! গেল!

: এদিকে বিয়ে ঠিক। পাত্রী পাঁচপাহাড়ী স্টেটের রাজার মেয়ে। আর ও চলে গেল কিনা দার্জিলিং-এ গান গাইতে।

আমার কিন্তু অন্যরকম মনে হচ্ছে। (মনে মনে) জ্বলে গেল! পুড়ে গেল!

: কি মনে হচ্ছে?

এ বিয়েতে ওর ঠিক মত আছে তো? (মনে মনে) ধোঁয়া ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

শাড়ীর আঁচল থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে না। এ ধোঁয়া সেই ধোঁয়া—ঊর্ধ্বগামী হতে হতে এখন শ্বশুরমশাই-র জামার ভেতর থেকে বেরুচ্ছে। ধোঁয়া দেখে তিনি তো বিষম ভয় পেয়ে গেলেন। নিশ্চয়ই কোথাও আগুন লেগেছে, ঘরের মধ্যেই। এ ধোঁয়ার সঙ্গে শাড়ী জ্বলার কোনোরূপ সম্পর্ক না থাকলেও হয়ে গেল। হয়ে গেল ঠিকই। কেলোর কীর্তি ফাঁস হয়ে গেল। ততক্ষণে জ্বলন্ত সিগা-রেটের টুকরো শাড়ির অনেকখানি অংশ অধিকার করে নিয়েছে। শিখা তড়াক করে লাফ দিয়ে পড়ে আগুন নেভায়। হাতে-নাতে ধরা পড়ে সিধুর চোখ দুটি ট্যারা হয়ে যায়। অবশেষে সংজ্ঞাহীন।

জানবেন এই ছবির নাম 'রাগ-অনুরাগ' ব্যানার সত্যসুধা প্রোডাকসন্স। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শেখর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীচট্টো-পাধ্যায় এ ছবিতে শ্বশুরমশাই-র চরিত্র রূপায়িত করছেন। নায়ক, তার ভাগ্নে বিখ্যাত গায়ক শংকর সেন—রণজিত মল্লিক। নায়িকা পাদ্রু পাহাড়ী স্টেটের রাজার মেয়ে—অপর্ণা সেন। অন্যান্য চরিত্রের শিল্পী : রবি ঘোষ, কণিকা মজুমদার অনুপকুমার এবং সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়। গত সপ্তাহে এ ছবির সুটিং শুরু হয়েছে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে। সঙ্গীত হবে অন্যতম সম্পদ। গান রেকর্ড করা হয়ে গিয়েছে। গেয়েছেন আরতি মুখোপাধ্যায় এবং সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্বয়ং।

শচীন সেনগুপ্তের পরিচালনা ও নির্দেশনায় নির্মীয়মাণ চার্বাক দলের 'ছেলেবেলায় শরৎচন্দ্র' ছবির নামভূমিকায় মাঃ অরিন্দম

স্টুডিও সংবাদ

সমীর প্রোডাকশন্সের প্রথম পর্ব ছয় 'প্রেমিক' ছবির গান রেকর্ড করা হয়েছে। সুরকার মজুমদার। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন: মান্না দে, আরতি মুখোপাধ্যায় এবং তরুণ মুখোপাধ্যায়। সমীর মুখার্জি প্রযোজিত এ ছবির পরিচালক দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুবোধ ঘোষ রচিত 'বারবধূ' এবার চলচ্চিত্রে রূপায়িত হতে চলেছে। পরিচালনা করবেন বিজয় চট্টোপাধ্যায়। শুটিং শুরু হতে আর বেশী দেরী নেই। নায়ক-নায়িকার রূপে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন সমিত ভঞ্জ এবং সোমা দে। চিত্রগ্রহণ করবেন: শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়।

দয়াশংকর সুলতানিয়া কর্তৃত্বভার গ্রহণ করার পর থেকে ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে মাঝে মধ্যে শুটিং হচ্ছে। চলতি সপ্তাহে একজন নতুন পরিচালক এখানে তিনদিনের সিডিউল নিয়ে শুটিং শুরু করছেন। পরিচালক অমল রায় ঘটক। ছবির নাম 'রং নাম্বার'। এই পর্যায়ের শিল্পী নায়ক সমিত ভঞ্জ তরুণকুমার এবং জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায়। সেট মার্কারি ধরনের অফিস, নির্মিত হয়েছে শিল্প-নির্দেশক সূর্য চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে।

প্লে-বয় নায়ক সমিত ভঞ্জ অফিসের বস। টেলিফোনে কার সঙ্গে যেন খুব হেসে হেসে কথা বলছিলেন। ক্যামেরাম্যান দীপক দাশ ফ্রেমে ওকে, অফিসের অন্যান্য কর্মচারীদের মধ্যে উদয় ভট্টাচার্য এবং তরুণকুমারকে ধরছেন। কেননা এই টেলিফোনের পরিপ্রেক্ষিতে অফিসের অন্যান্য কর্মচারীদের রি অ্যাকশনসগুলো নোট করে রাখতে চান পরিচালক। বয়সে তরুণ অত্যন্ত ধীর স্থির প্রকৃতির খুঁটিনাটি প্রত্যেকটা ব্যাপারে তাঁর সজাগ দৃষ্টি। কোনোরকম প্রিটেনশন নেই। পয়সা রোজগারের জন্য ছবি করতে এসেছেন। একান্তভাবে আত্মতৃপ্তির জন্য নয়। তিনি ছবির মধ্যে নীট একটি গল্প রেখেছেন স্বরচিত। আগাগোড়া তিনি মূল গল্পটিকে রহস্যের আড়ালে রাখতে চাইছেন। বলতে পারেন টেলিফোন-রহস্য। প্লে-বয় নায়ক আজ এ মহিলা, কাল ও মহিলার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু কখনই সেই মহিলার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় না যাকে সে 'রং নাম্বার'-এ পেয়েছে। প্রতিদিন রাতে নির্দিষ্ট একটা সময়ে টেলিফোন বেজে ওঠে। নায়ক যেখানেই থাকুক বাড়িতে এসে টেলিফোনটা রিসিভ করে। ভেসে আসে কখনও বিষণ্ণ, কখনও উচ্ছল নারীকণ্ঠ। কে এই রহস্যময়ী নারী।

বুঝতে পারছ এখনো আমরা তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। সে হচ্ছে আমাদের নায়িকা। এখনো ঠিক হয়নি, জানালেন পরিচালক শ্রীরায়ঘটক। তিনি আরো জানালেন, এই চরিত্রের জন্য আমরা অনেক নতুন মেয়ে দেখেছি। কারুর চোখ পাওয়া যায় তো ফিগার পাওয়া যায় না। কারুর ফিগার পাওয়া যায় তো মুখ পাওয়া যায় না। রাস্তায় ঘাটে অলিতে গলিতে—খুঁজেছি ফ্যানাটিক্যালি খুঁজেছি। পাইনি, তাই পরিচিত নায়িকার মুখের কথা ভাবতে হচ্ছে।

ইউনাইটেড ইন্টারনাশনাল নিবেদিত এ ছবিতে খান ছয়েক গান থাকবে। দুখানা রেকর্ড করা হয়ে গিয়েছে। রচয়িতা দিলীপ গুহ। সুরকার দিলীপ ভট্টাচার্য। প্লে-ব্যাক করছেন: হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং মান্না দে।

চলচ্চিত্রে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি প্রগতিশীল দেশেই আজ বিস্তৃতি লাভ করেছে। আর তার ফলে ঘরে বসেই আমরা এমন এমন ছবি দেখছি যা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকেই শুধু নয় সুস্থ চেতনাকেও চমকিত এবং বৃহত্তর পৃথিবী সম্পর্কেও সজাগ করে তুলছে।

বলা বাহুল্য এর জন্যে আমরা বিশেষ করে ভারত সরকার, ভারতস্থ বিভিন্ন দেশের দূতাবাস এবং ফিল্ম সোসাইটি ও সিনে ক্লাবগুলির কাছে কৃতজ্ঞ।

তবু একটা কথা ভারতের বাইরের অনেক দেশে এমন এমন উল্লেখযোগ্য ছবি তৈরী এবং প্রদর্শিত হয়, যা যে কোন কারণেই হোক আমাদের দেশ পর্যন্ত এসে পৌঁছয় না। এ সম্পর্কে এখানকার ফিল্ম সোসাইটি ও সিনে ক্লাবগুলির মধ্যেও কিঞ্চিৎ ক্ষোভ লক্ষ্য করা গেছে। তাঁদের বক্তব্য এখানকার কনসুলেট যে সব ছবি দেন, তার মধ্যে থেকেই তাঁদের ছবি বেছে নিতে হয়। তার বাইরে ইচ্ছানুযায়ী তাঁরা কোন ছবি আমদানী করতে পারেন না। ভারত সরকারের আমদানী নীতির প্রতিবন্ধকতা ছাড়াও সে ক্ষেত্রে বিদেশী মুদ্রার প্রশ্নটাও এর সঙ্গে জড়িত আছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত চলচ্চিত্র উৎসবে যে সব উল্লেখযোগ্য ছবি প্রদর্শিত হয় এবং যার কথা আমরা পত্র-পত্রিকায় পড়ে থাকি তার খুব কম অংশই এদেশে আসে।

এ ব্যাপারে ভারত সরকার নিজে না হলেও সিনে ক্লাবগুলিকে যদি ছবি আনার জন্য অনুমতি দেন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা দেন, তাহলে বুদ্ধিজীবি দর্শকদের বড় একটা অংশ তা দেখার সুযোগ পান। এবং তাতে বোধকরি এদেশের চলচ্চিত্র শিল্পও লাভবান হবে।

একটা সুখের কথা গত কিছুকাল যাবৎ সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে হলেও চলচ্চিত্র উৎসবের মাধ্যম ছাড়াও পাবলিক হলেও তাঁদের দেশের কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য ছবির প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন।

এ ছাড়া ইউ এস আই এস কর্তৃপক্ষও মাঝে মাঝেই তাঁদের দেশের ক্লাসিক ছবিগুলি দেখাবার ব্যবস্থা করে থাকেন। কিন্তু সেটা একান্ত নিমন্ত্রিত এবং নিজস্ব মিনিয়েচার হলের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

অতএব কলকাতায় প্রাত্যহিক নিয়মে বিশিষ্ট ছবিগুলি দেখার তেমন সহজলভ্য সুযোগ নেই বললেই চলে।

এই অভাব পূরণ করতে পারে বিশেষভাবে ও উদ্দেশ্যে নির্মিত একটি আর্ট-থিয়েটার, যে হলে সে ছবির নিয়মিত প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকবে। আর এ ব্যাপারে সরকারী আগ্রহ সর্বাধিক কার্যকর। অথবা যে সব হল বা চিত্রপ্রদর্শক সংস্থা এদেশে বিদেশী ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে থাকেন তাঁদের এই জাতীয় ছবি আমদানী করার সুযোগ করে দেওয়া। মনে হয় এ ব্যাপারে তাঁরা নিশ্চয়ই উৎসাহ দেখাবেন।

সোলারিস

সোভিয়েট রাশিয়ায় নির্মিত এই ছবিটি শুধুমাত্র স্বদেশেই নয়, বলা যায় প্রায় সারা বিশ্বে এর বিষয় বৈচিত্র্য প্রয়োগ গুণ ও শিল্পোৎকর্ষের জন্য সাড়া জাগিয়েছে। এ ছবিতে পরিচালক মানুষের অন্তর জগতে এমন এক আশ্চর্যজনক অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন যা এ জাতীয় ছবির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অভিনব।

'সোলারিস' পরিচালনা করেছেন তরুণ পরিচালক আঁদ্রেই তারকোভস্কি। পোলিশ লেখক স্ট্যানিস্লাভ লেমের বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস অবলম্বনে এর কাহিনী গড়ে উঠেছে। যার পটভূমি মহাকাশ, বিষয় বস্তু কিছুটা মনস্তত্ত্ব ঘেঁসা—তবে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিক ঐ পটভূমিতে।

পরিচালক এই উপন্যাসের ভিত্তিতেই মানুষের মহাকাশ অভিযানের কয়েকটি দার্শনিক ও মানবিক সমস্যা নিয়ে ছবিটি তৈরী করেছেন।

ছবির নায়ক একজন মনস্তত্ত্ববিদ। মহাকাশ স্টেশন সোলারিসে এমন কিছু রহস্যজনক ঘটনা ঘটেছে যা পৃথিবীর মানুষের কাছে বুদ্ধিতে ব্যাখ্যার অতীত। নায়ক সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করছেন। সেখানে গিয়ে তিনি এমন এক ঘটনার সম্মুখীন হলেন যার রহস্য যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায় না।

এই মহাকাশ স্টেশনে এমন কিছু প্রাণীর রহস্যজনক আবির্ভাব ঘটেছে বাইরে থেকে যাদের অস্তিত্ব বা আচরণ ঠিক মানুষেরই মত। ঐ স্টেশনের কর্মীরা নায়ককে হদিশ দিতে পারে না যে, এই অনুপ্রবেশকারী বা আগন্তুক কে বা কারা এবং কোথা থেকেই বা আসছে। এদের প্রেতের মত আচরণ এবং নিয়মিত উপস্থিতির ফলে একজন বৈজ্ঞানিক আতঙ্কিত হয়ে এক সময় আত্মহত্যাও করেন।

শেষ পর্যন্ত নায়ক তাঁর বুদ্ধিবৃত্তির ওপর নির্ভর করে সেই রহস্য উদ্ঘাটনে সচেষ্ট হন কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করেন। বুদ্ধির দ্বারা কোন কিছুরই ব্যাখ্যা করতে পারেন না। শেষ পর্যন্ত অনুভূতিবোধ দ্বারা তিনি তার উত্তর খুঁজে পান।

ঘটনাটা এই রকম। নায়ক একদা হারি নামের একটি মেয়েকে ভালবাসতেন। কি করে সেই মেয়েটি যেন সেখানে তার কাছাকাছি এল। হারিকে পেয়ে তিনি খুশীই হলেন। ভাবল হারিকে পাশে নিয়ে তিনি আবার নতুন করে অনুসন্ধানের কাজ শুরু করতে পারবেন। কিন্তু হঠাৎই এক সময় নায়ক আবিষ্কার করেন যে পৃথিবীতে একদা যে মেয়েটিকে তিনি ভালবাসতেন এ সেই রক্ত-মাংসে গড়া হারি নয় তার প্রতিবিম্ব মাত্র। যার মধ্যে আত্মার অস্তিত্ব বিদ্যমান। কিন্তু এই প্রতিবিম্ব সৃষ্টির ক্ষমতা কার? মানুষের ঊর্ধ্বের এমন কোন শক্তিমানের?

একদা হারির মৃত্যু এবং পুনরায় আবির্ভাব চিন্তা নায়ককে রীতিমত বিস্ময়াবিষ্ট করে। কিন্তু সূত্র খুঁজে পান না। শেষ পর্যন্ত তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে এ রহস্যের কোন ব্যাখ্যা নেই। এরা হয়তো কোন পদার্থ অথবা এমন কিছু যা দ্বারা মৃত্যুর পরেও এরা পূর্ব রূপ ধারণ করতে পারে এবং যার গতিবিধি বা উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ রহস্যজনক পৃথিবীর মানুষের কাছে।

হিন্দু শাস্ত্রে পরলোক তত্ত্ব এবং জন্মান্তরবাদ বলে একটা কথা আছে। এ কাহিনীতে কোথায় যেন তার অস্তিত্ব এবং স্বীকৃতি খুঁজে পাওয়া যায়।

ছবিটি তার কাহিনীর জন্য দর্শকদের মধ্যে খুবই বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। এর প্রয়োগ ধারাও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

কান চলচ্চিত্র উৎসবে 'সোলারিস' ছবিটি জুরীদের বিশেষ পুরস্কার পায়।

সবশেষে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মহাকাশের ওপর আমেরিকায় তোলা স্ট্যানলি কুব্রিকের 'স্পেস ওডিসি টু থাউজেন্ড ওয়ান' ছবিটি মুক্তি লাভের পর তা দেখে অনুপ্রাণিত হয়েই তারকোভস্কি এই ছবিটি তৈরী করেন।

আন্দ্রে তারকোভস্কি

সাউন্ডার

হলিউডে কম বাজেটে তোলা 'সাউন্ডার' (SOUNDER) ছবিটি একটি নিম্নবিত্ত কৃষিজীবী নিগ্রো পরিবারের একেবারে ঘরোয়া কাহিনী। তাদের ছোট ছোট সুখ দুঃখ বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা এই ছবিতে তুলে ধরা হয়েছে সহানুভূতির সঙ্গে।

মূল কাহিনী গড়ে উঠেছে উইলিয়াম এইচ আর্মস্ট্রং-এর লেখা একটি মূল উপন্যাস অবলম্বনে। সময়কাল ১৯৩০-৩৩ সাল। যখন কাহিনীর পটভূমি লুসিয়ানার মানুষ তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক অব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে প্রায় পরিবারেই অর্থনৈতিক অস্বাচ্ছন্দ্যর জন্য খাদ্যাভাব সন্তানদের শিক্ষাদানের চেষ্টা প্রায় অসম্ভব।

কৃষিজীবী নথান মর্গান তিনটি সন্তান সহ সস্ত্রীক বাস করে তার ভাড়া করা খামারে। পারিবারিক দিক থেকে সে খুবই সুখী। কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে সে তার ছোট ছোট ইচ্ছাগুলি পূরণ করতে পারে না। এমন কি এক টুকরো মাংসও তুলে দিতে পারে না সে স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েদের পাতে।

সেই ইচ্ছাটাই একদিন তার মনে লোভের সঞ্চার করে এবং একদিন শূকর চুরি করতে গিয়ে সে ধরা পড়ে জেলে যায়। ফলে সমগ্র পরিবারটিই একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তির অভাবে চরম দারিদ্র্যের সম্মুখীন হয়।

এই সময় একজন শ্বেতকায় মহিলা নাথানের বড় ছেলে ডেভিড লীকে সংসারের হাল ধরার জন্য অনুপ্রেরণা দেন এবং নানা ভাবে সাহায্য করেন। লী পড়াশুনা বন্ধ রেখে সংসারকে বাঁচাবার জন্য উঠে পড়ে লাগে। কিন্তু পিতার আকর্ষণ তার কাছে দুর্বার। তাই সে একদিন তার সঙ্গে দেখা করার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু তার সেই যাত্রা সার্থক হয় না। ফেরার পথে তার সঙ্গে দেখা হয় একজন নিগ্রো শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে। তিনি তাকে আবার পড়াশুনায় মন দিতে বলেন। কিন্তু লীর মন তাতে সায় দিলেও সে তার কর্তব্যের কথা ভুলতে পারে না—অন্তত তার পিতা জেল থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত। প্রতিদিন তাকে সংগ্রাম করে যেতেই হবে তাদের সংসারকে অনাহারের হাত থেকে বেঁচে থাকার জন্য।

ছবির শেষ দৃশ্যটি এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। এক বছর বাদে গৃহকর্তা যখন তার কয়েদ জীবন শেষ করে ঘরে ফিরে এসে সংসারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ছেলের সংগ্রামের কথা শুনল তখন আনন্দে এবং অনুশোচনায় তার চোখে জল এসে গেল। সে আবেগে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'এখান থেকে তোমাকে স্কুলে যেতে হবে। লেখাপড়া শিখে তোমাকে জীবনে অনেক বড় হতে হবে। লেখাপড়াই মানুষের জীবনে বড় হবার প্রেরণা এনে দেয়।'

খুবই সাদামাটা কাহিনী। কোন অতি নাটকীয়তা নেই জটিল ব্যাপার নেই। সরল কাহিনীর সরল বক্তব্য। এই একটি পরিবারের মধ্যে দিয়েই নিম্নবিত্ত পরিবারগুলির দৈনন্দিন জীবনের অতি সামান্য সুখ দুঃখ হাসি কান্না কোন রকম নাটকীয়তার আশ্রয় না নিয়েই সরলভাবে দেখানো হয়েছে। শেষ কথাটিই এর মূল বক্তব্য। শিক্ষাই মানুষকে দারিদ্র্যের হাত থেকে রক্ষা করে, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ এনে দেয়।

ছবিতে নিম্নবিত্ত পরিবারগুলির বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম দুঃখ দৈন্য অভাবকে জয় করার একটা প্রবণতা দেখানো হয়েছে নিগ্রো পরিবারের মাধ্যমে। যারা আবহমানকাল ধরেই দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে আসছে।

ছবিটি আমেরিকায় প্রচণ্ড সাড়া জাগিয়েছে। দেশের প্রায় সব সমালোচকই 'সাউন্ডার' ১৯৭৩ সালের শ্রেষ্ঠ ছবি বলে মন্তব্য করেছেন। শান্ত সহানুভূতির সঙ্গে তোলা এই ছবিটি এ যাবৎ পর্যন্ত নিগ্রো সমাজের পটভূমিকায় তোলা ছবিগুলি থেকে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। যেখানে প্রচারটা ছবির অন্তরালে থেকেই কাজ করেছে।

ছবিটি পরিচালনা করেছেন মার্টিন রীট এবং প্রযোজনা করেছেন বার্ট র‍্যাডনিজ।

—শা, র, চ

[illegible]-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী আই কে গুজরাল এবং তুষারকান্তি ঘোষ।

আই কে গুজরাল

শ্রেষ্ঠ পরিচালক : মৃণাল সেন

বিবিধ সংবাদ

চন্দ্রাবতী দেবীর সংবর্ধনা : অবনমহলে মলয় গীতবীথির সমাবর্তন উৎসবের সূচনায় ছিলো প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শ্রীমতী চন্দ্রাবতী দেবীর সংবর্ধনা। অধ্যক্ষা শেলী সান্যাল তাঁর হাতে তুলে দেন শ্রদ্ধার্ঘ্য ও মানপত্র। শ্রীপ্রবোধ সান্যাল সাহিত্যিকের দৃষ্টিকোণ থেকে চন্দ্রবতী দেবীর শিল্পকৃতির প্রতি আলোকপাত করেন। আর তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের আনন্দ-সমৃদ্ধ উজ্জ্বল দিকটি মেলে ধরেন তাঁরই প্রাক্তন বান্ধবী শ্রীমতী বীণাদেবী।

অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে শিল্পী যথোচিত বিনয়ে উদ্যোক্তাদের কৃতজ্ঞতা জানান।

পরিশেষে মঞ্চস্থ হয় দুটি নৃত্যনাট্য—শিশুশিল্পী অভিনীত। প্রথমটি অ্যালফাবেট ক্লাব পরিচালনায় ছিলেন পলাশ মুখোপাধ্যায় ও সংগীত পরিচালনায় ছিলেন এ্যালফাবেট ক্লাব—দ্বিতীয়টি গুপী গায়েন বাঘা বায়েন পরিচালক ও নৃত্যপরিচালক যথাক্রমে শ্যামলেশ ঘোষ ও স্মৃতিরঞ্জন ঘোষ। বিষয়বস্তু অনুসারে দুটি নাটকই সুষ্ঠু রূপায়ণের দাবিদার। শিশুশিল্পীরা সারাক্ষণই শ্রোতাদের আনন্দে মাতিয়ে রাখতে পেরেছে। প্রযোজনার কৃতিত্ব শেলী সান্যালের।

রবীন্দ্রনাথ-শ্রীঅরবিন্দ : আষাঢ়ের প্রথম সন্ধ্যায় (১৬ই জুন, ৭৪, ৭টা ৪৫ মিঃ)

শ্রীঅরবিন্দ ভবনে পরিপূর্ণ শ্রোতৃবর্গের সমাগমে, শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির আয়োজিত এক অনবদ্যতার ও মনোজ্ঞ গীতি আলেখ্য : 'রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ'—ডঃ হরপ্রসাদ মিত্রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ-এর দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে অরবিন্দ এবং এই দুই মহামনীষীর ওপর রচিত গীতি আলেখ্যটির রচনাকার 'শাশ্বতী'-সম্পাদক শ্রীঅমলেশ ভট্টাচার্য গ্রন্থনায় অংশ নেন। নারীকণ্ঠে গ্রন্থনায় মূলে অংশ নেন শ্রীমতী ঊষা ভট্টাচার্য। কবিতা পাঠ ও রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশিত হয়।

বিচিত্রানুষ্ঠান : রঙ্গনায় 'আকাশবাণী রিক্রিয়েশন ক্লাবের' পঞ্চদশ বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়। বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন হৈমন্তী শুক্লা ও কল্যাণী সিকদার। যন্ত্রসংগীতে আলি আহমেদ হোসেন, সমরেন্দ্র সিকদার অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় ও গোবিন্দ বসু। পরে সদস্যরা অজিত মুখোপাধ্যায়ের 'সাংবাদিক' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। সরস সংলাপের গুণে নাটকটি খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। অভিনয়ে প্রথমেই নাম করতে হয় সৌমেন চৌধুরী অমলেন্দু হালদার, মিন্টু চক্রবর্তী, শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জি ও শেফালী ব্যানার্জি। নাট্য নির্দেশনায়ও ছিলেন অজিত মুখোপাধ্যায়। নাটকটিকে শৈল্পিক মুন্সিয়ানায় প্রোজ্জ্বল করে তুলতে তাঁর যে নিষ্ঠার কোন অভাব ছিল না, তা প্রযোজনার প্রতিটি মুহূর্তে ধরা পড়েছে। সংগীত পরিচালনা করেন বরুণ পাল। অনুষ্ঠানের ঘোষণায় ছিলেন জগন্নাথ বসু। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কবিতা সিংহ।

বহ্নিশিখা : ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক (ব্রেবোর্ন একসচেঞ্জ শাখা) কর্মচারী সমিতি আয়োজিত নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'বহ্নিশিখা' নাটকটি অভিনীত হয়। নাটকটির নির্দেশনায় অজিত মুখোপাধ্যায় অভিনবত্বের দাবী রাখেন। সুনিপুণ সম্পাদনার জন্য নাটকটির গতিবেগ অব্যাহত ছিল। দৃশ্যসজ্জা ও আলোকসম্পাত নাটকটিকে অত্যন্ত মনোরম করে তুলেছিলো।

সঞ্জীব রৌনিং শোরের রজত জয়ন্তী বর্ষপূর্তি উৎসব অবন মহল মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কাজি সব্যসাচীর অনবদ্য আবৃত্তির মাধ্যমে। পরবর্তী অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেন সুপ্রিয়া রায় ও সুচন্দ্রা রায়। সংগীতে ছিলেন সর্বশ্রী অসিত অধিকারী, অপর্ণা ঘোষ অতসী ঘোষ, সুনন্দা ঘোষরায়।

শেষ অনুষ্ঠান শুরু হয় অজয় কয়ালের পরিচালনায় বাদল সরকারের রাম-শ্যাম-যদু নাটক নিয়ে। সংঘের সভ্যবৃন্দ অভিনীত এই নাটক সমবেত দর্শকমণ্ডলীর বিশেষ প্রশংসা লাভ করে. অভিনয়ে বিশেষ দক্ষতা দেখান সর্বশ্রী অজয় কয়াল (গোবিন্দ চক্রবর্তী), সমীর ঘোষ (রাম), ভোলানাথ ঘোষ (যদু), সৌমেন ব্যানার্জি (শুকদেব), বরুণ ঘোষ (শ্যাম), পান্নালাল ব্যানার্জি (জয়দেব), অভিজিৎ ঘোষাল (নরো মিত্তির), দীপ্ত চ্যাটার্জি (ভবানী), চঞ্চল চ্যাটার্জি (ভদ্রলোক), স্ত্রী চরিত্রে দীপ্ত দে (ভবানী চৌধুরীর কন্যা)। পরিচালনা, আবহসংগীত, মঞ্চ ও আলোর কাজ সুন্দর।

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের রবীন্দ্র জন্মোৎসব

গত ৩১ মে সন্ধ্যায় গভর্ণমেন্ট আর্ট কলেজ ভবনে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের উদ্যোগে রবীন্দ্র জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক সুকুমার সেন। শ্রীসেন অল্প কিছুদিন বিশ্বভারতীর ছাত্র ছিলেন। স্মৃতিচারণার মধ্যেই তিনি রবীন্দ্রনাথ এবং শান্তিনিকেতন সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদারের নির্দেশনায় সংগীত পরিবেশিত হয়।

সংগীত পরিষদের অনুষ্ঠান

অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে সংগীত পরিষদের শিল্পীরা রবীন্দ্র-জয়ন্তী অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করেন। একক ও সমবেত সংগীত মিলিয়ে তেরখানি গান পরিবেশিত হয়। অরুণ ভট্টাচার্য বিভাস ঘোষ, ও মধুমাধবী ভট্টাচার্যের একক সংগীত আকর্ষণীয় হয়। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন পূরবী বন্দ্যোপাধ্যায় ঋতুপর্ণা ভট্টাচার্য মলয় রায় ও স্বপ্না মজুমদার। শেষে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকটি অভিনীত হয়। সংগীত পরিচালনা করেন মধুমাধবী ভট্টাচার্য এবং নাটকের ব্যবস্থাপনা করেন নীলিমা মজুমদার।

শ্রেষ্ঠ সহ অভিনেত্রী : বাসবী নন্দী

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা : সঞ্জীবকুমার

শ্রেষ্ঠ পরিচালক (হিন্দী) : গুলজার

শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী ববিতা

ভারতবর্ষের স্মরণীয়

(৯)

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ন্যাশনাল থিয়েটারের গোড়াপত্তনের মূলে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে নটগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ নট চূড়ামণি অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী, রসরাজ অমৃতলাল বসু এবং ধর্মদাস সুরই সাধারণের কাছে বেশী পরিচিত। এঁদের বিভিন্নমুখীন প্রতিভা এবং নাট্যশালার সংগে দীর্ঘদিনের যোগ ও কর্ম-তৎপরতাই রয়েছে এই পরিচিতির মূলে। কিন্তু আরো যাঁরা ছিলেন তাঁরা এঁদের মত খ্যাতিমান না হলেও তাঁদের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না।

ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্যোগ মূলে স্বর্গতঃ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অন্যতম প্রধান। সংগঠনী শক্তিতে নগেন্দ্রনাথ সর্বপ্রধান ছিলেন বললেও ভুল বলা হবে না।

বাগবাজারের কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম। ৫৭ রামকান্ত বসু স্ট্রীটের গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন নগেন্দ্রনাথ। নগেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্যকার হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মতান্তরে শিশিরকুমার এবং গিরিশচন্দ্রের সংগে দেবেন্দ্রনাথ ন্যাশনাল থিয়েটারে অন্যতম পরিচালক রূপে যোগদান করেন। নগেন্দ্রনাথের পরবর্তী ভ্রাতা লেফটেন্যান্ট কর্ণেল এইচ ব্যানার্জি ছিলেন পাতিয়ালার সিভিল সার্জেন। নাট্যান্দোলনের সংগে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও তিনি একজন উৎসাহদাতা ও নাট্যানুরাগী ছিলেন। অন্যান্য ভ্রাতাদের নাট্যসাধনার ছিলেন একজন প্রধান সমর্থক।

জ্যেষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বর্ণলতা নাটক ২৮ এপ্রিল ১৮৭৪ (বাং ১২৮১) খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধ অভিমতই এই নাটকে ধ্বনিত। বাঙালী মেয়েরা শিক্ষা পেলে বিপথগামী হয়—এই হলো নাটকখানির মূল বক্তব্য।

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'সতী কি কলঙ্কিনী' নাটকখানিকে রসরাজ অমৃতলাল বসু দেবেন্দ্রনাথের রচনা বলে অভিহিত করেছেন। ডঃ সুকুমার সেন বা অন্যান্য ঐতিহাসিকরা তা মেনে নেননি। স্বর্ণলতা নাটকের বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। নাটকখানি বেঙ্গল ও হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল। নগেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একজন প্রখ্যাত অভিনেতা ও নাট্যকার। কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত মাতা' ক্ষুদ্র নাটকখানি জাতীয়তাবাদী নাটক হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত।

১৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে নাটকখানি ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়ে সাড়া জাগায়। ভারত মাতা ও প্রধান সন্তান চরিত্রে অভিনয় করেন মহেন্দ্র বসু ও অমৃতলাল বসু। ১৬ ফেব্রুয়ারী হিন্দু মেলাতে জামাই বারিকের সংগে ভারতমাতাও অভিনীত হয়। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৮ আগষ্ট নাটকটি প্রকাশিত হয়।

কিরণচন্দ্রের দ্বিতীয় নাটক ভারতে যবন ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী ৩০ জানুয়ারী ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে হাওড়া রেলওয়ে মঞ্চে নাটকটির অভিনয় করেন। কলকাতার বিভিন্ন মঞ্চেও নাটকটির অভিনয় সংবাদ পাওয়া যায়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ৩ এপ্রিল ভারতে যবন জামাই বারিকের সংগে অভিনীত হয়। 'গোপন চুম্বন' নামে কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে আর একখানি ছোট নাটক লেখেন। অভিনেতা হিসেবে কিরণচন্দ্র খ্যাতিমান ছিলেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারী গিরিশচন্দ্রের সংগে কৃষ্ণকুমারী নাটকে জগৎ সিংহের চরিত্রাভিনয়ে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ৬ মার্চ বেঙ্গল থিয়েটার মঞ্চে গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কর্তৃক মাইকেলের মেঘনাদ বধ নাটকে মেঘনাদ চরিত্রে অমিত্রাক্ষর ছন্দে অপূর্ব অভিনয় দক্ষতার পরিচয় দিয়ে কিরণচন্দ্র ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর হয়ে আছেন।

২৭ মে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এখানেই মৃণালিনী নাটকে পশুপতি চরিত্রে কিরণচন্দ্র অভিনয় করে যথেষ্ট প্রশংসাজন করেন। স্মরণ থাকতে পারে পশুপতি চরিত্রে গিরিশচন্দ্রের অভিনয় ঐতিহাসিক সৃষ্টি হিসেবে কীর্তিত।

কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে মৃণালিনী নাটকে পশুপতি চরিত্রে অভিনয় করে কিরণচন্দ্র প্রশংসার্জন করেন। মাধবাচার্যের চরিত্রে অভিনয় করেন স্বয়ং বিহারীলাল। বিনোদিনী অভিনয় করেছিলেন মনোরমা চরিত্রে। মধ্যম ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথের প্রতি প্রচেষ্টার সংগে কিরণচন্দ্র জড়িত থেকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং অভিনেতা হিসেবে নগেন্দ্রনাথের চেয়েও তিনি বেশী খ্যাতি অর্জন করেন। ন্যাশনাল থিয়েটারের সর্বপ্রধান উদ্যোক্তা ও সংগঠক নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংগঠক নাট্যকার ও অভিনেতা হিসেবে ছিলেন সমান দক্ষ।

রসরাজ অমৃতলাল বসু তাঁর অমৃত মদিরায় ২৮৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন:

'বাগবাজার নিবাসী' ডাবসাট ইন্ড এ্যাকটর নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হাস্য-করুণ প্রভৃতি নানা রসেরই অভিনয়ে ইনি নটকুলের শীর্ষস্থানীয় এবং নাট্যশিক্ষা সম্বন্ধে অর্ধেন্দুশেখরের প্রধান সহকারী ছিলেন। সাধারণ নাট্যশালার প্রথম অপেরা 'সতী কি কলঙ্কিনী' ইঁহারই জ্যেষ্ঠ সহোদর দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত। ইঁহার ও ইঁহার ভ্রাতৃগণের ঐকান্তিক উদ্যোগ-যত্ন না থাকিলে সে সময়ে বঙ্গে সাধারণ নাট্যশালা স্থাপিত হইতে পারিত কিনা সন্দেহ।'

গান-বাজনা এবং নাট্যাভিনয়ের প্রতি তদানীন্তন কালের বেশীর ভাগ অভিজাত ধনিক সম্প্রদায়ের উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হতো। নগেন্দ্রনাথের পিতা গিরীশচন্দ্রের অনুরাগ এবং উৎসাহও এ বিষয়ে কম ছিল না। কারণ তাঁর সম্মতি এবং উৎসাহ না থাকলে—দেবেন্দ্রনাথ নগেন্দ্রনাথ এবং কিরণচন্দ্রের পক্ষে নাট্যানুশীলন সম্ভব ছিল না। বাগবাজারের নলদময়ন্তী সম্প্রদায়ের খ্যাতি তখন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। গিরীশচন্দ্র তাঁর গৃহেও নলদময়ন্তীর অভিনয়ের আয়োজন করেন একবার।

ছোটবেলা থেকেই নগেন্দ্রনাথের সংগীত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ও অভিনয়ে আকর্ষণ পরিদৃষ্ট হয়। নগেন্দ্রনাথদের পরিবারের

বলুন কী কীমৎ/অরুণা ইরাণী

সংগে পরিচিত বাগবাজারের গোকুলচন্দ্র মিত্রের বংশধর গিরীশচন্দ্র মিত্র এবং আনন্দলাল মিত্র নলদময়ন্তী দলে অভিনয় করতেন। এঁরা দুজনে একটি বাদন দল তৈরী করলেন। ডাঃ দুর্গাদাস করের মাধ্যম পুত্র রাধামাধব কর এবং হিংগুল খাঁর সংগে নগেন্দ্রনাথও এই বাদন দলে যোগদান করলেন। বাদন দলটি ধীরে ধীরে খ্যাতি অর্জন করলো। বিভিন্ন নাট্যানুষ্ঠানে ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে বাজিয়ে প্রশংসা লাভ করলো। ভবানীপুরের প্রখ্যাত উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নাম আমাদের অজানা নয়। পরবর্তীকালের নাট্য ইতিহাসে জগদানন্দবাবু ধিক্কৃত হয়ে আছেন। জগদানন্দবাবুদের গৃহে গিরীশ মিত্রের বাদন দল একবার বাজিয়ে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করে। ভবানীপুরের অন্য একটি শ্রেষ্ঠ দলকেও ম্লান করে দেয়। গিরীশ মিত্রের দলের এই খ্যাতি নগেন্দ্রনাথকে নিজস্ব একটি বাদন দল গঠনে অনুপ্রাণিত করে। এই দলের সংগে যুক্ত থেকে তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার্জন করেছেন।

দলের কয়েকজন সভ্যদের সংগে পরামর্শ করলেন গোপনে। হিংগুল খাঁ বিভিন্ন বাদ্যে এবং অভিনয়ে চৌখোস ছিলেন। কথিত আছে তিনি মুসলমান ছিলেন। পরে ধর্মান্তরিত হয়ে হিমুবাবু নামে পরিচিত হন। রাধামাধব কর ছিলেন নগেন্দ্রনাথের আবাল্য বন্ধু। এই দুজন নগেন্দ্রনাথের প্রধান সহকারী হলেন। পরে গিরীশ মিত্রের দলের অন্যান্য সভ্যরাও যোগ দেন। ফলে গিরীশ মিত্রের দল উঠে যায়। নগেন্দ্রনাথ 'বাগবাজার একতান বাদন দল' নামে নিজেদের দল গঠন করে আসরে নামেন। নটগুরু গিরিশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ শ্যালক ব্রজেন দেব মহাশয়ের একটি বাদন দল ছিল। এই দলটি শেষ পর্যন্ত উঠে যায়। এদের দলে ক্ল্যারিওনেট বাঁশী বাজানো হোত। তখন সব বাদন দলের ক্ল্যারিওনেট বাঁশী ছিল না। রাধামাধব করের সাহায্যে নগেন্দ্রনাথ ওদের ক্ল্যারিওনেট বাঁশীটি নিজ দলে কিনে আনলেন। সব দিক দিয়েই বাগবাজার একতান বাদন দল সেরা বাদন দলে পরিণত হয়ে জনপ্রিয়তার্জন করলো। বিভিন্ন নাট্যাভিনয়ে নগেন্দ্রনাথের দল বাজিয়ে আসতেন। বাজিয়ে যতই প্রশংসা লাভ করা যাক না কেন—মূল প্রশংসা উৎসারিত হতো অভিনয়কে কেন্দ্র করে। নগেন্দ্রনাথের মনে অভিনয় সম্প্রদায় গঠনের স্পৃহা উঁকি ঝুঁকি মারতে লাগলো।

পদ্মাবতীর অভিনয় তখন চতুর্দিকে সাড়া জাগিয়েছে। বাংলা ১২৭৩ সালে—ইংরেজী ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে শুঁড়ীপাড়ায় পদ্মাবতীর অভিনয় অনুষ্ঠিত হলো। নগেন্দ্রনাথ তাঁর দল নিয়ে বাজাতে এলেন। এদের সংগে একটু বেশী মাখামাখি হলো। নগেন্দ্রনাথ অভিনয়েও অংশ গ্রহণ করলেন। পদ্মাবতী নাটকে কঞ্চুকী চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করলেন নগেন্দ্রনাথ। অভিনয়ের প্রতি সক্রিয়ভাবে আকৃষ্ট হলেন নগেন্দ্রনাথ।

বাত্যাভিনয় বায়-বহুল বলে ইতিমধ্যে বর্কাসবাজারের একদল মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা যাত্রাভিনয়ে মেতে উঠলেন। শর্মিষ্ঠা ও উমা অনিরুদ্ধ বা উষাহরণ যাত্রাভিনয় খুব খ্যাতি অর্জন করলো। গিরিশচন্দ্র উভয় দলের সঙ্গেই জড়িত ছিলেন। শর্মিষ্ঠা নাটকের যাত্রারূপ এবং কৃষ্ণকথন্যা সঙ্গীত রচনা করে গিরিশচন্দ্র প্রশংসার্জন করেন। যাত্রা শুনে খুশী হয়ে অনেকে গিরিশচন্দ্রকে নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করতে অনুরোধ করেন।

গিরিশচন্দ্র নগেন্দ্রনাথের চেয়ে একটু বড়ই ছিলেন বয়সে। গিরিশচন্দ্রের বিদ্যাবুদ্ধি এবং কবিত্বশক্তির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন নগেন্দ্রনাথ। তারপর ছিলেন বন্ধুস্থানীয়। নগেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রকে অনুরোধ করলেন সবাই মিলে একটি নাট্যসম্প্রদায় গঠনের। গিরিশচন্দ্র সমর্থন করলেন। সবাই এসে দাঁড়ালেন এদের পাশেই। সংগঠন কার্যের মূলে দায়িত্ব নিলেন নগেন্দ্রনাথ নাটক নির্বাচন ও নাট্য শিক্ষার দায়িত্ব নিলেন গিরিশচন্দ্র। সংগঠন কার্যে নগেন্দ্রনাথের পরই নাম করতে হয় ধর্মদাস সুরের। মঞ্চ-বিষয়ক দায়িত্ব ভার ছিলই।

আর্থিক অবস্থার কথা চিন্তা করে গিরিশচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশী নাটক নির্বাচন করলেন। সম্প্রদায়কে দি বাগবাজার এমেচার থিয়েটার নামে নামাঙ্কিত করা হলো। ভূমিকালিপি বণ্টিত হয়ে রিহার্সেল চলতে লাগলো। অর্ধেন্দু মুস্তফী তখনও সম্প্রদায়ে আসেন নি। নগেন্দ্রনাথ ধর্মদাসবাবু প্রভৃতির অনুরোধে নগেন্দ্রনাথের বাড়ীতে পূর্ণ রিহার্সেলে অর্ধেন্দুশেখর উপস্থিত থাকেন। রিহার্সেল শেষে গিরিশচন্দ্র অর্ধেন্দুশেখরের অভিমত চাইলে তিনি কয়েকটি চরিত্রের দুর্বলতা সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র ও অন্যান্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কেনারাম চরিত্রে অরুণচন্দ্র হালদারকে নির্বাচন করা হয়েছিল। এই নির্বাচন বাতিল করে সকলের অনুরোধে অর্ধেন্দুশেখর শেষ পর্যন্ত অভিনয় করেন। কুমুদিনী চরিত্রে আনন্দচন্দ্র বিশ্বাসের নির্বাচন বাতিল করে গিরিশচন্দ্র অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়কে গ্রহণ করেন। নগেন্দ্রনাথ এবং গিরিশচন্দ্রের এবং আরো অনেকের নির্বাচন অপরিবর্তিত থাকে। এরা অটল ও নিমচাঁদ চরিত্রে যথাক্রমে আত্মপ্রকাশ করেন।

—কালীশ মুখোপাধ্যায়

অন্তরালে
ববিতা/জাফর ইকবাল

বাংলাদেশের ছবি

সুটিং বন্ধ রয়েছে

ক'দিন আগে ঢাকার বাইরে ছিলেন বাংলাদেশের চিত্রজগতের হাতে গোনা মাত্র কজন তারকা।

এ'রা হলেন রাজ্জাক কবরী ববিতা মোস্তফা সুজাতা আজিম।

ফলাফল সুটিং বন্ধ। এবং ডি সি খাঁ খাঁ—জনমানবশূন্য।

এখন রাজ্জাক কবরী ববিতা ঢাকায়। কিন্তু তবুও সুটিং বন্ধ।

কারণ মোস্তফা, সুজাতা, আজিম এখনও ঢাকায় ফিরে আসেন নি। ফলে রাজ্জাক কবরী ববিতা ঢাকায় থাকা সত্ত্বেও ছবির সুটিং বন্ধ রয়েছে।

যেমন পরিচালক কামাল আহমদ তার ছবি 'উপহার'এর কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছেন। উপহার ছবির নায়ক নায়িকা রাজ্জাক ও কবরী। কিন্তু মোস্তফা এ ছবিতে বিশেষ একটি চরিত্রে অভিনয় করছেন। এদের তিনজনকে নিয়ে 'শট' নিতে হবে। অতএব—সুটিং বন্ধ।

যেমন পরিচালক এক এ বেনু।

তিনি 'আকাশ কুসুম' ছবির পরিচালক। এ ছবিতে আজিম আছেন। কিন্তু আজিম মস্কো থেকে এখনও ফিরে আসেন নি। অতএব সুটিং বন্ধ।

একই পরিচালকের দ্বিতীয় ছবির নায়িকা সুজাতা। ছবির নাম 'প্রশ্ন আছে কিন্তু'। এ ছবির সুটিংও সুজাতা ফিরে না আসার কারণে বন্ধ রয়েছে।

অতঃপর খবর নিলে দেখা যাবে, একই কারণে বাংলাদেশের অনেক পরিচালক এখন ছবির সুটিং বন্ধ রেখে ছবির যেটুকু অংশের সুটিং ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে, তার এডিটিং নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন।

যেমন পরিচালক কামাল আহমদ তাঁর ছবি 'উপহার'এর এডিটিং নিয়ে এখন ব্যস্ত রয়েছেন।

এছাড়াও অন্য কিছু কারণে কয়েকটি ছবির সুটিং এখন বন্ধ রয়েছে।

যেমন শাহজাহান চৌধুরী পরিচালিত 'পিঞ্জর'এর সুটিং এখন বন্ধ রয়েছে। কারণ এ ছবির নায়ক উজ্জ্বল। কিছুদিন আগে উজ্জ্বলের পা ভেঙেছিল। এখন তিনি কিছুটা সুস্থ। তবে উজ্জ্বল এখনও সুটিং-এ অংশগ্রহণ করতে পারছেন না। আর তাই, ছবির সুটিং বন্ধ।

এবং শুধু 'পিঞ্জর'ই নয়, নির্মীয়মাণ যে কটি ছবিতে উজ্জ্বল রয়েছেন, সব কটিরই একই অবস্থা। অতএব পরিচালকগণ সবাই হাত গুটিয়ে বসে আছেন, কবে উজ্জ্বল সুস্থ হয়ে সুটিংয়ে পুনরায় অংশ নেন।

এছাড়া জাফর ইকবাল যে কটি ছবির নায়ক, সে সব ছবির পরিচালকরাও চিন্তিত মুখে হাত গুটিয়ে বসে আছেন।

কারণ জাফর ইকবাল সম্প্রতি এক অজ্ঞাত ও দুরারোগ্য রোগে ভুগছেন। রোগটা কি তা কেউ জানে না। হয়তো হতোশা।

জাফরের কারণে মোস্তফা আনোয়ার 'ফেরারী' ও আলী কাসেম 'শেষ লগ্নের' সুটিং বন্ধ রেখেছেন এবং 'অন্তরালে'র বাকি কাজটুকু শেষ করে ছবির পরিচালক ছবিটিকে মুক্তি দিতে পারছেন না বলে জানা গেছে।

অন্যান্য খবর

রাজ্জাকের পর—'ওয়াসীম' এখন বাংলা দেশের সর্বাধিক ব্যস্ত নায়ক। নির্মীয়মান বহু ছবির নায়ক ওয়াসীম ও নবাগতা কিশোরী সেকস-বম নায়িকা সুচরিতাকে ঘিরে এখন স্টুডিও পাড়ায় নানা কথার কানাঘুষো।

কিছুদিন আগে ছিল 'ববিতা জাফর' ইকবালকে নিয়ে জোরালো ফিসফাস গুজগাজ।

এখন 'ওয়াসীম-সুচরিতাকে নিয়ে ফিসফাস।'

সে যাই হোক, ওয়াসীম এখন বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন। তাঁর হাতে এখন অনেকগুলো ছবি। সুচরিতাও কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করেছেন।

বাংলাদেশের চিত্রজগতের একজন ব্যস্ত নায়িকা 'কবিতা' সম্প্রতি জাফর, ববিতা ওয়াসীম, সুচরিতার গুজগাজ ফিসফিস-এর রেকর্ড ভেঙেছেন। কবিতা এখন চিত্রমহলে আলোচনার হেডলাইন।

তাঁকে নিয়ে এখন চিত্রমহলে অনেক কথা অনেক আশংকা।

যাঁদের ছবির নায়িকা কবিতা যেসব ছবির পরিচালক ইদানীং বেশ আশংকিত হয়ে পড়েছেন।

কবিতাকে নিয়ে জোর গুজব—'কবিতা নাকি শিগ্গির বিয়ে করছেন এবং দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে যাচ্ছেন।'

না, চিত্রজগতের কাউকে তিনি বিয়ে করছেন না। বিয়ে করছেন কোটিপতি ব্যবসায়ীকে।

অবশ্য কিছুদিন আগের গুজব ছিল, 'কবিতা পরিচালক হাসমতকে বিয়ে করছেন।'

পরিচালক হাসমত অবশ্য সে খবরের প্রতিবাদ করেছেন।

সাম্প্রতিক গুজব, কবিতা যাকে বিয়ে করছেন, তার নাম গোলাম কবীর।

কিন্তু কথা হল, কবিতা যাকে খুশী বিয়ে করুন কারো কোন আপত্তি নেই। কিন্তু বিয়ের পর কবিতা কি অভিনয় ছেড়ে দেবেন?

আমাদের চিত্রমহলের আশংকা সেটাই। তাঁর বিয়ে নিয়ে কারো কোন মাথাব্যথা নেই।

বাংলাদেশে বর্তমানে কতজন চিত্রপরিচালক 'ছবি নির্মাণে' ব্যস্ত রয়েছেন তার সঠিক সংখ্যা আমি কেন, যে কোন চিত্রনির্মাতার পক্ষেও বলা শক্ত।

বাংলাদেশের অনেক চিত্রপরিচালকের একজন মইনুল হোসেন।

তাঁর আরো একটি পরিচয় রয়েছে। তিনি নিখোঁজ পরিচালক জহীর রায়হানের একজন সহকর্মী ছিলেন।

জহীর রায়হান ১৯৬৭ সালে তাঁর ৭ম ছবি 'আনোয়ারা' তৈরী করেন। মইনুল হোসেন সাহেব সে সময় থেকে জহীর রায়হানের সহকারীদের একজন হয়ে কাজ শেখেন।

অবশ্য এত কথা আমার জানা ছিল না।

কদিন আগে আর একজন বন্ধু চিত্রপরিচালক শাহজাহান চৌধুরীর বাসায় বসে মইনুল হোসেনের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে এতো কথা জানলাম।

মইনুল হোসেন বর্তমানে 'ছারজিৎ' নামে একটি প্রেম জম-জমাট ছবি নির্মাণে ব্যস্ত রয়েছেন।

'ছারজিৎ'-এর নায়ক জাফর ইকবাল। নায়িকা ববিতা।

জিগ্যেস করলাম—ছবি কবে শেষ হচ্ছে?

—ঠিক বুঝতে পারছি না।

হতাশ কণ্ঠে মইনুল হোসেন সাহেব জানালেন।

—কেন, কেন?

—কারণ আমার ছবির আশি ভাগ কাজ শেষ হয়েছে গত মার্চ মাসে।

—তারপর?

—তারপর আর কি? ছবির নায়িকা 'ববিতা' আজ কলকাতা কাল ভাসখন্দ। ফলাফল, ছবির কাজ বন্ধ। অথচ এপ্রিলে কাজ শেষ করে মে-তে আমি অনায়াসে ছবিটি মুক্তি দিতে পারতাম। কিন্তু—।

—আপনার নায়িকা 'ববিতা' তো এখন ঢাকায়। এবার নিশ্চয় আপনার ছবির বাকি বিশ ভাগ কাজ শেষ হবে।

—হ্যাঁ, তা হবে। তবে কথা হল কি, ববিতার এই অনুপস্থিতির কারণে অনেক পরিচালক হাত গুটিয়ে বসেছিলেন। এবার তাঁরা নায়িকার কাছে 'সিডিউলের' জন্য ভিড় জমাবেন। ফলাফল বুঝতেই পারছেন। তবে জুলাইতে আবার আমি আমার 'ছারজিৎ'-এর সুটিং শুরু করব, ঠিক করেছি। অর্থাৎ আগামী ঈদে 'ছারজিৎ' মুক্তি পাবে আশা করতে পারেন।

'শহীদুল হক খান' কলকাতার প্রখ্যাত সাহিত্যিক সমরেশ বসুর কাহিনী 'ছুটির ফাঁদে'র সুটিং আপাততঃ বন্ধ রয়েছে' কারণ ছবির পরিবেশকের সঙ্গে ছবির পরিচালকের ছবিটি নিয়ে সম্প্রতি নাকি কিছু মতবিরোধ ঘটেছে। বর্তমান পরিবেশক নাকি এ ছবির পরিবেশনার দায়িত্ব গ্রহণে এখন অসম্মতি জানিয়েছেন। কারণ অজ্ঞাত। তবে 'কান কানা কানু' জানা গেল, 'ছুটির ফাঁদে'র যে ৬৫ শতাংশ ভাগ সুটিং শেষ হয়েছে তার 'রাশ' দেখে পরিবেশক হতাশ হয়েছেন এবং উপরোক্ত সিদ্ধান্ত পরিচালককে জানিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য এ খবরের সত্য-মিথ্যা উক্ত ছবির পরিচালক ও পরিবেশকের মাঝে এখনও সীমাবদ্ধ রয়েছে।

'কান কানা কানু' খবরে আরো জানা গেছে 'ছুটির ফাঁদে'র যে ৪৫ শতাংশ কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে, তার ২০ শতাংশ ভাগ নাকি শেষ পর্যন্ত রাখা যাবে, বাকি ২৫ শতাংশ ভাগ 'পুনরায় সুটিং' করতে হবে।

যদি তাই সত্যি হয়, তাহলে এ ছবির পরিবেশকের মাথায় হাত!

শাহজাহান চৌধুরী 'পিঞ্জর' নামে একটি ছবি পরিচালনা করছেন। সম্প্রতি ছবির কাজ উজ্জ্বলের অসুস্থতার কারণে বন্ধ রয়েছে। তবে শাহজাহান চৌধুরী তাঁর ছবির ৬০ শতাংশ ভাগ কাজ ইতিমধ্যে শেষ করে ফেলেছেন। আগামী মাস থেকে ছবির সুটিং পুনরায় শুরু হচ্ছে বলে পরিচালক জানালেন।

উল্লেখ থাকে যে, 'পিঞ্জর'এর নায়ক উজ্জ্বল গত এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে আজিজুর রহমান পরিচালিত 'অপরাধ' ছবির সুটিং কালে আহত হন। এখন অবশ্য তিনি প্রায় সুস্থ। অচিরেই তিনি সুটিং শুরু করবেন বলে জানা গেছে।

বলা নিষ্প্রয়োজন, পিঞ্জরের নায়িকা কবিতা। অন্য অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন শওকত আকবর মুস্তাফা মেসবাহ্, হাসমত সুভাষ দত্ত প্রমুখ।

ছবির সংগীত পরিচালক খোন্দকার নূরুল আলম।

জিগ্যেস করলাম—কবে তক ছবিটি মুক্তি পাবে?

—আগামী ঈদে আশা করা যায়। শাহজাহান চৌধুরীর সংক্ষিপ্ত জবাব।

সাইফুল আজম পরিচালিত ও ববিতা জাফর ইকবাল মায়া হাজারিকা সুচন্দা প্রমুখ অভিনীত 'অন্তরালে' এখন মুক্তির দিন গুনছে।

এ ছবির প্রযোজক আজিজুর রহমান বুলি।

সংগীত-পরিচালক আলম খান, পরিবেশক প্রিয়তমা বাণী চিত্র।

ইবনে মিজান পরিচালিত 'ডাকু মনসুর' মুক্তির দিন গুনছে। এ ছবির নায়ক নায়িকা ওয়াসীম ও শাবানা। অন্যান্য চরিত্রে আছেন মোস্তফা জাসিম জবা সুচরিতা প্রমুখ।

কদিন আগে মুক্তি পেয়েছে 'মাসুদ রানা' নামে একটি ছবি।

এ ছবির পরিচালক নবাগত মাসুদ পারভেজ।

ছবির নায়ক নবাগত সোহেল রানা, ছবির নায়িকা কবরী ও অলিভিয়া। অন্য অন্যান্য চরিত্রে রূপ দিয়েছেন মুস্তফা খলিল জব্বের রাজ্জাক প্রমুখ।

ছবির কাহিনী সংলাপ ও চিত্রনাট্য লিখেছেন কাজী আনোয়ার হোসেন।

নতুন একজন পরিচালক, নতুন একজন নায়ক (পরিচালক স্বয়ং) এবং নায়িকা সহ সবাই পুরানো। ছবির কাহিনী জমজমাট। নায়ক পরিচালক অভিনয়ে ও পরিচালনায় যেহেতু নবাগত, সেহেতু এ ছবিতে ছোটখাটো কিছু কিছু ভুল ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও স্বীকার করতেই হবে 'মাসুদ রানা' এককথায় একটি মোটামুটি পরিচ্ছন্ন ছবি।

—আনওয়ার আহমদ

জলসা

তুষার-জয়ন্তীর সংগীতাসর

ঢাকুরিয়া লেকে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের ৭৬ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সাহিত্যিকদের পক্ষ হতে একটি অভিনন্দন সভার আয়োজন করা হয়। ঘরোয়া আসরটি জমজমাট হয়ে উঠেছিলো যখন প্রাচীন বাংলা গান দিয়ে অতীতের এক মধুর অধ্যায়কে জীবন্ত করে তুললেন শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রথমে ঐ বিশেষ মুহূর্তটিকে শ্রদ্ধা জানালেন সেদিনের জন্য রচিত একটি গান দিয়ে 'বারে বারে ফিরে আসি'। তারপর ধরলেন ডি এল রায়ের একটি বৈঠকী কৌতুকগীতি—

'তোমায় ভালবাসি বলে
তুমি বুঝি মনে ভাব
ঐ চন্দ্রমুখ না হেরিলে
আমি বুঝি মরে যাব।'

এ যেন সম-সাময়িক কালের জানালা দিয়ে বিগত একটি যুগকে দেখা। প্রেম, কৌতুকের জীবন রস-আস্বাদের সে উপভোগ্যতা ভোলবার নয়। এর পরের গান 'ভালবাসা লুকানো কি যায়?' শ্রীঘোষের অনুরোধে তিনি গাইলেন 'তোমার তুলনা তুমি প্রাণ'। এইটিই ছিলো শেষ গান। শিল্পীর মধুর কণ্ঠ, গাইবার আবেগ ও অভিব্যক্তির শিল্পকলায় প্রতিটি মুহূর্ত ভরে ওঠে। পরিশেষে তাঁর শিষ্যা শ্রীমতী নমিতা রায় শোনালেন একটি প্রাচীন বাংলা গান 'নীল আকাশে জ্বলছে যেন চতুর্দশীর চাঁদ।' এঁদের সংগে উপযুক্ত সংগতের কৃতিত্ব কিশোর শিল্পী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

উৎসবের প্রারম্ভে উদ্বোধনী সংগীত গেয়েছিলেন শ্রীমতী শান্তি মুখোপাধ্যায়। গানটি 'আহা তোমার সঙ্গে আমার প্রাণের খেলা'। এ অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এই যে বিনাসজ্জে বিনা সংগতে খালি গলায় পরিবেশিত গানে সুর তাল কম কোনটিরই ঘাটতি ছিলো না। উদ্যোগ সংগীতের শ্রোতাদের কাছে শান্তি মুখোপাধ্যায়ের নাম পরিচিত হলেও রবীন্দ্রসংগীতে তাঁর কৃতিত্ব প্রশংসা করবার মতই।

এল, পি ডিস্কে "চিত্রাংগদা"

নিজের রূপকে মলিন করে নারীত্বকে ধিক্কার দেবার কল্পনা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো ধ্যানলোকে স্থান পায়নি। এই অপরূপ কল্পনা অভিনয়ে গানে মঞ্জরিত হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গ্রামোফোন কোম্পানীর লেবেলে প্রকাশিত 'চিত্রাংগদা' এল. পি ডিস্কে।

কুরূপা চিত্রাংগদার হৃদয় বেদনা হতাশা সদাজাগ্রত নারীসত্তার ব্যাকুলতার প্রতিটি বিবর্তনের ছবি সুচিত্রা মিত্রের গানে উদ্বেলিত। 'অর্জুন তুমি অর্জুন ক্ষমা দিয়ো কোরো না অসম্মান'—এ চমকিত চিত্তের বিলাপ অনাঘ্রাত এক অনুভূতির মধুর অভিজ্ঞতা ('বঁধু কোন আলো লাগলো চোখে') হৃদয়ের অস্থিরতা ('ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে') অর্জুনের প্রত্যাখ্যানে আকুল কান্না ('রোদনভরা এ বসন্ত') ইত্যাদি নানান অনুভূতির পথ বেয়ে 'আমি চিত্রাংগদা' রাজেন্দ্রনন্দিনী-তে জ্যোতির্বিভাসিত আত্মপ্রকাশ। প্রতি মুহূর্তে শ্রোতাদের মনকে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার শরিক করে। শুধু আমার এ রিক্তডালি গানে সুচিত্রা মিত্রের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা কিছু ম্লান কিন্তু এ ক্ষতিপূরণ ঘটেছে 'অর্জুন ব্রহ্মচারী মোর মুখে হেরিল না নারী'র কান্নায় ভেঙে পড়ার অপূর্ব এক্সপ্রেশনে।

তুষারজয়ন্তীতে সংগীত পরিবেশন করছেন শান্তি চক্রবর্তী

সুন্দরী চিত্রাংগদার বিষাদ মেশানো আনন্দ নতুন কান্তিলাভের উল্লাস এই দুটি পরস্পরবিরোধী ভাবের ছবি সুরপ্রধান 'মোর অংগে অংগে কে বাজায়' ও ছন্দউত্তাল 'স্বপনমদির নেশায় মেশা এ উন্মত্ততা' গান দুটিতে উপলব্ধির গাম্ভীর্যে সৌন্দর্যের মাদকতায় উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লাবণ্যমধুর কণ্ঠে। 'কিংশুকদলের প্রান্তে'। 'শিশির বিন্দুর মত স্বচ্ছ...ী যৌবনের প্রতি অর্জুনের আকর্ষণে হৃদয়স্পন্দনে যুগ্ম কণ্ঠের গানে মর্তে কোন দেবতা সে' বীরাংগনা চিত্রাংগদার নাম শুনে অর্জুনের ভাবান্তর দেখে তাকে পরীক্ষা 'ছি ছি কুৎসিত কুরূপ সেই' নাটকীয়তাও উপভোগ্য।

আর অর্জুন? প্রথমে কুরূপা চিত্রাংগদাকে দেখে তাঁর ব্রহ্মচারী সুলভ অবজ্ঞা তারপর মদন বরে রূপান্বিতা চিত্রাংগদার প্রতি উন্মত্ত আকর্ষণ 'এসো এসো যে হও সে হও'—সম্ভোগের ক্লান্তি ('কেন রে ক্লান্তি আসে') এবং ঠিক সেই মুহূর্তে রাজকুমারী চিত্রাংগদার বর্ণনা শুনে ('স্নেহবলে তিনি মাতা বাহুবলে তিনি রাজা') অর্জুনের চিত্তচাঞ্চল্য ও ক্ষত্রিয় নারীর ভীষণ শোভার প্রতি বিস্মিত সম্ভ্রম হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গানে যথাযোগ্য রূপ নিয়েছে। কণিকা ও হেমন্তের [illegible] গীত 'কেটেছে একেলা বিরহের বেলা' গানটি ও অন্যতম আকর্ষণ। গানের কলিগুলির সংলাপ ভাবগাম্ভীর্য আবৃত্তিতে ফুটিয়ে তুলেছেন গৌরী ঘোষ ও প্রদীপ ঘোষ। বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে গৌরী ঘোষের কণ্ঠে স্পন্দমধিত চিত্রাংগদা চিত্তের রক্তাক্ত কাতরতা।

'আমি নহি [illegible] দেবী,
আমি শুধু [illegible] বারে ফোটা ফুল
এক প্রভাতের শুধু পরমায়ু।'

মদনের গানে চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের গান মনোহর। সখীদের গানগুলি সুপরিবেশনার কৃতিত্ব যেসব শিল্পীদের তাঁরা হলেন নীলিমা সেন বাণী ঠাকুর বনানী ঘোষ অদিতি সেনগুপ্ত প্রতিমা মুখোপাধ্যায় ও নীহার খোষাল। গ্রামবাসীদের গানগুলি গেয়েছেন শৈলেন দাস গোরা সর্বাধিকারী ও গৌতম মিত্র।

সমগ্র কাহিনীকে প্রতি মুহূর্তে উদ্বেল রূপময় করে রাখার কৃতিত্ব পরিচালক সন্তোষ সেনগুপ্তের। 'বঁধু কোন আলো লাগল চোখে'র পর 'ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে' গান দুটির ফাঁকটুকু একপলকে মূলতানের সুরে ও নৃত্যের তালে অনুরণনের শিল্পকর্ম লক্ষ্য করবার মতই।

এমন একটি সর্বাংগসুন্দর সৃষ্টির জন্য গ্রামোফোন কোম্পানী ধন্যবাদার্হ।

—চিত্রাংগদা

খেলার জগতে মেয়ে

ভলিবলে দুই বোন : পুরবী ও পুষ্পিতা

কলকাতার ফুটবল বা ক্রিকেটের দুই ভাইয়ের মত মেয়েদের ভলিবলেও দুই বোনের দেখা পাওয়া গেছে। এরা দুজনেই সর্বভারতীয় আসরে নিজেদের ক্রীড়াকুশলতা প্রমাণ করেছে। দুই বোনের বড়টি হল পুরবী চৌধুরী, ছোট পুষ্পিতা চৌধুরী। প্রথম জন স্ম্যাসার, দ্বিতীয় জন লিফটার।

পুরবী আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ভলিবলে বিজয়ী কলকাতা দলের নেতৃত্ব করেছে ১৯৭৩-এ বরোদায়। এর আগে '৭২-এ জাতীয় আসরে রাণার্স আপ বাংলাদলের নেতৃত্বের দায়িত্বও ওর ওপর পড়েছিল। দুজনেই গতবার বাঙ্গালোর ও হায়দরাবাদে জাতীয় প্রতিযোগিতায় বাংলার জয়লাভের ক্ষেত্রে সার্থক ভূমিকা নিয়েছিল।

পুরবী '৬৮ থেকে খেলছে কলকাতার বিজয়ী সংঘ দলে।ল গত ছ' বছর ধরেই পুরবী বিজয়ীসংঘের মহিলা ভলিবল দলের নেত্রী পদে রয়েছে।

লম্বা ছিপছিপে গড়ন সপ্রতিভ মেয়েটির রামকান্ত মিস্ত্রী লেনের বাড়ীতে গিয়ে দেখলুম মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের পরিবেশ। ছোট্ট বসবার ঘরে সুদৃশ্য ট্রফি, মানপত্র, তাছাড়া রাজ্য লীগ, নকআউট জাতীয় ও আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ভলিবল বিজয়ের স্বীকৃতিসূচক সার্টিফিকেট।

৭২-এ জামশেদপুরে জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতায় পুরবীই ছিল দলনেত্রী। বাংলা ফাইনালে পাঞ্জাবের মত শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে সরাসরি তিন গেমে হারিয়ে দেয়। পুরবী ঐ খেলায় এবং পরের বার দিল্লীতে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি লাভ করে। এর আগে সিমলার 'বেষ্ট স্ম্যাসারের' পুরস্কারও পেয়েছে। পুরবীর মতে তার শ্রেষ্ঠ খেলা হরিয়ানা দলের বিরুদ্ধে।

জিজ্ঞাসা করলুম—ভলিবল খেলার ইচ্ছা তোমার কি করে হল? ও বলল—'৬৬-তে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় বাংলার স্কুল দলের হয়ে মাদ্রাজে খোখো খেলতে যাই। সেখানে ভাল খেলা দেখে ভলিবলের দিকে ঝোঁক চাপে। কিন্তু সুযোগ না পেয়ে ৬৭তে খোখোর সচিব শৈলেন গাঙ্গুলীর চেষ্টায় ফেডারেশন ভলিবলে অনিমা গাঙ্গুলীর সঙ্গে একত্রে প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করি। কিন্তু মাস দুই পরেই বাবার অসুখের জন্য অনুশীলন বন্ধ করতে হয়। বাবা চন্দ্রশেখর চৌধুরী চট্টগ্রামের মানুষ। পুরবীর জন্ম কলকাতায়। ওরা পাঁচ বোন, দুজন ভলিবল, দুজন ব্যাডমিণ্টন আর একজন খোখো খেলায় পটু। পুরবীর নেতৃত্বে বিজয়ী সংঘ রাজ্য মহিলা লীগে ৭০-৭১, রাজ্য চ্যাম্পিয়ানশীপে ৭১-৭২ ও ৭২-৭৩-এ জয়ী হয়। ১৯৬৯-৭০এ রাণার্স এবং এ-বছর লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। কিন্তু প্রথম দিকে খেলাধুলায় যোগদানে বিশেষ করে বাবার দিক থেকে বাধা ছিল। বাবা চাইতেন মেয়ে লেখাপড়ায় মন দিক। পুরবী এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন নিয়ে এম-এ পড়ছে। ...

পুরবী চৌধুরী

পুষ্পিতা চৌধুরী

কিন্তু মেয়েদের খেলাধুলোতেও উৎসাহ দিয়েছেন। খেলাধুলোর প্রেরণা, মার কাছ থেকেই এসেছে বেশী করে। স্কুল-জীবনের সব বাধা অবশ্য কলেজে এসে কেটে যায়। পড়াশোনায় ও ভালই।

অন্যান্য প্রদেশের ক্রীড়ামান সম্পর্কে আমার প্রশ্নের উত্তরে পুরবী বললে, "বাংলার পরেই কেরল, হায়দরাবাদ, পাঞ্জাব আর তামিলনাড়ুর স্থান। ঐ সব দলে বিবাহিতা মেয়েও আছেন। থাকবে নাই বা কেন? ওদের সরকারও নানাভাবে সাহায্য করে। কেরলের সব মেয়েই ত পুলিশে চাকরী করে। অন্য দলগুলিতেও সরকারী বা বেসরকারী চাকরীরতা মেয়েরা আছেন। অথচ আমাদের বাংলা দলে একজনও বিবাহিতা বা চাকুরিয়া মেয়ে ছিল না।

খেলার উৎকর্ষের ব্যাপারে পুরবী বিজয়ী সংঘের আশুতোষ রায়চৌধুরী এবং দুই প্রাক্তন জাতীয় খেলোয়াড় অধুনা প্রশিক্ষক সুশীল ব্যানার্জি এবং দ্বারিক দাসের নাম শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করলো।

পুরবীর প্রধান লক্ষ্য বড় খেলোয়াড় হবার, আর ইচ্ছা অনেক নতুন নতুন খেলোয়াড় তৈরী করার। আগে চাকরী করার আকাঙ্ক্ষা ছিল। এখন আর সে ইচ্ছা নেই।

ভারতীয় মহিলা ভলিবল দলকে এবার তেহেরানে এশীয় ক্রীড়ায় পাঠান হবে না শুনে পুরবী খুবই দুঃখিত হল। এদেশে এখনও মহিলা ভলিবলকে এ রকম তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার অর্থ নবজাগ্রত প্রতিভাকে গলা টিপে হত্যা করা বলে ওর ধারণা। আমরা জাপান বা কোরিয়ার মেয়েদের সঙ্গে খেলতে পেলে তাদের বাড়তি গুণ এবং আমাদের দোষ-ত্রুটিগুলো বোঝার সুযোগ পেতাম। সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলাম। তেহেরানে যাবার প্রস্তুতির জন্য বাংলা থেকে যে ছ জনের ডাক পড়েছিল, তাতে পুরবী এবং পুষ্পিতা দুজনেই ছিল।

●

পুষ্পিতার আফশোষ আরও বেশী। বলল, বলুন তো কি অন্যায়? এরপরে মানে আরও চার বছর পরে যখন এশীয় আসর বসবে তখন কি আর দিদি, অনিমা-দি বা তপতীদির ফর্ম থাকবে? ওরা যেতে পেল না। কি দুঃখের বিষয়। পুষ্পিতা হচ্ছে বিজয়ী সংঘের লিফটার। দিদিকে বল তুলে দি স্ম্যাশ করার জন্য, বলল পুষ্পিতা। জাতীয় আসরে পুষ্পিতা নেমেছে ৭১-৭২ ও ৭৩-৭৪-এ. ৭২—৭৩ এর হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার জন্য খেলতে পায় নি। এখন বিদ্যাসাগর কলেজের প্রা[illegible] বি এস সি ক্লাশে প্রথম বর্ষের ছাত্রী। খোখো এবং ভলিবল খেলছে দিদির দেখাদেখি। পুষ্পিতা বলল আমি দিদির পিছু পিছু চলেছি। ৬৯ সাল থেকে বিজয়ীসংঘ দলের রাজ্য লীগ খেলছে। প্রথম খেলার হাতেখড়ি আশুবাবুর কাছে। পরে বিমল গাঙ্গুলী এবং দ্বারিক দাস ও সুশীল ব্যানার্জির কাছে প্রশিক্ষণ পাচ্ছে ডিফেন্স ও লিফটিং-এ। তেহেরানগামী দলের বাছাই শিবিরের জন্য পুষ্পিতারও ডাক এসেছিল, কিন্তু কপাল খারাপ। সরকার মেয়েদের ক্রীড়ামান উপযুক্ত বলে মনে করেন না। পুষ্পিতা বলল, বাস্তবে না দেখেই এরকম ধারণা করা উচিত নয়। দেখুন না, কেরলের বিরুদ্ধে হায়-দরাবাদে জাতীয় ফাইনালে খেলতে নামার আগে অবধি শুনেছি, ওরা দারুণ শক্তিশালী দল। ওদের সঙ্গে আর জিততে হবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরাই ত জিতলুম। সে বলল, জানেন আমার খেলা দেখে পাঞ্জাবের এক প্রাক্তন জাতীয় খেলোয়াড় মাঠেই আমায় পুরস্কার দিল। পরে অবশ্য ছোড়দি ও দীপ্তি মল্লিককেও পুরস্কার দিয়েছিল। ছেলেরা তেহেরান যাবে, আর মেয়েরা যেতে পাবে না, এতে পুষ্পিতার বড় দুঃখ।

বাংলার অন্য অন্য বিভাগের অনুজ-অগ্রজদের মত মেয়েদের ভলিবলেও এই অগ্রজা-অনুজা স্থায়ী খ্যাতির অধিকারিণী হবে বলেই আশা করা যায়।

—অময়

মাঠের নায়ক

তপন সিংহরায়

সংসারের চাপটা যদি আর একটু কম থাকতো তা হলে এবার প্রাণ ভরে খেলার চেষ্টা করতাম। খেলবো কি মাঠে নেমেও তো সেই সংসারেরই চিন্তা। মায়ের জন্য এক জোড়া থান না নিলেই নয়, বোন দুটো অনেক দিন ধরে বায়না ধরেছে দু-খানা প্রিন্টেড ভাল শাড়ী চাই। বড় ভাই স্পিনিং মিলের ছাঁটাই কর্মচারী। আমার পরের তিন জন ছোট। স্কুলে পড়ে। বোন দুটোর বিয়ে দিতে পারিনি।

ওপরের জবানবন্দী এরিয়ান্সের তরুণ স্টপার তপন সিংহ রায়ের। ফুটবল মাঠে অনেক স্ট্রাইকারকে সামলালেও সংসারের ময়দানে অনটন নামক স্ট্রাইকারটিকে সামলাতে তপনের আজ কাল হিমসিম খেতে হচ্ছে। বাবা প্রফুল্লকুমার গত হয়েছেন ১৯৬৭ সালের ৭ ডিসেম্বর। শেষ মুহূর্তে বাবার বিছানার কাছে থাকতে পারিনি। ওষুধ কিনতে কোলকাতায় এসেছিলাম। কল্যাণী স্টেশনে নেমে শুনলাম সব শেষ। বাবা নেই। বাবা পশ্চিমবঙ্গ কনস্ট্রাকশন বোর্ডের চাকুরে ছিলেন।

তপনদের আদি বাড়ী বাংলাদেশের ঢাকা জেলার সোনার গাঁয়ে। জন্মও ওখানে ১৯৫৩ সালে। ফুটবলের হাতে খড়ি ৬৫ সাল থেকে সত্যব্রত সরকারের কাছে। ৬৮ সালে আন্তঃ জেলা ফুটবল খেলার পর পড়ে যাই ২৪ পরগণার সুরেশ ব্যানার্জি'র নজরে। সংসারের হাল সম্পর্কে সুরেশদা ওয়াকিবহাল ছিলেন। ধরে করে চাকরী যুগিয়ে দিলেন স্টেট সিকিউরিটি ফোর্সে। ৬৯—৭১ পর্যন্ত ওদের হয়েই খেললাম। তারপর কলকাতার গড়ের মাঠে এলাম টালিগঞ্জ অগ্রগামীর জার্সি গায়ে চাপিয়ে। ৭২ সালেও আমি ছিলাম সিনিয়ার ডিভিসনে টালিগঞ্জের স্টপার। ৭৩-এ এরিয়ান্সে নিয়ে এলেন নন্টুদারা। ইতিমধ্যে (৭২-৭৩) জুনিয়র বাংলা দলে খেলেছি। ৭৩ সালে সিনিয়ার বাংলা দলে এবং ৭৪ সালে জুনিয়ার ভারতীয় দলে ছিলাম স্ট্যান্ডবাই। বলা বাহুল্য দুটোর কোনটাতেই খেলা হয়নি আমার। সত্যদা চেয়েছিলেন আমার উন্নতি। আমার সুনাম। খুব সামান্য হলেও প্রতিষ্ঠা গড়ের মাঠে হয়েছে। কিন্তু আমার সব চেয়ে বড়ো দুঃখ সেই সত্যদা আজ আর নেই। গত ৬৭ সালের ১লা ডিসেম্বর এক মর্মান্তিক রেল দুর্ঘটনায় সত্যদা মারা গেছেন।

কিশোর মুখার্জি

মা-বাবা নাম দিয়েছিলেন কিশোর। কিন্তু কিশোর এখন আর আক্ষরিক অর্থে কিশোর নেই, বরঞ্চ বলা যেতে পারে পুরোপুরি যুবক।

কলকাতারই মাঠে বছর ছ-য়েক হোল কিশোরের আনাগোনা। বলা বাহুল্য ঐ আনাগোনা ফুটবলের সূত্রেই, ফুটবলের আকর্ষণেই। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে, কিশোর কলকাতার মাঠে আজ কিছুটা প্রতিশ্রুতি পেয়েছে। শুধু কলকাতাই বা বলি কেন—বছর দুয়েক আগে কিশোর এশীয় যুব ফুটবলেও তো ভারতের প্রতিনিধিত্ব করলেন। তা ছাড়া জাতীয় জুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতায় (ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ট্রফি) তিনি বার কয়েক পশ্চিমবঙ্গের হয়ে খেলেছেন।

কিশোর মুখার্জি ১৯৭৪ সালে খেলছেন ইস্টার্ন রেলে। পজিসন রাইট উইং। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে খুব হৈ-হল্লা করলেও ঐ গন্ডীর বাইরে বেরিয়ে আসতে হলেই ব্যাস। কিশোর যেন বোবা! রাইট উইংয়ে খেলার অভ্যাস কিশোরের। বছর সাত-আট ধরে ঐ এক পজিসনে খেলা রপ্ত হয়ে গেছে সত্যি, কিন্তু দলের প্রয়োজনে লেফট উইংয়েও খেলতে পিছপা নন। চলতি মরশুমে পজিসন পাল্টে খেলার ঘটনা বহুবার দেখা গেছে কিশোরের ক্ষেত্রে।

ইস্টার্ন রেলওয়ের অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক নিজেও এক সময় গড়ের মাঠে ডাকসাইটে রাইট উইংগার ছিলেন। কিছুদিন ইস্টবেঙ্গল-দলে খেলেছেন তিনি। কিশোরকে যে তিনি মূলত রাইট উইংয়ে খেলাতে চান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে হালের ফুটবলের ক্রীড়ারীতিতে ঐ রাইট উইংগার, লেফট উইংগার, রাইট হাফ, লেফট হাফ বা রাইট ব্যাক বা লেফট ব্যাক, স্টপার নাম থাকলেও এ্যাটাক এবং ডিফেন্সের সময় চাহিদা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সবাইকে সব পজিসনে গিয়ে দাঁড়াতে হয়।

হাওড়ার বাসিন্দা কিশোরের ডান এবং বাঁ দু পায়েই সট আছে। ডিফেন্ডারের পা থেকে ছোঁ মেরে বল তুলে নিয়ে শত্রুপক্ষের এলাকায় ঢুকে রক্ষণ ব্যবস্থাকে তছনছ করে দিতে কিশোর পারদর্শী। ফুটবলের অনেক গুণ অধীত থাকলেও এই ছয়-সাত বছরে কিশোর খ্যাতির একেবারে শীর্ষে পেঁছোতে পারেন নি। না পারার কারণ অবশ্য বহুবিধ। প্রথমত কোন দলে থিতু হতে না পারা এবং দ্বিতীয়ত শারীরিক ঘাটতি। সত্তর আশী বা নব্বই মিনিট খেলতে যে ধরনের মেহনত করতে হয়, কিশোরের পুরোপুরি তা আছে বলে মনে হয় না। অধিকতর সার্থকতা লাভ করতে হলে সর্বপ্রথম কিশোরের শরীরের দিকে আরও বেশী নজর দিতে হবে।

কিশোর হাওড়ার মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। লেখাপড়া হাওড়ার অক্ষয় শিক্ষায়তনে এবং পাইকপাড়া কাশিমবাজার ইনস্টিটিউটে। কাশিমবাজার ইনস্টিটিউটে পড়ার সময়ই কিশোরের স্কুল সুব্রত ট্রফি লাভ করেছিল। ঘরোয়া সিনিয়ার ডিভিসন লীগ ফুটবলে প্রথম খেলেছে স্পোর্টিং ইউনিয়নের হয়ে। সেখান থেকে এরিয়ান্সে। তারপর মহামেডান স্পোর্টিংয়ে এক বছর। মহামেডান স্পোর্টিং থেকে ইস্টার্ন রেলে। ময়দানে কিশোরের সব চেয়ে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে এরিয়ান্স ক্লাব। শিশির গুহ দস্তিদার, কানু মজুমদার, দুলাল দেব, রাম দাস সবাই মিলে এরিয়ান্স সে বছর ময়দানের ফুটবলের আসর রীতিমত সরগরম করে রেখেছিল।

—বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্যদাকে আমি ভুলিনি। এবং ভুলিনি বলেই তাঁর স্বপ্নকে সার্থক করার জন্য সকাল সন্ধ্যা পরিশ্রম করছি। ভোর চারটায় উঠে ৪-৪২-এর ট্রেনে কল্যাণী থেকে কলকাতায় আসি প্র্যাকটিস করতে। তারপর যাই অফিসে (এ জি বেঙ্গল, ক্লার্ক)। সেখান থেকে আবার মাঠ। তারপর ট্রেনে কল্যাণী। অনেক রাত পর্যন্ত সত্যদার বুকের রক্ত দিয়ে গড়া কল্যাণী ইয়ংমেনস এসোসিয়েশনের কাজ-কর্ম দেখে বাড়ী গিয়ে যখন শুয়ে পড়ি তখন আর ইচ্ছা করে না—পরের দিন ৪-৪২ এর গাড়ি ধরতে। কিন্তু ধরতে হয় হবেই। গাড়ি না ধরলে এদিকে সংসারের চাকাও যে বন্ধ হবে।

জন নিউকম্ব

বিলি জিন কিং

খেলাধূলা

দর্শক

উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতা

গত ২৪শে জুন লণ্ডনের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের ঐতিহাসিক উইম্বলেডন শহরতলীতে ৮৮তম উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতার আসর বসেছে। এর বিশ্ববিশ্রুত আন্তর্জাতিক লন টেনিস প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা অল-ইংল্যাণ্ড টেনিস ক্লাব। এ বছরের প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস খেলায় রেকর্ডসংখ্যক খেলোয়াড় (৪১০ জন) অংশ গ্রহণ করেছেন। চিরাচরিত প্রথায় টেনিস খেলার পণ্ডিত ব্যক্তিদের সহযোগিতায় যোগদানকারী খেলোয়াড়দের যোগ্যতা বিচার করে নামের বাছাই তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ১৯৭৪ সালের এই বাছাই তালিকায় ১ম স্থান পেয়েছেন পুরুষদের সিঙ্গলসে জন নিউকম্ব (অস্ট্রেলিয়া), মেয়েদের সিঙ্গলসে শ্রীমতী বিলি জিন কিং (আমেরিকা), পুরুষদের ডাবলসে জিমি কোনার্স (আমেরিকা) এবং ইলি নাস্তাসে (রুমানিয়া), মেয়েদের ডাবলসে শ্রীমতী বিলি জিন কিং এবং কুমারী রোজমেরী ক্যাসলস (আমেরিকা) এবং মিকসড ডাবলসে শ্রীমতী বিলি জিন কিং (আমেরিকা) এবং আওয়েন ডেভিডসন (অস্ট্রেলিয়া)। পুরুষদের সিঙ্গলসে ১নং বাছাই খেলোয়াড় জন নিউকম্ব (অস্ট্রেলিয়া) ইতিপূর্বে তিনবার সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন—১৯৬৭, ১৯৭০ ও ১৯৭১ সালে। তিনি গত দু'বছর প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেননি। গত বছরের পুরুষদের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান জান কোডেস (চেকোশ্লোভাকিয়া) এ বছরের বাছাই তালিকায় ৬ষ্ঠ স্থান পেয়েছেন। গত বছর অনেক খ্যাতনামা খেলোয়াড় প্রতিযোগিতা বর্জন করায় তাঁর পক্ষে এই সিঙ্গলস খেতাব জয় খুবই সহজ হয়েছিল। মেয়েদের সিঙ্গলসের ১নং বাছাই শ্রীমতী বিলি জিন কিং ইতিপূর্বে ৫ বার সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন।

টেনিস খেলার পণ্ডিত মহলের দৃঢ় ধারণা, এ বছর পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হবেন অস্ট্রেলিয়ার জন নিউকম্ব এবং মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব পাবেন আমেরিকার শ্রীমতী বিলি জিন কিং।

■

উইম্বলেডন টেনিস আসরে গত আট দিনের খেলায় (জুন ২৪ থেকে জুলাই ১) মাত্র দু'টি বড় রকমের অঘটন ঘটেছে। পুরুষদের সিঙ্গলসের ৩য় রাউণ্ডের খেলায় ১৮ বছরের তরুণ খেলোয়াড় ৫নং বাছাই বর্জন বর্গ (সুইডেন) এবং ৮নং বাছাই আর্থার অ্যাস (আমেরিকা) অবাছাই খেলোয়াড়দের কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে হেরে গেছেন। মিশরের ইসমাইল—এল-সফি স্ট্রেট সেটে (৬-২ ৬-৩ ও ৬-১ গেমে) বর্গকে হারিয়েছেন। বর্গ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হেরেছেন জেতার কোন চেষ্টা করেননি। তাঁর এই অতি খারাপ খেলা দেখে দর্শকরা বিশ্বাস করতে পারেননি কোর্টে তাঁরা বর্গের খেলা দেখছেন। বর্গের এরকম খারাপ খেলার কথা নয়। এ বছরই বর্গ ইতালীয় এবং ফ্রেঞ্চ টেনিস প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলস খেতাব জয় করে উইম্বলেডন টেনিস আসরে খেলতে নেমেছিলেন। সকলেই এই আসরে তাঁর বিরাট সাফল্য আশা করেছিলেন। পুরুষদের সিঙ্গলসের বাছাই তালিকার ৮নং খেলোয়াড় আর্থার অ্যাস (আমেরিকান নিগ্রো) স্বদেশের অবাছাই খেলোয়াড় রসকো টেনরের কাছে ৫-৭ ৩-৬ ৯-৮ ও ৩-৬ গেমে হেরেছেন। পুরুষদের সিঙ্গলসের বাকি ১০ জন বাছাই খেলোয়াড়ই ৪র্থ রাউণ্ডে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছেন।

পুরুষদের সিঙ্গলসের খেলায় ভারতের তিনজন খেলোয়াড়ই হেরে গেছেন—১ম রাউণ্ডের খেলায় আনন্দ অমৃতরাজ ও যশজিৎ সিং এবং দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলায় বিজয় অমৃতরাজ। অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বখ্যাত প্রবীণ খেলোয়াড় এবং ৯নং বাছাই কেন রোজওয়ালের কাছে বিজয় অমৃতরাজের পরাজয় মোটেই অগৌরবের হয়নি। বিজয় আড়াই ঘণ্টা লড়াই করে শেষ পর্যন্ত ২-৬ ৭-৫ ৮-৯ ও ১-৬ গেমে হেরে যান। এখানে উল্লেখ্য বছর এই আসরে বিজয় কোয়ার্টার ফাইনালে গত বছর

চ্যাম্পিয়ান চেকোশ্লোভাকিয়ার জান কোডেশের কাছে ২-৩ সেটে হেরেছিলেন। বিজয় অমৃতরাজকে নিয়ে এ পর্যন্ত মাত্র তিনজন ভারতীয় খেলোয়াড় উইম্বলেডন আসরে পুরুষদের সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলেছেন। প্রথম খেলেন গাউস মহম্মদ। তারপর রমানাথন কৃষ্ণান উপর্যুপরি দুই বছর (১৯৬০—৬১) সেমি ফাইনাল পর্যন্ত খেলেছিলেন।

ভারত সফরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল

আগামী নভেম্বর মাসে ক্লাইভ লয়েডের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল ১৯৭৪-৭৫ সালের ভারত সফরে আসছে। ভারতের মাটিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলের এটি ৪র্থ সফর। এর আগে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভারত সফরে এসেছিল। ১৯৪৮-৪৯ ১৯৫৮-৫৯ ও ১৯৬৬-৬৭ সালে। ভারতের মাটিতে তারা তিনটি টেস্ট সিরিজেই 'রাবার' জয়ী হয়েছে—১৯৪৮-৪৯ সালে ১-০ খেলায় (ড্র ৪) ১৯৫৮-৫৯ সালে ৩-০ খেলায় (ড্র ২) এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে ২-০ খেলায় (ড্র ১)। এই তিনটি টেস্ট সিরিজের ১৩টি খেলার ফলাফল: ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয় ৬ ভারতের জয় ০ এবং খেলা ড্র ৭। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাটিতে ভারত তিনবার ক্রিকেট সফর করেছে—১৯৫২-৫৩ ১৯৬১-৬২ এবং ১৯৭০—৭১ সালে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাটিতে তিনটি টেস্ট সিরিজের ফলাফল: ওয়েস্ট ইণ্ডিজের 'রাবার' জয় ২ এবং ভারতের 'রাবার' জয় ১ (অজিত ওয়াদেকারের নেতৃত্বে ১৯৭০—৭১ সালে)।

১৯৬১-৬২ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে ভারত পাঁচটি টেস্ট খেলাতেই শোচনীয়ভাবে হেরে যায়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাটিতে টেস্ট খেলার ফলাফল: খেলা ১৫ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয় ৬ ভারতের জয় ১ এবং খেলা ড্র ৮। এ পর্যন্ত এই দুই দেশের মধ্যে যে ২৮টি টেস্ট খেলা হয়েছে তার ফলাফল: ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয় ১২ ভারতের জয় ১ এবং খেলা ড্র ১৫। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের 'রাবার' জয় ৫ এবং ভারতের রাবার জয় ১।

১৯৭৪-৭৫ সালের আসন্ন ভারত সফরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলে যে ১৭ জন খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে নতুন খেলোয়াড় আছেন চারজন। দল গঠনের আগেই গ্যারী সোবার্স এবং মরিস ফাস্টার এই ভারত সফরে তাঁদের যোগদানের অক্ষমতা জানিয়ে দিয়েছিলেন। রোহন কানহাই দলভুক্তই হননি। অথচ তিনি ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৭৪ সালের টেস্ট সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক ছিলেন।

নির্বাচিত খেলোয়াড়বৃন্দ

ক্লাইভ লয়েড (অধিনায়ক) ডেরেক মারে (সহ-অধিনায়ক) কিথ বয়েস আর্থার ব্যারেট রয় ফেডারিকস লান্স গিবস ভ্যানবার্ন হোল্ডার বার্নার্ড জুলিয়েন আলভিন কালীচরণ ডেভিড মারে লরেন্স রো অ্যান্ডি রবার্টস ক্লিকিউমেডো উইলেট এবং চারজন নতুন খেলোয়াড়—গর্ডন গ্রিনিজ অ্যালবার্ট প্যাডমোর লিওনার্ড বেটান এবং ভিভিয়ান রিচার্ডস।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ১৯৭৪ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়ে উপর্যুপরি ৫বার লীগ খেতাব জয়ের দুর্লভ গৌরব লাভ করেছে এবং সেই সূত্রে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের উপর্যুপরি ৫বার প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ জয়ের রেকর্ড স্পর্শ করেছে। আগামী বছর তারা লীগ চ্যাম্পিয়ান হলে উপর্যুপরি সর্বাধিক লীগ জয়ের নতুন রেকর্ড করবে। ইস্টবেঙ্গল নিঃসন্দেহে যোগ্যদল হিসাবে উপর্যুপরি ৫বার লীগ খেতাব পেয়েছে। তাদের এই একটানা জয়যাত্রার পথে বাধা দেওয়া অপর কোন দলের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই বাধা দেওয়া কোন মতেই নীতিবিরুদ্ধ কাজ নয়, বিশেষ সাফল্য হিসাবে স্বীকৃত। এ বিষয়েও ইস্টবেঙ্গলের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। একবার মোহনবাগানের একটানা লীগ জয়ের পথে ইস্টবেঙ্গল দুবার (১৯৬১ ও ১৯৬৬ সালে) লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়ে মোহনবাগানকে উপর্যুপরি ৫বার প্রথম বিভাগের লীগ খেতাব জয় করতে দেয়নি। ১৯৫৯ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল—এই আট বছরের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান ছয়বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হয় এবং বাকি দুবার ইস্টবেঙ্গল এমনভাবে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়, যার ফলে মোহনবাগানের পক্ষে উপর্যুপরি পাঁচবার লীগ খেতাব জয় সম্ভব হয়নি। সেই সময়ের লীগ জয়ের তালিকা এখানে তুলে দিলাম: ১৯৫৯-৬০ মোহনবাগান, ১৯৬১ ইস্টবেঙ্গল, ১৯৬২-৬৫ (উপর্যুপরি ৪বার) মোহনবাগান, ১৯৬৬ ইস্টবেঙ্গল এবং ১৯৬৭ মহমেডান স্পোর্টিং।

উল্লেখযোগ্য লীগ খেতাব জয়

মোহনবাগান—১৪বার (সর্বাধিক জয়ের রেকর্ড), ইস্টবেঙ্গল—১২বার, মহমেডান স্পোর্টিং ১০বার এবং ক্যালকাটা এফ সি (অধুনালুপ্ত)—৮বার।

উপর্যুপরি লীগ জয়

মহমেডান স্পোর্টিং—৫বার (১৯৩৪-৩৮), ইস্টবেঙ্গল ৫বার (১৯৭০-৭৪), মোহনবাগান ৪বার (১৯৬২-৬৫), মোহনবাগান ৩বার (১৯৫৪-৫৬) এবং ডালহৌসি এল আই ৩বার (১৯৩১-৩৩)।

এশিয়ান সাঁতার প্রতিযোগিতা

ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত ৫ম এশিয়ান বয়সভিত্তিক (১১ থেকে ১৭ পর্যন্ত) সাঁতার প্রতিযোগিতায় গতবারের চ্যাম্পিয়ান জাপান এবারও প্রথম স্থান লাভ করেছে। জাপান পেয়েছে মোট ৫৩টি পদক—স্বর্ণ ২৮ রৌপ্য ৫ ব্রোঞ্জ ১০। প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে তাইওয়ান এবং তৃতীয় স্থান সিঙ্গাপুর। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ১২টি দেশের মধ্যে ভারতবর্ষ বাদে সকলেই পদক জয়ী হয়েছে। ভারত থেকে পাঁচজন সাঁতারু যোগদান করেছিল। বাংলা থেকে দলে স্থান পেয়েছিল আশিস দাস।

১৯৭৩ সালের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়

পশ্চিম বাংলার স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের বিচারে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন খেলাধুলায় নিম্নলিখিত খেলোয়াড়রা ১৯৭৩ সালের জন্য শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান লাভ করেছেন।

ফুটবল: সমরেশ চৌধুরী (ইস্টবেঙ্গল); **ক্রিকেট:** গোপাল বসু (কালীঘাট); **হকি:** কৃষ্ণ ওয়ালিয়া (মোহনবাগান); **টেবল টেনিস:** শ্রীমতী রূপা ব্যানার্জি; **সাঁতার:** কুমারী নাফিসা আলি (ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিংস)।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরত পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণি-অর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫·০০	টাকা ৩০·০০
ষান্মাষিক	টাকা ১২·৫০	টাকা ১৫·৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬·২৫	টাকা ৮·০০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১, আনন্দ চাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন ঃ ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১৪ বর্ষ

১৩ সংখ্যা
মূল্য ৫০ পয়সা

"ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ন নিউজ
পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 2nd August, 1974 শুক্রবার, ১৬ শ্রাবণ, ১৩৮১ 50 Paise

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	সম্পাদকীয়		
৭	রক্তের কেন্দ্রে	(গল্প)	—শ্রীবীরেন্দ্র দত্ত
১৩	পটভূমি		—জন আবদুল হরিলামা
১৪	এই বাংলার খবর		—শ্রীদেবদত্ত
১৬	দেশেবিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
১৮	তিস্তা	(কবিতা)	—শ্রীবনফুল
১৯	রাজার রাজা	(উপন্যাস)	—শ্রীপ্রভাত দেব সরকার
২৪	যুবক-যুবতী		—শ্রীকনক মজুমদার
২৬	চিঠিপত্র		
২৭	বাংলাদেশে রাজনীতি ও চিত্রকলার একশ বছর		—শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু
৩০	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঝংকারু
৩৫	অলৌকিক জলযান	(উপন্যাস)	—শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

পাঠ্য বইয়ের আকাল

পাঠ্য বইয়ের সংকট দেখা দিয়েছে সারা দেশে। বছরের অর্ধেক হয়ে গেল এখনও অনেক রাজ্যের ইস্কুলে ছেলেমেয়েরা পাঠ্য বই জোগাড় করতে পারে নি। আমাদের পশ্চিম বাংলাও বাদ যায় না। সরকার যে-সমস্ত পাঠ্যবই প্রকাশ করেন তাও সোজা পথে পাবার জো নেই। সঙ্গে সহায়িকা গোছের কোনো বই না কিনলে স্বল্পমূল্যের সরকারী পাঠ্যবই পাওয়া যায় না। অন্যান্য পাঠ্যবই তো ছাপাই হচ্ছে না। এই সংকটের মূলে রয়েছে কাগজের অভাব।

সম্প্রতি কেরলে এবং উত্তর প্রদেশেও পাঠ্যবইয়ের সংকট খুব তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। কেরল সরকার সব পাঠ্যবই প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন। অথচ কাগজ নেই বলে তারা বই ছেপে বাজারে দিতে পারছেন না। উত্তর প্রদেশে পাঠ্যবইয়ের সংকট এমন তীব্র যে সরকারকে বাধ্য হয়ে স্কুল কলেজ আগামী ১লা আগস্ট পর্যন্ত ছুটি দিতে হয়েছে। বিধানসভায় বিরোধীরা শিক্ষামন্ত্রীকে সাজ্জী সাজ্জী করে ধরে ছিলেন। বলা বাহুল্য এর কোনো সন্তোষজনক উত্তর শিক্ষামন্ত্রী দিতে পারেন নি। বিক্ষুব্ধ সদস্যরা যতই ক্ষোভ প্রকাশ করুক না কেন অদূর ভবিষ্যতে বইয়ের সংকট দূর হবার কোনো আশা দেখা যাচ্ছে না।

কাগজ আজ দুষ্প্রাপ্য। এই সংকট যে আসবে সরকার আগে থাকতে তা চিন্তা করলে অবস্থাটা এ রকম দাঁড়াত না। গত দুই দশকে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে, স্কুল-কলেজের সংখ্যা বেড়েছে বিস্তর। শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বেড়েছে সে অনুপাতেই। এদের চাহিদা অনুযায়ী বইপত্র জোগানের কথাটা শিক্ষা নিয়ামকদের চিন্তা করা উচিত ছিল। এর জন্য প্রয়োজন ছিল কাগজের উৎপাদন বাড়ানো। শুনলে আশ্চর্য হতে হয় যে গত চোদ্দ বছরে ভারতে একটিও নতুন কাগজের মিল তৈরি হয় নি। বর্তমান কাগজের মিলগুলোর উৎপাদন চাহিদার তুলনায় নিতান্তই কম। তার ফলে বাজারে কাগজের দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। যাও পাওয়া যাচ্ছে তার দাম এত বেশি যে প্রকাশকদের পক্ষে সেই দামে কাগজ কিনে বাড়তি ছাপার চার্জ দিয়ে স্বল্প মূল্যে পাঠ্যবই দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। উত্তর প্রদেশের প্রকাশকরা তো পঞ্চাশ শতাংশ দাম বাড়াবার দাবি জানিয়েছেন। এই বাজারে ছাত্রদের যদি বাড়তি দামে বই কিনতে হয় তাহলে অনেক ছাত্রেরই পড়াশোনার ইতি ঘটবে।

ভারতীয় প্রকাশক পরিষদের সভাপতি শ্যামলাল গুপ্ত এম-পি বলেছেন গত এক বছরে কাগজের দাম আড়াই গুণ বেড়েছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ছাপার কালি কভার পেপার ও বই বাঁধাইয়ের দাম। তাই তাঁদের দাবি পাঠ্য-পুস্তকের দাম পঞ্চাশ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশ বাড়ানো হোক। প্রকাশকদের দাবি সরকার যাচাই করে দেখবেন। কিন্তু আমাদের আশংকা হয় যে এই বাড়তি দামে বই কিনতে হলে এই গরিব দেশের গরিব বাপ-মায়ের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা বন্ধ হবে। ছাত্র অসন্তোষ বাড়বে, পরীক্ষায় টোকাটুকি বাড়বে। কারণ সারা বছর তাদের অনেকেই বই চোখে দেখবে না। পরীক্ষার সময় টোকাটুকি ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না তাদের।

সব দেশেই পাঠ্য পুস্তকের দাম খুব কম রাখা হয়। আমাদের দেশে তো তা আরও বেশি দরকার। সব জিনিসই অগ্নিমূল্য। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী অপুষ্টিতে ভুগছে। দু-বেলা ভাল খাবারের সংস্থান যাদের নেই তারা বেশি দামে বই কিনবে এটা আশাই করা যায় না। তাই পাঠ্য পুস্তক নিয়ে খোলা বাজারের ব্যবসা করতে দিলে আমাদের শিক্ষা জগতে নৈরাজ্য আসবে। সরকারের কাছে তাই নিবেদন কাগজের বাজার তারা সামলান। প্রকাশকদের ন্যায্যমূল্যে কাগজ সরবরাহ করে নির্ধারিত মূল্যে পাঠ্যবই প্রকাশে সহায়তা করুন। লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ এর সঙ্গে জড়িত। পাঠ্য পুস্তকের কাগজের কালোবাজারি দৃঢ় হাতে বন্ধ করতে না পারলে শিক্ষা জগতে চরম সংকট ঘনিয়ে আসবে। এমনিতেই শিক্ষা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে। পরীক্ষার নামে চলছে প্রহসন। তার ওপরে যদি পাঠ্যবই বাজার থেকে উধাও হয়ে যায় তাহলে পড়াশোনা যে কী হবে তা মা সরস্বতীই জানেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী কি এই সমস্যার দিকে একটু নজর দেবেন?

'বউ।'

'উঁ।'

'ও-বৌ।'

'উঁ-উঁ।'

'বউ গো।'

'আহ্, এমন ছেলেমানুষি করে! এতো ভাববার কি আছে? দেখো, ঠিক ফিরে আসব।' ...

চমকে উঠল অরুণ। এতক্ষণ এক মুহূর্ত নিষ্পলক তাকিয়ে ছিল নীলিমার মুখের দিকে। দ্রুত ঝুঁকে পড়ল নিথর শায়িত শরীরের কাছাকাছি। মুখ শাদা। তীক্ষ্ণ নাকের ডগা একটু যেন বেঁকে গেছে। দু' চোখের গোড়ায় যন্ত্রণার এতটুকুও কলঙ্ক নেই। দুটি ঠোঁট শুকনো। স্তনের নীচে বুক বরাবর ঝাঁকিটার মধ্যে নিরক্ত মুখমণ্ডল একটু দুমড়ে মুচড়ে গুঁজে গেছে যেন।

বুকের মধ্যেকার সমস্ত রক্তনালী যেন মুহূর্তে জড়িয়ে দলা পাকিয়ে গেল অরুণের। শ্বাসনালী, দু'চোখ জ্বালা করে উঠল। মেরুদাঁড়া ধরে গ্রীবা-ব্রহ্মতালু পর্যন্ত চাপা শিহরণ যন্ত্রণায় টনটন করে উঠল হঠাৎ।

'আপনি সোজা হয়ে দাঁড়ান।' শীতল শান্ত এক কণ্ঠস্বর ওর ঠিক পিছনেই।

পিঠের ওপর সিস্টারের নরম হাত পড়তেই সোজা হল অরুণ। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল সিস্টারের দিকে। ভাবলেশ-হীন, নির্বাক।

'কটায় মারা গেছে?' ভিতরে ভয়ংকর ভেঙে পড়লেও অরুণের কণ্ঠস্বর এ সময় অতি সাধারণ। গলায় যেন শুকনো কাগজ ঘষার শব্দ।

'এই একটু আগে।'

'হঠাৎ?'

'দুপুরে তো ভাল ছিল। জ্ঞান হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। তারপর হঠাৎ যে কি হল।' সিস্টারের গলায় বুঝি মুহূর্তের জন্য কিছু হতাশা, অসহায়তা।

... অবস্থায় হয়েছেন।'

অরুণ কোন কথা বলতে পারল না। নীলিমার বিছানার সঙ্গে মিশে-যাওয়া শরীরটার দিকে এখন ও পিছন-ফেরা। অরুণ কি দেখছে বা ভাবছে ও নিজেই জানে না, শুধু অকারণে সিস্টারের দিকে তাকিয়ে আছে।

'আপনার আর কোন ভিজিটার এখনো আসেন নি বুঝি ?'

'এ্যাঁ।' অরুণ বোকার মত তাকাল সিস্টারের দিকে।

সিস্টার কি ভাবল, বলল, আপনি এখানে বসুন। এ সময়ে বাড়ির একজন থাকুন সামনে। অন্য ব্যবস্থা পরে হচ্ছে।' ছোট কাঠের টুলটা এগিয়ে দিল অরুণের সামনে।

অরুণ একবার নীলিমার মুখের দিকে তাকাল। সিস্টারের যন্ত্রচালিতের মত চলে যাওয়া দেখতে দেখতে বোধ হয় কেউ ওকে ঠেলে দিয়েছে—এইভাবে শব্দ করে বসে পড়ল টুলটায়। আবার তাকাল নীলিমার দিকে। স্থির নিষ্পলক দৃষ্টি। কেবিনের সিলিং-এ ঝোলানো পুরানো পাখাটা নিয়মিত গতিতে বিশ্রী শব্দ করতে করতে যেন একটু একটু করে সময় চলে যাওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। অরুণ পাখার ব্লেডে চিন্তাহীন দৃষ্টি বোলালো। ব্লেডের প্রান্তগুলি একটা অস্পষ্ট সচল বৃত্ত তৈরী করেছে চারপাশে। অরুণের দুচোখ পাখার কেন্দ্রে কয়েক পলক স্থির হয়ে সরে গেল।

একটু পরেই অরুণের মা আসবে দেখতে। সঙ্গে ছোট বোন, দিদি—জামাইবাবু, ছোটভাই, ছোটকা, নীলিমার বাড়িরও কেউ না কেউ। সকালে মা ছোট বোন এসেছিল। খুব কথা বলেছে নীলিমা তখন। ডাক্তার বলেছিল আজ সন্ধ্যের মধ্যে হয়ে যাবে। এই খবরটা অফিসেই বাড়ি থেকে ফোনে জানিয়েছিল অরুণকে। অরুণ তারপর থেকে অফিসে থাকতে পারে নি। ছটফট করতে করতে বেশ কিছুটা আগেই চলে এসেছে এখানে। অন্যমনস্ক দৃষ্টি হাতঘড়ির ওপর থেকে সরে গেল। এখন ঠিক সাড়ে তিনটে।

অরুণ হঠাৎ যেন ভুলে গেল নীলিমা আর নেই। লোহার খাটের ধারে কনুই রেখে আবার ঝুঁকল।

'.....এত কেন ঘুমোও ?'

'উঁ।'

'বউ।'

'উঁ।'

'ও বউ।'

'উঁ উঁ।'

'বউ গো।'

'লক্ষ্মীটি তুমি ওরকম কোরো না। দেখো ঠিক ফিরব। প্রথম বাচ্চা হতে গেলেই এত ভয় পেতে হবে ? কে বলল তোমাকে ?'

'বাচ্চা একটা গেলে আর একটা হবে। কিন্তু আমার তুমি—'

'আহ্‌। কি যা তা বলছ ? দেখো, আমরা দুজনেই ফিরব। আমরা দুজনেই যে তোমার। ফিরতেই হবে। না ফিরলে তোমার-আমার দুজনেরই যে কষ্ট। বাব্বা ভাবতেই পারছি না।.....'

অরুণ কেন যেন নীলিমার শরীর-ঢাকা ছাই রং চাদরটায় হাত দিতে যাচ্ছিল। চমকে হাত সরিয়ে নিল। সোজা হয়ে বসল। পিছনে কেবিনের কাঠের দেয়ালে হেলান দিল। এত কষ্টে বুক শ্বাসনালী যেন শুকিয়ে [illegible]। [illegible] অরুণ একটা সিগারেট খেতে পারত। কিন্তু না একটুও ইচ্ছে করছে না। অরুণ সামনের কাঠের দেয়ালে চোখ রাখল। সিলিং-এর কাছাকাছি একটা বড় গর্ত। ওপাশে বাইরের বারান্দা পেরিয়ে খানিকটা আলো, আকাশ বুঝি হঠাৎ হঠাৎ চোখে পড়ে। অরুণ স্থির ওই দিকে তাকিয়ে থাকল। কানে লাগছে বন্ধ হয়ে আসার মত পুরনো পাখাটার সেই ঘ্যানর ঘ্যানর শব্দ।

দুদিন আগে অরুণের মা বোন নীলিমাকে এই নার্সিং [illegible] দিয়ে গেছে। কাল সন্ধ্যেয় ওর সঙ্গে শেষ দেখা। কেবিন থেকে সকলে সরে গেলে অরুণ বলল 'বউ তুমি ভয় পাচ্ছ না তো ?'

নীলিমা হেসে ফেলল। 'তুমি ওরকম 'বউ' 'বউ' [illegible] না তো। বাইরে সব দাঁড়িয়ে আছে। শুনতে পাবে।'

'কেন তুমি আমার বউ না ?'

'তা বলে যেখানে-সেখানে এভাবে ডাকবে ?' নলিমার দুচোখে কৃত্রিম ধমক।

'সত্যি তুমি ভয় পাচ্ছ না তো ?'

'একটুও না। বরং তুমিই ভয় পাচ্ছ। এখন যাও তো।' নীলিমার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি।

'যাচ্ছি।' একটু থেমে নীলিমার বিছানার কাছ থেকে সরে যেতে যেতে আবার ডাকল, বউ। অরুণের সারা মুখ কৌতুকে ঝকঝকে।

নীলিমা খিলখিল করে হেসে উঠল। 'কাল এসো। বলছি এখন যাও।' বলেই অরুণের দিকে থেকে দৃষ্টি সরিয়ে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল নীলিমা।.....

অরুণ হঠাৎ তাকাল নিঃসাড় নীলিমার দিকে। এই মুখে কাল বিকেলে তিন বছর আগের নীলিমার সেই হাসি দেখেছে। খাঁটি গ্রামের মেয়ে নীলিমা। স্কুলের সব-চেয়ে উঁচু ক্লাশে পড়ছিল তখন। অরুণদের বাড়িরই পছন্দ করা জবুথবু বউটি হয়ে এলো কলকাতায়—ওদের বাড়ি। বিয়ের দিন পনেরো কেটে যাওয়ার পর একদিন রাতে বিছানায় বসে নীলিমা বলল। 'জানেন আমার ভীষণ ভয় করে।'

'উহুঁ কথাটা ঠিক হল না। এখনো 'আপনি' কেন ? সেদিন তুমি বললে আর কোনদিন ভুল হবে না। আমি আর কোন কথাই শুনব না।' অরুণ বিছানায় শুয়ে নরম বালিশের দুদিক তুলে দুকানে চেপে ধরে রইল।

নীলিমা বিছানায় উঠে বসেছে। 'বাঃ, বলেছি তো আপনি আমার থেকে কত বড়। আমি 'তুমি' বলতেই পারব না।'

অরুণ কিছু না শুনতে পাওয়ার ভান করে তাকিয়ে রইল। মুখের কৃত্রিম কঠিন গাম্ভীর্য।

'রেগে গেলে ?'

অরুণ হেসে ফেলল। দেখতে দেখতে কি যেন মনে হল অরুণের। 'এই শোন। এদিকে এস।'

'কি ?'

'এসো না।' বলেই মাথার বালিশের দু-প্রান্ত থেকে হাত সরিয়ে নীলিমার হাত ধরে জোরে টানল বুকের কাছে।

'উঃ বাববা। বল' নীলিমা সরে এল।

'তোমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে আমি নিজেকে এত ভয় পাই কেন বল তো ?'

নীলিমা সত্যিই অবুঝের মত তাকিয়ে রইল অরুণের দিকে। 'কি যে সব কথা বল আমি তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি না।'

'তুমি এত নিষ্পাপ, সরল।'

'যাও।' নীলিমার [illegible] প্রচ্ছন্ন অকৃত্রিম লজ্জা। এক সময়ে অরুণের চোখে চোখ রেখে বলল 'তোমাকে একটা কথা বলব ?'

'বলো।'

'আমাকে তুমি বিয়ে করলে কেন বল তো ?'

'কেন।'

'তুমি কত সুন্দর দেখতে কত শিক্ষিত প্রচুর পয়সা তোমার' বলতে বলতে ঝুঁকে পড়ল অরুণের [illegible] করে। কি সুন্দর ক[illegible]লো। কলকাতায় কত ভাল ভাল মেয়ে ছিল তোমার জন্যে।'

'ভাল ভাল মেয়ে। মানে ? অনেককে বিয়ে করার কথা বলছ ?'

'না সত্যি। জান আমি কতবার যে একথাটা ভেবেছি।' নীলিমা যেন অন্যমনস্ক।

'ভাবছ বুঝি তোমাকে একদিন ছেড়ে পালাব ?' অরুণ হাসল।

'যাঃ কি যা তা বলছ।' নীলিমা অরুণের বুকের মধ্যে গভীরভাবে মুখ লুকোল। 'তুমি সে রকমই নও।' নীলিমা মুখ ঘষছে অরুণের বুকে। 'এখন তুমি আমার, কোনদিন আর কারো হবে না, হতে পারই না।' একটু থামল নীলিমা। অরুণের বুকের গভীরে মুখ ডোবানো নীলিমার। দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে। আমি জানি, আগেও তুমি কারোর ছিলে না। তোমাকে দেখে আমি ঠিক ধরেছি।'

চাপা খুশীতে আরামে নীলিমার পিঠে হাত ঘুরছিল অরুণের। হঠাৎ থেমে গেল। কেন যেন সারা শরীর ঠাণ্ডা শক্ত হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্তে অরুণ নিঃসাড়।

'কি হল তোমার ?' নীলিমা সোজা হয়ে বলল। 'শরীর খারাপ লাগছে ?'

অরুণ নীলিমার চোখে চোখ রাখল। সেই বড় বড় চোখ যে চোখে ভয়ংকর বিশ্বাস শৈশব-কৈশোর থেকে সহজাত হয়ে আছে। সেই নিষ্পাপ চিবুকে, ঠোঁটের দুই প্রান্ত থেকে সীমা বরাবর সেই এক অদ্ভুত পবিত্র প্রচ্ছন্ন হাসি, দু-চোখের দৃষ্টিতে স্বচ্ছ নিস্তরঙ্গ পুকুরের জলের গভীর ছায়া।

'কি দেখছ?'

'আমি খুব ভয় পাই নীলিমা।'

'কেন বল তো?' নীলিমা ভীত অসহায় শিশুর মত তাকিয়ে আছে।

'জানি না।'

'আমাকে তুমি বলতে পার না?' একটু থামল নীলিমা। 'দেখো তোমার যাই হোক আমাকে বললে তোমার সব ভয় কেটে যাবে। কোনদিন তুমি আর ভয় পাবে না।' নীলিমা নিষ্পলক দেখছে অরুণকে। হঠাৎ হেসে ফেলল, 'আমার কাছে কিছু গোপন করতে পারবেই না, আমি জানি।'

'কি করে।'

'আমি তো আর কোনদিন এসব জিজ্ঞাসাই করব না তাই।'

অদ্ভুত কথা বলছে নীলিমা। রহস্যময়। নীলিমার কথায় বোধ হয় কঠিন অভিমান ছিল। অথচ সুন্দর করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। যেন সব কিছু উপেক্ষা করতে পারে সহজেই।

অরুণের কি হল যেন হঠাৎ বলল, 'আমি কিন্তু পাপী নীলিমা।'

নীলিমা কলকল করে হেসে উঠল, 'মানে।'

'বিয়ের আগে অনেক মেয়ের কাছে আমি গেছি।'

নীলিমার চোখ বড়। সকৌতুকে বলল, 'সত্যি! বললে? এখনো হাসছে।

'বিশ্বাস করো নীলিমা। তাদের কোন দোষ ছিল না। সব আমার—' অরুণ সহজ করে বলতে চেয়েছিল কেমন অদ্ভুত হয়ে গেল শব্দগুলো।

কষ্টের কণ্ঠস্বরে নীলিমা বোধ হয় কিছু ভাবল। হঠাৎ বলল 'চুপ করো তো, আমি সব বুঝি।'

'কিছুই বোঝ না।' অরুণ ক্রমশ পরিষ্কার হতে চাইছে নীলিমার সামনে। সাদা দেয়ালের ওপর থেকে কয়েকটা পুরনো দাগ ঘষে ঘষে তুলে দিতে চাইছে চিরকালের মত। বলল 'কোন কোন মেয়ের ক্ষতিও করেছি। পয়সার অভাব নেই, বয়সটা ভয়ংকর, মেয়েরাও চাইত আমাকে' একটু থামল অরুণ, তোমাকে কাছে পেয়ে তাই ভয় হয় নীলিমা ভীষণ কষ্ট হয়।' অরুণ দৃষ্টি অন্যদিকে ঘোরাল। কোথাও যেন আশ্রয় খুঁজছে।

নীলিমা শুনেছে মন দিয়ে। নির্বোধ অসহায় ভঙ্গি ওর। এখনি কি বলবে ঠিক করতে পারছে না।

'তুমি আমায় ঘেন্না করছ?'

নীলিমা যেন ভিতরে কেঁপে উঠল। 'কই না তো?'

'সত্যি।'

'সত্যি।' নীলিমা হঠাৎ অফুরন্ত হেসে উঠল। 'আগের কথা ছেড়ে দাও।' একটু দম নিল যেন। 'আগের কাউকে ভালবাসতে পার নি বলেই তো আমার কাছে এসেছ।'

অদ্ভুত অভিজ্ঞের মত গলার স্বর নীলিমার। বাইরের মুখে-চোখে কোথাও সেই অভিজ্ঞতার রেখামাত্র নেই। 'তুমি আমায় ক্ষমা করছ তো?'

হঠাৎ হাতের মুঠো দিয়ে অরুণের মুখ চাপল নীলিমা। 'কি যা-তা বলছ? আমি জানি তুমি এসব না বললেও তুমি আর কোনদিন কারোর কাছে যাবে না।'

'এত বিশ্বাস?' অরুণ উঠে বসেছিল একটু আগে। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসল এবার। 'কিন্তু জানো নীলিমা আমি তোমাকে না বললে কিছুতেই স্বস্তি, শান্তি পাচ্ছিলাম না। এতদিন তোমার কাছে গোপন করতে আমার এত ভয়।'

নীলিমা কিছু সময় স্থির তাকিয়ে থেকে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল অরুণের বুকে। 'তুমি আমাকে ভয় করতে যাবে কেন?'

'তবে?'

'একটুও ভয় কর না তুমি আসলে খ-উ-ব ভালবাসো তো তাই ভয়. নীলিমা একভাবে মুখ ঘষছে অরুণের বুকে। দু-চোখে জল।

অরুণ চমকে উঠল নীলিমার কথায়। 'হয়ত তাই।'

'হয়ত নয় এটাই ঠিক।'

অরুণ দুহাতের মুঠোয় নীলিমার ভিজে চিবুক ধরে সামনে আনল। আসলে তোমাকে খুব ভালোবাসি বলেই সব ভুলতে চাই। তাই তো এমন করে বললাম।'

'তুমি আর কোথাও যাবে না তো।'

'কোনদিনও না।'

নীলিমা দুচোখ বুজিয়ে অরুণের বুকে মাথা রাখল।

'নীলিমা'। অরুণ কিছু পরে ফিস ফিস করে ডাকল।

'উঁহু, নীলিমা নয়।'

'তবে?' অরুণ অবাক।

'বউ।' নীলিমা ভিজে চোখে হেসে উঠল কলকালিয়ে।

'বউ।'

'হ্যাঁ। জান আমার বাবা মাকে বউ বলে এখনো ডাকে। মায়ের বিয়ে [illegible] সেই আগেরদিনের মত দশ বছর বয়সে। সেই প্রথম থেকে বাবা মাকে বউ বলে ডাকে। আজও একদিনের জন্যেও বাবা মার ঝগড়া দেখিনি।'

'বউ' বুঝি খুব পয়মন্ত।

'খু-উ-ব।' নীলিমা থামল। তোমাদের এই নাম ধরে ডাকাটা বিচ্ছিরি শুনতে লাগে।'

'লোকে কিন্তু বলবে গেঁইয়া।'

'বলুক। তুমি তো না?'

'একটুও না।'

'তবে?'

'বউ।' নীলিমার দুচোখ বোজানো। ওর ঠোঁট সরিয়ে অরুণ হঠাৎ ডাকল।

'উঁ।'

'ও-বউ'

'উঁ-উঁ'

'বউ গো।'

'উঁ-উঁ-উঁ।' এবার ঝর্ণার মত স্বচ্ছ সাদা ফেনায় হেসে উঠল নীলিমা।......

নীলিমা কি সুন্দর হাসছে। কেবিনের মধ্যে বসে চমকে উঠল অরুণ। হঠাৎ সারা শরীর ছমছম করে উঠল। একটু একটু করে কখন যেন ঝুঁকে পড়ছিল শায়িত নীলিমার মুখের দিকে। যেন ধাক্কা খেয়ে সোজা হয়ে বসল। কেবিনে কেউ নেই। চারপাশ থমথমে। নীলিমার মুখটা এমন-ভাবে অসহায় হয়ে পড়ে আছে এখনি দু-হাতের মুঠোয় আলতো করে ধরে তুলে দিতে ইচ্ছে করছে অরুণের।

......[illegible] ভালভাবে শোও. ঘাড়ে ব্যথা করবে না।'

আচমকা ঘুম ভেঙে যেতে নীলিমা সোজা হয়ে শুলো। সদ্য অফিস-ফেরত অরুণকে দেখল ও। 'এই ফিরলে?'

'এই মাত্র। কেন?'

'নাঃ এমনি বলছি।' একটু অন্যমনস্ক নীলিমা। তবু মুখে হাসি লেগে আছে। 'একটু আমার পাশে বোসো তো।'

অরুণ ঈষৎ বিস্মিত। বসে বলল, 'কিছু বলবে?' নীলিমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে আরও ঘনিষ্ঠ হল। 'তুমি বুঝি ভয় পাচ্ছ?'

নীলিমা অরুণের হাতে হাত বোলাচ্ছিল। হঠাৎ বলল, 'তোমার কি কিছু হয়েছে?'

'কেন?'

'কদিন কিরকম অন্যমনস্ক যেন। এরকম কিন্তু কোনদিন দেখিনি।'

ভিতরে চমকে উঠল অরুণ। স্থির তাকাল নীলিমার দিকে।

'আমার কথা খুব ভাবছ তো?'

'না।' অরুণ গম্ভীর।

'তবে?'

অরুণ মুহূর্তে কিছু ভেবে নিল। হঠাৎ হেসে ফেলল। 'সে পরে বলব তুমি হাসপাতাল থেকে ফিরে এসো।'

'কেন এখনি বল না।'

অরুণ অকারণ বেশী হাসল। কত মজার কথা আছে। তোমরা দুজন এক-সঙ্গে ফিরে এস দুজনের সামনে গল্প করব।'

শরীরের মধ্যে সন্তান জন্ম নেওয়ার পর থেকে নীলিমার যেন একটু অভিমান বেড়েছে। হঠাৎ যেন অভিমান হল ওর। বল না। একটুখানি জোর দিয়ে থামল। 'বেশ তুমি যতই গোপন কর, আমি কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি' ...

'বুঝতে পারনি তুমি নীলিমা।' অরুণ বিড় বিড় করল। কাঠ হয়ে বসে থেকে শায়িত নীলিমার বোজানো দুচোখে দৃষ্টি স্থির রাখল। বিয়ের পর থেকে গত তিন বছরে অনেক কথা বলেছে অরুণ নীলিমাকে। একাধিক মেয়ের সঙ্গে সম্পর্কের কথা শুধু নয় ওর অনেক গোপন পাপের কথা অকপটে বলেছে নীলিমাকে। কিন্তু এই কিছুদিন আগে হঠাৎ সে অফিস থেকে বেরিয়ে সুনন্দার সঙ্গে দেখা হওয়ার ব্যাপারটা ভয়ংকর কাঁপিয়ে দিয়েছিল অরুণকে। তার কিছুই আজও জানে না নীলিমা।

অরুণ বল[illegible] পারে নি। বলতে গিয়েও সন্তান [illegible] নীলিমার [illegible]মনে কেন যেন অরুণ নীরব হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল সদ্যজাত শিশু আর নীলিমা—দুজনকে একসঙ্গে সামনে রেখে অরুণ সে কথা বলবে।

কিন্তু কি করে বলবে অরুণ? অরুণ ভয়ংকর [illegible] মধ্যে নীলিমার অন্তিম মুখচ্ছবির দিকে এক পলক তাকিয়ে রইল। সুনন্দা—যার কথা কোনদিন তোমায় বলতে পারিনি বউ সে দুদিন আগে আমার সঙ্গে শেষ দেখা করেছে।'...

'কি ঠিক করলে?' সুনন্দা ওর গাড়ির মধ্যে বসে বলল। দু-হাতে স্টিয়ারিং।

'আমাকে ছেড়ে দাও।'

'তুমি ভয় পাচ্ছ?'

'তোমার সন্তান কিছুতেই আমার নয়। অরুণ গাড়ির মধ্যে যেন ভীষণ চীৎকার করে বলতে চেয়েছিল তেমন করে পারল না। শব্দগুলো নীচু সুরে অব-লীলায় বেরিয়ে এল।

শান্ত সংযত কঠিন কন্ঠস্বরে সুনন্দা চমকাল। 'একথা তো সেই দেখা হওয়া থেকে বলে আসছ।'

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

সম্পূর্ণ
উপন্যাস

গল্প

আশাপূর্ণা দেবী
সতীকান্ত গুহ
প্রভাতদেব সরকার
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীলেখা বসু
দেবলদেব বর্মা
ইমদাদুল হক মিলন
প্রফুল্ল রায়
বীরেন্দ্র দত্ত
সমীর রক্ষিত
শৈলেন রায়
চণ্ডী মণ্ডল
নির্মল সরকার
শংকর দাশগুপ্ত
কামাল হোসেন

প্রবন্ধ ও আলোচনা

পশ্চিমবঙ্গ প্ল্যানিং বোর্ডের সদস্য
পান্নালাল দাশগুপ্ত
লিখেছেন একটি বিশেষ নিবন্ধ

অর্থনৈতিক সংকটে
ছায়াযুদ্ধ বনাম প্রকৃতযুদ্ধ

•

অন্য যাঁরা লিখবেন

বিশু মুখোপাধ্যায়
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
রণেন মুখোপাধ্যায়
শিবদাস চক্রবর্তী

শক্তিমান জনপ্রিয় লেখক শ্রী
শ্রীবারীন্দ্রনাথ দাশের
ভালোবাসার মনকাড়া কাহিনী

শেষ লগ্ন

•

অমৃতের সুপরিচিত লেখক
শ্রীঅদ্রীশ বর্ধনের
রুদ্ধশ্বাস গোয়েন্দা কাহিনী

নদী, নারী, নখী

•

নতুন লেখিকা
শ্রীমতী সবিতা সেনগুপ্তের
অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হৃদয় কাহিনী

ছায়া আলোর নক্সা

•

দাম তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা

'তা ছাড়া আমার আর কিছু বলার নেই।'

সুনন্দা মধুর করে তাকাল অরুণের দিকে। আমি তোমাকে ছাড়া এখনো এক মুহূর্তে ভাবতে পারি না।

'তুমি অনেকের সঙ্গে ঘুরেছে নন্দা।'

'তোমার সঙ্গে অনেক বেশী।'

'তার কারণ তুমি নিজে।'

হোক তবু তোমাকে আমার বড় নাইস লাগত। গাড়ির বেগ মন্থর হয়ে এলো। আজও তোমায় বড় ভাল লাগে। জান আমি তোমাকে নিয়ে সেটলড হতে চাই। অন্যের হলেও ছেলেটা থাক না। আফটার অল আমার তো। একটু থেমে বলল, সে বাইরে থাকবে। কেউ জানবে না। তোমার অসুবিধে কি? মনে করে দেখ তো আগে কত কথা বলেছ অরুণ।

তা হয় না। বলেছি তো আমি ম্যারেড।

ওই গ্রামের মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে ম্যারেড ভাবতে ভাল লাগছে তোমার। গাঁয়ের মেয়ে বউ, ওয়াইফ! ইস! ন্যাস্টি, ইলিটারেট ইডিয়ট, ফুল কম্প্যানিয়ন। প্র্যাকটিক্যালি ইনটলারেবল।

থাক আমাকে নামিয়ে দাও।

এই শেষ কথা? গাড়ি থামাল সুনন্দা গঙ্গার ধারে।

অরুণ গাড়ি থেকে নামতে চেষ্টা করছে নিরুত্তর।

অরুণ, আর কদিন বাদেই বাইরে চলে যাচ্ছি, চল আমার সঙ্গে। প্লীজ।

আর আমাদের কোনদিন যেন দেখা না হয় সুনন্দা।' অরুণ মাটিতে পা রেখে আর কোনদিকে না তাকিয়ে সামনে সোজা হাঁটতে লাগল। কেউ বুঝি ওকে তাড়া করছে। পায়ের নীচে নরম ঘাস।

রুণ। আর একবার ভাবে।

না।

রুণ।

না।

আমি একথা বলতে চাই তোমার বউ। বিড় বিড় করেই অরুণ দৃষ্টি বোলাল নীলিমার সাদা চাদর ঢাকা সারা শরীরে। মাথার ওপর পাখার গতি অনেক কমে এসেছে। নিয়মিত গতিতে একটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ কানে লাগছে অরুণের। বুকের মধ্যে নিঃশ্বাস ভারী। দম বন্ধ হবার উপক্রম। নীলিমা। অরুণ আবার যেন ডাকল। বিশ্বাস করো আমি তোমাকে কিছু মিথ্যে বলি নি আমি কোন পাপ করি নি। আমি সব বলেছি, সব বলতাম। কিন্তু আর কি করে বলব তোমায়?

অরুণ হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। আচমকা হাতঘড়ির ওপর থেকে দৃষ্টি ঘুরে এল। এখন চারটে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। ঘাড় কন কন করছে। মাথা ভার। দু ঠোঁট, জিভ, তালু শুকনো। বুকের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের বাতাস ভরার প্রক্রিয়া অনিয়মিত, আড়ষ্ট। কেবিনের বাইরে যাবার দরজার পর্দাটা নিখুঁত করে আড়াল করা। কেবিনের মধ্যে ছাই-ছাই অন্ধকার। অরুণ গোপন চাপা এক অস্থিরতায় এপাশ-ওপাশ কয়েকবার পায়চারী করল। একটু বা উত্তেজিত। অরুণ বুঝতে পারছে ভয়ংকর এক বড়কর উত্তেজনা অস্থিরতায় ওর এই মুহূর্তে দু চোখ লাল।

এক সময় স্থির হল নীলিমার সাদা ভিজে কাগজের মত নিষ্প্রাণ ঠান্ডা শরীরের সামনে। নীলিমার দু চোখ বোজানো। চোখ খোলা থাকলে নীলিমা কি ওকে দেখতে পেত? মৃতের চোখ কি রক্ত শুষে নেওয়ার মত মানুষের ভিতরটা দেখতে পায়? এখনি যদি নীলিমার সেই বড় বড় দুটি চোখের সামনে থাকত. অরুণ কি সেই চোখের দিকে তাকিয়ে সব পাপের কথা যা কিছু গোপন করেছে এ কদিন বলতে পারত?... তুমি যতই গোপন কর আমি কিন্তু সব বুঝতে পারছি।'...

না। অরুণ বসে পড়ল। ঝুঁকে দেখল নীলিমার মুখ চোখ নাক চিবুক ঠোঁট দেখতে দেখতে অরুণের ইচ্ছে হল নীলিমার সারা শরীর দেখে এখনি। জীবিত-মৃত—দুই নীলিমাই মাজা শ্বেত পাথরের মত পরিচ্ছন্ন পবিত্র। সারা শরীর এখন স্তব্ধ জমাট রক্তে সাদা। সেই উজ্জ্বল সরল পবিত্র অরুণের চিরকালের অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ বান্ধবী নীলিমা ওর অলক্ষ্যে কখন বোবা হয়ে গেছে। কয়েক ঘণ্টা পরেই মুছে যাবে চরাচর থেকে। অরুণের মাথা ছাড়া নীলিমা আর কোথাও থাকবে না। কোনদিনও না। অথচ নীলিমা জানল না অরুণ তার সন্তান আর স্ত্রীর সামনে নতুন করে কি বলতে চেয়েছিল। অরুণ এখন একা। পথে বাড়িতে অফিসে বন্ধুদের মধ্যে বাবা-মা ভাই-বোন আত্মীয়স্বজনদের মুখের দিকে তাকিয়ে সে একা একেবারে বন্ধুহীন নিঃসঙ্গ। নীলিমা নেই। কার কাছে বলবে? নীলিমা! একবার স্পষ্ট করে দেখতে চাইল নীলিমার মুখ। কিন্তু নীলিমার মুখ তো সে দেখতে পাচ্ছে না। নীলিমার মুখ-চোখ নাক-চিবুক কোথায় গেল? সব সাদা কেন? বিছানায় নীলিমা নেই! নীলিমাকে কি কেউ সদ্য কাচা বা নতুন কোন সাদা চাদর ঢেকে দিয়েছে। এমন দুধের মত সাদা, রহস্যময় চারদিকে। অরুণ ভাল করে তাকাল। সাদা একটা পাথর শোয়ানো। নীলিমা আমি বড় এক তোমাকে যে কথা বলার তা যে আর কাউকে বলতে পারব না কোনদিন! আমার শেষ মিথ্যে, শেষ গোপনতা পাপ দিয়ে এমন করে কোন বুকের মধ্যে রেখে গেলে তুমি?

অন্যমনস্ক অরুণের চোখের সামনে বাঁধ একরাশ কুয়াশা। ভিতরে ভয়ংকর যন্ত্রণা জ্বালা। অরুণের দু চোখের তারায় এতক্ষণ ধরে ভেসে থাকা ঘন অশ্রুর পর্দা ছিঁড়ে গলে পড়তেই যেনবা উপড়ে হয়ে নীলিমার বুকের ওপর আছড়ে পড়ল ও।

মুহূর্তের সচেতন অনুভবে অরুণের কানে এল, বাইরের কয়েকটা ইতস্তত সচল পদশব্দ কেবিনের মধ্যে এসে হঠাৎ স্তব্ধ নিথর।

পশ্চিমবঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ও তারপর

১৬ই জুলাই সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর হাওড়া ময়দানে বক্তৃতা শুনতে শুনতে আমার তিন বছর আগে ১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বরের সন্ধ্যার কথা মনে পড়ছিল। হাওড়া ময়দানে দাঁড়িয়ে যে কথাগুলি ১৬ই তারিখে বলছিলেন ঠিক এমনি সুরেই কথা বলেছিলেন '৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বরের সন্ধ্যায়। সেদিন অবশ্য সভা হয়েছিল ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। সেদিনও শ্রীমতী গান্ধী কোলকাতায় এসেছিলেন মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্যে। ৩রা ডিসেম্বর ছটা বেজে কয়েক মিনিট। রাজভবনের দোতলা থেকে দ্রুতভাবে নেমে এলেন। তারপর দ্রুতপায়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল একটি সংবাদ : পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করেছে। দশদিন আগে ইয়াহিয়া খাঁ বলেছিলেন, তিনি যুদ্ধে যাচ্ছেন। সেই যুদ্ধ শুরু হলো ৩রা ডিসেম্বর। এই ৩রা ডিসেম্বর ব্রিগেড প্যারেড ময়দানে দাঁড়িয়ে দেশবাসীকে সতর্ক, প্রস্তুত হতে আহবান জানিয়েছিলেন। এবারও হাওড়া ময়দানে দাঁড়িয়ে সেই একই কথা বলে গেলেন। তবে এটা ডিসেম্বর মাস নয়, এটা জুলাই মাস' ডিসেম্বর আসতে এখনও কয়েক মাস দেরী।

শ্রীমতী গান্ধী এবার কোলকাতায় এসে যে কথা বলে গেলেন তার সার মর্ম হলো, আমাদের ঘরে এবং বাইরে শত্রু এবং এই শত্রু দিনে দিনে তার নখ-দন্ত বিস্তার করছে। বাইরের শত্রু তারা যারা ভারতের ভূ-গর্ভস্থ পারমাণবিক বিস্ফোরণে দুনিয়া জুড়ে হল্লা তুলেছে। যেমন হল্লা তুলেছিল বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে। সে সময় এক কোটি মানুষ যখন ভারতের বুকে আশ্রয়ে পড়ে হা-অন্ন, হা-অন্ন বলে কাতর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস দীর্ণ করছিল, সেইদিন এইসব হল্লা-বাজরা ভারতকে এক দানা খুদ দিয়ে সাহায্য করেনি। আজ আবার ভারত যখন নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যায় স্বাবলম্বি হবার চেষ্টা করছে, তখন কেউ ভারতকে সম্প্রসারণবাদী বলে কুৎসা রটনা করছে। শত্রু শুধু বাইরে নয় ঘরের শত্রু সম্পর্কেও শ্রীমতী গান্ধী আঙুল উঁচু করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। দেশের মধ্যে পরিকল্পিত [illegible] ভেঙে [illegible] নৈরাজ্য প্রতিষ্ঠার যে চক্রান্ত দুর্নীতিগ্রস্থ রাজনৈতিক নেতা ও বৃহৎ ব্যবসায়ী পুঁজিপতিগোষ্ঠী করছে, সেদিকেও প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়ে গেছেন। ১৯৭১ সালের সঙ্গে ১৯৭৪ সালের এই একটি মৌল তফাৎ। সেদিন যখন পাকিস্তান এবং তার মুরুব্বিরা ভারতের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছিল সেইদিন দেশের অভ্যন্তরে এই পুঁজিপতি ব্যবসায়ী এবং গণতন্ত্র রক্ষার নামে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী শক্তি সম্পূর্ণ অবদমিত ছিল। কাজেই এটা হলো একটা নতুন পরিস্থিতি। তবে ডিসেম্বর মাস আসতে এখনও সময় আছে। দেশের মানুষ প্রধানমন্ত্রীর আহবানের কথা মনে রেখে ঘরের শত্রুদের সম্পর্কে আরও সজাগ হবার সুযোগ পাবেন।

প্রধানমন্ত্রীর এবারের কোলকাতা আগমন তাৎপর্যের ব্যাপার হবে, এটাই ছিল সকলের ধারণা। ঘরের এবং বাইরের শত্রুদের সম্পর্কে তাঁর যে সতর্কীকরণ এটা নিশ্চয়ই তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ প্রধানমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে কিছু অন্য কথা শুনবার প্রত্যাশায় ছিল। আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতার ওপর যে কোন আঘাত এলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সর্বস্ব ত্যাগে প্রস্তুত, এ কথা আজ আর কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। কাজেই জাতীয় বিপদ যদি কোনদিন আসে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সবার আগে প্রধানমন্ত্রীর পাশে গিয়ে দাঁড়াবে, একথা অজানা নয়। হয়তো প্রধানমন্ত্রীও পশ্চিমবঙ্গের মানুষের এই মানসিকতা জানেন বলে অথবা কোলকাতার মানুষের প্রতি তাঁর কিছু বেশী আস্থা আছে বলেই ঘরের বাইরের শত্রুদের সম্পর্কে বক্তব্যটি অন্য কোথাও না রেখে কোলকাতাতেই (হাওড়া ময়দানে) রেখেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ প্রধানমন্ত্রীর এই বিশ্বাস ও আস্থার পরিপূর্ণ মর্যাদা দেবে। কিন্তু সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা নিয়ে এবং এখানকার সংকট নিয়ে প্রধানমন্ত্রী কিছু চিন্তা-ভাবনা করুন এবং কিছু আশার আলো দেখান এই ভরসা পাড় উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে কেন্দ্র করে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ভবিষ্যৎ কিছু বললেন বা না বললেন, তা নিয়ে সম্ভবতঃ কারও খুব বেশী মাথা ব্যথা ছিল না। পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতির উৎকট বিরহ বিকট মিলন যা চলছে চলুক, বারো নারকেল তেরো বামনের ঘাড় ভাঙছে ভাঙুক। পশ্চিমবঙ্গ শুধু কেন্দ্রের কাছ থেকে কিছু সুবিচার চেয়েছে খাদ্য বিদ্যুৎ ও শিল্পের ক্ষেত্রে। কেননা পশ্চিমবঙ্গ আজ চরম সংকটের মুখে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী কোলকাতায় এসে রাজ্য কংগ্রেস নেতাদের তাঁদের ঘরোয়া ঝগড়া ও কোন্দল সম্পর্কে একটি কথাও না বলে চলে যাওয়া বেশ কিছুটা বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। অনেকে ভাবছিলেন পশ্চিমবঙ্গে পি ডি এ ভেঙেছে কংগ্রেসের একটি দল সরকার চালাতে গিয়ে চৌদ্দ দলের যুক্তফ্রন্ট অপেক্ষা বেসামাল অবস্থায় পড়েছে অথচ প্রধানমন্ত্রী কোলকাতায় এসেও সেই সব সম্পর্কে টুঁ শব্দটি করলেন না কেন? সুযোগ পান নি এমন নয়। ১৬ই রাতে রাজভবনে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করতে পারতেন। এমন কি কোলকাতা থেকে হাওড়ায় গঙ্গা পারাপারে সব নেতাদের কিনি ইতিমধ্যে পেয়েছিলেন। কিন্তু সেখানেও কোন কথা নয়। শুধু নিজে হাতে চা করে খাইয়ে গেলেন। শ্রীমতী গান্ধী মুখ খুলেছেন দিল্লীতে এ আই সি সি-র বৈঠকের প্রাককালে। শ্রীমতী গান্ধী পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস নেতাদের উদ্দেশ্যে যে উক্তি করেছেন তার দ্বারাই শ্রীমতী গান্ধীর মনোভাব পরিস্কার হয়েছে। আর কংগ্রেস নেতাদেরও বোঝা উচিত পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতাদের সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর মনোভাব কি? প্রধানমন্ত্রী বলেছেন নিক্সন মাও এক হতে পারেন আর পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসীরা একদলের হয়ে এক সঙ্গে চলতে পারেন না। কংগ্রেসের এই উপদলীয় বিরোধের সুযোগ কারা নিচ্ছে, সে কথাও প্রধানমন্ত্রী বলে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন লাভবান হচ্ছে সি পি আই (এম)। এক কথায় প্রধানমন্ত্রীর হুঁশিয়ারী হলো এখনও সময় আছে, সাধু সাবধান।

— [illegible]

এই বাংলার খবর

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে বাধা

এবার প্রধানমন্ত্রীর কলকাতা সফরে সবচেয়ে চোখে-পড়ার মতো ব্যাপার ছিল হাওড়া-আমতা-চাঁপাডাঙা ব্রডগেজ রেল লাইনের শিলান্যাস। আর সেই সঙ্গে জনসভা। কিন্তু এটাই তাঁর এই রাজ্যে আসার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ নয়। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সব সময়েই প্রধানমন্ত্রী তবে সম্প্রতি তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার খাদ্য উৎপাদন কমিটির চেয়ারম্যানও হয়েছেন। এবার তিনি কলকাতায় এসেছিলেন যতোটা না প্রধানমন্ত্রী হিসেবে, তার চেয়ে বেশি ঐ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে।

কেন্দ্রীয় সরকার সব রাজ্যকেই তাগাদা দিচ্ছেন—খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াও। পশ্চিম বাংলাকেও দিচ্ছেন। উৎপাদন বাড়ানো তো দরকার বটেই, কারণ পশ্চিমবাংলা খাদ্য-শস্যের দিক দিয়ে ঘাটতি রাজ্য। কিন্তু উৎপাদন বাড়ানোর পথে কতকগুলো বড় বাধা আছে। সেই সব বাধার কথা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সঙ্গে যেসব পদস্থ ব্যক্তিরা এসেছিলেন তাঁদের সামনে তুলে ধরা হয়। প্রথম কথা সারের অভাব। ঠিক মতো চাষ করতে হলে দরকার দু লাখ টনের বেশি সার। গত বছর পাওয়া গিয়েছিল তার সিকি ভাগ। এ-বছর অন্তত ৯০ হাজার টন সার চাই। সেই সঙ্গে চাই যথেষ্ট গমবীজ। সেচের ব্যবস্থার উন্নতিও দরকার। কিন্তু বিদ্যুতের ঘাটতির ফলে গভীর ও অগভীর নলকূপগুলোকে পুরোপুরি কাজে লাগানো যাচ্ছে না।

প্রধানমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী সুব্রহ্মণ্যম, আরো সব কেন্দ্রীয় কর্তারা সকলেই রাজ্য সরকারের এই সব কথা শোনেন। তাঁদের জন্যে রাজ্য সরকার একটি স্মারকলিপিও তৈরি করেন। তাঁরা সেটা পড়েনও। কিন্তু তাঁরা কেউই বিশেষ আশার কথা শোনাতে পারেননি। বেশি সার বা বীজ পাওয়া যাবে, এমন প্রতিশ্রুতি মেলেনি। সার-বীজের টানাটানি দেশ জুড়ে। সুতরাং কেন্দ্রের কাছে চাইলেই ঐ সব জিনিস পাওয়া যাবে না। যা হাতে আছে তাই দিয়েই উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করার জন্যে রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আগামী খরিফ মরশুমে ধান চাষের সময় ছাত্রদের কাজে লাগাবার পরামর্শও দিল্লির কাছ থেকে পাওয়া গেছে।

সামনের কয়েক মাসের ভাবনা

নতুন ধান উঠতে সেই অঘ্রাণ-পৌষ। সে-চাষ কেমন হবে, সেই ভাবনা তো আছেই। তার চেয়ে আশু ভাবনা হলো, আগামী মাস পাঁচেক পশ্চিম বাংলার ক্ষুন্নিবৃত্তি হবে কী করে। একেই ঘাটতি রাজ্য, তার ওপরে খাদ্যের বরাদ্দ ছাঁটাই করেছে দিল্লি। জেলার খবর যে কী রকম ভয়াবহ তা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিধানসভার সদস্যদের সাম্প্রতিক বৈঠকেই জানা গেছে। রেশন ব্যবস্থা চালু রাখার জন্যে দিল্লি থেকে মাসে ৯০ হাজার টন গম এবং ৫০ হাজার টন চাল পাওয়া দরকার। এ মাস থেকে গমের বরাদ্দ ২৫ হাজার টন কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। চালের বরাদ্দও ২০ হাজার টন ছাঁটাই করার কথা উঠেছে। তাই যদি হয়, তবে শহর এলাকাতেই নিরবচ্ছিন্ন রেশনিং টিকিয়ে রাখা দায় হবে, গ্রামাঞ্চলে আংশিক রেশনে আরো বেশি খাদ্যশস্য তো দেওয়ার কথাই ওঠে না। এ-বিষয়ে কথা বলার জন্যে খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লকান্তি ঘোষ দিল্লি গিয়েছিলেন, কিন্তু কোনো নতুন প্রতিশ্রুতি আদায় করতে পারেন নি।

শ্রীসুব্রহ্মণ্যমের কলকাতা সফরের সময়ও তাঁর কাছ থেকে এ-বিষয়ে নতুন কোনো কথা শোনা গেল না। তিনি জানালেন, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে কথা বলার জন্যে তাঁরা কলকাতায় এসেছেন। রেশনের জন্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্যশস্য সরবরাহ সংক্রান্ত কাগজপত্র তাঁদের সঙ্গে নেই। সুতরাং এ-বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনার সুযোগ নেই। রাজ্য সরকার তাঁদের দাবির কথা জানিয়েছেন। তা নিয়ে দিল্লিতেই আবার আলোচনা হবে।

এদিক থেকে একটা সুখবর—পাঞ্জাব পশ্চিম বাংলাকে দশ হাজার টন গম, তিন হাজার টন ভুট্টা আর পাঁচ হাজার টন চাল দিতে রাজি হয়েছে। এর আগে পাঞ্জাব থেকে বিশ হাজার টন গম পাওয়া গেছে। কিন্তু এটা এই রাজ্যের খাদ্য ঘাটতি মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। পশ্চিম বাংলায় যে-পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় আর এই রাজ্যের সাড়ে চার কোটি মানুষের জন্যে যে-পরিমাণ খাদ্যশস্য প্রয়োজন তার মধ্যে ফারাক ১৫ থেকে ২০ লাখ টন।

অশান্ত শিক্ষায়তন

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ে গণ্ডগোল মোটেই কোনো নতুন ব্যাপার নয়। তবু গত কয়েক দিন পরপর এমন কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেল, যার ফলে এই পুরোনো সমস্যার দিকে আবার নতুন করে সকলের নজর পড়ছে। বি-কম পার্ট ওয়ান পরীক্ষায় যখন বেপরোয়া টোকাটুকির অভিযোগ ওঠে তখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হয়ত তেমন ঘাবড়ান নি। কিন্তু তারপর সুরু হয়ে যায় কলকাতা ও মফঃস্বলের নানা কেন্দ্রে হাঙ্গামা—আসবাবপত্র ভাঙা আর উত্তরপত্র ছেঁড়া। অভিযোগ, প্রশ্নপত্র কঠিন কিম্বা পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা বড় কড়া কিম্বা বই দেখে টোকাটুকি করতে দেওয়া হচ্ছে না। অনিবার্য ভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নিরীহ ছাত্রেরা। তাদের অভিযোগ, পুলিশ হাজির থাকা সত্ত্বেও তাদের খাতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ-সব কিছুকেই ছাড়িয়ে গেছে, প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার অভিযোগ। অর্থনীতির দুটি পত্রের পুরো প্রশ্নপত্র পরীক্ষার দিন সকাল থেকে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে বলে শোনা যায়।

এর দু দিন পরেই মেডিক্যাল পরীক্ষায় (১৯৭২)

অকৃতকার্য ছাত্রেরা সিন্ডিকেটের সদস্যদের একটানা ছ ঘণ্টা আটক করে রাখে। তাদের দাবি, শতকরা পাঁচ নম্বর গ্রেস মার্ক দিতে হবে। পরীক্ষকেরা এবং আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট কাউন্সিল এই গ্রেস নম্বর দেওয়ার জন্যে সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু সিন্ডিকেটের সদস্যেরা সেই সুপারিশ অগ্রাহ্য করেন। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন অবশ্য এই ধরনের গ্রেস নম্বর দেওয়ার বিরোধী। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্থির করেছেন, ফেল-করা ছাত্রদের জন্যে সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। মেডিক্যাল পরীক্ষা নিয়ে আরো যে-সব গণ্ডগোলের অভিযোগ উঠেছে সে-বিষয়ে তদন্ত হবে। তদন্ত করবে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি। মেডিসিন ফ্যাকাল্টির ডীন ডঃ অজিত বসু ঐ কমিটির চেয়ারম্যান।

সেদিন সিনেটের সভায় যে-গণ্ডগোল হলো তার সঙ্গে অবশ্য কোনো পরীক্ষার সম্পর্ক ছিল না। সভায় আলোচনা হচ্ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষণা করার প্রস্তাব নিয়ে। অন্যতম সদস্য অধ্যাপক নির্মল বসু এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, দেশে যে এককেন্দ্রিক শাসন চালু করার চেষ্টা হচ্ছে, এই প্রস্তাব তারই একটা অংশ। ঐ সময় ছাত্র পরিষদের কিছু সদস্য তাদের দাবি-দাওয়া জানানোর জন্যে সভার মধ্যেই দাঁড়িয়েছিল। তারা অধ্যাপক বসুর এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করে। সেই থেকেই গোলযোগের সূত্রপাত এবং শেষ পর্যন্ত সভা মুলতুবী।

বর্ষায় সি এম ডি এ'র কাজ

কলকাতার উন্নয়নের জন্যে কাজ করতে নেমে সি এম ডি এ যতো না প্রশংসা পেয়েছে তার চেয়ে বেশি পেয়েছে নিন্দা। তার একটা বড় কারণ, সি এম ডি এ-র প্রায় সব কাজেই রাস্তা খোঁড়ার দরকার হয়। আর রাস্তা ঐ রকম খোঁড়া অবস্থায় পড়ে থাকে অনেক দিন। তার কারণ হয়ত অনেক, কিন্তু যাঁরা এর ফলে অসুবিধেয় পড়েন তাঁরা সব সময় ঐ সব কারণ নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না। রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ির ফলে দুর্ভোগ চরমে পৌঁছয় বর্ষায়। এই দুর্ভোগের কথা মনে রেখেই গত বছর এই মরশুমে সি এম ডি এ অন্তত সেই সব কাজ স্থগিত রেখেছিল যার জন্যে রাস্তা খোঁড়ার দরকার হয়।

এ-বছরও সি এম ডি এ ঠিক করে যে, সাধারণভাবে বর্ষায় ঐ ধরনের কাজ বন্ধ রাখা হবে। তবে যদি কোনো বিশেষ এলাকার জনসাধারণের তরফ থেকে অনুরোধ আসে যে কাজ চালিয়ে যাওয়া হোক, তবেই কাজে হাত দেওয়া হবে। এখন দেখা যাচ্ছে, অনেক এলাকার লোকই চাইছেন যে, বর্ষাতেও কাজ চলুক। সেই মর্মে সি এম ডি এ-র কাছে অনেক অনুরোধ আসছে। অনুরোধ করছেন বিধানসভার সদস্যেরা আবার কোথাও সাধারণ মানুষ সরাসরি।

বলাই বাহুল্য, এর ফলে সি এম ডি এ-র খুবই সুবিধে হবে। কারণ, কাজ একটানা শেষ করতে পারলে ভালো তো বটেই, তা ছাড়া সি এম ডি এ এমন কতকগুলো কাজ হাতে নিয়েছে যেগুলো খুবই জরুরি। তার মধ্যে জলনিকাশের কাজ আছে, পানীয় জল যোগানের কাজও আছে। কাজ যতো তাড়াতাড়ি শেষ হয়, কলকাতাবাসীর ততোই কল্যাণ।

চুরি-ডাকাতি-সংঘর্ষ

ট্রেন ডাকাতির সংখ্যা বৃদ্ধিই হোক, আর উগ্রপন্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষই হোক—সব মিলিয়ে এই রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা তেমন একটা ভালো বলা চলে না। পূর্ব রেলের হাওড়া বর্ধমান লাইনে পালসিট স্টেশনের কাছে সেদিন আবার ট্রেন ডাকাতি হলো। প্রকাশ, একদল লোক ট্রেনের একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠে যাত্রীদের জিনিসপত্র লুঠপাট করে। তাদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে দুজন যাত্রী আহত হন।

তার দিন কয়েক আগে শেওড়াফুলি ও শ্রীরামপুর স্টেশনের মধ্যে ডাউন তারকেশ্বর লোক্যালে বড় রকমের ডাকাতি হয়ে যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর এক কামরায় উঠে একদল যুবক ২৫ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে পালায়।

ট্রেন ডাকাতি ছাড়াও এমনিতে রাজ্যের অনেক জায়গায় নাগরিকেরা সব সময় নির্ভয়ে চলাফেরা করতে পারছেন না বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। কলকাতার জনবহুল রাস্তাতেও দিনের আলোয় চুরি-ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছে।

এদিকে পুলিশের সঙ্গে উগ্রপন্থীদের আর একদফা সংঘর্ষ ঘটেছে বাটানগর রেল সাইডিংয়ের কাছে। চিৎপুর থেকে বাটা রেল সাইডিংয়ে রেলরক্ষী বাহিনীর তদারকিতেই মালগাড়ি যাতায়াত করে। প্রকাশ, ঘটনার দিন একটি ট্রেন বাটায় পৌঁছবার পর একদল সশস্ত্র লোক রেলপুলিশকে আক্রমণ করে। একজনের রাইফেল ছিনিয়ে নেওয়া হয়। পুলিশ গুলি চালালে আক্রমণকারীদের মধ্যে জন-পাঁচেক আহত হয়। এর দিন কয়েক আগে যাদবপুরে ছুরিকাঘাতে এক পুলিশ কনস্টেবলের মৃত্যু ঘটে।

কলকাতার কার্জন পার্কে প্রবীর দত্ত নামে এক যুবকের মৃত্যু নিয়ে বেশ বিতর্ক দেখা দেয়। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবস উপলক্ষে কার্জন পার্কে নাটক অভিনয়ের সময় গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। পুলিশের অভিযোগ, তাদের আক্রমণ করা হয় ইট-পাটকেল ছুঁড়ে। পুলিশ কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করে। কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি চলে। যার সঙ্গের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয় পুলিশের লাঠি চার্জে প্রবীরের মৃত্যু হয়েছে। ময়না তদন্তে দেখা যায়, পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে প্রবীরের মৃত্যু হয়েছে।

২৩-৭-৭৪ —দেবদত্ত

দেশে বিদেশে

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির তিন-দিনব্যাপী অধিবেশন [illegible] হয়ে গেল। এই অধিবেশনে যে রাজনৈতিক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তাতে 'সংসদীয় রীতি-বহির্ভূত ও ফ্যাসিস্ট কায়দায় ব্যালট বাক্সের বাইরে ঠেলে দেওয়ার' চেষ্টার নিন্দা করা হয়েছে।

যদিও প্রস্তাবে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের নাম উল্লেখ করা হয়নি অথবা প্রস্তাবেও তাঁর নাম নেই, তাহলেও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে এই প্রস্তাবের উপর আলোচনাকালে বিতর্কের অধিকাংশই জুড়ে ছিল শ্রীনারায়ণের [illegible] 'বিপ্লব'-এর প্রসঙ্গ।

প্রস্তাবের এক জায়গায় বলা হয়েছে, [illegible] ও [illegible] অহিংসার কথা বলেন এবং উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য যোগের কথা বলেন তাঁরাই প্রকাশ্যেই বলেছেন যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারকে তাঁরা সংসদীয় রীতিবহির্ভূত পথে উৎখাত করতে চান। এতে হিংসা ও বিশৃঙ্খলার শক্তি আরও উৎসাহ পাচ্ছে।'

এই প্রস্তাবের উপর আলোচনার সময় পশ্চিমবঙ্গের [illegible] সিদ্ধার্থশংকর রায় শ্রীনারায়ণের 'দলহীন গণতন্ত্রের' ধারণা তীব্র সমালোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন, দলহীন গণতন্ত্র দিয়ে কোন দেশে কিছু কাজ হয়নি, হবেও না।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর যে অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তাতে অন্যান্য অনেক প্রসঙ্গের উল্লেখ থাকলেও বিতর্কের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেছিল ভারত-পাক সম্পর্কের বিষয়টি।

আলোচনায় যোগ দিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং খুব স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন যে, পাকিস্তানকে সিমলা চুক্তির দায়দায়িত্ব থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার ভারতের সঙ্গে বিরোধ বাধিয়ে তুলতে দেওয়া হবে না। শ্রীস্বরণ সিং ইতিমধ্যে গোপনে কাবুলে গিয়েছিলেন, পাকিস্তান থেকে একদল আহমদিয়া তীর্থযাত্রার অজুহাতে ভারতবর্ষে এসেছিল, ইত্যাদি যেসব মিথ্যা কাহিনী পাকিস্তান থেকে ছড়ান হচ্ছে সেগুলির উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী [illegible] করে দেন যে পাকিস্তানের ঘরোয়া সমস্যার মধ্যে তিনি যেন ভারতকে টেনে না নেন।

অর্থনৈতিক নীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবে মুদ্রাস্ফীতি দমনের জন্য গৃহীত সরকারি ব্যবস্থাগুলির প্রতি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সমর্থন জানান হয়েছে। অর্থমন্ত্রী চ্যবন আশ্বাস দিয়েছেন যে সরকার ইতিমধ্যে যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন বা করতে যাচ্ছেন সেগুলি থেকে তিন মাসের মধ্যে ফল পাওয়া যাবে।

কংগ্রেসের ভিতরকার কিছু সাংগঠনিক প্রশ্ন নিয়ে এবার নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে বেশ কিছুটা উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র সংশোধনের জন্য যেসব প্রস্তাব অধিবেশনের সামনে রাখা হয়েছিল, সেগুলি অবলম্বন করে এই বিতর্ক হয়। প্রত্যেক কংগ্রেস সদস্যকে আবশ্যিকভাবে খাদি পরতে হবে ও কোন কংগ্রেস সদস্যই মদ্যপান করতে পারবেন না, দলের গঠনতন্ত্রের এই সব বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে কোন কোন বক্তা তীব্র আপত্তি জানান। একজন বক্তা বলেন যে খাদি পরার নিয়ম অনেক আগ্রহী বুদ্ধিজীবীর কংগ্রেসে ঢোকার বাধা হয়ে উঠেছে। মদ্যপান সংক্রান্ত নিষেধ সম্পর্কে তিনি বলেন, অন্য সব অসদাচরণ বাদ দিয়ে শুধু মদ্যপানের উল্লেখ করা অর্থহীন।

●

ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের যে অবনতি হয়েছে, তার ছায়া অনিবার্যভাবেই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এই অধিবেশনের উপর পড়েছিল।

পাকিস্তানের দিক থেকে আবার চ্যালেঞ্জ আসতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দিয়ে কংগ্রেস সভাপতি ডঃ শংকরদয়াল শর্মা বলেন যে, পাকিস্তান দ্রুত অস্ত্র-সজ্জিত হচ্ছে। ছেড়ে দেওয়া যুদ্ধবন্দীদের মধ্য থেকে পাকিস্তান নতুন ডিভিসন গড়ে তুলেছে। সীমান্তে সে সৈন্য সমাবেশ করছে।

আর একটি কড়া বক্তৃতায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং বলেন যে ভারতের সঙ্গে বিরোধ বাধিয়ে পাকিস্তানের অতীতে কোন ফায়দা হয়নি, এখনও হবে না, ভবিষ্যতেও হবে না। 'পাকিস্তানের সামনে একমাত্র পথ হল আমাদের সঙ্গে বসে বিরোধ মিটিয়ে নেওয়া। পাকিস্তান যদি

তার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমাদের টেনে নেয়, তাহলে আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকব না।'

ইতিমধ্যে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন প্রাক্তন জনসংযোগ অফিসার কর্তৃক লিখিত একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তকে দেখা যাচ্ছে ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি পাকিস্তান যে সীমান্ত সেনাসমাবেশ করে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করছে সেটা লেখক আগেই অনুমান করেছিলেন।

কর্ণেল ভি লংগার তাঁর এই বইয়ে আরও বলেছেন যে, এই বছরের শুরুতেই পাকিস্তান তার সামরিক বাহিনীর শক্তিকে ১৯৭১ সালের আগেকার স্তরে নিয়ে গেছে। চীন ও অন্যান্য দেশ থেকে সে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করছে এবং তার সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণের জন্য বাজেটের অধিক অর্থ ব্যয় করছে।

মুদ্রাস্ফীতি নিরোধের জন্য ভারত সরকার আরও কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা ঘোষণা করেছেন। এগুলির মধ্যে আছে উচ্চ আয়ের লোকদের জন্য আবশ্যিক সঞ্চয়ের ব্যবস্থা এবং ডাক্তার ঠিকাদার প্রভৃতি যেসব স্বয়ংনিযুক্ত মানুষ আয়কর এড়িয়ে যাচ্ছেন তাঁদের আয়করের আওতায় আনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন।

একই উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কের বাট্টার হার ৭ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৯ শতাংশ করা হয়েছে।

১৯৪৫ সালের পর এই প্রথম আবার ইউরোপের মাটিতে যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠেছে। এবারকার যুদ্ধটা অবশ্য মূল ভূখণ্ডে নয় মহাদেশের সমুদ্রতটবর্তী অবস্থিত দ্বীপভূমি সাইপ্রাসে। কিন্তু ঘটনাক্রমে এই যুদ্ধ মহাদেশের ভিতরেও ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। কারণ অন্তত দুশোত এই যুদ্ধ বেধেছে সেই ন্যাটো শক্তিগোষ্ঠীর দুই শরিকের মধ্যে যে গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল সম্ভাব্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জোট বাঁধার জন্য। ইতিহাসের নতুন অধ্যায়ে আজ যখন সেই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরের নেতারা নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়ায় সন্ধান করছেন তখন সাত লাখ মানুষের ক্ষুদ্র সাইপ্রাস দ্বীপে পরস্পরের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে ন্যাটো গোষ্ঠীর দুই সদস্য—গ্রীস ও তুরস্ক। গ্রীসের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ প্রশ্রয়ে সাইপ্রাসের ন্যাশনাল গার্ড বাহিনীর গ্রীক অফিসাররা এক আকস্মিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আর্চবিশপ ম্যাকারিওসকে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করেছেন আর অন্যদিকে তুর্কী বাহিনী সাইপ্রাসের উপর আক্রমণ চালিয়েছেন।

এটা অবশ্য বাহ্যিক চিত্র। এদিকে আর্চবিশপ ম্যাকারিওস যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তা যদি ঠিক হয় তাহলে এই বাহ্যিক চিত্রের অন্তরালে ন্যাটোর দুই শরিক আসলে একটি গভীর ষড়যন্ত্র করেছে। সেই ষড়যন্ত্র হচ্ছে এই যে, সাইপ্রাসকে গ্রীকপ্রধান ও তুর্কিপ্রধান এলাকায় বিভক্ত করা হবে আর তারপর ঐ দুই অংশকে যথাক্রমে গ্রীক ও তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আর্চবিশপ ম্যাকারিওসের নেতৃত্বে স্বাধীন ও অবিভক্ত সাইপ্রাস যে জোটনিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করে চলছে সেটা এভাবে ন্যাটো গোষ্ঠীর স্বার্থে উল্টে দেওয়া যাবে।

হোয়াইট হাউস এক সময় প্রেসিডেন্ট নিকসনের প্রবীণতম সহকারীদের একজন বলে গণ্য জন ডি এরলিখম্যান, আদালতের বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট নিকসনের ইমপিচমেন্টের সম্ভাবনা আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল।

এই ইমপিচমেন্টের জন্য সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহের কাজ কিছুকাল ধরেই চলছিল। সেই কাজ করছিলেন প্রতিনিধিসভার বিচারবিভাগীয় কমিটি। কমিটির কাজ এখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট নিকসনের মুখপাত্রই এখন প্রকাশ্যে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, কমিটি প্রতিনিধি-সভায় প্রেসিডেন্ট নিকসনের ইমপিচমেন্টের সুপারিশ পাঠাবেন।

ইতিমধ্যে সিনেটের ওয়াটারগেট কমিটির যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তাতে কারও বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে দোষারোপ না করেও বলা হয়েছে যে, প্রেসিডেন্টের অসীম ক্ষমতা আছে বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল বলেই ওয়াটারগেট সংক্রান্ত ঘটনাগুলি এভাবে ঘটতে পেরেছে।

২৩-৭-৭৪

—পুণ্ডরীক

তিস্তা

বনফুল

পাহাড়ী নদী তিস্তা,
দুরন্ত দামাল।
কখনও নিগূঢ়-রহস্যে ঢাকা,
কখনও প্রবল উচ্ছ্বাসে দিগন্ত-প্লাবিনী।
কখনও প্রগলভা,
কখনও কুন্ঠিতা,
কখনও স্খলিত-ছন্দা,
কখনও নৃত্য-পরা।
অসংখ্য তার ভাব-ভঙ্গী
অজস্র তার লীলা।
কেন জানি না
কল্পনা করতে ইচ্ছে হচ্ছে
এই বিদ্রোহিনী
এই বন্ধন-বিমুখা
নাতনী হয়ে এসেছে আমার ঘরে
আমার চারদিকে তুফান তুলছে।
সব সময় তাকে ঘিরে
ধর-ধর-হাঁ—হাঁ
সে কিন্তু কিছুতেই বাগ মানছে না
কিছুতেই সামলানো যাচ্ছে না তাকে।

প্রভাতদেব সরকার

রাজার রাজা

আজও সে-ই-ই—?

কানে গোলমাল ভেসেছে। ট্রাম পড়েছে কি বাস পড়েছে, কি পুলিশে গুলি ছুঁড়েছে!

সত্যি গুলি চলছে? পুলিশ গুলি চালিয়েছে?

সত্যি না তো মিথ্যে? যান না দেখে আসুন গিয়ে—বিশ্বাস না হয়!

ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে গেছে? ধর্মতলায় কোনো গাড়ি চলছে না?

গোলমালটা কোথায়? হাঙ্গামা শুরু হলো কি করে?

ট্রাবল স্পট? শুরু হওয়ার আবার কারণ কি? কোথাকার লোক আপনি!

তা কেউ স্পষ্ট করে জানে না। তবে বাতাসে গন্ধ অনেক আগেই ভেসে এসেছে, দূর থেকে, কাছ থেকে আশপাশের কোথাও থেকে খবর ঠিকই পৌঁছে গেছে। বেলা দুটো কি আড়াইটার আগে থেকেই আপিস পাড়াটা থম্‌থম্‌ করছে, সবার মুখে-মুখে উদ্বেগের চিহ্নটুকু ফুটে উঠেছে—

এখন হাঙ্গামা যেখানেই হোক, তা নিয়ে কথা নয়—আপিস শেষে ঘরে ফেরা সহজ হবে না, সেই নিয়ে যত দুর্ভাবনা! ট্রাম-বাস নেই, গাড়ি-ঘোড়া বন্ধ, তাহলে।

তাহলে আর কি, হাঁটুন—

রোজ রোজ ভাল লাগে, না পোষাতে কুলোয়? সারাদিনের পর এইভাবে কুকুর-তাড়া ছাগল-তাড়া কার ভাল লাগে মশাই? কি পেয়েছে সব, ল এন্ড অর্ডার মানবে না? দুচারজনের জন্যে রাজত্ব উল্টে যাবে? কি মজা করেছে সব!

গুলি করে এদের শায়েস্তা করতে পারছে না? পুলিশগুলো কি! যাচ্ছেতাই মশাই! রোজ রোজ একটা না একটা কান্ড লেগেই আছে! কলকাতা শহরে বাস করাই দায়! তারপর কাল শুনবেন আপিস-ফেরৎ এক কেরানীই হয়তো পুলিশের গুলিতে মারা গেছে, কি কোন শাক-সবজিওলার বুকে গুলি বিঁধেছে! এই কেরামতী শান্তি-শৃঙ্খলার নামে আর কদ্দিন চলবে?

সুন্দরী চিঠিটার আর শেষ হলো না। প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, যুবক সহকর্মীরা অনেক আগেই আসন ছেড়ে আপিস-করিডরে দাঁড়িয়ে ভিড়-জটলা করছে। এখন একা-একা সিটে বসে মাথাঠান্ডা করে কাজ করা অসম্ভব। ফাইল চাপা দিয়ে বিকাশও উঠে পড়ল। সামনের দেয়ালে বিবর্ণ-মুখ ঘড়িটা যেন থেমে গেছে মনে হল। বিকাশ চোখ মুছে ভাল করে চেয়ে দেখলে, না, চলছে বোধ হয় ঘড়িটা, দুটো উনপঞ্চাশ মিনিট ঘড়ির মুখে লেখা হয়েছে—হৃৎপিন্ডটা লুকিয়ে লুকিয়ে কাজ করছে, মুখাবরণের গোল কাচটা ফুসফুসের দুটো ছিদ্রকে প্রতিভাত করেছে! কবেকার ঘড়ি কে জানে, কিন্তু ওরই নির্দেশে যেন আপিসটা চলছে, দশটা পাঁচটা ঠিক হচ্ছে! সামনে বসলে কেমন একটা নিঃশব্দ শাসন যেন বোধ করা যায়—আপিস শুরু হয়, আপিস ভেঙে যায়, চেয়ার-টেবিল র‍্যাক আলমারী নড়ে-চড়ে আবার স্থির হয়ে যায়!

কোনদিন ভাবেনি, আজ বিকাশ ভাবলে, কত কালের ঘড়ি, কতদিন ধরে দেওয়ালের ঠিক এই জায়গাটিতে বসান আছে, গোল-মুখটা বড়সাহেবের ভাবলেশহীন মুখের মত স্থির নিশ্চিন্ত। ঐ ঘড়িতে কে দম দেয়, কে ওটাকে দশটা পাঁচটার নির্দেশ দিতে বলে? ঘড়ি নয় যেন সিংহাসন শাসন!

দুটো পঞ্চাশ। বিকাশ চেয়ার সরিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। আরে ঘড়ির তলায় যে-লোকটি সবার আগে-ভাগে এসে বসে থাকেন তিনি কোথায় গেলেন? মানে বড়-বাবু, অনন্তবাবু, যাঁর ওপর ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে কেরানীদের আসা-যাওয়া খবর নেবার ভার। ভদ্রলোক গেলেন কোথায়? গেলেন গেলেন ঘড়িটা বগলদাবায় করে নিয়ে গেলেন না কেন? কেমন সব দেখতে লাগছে যেন, মাথার ওপর ঘড়িটা আছে, কিন্তু তলায় পেন্ডুলামের মত অনন্তবাবু নেই—আপিসের ভারসাম্য আছে তো?

বিকাশ চেয়ার টেবিল ফাইল র‍্যাক আর আলমারীর বেড়া পেরিয়ে একফালি চলনের

সামনে এসে দাঁড়াল। চোখ তুলে ঘড়িটার দিকে চাইতে দুটো পঞ্চাশের পর আর যেন কাঁটা সরেনি, ঘড়িটা বুঝি বন্ধই হয়ে গেছে! চেয়ারে উঠে দাঁড়িয়ে চালিয়ে দেবে? কিন্তু কোথায় কই? ফুসফুসের গর্তে দুটো অন্তহীন গহ্বর যেন, কালো অন্ধকার ঘুটঘুট করছে!

থমকে দাঁড়িয়ে বিকাশের হঠাৎ মনে হল, এতদিন চাকরি করছে, ঘড়ির সামনা-সামনি বসেছে, কিন্তু কোনদিন যেন ঘন্টা-বাজার শব্দ পায়নি—ঢং ঢং করে দশটা কি পাঁচটা কোনদিন বাজেনি। ঘড়িটা বাজে না, টিক টিক শব্দ করে না, তবু ওর সময় নির্দেশে আপিস চলে! অনন্তবাবুও ঐরকম, কোন সাড়াশব্দ করেন না, ঘড়ির তলায় বসে ঠিক কাজ চালিয়ে যান—হাজিরাখাতায় ঠিক টাইম বসিয়ে যান।

অনন্তবাবু বেশি দূরে যাননি, দুঁড়ি-চোঁয়া হয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, কান পেতে কি যেন শুনছিলেন। ওদিকে করিডরে বেশ জটলা হচ্ছিল। বিকাশ পাশ কাটাবার চেষ্টা করতে যেন খ্যাঁক করে কামড়ে দিলেন অনন্তবাবু, এই যে কোথায় যাচ্ছ? সবাই চললে!

বিকাশ পিছন ফিরে দেখলে, সত্যি সেকশনটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে! সিটে কেউ নেই, আপিস ছুটি হয়ে গেছে যেন!

বিকাশ মাথা চুলকে বললে, কোথায় যেন গোলমাল বেধেছে, ট্রাম পুড়ছে!

এতক্ষণে সব জেনেও যেন কিছু জানেননি এমনি ভাব করে অনন্তবাবু বললেন, কে বললে? কোথায় শুনলে?

সবাই বলছে। ট্রামবাস তো বন্ধ হয়ে গেছে! বেশ উদ্বেগ আর উত্তেজনা প্রকাশ পায় বিকাশের কণ্ঠস্বরে।

অনন্তবাবু এবার মাতব্বরি করলেন, ট্রাম-বাস বন্ধ হয়েছে তা তোমার কি, যাও, বোস গিয়ে! রাস্তায় গোলমাল হল বলে অমনি ঘরের মধ্যে সব হুজুক, কাজ বন্ধ! যাও, যাও—

শুনলেও পাঁচমুখে যেন পরখ করার দরকার আছে। তাছাড়া এসব খবরের উত্তেজনা বা উদ্বেগ একলা-একলা অনুভব করা যায় না। বিকাশ মাথা চুলকে বললে, একটু জেনে আসি স্যার।

এই তো বললে শুনেছ, আবার নতুন করে কি জানবে? রোজ রোজ বেশ হুজুক হয়েছে! ট্রাম পুড়ছে গুলি চলছে, সঙ্গে সঙ্গে আপিসের কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে! আচ্ছা তামাশা পেয়েছে সব! অনন্তবাবু বেশ মেজাজের সঙ্গে বললেন।

বিকাশ নিজের সিটে ফিরে এল। সবাই যখন কাজ ছেড়ে উঠে গিয়ে জটলা করছে সেও করতে পারতো, কিন্তু অনন্তবাবুর সামনাসামনি অবাধ্য হবার সাহস হল না। [illegible] হয়েছিল, বলে, আপনি তাহলে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন কেন আপনিও তো জেনেশুনে কর্তব্যে অবহেলা করছেন, আগুন বা গুলি বা বোমা তো আপনার মাথার ওপর এসে পড়েনি, ট্রামবাস চলার সঙ্গে আপিস চলার কোন সম্বন্ধ নেই!... আমাকে ফেরাচ্ছেন, কই সুবোধ সুধীর প্রতুল বিনোদ এঁদের ধরে এনে সিটে বসান দেখি! তাঁরা কখন উঠে চলে গেছেন সেকশন ছেড়ে।

না, তাঁদের কিছু বলবার সাহস নেই অনন্তবাবুর। সবাই সিনিয়ার। ওঁদের মধ্যে দু-একজনকে বেশ ভয়-ভয় করেন বড়বাবু! সেদিন তো খুব লেগেছিল সুধীরবাবুর সঙ্গে লেট-মার্কা করা নিয়ে, বেশ তর্কাতর্কি—

সে তুলনায় বিকাশ অনেক ছোট্ট জুনিয়র। সবে দু বছর আপিসে চাকরি করছে। এখনো আধ-পাকা বা পাকা হয়নি।

সুধীরবাবু তর্ক করেন লোকটা খুব স্ট্রেট-কাট স্পষ্টাস্পষ্টি। বিকাশকে কাজ শিখিয়েছে, অনন্তবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করে তার কাজের কোটা কম করে দিয়েছে। নতুন লোক বলে সুযোগ নেননি আর পাঁচজনের মত।

একে একে সবাই ফিরে এল, বাইরে আপিসের চতুঃসীমার ওদিকে আর যেন কোন শব্দ উঠছে না, ট্রামের ঘড়ঘড়ানি কি বাসের গোঁ গোঁয়ানি কিছু শোনা যাচ্ছে না—হঠাৎ অদ্ভুত একটা স্তব্ধতা যেন আপিস বাড়িটাকে ঢেকে দেয়।

কতক্ষণ পরে যেন বিকাশের খেয়াল হয় চোখ তুলে দেখে অনন্তবাবু আপিস-ঘড়ির তলায় সেই যেমন বসেছিলেন শুরুতে তেমনি বসে আছেন, সেই ঘড়িটা—

না, চলছে না বোধহয়। দুটো পঞ্চাশ। তা কখনো হয় এতক্ষণ সময় কাটানোর পর কটা বেজেছে? বিকাশ যেন ভয়ে ভবে পাশের সহকর্মীকে জিজ্ঞেস করলে।

সাড়ে তিনটে! কেন তাড়াতাড়ি বাড়ি যাবে? সহকর্মী যেন রহস্য করতে যায়।

আপিসের ঘড়িটা বন্ধ বোধহয়। দুটো পঞ্চাশ মোটে—

তাই তো! সহকর্মী বললে, কখন বন্ধ হয়ে গেল? বেশ মজা তো! অত বিজ্ঞ লোকটা যেন ছেলেমানুষের মত কথা বলছে, কখন বন্ধ হয়ে গেছে? যখন দুটো পঞ্চাশ হয়েছিল! মজা আবার কি, দম নিশ্চয়ই ফুরিয়ে গেছে কাইভের আমলের ঘড়ি—সময়মত দম দেওয়া হয়নি, অবাক হবার কি আছে!

সেকশন শুদ্ধ সবাইকে চকিত করে সহকর্মী বলে উঠলেন, বড়বাবু দেখছেন না? আপনার মাথার ওপর চেয়ে দেখুন ঘড়িটা এক ঘন্টার ওপর বন্ধ হয়ে গেছে, দেখুন দেখুন।

তারপর হা-হা করে হাসতে লাগল পাগলের মত।

অনন্তবাবু চোখ তুলে সামনে চাইলেন, ভ্রূকুঞ্চিত করলেন, তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন বন্ধ [illegible] না [illegible] কি? হাসছেন কেন? হাসির কি আছে! নিজের কাজ করুন।

সহকর্মী বললেন, কাজ তো করছি, কিন্তু ঘড়ি ঠিক না থাকলে কাজের হিসেব হবে কি করে? তারপর যাবার সময় আপনি বলবেন—

অনন্তবাবু মাথা নিচু করে ফাইল দেখতে দেখতে বললেন, আপনাদের তো ঘড়ি আছে, ভাবনার কিছু নেই!

সহকর্মী সেই তর্ক জুড়লে, আপনি তো বলছেন ভাবনার কিছু নেই, কিন্তু ঐ আপিসের ঘড়ির মুখ না দেখলে তো আপনাদের চলে না—উঠতে বসতে ঘড়ি দেখান না?

বেশ গম্ভীর স্বরে অনন্তবাবু বন্ধ-ঘড়ির তলা থেকে বললেন, চুপ করুন! ডোণ্ট ডিসটার্ব আদারস।

সুধীরবাবু বললেন, আঃ চুপ কর না প্রশান্ত। যাও না কেয়ারটেকারকে বলে এস না, আপিসের ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে। ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে তো উনি কি করবেন।

প্রশান্ত বললে, না ওঁকে জানিয়ে রাখছি, পাঁচ-দশ মিনিটে ওঁর আবার মাথা গরম হয়ে যায় কি না! বলবেন আমাদের ঘড়ি ফাস্ট!

সে অনেকদিন হয়েছে, আপিসের ঘড়ি শুরুতে নাকি খুব তাড়াতাড়ি করে দশটা বাজিয়ে দেয়, কিন্তু শেষের দিকে নাকি বড় গড়িমসি করে, কিছুতে পাঁচটা বাজতে চায় না। অনন্তবাবু বলবেন আপিসের ঘড়ি ঠিক, প্রশান্ত বলবে তার হাতঘড়ি ঠিক! দু-এক মিনিট নিয়ে মারামারি!

সুধীরবাবু বললেন, আজ আর ও কথা বলবেন না। গোলমালে কে কোথায় কেমন করে বাড়ি ফেরে তার [illegible] ঠিক, এখন ঘড়ির সময় নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি এখন ঘড়ি চলুক আর না চলুক কেউ [illegible] থা ঘামাবে না।

ঘড়ি নিয়ে মাথা না ঘামালেও বাইরের ঘটনা নিয়ে সবাই মাথা ঘামায়। বেশ বোঝা যায় কেরাণী পাড়ায় জীবন আর আগের মত নেই—শান্ত সহজ সরল! বেশ একটা যেন অস্বচ্ছন্দ অস্থিরতা এসে গেছে।

বিকাশ শুনলে সবাই নিজেদের মধ্যে সেই কথা বলছে, রোজ রোজ একি আরম্ভ হল? আপিস করতে এসে কোনদিন বেঘোরে প্রাণ যাবে! হয় পুলিশ, নয় জনতা কে কাকে কখন মারে তার ঠিক নেই!

ব্যাপারটা কি? ট্রাম পুড়লো কেন?

ব্যাপার আবার কি, বিক্ষোভ! গভর্মেণ্টকে কেউ চাইছে না!

আবার তর্ক—কেউ চাইছে না মানে, কতকগুলো লোক চাইছে না বল! আপনি চান না, আমি চাই না?

চাইলেও এমনিভাবে আর চলবে না। যেমন গভর্মেণ্ট—

অনন্তবাবুর কানে যায়, তিনি সচকিত হয়ে বলেন, নো পলিটিকস। কাজ করুন।

কিন্তু কে কার কথা শোনে, আজ পলিটিকস ছাড়া যেন কাজের কোন মানে নেই।

রাজনীতি আর প্রেমনীতি যেন এক। অনন্তবাবু ঐ তর্ক থামাতে পারেন না। কেরাণীরা বাইরের অসন্তোষ নিজেদের কয়ে তর্কের মধ্যে মীমাংসা করতে চায়। পুলিশী বোমা প্রতিবাদের কারণ বার করতে চেষ্টা করে।

কোনো মীমাংসায় পৌঁছবার আগে আপিসের ছুটি হয়ে যায়। বড়সাহেবের ঘর থেকে নির্দেশ আসে, সবাই যেন আস্তে-আস্তে যে-যার মত সাবধানে বাড়ী ফিরে যায়—রাস্তায় যেন জটলা না জেরী না করে। আর কেউ যদি যেতে না চায় শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে যেতে পারে।

সুধীরবাবু বললেন, যাবে তো, কিন্তু কি উপায়ে? ট্রামবাস তো অনেকক্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে।

প্রশান্ত বললে, যথা লাভ......হেঁটেই যাব!

দু-মিনিটে আপিস ফাঁকা হয়ে গেল। বিকাশ বাইরে এসে দেখল রাস্তার দুধার দিয়ে কাতারে কাতারে লোক চলছে, কেউ শিয়ালদা, কেউ হাওড়া, কেউ দক্ষিণে কেউ উত্তরে কেউ বা পূর্বে। যেন দিশাহারা ভীত সন্ত্রস্ত, ঊর্ধ্বশ্বাস জনতা! বিশ্বাস হয় না এরা কেউ কোনো দিন কোনো রাজনীতির প্ররোচনায় অভ্যস্ত জীবনের পথ থেকে বেরিয়ে এসে মারমুখী হয়ে উঠবে। বাইরে যত বিক্ষোভ যত অগ্নিকাণ্ড হোক এ জীবন-যাত্রার যেন কোনোদিন অবসান হবে না। হঠাৎ বিকাশের ছেলেবেলার একটা কথা মনে পড়ে গেল—সে-ছবিটা যেন এই রকমই: পিঁপড়ের সারটা বেশ বড় ছিল, কি খেয়াল হয়েছিল কি, মাথায় দুষ্টবুদ্ধি চেপেছিল বিকাশের—একটা ছোট্ট ঢিল সেই পিঁপড়ের সারের ওপর ছুঁড়ে দিয়েছিল পিঁপড়ের সারটা ছেতরে গিয়েছিল, কয়েকটা পিঁপড়ে মরেছিল কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে পিঁপড়ের সারটা আবার দানা বেঁধে উঠেছিল।

বিকাশ চায় না ঐ প্রবহমান জনস্রোতের সঙ্গে মিশে যেতে। কেমন যেন নিজের মনে সঙ্কোচ বোধ করে, মনে মনে লজ্জাও পায়। তবে কি ভাবনায় তাড়াতাড়ি পড়ি-কি মরি করে বাড়ী ফেরার কোন মানে হয় না। সে বুঝক তার ভয় কি? প্রায় প্রতিদিন এই যে গোলমাল, এই যে প্রতিবাদের নামে অশান্তি মনে মনে সে কি সমর্থন করে না? সে কি চায় না যেভাবে চলছে সেইভাবে আর চলা উচিত নয়? সে কি কোনদিন তার সমবয়সী বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আলোচনা করেনি, এ রাজত্ব ঠিক চলছে না, অনেক অন্যায় অনেক অবিচার রয়ে গেছে? কেবল কতকগুলো বিশেষ লোক মজা লুটছে, সুখ ভোগ করছে সাধারণের জীবনযাত্রা অসহ্য হয়ে উঠছে? প্রতিকার চাই?

কিন্তু তার চেহারা যে এমন হবে কোনদিন বিকাশ বুঝি ভাবতে পারেনি। আশ্চর্য অদ্ভুত, অভাবনীয় সব ঘটনা যেন ঘটছে, রোজই প্রায় গোলমাল কোথাও না কোথাও বাঁধছে। প্রতিবাদের নামে আগুন জ্বলছে, ট্রাম-বাস-রেল পুড়ছে, পুলিশে-জনতায় সংঘর্ষ হচ্ছে। বোমা-বারুদে মরছে কত।

না এভাবে অবস্থার উন্নতি হবে না। প্রতিষ্ঠিত সরকারকে ওল্টানো যাবে না। বিকাশ শান্তিবাদী নয়, কিন্তু দেশে এভাবে অশান্তি ঘটুক সে চায় না। বন্ধুরা তাকে তর্কের ছলে বলেছে কংগ্রেস সাপোর্টার, রিঅ্যাকশনারি।

তা নয়, তবে ঠিক যে সে কি, তাও জানে না। কোনো মতবাদের বা কোনো রাজনৈতিক দলের সে সমর্থক এখনো নয়। তাছাড়া তাদের মত নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে যাদের একমাত্র জীবিকা কলমপেশা তাদের আবার পলিটিকস কি, দল বা মত কি!

কিন্তু ভোট দেবার সময় সে কোন দলকে সমর্থন করে? কোনো দলকেই নয়। আজও তার ভোটার লিস্টে নামই ওঠে নি—একুশ বছর তো কবে পেরিয়ে গেছে।

ওদিকে গোলমাল বুঝি পুলিশের আয়ত্তে এসে গেছে, দু-একটা বাস চলাচল করছে। ট্রাম বোধ হয় চলছে না। জনতার রাগটা ট্রামের ওপরই বেশি, দেখ না দেখ আগুন দিয়ে দেয়! পরের দিন কাগজে ছবি বেরয়—ঘর-পোড়ার মত ট্রাম পুড়ছে।

আপিস থেকে খানিকটা হেঁটে গেলে চার রাস্তার মোড়ে ট্রাম লাইন দেখা যায়—উত্তর-দক্ষিণ, পূব-পশ্চিম সব দিকেই ট্রাম যায়! মাথার ওপর তারের জালে শোঁ শোঁ শব্দ হয়, পায়ের নীচে লাইনের ওপর চাকার ঘড়-ঘড়ানি রাস্তা মুখর করে রাখে। অনেকদিন সন্ধ্যার পর ট্রামের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে হঠাৎ চোখ তুলে বিকাশ কেমন অবাক হয়ে গেছে, একটা নীল মণি যেন গড়িয়ে-গড়িয়ে তারের পথ বেয়ে চলেছে—আলো-অন্ধকারে অদ্ভুত দেখায়!

পায়ে পায়ে বিকাশ এসে রাস্তার মোড়ে দাঁড়াল। রাস্তায় লোক ধরে না জল তাড়া দিয়ে পুকুরের একদিকে মাছ জড় করার মত মানুষ-জন থিক থিক করছে—বাস নেই ট্রাম নেই, বাড়ী-ফেরার উপায় কি হবে ভেবে যেন লোকজন থমকে দাঁড়িয়ে আছে, ইতস্তত করছে—হঠাৎ এক-আধটা বাস আসতে দেখলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে ভিড় করছে, পা-দানা দিয়ে এদিক-ওদিক লোক ফেলে দিয়ে ছত্রাকার করে দিয়ে বাস চলে যাচ্ছে। অদূরে ট্রামের ফাঁকা আস্তানাটা পেরিয়ে মাঠের ওপারে সূর্য পাটে বসছে। এদিকে যানবাহন চলাচলের রাস্তাটা লোকে-লোকারণ্য হয়ে গেছে। গৃহ-গত-প্রাণ মানুষগুলোকে যত্র

অ্যাক্রোবেটিকের মত দেখাচ্ছে! মনুমেন্টের চূড়োটা যেন অনেক উঁচু হয়ে গেছে।

বিকাশ রাস্তা পেরিয়ে ট্রাম গুমটির দিকে চলে এল। ট্রাম আর চলবে না জেনে, তবু জায়গাটা ফাঁকা, অপেক্ষাকৃত জনবিরল! ইচ্ছে আছে ট্রামলাইন ধরে বাড়ীর দিকে এগিয়ে যাবে—কালীঘাট আর কত দূরে? এর আগে কতদিন সাধারণ ধর্মঘটে ট্রাম-বাস বন্ধ থাকলে হেঁটে এসে আপিস করেছে—না, সে ধর্মঘটী নয়। ওসব হুজুককে সে বিশ্বাস করে না।

বিকাশ মনে মনে বললে, কাল কি পরশু, কি, তার পরের দিন সাধারণ ধর্মঘট হবে নিশ্চয়ই—পুলিশ গুলী চালিয়েছে, দুজন না তিনজন মারা গেছে! আবার একটা সাধারণ ধর্মঘট না হয়ে যায় না। কাল কাগজে সরকার বিরোধী নেতারা শহরবাসীকে আহ্বান জানাবেন ধর্মঘট পালনের জন্যে—বলবেন এই প্রতিবাদ অন্যায়ের বিরুদ্ধে পীড়নের বিরুদ্ধে বাদশাহী শাসনের বিরুদ্ধে!

প্রতিবাদ! প্রতিবাদ! প্রতিবাদ! যেন অ[illegible] শেষ নেই। সেই নাকি কবে তার জন্মের আগে থেকে চলছে। জ্ঞান হওয়া থেকে বিকাশ দেখছে, দলে দলে লোক মাঠে-ঘাটে রাস্তায় প্রতিবাদের কণ্ঠ উচ্চ্বল করে এগিয়ে চলেছে, হাতে তাদের নানা রং-এর ঝাণ্ডা, ফেস্টুনে নানা দাবী-দাওয়ার কথা! বেশ দেখার এই মিছিলগুলো—ছেলেমেয়ে-বুড়ো সবাই প্রতিবাদে পঞ্চমুখ—চলবে না! চলবে না দাবী মানতে হবে ইনকিলাব জিন্দাবাদ! কোনো মিছিলের শেষ কোনদিন বিকাশ দেখেনি কোনো মিছিলের আগেও যায়নি কোনদিন!

অনেক আগে থেকেই ট্রাম গুমটিতে লোক জড় হয়ে আছে, অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে—

ধারে কাছে একটিও ট্রাম নেই ট্রাম লাইন পাতা জায়গাটা মার-খেয়ে পিঠে কালশিরা দাগের মত দেখাচ্ছে। বিকাশের মনেই পড়ে না কোনদিন জায়গাটাকে এমন শূন্য দেখেছিল কি না।

'কি মুশকিল! ট্রাম নেই বাস নেই মানুষ এবার যাবে কি করে? কোথায় হাঙ্গামা হলো তো অমনি ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে গেল! রোজ রোজ আচ্ছা মজা পেয়েছে!'

বলতে বলতে একদল ট্রাম গুমটির আপিসের দিকে ছুটে গেল, আশপাশ থেকে আরো উত্তেজনা যেন ঝড়ের মুখে খড়কুটোর মত এগিয়ে চলল, বিকাশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে, কি করবে না করবে যেন ভাবতে পারলে না সে জানে এবার একটা হাঙ্গামা শুরু হবে, পুলিশ আসবে, গুলী কি গ্যাস চলবে তারপর—

না আর অপেক্ষা নয়—জায়গাটা নিরাপদ নয়, বেশ ভিড় হয়েছে আপিসের সামনে হৈ-হৈ শব্দ উঠছে—জাহাজের কেবিনের মত আপিসটা বুঝি এখনি অতলে তলিয়ে যায়!

ছুট! ছুট! ছুট! বলতে না বলতেই, ছুটতে ছুটতে বিকাশ পিছনে আগুনের শিখা দেখতে পেল, ফট-ফট শব্দ আর মার-মার আওয়াজ হতে লাগল। ট্রাম গুমটির আপিস পুড়ছে—

'পুড়বে না তো কি। শালাদের সব বজ্জাতি, ইচ্ছে করে হায়রানি করবে! বলা নেই কওয়া নেই রাস্তা থেকে ট্রাম তুলে নিলে! মর শালা তোমরা এবার! কেন! কুকুর-বেড়াল পেয়েছে?'

কে কি পেয়েছে বিকাশ অত ভেবে দেখেনি, কিন্তু যে-ভাবে রোজ তাকে আপিসে যেতে-আসতে হচ্ছে তা কোন মতেই কাম্য নয়। নেহাৎ চাকরি করে বলে, নইলে—

নইলে? —না, কিছু নয়, চাকরি ছাড়া সে আর কি করবে? করবারই বা কি আছে, বি-কম পাশ কেন করেছে সে তো পাশ করবার অনেক আগেই জেনেছে। তার বাড়ীর সবাই জানতো—পাশ করলেই বিকাশ চাকরি করবে, তারপর সে চাকরি পাকা হলে—

বিয়ে? হ্যাঁ! বাবার ইচ্ছে বিকাশ ঠিক জানে না, মা কিন্তু এর মধ্যেই বলতে আরম্ভ করেছেন পাকা নাই বা হলো গভর্মেন্টের চাকরি কখনো যায়? এবার একটা সম্বন্ধ দেখে—

বিয়ের কথাটা এখনো তেমন জোরদার হয়ে ওঠেনি মাও তেমন বলে কয়ে হার মানবার মত অবস্থায় এসে পৌঁছায়নি। তবে, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই জানে বিকাশ অতঃপর কোন অবস্থার মধ্যে অনুপ্রবেশ করবে—সেদিনের আর বেশি দেরী নেই, সানাই না হোক শাঁখের শব্দ শোনা যাচ্ছে! বিকাশকে দেখলে সবার মুখে চোখে কেমন একটা ভাব যেন ফুটে ওঠে—বিকাশ লজ্জা পায়, আবার মনে মনে নিজের সম্পর্কে কেমন যেন সচেতন গর্বিত হয়ে ওঠে—চাকরি-করা, স্বাস্থ্যবান বাঙালী যুবক ভবিষ্যৎ তো জানা কথা! এ আবার নতুন করে কি বলবে লোককে।

কিন্তু চাকরি ছাড়া যেন অন্য কিছু করবার ইচ্ছে ছিল বিকাশের। সে ইচ্ছে সংসারের চাপেই বুঝি কবে তলিয়ে গেছে। আজ যেন আর খুঁজে পাওয়া যায় না—

প্রথম কদিন চাকরি করতে এসে খুব খারাপ লেগেছিল। চারপাশে অচেনা মানুষগুলোকে কেমন যেন বিশ্রী লেগেছিল। যেমন মানুষগুলো তেমনি চেয়ার-টেবিল আলমারী র‍্যাক বহু ব্যবহারে বিবর্ণ শ্রীহীন হয়ে আছে, আপিসটা মনে হয়েছিল বহুকাল রং-পলেস্তারা না-করা একটা পোড়ো বাড়ি যেন। তার বিশ পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতার সঙ্গে একেবারেই মেলে না, ওঠা-বসা-চলা-ফেরা কেমন যেন বাঁধাধরা, একটা অদৃশ্য রজ্জু যেন তাদের সবার হাতে-পায়ে বাঁধা।

সহকর্মী নাতিবৃদ্ধ অনুকূলবাবু বোধ হয় আর ক' বছরে অবসর নেবেন, নুব্জ দেহ ক্ষীণদৃষ্টি অপরিচ্ছন্ন বেশ-বাস ওষধির আয়ু শেষ অবস্থার মত চেহারাটা। পাশে বসতে চোখ তুলে বললেন, নতুন এয়েছো বেশ বেশ! তা'পর?—

অনুকূলবাবু অনেকক্ষণ আর কথা বললেন না, কি যেন বলতে চাইলেন, তা ভুলে গেলেন বোধ হয়, নিজের কাজ করতে লাগলেন।

বিকাশ এদিক ওদিক চারপাশ চেয়ে দেখলে, বেশীর ভাগ কেরানীই অনুকূলবাবুর বয়সী ছেলে-ছোকরা কি যুবকের সংখ্যা নগণ্য। যেন এক জাতের বাসি ফুলের মালা গাঁথতে গাঁথতে শখ করে কেউ দু-চারটে ভিন্ন জাতের তাজা ফুল গেঁথে দিয়েছে। 'অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্ত'—

কে জানে আজ অনুকূলবাবুরা কিভাবে বাড়ী ফিরছেন।—এই গোলমালে বেচারারা কি ছোটাছুটি করতে পারবেন, না বোমাবাজদের এলাকা থেকে পালাতে পারবেন? তারা না হয় ছেলেছোকরা—

না, এখন ছুটে পালানই বুদ্ধিমানের কাজ। আগুন বেশ জোর হয়েছে ক্ষিপ্ত জনতা বোমা ফাটিয়েছে, এবার পুলিশ এসে কাঁদানে গ্যাস ফাটাবে, লাঠি হাঁকড়াবে তারপর—

গুলি ছুঁড়লে আর বলবার কি থাকবে? ঠিক কাজই করবে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্যে ল এণ্ড অর্ডার!

তারপর কাল [illegible] সরকারী বিজ্ঞপ্তি বেরুবে: একদ[illegible] মারমুখী উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশকে পাঁচ কি পঁচিশ রাউণ্ড কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে হয়েছে, তাতেও কোন ফল না হওয়ায় পুলিশ দু রাউণ্ড গুলি ছোড়ে, হতাহত কেউ হয়নি। কিন্তু জনতা বিক্ষিপ্তভাবে পুলিশের ওপর ইট-পাটকেল ছোঁড়ার ফলে দুজন পুলিশ অফিসার এবং একজন কনস্টেবল আহত হয়েছে—তাদের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

একই ভাব, ভাষা এই বিজ্ঞপ্তির, যেন হাঙ্গামার শুরুতে সেই কবে ছাপা হয়েছিল তারপর আর বদলান হয়নি। জনতার যে ভাব পুলিশেরও সেই ভাব, সুতরাং নতুন করে তার সংবাদ দেবার কি আছে। ছাপার ভাষা কি অক্ষর বদলে কি লাভ?

বিকাশ পিছন ফিরে মাঠের দিকে ছুটতে লাগল, ট্রামগুমটি-পোড়া-আগুন বেশ লেলিহান হয়ে উঠেছে, কালো ধোঁয়া কেটে গেছে, সূর্যাস্তের রংটা চৌরঙ্গী

পাড়াটা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে আছে— কুয়াশার সঙ্গে কালো রং মিশেছে।

ফট্। ফট্। ফট্। ঠিক পুলিশ এসে গেছে কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ছে। বিকাশ একটু থমকে মাঠের মধ্যে দাঁড়াল— শব্দটা যেন কেমন লাগল কানে। কাঁদানে গ্যাস নয়, গুলি বোধ হয়—

মাঠের পূব দিকে আপিস পাড়ার বাড়ীর দেওয়ালে শব্দগুলো প্রতিধ্বনিত হয়ে মাঠ পেরিয়ে বিকাশের কানের পাশ দিয়ে চলে গেল। শব্দ যেন গুলি হয়ে তার বুকের মধ্যে ঢুকে গেল। প্রাণভয়ে পাখীর মত বিকাশ অকুস্থল থেকে অনেক দূরে দিক-বিদিক জ্ঞান হারিয়ে চলে এল। অনেক দূর মহাত্মা গান্ধীর মর্মরমূর্তি ছাড়িয়েও—

গুলি বা গ্যাস ছোড়ার আর শব্দ কানে আসছে না। যেন কোন শব্দই আর বিকাশের কর্ণগোচর হচ্ছে না। সন্ধ্যা হয়-হয় হয়ে মাঠের সবুজ কালো হয়ে গেছে আকাশের নীল মুছে গেছে।

এদিক-ওদিক চেয়ে বিকাশ খেয়াল করতে পারলে এই মাঠটাকেই ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ড বলে। সৈনিকের প্যারেডের বদলে আজকাল এখানে বড় বড় বক্তৃতাসভার আয়োজন হয়, কাতারে কাতারে লোক জড় হয়, মিছিল করে বন্যার স্রোতের মত দূর দূর গ্রাম থেকে লোক আসে। চাকুরেবাবুদের খুব ভোগান্তি হয়, ঠিক আপিস ছুটির পর যত মিছিল, শোভাযাত্রা সমাবেশ ইন-কিলাব-জিন্দাবাদ। ট্রাফিক পুলিশ হিমসিম খেয়ে যায় গাড়ি-ঘোড়া আর মানুষ সাম-লাতে। এক একদিন তো বিকাশদের চোর চোর খেলতে খেলতে বাড়ি ফিরতে হয়েছে এ রাস্তায় মিছিল তো ও রাস্তায় বাস ঘুরিয়ে দাও, ও রাস্তায় গিয়ে দেখ সেই একই অবস্থা যত ঝাণ্ডা যত ফেস্টুন আর যত মাথা। শহরের যত লোক সব যেন বাইরে বেরিয়েছে, বাইরের যত লোক সব ঝেঁটিয়ে শহরে এসেছে।

কিছুদিন আগে এখানে একটা বিরাট মিটিং হবার কথা ছিল, কিন্তু বেআইনী ঘোষণা করে বেপরোয়া মারধোর করে পুলিশ সে মিটিং হতে দেয়নি অনেক ধর-পাকড়ও হয়েছে।

বিকাশ যেন আর হাঁটতে পারছে না, যেন শরীর আর বইছে না। দেহের সঙ্গে মন-মেজাজ যেন কেমন হয়ে গেছে—এখন এইখানে এই মাঠের মধ্যে বসে সে আগামী-কালের ভোরের জন্য অপেক্ষা করবে, আবার যখন সব স্বাভাবিক সহজ হয়ে যাবে।

মাঠে খানিক বসে থেকে বিকাশের কেমন যেন মনে হল, তার চারপাশে অনেক লোক যেন জড় হয়ে কল্ কল্ করছে, সবার সব শব্দ ছাপিয়ে একটা [illegible] শব্দ যেন কানে আসছে, বক্তৃতার [illegible]

বাদুড়ের বেগের মত, [illegible] সোঁ সোঁ করছে।

বিকাশের বাবা ছেলেদের অনেক আগে থেকে বলে এসেছেন দেখ ভাল যদি চাও কখনো ভিড় কি মিটিং কি মিছিলের মধ্যে যাবে না। ও করে কিছু হয় না মাঝখান থেকে গোবেচারারাই প্রাণ দেয়। গরীবের ছেলে লেখাপড়া শিখেছ, চাকরি বাকরি কর, নিজের কিসে ভাল হয় তার চেষ্টা দেখ। না তো ওই সব কি ভদ্রলোকের কাজ?

কে জানে ছেলেমেয়েরা কত অবনী-বাবুর কথা শুনেছে। বিকাশ অবশ্য বাপের মতই সাবধানী সংসারী, নিজের ভালর কথাই ভাবে রাত দিন, কিসে জীবনে উন্নতি করতে পারে, কিসে—

গলার শব্দটা যেন চেনা, কথাগুলো মনে লাগার মত। রোজ খবরের কাগজ পড়লে কিন্তু বুঝতে পারা যায় না দেশের অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে এসেছে, যারা দেশ-চালাচ্ছে তারা কেবল নাকি নিজের ভালর চেষ্টাই করছে, দেশবাসীর কথা কেউই চিন্তা করছে না।

বক্তৃতার সব কথা সত্যি না হলেও একশ ভাগের এক ভাগ সত্যি হলে সাধারণ লোকের দাঁড়াবার কোন জায়গা থাকে না। বিকাশ যে-কাগজ পড়ে তাতে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে কিছু কিছু আলোচনা হয় বটে, কিন্তু এমন করে চোখে আঙুল দিয়ে না প্রকাশ করে কিছু বলা হয় না। বোঝাও যায় না—কেমন যেন ঘোলাটে ঘোলাটে। তা-ছাড়া ভাববারই বা কি আছে, চায়ের সঙ্গে খবরের কাগজ একটা অভ্যাস—

বাবার কথা ঠিক নয়—মিটিং-এ কিছু হয় না। বরং খবরের কাগজ পড়ে কিছু হয় না। ভাগ্যিস সেদিন তাকে তার এক প্রবীন সহকর্মী এক রকম করে মিটিং-এ এনেছিল, না হলে সে কিছু জানতো না, মন্ত্রীরা এক-একটি কি, দেশকে তারা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, কেন দিন দিন অবস্থা অসহনীয় হয়ে উঠছে, কেন সাধারণ লোকের এত দুর্দশা।

তবু সেদিন বিকাশ তর্ক করেছিল সহ-কর্মী বন্ধুর সঙ্গে। অর্ধেক মিছে কথা বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল, মাঠে-ঘাটে বক্তৃতায় নাকি অমন করে সবার নামে বলা যায়, কেউ কিছু মনে করে না। ওরাও যখন বক্তৃতা দেবে তখন এমন করে মিছে কথা বানিয়ে কথা বলবে। তুমিও যেমন, ওয়াল পার্সেন্ট সত্যি হলে আর কেউ এমন ধীর-স্থির হয়ে বক্তৃতা শুনতো না, মার-মার কাট কাট করে বেরিয়ে পড়তো।

বন্ধুটি গম্ভীর হয়ে বলেছিল, এ তারই সূচনা, সেদিনের আর দেরি নেই।

বিকাশ হেসেছিল। সব সত্যি হলেও অসম্ভব। দিন যেমন চলছে তার তেমনিই চলবে, বাবার খুব ভয় ছেলেরা ঠিক সময় বাড়ী না ফিরলে অস্থির হয়ে পড়েন। চিন্তার কারণ তাঁর নানারকম—বিকাশকে তাই কম বকুনি খেতে হয় আজও।

(ক্রমশঃ)

যৌন শিক্ষা

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই বেশ কিছু প্রবীণ নাক সিঁটকে বিজ বিজ করেন, এবার দেশটা গোল্লায় যাবে। যত সব বেলেল্লাপনা। ছেলে মেয়েগুলোর কচি মাথা চিবিয়ে-না খেলে আর চলছিল না।

মধ্যবয়সী ঘরণীদের নিজেদের মধ্যে কথোপকথন 'এতকাল আড়ালে আবডালে আলোচনা করত ছেলেমেয়েরা এখন সামনা-সামনি করবে আর কোন আগল থাকবে না।

স্কুলে যৌনশিক্ষা দেওয়ার ব্যাপার হলে বাড়িতে ছেলেমেয়েদের নানান প্রশ্ন লেগে থাকবে। দিদিমনি যা বললেন ভাল বুঝতে পারিনি, তুমি একটু বুঝিয়ে দাও না মা।'

কচি-কাঁচারা ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে পারেনি। আসলে কী শেখানো হবে তার মধ্যে কী এমন রহস্য সেটা ওদের মাথায় ঢোকেনি। তবে বড়রা কেউ খারাপ হবে বলছে কেউ ভাল বলছে—এসব শুনে ওদের মনে হয়েছে নিশ্চয়ই জটিল কিছু।

বেশ কয়েক বছর আগে, ডঃ সুশীলা নায়ার তখন কেন্দ্রে স্বাস্থ্যমন্ত্রী। কথা উঠল, স্কুলে স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের যৌন বিষয়ে শিক্ষাদানের উদ্যোগ নিলে কেমন হয়? নানা মহলে গুজব উঠল। একদল এর পক্ষে, একদল বিপক্ষে। ধীরে ধীরে সব আবার থেমে গেল। সম্প্রতি, এই সেদিন আমাদের পশ্চিমবাংলা সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে মন্ত্রী শ্রীঅজিত পাঁজা স্বয়ং আবার পাড়লেন কথাটা। চারপাশে আবার আলাপন। কেউ বললেন এ হয় না। খুব খারাপ ফল হবে। কেউ বললেন, কি হয়েছে তাতে? বিদেশে তো এটা জলভাত- হলে মন্দ কী? যাদের নিয়ে মাথাব্যথা সেই স্কুল এবং ছাত্রছাত্রীরা এ বিষয়ে কী ভাবেন দেখা যাক।

প্রশান্তকুমার দত্ত, সবে গোঁফের রেখা উঠেছে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্যের ছাত্র। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন হয় স্কুলে-কলেজে খোলাখুলি যৌনবিজ্ঞান পড়ানো হলে?

প্রশান্ত বললো, ব্যাপারটা অনেকখানি নির্ভর করে কিভাবে শেখানো হবে তার ওপর। রামায়ণ আসলে একটাই। ছোটদের জন্যে ছোটদের রামায়ণ বড়দের জন্যে গোটাটা। এরকম হবে, না পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা দেওয়া হবে সে সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। ব্যাপকভাবে কম্পালসারি স্কিম নেওয়া হলে মনে হয় না তা খুব এফেকটিভ হবে।

জিজ্ঞেস করলাম, কী রকম?

প্রশান্ত জবাব দিলে, এই বয়েস এমন একটা বয়েস, বিষয়টাও এমন একটা বিষয় যে অন্য সব ভুলে সব এইদিকে আকৃষ্ট হয়ে মেতে উঠবে। আমাদের দেশে সেকস্‌কে একেবারে আলাদা করে দেখা হয় বলেই ভয় হয় এর পরিমাণ কি হবে। তাই পদ্ধতির ওপরই অনেকটা নির্ভর করে।

সিটি কলেজ বাণিজ্য বিভাগের ছাত্র সত্যেন সরকারের মতে, 'বিদ্যালয়ে যৌনশিক্ষা চালু করার আগে ক্ষেত্র তৈরি করা দরকার।'

ক্ষেত্র বলতে আপনি কি বলতে চান?

এই ব্যবস্থাটা একেবারে আচমকা এসে পড়লে বিভ্রান্তি আসবে। পাশ্চাত্যের কোন কোন দেশে তো যৌন-বিজ্ঞান পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত। সেখানে যে কারণে অসুবিধে তেমন হচ্ছে না, আমাদের পক্ষে সেটাই হবে অসুবিধের।'

নেতাজী শিক্ষায়তনে দশম শ্রেণীর ছাত্রী-যাদবপুরের কল্পনা তপাদার বললেন, 'এটাকে একটি পৃথক বিষয় বলে না ধরে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে শারীরিক জ্ঞান-চর্চার সঙ্গে শেখানো যেতে পারে।

এতে সমাজে নতুন কোন সমস্যা আসবে বলে মনে হয়?

মানসী চক্রবর্তী

প্রশান্ত দত্ত

সমস্যা তো সবেতেই আছে। সবেতেই আসবে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের ছাত্রী মানসী চক্রবর্তীকে জিজ্ঞেস করলাম, সামাজিক অবক্ষয় বলে যা বলা হয়ে থাকে তার সঙ্গে এই শিক্ষাক্রমের কোন সম্পর্ক আছে কি-না?

—আমার মনে হয়, আছে। আমি যেখানে থাকি সেখানে একটা ছোট মাঠ আছে। সন্ধ্যে হলে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা জোড়ায় জোড়ায় সেখানে হাজির হয়ে যা করে তা চোখ মেলে দেখা যায় না। এই অবস্থায় আমাদের দেশে যৌনশিক্ষা কিভাবে দেওয়া হবে তা নিয়ে সাবধানে ভাবা উচিত। আমার তেমন গোঁড়ামি নেই। আমি মনে করি এটাও প্রয়োজনীয় বিষয়। জানার বিষয়।

উত্তর কলকাতার বৈষ্ণব সম্মিলনী লেনের বাসিন্দা বিদ্যাসাগর কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী গোপা রায়।—

—এতে আমাদের খুব ক্ষতি হবে।

—কেন?

—আমাদের অনেক সমস্যা। খাদ্য বস্ত্র সব কিছুরই আকাল। শিক্ষা সমস্যা তো আছেই। তার ওপর যদি নতুন করে এ ব্যবস্থা চালু করা হয় তবে সে ভার বহন করা ছাত্রদের পক্ষে সম্ভব হবে না। শুনেছি আমেরিকায় যৌন-অপরাধের সংখ্যা বাড়ছে। অথচ সেখানে যদি এই হাল হয়, আমাদের তাহলে কি হবে ভেবে দেখুন।

—আপনি কি কৈশোর-তারুণ্যকে এই চর্চা থেকে বিমুখ রাখতে চান?

—হ্যাঁ—ঠিক তাই। আমাদের দেশে এই শিক্ষা চালু করার আগে বহু বছর ধরে পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এ বড়ি হজম করা নয়তো মুস্কিল হবে।

গৃহবধূর পুতুলের কারখানা

দুর্গাচরণ ডাক্তার লেনের 'রূপায়ণের' দোতলায় উঠতেই আমি থমকে দাঁড়ালাম—দুটো ঘর জুড়ে শুধু পুতুল আর পুতুল—সাঁওতালী মেয়ে বেদেনী কৃষক-রমনী নাগা-কন্যা দার্জিলিং-এর চা-কুড়ানী এবং বাউল থেকে শুরু করে অতি-আধুনিকা কলেজ গার্ল পর্যন্ত। রয়েছে ভারতনাট্টম মণিপুরী ও কথাকলি ঢং-এ নৃত্যরতা পুতুল। তুলো আর ছেঁড়া কাপড় দিয়ে তৈরী—কিন্তু শিল্পীর হাতে এগুলো যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। দেখলাম এই পুতুলের রাজ্যে এক মনে কাজ করে চলেছেন 'রূপায়ণে'র কর্ত্রী শ্রীমতী দেবযানী দাস এবং ছ-সাতটি মেয়ে।

বছর চারেক আগে ৭০ সালে এই বাড়িরই একটি ছোট্ট ঘরে শ্রীমতী দাস পুতুল তৈরীর কারখানা সুরু করেন। মাত্র তিনশো টাকা পুঁজি করে যখন এ-ব্যবসায়ে নেমেছিলেন তখন জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবকিছুই তাঁকে করতে হয়েছে। সংসারের অবসরটুকু কাজে লাগিয়ে দু পয়সা আয় করার উদ্দেশ্য নিয়ে শ্রীমতী দাস এ ব্যবসায় নামেন।

ছোট্ট রূপায়ণ' চার বছরে অনেক বড় হয়েছে। এখন এই প্রতিষ্ঠানের তৈরী পুতুল দিল্লী বম্বের বাজার মাৎ করেছে—ভারতের বাইরে আমেরিকা অস্ট্রেলিয়াতেও পাঠানো হচ্ছে। শীগ্গির লণ্ডনেও হয়তো যাবে। এশিয়া ৭২-এর আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতেও এঁদের পুতুল সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

—বছরে কত টাকার পুতুল বিক্রী হয়?

—গত বছর হাজার ছয়েক টাকার উপর পুতুল বিক্রী হয়েছে। প্রচুর অর্ডার আসে। কিন্তু সময়ের অভাবে সব অর্ডার নিতে পারি না। স্বামীপুত্রের প্রতি কর্তব্য অর্থাৎ সাংসারিক কাজকর্ম সেরে যে বাড়তি সময়-টুকু হাতে থাকে তা এই ভাবেই কাজে লাগাই। শ্রীমতী দেবযানী বললেন।

—আপনি কি ব্যাঙ্কের কাছ থেকে লোন নিয়েছেন?

—এখনও পর্যন্ত একটি পয়সাও লোন নিইনি। কয়েকটি ব্যাঙ্ক আমার কাজ দেখে নিজেরাই লোন দিতে এগিয়ে এসে-ছিলেন কিন্তু আমি নিইনি। কারণ এতে ঝুঁকি অনেক—হিসেবপত্র রাখার ঝামেলাও অনেক।

—পুতুল তৈরীর জন্য কি কি জিনিস লাগে?

—এর জন্য এমন কিছু দামী জিনিস দরকার হয় না। তুলো ছেঁড়া কাপড় কাগজের মন্ড লোহার শিক কাঠের স্ট্যান্ডে নকল গয়না দাস। তবে সবার উপরে প্রয়োজন শিল্পী-মন।

—কাঁচামালের কোনও অভাব হয় নাকি?

—না, এখনও তেমন কিছু প্রবলেম দেখা দেয় নি। কারণ হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তা দিয়েই আমার ব্যবসা চালানো যায়।

—মাসে আপনার কত টাকা আয় হয়?

—তা কর্মচারীদের মাইনে ও সব রকমের খরচ মিটিয়ে মাসে তিনশো টাকা আমার হাতে আসে। তবে এই অঙ্কটা সহস্র হাজারে নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু তার জন্যে প্রয়োজন আরও সময়।

—পুতুলের মার্কেট ....

—হ্যাঁ, কলকাতা দিল্লী ও বম্বেতে এর চাহিদা আছে। আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় পুতুলের খুব ভাল মার্কেট। তবে ফ্রেট চার্জ বেড়ে যাওয়ায় স্বাভাবিক ভাবে পুতুলের দামও বেড়ে গিয়েছে।

—পুতুলের ব্যবসায়ে কি খুব ঝুঁকি প্রয়োজন?

—মোটেই না। অল্প মূলধনে এ ব্যবসা শুরু করা যায়। এ জন্য একমাত্র সেলাই কল ছাড়া আর কোনও মেশিনই দরকার হয় না। শ্রীমতী দেবযানী দাস মৃদু হেসে বললেন—সব বাঙ্গালী গৃহবধূই অবসর সময়ে পুতুলের ব্যবসা শুরু করতে পারেন। তবে দুটো জিনিস তাঁদের ছাড়তে হবে।

—কি?

—দিবানিদ্রা আর পরনিন্দা।

[অলক মজুমদার]

চিঠিপত্র

[illegible]

[illegible] ২৭শে আষাঢ় [illegible] ১৩ [illegible] অমৃত পত্রিকায় আজি [illegible] [illegible]কে বাঁশী বাজায়—লেখাটা দেখেই [illegible]তে ডুবে গেলাম। লোক্ত লোডিং-এর [illegible] সেদিনও বসে বসে গুন গুন করে ঐ [illegible] গেয়েছিলাম। আমি জানতাম আমিই জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের একমাত্র ছাত্রী।

যতদূর মনে পড়ে ইং ১৩৩৯।৪০ সালের কথা—মহারাণী হেমন্তকুমারী [illegible]তে বছর খানেকের ওপর গান শিখে-ছিলাম। দিলীপবাবু যদি তাঁর জয়-জয়ন্তীর ওপর কিছু বিশেষ করে বলতেন তাহলে লেখাটা আরও উপভোগ্য হোত। আমিও এক সময় গানপাগল ছিলাম তাই এই সুযোগে কিছু বলে মনটাকে হাল্কা করতে চাই।

শ্রীবিজয় সিং নাহারের ভাই শ্রীকে এস নাহারের পরিচালনায় নিখিল বঙ্গ সংগীত প্রতিযোগিতা হোত। একবার ঐ প্রতি-যোগিতায় ১৯৩৯ সালে ১৯৪০ সন [illegible]-দের কম্পিটিটরসদের মধ্যে আমি বেস্ট কম্পিটিটার পুরস্কার পাই। ঐ প্রতি-যোগিতার অনুষ্ঠানের পর নানা জায়গা থেকে বিখ্যাত গায়ক-গায়িকাদের নিয়ে একটা জলসা হয়েছিলো তাতে ঐ প্রতি-যোগিতার কৃতকার্য শিল্পীদেরও ডেমন-স্ট্রেশন দিতে হয়েছিলো। আমিও ছিলাম। মিঃ নাহারের কি মর্জি হোল প্রোগ্রামে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের পরেই আমার নাম দিলেন। আমি তো অবাক। তাঁকে বললাম, 'এ কি করেছেন জ্ঞানবাবুর পরেই আমি স্টেজে উঠলে তো হল ফাঁকা হয়ে যাবে—'। মিঃ নাহার হেসে বললেন বেশ ইনটা-রেস্টিং হবে, তুই গা-না। আমার খুব মন খারাপ হয়ে গেল।

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গাইতে বসলেন, ধরলেন তাঁর মনমাতানো জয়জয়ন্তী। যতবার কোমল গান্ধার স্পর্শ করছিলেন ততবার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিলো, আহা আহায় হল ফেটে পড়ছে। মাত্র ৮।১০ মিনিট হয়েছে হঠাৎ কি খেয়াল হোল জ্ঞানবাবু কেরামত খাঁর হাত আর তবলা একসঙ্গে চেপে ধরলেন অর্থাৎ ইঙ্গিত করলেন গান হয়ে গেছে উঠে পড়ো। সবাই অবাক। অত্যন্ত পিপাসার সময় যদি কেউ সামান্য একটু জল দেয় তাহলে তার যা মনের অবস্থা হয় তাইই হয়েছিলো শ্রোতাদের।

জ্ঞানবাবু উঠে গিয়ে ভেতরেই একটা বেঞ্চে বসলেন, ভাবটা এই যেন ও'র প্রোগ্রাম হয়ে গেল। এইবার পাঠকরা শুনে হাসবেন আমি স্টেজে উঠলাম। না হল ফাঁকা হোল না, বরং পিন পড়লে শোনা যায় এমন নিস্তব্ধ। আমার খুব নার্ভাস লাগছে লজ্জাও করছে ঠুংরীটাই বেশী গাইতাম—সেদিন ঠুংরীই গাইলাম। গান শেষ করে যখন চলে আসছি পাশ থেকে হঠাৎ জ্ঞানবাবু বলে উঠলেন আমার পরে কে গাইলে? পাশের ভদ্রলোক আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। জ্ঞানবাবু আমার ডেকে তাঁর বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে অমুক দিন অমুক সময় যেতে বললেন।

আমি এতদিন শুধু স্বপ্নই দেখেছিলাম জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের প্রসাদ পাবার। সেদিন আমার স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হোল যেদিন মহারাণী হেমন্তকুমারী স্ট্রীটের বাড়ীতে প্রথম বললেন আমার যা আছে সব তোকে দিয়ে যাবো আমার বয়স [illegible] হোল সত্তর হবে—কৃতজ্ঞতায় শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়েছিলো—সেদিন আর কোন কথাই বলতে পারিনি।

যখনই যেতাম তিনি নিজেই দরজা খুলে দিতেন সুর ভাঁজতে ভাঁজতে সাহসে ভর করে একদিন দুটো কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম—একটা হোল—আপনি যে বলেন, মেয়েরা আবার প্যান প্যান করে কি গান গাইবে সেইজন্যে আপনি মেয়েদের গান শেখাতে চান না। সেদিন জলসায় শুনলেন তো কাশীবাঈ অফ বেনারস কি করে কোন স্ট্যান্ডিং সুর তানপুরা বা হারমোনিয়াম ছাড়াই শুধু মাত্র এক সারেঙ্গী দিয়ে সুরে ভরিয়ে দিয়ে গেলেন? কোন উত্তর না দিয়ে আপন মনে গুন গুন করছেন যখন বার বার বলুন না বলুন না করে বিরক্ত করছি, তখন হেড়েফুঁড়ে বলে উঠলেন আরে তোর ওরকম বয়স হোলে তুই ওর বাবা হবি। অর্থাৎ বলতে চাইলেন ওর চেয়ে ভাল গাইবো। আর একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের খ্যাতি সম্বন্ধে—তার উত্তরে বললেন আরে ও আমার চেয়ে দশ বছরের বড়। (অর্থাৎ বলতে চাইলেন তাঁর সাধনা ও'র চেয়ে দশ বছর বেশী) দশ বছর পরে আমি ওর বাবা হবো তার দশ বছর পরে ওর ঠাকুরদাদা হবো।

জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের কথাবার্তা থেকে বোঝা যেতো যে তিনি একদিকে যেমন প্রাউড ছিলেন অপরদিকে তেমনি উচ্চা-কাঙ্ক্ষী ছিলেন। ধনীদের উপলক্ষ করে বলতেন—আরে, তুমি টাকার রাজা আমি গানের রাজা। (বুক চাপড়ে বলতেন) তোমার আছে লক্ষ্মী আমার আছে সরস্বতী। একদিন তোমার লক্ষ্মীই আমার কাছে এসে বলবে, আমায় দাও আমি ধন্য হই।'

রবীন্দ্রনাথের যেমন জীবন ও কাব্য মাখামাখি ছিলো জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদেরও সাধারণ কথাবার্তার ভেতরে প্রত্যেক বা [illegible] গান বা সুরের কথা। একদিন এক ফেরিওয়ালা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে [illegible] হাঁকছিলো। আমি ভাবলাম চেঁচামেচি করলেই বকবেন তা নয় তিনি বললেন 'এই—বেসুরো চেঁচাস নি'। লোকটা কি বুঝলো জানি না, মুখে কাঁচুমাচু করে দে ছুট।

একবার জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের স্ত্রী আমাকে বলেছিলেন দেখো ভাই অনেক বলার পর আমায় (জ্ঞানবাবু) একটা সেলাই-এর মেশিন কিনে দিয়েছে আমি সার্ট পাঞ্জাবি কেটে সেলাই করতে শিখেছি, ওকে বললাম তোমায় একটা পাঞ্জাবি করে দেবো। জ্ঞানবাবু পাশেই বসেছিলেন তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন 'হ্যাঁ তুমি আবার আমায় পাঞ্জাবি করে দেবে আর সেই পাঞ্জাবি পরে আমি রাজবাড়ী যাবো দরবারী কানাড়া গাইতে।'

একবার একটা জয়জয়ন্তী সুরের একটা খেয়াল শেখবার সময় ঐ গানের একটা লাইন ছিল—উন বিন ক্যায়সে ভরদ দিল রে—এই 'রে'র ওপর বেশ সুন্দর একটা তান ছিল। যতবার গানটা গাইছিলাম ততবারই ঐ বিশেষ জায়গাটা ছেড়ে দিচ্ছিলাম। জ্ঞানবাবু বুঝতে পেরে বললেন 'আচ্ছা তোকে গাইতে হবে না আমি গাইছি তুই শুধু শুনে যা—এই রকম শুনতে শুনতে দেখবি একদিন ঠিক বেরোবে।' তাই-ই হোল একদিন। ঠিক তানটা বেরোলো। সেদিন তাঁর কি আনন্দ। বললেন, 'তুই লেখাপড়া শিখছিস? লেখা শিখতে কতক্ষণ যায়? —আরে সদা সত্য কথা বলিবে এইটুকু শিখলেই হয়ে গেল ব্যস্'।

আর একটা ঘটনা বলে শেষ করবো—একদিন শিল্পীদের সমালোচনা হচ্ছিলো। জ্ঞানবাবু বললেন—'এ ধরনের গায়ক আছে তাদের সুরের দিকে কোন নজর নেই। শুধু তবলার সঙ্গে 'ফাইট' করবে। ডান হাতে তানপুরা ধরবে আর মুণ্ডুটা থাকবে বাঁ-দিকে তবলার দিকে আর করবে কি জানিস? হাত পা নেড়ে দুড়ুম-তাক-তা ধুম-আ-যা বেরিয়ে যা'—শেষে শব্দ খুঁজে না পেয়ে যখন বললেন 'বেরিয়ে যা' আমার সে কি প্রচণ্ড হাসি—আমি খুব জোরেই হাসি—ভীষণ হেসেই চুপ করে গেছি—জ্ঞানবাবু কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি তো ভয় পেয়ে গেছি, হয়তো জোরে হাসার জন্যে বকুনি খাবো যা বাড়ীতে হরদম খেতাম। কিন্তু না বকলেন না বললেন 'যা রে, তুই তো বেশ সুরে হাসিস'—

'আমার যা আছে তোকে সব দিয়ে যাবো'—একথা আজও সুর হয়ে যেন কানে বাজে। কিন্তু আমার ভাগ্যদেবী নেবার হাত আমার চিরকালের জন্য ঠুঁটো করে দিলেন। সাধারণ বাঙ্গালী ঘরের হিন্দু মেয়ে আমি, সংসারের অতল তলে তলিয়ে গেলাম।

বীণা বসু
হাওড়া-১

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এদিকে ১৯১০-১১ নাগাদ সুদূর পশ্চিম গগনে একটি ছোট্ট কালো মেঘ দেখা দিল—প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বাভাস। দূরদর্শী বৃটিশরাজ তোষণের দিকে ঝুঁকলেন। ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের মনীষীদের ঘন ঘন রাজনৈতিক বৈঠক বসতে লাগল। স্বয়ং সম্রাটবাহাদুর বঙ্গভূমিতে পদার্পণ করে ভঙ্গ-বঙ্গ জোড়া লাগালেন। কিছুদিন পরেই অধ্যাপক রথেন-স্টাইন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতি চিত্রের এক উচ্ছ্বসিত প্রশংসাভরা ভূমিকা লিখে দিলেন। প্যারিস ও লন্ডনে অবনীন্দ্র-নাথ ও তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের ছবির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হল—একটু পশ্চিম-ঘেঁষা হলেও গগনেন্দ্রনাথও তাতে স্থান পেলেন। অবশেষে রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেলে আমরা পুরোমাত্রায় বিমোহিত হয়ে পড়লাম রঙ্গমঞ্চে ঘন ঘন করতালি শুরু হল। এরপরে ভদ্রতের নাট্যমন্দির রাজনীতি ও চিত্রকলা হাত ধরাধরি করে তালে বেতালে নৃত্য শুরু করে দিল। 'অলমিতি বিস্তরেণে—'—চিত্রকলা প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক।

আর্ট স্কুলে চিত্রপ্রশ্নসঙ্কুল ছাত্রশাসন-নীতি নিয়ে অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউনের সঙ্গে উপাধ্যক্ষ অবনীন্দ্রনাথের মতান্তর মনান্তরে পরিণত হয়। ফলে ১৯১৬ [illegible] অবনীন্দ্র-নাথ অভিমানভরে পদত্যাগ [illegible]। তাঁর [illegible] নামজাদা প্রতিকৃতি ও নিসর্গচিত্র শিল্পী (পোর্ট্রেট অ্যান্ড ল্যান্ডস্কেপ পেইন্টার) [illegible] যামিনী-প্রকাশ গাঙ্গুলী [illegible] নিযুক্ত হলেন। বহুদিন পরে বাস্তবধারায় ছবি আঁকার সুযোগ পেয়ে ছাত্রদের উৎসাহের সীমা রইল না। গাঙ্গুলীমশাইও খুবই ছাত্রদরদী ছিলেন—ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে 'আলমা মাটার' সম্বন্ধে একটা স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা জন্মায় এবং তাদের কাজকর্মও উন্নততর হয়ে ওঠে। বস্তুত উনি যতদিন আর্ট স্কুলে ছিলেন (১৯১৬—২৮) ততদিনই শেষবারের মত বাস্তবধারায় ছবি আঁকার কিছু নিশ্চিন্ত সুযোগ তরুণ শিল্পীরা পেয়েছিল। পূর্ব-তন অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেবের মত ভারতীয় অভারতীয় প্রশ্ন নিয়ে অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউনের কোনো পক্ষপাতিত্ব ছিল না যদিও ভারতীয় চিত্রকলার উপর তাঁর ক'খানি বই অথারিটি আখ্যার যোগ্য। তাঁরই অধ্যক্ষতাকালে (১৯০৯—১৭ ভারতের বিখ্যাত চিত্রকর নন্দলাল বসু মুকুল দে অসিত হালদার যামিনী রায়, ক্ষিতীন মজুমদার প্রমুখ বহু শিল্পী বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। আর্ট স্কুলের সুষ্ঠু পরিচালনা ও স্বচ্ছন্দ গতির সঙ্গে ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরেয়িন্টাল আর্ট প্রতিষ্ঠিত শিল্পবিদ্যালয়ও তখন নন্দলাল বসু ও তাঁর সতীর্থদের তত্ত্বাবধানে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। আপাতঃদৃষ্টিতে সময়টা চিত্রচর্চার পক্ষে খুব অনুকূল বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক।

কিন্তু কালস্রোত চিরকালই একটু উপল-ব্যথিত গতিতে চলে। গাঙ্গুলীমশায়ের নিয়োগের অল্প পরেই অবনীন্দ্রনাথের 'ষড়ঙ্গ' ও রবীন্দ্রনাথের 'ছবির অঙ্গ' প্রবন্ধ দুটি চিত্রকলাক্ষেত্রে বাস্তবধারা ও ঐতিহ্যা-নুযায়ী ধারায় বিশ্বাসী দুই দলের মধ্যে এক গভীর ফাটল ধরিয়ে দেয়। দুটি প্রবন্ধই বাৎস্যায়নের একটি শ্লোক ব্যাখ্যা করে লেখা। মূল শ্লোকটি 'রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্য যোজনম সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গম ইতি চিত্রষড়ঙ্গকম'।। দুই মহামনীষী ব্যাখাকারই সাদৃশ্যং কথাটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দৃশ্যমান প্রকৃতির রূপায়ণে সাদৃশ্যকরণ কারুকর্মের প্রতি অযথা কটুবাক্য প্রয়োগ করেছেন। আশঙ্কা হয় ওঁদের দুজনেরই প্রকৃতিদেবীর কাছে আক্ষেপ ছিল 'কেন তুমি মূর্তিমতী হয়ে এলে রহিলে না ধ্যানধারণায়'। সাধারণ-ভাবেই শ্লোকটির ব্যাখ্যা হতে পারে যে 'ভাবলাবণ্য' যোগে 'রূপভেদ' সমূহ 'প্রমাণানি' সহ বর্ণিকাভঙ্গে সাদৃশ্যকরণ চিত্রের ছয় অঙ্গস্বরূপ—প্রত্যক্ষ পরোক্ষ বা ধ্যানদৃষ্টিপ্রসূত যে কোনো চিত্র রচনাই হোক না কেন। সুতরাং সহজেই অনুমেয় যে প্রত্যক্ষ দৃষ্টির প্রমাণানির সঙ্গে ভাবলাবণ্য যোগ না হলে চিত্র অঙ্গহীন হয়ে পড়বে। অথচ প্রত্যক্ষদৃষ্টি সাদৃশকরণ দুজনেরই এত বিসদৃশ লাগল যে সেই ধারার শিল্পীদের উদ্দেশ্যে বলা হল 'অনুকৃতি অধমসাদৃশ্য—কীট-পতঙ্গাদি নানা ইতর জীবকে আত্ম-গোপনের জন্য অবলম্বন করতে দেখা যায়' (অবনীন্দ্রনাথের 'ভারতশিল্পে ষড়ঙ্গ' পৃঃ ৪৩ দ্রঃ)। আশৈশব প্রকৃতির রূপমুগ্ধ কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথও তাদের প্রকৃতির [illegible] 'অবিকৃত [illegible]' বলতে দ্বিধা করলেন না। পাঠকদের যদি খটকা লাগে তবে এই সূত্রে প্রবন্ধ দুটি আবার পাঠ করতে অনুরোধ করি।

যদিও এই দুই মনীষীর শ্রেষ্ঠ পরিচয় কাব্যে ও চিত্রে, তবু ছবির আদর্শ সম্বন্ধে এঁদের মতামত যে আমাদের সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে প্রায় শেষ কথারই সামিল তা সহজেই অনুমেয়। আক্ষেপের বিষয় এই যে মতবাদ প্রচারে বহুবার বিপরীত কথা বলে রবীন্দ্রনাথ ভক্তবৃন্দকে বিভ্রান্ত করেছেন (এই প্রবন্ধেই পরে তার নজির দেব)। অবনীন্দ্রনাথ কদাচিৎ এরকম করেছেন—কথায় ও কাজে তাঁর বরাবর সঙ্গতিই ছিল।

তাঁর সংস্পর্শে এসে যদি কিছু শিল্পীও ভারতীয় চিত্রকলার আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব ও তুলনায় জড়ধর্মী পাশ্চাত্যের নিকৃষ্টতা প্রচার না করে এবং পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে জোর করে মুক্ত হবার অপচেষ্টা না করে স্বীয় আদর্শানুযায়ী চিত্র রূপায়ণে নিযুক্ত থাকতেন তবে এতদিনে ভারতীয় সঙ্গীতকলার মতই একটা ট্র্যাডিশান গড়ে উঠতে পারত। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের অকস্মাৎ উদ্ভূত নন-অ্যাকাডেমিক ছবি বা পাশ্চাত্য সুররিয়া-লিস্টিক ছবি ভারতীয় শিল্পসৌধের ভিতও নড়িয়ে দিতে সক্ষম হত না।

বৃটিশ কূটনীতির আনুকূল্যে ভারতীয় ঐতিহ্যের চিত্রধারা কেবল চাকুরী-সম্বলই হয়ে রইল। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য-প্রশিষ্যগণ প্রধান আসনে প্রতিষ্ঠিত হন; তাঁদের কেউ কেউ নিজস্ব আর্ট স্কুল ও শিল্প প্রতিষ্ঠানও খোলেন। (দিল্লীতে সারদা উকীল প্রতিষ্ঠিত উকিল স্কুল অব আর্ট (১৯৩০), ও পরে তাঁর ভ্রাতা কর্মবীর বরদা উকীল প্রতিষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস সোসাইটির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য)।

এই প্রসঙ্গে সূত্রকারের [illegible] কথাটির অন্য এক ব্যাখ্যাও করা [illegible] পারে—বর্ণিকাভঙ্গে ভাবলাবণ্য [illegible] করে সাদৃশ্যকরণই বাস্তববাদীর প্রধান [illegible] বিষয়বস্তুর আপাত রূপায়ণ [illegible] গৌণ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে [illegible] যৌবনা তরুণী কিম্বা লোলচর্মা [illegible] বৃদ্ধা, বনমধ্যে চকিতা হরিণী কিম্বা [illegible]-পথে ভারবাহী শ্রমক্লান্ত মহিষ [illegible] ফণীমনসা অথবা সুকোমল [illegible] বাগান বা বস্তির অন্ধগলি ইত্যাদি [illegible] ভিন্ন বিষয়বস্তুর চিত্রসজ্জাই সাদৃশ্য ও বর্ণিকাভঙ্গের মাধ্যমে সমভাবে রসোত্তীর্ণ হতে পারে। যাই হোক বিদেশী বাস্তব-ধারায় মুগ্ধ হয়ে যে সব শিল্পী চিত্রকর্ম করতেন তাঁদের অনেকরকম কটুবাক্যই শুনতে হয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না। 'রূপম' পত্রিকার সম্পাদক ও সি গাঙ্গুলী মহাশয় তো প্রচার করলেন যে ভারতের ঐতিহ্যানুযায়ী শিল্পকর্ম পরিত্যাগ করে

[illegible] মেয়ে। শিল্পী রণদাপ্রসাদ গুপ্ত ১৯০০ খৃ

ভিন্নপথ গ্রহণ দেশপ্রীতির বিরুদ্ধে মহাপাপ।' প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে ভাস্কর ফণীন্দ্রনাথ বসু (পরে রয়াল স্কটিশ অ্যাকাডেমির অ্যাসোসিয়েট) যখন বিদেশে ভাস্কর হিসাবে খুবই সুনাম অর্জন করেন তখন এদেশে তাঁর কাজকর্ম নিয়ে কিছু বাদানুবাদ হয়। ফণীবাবু প্রমুখ শিল্পী যে পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে দেশের শিল্পজগতে মহাবিপদ ডেকে আনবেন এই মর্মে রায় দিয়ে গাঙ্গুলীমশাই দেশবাসীকে সাবধান করে দিলেন। দেশকালপাত্রের প্রভাব সম্যক উপলব্ধি করে সাবধানী পথিক ফণীবাবু আর দেশে ফেরেন নাই। শতাব্দীর গোড়াতেও শশী হেস ঐতিহ্যবাদীদের মতিগতি লক্ষ্য করে চিরকালের জন্য দেশত্যাগীই হয়ে রইলেন। শশী হেসের আঁকা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতি বা যামিনী গাংগুলীর 'গঙ্গাবক্ষে উষার আলো' প্রভৃতি ছবি যদি খুব উন্নতমানের নাও হয়ে থাকে তবু সূত্রাকারের 'সাদৃশ্যং' কথাটির অর্থ নিশ্চয় ক্ষুণ্ণ করে না। আজ যে চিত্রকলার সকল ক্ষেত্রেই প্রকৃতির বাস্তবরূপের 'বিকৃতবমন' চলেছে তাতে আর বিস্মিত হবার কি!

ঘাত প্রতিঘাত একটি নৈসর্গিক নিয়ম—কি জড়বস্তুতে কি সমাজজীবনে সর্বত্রই তার প্রয়োগ অনস্বীকার্য। নানা দিক থেকে আক্রান্ত কিন্তু জনসাধারণের বোধগম্য ও উপভোগ্য চিত্রকলায় আস্থাবান, বাস্তবধারার শিল্পীদের মধ্যেও এক নবচেতনার বীজ অঙ্কুরিত হয়। আগেই বলা হয়েছে যে ১৮৯৭ থেকেই আর্ট স্কুলে বাস্তবধারায় উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছিল এবং যে সমস্ত ছাত্র এখানকার ফাইন আর্টস বিভাগ থেকে সসম্মানে উত্তীর্ণ হত তারাও কলারসিকসমাজে ভারতের ঐতিহ্যে অবিশ্বাসী পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকারী বলেই গণ্য হত। কিন্তু যামিনী গাঙ্গুলীমশায় আর্ট স্কুলে যোগ দেবার পর এবং রণদা গুপ্তের শিষ্যরাও ক্রমশ চিত্রকলায় পারদর্শী হতে শুরু করলে বীজ আর অংকুরে রইল না ঘাত প্রতিঘাতের প্রতিক্রিয়ায় তার নানা ডালপালা গজিয়ে উঠল। নেহাৎ বেঁচে থাকবার তাগিদেই সমাজে স্বীকৃতিলাভ সেই সব তরুণদের কাছে অপরিহার্য ঠেকল। সুজবুদ্ধিতেই তাদের ধারণা হল যে চিত্রকলায় কারুকুশলতার নিদর্শন স্বচক্ষে দেখলে দর্শকসাধারণ রসবিচারই করবে, ভারতীয়-অভারতীয় ছাপ দেখে বিভ্রান্ত হবে না। এখানে বলে রাখা দরকার যে তখনকার দিনে (১৯০০—১৫) আর্ট স্কুলে বা অন্য কোথাও চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল না। একমাত্র ভারতীয় পন্থায় যাঁরা ছবি আঁকতেন তাঁরাই সরকারি বদান্যতায় ওরিয়েন্টাল আর্ট ভবনে ১৯০৭ থেকে চিত্রপ্রদর্শনীর সুযোগ পেতেন। তখনকার নামকরা মাসিক পত্র 'প্রবাসী' ও মডার্ণ রিভিউ শুধু তাদের ছবি ছাপেয়েই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করত। এই সংকটকালে নেহাৎ নৈসর্গিক নিয়মেই নবীন শাখায়ও ফুল ফুটে উঠল। রণদা গুপ্তের এক অত্যুৎসাহী শিষ্য নববিবাহিত হেমেন মজুমদার বয়োজ্যেষ্ঠ যামিনী রায়কে পুরোভাগে রেখে ইন্ডিয়ান আকাডেমিক অব আর্ট নামে এক শিল্পীচক্র গড়ে তোলেন, এবং সামান্য মাত্র মূলধন সম্বল করেই এই চক্রের নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশের দুঃসাহসেও ব্রতী হলেন। যামিনী রায় ছাড়া এই চক্রের সব সদস্যই কুড়ির কোঠায় লেখকও তার অন্যতম সদস্য ছিল। ভাগ্যক্রমে 'হযবরল' লেখক সুকুমার রায় ও লক্ষ্মীবিলাস প্রেসের স্বত্বাধিকারী নামমাত্র মূল্যে ব্লক ও মুদ্রণকার্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় ১৯১৯ সালে পত্রিকাটি সগৌরবে আত্মপ্রকাশ করে। এরকম একটা প্রতিষ্ঠানের যে একটা সামাজিক প্রয়োজন ছিল তা পত্রিকার অভাবনীয় সাফল্যই প্রমাণ করল। বলে রাখা দরকার যে সেই চক্রে ভারতীয়-অভারতীয় বলে কোনো পক্ষপাতিত্ব ছিল না। ভারতের সবজায়গা থেকেই শিল্পীরা তাঁদের নিদর্শন পাঠাতে শুরু করলেন। এই পত্রিকা মারফতই বাংলাদেশে যামিনী রায় হেমেন মজুমদার পাঞ্জাবের আবদুর রহমান চুগতাই মহারাষ্ট্রের ভাস্কর বিনায়ক করমারকার বম্বের ভালিম ও ফাড়কে মাদ্রাজের এলাতাইর প্রমুখ বহু শিল্পীই জনসাধারণের কাছে প্রথম পরিচিতি লাভ করেন। তবু অচিরেই দেখা গেল যে পত্রিকাপ্রকাশ শুধু উৎসাহ সম্বল করেই সম্ভব হয় না একটা ন্যূনতম অর্থেরও সঙ্কুলান হওয়া চাই। অতএব স্বাভাবিক কারণেই কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশের পর পত্রিকাটি উঠে যায় (১৯১১)। একটি ফুল অকালে ঝরে গেল। এই প্রসঙ্গে বলে রাখতে চাই যে, পরবর্তী জীবনে ভারতের বহু জায়গায় বহু সর্বভারতীয় প্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ও রাজা-রাজড়াদের দরবারে বিশেষ সমাদর লাভ করলেও এই পত্রিকাপ্রকাশের মধ্যে দিয়েই হেমেন মজুমদার বাংলাদেশের চিত্রজগতে এক বিস্মৃতপ্রায় ঐতিহাসিক অবদান রেখে যেতে পেরেছেন। এই সূত্রে অক্লান্তকর্মী বাল্যসুহৃদকে শ্রদ্ধা জানাই। সেই সঙ্গে স্মরণ করি শিল্পীচক্রের অন্যান্য বন্ধুদের। এঁদের মধ্যে যামিনী রায় এবং রণদাবাবুর শিষ্য সতীর্থ যোগেশ শীল ও সতীশ সিংহের সঙ্গে লেখকের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। আর্ট স্কুলের শেষ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হবার পর (১৯১৮) অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউনের সুনজরে আসার সৌভাগ্যও তার হয়। এই প্রস্তুতিপর্বের ভিত্তিতে উত্তরজীবনে লেখককে চিত্ররংগমঞ্চে নানা ভূমিকায় [illegible] হয়েছে। ফলে অনেক ব্যর্থতা ও [illegible]ত্বের বোঝা জমে যাওয়াতে এই ইতিবৃত্ত একটু সংকোচ ও দ্বিধার সংগেই লিখতে হল।

পুরোনো প্রসংগে ফেরা যাক। স্বভাবতই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চক্রের সদস্যেরা খুবই মর্মাহত হয়। তাদের মতপ্রকাশের ও সমাজে স্বীকৃতিলাভের আগ্রহ কিন্তু বজায় রইল এবং ক্রমে তা একটি নির্দলীয় সর্বভারতীয় প্রদর্শনীর পরিকল্পনার রূপ নেয়। সোৎসাহে ও নিঃশঙ্কচিত্তে অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউনের কাছে এই পরিকল্পনা উপস্থিত করা হল। তিনিও এ প্রস্তাব খুবই সমর্থনযোগ্য মনে করে বিদ্যালয়ভবনেই প্রদর্শনীর প্রতিশ্রুতি দিলেন। লেখকের আর উৎসাহের সীমা রইল না। অচিরেই দি সোসাইটি অব ফাইন আর্টস নাম দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। সভাপতি হলেন সর রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী, সম্পাদক ধনীঘরের বিশিষ্ট চিত্রকর ভবানীচরণ লাহা এবং সহকর্মী যুগ্মসম্পাদক যোগেশ শীল ও লেখক। অনেক ব্যক্তিরাও এর সদস্য হন। ১৯২১ সালের ২১শে ডিসেম্বর তারিখে বাংলার লাটবাহাদুর লর্ড রোনাল্ডসে প্রতিষ্ঠানের প্রথম

প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করলেন। ভারতীয়-অভারতীয় পৃষ্ঠপোষক নিরপেক্ষ পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থায় ও নানা প্রদেশের বহু দেশী-বিদেশী শিল্পীর যোগদানে সোসাইটির বার্ষিক প্রদর্শনীগুলি খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। বস্তুত ১৯০৪ সালে আর্ট গ্যালারী উঠে যাবার পর কলকাতার জনসাধারণের পক্ষে একসঙ্গে এতগুলি চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের নমুনা দেখার সুযোগ আর হয়ে ওঠেনি। তাদের রসবিচারেও খুব ত্রুটি হয়নি। পরবর্তীকালে যে সকল শিল্পী বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছেন তাঁদের অনেকেই—যেমন যামিনী রায় বা দেবীপ্রসাদ রায়-চৌধুরী—এই প্রদর্শনীতেই তাঁদের প্রতিশ্রুতির প্রথম স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। লেখকও কাঠকয়লায় আঁকা স্যার আশুতোষের এক প্রতিকৃতি, 'দি বেঙ্গল টাইগার' নামে ছবি প্রদর্শন করে প্রায় রাতারাতি নাম করে ফেলল'। পরের বছর, ১৯২৩ সালে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বৃত্তি পেয়ে বিলাতে রয়াল অ্যাকাডেমি অব আর্টস-এ বহু বিশিষ্ট শিল্পীর সংস্পর্শে আসার সুযোগও তার ঘটেছিল। ইতিমধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপক নিযুক্ত হওয়ায় (১৯২০) বেশ একটা সাড়া পড়ে যায়। তাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্য দ্বারভাঙ্গা হলে তিলমাত্র জায়গাও খালি থাকত না।

কয়েক বছরের মধ্যেই ভারতীয়-অভারতীয় প্রশ্ন আর্ট স্কুলে এক বিপর্যয় ঘটিয়ে দেয়। এর প্রতিষ্ঠিতা-অধ্যক্ষ লক সাহেবের আমল (১৮৬৪) থেকেই অধ্যক্ষ-কর্তৃপক্ষের মতান্তর-মনান্তর যেন এখানকার এক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এরই কবলে ১৯২৭ সালে পার্সি ব্রাউন বাধ্য হয়ে অবসর গ্রহণ করেন। তখন সবাই ধরে নেন যে ছাত্রদের একান্ত শ্রদ্ধাভাজন উপাধ্যক্ষ যামিনী গাঙ্গুলীই অধ্যক্ষপদে বৃত হবেন। কিন্তু ইতিহাসের রুচি ও গতিপথ বিচিত্র। অবনীন্দ্রশিষ্য এচিং বিদ্যার পারদর্শী মুকুল দে মহাশয় রবীন্দ্রনাথের সুপারিশে ১৯২৮ সালে আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। নবনিযুক্ত অধ্যক্ষের কাজকর্ম দেখে ছাত্রদের দৃঢ় ধারণা হল যে সেলাহেবের তেলরং কি জলরঙের ছবি আঁকায় কোনো দক্ষতাই নেই। তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ল—যামিনী গাঙ্গুলীর প্রতি অবহেলাও তাতে ইন্ধন জোটায়। এ অবস্থায় ছাত্রশাসনতন্ত্র পাকা করার জন্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এসে ছাত্রদের কোনো জিজ্ঞাসাবাদ না করেই তীব্রতম ভাষায় তাদের তিরস্কার করেন। তারা হতবাক ও নিস্তব্ধ হয়ে যায়। যদি কারও সন্দেহ থাকে তবে 'বাংলার কথা' দৈনিক পত্রিকাটিতে 'শিল্পবিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ' চিঠিখানি পড়ে দেখবেন (তাং ২৮শে শ্রাবণ, ১৩৩৫)। চিঠিখানি প্রবীণ শিল্পী প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত। ইতিমধ্যে সহজবোধ্য কারণেই আর্ট স্কুলে লেখকের একটি অস্থায়ী কাজেরও অবসান ঘটে। আবার তখনকার ডি পি আই স্টেপলটন সাহেব ছাত্র বিক্ষোভের কারণ অনুসন্ধান করে লেখকের পুনর্নিয়োগের ব্যবস্থা করলে আর্ট স্কুল অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে অধ্যক্ষ মুকুল দে বিদ্যালয়ভবনে সোসাইটি অব ফাইন আর্টস-এর প্রদর্শনীর অনুমতি না দেওয়ায় এবং কলকাতায় অন্য কোনো উপযুক্ত প্রদর্শনীকক্ষ না থাকায় সোসাইটির কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। ঘটনাচক্রে দিল্লীতে ভাইসরয়েজ হাউস সাজাবার জন্য লণ্ডনের বাকিংহাম প্যালেস ও উইণ্ডসর ক্যাসেল-এ রাজারাণীর ছবির অনুকৃতির জন্য লেখক ১৯৩০ সালে ভারত সরকারের নিয়োগে দ্বিতীয়বার বিলাত গমন করে, আর্ট স্কুলের আবহাওয়া থেকে মুক্তি পায়।

এই সময়েই কলকাতার টাউন হলে রবীন্দ্রনাথ একেবারে নন-অ্যাকাডেমিক সাজে চিত্ররঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন। তখন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অতিশায়ী বিমূর্তপন্থী সুররিয়ালিস্ট আন্দোলনের জয়ধ্বনিতে পশ্চিম মুখর। এর কিছুদিন আগেই কবিগুরু স্নেহভাজন অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের ভারতীয় চিত্রকলার পুনর্জীবন সাধনার কথা একবারেই বিস্মৃত হয়ে তরুণ শিল্পীদের বরাভয় দিয়ে আহ্বান জানালেন

"When in the name of Indian Art we cultivate with deliberate aggressiveness a certain bigotry, we smother our souls under idiosyncracies unearthed from buried centuries....Let us take heart and make daring experiments, venture out into the open road to face risks ..... defying unholy prohibitions preached by prudent little critics".

আরও স্পষ্টভাবে তিনি অন্যত্র লিখেছেন, 'তুমি কি ভাবছ চোখবুজে ধ্যানযোগে দেখবার কথা আমি বলছি? আমি এই চর্মচক্ষে দেখবার কথাই বলছি। চর্মচক্ষুকে চর্মচক্ষু বলে গাল দিলে চলবে কেন? একে শারীরিক বলে তুমি ঘৃণা করবে এত বড় লোকটি তুমি কে? আমি বলছি, এই চোখ দিয়েই, এই চর্মচক্ষু দিয়েই এমন দেখবার আছে, যা চরম দেখা।' ('দেখা' শান্তিনিকেতন, পৃঃ ৫৫)।

রবীন্দ্রপ্রশস্তি করতে গিয়ে আমাদের আর্ট-ক্রিটিকদের আধুনিকতম পাশ্চাত্য নন্দনতাত্ত্বিক ভাষাই আশ্রয় করতে হল বটে, কিন্তু কথায় ও কাজে ভাবধারার বৈষম্যে শান্তিনিকেতনে এক ঘূর্ণাবর্তেরই সৃষ্টি হল। কোনও তরুণ শিল্পী তো রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে পথ ভুলেও বাস্তবপন্থী হতে চাইল না, 'সাবধানী পথিক'ই রয়ে গেল। একমাত্র ব্যতিক্রম দুঃসাহসী যামিনী রায়। ইনি যৌবনে বাস্তবপন্থীই ছিলেন কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের বাণী, 'আমাদের শিল্পকর্মে ভারতীয় ছাপ রাখতেই হবে', তাঁর জীবনে মন্ত্রস্বরূপ হয়ে পড়ল। ক্রমে উনি সৃজনশীল শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে বিশ্বখ্যাতিও লাভ করলেন। দুর্ভাগ্যত তিনি যখন খ্যাতির শিখরে তখনই নানা এলোমেলো প্রচারে তাঁর শিল্পীজীবন যেন কিছুটা ব্যাহত হয়ে যায়। বিশ্বজুড়ে ওরিজিনাল ছবির চাহিদায় তখন তাঁর ছবিগুলির ম্যাস প্রোডাকশন শুরু হল, অর্থাগমও হল প্রচুর। ক্রমে অর্থ-অনর্থ তুল্য হয়ে এই বৈষ্ণবজনোচিত ভক্ত সুন্দরপূজারী শিল্পীর (১৮৮৮-১৯৭১) শেষজীবনে আর ক্রেশের অবধি রইল না। আধুনিকতার পটভূমিতে যামিনী রায় এককই রয়ে গেলেন, চিত্রকলা ক্ষেত্রে পথিকৃৎ হতে পারলেন না। তাঁর উত্তরসূরীও এ পর্যন্ত কেউ দেখা দিল না।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

আমেরিকায় বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রচার :

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে রাজ্যের চলচ্চিত্র শিল্পের একটি প্রতিনিধিদল আমেরিকা গিয়েছিলেন পশ্চিম গোলার্ধের কোন কোন দেশে বাংলা ছায়াছবি প্রদর্শনের সুযোগ-সুবিধা ও তার ব্যবসায়িক সম্ভাব্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য। এঁদের অন্যতম বন্ধুবর আশুতোষ নাগের সৌজন্যে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত একটি সংবাদ পত্রিকা আমার হাতে এলো। বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘের উদ্যোগে প্রকাশিত 'সংবাদ বিচিত্রা' নামে এই পত্রিকাটির ২৯ জুনের সংখ্যাটি (৩য় বর্ষ ৯ম সংখ্যা) পেয়ে আমরা আনন্দলাভ করেছি। পশ্চিমবাংলা তথা বাংলাদেশ সম্পর্কে নানা সংবাদ যেমন এই আট পৃষ্ঠার (সাপ্তাহিক 'অমৃত'-এর আকারে) কাগজে স্থান পেয়েছে তেমনি নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের স্মারকলিপিও এর শেষ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে। গত ২৩ জুন নিউইয়র্কে ডঃ কে পি [illegible] গারের উদ্বোধনের কথা আমরা এই স্মারকলিপিতে জানতে পারলাম। তাছাড়া ঐ শহরেই ২৮ জুলাই ডঃ জয়া হালদারের ফ্ল্যাটে মানিক পাঠাগারের উদ্বোধনের সংকল্প প্রচার করা হয়েছে। [illegible] চৌধুরীর পরিচালনায় শিশুমহল (৪ থেকে ১০ বৎসরের বালক-বালিকাদের জন্য)-এর সংবাদ এবং রবীন্দ্র পাঠাগারের স্থান পরিবর্তনের সংবাদও আমরা দেখলাম, তাছাড়া দেখা গেল টেগোর সোসাইটি অব নিউইয়র্কের উদ্যোগে কৌশিক সান্যালের বাংলা নাটক 'কয়েকটি কণ্ঠস্বর'এর মঞ্চস্থ করার কথা। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে আমেরিকা-প্রবাসী বাঙালীগণ পূর্ণোদ্যমে সাগরপারে বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রচারে ব্রতী আছেন। তাঁরা বাঙালীমাত্রেরই ধন্যবাদ-ভাজন সন্দেহ নাই। পত্রিকাটি সংঘের পক্ষ থেকে রণজিতকুমার দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

কবি বিভূতি চৌধুরী স্মরণসভা :

সরোজ সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে পরিষদ ভবনে সম্প্রতি কবি-অধ্যাপক বিভূতি চৌধুরীর স্মরণে প্রধানত নবীন লেখকদের উদ্যোগে একটি আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। কবির সহপাঠী ও বন্ধু প্রখ্যাত সাহিত্যিক-সাংবাদিক দক্ষিণারঞ্জন বসু প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীবসু ভারাক্রান্ত চিত্তে বন্ধুর স্মৃতিচারণ করেন। বহু তরুণ লেখক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে কবির বিভিন্ন কবিতা পাঠ করে সুধী-মণ্ডলীকে আনন্দ দেন। ডঃ অশোককুমার দে একটি ভাষণে কবি জীবনানন্দ দাশের রচনার সঙ্গে কবি বিভূতি চৌধুরীর ভাব, ভাষা ও রচনাশৈলীর সাদৃশ্য নিয়ে আলোচনা করেন। সভার সভাপতি ডঃ অজিতকুমার ঘোষ মর্মস্পর্শী ভাষায় কবি অধ্যাপক সমালোচক ও ব্যক্তি হিসেবে বিভূতি চৌধুরীর গুণাবলীর কথা স্মরণ করেন। এই সভায় কবি বিভূতি চৌধুরীর তিনটি অপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ থেকে এগারোটি নির্বাচিত কবিতা নিয়ে 'নীল সাপ ও অন্যান্য কবিতা' নামে একটি কাব্য-সংকলন প্রকাশ করা হয়। এই সভায় বিভূতি-স্মৃতি বক্তৃতার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের বিভাগীয় প্রধান ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিভূতি-স্মৃতি বক্তৃতার প্রথম বক্তারূপে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্তও এই সভায় গৃহীত হয়।

ত্রিশ-চল্লিশের দশকের প্রতিভাবান কবি বিভূতি চৌধুরীর মৃত্যুতে বাংলা কাব্য-জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু যেটুকু তিনি দিয়ে গেছেন, তার মূল্যও কম নয়। প্রতিভার সেই স্বতঃস্ফূর্ত দানকে নানাভাবে স্মরণ ও সম্মানিত করার জন্য এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাগণ বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখেন।

মফঃস্বলের দৈনিক সংবাদপত্র :

রাজধানী বা বড়ো বড়ো শহর থেকে যে-সব সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় সে-সব সংবাদপত্রের বেশীর ভাগ স্থানই দখল করে থাকে আন্তর্জাতিক তথা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। ফলে দেখা যায় জেলা বা মহকুমা স্তরের যেসমস্ত সংবাদ, তা এই সব সংবাদপত্রে কর্তৃপক্ষের ইচ্ছে থাকলেও স্থানাভাবে পরিবেশন করা সম্ভব হয় না। অথচ যে কোনো দেশ, বিশেষ করে আমাদের দেশে এখনও জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ গ্রাম ও ছোট শহরেই বাস করে থাকেন। কাজেই ছোটো শহর বা গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের নানা সমস্যার কথার যথোচিত প্রচার একটা সমস্যা হয়ে ওঠে। তার ফলে তাদের সমস্যা কদাচিৎ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। প্রধানত এই সমস্ত সমস্যার দূরীকরণের জন্য আজকের পৃথিবীতে অনেক দেশে জেলা, এমনকি মহকুমা স্তরেও দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশের বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। পশ্চিমবাংলায় এ-ধরনের প্রথম উদ্যোগ 'দৈনিক চন্দ্রভাগা' সম্প্রতি তার প্রকাশের সহস্রতম দিবস পূর্ণ করলো। এই সংবাদপত্রটি প্রকাশ করা হয় [illegible]পুর থেকে। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন প্রবীণ সাংবাদিক ও সমাজসেবী দাশরথি তা। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন : 'মফঃস্বল থেকে প্রকাশিত ছোট ছোট পত্রিকাগুলিকে ছোট ছোট লোকদের ছোট ছোট সমস্যার কথা বড়ো করে তুলে ধরতে হবে।' এই অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম উপমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় ছোট ছোট সংবাদ ও সাময়িক পত্রগুলি সাক্ষরতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হক—এই অভিমত ব্যক্ত করেন। বিভিন্ন বক্তা 'দৈনিক চন্দ্রভাগা'র স্রষ্টা মনোহর সিং-এর দৃষ্টিভঙ্গী ও উদ্যমের ভূয়সী প্রশংসা করে বক্তৃতা করেন।

লাইব্রেরীয়ানদের জাতীয় সংস্থা :

সম্প্রতি 'ইনস্টিটিউট অব লাইব্রেরীয়ান্স' নামে একটি জাতীয় সংস্থা কলকাতায় সংগঠিত হয়েছে। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ সুধী ব্যক্তিগণ এই সংস্থা গঠনের ব্যাপারে নানাভাবে পরামর্শ ও উৎসাহ দিচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ-

শংকর রায় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেন এই সংস্থার পৃষ্ঠপোষক হতে সম্মত হয়েছেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে উপযুক্ত ব্যক্তিদের শিক্ষিত করে তুলবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংস্কৃত কলেজে কিছুটা স্থান দিয়েছেন এবং গত ৩ জুন থেকে নিয়মিত ক্লাশ শুরু হয়েছে। এই সংস্থা তাঁদের নিজস্ব মুখপত্র হিসেবে একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশের আয়োজনও করেছেন। আপাততঃ সংস্থার কর্মকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ ভবনের গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান বিভাগে।

সাহিত্যিক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা :

কল্লোল যুগের অন্যতম নায়ক সম্প্রতি পরলোকগত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতি রক্ষাকল্পে স্মৃতিরক্ষা সমিতি গত ১২ জুলাই একটি সভার আয়োজন করেছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতি ভবনের এই সভায় সাহিত্যিক মনোজ বসু সভাপতিত্ব করেন। বহু প্রবীণ তথা নবীন সাহিত্যিকের উপস্থিতিতে এই সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় : (১) পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনার একটি পূর্ণাঙ্গ সংকলন প্রকাশ করা হবে। (২) একজন নবীন সাহিত্যিককে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে একটি বার্ষিক পুরস্কার দেওয়া হবে। (৩) তাঁর নামে তাঁর শেষ বাসভবনের নিকটে একটি রাস্তার নামকরণের জন্য চেষ্টা করা হবে।

পরলোকে স্যার হ্যারি বুটেন :

কমনওয়েলথ প্রেস ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা স্যার হ্যারি বুটেন গত ৯ জুলাই ১০১ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। ১৯০৯ সালে স্যার বুটেন ইম্পিরিয়্যাল প্রেস কনফারেন্সের উদ্যোগ করেন। এই কনফারেন্সই পরে কমনওয়েলথ প্রেস ইউনিয়ন নামগ্রহণ করে। ১৯৫৯ সালে এই সংস্থার সুবর্ণজয়ন্তী প্রতিপালিত হয়েছে। দীর্ঘ ৭০ বৎসর যাবৎ স্যার বুটেন স্বদেশের বহু দৈনিক সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক পত্র-পত্রিকা পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর তিন খণ্ডে প্রকাশিত আত্মজীবনী সংবাদপত্র তথা সাংবাদিকতার ইতিহাসের একখানি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। সাংবাদিক হিসেবে স্যার বুটেন ভারতসহ কমনওয়েলথ-এর প্রায় সব দেশের সাংবাদিক সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। তাঁর মৃত্যুতে সাহিত্যিক-সাংবাদিক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ শোকপ্রকাশ করে একটি বিবৃতি দিয়ে তাঁর গুণাবলীর উল্লেখ করেন।

জাপানের সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক :

'আকাহাতা' (লাল ঝাণ্ডা) জাপানে সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা। এই পত্রিকার সম্পাদক তাদাও নিরাসাওয়া দাবী করেছেন যে, তিন বছর থেকে নব্বুই বছর পর্যন্ত সমস্ত বয়সের পাঠকই তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত পত্রিকাটি পছন্দ করে। এই পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগে তিনজন সহকারী সম্পাদক পৃথিবীর সমস্ত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক সাপ্তাহিক তথা মাসিক পত্রিকা নিয়মিত লক্ষ্য করেন এবং সে-সব থেকে নানা তথ্য সংকলন করে পাঠকসমাজে পরিবেশন করেন। ১৯৫৯ সালে এই পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম সংখ্যা ছাপা হয়েছিল তিশ হাজার। আর বর্তমানে এর প্রচার-সংখ্যা ২২,০০০০০।

পত্রিকাটি জাপানের কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত হলেও, দেশের প্রায় সমস্ত শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী এটিকে নানা তথ্যমূলক ও সৃজনধর্মী রচনায় সমৃদ্ধ করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট পত্রিকাটির দৈনিক প্রচার সংখ্যা মাত্র ৫০,০০০ কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে প্রধানতঃ ম্যাগাজিন বিভাগের আকর্ষণেই এর রবিবাসরীয় সংখ্যাটি লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রীত হয়ে থাকে। এই পত্রিকার রবিবাসরীয় সংখ্যার নিয়মিত ফীচারগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : রম্যরচনা—সচিত্র হাস্য-কৌতুক, নতুন নতুন বইয়ের কথা চিত্র ও মঞ্চ টেলিভিশন খেলাধুলো, শিশু কিশোর ও বৃদ্ধ সম্পর্কে বিচিত্র সব সংবাদ, কৃষিকথা শিকার বিশেষ করে মৎস্যশিকার ট্যুরিস্ট ও ভ্রমণ সম্পর্কে রচনা। আর একটি বিশেষ ফীচার হ

...সংখ্যাতেই দেখা যায় তা হলো ...লেখকদের রচনা। জাপান পৃথিবীর ...উন্নত দেশগুলির অন্যতম। ...সাহিত্য সম্পর্কে উৎসাহী বহু ...বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় সব ...জাপান ভ্রমণে গিয়ে থাকেন। ...দের তাদাও অনুরোধ জানান তাঁর ...বিভাগের জন্য কিছু না কিছু ...র জন্য। আমাদের দেশ তথা সব ...দেশের পত্রিকা পরিচালকবর্গের পক্ষেই ব্যাপারটা ভাববার মতো সন্দেহ নাই। যে সাংস্কৃতিক সমন্বয় তথা বিনিময়ের কথা আমরা সর্বক্ষণ মুখে বলে থাকি তার দ্রুততম রূপায়ণের জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করাই বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়। পাঁচ-দশ কি পঞ্চাশ বছরের পুরনো সাহিত্য অনুবাদ করে প্রচার করার চাইতে একেবারে টাটকা-টাটকা বিদেশী বুদ্ধি-জীবিগণের ধ্যানধারণার সঙ্গে পরিচয় লাভের সুযোগ পেলে পাঠকসমাজ উপকৃত হবেন সন্দেহ নাই।

—জরৎকারু

মাইকেল মধুসূদন মহামেলা

ধ্রুপদী সাহিত্য সংস্থা মহাকবি মধুসূদন দত্তের জন্মের সার্ধশত বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে এক মহামেলার আয়োজন করা হয়েছে। কলকাতা এবং মফস্বলের বিভিন্ন স্থানে এই মহামেলা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে। মধুসূদনের জীবনের বিভিন্ন পর্ব নিয়ে এই মহামেলায় আলোচনা করা হবে এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিক শিল্পীদের সমাবেশে মধু কবির কতকগুলি নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা হবে। মেঘনাদ বধ কাব্যের নাট্যরূপও পরিবেশিত করা হবে। মহামেলার প্রস্তাবিত কমিটিতে সভাপতি হয়েছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। সহ-সভাপতিদের মধ্যে আছেন অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রবোধ সান্যাল বিশু মুখোপাধ্যায় মণীন্দ্র রায় ভবানী মুখোপাধ্যায় সন্তোষকুমার ঘোষ সাগরময় ঘোষ এবং সুপ্রিয় সরকার। সুশীল রায় হলেন মহামেলার সম্পাদক।

সমব্যথীর সাহিত্যবাসর: হাওড়া রামরাজাতলায় সমব্যথী সাহিত্য পত্রিকার উদ্যোগে সাহিত্য বাসর অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে আলোচনার বিষয় ছিল 'আধুনিক কবিতার বাস্তবমুখীতা।' আলোচনা ও স্বরচিত সাহিত্য পাঠে অংশ গ্রহণ করেন হাওড়ার তরুণ কবিরা। হাওড়ার তরুণ কবিদের জন্য একটি নির্দিষ্ট কবিতার মঞ্চ শেঠবাড়ী প্রাঙ্গণে নির্ধারিত হয়।

প্রথম প্রেম দ্বিতীয় পুরুষ (উপন্যাস)। সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ। আধুনিক পুস্তক প্রকাশন ৪০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট কলকাতা-৯। ছয় টাকা।

কাহিনীটি প্রধানত তিনটি সংসারের মধ্যে আবর্তিত—রমানাথ - সুলতা - সর্বাণী কল্যাণ দত্ত মিঃ বোস—হৈমন্তী বিজন ঘোষ এবং বেকার সেন্টু, সেন্টুর বাবা-মা প্রসঙ্গ। বিজন ঘোষ হৈমন্তীর পূর্ব প্রেমিক সুমি এদেরই সন্তান। হৈমন্তী পার্টিতে যায় জীবন তার উৎকেন্দ্রিক। রমানাথ ব্যবসায় উন্নতির জন্য স্ত্রী সুলতাকে পার্টিতে নিয়ে যেতে চায়। সর্বাণী তাদের কন্যা। হৈমন্তীর ছেলে পরিতোষের সঙ্গে সুলতার মেয়ে সর্বাণীর বিয়ে দিতে চায় রমানাথ-সুলতা। কিন্তু সর্বাণী ভালবাসে বেকার সেন্টুকে। তাদের প্রথম প্রেম তা-ই। সুলতার প্রথম প্রেমিক অধ্যাপক কল্যাণ দত্ত হৈমন্তীর প্রথম প্রেমিক বিজন ঘোষ সর্বাণীর প্রথম প্রেমিক সেন্টু কিন্তু এদের জীবনে আসে দ্বিতীয় পুরুষ একমাত্র সর্বাণী ছাড়া। উপন্যাসের শেষদিকে কল্যাণ দত্তকে নিয়ে রমানাথের স্ত্রীর প্রতি সংশয় অন্তর্জ্বালা সংশয়ের নিরসন হৈমন্তী মিঃ বোসের চরিত্র সংঘাত তীব্র হয়েছে কল্যাণ দত্ত শেষে বাইরে চলে যায় এদের সান্নিধ্য ছেড়ে। কাহিনীটি বেশ সুচিন্তিতভাবে গ্রথিত। চরিত্রগুলি সুচিত্রিত। লেখক নিটোল গল্প কথা ও চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক ঘাত-প্রতিঘাত দেখাতে গিয়ে সার্থক হয়েছেন। উপন্যাসটি সাধারণ পাঠকদের ধরে রাখবে।

মহামিলন (উপন্যাস)। যোগেশচন্দ্র মজুমদার নিউ বীণাপাণি লাইব্রেরী কাঁথি মেদিনীপুর। ছয় টাকা পঁচিশ পয়সা।

উনিশ শ পঞ্চাশ সালের পূর্ববঙ্গের গোবিন্দপুর গ্রাম। সে গ্রামে বর্ধিষ্ণু পরিবারের মধ্যে গোস্বামীরাই প্রধান।

জাতির অধঃপতনের মূলে যত সব সাহিত্যিকরা. এদের হাত থেকে জাতির নৈতিক স্বাস্থ্যরক্ষার তাগিদে যে মারাত্মক অস্ত্রটির আবির্ভাব, তার নাম ক্যাম্পবেল আইন। সমাজ আর রাষ্ট্র কর্ণধারদের মতে সাহিত্যে যৌনানুভূতির প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ না করলে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আর ব্যাপক শিল্পোৎপাদন ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা। ফলে অগণিত কালজয়ী লেখক আর কবিরাও একদিন রাষ্ট্রের নীতিগত ভ্রূকুটি থেকে রেহাই পাননি।

আজও এই শাসন এতটা জোরালো হোক বা না হোক ভালো বই আর মন্দ বই সম্পর্কে অনেক স্তুতি আর অনেক গর্জন-বর্ষণ কানে আসে। কিন্তু আশ্চর্য ভালো বই আর মন্দ বইয়ের নিশ্চিত সংজ্ঞা আজ পর্যন্ত কেউ দিয়ে উঠতে পারেনি।

সেই সুদূরকাল থেকে মোটামুটি একটা হিসেব করলে দেখা যাবে প্রায় পাঁচ হাজার বই রাজরোষ, রাষ্ট্ররোষ অথবা সমাজ রোষে নিগৃহীত হয়েছে। সেই সব বই সমকালীন বিচারে যে নিছক মন্দ বই তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু পরবর্তীকালের বিচারে এগুলোর থেকেই নোবেল প্রাইজ পেয়েছে এমন নজির বিরল নয়। আর সাহিত্য বিচারে প্রভূত সম্মান পেয়েছে এমন সংখ্যাও প্রচুর।

কালের বিচারের একটি শাশ্বত-কালের হৃদয়বিদারক নজির এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ইংলণ্ডে সর্বপ্রথম একখানি বই বাজেয়াপ্ত এবং অগ্নিদাহ করা হয়েছিল ১৫২৫-২৬ সালে।

ছ'হাজার বইয়ের ছাপা ফর্মা প্রকাশ্যে আগুনে পুড়িয়েছিলেন চার্চের পদস্থজনেরা। কিন্তু আরব্ধ কাজ সুসম্পূর্ণ করার ব্যাপারে এরও ঢের আগে থেকে অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে। লেখক ইংলণ্ডে নিরাপদে বসে তাঁর এই বিপুল সৃষ্টি সম্পূর্ণ করতে পারেননি। কারণ সেই বইয়ের গোড়ার কিছু অংশ তখন বাইরে থেকে ছাপা হয়ে এসেছে। আর সেটুকু পড়েই ক্রোধান্ধ ধর্মযাজকরা সেটাকে নারকীয় ব্যভিচার আর মারাত্মক পণ্যসামগ্রী বলে ঘোষণা করেছিলেন। ওদিকে সম্রাট অষ্টম হেনরীও তেমনি ক্রুদ্ধ লেখকের ওপর।

হাওয়া বুঝে লেখক আগেই ইংলণ্ড ছেড়ে পালালেন। কিন্তু আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করার মতো নিরাপদ জায়গা

পাড়ার সেরা ব্যক্তি বড় মিঞা। বড় মিঞার এক ছেলে আবদুল মেয়ে ছাবেদা। বিপিন গোস্বামীর সঙ্গে বড় মিঞার অনেক দিনের বন্ধুত্ব। কিন্তু দাঙ্গার সময় আবদুল তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু শংকর অর্থাৎ বিপিন গোস্বামীর ছেলেকে হত্যা করতে যায় বাধা দেয় ছাবেদা—কারণ সে ভালবাসে শংকরকে। এই নিয়ে কাহিনীর ঘাত-প্রতিঘাত। অনেক বাধা সরিয়ে শেষে ছাবেদা শংকর মিলিত হয়। উভয় পরিবার তা মেনে নেয়। কাহিনীই বলা হয়েছে কিন্তু শিল্পগুণ অনেক কম। অতি-কথন মেলোড্রামা সংলাপ ও গদ্যে আড়ষ্টতা বক্তৃতা ধর্মিতা এর উপন্যাসগুণ নষ্ট করেছে।

অবিচ্ছেদ্য (উপন্যাস)। ভোলানাথ শীল। সারবান ৪১ পরাশর রোড, কলকাতা ২৯। তিন টাকা।

ভোলানাথ শীল তাঁর 'অবিচ্ছেদ্য' উপন্যাসটিতে কাব্যিক ভাষায় রতন-রত্না-প্রদীপ - সুখেন - শ্যামলদা—এই রকম কয়েকটি বিশেষ মানসিকতায় জীবন্ত চরিত্রের চিত্ররূপ উপহার দিয়েছেন। রত্নার সঙ্গে প্রদীপের 'কামহীন ভালবাসা রূপান্তরিত হয়েছিল ভাইবোনে।' প্রদীপ সুখেনের বন্ধু, রতনও প্রদীপের বন্ধু। রতনের সঙ্গে রত্নার প্রেম শেষে রত্না হয় অন্তঃসত্ত্বা কিন্তু তার এই অবস্থা যখন তখন রতন অনেক দূরে আসামে শায়িত। ভাল রোমান্টিক সিচুয়েশান তৈরী করে কবিত্বপূর্ণ ভাষা কোথাও বা সোজাসুজি কবিতা দিয়ে উপন্যাসের কাহিনী ঘটনা চরিত্রচিত্র এমনকি সিদ্ধান্ত এঁকেছেন নতুন ঔপন্যাসিক ভোলানাথ শীল। উপন্যাসের আঙ্গিকে কিছু পরীক্ষা করতে চেষ্টা করেছেন—স্মৃতি অতীত বর্তমান, জীবনযৌবন ভাবনা ইত্যাদি বিষয়কে ভিত্তি করে। সম্পূর্ণ সার্থক হতে না পারলেও লেখকের প্রয়াস কিছুটা মানতে হয়। গদ্যে সাধু প্রয়োগ বর্জনীয়। সংলাপে প্রচুর আড়ষ্টতা আছে। এসব সত্ত্বেও 'অবিচ্ছেদ্য' উপন্যাসটি লেখক ভোলানাথ শীলকে ভবিষ্যৎ উপন্যাসধারায় নবসৃষ্টির প্রতিশ্রুতি দানে সমর্থ।

প্রেয়সী পদ্মা (উপন্যাস)। শৈবাল চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক : জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। এল।১২২ নেতাজী কলোনী, কলকাতা ৫০। চার টাকা।

যে মাঝি নিজেকে বলে জাহাজ কোম্পানীর মাঝি যাকে লোকে জানে ঘাটমাঝি বলে সেই সনাতন মাঝির জীবনকাহিনী শুনিয়েছেন শৈবাল চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'প্রেয়সী পদ্মা' উপন্যাসে। সনাতনের কাহিনীসূত্রেই আসে স্টেশন-মাস্টার মনসুর সাহেব, মৌলবী সাহেবের [illegible] আন্দোলনের পদ্মা পলায়ন সংসার দ্বিতীয় বিবাহের কাহিনী মেয়ে আব্বাসের জন্ম [illegible] মৃত্যু ইত্যাদি ঘটনা। এরই সঙ্গে [illegible] দীপংকর বিবাহের কাহিনী [illegible] কালীকিশোর [illegible] ইত্যাদি [illegible] গড়ে ওঠে। কাহিনী [illegible] জীবনকাল রচিত। লেখকের [illegible] কাহিনীগঠন ক্ষমতা চরিত্র চিত্রণরীতি মোটামুটি প্রশংসনীয়।

লাল মাটি নীল অমল। শান্তি সিংহ। [illegible] প্রকাশনী। পরিবেশক—[illegible] সাহিত্য ৩৩ কলেজ রো কলকাতা-৯। দাম—সাড়ে তিন টাকা।

কবিতা আজকাল লিখছেন অনেকেই শুধু কলকাতায় নয় [illegible] থেকেও [illegible] প্রতিটি [illegible] এক বিরাট কবিবাহিনী এক [illegible] সমাবেশ [illegible]। তবে কি সব [illegible] কবিতা হয়ে ওঠে? সকলেই কি সর্বজনীন হন? না। [illegible] মধ্যে [illegible] ও আত্মপ্রকাশ [illegible] [illegible] মধ্যে একজন—'লাল মাটি নীল [illegible]' কবি শান্তি সিংহ তাঁর [illegible] [illegible] নিঃসন্দেহে তাঁকে বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল করেছে।

[illegible] [illegible] কবিতাগুলি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কবিতায় [illegible] কবিতাগুলি [illegible] সহজ [illegible] [illegible] সার্থক [illegible] শান্তি সিংহ পাঠক [illegible] [illegible] নেই। তাঁর কাব্যগ্রন্থ পাঠকমহলে সমাদৃত হোক।

কোথায়? চার্চের শক্তি ছুটেছে তাঁর বিরুদ্ধে, রাজশক্তিও। চার্চের মতে ভগবানের নামের আবরণে ব্যভিচারের অনুশীলন চলেছে ওই বইয়ে। আর রাজা অষ্টম হেনরীর বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে রয়েছে নিজের ব্যক্তিগত দুর্বলতা—ধর্মের আবরণে এই বিচ্ছেদেরই ব্যাপক মোহড়া দেখছেন তিনি গ্রন্থটিতে। লেখক যেন ব্যক্তিগতভাবে তাঁকেই ব্যঙ্গ-বিদ্ধ করে চলেছেন।

অতএব দস্যু-তাড়িতের মতো বহু জায়গায় প্রাণ নিয়ে পালিয়ে লেখক তাঁর কাজ শেষ করলেন। পূর্ণ গ্রন্থটি আত্মপ্রকাশ করল। আর তারপর সেই বই পোড়ানোর মহাড়ম্বরে সমগ্র দেশের শান্তি নড়েচড়ে উঠল। চার্চের হুকুম অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হোক লেখককে। প্রাণভয়ে লেখক এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছুটছেন। কিন্তু সর্বত্রই তো অসংস্কার।

শেষে ধরা পড়লেন তিনি।

বেলজিয়ামে তাঁকে আটক করা হল। তারপর রচনায় ধর্মের প্রতি অবমাননাবোধ করে এবং জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করা হল তাঁকে।

কিন্তু ততদিনে পঞ্চাশ হাজারের ওপর গ্রন্থ ছাপা হয়ে গেছে।

ভাগ্যহত সেই লেখকের নাম উইলিয়াম টিনডেল।

আর তাঁর সেই বইয়ের নাম?

বাইবেল।

বর্তমানে ইংরেজি বাইবেলের অনুমোদিত গ্রন্থটি তাঁরই সেই অভূতপূর্ব অনুবাদের নির্ভরে রচিত।

সমগ্র মানবজাতি আজ ঋণী ওই মানুষটির কাছে। ইংলিশ রিফরমেশন অধ্যায়ে সেই উইলিয়াম টিনডেল আজ এক অনন্য শক্তি হিসেবে স্বীকৃত। সেই কাল আর সেই দিনের বিচারের কথা চিন্তা করলে আমাদের মনে রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদকরাও কি অব্যাহতি পেতেন?

থাক যত নজিরই দেখাই, ভালো বই আর মন্দ বইয়ের বিচার সর্বকালে আর সর্বদেশে [illegible] আছে। ভালো বই নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই, সমস্যা তথাকথিত মন্দ বই নিয়ে। কিন্তু একখানা মন্দ বই পড়ার আগ্রহ এবং পড়ার সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মধ্যে ঢুকলে সাহিত্যের বহু সমালোচকও হয়তো বা সাঁতার কেটে হাবুডুবু খাবেন।

সেটা পরের প্রসঙ্গ।

—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

বই\সংকলন\পত্রিকা

[illegible] মেলা। [illegible]শেখর মজুমদার। [illegible] প্রকাশক। ৫২ [illegible] পার্ক। কোলকাতা [illegible]। দাম তিন টাকা।

[illegible]শেখর মজুমদারের কাব্যগ্রন্থ 'স্বপ্ন-[illegible] মেলা' একই ছাঁদে বিন্যস্ত মৌলিক [illegible] ছন্দে হিল্লোল ললিত কবিতার [illegible] হৃদয়ে লেখায় স্মরণযোগ্য কিছুই তো [illegible] নেই। তবু মিষ্টি প্রেমে আটা একই [illegible] সুমধুর!—এ রকম বলে সমা-লোচনা সেরে দেওয়া যায়। কিন্তু তাতে [illegible] নিষ্ঠার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনে ত্রুটি থেকে যায়। তাই বলতে [illegible] নেই রবীন্দ্রানুসারী এই কবির লেখার [illegible] আমিই হেন। আমাকে বেষ্টন করে [illegible]। মধুর গৃহিণীপনা বড়ো প্রয়ো-[illegible]। কিম্বা নিম সুপুষ্ট নারকেল। শুকনো [illegible] ভালো। আমার বোগেনভিলা তিনরঙা [illegible] সব গাছে গাছে ভোর দুপুর [illegible] রেখে গেছে—র মতো নিটোল কবি-[illegible]ংশেরও অভাব নেই। ছাপা প্রশংসনীয়। [illegible]ও।

[illegible]কৃষ্ণ ভজনাঞ্জলি (গীত সংকলন)। ধ্রুব চৌধুরী ও শম্ভুনাথ ঘোষ। [illegible] প্রকাশনী ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলকাতা-১২। ছয় টাকা।

বাংলা ভাষায় খণ্ড সংগীত ব্রহ্মসংগীত [illegible] কীর্তন বৈষ্ণবদের রাধাকৃষ্ণ লীলা [illegible] গান ইত্যাদি ইতিপূর্বে পেয়েছি। [illegible]কৃষ্ণ স্বতন্ত্র একটি স্কুল গড়েছিলেন [illegible] সাধনার বিশেষ এক তাৎপর্যপূর্ণ [illegible]খ্যা করে। রামকৃষ্ণ স্বয়ং যেন এক [illegible] বিগ্রহ। সেই রামকৃষ্ণকে গুরুরূপে [illegible] করে সম্প্রতি রামকৃষ্ণ ভজনের [illegible]গীতরূপের সংগ্রহ আমাদের হাতে [illegible]সেছে। গ্রন্থটি ভক্তিমূলক রসাস্বাদক [illegible] বন্দনা সহ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ স্নেহ-[illegible] মা সারদা দেবী ও স্বামীজী বিষয়ক [illegible] রাগ-রাগিণী সমন্বিত ভজন সংগীত [illegible]। এতে বিস্তৃত স্বরলিপিগুলি রামকৃষ্ণ [illegible]কদের অত্যন্ত মূল্যবান। সাধন সংগীত [illegible] গ্রন্থটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ছায়ানট রামকেলী ভৈরবী মুলতানী বৃন্দাবনী সারং ইত্যাদি রাগে ও চৌতাল তেওড়া কাহারবা ইত্যাদি তালে গেয় আলোচ্য ভজন গানগুলি বস্তুত উচ্চাঙ্গের।

সনাতন নাম সাধনা। নরেশ ব্রহ্মচারী। শ্রীশ্রীকুলদানন্দ তাপস আশ্রম শৈল-দ্বীপ কহেল গ্রাম ভাগলপুর (বিহার)। তিন টাকা।

গঙ্গার বুকে শৈলদ্বীপে অজপা নাম সাধকদের তপস্যায় সুবিধার্থে 'সনাতন নাম সাধনা' প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থটির হিন্দী অনুবাদও প্রকাশিত হয়ে সাধকদের মধ্যে যথেষ্ট সমাদর পেয়েছে। কিছু বৈদিক শ্রুতি বচন উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যা করে অনন্ত ঐশ্বর্যশালী অনন্ত ভগবান-নামের সংকেত এ গ্রন্থে আছে। শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ কুলদানন্দের নাম সাধনার 'এমন সম্যক পরিচয় গ্রন্থ' বাংগালী সাধকদের কাছে দুষ্প্রাপ্য। অনু-রাগী ভক্ত সাধকরা এ গ্রন্থে উপকৃত হবেন।

অনুভব। সম্পাদক জয়ন্ত কুমার। ৩৩ চিত্ত-রঞ্জন এভিনিউ। কোলকাতা—১২। দাম ষাট পয়সা।

নবপর্যায়ে প্রকাশিত কবিতার মাসিক পত্রিকা 'অনুভব'-এর প্রথম সংখ্যা হাতে পেয়ে ভালো লাগল। কেন কবিতা শীর্ষক প্রাক-কথনটি বিতর্কিত হলেও বলিষ্ঠ। রাম বসুর স্মৃতিচারণার মধ্যেও কিছু কবিতা সম্পর্কিত মূল্যবান বক্তব্য আছে। তাঁর কবিতাটিও ভালো লাগল। আরও দুটি ভালো কবিতা পড়া গেল পত্রিকাটিতে। সেগুলি লিখেছেন গণেশ বসু এবং পবিত্র মুখোপাধ্যায়। এ ছাড়া রয়েছে গৌরাঙ্গ ভৌমিকের 'নদীর সময়' এবং নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' নামে কাব্যগ্রন্থ দুটি সম্পর্কে কিছু সুচিন্তিত মন্তব্য। প্রচ্ছদ সুন্দর।

প্রয়াস। সম্পাদক—বাসুদেব সরকার ও আলোক আচার্য। ৫৮ বাজে শিবপুর রোড হাওড়া। এক টাকা।

ত্রৈমাসিক 'প্রয়াস' পত্রিকার প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংকলন সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। কবিতা পত্রিকাটিতে লিখেছেন সিকদার আমিনুল হক আসাদুজ্জামান হেলাল হাফিজ শাহাদত হোসেন বুলবুল আহমেদ হুমায়ুন সৈয়দ আহমেদ তারেক রবিউল হুসাইন শুভ্রাংশু দেবনাথ গৌতম চৌধুরী অরূপ বসু ইত্যাদি। পত্রিকাটির কবিতাগুলি যথার্থ অর্থে উল্লেখযোগ্য।

কবিতা। সম্পাদক শাহেদ মুস্তাফা জাগির, ৩৬ স্বামী বাগ। ঢাকা।

[illegible] অমিত্রাক্ষর কবিতাগুচ্ছ কবিতার কয়েকটি কবিতা ভালো লাগল। লেখা নির্বাচনের দিকে আরও যত্ন দেওয়া প্রয়োজন।

শ্রীলেখা। গীতময় রায়। শ্যাম বাঁধ। বার্নপুর বর্ধমান পঞ্চাশ পয়সা।

অধিকাংশ লেখাই অত্যন্ত দুর্বল। লেখা নির্বাচনের দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার। ছাপাও পরিচ্ছন্ন নয়। সেদিকেও লক্ষ্য দিতে হবে। ভবিষ্যৎ সংখ্যাটি উন্নত হবে আশা করি।

অভিমান। সম্পাদক—দেবাশীষ মজুমদার ও গৌতম চৌধুরী। ২৬।৩১।২ কৈপুকুর লেন হাওড়া। এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

গত জুন মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক বিরাট কবি সম্মেলন উপলক্ষে 'অভিমান' প্রথম সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। লেখক সূচীর প্রবীণ ও নবীন কবিদের মধ্যে আছেন সর্বশ্রী হরপ্রসাদ মিত্র শিবশম্ভু পাল বীরেন্দ্র দত্ত ধূর্জটি চন্দ পলাশ মিত্র অজয় সেন শিবেন চট্টোপাধ্যায় অমেতাভ চক্রবর্তী শ্যামা দে সুচেতা মিত্র কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায় গৌতম চৌধুরী দেবাশীষ [illegible]মদার রাম বসু গৌরাংগ ভৌমিক [illegible] আচার্য অরুন্ধতী সেনগুপ্ত [illegible] রায় ইত্যাদি। পত্রিকাটির সম্পাদনা সুচিন্তিত।

কণ্ঠস্বর। (রবীন্দ্রজয়ন্তী সংখ্যা) সম্পাদনা সত্যরঞ্জন বিশ্বাস। ২ টেমার লেন। কোলকাতা। পঞ্চাশ পয়সা।

পঞ্চাশের চোখে সত্তরের কবিতা আন্দোলন প্রসঙ্গে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ এবং সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান বক্তব্যগুলি ভালো লাগল। ছাপা পরিচ্ছন্ন।

ঝিলিক। সম্পাদনা শিল্পীমন। চিত্তরঞ্জন পার্ক। নিউ দিল্লী।

এই অভিনব পত্রিকাটি প্রবাসী বাঙালীদের সাহিত্য অনুরাগ বহন করছে। প্রচুর পরিশ্রমে কিছু অংশ সাইক্লোস্টাইল কিছু বাংলা টাইপ করে পত্রিকাটি সাজানো। লিখেছেন, ইন্দু ঘোষ অমলা-প্রসন্ন গোস্বামী প্রবোধ ঘোষ ফণী বসু এবং আরও অনেকে।

পাতাড়েশ্বর। (নজরুল সংখ্যা) গোলাম নবী কাদেরী। [illegible]জপুর। বীরভূম। কুড়ি পয়সা।

গীতিকার নজরুল প্রেমিক কবি নজরুল' প্রবন্ধ দুটি ভালো লেগেছে।

(৫০)

স্যালি হিগিনস নিচে আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। ছোটবাবুকে সবাই মিলে ডাকাডাকি করছে। ছোটবাবু দরজা খুলছে না। দরজা ভাঙার আগে সবাই এই যেমন ডেবিড এনজিন সারেঙ বংকু জব্বার বার বার বলেছে ছোট দরজা খোল। তোর কি হয়েছে। এভাবে তুই শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়লি। ছোটবাবু কোনো জবাব দিচ্ছে না। স্যালি হিগিনস এক মুহূর্ত এখন সময় নষ্ট করতে পারেন না। এনজিন-সারেঙকে শেষ পর্যন্ত ছোটবাবুর দরজায় পাহারা রেখে ওপরে উঠে গেছেন। সব অফিসারসদের ডেকে পাঠিয়েছেন। সবাই এলে তিনি সাদা কাগজে পেনসিলে প্রথম বড় বড় তিনটে দাগ কেটে ফেললেন। যেহেতু সব চার্ট, ওসেনোগ্রাফি সংক্রান্ত বই লগবুক সেকসটান চার্ট-রুমে থাকত অর্থাৎ জাহাজ চালাবার পক্ষে যা কিছু প্রয়োজনীয় সব এখন সমুদ্রগর্ভে—তিনি কিছুমাত্র বিচলিত বোধ না করে খুব সহজভাবে দাগ কেটে জাহাজের অবস্থান মোটামুটি নির্ণয়ের চেষ্টা করার সময় বললেন আপনারা বুঝতে পারছেন আমরা লয়েলটি দ্বীপের কাছাকাছি কোথাও আছি। জাহাজটা সম্ভবত স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। এবং সম্ভবত দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতে জাহাজ ড্রিফটিং হচ্ছে। সামোয়া থেকে পোর্ট-মেলবোর্নের দূরত্ব ধরুন প্রায় দু হাজার তিনশ বিশ মাইলের মতো। জাহাজ পাঁচ দিন রান করেছে। সুতরাং অস্ট্রেলিয়ার উপকূল থেকে প্রায় বারোশো মাইলের দূরত্বে রয়েছি ধরে নিতে পারি। ঝড়ে যদি সাউথ ইস্ট ইস্টে কিছু এগিয়ে যাই দূরত্ব ধরে নিতে পারি সামান্য বেড়ে গেছে। আপনারা কি বলেন?

চিফ-মেট বলল—স্যার, কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

—কিছু না বুঝলে এ সময় চিফ-মেট আমাদের চলবে না। যখন আমরা বুঝতে পারছি জাহাজ থেকে নেমে পড়া বোকামি হবে তুমি ডেবিড কি বুঝছ! সহসা কথা শেষ না করে তিনি ডেভিডকে প্রশ্ন করলেন।

ডেবিড বলল—মাথা স্যার ঠিক নেই। মাথায় কিছু আসছে না।

স্যালি হিগিনস বললেন—মানুষকে এ সময়ে সবচেয়ে বেশি শক্ত থাকতে হয়। আচ্ছা ছোটবাবুটা কি। ওকে আমি ভেবেছিলাম এ সময়ে আমাদের বেশি কাজে আসবে। থার্ড তুমি সব দেখছ ত?

থার্ড মেট ঝুঁকে বলল—হ্যাঁ। শেষে বলতে চাইল হারামজাদা তুমি তবে জানতে সব।

স্যালি হিগিনস দরজার বাইরে একবার ঝুঁকে কি দেখলেন. অর্থাৎ জাহাজে কাজ-কর্ম ঠিক হচ্ছে কিনা কারণ এ-সময়ে সবাইকে সবচেয়ে বেশি কাজ না দিয়ে রাখলে সবার অবস্থা ছোটবাবুর মতো হয়ে যাবে।

তখন ডেক-কসপ বড় বড় সব রঙের টব খালি করে দিচ্ছিল আর মাঝে মাঝে ইনসে আল্লা বলছিল কাজ করতে করতে সে সোজা ডেকে উঠে নমাজের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকল স্যালি হিগিনস ওপর থেকে চিৎকার করে উঠলেন হাই। কি হচ্ছে। কাজ কাজ। ঈশ্বরকে ডাকার অনেক সময় পাবে। স্টুয়ার্টকে ডাকো ডেবিড।

স্টুয়ার্ট এলে তিনি গম্ভীর গলায় বললেন—সব বের করে দিচ্ছ তো?

স্টুয়ার্ট সালাম জানিয়ে বলল—হ্যাঁ স্যার। হ্যাম মটন বিফ টার্কি যা কিছু স্টক আছে সব তুলে দিয়েছি ওপরে।

হিগিনস বললেন—ক্যাবেজ কতটা আছে?

—স্যার স্টক বুকটা নিয়ে আসছি।

—ননসেন্স! ভয়, আরে এখন তোমাকে আমি স্টক মেলাতে বলছি না। যা কিছু খাবার আছে এক ফোটা নষ্ট হলে জাহাজ থেকে ফেলে দেব বললাম।

—ক্যাবেজ কি হবে স্যার।

—তুলে দাও ওপরে কেটে সব শুকোতে দাও। তখন তিন নম্বর মিস্ত্রি ছুটে এল। বলল—চারটা জায়গা ফাটা হয়ে যাবে মনে হয়।

—কোথায় কোথায় হয়েছে।

—দুটো ফোর মাস্টের দু পাশে আর দুটো মেন মাস্টের দু পাশে।

—বাড়াতে পারছ না।

—আর সব তো কাঠের স্যার। আগুন জ্বললে কাঠের ডেক পুড়ে যে পারে।

—বোট-ডেকে বয় কেবিনের পাশে এ জায়গা করতে পার।

একটা সে মস্ত ভুল করে মতো বলল—তা স্যার ঠিক বলেছে ভাণ্ডারীদের বল যা বিফ আর মটন যতটা পারে যেন বয়েল করে ফেলে। ঘরে তোমার কিছু রাখা আর ঠিক না। পচে যাবে সব। তারপর স্টুয়ার্টে দিকে তাকিয়ে বললেন—এক টুকরো খা নষ্ট হলে তুমি মারা পড়বে স্টুয়ার্ট। এ তুমি যেতে পার। তারপর তিনি চিফ-মেট বললেন—তবে এটা আমরা বুঝতে পা স্রোতের মুখে ঘুরে না গেলে কোনো দ্বী টিপ ঠিক পেয়ে যাব। আর মনে হচ্ছে কোনো জাহাজের সঙ্গে দেখা হয়ে যা শুধু ভয় আমরা স্রোতের মুখে ঘুরে যাই। স্রোতটা যদি সাউথ ইস্ট ইস্টে নিয়ে যায় ভাগ্য আমাদের সুপ্রসন্ন হবে। চারপাশে অজস্র দ্বীপ-টিপ যাব। পাঁচ সাতশ মাইলের ভেতরই যেতে পারি। চিফ-মেট কাপ্তানের বিরুদ্ধে একটা কথা বলতে পারছে বললে যেন শোনাতো আপনার খারাপ স্যার। সমুদ্রে পাঁচ সাতশ মা চাট্টিখানি কথা। শুনে তো মনে হয় পা একটা দ্বীপ রয়েছে। আমরা দ্বীপে একেবারে নেমে যাচ্ছি! কিন্তু বুড়োর ম ওপর কথা বলার সাহস তার নেই। সমস্ত সন্ততিদের মুখ স্ত্রীর মুখ ভেসে উ ভেতরে ভেতরে পাগল হয়ে যাচ্ছে ত কথাবার্তায় কিছু হয়নি মতো থাকতে হু

সে বলল—তা স্যার পেয়ে যাব মনে হচ্ছে।

—সুতরাং খুব ঘাবড়ে যাবে না। আরে জাহাজ তো সিউল ব্যাংক। তোমাদের ক্যাপ্টেন—ভীষণ বিশ্বস্ত জাহাজ। এতগুলো জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করবে মনে হয় না।

তারপর তিনি ফের বললেন—যদি ধরো [illegible] ঘূর্ণিতে পড়ে যাই তবে আমরা [illegible] জায়গাটা দ্বীপের পাশ দিয়ে যাব। ওটা একটা অবশ্য আমার কথা। আর একটা কথা মনে রেখ, স্রোত কখনও ঠিক থাকে না। আমরা এমন সব স্রোতজালে পড়ে যেতে পারি যে দেখবে হয়তো জাহাজ যেখানে যাবার [illegible] সেখানেই চলে যাচ্ছে।

[illegible] পাক শক্ত হয়ে যাচ্ছে। পাগল! [illegible] পাল্লায় পড়া গেছে। সব জায়গায় খবরাখবর। স্রোতে আর জাহাজ কতটা ঠেলে নেবে, জাহাজ তো প্রায় স্থির দাঁড়িয়ে আছে মনে হচ্ছে যেমন কাঠের গুঁড়ি ভেসে থাকে তেমনি ভেসে আছে। একটু নড়ছে বলে তো মনে হচ্ছে না। চিফ মেট আপনিই বা কি সব কথায় সায় দিয়ে যাচ্ছেন। বলতে পারছেন না বোট দিয়ে দিন আমরা নেমে যাই। অন্তত আর কিছু না হোক বোটে আমরা অনেকটা পথ এগিয়ে যেতে পারব।

স্যালি হিগিনস ফের উপুড় হয়ে পড়লেন তিনটে দাগের ওপর। মানচিত্র তৈরি করে ফেলছেন। মে-জুন মাসে কোথায় কোন সমুদ্রে কি স্রোত, কি আবহাওয়া কোথায় উচ্চচাপ কোথায় নিম্নচাপ এবং বাতাসের প্রভাবে জাহাজ কতটা কোনদিকে ভেসে যেতে পারে মোটামুটি তার একটা হিসেব দিয়ে বললেন, যদি জাহাজ আমাদের স্রোতের মুখে পড়ে সোজা দক্ষিণে চলতে থাকে তবে নিউজিল্যান্ডের উপকূল পেয়ে যেতে পারি। ধরুন প্রায় আঠারোশ মাইলের মতো হবে।

বেজন্মার বাচ্চা হিসেব শেখাচ্ছে! ডেভিড চিৎকার করে উঠতে চাইল। তারপরই মনে হল একজন যথার্থ নাবিকের পক্ষে এত সহজে ভেঙে পড়া ঠিক না। দুর্বল মানুষের মতো সে ব্যবহার করতে পারে না। ছোটবাবু, এজন্যই তুমি এত ভেঙে পড়লে। মান মা বলা আমাদের নেই, দেশে আমাদের কেউ নেই। কেবল তুমি ফিরবার কথা ভেবে দরজা বন্ধ করে বসে আছ।

স্যালি হিগিনস বললেন, যদি কোনো [illegible] সাউথ অথবা সাউথ-[illegible] এবং [illegible] জাহাজ তবে [illegible] থেকে ক্রমে ইস্ট-সাউথ-[illegible] সোজা পূর্বমুখ [illegible] পাঁচ হাজার [illegible] পায় না। [illegible] উপকূলে জাহাজ যেতে [illegible] কাঠ হয়ে যায়। [illegible] এলেম [illegible] না পায়। [illegible] শয়তানের বাসা হয়ে যাবে।

[illegible]

এবং সবাই নেমে গেল নিচে। বোট-ডেক ধরে হাঁটার সময় ডেভিড বলল কি বুঝছেন স্যার?

—বুড়ো নিজেই একটা শয়তানের বাসা। ওর ভরসায় থাকলে সবাই মারা পড়ব। আমাদের গোপনে বসার দরকার। এবং চারপাশে সমুদ্রের নীলাভ জল আর অন্তহীন দিগন্ত দেখে সবাই কেমন হাহাকার করে উঠল। থেকে উঠে একেই বুকের রক্ত হিম হয়ে আসছে। সমুদ্র কি ভয়ঙ্কর কি যে শূন্যতা নিয়ে গ্রাস করার মতো উদ্যত হয়ে আছে। এই মানুষগুলোর ভেতর ওরা না জানি কতদিন ভেসে বেড়াবে। একটা কথা আর কেউ বলতে পারছে না। সূর্য মাথার উপর উঠে আসছে। আপন মহিমায় তেমনি কিরণ দিচ্ছে। কি শান্ত জলরাশি। ছোট ছোট সব মাছের ঝাঁক বড় চক্রাকারে সব কি ভেসে আসছে। যেন জাহাজটাতে মাংসের গন্ধ পেয়ে গেছে সমুদ্রের অতিকায় সব প্রাণীরা। সব ধেয়ে আসছে। কে বলবে মধ্যরাতে জাহাজটা ঝড়ে তার সব সামর্থ্য হারিয়েছে! মধ্যরাতে সমুদ্র শেষবারের মতো তাদের পঙ্গু করে দিয়ে গেছে। সমুদ্রের মহামহিম শান্ত জলরাশি দেখলে এখন বিশ্বাস করা যায় না তার কোনো দুঃখ অথবা ক্রোধ আছে। বরং দুরন্ত বালিকার মতো ভারি মিষ্টি হাসি হাসছে। ছোট ছোট ঢেউ-এর ভেতর এমন সব সমুদ্রের দুরন্তপনা এবং উজ্জ্বল রোদ নীলাভ জলে বর্ষার ফড়িঙের মতো উড়ে বেড়াচ্ছে।

তখন কাপ্তান বয় বলল আপনি জানেন না স্যার!

—না তো!

—ওপরে থাকেন শুনতে পাননি?

বনি বলল সত্যি ভাবতে পারিনি। ছোটবাবু এমন করবে আমি কি করে ভাবব। সে তাড়াতাড়ি প্রায় সবটা কফি একবারে গিলে ফেলার মতো গিলে ফেলল। পায়ে স্লিপার গলিয়ে সে ছুটে নেমে গেল। কেবিনে গোপনে লুকিয়ে ছিল আয়নায় মুখ দেখে বুঝেছিল কিছু নখের আঁচড় ওর মুখে স্পষ্ট। বাইরে বের হতে সংকোচ ছিল তার। এখন সে সব ভুলে নিচে নেমে গেল। এনজিন-সারেঙ দাঁড়িয়ে আছেন। সে তখনও সব কত কথা বলে যাচ্ছিল। একটা কথা বুঝতে পারছে না বনি। বনি ফিসফিস গলায় ডাকল সারেঙ! সারেঙসাব কাছে গেলে বলল ও কি বলছে?

—তা তো জানি না সাব। কি বলছে জানি না তো। মাইজলা মালোম বলল ছেলে হাউ হাউ করে কাঁদছে। কোথায় কাঁদছে! আমি তো এসে দেখছি ভেতরটাতে কেউ রা করছে না। কখন কাঁদল। কত ডাকছি বলছে কেবল আপনি যান চাচা আমার কিছু হয়নি। কিন্তু হয়নিতো দরজা বন্ধ করে বসে আছিস কেন। দরজা খোল। দেখি ভয়ে তোর মুখের কি অবস্থা! আরে বাপু নসিব তো পাল্টাতে পারবি না। বার বার বলেছিলাম সাব, ছেলে ভেবে দেখ যাবি কিনা [illegible] কত দুর্ঘটনা ঘটতে

পারে—কথা শুনল না। জেদ। জেদ ধরে চলে এল জাহাজে। আর আমার কি দুর্গতি হল সাব যদি না নিয়ে আসতাম ঘরের ছেলে ঘরে থাকত আমার তো সাত কলঙ্কের ভাগী হতে হত না।

এসব কথা ছোটবাবু শুনেছিল ভেতর থেকে। ওর চোখে জল চলে আসছে। চাচা কার সঙ্গে এতসব কথা বলছে। বরং ভালো এই যেমন সে ভেবেছিল পরিবারের এক পরিমণ্ডলের ভেতর সে মানুষ তার বাবা মা পাগল জ্যাঠামশাই ঈশম অথবা কাকিমা এবং দুর্গাপূজার সময় আমলা কামলা অথবা সেই যে বনের ভেতর কখনও হারিয়ে যাওয়া পাগল জ্যাঠামশাইকে খুঁজতে গিয়ে কখনও সোনালি বালির নদীর চরে কখনও হাতীতে চড়ে সে আর জ্যাঠামশাই পৃথিবী আর আকাশ তখন কত বড় হয়ে যেত তার কাছে কিংবা সেই অর্জুন গাছে সে যে লিখে রেখেছিল জ্যাঠামশাই আমরা হিন্দুস্থানে চলিয়া গিয়াছি, তার নিরুদ্দিষ্ট জ্যাঠামশাইর জন্য সে অর্জুন গাছে একটা বার্তা রেখে এসেছিল—সব অধিকার থেকে সহসা মনে হয়েছিল সে বঞ্চিত। একজন হত্যাকারী মানুষের জন্য যেন ওরা নয়। ছোটবাবু ভারি অসহায় বোধ করেছিল। সে কেঁদেছিল। আর যা হয় ভেতরে সেই দাহ—বনি যেন তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বলছে—ছোটবাবু তুমি খুনী আসামী। তোমার আর কোনো পরিচয় নেই।

সারেঙসাব তখনও অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। দেখুন সাব আপনি যদি পারেন। আপনাকে তো ভয় পায়। আমাকে তো আর ভয় পায় না। আমাকে মানবেই না কেন। কত বললাম ছেলে ঘাবড়ে [illegible] না। আল্লা মুবারক। ওর ওপরে তো [illegible] নাইরে। তাই বলে ভয়ে মাথা খারাপ [illegible] ফেললি! লোকে হাসাহাসি করবে না। লোকে হাসাহাসি করলে আমার সম্মান থাকে কোথায়। তুই তো কিছু বুঝলি না ছেলে, সবাই মুখে রক্ত তুলে খাটছে তুই এখন বসে থাকতে পারছিস ছেলে!

ছোটবাবু আর পারছে না। সে বসেছিল দুহাতে মুখ ঢেকে। এত কথা কার সঙ্গে বলছে চাচা! সে হঠাৎ টেনে দরজা খুলে বলল, কি হয়েছে আপনার কেবল সেই থেকে ঘ্যান ঘ্যান করছেন। সারেঙ সাব বিন্দুমাত্র বিচলিত বোধ করল না। সরল হাসি মুখে ফুটে উঠল। বলল ছোটসাব পর্যন্ত এসে গেছে। তুই চল ছেলে, ডেকে চল। সবার সঙ্গে থাকলে মন ভাল থাকবে। আমার সোনা, লক্ষ্মী মানিক চল। সঙ্গে সঙ্গে ছোটবাবুর ফের বুক বেয়ে কান্না উথলে উঠল। সে সোনা ছিল ছোটবাবু ছিল। এখন জাহাজে সে ম্যান হয়ে গেছে। সারেঙসাব পাশে দাঁড়িয়ে তখন বলছেন ছেলে তোর কি হয়েছে। এভাবে ছেলেমানুষের মতো কাঁদছিস কেন। আমরা সবাই দেখবি বাড়ি ফিরে যেতে পারব। ছেলে আল্লার কাছে আমার এত গুনাহ জমা নেই, সমুদ্রে ডেকে আমার হারাতে হবে।

ছোটবাবু বলল আপনি যান চাচা আমি যাচ্ছি। ছোটবাবু বনির দিকে তাকাল না। ছোটবাবু ফের বলল, আপনি ভাববেন না চাচা। আমার কিছু হয়েছে ভাববেন না। বাড়ির কথা মনে পড়ে গেছিল। কেমন যে মাথাটা গোলমাল হয়ে গেল বুঝলাম না। সারেঙসাব পিছিলে চলে গেলে ছোটবাবু খুব শক্ত হতে চাইল ভেতরে। সে বনির দিকে তাকাল না পর্যন্ত। বনি পাশে বলকেডে হেলান দিয়ে আছে। সে ছোটবাবুর দিকে মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকাচ্ছে। ছোটবাবুর পিঠ ঘাড় লম্বা চুল দেখতে পাচ্ছে। আর কিছু না। একবারও তাকে মুখ ঘুরিয়ে দেখছে না ছোটবাবু। সে ডাকল ডাকলে ছোটবাবু তোমার কি হয়েছে। কিন্তু ছোট-আবার খুব বেশি সাহসী, ছোটবাবু যেন এক্ষুনি দরজা লক করে ডেকে বের হয়ে যাবে। যারা ড্রামে কয়লার বড় বড় উনুন তৈরি করছে, যারা কাঠের ঠেকা তৈরি করছে এবং যারা এখন প্রায় আস্ত গরু অথবা ষাঁড়ের শুয়োরের হতে পারে ভেতরে লোহার শিক ঢুকিয়ে প্রাচীন বন্য মানুষের মতো ডেকে আগুন জ্বেলে ভেড়া গরু হাঁস মুরগী রোস্ট করার ব্যবস্থা করছে, অর্থাৎ এখন সব মাংস পুড়িয়ে গুদামজাত করে রাখা কতদিন এজাহাজ নিরুদ্দিষ্ট থাকবে কে জানে—ছোটবাবুও জানে না ছোটবাবু যাচ্ছে সে-সবে হাত লাগাতে। সকালে সে একটা সিন ক্রিয়েট করেছিল ভাবতেই সে আর যেন সংকোচে পায়ে জোর পেল না।

ছোটবাবু চলে যাচ্ছিল ভেতরে। বনি ছোটবাবুর হাতে হাত বাড়িয়ে দিল। ছোটবাবু তাকাচ্ছে না। ছোটবাবু একপা ভেতরে রেখেছে, আর এক পা বাইরে। বনি ওর ডান হাত যেন ছুঁয়ে রেখেছে। কিছুতেই হাতটা আর টেনে নিতে পারল না। সে কেমন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। বনি হাত ছেড়ে না দিলে ক্ষমতা নেই সে এখন কেবিনের ভেতর ঢুকে যায়। এত সে দুর্বল হয়ে যায় কি করে! কোথায় সেই আশ্চর্য রহস্যময়তা! ডেকে ভীষণ মাংসপোড়া গন্ধ উঠছে। ডেকে আগুনের ভেতর সব কাঠে ঝুলিয়ে মাংস পোড়ানো হচ্ছে। গরু শুয়োর ভেড়া হাঁস মুরগী পাঁচটা লোহার পিপের ভেতর আগুন জ্বলছে আর লোহার শিকে গোটা প্রায় আস্ত ঠ্যাং শিক কাবাবের মতো রোস্ট হচ্ছে সব। ছোটবাবুর হাতে সামান্য ছুঁয়ে আছে বনি। কি আশ্চর্য অধিকার! কিছু বলছে না। কোনো কথা বলছে না। কোনো আবদার অথবা অভিমান নেই। তুমি যেখানে আছ ছোটবাবু আমিও সেখানে আছি। যা কিছু পাপ সব আমার তোমার। তুমি একা কেঁদে পাপ থেকে রেহাই চাইবে সে হবে না ছোটবাবু। আমরা দুজনে মিলে সব পাপের অধিকার বহন করব। সামান্য হাত ছুঁয়ে রেখে বনি এতবড় কথা বলে ফেললে ছোটবাবু এই প্রথম বনিকে টেনে ভেতরে নিয়ে প্রথম বুকে জড়িয়ে নিল। বলল বনি মাই লিটল বনি। মাই ডার্লিং। আলিঙ্গনে আলিঙ্গনে একেবারে পাগল করে দিল। চুমো খেতে খেতে কোথায় কিভাবে যে জীবনের সব আকাঙ্ক্ষা ফুটে ওঠে ছোটবাবু জানে না।

সহসা বনি চিৎকার করে উঠল, ছোটবাবু প্লিজ দরজাটা বন্ধ করে দাও।

ছোটবাবু অবাক। দরজা খোলা ছিল। সে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে যেই না ফিরে এল একেবারে আলাদা মানুষ। কেমন এক বিস্ময় অবাধ্য বলা যেতে পারে সংকোচ—সে এটা কি করতে যাচ্ছিল! বনি তো তার কেউ নয়। সে আর্চির মতো কি সব করতে যাচ্ছিল। অমানুষ হয়ে গেলে তার আর অহংকার বলতে কিছু বুঝি থাকে না। সে বনির পাশে ধুপধাপ বসে পড়ে বলল, বনি সত্যি আমার মাথা ঠিক নেই। তুমি রাগ কর না। তারপর সে কেমন হয়ে গেল। বনির সমস্ত চোখে উদ্গত অশ্রু। ছোটবাবু তুমি আমাকে আর কতভাবে অপমান করবে। তুমি আমাকে ছোটবাবু কি ভাবো......। আমার কি কোনো দাম নেই। আমি এতই খারাপ...

ছোটবাবু বাইরে এসে অবাক। ওকে আসতে দেখে জম্বার লাফিয়ে লাফিয়ে প্রায় চলে আসছে। সারেঙসাব আসছে। বংকু এবং কেউ কেউ যাদের কাজ এখন আগুনে মাংস ঝলসে ফেলা এবং যারা হাতে ধারালো ছুরি রেখেছে, যখন তখন খুশি-মাফিক ঝলসানো মাংস সামান্য কেটে মুখে ফেলে দিচ্ছে সব ফেলে ওরা চলে আসছে। বেশ একটা নতুন পরিবেশ জাহাজে। এবং সিউল ব্যাংক ফিস্ট। সব রেশন জাহাজের সিজ করে ফেলেছে কাপ্তান। এদের জন্যে সামান্য রসদ বের করে দেয়া হয়েছে। এই যে সব মাংস ঝলসে রাখা হচ্ছে কারণ এভাবে মাংস ঝলসে না রাখলে বিকেল থেকেই জাহাজে দুর্গন্ধে টেকা যাবে না। দু-চারদিন সবাইকে কেবল মাংস খেয়ে থাকতে হবে পুরোপুরি। ভাণ্ডারীগণ বড় বড় ডেকচিতে যতটা পারছে মাংস খণ্ড খণ্ড করে সেদ্ধ করছে। আর যা হয় এই প্রয়োজনে [illegible] সমুদ্রে সব বড় বড় হাঙর কি যে [illegible] তারা জাহাজের চারপাশে জড় [illegible] সমুদ্রের অতলে নেমে যাচ্ছে, আবার [illegible] ভাসিয়ে রেখেছে তাঁর মনোরম পাখনা। কেউ কেউ জলে বড় বড় কাঠে বাড়ি মারছে হাঙরের মাথায়। চারপাশের সমুদ্রে বীভৎস দৃশ্য। সব ঝাঁক বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। [illegible] রঙের পিঠ সাদা রংয়ের পেট। খুশিতে মাঝে মাঝে উল্টে গেলে অতিকায় সব দাঁতের চর্বির থলে দেখা যাচ্ছে পর্যন্ত। এবং

জাহাজে শীতের ঝিলিক দেখলে প্রাণে আর মানুষের সাহস থাকে না। জাহাজটাকে মনে হচ্ছে সেই হাজার বছর আগের পালতোলা জাহাজের মতো। কেবল সারা আকাশময় এখন ধূম উদ্গীরণ হচ্ছে প্রবলভাবে। আগুনে জ্বলছে লেলিহান জিহ্বায়। তার ভেতরে সব মাংস ঝলসে তুলে নেওয়া হচ্ছে। এভাবে মাংস প্রথমে গুদামজাত করে রাখা দরকার মতো রোদে শুকিয়ে রাখা তেলে চর্বিতে ভেজে রাখা অন্য সব খাবার যা আশু নষ্ট হয়ে যাবার কথা যেমন বাঁধাকপি ফুলকপি, কাল থেকে ভেজে বাঁধাকপি ফুলকপি কেটে কেটে ত্রিপালে ছড়িয়ে দেওয়া হবে. সব শুকিয়ে যা কিছু খাবার আছে এখন কেবল গুদমাজাত করে রাখা। স্যালি হিগিনসের বোধহয় মনে হয়েছে জাহাজে বেঁচে থাকতে হলে এটা প্রাথমিক প্রচেষ্টা। তিনি ঘুরে ঘুরে দেখছেন। কেউ আবার সহজেই ঝলসানো মাংস সরিয়ে ফেলতে পারে তজ্জন্য স্টুয়ার্ট যা যা দিচ্ছে আবার তা সঠিক ফেরত আসছে কিনা দেখে নিচ্ছে। কেউ কেউ যে চুরি করে এক দু খন্ড আলগা করে মুখে ফেলে দেবে—এরই মধ্যে দুটো একটা ঝলসানো ঠ্যাং অথবা মাংসপিন্ড দেখে সে ঠিক ধরে ফেলেছে। এবং রিপোর্ট করলে স্যালি হিগিনস বলেছেন, কিছু খেতে দাও। একেবারে খেতে না দিলে চলবে কেন।

ছোটবাবুর কাছে প্রায় অশ্বমেধ যজ্ঞের মতো ঘটনা। ফরোয়ার্ড ডেকে আছে চিফ-মেট দুজন ডেক জাহাজি তিনজন ফায়ারম্যান একজন কোলবয়। চিফ মেটের অধীনে দুটো উনুন। ফোর-মাস্টের দুপাশে। তিন নম্বর মিস্ত্রি কয়লা বাকেটে তুলে যোগান ঠিক রাখছে। বাংকারে আছে ছোট টিন্ডাল। দুজন কোলবয়। এবং উইন্ডসেলের নিচে একজন উইনচ চালিয়ে কয়লা বাংকার থেকে তুলে আনছে। যেখানে যত কয়লা লাগবে তার তদারকের ভার তিন নম্বর মিস্ত্রির। ছোটবাবুর মনে হয়েছিল—যখন জাহাজ অচল সমুদ্রে স্থির ও সমান সূর্যের গনগনে আগুনে আকাশ দীপ্তিময় তখন শুধু খাওয়া আর বসে থাকা জাহাজে। দূরবীনে চোখ রাখা। আশ্চর্য সে-সবের কিছু নেই। কেউ দেখছে না কেন কোথাও জাহাজ কিংবা টিপটিপ যদি দূরে দেখা যায়। আর সে উল্টো দেখছে জাহাজের যা কিছু খাবার সব নিচ থেকে তুলে কেবিনগুলোতে সাজিয়ে রাখা হচ্ছে। কার্পেন্টার জলের পরিমাণ মেপে দেখছে। কেউ একদন্ড দাঁড়াতে পারছে না। অমানুষের মতো সবার চোখমুখ। সবার মেন মাস্টের নিচে আছে। এখানে দেখাশোনা করছে ডেভিড। সে ঠিক ঠিক লোহার রডটা ঘুরিয়ে দিচ্ছে মাঝে মাঝে। [illegible] অথবা হৃদপিন্ড কলজে এবং যা কিছু সব জ্বলছে আগুনের ওপর। চর্বিপোড়া গন্ধে টেকা যাচ্ছে না। ধোঁয়ায় চোখ জ্বলছে সবার। [illegible] সবাই লাফাচ্ছে। [illegible] কোমরে কেউ বেঁধে নিয়েছে কেউ। মাথায় ফেটি। সবাই আদিম নরখাদকের মতো। যেন

উল্টে পাল্টে দিচ্ছে হাত-পা শরীর। ছোটবাবুর মাথা গুলিয়ে উঠল।

হেই ওখানে কেন? এস। হাত লাগাও।

ছোটবাবু কোনো রকমে বলল, যাচ্ছি।

এবং সে নেমেই জোরে একটা লোহার রড ঘুরিয়ে দিল বোধ হয় চর্বির ভাগ বেশী একটা বড় সাইজের ভেড়া প্রায় হাত-পা তার এখন লাল, ঘন সাদা আবার ফিনকি দিয়ে বের হচ্ছে যাবতীয় জমে থাকা বরফের শক্ত কণিকা সব শুকিয়ে কাঠ কাঠ মাংস দিন মাস গেলে চিবিয়ে জীবন ধারণ করতে হবে—সে কেমন সাহসী হয়ে গেল। একটা প্রেরণার মতো কাজ করছে বুড়ো মানুষটা। একবার খবরও নিচ্ছে না তার জাতক এ-জাহাজেই আছে কোথায় কি করে বেড়াচ্ছে একবার দেখছে না। সে বলল, ডেভিড তুমি বরং ঠাণ্ডায় গিয়ে বস। ডেভিড নড়ছে না। রোদে ডেক তেতে আছে এবং সঙ্গে এই আগুনের উত্তাপ প্রায় ফার্ণেসে ঢুকে যাবার মতো। ডেভিড ছুরি দিয়ে সামান্য মাংস কেটে দিল, দেখ তো জিভে দিয়ে ঠিক মতো রোস্ট হয়েছে কিনা?

ছোটবাবুর বেশ খিদে পেয়েছে। ডাইনিং হলে আজও হয় তো নিয়ম মাফিক খাবার দেওয়া হবে বয় বাবুর্চিরা বড় বেশী এদিকে আসছে না তবু সে একটু খেয়ে বলল, ঠিক বুঝতে পারছি না। তুমি দ্যাখো।

ডেভিড মাঝে মাঝে ছিঁড়ে খেয়েছে। খেতে কটা হবে অফিসারদের কেউ জানে না। এবং জাহাজে কখন খাবার সময় পার হয়ে গেছে—কারো বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই। খাওয়া-দাওয়ার কথা কারো মাথায় থাকছে না।

থার্ড-মেটকে নিয়ে তিনি ঘুরছেন জাহাজে। ডেভিডের ওখানে ছোটবাবুকে দেখে বললেন ছোটবাবু তোমার জীবনটা খুব দামী না হে। আর এতগুলো জীবনের কোনো দাম নেই। ছোটবাবু সংকোচে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকল। সে কি করে বলবে, স্যার আমাকে তেমন ছোট ভাববেন না। কিন্তু সে তো বলতে পারে না। সে তো বলতে পারে না স্যার, আর্চিকে আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে মেরেছি। বিশ্বাস করুন স্যার আর্চিকে সামান্য ইঁদুরের মতো মনে হয়েছিল। মুখ বালিশে চেপে ধরার সময় মনে হয়েছিল সামান্য একটা জীব। ওকে সমুদ্রে ছুঁড়ে দেবার সময় মনে হয়েছিল বনি আর কোন অশুভ প্রভাবে পড়ে যাবে না। এত বড় একটা পাপ কাজের জন্য বিশ্বাস করুন আমার এতটুকু অনুশোচনা হয় নি। তখন হিগিনস বললেন দাঁড়িয়ে থাকবে না। নিচে যাও। চার নম্বরের কাছ থেকে কাজ বুঝে নাও গে।

সে যখন এনজিন রুমে নেমে এল অবাক, এত বড় এনজিনটা কিভাবে ছাটু মত্তে পড়ে আছে সব এলোপাথাড়ি কন-ডেনসার স্টার্কোলিং পাম্প সব গাড়ো গুড়ো হয়ে গেছে। বয়লারের [illegible] ফিল্টার

বকস কোথায় সব ছিটকে বের হয়ে গেছে। এভাপরেটারটা শুধু অক্ষত আছে। সিঁড়ি সব ঝুলে আছে। খুব সন্তর্পণে নিচে নেমে আসতে হয়েছে। তেলের ড্রাম গড়িয়ে ওপরে তোলা হচ্ছে। সে ডাকল! এই এনজিন কশপ চার নম্বর কোথায়?

আর্চি চলে যাওয়ায় এনজিন কশপ খুব দমে গেছে। সে বলল বয়লার রুমে। টব কেটে সব লম্ফ বানাচ্ছে।

ছোটবাবুকে দেখে চার নম্বর বলল তুমি টবগুলো গোল করে কেটে ফেল। দুটো টব ক্লোজ-নেস্টে বসিয়ে দিতে হবে। লম্ফের মতো জ্বলবে। যেন দূরে থেকে রাতে কোনো জাহাজ সমুদ্রে আমাদের দেখতে পায়। সারা রাত জ্বলবে। বাংকারে দুটো লম্ফ আর সারেঙের ঘরে একটা, কশপের কাছে গোটা তিনেক আছে। বুড়োর সব তাতেই তাড়াহুড়ো। বিকেলের ভেতর সব ওপরে তুলে নিয়ে যেতে হবে। এবং ছোটবাবু সামান্য ঘুরে গেলে বলল, ওদিকে যাবে না। সব আলগা হয়ে গেছে। মাথায় পড়তে কতক্ষণ?

—কিভাবে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে।

—তাই। চার নম্বর মাথায় সামান্য ফাইলটা ঘসে নিল অর্থাৎ সামান্য তেল লাগিয়ে নেবার মতো সব তুলে সে ফের ফাইল করছে। কেমন বিড় বিড় করে বলল, জাহাজে সত্যি কিছু একটা অশুভ প্রভাব ছিল ছোটবাবু। যাবার সময় সব নিয়ে চলে গেল জাহাজের। বলেই সে ক্রস টানল। মুখ থম থম করছে চার নম্বরের। সে বোধ হয় কেঁদে ফেলবে। অথবা নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ালে মানুষের যে অবস্থা হয় একজন ছন্নছাড়া মানুষের মতো মুখ চোখ—চার নম্বর ঠিক তেমন হয়ে গেছে। [illegible] সের মাথায় সে কাজ করছে না। সে মাঝে মাঝে বলছে আমরা সবাই মরে যাব ছোটবাবু। আমরা কেউ বাঁচব না। মিরাকেল কিছু না ঘটে গেলে আমরা কেউ বাঁচতে পারি না।

ছোটবাবু কিছু বলল না। যত ভাবনা বনিকে নিয়ে। সে বুঝতেই পারে না বার বার তার চোখের সামনে কোনো হতাশা ফুটে উঠলে কেন দেখতে পায় বনি কাতর চোখে তাকিয়ে আছে। একটা নিমজ্জমান জাহাজে সে আছে। দেশের কত রকমের ছোট-বড় ছবি যেমন অনায়াসে সে যে স্বপ্ন দেখেছিল মাথায় এংকোরের টুপি, সাদা নেভির পোশাক পরে সে ফিরে গেছে বাড়িতে বাবা-মা রাতে দরজা খুলে লণ্ঠনের আলোতে একজন অপরিচিত সাহেব সুবো মানুষ দেখে অবাক—কে আপনি কাকে চান, তখন সে যেমন ভেবেছিল মা আমাকে তুমি চিনতে পারছ না. আমি সোনা। আমি তোমার মেজ ছেলে সোনা। তোমার নিরুদ্দিষ্ট সন্তান। আমি এত বদলে গেছি, মুখ দেখেও আমাকে চিনতে পারছ না। ছোট ছোট ভাই-বোনের মুখ, ওরা শীতের ভিতর কুঁকড়ে বসে আছে সে তার দামী কম্বল দিয়ে ভেবেছিল যে সংসারের সব শীত নিবারণ করবে, কিছুই আর বুঝি হয়ে উঠছে না—

অথচ এখন কোনো তার দুঃখও নেই—কেবল খনির কথা ভাবলে হাহাকার করে ওঠে কেন বুকটা। সে বলল, বুড়ো মানুষটা যখন আছে তখন কোন ভয় নেই।

চার নম্বর রোগা মতো মানুষ। ভীষণ কর্তব্যপরায়ণ। সে দেখেছে জাহাজে মানুষটা নিঃশব্দে কাজ করে গেছে। বন্দর এলে সে কাজের পর শুধু মাতাল হয়ে পড়ে থাকত। আর আশ্চর্য সে দেখে ভাবত সকালে চার নম্বর অসুস্থ থাকবে. ডিউটিতে আসবে না, কিন্তু সেই মানুষ সকালে সরল সোজা আর কি তাজা শিস দিতে দিতে নেমে আসত নীচে. যেন সে রাতে মাতাল না হলে গভীর ঘুমে ডুবে যেতে পারত না। গভীর ঘুম না হলে সে অসুস্থ হয়ে পড়ত। সেই মানুষটা পর্যন্ত ঘাবড়ে গেছে।

ছোটবাবু এত দিনে এই প্রথম বলল, কে আছে দেশে?

—দেশে আছে। ছোটবাবু. সবার যা থাকে আমারও তাই আছে। ছোট দুটো বাচ্চা. ফুটফুটে মেয়ে। বড়টা হাঁটতে পারে. ছোটটা মায়ের কোলে থেকে আমায় আদর জানিয়েছে। ভেবেছিলাম দেশে গিয়ে দেখব ছোটটাও হাঁটতে শিখে গেছে। ওদের দুজনকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় যাব ভেবেছিলাম। বড় মেয়েটার খুব সখ হাতী বাঘ দেখার। কিছু বোধ হয় আর হয়ে উঠবে না। তাছাড়া যেন বলতে চাইল দু-চার দিনের ভেতরই সর্বত্র খবর ছড়িয়ে যাবে— সিউল ব্যাংক জাহাজের কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। একেবারে মাঝ দরিয়ায় চুপ মেরে গেছে। তারপর যা হয়. পত্রিকায় ফলাও খবর জাহাজীদের ছবি ছেপে সামান্য খবর শেষে সব খবর কেমন মানুষের অগোচরে চলে যায়। আমাদের কথা ছোটবাবু কেউ আর মনে রাখে না। ঘন্টায় ঘন্টায় যে জাহাজটা খবর পাঠিয়েছে ঝড়ের সেই এখন অকূলে ভাসছে।

ছোটবাবু বলল. আমরা একটা এস-ও-এস পর্যন্ত পাঠাতে পারলাম না।

চার নম্বর সতর্ক গলায় বলল. বুড়ো মানুষটার কোনো আপশোষ আছে সেজন্য। কেমন মজা পেয়ে গেছে। অন্য কাপ্তান হলে মার্কনি সাবের গলা টিপে ধরত। কোনো এস ও এস না পাঠিয়ে কেন স্টেশন লিভ করলে। কৈফিয়ত তলব করত। তারপর একটু থেমে বলল, কিছু করল না। বুঝলে সব শয়তানটা জানত।

—জানত মানে?

—জানত না! না জানলে এমন নিরুদ্বিগ্ন কেউ থাকে? যেন মজা পেয়ে গেছে। জাহাজটা এখন আর কেউ স্ক্র্যাপ করতে পারছে না। জাহাজ নিয়ে সারা জীবন সমুদ্রে ভেসে বেড়াতে পারবে।

ছোটবাবু বলল, ওর ছেলে জাহাজে আছে।

—আরে ওকি মানুষ আছে? ও তো সারা জীবন জাহাজ চালিয়ে চালিয়ে একটা অদ্ভুত জীব হয়ে গেছে।

ছোটবাবু এ-নিয়ে কথা বলল না। আসলে মাথার সবার এখন রক্ত উঠে যাচ্ছে। এবং এটা স্বাভাবিক। যত দিন যাবে ওটা বাড়বে। কাপ্তান তখন আর সত্যি মানুষ থাকবে না। সে একটা আস্ত শয়তান হয়ে যাবে সবার চোখে। আর যা মনে হলো যত দিন যাবে তত এই সব মানুষেরা ক্রমে অমানুষ হয়ে উঠবে। দুর্ঘটনা ঘটে যাবার মুখে কেউ বুঝতে পারছে না কি ভয়াবহ এই ভাসমান জাহাজে বেঁচে থাকা। দিন যাবে আর ক্রমে টের পাবে খাবার যত ফুরিয়ে আসবে তত টের পাবে, জল যত কমে আসবে তত টের পাবে। এখনও যে জাহাজে সবাই মুখ বুজে কাজ করে যাচ্ছে সে কেবল তীরের আশায়। কোনো মিরাকেলের আশায়।

ঠিক সন্ধ্যা সময় দুটো মাস্তুলের ক্রোজ-নেস্টে লম্ফ জ্বালিয়ে দেওয়া হল। বেশ বড় টবের মুখে হাসিল পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাসিল সলতের মতো কাজ করছে। আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলে যেন মশালের মতো আকাশে লম্ফ দুটো জ্বলতে থাকল। টর্চ সহজে কেউ ব্যবহার করবে না। সব টর্চ এখন কাপ্তানের জিম্মায়। চীফ-মেট সব বোট থেকে টেনে নামিয়েছে। সিগনেলিং লাইট। থ্রি সর্ট থ্রি লঙ আলোর সিগনালিংয়ে দূরবর্তী উপকূল অথবা জেলে জাহাজ কিংবা কোনো কার্গোসিপ যদি যায় তবে বুঝতে পারবে এস-ও-এস আসছে জাহাজ থেকে। যারা সারা দিনমান মাংস ঝলসে গুদামজাত করেছে তারা এখনও কাজ করছে। সব রোস্ট করতে বেশ সময় লেগে যাচ্ছে। আধ পোড়া হলেও যেন ক্ষতি নেই। দরকার মতো কাল আবার ঠিকমত ঝলসে নেয়া যাবে। এবং রাতে সেই গোল অগ্নিকুণ্ডের ভেতর মানুষের মুখ লাল আভায় ডুবে থাকলে স্যালি হিগিনস বুঝতে পারছেন জাহাজটা এখন এক দল ক্ষুধার্ত বন্য মানুষের হাতে পড়ে গেছে। অন্ধকার কেবিন থেকে তিনি সব দেখছেন। পোর্ট-হোল খোলা রেখে চার পাশে যা কিছু আছে প্রত্যেকটা পোর্ট-হোলে গিয়ে দাঁড়ালেই দেখতে পাচ্ছেন। দলে দলে এই সব বন্য মানুষেরা ভাগ হয়ে এখন আগুনের ওপর উপুড় হয়ে পড়েছে। মনে হল সেই আগুনের ভেতর জামা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে কেউ। স্যালি হিগিনস এত ওপর থেকে ঠিক বুঝতে পারছেন না। কে সে? সবাই আগুনের চার পাশে হল্লা করছে। আর লোকটাকে চ্যাংদোলা করে ধরে আনছে। ওর প্যান্ট খুলে আগুনে পুড়িয়ে হাততালি দিচ্ছে। এই বন্য ইচ্ছে কোনো রকমে বেড়ে গেলে এখন ওরা লোকটাকে আগুনে ফেলে দিয়েও তামাসা দেখাতে পারে। তিনি আর বিন্দুমাত্র দেরি করলেন না। তিনি বোট-ডেকে মস্ত কেবিনের সামনে এসে দাঁড়াতেই বিরাট এক পুরুষের মতো মুখ এবং চার-পাঁচ দিন দাড়ি না কামানোর জন্য সাদা দাড়ি ক্রমে বেড়ে যাচ্ছিল এবং তিনি সেই বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠলেন—হাই। সঙ্গে সঙ্গে লোকটিকে ছেড়ে দেওয়া হল লোকটি একেবারে উলঙ্গ, সে পিছনের দিকে ছুটছে। বন্য লোকগুলো আর হাতে তালি বাজাতে পারল না। আগুনের আভায় তিনি প্রায় যেন জ্বলে উঠলেন। তাড়াতাড়ি ডেভিড লোহার রডে একটা নরম পাছার মাংস গেঁথে আবার দুটো কাঠের ফাঁকে ঝুলিয়ে দিল স্যালি হিগিনসের সেই কঠিন চেহারার সামনে আর একটু বেয়াদপী করার ক্ষমতা তার নেই। সে বিনীত ভদ্র ভাল মানুষ হয়ে গেল। এবং বুঝতে পারছে এক্ষুনি জেলে পাঠাবে তাকে। কারণ তিনি ফিরে যাচ্ছেন অন্ধকারে। বোট ডেকের অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছেন। সে ভয়ে আর একবার ফিরে তাকাতে পর্যন্ত পারল না। চোখ মুখ কয়লার ধোঁয়া এবং কালিতে ছোপ ছোপ দাগ. এবং মুখে হাতে পায়ে মনে হয় কত দিন যেন স্নান না করে আছে। সমুদ্রে ভয়ংকর ঝড় ছিল বলে এতদিন কেউ দাড়ি কামাবার সুযোগ পায় নি। ফলে সবার খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ডেভিডের গালে লাল দাড়ির পাশে অগোছালো সেই খোঁচা খোঁচা দাড়ি কেমন তাকে আরও বেশী জংলী করে তুলেছে। বয়স মনে হয় বেড়ে গেছে। টিন্ডালকে নিয়ে এতটা মসকরা না করলে যেন ভাল ছিল। ওর চারটা বিবি। চার নম্বর বিবি লিটল গার্ল। বুড়ো মানুষ লিটল গার্ল নিয়ে কি সুখে এবং অন্য রকমের ঠাট্টা তামাশা করার স্পৃহা কেন

[illegible] উঠল। সে বলেছিল লিটল [illegible] বয়েসে দাঁতও কি করে? [illegible] বাদশা মিঞা হেসেছিল দাঁত বাঁধ [illegible]—খুব মজার কথা। সে দাঁত সোনার [illegible] বিবির জন্য, দাঁত বের করে [illegible]ছিল।

ডেভিড আগুন উসকে দিয়ে বলেছিল [illegible] কি মিঞা বিবিরে দাঁতে কামড়ে দেখ[illegible]।

[illegible] আবার হেসেছিল। সাহেব [illegible] বিবিকে নিয়ে বেশ তামাশা করছে [illegible]। সেও বেশ মজা পেয়ে গেছিল। [illegible]ছিল তা পাই।

—তা হলে বাদশা তোমার ওটা নেই।

—আছে।

—না নেই।

—আছে সাব।

—তবে দ্যাখাও।

—তোবা তোবা। বাদশা দৌড়ে পালাতে [illegible]ছিল।

আর সঙ্গে সঙ্গে সে বলেছিল দুজন [illegible]ম্যানকে সে বলেছিল দুজন খীজারকে [illegible] পাকড়ো। আধা হিন্দী আধা বাংলায় [illegible] যে দুটো একটা কথা বলতে পারে [illegible] মতো বলে সে বলেছিল পাকড়ো। [illegible] হ্যায় না। এবং সঙ্গে সঙ্গে ওরা চার-[illegible] ওকে চাংদোলা করে নিয়ে এলে কি যে [illegible] রসিকতায় সে উন্মাদ হয়ে গেছিল [illegible] জামা প্যাণ্ট একেবারে খুলে সব [illegible] ছুড়ে ফেলে সে উলঙ্গ করে দিয়ে [illegible]ছিল তোমার কিছু নেই মিঞা। ঝুট [illegible] বলতা হ্যায়। তুম নিমকহারাম। অর্থাৎ [illegible] হয় আমানুষ [illegible] কিছু [illegible] পাজা, তুমি [illegible] লিটল গার্ল [illegible] এনেছ। দেব আগুনে ফেলে। দাঁতে [illegible] মজা পাও তুমি। আগুনে ফেলে [illegible] মজা [illegible] দেব। এবং স্যালি [illegible]গিনস [illegible] এসে বোট-ডেকে না দাঁড়ালে [illegible] সত্যি আগুনে ফেলে দিত কিনা [illegible] না।

তখন বনি ছুটে এসে বলল—তুমি এখন [illegible] ডেভিড। আমি এখানে আছি।

ডেভিড বলল—কোথায় যাব!

—[illegible] ছুটি। [illegible] এখন [illegible] হয়ে নাও। বাবা তোমাকে [illegible] বিছে [illegible]।

ডেভিড কি করবে বুঝতে পারল না। [illegible] একটা আমানুষিক [illegible] জ্যাকের [illegible] আগুনের [illegible] তিনিই দাঁড়িয়ে থাকলে [illegible] হয় মনে। সে বলল—তুমি [illegible] না [illegible]।

—[illegible]।

—[illegible] পারছে না।

—এরা তো আছে।

ডেভিড [illegible] তখন দেখল ছোট-[illegible] মাথায় [illegible] [illegible] ছোটবাবুর [illegible] [illegible] পড়েছে। আসলে [illegible]। জ্যাক মাঝে মাঝে এটা-

ওটা এগিয়ে দেবে। এবং চোখ তুলে ওপরে তাকাতেই দেখল অতিকায় দুটো যেন মশাল জ্বলছে আকাশে। এতক্ষণ সে কিছুই খেয়াল করেনি। সামনের প্রতিবিম্ব সমুদ্রে ভাসছে। এবং এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে প্রতিবিম্ব। সে বুঝতে পারল জাহাজ সকালে যেখানে ছিল এখনও ঠিক সেখানেই আছে। এতটুকু ভেসে যাচ্ছে না কোথাও। এবং আগুনের আভায় মশালের আলোতে সে লক্ষ্য করল চারপাশে সব সামুদ্রিক মাছ বড় হাঙ্গর অকটোপাস উঠে এলেও বিস্ময়ের থাকবে না। এবং জাহাজটা যে এক সময় সব ধূর্ত মনস্টারদের আড্ডা হয়ে যাবে না কে জানে। সে ঘরে ঢুকেই আকণ্ঠ মদ গলায় ঢেলে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকল। বুক গলা পুড়ে যাচ্ছে। আহা তবু এক আশ্চর্য আরাম। সে দেয়ালে মুখ লেপ্টে দিল।—এবি তুমি এখন কি করছ। সে ছেলেদের নাম ধরে ডাকতে থাকল তোমরা সবাই কি করছ, কিছু করতে পারছ না, তারপর কেমন নেশার ঘোরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল এবি আমাদের কি হবে। আমরা সবাই মরে যাব।

স্যালি হিগিনস অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন। যারা সারাদিন আগুনের সামনে ছিল তাদের এখন ছুটি, অন্যদল কাজ করছে। এখনও যেন দুর্দশার গুরুত্ব তেমন-ভাবে কেউ বুঝতে পারেনি। এটা হয়। দুর্ঘটনা ঘটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে না আসলে কতটা তারা বিপন্ন। বুঝতে সময় লেগে যায়। দিন যত যাবে তত সবাই মরিয়া হয়ে উঠবে। আফটার-পিকে এখন একজন জাহাজি অন্ধকারে চুপচাপ বসে আছে। ওর কাছে রয়েছে সিগনেলিং টর্চ। সে যদি কোনো জাহাজ দেখতে পায়। সে অন্ধকারে এখন ভীষণ সজাগ। দু ঘণ্টা পর পর ডিউটি পাল্টে যাবে এবং সকাল হলে তিনি পাহারায় রাখবেন জ্যাককে। জ্যাক ডেভিড চিফ-মেট থার্ড-মেট পালা করে সতর্ক নজর রাখবে চারপাশে। ওরা দূরবীণে যদি কোনো তেলের জাহাজ অথবা কোনো মালবাহী জাহাজ দেখতে পায় দূরে। সবই দুরাশা। তবু যেন বিশ্বাস করতে ভাল লাগে সকাল হলেই দেখতে পাবেন কোনো [illegible] জাহাজ সমুদ্রের জল কেটে [illegible] আসছে। তখন তিনি অনায়াসে সবাইকে [illegible] ডাঙায় পৌঁছে দিতে পারবেন।

এবং তিনি এও জানেন এখন আশা কুহকিনী ছাড়া তাদের বেঁচে থাকার আর কিছু অবলম্বন থাকবে না। মশাল দুটো মাস্তুলে [illegible] জ্বলছে। সামান্য হাওয়া [illegible] শিখা লম্বা হয়ে যাচ্ছে এবং যেন [illegible] জাহাজ স্থির অনড়, মাস্তুলে অগ্নিশিখা কাঁপছে। জাহাজটা সেই [illegible] ভারি [illegible]। সেই [illegible] সে [illegible] [illegible] মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে। আর উঠতে পারছে না। সমুদ্রের অতল থেকে ভেসে উঠছে সব

সামুদ্রিক মাছ। অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না। জলে মাছের শব্দ ওরা কোনদিন জলে এমন একটা আজব জীব ভাসতে দেখে অবাক হয়ে গেছে। কেমন ঠাণ্ডা মরা ভুতুড়ে জাহাজ ভুতুড়ে আলো জ্বালিয়ে বেশ স্থির। তবে কি জাহাজ কোনো স্রোতের মুখে পড়ে যায় নি। জল দেখে কিছুই স্থির করা যাচ্ছে না। আকাশের নক্ষত্র দেখে তিনি বুঝতে পারছেন না কিছু, প্রতিদিনের মতো একই নক্ষত্রমালা আকাশে দপ-দপ করে জ্বলছে। এবং মনে হচ্ছে আকাশের নিচে জাহাজের চারপাশে রয়েছে সেই পাখিটা। ধোঁয়া এবং আগুনের জন্য সে মাস্তুলে এসে বসতে পারছে না। সমুদ্রে ভেসে রয়েছে কোথাও। পাখিটা মাঝে মাঝে কক কক করে ডাকছে। তার শব্দ ভেসে আসছে, আশ্চর্য পাখিটা সেই যে জাহাজের পেছন নিয়েছে সেই যে কেবল উড়ছে উড়ছে তো উড়ছেই সমুদ্রে থেকে যাচ্ছে না। জীবনে তিনি কখনও এমন দেখেননি। অ্যালবাট্রস পাখিদের দীর্ঘদিন জাহাজের পেছনে উড়তে দেখেছেন। ডাঙা এলেই তাদের আর দেখা যেত না। আবার হয় তো আর এক জোড়া পাখি কিন্তু লেডি অ্যালবাট্রস একা নিঃসঙ্গ যেন জাহাজটাতেই আছে তার প্রিয়জন। ছোটবাবুর পোষ মানা পাখি খাবারের লোভে বুঝি পাখিটা জাহাজ ছেড়ে যাচ্ছে না। এবং কেন জানি এই সব বিপন্ন মানুষের সঙ্গে স্যালি হিগিনসের মনে হচ্ছে পাখিটাও ভারি বিপন্ন, তারা ডাঙায় ফিরে যেতে না পারলে পাখিটাও ফিরে যেতে পারবে না।

সকালে চিফ-মেট দুঃখে হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পেল না। এখন থেকে জাহাজে সবার দৈনিক রেশন কি পরিমাণ হবে ভাগ বাটোয়ারার সময় প্রত্যেকের নাম এবং নিবাস লিখে রাখার মতো কাপ্তান পাখিটার নাম এবং নিবাস লিখে রাখলেন। সবার খাদ্যের গড় তালিকা যেমন হওয়া দরকার ঠিক তেমনি পাখিটারও একটা খাদ্য তালিকা প্রস্তুত হয়ে গেল। চিফ-মেট অতি দুঃখে তালিকাটি দেখার সময় না হেসে পারল না।

স্যালি হিগিনস আড়চোখে চিফ-মেটের মুখ দেখে সামান্য বিব্রত হলেন। মুখের উপর তিনি তাকে কিছু বলতে পারলেন না। দূরবীন নিয়ে বোট-ডেকে নেমে গেলেন। তাঁকে সত্যি ভারি দুঃখী এবং অসহায় মনে হচ্ছিল।

চিফ-মেট সহসা তখন লাফিয়ে নেমে গেল পেছনে। বলল—স্যার দেখেছেন।

স্যালি হিগিনস মুখ তুলে দেখলেন চিফ-মেটকে। ভীষণ ঝুঁকে আছে। চিফ-মেট ঘামছে।

—কী হয়েছে।

—যীশুর মূর্তি দেয়ালে নেই।

—তুলে রেখেছি। তিনি বললেন না ওটা ঝড়ের সময় পড়ে ভেঙে গেছে। ওটা শেষ।

(ক্রমশঃ)

আর্থিক প্রসঙ্গ

চঞ্চলা লক্ষ্মী

(২)

সপ্তিতার্থ :

উপাখ্যানটি হয়ত আপনারও জানা। তবুও আর একবার শুনুন আজকের প্রসঙ্গের পটভূমিকা হিসেবে।

এক সময় এক অতি অমিতব্যায়ী রাজা ছিলেন। রাজা কিন্তু নিজেকে মোটেই অমিতব্যয়ী বলে মনে করতেন না। তাঁর জীবনদর্শন ছিল সেই চিরন্তন বাণীভিত্তিক, তদন্তম্ যদ্ দীয়তে—যা অপরকে প্রদান না করে নিজের কাছে ধরে রাখা হয় মাত্র তাই নষ্ট হয়। অপরের —কিন্তু বিশেষ করে রাজার মুখ্যামাত্য বা প্রধানমন্ত্রীর এই জীবনবেদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। তাই তাঁরা রাজাকে অমিতব্যয়ী বলেই মনে করতেন।

শেষ পর্যন্ত রাজার ব্যয়-বাহুল্য দেখে মুখ্যামাত্য এত বিচলিত হলেন যে কিছু একটা না করে আর স্থির থাকতে পারলেন না। কিন্তু কি করবেন? রাজাকে ত সোজা-সুজি বলা যায় না : মহারাজ ব্যয়সংকোচ করুন, নইলে অচিরে রাজকোষ শূন্য হয়ে যাবে।

শেষ পর্যন্ত মহামাত্য রাজার শৌচা-গারে গিয়ে লিখে রাখলেন : মহারাজ! শ্রীমন্তের পক্ষেও সংযত হয়ে চলা উচিত। কারণ চিরদিন কারও সমান যায় না।

পরের দিন মহামাত্য কৌতূহলবশে শৌচাগারে প্রবেশ করে দেখেন তাঁর সতর্ক-বাণীর নীচেই রাজার উত্তর : আমি যদি শ্রীমন্তই হই তবে আমার আশঙ্কার কারণ কোথায়? তার জবাব মহামাত্য আবার লিখলেন : শ্রীমন্তের পক্ষেও আশঙ্কার কারণ আছে—লক্ষ্মীদেবী যে চঞ্চলা তা ভুলবেন না, মহারাজ!

পরের দিন আবার রাজার শৌচাগারে প্রবেশ করে দেখেন রাজা এবার লিখেছেন : লক্ষ্মীদেবী যখন শ্রীমন্তকে পরিত্যাগ করেন তখন সঞ্চিতার্থ বিনষ্ট—যতই অর্থ সঞ্চয় করা হোক না কেন, সবই বিনষ্ট হয়। মহামাত্য আর কিছু লিখতে পারলেন না।

কল্পতত্ত্ব :...

উপাখ্যানটিতে রাজা তাঁর মহামাত্যকে যে শিক্ষা প্রদান করলেন তা অন্যতম চির-ন্তন সত্য, এবং এই সত্য বিশেষ সুস্পষ্ট-ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে হিন্দু কল্পতত্ত্বে। সংক্ষেপে তত্ত্বটি হল : জাগতিক সব-কিছুই চক্রাকারে আবর্তিত হয়—ঊর্মিমালার মত উত্থানপতনই জগজ্জীবনের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং মানবজীবন—ব্যক্তিজীবন ও গোষ্ঠী-জীবন উভয়ই—এর ব্যতিক্রম নয়। অন্যভাবে বলা যায় : চঞ্চলা লক্ষ্মী কোথাও চিরকাল প্রতিষ্ঠিত থাকেন না, তিনি যে চিরসঞ্চরমানা:

যেহেতু তিনি চিরসঞ্চরমানা সেইহেতু তিনি বরদারূপে একস্থান পরিত্যাগ করে অন্য এক স্থানে অধিষ্ঠিত হন। সুতরাং একস্থানে শূন্যগর্ভতার সৃষ্টি হয়ে অন্য একস্থানে ওঠে তরঙ্গ। যেমন ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারীর ফলে রাষ্ট্রপতি নিকসন ও তাঁর সহচরদের কেউ কেউ পাঁকে পড়লেও অনেকেরই ঘাটে কিন্তু জোয়ারের জল উঁচু হয়ে উঠেছে। মার্কিন ঔপন্যাসিক ফিলিপ রোথ নিকসন প্রশাসনের তীব্র সমালোচনা করে ১৯৭১ সালে 'আমাদের দুর্বৃত্ত দল' (আওয়ার গ্যাং) নামে একখানা বই লেখেন। গত বছর বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়—নাম ছিল 'ওয়াটারগেট সংস্করণ'। বর্তমানে বইখানির তৃতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ—নাম ইমপিচমেন্ট সংস্করণ। সংস্করণটি প্রকাশিত হলে মোট মুদ্রিত কপির সংখ্যা ১০ লক্ষে দাঁড়াবে। একটি সংবাদপত্রে মন্তব্য করা হয়েছে : রোথ নিশ্চয়ই ভাবছেন, মাঝে মাঝে এই রকম এক-আধজন নিকসনের সন্ধান পেলে রোথকে হলিউডের চিত্রতারকারাও ঈর্ষা করতে শুরু করবেন।

রত্নগর্ভ :

এইভাবে কোন্ গাঙে কখন যে জোয়ার লাগে আগে থেকে তা অনুমান করা একরকম অসম্ভব। বিপরীত দিকে আবার কোন্ গাঙ কখন শুকুতে শুরু করে, তাও ঠিক পূর্বাহ্নে উপলব্ধি করা যায় না। কয়েক মাস আগেও কে আশা বা আশংকা করেছিল

যে চঞ্চলা লক্ষ্মী সভ্যতার পীঠস্থান শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলিকে ছেড়ে তাঁর বাহনে আরোহণ করে মরুভূমি অভিমুখে যাত্রা করবেন।
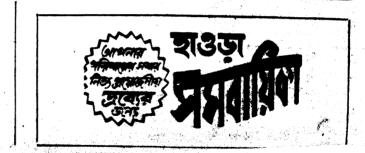
সাহারা অঞ্চলে প্রচলিত একটি কাহিনীর ঠিকমত ব্যাখ্যা করতে পারলে হয়ত এ-বিষয়ে ইঙ্গিত পাওয়া যেত। কাহিনীটি হল এই রকম : আল্লা যখন মরুভূমি এবং সেখানে বাস করবার জন্যে মানুষ সৃষ্টি করেন তখন তাঁর হাতে শেষ পর্যন্ত দুটি কাদার তাল ও কিছুটা জল অবশিষ্ট ছিল। কাদার তাল দুটি থেকে তিনি আবার গড়েন উট ও খেজুর গাছ—যে দুটি বস্তু মরুভূমিতে মানুষের জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য, আর বাকী জলটুকু তিনি ঢেলে দেন মাটিতে। এতদিন পর্যন্ত মনে করা হোত যে এই জল থেকেই স্বাভাবিক প্রস্রবণগুলোর সৃষ্টি হয়েছে যাদের ঘিরে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন মরূদ্যান। বর্তমানে কিন্তু ব্যাখ্যা করা হচ্ছে যে সেই অবশিষ্ট জলই পরিণত হয়েছে তেলে, এবং মরুভূমি হয়ে উঠেছে সত্যিই রত্নগর্ভ। বর্তমানে এই রত্ন বিশ্ব অর্থ-ব্যবস্থায় নতুন সমীকরণের সৃষ্টি করে চলেছে। ফলে ধনী আরও ধনী এবং দরিদ্র দরিদ্রতর হওয়ার পরিবর্তে চাকা ঠিক বিপরীত দিকে ঘুরতে শুরু করেছে—এপর্যন্ত ধনী বলে পরিচিত অনেক দেশ গরীব হতে চলেছে এবং তৈল-সমৃদ্ধ দেশগুলো হয়ে উঠছে উত্তরোত্তর ধনী।

নতুন সমীকরণ :

পরিসংখ্যানের সাহায্যে এই জোয়ার-ভাটার জল কোথায় কতটা উঠেছে এবং কোথায় কতটা নেমেছে সে সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যাক।

এক বছরের মধ্যে অপরিশোধিত তেলের দর-প্রায় চারগুণ বৃদ্ধির ফলে আরব রাষ্ট্রগুলো ও ইরানের কোষাগার কি রকম স্ফীত হয়েছে তা কল্পনাও করা যায় না। ১৯৭৩ সালে মধ্যপ্রাচ্য ও পূর্ব আফ্রিকার আটটি তেল উৎপাদনকারী রাষ্ট্রের তেল রপ্তানী থেকে রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৭০০ কোটি ডলার (১ ডলার মোটামুটি আমাদের ৯ টাকার মত)। ১৯৭৪ সালে তা ৭২০০ কোটি ডলারে দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হয়েছে। দাম যদি আর নাও বাড়ে তবুও মাত্র মধ্যপ্রাচ্যের তেল রপ্তানী থেকে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর রাজস্ব বর্তমান দশকের মধ্যেই ৫০,০০০ কোটি ডলারে পৌঁছুবে বলে মনে করা হচ্ছে।

তেলের এই বর্ধিত দাম মেটাতে গিয়ে এই বছরেই ধনীশ্রেষ্ঠ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ হবে ২০০ কোটি ডলার, ইংল্যাণ্ডের ৮৫০ কোটি ডলার, ফ্রান্সের ৫০০ কোটি ডলার পশ্চিম জার্মানীর ও জাপানের ৬০০ কোটি ডলার করে এবং ইতালীর ৮০০ কোটি ডলার। আমাদের বাণিজ্য - উদ্বৃত্তেরও যে মোড় ঘুরেছে তা এর দরুনই! ইতিমধ্যেই আমাদের এই খাতে বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় থেকে ৮০ কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়েছে। সবচেয়ে অবস্থা খারাপ নাকি ইতালীর। তার বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, এবার সঞ্চিত সোনায় হাত পড়বে। শুধু সোনার দাম আরও বাড়বার অপেক্ষা। সোনার দাম বাড়লে আর আর সবাই-এর যাই লাভক্ষতি হোক ইতালী আপাতত বেঁচে যাবে। আমাদের অবশ্য এখনও বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় থেকে ব্যয় করেই চলছে। কিন্তু এও ত সঞ্চিত অর্থের বিনাশ। উপাখ্যানের রাজা ঠিকই বলেছিলেন : চঞ্চলা লক্ষ্মী অন্যত্র গমন করলে সঞ্চিত অর্থও বিনষ্ট হয়।

এই ভাবে তেলকে কেন্দ্র করে বিশ্ব অর্থনীতিতে যে নতুন সমীকরণের সৃষ্টি হতে চলেছে শেষ পর্যন্ত তার রূপ কি হবে সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা এখনও সম্ভব হয়নি।

তেল দিন :

বিগত মধ্যপ্রাচ্য সফরের সময় সাউদি আরবের রাজা ফায়জলকে পাহাড়ের চূড়ো রাষ্ট্রপতি নিক্সন বলেছিলেন : ইয়োর ম্যাজেস্টী এই সফরের পর পরবর্তী গন্তব্যস্থলে পৌঁছোবার জন্যে আমাদের তেলের দরকার হবে। আমি সেই তেলই আপনাদের কাছ থেকে চাইছি। তবে হ্যাঁ আমরা বাজার দামই দেব। বাজার দাম মানে যে দাম বর্তমানে বিশ্বে বর্তমান আছে যা ভবিষ্যৎ দিনেও বর্তমান থাকবে। অধিকাংশ দেশই—বিশেষ করে উন্নত দেশগুলো—এই বাজার দামেই মধ্যপ্রাচ্য ও অন্যান্য দেশের তেল কিনতে চাইছে। ফলে ক্রেতাদের মধ্যেই প্রতিযোগিতা তেলের দাম —[illegible] এই তেল দিন তেল দিন রবে এখন আমাদের মত দরিদ্র দেশ সম্পূর্ণ দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

সম্পদের বিড়ম্বনা :

রাতারাতি অচিন্তিত পরিবর্তন ঘটলে অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে বিশেষ অসুবিধে হয়, আর হঠাৎ ধনী হয়ে উঠলে অনেক সময় বিশেষ বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়। তেল রপ্তানীকারী দেশগুলো বর্তমানে এই বিড়ম্বনাতেই পড়েছে। সমস্যা : এত টাকা নিয়ে কি করা যায়। সমাধান : পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক উন্নয়ন। অবশ্য তার জন্যে অনেক কিছুই প্রয়োজন—বিশেষ করে শিল্পগত কলাকৌশল বা প্রযুক্তিবিদ্যা। তাও এই সব দেশের নেই। অবশ্য এই উপাদানটি আমদানী করা যায় এবং এই ব্যাপারে সহযোগিতাও সম্ভব। উপরন্তু সম্ভাব্য সহযোগীও অসংখ্য রাষ্ট্র শিল্পজোট ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী সবাই বলছে : আমরাই সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, আপনি শুধু রূপেয়া দে কর খালাস—আপনাকে চোখে দেখতে হবে না। কিন্তু আরবদের মুস্কিল হয়েছে কিভাবে নকলের মধ্যে আসলদের বেছে নেওয়া হবে তা নিয়ে। ছোট শেখ রাজ্য আবুধাবির এক হোটেলের মালিক উক্তি করেছিলেন : স্যুটকেশ-ব্রীফকেশ নিয়ে সারা দুনিয়া থেকে রোজই নতুন নতুন লোক এসে হাজির হচ্ছে। মাত্র এক রাতের জন্যে ৫০ ডলার করে বিছানা ভাড়াও দিচ্ছে কিন্তু ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না ঐ স্যুটকেশ-ব্রীফকেশে ঠিক কি আছে।

এই ভাবে স্বয়ংবর সভায় দময়ন্তীর মত আসল নলরাজাকে চিনতে না পেরে তেল রপ্তানীকারী দেশগুলো দেশের বাইরে বিনিয়োগের কথাই বিশেষভাবে চিন্তা করছে। চিন্তার এই গতির অবশ্য আরও দুটি কারণ আছে : টাকার পরিমাণ এত বেশী যে সবটাই দেশে বিনিয়োগ করা সম্ভব নয়। এবং খুব দ্রুত উন্নয়ন ঘটলে নানারকম রাজনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয়। তা ছাড়াও হয়ত বলা যায় সব ডিম কি একই ঝুড়িতে রাখা উচিত? অপর দিকে আবার বিদেশে বিনিয়োগের ঝুঁকিও আছে। অন্তত বিভিন্ন মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার যখন বিশেষভাবে তরল অবস্থায় রয়েছে তখন ভেবেচিন্তে কাজ করতে হবে বৈকি, রাষ্ট্রবিপ্লব ইত্যাদির কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল।

উপসংহার :

মোটকথা তেলকে কেন্দ্র করে বি[illegible] অর্থনীতিতে আজ তামুল ভাঙাগড়ার ক[illegible] চলছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই রূপান্ত[illegible] সম্পূর্ণ না হবে ততক্ষণ ভবিষ্যৎ ক[illegible] সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করাই সম্ভ[illegible] হবে না এবং ততক্ষণ বিশ্বজনীন বিনি[illegible] অর্থনৈতিক সমস্যা বিশ্বকে প্রপীড়ি[illegible] করতেই থাকবে। প্রত্যেক যুগসন্ধিক্ষণ[illegible] এই রকমই হয়।

শান্তিলাল মুখোপাধ্যা[illegible]

বিজ্ঞাপনের ভাষা

শ্যামলী বসু

আজকের যুগে আমরা সকলেই বিজ্ঞাপনের আবেষ্টনীর মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছি। যে দিকে তাকাই বিজ্ঞাপনের ছটা। বিজ্ঞাপন, খবরের কাগজের বৃহদাংশে, মাসিক পত্রিকায় সিনেমায় রেডিওতে চলন্ত ট্রামে-বাসে ট্রেনে মিনি পত্রিকায় রাস্তার মোড়ে সুউচ্চ স্তম্ভে রিকসাওয়ালার গেঞ্জিতে, চটের থলিতে আকাশের ফানুসে। এমনকি গড়ের মাঠের মুক্তাকাশে তাকাতে গিয়েও দৃষ্টির ধাক্কা মনোরম বিজ্ঞাপিত স্তম্ভের সঙ্গে। মন চলে যায় রঙ্গীন আকাশ থেকে রং-বেরংয়ের কোন এক দৈনন্দিন জিনিসের বিজ্ঞাপনে। মনে মনে স্বগতোক্তি করতেই হয় জিনিসটা সত্যিই ভাল বা এটা আবার কবে হলো, পরখ করে দেখতে হবে তো—এ রকম আরো কত কি।

বিজ্ঞাপনের প্রচণ্ড গতি আজ প্রায় প্রতিটি মানুষের দৃষ্টি মন বুদ্ধিকে আকর্ষণ করছে। কিন্তু এই বিজ্ঞাপনের গোড়ার কথা জানলে ভাবতে অবাক লাগে কি আকর্ষণীয় এর পরিবর্তনের ক্রমইতিহাস।

'এ্যাডভারটাইজিং' কথাটা এসেছে ল্যাটিন শব্দ এ্যাডভারটিয়ার থেকে। যার অর্থ মনকে কোন এক বিশেষ দিকে ঘোরান। সহজভাবে বলতে গেলে, বিজ্ঞাপনের প্রধান উদ্দেশ্য কোন একটি উৎপাদিত বস্তু বা কোন আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি

আকর্ষণ করা এবং তার পক্ষে প্রভাব সৃষ্টি করা।

বর্তমানের বিজ্ঞাপন পন্থা একটি প্রগতিশীল শক্তিতে পরিণত হয়েছে। অন্যান্য জনসংযোগের মাধ্যমের মতই বিজ্ঞাপিত বস্তুটিও কোন বিষয়ের সম্বন্ধে কিছু জানাবার চেষ্টা করে। বিজ্ঞাপনের সূচনা কিন্তু ঠিক এভাবে হয়নি। তার উৎসের মূলে ছিল অন্যখানে।

আধুনিক পৃথিবীতে যেমন সংবাদ ও বিজ্ঞাপনের মধ্যে সুস্পষ্ট একটা দাগ টেনে দিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন করা যায়। তিন হাজার বছর আগে তা করা সম্ভব ছিল না। তখন ছিল সাম্প্রতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করেই বিজ্ঞাপনের আকারে তা প্রচার করা অর্থাৎ বিজ্ঞাপনের মোড়কে সংবাদ। একই সঙ্গে সংবাদ এবং বিজ্ঞাপন। যদিও আজকের পৃথিবীতে দুটির মূল লক্ষ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন।

প্রাচীন বিজ্ঞাপনের বহু তথ্য ও নিদর্শন পাওয়া গেছে প্রধানতঃ মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস ও রোমের শহরগুলোর ধ্বংসাবশেষ থেকে। ব্যবসাক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের সচারিত নতুন ঘটনা নয়। এর মূল্যায়ন প্রাচীনকালেও অনভিপ্রেত হয়। সেকালে ব্যবসায়ীরা তাদের বক্তব্য বিষয় পাথরের ওপর খোদাই করে জনবহুল রাস্তার পাশে রাখত। যাতে খুব সহজেই পথচারীর চোখে পড়ে। এ ছাড়া প্রচারের জন্যে লোকও ভাড়া করা হত। তারা বসন্তের রাস্তায় অঙ্গ-ভঙ্গীসহ সুউচ্চ গলায় প্রকাশ করত মালিকের বক্তব্য।

খ্রীষ্টের প্রারম্ভে মুখের কথাই বিজ্ঞাপনের প্রধান মাধ্যম ছিল। তবুও মধ্যযুগের প্রথম দিকে কিছু কিছু লিখিত বিজ্ঞাপনেরও হদিস পাওয়া গেছে। থীবস্ নগরীর ধ্বংসস্তূপ থেকে একটি প্যাপাইরাসের অংশ পাওয়া যায় যাতে এক মিশরীয় জমিদার তাঁর পলাতক ক্রীতদাসের ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। তখনকার গ্রীস ও রোমের শিক্ষিত মহলে লিখিত বিজ্ঞাপনের কদর ও প্রভাব দুই ছিল। অন্যান্য জায়গা থেকে, রোমে বিজ্ঞাপনের উৎকর্ষ দিন দিন বাড়তে থাকে। সেখানে দেওয়ালে অঙ্কিতাকারে বিজ্ঞাপনের কথাও জানা যায়। তাতে পাওয়া যেত বিজ্ঞাপন ও চারুকলার সম্মিলিত নমুনা।

ক্রমশ বিজ্ঞাপন বিবর্তনের পথে পা বাড়াল। বিজ্ঞাপনের ইতিহাসে যুগান্তকারী প্রবাহ আনলো সাইনবোর্ডের আগমন। পঞ্চ ও ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে সাইনবোর্ডের ব্যবহার অবাধে চলতে লাগলো। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের দোকানগুলিতে দেখা যেত বড় বড় সাইনবোর্ড।

ইতিমধ্যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ছাপাখানার সূত্রপাত। ফলে ছাপাকারে বিজ্ঞাপনের আবির্ভাব এবং প্রসার খুব সহজেই এলো। বিজ্ঞাপনগুলি একঘেয়েমি কাটিয়ে অনেক বেশী চিত্তানুগ ও ডিজাইনে সুসজ্জিত রূপ পেল। ছাপাখানার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের প্রভাব বাড়লো এবং স্বভাবতঃই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পরিণত হলো। প্রথম সংবাদপত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় ইংল্যাণ্ডে। সম্ভবতঃ সেটা ছিল কোন একটি নতুন পুস্তকের আগমন বার্তা। বইটি প্রকাশিত হয় ১৬২৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারী লণ্ডনে। এইভাবে বিজ্ঞাপন ক্রমশ উন্নতির পথে আজকের স্তরে এসে পৌঁছেছে। ভারতেও বিজ্ঞাপনে এক নতুন ধারা প্রবর্তন দেখা দিয়েছে। আমাদের বিজ্ঞাপন নীতি সূত্র জানিয়ে দিয়েছে বর্তমানের বিজ্ঞাপন চিন্তাকে। তার ফলস্বরূপ জনসাধারণ ও পেশাগত দিক দিয়ে বিজ্ঞাপন ভারতে সুপরিচিত হয়ে উঠছে।

আধুনিক বিজ্ঞাপন কৌশলে ইলাসট্রেশনের ব্যবহার এক নবীকরণ। বিশেষ করে প্রসাধনী ও পোষাকের ক্ষেত্রে একটি কোম্পানী আর একটি কোম্পানীর সাথে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে কে কত বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজের উৎপাদনের শ্রেষ্ঠত্ব ও স্থায়িত্বের উদাহরণ রাখতে পারে। আগে বহু শব্দের লম্বা বাক্যের লাইন রচনা করে বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো। এখন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ইলাসট্রেশনের ব্যবহার এসেছে, সঙ্গে অল্পসংখ্যক নির্দিষ্ট বাক্য। তার ফলে পাঠক যে কোন বস্তুর বক্তব্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। সুতরাং ইলাসট্রেশনে একটা সুখকর দৃষ্টান্ত রেখে সহজেই পাঠককে উদ্দীপ্ত করতে পারে বিজ্ঞাপিত অংশে।

বিজ্ঞাপনের ব্যবহার মূলতঃ ব্যবসাক্ষেত্রের প্রচার যন্ত্র। তবুও সমাজের প্রতি এর কিছু দায়িত্ব আছে। তাই বিজ্ঞাপনদাতার কাছ থেকে আমরা বস্তুনিষ্ঠ, যুক্তিবাদী ও শিক্ষামূলক বিজ্ঞাপন আশা করি। আজকের দিনে বিজ্ঞাপন সাধারণের মতামত গঠনে যথেষ্ট প্রভাব ছড়ায়। তাই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এমন কিছু প্রচার করা যুক্তিসঙ্গত নয় যাতে মানুষের নৈতিক ও শারীরিক ক্ষতি হয়। সুতরাং জনসাধারণকে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করার জন্যে বিজ্ঞাপন সেনসারশিপের প্রয়োজন আছে। বিদেশে কিছু সংবাদপত্র যেমন নিউইয়র্ক টাইমস, দি শিকাগো ট্রিবিউন ক্রিশ্চান সায়েন্স মনিটর নিষ্ঠার সঙ্গে বিজ্ঞাপনের গুণাগুণ যাচাই করে তা প্রকাশ করে। সাধারণতঃ এ ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ন্ত্রণ নির্ভর করে সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষের সমাজচেতনার সজীবতার ওপর।

সুতরাং সমাজের প্রতি দায়িত্ব হিসাবে আজকের বিজ্ঞাপনগুলিকে যথাযথভাবে সমীক্ষা ও পরীক্ষার সময় এসেছে। প্রাচীনকালে যার প্রয়োজন ছিল না। কারণ তখন বিজ্ঞাপন-বিজ্ঞান তত জটিলতা ও প্রসারতা লাভ করেনি। বর্তমানে সমাজের ধারা গেছে বদলিয়ে। বিজ্ঞাপন চিন্তাও নতুন নতুন মোড় নিচ্ছে তাই এক্ষেত্রে প্রকাশক ও বিজ্ঞাপনদাতার উভয়েরই দায়িত্ব কম নয়।

বিজ্ঞাপন এখন আর শুধু ব্যবসায়ীভিত্তিক নয়। আজ সে বহু জনকল্যাণমূলক কাজেও জড়িত। তাই আমাদের সকলের কাম্য বিজ্ঞাপন সুষ্ঠু, রুচিশীল ও নিখুঁতভাবে প্রকাশিত হোক তা যেন মানুষকে প্রবঞ্চনা ও বিপথের পথে ঠেলে না দেয়।

আষাঢ়ের পর এসেছে বর্ষণ-মুখর শ্রাবণ। ঋতুচক্রে বর্ষার শেষ মাস। এই শ্রাবণের উপর কবিগুরু কত যে গীত রচনা করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। 'গহন রাতে শ্রাবণ ধারা পড়িছে ঝরে', 'ওগো আমার শ্রাবণ মেঘের খেয়াতরীর মাঝি' 'এই শ্রাবণ-বেলা বাদলঝরা। যূথীবনের গন্ধে ভরা', 'শ্রাবণ বরিষণ পার হয়ে। কী বাণী আসে ঐ রয়ে রয়ে', 'শ্রাবণ মেঘের আধেক দুয়ার ঐ খোলা', 'এ শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে।' এমনি বাদল দিনের নানা কথায় ভরা কবির নানা অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে এই গীতি-কবিতাগুলির মধ্যে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা দিয়েছে যেন একটি প্রচ্ছন্ন বেদনার আকুতি।

অতীতে এই শ্রাবণের সঙ্গে বহু বেদনার স্মৃতি জড়িয়ে আছে,—বহু বিশিষ্ট, ধনাঢ্যধন্য, পুণ্যশ্লোক, কবি-সাহিত্যিক-সাধক ও কীর্তিমান বঙ্গবাসীর তিরোধান ঘটেছে এই শ্রাবণে। গোড়া থেকে ধরলে যতদূর মনে পড়ে, ৮ই শ্রাবণ (১২৯১) স্বাধীনচেতা, সুলেখক ও বাগ্মী কৃষ্ণদাস পাল পরলোকগমন করেন। ১২৭৭ সালের ৯ই শ্রাবণ আর এক অনন্যসাধারণ প্রতিভাধর বাঙালী মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে ইহলীলা সংবরণ করেন। তিনি হলেন, ভারতবিদিত মহাভারতের রচয়িতা উদারচেতা ও দানবীর কালীপ্রসন্ন সিংহ।

আমরা এ স্থলে মহামতি কালীপ্রসন্ন সিংহের মহান গ্রন্থ মহাভারত সম্বন্ধে প্রখ্যাত প্রাচীন গবেষক ও জীবনীকার স্বর্গত মন্মথনাথ ঘোষ এম-এ, এফ-এস-এস, এফ-আর-ই-এস বিরচিত 'মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ' নামক বহু তথ্যসংবলিত মূল্যবান গ্রন্থ থেকে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের 'মহাভারত' অংশটি আংশিকভাবে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। এই গ্রন্থখানি বাংলা ১৩২২ সালের ১লা আশ্বিন প্রথম প্রকাশিত হয় এবং এর সুদীর্ঘ ভূমিকা রচনা করেন স্বর্গত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। এই মহাভারতের প্রকাশ-প্রসঙ্গ যেমন কৌতূহলোদ্দীপক, তেমনি তথ্যসমৃদ্ধ।

পরবর্তীকালে এই মহাভারত স্বল্পমূল্যে বঙ্গবাসী ও বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত হয়। বর্তমানে নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির উদ্যোগে এই মহামূল্য গ্রন্থ খণ্ড খণ্ড ভাবে সাধারণের হস্তগত হবার সুবিধা হয়েছে।

।। মহাভারত ।।

'অমর কবি দীনবন্ধু 'সুরধনী কাব্যে' লিখিয়াছেন ঃ—

দানশীল কালী সিংহ বিজ্ঞ মহাশয়
সভ্য 'সারস্বতাশ্রম' যাঁহার আলয়
পণ্ডিতে পালন করে, আপনি পণ্ডিত
'ভারতের' অনুবাদ পণ্ডিত সহিত,
বিপুল বিভব, যেন অবনী ধনেশ,
দেশের কল্যাণে প্রায় করিয়াছে শেষ,
রহস্য-কৌতুক হাসি রসিকতা-ভরা,
'হুতোম পেঁচার' ধাড়ী পড়েছেন ধরা।

এই প্রবন্ধে বিদ্যোৎসাহী কালীপ্রসন্নের দানশীলতা প্রভৃতির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। 'হুতোম পেঁচা'রও সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে আমরা কালীপ্রসন্নের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি-স্তম্ভ মহাভারতের বিষয় দুই একটি কথা বলিব।

·মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত সংস্কৃত মহাভারতের বঙ্গভাষায় অনুবাদ-প্রচারের বিরাট কল্পনা কিরূপে কালী-প্রসন্নের মনে উদিত হইয়াছিল, এবং কিরূপে এই মহৎ কার্য্যের আরম্ভ হয়, তাহা নিশ্চয় জানা যায় না।

শুনা যায়, কালীপ্রসন্ন স্বয়ং মহাভারতের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট সমগ্র মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হরচন্দ্র তাঁহাকে উৎসাহিত করেন, কিন্তু একাকী এরূপ বৃহৎ কার্য্য সম্পাদন করা সম্ভবপর নহে বলিয়া পণ্ডিতগণের সাহায্য গ্রহণ করিতে উপদেশ প্রদান করেন। পূজনীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মহাভারতের অনুবাদ ক্রমশঃ প্রকাশিত করিতেছিলেন। এক্ষণে কালী-প্রসন্ন তাঁহাকেই উপযুক্ত পাত্র বোধে এই মহাগ্রন্থ প্রকাশের জন্য অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সময়াভাববশতঃ স্বয়ং এই অনুবাদকার্য্য গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন, কিন্তু পরমস্নেহভাজন কালী-প্রসন্নের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া উপযুক্ত পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা মহাভারত অনুবাদের ব্যবস্থা করিয়া দেন, এবং স্বয়ং ঐ কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন।

মহাভারতের অনুবাদ যখন আরম্ভ হয়, তখন কালীপ্রসন্নের বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ মাত্র। মহাভারতের উপসংহারে কালী-প্রসন্ন লিখিয়াছেন—

'১৭৮০ শকে সংকীর্ত্তি ও জন্মভূমির হিতানুষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া ৭ জন কৃতবিদ্য সদস্যের সহিত আমি মূল সংস্কৃত মহাভারত বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই। তদবধি এই আটবর্ষকাল প্রতিনিয়ত পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায় স্বীকার করিয়া বিশ্বপিতা জগদীশ্বরের অপার কৃপায় চিরজীবনের ব্রতের উদ্‌যাপন স্বরূপ মহাভারতীয় অষ্টাদশ-পর্ব্বের মূলানুবাদ সম্পূর্ণ করিলাম। অনুবাদ গ্রন্থ কতদূর সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, তাহা গুণজ্ঞ পাঠকগণ ও সহৃদয় সমাজ বিবেচনা করিবেন; আমি সাহস করিয়া এই মাত্র বলিতে পারি যে, অনুবাদ সময়ে মূল মহাভারতের কোন অংশই পরিত্যাগ করি নাই ও উহাতে আপাততরমণ অমূলক কোন অংশই সন্নিবেশিত হয় নাই; অথচ বাঙ্গালা ভাষায় প্রসাদগুণ ও লালিত্য পরিরক্ষণার্থ সাধ্যানুসারে যত্ন পাইয়াছি এবং ভাষান্তরিত পুস্তকে সচরাচর যে সকল দোষ লক্ষিত হইয়া থাকে, সেগুলির নিবারণার্থ বিলক্ষণ সচেষ্ট ছিলাম।'

বরাহনগরস্থ যে বাটীতে এই অনুবাদ কার্য্য সম্পন্ন হয়, কালীপ্রসন্ন তাহার নাম দিয়াছিলেন 'সারস্বতাশ্রম' ও 'পুরাণসংগ্রহ কার্য্যালয়'* গ্রন্থখানি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পুণ্যনামে উৎসৃষ্ট হয়। যে পত্রে মহারাণীকে এই মহাগ্রন্থ উৎসর্গ করা হয়, সেই পত্রখানি পাঠ করিলে কালীপ্রসন্নের দেশহিতসাধনেচ্ছা কিরূপ প্রবল ছিল এবং হৃদয় কত উচ্চ ছিল তাহা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়—

পরম ভক্তিভাজন

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়া
অতুল প্রভাবশালিনীষু—

মহারাজ্ঞি!

পৃথিবীমধ্যে যখন দেশের সৌভাগ্য-দিবাকর সমুদিত হইতে আরম্ভ হয়, সে সময় তত্রত্য রাজলক্ষ্মী অবশ্যই কোন না কোন সর্ব্বগুণাধার মহাত্মাকে সমাদর-পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। নৈসর্গিক নিয়ম এই যে, রাজ্যের উন্নতির সময় বিশুদ্ধ গুণশালী প্রজাবৎসল নরপতিগণই রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। জগদীশ্বরপ্রসাদে চিরদুঃখিনী ভারতভূমির ভাগ্যে এক্ষণে সেই শুভদিন উপস্থিত। হিন্দু শাসনাবসানে যবন সাম্রাজ্যের অন্তিম-কালে নিত্য নামপরায়ণ ব্রিটিশজাতি রাহুগ্রস্ত শশধরসদৃশ মোগলরাজগণের করাল-কবলস্থিত ভারতবর্ষকে উদ্ধার করিয়াছেন, এক্ষণে দিনে দিনে তাঁহার রাজ্য মুখশ্রী পূর্ণশশীর অনুরূপ উজ্জ্বল কান্তি ধারণ করিতেছে এবং ভারতবর্ষবাসিগণ আপনার অকৃত্রিম স্নেহ ও অনুগ্রহ লাভ করিয়া আপনাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও চিরকাল জ্ঞান করিতেছেন।

দেবি! আমি এই শুভক্ষণ সন্দর্শনে স্বদেশের হিতসাধন করিতে উৎসাহিত হইয়া আত্মহিতৈষণসহকারে মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত সংস্কৃত মহাভারত বাঙ্গালাভাষায় অবিকল অনুবাদে প্রবৃত্ত হই। এক্ষণে আট-

জগদীশ্বরের অপার কৃপায় অদ্য আমার সেই চিরসংকল্পিত কঠোর ব্রত উদ্যাপিত হইল। এই আটবৎসরের বহুপরিশ্রম ও যত্নসজাত সাহিত্যকুসুম অন্য কোন নিভৃত নির্ম্মাতস্থলে বিন্যস্ত করা কোন ক্রমেই যুক্তিসংগত নহে। বিশেষতঃ মহাভারত যেরূপ অনুপম গ্রন্থ, উহাতে ভারতেশ্বরী মহারাজ্ঞীর নাম অঙ্কিত না হইলে শোভা পায় না। যেমন দেবতারা বহুপরিশ্রমে পয়োনিধি মন্থন করিয়া তদুত্থিত পারিজাত কুসুম সুররাজ পুরন্দরকে অর্পণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমি এই বহুযত্নলব্ধ বিকসিত ভারতপংকজ আপনাকে উপহার প্রদান করিলাম।

ভারতেশ্বরি! অবশেষে জগদীশ্বর সমীপে আমার এই প্রার্থনা যে, ভারতবর্ষের রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ্যশাসন সময়ে যেরূপ কালিদাসাদি ভুবনবিখ্যাত মহাকবিগণ জন্মগ্রহণপূর্ব্বক সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন এবং মহারাণী এলিজাবেথের ইংলণ্ডশাসন সময়ে যেরূপ সেক্সপিয়ার প্রভৃতি কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ কবি জন্মগ্রহণ করিয়া কবিত্বশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার শাসনকাল চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন, তদ্রূপ আপনার শাসনকালেও হিন্দুস্থান শত শত সংস্কৃত সাহিত্যদীপের উজ্জ্বলতা সাধন করিয়া লোকের মোহান্ধকার নিরাকৃত ও এই বিশ্বরূপে বাসগৃহ আলোকিত করুন। ইতি—

সারস্বতাশ্রম মহারাজ্ঞি!
শকাব্দা ১৭৮৪। আপনার চিরানুগত
প্রজা ও বিনয়াবনত দাস
শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ'

*মহাভারতের প্রথম খণ্ড 'পুরাণসংগ্রহ' নামে প্রকাশিত হয়। ইহাতে বোধ হয় যে, কালীপ্রসন্ন ক্রমে ক্রমে আমাদের অন্যান্য পুরাণ গ্রন্থাদির অনুবাদও প্রকাশিত করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন।

কালীপ্রসন্ন বিনামূল্যে মহাভারত বিতরণ করিয়াছিলেন। ব্যয়সাধ্য বিরাট পুস্তক এরূপে দানের দৃষ্টান্ত বোধহয় বঙ্গদেশে পূর্ব্বে আর কখনও দেখা যায় নাই।

আদি পর্ব্ব সমাপ্ত হইলে ১৭৮০ শকাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' এই মহাগ্রন্থ বিতরণের যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল এবং যাহার প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল, সেইরূপ বিজ্ঞাপন কি এ পর্য্যন্ত কোনও পাঠকের নয়নগোচর

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়কর্ত্তৃক
গদ্যে অনুবাদিত
বাঙ্গালা মহাভারত

মহাভারতের আদিপর্ব্ব তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে, অতি ত্বরায় মুদ্রিত হইয়া সাধারণে বিনামূল্যে বিতরিত হইবে। পুস্তক প্রস্তুত হইলেই পত্রলেখক মহাশয়দিগের নিকট প্রেরিত হইবে। ভিন্ন প্রদেশীয় মহাত্মারা পুস্তক প্রেরণ জন্য ডাক ষ্টাম্প প্রেরণ করিবেন না। কারণ, পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে ভিন্ন প্রদেশে পুস্তক প্রেরণের মাসুল গ্রহণ করা যাইবে না। প্রত্যেক জেলায় পুস্তক বণ্টন জন্য এক একজন এজেণ্ট নিযুক্ত করা যাইবে, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রদেশীয় মহাত্মারা বিনাব্যয়ে আনুপূর্ব্বিক সমুদায় খণ্ড সংগ্রহ করণে সক্ষম হইবেন।

শ্রীরাধানাথ বিদ্যারত্ন
বিদ্যোৎসাহিনী সভার সম্পাদক।

যে মহাপণ্ডিতগণের সাহায্যে কালীপ্রসন্ন মহাভারত অনুবাদ করিয়াছিলেন, যে সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে তিনি উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মহাভারতের উপসংহারে তাঁহাদিগের নাম কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করা হইয়াছে। এস্থলে তাঁহাদিগের বিষয় পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। অনেকে মনে করেন যে, কালীপ্রসন্ন স্বয়ং মহাভারতের কোনও অংশ অনুবাদ করেন নাই। এ ধারণা সত্য নহে।...

মহাভারতের প্রথমাংশ প্রকাশিত হইলে সুপণ্ডিত রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত বিবিধার্থ সংগ্রহে যে সুন্দর সমালোচনা প্রকাশিত হয় তাহা এস্থলে উদ্ধারযোগ্য ঃ—

'পূর্ব্বে আমরা দুই তিন বার শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যানুরাগিত্ব বিষয় প্রশংসা করিয়াছি। তদবধি উক্ত বাবু এক মহদ্ব্যাপারে নিযুক্ত হইয়া তাহার প্রথম ফল-স্বরূপ 'পুরাণ সংগ্রহ' নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ড জনসমাজে সমর্পিত করিয়াছেন। ঐ খণ্ডে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মহাভারতের আদি পর্ব্বান্তর্গত অনুক্রমণিকা, পর্ব্বসংগ্রহ পৌষ্য, পৌলোম ও আস্তীক পর্ব্বাবধি আদি বংশাবতরণিকা সহিত সম্ভবপর্ব্বীয় ভারতসারে শকুন্তলোপাখ্যান বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়া বিষয়িকজনগণের ভারতার্থ সংগ্রহের [illegible] উপায় হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে কাশীরাম দাস-কৃতক অনুবাদ ভারতামৃত পানের একমাত্র উপায় ছিল, এবং তাহা সুকোমল পয়ারে বিরচিত হওয়াতে এতদ্দেশীয় অপর সাধারণ সকলেরই সমাদরণীয় ছিল ফলতঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তুলসীদাস-কৃত রামায়ণ যেরূপ সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গদেশে কাশীরাম দাসের ভারতও [illegible] উক্ত গ্রন্থকর্ত্তারা [illegible] বাল্মীকি ও ব্যাসের উক্তি পরিবর্ত্তন করিয়া নানাবিধ স্ব স্ব কপোলকল্পিত আখ্যায়িকাদ্বারা [illegible] বাল্মীকি রামায়ণ ও ব্যাসের ভারতের প্রকৃত অর্থ জানিতে যাঁহাদিগের বাসনা, তাঁহাদিগের পক্ষে উক্ত গ্রন্থ কদাপি সমাদরণীয় হইতে পারে না। তন্মধ্যে যাঁহারা ভারতের তাৎপর্য্য জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের নিমিত্ত কালীপ্রসন্নবাবুর গ্রন্থ উপযুক্ত হইয়াছে, যেহেতু তিনি অতীব সাবধানে সংস্কৃত মূলের অবিকল অর্থ বাঙ্গালা অনুবাদেতে রক্ষা করিয়াছেন এবং ঐ অনুবাদও এতাদৃশ সুকোমল ও সুমধুর হইয়াছে যে তাহা পাঠ মাত্রেই পরিতৃপ্ত হইতে হয়। ইহা অবশ্যই স্বীকর্ত্তব্য যে, ব্যাসোক্ত সংস্কৃত পদ্যের লালিত্য কদাপি বাঙ্গালা গদ্যে প্রত্যাশা করা যায় না পরন্তু যাঁহারা সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ অথচ ভারতের প্রকৃতার্থ জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা উপস্থিত গ্রন্থ হইতে সদর্থায় অনায়াসে প্রাপ্ত হইতে পারেন। কালীপ্রসন্নবাবুর বয়ঃক্রম নিতান্ত তরুণ, এই অবস্থায় দেশীয় অপর ধনাঢ্যের ন্যায় ইন্দ্রিয় সেবায় বিব্রত না হইয়া তিনি যে মহৎ ও দুরূহ ব্যাপারে অভিনিবিষ্ট হইয়াছেন ইহাতেই তিনি অবশ্য প্রশংসনীয়; অধিকন্তু তাহাতে যেরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি সমস্ত বিদ্যানুরাগিদিগের ধন্যবাদার্হ হইবেন।'...

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বলিয়াছেন 'বর্ত্তমানকালে প্রাঞ্জল ও সরস অনুবাদে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতই আদর্শরূপে পরিগৃহীত ও সমাদৃত হইয়া থাকে।'...

আমাদিগের বিশ্বাস যে এইরূপ সুললিত ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট অনুবাদগ্রন্থ বঙ্গভাষায় আর নাই এবং যতদিন বঙ্গভাষার অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন এই গ্রন্থের সমাদর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে এবং যতদিন হিন্দুধর্ম্মের অস্তিত্ব থাকিবে, ইহা লক্ষ লক্ষ নরনারীর নিরাশ হৃদয়ে আশা, শোকসন্তপ্ত চিত্তে শান্তি ও সংসারাকুল মনে ভগবৎপ্রেমের অমৃতধারা বর্ষণ করিবে।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে কালীপ্রসন্নের মহাভারতানুবাদ সম্পূর্ণ হয়। ইহার পর কালীপ্রসন্ন চারি বৎসরকাল মাত্র জীবিত ছিলেন। অপরিমিত দান ও সদনুষ্ঠানের ব্যয়ে তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন একমাত্র মহাভারত প্রকাশ ও বিতরণে তাঁহার ন্যূনাধিক আড়াই লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল।'

—ক্রমশঃ

রূপসীর খাতা

কেশ বিন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেল। কেশ সৌন্দর্য শুধু যে কেশের প্রাচুর্যে কিম্বা লীলায়িত গুচ্ছেই হয় তা নয়, যে গ্রীবা কিম্বা যে ঘাড়ের উপর সেই চুলের রাশি ছড়িয়ে থাকবে তাকেও তেমনই হতে হবে। বেণী বাঁধলে (লম্বা চুলের কথাই ধরছি) পিঠ ছাড়িয়ে নীচে নামে, চুল যতটা লম্বা, ততদূর পর্যন্ত। এখন কথা হচ্ছে বেণীর শুরুতে ঘাড়ের কাছে চুলের ঢঙ কেমন হবে। ঢিলে নরম, কি কষে শক্ত ভাবে বাঁধতে হবে সেটা নির্ভর করবে মুখের ছাঁদ ও ঘাড়, কাঁধ গলা ইত্যাদির গড়নের উপর। লম্বাটে মুখ হলে শুরুতে চুলের গুচ্ছগুলি বেশ কষে বেঁধে নিচের দিকে নামবে। কাঁধ চওড়া বেশী হলে বেণী না বাঁধাই সবচেয়ে বাঞ্ছনীয়। গোল মুখ সরু ঘাড় লম্বা গলা—এসব ক্ষেত্রে বেশী ঢিলে করে চুল নরমভাবে ছড়িয়ে ছড়িয়ে বাঁধতে হবে। শুধু তাই নয়, গলার বাঁপাশ ঘেষে ঘাড়ের মাঝামাঝি ফুল কিম্বা পাতা লাগালে ভাল দেখাবে। তার ফলে মুখ আর সবকিছু মিলিয়ে বেশ ভাল দেখায়।

খোঁপার সম্বন্ধে তো আগেই আলোচনা করেছি। ছোটগলা কিম্বা মোটা চওড়া ঘাড়ের মহিলাদের ব্লাউসের গলা পাশে বেশী চওড়াভাবে খোলা থাকলে তার উপর খোঁপা হলে পিঠের দিকটা ভাল দেখায়। তাঁরা যেন ফ্যাশানের পাল্লায় পড়ে কোন কারণেই ছোট গলা কিম্বা উঁচু বন্ধ গলার জামা না পারেন। আজকাল প্রায় সকলেই বড় গলার ব্লাউস পরে থাকেন যার ফলে পিঠ ও বুকের অনেক অংশ খোলা থাকে। কিন্তু এটা বেশ ভাল করে বিচার করে নেওয়া উচিত যে তেমন ব্লাউস মানাচ্ছে কিনা। যাঁরা খুব রোগা শিরদাঁড়া উঁচু হয়ে উঠে থাকে, কিম্বা যথেষ্ট দোহারা নন, তাঁদের ব্লাউসের গলা গোল এবং ছোট হওয়া ভাল। গলা ও ঘাড় লম্বাটে হলে গলাবন্ধ কিম্বা উঁচু কলার দেওয়া জামা পরলে খুব স্মার্ট দেখায়। কিন্তু সাধারণত আমরা আধুনিক ফ্যাশানের স্রোতে ভাসি, আর একই ধরণে একই রঙের বাহারে মাতে থাকি। ফলে একজনকে সুশ্রী অথচ সেই একই পোষাকে অপরকে ভাল দেখায় না। এমন কি সময় সময় দৃষ্টিকটুও লাগে। তাই আমার মনে হয় নিজেদের চেহারা ও গড়নের উপর লক্ষ্য রেখে চলা আমাদের বিশেষ দরকার।

খুব বড় মুখে যেমন বিরাট উঁচু খোঁপা চলে না, ঠিক তেমনি খুব ছোট মুখেও উঁচু বড় খোঁপা অচল। এইভাবে প্রতিটি বিষয়ে সযত্ন বিচার ও বুদ্ধি রেখে সাজা উচিত।

আজকাল কৃত্রিম চুল ও খোঁপা প্রায় সবাই ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু আমার অনুরোধ, সেই চুল বেছে ও দেখে এমন কেনা উচিত যার ফলে নিজস্ব চুল খারাপ না হয়ে যায়। এছাড়া এইসব চুল, যদি ভালো জাতের না হয়, নিয়মিত ব্যবহার করাও ভাল না। চুল কিনে তা দিয়ে খোঁপা তৈরী করে ব্যবহার করা বেশী শ্রেয়। এমন চুল কেনা উচিত যা নিয়মিত ধোয়া যায়, আঁচড়ান যায় ও তেল ব্যবহার করা যায়। তার ফলে সেই চুলও আসল চুলের মতন দেখাতে থাকে। এই কৃত্রিম চুল কেনার সময় নিজের চুলের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে না কিনলে তা দেখাতে খুবই খারাপ লাগে। এমন অনেক সময় দেখা গেছে যে আসল চুলের রঙ কালো আর নকলের রং খয়েরী অথবা লালচে। তখন দুই চুলের বিন্যাস হাস্যকর দেখায়।

আধুনিক কেশসজ্জার সময় আজকাল দোকানে ও বাড়ীতে সব জায়গাতেই ল্যাকার বা আঠা জাতীয় এক রকমের জিনিস ব্যবহার করা হয়। চুলকে সংযত রাখার জন্য আর পরিষ্কার রাখার জন্য। এই ল্যাকার ভাল কোম্পানীর হওয়া একান্ত দরকার, না হলে চুল খারাপ হয়ে যায়। তাছাড়া আমার মনে হয় যথাসম্ভব কম ল্যাকার ব্যবহার করা উচিত। এছাড়া ল্যাকার ব্যবহার করার পর চুল যখন খোলা হয় তখন চিরুনি জোর করে চালিয়ে আঠা ছাড়ান কিম্বা জট ছাড়াবার চেষ্টা খুবই খারাপ। ধৈর্য ধরে আস্তে আস্তে চুলের জট ছাড়ান উচিত। ল্যাকার ওঠানোর জন্য বাটি করে জল নিয়ে আঙ্গুল ভিজিয়ে, আঙ্গুল দিয়ে আস্তে আস্তে চুলের ল্যাকার ছাড়াতে হয়। তারপর খুব সাবধানে চিরুনি কিম্বা ব্রাশ দিয়ে চুল পরিষ্কার করা উচিত। এরপর তোয়ালে ভিজিয়ে তা দিয়ে মাথা বেশ করে মুছে আঁচড়িয়ে চুল খুলে শোয়া ভাল। এতে চুল ভাল থাকে। পরদিন শ্যাম্পু করে ফেলা দরকার। এত হাঙ্গামার জন্যই বলছি খুব দরকার না মনে হলে এসব ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়।

এইখানে জেনে রাখা ভাল, চুলের ঐ জট সৃষ্টি হয় চুলকে উল্টো দিকে আঁচড়িয়ে জট জমবার তার ওপর চুল ভালভাবে আঁচড়িয়ে ফোলানোর জন্য কিম্বা উঁচু করার জন্য। এই ব্যাককোম পদ্ধতি বেশী দিন চল চালু হয়নি, তবে এর মধ্যেই তার ব্যবহার কমে যেতে শুরু করেছে। কারণ এর ফলে চুলের আগা ফেটে যাচ্ছে—চুল ভেঙ্গে ফেটে যাচ্ছে ও স্বভাবতই চুলের জাত নষ্ট হচ্ছে।

ঘাড় গলা ও কানের পেছনের অংশগুলি বিশেষভাবে নজর রেখে পরিষ্কার রাখা দরকার। অনেক সময় অনেক সুন্দরীরও ঘাড়ে গলায় ময়লা দেখতে পাওয়া যায়, এবং তা তাঁদের সৌন্দর্য কমিয়ে দেয়। নিয়মিতভাবে এই সব জায়গা পরিষ্কার ও মসৃণ রাখা বিশেষ প্রয়োজন। এর ফলে সৌন্দর্যপ্রিয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়।

প্রতিটি ছোট বড় বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখলেই সুন্দর হওয়া যায়। প্রকৃতির বুকে তো কতো রঙ, কতো রস, কতো আলো ছড়ানো আছে। সেগুলিকে ঠিক মত সাজিয়ে তুলতে পারলেই জন্মগত চেহারাটার ওপর রূপ জৌলুস আনা যায়। এবং আনাই উচিত। নারী যে সৌন্দর্যের প্রতীক।

—[illegible]

অঙ্গনা

বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আর বর্তমান সমাজ

তিন মাথা যার বুদ্ধি নেবে তার বাংলায় একটি চলতি প্রবাদ আছে অর্থাৎ কোন কাজের জন্য বৃদ্ধদের পরামর্শ নেওয়াই সমীচীন। যে বৃদ্ধদের পরামর্শকে এত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে—আমাদের সমাজে এই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের স্থান কোথায়?

বৃদ্ধ হলে অনেকেই শিশুদের মত হয়ে যান—তাঁদের সঙ্গে শিশু বয়সের আচার-আচরণে একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। শিশুর আবদার বা মর্জি শিশুর বাবা-মায়েরা সানন্দেই পালন করে থাকেন। অথচ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের চাহিদা বা আবদার মেটাতে ছেলে-মেয়ে বা ছেলের বৌয়েরা প্রায়ই উদাসীন নীরব। সেকারণেই আজকাল বৃদ্ধ বয়সের ভাবনায় আগের চেয়ে প্রৌঢ়েরা বেশী চিন্তিত।

কথাটা শুনতে অতি অপ্রিয় হলেও পেনসনভোগী অথবা কোনরকম আয় আছে বৃদ্ধদের পরিবারে যে স্থান সম্মান থাকে আয়বিহীন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের অবহেলাটাই কিন্তু প্রধান প্রাপ্য হয়ে দাঁড়ায় দিনকাল বদলের পরিবর্তন সবচেয়ে বড় কথা অর্থনৈতিক কারণে আমাদের যৌথ পরিবারগুলি ভেঙ্গে যাচ্ছে। সেখানে ছোট ছোট পরিবারগুলি মোটামুটি তিন চারজনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য চাওয়া-পাওয়া মেটাবার জন্যই গড়ে উঠছে। নিজেদের ছোট সংসারের দু'চারজনের কথা ভাবনার পর আত্মীয়স্বজন এমন কি নিজেদের বৃদ্ধ বাবা মায়েদের কথা ভাবনারও অবকাশ বা সুযোগ তাঁদের হয়ে ওঠে না। একান্নবর্তী পরিবারে পাঁচ-সাত ভাই পরস্পরের মোটামুটি সদ্ভাব রেখে একে অপরের সুযোগ-সুবিধা স্বার্থের প্রতি নজর রেখেই চলতেন সেখানে বৃদ্ধ বাবা-মায়েরা সসম্মানেই বসবাস করতে পারতেন। সব পুত্রেরাই সমানভাবে বাবা-মায়ের দায়-দায়িত্ব বহন করতে বাধ্য থাকতেন। একান্নবর্তী পরিবারে বৃদ্ধ বয়সের আশ্রয় প্রতিপালন করা অনেক সময়েই সম্ভব হতো কারণ সেখানে সংসারখরচের কোন প্রশ্ন নেই। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে ভাইয়েরা আর পরস্পর একসঙ্গে বসবাস করেন না বলে তাঁদের বৃদ্ধ বাবা-মায়েদের অবস্থা দিন দিন অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়ছে। তাঁদের ছেলেরা যত উচ্চপদস্থ হোন যত উপার্জন করুন না কেন একাধিক ভাই থাকলেই পিতা-মাতার দায়দায়িত্ব কে কত [illegible] আর একটা ছল অজুহাতে বাবা-মাকে কাছে এনে রাখতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। কোন পুত্র হয়তো তাঁর স্ত্রীর চাকুরীর ছলছুতোয় বাবা-মায়ের দায়িত্ব এড়িয়ে যান শুধুমাত্র কিছু দিয়ে। কেউ বা নিজেদের স্ট্যাটাস বজায় রাখতে বৃদ্ধ বাবা-মায়ের অর্বাচীনতাকে বেমানান মনে করেন। কেউ বা বদলীর চাকুরীর অসুবিধায় বাবা-মাকে সঙ্গে রাখতে রাজী নন। সেক্ষেত্রে বৃদ্ধ বাবা-মায়েদের পুত্রদের মর্জি মতো দানধ্যানে কোনরকমে দিন কাটাতে হয়। তাছাড়া পিতার অবর্তমানে বৃদ্ধা মা একলা পাড়াপ্রতিবেশীদের সহায়তায় ভরসায় একাই দিনযাপন করেন এ ঘটনাও আমাদের দেশে বিরল নয়। সুতরাং ভাগের বাবা-মায়ের প্রায়শই গঙ্গা পাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। ক্ষমতাবান ভাইও অক্ষম ভাই-এর অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে নিজেও যত কম সম্ভব বাবা-মাকে সাহায্য করে নিজের দিনকাল খারাপের কথা জাহির করেন। তখন তাঁরা ভুলে যান তাদের শিশু বয়স থেকে এই বাবা-মাই সযত্নে প্রতিপালন করে যথাযথ শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে আজকের দিনে তাঁদের সুপ্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছেন। যে বৃদ্ধ বাবা-মায়েরা একটি মাত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন এ ব্যাপারে তাঁরা কিছু কিছু বিপরীত ফল পান। অধিকাংশ সময়ই তাঁরা পুত্রের সঙ্গে একত্রে বসবাস করার সুযোগের অধিকারী হন। আবার পুত্রের সঙ্গে মনোমালিন্যের জন্য বিচ্ছিন্ন জীবনযাপনেও বাধ্য হন। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে যৌথ পরিবারে বাবা-মাকে দেখার দায়িত্ব যেখানে সব ছেলে ও তাঁদের বৌদের ওপর ন্যস্ত থাকতো সেখানে ছোট পরিবারে লোকাভাবেও অনেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কাছে রাখতে আতঙ্কিত হন।

এই বৃদ্ধদের মধ্যে ব্যতিক্রম আছেন—যাঁদের বৃদ্ধ বয়সেও কিছু কিছু আয় আছে। আয়-এর জন্যই হোক অথবা নিজেদের নিজেদের খরচ চালাতে সক্ষম বা আয়ের অর্থ সবটাই ছেলে এবং ছেলের বৌ-এর হাতে তুলে দেন বলেই পরিবারে তাঁদের একটা বিশেষ স্থান থাকে। পরিবারের আদর এবং সেবা-যত্ন অনেক সময়েই তাঁরা অর্থের বিনিময়ে আদায় করতে সক্ষম হন।

পরিবারে সম্মান এবং বৃদ্ধাদের মান-সম্মান আদরেরও অভাব থাকে না যদি তাঁরা হাতে পায়ে ভাল থাকেন। সংসারের কাজে বৃদ্ধা শাশুড়ীকে অনেক সময় ছেলের বৌয়েরা নিজেদের কাছে রাখেন নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে।

বৃদ্ধ বয়সে মানুষ একটু গল্প করতে ভালবাসেন বিশেষ করে অতীতের ঘটনাবহুল জীবনকে বারবার স্মরণ করে তাঁরা শান্তি পান। কারু কারু অতীতের ঘটনা এমন উল্লেখযোগ্য যে বর্তমানের ছেলেমেয়েরা বিশেষ করে নাতি-নাতনীরা সব সময় গল্প শোনার জন্য ভীড় করে থাকেন। সেখানে বক্তা ও শ্রোতাদের নিজের শৈশবের দৌরাত্ম্য কৈশোরের রোমাঞ্চকর অভিযান যৌবনের বীরত্ব নিপুণভাবে বর্ণনা করেন। তার ওপর যদি স্বদেশী আন্দোলনের কোন সক্রিয় অংশে যুক্ত থাকেন তবে শ্রোতাদের গল্প শোনার বায়নায় তিনি মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে ওঠেন। আবার একথাটাও লক্ষ্য করা যায় কোন কোন বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে দেখলে পরিবারের লোকজন বন্ধুবান্ধব এমন কি আত্মীয়-স্বজন এড়িয়ে যান। তাঁর গল্প শোনার ধৈর্য কারও থাকে না। হয় তাঁর গল্প বলার দক্ষতার অভাব না হয় তাঁর জীবনে রেখাপাত করার মত ঘটনা কিছু ঘটেনি। এক একটা সময় সকলের থাকে এখন ছেলেমেয়েরা রূপকথার গল্পকে নিছক কল্পনা অবাস্তব বলে জানতে শেখে স্বভাবতঃই তাদের এ গল্প শোনার আর ধৈর্য থাকে না। তারা চায় বাস্তবভিত্তিক কিছু ঘটনা যার মধ্যে শক্তি সাহস কিছু আছে। সেকারণে রূপকথা শুনিয়ে যে দাদু-দিদিমা তাঁদের নাতি-নাতনীদের এক সময় মন ভরিয়ে রাখতেন আস্তে আস্তে সে বয়স ছোটরা কাটিয়ে উঠলেই বৃদ্ধরা তাদের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে আঘাত পান।

বার্ধক্য মানুষের জীবনের পরিণতি একে এড়ানো কারও পক্ষে সম্ভব নয়। আজ যাঁরা বার্ধক্যকে অবহেলা করে উদাসীন আছেন তাঁদের জীবনেও একদিন এই চরম দিন আসবে। সেদিনের সেই চিন্তায় ও আজকের সমস্যায় বৃদ্ধদের প্রতি যত্নবান হবেন। তা ছাড়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা তো আমাদের আপনার জন—কারো বাবা-মা কারো বা দাদু-দিদিমা। একদিন তাঁরা আমাদের মত জীবনীশক্তিতে ভরপুর ছিলেন আজ তাঁদের শেষ কটা দিন নিজেদের কাজ স্বীকার করেও সুন্দর ব্যবহার ও আন্তরিকতায় তাঁদের উৎফুল্ল রাখতে চেষ্টা করতে পারি।

—অঞ্জলি চৌধুরী

অবনীশের কোলে মাথা রেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে শ্বেতা। উদগত কান্নার বেগ চাপতে গিয়ে ঠোঁট দুটো কেঁপে ওঠে শুধু। বাগ মানে না, শেষ পর্যন্ত বাঁধ ভেঙে যায়। অবনীশ ভেবে পায় না এই মুহূর্তে তার কি করা উচিত। কী বলে সান্ত্বনা দেবে।

ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে শ্বেতা। অবনীশ কিছু বলতে পারে না, মাথায় হাত বুলোয় শুধু।

কাঁদুক, কেঁদে মনটাকে একটু হাল্কা করুক। শেষ থেকে যেখানে শুরু জীবনের সব কিছুই সেখানে নিরর্থক দুর্বিসহ বোঝা।

জামাইবাবু ?

অ্যাঁ ? একটু কথা বলবার সুযোগ পায় অবনীশ দরদভরা চোখে শ্বেতার মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলে, আমায় কিছু বলবে ?

আমার এখন কি হবে জামাইবাবু ? অবনীশের মুখের দিকে করুণভাবে তাকায় শ্বেতা।

বিব্রত বোধ করে অবনীশ। চট করে এর কী জবাব দেবে সে। অথচ কিছু বলা দরকার। [illegible] সংসারের অবহেলা আর সমাজের উদ্যত শাসন হাত ধরাধরি করে জোর কদমে ছুটে আসছে। হয়তো একটা কিছু অনর্থ ঘটিয়ে বসবে এক্ষুনি।

নিজের কোন শ্যালক শ্যালিকা নেই বলে স্ত্রীর মাসতুতো বোন শ্বেতাকেই আপন শ্যালিকার মর্যাদা দিয়ে এসেছে এতদিন, কিন্তু এ কি হল !

চা আর বিস্কিট নিয়ে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন অমিতাদেবী। মেয়ের অসহায়তা আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে যেন পাথর হয়ে গিয়েছিলেন তিনি ভুলে গেলেন চা দিতে। নাঃ এখন আর এ চা দেবার কোন মানে হয় না, জুড়িয়ে একদম জল হয়ে গেছে। ফের গরম করে আনতে হবে।

ফিরে যাবার জন্য পা বাড়াতেই দেখতে পেয়ে অবনীশ বলে ওঠে আমি চা খাব না মাসিমা বরং ওকে নিয়ে একটু বেরিয়ে আসি। বেড়াবে না ছাই যাবে ডকটর সেনের নার্সিং হোমে। এক্ষুণি একটা কিছু করা দরকার। মনোজবাবুটা একটা স্কাউন্ড্রেল, ছুই না......ছিঃ ছিঃ, এখন ভয়ে পালিয়েছে।

শ্বেতাকেও বলিহারি যাই বাবা। আর যা-ই হোক তুমি তো কচি খুকিটি নও।

যাক গে, যা হবার হয়ে গেছে যা বলবার নয় তাই-ই হয়েছে। এখন জান না বাঁচলেও মান বাঁচানো দরকার।

নার্সিং হোমের সামনে এসে থমকে দাঁড়ায় অবনীশ, সে ভুল করেছে; এভাবে

আসাটা ঠিক হয়নি। তাকে পুলিশে হ্যাণ্ড-ওভার করাতে পারে। দুচার ঘা খাবার পর ট্রায়াল। পরে হয়তো বেল। সময় লাগবে। লোক জানাজানি হবে; অফিসের কলিগরা মুখ টিপে হাসবে। পাড়াপড়শীরা টিটকারি দেবে। রীতা সন্দেহ করবে। ওর সন্দেহ মন, গরল হলে আর রক্ষে নেই। তার চাইতে——

ঘুরে দাঁড়ায় অবনীশ, বিস্মিত হয়ে শ্বেতা বলে, কি হল অমাইবাবু?

না—মানে আজ থাক শ্বেতা; কাল বরং আসব। অফিসের একটা কাজে মিঃ দত্তর সংগে এক্ষুণি একবার দেখা করা দরকার। একদম খেয়ালই ছিল না আমার।

মিথ্যে কথা বলে অবনীশ। মুষড়ে পড়ে শ্বেতা। তবে কি—তবে কি ইনিও ঝুট ঝামেলার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য এড়িয়ে যেতে চাইছেন।

এতক্ষণ যাকে দেবতা বলে মনে হয়েছিল এই মুহূর্তে তাকে মনে হচ্ছে একটা ভীরু কাপুরুষ। মনোজের চাইতেও জঘন্য। ও তবু সাহস করে দুর্বুদ্ধি করেছিল, ভয়ে পেছোয়নি। কিন্তু মারের চোটে পালাতে বাধ্য হল। প্রেম প্রেমই। তা স্থান কাল পাত্র ভেদ কিংবা রাশি নক্ষত্র বিচার করে হয় না, হতে পারে না। যারা ভাবে তারা ভুল করে যেমন ভুল করেছে—

থাক সে কথা। এখন অসব চিন্তা করবার সময় নেই। অপরিণামদর্শিতার ফল হাতে হাতেই ফলেছে।

অবনীশ বলে, কাল আবার আসব কাল একটা ব্যবস্থা করবই। ভেবো না। তবে বেরুবার আগে তোমাকে—

চোখের জল মুছে শ্বেতা বলে থাক, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। রেল লাইন এখান থেকে খুব বেশী দূরে নয়। আপনি যান।

শিউরে ওঠেন অমিতাদেবী, হয়তো ডুকরে কেঁদেই উঠতেন। তাঁর একমাত্র মেয়ে—মানে একমাত্র সন্তান শ্বেতা। ওকে চার বছরের রেখে ওর বাবা মারা যান; আর সেই থেকে কত কষ্ট করে ওকে বড় করে তুলেছেন অমিতা দেবী। হায়ার সেকেণ্ডারী পাশও করিয়েছেন। অবিশ্যি শ্বেতার পাশ করবার মূলে যার অবদান সব চাইতে বেশী তার নামোচ্চারণ করতেও আজ ঘৃণা বোধ হয়।

অবনীশ বলে, তুমি ভুল বুঝোনা শ্বেতা শোন। কাছে এগিয়ে গিয়ে কানে কানে যেন কি বলে। শ্বেতা বোধহয় একটু আশ্বস্ত হয়, অপসৃত হয় মনের কালিমা। অমিতা দেবী অবিশ্যি কিছু শুনতে পাননি, বুঝতেও পারেন নি কিছু। একটা চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন।

কদিন যাবৎ শ্বেতাকে নিয়ে দৌড়ঝাঁপ করায় শরীরটা একটু ক্লান্তই লাগে অবনীশের। বাড়িতে ফিরে একটু সকাল সকাল খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়।

রীতা বলে কদিন ধরে একটা কথা বলব বলব করে আর বলবার সুযোগ পাইনি।

অবনীশ হেসে বলে, বলো না কি বলবে?

শ্বেতাকে নিয়ে এত মাতামাতি করবার কোন মানে হয় না। যতসব আদিখ্যেতা।

ক্ষুণ্ণ হয় অবনীশ। তবশ বলে তুমি বুঝতে পারছ না শ্বেতা—

থাক, বাধা দেয় রীতা বুঝি কি আর না? সব বুঝি। আমি পুরোনো হয়ে গেছি।

যেন কঁকিয়ে ওঠে অবনীশ, ছিঃ রীতা ছিঃ। মনটাকে অত ছোট কোর না।

ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে রীতা, বলে মন আমার ছোট নয় মোটেই—একথা শুধু তুমিই বললে, আর কেউ বলেনি কোনদিন।

শ্বেতা তোমার ছোট বোন, শান্তভাবে বলে অবনীশ।

ছোট বোন বলেই তো শত্রুতা করছে! নিজের মুখ পুড়িয়েছে, এবার আমার ঘর ভাঙ্গবে।

আমাকে তুমি অবিশ্বাস কর রীতা?

ভরসা পাচ্ছি কৈ। দিনকে দিন তুমি যেন কী রকম হয়ে যাচ্ছ।

ওটা তোমার মনের বাতিক।

কথাবার্তা আর বেশীদূর এগোয় না। রীতা গম্ভীর হয়ে যায়। অবনীশও অফিস-কাছারি করে বেড়াতে যায় আর কম সময় ঘরে থাকে। সন্দেহ বেড়ে যায় রীতার।

দেহের কোন অংশে একবার বিষ ঢুকলে তা ধীরে ধীরে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে, মিশে যায় প্রতি রক্ত কণিকায়। রীতার মনে বিষক্রিয়া শুরু হয়েছে, অবনীশের সব কাজে এখন খুঁত ধরে, দোষ দেখে। বায়ু কোণে মেঘ দেখা দেয়।

মনের ঝড় প্রাকৃতিক ঝড় থেকেও ভয়ঙ্কর। সব কিছু তছনছ করে দিতে পারে এক মুহূর্তে। রীতার মনে যে ঝড় উঠেছে তার গতিবেগের সামনে অবনীশ দাঁড়াতে পারে না সামান্য খড় কুটোর মত উড়িয়ে নিয়ে যায় দূরে—অনেক দূরে।

আবার সেদিন ছুতোনাতা নিয়ে খিটিমিটি শেষ পর্যন্ত চরমে পেঁছোয়। অবনীশ ক্ষিপ্ত হয়ে বলে ওঠে, তুমি নীচ জঘন্য। কোন ভদ্রঘরের মেয়ে যে এত হীন হতে পারে তা আমার জানা ছিল না।

রাগে ফেটে পড়ে রীতা—কী, কী বললে তুমি? আমি ছোটলোকের মেয়ে? বাপ তুললে তুমি?

—ভুল করছ তুমি, আমি বাপ তুলিনি।

—ঐ হল। যার নাম চাল ভাজা তার নামই মুড়ি। আমি নুন দিয়ে ভাত খাই।

আবহাওয়াটা একটু হাল্কা করে দেবার উদ্দেশ্যে অবনীশ বলে চড়কডাঙ্গা গিয়ে ক-দিন থেকে এলে পার, বহুদিন তো যাও না।

দরদ যে উথলে পড়ছে, বলে রীতা। আমি বাপের বাড়ি গেলে ওকে সরাসরি এনে ওঠাতে পার, নয়? অভিসারের সুবিধে হয়! আমি যাব না।

বেশ, না যাও থাকো। বিরক্ত হয় অবনীশ। আমাকে জ্বালিও না।

এরপর থেকে দুজনার কথাবার্তা এক-রকম বন্ধই বলা যায় যেটুকু হয় তা ভাব-বাচ্যে এবং বাচ্চাটিকে মাধ্যম করে।

পরদিন যথারীতি অফিসে যায় অবনীশ। চান সেরে কাপড় পরতে পরতেই শুনতে পায় রীতা ছেলেকে বলেছে তোর বাবাকে বল—ভাত দেওয়া হয়েছে। এক বছরের ছেলে যে বলতে পারবে না তা রীতা বেশ ভাল করেই জানে। তাই একটু জোরে জোরে বলে যাতে অবনীশ শুনতে পায়।

মনে মনে হাসে অবনীশ, কী বিচিত্র এই নারীমন! এদের মনে হিংসেটা বোধহয় একটু বেশী থাকে। তা না হলে নেহাৎ সন্দেহ বশে ঝুটমুট একটা অশান্তির সৃষ্টি করবার কোন মানে হয়?

অফিস থেকে ফিরতে সেদিন বেশ একটু দেরীই হয়েছিল অবনীশের। ফিরবার পথে একবার শ্বেতাদের বাড়ি হয়ে এসেছে। ওর মার হাঁপানীর টানটা বড্ড বেড়েছে। খবর পেয়েও না যাওয়াটা অন্যায় হত। ফিরে এসে দেখে ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে। ব্যাপার কি! রীতা কি চড়কডাঙ্গা চলে গেল নাকি? কিন্তু একা তো যায় না কখনো। আজকালকার মেয়ে হয়েও চলা-ফেরায় অতটা পটু নয়। দিল-মেজাজ জানা না। হয়তো পাশের বাড়ি একটু বেড়াতেও গেছে। এত রাতে বেড়ানো তো ভাল কথা নয়। কিন্তু না, রীতা পাশের বাড়িও যায়নি পাশের বাড়ি চাবি রেখে বাপের বাড়ি গেছে।

অবনীশ ঘর খুলে দেখে রাতের খাবার —রুটি-তরকারী ঢাকা দেওয়া আছে, পাশে এক গ্লাস জল।

হাতমুখ ধুয়ে এক কাপ চা খেতে ইচ্ছে করছিল অবনীশের, কিন্তু উপায় নেই। রীতা কোথায় কি রাখে তা জানে না অবনীশ। হীটারটা জ্বালিয়ে অনায়াসে এক কাপ চা করা যেত।

ঘরের দরজায় তালা দিয়ে কলোনীর মোড়ে মমুর দোকানে গিয়ে এক কাপ চা খায় অবনীশ, আর দুটো বিস্কুট। তারপর আড্ডা মেরে ঘরে ফেরে রাত প্রায় সাড়ে দশটায়। এসেই শুয়ে পড়ে, খায় না কিছু। খেতে মন চায় না। ভেবে দেখা যাক রাগ কদিন থাকে। থাক না যতদিন খুশি, কিন্তু মন খারাপ লাগে ছেলেটার জন্য।

একদিন, দুদিন তিনদিন—রীতা আর ফেরে না—অবনীশ রান্না করতে জানে না, দু-বেলাই হোটেলে খায়। চারদিনের দিন অফিস ফেরত অবনীশ গিয়ে হাজির হয় শ্বশুর বাড়ি, অবিশ্যি একটু আগেই বেরোয় সেদিন। সেধে রীতাকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে। এরকম করলে লোকে কি বলবে? তাছাড়া ছেলেকে ছেড়ে থাকতেও পারে না সে।

চড়কডাঙ্গা গিয়ে দেখে জগদীশবাবু অর্থাৎ অবনীশের শ্বশুর মশাই বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন, আর কি যেন আণ্ডার লাইন করছেন। অবনীশকে দেখে বললেন, ওরা কেউ বাড়ি নেই। হাবড়া গেছে। কখন ফিরবে কিছু ঠিক নেই।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে অবনীশ। ফিরবে তো আজ তা সে যত রাতই হোক। থেকেই যাবে না হয় সে। ভোরে উঠে ওদের নিয়ে চলে যাবে, নয়তো অফিস কামাই করবে কাল। অনেক ছুটি পাওনা আছে। প্রতি বছর নষ্ট হয়ে যায়।

প্রায় ঘন্টাদেড়েক বোকার মত চুপচাপ বসে থাকবার পর ওরা এলো। টের পেয়ে অবনীশ ঘরে ঢুকতে যাবে এমনি সময় চোখাচোখি হতেই ভ্রূ কুঁচকে যায় রীতার বলে কাপড় ছাড়ব। অবনীশ বলতে যাচ্ছিল —ছেলেটাকে দাও। রীতা দুম করে দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

কিছুক্ষণ পরে শাশুড়ী এক কাপ চা আর দুটো বিস্কিট দিয়ে যান, ভাল মন্দ কোন কথাই বলেন না। মনে হল যেন কোন এক অপরিচিত ভদ্রলোক জগদীশবাবুর কাছে এসেছেন। নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে চা দিতে হয় তাই দেওয়া। অবনীশ কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারে না, নতুন ব্যবস্থায় একটু দমে যায়।

শ্বশুরবাড়ির বৈঠকখানায় বসে চা খাওয়া অবনীশের এই প্রথম। এখানে বসে কোন সময় চা খেতে চাইলেও উনি দিতেন না। জামাই বলে কথা। তা-ও একটামাত্র জামাই। বাইরের ঘরে বসে চা খাবে কেন? আজ কিন্তু ঠিক তার উল্টো ব্যবস্থা।

চায়ের পেয়ালায় মুখ ঠেকাতে পারে না অবনীশ। এলোমেলো চিন্তা এসে মাথায় ভিড় করতে থাকে। খবরের কাগজ থেকে মুখ না উঠিয়েই জগদীশবাবু বলেন, তোমার ট্রেন কটায়?

কানে ভুল শুনছে না তো অবনীশ। এখানে এলে যিনি সবচাইতে খুশী হতেন, মনের যত জমানো কথা উজার করে দিতে চাইতেন, চটে যেতেন থাকতে না চাইলে—বলতেন, এখান থেকে দুচারদিন আপিস করো না। লোকে তো সেই বর্ধমান কিংবা কৃষ্ণনগর থেকেও ডেইলী প্যাসেঞ্জারী করে। এ তো মাত্তর সাত আটটা ষ্টেশনের মামলা। কখনো কখনো কথায় এত মশগুল হয়ে যেতেন যে শাশুড়ী অনেক সময় রেগে যেতেন। ছেলেটাকে একটু বিশ্রাম করতেও দেবে না নাকি? এলেই যত রাজ্যের কথা শুরু হয়ে যায়।

পায়ের তলার মাটি যেন এবড়ো খেবড়ো উঁচু নীচু মনে হয় অবনীশের। চোখ দেখাতে গিয়ে ডার্করুম থেকে বেরুলে যে অবস্থা হয় ঠিক সেই রকম—সামনের রাস্তা অসমান আর অসমতল ঠেকে।

অবনীশ ঢোক গিলে বলে না—মানে, ওদের নিয়ে যেতে এসেছি।

ওরা এখন যাবে না, এখানেই থাকবে। তুমি যাবে তো চল। আমিও ষ্টেশনের দিকে যাচ্ছি।

অবনীশের ইচ্ছে হচ্ছিল চলে যায়। কিন্তু ছেলেটাকে না দেখে, ওকে একটু আদর না করে যেতে মন চায় না। পকেটে চকোলেট। আবার গিয়ে দেখে বাইরে থেকে ঘরের শেকল টানা, ঘরে কেউ নেই। রান্না ঘরে উঁকি মেরে দেখে শাশুড়ী রাতের খাবারের জোগাড় করছেন। অবনীশকে দেখেও যেন দেখলেন না। ঘুমের মানুষকে সজাগ করা যায়, কিন্তু যারা জেগে ঘুমোয় তাদের সজাগ করা যায় কখনো?

রাগে অপমানে মুখ লাল হয়ে ওঠে অবনীশের। কিছু একটা কড়া কথা শোনাতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু না, কিছু বলে না; দাঁতে দাঁত চেপে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে যায় বাইরে, পকেটের চকোলেটগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেয় রাস্তায়।

বাসায় ফিরে আসতেই একটা লোক এসে খবর দেয় শ্বেতার মা হার্টফেল করেছেন এক্ষুনি যেতে হবে অবনীশকে। কি আর করা যায় অগত্যা—

কাজকর্ম সব চুকে বুকে গেলেও একটা সমস্যা এসে উঁকি দেয়। শ্বেতা এখন যাবে কোথায়? জগদীশবাবুর বাড়িতে যে স্থান হবে না তার আভাস আগেই পাওয়া গেছে, অন্য কোথাও যেতে চায় না শ্বেতা; তা ছাড়া যাবার জায়গাও নেই। রীতা বাড়িতে নেই। ওদের কাজের সময়ও যায়নি। জগদীশবাবু গিয়েছিলেন। যেতে হয় বলেই গিয়েছিলেন হয়তো। দু-একটা দরকারী কথা ছাড়া আর কোন কথা বলেন নি, বলতে বোধহয় চানও নি। এহেন অবস্থায় শ্বেতাকে নিয়ে যাওয়া সমীচীন কিনা সেটা ভাবতে হবে বৈ কি! তবু শ্বেতাকে নিয়ে যেতে হল নিজের বাসায়। পাড়াপড়শীরা সবাই ধরলে, কিন্তু ভেতরের খবর তো আর কেউ জানে না। ওপরে থুতু নিক্ষেপ করলে তা নিজের গায়েই এসে লাগবে। অবনীশ নিয়ে যায় শ্বেতাকে। যাকগে, হোটেল মারার হাত থেকে বাঁচা গেল। রীতা কবে ফিরবে কে জানে?

শ্বেতা সোমত্ত মেয়ে, বোন বাড়িতে নেই—ভগ্নীপতি বয়সের ছেলে। পাড়ায় কানা-ঘুষো হতে আর দেরী হয় না। অবনীশ ও

শ্বেতাকে নিয়ে এক মুখরোচক কাহিনী গড়ে ওঠে। শ্বেতার সম্বন্ধের খোঁজ করতে থাকে অবনীশ। পুত্রবাও বার কয়েকটা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নো প্রাপ্তা; চিঠি দেবে বলে আর দেয় না। কোন বাড়িতে নেই—অবনীপতির কাছে থাকে। ব্যপারটা যেন কী রকম গোলমেলে। এইজন্যে অনেকের আপত্তি।

শ্বেতা বিব্রত বোধ করে, বলে আমাকে নিয়ে তো আপনি বিপদে পড়লেন যা হোক।

বিপদ আর কি! ম্লান হাসে অবনীশ, বলে ওদের থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেবার ওষুধও জানা আছে আমার।

মনস্থির করে ফেলে অবনীশ, রীতাকে চিঠি দেয়। যদি ফিরে আসে তাহলে অবনীশ গিয়ে নিয়ে আসতে রাজী আছে, না এলেও যেন জানায়। কিন্তু চিঠির কোন জবাব আসে না। শেষে রেজিস্টি করে উকিলের চিঠি দেয়। তাও রিফিউজড মার্কড হয়ে ফিরে আসে। উপায়ান্তর না দেখে একটা দিন দেখে শাস্ত্রমতে বিয়ে করে শ্বেতাকে।

দিন যায় রাত আসে। রাত কাটে দিন হয়। ঘুরে যায় প্রায় একটি বছর। অবনীশের মনের উৎসাহ দিন দিন কমে আসে, মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। শরীরও খারাপ হয়। উঃ কতদিন ছেলেটাকে দেখে না! বিয়ের পরেও গিয়েছিল কয়েকবার। শেষবার তো যাচ্ছেতাই অপমানিত হতে হয়।

অবনীশের ভাবগতিক লক্ষ্য করে শ্বেতা বলে, দেখতে যখন দেবেই না তখন আর অপমানিত হতে যাওয়া কেন?

অবনীশ বিরক্ত হয়ে বলে, তুমি বুঝবে না শ্বেতা ও আমার কত স্নেহের মাণিক।

না, বুঝব কেন শ্বেতা অভিমানের সুরে বলে তোমার মন যদি ওখানেই পড়ে থাকবে তাহলে আর আমাকে লোক দেখানো বিয়ে না করলেই হত। আমার ছেলেপুলে হলে বোধহয় ওদের ভালবাসতেও পারবে না।

আহত হয় অবনীশ, বলে সে সম্ভাবনা আর নেই।

মানে, গর্জে ওঠে শ্বেতা। কী বলতে চাও তুমি? আমার কি ছেলেপুলে হবে না কোনদিন?

আমার হাতে না পড়লে হয়তো হত।

তার মানে?

মানে অতি সোজা, আমি না হওয়ার ব্যবস্থা করিয়ে রেখেছি।

শ্বেতা কি বোবা হয়ে গেল নাকি? কিছুক্ষণ কোন বাক্যস্ফুরণই হয় না ওর দেহের সমস্ত রক্ত যেন হিম হয়ে জমাট বেধে গেছে। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, আমাকে জব্দ করাই কি তাহলে তোমার উদ্দেশ্য ছিল?

নির্লিপ্তভাবে বলে অবনীশ, না বাঁচানো।

একে কি বাঁচানো বলে?

তোমার বিবেককেই জিজ্ঞাসা কর।

মরীয়া হয়ে ওঠে শ্বেতা, আজই এর একটা হেস্তনেস্ত করা দরকার। সাধে কি দিদি চলে গেছে! তীক্ষ্নস্বরে বলে, হেঁয়ালি রাখ স্পষ্ট করে বল।

ডাক্তার সেনের নার্সিং হোমের কথা এরই মধ্যে ভুলে গেলে?

সে তো আমার জন্য।

প্রথম দিন ফিরে এসেছিলাম তা মনে আছে?

আছে, তুমি ভয় পেয়েছিলে।

ম্লান হাসে অবনীশ, বলে হ্যাঁ ভয় পেয়েছিলাম বৈকি! তাইতো পরের দিন তোমাকে সিঁদুর পরিয়ে নিতে হল। সব দিক বজায় রাখতে গিয়ে শেষপর্যন্ত আমাকেই ব্যবস্থা নিতে হয়েছে—মিথ্যে কথা বলে।

রাগে ফুঁসতে থাকে শ্বেতা। সে রাত্তে আর কিছু খায় না অবনীশের সঙ্গে কথাও বলে না। মেঝেতে একটা মাদুর পেতে রাত কাটিয়ে দেয়। পুরুষ মানুষকে চেনা ভার। ওখানে টাকা পয়সাও দেয় বোধ হয়। তা, না হলে প্রায়ই টান পড়ে কেন?

ইদানীং শ্বেতা অবনীশকে এড়িয়ে চলতে চায়, বেড়াতে বেরোয় যখন তখন। কখনো শ্যামবাজার আবার কখনো বা দূরে—অনেক দূরে। প্রায়ই রাত করে ফেরে। হঠাৎ একদিন মনোজের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। প্রেমোশন হয়েছে তার। ফুল ফ্লেজেড অফিসার। মনের আগল খুলে যায়। দুজনায় তখন বোকামী না করলে ঘটনার গতি অন্যরকম হত এবং তা এখনো হতে পারে।

অবনীশ বাড়িতে না থাকলে প্রায়ই আসে মনোজ, কত কি শলা-পরামর্শ হয় বাড়ি থাকলে বেরোয় শ্বেতা। অবনীশ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলে সব সময় কৈফিয়ত ভাল লাগে না। অবনীশ চুপ করে যায়, কিন্তু লক্ষণ ভাল ঠেকে না মোটেই।

সিনেমার নাম করে বেরিয়ে সেদিন আর বাড়ি ফেরেনি শ্বেতা। পরের দিনও না এবং তার পরের দিনও নয়। একটা অব্যক্ত ব্যথায় বুকটা টনটন করতে থাকে অবনীশের—একটা দৃশ্যের পুনরভিনয়? যাকগে আপদ গেছে।

আবার হোটেলে খাওয়া, আবার একলা থাকা একটা বাড়ি আগলে। মেসেও যেতে পারে না, রীতা যদি—থাকগে ওসব অবান্তর ভাবনা।

বিছানা ঠিক করতে গিয়ে হঠাৎ বালিশের তলায় একটা চিরকুট পায় অবনীশ। তাড়াতাড়ি চশমাটা চোখে দিয়ে এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলে সেটা—কয়েকটা মাত্র শব্দ—আমার খোঁজ কোর না।'

বিতৃষ্ণা আসে জীবনে। হায়রে, দুনিয়ায় যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর? ধুত্তোর।

নিজের অজান্তেই নিজের ওপর অবিচার ও অত্যাচার চালিয়ে যায় অবনীশ। প্রথমে তা টের পায় নি, কিন্তু টের যখন পেল তখন আর সময় নেই। হোটেলে খেয়ে আর অনিয়ম করে গ্যাসট্রিক থেকে গ্যাসট্রিক আলসার এবং শেষ পরিণতি ক্যানসার। অবনীশ বুঝতে পারে তার দিন ফুরিয়ে এসেছে।

বন্ধুবান্ধবের চেষ্টায় যদিও বা চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হসপিটালে একটা সীট পেল তা আর কাজে লাগল না। বড্ড দেরী হয়ে গেছে।

খবর পেয়ে ছুটে আসে রীতা, বাচ্চাটিকেও সঙ্গে নিয়ে আসে। কতদিন ওকে দেখতে গিয়ে ও অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছে।

রীতার মা-বাবাও এসেছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। বুকের ওপর আছড়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে রীতা, চীৎকার করে কাঁদে ওগো, অভিমান করে চলে যেও না। তোমাকে জব্দ করতে গিয়ে আমিও কম শাস্তি পাইনি। এই দেখ তোমার বাবুয়া। ও এখন বাবা ডাকতে শিখেছে—আরো কত কথা বলে।

বাবুয়া কি বুঝল সেই জানে। ডাকে বা—বা। চোখের জলে ছেলেকে তাড়াতাড়ি বুকে চেপে ধরে রীতা।

গৌরীশঙ্কর মিত্র

সেকালের সঙ্গীতগুণী

(১৭)

সুরের সঙ্গতিয়া সারঙ্গী

সুরের কি সঞ্চরণ কি বিস্তার এই সারঙ্গ যন্ত্রে। গানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে তার সুরের ঝঙ্কার। কণ্ঠশিল্পীর সঙ্গে সারঙ্গীর সুরবিহার অঙ্গাঙ্গী মিশে গেছে। তাল লয়ের সঙ্গতকার যেমন তবলিয়া, সুরের সঙ্গতিয়া তেমনি সারঙ্গী। গানকে ভরে দিয়ে আসরকেও তিনি সুর-রণনে পরিপূর্ণ করে দিচ্ছেন।
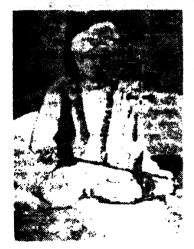
কিন্তু সামনে থেকেও সারঙ্গী যেন নেপথ্যচারী। বাইজী বা গায়কের পাশে বসেই সুরে সঙ্গত করছেন তিনি। কখনো গীতশিল্পীর দুদিকেই দুজন সারঙ্গবাদক আছেন। বাইজীর গানের আসর ত সারঙ্গী বিনা অঙ্গহীন। বাইজীর খেয়াল টপ্পা ঠুংরির সঙ্গে সারঙ্গের সঙ্গত সুরের জাল বুনে চলে। তেমনি খেয়াল গায়কের আসরেও। কিন্তু এমন সুরের ভাণ্ডারী সারঙ্গবাদকের যেন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। শ্রোতাদের মনে নেই তাঁর জন্যে কোন উপযুক্ত মর্যাদা এবং ধারণাও।

গানের সঙ্গে সারঙ্গের সুরের সঙ্গত নিরবচ্ছিন্ন। সারঙ্গীর সুরে বিরাম নেই। গানে সাময়িক বিরতি থাকে। গায়িকা কিংবা গায়ক বিশ্রাম নেন ক্ষণেক। কিন্তু সুরের ধারা অব্যাহত রেখে দেন সারঙ্গী। গানের প্রথম কলির মুখ তিনি কণ্ঠেরই অনুকরণে অনুরণন করে চলেছেন। শুধু তাই নয়। কখনো আভাস দিচ্ছেন নব নব সৌন্দর্যসৃষ্টির। রাগের চলনে নতুন পথের সন্ধান। গানের সহযোগেও তেমনি কণ্ঠের যাবতীয় কারুকর্ম যন্ত্রে লীলায়িত করছেন। যে কোন তান বা বিস্তার হোক, তিনি তখনি তা দেখান সারঙ্গে। এমন কি গায়ক গায়িকার গানের আবেগ পর্যন্ত। আর এ যন্ত্রে সুরের কি রেশ। অনুধ্বনির কি ঐশ্বর্য। ৩৬টি তরফের তারে সুর-লহরীর কি বিপুল পরিধি। মূল তিনটি তাঁতে সঞ্চরমান অঙ্গুলি ও ছড়ের স্পর্শ। কিন্তু তার অনুধ্বনিতে ৩৬টি তারের ঝঙ্কার। সুরের কি সমারোহ সারঙ্গ যন্ত্রে। সেই সুরের কাণ্ডারী সারঙ্গীর প্রতিভা কি কণ্ঠশিল্পীর চেয়ে ন্যূন?

অথচ সারঙ্গী যথোচিত স্বীকৃতি অনেক সময়েই পান নি। সেকালের সঙ্গীতজগতে কত গুণী সারঙ্গী হারিয়ে গেছেন অখ্যাতির অন্ধকারে। অনেকের নাম পর্যন্ত বিস্মৃতির অতলে লুপ্ত হয়েছে।

তাছাড়া সফল সারঙ্গী কি কেবল সঙ্গতকার শুধু ছিলেন? সঙ্গীতকে প্রাণবন্ত, অবিশ্রান্ত রাখবার যন্ত্রী শুধু? না। তার চেয়েও বড় ভূমিকা ছিল কোন কোন গুণীর। বাইজী কিংবা গায়কের সঙ্গে ভিন্ন নিজস্ব আসরও করেছেন সারঙ্গী। তেমনি অনুষ্ঠানে স্বতন্ত্র কলাকাররূপেই তিনি দেখা দিয়েছেন। আসরে তখন তিনি একক বাদ্যকর। অনন্য-নির্ভর সঙ্গীত-শিল্পী। তখন তাঁর সঙ্গতকার হয়েছেন তবলিয়া। আসরের মূল শিল্পী হয়ে তখন সারঙ্গী গুণপনা দেখিয়েছেন। তবে তেমন দৃষ্টান্ত স্বল্প। বেশির ভাগ সারঙ্গীই সুরের সঙ্গতকার। গানের সহযোগী বাদক। সেই রূপেই তাঁদের পরিচয়।

হয়ত তার অন্তরালে থেকে গেছে তাঁদের আর একটি মহৎ পরিচিতি। যাঁর সুরের সঙ্গতকার হয়ে আসরে বসেছেন, হয়ত সেই গীতশিল্পীর ওস্তাদ তিনি। তাঁর শিক্ষাতেই সে কণ্ঠশিল্পী সঙ্গীতক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। তিনিই প্রস্তুত করে দিয়েছেন সেই গায়িকাকে। আসরে বাইজীর গানে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে শ্রোতারা তারিফ করেছেন। কিন্তু বাইজীর শিক্ষক সামনেই রয়েছেন সঙ্গতিয়া হয়ে। প্রশংসা-মুখর শ্রোতাদের কাছে পরিচয়বিহীন। অনেক সময় সারঙ্গীদের নাম পর্যন্ত আসরে অজানা থেকে যায়। শ্রোতাদের কোন আগ্রহ নেই তাঁদের প্রতি। বাইজীর পাশে বসেও প্রতিভার সাক্ষাৎ পরিচয় দিয়েও সারঙ্গীরা যেন নেপথ্যবাসী। তাঁদের শিক্ষকতার জীবন ত আরো অন্তরালবর্তী। তা শুধু চোখের আড়ালে নয়, জ্ঞানেরও বাইরে থেকে যায়। সঙ্গীত-জগতে উপেক্ষিত তাঁরা। সঙ্গীতচর্চার ইতিহাসে লুপ্ত-নামা।

তেমন সঙ্গীতসমাজের প্রান্ত-স্মৃতিতেও জীবন্ত নেই ওস্তাদ গৌরীশঙ্কর মিশ্র কিংবা কালী ওস্তাদের নাম।

সেকালের সুপ্রসিদ্ধ গায়িকা শ্বেতাঙ্গিনী কিংবা কৃষ্ণভামিনীর কথা যাঁরা জানেন, তাঁদের আসরে গান কিংবা রেকর্ড যাঁরা শুনেছেন তাঁরাও অনেকেই জানেন না যে গৌরীশঙ্করের শিক্ষাতেই গড়ে উঠেছে বাংলার ওই দুজন শ্রেষ্ঠা বাইজীর সঙ্গীতজীবন। তিনিই কৃষ্ণভামিনীকে [illegible] শিখিয়েছেন। গানে তাঁর সহযোগী থেকেছেন কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালিপ্রসাদ বা কালী ওস্তাদ। তাঁরা বাইজীদ্বয়কে শুধু তালিমই দেননি, শ্বেতাঙ্গিনী ও কৃষ্ণভামিনীর আসরে গায়িকার দুদিকে বসেছেন সুরের সঙ্গতিয়া হয়ে। শ্রোতারা তাঁদের আসরে আসরে সেই রূপে দেখেছেন। [illegible] করেননি তাঁদের। আর বিস্মৃত হয়েছেন তাঁদের গুণপনার কথা। তাঁদের সঙ্গীত-জীবনের পরিচয় জানবার কৌতূহলও বোধ করেননি।

কিন্তু গুণের বিচারে গৌরীশঙ্কর ছিলেন এক শ্রেষ্ঠ কলাবৎ। রাগসঙ্গীতের একজন আচার্যস্থানীয় ব্যক্তি। সঙ্গীতজ্ঞ সারঙ্গীরূপে পরম নির্ভর সহযোগী। সুরের শুধু সঙ্গতকার নন, তিনি উদ্বুদ্ধও রাখতেন গায়নশিল্পীকে। আবার একক সারঙ্গ বাদকের আসরে আপন শিল্পী-সত্তার পরিচয় দিতেন। রাগবিদ্যায় এবং বাদননৈপুণ্যে শিক্ষকতায় দেখাতেন সঙ্গীতজ্ঞানের বিপুল পরিধি ও বিচক্ষণতা। খেয়াল টপ্পা ঠুংরি টপ-খেয়াল থেকে কাজরি চৈতী লাউনী ইত্যাদি নানা-প্রকার গানের শিক্ষাদাতা। তাঁর শিক্ষায় গঠিত হয়ে গায়িকারা বিভিন্ন গীতরীতিতে পেশাদার জীবনে প্রতিষ্ঠিতা হতেন। নিজে সুকণ্ঠ গায়কও ছিলেন গৌরী-শঙ্কর। গান যাঁদের শেখাতেন, গেয়েই দেখিয়ে দিতেন। আর ভিন্ন ভিন্ন গানের সঞ্চয়ও ছিল তাঁর প্রচুর পরিমাণে। সেকালের পেশাদার গায়িকাদের [illegible] গানেই পারদর্শিনী হতে হত। এই ভিন্ন

রেওয়াজ। একটিমাত্র রীতিতে গায়ন-ক্ষমতা নিয়ে মুজরো করতে পারতেন না তাঁরা। তাঁদের ওস্তাদরাও নানামুখীন গুণী হতেন। গৌরীশঙ্কর মিশ্র তেমনি এক দিকপাল কলাকার।

একক সারঙ্গবাদক বলেও তাঁর সবিশেষ পরিচিতি ছিল। শুধু কলকাতায় নয় বাংলার বাইরের আসরেও। ওস্তাদজীর সুদীর্ঘ সঙ্গীতজীবনে কলকাতায় নানা আসরে তাঁর একক বাদন শোনা যায়। তাঁর শেষ বড় আসরও হয়েছিল জীবনের প্রায় অন্তিম পর্বে। সে অনুষ্ঠানও কলকাতায়। ২৫ জুলাই, ১৯৩৭ সালের কথা। সেবার মহাআড়ম্বরে ক্যালকাটা মিউজিক এ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক উৎসব হয়েছিল। দামোদরদাস খান্নার ১৭ বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটের বাড়িতে সেই জলসা। সেদিন শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন দানীবাবু নামে সুপরিচিত সতীশচন্দ্র দত্ত (ধ্রুপদ গান ও পাখোয়াজ বাদন) গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (ধ্রুপদ), হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল (খেয়াল) রামকিষণ মিশ্র (খেয়াল) খুশী মহম্মদ (হারমোনিয়ম), বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (বীণা) প্রভৃতি। আর একক সারঙ্গ বাজিয়েছিলেন গৌরীশঙ্কর মিশ্র। তাঁর বয়স ৭২।৭৩ বছর। কিন্ত বাদন-শক্তি ও নৈপুণ্য প্রায় পূর্ণমাত্রায় ছিল, কারণ তখনো স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়নি। তেমনি একক অনুষ্ঠান তিনি করতেন উপযুক্ত আসরে।

তার ৫ বছর আগে (১৯৩২) গৌরীশঙ্করের আর একটি বড় আসর হয় কাশীতে। কবীরচৌরা মহল্লায় সেদিন বিশেষ করে তাঁর জন্যেই সে আসর বসেছিল। তখন তিনি স্থায়ীভাবে কলকাতাবাসী। কাশীতে আর বেশি যাতায়াত হয় না। সেজন্যে তাঁর একক বাদন একবার ভাল করে শুনতে চান বারাণসীর নানা বিখ্যাত গায়ক বাদক গুণীজনেরা। গৌরীশঙ্করের সে আসরে উপস্থিত ছিলেন—খেয়াল টপ্পা কলাবৎ বড়ে রামদাস বীণকার মিঠাইলাল তবলিয়া মৌলবীরাম মিশ্র গায়ক ও সারঙ্গী ঠাকুরপ্রসাদ (গৌরীশঙ্করের খুল্লতাত), তবলিয়া ভিকরু মহারাজ (শান্তা প্রসাদের ওস্তাদ), তবলিয়া কণ্ঠে মহারাজ প্রমুখ। অনেকে। গৌরীশঙ্করের সারঙ্গ বাদনে সেদিন তাঁরা সকলেই পরিতৃপ্ত হয়েছিলো।

তাঁর আর একটি আসর হয়েছিল দিল্লীতে। তা আরো কম বয়সের কথা আর অন্য রকমের আসর। সেকথা বিশেষ করে বলবার মতন। কিন্তু তাঁর আগে তাঁর সঙ্গীতজীবনের অন্যান্য পরিচয় দিয়ে রাখা যায়।

গৌরীশঙ্করের জীবনে পঞ্চাশ বছরেরও বেশি অতিবাহিত হয় কলকাতায়। সেই দীর্ঘকালে আসরে আসরে সুরের সঙ্গতকার বলেই তিনি সুপরিচিত ছিলেন। শ্বেতাঙ্গিনী কিংবা কৃষ্ণভামিনীর গানের সঙ্গে নয় কেবল। বাংলার আর দুজন বিখ্যাত বাইজী কিরণময়ী ও সুরমার সঙ্গেও তিনি সারঙ্গ বাজাতেন। তাঁরা ছিলেন দুই ভগিনী। কিরণময়ী ও সুরমা অনেক সময়ে আসরে জুটিতে গাইতেন গৌরীশঙ্করের সারঙ্গ সহযোগে। ওস্তাদজীর সেসব প্রথম জীবনের কথা।

পরিণত বয়সেও তাঁকে নানা গায়ক-গায়িকার সঙ্গে সঙ্গীতিয়ারূপে আসরে দেখা গেছে। বারাণসীর প্রসিদ্ধা ঠুংরি-গায়িকা বড়ী মোতি বাই তখন আসতেন কলকাতায়। এখানকার আসরে তাঁর গানের সঙ্গে সেসময় গৌরীশংকরজী সারঙ্গ বাজাতেন। ইন্দুবালা এবং কৃষ্ণচন্দ্র দের সঙ্গেও নানা আসরে সংগত করেছেন তিনি। মেটিয়াবুরুজের মিহি কণ্ঠের গায়ক পিয়ারা সাহেবের গানের সঙ্গেও তিনি আসরে বাজিয়েছেন। গ্রামোফোন রেকর্ডেও কিছু চিহ্ন আছে মিশ্রজীর সারঙ্গের। কিন্তু তা একক বাদনের নয়। পিয়ারা সাহেব, ইন্দুবালা কৃষ্ণচন্দ্র দের কোন কোন গানের সঙ্গে তিনি সারঙ্গ বাজিয়েছেন গ্রামোফোন রেকর্ডে।

তবে সঙ্গীতীয়া, সারঙ্গী হিসেবে গৌরীশঙ্কর সবচেয়ে খ্যাতিমান হন গহর জানের আসরের জন্যে। বাংলায় এবং ভারতের নানা অঞ্চলে।

তবে তওয়ায়েফদের শীর্ষস্থানীয়া গহর জানের প্রধান সারঙ্গী তিনি। গহরজান দুই সারঙ্গী সংগতকার নিয়ে আসরে গান শোনাতেন। তাঁর বামে বসে বাজাতেন পাটনার এমদাদ খাঁ এবং দক্ষিণে গৌরীশঙ্কর। সেকালের আসরের রেওয়াজ অনুসারে ডাইনের সারংগবাদকের মর্যাদা বেশি ছিল। তিনিই অধিকতর গুণী বলে গণ্য হতেন।

জীবনের শ্রেষ্ঠ পর্বে মধ্যবয়সে গহর জানের খ্যাতি ছিল ভারতব্যাপী। উত্তর [illegible] থেকে কর্ণাটকে মহীশূর দরবারে পর্যন্ত তিনি মুজরো করতে যেতেন। আর উত্তর দক্ষিণের আসরে দরবারে তাঁর প্রধান সারঙ্গী হয়ে সঙ্গত করে আসতেন গৌরীশঙ্কর। পাটনা বারাণসী এলাহাবাদ লক্ষ্ণৌ রামপুর দিল্লী পাতিয়ালা কাশ্মীর বোম্বাই মহীশূর হায়দরাবাদ প্রভৃতি সর্বত্র।

সম্রাট পঞ্চম জর্জের দিল্লী দরবারেও (১৯১১) গহর জানের গানের সঙ্গে সারঙ্গ বাজান গৌরীশঙ্কর।

এমনিভাবে দেখা যায়, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তিনি একজন প্রথম সারির কলাবৎ বলে গণ্য হতেন। আর গহর জানের প্রধান সারঙ্গী—এই পরিচয়ও যথেষ্ট ছিল সেকালে।

যৌবনকাল থেকেই গৌরীশঙ্কর কৃতী হয়েছিলেন। আবাল্য বারাণসীতে শিক্ষা পেয়ে প্রথম জীবনেই যোগ দিয়েছিলেন বৃহত্তর সঙ্গীতক্ষেত্রে। যুবক বয়সে তাঁর সঙ্গীতজীবনের বৃত্তি নেপাল রাজ্যে আরম্ভ হয়েছিল।

কলকাতায় স্থায়ী হবার আগে তিনি নেপাল দরবারেও কিছুকাল সারঙ্গবাদক নিযুক্ত ছিলেন। তবে তা গহর জানের সঙ্গে নয়। গহরের সঙ্গে তাঁর বাদকজীবনের শুরু কলকাতায়।

গহর জানের সঙ্গে গৌরীশঙ্করের সাঙ্গীতিক যোগাযোগের প্রথম কারণ—গহরের অন্যতম সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন গৌরীশঙ্করের পিতা বেচু ওস্তাদ। দ্বিতীয় কারণ—গৌরীশঙ্করের নিজস্ব গুণ, নির্ভরযোগ্যতা। এমন সুর-সঙ্গতিয়া সে সময় আর কজনই বা ছিলেন।

সমকালীন সঙ্গীতজগতে তাঁর ছিল একটি নির্দিষ্ট সম্মানিত স্থান। আর গুণীমহলে তিনি সকলের স্নেহধন্য জীবন-যাপন করে গেছেন। সেকালের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের তিনি যে কত জনপ্রিয় ছিলেন, তার একটি প্রমাণ তাঁর জন্মাষ্টমীর আসর।

প্রতি বছর জন্মাষ্টমীতে গৌরীশঙ্কর একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠান করতেন। সেদিন সন্ধ্যা থেকে সারারাত গানবাজনা হত তাঁর বাড়িতে। জন্মাষ্টমীর সে জলসায় তাঁর সাদর আহ্বানে নানা শ্রেষ্ঠ শিল্পীরাই যোগ দিতেন। এমন কি মুসলমান গায়ক-গায়িকারা পর্যন্ত। পুরুষদের মধ্যে যেমন সরদী করামৎউল্লা খাঁ, লছমী ওস্তাদ, মৌজুদ্দিন প্রভৃতি তেমনি গায়িকাদের মধ্যে কলকাতা ও কাশীর কয়েকজন শ্রেষ্ঠা বাইজী। যথা—গহর জান আগ্রাওয়ালী মালকা ও চুলবুলাওয়ালী মালকা নূরজাহান যাদুমণি, সুরমা কিরণময়ী শ্বেতাঙ্গিনী কৃষ্ণভামিনী, কলকাতা নিবাসিনী লক্ষ্ণৌর প্রসিদ্ধা নর্তকী বাচুয়ার নৃত্যও হত। বারাণসীর বাইজীদের মধ্যে আসতেন বিখ্যাত গায়িকা হুসনা বাই বড়ী ময়না ময়না বাই প্রভৃতি।

কলকাতা ও কাশীর সঙ্গীতক্ষেত্রকে গৌরীশঙ্কর নিজের জীবনে যুক্ত করে রেখেছিলেন। তাঁর জন্মাষ্টমীর আসর ছিল তার একটি সূত্রকার।

কলকাতায় [illegible] একজন তাঁরই গৌরীশঙ্কর বাস করাতেন। গহর জান, শ্বেতাঙ্গিনী কৃষ্ণভামিনী

সুরমা, কিরণময়ী ও আরো নানা বাইজীর সঙ্গে কলকাতার আসরে সারঙ্গীরূপে দেখা যেত তাঁকে। কোন কোন আসরে এককও সারঙ্গ বাজাতেন। সেকালের নানা রঙ্গমঞ্চে মাঝে মাঝে জলসা হত, তাতেও যোগ দিতেন গৌরীশঙ্কর। কোন কোন মঞ্চে নাটকের মধ্যেও নেপথ্য বাদকের ভূমিকা নিতেন। সুরসৃষ্টি করতেন নাটকীয় পরিবেশে বিশেষ নাট্যমুহূর্তে। তাঁর শিল্পীমানসের এমনি অনেক দিক ছিল। অথচ সেসব কারণে তাঁর মূল সঙ্গীত-চর্চা, রাগসংগীতের অনুশীলন ব্যাহত হয়নি কোনদিন। আর বিভিন্নভাবে তিনি কলকাতার সঙ্গীতজীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য হয়ে দীর্ঘকাল বিদ্যমান ছিলেন।

মধ্যবয়স থেকেই একজন আচার্যের সম্মানে কলকাতার সংগীতজীবন যাপন করতেন গৌরীশঙ্কর। শ্বেতাঙ্গিনী ও কৃষ্ণভামিনীর তুল্য শ্রেষ্ঠা গায়িকারা যে তাঁর ছাত্রী ছিলেন সেকথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর সঙ্গীতশিক্ষা দানের কথায় আরো গৌরব করবার আছে। যেমন বাংলায় স্বনামধন্য গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে-ও গৌরীশঙ্করের কাছে তালিম নিয়েছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের আরো একাধিক ওস্তাদ ছিলেন, কিন্তু গৌরীশঙ্করও তাঁর অন্যতম সংগীত-শিক্ষকরূপে গণনীয়। মিশ্রজীর কাছে তিনি অনেক পেয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের সংগীত জীবনের যোগ ছিল দীর্ঘকালের। কৃষ্ণচন্দ্রের অনেক গানের আসরে গৌরীশঙ্কর সারঙ্গ সহযোগিতাও করতেন। তাঁর সঙ্গে ওস্তাদজীর যোগাযোগ ছিল জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত।

বিখ্যাত গায়িকা ইন্দুবালারও প্রথম ওস্তাদ গৌরীশঙ্কর। কলকাতায় বাংলা গানের শিল্পীরূপে ইন্দুবালা বেশি পরিচিত। কিন্তু বৃহত্তর সঙ্গীতক্ষেত্রে তিনি খেয়াল ঠুংরি প্রভৃতি রাগসঙ্গীতের গায়িকা রূপেও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। বাংলার বাইরে উত্তর ভারতের নানা কেন্দ্রে, দাক্ষিণাত্যের মহীশূর দরবারেও তাঁর খ্যাতি ছিল রাগসঙ্গীতের শিল্পীরূপে। সেই রাগসঙ্গীতের তালিম তিনি প্রথমে গৌরীশঙ্করের কাছেই নিয়েছিলেন মিশ্রজীর শিক্ষাতেই সম্ভব হয় তাঁর স্বরসাধনা ও কণ্ঠপ্রস্তুতি। সে প্রসঙ্গ ইন্দুবালা তাঁর স্মৃতিকথায় বর্ণনা করেছেন। সে বিবরণ থেকে বোঝা যায়, রীতিমত কণ্ঠসাধনাকে কতখানি গুরুত্ব দিতেন গৌরীশঙ্কর। সংগীতশিক্ষা দান করতে তিনি কিরকম নিষ্ঠাবান ছিলেন এসব কথাই ইন্দুবালার স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়। ইন্দুবালাকে গান শেখাতে ওস্তাদজী সম্মত হন একটি অনড় সর্তে। শিক্ষার্থিনীকে সে সর্ত স্বীকার করে নিতে হয় গুরুর উপবীত স্পর্শ করে। তা হল ওস্তাদজী যতদিন বিবেচনা করবেন তাঁর নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ছাত্রীকে শুধুমাত্র সার্গম সাধনা করে যেতে হবে। কোন গান তখন গায়িকা গাইতে পারবেন না, প্রার্থনাও করবেন না গুরুর কাছে। এইভাবে ছাত্রী মাসের পর মাস স্বরসাধনা করে গেলেন। বহু মাসের পরে গৌরীশঙ্কর সন্তুষ্ট হলেন পরীক্ষা করে। তারপর ইন্দুবালাকে গান দেবার জন্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালী ওস্তাদকে যথাবিহিত নির্দেশ দিলেন। তখন গান পেয়ে ছাত্রী দেখলেন যে কোন গান তিনি শিখতে সমর্থ হয়েছেন। একনিষ্ঠ কণ্ঠসাধনার ফল তখন বুঝতে পারলেন গায়িকা।

ইন্দুবালার সংগীতজীবনে গৌরী-শঙ্করের সঙ্গে সেই গুরু-শিষ্যার সম্পর্কের সূত্রপাত। তারপর থেকে সুদীর্ঘকাল ওস্তাদজীর সঙ্গে তাঁর গায়িকা জীবনে সহযোগিতা ছিল। পরে ইন্দুবালার গানের আসরে বহুবার সারঙ্গে সঙ্গত করেছেন গৌরীশঙ্কর। ইন্দুবালা সবাক ছায়াচিত্রেও যোগ দিয়েছেন। প্রধানত অবতীর্ণা হয়েছেন গায়িকার নানা ভূমিকায় কখনো কখনো তাঁর ওস্তাদকেও তাঁর সঙ্গে চিত্রে অবতরণ করতে হয়েছে। সেই পর্বে ইন্দুবালার অনুরোধে তাঁর কোন কোন চিত্রে সারঙ্গবাদকের ভূমিকাতেই গৌরী-শঙ্কর দেখা দিয়েছেন। যেমন ইস্ট ইন্ডিয়া ফিল্ম কম্প্যানীর স্টেপ মাদার চিত্র। এই ছবিতে একটি বাইজীর আসরের দৃশ্যে সারঙ্গীরূপে অবতীর্ণ হন গৌরীশঙ্কর। সেই দৃশ্য থেকেই এ প্রবন্ধে মুদ্রিত ওস্তাদজীর প্রতিকৃতিটি নেওয়া হয়েছে। নচেৎ তাঁর চিত্র অপ্রাপ্য হত হয়ত। ইন্দুবালার সঙ্গে গৌরীশঙ্কর মিশ্র মায়াকেও এমনি একটি সবাকচিত্রে কাজ করেছিলেন।

শ্বেতাঙ্গিনী, কৃষ্ণভামিনী কৃষ্ণচন্দ্র দে, ইন্দুবালা—এঁদের সকলেই গৌরীশঙ্করের কাছে শিক্ষা পান কণ্ঠসঙ্গীতে। আর তাঁর কাছে সারঙ্গের তালিম পেয়েছিলেন দুজন। তাঁর সেই দুই শিষ্যই তাঁর আত্মীয়। বাঙালীরা সারঙ্গবাদন শিক্ষা করেন না। নচেৎ আগ্রহী হলে বাঙালী শিষ্যকেও সারঙ্গ শেখাতেন গৌরীশঙ্কর। তাঁর সেই দুই সারঙ্গী শিষ্য হলেন ছন্নুলাল মিশ্র ও চামু মিশ্র। দুজনকেই তিনি কলকাতায় গঠিত করেছিলেন এবং তাঁরা ওস্তাদজীর মতন কলকাতার সঙ্গীত ক্ষেত্রেই যুক্ত থাকেন। ছন্নুলাল তাঁর শ্যালকপুত্র। সারঙ্গ যন্ত্র ও গান দুয়ের তালিমই তিনি ওস্তাদের কাছে পান। মধ্যবয়স পর্যন্ত সারঙ্গবাদক থেকে পরিণত বয়সে কণ্ঠসংগীতের শিল্পীরূপে পরিচিত হন ছন্নুলাল। তিনি আজো কলকাতায় বর্তমান আছেন। চামু মিশ্র ছিলেন গৌরীশঙ্করের ভ্রাতুষ্পুত্র। অপুত্রক তিনি চামুকে আবাল্য সযত্নে সারঙ্গবাদকের

[illegible] প্রতিভা- [illegible] করেন [illegible] বিষয় [illegible] বয়সে তাঁর মিশ্র [illegible] হয়েছিলেন (১৯৪৩)। তাঁর [illegible] অকালমৃত্যু না ঘটলে সারেঙ্গী গৌরীশঙ্করের প্রতিমূর্তি পরবর্তীকালের [illegible] সুযোগ্যতাবেই লাভ করতেন।

গৌরীশঙ্করের শিষ্য প্রসঙ্গে বাংলার সুপরিচিত গুণী অনাথনাথ বসুর নামও উল্লেখ্য। খেয়াল ও ঠুংরি গানের অন্যাবং অনাথনাথও ওস্তাদজীর শিষ্যস্থানীয়। গৌরীশঙ্করের কাছে তিনি সঙ্গীতশিক্ষার নানাভাবে উপদেশ লাভ করেছেন। উপকৃত হয়েছে রাগবিদ্যায়। ওস্তাদজী তাঁকে অনেক রাগের রাস্তা দেখিয়েছেন। স্ত্রীর গানের আসরে সহযোগিতা করেছেন সঙ্গতিয়া সারঙ্গীরূপে। গৌরীশঙ্করের সঙ্গে তাঁরও দীর্ঘকালের সঙ্গীতিক যোগাযোগ ছিল। অনাথনাথকেও শিষ্যবৎ স্নেহ করতেন, নির্দেশাদি দিতেন গৌরীশঙ্কর।

বাংলার এক সঙ্গীতগুণী (হায়) ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কথাও এ প্রসঙ্গে একবার উল্লেখ করা যায়। ভীষ্মদেব তখন কলেজের ছাত্র। গেরুয়া পরিধেয়ের জন্য যেমন চিহ্নিত তেমনি উদীয়মান উচ্ছ্বসিত কণ্ঠগায়ক প্রতিভারূপেও। সে সময় তিনি গৌরীশঙ্করজীর কাছেও শিক্ষার্থীরূপে আসতেন। কিছু কিছু শেখেনও ওস্তাদজীর কাছে। সে প্রায় ১৯২৫।২৬ সালের কথা। গৌরীশঙ্কর তখন প্রবীণ—বয়সে এবং সঙ্গীতে। ৬০ বছর পার হয়েছেন। কলকাতার সঙ্গীতসমাজে অবস্থান করছেন একজন আচার্যরূপে। সেই সময় তরুণ ভীষ্মদেব তাঁর কাছে যাতায়াত করতেন। ভীষ্মদেবের শিক্ষকরূপে নগেন্দ্রনাথ দত্ত এবং বাদল খাঁর নামই অবশ্য স্মরণীয়। কিন্তু কিছুদিনের জন্যে গৌরীশঙ্করও যে তাঁর একজন ওস্তাদ ছিলেন একথাও নথিভুক্ত রাখা যায়।

গৌরীশঙ্কর শুধু সারঙ্গ যন্ত্রের সাধক ছিলেন না। তিনি গায়কও, যদিও গান গাইতেন না আসরে। প্রত্যেক যন্ত্রী বিশেষ সারঙ্গী ত অর্ধেক গায়ক। গান তাঁরা অন্তরঙ্গভাবে জানেন। নইলে গানের অত সূক্ষ্মতম কারুকর্মের সঙ্গে সুসঙ্গত করতে অক্ষম হতেন তাঁরা। তবে গৌরীশঙ্কর তার চেয়েও অধিক। তিনি বাল্যকাল থেকেই পিতার কাছে রীতিমত কণ্ঠসঙ্গীত শিখেছেন। যেমন অভ্যাস করেছেন সারঙ্গ যন্ত্রে ঠিক তেমনি নিষ্ঠার সঙ্গে। তাঁদের ঘরানার এইটিই বৈশিষ্ট্য। একাধারে গান ও সারঙ্গের অনুশীলন। সেজন্যেই যন্ত্রীরূপে তাঁদের হাতে সুর আরো বসে। অঙ্গুলির স্পর্শ হয় বেশী সুরেলা, সুমিষ্ট। গানের চর্চার ফলে সঙ্গতকার সারঙ্গীরূপেও আসরে তাঁরা সফলতর হন। আবার গানের শিক্ষক বা ওস্তাদরূপেও বরণীয় হতে পারেন পেশাদার জীবনে। সেই কারণে এই মিশ্র ঘরের ধারায় যাঁরা সারঙ্গীর বৃত্তি নেবার জন্যে প্রস্তুত হতেন তাঁদের প্রত্যেকেই রীতিমত গানও শিক্ষা করতেন।

তার ফলে সারঙ্গ এবং গান যন্ত্রসঙ্গীত এবং কণ্ঠসঙ্গীত ওতপ্রোত ছিল গৌরীশঙ্করের সঙ্গীতজীবনে। সারঙ্গীরূপে যখন গানের সঙ্গে সহযোগিতা করতেন আসরে, কিংবা যখন একক অনুষ্ঠান করতেন তাঁর যন্ত্রে তখন গানই বাজত। কণ্ঠের যাবতীয় কৃতি—তান বিস্তার ইত্যাদি শুধু নয়। কণ্ঠসঙ্গীতের আবেগ পর্যন্ত পরিস্ফুট অনুরণিত হত তাঁর যন্ত্রে। সারঙ্গের এই বৈশিষ্ট্য। অন্য কোন বাদ্যই এমন সুচারুভাবে গানের সুর সঙ্গাতে সক্ষম হতে পারে না। কণ্ঠসঙ্গীতের এমন একাত্ম হওয়া অন্য যন্ত্রের পক্ষে অসম্ভব। ৩৬টি তরফের তারযোগে এতখানি সুরপরিধিও সারঙ্গের এক অনন্যতা। সুরের ঐশ্বর্যে ঝঙ্কারে বর্ণাঢ্য সারঙ্গ বাদন। এ যন্ত্রের সমস্ত [illegible] বন্সীর কথা তাঁর সঙ্গীতজীবনের প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে আসে।

সারঙ্গ বাদ্যধারার এক শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ ছিলেন গৌরীশঙ্কর মিশ্র। এই বাদনরীতির এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্য তিনি বহন করে এনেছিলেন। বারাণসী থেকে কলকাতায় প্রসারিত করেছিলেন তার ধারা। বাংলায় তাঁর সঙ্গীতকৃতির এ এক উল্লেখনীয় ভূমিকা। মিশ্র ঘরের [illegible]

[illegible] তিনি [illegible] সংগীত-চর্চার [illegible]।

গৌরীশংকরের প্রৌঢ় বয়সে আর এক সারংগ-শিল্পী কলকাতার সংগীত ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তিনিও গুণী বাদক এবং কৃতিত্ব দেখাতেন একক অনুষ্ঠানে। তাঁর নাম ছোটে খাঁ। কিন্তু তিনি গৌরীশংকরের তুল্য দীর্ঘকাল বাংলার সংগীতজগতে স্বাক্ষর রাখেন নি। তাঁর কোন উত্তরসাধকও থাকে নি এই প্রদেশে। ১৯৪৬ সালে ছোটে খাঁকে কলকাতা ত্যাগ করে চলেও যেতে হয়। তাঁর স্বস্থান ইন্দোরের নিকটে গোয়ালদায় বাস করেন তারপর। আর তিনি বাংলায় ফিরে আসেন নি শেষ জীবনে। গৌরীশংকর কিন্তু নানাভাবে বাংলার সংগীত-জীবনের সংগে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত ছিলেন। আর তাঁর দেহান্তের পরেও তার একটি রেশ ক্ষীণ স্মৃতিরেখায় রয়ে যায় বাংলার সংগীতজগতে।

কাশীর এক প্রাচীন সারংগ-ধারার বাহক গৌরীশংকর। যৌবনকালেই সে সম্পদ নিয়ে তিনি আসেন কলকাতায়।

বারাণসীর সেই বিরাট কত্থক সম্প্রদায়ের এক মহাগুণবান প্রতিনিধি গৌরীশংকর। কবীর-চৌরা সেনপুরা রামাপুরা প্রভৃতি এলাকায় বিস্তারিত সেখানকার সেই কত্থক সমাজ। তাঁদের নানা শাখার মধ্যে আত্মীয়তাও বিদ্যমান। পরস্পর সম্পর্কিত তাঁরা। কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীতের বিভিন্ন বিভাগে সেই মিশ্র উপাধিক সংগীতসাধকরা বিশেষজ্ঞ হয়েছেন। সমৃদ্ধ করেছেন ভারতীয় সংগীত-চর্চাকে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলকে প্রভাবিত করে নানা ধারায় নিজেরাও তাঁরা বিকশিত হন। তাঁদেরই কোন কোন শাখা এসে স্থায়ী-ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন কলকাতার সংগীতক্ষেত্রে। বাংলার রাগসংগীতচর্চার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। যেমন—কণ্ঠ-সংগীতের নানারীতি ও বীণা ইত্যাদি যন্ত্রসংগীতে রামকুমার লছমী ওস্তাদ শিউসহায়। কণ্ঠ ও যন্ত্রের নানা বিভাগে রামকুমার পশুপতিসেবক শিবসেবক। তবলার মৌলবীরাম নামসহায় প্রভৃতির ধারা। তেমনি এক সারংগ বাদক-গায়ক ধারার কত্থক বংশীয় গৌরীশংকর মিশ্র।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই প্রক্রিয়ার সূচনা। আর বিশ শতকের প্রথম ভাগে তার সুপরিণতি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ভারতীয় সংগীতচর্চার ক্ষেত্রে যে নব-জাগৃতির পর্ব আরম্ভ এবং বাংলাদেশ হয় যার মুখপাত্র—কাশীর কত্থক সম্প্রদায়ের একটি উল্লেখ্য অংশের বাংলায় স্থিতিলাভ তারই অন্যতম অধ্যায়। দেখা যায়, এক আশ্চর্য ঐতিহাসিক যোগাযোগে বারাণসীর কত্থক সমাজের কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীতের একাধিক বংশধারার [illegible] বাংলাদেশেই বর্তায়।

[illegible] সারংগবাদক গায়ক [illegible] [illegible] বংশের সংগীতসম্পদও [illegible] বাংলার ক্ষেত্রে অংশভাগী হয়ে যায়।

বারাণসীতে এই পরিবার পুরুষানুক্রমে সারংগী-গায়নশিল্পী। গৌরী-শংকরের পিতৃ-পিতামহ সকলেই ছিলেন [illegible] সারংগবাদক ও গায়ক।

গৌরীশংকরের পিতামহ বুদ্ধু মিশ্র থেকে এই বংশের নিশ্চিত বিবরণ পাওয়া যায়। বুদ্ধু মিশ্র সারংগী-গায়করূপে একযোগে পরিচিত ছিলেন কাশীর সংগীতসমাজে। কবিরচৌরা মহল্লায় কবির মন্দিরের পিছনে তিনি বাড়ি ক্রয় করে বাস করতে থাকেন। সেই থেকে এই পরিবার কবিরচৌরা নিবাসী।

বুদ্ধু মিশ্রের দুই পুত্র। বেচু ওস্তাদ ও ঠাকুরপ্রসাদ। দুজনেই সারংগবাদক ও কণ্ঠসংগীতের সাধক। বুদ্ধু মিশ্রের কাছেই বেচু ও ঠাকুরপ্রসাদ সারংগ ও গানের তালিম পান। জ্যেষ্ঠ বেচু ওস্তাদের কাছে গান শেখেন কলকাতার গহর জান। বেচু ওস্তাদের সময় থেকেই এ বংশের কলকাতার সংগীতক্ষেত্রের সংগে যোগা-যোগ ঘটে। তবে বেচু ওস্তাদ কলকাতায় আসতেন সাময়িকভাবে। এ শহরে স্থায়ী বাসিন্দা হন নি। কনিষ্ঠ ঠাকুরপ্রসাদ বারাণসী নিবাসীই থাকেন, একজন নেতৃস্থানীয় সারংগী ও গায়ক হয়ে। তিনি অপুত্রক। তবে তাঁর দৌহিত্র ছোটে রামদাস তাঁরই শিক্ষায় বিখ্যাত গায়ক হয়েছিলেন। ছোটে রামদাসজীর আসা-যাওয়া ছিল কলকাতায়। এখানে নানা আসরে তিনি যেতেন [illegible] টপ্পা গানে গুণপনা দেখিয়েছেন। তাঁর তালিমে গঠিত [illegible] এই বংশের [illegible] প্রতিনিধি [illegible] এখনো [illegible] [illegible] কলকাতার সংগীতক্ষেত্রে। [illegible] হলেন বেচু ওস্তাদের পৌত্র।

গহর জানের অন্যতম সংগীতশিক্ষক বেচু ওস্তাদের কলকাতার সংগে যোগসূত্র ছিল। লছমী ওস্তাদের পিতা রামকুমার মিশ্র হলেন বেচু ওস্তাদের ভগিনীপতি। রামকুমারের অনেক দিন কলকাতায় বাস ও শিষ্যগঠনের বিবরণ লছমী ওস্তাদের প্রসংগে দেওয়া হয়েছে। রামকুমারের সূত্রেও হয়ত বেচু ওস্তাদের আর একটি সম্পর্ক থাকতে পারে কলকাতার সংগীত-ক্ষেত্রের সংগে। তবে তিনি কাশী নিবাসী থেকেই কলকাতায় মাঝে মাঝে আসতেন। গহর জানের এক ওস্তাদ বলেই তাঁর পরিচিতি ছিল পেশাদার মহলে।

বেচু ওস্তাদের পাঁচ পুত্র। তাঁদের সকলেরই জন্ম কাশীতে। তাঁরা হলেন—শ্যামাচরণ গৌরীশংকর কংকর বুদ্দি ও কালিপ্রসাদ। তাঁরা পাঁচজনেই পেশাদার গায়ক বাদক হন। তৃতীয় কংকর গায়ক ও সারংগবাদক হয়ে বাস করতেন বারাণসীতে। সেখানেই তাঁর পাঁচজনের মধ্যে প্রথমে মৃত্যু হয়। বেচু ওস্তাদের অন্য চার পুত্রই কলকাতার সংগীতক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই শহরেরই স্থায়ী নিবাসী থাকেন জীবনের শেষ পর্যন্ত। গায়ক বা সারংগী বা তবলিয়া কিংবা ওস্তাদ রূপে তাঁরা প্রত্যেকেই কলকাতার সংগীতজীবনের সংগে আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন।

(ক্রমশঃ)

প্রেক্ষাগৃহ

দাবী

অনুপকুমার

মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়

রবি ঘোষ

অমল্য সান্যাল

বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়

দিলীপ রায়

সমিত ভঞ্জ

মানসী মধ্যবিত্ত পরিবারে মানুষ হয়ে সহজে কোন বিষয়ে পিছু হটতে শেখেনি। ওদের সংসারে অবিশ্যি ছিল দারিদ্র্য এবং পারিবারিক নানা সমস্যা ছিল। প্রৌঢ় পিতা, বেকার ছোড়দা, স্নেহময়ী মা এবং সহানুভূতিশীল বড়দা। এই বড়দাই কোনরকমে [illegible]র পরিশ্রমে সংসারটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে, ধনীদের অত্যাচারে নিজেকে জর্জরিত করলেও ছোট বোনটির (মানু) গায়ে এতটুকু আঁচ লাগতে দেয়নি। মানসীও বাড়ীর সকলের মুখ রক্ষা করে ডিস্টিংকশন নিয়ে বি-এ পাশ করেছে। কলেজের ছাত্রী থাকার সময়েই মানু 'আচারিয়া ইন্ডাস্ট্রীজের' মালিক মিঃ আচারিয়ার একমাত্র ছেলে সুবীরকে ভালবাসে। কিন্তু সুবীরের মা সুরমা দেবী ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে প্রেম ও প্রণয়ের স্থান দিতে চান না। তিনি সুবীরের জন্যে মনে মনে হাইসোসাইটির ধনী কন্যা মিস্টার ব্যানার্জীর মেয়ে অনুপমাকে একরকম ঠিকই করে রেখেছেন। সে মেয়েটি নাচে-গানে যেমন তুখোড়, তেমন আধুনিকা, এরকম মেয়ে না পেলে হাইসোসাইটিতে মুখ দেখানো যাবে না বলে ওঁর ধারণা। কিন্তু সুবীর মায়ের তাগিদে অনুপমার সঙ্গে মিশলেও ভালবাসে মানসীকে। মিস্টার আচারিয়াও এই নম্র মেয়েটিকে ভালবাসেন এবং ছেলের ভালবাসার ব্যাপারে মৌন স্বীকৃতিই আছে।

আচমকাই সুবীর বাবার সাহায্যে মানসীকে রেজিস্ট্রি-মতে বিবাহ করে আনে। কিন্তু মা (সুরমা) ওদের এই ছেলেমানুষীকে বিবাহ বলে মানতে রাজী নন এবং মানসীর প্রতি মিস্টার আচারিয়ার পক্ষপাতিত্বকে মোটেই সহ্য করতে পারেন না। বোধহয় স্বামীর অহেতুক পক্ষপাতিত্বের জন্যই উনি মানুকে বললেন সে এখন মিঃ আচারিয়ার পুত্রবধূ,

এখন কোনমতেই তার পক্ষে বস্তিতে, অর্থাৎ বাপেরবাড়ীতে যাওয়া চলবে না এবং তাদের কারো সংগে কোন যোগাযোগ রাখাও চলবে না। অথচ মানুর মা বাবা দাদা সকলেই ওর বিবাহিত জীবনের সুখ ও সাচ্ছন্দ্যের জন্যে ব্যস্ত। তার ছোড়দাই কোনরকমে ও-বাড়ীর দারোয়ানকে ধরে মানুর খবর নিয়ে যায়। আর এইভাবেই ক্রমে ওঁরা জানলেন, মানু এখন একটি ফুটফুটে ছেলের মা হয়েছে। শাশুড়ী সরমা মানসী ও সুবীরের সুখের সংসার সহ্য করতে না পেরে চিন্তিত হয়ে পরলেন, আর এই সুযোগকে কাজে লাগালেন ব্যান্ডো-দম্পতি। ওঁরা সরমাকে পরামর্শ দিলেন সুবীর যেন মানুকে ডিভোর্স করে ওঁদের একমাত্র মেয়ে অনুপমাকে বিবাহ করে। এবং এরপর তাঁরা কাগজপত্র তৈরী করে মানসীকে দিয়ে সই করিয়ে সরমার সাহায্যে মানসীকে চিরতরে উৎখাত করলেন। কিন্তু মানুষে যা ভাবে সব সময় সেটা ঘটে না। কোর্টেই প্রমাণিত হল আদৌ উকীল সুবীর ও মানসীর ডিভোর্সের কাগজপত্র জমা দেয়নি, এবং মানসীও তাঁর শশুড়বাড়ী থেকে ছেলেকে নিয়ে আসবার সম্পূর্ণ অধিকারিণী। কারণ সে মা, সন্তান তো মার কাছেই থাকে। অভিনয়ে বিকাশ রায় (আচারিয়া) সরমা (দীপ্তি রায়) মানুর মা (সন্ধ্যারাণী) বাবা (অসিতবরণ) ছোড়দা (অনুপ-কুমার) বড়দা (দিলীপ রায়) সুবীর (সমিত ভঞ্জ) মানু (মৌসুমী) মিস্টার ব্যান্ডো (শেখর চট্টোপাধ্যায়) উকীল (রবি ঘোষ) এবং অনুপমা (রঞ্জনী গাঙ্গুলী) নির্বাচিত ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করেছেন। ছবির সম্পাদনায় আছেন অমিয় মুখার্জি, আলোকচিত্র গ্রহণে শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সংগীতে অমল মুখোপাধ্যায় ও পরিচালনায়—কনক মুখোপাধ্যায়।

ওঁরা বলেন

জয়শ্রী রায়

ঃ অটোগ্রাফ দিতে কেমন লাগে আপনার?

—সত্যিকথা বলবো!

ঃ নিশ্চয়ই!

—অটোগ্রাফ টটোগ্রাফ দিতে আমার মোটেই ভাল লাগে না।

ঃ তাহলে দেন কেন?

—সত্যিকথা বলতে কি আমাদের সম্পর্কে ফ্যানদের একটা সুন্দর ধারণা আছে। বলতে গেলে ফ্যানদের এই অ্যাটিচুডটাই আমাদের অ্যাসেট। সুতরাং তাদের বিমুখ করা তো চলে না অভিনয় করবো জনপ্রিয়তাও চাইবো অথচ ফ্যানদের চটাবো এটা কি করে হয়। সুতরাং ইচ্ছের বিরুদ্ধেও অটোগ্রাফ দিচ্ছি দেবোও।

ঃ নিজের ইচ্ছে দমন করে অন্যের সঙ্গে আপোষে তাহলে আপনি রাজী নন?

—অটোগ্রাফ দেবার ব্যাপার আর আপোষ ব্যাপারটা কিন্তু এক নয়। ধরুন কোনো সাংসারিক ঘটনা যেখানে মতভেদ হচ্ছে কারও সঙ্গে আমার সেখানে অপরপক্ষ আমাকে যদি ঠিক ঠিক কারণ দেখিয়ে স্যাটিসফাই করতে পারেন নিশ্চয়ই সেখানে আমি আপোষে রাজী। বিনা কারণে আমি কখনও রাজী হই না জোর করে আমার মত আদায় করা আমি একদম পছন্দ করি না।

ঃ আপনার কোনটা বেশী—রাগ জিদ না দৃঢ়তা?

—তিনটেই আমার মজ্জায়। আগেই তো বললাম জিদ এবং দৃঢ়তা আমার অকারণে নয়। আর রাগের কথা বলছেন। রাগটা আমার ভয়ানক সাংঘাতিক। তেমন রাগ করি না সহজে। একবার করলে আবার থেমেও যায় সহজে। আসল ব্যাপারটা কি জানেন— আমি ছোটবেলা থেকে এমন পরিবেশে মানুষ যেখানে আদর আবদার ছাড়া আমার ভাগ্যে আর কিছু জোটেনি। ননী পথের মতো আদরে মানুষ। স্বাভাবিক জীবনের কোনো আঁচই লাগতে দেননি বাবা-মা। জানি আমার ঐ বদগুণগুলো অনেক অসুবিধের কারণ কিন্তু কি করব বলুন আই কান্ট হেল্প ইট।

ঃ আপনি সবচাইতে বেশী ভালবাসেন কাকে?

—বেশী ভালবাসাটা কিন্তু একজনকেই হয় না। বিশেষ করে আমার মত পারিবারিক মানুষের পক্ষে। কারণ আমার স্বামী আছে মেয়ে আছে বাবা-মা তো আছেনই প্রত্যেককেই আমি সমান ভালবাসি। কিন্তু ভালবাসার অ্যাটিচুডটা আলাদা। মেয়েকে যেভাবে যে দৃষ্টিতে ভালবাসি স্বামীর প্রতি আমার ভালবাসার অ্যাটিচুড নিশ্চয়ই তা নয়। বাবা-মার ক্ষেত্রেও তাই।

ঃ আউটডোরে গেলে বাড়ীর কাকে আপনি সবচাইতে বেশী মিস করেন?

—মৌ এর (মেয়ে) জন্যই মনটা কেমন কেমন করে। তবে বেশীর ভাগ সময়ই প্রবীর (স্বামী) ও মৌ আমার সঙ্গে যায়। এই কদিন আগে রামপুরহাট গিয়েছিলাম দুটো ছবির কাজে—প্রথম একা গেলাম এবার। ওদের জন্য মনটা খারাপ লাগলেও ভাবি যে আমার সঙ্গে ওদের নিয়ে গেলে ওদেরই বাজে লাগে। আবার অনেক সময় না নিয়েও পারি না।

ঃ শুনেছি আপনি প্রেম করে বিয়ে করেছেন। প্রবীরবাবুর সঙ্গে আপনার পরিচয় কিভাবে?

—সে এক মজার ব্যাপার। (গালে টোল ফেলে হাসলেন খানিক কিভাবে শুরু করবেন বোধহয় সেটাই ভাবলেন।) বয়স তখন খুব অল্প। মেয়েলি কৌতূহল নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ছেলেদের নিয়ে আলাচনা করি আড্ডা মারি। একদিন হঠাৎ এক বন্ধুর দাদার সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে কথা উঠেছিল। ব্যাপারটায় আমি আমল দেইনি তেমন। একদিন হঠাৎ ফোন পেলাম সেই বন্ধুটির দাদার। আমি তো অবাক! চিনিই না তাকে আমি। মিথ্যে গুজবের সমাধানের পর আমার নেমন্তন্ন জানালাম ভদ্রলোককে। তিনি

এলেন। পাল্টা নেমন্তন্ন আমারও হলো। আমিও গেলাম। বেশীদিন নয় মাত্র দু মাস বোধ হয় এই যাতায়াত করতে করতেই কখন যে গুজবটা সত্যি হয়ে গেল বুঝতেই পারিনি। তারপরেই বিয়ে! পড়াশুনো তাই উঠে গেল। হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষাটাই আর দেয়া হলো না।

ঃ আপনাদের বিয়েতে কোনো পক্ষের বাড়ী থেকে কোনো আপত্তি এসেছিল?

—না সেরকম কোনো ব্যাপার ঘটেনি প্রথমতঃ। প্রবীররা ব্রাহ্ম ওঁদের কোনো সংস্কার নেই আর আমাদের বাড়ীর আবহাওয়া একেবারে অন্যরকম বাবা-মার আমার ওপর এতখানি কনফিডেন্স ছিল যে তাঁরা আমার কোনো কাজেই খুব একটা বাধা দেননি। বিয়ের ব্যাপারে তো নয়ই।

ঃ মেয়েরা চায় সিকিওরিটি —প্রেম কি সেই পথ ধরে চলে?

—দুটো কথা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা যদিও আপনি জুড়ে দিয়েছেন। সিকিওরিটি কে না চায়! আজকের এই হাজারো সমস্যার মাঝে বাঁচার সবচাইতে বড় হাতিয়ার তো সিকিওরিটিই! শুধু প্রেম দিয়ে পেট ভরবে না। কাজেই সিকিওরিটি খোঁজাটা খুব একটা অনুচিত নয় বলেই আমি মনে করি। কিন্তু প্রেম সেই সিকিওরিটির কথা ভেবেই চলে এটা সত্য নয় ট্রু লাভ কোনো কিছু মেনে চলে না ভেবেও এগোয় না।

ঃ আপনার নিজের ক্ষেত্রে কি ঘটেছিল?

—নিশ্চয়ই ট্রু লাভ! সিকিওরিটির কথা তখন আমি ভাবিনি। ওটা আমার আপনা

থেকেই এসে গেছে। প্রবীরদের বাড়ীর অবস্থা খুবই ভালো।

ঃ কখনও নিঃসঙ্গ মনে হয়?

—[illegible] কথা বলছেন। (ভুরু কুঁচকে একটু ভাবলেন) তাহলে একটু খুলেই বলি। খুব ছোটবেলা থেকেই আমি প্রায় একা হয়েই মানুষ। অথচ মা-বাবা বোন সবাই-ই ছিলেন। আমি খুব দুর্বলও ছিলাম। প্রায়ই স্কুলে যেতে পারতাম না ঘরে বসেই পড়াশুনো করতাম। বাবা ছিলেন জার্নালিস্ট—ব্যস্ত থাকতেন ভয়ানক। পারিবারিক ব্যবসাপত্র দেখাশুনো করতেন আমার মা। দিদা-দাদুর কাছে সময়টা আমার বেশী কেটেছে। সম্ভবত সিকলি ছিলাম বলেই কেউ আমাকে বিরক্ত করতো না। নিজের মনে ছবি আঁকতাম পড়তাম। ছোটবেলা থেকেই এই একা থাকার ব্যাপারটা আমার চরিত্রের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে তাকে এখন আর আলাদা করা সম্ভব নয়।

জানেন আমি ভয়ানক হৈ-চৈ করতে ভালবাসি! আউটডোরে যে ইউনিটের সঙ্গেই যাই না কেন—সবার সঙ্গে জমিয়ে নিতে আমার খুব একটা দময় লাগে না। কিন্তু এত হৈ-চৈ হুল্লোড়ের মধ্যেও আমার ভেতরটা কেমন যেন একা হয়ে যায়। ঠিক বোঝাতে পারব না!

ঃ আপনার এই ব্যবহারে স্বামীর রি-অ্যাকশন কি রকম?

—স্বাভাবিকভাবেই যা হয়ে থাকে প্রথমটায় ভুল বোঝাবুঝি তারপর সব ঠিক। আসল কথা হলো প্রবীর ভয়ানক কনসিডারেট এবং অ্যাকোমোডেটিংও। আমার ফিলিংস ও বুঝতে পেরেছে সহজেই।

ঃ নিজের কাজের সমালোচনা আপনি সহ্য করতে পারেন?

—অভিনয়ের কথা বলছেন তো?

ঃ অভিনয় পারিবারিক কাজ দুটোই বলছি।

—আচ্ছা। আগে অভিনয় সম্পর্কেই বলছি। সমালোচনা অর্থে মন্দ-ভালোর আলোচনা তো! আমাকে নিয়ে তেমন কিছু আমার চোখে পড়েনি। ফ্যানমেল বা খবরের কাগজ শুধু প্রশংসাই করেছেন। একমাত্র বাবা আর প্রবীর আমার কাজের সমালোচনা করেন। এবং বলা বাহুল্য তাঁদের আলোচনা আমার খারাপ দিকগুলো নিয়েই। তাতে আমার উপকারই তো হয় ক্ষতি কি? কাজ খারাপ করলে সমালোচনা হবে—এটা সহ্য না করার কি আছে?

আর পারিবারিক ব্যাপারে আমরা দুজনে মিলেই সব কাজ করি। ভুলচুকের শেয়ার আমাদের দুজনেরই।

ঃ বহু পুরোন প্রশ্ন [illegible] আপনার মতটা শুনা দরকার। ছবিতে সেক্স ও ন্যুডিটি সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?

—সেক্স তো লাইফেরই একটা অঙ্গ। খাওয়া-পরা-কথা বলার মত সেক্সুয়াল অ্যাক্টও নর্মাল লাইফের অঙ্গ। এটা নিয়ে আলোচনার কি আছে? তবে আমাদের দেশের ছবিতে বিশেষ করে হিন্দীতে এই স্বাভাবিক ব্যাপারটাকে নিয়ে যে নোংরামি চলছে যে ব্যবসা চলছে সেটা খুবই ইরিটেটিং। সেক্স লাইফ ডেপিক্‌শনে তারা নর্মালসির ধারে-কাছেও যায় না উল্টোটাই করে। এটা বন্ধ করা দরকার।

ঃ ফিল্ম লাইনের গুজবে আপনি বিশ্বাস করেন?

—কোনো গুজবেই আমি বিশ্বাস করি না। কারণ সত্যি ঘটনা আর গুজবের মধ্যে দূরত্ব টালি থেকে টালার চাইতেও বেশী। তাছাড়া এই ফিল্ম লাইনের আজগুবি গুজবে কান দিলে তো কবেই বাইরে চলে যেতে হতো?

ঃ কেন আপনাকে নিয়েও তেমন কিছু হয়েছে নাকি?

—'তেমন কিছু নয়' কিন্তু সামান্য কিছু তো হয়েছিল বটেই। দাদার (উত্তমকুমার) সঙ্গে আমার নাম জুড়ে ইঙ্গিতপূর্ণ কিছু খবর বেরিয়েছিল কাগজে একবার। আমি ব্যাপারটা জানতাম না কাগজটাও পড়িনি। শুটিংয়ে যেতে দাদাই আমার প্রথম দেখালেন খবরটা। রসিকতার সুরে বললেন 'পঞ্চাশ বছর বয়স হতে চলল এখনও এমন সব খবর বেরোচ্ছে! কি বলব বলো? যাই হোক তোমার বাড়ীর লোকেরা কিছু [illegible] লোকেরা ভাববেটা কি—ওরা আমাকে বেশ ভালো করেই জানে। এ-ঘটনার প্রতিক্রিয়া আমার নিশ্চয়ই একটা খারাপ লেগেছিল। তারপর বুঝেছি এ-লাইনে থাকতে গেলে এমন আজগুবি গুজবে কান দিয়ে [illegible] [illegible] বলা বৃথা। তবে এসব ঘটনার পর আমার পেছনে যে ফিসফিস আলোচনা [illegible] একেবারে অপছন্দ। ট্রুথ টার্নেটটেড মী ডেভির ম্যাচ। বম্বেতে দেখেছি এসব নেই। [illegible] সব। আই লাইক দিস অ্যাটিচুড।

—নির্মল [illegible]

হামরাহী

হামরাহী :: কাল্পনিক কাহিনীকেন্দ্রিক দমফাটা হাসির ছবি! (প্রযোজনা : সাগর আর্ট কর্পোরেশন)। নির্মল হাসির ছবি তৈরী করবার ব্যাপারে বম্বের প্রযোজকগণ যতনা নজর দেন, তত ও'রা কাল্পনিক কাহিনীকে নিয়ে হাসির ছবি তৈরী করেন, আর সেইসঙ্গে প্রয়োজনমতো হাস্য কৌতুকের অনুপান হিসেবে আশুতোষ দর্শকদের জন্যে পরিবেশনা করেন নৃত্য গীত প্রেম প্রণয় আর কৃত্রিম ধরনের ক্রাইম।

বম্বের এক খ্যাতনামা ইলেকট্রনিক কোম্পানী একটি বিশেষ পদের জন্যে দুজনকে ইন্টারভিউ দেবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছে। ও'রা হলেন রমেশ এবং শালিনী। চাকরি একটি অথচ ডাকা হোল দুজন প্রার্থীকে। রমেশ মনে মনে ভাবল এই উচ্চপদের চাকরিটি পেলে অসুস্থ মায়ের ক্যানসারের চিকিৎসা করাবে এবং একমাত্র আদরের বোনের বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে। শালিনী ভাবছে, চাকরিটি পেলে প্রথমে তার কাজ হবে মর্টগেজের হাত থেকে পূর্বপুরুষদের বাড়ীটিকে বাঁচানো এবং নিজেদের মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের ব্যবস্থা করা। কিন্তু বাস্তবে পৌঁছে রমেশের চাকরি পাবার পথে এল অনেক বাধা ও বিঘ্ন। তারপর

রণধীর কাপুর

থেকে ভবিষ্যতে ভাল চাকরি পাবার আশায় রমেশকে অনেক কৃচ্ছ্রসাধন করতে হোল। ইন্টারভিউ দেবার জন্যে রমেশ এবং শালিনী যে প্লেনে বম্বে পৌঁছুবার কথা, সেটি যান্ত্রিক যোগাযোগের জন্যে রাজস্থানের মরুভূমিতে নামতে বাধ্য হোল এবং প্যাসেঞ্জাররাও প্রাণভয়ে পালাতে শুরু করলো। অতিকষ্টে তারা যখন শহরের দিকে এগোচ্ছে, পথে এক ডাকাতদল ওদের সকলকেই তাদের আস্তানায় যেতে বাধ্য করলো। এই ব্যবস্থা হয়েছিল বিশেষ এক ব্যক্তির সন্ধান নেবার জন্যে। কিন্তু একটা সত্য কথা ঢাকতে গিয়ে যাত্রীরা আরো বিপদে পরলো। পরিশেষে কাওয়ালী এবং নৃত্য-গীত-পরিবেশন করে দস্যু সর্দারের হাত থেকে নিজেদের বাঁচালো।

এরপরও রমেশের সঙ্গে ওখানকার এক গ্রামের প্রধানের ছেলের চেহারার মিল থাকায় রমেশ ও শালিনীকে নিয়ে গিয়ে আদরযত্ন করল তারা। কিন্তু সেই গ্রাম্য সর্দারের আসল উদ্দেশ্য অন্যরকম। সে চেয়েছিল ছেলের প্রথম পক্ষের পরিত্যাগ করা কুৎসিত বৌয়ের সঙ্গে রমেশকে মিলিত করতে। সেজন্যে তাকে আবার নতুন করে বিবাহসভার ব্যবস্থা করতে হোল। আর এবার পুরনো বৌ-এর সঙ্গে বিবাহের ব্যবস্থা যেমন হয়েছিল, সেইভাবে শালিনীর সঙ্গে রমেশের মিথ্যা বিবাহ দেওয়ার ব্যবস্থা হোল।

কিন্তু ওদের আসল উদ্দেশ্য ভালো নয় জেনে বিবাহের রাতেই শালিনীর সঙ্গে রমেশ পালিয়ে বম্বে চলে এলো। বম্বেতে এল অবিশ্যি ওরা ইন্টারভিউয়ের জন্যে। কিন্তু এক কুচক্রীর পাল্লায় পরে শালিনীকে তাদের হাতে বন্দী হতে হলো। আসলে ওরা হোল আন্তর্জাতিক চোরা-কারবারের দল। ওদের ধারণা শালিনীর কাছে অনেক মূল্যবান মণি-মাণিক্য হীরে-জহরৎ আছে। এরপর অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে রমেশ পুলিশের সাহায্যে শালিনীকে উদ্ধার করলো। এবং এবারে সব ভুল বোঝা-বুঝির পালা সাঙ্গ করে রমেশ ও শালিনী মিলিত হোল সত্যিকারের বিবাহ বন্ধনের মধ্যে দিয়ে। অভিনয়ের মধ্যে যাঁরা উল্লেখ্য তাঁরা হলেন—রণধীর কাপুর (রমেশ) তনুজা (শালিনী) সুজিতকুমার (কুচক্রী) স্মাগলার দলের পাণ্ডা (কে এন সিং) জাগিরদার (শালিনীর পিতা) তিওয়ারী (ডাকাত সর্দার) এবং লক্ষ্মী [illegible] (রমেশের মা) [illegible] [illegible]কুমার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রাজেন্দ্রনাথ। চিত্রকাহিনী ও সংলাপ— [illegible] চিত্রনাট্য—শক্তি সামন্ত পরিচালনা—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্পাদনা—[illegible] দাস এবং সঙ্গীত পরিচালনায়—কল্যাণজী ও আনন্দজী।

ওয়াহিদা রহমান

শেখর চট্টোপাধ্যায়

মঞ্জু দে
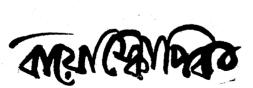
অতএব আমাদের হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। একটা ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা। চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। খট খট মেটালিক শব্দ আশে-পাশে মাথার ওপর অটোমেটিক ম্যাগাজিন লোড হচ্ছে রাইফেলের বুকে সেফটি ল্যাচ তার অনেক আগেই খুলে গেছে। দেখতে না পেলেও বুঝতে পারছি—প্রতিটি রাইফেল স্টেনগান আর লাইট মেসিনগানের ট্রিগারে আঙ্গুল ধীরে ধীরে চেপে বসছে সবাই এখন একটা মাত্র সিগন্যালের জন্য অপেক্ষা করছে—ফায়ার।

সার্জেণ্ট উধম সিং মরিয়া হাতে অটো-মেটিক রিভলবার বাগিয়ে সন্তর্পণে এগিয়ে যাচ্ছে সামনের বেহড়ের দিকে। মুখে কঠিন শীতল একটি মাত্র নির্দেশ—টেক কভার গোলী চলেগী...চলনা আজ বহুত জরুরী হ্যায়...

চারিদিকে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা। আমি সামনের দিকে এগোবার চেষ্টা করতেই প্রদীপকুমার বাধা দিলেন স্পষ্ট ভয় পাওয়া মানুষের কণ্ঠস্বর—কোথায় যাচ্ছো?

—অ্যাঁ? ...ইয়ে দেখি মঞ্জুদি কোথায় রামদা কোথায়। এক্ষুনি যা হোক একটা ডিসিশান নিতে হবে। উই কান্ট রান দিস রিস্ক প্রদীপদা......

প্রদীপকুমার খপ করে কাঁধ চেপে ধরলেন। —না তুমি দাঁড়াও। আমি একলা পড়ে যাব...

আমি আর প্রদীপকুমার তখন গ্রামের একেবারে শেষ সীমানায় অন্ধকারে একে-বারে অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে। অদূরে বিভীষিকাময় চম্বলের বেহড় এর কূল নেই কিনারা নেই। হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে মোরেনা জেলা ছাড়িয়ে ভিণ্ড জেলার দিকে ভিণ্ড পার হয়ে রাজস্থান বর্ডারের দিকে। খতরনাক বিলকুল খতরনাক।

মঞ্জু দে যখন বেহড়ের এই গ্রামে নাইট শুটিং করবার অনুমতি চেয়েছিলেন ফিপথ ব্যাটেলিয়ান সিকিউরিটি ফোর্সের অধিনায়ক কর্ণেল শীতলে প্রথম সুযোগেই ইয়েস বলতে চাননি। সামান্য ইতস্তত করে বলেছিলেন—এর মধ্যে আবার নাইট শুটিং? একটু রিস্কি হয়ে যাচ্ছে না?

—কিসের রিস্ক?

মৃদু হাসি। —রিস্ক ডাকুদের। যে জন্যে গত দশদিন আমি একটা আস্ত প্লেটুন আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে ডিউটিতে পাঠাচ্ছি।

সুবেদার রামবিলাস সিংকে জরুরী তলব দিলেন কর্ণেল। ইয়েস বলবার আগে তার রিপোর্ট নেওয়া দরকার। আর্মি ইন্টেলিজেন্স কি বলতে চায় সেটা জেনে নেওয়া দরকার। কোন ডাকাতের দল বেহড়ের কোন এলাকায় এখন অপারেট করছে—খবরটা এখন একমাত্র সিকিউরিটী ফোর্সের গোয়েন্দা বিভাগই দিতে সক্ষম। আর সেটাই তাদের কাজ।

সুবেদার রামবিলাস সিং এসে বুটে বুট ক্লিক করে দাঁড়াল—হুজুর—

—মাধো সিং-এর দলের হাল খবর?

সুবেদার জানাল—মাধো সিং রেওয়াতে একটা এনকাউণ্টারে ফেঁসেছিল গত সপ্তাহে ওর দলের একজন গায়েব। তারপর থেকে কোন খবর নেই—

—মাখন সিং?

—গত পরশু সে সালা মহকুমায় দলবল নিয়ে একবার ঘুরে গেছে। মনে হয় মোরেনা জেলার ভেতরেই এখন সে অপারেট করছে—

—কোন ডাকাতির খবর?

কি যেন বলতে গিয়ে থমকে গেল সুবেদার। আমরা কয়েকজন অপরিচিত মানুষ। কর্নেল ওকে চোখের ইঙ্গিতে

অ

আশ্বস্ত করলেন। তখন সুবেদার কবুল করল গত সপ্তাহে আমাদের এলাকাতেই পাঁচ ছ'টা ভারি ডাকাতি হয়েছে, দুটো কিডন্যাপিং হয়েছে।

—শেঠ?

—হান্‌জী।

কর্নেল চোখ নামিয়ে কি যেন ভাবলেন সামান্য তারপর বললেন—থ্যাঙ্ক ইউ সুবেদার ইউ মে গো নাউ—

বুটে বুট ক্লিক করে সুবেদার অ্যাবাউট টার্ণ, তারপর গট গট করে চলে গেল।

কর্ণেল বললেন—সব তো শুনলেন এখন কি করবেন বলুন।

উপায় নেই। প্রদীপকুমারের এ ছবির জন্যে দেওয়া ডেটস ফুরিয়ে আসছে। কাল পরশুর মধ্যে ওই দৃশ্যের শুটিং না করলেই নয়। কলকাতা থেকে এত টাকা-পয়সা খরচ করে আসা—এখন আধা-খ্যাচড়া অবস্থায় চলে যাওয়ার কোনই অর্থ হয় না। তা ছাড়া মঞ্জু দে'র মত এমন সাহসী মেয়ে আমাদের দেশে বাস্তবিকই বিরল। উনি যে সাহস করে অভিশপ্ত চম্বল-এর মত ছবি করতে নেমেছেন—এটাই যথেষ্ট। তারপর স্টাফদের একটা বিরাট ইউনিট নিয়ে প্রায় হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে এসেছেন চম্বলের ভয়ঙ্কর ডাকাত অধ্যুষিত এলাকায় মোরেনা জেলায়। এটা কম্পো মাথায় ভাবলে এখনও আমার গা শির শির করে।

ক্যামেরাম্যান রামানন্দ সেনগুপ্ত আমতা আমতা করলেন—তাই তো, সবাই যখন ইচ্ছে করছে তখন......

মঞ্জু দে হেসে ফেললেন—আহা মরলে শুধু আপনি একাই তো মরছেন না, আমরাও যাব সেই সঙ্গে। শুনেছেন তো প্রদীপ আর কিছুতেই এক্সটেন্ড করতে চাইছে না।

নার্ভাস হওয়ার কারণ ছিল।

কয়েকদিন আগে আমরা দুর্ধর্ষ বেহড়ের প্রায় পঞ্চাশ মাইল ভেতরে একটা পুলিশ আউটপোস্টের কাছে শুটিং করছিলাম। আমাদের ছিল ডাকাতের সীন। প্রদীপকুমার শেখর চ্যাটার্জি, রবীন বানার্জি সুনীল ভট্টাচার্য প্রভৃতিদের নিয়ে প্রায় ত্রিশজনের একটা দলের গুলি চালানার দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ করা হচ্ছিল। শটের বিরতিতে আমরা মাঝে মাঝেই গুলি গোলার আওয়াজ পাচ্ছিলাম। এখন আমাদের নিজেদের শুটিং-এ এত বেশী শব্দ হচ্ছিল যে দূর থেকে ভেসে আসা শব্দটার ব্যাপারে কেউ বিশেষ খেয়াল করেনি। খেয়াল হল লাঞ্চ ব্রেকের সময়। বেহড় থেকে আমরা সবাই সমতলে উঠেছি লাঞ্চ খাবো বলে, হঠাৎ দেখি আমাদের সিকিউরিটী ফোর্সের একদল জোয়ান একটা জীপের কাছে দাঁড়িয়ে খুব উত্তেজিত ভঙ্গিতে কি যেন দেখছে, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে—হাত-পা নেড়ে।

অপরাজিতা / রঞ্জিত মল্লিক ও রাজশ্রী বসু
ফটো : অমৃত

মেক-আপম্যান শম্ভুর সব ব্যাপারেই একটু যেন বেশী কৌতূহল। সে সরল মনে গিয়েছিল ব্যাপারটা কি দেখে আসবে বলে। আসতে আর পারেনি ওখানে এক বিকট চিৎকার করে দড়াম করে পড়েই অজ্ঞান।

পরে জানা গেল সব। আমরা যখন শুটিং করছি তখনই ডাকাতের একটা দল ওই এলাকা নাকি পার হয়ে যাচ্ছিল। আমাদের গুলি-গোলার শব্দে ওরা প্রথমে ঘাবড়ে যায়। তারপর গোটা ব্যাপারটা না বুঝে ওরা বোকার মত হঠাৎ সিকিউরিটী ফোর্সকে তাগ করে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করে। সিকিউরিটী ফোর্সও এই রকম একটা আকস্মিক অবস্থার জন্যে তৈরী ছিল না। তারা এসেছে প্রধানত আমাদের গার্ড দিতে। কমান্ডে ছিল ভীর সিং। বাইনোকুলার দিয়ে দেখতে গিয়ে সেই প্রথম আবিষ্কার করে ডাকাতরা গুলি চালাতে চালাতে বেহড়ের গোলক-ধাঁধায় অদৃশ্য হচ্ছে। ব্যস, আর কি—ফায়ার। ডাকাতদের তাড়া করতে করতে এরা চার মাইল পর্যন্ত ছুটেছে। তার মধ্যে পাকা আমের মত ফেলেছে তিনটিকে। ফোর্সের একজন জখম হয়েছে। তাকে জীপে করে তৎক্ষণাৎ মোরেনার হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তারপর সমস্ত এলাকা তন্ন তন্ন করে খুঁজে এ পর্যন্ত সেই তিনটি লাশ খুঁজে পাওয়া গেছে। এখনও খোঁজা চলছে, যদি আর কাউকে পাওয়া যায়।

শুনে, শুটিং আমাদের মাথায়। এতবড় একটা এনকাউণ্টার হয়ে গেল—আমরা বুঝতেই পারলাম না। শেখর চ্যাটার্জি বললেন—কি সর্বনাশ, অ্যাক্টিং করতে এসে শেষ পর্যন্ত প্রাণ খোয়াব নাকি? ও রঞ্জন, মঞ্জু দেবীকে বলো এখুনি প্যাক আপ করে চল ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই......

রামানন্দ সেনগুপ্ত এমনিতেই সামান্য খুঁৎখুঁতে, প্রকৃতির মানুষ। তিনি শেখর চ্যাটার্জিকে সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন করলেন।

ভিজ পরি হয় প্রেমিক
পার্থ মুখোপাধ্যায়
নবাগতা সোমা মুখোপাধ্যায়

পিণ্টু এসে খবর দিল—রামদা আরও একটা লাশ পেয়েছে। সিকিউরিটীর লোকদের কী ফুর্তি। আসলে ওরা বড় ইনাম পাবে শুনলাম। ডাকাত মারলেই নাকি ক্যাশ রিওয়ার্ড।

প্রদীপকুমার নিজের ব্যক্তিগত দামী একটা রাইফেল আর একটা পিস্তল এনেছিলেন বোম্বে থেকে। ও-দুটো সব সময় নিজের সংগে সংগে রাখতেন। দেখি এই ঘটনা শোনার সংগে সংগে তিনি পিস্তলটি হাতে করে ঘুরছেন। ভদ্রলোক নিঃসন্দেহে বিব্রত। কাছে এসে রামানন্দকে বললেন—রামবাবু ব্যাপারটা মোটেও সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না কিন্তু। এতগুলো লাশ পড়ে যাবার পর ভেবেছেন ওরা সব পালিয়ে গেছে। উহুঁ.. ওরা নিশ্চয় আশে-পাশে লুকিয়ে আছে। চান্স পেলেই অ্যাটাক করবে। চম্বলের ডাকাত ওয়ার্ল্ড ফেমাস আউট-ল। এদের দমন করা অসম্ভব ব্যাপার।

বোম্বের মণি ভট্টাচার্য এর কিছুদিন আগে এসেছিলেন চম্বল এলাকায় শুটিং করতে মুঝে জীনে-দো ছবির সংগে আর্টিস্ট ছিলেন সুনীল দত্ত আর ওয়াহিদা রেহমান। মোরেনার চম্পক কনক্টর কোম্পানীর ভগিনী আমায় গল্প করে বললেন যে মশাই ওয়াহিদাকে ওরা পাকড়ে করে ছেড়ে দেয় ঠিক করে ফেলেছিল। ওকে কিডন্যাপ করতে পারলে তো লাখ লাখ টাকার মুক্তিপণ। দস্যুদের ধরে রাখবার জন্য এখনকার ডাকাতির একটা মস্তবড় রেওয়াজ। সেখানে ওয়াহিদাকে একবার তুলতে পারলেই তো কাম হতে এক চান্সে সারা জীবনের রোজগার হাতের মুঠোয়। কিন্তু ওদের ব্যাড লাক শেষ পর্যন্ত ওরা পারেনি। আফটার অল ওরা বোম্বের ফিল্ম লাইনের ধুরন্ধর লোক বাতাসে উল্টা গন্ধ পেয়েই হাওয়া। রাত্রে সদলবলে ডাকাতি করতে এসে ডাক বাংলোয় ঢুকে ওরা দেখে পাখী উড়ে গেছে। মাঝখান থেকে বেচারি চৌকিদারের জীবনটা গেল। রাগের চোটে ওরা ওকেই গুলী করে মারল।

সেদিন ওখানে দাঁড়িয়ে পর পর শোয়ানো চারটে রক্তাক্ত লাশ দেখে আমার তো মাথাটাই বোঁ করে ঘুরে গেল। মধ্যপ্রদেশের গাঁয়ে-গঞ্জে চাষাভূষোদের দেখতে যেমন হয়, এদের পোষাক-আশাকও অবিকল সেই রকম। খাঁকি শার্ট মালকোছা দিয়ে পরা মোটা সুতোর ধুতি। সংগে কাপড়ের একটা ঝোলানো ব্যাগ। তাতেই ওদের সর্বস্ব—সম্পত্তিই বলুন বা যা-কিছু। একতাড়া কারেন্সী নোট। একতাল সোনা। একরাশ বুলেট। বিড়ি গাঁজা দেশী-বিলেতী মদের বোতল। কিছু ওষুধপত্র। একটা জীর্ণ রামায়ণ। খুচরো পয়সা। দেশলাই। আর প্রত্যেকেরই সংগে একটি করে দামী রাইফেল। একজনের রাইফেলে আবার একটা টেলিস্কোপ লাগানো।

সার্জেণ্ট উধম সিং একদিন ক্যাম্পে আড্ডায় গল্প করতে করতে বলেছিল দারুণ একটা কথা। চম্বলে একবার যে মানুষ বন্দুক হাতে করে বেহড়ে নেমে যায়, অ্যামিউনেশান ফ্যাক্টরীতে তার নামে সংগে সংগে একটা বুলেট তৈরী হয়ে যায়—।

অর্থাৎ পুলিশের গুলীতেই হোক বা কোন কোন বিশ্বাসঘাতকের—একদিন বুলেটে ঝাঁঝরা বুক নিয়ে তাকে এই চম্বলের রক্ত-পিপাসু মাটিতে শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে হবে। কি সাংঘাতিক কথা ভাবুন।

সেদিন আর লাঞ্চের পর শুটিং করা সম্ভব হয়নি। আমরা তাড়াতাড়ি লোকেশান প্যাক আপ করে মোরেনায় ফিরে গিয়েছিলাম চারধারে সিকিউরিটী ফোর্সের পাহারায়.... ..

অন্ধকারের মধ্যে রিভলবার বাগিয়ে ঠিক বিড়ালের মত সন্তর্পণে সার্জেণ্ট উধম সিং এগিয়ে যাচ্ছে। মুখে বিড় বিড়—টেক কাভার...গোলী আজ জরুর চলেগী .. চলনা বহুত জরুরী হ্যায়...

চোখের নিমেষে যেন ভোজবাজি হল একটা। আমরা ছবির মত সাজানো এই গ্রামে যখন এসেছি তখনও পুরুষেরা ফেরেনি। মেয়েরা কৌতূহলী চোখে দূরে থেকে আমাদের শুধু দেখইছে। মঞ্জু দে রামানন্দ সেনগুপ্ত আর শান্তি সিকিউরিটী গার্ড নিয়ে গ্রামে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে। জোয়ানরা রাইফেল বাগিয়ে দলে দলে গ্রামে ঢুকেছে ডোর-টু-ডোর সার্চ করেছে, প্রশ্ন করেছে মেয়েরা নাকি দাপটের সংগেই সে সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছে—লজ্জা করে না গ্রামের পুরুষেরা যখন মাঠে চাষের কাজে নিয়ে ব্যস্ত তখন এসেছো সার্চ করতে তোমরা খবর না জেনানা। থাক থাক। বেলা পড়ার সঙ্গে সংগে গ্রামের মানুষেরা একে একে ফিরে এসেছে। তারা তো অবাক। সিপাই-শান্ত্রী নিয়ে একদল ভিনদেশী মানুষ যন্ত্রপাতি নিয়ে এখানে কি করছে? ওরা ফাঁড়ি করে এসেছে। প্রশ্ন করছে। উধম সিং ওদের বলিয়ে বলছে আজ তোমাদের এই গ্রামে বাঙালীবাবুরা সিনেমার ছবি তুলবে খুব মজা হবে—

সিনেমা ওরা বোঝে না অথবা বুঝতে চায় না। সারাদিন হাড়ভাংগা পরিশ্রমের পর ঘরে ফিরে কোথায় একটু বিশ্রাম করবে তা নয়—এ কোথাকার এক উটকো উৎপাত জুটে গেল? অ্যাঁ?

মোড়লকে ডাকা হল।

সে বললে—আমি একা কিছু বলতে পারব না। পঞ্চায়েত বসুক।

বসল পঞ্চায়েত। প্রচুর তর্কবিতর্ক হৈ হল্লা করে ওরা বলল—তোমাদের সংগে এরা এসেছে কেন?

—কারা?

—এই মিলিটারী। এদের কি মতলব?

—এরা মানে এরা আমাদের দোস্ত-বন্ধু, এমনিই সংগে এসেছে। এরা তোমাদের কোন ক্ষতি করবে বলে আসেনি—

—এরা আমাদের দুশমন। ...তোমরা চলে যাবে আর এক একটা লোক তের দল এসে আমাদের গাঁয়ে হামলা করবে জেরা করবে, মারবে ধরবে কাটবে ডাকাত পালিয়েছে বলে—তখন? তখন আমাদের বাঁচাবে?

জনঅরণ্যে প্রহরায়
সুরঞ্জন দাস ও সুমিতা সান্যাল...
—ফটো : অমৃত

সাধু যুধিষ্ঠিরের কড়চা
জয়া ভাদুড়ী ও চিন্ময় রায়

উধম সিং সব শুনে বললে—রাগে আমার শরীর জ্বলছে। শালা এরা ডাকু নয় ছ্যাচড়া হারামী নইলে নিরীহ গ্রামবাসীদের ওপর অনর্থক অত্যাচার করে? যখন-তখন এসে খান পাকাতে বলে? মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট করে? খুন-খারাবী করে? আরে ওদের হাতে রাইফেল আছে আমাদেরও আছে আয় মায়ের দুধ যদি খেয়ে থাকিস তো লড়ে যা, সামনাসামনি লড়ে যা, বাহাদুরের মত লড়ে যা—মরতে তো একদিন হবেই—

অ্যাটেনশান কোম্পানী আমরা এখানে আজ গোটা রাত থাকব। দু মাইল আগু পিছু মহল্লা সীল করে দাও। একটা মাছি যেন গলতে না পারে। দেখি শালা ডাকুরা কি করে। দিন সান্ধ্য হয়ে আসছে আপনারা শুটিং শুরু করুন।

ওয়াকী-টকী মুহূর্তে সজীব হয়ে ওঠে। চারিদিকে কর্ডনিং হচ্ছে। পাল্লা দু মাইল জায়গা জুড়ে। ওপেন থাকছে শুধু পশ্চিমদিকের বেহড়। হেড কোয়ার্টার রিপোর্টিং হচ্ছে ঘন-ঘন এমন সময় বেতারে খবর এল— প্রদীপকুমার লোকেশানের দিকে মুভ করছেন সঙ্গে সিকিউরিটি আগে সিকিউরিটী পেছনে। কুমারী নদীর পূর্ব দিকের ঢালে যে রাস্তা গাড়ি ওখান দিয়ে নামবে...ওভার।

ভানু গাঙ্গুলীর বিরাট জেনারেটর এক সময় সশব্দে চালু হয়েছে। অনেকগুলো বাত্তি জ্বলে উঠে চির অন্ধকারে পড়ে থাকা বেহড়ের বিভীষিকা ঘেরা এই গ্রামটি আজ হঠাৎ আলোর বন্যায় ভেসে গেছে। শিল্পীরা একে একে মেকআপ নিয়ে ডাকাতের রূপসজ্জায় ক্যামেরার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। শব্দযন্ত্রী অবনী চ্যাটার্জি সাউন্ড ভ্যানে বসে মনিটার শুনেছেন শটের রিহার্সাল নিয়েছেন ক্যামেরাম্যান রামানন্দ পরিচালিকা মঞ্জু দে এরপর একসঙ্গে টেক চেয়েছেন। শুরু হয়েছে চিত্রগ্রহণের পালা।...

...বাইজী পুতলী বাই-কে সঙ্গে নিয়ে ডাকু সুলতান সিং ডাকাতি করতে বেরিয়েছে। পুতলী নাচনেওয়ালী সুলতান তাকে ডাকুতে রূপান্তর করতে চায়। ঝড়ের বেগে সুলতান সিং সদলবলে রাতের অন্ধকারে গ্রামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে চতুর্দিকে গুলী চলছে, সন্ত্রস্ত গ্রামবাসী ছোটাছুটি করছে প্রাণভয়ে বিকট আর্তনাদ করে কে-যেন ধপ করে মাটিতে গড়িয়েও পড়েছে সুলতান সিং জিঘাংসায় হাঃ হাঃ হাঃ করে হাসছে ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে পুতলী বাই আতঙ্কে তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এসেছে এই রকম এক উত্তেজিত মুহূর্তে—

হুশিয়ার...হুশিয়ার বাঘের মত ক্ষিপ্র গতিতে লাফিয়ে উঠেছে উধম সিং ওয়াকীটকী সজীব হয়ে কিছু বলছে—চেক টু ইয়োর ওয়েস্ট ফ্ল্যাং...ওভার।

উধম সিং চেঁচিয়ে উঠেছে—বন্ধ করো। কোম্পানী বি অন ইয়োর গার্ড—দুশমন নজদীগ হ্যায়, হু-শি-য়া-র!

লাইটস অফ লাইটস অফ। ভানু গাঙ্গুলী লাফিয়ে উঠে জেনারেটারের মেন সুইচ বন্ধ করতেই ধক শব্দে জেনারেটারটা প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনী দিয়েই নীরব হয়ে গেছে। ঝিঁ...ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ...ঝিঁ। এখন শুধু ঝিঁঝির ডাক। তারই মধ্যে পশ্চিম বেহড়ের দিক থেকে ভেসে আসা বাতাস কিসের শব্দ শুঁকছে সার্জেন্ট উধম সিং? অস্পষ্ট একটা কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে না? শুনুন তো কান পেতে!

আমাদের হৃদপিণ্ড যেন লাফাচ্ছে। প্রদীপকুমারের একটা হাত আমার কাঁধে শক্ত করে ধরা। সমস্ত গ্রামটা নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে যেন টুপ করে ডুবিয়ে গেছে। বাড়ির ছাতে গাছের মাথায় শান্ত্রীর শক্ত হাতে ধরা রাইফেলের নল এখন পশ্চিমদিকে বাগানো। লাইট মেশিনগানার মাটিতে বুক দিয়ে পড়েছে অব্যর্থ লক্ষ্যে এখন সে হৃৎপিণ্ড ছ্যাঁদা করবার জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছে। হায় ঈশ্বর...

ফায়ার!

উঃ কল্পনা করুন সে দৃশ্য ঘন অন্ধকারের বুক চিরে একটা নরম শব্দ—সুঁইঁইঁইঁইঁশ ক-শাক-শাক আলোর রোশনাই ছুটছে তো ছুটছে তো ছুটছেই—জ্বলন্ত ট্রেসিং বুলেট খুঁজছে দুশমনকে অভিশপ্ত বেহড়ের অলিতে-গলিতে সেই সঙ্গে উধম সিং-এর—ইয়ে সাহাব মোত হ্যায় আজ মরনাই হ্যায় দেখ লো ইয়ে জিন্দেগী মোতসে বড়ে জিন্দেগী আজ কামাল হো যাতা হ্যায়...

ভোর রাত্রে অর্ধমৃত আমরা সবাই কোনো গতিকে ফিরে এসেছিলাম মোরেনাতে অতান্ত নিরীহ ফিল্ম টেকনিশিয়ান এবং শিল্পী কয়েকজন তারপর একদিন পরেই আমরা কলকাতায়। হাঃ!

—রঞ্জন মজুমদার

পৃথিবীর যেমন তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল, স্যার নবকৃষ্ণের মাত্র পঁয়ত্রিশ কি সাঁইত্রিশ বছরের জীবনে তেমনি তিন ভাগ মেয়ে এক ভাগ ছেলে। এ হেন নবকৃষ্ণ তাহলে তো কলির ইয়েই বটে। মেয়েদের ধরতে হয় না মেয়েরাই ওঁর কাছে ধর্না দিয়ে বসে থাকে। যেমন বসে আছেন সুলতা নন্দী এবং জনৈকা। সঙ্গে সঙ্গে খবর হয়ে গেল ঃ 'এসে গেছে স্যার, এসে গেছে দুজন।' বললে বিপুল, ওঁর সেক্রেটারী।

দুজন সুলতা নন্দী বল কি হে— স্যার কৌতূহল ব্যক্ত করলেন।

বিপুল, বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি এ রকম একটা ভাব চোখে মুখে ফুটিয়ে শেষে মোদ্দা কথাটা প্রকাশ করল ঃ একটা বড় একটা কচি।

'কচি।' স্যার একেবারে লাফিয়ে ওঠার উপক্রম করেছিলেন। কি ভেবে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। নিজেকে আপাদমস্তক দেখলেন, নিজেকে রোমিওর মতো রোমান্টিক ভাবলেন, ডন জুয়ানের মতো জোয়ান ভাবলেন। তারপর আদেশ করে বললেন ঃ ল্যাভেন্ডার মারো, একটু ল্যাভেন্ডার মারো।...

বিপুলের মাথায় শর্ট সার্কিট হয়ে বুদ্ধির বাল্বটি গেল ফিউজ হয়ে...আজ্ঞে।

আহা এ রকম পরিস্থিতিতে কি সমস্ত ব্যাপার বলে বোঝান যায় না কি বুঝিয়ে বলা যায়। এখন স্যারের হৃদয়ের জেনারেটর লোড শেডিং এর জন্য থেকে অনবরত বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে। পুরুষ সিংহ প্রমাণিত করার চেষ্টায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলছেন। একটা ছোট্ট কথা আণবিক বোমা হয়ে বিস্ফোরিত হয়েছে একটু আগে ঃ কচি...কচি...কচি বললে যে। মারো ল্যাভেন্ডার মারো, ভাল করে মারো।...

এই ঘর লংকাকাণ্ডের জন্য মোটেই প্রস্তুত নয়। অতএব ছটাক [illegible] ল্যাভেন্ডার। স্যার স্লিপিং ট্রাউজারের ওপর জামা চাপিয়ে গলায় টাই ঝুলিয়ে দাঁড়ালেন পেছন ফিরে। ল্যাভেন্ডার স্প্রে চলতে থাকে। স্যার টাই এর নট লাগাতে থাকেন।

সেট থেকে [illegible] দৃশ্যে হরিধন মুখোপাধ্যায় এবং উত্তমকুমার। পরিচালনায় ঃ সলিল দত্ত। —ফটো ঃ [illegible]

মহিলাদের মহিমা অনেক। ঢঙ দেখে আর বাঁচিনে। সুলতা নন্দী জানিয়েছেন তিনি আর পারছেন না। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল যুবক তরুণ। তার বক্তব্য হল এই একবারটি নীচে আসুন স্যার ম্যাডাম আপনার জন্য অনেকক্ষণ ওয়েট করছেন। আপনার সঙ্গে দেখা না করে জলস্পর্শ করবেন না।' মহিলার ন্যাকামির বহর উপলব্ধি করে স্যার একদম গাছ থেকে পড়লেন ঃ তাই নাকি?

ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। এক্ষুণি চলুন।

একবার নিজের দিকে তাকিয়ে একবার স্যুটেড-বুটেড তরুণের দিকে দৃষ্টিপাত করেই দীর্ঘশ্বাস। নাহ্‌ আর পারা যাবে না। মেয়েদের চোখমুখে দেহের সর্বত্র শক্তিশেল। তাদের সামনে এভাবে যাওয়া যায়? দ্যাখ তরুণ এসব ব্যাপারে তোমার বয়সটিও যেমন কাঁচা বুদ্ধিটাও তেমনি...

তরুণের মুখ হাঁ। একটা মাছি অনায়াসে সেখানে চারবার চক্কর দিতে পারে...কোন সব ব্যাপারে'

এইভাবে কোন মহিলার সামনে যাওয়া যায়—

ঃ ঠিকই বলেছেন...স্যার মহিলা ব্যাপারটাই বড় গোলমেলে আপনি বরং তৈরী হয়ে আসুন...আমি ততক্ষণে আমার বাড়িতে ব্যবস্থা করছি।

তরুণের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে স্যার নবকৃষ্ণ ধপ করে বিছানার ওপর বসে পড়লেন, ফুলের ঘায়ে কেউ মূর্ছা যায় কিনা জানিনা কিন্তু 'গোলমেলে' কথাটার ঘায়ে মূর্ছা যেতে দেখলাম একজনকেই।

পার্বতীর এক ধাক্কায় দেবদাস ছারেখার হয়েছিলেন। গোলমেলে কথার ধাক্কায় নবকৃষ্ণ যে রামকৃষ্ণ হতে চলেছেন। এইসব দৃশ্য দেখে বিপুলের মাথা ঠিক থাকে কেমন করে। সে প্রায় রেগে গিয়ে জিগ্যেস করে ঃ কি হল বসলেন যে। এদিকে স্যার যতই ভাবছেন ততই মনের মধ্যে হাজারো মেয়ে উঁকি দিচ্ছে। ঠগ বাছতে গাঁ উজোড়। অতঃপর কয়েক মুহূর্ত বয়ে গেল। এক সময় ঃ অ্যালবামটা দাও।

ঃ অ্যালবাম।

দুজন বললে যে যদি গুলিয়ে যায়।

স্যার নবকৃষ্ণ। 'স্যার' উপাধিটা এসেছে পূর্বপুরুষদের দৌলতে যাঁরা একদা বৃটিশদের সুনজরে ছিলেন। সেরকম এক বনেদী বাড়ির এই নবকৃষ্ণ যিনি জীবনকে ইতিমধ্যে বাহান্নটা তাসের মতো ছিটিয়ে প্রায় সবগুলো তাসই উল্টিয়ে দেখে নিয়েছেন। তবে এখনো তিনি বড় তাসটা

উলটাতে পারেননি। সিঁদুর আর ঘোমটার জীবনটা জানা হয়নি তাঁর। জীবনের অজস্র ভোগের মধ্যে নবকুমার খুঁজে বেড়ান...। ঐশ্বর্য যত বেড়েছে ততই তিনি নিঃস্ব হয়ে গেছেন। প্রাচুর্যের ক্লান্তিতে বুকের মধ্যে অস্ফুট বেদনা। এখনো তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন সেই চোখ যার দিকে তাকিয়ে পরম নির্ভরতায় ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখা যায় আশা হয় নতুন নামের নতুন জন্মের একটা জীবন...। ফলে এই ছবির নাম 'সেই চোখ'।

গল্পটি তোলা হয়েছে কমেডির আদলে আসলে স্যাটায়ার—স্যার নবকুমার চরিত্রটির সংলাপে দর্শক হাসবেন ঠিকই কিন্তু অন্তরালে কোথায় যেন খেলার আছে। ব্যঙ্গ করা হচ্ছে [illegible] উত্তমকুমার। কাহিনীকার - চিত্রনাট্যকার-পরিচালক সলিল দত্ত বললেন : এক কথায় বলতে পারেন সোশ্যাল স্যাটায়ার। আমি হাই সোসাইটির লোকজনদের নিয়ে একটি ব্যঙ্গ করছি। সত্যি হাইসোসাইটি বলা যাবে না বরং বলা যায় যাঁরা মাসে এক হাজার টাকা রোজগার করে নিজেদের হাই সোসাইটির ভাবেন আমি সেই জাতীয় লোকজনদের নিয়ে ব্যঙ্গ করেছি।'

ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে তরুণ পরিচালক বরুণ কাবাসী 'ছুটির ঘন্টা' ছবির শুটিং শেষ করলেন। ঐকতান নিবেদিত এ ছবির কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকার পরিচালক স্বয়ং। প্রধান নারী চরিত্রে রূপদান করেছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়। এ ছবির অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে আছেন : জহর বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় গীতা দে, নবাগত সুনাম, শিপ্রা চক্রবর্তী

[illegible] সিং, উমা দেবী ও অন্যান্য শিল্পী

সুনীতি দত্ত এবং দ্বিজু ভাওয়াল। শিশু শিল্পী মাস্টার শান্তনুর অভিনয় এ ছবির অন্যতম আকর্ষণ। সুর সংযোজনা করেছেন : [illegible] নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন : হেমন্ত মুখার্জী শ্যামল মিত্র এবং আরতি মুখোপাধ্যায়। স্বপ্নদীপা চিত্র মন্দিরের পরিচালনায় ছবিটি অনতিবিলম্বে মুক্তি লাভ করবে।

সঙ্গীত পরিচালক নচিকেতা ঘোষ বিগত সপ্তাহে 'সন্ন্যাসী রাজা' ছবির গান রেকর্ড করলেন। গাইলেন : মান্না দে। অসীম সরকারের প্রযোজনায় নির্মীয়মান এ ছবির চিত্রনাট্যকার পরিচালক : পীযূষ বসু। নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন উত্তমকুমার। চলতি সপ্তাহ থেকে তৃতীয় পর্যায়ের শুটিং শুরু হচ্ছে নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওতে। এক নাগাড়ে দশ দিন ধরে শুটিং চলবে। অন্যান্য চরিত্রের শিল্পীরা হলেন : তরুণকুমার রসরাজ চক্রবর্তী, কল্যাণী মন্ডল কল্যাণী অধিকারী সুলতা চৌধুরী, প্রমিলা ত্রিবেদী রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুপ্রিয়া দেবী। চিত্রগ্রহণ করছেন : বিজয় ঘোষ।

এ মাসেই 'অগ্নীশ্বর' ছবির নতুন পর্যায়ের শুটিং হবে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে জানালেন অন্যতম প্রযোজক উদয় সামন্ত। প্রতিভা পিকচার্সের পতাকা তলে নির্মীয়মান এ ছবির পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। কাহিনী বনফুলের। নাম ভূমিকায় অর্থাৎ ডাক্তার অগ্নীশ্বরের চরিত্রে রূপদান করছেন উত্তমকুমার। সঙ্গে আছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় তরুণকুমার সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় অসীমকুমার, দিলীপ রায়, পার্থ মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

বেশ কিছুদিন পর পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে বাংলা ছবি নির্মিত হতে চলেছে। 'বিল্বমঙ্গল'। পরিচালনা করবেন এককালের বিখ্যাত প্রযোজক গোবিন্দ রায়। সম্প্রতি গান রেকর্ডিং এর মাধ্যমে শুভ মহুর্ত উদযাপন করা হয়েছে। সঙ্গীত পরিচালক অনিল বাগচীর তত্ত্বাবধানে গোবিন্দগোপালের স্তোত্র এবং নির্মলা মিশ্রের গাওয়া একটি গান রেকর্ড করা হল। জানা গেল [illegible] বর নায়ক সমিত ভঞ্জ নায়িকা [illegible] মা দে এবং একটি বিশেষ চরিত্র র[illegible]ত করবেন শেখর চট্টোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণ করবেন : দীপক দাস।

'পান্না হীরে চুণী' খ্যাত পরিচালক অমল দত্ত 'এমনি অনেক' নামে একটি নতুন ছবির দৃশ্যগ্রহণ শুরু করেছেন। এ ছবির কাহিনী আজকের যুব সমাজকে নিয়ে। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করছেন : কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, পার্থ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ রায় সুখেন দাস সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় ভগবতী ঘোষ শিবানী বসু কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় জহর রায় পদ্মা দেবী এবং অনিল চট্টোপাধ্যায়। আলোকচিত্র শিল্পী : সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে দীপক গুপ্তের পরিচালনায় 'রাঙা বৌদি'র শুটিং দ্রুত এগিয়ে চলেছে। রাঙা বৌদি সেজেছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন : শেখর চট্টোপাধ্যায় অশোক মিত্র, দেবিকা মুখোপাধ্যায় পদ্মা দেবী এবং দিলীপ রায়। চিত্র শিল্পী : বিজয় দে।

শৈলেশ দে রচিত 'আহ্লাদবাগানের মেয়ে' চলচ্চিত্রায়িত হচ্ছে। শুটিং এগিয়ে চলেছে। সলিল সেন কৃত চিত্রনাট্যে ছবিটি পরিচালনা করছেন মানু সেন। বিভিন্ন চরিত্রের শিল্পীরা হলেন : উৎপল দত্ত,

চিন্ময় রায়, রুবী মিশ্র রবি ঘোষ দীপঙ্কর দে ও রাজশ্রী বসু। চিত্রগ্রহণ করছেন ঃ মণীশ দাশগুপ্ত। প্রযোজক ঃ শৈলেন সরকার।

অভিনেতৃ সংঘ তাঁদের প্রতিশ্রুত পরিকল্পনা রূপায়িত [illegible] এলেন। সম্প্রতি সংঘের সভ্যারা দুঃস্থ শিল্পী কলাকুশলী এবং দুর্গত মানুষের সাহায্যার জন্য রক্তদান করলেন। এই প্রথম পর্যায়ে রক্তদান করলেন ঃ অনুপকুমার, দিলীপ রায় দেবদাস দে অশোক মিত্র প্রণব নন্দী দেবকুমার দাস সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় গোবিন্দ দে সুখেন্দু চট্টোপাধ্যায় গোর মালাকার পবিত্রকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং নবকুমার দাস। বিভিন্ন পর্যায় আরও অনেক সভ্য রক্ত দান করবেন। রক্ত জমা থাকবে [illegible]। এক [illegible] পর্যন্ত রাখা যায়। দশ মাস পর্যন্ত দেখা [illegible] ব্যাঙ্ককেই ডোনেট করা হবে সাধারণ মানুষের সাহায্যে। প্রেফারেন্স অনুযায়ী প্রথমে সাহায্য পাবেন সংঘের সভ্যরা। তারপর অন্যান্য শিল্পী এবং কলাকুশলীরা।

কাহিনীকার চিত্রনাট্যকার এবং পরিচালক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে সুখেন দাস আবার নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ। 'লালুভুলু' ছবির নায়ক মাস্টার সুখেনকে মনে পড়ে? আমার বড় বেশী করে মনে পড়ে। তাই তো অতীত স্মৃতিগুলো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মুহূর্তে। মনে পড়ে তাঁর ছিন্নভিন্ন সংগ্রামী দিনগুলির কথা। একে একে অতিক্রম করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সুখেন। এক জোড়া অপূর্ব সুন্দর চোখ। মাথায় উত্তাল ঢেউয়ের মতো এক রাশ কালো চুল। সহজাত সেই মিষ্টি হাসি। সফল বাংলা ছবি 'অচেনা অতিথি'র কলাধ হিন্দী ভার্সান 'অনজানে মেহমান'-এর নায়ক। পাশে আছেন সমিত ভঞ্জ। বাংলায় স্বরূপ দত্ত যে রোল সেটি করছেন সুখেন, সুখেন নিজের রোলটি দিয়েছেন সমিতকে। হিন্দিতে নায়িকার ভূমিকায় অনেক দিন পরে এলেন সুমিতা সান্যাল।

টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওর [illegible] একটি সেটে কোনো পাহাড়ী অঞ্চলে একটি বাড়ি যেখানে নায়কের সঙ্গে নায়িকার সাক্ষাৎ ঘটবে দেখলাম [illegible] মুহূর্ত। নায়িকা, নায়িকার পিতার জন্য নায়কের সমবেদনা অথচ কিছুই সে করতে পারছে না এ-রকম ভাব আনতে হবে এক্সপ্রেস করতে হবে, পরিচালক জ্ঞানেশ মুখার্জী একটা রিহার্সাল চাইলেন। ক্যামেরার জোনের বাইরে দাঁড়িয়ে রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে সমিত কিউ দিচ্ছিলেন। শটটা বেশ জমল। যেমন জমে থাকে সাধারণ হিন্দি ছবিতে।

অসাধারণ হিন্দি ছবি করার বাসনা নিয়ে এ ছবি তৈরী হচ্ছে না। এখানকার ইনডাস্ট্রির সংকট মোচনের উদ্দেশ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দর্শকদের কথা ভেবে হচ্ছে। তদুপরি এই ছবিতে বঙ্গ সংস্কৃতির প্রতিফলন থাকবে—গল্পে রুচিতে বক্তব্যে। আগের দিনে যেমন ছিল। সারা ভারতের অগণিত দর্শক সব সময়েই যে স্বল্পবাস পরিহিতা নায়িকার নাচ-গান ভিলেনের অবাস্তব কান্ড-কারখানা, সর্বশক্তিমান নায়কের অবিশ্বাস্য বীরত্ব দেখতেই চান সেটা সত্য নয়। যে কারণে রুচিসম্পন্ন ভাল ভাল হিন্দি ছবি আজকাল বক্স অফিস সফল। এমন একদিন ছিল যখন কলকাতার তৈরী হিন্দি ছবি সারা ভারত থেকে পয়সা নিয়ে আনত। এই ছবির মাধ্যমে সেই চেষ্টা হচ্ছে। এবং একইভাবে শুধুমাত্র বাংলা ছবির শিল্পী এবং কলাকুশলীদের নিয়েই এই প্রয়াস।

—স্টুডিও সংবাদদাতা
১৮।৭।৭৪

বোম্বাই ফিল্মের কড়চা

মৌসুমী এখনও বালিকা বধূটি হয়ে থাকতে চায়। বড় হতে চায় না। বড় হতে তার প্রবল আপত্তি। একবার বড় হয়ে গেলে ছবির বাজার তেমন [illegible] না [illegible] সিরিয়াসলি প্রেম করতে আসে। প্রথম প্রথম এরকম দুর্ঘটনা ঘটতে বসেছিল। কলকাতা থেকে হিরোইন আসছে বেশ ডাগর ডাগর চোখ দুটি—খবর পাওয়া মাত্র হিরোরা সব লাইন দিয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যেই লাইন পাতলা। [illegible] রামচন্দ্র। এ এতো বাচ্চা মেয়ে প্রেম টেম কিসসু বোঝে না। [illegible] কে। কিন্তু হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নয় বিনোদ মানে বিনোদ মেহরা। মৌশুমী যখন স্কুলে পড়ে তখন থেকে লাইন লাগিয়েছে বেচারা। যাই হোক সেই বিনোদ যখন রেখার প্রেমে পড়ল তখন মৌসুমী বলল ঃ রেখাটা বড্ড হিংসুটে। রেখা বলল ঃ বাচ্চা বাচ্চা ইমেজ নিয়ে আর কতদিন থাকবে, এখন তো সংসার হয়েছে। সুতরাং ওসব খেলাধুলো ছেড়ে লক্ষ্মী মেয়ের মতো ঘর কর বুঝলে?

শোনা যায়

উঠতি নায়িকা নীতু সিং মজা করতে পারে বেশ। প্রযোজক-নায়ক কাউকেই নাকি সে খুব একটা আমলই দেয় না। মুডের সময় [illegible] খেয়ালিপনার ফল সে সম্প্রতি হাতে হাতে পেয়েছে। এক ককটেল পার্টিতে নীতু বুঝি বেশ মুডেই ছিল তখন। নতুন ছবির নায়ক [illegible] কাছে আসতে [illegible] বলেছিল—কি কাকু কেমন আছ? নায়ক [illegible] প্রেম করার অ্যাটমসফিয়ারটাই মাটি। প্রযোজককে গিয়ে [illegible] সঙ্গে নালিশ। নীতু আমায় [illegible] বলেছে—ভাইঝির সঙ্গে আমি তো প্রেম করতে পারবো না। সুতরাং ছবির নায়িকা বদলাতে হবে। নায়ক যখন প্রযোজকের [illegible] কার্ড তখন নীতুকে সরে যেতেই হলো শেষ অবধি।

বাজার-হাট চারদিকে যেমন অভাব আর [illegible] লেগেছে। সান এন্ড স্যান্ড শেরাটন বা তাজে প্রতিদিন কত বোতল স্কটল্যান্ডের জল গড়াচ্ছে সেটার যেমন কোনো হিসেব নেই—শিল্পীদের ডেট পাবারও তেমনি কোনো হিসেব নেই। অভাব এখানেও। সারাটা চুয়াত্তর সালের ডায়রী ভর্তি এনগেজড লেখা [illegible] নবীন নিশ্চল প্রমুখের। এঁদের বিপরীতে নায়িকারাও কমতি যান না। রেখা যোগিতাবলী নীতু সিং হেমা মালিনী শর্মিলা ঠাকুর মৌসুমীর ডায়রীর পাতাও [illegible] নেই। [illegible]

গুলজারের নতুন ছবি আঁধি-র নায়িকা শিল্পী হলেন কলকাতার সুচিত্রা সেন। ছবি শুরুর আগে এই নায়িকা সিলেকশন নিয়ে নাকি রাখী গুলজারের মধ্যে [illegible] হয়েছিল সোচ্চার। রাখী ছিলেন সুচিত্রা সেনের পক্ষে আর গুলজার চাইছিলেন শর্মিলাকে নিতে। কিন্তু রাখী তো নাছোড় বান্দা। সেই দাগ ছবির সময় থেকে রাখী শর্মিলার মন কষাকষির সূত্রপাত। রাখী এখনও তা বর্জন করতে পারেন নি। স্বামীর ছবিতে শর্মিলাকে তিনি কাজ কিছুতেই করতে দেবেন না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য স্ত্রীর জিদের কাছে স্বামীকে হার মানতেই হয়েছে। না মেনে উপায় কি?

—অভিজিত

একেই বলে তৃতীয় নয়ন। আপনারা জানেন কিনা জানি না সংগীত পরিচালক [illegible] একটা জুটি। এই জুটির একজন অন্ধ সে হচ্ছে সৌনিক। [illegible] সেন্টারে [illegible] ছবির গান টেক করার সময় দেখি সৌনিক হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র থেমে গেল। কি হয়েছে? গাইছিলেন আশা ভোঁসলে তিনিও স্তম্ভিত। এ হেন পরিস্থিতিতে একজন মিউজিশিয়ানের নাম ধরে ডাকলেন সৌনিক। সে তখন ভয়ে থর থর করে কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতে সে তার দোষ স্বীকার করল হ্যাঁ আমি ঠিক জায়গাতে দাঁড়াইনি। তখন সৌনিক হাত তুলে ওর জায়গা দেখিয়ে দিলেন। অতঃপর গান রেকর্ড করা হল।

* * *

প্রযোজক পরিচালক নরেশকুমার একটানা ন'রোদিন ধরে দো জাসুস ছবির স্যুটিং করলেন। প্রচুর অর্থব্যয়ে একটি ক্লাবের সেট নির্মাণ করা হয়েছিল। এতে অংশ গ্রহণ করলেন ছবির প্রধান দুই অভিনেতা রাজ কাপুর এবং রাজেন্দ্রকুমার। এঁরা এ ছবিতে অ্যামেচার ডিটেকটিভস। কমেডি রোল। কে এ নারায়ণ রচিত এই কাহিনীর অন্যান্য চরিত্রগুলিতে রূপদান করছেন ঃ ভাবনা ভাট শৈলেন্দ্র সিং প্রেম চোপরা কমল কাপুর [illegible] মনমোহন কৃষ্ণ এবং অলকা। সংগীত পরিচালক ঃ [illegible]ন্দ্র জৈন।

* * *

অলক [illegible] সঙ্গে সতীশ কাউলের মেলামেশা বেড়েছে। মাঝে মাঝে সতীশ আবার প্রেমা নারায়ণের সঙ্গে ঘুরছে। এদিকে নরেন্দ্র সাহুর মন খুব খারাপ। সমস্ত ব্যাপারটাই বেশ দর্শনীয় কিন্তু বোধগম্য হচ্ছে না যে।

* * *

গ্যাম্বলার এবং প্রেমপুজারীর গান লিখে বিখ্যাত নীরজ বম্বে ছেড়ে চলে গেলেন। কারণ তাঁর এখানে বনিবনা হল না। মোদ্দা কথা তিনি বম্বের কনভেনশনাল সংগীত পরিচালকদের সঙ্গে [illegible] করে কাজ করতে পারলেন না। বিদ্রোহ, অন্ততঃ একজন হলেও তো করলেন।

• • •

কদিন আগে দেবানন্দের বাড়িতে চোর ঢুকেছিল। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত অবস্থায়। চুরি করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে [illegible] পর সে চম্পট দেবার উদ্যোগ করে। আইরিশ পার্কে দেবানন্দের বাড়ি যারা দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন কত উঁচু পাঁচিল। পালানো কি সহজ কাজ। মোটেই না। ফলে চোর একেবারে হাতে নাতে ধরা পড়ল। পরে মারধোর হজম করার পর সে স্বীকার করল শুধু একটা ফটো নিয়েছি দেব সাহেবের। আমি চোর নই, ফ্যান।

বিদেশী ছবি

ক্যাচ টুয়েণ্টি টু

অতি সম্প্রতি কলকাতার মিনার্ভা চিত্রগৃহে যে উল্লেখযোগ্য ছবিটি দু সপ্তাহ ধরে দেখানো হোল তার নাম 'ক্যাচ টুয়েণ্টি টু'।

খুব কাছাকাছি সময়ে কলকাতায় এমন একটি চিহ্নিত করে দেখার মত ছবি এসেছে কিনা সন্দেহ।

ছবিটির ঘটনাকাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। পাত্রপাত্রী বিমান বাহিনীর কর্তব্যরত সৈনিক। স্থান মরুভূমির মত রুক্ষ পাহাড়ী জায়গা যার কাছাকাছি নদী থাকলেও শ্যামলা ভূমির অস্তিত্ব খুব কম। লোকালয় শূন্য।

এ ছবিতে গল্পাংশ খুব কম। বক্তব্য হল যুদ্ধ ও শান্তি, মানুষের মনের সহজাত প্রেম ভালবাসা এবং বিপরীতে তার যৌন-লালসা যুক্ত কামনা বাসনা, মানুষের জীবন সম্পর্কিত সৌন্দর্য বোধ অথবা তার ভেতরের পাশব প্রবৃত্তি—এরই খন্ড খন্ড চিত্রের সমষ্টি এই কাহিনী। কাহিনী না বলে একে বলা উচিত একটা টেন্ডেন্সীর আত্মপ্রকাশ।

ঠিক তাও নয়, বস্তুত গল্প বলে এছবি বোঝানো যাবে না। কথার পিঠে কথা, যুক্তির বিনিময়ে পাল্টা যুক্তি, প্রশ্নের সঙ্গে উত্তরের অসঙ্গতি—যার সবটাই মানবিকতায় চিহ্নিত।

যুক্তির দিক থেকে ছবিটি যুদ্ধের বিরোধী এবং মানবিকতার স্বপক্ষে কথা বলেছে।

আশ্চর্য সতেজ এবং বলিষ্ঠ এর সংলাপ। এক এক সময় এর সংলাপ শুনতে শুনতে হাসিতে ফেটে পড়তে হয় এবং পরক্ষণেই তার সম্বন্ধে বিস্মিত হয়ে ভাবতে হয়। সংলাপের সঙ্গে সঙ্গেই হাসি এবং ভাবনা আমাদের বিভ্রান্ত করে দেয়। সেই হাসি ও সেই সংলাপ আমাদের মনেও প্রশ্ন তোলে। ছবিটির শুরু হাসি দিয়ে। কিছু কিছু সংলাপ কিছু হাস্যকর অথচ ইডিয়টিক দৃশ্যের অবতারণা থেকে ছবি দর্শককে কখন যেন নিয়ে গেছে তার বক্তব্যের গভীরে। আর সর্বত্রই যেন একটা 'কেন'র বেড়াজাল।

ছবিটিতে ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতিতে গল্প বলা। কিছু অংশে যুদ্ধের মহড়া দৃশ্য ছাড়া (যেখানে দেখা যাচ্ছে ছবির নায়ক তা মানিয়ে নিতে পারেনি, স্বীকার করে নিতে পারেনি মারণাস্ত্র প্রয়োগের ব্যাপারটা) বাকিটা জুড়ে আছে একজন সুস্থ মানুষের বিপরীত পরিবেশে পড়ে তার মানসিক অস্থিরতা এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব। এবং তার প্রতিটি দৃশ্যই যেন নিবিষ্ট হয়ে দেখতে হয়। এ ছবিতে কোন নায়িকা নেই। তবে নারীর ভূমিকা আছে। যারা কামনা-বাসনা মিটিয়েছে বুভুক্ষু মানুষের।

ছবিটির গল্পকার জোসেফ হেলার্স, পরিচালক মাইক নিকলস (দি গ্রাজুয়েট খ্যাত)

ছবিটি দেখার পরও অনেকক্ষণ তার রেশ থাকে। কয়েকটি নিষ্ঠুর এবং কয়েকটি প্রতীক দৃশ্য মনকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়।

দ্বিতীয়বার ছবিটি এলে পাঠক অবশ্যই দেখতে ভুলবেন না।

একটি চেক ছবি

সরলা মেমোরিয়াল হলে দেখান হয় চেক ছবি টু থিংগস ফর লাইফ। ছবিটি রঙিন। পরিচালক জিরি হানিবল:

ছবিটিতে বর্তমান যুগের সমস্যা ও যন্ত্রণার কথা বলা হয়েছে। তার সঙ্গে আছে এ যুগের মানসিকতা ও আবেগের ক্রম-বিকাশ।

এছাড়াও ছবির গল্পের বক্তব্য আছে একটি। ছবির নায়ক প্রথম পর্যায়ে উত্তর ... শহর ... এক খনিতে এক বছর স্বেচ্ছা-শ্রমের বিনিময়ে যে অর্থ পাবে তাই দিয়ে ফিরে গিয়ে একটি ফ্ল্যাট কিনবে বলে।

এক সময় ওখানেই সে একটি মেয়েকে ভালোবেসে বিয়ে করে এবং তারই আত্মীয়ের বাসায় বসবাস করতে থাকে। কিন্তু নিজস্ব গন্ডির অভাব নিয়েই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ক্রমে মনোমালিন্য হয় এবং নায়ক বেরিয়ে আসে সেখান থেকে।

ছবির শেষে নায়ক আবার ফিরে এলো অসত্রাভে। সেখানেই সে অনুভব করল যে, জীবনে দুটি ব্যাপার অপরিহার্য। প্রথম হোল কাজ করার, পরিশ্রমী হবার চেষ্টা থাকা, যা জীবনে এনে দেয় সার্থকতা। এবং দ্বিতীয়ত কাজের মানুষের সঙ্গে আরও নিবিড় অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তোলা।

—শা, র, চ

বৃটেনে সত্যজিৎ রায় সম্বর্ধিত

সম্প্রতি সত্যজিৎ রায় যখন ব্রিটেনে গিয়েছিলেন তখন তাঁকে দুটি অনুষ্ঠান মারফৎ সম্বর্ধনা জানানো হয়। প্রথম রয়েল কলেজ আর্ট তাঁকে অনারারী ডকটরেট উপাধিতে ভূষিত করেন। দ্বিতীয়. গত ২৩শে জুন থেকে ১২ই জুলাই পর্যন্ত লণ্ডনের ন্যাশনাল ফিল্ম থিয়েটারে ব্রিটিশ ফিল্ম ইন্সটিটিউট কর্তৃক শ্রীরায়ের ছবি প্রদর্শন করে। এখানে তাঁর মোটামুটি সব কটি ছবিই দেখানো হয়।

ওখানে সত্যজিৎ রায়ের ছবির দর্শক যে বরাবরই বেশী এবং বৃটেনের লোকেদের কাছে যে শ্রীরায় বিস্ময় মিশ্রিত শ্রদ্ধার পাত্র এই অনুষ্ঠান এবং সম্মান প্রদর্শন তাই আর একবার প্রমাণ করছে।

শতবর্ষের স্মরণীয়

অবিনাশচন্দ্র কর

'অবিনশী মুনি ঋষি করছে বসে ধ্যান'—গিরিশচন্দ্রের 'লুপ্তবেনী'র 'অবিনাশী' অবিনাশচন্দ্র করের আদি বাসও বাগবাজারেই ছিল। সধবার একাদশী বা লীলাবতীর প্রথমাভিনয়ে অবিনাশবাবু কোন ভূমিকা গ্রহণ করেননি। লীলাবতীর সময়ই তার যাতায়াত। নীলদর্পণ নাটক নির্বাচন করে ভুবনমোহন নিয়োগীর বাড়ীতে যখন প্রথম গিরিশচন্দ্রের শিক্ষাধীনে রিহার্সেল শুরু হয়—তখন রোগ সাহেবের চরিত্রে অবিনাশ করকে গিরিশচন্দ্রই নির্বাচন করেন। টিকেট বিক্রী করে নীল-

সুরশিল্পী কমল দাশগুপ্ত

সেটা সম্ভবত ১৯৩৪ সাল। স্বয়ং কাজী সাহেবের কাছে তালিমে ছাড়পত্র পেয়ে তাঁরই কথা এবং সুরে এইচ-এম-ভি কোম্পানিতে গান রেকর্ড করলাম। কিন্তু কোনো অনিবার্য কারণে সে রেকর্ড প্রকাশিত হোল না। সম্ভবত আমার দিক থেকেই কোনো অসম্পূর্ণতা থেকে থাকবে। হয়তো আমিই সে সংগীত-রূপের যথাযথরূপে উপস্থাপনা করতে পারিনি। যাই হোক সেই প্রকাশ না হওয়া গান শুনেই আমার সম্পর্কে আশা প্রকাশ করে বললেন সুরকার শ্রীকমল দাশগুপ্ত। ফলে তাঁরই উৎসাহে এবং অনুপ্রেরণায় এইচ এম ভি-তে প্রথম প্রকাশিত হোল আমার গান 'আমি ভোরের যূথিকা' এবং 'সাঁঝের তারকা আমি'। এ গানের কথা ছিল গীতিকার প্রণব রায়ের আর সুর ছিল স্বয়ং কমল দাশগুপ্তের। বলতে দ্বিধা নেই সেকালে আমার এই গানদুটি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

তারপর থেকে অসংখ্য গান আমি রেকর্ড করেছি; আমার রেকর্ড-করা গানের অধিকাংশই কমলবাবুর দেওয়া সুরে। তাঁর সঙ্গে একত্রে রেকর্ডেও গান গেয়েছি। তাঁর সঙ্গে একত্রে গাওয়া প্রথম গান 'চিতনন্দন দিল ধরা' গানখানাও জনপ্রিয় হয়েছিল।

খুব কম বয়েস থেকেই জীবনের কঠিন [illegible] মাটিতে দাঁড়াতে হয়েছিল তাঁকে। অল্পবয়সেই বাবা মারা যান। সংসারের সমস্ত [illegible] দাদার ওপর। দাদা ছিলেন সুপরিচিত সংগীতশিল্পী এবং যাদুকর শ্রীবিমল দাশগুপ্ত ছেলেবেলায় একবার আমার বাবা [illegible] আমাকে গান শেখানোর জন্যে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বয়েস তখন খুবই ছেলেমানুষ ছিলাম বলে বিমলবাবুর গান [illegible]।

ভালো ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও দাদার ওপর পড়ে যাওয়া অত্যাধিক আর্থিক চাপ কমাতেই বোধ করি কমলবাবুকে পড়াশোনায় ইস্তফা দিতে হয়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সংসারের হাল যিনি শক্তহাতে আঁকড়ে ধরেছিলেন সেই দাদাই তাঁদের ছেড়ে চলে গেলেন। কমলবাবুর ভাগ্যের আকাশে ঘনিয়ে উঠলো বিষম ঝড়। এমনি ঝড়ঝাপটা আর উত্থান-পতনের বন্ধুর পথ দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল তাঁর জীবন। সংগীতসাধনা কিন্তু থেমে থাকেনি। তারই মধ্যে পথ খুঁজে নিয়েছিল। অবশ্য তাঁদের পরিবারের চারপাশেই বইত সংগীতের হাওয়া; ভাইবোন সকলেই ছিলেন সংগীতে বিশেষ আগ্রহী এবং পারদর্শী।

সুকণ্ঠ গায়ক, নজরুল সংগীতের ভাণ্ডারী, সার্থক প্রশিক্ষক কমল দাশগুপ্তের সুরজ্ঞান ছিল অসাধারণ। তাঁর প্রশিক্ষণে কোনো দিন কোনো ত্রুটি দেখিনি। এইচ এম ভি-তে যখনই গান রেকর্ড করেছি তখনই তিনি বাড়ীতে এসে আন্তরিকতার সঙ্গেই সেই গানের তালিম দিয়েছেন। তখনকার সময়ে অধিকাংশ বনেদী পরিবারের মেয়েদের পক্ষেই নিয়মিত রেকর্ড কোম্পানীর ঘরে গিয়ে রিহার্সাল দেওয়ায় ঘোরতর আপত্তি ছিল। কারণ তখনই গান-বাজনা কিংবা সিনেমা-থিয়েটারের জগৎ এখনকার মতো সহজ যাতায়াতের জায়গা ছিল না। আমাদের মতো অনেক গায়িকারই আপত্তি ছিল সেই পরিবেশের মধ্যে বসে রিহার্সাল দেওয়ায়। সেই কারণেই তিনি আমারও অসুবিধার কথা চিন্তা করে আমার বাড়ীতে এসেই গানের তালিম দিতেন। তৈরী হয়ে যাওয়ার পর রেকর্ড করার আগে হয়তো সেই রিহার্সালের সময় কোম্পানীতে গিয়ে রিহার্সাল দিতাম। অনেক গায়িকার এই ধরনের অসুবিধার কথা চিন্তা করেই কমলবাবু মেয়েদের রিহার্সালের জন্যে কোম্পানীতে আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করেছিলেন।

মিতবাক এবং গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন কমলবাবু। তাঁর সুর দেওয়া গান গাওয়ার পর ভালো হলেও তিনি কোনো দিন সামনে প্রশংসা করতেন না। ভালো হলে চুপ করে থাকতেন। আশানুরূপ না হলে [illegible] সে অভাব পাওয়া [illegible]।

আমার সংগীতজীবনের যতটুকু খ্যাতি বা যশ পেয়েছি তার সবটুকু কৃতিত্বই তাঁর। তাঁরই দেওয়া সুরের [illegible] গেয়ে আমি শ্রোতাদের মন ভরিয়েছি। শ্রোতাদের স্বীকৃতি পেয়েছি।

—যূথিকা রায়

দর্পণের অভিনয় করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে গিরিশচন্দ্র যখন দলত্যাগ করেন অবিনাশচন্দ্র নগেন্দ্রনাথদের সঙ্গেই থাকেন।

সান্যাল ভবনে নীলদর্পণ অভিনয়ে রোগ সাহেব আর খুশিতে চরিত্রে অভিনয় করেন অবিনাশবাবু। রোগ সাহেব চরিত্রে অবিনাশ করের অভিনয়কে অন্য কোন দিকপাল অভিনেতাও ম্লান করতে পারেননি। কথিত আছে একবার নীলদর্পণের অভিনয় দেখে অবিনাশবাবুকেই বিদ্যাসাগর চটিজুতো ছুঁড়ে মেরেছিলেন—অর্ধেন্দুশেখরকে নয়। ন্যাশনাল থিয়েটারের অন্যান্য নাটকেও অভিনয় করে অবিনাশবাবু দক্ষ অভিনেতারূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। শেষ পর্যন্ত ন্যাশনাল থিয়েটার দ্বিধাবিভক্ত হলে অবিনাশবাবু ধর্মদাস সুরের দল ন্যাশনাল থিয়েটারেই থাকেন এবং এই দলের উদ্যোগে টাউন হলে নীলদর্পণ অভিনয়ে স্বীয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই অভিনয়ে প্রখ্যাত ব্যারিস্টার দীনবন্ধু বসু ও বিচারপতি উডরোফ সাহেবের পিতা মিঃ উডরোফ উপস্থিত ছিলেন। ক্ষেত্রমণির ওপর রোগসাহেবের অত্যাচারের দৃশ্যে মিঃ উডরোফ এতই উত্তেজিত হন যে দর্শকের আসন থেকে 'পুলিশ পুলিশ' বলে চীৎকার করে ওঠেন রোগসাহেবকে সায়েস্তা করার জন্য। শেষপর্যন্ত তিনি প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করে শান্ত হন এবং অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। কপালকুণ্ডলা ও অন্যান্য অভিনয় করে ঢাকা যান। ঢাকায় ন্যাশনাল থিয়েটার দল সুবিধা করতে পারেন না। ঢাকা থেকে প্রত্যাবর্তন করে কাশীতে যান। কাশী থেকে প্রত্যাবর্তন করে গ্রেট ন্যাশনালে যোগদান করেন অবিনাশবাবু। গ্রেট ন্যাশনালে ধর্মদাস সুরের সহকারী রূপে কাজ করেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ধর্মদাস সুরের নেতৃত্বে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের সঙ্গে দিল্লী লাহোর লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি পশ্চিমের বিভিন্ন স্থানে অভিনয় করে সম্প্রদায়ের সঙ্গে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। নীলদর্পণ লীলাবতী সতী কি কলঙ্কিনী ভ্রমরত-মাতা নবীন তপস্বিনী প্রভৃতি আরো অপেরাধর্মী নাটক পশ্চিম সফরে অভিনীত হয় এবং অবিনাশবাবু স্বীয় চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের প্রশংসাভাজন হন। মূল চরিত্র ছাড়া প্রতিজন শিল্পীকেই প্রয়োজনবোধে একাধিক চরিত্রে অংশগ্রহণ করতে হতো। লাহোরে দলের সুনাম সবচেয়ে বেশী হয়। লক্ষ্ণৌতে সম্প্রদায়কে বিরাট হাঙ্গামার সম্মুখীন হতে হয় নীলদর্পণের অভিনয়ে। শেষপর্যন্ত সম্প্রদায় কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন।

নীলদর্পণের সারাংশ ইংরেজীতে মুদ্রণ করা হয়েছিল। লীলাবতী সতী কি কলঙ্কিনী এবং নীলদর্পণের প্রথম রজনীর অভিনয় অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করে। উদ্যোক্তাদের অনুরোধে দ্বিতীয় রজনীর জন্য নীলদর্পণের অভিনয় আয়োজন করা হয়। গ্রেট ন্যাশনাল হলেও কলকাতায় ন্যাশনাল থিয়েটার নামেই সম্প্রদায় লক্ষ্ণৌতে পরিচিত হয়। স্ত্রী চরিত্রে মেয়েরাই ছিলেন। নীলদর্পণে : অর্ধেন্দু—উডসাহেব মতিলাল সুর—তোরাপ অবিনাশ কর—রোগ। মেয়েদের মধ্যে ক্ষেত্রমণি—সাবিত্রী ও আদুরী কাদম্বিনী—সৈরিন্ধ্রী বিনোদিনী—সরলা নারায়ণী—পদী [illegible] আর [illegible]—[illegible] চরিত্রে অভিনয়

খেলার জগতে মেয়ে

শিখা সেন

শিখা প্রথমে শুরু করে সাঁতার। বউবাজার ব্যায়াম সমিতিতে। ওঁর মা বললেন আমরা ভেবে দেখলাম প্রথমত সাঁতারে ও বেশী সাফল্য অর্জন করতে পারবে না, কারণ বেশীক্ষণ জলে থাকলে গলা বা কানে ঠান্ডা লেগে যায়। তবু ৭০-এ আগরতলা ও ৭১-এ [illegible] স্কুল ক্রীড়ায় শিখা বাঙলার সাঁতার দলে স্থান পেয়েছিল। একশ দশ ও চারশ মিটার ফ্রি স্টাইলে ফাইনালে উঠেছিল। কিন্তু শারীরিক কারণে সাঁতার ছেড়ে সাইক্লিং শুরু। ৬৮র শেষ দিকে মাস দুই অনুশীলন করে শিখা ত্রিবান্দ্রমে জুনিয়ার বিভাগে নেমে পাঁচশ মিটার টাইমট্রায়ালে ৪র্থ হয়। ওই ছিল বাংলার একমাত্র মেয়ে প্রতিনিধি। ৬৯-এ দিল্লীতে ১৪ বছরের নীচের বিভাগে তৃতীয় হয়। ৭০-এ কটকে জাতীয় আসরে দুটি সোনার পদক জয় করে শিখার নিজের ওপর আস্থা বেড়ে যায়। এই বছরই ফিরোজাবাদে জুনিয়ার বিভাগে ৬টি বিষয়ে স্বর্ণপদক পায়। সেবারও শিখাই ছিল বাংলার একমাত্র মেয়ে প্রতিনিধি। [illegible] নয় এই ছোট্ট মেয়েটি নিজ দলের [illegible]। ৭১-এ কলকাতায় টাইম-ট্রায়াল পাঁচশ হাজার, একক দশ হাজার মিটার এবং মাস্টার্স ও ল্যাপ-রেস—ছটিতে পেল প্রথম স্থান। ৭২-এ হায়দরাবাদেও ১৪ বছরের অনূর্ধ্বদের বিভাগে শিখা পাঁচশ মিটার টাইমট্রায়ালে নতুন রেকর্ড করে। ৭৩-এ পিঠে ব্যথার জন্য তেমন জোরালো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে নি। তাই সেবার জব্বলপুরে ওড়িশার প্রতিযোগিনীর কাছে হেরে দুটি রৌপ্যপদক পায়। ৭৪-এ ত্রিবান্দ্রমে জুনিয়র্স জাতীয় আসরে ১৮ বছরের কম বয়সীদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়। অন্তঃ-আঞ্চলিক আসরেও শিখাই চ্যাম্পিয়ান আখ্যা লাভ করে। ৭৫-এ হরিয়ানায় রাইতে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় আসরে ১৮ বছরের অনূর্ধ্ব বিভাগে দুটি সোনা ও সিনিয়রে [illegible] পদক [illegible]। [illegible] বিশ্বখ্যাতি অর্জনের স্বপ্নে ছোট্ট মেয়েটির মন প্রাণ ভরপুর।

ও বলে, যদি একটা ভাল রেসিং সাইকেল পাই তাহলে আমার স্ট্যান্ডার্ড আরও বাড়াতে পারি। এখন রোজ ভোরে রেড রোডে দুই বোন ছেলেদের সঙ্গে অনুশীলন করে। শিখা বলল আমার সাইক্লিং-এ হাতেখড়ি হয় স্বর্গত জিয়াউর রহমানের কাছে। আর ছেলেরা আমাকে খুব সাহায্য করে। শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করল প্রবীণ রাজকুমার মেহরা, সুপ্রভাত চক্রবর্তী আর সুব্রত শেঠের নাম। সাইক্লিং সংস্থাও নানাভাবে শিখাকে সাহায্য করে সেকথাও ওঁরা সবাই বললেন। পূর্বসূরী সাইক্লিস্ট শোভা নন্দী, চিত্রা সেন ডাঃ তপতী মিত্রদের কথাও শিখা বলল। তাঁদের অনুপ্রেরণাও ওর এই ছোট্ট জীবনে কম নয়। পত্র-পত্রিকা ঘেঁটে তাঁদের বিষয়ে পড়বার খুব ঝোঁক ওর। বর্তমানে ভারতে মেয়েদের সাইক্লিং-এর মান বেশ উঁচু। আর এখন নানা রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিনীর সংখ্যাও অনেক। সাইক্লিং-এর আসরে দুর্ঘটনাও বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ইউরোপের মেয়েদের মান আমাদের দেশের ছেলেদের চেয়েও উঁচু। প্রসঙ্গত বিশ্ব আসরের শীর্ষস্থানীয় মহিলা মিসেস বেল ব্যাটন ও তাঁর কন্যা ক্যারল ব্যাটনের কথাও শিখা বলল। [illegible] শ্রীমতী বেলের স্থান বিশ্বতালিকায় তৃতীয়। শিখা চায় এ বিষয়ে ভারতের দুর্নাম দূর করতে। এদেশে রেসিং

সাইকেল বা তার যন্ত্রাংশ পাওয়া দুষ্কর বলে শিখা শিপ্রা দুজনেই আফশোষ করলো। বলা প্রয়োজন শিপ্রা বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রী। সেও কলেজের হয়ে সাঁতারের আসরে নেমেছে। গত বছর থেকে ছোট বোনের সঙ্গে সঙ্গে সাইক্লিং শুরু করেই ত্রিবান্দ্রমে জুনিয়ার জাতীয় আসরে দু হাজার মিটার একক পারসুটে স্বর্ণপদক পেয়েছে। শিপ্রাও বলে, ভাল রেসিং সাইকেল একখানা থাকলে খুব সুবিধা হত আমাদের দুজনেরই। এর আগে জাতীয় আসরে সিট ভেঙে শিখা খুব অসুবিধায় পড়েছিল। ছেলেদের কাছ থেকে সিট নিয়ে তাই লাগিয়ে প্রতিযোগিতায় নামে। বাবা-মারও ইচ্ছা মেয়ে সাইক্লিং-এ ভারতের মুখ উজ্জ্বল করুক। সত্যি সমগ্র পরিবার খেলাধুলায় অভিজ্ঞ এবং একনিষ্ঠ এমন বড়একটা দেখা যায় না। শিখার আফশোষ দেশের ছেলেদের সাইক্লিংয়ের মান অনেক নীচু হলেও তারা আন্তর্জাতিক আসরে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে আর মেয়েরা পাচ্ছে না। শিখার হবি—প্রথম, বড় বড় খেলোয়াড়দের জীবনী পড়া। দ্বিতীয়, ফটো তোলা। স্কুলছাত্রী শিখার একান্ত বাসনা আন্তর্জাতিক আসরে স্বীকৃতি লাভ। শিখার এ আকাঙ্ক্ষা যেন পূরণ হয়।

—অময়

কোর্টের রাণী ক্রিস

গত দু বছর ধরে যে ফুলের কুঁড়িটি প্রকাশের বেদনায় ব্যাকুল হয়েছিল আজ তা প্রস্ফুটিত। আমেরিকার ১৯ বছরের দীপ্তিময়ী ছিপছিপে মেয়ে ক্রিস ভোট সদ্যসমাপ্ত উইম্বলেডন প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী। ক্রিস ক্রীড়া কৃতিত্বে রূপলাবণ্যে ফুলের মতই সরস সুন্দর।

দু বছর আগে উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতায় প্রথম আবির্ভাবে ক্রিস বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল সেমিফাইনালে ইভান গুলাগাং-এর কাছ থেকে প্রথম সেটটি ছিনিয়ে নিয়ে। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর গুলাগাং পরের দুটি সেট নিজের [illegible] রসিকরা মুখর উচ্ছ্বাসে নতুন টেনিস তারকাকে অভিনন্দিত করেছিলেন। সাংবাদিক সমালোচকরা সম্ভাবনায় উজ্জ্বল সপ্তদশী ক্রিস-এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রমাদ গুনেছিলেন।

অনুমান মিথ্যে হয়নি। গত বছরে অনুষ্ঠিত উইম্বলেডন প্রতিযোগিতায় ক্রিস অঘটন ঘটিয়ে টেনিস কোর্টে ঝড় তুলেছিল। কোয়ার্টার ফাইনাল ও সেমিফাইনালে দুই প্রাক্তন শক্তিশালী প্রতিপক্ষ মার্গারেট কোর্ট ও ইভান গুলাগাংএর ললাটে পরাজয়ের তিলক এঁকে দিয়েছিল। চূড়ান্ত খেলায় টেনিস সাম্রাজ্ঞী অভিজ্ঞ [illegible] ক্রিস ৬-০ ৭-৫ সেটে পরাজিত হয়। কিন্তু এই খেলার [illegible] প্রতিযোগিতায় ছবার মুখোমুখি হয়েছে। তার মধ্যে ক্রিস জিতেছে চারবার। স্মরণ করা যেতে পারে গত বছর ছাড়াও বিলি জিন কিং ১৯৬৬ ৬৭ ৬৮ সালে উপর্যুপরি চ্যাম্পিয়ান হয়ে উইম্বলেডন প্রতিযোগিতার ইতিহাসে নজির সৃষ্টি করেছে।

ক্রিস ইভার্ট ফ্লোরিডার ফোর্ট লডারডেলে সেন্ট টোমাস হাইস্কুলের ছাত্রী। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে দ্বিতীয় সন্তান। কোমল স্বভাব ও হাসিখুশী ব্যবহারের জন্যে ক্রিস [illegible] বই পড়ে। সাঁতার কাটে। সৌখিন রান্না করে। বাহারী সেলাইয়ের কাজ করে। [illegible] না। সেও দিদির সঙ্গে নিয়মিত অনুশীলন করে। টেনিস কোর্টে বাড়ীতে দিদির সঙ্গী। টেনিস অনুরাগী বাবা দু বোনের প্রশিক্ষক। বাবা ক্রিসদের বাড়ীর সামনে টেনিস-কোর্টগুলোর তত্ত্বাবধায়ক। দিনের অধিকাংশ [illegible] থাকে বাবার সঙ্গে। খেলে বিশ্রাম করে। [illegible] নাকি তাঁর মত।

বাবার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে ক্রিস বলে বাবা আমাদের বন্ধু শিক্ষক অভিভাবক। সকলেই বলে আমি বাবার মত তাঁর মত দেখতে। আমার চালচলনও নাকি তাঁর মত।

গত দু বছর আগে ধূমকেতুর মত অকস্মাৎ আবির্ভাবে লাস্যময়ী সপ্তদশী [illegible] আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তখন কয়েকজন সাংবাদিকের এক প্রশ্নের উত্তরে ক্রিস দার্শনিকের মত চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উত্তর দিয়েছিল — আমি পৃথিবীর সেরা খেলোয়াড় হতে চাই। স্বীকৃতির সিঁড়ি বেয়ে ক্রিস এখন তার স্বপ্নের শিখরে। স্বপ্নের কথা যেখানে সে আর জিমি কোনরস থাকবে কাছাকাছি। কোনরস পুরুষদের বিভাগে এ বছরের উইম্বলেডন চ্যাম্পিয়ান। ইভার্ট তার বাগদত্তা। আগামী নভেম্বরে ওদের মিলন হবে। ক্রিস ইভার্টের যোগ্য স্বামী। দুজনেই শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিতে ভূষিত।

—প্রশান্ত দাঁ

কাজল ঢালী

জংলাদার কাছে আমি সবচেয়ে বেশী কৃতজ্ঞ সবচেয়ে বেশী ঋণী।'

'তা হলে ইনসিডেন্টটা বলি শুনুন: ছেষট্টি সালের শেষের দিকে অথবা সাতষট্টির গোড়ায় জংলাদা (ইস্টবেঙ্গলের পরিমল দে) একদিন আমাদের ওখানে মানে হাবড়ায় খেলতে গেছেন।

শ্রীচৈতন্য কলেজের হয়ে আমিও খেললাম। খেলার শেষে জংলাদা আমায় কাছে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে আমি কলকাতার কোন দলে খেলায় আগ্রহী কিনা। সত্যি কথা বলতে কি প্রশ্নটার পর আমি একটু নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম। ওরে বাবা কলকাতা? সে বড় কঠিন ঠাঁই। না দরকার নেই। হাবড়ায় আছি এই বেশ ভাল'।

'কিন্তু দ্বিধা, সংকোচ অনেক থাকলেও আমাকে শেষ পর্যন্ত আসতে হোল গড়ের মাঠে। বলতে গেলে একেবারে সোজাসুজি প্রমোশন পেয়ে সিনিয়ার ডিভিসন লীগের আসরে নামলাম জর্জ টেলিগ্রাফের জার্সি গায়ে দিয়ে (১৯৬৭)। ৬৮ থেকে ৭০ পর্যন্ত খেললাম ইস্টার্ন রেলে। রেল থেকে ৭১ সালে মোহনবাগানে, ৭২-এ মহামেডান স্পোর্টিং ৭৩-এ আবার মোহনবাগানে। ৭৪ সালে আমি ইস্টবেঙ্গলের লেফট ব্যাক।'

বলতে পারেন আমি অল্প সময়ের মধ্যেই অনেকবার দল বদল করেছি। কথাটা সত্যি! কে না উন্নতি চায় বলুন? ভাল খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলবো একটা হিস্টরিক ইভেন্টের সাক্ষী হয়ে থাকতে কিংবা খ্যাতনামা প্রশিক্ষকের পরিচর্যায় (প্রদীপ ব্যানার্জি) কে না থাকতে চায়? সব জেনেশুনেই এখন ইস্টবেঙ্গলে এসেছি।

কাজল ঢালি ইস্টবেঙ্গল গ্যালারীতে বসে সেদিন বিকেলে নিরুত্তাপ কণ্ঠে নিজের কথা বলছিলেন। একেবারে ঘরোয়া মেজাজ। অহং ভাব নেই এক রত্তি। কাজলের বয়স ২৫। জন্ম কলকাতায়। কিন্তু আদি বাড়ী নোয়াখালী (বাংলাদেশ)। বাবা মহেন্দ্রকুমার ঢালী চাকরীর খাতিরে দীর্ঘদিন থেকে এপার বাংলার বাসিন্দা। সংসারে মা আছেন বাবা আছেন। কাজলের আরও দুটি ভাই আর একটি বোন।

'দাদা কলকাতা পুলিশের সার্জেন্ট (মাউন্টেড)। আমিও মোটামুটি ভাল চাকরী করছি। সংসারে এখন খানিকটা স্বাচ্ছল্য এসেছে। আগে অবশ্য এমনটি ছিল না। সংসার নিয়ে অন্যের সঙ্গে আমাকেও দারুন ভাবতে হোত। বিশেষত হাবড়া থেকে বেহালায় চলে আসার পর। আর্থিক ভাবনা চিন্তা এখন খানিকটা কমেছে বটে তবে জুড়ে বসেছে আর একটা চিন্তা। বাড়ীর লোক ধরেছে—বিয়ে করতে হবে কি যে করি!'

'দেখুন, সময় তো কারও জন্য হাত গুটিয়ে বসে থাকে না। আমার ক্ষেত্রেও তা নেই। দিনের পর দিন বয়স তো বেড়েই যাচ্ছে। খেলার মাঠের ব্যাপারেই হোক বা ঘর সংসারের ব্যাপারেই হোক আজকে অথবা দুদিন পরে সেটাল একটা আমাকে কিছু করতেই হবে। একটা জিনিস আমি মর্মে মর্মে অনুভব করছি আজ তা হোল সব কিছুই আমার একটু লেটে হয়েছে। ফুটবলে স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠা তাও যথেষ্ট লেটে। তবে আমি বিশ্বাস করি ইট ইজ বেটার লেট দ্যান নেভার।'

কাজল স্কুলে লেখাপড়া করেছেন হাবড়া স্কুলে। কলেজে হাবড়া শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয়ে ১৯৬৫ সালে বি এস-সি পাশ করে কাজল ল কলেজেও ভর্তি হয়েছিলেন। ঐ ল কলেজের ছাত্র হিসেবেই আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলের আসরে প্রবেশ (১৯৬৫)। কাজল এখন ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের হেড অফিসে সাপ্লাই বিভাগের কর্মচারী।

বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

দর্শক

রাশিয়া বনাম আমেরিকা

ডারহামে রাশিয়া বনাম আমেরিকার দ্বৈত অ্যাথলেটিকসের [illegible] অনুষ্ঠানে রাশিয়া মোট পয়েন্টের ভিত্তিতে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে—রাশিয়ার মোট পয়েন্ট ১৮৯ এবং আমেরিকার ১৭৫। পুরুষ বিভাগে জয়ী হয়েছে আমেরিকা ১১৬—১০২ পয়েন্টে। অপর দিকে মেয়েদের বিভাগে রাশিয়া ৮৭—৫৯ পয়েন্টে জিতে শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করে।

পুরুষ বিভাগে ১৯৭২ সালের অলিম্পিকের ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ের স্বর্ণপদক বিজয়ী ভ্যালেরী বোরজভ (রাশিয়া) এবারও ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান পান নি। ১৯৭৩ সালের এই আসরে তিনি দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিলেন এবং এ বছর পেয়েছেন তৃতীয় স্থান। এ বছর পুরুষদের ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে আমেরিকার আর জোন্স প্রথম স্থান লাভের সূত্রে 'ডাবল' খেতাব পেয়েছেন। এবারও রাশিয়া বর্শা নিক্ষেপে শীর্ষস্থান পায় নি। রাশিয়ার প্রতিনিধি অলিম্পিকের স্বর্ণপদক বিজয়ী জানিস লুসিস তৃতীয় স্থান পেয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য লুসিস রাশিয়া বনাম আমেরিকার এই দ্বৈত অ্যাথলেটিকস আসরে উপর্যুপরি সাতবার পুরুষদের বর্শা নিক্ষেপে প্রথম হয়েছিলেন।

রাশিয়া বনাম আমেরিকার এই দ্বৈত অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার সূচনা ১৯৫৮ সালে। এ পর্যন্ত এই দ্বৈত প্রতিযোগিতার আসর বসেছে মোট ১২ বার। মাঝে ৫ বছর (১৯৬০, ১৯৬৬—৬৮ ও ১৯৭২) আসর বসে নি। গত ১২ বারের আসরে মোট পয়েন্টের ভিত্তিতে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে রাশিয়া ৯ বার এবং আমেরিকা ২ বার। ১৯৭১ সালের আসরে দুই দেশেরই পয়েন্ট সমান (১৮৬—১৮৬) দাঁড়ায়। পুরুষ বিভাগে প্রথম স্থান পেয়েছে আমেরিকা ৯ বার এবং রাশিয়া ৩ বার। মহিলা বিভাগে প্রথম স্থান পেয়েছে রাশিয়া ১১ বার এবং আমেরিকা একবার। একই বছরের [illegible] পুরুষ ও মেয়েদের বিভাগে [illegible] লাভ করেছে রাশিয়া ৩ বার (১৯৬৫, ১৯৭০ ও ১৯৭৩) এবং আমেরিকা একবার (১৯৬৯)। একটি আসরে মোট ২০০ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে রাশিয়া ২ বার—১৯৭০ সালে ২০০ পয়েন্ট এবং ১৯৭৩ সালে ২১৬ পয়েন্ট। অপর দিকে [illegible] আমেরিকার সর্বাধিক [illegible] পয়েন্ট ১২৪ (১৯৬৫ সালে)।

বিশ্ব ফুটবল কাপ

১৯৭৪ সালের ১০ম বিশ্ব ফুটবল কাপ প্রতিযোগিতায় পশ্চিম জার্মানীর বিশ্ব কাপ জয় হল্যাণ্ডের ২য় স্থান এবং পোল্যাণ্ডের তৃতীয় স্থান লাভের ফলে আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলায় আবার ইউরোপের প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। এ পর্যন্ত বিশ্ব ফুটবল কাপ প্রতিযোগিতায় ইউরোপের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেশ বিশ্ব কাপ জয়ী হয়েছে—ইতালী ২ বার, জার্মানী ২ বার এবং ইংল্যাণ্ড ১ বার। তাছাড়া ল্যাটিন আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত দুটি দেশও বিশ্ব কাপ পেয়েছে—ব্রাজিল ৩ বার এবং উরুগুয়ে ২ বার। একটা লক্ষ করার বিষয়, ল্যাটিন আমেরিকার মাটিতে আয়োজিত বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার ৪টি আসরে

অমৃত

সম্পাদক
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

[১৪ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা] শুক্রবার, ২৩ শ্রাবণ, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ [মূল্য

আজ থেকে তিন বছর আগে

৯ই আগস্ট, ১৯৭১

দু-দেশের জনগণের মধ্যে ২৫ বছরের ঘনিষ্ট মৈত্রী ও সর্বাত্মক সহযোগিতার সম্পর্ককে চূড়ান্তরূপ দিয়ে স্বাক্ষরিত হয়েছিল

সোভিয়েত-ভারত শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি

আজ, এই ঐতিহাসিক চুক্তির তৃতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে, সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী ও সহযোগিতার সুফলগুলি আমরা তুলে ধরছি।

- এই সহযোগিতা ভারতকে তার রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রটিকে প্রসারিত করতে সাহায্য করেছে, স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশকে সুনিশ্চিত করে তার অধিকতর বিকাশের পূর্বশর্ত সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে।
- সোভিয়েত সহায়তায় নির্মিত হতে চলেছে তেল, কয়লা, রাসায়নিক, অ্যালুমিনিয়াম, তামা ও অন্যান্য বহু নতুন প্রকল্প। ৬০ লক্ষ টন শোধনক্ষমতাসম্পন্ন মথুরা শোধনাগার হবে ভারতের বৃহত্তম শোধনাগার।
- সোভিয়েত সহযোগিতায় নির্মিত ভিলাই ও বোকারো ইস্পাত কারখানার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে হবে যথাক্রমে ৭০ লক্ষ টন ও ১ কোটি টন।
- সোভিয়েত সহযোগিতায় ভারতে নির্মিত শিল্পোদ্যোগগুলিতে উৎপন্ন হয় মোট ধাতুবিদ্যাগত সাজ-সরঞ্জামের ৮০ শতাংশ, ভারী বৈদ্যুতিক সাজ সরঞ্জামের ৬০ শতাংশ, তেল উৎপাদন ও পরিশোধনের ৫০ শতাংশ, ইস্পাতের ৩০ শতাংশ এবং বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের ৩০ শতাংশ। এই সব শিল্পোদ্যোগের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা ভারত সরকারেরই।
- ভারতের বিদ্যুৎ শক্তি সংকট কাটিয়ে ওঠার প্রচেষ্টায় সোভিয়েত সহযোগিতা অদূর-ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। ১৯৭৩-৭৪ সালে ১৭টি নতুন প্রকল্পে হাত দেওয়া হয়েছে হরিদ্বারের ভারী বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম কারখানায় জেনারেটর উৎপাদনের ভিত্তিতে। এই কারখানাটিও সোভিয়েত সহায়তায় নির্মিত।
- ভারতের কয়লা শিল্পের বিকাশে সোভিয়েত সহায়তাও তাৎপর্যপূর্ণ। ভারত-সোভিয়েত প্রকল্পগুলিতে ইতিমধ্যেই উৎপন্ন হচ্ছে ৩০ লক্ষ টন এবং আশা করা যাচ্ছে নতুন প্রকল্পগুলি চালু হলে ১ কোটি টনের বেশী কয়লা পাওয়া যাবে। রামগড়ে একটি বড় 'ওপেনকাস্ট' খনি চালু করার প্রকল্পে ইতিমধ্যেই হাত দেওয়া হয়েছে।
- কলকাতায় ভূগর্ভ রেলপথ নির্মাণে সোভিয়েত সহযোগিতা কলকাতার যানবাহন সমস্যা সমাধানের কাজে অনেকখানি সাহায্য করবে।

সোভিয়েত-ভারত সহযোগিতা উভয় দেশের জনগণের স্বার্থানুগ এবং এশিয়ায় তথা সারা পৃথিবীতে শান্তিকে সুরক্ষিত করার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী ও সহযোগিতা দীর্ঘজীবী হোক!

—কলিকাতাস্থিত সোভিয়েত দূতাবাসের
বার্তা বিভাগ

১৪ বর্ষ

১৪ সংখ্যা
মূল্য ৫০ পয়সা

"ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন নিউজ
পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 9th, August 1974 শুক্রবার, ২৩ শ্রাবণ, ১৩৮১ 50 Paise

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত [illegible] কোন প্রাপ্তিস্বীকার পাঠানো হয় না।

২। [illegible] রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মনি-অর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫.০০	টাকা ৩০.০০
ষান্মাসিক	টাকা ১২.৫০	টাকা ১৫.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬.২৫	টাকা ৮.০০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

ভাষাগত সংখ্যালঘুদের সমস্যা

গত সপ্তাহে সংসদে ভাষাগত সংখ্যালঘু কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে এক দফা আলোচনা হয়ে গেল। ভারতবর্ষে বহুভাষার অস্তিত্ব রয়েছে। এই ভাষা নিয়ে অনেক রাজ্যে অনেক বিরোধও হয়ে গেছে। ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন করে এই ভাষা-বিরোধের অবসান ঘটানো যায়নি। দেখা গেছে যে, ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠিত রাজ্যেও একাধিক ভাষার অস্তিত্ব রয়েছে যার ফলে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের সমস্যা দেখা দিয়েছে নতুন করে। সংবিধানে স্বীকৃত ভাষা ছাড়াও ভারতে বহু ভাষা রয়েছে যা বহুলোকের মাতৃভাষা এবং যে ভাষায় উৎকৃষ্ট সাহিত্যও রয়েছে। মৈথেলি, নেপালী প্রভৃতি ভাষা এই পর্যায়ে পড়ে। উর্দু সংবিধানে স্বীকৃত ভাষার অন্যতম হলেও কোনো রাজ্যে তা সরকারী ভাষার স্বীকৃতি পায়নি। এই সমস্ত প্রশ্ন মাঝে মাঝেই দেখা দেয়। কমিশনের রিপোর্টে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের দাবিদাওয়া এবং বর্তমান অবস্থা নিয়ে নানাবিধ সুপারিশ করা হয়েছে সত্যি কথা। কিন্তু যেহেতু এগুলো সুপারিশ মাত্র সরকার সদিচ্ছাসহকারে এগুলো ধীরেসুস্থে বিবেচনা করবেন। তা কার্যকর করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

পশ্চিমবাংলার দার্জিলিং জেলায় নেপালীভাষীরা তাদের ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতির জন্য দাবি জানিয়ে আসছেন। সম্প্রতি মেঘালয় সরকার খাসি ভাষাকেও সংবিধানের অষ্টম তপশীলভুক্ত করার জন্য দরবার করেছেন। অবশ্য সংবিধানে স্বীকৃতি লাভ না করলেও ভাষা তার নিজের জোরে এবং সাহিত্যিক উৎকর্ষে বেঁচে থাকতে পারে। তাহলেও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের এই দাবি উপেক্ষণীয় নয়। সরকার সিন্ধি ভাষাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে পারলেন নেপালী বা খাসি ভাষার বেলায় তাদের আপত্তির কোনো হেতু নেই। এছাড়াও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের কঠিন পরীক্ষা দেখা দেয় চাকরি-বাকরি এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে। তামিলনাড়ুতে মালয়ালীভাষী সংখ্যালঘু, কর্ণাটকে তেলেগুভাষী সংখ্যালঘু কিংবা আসামে বাংলাভাষী সংখ্যালঘুদের সমস্যার বিষয় লোকসভায় উঠেছে। এদিকে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত একই রাজ্যে একাধিক ভাষাভাষী লোকের বাস স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু ভাষাগত সংখ্যালঘু বলেই তাদের মাতৃভাষার অধিকার সংখ্যাগরিষ্ঠরা কেড়ে নিতে পারেন না। চাকরি কিংবা শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণও গণতন্ত্রবিরোধী। কেন্দ্রীয় সরকার এসম্পর্কে বিশেষ কিছু করেননি। উত্তরপ্রদেশে উর্দু সংখ্যালঘুদের ভাষা। উর্দু জবান অতি মিষ্ট এবং তার সাহিত্যিক উৎকর্ষ গুণীজনের দ্বারা স্বীকৃত। অথচ এই ভাষার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক মনোভাব আমদানি করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এই সাম্প্রদায়িক চিন্তা বা প্রাদেশিক সংকীর্ণতা রাষ্ট্রের আদর্শের পক্ষে ক্ষতিকর। আসামে বাংলাভাষীরা এর জন্য দীর্ঘদিন আন্দোলন করে আসছেন। ভাষা সম্পর্কে বিশেষ করে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে সরকারকে সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করতে হবে। এ নিয়ে দ্বিধা করলে তার ফল হবে মারাত্মক।

সরকারী ভাষা হিসাবে হিন্দি নিয়েও এক শ্রেণীর অত্যুৎসাহী হিন্দিপ্রেমী বড় বাড়াবাড়ি করছেন। ভারতবর্ষের মতো বহুভাষী দেশে সব ভাষাকেই সমান মর্যাদা দিতে হবে। কোনো ভাষা দমন করে জোর করে হিন্দি চাপানোর চেষ্টা জাতীয় সংহতির পরিপন্থী। ইতিমধ্যেই দক্ষিণ ভারতে, বিশেষ করে তামিলনাড়ুতে হিন্দির বিরুদ্ধে জনমত খুব তীব্র। সর্বভারতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দিকে গ্রহণযোগ্য করতে হলে হিন্দিভাষীদের অন্যান্য ভাষা বিষয়ে সহনশীল হতে হবে। সকল ভাষার সমৃদ্ধি ও সামগ্রিক বিকাশই স্বেচ্ছায় একটি সর্বভারতীয় ভাষা গ্রহণের পথ প্রশস্ত করবে। ভাষার ওপর দমননীতি উপেক্ষা বা অবহেলা জনসাধারণকে বিক্ষুব্ধই করে। জাতীয় সংহতি বা ভাষাগত সংহতির পক্ষে যে তা প্রবল প্রতিবন্ধক সরকারকে এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে হবে। কারণ, ভাষা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার পরিণতি বিপজ্জনক, ইতিহাসে তার নজীরের অভাব নেই।

মানুষ

প্রলয় সেন

দরজার খিল খোলার শব্দে বিকাশের ঘুম ভাঙল। মঞ্জু বেরিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিন হলে সে ব্যাপারটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনত না। ফের বালিশকে জড়িয়ে ধরে আরো কিছুক্ষণ চোখ বুজে পড়ে থাকত বিকাশ। আজ পারল না। তেড়ে-ফুঁড়ে উঠে বসল। মঞ্জুকে ডাকতে গিয়েও থেমে গেল। কোন রকম কু-সংস্কার নেই বিকাশের। আজ তবু ভোর-বেলা বেরুবার মুখে মঞ্জুকে পেছু ডাকতে ওর বাধল।

গতকাল অফিস থেকে বাড়ি ফিরে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল বিকাশ। ফেরার পথে পার্কে দুজনে কিছুক্ষণের জন্য বসেছিল। তখনই বিকাশ মঞ্জুকে অনেক করে শিখিয়ে পড়িয়ে রেখেছিল। তবু, ওর ওপর আস্থা কম। সুহাসিনীর সামনে পড়ে যদি বেফাঁস কিছু বলে মঞ্জু ব্যাপারটাকে শুরুতেই কাঁচিয়ে দেয়—এই আশঙ্কায় খাট থেকে নেমে পড়ল বিকাশ।

বাবা দাদা বারান্দায়। রান্নাঘরে রাঁধুনী-ঝি। হাঁড়িতে ভাত ফুটছে। বাবা খবরের কাগজ পড়ছেন। পাশে দাদা। দাড়ি কামাচ্ছে। ওকে সকাল সকাল কাজে বেরুতে হয়। সবকিছু স্বাভাবিক। প্রতিদিনকার মতই। শুধু বৃষ্টিশেষের ভোরবেলাটাই যা অন্যরকম। মলিন। আলোর বড়ই অপ্রাচুর্য। মেঘচাপা রোদ পাণ্ডুর।

দরজার মুখে দাঁড়িয়ে বাথরুমের দিকে চোখ পড়তে বিকাশের মগজে রক্ত চড়ল। সুহাসিনী বাথরুমের দরজা খুলে কুমারিকে নিয়ে বেরুচ্ছেন। ওর মুখোমুখি পড়ে গেছে মঞ্জু। দুধের দাঁত পড়তে শুরু করলে মেয়েকে মা-বাবার সঙ্গে একই খাটে শোওয়া বিপজ্জনক মনে করে বিকাশই আজ এক বছরের ওপর হয়ে গেল কুমারিকে সুহাসিনীর ঘরে চালান করে দিয়েছে।

বিকাশের বুক কেঁপে উঠল। সুহাসিনী কি সব যেন বলছেন মঞ্জুকে। এমন সময় ঘরের ভেতর বাপি কেঁদে উঠতে পায়ের তলায় মাটি পেল বিকাশ। সে গলা চড়িয়ে বলল, মা, বাপি উঠে গেছে। শিগগীর এসো।

দাঁতে ব্রাশ চেপে কুয়োতলায় চলে এল বিকাশ। কুয়োতলার ওধারে মস্ত পগার। ওটাই বাড়ির সীমানা। তারপর রাস্তা। রোদ মলিনতর হচ্ছে। আকাশের গতিক ভাল নয়। মনে মনে আবহাওয়ার মুণ্ডুপাত করল বিকাশ।

চোখেমুখে জল দিতে হঠাৎ নজরে এল। মঞ্জু দাদার ঘরে। বৌদির সঙ্গে কথা বলছে। সেদিকে চোখ পড়তে রাগে গজগজ করতে লাগল বিকাশ। সকালবেলা বৌদির সঙ্গে এত কি কথা থাকতে পারে! মঞ্জুর যদি কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে। বড় আলগাস্বভাবের মেয়েমানুষ। কোন ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে চায় না। নিমমুখে কুয়োতলা থেকে ফিরে এল বিকাশ।

দাদার দাড়ি কামানো শেষ। কাঁধে গামছা। কুয়োতলার দিকেই যাচ্ছে। মায়ের ঘরে সুহাসিনী। বাপিকে কোলে নিয়ে বসে দুধ খাওয়াচ্ছেন। এতক্ষণে মঞ্জুর কথা শেষ হল। ও ঝুমরিকে নিয়ে ঘরে ঢুকছে। বিকাশ বারান্দায় উঠে হাঁক পাড়ল, মতির মা, চা দিয়ে যাও।

ঘরে ঢুকে বিকাশ বলল, একি, আবার বিছানা নিয়ে বসলে যে। বেরুতে দেরী হয়ে যাবে কিন্তু—বেডকভার দিয়ে বালিশ চাপা দিতে দিতে রুষ্ট গলায় উত্তর করল মঞ্জু বাসি বাসি বিছানা ফেলে রেখে যাব নাকি?—ড্রেসিং টেবিলের কাছে এসে চুলে চিরুনী চালাতে চালাতে বলল বিকাশ, এতক্ষণ বৌদির সঙ্গে কি বকবক করছিলে?—মঞ্জুর গলা তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠল, তোমার কি সব কথাই জানা চাই? না মানে তোমাকে তো বিশ্বাস নেই। ফস করে কি বলতে কি বলে ফেল।

বাইরে টিপটিপানি শুরু হয়ে গেছে। মঞ্জু বিকাশের কথার জবাব না দিয়ে আলমারী থেকে কাপড় নামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বারান্দায় মতির মার গলা শোনা গেল, ছোড়দাদাবাবু, চা।—

বিকাশ বলল, সঙ্গে একটা শাড়ি নিয়ো কিন্তু—মঞ্জু খেপে গেল, তা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।

মতির মার হাত থেকে চায়ের কাপ তুলে নিয়ে বারান্দায় বসল বিকাশ। সে সবে চায়ে চুমুক দিতে যাবে এমন সময় কাগজ থেকে মুখ তুলে বাবা বললেন, বাঁচলাম। পড়ার মত যদি কোন খবর থাকে। শুধু খুন-জখম আর শত্রুপাতের সংবাদ—

শত্রুপাত শব্দটা ছুরির ফলার মত ধাঁ করে মাথার মধ্যে যেতে বিকাশের হাত কেঁপে উঠল। খানিকটা গরম চা চলকে তার বুকে পড়ল। সে সবেগে মাথা ঝাঁকিয়ে চড়া গলায় বলল, যা বলেছ! আগামী মাস থেকে ভাবছি কাগজ বন্ধ করে দেব।—যৌথ পরিবারে। সংসার খরচ-খরচার মধ্যে দৈনিক কাগজের টাকা জোগানোর দায়িত্ব বিকাশের ভাগে পড়েছে।

বিকাশ মাত্রাতিরিক্ত চেঁচিয়ে ওঠায় দুই ভ্রূ জোড়া করে বাবা একবার তার দিকে তীর্যক তাকালেন। লজ্জিত বিকাশ নিজেকে সংশোধন করার জন্য বলল খবরের কাগজওয়ালাদের যত কাণ্ড। ওরা কি ভাল খবর খুঁজে পায় না!—বাবা নিজের বিরক্তি লুকোবার জন্য ফের কাগজে চোখ রাখলেন।

স্নানশেষে দাদা কুয়োতলা থেকে ফিরে আসতে বিকাশ চঞ্চল হয়ে উঠল। এক নিঃশ্বাসে সে চায়ের কাপ শূন্য করল। যে করেই হোক ন'টার ভেতর তাদের পৌঁছুতে হবে। বিকাশ উঠে মায়ের ঘরে চলে এল। খেলনা নিয়ে বাপি খাটের মাঝখানে বসে আছে। সুহাসিনী সিংহাসনের কাছে। বাবার রিটায়ারমেন্টের পর থেকে সুহাসিনীর দেবদ্বিজে ভক্তি ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। হাতে সময় বেশি নেই। ব্যস্তসমস্ত হয়ে বিকাশ বলল, আমরা কিন্তু এখখুনি বেরিয়ে যাচ্ছি মা।—সুহাসিনীর হাতে ছোট ছোট পেতলের থালা-গেলাস। শান্ত গলায় বললেন, তুই স্নান খাওয়া করে যাবি না?—ফের ছেতু-শূন্য চড়া গলায় বিকাশ বলল, না-না। মঞ্জুকে অমলের বাড়ি পৌঁছে দিয়েই আমাকে অফিসে ছুটতে হবে।

কাল রাতে জমি প্রস্তুত করে রেখেছিল বিকাশ। বলেছিল: কাল ভোর বেলা মঞ্জুকে নিয়ে অমলের বাড়িতে যাব। ফিরতে কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে যাবে।—সুহাসিনী বলেছিলেন: অমল, সে আবার কে?—অমলকে তুমি চিনবে না মা। আমরা এক সঙ্গে কলেজে পড়তাম।—উত্তরে বিকাশ বলেছিল।—হঠাৎ ওর বাড়িতে সারাদিন নেমন্তন্ন নাকি?—না, ওসব নয় হেসেছিল বিকাশ আজ হঠাৎ ওর বউ কলতলায় পড়ে গিয়ে কোমরে চোট পেয়েছে।—সে কিরে, বউটি পোয়াতি নয় তো?—মায়ের বিপজ্জনক প্রশ্নটাকে কোন রকমে বিকাশ পাশ কাটিয়েছিল: না-না। এমনি হঠাৎ পড়ে গেছে। ভীষণ ব্যথা। উঠে বসতে পারছে না। এদিকে ঘরে বাচ্চা-কাচ্চা, স্বামী। কে ওদের রেঁধে খাওয়ায়। অমল কাল সকালে কৃষ্ণনগরে যাবে। ওর মাকে নিয়ে আসতে। তাই ভাবছি কাল সকাল সকাল মঞ্জুকে নিয়ে ওর বাড়িতে যাব। যাতে রান্নাটা করে দিতে পারে।—বলতে গেলে পুরো একটা অনুচ্ছেদ। বানিয়ে বলতে গিয়ে শেষের দিকে তোতলাচ্ছিল বিকাশ। শেষ পর্যন্ত সুহাসিনীই ওকে সামলে ছিলেন, নিশ্চয়ই যাবি। এই দুঃসময়ে—

বেরুবার মুখে ঝুমরির বায়না ধরেছিল সঙ্গে যাবে। বিকাশ ধমকে উঠেছিল। মঞ্জু বলেছিল, মেয়েটাকে ও ভাবে বকছ কেন। ছেলেমানুষ না।

পাঁচিল পেরিয়ে রাস্তায় এসে বুক থেকে পাথর নামল বিকাশের। একটা সিগারেট ধরাল সে। ফুসফুস দুটোকে ধোঁয়ায় তৃপ্ত করে নিয়ে বলল যাক ভালয় ভালয় বেরুনো গেল।—কথাটা যেন কানে গেল না, এই ভঙ্গীতে প্রশ্ন করল মঞ্জু, কটা বাজে?—হাতঘড়িতে চোখ রাখল বিকাশ আটটা পাঁচ। ঠিক সময়ে পৌঁছে যাব আমরা।—কথাটা শেষ করে সে হাত নেড়ে অদূরবর্তী এক সাইকেল রিকসাকে ডাকল। মঞ্জু বলল আবার রিকসা কেন? বাসস্টপ, কতটুকু বা পথ—।—রিকসা এগিয়ে এল। মেঘ পাতলা হতে শুরু করেছে। বিকাশ এখন ভিন্ন মেজাজের। মঞ্জুকে খুশি করতে ব্যস্ত। ওর কথাটা গায়ে মাখল না। বলল, ব্যাগটা আমাকে দাও।—মঞ্জু কাপড়ের ব্যাগটা, মঞ্জু বিকাশের দিকে এগিয়ে দিতে ওর সঙ্গে চোখাচোখি হল। একটা সাধারণ শাড়ি পরেছে মঞ্জু। তাড়াহুড়োয় ভাল করে চুল আঁচড়াতে পারেনি। প্রসাধনহীন মুখ। তবু আটপৌড়ে মঞ্জুকে দেখতে ভাল লাগছিল বিকাশের।

সাইকেল রিকসায় উঠে বিকাশ বলল আসলে কি জানো মা হার্ড মার্কেট, আজকাল এসব আকছার ঘরে ঘরে হচ্ছে তবু ঢাকঢোল পিটিয়ে সকলকে জানান দিয়ে যাওয়ার তো কোন মানে হয় না।

মঞ্জুর চোখ তখন রাস্তার চলাচলের দিকে। সে এক সময় উন্মনা হয়ে বলে উঠল, বাপিটা সারাদিন ঘরে একলা থাকবে।—ওর কাঁধে হাত রেখে আলতো করে চাপ দিয়ে নরম গলায় বিকাশ বলল, একটা বেলার তো মামলা, মা আছে বাড়িতে অত ভাবছ কেন।

দোতলা বাড়ি। নার্সিং হোম একতলায়। গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকলে খানিকটা প্যাসেজ। প্যাসেজের শেষে দরজা। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলে বাঁয়ে ছোট একটা খুপরি অফিসঘর। তার ওধারে অপারেশন রুম। মাঝখানে করিডোর। করিডোরের দুপাশে কেবিন। বেড অল্পই। সামনের দিকে সিঁড়ি। দোতলায় ডাক্তারবাবু সপরিবারে থাকেন।

কাল সন্ধ্যায় এখানে এসে মঞ্জুর ভয় অনেকটা কেটে গিয়েছিল। টাইলস বিছানো মেঝে। ডিসটেম্পার-করা দেয়াল। সিঁড়ির দুধারে মস্ত পেতলের ভাস। তাতে রাশিকৃত সিনিয়া সাজানো। সবকিছু সাজানো-গোছানো, মানানসই। ডাক্তার দেখতে সুপুরুষ। মধ্যবয়সী। চেহারায় ভাব নেই।

ফেরার পথে মঞ্জু বলেছিল: দেখেশুনে তো ভালই মনে হল। ডাক্তারবাবু মানুষটিও বেশ। আত্মসর্গে ফেটে পড়েছিল বিকাশ: দুম্ভুল্লা এবার বুঝলে তো। আমি তোমাকে আজেবাজে জায়গায় —।—মাঝপথে মঞ্জু থামিয়ে দিয়েছিল: থাক, আর বাহাদুরী কথা বলতে হবে না। তোমাকে চেনা হয়ে গেছে আমার।—কপালমুখে মঞ্জুর কথাটা শব্দ-দুঃখের বলেছিল বিকাশ। আহত হয়েছিল মনে মনে। হবার সঙ্গত কারণ ছিল। আজকাল

শহরের আনাচে-কানাচে ব্যাঙের ছাতার মত নার্সিং হোম গজিয়ে উঠছে। চটকদার সাইনবোর্ডের আড়ালে সেগুলোর অধি-কাংশই পাপ-ব্যবসায়ের এক-একটা বড় ঘাঁটি। মস্ত হাতুড়ে ডাক্তারের ভিড় সেখানে। সেরকম কোথাও ঢু মারলে অর্থের শ্রাদ্ধ হত। তবু সেপথ বিকাশ মাড়ায়নি। গড়-বড় কিছু একটা হয়ে গেলে সারাজীবন বুক চাপড়াতে হবে, এই ভেবে। অনেক খোঁজখবর নিয়ে তবে সে এখানে এসেছে। নামকরা ডাক্তার। অনেকগুলো বিলিতি ডিগ্রী আছে। বড় একটা হাসপাতালের সঙ্গেও যুক্ত।

ওরা পৌঁছবার মিনিট পনের বাদে অপারেশন-রুম থেকে নার্স বেরিয়ে এল। গতকাল ওই নার্স মঞ্জুকে অ্যাটেন্ড করে-ছিল। মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসল এসে গেছেন।—ধপধপে সাদা ইউনিফর্ম। ভরন্ত শরীর। চোখমুখ উজ্জ্বল। বিকাশ ভাবল ঃ সাধ্যাদিম নোংরা ঘাটে। তবু, নার্সদের সব সময় উজ্জ্বল দেখায় কেন।

বিকাশ এগিয়ে গেল। ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করল অপারেশন কখন হবে?—অনভিপ্রেত প্রশ্নে নার্সের চোখে বিরক্তির ছায়া নামল। বলল নির্বিকার গলায়, এই কিছুক্ষণের মধ্যেই। আজ আর কোন কেস নেই।

আরো মিনিট পনের বাদে ডাক্তার দোতলা থেকে নেমে এলেন। পরনে একটা ঢিলেঢালা অ্যাপ্রণ। বিকাশের সঙ্গে চোখা-চোখি হতে তিনি আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন। গটগট করে অপারেশন-রুমের দিকে চলে গেলেন। পেছনে সেই নার্সটি। বিকাশের দুপা কাঁপছিল। নার্স ডাকল মঞ্জুকে আসুন।—বিকাশের হাত থেকে কাপড়ের থলিটা নিতে নিতে রক্তশূন্য মুখে মঞ্জু বলল, যাই।—বিকাশ উত্তরে কিছু বলতে পারল না। তার বুকের ভেতর তখন যেন কেউ একটা চাকা ঘোরাচ্ছিল সবেগে।

তারপর কিছু সময় অস্থির উত্তাক্ত বিকাশ। একবার বেঞ্চে বসছে। একবার উঠে দাঁড়াচ্ছে। বারবার সে হাতের পিঠ দিয়ে চিবুকের ঘাম মুছে ফেলছিল। একটা কাতরোক্তি চাপা, স্তব্ধ মঞ্জুর। বালতি জাতীয় কিছু মেঝেতে ঘসটে টেনে নিয়ে গেলে যেরকম হয় সেই জাতীয় শব্দ। ছুরি-কাঁচির ধাতব আওয়াজ। সিগারেট ক্ষয়ে বিকাশের আঙুলের ডগা পুড়ে গেল একসময়। হঠাৎ পাশের কেবিনে একটা বাচ্চার চিৎকার জেগে উঠল। বিকাশের মনঃসংযোগ কেটে গেল। এখানে ডেলিভারীও হয় নাকি? ভাবতে গিয়ে অবাক হল সে।

অফিস-ঘর থেকে একটা লোক বেরিয়ে এল। বিকাশকে ডাকল। অফিস-ঘরে ঢুকে টাকা জমা দেবার সময় হাত কেঁপে যাচ্ছিল বিকাশের। সে শুধোল, ভয়ের কিছু নেই তো?—নোটগুলো গুনতে গুনতে লোকটা বলল, না না। ডাক্তারবাবুর হাত্যশ আছে।—বিকাশ আরো আশ্বস্ত হতে চাইল না, মানে, আমার ওয়াইফের খবর পাব কখন?—লোকটা বিকাশের দিকে অর্থপূর্ণভাবে তাকাল। হাসল একটু, ঘাবড়াবার কিছু নেই। মাইনর অপারেশন। সকালবেলা জিভছোলা দিয়ে জিভ পরিষ্কার করেন না, অনেকটা সেইরকম আর কি।

নাম সই করতে গিয়ে লেখা জড়িয়ে যাচ্ছিল বিকাশের। লোকটা অভয় দিল, এ কিছু নয়। ফরমালিটি সেরে আমরা বন্ডে সই করিয়ে রাখি।—বিকাশ মাথা নাড়ল। হাসতে চাইল বলল তা তো বটেই।—লোকটা, সইপর্ব শেষ হলে বিকাশের হাতে একটা প্রেসক্রিপশান ধরিয়ে দিল, যান এই ওষুধগুলো চটপট নিয়ে আসুন।

এদোকান ওদোকান ঘুরতে বিকাশের দেরি হয়ে গেল। সব ওষুধ-ইনজেকশান এক দোকানে পাওয়া গেল না। নার্সিং হোমে ফিরে আসতে এক মাঝবয়সী আয়া বিকাশের হাত থেকে ওষুধগুলো নিল। বিকাশ বলল, অপারেশন হয়ে গেছে?—আয়া মাথা নাড়ল, হ্যাঁ। এই প্রথম বুঝি? —প্রশ্নটা বোধগম্য হল না বিকাশের। সে বলল, মানে, আমার দুটি ইস্যু আছে। —আয়ার চোখের দৃষ্টি ঘন হয়ে এল, ওঃ। সত্যি যা দিনকাল পড়েছে। —গদগদ হয়ে বিকাশ বলল, যা বলেছেন।

বিকাশ একবার অপারেশন রুমের দিকে গেল। আধভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারল। টেবিলে শুয়ে আছে মঞ্জু। গলা অব্দি সাদা চাদরে ঢাকা। দু চোখ বোঁজা। ভেতরে শুধু নার্স ছিল। সে বিকাশকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল। কর্কশ গলায় বলল, একি আপনি এখানে কেন। চলে যান। বিকাশ অপরাধীর ভঙ্গীতে বলল, একটা কথা বলব ওকে। —নার্স বলল এখন কি কথা বলবেন। পেসেন্টের তো সেন্সই ফেরেনি।

—ওকে কখন রিলিজ করবেন?

—তা, তিনটে সাড়ে তিনটের আগে তো নয়ই।

—খাবারটাবার কিছু আনতে হবে?

গ্লোকোজ দেওয়া হয়েছে। আজ সলিড কিছু খেলেই বমি করে ফেলবেন। —নার্স অধৈর্য হয়ে উঠল।

—গরম দুধটুধ? —বিকাশ নাছোড়-বান্দা।

—দুধ, তা চলতে পারে। তাও ঘণ্টা-তিনেক বাদে, বলেই নার্স দরজা বন্ধ করে দিল।

ঘড়িতে এখন পৌনে এগারটা। এতটা সময়, বিকাশ, কি করবে ভেবে পেল না। শেষমেষ নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে এল। দু একজনকে জিজ্ঞেস করতে পোস্টঅফিসের সন্ধান পেয়ে গেল।

টেলিফোনের কাছে লাইন। সামনে একটি মেয়ে। মাথায় তাসখোঁপা। ভি কাট ব্লাউজ। ব্রার স্ট্র্যাপের একটা অংশ বেরিয়ে পড়েছে। মুখে হাল্কা পাউডারের প্রলেপ। ফোনের ওপারের পাত্রের কাজকেও শুনে নিল। মাঝে মাঝে বকবক করছিল। এই শাড়িটা, প্লীজ। আঁ, টিকিট কেটে ফেলেছ। অড্‌ড্রাইটায় সময় মোটেই ইমপসিবল, আজ এস কে জির ইমপর্টেন্ট ক্লাশ আছে। কলেজ কাটব? বলো কি। এই, রাগ করলে। ঠিক আছে, যাব। সেন্টিমেন্টাল তুমি—মেয়েটি কুলকুল করে হেসে উঠতে ওর কাঁধের মসৃণ মাংসে ঢেউ খেলে গেল। মনে মনে হাসল বিকাশ। খুব মজা, না। টের পাবে একদিন। ভাল করে মাথাটা জড়াক। বিয়েটা হয়ে যাক। তারপর কালে কালে সব জারিজুরি ঘুচবে। কোথায় যাবে শরীরের গুমর। দেখা যাবে, সব দেখা যাবে।

ফোন ধরল কল্যাণ। একই ডিপার্ট-মেন্টে কাজ করে। বলল কে—? আমি। শ্লেষ্মা ভাঙল বিকাশ। —আমি কে? নামটা বলুন। —বিকাশ নাম বলতে কল্যাণ বলল, ও বিকাশদা, তুমি। কোত্থেকে ফোন করছ? —পোস্টঅফিস থেকে। —বিকাশের কণ্ঠস্বরে জোর এল না। —কি খবর বলো? —শশব্যস্তে কল্যাণ বলল। —খবর কিছুই নয়। দেরী হয়ে গেল। ভাবছি অফিসে যাব কিনা। —দেরী হয়েছে তো কি হয়েছে। কল্যাণ অবাক কণ্ঠে বলল। —না মানে, আজকে শনিবার কিনা। একেই হাফডে। তার ওপর লেট। আমতা আমতা করল বিকাশ। সেইজন্যেই তো আসবে। মিছিমিছি একটা সি, এল নষ্ট করে লাভ কি—। কল্যাণ সদুপদেশ বর্ষণ করল। —সেকথা হচ্ছে না। বিকাশ কথা শেষ করতে পারল না। কল্যাণ ততক্ষণে লাইন ছেড়ে দিয়েছে।

অফিসে পৌঁছুতে কল্যাণ বলল, ব্যাপার কি বিকাশদা। চোখমুখ উস্ক-খুস্কো—। কিছু না। এমিন। সকালের দিকে বেহালায় এক আত্মীয়ের বাড়ি গিয়েছিলাম তাই। হাত নেড়ে কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক করতে চাইল বিকাশ।

খাওয়া দাওয়া হয়নি নিশ্চয়ই? কল্যাণ প্রশ্ন করল। না, হাসল বিকাশ, যাই ক্যান্টিন থেকে কিছু খেয়ে আসি। হ্যাঁ মিস্টার মুখার্জি এসেছেন? —না, উনি রাইটার্সে গেছেন। সেখান থেকে আসবেন।

নিশ্চিন্ত হল বিকাশ। শিস দিতে দিতে বাথরুমের দিকে চলে গেল তারপর। বেসিনের সামনে এসে আয়নার দিকে মুখ তুলতে চমকে উঠল বিকাশ। নিজেকে চেনাই যাচ্ছে না। শুকনো মুখে গালময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কাপড়পর দুদিন দাড়ি কামানোর ফুরসৎ হয়নি। দুই চোখের দৃষ্টির মধ্যে সমতা নেই। অবিন্যস্ত চুল তাড়াতাড়ি বিকাশ টাপ খুলে মাথা নিচু করে চোখে মুখে জল ঢালতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ডিউটির মধ্যে বেলা। মিস্টার মুখার্জি বেয়ারা দিয়ে বিকাশকে তলব করলেন।

সুইংডোর ঠেলে চেম্বারের ভেতর ঢুকতে মিস্টার মুখার্জি বললেন, আসুন বিকাশবাবু। আপনার অপেক্ষায় আছি। বিকাশ শুধোল কেন স্যার? পাইপে তামাক ভরতে ভরতে মিস্টার মুখার্জি বললেন একটা জরুরী কাজের জন্যেই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। আপনি সবচেয়ে এফিসিয়েন্ট হ্যান্ড। একটা স্টেটমেন্ট তৈরী করে দিতে হবে। সোমবার আরলি আওয়ার্সে ওটা হাইটার্সে পাঠাতে হবে। ঝালমশলায় কটকটে ডিমের কারি, তার সঙ্গে কাঁচা পাঁউরুটি, ক্যান্টিন থেকে অখাদ্য গিলে এসে বিকাশের বুক জ্বালা করছিল। তার ওপর নতুন দুঃসংবাদ তার মেজাজটা মুহূর্তে টকে গেল। তবু, চেষ্টাকৃত হেসে বলল, ঠিক আছে।

অফিস থেকে বেরুতে চারটা বেজে গেল। বাইরে তখন নতুন করে টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। বাসে প্রচন্ড ভিড়। পাদানিতে ঝুলতে ঝুলতে গোটা কলকাতা শহর এবং তৎসহ মিস্টার মুখার্জির চোদ্দপুরুষ উধার করতে করতে বিধ্বস্ত বিকাশ কোনক্রমে এসে পৌঁছুল নার্সিংহোমে।

কেবিনে আধশোওয়া হয়ে আয়ার সঙ্গে গল্প করছিল মঞ্জু। বাস থেকে নেমে পাঞ্জাবী হোটেল থেকে ভাঁড়ে করে গরম দুধ নিয়ে ভেতরে ঢুকল বিকাশ। জিজ্ঞেস করল কেমন আছো? নড়েচড়ে উঠল মঞ্জু, ভালই। এক সহমায় ওকে জরিপ করে নিল বিকাশ। শ্রমকাতর মুখ। সবচেয়ে যেটা লক্ষণীয়, ওর চোখের উজ্জ্বলতাটুকু যেন কেউ ছেঁকে বের করে নিয়েছে।

নাও, ধরো। দুধের ভাঁড়টা মঞ্জুর দিকে এগিয়ে দিল বিকাশ। আবার দুধ কেন? ক্ষীণকণ্ঠে বলল মঞ্জু। চুপ করো দেখি। সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি। চাপা ধমকের সুরে বলল বিকাশ।

ডাক্তারবাবু ছিলেন না। দুপুরের দিকেই হাসপাতালে চলে গেছেন। অফিস ঘরের লোকটা সব বুঝিয়ে দিল। কখন কোন ওষুধটা খেতে হবে।

মঞ্জুকে হাতে ধরে আয়া রাস্তা পর্যন্ত এসেছিল। খুশি হয়ে বিকাশ ওকে একটা আস্ত পাঁচ টাকার নোট দিয়ে ফেলেছিল। মঞ্জু ট্যাক্সির ভেতরে গিয়ে বসলে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আয়া বলেছিল চিন্তার কিছু নেই মা। তিনটে দিন একটু ভারী কিছু তুলবে না, হাঁটা-চলা কম করবে, আর আগুনের আঁচ লাগাবে না।

ট্যাক্সি ছাড়তে বিকাশ মঞ্জুর কাছে সরে এল। একটা অপরিচিত ওষুধের গন্ধ ফুটে উঠছিল ওর শরীর থেকে। মঞ্জু সীটে হেলান দিয়ে চোখ বুজতে বিকাশ নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল খুব কষ্ট হচ্ছে? চোখ খুলল মঞ্জু। ম্লান হাসল, না। তিনটে দিন তো মোটে। মাতির মাকে বলব—বিকেলের রান্নাটাও করতে। তার জন্যে ওকে না হয় কয়েকটা টাকা দেব। —বিকাশ আস্তে আস্তে বলল। মঞ্জু কিছু বলল না। ফের চোখ বুজল।

মৌলালীর মোড়ে এসে বিকাশ বলল, ড্রাইভার এখানে একটু গাড়িটা থামান। —মঞ্জু শুধোল, এখানে কেন? —ট্যাক্সি থেকে নেমে যাবার আগে বিকাশ বলল, বাপি আর ঝুমরির জন্যে কিছু পুতুল-টুতুল কিনব।

রথের মেলা। অপর্যাপ্ত খেলনা। কেনাকাটা সারতে বিকাশের দেরী হল না। ট্যাক্সি গড়িয়াহাটের মোড় ছাড়ালে বিকাশ বলল তুমি সোজা গিয়ে ঘরে ঢুকে পড়বে। কারুর সঙ্গে কথা কইবে না। আমি সব ম্যানেজ করব—। —মঞ্জু তখন বাইরের দিকে তাকিয়ে। ক্লান্ত চোখে ছুটন্ত বৃষ্টিভেজা শহরটাকে দেখছে।

বারান্দায় বাপিকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সুহাসিনী। মঞ্জু ঘরের ভেতরে চলে গেল। ছেলেকে শুধোলেন সুহাসিনী, হ্যাঁরে, বউটা এখন কেমন আছে রে? —ভাল নয়। শরীরের বাঁদিক অবশ হয়ে গেছে। ডাক্তার বলছে—পারশিয়াল প্যারালিসিস। গড়গড় করে বলল বিকাশ।

—আহারে। বলিস কি। কাঁচ বয়স। কত কিই যে ঘটছে আজকাল।

খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে বসেছিল মঞ্জু। সুহাসিনী ঘরে ঢুকে বললেন তোমার আবার কি হল বউ? মঞ্জু উত্তর দেবার সুযোগ পেল না। বিকাশ বলে উঠল, মাথা ধরেছে। একটু জ্বরও হয়েছে বোধ হয়। মঞ্জু ডাকল, আয় বাপি। বাপিকে ওর কোলে তুলে দেবার সময় সুহাসিনী বললেন জ্বর হলে আজ রাত্রে আর ভাত খেয়ে কাজ নেই বউমা। বৃষ্টিবাদলার দিন—

ঝুমরি পাশের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে খেলছিল। বাবার গলার আওয়াজ পেয়ে ছুটে এল। বিকাশ বলল এই দ্যাখ, তোদের জন্যে কত পুতুল কিনে নিয়ে এসেছি।

সুহাসিনী পাশের ঘরে চলে গেলেন। মঞ্জু শুধোল, তোর জেঠিমা কইরে ঝুমরি? দেখছি না।—ঝুমরি বলল, জেঠুর সঙ্গে সিনেমা দেখতে গেছে। অন্যদিন হলে বিকাশ সঙ্গে সঙ্গে তেতে উঠত। দাদা-বৌদি বেশ আছে। এগারো বছরের ওপর হয়ে গেল—ওদের ছেলেপুলে হবার নাম নেই। দিব্যি গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজ বিকাশ তেতে উঠল না। বরং বাড়িতে বৌদি নেই জেনে আশ্বস্ত হল।

বাপি মঞ্জুর শরীরের সঙ্গে মিশে গিয়ে আদর খাচ্ছিল। বিকাশ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল মঞ্জুকে। এমন সময় পাশের ঘরে শাঁখের ফুঁ বেজে উঠল।

রাতে আলো নিভিয়ে বিকাশ খাটে উঠে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, এখন কেমন আছো মঞ্জু?

অন্ধকারে মঞ্জুকে দেখা যাচ্ছিল না। মাঝখানে বাপি। ওধার থেকে মঞ্জু উত্তর করল, ভালই—

বড় করে একটা নিশ্বাস ছাড়ল বিকাশ, যাক, ব্যাপারটা নির্বিঘ্নে চুকে গেছে কেউ টের পায়নি।

মঞ্জুর সাড়া পাওয়া গেল না।

পাশের ঘরে সুহাসিনীর গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। সুহাসিনী অনেক রাত অব্দি জাগেন। বাবার রিটায়ারমেন্টের পর থেকে মার ঘুম কমে গেছে। অনেক রাত অব্দি ঠাকুরের সিংহাসনের সামনে বসে থাকেন। কি করেন কে জানে। হয়ত সংসারের মঙ্গল কামনায় ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেন।

মঞ্জু, এই মঞ্জু, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?—একটা হাত বাড়িয়ে অন্ধকারে মঞ্জুকে খুঁজল বিকাশ।

মঞ্জু বলল, কি, চেঁচাচ্ছ কেন?

না মানে, বলছিলাম, শরীর ভাল আছে তো? —[illegible] চেরা গলায় বলল বিকাশ।

হঠাৎ শিয়রের দিকের জানলাটা ঠকঠক শব্দে নড়ে উঠল। এক তীব্র ফোঁস ফোঁসানির আওয়াজ শোনা গেল।

বিকাশ বুঝল—আবার ঝড়বৃষ্টি আসছে।

থাক, আর ন্যাকামো করতে হবে না। তুমি একটা জানোয়ার। একটা প্রাণকে খুন করে এখন সোহাগ দেখাতে এসো না।

বিকাশের বুকের মধ্যে যেন বজ্রপাত হল। সে আর একটা কথাও বলল না। নিঃশব্দে শুয়ে পড়ল।

শুয়ে পড়ে বাপিকে কাছে টানল বুকের মধ্যে নিয়ে এল। বাপির হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানির শব্দ শুনতে লাগল।

এক সময় অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামল। বৃষ্টি না নামলে টের পেত মঞ্জু—বাপিকে বুকের গভীরে টেনে নিয়ে তিনশ আটান্ন টাকা মাইনের এক আধা সরকারি অফিসের কেরানী বিকাশ সরকার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

পটভূমি

মার চেয়ে মাসী যদি দরদ বেশী দেখায়, তবে বহু ক্ষেত্রে সেই দরদকে সন্দেহের চোখে দেখা হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই জাতীয় বেশ কিছু মাসী রাজ্যের সরকার ও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ রায়ের সম্পর্কে বা কংগ্রেস দল ও তাদের মন্ত্রীদের সম্পর্কে যে-জাতীয় দরদ দেখাচ্ছেন, তাতে এই মাসীরা আসলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম ভাগে ভুবনের মাসী কি-না সেই সন্দেহ ক্রমেই জোরদার হয়ে উঠছে। একদিকে চোরকে চুরি করতে সহায়তা, চোরের হাতে সিঁদ-কাঠি তুলে দেওয়া, অপর দিকে গেরস্থকে এসে বলে যাওয়া, চোর আসছে, সজাগ থেকো। এই যে দু'পক্ষকে লড়িয়ে দেবার তাল, এটা ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছে। দিল্লীতে সদ্য অনুষ্ঠিত এ আই সি সি বৈঠকে কি আলোচনা হয়েছে, তা নিয়ে একইভাবে এই লড়িয়ে দেবার তাল সৃষ্টির একটা নগ্ন প্রচেষ্টা দেখা গেছে। দিল্লীতে এ আই সি সি বৈঠক উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী সব প্রদেশের কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আলাদা আলাদা বৈঠক করেছিলেন, একইভাবে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গেও একটা বৈঠক করেন। এই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী কি বলেছেন সেটা নিয়ে ফলাও করে খবর বের হলো। খবরের মূল কথা যা ছিল, তা হলো এই—পশ্চিমবঙ্গে পি ডি এ ভাঙায় প্রধানমন্ত্রী খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং পরোক্ষে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়ের ওপর দোষারোপ করেছেন।

এ-খবর যেদিন কাগজে বের হলো সেদিন রাত্রেই সিদ্ধার্থশংকর রায় কোলকাতায় ফিরে বললেন, প্রধানমন্ত্রী পি ডি এ সম্পর্কে কোনও কথা বলেন নি বা পি ডি এ-র পুনরুজ্জীবনেরও কোনও কথা বলেন নি। প্রধানমন্ত্রী যা বলেছেন, তার মূল কথা হলো সি পি আই-এর সঙ্গে অপ্রয়োজনে সংঘর্ষ এড়িয়ে পারস্পরিক সমঝোতার মধ্যে চলাই ভালো। শ্রীরায়ের এই কথা প্রকাশ হবার পর দিল্লী থেকেও প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সূত্র থেকে প্রায় একই কথা বলা হলো। পরদিন দেখা গেলো আবার খবর। সে-খবর হলো এই—সিদ্ধার্থশংকর রায় নাকি অনেক চেষ্টা করে প্রধানমন্ত্রীর সূত্র থেকে ঐ খবরটি বের করিয়েছেন। এটা হলো চালের একটা নমুনা। অর্থাৎ খবরের সঙ্গে খবরকে লড়িয়ে দুইপক্ষের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করা। খবরের সেনগুপ্তো খবরের নামে বাজারে এরা যেসব জিনিস চালাচ্ছেন, সেটা সবই হলো একের বিরুদ্ধে অপরকে লড়িয়ে দেবার তাল। কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়ের বাড়ীতে শ্রীরায় ঘরোয়াভাবে এক বৈঠকে দলীয় নেতাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। পরদিন খবর : একজন কংগ্রেস নেতা সেই বৈঠকে হাপুস নয়নে কেঁদেছেন, আর একজন কংগ্রেস নেতা ঠাকুরের পায়ে মাথা কুটেছেন। এমনি আরও অজস্র নজির আছে যার মধ্যে দিয়ে দেখানো যায় সাম্প্রতিককালে এই জাতীয় ডজন ডজন খবর বের হচ্ছে যার মূল লক্ষ্য খবর নয়, মূল লক্ষ্য হলো, যাঁরা রাজ্যে প্রশাসন চালাচ্ছেন বা যাঁরা দলীয় নেতা হিসাবে সম্মানিত তাঁদের জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করা, তাঁদের সাধারণ মানুষের কাছে খেলো করে তোলা। এইসব খবরের আরও একটা মজা হলো যে, এর প্রতিবাদ করা চলে না, এবং প্রতিবাদ করলে আরও খেলো হতে হয়। যেমন যে-নেতার নামে খবর বের হলো, তিনি হাপুস নয়নে কেঁদেছেন, তাঁকে প্রতিবাদ করতে হলে বলতে হয় না আমি কাঁদিনি'। কান্নার খবরের চাইতে কাঁদিনি বলতে গিয়ে নিজেকে আরও খেলো হতে হয়। তবু মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় তাঁর বাড়ীতে যা যা ঘটেছিলো তার এক লাইন প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, কাগজে যা বেরিয়েছে, তা সর্বৈব মিথ্যা। চাটনী-প্রিয় পাঠকরা খবরকেই বিশ্বাস করে,

প্রতিবাদকে নয়। যেমন, প্রধানমন্ত্রীর সূত্র থেকে পি ডি এ সংক্রান্ত সংবাদে প্রতিবাদ করা হয়েছিলো। কিন্তু অনেকেই হয়তো ধরে নেয়, এসব হলো শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা।

শুক্রবার ২৬শে জুলাই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কোলকাতা প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতার মধ্যে কেউ এই জাতীয় সংবাদ এবং সাংবাদিকতা সম্পর্কে খুবই উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি দুটি উদ্ধৃতি ও নজির সাংবাদিকদের কাছে পেশ করে বলেন নেপোলিয়ন বলেছেন, এক হাজার সঙ্গীনসহ বন্দুকের চেয়ে একজন সাংবাদিকের কলম শক্তিশালী। আর সেই বৌদ্ধ যুগেও চরিত্রহননের চেষ্টায় কিভাবে এক সন্ন্যাসীর মৃতদেহ বেশ্যাবাড়ীর দোরগোড়ায় রেখে প্রমাণের চেষ্টা হয়েছিলো 'সন্ন্যাসী আসলে বেশ্যাবাড়ীতে গিয়েই মারা গেছেন।' মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়ের তাই অনুরোধ ছিলো, চরিত্রহননের চেষ্টা থেকে সাংবাদিকতা দূরে সরে যাক। মুখ্যমন্ত্রী কি বলেছেন, সেটা বড় কথা নয়, অথবা সাংবাদিকরা এই জাতীয় খবর সৃষ্টি করে যে নজির ও প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করছেন সে সম্পর্কেও কোন কথা বলার এক্তিয়ার বা স্পর্ধা আমার নেই। তবে সাবধান হওয়ার সময় এসেছে দুটো

কারণে। একটি কারণ হলো এই,

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যে একটি আইন

প্রণয়ন করে ব্যবস্থা করেছেন যে,

খবরের কাগজের বিরুদ্ধে

অথবা কোন সংবাদের 'পরে

ভিত্তি করে মানহানির মামলা করলে অথবা খেসারত দাবীতে মামলা করলে অভিযোগকারীর কোনও খরচা লাগবে না। আগে ছিলো এক লক্ষ টাকার খেসারতের মামলা করলে সেই টাকার অনুপাতে কোর্ট ফী স্ট্যাম্প লাগতো। কাজেই খুশি মতো খেসারতের মামলা কারও করার সাধ থাকলেও সাধ্যে কুলাতো না। এখন কিন্তু সেই দরজা খুলে গেলো। রাজ্যের একজন মন্ত্রী আছেন, তিনি ইতিমধ্যে একজন সম্পাদককে শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা করে ফেলেছেন ও পাঁচ-সাতটা কোর্টে মামলা চালাচ্ছেন। কাজেই যাঁরা এই

সুনিপুণভাবে চরিত্রহননের খেলায় মেতেছেন তাঁরা পরোক্ষে স্বাধীন, নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার পথে অবরোধ সৃষ্টিরই প্ররোচনা সৃষ্টি করছেন। দ্বিতীয় কথা হলো, শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়ের কথাও না হয়, বাদ দেওয়া গেলো। কিন্তু তরুণ নবীন এবং এখনও পর্যন্ত যাঁরা সবে মাত্র রাজনীতিতে পা দিয়ে প্রশাসনে নিজেদের তালিম দিচ্ছেন, তাঁদেরও যদি এই ভাবে চাটনি মার্কা খবর দিয়ে মাথা খাওয়া হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ কর্ণধার কারা হবেন? কিছু কাল আগে এই জাতীয় প্রবণতা রোধে এক সময় সংবাদপত্র অফিসে কিছু কিছু হামলা হয়েছিল। এই লেখকেরই হাতের লেখা কেটে দেবার জন্য চেপে ধরেছিলো কয়েকজন গরম মেজাজী। যাঁরা সংবাদের নামে চরিত্র হননের এই খেলায় মেতেছেন, তাঁরা আসলে কি আবার সেই দিনে রাজ্যকে ফিরিয়ে আনতে চান? কথাটা ভেবে দেখা দরকার।

—জন আব্দুল হান্নান

এই বাংলার খবর

সরকারের অর্থচিন্তা

পশ্চিম বাংলা সরকারের মাথাব্যথার নতুন কারণ বাজেটের ঘাটতি। বাজেটের জমা-খরচের পর ঘাটতি থেকে যাওয়া অবশ্য কিছু নতুন ব্যাপার নয়, বরং সেটাই বোধ হয় রেওয়াজ। কিন্তু এ-বছর অন্যান্য রাজ্য সরকারের মতো পশ্চিম বাংলা সরকারেরও ভাবনার কারণ, নয়াদিল্লীর মনোভাব। বাজেটে ঘাটতি থেকে গেলে তা নোট ছেপে সামলাতে হয়, ফলে বাজারে টাকার যোগান বাড়ে। তাই কেন্দ্রীয় সরকার নিজেদের বাজেটেও ঘাটতি নিয়ন্ত্রণ করতে চান, আর কোনো রাজ্য সরকারের বাজেটে ঘাটতি থাকুক তাও চান না। কিছুদিন আগে পর্যন্ত রাজ্য সরকারের বাজেটে ঘাটতি পড়লে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ওভারড্রাফট নিয়ে তা সামলানো যেত। এখন সে-ব্যাপারেও কড়া নিষেধ।

এই যখন অবস্থা তখন পশ্চিম বাংলা সরকারের জমা-খরচের হালচাল মোটেই ভালো নয়। এই হালই যদি বজায় থাকে তবে বছরের শেষে ঘাটতি দাঁড়াবে ২৬ কোটি টাকা। অথচ মার্চে যে-বাজেট পেশ করা হয় তাতে চলতি বছরে কিছু উদ্বৃত্ত থাকবে বলেই দেখানো হয়েছিল। এমনিতে ঘাটতি দাঁড়িয়েছিল পৌনে বারো কোটি টাকা। রাজ্য সরকার নতুন কর বসিয়ে ২৪ কোটি টাকা তুলবেন বলে স্থির করেন। তাতে ঘাটতি কমে গিয়ে সোয়া বারো কোটি টাকার মতো হাতে থাকার কথা। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, ঘাটতি হবেই। অবস্থা কী করে সামলানো যায় তা নিয়ে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে আলোচনা হলো। নয়াদিল্লী চাইছে, দরকার হলে আরো নতুন কর বসিয়ে ঘাটতি পূরণ করা হোক। কিন্তু রাজ্য সরকার আপাতত ঠিক করেছেন, বাজারে সরকারের যে-সব টাকা অনাদায়ী পড়ে আছে তা আদায় করেই আয়-ব্যয় সমান করবেন। অনাদায়ী টাকার পরিমাণও শুধু একটা কম নয়। প্রায় এক শ' কোটি টাকা। সার আর বীজ কেনার জন্যে যে ঋণ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে ৪২ কোটি টাকা এখনও ফেরৎ পাওয়া যায় নি, জলকর বাবদ অনাদায়ী সাড়ে চার কোটি টাকা। কী করে এই সব টাকা আদায় করা যায় তার পথ বাৎলাবার জন্যে একটি কমিটি তৈরি হয়েছে। সেই কমিটিতে আছেন তিনজন মন্ত্রী এবং কয়েকজন পদস্থ আমলা। এ-ছাড়া অনাবশ্যক অনেক খরচ (যেমন পেট্রল) বাঁচাবার জন্যেও মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন।

জেলা কর্ডনিংয়ের পালা শেষ

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক—যে-কোনো দিক থেকেই দেখুন না কেন, বিভিন্ন জেলার মধ্যে ধান-চাল চলাচলের ব্যাপারে কর্ডনিং তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। আগস্ট থেকেই আর এই কর্ডনিং থাকছে না। তবে বিধিবদ্ধ রেশন এলাকা (কলকাতা, দুর্গাপুর-আসানসোল) ঘিরে কর্ডনিং আগের মতোই থাকবে। ১৯৬৫ সালে যখন এই রাজ্যে খাদ্যশস্যের রেশন ব্যবস্থা চালু হয়, সেই তখন থেকেই এই জেলা কর্ডনিংও চালু ছিল। আজ ন'বছর পরে সেই কর্ডনিং তুলে দেওয়া হলো কেন?

রাজ্য সরকার অনেক যুক্তি দেখিয়েছেন। এক, এই কর্ডনিংয়ের ফলে ঘাটতি জেলায় চালের দর হু হু করে বেড়ে যাচ্ছিল। ধান-চাল যে এ-বছর খুব একটা কম হয়েছে তা নয়, তবু দাম খুবই চড়া। ধান-চাল অবাধে চলতে দিলে ঘাটতি জেলায় দাম পড়বে। দুই, এখন সরকারি ভাণ্ডারের জন্যে ধান-চাল সংগ্রহের চেষ্টাতেও ইতি টানা হয়েছে, সুতরাং কর্ডনিং না-থাকলে ক্ষতি নেই। তিন, জেলা কর্ডনিংয়ের কাজে বহু পুলিশ লাগছে। জেলা কর্ডনিংয়ের দায়িত্ব থেকে রেহাই পেলে পুলিশ বিধিবদ্ধ এলাকার চারপাশে পাহারা আরো কড়া করতে পারবে, সাধারণ চোর-ডাকাত ধরার কাজেও আরো মন দিতে পারবে।

রাজনৈতিক দিক দিয়ে এই সিদ্ধান্তের তাৎপর্য হলো, ধান-চাল সংগ্রহের ব্যাপারে বেসরকারি ব্যবসায়ী আর চালকলের মালিকদের সঙ্গে রাজ্য সরকার শেষ পর্যন্ত এঁটে উঠতে পারলেন না। ধান-চাল সংগ্রহের সরকারি চেষ্টা যে এখন সরকারিভাবেই পরিত্যক্ত হলো, অর্থনৈতিক দিক থেকে তার গুরুত্ব কম নয়। কথা ছিল, পাঁচ লাখ টন সংগ্রহ হবে, হয়েছে এক লাখ আশি হাজার টন। রেশন ব্যবস্থার ওপর এর কোনো প্রতিক্রিয়া হবে কিনা, সেদিকে এখন নজর দিতে হবে। অন্যদিকে, সরকারের অনুমান অনুযায়ী যদি ঘাটতি জেলায় এর ফলে চালের দাম কমে তবে ঐ সব এলাকার মানুষ উপকৃত হবেন। কর্ডনিং থাকার ফলে চোরাচালানের কাজে বহু নারীপুরুষশিশু লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। এখন যদি এই চোরাচালান বন্ধ হয় তবে একদল মানুষের অপরাধে লিপ্ত হওয়ার পথ বন্ধ হবে, সামাজিক দিক থেকে এর গুরুত্ব যথেষ্ট।

ঘোলা জল নিয়ে জল ঘোলা

কলকাতার মানুষকে পৌরসভা যে জল খাওয়ায় তা কতোটা শুদ্ধ, তা নিয়ে সন্দেহ অনেকেরই ছিল। তবু যে ঐ জল এতদিন গলাধঃকরণ করা হয়েছে তার কারণ অন্তত সাদা চোখে ঐ জলের মধ্যে কোনো নোংরা ধরা পড়ে নি। কিন্তু কয়েকদিন ধরে পৌরসভা যে জল দিয়েছেন তা রীতিমতোই নোংরা—একেবারে ঘোলা। হঠাৎ দেখলে পবিত্র

গংগা জলের সংগে কোনো ফারাক চোখে পড়ে না। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই হৈ চৈ পড়ে যায়। পৌরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের অফিসার জানান, ঐ জল খেলে কোনো অপকার হবে না, তবে ফুটিয়ে খাওয়াই ভালো। উত্তর ভারতে বৃষ্টি হয়েছে জোর, বাংলায় তেমন বৃষ্টি হয় নি, ফলে গংগার জলের ঘোলাভাব কাটে নি। কিন্তু এই সব ব্যাখ্যা শুনেও লোকের উদ্বেগ ঘোচে নি; তাই অবস্থা খতিয়ে দেখার জন্যে পৌরমন্ত্রী নিয়োগ করলেন এক তদন্ত কমিটি।

কমিটি কিন্তু বললেন, জল যে কেন ঘোলা সে-ব্যাপারে তাঁরা পলতা পাম্পিং স্টেশনের মুখ্য বিশ্লেষকের কাছ থেকে কোনো জুতসই উত্তর পান নি। অবশ্য ঐ বিশ্লেষকের যুক্তি হলো, জল ঠিকমতো পরিষ্কার হয়েছে কিনা তা যে যাচাই করে দেখা হবে গবেষণাগারে সে-রকম ব্যবস্থাই তো নেই। সেখানে যন্ত্রপাতি সব আদ্যিকালের। কমিটি সুপারিশ করেছেন, ঐ গবেষণাগারে নতুন যন্ত্রপাতি বসানো হোক, উপযুক্ত লোকও নিয়োগ করা হোক। তবে কমিটি একটা বড় ত্রুটির দিকেও আঙুল দেখিয়েছেন: খাওয়ার জল সরবরাহের আগে তা পরীক্ষা করার ব্যবস্থায় গলদ আছে। দিনে মাত্র একবার এই পরীক্ষা করা হয়। তাও রবিবারে হয় না, মাঝে মাঝে শনিবারও বাদ যায়। কমিটির মতে এই পরীক্ষা শুধু প্রতিদিনই নয়, দিনের মধ্যে কয়েক-বারই হওয়া উচিত। এদিকে অভিযোগ পাওয়া গেছে, পলতায় ফিলটার বেডে যতোটা বালি থাকার নিয়ম তা থাকছে না। এখন জল পরিষ্কার করার জন্যে ফটকিরি বেশি মেশানো হচ্ছে। কিন্তু সেটাও স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী হতে পারে।

প্লাবিত উত্তরবঙ্গ

প্রায় প্রতি বর্ষায় যে দুর্ভোগ উত্তরবঙ্গের মানুষের কপালে লেখা থাকে, এবারও তা থেকে রেহাই মেলে নি। বরং গতবারের চেয়ে এবারে বন্যার দাপট বেশি বলে মনে হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের ব্যাপক এলাকা জলের তলায়। ফুলে উঠেছে ছোট-বড় অনেক নদী। জলপাইগুড়ি আর কোচবিহার জেলাতেই ক্ষতির পরিমাণ বেশি। এক কোচবিহার জেলাতেই এ পর্যন্ত লাখখানেক লোক ভিটেমাটি ছাড়া হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। জলপাইগুড়ি জেলাতেও প্রায় আধ লাখ লোক ক্ষতিগ্রস্ত। বিপন্নদের ত্রাণের জন্যে সেনাবাহিনীকে কাজে লাগানো হচ্ছে। তারা প্রায় দশ হাজার পরিবারকে ইতিমধ্যেই উদ্ধার করেছে। বিপন্নদের রাখার জন্যে খোলা হয়েছে অনেক শিবির।

পরপর দিন কয়েক বৃষ্টি হওয়ার পর উত্তরবঙ্গের সব নদীতেই জল বেড়ে যায়। তিস্তা, তোরসা, জলঢাকা, রায়ডাক, কুমলাই সব নদীতেই বিপদ সংকেত দিতে হয়। পশ্চিম দিনাজপুরে আত্রেয়ী ও পুনর্ভবার জলও বিপদসীমা ছাড়িয়ে যায়। অনেক জায়গায় বাঁধ ভেঙেছে, রাস্তা ভেঙেছে। দার্জিলিং জেলার অনেক এলাকাও প্লাবিত। স্ফীত মহানন্দার জলে শিলিগুড়ি শহরের অনেক এলাকা ডুবেছে। শিলিগুড়ি-দার্জিলিং সড়কের বিভিন্ন জায়গায় ধস নামায় সেখানে যানবাহন চলাচল বন্ধ। ঐ রাস্তা দুটি সেতুও ভেঙেছে। শিলিগুড়ি আর কালিম্পংয়ের মধ্যে তিস্তা ভ্যালি সড়কও ক্ষতিগ্রস্ত। বন্যার্ত এলাকা দেখার জন্যে মুখ্যমন্ত্রী, সেচমন্ত্রী, ত্রাণমন্ত্রী সকলে উত্তরবঙ্গে গেছেন (এঁরা তিনজনেই উত্তরবঙ্গ থেকে নির্বাচিত)। বিপন্নদের গম চাল চিঁড়ে যোগানোর ব্যবস্থা হয়েছে। ত্রাণের জন্যে বরাদ্দ হয়েছে বিশেষ অর্থ।

সাহিত্য পরিষদের দুরবস্থা

৮২ বছর বয়স একজন ব্যক্তির পক্ষে অনেক, তবে একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নয়, বিশেষ করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মতো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তো নয়ই। কিন্তু বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনে বিশিষ্ট এই প্রতিষ্ঠানটির অবস্থা যে এখন মোটেই ঈর্ষণীয় নয় তা স্পষ্ট হয়ে উঠলো ৮২তম বার্ষিক সভার অনুষ্ঠানে। সাহিত্য পরিষদ থেকে একাদশ শতাব্দীর যে দুটি বিষ্ণু মূর্তি কিছুদিন আগে চুরি যায় সে দুটি আবার ফিরে পাওয়া যাচ্ছে। সুদূর আমেরিকা থেকে উদ্ধার হয়ে সেই চোরাই মাল আবার স্বগৃহে ফিরছে। এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে পরিষদের একটি বিশেষ সমস্যার দিকে অনেকের নজর গেছে, সেটা হলো মূল্যবান মূর্তি-পাণ্ডুলিপি চুরি বন্ধ করা। সেটা একটা সমস্যা তো বটেই, কিন্তু তার চেয়েও বড় সমস্যা বোধহয় পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি রাখবার সমস্যা। বার্ষিক অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ডায়াস পরিষদের বর্তমান দুরবস্থা দেখে রীতিমতো হতাশ হয়েছেন। মূল্যবান জিনিসপত্র রাখবার জায়গা নেই, সেই সব জিনিস সংরক্ষণের আধুনিক ব্যবস্থারও অভাব। সঙ্কট মোচনের জন্যে রাজ্যপাল দশ হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেছেন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এবং আগ্রহী অন্যান্যরা যাতে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন সেজন্যেও তিনি আবেদন জানিয়েছেন।

৩০।৭।৭৪

—দেব দত্ত

দেশে বিদেশে

সংসদের অধিবেশন শুরু হবে বিরোধী দলের অনাস্থা প্রস্তাব দিয়ে এটা একটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। এবারকার বর্ষা অধিবেশনেও সেই রেওয়াজের ব্যতিক্রম হয়নি।

এবার সরকারকে আক্রমণ করার মত যথেষ্ট বারুদ বিরোধী পক্ষে জমা হয়েছিল। রেল ধর্মঘট দমনের সরকারি নীতি, দুর্নীতি ও মূল্যবৃদ্ধি, সংসদের অধিবেশনের প্রাক্কালে অর্ডিন্যান্স জারি করে সংসদের প্রতি উপেক্ষা ইত্যাদি অনেক বিষয়ই ছিল যেগুলি সম্পর্কে বিরোধী পক্ষে ক্ষোভ প্রকাশের সুযোগ ছিল।

সি পি এম-এর শ্রীজ্যোতির্ময় বসু, সি পি আই-এর শ্রীইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, সোস্যালিস্ট পার্টির শ্রীমধু লিমায়ে প্রভৃতি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন।

কংগ্রেস ভোটের জোরে এই অনাস্থা প্রস্তাব হারিয়ে দিয়েছে, কিন্তু সূচনা থেকেই বোঝা গেল, সংসদের এবারকার অধিবেশন বেশ উত্তপ্ত হবে এবং বিভিন্ন প্রশ্নে সরকারকে বেশ কতকটা বেকায়দায় পড়তে হবে।

যৌথভাবে বিরোধী দলগুলির প্রার্থী হিসাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য আর এস পি নেতা ত্রিদিব চৌধুরী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। একমাত্র সি পি আই বাদে প্রধান প্রধান অন্যান্য প্রায় সব অকংগ্রেসী দল তাঁকে সমর্থন করতে পারে বলে মনে হচ্ছে। বড় পার্টিগুলির মধ্যে সি পি আই অবশ্য তাদের মত এখনও জানায়নি। দলের ভিতরে এ-বিষয়ে মতান্তর আছে বলে প্রকাশ। একটা অংশ শ্রীচৌধুরীকে সমর্থন করতে চান, অন্য একটা অংশ কংগ্রেসের সঙ্গে সি পি আই-এর বিশেষ সম্পর্কের কথা মনে রেখেও দক্ষিণপন্থী দলগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে কংগ্রেসের বিরোধিতা করা উচিত হবে না। এই যুক্তিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন থেকে বিরত থাকতে চাইছেন।

ইতিমধ্যে ভারতীয় লোকদল নামে একটি নতুন দল গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতীয় ক্রান্তি দল, স্বতন্ত্র পার্টি, শ্রীবিজু পট্টনায়কের প্রগতি পার্টি, শ্রীরাজনারায়ণের সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল, শ্রীবলরাজ মাধোকের লোকতান্ত্রিক দল, ডঃ রামসুভগ সিংহের ভারতীয় ক্ষেতিদার সংঘ ও হরিয়ানার হরিজন সংঘর্ষ সমিতির সংযুক্তিতে গঠিত এই নতুন দল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অকম্যুনিস্ট বিকল্প শক্তি হিসাবে দাঁড়াবার ঘোষিত উদ্দেশ্য নিয়ে আসরে নেমেছে।

এই সংযুক্তির সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় ক্রান্তি দলে ভাঙন দেখা দিয়েছে। যাঁরা সংযুক্তির বিরোধী তাঁরা দলের চেয়ারম্যান চরণ সিং-কে অস্বীকার করেছেন এবং শ্রী এম এম জমেরকে নতুন চেয়ারম্যান হিসাবে ঘোষণা করেছেন। এই নিয়ে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় ভারতীয় ক্রান্তি দলের দুই অংশের মধ্যে মারপিটও হয়ে গেছে।

*

বিহারী বিতণ্ডা

বিহারে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ 'ভ্রষ্টাচার, বেরোজগারি অউর মাংগাই'-এর বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চালাচ্ছেন সেই আন্দোলনকে একটি নতুন পর্যায়ে তোলার জন্য তিনি এখন প্রস্তুত হচ্ছেন। তাঁর এই আন্দোলনের প্রধান রূপ হচ্ছে এখন কলেজের ছাত্রদের ক্লাস ও পরীক্ষা বয়কট। এর পর তিনি কর দেওয়া বন্ধ করার জন্য আহ্বান জানাবেন বলেছেন। ইতিমধ্যে একটি জনসভায় পুলিশের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন যে, উপরওয়ালার কোন হুকুম অন্যায় মনে করলে তারা যেন সেই হুকুম না মানে। কংগ্রেস সভাপতি ডঃ শংকরদয়াল শর্মা শ্রীনারায়ণের এই বক্তব্যে তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন।

শ্রীনারায়ণ একজন 'ডিকটেটর' হতে চাইছেন, এই অভিযোগ করে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী আবদুল গফুর বলেছেন, শ্রীনারায়ণ যদি বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার দাবি তুলে নেন, তাহলে তিনি মুখ্যমন্ত্রিত্ব ত্যাগ করতে রাজি আছেন। শ্রীনারায়ণ এর জবাবে বলেছেন, জনগণের দাবিতেই গফুরকে সরে যেতে হবে।

ছাত্রদের ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের আন্দোলন কোথাও কোথাও হিংসাত্মক রূপ নিচ্ছে। বিহার শরিফে একজন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে গিয়ে খুন

হয়েছেন। এইসব ঘটনা সম্পর্কে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ বলেছেন, এগুলি হচ্ছে, পরিকল্পিত হিংসাত্মক ঘটনা।'

*

ওয়াটার গেটের শেষ?

দু'বছর আগে এক জুন মাসে ওয়াশিংটনের ওয়াটারগেট ভবনে সিঁধ কাটতে গিয়ে কয়েকটি লোক যখন ধরা পড়ে, তখন প্রেসিডেন্ট নিকসন তাঁর সমুদ্রতীরবর্তী কি বিস্কেনের বাসভবনে অবকাশ যাপন করছিলেন।

আর সেই ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির জট ছাড়াতে ছাড়াতে হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভদের বিচার কমিটি শেষপর্যন্ত প্রেসিডেন্ট নিকসনকে ইমপিচ করার জন্য সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত নিলেন, সেদিনও তিনি প্রশান্ত মহাসাগরে সাঁতার কাটছিলেন। শতাধিক বছরের মধ্যে এই দ্বিতীয়বার যখন একজন মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে গুরুতর অপরাধের অভিযোগে আইনসভার বিচারের জন্য সোপর্দ করা হতে যাচ্ছে, তখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৮তম প্রেসিডেন্ট রিচার্ড মিলহাউস নিকসন অন্তত বাহ্যত অবিচলিত ভাব দেখাচ্ছেন। তাঁর প্রেস সেক্রেটারির মারফৎ তিনি জানিয়েছেন যে, তিনি পদত্যাগ করবেন না, কারণ, তিনি নির্দোষ এবং আইনসভার বিচারে তিনি খালাস পাবেন বলে তাঁর বিশ্বাস আছে।

শেষপর্যন্ত যাই হোক না কেন, হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের ৩৮ জন সদস্য নিয়ে গঠিত বিচার কমিটিতে এমনকি রিপাবলিকান সাংসদেরও একাংশ যে ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিকসনকে ইমপিচ করার মত একটি অভিযোগ-তালিকা প্রস্তুত করেছেন, সেটাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের উচ্চ পদমর্যাদার পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকর।

*

সাইপ্রাস

স্বস্তি পরিষদের হস্তক্ষেপে সাইপ্রাসে যখন একটা আনুষ্ঠানিক অনিশ্চিত যুদ্ধবিরতির অবস্থা চলছে, তখন জেনেভায় বৃটেন, গ্রীস ও তুরস্কের মধ্যে শান্তি আলোচনা শুরুতেই ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।

ইতিমধ্যে গ্রীস ও সাইপ্রাস, উভয় দেশেই সরকারের পরিবর্তন হয়েছে। গ্রীসে সামরিক সরকারের পতন হয়েছে। তাদের স্থলে নতুন অসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাইপ্রাসে সামরিক অভ্যুত্থানের দ্বারা আর্চবিশপ ম্যাকারিওসকে সরিয়ে তাঁর স্থলে যাঁকে রাষ্ট্রপতির আসনে বসান হয়েছিল, সেই সংবাদপত্র-মালিক নিকোলাস স্যামসন পদত্যাগ করেছেন এবং তাঁর স্থলে রাষ্ট্রপতির আসনে বসেছেন সাইপ্রাস আইনসভার স্পীকার গ্লাফকোস ক্লেরিডিস।

যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হওয়ার পরও তুর্কী বাহিনী সাইপ্রাসে যুদ্ধ চালিয়ে তুর্কী সিপ্রিয়ট এলাকা বেশ কিছুটা বাড়িয়ে নিয়েছে। কিরেনিয়া বন্দর থেকে রাজধানী নিকোসিয়া পর্যন্ত যে সড়কটি গেছে সেটি তুর্কী বাহিনী নিজেদের অধিকারে রেখেছে। অর্থাৎ যে-কোন মুহূর্তে সমুদ্রপথে সৈন্য ও রসদ আমদানি করে রাজধানীর উপর হামলা করার ক্ষমতা সে নিজের আয়ত্তে রেখে দিয়েছে। যুদ্ধবিরতির এক সপ্তাহ পরেও সাইপ্রাসে তুর্কী বাহিনীর সঙ্গে গ্রীক সিপ্রিয়ট বাহিনীর ইতস্তত লড়াই চলছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।

এদিকে, স্বস্তি পরিষদের প্রস্তাবের ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে। এই প্রস্তাবে একই সঙ্গে সাইপ্রাস থেকে বিদেশী সৈন্যবাহিনীর অপসারণ ও সেখানকার সামরিক অভ্যুত্থানের পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। অথচ, সামরিক অভ্যুত্থানের আগে থেকেই সাইপ্রাসে রয়েছে তুর্কী গ্যারিসন এবং গ্রীসের মূল ভূখণ্ড থেকে আগত গ্রীক সামরিক অফিসারগণ। তাদের কি হবে, সে-বিষয়ে স্বস্তি পরিষদে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। জেনেভা সম্মেলনে গ্রীক পররাষ্ট্রমন্ত্রী শুধু যুদ্ধবিরতি নিয়েই আলোচনা করতে চাইছেন। অন্যদিকে, তুর্কী পররাষ্ট্রমন্ত্রী চাইছেন সাইপ্রাসের ভবিষ্যৎ সংবিধান নিয়ে আলোচনা হোক।

তুরস্কের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে সাইপ্রাসকে বিভক্ত করা এই বিভাগ পরিকল্পনায় তলে-তলে বৃটেন ও আমেরিকার সায় আছে বলে শোনা যাচ্ছে। সোভিয়েট রাশিয়া এতে প্রমাদ গুনছে। তার আশঙ্কা, বিভক্ত সাইপ্রাসের দুই অংশই হবে ন্যাটো ঘাঁটি। আলোচনার গতির উপর নজর রাখার জন্য রাশিয়া জেনেভায় একজন পর্যবেক্ষক পাঠাচ্ছে। আর্চবিশপ ম্যাকারিওসকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সে রাষ্ট্রসংঘকে উদ্যোগী হতে বলছে।

—পুণ্ডরীক

২৯-৭-৭৪
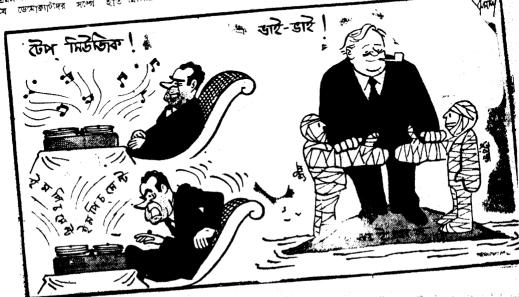
নয়নাভিরাম নীলে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া ॥

—বিষ্ণু দে

গ্রামীণ উদ্বেগ তীব্র, মেঘ হাওয়া ছোটে প্রত্যহই,
আমজাম ঝ'রে যায়। কিন্তু কী বিচিত্র ঘনশ্যাম
রঙের বাহার আনে বেগের উল্লাসে
চোখের নন্দনে আর স্বেদাক্ত শরীরে
আমাদেরই বিলাসী আরাম!

শহুরের ত্বকে কিন্তু সংবেদ্যতা কই?
কখন? কোথায় বৃষ্টি? মাঠক্ষেত ভাসে
অন্তত দু'ঘণ্টা-টাক, লাঙল হাজির ধীরে ধীরে,
মৃত্যুহীন আশা জাগে, — যদি বিধি নাই হন বাম।

মেঘের ঐশ্বর্য দেখে ভিন্ লোকের ভিন্ন প্রতিক্রিয়া,
কারো পেশী তৈরি হয়, কোনো যক্ষভাবে কোথা আয়তনয়না।
ওদিকে পাহাড় যেন শ্রোণিভারাদলসশয়না,
নয়নাভিরাম নীলে কেবা যক্ষ কোথা তার প্রিয়া!
আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে, সুখ তাই দুখজাগানিয়া।

ভিজে হাওয়া ওঠে নামে, ক্ষ্যাপে, ছোটে মেঘ অবিরাম।
মাঠে ক্ষেতে শোনা যায়ঃ বহুত বহুত আজ কাম্।।

অতুলচন্দ্র বসু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আবার পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরি। আশা ছলনাময়ী—সেই ছলনায় ভুলে সোসাইটি অব ফাইন আর্টস বন্ধ হয়ে যাবার পর (১৯২৮) আবার সেই আদর্শেই জাতিধর্মনিরপেক্ষ শিল্পক্ষেত্রে একটি জগন্নাথধাম নির্মাণের সাধ লেখকের মনে দেখা দেয়। ইতিমধ্যে ভাইসরয়েজ হাউস-এর জন্য তার আঁকা ছবি কর্তৃপক্ষের খুবই মনোনীত হওয়ায় তার আত্মবিশ্বাসে একটু আতিশয্য দোষই ঘটেছিল। যাই হোক, এই প্রচেষ্টায় মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরকে উৎসাহিত করতে পেরে উদ্যোগপর্ব পুরোদমে শুরু হল। ১৯৩৩ সালের ১৫ই অগাস্টে মহারাজারই নেতৃত্বে সার রাজেন মুখার্জির সভাপতিত্বে ও বিশিষ্ট নাগরিক ও কলারসিকদের সহযোগিতায় ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস নামে প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক যোহান ভ্যান ম্যানেন ও লেখক যুগ্মসম্পাদক নিযুক্ত হয়। 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি' কথাটির সারবত্তা প্রমাণ করবার জন্যই যেন ঘরে-বাইরে প্রবল অসন্তোষের আগুন জ্বলে উঠল। আশংকা হয় বাস্তবধর্মী চিত্রকর এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট থাকার জন্যই অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ দুজনেই এতে যোগ দিতে অসম্মত হন। লখনৌ থেকে অসিত হালদারও কিঞ্চিৎ উষ্মার সঙ্গেই প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করেন। বলাবাহুল্য, এই অসম্মতি বাংলাদেশের চিত্রকলায় ভারতীয় কৌলিন্য প্রথাপ্রবর্তনের মনোভাবপ্রসূত, কোনো ব্যক্তিগত কারণে নয়। অন্যদিকে বম্বাই-এর দৈনিক টাইমস অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদকীয় স্তম্ভে বাংলাদেশে এই সর্বভারতীয় পরিকল্পনার প্রতিবাদ তীব্রভাবে উচ্চারিত হয়। শিল্পক্ষেত্রে বাংলা-বম্বাই-এর বিভেদসৃষ্টির প্রধান হোতা স্যার জে জে স্কুল অব আর্টস-এর অধ্যক্ষ গ্ল্যাডস্টোন সলোমন স্বয়ং উদ্যোক্তা হয়ে বড়লাটের কাছে দরবার করেন। এতই যখন বিঘ্ন তখন কাজটি নিশ্চয় শ্রেয়, এই বিবেচনায় শিল্পীসম্পাদক বম্বাই দিল্লী ঘুরে প্রধান প্রধান শিল্পীদের সঙ্গে দেখা করে প্রস্তাবিত প্রদর্শনীতে তাঁদের যোগদানের প্রতিশ্রুতি আদায় করতে সক্ষম হয়। অবশেষে দার্জিলিং-এর লাট-দরবারে বহু-তর্কাতর্কির পর বম্বাই-এর মানরক্ষার্থে প্রতিষ্ঠানটির নাম থেকে ইণ্ডিয়ান শব্দটি ঘুচিয়ে, ও ক্যালকাটা জুড়ে দিয়ে, নতুন নাম হল অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস, ক্যালকাটা। ১৯৩৩ সালের ২২শে ডিসেম্বর এর প্রথম প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন বড়লাট লর্ড উইলিংডন। নানা প্রদেশের রাজারাজড়াদের বদান্যতায় এর পুরস্কার তহবিলে বেশ মোটা চাঁদা জমল। বড়লাট ও বাংলার ছোটলাটও যথাক্রমে স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক উপহার দিলেন। ভারতীয়-অভারতীয় দলের প্রধান শিল্পীদের নিদর্শন আবারও জনসাধারণের কাছে খুবই সমাদর পেল। অ্যাকাডেমির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্ভাব্য সন্দেহ দূর করার জন্য লেখক শান্তিনিকেতন গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের অনেক ছবি প্রদর্শনীর জন্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়।

আপাতদৃষ্টিতে সুষ্ঠু ও স্বাচ্ছন্দ মনে হলেও অ্যাকাডেমির একটি মূল ত্রুটি বরাবরই ছিল—সংসারক্ষেত্রে লেখকের বাস্তবজ্ঞানের অভাব। গণ্যমান্য নেতৃস্থানীয় লোকদের পারস্পরিক ঈর্ষা, 'অভাবে স্বভাব নষ্ট' শিল্পীদের রেষারেষি ইত্যাদি কঠিন ও বাস্তব সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধির বা সেগুলির সমাধানের যোগ্যতা লেখকের কোনো দিনই ছিল না। এ পরিবেশে প্রতিষ্ঠানটির যাবতীয় সম্ভব ও অসম্ভব ত্রুটির জন্য তাকেই দোষী সাব্যস্ত, ও প্রকাশ্য চরিত্রহননের শিকার, হতে হয়। কোনোমতে চতুর্থ প্রদর্শনীর কাজ শেষ হলে যুগ্মসম্পাদক দুজনেই ইস্তফা দেন। বলা বাহুল্য ভারতীয়-অভারতীয় শিল্পরাজনীতির শিবফোঁড়া বরাবর রক্তঝরাই ছিল এখনও আছে। কালক্রমে নানা বিচিত্র পথপরিক্রমার পর প্রতিষ্ঠানটি এখন শ্রীমতী রাণু মুখার্জির নেতৃত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত, একথা অনেকেই জানেন। এ এফ এ-এর নিজস্ব অট্টালিকায় দেশীবিদেশী সমস্ত পন্থেরই শিল্পীদের জন্য এখন দুয়ার খোলা রয়েছে। যে অ্যাকাডেমি চল্লিশ বছর আগে কলকাতায় কোনোমতে বহু সাধনায় একটি বার্ষিক প্রদর্শনীর আয়োজন করতে পারত, এখন তারই প্রদর্শনীকক্ষে বছরে একশোরও বেশী প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ সহ সমসাময়িক শিল্পীদের আঁকা নানাধরনের ছবির স্থায়ী গ্যালারী, চিত্রশিক্ষার জন্য স্টুডিও ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির ব্যবস্থা এখানে রয়েছে। তবু স্নেহপাপাশংকে আশঙ্কা হয় পূজারীদের ফুলের ভারে বিগ্রহই না চাপা পড়ে যায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে আমাদের শিল্পশিক্ষাজগতে কিছু পরিবর্তনের কথা এখানে লিপিবদ্ধ করছি—আমাদের বিভিন্ন চিত্রভাবনার সূচনা তো সবসময়ে আর্ট স্কুলেই, তার চিরাচরিত অশান্তি গোলযোগ সহ। এর প্রাক্তন ইতিহাসের ধারাতেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিবাদের ফলে অধ্যক্ষ মুকুল দে অকালে অবসর গ্রহণ করেন (১৯৪৩)। কিছুদিন খালি থাকবার পর পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নির্বাচনক্রমে লেখককেই সে পদ পূরণ করতে হয় (১৯৪৫), যদিও আর্ট স্কুলের পরিচালকমণ্ডলী ও শিক্ষাদপ্তর তদানীন্তন সহকারী প্রধান শিক্ষক (উপাধ্যক্ষের পদ মুকুলদের সময়ে বিলুপ্ত করা হয়) অবনীন্দ্রশিষ্য রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নিয়োগের জন্য বিশেষ আগ্রহী ও সচেষ্ট ছিল। তাঁদের, ও ছাত্র মাস্টার অনেকের, কাছেই লেখক প্রায় অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হিসাবেই গণ্য হয়, খবরের কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভেও তার প্রতি ধ্বনি শোনা যায়। ঘটনাপরম্পরায় তা অবশ্যম্ভাবী পদত্যাগে (১৯৪৮) সংশ্লিষ্ট বহুব্যক্তিই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রমেনবাবুও যথাযথ অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন দুর্ভাগ্যত বিদ্যালয় পরিচালনা তাঁর কাছে মোটেই নিরুপদ্রব হয়নি—শেষ পর্যন্ত না অশান্তি ও দ্বন্দ্বদ্বেষের মধ্যে কালাতিপাত করে তিনি ভগ্নহৃদয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করেন (১৯৫৫)। অধ্যক্ষতাকালে তি উডকাট, অ্যাকোয়াটিন্ট প্রভৃতি গ্রাফিক আ এর প্রচলন করেছিলেন, ছাত্ররাও তা উৎসাহী হয়। অকালে তাঁর কর্মজীব যতি না পড়লে এই শিল্পকর্মগুলিকে তি আরও উন্নতমানে নিয়ে যেতে পারতে সন্দেহ নেই। রমেনবাবুর মৃত্যুর পর অ জন অবনীন্দ্রশিষ্য, আধুনিক পাশ্চা ভাস্কর্যে কুশলী ও দীর্ঘদিন প্যারি লণ্ডনের বাসিন্দা, চিন্তামণি কর স দলের অভিনন্দন সহ অধ্যক্ষ নিযুক্ত যদিও সে সৌভাগ্য তাঁর বেশীদিন স্থা হয়নি। যাই হোক অতিসম্প্রতি তিনি য কালেই অবসর গ্রহণ করেছেন। চি বিশেষত ভাস্কর্যে আধুনিক বিমূর্তধ শিক্ষাপ্রচলন তাঁর সময়েই ঘটেছে। শা নিকেতনের শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধেও দু-এ কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। নানা ও পথের সম্মিলনের জন্যই রবীন্দ্রনাথ বি ভারতীর প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু চিত্রক বিশ্বভারতীর কলাভবন প্রথমাবধি বি ঐতিহ্যবাদের পীঠস্থান হিসাবেই গণ্য এক সময়ে তেলরংয়ে ছবি এ

বাউল। শিল্পী : যামিনী রায় ১৯২০ খৃঃ

এখানে বিষবৎ পরিত্যাজ্য ছিল, যদিও ভাস্কর্যচর্চা পাশ্চাত্য রীতি অবলম্বন করেই প্রথম থেকে এখানে গড়ে ওঠে। ক্রমে রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল এই তিন প্রধানের মধ্যে চিত্রকলার আদর্শ ও শিক্ষারীতি নিয়ে যথেষ্ট মতান্তর দেখা দেয় যদিও তা মনান্তরে কখনো পর্যবসিত হয়নি। কালের গতিতে আজ কলাভবনেও অবনীন্দ্রধারা ক্ষীয়মাণ আধুনিকতার নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষও সেখানে চলছে। প্রতিশ্রুতিপূর্ণ তরুণ শিল্পীদের নেতৃত্বাধীন শান্তিনিকেতনের কাছে আমাদের ভবিষ্যৎ আশা যথেষ্ট।

সব মিলিয়ে আর্ট স্কুল স্থাপনের শতাধিক বৎসর পরে আজ আধুনিক পাশ্চাত্য চিত্রধারা যে চারিদিকেই প্রকট তা প্রায় যে কোনো প্রদর্শনী ঘুরে দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। সাধারণ লোকের কাছে এর নিদর্শনগুলি অনেকটাই দেশী মাটিতে বিলাতী বীজের মরসুমী ফুলের চাষের মতই ঠেকে, স্বতঃস্ফূর্ত উপভোগ ঘটায় না। শতাব্দীর গোড়াতেও এদের কাছে পরাসিয়ান মিনিয়েচার ঐতিহ্য ভারতীয় পদ্ধতিতে আঁকা ছবি রূপকথার উপকথায় কুহেলিকাধর্মীই মনে হত। ক্রমে ক্রমে চিত্রকলা আজ এমন এক ভুরীয় আনন্দের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যা দর্শকসাধারণের নাগালের অনেক বাইরে। অথচ প্রদর্শনীকক্ষে অনেকেরই মনে স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগে কেনই বা গত তিরিশ-চল্লিশ বছর ধরে উন্নতমানের প্রতিকৃতি বা নিসর্গ চিত্রের ধারা এত ক্ষীণ হয়ে আসছে, এ বিষয়ে আমার একটি বক্তব্য পেশ করছি।

সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন বিলাতে প্রকাশিত বহু শিশু বা কিশোর-পাঠ্য সচিত্র বই ও পত্রিকা আমাদের দেশে কতটা জনপ্রিয়। এগুলোর ছবি কোনো নামকরা শিল্পীর আঁকা নয়—নূনতম মান বজায় রেখে বাস্তবধর্মী শিল্পী বা শিক্ষার্থীদেরই কাজ, জনপ্রিয় হলেও এগুলো কারও চিত্রবোধে আঘাত করে না। রূঢ় শোনালেও একথা সত্য যে আমাদের মধ্যে একজন নামকরা শিল্পীও নেই যিনি সামান্য বিলাতী ইলাসট্রেটারদের মতই সাধারণ মানের বাস্তবধর্মী চিত্র রূপায়ণ করতে পারেন। আক্ষেপের কথা এই যে আমাদের শিল্পবোধ বা কারু-কুশলতা জগতে কারো চাইতে কম নয়। তবে জনসাধারণের উপভোগ্য চিত্রকর্মে এত বিতৃষ্ণা কেন? কেনই বা অসাধারণ হবার অসাধারণ দুর্বলতা প্রকাশ্যে জাহির করতে কেউই পিছপা নয়?

কার্যকারণ ছাড়া কিছুই তো ঘটে না। পুনরুক্তি করেই বলছি, শতাব্দীর গোড়া থেকে বৃটিশরাজের অনুজ্ঞায় আমরা চিত্রকলার স্বতঃস্ফূর্ত গতিপথ ভারতীয়-অভারতীয় প্রশ্নে এতই ব্যাহত করে তুলেছিলাম যে, কোনো প্রাণবন্ত শিল্পধারাই যে চিরকাল একই ছাপ বহন করতে পারে না, এই সহজ সত্যটুকুও আমরা বিস্মৃত হলাম। বাস্তবধারায় যথাযোগ্য চিত্রচর্চার নূ্যনতম মানও আমরা চিত্রকলায় বজায় রাখি নি। এতদপ্রসঙ্গে একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে এই-ভাবে বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে এবং দুনিয়ার নানা সাহিত্যচিন্তার সাক্ষাৎ পরিচয়ে, আমাদের সাহিত্যসৃষ্টি কতটা উন্নীত, নাট্য ও চলচ্চিত্রও বর্তমানে উন্নতিগামী। অন্যদিকে আমাদের সংগীত ও নৃত্য-চর্চায় বিলাতী প্রোপাগান্ডা অনুপ্রবেশ করে নি বলে তার জাত ও মান দুই-ই এখনও বজায় রয়েছে। (তা নইলে হিন্দুর বিয়েতে আজ মুসলমানেরই সানাই আর বাজত না!) ভারতীয় চারুশিল্পে যে প্রাণ-বন্ত সঙ্গীতচর্চা আমাদের একমাত্র গৌরবের বিষয়, তাও নানা প্রদেশের বিভিন্ন ঘরানার পরস্পর আদান-প্রদানের মাধ্যমেই সম্ভবপর হয়েছে। আরও ভাববার কথা আছে—সুদূর অতীতে পাশ্চাত্যভাবধারার নিঃসংকোচ গ্রহণের ফলেই গুপ্তযুগের ভাস্কর্য সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। মোগল-পাঠান স্থপতি কিম্বা পারসিক চিত্রকলার স্বচ্ছন্দ প্রভাব তো সেদিনের কথা। অনুরূপে চিত্রকলাক্ষেত্রেও মাত্র একশ বছর আগে বিনাবাধায় বিদেশী [illegible]ধারায় অনু-প্রাণিত হয়ে বাংলাদেশের শিল্পীরা কি প্রাণবন্ত কাজেরই না চিহ্ন রেখে গেছেন। (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রণদা গুপ্ত ও যামিনী রায়ের নিদর্শনচিত্র তিনটি দেখলেই তা বোঝা যায়)। বৃটিশ যাদুমন্ত্র এতটা কার্যকরী না হলে গত পঞ্চাশ বছরে এঁদের চাইতে বা শশী হেসু, জলধি মুখার্জি যামিনী গাঙ্গুলী হেমেন মজুম-দার বা লেখকের চাইতেও অনেক উন্নত-মানের ছবিই আমাদের জাতীয় সম্পদ হতে পারত। মাঝখান থেকে বাস্তবধর্মী শশী হেস ফণী বোস দেশত্যাগী আর্ট স্কুলে যামিনী গাঙ্গুলী প্রথমে উপেক্ষিত পরে অপমানিত হয়ে পদত্যাগ করলেন—কেউ উচ্চবাচ্যও করলেন না। এ অবস্থায় নেহাৎ জীবনধারণের জন্যই প্রতিশ্রুতিপূর্ণ শিল্পীরা যে শিক্ষকতার নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য বিসদৃশ প্রতিযোগিতায় শিল্পধর্ম বিসর্জন দেবে তাতে আর আশ্চর্য কি! অন্যদিকে ভাপাধানন্দ মৌলিকে পূর্ণ চক্রবর্তী প্রমথ শিল্পীদের

তো পরিচয়শেলী চিত্রকর্মই অবলম্বন করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত নগদ পয়সার চালু কারবারে সস্তা সেলসম্যানশিপ বাজার ছেয়ে ফেলেছে, যৌনধর্মী ফটো-নির্ভর কমার্শিয়াল আর্ট সৃষ্টিশীলতা পুরোপুরিই বিসর্জন দিয়েছে। 'শিল্পকর্মে বিদেশীদের কাছে আমাদের কিছুই শেখবার নেই' এই অপপ্রচারে ইউরোপীয় শিল্পের যথাযথ ইতিহাসচর্চা, কি তার বিভিন্ন ঘরানার তুলনামূলক বিচার কিম্বা বিভিন্ন আঙ্গিকের বিদগ্ধ অনুশীলন কিছুই আমরা নিষ্ঠার সংগে পালন করতে পারলাম না। 'মানে' থেকে 'পিকাসো' অবধি যুগান্তকারী শিল্পীদের বোহেমিয়ান জীবনচরিত বা ছাপা-ছবির পরিচিতিই যথেষ্ট মনে হল। কত অবলীলাক্রমেই না অধ্যক্ষ অসিত হালদার থেকে 'ইউরোপীয় চিত্রকলা' লেখক আই সি এস অশোক মিত্র পশ্চিমের চিত্রশালা ঘুরে এসে একবাক্যে রায় দিলেন 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং'।

Art is the efflorescence of civilization.

কথাটি ধরে পশ্চিমের সভ্যতা কি করে সুররিয়ালিজম-এ পুষ্পিত হল তার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া বোধহয় এখানে অসঙ্গত হবে না। প্রায় তিন হাজার বছর আগে গ্রীসে পশ্চিমী বাস্তবধারার সূত্রপাত। নানা পথপরিক্রমার পর সেই ধারা পাঁচশ বছর আগে ইতালীতে রেনেশাঁর যুগে এক পুনরুজ্জীবন লাভ করে এবং রাজারাজড়া ও ধনী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় কতগুলি বিশেষ ঘরানার দানা বাঁধে। ফলে শিল্পীদের মধ্যে একটা নিশ্চিত স্বাচ্ছন্দ্য এসে পড়ায় যথার্থ শিল্পবোধ যে উন্নতমানের কারুকর্ম ক্রমশ ক্ষুণ্ণ হতে থাকে। কোনো কোনো প্রতিভাবান শিল্পীর নিজস্ব শিল্পবোধ ও কারুকর্মে এর ব্যতিক্রম ঘটলেও সংস্কারবদ্ধ ঐতিহ্যের চাপে এঁরা কখনই রসিক-সমাজে সহজ স্বীকৃতি পান নি। চিত্রকলা ধনীগৃহের বিলাসসামগ্রী মাত্র, এ রকম একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়ায়, ছবিতে নানা ছলাকলা ও নিষ্প্রাণ অলঙ্করণেরও প্রাদুর্ভাব ঘটতে থাকে। মোড় ঘোরাবার সচেতন প্রচেষ্টা এল গত শতকের মাঝামাঝি 'বারবিজ' নামে পরিচিত মিলে, কুর্বে প্রভৃতি একদল ফরাসী চিত্রকরের কাজে— ছবির বিষয়বস্তু ও অংকনপদ্ধতির মধ্য দিয়ে জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ হবার প্রয়াসে। তাঁরাই প্রথম উন্মুক্ত প্রকৃতির পরিবেশে খেটে-খাওয়া মানুষের সহজ জীবনধারাকে ছবিতে রূপদানের চেষ্টা করলেন। অতঃপর অকস্মাৎ বন্যার মতই এই সূত্র ধরে বয়ে এল বর্তমানে ইমপ্রেশানিজম নামে বর্ণিত ছবির ধারা—বারবিজ স্কুলের সহজ সমাজচেতনার সংগে যুক্ত হল নতুন নান্দনিক চেতনা বা একটা নন্দনতাত্ত্বিক বিপ্লব। প্রাচীন অচলায়তনের দরজায় একের পর এক আঘাত পড়তে শুরু করল। প্রকৃতির প্রসারিত বিস্তারের মধ্যে একটি দৃষ্টিনন্দন ক্ষেত্র আবিষ্কার করে ও তার মধ্যে ফসল ফলিয়ে, ইমপ্রেশানিস্ট চিত্রকরেরা নতুন সতেজ চিত্ররূপ সৃষ্টি করলেন। পুরোনো কলামন্দিরের রুদ্ধদ্বার খুলে দিয়ে এদের নতুন ভাবধারা চারিদিক প্লাবিত করে ফেলল। তারপরের...... অর্ধশতাব্দীকাল চলল চিত্রে নব্য ও ঐতিহ্যবাদীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ যার আভাষ গোড়াতেই দিয়েছি। তখনকার যেসব তরুণ শিল্পী পর পর অনেক পুরোনো পথঘাটই বিধ্বস্ত করে দিলেন তাঁদের মধ্যে মানে সেজান ভ্যান গথ গগ্যাঁর নামই সর্বাগ্রগণ্য! এঁরাই পরবর্তী যুগের সুররিয়ালিজম এ পূর্বসূরী এবং এঁদেরই উত্তরসাধক পিকাসো নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্ফুলিঙ্গ চারদিকে ক্রমাগত ছড়িয়ে দেন। এই স্ফুলিঙ্গের আলোয় পশ্চিমী সভ্যতার এক নগ্নরূপ প্রকাশ পায়। দেহমনে বিকারগ্রস্ত ভীতসন্ত্রস্ত পশ্চিমী সভ্যতা বীভৎস ক্ষুৎপিপাসায় কাতর—সুররিয়ালিস্টদের ছবি যেন তারই প্রতীক।

আমাদের ধ্যানমগ্ন সুপ্রাচীন বটবৃক্ষের মূলে শিকড় ও ডালপালা সদাচঞ্চল ইউরোপ থেকে স্বতন্ত্র এই সামান্য তথ্যটি উপস্থাপিত করতে উপরের ইতিহাসিক রেখাচিত্র আঁকলাম। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতা যথাক্রমে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শাশ্বত বিশেষ লক্ষণ বলে ধরে নিয়ে অনর্থক আমাদের চিত্রকলা বিভ্রান্ত হয়েছে। অথচ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনুভূতি চারুকলা সৃষ্টিকর্মে মানবাত্মার দুটি বহিঃপ্রকাশ মাত্র—কোনোটাই শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হতে পারে না। স্বতন্ত্র বলেই এরা বিরোধী নয়, বরং বহুস্থলে পরস্পরের পরিপূরক। অতএব চোখে চোখে দেখা ও মনে মনে দেখার যোগ্যতা বা প্রতিভা কোনো ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ থাকতে পারে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় ইংরাজি 'পার্সপেকটিভ' কথাটির চাইতে আমাদের ভাষায় একাগ্র প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ধ্যান ও দিব্যদৃষ্টি কথাগুলি কত স্পষ্ট ও অর্থবহ। যাই হোক, ইউরোপে গত

পাঁচশ বছরের সদাচঞ্চল আলোড়নের মত আমাদের ঐতিহাসিক চিত্রপটে কখনই যুগান্তকারী বিবর্তন ঘটে নি 'পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থাও পরিক্রমা করতে হয় নি। এ শতকের গোড়ায় শুধু কতগুলি অন্যান্তর ভাবাবেগে চিত্রকলাক্ষেত্রে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সভ্যতার আদর্শ নিয়ে খুঁথা বাকবিতণ্ডায় উদভ্রান্ত হলাম, আর তারপর থেকে এ পর্যন্ত পশ্চিমী পুঁথির বর্ণমালা উচ্চস্বরে পাঠ করে পাঠশালা মুখরিত করে তুলেছি। নতুন পথের সন্ধানে বেরিয়ে পড়া আজ নিতান্ত প্রয়োজন। নির্ভুল বিচার বা উপায় নির্ধারণের কোনো দাবি করছি না কিন্তু চিত্রকলাজগতের নানা ভূমিকা গ্রহণ ও অভিজ্ঞতার ফলে সহজবোধ্য প্রাথমিক কয়েকটি তথ্যের মধ্য দিয়েই একটি বক্তব্য তুলে ধরে লেখাটি শেষ করতে চাই।

পরিদৃশ্যমান প্রকৃতির রূপভেদ বহুধা-বিভক্ত : (ক) রামধনুর সাতটি রঙ অগণিত বর্ণান্তরে দিকে দিকে উদ্ভাসিত। (খ) ধরা-ছোঁয়ার স্পর্শযোগ্য ছোট-বড় বস্তু অসংখ্যরূপে চারদিকে সমাবেশিত। (গ) ভিন্ন ভিন্ন রূপভেদে আলোকপাত ও ছায়ার আবরণে দিন-রাত এব বিরাম-বিহীন লুকোচুরি খেলা চলছে। (ঘ) সমস্ত রূপভেদই আবার দ্রষ্টা ও দৃশ্যের দূরত্বের ব্যবধানে ও দৃষ্টিবিন্দুর পরিবর্তনে রূপান্তরিত হয়ে যায়। (ঙ) সব শেষে রূপমাত্রই প্রতিমুহূর্তে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে বিড়ম্বিত হয়ে চলেছে। নিতান্তই নৈসর্গিক এই তথ্যগুলি বাস্তবপন্থী চিত্রকরের বর্ণ-মালা। এই বর্ণমালা আয়ত্ত করে চিরচঞ্চলা প্রকৃতি দেবীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে পরোক্ষঅভিজ্ঞতানিরপেক্ষ প্রত্যক্ষ একটি ক্ষণিকমূর্তির চিত্রকল্প-রূপায়ণই তার সাধনাপথের প্রথম সোপান: যুগ যুগ ধরে পশ্চিমের শিল্পী এই সাধনারই স্বাক্ষর রেখে ধন্য হয়ে গেছেন। এখানে প্রথমেই এক প্রশ্ন ওঠে যে সাত-রঙ বিহঙ্গ নয়নমন স্পন্দিত করে মুক্ত-আকাশে দেখা দেয়, মিলায় নিমেষে, তাকে কোন উপায়ে কোন পিঞ্জরে ধরে রাখা যায়? উপায় নৈসর্গিক নিয়মেই নিহিত। একটি সীমিত বাতায়নপথে প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতেই দেখা যায় যে স্মৃতিসঞ্চিত সংস্কারবদ্ধ সমস্ত পরোক্ষ রূপভেদই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে একটিই দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপে সংহত। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য কথাটির তাৎপর্য বাস্তবপন্থী চিত্রকর তার পথপরিক্রমায় এই ভাবেই বুঝতে ও বোঝাতে পারে। রূপ-রহস্যে চিত্রসত্তার সন্ধানে এরাই আলো অন্ধকার রং-বেরং ছোটবড়র রূপভেদে ভেদমুক্ত চিত্রসত্তা দেখে রূপমুগ্ধ এবং বর্ণকাভঙ্গের মাধ্যমে চিত্রফলকের জড়ত্ব (রং তুলি কাগজ ইত্যাদি) মুক্ত করে চিত্রের চিন্ময়রূপের প্রত্যক্ষ প্রত্যয় ঘটাতে পারে। কর্মযোগের এই সাধনা সহজ নয়। তবু যে রূপমুগ্ধ, সে তো অধরাকে ধরতে গিয়ে চির-অতৃপ্তই থেকে যাবে। একটি উদাহরণে 'সীমিত বাতায়ণ' 'সংস্কারবদ্ধ পরোক্ষ-রূপ' কথাগুলির অর্থ হয়ত স্পষ্ট হবে।

একটি ছোট জানালার মধ্য দিয়ে দূরের পাহাড়, নীলাকাশে সাদা মেঘের খেলা, শস্য-শ্যামলা ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা নদী, দূরে বৃক্ষশ্রেণী কৃষকের কুটির, অট্টালিকা মন্দির মাঝে মাঝে দু-চারটি তাল বা নারিকেল গাছ সবারই ছোটবড় আয়-তনের পরোক্ষরূপ (কনসেপচুয়াল এক্স-পিরিয়েন্স) রূপান্তরিত হয়ে একই সঙ্গে প্রত্যক্ষ দেখা যায় (পারসেপচুয়াল এক্স-পিরিয়েন্স)। অথচ, একই সময়ে চোখে চোখে দেখা ও মনে মনে দেখায় আমরা এতই অভ্যস্ত যে ধারণাই করতে পারি না কত বহুধাবিভক্ত রূপভেদ একই সঙ্গে নির্বি-রোধে প্রতিভাত হয়। পাহাড়-নদী গাছপালা সবই জানালার থেকে ছোট প্রতীয়মান না হলে দেখি কি করে? মনে মনে এদের আপেক্ষিক আয়তনের ধারণা ঠিকই থেকে যায়, অথচ ভিসুয়াল ইমেজ-এর প্রত্যক্ষ প্রমাণে মনে মনে বদ্ধমূল ধারণার বিসর্জন দিতে হয়। সবচাইতে উঁচু যে পাহাড় তাও নেবে এসে ধরণীতল স্পর্শ করে, আর ধরণীতলও ক্রমে উঁচু হয়ে দূরদিগন্তে চোখের সমান্তরাল রেখায়, আকাশ ধরে ফেলে। এসব তথ্য সম্বন্ধে বাস্তবধারার চিত্রকরকে রূপায়ণকর্মে বিশেষ সচেতন থাকতে হয়, যদিও আমরা হয়ত সবসময়ে এগুলো সম্বন্ধে যথাযথ অবহিত নই! এগুলিই তার পথনির্দেশক, যা তাকে চিত্র-পটে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের লক্ষ্য থেকে পথভ্রষ্ট হতে দেয় না। অন্যদিকে পরোক্ষ বা ধ্যানদৃষ্টির অনুপ্রেরণায় যখন চিত্রপট রচিত হয় তখনও রং রেখা আয়তনের যাবতীয় রূপভেদ যথাযথ বিন্যাসে, বহুর মধ্যে একীভূত প্রকাশে সার্থক চিত্রকল্প রসোত্তীর্ণ হতে পারে। পথের তো অন্ত নেই —যে পথই নেওয়া হোক না কেন, একই চিত্রপটে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর চিহ্ন চিত্র-কল্পের স্থিররূপ বিঘ্নিত করে বলেই চিত্রকরমাত্রেই তা বর্জন করে। পথ একবার বাছা হলে আর তা থেকে ভ্রষ্ট হওয়া কিম্বা দৃষ্টিবিন্দুর পরিবর্তন চলে না। তাই সবাই জানেন যে সার্থকরচনা শেষপর্যন্ত স্থিতধী কারুকুশলতার উৎকর্ষের উপরই নির্ভর করে—সদুদ্দেশ্য বা গুড ইনটেন-শনই যথেষ্ট নয়। কারুকর্মের তারতম্য বিচারের প্রশ্নটা চিরকালের, সেটা থাকবেই। এখানে শুধু আমার একটা বিশ্বাস ব্যক্ত করতে চাই: কিছুদিন স্বচ্ছদৃষ্টিতে প্রকৃতির প্রত্যক্ষপরিক্রমায় চিত্রসত্তার অনু-সন্ধান করলে নতুন দিগন্ত খুলেও যেতে পারে।

চিত্রকলায় বাস্তবতার যে ধারা একশ বছর আগে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল, বারবার ব্যাহত হলেও তা একেবারে শুকিয়ে যায়নি। বিপুল স্রোতসম্ভবা সে ধারা নানা রাজ-নৈতিক খননে পঙ্কিল ও বিপথগামী হয়েছে, আজ কতগুলি নতুন ধরনের সংস্কারে আবদ্ধ হয়ে তা বদ্ধজল শয়ে রুদ্ধ হয়ে যাবার উপক্রম। এই ধারণা যুক্তি-সংগত মনে করলে আমাদের ভবিষ্যতভরসা চিত্রকরেরা বাস্তবধারার উৎসমুখেই তার গতি প্রাণবাহী করে তুলতে পারবেন। স্থির দৃষ্টিবিন্দু-নির্ভর বলেই বাস্তববাদী ব্যক্তি-গতভাবে বা জাতিগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন চিত্রকল্প রূপায়ণ করে চলে, বিভিন্ন পদ্ধতিও অনুসরণ করতে দ্বিধা করে না। আমি পাশ্চাত্য ভাবধারার বিশেষ কোনো প্রকাশভঙ্গীর আদর্শ প্রচার করছি বলে মনে হতে পারে বলে এ কৈফিয়ৎ দিতে হল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্য শিল্পীরা তাঁদের পথপরিক্রমায় যে স্বাক্ষর রেখে গেছেন তা ইতিহাসে চিরবিস্ময়ের বস্তু হয়েই বেঁচে থাকবে। গুরুবাদে বিশ্বাসী নয় বলে কোনো ঐতিহ্যই তাদের বেশীদিন ধরে রাখতে পারেনি। সুর-রিয়ালিজম-এর সূর্য শতাব্দীর সঙ্গেই অস্তমিত হলে আমেরিকার অধুনাতম যান্ত্রিক চিত্রকলায় ও কারুকর্মে তার লক্ষণ স্পষ্ট। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস পাশ্চাত্য কোনো শিল্পকর্ম নয়, পাশ্চাত্য শিল্পী-মনের বিশেষত্বই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। প্রত্যক্ষ দৃষ্টিবিন্দু থেকে উৎসারিত ভবপ্রবাহ যেমন সংস্কারশৃঙ্খল মোচন করতে পারে, তেমন নিজেকে উপলশৃঙ্খলে সংহত বেগবতী স্রোতস্বিনীর রূপও দান করতে পারে। সাবধানী পথিকের মত কোনো মতে বেঁচে থাকতে অস্বীকার করে, কবি-গুরুর ভাষায়,

> Let us take heart and make daring experiments defying unhol. prohibitions preached by pre-. dent little critics'

এ বাণী তরুণ শিল্পীদের অস্ত্রস্বরূপ হোক। তাঁদের একটি অনুরোধ করে আমি বিদায় নিতে চাই। সমস্ত মতামত অগ্রাহ্য করে শুধু চোখে চোখ রেখে মায়ের যে মুখখানি একদিন ভাল লেগেছিল, মন থেকে 'মা' বলে ডাকবার মত তারই একখানি প্রতি-চ্ছবি যেন তাঁরা একদিন রূপায়ণ করেন। মা আশীর্বাদ করবেন, আমাদেরও পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।

প্রভাত দেবসরকার

রাজার রাজা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আজ বাবা খর-বারা করছেন, এতক্ষণ কবার এসে ট্রাম লাইনে ঘুরে গেছেন মাকে নানাভাবে জেরা করছেন, ঝি তাঁকে কিছু বলে গিয়েছিল কিনা কোনো বন্ধু-টন্ধুর বাড়ী যাবে, না ছুটির পর সোজা বাড়ী আসবে?

মা কিছু বলতে পারবেন না, বাবা রেগে রেগে অস্থির হয়ে উঠবেন তত। তারপর গুম হয়ে বসে থাকবেন যতক্ষণ না অনুপস্থিত ছেলেটি গৃহ-প্রত্যাগত হচ্ছে। তারপর চলবে বকুনীর নামে গজগজানি, বাড়ী-শুদ্ধ সবাই ভীত-বিরক্ত।

ঠিক সময়ে বাড়ী না ফেরা ছেলেমেয়ের পক্ষে যেন অমার্জনীয় অপরাধ। বিকাশের এক কাকাও ঐ রকম ছিলেন, তাঁর আশ্রিত আত্মীয়স্বজন সে যে কেউ হোক, একটা নির্দিষ্ট সময়ে বাড়ী না ফিরলেই বকা-ঝকা মহামারি কাণ্ড হয়ে যেত। ছোট বড় নাবালক, সাবালক কোন বিচার বিবেচনাই কাকা করতেন না। আর সুর-জ্ঞানের মত কি কান ছিল সে-কাকার—যে কেউ যখন কড়া নাড়ুক, বলে দিতে পারতেন, অমুক এসেছে, তমুক এসেছে কি বাইরের কেউ কড়া নাড়ছে।

সেদিনের সেই মিটিং-এর পর আর বিকাশ এদিকে আসে নি। ঝড়ের পর শান্ত সমুদ্রের মত মাঠটা এখন স্তব্ধ স্থির। বেশ বড় বড় ঘাস গজিয়ে উঠেছে, ধুলো মরে গেছে।

সেই যখন হেঁটেই বাড়ী ফিরতে হবে তখন আর মাঠের মধ্যে বসে থেকে লাভ কি। আর এই প্রথম নয় বিকাশের চাকরি-জীবনে। হিসেব করলে কত দিনের কথা মনে পড়ে, এই হরতাল, এই মিটিং এই পুলিশের গুলি, এই বোমা- আগুন।

আপিসের বয়স্ক প্রৌঢ় সহকর্মীরা রোজই বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন, এর চেয়ে ইংরেজরাই ভাল ছিল, অমন স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাঁদের কখনো চোরের মত হেঁটে বা দৌড়ে কি পালিয়ে আপিস করতে হয়নি। আপিস আদালত ঠিক চলেছে।

বংকিমবাবু খুবই ইংরেজ-ভক্ত উদ্দেশ্যে হাত তুলে প্রণাম জানিয়ে বলেন, আরে বাবা, কিসে আর কিসে? ওরা হলো রাজার জাত দেবতা। তারা জানতো কি ভাবে শাসন করতে হয়—টাঁ-ফোঁ-ও করবার উপায় ছিল না। আর এখন দেখ ছুঁচের কেত্তন আরম্ভ হয়েছে কে কাকে মানছে কে কার কথা শুনেছে। সবাই রাজা। থাকতো ইংরেজ—

মাঝে মাঝে বাবাও যেন ঐ কথা বলেন। দেশের লোক স্বাধীন হবার যোগ্যতা অর্জন করেনি। কেবল কতকগুলো সুবিধাবাদীর সুবিধার জন্যে দেশে স্বাধীনতা এসেছে। ইংরেজরা ভুল করে চলে গেছে, তাদের ভয় অমূলক—

বংকিমবাবু কিন্তু বলেন, ভয় কি বলবো, তাঁরা দয়া করে স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন মজা দেখবে বলে। আবার তাঁদের ডেকে আনতে হবে দেখো না।

আপিসে এই নিয়ে বিকাশরা ভদ্রলোককে খুব ক্ষেপায়। খুব ঝগড়া করে। বংকিমবাবুও তত চার্চিলের বক্তৃতার অংশ-বিশেষ মুখস্থ বলেন। চার্চিল লোকটা ঠিক বুঝতো। আই অ্যাম নট টু প্রিসাইড ওভার দি লিকুইডেশন অফ দি ব্রিটিশ এম্পায়ার। মহাত্মা গান্ধীকে বলতো নেকেড ফকির।

অনেকক্ষণ থেকে বিকাশ লক্ষ্য করছিল, মাঠের মরা আলোর মধ্যে মূর্তিটা যেন ছায়ার মত নড়ছিল, উঠছে বসছে কি চলছে ঠিক যেন ঠাহর করতে পারছিল না। কিন্তু চোখে গোধূলির আলো-আঁধারে বড় আকর্ষণীয় মনে হচ্ছিল, তার যুবক মনে উৎসুক্যের—

হঠাৎ যেন কেমন করে মুখোমুখি হয়ে গেল, বিকাশ অপ্রস্তুত হয়ে পাশ কাটাবার চেষ্টা করলে। দু পা এগোতে, ছায়ামূর্তি কায়াবিশিষ্ট নারী মূর্তি ধরে বললে, একটু শুনবেন?

যেন গুলি-গোলা বোমা আগুন পুলিশ বেশ ভয় পেয়েছিল বিকাশ মেয়েটিকে সহসা সমীপবর্তিনী হতে দেখে: ভূতে পাওয়ার মত—

তেমনি ভয়ে ভয়ে আড়ষ্টভাবে বিকাশ বললে, আমাকে বলছেন?

মেয়েটি যেন হাসলে, বেশ কথা বলছে ছেলেটি, এই নির্জন মাঠে এখন সে ছাড়া সামনে কাছে আর কে আছে যাকে সম্বোধন করবে?

বেশ সপ্রতিভ কণ্ঠে মেয়েটি জিজ্ঞেস করলে আপনি কোন দিকে যাবেন?

একটু ইতস্তত করে বিকাশ বললে, কেন?

হাত বাড়িয়ে সামনেটা নির্দেশ করে মেয়েটি বললে, তা হলে আপনার সঙ্গে যেতুম। যা গোলমাল চারদিকে—

গোলমালের জন্যে সেও মাঠের এদিকে এসে পড়েছে, নিরাপদ ভেবে হাঁটাপথে বাড়ী ফেরার মনস্থ করেছে। বিকাশ ভাবলে, মেয়েটিও কি তার মত ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে মাঠ ভেঙে পালিয়ে এসে দিশাহারা হয়ে পড়েছে?

বিকাশ বললে, আমি সাউথে যাব।

সপ্রতিভ মেয়েটি বললে, আমিও। ভবানীপুর, এলগিন রোড—

কেন জানি না, এরপর আসুন কি চলুন কি সঙ্গে আসুন কোন কথাই বিকাশ বলতে পারলে না। মাঠ থেকে নিঃশব্দে হেঁটে এসে পিচের রাস্তায় উঠে পিছু ফিরে চাইলে। বিনা আশ্বাস বা অভ্যর্থনায় মেয়েটি ঠিকই তার পিছু পিছু চলে এসেছে।

নিঃশব্দে রাস্তা চলতে চলতে বিকাশের মনে হলো, ঠিক আজকালকার মত আধুনিক সাজে সজ্জিত নয় মেয়েটি, সপ্রতিভ হলেও কোথায় যেন একটা কুণ্ঠিত জড়তা আছে, পায়ের শব্দ বড় মৃদু।

তারপর রাজপথে আলোর মধ্যে এসে বিকাশ থমকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে মেয়েটিকে স্পষ্ট করে দেখলে—বেশবাস যাই হোক, মুখাবয়বের কমনীয়তা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, মনে হয় যেন কতবার দেখা মেয়েটিকে, ঠিক পথে ঘাটে নয় কোথায় যেন সে দেখেছে এই মুহূর্তে মনে করতে পারছে না।

হঠাৎ অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চ সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে বিকাশ গদগদ স্বরে বললে, এবার কোন দিকে যাবেন? একলা যেতে পারবেন তো?

অন্ধকারে নির্জন মাঠের মধ্যে যে মেয়েকে ছায়ামূর্তি মনে হয়েছিল আলোকিত মুখর রাজপথের উপর তাকে যেন বিষাদ-

মরী মনে হয়। বিকাশ খানিক ইতস্তত করে এগিয়ে গেল।

ট্রাম এখনো চলেনি, বাসও রাস্তায় দেখা যাচ্ছে না। রাস্তার ওপারে পথচারীর ভিড় আছে, বেশ বোঝা যায় আতঙ্ক এখনো কাটে নি। ট্রাম লাইনের এদিকের ফুটপাথটা আলোকিত নয়, আশপাশের আলোয় সেটুকু আলোকিত, তার ওপর অনেকগুলো বড় গাছ রাস্তা জুড়ে—হলুদ হলুদ ফুলে ফুটপাত ছেয়ে আছে। পুলিশের তাড়া খেয়ে কতদিন হেঁটে বাড়ী ফিরতে ফিরতে এই ফুটের ওপর থমকে দাঁড়িয়ে বিকাশ ভেবেছে এত বড় বড় গাছে কি ফুল হয়—নাম কি? মুঠো ভর্তি ফুল কুড়িয়ে রাস্তার মোড়ে এসে মনে মনে অনেক গবেষণা করেছে, শিরীষ বকুল না আর কিছু? তেমন উজ্জ্বলও নয় যেন ফুলগুলো, বাসি হলুদ বাটার মত কেমন ম্লান। যা হাত বাড়িয়ে তোলা যায় না, তা যেন ফুলই নয়। বিকাশ মনে মনে বললে, বড় গাছ লাল ফুল ছোট পাতা—পথ ছাড় বাড়ী যাও হাত শূন্য।

এলগিন রোডের মোড়ে এসে বিকাশ দাঁড়িয়ে পড়ে পিছন ফিরে তাকাল কই, সঙ্গিনী মেয়েটি কোথায় গেল?

বিকাশ সন্ত্রস্ত হয়ে উদ্বিগ্ন দৃষ্টি মেলে এদিক ওদিক সন্ধান করলে, না কোথাও নেই। আশ্চর্য, হঠাৎ কোথায় মিলিয়ে গেল মেয়েটি? অবাক কাণ্ড?

কেন জানি না বিকাশ মনে মনে ভারি ভয় পেল। যেন তারই দোষ, সে অসতর্ক হয়েছে বলে মেয়েটি হারিয়ে গেল, তার অন্যমনস্ক অসাবধানতায়—

না, রাগ করে বিকাশ ভাবলে, বড় স্বার্থপর মেয়ে তো, বড় অভদ্র মহিলা—এতখানি ভয়ের পথ অতিক্রম করে না বলে সরে গেল আর দরকার কি, নিরাপদ স্থানে পৌঁছে গেছে এসকর্ট-এর মুখাপেক্ষিতাই বা কি?

নিজেকে কেমন যেন প্রতারিত, নিঃস্ব মনে হল বিকাশের। অপমানিতও—ছিঃ ছিঃ।

বৃথাই মনের মধ্যে ক্ষোভ বোধ করে, হয়তো ক্ষীণ প্রত্যাশাও, বিকাশ গুটি গুটি

পা ফেলে সামনে এগিয়ে চলল। সামনে পানের দোকানে পথচারির ভিড় জমেছে, রেডিও-তে কি যেন বলছে কলকাতার অবস্থা সম্বন্ধে। বিকাশের মনে হল, পুকুরের জীয়ানো মাছগুলোকে একদিকে তাড়া খেয়ে আর একদিকে এনে জড় করা হয়েছে, অবশ্যে ধরে নিরাপদ জায়গাটা।

একটা পুলিশের গাড়ি গোঁ গোঁ করে এগিয়ে গেল, পানের দোকানের সামনে ভিড়টা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল—রেডিওর শব্দটা স্পষ্ট শোনা গেল।...'উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ চার রাউণ্ড কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে...অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় পুলিশ দু রাউণ্ড গুলি ছোঁড়ে, কেউ হতাহত হয়নি...' ...

পুলিশের গাড়িটা বোধ হয় দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে, পানের দোকানের ভিড়টা নানা মন্তব্য করতে লাগল, 'মিছে কথা। শুয়োরকা বাচ্ছা।...কেউ মরেনি? চারজন মরেছে। শিয়ালদা থেকে হাঁটতে হাঁটতে আসছি...নিজের চোখে দেখেছি। শালা রেডিওর খবর সব মিথ্যে। কম করে চোদ্দ রাউণ্ড গুলি ছুঁড়েছে।'

কিন্তু কারণটা?

আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ। ল এ্যাণ্ড অর্ডার রক্ষা করা সরকারের প্রধান কর্তব্য—'পিটিয়ে সব সোজা করতে হবে।' কথাটা এক সহকর্মীর বেশ বয়স হয়েছে ভদ্রলোকের—বলেছিলেন, তাঁর হাতে ভার দিলে দু দিনে নাকি সব ঠাণ্ডা করে দিতে পারেন। মারের চোটে সব— .

বোধ হয় ব্যাপারটা অত সহজ নয়। মার কম হয়নি, গুলিগোলাও কম চলেনি—পুলিশ হামলা বলতে যা বোঝায় তারও ব্যতিক্রম হয়নি। তবু দিন দিন অবস্থা যেন কেমন হয়ে আসছে, মনে হয় ভয়ঙ্কর কিছু একটা হতে আর দেরী নেই। সব যেন কেমন অসহ্য আর উত্তাল হয়ে উঠছে। পুলিশ দেখলেই লোক ক্ষেপে যাচ্ছে, হাতের কাছে যা পাচ্ছে তাই দিয়ে পুলিশ ক্ষেপাচ্ছে। কবে যে এর শেষ হবে কে জানে—

অবনীবাবু রাস্তার মোড়ে পায়চারি করছিলেন। দুর্ভাবনা তাঁর ছেলেরা এখনো বাড়ী ফিরছে না কেন। উত্তর কলকাতায় গোলমালের খবর অনেক আগেই এসে গেছে, সত্যি মিথ্যের তো পল্লবিত হয়ে ঘরে-না-ফেরা আত্মজনের জন্যে উৎকণ্ঠা আর বিভীষিকায় পরিণত হয়েছে। মনের মধ্যে নানা দুর্লক্ষণ উঁকি দিচ্ছে।

বিকাশ খুব সাবধানী, হুঁশিয়ার ছেলে হলেও অবনীবাবুর মনে হচ্ছে হাঙ্গামার মধ্যে জড়িয়ে পড়া বিচিত্র অসম্ভব নয়। যে দিনকাল—শান্ত নিরীহ লোকরাই মারা পড়ে।

অবনীবাবু ইতিমধ্যে অন্তত পঞ্চাশ জনকে ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছেন, শুনুন, শুনুন ওদিকে কি হচ্ছে মশাই? কিছু শুনেছেন? গুলি চলেছে নাকি?

কেউ হয়তো দাঁড়িয়েছে, কেউ হয়তো না দাঁড়িয়েই পিছন না ফিরে জবাব দিয়েছে গোলমাল খুব। শেয়ালদা বেলেঘাটা শ্যামপুকুর অঞ্চলে অনেক জায়গায় গোলমাল হয়েছে, গুলি গ্যাস কিছু বাকি নেই।

কাউকে হয়তো পাকড়াও করে অবনীবাবু খানিক থামিয়েছেন। চুপি চুপি জিজ্ঞেস করেছেন, আসল ঘটনাটা কি? হঠাৎ গোলমাল কেন? কি হল?

ভদ্রলোক বোধ হয় নিরাপদ স্থানে পৌঁছে গেছেন কি নিজের ডেরায় এসে গেছেন, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দেবার মত সময় তাঁর হাতে আছে হয়তো। তিনি যা বলেন তাতে অবনীবাবু আরো আতঙ্কিত উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন ছেলেদের জন্যে। মনে অদ্ভুত কল্পনা বিশেষ স্থান অধিকার করে—অবনীবাবু অস্থির হয়ে রাস্তার এক মোড় থেকে আর এক মোড় ঘোরাঘুরি করেন। কেবলি মনে হয় ঐ বুঝি দূরে বিকাশকে দেখা যাচ্ছে, ঐ ভীত ক্লান্ত বিপর্যস্ত হয়ে যেন ফিরছে ছেলেটা। কিন্তু না, বিকাশ নয়, অপর কেউ। বড় যেন হতাশ বিহ্বল মুহ্যমান হয়ে পড়েন অবনীবাবু, রাস্তার ওপর বসে পড়বেন কিনা কে জানে। নিজেকে বুঝিয়ে পারেন না—ছেলে বড় হয়েছে চাকরি করছে, বুদ্ধি-বিবেচনা যথেষ্ট আছে বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করার, ছেলে মানুষ নয়—মিছিমিছি ভাবনার কোন মানে হয় না। তবু ভাবনা হয়, বিকাশের ভাল মন্দ নিয়ে বড় বিহ্বল হয়ে পড়েন কি করবেন না করবেন ভাবতে যেন আর পারেন না অবনীবাবু—মনে হয় এখনই হৃদয়বিদারক কিছু একটা দেখবেন কি শুনবেন।

রেডিওতে সংবাদ বলা শেষ হলো যথারীতি রবীন্দ্রসংগীত শুরু হল, অবনীবাবুদের পাড়াটা নিস্তব্ধ হয়ে এল। যেন রোজকার মত শান্ত নিরুদ্বেগ নিরুপদ্রব জীবন-যাত্রা।

রাস্তা থেকে অবনীবাবু বাড়ীতে এলেন। বিকাশ এখনো ফেরেনি। সেই কোন সকালে বেরিয়েছে চাকরি করতে, আটটা বেজে গেল এখনো এল না। অবনীবাবুও যে চাকরি করেন, তিনি কখন ফিরেছেন—ট্রাম বাস নেই বটে, হেঁটে আসতেই বা কতক্ষণ লাগে, এই তো গড়ের মাঠটা পেরুলেই—কত দূর আর। তিনি আসতে পারলেন বিকাশ আসতে পারল না?

না নিশ্চয়ই কোন গোলমাল হয়েছে, কি হাঙ্গামার মধ্যে পড়েছে! আজকালকে ছেলে-ছোকরাদের কোন বিশ্বাস নেই, যেখানে গোলমাল সেখানেই আছে, সব ব্যাপারে মাতব্বরি। ছেলেদের অবনীবাবু কত বুঝিয়েছেন কি দরকার বাবা তোমাদের হাঙ্গামার মধ্যে গিয়ে—যা হচ্ছে হোক না, তুমি আমি কি করবো আর বোকার মত জড়িয়ে পড়লে তোমাকে নিয়েই টানাটানি। দেখছো না যারা কলকাঠি নাড়ছে তারা কজন মরছে? হ্যাঁ, ওসবের মধ্যে থাকতে যদি চাও তো থাকার মতো থাকো, তা নয় শুধু শুধু—

বিকাশ অবশ্য তেমন কাজ আজ পর্যন্ত কিছু করেনি, কোন গোলমাল বা হাঙ্গামার মধ্যে যায় নি। বয়সের তুলনায় যেন অনেক বুঝদার। এই তো সেদিন পাশ করলে, চাকরিটা তো নিজে থেকেই জোগাড় করলে। অবনীবাবু ছেলের জন্যে অনেক ধরাধরি করেছেন, কিন্তু কিছু হয়নি। সেদিক থেকে ছেলের নিশ্চয়ই বাহাদুরী আছে—কোন দিনও তাঁর ছেলে কারো মুখাপেক্ষী নয়, ঐ বাপের কাছে মাসে মাসে মাইনে দিয়ে যা পড়াশোনা করেছে তাছাড়া আর কোন ব্যাপারে ব্যাপক ব্যতিক্রম করে নি। অনেক সময় অবনীবাবু ছেলেকে যেন বুঝতে পারেন নি, কেমন যেন পরপর মনে হয়েছে, ঠিক আর পাঁচটা ছেলের মত নয় যেন বিকাশ ছেলেবেলা থেকেই। একবার কি কারণে যেন অবনীবাবু বিকাশকে খুব মেরেছিলেন, লঘু পাপে গুরু দণ্ডের মত। সেদিন নিজেকে বরদাস্ত করতে পারেন নি অবনী-

বাবা ছেলেটাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেয়েছিল মুখ বুজে ভাগ্যিস বিকাশের মা এসে পড়েছিলেন না হলে একটা রক্তারক্তি কান্ড হয়ে যেত। অন্য ছেলে হলে হয়তো একটা বিপরীত কান্ডই করে বসতো, হয় বাড়ি ছেড়ে চলে যেত, নয় বাপকেই সমুচিত শিক্ষা দিত, কি ঝোঁকের মাথায় আর কিছু করে বসতো।

অবনীবাবু বুঝেছিলেন, শাসনটা বড় বেশি হয়ে গেছে, বিকাশের মার কথাই তিনি মেনেছিলেন, মানুষ কুকুর-বেড়ালকে অমন করে মারে না—অত বড় ছেলেকে তুমি অমন করে মারলে? ছিঃ।

পরে অবনীবাবুও মনে মনে বুঝেছিলেন ছেলেকে, তারপর কি ভাবে নিজের ত্রুটিটা জানাবেন, কি অপরাধ স্বীকার করবেন, ভেবে পান নি। খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, বিকাশ যদি কিছু করে বসে। বলা কি যায় আজকালকার ছেলে—

না বিকাশ কিছু করেনি। দোষ থাক বা না থাক গুরুজনদের শাসন মেনে নিয়েছিল। অবনীবাবু কদিন খুব ভয়ে ভয়ে সংকোচ এবং কুণ্ঠাভরে কাটিয়েছিলেন। ছেলের সংগে কেমন যেন একটু সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল। ঠিক অপত্য—

তারপর বিকাশ বাড়ী পৌঁছতে অবনীবাবু কোন কথা জিজ্ঞেস করলেন না। কেবল নিজের মনের অস্বস্তিকর অবস্থাটা মহূর্তে অপসৃত হল, নিজেকে খুব হাল্কা মনে হল। বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে তারপর শোবার ঘরে বসে নিজের মনেই বলতে লাগলেন, দিন দিন যা হচ্ছে, আর ঘরের বাইরে বেরিয়ে কাজকর্ম করতে হবে না মানুষকে। রোজ একটা না একটা হাঙ্গামা লেগেই আছে। কি দরকার ছিল বাবা যুক্তফ্রন্টকে বাতিল করে বেশ ছিল।

অবনীবাবু শুনতে পেলেন, বিকাশ মাকে বোঝাচ্ছে কেন তার বাড়ী ফিরতে এত দেরী হলো, কত কাণ্ড করে তবে এল। এসপ্ল্যানেডের ট্রাম-গুমটিতে আগুন দিয়েছে, পুলিশ গুলি চালাচ্ছে হেঁটে আসাও মুশকিল! কোথায় কখন কি গোলমাল হয় বলা যায় না।

এ-ঘর থেকে অবনীবাবু উঠে এলেন, মা-ছেলের সামনে দাঁড়ালেন, ওরা কথা বন্ধ করে দিল অবনীবাবু মুখে হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মনে মনে কেমন যেন কৌতুক বোধ করলেন।

বিকাশ বাড়ী ফেরার কণ্টকর অভিজ্ঞতার কথা বললেও মাঠ থেকে একটি যুবতী মেয়ে যে তার সংগ নিয়েছিল সে-কথা কিছু বললে না। কেবল বললে যে-সব মেয়েরা চাকরি করতে যায় তারাও আজ খুব ভুগেছে। ট্রাম-বাস কি করে যে বাড়ী ফিরছে সব।

মা বললেন, ওসব শখের চাকরি, এবার বুঝুক সব! মান করে খুব কত্তামশাই হচ্ছে—চাকরি করছি মাসে মাসে টাকা আনছি স্বাধীন হয়েছি—গুরুজনদের সংগে টেক্কা দিচ্ছে।

আজকে মেয়েদের চাকরি-করা নিয়ে সবার ঠিক এ-মনোভাব কিনা বিকাশ জানে না, তবে সে বিশ্বাস করে তার মা-র মত কেউ মনে করে না, বরং সহজভাবে মেনে নিয়েছে ছেলেদের পক্ষে যেমন মেয়েদের পক্ষেও তেমন লেখাপড়া শেখা কি চাকরি করা অবধারিত সত্য, মানুষ-হওয়ার রীতি বা পথ।

মা বললেন, সে আর দেরী করিসনি হাতমুখ ধুয়ে খেয়ে নে। অনেক রাত হয়েছে।

বিকাশ জিজ্ঞেস করল বাবা খেয়েছে? নন্তু?

না, কেউই খায়নি। তোর জন্যে— বলতে বলতে মার যেন ছোট ছেলের কথা মনে পড়ল। বাজত হয়ে বললেন নন্তুটা আবার গেল কোথায়? উঃ, ওই ছেলেটাকে নিয়ে হয়েছে যত জ্বালা।

কেন কি হয়েছে? বিকাশ জিজ্ঞেস করলে।

মা গজ গজ করে বললেন লেখাপড়া চুলোয় গেল, রাতদিন বাইরে বাইরে টো-টো করছে! বাবুর নাইবার খাবার সময় হয় না।

বিকাশ বললে ওর দোষ কি, পড়াশোনা করছিল স্কুল ছাড়িয়ে দিলে, এখন ওছাড়া আর কি করবে?

নন্তুকে স্কুল ছাড়ানর কথায় মা-র মুখটা কেমন হয়ে গেল, মনে মনে খুব ব্যাঘাত পেয়েছেন।

মা নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন স্কুল কি আমরা ছাড়িয়েছি, ও ছেড়েছে—তুই তো জানিস সব পড়াশোনা একেবারে ছেড়ে দিলে, কি কান্ড করলে তুই তো দেখেছিস! শেষে তোর বাবা বাধ্য হয়ে বললে—

ছোট ভাইয়ের পক্ষ নিয়ে কথাটা ওভাবে বলা ঠিক হয়নি। কেননা বিকাশ জানে নন্তু যখন পড়াশোনা ছেড়েছিল তখন তাদের সংসারের কি অবস্থা চলছিল, বাবা একবার রোজগারে কিছুতে চালাতে পারছিলেন না বিকাশও বি-কম পাশ করে বসেছিল— একটা টুইশানিও জোগাড় করতে পারেনি, কি ভীষণ টানাটানি সে-সময়। তার ওপর নন্তুটা লেখাপড়ায় তেমন সুবিধের ছিল না টানে-টুনে পাশও করতে পারতো না—প্রতি বছর ক্লাশ প্রমোশনের সময় কান্নাকাটি!

সুতরাং—

নন্তুর পড়াশোনা না হওয়ার অনেক কারণ আছে। ও নিজেই তার জন্যে দায়ী। বাবাকে বা সংসারকে দোষ দেওয়া অন্যায়। ইচ্ছে থাকলে আর পড়াশোনা হয় না। আসলে নন্তু পড়াশোনা করলে, না ফল পাকাবে ওই জানে।

মা বললেন, তুই-ও তো বলেছিলি পড়তে। শুনলে তোর কথা?

বিকাশ ভাইয়ের সম্বন্ধে আর কোন কথা বললে না। নন্তুকে নিয়ে মা-র মনে কি যেন একটা ক্ষোভ বা দুঃখ আছে।

হঠাৎ মা বললেন নন্তুকে তুই দেখ, না হলে ছেলেটা একেবারে গোল্লায় যাবে রাতদিন বাইরে বাইরে কি যে কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে কে জানে।

[illegible] বিকাশ উঠে [illegible] গিয়ে বললে, [illegible]। [illegible] থাকলে [illegible] ঝাপ—

মা বললেন, তোর আপিসে ঢুকিয়ে দে [illegible] চেষ্টা করে। চাকরি-বাকরি করলে মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

মা-র কথা শুনে বিকাশ হাসলে চাকরি করলে নন্তুর মাথা ঠাণ্ডা হবে [illegible] হবে, বড় ছেলের মত সংসার নিয়ে মাথা ঘামাবে—?

কিন্তু চাকরি? মা কি ভুলে গেছেন তার পাশ-করা ছেলেকে চাকরির জন্যে কত কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে, বাপ-ছেলেকে কত লোকের দোরে দোরে ঘুরতে হয়েছে দরখাস্ত করে করে হেরে গেছে—সে-হতাশার দিনগুলো বুঝি মা-র মনে নেই?

তাছাড়া খুব সাধারণ চাকরি করতে গেলেও শিক্ষাগত যে-যোগ্যতা থাকা দরকার নন্তুর তা নেই—স্কুলের গণ্ডিই সে পেরোয়নি। দু-তিন বছর পড়া নষ্ট হয়েছে। এতদিনে লেগে থাকলে হয়তো একটা পাশ করে ডিগ্রী ক্লাশে পড়তে পারতো। বিকাশের ঠিক ইচ্ছে ছিল না নন্তু পড়াশোনা ছেড়ে দিক, বাবা কিন্তু ক্ষেপে গিয়েছিলেন—শুধু ক্লাশের রেজাল্ট নয়, নন্তুর চলাফেরায় বাবার সন্দেহ হয়েছিল, সব তাতে নাকি মাতব্বর হয়ে উঠছে স্কুলে মাস্টারমশাইদের সঙ্গে তর্ক করে অপমান করে—আবার এমন অভিযোগও অবনীবাবু শুনেছেন যাতে তিনি আরো নিশ্চিত হয়েছেন যে ও-ছেলের কিছু হবে না পয়সা খরচই বৃথা।

অবনীবাবু সবাইকে শুনিয়ে বলেছিলেন, বাবু রাজনীতি করছেন পড়াশোনা করবেন না মিথ্যে মিথ্যে স্কুলের মাইনে গুণোগার দিয়ে লাভ? তার চেয়ে জানলুম পয়সাটা বেঁচে গেল।

বিকাশ বাবাকে বোঝাতে পারেনি, নন্তুর মত ক্লাশ টেনে-পড়া ছেলে আবার কি পলিটিকস করবে। পলিটিকসের ও বোঝে কি?

অবনীবাবু বলেছিলেন, ওর আবার বোঝাবুঝির কি আছে, দাদার জয় বললেই হলো! ভোটের সময় মিছিলের সঙ্গে গলা ফাটালেই হলো! দেখিসনা আজকাল বিপিনবাবুর ছেলেটা কত বড় নেতা হয়ে উঠেছে! ঠিক ঐ নন্তুর মত, লেখাপড়া হলো না এখন দল পাকাচ্ছে, পাণ্ডাগিরি করছে, যেখানেই গোলমাল দেখ সেখানেই আছে—

বিকাশ তর্ক করেনি, কিন্তু মনে মনে বাবার কথা মানেনি, লেখাপড়ায় সুবিধে হয় না বলে কেউ দল গড়ে, কি, রাজনীতিতে মাতে একথা ঠিক নয়! বিকাশ জানে শিক্ষিত পণ্ডিত লোক আছে এই সব দলে!

নন্তু সেদিন বলছিল, বিপিনবাবুর ছেলে অমর প্রাইভেটে নাকি বি-এ পাশ করেছে, পার্টির কাজ করেও পড়াশোনায় মন আছে।

বিকাশ ভাইকে বলেছিল, তুই-ও তো করতে পারিস—লেখাপড়াটা শেষ কর, তারপর না হয় যা প্রাণ যায় তাই করিস। জানিস তো বাবা পছন্দ করেন না।

নন্তু কোন কথাই বলে না। একবার কেবল বলেছিল, তখন বিকাশ চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে আছে,—কি হবে লেখাপড়া করে, তুমি তো বি-কম পাশ করেছ, কি হয়েছে! চাকরি পাচ্ছ?

এরপর আর তর্ক চলে না। পাশ করে চাকরি না পেলে সে পাশের মূল্য কি? মিথ্যে পরিশ্রম শুধু নয়, অর্থ নষ্ট, মনোকষ্ট!

তবু তর্ক হয়। পড়াশোনাটা কেবল রোজগারের জন্যে না ভেবে, পড়াশোনার জন্যেই ভাবলে হয়। পড়াশোনার একটা আলাদা দাম আছে, মূল্য আছে?

কি দাম? বেশ তর্ক করতে শিখেছে ক্লাশ টেন পর্যন্ত পড়া ছেলেটা। কি দরকার লাগে জীবনে? চাকরি ছাড়া অন্য কি কাজ হয়?—

বিকাশ রেগে গিয়ে বলেছিল, যা যা তর্ক করিসনি, যা বুঝিস না, তাই নিয়ে কথা বলিসনি।

নন্তুর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বাবা আশা ছেড়ে দিয়েছেন বিকাশও আশা ছেড়ে দিয়েছে। মা কেবল আঁক-পাঁক করছেন। ছোটছেলের ওপর দিন দিন যেন টান বাড়ছে। যতই উদ্বেগ ততই যেন স্নেহ বেশি প্রকাশ পাচ্ছে। বিকাশ বেশ লক্ষ্য করেছে, নন্তুকে নিয়ে বাবা কি সে যদি রাগারাগি বা বকাবকি করে মা বেশ ক্ষুব্ধ হন। অন্যায় জেনেও নন্তুর পক্ষ নেন।

বাবা মাঝে মাঝে রেগে বলেন, খাওয়া বন্ধ করে দাও, বাড়িতে ঢুকতে দিও না অমন ছেলের দরকার নেই, কেবল খাওয়ার বেলায় বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক, বেরিয়ে যাক!

কিন্তু নন্তু জানে মা যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন তার এ বাড়ির অন্ন কেউ ওঠাতে পারবে না। আর বাড়ীর দরজাও তার জন্যে কোন দিন বন্ধ হবে না। বাবা ঐ মুখেই বলছেন।

মার জন্যে বিকাশও ভাইকে কিছু বলতে পারে না। ইদানিং তো কথাবার্তাও কিছু হয় না। কখন আসে কখন যায়, কি করে কোথায় থাকে নন্তু, বিকাশ কোনই খোঁজ রাখে না। আপিস যাবার সময় দেখে না, আপিস থেকে ফিরে এসেও দেখতে পায় না। তারপর কখন চুপিসাড়ে এসে খেয়ে শুয়ে পড়ে বিকাশ টের পায় না। বাবাও বোধ হয় জানতে পারেন না, মা আর নন্তুর মধ্যে এ ব্যাপারে সন্ধি আছে। নন্তুকে মা-ই প্রশ্রয় দিয়ে আরো খারাপ করে দিয়েছেন।

চাকরিতে ঢুকে বিকাশ দু-একদিন ভাইকে বলেছে, নন্তু ঐ আড্ডা দেওয়া ছাড়, পড়াশোনা কর—বাবা না দেয় আমি পয়সা দেব তুই চেষ্টা করে একটা পাশ দে। স্কুলে না যাস, প্রাইভেটে পড়।

নন্তু কোন উত্তরই দেয়নি। অনেক বলতে বলেছে, পাশ করে কোন লাভ নেই!

রাগে আপাদমস্তক বিকাশের জ্বলে গিয়েছিল। বাবু এর মধ্যে সব বুঝে ফেলেছেন! পাশ করে কিছু হবে না, পাশ না করেই যত কিছু হবে!

বিকাশ বিদ্রূপ করে বলেছিল, হ্যাঁ যা করবো তাইতেই মোক্ষ লাভ হবে! যত সব গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল জুটে দেশের বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে। ঝাণ্ডা মিছিল আর বক্তৃতা দিয়ে দেশসেবা করছেন! কি হচ্ছে শুনি?

নন্তু কোন কথা বলেনি দাদার মুখের ওপর। মনে মনে যেন হেসেছিল দাদার কথা শুনে—চাকরি করছেন বলে পণ্ডিত হয়ে গেছেন! উনি তারি জানেন মিছিল, বক্তৃতা সভায় কিছু হবে না!

তারপর একদিন ভাইকে বিকাশ বুঝিয়েছিল, দেখ ওসব করে কিছু হবে না। ওরা তাদের মত ছেলেদের দিয়ে কাজ উদ্ধার করে নেয়, মার-ধোর-পুলিশ-হাঙ্গামা তোদের ওপর দিয়েই হয়, ওরা মজা লোটে! ওসব ছাড়।

নন্তু রাগ করে বলেছিল, যা জান না তা নিয়ে কথা বোলো না। চাকরি করছো কর!

নন্তুর কথা ইদানিং সে ছেড়েই দিয়েছে, তার ভাবনার কোন দরকার নেই। যে-যার ভাবনা সে নিয়ে থাকুক।

হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসে বিকাশ বললে, কই বাবার জায়গা করলে না! বাবাকে দিলে না?

মা বললেন, পরে খাবে বলেছে।

কেন অনেক রাত তো হয়েছে, আরো পরে? বিকাশ তাড়া দিলে। বাবাকে ডাক না?

কাকে ডাকবো, ঘরে আছে নাকি। মা জাড় নাড়তে নাড়তে বললেন।

কোথায় গেল আবার এত রাত্তিরে? বিকাশ উদ্বিগ্ন হয়ে বললে।

কোথায় আবার রাস্তায়, হারামজাদাকে খুঁজতে গেছে। গুণধর পুত্র দেশোদ্ধার করছেন, বাপ-মা-ভাই সবাই এদিকে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে আছে।

মুখে মা-বাবা যাই বলুন নন্তুর জন্যে মনে মনে খুব উদ্বিগ্ন এ'রা দুজনেই। কোন মানে হয় না রাতদুপুরে দলপাকানো ছেলের আগমন প্রতীক্ষায় রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ানর। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দুর্গা নাম জপ করার। মাও ঐ রকম, মুখে গালা-গাল দিলে কি হবে, এখন নন্তু যতক্ষণ না ফিরে আসবে ততক্ষণ এ'রা ঘরবার করবেন, রাস্তার দিকে চেয়ে প্রতিটি লোকের মুখের দিকে চেয়ে নন্তুকে খুঁজবেন।

বিকাশ মাথা নীচু করে খেতে খেতে মনে মনে বললে, রাবিশ! যত সব আদিখ্যেতা!

খাবার কাছে বসে থাকলে কি হবে মা বেশ অন্যমনস্ক হয়ে উঠেছেন। বার বার দালানের প্রবেশ-পথটার দিকে লক্ষ্য কর-ছেন। মনে হয় কান পেতে আছেন।

খাওয়ায় বিকাশের রুচি রইল না। তার মনে হল, সে বড়, সে চাকরি করে সংসার সচ্ছল করলে কি হবে, তার প্রতি বাবা-মার আগ্রহ আর তেমন নেই। এখন ছোট ছেলেই তাঁদের চিন্তা-ভাবনা সবখানি জুড়ে রেখেছে। তাকে সবাই মিলে অবহেলা, উপেক্ষা করছে।

আধ-খাওয়া অবস্থায় বিকাশ উঠে পড়ল। মা হাঁ-হাঁ করে উঠলেন।

ততক্ষণে বিকাশ তিন লাফে কলতলায় গিয়ে পৌঁছল, শব্দ করে মগ ছুঁড়ে জল ফেলে আঁচিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে গুম হয়ে বসল। তার মনে হল, এ সংসারের সে কেউ নয়—মা-বাবাও তার আপনার নয়! তার কথা আর কেউ ভাবে না, সে ফালতু হয়ে গেছে। এখন নন্তুই সব! নন্তুকে নিয়ে—

মা ছেলের পিছনে পিছনে এসে উদ্বেগ প্রকাশ করে বললেন, কি রে খেলি না যে? অমন করে বসে আছিস কেন? শরীর খারাপ হয়েছে? আপিসে কি খেয়েছিলি? রান্না ভাল হয়নি? কি রে—

বিকাশ রুক্ষ স্বরে বললে, কেন বক্ বক্ করছো, যাও না—

তবু মা কাছে এসে ছেলের মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, অমন করছিস কেন, কি হয়েছে বল না।

বিকাশ কি হয়েছে, কি বলবে নিজেই জানে না।

...গোলমাল একটা না একটা রোজ লেগেই আছে। আপিসে তাই নিয়ে খুব গুলতানি। কলম পিষলে কি হবে, রাজ-নীতিক ঘটনা বিশ্লেষণে সবাই খুব পটু মনে হয়। কেউ কম নয়। আপিসের কাজ মাথায় ওঠে।

বিকাশ চুপ করে সহকর্মীদের কথা শোনে আর ভাবে আশ্চর্য, সে এসবের কিছুই জানে না। রাজাপালা যে কত বড় অন্যায় করেছে একটা নির্বাচিত সরকারকে বাতিল করে সে ভাবেনি। তবে অবস্থা যে দিন দিন ঘোরাল হয়ে আসছে তা সে বুঝতে পারছে। সবাই যেন কেমন বেপরোয়া আর উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। এই এখানে আগুন ওখানে গোলমাল সেখানে বোমা। ট্রাম-পোড়ান কি বাস-পোড়ান, যেন একটা খেলা। কে কার কথা শোনে। হরদম মিছিল বেরচ্ছে, হরতাল হচ্ছে, ইটপাটকেল বোমা ছুঁড়ছে, পুলিশ-ফুলিশ মানছে না।

প্রতিবাদ! কিসের প্রতিবাদ? যে বছর বিকাশের চাকরি হলো সেই বছরে যেন বেশী। সুরুও তখন থেকে। তার কয় বছর আগের কথা বিকাশের হিসাবে কেমন গুলিয়ে যায়—

বাবা বলেন, স্বাধীনতার পর দেশের অবস্থা কোনকালে ভাল না হলেও এমন অরাজকতা কোনদিন ছিল না। একি! কথায় কথায় মার-ধোর, যা ইচ্ছে তাই!

এ নিয়ে আপিসের যাঁরা তর্ক করেন, অবস্থা বোঝেন বলে জাহির করেন, তাঁরা তো বলেন, অবস্থা কোন কালেই ভাল ছিল না। একদল লুটেপুটে খেলে যা হয়!

চাকরি হয়েছে, সুতরাং বিকাশের কিছু বলবার নেই—দুধভাত না হোক শাক-ভাত তার মারে কে! ওসব রাজনীতিক চাল, লোক ক্ষেপিয়ে নাম করবার তাল। লোক গুলোও তেমনি—

কোনো বুদ্ধিশুদ্ধি নেই, না হলে কেউ নিজেদের সম্পত্তি নষ্ট করে—ঘরে-দোরে আগুন লাগিয়ে দেয়?

সমবয়সী সহকর্মী বন্ধুরা কিন্তু কেউ ওসব দোষ দিয়ে এই গোলমাল, নিত্য অশান্তিকে নিন্দা করে না। বরং তাদের মুখেচোখে কেমন একটা উল্লাসের ভাব দেখা যায়, আপিস কাটিয়ে অশান্তির সমর্থনে কথা বলে। কথাবার্তা শুনলে মনে হয়, ভেতরে ভেতরে ওদের সবার সঙ্গে যোগা-যোগ আছে। সব পরিকল্পনা মত ঘটছে।

ওদের মধ্যে দিব্যেন্দুর কথাবার্তা শোনবার মত। শোনেও সকলে। কত আর বয়স হবে, বিকাশেরই বয়সী, সাতাশ-আটাশ। তার কথায় বিকাশ নতুন সরকার গঠন হবার সূচনায় ময়দানে যে বড় মিটিং হয়েছিল তা শুনতে গিয়েছিল। মিটিং না জনসমুদ্র! কাতারে কাতারে দলে দলে লোক আসছে, মানুষের আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটি যেন মাঠের মধ্যে ঐ সভাস্থলে সবার দ্রষ্টব্য করে রাখা হয়েছে। সাধারণ মানুষের আনন্দ-উল্লাস যেন ধরে না!

দল-নেতাদের কথা শুনতে শুনতে বিকাশের মনে হয়েছিল, এতদিন তারা কি ভুলটাই না করে এসেছে, এতদিন তাদের কি চক্রান্তের মধ্যেই না ফেলে রাখা হয়েছে! সমাজতন্ত্রের নামে তাদের গলায় পা দিয়ে চুবিয়ে রাখা হয়েছে দারিদ্র্যের মধ্যে, অক্ষমতার তিমিরে।

(ক্রমশঃ)

যুবক-যুবতী

প্রেম

প্রেম কথাটির মধ্যে লুকিয়ে আছে এমন এক সাংঘাতিক আকর্ষণ যা কাউকে কাঁদায় কাউকে দেয় প্রেরণা, কাউকে বাধ্য করে গলায় দড়ি দিতে আবার কেউ আজীবন সংসারে জলাঞ্জলি দিয়ে বাউণ্ডুলে সাধ্য-সন্ন্যাস জীবন বেছে নেয়। একটা বয়েসে প্রায় সবাই প্রেমে পড়বার জন্যে পাগল হয়, প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে পাগল হয়, বিরহ জ্বালায় বুকে দগদগে ঘা নিয়ে হা-হুতাশ করে কিন্তু প্রেমের হাতছানি পেলেই পড়ি-মরি করে এগিয়ে যেতে কেউই প্রায় গড়িমসি করেন না।

সব প্রেমেরই পরিণতি যে বিবাহ এমন কোন কথা নেই আবার সব বিবাহেই যে প্রেমের চরম সার্থকতা এমন কথা কোন অভিধানেই লেখা নেই। যুগ যুগ থেকে প্রেমের ব্যাপারটা চলে আসছে, পাঁজি-পুঁথি দেখে দিনক্ষণ মিলিয়ে কেউ প্রেম করেন না। জোয়ারের জল বালিয়াড়ি পেরিয়ে কীভাবে যে কোথায় কখন ঢুকে পড়ে তা কেউ টের পান না। যখন টের পান তখন আধা-শুকনো কৃষ্ণচূড়াতেও কুঁড়ির আভাস দেয়, চল্লিশোর্ধ্ব কুমার-কুমারীদের চোখেও নেশা ধরে। ভুল করে কেউ পা বাড়ান, পা বাড়িয়ে কেউ ভুল বোঝেন, ভুল শোধরাতে আবারও নতুন করে আটকা পড়েন প্রেমের আঠাকাঠিতে।

হাল-আমলের তরুণ-তরুণীরা প্রেমকে কীভাবে দেখেন, অভিজ্ঞতায় তাঁরা কি বুঝেছেন বা আদৌ কিছু বুঝেছেন কিনা, তাঁদের মনের কথা টেনে বার করবার জন্যেই আমার এই সাক্ষাৎকার। প্রথমে হাজির হলুম মুরলীধর গার্লস কলেজের বি-এ দ্বিতীয় বর্ষের (কলা) ছাত্রী জয়শ্রী দত্তর কাছে। কী প্রশ্ন করব, প্রশ্ন করলেই উত্তর মিলবে কিনা এ নিয়ে আমার নিজেরই প্রচুর সংকোচ ছিল। আবার ভয়ও ছিল যদি পাল্টা প্রশ্ন আসে 'আপনি আগে বলুন প্রেমে পড়েছেন কিনা।' তা হলে কি জবাব দেব? এইসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে জয়শ্রী দত্তকে দুম করে জিগেস করে বসলুম 'আপনি কি কখনও প্রেমে পড়েছেন?'

প্রথমটায় জয়শ্রী একটু ঘাবড়ে গেলেন, মুখ নিচু করে কাপড়ের খুঁট ঠোঁটের কোণে লাগালেন নখ দিয়ে। কুড়ি পেরিয়ে যাওয়া মেয়ের লজ্জা-সংকোচ দেখে আমিও মুখ তুলে ওঁর দিকে চাইতে পারছিলুম না। যে-কোন মহিলাই এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে ইতস্তত করবেন, রাঙা হয়ে উঠবেন। তাই প্রশ্ন বদলে আবার জিগেস করলুম, 'মানে প্রেম সম্পর্কে আপনি ভাবনা-চিন্তা করেন তো?'

'তা করি।'

'ঠাকুর্দার আমল আর হাল-আমল এ-দুয়ের মধ্যে কোন তফাৎ দেখতে পান?'

'নিশ্চয়ই।' জয়শ্রী যেন এবার বেশ কিছু কথা বলার উৎসাহ পেলেন। ব্যক্তিগত ব্যাপারটা এড়িয়ে আর পাঁচজনের প্রেম-ভালবাসার কথায় মুখর হয়ে উঠতে অবশ্য সবারই ভাল লাগে।

'কি রকম?'

'ধরুন, আমার ঠাকুর্দা যখন প্রেম করতেন, তখন তাঁর অবসর ছিল প্রচুর, সমস্যা ছিল কম। প্রেমে ঝাঁপ দিতে পারতেন মনপ্রাণ দিয়ে।'

'তার মানে এখনকার তরুণ-তরুণীরা ঝাঁপ দিতে পারেন না বলতে চান?'

'না তা ঠিক নয়। আমি বলতে চাইছি সম্পূর্ণ মনোযোগটা দিতে পারেন না। আমাদের এখন অনেক সমস্যা।'

'এত সমস্যা থাকা সত্ত্বেও প্রেম তো প্রেমই আছে—তাই না?'

'তা ঠিক। তবে বাইরের মত আমার মনে হয় মানুষেরও ভেতরে ভেতরে বদল হয়ে যাচ্ছে অনেক। আগেকার দিনে ইন্টার-কাস্ট ম্যারেজ দারুণ অপরাধের

মিতা রায়

জয়শ্রী দত্ত

ব্যাপার ছিল, গ্রামে তো ঠেকো করে দিত। এখন অনেক লিবারেল হয়েছে সত্যি, কিন্তু সমস্যা আর এক জায়গায় বেড়েছে। মনে হয় আর্থিক কারণেই অসন্তোষ এত দানা বেঁধে উঠছে। কথায় কথায় ভালবাসা মরে যাচ্ছে—ছাড়াছাড়ি হচ্ছে ঘন ঘন।'

'এর রেমেডি কি?'

'তা ভাববার ক্ষমতা আমার নেই।'

মধ্য কলকাতার নিতা রায় বললেন, 'প্রেম-ট্রেম এখন জল-ভাত হয়ে গেছে। যে যখন খুশি যার তার সঙ্গে প্রেম করে বসছে—আর ক'দিন পরেই আবার দিব্যি ভুলে গিয়ে অন্য জায়গায় গাঁট বাঁধছে।'

'এরকম হচ্ছে কেন?' আমি প্রশ্ন করি।

'অস্থিরতা। ঘরেবাইরের জ্বালা-যন্ত্রণায় আমরা এখন দিশেহারা হয়ে আছি, যে-কোন একটা পয়েন্টে আসতে পারছি না।'

'আপনি প্রেম করেন?'

'করি।'

'জীবনে ক'বার প্রেমে পড়েছেন?'

'একবারই। অ্যান্ড দ্যাট ইজ ফাইনাল।'

'তবে কি আপনার মধ্যে অস্থিরতা নেই?'

'আছে। তবে ভালোবাসার ক্ষেত্রে আমি খুব হিসেবী থাকার চেষ্টা করি।'

'হিসেব করে কি ভালোবাসা যায়—বিশেষ করে কাঙ্ক্ষিত পুরুষকে?' প্রশ্নটা করে বসলাম ক্যালকাটা উইমেনস কলেজের ছাত্রী (প্রথম বর্ষ, কলা) সুনন্দা ঘোষকে।

খুব সপ্রতিভভাবে সুনন্দা বললেন 'কোন হিসেবে ফয়সালা হবে তা অবশ্য আগে থেকে জানা চাই। যেমন ধরুন, আমি চারুব্রত নামে একটি ছেলেকে ভালোবাসি। সে এখন বেকার। সারাদিন হিসেব করছি, ওর একটা চাকরি হলে কিংবা আমি একটা চাকরি পেলে দুজনের

ইন্টিমেট লেদার ওয়ার্কসের চপ্পল তৈরির কারখানায় একাংশ

দিকে সস্তায় একখানা ঘর ভাড়া করে সংসার বাঁধব।'

দেব লেনের মোহন দাশগুপ্ত বললেন 'আমি উইকে একটা করে মেয়েকে ভালোবাসি।'

'কেন করেন এরকম? কি সুখ পান এতে?'

'যদ্দিন স্বাস্থ্য আছে, চেহারা আছে তদ্দিনই তো লাইফ—তারপর তো ফাঁকা।'

'বিয়ে করবেন না?'

'কাকে করব? সব তো কোথাও না কোথাও বাঁধিয়ে বসে আছে। জামানা এখন বড্ড খারাপ।'

অস্থিরতা ও সময়ের প্রতি অবিশ্বাসই শুধু নয়, দারুণ হতাশার সুরে টালিগঞ্জ প্রিন্স আনোয়ার শা রোডের কবীর ভৌমিক বললেন, 'কোন কোন মেয়েকে ভালো লাগে বটে—তবে এগুতে সাহস হয় না।'

'কেন?'

'ভয় করে। শেষকালে সত্যি যদি প্রেমে পড়ে যাই।'

হরতুকি বাগান লেনের অষ্টাদশী কুমারী চন্দ এই বিশ শতকের শেষার্ধের মানুষ হয়েও প্রেমকে ঘৃণা করেন। বললেন, 'প্রেম আবার হয় নাকি এখন? সব তো কেলেঙ্কারি বাধায়।'

'আপনার তো একদিন বিয়ে হবে কুমারী দেবী—সেদিন স্বামীর সঙ্গে প্রেম করবেন না?'

প্রশ্নটা করে নিজেই ভাবতে লাগলাম বিয়ের পর প্রেম? তা কেউ করেন নাকি? তবে অনেকে যে বলেন, বিয়ের পর প্রেম জোলো হয়ে যায়। যা থাকে তা ঘি ফাটানোর পর নিচে পড়ে থাকা চনা।

প্রশ্নটা শুনেই কুমারীর মুখখানা রাঙা হয়ে ওঠে। কোন কথার জবাব না দিয়ে এক-পা এক-পা করে তিনি ঘর ছেড়ে পালিয়ে যান।

—কৃষ্ণা সেনগুপ্ত

এরাও পিছিয়ে নেই

বাঙালী তরুণদের চপ্পলের কারবার

ভদ্রলোককে চেনাচেনা মনে হচ্ছিল। হাত তুলে নমস্কার করে বালিগঞ্জের বামনপাড়া লেনের 'ইন্টিমেট লেদার ওয়ার্কসে'র ছিটের শার্ট আর পাজামা-পরা তরুণ কর্ণধার মৃদু হেসে বললেন, আমার নাম শানু ব্যানার্জি।

বছর আষ্টেক আগেও তিনি যুব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এখন উনি বিজনেসম্যান—চপ্পলের কারবারী। একটি হাল-ফ্যাশানের চপ্পল প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার তিনি। ইন্টিমেটের চপ্পল বানিয়ে প্রায় শ'দেড়েক কারিগর রুজি-রোজগার করছে—জনাদশেক শিক্ষিত বাঙালী যুবক জীবিকার সন্ধান পেয়ে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছেন এটা আনন্দের কথা বইকি।

'৭২-এর সেপ্টেম্বরে সরশুনায় ভাঙা চালাঘরে যে-সংস্থার শুরু, এক বছরে সেই নবজাতক সংস্থা সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকার চপ্পল বিক্রী করেছে। এখন প্রতি মাসে ৮০ হাজার টাকার চপ্পল সাপ্লাই করছে একটি বিশিষ্ট জুতো কোম্পানী এর ক্রেতা। ভারতের বাইরে কানাডাতেও মাসকয়েকের মধ্যে লেডিস চপ্পল রপ্তানী করবেন—মাসে সাত হাজার জোড়া চপ্পলের অর্ডার পেয়েছেন এঁরা। জাপানেও পাঠাবার কথাবার্তা চলছে—তবে এখনও চুক্তিটা পাকাপাকি হয়নি। ইন্টিমেটের ১৬টা ইউনিটে এখন দিনরাত কাজ চলছে।

অথচ শানুবাবু যে জুতোর কারবারী হবেন তা তিনি স্বপ্নেও কোনও দিন ভাবেননি। বিয়ে-থা করেছেন। একটা কিছু আর্থিক সাশ্রয় না হলে আর দিন চলে না। চাকরি যে জুটত না তা নয়, বাবা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, অধ্যাপনা ছাড়াও নিজের একটা ফার্মও আছে। শানুবাবু সিটি কলেজে বি-কম পর্যন্ত পড়েছেন—কাজেই শতিনেক টাকার একটা চাকরি হয়তো জুটে যেত। কিন্তু ও-পথে তিনি গেলেন না।

শানুবাবু অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে প্রচণ্ড আর্থিক ঝুঁকি নিয়ে সরশুনায় একটি চালাঘর ভাড়া করে সেখানেই শুরু করলেন ইন্টিমেটের ফ্যাক্টরি-কাম-অফিস। সঙ্গে রইল ওঁর ভাই মিলন। স্ত্রীর গয়নাগাটি বিক্রী করে 'ক্যাপিটাল' সংগ্রহ করলেন। শানুবাবুর স্ত্রীও তখন চাকরি করতেন। এর মধ্যে কলেজ স্ট্রীটের মুচিপট্টিতে পনেরো দিন অ্যাপ্রেন্টিসশিপ খেটে এসেছেন তিনি।

শানুবাবু সেসব দিনের কথা স্মরণ করে বললেন, তখন মাঝরাত পর্যন্ত জুতো তৈরি করতাম আর দিনের বেলায় থলি করে দোকানের দরজায় দরজায় ঘুরতাম। অর্ডার যা পেতাম তার চাইতে টাকা মার যেত বেশী। ক্রমেই ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে পড়ছিলাম। আলোর সন্ধান দিলেন আমারই পল্লীর সন্তোষ লাহিড়ী।

সন্তোষবাবুর সঙ্গে ওঁর পরিচয় বহুদিনের। মিঃ লাহিড়ী পেন্ট-টেকনোলজিস্ট—জামসেদপুরে রং-এর ব্যবসা আছে। উনি একদিন শানুবাবুর জীবিকার সংগ্রামের কথা শুনলেন। সব শুনে মিঃ লাহিড়ী শানুবাবুকে সবরকমের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। সন্তোষবাবুর পরামর্শমত কারখানা স্থানান্তরিত করা হল ২বি বামনপাড়া লেনে ওঁরই বাড়িতে। এরপর পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে ঋণের দরখাস্ত করলেন শানুবাবু। '৭৩-এর জুলাই মাসে ভবানীপুরের পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ৫০ হাজার টাকা ঋণ মঞ্জুর করলেন। শানুবাবুর ভাষায়—আমি সেদিন আনন্দে কেঁদে ফেলেছিলুম।

শানুবাবু এবার কয়েকটি সমস্যার কথা বললেন। এখনও বড় রকমের অর্ডার তাঁদের হাতে আছে। কিন্তু পছন্দমত চামড়া, পেস্ট্রোল, মাইক্রো সোল ও ফোমের অর্ডারের জন্য নতুন অর্ডার হাতে নিতে পারছেন না। শানুবাবু বললেন, অনেস্টি আমাদের মূলধন। কোয়ান্টিটির চাইতে কোয়ালিটির উপরই আমরা দৃষ্টি দিয়েছি। আরও একটি কথা, আমরা সকলেই ইয়ং—চারজনের এই অংশীদারী কারবারে প্রত্যেকেই আমরা একই পরিবারভুক্ত বলে মনে করি।

আমি ২বি, বামনপাড়া লেনের ইন্টিমেট লেদার ওয়ার্কসের পার্টনারদের মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম—প্রোডাকশন ম্যানেজার অমিতাভ লাহিড়ী, অ্যাকাউন্টেন্ট স্বপন গাঙ্গুলী, অফিস সুপার সুবিমল বসু, প্যাকিং-ইন-চার্জ নিরঞ্জন দাস—এঁদের কারোরই দাড়ি-গোঁফ এখনও ভাল করে ওঠেনি।

—অনক মজুমদার

চিঠিপত্র

লেখকদের সংগীতগুণী

অমৃত, ১৪ বর্ষ, দশম সংখ্যায় প্রকাশিত জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর জীবনীতে কিছু অসংগতি চোখে পড়ল। ১। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের মৃত্যুর দিন বৃহস্পতিবার নয়, সোমবার। ২। 'নিঝুম রাতে কে বাঁশি বাজায়' গানটির রচয়িতা নজরুল তুলসী লাহিড়ী নন। ৩। 'হিজ মাস্টার্স' ভয়েসে প্রকাশিত গানগুলির রচয়িতা নজরুল হলেও, মেগাফোনে প্রকাশিত রেকর্ডগুলির অধিকাংশই তুলসী লাহিড়ীর লেখা। ৪। 'ছন্দে ছন্দে নাচে নন্দদুলাল' নটমল্লার (অনেকে গৌড়মল্লার বলেন) রাগে গাওয়া, নটরাগে নয়। রচনা কি নজরুলের? কারণ মেগাফোনে প্রকাশিত হয়েছিল। ৫। 'বিশ্বজননী ভাগীরথী'র জায়গায় 'ভীষ্মজননী ভাগীরথী' হবে। আময় বোলো না ভুলিতে বোলো না গানটির তৃতীয় লাইনে 'হেরিবারে করি কত সাধনা' নয়, ছলনা হবে।

সবশেষে একটি প্রশ্ন—মেগাফোনে প্রকাশিত রেকর্ড 'কি আছে তোমার মনে' (হাম্বীর) ও 'স্বপনে শুনেছি আশা' (পূরবী) কি গায়ক দুইবার রেকর্ডিং করেছিলেন? কারণ রাগ ঠিক থাকলেও আমি দুইটি রেকর্ডে গানগুলির ভিন্ন রূপান্তর শুনেছি।

অরুণ সান্যাল
খড়গপুর-২

(২)

সংগীত শিল্পীদের জীবনকাহিনী সংক্রান্ত রচনাগুলি আমার অত্যন্ত ভালো লাগে বলেই ২২শে চৈত্র ১৩৮০ সংখ্যা 'অমৃতে' সাপ্তাহিক পত্রিকায় গহর জান সম্পর্কিত লেখাটিতে 'রাধেকৃষ্ণ বোল' গানটির বাণী অতিশয় বিকৃতভাবে ছাপা হওয়ায় আমি অস্বস্তি বোধ করছি।

যাঁরা গানটি জানেন অথবা হিন্দী জানেন তাঁদের কাছে এই বিকৃতি অত্যন্ত মন্দ লাগবে। তাঁরা ছাপার ভুলকে লেখকের ভুল বলে মনে করতে পারেন। এই অনবদ্য গানটি অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে মহাশয়ের মুখেও তাঁর বাড়িতে শুনেছি গ্রামোফোন রেকর্ডে পণ্ডিত নারায়ণ রাও ব্যাসের মুখে এবং সঙ্গীত আসরে শ্রীমতী হীরাবাইর মুখে। বাণী এই রূপ :—

রাধে কৃষ্ণ বোল মুখসে রাধে কৃষ্ণ বোল তেরো ক্যা লাগেগা মোল। ছাত পৰ (ওয়) নাহি ছিল না দম বাঁস কোস নাহি চলনা, কুছ গিরে গাঁঠ নাহি ছুটনা, তেরী মনকী গুন্ডী খোল।। কেন বচন মে আয়া ইস মায়ানে ঘের গিরায়া, ইস মায়ানে মন লুভায়া, তেরো গঠরী কা গাঠ্ঠা ছোড়, তোমো ক্যা লাগেগা মোল। (নারায়ণ রাও ব্যাসের স্বরলিপি থেকে এরকম পেয়েছি। শ্রীমতী হীরাবাইর এ গানে আরো কিছু অতিরিক্ত পদ ছিল, তা আমার মনে নেই।) শুনেছি এ গানখানি আবদুল করিম খাঁ সাহেবও গাইতেন। কিন্তু তাঁর মুখে শুনবার সৌভাগ্য হয়নি। গানটির রচয়িতা এবং সুরকার কারা তাও জানতে ইচ্ছে করে।

রাধিকপ্রসাদ গোস্বামী কালিপদ পাঠক পিয়ারা সাহেব, কে মল্লিক কৃষ্ণচন্দ্র দে, ওংকারনাথ ঠাকুর কীর্তনীয়া গণেশ দাশ এবং পদ্মময়ী দাসী, গিরিজাশংকর ভীষ্মদেব **তারাপদ চক্রবর্তী** জমিরুদ্দিন খাঁ **ইন্দুবালা আঙ্গুরবালা** এস্রাজী শীতল মুখোপাধ্যায় **কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়** (তবলা)—এঁদের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করলে বড় ভালো হয়। এবং আবদুল করিম গুলাম আলি ও ফৈয়াজ। অমর নাটক 'আলিবাবা'র সুরস্রষ্টা দেবকণ্ঠ বাগচি সম্বন্ধেও আমার মতো অনেকের কৌতূহল আছে। তাঁর বিষয়েও কিছু আলোচনা করলে খুব ভাল হয়। (ওপরের ফর্দে যাঁদের নাম বোল্ড টাইপে লেখা দিয়েছি তাঁরা এখন জীবিত থাকলেও আসর থেকে বিদায় নিয়েছেন বলে বিগতদের দলে পড়েন)।

লেখককে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং অমৃত-র আগামী সংখ্যার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছি।

অজিতকৃষ্ণ বসু
কলিকাতা-২৬

সারা বাংলা কবি সম্মেলন প্রসঙ্গে

গত ৫ জুলাই অমৃত পত্রিকার সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগে 'শ্রীজরৎকারু' তাঁর কলমে মুর্শিদাবাদের প্রবাহ আয়োজিত সারা বাংলা কবি সম্মেলনের কথা পাঠক-পাঠিকাদের কাছে তুলে ধরেছেন।

শ্রীজরৎকারু হয়ত সম্পূর্ণই ভুলে গেছেন পুরস্কৃত কবিদের কথা। না-কি এই নয় ঘণ্টাব্যাপী কবি সম্মেলনে কবিরা শুধু কবিদের সঙ্গে পরিচিতই হলেন?

এই কথাগুলো পুরোপুরি তুলে ধরলে আমার মত সাহিত্যানুরাগী প্রবাসী বাঙালী নিঃসন্দেহে খুশী হতো।

অমল দেব
কানপুর-৮

ভারতের ডাকটিকিট

অমৃতে প্রকাশিত আমার 'ভারতের ডাকটিকিট' নামে প্রবন্ধের একটি প্রতিবাদ পত্রস্থ হয়েছে। পত্রটির লেখক শ্রীসুরেশপ্রসাদ নিয়োগী সম্ভবত আমার লেখার বক্তব্য ধরতে পারেন নি। তিনি সংখ্যা নিয়ে অযথা বিতর্কের সূত্রপাত করেছেন এবং সে ক্ষেত্রেও তিনি সঠিক তথ্য পরিবেশন করতে পারেন নি।

স্মারক টিকিটের সংখ্যা (১৯৭৩ সাল অবধি) তিনি দেখিয়েছেন ৩১৩। আসলে ঐ সংখ্যা হবে ৩১৬। (১৯৭২-এ একটি ও ১৯৭৩-এ দুটি কম দেখিয়েছেন)।

শ্রীনিয়োগী লিখেছেন—'কোরিয়া ইন্দোচীন লাওস কম্বোডিয়া ভিয়েতনাম কঙ্গো প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ব্যবহারের জন্যে ৫০টি টিকিট নবরূপে প্রকাশ করা হয়েছে।' নিচের তালিকা অনুযায়ী উপরের সংখ্যাটিও অসম্পূর্ণ।

কোরিয়া—১২ কঙ্গো—৬ গাজা—১ লাওস—১২ কম্বোডিয়া—১০ ভিয়েতনাম—১৩ ইন্দোচীন—৯, মোট—৬৩

এইসব ব্যাপার নিয়ে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হতে চাই না।

পুষ্পেন্দু লাহিড়ী
কলিকাতা-১৩

পরিশোধ কবিতার নৃত্যনাট্যরূপ

কয়েকদিন আগে কলকাতায় একটি সঙ্গীত সংস্থার সংগঠকের সঙ্গে 'পরিশোধ' নৃত্যনাট্য প্রসঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়। প্রযোজনা সংক্রান্ত কিছু ছবি, স্মরণী ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মতামতসম্বলিত একটি খাতা এবং পরিশোধ কবিতার নৃত্যনাট্যের একটি সুন্দর স্ক্রিপ্টও তিনি আমাদের দেখান। আমাদের বিশ্বাস যে শ্যামা নৃত্যনাট্য সৃষ্টির আগে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকৃত 'পরিশোধে'র পরে এঁদের প্রযোজনাই প্রথম। সে ক্ষেত্রে কলকাতার কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত অপর একটি সংস্থা আয়োজিত 'পরিশোধ' নৃত্যনাট্য সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটি আমাদের মনে খুবই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। শুধু তাই নয়, এই প্রযোজনার নির্দেশক পরিচালকও পূর্বোক্ত প্রযোজনায় প্রধান ভূমিকায় রূপদান করেন। সে ক্ষেত্রে এই প্রযোজনাটিকে 'পরিশোধ' কবিতা অবলম্বনে প্রথম নৃত্যনাট্য বলে দাবী করা আমাদের কাছে খুবই অ-শিল্পীসুলভ বলে মনে হচ্ছে।

স্মরজিৎ দত্ত,
নয়াদিল্লী—৫।

'বিবিধ সংবাদ' প্রসঙ্গে'

গত ১৩ই আষাঢ়ের (১৮শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা) অমৃতে 'বিবিধ সংবাদ' শিরোনামায় প্রকাশিত মিনার্ভা থিয়েটারে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের বর্ণনায় দুইটি স্থানে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষকে মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের একমাত্র পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত লেখক অজ্ঞতাবশত এই ভ্রান্ত সংবাদ পরিবেশন করেন। তাঁর পরলোকগত দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম স্বর্গত পীযূষকান্তি ঘোষ ও স্বর্গত নীহারকান্তি ঘোষ।

অচ্যুতকুমার সিংহ,
কলিকাতা—২৬।

বঙ্গীয় কবি পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন

গত ১৩ ও ১৪ [illegible] সেন্ট জেভিয়ার্স কনভেন্টের সভাগৃহে বঙ্গীয় কবি পরিষদের দশম বার্ষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হয়েছে। বহু নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যসেবী তথা সাহিত্যরসিক এই অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। অধিবেশনের উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত কথাশিল্পী বনফুল। দু দিনে মোট চারটি অধিবেশন বসে। প্রারম্ভিক অধিবেশন ব্যতীত—কথাসাহিত্যের অধিবেশন, শিশু-সাহিত্যের অধিবেশন ও কাব্যসাহিত্যের অধিবেশন। প্রবীণ ও নবীন সাহিত্য-সেবীগণ তাঁদের স্বরচিত রচনা পাঠে শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। সর্বশ্রী মন্মথ রায়, শিবরাম চক্রবর্তী, অখিল নিয়োগী, কুমারেশ ঘোষ, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী প্রমুখ সাহিত্য-সেবীগণ এই অধিবেশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বড়িশা সাহিত্য পরিষদের আলোচনাচক্র

দক্ষিণ শহরতলীর জনপ্রিয় সাহিত্য সংস্থা বড়িশা সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে সম্প্রতি কবিতা পাঠ ও আধুনিক কাব্য সম্পর্কে একটি আলোচনাচক্রের অধিবেশন হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন দক্ষিণ কলকাতা আঞ্চলিক রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনের সম্পাদক শ্রীরমেশচন্দ্র পোদ্দার। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়। বহু নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যসেবী এই অধিবেশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তাঁরা অনেকেই স্বরচিত কাব্য পাঠ করে উপস্থিত সুধীবৃন্দকে আনন্দ দেন।

বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের পঞ্চাশ বর্ষপূর্তি

বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের পঞ্চাশ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে জওহর শিশু ভবনে বিশ্বভারতী প্রকাশিত গ্রন্থ ও চিত্রের একটি সুন্দর প্রদর্শনী হয়ে গেল। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি তাঁর ভাষণে বিশ্বকবিকে পলকাটা হীরের সঙ্গে তুলনা করেন। প্রকাশন শিল্পে নানা পরিবর্তনের সঙ্গে সমতা রাখতে গিয়ে বিশ্বভারতীরও যে নানা পরিবর্তন ঘটেছে তিনি তার উল্লেখ করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে গ্রন্থন বিভাগের নৈপুণ্যে সচিত্র রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশের চেষ্টা করা হবে। এর ফলে বহু শিল্পীও তাঁদের নৈপুণ্য কাজে লাগাবার সুযোগ পাবেন বলে আচার্য মন্তব্য করেন। বিশ্বভারতীর উপাচার্য শ্রীপ্রতুল গুপ্ত উপস্থিত ব্যক্তি-গণকে স্বাগত জানিয়ে সংক্ষেপে বিশ্ব-ভারতী গ্রন্থন বিভাগের ইতিহাস পর্যা-লোচনা করেন। প্রসংগত এই গ্রন্থন বিভাগের সহযোগিতার ফলে প্রকাশনের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও রবীন্দ্র রচনাবলীর ব্যবসায়িক সাফল্যের কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণযোগ্য কাগজের সঙ্কট

ভারতীয় প্রকাশক পরিষদের সভাপতি শ্যামলাল গুপ্ত সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এরূপ আশংকা প্রকাশ করেছেন যে, মুদ্রণযোগ্য কাগজের দুষ্প্রাপ্যতাহেতু প্রকাশকগণ পাঠ্য-পুস্তকসহ সর্বশ্রেণীর পুস্তকের মূল্য বাড়াতে বাধ্য হবেন। ক্ষেত্রবিশেষে এই মূল্য বৃদ্ধি ৫০ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশও হতে পারে। সরকার এতে সম্মত না হলে, কিম্বা বিকল্প নিয়ন্ত্রিত মূল্যে কাগজ সরবরাহের দায়িত্ব না নিলে দেশব্যাপী পাঠ্যপুস্তকের আকাল সৃষ্টি হবে বলে শ্রীগুপ্ত আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

চতুর্দশপদীর উদ্ভাবকের মৃত্যুর ছয়শত বৎসর

গত আঠারোই জুলাই লা পয়েজি পত্রিকার উদ্যোগে সনেটের অন্যতম উদ্ভাবক ইতালীয় কবি পেত্রার্কার ছয় শততম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ সাহিত্যানুষ্ঠান হয়ে গেছে। ৪১নং চৌরঙ্গী রোডে, কনক বিল্ডিংস-এর চারতলায় এ উপলক্ষে সেদিন বহু বিশিষ্ট সাহিত্যানুরাগীর সমাবেশ ঘটে-ছিল।

ভারতীয় ইতিহাসের বিকৃত ব্যাখ্যা

ভারতের প্রথম জাতীয় সংগ্রামকে সাম্রাজ্যবাদীগণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এমন কি এদেশীয় ঐতিহাসিকগণও স্বাধীনতার পর থেকে বহু প্রতিষ্ঠাবান ঐতিহাসিকের নব নব গবেষণালব্ধ আবিষ্কারের ফলে ঐ ভুল তথ্য যথাযোগ্য স্বীকৃতি লাভ করেছে। তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহ যে নিছক সিপাহীদের একটা ব্যাপার ছিল না, সর্বশ্রেণীর ভারতীয় জনগণ যে ঐ সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন — সেকথা আজ সকলেই স্বীকার করে থাকেন। কিন্তু এখনও বহু ভুল ও বিকৃত তথ্য প্রচারিত হয়ে থাকে। যেগুলি উদ্দেশ্যমূলক বলে মনে করবার কারণ আছে। এ সবের অন্যতম হলো 'বিশ্বের ইতিহাসের পট-ভূমিকায় ভারতের অবদানের কথা। সম্প্রতি প্রাভদায় তিনজন বিশিষ্ট রুশ ঐতি-হাসিক—কে আনাতোনোভা, সি বনগার্ড-লেভিন ও ও জি কটোভস্কি এ সম্পর্কে লেখা একখানি বই-এর সমালোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে বহু ঐতিহাসিক এমন কি আজকের দিনেও ঔপনিবেশিক পটভূমিকায় ভারতের সব কিছুর বিচার করে থাকেন। তাঁরা মনে করেন যে, প্রাচীন তথা অাসুরিক ভারতের সামাজিক অর্থ-নৈতিক তথা সাংস্কৃতিক বৃত্তান্ত যা আজকের দিনে বহু ঐতিহাসিকের শ্রমের ফলে জানা গিয়েছে তার ভিত্তিতে ভারতীয় ইতিহাসের নতুনতর পর্যালোচনা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

যে কাজটা ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের করণীয় ছিল, সেই কাজটাই রুশ বুদ্ধি-জীবীগণ করেছেন দেখে আমরা তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু সেই সঙ্গে এমন আশাও আমরা করবো যে অন্তত এখন এ সম্পর্কে এদেশে সক্রিয় কোনও প্রচেষ্টা দেখা দেবে যার ফলে ভারতের সর্বাঙ্গীন সঠিক ইতিহাস জনগণ জানতে পারবে।

—জরৎকারু

নতুন বই

[illegible] (কাব্য সংকলন)। মণীশ ঘটক। প্রকাশক—দীপক সে ১০৭।২ রাজা রামমোহন সরণী, কলকাতা-৯। দামের উল্লেখ নেই।

'[illegible]' কাব্য সংকলন মূলত মণীশ ঘটক রচিত সনেট সংকলন। সনেটগুলির সবই খ্যাতনামা মণীষী কবি-সাহিত্যিক দেশ নেতা ইত্যাদির নামে নামাঙ্কিত। শরৎ [illegible] গঙ্গোপাধ্যায় জীবনানন্দ বুদ্ধদেব [illegible] লুথার কিং শরৎচন্দ্র পন্ডিত সীমান্ত গান্ধী প্রমথ চৌধুরী নজরুল সুভাষচন্দ্র [illegible]নাথ বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দের নাম গ্রহণ করে রচিত। রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের নাম দিয়ে দু'টি করে সনেট রচনা করেছেন কবি মণীশ ঘটক। মণীশ ঘটক প্রতিষ্ঠিত ও প্রবীণ কবি ও উপন্যাসিক। [illegible] কবি-ব্যক্তিত্ব অন্যান্য বিবিধ বিচিত্র ব্যক্তিত্বগুলিকে যথযথ মর্যাদা দিয়েই সনেটে [illegible] করেছে। শরৎচন্দ্র পন্ডিতের নামে লেখা কবিতাটি সনেট নয়, অন্ত্যমিল দেওয়া [illegible] চরণ ও দুই স্তবকের কবিতা। সনেটগুলিতে প্রবীণ কবির প্রাজ্ঞ জীবন ভাবনা ও [illegible] ভাবনার যথাযথ স্বাক্ষর আছে। [illegible]টির কলেবর ক্ষীণ হলেও সর্বাবয়ব [illegible] পরিকল্পনা অবশ্যই উল্লেখের দাবী [illegible] এবং [illegible]।

অতন্দ্র সীমান্ত ট্যাকস মন্ত্রী দশোর দর্পণে (একাংক সংকলন)। বোম্মানা বিশ্বনাথম। প্রকাশক ঃ বি রাণা ৬২ নিমতলা রোড কলকাতা-৫৬। প্রথম দু'টির মূল্য পঞ্চাশ পয়সা শেষটির মূল্য এক টাকা।

'অতন্দ্র সীমান্তে' একটি একাংক [illegible] পুস্তিকা। 'ট্যাকসমন্ত্রী' এবং '[illegible] দর্পণে' নাট্য-পুস্তিকা দু'টিও [illegible] একাংকের সংকলন। নাট্যকার [illegible] বিশ্বনাথম গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। আলোচ্য নাট্য-পুস্তিকা তিনটি [illegible] নাট্য-খ্যাতির পরিচয় বহন করে। '[illegible] দর্পণে' নাট্য পুস্তিকাটি নাম-[illegible] ছাড়া আরও দু'টি একাংক আছে 'বাড়ির হৃদয়' ও 'একটি [illegible]'। [illegible] সীমান্তে'র [illegible] ও অতন্দ্রের সহায়তা ক্রোধ সীমান্তের দুর্জন পাই-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও সংকৌশলে [illegible] করার কাহিনীটি সুগ্রথিত। [illegible] চরিত্র—ট্যাকসমন্ত্রী দালাল গণহরি [illegible]। কিন্তু নির্মল হাসির মাধ্যে [illegible] অব্যবস্থা ও বৈষম্যের সুন্দর [illegible] এঁকেছেন। 'বাড়ির হৃদয়' একাংকের [illegible] তার পত্র এবং ডঃ রায়ের [illegible] সুঅঙ্কিত। নাটকটি অনেকাংশ [illegible]। শেষে দয়ালসুন্দরের মানবিক [illegible] নাট্যকার যথেষ্ট ক্ষমতার সঙ্গে এঁকেছেন। 'একটি দুর্নীতির অফিসের কর্মচারীর ও স্থানীয় যুবকদলের যৌথ আন্দোলন ও কর্মতৎপরতার বিষয়টি সমন্বয়ে ও নাট্যক্রিয়ায় দীপিত। 'দশোর দর্পণে' তিনটি মাত্র চরিত্র চুনচুনিয়া ত্রিদিবেশ ও প্রণব সুঅঙ্কিত। প্রত্যেকটি একাংকই নাট্যকারের যথেষ্ট নাট্যদক্ষতার পরিচয় বহন করে।

ক্রমান্বয় অধঃপতন ও অন্যান্য রচনা (প্রবন্ধ)। চিত্ত সিংহ। সজনী ৬৭-এ বেলগাছিয়া রোড, কলকাতা-৩৭। দশ টাকা।

শ্রীচিত্ত সিংহ একজন তরুণ কবি প্রবন্ধকার ও চিত্রশিল্পী। বর্তমান গ্রন্থটি কয়েকটি বিচ্ছিন্নভাবে রচিত ও প্রকাশিত প্রবন্ধের একটি সুসংবদ্ধ সংকলন গ্রন্থ। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত প্রকাশিত যুবকীয় রচনার মধ্য থেকে লেখক কিছু প্রবন্ধ বাছাই করে তাঁর পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। প্রবন্ধগুলি লেখক চিত্ত সিংহের সাহিত্যিক ক্ষমতার পরিচয় বহন করে।

চিত্ত সিংহ লিখিত গ্রন্থ সমস্ত প্রবন্ধই সাহিত্য সম্পর্কিত, কিন্তু কোনটাই ছাত্রপাঠ্য বা কোন বিশেষ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্পর্কিত নয়। প্রবন্ধকারের কল্পনাপ্রবণ মনই বিষয়গুলির নির্বাচক হওয়ায় বিষয়ের মধ্যে বৈচিত্র্য আছে। সে বৈচিত্র্য কখনো রম্য ভঙ্গি নির্ভর রোমান্টিক অনুভাবনায় মদুস্বাদী হয়েছে যেমন কলকাতার কুয়াশা আবার কিছু প্রবন্ধ রম্য পথ থেকে গভীরে কিছু তত্ত্ব ও তথ্যের আশ্রয়ে সাহিত্যিক রস সরসতার উজ্জ্বল্য পেয়েছে যেমন মূল্যবোধের প্রশ্নে। 'সংগ নিরসংগতা' 'স্মৃতি-চিহ্ন' 'প্রত্যয়ের প্রশ্নে' ইত্যাদি প্রবন্ধে লেখক চিত্ত সিংহের 'সাবজেকটিভ' ভাব ও ভাবনার গভীরতলস্থায়ী স্নিগ্ধ চেতনার ও মন এবং জীবন সম্পর্কিত যথার্থ মূল্যায়নের পরিচয় মেলে। চিত্ত সিংহের গদ্য ভাষা কবির লেখার গদ্যের মত চিকন হলেও প্রয়োজনে তা যুক্তি-চিন্তার দৃঢ়তা এড়িয়ে যায় নি। এখানেই লেখকের প্রাবন্ধিক সত্তার জয়।

বাঙালীর জয় (কাব্য সংকলন)। খোন্দকার মসুদার রহমান। জাকারিয়া প্রকাশনী, ৪২৯ বড় মগবাজার ঢাকা-২। সাত টাকা।

'বাঙালীর জয়' বাংলাদেশের এক খ্যাতনাম দেশপ্রেমিক কবির হৃদয় গাথা। বিশেষ গ্রন্থটির ভূমিকা অংশে বিস্তারিতভাবে কবি খোন্দকার মসুদার রহমান তাঁর কাব্য বিষয় কবি ভাবনা ও দেশ-সম্পর্কিত আবেগ-উচ্ছ্বাস ও মনন সম্পর্কে চিন্তা উপস্থাপিত করেছেন। কবিতাগুলিতে সেই চিন্তাই শৈল্পিক রস-তাৎপর্য লাভ করেছে। ছন্দে কোন নূতনত্ব না থাকলেও স্তবক বন্ধে আধুনিক কোন পরীক্ষামূলকতার পরিচয় অনুপস্থিত হলেও মসুদার রহমান তাঁর কাব্য বক্তব্যে যথেষ্ট আন্তরিক। সহজ সরল ভাষায় আপন আবেগ উদাম ও দেশ-ভাবনার আন্তরিকতা সর্বোপরি মানবতা-বিধ্বংসী বিরুদ্ধ শক্তির স্বরূপটিকে চিহ্নিত করেছেন। কবিতাগুলি পড়ে কবি তাঁর দেশ ও অত্যাচারিত মানুষের অসহায়তা এবং সে দেশের জনমানসের সঙ্গে সর্বকালের সর্বদেশের মানবপ্রাণের সহমর্মিতা উপলব্ধি করি। এখানেই কবি খোন্দকার মসুদার রহমান রচিত বাঙালীর জয় কাব্য সংকলনের সর্বাধিক সার্থকতা।

বই\পত্র-পত্রিকা

রোশেনারা কাদের (কাব্য সংকলন) নিমাই-কুমার ঘোষ। মোহন লাইব্রেরী ৩৫-এ, সূর্য সেন স্ট্রীট কলকাতা-৯। চার টাকা।

প্রথম কবিতার নাম 'রোশেনারা' শেষ কবিতার নাম 'কাদের'—এই মিলিয়ে নিমাইকুমার বসুর সম্প্রতি প্রকাশিত কাব্য সংকলনের নাম 'রোশেনারা কাদের'। সমকালের বহু ঘটনা রাজনীতি ভাবনা নিস্পৃহ সাম্যবাদ ব্যক্তিত্ব-ভাবনা মানবভাবনা— এইসব বিষয় নিমাইকুমার বসুর কবিতার মূলে নিহিত। কবি বীর রমণী রোশেনারার প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা জানিয়েছেন আবার সমস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন। [illegible] অমিল গদ্য-ছন্দের কবিতাগুলি [illegible] গ্রন্থটিকে বিচিত্র আস্বাদ্য-ক্ষমতা দান করেছে। যাঁরা সব রকমের কবিতা পড়ে আনন্দ পান এ গ্রন্থ তাঁদের [illegible] করবে।

ঘুমন্ত দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ (কাব্য সংকলন)—শলভ শ্রীরাম সিং। উলথা প্রকাশন ৩৩ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ (আন্ডার গ্রাউন্ড নং ২) কলকাতা-১২। তিন টাকা।

শলভ রায় সিং একজন প্রবাসী হিন্দী কবি। কলকাতায় যে বাংলা কবিতা ও বাঙালী কবি দল আছেন তার সঙ্গে শলভ রায় সিং-এর যোগ গভীর ও নিবিড়। শুধুমাত্র ভাষা ছাড়া যে কোন বাঙালী কবির সঙ্গে আলোচ্য কবির তেমন কোন ব্যবধান নেই। ব্যবধান যে নেই এই ত্রিশ বয়স্ক কবির মোট একুশটি কবিতা অনুবাদ করে উলথা প্রকাশন আলোচ্য 'ঘুমন্ত দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ' গ্রন্থটি প্রকাশ করে প্রমাণ দিয়েছেন। অনুবাদক প্রখ্যাত তরুণ কবি জয়ন্তকুমার। 'হাওড়া ব্রিজ সান্ধ্য' কবিতার সিদ্ধান্তে * কবি বলেছেন—দিকে দিকে ঝুলছে সাপের

[illegible] হয়তো—বিদগ্ধের জানালাগুলি [illegible] আমায় [illegible] শক্ত রায় সিং-এর কবিতার নাট্যরস প্রচ্ছন্ন কিন্তু অবশ্য নাটকীয়তা নয় বরং দর্পণে আত্মবিম্বকে বিভিন্ন প্রতীকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কিছু সময় স্বগত ভাবনের অন্তরঙ্গ গভীর গোপন পরিবেশে কাল যাপন করেন। অবশ্যই [illegible] খ্যাত কীর্তি নীতি কবিরাই এই প্রণালী ধরানা। তবু শক্ত রায় সিং আশ্চর্য সহজ সরল ভাষায় শব্দ ছন্দ প্রতীকে কাব্য বক্তব্য রাখতে অভ্যস্ত। তাই তার পাঠক-কুল সহজে বাড়তে পারে। অনুবাদক হিসেবে জয়ন্তকুমারের প্রধান কৃতিত্ব হল কবির কলম হাতে আছে বলেই জয়ন্তকুমার আর এক কবিকে সুন্দরভাবে সর্বকালের বাঙ্গালী পাঠকের সামনে আনতে পেরেছেন সাহিত্য পথের এক সতীর্থকে। অনুবাদ সহজ সরল সাবলীল হওয়ার কারণেই গ্রন্থটি উল্লেখ্য।

গ্রামবাংলা। সম্পাদক নকুল মল্লিক। মসলন্দপুর। ২৪ পরগণা। দশ পয়সা।

'একটি দোয়েল দেয় শিখিয়ে' উষ প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের কবিতাটি ভালো লেগেছে। হঠাৎ যেন বহুদূর থেকে গ্রামবাংলার সোঁদা মাটির গন্ধ বায়ুতরঙ্গে ভেসে এলো। 'রবীন্দ্রনাথের গান : একটি ভাবনা' সন্দীপ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটিও উল্লেখ করার মতো। ছাপা পরিচ্ছন্ন।

সাগরপারে। (রবীন্দ্র স্মরণ সংখ্যা) সম্পাদক হিরণ্ময় ভট্টাচার্য। ১২২ বিপিন-বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কোলকাতা-১২। এক টাকা।

'সাগর পারে' সুদূর ইংল্যান্ডের প্রবাসী বাঙালীদের কাছে বাংলাদেশের সাহিত্যের হাওয়া বয়ে নিয়ে যায়। শুধু সাহিত্যের হাওয়াই নয় কোলকাতার 'লোডশেডিং' থেকে শুরু করে সি এম ডি-এর গর্ত খোঁড়া পর্যন্ত টুকিটাকি খবরও এতে থাকে। এই সংখ্যায় লিখেছেন মৈত্রেয়ী বসু, এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, মাহমুদ হাসান এবং লতিকা হিললী। ছাপা পরিচ্ছন্ন।

কথা (আষাঢ় : ১৩৮১) সম্পাদক : হাসান আজিজুল হক এবং অসিতবরণ ঘোষ। ২৭ আহসান আহমেদ রোড, খুলনা। দাম দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

'শুধু দেশ আর সমাজকে আমরা ভালো করে বুঝতে চাইছি কথাসাহিত্যের আয়নায় তাকে প্রতিফলিত দেখতে চাইছি।' —এই উদ্দেশ্য নিয়েই পত্রিকাটির বর্তমান সংখ্যার রচনাগুলি মুদ্রিত হয়েছে। স্যামুয়েল বেকেটের নাটকের অনুবাদ, সনৎকুমার সাহা, আবুল কাসেম সাঁফ আহমেদ এবং আবু বকর সিদ্দিকের আলোচনা আছে বিভিন্ন প্রসঙ্গে। মুক্তি-যুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা হাসান আজিজুল হকের গল্পটি অনেককেই আকৃষ্ট করবে।

হিজল বনে [illegible] (কাব্য সংকলন) [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] কলকাতা-[illegible]। দু টাকা।

[illegible] [illegible] [illegible] নামে কেন কবিতা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভাবে কবি ব্যবহৃত এই [illegible]-এর [illegible] বিভিন্ন কবিতায় [illegible] হয়ে আছে—বোঝা যায়। [illegible] [illegible] প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন আধুনিক কবি। এর প্রমাণ বহু শব্দ প্রয়োগে ছন্দের বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে চিত্রকল্পের যথাযথ প্রয়োগে নিহিত। তবে সংকলনভুক্ত প্রায় প্রতিটি কবিতার মধ্যেই '[illegible]' শব্দটির প্রয়োগ সচেতন পাঠককে ক্লান্ত করতে পারে।

জানালার ধারের মেয়েটি (কাব্য সংকলন)। নজরুল ইসলাম। প্রকাশক—সুরজিৎ দত্ত ত্রিবেণী হুগলী। দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

তরুণ কবি নজরুল ইসলামের সম্ভবত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'জানালার ধারের মেয়েটি' ছন্দে কোথাও কোথাও ত্রুটি দুর্লক্ষ্য নয়। অকারণ আবেগে কোন কোন বক্তব্য নীরস গদ্যাত্মক হয়ে গেছে। কোথাও বা স্থূল বক্তব্যই একমাত্র হওয়ায় কবিতা সুখপাঠ্য হয় নি। তবু এই তরুণ কবি এক-আধটি চকিত কাব্যিক পংক্তি যে রচনা করেন নি তা নয়। আলোচ্য কবির আধুনিক কবিতা পাঠ এখনো যথেষ্ট নিষ্ঠার সঙ্গেই প্রয়োজন।

স্বপন-সুন্দরী। পথিক। প্রকাশক—রমেশ-চন্দ্র রায় ১ নিবেদিতা লেন কলকাতা-৩। তিন টাকা।

'পথিক' নামের এই লেখকের লেখা 'স্বপন-সুন্দরী' বস্তুত লেখকের স্ত্রী বিয়োগের পর জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কিত কিছু গূঢ় দর্শন ভাবনা সম্বন্ধ জীবন চিন্তার সংকলন লেখক আত্মচিন্তাকে গল্পচ্ছলে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনা সহজ, সরল : পরিভ্রমণ মূলতঃ মানস ভ্রমণ। লেখক স্বপ্ন-লোক জগত রচনা করে তারই লীলায় নানা প্রসঙ্গ এনেছেন। নদীয়ার অদ্বৈত-নিত্যানন্দ মহাপ্রভু ইত্যাদি বিষয় অবতারণা করে এপার-ওপার—জীবন নদীর দুটি দিককে রম্য ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

পদ্মাগঙ্গা। সম্পাদকা মৃণাল বসু এবং গুণদেব বিশ্বাস। ৭৯বি চিত্তরঞ্জন এভিনিউ। কলকাতা-১২। দাম এক টাকা।

পদ্মাগঙ্গার সাম্প্রতিক সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখেছেন অন্নদাশঙ্কর রায় এবং ভূপেশ আচার্য। গল্প লিখেছেন আশাপূর্ণা দেবী মনোরঞ্জন বসাক ও গুণদেব বিশ্বাস। এছাড়া মৃণাল বসুর উপন্যাস এবং বেশ কিছু কবিতাও রয়েছে। ছাপা এবং প্রচ্ছদে মার্জিত রুচির ছাপ আছে।

সংখ। সম্পাদক অসিত চট্টোপাধ্যায়। কেদার ভট্টাচার্য লেন। ইছাপুর। সাঁত্রাগাছি। হাওড়া-৪।

অরুণ। সম্পাদক শৈবাল মহাপাত্র। ২৯।৪-এ১ চেতলা সেন্ট্রাল রোড। কলকাতা-২৭ দাম এক টাকা।

কিছু কবিতা গল্প উপন্যাস এবং প্রবন্ধ রচনা নিয়ে অরুণের বর্তমান সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ করার মত কোনো লেখা চোখে পড়ল না। প্রচ্ছদটি ভালো লেগেছে।

বিংশতি (কাব্য সংকলন) : স্বপন বসু। প্রকাশক : সলিলকুমার ঘোষ, ১৬৩, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড, কলকাতা-৪। দু টাকা।

কবি স্বপন বসু 'বিংশতি' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে বলতে চেয়েছেন, কবি পৃথিবীকে ভালবাসেন, ভালবাসেন মানুষ জীবন, জন্মকেও। তাই অবলীলায় বলতে পেরেছেন, 'আমি তাই জনজন্মা হয়েও রাজি।' আধুনিক যন্ত্রণা, [illegible] বাঁচার বাসনা—এসবই কবিমনকে [illegible] তাড়িত করে। অধিকাংশ কবিতা গদ্যছন্দে লেখা। চিত্ররচনা আরও গভীর হওয়া উচিত ছিল। কোন কোন কবিতায় গদ্যকবিতার প্রাণ অনুপস্থিত। কবির পক্ষে আধুনিক কবিমান ও কাব্য-আঙ্গিক এখনো অনু-শীলনযোগ্য।

দীপ্যন্ত (মে-জুন) সম্পাদক—গণেশ বসু এবং দীপেন রায়। ৬১।২, হরতকী বাগান লেন, কলকাতা-৬। দাম দুই টাকা।

চিলির সামরিক জান্তার হাতে নিহত কবি পাবলো নেরুদা সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখেছেন বিজয় দেব নেরুদার একটি কবিতা অনুবাদ করেছেন আশিস সেনগুপ্ত। কবিতা লিখেছেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত গোপাল ভৌমিক অমিয় ধর, অনন্ত দাশ, প্রশান্ত রায় এবং আরো অনেকে। কবিতার বই-এর আলোচনা পর্যায় সব থেকে উল্লেখযোগ্য। এই জাতীয় গ্রন্থালোচনা পুরোন যুগের পরিচয় পত্রিকার কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

ছিন্ন প্রজ্ঞা এবং প্রবাস (কাব্য সংকলন)—চন্দন সেন। প্রকাশিকা, কৃষ্ণা দত্ত, ১।২৪ মানিকতলা, কলকাতা-৩৭। তিন টাকা।

চন্দন সেন তাঁর 'ছিন্ন প্রজ্ঞা ও প্রবাস' কাব্য সংকলনে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথকে আজ আকাঙ্ক্ষা-প্রণাম জানিয়ে বলেছেন "তুমি/কালরাত্রির মুছে দাও ঘরে ও বাহিরে" এর পরের কবিতাগুলিতে কবি স্মরণ করেছেন তাঁর সাম্প্রতিক স্বদেশকে অ মায়ের অতীত অস্তিত্ব, স্বাধীনতার নিষ্ফল সত্তর দশকের বাংলাদেশ, সময়-অসময় দুঃসময়, পৌত্তলিকতা থেকে নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য, ক্ষোভ ইত্যাদি। [illegible] গুলি সুলিখিত, তদুপরি অন্তর্নিহিত [illegible] আধুনিক, মানবভাবনায় চিরকালীন। [illegible] সবই গদ্য কবিতায় লেখা কবিতাগুলি অনুভাবী পাঠকদের কাব্যসম্ভাবনায় [illegible] দেবে বলে মনে হয়।

আর্থিক প্রসঙ্গ

বিচিন্তা

সোনা :

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সোনা বোধহয় বিচিন্তাভুক্ত হতে পারে না, কারণ বর্তমান দিনের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়— সম্প্রসারণ আয় কর্মসংস্থান মুদ্রাস্ফীতি, সুদের হার, লোকের সাধারণ জীবনের সঞ্চয় ইত্যাদির সঙ্গে সোনার সম্পর্ক নেই বললেই হয়। তবুও সোনার কথা বা আরও সুস্পষ্টভাবে বলতে গেলে সোনার দামের কথা লোকের মুখে মুখে। সাধারণ লোকের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম অর্থনীতিবিদরাও সোনার প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে পারছেন না। এই অবস্থায় কেইনস বা ফ্রয়েডেরই বা কি প্রতিক্রিয়া হত? হয়ত তাঁরা উপদেশ দিতেন : ঐ পীত ধাতুর মিথ্যা মোহ থেকে মুক্ত হও। এই উপদেশের মধ্যেই কিন্তু রয়েছে একটি বিশেষ স্বীকৃতি : ঐ পীত ধাতুর প্রতি মানুষের আকর্ষণ মিথ্যা হলেও তীব্র। আর মিথ্যাই বা কেন, সোনার কি কোন উপযোগ নেই? অ্যাডাম স্মিথ অবশ্য অভিযোগ করেছিলেন যে উপযোগের তুলনায় সোনার বাজার দাম অযৌক্তিকভাবে বেশী সোনার ক্ষেত্রে ব্যবহার-মূল্য এবং বিনিময়-মূল্যের মধ্যে বিস্তর ফারাক। ফলে উদ্ভূত হয়েছে মূল্যতত্ত্বের প্যারাডকস।

ঠিক এই প্যারাডকসের সমাধানে নয়, বিশ্ব অর্থ-ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করবার জন্যে বিভিন্ন দেশ মুদ্রা-ব্যবস্থাকে স্বর্ণ-ভিত্তিক করেছিল এবং ফলে জন্ম নিয়েছিল স্বর্ণমান। আশা ছিল এর ফলে টাকা-কড়ির জোগান ও মূল্যস্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতেই সাধিত হবে। এবং তা হয়েছিল মাত্র কয়েক দশক ধরে—যখন মজুরি ও মূল্যস্তর নিয়মিত ওঠানামা করত।

বর্তমানে ত' মজুরি হ্রাসের কোন প্রশ্নই নেই, আর মূল্যস্তর ত' ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী। এ অবস্থায় সোনার উপযোগ কি? উপযোগ হল সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসেবে। শুধু ব্যক্তি নয়, বিভিন্ন রাষ্ট্রও এই দিকে ঝুঁকেছে—ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়েই স্বর্ণসঞ্চয়ে ব্যাপৃত। এর ফলে সুযোগ মিলেছে সোনার ফাটকা কারবারীদের।

ব্যাপারটা হল এইরকম। বর্তমানে সোনার আন্তর্জাতিক দাম বা আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (আই-এম-এফ) নির্ধারিত দাম হল আউন্স প্রতি ৪২-২২ ডলার, আর বাজারে দাম ২৫০—৩০০ ডলারের মধ্যে ওঠানামা করছে। (১ ডলার =৯-১০ টাকা) এর ফলে ফাটকা কারবারী-দের যে সুবিধা হবে তা সহজেই অনুমেয়—দামে যদি ৫০ ডলারের তারতম্য হয় তবে স্পেকুলেশনের ক্ষেত্র থাকবেই।

এত দামে সোনা কিনে সঞ্চয় সংরক্ষণ কি সম্ভব? হয়ত নয়। কিন্তু লোকে যদি সন্ত্রস্ত হয় বা বিশেষ লোভী হয়ে ওঠে তখন ঘটে তাদের বুদ্ধিভ্রম। অবশ্য সব স্বাধীন নাগরিকেরই অধিকার আছে নিজস্ব সঞ্চয় ধ্বংস করবার, কিন্তু রাজনৈতিক সংস্থা বা রাষ্ট্রেরও কি সেই অধিকার আছে? প্রশ্নটি তুলেছেন অধ্যাপক পল ম্যানুয়েলসন। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে স্বর্ণ সঞ্চয়ের ব্যাপারে কাড়াকাড়ি পড়ে যাওয়ায় সোনার দাম আরও বাড়ছে। শোনা যাচ্ছে, অন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার সোনার আন্তর্জাতিক মূল্য পুনর্নির্ধারণের কথা ভাবছে। হয়ত পুনর্নির্ধারিত দাম হবে আউন্স প্রতি ১৪০—১৫০—১৬০ ডলার। এই গুজবের ফলে ব্যক্তিগত স্বর্ণ সঞ্চয়ের প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ফাটকা কারবারীরা হয়ে উঠেছে আরও সক্রিয়।

কফি বা চা :

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তেলের পর কফির স্থান—বছরে ৪৫০ কোটি ডলারের মত কফি আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রী হয়। তেল উৎপাদনকারী দেশগুলো তাদের তেলের দাম অবিশ্বাস্যভাবে বাড়িয়ে নিয়েছে, এইবার কফি উৎপাদনকারী দেশগুলো বিশেষ করে কলম্বিয়া, ব্রাজিল, অ্যাঙ্গোলা এবং আইভরী কোস্ট—জোট বেঁধেছে। কিভাবে কফির দাম বাড়ানো যায় সে বিষয়ে শলাপরামর্শ শুরু হয়েছে।

সুতরাং কফির দাম বাড়বেই এবং এর ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—সর্ববৃহৎ কফি আমদানীকারী দেশ।

চায়ের দামও বাড়তে শুরু করেছে। সেদিন কলকাতায় নিলামে এক বাগানের চা কিলোগ্রাম প্রতি ২২০ কোটি টাকায় বিক্রী হয়েছিল—যা সর্বসময়ের রেকর্ড।

কিন্তু এ হল অন্ধকারে এক বিদ্যুৎ ঝিলিকের মত—চা কফির ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত দ্রব্য হলেও চা-এর দাম ঠিক কফির মত ঊর্ধ্বমুখী নয়, কারণ ভারত, কেনিয়া, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা—এই চারটি প্রধান চা উৎপাদনকারী দেশ এখনও স্বতন্ত্রভাবে চলছে। কিন্তু জোট বাঁধার দিন কি এখনও আসেনি? বর্তমানে পণ্যের তেজী বাজারের দিনে আত্মরক্ষার্থে ত করতে হবে। যেমন কলি তেমনি চলি। তাছাড়া মধ্য-প্রাচ্যে চা-এর চাহিদা বাড়ছে। এই সুযোগ —অবশ্য সাবধানতার সঙ্গে গ্রহণ করাই উচিত বলে মনে হয়।

আফিম :

আফিমের নেশায় মার্কিন মুলুক ক্রমশ বুঁদ হয়ে উঠেছিল ৬ লক্ষের ওপর কলেজের ছেলেমেয়ে নাকি এই নেশায় আসক্ত হয়েছিল। এই মাদকের ৮০ শতাংশ আসত তুরস্ক থেকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তুরস্ককে অনুরোধ করে : আপনারা আফিমের চাষ বন্ধ করুন আমরা ক্ষতিপূরণ করব। সঙ্গে সঙ্গে ১৯৭১ সালে ৩৫৭ কোটি টাকার ক্ষতি-পূরণের ব্যবস্থা হয় এবং এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঐ মাদক দ্রব্যসেবীর সংখ্যা নাকি হ্রাস পেয়ে ২ লক্ষে দাঁড়ায়।

সম্প্রতি আবার তুরস্ক আফিম চাষের সিদ্ধান্ত করেছে। কারণ? ক্ষতিপূরণের টাকা পর্যাপ্ত নয়—আমদানি পণ্যের দাম বেড়েছে। অতএব, হাস-হাসের চাষ করতেই হবে। তা ছাড়া অপরের কি লাভক্ষতি হল তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার কি? উক্তি করেছেন তুরস্ক সরকারের এক মুখপাত্র।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য সাহায্য বন্ধের ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু তাতে যে ফল ফলবে তা মনে হয় না। যা হোক আন্তর্জাতিক আইন যেমন বিধিশাস্ত্রের বিলয়স্থান, তেমনি আন্তর্জাতিক অর্থনীতিও নীতিশাস্ত্রের পরিধির বাইরে। কিন্তু এদিক দিয়ে ভাববার দিন কি আসেনি? পৃথিবী দিন দিন ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হচ্ছে ফলে ধ্বংস থেকে বাঁচতে হলে পরিকল্পনার—সভ্যতার পরিকল্পনার—দিন নিশ্চয়ই এসেছে।

—শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

(৫১)

জাহাজ তখন সমুদ্রে ক্রমাগত ভেসে বেড়াচ্ছিল। জ্যোৎস্নার ভেতর জাহাজটাকে আর জাহাজ মনে হচ্ছে না। সত্যি যেন কিংবদন্তির জাহাজ হয়ে গেছে। অশরীরী আত্মার মতো সে মহাশূন্যে যেন পাড়ি জমিয়েছে।

—স্যার ওরা আপনার সংগে কথা বলতে চায়।

স্যালি হিগিনস কেবিনের ভেতর চুপ-চাপ বসেছিলেন। টেবিলের লম্ফটা বাতাসে কখন নিভে গেছে, কখন চিফ-মেট ঘরে ঢুকেছে তিনি টের পাননি। তিনি মুখ না তুলে বললেন কারা দেখা করতে চায়।

—সব জাহাজিরা।

—ওরা দেখা করতে চায় বল আমি এখন দেখা করতে পারব না। কোয়ার্টার-মাস্টারকে বল লম্ফটা যেন জেলে দিয়ে যায়।

চিফ-মেট বলল অবস্থা স্যার ভাল না!

—অবস্থা ভাল কে বলেছে!

—ওরা বলছে জাহাজে থাকবে না।

—থাকবে না কোথায় যাবে!

—ওরা বোটে নেমে যেতে চাইছে।

—কতদূর যাবে?

—যতদূর সম্ভব।

—যতদূরে কি দশ-বিশ মাইল কি পঞ্চাশ একশ পাঁচশ মাইল! সহসা উত্তেজিত গলায় বললেন—চিফ-মেট লম্ফটা তোমাকে জেলে দিতে বলেছি না!

চিফ-মেট গলা বের করে ডাকল কোয়ার্টার-মাস্টার। তারপর কেবিনের ভেতর ফের সেই অসহায় অন্ধকার। চোখের ওপর অন্ধকারটা সরে গেছিল বাইরে মুখ বের করতেই সমুদ্রের জ্যোৎস্না ভয়ংকরভাবে চোখের ওপর ঝলমল করে উঠেছিল এখন কেবিনের ভেতর সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। কেবল ঘুলঘুলির মতো পোর্ট-হোল দিয়ে সামান্য জ্যোৎস্না নেমে আসছে। আর মনে হচ্ছিল মানুষটা একটা ইজি-চেয়ারে চোখ বুজে পড়ে আছে। ঠিক লম্ফ না জ্বাললে সে বুঝতে পারবে না। বাইরে সেই ক্রোজ-নেস্টে মশাল জ্বলছে। জাহাজের সামনে পেছনে দুটো অতিকায় লম্ফ ক্রোজ-নেস্টে ঠিক আগের মতো এবং কোথাও থেকে একটুকু কোনো গণ্ডগোল ভেসে আসছে না। জাহাজটা সহসা ভারি নিশ্চুপ। সবাই যেন জাহাজ ছেড়ে চলে গেছে।

কোয়ার্টার-মাস্টার লম্ফ জ্বালিয়ে চলে গেল নিচে। স্যালি হিগিনস এবার চিফ-মেটের দিকে তাকালেন। বললেন—বোটে তোমরা কতদূর যেতে চাও।

চিফ-মেটের ফ্যাকাশে মুখ আরও ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে বলল—আমি তো স্যার জানি বেশি দূরে বোটে যাওয়া যাবে না।

—যাওয়া যাবে না ঠিক না। যাওয়া যাবে।

মোটর-বোট যখন বেশ কিছু দূরে যেতে পারবে। তেল ফুরিয়ে গেলে পালে হাওয়া লাগবে। সবই তুমি জান। কিন্তু চিফ-মেট সেটা কতদূর। কতদিনে! কতদিনে ডাঙ্গা পাবে যখন [illegible] পায় না অহেতুক জাহাজ থেকে নে[illegible]ভ!

চিফ-মেট বলল—স্যার আপনি কিছু টের পাচ্ছেন না!

—কে বলছে টের পাচ্ছি না! সব টের পাই। স্টোর-রুম থেকে দুটো কনডেনসড মিল্ক কে চুরি করেছে তা বলতে পারি। স্যনডু বিস্কের প্যাকেট কে নেকড়ায় জড়িয়ে রেখেছে এবং রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে অন্ধকারে বসে খাচ্ছে তা আমি জানি না তো তুমি জানো চিফ-মেট!

চিফ-মেট বলল—কিন্তু স্যার সবাই নিচে জড় হয়েছে!

—নিচে মানে বোট-ডেক।

—ইয়েস স্যার।

—কেন! কেন জড় হয়েছে! কোনো সাড়াশব্দ পাচ্ছি না তো!

—ওরা স্যার বলছে জাহাজে থাকবে না! নেমে যাবে। চুপচাপ নিচে বসে আছে।

—নেবে যাবে বললেই নেমে যাওয়া যায়! স্যালি হিগিনস এবার উঠে দাঁড়ালেন।—ইউ হেল, গেট-আউট, আই সে গেট-আউট। তোমরা থাকতে আমার কাছে আসে কেন! তোমরা কি করতে আছ জাহাজে!

চিফ-মেট ডেভিড এবং ক্রমে রেডিও-অফিসার পর্যন্ত এসে গেল শেষ পর্যন্ত।—আপনি একবার বলুন। ওদের সঙ্গে কথা বলুন। আপনি বুঝিয়ে বললে ওরা শুনবে।

স্যালি হিগিনস পোর্ট-হোলে দাঁড়িয়ে বললেন—তোমরা কিছু শুনবে না ডেভিড। তোমরা সব আগেই ঠিক করে নিয়েছ।

ধরা পড়ে গিয়ে আর মুখ থাকে না তখন প্রায় ক্ষেপে যাবার মতো ডেভিড অনর্গল বলে যেতে থাকল—না স্যার বুঝতে পারছেন এভাবে দিনের পর দিন আমরা ভাসতে ভাসতে কোথায় যাচ্ছি! কেবল জল কেবল আকাশ কেবল জল কেবল আকাশ কেবল দিগন্ত একই রকমের। যেদিকে তাকাই স্যার সমুদ্র ঠিক একভাবে আমাদের ঘিরে রেখেছে। আমরা স্যার পাগল হয়ে যাব নি এ স্যার আপনার বাবার ডাঙ্গা তারপর সে এক্সকিউজ মি বলে জিভে কামড় দিল এবং রসিকতা পুরো আয়ত্ত বিন্দুমাত্র ভয়ডর নেই, সে যে এমন বড় প্রথম জিভ ঝালিয়ে নিচ্ছে বোঝাই যাচ্ছিল কারণ প্রথমেই তো আর বেজন্মার বাচ্চা বলে আরম্ভ করা যায় না। বাবার ডাঙ্গা দিয়ে আরম্ভ বেজন্মায় বাচ্চা বলে শেষ।

স্যালি হিগিনস আর একটা কথা বললেন না ডেভিডের সঙ্গে।

ডেভিড যেমন মরিয়া হয়ে উঠেছে।—স্যার আপনি আমাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। আমরা আপনাকে অসম্মান করতে চাই না। আমরা এতগুলো লোক একদিকে আপনি একা একদিকে। আমাদের [illegible] উচিত।

বাইরে সেই একইভাবে জাহাজের মশাল আলো। জ্বলছে। বোট-ডেকে [illegible]

[illegible] মতো সব মানুষের মুখ ওরা বসে [illegible] বোট-ডেকে। প্রায় [illegible]দের [illegible] বলে যেন বসে আছে। একটা [illegible] কেউ বলছে না। ওপরে সব মাবুরা [illegible]। মাবুরা ঠিক হেস্তনেস্ত করে আসবে। [illegible] আলোতে আবছা ওদের মুখ দেখা [illegible]—প্রায় সব ফ্যাকাশে মুখ। শুধু চোখ [illegible] জ্বলজ্বল করে জ্বলছে চোখ। [illegible] স্যালি হিগিনসের কাছে এসেছে ওরা [illegible] যেহেতু তিনি জাহাজের সর্বময় কর্তা। তিনি ইচ্ছে করলে সব বিদ্রোহ সহজেই [illegible] করতে পারেন [illegible] তিনি জাহাজ [illegible] যে কেন নামিয়ে দিচ্ছেন না কি যে [illegible] একগুলো লোক নিয়ে এখন মত্ত [illegible] জাহাজ [illegible] পড়া বাঞ্ছনীয়। অথচ তিনি যেন যেন [illegible] এক [illegible] খেলায় মেতে উঠেছেন—তাঁর বিন্দুমাত্র ভাবনা নেই।

তখন ডেভিড রেলিংও ঝুঁকে চিৎকার করে বললে—তিনি আপনাদের মোকাবেলা করতে চাইছেন না।

ছোটবাবু ফানেলের পাড়িতে ছিল। [illegible] বলল—তুমি শিগগির যাও জ্যাক। রাজি [illegible], বুড়ো নিজেও মরবে। আমাদেরও [illegible]।

জ্যাক বলল বাবা ভীষণ একগুঁয়ে। [illegible] কথায় রাজী হবেন না। তুমি আমায় [illegible] এস।

ছোটবাবু এবং জ্যাক প্রায় [illegible] [illegible] থাকল। ডেভিড ওদের দেখে [illegible]—তিনি কি ভেবেছেন জ্যাক তিনি কি [illegible] আমরা এভাবে জাহাজে মরে [illegible]। বড় অসহায় চোখ ডেভিডের। ডেভিড [illegible] উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে। শুধু [illegible] কেন, সবাই। ছোটবাবু বলল, ডেভিড [illegible] খারাপ করবে না। দেখছি।

[illegible] চুকে বলল—স্যার ওদের সঙ্গে [illegible] কথা বলুন।

স্যালি হিগিনস কেমন মরিয়া। তিনি বললেন—তোমরা সব ঠিকঠাক করে এসেছ। [illegible] সঙ্গে আমি কি কথা বলব!

—না স্যার ঠিকঠাক নেই। আপনি কথা [illegible]। কথা না বললে ওরা জাহাজে আগুন [illegible] দেবে। আপনি একা কিছু করতে পারবেন না। আমরা সবাই এবার বোট [illegible] করে দেব। বোট সমুদ্রে নামিয়ে জাহাজে আগুন ধরিয়ে দেব। জাহাজটা অলৌকিক না আপনি অলৌকিক কিছু আমাদের এখন তাই দেখা দরকার। অলৌকিক হলে জাহাজ এবং আপনি নিশ্চয় বেঁচে যাবেন। আমরা আপনাদের কিছু করতে পারব না। আগুনে আমরা আপনাদের পুড়িয়ে মারতে পারব না। আমরা [illegible] যাব। আপনি কথা বলুন স্যার। ওরা ভারি সরল সহজ মানুষ। এঁদের সংস্কার রয়েছে কিছু। এবং জাহাজে ওঠার পর থেকে এমন সব ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছে, এমন সব কাণ্ডকারখানা একের পর এক যে ওরা উন্মাদের মতো কিছু করে ফেললে আপনি আমাদের বিশ্বাসঘাতক ভাববেন না। আসলে এটা কোনো বিশ্বাসঘাতকতা নয়। ওরা আপনার ওপর সব বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হচ্ছে। ওদের কোনো দোষ নেই স্যার। ওদের দিনের পর দিন জাহাজে আটকে রেখেছেন, বোট দিচ্ছেন না, একবার, দোহাই আপনার ঈশ্বরের একবার কথা বলুন। ছোটবাবুর কথায় স্যালি হিগিনস বোধহয় সামান্য ভয় পেয়ে গেলেন। জোরজার করে বোট নামিয়ে চলে যাবার আগে জাহাজে আগুন ধরিয়ে দিলে কিছু করার থাকবে না। তাঁর চোখ-মুখ ভীষণ কঠিন এবং খাবার ক্রমে ফুরিয়ে আসছে বলে ওরা দুর্ভাবনায় আর মানুষ নেই। এখন এরা সব কিছু করতে পারে। তিনি চোখ তুলে অপলক ছোটবাবুকে দেখলেন। ছোটবাবুকে ভীষণ অবিশ্বাস করছেন। করুক। সে এখন এছাড়া আর কিছু বলতে পারে না। যেন স্যালি হিগিনস ছোটবাবুর আসল চেহারা এতদিনে দেখতে পেয়েছেন। ছোটবাবু পর্যন্ত হাত মিলিয়েছে।

স্যালি হিগিনস বাইরে এসে দাঁড়ালেন। চিফ-মেট লম্ফটা হাতে নিয়ে আসছে। চার্ট-রুম, মাংকি আয়ল্যান্ড এবং হুইল-রুম- সব উড়ে গেছে বলে রেলিং ভারি নড়বড়ে। যে কোনো সময় স্যালি হিগিনস সামান্য অসতর্ক হলে উল্টে নিচে পড়ে যাবেন। তা ছাড়া তাঁকে যেন পথ দেখানো দরকার—চিফ-মেট আগে আগে লম্ফের আলোতে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। সমুদ্রে ভীষণ জ্যোৎস্না। এত জ্যোৎস্নার আলো লাগে না। তবু নিচে যারা বসে আছে তারা বোধ হয় দেখে আশ্বস্ত হতে পারবে লম্ফের আলোতে সত্যি তিনি মাথার ওপরে দাঁড়িয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলছেন। কি বলছেন ওরা এক বিন্দু বুঝতে পারবে না। ছোটবাবু ওদের বুঝিয়ে দেবে—পাশে ছোটবাবু দাঁড়িয়ে আছে। ওরা ছোটবাবুকে দেখে নিচ থেকে সবাই হাত নাড়ল।

আর ছোটবাবু দেখল, নিচ থেকে দুটো মশাল জ্বালিয়ে এনেছে ডেক-কশপ। দুদিকে দুটো মশাল বসিয়ে দিয়েছে সে। জ্যোৎস্নায় অস্পষ্ট মুখগুলো একেবারে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ডেক-কশপ বুদ্ধি করেছে এভাবে মশাল জ্বেলে দিলে কাপ্তান সবার মুখ স্পষ্ট দেখতে পাবেন। এতগুলো নিষ্ঠুর [illegible] হয়ে মুখ দেখলে তিনি নিজের বিশ্বাসে আর [illegible] থাকতে পারবেন না। এবং মশালের শিখা পরিব্যাপ্ত হয়ে যাচ্ছে আকাশে বাতাসে। সমুদ্রে এমন যখন বিশালতা আর জাহাজের কিছু [illegible] বিভীষিকা যখন এভাবে দেখছে তখন স্যালি হিগিনস খুব ধীরে ধীরে বললেন—বন্ধুগণ আমরা এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন। জাহাজ অচল। খাবার শেষ হয়ে আসছে। যা খাবার আছে বড় জোর দু হপ্তা। প্রায় তিন হপ্তা আমরা জাহাজে ভেসে বেড়াচ্ছি। এতদিন আপনারা ধৈর্য ধরেছিলেন বলে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

ছোটবাবু তাদের এবার সবটা বাংলায় বুঝিয়ে দিল।

—আমরা বিশ্বাস করি বিশ্বাস ছাড়া আমাদের এখন আর কি আছে! আমরা বিশ্বাস করি সিউল-ব্যাংক আমাদের ঠিক ডাঙায় পৌঁছে দেবে।

ছোটবাবু বুঝতে পারছে স্যালি হিগিনস বিশ্বাস কথাটার ওপর ভীষণ জোর দিচ্ছেন বার বার। বিশ্বাস কথাটার ওপর সেও বলার সময় বিশেষ জোর দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু আশ্চর্য যতটা জোরের সঙ্গে কাপ্তান বিশ্বাস কথাটা উচ্চারণ করেছেন, সে যেন তেমনভাবে পারছে না। এমন নিরুদ্দিষ্ট যাত্রা প্রায় যেন এক অলৌকিক জলযানে এরা নিরুদ্দেশে পাড়ি জমিয়েছে। অথবা তার মনে হচ্ছে আসলে যেন কেউ বেঁচে নেই জাহাজে। এক অন্যলোকে ওরা এসে গেছে। ঝড়ের রাতে ওরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সমুদ্রের অতলে। ওরা সবাই সেই সব মানুষের প্রেতাত্মা। এবং মানুষের আকাঙ্ক্ষা মরে গেলেও শেষ হয়ে যায় না—সে আবার ফিরে আসে পৃথিবীতে। অথবা এমন দুর্ঘটনায় যখন মৃত্যু [illegible] তো সবাই নিজের নিজের ইচ্ছের কথা [illegible] হিগিনসকে জানাবেই। ওরা দেশে ফিরে যেতে চায়—এমন শব্দগন্ধহীন সমুদ্রে তারা ঘুরে বেড়াতে চায় না। সেও যেমন ভাবত আর্চির ওপর প্রতিশোধ নেবে, মরে গিয়ে সে সেই প্রতিশোধের কথা ভেবে থাকে আর ভাবে ঘটনা সত্যি সে আর্চিকে খুন করেছে। আসলে সে কিছুই করেনি। সবই এক অন্যলোকের ঘটনা সে মিথ্যে বিশ্বাস কথাটার ওপর জোর দিতে চাইছে। আর এভাবে ওর সহসা সত্যি কেন যে মনে হল কেউ বেঁচে নেই। এরা সবাই মানুষের ছায়া। মরে গিয়ে একটা ছায়ার মতো জাহাজে সবাই ভেসে রয়েছে। ঠিক যেমন জলের বুদবুদ ভেসে থাকে সমুদ্রে [illegible] সময়ে মিশে যায় সমুদ্রে তেমনি তারা এখন দুর্ঘটনা [illegible] পর বুদবুদের মতো পৃথিবীর বাতাসে ভেসে রয়েছে। সময় হলেই তারা বাতাসে মিশে যাবে। কোনো আর চিহ্ন থাকবে না।

[illegible] কেমন সব গুলিয়ে ফেলছে। একটা কথা ঠিক প্রকাশ করতে পারছে না। স্যালি

হিগিনস পর পর কি বলে যাচ্ছেন সে বুঝতে পারছে না। এখনগুলো মানুষের মুখমণ্ডলে কেমন কঠিন রেখা এবং মশালের আলোতে ওরা যেন সত্যি আর পৃথিবীর কেউ নয়। মাস্তুলে আগুনের প্রজ্বলিত শিখা যেন আকাশ এবং সমুদ্রে ভাসমান। নিশান। মুখমণ্ডলে তাদের বুঝি এখন প্রতিবিম্ব ভাসছে। সে বলল—আজ আসুন বরং স্যার আমরা কিছু সত্যি কথা বলি। আর্চি কোথায়। সে তো নেই—সে গেল কোথায়!

স্যালি হিগিনস বললেন—ছোটবাবু এটা ফাজলামির জায়গা না। তুমি কিছু বলছ না। একটা কথা বলছ না। আজে-বাজে বকছ! বেশি আজে-বাজে বকলে জাহাজ থেকে ছুড়ে ফেলে দেব। এবং ছোটবাবুর কেমন সম্বিত ফিরে আসার মুখে বলল—স্যার আপনার কি মনে হয় না আমরা এক অলৌকিক জলযানে ভেসে যাচ্ছি। মনে হয় না আমরা সত্যিকারের কেউ বেঁচে নেই। মনে হয় না আমাদের যাত্রা অন্য কোনো গ্রহলোকে আমরা আর পৃথিবীর মানুষ না। মরে গিয়ে পৃথিবীর মানুষ ভেবে সান্ত্বনা পাচ্ছি। সহসা জ্যাক ছুটে এসে বলল তখন ছোটবাবু প্লিজ! কি তুমি আজে-বাজে বকছ। তুমি কি সবার মাথা খারাপ করে দেবে।

ছোটবাবু কেমন ফ্যাকাশে মুখে বলল—আমি সবার মাথা খারাপ করে দিচ্ছি।

জ্যাক বলল—দিচ্ছ না! তুমি ভাগ্যিস বাবাকে বলেছ। এখন যদি বাংলায় বলতে কি হত বলত।

তখন পাঁচ নম্বর এসে দাঁড়াল। সে স্যালি হিগিনসকে মাথা নুইয়ে বাউ করল। এক্সকিউজ মি! এমন বলল। লম্ফের আলোতে ডেভিড পাঁচ নম্বরের মুখটা তুলে দেখাল সবাইকে। ডেভিড ওকে ঠেলে পাঠিয়েছে। ছোটবাবুর কথাগুলো বাংলায় এখুনি সবাইকে বুঝিয়ে বলতে হবে। এমন মওকা আর পাওয়া যাবে না।

পাঁচ নম্বর তখন বলছে ছোটবাবু কি বলছে শুনুন।

ছোটবাবু বলল—ছোটবাবু কি বলছে—ছোটবাবুই বলবে ফাইভার...। —আপনারা শুনুন আমি কি বলেছি। পাঁচ নম্বর বলল, ছোটবাবু বলছে...। ছোটবাবু বলল—আমার কথা আপনারা আমার কাছ থেকে শুনবেন না ফাইভারের কাছ থেকে শুনবেন।

সবাই হাত তুলে দিল। কেউ বোধ হয় ছুটে ছুটে আসছে! কে আসছে ওটা! এনাজিন-কাশপ। সে এসেই একটা মশাল নিচ থেকে চিৎকার করে ওপরে ছুড়ে দিল। ছোটবাবু সেই মশাল খাঁজে গড়িতে ফেলল। তারপর ফের ছুড়ে দিলে বলল—এনাজিন-কাশপ জায়গারটা জায়গায় রেখে দাও। মাথা গরম করবে না।

ছোটবাবু চিৎকার করে এবার বলল—ন্যাশনাল সিটিজেন ব্যাংকের ওপর বিশ্বাস রাখতে আপনাদের বারণ করছেন। বিশ্বাস হারালে আমাদের আর কিছু থাকে না বলছেন। জাহাজ অচল, জাহাজে খাবার ফুরিয়ে এসেছে আমরা চানের জল পাচ্ছি না আমাদের এখন নোংরা জামা কাপড়ে থাকতে হচ্ছে। তিনি জল পর্যন্ত রেশন করে দিচ্ছেন, সবই কোনো না কোনো দিন আমরা ডাঙায় ফিরে যাব বলে।

পাঁচ নম্বর বলল—ছোটবাবু তুমি কিন্তু নিজের কথা বললে না।

পাঁচ নম্বর ভারি লম্বা মানুষ। ছোটবাবুকে আরও লম্বা মনে হচ্ছে। ছোটবাবু কালো প্যান্ট হলদে সার্ট পরে আছে। ঠাণ্ডা শীত লাগছে। ওর চুল এখনও মনোরম। সে তো কখনও দাড়ি কামায় না। ডেভিড এবং অন্য সবাই দাড়ি কামানো-টামানোর পাট প্রায় তুলে দিয়েছিল। সকালে কাপ্তান পাইকারি হারে সবাইকে দাড়ি কামিয়ে ঘরে হাজিরা দিতে বলেছিল। সবাই দাড়ি কামিয়ে মুখ দেখিয়ে গেছে। স্যালি হিগিনস ঠাট্টা করে বলেছিলেন তোমাদের সবাইকে জামাই জামাই লাগছে হে! বেকার মতো হেসে সবাই বের হয়ে এসেছিল—কি যে বলেন স্যার! আর সেই লোকটার মুখ এখন কি নিষ্ঠুর। প্রায় নিয়তির মতো দাঁড়িয়ে আছেন মাথার ওপর। মনেই হয় না মানুষটা জীবনে কারো সংগে কোনো রসিকতা করেছে।

পাঁচ নম্বর ফের বলল—তুমি কি বলেছিলে একবার বল।

এনাজিন-কাশপ ভিড়ের ভেতর থেকে উঠে দাঁড়াল। সে চিৎকার করে বলল—আমরা শুনতে চাই।

এবং পাশাপাশি আর যারা ছিল ছোটবাবু অবাক সবাই বলছে আমরা শুনতে চাই।

সে এমন কাউকে দেখল না যে বলতে পারে না শুনতে চাই না। সে সারেঙসাবকে খুঁজছে। নিচে সব মুখগুলো সে একে একে চিনতে পারছে। যতই বন্য হয়ে যাক যতই তারা অমানুষ হয়ে যাক সে সবাইকে চিনতে পারছে। কেউ উঁচু হয়ে বসে আছে। কেউ পা ছড়িয়ে দিয়েছে। কেউ সব হারিয়ে গেলে মানুষের যে মুখ যে উদাসীনতা অথাৎ মৃত্যু চারপাশে হাত তুলে নৃত্য করে বেড়ালে তখন যেমন লাগে মানুষকে—হুবহু সেই সব ছবি। ঠাণ্ডা বাতাস সমুদ্র থেকে উঠে আসছে। বাতাসে জলের ভেজা গন্ধ। জলে কোনো অতিকায় মাছের ভেসে বেড়ানোর শব্দ। অথবা দূরে রাশি রাশি সব প্লাংকটন ফিসের ঝাঁক। নিচে জাহাজের অতলে সব জেলিফিশ মতো জোনাকি ফিসেরা সাঁতার কাটছে। এবং ব্যারাকুডা মাছের প্রবল আক্রমণে জাহাজের খোল এখন ভিজবিজে আঁশের মাছ যেন একটা। এত বড় খোলের কোথাও আর বিন্দুমাত্র জায়গা নেই যেখানে ফাঁক রয়েছে। জায়মান মাছ ছোট গুগলির মতো নিজের আশ্রয় ইতি-মধ্যে গড়ে তুলেছে এবং ক্রমে সময় পার হয়ে গেলে ছোটবাবুর মনে হল খোলের ফুটোতে সব শ্যাওলা জমে বড় বড় দাড়ি এবং অতিকায় জলযানটা একসময় জলচর প্রাণী হয়ে যেতে পারে যে কোনো সময়। চারপাশে সাদা জ্যোৎস্নায় মরা সমুদ্রে এমনই মনে হল তার। এবং সংগে সংগে সে হাত তুলে বলল—আমার কখনও এটা কেন যে মনে হয় আমরা যেন এক অলৌকিক জলযানে ভেসে যাচ্ছি। যেন নিয়তির মতো এই যান। আমরা নিজেরা জানি না কোথায় তাকে নিয়ে যাব অথচ কি আশ্চর্য দেখুন ঠিক কোথাও যাবার জন্য আমরা প্রত্যেকে বের হয়ে পড়েছি—সেই কবে থেকে, যেন সেই, আচ্ছা, আপনারা কেউ বলতে পারেন সেই কবে থেকে আমরা যানে চড়ে বের হয়ে পড়েছি—কেউ মনে করতে পারছেন না, এই সেদিন লক্ষ কোটি বছর আগে...।

—ও হো ছোটবাবু তুমি অন্য কথায় চলে যাবে না। ঠিক ঠিক বলে যাও। লম্ফটা এবার পাঁচ নম্বর ছোটবাবুর মুখের সামনে তুলে ধরল।

স্যালি হিগিনস ঠিক ছোটবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। লম্বা রেলিং। তার পাশে চিফ-মেট ডেভিড এবং রেডিও-অফিসার। দোমড়ানো ফানেলের গুঁড়িতে যদি তেমনি তাকিয়ে আছে ওপরে। নিচে নেমে ছোটবাবু এবং বাবা তারপর এই সব জাহাজিরা কিভাবে পরস্পর মোকাবেলা করবে সে বুঝতে পারছে না। সে ভীষণ উদবিগ্ন চোখে-মুখে প্রত্যাশায় আছে, ছোটবাবু ঠিক সব সামলে দিতে পারবে। কিন্তু কেমন জল ঘোলা করে ফেলছে ফাইভার। ওরা পরস্পর বচসা করছে যতো৹ ছোটবাবুকে অপদমস্ত করার জন্য বার বার চাপ দিচ্ছে।

আর ছোটবাবু তখন আবার জাহাজিদের উদ্দেশ করে কি সব বলে যাচ্ছে। আশা করছে ছোটবাবু ওদের বলে দিলেই সে ফের এই সব ইংরেজ অফিসারদের বুঝিয়ে বলবে।

ছোটবাবু যা যা বলেছিল সব হুবহু বললে—পাঁচ নম্বর হৈ-চৈ বাঁধিয়ে দিল—ভবে! ডেভিড বুঝতে পারছ?

ডেভিড বলল—না। কিছু বুঝতে পারছি না।

পাঁচ নম্বরই ইংরেজিতে বলল—স্যার। সে স্যালি হিগিনসকে উদ্দেশ্য করে বলছে।

দ্য বাস্টার্ড। স্যালি হিগিনস ক্ষেপে গেলেন। এই ফাইভারের এত রোয়াব! সময় বুঝে বদলা নিচ্ছে। আর ছোটবাবুর কথা শুনে স্যালি হিগিনস একেবারে থরথর করে কাঁপছেন উত্তেজনায়। —কি কি বলছ! এটা অলৌকিক জলযান! আমরা কেউ বেঁচে নেই! আমাদের যাত্রা অন্য কোনো গ্রহলোকে! আমরা আর পৃথিবীর মানুষ না! ননসেন্স। স্যালি হিগিনস আর চুপচাপ থাকতে পারলেন না। মিথ্যে কথা। ছোটবাবু আপনাদের মিথ্যে কথা বলেছে। এটা অলৌকিক জলযান নয় আমি বলছি। আমরা বেঁচে আছি আমি বলছি! আমরা অন্য কোনো গ্রহলোকে পাড়ি জমাচ্ছি না। আপনাদের জন্য পাইরেট জাহাজ জন্য এসব ছোট-

ষড়যন্ত্র। এরা সবাই আপনাকে ... পাইয়ে দিতে চায়। এটা ভুতুড়ে জাহাজ এটার মাথা ঠিক নেই—ঠিক না। এটা আর দশটা জাহাজের মতো জাহাজ আর দশটা জাহাজের মতো এর কলকব্জা। দশটা জাহাজের মতো এটা পুরানো। পুরোনো গন্ধ এর শরীরে আছে। এর ইস্পাত আর দশটা জাহাজের চেয়ে সামান্য আলাদা। কমপাসে সামান্য গন্ডগোল দেখা দিত মাঝে মাঝে। আসলে জাহাজটা সম্পর্কে এত বেশি প্রচার ছিল এত পুরোনো সব খবর জাহাজিদের গায়ে ঘরে পৌঁছে গেছিল যে জাহাজে উঠলেই সব সময় একটা অস্বস্তিকর পরিবেশে পড়ে যেত ভয়ে। শুধু গুজব গুজব এ জাহাজটাকে এমন একটা অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। ছোটবাবু তুমি কী! তুমিও ছোট-বাবু শেষ পর্যন্ত...তোমার ওপর খুব বেশি নির্ভর করেছিলাম হে। হাতের শেষ তাসটাও কেড়ে নিলে!

ছোটবাবু ততোধিক চিৎকার করে বলল—ক্যাপ্টেন স্যালি হিগিনস আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। এবং তারপর কাপ্তানের সব কথার বাংলা করে দিলে এনজিন-কশপ, ডেক-সারেঙ সবাই উন্মত্তের মতো লাফাতে থাকল—মানি না। এটা কাপ্তান বাড়িয়ে বলছে। যদি আর দশটা জাহাজের মতো হয় তবে আমাদের এভাবে আটকে রেখে কি লাভ। তিনি কি জাহাজে রেখে সবাইকে মেরে ফেলতে চান। শয়তানির একটা সীমা থাকা উচিত।

ছোটবাবু বলল—স্যার ওরা বলছে আর দশটা জাহাজের মতোই যদি হয় তবে সবাইকে জাহাজে আটকে রেখেছেন কেন? বোট দিচ্ছেন না কেন?

স্যালি হিগিনস এবার ধীরে ধীরে বললেন—বন্ধুগণ বোটের চেয়ে জাহাজে বেশি আপনারা নিরাপদ।

ছোটবাবু বলল—বোটের চেয়ে জাহাজে আপনারা বেশি নিরাপদ।

ডেবিড বলল—মিথ্যা কথা।

স্যালি হিগিনস ভীষণ ধমকে উঠলেন—ডেবিড!

ডেবিড বলল—আমরা তবে স্যার এভাবে বসে বসে নিয়তির হাতে মার খাব।

—কোনো উপায় নেই। প্লিজ ডিপেনড অন দ্য বোট।

নিচ থেকে সরগোল উঠছে। —বাংলায় বলুন। বুঝতে পারছি না কি বলছেন!

ছোটবাবু বলল—ডেবিড বিশ্বাস করছে না জাহাজ বোটের চেয়ে বেশি নিরাপদ জায়গা।

সমস্বরে সবাই চিৎকার করছে, আমরাও বিশ্বাস করছি না। আমরা সমুদ্রে নেমে যেতে চাই। আমরা সমুদ্রের সঙ্গে লড়তে চাই। সমুদ্রের হাতে বসে বসে আর মার খাব না।

স্যালি হিগিনস ছোটবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। কখন ছোটবাবু তাঁর কথা সব খুলে বলবে।

ছোটবাবু বলল—স্যার ওরা তো ঠিকই বলছে। ওরা বলছে বসে বসে নিয়তির হাতে মার খাবে না। ওরা বোট নিয়ে ভেসে পড়তে চায়। ওরা লড়তে চায়।

স্যালি হিগিনস দাঁড়িয়ে থাকলেন। তিনি স্লিপিং গাউন পরে আছেন। সোনালী রঙের স্লিপিং গাউন। জ্যোৎস্নায় তার গেরুয়া রং হয়েছে। দাড়ি না কামানোর জন্য বেশ বড় দাড়ি মাথার চুল সাদা বলে ভীষণ প্রাজ্ঞ পুরুষ মনে হচ্ছে। তিনি এবার সত্যি সত্যি জাহাজ সমুদ্র এবং এই সব নক্ষত্র-মালা সম্পর্কে এমন খবর দেবেন যে সবাই তাজ্জব বনে যাবে। যেন এক্ষুনি বললেন সমুদ্রকে তোমরা কতটুকু চেন! সিউল-ব্যাংককে তোমরা কতটুকু জান! তোমরা যখন আমার চেয়ে বেশি জান না তখন আমার ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় কি! কিন্তু তিনি তার কিছুই বললেন না। শুধু বললেন—আপনাদের কি মনে হচ্ছে না জাহাজ কোথাও যাচ্ছে। আপনারা কি বুঝতে পারছেন না জাহাজ এক জায়গায় নেই। বোটের কমপাশ থেকে আমি বুঝতে পারছি জাহাজ তার কোর্স পাল্টে ফেলেছে। চোখের ওপর মনে হয় জাহাজ স্থির—এত বড় সমুদ্রে এ ছাড়া কিছু বোঝারও উপায় নেই। তবু বলছি জাহাজ আমাদের ওয়েস্ট-নর্থ-ওয়েস্টে উঠে যাচ্ছে। জাহাজ তার কোর্স পাল্টে ফেলেছে যখন আমাদের ভয় নেই। আমরা এবার সামনে অসংখ্য দ্বীপ পেয়ে যাব। পাঁচ সাতশ মাইলের ভেতর এখানে থাকবে অসংখ্য দ্বীপ। বলা যায় না ফিজিতেও গিয়ে আমরা উপস্থিত হতে পারি। ভাগ্য যদি তেমন সুপ্রসন্ন না থাকে ভিতিলেয়ুতে যেতে পারি আরও ওপরে ফানফুতি—যদি জাহাজ চোরাস্রোতে কোনাল সিতে ঢুকে যায় চারপাশে থাকবে নিউ-ক্যালেডোনা, নিউ হেব্রাইটস রতুম, সান্তা-ক্রুজ সালোমন দ্বীপপুঞ্জ এমন কি আর একটু ওপরে উঠে গেলে এলিস। সেখানে খাবার থাকবার এবং ঘরে ফিরে যাবার সব রকমের ব্যবস্থা...

বংকু বলল তখন—অ ছোটবাবু, সাহেব এত কি বলছে রে!

অনিমেষ বলল—অ ছোটবাবু নাকে নস্যি গুঁজে দাও। নাইলে থামবে না।

বাধা পেয়ে স্যালি হিগিনস থেমে ছোট-বাবুর দিকে তাকালেন। ছোটবাবু বলল—স্যার আপনি বলে যান। ওদের কথায় কান দেবেন না।

মনে হল সব বুঝতে পারছেন তিনি। এই জাহাজিরা তাকে এখন অপমান করতে চায়। তিনি জানেন তার কাছে যেহেতু একমাত্র আগ্নেয়াস্ত্র আছে এবং তিনি যেহেতু

যে কোন জাহাজিকে টেনে এনে বুলেটের সামনে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন তিনি বোধ হয় সেজন্য আদৌ বিচলিত হচ্ছেন না। তাঁর গলা মাঝে মাঝে চড়ে গেলেও অধিকাংশ সময় মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করে যাচ্ছেন।

—আর ছোটবাবু তুমিও শালা শেষ পর্যন্ত দালাল হয়ে গেলে। বংকু লাফিয়ে রেলিঙের নিচে এগিয়ে এল। —কি বলছে সাহেব। ছোটবাবু ফের সবটা বুঝিয়ে বললে—এবার আর কেউ যেন তেমন চিৎকার চেঁচামেচি করে উঠল না।

ওদের মুখ দেখে স্যালি হিগিনস কিছুটা স্বস্তি বোধ করছেন। তিনি ফের ওদের ভুল ধারণা মন থেকে মুছে ফেলার জন্য বললেন—এসব দ্বীপপুঞ্জে আমরা পাঁচ সাতশ মাইলের ভেতর পেয়ে যাব আশা করছি।

ডেবিড তখন আর ধৈর্য ধরতে পারল না। সে চিৎকার করতে করতে নেমে যাচ্ছে। —সব ভাঁওতা। আপনারা এর বিন্দু-বিসর্গ বিশ্বাস করবেন না। দোহাই ঈশ্বরের আপনারা ফাঁদে পা দেবেন না। তিনি মুখে যাই বলুন মনে মনে জাহাজের অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী। তাঁর বিশ্বাস জাহাজ ঠিক আমাদের পৌঁছে দেবে। ও'র মনগড়া কথা। জাহাজে তো আর পাখা গজায়নি।

ছোটবাবু এখন কাকে কি বলবে বুঝতে পারছে না।

ডেবিড তখনও তারস্বরে চিৎকার করছে। —এখনও আপনাদের সময় আছে। এই ছোটবাবু তুমি ওদের বোঝাও। বুড়ের কথায় ওরা তো সব বুঝে ফেলেছে। দ্যাখো সবাই মাথা নুয়ে চলে যাচ্ছে মতো। এই এনজিন-কশপ কোথায় যাচ্ছে! জাহাজের খাবার ফুরিয়ে গেলে কি করবে। জল ফুরিয়ে গেলে! চিফ-মেট আপনি একটা কথাও বলবেন না! জাহাজ এক ইঞ্চি নড়ছে না এটাও বলবেন না! এবং এ-সময় যা হয় চোখের ওপর শুধু শহর নদী গাছপালা এবং গায়ের খেত। আর সেই প্রিয়জনেরা মুখের ওপর মিছিলের মতো সরে সরে যায়। তখনই সে মরিয়া হয়ে বলল—আমি থাকব না এ জাহাজে থাকব না। সমুদ্র অনেক নিরাপদ জায়গা। জাহাজের অশুভ প্রভাবে থাকলে আমরা কেউ বাঁচব না। বলতে বলতে সে একেবারে বোটের নিচে হামাগুড়ি দিয়ে সত্যি সমুদ্রে লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছে। এবং তখন যে যার মতো ছুটছে। ডেবিডকে ধরার জন্য। ছোটবাবু তখন বিরক্ত মুখে যেন না বলে পারল না স্যার কেন এদের আটকে রাখছেন! এদের বোট দিয়ে দিন। যারা নেমে যেতে চায় নেমে যাক।

স্যালি হিগিনস প্রায় কৈফিয়তের সুরে বললেন—ছোটবাবু জাহাজ ভেসে থাকলে আমাদের চলে যাবার নিয়ম নেই। জাহাজ ডুবে যেতে থাকলে উই ক্যান এবানডান দ্য সিপ। কিন্তু সে তো আমাদের জলে ভাসিয়ে সমুদ্রের অতলে ডুবে যাচ্ছে না। এর জন্য তার প্রতি তোমাদের এতটুকু কৃতজ্ঞতা নেই।

ছোটবাবু কেমন বোবা বনে গেল। কী আন্তরিক কথাবার্তা তাঁর। থার্ড-মেট বলল—স্যার দেশলাই আছে? লম্ফটা নিভে গেছে আবার। ডেবিডের পা কেটে গেছে ছুটতে গিয়ে। বেনজিন লাগাতে হবে।

স্যালি হিগিনস পকেট থেকে দেশলাই বের করে লম্ফটা জ্বালালেন। অল্প অল্প হাওয়া বইছে। থার্ড-মেট হাতে হাওয়া বাঁচিয়ে কোনোরকমে নিচে নেমে গেল। বেনজিন তুলো এনে এখন টুইন ডেকে জোরজার করে ওষুধ লাগাচ্ছে। ওকে ঘিরে রেখেছে ক'জন জাহাজি। লাফিয়ে সমুদ্রে পড়ে গেলে কেলেঙ্কারি। মাস্তুলে লেডি-এ্যালবাট্রস বসতে পারছে না। সেখানে এখন আগুন জ্বলছে। কাছাকাছি কোথাও সে সমুদ্রে ভেসে রয়েছে। ছোটবাবু জ্যোৎস্নায় নিরুপায় হয়ে এখন কেবল পাখিটাকে যেন খুঁজছে। ফানেলের গুঁড়িতে বনি তেমনি শূন্যচোখে তাকিয়ে আছে ওপরে। সে বুঝতে পারছে না কার ঠিক। সে বাবার পক্ষে না বিপক্ষে তাও বুঝতে পারছে না বোধহয়।

ডেবিড তখন খোঁড়াতে খোঁড়াতে আবার উঠে আসছে। সে সবার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। একটা মশাল সে নিজের মুখের ওপর ধরে রেখেছে। এবং মশালের আলোতে ওর চোখ-মুখ জ্বলছিল। সে তারপর নিশীথে সবার মুখের ওপর দিয়ে সেই মশালের আলো ভাসিয়ে নিয়ে গেল। এবং নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর মতো সে ঘুরে দাঁড়াল কোনো যুদ্ধবাজ মানুষের মতো সে জ্বলে উঠছে। সে জানে জীবনে সে আর জাহাজে কাজ পাবে না, যদি কোনো কারণে সবাই রক্ষা পেয়ে যায় সে জানে তার সব রেকর্ড বিশ্বস্ততার সব ইতিহাস মুছে যাবে।—এমন কি শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে কারাগারে বন্দী জীবনযাপনও করতে হতে পারে। তবু সে এবির মুখ সন্তানের কথা ভেবে কেমন মশাল তুলে দিচ্ছে ওপরে। বলছে আপনারা ওই লুকেনারের ডামিটাকে শুধু একটা প্রশ্ন করুন। মাত্র একটা প্রশ্ন। তিনি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলবেন— সামোয়া বন্দরে তিনি কেন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ছোটবাবু তুমি এদের বুঝিয়ে বল। বলে সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সব জাহাজিদের পাশে ওদের সামিল হয়ে দাঁড়াল। ছোটবাবু বলল—ডেবিড আজ না হয় থাক। বুঝতেই পারছ আমরা কেউ ঠিক নেই। দু-একদিনে এমন কিছু হবে না আমাদের। আমাকে তোমরা সময় দাও বুঝিয়ে-সুজিয়ে যদি মত বদলাতে পারি। সে কিছুতেই বলল না চাবিকাঠি তার হাতে। সে বনিকে দিয়ে কাজটা উদ্ধার করতে পারে বলল না।

ডেবিডের কথায় আবার যেন সবাই সাহস ফিরে পেয়েছে। ওরা আবার আগের মতো গোল হয়ে দাঁড়াল। স্যালি হিগিনস এক পা নড়ছেন না। ঠিক আগের মতো স্থির। গীর্জার কোনো ফাদার সিঁড়িতে যে-ভাবে মানুষের শুভ কামনায় দাঁড়িয়ে থাকেন তেমনি তিনি দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের নামে শপথ গ্রহণ করবেন যেন এবার। তিনি সত্যি সত্যি বলতে আরম্ভ করলেন—ডেবিড আপনি যা ভেবেছেন তাই। আপনি সবটা জোরগলায় প্রচার করতে পারেন—আমার কোনো দুঃখ নেই [illegible]ার। আমি সব মেনে নেব। এবং এই [illegible] সম্বোধনে ডেবিড কেমন যেন অ[illegible]র ভেতর পড়ে গেল। একজন কাপ্তানের এ-ভাবে পরাজয় তাকে বোধহয় ক্ষতবিক্ষত করছিল। সে সহসা নতজানু হয়ে গেল, স্যার আমাকে ক্ষমা করুন। বলে সে দূরে সমুদ্রের ভেতর তার মশালটা নিক্ষেপ করে অন্ধকারে নিচে নেমে গেল। সবাই হাঁ। বোট-ডেকে কতগুলো ছায়া মাত্র। তাদের জোর একদম হারিয়ে গেছে। ওপরে মাথা নিচু করে রেখেছেন স্যালি হিগিনস। পাশে ছোটবাবু থার্ড-মেট চিফ-মেট এবং এইমাত্র তিন নম্বর মিস্ত্রি ওপরে উঠে কেমন একটা স্তব্ধতার ভেতর পড়ে গিয়ে আর সিঁড়ি ভাঙতে পারল না। সবাই যেন ফ্রীজ হয়ে গেছে মুহূর্তে।

এনজিন-কশপ সেই স্তব্ধতাভঙ্গকারী। সে বলল, ছোটবাবু তিনি কেন ব্যামোতে পড়েছিলেন আমি বলতে পারি।

ছোটবাবু একটা কথা বলল না।

এনজিন-কশপ একবার চারপাশের জাহাজি-দের কাছে গলা উঁচিয়ে বলতে থাকল—তার গলার রগ ফুলে যাচ্ছে, সে হাতে একটা মশাল জ্বালিয়ে নিয়েছে। না নিলে সে যেন জোর পাচ্ছে না। সবার সামনে মশাল তুলে

বলছে—ইনজে আল্লা অবশ্য যেন বলছে আল্লার কসম—আপনারা রিএ্যাক্সাইরা অ্যারা জাহাজ ঘোড়া মেহেরবানী করে শুনে লোন—জাহাজ দু' দু'বার পিজরাপোলে যাওয়ার কথা!

ফাইভার দেখছে ঠিকমতো লোকটা বলতে পারছে না গুছিয়ে। সে মশালটা এবার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। বলল, তুমি থামো মিঞা। বলেই সে তকাল ওপরে। তারপর বলল, শিও ফেল স্যার দৈব দুর্ঘটনায় মারা গেছেন; ঠিক?

স্যালি হিগিনস বললেন—ঠিক।

জাহাজ স্ক্র্যাপ করার দলিলপত্রে সই করার নিমিত্ত গাড়িতে রওনা হয়েছিলেন?

—হয়েছিলেন।

—মধ্যপথে তিনি রাস্তায় মারা গেলেন।

স্যালি হিগিনস মাথা নুয়ে ক্রস টানলেন বুকে।

—তারপর রিচার্ড-ফেলের পালা।

—হ্যাঁ তিনিও জাহাজটা বিক্রি করে দিতে চেয়েছিলেন।

পাঁচ নম্বর যেন মশালের আলোতে সবাইকে একসঙ্গে দেখতে চায়। সে সকল শেষ পর্যন্ত পারেন নি। একমাত্র নাবালক পুত্র, একমাত্র উত্তরাধিকার তার মরে গেল। দুর্ঘটনায় মারা গেল। রিচার্ড-ফেল গাড়ি করে যাচ্ছেন। হস্তান্তরের জন্য কাগজপত্র সব রেডি। যাবার পথে তাঁর বিঘ্ন ঘটল। গাড়িতে পুত্রের মৃতদেহ আবিষ্কার করলেন—ঠিক?

ছোটবাবু এমন একটা ভয়াবহ ঘটনা যেন এই প্রথম শুনছে। আর জ্যোৎস্নায় সমুদ্র জাহাজ আকাশের সব নক্ষত্রমালা এবং চারপাশের সব মানুষ কেমন অজানা অচেনা হয়ে যাচ্ছে। ভীতিকর সব কথাবার্তা। জাহাজটা যেন ফুঁসছে নিরন্তর নিজের ভেতর। জাহাজটাকে আর কিছুতেই দশটা জাহাজের মতো মনে হচ্ছে না। স্যালি হিগিনসকে জ্যোৎস্নায় সেই মৃত লুকেনারের অবয়ব মনে হচ্ছে। একমাত্র সে যদিও চিনতে পারছে, ফানেলের গুঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে তেমনিভাবে। সে খুব অসহায় গলায় চিৎকার করে ডাকল, জ্যাক ওপরে এস। ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছ তুমি।

পাঁচ নম্বর সেই সব কথাবার্তা একবার ইংরেজিতে একবার বাংলায় প্রায় ধর্মগ্রন্থ পাঠের মতো বলে যাচ্ছিল। সে এবার খুব সতর্ক গলায় বলল, যেখানে কথা বলতে বলতে জার্মান পড়ে গেলেন। পাঁচ নম্বর প্রায় একজন উকিলের মতো জেরা করে যাচ্ছে। আর বিস্ময়ের ব্যাপার ছোটবাবু দেখছে কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে প্রায় আসামীর মতো তিনি স্বীকারোক্তি করে যাচ্ছেন।

বোমহয় পাঁচ নম্বর একটুনি ঘুরে যাবে বলবে হিয়ার ইজ দ্য পয়েন্ট।

স্যালি হিগিনস বললেন, ফাইভার শরীরটা আমার ভাল ছিল না।

—নো নো। ঠিক কথা বলছেন না। ঠিক কথা বলুন। আসল রহস্য খুলে বলুন। এমন দিগন্ত-ব্যাপী সাদা জ্যোৎস্না যখন, আমরা যখন সবাই সমুদ্রের বিভীষিকায় পড়ে গেছি এবং যে কোনো মুহূর্তে জাহাজ সমুদ্রের অতলে ডুবে যেতে পারে, আমরা আশা করব অন্ততঃ ক্যাপ্টেন আমাদের কাছে কোনো রহস্য আর গোপন রাখবেন না।

স্যালি হিগিনস আর পারলেন না। দু' হাতে মাথার চুল ছেঁড়ার মতো চিৎকার করে ফেটে পড়লেন ফাইভার প্লিজ, প্লিজ আমাকে আর টর্চার করবে না।

আর যায় কোথায়। এমন পরাজয়ের মুখে পাঁচ নম্বর জীবন্ত কিন্তু গলায় বলে উঠল, আপনি এত সব জেনে কেন কাগজ-পত্রে সই করলেন জবাব দিন! কেন আপনি এতগুলো মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন জবাব দিন! আপনি যখন জানতেন, জাহাজে ক্যাপ্টেন লুকেনারের অশুভ প্রভাব আছে তখন কেন একবার ভাবলেন না, আপনার সই করার বিনিময়ে সব জাহাজিদের জীবন বিপন্ন হতে পারে।

শুধু নিজের কথা আর শ্রীমান জ্যাকের কথা ভাবলেন। আমাদের কথা আপনার একবারও মনে হল না। আপনি স্বার্থপর, আপনি আপনি......।

ছোটবাবু বলল, ফাইভার আপনি কী সব বলছেন।

পাঁচ নম্বর এবার আরও জোর গলায় প্রতিটি শব্দ, যেন সে তার চিৎকার সমুদ্রের দিগন্তে অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় যতদূর সম্ভব পৌঁছে দিতে চায়। তারপর প্রায় নাটকীয় গলায় সে বলে উঠল, বন্ধুগণ আমরা এখন বুঝতে পারছি মহামান্য ক্যাপ্টেনের খামখেয়াল আমাদের নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। কোম্পানীর কর্তাব্যক্তিরা তাঁকে পরিচালকবর্গের একজন করে দিয়েছেন বিনিময়ে। কতদূর নীচ হীন এই মানুষ, জাহাজের এতগুলো লোককে তুচ্ছ করে নিজের জীবন আর শুধু জ্যাকের জীবনের কথা একবারও ভাবলেন না—সবচেয়ে অবাক কাণ্ড এই বুড়ো বয়সে তোর কি এমন প্রয়োজন ছিল বলেই কোথায় যেন কথাবার্তায় গাফিলতি থেকে যাচ্ছে—ঠিক ঠিক সবাই যেন এখন মশাল তুলে ছুটে আসছে না, মশালের আগুনে কাপ্তানকে পুড়িয়ে মারছে না—কিভাবে আর এইসব ঘটনা জোর গলায় বলা যেতে পারে—সে মরিয়া হয়ে যেন

বলল, এখন কি দেখতে পাচ্ছি? চারিদিকে শুধু সমুদ্র। শুধু জল। আমরা বুঝতে পারছি না কোথায় আছি। তারপর সে কি ভেবে বলল দেখুন দেখুন—জাহাজটাকে দেখুন। ভাল করে দেখুন। এর মাস্তুল আফট্‌র-পিক ফরোয়ার্ড-পিক ফানেল উইন্ড-লেস হ্যাচ উইন্‌চ সব কেমন যেন কতদিন পর হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। রেস্ট রেস্ট...রেস্ট। নিরুদ্বিগ্ন জীবন। ভাবনা নেই আর। কেউ তাকে আর নকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাবে না। সে মুক্ত। সি ইজ ফ্রি নাও।

ছোটবাবু দেখছে সব মানুষগুলোর চোখ মশালের আলোতে প্রায় স্থির। গোল গোল চোখে স্যালি হিগিনসকে দেখছে। কারো পলক পড়ছে না। সে ভয় পেয়ে ডাকল, স্যার আপনি কিছু বলুন। দোহাই। দেখছেন না এরা কি হয়ে যাচ্ছে। স্যার এ-ভাবে মাথা নুয়ে দাঁড়িয়ে থাকার এখন সময় নয়। আমরা সবাই এখন বুঝতেই পারছেন পাঁচ নম্বরের হাতে পড়ে গেছি। আমরা কিছু করে ফেললে...।

পাঁচ নম্বর এবার সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে আসছে। আর চিৎকার করছে। যেহেতু সে পরেছিল কালো প্যান্ট এবং খয়েরী রংয়ের গেঞ্জি জ্যোৎস্নায় সব কালো দেখাচ্ছে, ওর পোশাকে কেউ যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে এমনভাবে হাঁউ-মাউ করছিল—অর্থাৎ ভয়ে-ভীতিতে যেন সে ভেঙে পড়ছে।—সে চিৎকার করে কি বলছে সব বোঝা যাচ্ছে না। কিছুটা বোঝা যাচ্ছে। সেই কিছুটাই প্রায় সবার হৃৎকম্প এনে দিয়েছে। সে বলছে আমরা মরে কাঠ হয়ে যাব। সেই অশুভ প্রভাব—ক্যাপ্টেন লুকেনার আমাদের পাশেই আছে। এ-জাহাজে বহাল তবিয়তে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জাহাজের কলকব্জা সব উপড়ে ফেলেছে। একেবারে নিজের মতো চিরকালের জন্যটা আশ্রয় বানিয়ে ফেলেছে। এতদিন লুকেনার সেই ফিকিরেই ছিল।

ছোটবাবু বলল, স্যার দোহাই আপনার ঈশ্বরের। সব, সবাই পাঁচ নম্বরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কিছু না বললে, আপনাকে স্যার ওরা পুড়িয়ে মেরে ফেলবে! আপনি বলুন, একটাও সত্যি কথা নয়! সব মিথ্যা কথা বলছে ফাইভার! সব বানিয়ে বলছে!

পাঁচ নম্বর তখনও তেমনি চিৎকার করছে, একজন বিজ্ঞাপনদাতার মতো মুখ পাঁচ নম্বরের। গুজব ছড়াবার পক্ষে যা যা দরকার সব সে এবার বিজ্ঞাপনে হাজির করছে। সে এবার প্রায় লাফাতে থাকল, যেন সারা শরীরের আগুন ওর মাথায় উঠে পড়ছে। সে বলল, এবারে থিও ফেল নয়। রিচার্ড ফেলের পুত্র নয়—এবারে বকধুপল আমাদের পালা। আপনারা তৈরি হোন। মহামান্য ক্যাপ্টেন এবার আমাদের লুকেনারের হাতে তুলে দিলেন। অজানা সমুদ্রে ঢুকে গেছি। সমুদ্রে শুধু ভৌতিক অগ্নিকান্ড দেখতে পাব না। এবার লুকেনার আমাদের আরও সব ভয়াবহ নৃসংশতার ভেতর নিয়ে যাবে। সোজা কথায় জাহাজটাতে আমরা সবাই লুকেনারের মতো মরে ভূত হয়ে যাব। লুকেনারের মতো জাহাজটাও এতদিন সেই ফিকিরে ছিল। এতদিন পর সে আমাদের বাগে পেয়েছে। আর তখনই দূরে কক কক করে ডাকছিল পাখিটা। সে কেমন এবার ফিসফিস গলায় বলতে থাকল, শুনতে পাচ্ছেন? ডাকছে! কেউ ডাকছে! মনে হচ্ছে কেউ হাসছে, কেউ হাসছে! দ্য সি-ডেভিল হাসছে। আমরা কেউ বাঁচব না। আতংকে পাঁচ নম্বর বলতে বলতে হাটু মুড়ে বসে পড়ল।

সমুদ্রের ভয়ংকর স্তব্ধতা কি যে কঠিন শীতল হাহাকারে ভুগছে। কেউ একটা আর কথা বলতে পারছে না।

ছোটবাবু তখন প্রায় পাগলের মতো দু' হাত নাড়তে থাকলে স্যালি হিগিনসকে—জ্যাক নিচে তুমি কি করছ? ওপরে এস দেখ তিনি কী হয়ে যাচ্ছেন! সে নিরুপায় হয়ে বলল, চিফ-মেট আপনি কিছু বলছেন না—স্যার স্যার! একবার আপনি প্রতিবাদ করুন। তা না হলে সবাই ভয় পেয়ে যাবে। ঘাবড়ে যাবে। আমরা আর আপনার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারব না।

স্যালি হিগিনস শুধু বললেন, ছোটবাবু ও তো ঠিকই বলেছে। ফাইভার তো বানিয়ে কিছু বলে নি!

—স্যার আপনি কী বলছেন: এ-সব আজগুবী কথা স্যার আপনি বিশ্বাস করেন! এতদিনের বিশ্বস্ত জাহাজ! ফাইভার অযথা দুর্নাম দিচ্ছে, আর আপনি সবার সামনে স্বীকার করছেন! আমাদের শেষ বিশ্বাসটুকু এ-ভাবে নষ্ট করে দিচ্ছেন!

স্যালি হিগিনস বিশ্বস্ত কথাটা বার বার উচ্চারণ করতে লাগলেন। সিউল-ব্যাংক তাঁর তার অনুগত ছিল। এখনও আছে। জাহাজটার জন্য তাঁর সর্বস্ব বাজি রেখে ভেবেছিলেন, তিনি স্যালি হিগিনস। পাঁচ নম্বর কত সহজে সব কেড়ে নিচ্ছে! তিনি জাহাজটাকে অযথা গুজবের হাতে ছেড়ে দিতে পারেন না। মনের দুর্বলতা প্রশ্রয় পেয়ে যাচ্ছে ভেবে সোজা হতে চাইলেন। তিনি সোজা হয়ে দেখলেন চারপাশে কি নিদারুণ জ্যোৎস্না, কি নীল আকাশ আর অনেক দূরে যেন সেই মহাপ্রাণ—কক্ কক্ করে ডাকছে। তিনি সাহস সঞ্চয় করছেন—কল আপন মি ইন দ্য ডে অফ ট্রাবল, আই উইল ডেলিভার দি এ্যান্ড দাউ শ্যালট গ্লোরিফাই মি। তিনি এবার দ্রুত নেমে গেলেন। আর বলতে থাকলেন জাহাজটার প্রতি আপনারা কে বিশ্বস্ত বলুন। হু ইজ ফেথফুল টু দ্য সিপ। সবাই আপনারা মাসতারে দাঁড়ান।

এবং ওপরে কেউ আর থাকল না। সবাই যে যার মতো বোট-ডেকে মাসতার দিলো। তিনি বললেন—ইউ? ইউ? তাঁর আলখাল্লার মতো লম্বা শিলপিং গাউন পাটাতনে লোটাচ্ছে। তাঁর কপালে ভীষণ ঘামছে। মনে শংকা তাঁর। প্রত্যেকের মুখের সামনে মশাল তুলে বলছেন—ইউ? নান! কেউ তাঁর স্বপক্ষে নেই। তিনি কেমন ভেঙে পড়ছেন! তখন ছোটবাবুর মুখ মশালের আলোতে প্রায় উদ্ভাসিত—তিনি বললেন, তুমি ছোটবাবু?

ছোটবাবু বলল, মি ফেথফুল টু দ্য শিপ স্যার।

আর, আর [illegible] তিনি যেন ফের সাহস ফিরে পাচ্ছেন।—[illegible] তুমি?

জ্যাক হাত তুলে দিল। যেন বলতে চাইল ইয়েস [illegible] ফেথফুল টু দ্য শিপ, টু ইউ অল। [illegible] কথাটাতে সে বোধহয় ছোটবাবুকে বোঝাতে চাইল। সব মিলে যেন ছোটবাবু বাবার পাশে দাঁড়াবার মতো যথার্থ মানুষ। এবং এভাবে সে আর বিন্দুমাত্র ভয় পাচ্ছে না জাহাজে থাকতে। বাবা ছোটবাবু সে। তার আর কিছু লাগে না।

তিনি তখন মশালের আলোতে বলে বলে যাচ্ছেন, আর আর কে? এনি মোর? এক হাতে গাউন সামলাচ্ছেন অন্য হাতে মশাল তুলে বলছেন—ইউ? নে ফেথ্! নো।...দেন... ইউ...ইউ?

—মি সার ফেথফুল! এনজিন-সারেঙ হাত তুলে দিলেন।

আর কেউ না। তিনি এবার ফিরে যেতে থাকলেন। আর কেউ জাহাজটার প্রতি বিশ্বস্ত নয়। তারা সহজেই তাকে পুড়িয়ে মারতে পারে। ভয়ে মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেলে তিনি সিঁড়িতে দ্রুত উঠে গেলেন। যেন ওরা ছুটে আসছে পেছনে। ওঁকে ধরবার জন্য হা-হা করে ছুটে আসছে। ওপরে উঠে পেছনে তাকালেন। তিনি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। কেউ নেই। তিনি একা। একা দাঁড়িয়ে আছেন। জাহাজে একটা কাক-পক্ষী নেই। অন্তহীন সমুদ্র আর আকাশ। জাহাজটা সাঁতার কাটছে সমুদ্রে। তিনি এবার ভীষণ অহংকারী গলায় বলে উঠলেন—আপনাদের ছুটি। কাল সকালে আপনারা সেল করবেন। ঈশ্বরের আপনাদের সহায় হোন।

(ক্রমশঃ)

তারাপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট
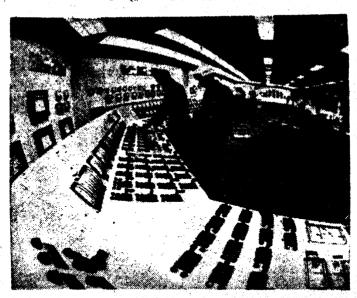
বিজ্ঞানের কথা

* বিশ্ব জনসংখ্যা বৎসর

* পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার

বিশ্ব জনসংখ্যা, বৎসর

জাতিসংঘ সংগঠনের পক্ষ থেকে ১৯৭৪ সালটিকে 'বিশ্ব জনসংখ্যা বৎসর' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এতদুপলক্ষে একটি বিশ্ব জনসংখ্যা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রুমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্টে আগামী আগস্ট মাসে। সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যাগত সমস্যা নিয়ে আলোচনা হবে এবং সমস্যার সমাধানের উপায় অনুসন্ধান করা হবে।

পাঁচটি উদ্দেশ্য নিয়ে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে :

১। জনসংখ্যার ঝোঁক নির্ধারণের জন্য তথ্য-সংগ্রহের ব্যবস্থা উন্নত করা,

২। জনসংখ্যাগত সমস্যার মোকাবিলা করার জরুরি প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা

৩। জনসংখ্যার বৃদ্ধি রোধের পদ্ধতি সম্পর্কে গণ-শিক্ষার একটি প্যাটার্ন উদ্ভাবন করা,

৪। জনসংখ্যার বিস্ফোরণ এবং উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর ক্ষেত্রে তার বিরূপ ফল সম্পর্কে আলোচনায় উৎসাহিত করা, এবং

৫। জনসংখ্যাগত সমীক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সমঝোতা ও সহযোগিতা বাড়িয়ে তোলা এবং উন্নতিশীল দেশগুলিকে কারিগরী সহায়তা দানের ব্যবস্থা করা।

জাতিসংঘের পক্ষ থেকে পুরো একটি বছরকে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত করা থেকে বোঝা যাচ্ছে বিষয়টি কতখানি গুরুতর। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পৃথিবীর জনসংখ্যা এত দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে এবং বিশেষ বিশেষ এলাকায় তার এমন নাটকীয় সমাবেশ ঘটছে যে বর্তমান শতাব্দীর বাকি সময় এবং তারপরেও এইটিই হয়ে থাকবে পৃথিবীর মানুষের সামনে একটি সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। পৃথিবীর জনসংখ্যা সাড়ে-তিনশো কোটিতে পৌঁছতে সময় লেগেছে দশ লক্ষ বছরেরও বেশি কিন্তু এই জনসংখ্যার সঙ্গে আরো সাড়ে-তিনশো কোটি যুক্ত হতে সময় লাগবে আর মাত্র তিরিশটি বছর। তবে সম্ভবত আগামী কয়েকটি দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যথেষ্ট কমবে (পরিবার পরিকল্পনার কল্যাণে)। মনে রাখা দরকার, বিশ্বের জনসংখ্যার ৭৫ শতাংশই বাস করে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে। ২০০০ সালের মধ্যে এই দেশগুলিতে বাস করতে শুরু করবে ৮৪ থেকে ৮১ শতাংশ মানুষ এবং ইউরোপের ও উত্তর আমেরিকার অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল দেশগুলিতে ১৬ থেকে ১৯ শতাংশ।

ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাটি বলা হয়ে থাকে আতঙ্কজনক। মাত্র কুড়ি বছরের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা ৩৬·১ কোটি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৫৮·৬ কোটি। হিসেব করলে দেখা যায়, বৃদ্ধির এই হার বজায় থাকলে আগামী দশ বছরের মধ্যে জনসংখ্যা হয়ে দাঁড়াবে ৮০ কোটি। এই বিপুলসংখ্যক মানুষের জন্য খাদ্য ও বস্ত্রের যোগান দেওয়াটাই একটা মূল সমস্যা। তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে পরিবারের স্বাস্থ্য ও সুখ জাতির বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও সামাজিক অগ্রগতি আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও শান্তি।

একেবারে মূল কথাটি এই : প্রাকৃতিক সম্পদ যে পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে তার সঙ্গে প্রতিটি মানুষের সর্বনিম্ন প্রয়োজনের অনুপাত সঙ্গতিপূর্ণ কিনা। অন্য ভাষায়, জমির উর্বরতা ও মানুষের প্রজননশক্তির মধ্যে সমতা থাকছে কিনা। বলা বাহুল্য এই সমতা না আসা

[illegible] পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা দাঁড়াবে সাতশো কোটি। তখন [illegible] খাদ্য পাওয়া যাবে না।

পর্যন্ত জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির সকল প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

বিশেষ করে যে-সব দেশের জনসংখ্যা এমনিতেই অত্যধিক—যথা ভারত, বাংলাদেশ, চীন ইত্যাদি—সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চ হার গুরুতর সমস্যা হয়ে দেখা দিতে পারে, উল্লিখিত দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এতই অধিক যে সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে, এই দেশগুলিতে 'জনসংখ্যার বিস্ফোরণ' ঘটছে। তবে বিস্ফোরণ সত্ত্বেও চীনদেশ থেকে এখনো পর্যন্ত খাদ্যাভাবের কথা শোনা যায়নি আমাদের দেশে—পরিসংখ্যানবিদ বিশেষজ্ঞদের মতে—খাদ্যাভাব এখনো পর্যন্ত মার্জিনাল (অর্থাৎ সুষ্ঠু বণ্টনের ব্যবস্থা থাকলে ঠিক পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ), বাংলাদেশেও সম্ভবত তাই, তবে এ-আলোচনা স্বতন্ত্র।

কিন্তু এমন কথা কেউ যদি ভাবেন যে জনসংখ্যা অবাধে বেড়ে চলুক সেই সঙ্গে উৎপাদনও সমহারে বৃদ্ধি ঘটানো যেতে পারে—তাহলে একদল বিজ্ঞানীর মতে, তাহলে ভুল করা হবে। তাঁরা বলেন, আমাদের বাসভূমি এই গ্রহটাই তো সীমাবদ্ধ, অতএব এই সীমাবদ্ধ এলাকায় সীমাহীন বৃদ্ধি কিছুতেই সম্ভব নয়। সে-চেষ্টা করার অর্থই হবে প্রকাণ্ড একটি বিপর্যয়।

নানা দেশের বিজ্ঞানী ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা মিলিত হয়ে এ-বিষয়ে লিখিত প্রতিবেদন পর্যন্ত উপস্থিত করেছেন। তাঁদের মতে, পৃথিবীর মানুষ একটি পরিবেশগত বিপর্যয়ের সম্মুখীন। তা রোধ করতে হলে ১৯৭৫ সালের মধ্যে মানুষের প্রজননগত বৃদ্ধি ও উৎপাদনগত বৃদ্ধি রোধ করা দরকার। শেষহীন বৃদ্ধি বলে কিছু থাকতে পারে না, সীমাহীন সম্পদ বলেও কিছু নয়। আমাদের এই গ্রহ নিতান্তই সীমাবদ্ধ, সব বৃদ্ধিরই শেষ আছে।

একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'আমরা আশা করি মানুষ শিক্ষালাভ করবে ও অবহিত হবে...যাতে দূষিতকরণ নিয়ন্ত্রণে আগে এবং মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি ও সম্পদ-ভোগকে বেঁধে রাখা চলে একটা স্থায়ী ও নির্ভরযোগ্য অবস্থার প্রয়োজন।' তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এ-কাজটি করা না হলে সভ্যতার পতন অনিবার্য এবং একটি কি দুটি প্রজন্মের মধ্যেই তা ঘটে যেতে পারে।

আমাদের এই পৃথিবীর জনসংখ্যা বছরে ১·৯ শতাংশ হারে বাড়ছে। এই হার বজায় থাকলে আগামী তেত্রিশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাবার কথা। অতএব ধরে নিতে হয়, উৎপাদনের বৃদ্ধিও সমহারে হয়ে চলবে এবং তা হতেই থাকবে। তাহলে আর একশোটি বছরও পার হবে কি? এই বিজ্ঞানীরা বলছেন, না হওয়ারই সম্ভাবনা, তার আগেই প্রকাণ্ড একটি বিপর্যয় সর্বকিছুকে গ্রাস করবে। তাঁরা বলেন, প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে সীমাবদ্ধতা আর সেই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে চায় মানুষ যে-উপায়ে সেই উপায়ের মধ্যেও সীমাবদ্ধতা। গত একশো বছরে প্রযুক্তিবিদ্যার বিপুল অগ্রগতি মানুষকে আশাবাদী করে তুলেছে সন্দেহ নেই (যদিও তা সত্ত্বেও অধিকাংশ দেশে বিপুল দারিদ্র্য) এবং সে অনায়াসেই ভাবতে পারে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চ্যালেঞ্জকে সে মোকাবিলা করবে প্রযুক্তিবিদ্যা দিয়ে, কোনো সম্পদ যদি ফুরিয়ে যায় তাহলে প্রযুক্তিবিদ্যা তাকে সন্ধান দেবে নতুন সম্পদের, ইত্যাদি। তখন এই বিজ্ঞানীরা বলেন, এই ধারণাটিই ভুল, পরিবেশগত বিপর্যয় এমন একটা আকার ধারণ করতে চলেছে যে ধ্বংসই সেখানে ভবিতব্য।

বৃদ্ধি ও পরিবেশ নিয়ে যাঁরা অনুশীলন করেন তাঁদের মতে, ভোগের বর্তমান হার যদি বজায় থাকে তাহলে আগামী ২৫০ বছর সকল সম্পদের যোগান অব্যাহত থাকবে। কিন্তু এই সঙ্গে যদি মনে রাখা যায় যে পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলবে এবং সেই সঙ্গে ভোগের মাত্রাও, তাহলে সম্পদের যোগান একশো বছরের মধ্যেই নিঃশেষ হবার কথা। তখন আর যথেষ্ট পরিমাণে সার পাওয়া সম্ভব হবে না, ফলে খাদ্যের সরবরাহ কমবে।

তাই এই বিজ্ঞানীরা বলেন মানুষকে বাঁচতে হলে এখন দাঁড়িয়ে পড়তে হবে। আর বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই—না প্রজননে না উৎপাদনে। বৃদ্ধি হোক শূন্যমাত্রার—অর্থাৎ, যা আছে তাই থাকুক। তাহলে প্রশ্ন করা যেতে পারে, পৃথিবীর বর্তমান অবস্থাটা কি খুব কাম্য? কোথাও প্রাচুর্য, কোথাও অনটন—এই অসাম্যের অবস্থা? আসলেই নয়, চাই ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সম্পদের পুনর্বণ্টন। সম্পদের বণ্টন এখন তো নিতান্তই একপেশে। আমেরিকার কথাই ধরা যাক—পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মাত্র ৫·৬ শতাংশ বাস করে এই দেশে অথচ তারা ব্যবহার করে গোটা পৃথিবীর প্রাথমিক কাঁচামালের প্রায় ৪০ শতাংশ, ভোগ করে গোটা পৃথিবীর প্রাকৃতিক গ্যাসের ৬৫ শতাংশ [illegible] বিদ্যুতের ৩৩ শতাংশ। আবার একইভাবে আমেরিকার কথা ধরলেও [illegible] সম্পদ

উপমহাদেশে অধিবাসীর এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের এমানতর বা ততোধিক ব্যবধান। এই বিজ্ঞানীদের মতে, বুদ্ধির মাত্রা শূন্যে রেখে দেশের সঙ্গে দেশের এবং দেশের অভ্যন্তরে এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের ব্যবধান দূরে করতে পারলে স্থায়ী মীমাংসা হতে পারে।

অর্থাৎ, আমাদের এই পৃথিবী নামক গ্রহটি যে নিতান্তই সীমাবদ্ধ, এই সত্যটি ধরে নিয়ে সমস্যার বিচার করা চাই। গণ্ডগোল বাধে যদি হিসেবের অন্যদিকে কোনো সীমানা না থাকে। আমাদের এই পৃথিবীতে ১৯৭০ সালে জনসংখ্যা ছিল সাড়ে-তিনশো কোটি, ২০০৩ সালে হবার কথা সাতশো কোটি। ধরা যাক, কোনো একটি কাঁচামালের চাহিদা এ বছরে দুই টন এবং প্রতি বছরে এই চাহিদা দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে পনেরো বছর পরে এই চাহিদার পরিমাণ দাঁড়াবে ৩২,৭৬৮ টন, কুড়ি বছর পরে ১০৪৮৫৭৬ টন। সহজেই অনুমান করা চলে, চাহিদা যদি এই হারে বাড়তে থাকে তাহলে যোগানে ঘাটতি পড়তে বাধ্য—যেমন-তেমন নয়, বিপুল পরিমাণের ঘাটতি। অ্যালুমিনিয়ম সম্পর্কে বলা হয় বর্তমান চাহিদা যদি বছরে-বছরে নাও বাড়ে তাহলেও পৃথিবীর অ্যালুমিনিয়ম সম্পদ আগামী একশো বছরের মধ্যে নিঃশেষ হবার কথা। কিন্তু পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে, সেই সঙ্গে চাহিদাও, ফলে নিঃশেষ হবার সম্ভাবনা আগামী একত্রিশ বছরের মধ্যেই। খাদ্য উৎপাদনের বেলায় অবস্থা আরও সঙ্গীন। পৃথিবীর জনসংখ্যা যদি বর্তমান হারে বেড়েই চলে তাহলে ২০০০ সালের মধ্যে খাদ্য উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় জমি আর পাওয়া যাবে না।

আবার অন্যদিকে এমন একদল আশাবাদী বিজ্ঞানীও রয়েছেন যাঁদের মতে ভবিষ্যৎ মোটেই ভয়াবহ নয়। তাঁরা বলেন, আগামী একশো বছরের মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত জরুরি সম্পদ যদি সম্পূর্ণ ফুরিয়েও যায় তাহলেও ইতিমধ্যে অন্য উৎসের সন্ধান পাওয়া যাবে। মানুষ জয় করবে অন্যান্য গ্রহ এবং সম্পদ আহরণ করে আনবে সেই সমস্ত গ্রহ থেকে। যদি এই সম্ভাবনাকে অবাস্তব মনে হয় তাহলে এই পৃথিবীর মধ্যেই প্রতিটি নিঃশেষিত সম্পদের বিকল্প আবিষ্কার করতে পারবে। তাছাড়া, বিরাট এক সম্পদের আধার সমুদ্র তো অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত রয়ে গিয়েছে। ভূপৃষ্ঠের তিন-চতুর্থাংশ জুড়ে থাকা এই সমুদ্র থেকে বাকি এক-চতুর্থাংশের আরো অনেক [illegible] সম্ভব বলে এই বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার

গত ১৮ই মে তারিখে ভারত যে [illegible] সম্পর্কে কয়েকটি দেশের সন্দেহ এখনো প্রবল। ভারত ঘোষণা করেছে, তার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ। যদি ধরেও নেওয়া যায় এই ঘোষণা একটা ধাপ্পা মাত্র তাহলেও এই মুহূর্তে উদ্বিগ্ন হবার কোনো কারণ নেই। ভারত যদি একটি পরমাণু-বোমা বানিয়েও বসে তাহলে সেটি নিয়ে তাকে হয়তো বসেই থাকতে হবে। কেননা, লক্ষ্যবস্তুর ওপরে পরমাণু-বোমাটি নিক্ষেপ করতে হলে ততক্ষণে পরমাণু-বোমাটি বহন করে নিয়ে যাবার যে বিশেষ ব্যবস্থাটি থাকা দরকার ভারতে তা অবর্তমান। এমন একটি ব্যবস্থা অদূর ভবিষ্যতে তৈরি হতে পারবে এমন সম্ভাবনাও না-থাকার মতো। প্রধান [illegible] ইন্ডিয়ার কোনো বাতিল বোয়িং বিমানে পরমাণু-বোমাটি তোলা যেতে পারে, কিংবা বিমানবাহিনীর কোনো বোমারু বিমানে—তবে তাতে প্রতিবেশী কোনো দেশের উদ্বিগ্ন হবার কোনো কারণ আছে বলে মনে হয় না। আপাতত বেশ কিছুকাল ভারতের এই নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ শুধুই বৈজ্ঞানিক কৌতূহল চরিতার্থ করতে পারে মাত্র—তার বেশি কিছু নয়।

তবে যে কথা বলা হচ্ছে, শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে নিউক্লিয়র বিস্ফোরণ ঘটানো হল—তার কতদূর? ভারতের বর্তমান অবস্থা দেখে (এ-দেশে এখনো ২৬,০০০ মানুষ বসন্তরোগে মারা যায়) এ-প্রশ্নের জবাবে চুপ করে থাকাই ভালো।

তবে, শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে নিউক্লিয়ার শক্তির ব্যবহার কী হতে পারে, এপ্রশ্নের জবাব নিশ্চয়ই স্পষ্ট ভাষায় দেওয়া যেতে পারে।

তিনভাবে হতে পারে ঃ

১। উচ্চ বিস্ফোরণ ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ ব্যবহার।

২। শক্তির উৎসরূপে শান্তিপূর্ণ ব্যবহার।

৩। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিবিধ ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ ব্যবহার।

বিস্ফোরণ-ক্ষমতা কাজে লাগানো যেতে পারে (ক) খনিজ অনুসন্ধানে ও উন্নয়নে এবং (খ) বাঁধ ও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্পে।

খনিজ অনুসন্ধান ও উন্নয়নের কাজ হতে পারে নানা রকমের। এক, উপরিস্থিত বিপুল বোঝা বা পাথরের চাঁই একযোগে অপসারণ করা। দুই, হাইড্রো-কার্বন মজুতাধারের জন্যে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি [illegible] চার, ভূগর্ভের আগুন নির্বাপিত করা।

নিউক্লিয়র বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিপুল পরিমাণ পাথরের চাঁই অপসারণের কাজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও সোভিয়েত ইউনিয়নে খানিকটা করা হয়েছে। আমাদের দেশেও বিভিন্ন তামার খনিতে ও কয়লার খনিতে করার চেষ্টা হতে পারে। তাছাড়া, ভূগর্ভের আগুন আমাদের দেশের কয়লা-খনিগুলোতে বিরল ঘটনা নয়। ভূ-তাপগত উৎস গড়ে তোলার জন্যে গ্যাসের উৎপাদন বাড়িয়ে তোলার সম্ভাবনাও পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

আমাদের দেশের কয়েকটি বাঁধের নির্মাণকার্যে বিপুল খননকার্য করতে হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা চলে, ভাকরা বাঁধের ভিত্তি গড়ার জন্যে প্রায় ৩০ লক্ষ ঘনমিটার খনন করতে হয়েছিল। কেরালে একটি প্রকল্পে ৩৩,০০০ ঘনফুট খননের প্রয়োজন হতে পারে। শুধু মজুর লাগিয়ে প্রচলিত প্রথায় এই খনন করতে হলে প্রচুর সময় ও কয়লা লাগার কথা। তেমনি সুড়ঙ্গ বা খাল ইত্যাদি তৈরি করতে হলেও বিপুল খননকার্য চালাতে হয়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে নিউক্লিয়র বিস্ফোরণের সাহায্য নেওয়ার কথা অবশ্যই বিবেচিত হতে পারে।

[illegible] ইত্যাদি নদী দিয়ে বিপুল পরিমাণ

[illegible] জল [illegible] হচ্ছে এবং বর্ষাকালে [illegible] বন্যা হয়ে থাকে [illegible]। বিজ্ঞানীরা [illegible] ব্যতীত জল ধরে [illegible] তৈরি [illegible] পারে। [illegible] এই [illegible] নিউক্লিয়ার শক্তির [illegible] সম্ভব।

[illegible] আজকাল পারমাণবিক খনিজ থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের কথা ওঠে। বর্তমানে জল-বিদ্যুৎ ও তাপ-বিদ্যুতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। ভারতে নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাত্রা ৫৮০ মেগাওয়াট। আরো ৬৪০ মেগাওয়াট উৎপাদনের নিউক্লিয়ার পাওয়ার-প্লান্ট নির্মিত হচ্ছে রাজস্থানে ও তামিলনাড়ুতে। ৪৬০ মেগাওয়াটের আরো একটি নিউক্লিয়ার পাওয়ার-প্লান্ট নির্মাণের কথা হচ্ছে উত্তরপ্রদেশে। এই সমস্ত নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টে পারমাণবিক খনিজ ব্যবহৃত হয় ইউরেনিয়াম। কিন্তু বর্তমানে যে দ্বিতীয় চুল্লি তৈরি হতে চলেছে তাতে ইউরেনিয়ামের বদলে থোরিয়াম ব্যবহার করা যাবে। থোরিয়াম আমাদের দেশে প্রচুর। অতএব আশা করা চলে নিউক্লিয়ার উৎসের ওপরে নির্ভরশীল আরো অনেক পাওয়ার-স্টেশন আমাদের দেশে নির্মাণ করা সম্ভব হবে। পশ্চিমবাংলায় একটি নিউক্লিয়ার পাওয়ার-স্টেশন নির্মাণের দাবি তো কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে।

[illegible] নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ [illegible] পেট্রল ইত্যাদির বদলে নিউক্লিয়ার জ্বালানীর ব্যবহার সম্ভব কিনা তাই নিয়ে বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন। পেট্রল পাওয়া যায় ফসিল জ্বালানী থেকে বিদ্যুৎ নিউক্লিয়ার জ্বালানী থেকে। কিন্তু এই দুই জ্বালানীরই সম্পদ সীমাবদ্ধ। বিজ্ঞানীরা তাই ভাবছেন ফিউজন বা একীভবনের দ্বারা নিউক্লিয়ার শক্তির যোগান পাওয়া সম্ভব কিনা। হাইড্রোজেন বোমার শক্তি এই ফিউজন থেকে সূর্যেরও তাই (সূর্যের মধ্যে যেন কোটি কোটি হাইড্রোজেন বোমা একসঙ্গে বিস্ফোরিত হচ্ছে)। ফিউজনের মূল উপকরণ হচ্ছে হাইড্রোজেন, যা আমাদের এই গ্রহে অফুরন্ত পাওয়া যায়। কাজেই ফিউজন থেকে শক্তির যোগানের ব্যবস্থা করতে পারলে শক্তির সংকট বলে আর কিছু থাকে না।

নিউক্লিয়ার শক্তির দ্বারা চালিত জাহাজ ইতিমধ্যে জাপানে, সোভিয়েত ইউনিয়নে ও আমেরিকায় তৈরি হয়েছে। সোভিয়েত আইসব্রেকার 'লেনিন' জাহাজটির নাম এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

চিকিৎসা-বিদ্যায় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় নানা ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয়তার ব্যবহার তো ব্যাপকভাবেই শুরু হয়েছে।

[illegible]

প্রশ্ন : ভারতের নিউক্লিয়ার গবেষণা ও পারমাণবিক শক্তির প্রতিষ্ঠানগুলির নাম কী? জায়গাটি কোথায়?

অগ্রগামী একদল মানুষের মধ্যে পুঁজিবাদী [illegible] নির্ভরশীল হবে, বিজ্ঞানীরা মনে করেন। তখন আর জমির দাবি তৈরি হবে না। খাদ্য সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে।

উত্তর : (১) ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার ট্রম্বে (মহারাষ্ট্র), (২) ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি আমেদাবাদ (গুজরাট), (৩) টাটা ইনস্টিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ বোম্বাই (মহারাষ্ট্র), (৪) হাই অ্যালটিটিউড রিসার্চ ল্যাবরেটরি গুলমার্গ (কাশ্মীর), (৫) সীসমিক রিসার্চ সেন্টার গৌরিবিদানুর (কর্নাটক) (৬) সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার রিসার্চ (পশ্চিমবাংলা)।

সকলেই জানেন, ভারতের প্রথম নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণটি ঘটানো হয়েছে প্লুটোনিয়ামের সাহায্যে। নাগাসাকির পরমাণু-বোমাটিও ছিল প্লুটোনিয়ামের। এখন প্রশ্ন : প্লুটোনিয়াম কী?

উত্তর : প্লুটোনিয়াম হচ্ছে মানুষের তৈরি একটি ধাতু। একমাত্র নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদন করা ছাড়া এই ধাতুর আর কোনো ভূমিকা আছে বলে মনে হয় না।

প্লুটোনিয়াম তৈরি হয় নিউক্লিয়ার চুল্লিতে যেখানে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হয় ইউরেনিয়াম। ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় দু-ধরনের। একটি থেকে (ইউরেনিয়াম-১৩৫) নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপন্ন হয় অপরটি (ইউরেনিয়াম-২৩৮) এক্ষেত্রে কোনো কাজে লাগে না। কিন্তু নিউক্লিয়ার চুল্লির এই অকাজের ইউরেনিয়াম থেকেই পাওয়া যায় প্লুটোনিয়াম। একটি অতি জটিল সূক্ষ্ম [illegible] করতে হয়। ভারতে এটি সম্পন্ন হয় ট্রম্বের ৪০ মেগাওয়াট চুল্লিতে। এখানে বছরে প্রায় ১০ কিলোগ্রাম প্লুটোনিয়াম উৎপন্ন হয়ে থাকে।

প্লুটোনিয়াম তেজস্ক্রিয় ও বিশ্বের সবচেয়ে বিষাক্ত পদার্থ। দীর্ঘকাল জীবন্ত থাকে, প্লুটোনিয়াম পরমাণুর বিপজ্জনক বিকীরণ হাজার হাজার বছর ধরে চলতে পারে। এই বিকীরণ থেকে ক্যানসার হওয়া অসম্ভব নয়।

ট্রম্বের প্লুটোনিয়াম-বিজ্ঞানীরা চার ফুট পুরু কংক্রিটের দেয়ালের আড়ালে থেকে দূর-নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার সাহায্যে কাজ করেন।

শোক সংবাদ : অধ্যাপক পি এম এস ব্ল্যাকেট

৭৬ বছর বয়সে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পরমাণু-বিজ্ঞানী অধ্যাপক প্যাট্রিক মেনার্ড স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকেট-এর জীবনাবসান হল।

নোবেল পুরস্কার তিনি পেয়েছিলেন ১৯৪৮ সালে—মহাজাগতিক বিকীরণ সম্পর্কিত গবেষণায় দ্রুতগামী পারমাণবিক কণিকার গমনপথের দিশা পাবার উপায় হিসেবে উইলসন ক্লাউড চেম্বার পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্যে এবং নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ্যায় তাঁর আবিষ্কারের জন্যে।

কিন্তু তার আগেই অধ্যাপক ব্ল্যাকেট আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ১৯৩৩ সালে তিনি পজিটিভ ইলেকট্রন বা পজিট্রন আবিষ্কার করেন। পরমাণু-বিজ্ঞানে তাঁর গবেষণা পরমাণু-বোমা উদ্ভাবনের সহায়ক হয়েছিল।

অধ্যাপক ব্ল্যাকেটের মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, 'ভারত তার এক অকৃত্রিম বন্ধুকে হারাল এবং মানুষের জ্ঞানের জগৎ থেকে এক বিশিষ্ট ব্যক্তি সরে গেলেন।'

অধ্যাপক ব্ল্যাকেট স্মরণীয় হয়ে থাকবেন শুধু তাঁর বৈজ্ঞানিক অবদানের জন্যে নয় বিজ্ঞানকে মানব-কল্যাণে নিয়োজিত করার চেষ্টার জন্যেও। স্বাধীন ভারতের বৈজ্ঞানিক নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে জওহরলাল নেহরু তাঁর পরামর্শ নিয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে নেহরু স্মৃতি বক্তৃতা দেবার জন্যে তিনিই ছিলেন ভারতে প্রথম আমন্ত্রিত বিজ্ঞানী। সে-সময়ে কলকাতাতেও এসেছিলেন এবং ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে অধ্যাপক মহলানবিশের অতিথি হয়ে ছিলেন। কলকাতার বহু বিজ্ঞানী তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত।

—অমরকান্ত

সেকালের সঙ্গীতগুণী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ হয়েছিলেন তবলা-গুণী। কাশীর বিখ্যাত তবলিয়া ভগৎজী তার প্রধান ওস্তাদ। পরে শ্যামাচরণ কলকাতায় লছমী প্রসাদের কাছেও তবলার তালিম পান। শ্যামাচরণ একজন নির্ভর-যোগ্য তবলাবাদক বলে পরিচিত হন কলকাতার সংগীতসমাজে। তিনি উত্তর কলকাতায় জোড়াবাগান অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর সঙ্গেই বাস করতেন তাঁদের চতুর্থ ভ্রাতা বুন্দি মিশ্র। বেচু ওস্তাদের এই পুত্র একাধারে তবলাবাদক ও গায়ক। তবে কলকাতার তবলিয়া বলেই বুন্দি মিশ্র বেশী খ্যাতনামা হয়েছিলেন। এখানে তবলায় তাঁর শিষ্যদের মধ্যে একজন হলেন সুপরিচিত অনাথনাথ বসু।

তাঁদের দ্বিতীয় ভ্রাতা গৌরীশংকর এবং কনিষ্ঠ কালিপ্রসাদ প্রধানত সারঙ্গী। অবশ্য গানে ওদের দুজনেরই যেমন অভিজ্ঞতা, তেমনি সংগ্রহ। গান ও সারঙ্গ এই দুই মাধ্যমেই পিতৃ-পিতামহের উত্তরাধিকার দুই সহোদর লাভ করে-ছিলেন। পিতার তালিম দুজনেই পান তাঁরা। তবে বংশের অতিরিক্ত শিক্ষাও গৌরীশঙ্করের কিছু ছিল। গৌরীশংকর সারঙ্গের তালিম পেয়েছিলেন কাশীর বিরাই মিশিরের কাছেও। কবীরচৌরা নিবাসী বিরাই মিশ্র ছিলেন এক সুপরি-চিত সারঙ্গী বংশের ঘরানাদার। তাঁর এক পৌত্র পাটনা বেতার কেন্দ্রের সারঙ্গ-বাদকরূপে এখনো বর্তমান আছেন।

গৌরীশঙ্কর বাল্যকাল থেকে একই সঙ্গে গান ও সারঙ্গের চর্চা আরম্ভ করে-ছিলেন। আর যৌবনকালেই প্রস্তুত হন পেশাদার জীবনের জন্যে। সারেঙ্গীর বৃত্তি নিয়ে প্রথমে তিনি নেপাল দরবারে কিছুদিন ছিলেন। তারপর স্থায়ী হন কলকাতার সঙ্গীতসমাজে। তাঁর অন্য তিন ভ্রাতারাও একে একে এখানকার সঙ্গীতক্ষেত্রে যোগ দেন।

এখানে গৌরীশঙ্কর প্রথম থেকেই গহর জানের সঙ্গে পরিচিত হন। সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালিনী বাইজীর সহযোগিতা তখন থেকেই পান বেচু ওস্তাদের এই উপযুক্ত পুত্র। অভিজাত পর্ব মহীশূর দরবারে উপস্থাপনের আগে গহর জান দীর্ঘ-দিন কলকাতাবাসিনী ছিলেন, গৌরীশঙ্কর সঙ্গীতাসরে তাঁর সহযোগী হয়েছেন। কলকাতা থেকে উত্তর ভারতের প্রায় অনেক সঙ্গীত কেন্দ্রে আসরে দরবারে। এমন কি ১৯১১ সালের দিল্লী দরবারেও। গহরজানের পরম নির্ভর দক্ষিণের সারঙ্গী বরাবর থাকেন গৌরীশঙ্কর। তাঁরও পেশাদার জীবনে এই যোগাযোগ একটি নির্ভরতার বিষয় হয়েছিল।

গৌরীশঙ্কর কলকাতায় যখন বাস করতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁর বয়স ৩০-এর দু-এক বছর কম। আর তাঁর মৃত্যুও অশীতিপর বয়সে এই শহরেই হয়েছিল। পূর্ণ ৫০ বছরের সঙ্গীত-জীবন অতিবাহিত হয় এখানে। গৌরী-শঙ্করের জন্মসন আনুমানিক ১৮৬৫।

কনিষ্ঠ কালিপ্রসাদ গৌরীশঙ্করের শিক্ষাও পেয়েছিলেন। তিনিও কলকাতায় প্রসিদ্ধ হন কালী ওস্তাদ নামে। গৌরী-শঙ্করের আমৃত্যু সঙ্গীতজীবনের সহযোগী তিনি। দুজনে অনেক সময় একই ছাত্রীকে তালিম দিয়েছেন। যেমন কৃষ্ণভামিনী কিংবা ইন্দুবালাকে। আসরে একই বাইজীর দুদিকে বসে দুজনে সারঙ্গে সঙ্গত করেছেন। যেমন শ্বেতাঙ্গিনী সুরমা কিরণময়ী কৃষ্ণভামিনী প্রভৃতির গানের সঙ্গে। দুই সহোদর একত্রে জোড়াসাঁকো অঞ্চলে অর্ধশতাব্দী কাল যাপন করেছেন। শ্যামাচরণ ও বুন্দি যেমন জোড়াসাঁকোর বাসিন্দা তেমনি গৌরী-শংকর ও কালিপ্রসাদ ছিলেন জোড়া-সাঁকোর ১৫৮ বলরাম দে স্ট্রীট নিবাসী।

গৌরীশঙ্করের সঙ্গীতজীবনের কেন্দ্র হল কলকাতা। এখান থেকেই তিনি ভারতের নানা অঞ্চলে গিয়ে মুজরো করেছেন। [illegible] গহর জানের সঙ্গে তাঁর [illegible] কখনো কখনো পশ্চিম অঞ্চলে [illegible] গেছেন। কখনো বা অন্য শিল্পীর সঙ্গীতসভাতে। [illegible] নিবাসী হয়ে গেলেও বারাণসীর সঙ্গীত জগতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কখনো বিচ্ছিন্ন হয় নি। সেখানকার গায়ক-গায়িকারা কলকাতায় এলে তিনি তাঁদের সঙ্গে সারঙ্গে সহযোগিতা করতেন আসরে। কখনো কখনো এখানে তাঁদের মুজরোর ব্যবস্থাও করে দিতেন। তাঁর জন্মাষ্টমীর আসরে যোগ দিতেন কাশীর নানা প্রসিদ্ধ শিল্পী, বিশেষ বাইজীরা। বড়ী মোতি বাই হুসনা বাই বড়ী ময়না ময়ূরা বাই প্রভৃতি প্রসিদ্ধা বাইজীদের সঙ্গে তাঁর বাদকরূপে যোগ ছিল। কাশীতে এবং কলকাতায়। বারাণসী ও কলকাতার সঙ্গীতক্ষেত্রের এক যোগসূত্র হয়েও থাকতেন গৌরীশঙ্কর।

সেকালে বাইজীদের গানের সঙ্গেই সারঙ্গসঙ্গতের রেওয়াজ ছিল। সেজন্যে বাইদের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিল বেশি। গহর জানের গানে সঙ্গত করেই হয়ত অন্যান্য বাইজীদের তিনি সহযোগী হয়ে-ছিলেন। মোট কথা, তাঁর মুজরো নিয়মিত এবং বেশির ভাগই হত বাইজীদের আসরে অংশীদার হয়ে। শিক্ষাও দেন বাইজী-দেরই বেশি।

মধ্যবয়স থেকে গৌরীশঙ্করের ওস্তাদজীবন আরম্ভ হয়। শ্বেতাঙ্গিনী ও কৃষ্ণভামিনী তখন তালিম নিতে থাকেন তাঁর কাছে। তারপর তিনি প্রৌঢ়জীবনে ইন্দুবালা কৃষ্ণচন্দ্র দে জমুলাল মিশ্র প্রভৃতিদের শিক্ষা দেন। আরো পরে তাঁর কাছে শিক্ষার্থী হয়ে আসতেন তরুণ ভীষ্মদেব। আর চামু মিশ্র গৌরীশঙ্করের বৃদ্ধবয়সের শিষ্য। তাঁদের মধ্যে কেবল জমুলাল মিশ্র ও চামু মিশ্র তাঁর সারঙ্গের তালিম পেয়েছিলেন। অন্যান্যদের শিক্ষা দেন গানে।

এখন অন্ত কথার আগে তাঁর গানের প্রসঙ্গ একটু আছে। তাঁদের বংশে গান চর্চার একটি বিশেষত্ব। পারিবারিক ধারায় এবং সংগীতজ্ঞের বৃত্তির জন্যে তাঁকে প্রায় সকল রীতির গানে অভিজ্ঞ থাকতেন। সঙ্গতকার সারঙ্গীরূপে একমাত্র ধ্রুপদ ভিন্ন বাইজীদের আসরে প্রচলিত নানা প্রকার গান শিক্ষা-সংগ্রহ করতেন তাঁরা। খেয়াল টপ্পা ঠুংরি দাদরা হোরি থেকে কাজরি চৈতী লাউনী ইত্যাদি সবই। তাদের মধ্যে টপ্পার ছিল বিশেষ স্থান। বারাণসীর সংগীতচর্চায় টপ্পা-গানের যেমন সমৃদ্ধ ইতিহাস তেমনি এই মিশ্র ধরনেও। গৌরীশঙ্করও কাশীর সংগীত-ধারায় টপ্পা সংগীতে অতিসম্পন্ন গুণী ছিলেন। আপন পরিবারে ভিন্ন হয়ত তিনি বিরাই মিশ্রের সারঙ্গ-তালিমে আরো লাভ করেন টপ্পা-অঙ্গ সংগীতে। বারাণসীতে নানা কলাবৎ টপ্পাগীতিতেই সংগীত-জীবন অতিবাহিত করতেন। আর তদীয় শিল্পীরা কত দিক থেকে কিভাবে যে সংগ্রহ করেন তার হিসাব পাওয়া যায় না বাইরে থেকে। তেমনি ঘরের সঙ্গে বাইরের সূত্রেও গৌরীশঙ্কর হয়ত টপ্পার বহু সঞ্চয় করেছিলেন। সে বৃত্তান্ত জানা না গেলেও তাঁকে দেখা যায় টপ্পা-প্রবীণ-রূপে। শুধু গানে নয় সারঙ্গবাদনেও। তাঁর শিক্ষা পেয়েই টপ্পা টপখেয়াল গানের অমন কলাবতী গায়িকা হয়েছিলেন কৃষ্ণভামিনী। টপ্পা অঙ্গের সে বিদ্যা কৃষ্ণভামিনীর কাছে কালিপদ পাঠক পরে পেয়েছিলেন। গানে গৌরীশঙ্করের টপ্পা-গুণের সাক্ষ্য হন কৃষ্ণভামিনী। আর সারঙ্গে টপ্পার গুণপনা উস্তাদজী দেখান দিল্লীর সেই জলসায়। মম্মন খাঁ সারঙ্গীর আসরে।...

টপ্পায় কি ঐশ্বর্যবান ছিলেন গৌরীশঙ্কর। টপ্পার নানা মনোহারী অলংকরণের যেমন রূপকার, তেমনি টপ্পারীতিতে রাগের পরিবেশনায় কুশলী। আর টপ্পা অঙ্গে রাগের কি বৈচিত্র্য। টপ্পায় সচরাচর কয়েকটি নির্দিষ্ট রাগই আসরে শোনা যায়। অপেক্ষাকৃত লঘু রাগ সেসব। টপ্পায় সাধারণতঃ প্রচলিত সেই সমস্ত রাগ তো গৌরীশঙ্করের ছিলই। কিন্তু এমন অনেক রাগেও তিনি টপ্পা শোনাতেন এবং শিক্ষাও দিয়েছেন যা অন্য অনেক কলাবন্তের কাছে পাওয়া যেত না। যেমন সোহিনী পূরিয়া ভীমপলাশী নায়কীকানাড়া মালকোষ সাহানা মুলতান ইত্যাদি রাগে।

টপ্পায় এমন সিদ্ধ বলেই গৌরীশঙ্কর দিল্লীর সেই আসর করতে পেরেছিলেন। পাল্লা দিতে এগিয়েছিলেন মম্মন খাঁর মতন সারঙ্গীর সঙ্গে।

সেই লড়াইয়ের আসরের আগে গৌরীশঙ্করের শেষ অধ্যায়টি বলে নেওয়া যায়।

শ্যামবর্ণ একহারা চেহারার মানুষ ছিলেন তিনি। আকারেও ছোটখাটো। পাঁচ ভ্রাতার মধ্যে তিনিই সবচেয়ে ক্ষুদ্রাকৃতি। তবে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত শরীর বেশ সুস্থই ছিল। আর যশ সম্মানে ভরা একান্ত সংগীতসেবীর জীবন। শিল্পীর পরিতৃপ্তিতে বেশ স্বচ্ছন্দেই দিন যাপন করছিলেন। বাংলার সংগীতজগতের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন সুখে-দুঃখে। বাংলার সুরশিল্পী সংগীতকারদের সঙ্গে, সংগীতের পৃষ্ঠপোষকদের সঙ্গে আন্তরিক প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। সংগীতক্ষেত্রে পেয়েছিলেন মর্যাদার আসন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না। তাই আর কিছু অভাব বোধ করেন নি গৌরীশঙ্কর। শুধু একটি ক্ষোভ ছিল জীবনে। কারণ অপুত্রক ছিলেন। তবে তা নিয়েও আর আক্ষেপ করতেন না। একমাত্র বৃন্দ ভিন্ন তাঁরা চার ভ্রাতাই ত নিঃসন্তান। বৃন্দের দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ চামুকে অপত্যস্নেহে তালিম দিচ্ছিলেন। গঠিত করছিলেন সুদক্ষ সারঙ্গবাদকরূপে। প্রতিভাবান চামু মিশ্র অল্পসময়েই কলকাতার সংগীতাসরে গুণপনা দেখাচ্ছিলেন। এজন্যে তৃপ্ত বোধ করতেন গৌরীশঙ্কর।

এমনিভাবে ওস্তাদজীর জীবন এক-প্রকার শান্তিতেই অতিবাহিত হচ্ছিল। স্বাস্থ্যও তাঁর প্রায় নিরোগ ছিল বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত। কোন বিশেষ ব্যাধিতে কষ্ট পেতেন না।

৭৩।৭৪ বয়স পর্যন্ত পূর্ণ সক্ষম ছিলেন গৌরীশঙ্কর। আসরে আসরে সারঙ্গ সংগত করতেন। তালিম দিতেন ছাত্রদের। সংগীতসমাজে সকলের সঙ্গে সপ্রীতি যোগ দিতেন। সিনেমায় যে অংশ নিতেন তাও এই বয়সে।

একদিন কোন আসর থেকে বাড়ী ফিরছিলেন। বাড়ী সেই জোড়াসাঁকোর ১৫৮ বলরাম দে স্ট্রীটে, যেখানে কনিষ্ঠ লছমী ওস্তাদের সঙ্গে কাটিয়েছিলেন জীবনের অর্ধেক কাল।

সেদিন গাড়ীতে তাঁর সঙ্গে ছিলেন গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে। আরো দু-একজন।

বলরাম দে স্ট্রীটে পৌঁছে গৌরীশঙ্কর গাড়ী থেকে নামতে পারলেন না। অবশ হয়ে গেছে তাঁর শরীরের দক্ষিণ অংশ। ডান হাত ডান পা অক্ষম।

ধরাধরি করে দোতলার ঘরে তাঁকে নিয়ে আসা হল। পক্ষাঘাত। শয্যাশায়ী হয়ে রইলেন গৌরীশঙ্কর। কয়েক মাস চিকিৎসা হতে লাগল। সেসময় তাঁর অনেক যত্ন নিয়েছিলেন স্বনামধন্য গোবরবাবু। মল্লবীর সংগীতসেবী কলাবন্তদের পৃষ্ঠপোষক গোবরবাবু গৌরীশঙ্করের একজন গুণমুগ্ধ। তিনি সেসময় ওস্তাদজীর মাসোহারার ব্যবস্থাও করেছিলেন।

সে যাত্রা অল্পে অল্পে অনেকখানি আরোগ্য লাভ করলেন গৌরীশঙ্কর। তবে আগেকার শরীর আর ফিরে পেলেন না। ক্রমে আসরে সারঙ্গ হাতে দেখা দিতে লাগলেন বটে। কিন্তু পূর্বের ক্ষমতায় আর বাজাতে সক্ষম হন নি। কারণ আর তেমন সবল থাকে নি দক্ষিণ হস্ত। তবে দীর্ঘকালের সাধন ছিল। তাই কোনক্রমে সংগতিয়ার কর্তব্য পালন করতে লাগলেন আসরে। এমনিভাবেই কিছুকাল গেল।

১৯৩৮ সালে প্রথম তাঁর পক্ষাঘাত হয়েছিল। লালাবাবুর বাড়ীতে কলকাতা মিউজিক এসোসিয়েশনের সেই বড় আসরের বছরখানেক পরে।

তখন কয়েক মাস অসমর্থ থাকবার পর গৌরীশঙ্কর পক্ষাঘাতের প্রকোপ খানিক কাটিয়ে ওঠেন। সংগীতজগতে যোগ দিতে আরম্ভ করেন পুনরায়। কিন্তু পরের বছরেই মহাযুদ্ধ বেধে গেল। আর ৪২।৪৩ সালে তার ফলে যুদ্ধজাত দুর্ভিক্ষ নিষ্প্রদীপ বোমার আক্রমণ ইত্যাদি। কলকাতার সংগীতক্ষেত্র বিপর্যস্ত হয়ে গেল। অন্যান্য পেশাদার সংগীতশিল্পীদের মতন গৌরীশঙ্করের জীবনে দেখা দিল মহাসঙ্কট। তাঁর আর দুর্যোগের ওপরে দুর্যোগ। সেই দুর্দিনের মধ্যে মাত্র কয়েকদিনের কালাজ্বরে—সংগীতজীবনে পরম স্নেহের পাত্র হাতে-গড়া ভবিষ্যতের আশাভরসা স্থল—চামু মিশ্রের ২৬ বছরের জীবনদীপ নিভে গেল। সেই দারুণ শোকের মধ্যে কলকাতায় আবার ঘনিয়ে এল বোমার বিপদ। প্রাণভয়ে হাজারে হাজারে কলকাতাবাসীরা শহর ত্যাগ করতে লাগল। জনশূন্য হয়ে পড়ল কলকাতা। তখন গৌরীশঙ্করও সেই শহর ত্যাগের হিড়িকে কলকাতা থেকে পুরুলিয়া চলে গেলেন। সেখানে বাস করতে লাগলেন চামুর কনিষ্ঠ দামোদরের সঙ্গে।

সেই পুরুলিয়াবাসের মধ্যেই প্রথম মৃগী রোগের আক্রমণ হল। তখন আবার তাঁকে আত্মীয়েরা ফিরিয়ে নিয়ে এলেন কলকাতায়। এ রোগের দুর্ভোগ বৃদ্ধি পেতেই লাগল। কোন চিকিৎসাতেই আর তিনি নিরাময় হতে পারলেন না। অবশেষে ১৯৪৫ সালে পরলোকগত হলেন গৌরীশঙ্কর। সেই ১৫৮ বলরাম দে স্ট্রীটের বাড়ীতে। বয়স তখন তাঁর ৮০ পার হয়েছিল।

৫০ বছরেরও বেশী দিনের একটি সারঙ্গের ঝঙ্কার চিরস্তব্ধ হয়ে গেল কলকাতায়।

সেই সারঙ্গের সুর-রণন কলকাতা থেকে বোম্বাই পর্যন্ত কত রাতের কত আসর ঝংকৃত মর্মরিত করেছিল। সে সমস্ত শ্রুতিস্মৃতি লুপ্ত হয়ে গেছে কবে।

শুধু একটি আসরের কাহিনী কালের পারাবার উত্তীর্ণ হয়ে রক্ষা পেয়েছে। দিল্লীর সেই আসর। সারঙ্গ-নেওয়াজ মম্মন খাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গৌরীশঙ্করের সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

আপনি কেমন আছেন

বিষক্রিয় খাদ্য

বিষক্রিয় খাদ্য গলাধঃকরণ করে গুরুতর অসুস্থ হওয়ার খবর মাঝে মাঝেই পাওয়া যায়। আক্রান্ত হন কখনো ব্যক্তিবিশেষ, কখনো একসঙ্গে অনেকে। সময় সময় তার পরিণতি ঘটে মর্মান্তিক অপমৃত্যুতে।

ব্যাপারটা এমন কিছু অভিনব নয়। আগেকার দিনে রাজা-রাজড়া নবাব-বাদশাদের খাদ্যবস্তু আগে খাওয়ান হত ক্রীতদাস কিংবা কুকুর-বেড়ালদের। এঁদের ছিল রাজনৈতিক গুপ্তহত্যার ভয়। আমাদের কালে জুটেছে ভেজাল খাদ্যের প্রাদুর্ভাব। লক্ষ্য কিন্তু প্রায় একই মানে ব্যক্তিস্বার্থ। তবে পরিণতি আরও ভয়ংকর, আরও জঘন্য—অর্থাৎ গণহত্যা। এই সেদিনও মালদহে প্রায় চারশ জন এবং দমদমে প্রায় শ তিনেক মানুষ ভেজাল তেল খেয়ে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হলেন।

অবশ্য বাস্তবে দেখা গিয়েছে, খাদ্য বিষাক্ত হওয়ার মূলে ইচ্ছাকৃত ভেজালই একমাত্র দায়ী নয়, তাছাড়াও আছে নিজেদের অসাবধানতা এবং অজ্ঞতাও। এরকম অনিচ্ছাকৃত দুর্ঘটনা ঘটে থাকে সামাজিক ভোজ বা পিকনিকের পর, বড় বড় হোটেলে কিংবা ছাত্রছাত্রীদের হস্টেলে। মাঝে মাঝে গৃহস্থ বাড়িতেও হয় না, তা নয়।

●

খাদ্য বিষক্রিয় হয় সাধারণত দুভাবে—১। রোগ বীজাণুর প্রভাবে, ২। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়।

বীজাণু : দূষিত খাদ্যের সঙ্গে বীজাণুগুলি পেটের মধ্যে ঢুকে দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে এমন কিছু বিষ বা টক্সিন নিঃসরণ করে যা শরীরের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর। এরা প্রধানত সালমোনেলা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সৃষ্টি করে তীব্র উদরাময়—বারবার বমি, পাতলা দাস্ত, অবসন্নতা। দুরন্ত বিষক্রিয়ায় অপমৃত্যু ঘটাও অসম্ভব নয়। অন্যান্য বীজাণুও আছে—যেমন আছে বায়ু-আশ্রয়ী স্ট্যাফ ইলোকক্কাস। এরা বংশবৃদ্ধি করতে পছন্দ করে দই, পুডিং, কাস্টার্ড, মাংসের স্টুর মত ঘন বা আধা-তরল খাদ্যে। এদের বিষক্রিয়াও সালমোনেলার মত। কলেরা বীজাণু প্রধানত জলবাহী হলেও মাছির গায়ে-পায়ে লেগে খোলা খাবারকে দূষিত করতে পারে। স্ট্যাফাইলো হাওয়ায় ভেসে আঢাকা খাবারকে দূষিত করতে পারে। সালমোনেলা সংক্রামিত হয় নোংরা হাতে, দূষিত জল, অপরিষ্কার বাসন, মাছি আরশোলা ইঁদুর ইত্যাদি মারফৎ।

প্রতিষেধের পথ হল খাদ্যবস্তুকে ভাল করে ধুয়ে ফুটন্ত জলে সুসিদ্ধ করে নেওয়া এবং নলকূপের বা কলের জলে কিংবা ফোটান জলে ধোয়া বাসনে ঢাকা দিয়ে রাখা।

বটুলিনাস নামে আর এক জাতীয় মারাত্মক বীজাণু কখনো কখনো খাদ্যে মিশে তীব্র বিষ সৃষ্টি করে। এদের অবস্থান বিশেষ করে টিনে-ভরা অ্যাসিডহীন খাদ্যে। কোন খাবারে গাঁজা বা গ্যাসের বুদবুদ দেখলে কিংবা বদ্ধ টিন টোল খেয়ে ফুলে উঠলে গ্যাস সন্দেহে তা ফেলে দেওয়াই ভাল। যেহেতু বটুলিয়ুস বীজাণু যথেষ্ট তাপসহ, তাই টিনের খাবার অন্ততঃ দশ মিনিট ফুটিয়ে খাওয়াই নিরাপদ। টমাটো বা ফলে বটুলিনাস জন্মাতে পারে না।

বীজাণু প্রভাবে প্রোটিন জাতীয় খাদ্য পচে সৃষ্টি হয় টোমাইন বিষ। ঘন ঘন রক্ত-মিশ্রিত পাতলা দাস্ত এই বিষক্রিয়ার লক্ষণ। অনেক সময় থালা-বাটিতে অদৃশ্য প্রোটিন কণা লেগে থাকলে তা থেকে অথবা বাসি মাছ মাংসে টোমাইন বিষ সৃষ্টি হয়।

পরজীবী কিছু কিছু কীটাণু ও ক্রিমি খাদ্য ও পানীয়ের সঙ্গে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়, তেমনি নিজেদের বিষ নিঃসরণ করে ব্যাধি সৃষ্টি করে না তারা। টাইফয়েড বীজাণু বিষ নিঃসরণে ব্যাধি সৃষ্টি করলেও তাৎক্ষণিক বিপদের সম্ভাবনা কম। এই বীজাণুও বহন করে জল এবং মাছি।

রাসায়নিক প্রক্রিয়া : ডাল ছোলা মটর বাদাম ইত্যাদিতে যে ছত্রাক জন্মায় তা তীব্র বিষক্রিয় হতে পারে। বিশেষ করে সাবধান হওয়া উচিত ছাতাপড়া চিনাবাদাম সম্পর্কে যা সামান্য সেঁকেই খাওয়া হয়। আলুতে সবুজ কলা গজালে তাতে থাকে সোলানিন নামে এক ধরনের বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ যা খেলে পেটে ব্যথা বমি পাতলা দাস্ত ও অবসাদ হতে পারে। ব্যাঙের ছাতা ও নানা রকম অচেনা লতাপাতায় থাকতে পারে স্ট্রিকনিন, অ্যাট্রোপিন ইত্যাদি বিষক্রিয় পদার্থ। খাদ্যাভাবের সময় দরিদ্র গ্রামবাসীরা এইসব অখাদ্য খেয়ে বিষক্রিয়ার শিকার হন।

খেসারির ডাল খেয়ে পক্ষাঘাত, সরষের সঙ্গে মেশান শেয়ালকাঁটা বীজের তেল খেয়ে এপিডেমিক ড্রপসী হওয়ার কথা সকলেই জানেন। শেয়ালকাঁটা বিষ হিসাবে গণ্য হওয়া সত্ত্বেও এর চাষ এবং সরষের সঙ্গে এই বীজের ভেজাল দেওয়া আজও অব্যাহত রয়েছে।

ভেজালের উপাদান হিসাবে সম্প্রতি আর একটি বিষক্রিয় পদার্থ চালু হয়েছে, তার নাম ট্রাইঅর্থো-ক্রিসল-ফসফেট। যন্ত্রশিল্পে ব্যবহৃত এই তরল পদার্থটি সরষের তেলের সঙ্গে মেশানর ফলেই মালদহে ও দমদমে সাত-আটশ মানুষ পক্ষাঘাতে বিকলাঙ্গ হয়ে পড়েন। অথচ যারা জেনে-শুনে মানুষের খাদ্যে এই বিষ মেশান তাদের একজনেরও ফাঁসি হয়নি, দ্বীপান্তরও হয়নি।

আজকাল নানারকম কীটাণুনাশক রাসায়নিক পদার্থ চাষের কাজে ব্যবহার হচ্ছে যা অসাবধানবশত খাবারের সঙ্গে মিশে গিয়ে অনেক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। ফলিডল খেয়ে অপমৃত্যুর ঘটনা মাঝে মাঝেই শোনা যায়। কিছু কিছু কীটাণুনাশী ও বাসনমাজার গুঁড়ো দেখতে আটা ময়দা বা গুঁড়ো দুধের মত। বিষাক্ত গুঁড়ো দুধে তৈরি দই খেয়ে একসঙ্গে অনেক মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনা কয়েক বছর আগে এই কলকাতাতেই ঘটেছিল। তাই সংসারে রাসায়নিক সার বা কীটনাশক পদার্থ বিশেষ বিপদচিহ্ন দিয়ে খাদ্যবস্তু থেকে তফাৎ রাখার ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত।

রান্নার গুঁড়ো মশলায় বা নুনের সঙ্গে মাটি বা বালি ইত্যাদি ভেজাল মেশান আজকাল সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই রকম অখাদ্য মশলা খাওয়ার ফলে বড় রকমের কোন দুর্ঘটনার কথা শোনা না গেলেও দীর্ঘদিন ব্যবহারে আন্ত্রিক প্রদাহ সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়।

অনেক বাড়িতে স্বাস্থ্যবিধি পালন করার ইচ্ছায় শিশুর দুধ বারে বারে ফোটানর রেওয়াজ আছে। কিন্তু বার বার ফোটানর ফলে দুধের ফ্যাট বিষক্রিয় হয়ে শিশুর উদরাময় সৃষ্টি করতে পারে। চিংড়ি মাছের খোলায় অন্ত্রের প্রদাহ সৃষ্টি হওয়া এবং বার বার বাথরুমে ছুটোছুটি করার মত ঘটনা ঘটা সম্ভব। বিশেষ করে যাদের চিংড়িতে অ্যালার্জী আছে তাদের পক্ষে তো বটেই। খোলাসুদ্ধ চিংড়িমাছের বড়া বা চপ খেয়ে তীব্র উদরাময়ের ঘটনা বিরল নয়।

বাড়ির কথা আলাদা—অনবধানতায় খাদ্য বিষাক্ত হওয়া নিতান্তই আকস্মিক ব্যাপার। কিন্তু হোটেলে অথবা মেস-হস্টেলে রান্না ও পরিবেশনের পূর্ণ দায়িত্ব যাদের হাতে ন্যস্ত থাকে, খাদ্যের বিষক্রিয়া সম্পর্কে তাদের সচেতন করার দায়িত্ব তোমাদের। আর মানুষের খাদ্যে যারা বিষ মেশায় সেই সব বিষাক্ত প্রাণীকে টিকিয়ে রেখে লাভ কী!

—অশ্বিনী সামন্ত

জোনাকজ্বলা আলোয়

তারাজ্যোতি মুখোপাধ্যায়

ট্যাক্সিতে চড়ে মনে মনে হাসল জয়া। তোর হাতব্যাগে পুরো দুটো টাকাও নেই অথচ দুম করে ট্যাক্সি চড়ে বসল। তারপর যদি ভাড়া না দিতে পারে তখন। কী যে হবে তখন সেকথা আর চিন্তা করতে পারল না জয়া। ওদিক থেকে মনকে সরিয়ে অনবরত চেষ্টা করতে থাকল। টানতে টানতে চিন্তাটাকে আজ সকালের ঘটনায় ফিরিয়ে নিয়ে গেল। মনে মনে মায়ের উক্তিগুলো বারবার আওড়াতে লাগল জয়া।

শরীর ভাল থাকলে কি কেউ শুয়ে থাকে শুধু শুধু। মুখ ধুয়েছে চা খেয়েছে আবার চিৎপাৎ হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছে জয়া। এর মধ্যে বারদুয়েক শুধু আয়নার সামনে উঠে গেছে। নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে। শাড়িটাকে একটু সরিয়ে হাত, বুক সব দেখে নিয়েছে জয়া। তারপর নিজের মনেই বলেছে, না এখনও চুপসে রয়েছে শরীরটা। নিটোল হতে আরও কিছু দিন লাগবে। তারপরই আবার ধড়াস করে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছে।

আর ঠিক সেই সময় মা এসে ঢুকেছেন ঘরে। জয়ার ওপর এক নজর তাকিয়ে সরাসরি বলেছেন, কী রে আবার যে শুয়ে পড়লি। বেরোবি না। এইভাবে শুয়ে বসে থাকলে চলবে?

কথাগুলো জয়ার মাথার মধ্যে যেন আলপিন ফুটিয়েছে। দু মাস রোগ ভোগের পর আজ ক'দিন একটু সুস্থ আছে জয়া। এখনও শরীরের দুর্বলতা কাটে নি। ঘরের মধ্যে দু চারবার পায়চারি করলে হাঁফ ধরে। এ অবস্থায় কারই বা বাইরে বেরোতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করলেও কি বেরোনো উচিৎ। যদি চলতে চলতে মাথাটা দুম করে ঘুরে যায়। তখন কে দেখবে। এসব কথা কী মা একটু ভেবে দেখেন না। না, তার সঙ্গে সম্পর্ক শুধু টাকার। তারপরই মার সঙ্গে দু-চারটে কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। মন খুলে আজ অনেক কথা শুনিয়ে দিয়েছে মাকে। বলেছে, মুখ দেখে তো আমায় টাকা দেয় না। যা দেখে দেয় সেটাই তো এখন রোগে খেয়ে নিয়েছে। তাহলে আমি বেরিয়ে রোজগারটা করব কী করে শুনি?

গলা বেশ ছেড়েই কথাগুলো শুনিয়েছিল মাকে জয়া। খোলা জানলা দিয়ে পাশাপাশি বাড়ির অন্দরমহলে চলে গিয়েছিল জয়ার উক্তিগুলো। তাই মা বেশ বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, 'আঃ, জয়া একটু আস্তে'।

তাতে জয়া আরও চটে উঠেছিল। বলেছিল, আমি কী কাজ করি পাড়ার লোকের জানতে কি আর বাকি আছে। বেশ করি করি। ওরা কী আমাদের খেতে পরতে দেবে?

এরপর আর মার মুখ দিয়ে কথা বেরোয় নি। শুধু ভেবেছেন, মেয়েটা জেদী কিন্তু এমন উগ্র কথাবার্তা তো বলে না। কী হয়েছে কে জানে ওর আজ।

জয়ার যে কী হয়েছে তা মা কী করে বুঝবেন। তার পেশায় ভেজাল-এর কারবার চলে না। সবকিছু নিখুঁত হওয়া চাই। নইলে এক কথায় নাকচ। নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে সেই সব কথা ভেবে ভেবে সারা হচ্ছে জয়া। আর তখন কিনা মা অবুঝের মতো আদেশ নির্দেশ শুরু করে দিলেন অমার্জিত ভাষায়। মায়ের ওপরের আক্রোশটা হঠাৎই বাবার ওপর গিয়ে পড়ল। আজ বাবার জন্যেই তো তার এই দুর্দশা। সংসারের দায়িত্বটা তো অসময়ে ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু রাগটা বেশিক্ষণ বাবার ওপর থাকল না। নিজের মনেই এক সময় বললে, আহা বাবার কি দোষ। পক্ষাঘাতে পঙ্গু মানুষটা এ-পাশ ও-পাশ পর্যন্ত করতে পারেন না অথচ এই মানুষই একদিন অসুরের মতো খাটতেন সংসারের জন্যে। তিন তিনটে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। একটা ছেলে থাকলে সংসারের ভার সে-ই নিতো। বেচারা বাবা। এইসব ভাবতে ভাবতে রাগটা শেষ পর্যন্ত এসে পড়েছে জয়ার নিজের ওপর। ছেলে নেই যখন বাপ মায়ের দায়িত্বটা তো মেয়েরই নেওয়া উচিৎ। মেয়েও তো সন্তান। তাহলে ওঁদের ওপর দোষ চাপিয়ে দায়িত্বটা কেন এড়িয়ে যেতে চাইছে জয়া।

এইসব ভাবতে ভাবতে তড়াক করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছিল জয়া। ঝিমিয়ে পড়া স্নায়ুগুলো তখন যেন বেশ সতেজ হয়ে উঠেছে। একটু আগের ক্লান্তি গা ছেড়ে পালিয়েছে দ্রুত রক্ত চলাচলে।

কলঘরে ঢুকে সাবানের ফেনা মাখিয়ে মুখটাকে একটু ফিটফাট করে নেওয়া দরকার। পাউডার পাফটাকেও একবার বুলিয়ে নিতে হবে মুখে। ভাল দেখে একটা শাড়িও পরে নিতে হবে। সবই একে একে করেছে আর, তারপরই মায়ের পিছুডাকে কান না দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে জয়া।

ট্যাক্সিটাকে একটা বাড়ির সামনে দাঁড় করাল জয়া। আর্টিস্ট সলিল বোসের স্টুডিও। দোতলায় সিঁড়ি দিয়ে উঠে দরজায় টোকা মারল। আর সবাই কলিং বেল টেপে। কিন্তু সলিলদার কাছে এটাই জয়ার নিজস্ব সংকেত।

—আরে জয়া, কী খবর। তোমার তো পাত্তাই নেই। শরীরটা তো দেখছি টসকে খেয়েছে। ইস, বড্ড রোগা হয়ে গেছ। অসুখ করেছিল শুনেছিলুম। এত বাড়াবাড়ি অসুখ তা জানতাম না।—একগাদা কথা বলে গেল সলিল বোস।

জয়া অভিমান করে বললে, শুনেছেন অসুখ, অথচ একদিন তো দেখতেও গেলেন না।

—দেখতে যাবো ভেবেছিলুম, কিন্তু এত কাজের চাপ যে সময় করে উঠতে পারি নি। আর তারপর দেখ না তোমার জন্যে কাজকটা কাজ ছেড়ে দিতে হলো। তারপর খুঁজে পেতে...।

সলিল বোসকে কথাটা শেষ করতে দিল না জয়া। বললে, কাজের জন্যেই আমি এসেছি সলিলদা। ক'মাস বসে থেকে সংসারকে একেবারে হাড়জিরজিরে করে ফেলেছি। তাই জোর করে বেরিয়ে পড়লাম।

সলিল বোস কেমন বিরক্ত বোধ করল। বললে, মানে, কাজ তো এখন নেই জয়া। যা কাজ আছে সে তো একটা নতুন মেয়েকে দিয়ে সারছি। এ মেয়েটি নতুন মডেল লাইনে এসেছে। ফিগারটা ভাল।

জয়া ক্ষুণ্ণ হয়ে বললে, আমারও ফিগার ভাল একথা তো একদিন আপনি বলেছিলেন সলিলদা।

—হ্যাঁ তাতো বলেছিলুম। কিন্তু এখন সে ফিগার তো তোমার নেই। আরও কিছু দিন যাক না। শরীরটা ঠিক হোক। তখন ডেকে পাঠাব।

জয়ার এখন মরিয়া অবস্থা। বললে, আপনি শিল্পী। যে ফিগার আপনি দেখেছিলেন আমাকে সামনে বসিয়ে সেই ফিগার কি আপনার ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে পারেন না। নিশ্চয়ই পারেন।

একথায় সলিল বোস বেশ অসুবিধেয় পড়ল। নতুন মডেল পেয়ে গেছে অতএব জয়াকে এখনি তার প্রয়োজনও নেই। তাই একটু ঘুরিয়ে বললে, তোমার কথা হয়তো ঠিক কিন্তু মডেল একটু তরতাজা না হলে শিল্পীর হাত ঠিকমত খোলে না। রাঁধুনী যতই ভাল হোক মালমশলা ঠিকমতো না হলে কী ভাল রাঁধতে পারবে। ব্যাপারটা এই।

এরপর আর কিসের আশায় বসে থাকবে জয়া। উঠে পড়ল। যাবার আগে একবার ভেতরটা উঁকি মেরে দেখে নিল জয়া। গা-খোলা অবস্থায় নতুন মেয়েটি বসে আছে। জয়াকে দেখে কাপড়টা একটু টেনে দিল। মেয়েটির শ্রী আছে, স্বাস্থ্য আছে কিন্তু জয়া যেন পুরোপুরি তা মানতে চাইল না। মনে মনে বললে, ও আর এমন কি। গোলগোল মোটাসোটা। এ আবার একটা ফিগার!

দরজার মুখটায় দাঁড়িয়ে সলিল বোস বললে, কিছু মনে করো না জয়া। আবার এসো।

উত্তরে জয়া শুধু একফালিতে ম্লান হাসি ফোটাল ঠোঁটে। তারপর আর পেছনে না তাকিয়ে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নীচে। ট্যাক্সির দরজা খুলে গদির ওপর গা এলিয়ে দিল। ড্রাইভার ঘাড় ফেরাতেই মিয়নো গলায় বললে, চলুন 'পার্কসার্কাস'।

শুধু হাতে সলিল বোসের স্টুডিও থেকে নেমে আসার পর একটা দুশ্চিন্তা মাথার মধ্যে গেড়ে বসবার চেষ্টা করছিল কিন্তু জয়াকে এখন মন শক্ত করতে হবে ভেঙে পড়লে চলবে না। ট্যাক্সির মিটার বাড়ছে। এই সময় তার মনের 'মিটার' ডাউন হলে চলবে কেন।

পার্কসার্কাসে রবীন মুখুটির স্টুডিও এর কাছেও কয়েকবার কাজ করেছে জয়া এর কাজ কম কিন্তু নাম বেশি। এ'র ছবি জাতে কুলীন। মাতৃভাব, জায়াভাব, কন্যাভাব এইসব ফুটিয়ে তোলেন তাঁর আঁকা ছবিতে ও'র নির্দেশে সেইরকম মুখের ভাব করতে হয় মডেলকেও। পোশাক সাত্ত্বিক। সলিলদার মতো খোলামেলা নয়। সলিলদার হাত আবার এইদিকে খুব পাকা। তাই একটু বেশি অন্তরঙ্গতা হয়েছিল সলিলদার সঙ্গে জয়ার। কতদিন ... আঁকতে আঁকতে ক্লান্ত হয়ে তারই পা... এসে শুয়ে পড়েছে সলিলদা। শুয়ে শুয়ে তার শরীর নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে খেলাচ্ছলে। এইসব নাকি করতে হয় শিল্পীকে বলেছে সলিলদা। জ্যান্ত জিনিস ঘাঁটলে তবে তো ছবি জীবন্ত দেখাবে শিল্পীর তুলির টানে। তাই মডেল ছাড়াও আলাদা একটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল সলিলদার সঙ্গে। কিন্তু সেই সম্পর্কটাকে আজ যেন আমলই দিল না আর্টিস্ট সলিল বোস। নইলে সংসারের অবস্থার কথা শুনে কিছু টাকাও তো আগাম দিতে পারত। সেকথা তোলবার সুযোগই দিল না সলিলদা।

আজ জয়ার ভাগ্যটা সত্যিই খারাপ। রবীন মুখুটির কাছেও সুবিধে হলো না। উনি বললেন আপনার চেহারার তো কোন কাজ নেই আমার হাতে। এখন আমার একজন বৃদ্ধার দরকার। অন্তিম সময়ের জন্যে দিন গুনছেন এই ভাবটা ফুটিয়ে তুলতে হবে ছবিতে। তা সেতো আপনার মতো অল্পবয়সী মেয়েকে দিয়ে হবে না।

জয়া তবু বললে, আমাকে মেকআপ দিয়ে বুড়ি সাজিয়ে আঁকুন না।

রবীন মুখুটি জয়ার কথা শুনে হেসে বললেন, মেকআপ দিয়ে আঁকলে চলে কিন্তু

আঁকা চলে না। এক একটা বয়েসে এক রকম রেখা পড়ে দেহের প্রতিটি অঙ্গে। আপ দিয়ে তা ঢাকা যায় না। সেই-জ্যই তো মডেলের দরকার হয়। নইলে আমরা মন থেকেই আঁকতে পারতুম।

হতাশ হয়ে উঠে পড়ল জয়া। বিদায় ার সময় জয়ার করুণ মুখের দিকে কয়ে কি যেন মনে হলো রবীনবাবুর। টু চিন্তা করলেন মনে মনে। তারপর লন, দিনদশেক পর একটু খবর নেবেন। টা অর্ডার আসার কথা আছে। সেটা পনাকে দিয়ে ভাল চলবে।

জয়া আবার ট্যাক্সিতে চড়ে বসল। দশেক পরের কথা এখন না ভাবলেও ব। তার সমস্যা আজকের। এই ূর্তের। ট্যাক্সির মিটার বাড়ছে। কিন্তু দম তো এখনও একটা পয়সাও হলো

এখন কোথায় যাবে জয়া। আরও ়কজন আর্টিস্ট-এর সঙ্গে জানাচেনা হ জয়ার। তারা একটু সস্তার আর্টিস্ট। রভাগই নির্লজ্জ ছবি আঁকে তারা। ও কম দেয়। ইজ্জতও যায় অথচ পেট না। আজ অবশ্য মান সম্মান ইজ্জত র মাথা ঘামাবার মতো মনের অবস্থা জয়ার। এখুনি তার কিছু টাকা চাই। তু ওদের কাছে যেতে আজ ভরসা পাচ্ছে ওরাও যদি এইভাবে বিমুখ করে তখন বে কোথায়? তবু থেকে মাথার কাছে ল হয়। ধার চাইলে কিছু টাকা পাওয়া ব। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়ে। জয়ার ই মডেলগার্ল। তবে জয়ার থেকে কাজ অনেক বেশি। বিলিতি কোম্পানীর াপনের বাজারে ওর নাম একচেটিয়া। ার অঙ্কও মোটা।

ম্যাডান স্ট্রীটের ফ্ল্যাটের দরজায় দাঁড়িয়ে ং বেল টিপল জয়া। দরজা খুললেন ির মা। ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। মর্থা কোথায়? উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা ল জয়া।

মার্থা বোম্বাই গেছে। এক সপ্তাহ পরে রবে। মা বললেন।

কথাটা শুনে জয়ার মাথায় যেন বাজ ়ল। মুখে একরাশ আতঙ্ক জড় হলো। ির মা তাই দেখে বললেন, তোমাকে মন যেন দুর্বল দুর্বল লাগছে। রোটাও তো শুকনো শুকনো। তোমাদের দিকে খুব নজর দেওয়া দরকার। মাখন, স্তা, বাদাম খুব করে খাবে। নইলে শরীর কবে কেন। মার্থাও ঠিক তোমার মতো। ছু খেতে চায় না। কেবল চা আর কফি। মি জোর করে করে খাওয়াই। পেস্তা াম চিবোতে চায় না। আমি তাই সরবৎ র খাওয়াই।

এসব কথা কানে ঢুকছে না জয়ার। স্তা বাদাম খাবে জয়া। ভাত খাবার াসা জুটছে না। বললে, আজ উঠি।

মার্থার মা শুনে মুখে ছাড়লেন না। পেস্ট্রীর সঙ্গে কফি খাওয়ালেন। খিদেও পেয়েছিল জয়ার তাই আর আপত্তি করল না।

অন্যদিন হলে জয়া মাথা ঘুরে ওখানেই পড়ে যেত। একটা টাকাও এত ঘুরে রোজগার হলো না অথচ ট্যাক্সির মিটার তো চড়ে বসে আছে। আজ কিন্তু একটুও দমল না জয়া। নিজেকে নিয়ে এতক্ষণ জুয়া খেলছিল। সবদানেই হেরে বসে আছে। শুধুটি শেষ।

ট্যাক্সিটাকে ঘিরে তখন বেশ কয়েক-জনের জটলা শুরু হয়ে গেছে। বেশিরভাগ লোকের নজর তখন জয়ার ওপর। সবাই উঁকি মেরে দেখছে। জয়া চুপচাপ বসে আছে ট্যাক্সির মধ্যে। মুখে কথা নেই কিন্তু একরাশ চিন্তা ঘিরে ধরেছে তাকে।

ট্যাক্সিওলা ভিড়ের দিকে কথাগুলো ছড়িয়ে দিতে দিতে জয়াকে শুনিয়ে বললে, চাল্লিশ টাকা মিটারে উঠেছে। এখন বলছেন টাকা নেই। এই নিয়ে তিন বাড়ি ঘুরলেন। তা আমার ভাড়া মেটাবে কে?

জয়া উত্তরে বেশ শান্ত স্বরেই বললে, টাকার চেষ্টা তো করলুম কত। কিন্তু পেলুম না। কী করব বলুন। আপনার টাকা আমি মারব না। আজ না পারি পরে দিয়ে দেব। বাড়িটা দেখে রাখবেন চলুন।

ট্যাক্সিওলা লোক খারাপ নয়। তাই ভিড়ের পাশ কাটিয়ে একটু এগিয়ে গেল। তারপর একধারে গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে বললে, পরে দেবেন বললে কি আমাদের চলে। পেট্রল আছে, মোবিল আছে এসব তো কিনতে হবে নগদ টাকা দিয়ে। তা বাড়িতে গিয়েই না হয় টাকা দেবেন।

সোজা হয়ে বসে স্পষ্টই বললে, বাড়িতে টাকা থাকলে কি আর রোজগারের জন্যে সেই থেকে টো টো করে ঘুরছি। আজ বরাতটাই আমার খারাপ।

ট্যাক্সির অ্যাসিস্টেন্ট ছোকরাটি এতক্ষণে মুখ খুলল। বললে, কিছু যদি মনে না করেন দিদি তো একটা কথা বলি। ট্যাক্সির ভাড়া দিতে হবে, বাড়িতেও কিছু

নিয়ে যেতে হবে যখন তখন শুধু হাতে ফেরা ঠিক নয়। ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু বাজার তো আমরাও বুঝি। তাই বলছিলুম কিছু যদি মনে না করেন তো মিঃ রায়ের অ্যাপার্টমেন্টে চলুন। ভাল টাকা পেয়ে যাবেন।

ইঙ্গিতটা বুঝতে অসুবিধে হলো না জয়ার। অন্য সময় হলে ঠাস করে ছেলেটার গালে একটা চড় বসিয়ে দিত জয়া। কিন্তু আজ হাত উঠল না। আর কেনই বা উঠবে। যে প্রস্তাবটা ছেলেটা করছে তারই তো কাছাকাছি তাদের ব্যবসা। মডেলগার্লদের কে ভাল চোখে দেখে। কিছু না করলেও দুর্নামের লম্বা লেজ তাদের পেছনে ঝুলবেই। তাই আর কথা না বাড়িয়ে শুধু জিজ্ঞাসা করল জয়া, মিঃ রায় কী করেন?

ছেলেটি একগাল হেসে বললে, করবেন আর কী। বিরাট ধনী লোক। কাজকর্ম কিছু নেই। তাই আমোদ ফুর্তিতে মেজাজটাকে সবসময় চুবিয়ে রাখেন। অন্যের কিছু নেই দিদি। এমনিতে ভারি ভাল লোক। ওই একটু আর কি।

ছেলেটির সঙ্গে মিঃ রায়ের বেশ জানা-শোনাই মনে হলো। এর আগে হয়তো জয়ার মতো অনেককেই ও'র হাতে তুলে দিয়েছে।

ঘরে ঢুকতেই মিঃ রায় বেশ কিছুক্ষণ জয়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, আচ্ছা আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো। খুব চেনাচেনা লাগছে।

জয়া দৃঢ়স্বরে বললে, না আমাকে কোথাও দেখেন নি। এর আগে আমি আর কোথাও এভাবে আসি নি। এই প্রথম। তাও দায়ে পড়ে।

মিঃ রায় জিভে চুকচুক আওয়াজ করে বললেন, না না আমি সেকথা বলছি না। মানে আপনার মুখটা আমার খুবই পরিচিত লাগছে। যাক গে।

আবার কি যেন খুঁজতে লাগলেন জয়ার মধ্যে। দুটো হাত দিয়ে মুখটা তুলে ধরে দেখলেন কিছুক্ষণ। সারাগায়ে হাত বোলাতে লাগলেন। তখনও যেন ভদ্রলোক মনে করবার চেষ্টা করছেন। তারপর এক
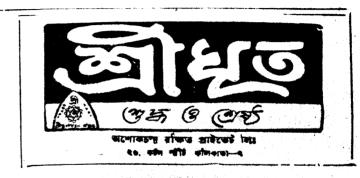
সময় জয়াকে বললেন, আপনাকে আমার খুব ভাল লাগছে। বলে জয়ার হাত ধরে আদর করে বিছানার ওপর বসালেন।

বেল টিপতেই বেয়ারা দুগেলাস দুধ দিয়ে গেল। উনি জয়াকে বললেন, নিন খেয়ে নিন।

জয়া আপত্তি জানাল, না না এসব আবার কেন।

ভদ্রলোক মিষ্টি হেসে বললেন, আপনি অতিথি। এটুকু না খেলে আমি ক্ষুন্ন হবো। নিন চুমুক দিন।

জয়ার হাতটা নিজের মুঠোয় ধরে খুব অন্তরঙ্গ আলাপ করলেন ভদ্রলোক। বছর পঁয়ত্রিশ বয়েস। শিক্ষিত লোক। কত ভাল ভাল কথা বলছেন। তবে এ মতিগতি কেন? নিজের মনে ভাবতে লাগল জয়া। তখন অনেক কাছে টেনে নিয়েছেন জয়াকে। বড় আলোটা নিবে গেছে। মৃদু বাতিটা জ্বলছে। নীলচে আলো। মাথা, মুখ, বুক পা সব নীল দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন পূর্ণিমার রাতে সমুদ্রের জল ছুঁয়ে চাঁদের আলো ঠিকরে এসে পড়েছে গায়ে। সেই সময়টা যেন অন্য এক জগতে চলে গেছে জয়া। সারাদিন নিজেকে নিয়ে জুয়া খেলতে খেলতে উটকো ঘাঁটি শেষপর্যন্ত জান ওঠাল। তাই এখন আর মান ইজ্জত, এসব কথা চিন্তা করছে না জয়া। জেতার আনন্দে নিশ্চিন্ত। এই নিশ্চিন্ততাই সারাদিন খুঁজে বেড়িয়েছে। হাজার মাথা খুঁড়েও পায় নি। তাই এখন নিজেকে এত খোলাখুলি ছেড়ে দিয়েও একটা সুখ, একটা সারাদেহ জোড়া তৃপ্তি অনুভব করছে জয়া। বেশ লাগছে। আরও হাত পা ছড়িয়ে গা এলিয়ে দিল জয়া।

কতক্ষণ পরে বড় আলোটা জ্বলেছে তা টের পায় নি জয়া। এই ফাঁকে হাল্কা একটা ঘুম দিয়ে নিয়েছে। চোখ রগড়ে উঠে বসল জয়া। তারপর বাথরুমে ঢুকে চোখে, মুখে, ঘাড়ে জলের ছিটে দিয়ে ভিজিয়ে নিল। মনে মনে ভাবল জয়া সব ব্যবস্থাই আছে যখন চানটা সেরে নিলেই হয়। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাওয়ারটা ছেড়ে দিল। তারপর বেশ করে সাবান ঘষে গা ধুলো জয়া।

বাথরুম থেকে যখন বেরোলো জয়া তখন তাকে অনেক ফিটফাট দেখাচ্ছে। সারাদিনের পর শরীরটাও বেশ ঝরঝরে লাগছে। মিঃ রায় এতক্ষণ জয়ার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন।

টাকা বের করলেন মিঃ রায়। টাকাগুলো হাতে নিয়ে ঘরময় পায়চারি শুরু করলেন। নিজের মনে বিড়বিড় করে কি যেন সব বলতে বলতে একেবারে এসে দাঁড়ালেন জয়ার সামনে। ওর মুখের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থেকে খুব মিহি গলায় বললেন, এতক্ষণে চিনতে পারলাম। কিন্তু একটু দেরী হয়ে গেল। খুব আস্তে আস্তে কথাগুলো বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিঃ রায়।

—নিন ধরুন। টাকাগুলো জয়ার দিকে এগিয়ে দিলেন।

টাকাগুলো হাত বাড়িয়ে নিল জয়া। দশখানা একশো টাকার নোট। এতগুলো টাকা মাত্র দুঘণ্টায় রোজগার। অথচ জয়া পরপর তিনদিন সিটিং দিয়েও আর্টিস্টদের কাছ থেকে এর সিকি টাকাও আদায় করতে পারে না। তাই অজান্তেই বলে ফেলল, এত টাকা।

মিঃ রায় গম্ভীর স্বরে বললেন, জানেন না তাই। জানলে বুঝতেন আপনার দাম এর থেকে অনেক বেশি।

মিঃ রায়ের কথার ইঙ্গিতটা ধরতে পারল না জয়া। সে একজন সামান্য মডেল-গার্ল। দেহ ভাঙিয়ে রোজগার। তার মূল্য আর কতটুকু। কিন্তু মিঃ রায় যেন জয়ার মধ্যে নতুন কিছু খুঁজে পেয়েছেন। তারই জের টেনে একজোড়া চোখ দিয়ে জয়ার সারা শরীরটাকে বারবার জরিপ করে চলেছেন।

মিঃ রায় আবার শুরু করলেন। বললেন, জানেন জয়াদেবী, আমি একজন দুশ্চরিত্র লম্পট। রক্ত মাংসের মেয়েরা কেউ আমার কাছে ছাড়া পায় না। তাই আমি বিয়ে করি নি। বিয়ে করলে আমার স্ত্রীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতাম। ছেলেমেয়েদের চোখে আমি হতাম এক কুলাঙ্গার জন্মদাতা। সেই জন্যে সংসার পাতি নি। জগতে আমার আপনজন বলতে কেউ নেই। আমি বদমাইস, আমি লম্পট, আমি দুশ্চরিত্র। শেষের কথাগুলো যেন একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন মিঃ রায়।

জয়া অবাক হয়ে শুনতে শুনতে ভদ্রলোককে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললে, কে বললে আপনি বদমাইস লম্পট। আপনি খুব ভাল লোক। বদমাইস লোক কখনও নিজেকে বদমাইশ বলে?

মিঃ রায় মৃদু হেসে বললেন, আমি ছেলেমানুষ নই যে আমাকে যা খুশি বুঝিয়ে দেবেন। আমি যা আমি তাই। কিন্তু তবু আমি একটা সংসার তৈরী করেছি। আপনি সেই সংসারে একটু চিড় ধরিয়ে দিলেন। খুব ক্ষতি করলেন আমার। প্রথমে বুঝতে পারলে হয়তো নিজেকে সামলে নিতে পারতাম। কিন্তু যখন বুঝতে পারলাম তখন অনেকটা এগিয়ে গেছি। আগেই তো আপনাকে বলেছি মেয়েদের নাগালে পেলে সংযম বলে আমার কিছু থাকে না। আপনি যে আমার সেই সংসারের একজন।

জয়া বিস্ময়ে হতবাক। এসব কী বলছেন ভদ্রলোক। নিশ্চয়ই কারুর সঙ্গে তাকে মিলিয়ে ফেলে ভুল বকছেন। এবার তাই জয়া একটু স্পষ্ট হলো। বললে, মিঃ রায় আমার মনে হয় আপনার বোধহয় কোথাও ভুল হচ্ছে।

কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে জয়ার হাতটা চেপে ধরলেন ভদ্রলোক। তারপর তাকে টানতে টানতে পাশের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন, আমার ভুল। চেয়ে দেখুন। নিজেকে চিনতে পারেন কিনা দেখুন।

দেওয়াল ভর্তি অয়েলপেন্টিং করা ছবি। একটা দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা...। জয়া তাকিয়ে থাকল পাঁচ নম্বর ছবির দিকে। তারই ছবি। আর্টিস্ট রবীন মুখার্টি এঁকেছিলেন। বধূবেশে। সলজ্জ হাসি।

মিঃ রায় আবার শুরু করলেন। বললেন, এই হলো আমার ছবির সংসার। এরা কেউ আমার কাকীমা, কেউ মাসিমা, কেউ মামীমা কেউ বৌদি কেউ দিদি কেউ ছোট-বোন। পাতানো সম্পর্ক দিয়ে আমি আমার ছবির সংসার গড়ে তুলেছি। জগতে আমার আপনজন কেউ নেই। এদের সঙ্গেই আমি কথা বলি। আমার মনের প্রাণের কথা। আমি বদমাইস লম্পট দুশ্চরিত্র। কোন সংসারে আমাকে কেউ ঢুকতে দেবে না। তাই আমি আমার এই ছবির সংসারে খুব শান্তিতে আছি।

তারপরই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, জানেন আপনার এই ছবিটা রবীনবাবুর কাছ থেকে কিনেছিলুম দশ হাজার টাকা দিয়ে। আপনার সঙ্গে একটা মধুর সম্পর্কও পাতিয়েছিলুম। কিন্তু রক্ত মাংসের আপনি আমার কাছে এসে সে সম্পর্ক ভেঙে দিলেন। আপনারা তো খোঁজ রাখেন না। নিজেদের মডেলগার্ল বলেই শুধু জানেন। কিন্তু আমার মতো কত লোক আপনাদের ছবি নিয়ে কোন স্বর্গে বাস করে তা যদি জানতেন তাহলে নিজেদের একটু আড়াল করে রাখতেন নিশ্চয়।

এবার জয়া সত্যিই মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। এ-লাইনে নামার পর থেকে চক্ষুলজ্জা ঘুচে গেছে কবে। কেচ্ছা শুনে শুনে কান-জোড়া হয়েছে বেহায়া। দুর্নাম রটতে রটতে দেহ হয়েছে নির্লজ্জ, কিন্তু আজ এসব কী শুনছে ভদ্রলোকের মুখে। এ যে একেবারে নতুন খেতাব।

কী ভাবে বিদায় নিল মিঃ রায়ের কাছ থেকে তাও মনে পড়ল না। কখন ট্যাকসিতে এসে বসল তাও খেয়াল করতে পারল না। বাড়িতে পৌঁছে মার হাতে টাকাগুলো দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর সটান খাটের পর পা ছড়িয়ে শুয়ে আরামে নিশ্বাস টানতে লাগল জয়া।

একটা অদ্ভুত আমেজে তখন জয়ার সারামন আচ্ছন্ন। নিজের সঙ্গে যেন নতুন করে পরিচয়ের আনন্দ উপভোগ করছে। এক সময় একরাশ ঘুম এসে জড়ো হলো চোখের পাতায়। আর ঠিক সেই সময় জয়ার যেন মনে হলো তার সারা শরীরটা হাওয়ায় দুলতে দুলতে মাটি ছাড়িয়ে অনেক ওপরে উঠে যাচ্ছে।

রূপসীর খাতা

হাসলে এক ঝরা মুক্তোই যদি না ঝরলো তাহলে সে লাস্যে মোহময়ী আবেশ আসবে কোথা থেকে? তাই সুশ্রী সুন্দর হতে হলে মুক্তো ঝরা দাঁতের সারি রাখতে হবে। সিনেমায় বিজ্ঞাপনে নানাভাবে নানা রকমের দাঁতের যত্ন ও দাঁতের ওষুধের খবর লেখা হয়। আমরা দেখি শুনি, কিন্তু কতটা মনে রাখি বা কতটা ব্যবহার করে থাকি তা অবশ্য বলা মুস্কিল। তবে আমার বিশ্বাস ভাল ভাবে দাঁতের যত্ন করলে দাঁত ভাল থাকে শুধু তাই নয়, সৌন্দর্যের বিকাশ হয় অনেক।

দাঁত প্রতিদিন দুবার মাজা উচিত। রাত্রে শোয়ার আগে দাঁত ব্রাস দিয়ে ও ভাল মাজনসহকারে বেশ কিছুক্ষণ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাজা ভাল। তারপর মুখ বেশ ভাল করে ধুয়ে 'লিসটারীন' কিম্বা 'ডেটল' দুই ফোঁটা এক গ্লাস জলে দিয়ে তাই দিয়ে বার কয়েক কুলকুচি করে তবেই মুখ ধোয়ার প্রোগ্রাম শেষ করা উচিত। ব্রাস তারপর নুন জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। সকালে ঘুম থেকে উঠে ওই নুন জল যেটুকু ব্রাসে লেগে থাকবে তাই দিয়ে দাঁত একবার ঘষে নিয়ে তারপর কোন ভাল দাঁতের গুঁড়ো মজন আঙুলের সাহায্যে দাঁতের উপর ঘষে চেপে চেপে মাজা ভাল। সবচেয়ে ভাল ও উপকারী নিমদাঁতন। সকালের পর্ব নিমদাঁতনে সারলে সবচেয়ে ভাল। এছাড়া প্রতিবার খাওয়ার পরে মুখ ভাল করে কুলকুচি করে ধোয়া আর আঙুল দিয়ে মাড়ি ও দাঁত চেপে চেপে ধোয়া দরকার। এর ফলে দাঁত সমান হয় আর মাড়ি সুস্থ ও সতেজ হয়।

অনেকের দাঁত দিয়ে অর্থাৎ মাড়ির গোড়া দিয়ে রক্ত পড়ে। তাদের এভাবে নিয়মিত দাঁতের যত্ন করে সুফল পেতে দেখা গেছে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্র ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া চলা সম্ভব নয়। এভাবে অবশ্য যত্ন নিলে মুখেও দুর্গন্ধ হয় না। তবে পেটের গোলমাল হলে কিম্বা লিভার খারাপ থাকলে, মুখে গন্ধ হয় যা ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করে নেওয়া উচিত। এ-ও দেখা গেছে, পেটের গোলমাল বেশী থাকলে দাঁত অকালে পড়ে যায়। দাঁত পরিষ্কার ও সুগন্ধ মুখ একজন মহিলাকে অনেক বেশী আকর্ষণীয় করে তোলে।

এতো গেল দাঁতের পরিচর্যা। এবার আসা যাক হাত ও পায়ের নখ সম্বন্ধে একটু আলোচনায়। হাত-পা সুন্দর মসৃণ আর সেই সঙ্গে সুন্দর নিটোল চকচকে নখ খুব সুন্দর দেখায়। ত্বকের যত্নের সঙ্গে সঙ্গে হাত ও পায়ের উপরিভাগের সুন্দরতা তো [illegible] পায় কিন্তু নখ? অনেক সময় দেখা গেছে নোংরা বিচ্ছিরী নখের জন্য অনেক সুন্দরীর সৌন্দর্য হ্রাস পেয়েছে। তাই দেখতে খুব ছোট হলেও নখের সুন্দরতার মূল্য যে অনেক তা বলাই বাহুল্য।

হাতের নখ পরিষ্কার ও সুন্দর রাখার জন্যে কতকগুলি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথমত প্রশ্ন, হাতের নখ বড় রাখা হবে কিনা। কারণ নখ আঙুলের ডগার পাশ ধরে গোল করে কেটে ফেললে তো কোন কথাই থাকে না, কিন্তু নখ হাল-ফ্যাশানের মতো করে বড় রাখতে হলে তাকে নিয়মিত পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। বড় নখ রাখতে হলে মনে রাখা ভাল যে, সেই হাতে খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ও নখের রঙের পক্ষে ভাল নয়। তাই বড় নখ রাখতে হলে চামচ-কাঁটা দিয়ে খাওয়াই যুক্তিযুক্ত। এর পর আসা যাক কিভাবে পরিষ্কার রাখা হবে সেই প্রসঙ্গে। ২।৩ দিনে একবার করে উষ্ণ গরম জলে নখ ভিজিয়ে বাচ্চাদের দাঁত মাজার নরম ব্রাশ দিয়ে সাবান দিয়ে আস্তে আস্তে পরিষ্কার করতে হবে। তারপর তাতে ইচ্ছামতন রঙ লাগানো যায়, যদি ভাল লাগে। রঙ লাগানোর ব্যাপারেও কতকগুলি বিষয়ে নজর রাখা ভাল। (১) রঙ কোনো ভাল কোম্পানীর হওয়া উচিত যাতে করে নখের উপরের চকচকে ভাব নষ্ট না হয়ে যায়। (২) রঙটা লাগানো হচ্ছে কোনো বিশেষ উপলক্ষ্য বা সাজের জন্যে কিনা। (৩) নিয়মিত রঙ ব্যবহার করা হয় কিনা।

রঙ যদি বিশেষ উপলক্ষের জন্যে হয় তাহলে শাড়ী ও মুখের মেকআপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রঙ করা উচিত। তবে এ-ও দেখতে হবে হাতের রঙ, অর্থাৎ গায়ের রঙ কোন পর্যায়ের। যদি খুব কালো হয় তাহলে আমার বিশ্বাস নখের রঙ খুব হালকা গোলাপী হওয়াই শ্রেয়, যা নিজের জন্মগত রঙের সঙ্গে মিশে কেবল একটা উজ্জ্বল ভাব আনবে। শ্যামলা রঙ হলে দুই একটা রঙ চলে যদি তা সাজের বা শাড়ীর রঙের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্যবহার করা হয়। যেমন, খুব উজ্জ্বল রঙের কাপড় পরলে কালচে লাল রঙ ব্যবহার করা চলে কিম্বা হালকা খয়েরী। ভাল কোম্পানীর রঙের বহু শেড পাওয়া যায়। ফর্সা কিম্বা উজ্জ্বল শ্যামলা রঙ হলে বহু রঙ মানায়। তবে সর্বদা লক্ষ্য রাখা ভাল যে বাকী সাজের সঙ্গে তা চলছে কিনা। আজকাল চকচকে শাদা, সেলেট রঙ ইত্যাদির খুব চল হয়েছে—। কিন্তু ওগুলো বিদেশীদের হাতে তাদের সাজের সঙ্গে যতটা মানায় আমাদের ততটা হয় না। তবে খুব [illegible]

শাড়ীর সঙ্গে এই শাদা রংটা চলে। বিশেষ করে শাড়ীর রঙ নীল, লাল কিম্বা বেগুনী হলে। আর যদি শাড়ীর রঙের সঙ্গে রঙ মিশিয়ে পরতে হয় তাহলে সেই রঙ খুব হালকা টানে দেওয়া যেতে পারে। তবে এসব শুধু ফর্শা বা উজ্জ্বল রঙের জন্যই দরকার। আর একটা কথা মনে রাখতে হবে। ভাল রঙ তোলার পালিশ প্রতিবার নখের রঙ বদল করার সময় ব্যবহার করতে হবে। একটু তুলোতে ভিজিয়ে তা দিয়ে নখ মুছে ফেলে গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে—তারপর বড় চামচের দুই চামচ দুধ এক কাপ জলে দিয়ে নখগুলি ভিজিয়ে রাখলে স্বাভাবিক রঙটা ফিরে আসে। আর নখের উজ্জ্বলতাও নষ্ট হয় না। এইভাবে হাতের নখের যত্ন নেওয়া ভাল।

পায়ের নখের সম্বন্ধেও বিশেষ সচেতন হওয়া সৌন্দর্য প্রিয়দের পক্ষে ভাল। পায়ের নখ নোংরা ও বড় এবং ভাল করে কাটা না হলে খুব খারাপ দেখায়। পায়ের নখ পরিষ্কার রাখার জন্যও হাতের মতো একই পদ্ধতি। গরম জলে একটু সাবান দিয়ে ব্রাশ করে পায়ের নখ পরিষ্কার করতে হবে। তারপর বুড়ো আঙুলের নখ সামান্য একটু বড় রেখে তাকে গোল করে মাঝখানটা একটু উঁচু রেখে কাটতে হবে। বাকী নখগুলিও গোল করে কাটতে হবে। তাতে নখের গড়ন সুন্দর দেখায়। তারপর যদি রঙ দিতে হয় তাহলে সাধারণ শ্যামলা বা কালো রঙ-এর জন্য কালচে-লাল ও ইঁট-রঙই সবচেয়ে সুন্দর। খুব ফর্শারাও একই ব্যবহার করতে পারেন, তবে তার সঙ্গে গোলাপ-লাল ও মেটে রঙও ব্যবহার করতে দ্বিধা করবেন না। পায়ের নখের রঙ একটু বেশী প্রলেপ দিয়ে মোটা করে দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

এমনি সুন্দর হাত-পা থাকলে যে-কোন রমণীকে অনেক বেশী সুন্দরী লাগে। কতো প্রেম, কতো আকর্ষণ তো হাত কিম্বা পা-এর দিকে চোখ পড়েই হয়েছে। পাণিগ্রহণ আর দেহি পদপল্লব তো শুধু কথার কথা নয়।

হাত ও পায়ের মোটামুটি সৌন্দর্য চর্চার কথা তো আলোচনা করলাম। এখন আরোও কিছু ভাবতে ও লিখতে মন চাইছে। আজকালকার মেয়েরা সৌন্দর্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন ভাবতেও ভাল লাগে। পথে-ঘাটে সুসজ্জিত মেয়েদের দেখলে মন খুশি হয় এটা প্রত্যেকের মত। তাই যদি একটু বিশেষ করেই যত্ন নেওয়া যায় তাতে ক্ষতি কি? পুরানো দিনের বহু শিল্প বহু সাজ-সজ্জার পুনর্বিভাব আবার দেখা যাচ্ছে, তবে তাতে রয়েছে শুধু বর্তমান কালের বিজ্ঞানের ছোঁয়া আর একটু বেশী সূক্ষ্মতার প্রতি ঝোঁক।—যেমন হাতে পায়ে 'চিত্র' করা। আলতা রাঙা পায়ে মল পরে থাকা ও সেই আলতা দিয়ে কিম্বা ফুলের রস দিয়ে পায়ের পাতার ওপর ফুল লতাপাতা আঁকা এক বিশেষ শিল্প ছিল। শকুন্তলার যুগেও এর প্রচলন দেখতে পাওয়া গেছে। হাতের তেলোতে আলতা দিয়ে রাঙান কিম্বা ফুলের পাতা বেটে তার রঙ লাগান, সৌন্দর্য বিকাশের একটা বিশেষ দিক ছিল।

ভারতবর্ষে বহু জাতির সংমিশ্রণ—আর তাই বহু প্রথা ও বহু কিছুর সংমিশ্রণ ঘটে গেছে। মেহেদি লাগিয়ে মেয়েদের হাত-পা সুন্দর করে সাজানোর এই অপূর্ব শিল্প আজ বিহার আর রাজস্থানেই সীমাবদ্ধ নেই, বাংলাদেশেও প্রচলিত হয়ে গেছে। বাড়ীতে মেয়েরা কাঠি দিয়ে কিম্বা শুধুমাত্র আঙুল দিয়ে যে অপূর্ব শিল্পচাতুর্যের নিদর্শন দেন তা না দেখলে ভাবা যায় না। পুজোপার্বণ বিয়ে ইত্যাদিতে মেহেদী পরা অনেক অঞ্চলে একটা বিশেষ প্রথা। কিন্তু আজকাল সাজের জন্য এই মেহেদী পরাটা বহু জাতির মধ্যে এসে গেছে। বিয়েতে কিম্বা বিশেষ উৎসবে মেহেদী দিয়ে হাতে ও পায়ে আঁকলে খুব ভাল দেখায়। এই-ভাবেও সৌন্দর্যের অনুরাগী যাঁরা তাঁরা সুন্দর হতে পারেন। এটা অবশ্য নিজ নিজ রুচি ও ইচ্ছার ওপর নির্ভর করবে।

হাতের পাতা নরম ও মসৃণ রাখার জন্য কতকগুলি কাজ করলে ভাল হয়। আজকাল মহিলারা অল্পবেশী সকলেই কাজ করেন। ঘরের ও বাইরের। কেউ সময় সময় বাসনও মাজেন। এসব কাজে হাতের পাতা অনেক সময় খরখরে ও রুক্ষ হয়ে যায়, আঙুলের ডগা নষ্ট হয়ে ফেটে যায়। এইসব ক্ষেত্রে 'গ্লাবস' বা হাতের দস্তানা ব্যবহার করলে ভাল হয়। আর যদি কেউ দস্তানা ব্যবহার না করেন, তাহলে কতকগুলি সাধারণ প্রক্রিয়া অভ্যাস করলে ভাল। প্রতিদিন দুইবার। একবার দিনে—রান্না ও ঘরের কাজ শেষ করে হাত ভাল করে সাবান দিয়ে ধুয়ে একটু অলিভ তেল কিম্বা খাঁটি নারকেল তেল বেশ করে ঘষে নেওয়া। তারপর ৫।১০ মিনিট পরে হাতটা আবার ধুয়ে একটু 'ভেসেলীন' কিম্বা চারমিস ক্রীম হাতে ঘষে নেওয়া। আবার রাত্রে—ঠিক এই একই জিনিস শোয়ার আগে করা। এতে হাত খুব নরম মসৃণ সুন্দর থাকে। এছাড়া যদি হাতের জন্য যেসব লোশান ও ক্রীম পাওয়া যায় তা ব্যবহার করতে পারেন তো আরও ভাল ফল পাওয়া যাবে।

এছাড়া হাতের আর একটা অংশ পরিষ্কার রাখা খুবই উচিত, তা হল—কনুই। বেশীর ভাগ লোকেদের দেখা যায় হাতের কনুই কালো ও চাপ-ধরা ময়লা, কোঁচকানো। সেসব ক্ষেত্রে দাঁত মাজার ব্রাশ দিয়ে কনুইয়ে সাবান ঘষে নেওয়া ভাল। এছাড়া পাতিলেবু কেটে তাই দিয়ে কনুই বেশ করে ঘষে নিতে হয়। পরে সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেল্লেই কনুই পরিষ্কার থাকে। এই কাজটি সপ্তাহে অন্তত এক-বার নিয়মিতভাবে করলেই উপকার পাওয়া যাবে।

এসব ছোটখাট বিষয়ে নজর রাখলে দেখা দেবে সর্বাঙ্গসুন্দর রূপের জৌলুস। জন্মগত রূপ সবার থাকে না, হয়ও না। কিন্তু যতটুকু আছে তার ওপর আরও চর্চা করলে ও যত্ন নিলে সৌন্দর্য বাড়বে বই কমবে না। এমনও দেখা গেছে যে রূপচর্চা করে অতি সাধারণ চেহারার মহিলারাও বেশ অসাধারণ সুন্দরীদের পর্যায়ে এসে গেছেন। রমণীর আর এক নাম সুন্দরী। তা নামের মর্যাদা রাখতে দ্বিধা কীসের?

—বরবর্ণিনী

পিকাডিলী সার্কাস

নিমাই ভট্টাচার্য

উপন্যাস

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্লেনে উঠেই মনে হলো ইন্ডিয়া আর দূরে নেই। কাছে এসে গেছে। মাঝখানে বেইরুট। তারপরই দিল্লী। দিল্লী মেলে দিল্লী থেকে হাওড়া আসার সময় আসানসোল ছাড়ার পর বার বার মনে হয় এসে গেছি। বর্ধমান পেরুলেই তো হাওড়া। কলকাতা। জানলা দিয়ে দেখতে দেখতে রোম দৃষ্টির বাইরে চলে যেতেই আমারও মনের অবস্থা ঠিক ঐ রকম হলো।

নো স্মোকিং আর ফ্যাসেন ইওর সীট বেল্টের সংকেত আলো অফ হবার সঙ্গে সঙ্গেই এয়ারক্র্যাফট'এর কমান্ডার জানালেন রোম থেকে বেইরুটের দূরত্ব চোদ্দশ' পঞ্চাশ মাইল। টু-থ্রী ফোর-টু কিলোমিটার। ঘন্টা তিনেকের পথ। পথে এথেন্স ও নিকোশিয়া পড়বে।

পড়ুক। ছোটখাট আরো কত শহর পড়বে কিন্তু কোন শহরের কোন কিছুই তো দেখতে পাব না। সুতরাং কোন শহরের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছি তা জেনে কি লাভ? ট্রেনে যাবার সময় শহরের একটা প্রান্তকে অন্তত দেখা যায়। স্টেশনে কিছু মানুষ দেখা যায়। ট্রেন না থামলেও এসব দেখা যায়। প্লেনে সে আশা নেই। তিরিশ হাজার ফিট উপর দিয়ে যেতে যেতে শুধু কিছু আলো দেখা যাবে। আর কিছু না। দূরের আকাশের কয়েকটা তারা ছাড়া এখন জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আর কিছুই দেখতে পাব না।

আস্তে আস্তে যত বেশি দিল্লীর কাছে আসছি মনের মধ্যে চিন্তাগুলো তত বেশি জট পাকিয়ে যাচ্ছে। যখন টিকিট কাটি তখন বিবেককে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছিলাম। মনে মনে আমার আর বিবেকের একটা ছোট্ট সংসার গড়ে তুলেছিলাম। এখন সে স্বপ্ন দেখতে বিস্বাদ লাগছে। মনে হচ্ছে না, না অত ছোট আমি হতে পারব না। ছোট হবো না। কেন হবো? যে কোন কারণেই হোক আমি স্বামীকে পেলাম না বলে কি আমার রূপ-যৌবনের পসরা নিয়ে বিবেকের কাছে দরবার করব?

অসম্ভব। আমার পক্ষে কল্পনাতীত। একবার যখন প্লেনে চড়েছি তখন দিল্লী যাবই। কদিন ওর ওখানে থাকব। কুতব মিনার, লালকেল্লা, পার্লামেন্ট হাউস, রাষ্ট্রপতি ভবন দেখব। আর যদি সম্ভব হয় তাহলে একদিনের জন্য আগ্রা গিয়ে তাজমহল দেখব। এসব কিছুই আমি দেখি নি। যখন দিল্লী যাচ্ছি তখন এই সুযোগে এইসব দেখে নেওয়াই ভাল। আর কোনদিন এ সুযোগ পাব কিনা জানি না। সম্ভাবনা কম। যদি বিবেক ভাল ব্যবহার করে, আগ্রহ দেখায় তাহলে কয়েক দিন বেশী থাকব নয়ত দু-একদিন থেকেই চলে যাব।

হঠাৎ নিঃসঙ্গতায় জ্বালা সহ্য করতে না পেরে নিছক ভাবাবেগের তাড়নায় দিল্লী যাচ্ছি ঠিকই কিন্তু আমি কারুর কাছে কৃপা ভিক্ষা করতে পারব না। কারুর গলগ্রহ হয়ে থাকতে পারব না। ক'বছর লন্ডনে কাটিয়ে নিজের আত্মমর্যাদা সম্পর্কে বেশ সচেতন হয়েছি। ভারতবর্ষ ছেড়ে লন্ডনে গিয়ে অনেক কিছু হারিয়েছি কিন্তু পেয়েছিও অনেক কিছু। তার একটি এই আত্মমর্যাদা।

ভাবাবেগের তাড়নায় দিল্লী যাবার সিদ্ধান্ত নিলেও এই আত্মমর্যাদাবোধের জন্য রিটার্ণ টিকিট কেটেছি। যেদিন যে মুহূর্তে মনে হবে না, ভাল লাগছে না, তখনই এয়ার ইন্ডিয়া অফিসে গিয়ে রিটার্ণ বুকিং করব। ফিরে যাব লন্ডন। ব্যাগে পাগলামী করার জন্য একজন পুরুষ মানুষ ছাড়া আর সব কিছুই সেখানে আছে। পাব। আমার ঘরবাড়ী, সংসার-ধর্ম, চাকরি-বাকরি—সব কিছুই আছে। বার্কলে ব্যাঙ্ক থেকে প্রায় সব টাকা তুলে নিলেও এখনও চল্লিশ পাউন্ড পড়ে আছে। যদি এক শ' পাউন্ডের চেক দিয়েও ব্যাঙ্কে যাই তাহলেও ওরা ফিরিয়ে দেবে না। আস্তে আস্তে বাকি টাকা জমা দিলেই ওরা খুশী। তাছাড়া দু-এক মাস বাড়ী ভাড়া না দিলেও ইসলাম সাহেব কিছু বলবেন না। এর উপর আমার চাকরি আছে। সুতরাং বিবেকের মধ্যে আন্তরিকতার অভাব দেখা দিলেই ফিরে আসব।

আচ্ছা যদি কোন কারণে বিবেক এয়ারপোর্টে না আসে?

একটু মুস্কিলে পড়ব ঠিকই কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। এয়ারপোর্ট থেকে টেলিফোন করে একটা মাঝারি ধরনের হোটেল ঠিক করে চলে যাব। তারপর সম্ভব হলে নিজে নিজেই একটু ঘুরে-ফিরে দেখব। বেড়াব। যদি পারি আগ্রাও যাব। শুনেছি তাজ এক্সপ্রেস বলে একটা ভাল ট্রেন আছে। লন্ডন থেকে আমাদের যারাই দিল্লী এসেছেন তারাই এই ট্রেনে আগ্রা গিয়ে তাজমহল দেখেছেন। যদি ভাল লাগে এবং সুবিধা হয় তাহলে আগ্রাতে একটা দিন থাকতেও পারি। তারপর কলকাতা।

শুনেছি দিল্লী থেকে কলকাতা যাবার রেলের টিকিট পাওয়া খুব কষ্টকর। দু-একজনের কাছে শুনেছি ঘুষ দিলে টিকিট পাওয়া যায় কিন্তু আমার দ্বারা ও কাজ হবে না। যদি রেলের টিকিট না পাই তাহলে প্লেনেই চলে যাব। আমার কাছে একশ' পাউন্ডের ট্রাভেলার্স চেক ছাড়াও প্রায় পঞ্চাশ পঞ্চান্ন পাউন্ড আছে। তার মানে ইন্ডিয়ান কারেন্সীতে তিন হাজার টাকা। মাস খানেক ছুটি কাটাবার পক্ষে যথেষ্ট।

দিদালীকে জানিয়েছি আমি দিল্লী হয়ে কলকাতা আসছি কিন্তু ঠিক কবে কখন পৌঁছচ্ছি তা জানে না। তবে লিখেছি কলকাতায় গিয়ে ওর কাছেই থাকব। আমি কয়েকবার ওকে লিখেছি, তোর স্বামী তো বেশ মোটা মাইনে পায়। প্রত্যেকবার ছুটিতে দিল্লী—সিমলা, বোম্বে—মাদ্রাজ না ঘুরে একবার দুজনে চলে আয় আমার কাছে। কদিনের জন্য হলেও আবার সেই পুরনো দিনগুলোর স্বাদ পাওয়া যাবে। উত্তরে দিদালীর স্বামী আপনি দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটের

তোমাদের বেশ সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাচ্ছেন বলে কি আমাদের কোন খবরই রাখেন না? আমাদের সঙ্গে এভাবে ঠাট্টা না করে আপনিই একবার চলে আসুন। পুরনো দিনের কলকাতাতেই পুরনো দিনের আনন্দ পাওয়া সম্ভব, লন্ডনে নয়। তাছাড়া আপনার প্রশংসা শুনতে শুনতে আমি প্রায় পাগল হবার উপক্রম। আসুন। কদিন আপনাদের দুই বন্ধুকে নিয়েই সংসার করে জীবন ধন্য হোক।

আমি দিল্লীতে বিবেকের কাছে থাকার জন্য গেলেও লন্ডনে কাউকে সেকথা বলি নি। সবাই জানে দু-একদিন দিল্লীতে বেড়িয়েই আমি কলকাতায় চলে যাব। বিজয়া আর শ্রীকান্তকে পিয়ালীর ঠিকানা দিয়ে এসেছি। দরকার হলে ওরা ঐ ঠিকানাতেই আমাকে চিঠি দেবে। ওদের দুজনকেই কিছু কিছু কাজের ভারও দিয়ে এসেছি। সেসব সম্পর্কেও নিশ্চয়ই ওরা আমাকে চিঠি দেবে।

গত পরশুদিন রাত্রে বিজয়া খেতে বলেছিল। শ্রীকান্তও ছিল। বিজয়া কয়েকটা মুর্শিদাবাদ সিল্কের শাড়ী নিতে বলেছে। কলকাতার ব্যাঙ্কে ওর বেশ কিছু টাকা আছে। আমাকে চেক দিচ্ছিল কিন্তু নিলাম না। বলেছি দরকার হলে জানাব। আমি জানি শ্রীকান্তর অনেক দিনের সখ পুজোর সময়, নববর্ষের দিন গরদের পাঞ্জাবি পরে কিন্তু ওর নেই। আমাকে টাকা দিতে গেলেও নিতে পারলাম না। রাত্রের খাওয়া-দাওয়া গল্প-গুজবের পর শ্রীকান্তর গাড়ীতেই বাড়ী ফিরলাম। বাড়ীর সামনে পৌঁছবার পর ও বললো, ইন্ডিয়ায় যাচ্ছ তোমার তো অনেক খরচ হবে। তাই বলছিলাম তুমি যদি কিছু মনে না করো তাহলে .....

এইটুকু বলেই কোটের ইনসাইড পকেট থেকে এক গোছা পাউন্ডের নোট বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিল, রেখে দাও। হঠাৎ দরকার হতে পারে।

আমি নোটগুলো ওর হাত থেকে নিয়ে আবার ওর ইনসাইড পকেটেই রেখে দিলাম।

কি হলো? নিলে না?

না। দরকার হবে না।

হঠাৎ তো দরকার হতে পারে। দরকার না হলে ফিরে এসে দিয়ে দিও।

যদি হারিয়ে ফেলি? যদি চুরি হয়ে যায়?

শ্রীকান্ত শুধু বললো, নিলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হতাম।

ওর ঘন্টাখানেক পরেই বিজয়া আর শ্রীকান্তর টেলিফোন এলো। দুজনেই আমার কলকাতার ঠিকানা জেনে নিল। আমি বেশ বুঝতে পারলাম আমি টাকা-কড়ি না নেওয়ায় ওরা টেলিফোনেই আলাপ-আলোচনা করে আমার ঠিকানা জানতে চাইল। তাইতো আমার মনে হয় ওরা দুজনেই আমাকে কিছু টাকা না পাঠিয়ে শান্তি পাবে না।

ভালই হবে। বিপদ-আপদের কথা কেউ বলতে পারে না। তাছাড়া এতদিন পরে কলকাতা গিয়ে কি পরিস্থিতির মুখোমুখি হবো তাই বা কে জানে। ওদের টাকায় আমি কেনাকাটা না করে যদি নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করি তাহলেও ওরা কিছু মনে করবে না।

আজ খুব ভোরে উঠেছি। ঘরদোরের সব কিছু ঠিকঠাক করার পর নিজে তৈরী হয়েছি। কিছু খেয়েছি। তারপর ইসলাম সাহেবদের বলে ভাবীজির কাছে চাবি দিয়েই ট্যাক্সিতে এয়ার টার্মিন্যালে গিয়েছি। সেখান থেকে হিথরো। তারপর সারাদিন ধরে এই প্লেন জার্নি। বড্ড ক্লান্ত লাগছে। চোখ দুটো বুজে আসছে। মিঃ ওয়াল হ্যাট র‍্যাক থেকে একটা ছোট্ট বালিশ নিয়ে আমার মাথায় দিতেই বুঝলাম আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। শুধু চোখ মেলে তাকিয়ে একটু হেসেই ওকে ধন্যবাদ জানালাম। চোখে তখন এত ঘুম যে মুখে কোন কথা বলতে পারলাম না।

ঘুম ভাঙ্গল ওয়াল সাহেবের ডাকে, এক্সকিউজ মী, মিস রুণু ফাসেন ইওর সীট বেল্ট। বেইরুট এসে গেছি।

চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি নীচে দেওয়ালী দীপান্বিতার মত আলোর উৎসব। বুঝলাম, সত্যি পৃথিবীর অন্যতম আনন্দ নিকেতন বেইরুট এসে গেছি। তাড়াতাড়ি কোমরে সীট বেল্ট জড়িয়ে নিলাম। হ্যান্ড ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে চোখমুখ মুছতে মুছতেই আন্ডার-ক্যারেজ রানওয়ে টাচ্ করল।

বেইরুট।

কলকাতা থেকে লন্ডন যাবার সময় কায়রো হয়ে গিয়েছিলাম। বেইরুট এই প্রথম দেখছি। কি বিরাট ও সুন্দর টার্মিন্যাল বিল্ডিং। ইউরোপের বহু এয়ারপোর্টেই এত বড় ও সুন্দর টার্মিন্যাল বিল্ডিং দেখা যাবে না। কায়রো এয়ারপোর্টের টার্মিন্যাল বিল্ডিং ভারী সুন্দর। কেন জানি না আমার পশ্চিম এশিয়া—মধ্য প্রাচ্যকে খুব অনগ্রসর অঞ্চল মনে হয়। অধিকাংশ ভারতীয়রই এই ধারণা। কায়রো বা বেইরুটের এয়ারপোর্ট টার্মিন্যাল বিল্ডিং আর ওখানকার মানুষগুলোর স্বাস্থ্য দেখলে মনেই হয় না ওখানে অভাব অনটন আছে।

টার্মিন্যাল বিল্ডিং-এর ভেতরে ট্রানজিট লাউঞ্জের মধ্যে সারি সারি দোকান। ডিউটি ফ্রী শপস। সুইস ঘড়ি, জার্মান ক্যামেরা, জাপানী ট্রানজিসটার—টেপ রেকর্ডার থেকে শুরু করে লেবাননের পৃথিবী বিখ্যাত রেকেড এমব্রয়ডারি সোনার গহনা, চামড়ার জিনিস ও আরো কত কি। আমাদের প্লেনের সব প্যাসেঞ্জারই ঐ দোকানগুলোর সামনে ভীড় করেছেন। দেখাশুনা কেনাকাটা হচ্ছে। ওদের সবার মত আমিও দোকানগুলোর সামনে ঘুরাঘুরি করে জিনিসপত্র দেখতে শুরু করলাম। তারপর কি জানি কি মনে করে পাঁচ পাউন্ড দিয়ে হঠাৎ একটা আংটি কিনলাম।

ফর ইওর বয় ফ্রেন্ড, মিস রুণু? হাসতে হাসতে মিঃ ওয়াল জিজ্ঞাসা করলেন।

আপনি ছাড়া আমার তো আর কোন বয়ফ্রেন্ড নেই। হাসতে হাসতেই আমি উত্তর দিলাম।

এই কথাটা শোনবার জন্যই তো আমি জিজ্ঞাসা করলাম

অশেষ ধন্যবাদ।

মিঃ ওয়াল আমার কাছে একটু ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, ক্লাইভের সঙ্গে আপনার দেখা হলে আমরা আর ইন্ডিয়া জয় করতে পারতাম না।

ও কথায় আমি হাসি।

হাসছেন যে। আমি ঠিকই বলেছি। ক্লাইভ হেরে ভূত হয়ে গেলেও হাসতে হাসতে লন্ডন ফিরত।

আমাদের বেইরুট বাসের এক ঘন্টা মেয়াদ শেষ হয়ে গেল। আবার যাত্রারম্ভ হলো। প্লেনে নতুন ক্রু। এয়ার হোস্টেস থেকে কমান্ডার—সবাই নতুন। প্লেন টেক অফ করতেই নতুন কমান্ডার তাঁর ও তাঁর সহকর্মীদের শুভেচ্ছা জানালেন আমাদের। আর জানালেন দিল্লীর দূরত্ব। দু হাজার আটশ' আটত্রিশ মাইল। চার হাজার পাঁচশ আটষট্টি কিলোমিটার। অর্থাৎ প্রায় ছ' ঘণ্টার পথ। লেবানন ছাড়া সিরিয়া, ইরাক, ইরান, আফগানিস্থান পার হয়ে পাকিস্তানকে পাশ কাটাবার পরই দিল্লী। দামাস্কাস, কারমানশা, কান্দাহার ছাড়াও আরো অনেক শহরের উপর দিয়েই আমরা উড়ে যাব।

আর?

এক্ষুনি ডিনার সার্ভ করা হবে।

ডিনার খেতে খেতেই মিঃ ওয়াল জিজ্ঞাসা করলেন, দিল্লীতে পৌঁছেই কি হারিয়ে যাবেন?

হারিয়ে যাব কেন?

দেখা হবে?

কিন্তু আমি কদিন দিল্লী থাকব তা তো ঠিক নেই।

তারপর কোথায় যাবেন?

কলকাতায়।

তারপর?

কি উত্তর দেব? আমি নিজেই জানি না তো ওকে কি বলব? বললাম, দিল্লীতে দু-একদিন না থেকে কিছু বলতে পারছি না।

(ক্রমশঃ)

চলচ্চিত্র উৎসবে
এবারের প্রতীক

আগামী গ্রীষ্মে রজত-জয়ন্তী উৎসবের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এ বছরের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের বার্লিন উৎসবের সমাপ্তি ঘোষিত হোল। এবারের এই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের মেলায় একদিকে যেমন আগামী-দিনের বিশ্ব-চলচ্চিত্রের গতিপ্রকৃতির রূপ-রেখার সন্ধান মেলে, অন্যদিকে তেমনি প্রধানত ইউরোপ-আমেরিকার মধ্যে সীমা-বদ্ধ এই 'আন্তর্জাতিক' উৎসবের ভৌগ-লিক বিস্তৃতিও দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। বার্লিন উৎসবের চৌহদ্দিতে মহাদেশ আফ্রিকা এখনো অনাদৃত হলেও ক্রমশ বেশী সংখ্যায় এশীয় দেশগুলি চলচ্চিত্র-শিল্পে পরিপক্কতার সুস্পষ্ট ছাপ রেখে যেতে সক্ষম হয়েছে। তাছাড়া দীর্ঘ চব্বিশ বছরের বয়কট পরিহার করে এ বছরেই প্রথম সোভিয়েট ইউনিয়ন তার ছবি পাঠিয়েছে। আশা করা যায়, আগামী বছর ব্যাপকভাবে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া বার্লিনের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের রজত-জয়ন্তী উৎসবে অংশগ্রহণ করবে।

বার্লিনের দীর্ঘদিনের অতিথি সত্যজিৎ রায় অনুপস্থিত, মৃণাল সেন আসেন নি। তাই ভারতীয় শিবির নিষ্প্রাণ হলেও বার্লিনে তাঁরা যে ভারতীয় ছবির ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গেছেন তার প্রমাণ মিলল 'অংকুর' ছবির প্রদর্শনে, ফুটবলের বিশ্বকাপের খেলা সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যক দর্শক সমাগমে। শ্যাম বেনেগাল পরিচালিত হিন্দী ছবি 'অংকুর' বোম্বের হাসি-হুল্লোড়ের ফিল্মী জগতে যেন এক ব্যতিক্রম। পরিচালক গ্রাম-ভারতের এক সামাজিক সমস্যাকে এই ছবিতে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন, যে সমাজ দ্রুত ভাঙছে কিন্তু ভেঙে পড়ছে না। ধনী চাষীর কলেজে-পড়ুয়া পুত্র সূর্যকে পড়াশুনায় ইস্তফা দিয়ে সম্পত্তি রক্ষণা-বেক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে গ্রামে ফিরে আসতে হোল। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিশোরী সারুর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হোল সে। নববধূ বিয়ের পরেই পতিগৃহে যাত্রা করল যৌবনে কুসুমিত হবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে। এদিকে গ্রাম্য নির্জনতায় একাকীত্বে বন্দী সূর্য গ্রামের মূক-বধির কুমোরের ধর্মপত্নী লক্ষ্মীর প্রতি আকৃষ্ট হোল। কালক্রমে তাদের অবৈধ প্রেমের সাক্ষ্য হিসেবে লক্ষ্মী হোল সন্তান-সম্ভবা। সমাজের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করে সূর্য এই জারজ সন্তানকে স্বীকৃতি দেবে কেমন করে! তাই লক্ষ্মীকে সে গর্ভপাতের পরামর্শ দেয়। লক্ষ্মী সায় দেয় না। সামাজিক কষাঘাতে বিপর্যস্ত বিবেক সূর্য এক নাটকীয় মুহূর্তে লক্ষ্মীর মূক-বধির স্বামী কিস্তৈয়াকে চাবুকের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করে। লক্ষ্মী স্বামীর পাশে এসে দাঁড়ায়, রক্ষা করে তাকে। অনুতপ্ত সূর্য ভাঙা মন নিয়ে অন্ধকার জীবনের বাকি দিনগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। শ্যাম বেনেগাল 'অংকুর' ছবিতে সামাজিক নিগড় ভাঙতে পারেননি ঠিকই কিন্তু গ্রাম-ভারতের একটি স্বাভাবিক দৈনন্দিন সমস্যাকে তুলে ধরেছেন। এই ছবির দুর্বল গল্পের উপর ভিত্তি করে বোম্বে-মার্কা চটুলতার অবকাশ ছিল, কিন্তু সেই চিরাচরিত পথ থেকে তিনি অনেকটা সরে আসতে পেরেছেন, সেই কারণেই তাঁকে বাহবা দিতে হয়।

বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে যোগদানকারী সোভিয়েট ছবিটিও বিপ্লব-পরবর্তী সোভিয়েত ইউনিয়নের এক গ্রাম্য সমস্যাকে দর্শকদের সামনে হাজির করেছে। শ্যাম বেনেগাল যে সমস্যাকে প্রধানত মানব-মানবীর প্রেমোপাখ্যান হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন

'উইথ ইউ অ্যান্ড উইদাউট ইউ' ছবির পরিচালক রোডিন নাচাপেটভ সেই সমস্যাকে সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনের পটভূমিকায় বিশ্লেষণ করেছেন। রোডিনের ছবিতে 'যৌন নয়, সমস্যা জমির।' ধনী চাষী ফেডর বাজিরিন কৃষি-শ্রমিক মেয়ে সুন্দরী স্টেচাকে বিয়ে করল। ফেডর কৃষিতে সমবায়ের বিরোধী। অথচ স্টেচা চায় যে, তার স্বামী সমবায় খামারে যোগ দিক। ফেডর বাজিরিনও ভারতীয় সূর্যের মতই গ্রাম্য নির্জনতার একাকীত্বে বন্দী কিন্তু এখানে সংঘাত ব্যক্তি এবং সমষ্টির মধ্যে। স্টেচা স্বামীকে ছেড়ে যায়, আত্মীয়রা তাকে দূরে সরিয়ে রাখে। নানা সংঘাতের মধ্যে দিয়ে ফেডর শেষ পর্যন্ত সমবায়ের মধ্যেই তার জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পায়। এই ছবিকে পরিচালক রোডিন নাচাপেটভ কেতাবী বুলিতে ভারাক্রান্ত করেননি। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ভেঙে আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে সমাজতান্ত্রিক সমাজে উত্তরণের পথে সোভিয়েত গ্রাম-জীবনে যে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, অত্যন্ত দরদের সঙ্গে অদ্ভুত সুন্দর ফটোগ্রাফীর চমক দিয়ে পরিচালক আমাদের সামনে তা তুলে ধরেছেন।

ভারতীয় ছবি
অংকুর
সাধু মেহের / শাবানা আজমী

এক সম্বর্ধনা সভায় সুবর্ণ ভল্লুকপ্রাপ্ত কানাডার ছবি দি অ্যাপ্রেনটিসশীপ অফ ডাডি ক্রাভিচ-এর পরিচালক টেড কোটচেফ এবং নায়িকা মিচেলিন ল্যাংকটট।

বার্লিন উৎসবে প্রথম পুরস্কার সুবর্ণ ভল্লুক লাভ করেছেন কানাডার পরিচালক টেড কোটচেফ 'দি অ্যাপ্রেনটিসশীপ অফ ডাডি ক্রাভিচ' ছবির জন্য। মনট্রিল শহরের ইহুদি অধ্যুষিত মহল্লার ডাডি ক্রাভিচ ঐশ্বর্য—অগাধ ঐশ্বর্যের পেছনে ছুটছে। কোন বাধাকেই সে মানতে রাজী নয়। সামাজিক মূল্যবোধের কোন মূল্য নেই তার কাছে। তাই বড়লোক হবার তাগিদে এমনকি প্রিয়জনদের প্রতি নিষ্ঠুরতায় সে অমানুষ। জাল-জুয়াচুরি, এমনকি নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে প্রতারিত করতে, নিজের প্রেমিকাকে ষড়যন্ত্রের শিকার করতে সে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। কালক্রমে ডাডি ক্রাভিট অগাধ ঐশ্বর্যের অধিকারী হয় ঠিকই, কিন্তু তখন আত্মীয়রা তাকে পরিত্যাগ করেছে, বন্ধুহীন সে, প্রেমিকা ইভেটে দূরে সরে গেছে। ঐশ্বর্যের সন্ধানে বেরিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য—স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা থেকে সে বঞ্চিত। ঐশ্বর্যের গজদন্ত মিনারের বাসিন্দা ডাডি ক্রাভিচের কাছে এই পৃথিবী শূন্যতায় ভরা।

নিরানন্দময় শূন্যতার বোঝায় ভারাক্রান্ত ইরানের এক গন্ডগ্রামের রেলওয়ে গেটম্যান। লেভেল ক্রশিং-এর চৌহদ্দির ভেতর দিয়ে দিনে মাত্র দুটি ট্রেন যায়। মিলিটারীতে চাকরীরত ছেলে তাকে একবার দেখতে আসে। বৃদ্ধ লেভেল ক্রশিংয়ের গেটম্যানের সঙ্গে বহির্জগতের আর কোন যোগাযোগ নেই। কিন্তু যেদিন সে বার্ধক্যহেতু আসন্ন কর্মচ্যুতির খবর পায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে সে। একজোড়া রেললাইন ছাড়া পৃথিবীটা তার কাছে মিথ্যা। ইরানের তরুণ পরিচালক সোহরাব শহীদ-সালেস অত্যন্ত স্পর্শকাতর ভঙ্গীতে এই গেটম্যানের জীবনের বৃত্তান্ত এঁকেছেন তাঁর বার্লিনে দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত 'স্টিল লাইফ' ছবিতে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সালেস প্রতিষ্ঠিত অভিনেতাদের নিয়ে কেন ছবি করেন না। ছবির প্রয়োজনে সাধারণ মানুষের ভেতর থেকে বেছে নিয়ে তিনি অভিনেতার সৃষ্টি করেন। এবারকার বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে রৌপ্য ভল্লুক ছাড়াও এই পরিচালক আরো পাঁচটি বিভিন্ন পুরস্কার লাভ করেছেন।

'দি ওয়াচ-মেকার অফ সেন্ট পাউল' ছবির জন্য ফরাসী পরিচালক বেরট্রান্ড টাভেরনিয়ে রৌপ্য ভল্লুক লাভ করেছেন। খুনী পুত্রের জন্য এক স্নেহান্ধ [illegible] আকুতি, অন্যদিকে হত্যার বিরুদ্ধে তার ধিক্কার। স্নেহ বনাম সামাজিক মূল্যবোধের সংঘাতে ঘড়িওয়ালা ডেসকমব জীবনের নতুন তাৎপর্য আবিষ্কার করে।

এছাড়াও বার্লিনের চতুর্বিংশতিতম চলচ্চিত্র উৎসবে রৌপ্য ভল্লুক লাভ করেছে ওটোকার রুনজে পরিচালিত পশ্চিম জার্মান ছবি 'ইন দি নেম অফ পিপলস', হেকটর অলিভেরা পরিচালিত আর্জেন্টিনার ছবি 'দি রিবেলিয়ান ইন প্যাটাগোনিয়া', ইংল্যান্ডের স্টুয়ার্ট কুপারের 'লিটল ম্যালকোলম' এবং ফ্রাংকো ব্রুশাটি পরিচালিত 'ব্রেড অ্যান্ড চকোলেট।'

অন্যান্য বছরের মত এবারেও সরকারী প্রতিযোগিতার পাশাপাশি বিভিন্ন বামপন্থী চিত্রামোদীদের প্রচেষ্টায় ফোরাম অফ ইয়ং ফিল্মস বিভাগে অসংখ্য ছবির প্রদর্শনী হয়েছে। দুঃখের কথা এই বিভাগে ভারত ছিল অনুপস্থিত।

—সরল সেন
বার্লিন

জয়া ভাদুড়ী / সঞ্জীবকুমার

প্রেক্ষাগৃহ

নয়া দিন নয়ী রাত

একটি পরিচ্ছন্ন ও উপভোগ্য হিন্দী ছবি (প্রযোজনা : জ.জ. পিকচার্স)

বিত্তবানের কন্যা হয়েও সুষমার মনে শান্তি নেই। কারণ সে বাড়ীর সকলের অমতে, বিশেষ করে বাবাকে না জানিয়ে 'আনন্দ'কে ভালবেসেছে। সুষমার বাবার ইচ্ছা তাঁর পছন্দমত পাত্রের সঙ্গে ওর বিবাহ হোক। ভগ্নহৃদয়ে নানা দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে দিন কাটাতে গিয়ে হঠাৎ সুষমা একদিন দেখল আনন্দের মতো একজন যুবক বরের আসনে বসে বিবাহ করতে যাচ্ছে, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন নিয়ে। এ অবস্থায় নিঃসহায় সুষমাও বাড়ী ছেড়ে পালাতে গেল। পথে সে প্রথমে একদল গুন্ডার কবলে পড়ল। সেখান থেকে একজন দরদী মহিলা তাকে রক্ষা করলেন। তবে তিনিই সুষমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর নিজের আশ্রয়ে, সেখানে পতিতা মেয়েদের দিয়ে সমাজের তথাকথিত ধনী ব্যক্তিদের 'মনোরঞ্জন' করবার ব্যবস্থা করা হয়। সুষমাকেও বলা বাহুল্য একজন ধনী ব্যক্তির দিকে ঠেলে দেওয়া হোল—এক স্ত্রী-পরিত্যক্ত ধনী ব্যক্তির কাছে। উনি সুষমার সব দুঃখের কথা শুনে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দিতে চাইলেন। উদ্দেশ্য আশ্বাস দিলেন তাঁর ভালবাসার। কিন্তু সে আশ্রয়ও নিরাপদ মনে হোল না সুষমার। সুতরাং নতুন আশ্রয়ের সন্ধানের জন্যে আবার ছুটতে হোল তাকে। এবার পুলিশ তাকে রাতের রজনী-গন্ধা মনে করে হাজতে নিয়ে গেল। সেখানে তার কথাবার্তা শুনে পুলিশের মনে হোল, আসলে সুষমার হয়তো মাথায় গণ্ডগোল ঘটেছে। তাই তাকে পাঠানো হোল মেন্টাল হসপিটালে। সেখানকার অধ্যক্ষ বৃদ্ধ ডাক্তার তার আসল রোগ কি তা নির্ণয় করবার আগেই সুষমা আবার পালিয়ে গেল। এবারও তার মনে ছিল পুলিশের ভয়। কে জানে যে কোন মুহূর্তে ওকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। এই সময় সুষমার সঙ্গে পরিচয় হোল এক হত্যাকারী ডাকাতের যে কিছুক্ষণ পূর্বে তার একমাত্র ভাইয়ের প্রণয়িনীর পিতাকে হত্যা করেছে। কেননা সেই নিরপরাধ ভাইকে দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে লাঞ্ছিত করতে দ্বিধা বোধ করে নি সেই লোকটি, তার অপরাধ ছিল, সে দরিদ্র হয়ে ধনীর রূপবতী কন্যাকে ভালবেসেছিল। তারপর এল একজন ভণ্ড সন্ন্যাসী যে দিনে সাধু ও সন্ত, কিন্তু রাতে ভারতীয় দুষ্প্রাপ্য মূর্তিগুলি মন্দির থেকে অপহরণ করে বিদেশে বিক্রী করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে, সেও সুষমাকে আশ্রয় দিয়ে তার দিকে কামনার কলুষিত হাত বাড়িয়ে দিল। সেখান থেকে পালিয়ে সুষমা এল এক মাস্তানদলের নায়কের কাছে। অবশ্য উনি সুষমাকে বোনের মতো আশ্রয় দিলেন। কিন্তু ওখানকার মস্তানেরা অর্থলোভী ব্যক্তি তাকে রাতের জন্যে দাবী করে বসল। সুতরাং ওখান থেকেও পালিয়ে 'সুষমাকে' যেতে হোল এক সাহসী শিকারী এবং পুলিশ অফিসারের বাড়ীতে। ইনি দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখেও বোকা সেজে ছিলেন—'সুষমার' পুরুষের বেশে পালিয়ে বেড়ানোর ব্যাপারে। সুযোগমতো তিনি আনন্দের পিতা এবং সুষমার পিতাকে সংবাদ পাঠিয়ে, চিরতরে ওঁদের মিলনের ব্যবস্থা করে দিলেন।

অভিনয়ে—'সুষমা'র ভূমিকায় জয়া ভাদুড়ী (বচ্চন) এবং 'আনন্দ' তথা আরো ৮টি বিভিন্ন ভূমিকায় (মাতাল, ডাক্তার, ডাকাত, কুষ্ঠরোগী, মস্তানদলের নায়ক, শিকারী; ভণ্ড সন্ন্যাসী) সঞ্জীব কুমারের অভিনয় সত্যিই প্রশংসনীয়। অন্যান্য ভূমিকায়—ডেভিড, সুন্দর, কেশব রাণা, দিলীপ দত্ত শ্যামা নাজনীন ফরিদা জালাল মনোরমা ও ললিতা পাওয়ার ও পিংকী চিত্রনাট্যানুযায়ী অভিনয় করেছেন। পরিচালনায় এ ভীম সিং যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। সংগীত পরিচালক লক্ষ্মীকান্ত পেয়ারেলালের সুরে একাধিক গান জনপ্রিয় হবার আশা রাখে।

—চিত্রদূত

ওঁরা বললেন

দেবরাজ রায়

ঃ কলকাতায় নাট্য আন্দোলন কি সফল ?

—নিশ্চয়ই সফল। আমার ধারণা এই কলকাতার বিভিন্ন ছোটখাটো দল নাটকের গতানুগতিকতাকে ভেঙে নানারকম এক্সপেরিমেন্ট করছে বিভিন্নভাবে। প্রচুর বিদেশী নাটকের অনুবাদ হচ্ছে, শুধু অনুবাদ বলি কেন—অভিনয়ও হচ্ছে। এই কর্মচঞ্চলতা যে কোনো আন্দোলনের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। সুতরাং নাট্য আন্দোলন থেমে গেছে বা অসফল বলি কি করে।

ঃ বাংলা নাটকের অন্তরঙ্গে ও বহিরঙ্গে বিদেশী প্রভাব কি খুব বেশী ?

—প্রথমত বাংলা নাটকে বিদেশী প্রভাব খুব বেশী একথা আমি বিশ্বাস করি না। বিদেশী প্রভাব আছে, থাকবেও। যে কোনো ভাষা বিদেশী ভাষাকে আত্মীকরণ করে নিজেই সমৃদ্ধশালী হয়, তেমনি নাটক যদি প্রকরণ-ব্যাকরণে বিদেশী প্রভাবিত হয়েই থাকে তাতে ক্ষতি কোথায় ? বিদেশী আঙ্গিক, লাইটিং পদ্ধতি, কম্পোজিশন—এসব জিনিসগুলো যদি নিজস্ব ভঙ্গীতে বাংলা নাটকের অঙ্গীভূত করা যায় তাতে লাভ ছাড়া লোকসান আছে কি ?

ঃ উত্তমকুমারের মত জনপ্রিয়তা কি আপনার কাম্য ?

—এখনও অব্দি জনপ্রিয়তা ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছি না কিছু। অভিনয় করতে ভালো লাগে তাই করছি। বলতে পারি একটু বেছেটেছেই কাজ করছি। ছাত্র ছাড়া নিজেকে অন্যকিছু ভাববার মত মানসিক অবস্থা এখনও আসে নি। সময় এলে ভাবা যাবে। আপাতত কাজ করে তো যাই।

ঃ আপনি তো আর্টসের ছাত্র, ইকনমিকস নিশ্চয়ই সাবজেক্ট ছিল। সাম্প্রতিক মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে আপনি কি বলেন ?

—আমি আর অর্থনীতির কতটুকুই বা পড়েছি। মতামত দেবার মত ক্ষমতা আমার নেই। তবে শুধু চোখে যেটুকু দেখতে পাচ্ছি, ফিল করছি—তাতে এটা মনে হচ্ছে ইনফ্লেশন এখন আমাদের জাতীয় অর্থনীতিকে এমনভাবে চেপে ধরেছে যে, প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ ছাড়া কোনো সমাধান সম্ভব নয়। কালো টাকার পরিমাণ এখন সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। বাজারে গিয়ে দেখছি—পাঁচিশ টাকা সের চিংড়ী মাছ, তাও উধাও। কারা কিনছেন ?

ঃ অবসর সময় কাটান কিভাবে ?

—সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশায় আমি খুব আগ্রহী। কোনো কাজ না থাকলে কখনও একা, কখনও বা দু-একজন বন্ধু মিলে বেরিয়ে পড়ি কোথাও। আশ-পাশের লোক আমাকে ভয়ানক আকর্ষণ করে। তাদের কথা বলা, ব্যবহার রুচি ইত্যাদি ব্যাপারগুলো বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করি। এক কথায় বলতে পারেন অবজারভেশন আমার অবসর সময়ের খোরাক।

ঃ আপনার জীবনের সবচাইতে আনন্দের দিন কোনটা ?

—আনন্দের ঘটনা আছে অনেক। সত্যজিৎবাবুর ছবিতে অভিনয়ের দিন, মৃণালবাবুর সঙ্গে কাজ করার কিছু ঘটনা, এমন আরও কিছু। কিন্তু কিছুদিন আগে একটা দিন আমার কেটেছিল শ্রদ্ধেয় শম্ভু মিত্রের সঙ্গে। গিয়েছিলাম সকাল নটায়, উঠেছি আড়াইটে নাগাদ। এই দীর্ঘ সময়টা আমি জীবনে কোনদিন ভুলব না। ব্যাপারটা এই রকম। রবীন্দ্র-সদনে

আমাদের বিসর্জন নাটকে জয়সিংহের চরিত্রে আমাকে দেখে শম্ভুবাবু আমার বাবার মারফত ও'র সঙ্গে একদিন আমায় দেখা করতে বলেন। আমি তাই গিয়েছিলাম একদিন সকালে। বেলা সাড়ে ন'টা থেকে প্রায় আড়াইটে পর্যন্ত নাটক সিনেমা রাজনীতি কি নিয়ে না আলোচনা হয়েছে! ও'র সঙ্গে এই ম্যারাথন আলোচনায় আমার অনেক অজানা জিনিস জানা হয়েছে, অনেক জটিল ব্যাপার প্রাঞ্জল হয়েছে আমার কাছে। ছেলের মত স্নেহ দিয়ে তিনি আমাকে বুঝিয়েছেন সব। অভিনয়-নাটক তাঁর কাছে সাধনার বস্তু। ভাবতেই পারি না পার্ক সার্কাসের এক বাড়ীতে বসে একলা ভদ্রলোক কি সুন্দর ধ্যানে মগ্ন।

ঃ অভিনয়ে আপনি বাবা-মা'র দ্বারা কতখানি প্রভাবিত? —আমি মোড অফ অ্যাকটিংয়ের কথা বলছি আর কি?

—অভিনয় কাজটায় বাবা-মা'র প্রভাব খুবই বেশী এবং স্বাভাবিকও। বলতে গেলে ছোটবেলা থেকেই এই থিয়েটার সেন্টার হলের (যেখানে আমাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া চলছিল) স্টেজেই কেটেছে। সুতরাং স্টেজ-ভীতি আমার কোনও দিনই ছিল না। কিন্তু মোড অফ অ্যাকটিংয়ে আমি বাবা-মা'র দ্বারা আদৌ ইনফ্লুয়েন্সড কিনা বলতে পারব না। দর্শকরা—আপনারাই বলবেন আমার অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য কোথায়—বাবা-মা'র সঙ্গে আমার পার্থক্যটা কি রকম। তবে একথাও বলে রাখি গুরুবাদ-টুরুবাদে আমার বিশ্বাস নেই। আমার মনে হয় কোনো অভিনেতার গুরু অর্থে কোনো গুরু থাকতে পারে না। দর্শকের রিঅ্যাকশন লক্ষ্য করে সময়ের পরিবর্তন অনুযায়ী অভিনয়েরও পরিবর্তন প্রয়োজন।

ঃ সত্যজিৎ রায়-মৃণাল সেনের সঙ্গে কাজ করেছেন, ঋত্বিক ঘটকের ছবি নিশ্চয়ই দেখেছেন। এ'দের তিনজনকে আপনার পছন্দমত সাজিয়ে দিতে পারবেন?

—দেখুন তিনজনই বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক। এ'দের ছবিতে কাজও করেছি, ছবিও দেখি। কিন্তু পছন্দমত সাজানোর ব্যাপারটা গোলমেলে নয় কি? একজনকে অপরের সঙ্গে তুলনা করতে না পারলে সাজাবো কি করে? তিনজনের মানসিকতা তিন রকম। কাজ করার ভঙ্গীও এক নয়। ছবিগুলো তো আপনিও দেখেন। বলুন না তুলনা করা যায় কি? শ্রেষ্ঠ লোকদের তুলনা চলে না।

ঃ বেড়ানো ছাড়া আর কীভাবে দিন কাটে আপনার?

—থিয়েটার সেন্টারে নিয়মিত নাটক তো দেখিই, সিনেমা দেখি। সিনেমা-থিয়েটার নিয়ে পড়াশুনোও করি

ছেঁড়া তমসুক
রণজিৎ মল্লিক ও সুমিত্রা মুখার্জি
পরিচালনা ঃ পূর্ণেন্দু পত্রী

তপন সিংহ পরিচালিত সাগিনা চিত্রে দিলীপকুমার / সায়রা বানু

অনেক সময়। সিনেমা মিডিয়মটা আমাকে বড় ভাবায়. পরিচালক হবো এমন কোনো ইচ্ছে নেই ঠিকই কিন্তু ছবি সম্পর্কে ফিল্ম মেকিং ব্যাপারটা আমাকে ভাবায়। সেই জন্যই পড়াশুনো করি সময় পেলে। আর একটা কাজ আমি করি—অবশ্য সেটাকে কাজ নাও বলতে পারেন। বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে খুব আড্ডা দিই। ফলে হয় কি—বিভিন্ন মানুষ, তাদের চরিত্র আচার-আচরণ, নর্মসগুলো আমার জানা হয়। অভিনয় করার সময় এই অভিজ্ঞতা খুব কাজ দেয়।

ঃ তপন সিংহের রাজায় রাজার চরিত্রটা তো করছেন। কেমন লাগছে?

—এক কথায় দারুণ। তপনবাবুর সঙ্গে কাজ করার একটা আলাদা মজা আছে। কখনই বুঝতে পারি না আমি অভিনয় করছি। ইউনিটটাকে একটা ফ্যামিলির মত মনে হয়। তার ওপর রাজা চরিত্রটাও একটা প্রচণ্ড ডায়নামিক ক্যারেকটার। কি হবে জানি না—কাজ তো করছি নিজের সাধ্যমত।

ঃ 'গরীবি হঠাও' আন্দোলন কতখানি সফল বলে আপনি মনে করেন?

—'গরীবি হঠাও' কি আন্দোলন, না শ্লোগান? আমার তো মনে হয় শ্লোগান। তবে শ্লোগানটা খুব কড়া। কিন্তু কাজ কোথায়? শ্লোগান দিয়ে কি কাজ হয়? আমাদের দেশের আসল গরীবরা তো সব গ্রামে। কিন্তু গ্রামের অবস্থা দেখুন। সমস্যার আগ্নেয়গিরি সেগুলো। এ থেকেই প্রমাণ হয় এই শ্লোগান কি রকম সার্থক হচ্ছে।

—নির্মল [illegible]

দৃশ্যটা ছিল এইরকম। সিঁড়ির ওপর বসে আছেন ক'জন—ইলেকট্রিসিয়ান, ক্যামেরার কেয়ার টেকার, মেক-আপম্যান এট্‌সেটরা এট্‌সেটরা। মুখোমুখি ক্যামেরা-ম্যান শক্তি বাড়ুজ্যে এবং তাঁর দুই শিষ্য পান্ডু নাগ ও দিলীপ। কেউ তুড়ি বাজিয়ে হাই তুলছেন। কেউ তন্দ্রায় আচ্ছন্ন, মাথাটা ক্রমশ পায়ের দিকে এগিয়ে নিচ্ছেন। কেউবা মৃদু নাক ডাকাচ্ছেন। বেলা তখন বারোটা বাজে। এই দৃশ্য দেখার পর বলা যায়, তখন শুটিংএরও বারোটা বেজে গিয়েছে। সেটা স্পষ্ট বোঝা গেল বাড়ির দোতলায় উঠে। দেখি বিকাশ রায় টান টান হয়ে ঘুমোচ্ছেন। বিরাট হল ঘরের চারদিকে বাদ্যযন্ত্র ছড়ানো। দুদিকে দুটি সোফা। একদিকে ডিরেকটর জগন্নাথ চ্যাটার্জি ও মিউজিক ডিরেকটর সুধীন দাশগুপ্ত আলোচনায় রত। অন্যদিকে কয়েকজন যুবক। গল্প করছেন ফিশ ফিশ করে, অংগভঙ্গী করছেন, প্রচণ্ড স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করছেন।

পাশের ছোট্ট ঘরটিতে নায়িকা রাজশ্রী বসু এক দঙ্গল মেয়ের মধ্যে বসে। কথা বলছেন না, মুড অফ। মাঝে মাঝে ধামছেন, ঘাম মুছছেন। গরমটা চেপে পড়েছে, মেক-আপ-এ কাট বসছে। ভীষণ উদ্বিগ্ন করছিলেন। কিন্তু উপায় কি। নাচ হবে, গান হবে—বড় বেরসিক এই লোডশেডিংটা। এক কিশোরীর কম্পিত হাত থেকে জলের গ্লাস নিতে যেটুকু ছোঁয়াছুঁয়ি হয়, তাতে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, কলকাতা শহরকে এক বছরের জন্য আলোকিত করে রাখা যায়—অথচ কি যে হচ্ছে, সেই সকাল সাতটা কুড়ি মিনিটে গিয়েছে, এখনো পাত্তা নেই, মন্তব্য করতে করতে আক্ষেপ করলেন একজন। আমি কি আর করি, জগন্নাথবাবুর সঙ্গে দেখা করলুম। তখনও তিনি কথা বলে চলেছেন। এই সদাশয় লোকটি বহুদিন ধরে চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত। বয়স খুব বেশী নয় তবে তার চেয়ে অভিজ্ঞতা অনেক বেশী। তাঁর প্রথম স্বাধীন চলচ্চিত্র প্রয়াস 'দুরন্ত চড়াই'। উক্ত ছবিতে তিনি কলাকৌশলে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে-ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, স্বীকৃতি পান নি' শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়—নতুনরা এখানে নতুন কিছু করলে রেকগনিশন পাওয়া খুব শক্ত ব্যাপার, রেকগনিশন পাওয়ার জন্য অনেক লোকজন আছেন, তাঁরা এক্সপেরিমেন্ট করতে পারেন, করার অধিকার বোধকরি তাদেরই আছে।...

হঠাৎ আলো এসে গেল। হ্যাঁ, হঠাৎই একটা 'ইয়াহু' মার্কা গান বেজে উঠল।... মৃত্যু, মৃত্যু, মহামারী...মৃতদেহ সারি সারি...প্রচণ্ড পরিহাস...দুরন্ত ইতিহাস... ফুলের বন শূন্য আজ...সেভেনথ ফ্লিট, মিরাজ, মিগ, ন্যাপাম, অ্যাটম; হাই-ড্রোজেন।...ধড়মড় করে উঠে বসলেন বিকাশ রায়। টেকনিসিয়ান্সদের ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল। নায়িকা মেক-আপ-এ বসলেন। একেবারে সাজ সাজ রব। ক্যামেরা পজিশনে এসে গেল। দেখতে দেখতে শিল্পীরা স্ব স্ব পজিশনে। আবার সেই গান চালু হল। জানা গেল এই গানটি পিকচারাইজ করতে করতে একটি দৃশ্য সম্পূর্ণ হবে। বেশ ভাল কথা। গানে লিপ দিচ্ছেন কে? একজন অবাঙ্গালী দাড়িওয়ালা ছোকরা। ডিরেকটর রিহার্সাল চাইতেই সে একেবারে উদ্দাম নৃত্য শুরু করে দিল। নাচতে নাচতে গীটার বাজাতে বাজাতে পরিস্থিতি একেবারে তোলপাড় করে ছাড়ল। আসলে ও রিহার্সাল—ফান অ্যাণ্ড ফিয়েস্টা কার্নি-ভালের জন্য। নায়িকা তার বন্ধু, বান্ধবী-দের নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, এমন সময় বাপী মানে বাবার আগমন। আদুরে মেয়ে বাবাকে গান শোনাবার উদ্যোগ করে। বাপী গভীর আগ্রহে গান শুনতে বসেন! কারণ গান সম্পর্কে তার ভয়ানক দুর্বলতা আছে। স্ত্রী ভালো গান জানতেন। আজ বিচ্ছিন্ন, স্ত্রী কাছে নেই। তার গাওয়া গানের রেকর্ডটা আছে, সযত্নে রেখে দিয়েছেন। এই গান শুনে তিনি একেবারে অস্থির হয়ে উঠলেন। ফলে গান থামাতে হল। না না এমন গান তিনি শুনতে চান নি। মেয়ে ছুটে এলো। ভাবটা এমন, বাপী কি হয়েছে, বাপী কি হয়েছে তোমার।...

অতএব সেই রেকর্ডটি বার করা হল। প্লেয়ারে চাপানো হল। একটা মিষ্টি গান সমস্ত পরিবেশকে স্নিগ্ধ করে তুলল : তোমাতে আমাতে...আলোতে ছায়াতে...এই লুকোচুরির খেলা শেষ হবে কবে মিলন উৎসবে...দুজনে ভাসাব ভেলা...

গান তখনও শেষ হয় নি। একজন রিমার্ক করলে : টু টিমিড। আরেকজন : মরবিড। আরেকজন : টু ওল্ড ট্রিল। আরেকজন : আজকের মানুষের সময় নেই। চটপট আনন্দ দিতে হবে। অ্যাণ্ড সো হোয়াই আওয়ার সং ইজ হট। স্পীড, শুধু স্পীড চাই—এটা চাঁদে যাবার যুগ।

বাপী সবশেষে প্রশ্ন করলেন : ঠিক, মানুষ চাঁদে চলে গেছে, অনেক উঁচুতে উঠেছে। সবই ঠিক। কিন্তু কত গভীরে যেতে পেরেছে বলতে পার?

মহুয়া রায়চৌধুরী
আরতি ভট্টাচার্য
দেবরাজ রায়
ছবির নাম রাজা
পরিচালনা : তপন সিংহ

প্রশ্নের উত্তর আপাতত মুলতুবী থাক। জানবেন, এই ছবি 'শুভ সংবাদ' বেশ হয়েছে। সদ্যপাশ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। জুনিয়ার্স ওয়েলকাম। একজন আরেকজনকে দেখল। পরস্পরের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। একজন গোপা, শান্ত ধীর স্থির প্রকৃতির, ইন্ট্রোভার্ট এনসিয়েন্ট হিস্ট্রি নিয়ে পড়ছে। অন্যজন রূপা, অশান্ত অস্থির, একসট্রোভার্ট, ফিলসফি নিয়ে পড়ছে। তার কথা হচ্ছে—চেহারাটা ধার করেছেন করেছেন, আগ্যাস নামটা ধার করেন নি। গোপা, রূপার কথার তোড়ের সামনে দাঁড়াতে পারে না। গোপার অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করে রূপা মনে মনে খুব দুঃখিত হয়, ক্ষমা চায়। তারপর থেকে বন্ধুত্ব। ধীরে ধীরে জানাজানি হয়—একই জায়গায়, একইদিনে, একই সময় ওদের জন্ম। তাহলে? রূপা তার বাবার ছবি নিয়ে আসে, গোপা তার মা'র ছবি। নিস্তরঙ্গ কয়েকটি মুহূর্ত। ঠিক হল রূপা গোপা হবে, আর গোপা রূপা হবে, অর্থাৎ ক্যারেক্টার চেঞ্জ। গোল বাধে অতীন আর সংগতকে নিয়ে। জটিল ব্যাপার। জট খোলা যাচ্ছে না।

আরেকটু জানবেন গোপা এবং রূপা, দ্বৈতভূমিকায় রাজশ্রী। এখানে রূপা। বাপী অথবা বাবা : বিকাশ রায়। মা : শিপ্রা মিত্র। অতীন এবং সংগত যথাক্রমে : দীপঙ্কর দে এবং নবাগত নির্মাল্য সেনগুপ্ত। কাহিনী ও চিত্রনাট্য : সুবীর হাজরা। 'ইয়াহু' ধরনের গানটাও লিখেছেন শ্রীহাজরা, গেয়েছেন অমিতকুমার। রেকর্ড'এর গানটা গেয়েছেন সুজাতা মুখোপাধ্যায়। প্রযোজনা : প্রণবকুমার বসু। পরিবেশনা : জে কে ফিল্মস।

নিউ থিয়েটার্স দুনম্বর স্টুডিওর ফ্লোরে ঢুকতেই আরতি ভট্টাচার্য সাদর সম্ভাষণ জানালেন, আসুন, এই হচ্ছে আমার ঘর। মানে রমলার ঘর। রমলা, রাজাকে ডেকে পাঠিয়েছে, সে এলো বলে। ঘরে এখন বসে আছে জয়া। না, জয়া ম্লানভাবে বসে থাকবে না। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেবে রাজা ঘরে এসে ঢুকলে, ঠিক এরকম এরকম পজিশনে দাঁড়াতে হবে ক্যামেরা থাকবে এখানে, বিস্তারিত বুঝিয়ে দিলেন স্বনামধন্য পরিচালক তপন সিংহ। আলোকচিত্রশিল্পী সেইমত আলো করতে, প্রধান সহকারী পরিচালক বলাই সেন সেইমত রিহার্স করতে ব্যস্ত হলেন। রাজা ঘরে ঢুকে দাঁড়াল। সে কিছু বলতে চাইল, বাধাপ্রাপ্ত হল রমলার কাছে। রমলা দিলেন মহিলা। তার জ্বলন্ত চোখ দুটির সামনে এই মুহূর্তে দাঁড়াবে কার এমন সাধ্য। জয়াকে কোথাও চালান দিতে হবে, সেজন্য রমলা রাজার হাতে কুড়িটা টাকা দিল। রাজা অনিচ্ছাসত্ত্বে সেটা গ্রহণ করল।

বিকাশ রায় / রাজশ্রী বসু
শুভ সংবাদ
পরিচালনা : জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়

জয়ার সরল চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল। জয়াকে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করল। কিন্তু সে কি পৌঁছে দিতে পারল? শেষ পর্যন্ত পারল না। বিদ্রোহী হল। প্রতিবাদ করল সে এই ঘরে দাঁড়িয়ে। রমলা তখন ভেঙে পড়েছে। তবুও তার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ—কেন পারবে না? তাকেও তো একদিন এভাবে যেতে হয়েছিল। নিজেকে বিকিয়ে যেতে হয়েছিল।......

এই অতীত রমলার চরিত্রটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। রমলা, বেশ্যাবাড়ির তথাকথিত মাসী নয়, যদিও তার কাজকর্ম প্রায় একই। কিন্তু চরিত্রের চারপাশে পরিবেশ, গভীরতা, জীবনদর্শন—সব মিলিয়ে মনে দাগ কাটে, তার জন্য সহানুভূতি জাগে, জীবনের ভিন্নমুখী সমস্যার আয়নায় প্রতিফলন দেখার অবকাশ থাকে। প্রতি মুহূর্তে এই চরিত্রটিকে, অনেক কিছু বলা না বলার মধ্য দিয়ে, স্পষ্ট করে তুলছেন শক্তিশালী অভিনেত্রী আরতি ভট্টাচার্য। এই পর্যায়ে পাশাপাশি অভিনয় করলেন রাজার ভূমিকায় দেবরাজ রায়, জয়া : মহুয়া রায়চৌধুরী এবং একটি বিশেষ চরিত্রে সমিত ভঞ্জ।

তপন সিংহের এ-ছবি 'রাজা' শুধু ছবি নয়—চিত্রে-বৈচিত্র্যে, শব্দে স্তব্ধতায় অন্তরঙ্গে-বহিরঙ্গে সমস্যা সঙ্কুল সমসাময়িক জীবন; বিশেষভাবে যুবকদের কথা। তাঁর বলার আধুনিক ভঙ্গীটি অত্যন্ত শিল্পসচেতন এবং শিল্পনিষ্ঠ, তাঁর এই স্টাইল অফ ট্রিটমেন্ট লাইন ধরতে হবে দর্শকদের; অন্ধকারে বসে যাঁরা প্রক্ষেপিত আলোর দিকে চোখ রাখেন। কারণ বৈশিষ্ট্যে এ-ছবি দর্শকদের চেতনার ধমনীপ্রবাহে ঝড় তুলবে, এই ঝড় আজকের জীবনের টানাপোড়েনের মনন আর মানসিকতায় অনিবার্য।

—স্টুডিও সংবাদদাতা

রবি/চিন্ময়

সাধু যুধিষ্ঠিরের কড়চা

যুধিষ্ঠির ও সাধুচরণ; দুই ছিঁচকে চোর হলেও
দুজনেই অনেকদিনের পুরোনো বন্ধু। ছিঁচকে চোরেরা
করে দিন কাটায় ওরাও তাই করে, অর্থাৎ ঘটি বাটি হাতে
কাছে যে আসবাবপত্রই ওদের চোখে পড়ে ওরা সেগুলি
লোপাট করে দেয়। তারপর ধরা পড়ে, বেশ কিছুদিন জেলে
কাটিয়ে আবার ছাড়া পায়। কিন্তু চুরির নেশা এমনই
আবার চুরি করার দায়ে জেলে যায়। এবং আবার ছাড়া
পায়। হাজার চেষ্টা করেও নিজেদের সংশোধন
করতে পারে না।

একবার জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ওরা দুজনে এক ধনী
ব্যবসায়ী (মিস্টার ব্যানার্জীর) বাড়ীতে এসে উপস্থিত
হয়। যুধিষ্ঠির ও সাধু ও'রা দুজনে বাড়ীতে ঢুকে
বুঝতে পারলো যে একদল মহাচোর. একই উদ্দেশ্যে সে
বাড়ীতে এসেছে। ওরা নিজেদের অস্তিত্ব গোপন করে
ডাকাতদলের সর্দারের কাছ থেকে জানতে পারলো যে ও'
মিস্টার ব্যানার্জীর একমাত্র ছেলে ববিকে অপহরণ করে নি
এসেছে। বাড়ীতেও চাকর দারোয়ান ছাড়া বিশেষ কেউ
নেই। যারা আছে সব ঘুমিয়ে পড়েছে। ছিঁচকে চোর দু
বন্ধু প্রথম দিকে মূল্যবান জিনিস চুরি করবার চে
করে ব্যর্থ হল। তারপর ঘরে ঘরে ঘরে সাজানো বিলা
মদের সদ্ব্যবহার করলো। এই সময় আচমকা আর এক
"মহাচোরের" আগমন ঘটল। তাই দেখে সন্ত্রস্ত হ
আত্মগোপন করলো ওরা। ডাকাতরা ববিকে ক্লোরো
ফরমের সহায্যে অজ্ঞান করে, ড্রয়িংরুমে এসে বিলাতি
মদের সদ্ব্যবহার করবার কাজে নিজেদের আত্মনিয়ো
করলো।

এদিকে বাড়ীর কর্তা ব্যানার্জীর জন্যে

বাইরে ছিল। আর তাঁর স্ত্রী একটা পার্টিতে যাবার জন্যে রওনা হয়েছেন। এই সুযোগ হেলায় হারাতে রাজী নয় ছিঁচকে চোর দুজন। আর মহাচোরের দল বাবুকে অপহরণ করে, বিদেশী অসামাজিক ব্যক্তিদের অনুকরণে 'মিলিয়ান ডলার' অথবা লক্ষাধিক টাকা পাবার স্বপ্নে বিভোর। সুযোগে পেয়ে দুজন ছিঁচকে চোর বাবিকে নিয়ে পালিয়ে গেল। গেল ওরা যুধিষ্ঠিরের মাসতুতো বোনের বাড়ীতে। অবশ্য ওর বোন রাণী চোর বা জোচ্চোর অথবা ছিঁচকে চোররূপী যুধিষ্ঠিরকে কোনদিনই ভালো চোখে দেখত না। কিন্তু বাবির মতো এক ফুটফুটে ছেলেকে দেখেই বোধহয় এবার আর যুধিষ্ঠিরের দৌরাত্ম্য সহ্য করে নিল। মহাচোরের দল মিস্টার ব্যানার্জীর মিথ্যে কথা বলে এক লক্ষ টাকা পাবার আশায় টেলিফোন করে চললো দিনের পর দিন, কিন্তু হাজার চেষ্টা করে বাবিকে খুঁজে বের করতে পারলো না। ফলে লক্ষ টাকার স্বপ্ন 'আকাশ কুসুমে' পরিণত হোল। ছিঁচকে চোর দুজনও মিস্টার ব্যানার্জীকে খবর দিলো ৫০ হাজারে ওরা বাবিকে ফিরিয়ে দিতে রাজী। ৫০ হাজার টাকা নেবার জন্যেই বাবিকে নিয়ে ওরা ময়দানে "প্যাটন ট্যাঙ্কে'র কাছে উপস্থিত হোল, ওখানেই ওদের গ্রেপ্তার করা হোল এবং পথিমধ্যে রাণীর কাছ থেকে বাবিকে জোর করে অপহরণ করে নেবার সময় দলসমেত মহাচোরের দল পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হোল। বাবির স্নেহ ও ভালবাসার জন্যেই দুই ছিঁচকে চোর ছাড়া পেল এবং রাণীও বাবির 'দাসী' হিসাবে পরিচিত হোল।

শিশু অপহরণ বিষয়ক কাহিনীর মধ্যে একটি জাপানী ও বৃটিশ ছবির ছায়া এসে পড়লেও, চিত্রনাট্যকার ও অন্যতম পরিচালক উমানাথ ভট্টাচার্যের চিত্রনাট্য ও সংলাপ সকলেরই প্রশংসা পাবে। পরিচালক 'একলব্য' একটি সুন্দর হাসির ছবি উপহার দেবার জন্যে সকলের সাধুবাদ পাবেন। ছবিতে গানের প্রয়োজন খুব একটা ছিল না। আবহসঙ্গীত রচনায় অজয় দাসের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। অভিনয়ে মাতিয়েছেন—জয়া ভাদুড়ী (রাণী), যুধিষ্ঠিররূপী রবি ঘোষ, চিন্ময় রায় (সাধুচরণ); মিস্টার ব্যানার্জীরূপী উৎপল দত্ত, মহাচোরের সর্দাররূপী শেখর চট্টোপাধ্যায় এবং বাবিরূপী সুমন ঘোষ এবং অন্যান্য ভূমিকায় তপেন চট্টোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা, ভেলো দত্ত প্রভৃতি।

জয়া ভাদুড়ী

নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওতে ...সী রাজারে ... শুটিং চলছে। ...রাণীর নির্মাণ কলা হয়েছে জোর জুড়ে। অর্থাৎ ... শিল্পনির্দেশক ... প্রথম ... ছিলেন ... ও ... রাজা রাণীর ভূমিকায়। রোমান্টিক দৃশ্য করা হয়। ... ছিল কখনো কখনও ... কখনও বা স্ট্যান্ডে। ...হণ করেন কুশলী আলোকচিত্রী বিজয় ঘোষ। স্বরচিত চিত্রনাট্যে ...নি পরিচালনা করছেন পীযূষ বসু। ...ন্য করছেন : অসীম সরকার।

...ত্রলিপি ফিল্মসের 'যে যেখানে ...য়' ছবির শুটিং শেষ করতে ...ী গোষ্ঠী সদলবলে আবার গোমিয়া অভিমুখে রওনা হয়েছেন। রমাপদ চৌধুরীর কাহিনী অবলম্বনে স্বরচিত চিত্রনাট্যে ছবিখানি পরিচালনা করছেন অগ্রগামী। প্রধান কয়েকটি ভূমিকার শিল্পী : কাবেরী বসু, দীপঙ্কর দে, ... চক্রবর্তী, এন বিশ্বনাথন, ... রায়চৌধুরী এবং নবাগত ভাস্কর সেন। চিত্রগ্রাহক : বিশু চক্রবর্তী। সঙ্গীত-পরিচালক : ওস্তাদ বাহাদুর খান।

প্রবীণ কুশলী মঙ্গল চক্রবর্তীর পরিচালনায় নির্মীয়মান 'আমি সে ও সখা'র ভূমিকালিপিতে আরেকটি নাম যুক্ত হল, আরতি ভট্টাচার্য। তিনি এ ছবির বিশেষ একটি নারী চরিত্র রূপায়িত করবেন। প্রধান তিনটি চরিত্রের শিল্পী : কাবেরী বসু, অনিল চট্টোপাধ্যায় এবং উত্তমকুমার। অন্যান্য চরিত্রে আছেন : বাসবী নন্দী, ... চৌধুরী, ...কুমার গীতা দে প্রভৃতি। শ্যামল মিত্র ও দীপেন ... প্রযোজিত এ ছবির শুটিং ... ...থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওতে ... গান রেকর্ড করা ... বাহুল্য, এ ছবির সঙ্গীত পরিচালক শ্যামল মিত্র, একটি গানও তিনি গেয়েছেন। অপরটি গেয়েছেন হৈমন্তী শুক্লা।

নবীন প্রোডাকসন্সের 'তিন পরী ছয় প্রেমিক' ছবিতে ... চৌধুরীর স্থানে এলেন দিলীপ রায়। শ্রীরায় এখানে এক প্রেমিক ... বিপরীতে পরী ... এদের নিয়ে সম্প্রতি ... একটি কক্ষে শুটিং ... দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—স্টুডিও সংবাদদাতা

...ন্দর 'পা' এর জন্য নায়িকার বদল ...নেছেন কখনো? শুনুন তাহলে, সায়রা বানুকে একদা মনোজকুমার ...বিতে কাস্ট করেছিলেন প্রধানত এই ...। মনোজকুমারের প্রবল ইচ্ছা ছিল ...কে নেবার। সবই পছন্দ হল। ...লে না 'পা'। ফলে শর্মিলা বাতিল। ...মার কেন, বম্বের তাবড় তাবড় ...দের মতে সায়রার সৌন্দর্যের ...য় না। যাকে বলে সর্বাঙ্গসুন্দর। ফিগার, তেমনি ফেস। প্রসঙ্গত বলেন : এইসবেই আমার সর্বনাশ এতদিন ধরে দেখছি প্রায় সব ...কই আমার রূপের প্রতি বেশী ...। রূপ নানাভাবে এক্সপ্লয়েট ...ন। সেজন্যই আমার অভিনয়...ে আজো এক্সপ্লয়েট করা হয়নি। ...ন আমি ভয়ানক সচেতন। ভাল ...পেলে সাইন করি না। বেশ ছবিতে কাজ করছি। তার মধ্যে ...গা বি আর চোপরার 'জমির' ...নীল দত্তর 'নেহলে পে দহেলে'। ...। দুটি চরিত্র পেয়েছি। এছাড়া মুখার্জির 'চৈতালী' ছবির বেশ ভাল। অভিনয় করে আনন্দ

* *

...কদিন পর জয় মুখার্জি আবার ...াইটে এসেছেন। ইতিমধ্যে তাঁকে নায়ক, প্রযোজক এবং পরিচালক...খেছি। নায়করূপে খানিকটা সফল ...ন কিন্তু প্রযোজক-পরিচালক ...ফল। ছবির নাম 'হমসায়া'। ...বেশ কিছুদিন বিরতি কেন, এই ...উত্তরে জয় বলেন 'এতদিন আমি ধার দেনা শোধ করেছি। এমন অবস্থা হয়েছিল, ঘটি বাটি বিক্রী করার উপক্রম। হঠাৎ ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল। আমি পরিচালক হিসেবে ছবি করলাম 'লাভ ইন বম্বে'। আরেকটা ছবি করছি, 'ছলিয়াবাবু' —রাজেশ খান্না-জিনত আমনকে নিয়ে। এই ছবি দুখানার পর নির্ভর করছে ভবিষ্যৎ। যে কোন একটা ছবি লেগে গেলে আমি ছবির জগতে রয়ে গেলাম, নচেৎ শীঘ্রম শীঘ্রম বিদায় গ্রহণম, কি বুঝলেন?' আমি আর কি বলব বললাম এই যে, আমি কিছু বুঝি আর না বুঝি আপনি সব বুঝেছেন।

* * *

বম্বের ছবির জগতে, নায়িকাদের মধ্যে বিয়ের ধুম পড়ে গিয়েছে। মুমু আর সিমির পর লাইনে আছেন ওয়াহিদা এবং 'গরম হাওয়া' ছবির নায়িকা গীতা। অনেক জল ঘোলা হওয়ার পর স্থির হয়েছে ওয়াহিদা বিয়ে করবেন কমলজিতের সঙ্গে। স্মরণ থাকতে পারে এই কমলজিত মেহবুব খানের 'সন অফ ইন্ডিয়া' ছবিতে সিমির বিপরীতে কাজ করেছিলেন। ছবির বিয়ে নয়, সত্যিকারের বিয়ে—হবে আগস্ট মাসের যে কোন দিন। গীতা বিয়ে করবেন টি ভি প্রোগ্রাম অ্যানাউন্সার সিদ্ধার্থ কককে। বিয়ে হবে আগামী সাতই আগস্ট।

* *

যোগিতা বালীর সঙ্গে কিরণকুমারের নামটা ইদানীং আর তেমনভাবে জড়াচ্ছে না। মান অভিমানের পালা চলছে কিনা কে জানে। ওদের একসঙ্গে সিনেমা হলে দেখা যাচ্ছে না, পার্টিতে দেখা যাচ্ছে না। এমনকি শুটিং করতেও দেখা যাচ্ছে না। যোগিতার ঘনিষ্ঠ বান্ধবীরা বলে কাজ ফুরিয়েছে চলে গেছে। ও আসলে যোগিতার সঙ্গে নিজের নামটা জুড়ে দিয়ে গসিপ কলামে খুব পাবলিসিটি পেয়েছিল। সেটা পেয়েছিল যোগিতার সহযোগিতাতেই। আজ সব ভুলে গেছে, নমকহারাম। কিরণের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা বলে, ফিল্মের মেয়েদের সঙ্গে কেউ প্রেম করে নাকি। হীরের টুকরো ছেলে আমাদের কিরণ। দিল দিয়ে দর্দ নিয়েছে। দায়দাস হয়ে বেচারা সবকিছু ভুলে থাকার চেষ্টা করছে।

* * *

কয়েকদিন আগে একটা ছবির আউটডোর শুটিং-এর সময় বিনোদ খান্না এবং নীতু সিং এর সম্পর্কটা বেশ নিবিড় হয়। অবশ্য নীতুর বয়ফ্রেন্ডেরই একটু গায়ে পড়া স্বভাব। এজন্য একবার দুই ভাইয়ে হাতাহাতি হয় হয়। রণধীর কাপুর আর ঋষি কাপুর আরেকটু হলে লড়ে গিয়েছিল। রণধীর ঋষিকে সন্দেহ করেছিল, ঋষি রণধীরকে। আসলে দোষটা ছিল নীতুরই। এক্ষেত্রে মেয়েদা ব্যাপারটা কি হচ্ছে সেটা সঠিক কেউ বলতে পারে না। নীতু বলে—'কি আবার হবে ওকে আমার ভাল লাগে তাই ওর সঙ্গে শুটিং শেষ হলে বেড়াতে যাই। মনের কত কথা বলি...।' বিনোদ বলে : 'ওসব কিসসু নয়। মেয়েটা অসম্ভব ছটফটে চ্যাংড়া। ইয়ার্কিতামাশা। আমাকে ... করে। কাকু বলে ডাকে।' প্রজাপতি-কাকু নয়তো!

—অভিজিত

বায়োস্কোপিক

মাইকেল সেভেনবার্গ আর রোজী জোন্স-র সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ রাজকাপুরের শীততাপনিয়ন্ত্রিত আর কে স্টুডিওতে। সেদিন ওখানে একটা বিগ বাজেটের রঙিন হিন্দী ছবির শুটিং চলছিল। ফ্লোরে একদল হিপি ছেলেমেয়ে, অদ্ভুতধরনের পোষাক পরে নানা ঢং করছিল। প্রোডাকশনকে জিগ্যেস করতে সে বললে, আজ ফাংশনের পার্টির শট নেয়া হচ্ছে ছবির ছিলো যেহেতু বিলেতফেরতা, তাই এইরকম বিদেশী ছেলেমেয়েদের সেটে রিকুইজিশান দেওয়া হয়েছে। নাচ হচ্ছে নাচ।

লাঞ্চ ব্রেকের পর ফ্লোরের বাইরে হঠাৎ দেখি দুটি ছেলেমেয়েকে কেন্দ্র করে হিপিদের একটা ভিড় জমেছে। এক্সট্রা সাপ্লায়ার ইয়াকুব গলদঘর্ম হাত-পা নেড়ে ওদের কি-যেন বোঝাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু হিপিরা বুঝতে চাইছে না। ইয়াকুব আমায় দেখে বললে, দেখুন সাহাব, এই লোকেরা কি খতরনাক আদমী. পুরো অ্যাডভ্যান্স খেয়েছে, ফের বলছে এখুনি চলে যাবে. প্যাক আপ হওয়া পর্যন্ত থাকবে না। বলুন তো, পার্টি আমায় ছেড়ে কথা কইবে, মেরে আমার চামড়া গুটিয়ে দেবে—

মাইকেল সেভেনবার্গ বলল, আলবৎ দেবে। তুমি আমাদের ধোঁকা দিচ্ছ. আমরা বলেছিলাম আট ঘণ্টা শিফটের জন্যে পাঁচ ডলার দিতে হবে, এখন শুনেছি আড়াই ডলার, অতএব আমরা নেই ভাই। চার ঘণ্টা হয়ে গেছে, এখন আমরা চলে যাব—

ইয়াকুব লাফালো—ই-ই-ইঃ, যাও দেখি তোমার কত বড় ক্ষমতা;

মাইকেল মৃদু হেসে বললে—তুমি আটকাও দেখি—, চলে এসো রোজী—

ওরা চলে যাচ্ছে দেখে ইয়াকুব হতভম্ব, ব্যাকুবের মত এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে হঠাৎ ঊর্ধ্বশ্বাসে ওদের পেছনে ছুটল—এই সাহেব, সাহেব—আরে সত্যি সত্যিই চলে যাচ্ছ নাকি? আমি কিন্তু ভীষণ হ্যাঙ্গামায় পড়ে যাব। তোমরা কন্টিনিউটী আর্টিস্ট, প্রত্যেক শটে তোমাদের দরকার, এঃ—

মাইকেল বললে—পাঁচ দেবে তো-?

ইয়াকুব তখন মরিয়া—দেব দেব, নিশ্চয় দেব, কসম।

মাইকেল বলল, তোমাকে বিশ্বাস নেই নগদ নগদ দিলে থাকব নইলে চলে যাব।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে ইয়াকুব ভেতরের পকেট থেকে এক তাড়া নোট বের করে তা থেকে গুনে গুনে কিছু টাকা মাইকেলের হাতে দিল। মাইকেল সঙ্গে সঙ্গে বলল —ব্যাঃ, কম দিলে কেন-?

—কোথায় কম?

—নিশ্চয় কম, ডলার বাজারে বিক্রি করলে কত পাওয়া যায় জানো না বুঝি? ন্যাকামো করবে না—

ইয়াকুবের সে কথা শুনে কি প্রচণ্ড ক্রোধ। দাঁতে দাঁত পিষে বলল—কসম, আর যদি কোনদিন তোদের কাজ দিই—মস্তসব— বলে আরও কিছু নোট ওর হাতে গুঁজে দিতে তবে ব্যাপারটার ফয়শালা হলো। মাইকেল আর রোজী হাসিমুখে ফ্লোরে গেল।

ইয়াকুব ফোঁস করে এক নিঃশ্বাস ফেলে বললে—দেখলেন তো সাহাব, কি রকম তেএঁটে মাল এক-একটা, হিপিদের মত গোলমেলে মানুষ দুনিয়ায় খুঁজে পাবেন না...

এরপর একদিন চার্চগেট স্টেশনে ওদের সঙ্গে দেখা। ওরা দল বেঁধে কোথায় যেন যাচ্ছে। মাইকেল আর রোজী ওদের ঝোলা খুলে কি-যেন করছে।

আমি হেসে বললাম—কি, কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

ওরা বলল—দেশলাই আছে তোমার কাছে?

দিলাম। ও হরি, ওরা গাঁজার কল্কে ধরাল। সঙ্গে একটা ডুগডুগি। সেই ডুগডুগি বাজিয়ে ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে মাইকেল বলল, দাঁড়াও এটু মন্তর পড়ি—ব্যোম শঙ্কর, কাটা হরেণ টঙ্কর, মিসকো খানা উলকো পিনা—হরহরহর মহাদেও—তারপর কষে টান, সাবাশ, কল্কের ডক ডক আগুন ছুটে একাকার দেখে আমার তো চক্ষুস্থির। অরে করে কি ব্যাটারা তারপর গরম কল্কেটা রোজীর পেলব হাতে তুলে দিয়ে পাক্কা দেড়-দু মিনিট দম আটকে পড়ে রইল মাইকেল। আর রোজীরও সমান ক্ষমতা; হ্যাঃ, কল্কে ফাটাবার ক্ষমতা রাখে যেন মেয়েটা। অনেকক্ষণ পর ধোঁয়া ছেড়ে মাইকেল বলল—মন্তরটা ঠিক ঠিক বলা হয়েছে তো?

বললাম—প্রায়।...ইয়ে, তা এখন চলেছ কোথায় তোমরা?

রোজী বলল—আমরা আজ নেপাল যাত্রা করছি। ওখান থেকে আরও কয়েকটা জায়গায় যাব। কিন্তু তুমি কে হে?

বললাম—আমি বায়োস্কোপের লোক—

রোজী বলল—সরি, আমরা আর তোমাদের বায়োস্কোপে কাজ করব না। আমাদের যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।

বললাম—না না, আমি তোমাদের ফিল্মের কাজ দিতে আসি নি। সেদিন আর. কে. স্টুডিওতে দেখেছিলাম বলেই আজ কথা বলছি। কেন, রাগ করছ নাকি?

মাইকেল তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী করল—না না, সে রকম কিছু নয়।

আমি সরে পড়লাম।

তখন ভারতে রাশি রাশি হিপি ছেলেমেয়ে আসছে। বোম্বের রাস্তায় প্রচুর চোখে পড়ছে। ছেলে-মেয়ে অবশ্য চেনবার উপায় নেই এমনই বিচিত্র সব বেশভূষা তাদের। এল এস ডি মারিজুয়ানা ভাঙ, সিদ্ধি—এসব নিয়েই মেতে আছে ওরা। দেখে বড় কৌতূহল হত—কোত্থেকে এসেছে, কিইবা ওদের উদ্দেশ্য-আদর্শ, কি-ভাবে দিন চলে, প্রশ্ন করলে সদুত্তর পাওয়া যেত না।

এমন সময় হঠাৎ একটা যোগাযোগ হয়ে গেল। আইভরি মার্চেন্ট প্রোডাকশন ভারতে একটা ছবি করছিলেন—'দি গুরু', জেমস আইভরি সে ছবির পরিচালক, ইসমাইল মার্চেন্ট প্রযোজক—টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্সের ব্যানারে তোলা হচ্ছিল ছবিটি। ওঁরা এদেশে কি ভাবে ছবিটি তোলা হচ্ছে—তার ওপরই একটি শর্ট ফিল্ম করতে মনস্থ করলেন। ইমেজ ইন্ডিয়ার শান্তিপ্রসাদ চৌধুরীর সঙ্গে তখন আমার যোগাযোগ ছিল, ওঁরা আমাকেই সাজেস্ট করলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা টিম তৈরী হল। বোম্বের প্রেম বাপ্তিস্তা, মাদ্রাজের মণীন্দ্র রাও আর কলকাতার আমি। একটা বড়লোকের টি ভি ইউনিট। বাপ্তিস্তা আমায় বোম্বেতে ব্যাপারটা ব্রিফিং করলেন, 'দি গুরু'র

পর ছবি করা ছাড়া বিদেশী টেলিভি-
[নে]র জন্যে একটা স্বতন্ত্র ছবি আমাদের
[ক]রতে হবে—ভারতে এই যে রাশি রাশি
[হি]পি আসছে—তার সঠিক কারণ খুঁজে
[বা]র করতে হবে। আমি বললাম, তাহলে
[আ]মাকে হিপিদের নিয়ে যে ছবি হবে
[তা]র দায়িত্বই বরং দেওয়া হোক।

তথাস্তু।

আমাদের প্রথম লোকেশান—বেনারস।
[খ]বর পাওয়া গেল, বাবা বিশ্বনাথের চরণে
[ঠা]ই নেবার জন্যে হাজার হাজার হিপি
[আ]র হিপিনী নাকি ওখানে জড়ো হয়েছে।

বেনারসের এয়ারপোর্টে নামতেই
[ব্য]াপারটা কিঞ্চিৎ মালুম পাওয়া গেল।
[হো]টেল থেকে গাড়ী এসেছিল। ড্রাইভার
[ছে]লেটি খুব চৌকস। বললে হ্যাঁ বাবুজী
[ব]হুৎ গোরা সন্ন্যাসী আব্ ইধর মে হ্যায়।
[স]মঝমে নেহি আতা ক্যা মতলব—

সহকারী ক্যামেরাম্যান জাম্বলে বললে
—মতলব সোজা। নেশা-ভাঙ করার এমন
[স্ব]র্গ তো ত্রিভুবনে আর কোথাও নেই, তাই
[এ]সেছে—

সন্ধ্যেবেলায় চার্লস গ্রেগরী নামে
[এ]কটি হিপির সঙ্গে দেখা হল। ও বললে,
[আ]মরা এখানে এসেছি মুক্তির সন্ধানে।
[আ]মরা মুক্তি চাই। আত্মার মুক্তি...

—ব্যস ?

—কেন, এটাই কি যথেষ্ট নয় ? আরে,
[ও]কি, ওকি হচ্ছে ? চার্লস হাঁ-হাঁ করে
[উ]ঠল, তোমরা ছবি তুলছ নাকি ?

জাম্বলে একগাল হেসে বললে—
[স]বলক্ষণ।

চার্লস বলল—না না, ছবি-টবি আমি
পছন্দ করি না। আলোচনা হচ্ছে আলো-
[চ]না হোক, তার মধ্যে হুট করে আবার
ছবি-টবি কেন ?

আমরা বুঝিয়ে বললাম—তোমাদের
এই যে মহৎ উদ্দেশ্য, এটা যাতে সবাই
তাড়াতাড়ি বোঝে, সেইজন্যেই এই
ব্যবস্থা। আপত্তি করার কি আছে ?

চার্লস সখেদে বললে—বাঙালীকে হাই-
কোর্ট দেখাচ্ছ ? আমি বাবা সব বুঝি।
তোমরা টু-পাইস কামাবার জন্যে এটা
করছ। না বাবা, আমি ওর মধ্যে নেই—

জাম্বলে বললে—তুমি ভাল 'লিয়াজ'
করতে পারছ না, তুমি সর, আমি এক্ষুনি
ওকে কাৎ করে ফেলছি।

বলে জাম্বলে বলল—চার্লস সাহেব
গুপী যন্তর বোঝ ?

—হোয়াট গুপী যন্তর ?

—কল্কে ? বলে হাতের মুদ্রা করে
দেখাল। আর হাসি যেন ধরে না। চার্লসের
মুখে—নিশ্চয় জানি, ইউ মিন গাঁজা ?

—হ্যাঁ গাঁজা! জাম্বলে বললে—
তোমার পারফরমেন্সটা একবার দেখতে
চাই আমরা। দেখাবে ?

চার্লস সহাস্যে তার থলে থেকে
কল্কে বের করে তৎক্ষণাৎ মশলা পুরে
ফেলল। তারপর বললে—এইবার অগ্নি-
সংযোগ—

জাম্বলে মহা উৎসাহে দেশলাই
জ্বালিয়ে দিল কল্কেয়.. আমাদের ক্যামেরা
ততক্ষণে চালু হয়ে গেছে—জাস্ট দিস ইজ
দি ওয়ে ওয়ান হ্যাজ টু স্মোক, কিছু
ক্ষণের মধ্যেই তুমি ভারশূন্য একটা মার্গে
যদি না ওঠো তো কি বলেছি।

পুণ্যস্রোতা গঙ্গার ঘাটে তখন সবে
সন্ধ্যে নামছে। হিপি আর হিপিনীরা
টাউন ভ্রমণ শেষ করে একে একে ফিরছে।
আমেরিকান, ইতালীয়ান, জার্মান ফ্রেঞ্চ
কানাডিয়ান বৃটিশ স্ক্যান্ডানেভিয়ান।

জাম্বলের ঠিকই নজর আছে। ব্যাটারী
সান-গান লাইট ওদের দিকে পয়েন্ট করা
আছে, আমাদের সিগন্যাল পাওয়া মাত্রই
জ্বেলে দেবে, আর ওরা কেউ আপত্তি
জানাবার আগেই দু'-তিনশো ফুট এক্স-
পোজ করে নেবে ক্যামেরাম্যান মণীন্দ্র
রাও। আমরা গোটা পরিকল্পনাটাই
এভাবে করে রেখেছিলাম। হঠাৎ জাম্বলের
আর্তনাদে আমরা ওদের দিকে চোখ
ফিরিয়েই থ'। আরে রামচন্দ্র, একেবারে
বিবস্ত্র হয়ে ওরা ঝুপ ঝুপ করে নেমে
পড়ছে গঙ্গার জলে।

চার্লসের শট নিয়ে নেওয়া হয়েছে
ততক্ষণে। চেঁচিয়ে ডাকল—ব্রো, এদিকে
এসো মিট আওয়ার ইন্ডিয়ান ফ্রেন্ডস—

ব্রো তখন জলে।

চার্লস বললে—ব্রো কানাডিয়ান, ইন্সি-
ডেন্টালী শি ইজ মাই হাজব্যান্ড—

'শি' কথায় চমক লাগল জাম্বলের।—
সেকি, ব্রো ছেলে, না মেয়ে ?

—মেয়ে।

—তোমার হাজব্যান্ড কি করে হল ?
মেয়ে তো ?

চার্লস বললে—ওই হচ্ছে ব্যাপার।
ওটাই আমাদের হিপিইজম বলতে পার।
পুরুষরাই চিরকাল স্বামী হবে ? কেন ?
মেয়েরাও তো হতে পারে। ব্রো, কাম অন,
একটু আলাপ কর এদের সঙ্গে—

জাম্বলে লাফিয়ে উঠে বললে, সর্বনাশ,
ও যে ন্যাংটো এখানে আসবে নাকি ?

—আলবৎ আসবে। আসতে পারলেই
আসবে। তোমাদের এখানকার পুলিশরা
বড্ড গোঁড়া, নইলে এইরকম একটা
ট্রপিক্যাল কান্ট্রি, গরমের দেশ, এখানে
গুচ্ছের জামা কাপড় পরে সঙ সেজে
বেড়াবার কোন অর্থ হয় না—

—চার্লস, তোমার গার্ল-ফ্রেন্ডের শট
নেব আমরা ?

—ও যদি চায় নিশ্চয় নেবে। ওকে তোমরা কিছু অফার কর। ড্যাড, সিম্পি অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ—

জাম্বালে বলল—নিশ্চয় নিশ্চয়।

মণীন্দ্র রাও খাটো গলায় প্রশ্ন করল—সব ঠিক আছে, লেকিন পেমেন্ট ?

বললাম, চলবে তো বাই ওদের দেশের টেলিভিশনে। ওদের আবার শুদব নেই। বিকিনি পরে এখানে সেখানে ন্যাংটো হয়ে জলে কেলি করছে, আইডিয়ালি ইন্ডিয়ান ফিলিং টি কেন। আমাদের কর্তার খাঁই চড়েছে—শট তো দেখে শুনি, এবার বাথ-ক্লেপ্যাচে নিয়েছি আরেও দেখবে গঙ্গায় জলে নাইছে।

মেয়েদের বয়স ধরে কার সাধ্য। তবে বিলেতি মেয়েদের শরীরের যৌবন দীর্ঘস্থায়ী হয় এটা ইন্ডিয়ানদের আমরা জানি। যো নামক মেয়েটি যে কথে জল থেকে উঠে আসতেই মণীন্দ্র রাওয়ের কান লাল। বললে, বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে, চার্লস এনাফ অফ ইট, প্লীজ এবার ওকে কাপড়চোপড় পরতে বল।

ওধারে কিছু লোক স্নান করছিল। এই দৃশ্য চোখে দেখে তারা তাজ্জব। মুহূর্তে ভিড় জমে গেল আঘাটায়। বাইস্কোপ কা শুটিং চল রহা হ্যায়, বড়ি আনন্দ কি বাৎ, ভাই.. বোম্বেসে কোন আয়া ?

জাম্বলের কি বিরক্তি। —কেউ আর্সোন বাট কেউ আসেনি। কেটে পড়।

চার্লস বললে—আহা তাড়াচ্ছ কেন ? আমাদের দেখবার জন্যে তোমাদের লোকজন তো সর্বত্রই ভিড় করে, কিছু পয়সাও পায়। সেইজন্যে আমরা কখনো কিছু বলি না। দেখুক দেখুক।

আর ঠিক সেই সময় হঠাৎ মাইকেল গেভেনবার্গের সঙ্গে দেখা। আমায় দেখে মৃদু হেসে বলল, আবারো দেখা হল। তোমরা এখানে শুটিং করছ নাকি ?

বললাম—হ্যাঁ, তবে তোমার সেই বোম্বের হিন্দী ছবি নয়, এটা টেলিভিশনের জন্য একটা স্পেশাল ফিচার তোলা হচ্ছে—গ্লিম্পস অ্যারাউন্ড ইন্ডিয়া, ইচ্ছে করলে তুমিও ইন্টারভিউ দিতে পার।

মাইকেল হাসল।

—কোথায় আছো ?

মাইকেল বলল—ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের পাশে লঙ্কা নামে একটা জায়গা আছে, একটা ভাঙাচোরা বাড়ী ভাড়া করে আছি আমরা—

—তোমার সেই গার্ল ফ্রেন্ড, সে কোথায় ?

মাইকেল ভ্রু-ভঙ্গী করল—রোজীর কথা জানতে চাইছ ? রোজী এখন নেপালে। ওর ইচ্ছে ও ওখানেই থেকে যাবে।

—কেন, কি হল।

—রোজী খুব টায়ার্ড ফিল করছে। কিছুদিন আগে ওর একটা বাচ্চা হয়েছে, ও আর আমাদের সঙ্গে ঘুরতে পারছে না।

মাইকেল বৃটেনের ছেলে। রোজী স্টেটসের। ওরা দুজনেই শিক্ষিত। জীবনে এক একটা মুহূর্ত আসে যখন নিজেকে ভীষণ নিঃসঙ্গ, দারুণ অর্থহীন, সব কিছুর আকর্ষণকে বিড়ম্বনা বলে মনে হয়, তখন হঠাৎ একদিন কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়েছিল। মধ্যপ্রাচ্যে এসে রোজীর সঙ্গে ওর দেখা। ভোগবিলাসের চূড়ান্ত করার পর রোজী জীবনের প্রকৃত অর্থ খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছিল অকস্মাৎ-ই একদিন। ওর জীবনে তখন ভাললাগা মন্দলাগা বলে কোন অনুভূতিও ছিল না। এল এস ডি আর মারিজুয়ানার নেশায় বুঁদ হয়ে এদেশ থেকে ওদেশে শুধু যাওয়াই যখন জীবনের একমাত্র কাজ—তখন হঠাৎ মাইকেলের সঙ্গে ওর দেখা।

ভাল।

মাইকেল বলল—এসব তোমাকে বলছি কেন হে ? তুমি কে ?

আমি একজন শ্রোতা।...বলতে তোমায় একদিন হতই। আর শ্রোতা কেউ না কেউ একজন থাকতই। ধর আজ সেই শ্রোতা আমি—

—বটে।...তাহলে শোন, আমি শুনেছিলাম ভারতের একজন যোগী, লন্ডনে সে একদিন গুপ্ত মিটিং করে বললে, আমার সঙ্গে চল, জীবনের সব অকৃতকার্যতা, অকৃতার্থতার, অকৃতজ্ঞতার শেষ দেখাব আমি, নতুন একটা পয়েন্টে দাঁড় করিয়ে দেব—, নতুন জীবন শুরু হবে তোমাদের সকলের—কাম অন—

জাম্বলের তার রেকর্ডিং মেশিন অন করেছে ততক্ষণে, মণীন্দ্র রাও তার শক্তিশালী অ্যারিফ্লেক্স ক্যামেরা, মাগণ জনের মধ্যে সেলুলয়েডের ফিতে সমগ্র দৃশ্য এবং শব্দকে সতর্কতার সঙ্গে গ্রহণ করতে শুরু করেছে।

—তারপর ?

—তারপর এদেশে এসে দেখলাম খিলাটি বুজরুকি, লোকটা স্রেফ ধাপ্পা দিয়েছে আমাদের। আসলে ও নিজেই জানে না ওকে। যেমন আমরাও জানি না আমরা কোথায় যাচ্ছি—কোথায় আমাদের আসল উত্তরণ......

রাত্রি দেড়টা পর্যন্ত আমরা শুটিং করছি, লঙ্কার সেই ভগ্নগৃহ স্তূপে। কুড়ি পঁচিশটি জোয়ান ছেলেমেয়ে নেশায় আত্মবিস্মৃত। তারা বকছে, খাচ্ছে, নাচছে, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরছে, প্রলাপ বকছে, হাসছে কাঁদছে যৌনক্রিয়া করছে। আমরা যেন পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যাওয়া একখণ্ড আশ্চর্য মানুষের জীব এই মুহূর্তে ইতিহাসের পাতায়, ফিল্মের ইমালশানে যেটা আশ্চর্য নিখুঁততার সঙ্গে রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে আগামী দিনের অনাগত কোন মানবসন্তানের জন্যে......

পরদিন আমরা সবাই বেনারসের পশ হোটেল 'হোটেল-দ্য-প্যারিস'। বৃটেনের তরুণী চলচ্চিত্রাভিনেত্রী রীটা টুশিংহ্যাম ইন্টারভিউ দেবেন। আর দেবেন বৃটেনের জনপ্রিয় নায়ক মাইকেল ইয়র্ক। ওখানে অপর্ণা সেনের সঙ্গে দেখা। উনি 'গুরু' ছবির শুটিং-এ এসেছেন, ওঁর স্বামী সঞ্জয় সেনও এসেছেন। সঞ্জয় আমার অনেক দিনের বন্ধু। উৎপল দত্তের ইন্টারভিউ নেওয়া হল।

আমরা ফিরে আসছি। সারাদিনের কাজ শেষ। পরদিন সকালে হৃষিকেশ যাবার কথা। ওখানে বিটল রাঙ্গো জর্জ হ্যারিসন এসে মহর্ষি মহেশ যোগীর আশ্রমে উঠেছে। শোনা গেল ফ্র্যাংক সিনাত্রার সদ্য তালাক দেওয়া স্ত্রী মিয়া ফারো-ও এসেছে। এক ডজন টি, ভি ইউনিট নাকি ওখানে দমাদ্দম শুটিং করছে।

হোটেলে খবর দেখি, মাইকেল একটা স্লিপ রেখে গেছে। তাতে একটা ঠিকানা লেখা, তোমাদের এই ছবির একটা প্রিণ্ট এই ঠিকানায় পাঠালে সঙ্গে সঙ্গে বিক্রী হয়ে যাবে। ওরা কিনবে, কারণ আমার অনেকগুলো মুভিশট ওর মধ্যে আছে। আমার নৈতিক অধঃপতনের এমন খোলাখুলি ছবি ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায়নি। যদিও আমার মত অধঃপতিত পুরুষ পৃথিবীতে দ্বিতীয় কেউ নেই বলে আমার নিজের ধারণা। আমি, ' ' অভিজাত পরিবারের ছেলে। টাকা পয়সা মান প্রতিপত্তি কিছুরই অভাব নেই। আর নেই বলেই আমি নিজের ওপর ভীষণ বিরক্ত এক্ষুনি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছি। মনে হচ্ছে এখন আত্মহত্যাটাই একটা করার মত জিনিস। বাই।

আমি হৃষিকেশে গিয়েছিলাম। সহস্র ঘটনার মুখোমুখি হয়েছি। কিন্তু মাইকেলের মত আর একটি ঘটনার কিন্তু পুনরাবৃত্তি হয়নি।

—রঞ্জন মজুমদার

উল্লেখযোগ্য সুইডিশ সর্ট ফিল্ম
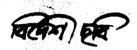
সরলা মেমোরিয়াল হলে সম্প্রতি প্রদর্শিত সুইডিস শর্ট ফিল্ম নানা কারণেই উল্লেখ্য। এতে সুইডিশ চলচ্চিত্র প্রচেষ্টার তিনটি দিক তুলে ধরা হয়েছে।

প্রথম তার নির্বাক যুগ, যার সময়কাল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত।

সেই সময়েও, যখন সিনেমার বিভিন্ন দিকে আজকের মত এমন উন্নতি ঘটেনি, সুইডিশ নির্বাক চলচ্চিত্রের প্রবর্তক মরিজ স্টিলার ও ভিকটর সজসট্রম ক্যামেরাম্যান জুলিয়াস জ্যানসনের সহায়তায় যেসব বিস্ময়কর নির্বাক ছবি করেছেন তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। তার গল্প বলার ভঙ্গি তার আবেদন তার গঠন পারিপাট্য একালের দর্শককেও মুগ্ধ করে রাখতে সক্ষম।

দ্বিতীয় যুগকে বলা যায় সুইডিশ চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগ। যে যুগের স্রষ্টা আজকের বিশ্ববিখ্যাত চিত্র-পরিচালক ইংগমার বেয়ারম্যান।

এর পরের পর্যায়ে ১৯৬০ সালে ফরাসী ছবিতে যে বিপ্লবের সূচনা হয় তার অনুসারী বা পরিপূরক রূপে দেখা দেয় এক-শ্রেণীর নবীন চলচ্চিত্রকারের প্রচেষ্টা। যাঁরা সামাজিকতার বেড়া ডিঙিয়ে বাস্তব এবং কমার্শিয়াল ছবি করার দিকে ঝুঁকে পড়েন।

এই সময়কার দুজন পরিচালক বো ওয় ইডারবার্গ ও জেন ট্রিভের ছবি সুইডেনের বাইরে অনুষ্ঠিত একাধিক চলচ্চিত্র উৎসবে স্বীকৃতি লাভ করে।

ষাটের দশকেই যে সুইডিশ ছবি বিদেশে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সার্থকতার সূচনা করেছিল এদের উপস্থিতিতে সেটা আরও বিস্তৃত হয়

প্রথমেই নির্বাক যুগের ছবির অংশ-বিশেষ দেখানো হয়। তারপর আধুনিক সুইডিশ ছবির নমুনা স্বরূপ 'র‍্যাভেনস এন্ড, লাভ সিকসটি-সিক্স, দি [illegible] এ সুইডিশ লাভ স্টোরী দি [illegible] ও হ্যারি মার্টের ছবিগুলির অংশ বিশেষ দেখানো হয়।

কিন্তু নির্বাক যুগের ছবি ছাড়া শর্ট ফিল্ম-এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করেছে জান ট্রোয়েল পরিচালিত 'স্টে ইন দি মার্শল্যান্ড' ছবিটি।

সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের ছবি এটি। এবং গল্পের দিক থেকেও স্বতন্ত্র।

একজন নেভীর লোক হঠাৎই সুইডেনের সুদূর উত্তরাঞ্চলের এক নির্জন জনমানবশূন্য স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে পড়ল। তার কারণ জীবনে সে সর্বদিক থেকেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাই সে একটু পরিবর্তন চায়, তার মানসিক পরাধীনতার হাত থেকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও নিষ্কৃতি চায়।

মূলত ছবিটি বিশেষ একটি অনুভূতির ওপর তোলা। আবেগ এবং জীবন বোধ যার মূলধন।

পরিচালক এমনি টুকরো টুকরো আরো তিনটি ছবি তুলে—মোট চারটে ছবির সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ছবিতে তার এক বিশেষ বক্তব্য উপস্থাপিত করেছে। সে ছবির নাম-করণও লক্ষ্যণীয়—'৪×৪'।

ছবিটি দেখতে দেখতে আমার মৃণাল সেনের বিস্ময়কর ছবি 'ভুবন সোম'-এর কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। যদিও মূল সংগীত ছাড়া দুটো ছবির মধ্যে আর কোন মিলই নেই এবং বলতে বাধা নেই মৃণাল সেনের ছবি এর চেয়ে অনেক বলিষ্ঠ। এমন কি তার ফটোগ্রাফী পর্যন্ত।

সর্বশেষ একটা কথা। সুইডিশ ছবিতে আমরা যেসব ব্যাপার দেখে অভ্যস্ত, যথা নতুন রীতির নামে যৌন জগতের খুঁটিনাটি বা ঐ জাতীয় অনুভূতির ব্যাপারটা, এখানে প্রায় অনুপস্থিত।

এই বৈপরীত্য অবশ্য লক্ষণীয়।

মঞ্চাভিনয়

রঙমহলে 'অনন্যা'র বিশতত্তম অভিনয়োৎসব : বিগত ২৫শে জুলাই, রঙমহল রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ 'অনন্যা' নাটকের বিশতত্তম অভিনয়োৎসব এক মনোজ্ঞ পরিবেশের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হলো। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথি-রূপে ভাষণ দেন পশ্চিমবাংলা সরকারের দুই নবীন রাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় ও প্রদীপ ভট্টাচার্য। জনপ্রিয় জননেতা ও বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ, খাদ্য-মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ, লোকসভা সদস্য শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী ও আরো বহুজনের উপস্থিত থাকবার কথা ছিল। অনুপস্থিতির জন্য তাঁরা অনুষ্ঠানের শুভেচ্ছা কামনা করে বাণী পাঠান।

বনশ্রী সেনগুপ্তের উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর রঙমহল শিল্পীগোষ্ঠীর সম্পাদক জনপ্রিয় অভিনেতা জহর রায় উপস্থিত সুধীজনকে স্বাগত জানিয়ে শিল্পীগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের সংগ্রাম-শীলতার প্রতি সবাকার এবং দর্শক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরলোকগত বিধানচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে যেয়ে শ্রীরায় বলেন, ডাঃ রায়ের হস্তক্ষেপেই আমরা আজ পর্যন্ত ১২।১৩ বছর ধরে সমানভাবে রঙমহল রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে যেতে পারছি। নানান বাধা-বিপত্তি এসে আমাদের পথে দাঁড়িয়েছে তবু আমরা হতাশ হইনি। সরকারের কাছে সাহায্যও চাই নি। কিন্তু বাংলার ঐতিহ্যদীপ্ত রঙমহলকে চালু রাখতে আশা করি সরকার প্রয়োজন হলে এগিয়ে আসবেন।'

প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীপ্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, নাটকটি আমি দেখেছি। শিল্পী এবং কর্মীদের ঐকান্তিক চেষ্টা অনন্যার জনপ্রিয়তার মূলে নিহিত রয়েছে। ২০০ শত রজনী অতিক্রম করে অনন্যা এগিয়ে চলেছে। অনন্যার এই সাফল্য বিশেষভাবে অভিনন্দনযোগ্য। শক্তিমান অভিনেতা জহর রায় অনন্যার প্রাণস্বরূপ।

শিল্পীগোষ্ঠী তথা রঙমহলের সমস্যা সম্পর্কে সরকার নিশ্চয়ই তাঁর কর্তব্য পালন করবেন। বন্ধুবর সুব্রত মুখো-পাধ্যায়ের হাতে এই বিভাগের দায়িত্ব। এবিষয়ে সব সময়ই তিনি তৎপর আছেন।'

সভাপতির ভাষণে শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় তাঁর আবেগময় ভাষায় পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নাট্যশালার অবদান সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন, পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদপুষ্ট পশ্চিম-বাংলার নাট্যশালা চিরদিন লোকশিক্ষার ধারক ও বাহক হিসেবে কাজ করে এসেছেন। জাতির প্রতি, দেশের প্রতি নাট্যশালার যে গুরুদায়িত্ব রয়েছে সেকথা যেন আমরা কখনও ভুলে না যাই। কিন্তু আজকাল কোন কোন মঞ্চে জাতীয় সংস্কৃতি বিরোধী চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ সত্যই বেদনাদায়ক। এবিষয়ে সরকারের হাতে কোন আইন নেই। জোরজবরদস্তি করেও মানুষের মনোভাবের পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। তাই আমি অনুরোধ করবো মঞ্চ মালিকদের—তাঁরা যেন শিল্পকে নিছক ব্যবসায় পণ্যের পর্যায়ে টেনে না নামান। অনুরোধ করবো দর্শক-সমাজকে—দেশের যুবশক্তিকে এবিষয়ে সচেতন হয়ে উঠতে।'

জহর রায়ের শক্তিমত্তার প্রশংসা করে শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেন, 'অসুস্থ শরীর নিয়ে যেভাবে তিনি অভিনয় করে যাচ্ছেন আমার কাছে তা এক বিস্ময়। আমি তাঁর সুস্থ জীবন কামনা করি।'

প্রতিভাবান শিল্পী ও কর্মীদের বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। পুরস্কার প্রদান করে ছায়া দেবী। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জহর রায়। অনুষ্ঠান শেষে যথারীতি অনন্যা নাটক অভিনীত হয়।

কুনাল মুখোপাধ্যায় রচিত অনন্যা পরিচালনা করেছেন জহর রায়। অভিনয়ে আছেন জহর রায়, অসীমকুমার, স্বরূপ দত্ত, মৃণাল মুখার্জি, ঠাকুরদাস মিত্র অজিত চ্যাটার্জি, কালিদাস গাঙ্গুলী, বাসু মুখার্জি জয়শ্রী সেন দীথি গাঙ্গুলী, সীমা দে, ঝুমরী বসু মিস চন্দ্রকলা প্রভৃতি। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন চণ্ডীদাস বসু।

কর্মাধ্যক্ষ শান্তিরঞ্জন ব্যানার্জি ও ব্যবস্থাপক পলাশ ব্যানার্জি সব সময় অতিথিদের প্রতি যত্নপর ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সংসদের উদ্যোগে যাত্রা উৎসব : পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সংসদের উদ্যোগে আগামী ২৪শে আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রবীন্দ্র সদনে পনেরোদিনব্যাপী যাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

মোহন অপেরার ৩০৯, রবীন্দ্র সরণি-স্থিত কার্যালয়ে পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সংসদের পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল। যাত্রা উৎসব সমিতির সম্পাদক শ্রীরমেন বসুমল্লিক সাংবাদিকদের সামনে উৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে নবগঠিত যাত্রা সংসদের কর্মপদ্ধতি বিশ্লেষণ করেন।'

নট্ট কোম্পানী, মঞ্জুরী অপেরা, নিউ প্রভাস অপেরা, জনতা অপেরা, মাধবী নাট্য কোম্পানী, নবরঞ্জন অপেরা, নিউ রয়েল বীণাপাণি শিল্পভারতী অগ্রগামী, শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির, তপোবন নাট্য কোং, সুশীল নাট্য কোং, শিল্পীতীর্থ দি কমলা অপেরা মোহন অপেরা এই ১৭টি যাত্রা সংস্থা ১৫ দিনে ১৭টি যাত্রা নাটক অভিনয় করবেন। অন্যান্যবারে একটি করে এবং রবিবারে ২টি করে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। তাছাড়া ৭ই সেপ্টেম্বর সম্মিলিত অধিবেশনে সর্বশিল্পী সমন্বয়ে 'বাঙ্গালী' যাত্রা নাটকের অভিনয় আয়োজন করা হয়েছে।

এই অভিনয়ের বিক্রয়লব্ধ অর্থ দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্য ও একটি স্থায়ী যাত্রা-মঞ্চ নির্মাণ তহবিলে মজুত রাখা হবে। নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সংসদ বিরাট কর্মসূচী নিয়ে পশ্চিমবাংলার যাত্রা-শিল্পের সর্বাত্মক উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করেছেন। সুদীর্ঘকালের ঐতিহ্যমণ্ডিত পশ্চিমবাংলার যাত্রাশিল্পের প্রসার, সংরক্ষণ ও বিবিধ সমস্যা সমাধানে পশ্চিমবাংলা সরকারের সহযোগিতা কামনা করে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে। তবে বর্তমানে সংসদের সামনে যাত্রা মঞ্চ-নির্মাণ ও দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্যদানের সমস্যাই সর্বপ্রধান। উত্তর বা মধ্য কলকাতায় কোন উপযুক্ত স্থানে সংসদ স্থায়ী যাত্রা মঞ্চ নির্মাণের কথা চিন্তা করছেন। বর্তমানে যাত্রাভিনয়ের যে রেওয়াজ আছে তাতে দেখা গেছে বছরে গড়পরতায় ছয় মাস নিয়মিত যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। স্বভাবতই বাকী ছয় মাস বেকারত্বের জন্য শিল্পী, কর্মী ও স্বত্বাধিকারীদের সামনে বিরাট আর্থিক সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে। স্থায়ী মঞ্চ নির্মিত হলে এই সময়ে পালাক্রমে বিভিন্ন দল অভিনয় করবার সুযোগ পাবেন। স্থায়ী মঞ্চ সংলগ্ন একটি সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও সংসদের আছে। ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়-বরাদ্দের একটি পরি-কল্পনা তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু সংসদের পক্ষে ব্যক্তিগত বা প্রতিষ্ঠানগত চাঁদা বা যাত্রাভিনয় থেকে অর্জিত অর্থ দ্বারা ব্যয়সংকুলান সম্ভব হবে না। তাই সরকারের কাছে অন্তত ৫ লক্ষ টাকা সাহায্য চাওয়া হবে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীবসু-মল্লিক জানান যে, আসন্ন উৎসব থেকে উৎসব কমিটি ৬০।৭০ হাজার টাকার লাভ আশা করেন। তবে রবীন্দ্রকাননে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হলে ১ লক্ষ ২৫

...ত্রাদেরও বেশী সংগৃহীত হতো। কাতা করপোরেশন রবীন্দ্রকাননে যাত্রা ...দব অনুষ্ঠিত হবার অনুমতি না দেবার ...াই সংসদ মহাজাতি সদনে যাত্রা ...দবের আয়োজন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ ...া সংসদ মালিক, শিল্পী ও কর্মীদের ...র্নিধিমূলক প্রতিষ্ঠানরূপেই গড়ে ...ছে। ইতিমধ্যেই বহু যাত্রা প্রতিষ্ঠান ...ং শিল্পীরা সংসদের সভ্যতালিকাভুক্ত ...য়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সংসদের সভাপতি ...ছেন শ্রীতিনকড়ি গুছাইত। যুগ্ম-...পাদক হচ্ছেন দীনবন্ধু গুছাইত ও ...রায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য। উৎসব কমিটির ...াপতি আর সম্পাদক নির্বাচিত ...য়েছেন স্বপনকুমার মুখার্জি আর ...ন বসুমল্লিক। দিলীপ চট্টো-...ধ্যায়, স্বপনকুমার, মোহন চট্টোপাধ্যায় ...ীপ দেবনাথ এবং বিভিন্ন যাত্রা ...প্রদায়ের স্বত্বাধিকারী, শিল্পী ও ...ীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

...র থিয়েটার

বিগত ১৮ জুলাই বিকেল ৪ ঘটিকায় ...র থিয়েটারে সঙ্গীতসুধাকর তারা ...চার্যের একক সঙ্গীত পরিবেশনার ...ুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীরণজিৎমল ...ংকারিয়া, পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ...ণীসহ রামপ্রসাদী ও অন্যান্য ভক্তিমূলক ...গীত দুঘণ্টা শ্রোতৃমণ্ডলীকে মন্ত্রমুগ্ধ ...রে রাখে। পুরোনোদিনের শিল্পীদের ...নসমক্ষে তুলে ধরাই ছিল বর্তমান ...নুষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

কিংকুটের বিনয়-বাদল-দীনেশ

কিংকুটের সদস্যরা বয়েজ ওন ...াইব্রেরী মঞ্চে নরেশ চক্রবর্তীর বিনয়-...াদল-দীনেশ নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। ...াটকের পূর্বে যাত্রা-জগতের এককালীন প্রখ্যাত অভিনেতা স্বর্গত পঞ্চু সেন এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী স্বর্গতা নমিতা দত্তের আত্মার উদ্দেশ্যে নীরবতা পালন করে তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন শ্রীতারক পাল, প্রধান অতিথি অন্নপূর্ণা সেন ও মূল বক্তা শ্রীসুহৃদগোপাল দত্ত। এই ভাবগম্ভীর ছোট্ট অনুষ্ঠানটির পর নাটক পরিবেশিত হয়। নির্দেশক শ্যামল রায়চৌধুরী অবশ্যই কৃতিত্বের অধিকারী। প্রযোজনায় ছোট মঞ্চের অসুবিধা, দৃশ্যপট ও দৃশ্যসজ্জার অভাব নাটকের ভাবমণ্ডল যথাযথ গড়ে তুলতে না পারলেও দলগত অভিনয়ের দৃঢ় বাঁধুনী নাটকটিকে সজীব রাখতে পেরেছিল। অভিনয়ে গভীর চরিত্রচিত্রণের স্বাক্ষর রাখেন আশীষ ভট্টাচার্য, শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিত দাস, অজন ভট্টাচার্য, পৃথ্বীশ মুখার্জি ও শ্যামল রায়চৌধুরী।

বিবিধ সংবাদ

ফিল্ম ফিনান্স করপোরেশানের **সাংবাদিক সম্মেলন ও চলচ্চিত্রোৎসব**—গত ২৬শে জুলাই ফিল্ম ফিনান্স করপোরেশানের চেয়ারম্যান শ্রী বি কে করঞ্জিয়া কলকাতায় ফেডারেশান অফ ফিল্ম সোসাইটিজ এবং করপোরেশানের যুগ্ম উদ্যোগে চলচ্চিত্রোৎসবের পরিপ্রেক্ষিতে আগমন উপলক্ষে 'গ্র্যাণ্ড কন্টিনেন্টাল' হোটেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন হয়।

শ্রীকরঞ্জিয়া সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানান—সাম্প্রতিককালে ফিল্ম ফিনান্স করপোরেশান যেভাবে ঋণদানের ব্যবস্থা করেছেন, তাতে কলকাতায় প্রযোজিত ছবি, বিশেষ করে বাংলা ছবির উপকার হবে। ইতিপূর্বে অনেকেই করপোরেশানের কাজের সমালোচনা করেছেন। অনেকেরই ধারণা ওঁদের অফিস বম্বেতে থাকায় কেবল হিন্দী ছবিকেই ঋণ দেওয়া হয়। কিন্তু বর্তমানে কলকাতার ছবির জন্যে প্রায় ৪৮ শতাংশ, বম্বের তথা হিন্দী ছবির জন্য ১৪ শতাংশ, মাদ্রাজ তথা দক্ষিণ ভারতীয় ছবির জন্য ১০ শতাংশ এবং অন্যান্য স্থানের এবং বিভিন্ন ভাষাভাষীর জন্যে ১৩ শতাংশ ঋণ দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত বছরের এবং এ বছরের প্রথম ৬ মাসে ৪৬টি ছবির ঋণের জন্যে দরখাস্ত আসে। এর থেকে বাছাই করে ১৫ জন বিশিষ্ট বাঙালী প্রযোজক ও পরিচালককে ঋণ দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এযাবৎ মুক্তিপ্রাপ্ত করপোরেশানের ছবির মধ্যে শতকরা ৮০ শতাংশ ভাগই বক্স অফিসের ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করেছে। ভারতীয় ছবি বিদেশে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পাঠানো, ভারতীয় চলচ্চিত্রোৎসবের আয়োজন করা ছাড়া, বিদেশের প্রায় সব দেশ থেকেই বিশিষ্ট ছবিগুলি আমদানী করবার দায়িত্বও করপোরেশানের।

তাছাড়া বম্বের 'আকাশবাণী' প্রেক্ষাগৃহের মতো ভারতের প্রায় সব বড় বড় শহরে আর্ট থিয়েটার তৈরী করবার ইচ্ছা আছে এই সংস্থার। অনুষ্ঠানে শ্রীহৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় ও নিতীন শেঠী প্রশ্নের উত্তর দেন।

২৬শে জুলাই সন্ধ্যা থেকে মিনার্ভা সিনেমায় এফ এফ সির ছবির উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। এই জাতীয় উৎসবের সার্থকতা প্রসঙ্গে ফেডারেশানের বিভিন্ন চলচ্চিত্র বিষয়ক কার্যাবলীর প্রশংসা করেন তিনি।

পরলোকে চিত্র ও মঞ্চাভিনেতা দীপক মুখোপাধ্যায়

জনপ্রিয় চিত্র ও মঞ্চাভিনেতা দীপক মুখোপাধ্যায় বিগত ২৪শে জুলাই ক্যান্সার রোগাক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই দীপক মুখোপাধ্যায় কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা স্বর্গত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। চার ভ্রাতা ও এক ভগ্নীর মধ্যে দীপক ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। প্রখ্যাত পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় দীপকবাবুর জ্যাঠতুতো ভ্রাতা। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দীপকবাবু রিপন কলেজে পড়াশুনা শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত বয়লার ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধে যোগদান করেন। খেলাধুলায় প্রথম থেকেই দীপকবাবুর খ্যাতি ছিল। তাই সেনাবিভাগে যোগদান করে অতি সহজেই তিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। সেনাবিভাগে যুক্ত থাকা সময়ে আম্বালা, কাশ্মীর, জলন্ধর ফিরোজপুর মাদ্রাজ বম্বে ব্যাঙ্গালোর কোচিন সিংহল প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে স্বইচ্ছায় সেনা বিভাগের কাজ পরিত্যাগ করে চিত্রজগতে যোগদান করেন।

অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'পূর্বরাগ' ছবিতে দীপক মুখোপাধ্যায়ের সর্বপ্রথম চিত্রাবতরণ। এর পর থেকেই তদানীন্তন বহু ছবির নায়ক চরিত্রে দীপকবাবু খ্যাতি অর্জন করেন। ওরে যাত্রী ছবিতে দীপকবাবু নায়ক আর বর্তমানের জনপ্রিয় শিল্পী উত্তমকুমার ছিলেন সহনায়ক। বাংলা চিত্রজগতে জনপ্রিয়তার্জন করার পর দীপক মুখোপাধ্যায় বম্বে যান এবং কয়েকখানা হিন্দি ছবিতে অভিনয় করে পুনরায় বাংলা চিত্রজগতের সঙ্গেই জড়িত থাকেন। কিন্তু পরিবর্তিত পরিবেশে দীপক মুখোপাধ্যায় মঞ্চজীবনে প্রবেশ করেন। উল্কা নাটকের অরুণাংশু চরিত্রে অভিনয় করে দীপক মুখোপাধ্যায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তখন থেকে মঞ্চশিল্পী হিসেবেই অভিনন্দিত হন। মৃত্যুর পূর্বে কিছুদিন যাত্রাভিনয়ের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েন।

—শীলভদ্র

ভাড়াটে বাড়ী
হাসমত

বেইমান
নায়িকা কবরী

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র কি ইদানিং তার নিজস্ব স্টাইল ত্যাগ করে ক্রমশ বোম্বাই চলচ্চিত্রের স্টাইলে গড়ে উঠতে যাচ্ছে?

দেখেশুনে তাই মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে সেক্স বা 'নগ্নতা' এখন ধীরে ধীরে জায়গা করে নিচ্ছে।

বোম্বের খোলামেলা সেকস এদেশের চলচ্চিত্রে পুরোপুরি আসতে যদিও দেরী হবে, তবে সেকস বা নগ্নতা যে ক্রমশ হাঁটি হাঁটি পা পা করে নির্মীয়মাণ ও মুক্তিপ্রাপ্ত কিছু কিছু ছবিতে ইতিমধ্যে আসন করে নিচ্ছে ও নিয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

আমাদের নায়িকারা ইদানিং মিনি শাড়ী, মিনিস্কার্ট, প্যান্ট, লুঙ্গী ও উরুকাটা ম্যাক্সি শার্ট পরছেন।

একদা 'আপন দুলাল' ছবিতে নাসিমা খান এবং 'টাকার খেলা' ও 'এখানে আকাশ নীল' ছবিতে সুজাতা, 'রং-বাজ' 'বেঈমান' ছবিতে কবরী, 'এক পাসলা কে নকল' ছবিতে কবিতা মিনি ঢংয়ে শাড়ী পড়েছেন।

'মাসুদ রাণা' ও 'টাকার খেলা' ছবিতে অলিভিয়া উরুকাটা ম্যাক্সি পরেছেন।

শাবানা নির্মীয়মান 'জীবন সাথী' ও মুক্তিপ্রাপ্ত '[illegible]' ছবিতে কবিতা, নির্মীয়মান 'অচেনা মানুষ' ছবিতে কবরী 'দুই পর্ব' ছবিতে, সুজাতা 'অশ্রু দিয়ে লেখা' ছবিতে শার্ট প্যান্ট পরেছেন।

কবরী 'অবাক পৃথিবী' ছবিতে লুঙ্গী ও ব্লাউজ পরেছেন।

এ ছাড়া 'ডাকু মনসুর' ছবিতে সুচরিতা 'বাঁদী থেকে বেগম' ও 'রাতের পর দিন' ছবিতে ববিতা, 'জেহাদ' ছবিতে কবিতা 'দস্যু' ছবিতে কবরী নাভী, পেট এবং শরীরের অংশবিশেষ দেখিয়েছেন।

এসব ছাড়াও কিছু কিছু নায়িকা ছবিতে 'টুপী' পরছেন।

ছবিতে 'গহনা'র জৌলুষও বৃদ্ধি পেয়েছে—যা অতীতে কখনও এত প্রকট-ভাবে চোখে পড়েনি।

নায়কেরাও কিছু পিছিয়ে নেই। শেরোয়ানী, স্যুট বিচিত্র ধরনের গেঞ্জী পাঞ্জাবি, সোয়েটার শার্ট এখন এখানকার ছবিতে নায়কের শরীরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

এসব ছাড়াও ছবির কাহিনীতেও এসেছে বৈচিত্র্য। পুরানো 'ছকে'র বদলে নতুন ছকের আমদানী হয়েছে, এখন প্রায় ছবিতে 'নাচে'র বাহুল্য ও 'মারপিটের' আধিক্য লক্ষণীয়। 'ক্যাবারে ড্যান্সও' এখন ছবিতে দেখানো হচ্ছে অবাধে।

এসব দেখেশুনে মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক, আমাদের চলচ্চিত্রশিল্প কি ক্রমশ তার নিজস্ব ঐতিহ্য ও স্টাইল থেকে সরে গিয়ে দিনে দিনে বোম্বে ঘেঁষা হয়ে পড়ছে?

চলচ্চিত্র পুরস্কার

'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি' এবার থেকে 'চলচ্চিত্র পুরস্কার' দেবেন।

সম্প্রতি সমিতির এক সভায় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৭২-৭৩ সালকে এক ইউনিট হিসেবে ধরে প্রথম-বারের মত চলচ্চিত্র পুরস্কার দেয়া হবে।

আগামী আগস্ট মাসে পুরস্কারের ফলাফল ঘোষণা করা হবে বলে জানা গেছে।

রক্তপথ

'রক্তপথ' একটি ছবির নাম। এ ছবির পরিচালক মালিক মাজিদ। ছবির কেন্দ্রীয় তিনটি চরিত্রে কায়েস জাভেদ ও বাবর অভিনয় করছেন। কেন্দ্রীয় নারী চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন কবরী ও নবাগত কনক।

ছবির সত্তর ভাগ স্যুটিং ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। ছবিটির চিত্রগ্রাহক সাধন রায়। আগামী আগস্টের শেষাশেষি ছবিটি মুক্তি পেতে পারে।

ত্রি-রত্ন

খান আতাউর রহমান বর্তমানে ঝটিকাবেগে একটি ছবি নির্মাণে ব্যস্ত রয়েছেন। ছবির নাম 'ত্রি-রত্ন'। এক মাসে ছবিটি স্যুটিং শেষ করে আগামী আগস্টে ছবিটিকে মুক্তি দেয়ার চেষ্টা তিনি চালাচ্ছেন বলে জানা গেল। 'ত্রি-রত্নে'র বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন রাজ্জাক, খান আতা আশিসকুমার লোহ, খান জয়নুল, কেশব চ্যাটার্জি ওবায়দুল হক সরকার, কবরী, রোজী সামাদ প্রমুখ।

ভুল যখন ভাঙলো

রফিকুল বারি চৌধুরীর ছবি 'ভুল যখন ভাঙলো' গত ১৯ই জুনে মুক্তি পাবার কথা ছিল। কিন্তু সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র না পাওয়ায় ছবিটি শেষ পর্যন্ত এ সপ্তাহে মুক্তি পেল।

এ ছবির নায়ক-নায়িকা রাজ্জাক-ববিতা। অন্যান্য চরিত্রে আছেন আলতাফ, হাসমত খান জয়নুল প্রমুখ। সঙ্গীত পরিচালনা রাজা শ্যাম।

আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পের বয়স নিতান্ত কম নয়। কিন্তু সে তুলনায় আমা-দের চলচ্চিত্রে শিল্পীদের সংখ্যা হাতে গোনা মাত্র ক'জন।

মূলতঃ মাত্র ক'জন শিল্পীকে ঘিরে যে আমাদের আজকের চলচ্চিত্র শিল্পের অস্তিত্ব অন্যকথায় মাত্র ক'জন শিল্পীর জন্য যে আজও আমাদের চলচ্চিত্র শিল্প টিকে রয়েছে ও সর্বক্ষণ আবর্তিত হচ্ছে তার প্রমাণ আজকের চিত্রপুরী।

গত ক'দিন ধরে 'চিত্রপুরী' 'বিজনপুরী' হয়ে রয়েছে। স্যুটিং বন্ধ। ফ্লোর খালি।

এর কারণ রাজ্জাক, মুস্তফা প্রমুখ মাত্র কজন শিল্পীর অনুপস্থিতি।

ক'দিন আগে এঁদের একদল গেছেন মস্কোতে, অন্যদল গেছেন তাসখন্দে—চিত্র মেলায় যোগ দিতে।

তাই বলছিলাম, আমাদের আজকের চলচ্চিত্র শিল্প মাত্র কজন শিল্পীর উপরই পুরোপুরি নির্ভরশীল। যদি তাই না হবে, তাহলে চিত্রপুরী বিজনপুরী হয়ে আছে কেন? স্যুটিং বন্ধ কেন? ফ্লোর খালি কেন?

উজ্জল অবশ্য পা ভেঙ্গে শয্যাশায়ী রয়েছেন। মেসবাহও অসুস্থ। কিন্তু সুচন্দা, রোজী, ওয়াসীম জাফর ইকবাল ফতেহ লোহানী রাণু সাইফুদ্দীন হাসমত খান জয়নুল খলিল শাবানা কবিতা সুচরিতা প্রবীর মিত্র, আলমগীর কাবেরী অলিভিয়া সুমিতা এককথায় মাত্র কজনকে বাদ দিয়ে বাকী সবাই তো ঢাকাতেই আছেন। তবে? তবে কেন চিত্রপুরী আজ বিজনপুরী,

অন্তরালে
ববিতা

এছাড়াও চিত্র পরিচালক ও প্রযোজক, যাঁরা ছবি তৈরী করাবেন, করছেন, তাঁরা তো আর ঢাকার বাইরে বিদেশে চলে যাননি! তবে? তবে কেন স্যুটিং বন্ধ? ফ্লোর খালি?

অন্য সময় ফ্লোর খালি না-থাকার কারণে স্যুটিং বন্ধ থাকে। কিন্তু এখন তো ফ্লোর খালি। তবে কেন স্যুটিং বন্ধ?

'বেঈমানে'র নায়ক নায়িকা রাজ্জাক; কবরী, 'ডাকু মনসুরের' নায়ক নায়িকা ওয়াসীম শাবানা, 'অন্তরালে'র নায়ক-নায়িকা জাফর ইকবাল ববিতা, দুই পর্বে'র নায়ক-নায়িকা রাজ্জাক কবরী, 'জিঘাংসা'র নায়ক-নায়িকা ওয়াসীম, অবা চৌধুরী।

ইবনে মিজান বর্তমানে 'ডাকু মনসুর' ও 'জিঘাংসা' শেষ করতে ব্যস্ত রয়েছেন। নারুল হক বাচ্চু তাঁর 'জীবন সাথী' নিয়ে রহিম নেওয়াজ তাঁর 'আপনজন' নিয়ে এবং শিবলী সাদিক তাঁর 'জীবন নিয়ে জুয়া' ও মহসীন তার 'বাঁদী থেকে বেগম' নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন।

ছবিগুলোর কাজ দ্রুত এগোচ্ছে। আগামী ২।৩ মাসের মধ্যে ছবিগুলোর কাজ শেষ হবে ও মুক্তি পাবে বলে অনায়াসে আশা করা যায়।

এছাড়া আলী কাশেম 'শেষ লগ্ন' রফিক চৌধুরী 'ভুল যখন ভাঙলো', শেখ আলাউদ্দীন 'বাসর রাত', মোতালিব হোসেন 'দংশন', হেদায়েত ইসলাম 'কে দস্যু', সফদর আলী ভূইয়া তাঁর অভাগা ছেলে' কামাল আহমদ 'উপহার' কবীর চৌধুরী 'অনেকদিন পর' এর স্যুটিং নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন।

—আনওয়ার আহমদ

জলসা

কাফির রাগে কল্যাণী রায়ঃ সম্প্রতি নিউ আলিপুরে ক্যালকাটা মিউজিক সার্কেল আয়োজিত এক সংগীতচক্রে একটি একক সেতার বাদনের আসরে শোনা গেলো শ্রীমতী কল্যাণী রায়ের সেতার। প্রকৃতির পট-ভূমিকার সংগে ছন্দসংহতি রেখে ধরলেন মিঞা কি মল্লার। সুমিত সংক্ষিপ্ত আলাপ। কিন্তু রাগের রূপটি এক লহমায় যেন মূর্ত হয়ে উঠল তাঁর রেখাব পঞ্চমের সংগে কোমল গান্ধারের আলতো ছোঁওয়ায়। ঘুরে ফিরে ঐ গান্ধারের অনুরণনে সিক্ত সজল বিরহবেদনার আভাস এক অনুপম কাব্য-সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছিলো। গতের সংগেও ছন্দ ও লয়কারীর মারপ্যাঁচের চেয়ে সুর মাধুর্য অনাহত রাখার দিকেই শিল্পীর প্রবণতা ছিলো বেশী। রসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখলে কল্যাণী শান্ত রসেই অচলনিষ্ঠ। রাগের মর্মভাব বিস্তারে হয়েছে তাই সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত। শ্যামল বসুর তবলা সংগত মাঝে মাঝে সোমে পৌঁছনর আগে বক্রমাত্রী [illegible] অবতারণা করে চমকপ্রদতার বৈচিত্র্য এনেছে।

মিঞা কি মল্লারের পরই দেশ যেন একই ভাবের বিস্তার বিন্যাস। মল্লারে যা ছিলো মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকের মৃদু গাম্ভীর্যে সংযত—সেই না বলা বাণী যেন উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁপিয়ে পড়ে [illegible] অভিমানের চড়াসুরে। সাপট তানের প্রতিটি স্বর ও স্ট্রোকের স্পষ্টতা ওজনের সমন্বয় ও সুরের শুদ্ধতায় শিল্পীর সাধনার ছবিটি চোখে পড়ে। ঝালার সুরনির্ঝরে অন্তহীন [illegible] মধ্যে ধ্বনি শ্রোতাদের চিত্তকে মাতিয়ে রেখেছে সারাক্ষণ। সমাপ্তির বাউল সুরের শান্তিমাখা মেঠো সুরে কল্যাণীর হাতের কল্যাণ স্পর্শই যেন ঝরে পড়লো।

[illegible] দমদম মহিলা সমিতির নৃত্যনাট্য

শ্রীমতী প্রীতি দত্ত পরিচালিত দমদম মহিলা সমিতি নানারকম কল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত থেকে পরোক্ষভাবে সমাজসেবাই করছেন বলা যায়। সম্প্রতি রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে এই সংস্থা পরিবেশিত দুটি নৃত্যনাট্যে কিশোরী শিল্পীদের রূপায়ণে এঁদের সুশিক্ষা ও শিল্পচর্চার প্রশংসাযোগ্য স্বাক্ষর ছিলো। শ্যামা নৃত্যনাট্যের পরিচালনায় ছিলেন শ্রীমতী দীপা বসু এবং চিরকুমার সভার নাট্যনির্দেশিকা ঝরণা মিত্র ও শ্রীমতী [illegible]। অনুষ্ঠানের সভানেত্রী প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে ডাঃ সুষমা ঘোষ, ডাঃ রমা চৌধুরী ও শ্রীমতী ওয়াহাবুদ্দীন। শ্রীমতী ওয়াহাবুদ্দীন সংস্থার তহবিলে ৫০১ টাকা দান করেন।

শ্রুতি নিবেদিত বাল্মিকী প্রতিভা ঃ রবীন্দ্র সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় এক উজ্জ্বল তারকা। কিন্তু নৃত্যনাট্য পরিচালনা ও অভিনয়ের ক্ষেত্রেও তিনি যে যথার্থ প্রতিভারও অধিকারী—তারই পরিচয় মিলেছে এক বছর আগে বাল্মিকী প্রতিভা নৃত্যনাট্যে নাম-ভূমিকায় তাঁর অভিনয় দেখে। সেই [illegible] এবারের রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষ্যে রবীন্দ্র সদনে পরিবেশিত তাঁর বাল্মিকী প্রতিভা দেখে। পরিবেশক শ্রুতি সংস্থা।

প্রতিটি অধ্যায়ের খুঁটিনাটির প্রতি যথাযথ আলোকপাত করলেও অশোকবাবুকে মানিয়েছিল বেশী ভাবান্তরের স্বপ্নে। সবের ওপর ছিল তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের [illegible] গান। [illegible] প্রতিটি কথাকে প্রতিফলিত করবে দুরূহ কাজে — সঙ্গীতকুশলতা ছাড়াও লক্ষ্যণীয় [illegible] উপস্থাপনার চরিত্র বজায় রাখার কৃতিত্ব। গানের মধ্যে হারিয়ে গেলেও আঙ্গিকের গঠনের সম্বন্ধে এই সচেতনতায় অশোকতরুর মননশীলতার স্বাক্ষর বিদ্যমান। এখানে স্রষ্টা ও শিল্পী মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছেন।

বালিকার ভূমিকায় সুমিত্রা সেনের প্রতিভাময়ী কন্যা ইন্দ্রাণী সেনের একাধারে নাচ গান ও অভিনয়ের বিস্ময়কর কৃতিত্ব বিশেষ উল্লেখের দাবীদার। [illegible] গৌরী ঘোষকে মানিয়েছিল [illegible]। তাঁর মঞ্চচারী আবৃত্তির অবদানও এ চরিত্র সৃষ্টির সহায়ক হয়ে ওঠে। [illegible] মাধবী। [illegible] ভূমিকায় সুনন্দা চৌধুরী ও [illegible] নৃত্য অনিন্দনীয়। [illegible] দলের প্রাণকেন্দ্র। [illegible] রবীন বসু এঁদের প্রধান ভূমিকায় ছিলেন।

নৃত্য রচনা আলো ও মঞ্চ পরিকল্পনার কৃতিত্ব পাবেন যথাক্রমে অসিত চ্যাটার্জি তাপস সেন।

আফগানিস্থান সরকারের আমন্ত্রণ কথক নৃত্যশিল্পী সুমিত্রা মিত্রকে ঃ আফগানিস্থান সরকারের পক্ষ থেকে এইবারই প্রথম বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসব হচ্ছে কাবুলে। এই অনুষ্ঠানে পশ্চিম বাংলার একমাত্র আমন্ত্রিতা শিল্পী শ্রীমতী সুমিত্রা মিত্রকে [illegible] কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশন সংস্থা।

বাণীচক্র প্রযোজিত ছায়াসংগীত ঃ রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের সঙ্গে সঙ্গে আর এক গোষ্ঠীর অনান্য বিষয়বস্তু অবলম্বনে [illegible] হয়েছেন। সম্প্রতি রবীন্দ্র সদনে বাণীচক্র [illegible] প্রচেষ্টা। কিছুটা ক্ষুধিত পাষাণের ছায়াবলম্বিত এই কাহিনীর রচয়িতা রবীন্দ্র দাস নৃত্য রচয়িতা শক্তি নাগ। সঙ্গীত-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন শৈলেন মুখার্জি ও দেবীরঞ্জন ব্যানার্জি।

পরিকল্পনার অভিনবত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু [illegible] অনুষ্ঠান অকারণ দীর্ঘ না করলে এর আবেদন আরো রসোত্তীর্ণ হতো। সংগীত ও নৃত্য সত্যিই উচ্চ মানের। উপভোগ্যতার মাত্রা বাড়ত যদি উপযুক্ত [illegible] উপস্থাপনা আরো ব্যঞ্জনাধর্মী করা যেত।

তবে সকল অসম্পূর্ণতা ভুলিয়ে দিয়েছে [illegible] সমাবেশে। নৃত্য ও সঙ্গীত উভয় ক্ষেত্রেই। রামগোপাল ভট্টাচার্য ধূর্জটি সেন ও শম্ভু ভট্টাচার্যের নৃত্যের সামান্য অবকাশেই তাঁরা মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন যথেষ্ট। মাধবী ও আমিনার চরিত্রচিত্রণে শিবানী রায় ও শ্যামলী দাস প্রাণবন্ত।

সুমিত্রা মিত্র নাগশঙ্কুমার ও আরতি মজুমদারের মত উঁচু দরের শিল্পীদের নাচের প্রাচুর্যে প্রতিটি মুহূর্ত ভরে উঠেছিল। নেপথ্যের গানগুলি শোনা গেল মানবেন্দ্র শৈলেন মুখার্জি মঞ্জু ব্যানার্জি অধীর বাগচী তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীমতী [illegible] মজুমদার। গজল আধুনিক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত—সব রকম গানই ছিল। শিল্পীরা গেয়েছেনও ভারী সুন্দর। সকল শ্রেণীর শ্রোতাদের রুচির প্রতি লক্ষ্য [illegible] ও গানের ঢালাও ব্যবস্থা ছিল বলেই শেষ পর্যন্ত প্রেক্ষাগৃহে দর্শকবৃন্দ সমাসীন ছিলেন।

ভাষ্যপাঠ আলো রূপ ও মঞ্চসজ্জার দায়িত্ব পালনের জন্য যাঁরা কৃতিত্ব পাবেন তাঁরা হলেন শান্তনু রায় সুশীল দাস ননী দাসগুপ্ত ও শোভন সান্যাল। সংলাপে ছিলেন স্বপন মুখার্জি মদন দাস নন্দনা বসু দিলীপ রায় রমা চক্রবর্তী ও গৌতম বসু।

—চিত্রাঙ্গদা

খেলার জগতে মেয়ে

শ্রীরূপা বসু

গত মরশুমে বারাণসীতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সর্বভারতীয় মহিলা ক্রিকেট প্রতিযোগিতার বিজয়ী পশ্চিমবঙ্গ ক্রিকেট দলের অধিনেত্রী শ্রীরূপা বসু প্রকৃত অর্থেই চৌখশ খেলোয়াড়। একই সঙ্গে বাস্কেটবল হকি, ব্যাডমিন্টন এবং ক্রিকেটের সর্বভারতীয় আসরে যোগদানের কৃতিত্ব এ রাজ্যের আর কোন ছেলে-মেয়ে দাবী করতে পারে না। শ্রীরূপা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের ক্রীড়া বৃত্তিও পেয়েছে।

উল্টোডাঙ্গা সি আই টি কোয়ার্টারের চারতলার ফ্ল্যাটে স্বল্পবাক বিনম্র স্কটিশ চার্চ কলেজের বি-এ পার্ট টু-র ছাত্রী শ্রীরূপার কাছ থেকে তার ক্রীড়া-কুশলতার কথা শুনছিলাম। শ্রীরূপার বাবা অশোক বসু উনবিংশ শতাব্দীর দিকপাল সমাজনেতা রাজনারায়ণ বসুর

পড়তো। শ্রীবসু নিজেও ত্রিশ দশকে ইস্টবেঙ্গলের হকি দলের নিয়মিত খেলোয়াড় ছিলেন। তবে খেলাধুলোয় খুব ছোট থেকেই শ্রীরূপা সবচেয়ে বেশী উৎসাহ পায় মায়ের কাছ থেকে। শ্রীরূপার বড় ভাই কর্ণাটকে একটি ব্যাংকের নতুন অফিসার। অন্য ভাই এখনও কলেজের ছাত্র। এদের আদি বাড়ী খোড়ালে। শ্রীঅরবিন্দ শ্রীবসুর পিসতুতো ভাই।

শ্রীরূপা ক্যালকাটা গার্লস স্কুলের ছাত্রী থাকাকালে ৬৮তে হায়দরাবাদে এবং ৬৯-এ দিল্লীতে সর্বভারতীয় স্কুল ক্রীড়ায় ব্যাডমিন্টনে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করে। এ ছাড়া ১৯৭০-এ স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্রীরূপে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাডমিন্টনেও কলকাতার প্রতিনিধিত্ব করেছে। আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বাস্কেটবলেও ১৯৭১-৭২-এ কলকাতা দলে ছিল। জাতীয় আসরেও শ্রীরূপা বাংলার বাস্কেটবল ও হকি দলে স্থান পেয়েছে। ৭১-এ কোচিনে আয়োজিত জাতীয় বাস্কেটবলে বিজয়ী বাংলা দলে শ্রীরূপা অন্যতম সদস্যা। ৭২-এ প্রাক-এশীয় প্রতিযোগিতাতে বাংলা দল চ্যাম্পিয়ান হয় এবং পাণাতে রানার্স-আপ হয়। সুতরাং ক্রিকেট অধিনায়িকা শ্রীরূপা বাস্কেটবলে প্রথম শ্রেণীর কুশলী। বর্তমানে খেলে ক্যালকাটা রেঞ্জার্স দলে। হকিতেও শ্রীরূপার ক্রীড়াকুশলতা উল্লেখ করার মত। প্যারিসে বিশ্ব মহিলা হকি কাপে খেলার জন্য ভারতের যে দল বাছাই হয়েছিল তার প্রথম বাইশ জনের মধ্যে আমাদের এই মেয়েটিও স্থান পায়। ৭৩-এ ক্রিকেট দলে ডাক পড়ায় শ্রীরূপা বাস্কেট ছেড়ে ক্রিকেট অনুশীলনে নামে। স্বল্প সময় অনুশীলন-প্রশিক্ষণের পর সেপ্টেম্বরে ট্রায়াল ম্যাচ খেলা হয় এবং তাতে নির্বাচকমণ্ডলী ওকেই দলনেত্রী মনোনীত করেন।

শ্রীরূপা বলল, প্রথমবারের সর্বভারতীয় আসরে বাংলা যায় নি। তখন তো আমাদের টিম তৈরী হয় নি। প্রথমবারের বিজয়ী বোম্বাই দলের সঙ্গে খেলতে নেমে কম রানে ইনিংস শেষ হওয়ায় আমি একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু আমাদের দলের বোলিং আর ফিল্ডিং খুব ভাল হওয়ায় জিতে যাই। তামিলনাড়ু এবং পরে ফাইনালে কর্ণাটক আমাদের সঙ্গে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। কিন্তু এবার আমার মনে একটা জোর বিশ্বাস এসেছিল যে আমরা জিতবোই। ব্যাটিং অর্ডার তৈরীর ব্যাপারে আমি প্রশিক্ষক ও ম্যানেজার বাদল চন্দ্রর পরামর্শ নিই। তবে বোলিং-এর সময় আমি নিজেই কর্তব্য স্থির করি। প্রসঙ্গত শ্রীরূপা প্রাক্তন রণজি ট্রফির খেলোয়াড় বাদল চন্দ্র ও প্রশিক্ষক সুনীল দাশগুপ্তের কথা জোরের সঙ্গে উল্লেখ করল। ওঁদের প্রশিক্ষণ রীতির গুণেই দল এতখানি সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে বলে আমার। এ রাজ্যে ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে শ্রীরূপার ধারণা—ভাল রকম অনুশীলন ও প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা পেলে আমরা অনেক উন্নতি করতে পারব। সেখানে না বাঙ্গালোর থেকে আমন্ত্রণমূলক ট্রফিতে খেলার ডাক এসেছিল। ও আগামী মাসে হবার কথা. কিন্তু অনুশীলনের ব্যবস্থার ব্যাঘাত ঘটায় হয়ত দল যাবে না। এখন মেয়েদের অনেক ক্রিকেট ক্লাব গড়ে উঠছে। কলকাতার স্থায়ী ক্লাবগুলি যদি আমাদের খেলায় সাহায্য দেন তাহলে খুব ভাল হয়। আসছে ৭৫-এর জানুয়ারীতে কলকাতায় তৃতীয় জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আসর বসবার কথা। সুতরাং আমাদের ভালভাবে তৈরী হতে হবে। আগে ২৫ ওভারের (ফাইনালে ৪০ ওভার) খেলা হয়েছে, এবার তা বেড়ে ৫০ কি ৬০ ওভার হবে। এই সঙ্গে শ্রীরূপা বলে আমাদের দল দূর থেকে মাঠে অনুশীলন করতে যেতে হয়। সরকার যদি আমাদের ট্রাম-বাসে যাতায়াত সুবিধা করে দেন, তাহলে খুব সুবিধা পাওয়া যায়। সরকার তো ইচ্ছা করলেই ট্রাম-বাসে কনসেসনের ব্যবস্থাও করতে পারেন।

সি এ বি এবং শ্রীএন সি কোলের অকুণ্ঠ সাহায্যের কথা শ্রীরূপা জানান। আর বলেন অতীতের ফুটবল কুশলী শ্রীপরিমল উকীলের কথা। এই ভদ্রলোক ওদের খেলা অনুশীলনের সমস্ত যোগাড়যন্ত্র তৈরী রেখে সবার সপ্রশংস কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

•

বাংলায় মেয়েদের ক্রিকেট দল (সংবাদপত্রের ভাষায় যাকে প্রমীলা ক্রিকেট দল বলা হয়) গঠনের ইতিহাস জানবার জন্য দেখা করেছিলুম প্রখ্যাত ফুটবল প্রশিক্ষক প্রদীপ ব্যানার্জির সহধর্মিণী শ্রীমতী আরতি ব্যানার্জির সঙ্গে। নামী খেলোয়াড়ের যোগ্য সহধর্মিণী শ্রীমতী আরতি জানালেন মেয়েদের ক্রিকেট দল গড়ার ইচ্ছা আমাদের কয়েক জনের মনেই উঁকি দিচ্ছিল। এই সময় একদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আই দে-সরকার কথাটা তুললেন। শ্রীমতী অলকা উকীল, অনিলা দাশগুপ্তা নীলিমা সেনগঙ্গোপাধ্যায় ও আমাকে নিয়ে একটি এড হক কমিটি গঠিত হল। এর থেকে তৈরী হল পশ্চিমবঙ্গ মহিলা ক্রিকেট সংস্থার কার্যকরী সমিতি। সি এ বি ও ভারতীয় ক্রিকেটের দুই দিকপাল শ্রীঅমর ঘোষ ও শ্রী এম দত্তরায়ও সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এলেন। শ্রী ঘোষ হলেন কমিটির সভাপতি। রাজ্যের ক্রীড়া-পরিচালক ও প্রখ্যাত প্রাক্তন ক্রিকেটার শ্রীপুলিন দাসও সদস্য হলেন।

শ্রীমতী ব্যানার্জি বললেন আমরা মেয়েদের খেলার আবেদন প্রচার করায় প্রায় ৫০০ জন মেয়ে এল। তার থেকে প্রাথমিকভাবে ৩৬ জনকে বেছে নেওয়া হয়। খেলার ব্যাপারে শ্রীবাদল চন্দ্র ও স্বরূপ গুহঠাকুরতা এবং সংগঠনে শ্রীমতী অলকা উকীল, অনিলা দাশগুপ্তা প্রতিমা দাশগুপ্তা এবং কুমকুম দেব সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। শ্রীমতী উকীল এই সংস্থার সাধারণ সচিব, কুমকুম দেব ও শ্রীমতী ব্যানার্জি হলেন সহকারী সচিব। আর্থিক দিক দিয়ে এবং অনুশীলনের সব রকম ব্যাপারে এই সংস্থাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেন শ্রীনিতাই কোলে। কালীঘাট ক্লাব খেলার সরঞ্জাম ও মাঠ দেয়।

শ্রীমতী ব্যানার্জি বললেন কালীঘাট মাঠে অনুশীলন দেখে ২০ জনকে বাছাই করা হয়। এরা সুনীল দাশগুপ্তের কাছে নিয়মিত প্রশিক্ষণ পেতে থাকে। বারাণসীতে দল পাঠাবার জন্য এর থেকে ১৫ জনকে চূড়ান্তভাবে বাছাই করা হয়। এদের নেত্রী মনোনীত হয় শ্রীরূপা আর সহনেত্রী চন্দ্রিমা সাহা।

শ্রীমতী ব্যানার্জি বললেন খেলাধুলোর নানা ক্ষেত্রে আমরা দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজের থেকে পিছিয়ে নেই, ক্রিকেটেই বা পিছিয়ে থাকব কেন। বিভিন্ন সংস্থা ও ক্লাবগুলির সাহায্য পেলে বাংলার মেয়েদের ক্রিকেট দলও শক্তিশালী হয়ে উঠবে এ বিশ্বাস আমার দৃঢ়।

—অমল

মাঠের নায়ক

শিবব্রত নাথ

শিবব্রত নাথ। নামটা আজ গড়ের মাঠে শুধু গড়ের মাঠেই বা কেন গোটা পশ্চিম বাংলার কারই বা অজানা? ভ্রাতৃ সঙ্ঘের লেফট স্ট্রাইকার শিবব্রতের কিন্তু সেজন্যে এতটুকু দেমাক নেই নেই অহংকারও। শিবব্রত ফলভারে তরুর মত অবনত বিনম্র প্রচারবিমুখ। নিজের কথা বলতে তাই প্রচণ্ড অনীহা, অস্বস্তি আপত্তি।

১৯৭৩ সালে শিবব্রত ভ্রাতৃ সঙ্ঘের হয়ে রোভার্স খেললো বোম্বাইয়ে গড়ের মাঠে খেললো পাওয়ার লীগ। গলফ ক্লাব রোড থেকে শিবু কালীঘাটে আমার বাড়ীর কাছে ঘর ভাড়া নিল। ১৯৭৩টা খুব ভাল খেললো। ভাল খেললে বাংলার দলনেতা হিসেবে জাতীয় জুনিয়ার ফুটবলে ([illegible])। ৭৪ সালে যেমনটি আশা করেছিলাম শিবু সে রকমটি খেলতে পারছে না পায়ে চোট আছে বলে। তবে ঐ চোট পাওয়া পা নিয়েই সেদিন লীগের খেলায় শিবু মোহনবাগানকে কাৎ করে দিয়েছে। তাছাড়া এবার একটু পড়াশুনোর চাপও আছে। চারুচন্দ্র কলেজ থেকে শিবু প্রি-ইউ পার্ট ওয়ান (কমার্স) দিল। চাকরী একটি জুটেছে। জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ায়। অবশ্য ইষ্টার্ণ রেল কাস্টমস থেকে অফার এসেছিল। অফার এসেছিল একটি লাখ টাকায় গড়া ক্লাব থেকে। শিবু সব অফার আপাতত রিজেক্ট করেছে কারণ বাড়ীর লোকেরা তো বটেই শিবু নিজেও চায় পড়াশুনোটা আর একটু চালিয়ে যেতে।

১৯৭৩ সালে এশীয় যুব ফুটবলেও হয়তো শিবব্রতের নাম ভারতীয় দলে থাকতো কিন্তু জলে থেকে কুমীরের সঙ্গে লড়াই করার অপরাধে পাতিয়ালায় প্রশিক্ষণ শিবিরে গিয়েও ষড়যন্ত্রের বলি হয়ে তাকে খালি হাতেই ফিরে আসতে হয়েছে। পাতিয়ালার স্মৃতি শিবব্রতের কাছে এক দুঃস্বপ্ন। ঐ দুঃস্বপ্নকে সহযোগী শিক্ষার্থীর সেই আসুরিক ব্যবহারকে শিবব্রত কি কোনদিন ভুলতে পারবে?

—বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

দর্শক

ইংল্যাণ্ড বনাম পাকিস্তান

প্রথম টেস্ট খেলা

লিডসে ইংল্যাণ্ড বনাম পাকিস্তানের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। বৃষ্টির জন্যে পঞ্চম দিনে খেলা আরম্ভ করাই সম্ভব হয়নি। এই খেলাটি ছিল ইংল্যাণ্ডের ৫০০তম টেস্ট খেলা। ইংল্যাণ্ড এবং পাকিস্তানের মধ্যে এই নিয়ে ২৫টি টেস্ট খেলা হ'ল এবং খেলার ফলাফল দাঁড়াল : ইংল্যাণ্ডের জয় ৯, পাকিস্তানের জয় ১ এবং খেলা ড্র ১৫।

প্রথমদিনে পাকিস্তান প্রথম ইনিংসের ৯টা উইকেট খুইয়ে ২২৭ রান সংগ্রহ করেছিল। মাজিদ খাঁ (৭৫ রান) এবং জাহির আব্বাস (৪৮ রান) ছাড়া অপর কেউ ইংল্যাণ্ডের বোলিংয়ের মুখে দাঁড়াতে পারেননি। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে মাজিদ খাঁ এবং জাহির আব্বাস দলের অতি মূল্যবান ১০০ রান সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস ২৮৫ রানের মাথায় শেষ হয়। শেষ ১০ম উইকেটের জুটিতে আসিফ মাসুদ এবং সরফরাজ নওয়াজ ৫৮ মিনিটে ৬২ রান তুলে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে পাকিস্তানের পক্ষে ১০ম উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড রান সংগ্রহ করেন।

দ্বিতীয় দিনেই ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ১৮৩ রানের মাথায় শেষ হলে পাকিস্তান প্রথম ইনিংসে ১০২ রানে এগিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় কোন উইকেট না খুইয়ে ২০ রান সংগ্রহ করেছিল। ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের ১৮৩ রানের মধ্যে ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে অ্যালান নট এবং টনি গ্রেগ দলের চরম সংকটকালে অতি মূল্যবান ৭২ রান সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন।

তৃতীয় দিনে পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস ১৭৯ রানের মাথায় পড়ে যায়। খেলায় জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২৮২ রান তুলতে ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে ২ উইকেট খুইয়ে ৩৮ রান সংগ্রহ করে।

চতুর্থ দিনে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২৩৮ (৬ উইকেটে) এইদিন ইংল্যাণ্ড আরও ৪টে উইকেট খুইয়ে তৃতীয় দিনের ৩৮ রানের (২ উইকেটে) সঙ্গে ২০০ রান যোগ করেছিল। ৩য় উইকেটের জুটিতে এডরিচ এবং ডেনেশ ৭২ রান তুলেছিলেন। এবং ৪র্থ উইকেটের জুটিতে এডরিচ এবং ফ্লেচার (নট আউট ৬৭ রান) ১২৮ মিনিটে ৮০ রান সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। খেলায় জয়লাভের জন্যে ইংল্যাণ্ডের ৪৪ রানের প্রয়োজন ছিল, হাতে জমা ছিল ৪টে উইকেট। বৃষ্টির জন্যে খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় আধঘণ্টা আগে খেলা বন্ধ হয়ে যায়।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে প্রবল বৃষ্টির জন্যে খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি। ফলে খেলাটি অমীমাংসিত থেকে যায়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পাকিস্তান : ২৮৫ রান (মাজিদ খাঁ ৭৫, সরফরাজ নওয়াজ ৫৩ এবং জাহির আব্বাস ৪৮ রান। আরনল্ড ৬৭ রানে ৩ এবং ওল্ড ৬৫ রানে ৩ উইকেট)
ও ১৭৯ রান (মুস্তাক মহম্মদ ৪৩ এবং ইমরান খাঁ ৩১ রান।

ইংল্যাণ্ড : ১৮৩ রান (ডেভিড লয়েড ৪৮ রান। আসিফ মাসুদ ৫০ রানে ৩ এবং সরফরাজ ৫১ রানে ৩ উইকেট)
ও ২৩৮ রান (৬ উইকেটে। এডরিচ ৭০, ডেনেস ৪৪, এবং ফ্লেচার নট আউট ৬৭ রান। সরফরাজ ৫৬ রানে ৪ উইকেট)

মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা

অষ্টাদশ মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা বর্তমানে সেমি-ফাইনাল পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এ বছরের প্রতিযোগিতায় সাতটি দেশ অংশগ্রহণ করেছে। প্রাথমিক লীগ পর্যায়ের 'এ' গ্রুপে খেলেছে তিনটি দেশ—গত বছরের চ্যাম্পিয়ান মালয়েশিয়া, হংকং এবং ভারতবর্ষ। লীগের 'বি' গ্রুপে অংশগ্রহণ করেছে তাইল্যাণ্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং সিঙ্গাপুর। সেমি-ফাইনালে উঠেছে—'এ' গ্রুপ থেকে মালয়েশিয়া ও হংকং এবং 'বি' গ্রুপ থেকে তাইল্যাণ্ড, দক্ষিণ কোরিয়া।

'এ' গ্রুপের লীগের খেলায় মালয়েশিয়া ১—০ গোলে হংকং এবং ৪—১ গোলে ভারতকে হারিয়ে শীর্ষস্থান পেয়েছিল। ভারত এবং হংকংয়ের খেলা ২—২ গোলে ড্র ছিল। গোল এভারেজের ভিত্তিতে হংকং শেষ পর্যন্ত সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে।

লীগ পর্যায়ের খেলা

'এ' গ্রুপ

	খে	জ	ড্র	হার	স্ব	বি	প
মালয়েশিয়া	২	২	০	০	৫	১	৪
হংকং	২	০	১	১	২	৩	১
ভারতবর্ষ	২	[illegible]	১	১	৩	৬	১

'বি' গ্রুপ

	খে	জ	ড্র	হার	স্ব	বি	প
তাইল্যাণ্ড	৩	১	২	০	৪	৩	৪
দঃ কোরিয়া	৩	১	২	০	২	১	৪
ইন্দোনেশিয়া	৩	১	১	১	৬	২	৩
সিঙ্গাপুর	৩	০	১	২	১	৭	১

বিশ্ব ক্রিকেট কাপ

আগামী বছর ৭ জুন ইংল্যাণ্ডের মাটিতে প্রথম বিশ্ব ক্রিকেট কাপ প্রতিযোগিতার আসর বসবে। এই প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ৮টি দেশ সমান দু'ভাগ হয়ে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলবে এবং প্রতি গ্রুপের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দেশ সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করবে। সেমি-ফাইনাল খেলা এইভাবে হবে : (১) ১নং গ্রুপের বিজয়ী বনাম ২নং গ্রুপের রানার্স-আপ এবং (২) ২নং গ্রুপের বিজয়ী বনাম ১নং গ্রুপের রানার্স-আপ। লীগের প্রতিটি খেলার মেয়াদ একদিন এবং প্রতি দল ৬০ ওভার করে খেলবে। সেমি-ফাইনাল এবং ফাইনাল খেলা হবে তিন দিন ধরে। ফাইনাল খেলা হবে লর্ডস মাঠে ২১ জুন।

লীগ খেলার তালিকা

গ্রুপ 'এ' : ইংল্যাণ্ড, ভারতবর্ষ, নিউজিল্যাণ্ড এবং পূর্ব আফ্রিকা।
গ্রুপ 'বি' : অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

কুকমী
গুঁড়া মশলা

হ'লো সেই আসল জিনিষ যার পেছনে রয়েছে ১২৫ বছরের অভিজ্ঞতা

অমৃত

মূল্য ৫০ পয়সা

১৪ বর্ষ

সংখ্যা ১৭
মূল্য—৫০ পয়সা

"ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন নিউজ
পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 30th August, 1974. শুক্রবার, ১৩ ভাদ্র, ১৩৮১ 50 Paise

সূচিপত্র

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

কেন এই আশাভঙ্গ ?

বিদায়ী রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি গত স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে কতকগুলো স্পষ্ট কথা বলেছেন যা সরকার ও দেশবাসীর পক্ষে খুব ভালভাবে অনুধাবন করার দরকার আছে। সাতাশ বছর পার হয়ে গেছে। একটি স্বাধীন জাতির পক্ষে এই সময়টা নিতান্ত কম নয়। যদি আশাভঙ্গ হয়ে থাকে তবে কেন তা হয়েছে তা জানা আমাদের পক্ষে আজ খুবই জরুরি। কারণ, অগ্রগতির পথে পদে পদে বাধা আসছে। বিদায়ী রাষ্ট্রপতি শুধুমাত্র সুভাষিত বাণী বিতরণ না করে দেশবাসী ও সরকারকে সতর্ক করে গেছেন। এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ।

দুর্নীতি আজ সমাজের সর্বস্তরে। এমনকি নির্বাচনেও আজকাল টাকার ছড়াছড়ি। নির্বাচনে জেতার জন্য যাঁরা টাকা খরচ করছেন অঢেল তাঁরা যে দান-খয়রাতির উদ্দেশ্যে নির্বাচনে নামছেন না তা বলাই বাহুল্য। এই কালো টাকার প্রভাব থেকে গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলোকে রক্ষা করার জন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে প্রয়োজন সচেতন সহযোগিতা। তা না করা হলে সাধারণ মানুষ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর আস্থা হারাবে। দুর্নীতির সূত্রপাতই হল নির্বাচনে কালো টাকার অশুভ প্রভাব থেকে।

গণতন্ত্র হবে নির্ভয় ও স্বাধীন। কারো ভয়ে বা কারো প্রসাদে গণতন্ত্রের নড়চড় হলে তার পরিণাম হবে মারাত্মক। ভারতবর্ষ বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের গৌরবের অধিকারী। দুর্নীতিপরায়ণদের ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এই গৌরব ভারতবর্ষ জলাঞ্জলি দিতে পারে না। সুতরাং সতর্ক হবার সময় এসেছে। দেশের সংকট বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বিদায়ী রাষ্ট্রপতি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি এবং মুদ্রাস্ফীতির উল্লেখ করেছেন। আজকের ভারতবর্ষে এই দুটো বস্তুই জনসাধারণের অশেষ দুঃখের কারণ হয়েছে। প্রতি মাসে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। সাধারণ মানুষের পক্ষে তার নাগাল পাওয়া দুঃসাধ্য। এর জন্য সরকারী স্তরে কী করণীয় তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন শ্রীগিরি। মুদ্রাস্ফীতি রোধের জন্য সরকার ইতিমধ্যেই কতকগুলো ব্যবস্থা নিয়েছেন। তার পাশাপাশি করা দরকার খাদ্যশস্য বন্টনের সুব্যবস্থা।

ভারতবর্ষের পক্ষে খাদ্যে স্বয়ম্ভর হবার পথে কোনো বাধা থাকা উচিত নয়। বস্তুত খাদ্যঘাটতি যে আমাদের খুব বেশি তা মোটেই ঠিক নয়। আসল অসুবিধা সুষ্ঠু বন্টন ব্যবস্থার। বন্টন-ব্যবস্থার ত্রুটির জন্যই দেশে প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণ প্রয়োজনমত খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে না। অসাধু ব্যবসায়ী ও মজুতদাররা খাদ্যশস্য লুকিয়ে ফেলে মাত্রাতিরিক্ত দামে তা বাজারে ছাড়ে। এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে শ্রীগিরি সরকারকে কঠোরতম ব্যবস্থা নেবার নির্দেশ দিয়েছেন।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান ও গ্রামপ্রধান দেশ। কৃষি-ব্যবস্থার উন্নয়ন গ্রামীণ অর্থনীতি পুনরুজ্জীবনে সহায়ক হবে। কৃষিবিজ্ঞানচর্চায় ভারতবর্ষ যথেষ্ট অগ্রসর। সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারলে ভারতবর্ষের কৃষি-অর্থনীতিই উন্নততর সমাজবিকাশের পথ উন্মুক্ত করে দিতে পারবে। কিন্তু তার জন্য চাই দৃঢ় সংকল্প এবং পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গিকে বাস্তবসম্মত করে তোলা। শ্রীগিরির মতে, একেবারে নিচু স্তর থেকে পরিকল্পনা এবং জমিতে গ্রামবাসীদের প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপক কর্মসূচীই ভারতের অর্থনৈতিক দুর্দশা স্থায়ীভাবে দূর করতে সক্ষম। এই আশাভঙ্গের দিনে শ্রীগিরির বাস্তব প্রস্তাব নিশ্চিতই দেশবাসীর কাছে নতুন আশার ইঙ্গিত বহন করে এনেছে। তাকে কার্যকর করার দায়িত্ব যাদের তাঁরা কি এ বিষয়ে সচেতন হবেন ?

জোয়ারের দিন

ইমদাদুল হক মিলন

এরকম বৃষ্টিপাত হচ্ছে অনবরত।

টুপটাপ টুপটাপ। একেকবার থেমে যায়, আবার নামে। মাঝে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকায় আকাশে। রাতের ভাঙা ভাঙা নোর মতো শব্দে মেঘ ডাকে গুরগুম্ করে। বৃষ্টির বেগ বাড়ে। বড় বড় ফোঁটা পড়ে টুপ টুপ শব্দে। আবার কমে যায়। গাছপালা বাতাস ছড়ায় সোঁ সোঁ শব্দ। আকাশের কোণ থেকে কালো রং মেঘ উঠে আসে। বাতাসে সেই মেঘ হালকা তুলোর মতো ওড়ে মধ্য আকাশে। আর বৃষ্টি নয়।

এবারের বর্ষা খুব দ্রুত নেমে আসছে [illegible]।

খাল বিল উপচে জল উঠে যাচ্ছে জমিতে। চোত বোশেখের খাঁ খাঁ রোদ্দুরে পুড়ে যাওয়া মাটি জলে ভেজা পাটের মতো কোমল হয়ে উঠেছে। মনে হয় আবহমান কাল ধরে এরকম বৃষ্টিপাত হচ্ছে পৃথিবীতে। এখানে কখনো সূর্য উঠেনি, নীল রোদ পড়েনি প্রান্তরে কিংবা রাতের বেলা চাঁদ উঠেনি শুভ্র জ্যোৎস্না খেলেনি চরাচরে। শুধু বৃষ্টিপাত হচ্ছে অবিরল।

ইরফানের ঘরের খড়ের চালা ভিজে চুপচুপ করছে।

জায়গায় জায়গায় ফুটো হয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল নেমে আসছে ঘরের ভেতর। একটা বড় মতো ফুটোর তলায় টিনের থালা পেতে রেখেছে পদ্মা। থেমে থেমে ফোঁটা পড়ছে সেটার উপর। আর শব্দ উঠছে টুং টাং করে। ঘরের মেঝেও ভিজে উঠেছে। স্যাঁতস্যাঁতে নরম মাটির গন্ধ পাওয়া যায় নাক উঁচলে। বর্ষা খুব প্রবল হয়ে নেমে আসছে।

পুরোনো মাথালটা মাথায় পড়লো ইরফান।

খালুই হাতে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। দরোজার বাইরে চালার সাথে দড়ির আংটায় আড়াআড়ি ঝুলানো টেটাটা নামাতে নামাতে আকাশের দিকে তাকালো। দুপুর বেলাটা কেমন কালো হয়ে উঠেছে চারদিক। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে সোনালী জিভ দেখিয়ে। তার পরপরই মেঘ ডেকে উঠছে গুমগুম করে। আঙুলের ডগা বুলিয়ে টেটার ধার পরীক্ষা করলো ইরফান। তারপর পদ্মার দিকে চেয়ে বললো আইজকা বড়ো মেঘ ভাঙছে মা। কই মাছ উজাবো।

পদ্মা ভীত গলায় বললো ঠান্ডা পড়াতে পারে। কম নই তুমার মাছ মারতে যাইবা। আমাগর কই মাছ লাগে না।

হা হা করে হাসল ইরফান।

জোয়ারের দিনে ঠান্ডা পড়ে না। আসল কতা ক বউ। জোয়ারের মাছ ধরলি তর খারাপ লাগে।

পদ্মা চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে মাছগুলোর বড়ো সুখের সময় এডা। তুমি কি নিঠুর গো! এসময় মাছ না মারলি কি অয়!

আবার শব্দ করে হাসে ইরফান।

তুই আহনো পোলাপাইন রইছুল বউ।

তারপর আঙিনার পিছল মাটি দিয়ে হেঁটে যায়। পেছন থেকে কথা বলে পদ্মা।

হাঁজে হাঁজে আইয়ো পইরো। [illegible] বাইতে আর মাছ মরাতি যাইতে পারবা না।

ইরফান কথা বলে না। ঠোঁট ছড়িয়ে হাসে। তারপর আঙিনা ছড়িয়ে মাঠের দিকে নেমে যায়।

পুকুর ডোবা টইটম্বর হয়ে জল উপচে পড়ছে মাঠে।

ধান পাটের জমিতে গোড়ালী ডুবে যাওয়ার মতো জল। পাট পাতা বৃষ্টিতে ভিজে ঘন সবুজ হয়ে উঠেছে হঠাৎ করে। নদী থেকে খাল বেয়ে জল আসছে গ্রামে। এ অঞ্চলটা নীচু। খাল ডোবার সংখ্যা বেশি। খুব অল্প সময়ে পুকুর ডোবা ভরে জল উঠে যায় মাঠে।

টুপ টুপ অনবরত বৃষ্টি পড়ছে জলের উপর।

বাতাসে ঝিলমিলিয়ে ঢেউ কাটে। কনকনে শীত গড়ায়। এসময় ধান পাটের ক্ষেতে মাছ পাওয়া যাবে না। মাছেরা সব কেলি করে রাতের বেলা। উদ্দাম ছুটোছুটি করে অল্প জলে। পাঁর ধরে।

মিয়া বাড়ির পুকুর থেকে জল নামছে পাশের নীচু জমিতে।

পুঁটি মাছ নেমে আসছে ঝাক ঝাক। পুঁটি মাছের শরীরের দু পাশে লাল রং [illegible] সির পড়ে এসময়। পেট ভর্তি ডিম। আর শরীর কি নরম।

মিয়া বাড়ির ঘন গাছগাছালির ভেতর ছায়া। ছমছমে অন্ধকার জমে। ঝিম মারা গাছপালা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজে। সর সর একটানা শব্দ হয়। এক টুকরো কালো মেঘ ধীরে ধীরে উঠে আসে মধ্য আকাশে। অন্ধকার ঘনায়।

মাঠে না গিয়ে মিয়াবাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলো ইরফান। জায়গাটা নিরিবিলি। কিছু ঝোপ-ঝাড় আছে, লম্বা লম্বা আড়ালি আর বাকসা ঘাস আছে। এসব জংগলে সিংমাছ উঠার সম্ভাবনা। এ মাছগুলো সব সময় উঠে। আট দশটা একসঙ্গে হয়ে খেলা করে। ক্যোৎ ক্যোৎ শব্দ করে। তখন [illegible] একসঙ্গে অনেকগুলো গাঁথা যায়। পেটের ভেতর ডিম থাকে বলে কম জোরী মাছগুলো। অনায়াসে খালুইতে তোলা যায়।

মিয়াদের আমবাগানের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আকাশে মেঘের গুরুগুরু ডাক শুনলো ইরফান। বুকের ভেতরটা খুশীতে নেচে উঠলো [illegible]। [illegible] দিনে আজ প্রথম এরকম শব্দে মেঘ ডাকছে। আজ কই মাছ না উঠে যায় না। মেঘের এরকম ডাকে উচ্ছলতা বাড়ে কই মাছের। জলায় থাকতে পারে না। কানকো [illegible] পায়ের মতো ব্যবহার করে উঠে আসে ডাঙ্গায়।

অখিলা বড় চালাক।

পুকুর থেকে চারদিক দিয়ে জল উপচাতে দেখে ছোট মতো নালা কেটে দিয়েছে এক জায়গায়। [illegible] জলটা নেমে আসছে ওখান দিয়ে। সঙ্গে পুঁটি মাছের ঝাঁক। অখিলা সকাল থেকে একটানা সন্ধ্যে পর্যন্ত মাছ ধরে। খালুই, [illegible] পুঁটি মাছ। [illegible] দিয়ে ভেশালের মতো করে ছোট জাল পেতে দিয়েছে নালার মুখে। জল গড়ায় ওটার ভেতর দিয়ে। মাছগুলো আটকে থাকে জালে। লাফালাফি করে রূপোলী শরীরে।

এসব ছোট মাছ ধরতে ভালো লাগে ইরফানের।

কাল অখিল পুঁটি মাছ [illegible] পদ্মার জন্য। সেই মাছ দেখে পদ্মা কিরকম আফসোস করেছিলো। পুঁটি মাছের লাল শির দেখিয়ে বলেছিলো মাছেরা ক্যামন শাড়ি পিনছে দ্যাখ! এইডা বড়ো খুশির সময় ওগর। এই মাছগুলানার তুমরা মার!

ইরফান রাগ করেছিলো।

তর মত সোয়াগের কতা বউ। মাছের ভালা সময় দেইখ্যা অমরা মাছ মারমু না!

ইরফানকে দেখে দাঁত ছড়িয়ে হাসলো অখিলা।

উদোম গায়ে লুঙ্গি কাছা মেরে বসে মাছ ধরছে সে। গন্ধরাজ ফুলের মতো থোকা থোকা পুঁটি মাছ তুলে রাখছে খালুইতে। অখিলার মোষের মতো কালো শরীরে বৃষ্টির জল গড়াচ্ছে। হঠাৎই অখিলার ঠোঁটের দিকে চোখ গেলো ইরফানের। [illegible] ধরেছে ঠোঁটের। সারাদিন বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে মাছ ধরেছে বলে এমন অবস্থা।

উঁকি মেরে খালুইয়ের ভেতরটা দেখলো ইরফান।

কি র‍্যা অখিলার পো, কতডি পাইলি?

অখিলা তেমন করে [illegible]।

দুই খালুই থুইয়া আইচি। এইডা ভরলে যামুগা। ভারি শীত করে মেবাই।

কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে দাঁত ঠুকে যায় অখিলার।

[illegible] কাঁপে। [illegible] দিয়ে জল গড়ানোর দৃশ্য দেখতে দেখতে কথা বলে ইরফান।

পুঁডি মাছ এত ধইরা কি করবি? হেরচে বাইত্তে গিয়া গুমা। কাম আইবো!

অখিলা কথা বলে না। হাসে। একটা মেটে সাপ এসে চোখের পলকে জড়িয়ে যায় জালে। পুরো শরীরটা প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে উথাল পাথাল করে জলটা। স্বচ্ছ জলের তলায় পুঁটি [illegible] দেখা যায়। [illegible] উজান ঠেলে পালায় মাছগুলো। ইরফান [illegible] বিড় বিড় করে গালি আওড়ায়। হারামুন্দির পুত হাপেই [illegible] থাইলে! [illegible] ছাড়াইলাম। হাঙ্গর একবার প্যাচাইয়া গ্যালে সহজে ছাড়ান যায় না। জাল ছিড়া যায়।

ইরফান কথা বলে না [illegible]লাটা ডিঙিয়ে দক্ষিণের জংলা মাঠে নেমে যায়। [illegible] হাগড়া, আড়ালি আর বাকসা ঘাসের জংগল। [illegible] ডুবে [illegible] জংগলের দিকে [illegible] যায় ইরফান। শব্দ পেলে মাছ ছুটে [illegible] ইরফান। মাছদের ইন্দ্রিয় খুব সচেতন।

পায়ের কাছ থেকে এক জোড়া কোলা ব্যাঙ [illegible] চমকে টেটা বাগিয়ে ধরলো ইরফান। তারপর ব্যাঙ দেখে হেসে [illegible] নিঃশব্দে। কোলা ব্যাঙরাও ডিম ছাড়ে এসময়। আধা জল আধা শুকনোয় পড়ে থেকে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর একটানা ডাকে [illegible] পর পর কালো দানা দানা ডিম ছাড়ে। জলের ভেতর এলোমেলো ছড়িয়ে থাকে ডিমগুলো।

হু হু করে বাতাস দেয়।

মিয়া বাড়ির গাছপালা সাপের মতো সোঁ সোঁ শব্দ ছড়ায়। [illegible] কালো মেঘ এসে থির হয়। বিদ্যুৎ চমকায়। মেঘ ডাকে গুরগুর করে। বৃষ্টির তেজ বাড়ে। মাথলাটা এক হাতে [illegible] চড় ঠিক করে ইরফান। হিজল গাছের

তলায় দাঁড়িয়ে কোমর থেকে বিড়ি আর দেয়াশলাই বের করে। বৃষ্টি এবং হাওয়া সেরে আঁচ বাঁচিয়ে কায়দা করে বিড়ি ধরায়। গলা জুড়িতে ধুয়া ছাড়তে ছাড়তে মিয়াদের পুকুরের দিকে তাকায়। পুকুরের শরীর পোয়াতি মেয়েমানুষের মতো ভরাট। সেখানে বৃষ্টি পড়ে। মনে হয় যেনো অসংখ্য পোনামাছ পুট পুট করে ভাসছে পুকুরের জলে। একটা গাংই লেজ নাড়িয়ে আস্তে আস্তে সাঁতার কাটে। হু হু বাতাস দেয়। বাতাসে কনকনে শীত। আঁধলা জাল গুটিয়ে বাড়ি চলে গেছে কখন।

বিড়ি টানতে টানতে হাঁটে ইরফান।

বিড়ির ধোঁয়া উত্তেজনা দেয় শরীরে। পায়ের তলায় শীতল জলের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না।

একটা ছোট ঝোপের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো ইরফান অল্প অল্প নড়ছে ঝোপটা। মুহূর্তে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো দরফানের চোখ। এটা অড়ালির ঝোপ। ভেতরে কেমন খল খল শব্দ। মুহূর্ত দেরী করলো না ইরফান। আন্দাজে টেটা চালিয়ে দিলো খচ করে। স্থির হয়ে গেলো ঝোপটা। বিড়িটা শেষাশেষি চলে এসেছে। হাতে আঁচ লাগে। সুখটান দিয়ে বিড়িটা ফেলে দিলো ইরফান। তারপর যত্ন করে টেটাটা তুলতে গেলো।

উরে বাপু রা...

অজান্তেই শব্দটা বেরিয়ে এলো মুখ থেকে। টেটাটা অল্প একটু টানতেই শরীর দেখা গেলো সাপটার। কালোর ভেতর হলুদ ডোরাকাটা। বড় নৌকার কাছির মতো মোটা। হাঁকরা মুখের ভেতর একটা পেট-মোটা কৈ মাছের অর্ধেকটা সেঁধে আছে। ঠিক ঘাড়ের কাছটায় টেটা গেঁথেছে।

টেটা ছেড়ে সরে এলো ইরফান।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে ভয় পেতে লাগলো। কি সাপ! জাতটাত নয়তো! না, জাত সাপেরা মাছ খায় না। বোরা টোরা হবে!

এরকম ভাবলে সাহস কাজ করল মনের ভেতর। সাবধানে হেঁটে এসে টেটাটা টেনে আনলো একটু। যাই হোক শলা ভালো করে গেঁথেছে। ছুটে এসে কামড়াতে পারবে না।

সাপটা এতক্ষণ প্রচণ্ড শক্তিতে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছে। পুরো শরীরটা টেটার সঙ্গে প্যাঁচিয়ে উথাল-পাথাল করছে। কিন্তু কাজ হচ্ছে না। সাবধানে ঝোপের ভেতর থেকে টেটাটা বের করে আনলো ইরফান। এবং চমকে উঠলো ভীষণভাবে।

তুড়ে বাপু রা...

আসলে ইরফানের ভাবনাই ঠিক। একটা পুরোনো কাল বোরা মাছ খেতে এসে তার টেটায় গেঁথে গেছে। কিন্তু এটাকে ছাড়ানো যায় কি করে! তাছাড়া বোরার মধ্যে এ-জাতটা বড় খারাপ। কামড়ালে বিপদ আছে।

অপেক্ষাকৃত উচ্চশব্দে মেঘ ডাকলো এ সময়। চারদিকে তাকিয়ে অবাক হলো ইরফান। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বাসে বাসে জল-কার জন্মে উঠেছে গাছগাছালিতে। ব্যাঙে কোথাও গলা ছেড়ে ডাকতে শুরু করেছে কোলা ব্যাঙ।

বৃষ্টি কমে এসেছে।

মাঠের দিকটা এখনো ফর্সা। কিন্তু অন্ধকার হতে দেরী হবে না। একটু থেমে কি ভাবলো ইরফান। তারপর টেটাটা ফেলে রেখে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলো। সাপটা যদি একা একা নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় তো ভালো, না হয় কাল সকালে এসে যা হোক ব্যবস্থা করা যাবে। এখন ওটাকে ঘাটানো সুবিধের হবে না। তাছাড়া সন্ধ্যেও হয়ে আসছে। বাড়ি ফিরে সন্ধ্যা রাতে ছোটখাট ঘুম দিতে হবে একটা। মাঝরাতে বিলে যেতে হবে। পশ্চিমের বিলে বোয়ালমাছ পাবে ধরে রাতের বেলা।

বাড়ি ফিরে দেখলো আবছা আঁধারে গোয়ালঘরে গরু বাঁধছে পদ্মা। বকনাটা হাম্বা হাম্বা করে চেঁচাচ্ছে। লেজ ঝাপটা মেরে মশা তাড়াচ্ছে। এই রকম বৃষ্টি বাদল অথচ মশার কমতি নেই। গরুগুলো থাকতেও কষ্ট করে। লেজ ঝাপটে মশা তাড়ায়।

আঙিনার মাটি পচে উঠছে বৃষ্টিতে। একাকার কাদা। পা রাখা যায় না। আঠালো মাটির কাদা কামড়ে ধরে পা। পিচ্ছিল কাদা। মাটিতে কেমন সোঁদা গন্ধ।

ইরফানকে শুধু খালি হাতে ফিরতে দেখে অবাক হলো পদ্মা।

ঠোঁটে হাসি টেনে বললো, টেডা কৈ?

ইরফান সে কথার জবাব না করে ঘরের সামনের ইট দুটোর উপর দাঁড়িয়ে বদনার জলে পায়ের কাদা ছাড়াতে লাগলো। পদ্মা ঘরে যেয়ে কুপি জ্বালালো। এখন বৃষ্টি নেই। দমকা দমকা বাতাস দিচ্ছে। গাছ-পালায় সোঁ সোঁ শব্দ বাজে। যেন ভয়ানক তেজি কোন সাপ ফুঁসছে থেমে থেমে। মাথলাটা খুলে রাখে ইরফান। তারপর গামছায় শরীর মুছতে মুছতে কথা বলে।

মনডায় কইছিলো হিংয়ের পীর অইবো! টেডা মারতেই দেখলাম কলিবে মা ও'রে বাপ্‌রে! হালার পুতে পাচ আঙ্গের কম না। টেডা ভাইঙ্গা হালাইতে চয়। হালাই থুইয়া আইয়া পড়লাম।

চোখ বড় করে ভয় খায় পদ্মা।

মাগো! তুমারে হাপেই খাইবো একদিন!

ঠা ঠা করে হাসে ইরফান।

দে ভাত দে।

মাটির হাঁড়ি থেকে ভাত বেড়ে দেয় পদ্মা। গপাগপ ভাত খায় ইরফান। পদ্মা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

কি মানুষ গো। ডর ভয় নাই পরানে!

ইরফান পদ্মার মুখে তাকায়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শরীর দেখে। হাসে।

তর শরীলডারও তো জোয়ার লাগচে মনে অয়!

পদ্মা মাথা নীচু করে হাসে।

তুমি আবার এহগল দ্যাহ নি!

ঢক ঢক করে জল খায় ইরফান। বিড়ি ধরিয়ে টানে। দাহি র‍্যা! দাহি!

তারপর টান হয়ে শুয়ে পড়ে হোগলার উপর। চিত হয়ে বিড়ির ধোঁয়া উড়ায়।

হারিকলডা আগ্গাইয়া থো।

পদ্মা ঝামটা মারে। না, আইজ্‌কা রাইতে আর মাছ মারতে যাইতে পারবা না!

ইরফান বিড়ি টানে। খুক খুক করে কাশে।

প্যাচাইল পাড়িছ না। আগ্গাইয়া থো হারিকলডা। রাইতে আর তরে জাগামু না।

পদ্মা আর কথা বলে না। কাচ পরিষ্কার করে কুপির সলতেয় হ্যারিকেন জ্বালায়। ইরফান শুয়ে থেকে দেখে গোমড়া হয়ে গেছে পদ্মার মুখ। বউটা এরকমই। একটুতেই বাচ্চা মেয়ের মতো অভিমানী হয়ে ওঠে। গাল ফুলিয়ে মুখ গোমড়া করে। কথা বলে না সহজে।

কুপি নিভিয়ে হ্যারিকেনটা পাশে রাখে পদ্মা।

তারপর শুয়ে পড়ে ইরফানের গা ঘেঁষে। কিন্তু কথা বলে না। শব্দ করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। ইরফান আস্তে করে জিজ্ঞেস করে, পলোডা কই রাখছস?

উত্তর মেলে না সহজে। আবার জানতে চায় ইরফান।

কতা কয়না ক্যা!

এবার কথা বলে পদ্মা। গরুর গারে রাখচি।

তারপর আবার সব চুপচাপ। নিরেট নীরবতা। হ্যারিকেনটা থির হয়ে ম্লান আলো ছড়ায় ঘরের ভেতর। সোঁ সোঁ বাতাস দেয় বাইরের গাছপালা। বিদ্যুৎ চমকায়। গুরু-গুরু মেঘ ডাকে। অথচ বৃষ্টি হয় না।

ইরফানের শরীরে ঘন হয়ে মিশে যায় পদ্মা।

ঘুরে শোয় ইরফান।

গুমাইয়া পড় বউ।

পদ্মা সে কথা কানে নেয় না। ইরফানের পিঠে হাত রাখে। আস্তে আস্তে হাত বুলায়

গুমাইলা?

ক্যা! অস্পষ্ট শব্দ করে ইরফান।

বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে পদ্মা। 'ছুখিনার পোলা অইবো'!

হাছা?

হ!

আগের মতো হাত বুলায় ইরফানের শরীরে। 'আমাগ যদি একডা পোলা অইতো'!

কথা বলে না ইরফান। ঘুমে চোখ টানে তার। পদ্মা কান্না কান্না গলায় বলে,

আমারে ইট্টুও মায়া কর না তুমি!

ইরফান ঘুমের ভান করে। পদ্মা দু-হাতে জড়িয়ে ধরে তাকে। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসে গলায় বলে

আমরে ইট্টু আদর দবো না গো! আদর করলে আমারও পোলা অইব!

এবার বিরক্ত হয় ইরফান। গর্জে উঠে রাগে।

চুপ কর মাগী। খালি রঙ্গের প্যাচাইল! রাইরে মাছ মারতে যামু। তর লগে পিরীত করতে পারমু না অহনে। গুমাইতে দ্য।

মুখের উপর চড় মেরে থামিয়ে দিলো যেন। থতমত খেয়ে গেলো পদ্মা। তখন ঘুমের ভেতর তলিয়ে যাচ্ছে ইরফান। গুমরে গুমরে পদ্মা কাঁদে। সে টের পায় না।

দুপুর রাতে চট করে ঘুম কেটে গেল ইরফানের।

এ রকম অভ্যেস দাঁড়িয়ে গেছে কয়েক-দিনে। গভীর রাতে ঘুমের ভেতর থেকে কেউ যেনো ডেকে যায় তাকে। 'উঠ ইরফান। বিলে মাছ উঠছে! বোয়ালবা পীর ধরছে! দুনিয়া ভইরা গ্যাছে মাছে!'

ঘুম কেটে যায় ইরফানের। বাঁশের বেড়ার ফাঁকে হু হু করে বাতাস আসে ঘরের ভেতর। বাতাসে মাছের আসটে গন্ধ পায় ইরফান। সেই গন্ধ বিড়ির নেশার মতো কাজ করে।

হ্যারিকেনটা উসকে দিলো ইরফান।

উঠে বিড়ি ধরালো। পদ্মাকে দেখলো কাত হয়ে হয়ে ঘুমুচ্ছে। হ্যারিকেনের অস্বচ্ছ আলোয় কান্নার চিহ্ন দেখা গেলো পদ্মার চোখে। ঘুমানোর আগে প্রচুর কেঁদেছে পদ্মা বোঝা যায়। নিঃশব্দে হাসলো। ইরফান। অহনতরি পোলাপাইন রইছে বউডা!'

হ্যারিকেন হাতে উঠে দাঁড়ালো ইরফান।

না পদ্মাকে জাগাবে না। টের পেলে বউডা আবার আপত্তি তুলবে। 'একলা একলা ডর করে না আমার!' কিংবা 'জোয়ারের মাছ ধইরো না তুমার আল্লার কছম! এডা বড়ো ভালা নুমায় ওগর!'

এসব শুনলে হাসি পায় ইরফানের। কি সব ছেলেমানুষী। মাছেরা বাচ্চা দেবে তাতে ওর কি!

ঝাপ সরিয়ে বেরিয়ে এলো ইরফান।

বাইরে দাঁড়িয়ে সেটা আবার লাগিয়ে দিলো ঠিকঠাক করে। তারপর আকাশের দিকে তাকালো। ম্যাটম্যাটে জ্যোৎস্না উঠেছে এখন আকাশে মেঘের চলাচল আছে। আমগাছের মাথায় পাতলা শাড়িতে মুখ ঢাকা টকটকে মেয়ে মানুষের মতো চাঁদের অস্তিত্ব। মেঘ এসে বারবার ঢেকে দেয় চাঁদ। তখন আবছা আঁধার নামে।

সাপের মতো শব্দে বাতাস দেয়।

আঙিনার পিচ্ছিল মাটি পা কামড়ে ধরে। গোয়াল ঘরের দিকে যায় ইরফান। ঘরের ভেতর থেকে পদ্মার বিড়বিড়ে কথার শব্দ আসে। তারপর কান্নার। তাই শুনে নিঃশব্দে হাসে ইরফান।

বউডা এহেন পোলাপাইন রইছে! গুমের তালে কত্তা কয় কান্দে!

গোয়াল ঘরে পলো খোঁজে ইরফান।

গরুগুলো লেজ ঝাপটে মশা তাড়ায়। বকনাটা দাপাদাপি করে। হ্যারিকেনটা উসকে দেয় ইরফান। চালার কাছ থেকে

পলো টেনে নামায়। বাতাস দেয় সোঁ সোঁ করে। কাছে কোথাও ঘ্যাঙগর ঘ্যাঙগর ব্যাঙ ডাকে। এক হাতে ঘাড়ের উপর দিয়ে পিঠে পলো ধরে রেখে অন্য হাতে হ্যারিকেন ঝুলিয়ে মাঠে নেমে যায় ইরফান। বুকের ভেতর উত্তেজনা ঢিব-ঢিব করে।

ইরফানের আঙিনা ছাড়িয়েই মাঠ।

গোড়ালি ডুবে যাওয়ার মতো জল উঠে গেছে মাঠে। সেই মাঠ দিয়ে ছপছপ শব্দে হেঁটে যায় ইরফান। পশ্চিমের বিল ছাড়া বোয়াল পাওয়া যায় না। ধান পাটের ক্ষেতে পীর ধরে বোয়াল মাছ। একটা আর একটার গায়ে এমনভাবে লেগে যায় যে দুটোকে একটা মনে হয়। আর সেকি শব্দ! মানুষ কাছে গেলেও পালায় না। যৌবন কি অদ্ভূত ক্ষমতায় ভুলিয়ে দেয় মৃত্যুভয়!

টেটা দিয়ে পীরের বোয়াল মারা যায় না।

টেটা মারলে একটার বেশি গাঁথে না। পলো দিয়ে আটকে দিতে হয়। কিন্তু তাতে ভয় আছে। পলোতে বোয়াল আটকে সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে হাত দিলে কামড়ে খেয়ে ফেলবে। বোয়াল মাছ এ সময় পাগল হয়ে উঠে। এ যেন দুরন্ত বিদ্রোহ!

এসব ভেবে হাসে ইরফান।

বোয়ালের মন্ত্র তার জানা আছে। পলোর ভেতর ঘন্টাখানেক আটকে রাখলে নরম হয়ে যায় মাছ। তখন ভয় থাকে না। নির্বিঘ্নে তুলে আনো।

ইরফানের পায়ের শব্দে ছোট ছোট মাছ ছুটে পালায়।

ব্যাঙ লাফিয়ে সরে যায়। ঘাসবনে চুট-পটু শব্দ হয়। খোলা মাঠে জলো বাতাস গড়ায়। মরা জ্যোৎস্না থির হয়ে থাকে। প্রান্তরে বিদ্যুৎ চমকায়। মেঘ ডাকে। কিন্তু বৃষ্টি হয় না। রাত্রি বড় আশ্চর্য গভীরতায় বিভোর।

দূরের ছাড়াবাড়ির সামনে আলো দেখা যায় টিমটিমে।

কেউ মাছ ধরতে বেরিয়েছে। দেশ ভরে গেছে মাছে। মানুষেরা সেই মাছ ধরছে। অথচ পদ্মা কি। জোয়ারের মাছ ধরতে নিষেধ করে।

ছাড়াবাড়িটা বায়ে রেখে বিলের দিকে এগোয় ইরফান।

বিলের প্রান্ত থেকে ক্রমশঃ জমাট হতে শুরু করেছে পাটক্ষেত। ঘন আঁধার ঘাপটি মেরে বসেছে পাটক্ষেতের ভেতর। পাতলা জ্যোৎস্নার অস্তিত্ব বুঝা যায় না। আস্তে আস্তে হাঁটে ইরফান। পা ছুঁয়ে ছুঁয়ে মাছ চলে যায়। মনে মনে আফশোস করে ইরফান। টেডা আনলে কাম অইতো। মাছে বিল ভইরা গ্যাছে।

পাটক্ষেতের ভেতর দিয়ে সরু আল পথ জলে ডোবা। ঘন পাট গাছের চাপে পথের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। তবুও সেই পথে চিনে চিনে হাঁটে ইরফান। এতো রাতে বিলে কেউ আসে না মাছ ধরতে। মানুষেরা ভয় পায়। জোয়ারে বোয়ালের সঙ্গে ভূতের আছর থাকে। কপালে সিঁদুর রং টিপ-পড়া অতিকায় বোয়াল মাছ মরিচিকার মতো পথ ভুলিয়ে গভীর জলায় ডুবিয়ে মারে। এরকম প্রবাদ আছে। মানুষেরা তা বিশ্বেস করে। হাসি পায় ইরফানের। মানুষেরা কি বোকা।

এখোন বাতাস নেই।

পাটক্ষেত ঘুমের মতো মগ্ন। অথচ কান পাতলে আশ্চর্য রকমের শব্দ পাওয়া যায়। আসলে মৌনতার ভেতরও শব্দ থাকে।

কিন্তু পাটক্ষেত এমন নিঃসাড়ে কেন?

বিলের মাঝামাঝি চলে এসেছে ইরফান। অথচ বোয়ালের পীর কিংবা তার কোন আভাস পর্যন্ত পাচ্ছে না। মাছ কি হলো।

দূরের চটানে শেয়াল ডাকে।

আখ ক্ষেতের অল্প জলে শেয়ালদের চলাচল স্পষ্ট হয়। ইরফান নিশিপাওয়া মানুষের মতো হাঁটে। পায়ের কাছে চেলা-মাছ তির-তির করে। জলো বাতাস উঠে আসে বিল থেকে। বিড়ির নেশা পায়। কিন্তু বিড়ি ধরায় না ইরফান। পদ্মার কথা মনে আসে। পদ্মাষ যেন যেয়ারে মাছ! পীর ধরতে চায়!

হঠাৎ খলখল শব্দ হয় পাটক্ষেতের ভেতর।

সচেতন হয়ে উঠে ইরফান। দাঁড়িয়ে পড়ে। বোয়ালের পীর না হয়ে যায় না। কাঁধ থেকে পলো নামিয়ে হাতে আনে ইরফান। হ্যারিকেনটা তুলে ধরে বিড়ালের মতো নিঃশব্দে এগোয়। শব্দের উৎস খেয়াল করে। কিন্তু কাছাকাছি গিয়ে শব্দ পায় না। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। কান খাড়া করে শব্দের জন্য। আলতো বাতাসে পাটের পাতা শরীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে খেলা করে তার। কাছাকাছি শব্দ হয় আবার। একটানা মিহি খলখল শব্দ। আগের মতো এগিয়ে যায় ইরফান। কিন্তু কাছাকাছি গিয়ে স্থির করতে পারে না কোথায় শব্দ। আবার দাঁড়িয়ে পড়ে। কান পেতে থাকে। চোখ তীক্ষ্ণ করে। এবার শব্দ হয় ডান দিকে। সে এগিয়ে যায়। মাছ দেখে না। আবার দাঁড়ায়। আবার শব্দ হয়। এবার পেছনে। ঘুরে দাঁড়ায় ইরফান। পেছন দিকে হাঁটে। কিন্তু মাছ দেখে না। উদগ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

এক সময় সামনে পেছনে ডানে বায়ে অসংখ্য বোয়ালের খলখল শব্দ পেলো ইরফান। দিক-বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেললো সে। এক পা সামনে এক পা পেছনে, ডানে, বায়ে চারদিকে চরকবাজীর মতো ঘুড়তে শুরু করলো সে। অথচ একটাও মাছ দেখলো না। শুধু মাছের অবিরাম খলখল শব্দ তার স্নায়ু জুড়ে নেচে চললো। এ সময় মরা চাঁদের তলায় ঘন কালো মেঘ এসে থির হলো। খাড়া হয়ে আঁধার নামলো বিলে। এবং মাছের শব্দটা ক্রমশঃ সরে যেতে শুরু করলো দূরে। ইরফান সেই শব্দ খেয়াল করে এগুলো। কিন্তু সে যতো এগোয় শব্দও ততো সরে যায়। নেশার মতো কিছু একটা কাজ করে তার ভেতর। সে এগোয়। শব্দ সরে যায়। সে এগোয়। জল ক্রমশ গভীর হয়।

তবু তাকে ॥ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

শিক্ষা নেই
তবু তাকে কথা বলতে দাও।
সে বলুক জলের স্বচ্ছন্দ ভাষা
লিখতে পারলে লিখুক মেঘের যে কোনো অনুবাদ।
তাকে শুধু বলা হোক
ঢেউ মানেই গভীরতা নয়
নয় সমুদ্রআসক্ত কোনো
অনিবার্য নদী;
গ্রামীণ রহস্য থেকে যার বিস্তৃতি খুঁজছে মহাদেশ।
সে ঘটনা করুক তার ব্যক্তিগত প্রাথমিক স্নান
পা এবং শরীর ডোবানো, সর্বাঙ্গীণ ক্লেদ ফেলে আসা।

শিক্ষা নেই
তবু তাকে লিখতে দাও
আয়ুর নতুন অহংকার:
তার শরীর অদ্ভুত বেড়িয়ে ফিরুক
অচেনা মানুষে
চেনা নিশ্বাসের শব্দে;
প্রাণ
ছন্দপতনও গ্রাহ্য না করে ফিরে যাক
ছিন্ননাড়ী শৈশবের রক্তমাখা চিৎকারের কাছে;
জলের ভিতর জলে
যেখানে রমণী আজো
জননীর মতো এক মুখ শেখা নদী।

সত্তার ভেতরে ॥ বার্ণিক রায়

নির্জন যন্ত্রণা নিয়ে একা থাকা যায় না জীবনে,
চোখের জলের গান পাখির ওড়ায় ভেসে যায়—
নিঃসঙ্গতা কান্না তোলে দেহের গোপনে;
কাদা করে দেয় এই মাটির শরীর,
জলের বিরহে মাটি চেয়ে থাকে নরম বিকেলে

নিবিড় সবুজ, আর মোরগ ফুলের লালে
চুলের শ্বাসের গন্ধে ডুবে গেলে
ফুলের বুকের তৃষ্ণা জুড়ে থাকে সারা রাত,
নীরব পাতার ফাঁকে নিশীথিনী চমকে ওঠে—
লোকাল ট্রেনের আলো হেঁটে যায় দূরে

ঝরা পাপড়ির নিঃসঙ্গ বাতাস মাটি কাম[illegible]ড়ে থাকে,
ওপরে টেলিফোনের তারে কাক, কা-কা [illegible], চড়ুই

দিবস রজনী
নিঃসঙ্গ যন্ত্রণা শুধু সত্তায় ভেতরে মুখোমুখি কথা কয়॥

সুখ ॥ অমরনাথ বসু

মূল্যহীন জীবন নিয়ে কি যে লাভ
দুঃখ দুঃখ দুঃখ কেবলই দুঃখ আমার
দিনভোর রাতভোর নির্লজ্জ বেহায়া শরীর ডুবে যায়
চোখের কালোজলে

মূল্যহীন জীবন নিয়ে কি যে মূল্যবোধ!
কেউ তো কারুর কথা বোঝে না জানে না মানে না
শুধু নির্বিঘ্নেই শেষকৃত্য

কান্না…কান্না…কান্না…কেবলই কান্না আমার
বুকের জমাট অন্ধকারে

আজ কাল কিংবা পরশু হলেই শেষ পোশাকী জীবন
মূল্যহীন জীবন চিনে কেবলই অভিযোগ অনুযোগ
রক্তের ভিতরে রক্তেরই ক্রম আন্দোলন
কণ্ঠনালীতে যেনবা গেঁথে দেয় এক সূক্ষ্ম আলপিন

কলকাতা, কলকাতা

প্রেমের পয়লা কিস্তি

শেকসপীয়ার যে মহাকবি ছিলেন এটা বোঝার জন্যে তাঁর মোটা-মোটা বইগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করার দরকার নেই, এমনকি রাত জেগে নোটবই মুখস্থ করাও বাহুল্য, তাঁর দু'একটা উক্তি, কিম্বা বইপত্র নামকরণের কায়দা দেখেই সেটা বিলক্ষণ টের পাওয়া যায়। যেমন ধরুন—'অল্‌স্‌ ওয়েল দ্যাট এণ্ডস ওয়েল'। পৃথিবীর সমস্ত কবি, প্রেমিক এবং পকেটমারের বাড়িতেই এই মহাবাক্যটি দেয়ালে বেশ পোস্টার সাইজের হরফে লেখা থাকা উচিত। কিম্বা ধরুন—'লাভস লেবার'স লস্ট'। এ বাণীটিও প্রত্যেক ফুটবল ফ্যান, প্রেমিক এবং ইলেকশান-প্রার্থীর বোঝা উচিত।

পাঠক, লক্ষ্য করে দেখেছেন নিশ্চয়ই, দুটি এগজাম্পল্‌-এই প্রেমিক কথাটি কেমন? না হয়ে উপায়ই নেই। প্রেমে পড়লে মানুষ এমন বিগলিত অবস্থায় এসে পৌঁছয় যে জলের মতো যেকোনো পাত্রে ঢাললেই দিব্যি সেই পাত্রের চেহারা নিয়ে নেয়।

তা, কথাটা উঠল কী করে তা বলি। কিন্তু তার আগে ঐ ইংরেজি নামের একটা বাংলা করে নেওয়া যাক। ব্যাপারটা এইরকম দাঁড় করালে কী হয়—"প্রেমের পরিশ্রম পয়মাল?" জানি, 'পরিশ্রম' কথাটা একটু খটোমটো লাগছে। কিন্তু ওটা করতে হয়েছে অ্যালিটারেশানের খাতিরে। শেকসপীয়ার যেমন 'লাভস লেবার'স লস্ট' বলে এল-এ লয়কারী করেছেন, আমিও তেমনি 'প' নিয়ে পরিতোরা করছিলাম আর কি। কিম্বা থাকগে, একেবারে প্রাকৃত বাংলায় ভাষা পাল্টে ফেলি, বলা যাক, "প্রেম করতে গালে চড়।"

এবার আসল কথায় আসা যাক।

সেদিন তো 'আইস পাঠক' বলে আপনাদের প্রেম করতে ডাকলাম, তারপর সেজেগুজে নিজেই বেরিয়ে পড়লাম। একটু লজ্জা-লজ্জা করছিল বটে। তা অমন হয়। কোথায় যেন এই ধরনের একটা বর্ণনাও পড়েছি মনে পড়ছে। কোনো একটা গল্পতেই হবে বোধকরি, লেখক লিখেছিলেন, কে যেন এক পুরনো পাপী (মানে অনেকবার প্রেম-টেম করেছেন ভদ্রলোক) নতুন করে প্রেমে পড়ে বেশ একটু ব্রীড়াবনত হয়ে উঠেছিলেন। লেখক মন্তব্য করছেন, (স্মৃতি থেকে কোট করছি)—নায়ক সর্বদাই মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। তা হাসিবেন নাইবা কেন? সিদ্ধির সরবৎ খাইলে অথবা জীবনে স্ত্রীলোকের আবির্ভাব ঘটিতে থাকিলে ঐরূপই হয়। না হাসিয়া তখন পারা যায় না। জীবনে আমি অনেক এরূপ দেখিয়াছি: পাঁচ বৎসর মেডিক্যাল কলেজে পড়া ডাক্তার নারীদেহের সকল রহস্যই যিনি কাটিয়া-কাটিয়া ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া দেখিয়াছেন তাঁহাকেও আমি বিবাহের দিন টোপর-মাথায় হাসিতে দেখিয়াছি।"

বুঝুন একবার ব্যাপার। তা আমিও সেদিন কলকাতা নাম্নী নাগরীর সঙ্গে কিঞ্চিৎ আশনাই করার মানসে বেরিয়েছিলাম। আকাশে সেদিন চাঁদ ছিল কিনা দেখি নি। কিন্তু রাস্তাঘাটে নিয়ন আলোর আর্টিফিশিয়াল জ্যোৎস্নার ঘাটতি ছিল না। মনটাও বেশ একটু উড়ু-উড়ু ছিল। আর জায়গাটা সাদার্ন এভিনিউয়ের ধার ঘেঁষে হওয়ার ফলে ফুটপাথও বেশ ফাঁকা ছিল। (প্রসঙ্গত একটু পরোপকারের লোভ সামলাতে পারছি না, পাঠক একটু ক্ষমা করবেন। সাদার্ন এভিনিউয়ের ফুটপাথ বেশ প্রশস্ত, কিন্তু একটিও ঝুপড়ি দোকান নেই। যদি মনে করা হয় যে ওখানে লোকজন কম আনাগোনা করে, তাহলে বুঝতে হবে হকারদের মার্কেট সার্ভে নিখুঁত নয়। লেকের দিকটাতে সকালে এবং বিশেষ করে বিকেলে বিস্তর লোক চলাচল করে। তাছাড়া আশেপাশে দোকানদারও কম নেই। উৎসাহী দোকানদারেরা তাড়াতাড়ি তৎপর হন এবং খালি ফুটপাথের অপচয় বন্ধ করান।)

যাহোক রাস্তা দিয়ে তো বেশ যাচ্ছিলাম। এই সময়, হ্যাঁ ঠিক এই সময়, তার পরিচয়। হ্যাঁ প্রথমই তার [illegible]— অর্থাৎ কিনা [illegible]। [illegible] অন্ধকার, এমনকি [illegible] দেখতে পেলাম না। কী আর বলা [illegible] হাঁটি-হাঁটি পায়ে। কিন্তু একটু পরেই টের পেলাম আরো একজনও যেন আমার পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলছেন। তাঁর নিঃশ্বাসের শব্দ আমার কানে এল এবং তাঁর করপল্লবের [illegible] আমার [illegible]। [illegible] কিছু [illegible] টের পেলাম [illegible] কলকাতা।

তারপর কী হল বলুন দেখি! এ ঘটনার [illegible] কী? আপনারা [illegible] [illegible] অনেক [illegible] গতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াল ঠাহর করুন একবার?

কী পারছেন না তো? শুনুন তাহলে।

আমি [illegible] কপালে [illegible] পড়লাম। কিন্তু কী [illegible] [illegible] আগেই [illegible] [illegible] একবার [illegible]। এখানেই [illegible]। [illegible] ছিলাম কিনা [illegible] একেবারে [illegible] আর কি!

ইতিমধ্যে আরো একজন দাঁড়িয়ে পড়েছেন অকুস্থানের কাছাকাছি। একজনের পকেটে টর্চলাইট ছিল, তারই আলোয় দেখতে পেলাম—

ঢাকনিহীন ঝাঁঝরির গর্তে পা-মচকে পড়ে আছে এক ব্যক্তি এবং তার হাতে গড সেভ দ কিং, আমার সেই হারানো মানিব্যাগটি।

প্রেমের পয়লা কিস্তি এই অবধি রইল।

—[illegible]

বাংলার খবর

প্রকৃতির মার

উত্তর বাংলায় প্লাবনের পর দক্ষিণ বাংলায় ঘূর্ণিঝড়। স্বাধীনতা দিবসে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রধান শিকার মেদিনীপুর। কিন্তু ২৪ পরগণাতেও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কম নয়। এক মেদিনীপুরেই জন বারো প্রাণ হারিয়েছেন বলে আশঙ্কা। ২৪ পরগণা, হুগলী আর কলকাতায় মিলেশ ধরলে নিহতের সংখ্যা সত্তর থেকে উনিশ। মেদিনীপুরে লাখখানেক লোক ঘরবাড়ি হারিয়ে সর্বস্বান্ত। পনের থেকে বিশ হাজার বাড়ি ধসে গেছে। নিরাশ্রয় মানুষ আশ্রয় খুঁজছেন উঁচু জায়গায়। স্কুল কিংবা ঐ ধরনের পাকা বাড়িতে। সরকারিভাবেই এখন স্বীকার করা হচ্ছে যে, এত ভীষণ ঘূর্ণিঝড় এই বাংলায় আগে খুব বেশি হয় নি। ঝড়ের সঙ্গে আবার প্রবল বৃষ্টি, ফলে নদীতে জল বেড়ে প্লাবন। সুবর্ণরেখা, শিলাবতী কেলেঘাই, জল বেড়েছে সব নদীতেই।

একদিকে এই প্রকৃতির মার, তার ওপর দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন ছেড়েছে জল। ঘূর্ণিঝড়ের পর দু দিন না পেরোতেই মাইথন আর পাঞ্চেত জলাধার থেকে ছাড়া হয় ৫০ হাজার কিউসেক জল। আর তারপরে আরো কিছু সব মিলিয়ে প্রায় সোয়া লাখ কিউসেক। ফলে বিশেষ করে তমলুক আর ঘাটাল মহকুমার অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছে। প্রায় দেড় লাখ একর চাষের জমি জলে ডুবে যায়।

এই বিরাট বিপর্যয়ের মুখে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ত্রাণের ব্যবস্থা। কিন্তু সেই ব্যবস্থাকে মোটেই যথেষ্ট বলা চলে না, যদিও সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছে যে ত্রাণের ব্যাপারে কোনো ত্রুটিই থাকবে না। একে তো জেলা কর্তৃপক্ষ এত বড় একটা বিপর্যয়ের জন্যে তৈরি ছিলেন না, তার ওপর ত্রাণের কাজ চালানোর মতো সাজসরঞ্জামও তাঁদের হাতে যথেষ্ট নয়। যেমন, দরকার যদি হয় দশ হাজার ত্রিপলের, তবে তাঁদের হাতে হয়ত ছিল শ' তিনেক। রাজ্য সরকার অবশ্য বিশেষ সাহায্য বরাদ্দ করেছেন মেদিনীপুরের বন্যাকবলিত মানুষের জন্যে ২৫০ টন খাদ্যশস্য, দু হাজার করে ধুতি আর শাড়ি, দু হাজার শিশুদের পোষাক, পাঁচ কুইন্টাল গুঁড়ো দুধ। বলা বাহুল্য, প্রয়োজনের তুলনায় এই বরাদ্দ যথেষ্ট নয়। ফলে ঐসব এলাকায় জিনিসপত্রের আগুন দাম। সাহায্যের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবার করা হবে স্থির হয়েছে। যে-সব এলাকায় ঘূর্ণিঝড় হয়ে থাকে সেখানকার দুর্দশা লাঘবের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারেরই একটি কমিটি নানারকম সুপারিশ করেছেন। ঐসব এলাকায় আগে থাকতেই যথেষ্ট খাদ্যশস্য, কাপড়চোপড়, ত্রিপল ইত্যাদি মজুত করে রাখার ব্যবস্থা করার জন্যে সুপারিশ করা হয়। কিন্তু এ-সব কিছুই হয় নি। আর ত্রাণের জন্যে কেন্দ্রীয় সাহায্যও চট করে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। উত্তর বাংলার বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে দিল্লী হাত উপুড় করতে ইচ্ছুক নয় বলে আগেই জানিয়ে দিয়েছে। অথচ উত্তর বাংলায় অনেক জেলাতেই এখনও চলছে বন্যার তাণ্ডব। বিহারে মহানন্দার বাঁধ ভেঙে জল এসে ঢুকেছে মালদহ আর পশ্চিম দিনাজপুরে। মুখ্যমন্ত্রী কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে আবার বন্যার্ত এলাকা দেখে এসেছেন। এদিকে বন্যার হাত থেকে মুর্শিদাবাদও রেহাই পায় নি। এই জেলাতেও হাজার পনের একর চাষের জমি জলের তলায়। প্রায় আড়াই হাজার ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে। অথচ রাজ্য সরকারের হাতে ত্রাণের টাকা বাড়ন্ত। বাজেট বরাদ্দ ছিল সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা। এর মধ্যেই খরচ হয়ে গেছে সাত কোটি টাকার মতো।

আলো এবং অন্ধকার

ঠিক যেদিন থেকে রেশনের লোডশেডিংয়ের অনিয়মকে বাগে আনার চেষ্টা সুরু হওয়ার কথা তার আগের দিনই বৃহত্তর কলকাতার ব্যাপক এলাকা অন্ধকারে ডুবে গেল। প্রথম দুঃসংবাদ এলো ব্যাণ্ডেলের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে। সেখানে দুটি বয়লারের টিউবে দেখা দিয়েছে ছিদ্র। ফলে দুটি ইউনিট বিকল। প্রায় একই সঙ্গে দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটেডের একটি ইউনিট অচল। ওদিকে সি ই এস সি'র মূলাজোড় কেন্দ্রে মেরামতির জন্যে বিজলী উৎপাদন বন্ধ। রেশন চালু হওয়ার মুখে একই সঙ্গে এই বিপর্যয়, ফলে স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ দেখা দেয় যে এর সঙ্গে কি কোনো নাশকতার ব্যাপার জড়িত নাকি এটা শুধুই দুর্ঘটনা? কিন্তু সরকারিভাবে কোনো নাশকতার কথা স্বীকার করা হয় নি। বলা হচ্ছে, বয়লারের এই বিপদের প্রধান কারণ খারাপ কয়লা। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্যে যে-ধরনের কয়লা দরকার তা ইদানিং মিলছে না, বিশেষ করে কয়লা খনি সরকারের হাতে যাওয়ার পর। ওদিকে ব্যাণ্ডেলের চারটি ইউনিটকে একই সঙ্গে ক্রমাগত চালানোও দুর্ঘটনার একটা কারণ। বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটাতে গিয়ে কোনো ইউনিটই নিয়ম অনুযায়ী বিশ্রাম পাচ্ছে না।

রেশন চালু হওয়ার মুখে বিপর্যয় যদি রহস্যজনক মনে হয়ে থাকে তবে তার দিন দুয়েক পর থেকেই অবস্থার নাটকীয় উন্নতিকেও কিছুটা "দুর্বোধ্য" বলে মনে হতে পারে। যে-যোগানের ভিত্তিতে বিজলী রেশন চালু হয় তার তুলনায় প্রথম দিনে ঘাটতি দেখা দেয় প্রায় ২৫০ মেগাওয়াট। কিন্তু স্বাধীনতা দিবসের পর থেকে যোগান রীতিমতো ভালো। ফলে লোডশেডিং একরকম দরকারই হয় নি। দিনে প্রায় ৫০০ মেগাওয়াট বিজলী অনেক দিনই বৃহত্তর কলকাতার কপালে জোটে নি। কী করে সম্ভব হলো এই "অসম্ভব"? সব উৎপাদন কেন্দ্রেই নাকি এখন পুরোদমে বিজলী তৈরির চেষ্টা চলছে। তবে ব্যাণ্ডেলের মতো দুর্ঘটনা এই সুখকে যে-কোনো মুহূর্তেই বানচাল করে দিতে পারে। এদিকে রেশন ব্যবস্থা অনুযায়ী যাতে সকলে বিজলী ব্যবহার করেন সেদিকে নজর রাখার জন্যে সরকারি কর্মচারীরা কল-কারখানা ও পাড়ায় পাড়ায় যাবেন বলে সরকার ঠিক করেছেন।

চাল-চিন্তা

এই বাংলায় খাদ্যদ্রব্যের চড়া দাম নিয়ে সকলেই উদ্বিগ্ন, তবু তার মধ্যে প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্বেগের একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। কংগ্রেসের কর্মসমিতির সভায় মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলেছেন, খাদ্যের অবস্থা ভয়াবহ। সরকারের হাতে যা খাদ্যশস্য আছে তা দিয়ে বড় জোর সেপ্টেম্বর মাসটা রেশন ব্যবস্থা টিঁকিয়ে রাখা যাবে। কিন্তু অকটোবরে দিল্লীর কাছ থেকে বাড়তি চাল-গম না পেলে চলবে না।

বিভিন্ন জেলার খাদ্যাবস্থা নিয়ে কর্মসমিতির সদস্যেরা যে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তা অকারণে নয়। গ্রাম বাংলায় চালের দাম এখন আগুন। এই সময়টা ঘাটতিরই সময়, ফলে প্রতি বছরই চালের দাম বাড়ে। কিন্তু এ-বছরের মতো আগে কখনও বাড়ে নি। বাঁকুড়া বা পুরুলিয়ার মতো ঘাটতি এলাকাতে তো দাম চড়েছেই (প্রতি কিলো চার থেকে সাড়ে চার)। দাম চড়ছে বর্ধমান-বীরভূমের মতো জেলাতেও, যেগুলো উদ্বৃত্ত এলাকা বলে গণ্য হয়ে থাকে। ধান-চাল চলাচলে যে কর্ডন ব্যবস্থা চালু ছিল তা তুলে দেওয়ার পরও অবস্থার উন্নতির কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। পুরুলিয়া-বাঁকুড়া থেকে যে-সব খবর আসছে তা ভয়াবহ। ঐসব জেলার অনেক এলাকায় মানুষ বেশ কিছু দিনের মধ্যে ভাতের মুখ দেখে নি। আটা জুটলে খাচ্ছে, না হলে মাইলো।

প্রদেশ কংগ্রেসের সভায় সরকারের খাদ্যনীতির সমালোচনা শোনা যায়। ধান-চাল সংগ্রহে সরকারি ব্যর্থতার কথা মুখ্যমন্ত্রীও স্বীকার করে নেন। সভায় অভিযোগ ওঠে, জোতদার, মজুতদার আর চালকলের মালিকেরা মিলে সরকারের খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টাকে বানচাল করে দিয়েছে। নির্ধারিত পাঁচ লাখ টনের মধ্যে চালকলের মালিকদেরই দেওয়ার কথা ছিল তিন লাখ ৬০ হাজার টন। কিন্তু তাঁরা দিয়েছেন মাত্র ৫৬ হাজার টন। মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেন যে, পুলিশ দিয়ে লুকোনো-খাদ্যশস্য উদ্ধার করা সম্ভব হবে না। তাই তিনি এ-ব্যাপারে ছাত্রযুবকদের এগিয়ে আসতে ডাক দেন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঘোষণা করার জন্যে একটি প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত সেনেটে গৃহীত হলো। কিছুদিন আগে সেনেটের বৈঠকে এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা সুরু হয়। কিন্তু অধ্যাপক নির্মল বসু প্রস্তাবটির বিরোধিতা করতে উঠলে সভায় হাজির একদল ছাত্র বিক্ষোভ জানাতে সুরু করে। ফলে সভা পণ্ড হয়ে যায়। কিন্তু যে-বৈঠকে প্রস্তাবটি গৃহীত হলো সেখানেও বিরোধিতা কম হয় নি। অনেক সদস্যই চেয়েছিলেন, এই বিষয়ে আলোচনা আপাতত মুলতুবি থাকুক। বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত একটি কমিটি (গাণি কমিটি) এ-বিষয়ে একটি রিপোর্ট দিয়েছেন। সেই রিপোর্টটি সরকারিভাবে এখনও প্রকাশিত হয় নি, যদিও "বিশ্বস্ত সূত্রে" সব সুপারিশই জানা হয়ে গেছে। তবু সেনেটের সভায় অনেক সদস্য বলেন যে ঐ রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার আগে কোনো প্রস্তাব গ্রহণ ঠিক হবে না। ঘণ্টা চারেক বিতর্কের পর প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। অনেক সদস্য যে এই প্রস্তাবে আপত্তি করেছেন তার কারণ তাঁদের আশঙ্কা, এর ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার ক্ষুণ্ণ হবে, কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের খবরদারি বাড়বে। কিন্তু প্রস্তাবের সমর্থকেরা বলতে চাইছেন, কলকাতাকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঘোষণার মানে এই নয় যে এটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হবে। এর ফলে কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য পেতে সুবিধে হবে ঠিকই, কিন্তু তা সত্ত্বেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর রাজ্য সরকার ও বিধানসভার এক্তিয়ার বজায় থাকবে, এমন ব্যবস্থা করাও সম্ভব। তবে গাণি কমিটি তো শুধু কেন্দ্রের কাছ থেকে বেশি টাকা পাওয়ার পথই বাৎলান নি। সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কাঠামো বদলেরও সুপারিশ করেছেন। সেই সুপারিশ গৃহীত হলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্তিয়ার এখনকার তুলনায় খাটো হবে। উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনও তাই চান। তাঁর মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আগের মর্যাদা ফিরিয়ে আনার সেটাই হবে পথ।

—দেবদত্ত

২০-৮-৭৪

[illegible]শে বিদেশে

[illegible] গিরির শেষ ভাষণ

[illegible] ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের [illegible] শ্রী ভি ভি গিরি যে ভাষণ [illegible] সেটাই ছিল রাষ্ট্রপতি হিসাবে [illegible] উপলক্ষে তাঁর শেষ ভাষণ।

[illegible] এই ভাষণের একটা উল্লেখযোগ্য [illegible] এই যে, তিনি নির্বাচনে টাকার খেলা [illegible] চলছে তাতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এমনকি নির্বাচনে টাকার [illegible] যে দুর্নীতির একটা বড় উৎস [illegible] তিনি বলেছেন। এর আগে আর [illegible] এমন উচ্চ মহল থেকে নির্বাচনে টাকার খেলার কথা স্বীকার করা হয়েছে কিনা সন্দেহ আছে।

শ্রীগিরি এই ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন যে সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতাদের একসঙ্গে বসে সলাপরামর্শ করে এই পরিস্থিতির প্রতিকার করতে হবে। তিনি বলেছেন, এই সমস্যার মোকাবেলা ঠিকমত করা না হলে অনেক মহলে লালিত মূল্যবোধগুলির উপর জনসাধারণ তাদের আস্থা হারিয়ে ফেলবে।

শ্রীগিরি তাঁর এই ভাষণে কালো টাকার চোরাকারবার ও মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের আহ্বান জানিয়েছেন। বাজার দর কমাবার জন্য তিনি খাদ্যশস্যসহ সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সুষ্ঠু সরকারি বণ্টন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বলেছেন। পরিকল্পিত উন্নয়নের উপর জোর দিয়ে তিনি বলেছেন যে, দারিদ্র্য ও বেকারির চ্যালেঞ্জের একমাত্র উত্তর এটাই।

ক্ষেতেখামারে ও কলকারখানায় কর্মরত 'কমরেডদের' সম্বোধন করে শ্রীগিরি বলেন, তাঁরা যেন উপলব্ধি করেন যে, দেশ যখন অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তখন শিল্পে, পরিবহণে অথবা কোন অত্যাবশ্যক উদ্যোগ সংস্থায় ধর্মঘট বা লক-আউট উৎপাদনের ব্যাঘাত ঘটাবে ও আত্মঘাতী হবে। মুদ্রাস্ফীতি ও উচ্চমূল্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার হাতিয়ার হল অব্যাহত উৎপাদন, বিশেষ করে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক পণ্যের।'

•

লালকেল্লায় পতাকা উত্তোলন

লালকেল্লার প্রাকারে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন যে, দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটে হতাশ না হয়ে সমগ্র জাতিকে এই সংকটের মোকাবেলা করতে হবে। ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য জাতি গঠনের কাজে যোগ দিতে ও যেসব অন্যায় অনাচার জাতির প্রাণশক্তি নষ্ট করে দিচ্ছে সেইসব অন্যায় ও অনাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সামিল হতে তিনি দেশের মানুষদের প্রতি আহ্বান জানান।

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাবে মানুষের যে কষ্ট হচ্ছে সেকথার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, এবিষয়ে জনসাধারণেরও কর্তব্য আছে। যেসব জিনিস অত্যাবশ্যক নয় সেগুলি বাদ দিয়ে চলার চেষ্টা করতে হবে। অভ্যস্ত খাদ্যও বদলাতে হবে।

•

বিহারে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা

বিহারের মানুষ যখন বন্যায় ভাসছেন তখন সেখানকার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন জল্পনাকল্পনা শুরু হয়েছে।

বিহার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সীতারাম কেশরী যেভাবে প্রকাশ্যে মুখ্যমন্ত্রী আবদুল গফুরের বিরোধিতায় নেমে পড়েছেন। শ্রীললিত-নারায়ণ মিশ্রের অনুগামীরা আগে থেকেই গফুরকে সরাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন কারণ তাঁদের আশঙ্কা গফুরকে সরাতে না পারলে তিনিই হয়ত মন্ত্রিসভা থেকে তাঁদের প্রতিনিধিদের সরিয়ে দেবেন। এখন শ্রীকেশরীও তাঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বলছেন, গফুর জয়প্রকাশের আন্দোলনের মোকাবেলা করতে ও বন্যাত্রাণের সংগঠন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছেন।

•

কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ

শেখ আবদুল্লা বলেছেন যে, কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কেন্দ্রের সঙ্গে বোঝাপড়া আগামী সেপ্টেম্বর বা অকটোবর মাসের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে যাবে বলে তিনি আশা করছেন।

সংখ্যালঘু-অধ্যুষিত জম্মু ও লাদাখের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য শেখ আবদুল্লা সম্প্রতি শ্রীনগরে একটি সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। ঐ সম্মেলনের শেষে তিনি বলেন যে, ১৯৫৩ সালের পর জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে যেসব আইন চালু করা হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কেন্দ্রের সঙ্গে বোঝাপড়া কার্যকর করার পদ্ধতি নিয়ে অবশ্য এখনও আলোচনা হয় নি। নতুন নির্বাচন করে, কোয়ালিশন গঠন করে অথবা অন্যভাবে এই বোঝাপড়া কার্যকর করা যেতে পারে।

•

প্রেসিডেন্ট ফোর্ডের অভিষেক

ওয়াটারগেট কেলেংকারির কালিমা গায়ে মেখে রিচার্ড নিকসন হোয়াইট হাউস থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৮তম প্রেসিডেন্টের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন জেরাল্ড ফোর্ড।

•

প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর ফোর্ড মার্কিন কংগ্রেসের সামনে তাঁর যে প্রথম আনুষ্ঠানিক ভাষণ দিয়েছেন তাতে তিনি বলেছেন যে, নিকসনের আমলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করেছে তিনি সেই নীতিই অনুসরণ করে যাবেন।

প্রেসিডেন্ট ফোর্ডের ঘোষণা অনুযায়ী এই পররাষ্ট্রনীতির কতকগুলি উল্লেখযোগ্য উপাদান হল—(১) সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে বিরোধের অবসান ও সামরিক অস্ত্র-সজ্জায় প্রতিযোগিতা বন্ধ করা। (২) চীনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতিসাধন। (৩) পশ্চিম এশিয়ায় স্থায়ী শান্তির সন্ধান। (৪) এশিয়ার বন্ধুরাষ্ট্রগুলির প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা ও তাদের নিরাপত্তা স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি আমেরিকার সমর্থন।

কোন কোন পর্যবেক্ষক মনে করছেন, এশিয়ার বন্ধুরাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তা রক্ষার এই প্রতিশ্রুতি পুনরায় ঘোষণা করে প্রেসিডেন্ট ফোর্ড পাকিস্তানকে এই ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন যে, নিকসন-কিসিঞ্জারের পররাষ্ট্রনীতিতে পাকিস্তানের যে স্থান ছিল তার কোন পরিবর্তন হবে না। এটা সকলেই জানেন যে, নিকসনের আমলে পাকিস্তানের তথাকথিত নিরাপত্তাই দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির একটি মূল বিষয় ছিল।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং অবশ্য ফোর্ডের এই ভাষণের মধ্যে নিরাশ হওয়ার মত কিছু দেখেন নি। সংসদে তাঁর বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ফোর্ডের বক্তৃতায় তিনি ভারত-বিরোধী কোন ইঙ্গিত দেখেন নি। তিনি বলেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের উন্নতির জন্য [illegible] চালিয়ে যাওয়া হবে। ভারত-মার্কিন সম্পর্কের উন্নতি থেকে যেটুকু সুবিধা পাওয়া যাবে সেটুকু সুবিধা গ্রহণ করতে ভারত সরকার চেষ্টার ত্রুটি করবেন না।

•

সাইপ্রাসের যুদ্ধ

তুরস্ক সাইপ্রাসে পুনরায় সামরিক অভিযান চালাবার ফলে ঐ দ্বীপের পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে উঠেছে। তুর্কী সেনাবাহিনী ঐ দ্বীপের উত্তরাংশে তুর্কী-অধ্যুষিত অঞ্চলে কার্যত একটি পৃথক সরকার স্থাপন করার পর এখন রাজধানী নিকোসিয়াকে ঘিরে ফেলেছে।

এদিকে, গ্রীস ন্যাটো থেকে তার সামরিক বাহিনী সরিয়ে নিয়ে গেছে এবং গ্রীসে প্রচণ্ড মার্কিন-বিরোধী বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। একদল বিক্ষোভকারী এথেন্সে মার্কিন দূতাবাসে হানা দিয়ে সেখানকার মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে হত্যা করেছে।

—পুণ্ডরীক

নবনির্বাচিত পঞ্চম রাষ্ট্রপতি

ঊনসত্তর বৎসর বয়স্ক ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ বিপুল ভোটাধিক্যে ভারতের পঞ্চম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিনি তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধী দলগুলির মনোনীত প্রার্থী ত্রিদিব চৌধুরীকে পরাজিত করেছেন।

শ্রীআহমেদ মোট যে বৈধ ভোট পেয়েছেন তার মূল্য ৭,৬৫,৫৮৭। আর শ্রীচৌধুরীর ভোটের মূল্য ১,৮৯,১৯৬। অর্থাৎ শ্রীআহমেদ মোট ভোটের ৮০·২ শতাংশ ও শ্রীচৌধুরী ১৯·৮ শতাংশ পেয়েছেন।

একমাত্র কেরল ছাড়া অন্য সব রাজ্যেই শ্রীআহমেদ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছেন।

২০ আগস্ট বিকালে এই নির্বাচনের ফল ঘোষিত হওয়ার পর ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ জাতির উদ্দেশে এক বাণীতে বলেছেন, 'বর্তমান সঙ্কট থেকে দেশকে উদ্ধার করার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করতে হবে। আমরা একথা উপলব্ধি করি যে, ভারতে প্রতিটি মানুষ অত্যন্ত দুর্দশার মধ্যে জীবনযাপন করছে। সরকার যা করছেন তা ছাড়াও আমাদের সকলের সর্বপ্রকার চেষ্টার দ্বারা আমরা এই দুর্দশা কাটিয়ে উঠতে পারব।' দেশের এই সর্বোচ্চ পদের মর্যাদা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শ্রীআহমেদ বলেছেন, সংবিধানের মর্যাদা রক্ষা করে এবং ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সংবিধান-নির্দিষ্ট আদর্শগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যাতে সংসদের কার্য পরিচালিত হয় সেটা সুনিশ্চিত করাই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য হবে।

নির্বাচকমণ্ডলীর মোট ৩৭৯৭ জন সদস্য এই নির্বাচনে ভোট দিয়েছিলেন। ২৩২ জন ভোটদানে বিরত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১৮৬ জন সি-পি-আই ২৯ জন মুস্লিম লীগ, ৫ জন জম্মু ও কাশ্মীরের জামাৎ-ই-ইসলামী ও ১৫ জন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সি পি এম সদস্য।

গুজরাট বিধানসভা ভেঙে দেওয়ায় এই নির্বাচনে গুজরাট অংশ গ্রহণ করে নি।

নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রত্যাশিত পার্টি লাইন থেকে ভোটের ব্যতিক্রম বিশেষ কিছু হয় নি। সি-পি-আই ও মুস্লিম লীগ আগে থেকেই জানিয়েছিল যে, তারা এই নির্বাচনে যোগ দেবে না। শ্রীআহমেদ কংগ্রেসের ভোট ছাড়াও ডি-এম-কে, ভারতীয় ক্রান্তি দলের ওবেরয় গোষ্ঠী ও কিছুসংখ্যক নির্দলীয় সদস্যের ভোট পেয়েছেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীচৌধুরী সি-পি-এম, সোস্যালিস্ট পার্টি আর-এস-পি, সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি স্বতন্ত্র পার্টি, জনসঙ্ঘ, সংগঠন কংগ্রেস প্রভৃতি সমেত প্রায় সব কংগ্রেসবিরোধী দলের ভোট পেয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরির পাঁচ বৎসরের কার্যকাল শেষ হওয়ায় শ্রীআহমেদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন।

অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে শ্রীগিরি সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, তাঁর মতে নৈতিক কর্তৃত্ব প্রয়োগ করাই রাষ্ট্রপতির কাজ এবং তাঁর কার্যকালে তিনি এই কর্তৃত্ব প্রয়োগেরই চেষ্টা করেছেন।

দীর্ঘ জনজীবনের স্বীকৃতি

ফকরুদ্দিন আলি আহমেদই ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি যিনি বিংশ শতাব্দীর মানুষ। ১৯০৫ সালের মে মাসে জন্মগ্রহণ করে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লির স্টিফেন কলেজ ও কেম্ব্রিজে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং সুদীর্ঘকাল জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত থেকে আজ তিনি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হলেন।

ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ একজন পুরাতন স্বাধীনতা যোদ্ধা। ১৯৩১ সাল থেকে তিনি কংগ্রেসে আছেন। দেশবিভাগের প্রাক্কালে যেসব জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করেও মুসলিম লীগের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করেছেন ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ তাঁদের অন্যতম। ১৯৬৯ সালে কংগ্রেস যখন বিভক্ত হয় তখন যেসব নেতা শ্রীমতী গান্ধীর সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে তিনিও ছিলেন।

১৯৩৮-৩৯ সালে গোপীনাথ বড়দলুই-এর নেতৃত্বে গঠিত আসামের প্রথম কংগ্রেস মন্ত্রিসভায় ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ অর্থ ও রাজস্বমন্ত্রী হিসাবে যোগ দেন। পরবর্তীকালে তিনি আসামের একাধিক মন্ত্রিসভায় বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছেন। ১৯৫৬ সাল থেকে কিছুকাল তিনি আসামে অ্যাডভোকেট-জেনারেলের পদেও কাজ করেছেন। ১৯৬৬ সালে তিনি সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দেন।

শ্রীআহমেদ স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে দুবার কারাদণ্ড ভোগ করেছেন ২৮ বছর আগে তিনি প্রথম কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হন। [illegible] সাল থেকে তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও কংগ্রেস পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্য আছেন।

আগেই বলা হয়েছে, শ্রীআহমেদের বয়স ৬৯ বছর। তাঁর স্ত্রী বেগম আবিদা একজন চিত্রশিল্পী। ১৯৪৫ সালে তাঁদের বিয়ে হয়। তাঁদের দুই পুত্র ও এক কন্যা।

শ্রীআহমেদের খেলাধুলোর শখ আছে। তিনি নিখিল ভারত লন টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। বেশ কিছুকাল যাবৎ তিনি আসাম ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন।

প্রমোদবাবু-জ্যোতিবাবু আরো একখানা ট্রেন ছাড়লেন

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন শেষ হলো। এই নির্বাচনে সর্বভারতীয়ভাবে সি পি আই অংশ গ্রহণ করেনি। আর সি পি আই (এম) সারা ভারতে অংশ গ্রহণ করেছে, শুধু বাদ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সি পি আই (এম)-এর সদস্যরা। সি পি আই অংশ গ্রহণ করেন এই কথা বলে যে, কংগ্রেসপ্রার্থী ফকরুদ্দীন আলী আমেদ কংগ্রেসের দক্ষিণঘেঁষা নীতির প্রার্থী, আর শ্রীত্রিদিব চৌধুরী দক্ষিণপন্থী দলের সাহায্যপুষ্ট প্রার্থী। অতএব সি পি আই নির্বাচনে নিজেকে সাচ্চা বামপন্থী প্রমাণ করতে ভোট বয়কট করলো। সি পি আই (এম) ছিলো শ্রীত্রিদিব চৌধুরীর প্রার্থী-পদের অন্যতম সমর্থক। কিন্তু এই সমর্থক হয়েও পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্যদের ভোটাধিকার প্রয়োগে তারা এগিয়ে এলো না। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কোনও বৎসরিক ঘটনা নয় বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের তাৎপর্যহীনও নয়। বিশেষ করে '৬৯-এর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ছিলো সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক সংগ্রাম ও শক্তি সমাবেশে গভীর প্রতিশ্রুতিময়। এবারই প্রথম একজন ভারতের বামপন্থী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা ও মার্কসবাদী চিন্তা নায়ক রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন প্রার্থী হয়েছিলেন। কোনও কনফেশনাল নয়, আটপৌরে ধরনের শিবির নয়, সরাসরি কংগ্রেসপ্রার্থীর সংগে কংগ্রেস-বিরোধী বামপন্থী প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেসপ্রার্থী জয়ী হবেন এবিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ কোনও অবস্থাতেই ছিলো না। কিন্তু এই লড়াইটি ছিলো প্রতীকী, যে কারণে আগেই বলেছি শক্তি সমাবেশে গভীর প্রতিশ্রুতিময়। সেই লড়াইয়ে সারা ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত দুটি সর্বভারতীয় বামপন্থীদল, যার একজন রইলো নিষ্ক্রিয় ও নীরব নিরপেক্ষতার কম্বল মুড়ি দিয়ে, আর একজন, যার সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ঘাঁটি পশ্চিমবঙ্গে, তারা সেই পশ্চিমবঙ্গ ঘাঁটিকে ব্যবহার করলো না। শেষোক্ত দল হলো সি পি আই (এম)। সি পি আই (এম) '৭২-এর নির্বাচনের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা বয়কট করে আসছে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন উপলক্ষেও সেই বয়কট অব্যাহত রাখা হলো, ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার সি পি আই (এম) সদস্যরা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেন নি। অবশ্য সি পি আই (এম) [illegible] সদস্যদের সঙ্গে এস ইউ সি ও ওয়ার্কার্স পার্টিও ভোট দিতে আসেন নি।

এই যে সি পি আই (এম) রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিধানসভার সদস্যদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলো না এটাকেই বলছি প্রমোদবাবু এবং জ্যোতিবাবু রাজ্যোৎ পরিষদীয় রাজনীতিতে ফিরে আসবার আরও একখানা ট্রেন ছেড়ে দিলেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দুদিন পর শ্রীজ্যোতি বসু এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন না, এখনও বিধানসভা বয়কট সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের সময় আসেনি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কবে এই সময় আসবে? গত নির্বাচনের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এম) শুধু বিধানসভা বয়কট করে ক্ষান্ত নেই, আধা ফ্যাসিস্ট' শাসনের দোহাই দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েৎ নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করছে না। যদিও একই কংগ্রেস শাসনাধীন অন্যান্য রাজ্যে সি পি আই (এম) লোকসভা বিধানসভা, পৌরসভা, পঞ্চায়েৎ সর্বত্রই অংশগ্রহণ করছে। অনেক গুলি নির্বাচনে সি পি আই (এম) জয়ীও হচ্ছে। এই তো সেদিন আসামের একটি লোকসভা কেন্দ্রে, রাজস্থানের একটি বিধানসভা কেন্দ্রে সি পি আই (এম) প্রার্থীরা জয়ী হলেন। কাজেই ভারতের অন্য সব রাজ্যে কংগ্রেসী শাসন থেকেও সেখানে সি পি আই (এম)-এর ফ্যাসি-বাদের ধুয়ো নেই, বয়কটও নেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বয়কট চলছে ও চলবে—এই হলো ধ্বনি। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এই ধ্বনি প্রত্যাহারের একটা সুযোগ এনে দিয়েছিলো কিন্তু সি পি আই (এম) রাজ্য নেতৃবৃন্দ সে সুযোগ গ্রহণ করেন নি।

তাই সঙ্গতই প্রশ্ন ওঠে, জ্যোতিবাবু-প্রমোদবাবু রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ট্রেনটা ছেড়ে দিয়ে এখন কোন ট্রেনের অপেক্ষা করবেন, যে-ট্রেন তাঁদের পশ্চিমবঙ্গের সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বাভাবিক পরিবেশে ফিরিয়ে আনবে? সি পি আই (এম) পরিষদীয় গণতন্ত্রের পথ ত্যাগ করেছে বা সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি তাঁদের বৈরাগ্য সৃষ্টি হয়েছে, এমন কথা মোটেই সত্য নয়। দলের মধ্যে যাঁরা হঠকারী বা পরিষদীয় গণতন্ত্রে আস্থাহীন, তাঁরা ১৯৬৮ সাল থেকে একে একে দল ছেড়ে গেছেন। পশ্চিমবঙ্গে সি পি আই (এম-এল)-এর নামে ডজনখানেক পার্টি তৈরী হয়েছে, অন্য রাজ্যেও তাই। কাজেই সি পি আই (এম) দল এখন যাঁরা চালাচ্ছেন, তাঁরা সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি অন্য অনেক দলের চেয়ে বেশী আস্থাশীল। পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম একটি সংগঠিত ও প্রভাবশালী দল। কিন্তু সেই দল সংসদীয় গণতন্ত্রে অংশ গ্রহণ না করায় পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা বেশ কিছুটা অঙ্গহীন হয়ে রয়েছে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দেখা গেলো পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত লোকসভার সদস্যরা ভোট দিলেন, কিন্তু বিধানসভার সদস্যরা নয়। তাই আবারও প্রশ্ন করতে হয়, এক বছরের ব্যবধানে অর্থাৎ ১৯৭৬ সালে লোকসভার নির্বাচন। রাজনৈতিক পরিবেশ ও অবস্থাসমূহ লক্ষ্য করে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ঐ একই সময়ে সারা ভারতে বিধানসভাসমূহেরও নির্বাচন হবে। কারণ, ১৯৭৬ সালে একবার লোকসভার নির্বাচন এবং ১৯৭৭ সালের সাধারণ নির্বাচন, এই দুবার নির্বাচনের ঝুঁকি নিশ্চয়ই শ্রীমতী গান্ধী নেবেন না। যদি '৭৬ সালে শুধু লোকসভার নির্বাচনই হয়, তাহলে জ্যোতিবাবু-প্রমোদবাবু সেই নির্বাচনও কি বয়কট করবেন? যদি বয়কট করেন তাহলে লোকসভায় তথা সর্বভারতীয় মঞ্চে সি পি এম দলের যে প্রভাব, তা উবে যাবে। কারণ, লোকসভায় সি পি এম দলের ২৬ জন সদস্য আছেন। তার দুজন কেরালার, দুজন ত্রিপুরার, একজন অন্ধ্রের, একজন আসামের, বাকী কুড়িজনই হলেন পশ্চিমবঙ্গের। তাই লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গের কুড়িজন সদস্য না থাকার অর্থ কি সেটা না বললেও বোঝা যায়। লোকসভার নির্বাচনের এক বছর বাকী। ছ'মাস সময় বাড়তি যা আছে, তা দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তাই লোকসভার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে হলে সি পি এম-কে নিকট ভবিষ্যতে আসরে নামতে হবে। আজ গণতন্ত্র নেই, ফ্যাসিস্টরাজ চলছে বলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট বয়কট করা হল। ক'মাস পরে বদলে গেলো মতটা' বলে ভোটের আসরে নামা সম্ভব হবে কি? সেই জন্যেই প্রশ্ন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশ গ্রহণের ট্রেন ছেড়ে দিয়ে জ্যোতিবাবু-প্রমোদবাবু এখন কোন ট্রেন ধরবার অপেক্ষা করবেন?

—জন আবদুল হাই মাজা

নিঃসঙ্গ পথিক

নিকসন

দিলীপ মালাকার

রাষ্ট্রপতি নিকসন

'নিকসনপন্থী' নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকা মে মাসে বড় বড় হরফে ছাপল, 'নিকসন ইজ এলোন' নিঃসঙ্গ—একাকী। নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকা বহুকাল নিকসনকে সমর্থন জানিয়ে এসেছে। গত মে মাসে সেই পত্রিকাও নিকসনকে পরিত্যাগ করল। বোধহয় ত্যাগ করতে বাধ্য হল। তার প্রধান কারণ ওই সময়ে নিকসনের নিজের দল রিপাবলিকান পার্টির একটি বড় অংশ তাকে ত্যাগ করেছে। নিকসনের প্রতি সহানুভূতি ছিল না তাঁর দলীয় নেতৃবৃন্দের। সে-কথা নিকসন পদত্যাগের দিন নিজেই বলেছেন।

আটই আগস্ট মিঃ নিকসন পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। তারপরের দিন যখন হোয়াইট হাউস থেকে বিদায় নিলেন সাশ্রুনয়নে সেদিন তিনি ছিলেন সত্যি নিঃসঙ্গ একাকী। তাঁর দলের নেতারা কেউ বিদায় জানাতে আসেননি। সেদিন ক্যালিফোর্নিয়া পৌঁছে তিনি সে-কথাই বলেছেন, তিনি একাকী।

বৃহৎ শক্তিবর্গের অন্যতম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির অংগুলি হেলনে বিশ্বের অনেক দেশেই রাজনৈতিক ওলট-পালট ঘটে যায়। তাঁরই আজ্ঞায় সি আই এ বা এফ বি আই কী না করতে পারে। শেষ পর্যন্ত তিনিই নিজের জালে জড়িয়ে পড়লেন।

সমস্ত ব্যাপারটাই যেন নাটকীয়। নাটকের নাম দেওয়া যেতে পারে 'ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারী'। এই নাটকে প্রধান চরিত্রগুলো সবই রাজপুরুষ। পার্শ্ব-চরিত্রে দু-একজন নারী আছেন বটে তবে তাঁরা নেহাৎই ছায়া। স্ত্রী-চরিত্র বর্জিত নাটকের প্রধান নায়ক স্বয়ং রাষ্ট্রপতি। জেমস বন্ডের গোয়েন্দা বা রহস্যোপন্যাসের চেয়েও রোমহর্ষক। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সাসপেন্সে ভরা। এমন মজার গোয়েন্দা নাটকের আবিষ্কর্তা হলেন দুজন তরুণ সাংবাদিক মিঃ বব উডওয়ার্ড ও মিঃ কার্ল বার্নস্টাইন। দুজনের বয়স তিরিশের কোঠায়। দুজনেই ওয়াশিংটন পোস্টের রিপোর্টার। এঁদের সঙ্গে সাংবাদিক মিঃ জ্যাক এণ্ডারসনও ছিলেন। একটা চুরির খবর অনুসন্ধান করতে গিয়ে এই দুই সাংবাদিক ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারীর সূত্র খুঁজে পান। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বার হবার মতন ব্যাপার ঘটল শেষ পর্যন্ত। ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারীর নাটকীয় ঘটনাগুলো নিয়ে একটি বই লিখে দুই সাংবাদিক বব ও কার্ল ইতিমধ্যে দশ লাখ টাকা রোজগার করেছেন। ভবিষ্যতে সত্যি সত্যি সিনেমা ও থিয়েটারে নাটক হবে এবং তার জন্যে রয়ালটি বাবদ ওঁরা দুজনে কোটিখানেক টাকা পাবেন। কিন্তু তার চেয়েও উল্লেখযোগ্য হল গণতন্ত্র ও সংবাদপত্র স্বাধীনতার জয়যাত্রা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতন দেশেই তা সম্ভব। অন্য দেশে তা হয়ত সম্ভব হত না।

ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারী মামলায় জড়িত প্রেসিডেন্ট নিকসনের দুই আস্থাভাজন উপদেষ্টা মিঃ হালডেম্যান ও মিঃ এরলিখম্যান যখন আদালতে নাজেহাল তখন মিঃ এরলিখম্যান একদিন বলেছিলেন এবার ভাবছি সংবাদপত্রে লেখা শুরু করব। অবশ্য কথাটা তিনি বলেছিলেন সাংবাদিকদের প্রতি বিরক্ত হয়ে। মিঃ এরলিখম্যান ছেঁদি-পেঁচি রাজকর্মচারী নন, স্বয়ং রাষ্ট্রপতির ডান হাত আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের উপদেষ্টা। তাঁর হুকুমে কি না হয়। কিন্তু সাংবাদিকরা তাঁকে একটুও ভয় না করে উত্তর দিয়েছিলেন 'হ্যাঁ আপনি কাগজে লিখবেন বৈকি, তবে জেলে বসে লিখতে হবে।' ঘটলও তাই। ওয়াটার গেট মামলার ছোটখাট অভিযুক্তদের যখন বিচার চলছিল তখন এরলিখম্যান ইত্যাদিরা বেশ মজা লুটছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল তাঁদের কেশাগ্র ছোঁয়ার মতন ক্ষমতা কারুর নেই। কারণ, তাঁরা স্বয়ং রাষ্ট্রপতির ডান হাত। যত অপকর্মই করুন না কেন, তাঁদের বিচার হবে না। যেদিন এরলিখম্যানের সাজা হল সেদিন চোখের জলে নিশ্চুপ হয়েছিলেন মিঃ এরলিখম্যান।

ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারীর সূত্রপাত ১৯৭২ সালে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় প্রতিপক্ষ ডেমোক্র্যাট দলের কার্যালয়ে আড়ি পেতে ওদের গতিবিধি-পরিকল্পনা আগে থেকে জানার জন্যে টেলিফোন ও গোপনে কথাবার্তা বলার সবকিছুই টেপরেকর্ডে লিপিবদ্ধ করার যন্ত্র বসিয়ে ব্যবস্থা করেছিলেন মিঃ নিকসনের চ্যালারা। ব্যাপারটা যখন ফাঁস হল তখন তাকে চাপা দেবার জন্যে নিকসনের চ্যালারা সব রকমের সরকারী ক্ষমতা ও টাকা খরচ করে জলের মতন। এই বে-আইনী কাজ কোনোদিন সমর্থন করেনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ—কোনো রাজনৈতিক দল। কারণ, বাক্-স্বাধীনতা তখন বিপর্যস্ত—গণতন্ত্র তখন প্রহসনে পরিণত।

ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারী যখন আদালতে যায়, তখন জানা যায় যে, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর সহচরদের যখনই কোনো আলোচনা হত, তখনই সব আলোচনা টেপ রেকর্ড করা হত। আদালত বলল যে কথোপকথন ও আলোচনার টেপ চাই। নিকসন প্রথমে ওই টেপগুলো আদালতকে দিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু তাঁর আবদার টিঁকল না। শেষ পর্যন্ত তাঁকে দিতেই হল। টেপ রেকর্ডের বিষয়বস্তু ও আদালতের শুনানী সমেত সরকার ব্লু বুক ছেপে প্রকাশ করলেন গত এপ্রিল মাসে। সে ব্লু বুকের পৃষ্ঠা-সংখ্যা তেরশ' পাতা, দাম বার ডলার। তেত্রিশ ঘণ্টার কথোপকথন ও আলোচনা লিপিবদ্ধ হয়েছে ওই বইতে। তাতে ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারীতে জড়িত সবার নামধাম প্রকাশ পেল। শুরু হল নিকসন বিরোধী প্রচার। তাতে জানা গেল যে, নিকসন নিজেই বিরোধী দলের গোপন তথ্য জানার জন্য ওয়াটার গেট ষড়যন্ত্রের আদেশ দেন, তারপর কেলেঙ্কারী জানাজানি হয়ে গেলে তা ধামা চাপা দেবার জন্যে তিনি আশী লাখ টাকা ঘুষ দেবার প্রস্তাব করেন।

ব্লু বুক প্রকাশের পর মার্কিন শ্রমিক সংস্থার সভাপতি মিঃ মিনী মন্তব্য করেন, সব শুনে আমার ঘেন্না ধরে গেছে। রিপাবলিকান সিনেটর মিঃ হিউ স্কট বলেন, ছিঃ-ছিঃ রাষ্ট্রপতির পদে থেকে দুর্নীতি বরদাস্ত করা যায় না। যখন

অ্যাটর্নি জেনারেল মিঃ জন মিচেল
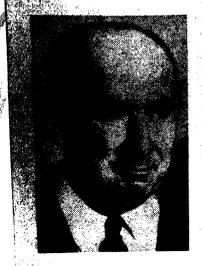
নিকসনের প্রধান উপদেষ্টা মিঃ জন এরলিখম্যান

নিকসনের দ্বিতীয় উপদেষ্টা মিঃ এইচ আর হ্যালডেম্যান

চারদিকে ধিক-ধিক রব তখন আওয়াজ উঠল নিকসনকে আদালতে যেতে হবে। আদালতে গেলে নিকসনের মান সম্মান সবই যেত। তাই তার দলের নেতারা যেমন জন এণ্ডারসন জর্জ রোমনি, মিল্টন ইয়ং বললেন মিঃ নিকসনের এখনই পদত্যাগ করা উচিত। তাহলে তাঁর মান সম্মান রক্ষা পাবে।

গত মে মাসে যখন ওয়াটার গেট কেলেংকারী চরম পর্যায়ে পেঁাছেচে তখন নিকসনের নিজের দলের দুই নেতা মিঃ রিচার্ড শোয়াইটলার ও মিঃ নেলশন রকিফেলার এমন সব মন্তব্য করলেন যে, ওই অবস্থায় কোনো রাষ্ট্রপতি বহাল থাকতে পারেন না। ঠিক সেই সময়ে জনমত সমীক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নিকসন সম্বন্ধে জনমত সমীক্ষা করে জানালেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ জনগণ যদিও ওয়াটারগেট কেলেংকারী সম্বন্ধে পরিপূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল নন তাহলেও তাঁরা বলেছেন যে, এর জন্যে দায়ী নিকসন এবং তিনি অভিযুক্ত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকসভার হাউস অব জুডিসিয়ারী কমিটির কেঁাশুলি মিঃ জন ডোর বলেছেন ১৯৭২ সালে ডেমোক্র্যাট দলের কার্যালয়ে আড়িপাতার যন্ত্র বসানোর সময় থেকে মিঃ এরলিখম্যান জড়িত ছিলেন। তার পর গোপন তথ্য ফাস হবার পর ১৯৭৩ সালে সব কেলেংকারী ধামাচাপা দেবার জন্য মিঃ জেমস ডিন সরাসরিভাবে জড়িত। আর এক অভিযুক্ত মিঃ হাওয়ার্ড হান্টকে দেওয়া হয় এক লাখ বিশ হাজার ডলার। সেই টাকার কিছু পাওয়া যায় হান্টের স্ত্রী যখন এক বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। সেই থেকে সূত্রপাত অনুসন্ধানের। এই টাকাটা দেওয়া হয় রাষ্ট্রপতির নির্দেশে। এই ব্যাপারে নিকসনের আরেক উপদেষ্টা মিঃ হ্যালডেম্যানও জড়িত। প্রথম দিকটায় ধরা পড়ে দুজন কিউবান। পরপর যখন সবাই অভিযুক্ত হতে থাকে তখন নিকসন সব দায়িত্ব তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। তিনি নির্দোষ থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যারা অভিযুক্ত হন শেষে তাঁরা সব গোপন কথা ফাঁস করে দেন। প্রথম দিকটা তাঁরা ভেবেছিলেন যে রাষ্ট্রপতি তাঁদের রক্ষা করবেন তাই তাঁরা আদালতে মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছিলেন। শেষে যখন তাঁরা দেখলেন যে, নিকসন তাঁদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসছেন না তখন তাঁরা আদালতকে বলতে বাধ্য হন যে তাঁরা মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছেন তারপর তাঁরা সত্যি ঘটনাগুলো বলে দেন। এর পরে নাটকের শেষ দৃশ্যগুলো চরম পর্যায়ে গিয়ে পেঁাছয়। কয়েকজন অভিযুক্তের স্ত্রীরা সংবাদপত্রে অনেক গোপন তথ্য ফাঁস করে দেয়। তথ্যের পর তথ্য সংগৃহীত হতে থাকে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিকসন রাজনৈতিক দুষ্কর্ম ও নিজের স্বার্থের খাতিরে সরকারের লাখ লাখ টাকার অপব্যয় করেছেন। এমন কি গোপন সংস্থার এক কোটি টাকা তিনি ক্যালিফোর্ণিয়ার বাগানবাড়ীতে খরচ করেছেন। কয়েক লাখ টাকা আয়করও তিনি ফাঁকি দিয়েছেন। সব মিলিয়ে সে এক জঘন্য কেলেংকারী।

ওয়াটারগেট কেলেংকারী যখন চরম পর্যায়ে পেঁাছেচে তখন হোয়াইট হাউসে চলে ক্ষমতার লড়াই। ১৯৭৩ নভেম্বরে আয়কর কেলেংকারীতে জড়িত উপ-রাষ্ট্রপতি মিঃ স্পিরো অ্যাগনিউ পদত্যাগ করলে মিঃ জেরাল্ড ফোর্ডকে উপ-রাষ্ট্রপতি করা হল। তারপর এবার নিকসনের পদত্যাগে মিঃ ফোর্ড হলেন রাষ্ট্রপতি। মিঃ ফোর্ডের ভাগ্য ভাল তাঁকে কোনো নির্বাচনে না দাঁড়িয়ে প্রথমে উপ-রাষ্ট্রপতি করা হল তারপর তিনি হলেন বিনা নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি এবং তিনি ওই পদে থাকবেন ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত। যতদূর জানা গেছে মিঃ ফোর্ড উদারনৈতিক। তিনি নিকসনকে ক্ষমা করবেন বলে আশা নেই। ভবিষ্যতে তিনি নিকসনকে সমর্থন জানাবেন না। তবে ইতিমধ্যে হোয়াইট হাউসে ডঃ হেনরী কিসিঞ্জারের সংগে মিঃ ফোর্ডের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। সম্ভবতঃ ১৯৭৬ সালে রাষ্ট্রপতি পদ প্রতিযোগিতায় এই দুজন হবেন প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী।

মিঃ নিকসন নিঃসঙ্গ পথিকই থেকে গেলেন। এখন থেকে মার্কিন সরকারের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতির বদল হবে বলে জানা গেল। নিকসনের আমলে ভারত-বিরোধী যে সব পথ গ্রহণ করেছিল মার্কিন সরকার এখন আর তা থাকছে না। ভারতের প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছেন বর্তমান রাষ্ট্রপতি মিঃ ফোর্ড।

ওয়াটারগেট কেলেংকারী নিয়ে মার্কিন মিত্র রাষ্ট্রগুলো অর্থাৎ পশ্চিম ইউরোপের সংবাদপত্রে যত আলোচনা হয়েছে তার সিকি ভাগ হয়নি রুশ বা চীন সংবাদপত্রে। নিকসনের পদত্যাগ নিয়ে চীন কিন্তু কোনো মন্তব্যই করেনি। যে চীন আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে একটু ছুতো পেলেই মুখর হয়ে উঠত এখন সে একেবারে নীরব।

(১)

শরৎচন্দ্র ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি থেকে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল পর্যন্ত ব্রহ্মদেশে ছিলেন। এই দীর্ঘ বার বছরেরও বেশী সময়ের মধ্যে তিনি মাত্র তিনবার ১৯০৭, ১৯১২ ও ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে অফিসে কিছুদিন করে ছুটি নিয়ে বাংলায় এসেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের রেংগুনের দুইজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকার ও যোগেন্দ্রনাথ সরকার শরৎচন্দ্রের ব্রহ্ম-প্রবাস নিয়ে দুটি বই লিখে গেছেন। এঁদের বই দুটির নাম যথাক্রমে 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' ও 'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র'। এঁরা ছাড়া শরৎচন্দ্রের রেংগুনের আর একজন বিশিষ্ট বন্ধু সতীশচন্দ্র দাসও শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে একটি বই লিখে গেছেন। সতীশবাবুর বইটির নাম—শরৎ-প্রতিভা। এই বইটি শরৎচন্দ্রের জীবনী ধরনের লেখা হলেও এতে শরৎচন্দ্রের ব্রহ্মদেশের জীবনের কথাই বেশী আছে।

শরৎচন্দ্রের রেংগুনের এই ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের বইয়ে নেই, এমন কিছু কথা, শরৎচন্দ্রের ব্রহ্ম-প্রবাস সমাপ্তির দু-পুরুষ পরে কলিকাতাবাসী ডঃ অজিতকুমার ঘোষ তাঁর 'শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার' গ্রন্থে লিখেছেন। অজিতবাবু এই বই লিখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম সম্মান ডি-লিট উপাধি লাভ করেছেন।

অজিতবাবু তাঁর বইয়ে লিখেছেন—শরৎচন্দ্র রেংগুনে যাওয়ার পর থেকেই অতিশয় মদ্যাসক্ত ও অতিমাত্রায় বেশ্যাসক্ত হয়েছিলেন। প্রথম বছর দুই রেংগুনে থাকার পর তিনি যখন পেগুতে গেলেন, তখনও তিনি এইরূপ ছিলেন, আবার পেগু থেকে ফিরে এসে রেংগুনে মিস্ত্রীপাড়াতে যখন ছিলেন তখনও তাই ছিলেন। অজিতবাবু এই নিয়ে তাঁর বইয়ে বেশ অনেকটাই লিখেছেন এবং নিজ পক্ষ সমর্থনে কয়েকটা যুক্তি দেখাবারও চেষ্টা করেছেন। এ সম্পর্কে অজিতবাবুর সমস্ত লেখাটাই একসঙ্গে উদ্ধৃত না করে পর পর একটু একটু উদ্ধৃত করেই এখানে আলোচনা করছি। অজিতবাবু লিখেছেন—

'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্রের জীবন ছিল নীতিনিয়মহীন উচ্ছৃংখল ও কলুষিত। শরৎচন্দ্র যখন অঘোর চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে ছিলেন, তখন হইতেই তাঁহার চরিত্র কলুষ-পঙ্কে নিমগ্ন ছিল। তাঁহার আত্যন্তিক মদ্যাশক্তি ও অসংযমের ফলও তাঁহাকে ভুগিতে হইল। তিনি ব্রহ্মদেশে পৌঁছিবার কিছুকালের মধ্যেই অসুস্থ হইয়া পড়েন। শরৎচন্দ্রের মামা সুরেন্দ্র-নাথের দাদা মণীন্দ্রনাথ যখন অঘোরনাথের স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া রেংগুনে পৌঁছিলেন তখন শরৎচন্দ্রের এই উচ্ছৃংখল জীবন-যাত্রার কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—'চাটুজ্যেমশাইয়ের মৃত্যুর পর অনুদিদি তাঁর স্ত্রী আমার দাদাকে (মণীন্দ্রনাথ) সঙ্গে করে রেংগুনে যান। সেখানে গিয়ে তিনি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে পারেন নি। লোকের মুখে শুনেছিলেন যে শরৎচন্দ্র পীড়িত হয়ে কোন হাসপাতালে আছেন। তাঁর এমন কোন অসুখ যে সকলের সঙ্গে দেখা করেন না। দাদার তখন ধর্মপ্রমুখ মন, তাই তিনি দেখা করবার আর চেষ্টাই করেন নি। অথচ সম্যক্রূপে তাঁর ধারণা মোটেই ভাল হয়নি। সেটাই স্বাভাবিক।'

শরৎচন্দ্র

এই উদ্ধৃতির মধ্যে শরৎচন্দ্রের মামা সুরেন্দ্রনাথ হলেন ভাগলপুরের সুরেন্দ্র-নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, আর অঘোর চট্টো-পাধ্যায় হলেন শরৎচন্দ্রের সম্পর্কে এক মেসোমশায়। ইনি রেংগুনের একজন নাম-করা এডভোকেট ছিলেন। শরৎচন্দ্র রেংগুনে গিয়ে এঁরই বাসায় প্রথম উঠেছিলেন এবং এঁর বাড়ীতে দুবছর ছিলেন। অঘোর-বাবুর মৃত্যু হয়েছিল ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারি তারিখে।

এখানে সুরেনবাবুর একটু লেখা সহ অজিতবাবু যা বলেছেন তাতে পরিষ্কার এই দাঁড়াচ্ছে যে শরৎচন্দ্র রেংগুনে গিয়েই অঘোরবাবুর বাড়িতে থাকাকালে অতিশয় মদ্যপ ও বেশ্যাসক্ত হয়েছিলেন, যার ফলে রেংগুনে পৌঁছবার কিছুকালের মধ্যেই তিনি যৌন-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। অজিতবাবু নিজের বক্তব্যের সমর্থনে সুরেনবাবুর লেখাটা উদ্ধৃত করলেও, আসলে কিন্তু তিনি সুরেনবাবুর ঐ লেখাটা পড়েই নিজের বক্তব্য খাড়া করে-ছেন। পরে নিজের কথার সমর্থনে সুরেন-বাবুর লেখাটা দেখিয়েছেন। এখন আসলে সুরেনবাবুর এই কথাটাই সত্য কিনা তাই দেখা যাক—

অঘোর চট্টোপাধ্যায় যেমন রেংগুনের একজন নামজাদা এডভোকেট ছিলেন তেমনি তিনি নিয়মিত ব্যায়াম চর্চা করে দেহে অমিত শক্তিরও অধিকারী ছিলেন। এই অঘোরবাবু সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গো-পাধ্যায়ের একটা লেখার উদ্ধৃতি সহ অজিত-বাবুই তাঁর বইয়ে লিখেছেন—লালমোহনের এক ভগ্নীপতি অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় রেংগুনে এডভোকেট ছিলেন। কংগ্রেসের সময় তিনি সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া লালমোহনের বাড়িতে উঠিতেন। তিনি ছিলেন, অমিত বলশালী এক বিরাট দেহ বজ্রকণ্ঠ পুরুষ। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গো-পাধ্যায়ের 'শরৎ-পরিচয়' গ্রন্থে অঘোরনাথের একটা অত্যন্ত সরস চিত্র পাওয়া যায়।

[illegible]নাথ লিখিয়াছেন—'একদিনের [illegible] মনে পড়ে। ভবানীপুরের [illegible] বাজারের পাশে একটা ময়রার [illegible] বিজ্ঞাপনটা খুব বড় বড় হরফে [illegible]। গাড়ি করে যেতে যেতে, সেই [illegible] সমুচিত মূল্যদান করে তিনি [illegible] উচিত সম্মান দান করে যে [illegible] ছেড়েছিলেন তার কাছে চিঁড়িয়া-[illegible] আধপেটা খাওয়া সিংহ-গর্জন [illegible] লাগে। আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে [illegible] লেখার আকারের অনুপাতে যে [illegible] ছেড়েছিলেন, তাতে কোচওয়ান কোচ-[illegible] নিরুদ্দেশ কোথায় হাওয়া হয়ে [illegible] চারিদিকে লোকারণ্য। কি হয়েছে। [illegible]। কি হয়েছে মশাই?

[illegible] হয়নি কিছু। ঐ ময়রা লেখার [illegible] মূল্য দান করছিলাম মাত্র। দেখা [illegible] জোড়া দুটো রাস্তায় বহুল পরিমাণে [illegible] কোরে দাঁড়িয়ে কম্পমান।

কিছু পরে কোচওয়ান ফিরলে— কোথায় গিছলে হে? প্রশ্ন।

—এজ্ঞে লুংগি বদলাতি।

—কেন, ছেঁড়া ছিল?

—এজ্ঞে না।

—চল চল হাঁকিয়ে যাও—দেরি হোয়েছে।

চট্টোপাধ্যায় মশাই লিলিপুটিয়ানদের 'হেট' কোরতেন। তিনি ছিলেন প্রচণ্ড ব্রবডিংনাগ।

অজিতবাবু তাঁর বইয়ে সুরেনবাবুর এই যে লেখাটা উদ্ধৃত করেছেন, এটা 'অত্যন্ত সরস চিত্র' হলেও এর মধ্যে কতটা সত্য আছে আগে তাই দেখা যাক—

কলকাতায় অনেক দোকানের সাইন-বোর্ডে পরীক্ষা প্রার্থনীয়, বৃহস্পতিবার বন্ধ—প্রভৃতি লেখায় ভুল বানান দেখা যায়। এইরূপ কোন সাইনবোর্ডে ভুল বানান দেখে অঘোরবাবু যদি আঁৎকে উঠে লোককে ভুল বানান শেখানো হচ্ছে বলে হুংকার দিয়ে উঠতেন, তবু তার একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া যেত। কিন্তু একটা ময়রার দোকানের বিজ্ঞাপনটা বড় হরফে হয়েছে বলে, তাতে অমন হুংকার দেবার কি যে থাকতে পারে তা বোঝা গেল না। তাই সন্দেহ হয়, অঘোরবাবু সত্যই কি ঘোড়ার গাড়ীতে করে যেতে যেতে পথে বিজ্ঞাপন দেখে ঐরূপ হুংকার দিয়েছিলেন। অঘোরবাবু যে কারণেই হোক হুংকার দিয়েছিলেন এটা ধরে নিলেও এবং চারিদিকে লোকারণ্যের কথা বাদ দিয়ে কিছু লোক জমেছিল এটা স্বীকার করে নিলেও তাঁর সেই কণ্ঠস্বরে ঘোড়া দুটো ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পেচ্ছাব করেছিল এবং গাড়োয়ানও ভয়ে তার লুঙ্গিতে বাহ্যে-পেচ্ছাব করে ফেলেছিল, এ মোটেই বিশ্বাস্য নয়। তাই সুরেনবাবুর বর্ণিত এই কাহিনীটিকে অসত্য বা অতিরঞ্জিত বলেই মনে হয়।

যাই হোক, সুরেনবাবুর এই লেখা থেকে বোঝা গেল যে, অঘোরবাবু অতিশয় শক্তিশালী এবং অপরের সামান্যতম ত্রুটি বা অন্যায়েরও বিরোধী ছিলেন। তাই যদি হয়, তাহলে এটাও ঠিক যে, শরৎচন্দ্র তাঁর এ হেন মেসোমশায়ের বাড়িতে এসেই অতি-রিক্ত পরিমাণে মদ খেতে এবং লুকিয়ে বেশ্যাবাড়ি যেতে কখনই সাহসী হতেন না। কারণ, শরৎচন্দ্র এটা নিশ্চয়ই জানতেন, অঘোরবাবু যদি কোনরকমে একথা জানতে পারেন, তাহলে তিনি তাঁকে শুধু চড়-চাপড় নয়, আছাড় মেরেই একেবারে শেষ করে দেবেন।

অঘোরবাবু যে অত্যন্ত রাগী মানুষ ছিলেন, তাও ত সুরেনবাবুর লেখা থেকেই জানা যায়। সুরেনবাবু লিখেছেন—'অঘোরনাথের টাইফয়েড হওয়ায়, একটা বয়কে এমন কিক্ করেছিলেন যে তাই দেখে (শরৎচন্দ্র) পেগুতে পালিয়ে যান। মাস ছয়েক সেখানে থেকে রেঙ্গুনে ফিরে এসে মণি মিত্র মহাশয়ের চেষ্টায় সরকারি চাকরিতে বহাল হন।' —(শরৎ-পরিচয়, পৃঃ ১৪৭)

অঘোরবাবু টাইফয়েড রোগের সময় তাঁর চাকরকে জোরে কিক করেছিলেন কিনা জানি না তবে সুরেনবাবু যে বলেছেন, ঐ দেখে শরৎচন্দ্র অসুস্থ অঘোরনাথের শুধু বাড়ি ছেড়েই নয়, একেবারে রেঙ্গুন ছেড়েই ৪৫ মাইল দূরে পেগুতে চলে গিয়েছিলেন, একথা সত্য নয়। কারণ শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকারের 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি, অঘোরবাবুর অসুখের সময় শরৎচন্দ্র তাঁকে ফেলে পেগু পালান নি, আর শরৎচন্দ্র কবে কিভাবে পেগু গিয়েছিলেন এবং সেখানে কত দিন ছিলেন সে সম্বন্ধেও গিরীনবাবু অন্য কথা লিখেছেন। এক্ষেত্রে সুরেনবাবুর কথা অপেক্ষা গিরীনবাবুর কথাই বিশ্বাসযোগ্য। কেননা, এই সুরেনবাবুই তাঁর বইয়ে অন্যত্র আবার অঘোরবাবুর অসুখের সময় তাঁকে ফেলে শরৎচন্দ্রের চলে যাওয়া সম্বন্ধে অন্য কথা লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, শরৎচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন—'আমার ভুল হয়েছিল, চাটুয্যে মশাইকে বোঝায়। রেঙ্গুনে গিয়ে তা বুঝেও কোনরকমে কার্য সিদ্ধির জন্য টিকেছিলাম। অত অল্প দিনে বর্মী ভাষা আয়ত্ত করা যায় না। আর মনে করতে পারি নি যে অত বড় সার্জন মন্দলোকটা ধাঁ করে মরে যাবে। তাই যখন বুঝলাম যে, বাঁচা সম্ভব নয়, তখনই সরে পড়লাম।' —(শরৎ-পরিচয়, পৃঃ ১৬৯)

সুরেনবাবুর এই লেখাটা নিয়ে একটু আলোচনা করছি। সুরেনবাবু লিখছেন—শরৎচন্দ্র তাঁর কাছে অঘোরবাবুকে বলেছিলেন—'চাটুয্যে মশাই'। একথা ঠিক নয়। কেননা, শরৎচন্দ্র অঘোরবাবু সম্বন্ধে কিছু বললে, অঘোরবাবুকে চাটুয্যে মশাই কখনই বলতেন না, বলতেন—মেসোমশাই।

পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে হাওড়া হুগলী অঞ্চলে শরৎচন্দ্রের আমলে এবং আজও কেউ কেউ বড় ভগ্নীপতিকে সম্বোধন করতে হলে, তাঁর পদবীর সঙ্গে মশাই যোগ করে সম্বোধন করে থাকেন।

সুরেনবাবু তাঁর বইয়ের যে পৃষ্ঠায় অঘোরবাবু সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের বলে ঐ উক্তিটি লিখেছেন, সেই পৃষ্ঠাতেই আছে, শরৎচন্দ্র তাঁর বড় ভগ্নীপতির সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন—মুখুয্যে মশাই। আর সুরেনবাবুও অঘোরবাবু সম্বন্ধে বলেছেন—চাটুয্যেমশাই। অতএব শরৎচন্দ্র সুরেন-বাবুর কাছে অঘোরবাবুকে চাটুয্যেমশাই কখনই বলেন নি।

দ্বিতীয়তঃ শরৎচন্দ্রের মুখের কথা বলে সুরেনবাবু যে লিখেছেন, 'যখন বুঝ-লাম যে বাঁচা সম্ভব নয়'...এটাও শরৎ-চন্দ্রের কথা নয়। কেননা, বাঁচা সম্ভব নয় এই কথাটা লোকে সাধারণত নিজের সম্বন্ধে বলতে গেলেই বলে। অপরের সম্বন্ধে বলবার সময় বলে—বাঁচান সম্ভব নয় বা বাঁচার সম্ভাবনা নেই।

তৃতীয়তঃ টাইফয়েডই হোক আর নিউ-মোনিয়াই হোক, বড় লোকের অসুখে যখন বড় বড় ডাক্তার দেখানো হচ্ছে তখন বাঁচা বা বাঁচান সম্ভব নয়, শরৎচন্দ্র এ কথা বলতে যাবেনই বা কোন সাহসে। অঘোর-বাবুকে বাঁচান সম্ভব নয়, এটা যদি শরৎ-চন্দ্র বুঝেও থাকেন তাহলেও তিনি অঘোরবাবুকে ঐ অবস্থায় ফেলে চলে যেতে পারেন না। এত বড় অকৃতজ্ঞ তিনি ছিলেন না। তাছাড়া তিনি এও নিশ্চয়ই জানতেন যে, ঐভাবে অঘোরবাবুকে ফেলে চলে গেলে, যদি তিনি সেরে ওঠেন তাহলে সারা ব্রহ্মদেশ খুঁজে তাঁকে (শরৎচন্দ্রকে) বার করবেনই এবং তখন আর তাঁকে আস্ত রাখবেন না।

অঘোরবাবুর অসুখের সময় তাঁকে ফেলে শরৎচন্দ্রের অকৃতজ্ঞের মত চলে যাওয়া সম্বন্ধে সুরেনবাবু এই যে দুরকম কথা বলেছেন, এর কোনটাই সত্য নয় বলে আমার দৃঢ় ধারণা। অঘোরবাবুর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর শয্যা পার্শ্বে থেকে শরৎচন্দ্র যে তাঁর সেবাশুশ্রূষা করেছিলেন, তার প্রমাণ পাই গিরীন্দ্রনাথ সরকারের লেখায়। গিরীনবাবু লিখছেন—'পরিবারবর্গ নিকটে না থাকায় তাঁহার (অঘোরবাবুর) মৃত্যু-শয্যায় সেবাশুশ্রূষার ভার শরৎচন্দ্র ও আমি লইয়াছিলাম। দিনরাত কঠোর পরি-শ্রম করিয়া তাঁহার (শরৎচন্দ্রের) আত্মীয়ের সেবা শুশ্রূষা করিতেন এবং রাত্রি জাগরণে বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িলে আমি তাঁহার সাহায্য করিতাম।' —ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র

গিরীনবাবুর লেখা থেকে জানা যায় যে মাসাধিক কাল শরৎচন্দ্র ও তিনি রাত জেগে অঘোরবাবুর সেবা করেছিলেন। এখানে গিরীনবাবুর কথাই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য।

(ক্রমশঃ)

অলৌকিক জলযান

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

উপন্যাস

(৫৩)

সিউল ব্যাংক এগিয়ে যাচ্ছে কি অতিকায় ক্রসটা কাছে ছুটে আসছে বোঝা যাচ্ছে না। সমুদ্র পার হয়ে দিগন্তের নিচ থেকে ক্রমে ওটা আকাশের বুকে বড় হয়ে যাচ্ছিল। যেন কেউ ওটা ঠেলে আকাশের গায়ে তুলে দিচ্ছে। সব বর্ণছটা ক্রসটার গা থেকে ঠিকরে বের হচ্ছে—কারণ মনে হচ্ছিল এক আলোময় জগত যেন অনেক সূর্যের দীপ্যমান আলো নিয়ে সে আকাশে জ্বলে উঠেছে। স্যালি হিগিনস দেখতে দেখতে প্রায় বিহ্বল। তিনি বিড়বিড় করে বকছিলেন—মাই টাইম হ্যাজ কাম। মাই টাইম হ্যাজ কাম। শি উইল সুন সারাউন্ড মি! এ্যান্ড দিস ইন মাই ফেট।

ছোটবাবু নিচে দাঁড়িয়ে আছে। সে দেখছিল—বহুদূরে প্রায় দিগন্তে কিছু দেখা যাচ্ছে। বিন্দুর মতো অস্পষ্ট। কখনও অজস্র ঢেউ ছুটে গেলে কিছু আর দেখা যাচ্ছে না। উঁচু নিচু ঢেউএর ভেতর ওটা হারিয়ে যাচ্ছে। সে নিজের চোখকে ভীষণ অবিশ্বাস করছে এখন। ক্রোজ-নেস্ট থেকে সে যা দেখেছিল—ডেকে নেমে সে তার প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। কখনও বিন্দুবৎ কালো কিছু দিগন্তে উঁকি মেরে সমুদ্রগর্ভে অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে। যা সে এত কাছে দেখেছিল, যা সে ভেবেছিল প্রায় আকাশের মতো অতিকায় কি করে যে সে সহসা আবার বিন্দুবৎ হয়ে গেল। সে বলল, এনি মিরাকল!

তিনি বললেন, মিরাকল! অল ননসেন্স।

ছোটবাবু বলল, শুধু বিন্দুবৎ কিছু দেখা যাচ্ছে। একটা পাহাড়ের মতো ক্রসটা দেখেছিলাম। এখন কিছু নেই। একেবারে ফাঁকা।

হিগিনস আর একটা কথাও বলছেন না। তিনি দ্রুত নেমে আসছেন। সারেং-সাব পাশে দাঁড়িয়ে কি করবে ভেবে পাচ্ছেন না। বনি চিফ-কুকের গ্যালি থেকে মুখ বার করে রেখেছে। সে চাপাটি ওল্টেপাল্টে দিচ্ছে। একটু এদিক ওদিক হলে পুড়ে যাবে। সে বের হয়ে আসতে পারছে না। চিৎকার করে কথা বলছে—বাবা ওটা কি! কি দেখলে?

হিগিনস ডেকে লাফ দিয়ে প্রায় নেমে পড়লেন। খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন—কিছু না। প্রবালের দ্বীপ-টিপ হবে।

—আমরা ওখানে নামতে পারব বাবা।

ছোটবাবু লাফ দিয়ে তখন ফের দেখার জন্য সিঁড়িতে উঠে গেলে খপ করে হিগিনস হাত ধরে ফেললেন। বললেন, ইয়াং ম্যান প্লিজ লিসেন টু মি। ডোন্ট গো!

ছোটবাবু বললেন, কিন্তু স্যার...

হিগিনস বললেন, প্লিজ ইউ ফলো মি।

সারেং-সাব বললেন, আমি একবার উঠে দেখব সাব?

হিগিনস বললেন, কিছু আর দেখার নেই।

বনি দু হাতে তখন চাপাটি ওল্টে-পাল্টে দিচ্ছে। সে কিছুতেই বের হয়ে কেন ছোটবাবু ক্রোজ-নেস্ট থেকে চিৎকার করে উঠেছিল বাবা উঠে গেলেন কেন আবার তিনি নেমেই বা এলেন কেন

এবং একটা কথা কেউ বলছে না, বাবা ছোটবাবুকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, এসব জিজ্ঞাসা করতে পারছে না। সে একটা পাতলা জামা গায়ে দিয়ে নিয়েছে। দিন যত যাচ্ছে বাতাসে তত উত্তাপ। দু তিন আঙুলে ইতিমধ্যে ফোসকা পড়েছে। সামনে সব হাতের কাছে এগিয়ে দিচ্ছেন। আগুন খুঁচিয়ে দিচ্ছেন। এবং সব কাজে সহায়তা না করলে সে কিছু করতে পারত না। অথচ যে ছুটে গিয়ে বলবে—ছোটবাবুকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ বাবা, ও কি করেছে, আমাকে তোমরা কিছু বলছ না। কোনো—কো না পেরে সব উনুন থেকে নামিয়ে দু লাফে বাইরে বের হয়ে এল। বলল, বাবা ছোটবাবুকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

হিগিনস দেখলেন সত্যি তিনি ছোটবাবুকে প্রায় টেনে নিয়ে যাচ্ছেন বোট-ডেকে। যেন কিছুতেই আর তাকে ক্রোজ-নেস্টে উঠতে দেবেন না। তিনি যে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন একেবারে খেয়াল করেন নি। কেমন জোরের ভেতর সব ঘটে যাচ্ছে। তিনি বনিকে আশ্বস্ত করার জন্য না বলে পারলেন না, বোট-ডেকে আমাদের সামান্য কাজ আছে বনি।

বনি বলল, কি যে দেখলে তোমরা!

—কিছু না তো।

—ছোটবাবু যে চিৎকার করে উঠেছিল—কি সব এগিয়ে আসছে।

—কোথায় কি এগিয়ে আসছে! দ্যাখো না। কিছু দেখতে পাচ্ছ। বনি চারপাশে খালি চোখে সত্যি কিছু দেখতে পেল না। বলল, ছোটবাবু, তোমার ঠাট্টা করার সময় অসময় নেই।

ছোটবাবু ভীষণ বোকার মতো তাকিয়ে আছে। সে বলল, স্যার তবে আমি চোখে ভুল দেখেছি।

তিনি শান্ত গলায় বললেন, উই উইল নো লংগার ওয়ানডার ইন দ্য ডারকনেস। তাড়াতাড়ি আমাদের হাতের বাকি কাজ সব করে ফেলা ভাল। স্যালি হিগিনস ফের তাঁর পুরোনো মর্জি, পুরোনো স্বভাব, পুরোনো ব্যক্তিত্ব ফিরে পাচ্ছেন। ছোটবাবুকে কিছু বলার সময় দিচ্ছেন না। তিনি কি সব অজস্র কথা বলে যাচ্ছেন বিড়বিড় করে। মাথামুণ্ডু সে কিছু বুঝতে পারছে না। তিনি তাকে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। এবং জাহাজের ফরোয়ার্ড-পিকে উঠে বাঁধার মুখে প্রায় লাথি মেরে একটা দরজা খুলে ফেললেন। এবং বললেন ইয়াং ম্যান, প্লিজ গো ইন-সাইড। বলে অন্ধকারে তাকে ঢুকিয়ে বললেন, দ্যাখো ভিতরে কি কাঠ আছে। তিন বাই চার এবং যত লম্বা সব কাঠ আছে বের করে ফেল। ছোটবাবু জানে এটা কার্পেন্টারের ঘর। পাশে ডেক-কশপের স্টোর-রুম। সে যত লম্বা কাঠ আছে ছোট বড় সব ডেকে টেনে টেনে-বের করে আনছে। আর মাঝে মাঝে বলছে, স্যার এত সব ভারি কাঠ দিয়ে কি হবে। তিনি ফিতে গজ দিয়ে মাপছেন। এবং পছন্দমতো সব কাঠ টেনে একপাশে রেখে দিচ্ছেন। তারপর হাঁটু গেড়ে বললেন, কাঠগুলো সব আমার কাঁধে তুলে দাও ছোটবাবু।

ছোটবাবু ভীষণ বিব্রত বোধ করছে। —রাখুন। আপনাকে নিতে হবে না। কোথায় রেখে আসতে হবে বলুন, রেখে আসছি। ছোটবাবু বিরক্ত গলায় এ-সব বলতে গেলে বুঝতে পারল স্যালি হিগিনস ভীষণ ভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। সেই চোখ, যেমন সে জাহাজে উঠে প্রথম দেখেছিল—যা দেখলে ওর বুকের রক্ত হিম হয়ে যেত। সে বলল, এক্সকিউজ মি স্যার। আপনার কষ্ট হবে ভেবে বলেছি। ছোটবাবু বুড়ো মানুষটার কাঁধে সব কটা কাঠ তুলে দিলে তিনি সোজা উঠতে পারলেন না। প্রায় টাল খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। ছোটবাবু এবার ধরে ফেলল। বলল, স্যার আপনি পারবেন না।

তিনি তবু কাঁধে সব কটা কাঠ নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। এত ভারি যে তিনি নুয়ে পড়ছিলেন। তবু যেন হার মানবেন না—বিড়বিড় করে বকছেন। কখনও ঈশ্বরকে অজস্র গালাগাল করছেন—কখনও বোধ হয় নতজানু—যেমন তিনি এবার জোরে জোরে বলছেন, লর্ড ব্রিংগ মি আউট অফ অল দিস ট্রাবল, বিকজ ইউ আর ট্রু টু ইউর প্রমিসেস। এ্যান্ড বিকজ ইউ আর লাভিং এ্যান্ড কাইনড টু মি......বলতে বলতে চলে যাচ্ছেন। ছোটবাবু পেছনে পেছনে যাচ্ছে—যদি ওপুড় হয়ে পড়ে যান—তার আগেই ধরে ফেলতে হবে—এবং আবার তিনি বলছেন—কাট অফ অল আওয়ার এনিমিজ এ্যান্ড ডেস্ট্রয় দোজ হু আর ট্রাইং টু হার্ম আস, ফর উই আর ইয়োর সার্ভেন্টস। যেন জপ করছেন, উই আর ইয়োর সার্ভেন্টস।

ছোটবাবু বলল, আমাকে কিছু দিন। পড়ে গেলে হাত পা ভাঙবে। তিনি একটা কাঠ ওকে দিলেন না। বসলেন। কাঠগুলো এবার সিঁড়ির কাছে রেখে একটা একটা করে বোট-ডেকে তুলে নিয়ে গেলেন। সব কটা কাঠ তুলে ফের নেমে এলে ছোটবাবু বলল, কোথায় যাচ্ছেন আবার!

—আমার সঙ্গে এস। মুখে যে ছোটবাবুর সামান্য বিরক্তি ফুটে উঠেছিল স্যালি হিগিনসের গলার স্বরে তা মিইয়ে গেল। সে তাঁর পেছনে মন্ত্রপূত মানুষের মতো হেঁটে যেতে থাকল। আর একটা প্রশ্ন করতে পারল না।

ছোটবাবুকে নিয়ে তিনি ফের ডেক-কশপের ঘরে ঢুকে তন্নতন্ন করে খুঁজছেন সব। পেরেক ছোট বড় মাপমতো যা পাচ্ছেন, ছোটবাবুর হাতে দিয়ে বলছেন, রাখো। লোহার পাতলা প্লেট এবং স্ক্রু। ত্রিপল টেনে বের করছেন। আর যেন এখন বরভাতে আরশোলা পা বেয়ে মাথা বেয়ে উঠে যাচ্ছে। আবার উড়ে যাচ্ছে কখনও। কত অল্পসময়ে ওদের উপদ্রব বেড়ে যাচ্ছে। এবং রং তেল বার্ণিশের গন্ধ। তিনি পাতলা কাঠ যা পাচ্ছেন টেনে বের করছেন। লোহার শিক টেনে বের করছেন। ছোটবাবু একটা কথা বলছে না। ভয় পেয়ে গেছে হয়তো, তিনি এবার টর্চের আলো অন্ধকারে ছোটবাবুর মুখে ফেললেন। সহসা আলো পড়ায় সে মুখের ওপর হাত তুলে দিলে স্যালি হিগিনস কেমন অমানুষের মতো হেসে উঠলেন। বললেন, ছোটবাবু তুমি ভীষণ কাওয়ার্ড। মুখ এমন করে রেখেছ কেন? আরে কিছু হয় নি। এই ছোটবাবু তুমি ক্রোজ-নেস্টে উঠে গেলে কিছু আর দেখতে পাবে না। কিন্তু আমি জানি আমরা কোথায় এসে গেছি। তোমাকে বলতে পারি কিন্তু তুমি যা একখানা মানুষ।

ছোটবাবু শক্ত গলায় বলল, স্যার আমরা কোথায় এসেছি? কোন সমুদ্রে!

—সমুদ্রটার সঠিক কিছু আমি জানি না। তবে এটা বলতে পারি কোরাল-সির কাছাকাছি জায়গা। এতদিনে অন্তত কোথায় আমরা আছি জানা গেল। একবার এখানে সিউল-ব্যাংক কোর্স ভুল করে ফেলেছিল।

—কি বলছেন স্যার!

—ভয় পাচ্ছ কেন? এই দ্যাখো হাত থেকে দুটো তোমার স্ক্রু পড়ে গেল। তবে তাঁর একান্ত করুণায় ছ সাত দিনের ভেতর আমরা আবার কোর্স পেয়ে গেলাম। একেবারে সহজ স্বাভাবিক কথা।

—তখন কিউ-টি-জি চাইলেন না কেন?

—চাইতে পারিনি। ভারি অসম্মানের ব্যাপার। এই তুমি কিন্তু আবার বনিকে বলবে না।

—না স্যার।

—বনিকে বললে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দেব। তিনি টর্চের আলো কাঠের র‍্যাক-গুলোতে ফেলে যাচ্ছেন। ছোট ছোট প্যাকেট, সব প্যাকেটে ঠিক পছন্দমতো তিনি ওয়াসার পাচ্ছেন না। দুটো বড় হাতুড়ি বেছে নিলেন। একটা র‍্যাঁদা। করাতের ব্লেড হাত দিয়ে বাঁকিয়ে দেখলেন কতটা ধকল সইতে পারবে। কাজ করছেন আর অজস্র কথা বলে যাচ্ছেন। —বুঝলে হে, জায়গাটা ভাল না। ক্রোজ-নেস্টে আর উঠবে না। কে কখন ঠেলে ফেলে দেবে ক্রোজ-নেস্ট থেকে।

ছোটবাবু বলল, তা হলে দূরে কিছু দেখতে পেলেন!

—দেখার আর কিছু নেই। সব ঠিক হয়ে গেছে।

—তা হলে স্যার আমরা দু একদিনের ভেতর ডাঙ্গা পেয়ে যাব।

—যেতে পার। ছোটবাবুকে সব খুলে বলতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। এমন দুটো তাজা প্রাণ বিনষ্ট হবে। ভাবতেই চিৎকার করে বললেন, হ্যালেলুজা। ছোটবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, ডিয়ার ফ্রেন্ড আই এ্যাম প্রেইং দ্যাট অল ইজ ওয়েল উইদ ইউ এ্যান্ড দ্যাট য়োর বডি ইজ অ্যাজ হেলদি অ্যাজ আই নো য়োর সোল ইজ...

ছোটবাবু বলল, স্যার আমাকে ভয় পাইয়ে দেবেন না।

তিনি শুধু বললেন, এস।

এবং ওরা দুজন আরও ভেতরে ঢুকে যেতে থাকল। তারপর তিনি কশপের ঘরে হন্যে হয়ে কি খুঁজতে থাকলেন। এবং পেয়ে গেলে বললেন টর্চ জ্বালো।

বাইরের আলো ভেতরে এতটুকু ঢুকতে পারছে না। ওরা অন্ধকারে যেন ভীষণ একটা গোপন জায়গায় চলে যাচ্ছে। ছোটবাবু বুঝতে পারছে না হিগিনস তাকে নিয়ে জাহাজের কোথায় নেমে যাচ্ছেন। এতদিন সে জাহাজে আছে কখনও এদিকটায় আসে নি। হিগিনস কি ওকে নিয়ে একেবারে জাহাজের তলায় নেমে যাচ্ছেন! অন্ধকারে ওরা একটা সিঁড়ি পেয়ে গেল। এবং টর্চ জ্বালিয়ে ক্রমে নিচে নেমে যখন ওপরে আলো ফেলল, তখন মাথার ওপরে ছাদ। পাশেই এক নম্বর হ্যাচ। ফসফেটের গন্ধ উঠে আসছে। ছোটবাবু বুঝতে পারছে না তিনি তাকে এত নিচে কেন নিয়ে এসেছেন। ওকে ফেলে তিনি ওপরে উঠে গেলে সে যেন ঠিক পথ চিনে ওপরেও উঠতে পারবে না। হিগিনস আর পার্থিব জগতের কেউ বিশ্বাস হচ্ছে না। চোখ জ্বলছে। বোধ হয় তিনি লুকেনারের প্রেতাত্মা কোথায় লুকিয়ে আছে অথবা মনে হয় তিনি তাকে বুঝি এখুনি দরজা খুলে দেখাবেন—হিয়ার ইজ দ্য ডেভিল। তার শুকনো অস্থিচর্মসার কংকাল দ্যাখো এখনও কি যে বহাল তবিয়তে আছে। ছোটবাবু চিৎকার করে উঠল, স্যার আপনি আমাকে কোথায় নিয়ে এলেন। আপনার কি ইচ্ছে?

হিগিনস চক-খড়ি দিয়ে তখন ইস্পাতের দেয়ালে একটা চার্ট এঁকে বললেন এই হচ্ছে কোরাল—সি। অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূল থেকে প্রায় উত্তরে এর আটশ নটিক্যাল মাইলের ওপর বিস্তৃতি। আমরা আছি তারও ওপরে। অর্থাৎ জাভা সুমাত্রা নিও-গিনি এখন আমাদের পাশাপাশি অঞ্চল। এখানে আছে অজস্র প্রবাল দ্বীপ। পাঁচ সাতশ মাইলের ভেতর জনহীন দ্বীপ তোমরা পেয়ে যেতে পার।

প্রায় ভূগোলের মাস্টারের মতো ছোট একটা স্টিক দিয়ে তিনি কাছাকাছি দ্বীপের দূরত্ব কি হবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। ঠিক কমপাসের কাঁটা বরাবর চালাতে পারলে আর পালে বাতাস লাগলে আট-দশ দিনের ভেতর পেয়ে যাবে। যদি কোনো কারণে দ্যাখো পাচ্ছ না, তবে বুঝতে হবে—তুমি ঠিক ঠিক বোট চালাতে পার নি। বলেই তিনি থামলেন, দুটো আরও দ্বীপের নাম লিখলেন—বেশ বড় বড় অক্ষরে যেন বুঝতে ছোটবাবুর অসুবিধা না হয়। এই হচ্ছে সান্তাক্রুজ দ্বীপপুঞ্জ তারপর ফানাফুতি। তারপর ওপরে তাকালেন। বোধ হয় গলা ছেড়ে কেউ ডাকছে। ছোটবাবু কান পেতে বুঝতে পারল ডেকে বনি গলা ফাটিয়ে ডাকছে। —বাবা, ছোটবাবু তোমরা কোথায় গেলে। প্রায় ওর গলা কান্নায় বুজে আসছে। সারেংসাবও চেঁচাচ্ছেন—ছোট তোরা কোথায় গেলি।

হিগিনস তাড়াতাড়ি দু হাতে সব মুছে বললেন, ছোটবাবু শিগগির ওপরে চল। উঠতে উঠতে বললেন, তোমাকে একটু শক্ত হতে হবে ছোটবাবু।

ছোটবাবু কেমন জেদি বালকের মতো নিচে দাঁড়িয়ে থাকল।

হিগিনস টর্চের ফোকাসে দেখলেন ছোটবাবু তেমন দাঁড়িয়ে আছে। উঠে

আসছে না। তিনি খুব সতর্ক গলায় বললেন অন্ধকারে ভয় পাবে ছোটবাবু। শিগগির উঠে এস।

ছোটবাবু বলল, স্যার আপনি আমাকে দিয়ে কি করাতে চাইছেন। আপনি চলে যান।

হিগিনস ফের নিচে নেমে বললেন, পরে বলব। সব তোমাকে বলব ছোট-বাবু। তুমি প্লিজ মুখ গোমড়া করে রাখবে না। বনি টের পেলে আমার কিছু আর করার থাকবে না। আমাদের ওরা খুঁজছে।
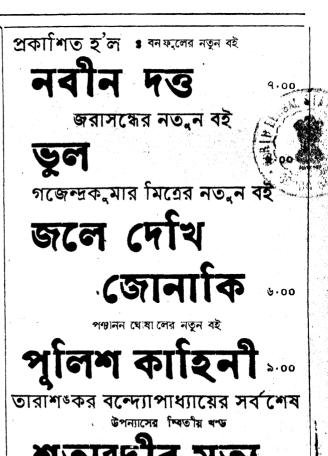
গলার স্বর এত অসহায়। এত তিনি অসহায় ছোটবাবু যেন এই জাহাজে প্রথম টের পেল। সে আর বিন্দুমাত্র দেরি করল না। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে কাপ্তেনের ঘরে এসে প্রথম সাড়া দিল আমরা এখানে বনি। চাচা আমরা এখানে কাঠ খুঁজছি।

বনি কাপ্তেনের ঘরে ঢুকে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাবার ওপর—কোথায় ছিলে। টেবিলে খাবার কখন সাজিয়ে রেখেছি—তোমাদের কারো পাত্তা নেই।

ছোটবাবু সকাল থেকে এত বেশি উদবিগ্ন ছিল, এত বেশি উত্তেজিত ছিল যে, মনেই হয় নি সে মাত্র এক কাপ চা খেয়ে আছে। পেটে জ্বলছে যেন দাবানল এবং সে আর একটা কথা না বলে বের হয়ে এল। কি মস্ত আকাশ আর সমুদ্র। জাহাজের ভেতর এমন ভয়াবহ সব জায়গা আছে সে কখনও জানত না।

খেতে বসে হিগিনস বললেন, বুঝলে ছোটবাবু গড্ মেন ইট টু লিভ অ্যান্ড মেন লিভ টু ইট।

দুটো চাপাটি দুটো আলুসেদ্ধ দুপুরের লাঞ্চ। ছোটবাবু জলখাবারের মতো প্রায় গিলে খেয়ে ফেলল। খিদে একেবারে যাচ্ছে না। সে ঢকঢক করে জল খাচ্ছিল—তখন স্যালি হিগিনস তাঁর দুটো আলুসেদ্ধ এবং একটা চাপাটি ওর পাতে তুলে দিলেন। বললেন, খাও ছোটবাবু। ছোটবাবু বলল আপনি এ-সব কি আরম্ভ করেছেন স্যার।

সারেঙসাব ভেতরে একসঙ্গে খেতে লজ্জা পাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর খাবার ডেকে নিয়ে গেছেন। বনি একেবারে এরই মধ্যে যতটা পারা যায় সেজেগুজে এসেছে। সে পাশে বসে খাচ্ছিলে। ছোটবাবুর যা শরীর ওবও ইচ্ছে করছে—ছোটবাবুর জন্য কিছু তুলে দেয়—কিন্তু সে জানে ছোটবাবু হয়তো খাবার ফেলে উঠে চলে যাবে। বাবা দিয়েছে বলে খাড় গুঁজে খেয়ে উঠেছে। এবং বনি দেখল ছোটবাবুর মুখ কেমন ভারি শুকনো। ছোটবাবু যে কেন বাবা জাহাজে থাকতে এত দুঃশ্চিন্তা করছে। বাবা ক্রমশ রোগা হয়ে যাচ্ছেন এবং বাবাকে দেখলেই বোঝা যায় আর তিনি আগের মতো নেই। চোখে মুখে যদিও হাসিটুকু তেমনি আছে তবু কোথায় যেন তিনি জোর হারিয়ে ফেলছেন।

ছোটবাবু বোট-ডেকে উঠে আবার সেই বিন্দুবৎ প্রবাল দ্বীপটিপ যদি চোখে দেখতে পায়—সে এগিয়ে যেতে থাকল রেলিঙে ঝুঁকে দাঁড়াল—কি কঠিন আর বিভীষিকাময় সমুদ্র ক্রমে চোখে ইতস্তত পাক খাচ্ছে—কেমন সামনে দুলে উঠছে সব কিছু—সেই প্রবাল দ্বীপ অথবা ক্রস কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সকাল থেকে সব অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছেন কাপ্তান। কেন তিনি এ-সব বলছেন—আর থেকে থেকে চিৎকার করে উঠছেন—হ্যালেলুজা অর্থাৎ জয় জগদীশ হরে! এখন বুড়ো মানুষটা চুপি-চুপি সারেঙকে ডেকে নিয়ে গেছে। কি-সব সলাপরামর্শ করছেন। এবং সারেঙ-সাব যখন নেমে এলেন মুখে ফ্যাকাশে যেন ও'র ফাঁসির হুকুম হয়েছে। চোখ স্থির। অতিশয় চুপচাপ তিনি হেঁটে যাচ্ছিলেন। ছোটবাবু ডাকল চাচা।

এখন হিগিনস ডাকলেন ছোটবাবু এদিকে এস।

ছোটবাবু দেখল, তিনি সব কাঠ বিছিয়ে দিচ্ছেন। করাত চালাচ্ছেন। ছোটবাবুকে একটি র‍্যাঁদা দিয়ে বললেন, চালাও। সারেঙ-সাব বোটে উঠে গেছেন—সব গিয়ার নিচে নামিয়ে রাখছেন। এবং কাঠের লাইনিং সেরে দেওয়া হচ্ছে। আর হিগিনস কাজের ফাঁকে ফাঁকে কথা বলে যাচ্ছেন। একজন বুড়ো মানুষ যেভাবে তার সন্তানসন্ততিকে তীর্থে যাবার আগে কথা বলে থাকে—তেমনি কথা বলে যাচ্ছেন। যেন মানুষটা প্রবাসে যাবার আগে বলে যাচ্ছেন বুঝলে হে—পাপের প্রতি মানুষের ভারি প্রলোভন। তিনি করাতের কাঠ চিরে হয়ে যাওয়ায় হাতুড়িতে ঠুকছিলেন। ছোটবাবুর র‍্যাঁদায় খসখস শব্দ হচ্ছে। হিগিনস এবার নুয়ে বললেন ছোটবাবু তুমি কি কি ধর্মগ্রন্থ পড়েছ।

—রামায়ণ মহাভারত পড়েছি স্যার।

—তোমাকে আমি বাইবেল দেব। তুমি পড়বে। প্রত্যেক মানুষের সব ধর্মগ্রন্থগুলো পড়ে ফেলা উচিত।

সে বলল পড়ব স্যার।

স্যালি হিগিনস খাকি রঙের হাফ-প্যান্ট পরেছেন। গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি। এবং ভীষণ লম্বা বলে আর চোখে গোল চশমা বলে গালে সাদা দাড়ি বলে কখনও কখনও তাঁকে ভীষণ ধার্মিক মানুষ মনে হচ্ছিল। তিনি যখন রাতে স্লিপিং গাউন পরে থাকেন অর্থাৎ সমুদ্রে ঠান্ডা বাতাস বইলে তিনি যখন বেশ লম্বা পোশাক পরেন তাঁকে সান্তাক্লজ না ভেবে পারা যায় না। তিনি এখন একটা কাঠ সোজা দাঁড় করিয়ে কতটা উঁচু দেখছেন। দেখতে দেখতে তিনি কিছু পাপ এবং লোভের গল্প বললেন তার পরিণতির গল্প বললেন। তারপর সামান্য সময় কান থেকে পেনসিল বের করে প্রায় একজন সূত্রধরের মতো কি সব রেখা টেনে গেলেন তাকালেন ছোটবাবুর দিকে—এ-সব গল্প শুনে ছোটবাবুর মুখে চোখে কি প্রতিক্রিয়া কাজ করছে বোঝার চেষ্টা করতে করতে এক সময় বলে ফেললেন ডিয়ার ফ্রেন্ড ডোন্ট লেট দিস ব্যাড একজাম্পল ইনফ্লুয়েন্স ইউ। ফলো ওনলি হোয়াট ইজ গুড। রিমেমবার দ্যাট দোজ হু হোয়াট ইজ রাইট প্রুভ দ্যাট দে আর গডস চিলড্রেন; অ্যান্ড দোজ হু কনটিনিউ ইন ইভিল প্রু[illegible]াট দে আর ফার ফ্রম গড।

ছোটবা[illegible] বুঝতে পারছিল চরম পরিণতি[illegible] তারা এগিয়ে যাচ্ছে। সে বলল স্যা[illegible]মি ছবিতে বাইবেলের কিছু গল্প দে[illegible]াম। একটা ব্যাপার ভারি আশ্চর্য [illegible]—মাঝে মাঝে এটা আমি স্বপ্নেও [illegible]—সেই মরুভূমির ভেতর সব মানুষেরা [illegible] যাচ্ছে। তাদের পিঠে অতিকায় [illegible] ছবিতে এটা দেখে কখনও আর ভুল[illegible] পারি নি। ভাল বুঝতেও পারিনি।

তিনি [illegible]র করে উঠলেন ফের—হ্যালেলুজা [illegible]রপর কাঠে পেরেক ঠুকতে ঠুকতে [illegible] বললেন স্যাক্রিফাইস। স্যাক্রিফাইস [illegible] ম্যানকাইন্ড। মানুষ তার সব [illegible] জন্য দায়ী সে নিজে। যা কিছু সে [illegible]য়োগ করবে লাভ লাভ তার ওপর বর্তা[illegible] সে নিজেই তার ক্রস বহন করে নিয়ে [illegible]য়। সে নিজেই রচনা করে তার বধ্যভূমি। [illegible]শব থেকে যৌবনে এবং যৌবন-কাল পার হলে প্রৌঢ় বয়সে সে দেখতে পায় এতদিনের যা কিছু প্রয়াস সব এক সুন্দর নীল উপত্যকাতে তার নিজের বধ্য-ভূমি তৈরিতে কেটে গেছে। জনগণেরা এবার হাততালি দিলে গলায় দড়িটা পরে ফেলবে। তারপ[illegible] সব শেষ—শুধু থাকে নীলবর্ণের এক আলোর ভূখণ্ড। বুঝতে পারছ আমাদের তা হলে কিছুই নেই। এত সুখ এত দুঃখ সবই তাঁর। তিনিই সব। সো প্রেইজ দ্য লর্ড। হাউ গুড ইট ইজ টু সিং হিজ প্রেইজেস! হাউ ডিলাইটফুল, অ্যান্ড হাউ রাইট।

বনি তখন ওপরে উঠে এসেছে।

বাবাকে ভীষণ উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। বাবা কাঠগুলো সব পালিস করছেন। সারেং ছোট ছোট সব কাঠের লাইনিং মেরে দিচ্ছে বোটে। সব ড্রাই ফুডের প্যাকেট নামিয়ে রেখেছে। পরিচ্ছন্ন নীল আকাশ। গরম নেই তেমন। পরিচ্ছন্ন আকাশের নিচে এখন একটু সময় পেয়ে গেছে বনি। সে চুল আঁচড়াচ্ছে। ওর সুন্দর নীলাভ চুলে ক্রিম ঘসে দিচ্ছে। সামনে সে রেখেছে ছোট্ট আয়না। সে ক্ষণে ক্ষণে পোশাক পাল্টাচ্ছে। বাবাকে, ছোট-বাবুকে দূর থেকে দুটো একটা কথা বলে আবার চুলে ক্রিম ঘসছে। মুখে ক্রিম ঘসছে। কেবিনের অন্ধকারে ভালো কিছু দেখা যায় না। বাবা ছোট-বাবু সারেং সারাদিন কেবল বোট-ডেকে খুট খুট করে কাঠ কাটছে, পেরেক পুঁতে দিচ্ছে কাঠে এবং আশ্চর্য বনি সন্ধ্যায়

দেখল বাবা বেশ বড় দুটো ক্রস বানিয়ে ফেলেছেন। ক্রস দেখে সে কেমন ভয় পেয়ে গেল। বলল বাবা এ-দিয়ে কি হবে?

তিনি ভয়ে মেয়ের দিকে তাকাতে পারলেন না। তিনি গজ ফিতে সব তুলে রাখছেন। সারেঙের পক্ষে একা কাজ শেষ করা কঠিন। এবার তিনি ছোটবাবুকে নিয়ে বোটের কাছে এসে দাঁড়ালেন। বনিকে তিনি কিছু বললেন না। অথবা কি বললে বনি আপাত শান্ত থাকবে কি বললে বনি বুঝতে পারবে না দ্য টাইম হ্যাজ কাম—ভেবে ভেবে তিনি যখন দেখলেন বনি কিছুতেই যাচ্ছে না তখন বাধ্য হয়ে বললেন, জায়গাটা ভাল না বনি। খারাপ জায়গা। শয়তানের প্রভাবে পড়ে যেতে পারি। ক্রস দুটো জাহাজের মাথায় দাঁড় করিয়ে দিলাম। এবারে দেখি কার কত সাহস!

ছোটবাবু এখন লোহার সরু জালের ওপর ত্রিপল ফেলে দিচ্ছে। বোটের ওপর হুড খোলা গাড়ির মতো এই ত্রিপল কাজ করবে। ঝড় বৃষ্টিতে হুড টেনে দিলে প্রায় নৌকায় ছই, সমুদ্রে বোট ভেসে গেলে ঝড়বৃষ্টিতে সামান্য আশ্রয়। জাহাজ তবে সত্যি অশুভ প্রভাবে পড়ে যেতে পারে—বাবা ক্রস দুটো বানিয়ে ভুল করেছেন। ক্রস থাকলে জাহাজে অশুভ প্রভাব ভিড়তে সাহস পাবে না। সে খুব নিশ্চিন্তে ঘরে ঘরে আলো জ্বালাবার জন্য নিচে নেমে গেল। সে ঘরে ঘরে লম্ফ জ্বেলে দিয়ে গেল।

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

লণ্ডনে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের সম্বর্ধনা

গত ২৭ জুলাই ব্রটেন প্রবাসী বাঙালীদের সাহিত্য পত্রিকা 'সাগর পারে'র উদ্যোগে লণ্ডনে সাহিত্যিক-সাংবাদিক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য এক ভোজসভার আয়োজন করা হয়। ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত শ্রেণীর সাহিত্যামোদী বাঙালী নর-নারী এই ভোজসভায় উপস্থিত ছিলেন। পত্রিকাটির সম্পাদক হিরন্ময় ভট্টাচার্য এই সভায় তাঁর বক্তৃতায় বলেনঃ 'রসিয়ে রসিয়ে গল্প বলা এবং লেখা সাহিত্যের গুণ। এ দুটোই তুষারবাবুর আয়ত্বে। তিনি সাংবাদিক হিসেবে পৃথিবীতে খ্যাত হলেও মনে-প্রাণে তিনি সাহিত্যিক।' সম্বর্ধনার উত্তরে তুষারকান্তিবাবু সাগর পারের সাফল্য ও দীর্ঘ জীবন কামনা করে বলেনঃ 'আমার সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে বয়সটা ছাড়া আর সব ভুল। আমাদের দেশে কাগজের অভাব তাই বড়ো বড়ো খবরকে কাটছাট করে ছোট করা হয় আর এদেশে বিষয়বস্তু নেই অথচ পাতার পর পাতা খবর।' তারপর তুষারকান্তি তাঁর নিজস্ব সরস ভঙ্গীতে বেশ কিছুক্ষণ ধরে পৃথিবীর নানা দেশ ঘুরে তাঁর যেসব বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে তার গল্প পরিবেশন করে সবাইকে আনন্দ দেন। এই ভোজসভায় লণ্ডন থেকে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 'জনমত'-এর সম্পাদক ওয়ালী আশরফও বক্তৃতা করেন। ভারত ও বাংলা দেশের বহু বিশিষ্ট নর-নারী এই ভোজসভায় উপস্থিত ছিলেন।

এর পূর্বে ১৮ জুলাই বেঙ্গলী ইনস্টিটিউটও শ্রীঘোষকে সম্বর্ধনা জানান।

ভারতীয় সাংবাদিকদের একটি ভোজসভায় শ্রীঘোষ বিশেষ আমন্ত্রণে যোগদান করেন। ৪ আগষ্ট তিনি কেনসেল গ্রীনের সমাধিক্ষেত্রে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এই অনুষ্ঠানে দ্বারকানাথের জীবনের কয়েকটি মর্মস্পর্শী ঘটনার উল্লেখ করে একটি ভাষণ দেন। ব্রটেন প্রবাসী ভারতীয়দের নানা সমস্যা সম্পর্কে তিনি ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রীবি কে নেহরুর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন। শ্রীঘোষ সরকারী তথা বেসরকারী নানা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও যোগ দেন। বৃটিশ ও কমনওয়েলথ প্রেসের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তা ছাড়া প্রবাসী বাঙ্গালীদের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীঘোষকে বহু ঘরোয়া বৈঠক ও মজলিশে এবং গৃহপ্রবেশ প্রভৃতি অনুষ্ঠানেও যোগদান করতে হয়। পক্ষকাল নানা ব্যস্ততার মধ্যে লণ্ডনে কাটাবার পরে শ্রীঘোষ ৫ আগষ্ট প্যারিস যাত্রা করেছেন। সেখান থেকে তিনি রোম যাবেন।

আমেরিকা ও বৃটেনের বাংলা পত্র-পত্রিকা ও সংস্কৃতি সংস্থা

'সুধী, আমাদের এই প্রবাস জীবনে বাংলা ভাষা ও তার সাংস্কৃতিক ভাবধারাকে বজায় রাখার শুভ সংকল্প নিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার কিছু ব্যক্তির উদ্যোগে ১৯৭১ সালের নভেম্বরে 'বঙ্গসংস্কৃতি সংঘের' প্রতিষ্ঠা হয়। এই সংঘের প্রধান কাজ হলো বাংলা ও অন্যান্য ভাষায় লেখা বই ও পত্রিকা সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, সামাজিক আনন্দানুষ্ঠান ইত্যাদি। এই দুটো মুখ্য উদ্দেশ্য এক—বিদেশের ভিন্ন পরিবেশে প্রবাসী বাঙ্গালীরা যেন বাংলা সাহিত্য ও কৃষ্টির আস্বাদন থেকে বঞ্চিত না হন। দুই—অন্যান্য সাংস্কৃতিক সংঘকে ভাব বিনিময়ের উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের সঙ্গে পরিচিত করা। ১৯৭১ সালের ১৫ই নভেম্বর থেকে আন্তর্জাতিক এবং বিশেষভাবে ভারত ও বাংলাদেশের সম্ভাব্য সমস্ত খবর পরিবেশন করে 'সংবাদ বিচিত্রা' নামে আমরা একটি সংবাদপত্র নিয়মিত প্রকাশ করছি।'...... এই উদ্ধৃতিটি নিউইয়র্কের বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘের পক্ষ থেকে ১৩৮১ সালের ১লা বৈশাখে নববর্ষ উপলক্ষে প্রচারিত পুস্তকটি থেকে নেওয়া হয়েছে। 'সংবাদ বিচিত্রা'র ৩য় বর্ষের ১০ম সংখ্যাটি (২০শে জুলাই, ১৯৭৪) আমাদের হাতে এসেছে। আট পৃষ্ঠার এই পত্রিকাটিতে প্রথম ছয় পৃষ্ঠায় ভারত ও বাংলাদেশের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণ প্রায় সমস্ত সংবাদেরই নির্বাচিত অংশ স্থান পেয়েছে। ৭ম পৃষ্ঠায় আমেরিকার বিভিন্ন শহরে নানা বাংলা নাটকের অভিনয়, বাংলা চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, বাঙালী শিল্পীর সঙ্গীতানুষ্ঠান বাংলা বইয়ের বিভিন্ন পাঠাগারের খবর, বাঙ্গালী শিশু ও কিশোরদের [illegible], এমনকি বনভোজন পর্যন্ত সমস্ত প্রকার উদ্যমের কথা জানা যাচ্ছে। এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করে থাকেন স্বর্ণ[illegible]মার দত্ত।

বৃটেন[illegible]ক প্রকাশিত দুটি বাংলা পত্রিকার কথা আমরা জানি। এ দুটি পত্রিকাই ১৯৬৯ সাল থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। একটি মূলতঃ সাহিত্য পত্রিকা—'সাগর পারে'—এর সম্পাদনা করেন হিরন্ময় ভট্টাচার্য। অন্যটি সংবাদ সাপ্তাহিক—সাপ্তাহিক জনমত— এটির সম্পাদনা করে থাকেন ওয়ালী আশরফ।

এই সমস্ত পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশে ও প্রবাসী বাঙালীরা যেভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকেন তা থেকে স্পষ্টতঃই বোঝা যায় যে বৃটেন ও আমেরিকার প্রবাসী বাঙালীরা নিজেদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রীতিমতো সজাগ। এটা খুবই আশা ও আনন্দের কথা। সম্প্রতি লণ্ডনে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন-এর প্রথম অধিবেশন সুসম্পন্ন হয়েছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিক ও সাহিত্যিক, 'অমৃত' সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ বয়সের ভার ও শারীরিক অসাচ্ছন্দ্য তুচ্ছজ্ঞান করে বৃটেনে গিয়েছিলেন এই অধিবেশনকে সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবার জন্য। তাঁর সে-প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। বৃটেনের সর্বত্র বঙ্গ সংস্কৃতি চর্চার জন্য নতুন করে উদ্দাম দেখা দিয়েছে। এই সমস্ত প্রয়াসের মূলে বৃটেন বা আমেরিকায় প্রবাসী যে সব বঙ্গসন্তান রয়েছেন তাঁরা সকলেই

বাঙালী মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন সন্দেহ নাই। সব দেশে যে-সব বাঙালীরা বসবাস করছেন—অস্থায়ীভাবেই হক আর স্থায়ীভাবেই হক তাঁরা প্রায় সকলেই কোন না কোন কাজকর্মে ব্যাপৃত থাকেন। তারই ফাঁকে ফাঁকে মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চা ও সাংবাদিকতার যে যোগ্যতা তাঁদের বিভিন্ন প্রয়াসের মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তা তাঁদের উচ্চ সাংস্কৃতিকমানেরই পরিচায়ক। আমরা আশা রাখি যে অচিরেই এমন দিন আসবে যখন সগর্বভাবেই আমরা একথা ঘোষণা করতে পারবো যে এই গ্রহে যেখানেই বাঙালী আছে সেখানেই বঙ্গদেশ বিদ্যমান।

শরৎ শতবার্ষিকী পালনের জন্য কমিটি গঠন

গত ২ আগস্ট রাজ্যের সাহিত্যিকগণ রাইটার্স বিল্ডিং-এ মিলিত হয়ে আগামী ১৩৮২ সালের ৩১ ভাদ্র থেকে এক বৎসরব্যাপী অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকী পালনের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় সর্বসম্মতিক্রমে এই কমিটির চেয়ারম্যান মনোনীত হয়েছেন। কথাসাহিত্যিক মনোজ বসু কার্যভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন এবং দক্ষিণারঞ্জন বসু, ডঃ অজিতকুমার ঘোষ ও সাহিত্যিক বিশু মুখোপাধ্যায় সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন। এই কমিটির উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বর্ষব্যাপী নানা কর্মসূচীর পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার জন্য। এই একই উদ্দেশ্যে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলেও আঞ্চলিক কমিটি গঠন করা হবে বলে জানা গেছে। কর্মসূচীর তালিকায় কয়েকটি বিষয় হলো : তিন বছরের মধ্যে শরৎচন্দ্রের রচনাবলীর সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করা ভারতের প্রতিটি ভাষায় শরৎচন্দ্রের জীবনী প্রকাশ করা ও তাঁর জীবনকে কেন্দ্র করে একটি পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র তৈরী করা। শতবার্ষিকীর উৎসবকালে শরৎপ্রদর্শনী শরৎচন্দ্র সম্পর্কে প্রকাশিত পুস্তকের প্রদর্শনী দেবানন্দপুরে শরৎসাহিত্য মেলা নাট্যাভিনয় ও শরৎ বক্তৃতামালার আয়োজন করা শরৎচন্দ্র সম্পর্কে ব্যাপারে কর্মসূচীর সুপারিশ করা কলকাতার রাস্তা ও শরৎচন্দ্রের একটি মর্মরমূর্তি স্থাপন করা শরৎচন্দ্রের স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হবে। তা ছাড়া রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানানো হবে শরৎচন্দ্রের জন্মদিনটি সাধারণ ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করার জন্য। এই উৎসবকে একটি সর্বভারতীয় রূপ দেবার জন্য বিভিন্ন রাজ্যেও এই উদ্দেশ্যে কমিটি গঠন করা হচ্ছে বলে জানা গেল।

শিবরাম সম্বর্ধনা

মহুয়া সাংস্কৃতিক সংস্থার পক্ষ থেকে সম্প্রতি কথাশিল্পী শিবরাম চক্রবর্তীকে একটি সম্বর্ধনা জানানো হয়। ঐ একই অনুষ্ঠানে সংগীতশিল্পী ডঃ চিত্রলেখা চৌধুরীকেও সম্বর্ধনা জানানো হয়। বিষয় নানা সমস্যা-জর্জর বাঙালী জীবনে বিগত কয়েক যুগ ধরে প্রচুর হাসির খোরাক জুগিয়েছেন শিবরাম। জ্বালাহীন ব্যঙ্গ আর অবিমিশ্র কৌতুক যে-কোনো ভাষার সাহিত্যেই অপেক্ষাকৃত কম সৃষ্টি হয়ে থাকে আর বাংলা সাহিত্যে এর অপ্রতুলতা সর্বজনস্বীকৃত। বিশুদ্ধ কল্পনাশ্রয়ী নিছক আজগুবি একান্ত বাস্তবধর্মী—নানা জাতের ছোটো-বড়ো হাস্য ভরপুর কাহিনী রচনায় বর্তমান বাংলা সাহিত্যে শিবরাম বোধ করি অদ্বিতীয়। ছোটো বড়ো সব বয়সের পাঠক-পাঠিকার প্রতিই তাঁর নজর থাকে। তাই সকলকেই তিনি সমানভাবে খুশী করতে পেরেছেন। ব্যক্তি শিবরামকে যাঁরা জানেন তাঁর সাহিত্যের অন্তর্নিহিত মাধুর্য উপলব্ধি করা তাঁদের পক্ষে একটা অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা। কদাচিৎ এ-রকম একজন লেখকের দেখা মেলে যাঁর মুখের কথা হাবভাব চালচলন আর রচনা এমন অভিন্ন। স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের কথাশিল্পী শিবরাম চক্রবর্তীকে শ্রদ্ধা জানাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী

১৯৭৪-৭৫ শিক্ষা বর্ষকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী শীতকালে কোনও এক সময়ে একটি বিশেষ অধিবেশনে এই সুবর্ণ জয়ন্তী সম্পর্কে সপ্তাহব্যাপী এক কর্মসূচী নেওয়া হবে।

'বাংলাদেশ'-এর রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস :

স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরেই সেখানকার নেতৃবৃন্দ বাংলা একাডেমিকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন স্বদেশের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি প্রামাণ্য ইতিহাস রচনার জন্য। জানা গেল যে সে-কাজ বর্তমানে সমাপ্ত হয়েছে। আশা করা যায় যে, একাডেমির তত্ত্বাবধানে শীঘ্রই এ-ইতিহাস মুদ্রিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে।

—অরূপকুমার

বিষণ্ণ পরবাস : বীরেন্দ্র দত্ত : সুপ্রকাশন, কলেজ রো, কলকাতা-৯। দাম সাড়ে সাত টাকা।

'বিষণ্ণ পরবাস' বীরেন্দ্র দত্তের সাম্প্রতিক উপন্যাস। এর কাহিনীতে ত্রিকোণ প্রেমের আভাস আছে বটে কিন্তু একটি কৌণিক বিন্দু অস্পষ্ট। এবং লেখক ইচ্ছে করেই ওই তৃতীয় বিন্দুটিকে অস্পষ্ট রেখেছেন। কারণ, অস্পষ্ট হলেও অন্য দুটি বিন্দুর যোগসাধনের রেখাটিকে ওই অস্পষ্ট বিন্দুটিই দূরে ও গভীর আকর্ষণে সরলরেখায় যুক্ত হতে দেয়নি। হোস্টেলে-থাকা, চাকরি-করা দুটি মেয়ে—নন্দিতা ও রুবি। নন্দিতার বিয়ে হয়েছিল। তার স্বামী দাঙ্গায় মারা গেছে। সে সুন্দরী, দাম্পত্যজীবনের শারীরিক ভোগের স্মৃতিও তার আছে। কিন্তু দৈনন্দিন জীবিকায় সে নিজেকে, নিজের শরীর ও যৌবনকে নষ্ট হতে দিতে চায়নি। তার আত্মপ্রেমই তাকে বাঁচিয়েছে। জীবনের ভিত একবার পায়ের তলা থেকে সরে গেলেও সে খুঁজে নিয়েছে আর একটি অবলম্বন। বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা তার ফুরোয়নি। রুবির সঙ্গে একসঙ্গে হোস্টেলে থেকে সে কিছুটা আত্মরতির মধ্যে সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে ঠিকই কিন্তু স্বাভাবিক সুস্থ যৌন-জীবনে সে আগ্রহী বলেই অমিতকে সে চায়, নতুন জীবনে প্রৌঢ়ত্ব ভুলে পুরোনো দাম্পত্য-জীবনের স্বাদ ফিরিয়ে আনতে সে অধীর হয়ে ওঠে। কিন্তু একই ঘরের বাসিন্দা অস্পষ্টযৌবনা রুবির অস্তিত্বই তার মধ্যে প্রৌঢ়ত্বের চোরা স্রোতের গভীর টান দিতে থাকে। মনে মনে রুবিকে অমিতের পাশে উপযুক্ত মনে করেও সে নিজের পলাতক যৌবনকে ধরে রেখে বয়সে ছোট অমিতকে আগলে রাখতে চায়। অন্যদিকে রুবির চাপা স্বভাব প্রবল আত্মপ্রকাশ চায় না বলেই নন্দিতার পক্ষে অমিতকে পাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে। লেখক নন্দিতা-রুবির পারস্পরিক সম্পর্কের এই জটিল ও ধূসর দিকটি অত্যন্ত কৌশলী ইঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন প্রধানতঃ নন্দিতার মানসিক ইতিহাসের ধীর পরিবর্তনের ধাপগুলি দেখিয়ে। মধ্যবিত্ত হোস্টেলবাসিনী চাকরিজীবী মেয়েদের জীবনের বৈচিত্র্য মানসিকতা ও বিনোদন তাদের জীবনের জটিল সমস্যা ও স্থিতি-সম্ভাবনাকে কোনো ঔপন্যাসিক ইতিপূর্বে এমন পরিমিতজ্ঞানে ধরতে চেষ্টা করেছেন কিনা জানি না।

শেষ পর্যন্ত সেই অস্পষ্ট কৌণিক বিন্দুটি জটিল জাল ছড়ালো। অমিত-নন্দিতার বিবাহিত জীবনে নন্দিতা যখন নতুন করে তার দ্বিতীয় যৌবনকে ধরতে চাইছে তখন নন্দিতার মনে রুবির ছায়া পড়লো। নন্দিতা তার অম্লান যৌবনকে আর ধরে রাখতে পারে না। প্রৌঢ়ত্বের গভীর ডাকে তার এই দ্বিতীয় যৌবন হার মেনে গেল। গভীর বিষণ্ণ প্রবাসী-বোধে সে নিজেকে কেবলই অক্ষম ভাবে। আর রুবির মধ্যে সেই যৌবনী ক্ষমতাকে দেখে। সেই চাপা অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশে নন্দিতার চেহারা, তার গভীর আচরণ-

বিচরণ তার স্বপ্ন, তার উদাসীন ক্লান্ত শান্তির অনুভূতি তাকে যেভাবে আত্ম-বিনাশের পথে নিয়ে গেছে, তাতে ঔপন্যাসিকের যুক্তিজ্ঞান ও সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বোধের প্রশংসা না করে পারা যায় না।

কাহিনীটির বাইরের পরিদৃশ্য বর্ণনা অনেক সময়ই সাংকেতিক, কিন্তু অনেক সময় ব্যঞ্জনাহীন ও একটু দীর্ঘ। নন্দিতা একাধিকবার স্বপ্ন দেখেছে—পাঠকের কাছে এই সচেতন উল্লেখ বোধহয় না থাকাই ভালো। স্বপ্ন-চিন্তা এবং কঠিন বাস্তব-ভূমির সম্পর্ক বোঝাতে লেখকের নিজস্ব কোনো পার্থক্যসূচক যতি-চিহ্ন থাকাই ভালো। সেই যতি-চিহ্নই বুঝিয়ে দেবে চরিত্র কখন চিন্তা থেকে স্বপ্নে স্বপ্ন থেকে কঠিন ভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছে। সে যাই হোক, এই প্রবাসী-বোধ-পীড়িত নন্দিতার আত্মপ্রেম কীভাবে আত্মবিনাশের গভীর নিঃশব্দ পথে যাত্রা করেছে তার বর্ণনা ও পরিচ্ছন্ন রচনার চেষ্টা সাম্প্রতিক উপন্যাসে দুর্লভ। এবং এই বিষণ্নবোধের যে কঠিন সামাজিক ভূমি থাকে তা যে লেখক ভোলেননি এটাও প্রশংসনীয়। নন্দিতার পূর্বজীবন ও নেপথ্যের সামাজিক পটভূমি রচনায় তার প্রমাণ আছে। তার নিঃশব্দ অপমৃত্যুর গভীরে যে সামাজিক জটিলতা আছে তার আভাসই উপন্যাসটিকে স্থায়ী ভিত্তিভূমি দিয়েছে।

উজ্জ্বল মজুমদার

চারদশকের বাংলা গান: সম্পাদনা অরুণ সেন এবং গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশভারতী। ১৩ রামধন মিত্র লেন। কোলকাতা-৪। দাম: পনের টাকা।

'চারদশকের বাংলা গান' নামের সংকলন গ্রন্থটি আধুনিক বাংলা গানের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সংগ্রহ। এতে গত চার দশকের বাংলা গানের সংগ্রহ থেকে নির্বাচিত কিছু গান সংগ্রহ করে আধুনিক বাংলা গানের কাল পরম্পরায় ধারাটিকে প্রাতিশুন্য দক্ষতায় উপস্থাপিত করতে পেরেছেন। শ্রীমুখোপাধ্যায় এবং শ্রীসেন নিজেরাই সংগীতস্রষ্টা হওয়ায় আধুনিক বাংলা গানের পরিবর্তন বিবর্তনের প্রতিটি স্তরে তাঁদের সন্ধানী দৃষ্টি ছিল। নিজেরা সংগীত-রচয়িতা হওয়ায় আরও একটা জিনিস তাঁদের ছিল সেটা হোলো আধুনিক গানের প্রতি একটা গভীর মমতা। এই কারণেই সংকলনে তাঁদের আন্তরিকতা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

চারদশকের সময়সীমাকে নিখুঁতভাবে মানা হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি—কননা, সেটা নেহাৎই কঠিন কাজ। সেই কারণে চারদশক সময়সীমার ধারে-কাছের কিছু গান এই সংকলনের মধ্যে ঢুকে পড়া অসম্ভব নয়। এমন ঘটনা যদি পাঠকের চোখে পড়ে তা সহানুভূতির সঙ্গেই গ্রহণ করা উচিত। আধুনিক বাংলা গানের বিবর্তনের ঐতিহাসিক ক্রমটিকে তুলে ধরতে সংকলনকারীরা একেবারে আধুনিক হাল আমলেরও কিছু গান সংগ্রহে রেখেছেন। গীতিকবি পরিচয় অংশটি বিশেষ আকর্ষণীয়। সব মিলিয়ে সংকলন গ্রন্থটি একটি সার্থক প্রয়াস। ছাপা এবং বাঁধাই ভালো।

পত্র-পত্রিকা

অভিনয়। (ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য স্মারক সংখ্যা)। সম্পাদনা দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩১ হরিশ মুখার্জী রোড। কোলকাতা-২৬। দেড় টাকা।

বাংলা নাটকের প্রসার-প্রগতির চিন্তা-চেতনায় যিনি আজীবন মগ্ন ছিলেন সেই নাট্যপ্রেমিক অধ্যাপক সাধনকুমার ভট্টাচার্যের স্মরণে এই সংখ্যার অভিনয় পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছে। নাটকের মূলে কথা এবং অভিনয়ের তাৎপর্য সম্পর্কেই যে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল তাই নয় তাঁর মধ্যে ছিল শিল্পীর প্রকাশ, যা তাঁর

যে বন্ধুটির সঙ্গে বাক্যালাপের প্রসঙ্গে এই রচনা তিনি একজন নামী লেখক। প্রৌঢ়। এখানকার সাহিত্যক্ষেত্রে অনেক কালের অভ্যস্ত বিচরণ তাঁর। মৃদুভাষী এবং মোটামুটি বিনয়ী মানুষ। বাছাই করা তিনটি প্রকাশকের সঙ্গে কারবার তাঁর। এই তিনটি প্রকাশকের মধ্যেও আবার এক নম্বর দু নম্বর তিন নম্বর আছে।

কথা প্রসঙ্গে কিছুটা বিমর্ষ মুখে জানালেন একজন ভালো প্রকাশকের খোঁজ করছেন তিনি যাকে সর্ব ব্যাপারে বিশ্বাস করা যায়—কারণ ওই এক নম্বর প্রকাশকটির সঙ্গেই এবারে সম্পর্ক শেষ করে ফেলতে চান তিনি।

শুনে আমি বেশ অবাক। জিজ্ঞাসা করলাম কি ব্যাপার—টাকা পয়সা নিয়ে কিছু গোলযোগ বেধেছে কিনা। তিনি জানালেন না তা নয়—টাকা ঠিক-ঠিকই পেয়ে যাচ্ছেন। তাহলে কি? বই ঠিক মতো 'পুশ' করছে না? বিজ্ঞাপন ঠিক মতো দিচ্ছে না? অন্য লেখকের আদর বেশি বেড়েছে? সবেতেই মাথা নাড়েন লেখক বন্ধু—ওসব কিছুই না।

ওই বড় প্রকাশক সংস্থার সঙ্গে আমারও কিছু স্বার্থের যোগাযোগ আছে তাই আমার জানার আগ্রহ। কিন্তু জেরার পরে যা প্রকাশ পেল সেটা নির্দিষ্ট অভিযোগ কিছু নয়। লেখক বন্ধু বিরক্ত মুখ করে জানালেন অনেক বড় হয়ে গেছে ব্যবসা ছড়াচ্ছে—আগের মতো সে-রকম একান্ত অন্তরঙ্গ ভাবটা আর নেই—কেমন যেন ছাড়া-ছাড়া ভাব আগের মতো সে-রকম আর সুখ-দুঃখের সংগী মনে হয় না ও'দের।

এই সামান্য ব্যাপারটাই আমাকে এক বৃহৎ চিন্তার দিকে ঠেলে দিয়েছে। আমাদের দেশে প্রকাশনার চিত্রটাই অন্যরকম। মোটামুটি একজন নামী লেখক তাঁর পরিণত জীবনপরিক্রমার প্রান্তে এসে দাঁড়ানোর মধ্যে সত্তর-আশী একশখানা বই লিখে ফেলেন। অতএব আট-দশটিরও বেশি প্রকাশ-সংস্থার সঙ্গে তাঁর লেন-দেনের কারবার—এক প্রকাশককে ছেড়ে অন্য প্রকাশক ধরার তাগিদ। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে যেখানে একখানা বই সে-রকম উৎরে গেলে লেখকের জীবনসংগ্রামের সমস্যা মোটামুটি মিটে [illegible]ল—সেখানেও লেখককে নিয়ে প্র[illegible]র এই গোছের সমস্যার সম্মুখীন [illegible] হয়। আর সেই কারণেই বিদেশের ওই সব প্রকাশ-সংস্থা তাঁদের লেখকদের নিজস্ব করে ধরে রাখার সাফল্যটাকে দস্তুর মতো এক অনুশীলনের বস্তু মনে করেন। একজন ভালো-বিক্রীর লেখক বড় জোর আট-দশখানা বই লিখবেন—মনের অমিল ভিন্ন এই সব লেখকদের এক প্রকাশককে ছেড়ে আর এক প্রকাশক ধরার প্রশ্নই ওঠে না। অতএব লেখকদের এই মনের দিকে তাকানোটাই একটা বড় আর্ট বলে মনে করেন তাঁরা।

আমার ধারণা লেখকদের নিভৃতের মানসিক দিকটা মোটামুটি সব দেশেই অভিন্ন। সেখানেও অতি তুচ্ছ কারণে লেখক বা লেখিকার তাঁর পুরনো প্রকাশককে ছেড়ে যাবার নজির আছে। যেমন প্রকাশক হয়তো তাঁর লেখক বা লেখিকার শেষের বইয়ের ছবি বা টেলিভিশন-অনুষ্ঠান দেখেনি তাঁর বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারে হয়তো আশানুরূপ সহানুভূতির আভাস মেলেনি তার অসুস্থতার খবর রাখেনি বইয়ের সংস্করণ শেষ হবার পরেও তড়িঘড়ি পুনর্মুদ্রণের আগ্রহ দেখায়নি অন্য নতুন কোনো লেখক-লেখিকার প্রতি হয়তো তাঁর

অভিনয়চাতুর্যের মধ্যে ধরা পড়ত। নাটক লেখা এবং তা অভিনয় করা সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার। দুটির সমন্বয় একই ব্যক্তির মধ্যে বড়ো একটা দেখা যায় না। সাধনবাবুর মধ্যে এই দুইয়ের সার্থক সমন্বয় দেখেছি। নাটকের বিষয় ছাড়াও শিল্পতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য একাধিক গ্রন্থের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। অধ্যাপক সাধনকুমার ভট্টাচার্যের একটা সামগ্রিক পরিচয় সার্থকভাবেই তুলে ধরা হয়েছে 'অভিনয়' পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যাটিতে। সহকর্মী ও ছাত্রদের জবানীতে ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য শিরোনামায় হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার বসু, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবং অমর ঘোষের স্মৃতিচারণা ভালো লাগল। 'অভিনয়' পত্রিকার এই প্রয়াসে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মুক্তি মনতাজ। প্রলয় শূর সম্পাদিত। ২৬ চৌরঙ্গী রোড কোলকাতা-১৩। দেড় টাকা।

'ক্যালকাটা সিনে ইনস্টিটিউটে'-এর ত্রৈ-মাসিক পত্রিকা 'মুক্তি মনতাজ'-এর সাম্প্রতিক সংখ্যায় বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র সম্পর্কিত রচনা উল্লেখ করার মতো। সোমেন ঘোষের লেখা 'বাংলা চলচ্চিত্র: অগ্রগতি ও সংকট'—চলচ্চিত্র নিয়ে যাঁরা ভাবেন তাঁদের কাছে মূল্যবান বিবেচিত হবে। আফ্রিকান চলচ্চিত্রকার ওসমান সেম্বেনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারটিও ভালো। অনেক নতুন চিন্তাভাবনার প্রতিফলন আছে এতে। চলচ্চিত্র আন্দোলনে শুভঙ্করীর বিরুদ্ধে কিছু বলিষ্ঠ প্রস্তাব রেখেছেন শুভেন্দু দাশগুপ্ত। প্রলয় শূরের চলচ্চিত্রে কালের কণ্ঠস্বর লেখাটিও উৎরেছে। প্রচ্ছদে পূর্ণেন্দু পত্রী তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। ছাপা পরিচ্ছন্ন।

চিত্রকল্প। সম্পাদক প্রমোদকুমার লাহিড়ী। ২ চৌরঙ্গী রোড কোলকাতা—১৩। দু' টাকা।

ঋত্বিককুমার ঘটক একজন দুরন্ত চিত্র-পরিচালক একথা অনিবার্যভাবেই স্বীকার করতে হয়। সম্প্রতি সিনে ক্লাব অফ ক্যালকাটার উদ্যোগে ঋত্বিক ঘটকের চারখানি ছবির প্রদর্শনী হয়ে গেল। দর্শকে ঋত্বিকবাবুর শিল্পকর্মকে নতুন মূল্যমানে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন অনুভব করলেন। সেই উদ্দেশ্যেই সম্ভবত চিত্রকল্প-এর এই সংখ্যাটি ঋত্বিক ঘটকের ছবির আলোচনায় সমৃদ্ধ। এছাড়া অশনি সংকেত: ইতিহাসের পুনর্গঠন এবং সময় ও পদাতিক নিবন্ধ দুটিও উল্লেখ করার মতো। পত্রিকাটির সর্বত্র সুরুচির ছাপ আছে।

কলাপ। সম্পাদনা বাদল সমাদ্দার। ১৯৭, গান্ধী কলোনী, টালিগঞ্জ। কোলকাতা-৪০। দাম এক টাকা।

'কলাপ' রীতিমতো একটি পরিচ্ছন্ন রুচির কাগজ। পরিচ্ছন্নতা এর অঙ্গসজ্জাতেও। কৃষ্ণ ধর এবং গৌরাঙ্গ ভৌমিকের কবিতা ভালো লেগেছে। ভালো লেগেছে নতুন কবিদের আরও কয়েকটি কবিতা। একজন প্রতিষ্ঠিত গল্প-লেখকের একটি কবিতাও আমাদের তৃপ্তি দিয়েছে। 'নামিবিয়া নতুন জীবনের স্পন্দন' নামের প্রবন্ধটিও পত্রিকার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। প্রশান্ত রায়ের স্কেচটিও ভালো।

প্রতিশ্রুতি (তারাশঙ্কর সংখ্যা)। সম্পাদনা ব্রজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য। ২০সি ক্যানাল রোড। কোলকাতা—১৯। চল্লিশ পয়সা।

এই সংখ্যায় লিখেছেন সুশীল রায় মানবেন্দ্র পাল ঋত্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় এবং বিশ্বেশ্বর রায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ছোট্ট অপ্রকাশিত কবিতা আছে পত্রিকাটিতে। ছাপার বিষয়ে যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।

গোমতী। সম্পাদক কৃষ্ণপদ দত্ত। ত্রিপুরা সরকারের জনসংযোগ ও পর্যটন অধিকার থেকে প্রকাশিত।

'ত্রিপুরার গল্প-উপন্যাসের গতি প্রকৃতি', 'ত্রিপুরার লৌকিক দেবদেবী প্রসঙ্গে' এবং চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে শীর্ষক লেখা তিনটি পত্রিকার আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। লিখেছেন কার্তিক লাহিড়ী জগদীশ গণচৌধুরী এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। আশা করব পত্রিকাটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

বিবেচনায় একটু বেশি নজর দেওয়া হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

ওদেশের কোনো এক বড় প্রকাশ-সংস্থার ডিরেক্টর তাঁর 'বাঁধা' লেখকদের প্রসঙ্গে বলেছিলেন আমি আমার লেখকদের কখনো আয়া কখনো ব্যাঙ্কার কখনো ডাক্তার কখনো বা ট্রাভেলিং এজেন্ট। তাঁর মোজা দেখে রাগ করে কখনো বা পাঁচ ডলার খরচ করে একজোড়া মোজা কিনে দিলাম অসুখের খবর পেয়ে সবার আগে ছুটলাম তাকে হাসপাতালে ভর্তি করার তাগিদ নিয়ে। একজন নামী লেখকের ছেড়ে যাওয়া প্রসঙ্গে তিনি মুচকি হেসে বলেছিলেন হঠাৎ দুর্ব্যবহার করে আমার এক সেক্রেটারিকে কাঁদানোর ফলে লেখকের সঙ্গে আমার ঝগড়াই হয়ে গেল। লেখকও রাগ করে চলেই গেলেন। অন্য এজেন্ট ফাঁকতালে তাঁকে অন্য পাবলিশারের কাছে নিয়ে গেল। সেখানে তিনি ভালো ব্যবহার পেলেন মোটা টাকাও পেলেন। কিন্তু ন'মাস না যেতে ঝগড়া মিটিয়ে সুড়সুড় করে আবার আমার কাছেই ফিরে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। ঝগড়া হলেই কি পুরনো মা-কে ছেড়ে যাওয়া এত সহজ।

১৯১৮ সালের কথা। ল্যান্ডমার্কস ইন ফ্রেঞ্চ লিটারেচারের সফল লেখক লীটন স্ট্র্যাচি সদ্য একখানা নতুন বই লিখেছেন— 'এমিনেন্ট ভিকটোরিয়ানস'। এ বই ছাপার ব্যাপারে তিনি শর্তাবদ্ধ হলেন প্রখ্যাত প্রকাশক সংস্থা 'চ্যাটো অ্যান্ড উইনডাস'-এর সঙ্গে। বই বেরুলো। কিন্তু তেমন কোনো সাড়া মিলল না। চ্যাটো অ্যান্ড উইনডাসের পঞ্চাশ পাউন্ড আগাম পাঠানোর ব্যাপারটা কিরকম করে ভুল হয়ে গেল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যায়—ভুলটা আর ধরা পড়ে না। ওদিকে লেখক লীটনও নীরব কিন্তু অসন্তুষ্ট তো বটেই।

শেষে অনেকদিন বাদে বইটার যখন আবার পুনর্মুদ্রণের সময় হয়ে এলো চ্যাটো অ্যান্ড উইনডাসের মাথায় হাত। এ কি বিতিকিচ্ছির ভুল করে বসে আছেন তাঁরা। তাড়াতাড়ি সবিনয়ে সেই ভুল সংশোধন করলেন। তখনো এই স্ট্র্যাচি তাঁদের কত টাকা এনে দেবেন কিছুই জানেন না—কারণ সে-রকম কোনো প্রতিশ্রুতি তখন পর্যন্ত তাঁরা দেখেননি। শুধু ওই ভুলের প্রায়শ্চিত্তের দিকে মন ঢেলে দিলেন তাঁরা।

নানা ছল-ছুতোয় লেখককে তাঁরা বাড়তি টাকা পাঠাতে লাগলেন। নতুন বইয়ের কনট্রাক্ট করে স্ট্র্যাচির প্রাপ্য আরো ঢের বেশি জানিয়ে একাধিকবার সেই কনট্রাক্ট ভঙ্গ করতে লাগলেন। লেখক আপত্তি করবেন কি প্রতিবারেই তাঁর প্রাপ্য বেড়ে যাচ্ছে! শুধু এই নয় তাঁর পছন্দ এবং অনুমোদনের প্রত্যাশায় হরেক রকমের জ্যাকেটের নমুনা পাচ্ছেন স্ট্র্যাচি চ্যাটো অ্যান্ড উইনডাসের পার্টনারদের কাছ থেকে কিরকম বাঁধাই তাঁর পছন্দ সেই খোঁজ আসছে তাঁর পছন্দের তারিফ করে অভিনন্দন পত্র আসছে তাঁর বইয়ের ছাপার কাজ দেখার আমন্ত্রণ আসছে ইনকাম ট্যাক্স নিয়ে তাঁদের লেখককে কোনো ঝামেলায় পড়তে হচ্ছে কিনা সেই খবরও প্রকাশক সংস্থা সবিনয়ে নিচ্ছেন তাঁদের অনুরোধ ঝামেলা উপস্থিত হলে তাঁদের প্রিয় লেখক যেন অবশ্য জানান—তাঁরা যথাসাধ্য ব্যবস্থা করবেন।

আর লীটন স্ট্র্যাচি?

ওই সংস্থা ছাড়ার চিন্তা দূরে থাক যে পার্টনার বহুদিন রিটায়ার করে গেছেন—চিঠিপত্রে তাঁরও আন্তরিক কুশল সংবাদ নিতে ভোলেননি।

—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সেকালের সঙ্গীতগুণী

(১৮)
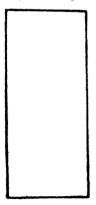
বিস্মৃত হারমোনিয়াম-শিলপী

আঙ্গুলে খেলিতেছে সাতটি সুর সাতটি যেন পোষা পাখি। শুধু সাতটি কেন। সাতটি তো শুদ্ধ স্বর। ঠুংরির অঙ্গে আর তেমন তেমন রাগে বারোটি সুরও হতে পারে, কোমল কড়ি নিয়ে। যেমন ভৈরবী কিংবা পিলুতে। পোষা পাখির মতন কলস্বরে সেই সব সুর বেজে উঠছে। হারমোনিয়মে কালো সাদা চাবির সারি। তার ওপর চলন্ত গোলাপী-গোরা আঙ্গুলি কটি। যেন মোলায়েম তুলির টানে আসা যাওয়া করছে তারা। আর চোখের পলকে সাদা কালো পর্দা কটি অনর্গল ওঠা-নামা করে চলেছে। বাঁ দিক থেকে ডাইনে। তারা গ্রামে ঘুরে এসে আবার থাম হয়ে মন্দ্র সপ্তকে। সাড়ে তিন অক্টেভের বিস্তার। আর সেই আঙ্গুলের পরশ পেয়ে চাবির সারি বেয়ে যেন ছোট ছোট ঢেউ খেলে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে নেচে চলেছে সুরের ঝর্ণা-ধারা। হারমোনিয়মের পর্দায় পর্দায় এত [illegible] এমন মোলায়েম ওঠা-নামা যেন একটির গায়ে আর একটি মিলে গেছে। একটির সঙ্গে মিলাচ্ছে আর একটি সুর। যেন মিড়ের কাজ। স্বর থেকে স্বরান্তরে, মাঝেরটি স্পর্শ করে গড়িয়ে চলে যাওয়া। শ্রুতির সূক্ষ্ম ক্রিয়া ত হারমোনিয়মে দেখানো যায় না। তবু মিড়ের কাজ হচ্ছে যতদূর সম্ভব।

শিল্পীর অন্তর সুরে এত পূর্ণ হাত এমন সাধনে দুরস্ত যে চাবির গায়ে গায়ে মিড়ের ঢল নেমে আসছে। আর কত তার চিকনতা। কখনো শিল্পী আশ্চর্য সাপাটে কটি পর্দা ছুঁয়ে যাচ্ছেন বর্ষণের ধরণে। আর হারমোনিয়মে যেন আশু-এর কাজ ফুটে উঠছে।

এমনি নানা অলঙ্কারে, সুরের নির্যাসে যেন কথা কইছে সুদৃশ্য যন্ত্রটি।

মীর্জা সাহেবের সেই হারমোনিয়ম বাদন। সেকালের আসরে ছিল এক মহা-উপভোগের যন্ত্রসঙ্গীত। এই শতকের ত্রিশের দশকে, বিশের দশকে, আরো পাঁচ দশ বছর আগেও।

সুরের সঙ্গতে যেমন, একক অনুষ্ঠানেও তেমনি। খেয়াল অঙ্গেও মীর্জা সাহেব বাজাতেন। কি তৈরী সে বাজনা। এমন এক একটি কর্তব করতেন যা অনেক গায়কের পক্ষেও অসম্ভব। ছোট ছোট তান কিংবা টুকরো কিরৎ কিংবা বকমারি পাল্টা, তিন গ্রামে পাল্লা দিয়ে ঘুরে আসা বড় বড় তান, সব দেখাতেন পরিপাটি ভাবে। সাধা কণ্ঠে খেয়াল গানই যেন হারমোনিয়মে বেজে চলেছে। কণ্ঠের বদলে যন্ত্রে। এই বাঁধা পর্দার বিদেশী যন্ত্রে যতদূর সম্ভব তার শেষ সীমা পর্যন্ত শিল্পী দেখিয়ে দিচ্ছেন সুরের বিস্তার।

মীর্জা সাহেবের বাজনা তা এত প্রাণবন্ত হবার কারণ, তিনি নিজেও গায়ক ছিলেন। তবে গান গাইতেন না আসরে। ঘরোয়া ভাবে কখনো গাইতেন। তা ছাড়া গানের তালিম দেবার সময়ও দেখাতেন গেয়ে। তখন শোনা যেত তাঁর সুকণ্ঠ। গানে অভিজ্ঞ না হলে সুরযন্ত্রের ভাল শিল্পী হওয়া যায় না। প্রায় তাবৎ গুণী বাদকেরাই নেপথ্যজীবনে থাকেন এক একজন গায়ক। অলক্ষ্যে সেই সত্তা যন্ত্রীর হাতে সুর সঞ্চার করে। মীর্জা সাহেবও গানের চর্চা করেছিলেন ভাল ভাবে। শুধু খেয়াল নয়, হোরি ধামার। রামপুরের দরবারের বীণকার (অন্তরালে ধ্রুপদ হোরি ধামার থেকে ঠুংরি পর্যন্ত নানা রীতির গায়কও) উজীর খাঁর কাছে তিনি হোরি ধামার শিখেছিলেন। নিজের শাগরেদের হোরি ধামার খেয়াল ঠুংরি সবই দিতেন মীর্জা সাহেব।

তবে আসরে তিনি ঠুংরিই বেশি বাজাতেন। একক অনুষ্ঠানে আর সঙ্গতেও। কারণ ঠুংরি তাঁর ছিল প্রাণের প্রিয়। তার মিহি কারুকর্ম তার মিষ্টত্ব তার লাবণ্য তাঁর মনোহরণ করেছিল। আর তার শৃঙ্গার রসের আবেদন। বোল বানিয়ে বানিয়ে হৃদয়ের আবেগ আকুতি কত ভাবে প্রকাশ করা। বোল বানানা ঠুংরি। এই চালের ঠুংরির চর্চাই তিনি করেছেন। আসরেই তাই বাজান। এই রীতির ঠুংরিই তাঁর প্রিয়।

গণপৎ রাওয়ের ঠুংরিও ত এই ধরনেরই। মীর্জা সাহেবও সেই একই ধারার শিল্পী। এই পছন্দ করা যন্ত্র হারমোনিয়মে ঠুংরির রীতিতে তাঁর দরদের চর্চা। হারমোনিয়ম আর ঠুংরি। এই দুই নিয়েই তাঁর আসল সঙ্গীত-জীবন। ঠুংরির মরমীয়া তিনি।

তবে গানে নয়, হারমোনিয়মে। আর আসরে সেই ভাবেই তাঁকে দেখা যায়। চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট বছর আগেকার কলকাতায়। তখনকার আসরে আসরে।

ঠুংরি গানের আবেগ আর হৃদয়-স্পর্শী ভাব তাঁর হারমোনিয়মে মেতে ওঠে। এক একটি ঠুংরি গানই যেন কণ্ঠের আবেদন নিয়ে বাজতে থাকে তাঁর যন্ত্রের চাবিতে চাবিতে, তাঁর আঙ্গুলের মরমী ছোঁয়ায়। শুভ্র আঙ্গুল কটি সুরের ধারায় হারমোনিয়মের পর্দায় পর্দায় যেন নৃত্য করে চলে।

মীর্জা সাহেবের হারমোনিয়ম বাজনা। এতদিন যাবৎ এমনি ভাবে বাজিয়েছেন এতক্ষণ ধরে বাজান যে আঙ্গুলগুলির এই বাঁকানো ভঙ্গী অন্য সময়েও থেকে যায়। বাজাবার ভঙ্গিমায় আঙ্গুলের মাঝখান থেকে বাঁকা দেখায়। হারমোনিয়ম যখন বাজান না, তখনো বাঁ হাতের আঙ্গুলগুলি অর্ধগোলাকার, বাঁকানো থাকে। সোজা করা যায় না আর। সোজা করবার চেষ্টাও তিনি করেন না। এখনি [illegible] আবার হার-মোনিয়ম নিয়ে বসতে হবে। আবার ত বাজনা চলবে আঙ্গুলের মাথা বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে।

মীর্জা সাহেবের বাঁ হাতের আঙ্গুল-গুলি বাঁকানো। কারণ তিনি ডান হাতে হারমোনিয়মের বেলো করেন। আর বাজান বাঁ হাতে।

গণপৎ রাওয়ের গোষ্ঠীর আরো কজনেরই এমনি বাজানোর দৃষ্টান্ত আছে। স্বয়ং গণপৎ রাও বাঁ হাতে বাজাতেন। আর বেলো করতেন ডান হাতে। তেমনি তাঁর প্রধান শিষ্যদের মধ্যে দুজন—গয়ার গফুর খাঁ ও ইন্দোরের বাসির খাঁ। গণপৎ রাওয়ের প্রধান শিষ্যদের মধ্যে ডান হাতে বাজাতেন অবশ্য শ্যামলাল ক্ষেত্রী, ইরসাদ (গয়ার) সোনীজী প্রভৃতি কজন।

মীর্জা সাহেব গণপৎ রাওয়ের শিষ্য না হলেও তাঁর বিরাট হারমোনিয়ম বাদক গোষ্ঠীর একজন ছিলেন। গণপৎ রাওয়ের প্রিয় শিষ্য শ্যামলাল ক্ষেত্রীর সঙ্গে মীর্জা সাহেবের অতি ঘনিষ্ঠতা ছিল সঙ্গীতের সূত্রে। আর শ্যামলালজীর শিষ্যস্থানীয়

গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর তিনি অন্তরঙ্গ ছিলেন। গিরিজাশঙ্করের ঠুংরি গানের প্রতিভা যখন পূর্ণ বিকশিত তখন তাঁর গানের সঙ্গে মীর্জা সাহেবের হার্মোনিয়ম সঙ্গত হত নানা আসরে। কলকাতায় বহু আসরে গিরিজাশঙ্করের সংগতকারী বাজনা শোনা যেত তাঁর।

আরো অনেকের সঙ্গে তাঁকে হারমোনিয়ম বাজাতে দেখা যেত। বিখ্যাত গায়ক-গায়িকা থেকে শুরু করে অখ্যাত শিল্পীর সঙ্গেও। মোজুদ্দিন কিংবা আগ্রাওয়ালী মালকা জানের সঙ্গে যেমন বাজিয়েছেন তেমনি অন্য অনেকেই তাঁকে পেয়েছেন। এক সুলভ উপায় ছিল তাঁর হারমোনিয়ম শোনার। সে তাঁর চরিত্রের একটি বিষম দুর্বলতা কিংবা এক প্রধান বৈশিষ্ট্য।

যেখানে সেখানে, যার তার সঙ্গে বাজিয়েছেন। তবু মীর্জা সাহেব একজন দস্তুরমত গুণী। আর হারমোনিয়মে এমন শিল্পী কজন ছিলেন সেকালের কলকাতায়? একমাত্র শ্যামলাল ক্ষেত্রী ভিন্ন?

গণপৎ রাওয়েরই আর এক কৃতী শিষ্য ছিলেন কলকাতায়। হারমোনিয়ম বাদক ইরসাদ। কিন্তু ইরসাদের চেয়ে অনেক ভাল বাজিয়ে ত বসির খাঁ বিখ্যাত খেয়াল দিকপাল আল্লাদিয়ার ভ্রাতুষ্পুত্র। সেই বসির খাঁ বলতেন, 'মীর্জা সাবহামসে আচ্ছা বাজা বাজাতা।

শ্যামলালজী ত সৌখীন অর্থাৎ অপেশাদার। মীর্জা সাহেব কিন্তু অদৃষ্টের ফেরে পেশাদার হয়ে পড়েছিলেন। যদিও অর্ধ সৌখীন হয়ত বলা যায় তাঁকে। কারণ বিনা মুজরোতেও বাজাতেন আসরে। তবে জীবনের শেষ বাজাতেন আসরে। তবে জীবনের শেষ দিকে সে সৌখীনতাও আর বিশেষ ছিল না।

যে কোন আসর বা হোক মুজরোয় তখন দেখা যেত তাঁকে। হারমোনিয়ম নিয়ে বসেছেন। কখনো একক, কখনো সংগতকার। পর্দায় পর্দায় আঙ্গুলের খেলায় সুরের লীলা ঠিকই আছে। কিন্তু প্রথম জীবনে দেখা অনেকেই হয়ত চিনতে পারবেন না তাঁকে। এই বৃদ্ধই কি সেই মীর্জা সাহেব? মাথা থেকে পা পর্যন্ত একি পরিবর্তন! চেহারায় ত হবেই। কিন্তু পোষাকে আশাকে ধরণ-ধারণে? কোথায় সেই সব লোমদার কি জরিদার টুপির বাহার? সৌখীন পিরান চুস্ত পায়জামা? ওই নতাপর আঙ্গুলে কোথায় গেল ঝকমকে আংটি? কানে তুলোর টিপ থেকে কাশ্মীরি আতরের খসবু? মথায় চিকন কৃষ্ণ কেশ? সেই গোলাপী গৌরবর্ণ আর মুখ-চোখের চমৎকার ছাঁদ শুধু খানিক আছে। শরীর ক্ষুদ্রাকৃতি বলে হয়ত তাঁকে ভাঙেনি তেমন। কিন্তু মুখে চিবুকে কপালে ফুটে উঠেছে বলিরেখা। বাঁকানো আঙ্গুলের মতন পৃষ্ঠদেশ কিছু ঝুঁকে পড়েছে। আর উস্কখুস্ক শুভ্র কেশ, শুভ্র ভ্রূ, গৌর দেহের সঙ্গে আরো করুণ দেখিয়েছে তাঁর মলিন বেশবাস।

কে মীর্জা সাহেব?

আসরের অনেকেই হয়ত জানেন না সেকথা। জানবার কৌতূহলও হয়ত নেই।

কিন্তু জানাবার মতন পরিচয় আছে মীর্জা সাহেবের। নবাব ওয়াজেদ আলির এক পৌত্র তিনি!

সে বংশ-কথা বলবার আগে মীর্জা সাহেবের সঙ্গীত জীবনের আরো কিছু কথা বলে নেয়া যায়।

কলকাতায় তাঁর আসর সচরাচর কোথায় হত, গান কিংবা হারমোনিয়ম কে কে শিখেছিলেন তাঁর কাছে এই সব প্রসঙ্গ।

মুজরো নিয়ে কিংবা বিনা মুজরোতে নানা আসরে তিনি বাজাতেন। সে সব সাময়িক আসর। কিন্তু নির্দিষ্ট কটি আসর তাঁর ছিল। যেখানে তিনি মাঝে মাঝেই বাজাতেন। বেশির ভাগই একক বাদন। তা তাঁর বন্ধু-বান্ধব বা সঙ্গীত জীবনের সহযোগী অনুরাগী, শিষ্য প্রভৃতিদের ঘরোয়া আসরে। বলা বাহুল্য, এসব আসরে তিনি অপেশাদার হয়েই যোগ দিতেন, গুণপনা দেখাতেন।

এমনি আসর তাঁর সবচেয়ে বেশি হত শ্যামলাল ক্ষেত্রীর হ্যারিসন রোডের আবাসে। শ্যামলালজীর সেই ১০১ সংখ্যক বাড়ির (সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ ও কলেজ স্ট্রীটের মাঝামাঝি দক্ষিণমুখী) দোতলায় সে যুগের একটি সঙ্গীত তীর্থ ছিল। নানা সুপ্রসিদ্ধ কলাবৎ কলাবতীদের সঙ্গীতচর্চায় ও যোগাযোগের কেন্দ্ররূপে ধন্য হত ক্ষেত্রী মহাশয়ের সেই নিত্য আসর। মীর্জা সাহেবেরও অনেক দিনের অনুষ্ঠান সেখানে হয়ে গেছে। সেই ১০১ হ্যারিসন রোড থেকেই গিরিজাশঙ্করের সঙ্গে মীর্জা সাহেবের আলাপের সূত্রপাত।

মেছুয়াবাজারে কিশোরীলাল চৌধুরীর বাড়িতেও প্রায়ই তাঁর বাজনা হত। চৌধুরীর সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল মির্জা সাহেবের। এখানে মাঝে মাঝে তিনি থেকেই যেতেন। কিশোরীলাল ছিলেন পাটনার লোক এবং সেকালের সুপরিচিত 'তাম্বুল বিহার' ব্যবসায়ী। তিনি কলকাতায় একজন সঙ্গীতপ্রেমীরূপে বাড়িতে আসর বসাতেন। কলকাতার মীর্জা সাহেবের মতন অনেক গুণীই শুধু নন, লক্ষ্ণৌর রাজা নবাব আলি, গয়ার সোনীজী প্রমুখ ব্যক্তিও যোগ দিয়ে গেছেন কিশোরীলালের আসরে।

মেছুয়াবাজার অঞ্চলেই ফজ্জে মিয়া নামে তাঁর এক দোস্তের বাড়িতেও মীর্জা সাহেব মাঝে মাঝে আসর করতেন।

প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীটে কিষণচাঁদ, বিষণচাঁদ, রাইচাঁদ বড়াল ভ্রাতাদের আসরেও বাজাতেন মীর্জা সাহেব।

বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটের ছোটকালালের গৃহেও তাঁর আসর হত। ছোটকালালের পুত্র হলেন পরবর্তীকালের সঙ্গীত-জগতে লালাবাবু নামে সুপরিচিত দামোদরদাস খান্না। উচ্চমানের এবং সর্ব-ভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলন ও নানা সঙ্গীতাসরের সংগঠক রূপে দেখা যায় লালাবাবুকে। তাঁদের ১৭ বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটে মীর্জা সাহেবের অনেক দিনের আসর হয়ে গেছে। ছোটকালাল তাঁর একজন শিষ্যও।

এমনি আগে, ... আসরে মীর্জা সাহেবের হারমোনিয়ম শোনা যেত। সকলের নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

তাঁর সারা সঙ্গীতজীবন কেটেছিল কলকাতায়। এ শহরের নানা ধরনের আসরে তিনি যোগ দিতেন। একবার একটি বড় জলসা হল নাট্যমন্দির মঞ্চে। বাংলার বিখ্যাত গায়ক শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সাহায্য রজনী হিসেবে অনুষ্ঠান। সে আসরে অংশ নেন হাফেজ আলি খাঁ, জমীরুদ্দিন খাঁ প্রমুখ অনেক বিখ্যাত গুণীবৃন্দ। মীর্জা সাহেবও সেদিন একক হারমোনিয়ম শুনিয়েছিলেন। সমবেত শিল্পীদের একটি ফটোগ্রাফ নেয়া হয়েছিল সে আসরে। মীর্জা সাহেবকেও সে ছবিতে দেখা যায়। সেইটিই বোধহয় তাঁর একমাত্র প্রতিকৃতি।

এক সময় 'আসর' নামে একটি সমিতি হয় ২০, চৌরঙ্গীতে। তার উদ্দেশ্য ছিল গুণী গায়ক বাদকদের উপযুক্ত দাক্ষিণ্য দিয়ে প্রতি মাসে অনুষ্ঠান করা। কলকাতায় তবলাচর্চার জন্যে সুপরিচিত মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সেখানে শুধু মন্মথনাথেরই এক স্মৃতি রজনীর সংবাদ পাওয়া যায়। ১৯৩২ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর সেই জলসায় গান গেয়েছিলেন গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, তবলা বাজিয়েছিলেন লক্ষ্ণৌর ওস্তাদ আবেদ হোসেন। আর 'সংগীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা'র ভাষায় 'প্রসিদ্ধ ওস্তাদ মীর্জা সাহেবের হারমোনিয়ম বাদনও সেদিন হয়েছিল।

এমনি নানাভাবে কলকাতায় সঙ্গীত জীবনে জড়িত ছিলেন মীর্জা সাহেব।

তাঁর শিষ্যমণ্ডলী বিরাট ছিল বলা যায়। আর কলকাতার বাইরে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, পূর্ববঙ্গের কোন কোন জেলা পর্যন্ত।

মীর্জা সাহেবের কাছে যাঁরা নানা সময়ে শেখেন, তাঁদের কয়েকজনের নাম পরিচয় এখানে দেওয়া হল :—

(১) তিলজলার সাহাবুদ্দিন। ইনি হারমোনিয়মে ভাল তালিম পেয়েছিলেন। ভাল বাজাতেনও মীর্জা সাহেবের ঢঙে।

(২) জানি সাব নামে পরিচিত, মেটিয়াবুরুজের তফজ্জল হোসেন। বিখ্যাত ঠুংরি দাদরা গজল ইত্যাদির গায়ক পিয়ারা সাহেবের পুত্র জানি সাহেব কৃতী হারমোনিয়ম বাদক হয়েছিলেন। তিনি গায়কও ছিলেন জমিরুদ্দিন খাঁ, ঝণ্ডে খাঁ প্রভৃতি নানাজনের তালিমে। কিন্তু হারমোনিয়মে জানি সাব শুধু মীর্জা সাহেবের শিক্ষাই পান।

(৩) বৌবাজারের ধীরেন্দ্রনাথ দাসও মীর্জা সাহেবের একজন প্রিয় শিষ্য এবং তাঁর ভাল তালিম পেয়েছিলেন হারমোনিয়মে। কলকাতায় স্বরক্ষ-পরিবর্তন-সক্ষম (স্কেল চেঞ্জিং) হারমোনিয়মের এক আদি নির্মাতা সুরেন্দ্রনাথ দাস হারমোনিয়ম বাদকও ছিলেন। গণপৎ রাওয়ের শিষ্য বসির খাঁ হলেন সুরেন্দ্রনাথের হারমোনিয়মের ওস্তাদ। সুরেন্দ্রনাথের হারমোনিয়মের বিপণি (৬৯ হ্যারিসন রোডে) শ্যামলাল ক্ষেত্রীর বাড়ির নিকটেই ছিল। সেই সূত্রে সাঙ্গীতিক যোগাযোগে শ্যামলালজী ও তাঁদের গোষ্ঠীর অনেকের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। হারমোনিয়ম নির্মাতা বলেও তাঁদের সঙ্গে তাঁর সহযোগিতা থাকত। মীর্জা সাহেবও সুরেন্দ্রনাথের কাছে আসতেন হারমোনিয়মের জন্যে। এমনি পরিচয়ের ফলে সুরেন্দ্রনাথের পুত্র ধীরেন্দ্রনাথ মীর্জা সাহেবের কাছে শিখতে আরম্ভ করেন এবং ১৭।১৮ বছর শিক্ষার্থী সম্পর্ক রাখেন ওস্তাদজীর প্রায় মৃত্যুকাল পর্যন্ত। মীর্জা সাহেবের এক যোগ্য শিষ্য হয়ে ধীরেন্দ্রনাথ দাস কলকাতার আসরে গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর সঙ্গেও অনেকবার হারমোনিয়ম সংগত করেছেন। কোন কোন আসরে গিরিজাশঙ্করের গানের সঙ্গে এক পাশে বসে বাজিয়েছেন মীর্জা সাহেব অন্য পাশে ধীরেন্দ্রনাথ দাস।

(৪) টৌরিটি বাজার অঞ্চলের আলি মহম্মদ সুস্তুরিও মীর্জা সাহেবের এক শাগীরদ। অতি রূপবান ইরাণী আলি মহম্মদ সুস্তুরি তাঁর কাছে হারমোনিয়াম শিখতেন।

(৫) বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটের লক্ষ্মীনারায়ণ গান এবং হারমোনিয়ম দুই শেখেন মীর্জা সাহেবের কাছে।

(৬) শ্রীহট্টের তৎকালীন নবাবও তাঁর হারমোনিয়মের শিষ্য ছিলেন।

(৭) মেছুয়াবাজারের কিশোরীলাল চৌধুরীর ভ্রাতা রামনারায়ণ চৌধুরী এবং কিশোরীলালের এক পৌত্রও হারমোনিয়ম শিখতেন মীর্জা সাহেবের কাছে।

(৮) ঢাকার কাজী হাউস নিবাসী মহা সৌখীন জমিদার জালালুদ্দিন আকবর কলকাতায় তাঁর কাছে হারমোনিয়ম কিছু কিছু শেখেন।

(৯) মুর্শিদাবাদের মৈনুদ্দিন মীর্জাকেও তাঁর হারমোনিয়ম শিক্ষা লাভ করতে দেখা যায়। তবে আসলে তিনি ছিলেন মীর্জা সাহেবের দরদী পৃষ্ঠপোষক অর্থ-সহায়ক।

(১০) বৌবাজারের আবদুল আজিজ খাঁ (সেতারী হাফিজ খাঁর ভাগিনা ও সেতার শিষ্য) মীর্জা সাহেবের কাছে হারমোনিয়মে তালিম পেয়েছিলেন।

(১১) সুপরিচিত সঙ্গীতজ্ঞ রাইচাঁদ বড়ালও কিছুদিন হারমোনিয়ম শেখেন মীর্জা সাহেবের কাছে।

(১২) মটরবাবু নামে পরিচিত কোরিন্থিয়ান থিয়েটারের হারমোনিয়ম বাদকও মীর্জা সাহেবের অন্যতম শিষ্য।

(১৩) ভ্রাতা নওশেরওয়ান জা'র পুত্র লাড়লি মীর্জাও তাঁর কাছে হারমোনিয়ম শেখেন।

(১৪) জোড়াসাঁকোর ছোটকামলও (লালাবাবুর পিতা) মীর্জা সাহেবের হারমোনিয়মে অন্যতম শিষ্য।

(১৫) ঢাকার নবাব পরিবারের কাজাম সাহেবের এক পুত্রও তাঁর কাছে হারমোনিয়ম শিক্ষা করতেন।

(১৬) বড়বাজারের বিখ্যাত হীরা-জহরৎ ব্যবসায়ী বদ্রিদাসের (যাঁর নামে বদ্রিদাস টেম্পল স্ট্রীট) কনিষ্ঠ পুত্রও হারমোনিয়ম শেখেন মীর্জা সাহেবের কাছে।

(১৭) বড়বাজারের তেজপাল ঝুনঝুনওয়ালাও হারমোনিয়মে মীর্জা সাহেবের এক শিষ্য ছিলেন।

(১৮) গড়পারের সুনন্দ ঘোষও (ব্যায়ামবীর বিষ্ণুচরণ ঘোষের অগ্রজ) হারমোনিয়ম শিখতেন তাঁর কাছে।

(১৯) বৌবাজারের কাশীনাথ শীল (রাইচাঁদ বড়ালের আত্মীয়) হারমোনিয়মে মীর্জা সাহেবের কৃতী শিষ্য হয়েছিলেন।

(২০) রামরাজাতলার (হাওড়া) নীলরতন চট্টোপাধ্যায় (গোয়ালিয়রের কলাবতী গায়িকা মজুবাঈয়ের শিষ্য) মীর্জা সাহেবের কাছেও গান শেখেন কিছুকাল।

তাছাড়াও লাডলে জঙ্গ (হারমোনিয়মে) পঙ্কজ সরকার (হারমোনিয়মে) প্রভৃতি আরো কয়েকজন মীর্জা সাহেবের কাছে

শিক্ষা করেছিলেন। তাঁদের সকলের নাম জানা যায়নি। মীর্জা সাহেবের জামাতা ছিলেন মুর্শিদাবাদের ওস্তাদ কাদের বক্সের তালিমে গঠিত মজ্জু সাহেব। সুকণ্ঠ গায়ক মজ্জু সাহেব শ্বশুরের সাঙ্গীতিক উত্তরাধিকারও কিছু লাভ করেন।

এই বিবরণ থেকে বোঝা যায়, মীর্জা সাহেবের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল হারমোনিয়ম চর্চার ক্ষেত্রে। এই যন্ত্রের শিল্পী এবং ওস্তাদরূপে সেকালের সংগীতজগতে তিনি স্বাক্ষর রেখে যান। একক বাদনে, সুরের সঙ্গতকার হয়ে, ঠুংরি দাদরায় পরিবেশনে। কলকাতায় রাগসংগীতের জলসার আসরে এই বিদেশী যন্ত্রটিকে (তার অপূর্ণতা সত্ত্বেও) তিনি অনেকের কাছে জনপ্রিয় করেছিলেন।...

সেকালের কলকাতায় সংগীতসমাজে এইভাবেই সুপরিচিত ছিলেন মীর্জা সাহেব। আসরে হারমোনিয়মের পর্দায় পর্দায় সুতাপের অঙ্গুলি। বাদ্য-বিহীন অবস্থাতেও বাঁকানো আঙুলে কৃতি। অর্ধ পেশাদার সুরের সওদাগর। লক্ষ্ণৌর ছিন্নমূল নবাব ওয়াজেদ আলীর পৌত্র। দীন পাঞ্জাবী পাজামায় এক নবাবী অবয়বের অবশেষ। মীর্জা সাহেব। এক পুরুষ আগেও অকল্পনীয় সে দৃশ্য! আর অভাবনীয় জীবনযাত্রা!

মীর্জা সাহেবের সংগীতজীবন। তার পটভূমিতে ছিল সেকালের মেটিয়াবুরুজ— যেখান থেকে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল।

খিদিরপুরের দক্ষিণ উপকণ্ঠে, গংগাতীরে মেটিয়াবুরুজ। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের গার্ডেনরীচ নবাব ওয়াজেদ আলির মেটিয়াবুরুজে পরিণত হয়েছিল। এ মেটিয়াবুরুজ নাম তারও তিনশ বছর আগেকার। মহারাজা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের এক প্রত্যন্ত দুর্গ ছিল এখানে। সেই মাটির গড়ের স্মৃতি বহন করত মেটিয়াবুরুজ নাম। মাটির দুর্গ কিংবা বুরুজের কোন চিহ্নই তখন অবশ্য ছিল না।

তবে নবাব ওয়াজেদ আলীর জন্যে মেটিয়াবুরুজের আরেক তাৎপর্য দেখা দিয়েছিল। লক্ষ্ণৌতে যে নবাবীর উৎপত্তি, তার পরিণতি বা পরিসমাপ্তি ঘটে এখানে।

মীর্জা সাহেবের যখন মেটিয়াবুরুজে জন্ম, তখনো নবাবীর রেশ ছিল। লক্ষ্ণৌতে নবাবী শুরু করেছিলেন ওয়াজেদ আলি। তার অবশেষের পর্ব তাঁর তখনো চলেছিল মেটিয়াবুরুজে।

উনিশ শতকের ৭৫।৮০ সালের সেই মেটিয়াবুরুজ!

লক্ষ্ণৌ থেকে নির্বাসিত নবাবের স্থায়ী আবাসস্থল সেদিনের মেটিয়াবুরুজ। আর নবাব ওয়াজেদ আলী তখনো দরবার বহাল রেখেছেন। তাঁর সেই ভারত-বিখ্যাত সংগীতের দরবার। প্রথম শ্রেণীর কলাবৎদের আসর বসে তখনো। 'রহস্‌ মঞ্জিল' জমজমাট। 'পরী'দের নৃত্যগীতে মুখর। নবাব রচিত গীতিনাট্যের মহা আড়ম্বরে অভিনয় হয় সেই মঞ্চে। নবাব নিজেও অংশ নেন। পরিচালনা করেন। নবাবের খাস বাস-ভবন সুলতান খানা। তারই কাছাকাছি শাহ মঞ্জিল বৈতুন নাজাত্‌ ইত্যাদি সদন। নবাবের রঙ্গমঞ্চ— রহস্‌ মঞ্জিল প্রেক্ষাগৃহ। নবাবের নিজস্ব চিড়িয়াখানা। এসবই মেটিয়াবুরুজের গঙ্গার ধারে সেই নবাবী এলেকা জুড়ে। সে চত্বরের পূর্বদিকে লোহ ফটক (যার স্মৃতি এখনো রয়েছে 'আয়রন গেট রোড' নামের আড়ালে)। আর পশ্চিমে অবারিত গঙ্গার দৃশ্য।

নবাবের সেই শেষ বয়সে মীর্জা সাহেবের শৈশব।

নির্বাসিত নবাব তখনো সরকারী বৃত্তি পান বার্ষিক ১২ লক্ষ তনখা। কিন্তু মাসে মাত্র লাখ টাকায় ওয়াজেদ আলি শা'র কি করে চলে। বিশাল হারেম। এত বেগম। এত সন্তান-সন্ততি পরিজনবর্গ। দাসদাসী খিদমদগার। মাস মাহিনায় এত কলাবৎ গায়ক বাদক। রহস্‌ মঞ্জিলের নর্তকী গায়িকা অভিনেত্রী বাঈজীরা। আর হেকিম থেকে দর্জি পর্যন্ত নানা পেশার বাঁধা সেবক। আশ্রিত জন বিভিন্ন প্রকারের। আরো আছে। বাগ বাগিচা। চিড়িয়াখানা। মতবা-ই-সুলতানি : সুলতানের ছাপাখানা। নবাবের রচনা সব কেতাব যেখানে মুদ্রিত হয় বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিতরিত হবার জন্যে। এসব ছাড়াও নবাব-এর নিজস্ব আরো নানারকম খরচপত্র আছে।

মাসে লাখ টাকায় সঙ্কুলান কিছুতেই হত না সব দিক বজায় থাকত না নবাবের খাস কোষাগার না থাকলে। লক্ষ্ণৌতে ক'পুরুষ ধরে নবাবদের সঞ্চিত ধনভাণ্ডার। সওয়া শ' বছরের নবাবীর পরেও কি জমা তখনো। সোনাদানার চেয়ে অনেক দামী দামী হীরে জহরৎ মুক্তো মানিক।

নবাব ওয়াজেদ আলি সেই সব মণি মুক্তো জহরৎ তখনো ফুরাতে পারেন নি। তাই বজায় আছে তাঁর মেটিয়াবুরুজের সব ঠাট। সংগীতপ্রাণ গুণীতে জমজমাট নবাবের দরবার। তার শ'খানেক কলাবৎ কলাবতীদের আসর। গান বাজনা নাচ। বাঈজী বেগম। ভোগ বিলাস। খাই খিলাই। দান খয়রাৎ। খরচের হাজারো রাস্তা তখনো খোলা আছে।

টান পড়লেই নবাব হাত দেন সেই জমাতে। এক মুঠো তুলে নিলেই আপাতত চলে যায়। নবাবের হীরে জহরৎ কেনবার লোক কলকাতায় নির্দিষ্ট কজন। তাঁদের খবর পাঠান। তাঁরা কিনে নিয়ে যান মেটিয়াবুরুজে এসে। খুব জরুরি হলে, কিংবা খেয়াল চাপলে নিজেও বেরোন নবাব। সেই প্রকাণ্ড ফিটন গাড়ির সওয়ার হন। পাকা আমের মতন চেহারায় কিংখাবের গদিতে বসে, মুখে তাঁর রুপার গড়গড়া নল। ময়ূরপুচ্ছে সাজানো মুক্তা-বসানো শিরস্ত্রাণ। আরো পিছনে দাঁড়িয়ে উর্দিপরা হুঁকা-বরদার।

বড়বাজারের সেই পাঞ্জা জহুরীর বাড়িতে আসেন নবাব। জহুরীর সঙ্গে তাঁর অতি বিশ্বাসের সম্পর্ক। মণিরত্ন ইত্যাদি নবাবের ইনি কিনেছেন, বেচে দিয়েছেন। মেটিয়াবুরুজেও এই কাজে মাঝে মাঝে যান নবাবের তলব হলেই। নবাবের মান রাখতে জানেন। তাই নবাব তাঁর বাড়িতেও আসেন প্রয়োজনে।

নবাবকে খাতির জানিয়ে জহুরী গদীতে বসালেন। লক্ষ্ণৌয়ি আতরের খসবুতে ভরে গেল কক্ষ।

তিনি জানেন, নবাব হীরে জহরৎ কিছু বেচতে এসেছেন। কিন্তু নবাবী কেতা আলাদা রকম। যেন ক[illegible] করছেন জহুরীর কাছে। জহুরীও সেই[illegible]তন কথা বলেন। নবাবের ইজ্জৎ বাঁ[illegible] জানতে চান— আজকের 'উধার' ক[illegible]বে।

—দেড় লাখ [illegible]নখা।

জহুরী উঠে গিয়ে কোন গুপ্ত সিন্দুক থেকে একটা তোড়া এনে নবাবের সামনে রাখেন।

তারপর দু-চারটে আদব-কায়দা আর বাক্যালাপের পর তসরীফ ওঠান নবাব। তোড়া নিয়ে চলে যান।

তখন জহুরীর সন্ধানী দৃষ্টিতে পড়ে রঙীন রেশমী রুমালের একটি তোড়া। নবাব যেখানে বসেছিলেন, গদীর সেখানেই রয়েছে। যেজন্যে এসেছিলেন, সেটি রেখে গেছেন নবাব।

সুগন্ধী রেশমী তোড়াটি জহুরী খুলে ফেলেন। ঝকমক করে ওঠে সাচ্চা হীরে মুক্তোর ছটা। যাচাই করতে থাকেন জহুরী। হিসেব করেন। এক লাখ ষাটপাঁয়ষট্টি হাজার হবে জরুর। সত্তর হাজারও হতে পারে।

এমনিভাবে নবাব নগদা রূপিয়া পেয়ে যান। হীরে জহরতের কারবারী উধার দেন এইভাবে। সুতরাং সে ঋণ পরিশোধ হবার কোন প্রশ্নই নেই!...

ওয়াজেদ আলী শা'র মহা সৌখীন জীবন-তরণী এমনি বিচিত্র বিলাসে বয়ে

হায় শেষ পর্যন্ত। সঙ্গীতে, হারেমে, বেগমে, পরীতে, কাব্য-সাহিত্যে, গানে, গীতিনাট্যে, আসরে দরবারে, রহস্‌ মঞ্জিলে, ভোগে দাক্ষিণ্যে, কর্তব্যে বাহুল্যে, আত্মজন অনুগত অনুরাগ-পোষণে সরকারী বৃত্তিতে সঞ্চিত সম্পদে টলমল নবাবী পৃথ্বীরাজ।

কিন্তু ভাটার স্রোতও অলক্ষিতে তলে তলে বহতা ছিল। তাই ১৮৮৭তে নবাবের মৃত্যুর পরেই ঝাঁপিয়ে এল মহাপ্লাবন। মেটিয়াবুরুজের তাবৎ নবাবী এলেকা নিমজ্জিত হয়ে গেল। নীলামে উঠল সুলতানখানা শাহ্‌মঞ্জিল রহস্‌-মঞ্জিল রাধা-মঞ্জিল শারদা-মঞ্জিল বাইতুন নাজাত চিড়িয়াখানা বাগ-বাগিচা ইত্যাদি নবাবের তামাম মকান জমীন। অনুক্ষণ-সুর-রণনে গুঞ্জরিত সঙ্গীত দরবার চির-নিস্তব্ধ হল।

মীর্জা সাহেব তখন নিতান্ত বালক বয়সী খুরসেদ মীর্জা। বিগত নবাবের পঞ্চম পুত্র প্রিন্স, আসমন জার দশম ও কনিষ্ঠ পুত্র।

নবাবজাদাদের নামমাত্র প্রিন্স খেতাব রইল। নবাবী মঞ্জিল থেকে বিদায় নিলেন তাঁরা। অনেকেই মেটিয়াবুরুজ ত্যাগ করে গেলেন। অনাথ। অভাবিত অবস্থায়। কেউ বসতি করলেন নিকটবর্তী খিদিরপুরে। কেউ আর একটু দূরে ওয়েলেসলী অঞ্চলে। কেউ বা মেটিয়াবুরুজেই অন্য এলেকায় অন্যভাবে বাস পত্তন করলেন।

ওয়াজেদ আলীর ২৪ জন পুত্র ২১টি কন্যা (প্রথম দুই পুত্র তাঁর জীবিতকালে গতায়ু)। তাঁদের মধ্যে পাঁচ পুত্র ও বারো কন্যার জন্ম লক্ষ্মৌতে। সেখান থেকে নবাব নির্বাসিত হয়ে ১৮৫৬ সালের এপ্রিল মাসে মেটিয়াবুরুজে আসেন। তারপর ২৬ মাস ফোর্ট উইলিয়মে বন্দীজীবন যাপনের পর ১৮৫৮ সালের শেষ থেকে স্থায়ী হন মেটিয়াবুরুজে। এখানে তাঁর ১৯ পুত্র ও ৯ কন্যার জন্ম। এই হিসাব অনুযায়ী সরকারী পেনসনপ্রাপ্তি ইত্যাদি সূত্রে স্বীকৃত। তা ছাড়াও পুত্র কন্যা হয়ত থাকতে পারেন, বলা যায় না। আর নবাবের বেগমদের সংখ্যা নিশ্চিতভাবে জানা প্রায় অসম্ভব।

এখানে কথা এই যে, এমন মহান সঙ্গীতজ্ঞ পিতার এই গুণ এত পুত্রদের কেউই লাভ করেন নি; পৌত্ররাও নন। ব্যতিক্রম কেবল খুরসেদ মীর্জা, পরবর্তীকালের মীর্জা সাহেব। তিনিও পিতামহের সঙ্গীতগুণের এক ভগ্নাংশ পান। কারণ তিনি শুধু হারমোনিয়মশিল্পী এবং গায়ক। কিন্তু নবাব ছিলেন একাধারে বহুমুখী গুণী। গায়ক সেতার-বাদক নৃত্যবিদ, বহু স্মরণীয় ঠুংরি গানের রচয়িতা ও সুরকার (ধ্রুপদও রচনা করতেন, যেমন শঙ্কর বেলাবলে 'শুভ সগন শুভ লগন ছত্র ধরাউ" ইত্যাদি), সংগীততত্ত্বের গ্রন্থকার ('বানি প্রভৃতি), গীতিনাট্য রচয়িতা ইত্যাদি নানা সাঙ্গীতিক পরিচয় ওয়াজেদ আলী শার আছে।

তবু নবাবের শতাধিক পুত্র-পৌত্রদের মধ্যে সঙ্গীত-গুণের একমাত্র উত্তরাধিকারী খুরসেদ মীর্জা—একথাও মনে রাখবার।

খুরসেদের পিতা আসমান জার জন্ম লক্ষ্মৌতে (আনুমানিক ১৮৫১)। নবাব ওয়াজেদ আলী তখন লক্ষ্মৌ মসনদে আসীন। তাঁর পঞ্চম পুত্র আসমান জার জননী যে নবাব-বেগম, তাঁর নাম রসক্‌ মহল। নির্বাসনের আগে লক্ষ্মৌতেই বেগম রসক্‌ মহলকে নবাব তালাক দিয়েছিলেন। মেটিয়াবুরুজে আসেন নি রসক্‌ মহল। নবাবের অন্যান্য পরিবারবর্গের সঙ্গে পাঁচ বছরের বালক আসমন জা মেটিয়াবুরুজে এসেছিলেন। তারপর থেকে এখানেই তাঁর বসবাস।

আসমন জার ৭ পুত্র, ৩ কন্যার মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ হলেন খুরসেদ মীর্জা। তাঁর জন্মস্থান মেটিয়াবুরুজ। তাঁর বাল্যজীবনও এখানে অতিবাহিত হয়, অন্তত ১৮৮৭ পর্যন্ত। তারপর মেটিয়াবুরুজের বিরাট নবাব পরিবারের বিপুল বিপর্যয়ে মীর্জা খুরসেদ কোথায় উৎক্ষিপ্ত হন, কোন্‌ ধারায় তাঁর জীবনচর্যা অগ্রসর হয় তার বিবরণ অপ্রাপ্য। অনেক পরে যখন তাঁকে আসরে আসরে হারমোনিয়ম-শিল্পী হিসেবে দেখা যায়, তখন আর তিনি মেটিয়াবুরুজের বাসিন্দা নন। তখন ক' বছর ছিলেন বেলেঘাটার এক বাসায়। তারপর ৯।১০ বছর জেলেটোলায়, মঠের পেছনে এক বসতিতে। সে-সময় তাঁর পাশের ঘরে থাকতেন ওস্তাদ বাদল খাঁ এবং শ্রীজান বাইয়ের পুত্র খাদেম হোসেন। মীর্জা সাহেব জেলেটোলার পর জীবনের শেষ ছয়-সাত বছর তাঁতিবাগানে (জোড়া গির্জার কাছে) কাটিয়েছিলেন। সেখানেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পড়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম দিকে। তাঁতিবাগান লেন ও আঞ্জুমান রোডের কোণে সেই দোতলা মাঠকোঠায়। বয়স প্রায় ৬০ বছর হয়েছিল।

মীর্জা সাহেবের দুই বিবাহ। দ্বিতীয় পক্ষ নিঃসন্তান। প্রথম পক্ষে দুই কন্যা। কনিষ্ঠার সঙ্গে পরিণীত হন মুর্শিদাবাদের সুপরিচিত গায়ক মজু সাহেব। মুর্শিদাবাদ নবাব পরিবারের এক সন্তান মজু সাহেব। এসব ছাড়া মীর্জা সাহেবের ব্যক্তিজীবনের অনেক কথাই অজ্ঞাত আছে। মেটিয়াবুরুজের পর কিভাবে তিনি জীবনযাত্রা আরম্ভ করেন সে বৃত্তান্তও দুষ্প্রাপ্য। এমন কি তাঁর সঙ্গীত-চর্চার সূচনা ও পরিণতি কি করে হয়, সে প্রসঙ্গও উদ্ধার করা যায়নি।

বেলেঘাটার এক সাধারণ বাসায় তাঁকে পাওয়া যায় কলকাতার এক অন্যতম হারমোনিয়ম-শিল্পীরূপে। আর অর্থ পেনশনদার। মেটিয়াবুরুজের নবাবদের হয়ে সামান্য সরকারী পেনসন পেতেন। ১৯২২ সাল পর্যন্ত মাসিক ২০ টাকা। তারপর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মাসে ৫০ টাকা মৃত্যুকাল পর্যন্ত। ছাত্রদের তালিম দিয়ে উপার্জন করতেন। মুজরো পেতেন অনেক আসর থেকেই। তা হলেও দারিদ্র্যের মধ্যেই তাঁর জীবন যাপন চলত। কারণ ঐসব আনুষঙ্গিক খরচ হত নিয়মিত। তেমন তেমন সন্ধ্যাবেলা নগদের বদলে ঐ পেলেই বাজিয়ে আসতেন যন্ত্রতন্ত্র। নিজেকে এমন হীন করছেন দেখে কোন হিতার্থী হয়ত অনুযোগ করতেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের পুতুল—দুর্বলচিত্ত সংযমে অপারগ। এমনিভাবে নবাব ওয়াজেদ আলীর এক পৌত্রকে হারমোনিয়ম-শিল্পীরূপে প্রথম দেখা যায় বেলেঘাটায়।

বেলেঘাটার আগে কলকাতার আরো কোথায় কোথায় ছিলেন মীর্জা সাহেব।

এর কথা জানা যায় না। যেমন জানা যায়নি তিনি হারমোনিয়ম শেখেন কার কাছে। এমন চালের বাজনা এমন মনোহারী শিল্পকর্ম কলাবতের তালিম ভিন্ন সচরাচর হয় না। কারণ এই প্রকার বিধিবদ্ধ অঙ্গুলিচালনার কায়দা শিক্ষাসাপেক্ষ।

মীর্জা সাহেবের কোন কোন শিষ্যের মতে ওস্তাদজী হারমোনিয়মের তালিম পেয়েছিলেন প্রসিদ্ধা চন্দ্রভাগা বাইয়ের কাছে। কিন্তু এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ দুজনের মধ্যে কালের অসামঞ্জস্য। খুরসেদ মির্জার জন্ম ১৮৮০ সালের পূর্বে প্রায় অসম্ভব কারণ তাঁর পিতার জন্ম সন ১৮৫১। খুরসেদ মির্জার হারমোনিয়ম শিক্ষা আরম্ভ সেই হিসাবে ১৮৯৫-এর আগে ধর্তব্য নয়। শেষোক্ত সময়ে চন্দ্রাভাগার বয়স ৭০ উত্তীর্ণ। তাছাড়া খুরসেদ মীর্জা তাঁর কাছে শিখবেন কোথায়? তিনি ত লক্ষ্ণৌবাসিনী। আর ওয়াজেদ আলির পরিবারের সেকালে লক্ষ্ণৌতে যাতায়াত নিষিদ্ধ ছিল বিশেষ অনুমতি ভিন্ন। এইসব কারণে চন্দ্রভাগার কাছে মীর্জা সাহেবের তালিম পাওয়া বোধহয় সম্ভব নয়।

তবে গণপৎ রাওয়ের— হারমোনিয়মের সেই অপরূপ শিল্পী গণপৎ রাওয়ের গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন মীর্জা সাহেব। চন্দ্রভাগারই পুত্র গণপৎ রাও (ভাইয়া সাহেব) আর ভাইয়া সাহেব হারমোনিয়মের তালিম ত জননীর কাছেই পেয়েছিলেন। চাবিতে চাবিতে অঙ্গুলি চালনার বিশিষ্ট সেইসব নিয়ম আর কায়দা। সেই চালের বাজনা। সেই বোল্ বাজানো ঠুংরির অনুসারী হারমোনিয়ম বাদন। আর গণপৎ রাওয়ের শিষ্যরাও ওস্তাদের সেই ধারা অনুসরণ করতেন। গয়ার গোফুর খাঁ আর সোনীজী। ইন্দোরের বাসির খাঁ। কলকাতায় শ্যামলাল ক্ষেত্রী আর ইরসাদ। গণপৎ রাও কলকাতায় এলেই তাঁর এই শিষ্যমণ্ডলীতে ঘেরা থাকতেন। আর তাঁর সঙ্গে মীর্জা সাহেবকেও দেখা যেত। অন্য সময়েও যখন ভাইয়া সাহেব থাকতেন না কলকাতায় মীর্জা সাহেব শ্যামলাল ক্ষেত্রীর সঙ্গে মিলতেন খুব। প্রায়ই শ্যামলালজীর ১০১ হ্যারিসন রোডের আসরে আসতেন বাজাতেন। তাঁর বাজনার চালও ঠিক এ'দেরই মতন। এমনি রীতির মনোহারী ঠুংরি। এই কায়দার অঙ্গুলি চালনা। আর ডান হাতে বেলো করে বাম হাতে বাজানো মীর্জা সাহেবেরও—গণপৎ রাও গোফুর বাসির খাঁর মতন। শ্যামলালজী ইরসাদ সোনীজী বাঁ হাতে বাজতেন না বটে। তবে তাঁদেরই মতন আঙ্গুলে আর ঠুংরি অঙ্গে মেজাজে চালে মীর্জা সাহেবের হারমোনিয়ম বাজনা। তাল লয়ের চেয়ে সুরের দিকে সূক্ষ্ম কারুকর্মের দিকে ঝোঁক বেশি। এই বাঁধা সুরের পর্দায় যত মিহি কাজ করা সম্ভব তা দেখানো। সে সবই এই ঘরের চাল। আর শ্যামলাল ক্ষেত্রীকে কেন্দ্র করে কলকাতায় গণপৎ রাওয়ের এই অনুগামীদের সঙ্গেই মীর্জা সাহেবের বেশি সাঙ্গীতিক যোগাযোগ। গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর সঙ্গেও এই সূত্রে তাঁর অন্তরঙ্গতা আসরে আসরে একযোগে গান বাজনাও। শুধু গিরিজাশঙ্কর কেন গহর জান মালকা জান ও'দের সঙ্গেও। গহন জান মালকা জানও ত এই গোষ্ঠীর। গণপৎ রাওয়ের তাঁরাও শিষ্যা। সেই সূত্রে গহর আগ্রাওয়ালী মালকা আসা যাওয়া করতেন শ্যামলালজীর বৈঠকে। আর মীর্জা সাহেবও যেতেন।

তাছাড়াও গহর জান মালকা জান-দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় মীর্জা সাহেবের। সেসব তাঁর যৌবনকালের কথা। তখন গহর মালকার বাড়িতেও তাঁর যাতায়াত ছিল। পানভোজন বিলাসী যেমন তেমনি এসব দিকেও সঞ্চরণ করত তাঁর বিলাসচিত্ত।

তখন ত এমন হাল হয়নি মীর্জা সাহেবের। চাল চলন সাজ পোষাক তখনো অনেকটা নবাব-পৌত্রের উপযুক্ত ছিল। আর যৌবনের সে লালিত্যময় স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শরীর। গোলাপী গৌরবর্ণ কান্তি মুখ চোখ ভ্রূ-যুগলের নন্দন-ছাঁদ। অন্য সব গেলেও নবাবী চেহারা মীর্জার সেই যৌবনে ছিল বৈকি। আর গহর জান তার কদর করতেন। মীর্জার সঙ্গে সুখের সম্পর্ক ছিল তখন গহরের।

তারই একটি উত্তর-প্রসঙ্গ এই শেষের কথায় বলে দেওয়া যায়।

স্বৈরিণী যৌবন বিলাসিনী গহর জান। আর রূপসী বাইজী-বিলাসী রূপবান ভোগপরায়ণ তরুণ।

কিন্তু সে সব মধু বাসন্তী দিনের অনেক বছর পরের এই কথা। গহর জানের জীবনে অনেক নাটকীয় আবর্তন বহু উপার্জন আর খ্যাতি প্রতিপত্তির দিনের এক উপসংহার কাহিনী। বর্ণাঢ্য নানা দৃশ্য-শেষে দুজনেরই জীবন-নাট্যে পঞ্চমাঙ্ক শুরু হয়েছে।

এক আসরের হাজার টাকা মুজরো ছিল যে সেরা বাই সাহেবার এখন তাঁর পসারহীন দুর্দিন। আয়নার সামনে বিগতকালের সে রূপতনু দেখার প্রত্যাশায় হয়ত আনমনা দাঁড়ান। আর বেদম-বিহ্বল হয়ে যান নতুন প্রতিবিম্ব দেখে। রমণী দৃষ্টি দিয়ে আপন দেহলতা লক্ষ্য করেন। হয়ত হাহাকার করে ওঠে অন্তর। বাইরে থেকে যা অলক্ষ্য পুরু কাঁচের সাহায্যে তা নিজের কাছে সুস্পষ্ট। বাহ্যত হয়ত অটুট দর্শন শরীর। তবে পুরু চশমা ঘরে ব্যবহার না করলে অনেক দৃশ্যই অস্পষ্ট থেকে যায়।

এ আয়না মালকা জানের তাঁর একটি গৃহ-কক্ষের। কলকাতা-জীবনের তখন শেষ পর্ব গহরের। এখান থেকে চিরবিদায় নিয়ে মহীশূর দরবারে চলে যাবার ঠিক আগের কথা। সেই বিপর্যস্ত দিনে অনেক কালের বান্ধবী গুরুবহিন মালকার অতিথি হয়ে আছেন। আগ্রাওয়ালীর সেই ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীটের উত্তরমুখী আবাসে।

সেদিনের ম্লান অপরাহ্ণ বেলা। দোতলার এক অন্দর কামরায় বসে আছেন গহর জান। অন্যমনস্ক হয়ে কেশ পরিচর্যা করছেন। নিতান্ত অন্তঃপুরের বেশবাস।

এমন সময় হঠাৎ হাজির হলেন লতিফ মালকা জানের সহোদর। সঙ্গে মীর্জা সাহেব আর তাঁর এক ছাত্র।

'কোন্ কোন্? অন্দরমে আ গিয়া।' বিরক্ত কণ্ঠে ধমক দিয়ে উঠলেন ক্ষীণদৃষ্টি গহন জান 'বে আদব্!'

লতিফ সান্ত্বনার সুরে বললেন 'জেরা দেখিয়ে ত কৌন্ আয়া আপ্‌কো পাস?'

লতিফকে দেখে তাঁর পর্দাবাসে ক্রোধ-শান্ত হল গহর জানের, কৌতূহলী হয়ে পুরু কাঁচের চশমাটি শুভ্র খড়্গ-নাসিকায় তুলে ধরলেন।

সামনে ও কে দাঁড়িয়ে?

অনেক হিম ঋতু সে দেহ-সৌষ্ঠবের ওপরেও কাল-প্রবাহে বয়ে গেছে। বহুদিনের অদর্শন। তবু চিনেছেন গহর জান।

'মীর্জা!' সে আকুল স্বরে পুলকোচ্ছ্বাস না আর্তনাদ? নাকি দুয়েরই আশ্লেষ? আকস্মিকতায় ভাবাবেগে উদ্বেল পরিস্থিতি। বাই সাহেবা আপ্লুতা হলেন। 'দেখো তুমহারা গউহরকি কেয়া হালাৎ হুয়ি কণ্ঠ অবরুদ্ধ হয়ে গেল অশ্রুধারায়।'

সেই গহর জান?

পরিণত-প্রৌঢ় মলিন মীর্জা সাহেবও চেয়ে রইলেন। নির্বাক নিরুত্তর...। বাষ্পাচ্ছন্ন চক্ষু......

হারানো সুরের ক্রন্দন।

হারমোনিয়মের পর্দায় পর্দায় ওঠেনো কোন ঠুংরির সকরুণ রেশ যেন!......

—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

উপন্যাস

প্রভাত দেবসরকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিকাশ একটু আগে আগে হাঁটা দিয়েছিল। পিছনে মাইক-বাহিত বক্তৃতার শব্দ ক্রমশ অস্পষ্ট হতে হতে ক্ষীণ হয়ে এল, এক সময় আর কানে এল না। শহীদ মিনার ছেড়ে দক্ষিণে অনেকদূর এসে গেছে সামনে গান্ধীর মর্মর মূর্তি ফোকাশ লাইটে আলোকিত। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বিকাশ চোখ তুলে দেখলে দেখবার মত না হলেও পথের মাঝে মূর্তিটাকে রেখে যেন অদ্ভুত একটা বিস্ময় সৃষ্টি করা হয়েছে পথচারীর মনে।

বিকাশের মনে হল, হঠাৎ যেন দেখার মত—এর আগে যেন খেয়াল করে দেখেনি, কি দেখলেও মনে রাখেনি। মূর্তিটা করেছে মন্দ নয় আর রেখেছেও বেশ জায়গায় সাজিয়ে গুছিয়ে, সবুজ ঘাস, মৌসুমী ফুল লোহার বেড়া।

বেশ যেন জীবন্ত মনে হচ্ছে, হাতের লাঠি কাটা স্টেপে আটকান গায়ের চাদর নগ্নপায়, কটি-বস্ত্র—

গান্ধী মর্মর মূর্তির বেদীতে ইংরেজীতে কি যেন লেখা আছে, পড়া যাচ্ছে না। এর আগে অনেকবার পড়বার চেষ্টা করেছে বিকাশ কিন্তু সবটা পড়তে পারেনি, মানেও স্পষ্ট হয়নি মনে—কি সব মৃত্যু, জীবন নিয়ে লেখা। মরুক গে।

বিকাশ মূর্তিটা পার হয়ে মাঠের রাস্তায় পড়ল। ডান দিকে অন্ধকারে কালো হয়ে আছে ওপারে রাস্তায় বিচ্ছুরিত আলোকরেখায় হাঁটা-পায়ের সীমারেখা দেখা যায়।

সামনে খানিকটা এগিয়ে আসতে একটা আলোর পোস্ট, অকারণে হাসির মত মাঠের রাস্তা আলোকিত। আর সেই আলোয় বিকাশ চিনল, মিটিং-এর সেই মেয়েটি সেদিনের সঙ্গিনী ভীতা সঙ্কুচিতা সেই মেয়েটি—

আজ কোন সংকোচ নেই কোন ভয় নেই। বেশ সপ্রতিভ মনে হয়, বেশ স্বচ্ছন্দগতি—

থরথর পা চালিয়ে বিকাশ মেয়েটির পাশে এসে দাঁড়াল, মৃদুকণ্ঠে বললে মিটিং শুনতে গিয়েছিলেন?

মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে বক্র দৃষ্টিতে দেখলে, তারপর যেন হাসলে।

নিঃশব্দে পাশাপাশি হেঁটে এসে গাছ-পালা পেরিয়ে মাঠের ফাঁকা রাস্তায় পড়ে বিকাশ তেমনি মৃদু কণ্ঠে বললে, আপনাকে আমি চিনতে পেরেছি আপনি হয়তো—

সামনে মুখ রেখে আকাশ-মাঠের একাকার সীমারেখায় পা দিয়ে যেন মেয়েটি এবার সশব্দে হাসলে।

অপ্রস্তুত হয়ে বিকাশ জিজ্ঞেস করলে, হাসলেন যে!

মুখ ফিরিয়ে মেয়েটি বললে হয়তো কি বললেন না তো?

নিশ্চয়ই গায়ে-পড়া ভেবেছেন।

তা হলে তো এতক্ষণ এক সঙ্গে হাঁটতেই পারতুম না। কখন—

আবার খানিকটা নীরবতা। উভয়ের পায়ের শব্দ শোনা যায় কেবল। নীরবতাটা বেশিক্ষণ নয়। বিকাশ বললে কখন কি বললেন না তো?

কখন আবার কি, যেন ভাবতে চেষ্টা করলে সঙ্গিনী মেয়েটি তারপর গম্ভীর হয়ে বললে চিৎকার করতুম, লোক ডাকতুম।

বিকাশ হেসে উঠলো তা হলে আপনি তো চিনতে পেরেছেন।

না চেনার কি আছে! সেদিন আপনি খুব সাহায্য করেছিলেন খুব গোলমাল ছিল একলা যেতে ভয় করছিল।

আজ? ট্রাম-বাস বন্ধ হেঁটে হেঁটে বাড়ী ফিরতে হচ্ছে!

ও আর কি, সবাই ফিরছে। রাস্তায় বেশ লোকজন আছে!

বেশ লোকজন আছে।

বিকাশের কিন্তু আশেপাশে রাস্তায় লোকজন ভাল লাগছে না। সেদিনের গোল-মালের মত চলার পথটা যদি আজও জন-শূন্য হয়ে থাকতো, মেয়েটি যদি এসে সেদিনের মত সঙ্গ নেবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করতো তাহলে যেন ভাল হতো—অপরিচয়ের রহস্যটা সহজেই খসে যেত পরিচয়টা সহজ সাবলীল হতো।

আজ মেয়েটি যায় নি, বিকাশই এগিয়ে এসেছে। কত কথা বলবার ইচ্ছে করছে কিন্তু কিছু বলতে পারছে না, কি যে সংকোচ তাও বুঝতে পারছে না। বিকাশ ভাবতে চেষ্টা করে তার সমবয়সী কারও সঙ্গে যদি পথের মধ্যে এমনি সাক্ষাৎ হতো পূর্ব-দেখায় সূত্র ধরে কি আলাপ করতো, সেই বা কি ভাবতো?

বিকাশ জিজ্ঞেস করলে, আপনি মিটিং শোনেন? মিটিং শুনতে এত দূরে আসেন?

এখানে রাস্তার ওপর একটা শিরীষ না কৃষ্ণচূড়ার ডালপালা ছড়িয়ে বেশ অন্ধকার সৃষ্টি হয়েছে দূরের আলোর অনুপ্রবেশ নেই। আলো থাকলে বিকাশ দেখতে পেত মেয়েটির মুখ বেশ গম্ভীর হঠাৎ আকাশে মেঘ করার মত।

বিকাশ আবার বললে, ময়দানে মিটিং-এ আসেন তা হলে?

না। বেশ গম্ভীর যেন কণ্ঠস্বর।

এর পর কি বলবে ভাবতে যেন অনেক সময় নেয় বিকাশ। মিটিং-এ সেও বড়-একটা আসে না। এতখানি বয়সে এই দুবার না তিনবার মিটিং-এ এল।

বিকাশ বললে, না আসাই ভাল। কোন লাভ নেই। কেবল হুজুক।

মেয়েটি কোন উত্তর দিলে না। পায়ে পায়ে এলগিন রোডের মোড়ে এসে পৌঁছল।...

...নন্তু কত রাতে ফিরেছিল বিকাশ জানে না। বাবা-মা নন্তুর জন্যে অপেক্ষা করেছিলেন বাবা ব্যস্ত হয়েছিলেন, মা গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন, বিকাশ বিরক্ত হয়ে বলেছিল, যেমন কে তেমন তোমরা খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়। আর ভাবনার কি আছে খিদে পেলে ঠিক আসবে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে মেঝের বিছানায় ভাইকে কুঁকড়ি মেরে শুয়ে থাকতে দেখে বিকাশ যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। মুখে যতই বলুক, ভাই-এর রাত করে বাড়ী ফেরায় মনে মনে সে কম চিন্তিত হয় নি। আজকাল নন্তু কি করে বোথায় যায় কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। বললেও কারো কথা শোনে না। ভূতের মত ঘুরে ঘুরে বেড়ায় রাজনীতি করে।

ময়দানের মিটিং-এ ভাইকে যেন দেখতে পাবে বিকাশ আশা করেছিল। নন্তু তাকে দেখে অবাক হয়ে যাবে। ভাববে মুখে দাদা যাই বলুক, ভেতরে ভেতরে তাদের সমর্থন করে, সকল প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে—

বিকাশ উঠে আলো জ্বালতে নন্তুরও ঘুম ভেঙে গেল। সোজা হয়ে শুয়ে বললে, আলো জ্বাললে কেন?

আলো নিবিয়ে বিকাশ বললে, কখন ফিরলি?

অনেকক্ষণ।

খেয়েছিস?

হ্যাঁ।

কোথায় গিয়েছিলি অত রাত পর্যন্ত?

নন্তু উত্তর দিলে না। পাশ ফিরে শুল।

ময়দানে মিটিং-এ গিয়েছিলি?

কোন উত্তর নেই। বিকাশ আবার জিজ্ঞেস করলে, যাস নি মিটিং-এ? খুব জোর মিটিং হয়েছে আজ।

নন্তু বিরক্ত হয়ে বললে মিটিং-মিটিং-এ আমরা যাই না।

জেরা করে বিকাশ বললে, তা হলে কোথায় যাস এত রাত পর্যন্ত? বাবা-মা ভাবনা করেন।

নন্তু বললে, না ভাবলেই পারেন। কোথায় আবার যাব।

বিকাশ উপদেশের ছলে বললে, যেখানেই যাও বলে যেতে পার না? তোমার আর কি বললেই হলো—না ভাবলে পারেন।

নন্তু কোন সাড়া করলে না। বিকাশও খানিক চুপ করে রইল। জানালার বাইরে যে দাতব্য আলোর খুঁটিটা আছে আজ অনেক দিন পরে তার মাথা থেকে আলো ঝরছে, তারই কিছু রেখা ঠিকরে ঘরে ঢুকেছে। ঘর অন্ধকার হলেও খুব অস্পষ্ট নয়। নীচে মেঝের বিছানায় নন্তুকে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে, দেওয়াল ঘেঁসে বাকস-পেটরা গাদাগাদি হয়ে আছে, ওদিকের দরজাটা খিল আঁটা।

আজ বোধ হয় ঘুম আসবে না। কত ক্লান্ত হয়েছে কে জানে। ওপরে তক্তাপোষের ওপর বিছানায় বিকাশ উসখুস করছে। নন্তুও কি জেগে আছে?

বিকাশ ডাকলে, নন্তু এই-ই—

উম্-ম্—নন্তু সাড়া দিলে।

বিকাশ বললে, আজ ময়দানে খুব জোর মিটিং হয়েছে, সব পার্টি মিলে বিরাট র‍্যালি করেছিল, দুপুর থেকে ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। উঃ কি লোক!

নন্তু নিরুত্তর। বিকাশ নন্তুর বিছানাটা ঠাহর করতে পারে না।

বিকাশ অবাক হয় পার্টির মিটিং-এর ব্যাপারে নন্তুর আগ্রহ নেই কেন। সে তো ভেবেছিল মিটিং-এর কথা শুনে নন্তু খুব আগ্রহ দেখাবে, আর যখন জানবে দাদারও আগ্রহ আছে, দাদাও ময়দানে মিটিং শুনতে যায় তখন আরো খুশী হবে, দাদাকে দলে টানতে চেষ্টা করবে।

সাগ্রহে বিকাশ জিজ্ঞেস করলে, তুই যাস নি? তোদেরই তো মিটিং ছিল রে!

বিছানার ওপরে নন্তু যেন ছিটকে উঠলো, না আমাদের কোন মিটিং নেই। মিটিং করে দেশের লোককে আমরা ভাঁওতা দিই না। সব বাজে—

এ আবার নন্তুর মুখে কি কথা? এত দিন তো বামপন্থীদের পেছন পেছন ঘুরেছে লোক জড় করেছে ঝাণ্ডা নিয়ে চিৎকার করেছে, কংগ্রেসীদের গাল দিয়েছে, বাড়ীতে তাই নিয়ে কত তর্ক, অশান্তি হয়েছে। বিকাশের চাকরী হতে বাবা কত বলেছেন ওরে ওসব করিস নি—পুলিশ রিপোর্ট চলে যাক, চাকরীটা পাকা হোক, তারপর যা পারিস করিস। কিন্তু কে কার কথা শোনে! বিকাশেরও রাগ হতো বাবা-মাকে বলতো, নন্তুর জন্যে তার চাকরী যাবে। আজকাল পুলিশ রিপোর্টে খুব চাকরী যাচ্ছে।

বিকাশ গম্ভীর হয়ে বলে, এখানে থেকে ওসব করা চলবে না। তোমার জন্যে সংসারে সবাই ব্যতিব্যস্ত হবে কেন? ভাল চাও তো লেখাপড়া কর লক্ষ্মী ছেলের মত ঘরে থাক, তা নয় শুধু শুধু গোলমাল—

নন্তু গম্ভীর হয়ে বললে, সে তোমাকে ভাবতে হবে না।

বিকাশ চিৎকার করে উঠলো, হবে না মানে তুমি কি ভেবেছ তোমার মাথার ওপর কেউ নেই তুমি যা ইচ্ছে তাই করবে?

নন্তু তেমনি গম্ভীর হয়ে বললে ওসব বুর্জোয়া ব্যবস্থায় মাথা গলিয়ে কোন লাভ নেই—আমরা সব কিছু ভেঙে দেব!

বিকাশ শ্লেষ করে বললে খুব মাতব্বর হয়েছে! এক পয়সা রোজগার করতে পার না এদিকে রোয়াব আছে কত। দুবেলা খাবার ব্যবস্থা না থাকলে বুঝতে বিপ্লব করার মানে কি! আগে নিজের পায়ে দাঁড়াও তারপর বিপ্লব করো বুঝলে? বুড়ো বাপের ঘাড়ে বসে বিপ্লব করো না!

নন্তু বললে, তোমাকে অত ভাবতে হবে না।

বিকাশ আরো জোরে চিৎকার করে বললে আলবৎ হবে! তোমার জন্যে সংসার নষ্ট হবে না কি? আমারও কন্ট্রিবিউশন আছে।

নন্তু বললে, আমি তোমার খাই না পরি না তোমার কথার ধার ধারি না—

বিকাশ তড়াক করে তক্তাপোষ থেকে লাফিয়ে পড়ে, নন্তুর পিঠে একটা চড় কষিয়ে বললে, যত বড় মুখ না তত বড় কথা, শুয়ার কোথাকার।

নন্তু কিছু করার আগেই পট করে ঘরের আলো জ্বলে উঠলো—মা এসে দুই ছেলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন, ছি ছি রাত দুপুরে এসব তোরা কি করছিস? ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি করছিস শেষটা!

বিকাশ মাথা নিচু করে তক্তাপোষের ওপর উঠে গেল নন্তু মেঝেয় বিছানার ওপর চুপ করে বসে রইল। মা বললেন, তোর জন্যেই দেখছি গলায় দড়ি দিতে হবে! এত বড় হয়েছিস যে বড়-ছোট জ্ঞান নেই। দাদার গায়ে হাত তুলিস? হারাম-জাদা!

নন্তু বললে, বারে আমি কখন হাত তুললুম, দাদাই তো আমাকে মারলে।

মা বললেন বেশ করেছে, আরো মারবে! দিন দিন যা করে বেড়াচ্ছ কোন দিন না সবার হাতকড়া পড়ে! বিকাশ আমি বলছি ওকে তোরা শেকল দিয়ে বেঁধে রাখ।

বিকাশ কোন কথা বললে না। নন্তু বললে বাঁধা অত সহজ নয়।

নয় মানে—মা ছেলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের আঁচলটা যেন বন্ধন রজ্জু করতে চাইলেন। নন্তু যত ধস্তাধস্তি করতে লাগল মা তত ছেলেকে কোলের দিকে টানতে লাগলেন। তিনি ছেলেকে বাঁধবেনই।

ইতিমধ্যে কখন অবনীবাবু ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। গম্ভীর হয়ে বললেন, ছেড়ে দাও, ও কি হচ্ছে।

ছেলেকে ছেড়ে মা কাঁদন-ঝাদন হয়ে বললেন দেখ না নন্তু কি সব আরম্ভ করেছে। বিকাশের সঙ্গে ঝগড়া করছে, যা ইচ্ছে তাই করবে বলছে। ওর কি কোন শাসন নেই?

অবনীবাবু বললেন, থাকবে না কেন সে তো তুমি নষ্ট করেছ — আদর দিয়ে ছেলেকে মাথায় তুলেছ! এখন বললে কি হবে।

মা ক্রন্দনস্বরে বললেন, আমারই তো যত দোষ! আমিই ছেলেদের নষ্ট করেছি আমি ওদের আদর দিয়েছি! ওই তো আর একটা ছেলে আছে ওকে জিজ্ঞেস কর না। কই ও তো এর মত নয়?

অবনীবাবু বললেন, সবাই কি সমান হয়। যখন পড়াশোনা গোল্লায় দিলে তখনই বুঝেছি—

মা প্রতিবাদ করে বললেন, ছাই বুঝেছো। তোমার আস্কারাতেও এমন হয়েছে, বা-ও না ছেলে ছেলে করে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াও, একটু রাত হলে ঘর-বার কর! আমি আদর দিয়েছি না তুমি আদর দিয়েছ? একবার ফেল করলে বলে পড়া

ছাড়িয়ে দিলে কেন- না হলে তো আর এমন হতো না। তুমিই ওর মাথা খেয়েছ—

অবনীবাবু বললেন ষেই থাক এখন তার আর চারা নেই।

মা বললেন তা বলে ও যা ইচ্ছে তাই করবে লঘু গুরু মানবে না? কোন শাসন নেই!

অবনীবাবু যেন শ্লেষ করলেন, কি আর শাসন! ওসব ছেলে শাসনের বাইরে।

তা বললে তো চলবে না, আমাদের খাবে পরবে, আমাদের সর্বনাশ করবে। ওকে দূর করে দাও।

অবনীবাবু বললেন, অনেকবার বলেছি আর কত বলবো—বাড়ীতে যদি থাক ওসব রাজনীতি করো না, গরীবের ছেলে মারা পড়বে সবাইকে সেই সঙ্গে মারবে! বিকাশও কতবার বলেছে, পড়াশোনা কর ভদ্রলোকের মত থাক, তা নয় যত সব দাদাদের সঙ্গে মিশে হৈ-হৈ।

নন্তু গম্ভীর কণ্ঠে বললে, আমার জন্যে তোমাদের ভাবতে হবে না।

কি হলো, অবনীবাবু হঠাৎ ছুটে এসে নন্তুর গালে এক চড় কষিয়ে বললেন, আবার মুখ নাড়ছিস হতভাগা ভাবতে হবে না—এত মাতব্বর হয়েছ!

বিকাশ আর চুপ করে থাকতে পারলে না বাপকে সরিয়ে দিয়ে বললে, এ সব তোমরা কি করছো? আমাদের কথা নিয়ে তোমরা কেন মাথা গরম করছো? যাও যাও তোমরা যাও—

অবনীবাবু তেমনি গরম হয়ে বললেন, না যাব না, আগে ও বলুক যা করছে আর করবে না, কোনো পলিটিকস-এ যোগ দেবে না পড়াশোনা করবে—

বিকাশ বললে, সে আমি ওকে বোঝাব, তোমরা এখন যাও।

তোর কথা ও শুনবে মনে করিস? ওর দাদারা ওকে যা বলবে তাই করবে—মাথাটি একেবারে চিবিয়ে খেয়েছে অত সহজ নয়!

নন্তু গালে হাত বুলতে বুলতে বললে, ও বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থায় কিছু হবে না—আরো বোকা বনে যেতে হবে। বি-এ এম-এ পাশের কোন মূল্য নেই।

যত মূল্য আছে তোমাদের মত ক-খ-পড়া পন্ডিতদের। শোন বিকাশ ওর কথা শোন ওকে তুই বোঝাবি। বেশ যা কতক মার দে ওর পন্ডিতী ছেড়ে যাবে বুর্জোয়া কাকে বলে বুঝতে পারবে।

হঠাৎ নন্তু উঠে দাঁড়িয়ে বললে মার দিতে এলে মার খেতে হবে—আর অত সোজা নয়।

নন্তুর কথা শুনে সকলে স্তব্ধ হয়ে গেল। তারা যা ভেবেছিলেন তা নয়। নন্তু তাদের শাসনের বাইরে অনেক দূর চলে গেছে। সংসারের লঘু-গুরু মানামানি, কি তার শাসন কিছু এখন আর ওর গ্রাহ্যের মধ্যে নয়। মা বলে বাবা বলে বড় ভাই বলে সম্মান-ভক্তির ধারও ও আর বোধহয় ধারে না। কে জানে আরও বেশী উত্তেজনায় নন্তু কোন বিপরীত কান্ড করবে কিনা।

...ভদ্রলোক অনেকক্ষণ বাড়ীর সামনে ঘোরাঘুরি করছেন। বিকাশের মা জানালা থেকে তাকে দেখেছেন। কিন্তু বাড়ীতে নকউ নেই যে, তাকে ডেকে পাঠাবেন জিজ্ঞেস করবেন কাকে চাই। অবনীবাবু এখনো ফেরেন নি। কে জানে হয়তো ট্রাম-বাসের গোলমাল হয়েছে। রোজই হাংগামা লেগে আছে। কেউ বাড়ী থেকে বেরলে ভাবনা হয় সুস্থ শরীরে অক্ষত অবস্থায় ফিরবে তো। দুর্গা-দুর্গা বলে যেন মনে আর সাহস পাওয়া যায় না। কি দিনকাল পড়েছে। উঃ সেই কবে থেকে শুরু হয়েছে এর যেন আর শেষ নেই!

অবনীবাবু বলেন, শেষ হবে কি দেখতে পাচ্ছ না নিজের ঘরেও শুরু হয়ে গেছে!

স্বামীর কথাটা উমাশশী বোঝেন ঐ জবালা নন্তু। কি করে বেড়াচ্ছে কে জানে।

ভদ্রলোক এসে কড়া নাড়লেন দু'বার যেন অস্ফুটে অবনীবাবুর নাম ধরে ডাকলেন। উমাশশী কি করবেন বুঝতে পারলেন না। স্বামীর নাম ধরে ডাকলেও তাঁর ভয় হল যদি কেউ নন্তুর জন্যে আসে—পুলিশের লোক হতে পারে। তিনি তো সব সময় সেই ভয় করছেন, নন্তু যেন বাইরে বাইরে সাংঘাতিক কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে। পরশু খেতে খেতে বিকাশ আবার বলেছে, বাবু আজকাল আর পার্টির লোকের সঙ্গে ঘোরে না। বিপ্লব না কি করছে!

ঠাট্টা করে বললেও কথাটা সেই দিন থেকে মার মনে যেন বিঁধে গেছে। পুলিশে এত ধরছে-মারছে জেলে পুরছে এতে কি বিপ্লব হচ্ছে না, নন্তু আবার নতুন করে কি করছে? সেটা না জানি কত সাংঘাতিক!

তার ওপর আরো একটা কথা বিকাশ একদিন বলেছিল নন্তুরা নাকি তেলেঙ্গানা না কোথায় একবার কি হয়েছিল এখানেও সেই রকম করবে। তাহলে তো আরো চিন্তার কথা ভাবনার ... মেজাজ দেখালে ও ছেলে... নেই একটা কিছু করলেই হলো।

বিকাশের বাবা বলেন, একদিন তিনিও নাকি জেল খেটেছিলেন স্কুলে যখন পড়তেন অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এখন কি করছেন, সামান্য মাইনের চাকরী করছেন, কিন্তু ও'রই সঙ্গে রবীনবাবু বলে কে নাকি এক সময় জেলে গিয়েছিল বলে নেতাদের ধরে মস্তবড় সরকারী চাকরী করছেন। আজ যাঁরা নেতা হয়েছেন তাঁদের অনেককে বিকাশের বাবা এককালে চিনতেন।

বন্ধ দরজার এপারে উমাশশী মনে মনে যেন কঠিন হয়ে উঠলেন। হোক পুলিশের লোক তিনি ভয় করবেন না মুখের ওপর স্পষ্ট জবাব দেবেন। জিজ্ঞেস করবেন কার হুকুমে তাঁর বাড়িতে এসেছে!

না বৃথা আশংকা উমাশশীর। দরজা খুলতেই কড়া-নাড়া ভদ্রলোক যেন বেশ অপ্রস্তুত বোধ করলেন পাশে সরে গিয়ে আমতা আমতা করে বলেন অবনীবাবু বাড়ী আছেন?

উমাশশী অস্ফুটে বললেন না।

ভদ্রলোক পিছন ফিরে বললেন আচ্ছা আমি পরে আসবো। বোধ হয় ফিরতে তাঁর দেরী হবে?

কি মনে হল উমাশশীর বললেন আপনি ঘরে এসে বসুন এখনি আসবেন—ফেরবার সময় হয়ে গেছে।

অনন্তবাবু যেন আরো অপ্রস্তুত বোধ করলেন ইতস্তত করে বললেন আমি ঘুরে আসছি। বলবেন বিকাশের আপিস থেকে লোক এসেছিল।

উমাশশীর বুকটা যেন ধড়াস করে উঠলো আবার বিকাশের আপিস থেকে লোক কেন? কি দরকার? সে তো আপিসে গিয়েছে! এখনো ফেরেনি—

উমাশশী কিছু বলবার আগেই অনন্ত-বাবু বললেন, বিকাশ আছে?

না, সেও ফেরেনি! উমাশশীকে বেশ চিন্তিত মনে হয়।

অনন্তবাবু বললেন ঠিক আছে আমি ঘুরে আসছি এদিকে একটু কাজ আছে—

[illegible] সুস্থ করে বললেন কি [illegible] পারেন আমি [illegible]

হ্যাঁ হ্যাঁ অবনীবাবুকে [illegible] [illegible] তা। মানে আমি এসেছিলুম [illegible]—উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট ব্যক্ত করতে [illegible] জড়তা বোধ করেন অনন্তবাবু [illegible] পারেন না সোজা-সুজি [illegible] করা উচিত হবে কি না। [illegible] বিয়ের সম্বন্ধ করতে [illegible] তাদের [illegible] হয়েছেন [illegible] তিনি পাত্রের বাই হোন এখন তিনি [illegible] পিতা। পাত্রের বাবা-মার কাছে [illegible] নিচু বিনীত হতেই হবে প্রার্থনা [illegible] হবে।

দরজায় দাঁড়িয়ে ভদ্রলোককে দেখে উমা-দেবীর কেমন যেন মায়া হল। তাঁর ভয়-ভাবনার কোন কারণ নেই নেহাৎ গোবেচারা ভদ্রলোক! হয়তো কোন কাজে এসেছেন বিকাশকে বলেছিলেন সে হয়তো ভুলে গেছে। কিন্তু কাজটা কি মনে মনে আন্দাজ করে ঠিক সিদ্ধান্ত করা যাচ্ছে না—কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে—টাকা-পয়সা জায়গা-জমি বাড়ীঘর—না ওসব হবে কেন তাঁরা তো কোন কালেই ওসবের কারবারি নন বাঁধা মাইনে ভাড়া বাড়ি দিন-আনা-দিন খাওয়া এ-ছাড়া বিকাশের বাবা কি এমন লোক যে তাঁর কাছে এসে ধর্ণা দিতে হবে?

তা হলে? হঠাৎ আবার যেন মনের মধ্যে ভয় ঘনিয়ে ওঠে—বিকাশকে নিয়ে আপিসে কিছু হয়নি তো? বিকাশের বিষয়ে কিছু বলতে আসেননি তো? আপিসে কোন গোলমাল হলো না কি? কে জানে কোন্ দিক থেকে কি বিপদ আসে তার ঠিক কি?

উমা দেবী বললেন আপনি বলুন আমি বলবো' খন—

না আচ্ছা থাক আমি বরং একটু পরেই আসি এই আধ-ঘণ্টা কি এক ঘণ্টার মধ্যেই আসবো। অনন্তবাবু পা বাড়ালেন।

উমা দেবীর যেন আরো ভয় হল ভাবলেন নিশ্চয়ই বিকাশের আপিসের কোন ব্যাপার তাঁর কাছে ভাঙছেন না যা বলবার কর্তাকেই বলবেন।

মনের ভয়টাকে দূরে করে ঠেলে দিতে যেন উমা দেবী মরিয়া হয়ে বললেন যা বলবার আপনি আমাকেই বলুন যদি আপিসের কিছু হয় কি—

নিজের মনে হেসে অনন্তবাবু সংগে সংগে বললেন না না আপিসের কিছু নয়। আমি এসেছিলুম—একটা কথা—

কথাটা শেষ করবার আগেই অবনীবাবু সামনে এসে পড়লেন। থমকে অনন্তবাবুর মুখের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন কাকে চাই?

ততক্ষণে উমা দেবী দরজার ওদিকে সরে গেছেন। অনন্তবাবু সবিশেষ আন্তরিক হবার চেষ্টায় বললেন আমি আপনার কাছে এসেছিলুম।

অভ্যর্থনা করে অবনীবাবু বললেন আসুন।

তারপর পিছন পিছন এসে ঘরের মধ্যে বসে অনন্তবাবু কেমন যেন নিজেকে অসহায়-বোধ করতে লাগলেন। মনে মনে কর্তা-গিন্নীর সম্বন্ধে নানা জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলেন—কে জানে কি ভাবে তাঁর প্রস্তাবটা এঁরা নেবেন। মনে মনে আপন আত্মজার গুণাগুণটও পর্যালোচনা করে নিলেন—লেখাপড়া খুব একটা কিছু না হলেও সংসারে বেমানান হবে না স্বভাব চরিত্র ইত্যাদি বিষয়ে আত্মজার ভূয়সী প্রশংসা করবেন—মানে বললেন আজকালকার মেয়ে-দের মত নয় নম্র ধীর স্থির—কিন্তু রূপ? যদি তাঁকে দেখেই এঁরা ঠিক করে ফেলেন কন্যা আদৌ মনোহারিনী নয় ঘরের বউ করার পক্ষে কন্যার যেটুকু গাত্রবর্ণ ন্যূন পক্ষে আবশ্যক তা নিশ্চয়ই নেই তা হলে অনন্তবাবু কি বলবেন? না মেয়ে তার কালো নয় তবে ফর্সাও নয়—সাধারণ যা হয় বাঙালী ঘরে—সুন্দরী না হোক কুৎসিত কিছুতে নয়। তখন অনন্তবাবু নিজেকে জোর দিয়ে বলবেন বেশ আপনারা নিজের চোখে একবার দেখে আসুন; বিশ্বাস না হয়—তারপর আপনাদের যা মত হয়—

অনন্তবাবু কালো মোটাসোটা পঞ্চাশের ওপর মুখচোখের যে ভাব হয় তেমনি মাথার চুল বিরল এবং প্রায়ই পক্ক।

অবনীবাবু বললেন তারপর বলুন—

অনন্তবাবু বললেন আমি আপনার বড় ছেলে বিকাশের সংগে এক আপিসে কাজ করি—

এ খবরে নতুন করে উৎসাহিত হবার কোন কারণ অবনীবাবু খুঁজে পেলেন না। অন্দর মহলে তাঁর স্ত্রী তাঁকে সে কথা বলেছেন এও বলেছেন আপিসের ব্যাপার হলে যেন বেশ ভাল করে জিজ্ঞাসাবাদ করে নেন। তাঁর কেমন ভয় করছে।

অবনীবাবু বললেন আমি শুনিচি। বলুন এবার আপিসের কি খবর আছে!

অনন্তবাবু বললেন আপিসের খবর-টবর কিছু নয় আমি আপনার সংগে আলাপ করতে এলুম।

অবনীবাবু বললেন বেশ বেশ; আপনার অন্ডারে তো বিকাশ কাজ করে?

অনন্তবাবু উৎসাহিত হয়ে বললেন হ্যাঁ ছেলে আপনার খুব ভাল কাজ-কর্মও খুব ভাল জুনিয়র তা হক এর মধ্যে সব কাজ বেশ পিক্ আপ্ করে নিয়েছে।

অবনীবাবু বললেন আপিসের কথা বিকাশ আমাকে কিছু বলে না তবে মার সংগে যা বলে কানে আসে শুনি...আপনার নাম তো অনন্তবাবু?

অনন্তবাবু হেসে বললেন হ্যাঁ।

বিকাশ তার মাকে আপনার কাজের কথা খুব বলে শুনতে পাই!

কাজ আর কি করি যতটা পারি সাধ্য-মত চেষ্টা করি। তা ছাড়া আজকাল কাজের সে স্ট্যান্ডার্ডও নেই কদর নেই। যত দিন যাচ্ছে তত যেন কাজের মধ্যে সিরিয়সনেসটা চলে যাচ্ছে! মানে তেমন আর রিলায়েবিলিটি রেসপন্সিবিলিটি ইনটেগরিটি কিছু নেই—তাই তো বিকাশকে বলি বাজে হা-হা হো হো না করে কাজ শিখে নাও নিজের কাজ করে যাও—আজকালকার ইয়ংম্যানদের মত ফাঁকি দেবার চেষ্টা করো না তা হলে কিন্তু ফাঁকি পড়বে—

অবনীবাবু মাথা নাড়লেন মানে তাঁরও ঐ মত। যদিও আপন মত খাটাবার পক্ষে তাঁর কোন সুযোগ ঘটেনি। তিনি কোন এক বেসরকারী আপিসে কেরাণী গিরি করেন।

অনন্তবাবু বেশ উৎসাহিত হয়ে বলতে লাগলেন বিকাশকে আমি তাই বলি ওয়ার্ক ইজ ওয়ার্শিপ! কারো কথা শুনো না নিজের কাজ করে বাড়ী যাও ভবিষ্যতে যাতে ভাল হয় তার জন্যে এখন থেকে চেষ্টা করে যাও ফাঁকি দিলে ফাঁকি পড়তে হবে।

অবনীবাবু মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললেন শুনেছি আপনার কথা বিকাশের মার কাছে। আপনি ওকে খুব স্নেহ করেন—

অনন্তবাবু হেসে বললেন স্নেহ আর কি নতুন আপিসে ঢুকেছে ছেলে-ছোকরা এখন ওদের দিকে একটু নজর রাখতেই হয়! তার ওপর বুঝতেই পারেন সরকারী আপিস! এখন তো হরি ঘোষের গোয়াল! তবে বিকাশ খুব ভাল ছেলে জোর আবিডিয়েন্ট ডিলিজেন্ট—

হঠাৎ যেন খেয়াল হলো কথার মাঝখানে অনন্তবাবু জিজ্ঞেস করলেন বিকাশ আসেনি?

অবনীবাবু অন্যমনস্কের মত বললেন না।

একটু যেন উদ্বিগ্ন হয়ে অনন্তবাবু বললেন এখনো আসেনি! আপিস তো অনেকক্ষণ—

বলতে বলতে বিকাশ বাইরে থেকে ঘরে এসে ঢুকলো।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানের কথা

* লৌহ আকর সম্পর্কে
* ভারতের নিউক্লিয়র বিস্ফোরণ সম্পর্কে
* ভারতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গোপন কার্যকলাপ
* স্যার জেমস চ্যাডউইক

লৌহ আকর আমাদের কি রপ্তানী করতেই হবে?

লৌহ আকর রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করার খবর আমাদের দেশে বেশ বড়ো গলাতেই প্রচার করা হয়। এমন কি সরকারী নিউজ রীলেও এ-খবর মাঝে মাঝে এমনভাবে দেখানো হয়ে থাকে যেন ভারতের কোনো কৃতিত্বের কথা বলা হচ্ছে। প্রকৃতই তাই কিনা এ-প্রশ্ন অবশ্যই তোলা যেতে পারে।

'সায়েন্স টুডে' পত্রিকার জুন ১৯৭৪ সংখ্যায় একটি প্রবন্ধে এই প্রশ্নই তুলেছেন আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ও প্রধান ডঃ ফকরুদ্দিন আহমদ। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম : লৌহ আকর আমাদের কি রপ্তানী করতেই হবে?

*

আগে আমরা রপ্তানী করতাম পিণ্ড-লোহা আমাদের পিণ্ডলোহা ছিল বিশ্বের বাজারে সবচেয়ে শস্তা। তারপরে আরও ক্রেতা পাবার জন্য আমরা পিণ্ড-লোহার বিক্রি বন্ধ করে দিয়ে সরাসরি লৌহ আকর রপ্তানী করছি।

গত কুড়ি বছরে আমাদের দেশ থেকে লৌহ আকরের রপ্তানী ৫০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ছিল ১৯৫১ সালে ৪৩৩১৪৫ টন হয়েছে ১৯৭১-৭২ সালে ২ কোটি ৯৪ লক্ষ টন। উন্নতি হয় নি? নিশ্চয়ই যে কোনো মাপকাঠি দিয়েই বিচার করা হোক না কেন। বর্তমানে আমাদের দেশ থেকে যতো খনিজ পদার্থ রপ্তানী হয় তার ষাট শতাংশই লৌহ আকর (মোট রপ্তানীর ৭-৭ শতাংশ)। এই খবর নিয়ে উল্লাস করার আগে একটি বিষয়ে অবহিত থাকার প্রয়োজন ছিল। তা এই যে লৌহ আকরের রপ্তানী বাড়িয়ে আমরা আমাদের পিণ্ডলোহা উৎপাদন-শিল্পের সর্বনাশ ঘটিয়ে বসে আছি। রপ্তানীকৃত লৌহ আকরের যাঁরা ক্রেতা আমাদের সেই উপকারী বন্ধুরা এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছেন—(১) মহামূল্যবান লৌহ আকর লাভ (২) ভারতের পিণ্ডলোহা উৎপাদন শিল্প বিনাশ। (অর্থনীতিক ডঃ আহমদ তুলনা করেছেন ব্রিটিশ আমলে ঢাকার তাঁতীদের বুড়ো আঙুল কেটে নেওয়ার সংগে যাতে ল্যাঙ্কাশায়রের নিকৃষ্ট মানের বস্ত্র অবাধে বিক্রি হতে পারে।)

এই নিয়ে কোনো সন্দিগ্ধমনা যাতে কোনো প্রশ্ন তুলতে না পারে তার জন্যেও আঁটঘাট বেঁধে রাখা হল। তৈরি হল ফলিত অর্থনৈতিক গবেষণার জাতীয় পরিষদ। তারই আওতায় একদল বিশেষজ্ঞ মতপ্রকাশ করলেন যে ১৯৬১-৮১ সালের সময়কালে আমাদের হাতে লৌহ আকরের বাড়তি মজুদ এসে যাচ্ছে ২৩২ কোটি ৫০ লক্ষ টন অতএব আগামী ৫০ বছর ধরে প্রতি বছরে অনায়াসে ৪০ কোটি ৫০ লক্ষ টন হিসেবে লৌহ আকর রপ্তানী করে যাওয়া চলতে পারে। অদূরদর্শী এই বিশেষজ্ঞদের মত বেদবাক্যের শামিল হয়ে গেল।

*

বিশেষজ্ঞরা বাড়তি লৌহ আকরের কথা বলছেন। 'বাড়তি' বলতে কী বোঝাতে চাইছেন তাঁরা? লৌহ আকর কি পাট বা চা বা মাখনের মতো যা নিজেরা খরচ করতে না পারলে ফেলে রাখা চলে না—বছর খানেকের মধ্যে রপ্তানী করতেই হয়? রপ্তানী না করে লৌহ আকর ফেলে রাখলে লৌহ আকরে কি পচন ধরে? লৌহ আকর কি নষ্ট হয়ে যায়? লৌহ আকর কি ওষুধ বা ফটো তোলার ফিল্ম বা কাগজের মতো এমন কোনো পদার্থ যা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে খরচ করে ফেলতেই হয় নইলে সবটাই বাতিল? লৌহ আকর কি ফ্যান বা সাইকেল বা পেতলের বাসনের মতো এমন কোনো পণ্য যা আমরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন করে থাকি এবং এই অতিরিক্ত অংশ রপ্তানী না করলে আমাদের কিছু শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা?

আরো একটি কথা জানা দরকার। চল্লিশ কি পঞ্চাশ বছর আগে লৌহ আকরের সম্পদে আমরা যতোটা ধনী ছিলাম এখন আর তা নই। সে-সময়ে আমরা প্রকৃতই ধনী ছিলাম—তখনকার প্রয়োজন ও নিরীখ অনুযায়ী। বর্তমানে আমাদের দেশে মজুদ লৌহ আকরের পরিমাণ হিসাব থেকে যতোদনের জন্য যায় ১০৫০ কোটি বেশি। ইস্পাত উৎপাদনের জন্য ও আকর রপ্তানীর জন্য যে-পরিমাণ লৌহ আকর বর্তমানে আমাদের প্রয়োজন সেই হিসেব মতো চললে ১৯৮৩ সালে আমরা প্রায় দশ কোটি টন লৌহ আকর খনি থেকে তুলতে থাকব। তার মানে আমাদের মজুদ লৌহ আকর দিয়ে আর মাত্র একশো বছর চলতে পারে। এই দশ কোটি টনের মধ্যে আমরা নিজেরা ব্যবহার করব প্রায় সাড়ে-চার কোটি টন আর রপ্তানী করব প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টন। এই হিসেবের সঙ্গে আরো কিছু যোগ করা দরকার। খনি থেকে তোলার পরে লৌহ আকরের কিছুটা নষ্ট হয় কিছুটা ধুলোবালি হয়ে যায়—এ-সব হিসেবে রাখলে আসলে আমাদের খনি থেকে তুলতে হবে প্রায় ১২ কোটি টন। তার মানে খরচের বর্তমান হার বজায় থাকলে আমাদের মজুদ লৌহ আকর দিয়ে চলতে পারে আর মাত্র নব্বই বছর।

যদি ইস্পাতের উৎপাদন আমাদের বাড়াতে হয় (বাড়াতেই হবে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে ২০০০ সাল নাগাদ আমরা উৎপাদন করব ১০ কোটি টন ইস্পাত) আর সঙ্গে সঙ্গে লৌহ আকরের রপ্তানীও যদি বজায় রাখতে হয় তাহলে আমাদের মজুদ লৌহ আকর ৫০ কি ৬০ বছরের মধ্যে ফুরিয়ে যাবার সম্ভাবনা। তাহলে ২০৩০ সাল নাগাদ আমরা হয়ে পড়ব মজুদ লৌহ আকরের সম্পদে একেবারেই নিঃস্ব।

এমন কি লৌহ আকরের উৎপাদনও যদি আমরা বন্ধ করে দিই এবং ইস্পাতের উৎপাদন বাড়িয়ে চলি তাহলেও মজুদ লৌহ আকর ৬০ কি ৭০ বছরের বেশি চলতে পারে না।

এই হিসেব আমাদের মজুদ লৌহ আকর ১০৫০ কোটি টন ধরে নিয়ে। সম্ভবত মজুদের পরিমাণ আরো অনেক কম—যা ধরা হয়েছে তার প্রায় অর্ধেক। তাহলে? তাহলে লৌহ আকরের সম্পদ আমাদের হাতে থাকছে আর মাত্র ৩০ কি ৪০ বছর। আমাদের দেশে লৌহ আকরের নতুন কোনো খনির সন্ধান পাওয়া যাবে এমন সম্ভাবনা না-থাকার মতো।

অতঃপর যদি আমরা দেখি লৌহ আকর রপ্তানী করে আমরা কী দাম পাচ্ছি তাহলে বোঝা যাবে অবস্থা আরও কতখানি ভয়াবহ। ১৯৫৫ সালে আমদানীকৃত ইস্পাতের জন্য আমরা দাম দিয়েছি টনপিছু ৭৫৮ টাকা, রপ্তানীকৃত লৌহ আকরের জন্য দাম পেয়েছি টনপিছু প্রায় ৪৩ টাকা। ১৯৭১ সালে আমরা প্রথম ক্ষেত্রে দিয়েছি ২০০০ টাকা, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পেয়েছি ৫৪ টাকা। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে টাকার পরিমাণ সামান্য যেটুকু বেড়েছে তা নিতান্তই টাকার অবমূল্যায়নের ফলে। ডলারের হিসেবে দেখলে ১৯৫৫ সালে

[illegible] ১৫৫ ডলারে [illegible] ডলারে, লৌহ [illegible] ১-৩ ডলারে [illegible] ৭-১৪ ডলারে। [illegible] লৌহ আকর রপ্তানী [illegible] আরও কমেছে। অথচ [illegible] তোলার খরচ ও [illegible] বাড়ছে বই কমছে না। [illegible] চলে লৌহ আকর [illegible] আমরা প্রতিটনে কুড়ি টাকা [illegible] দিয়ে চলেছি। সংবাদচিত্রে [illegible] সঙ্গে দেখানো হয়, দশ [illegible] টন লৌহ আকর নিয়ে কোনো [illegible] জাহাজ ভারতের বন্দর থেকে রওনা [illegible] তখন একথা কখনো বলা হয় না যে [illegible] জাহাজ-ভর্তি লৌহ আকরের সঙ্গে [illegible] লক্ষ টাকার একটি তোড়াও আমরা [illegible] দিচ্ছি। এ বছর যদি আমরা [illegible] কোটি টন রপ্তানী করার [illegible] নিয়ে থাকি তাহলে মোট [illegible] পরিমাণ দাঁড়ায় পঞ্চাশ কোটি টাকা—ভারতের মোট জনসংখ্যার হিসেবে মাথাপিছু প্রায় এক টাকা।

বিশ্বের বাজারে যে-সব দেশ তেল রপ্তানী করে তাদের একটি নিজস্ব সংগঠন আছে (অর্গানাইজেশন অব পেট্রোলিয়াম একসপোর্টিং কান্ট্রিজ) সেই সংগঠনই তেলের দাম ঠিক করে দেয়। এই দামই মেনে নিতে হয় তেল আমদানীকৃত দেশগুলোকে। এমন কি কোনো বৃহৎ শক্তিও এই দামের নড়চড় করাতে পারে না। বিশ্বের বাজারে লৌহ আকর রপ্তানী করে থাকে প্রধানত চারটি দেশ—অস্ট্রেলিয়া ব্রাজিল ভারত ও লাইবেরিয়া। এই চারটি দেশ মিলিত হয়ে অনুরূপ একটি সংগঠন কি গড়ে তুলতে পারে না? তাহলে আর কিছু না হোক অন্ততপক্ষে ন্যায্য দাম পাবার একটা ব্যবস্থা হতে পারে। এমন তো নয় যে লৌহ আকরের মজুদ রয়েছে অফুরন্ত অতএব যে-দামই পাওয়া যাক না কেন ঢালাও কারবার চলুক। অস্ট্রেলিয়া ও ব্রাজিলের মজুদ প্রচুর, আফ্রিকায় হয়তো লৌহ আকরের নতুন খনি আবিস্কৃত হতে পারে—তবুও সব দেশকেই এক সময়ে অনুভব করতে হবে যে মজুদ ফুরিয়ে আসার মুখে এবং সংকট আসন্ন। সময় থাকতে আটঘাট বেঁধে দাঁড়ালে ক্ষতি কি।

তারপরেও কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়: রপ্তানীই বা করতে যাব কেন? আমরা আমাদের দেশ থেকে সেরা মানের সমস্ত ম্যাঙ্গানীজ রপ্তানী করে বসে আছি প্রচুর মাইকাও। ধনী দেশগুলো এই ম্যাঙ্গানীজ ও মাইকা আমাদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে মজুদ করে রেখেছে এবং প্রয়োজন হলে হয়তো আমাদের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করবে (হয়তো ব্যবহার করেওছে। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি তৈরী করতে মাইকা লাগে [illegible] তৈরী করতেও)।

আমাদের দেশে ইতিমধ্যে স্থাপিত কারখানাগুলোতে ইস্পাত উৎপন্ন হতে পারে বছরে ৮৯ লক্ষ টন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিকল্পনার সময়কালে এই উৎপাদনকে বাড়িয়ে তোলা হবে ৫ কোটি ৩৪ লক্ষ টনে। সেজন্য খরচ করা হবে ৮,৫০০ কোটি টাকা। ডঃ আমেদ বলছেন, ইস্পাত উৎপাদনের জন্য সব সময় পশ্চিমের অনুকরণে বড় কারখানা স্থাপন করতে হবে তার কী মানে আছে? বরাদ্দ টাকার কিছু অংশ ব্যয় করে কিছু সংখ্যক মিনি-প্ল্যান্ট স্থাপিত হোক না কেন, কামারশালা ধরনের যে উৎপাদন-পদ্ধতি আগে আমাদের দেশে ছিল? এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই এই পদ্ধতিতে উৎপন্ন ইস্পাত দিয়েই কুতুব মিনারের কাছে অশোক স্তম্ভ তৈরী হয়েছিল। অবশ্যই, চাহিদা ও অবস্থা অনুযায়ী পদ্ধতির আধুনিকীকরণও চাই। তা অনায়াসেই হতে পারে। বৈদেশী মুদ্রা যদি অর্জন করতেই হয় তা অর্জিত হোক ইস্পাত রপ্তানী করে—লৌহ আকর নয়।

ভারতের প্রথম নিউক্লিয়র বিস্ফোরণ সম্পর্কে আরো কিছু খবর

বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল রাজস্থানের মরুভূমি এলাকায়, পোখরান-এ। বিস্ফোরণের স্থান থেকে সাড়ে-চার কিলোমিটার দূরে একটি গম্বুজ খাড়া করা হয়েছিল। সেই গম্বুজের ওপরে দাঁড়িয়ে ৫৫ জন বিজ্ঞানী ও সরকারী কর্মচারী বিস্ফোরণ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তারিখটি ছিল ১৮ই মে, সময় সকাল আটটা বেজে পাঁচ মিনিট। বিস্ফোরণের পরে গম্বুজটি কেঁপে উঠেছিল আর গুম-গুম একটা আওয়াজ শোনা গিয়েছিল। দেখতে দেখতে চোখের সামনে ফাঁকা জমির ওপরে গজিয়ে উঠেছিল উঁচু এক বালির পাহাড়। তারপরে সেই বালির পাহাড় ভেঙে গিয়ে তৈরী হয়েছিল ২০ মিটার গভীর ও ২০০ মিটার চওড়া একটি গহ্বর।

এই প্রকল্প নিয়ে যখন কাজ হচ্ছিল, লিখিতভাবে বিশেষ কিছু করা হয় নি। প্রায় পুরো কাজটাই হয়েছে মুখে মুখে, প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত একজন বিজ্ঞানীর ভাষায় বেদের মতো। বিশেষ বিশেষ কাজের ভার যাঁদের ওপরে ছিল তাঁরাও জানতেন না কি প্রকল্পে তাঁরা কাজ করছেন। তবে অনেকেই অনুমান করতে পেরেছিলেন।

পোখরান-এর স্থানীয় অধিবাসীরা বলে দু বছর আগেই সরকার থেকে জায়গাটা দখল করা ও ঘিরে নেওয়া হয়েছিল। তবে ১৮ই মে তারিখের সকালের আগে কেউ-ই অনুমান করতে পারে নি কি ঘটতে চলেছে। আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল ১৯৭৩ সালের মাঝামাঝির মধ্যেই। বিস্ফোরণের ব্যবস্থাটি টুকরো টুকরোভাবে তৈরী হয়েছিল ট্রম্বের ভাবা [illegible] গবেষণা কেন্দ্রে, তারপরে বিস্ফোরণের স্থানে এনে সমন্বিত হয়েছিল।

ব্যবস্থাটি স্থাপন করা হয়েছিল ইংরেজী হরফ এল-[illegible]-এর মতো একটি গর্তের মধ্যে। এল-হরফের খাড়াই বাহুটি ছিল ১০০ মিটার গভীর আর সমান্তরাল বাহুটি ১৫ মিটার লম্বা। এই সমান্তরাল বাহুর প্রায় শেষ প্রান্তে ছিল বিস্ফোরণের ব্যবস্থা। সেখান থেকে কেবল টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সাড়ে-চার কিলোমিটার দূরের একটি নিয়ন্ত্রণ টাওয়ারে। বিস্ফোরণ ঘটাবার সুইচ টেপা হয়েছিল এই নিয়ন্ত্রণ টাওয়ার থেকে।

বিস্ফোরণের পরে তেজস্ক্রিয়তা ঘটে কিনা তা পরখ করার জন্য সর্বপ্রকার সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত ছটি দল তৈরী হয়ে অপেক্ষা করছিল। তৈরী ছিল হেলিকপ্টার, যাতে তেজস্ক্রিয় ভস্ম উত্থিত হলে তার পিছু ধাওয়া করা চলে। বিস্ফোরণের অব্যবহিত পরেই এই দলগুলো বিস্ফোরণের স্থানের ৫০০ মিটারের মধ্যে হাজির হয়েছিল। আরও ৪০ মিনিট পরে একটি দল জীপে করে চলে এসেছিল ২০০ মিটারের মধ্যে। আরেকটি দল হেলিকপ্টারে চেপে মাত্র ৩০ মিটার উঁচু দিয়ে উড়ে গিয়েছিল। কোনো দলের কাছেই তেজস্ক্রিয়তা ধরা পড়ে নি।

হিসেব করে দেখা হয়েছে বিস্ফোরণের মাত্রা ছিল ১০ কিলোটনের। ভূকম্পন-যন্ত্রে মাটির কাঁপুনির যে মাত্রা ধরা পড়েছে তাকে বলা চলে মাঝারি থেকে জোরালো। এই কম্পনে আলগা করে রাখা পদার্থ নড়ে যেতে পারে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ীতে ঝাঁকুনি লাগতে [illegible], ঘুমন্ত মানুষ জেগে উঠতে পারে, [illegible]ন্ত ঘন্টা বাজতে শুরু করতে পারে। বাস্তবে যা ঘটেছিল তাও বড়ো কম নয়। বিস্ফোরণের স্থান থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরের গ্রামেও মাটির কাঁপুনি এত জোরালো ছিল যে জন্তু-জানোয়ার ছুটোছুটি শুরু করে দেয়, বাসনপত্র নড়ে ওঠে, মাটির ছাদ কাঁপতে থাকে; আর মানুষজন ভয়ে খোলা জায়গায় আসে।

সাধারণত দেখা যায়, ভূগর্ভে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটলে মাটিতে একটু-আধটু চিড় পড়েই থাকে আর সেই চিড় দিয়ে কিছু-না-কিছু তেজস্ক্রিয়তা বাইরের বায়ুমণ্ডলে বেরিয়ে আসে। পোখরানের বিস্ফোরণের পরে বাইরের বায়ুমণ্ডলে বিন্দুমাত্র তেজস্ক্রিয়তা টের পাওয়া যায় নি। সম্ভবত পোখরানের ভূস্তরের বিশেষ গড়নের জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে। বিস্ফোরণ ঘটেছিল ১০০ মিটার গভীরে এই গভীরতার ওপরের স্তরে ছিল বালি, তার পরে ভাঙা মৃত্তিকা, তার পরে শেলট পাথর। তেজস্ক্রিয়তাকে এই যে সম্পূর্ণ আবদ্ধ রাখতে পারা, এটাই বিজ্ঞানীদের কাছে একটা যুক্তি যে পারমাণবিক বিস্ফোরণকে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বিশ্বের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে আরও উন্নতির জন্য ট্রপিক্যাল আবহাওয়ার অনুশীলন

৭২টি দেশের চার হাজারেরও অধিক বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ যোগ দিয়েছেন এই পরীক্ষাকার্যে, যার নাম—ইংরেজিতে, গ্লোবাল অ্যাটমসফিয়্যারিক রিসার্চ প্রোগ্রাম'স অ্যাটলান্টিক ট্রপিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট (সংক্ষেপে 'গেট'), বাংলায়, 'বিশ্ব আবহ গবেষণা কর্মসূচীর অ্যাটলান্টিক ট্রপিক্যাল পরীক্ষাকার্য'। পৃথিবীর আবহাওয়া খুঁটিয়ে পরীক্ষা করবার জন্য এমন বৃহৎ ও এমন জটিল পরীক্ষাকার্য আগে কখনো হয়নি। জাতিসংঘের বিশ্ব আবহ সংগঠনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই পরীক্ষাকার্য শুরু হয়েছে ১৫ জুন তারিখে, চলবে ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। উদ্দেশ্য, ট্রপিক্যাল সমুদ্র ও বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে এবং বিশ্বের আবহাওয়ার ওপরে তাদের ক্রিয়া সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ। অনুসন্ধানের এলাকা—প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব, ল্যাটিন আমেরিকা, আটলান্টিক মহাসাগর আফ্রিকা ভারত মহাসাগরের পশ্চিম। যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে ৩৮টি জাহাজ, ৬০টিরও অধিক বয়া, ১৩টি বিমান, ৬টি কৃত্রিম উপগ্রহ ও বিভিন্ন দেশে প্রায় এক হাজার পর্যবেক্ষণ স্টেশন। অনুসন্ধান চালানো হবে বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগ থেকে সমুদ্রের ১,৫০০ মিটার গভীর পর্যন্ত। আশা করা হচ্ছে পরীক্ষাকার্যের ফলাফল থেকে বিশ্বের আবহাওয়ার পূর্বাভাস আরো ভালোভাবে জানা যাবে এবং বিধ্বংসী ঝড় সৃষ্টি হওয়ার কারণ আরো ভালোভাবে বোঝা যাবে।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্বর্ধনা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রকাশিত জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক ও জীববিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণার জন্য দেশ-বিদেশে খ্যাত শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের আয়োজন হচ্ছে, এ খবরে সবাই আনন্দিত হবেন। বিগত পঞ্চাশ বছরেরও অধিক কাল ধরে শ্রীভট্টাচার্য বাংলাভাষায় বহু বিজ্ঞানের লেখা লিখেছেন ও বিশেষ করে স্কুলের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচারে বহু রকমের সহায়তা করেছেন। তাঁর বিজ্ঞানের লেখা থেকে নির্বাচিত একটি সংকলন প্রকাশের আয়োজনও হচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রচারে যাঁরা উৎসাহী, তাঁরা অবশ্যই এই সমস্ত প্রয়াসের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। সম্বর্ধনার জন্য গঠিত অভ্যর্থনা সমিতির ঠিকানা : ১৮এ গৌরীবাড়ী লেন, কলিকাতা—৪। ফোন : ৫৫-১৯৩৩।

হাওড়া বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত লোকবিজ্ঞান

এটি একটি মাসিক বিজ্ঞান পত্রিকা, জুলাই ১৯৭৪ সংখ্যাটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে (১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা)। ডবল ক্রাউন ৮ পেজী সাইজের ছয় পৃষ্ঠার এই সংখ্যাটির দাম কুড়ি পয়সা। কিছু টুকরো খবর ও ডোমজুড় সম্পর্কে ধারাবাহিক রচনা ছাড়াও আছে পাখি ও সৌর শক্তি সম্পর্কে দুটি ছোট প্রবন্ধ। আর আছে পত্রিকার প্রচ্ছদে একটি উদ্ধৃতির সাহায্যে জরুরী একটি প্রশ্নের অবতারণা : বিবাহের আগে পাত্র-পাত্রীর স্বাস্থ্য-পরীক্ষা ও বিশেষ করে রক্ত-পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা। হাওড়া বিজ্ঞান পরিষদের ঠিকানা : ২৩ শিবপুর রোড হাওড়া—২।

বিয়োগ সংবাদ : জেমস চ্যাডউইক

গত ২৫শে জুলাই তারিখে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার জেমস চ্যাডউইক প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল তিরাশী।

পরমাণু বিজ্ঞানের ইতিহাসে জেমস চ্যাডউইক এক অতিসমুজ্জ্বল নাম। ১৯৩২ সালে তিনি যে নিউট্রন আবিষ্কার করেন তারই সাহায্য নিয়ে পরবর্তীকালে পরমাণুর বিভাজন সম্ভব হয়েছে। এই আবিষ্কারের জন্য তিনি ১৯৩৫ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

জন্ম ২০ অক্টোবর ১৮৯১। শিক্ষালাভ ম্যানচেস্টার ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে, তৎসহ বার্লিনের শার্লোটেনবুর্গ ইনস্টিটিউটে এইচ গাইগার-এর অধীনে। ১৯২৩ সালে কেমব্রিজ ক্যাভেনডিশ ল্যাবরেটরীতে সহকারী গবেষণা অধ্যক্ষ। ১৯২৭ সালে রয়্যাল সোসাইটির ফেলো। ১৯৩৫ সালে লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। ১৯৪৫ সালে স্যার উপাধি। তেজস্ক্রিয়তা ও আনুষঙ্গিক সমস্যা সম্পর্কে বহু গবেষণা-নিবন্ধের লেখক। লর্ড রাদারফোর্ড ও স্যার চার্লস এলিস-এর সহযোগিতায় লিখিত গ্রন্থ : তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকীরণ (১৯৩০)।

নিউট্রন আবিষ্কার করে প্রকৃতপক্ষে তিনিই পারমাণবিক বিস্ফোরণের কাল সূচিত করেন বলা চলে। পরমাণুর অভ্যন্তরের এই কণিকাটি এতকাল ধরা পড়ে নি, যদিও বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড ১৯২০ সালে রয়্যাল সোসাইটিতে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় আভাস দিয়েছিলেন যে নিউক্লিয়সের অভ্যন্তরে আরো একটি বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ কণিকার অস্তিত্ব থেকে গিয়েছে বলে তাঁর মনে হয়। জেমস চ্যাডউইক-ই সর্বপ্রথম এই কণিকার অস্তিত্ব প্রমাণ করলেন। ১৯৩২ সালে দেখালেন, বেরিলিয়ামকে আলফা কণিকা দিয়ে ঘা মারলে যে বিকীরণ ঘটে তাতে বিদ্যুৎ-অনাবিষ্ট নিউক্লিয়র কণিকার একটি ধারা থাকে। রাদারফোর্ড এই কণিকা সম্পর্কে অনুমান করেছিলেন মাত্র, জেমস চ্যাডউইক তাকে প্রতিষ্ঠিত বাস্তব করে তুললেন। আর তার নাম দিলেন নিউট্রন।

নিউট্রন বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ অতএব বৈদ্যুতিক আকর্ষণে বা বিকর্ষণে বিচ্যুত না হয়ে সরাসরি পরমাণুর নিউক্লিয়সকে ভেদ করতে পারে। এ-কারণে নিউক্লিয়সের রূপান্তরণের জন্য নিউট্রনের মতো কণিকার (যার ভর প্রোটনের ভরের প্রায় সমান) আবিষ্কারের প্রয়োজন ছিল।

একালের এই সবচেয়ে জরুরী আবিষ্কারের কৃতিত্বে জেমস চ্যাডউইক চিরস্মরণীয় হয়ে রইলেন।

ভারতে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার গোপন কার্যকলাপ

ভারতে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার গোপন কার্যকলাপ সম্পর্কে যে বিবরণ কলকাতার ইংরেজী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, বাংলা অনুবাদে তা পাওয়া যায় নি। যাঁরা শুধু বাংলা পত্রিকা পড়েন তাঁদের কাছে এই বিবরণ অজ্ঞাত থেকে যাবার সম্ভাবনা। অথচ এই বিবরণ প্রত্যেক ভারতবাসীর জানা দরকার কেননা এই বিবরণে ভারতের ভূখণ্ডে ও জনপদে মারী-সঞ্চারক ও প্রাণ-হন্তারক নানা যুদ্ধাস্ত্র পরখ করে দেখার মার্কিনী কার্যকলাপের কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রকাশ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে বিজ্ঞানের কথায় কয়েকটি লেখায় ভিয়েতনামে রোগ ছড়াবার, গাছপালা নষ্ট করার ও জীবজন্তু ধ্বংস করার মার্কিনী তৎপরতার কিছু বিবরণ আমরা দিয়েছি। ভিয়েতনাম থেকে বিতাড়িত হবার পর আমেরিকানরা কি ভারতে ভর করল? নীচের বিবরণ পড়ে পাঠকরা নিজেরাই বিচার করুন এবং ভিয়েতনামের পর ভারত যাতে আমেরিকান যুদ্ধবাজদের পরীক্ষাভূমি না হয় এই সে জন্য যেভাবেই হোক তৎপর হয়ে উঠুন।

বিবরণে বলা হয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নামে যে-সমস্ত গবেষণামূলক প্রকল্প একান্ত গোপনভাবে ভারতে চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেগুলো সম্পর্কে

ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কোনো কোনো মহল অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।

এই সমস্ত প্রকল্পের খরচ বহন করছে অ্যামেরিকান গভর্নমেন্টের কয়েকটি এজেন্সী এবং যতদূর বোঝা যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী গবেষণার অনুকূলের প্রশ্রয়। ভারতের মার্কিন রাষ্ট্রদূতের হাতে পি-এল—৪৮০ খাতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ জমা রয়েছে সম্ভবত তা থেকেই সমস্ত খরচ নির্বাহিত হচ্ছে।

প্রকল্পগুলির সঙ্গে জড়িত রয়েছেন তিনটি পক্ষ : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মেডিক্যাল গবেষণার ভারতীয় পরিষদ কিংবা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। কিন্তু আশ্চর্যের কথা—কি উদ্দেশ্য নিয়ে পরীক্ষাকার্য চলেছে এই প্রশ্ন বা অনুরূপ অন্য কোন প্রশ্ন করলে তিন পক্ষই সম্পূর্ণ নির্বাক থাকছেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরীক্ষাকার্য চলেছে বা চালু পরে সম্পূর্ণ হয়েছে তিনটি প্রতিষ্ঠানে—নয়াদিল্লীর মশক ইউনিটের প্রজননগত নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র, বোম্বাই-এর প্রাকৃতিক ইতিহাস সমিতিতে ও যোধপুরের ম্যালেরিয়া নির্মূলীকরণ স্টেশনে। (অতঃপর এই লেখায় আমরা প্রথমটিকে শুধু কেন্দ্র বলে উল্লেখ করব, দ্বিতীয়টিকে শুধু সমিতি তৃতীয়টিকে শুধু স্টেশন)। কেন্দ্র সাধারণের নজরে আসে দু বছর আগে, যখন প্রকাশ হয়ে পড়ে যে কেন্দ্র এমন সমস্ত রাসায়নিক ছড়িয়ে গ্রামের কুয়োর জল বিষাক্ত করছে যা ক্যান্সার রোগের সহায়ক এবং যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিষিদ্ধ। তারপর থেকে এই প্রকল্পের কাজকর্মে একান্ত গোপনীয়তা রক্ষা করা হচ্ছে।

জেনিভায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দপ্তর থেকে এই ইউনিটের কাজকর্ম চালান ডাঃ রাজেন্দ্র পাল। তিনিও কোনো কথা বলতে রাজী নন। গত মে মাসে তিনি ভারতে এসেছিলেন। তখনো সংবাদপত্রের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলতে সম্মত হন নি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অধিকর্তার নাকি বারণ আছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পদস্থ কর্মচারীরাও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রকল্প সম্পর্কে কোন রকম আলোকপাত করতে সম্পূর্ণ নারাজ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরীক্ষাকার্যে প্রযুক্ত হয়ে থাকে অতিপরিশীলিত সব প্রযুক্তি ও অতিআধুনিক সব বৈজ্ঞানিক ধারণা। এমনিতে মনে হতে পারে, অনুসন্ধান চলছে মশক নিয়ন্ত্রণ বা পাখির দেশান্তর-গমন বা অনুরূপ কোন নিরীহ বিষয়ে। কিন্তু এই একই পরীক্ষাকার্য থেকে জানা যাচ্ছে ভারতে রোগ-বহনকারী জীবের অস্তিত্ব আচরণ ও বৈশিষ্ট্য।

কোন কোন বিশেষজ্ঞ মনে করেন, জৈবিক বা জীবাণু যুদ্ধ চালাতে হলে ঠিক এই তথ্যগুলোই জানা দরকার।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অন্তত একটি পরীক্ষাকার্য (পাখির দেশান্তর-গমন সম্পর্কিত, সমিতির সহায়তায়) প্রবর্তিত হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এমন একটি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা (মাইগ্রেটরি অ্যানিম্যাল প্যাথোলজিক্যাল সার্ভিস সংক্ষেপে ম্যাপস) যেটি আসলে মার্কিনী সৈন্যবাহিনীর জৈবিক যুদ্ধ চালাবার গবেষণার ডিভিশন।

কোনো কোনো বিজ্ঞানী মহল তাই সরাসরি প্রশ্ন তুলছেন—এত যে চাপাচাপি, ভারতের কোনো কাজেই লাগবে না এমন সব প্রকল্প নিয়ে এত যে মাতামাতি, তা থেকে স্পষ্টই মনে হয় ভারতকে এমন সমস্ত রাসায়নিক বা পদ্ধতির পরীক্ষাভূমি করে তোলা হচ্ছে যা প্রবর্তনকারী দেশে চালানো একেবারেই অসম্ভব ছিল। মার্কিনী প্রতিরক্ষা বিভাগ সম্প্রতি কবুল করেছে যে, ২ কোটি ১৬ লক্ষ ডলার ব্যয় করে সাত বছর ধরে গবেষণা চালাবার পরে তবেই তারা ১৯৬৮-৬৯ সালে ভিয়েতনামে মারী যুদ্ধ শুরু করেছিল।

এমন কথাও জানা গিয়েছে, ভিয়েতনামে গাছপালা বিনষ্ট করার যুদ্ধে নামার আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই বিশেষ যুদ্ধাস্ত্র পরখ করে দেখেছিল ল্যাটিন আমেরিকায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা শুধু যে সাম্প্রতিক গবেষণামূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে কিছু বলতে নারাজ তাই নয়, আগেকার কার্যকলাপ সম্পর্কেও নয়। যেমন দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা চলে ১৯৬৯ সালে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ফলিত জীবাণুতত্ত্বের বিশ্বব্যাপী ক্রিয়া সম্পর্কিত সম্মেলনের কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না।

শুধু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিন্স মেডিকেল কেন্দ্রও ভারতের কলকাতায় ও নারাঙ্গলে (পাঞ্জাব) গোটাকতক প্রকল্প নিয়ে কাজ চালাচ্ছে। ভারতের মাটিতে জন হপকিন্সের জানার বিষয় কী ছিল সে সম্পর্কে প্রশ্ন করে কারও কাছ থেকে কিছু জানা যায় নি। সকলেই নির্বাক। তবে ভারতের দেশান্তরী পাখিরা কিভাবে রোগের জীবাণু বহন করে ও ছড়িয়ে দেয় এ-বিষয়ে সম্যক জানার জন্য বোম্বাইয়ের সমিতিকে ব্যবহার করছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। আর এই গবেষণার সমস্ত খরচ বহন করছে মার্কিন সৈন্যবাহিনীর উল্লিখিত সংস্থা ম্যাপস। কেননা, এই ম্যাপস-এর ব্যাংককস্থিত দূরপ্রাচ্যের দপ্তরে ডাঃ এলিয়ট এইচ ম্যাকক্লিয়রের কাছে সরাসরি পাঠানো হয়েছে দেশান্তরী পাখির মাধ্যমে ভারতে রোগ ছড়িয়ে পড়া সম্পর্কিত গোপন রিপোর্টের চারটি কপি (নং ডবলু-এইচ-ও-পি-এ ৬৮-৬৯)। অন্যদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জনসংযোগ অফিসার এন উইলার্ড বলেছেন, এই রিপোর্টের কোনো কপি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দপ্তরে নেই।

কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়েছিল ১৯৬৯ সালে। কেন্দ্রের পুরো খরচ বহন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য সার্ভিস। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মাধ্যমে আজ পর্যন্ত খরচ করা হয়েছে তিন কোটি টাকা। পুরো টাকাটাই এমন সমস্ত পরীক্ষাকার্যে যার সঙ্গে ভারতে মশকবাহিত প্রধান দুটি রোগ ম্যালেরিয়া ও ফাইলেরিয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। তার বদলে সংগৃহীত হচ্ছে এমন এক জাতের মশকের পরিবেশগত আচরণগত ও চাল-চলনগত তথ্য যা থেকে পীতজ্বর হয়ে থাকে।

পীতজ্বরের বাহক এই বিশেষ জাতীয় মশকের ডিম শুষ্ক করা চলে। তারপরে সেই শুষ্ক ডিম একটুকরো কাগজে রেখে খামে পুরে পৃথিবীর যে-কোনো দেশে পাঠানো চলে। সেখানে সেই ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে বেরোয়। অন্য কোনো মশকের ডিম এভাবে শুষ্ক করা চলে না।

পরীক্ষা-কার্যের অন্তর্গত কাজ হিসেবে কেন্দ্র আরো একটি কাজ করেছে। পুঙ্খানুপুঙ্খ মানচিত্র তৈরি করেছে দিল্লী, ফরিদাবাদ ও সোনিপতের চারদিকের এলাকার। সোনিপতের পরীক্ষাকার্য শুরু হবার কথা ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে। সম্ভবত এই পরীক্ষাকার্যের ফলাফল থেকে এ প্রশ্নেরও জবাব পাওয়া যাবে যে কেন পীতজ্বরের জীবাণুবাহী মশকের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও ভারতে পীতজ্বর হয় না।

ভারতে পীতজ্বর না হওয়ার কারণ, বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এমন কোনো বিপরীত জীবাণুর অস্তিত্ব থাকা যা পীতজ্বরের জীবাণুকে অ-কার্যকর করে। বিশেষজ্ঞরা আশংকা করছেন কেন্দ্রের পরীক্ষাকার্যের ফলে এই বিপরীত জীবাণুর অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। তখন? তখন আর ভারতে পীতজ্বরের প্রকোপ শুরু হতে কোনো বাধা থাকার কথা নয়।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সহায়তায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মশক নিয়ন্ত্রণের আরো কয়েকটি পরীক্ষাকার্য চালাচ্ছে যোধপুরে (ভারতে ভূগর্ভের পারমাণবিক বিস্ফোরণ যেখানে ঘটেছে তার কাছাকাছি)। এই পরীক্ষাকার্যে এরোপ্লেনের সাহায্যে কীটনাশক ছড়ানো হয়। পরীক্ষাকার্য শুরু করা হয়েছিল থাইল্যাণ্ডে, শেষ করা হয়নি। তারপরে হঠাৎ অজ্ঞাত কারণে আঠারো মাস আগে শুরু করা হয় যোধপুরে, সম্ভবত পরীক্ষাকার্যের জন্য এরোপ্লেনও ব্যবহার করা হয়। অথচ এটি এমন এক এলাকা যেখানে এই পরীক্ষাকার্যের প্রয়োজন খুব জরুরি ছিল না। কেন এখানেই পরীক্ষাকার্য শুরু হয়েছিল আর কেনই বা আচমকা এখান থেকে বাঙ্গালোরে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে তার কারণ কেউ জানে না।

—অরুণকান্ত

রহস্যময় একটি দলিল

মঞ্জিল সেন

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী জেম ক্লিপেন পেশায় ছিলেন আইনজীবী আর তাঁর নেশা ছিল পৃথিবীতে যত গুপ্তধনের কাহিনী মানুষের গোচরে এসেছে তা নিয়ে গবেষণা করা। এ-বিষয়ে তিনি বিস্তর পড়াশোনা করেছেন, নথিপত্রও ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন প্রচুর। শুধু তাই নয়, বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাহিনীও তিনি লিখে গেছেন। তারই একটি হোল 'দ্য সেভেন নিডলস'—বিস্ময়কর এক কাহিনী।

বিচিত্র সব উইল ক্লিপেনকে আকর্ষণ করত এবং ওটা ছিল তাঁর দ্বিতীয় গবেষণার বস্তু। ওই সূত্রে এমন এক আশ্চর্য উইলের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন, যার রহস্য শতাব্দীর রহস্য হিসেবেই হয়ত অনুদ্ঘাটিত থেকে যাবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক আগেই ক্লিপেন কিছুকাল ম্যুনিখে ছিলেন। অনেকটা দৈবাতই হের অটো স্কালজের উইল তাঁর নজরে আসে। এই উইল স্কালজের সঙ্গে হিটলার এবং 'সেভেন নিডলস'-এর গোপন যোগাযোগের জ্বলন্ত প্রমাণ। যুদ্ধে যদি জার্মানীর পরাজয় ঘটে তবে হিটলারের প্রাণরক্ষার জন্য আবশ্যাস্য যে এক চক্রান্ত গড়ে উঠেছিল, 'সেভেন নিডলস'-এর জন্ম সেই সূত্রে। পরবর্তীকালের ঘটনা নিঃসন্দেহে এই সংস্থার অস্তিত্ব প্রমাণ করেছে।

যুদ্ধ তখন মিটে গেছে, ক্লিপেন আর তাঁর ভাই হলিউডে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। দূর দূর দেশ থেকে মাঝে মাঝে বন্ধুরা আসেন, পুরোনো দিনের কথায় তাঁরা উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন। একদিন ক্লিপেনের ভাই তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে এলেন। যুদ্ধের সময় তাঁদের পরিচয় হয়েছিল।

ভদ্রলোকের নাম ডাঃ লরেন্স ম্যাক-এলোরি।* ক্লিপেনের ভাই সে-বাহিনীতে ছিলেন, ম্যাক ছিলেন তারই একজন মেজর। যুদ্ধের শেষের দিকটা জার্মানীর এক সামরিক হাসপাতালে তাঁর কেটেছিল।

* (ক্লিপেন এই বাহিনীর ভূমিকায় বলেছেন—বিশেষ কারণে ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের আসল নাম-ধামের সামান্য অদলবদল তিনি করেছেন।)

[illegible] [illegible] নৈর্ব্যক্তিক গণ্ডগোলে ডাঃ [illegible] [illegible] পড়েছিলেন। ক্লিপেনের [illegible] [illegible] ইংল্যাণ্ডে আসতে লিখেছিলেন [illegible] [illegible] সেলে সে-বিষয়ে পরামর্শ [illegible]। ক্লিপেন তাঁকে অ্যালেকস বার্টন [illegible] একজন আন্তর্জাতিক আইন-[illegible] কাছে নিয়ে যান। ও'রা বার্টনের [illegible] পৌঁছে আরও দুজন অতিথির [illegible] পেলেন। তাঁরা হলেন মিঃ এবং [illegible] নিউম্যান রিয়ান। মিঃ রিয়ান বিচার [illegible] লোক অল্প কিছুদিন হল [illegible] হয়ে এসেছেন।

[illegible] কথায় গুপ্তধনের প্রসঙ্গও [illegible] এবং অ্যালেকস ওই বিষয়ে ক্লিপেনের [illegible] গবেষণার কথা বলতে ভুললেন না। [illegible] জানতে চাইলেন ক্লিপেন জার্মানীতে কখনও গবেষণা করেছিলেন কিনা?

ক্লিপেন মুনিখে চার বছর থাকাকালে আদালতের নথিপত্র ঘেঁটে বেশ কিছু চমকপ্রদ গল্প ও কাহিনীর মালমশলা যোগাড় করেছিলেন। তিনি উন্মাদ সম্রাট লুডউইগের কয়েকশ' হাজার ডলার মূল্যের মুকুট, যার খোঁজ আজও পাওয়া যায় নি; কোটিপতি এক ভদ্রলোক, যিনি নিখোঁজ পান্নারাগমণির খনি তাঁর স্নেহের দুলালীকে দিয়ে গিয়েছিলেন (যা আজও নিখোঁজই রয়ে গেছে) এবং সেই মানুষটি, যিনি তাঁর বিষয়-সম্পত্তি উইল করে 'সেভেন নিডলস'কে দিয়েছিলেন সে-সব কাহিনীর কথা উল্লেখ করলেন।

'সেভেন নিডলস!' ডাঃ ম্যাক বিস্ময়োক্তি করে উঠলেন।

ক্লিপেন একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলেন ওই ব্যাপারে ডাঃ ম্যাক কিছু জানেন কিনা?

"ঠিক তা নয়", ম্যাক যেন থতমত খেলেন। মানে...যুদ্ধের সময় একটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে গেল।

সেভেন নিডলস-এর ব্যাপারে? ক্লিপেন প্রশ্ন করলেন।

আমি ঠিক নিশ্চিত নই, ম্যাক জবাব দিলেন তবে যদি মিঃ এবং মিসেস রিয়ান আর মিঃ বার্টন কিছু মনে না করেন, তবে আমি পুরো ঘটনা শুনতে ইচ্ছুক। হয়ত তা থেকে একটা সূত্র আমি পেতে পারি।

কেউই অবশ্য আপত্তি করলেন না। 'সেভেন নিডলস' কথাটাই সকলের মনে কৌতূহল জাগাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

মিঃ ক্লিপেন তাঁর কাহিনী শুরু করলেন। ওই অদ্ভুত উইল যিনি করেছিলেন তাঁর নাম অটো স্কালজ—জার্মান জাতের মধ্যে অতি সাধারণ একটা নাম। ক্লিপেন প্রথম ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে মুনিখের এক আদালতে ভবনে আসল ওই উইলের সংস্পর্শে আসেন। যা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল তা হল উইলের শেষে একটা অনুচ্ছেদ। অনুবাদ করলে ওটা এই দাঁড়ায় : সব খুঁটিনাটি এবং দায়-দায়িত্ব মেটাবার পর আমার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ আমি সেভেন নিডলসকে দিয়ে গেলাম যদি কখনও তারা পিতৃভূমিতে ফিরে এসে তাদের পরিচয় নির্দ্ধিধায় প্রমাণ করে, তবেই তারা আমার সম্পত্তির মালিক হবে।

উইলের ওই অনুচ্ছেদের অদ্ভুত ধারা ক্লিপেনের মনে কৌতূহল জাগিয়েছিল। তিনি আদালতের কেরাণীকে ওটার বিষয়ে প্রশ্ন করেন কিন্তু কোন সদুত্তর পাননি। তিনি উইলের একটা ফোটো তুলে ওটা আবার যথাস্থানে রেখে দেন। (মূল কাহিনীতে ওটার ফোটোস্ট্যাট কপি ছাপা আছে)।

সেই রাতে ক্লিপেন কয়েকজন প্রভাবশালী জার্মানের সঙ্গে নৈশভোজে মিলিত হয়েছিলেন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে অটো স্কালজ এবং তাঁর বিচিত্র উইলের কথা উল্লেখ করেন কিন্তু উপস্থিত কেউই এ-বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ সেটা ক্লিপেন লক্ষ্য করলেন। নাৎসী পার্টি গড়ে তোলার পিছনে যে পাঁচজনের অসামান্য অবদান ছিল স্কালজ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ওই পাঁচজন ছিলেন পার্টির মূল সংগঠক। স্কালজের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। হিটলার ক্ষমতায় আসীন হবার পরই তিনি মুনিখের কাছে তাঁর শহরতলীর জমিদারীতে অবসর গ্রহণ করেন এবং নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে থাকেন।

একটা রহস্যের আঁচ পেয়ে ক্লিপেন ব্যাপারটা তলিয়ে দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। পরদিন তিনি আবার আদালত ভবনে হানা দিলেন, উদ্দেশ্য উইলটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবেন। ফাইলিং ক্যাবিনেটে খোঁজ করতে গিয়ে তিনি দেখলেন উইলটা অদৃশ্য হয়েছে। সেই কেরাণীকে জিজ্ঞেস করে তিনি জানতে পারলেন মৃত অটো স্কালজের শেষ উইল আদালতের হুকুমে বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। ওই দিন সকালেই নাকি আদালত স্কালজকে উন্মাদ বলে ঘোষণা করেছে। কেরাণী চুপি চুপি অনেকটা যেন উপদেশ দেবার ভঙ্গীতে বলল, ক্লিপেন তাঁর নিজের স্বার্থেই সমস্ত ব্যাপারটা যেন ভুলে যান।

এই ঘটনার সময় হল ১৯৩৭ সাল যখন নাৎসী জার্মানী ক্ষমতার শীর্ষ শিখরে। যেদিন সকালে এই ঘটনা ঘটে, তার দু' বছর আগে কিন্তু স্কালজের মৃত্যু হয়েছিল, সুতরাং দীর্ঘ চব্বিশ মাস পর ওদিন সকালেই আদালত থেকে তাঁকে উন্মাদ বলে রায় দেওয়ায় ক্লিপেনের মনে জোর সন্দেহ জাগে। তিনি মনে মনে সংকল্প করলেন 'সেভেন নিডলস'-এর রহস্য তিনি উদ্ঘাটন করবেনই সারাজীবন যদি এর পিছনে কেটে যায় তাও সই। (সারাজীবন না হলেও জীবনের অনেক বছর তিনি এই রহস্যের পেছনে ব্যয় করেছিলেন।)

মুনিখে এমন কিছু ব্যবসায়ীর সঙ্গে ক্লিপেনের বন্ধুত্ব হয়েছিল যাদের নাৎসী নেতাদের এবং ওপর মহলের সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। এই প্রসঙ্গে ক্লিপেন এক পুরোনো বনেদী পরিবারের নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁদের আসবাবপত্রের বিরাট ব্যবসা ছিল। জার্মানীর সমস্ত মালবাহী জাহাজে তাঁদের প্রতিষ্ঠান আসবাব সরবরাহ করত। তাছাড়া মুনিখে হিটলারের প্রেয়সী এফা ব্রাউনের 'প্রেমকুঞ্জ' এবং হিটলারের ব্যক্তিগত নিভৃত আবাস বের্খটেশগাডেন তাঁরা আসবাবে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। ওই পরিবারের একজনের সঙ্গে ক্লিপেনের বেশ হৃদ্যতাও হয়েছিল।

প্রথম প্রথম সেই বন্ধু অটো স্কালজের বিষয়ে কোনরকম আলোচনার মধ্যে যেতে অনীহা প্রকাশ করেছিল। কয়েক মাসের চেষ্টা এবং অনেক গ্যালন মুনিখের দামী সুরার বিনিময়ে ক্লিপেন টুকরো টুকরো খবর জোড়া দিয়ে আসল ঘটনা আঁচ করতে পেরেছিলেন। কেনই বা স্কালজ তাঁর সম্পত্তি 'সেভেন নিডলস'কে দিয়ে গিয়েছিলেন, আর কেনই বা সাত তাড়াতাড়ি তাঁকে আদালত থেকে উন্মাদ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল সেটা ক্লিপেনের কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। সংক্ষেপে ঘটনা হল এই :

১৯৩৩ সালে জার্মানীর চ্যান্সেলার হবার পর হিটলার বুঝতে পারেন যে বিশ্ব যুদ্ধ অনিবার্য। প্রকাশ্য জনসভায় এবং তাঁর বিখ্যাত বই মাইন কাম্পফেও' তিনি একথা খোলাখুলি বলেছিলেন। মনস্তত্ত্ব পন্ডিত [illegible] [illegible] শুধু জয়ের পরিকল্পনাই করেন [illegible] যুদ্ধে পরাজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে [illegible] [illegible] পরিকল্পনাও ছকে [illegible] [illegible] আডল্‌ফ্‌ [illegible] মাস্টার ক্র্যাফটস্‌ম্যান অব পাবলিক সাইকোলজি প্ল্যান্ড নট ওনলি ফর টোটাল ভিক্টরি, বাট অলসো ফর টোটাল ডিফিট)।

ধূর্ত আডল্‌ফ্‌ বাঁচতে চেয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর হাজার হাজার অন্ধ অনুরাগী ও অনুচরের ভেতর থেকে সাতজনকে বাছাই করেছিলেন। এখানেই হের স্কালজের মুখ্য ভূমিকা, কারণ হিটলার তাঁর ওপরই অসংখ্য অনুরাগী থেকে সম্ভাব্য সাতজনকে বাছাই করার ভার দিয়েছিলেন। যে সামান্য কজন লোক চূড়ান্ত নির্বাচিত সাতজনের নাম জানতেন, স্কালজ হলেন তাদের একজন। এই সাতজনকে জার্মানীর বিভিন্ন স্থানে এবং সম্ভবত জার্মানীর বাইরেও হিটলারের পরিকল্পনা সফল করার উদ্দেশ্যে বিশেষ শিক্ষার জন্য ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল।

শিক্ষা শেষে তিন বছর পর ওই সাতজনকে ফ্যুরারের সঙ্গে দেখা করার জন্য বের্খটেশগাডেনে ডাকা হয়।

সেই প্রথম ও শেষ তাঁরা এক সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। হিটলার তাঁর প্রকাণ্ড লাইব্রেরি ঘরে তাদের সঙ্গে দেখা করে ছিলেন। ঘরের একদিকে চুল্লী থেকে উৎসারিত গনগনে আগুনে সৃষ্টি হয়েছিল আরাম-দায়ক পরিবেশ। বাছা বাছা প্রহরীরা ওই সাতজনকে ঢাকা গাড়ি থেকে হিটলারের সুরক্ষিত বাসভবনের ভেতর তাড়া-হুড়ো করে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। হিটলার তাদের কাছে এসেছিলেন সাধারণ নাগরিক পোশাকে—তিনি তাদের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল করতে চেয়েছিলেন যে তিনি তাদের পিতা, তারা তাঁর সন্তান।

ওই সাতজনকে যে কি মহৎ আত্মত্যাগের জন্য বেছে নেয়া হয়েছে তা তিনি আবেগকম্পিত কন্ঠে তাদের বলেছিলেন। বলেছিলেন যে মুহূর্তে থেকে তাদের নির্বাচন করা হয়েছে এই মুহূর্তে থেকে তারা পিতৃভূমির নাগরিকত্ব হারিয়েছে। শুধু তাদের পরিচয়ই লুপ্ত হয়ে যায় নি, মা-বাবা এবং প্রিয়জনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্কচ্ছেদ ছাড়াও ভবিষ্যতে কখনও জার্মান বলে নিজেদের পরিচয় দেবার অধিকারও তাদের বর্জন করতে হবে।

নাটকীয় ভাবে একটু থেমে হিটলার দ্রুত পদক্ষেপে পৃথিবীর একটা বিরাট ভূ-গোলকের দিকে এগিয়ে গেলেন। ওটাকে জোরে ঘুরিয়ে দিয়ে তিনি বললেন হিটলারের সাতটি ছুঁচ (সেভেন নিডলস) এই পরিচয়ে ওই রাত্রে পৃথিবীর খড়ের গাদায় তারা হারিয়ে যাবে।

কেন? যদি জার্মানীকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মত আবার পদানত হতে হয়, তবে একদিন না একদিন মাথা তোলবার জন্য রাইখকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। কারণ হিটলার যত দিন বেঁচে থাকবেন তত দিন জার্মানী তাদের পিতৃভূমি এবং নাৎসী দর্শনের মৃত্যু নেই। তাই সেভেন নিডলসের ওপর মহান হিটলার এবং গোটা জার্মান জাতির জীবন রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব ন্যস্ত করা হল। বিপর্যয় যদি ঘটেই, তবে তিনি তাদের যে কোন একজনের কাছে চলে যাবেন এবং সেখান থেকে গোপন প্রস্তুতি গড়ে চরম জয়ের জন্য আবার আঘাত হানবেন। সাতজনের কে পৃথিবীর কোথায় ছড়িয়ে পড়বে তা হিটলারই ঠিক করেছিলেন এবং সেই গোপন তথ্য তাঁর স্মৃতির মণি-কোঠায় কুলুপ দিয়ে রেখেছিলেন। তিনি ছাড়া আর কেউই এমন কি ওই সাতজনের একজন অপরের প্রতি নির্দেশের সামান্যতম ইঙ্গিত পায়নি।

এই হল ক্লিপেন তাঁর নীরব শ্রোতাদের সম্বোধন করে বললেন, সেভেন নিডলসের কাহিনী। অবশ্য আমার বিশ্বাস স্কাজেন্সের উইল কোন কাজেই লাগে নি কারণ আমরা সবাই জানি হিটলার এবং এভা ব্রাউনকে বার্লিনে তাঁদের বুঙ্কারের (বিমান আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য ভূ-গর্ভস্থ আশ্রয় কুঠুরী) সামনে দাহ করা হয়েছিল।'

অত নিশ্চিন্ত হবেন না বিচার বিভাগের ভদ্রলোক রিয়ান বলে উঠলেন, হিটলারের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল তা মনে না করার যথেষ্ট কারণ আছে।'

একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর মুখে ওই মন্তব্য শুনে সবাই চমকে উঠলেন।

আমি হিটলারের ওই তথাকথিত মৃত্যুর ব্যাপারটা খতিয়ে দেখেছি' রিয়ান বলে চললেন, ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ এবং আমেরিকান ইনটালিজেন্স ইউনিট এ ব্যাপারে এক সঙ্গে কাজ করেছিল। তাদের সঙ্গে যুক্ত থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। একটু থেমে রিয়ান বললেন ইউনিটের সবাই এক মত হয়েছিলেন বাংকারের বাইরে যে দুটো দেহের ভস্মাবশেষ পাওয়া গিয়েছিল তা হিটলার কিংবা এভার নাও হতে পারে।

তাঁর বক্তব্য শুনে শ্রোতাদের মনে যে বিচিত্র অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল, তা উপলব্ধি করে রিয়ান মৃদু হেসে বললেন, জার্মানরা আমাদের বলেছিল হিটলার এবং এভার মৃতদেহ বুঙ্কারের কুঠুরী থেকে বাইরে বয়ে আনা হয়েছিল। চল্লিশ লিটার গ্যাসোলিন ওই দেহ দুটোর ওপর ঢেলে আগুন লাগানো হয়। আগুন যখন নিভেছিল, হিটলার আর এভার ভস্মাবশেষ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সনাক্তকরণ? জার্মানরা বারবার বলেছিল, সনাক্ত করার মত সবকিছু চিহ্ন সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। তবে একটা কথা আমার মুখে শুনুন। সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের ক্যাপটেন ফিলিপ মার্লো পুরো ঘটনা সাজানো বলে সন্দেহ করেছিল। একজন বিকারগ্রস্ত সৈনিকের মুখ থেকেই 'সেভেন নিডলস'-এর ব্যাপারটা প্রথম সে জানতে পারে, আর সেই সূত্র ধরে তদন্ত শুরু করে। মার্লো হিটলারের ওজনের একটা শূকরকে ঠিক যেখানে হিটলারকে দাহ করা হয়েছিল, সেখানে রেখে চল্লিশ লিটার গ্যাসোলিনে চুবিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। আগুন নেভার পর শূকরটার দেহাবশেষ কিন্তু কিছু ছিল সম্পূর্ণ ভস্ম হয়ে যায়নি।

ক্যাপটেন মার্লো এই যুক্তি দেখিয়েছিল যে, বুঙ্কারের ভেতর হের গোয়েবলস এবং তাঁর পরিবারের শায়িত মৃতদেহের বেশ কয়েকটা ছবি জার্মানদের কাছে পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু হিটলার ও এভার মৃতদেহের একটি ছবিও তারা প্রমাণ হিসেবে দাখিল করতে পারেনি। ওখানে সেই সময় কেউ না কেউ ফোটোগ্রাফার ছিল। জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি তোলার সুযোগ সে হেলায় হারাবে এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

আরও কিছু খুঁটিনাটি তথ্য মার্লো সংগ্রহ করেছিল, যেমন একটা দাহকার্যে একজন মানুষের দেহ দাহ করতে যে তাপের প্রয়োজন তা হল, ৩২০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট এবং তা সত্ত্বেও হাড়ের কাঠামোর এমন নিদর্শন বা চিহ্ন থেকে যায় যা থেকে সনাক্তকরণ অসম্ভব নয়।

একদিন হয়ত মার্লোর পুরো কাহিনী আমাদের কালের অন্যতম কাহিনী বলে বিবেচিত হবে। না, রিয়ান তাঁর বক্তব্য শেষ করে বললেন আমারও ধারণা গোটা দুনিয়ার মানুষকে যেমন বোঝানো হয়েছে, সেভাবে হিটলারের মৃত্যু হয়নি। সেভেন নিডলসের যে-কাহিনী মিঃ ক্লিপেন আমাদের শোনালেন, তারপর আমার সন্দেহ আরও ঘনীভূত হল। তারপরই তিনি ম্যাকের দিকে ফিরে বললেন, ডাঃ ম্যাকএলোরি, আমার কৌতূহল ক্ষমা করবেন, সেভেন নিডলসের নাম শুনে আপনি অমন চমকে উঠেছিলেন কেন?

ডাঃ ম্যাকএলোরির কপালে কুঞ্চন দেখা দিল। পাইপ ধরিয়ে, সামান্য ইতস্তত করে তিনি বললেন, 'সেভেন নিডলস' এই কথাটা জার্মানীর এক হাসপাতালে এক জি, আইয়ের মুখে আমি প্রথম শুনেছিলাম (জি-আই কথাটার বাংলা সঠিক প্রতিশব্দ কি জানি না, তবে আমেরিকার সামরিক আইনে সরকার থেকে যাদের সেনাবাহিনীর জন্য তালিকাভুক্ত করা হয় তাদেরই জি আই বলে)। যুদ্ধে অতিরিক্ত পরিশ্রমে খুব খারাপ অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। মজার ব্যাপার হল চিকিৎসা চলাকালে এক সময় সে শুধু খাঁটি জার্মান ভাষায় কথা বলেছিল। (মনে রাখতে হবে আমেরিকান নাগরিক ছাড়া আর কাউকে 'জি আই' করার এক্তিয়ার মার্কিন সরকারের নেই)।

'যুদ্ধের সময়' ডাঃ ম্যাক বলে চললেন আহতদের তাড়াতাড়ি সক্ষম করে তোলার জন্য আমরা চিকিৎসা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে সংক্ষেপে কাজ সারতাম। যুদ্ধে অতিরিক্ত পরিশ্রমে যাদের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ত আগে তাদের চিকিৎসার পদ্ধতি ছিল দীর্ঘমেয়াদী এবং বিরক্তিকর।

আমরা কিছু বিশেষ ধরনের উত্তেজক ওষুধের উপাদান দিয়ে চিকিৎসা করে আশাতীত ফল পেয়েছিলাম। ওই ওষুধের প্রভাবে একজন রোগীর মানসিক চিন্তা-ধারাকে পেছিয়ে এনে নিদারুণ যে অভিজ্ঞতা তার শরীর ও মনের ওপর বিরাট চাপ সৃষ্টি করে তাকে পীড়িত করে তুলেছিল ধাপে ধাপে তার ভেতর দিয়ে আবার তাকে নিয়ে মানসিক সহ্য শক্তির আয়ত্তায় এনে তাকে চাঙ্গা করে তুলতে সাহায্য করছিল। এক কথায় বলা যায় ওই ওষুধ অনেকটা সম্মোহক শক্তির কাজ করছিল যার প্রভাবে নির্ভেজাল সত্যকে শরীর ও মনের সংগে সহনীয় করে তুলে একটা অভিনব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রোগীর শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ লাঘব করার চেষ্টা চলছিল। বলতে বাধা নেই এই প্রচেষ্টায় আমরা আংশিক সফলও হয়েছিলাম।

'আলামেনের পতন ঘটবার পর পরই এ ধরনের একজন রোগীর চিকিৎসায় আমার ডাক পড়েছিল। ওটা আমার কেস ছিল না তাই যা ঘটেছিল তার জন্য আমি পুরোপুরি প্রস্তুত ছিলাম না। ওই সৈনিকটিকে সোডিয়াম পেনটাথল ইঞ্জেকশান দেবার পর যথারীতি একশ' থেকে পিছন দিকে অর্থাৎ নিরানব্বুই আটানব্বুই এভাবে গুনে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়। এ-সব ক্ষেত্রে রোগী যখন থেমে পড়ে আর পিছন দিকে গুণতে পারে না তখন তার মস্তিষ্কের অধিকতর মিবৃত্ত কোষ ঘুমন্ত অবস্থায় আছে বলে ধরে নেয়া হয়। তখনই তার অবচেতন মনের সংগে সরাসরি যোগাযোগ সম্ভব হয়ে ওঠে।

'এবার কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। সৈনিকটির কণ্ঠস্বর যখন ক্ষীণ হয়ে আসছিল ডাক্তার তাকে প্রশ্ন শুরু করলেন। কিন্তু ডাক্তারকে স্তম্ভিত করে সৈনিকটি খাঁটি জার্মান ভাষায় কথা বলতে শুরু করল। আমাকে এবং ক্যাপটেন মার্লোকে তাই তাড়াতাড়ি এত্তালা দেয়া হয়েছিল কারণ জার্মান ভাষায় আমরা দুজনেই রপ্ত ছিলাম।

'আমরা ওখানে পেঁছে দেখলাম সৈনিকটি উন্মাদের মত অসংলগ্ন কথা বলছে; মার্লো তাড়াতাড়ি তার সেই প্রলাপ খাতায় টুকে নিতে লাগল।

'সৈনিকটি যা বলেছিল তার সারমর্ম হল সেভেন নিডলসয়ের সে একজন। অটো স্কোলজের নামও সে উল্লেখ করেছিল। যুদ্ধের আগে মুানিখে তার জীবনের কিছু কিছু ঘটনার কথাও সে বলেছিল। একটা বদ্ধ ধারণা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল তা হল যেমন করেই হোক তাকে যুদ্ধের জীবন থেকে বেরিয়ে এসে নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানে ফ্যুরারের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। যতদিন সে বেঁচে থাকবে এবং তার প্রিয় নেতার রক্ষণাবেক্ষণের মহান দায়িত্ব বহন করবে ততদিন ফ্যুয়ারের মৃত্যু নেই।

'আমরা অবশ্য ওর কথায় তেমন মূল্য দিই নি কারণ ও বিকারের ঘোরে ভুগছিল। মার্লো লোকটির রেকর্ড পরীক্ষা করে দেখল লেখা আছে ইংরেজী ছাড়া অন্য কোন ভাষা সে জানে না। তার জন্মস্থান হল আমেরিকার কানসাসে আর নাম ওনীল—স্কচ পিতা এবং আইরিশ মাতার সে সন্তান। (ক্লিপেন স্পষ্ট করে না বললেও সৈনিকটির পরিচয় যে ভুয়ো তা ধরে নেয়া যেতে পারে)।

'তাকে হাসপাতালের সাইকোপ্যাথিক ওয়ার্ডে পর্যবেক্ষণের জন্য রাখা হল। আমি তার কথায় তেমন গুরুত্ব দিই নি তাই ওই ঘটনা ভুলে যেতে আমার দেরী হয় নি। কিন্তু মার্লো ভুলল না। তার মনে সৈনিকটির উন্মত্ত প্রলাপ গভীর রেখাপাত করেছিল তাই আমাদের মত হালকাভাবে, ব্যাপারটা সে নেয় নি। দু' সপ্তাহ পর ওই সৈনিককে দেখতে যাবার সময় আমাকেও তার সংগী হতে সে বলল।'

ডাঃ ম্যাক নিভে যাওয়া পাইপটা আবার ধরিয়ে কয়েক মুহূর্ত চিন্তায় ডুবে গেলেন। শ্রোতারা অধৈর্যভাবে তাঁর পরের কথাগুলোর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

'আপনি না গিয়ে খুব ভুল করেছিলেন' ক্লিপেন আর থাকতে না পেরে বলে উঠলেন। 'আমি ভেবেছিলাম আপনি হয়ত এ-ব্যাপারে আগ্রহী হবেন।'

'আমি গিয়েছিলাম' ডাক্তার জবাব দিলেন 'আমার আগ্রহ হয়েছিল বৈ কি, কিন্তু সৈনিকটির সংগে আর আমাদের দেখা হয় নি।' তিনি মিঃ রিয়ানের দিকে তাকিয়ে বললেন 'বিছানার চাদর পাকিয়ে সে জানালা দিয়ে ঝুলে পালাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু মানসিক ভারসাম্য ঠিক রাখতে না পারায় চারতলা থেকে পড়ে ঘাড় ভেংগে সে মারা যায়।'

'আশ্চর্য'!' রিয়ান বিস্ময়োক্তি করলেন। 'আপনি ওই ঘটনার সূত্র ধরে আর এগোন নি কিম্বা মার্লোর সংগে যোগাযোগের চেষ্টা করেন নি?'

'না ও ব্যাপারে আমি আর এগুইনি তবে মার্লোর সংগে ঘটনাচক্রে আমার দেখা হয়েছিল। যুদ্ধের পর দেশে ফেরার জন্য লিভারপুল বন্দরে আমি জাহাজের অপেক্ষা করছিলাম। লন্ডনের শহরতলীর এক জায়গা থেকে আমার বাপ ঠাকুর্দা ভাগ্যের অন্বেষণে আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছিলেন। আমি সেই সুযোগে আমার পিতৃপুরুষের ভিটে দেখতে গিয়েছিলাম। যে হোটেলে আমি ছিলাম সেখানেই মার্লোর সংগে আমার দেখা। তাকে চেনা অবশ্য খুব সহজ ছিল না। ঢ্যাংগা বিশৃংখল চেহারার একটি লোককে আমি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বারের দিকে এগিয়ে যেতে দেখি। তার বাঁ চোখ একটা কালো ঠুলিতে ঢাকা ছিল। যাহোক চেনার পর আমরা এক টেবিলে বসে পুরনো দিনের কথায় মেতে উঠলাম। তার মুখেই শুনলাম বছর খানেক হল সে সরকারী কাজ থেকে অবসর নিয়েছে। ব্যক্তিগত একটা কারণেই নাকি সে চাকরির মেয়াদ ফুরোবার আগেই অবসর প্রার্থনা করেছিল।'

'আপনার ব্যক্তিগত কারণটা নিশ্চয়ই খুব সহজ ছিল না' আমি তাকে ভাল মত জানতাম বলেই ওই প্রশ্ন করেছিলাম।

'মার্লোর ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসি একটু কঠিনই বলা চলে ফুটে উঠল। 'আপনি ঠিকই ধরেছেন। এখন পর্যন্ত সেই ব্যাপারে একটা চোখ আমি হারিয়েছি। কাজ শেষ হবার আগে প্রাণটাও হারাব বলে অপেক্ষা করছি।'

'মার্লো আমাকে বলেছিল গোয়েন্দা বাহিনীর মধ্যে একমাত্র সে-ই ওনীলের প্রলাপকে গুরুত্ব দিয়েছিল। ওই সূত্র ধরে সে স্পেন তেল আভিভ এবং সাহারা মরুভূমি পর্যন্ত অতিক্রম করেছে। সম্প্রতি তিব্বত থেকে ফিরে এসেছে। প্রত্যেক জায়গায় বিপদ তার জন্য অপেক্ষা করছিল ব্যক্তিগত বিপদ তার জীবনের ওপর আক্রমণ।

'আমি তাঁর দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়েছিলাম। 'জেক' মার্লো বলেছিল 'আপনিও অন্যদের মত হয়ত আমাকে পাগল ভাববেন। মাসের পর মাস আমি অবিশ্বাস্য সব কাহিনীর পিছন পিছন তাড়া করে বেরিয়েছি। আপনি তো ঘটনার সংগে গোড়া থেকেই জড়িত তাই আপনাকে বলতে বাধা নেই হাসপাতালে ওনীলের ব্যাপারটা নিয়েই ঘটনার সূত্রপাত। আজ পর্যন্ত প্রায় গোটা পৃথিবীটা আমি চষে বেরিয়েছি কিন্তু সমাপ্তির ধারে কাছেও পেঁছুতে পারি নি। আপনাকে আমি খুব গোপনে বলছি—আমি হিটলারকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

'আমি না হাসবার চেষ্টা করলাম। মার্লো কি ভেবে চিন্তে কথা বলছে না। যুদ্ধের ভয়াবহ সব ঘটনায় স্নায়বিক পীড়ায় ভুগছে?

'মাত্র গত মাসে' মার্লোর কণ্ঠস্বর থেকে যেন তিক্ততা ঝরে পড়ল 'গোয়েন্দা বিভাগকে আমি বিশ্বাস করাতে পেরেছি যে হিটলার বেঁচে আছে আর তা প্রমাণ করার জন্য আমাকে একটা আস্ত শুকর পোড়াতে হয়েছে।'

'আমি ততক্ষণে ভাবতে শুরু করেছি মার্লোর মানসিক উত্তেজনা লাঘব করার জন্য আমি একটা ওষুধ লিখে দেব কিনা।

'বিশ্বাস করুন' টেবিলে এক ঘুঁসি মেরে মার্লো বলে উঠল...'ও'নীল যা বলেছিল তার একবর্ণও মিথ্যে নয় সেভেন নিডলসয়ের অস্তিত্ব ছিল...ছিল কি আজও আছে। মনে করে দেখুন আপনিও শুনেছিলেন। তাদের মধ্যে চারজনের সন্ধান পাওয়া গেছে।'

'মার্লো হঠাৎ থেমে আমার জামার আস্তিন মৃদু আকর্ষণ করে বলল 'আমি এতক্ষণ যা বললাম ভুলে যান। স্টেট ডিপার্টমেন্ট ধরে নিয়েছে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে ফলে বিদেশে যাবার ছাড়পত্র পেতে আমাকে এখন যথেষ্ট দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। ওরা বলছে যে সব জায়গায় আমি যাচ্ছি শেষ পর্যন্ত তার কোনও একখানে আমি বিদ্রোহ ঘটিয়ে ছাড়ব।'

'আমি ব্যাপারটা গোপন রাখব' আমি তাকে আশ্বস্ত করে বললাম। 'হিটলার হচ্ছে ডিনেমাইটের মত যদি সে বেঁচে থাকে তবে একটা বিধ্বংসী কান্ড ঘটাবেই। আমি আশা করব যে আপনি তাকে খুঁজে বার করতে পারবেন।'

'আঃ!' মার্লো বলল 'আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব খুশী হলাম ডক্। আমি দক্ষিণ আমেরিকায় যাচ্ছি তারপর নিউ-ইয়র্ক। যদি বেঁচে থাকি তবে আপনার সঙ্গে আবার দেখা করব। কারু সঙ্গে দু-দন্ড মন খুলে কথা বলতে পেরে খুব আনন্দ হল।'

'করমর্দন করার সময় আমি তার সৌভাগ্য কামনা' করলাম। তারপর সে লেংচিয়ে লেংচিয়ে চলে গেল। সেই শেষবার তাকে আমি দেখেছিলাম। নিউইয়র্কে সে পৌঁছেছিল কিনা তা আমার জানা নেই।'

ডাঃ ম্যাক চুপ করলেন।

মিঃ রিয়ান বলে উঠলেন 'ডক্ আমার কাছ থেকে শুনে রাখুন মার্লো ঠিক পথেই চলেছিল। আপনাকে সে কাহিনীর বাকি অর্ধেকটা বলে নি। স্টেট ডিপার্টমেন্টের আদেশে বিচার বিভাগ তার গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রেখেছিল। সে এত তাড়াতাড়ি এদেশ ওদেশ করছিল যে মাঝখানের কিছু ঘটনা অস্পষ্ট থেকে গেছে। কিন্তু একটা কথা আপনাদের আমি বলতে পারি : মার্লো নিঃসন্দেহে আমাদের বড় কর্তাদের কাছে এই তথ্য প্রমাণ করেছিল যে জার্মানরা দগ্ধ দেহাবশেষ দুটি সম্বন্ধে যে বিশ্বাস সৃষ্টি করতে চেয়েছিল তা ঠিক নয়। আমরা জানি মার্লো সেভেন নিডলসয়ের অস্তিত্ব ও সত্যতা সম্বন্ধে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনুসন্ধান চালিয়েছিল। অটো স্কোরজেনির ঘটনালিপি পরীক্ষা করে বের্খটেশগাডেনে ওই সাতজনের মিলিত হবার ঘটনা সম্বন্ধে সে নিঃসংশয় হয়েছিল। সেই রাত্রে যারা বিমানে জার্মানী ছেড়েছিল তাদের নামও সে খুঁজে বার করেছিল—মনে রাখবেন ওই রাত্রেই হিটলার তাঁর সাতজন অনুচরকে পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছিল। মার্লোর বিশ্বাস আডলফের সন্ধান সে খুঁজে বার করতে পারবে।

হিটলার মারা যায় নি একথা বিশ্বাস করলেও সরকারীভাবে প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা সেটা নিছক অনুমান ছাড়া আর কিছু বলে মেনে নিতে পারি না। তাই মার্লোকে বে-সরকারীভাবে সব কিছু করতে হচ্ছে।'

রিয়ান ম্যাকএলোরির মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন মার্লো নিউইয়র্কে এসেছিল ডক্। গত বছর বড়দিন উৎসবের ঠিক আগে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। বেচারীর বউ ওই সময় মারা যায়। জার্মানীতে কর্মরত অবস্থায় সেনা বিভাগের এক পরমাসুন্দরী সেবিকাকে সে বিয়ে করেছিল। পৃথিবী জুড়ে মার্লোর এই অভিযানে তার স্ত্রীও অংশ নিয়েছিল। দক্ষিণ আমেরিকার বোগোটায় (কলাম্বিয়া) বিদ্রোহের সময় তারা সেখানে উপস্থিত ছিল। মার্লোর নিশ্চিত বিশ্বাস ওই সংঘর্ষ আসলে হিটলারকে ওখান থেকে সরিয়ে নেবার জন্য একটা ধূম্রজাল ছাড়া আর কিছু নয়। বিদ্রোহীরা যখন শহরে আগুন দিচ্ছিল সেই ফাঁকে হিটলার একটা বিমানে সরে পড়ে।

পরে ওর মুখেই শুনেছিলাম আলপস পাহাড়ে মিসেস মার্লো কেমন করে তার স্বামীর প্রাণ বাঁচিয়েছিল। পাহাড়ী দুর্গম এলাকার একটি গাঁয়ে 'সাত ছুঁচে'র একজনের আস্তানা এই খবর পেয়ে সেখানে যাবার জন্য ওরা একজন পথপ্রদর্শকের সাহায্য নিয়েছিল। তুষারস্তূপের ফাটলের মাঝখান দিয়ে দুর্গম ঝোলানো পথ ধরে তারা যখন এগুচ্ছিল তখন তুষার পড়তে শুরু করেছে। তাদের গাইড হঠাৎ ঝুলন্ত দড়ি কেটে দেয়। মার্লো আঙুলের ডগা দিয়ে কোনমতে একটা পাথর আঁকড়ে ধরেছিল আর তার স্ত্রী নীচে শূন্যে ঝুলছিল। মার্লোর স্ত্রী লক্ষ্য করল স্বামীর আঙুল হড়কে যাচ্ছে। তখুনি সে চীৎকার করে স্বামীকে শেষ বিদায় জানিয়ে ছুরি দিয়ে দড়ি কেটে নিজেকে আলগা করে ফেলল। হাজার ফুট নীচে গভীর খাদে তার দেহ আছড়ে পড়ল। নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে স্বামীর প্রাণ সে রক্ষা করে গেল। মার্লো কোনরকমে শরীরকে টেনে হিঁচড়ে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে ওই গাইডের পিছু নিয়েছিল। ভাগ্য তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। কিছু দূরে সে তাকে দেখতে পেয়ে গুলি করে। গুলি ঠিক লক্ষ্যভেদ করেছিল। মৃতদেহের কাছে পৌঁছে সে দেখতে পায় মরবার আগে সেই গাইড তুষারের ওপর একটা স্বস্তিকা চিহ্ন (নাৎসী জার্মানীর প্রতীক চিহ্ন) এঁকেছে।

'তুষার-ঝড়ায় পথ হারিয়ে মার্লো সাহায্যের জন্য আর্ত চীৎকার করতে করতে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। জনা কয়েক পাহাড়ী ভাগ্যক্রমে ওই সময় ওখান দিয়ে যাচ্ছিল। তারা চীৎকার শুনে ছুটে আসে। তাকে উদ্ধার করে গ্রামে নিয়ে যায়। কয়েকদিন পর সে জানতে পারে এবারও তার অভিযান ব্যর্থ হয়েছে, পাখি উড়ে গেছে।

মার্লো এখন কোথায় তা আমরা জানি না। মাস চারেক আগে আমাদের কাছে একটা উড়ো খবর এসেছিল। তাকে নাকি বলিভিয়ার জঙ্গলে দেখা গেছে। ওই দুর্গম অঞ্চল থেকে খুব কম শাদা চামড়ার লোকই ফিরে আসতে পেরেছে। হয়তো মার্লো ওখানকার উষ্ণ আবহাওয়া, সংক্রামক রোগ কিংবা আদিবাসীদের রোগ-গান এড়িয়ে প্রাণে বাঁচবে আর আমরাও একদিন খবরের কাগজে বড় বড় শিরোনামায় হিটলারের ধরা পড়ার অথবা মৃত্যুর খবর পড়ব। যদি তাই হয় তবে সংগ্রামী মার্লোকে নিশ্চয়ই ধন্যবাদ দেব আমরা। সে জানে হিটলার কোথাও না কোথাও আত্মগোপন করে সুযোগের অপেক্ষায় আছে।'

মিঃ রিয়ানের চমকপ্রদ বক্তব্যে উপস্থিত সবাই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যান। একটাই প্রশ্ন তাঁদের মনে উঁকি মারে—তবে কি হিটলার আজও বেঁচে আছেন! তাঁর মৃত্যুর ঘটনা কি একটা সাজানো ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়।

হিপি মনোভাব

অল্প কয়েক বছর আগে বিচিত্র সাজের পার্টী কয়েক তরুণ-তরুণী সারা কলকাতা ব্যস্ত করে তুলল। এদেশের বেশ কিছু তরুণ-তরুণীও সেই বিচিত্র সাজের, বিচিত্র মনোভাবের ভক্ত হয়ে পড়লেন। দেখতে দেখতে জোয়ারের জল নদী-নালা টপকে খাল খন্দেও ঢুকে পড়ল। বৃদ্ধেরা ভ্রূ কোঁচকালেন, প্রৌঢ়েরা আমতা আমতা করলেন আর কিশোর-কিশোরীরা বেশ একটা মজায় মেতে উঠল।

পিঠ বরাবর লম্বা রুখু চুল, প্রায় চিবুক পর্যন্ত লম্বা জুলপি, ছিটের কটকটে রঙের জামা, পায়ের সঙ্গে লেপটে থাকা ট্রাউজার—এ চেহারা দেখতে এখন সবার চোখই রপ্ত হয়ে গেছে।

তরুণীদেরও প্রায় তাই। শাড়ি বাতিল হয়ে বেলবটম, ব্লাউজের কাপড় ছোট করে আনার প্রতিযোগিতা। হাবেভাবে বেপরোয়া, পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে অতি আধুনিক হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা।

এ নিয়ে দু চারটে মন্তব্যও যে ঠিকরে পড়ে না, তা নয়। কেউ বলেন, 'এসব স্রেফ ভান, মজা লোটার ভেক।' কেউ বলেন, 'যাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রুটি রোজগার করতে হয় না, তাদের বহুরূপী সেজে নেচে বেড়ানো সাজে।'

কিন্তু যে বয়সে বেপরোয়া হতে মন চায় ঠিক সেই বয়সের এক তরুণ তো সেদিন একরাশ লোকের মধ্যে হিপিদের নিয়ে রীতিমত বক্তৃতাই দিয়ে ফেললেন: 'আরে মশাই হিপিরা যে এদেশে এসেছে তারও তো একটা কারণ আছে। ওদেশে প্রাচুর্যের তো কমতি নেই। তাহলে সুখ-আয়েস জলাঞ্জলি দিয়ে সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীর জীবন কেউ শখ করে গ্রহণ করে? একটা আদর্শ আছে। লড়াইটা আদর্শের জন্যে। ভোগের তৃষ্ণায় কাঁটা দিয়ে ত্যাগের আদর্শকে মেনে নেওয়ার সমর্থন সকলেরই করা উচিত।'

হাওড়ার একটি নামকরা গার্লস স্কুলের একাদশ শ্রেণীর একজন ছাত্রীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। জানতে চাইলাম, 'আজকালকার তরুণ-তরুণীদের হিপি মনোভাব, বেশ-ভূষা আপনার কেমন লাগে?'

বললেন, 'আমি তো রীতিমত সমর্থন করি। ধেরাটোপে থেকে থেকে আমাদের মনগুলো প্যাঁচোয়া হয়ে যাচ্ছে। জীবনটাকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যা খুশি তাই করবার মানসিকতায় আমি বিশ্বাসী। কি পোষাকে, কি আচার-আচরণে পুরনো রীতিনীতির বিরুদ্ধে ঝড় তোলা দরকার। বস্তাপচা সংস্কারের নামাবলী গায়ে জড়িয়ে ডুবে ডুবে জল খাওয়ার আদর্শের প্রতি কোন সমর্থন আমার নেই। কী লাভ, কীসের আশায় মান্ধাতার আমলের সংস্কারকে মেনে নেব?'

অনর্গল কথা বলে যেতে লাগলেন ছাত্রীটি। মনে হল বহুদিনের চাপা ক্ষোভ যেন হঠাৎ পাড় ভেঙে আছড়ে পড়ল।

গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের ছাত্র সব্যসাচী ঘোষ থাকেন লোয়ার চিৎপুর রোডে। রঙ যদি কালো না হত তা হলে তাকে বাঙালী বলে ভাবাই ছিল দুষ্কর। ঘাড় অবধি চুল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। একমুখ দাড়ি। ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট। পরনে বেলবটম প্যান্ট—পেটের সামান্য ওপরে দু-পাশে দুটি পকেট—একটাতে চিরুনি দৃশ্যমান, অন্যটি ফুলে আছে সম্ভবত সিগারেটের প্যাকেট ও কাগজপত্রে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার পোশাকের দিকে তাকিয়ে মনে হয় আপনি আধুনিকতায় বিশ্বাসী। তবে যদি কারো অতি-আধুনিকতা মনে হয় আপনার কিছু বলার আছে?' বোধ-হয় একটু ক্ষুণ্ণই হলেন সব্যসাচী ঘোষ। বললেন, "অতি-আধুনিকতা আবার কী? আমি কি পোশাক পরব তা অ্যাবসলিউটলি আমার ব্যাপার।'

'তবু তো দেশ-পরিবেশের একটা ব্যাপার আছে সব্যসাচীবাবু?'

মিহির মন্ডল

শিপ্রা মল্লিক

'দেশ, পরিবেশ কাল ওসব ভুয়ো কথায় কান দিলে চলবে না। আমি চলব আমার ভাবনায়।'

খেই পেয়ে প্রশ্ন করলাম, 'আপনি কি ভাবেন একটু বলবেন?'

'দেখুন স্যার, বড় বড় চুল রাখলে বা বেলবটম পরলেই জাতীয়তা চলে যায় না। আর এটা অপসংস্কৃতিও নয়। আমি একটা ইজম্-এর জন্যে লড়াই করছি।'

'কি রকম?'

একটু থেমে সব্যসাচী বললেন, 'নিজস্ব বলতে কিছু থাকবে না। আমি গোষ্ঠীতন্ত্রে বিশ্বাস করি। এই যান্ত্রিক সভ্যতা থেকে মুক্তি চাই।'

'কিছু মনে করবেন না সব্যসাচীবাবু, আপনার এই ভাবনার সঙ্গে হিপিদের কিছু মিল আছে যেন।'

'হতে পারে। হিপিরাও তো একটা গ্রেট কজে' মুভমেন্ট করছে।'

'আমার স্বামীদেবতা গন্ধ পেতে পারে এ জন্যে টানি না।' কথার ধরনেই স্পষ্ট 'স্বামীদেবতা' শব্দটি স্বামীরই প্রতি বিদ্রূপ। কথাটা বললেন জনৈকা ঘোষজায়া। চুলে সচরাচর তেল পড়ে বলে মনে হয় না। হাসলে তাঁকে চমৎকার দেখায়। ওকে ঘিরে বসে আছে আরও পাঁচ-ছ'জন প্রায় একই পোষাকের বাঙালী তরুণ। গাঁজকার গন্ধে স্থানটি ভরে গেছে। উগ্র গন্ধে অস্বস্তি বোধ করি। তবু বসে পড়ি ওদের কাছে। স্থান, আউটরাম ঘাট এলাকায় এক ছিন্নমূল পরিবারের ছাউনি।

'আপনার স্বামী এসবে আপত্তি করেন না?'

'কোন্ সবে?'

'এই যে আপনি অন্ধকারে এভাবে ছেলেদের সঙ্গে—'

'কথা শেষ হবার আগেই ঘোষজায়া হেসে উঠলেন খিল খিল করে। হাসতে হাসতেই বললেন, 'আপত্তি করলেই হল?

আমার বলতে এ কয়েটা কি? বলুন কি সুখে আছে? কেরাণী আমাকে জেরাণীর মতো—আমি থাকব আমার মত।'

আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু কলেজের তৃতীয় বর্ষ (বিজ্ঞান)-এর ছাত্র মিহির মণ্ডলকে জিজ্ঞেস করি, 'এ জীবনে কিছু হবে না বলে আপনি বিশ্বাস করেন?'

'কি আবার হবে? রকে গুলতানি করি, বাড়ি যাই। বাবার বকুনি খাই। রোজ একখানা করে নোটিশ, বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে, হুল্লোড়বাজি করে থাকা চলবে না।'

'আপনি কি উত্তর দেন?'

'একদম বোবা। বেশি বাড়াবাড়ি করলে বড় জোর কাঁচের গ্লাশ বা কাপ ভেঙ্গে দিয়ে ঘণ্টা কয়েকের জন্যে বাইরে উধাও হয়ে যাই।'

'নেশা করেন?'

'করি। বাংলুও টানি মাঝে মাঝে।'

—তাতে লাভ কি হয়?

—জ্বালার যন্ত্রণা ভুলে থাকা যায়।

—কি যন্ত্রণা?

—তা কি আপনি জানেন না গুরু?

ওর শেষ জবাবে আমি নিঃশব্দে সরে আসি।

লম্বা চুল, সযত্নলালিত বড় বড় গোঁফ, গলায় রৌপ্যহার—লকেটে 'ওঁ' খচিত, হাসি-মাখা মুখখানা দেখে মনে হল, এর যন্ত্রণার মূল অনেক গভীরে। তার অনুসন্ধান সহজ নয়।

সিটি কলেজ (সাউথ)-এর ছাত্রী শিপ্রা মল্লিক শাড়ি পরতে ভালোবাসেন না। তাঁর পোশাক নিয়ে শুধু আত্মীয়-পরিজনের মধ্যেই নয়, বান্ধবীদের মধ্যেও সমালোচনা আছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'বাঙালীর শাড়ি ছেড়ে প্যান্ট ধরলেন কেন?'

'আমার ইচ্ছে।' ক্ষুব্ধ হলেন মল্লিকা।

একটু থেমে আবার জিজ্ঞেস করি, 'না—মানে আপনি এ পোশাক ভালোবাসেন কেন?'

'এটা আমাকে এ যুগের মেয়ে বলে চিহ্নিত করে। যা চলে আসছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে বুঝিয়ে দেয়।'

বুঝলাম, প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মল্লিকারও ক্ষোভ আছে। বললাম, 'কিন্তু পোশাকেই কেবল বোঝানো যাবে মিস মল্লিকা?'

'প্রথম চোটে যাবে। এছাড়া আমাদের মনের জ্বালা তো আছেই।'

'কি জ্বালা?'

'স্বাধীনতার অভাবে অতৃপ্ত। যা চাই কিছুই পাই না—। অসহ্য।'

আমি আর কথা বাড়ালাম না। মল্লিকাও বলতে চাইলেন না।

—কৃষ্ণা সেনগুপ্ত

এঁরাও

পিছিয়ে নেই (৪)

বি-কম অনার্স পাশকরা যুবকের বাটিকপ্রিন্টের দোকান

শিক্ষিত বাঙালী যুবকরা কায়িক শ্রমে ভয় পায়—আজ আর ওঁদের এ অপবাদ দেওয়া উচিত নয়। অন্তত ভবানীপুরের বকুলবাগান রোডের পূর্ণেন্দু মুখার্জির ক্ষেত্রে এ কথা খাটে না। পূর্ণেন্দু বয়সে তরুণ—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ, বি-কম (অনার্স), একটি নামী চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট সংস্থায় আর্টিকেলড ক্লার্ক হিসেবে কাজও করেছেন। কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তখমা এঁটে চাকরির জন্যে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে কখনও দরজায় দরজায় ধর্ণা দেন নি—নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে পূর্ণেন্দুবাবু ফুটপাথে জামাকাপড় ফেরি করেছেন, নিজের হাতে ধুতি শাড়িতে রং করেছেন—রকমারী নকশা ছাপিয়েছেন।

কিন্তু পূর্ণেন্দুবাবুর দিবারাত্রির পরি-শ্রম ব্যর্থ হয়নি। আজ তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে। '৬৮ সালে মাত্র তিনজনকে নিয়ে কাপড়-ছাপানোর যে ছোট্ট দোকানটি শুরু করেছিলেন আজ সেই 'ফাল্গুনী' অনেক বড় হয়েছে। ধুতি, শাড়ি, সিল্ক, নাইলন ও তাঁতবস্ত্রের ওপর রকমারী নকশা ছাপানোর বিপণি—ফাল্গুনীর মাধ্যমে শুধু পূর্ণেন্দুবাবুই নন, আরও সাতজন তাঁদের পরিবারের ভরণপোষণ চালাচ্ছেন—এটা কম কথা নয়।

—কত টাকা নিয়ে ব্যবসায় নেমেছিলেন? আমি প্রশ্ন করি।

—হাজার তিনেক টাকা সম্বল করে '৬৮ সালের ১লা বৈশাখ 'ফাল্গুনী' শুরু করি। তখন বকুলবাগান রোডের এই ঘরটা ছিল শোরুম-কাম-ফ্যাক্টরী। কর্মচারী ছিল তিনজন। এখন এটা শোরুম হিসেবেই ব্যবহার করি। হালতুতে একটা বড় ঘর নিয়েছি—ওটা আমার ফ্যাক্টরী। কর্ম-চারীও বেড়ে গিয়েছে—সাতজন কারিগর এখন কাজ করছে।

—কেমন ইনকাম হয়?

—ভালই। দেখুন, নিজের সাত-আট জনের একটা বড় সংসার তো চালাচ্ছি।

—বিয়ে করেছেন কি?

—না, কিন্তু সংসারের দায়-দায়িত্ব আমার ওপর...।

—লোন নিয়েছেন?

—হ্যাঁ, হাজার টাকা—ব্যাংক অব বরোদা-র কাছ থেকে। আমার প্রশ্নের উত্তরে পূর্ণেন্দুবাবু বললেন,—তবে আরও বেশি টাকার প্রয়োজন। কয়েকটি ব্যাংকের সঙ্গে

পূর্ণেন্দু মুখার্জী

যোগাযোগও করেছিলাম—কিন্তু লোন তাঁরা দেন নি। বাটিক প্রিন্টিং-এর দোকানের জন্য সব ব্যাংকে লোনের ব্যবস্থা নেই। কারণ এ ব্যবসায়ে কোনও দামী মেশিনপত্রের প্রয়োজন হয় না। সাধারণত, যন্ত্রপাতি থাকলে ব্যাংকের লোন দিতে সুবিধা হয়।

—এতে কোনও মেশিন দরকার হয় না?

—না, খুব কম টাকায় এই ব্যবসা শুরু করা যায়। দুটো বারো হাত লম্বা টেবিল দরকার, আর দরকার কাঠের ব্লক। টিংপুরে অর্ডার দিয়ে রকমারী নকশার ব্লক তৈরী করিয়ে নিই। মুসলমান কারিগররা এ ব্যাপারে এক্সপার্ট।

—আচ্ছা, আপনি তো এতদিন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হয়ে প্র্যাকটিস করতে পারতেন। তা করলেন না কেন?

—দেখুন সৎ পথে থেকে টাকা রোজ-গার করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হলে হিসেবপত্র কি করে ফাঁকি দিতে হয় তাই দিনরাত ক্লায়েন্টদের পরামর্শ দিতে হত।

—আচ্ছা, আপনি কি সৎপথে ব্যবসা করতে পারছেন?

—চেষ্টা করছি। কিন্তু এখন অনেস্ট নামক শব্দটি অভিধান থেকে মুছে দেওয়া উচিত। আজকের সমাজ এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে যেখানে কারও পক্ষেই অনেস্ট থাকা সম্ভব নয়। একটু থেমে বারো হাত লম্বা টেবিলে তাঁতের কাপড়ের উপর একটি কাঠের ব্লক সজোরে চেপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-কম অনার্স পূর্ণেন্দু মুখার্জি বললেন—দেখুন, আমাদের বংশে কেউ কোনও দিন ব্যবসা করেন নি। কাজেই ব্যবসা করতে গিয়ে আমার হয়তো ভুলভ্রান্তি হতে পারে। এবং হয়তো হয়েছেও। তবু সংগ্রাম করে একটা বিষয়ে লেগে থেকে ফল যে পেয়েছি সেকথা স্বীকার করতেই হবে।

—কনক মজুমদার

যুবক যুবতী

(১)

'অমৃত' পত্রিকায় যুবক-যুবতী ফিচার সম্পর্কে অলকা বসুমল্লিকের চিঠিটি নিঃসন্দেহে যুক্তিপূর্ণ। পত্রলেখিকা যৌনশিক্ষার ভালমন্দ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। শরীর সুস্থ রাখার জন্য বিজ্ঞানসম্মত যৌনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমিও একমত।

একটিই প্রশ্ন, পাঠক্রম তৈরী করার সময় খুব সতর্ক থাকা দরকার। আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় অদলবদল করতে গিয়ে নতুন যে পাঠক্রম চালু করা হয়েছে তা যুক্তিনির্ভর হলেও শিক্ষাদানের পক্ষে বাস্তবানুগ নয়। যে পাঠক্রম স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অনুসরণ করানো যাবে না তা আদর্শের দিক থেকে যতই উচ্চস্তরের হোক পড়াতে গিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা হোঁচট খাবেন।

যৌনশিক্ষার পাঠক্রম সম্পর্কে একই কথা, প্রচুর জ্ঞানগর্ভ পাঠক্রম তৈরী করা হল কিন্তু আদতে তা ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী হল না। পাঠক্রম তৈরী করার কাজে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সাধারণ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যুক্ত রাখা দরকার। যাঁরা হাতে-কলমে শিক্ষা দেন পাঠ্যসূচীর ভালমন্দ তাঁরা বুঝবেন।

অজ্ঞতাকে দীর্ঘকাল জিইয়ে রাখা কোন দেশের পক্ষেই শুভ নয়। এমন ঘটনাও জানি, অজ্ঞতা এবং অন্ধ সংস্কারের শিকার হয়ে অনেক মহিলা ডাক্তারের কাছে পর্যন্ত যৌন সংক্রান্ত ব্যাধি গোপন করে যান।

এখন প্রায় প্রত্যেক স্কুলেই ফার্স্ট এইড শিক্ষা দেওয়া হয়। তেমনি প্রাথমিক সেক্স এডুকেশন দেওয়ায় কারও দ্বিমত হওয়ার কথা নয়।

মঞ্জুশ্রী চক্রবর্তী জলপাইগুড়ি

(২)

এবারের 'যুবক-যুবতী' ফিচারে ফিল্ম নিয়ে সাক্ষাৎকার ছেপেছেন। ফিল্ম এমনিতেই বিতর্কিত বিষয়। একটি ছবি সম্পর্কে বিভিন্ন দর্শকের বিভিন্ন মত তৈরী হয়। যদিও খবরের কাগজের রিভ্যু সাধারণ দর্শকের মন অনেকখানি তৈরী করে দেয় কিন্তু প্রকৃত শিল্পবোদ্ধা যাঁরা তাঁরা কাগজের মতামতের ওপর খুব বেশি গুরুত্ব দেন কি?

লেখিকা শ্রীরত্না সেনগুপ্ত বলেছেন, 'বিশেষজ্ঞরা শিল্পের খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামান, যুবসমাজ কি ভাবছেন দেখা যাক।' লেখকের কি ধারণা যুবসমাজের মধ্যে বিশেষজ্ঞ বা শিল্প-বোদ্ধা নেই? তা যদি ভেবে থাকেন তাহলে ভুল ভেবেছেন। ইদানীংকালের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ফিল্ম নিয়ে যথেষ্ট পড়াশোনা করেন; প্রথম শ্রেণীর ফিল্ম কাকে বলে এবং ফিল্ম বিচারের মানদণ্ডই বা কি তাও বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী ভালভাবেই জানেন। লেখিকা যাঁদের সাক্ষাৎকার পেয়েছেন তাঁদের মতামত পড়ে পাঠকদের ধারণা হতে পারে যুব-সমাজের সিংহভাগ [illegible] ছবি দেখার, চটুল আনন্দ উপভোগের ভক্ত। যুব-সমাজকে এভাবে এক ব্র্যাকেটে ফেলা ঠিক হবে কি?

'বাবা' 'প্রেমনগর' প্রভৃতি ছবি যুব-সমাজকে আনন্দ দিতে পারে এবং অধিকাংশ বাংলা ছবি না পারে আনন্দ দিতে না পারে সিরিয়াস কথা বলতে—বাজে।

এ ধরনের মন্তব্য খুবই আপত্তিকর। সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ছাত্র অভিজিৎ রায়কে যুবসমাজের প্রতিনিধি মনে করা কঠিন। এভাবে দু-তিনজন যুবক-যুবতীকে বেছে নিয়ে ফিল্মের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর যবনিকা টানা মানে ফিল্ম শিল্পের ওপরও অবিচার করা।

আমি আশা করব সম্পাদকমশাই ফিল্মের ওপর একটি ওপেন ফোরাম করুন—যাতে ওয়াকিবহাল ছাত্রছাত্রীরা লেখার মাধ্যমে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

(৩)

'অমৃত' পত্রিকায় 'যুবক-যুবতী' ফিচারের দ্বিতীয় লেখা 'প্রেম' পড়ে বেশ

বাংলাদেশে। রাজনীতি ও চিত্রকলার একশ বছর

অমৃতে কার্ট সংখ্যায় প্রখ্যাত শিল্পী অতুল বসুর মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করার জন্য ধন্যবাদ। 'বাংলাদেশে রাজনীতি ও চিত্রকলা একশ বছর' প্রবন্ধে শিল্পী বসু খণ্ড অথচ সূত্রবাহী ইতিহাস তুলে ধরেছেন। বিদগ্ধ পাঠক ও তরুণ শিল্পীরা এ থেকে অনেক উপকৃত হবেন বলেই আমার বিশ্বাস।

আমি শিল্পী নই কিংবা শিল্পবোদ্ধাও নই। শহরে অনুষ্ঠিত তরুণ-প্রবীণ চিত্র-শিল্পীদের প্রদর্শনী দেখতে যাই, আশাহত হয়ে ফিরে আসি। সেটা ছবি বোঝবার যথেষ্ট জ্ঞান আমার নেই বলেই। আমার সীমিত জ্ঞান সম্পর্কে সচেতন হয়েই বিনীত ভাবে আধুনিক চিত্রশিল্পীদের কাছে একটি প্রশ্ন রাখছি।

সাহিত্যের মতই চিত্রশিল্পও কখনও এক জায়গায় থেমে থাকে না। বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে তার গতি-পথ সদা বহমান থাকে। আবস্ট্রাকট আর্ট বলে প্রচলিত কথাটি এখন সকলের মুখেই উচ্চারিত। প্রদর্শনীতে যে ছবির অ আ ক খ কিছুই বোঝা গেল না তাকেই একদল বললেন আবস্ট্রাকট আর্ট। শিল্পীর ভাবনা-চিন্তার হদিস আমাদের পাওয়ার কথা নয়, কিন্তু প্রত্যেকটি ভাবনা-চিন্তার তো সফল পরিণতি থাকার কথা। এলোমেলো ইমেজেরও একটি অন্তর্নিহিত যোগসূত্র থেকে যায় যে সূত্র ধরে আনন্দলোকে পৌঁছান সম্ভব। বলতে বাধা নেই হালের অধিকাংশ ছবিতেই সে সূত্র অনুপস্থিত। একদা গদ্য কবিতার নামে যে নৈরাজ্য চলেছিল সমকালের বেশ কিছু প্রতিভাবান কবির সার্থক সৃষ্টিতে তা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

শিল্পী শ্রীবসুর সর্বশেষ মন্তব্য সকল শিল্পী সকল শিল্পবোদ্ধার কাছে মূল্যবান এবং হৃদয়গ্রাহী। 'চোখে চোখ রেখে মায়ের যে মুখখানি একদিন ভাল লেগেছিল, মন থেকে মা বলে ডাকবার মত তারই একখানি প্রতিচ্ছবি যেন তাঁরা একদিন রূপায়ণ করেন।'

এর থেকে বড় কথা বোধহয় আর কিছু নেই। হৃদয়ের গভীরে যে ছবি দেখায় রূপে চির জাগ্রত রক্তের মধ্যে প্রবাহিত তার যথাযথ রূপায়ণই তো সার্থক সৃষ্টি হতে পারে।

অমলেন্দু মিত্র
চন্দননগর, হুগলী

লেখকের নিবেদন

উপরোক্ত শিরোনামায় আমার বক্তব্য আপনার পত্রিকার মাধ্যমে সাধারণের নিকট উপস্থিত করার সুযোগ দিয়ে আপনি আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

বর্তমান কাগজ সংকট সম্বন্ধে অবহিত হয়ে আমি প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত করার যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি। মুদ্রণের পর দেখছি, এর ফলে স্থানে স্থানে ঐতিহাসিক তথ্য ও তত্ত্বের পারম্পর্য সর্বদা রক্ষিত হয় নি—অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু উক্তি অপ্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে। তা ছাড়া, কোনও কোনও দরকারী কথা বাদও পড়ে গেছে—সন-তারিখে মুদ্রাকর প্রমাদও আছে। এ বিষয়ে পাঠকবর্গের নিকট হতে নানা প্রশ্নেরও সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এ জন্য স্থির করেছি যে শীঘ্রই সংশোধিত ও পরিবর্ধিত করে প্রবন্ধটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করব।

সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট আমার অনুরোধ—তাঁরা যেন তাঁদের বিচার সাময়িক স্থগিত রাখেন।

অতুলচন্দ্র বসু

খানিকটা ভরসা পেলুম। জয়শ্রী দত্তকে ধন্যবাদ। মুখে আমরা যত কথাই বলি না কেন, ছাপা হয়ে বেরুবে জেনে ব্যক্তিগত ব্যাপারে কোন কথা বলতে প্রায় সকলেই ঘেমে উঠেন। বিশেষ করে মহিলাদের পক্ষে প্রেম নিয়ে সাক্ষাৎকার দেওয়া খুবই অসুবিধের। যত কমই বলুন, তবু জয়শ্রী দত্ত কিছু কথা বলেছেন।

আসলে প্রেমে পড়েননি বা পড়ে হতাশ হন নি এমন মানুষের সংখ্যা হাতে গোনা যায়। ধরুন আমি। প্রেম করার জন্যে বুক ঠুকে এগিয়ে গেছি এবং বিরস বদনে প্যাভিলিয়নে ফিরে এসেছি বেশ কয়েকবার, তবু প্রেম করার সাধ মেটে নি। একটু হাতছানি পেলেই নেচে উঠি। কিন্তু বিস্তারিত বলতে পারব না। সেরকম তো সবারই। খোলাখুলি বলতে অনেকেরই জড়তা আসে।

এ প্রসঙ্গে ইদানীং একটি বিশেষ প্রশ্ন বারবার নাড়া দিচ্ছে। প্রেম ভালবাসা আর্থিক দাঁড়িপাল্লায় মাপ করা হচ্ছে।

আমি পুরো মাত্রায় তরুণ হয়েও একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে তরুণ-তরুণীরা আর্থিক সঙ্গতি অসঙ্গতির ওপর সর্বশেষ সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। যার পায়ের নিচে চলার মাটি শক্ত নয় তিনি প্রেম ভালবাসার ক্ষেত্রে যতই নিষ্ঠাবান হোন না কেন অপর পক্ষের প্রসন্নতা পাবেন না।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কিছু না কিছু কোয়ালিটি থাকেই, যাতে একে অপরের কাছাকাছি হওয়ার আকর্ষণ বোধ করেন। কিন্তু কোয়ালিটি এবং মনের গভীরতার থেকেও মুখ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে অর্থ। জানি উপায় নেই, বাস্তব পৃথিবীতে খেয়ে পরে বাঁচার প্রশ্নটাই এখন বড়। তবুও মানুষের মনের যাচাই তো কেবলমাত্র অর্থ নয়। বাঁচতে গেলে অর্থ যেমন দরকার তেমনি দরকার মন দিয়ে মনকে পল্লবিত করা। মনেই যদি ঘুন ধরল তবে বাকীগুলো নিয়ে মানুষ কতদিন বাঁচবে? আনন্দের উৎসকে রুদ্ধ করে বাইরের জৌলুস কখনই দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

অমলেশ মুখোপাধ্যায়
রাঁচী

অমৃত প্রসঙ্গে

আমি আপনাদের পত্রিকার একজন আগ্রহী পাঠক। সাহিত্য সৃষ্টির পর তা পাঠকের সামগ্রী হয়ে যায় সুতরাং অমৃতে প্রকাশিত সাহিত্য রচনা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করার অধিকার পাঠক হিসাবে আমার আছে মনে করি। অমৃত যে পাঠকের রুচির প্রতি শ্রদ্ধাশীল সেটা ইদানীং অমৃতের অলঙ্করণ দেখলেই বোঝা যাবে। নিত্যনতুন ডালি দিয়ে সাজানো হচ্ছে অমৃতের ভাণ্ডার। আমরাও তা থেকে অমৃতের স্বাদ পেয়ে পাঠকমনকে তৃপ্ত করতে চাইছি। একথা ভুললে চলবে না যে সাহিত্য পত্রিকাকে নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। প্রগতিশীল মানসিকতাদীপ্ত সৃষ্টি সাহিত্য পত্রিকার কর্তব্য। আজকের অপসংস্কৃতি ও বিকৃত সাহিত্য সৃষ্টির যুগে অমৃত নিঃসন্দেহে একটি ব্যতিক্রম। সেক্ষেত্রে তথাকথিত বাণিজ্যিক সম্ভারে এখনো সে পরিণত হয় নি। গত সংখ্যায় নতুন ফিচার যুবক-যুবতী নিঃসন্দেহে একটি বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত বহু যুবক-যুবতীর মনের সম্ভার হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে। আজকের যুবক-যুবতীরা নানাদিক থেকে বঞ্চিত এবং নানা কারণে তারা হতাশা-গ্রস্ত, উদ্ভ্রান্ত, অশান্ত। এই যুবমনকে তার সঠিক প্রকাশে সহায়তা করে অমৃত সমস্ত যুব সম্প্রদায়ের ধন্যবাদার্হ হবে সন্দেহ নেই। আজকের বেকার ছন্নছাড়া যুবক হয়তো আগামীকালের কোন বড় সাহিত্যিক। তার সেই সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করার কাজে সাহায্য করতে হবে অমৃতকে। সঙ্গে সঙ্গে পথ দেখাতে হবে—নতুন আলোর সংকেত দিতে হবে হতাশ যুবককে যে পায়ে বেঁচে থাকার সাহস, জীবিকার জোর অনুযোগের সন্ধান। আপনাদের কাছে সবিনয় অনুরোধ জানাব—যুবক-যুবতী বিভাগটিকে যেন কোন একজন অল্পবয়সীর কমীর হাতে ছেড়ে দেওয়া না হয়। যুবক-যুবতীদের সমস্যা—সমাধান তাদেরই লেখনীতে প্রকাশ পাবে, এই আশা করি।

অময় দাশ
খড়দহ, ২৪ পরগণা

সারা বাংলা কবি সম্মেলন

৯ই শ্রাবণ শুক্রবারের অমৃতে সত্যানন্দ গুহ মহাশয় সারা বাঙলা কবি সম্মেলন সম্বন্ধে ((চিঠিপত্র স্তম্ভে) যে অভিযোগ করেছেন সেই সম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করছি।

তাঁর মত পড়ে মনে হোল কবি সম্মেলনটা বড় নয়, যতটা মানুষের নাম বড়। ঐ দিন আমিও সকাল সাতটা হতে রাত্রি প্রায় নটা অবধি উপস্থিত ছিলাম। সকালবেলায় সভাপতি ও প্রধান অতিথিকে কেন একসঙ্গে আনা হোল। দুবেলা দুজনে এলে সুবিচার হোত। কেন? বিকালের অধিবেশনে তো অন্য সভাপতি এবং প্রধান অতিথি ছিলেন। অধিবেশন দু ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম অধিবেশন (সকাল ১০টা হতে বেলা ১টা) সভাপতি ছিলেন শ্রদ্ধেয় শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবং প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রদ্ধেয় শ্রীমণীন্দ্র রায়। এঁরা প্রায় বেলা ১টা অবধিই উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া বিকেলের অধিবেশনে (দুপুর ২টা থেকে ৮টা) উপস্থিত ছিলেন শ্রদ্ধেয় শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত এবং শ্রদ্ধেয় কবি শ্রীকৃষ্ণ ধর। এ ছাড়া গুণীজন সম্বর্ধনায় উপস্থিত ছিলেন কবি দিনেশ দাশ। এঁরা সাহিত্য-ক্ষেত্রে কি কিছুমাত্র কম? কবি সম্মেলন তো সকাল থেকেই সবার জন্য অবারিত দ্বার ছিল। হরপ্রসাদ মিত্র প্রমুখ গুণী ব্যক্তিরা শুধুমাত্র শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। যাঁরা গ্রাম থেকে এসেছেন তাঁদের কথা না হয় ছাড়লাম, কলকাতার নামী কবি কি করে অভিযোগ করেন? তাঁর বাড়ী কি কলকাতার বাইরে? পুরস্কার নিতে আসার সময় ছাড়া আগে বুঝি আসতে নেই? এত বড় কবি সম্মেলন যে কতটা ঝুঁকির ব্যাপার, যাঁরা করেছেন তাঁরাই জানেন।

শ্রীপ্রদীপ পাল
১ কাঁড়ার পুকুর লেন, হাওড়া—১

* এই প্রসঙ্গে আর কোন আলোচনা প্রকাশিত হবে না। ভা, স.

মফঃস্বলের সংবাদপত্র

সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক সংবাদ সরবরাহ এবং সুচিন্তিত আলোচনা ও মন্তব্য অমৃত পত্রিকার আকর্ষণকে বাড়িয়ে তুলছে। গত ১০ সংখ্যা অমৃতে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগে মফঃস্বলের দৈনিক সংবাদপত্র শীর্ষক সংবাদ ও আলোচনা প্রসঙ্গে কয়েকটি মন্তব্য রাখতে চাই।

প্রথমে বলে নিই বর্তমান সরকার কিছুদিন পূর্বে মফঃস্বল সংবাদপত্র প্রকাশ করা হবে বলে অভিমত জ্ঞাপন করেছিলেন এবং সেটা হবে প্রতি জেলা থেকে বিভিন্ন সমস্যাবিষয়ক মুখপত্র হিসাবে। কি পরিণাম ঘটলো জানি না। গ্রামবাংলার সমস্যা এবং তার সমাধান আজও অবহেলিত। বৃহৎ দৈনিক সংবাদপত্র-গুলির পক্ষে সম্ভবও নয় এই সমস্ত সংবাদ তুলে ধরা, কিন্তু এই মফঃস্বল সংবাদপত্রগুলি বা জেলা সংবাদপত্রগুলি থাকলে বৃহৎ সংবাদপত্র উক্ত সংবাদপত্র-গুলি থেকে প্রকট সমস্যাবিষয়ক সংবাদ-গুলি সংগ্রহ করে তুলে ধরতে পারেন 'জেলার খবর' শীর্ষক বিভাগে যা সরকারী দৃষ্টি আকর্ষণের একটি উপায়। মফঃস্বলে নিরপেক্ষ সংবাদপত্র অনেক আছে, যা সপ্তাহে একদিন বা দুই তিন দিন অন্তর প্রকাশিত হয়। কিন্তু অর্থানুকূল্যের অভাবে অচিরেই তাদের মৃত্যু ঘটে। বিভিন্ন জেলা সাংবাদিকদেরও এ বিষয়ে অগ্রণী হয়ে ব্যবস্থা করা উচিত।

চঞ্চল সিংহরায়
জোহিরা, হুগলী।

অঙ্গনা

মহিলারা এখনও সেই তিমিরে

শিক্ষা-দীক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই নারীরা প্রগতির দিকে দ্রুত পা বাড়িয়েছেন। স্কুল-কলেজ অফিস-আদালত ছাড়াও স্বাধীন ব্যবসায়ের ঝুঁকি নিতেও আমাদের দেশের মহিলারা আর ভীত নন। অনেক সময় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ছাড়াও যৌথ ব্যবসায়েও তাঁরা যথেষ্ট সাফল্যলাভ করছেন। এছাড়া বিভিন্ন উচ্চপদেও মহিলারা সগর্বে এগিয়ে চলেছেন। বাইরের জগতের এই সাফল্য যতই স্বরান্বিত হোক না কেন পরিবার অর্থাৎ সংসারে তাঁদের অবস্থার উন্নতি বোধহয় খুব বেশী একটা হয়নি। কারণ সংসারে মেয়েরা গৃহবধূ, জননী অথবা গৃহিণী সুতরাং সংসারের সব দায়-দায়িত্বই তাঁদের। এত দায়দায়িত্ব সম্পন্ন করতে কিন্তু মহিলারা পরিবারে এখনও নিজেদের আসন অর্থাৎ মূল্যবোধ ঠিকঠিক আদায় করতে পারেন নি।

কোন পরিবারে যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়েই চাকুরীজীবী হন তাহলে মহিলাটির শারীরিক ও মানসিক দায়িত্বের বোঝা কতখানি তা সেই পরিবারের সকলে এমনকি স্বামী ভদ্রলোকটিও হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না। মহিলাটি যথারীতি সংসারের যাবতীয় খুঁটিনাটি তদারকের ফাঁকেই ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা দেখিয়ে দেবেন। ছেলেমেয়েদের স্কুলে আনা-নেওয়ার দায়িত্বও বহুলাংশে তাঁর ওপরই ন্যস্ত থাকে। তার ওপর তো হাজার রকমের কাজ যার সবটুকু বোঝা বইতে হয় সেই মহিলাটিকে একাই। বাইরের কেউ বেড়াতে এলে যেমন অতিথির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাঁর, তেমনি বাইরে আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে কুটুম্বিতা রক্ষা করার সকল বোঝাও তাঁর। অথচ চাকুরীজীবী বলে তাঁর সময়সংক্ষেপ করেই সব কাজ সারতে হয়। এতসব বোঝা বহন করেও ছেলেমেয়ের পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার জন্যও দায়ী করা হয় গৃহিণীদের। যদিও মাঝে মাঝে সন্তানদের অকৃতকার্যতা বা উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য বাবা-মা উভয়কেই সমানভাবে অভিযুক্ত হতে হয়। সাধারণতঃ উভয়ের ওপর অভিযোগ আসে বাইরের পাঁচজনের কাছ থেকে, কিন্তু ঘরে? সেখানের ছবি কিন্তু অনুরূপ। স্বামী ভদ্রলোক ছেলেমেয়ের অকৃতকার্যতা, অসংযত আচরণ সবের জন্যই দায়ী করেন স্ত্রীকে। তিনি কিছুতেই বুঝতে পারেন না, যিনি ঘর-বার দুটো করেন, তাঁর পক্ষে সব ব্যাপারেই সব দায়িত্ব বহন করা সম্ভব নয়।

মেয়েরা কতগুলি বিশেষ গুণ নিয়েই জন্মায়। রান্না করা তার মধ্যে একটি বিশেষ গুণ। সপ্তাহের একটি ছুটির দিন একটু স্বতন্ত্রভাবেই সবাই উদ্‌যাপিত করতে চায়। যদিও অর্থনৈতিক কারণে সব পরিবারে আজকাল তা সম্ভব নয়। তবুও রকমফের একটু ভালমন্দ রান্নার জন্য ছুটির দিনগুলিকেই সবাই হিসেবের মধ্যে রাখেন। সেখানে স্বামীর দাপট স্ত্রীর ওপর অধিকাংশ পরিবারে থাকে। চাকুরীজীবী স্ত্রীও ছুটির দিনটিতে নিজের স্বামী, ছেলেমেয়ে ছাড়া পরিবারের আর সকলের রুচির একটু পরিবর্তন করতে চান খাদ্যে নতুন কিছু পরিবেশন করে। কিন্তু অনেক সময় শারীরিক অসুস্থতা বা একটু বিশ্রামের প্রয়াসে সেসব ঝামেলার মধ্যে তিনি হয়তো যেতে চান না, সেজন্য পরিবারের সকলের সহানুভূতি থেকেও বঞ্চিতা হন।

এই মহিলাই যদি এত পরিশ্রমের পর পোষাক-আসাক সম্বন্ধে সচেতন না হন তাহলেও তাঁকে সন্তানেরা অপছন্দ করেন। মনমতো টিপটপ থাকতে সকলেই ভালবাসেন, কিন্তু ইচ্ছাসত্ত্বেও যদি তিনি তা সময় বা পরিশ্রমে না করে উঠতে পারেন ছেলেমেয়েরা অদ্ভুত এক কমপ্লেকস্-এ ভোগে হয়তো প্রকাশ্যেই মহিলাকে নিয়ে হাসিঠাট্টায় বিব্রত করে তোলে। মহিলাদের অশান্তি কম নয়। এমন হতে পারে পোষাক-আসাকের ব্যাপারে তিনি তত্টা সচেতন নন, সেখানে তো কথাই নেই ছেলেমেয়েরা মায়ের সঙ্গে বাইরে বেরুতেও সংকোচ বোধ করে।

আমাদের দেশে মেয়েরা জন্মাবার পর থেকেই কতগুলি বাক্যবাণে জর্জরিত হয়। শহরের মানুষের হয়তো দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের সম্বন্ধে ধারণার কিছু রদবদল হয়েছে। তবুও অশিক্ষিত এমনকি অর্ধশিক্ষিত পরিবারে ধারণা মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা দেওয়া শুধু অর্থব্যয়। বিয়ের পরে মেয়ের থেকে অর্থনৈতিক কোন সুবিধা পাওয়ার আশা নেই। উপরন্তু বিয়ের মত একটা ব্যাপারে নেহাত মন্দ খরচ নয়। অথচ মেয়ের বাবা শিক্ষা দীক্ষা দেওয়ার জন্য যে অর্থ ব্যয় করেন মেয়ের উপার্জনের সবটুকু দাবীদার বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ী।

অর্থ নিয়ে এ দুর্ভোগ মহিলাদের শ্বশুরবাড়ীতেও ভোগ করতে হয়। সেখানে অর্থাভাব ঘটলেই স্বামীভদ্রলোক বিচলিত হয়ে স্ত্রীকে দোষারোপ করেন যে তিনি সংসারে খরচের মাত্রা এত বাড়িয়েছেন যে, গোটা মাস আর চালানো সম্ভব নয়। তাছাড়া ঘনঘন অসুস্থতা হেতু যদি তিনি পরিবারের সকলের সেবাযত্ন চান তাহলেও পরিবারের সকলেই বিরক্ত হবেন। পরিবারের সকলের বদ্ধমূল ধারণা গৃহিণী নিজেই অপরকে সেবাযত্নে সুস্থ করে তুলবেন। উল্টো কোন রকম কাজের জন্যই তিনি সকলকেই অপ্রসন্ন করে তোলেন। শাশুড়ী যিনি ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌ-এর হাতে সব কিছু সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলেন তাঁর অসন্তোষ সবচেয়ে বেশী। কারণ সংসারের সবকিছু ধকল তাঁকেই তখন সামলাতে হবে। তাছাড়া আমাদের দেশে তো অনেক শাশুড়ীরই বৌ-এর কাজে খুঁত ধরার একটা অভ্যাস রয়ে গেছে। প্রবীণা হিসেবে নতুনদের চিন্তাশক্তির পরিবর্তন বা কাজের ধরণ-ধারণ পালটানোকে বহু বহু শাশুড়ীই সানন্দে গ্রহণ করতে পারেন না। তার ফলেই নানাধরনের বিপত্তির উৎপত্তি হয়।

এত অশান্তি, বিঘ্নকে সহজে মানিয়ে নিয়ে ভারতীয় মহিলারা হাসিমুখে তাঁদের কাজ করে যান। অসীম সহ্যশক্তি নিয়েই ভারতীয় মহিলারা জন্মান। একান্নবর্তী পরিবার নেই নেই করেও সব একান্নবর্তী পরিবার টুকরো টুকরো হয়ে পৃথক হয়ে যায়নি। একান্নবর্তী পরিবারকে খুশী করে এখনও ভারতীয় মহিলারা মিষ্টি হাসি দিয়ে সকলের মন জয় করে থাকেন। কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ কিছু থাকলেও তা অনেক সময়েই অপ্রকাশিত থেকে যায়।

এত সত্ত্বেও কিন্তু মেয়েরা প্রায়ই তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিতা। এ ব্যাপারে পরিবারের সকলের একটু সজাগ নজর রাখা উচিত। পরিবারের গৃহিণী যদি মনে মনে সুখী থাকেন তবে তাঁর সব কাজেই একটা পরিপূর্ণতা আসে।

—অঞ্জলি চৌধুরী

রূপসীর খাতা

এবারে হাত বুক কোমর পেট উরু ও নিতম্বের সম্বন্ধে আলোচনা করব।

সোজা হয়ে দুই-পা আলাদা করে দাঁড়াতে হবে। ডান হাত মাথার উপর সোজা তুলে রাখতে হবে, বাঁ-হাত ঝুলিয়ে রাখতে হবে শরীর ছুঁয়ে। তারপর বাঁ-দিকে কাত হয়ে আস্তে আস্তে নীচু হয়ে মাটি ছোঁয়ার চেষ্টা করতে হবে। তারপর হাত তুলতে হবে। এইভাবে একবার ডানদিক ও অন্যবার বাঁদিকে করতে হবে। এর ফলে কোমরে সুন্দর ভাঁজ পড়বে ও কোমর সরু হবে। এরপর দুই হাত কাঁধের সমান সোজা দুই পাশে টান করে, দুই পা তফাৎ করে দাঁড়াতে হবে। তারপর আস্তে আস্তে মাথা সোজা রেখে একবার বাঁদিক, একবার ডানদিকে ঘুরাতে হবে যতটা সম্ভব ঘুরতে হবে। এতে কোমরে চাপ পড়বে ও কোমর সরু ও নিটোল হবে। আর একটা কথাও বলে রাখা ভাল।

মহিলাদের, বিশেষতঃ যাঁরা শাড়ী পড়েন তাঁদের কোমরে পেটিকোটের দড়ি বাঁধার দরুন খুব বিচ্ছিরি কালো গভীর দাগ হয়। এই দাগ দেখতে ভাল না, আর এর ফলে চামড়ায় চুলকানিও হয়। এই দাগ যাতে না হয়, তারজন্য কয়েকটি কাজ করা যায়। যেমন দড়ি কষে না বাঁধা, দড়ি একটু হাল্কা করে বাঁধা। এছাড়া নতুন এক ধরনের পেটিকোট তৈরী হচ্ছে যাতে দড়ি লাগানো হুক দিয়ে পেটের কাছে বাঁধা হয়। এর ফলে কোমর ও পেট চাপা থাকে আর দাগ হয় না। যাঁদের দাগ হয়ে গেছে তাঁরা দাগ ওঠাবার চেষ্টা করতে পারেন। একটু অলিভ তেল গরম করে লেবুর রস দিয়ে তা ভাল করে দাগের ওপর মালিশ করতে হবে। তারপর গরম জল ও সাবান দিয়ে পরে ধুয়ে ফেলা। কাপড় পড়ার আগে বোরোলীন ও তার ওপর পাউডার দিয়ে নেওয়া ভালো। এইভাবে একটু কষ্ট করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

এবারে আসা যাক পেটের পেশী শক্ত করা ও চর্বিযুক্ত মাংসল হলে তাকে কম করার চেষ্টার প্রসঙ্গে। প্রথমে সোজা হতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে নরম বিছানায় শুলে চলবে না। মেঝেতে চাদর জাতীয় কিছু বিছিয়ে কিম্বা কাঠের টেবিলের ওপর শোয়া চলে। সোজা শুয়ে মাথা ও কাঁধ ও অপর দিকে পা জোড়া করে দুইদিক আস্তে আস্তে জমি থেকে উপর দিকে তুলতে চেষ্টা করতে হবে। এবং পরে যতক্ষণ সম্ভব এইভাবে থাকতে হবে। তারপর খুব ধীরে ধীরে মাথা ও পা আবার নামাতে হবে। এই রকম করার সময় নিঃশ্বাস টানতে হবে আর নামাবার সময় আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস ছাড়তে হবে।

এছাড়া আর একরকম উপায় হচ্ছে আস্তে আস্তে কোমর পর্যন্ত তুলে (পা সোজা জমিতে ঠেকিয়ে রেখে) আঙুলের ডগা হাত দিয়ে ছুঁতে হবে। হাত দুটি মাথার দুই পাশ দিয়ে কান ছুঁয়ে থাকবে। এই রকম করতেও নিঃশ্বাস নিয়ে ও ছেড়ে করতে হবে। এতে পেটের পেশীতে চাপ পড়ে এবং বাড়তি মেদ কমে যায়। এছাড়া সকলেই জানেন যে বহু রকমের যোগ ব্যায়াম ইত্যাদি আছে যা জানা ভাল ও স্বাস্থ্যের উপকারী। এখানে এ-বিষয়ে এতো সবিস্তার আলোচনার দরকার নেই। তবে মোটামুটি সাধারণ যা বলা হল তাই করলে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। এতে সময়ও বেশী লাগে না।

পায়ের ও উরুর গঠন সুন্দর করার জন্য এবং পেশী শক্ত ও মজবুত করার জন্য কতকগুলি নিয়ম আছে। যেমন প্রথমে সোজা শুতে হবে। তারপর ডান-পা মুড়ে টেনে নিতে হবে নিতম্ব পর্যন্ত। হাত শরীরের দুপাশে রাখতে হবে—সোজা করে হাতের পাতা দিয়ে মাটি ছুঁয়ে। তারপর আস্তে আস্তে বাঁ-পা সোজা ওপরের দিকে তুলে শরীর থেকে ৯০ ডিগ্রি মতন করে রাখতে হবে, হাঁটু না ভেঙে। ডান-পা সোজাভাবেই রাখতে হবে। পিঠ ও নিতম্ব জমি থেকে উঠবে না। এইভাবে একবার বাঁ, একবার ডান পা করতে হবে। তবে এই ব্যায়াম খুব ধীরে এবং যত্ন নিয়ে করতে হবে।

নিতম্ব সুন্দর ও মানানসই করার জন্য একটি সহজ ও সুন্দর ব্যায়াম আছে। একটি শক্ত চেয়ার বা উঁচু আসন নিতে হবে। তার সামনে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে—দুই হাত দুপাশে ঝুলিয়ে। তারপর দুই-পা একের পর এক চেয়ারে তুলে সোজা দাঁড়াতে হবে—আবার নামতে হবে সোজা হয়ে। এইভাবে দশ-বারো বার করতে পারলেই ফল পাওয়া যায়। এছাড়া আর এক রকমের ব্যায়াম আছে যা করলে নিতম্ব ও উরু সুগঠিত ও মজবুত হয়। সামনে একটা চেয়ার বা কিছু ধরবার জায়গা রাখতে হবে। ডান হাত দিয়ে ওটা ধরতে হবে আর সোজা দুই-পা জোড়া করে বাঁ-হাত কোমরে রাখতে হবে। তারপর আস্তে আস্তে বসার ভঙ্গীতে পায়ের ওপর বসতে হবে। তখন গোড়ালি মাটি ছোঁবে না। পায়ের পাতার বাকী অংশ মাটি ছুঁয়ে থাকবে। এইভাবে বসার ভঙ্গিতে সোজা হয়ে যতক্ষণ সম্ভব থাকতে হবে। তারপর আবার উঠতে হবে আস্তে আস্তে। এইভাবে যতবার সম্ভব করলে ভাল হয়। এতে পায়ের, উরুর ও নিতম্বের পেশী শক্ত হয়, এবং সুন্দর গঠন পায়।

এই অতি সাধারণ ও অতি সহজ কতকগুলি ব্যায়াম আমরা নিয়মিতভাবে যদি করি, তাহলে শারীরিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি হবেই। তাছাড়া এতে স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। তবে এর সঙ্গে কতকগুলি কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, যদি কারুর কোন রকম নার্ভ-এর রোগ বা কোন রকম শারীরিক অসুস্থতা থাকে তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ না নিয়ে যেন কিছু না করেন। এখানে যা বলা হচ্ছে বা শেখান হচ্ছে তা মোটামুটি সাধারণ ও স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের মহিলাদের জন্যেই।

আর একটি সাধারণ ব্যায়াম আছে, যা করলে পেট, পা, উরু ও কোমর মোটামুটি সবকিছুরই সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে ফল পাওয়া যেতে পারে। যেমন সোজা শুয়ে ডান-পা উঁচু করে সোজা শরীরের বরাবর রাখতে হবে। তারপর আঙুলগুলি জড়ো করে সামনের দিকে টান করে ধরতে হবে। এর-পর পা দিয়ে গোল করে শূন্য আঁকতে হবে। একবার ডানদিক থেকে বাঁ-দিক, অন্যবার বাঁ-দিক থেকে ডান-দিক। এভাবে ১০।১২ বার করতে হবে। তার-পর পা নামিয়ে সোজা রেখে বাঁ-পা তুলতে হবে। ঠিক ওই একই নিয়মে বাঁ-পা দিয়ে শূন্য আঁকতে হবে। এইভাবে দুই-পা আলাদাভাবে করতে হবে। তারপর দুই-পা এক সঙ্গে করে করতে হবে। এইভাবেও বেশ ১০।১২বার করতে হবে। এর ফল খুব ভাল পাওয়া যায়।

রূপ-সজ্জার এগুলি বিশেষ অঙ্গ। রূপ শুধু রঙে নয়, চোখের ভঙ্গীতে ও ঠোঁটের হাসো নয়—রূপ শরীরের ভাঁজে ও গঠনের কমনীয়তায় বাড়ে। —তাই দুই রকমের চর্চাই এক সঙ্গে করা ভাল।

—বরবর্ণিনী

আগেকার দিনে বিভিন্ন ধরনের সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলিতে প্রায়শই নানা প্রকার হাসির খোরাক থাকতে দেখা যেত। গল্প-উপন্যাস ও নাটকের মধ্যে, কবিতা ও গানের মধ্যে বা 'হাস্য-কৌতুক', 'চুটকি' চার্টান প্রভৃতি শিরোনামায় সেগুলি ব্যক্ত হয়ে, পাঠক-পাঠিকাদের প্রভূত আনন্দ-বর্ধনের কারণ হ'ত। এই হাস্যরস বা মধুর শৃঙ্গাররস মানুষের নানাবিধ মানসিক পীড়নের মধ্যেও যে কিছুটা স্বস্তির উদ্রেক করত একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু অধুনা এ ধরনের পত্রিকা বিরল-দৃষ্ট। নিছক হাস্য-কৌতুক বা হালকা রঙ্গরসের পত্রিকা বলতে একমাত্র কুমারেশ ঘোষ সম্পাদিত 'যষ্টিমধু' ছাড়া আর তেমন কিছু আছে কিনা আমাদের জানা নেই। অথচ এককালে 'অবতার', 'হুসন্তিকা', 'ভোটরঙ্গ', 'শিশির' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকাগুলিতে কার্টুন চিত্র ও হাস্যরসাত্মক রচনা প্রচুর প্রকাশিত হ'ত।

এ ধরনের লেখকও ইদানীংতনকালে খুব কমই দেখা যায়। বিশেষভাবে নাম উল্লেখ করতে গেলে, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী এবং অজিতকৃষ্ণ বসু (অ-কৃ-ব) ছাড়া আর কারুরই নাম যেন সহজে মনে আসে না। কিন্তু এ ব্যাপারে অতীতের দিকে তাকালে রসরাজ অমৃতলাল বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় থেকে আরম্ভ করে কবি সত্যেন্দ্রনাথ, নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যো, গল্পকার ও ঔপন্যাসিক কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়, অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেককেই আমরা পাই যাঁরা নানাভাবে ঈশ্বর গুপ্তের সেই 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভরা' কথাটিকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করে গেছেন। এই পর্বের শেষ জ্যোতিষ্ক ছিলেন যেন রসসম্রাট রাজশেখর বসু।

হালফিলের কয়েকজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক তাঁদের অসংখ্য লেখার মধ্যে দু'চারটি হাসির গল্প লিখলেও, হাসির কবিতা কেউই প্রায়ই লেখেন না এবং সে কারণ হাসির কবিতা বা গান কদাচিৎ নামকরা পত্র-পত্রিকার নজরে পড়ে।

এই হাসি সম্বন্ধে কবিশেখর কালিদাস রায়ের একটি উপভোগ্য কবিতা এখানে নিদর্শনস্বরূপ উল্লেখ করছি অতঃপর প্রাচীন 'মালঞ্চ' পত্রিকায় প্রকাশিত (মাঘ-ফাল্গুন, ১৩২২) কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত রচিত সামাজিক নাটক 'আলোকে ও আঁধারে' এবং 'আক্কেল' থেকে দু'একটি গান উদ্ধৃত করে দেব।

কালিদাস রায়ের কবিতাটি অখিল নিয়োগী সম্পাদিত 'ঝিলিক' নামক সংকলন গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। কবিতাটির নাম 'হাসির ঝিলিক'। পঙক্তিগুলি হচ্ছে—

দেঁতো হাসি দাঁতেই মিলায়
হাসে না তায় মুখ,
কাষ্ঠ হাসি কষ্টে হাসা
হাসে না তায় বুক।

মুচকে হাসি মিলিয়ে যায়
কুঁচকে দিয়ে ঠোঁটে,
গুম্ফো হাসি কেয়ার মত
গোঁপের ঝোপে ফোটে।
অট্ট হাসি হো-হো করে
কাঁপিয়ে তোলে দিক,
হু-হু করে হাসি আসে
ডাকলে কুহু পিক।

হিহি করে হাস্য আসে
পউস মাসের শীতে,
শুকনো হাসি বেরসিকের
বোকার হাসির মিতে।

হাউই হাসি হা-হা করে
উপর দিকে ওঠে,
শঠের হাসি হেঁ-হেঁ করে
পকেট সবার লোটে।

চাপা হাসি সাপের হাসি
বেদেয় শুধু চেনে,
ফাঁপা হাসির ফানুস মানুষ
পয়সা দিয়েও কেনে।

দমকা হাসি আটকায় দম
কাঁদিয়ে তবে ছাড়ে,
কাতুকুতুর হাসির কাছে
সকল হাসিই হারে।

ঝলক হাসির ঝলক ওঠে
ছড়িয়ে ফেনার রাশি,
তীরের মত বেঁধে এসে
ঝিলিক মারা হাসি।

*

'আক্কেল' রঙ্গনাট্যে ধোপানী, গয়লানী প্রভৃতি চরিত্র আছে এবং একটি দৃশ্যে তাদের দুজনের দুটি গান আছে। তার মধ্যে গয়লানী গেয়েছে—

বাবুদের রকম দেখে হেসে বাঁচিনে
ঘরে নেই পয়সা চেলের, সাহেবী চাল—
চলে না দিন চা বিনে।
নেইকো পিতল কাঁসা ঘরে,
চায়ের বাসন থরে থরে,
সাজান তাকের পরে, হায় কি বাবু রে।

বাবুর মাথা গরম সাঁঝ-সকালে,
দুধ যোগাতে দেরি হলে—
আর দাম চাইতে এলেই শোন
—পাইনে মাইনে।
মাইনে সে তো ক্ষুদের কণা,—
কটি টাকা আঙ্গুলে গণা।

উপরি চুরি তাও তো সবার জোটে না।
ভাতে খেতে তায় মাছ মেলে না—
ছেলের পেটে দুধ পড়ে না—
তবু লম্বা ধারে রঙ্গ বাহার ভঙ্গী—
বুঝিনে।

এই নাটকের মধ্যে স্ত্রী-চরিত্র বাসন্তীর একটি সোহাগ-ভরা মজার গান আছে। গানটি হ'ল—

আমি তোমার রাইবিবি নাথ
তুমি যে শ্যামসাহেব মোহন।
এই সাজান ঘর কুঞ্জ মোদের,
কলিকাতাই বৃন্দাবন।
(দোঁহে) কুঞ্জে মুখোমুখি বসে
চা করি পান হেসে হেসে,
নবযুগের শ্যামে-রাইয়ে
কি সুধাময় কুঞ্জে মিলন।
নাই জটিলা, নাই কুটিলা,—
নাইকো বিরহের জ্বালা,
শুধু গানে সুধাপানেই
দোঁহে খাসা কাটাই জীবন।

লাজ কেন ভাই, ও শ্যাম ডিয়ার,
মিসেস রাই যে আমি তুঁহার।
নবরঙ্গে কুঞ্জে বিহার
সঙ্গ তব কি অতুলন।

*

'আলোকে ও আঁধারে'র গানগুলি ভারী মজার শৃঙ্গাররসে ভরা। এই নাটকে স্ত্রী-পুরুষ অনেক চরিত্র ও অনেক গান আছে। নবভিবাকর সভার সভ্য মন্মথর মুখের একটি গান হ'ল--

বিয়েটা মন্দ নয় তো
দিনগুলো যায় বেড়ে মজায়!
বিয়ে ছাড়া জীবন যেন—
বাসায় বামুন রেঁধে খাওয়ায়।

একটু বয়েস-টয়েস হ'লে পরে
বউটি যদি থাকত ঘরে—
(তবেই) ভরা ঘরে ভরা প্রাণটা—
গুড়ে যেন মাছি লোটায়।

বউ ছাড়া যে ঘরটি কেমন—
রোদে ঘুরে রোদেই জিরোন—
(যেন) কোনও মতে গলায় ঢালা
রোদে তাতা জল পিপাসায়!

বিয়েটা যার হ'য়ে গেছে
ঘরে সে বেশ শুয়ে আছে
(আর) যে শালার জোটেনি সে
বাইরে বসে মশা তাড়ায়!

(বুঝি) বউ নেই তাই জীবনটাতে
পাচ্ছি না ছাই আরাম মোটে
(যেন) লেপটি বিনে শুয়ে আছি
শীতের ঠান্ডা বিছানায়।

—ক্ষপণক

বায়োস্কোপিরিত

এইচ জি ওয়েলস সাহেব তাঁর লেখায় এক অত্যাশ্চর্য টাইম মেশিনের রূপরূপ দিয়েছিলেন। বায়োস্কোপে সেই কাহিনীর চিত্ররূপ দেখে আমরা ত্বহা তাজ্জব—বাপস, বাস্তবিক এমন একটা মেশিন পয়দা করতে পারলে কত না মজার ঘটনা উল্লেখ করা যায়। ধরা যাক্ এই মুহূর্তে পরিস্থিতিটা সেইরকম, ইত্যবসরে আসুন টাইম মেশিনে চেপে আমরা একটু পিছিয়ে আমাদের কলকাতার বায়োস্কোপের সবচেয়ে বেশী মজা যে দশকে—সেই চল্লিশের দশকে চলে যাই। কী?

জেনে রাখুন, তখন সুদূর মাদ্রাজ থেকে প্রযোজকরা দলে দলে কলকাতায় আসতেন তামিল তেলেগু ভাষায় ছবি তৈরী করতে। এখন যেমন আসামীয়া, ওড়িয়া, মণিপুরী, মৈথিলী, ভোজপুরী ভাষাভাষী ছবি করতে তাঁরা সদলবলে এখানে আসেন, তখন তামিল তেলেগু ছবি এখানে এসে করা ছাড়া বড় উপায় ছিল না। মলিনা দেবী নিজে আমায় একদিন বললেন, ভাই, আমরা ইন্দ্রপুরী। এন টি স্টুডিওতে একই ছবির দুটি ভার্সনের শুটিং করেছি—

—মাদ্রাজী?

—হ্যাঁ, তা-ও করেছি।

—কিন্তু করতেন কিভাবে? তামিল ল্যাংগুয়েজ জানতেন?

মুচকি হাসি মলিনা দেবীর। —ডায়লাগ খুব কমই থাকতো। তাছাড়া আমরা ভিনদেশী ভাষা কাগজে লিখে নিয়ে মুখস্থ করতাম, ডায়লাগ ট্রেনার থাকতেন। উচ্চারণে ভুল হলে তিনি শুধরে দিতেন। বেশী কথা কি, এখনও হিন্দী ছবির ক্ষেত্রে ট্রেনার রেখে তবে অ্যাক্টিং করতে হয়। মোটকথা, ভাবটা ফুটিয়ে তুলতে পারলেই হল।

খাঁটি কথা। কলকাতায় তনুজা এই একই নিয়মে পরের পর কতকগুলো বাংলা ছবিতে অভিনয় করে গেছেন। বাংলা-হিন্দী মিলিয়ে অ্যাক্টিং করেছেন বহু অ-বাঙালী শিল্পী। আমাদের এখানকার নন্দিতা বসু সম্প্রতি যিনি 'নগরদর্পণে' ছবিতে অভিনয় করতে কিছুদিন কলকাতায় এসেছিলেন, তিনি তামিল ছবির একজন নামী অভিনেত্রী। ওখানে বেশ কিছু ছবিতে অভিনয় করে নন্দিতা বেশ প্রশংসা পেয়েছেন। লিলি চক্রবর্তী একটি তেলেগু ছবিতে বেশ সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। তেমনি জন বিশ্বনাথন খাঁটি দক্ষিণ ভারতীয় হয়ে বাংলা ছবিতে যা অভিনয় করছেন—দেখে তাজ্জব হতে হয়।

মলিনা দেবী সহাস্যে বললেন—ভাষাটা কিছু নয় ভাই, আসলে অভিনয়টাই বড়

অনজানে মেহমান / সুস্মিতা-সুখেন

সভাপণ্ডিত চাইছেন তিনশো আবার ন্যাড়া-ফ্যাড়া কি?

নীরেন লাহিড়ীর সপ্রতিভ ভঙ্গী। নাটোরের রাজবাড়ির ছেলে উনি। ব্যক্তিত্বে কারো চেয়ে কম যান না। সামান্য কেশে গলা সাফ করে বিব্রত ভংগীতে বললেন ওই তো বললাম সভাপণ্ডিতের কথা ওটা ঠিকই আছে কিন্তু মুস্কিল হয়েছে কি জানেন—মাদ্রাজের ব্রাহ্মনরা ন্যাড়া মাথার আবার ইয়াব্বড় বড় টিকি রাখে; সভাপণ্ডিত মানেটা এবার বুঝে নিন—

নীরেন লাহিড়ী ব্যস্ততার ভংগী করে ফ্লোরে ঢুকে গেলেন। আর এদিকে গান্ধী-পতন হবার উপক্রম। পরিস্থিতিটা বুঝতে কয়েক মুহূর্ত লাগল। অর্থাৎ এক্ষুনি তিনশো ন্যাড়া লোক চাই। শুধু ন্যাড়া হলেই চলবে না। সেই সংগে মাথায় টিকি থাকাও দরকার — মাদ্রাজী ব্রাহ্মনদের ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায়।

বিহ্বলকণ্ঠে বললেন— একত্রে তিনশো ন্যাড়া এখন পাই কোথায় বলুন তো? দাদা আজ দেখছি এক ভয়ংকর রিকুই-জিশান আমায় ধরিয়ে দিলেন...

নীরেন লাহিড়ী অমনি ফ্লোরের ভেতর থেকে—গান্ধীবাবু বাঙালী টেকনিশিয়ানদের প্রেস্টিজ আজ সব আপনার হাতে। আসল কথা মাদ্রাজী ফ্রেন্ডদের আজ দেখিয়ে দিতে হবে—হ্যাঃ আমরাও এক ডাকে তিন দুগুনে ছশো ন্যাড়া এনে ফেলতে পারি ক্যামেরার সামনে...

গান্ধীবাবুর চুল খাড়া। বোঁদে মিত্তির ও'র সহকারী। এতক্ষণ ঘাপ্‌টি মেরে ছিল। এবার রঙ্গমঞ্চে এল যেন।—ক্ষেপেছেন। এই কলকাতা শহরে তিনটি ন্যাড়া যদি একত্রে পান তো জানলেন আপনার কপাল ভাল তিনশো পাবেন কোথায়? নীরেনদার যেমন কথা—

—তাহলে?

—তাহলে নেই, এর মধ্যে তাহলে বলে কোন কথা নেই গাঁধিদা। লোকে ন্যাড়া হয় এক ছেরাদ্দে আর তেমন তেমন সংগিনী পেলে—

—বুঝলাম, কিন্তু একটা উপায় তো খুঁজে বের করতেই হবে। কাজটা আটকে গেলে তো ভাল কথা হবে না বোঁদে। রাগিসনে। ভেবে-চিন্তে একটা উপায় বের কর। তুই তো অসাধ্য সাধতে পারিস—

বোঁদে মিত্তির বিব্রত মুখে বললে—দাদা এ অসম্ভব।

গান্ধীবাবুর আকুতি—বোঁদে বোঁদে, মোটা কমিশন—। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিসনি বাপ। চেষ্টা করে দেখ—

তখন বোঁদে মিত্তির উবু হয়ে বসে বিড়ি জ্বালিয়ে চিন্তায় বসল। কি করে সমস্যার সমাধান হয়—ভাবতে লাগল। গান্ধীবাবুও তথৈবচ। এর মধ্যে নীরেন লাহিড়ী এক চক্কর ঘুরে গেলেন—ফ্লোরে লাইট করছি গান্ধিবাবু, একটু চটপট করুন—

[illegible]

[illegible] ভঞ্জ এবং নন্দিতা বসু

হঠাৎ জ্বলন্ত বিড়ি ফেলে বোঁদে মিত্তির লাফিয়ে উঠতেই গান্ধিবাবু সাগ্রহে —পেলি নাকি কিছু?

—একটা ফন্দি এয়েচে মাথায় গাঁধিদা—বলে গলা খাটো করে বোঁদে মিত্তির গান্ধিবাবুর কানে কিসব যেন বলল। শুনে গান্ধীবাবু বললেন মন্দ বলিস নি কিন্তু বোঁদে...তাহলে দেখি একবার কপাল ঠুকে তুই তাহলে এদিককার বন্দোবস্তটা করে ফেল্‌ আমি বোঁ করে ঘুরে আসি—

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর পেছনে তখন ছিল পেল্লায় এক বস্তি। নানান দেশের লোকেরা সেখানে সহবস্থান করতো। গান্ধীবাবু সেখানে সুপরিচিত। এই বস্তির কিছু লোক প্রয়োজনে বিভিন্ন ছবির এক্সট্রার কাজও করত।

গান্ধীবাবু যখন সেখানে পৌঁছালেন বস্তির লোকজন তখন সবে রুজিরোজ-গারের ধান্দায় বেরুবে বলে প্রস্তুত হচ্ছে। বেশীর ভাগই কুলি কামিনের কাজ তাদের। গান্ধীবাবুকে দেখে তারা ভীড় করে এল। ছবির কাজে তো কোন কায়িক পরিশ্রমের প্রয়োজন পড়ে না অথচ রোজগারটার বেশ ভাল টিফিন পাওয়া যায়, বসে বসে নট-নটীদের নানা মজা দেখা যায়। গান্ধী-বাবু একটা চায়ের দোকানের টুল টেনে নিয়ে তার উপর দাঁড়িয়ে প্রথমে কিঞ্চিৎ আওয়াজ দিলেন ফলে ভীড় যা ছিল তা নিমেষে ডবল হলো। এরপর গান্ধিবাবু ভেড়ে একখন্ড বক্তৃতা দিলেন—রীতিমত ওজস্বিনী ভাষায় বয়ানটা মোটামুটি এই রকম: অদ্য ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে বিরাট এক যজ্ঞের আয়োজন করা হইয়াছে। সেই যজ্ঞে প্রচুর সভাপণ্ডিত চাই। প্রত্যেক সভা-পন্ডিতের বিদায়েরও সুবন্দোবস্ত হই-য়াছে। প্রত্যেককে একটি টাকা একখন্ড গামছা এবং পেটচুক্তি ভুরিভোজন। চলুন বন্ধুগণ আজ সদলবলে ঝাঁপাইয়া পড়ি।

শুনে শ্রোতাদের মধ্যে বিপুল চাঞ্চল্য দেখা গেল।

দরকার তিনশো, ঝাঁপিয়ে এলো চারশো।

গান্ধিবাবুর হুঙ্কার—তফাৎ যাও লাইন দিয়ে দাঁড়াও—

নিমেষে লাইন হল। কিছু লোক হঠাৎ ভলান্টিয়ারী শুরু করে দিল— একে বাদ দেয় তাকে ঢুকিয়ে দেয়। গান্ধীবাবু লাইন দেখে খুব খুশী। বেছে বেছে রোগা পটকা দেখে তিনি শ'তিনেক লোক নির্বাচন করে নিলেন। যারা বাদ পড়ল তাদের তো মুখ শুকিয়ে আমসী।

এবার মিছিল চলল স্টুডিওর দিকে। এমন অভিনব ঘটনা ইতিপূর্বে এখানে কেউ দেখেনি সবার চক্ষুস্থির।

ওদিকে স্টুডিওতে রিহার্সাল যা সেবার বোঁদে মিত্তির আগেই দিয়ে রেখেছিল। মিছিল যাঁহাতক স্টুডিওতে ঢোকা—দড়াম করে লোহার গেট বন্ধ হয়ে গেল চোখের ইসারায়। তারপর শুরু হল সেই ঐতি-হাসিক ঘটনা। স্টুডিওর ভোজপুরী দ্বারোয়ানরা তাদের লাঠিসোটা বের করে

[illegible] ও [illegible]ভাবের আর হুঙ্কার। [illegible]। এ কিরে বাবা! [illegible] জন্যে ছায়া অন্দী [illegible]। আমায় ওপর বন বন [illegible] আর হুঙ্কার ছাড়ছে বিকট [illegible] এমনে চেহারা দেখে [illegible] বৃহৎ-পঞ্চ-নাশিত মার্ডার্স— [illegible] এঁয়ারা এমন করছেন কেন গো? [illegible] তখন।

[illegible] বৌদি মিত্তিরের মুখ্যভূমিতে [illegible]। [illegible] মূর্তি অর। মাদ্রাজী [illegible] হতভম্ব। ব্যাপার স্যাপার দেখে [illegible] চোখও ছানাবড়া। হঠাৎ বৌদি মিত্তিরের হুঙ্কার—হ্যাজমলোল আঁও [illegible] আও!

[illegible] সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল জঙ্গ-[illegible] মনসুন্দর ঝটপট বেরিয়ে আসছে একটা ঘর থেকে। প্রত্যেকের হাতে একটা করে ধারালো ক্ষুর আর জলভরা বাটি। শুধু পণ্ডিতের দল বিস্ময় লর্ডাস। হঠাৎ [illegible] কেন?

বৌদি মিত্তিরের কঠিন নির্দেশ শোনা গেল—কামিয়ে দাও!

খাঁড়া কলা মনসুন্দরের দল সোৎসাহে এবং তীব্র বিক্রমে তাদের কাজে লেগে পড়ল। একজন করে ধরে মাথায় জল চাপড়ে দেয় তারপর চকচকে ক্ষুর দিয়ে নিমেষে মাথা চেঁচে সাফ করে দেয়। জেগে থাকে শুধু একখণ্ড টিকি।

মোখে পণ্ডিতদের মধ্যে মড়াকান্না পড়ে যায়—বাবাগো মাগো করুণ রবে অকুস্থল মুখরিত হয়ে ওঠে। পালাবার চেষ্টা বৃথা। ওদিকে মস্ত প্যালোয়ানের দল লাঠি হাতে থেকে থেকে রণহুঙ্কার ছাড়ছে। পালায় কার সাধ্যি। হাতে পায় ধরাধরি—চাই না গো—গামছা, টাকা ভুজিভোজ কিছুই চাই না, ছেড়ে দাও গো।

একদিকে এক ট্রিটমেন্ট অন্যদিকে স্নাক ট্রিটমেন্ট—ক্ষুরের মাঝে পড়ে সভাপণ্ডিতের ভূতের হুটোপাটি। ওপাশে দৌড়ের আস্ফালন —আমার উত্তম কিলবিল করছে ব্যাটাদের [illegible] দিয়ে কোথায় উপগার করছি, কোথায় খুশী হবে তা না কেঁদেকেটেই মলো...অ্যাই তোপরাও মুখ্যুর দল......

একটা করে ন্যাড়া হয় প্লাস টিকি, নর-সুন্দর তাকে ছাড়লে ধরে মেক-আপম্যান! সে মুখে খাবড়া মেরে জোরে রং মাখিয়ে ছাড়তেই ধরে ফেলে কস্ট্যুমম্যান—সে শর্ট করে সভাপণ্ডিতের পোষাক পরিয়ে দেয়। জোরে লাইট রেডি হয়ে গেছে। পরিচালক একে একে সব দেখে গান্ধীবাবুর ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন—তাড়া দিয়ে গেছেন এটু হাত চালিয়ে কাজটা শেষ করে দিন। আমি শট নেবার জন্যে তৈরী।

সেদিন বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ গান্ধীবাবুর নেতৃত্বে তিনশো দিশী সভা-পণ্ডিত প্রোসেশান করে হাজির হল তেলেগু ছবির বিরাট রাজদরবারের সেটে। পণ্ডিতদের জুলজুল চাউনি। তাদের মুখে আর ভাষা নেই। মাদ্রাজী ডায়লাগ শুনে যেটুকু আশা ছিল তাদের মনে তাও অন্তর্হিত। বেলা একটায় অবাক কাণ্ড ক্লাপস্টিক পড়ল যথা-রীতি। এখন যদি কোনদিন টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে যান একবার স্মরণ করাবেন গান্ধী-বাবুকে। বেশীরভাগ সময় ওঁর ওখানেই কাটে। যত্ন করে পাশে বসিয়ে বিগত দশকের চলচ্চিত্র নির্মাণ পর্বের যেসব গল্প উনি শোনাবেন তা নিশ্চিতই আপনার স্মৃতিতে অমর হয়ে থাকবে। গান্ধীবাবু প্রসঙ্গে লিখতে লিখতে আর একটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে। শুনুন। আমার নিজেরই অভিজ্ঞতা সেটা। ওই ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে 'রক্ততিলক' ছবি উঠছে। বিশ্বজিৎ বোম্বে থেকে এসে আমায় বলে গেলেন ভাই ক্যাকাজের যে দলটা সিলেকশান করবে সেটা বেশ দেখে শুনেই করো। ছবিতে একটা চরিত্র ছিল শ্যামলাল নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ হতে হবে তাকে, রীতিমত পেলওয়ানী, মাথা অবশ্যই ন্যাড়া হবে। আর সেই বিশেষ চরিত্র খুঁজে বের করতে আমরা কজন হিমশিম খেয়ে গেলাম। কলকাতার যত পালোয়ান আছে মোটামুটি সবাইকে দেখা হল কিন্তু কেউই আর ন্যাড়া হতে চায় না। যারা চাইল তারা আবার অ্যাক্টিং করতে পারে না। আমরা রোজই স্টুডিওতে পালোয়ানদের ইন্টারভিউ নিই কিন্তু কিছুতেই আর পছন্দ হয় না।

একদিন স্টুডিওতে গিয়ে দেখি জনা-আষ্টেক পালোয়ান আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। সবাই বাঙালী। প্রত্যেকেরই বলিষ্ঠ চেহারা। ছাতি সাধারণ চল্লিশ ফোলালে চুয়াল্লিশ। সবাইকে প্রথমে চা কফি দিয়ে আপ্যায়িত করা হল। তারপর ধীরে সুস্থে যেই বলা—আচ্ছা মশাই আপনারা ন্যাড়া হতে পারবেন তো?

—অ্যাঁ ন্যাড়া হতে হবে? সর্বনাশ—

বললাম—চরিত্রের ওটাই হবে বিশেষত্ব। আর শুধু একবার ন্যাড়া হলে চলবে না ছয় মাস ধরে ছবির কাজ চলবে ওই ছয় মাসই ন্যাড়া থাকতে হবে? পারবেন?

শুনে ছয়জন উৎসাহী পালোয়ান-অভি-নেতা তৎক্ষণাৎ ভীমবেগে সটকে পড়লেন বসে রইলেন মাত্র দুজন। তাঁরা তখনও আশা ছাড়েননি। একজন তো সাজেস্ট করলেন—আচ্ছা স্যার যদি অভয় দেন তো একটা কথা বলি—

—বলুন।

পালোয়ান ঢোক গিলে বললেন—ইয়ে বাজারে তো আজকাল কতরকম আর্টি-ফিশিয়েল জিনিষ বেরিয়েছে—টাক বা ন্যাড়া হওয়া যায় যদি সেদিক দিয়ে ব্যাপারটা—

বলা হল—দেখুন আর্টিফিশিয়েল ব্যাপারটায় আমাদের আপত্তি আছে। আর তাছাড়া ক্যামেরার লেন্সের সামনে তো কোন জারিজুরি খাটবে না ধরা পড়ে যাবে। না না কংপালসারি ন্যাড়া হতে হবে মশাই।

এতে ওঁরা যা বোঝার বুঝলেন। এবং মানে মানে সরে পড়লেন।

অতএব চলেছে খোঁজাখুঁজি। পছন্দও হয় কাউকে কাউকে। কিন্তু ন্যাড়া প্রসঙ্গ এলেই দুদ্দাড় পালিয়ে যায় মানুষ। সে-এক যন্ত্রণা। আমরা ভাবি—দেশের হলো কি অ্যাঁ? সামান্য ন্যাড়া অথচ তাও হতে চায় না কেউ! অথচ বোম্বেতে দেখ—পেঠি হলিউডে দেখ—

[illegible] : মাধবী ও জহর

য়েল রাইনার ন্যাড়া হয়ে যেমন বাজার গ্রাস করছে। ইদানীং জুলফি-ই ভোবাচ্ছে সবাইকে। মাথায় চুলের নামে তেমন খোঁজ নই অথচ জুলফি একটা ইয়াব্বড় আছেই। ক করে থাকে কে জানে!

আমাদের তখন মরিয়া অবস্থা। শুটিং-এর দিন আগতপ্রায় অথচ শ্যামলালের চরিত্রে আর লোক খুঁজে পাওয়া যায় না। বিশ্বজিৎ বোম্বে থেকে ট্রাঙ্ক ফোনে জানালেন—তাহলে কি শেঠিকে নিয়ে যাব? তাড়াতাড়ি তোমরা কনফার্ম করো—

আমরা বলি—আর দু একটা দিন সবুর করো। ফাইন্যাল জানাচ্ছি।

হঠাৎ এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। দীনেন গুপ্তর 'মর্জিনা আবদাল্লা' ছবিতে অভিনয় করতে এসেছিল। দারুণ চেহারা। প্রোডাকশন ম্যানেজার কমলকে বললাম—নজর রাখো যেন পালিয়ে না যায়।

ভদ্রলোকের নাম দাশু নাগ। ওই তো বিশাল ব্যায়ামবলিষ্ঠ চেহারা কিন্তু এমন নিরীহ মানুষ আমি ইতিপূর্বে দেখিনি। হাওড়ার কোন এক বাজারে নিজের একটি দোকান আছে দশকর্মা ভাণ্ডার ধরনের সখের মধ্যে মাছধরা আর যাত্রা করে বেড়ানো। বাঁধা ভীম। কখনো-সখনো ভাবনা কাজী। মাইথোলজিক্যাল যাত্রায় বেশ নাম-ডাক আছে। দাশুবাবুকে ছবির প্রস্তাব দিতে ভদ্রলোক তো লাফিয়ে উঠলেন—নিশ্চয় নিশ্চয় করব। বায়োস্কোপে অভিনয় করতেই তো এসেছি সখী—

—পারবেন?

—নিশ্চিত।

কমল প্রায় বলেই ফেলেছিল। আমি তাড়াতাড়ি ইসারা করে মানা করলাম। শুধু বললাম—ঠিক আছে। কাল দশটায় এখানে আপনার শুটিং চলে আসবেন।

দাশু নাগ হৃষ্টমনে চলে গেলেন। কমলকে বললাম—বিচ্ছু না, একজন নরসুন্দর ডেকে রেখো। দেখা যাক কি হয়।

—যদি রাজী না হয়?

—হবে। কায়দা করে রাজী করাতে হবে। ছবির শুটিং তো আর আপসেট করা যায় না। বিশ্বজিৎ আজ ইভনিং ফ্লাইটে আসছে বোম্বে থেকে।

পরদিন সকালে দাশু নাগ স্টুডিওতে রিপোর্ট করলেন। বললাম—এঃ, এত তাড়াতাড়ি এলেন। শুনুন একটা কাজ করতে হবে।

—বলুন।

—ইয়ে, ঝট করে ন্যাড়া হতে পারবেন?

বিহ্বল দৃষ্টি দাশু নাগের।—কেন বলুন তো? আমি তো বাড়িতে কিছু বলেও আসিনি—

—তাতে কি হয়েছে। ব্যাটাছেলের অত বলাবলি কিসের? আমরা পার্টটা একটু

প্রেমের ফাঁদে
আরতি ভট্টাচার্য, শর্মিলা দাস ও জহর ব্যানার্জি

বাড়াব ভাবছি, ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট ক্যারেক্টার তো, ন্যাড়া হলে চরিত্রটা দারুণ খুলবে—

—অ।

—চিন্তা করবেন না, এ বাবদ পয়সাও একটু বেশী দেওয়া হবে। যান ন্যাড়া হয়ে আসুন—

—কিন্তু...

—কোন কিন্তু নয় মশাই। ফিল্মে ওরকম এটু-আটু করতেই হয়। কমল, এঁকে নিয়ে যাও ভাই। ন্যাড়া করে কস্টিউম পরিয়ে সোজা ফ্লোরে নিয়ে চলে এস।

ভদ্রলোক কিছু বলবার আগেই ক্ষুর তার কাজ আরম্ভ করে দিল, নিমেষের মধ্যে মাথা বিলকুল সাফ। দাশু নাগের হতভম্ব ভাবটা তখনও কাটেনি। বিড় বিড় করে কি-সব বকতে বকতে কিছুক্ষণ পর ফ্লোরে এসে হাজির। বাঃ চমৎকার দেখাচ্ছে। ওহে, কে আছ, ওর হাতে একটা বন্দুক ধরিয়ে দাও।

পরদিন সকালে ভদ্রলোক উত্তেজিত-ভাবে হাজির। এঃ, আমার যা সর্বনাশ করলেন আপনারা...

ভদ্রলোক রাত্রে বাড়ী ফিরেছিলেন যেমন রোজ ফেরেন। দরজা খুলে ওঁর স্ত্রী ওঁকে দেখে প্রথমে অবাক, পরক্ষণে হাউমাউ কান্নাকাটি—ওগো তোমার একি দশা হলো। ভদ্রলোক যত বোঝান, আরে এটা ছবির জন্যে স্ত্রীর মড়াকান্না তাতে আরও বাড়ে—ছবি-টবি মিথ্যে কথা, তুমি নিশ্চয় কিছু করেছ তাই তোমার মাথা কামিয়ে দিয়েছে, ওগো আমার কি হলো গো...। হট্টগোলে ঘুমন্ত ছেলে-মেয়েরা জেগে উঠেছিল। তারা বাবাকে ন্যাড়া দেখে কি উল্লাস—এমা বাবা ন্যাড়া বাবা ন্যাড়া। ধমক দিলেও শোনে না। পাড়াপড়শীরাও ছুটে এসেছিল। দাশু নাগকে দেখে তাদেরও নানা সন্দেহ।

এই তো গেল। মাসখানেক পর দাশু নাগ একদিন স্টুডিওতে এসে একটা গল্প বললেন : বাঁকুড়ায় কলেজ স্ট্রীট দিয়ে। ন্যাড়া মাথা। হঠাৎ মাসীমার সঙ্গে দেখা। তিনি আমায় দেখে প্রথমে ডাক করে কেঁদে একসা। বললেন, হ্যাঁরে দিদি যে আমায় তার তিন ভরির বিছেহারটা দিয়ে যাবে বলেছিল, সেটা রেখে দিয়েছিস তো? যত বলি না না মাসীমা তত বলেন, ওরে দিদি আমায় বড় ভালবাসতো রে, বিছেহারটা আমায় দেবে তখুনি বলেছিল কেন যে পোড়া কপাল নিলাম না, ওরে তোর মা আমায় দেবে বলেছিল রে ও দাশু......

—রঞ্জন মজুমদার

কলকাতায় ইরাণের ছবি

গত মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে সিনে ক্লাব অফ ক্যালকাটা ও নয়াদিল্লীস্থ ইরান সরকারের রাষ্ট্রদূত অফিসের সাংস্কৃতিক বিভাগের যৌথ উদ্যোগে কলকাতায় ইরানের কয়েকটি ছবি দেখানো হয় নির্দিষ্টসংখ্যক দর্শক সমীপে।

ইরানের নিজস্ব চলচ্চিত্র নির্মাণের বয়স বেশী নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ইরানের শিল্পীদের নিয়ে পার্শী ভাষায় প্রথম ছবি তোলা হয় ভারতে। আর ইরানে তোলা তাদের নিজস্ব ছবি তৈরী হয় ১৯৪৮ সালে।

অতএব সেদিক থেকে দেখতে গেলেও ইরানে তোলা ছবির সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য হবার কথা নয়। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় চলচ্চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে তার ক্রমোন্নতি ইতিমধ্যেই বিশ্বের অন্যান্য চলচ্চিত্রশিল্পে উন্নত দেশগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

গত ১৯৭১ সালে ইরানের ছবি ভেনিসে অনুষ্ঠিত চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয় এবং পরে ইরাণী ছবির অভিনেতা চিকাগোয় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার লাভ করেন।

নতুন ভাবনা রীতির ছবি তৈরীর প্রচেষ্টাও ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে ইরানে। এই জাগরণের জন্য ইরানের চলচ্চিত্রশিল্প যে তিনজন চিত্রপরিচালকের কাছে ঋণী তাঁরা হলেন যথাক্রমে ইব্রাহিম গুলিস্তাঁ, ফারোক ঘাফারি এবং ফেরিদুন রাহনেমা।

এর পরবর্তী পর্যায়ে যেসব তরুণ পরিচালক নতুন গল্প ও সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতিতে ছবি তৈরীর কাজে এগিয়ে এলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম মাসুদ কিমায়েই ও ড্যারিউস মেহরজুই।

মাসুদের 'কাইসার' এবং ডেরিয়ুসের 'দি কাউ' বলা যায় সর্বপ্রথম তাদের চমৎকারিত্বের জন্য বহির্বিশ্বের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এছাড়া তরুণতর চিত্রপরিচালকদের মধ্যে বাহরাম বেইজাইর 'ডাউনপোর' ও 'দি স্প্রিং' 'পরীক্ষামূলক ছবি' হিসেবে ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত প্রথম তেহরান আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভালে বিদেশী সাংবাদিকদের বিস্মিত করে।
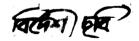
উক্ত উৎসবেই দারিয়ুস মেহরজু নতুন ছবি 'দি পোস্টম্যান' আলাদাভ দেখানো হয়। এই ছবিটি একটা আল আমেজ গড়ে তোলে দর্শকদের মনে।

এই সার্থকতার ফলে ইরানী চল শিল্পের ক্ষেত্রে একটা আলোড়নের স হয় এবং নতুন ভাবনা চিহ্নিত ছবি ক দিকে ঝোঁক আসে।

ফলে ১৯৭২-৭৩ সালে তৈরী হয় না তাগভাই পরিচালিত 'সাদেক দি কু ভেনিসে অনুষ্ঠিত শিশু চলচ্চিত্র উৎ গ্রান্ড প্রিকস পুরস্কার লাভ তাগভাইর 'ট্র্যাংকুয়িলিটি' ছবিটি।

দ্বিতীয় যে ছবিটি নানা কা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তার নাম মোঙ্গলস'। 'দি মোঙ্গলস'-এর পরিচা পারভিজ কিমিয়াভি।

ছবি তৈরীর জগতে এই জোড় কেবার দ্যালাই আজ ইরানকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছে।

ইরানে এখন মোট ১৫টি স্টুডিও এবং ১০টি ডাবিং স্টুডিও আছে। তবে ছবি দেখার দর্শক যে অনুপাতে বেড়ে গেছে ওখানে সেই অনুপাতে ছবি তৈরীর সংখ্যা না বাড়ায় বিদেশী ছবি এখনও ওখানে খুবই জনপ্রিয়।

এখানে যে ছবিগুলি দেখানো হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখ্য ছবি 'টুপোলি'র কাহিনীসার এইসঙ্গে দেওয়া হোল।

টুপোলি

ইশা এবং টুপোলি সম্পর্কিত ভাই। কাজও করত একই খামারে। দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব গভীর। কিন্তু স্বভাবে দুজনের মধ্যে অনেক তফাৎ। ইশা চটপটে এবং একরোখা কিন্তু টুপোলি আপাতত খুব মজাজের ছেলে হলেও একটু কাব্যিক এবং উদাস। তার মনটা যেমন খুবই নরম, তেমনি তার দুচোখের তারায় কেমন এক রকমের কামনার ছায়া ভাসা ভাসা ভাবে ছায়া ফেলত। এবং মেয়েদের সম্পর্কেও সে প্রায় নিরাসক্তই ছিল।

কিন্তু ইশা ইতিমধ্যেই খামারের মালিকের অবিবাহিতা মেয়েকে ভালবাসতে শুরু করে দিয়েছিল।

একদিন খামারের মালিকের সেই মেয়েটি যখন টুপোলির নিজের হাতে খরগোসের জন্য তৈরী করা ঘরের ওপর জল ছুঁড়ে মারল তখন হঠাৎই টুপোলির মাথায় রক্ত চড়ে গেল। ছুটে গিয়ে সে রাগে মেয়েটির গলা টিপে ধরল। কিন্তু মেয়েটি কোন রকমে পালিয়ে যেতে সমর্থ হওয়ায় টুপোলির তখন খুব ভয় হোল সহসা।

ঘটনাটা ইশাকে বলাতে সেও খুব ভয় পেয়ে গেল তার পরিণতির কথা চিন্তা করে।

শেষ পর্যন্ত ভয়ের আতঙ্কে দুই ভাই-ই গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে ছুটতে আরম্ভ করে দিল দিকবিদিক ভুলে।

ছুটতে ছুটতে গ্রামের শেষ প্রান্তের নদীটা পেরিয়ে তারা এক শহরে এসে পৌঁছুলো।

তখন তারা ঠিক করল যে, আর তারা গ্রামে ফিরবে না। এখানেই একটা চাকরী জোগাড় করে থেকে যাবে।

শেষ পর্যন্ত তারা দুজনেই চাকরী জুটিয়েও নিল স্থানীয় একটি কাঠের কারখানায়।

এই কাঠের কারখানার মালিক লোকটা এমনিতে দেখতে বেশ শক্তসমর্থ এবং স্বাভাবিক মনে হলেও তার স্ত্রীর মনে সুখ ছিল না। তার কারণ লোকটি পুরুষত্বহীন ছিল। ফলে তার স্ত্রীকে দৈহিক সুখের অন্বেষণে অন্য পুরুষের প্রতি ঝুঁকতে হয়।

টুপোলিরা যখন ওখানে, তখন মেয়েটি কারখানার ম্যানেজারের প্রতি আসক্ত [illegible] লোকটি তাকে বিশেষ প্রশ্রয় দেয় না।

ফলে সুঠাম গঠন, উদাস উদাস চাহনিযুক্ত টুপোলির প্রতি তার সহজেই নজর পড়ল। একদিন মেয়েটি তার স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে তাকে ডেকে একদম নিজের শোবার ঘরে নিয়ে উন্মত্তের মত ব্যবহার করতে থাকে এবং তার সঙ্গে শোবার জন্য অনুনয় করতে থাকে, তখন সে মেয়েটির আসল উদ্দেশ্যটা অনুমান করে রীতিমত ঘাবড়ে যায়। আর ঠিক তখনই কারখানার ম্যানেজার সেখানে হঠাৎ উপস্থিত হতে ব্যাপারটা সেদিন আর বেশীদূরে গড়াতে পারেনি।

কিন্তু সেই কথাটাই রং চড়িয়ে চাউর হয়ে যায় কানে চারদিকে। টুপোলিকে নিয়ে লোকে মুখরোচক আলোচনা করতে থাকে।

কথাটা শেষ পর্যন্ত মালিকের কানে পৌঁছুতে সে প্রচণ্ড রেগে গিয়ে টুপোলির কোয়ার্টারে এসে তাকে ধরেই প্রচণ্ড মার দিতে থাকে। টুপোলিকে অসহায়ভাবে মার খেতে দেখে সহ্য করতে না পেরে ইশা তাকে প্রথমটা ঠেকাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে সে ব্যর্থ হয়ে টুপোলিকে উত্তেজিত করে তোলে উল্টে মার দেবার জন্যে। শেষ পর্যন্ত টুপোলি আর কিছু না করে আত্মরক্ষার জন্য মালিকের হাতটা ধরে মচড়ে ভেঙ্গে দেয়।

এরই কিছুদিন পরে একদিন টুপোলি যখন বনের মধ্যে ছুটে ছুটে বুনো ইঁদুর ধরে মারছিল তখন হঠাৎই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হোল মালিকের স্ত্রী।

টুপোলিকে নির্জনে পেয়ে সে যেন আবার আদিম হয়ে উঠলো এবং সুখের আকাঙ্ক্ষায় তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললো।

টুপোলির নরম ভেলভেটের মত চুল, তার ভাসা ভাসা দৃষ্টি সুঠাম পৌরুষ মহিলাটিকে উন্মাদ করে তুলেছিল।

কিন্তু টুপোলির উদাস, কারুণ্যে স্পর্শকাতর অথচ বিপরীতধর্মী মন তাতে সায় দেয়নি। তাকে কোন ক্রমশঃই আকর্ষণ করতে পারেনি। বরং সে মহিলাটির উন্মাদ ব্যবহারে একসময় সে উত্তেজিত হয়ে কোন কিছু না ভেবেই হঠাৎ খুন করে বসল তাকে।

খবরটা মালিকের কাছে পৌঁছুতেই সে ক্ষিপ্ত হয়ে কারখানার অন্য সব কর্মচারীদের নিয়ে টুপোলি ও ইশাকে খুন করতে গেল।

ইশা ব্যাপারটার পরিণতি অনুমান করে এবং টুপোলির ব্যবহারে উত্তেজিত হয়ে মালিক তার দলবল নিয়ে আক্রমণ করবেই একটা পিস্তল নিয়ে ছুটে গেল বনের দিকে এবং টুপোলিকে দেখা মাত্রই তাকে গুলি করে হত্যা করে নিজেই স্বেচ্ছায় উন্মত্ত জনতার হাতে ধরা দেয়।

এ কাহিনীতে আধুনিকতা বা মনস্তত্ত্বের বিশেষ স্পর্শ নেই। তবে আপাতে নীতিকথার গল্প মনে হলেও একটা মানসিকতার স্পষ্ট ছোঁয়া থেকে গিয়েছে। বিপরীত স্বভাবের নায়কের মনে হঠাৎ খুন করার প্রবৃত্তি জেগে ওঠাই সেই মানসিকতা। আসলে সাধারণের পাশাপাশি সে বিপরীতধর্মী একটা চৈতন্যের যা কোন কিছু (সেটা যে কোন রূপ বা নিষ্ঠুর কাজও হতে পারে) করার জটিল মানসিকতা কাজ করে, এ গল্পে সেই কথাই বলা হয়েছে।

ছবিটি পার্শি ভাষায় তোলা। পরিচালনা করেছেন রেজা মীর লোহী।

প্রধান কয়েকটি ভূমিকায় অভিনয় করেছেন যথাক্রমে হুমায়ুন জাম খোশকার্নি, মার্জেনা ও আখিল।

অভিনয়ে নাটকীয়তার ছাপ থাকলেও কোন কোন ক্ষেত্রে ছবিটি মনকে খুবই নাড়া দেয়।

ছবিটি সাদা কালোয় তোলা।

সবশেষে একটি কথা। আমরা আশা করবো অদূর ভবিষ্যতে আরো কয়েকটি, পরীক্ষামূলক এবং বর্তমান ইরানের প্রতিনিধিত্বমূলক ছবি (কোন উৎসব মারফৎ) এদেশে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে।

শা, র, চ

জয়া ভাদুড়ী

কোরা কাগজ

সাম্প্রতিককালের হিন্দী ছবির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে।

(প্রযোজনা : শ্রীজি ফিল্মস)

ইদানীং বোম্বেতে একাধিক সফল বাংলা ছবির হিন্দী সংস্করণ হচ্ছে। অবশ্য সর্বভারতীয় দর্শক ও হিন্দী ছবির বক্স অফিসের কথা চিন্তা করে এসব ছবির প্রযোজকগণ অকারণে নৃত্যগীত, হাস্যকৌতুক পরিবেশন করে আশুতোষ চিত্রামোদীদের সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করেন। 'কোরা কাগজে'ও কৌতুক মুহূর্ত এবং একাধিক গানের ব্যবস্থা আছে। তবু অন্যান্য তথাকথিত হিন্দী ছবির চেয়ে এ-ছবি পৃথক, সেটা সম্পূর্ণ ছবিটি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়।

অর্চনা ও অরুণা দুই বোন খুব সুখী, কারণ ওরা বিলাস এবং ঐশ্বর্যের মধ্যে দিয়ে লালিত পালিত হচ্ছে। অভাব কী বস্তু সেটা ওদের জানা নেই। বাবা সদাশিব শান্ত। তিনি কলেজের অধ্যক্ষ, সর্বদা নিজের পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত। মা তাঁর সোসাইটি এবং ধনীপনা, অর্থাৎ নিজেদের অতুল ঐশ্বর্য লোককে দেখাবার জন্যে ব্যস্ত। সুতরাং অর্চনা একজন মনের মতো মানুষের অভাবে সর্বদা মনমরা হয়ে থাকে। ওর ভাই এবং ভাইয়ের বন্ধু এবং ছোট বোন অরুণার মাধ্যমে যেটুকু হাস্য ও কৌতুককর ঘটনার অবতারণা করা হয়, সেটুকু অবশ্য অর্চনা উপভোগ করে। তবে বাকী সময় ভবিষ্যতের জন্যে চিন্তিত থাকে। এই পরিস্থিতিতে বাসে এক অপরিচিত সুবেশ সুপুরুষ ব্যক্তির সঙ্গে অর্চনার পরিচয় হয়। ভদ্রলোককে ভুল বুঝে তাঁর ওপর সে বিরক্ত হয়। এক পার্টিতে সেই সুবেশ তরুণের সঙ্গে আলাপ হয় সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে। তারপর বলা বাহুল্য দিন দিন ওরা ঘনিষ্ঠ হয়। ছেলেটির নাম সুকেশ। সংসারে বয়স্ক পিসিমা ছাড়া তার আর কেউই নেই। অর্চনার মার ইচ্ছা ছিল অর্চনার ভাইয়ের সচ্ছল এবং সরল বন্ধুর সঙ্গেই অর্চনার বিয়ে দেবেন, কিন্তু বাবার ইচ্ছায় এবং অর্চনার কঠোর প্রতিজ্ঞার জন্যে অবশেষে সুকেশের সঙ্গে সকলের সম্মতিক্রমে অর্চনার বিয়ে হোল। বিয়ের পর প্রথম কদিন বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই ওদের জীবন কাটলো। সংসারে সুকেশের ছিলেন একমাত্র পিসিমা, উনি সহজেই অর্চনাকে আপন করে নিয়েছেন। এবারে এদের সংসারের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে কাশীবাসী হবেন তিনি। কিন্তু পিসিমা ঘুণাক্ষরে বুঝতে পারেন নি যে ঘটনাচক্রে তাঁকে এত শীঘ্র কাশীতে চলে যেতে হবে সুকেশ ও অর্চনাকে ছেড়ে। বিয়ের পর থেকে দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে অর্চনার মা সুকেশের পিসিমাকে অপমান করবার চেষ্টা শুরু করেছিলেন। অর্চনার কষ্ট হবে, তাই ওদের বাড়ীতে টেলিফোন এলো। এরপর পালাপার্বনে প্রায়ই ওদের আমন্ত্রণ হতে লাগল অর্চনার বাপের বাড়িতে। সেখানে আত্মীয়-স্বজনদের কাছে ফলাও করে অর্চনার মা অর্চনার ও সুকেশের নানাবিধ গুণের কথা বলতে শুরু করলেন। যেমন—সুকেশ শীঘ্রই থিসিস জমা দেবার ব্যবস্থা করছে; তারপর সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবার জন্যে লণ্ডন রওনা হচ্ছে। অথচ আসলে এর এক বিন্দুও সত্য নয়। সুতরাং একদিন যখন এজাতীয় কথা সুকেশের কানে এল, সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলো এর প্রতিবিধান করবে। তবে কিভাবে নেবে সেটা বোঝা যায় নি। এদিকে অর্চনা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করল যে, এজন্য অধ্যাপকের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করা ছাড়া তার আর উপায় নেই। ফলে হল ডিভোর্স।

ছাড়াছাড়ি হবার পরেও অর্চনাকে দেখে নীরব থাকবার চেষ্টা করে সুকেশ। তারপর এক ষ্টেশনে আচমকা ওয়েটিংরুমে দেখা হয়ে গেল আবার ওদের। কুশল প্রশ্নের আদানপ্রদান করতে গিয়ে ওরা বুঝল কেউ কাউকে ভোলে নি, বাইরে বিচ্ছেদ হলেও ভেতরে ওরা একই আছে।

"সাত পাকে বাঁধা"র কাহিনীকার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসকে চলচ্চিত্রায়িত করতে গিয়ে কিছু পরিবর্তন পরিচালক অনিল গাঙ্গুলী পরিহার করতে পারেন নি। বাংলা সংস্করণের সুচিত্রা সেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যালের সঙ্গে অভিনয়ের কোন তুলনামূলক বিশ্লেষণ না করেই বলা যায়, অর্চনা রূপী জয়া ভাদুড়ী, সুকেশ রূপী বিজয় আনন্দ এবং অর্চনার মা ও বাবার চরিত্রে অচলা সচদেব এবং এ কে হাঙ্গলের অভিনয় সত্যিই প্রশংসনীয়। অন্যান্য ভূমিকায় নাজনীন (ছোট বোন), দেবেন ভার্মা (ভাইয়ের বন্ধু), মেশোমশায় ও মাসীর চরিত্রে রমেশ দেও এবং সীমা এবং ভাইয়ের চরিত্রে অনন্ত রাঠোরের অভিনয় যথার্থ মর্মগ্রাহী। পরিচালক অনিল গাঙ্গুলী তাঁর প্রথম ছবিতে বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন। আলোকচিত্র গ্রহণে এবং সম্পাদনায় যথাক্রমে গুরু দত্ত ও অনন্ত রাঠোর এবং সঙ্গীত পরিচালনায় কল্যাণজী আনন্দজী তাঁদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

—চিত্রদূত

অভিনয়গুণে, জনপ্রিয় কাহিনীর রূপায়ণে এবং পরিচালনার গুণে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।
(প্রযোজনা : রূপশ্রী ইন্টারন্যাশনাল)

"সাগিনা" (হিন্দী)

তপন সিংহের পূর্ববর্তী হিন্দী ছবি "জিন্দেগী জিন্দেগী" "কালিকের অতিথি" ছবিরই হিন্দী রূপান্তর, মিলনান্তক কাহিনীর জন্যে খুব সাফল্যলাভ করে নি। এবার "সাগিনা" সাগিনা মহাতোর হিন্দী সংস্করণও বাংলা সংস্করণের মতো মনোরম হয় নি। হয়তো তপন সিংহ এবার কেবল বাঙালী দর্শকদের কথা ভাবেন নি, সর্ব-ভারতীয় দর্শকদের কথাও ভেবেছেন। সেজন্যে হিন্দী ক্রাইম ছবির মতো দৃশ্য গ্রহণ করেছেন। দিলীপকুমার থ্রিল বন্দের সব ছবিতে খুব আস্তে আস্তে সংলাপ বলেন, অন্যান্য চরিত্রগুলির মতো তাঁকে দিয়েও খুবই উচ্চগ্রামে সংলাপ বলিয়েছেন। অর্থাৎ জননায়ক হলেই তাকে যেন চিৎকার করতে হবে। অথচ "সাগিনা মাহাতো"তে এত উচ্চগ্রামে ওঁকে সংলাপ বলতে হয় নি। হয়তো পরিচালক ছবির বক্সঅফিসের সাফল্যলাভের কথাও চিন্তা করেছেন। সংলাপ রচনায় বাংলা ও হিন্দী দুভাষারই সাহায্য নিয়েছেন। ইচ্ছা করলে তিনি বাংলার কথা না ভেবে কেবল নেপালী অর্থাৎ 'সাগিনা'র মাতৃভাষা ও হিন্দীর সাহায্য নিতে পারতেন! ১৯৪২-৪৩ অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ভিত্তিক কাহিনী লিখেছিলেন 'রূপদর্শী', কিন্তু ললিতা এবং অন্যান্য নারীচরিত্রের পোষাক পরিচ্ছদ দেখে 'ব্রিটিশ যুগের' কথা মনে হয় না। তবুও একটি পরিচ্ছন্ন এবং বাস্তবসম্মত ছবির জন্যে পরিচালককে ধন্যবাদ।

১৯৪২-৪৩ সালে পূর্বভারতের এক পার্বত্য অঞ্চলে একটি ব্রিটিশ কোম্পানীতে চাকুরী করত পাহাড়তলীর সহজ ও সরল শ্রমিকরা। তারা বস্তিতে থাকতো। আর সাহেব ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করতো। কারণ কোম্পানীর বিরুদ্ধে তাদের হয়ে বলবার কেউই ছিল না। একবার এক বৃদ্ধের উপর সাহেব কোম্পানীর উচ্চপদস্থ লোকেরা এমন অত্যাচার করলো, যে সে এবার গিয়ে প্রভাব প্রতিপত্তিশালী, সহজ সরল শ্রমিক দরদী 'সাগিনাকে' সব কিছু বললো। তখন বৃদ্ধের প্রতি অত্যাচারের কথা শুনে ছুটে এল সাগিনা। ওর হয়ে কোম্পানীর সাহেবকে কিছু বলতে। কিন্তু ফল হোল বিপরীত, অর্থাৎ ওকে লাঞ্ছিত হতে হল মালিকপক্ষের লোকেদের কাছে। কিন্তু 'সাগিনার' বীরদর্প দেখে শ্রমিকরা 'সাগিনাকে' তাদের নেতারূপে বরণ করে নিল। অনেকে এই অত্যাচার ও অবিচারের প্রতিবাদে শ্রমিকদের দিয়ে ধর্মঘটের হুমকি দিয়ে কোম্পানীর কাছ থেকে শ্রমিকদের জন্যে সুযোগ সুবিধা আদায় করে নিয়েছে। শ্রমিকদের বস্তিতেই থাকে অপূর্ব সুন্দরী ললিতা। এক অকর্মণ্য শ্রমিককে বিয়ে করে ললিতার দিন কাটছে দুঃখের মধ্যে দিয়ে। 'সাগিনা' একবার ললিতার ওপর ওর স্বামীর অত্যাচার দেখে প্রতিবাদ না করে পারে নি। সাগিনা সেই থেকেই মনপ্রাণে ভালবাসে ললিতাকে, সে বিবাহিতা জেনেও। সাগিনার জীবনেও রোমান্সের সূত্রপাত হল এবং তা ললিতারই সৃষ্টি। শ্রমিকদের স্বার্থের জন্যে সাগিনার আত্মত্যাগের কথা শুনে কলকাতা থেকে এক ট্রেড ইউনিয়ান লীডার অনিরুদ্ধ এলেন শ্রমিকদের সাহায্য করবার জন্যে। তাঁর আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল, সাগিনাকে ট্রেড ইউনিয়নের কতখানি ক্ষমতা সেটা বোঝানো। কিন্তু সাগিনা সবকিছু বুঝেও কেবল গায়ের জোরেই সবকিছু দখল করতে চায়।

ট্রেড ইউনিয়ন নেতার সঙ্গে যে মহিলা সহযোগী এসেছিলেন তাঁকে দেখে ললিতা ভুল বুঝলো। বিশেষ করে সাগিনার সঙ্গে তাঁকে আলাপ আলোচনা করতে দেখে তার মনে ঈর্ষা হোল। আচমকাভাবেই এর মধ্যে ললিতাকে খুন করার চেষ্টা হল, কিন্তু সাগিনার জন্যে সেটা সম্ভব হল না। বাংলা ছবির মতো ও ছবিতে নিরীহ তরুণীর উপর এক কুচক্রীর পাশবিক অত্যাচারের দৃশ্য আছে। এই দৃশ্যকে আরো শিল্পসম্মতভাবে উপস্থিত করা যেত।

ট্রেড ইউনিয়ন নেতার সঙ্গে কলকাতা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মালিকপক্ষের লোকেরা সাগিনার বিরুদ্ধে অনেক কিছু কুৎসা রটনা করে তাকে বিশ্বাসঘাতক এবং কোম্পানীর দালাল বলে আখ্যা দিল। কিন্তু তাতেও তাকে দমিয়ে রাখা গেল না। কালক্রমে সাগিনা শ্রমিক দলপতি থেকে জননায়কে উন্নীত হল।

সাগিনার ভূমিকায় দিলীপকুমারের অভিনয় অপূর্ব। ললিতারূপী সায়রা বানু, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা অনিরুদ্ধের ভূমিকায় অনিল চট্টোপাধ্যায়, ওঁর সহযোগী রূপে অপর্ণা সেন, শ্রমিকদের কাছে ট্রেড ইউনিয়নের বার্তাবাহক রূপী স্বরূপ দত্তের অভিনয় প্রশংসনীয়। অন্যান্য ভূমিকায় চিন্ময় রায়, রজনী গুপ্তা, ভানু ব্যানার্জি, কল্যাণ চ্যাটার্জি, কে এন সিংহ, ওমপ্রকাশ ভালো অভিনয় করবার চেষ্টা করেছেন।

সঙ্গীত পরিচালনা এবং "সালা ম্যায়তো সাহেব বন গ্যায়া" গানটির সুরারোপে এস ডি বর্মণ তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। বিমল মুখার্জি'র আলোকচিত্র গ্রহণ, সুবোধ রায়ের সম্পাদনা, সুধেন্দু রায়ের শিল্পনির্দেশনার কাজ পরিচ্ছন্ন।

—চিত্রদূত

ওঁরা বললেন

ঃ এতদিন ধরে দর্শকদের কাছে নিশ্চয়ই আপনার একটা 'ইমেজ' তৈরী হয়েছে। আপনি সেটাকে কতখানি গুরুত্ব দেন?

— কোনো ইমেজ তৈরী হয়েছে কিনা তাই জানি না এখনও। যদি হয়েও থাকে ইমেজটা যে কি তাই-ই বা কে জানে। আমি তো দেখেছি দর্শকরা আমার 'কলঙ্কিত নায়ক', 'অপরিচিত'-ও নিয়েছে আবার 'এখানে পিঞ্জর'কেও অ্যাকসেপ্ট করেছে। সুতরাং আপনিই বলুন কোন ইমেজটা দর্শকরা পছন্দ করেছে আমি কি করে বুঝব? তবে এটা বুঝতে পারি দর্শকের কাছে আমার একটা পুল আছে আবেদনও বলতে পারি।

ঃ ইমেজের চরিত্র ও প্রকৃতি বুঝতে পারছেন না মানলুম, কিন্তু যাইহোক একটা ইমেজ তো হয়েছে। সেই ইমেজের ক্ষতি করতে পারে এমন কাজ কখনও আপনি করেছেন?

— আগেই তো বললাম ইমেজটা যে কি—তাই যখন জানি না। কাজেই তার লাভ-ক্ষতির ব্যাপারটাও আমার চিন্তার বাইরে। মোদ্দা কথা নানাধরনের চরিত্র আমি করতে চেষ্টা করি। প্রতিটা চরিত্রকেই ফোটাতে সমান চেষ্টা করি। ইমেজের ক্ষতিবৃদ্ধির ব্যাপারটা খুব একটা গুরুত্ব দিই না। তবে আমার প্রাইভেট লাইফের বড় রকমের কোনো ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে নিশ্চয়ই তেমন কোনো কাজ করব না। পাবলিক ইমেজের চাইতে ব্যক্তিগত জীবনটা নিশ্চয়ই আমার কাছে অনেক বেশী মূল্যোবান।

ঃ আচ্ছা ম্যাডাম, তাহলে আপনার প্রাইভেট আর পাবলিক সেলফের মধ্যে তফাৎটা কোথায় করবেন?

— সত্যি কথা বলতে কি আমার ব্যক্তিগত জীবন আর পাবলিক জীবনের মধ্যে খুব একটা তফাৎ করি না। এই কিছুদিন আগেও আমি বাসে-ট্রামে চড়েছি। এখনও অনেক সময় ট্যাক্সি করে সিনেমায় যাই। স্টার স্ট্যাটাস মেনটেইন করতে গেলে অনেক সময় ছোটখাটো আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখতে হয়। ধরুন মেট্রোয় কোনো ভালো ছবি হচ্ছে। নাইট শোয়ে যাবারও অসুবিধে। তখন যেতেই হয় ম্যাটিনি বা ইভ্নিং শোয়ে। আত্মীয়স্বজনের বাড়ীও এড়ানো যায় না সব সময়। তবে ফ্যানদের অত্যাচার যে একবারে হয় না তাও বলবো না সহ্য করে নিতেই হয়।

ঃ ফ্যানদের সম্পর্কে আপনার কি ধারণা? আপনি তাদের চাওয়া-পাওয়াকে কি যথেষ্ট গুরুত্ব দেন?

— ফ্যানরা যখন আমার কাজের খুঁটিনাটি আলোচনা করে চিঠি দেয় খুউব ভালো লাগে। শুধুমাত্র প্রশংসায় ভরা চিঠি বিরক্তিকর। আজকাল আবার অনেক ফ্যান ছবি চেয়ে পাঠান। কাজের চাপে প্রত্যেককে যেন আর চিঠি লিখে উঠতে পারি না। সেক্রেটারীকে বলা আছে, তিনিই ছবি পাঠিয়ে দেন। কিছুদিন হোল একজন ভদ্রলোকের কাছ থেকে মজার মজার চিঠি পাচ্ছি কিছু। তিনি মনে করেন আমি তাঁর স্ত্রী। আমাকে নানা উপদেশ দেন যেন রাত করে বাড়ী না ফিরি, খুব পরিশ্রম না করি, এরকম আর কি! আমার মনে হয় ভদ্রলোক বোধহয় পাগল-টাগল হবেন।

ঃ সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকারের উত্তরে আপনি কতখানি সৎ থাকতে পারেন?

— সাধারণ মানুষ দু-চারজন যখন কথা-বার্তা বলে, আলোচনা করে তখন প্রত্যেকে বিবেচনা করে কথা বলি, সত্যি মিথ্যে মিশিয়েই থাকতে হয়। এমন অবস্থায় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ম্যাক্সিমাম যতটুকু সত্যি বলা যায় নিশ্চয়ই বলি। একবারে উল্টোপাল্টা কিছু বলি না। উপরন্তু সিনেমা জগতের লোক আমরা, পাঠকরা-দর্শকরা আমাদের ব্যাপারগুলো কাউন্ট করে নাকি শুনি। সুতরাং নির্জলা মিথ্যেই বা বলব কেন?

ঃ আপনার সহঅভিনেতা বিশেষ করে নায়কদের সম্পর্কে আপনি কিছু বলতে রাজী আছেন?

— আমাদের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রী এতো ছোট যে এখানে সকলে যদি যথেষ্ট কো-অপারেটিভ না হন তাহলে কাজ করা প্রায় অসম্ভব। নায়ক-নায়িকা সহশিল্পী পরিচালক প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের কো-অপারেশন দরকার। আর আমিতো বেশীর ভাগই কাজ করেছি উত্তমকুমার আর সৌমিত্র চ্যাটার্জির সঙ্গে। ওঁরা যথেষ্ট কো-অপারেটিভ। নইলে এত ছবি করছি কি করে একসঙ্গে।

ঃ আপনার অতীত জীবনের কোনো ঘটনা কি আপনাকে এখনও লজ্জা দেয়?

— ঘটনা থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। এটা নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আমি কোনো কিছু বলতে চাই না।

ঃ সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে আপনি কি খুব চিন্তা করেন? কেন?

— চিন্তা করেতো উত্তর দিতেই হয়। যে কথাগুলো হাজার হাজার লোক পড়বে সেটাকে তো খুব ক্যাজুয়ালি নেওয়া যায় না। তবে আজকাল আমার কাছে সাধারণত যে ধরনের ইন্টারভিউ নিতে আসেন অনেকে (আপনার এই ইন্টার-

স্মরণীয় মুহূর্তে!
বিনী জানে আপনি
কি চান
তাই আপনার
জন্যে টেরীন মিশ্রণে
বিনীর আকর্ষণীয়
রূপ-সম্ভার—
জীবনে বিশেষ
করে মনে রাখার মত
মধুর লগ্নে আপনার
ইচ্ছা পূরণে।
বিনী
TERENE
আমরা অনেক অনেক —
আপনার মতই।

ভিউ সে তালিকায় অবশ্যই পড়ছে না!) সেটা খুবই একটা স্টেল ব্যাপার বলে মনে হয়। একঘেয়ে লাগে। নিজেকে নিয়ে আর আলোচনা করতে একদম ভালো লাগে না। কতভাবে আর নিজের ভালোমন্দ কথাগুলো আওড়াবো।

: সাংবাদিকরা কখনও কেউ এমন কিছু লিখেছেন আপনার সম্পর্কে যা আপনার পক্ষে প্রচণ্ড ক্ষতিকর?

— না, তেমন কোনো লেখা আমার চোখে পড়েনি। তাও মাঝে মধ্যে লেখা হয়েছে —তা ইনডিরেক্টলি। আমার নাম দিয়ে নয়। সুতরাং সেখানে প্রতিবাদ করতে পারিনি। তবে হয়নি, অনেক সময় আমার উত্তরগুলো ঠিকমত কোট করতে পারেন না কেউ কেউ, ভুল বোঝাবুঝির দরুনই হয় ব্যাপারটা। তাও খুব একটা মারাত্মক নয়। কিছুদিন আগে একজন সাংবাদিক বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সমস্যা সম্পর্কে আমায় প্রশ্ন করেছিলেন। আমি খুব ক্যাজুয়ালিই বলেছিলাম 'ইন্ডাস্ট্রির সমস্যার নিয়ে মাথা ঘামাই না বলব কি?' উনি সেই কথাটাই ছেপে দিয়েছিলেন। এইরকম হয় আর কি?

: ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে আপনাকে কি রকম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে?

— ছোট্ট ইন্ডাস্ট্রি। তাছাড়া কম্পিটিশন কোথায় নেই বলুন? আমার প্রতিযোগিতা কাদের সঙ্গে আপনি বলতে চাইছেন, নাম বলুন?

: ধরুন সুপ্রিয়া দেবী, মাধবী চক্রবর্তী, সাবিত্রী চ্যাটার্জি এঁদের সঙ্গে।

— প্রথমত বলি এঁরা তিনজনেই আমার থেকে খুব সিনিয়র এবং নিঃসন্দেহে গুণী শিল্পী। এঁদের সঙ্গে আমার কোনো প্রতিযোগিতাই হতে পারে না। আমি যে ধরনের চরিত্র করি সেখানেও এঁরা আসেন না কম্পিটিশনে।

: নবাগতা শিল্পীদের সম্পর্কে আপনার কি অভিমত?

— নতুনদের মধ্যে রাজশ্রী বসুর ছবিটা আমার দেখা হয়নি। সোমা দে'র একটা ছবি দেখেছি। ও'র পার্সোন্যালিটি আছে খুব। ভবিষ্যতে দাঁড়াবে পারেন।

: ভালো অভিনেত্রী হবার প্রধান গুণ কি?

— সোমা সম্পর্কে এইমাত্র যে কথাটা বললাম—স্ক্রিন পার্সোন্যালিটি—ঐ জিনিসটাই প্রধান। সাদা চোখে এমনিতে কাউকে ভালো লাগতে পারে, কিন্তু সিনেমার পর্দায় আলো লাগা ব্যাপারটা আলাদা। এবং ঐ জিনিসটাই হোল স্ক্রিন পার্সোন্যালিটি। সেই সঙ্গে সুন্দর চেহারাও প্রয়োজন। আর অভিনয় জিনিসটাতো জানতেই হয়। তবুও বলবো সবার ওপর সেই স্ক্রিন পার্সোন্যালিটিই দরকার।

: আমাদের এই সমাজ ব্যবস্থায় উইম্যানস লিব (স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্পর্কে আপনি কি বলেন?

— স্বাধীনতার গোড়ার কথা হোল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। সেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কি আমাদের দেশের মেয়েদের এসেছে? এখনও তো কোনও কাজ করার আগে স্বামী বা বাবা-মা'র কথা ছাড়া চলতে পারি না। তাই বলে আমি নিশ্চয়ই তাঁদের অমান্য করতে বলছি না। তবে ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আসছে মেয়েদের। মেয়েদের সম্পর্কে ছেলেদের ধারণা পাল্টাচ্ছে এখন। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে স্ত্রী-স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচারিতা নয়।

: প্লেটোনিক প্রেমে আপনি বিশ্বাস করেন?

— না। প্লেটোনিক প্রেম কখনও হতে পারে না, প্লেটোনিক বন্ধুত্ব হতে পারে। বিশেষ করে নারী-পুরুষের প্রেমের ক্ষেত্রে শারীরিক ঘনিষ্ঠতা আসবে না এটা হতে পারে না। মানসিক ঘনিষ্ঠতারই পরিণাম শারীরিক ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু বন্ধুত্ব যদি হয় সেখানে শারীরিক সম্পর্ক আসছে না। আমারই এমন ক'জন বন্ধু আছে।

: অভিনয় করতে শিল্পীর কিছু ম্যানারিজম এসেই যায়—এটা মানেন নিশ্চয়ই। ম্যানারিজম কোনো ক্ষতি করে না?

— ম্যানারিজম নিশ্চয়ই আমার আছে। কোথায় ঘাড় ফিরিয়ে তাকালে কোথাও বা একটু টিল্ট আপ করে তাকালে ভালো দেখায় আমাকে। অনেক সময় সিচুয়েশন—চরিত্র এসব ভুলে এগুলো করে ফেলি, পরিচালকরাও বলেন। আসল ব্যাপার কি জানেন—একের পর এক ছবি করে যাচ্ছি। ম্যানারিজমগুলো শুধরে নেবার সুযোগ পাচ্ছি না। তবুও আমি চেষ্টা করি নিজেকে আলাদা রাখতে।

: সিগারেট খাওয়া নিশ্চয়ই অভিনয়ের ক্ষতি করছে আপনার, তবুও খাচ্ছেন?

— এসব বলে আর লজ্জা দেবেন না। সিগারেট প্রচণ্ড ক্ষতি করছে আমার গলার। কিন্তু কি করব, ছাড়তে পারছি না। দেখি যদি ছাড়তে পারি।

: ফিল্মে কাজ করলে চরিত্র ঠিক থাকে না—এমন অভিযোগ আছে অনেকের। আপনি কি বলেন?

— একটা সময় ছিল যখন নাচিয়ে-গাইয়ে সম্পর্কেও একথা বলা হোত। ফিল্ম সম্পর্কে তো বটেই। এটা অসত্য বলতে পারব না তবে তখন এ-লাইনে যাঁরা কাজ করতেন, তাঁদের মধ্যে শিক্ষিতের হার ছিল কম। এগুলো ঘটতো তাই বেশী। এখন দিন পাল্টাচ্ছে। বদনামগুলোও চলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। যাবেও। আমার পরবর্তী জেনারেশনে দেখব হয়তো আর কোন অভিযোগই নেই!

: অভিনয় করার সময় আপনার নিজের সত্তা ও শিল্পী-সত্তা কিভাবে কাজ করে?

— থিয়োরী হলো দুটো সত্তাকেই পাশাপাশি রেখে কাজ করা। চরিত্রের সঙ্গে একাকার হয়ে গেল অভিনয় অভিনয় হয় না। আবার নিজের সত্তাকে ভুলতে না পারলেও চলে না। আমিও তাই করতে চেষ্টা করি। কিন্তু জানি সব সময় পেরে উঠি না।

: অভিনেত্রীর আদর্শ চেহারা কি হওয়া দরকার?

— ছিপছিপে হলেই ভালো। সব ধরনের চরিত্র করার পক্ষে খুব সুবিধে।

: আপনি কি মনে করেন আপনার চেহারা তাহলে আদর্শ অভিনেত্রীর চেহারা?

— না না, তা নয়, আমার চেহারাতেও ত্রুটি আছে।

: কি ত্রুটি বলবেন?

— (হাসতে হাসতে) আমার চেহারার ত্রুটিগুলো আপনার কাছে রিভিল করবো, বেশ বলেছেন বটে?

—নির্মল ধর

মঞ্চাভিনয়

ঘরে বাইরে

কাহিনী ঃ রবীন্দ্রনাথ। প্রযোজনা ঃ বহুরূপী। নাট্যরূপ ও নির্দেশনা ঃ তৃপ্তি মিত্র। মঞ্চ ঃ কুমার রায়। আলো ঃ দিলীপ সেন। আবহসংগীত ঃ অজয় সিংহরায়। অভিনয়ে শাঁওলী মিত্র—বিমলা। উদয়-সিংহ—নিখিলেশ। নমিতা মজুমদার—মেজবৌ। রমলা রায়—বড়বৌ। আরতি দাস—থাকো। কালীপ্রসাদ ঘোষ—সন্দীপ। প্রতিমা চ্যাটার্জি—ক্ষ্যামা। দেবতোষ কুমার ঘোষ—চন্দ্রনাথ। বলাই গুপ্ত—পঞ্চু। রমাপ্রসাদ বণিক—অমূল্য। উৎপল ভট্টাচার্য—কুলদা। অরিজিৎ গুহ—দারোগা। তাছাড়া আরো অনেকে। গত ২৮ জুলাই একাডেমী অফ ফাইন আর্টস হলে নাটকটি অভিনীত হোল। নব নাট্যান্দোলন আর গণ-নাট্যান্দোলন কথা দুটি যাঁরা একই অর্থে প্রয়োগ করেন—তাঁরা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। নাট্যশিল্পকে কেন্দ্র করে যেকোন আন্দোলনই উৎসারিত হয়ে উঠুক না কেন—নব আন্দোলনের মূলে কথাই হচ্ছে শিল্প-সৃষ্টি। শিল্পসৃষ্টির চিরাচরিত পথ বর্জন করে নবতম প্রকাশভঙ্গীর পথ-পরিক্রমার মধ্যেই নব নাট্যান্দোলনের যথার্থতা। গণ-নাট্যান্দোলনও নব নাট্যান্দোলনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, কিন্তু কেবলমাত্র গণ-নাট্যান্দোলনের মধ্যেই নব নাট্যান্দোলন সীমিত নয়। গণজীবনের প্রতিফলন যে নাটকে পরিস্ফুট হয় তাকেই গণনাট্য বলা যেতে পারে। নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করেই গণনাট্যের প্রকাশ। নাটকের বা নাট্য-সৃষ্টির নবতম প্রকাশভঙ্গীই নব-নাট্যের দ্যোতক। বিষয়বস্তুই এক্ষেত্রে একমাত্র মাপকাঠি নয়।

একদিন যিনি বা যাঁরা নব নাট্যান্দোলনের পুরোধা ছিলেন, পরবর্তী যুগে শিল্পসৃষ্টির পরিবর্তিত ধারার সঙ্গে যদি তিনি বা তাঁরা তাল রেখে চলতে না পারেন—তবে তিনি বা তাঁরাও পুরাতনপন্থী বলেই পরিগণিত হবেন। আজকের নতুন আগামী দিনে পুরাতন হবে। বর্তমানের মতই নব কথাটির পরমায়ু সীমিত। যতক্ষণ ভবিষ্যৎ এসে তার স্থান অধিকার না করবে—ততক্ষণই তার আয়ু। আজকের নতুন অর্থাৎ বর্তমান আগামী দিনের নতুনের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারলেই আবার নতুনরূপে ফুটে উঠবে। না পারলে অতীতের পৃষ্ঠায় তাকে স্থান করে নিতে হবে।

নীলদর্পণ গণনাট্য। তাই বলে আজকের নব নাট্যান্দোলনের প্রতীক নয়। বিষয়বস্তু পুরোন হলেও নব নাট্যধারায় নীলদর্পণ অভিনীত হয়ে নতুনত্বের দাবী করতে পারে। আরো পরিষ্কার করে বলতে গেলে বলতে হয়—যুগ বিবর্তনে যে নাট্যধারা উৎসারিত হয় সেই নাট্যধারাকে অনুসরণ করে পুরোন বিষয়বস্তু সম্বলিত

সুজাতা
অপর্ণা সেন

নাটক মঞ্চস্থ হলেও তাকে নব নাট্যান্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। অবশ্য বিষয়বস্তু ও আংগিক দুইই যদি যুগ বিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে উৎসারিত হয় তবে ত সোনায় সোহাগা। এত কথা বললাম এই জন্য যে, পথিক উলু খাগড়া, ছেঁড়া তারের মধ্য দিয়ে সে বহুরূপীকে নব নাট্যান্দোলনের পুরোধা রূপে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম—ঘরে বাইরে দেখার পর আজও তাকে সেই মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে দ্বিধাবোধ করবো না। ১৯৪৭-এর বহুরূপী ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দেও নব নব সৃষ্টির উন্মাদনায় উদ্বেল। বহুরূপী অতীতের পৃষ্ঠায় স্থানলাভ করে সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্তব্ধ হয়ে যায় নি। তার গতিও হয় নি রুদ্ধ।

ঘরে বাইরে নাটকের পরিচালিকা তৃপ্তি মিত্র তথা বহুরূপীর এখানেই সার্থকতা। ঘরে বাইরের যুগ আমরা অনেকদিন ডিঙিয়ে এসেছি—কিন্তু সেই যুগকে আজকের সর্বাধুনিক প্রকাশভঙ্গীতে অবিকৃতভাবে তুলে ধরে বহুরূপী শিল্প-সৃষ্টির পথে যে প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছি। নাট্যরূপে শ্রীমতী মিত্র রবীন্দ্র সাহিত্যের রসাস্বাদনের সুযোগ দিয়েছেন। নাটকের ধর্মানুযায়ী বহির্মুখী নাট্য-সংঘাত এড়িয়ে গিয়ে অন্তর্মুখী বিশ্লেষণ ধর্মীতাতেই শ্রীমতী মিত্রের মুন্সীয়ানা ফুটে উঠেছে।

অভিনয়ে বিমলা চরিত্রে শ্রীমতী শাওলী মিত্র অপূর্ব ব্যঞ্জনা ও আবেগে এই কঠিন চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। সন্দীপের জোড়ো কথায় পাখনা মেলে উড়ে যাওয়া আবার মিথ্যার মায়াজাল ছিন্ন করে ঘরমুখী বিমলার অন্তর্দ্বন্দ্ব শাওলী মিত্রের অভিনয়ে স্বচ্ছভাবে ফুটে উঠেছে। উদয়সিংহের সংযত এবং আন্তরিক অভিনয়ে নিখিলেশকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। যদিও কালীপ্রসাদ ঘোষের সন্দীপ অনেকের ভাল লাগবে। সন্দীপ নিজেই নিজেকে প্রকটিত করেন—তাঁর অভিনয়ও সাবলীল। জটিল নয়। নিখিলেশ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করতে হয়। চরিত্রটি সরবে উচ্চারিত নয়। তাই অনুচ্চারিত নিখিলেশকে যাঁরা উপলব্ধি করতে পারবেন না—তাঁরা সন্দীপের চরিত্র অভিনেতার গলাতেই প্রথম মালা দিতে চাইবেন।

মেজবৌ চরিত্রে মমিতা মজুমদার প্রদীপ্ত। নিখিলেশের প্রতি অন্তর্মুখী মুগ্ধ আবেগের বহিঃপ্রকাশে শ্রীমতী মজুমদার অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। রমলা রায়ের বড়বৌ আর অমিত দাসের থাকো যদিও অতি সহজেই জনপ্রিয়তা অর্জন করবে, কিন্তু সামগ্রিক অভিনয়ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে অতি-নাটকীয়তার জন্য। অন্যান্যদের অভিনয় প্রশংসনীয়। আবহসংগীত নাটকের ভাবধর্ম প্রকাশে সহায়ক হয়েছে। একটি মাত্র দৃশ্যপটে সমগ্র নাটকটি অভিনীত। ঘরে-বাইরের রূপটি পুরোপুরি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে দৃশ্যপটটির মাধ্যমে। আলোকসম্পাতের মধ্যে দিয়ে একই দৃশ্যপটে বিচ্ছিন্ন ভাবে বিভক্ত করে কাজে লাগানোর পদ্ধতিও প্রশংসনীয়। বহুরূপীর দুই স্তম্ভ শম্ভু মিত্র আর তৃপ্তি মিত্রকে অভিনয়ে না দেখতে পেয়ে অনেকের আশাভঙ্গ হলেও, বহুরূপীর পরবর্তী সভ্যরা যে বহুরূপীকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন—তাঁদের সমবেত অভিনয়ের মধ্যে সেই পরিচয়ই পেয়েছি।

কবি

বিগত ৪ জুলাই থেকে তারাশংকরের 'কবি' রঞ্জনা গোষ্ঠীর প্রযোজনায় অবনমহলে অভিনীত হচ্ছে। নাটকটি পরিচালনা করেছেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। সংগীত পরিচালনা করেছেন অনল বাগচী। অভিনয়ে আছেন অজিত ব্যানার্জি, সবিতাব্রত দত্ত, নীলিমা দাস, বাসন্তী চ্যাটার্জি, গীতা দে এবং আরো অনেকে। স্মরণ থাকতে পারে, 'কবি' ইতিপূর্বে দেবকীকুমার বসুর পরিচালনায় চিত্ররূপায়িত হয়। রঙমহল রংগমঞ্চে কবির নাট্যরূপে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। কবি দ্বিতীয়বার স্বর্গত সুনীল ব্যানার্জির পরিচালনায় চিত্রায়িত হয়ে মুক্তির দিন গুনছে। 'রঞ্জনার' প্রচেষ্টা সার্থক হোক আমরা তাই কামনা করি।

—শীলভদ্র

ক্যানাল : কোল এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যরা তাঁদের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ২৬ জুলাই বিশ্বরূপা মঞ্চে দুর্মুখ দেবশর্মা বিরচিত 'ক্যানাল' নাটকটি অভিনয় করেন। জোতদার শিবশংকরের ভূমিকায় গণেশ সাহা অপূর্ব অভিনয় করেন। বৃদ্ধ কৃষক নেতা নবীন মোড়লের ভূমিকায় সৌমেন চক্রবর্তীও সমানভাবে পাল্লা দিয়েছেন তাঁর সংগে। স্ত্রী চরিত্রে পুতুল চক্রবর্তীর অভিনয় সকলের মনে রেখাপাত করে। নাট্য-নির্দেশক অসীম হালদার পূর্ণ মর্যাদার সংগে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। আলোকসম্পাতে ভানু বিশ্বাসের কাজ ক্যানাল সার্থক রূপ পেয়েছে। বাউলবেশী সুব্রত মজুমদারের গানটি সুশ্রাব্য।

ভূতের বেগার : বিকৃতির আভিধানিক তাৎপর্য যাই হোক না কেন, নাটকের ক্ষেত্রে বিকৃতির সুপ্রয়োগ ঘটাতে পারলে আনন্দ আহরণের সুযোগ বাড়ে বৈ কমে না। রূপান্তরী নাট্যগোষ্ঠী এটি জোরালোভাবে প্রমাণ করেছেন তাঁদের সাম্প্রতিক নাটক 'ভূতের বেগার'-এর উপস্থাপনায়। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের রচনাকে সত্যিকার অপেরার ছাঁচে সাজিয়ে পরিচালক জোছন দস্তিদার প্রমাণ করলেন যে, হাস্যরসের উপাদান বহু তথাকথিত 'পুরোনো' নাটকের মধ্যে ছড়িয়ে আছে, প্রয়োজন শুধু তাকে খুঁজে বের করে আধুনিক মেজাজের উপযোগী করে রূপায়িত করা। নাটকটির রূপকার রূপাঞ্জলি একাডেমি অব ফাইন আর্টস।

নৃত্য, গীত, মনমাতানো অভিনয়—এই তিন বস্তুর সমাবেশে প্রেক্ষাগৃহে এমন একটা একটানা হিল্লোলের সঞ্চার হয় যে, দর্শক সওয়া দুঘণ্টাকাল একদমে এই ঠাসবুনোট আনন্দ উপভোগ করেন। এককালে [illegible] গাইতে আনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে এ্যামডি ব্যানারজীর ইংরেজ মনিবের আওতায় থেকে ধনী হবার স্বপ্ন ও ক্রিয়াকলাপের কথা ব্রেখটিয়ান প্রথায় দর্শককে আগে থাকতে জানিয়ে দেন। এ্যামডি ও তৎপত্নীর কর্মকাণ্ড দেখে দর্শক তা মিলিয়ে নিয়ে প্রাণ খুলে হাসেন। নাটকটির ঘটনাকাল—যে-যুগে আমরা সাহেবদের 'হুজুর মা-বাপ' বলে ভাবতে [illegible]ঐতিহাসিকভাবে অভ্যস্ত ছিলাম। ক্ষীরোদপ্রসাদের অক্রুদ্ধ ভারতীয় মন কত সহজেই চরিত্রচিত্রণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়ে জাতীয় একটি লজ্জাকে তুলে ধরেছিলো যাট বছর পরে ভেবে আজ নতুন করে বিস্মিত হতে হয়।

জোছন দস্তিদারের এ্যামডি ও চন্দ্রা দস্তিদারের এ্যামডিপত্নীর ভূমিকায় অভিনয় শিল্পসৃষ্টি হিসেবে মনে রাখবার মত। কুমারেশ মুখোপাধ্যায় (নিতাই), শিখা রায় (পটুটি), মণিকা চক্রবর্তী (গৌরমণি) প্রশান্ত ঘোষ (বাউয়েল) কমল রায় (শেঠজী), বিশ্বনাথ বণিক (এজেন্ট), শ্যামল সেনগুপ্ত, সুজিত ঘোষ ও পার্থ মিত্র অন্যান্য ভূমিকায় সার্থক অভিনয় করেছেন। সূত্রধাররূপী কাশীনাথ চক্রবর্তীর স্বচ্ছন্দ নাচ-গান উল্লেখযোগ্য। দেবাশিস দাশগুপ্তের সংগীত—এই নাটকটির উপভোগ্যতাকে অনেকখানি বাড়িয়েছে। মঞ্চ-পরিকল্পনা ও আলোকপ্রয়োগের কথা এই প্রসঙ্গে প্রশংসার দাবী রাখে।

বিবিধ সংবাদ

৩০ আগস্ট মুক্তিলাভ করবে

কে এল কাপুর ফিল্মস নিবেদিত এবং সমরেশ বসু রচিত 'বিকেলে ভোরের ফুল' ৩০ আগস্ট মুক্তিলাভ করবে রূপবাণী, অরুণা এবং ভারতী প্রেক্ষাগৃহে। দুটি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার ও সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য চরিত্রে চরিত্রে অভিনয় করছেন রবি ঘোষ, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, জয়শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। সংগীত পরিচালনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। পরিচালনা করেছেন পীযুষ বসু। দীপায় তোলা বহির্দৃশ্য গ্রহণ এ-ছবির অন্যতম সম্পদ। আলোকচিত্র গ্রহণ করেছেন বলাই দে। সম্পাদনায় বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সি এম ডি এ রিক্রিয়েশন ক্লাব : গত ২৩ জুলাই সি এম ডি এ রিক্রিয়েশন ক্লাবের বিভাগ—৩-এর ২য় বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রঙ্গনা মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন সাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ সান্যাল। এই অনুষ্ঠানে সমবেত অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংস্থার সভাপতি এক্স-কিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীসুকান্ত সেনগুপ্ত। এই অনুষ্ঠানে অফিসকর্মী রাধারমণ ঘোষ রচিত নাটক 'অথ স্বর্গ বিচিত্রা' সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন।

শতবর্ষের স্মরণীয়

। ১২ ।

ধর্মদাস সুর

জাতীয় নাট্যশালার সর্বপ্রথম মঞ্চাধ্যক্ষ, মঞ্চস্থাপক ধর্মদাস সুর ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে বাগবাজারেই জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ছয় বৎসর বয়সের সময় ধর্মদাসবাবুর পিতা রাধানাথ সুর মারা যান। ম্যাকেঞ্জীলিয়ালের একজন বিশ্বস্ত কর্মী ছিলেন রাধানাথবাবু। তাই প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত সদস্য মিঃ ওয়াটসন ধর্মদাসবাবুদের জন্য মাসিক ১০ টাকা ভাতার ব্যবস্থা করে দেন। দুই ভাইয়ের মধ্যে ধর্মদাসবাবু কনিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্মক্ষেত্রে লিপ্ত হয়ে পড়েন এবং উন্নতি লাভ করেন। ধর্মদাসবাবু তখন ডাফ সাহেবের স্কুলে পড়েন।

নটচূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ছিলেন ধর্মদাসবাবুর প্রতিবেশী। তাছাড়া বাল্যবয়স থেকে উভয়ের মধ্যে ছিল প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। অর্দ্ধেন্দুশেখরই ধর্মদাসবাবুকে নাট্যাভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট করান। তখনও ধর্মদাসবাবু স্কুলের ছাত্র। বয়স ১৪। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে অর্দ্ধেন্দুবাবু ধর্মদাসবাবুকে কয়লাঘাটাস্থিত তদানীন্তন কিছু কিছু বাছাই আখড়ায় নিয়ে যান এবং সভ্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। কিছু কিছু প্রহসনে চন্দনবিলাসীর চরিত্রটি ধর্মদাসবাবুকে দেওয়া হয়। চন্দনবিলাসীর চরিত্রেই ধর্মদাসবাবুর অভিনয়জীবনে সর্বপ্রথম হাতেখড়ি।

অঙ্কনবিদ্যায় ছোটবেলা থেকেই ঝোঁক ছিল। স্কুলে সুন্দর ম্যাপ আঁকতে পারতেন। সরস্বতী পূজা ও অন্যান্য পূজানুষ্ঠানাদিতে প্রতিমার চৌকি, মণ্ডপ সাজানো ও আলপনা দেওয়ায় ধর্মদাসবাবুর জুড়ি খুব কম পাওয়া যেত। ধর্মদাসবাবুর অঙ্কনের দক্ষতা সম্পর্কেও কয়লাঘাটা সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

ধর্মদাসবাবুর আত্মজীবনী থেকে পাওয়া যায় : 'বলিতে গেলে আমার স্কুলের ম্যাপ আঁকা উন্নতির প্রথম ও সরস্বতী সাজানো আমার উন্নতির দ্বিতীয় সোপান।'

অর্দ্ধেন্দুবাবুর আগ্রহেই ধর্মদাসবাবু কয়লাঘাটা সম্প্রদায়ে অভিনয়ের সঙ্গে স্টেজ ম্যানেজার বা মঞ্চাধ্যক্ষের দায়িত্বও গ্রহণ করেন। কয়লাঘাটার অভিনয় কয়েক রাত্রির পর বন্ধ হয়। কিন্তু অভিনয় ও অঙ্কনের নেশা ধর্মদাসবাবুকে পেয়ে বসে। ইতিমধ্যে স্বর্গত কালীকৃষ্ণ প্রামাণিকের অর্থানুকূল্যে 'শকুন্তলা' অভিনয়ের সংবাদ প্রচারিত হয়। ধর্মদাসবাবু একখানি প্রবেশপত্র সংগ্রহ করে উক্ত অভিনয় দেখে আসেন এবং দৃশ্যপটাদির অঙ্কনে মুগ্ধ হন। এ বিষয়ে আরো পারদর্শিতা অর্জনের চেষ্টায় থাকেন।

ইতিমধ্যে গিরিশচন্দ্র নগেন্দ্রনাথের চেষ্টায় গড়ে ওঠে বাগবাজার অ্যামেচার সম্প্রদায়। ধর্মদাসবাবু প্রথম থেকেই যোগ দেন এবং অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করেন। সম্প্রদায় সংগঠন ছাড়া মঞ্চের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন। লীলাবতীতে প্রথমে ললিত চরিত্রে নির্বাচিত হন পরে গিরিশচন্দ্র এই চরিত্রে অভিনয় করেন। অভিনয়ে ধর্মদাসবাবুর আগ্রহ ছিল না।

সধবার একাদশীর পর কিছুটা হতাশা দেখা দেয় সভ্যদের মধ্যে। এই হতাশার মূলে ছিল আর্থিক সমস্যা। বড় সমস্যা ছিল মঞ্চের। গিরিশচন্দ্রের সহায়তায় তাঁর জ্যেষ্ঠ শ্যালক ব্রজেন দেবের মঞ্চটি সম্প্রদায়ের জন্য সংগ্রহ করার মূলে হোতা ছিলেন ধর্মদাসবাবু।

ধর্মদাসবাবু তখন কম্বুলিয়াটোলা স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। চাঁদা তুলে যে সামান্য টাকা পাওয়া যায় তাই দিয়ে কাপড় রং প্রভৃতি কিনে নিজ বাড়ীতে সিন আঁকতে থাকেন। এই সময় অর্দ্ধেন্দুশেখর অনেক সময় তাঁর হয়ে স্কুলে পড়িয়ে আসতেন। একজন ইংরেজ ভিক্ষুকের সঙ্গে ধর্মদাসবাবুর পরিচয় হয়। সে জাহাজে রং-এর কাজ করতো। ধর্মদাসবাবু খাবার বিনিময়ে তাকে রঙের কাজে নিয়োগ করেন।

শ্যামবাজারের বৃন্দাবন পালের গলিতে রাজেন্দ্র পালের বাড়ীতে স্টেজ বেঁধে লীলাবতীর অভিনয় হলো।

সান্যাল ভবনের মঞ্চও ধর্মদাসবাবু নির্মাণ করলেন। তাঁর সহকারী ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ মিত্র।

ন্যাশনাল থিয়েটারে যে দলাদলি দেখা দেয় তার মূলে ছিল ব্যক্তিস্বার্থ। নগেন্দ্রনাথ, অমৃতলাল বসু এবং অর্দ্ধেন্দুশেখর ধর্মদাসবাবুকে দলে নিয়ে সম্প্রদায়ের অংশীদার হতে চেয়েছিলেন। ধর্মদাসবাবু তার প্রতিবাদ করেন অন্যান্যদের কথা চিন্তা করে। ফলে ন্যাশনাল আর হিন্দু ন্যাশনালে সম্প্রদায় দ্বিধাবিভক্ত হয়। ধর্মদাসবাবু ন্যাশনাল থিয়েটারের অধিনায়করূপে টাউন হলে গিরিশচন্দ্রকে

নিয়ে নীলদর্পণ অভিনয় করেন। শোভাবাজার রাজবাড়ীতে অভিনয় করে ঢাকা যান। ঢাকায় লোকসান খেয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। এবং পরে ভুবনমোহন নিয়োগীকে নিয়ে গড়ে তোলেন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার। নগেন্দ্রনাথও সঙ্গে থাকেন। বর্তমান মিনার্ভা থিয়েটারের জমিতে এই নাট্যগৃহটি ধর্মদাসবাবুই গড়ে তোলেন। এটি ছিল কাঠের বাড়ী।

এই থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় কোন বিদেশীর সাহায্য নেওয়া হয় না। কেবলমাত্র ড্রপ সিন ও দু' একটি সিন গ্যারিক নামক জনৈক শিল্পীকে দিয়ে আঁকানো হয়েছিল। গ্রেট ন্যাশনালের ম্যানেজার ছিলেন ধর্মদাসবাবু। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সম্প্রদায়ের একাংশ নিয়ে তিনি দিল্লী লাহোর, আগ্রা মথুরা বৃন্দাবন কানপুর প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করার পর ভুবনমোহন নিয়োগীর সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়াতে কিছুদিন তিনি দূরে থাকেন।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার দ্বারোদ্ঘাটন করলে ধর্মদাসবাবু সব সময় সতর্ক থাকতেন, কীভাবে দৃশ্যপটের মধ্য দিয়ে দর্শকদের চমৎকৃত করবেন। আরব্যোপন্যাসের কাহিনী হাঞ্চব্যাক, আলিবাবা ও আলাদীন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে লিখিত নাটকাভিনয়ে মনোরম দৃশ্যপটাদি দ্বারা ধর্মদাসবাবু দর্শকদের বিস্ময় উৎপাদন করতেন।

গ্রেট ন্যাশনালের যখন শোচনীয় অবস্থা অর্থাৎ পশ্চিম পরিভ্রমণের পূর্বে ধর্মদাসবাবুই উপেন্দ্রনাথ দাসের সরোজিনী নাটক ২০০ টাকায় ক্রয় করে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মঞ্চস্থ করার আয়োজন করেন। গিরিশচন্দ্র যখন ন্যাশনালে তখন ধর্মদাসবাবু পুনরায় যোগদান করেন। এবং এক একটি নাটকের দৃশ্যসজ্জায় অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

প্রতাপ জহুরীর থিয়েটারে রাবণ বধ, সীতার বনবাস প্রভৃতি নাটকের দৃশ্যা-

বলীতে ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করেন ধর্মদাসবাবু। এখানে শ্রীবৎস চিন্তা নাটকে সমুদ্রের দৃশ্য পরিবর্তিত হয়ে বনের দৃশ্য ফুটিয়ে তোলায় ধর্মদাসবাবুর কৃতিত্ব যুগ যুগ ধরে কীর্তিত হয়েছে এবং হবে। বাংলা নাটকে এই সর্বপ্রথম ডায়োরামার প্রবর্তন করেন তিনি। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে কুমারসম্ভব নাটকে ধর্মদাসবাবু মদন ভস্ম ও বসন্তের আবির্ভাবকালীন দৃশ্যে সর্বপ্রথম মেকানিক্যাল ডায়েরামার প্রবর্তন করেন।

গোপাললাল শীল গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার কিনে নিয়ে এমারেল্ড থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করলে ধর্মদাসবাবুর তত্ত্বাবধানেই থিয়েটারগৃহ ধূলিসাৎ করা হয়।

হাতিবাগানে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে যখন বর্তমান স্টার গৃহ নির্মিত হয় তার মূলেও ছিলেন ধর্মদাসবাবু। এই নাট্যগৃহটি মাত্র চার মাসে নির্মিত হয়।

বর্তমান মিনার্ভা থিয়েটার যখন গড়ে ওঠে ম্যাকবেথ নাটকাভিনয়ের সময় ধর্মদাসবাবু এখানে যোগদান করেন এবং গিরিশচন্দ্রের প্রতিটি নাটকের দৃশ্যপটাদির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

নন্দরিপুর আবির্ভাব প্যানোরমা—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের বিবর্তন প্রদর্শন এবং করমেতি বাঈ নাটকে আমেরিকান প্যানোরমার প্রবর্তন করেন ধর্মদাসবাবু। মেঘনাদ বধ ও লক্ষ্মণের শক্তিশেল নাটকে ধর্মদাসবাবু স্বর্গ ও মর্তের দৃশ্যাবলীতে অপূর্ব মায়াজালের সৃষ্টি করেছিলেন।

ক্লাসিক থিয়েটারেও বৎসরাধিককাল কাজ করেন ধর্মদাসবাবু। ইউনিক থিয়েটারের গঠনমূলেও ছিলেন তিনি। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে কোহিনূর থিয়েটারের মঞ্চের দায়িত্ব নিতেও ধর্মদাসবাবুকে দেখা যায়। কলকাতার তদানীন্তন কালের প্রতিটি নাট্যশালার সঙ্গে জড়িত থাকেন ধর্মদাসবাবু। তদানীন্তন রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে যখন গভর্নর জেনারেল লর্ড লিটন শকুন্তলা নাটকের অভিনয় দেখতে আসেন, ধর্মদাসবাবুই কর্তৃপক্ষের অনুরোধে বিনা পারিশ্রমিকে নাটকের দৃশ্যপটাদির নির্দেশ দেন এবং দুষ্মন্তের রথ নির্মাণ করেন। এই রথ দেখে সবাই ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বাংলা ৭ই শ্রাবণ, ১৩১৭, ইংরেজী ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ধর্মদাসবাবু পরলোকগমন করেন।

ধর্মদাস সুর সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র বলেন : স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দু মুস্তফী মতিলাল সুর, মহেন্দ্রলাল বসু, কাপ্তেন বেল (অমৃত মুখোপাধ্যায়) শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি জীবিত থাকলে উচ্চকণ্ঠে বলতেন, আমরা করতালি পাইয়াছি, প্রশংসা পাইয়াছি, কিন্তু ধর্মদাস অনেক সময়েই নেপথ্যে।" কেহ বা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 'এ দৃশ্য কাহার উদ্ভাবন ?'—আমার শংকরাচার্য নাটকের দৃশ্যগুলি যে তাঁহার মস্তিষ্কপ্রসূত এ... মিনার্ভায় অভিনীত চন্দ্রশেখরের দৃশ্যা... যে তাঁহার রঙ্গালয়ের শেষ কার্য তাহা তিনি প্রকাশ করিতে পারেন নাই। ....

বেলুড় মঠের মহোৎসবে তিনি কয়ে... বৎসর উপর্যুপরি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সিংহাসন সজ্জিত করিয়াছিলেন... যাহার সহিত এতাবৎকাল এক ব্যবসায়ী হইয়া রঙ্গালয়ের কার্য করিলাম, যাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ, যাঁহার মুখে কখনও অপ্রিয় কথা শুনি নাই, তাঁহার স্মৃতি আমার জীবনান্ত পর্যন্ত জাগ্রত থাকিবে।"

নটগুরু গিরিশচন্দ্রের উপরোক্ত কয়েকটি কথা থেকেই বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে ধর্মদাস সুরের অবদান সম্পর্কে অবহিত হতে পারি।

মহেন্দ্রলাল বসু

অমৃতলাল (মুখোপাধ্যায়), অমৃতলাল (বসু), মতিলাল (সুর), মহেন্দ্রলাল (বসু)—এই চার 'লাল' ছিলেন বাংলা নাট্যশালার প্রথম যুগের চার দিকপাল অভিনেতা।

করুণরসাত্মক অভিনয়ে মহেন্দ্রলাল বসু ছিলেন অদ্বিতীয়। তিনি 'ট্র্যাজেডিয়ান মহেন্দ্রলাল' নামেই ছিলেন সমধিক প্রসিদ্ধ।

আনুমানিক ১৮৫১-৫২ খৃষ্টাব্দে মহেন্দ্রলাল বসু জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ব্রজবিহারী বসু ছিলেন মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে জড়িত। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে মহেন্দ্রলাল বসু মাত্র ৫০-৫১ বৎসর বয়সে মারা যান।

মহেন্দ্রলাল বসুকে গিরিশচন্দ্রই আবিষ্কার করেন। এ বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের ভাষাতেই বলছি : "মহেন্দ্রলাল সধবার একাদশী অভিনয়ে প্রায়ই অভিনয়ের দিন

উপস্থিত হইতেন। তবে পরে ঐ সম্প্রদায় লীলাবতীর অভিনয় উদ্যোগ করে। সেই সময়ে মহেন্দ্রলালের সহিত আমার প্রথম দেখা। কৈশোর কাল অতীত, যৌবনে পদার্পণ, গৌরবর্ণ, সুঠাম কলেবর মহেন্দ্রলালকে এখনও আমি চক্ষের উপর দেখিতেছি। তিনি লীলাবতী নাটকের একটি ভূমিকার (পার্ট) প্রার্থী হইয়া আসেন। তৎপূর্বে প্রায় ভূমিকাই বিতরিত হইয়াছিল। তাঁহাকে ভোলানাথ চৌধুরীর ভূমিকা দেওয়া হয়। কৈশোর মূর্তি আবরণার্থে একটি পরচুলের গোঁফ দিয়া মহেন্দ্রলালকে জমিদার সাজাইলাম। মূর্তি পরিবর্তন দেখিয়া আমাদের দলস্থ আনন্দিত। নাট্যোল্লিখিত ভোলানাথ চৌধুরী যখন শ্রীনাথের সহিত কথোপকথনে মত্ততার ভঙ্গীতে বলিতেন, 'সে যে [illegible] ভাই, তা আমি কি করবো।' সে যাহারা শুনিয়াছে কখনও ভুলিবে না। অভিনয়ান্তে দীনবন্ধু তাঁহাকে ভোলানাথ চৌধুরী বলিয়া ডাকিয়াছিলেন।'

অবৈতনিক ন্যাশনাল থিয়েটার, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের ন্যাশনাল থিয়েটার, গ্রেট ন্যাশনাল, বেঙ্গল থিয়েটার, মিনার্ভা মঞ্চে এবং মফঃস্বলের বিভিন্ন স্থানে শতাধিক নাটকের বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করে মহেন্দ্রলাল বসু নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে নাম করতে হয়: লীলাবতী — ভোলানাথ চৌধুরী। নীলদর্পণ — ম্যাজিস্ট্রেট, সাধুচরণ, পদীময়রাণী। ভারতমাতা — মাতা। মৃণালিনী — রানী। কৃষ্ণকুমারী — রানী অহল্যা। কপালকুণ্ডলা — নবকুমার। হেমলতা — সত্যসখা। মৃণালিনী — বখতিয়ার খিলজী। চোরের উপর বাটপাড়ি — নারায়ণ। পদ্মিনী — ভীমসিংহ। সরোজিনী — কর্ণধার। বিষবৃক্ষ — শ্রীশ। দুর্গেশনন্দিনী — ওসমান। পলাশীর যুদ্ধ — সিরাজদ্দৌলা। হামির — উদয় ভট্ট। মায়াতরু — [illegible]। মোহিনীপ্রতিমা — মহেন্দ্র। আলাদীন — বাদশা। আনন্দরহো — নারায়ণসিংহ। রাবণবধ — লক্ষ্মণ। সীতার বনবাস — লক্ষ্মণ। অভিমন্যু বধ — জয়দ্রথ ও অর্জুন। লক্ষ্মণ বর্জন — লক্ষ্মণ। রামের বনবাস — রাম। সীতাহরণ — রাম। মাধবী কঙ্কণ — নরেন্দ্র। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস — অর্জুন (বৃহন্নলা)। আনন্দমঠ — মহেন্দ্রসিংহ। বসন্ত রায় — উদয়। পাণ্ডব নির্বাসন — দুর্যোধন। পূর্ণচন্দ্র — রাজা শালিবাহন। বিষাদ — অলর্ক। রাজা ও রানী — কুমারসেন। বিষবৃক্ষ — নগেন্দ্র। কৃষ্ণকান্তের উইল — গোবিন্দলাল। রজনী — শচীন্দ্র। আরো বহু নাটকে মহেন্দ্রলাল অভিনয় করে খ্যাত হয়ে ওঠেন।

মহেন্দ্রলাল বসু 'চিতোর রাজমাতা পদ্মিনী' নামে একটি নাটকও রচনা করেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ৩ জুলাই 'পদ্মিনী' গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়। মহেন্দ্রলালের সম্মানার্থেই এই অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।

গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে মতবিরোধের সময় মহেন্দ্রলাল বসু নগেন্দ্রনাথ দের সঙ্গে থাকলেও পরে ধর্মদাস সুরের দলে যোগদান করেন এবং গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ধর্মদাস সুরের নেতৃত্বে গ্রেট ন্যাশনাল সম্প্রদায়ের একটি অংশ পশ্চিম ভ্রমণে যাত্রা করলে অপর অংশ মহেন্দ্রলাল বসুর নেতৃত্বে কলকাতার মঞ্চে অভিনয় করতে থাকেন।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের অন্যান্যদের সঙ্গে মহেন্দ্রলাল বসুকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র যখন ন্যাশনাল থিয়েটারের অধিনায়ক, মহেন্দ্রলাল বসু গিরিশচন্দ্রের দলে থাকেন। গোপীচাঁদ শেঠীর স্বত্বাধিকারীত্বে ন্যাশনাল থিয়েটার ঢাকা, বাঁকীপুর, পাটনা প্রভৃতি স্থান যখন পরিভ্রমণ করেন, তখন মহেন্দ্রলাল বসু সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রতাপ জহুরীর থিয়েটারের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত জড়িত ছিলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এমারেল্ড থিয়েটারে যোগদান করেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গলে কিছুদিন অভিনয় করে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে মিনার্ভায় যোগদান করেন। তখন গিরিশচন্দ্র মিনার্ভার অধিনায়ক। এই সময় গিরিশচন্দ্র প্রফুল্ল নাটকে মহেন্দ্রলালকে যোগেশ চরিত্রে অভিনয় করতে বলেন। কিন্তু মহেন্দ্রলাল গিরিশচন্দ্র অভিনীত যোগেশ চরিত্রে অভিনয় করতে অস্বীকৃত হন। গিরিশচন্দ্র মিনার্ভা পরিত্যাগ করলেও মহেন্দ্রলাল মিনার্ভার সঙ্গে যুক্ত থাকেন এবং চুনীলাল দেবের নেতৃত্বে অভিনয় করেন।

মহেন্দ্রলাল বসু শেষ পর্যন্ত স্বর্গতঃ অমর দত্তের ক্লাসিক থিয়েটারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং বিভিন্ন নাটকে অংশ গ্রহণ করেন।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে মেঘনাদবধ নাটকে লক্ষ্মণ চরিত্রে অভিনয় করেন। তখন গিরিশচন্দ্রও ক্লাসিকে। ক্লাসিকে মুকুল মুঞ্জরা নাটক অভিনীত হবার পূর্বেই মহেন্দ্রলাল বসু অর্ধেন্দুশেখরের সঙ্গে মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করেন। সম্ভবতঃ শেষ পর্যন্ত মিনার্ভাতেই ছিলেন।

মহেন্দ্রলাল একজন ক্ষণজন্মা অভিনেতা ছিলেন। মহেন্দ্রলাল সম্পর্কেও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় খুব বেশী মালমশলা নেই। এ-বিষয়ে মহেন্দ্রলালের আত্মীয়স্বজনদের যোগাযোগ করবার জন্য অনুরোধ জানাই।

মতিলাল সুর

ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্যোক্তাদের অন্যতম মতিলাল সুরও মহেন্দ্রলাল বসুর মত পেশাদার একাদশী'র অভিনয়াংশে ছিলেন না। যাতায়াত করতেন। লীলাবতী নাটকের সময় চাঁদা সংগ্রহ ও অন্যান্য বিষয়ে কর্মতৎপরতার পরিচয় দিয়ে উদ্যোক্তাদের অন্যতম হয়ে ওঠেন। নবগোপাল মিত্র সম্প্রদায়কে 'দি ক্যালকাটা ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে নামাঙ্কিত করেন প্রথমে। মতিলাল সুরের প্রস্তাবক্রমেই 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম গৃহীত হয়।

লীলাবতী নাটকে মেজখুড়ো চরিত্রে মতিলাল সুরের সর্বপ্রথম অভিনয়। লীলাবতীর অভিনয়ের পরই সভ্যদের মধ্যে মতান্তর দেখা দেয়। গিরিশচন্দ্র মতিলাল সুরকে তাঁর ব্যর্থ কবিতা 'লুপ্ত বেণী'তে 'সিঁদুর মাখা মতির হার' বলে অভিহিত করেন।

সান্যাল ভবনে নীলদর্পণ নাটকে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর মতিলাল সুর তোরাপ, রাইচরণ, গোপ ও নীলকরদের মোক্তারের চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। অবিনাশচন্দ্র করের 'রোগ' সাহেবের মত সুরের তোরাপকেও কারো পক্ষে ম্লান করা সম্ভব হয়নি। অবিনাশচন্দ্র করের রোগ বিদেশীয়দের কাছে যেমন অভিনন্দিত হতো, ভারতীয়দের কাছে ঠিক তেমনি হতো ধিকৃত ও নিন্দিত। মতিলাল সুরের তোরাপ স্বভাবতঃই ভারতীয়দের কাছে হতো অভিনন্দিত। অপরদিকে বিদেশীয়রা এই অভিনয় দেখে উত্তেজিত হতেন। একাধিকবার মারমুখী হয়ে অভিনয় বন্ধ করে দিয়েছেন। লক্ষ্ণৌর ঘটনা এ-বিষয়ে চরম নিদর্শন।

অমৃতবাজার পত্রিকা, ইণ্ডিয়ান ডেইলী নিউজ সবাই মতিলালের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অভিনয় ছাড়া সম্প্রদায়ের আভ্যন্তরীণ পরিচালনায় মতিলালের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

গিরিশচন্দ্র এবং মহাত্মা শিশিরকুমারের যোগদানের পূর্বে নগেন্দ্রনাথ ও ধর্মদাস বাবুকে কেন্দ্র করে পৃথক দুটি দল গড়ে ওঠে। শেষোক্ত দল নগেন্দ্রনাথকে সম্পাদকের পদ থেকে অপসারিত করে মতিলাল সুরকে সম্পাদক করেন। ইণ্ডিয়ান ডেইলী নিউজ পত্রিকায় প্রকাশিত ২০ জানুয়ারী, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের বিজ্ঞপ্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

ন্যাশনাল থিয়েটার ন্যাশনাল ও হিন্দু ন্যাশনালে দ্বিধাবিভক্ত হলে মতিলালবাবু ধর্মদাস সুরের সঙ্গে ন্যাশনাল থিয়েটারেই থেকে যান। তৃতীয় পর্যায়ের ন্যাশনাল থিয়েটারের অধিনায়ক হন মতিলাল সুর। ধর্মদাসবাবু আর নগেন্দ্রনাথ কৃষ্ণমোহন নিয়োগীর সঙ্গে গড়ে তোলেন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৫ ডিসেম্বর মিলিতভাবে সান্যাল ভবনে সাময়িক উৎসব উদ্যাপনের পর মতিলাল বসুর নেতৃত্বে ন্যাশনাল থিয়েটার ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের

কপালকুণ্ডলা পর্যন্ত ন্যাশনাল ভবনেই অভিনয় করেন। এই সময় হেমলতা, কমলে-কামিনী, নীলদর্পণ, মৃণালিনী, নবীন তপস্বিনী প্রভৃতি নাটক অভিনীত হয়।

হেমলতা নাটকে সত্যসখারূপী মতিলাল সুর যখন বলতেন : ভারতভূমি পরাধীন হবার পূর্বে প্রত্যেক ভারত-সন্তান প্রাণত্যাগ করুক—তখন সবাই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতেন।

শেষ পর্যন্ত মতিলাল সুর গ্রেট ন্যাশনালে যোগদান করেন এবং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সম্প্রদায়ের সঙ্গে দিল্লী লাহোর লক্ষ্ণৌতে নীলদর্পণ নাটকের তোরাপ ও রোগ সাহেবের দৃশ্যে ক্ষিপ্ত হয়ে গোরা সৈন্যরা মারমুখী হয়। এবং শেষ পর্যন্ত সম্প্রদায় কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের সঙ্গেই যুক্ত থাকেন মতিলালবাবু। অন্যান্যদের সঙ্গে সতী কি কলঙ্কিনী নাটকাভিনয়ের সময় পুলিশ তাঁকেও গ্রেপ্তার করে।

গিরিশচন্দ্র যখন ন্যাশনাল থিয়েটারের অধিনায়ক তখন এখানে যোগদান করে আগমনী, মেঘনাদ বধ (বিভীষণ) পলাশীর যুদ্ধ (রায়দুর্লভ ও উদাসীন), দুর্গেশনন্দিনী (কৎলু খাঁ) প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করেন।

গোপীচাঁদ শেঠীর স্বত্বাধিকারিত্বে পরিচালিত ন্যাশনাল থিয়েটারেও বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করেন এবং ঢাকা, বাঁকীপুর, পাটনা বেতিয়া প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করেন।

প্রতাপ জহুরীর থিয়েটারেও গিরিশ-চন্দ্রের সঙ্গে হামির, আনন্দ রহো (ভীমশা) মাধবীকঙ্কণ (শৈলেশ্বর). প্রভৃতি আরো বহু নাটকের বিভিন্ন চরিত্র রূপায়িত করে তোলেন মতি সুর। কেদার চৌধুরীর অধিনায়কত্বে বসন্তরায়ের প্রতাপ, তরণীসেন বধে রাবণ চরিত্রে অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

গোপাললাল শীলের এমারেল্ড থিয়েটারে মতিলাল সুর অভিনীত পাণ্ডব নির্বাসন (যুধিষ্ঠির) নন্দ-বিদায় (নন্দ) বিবাদ (মাধব), রাজা ও রাণী (রাজা) অন্নপূর্ণা (গোবর্ধন) প্রভৃতিতে প্রশংসিত হয়।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে মতিলাল সুর মহেন্দ্র বসু অতুলকৃষ্ণ মিত্র এবং পূর্ণ ঘোষ এমারেল্ড থিয়েটারের লেসী হন। মতিলাল সুর ম্যানেজার হন এই সময়।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মহেন্দ্র বসু লেসী হন। কৃষ্ণকান্তের উইল নাটকে হরলাল চরিত্রে মতিবাবু অভিনয় করেন।

মতিলাল সুর সম্পর্কেও খুব বেশী তথ্য পাওয়া যায় না।

ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী

বাংলার সাধারণ নাট্যশালার গঠন যুগের সঙ্গে যেসব নাট্যরথীদের নাম জড়িয়ে আছে, স্বর্গত ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী ছিলেন তাঁদের অন্যতম। বেলবাবুর মত ক্ষেত্রবাবুও ছিলেন স্ত্রী-চরিত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। পুরোন নথিপত্র থেকে যতটা জানা যায়, তাতে মনে হয় ক্ষেত্রবাবুই ছিলেন স্ত্রীচরিত্রের সুনিপুণ অভিনেতা। তাঁর কণ্ঠস্বর ভাবভঙ্গী, সব কিছুর সঙ্গে নারীসুলভতা ফুটে উঠতো নিখুঁতভাবে।

বাংলা ১২৬৩, অগ্রহায়ণ মাসে বাগবাজারের ৪৯, রামকান্ত বসু স্ট্রীটে জন্মগ্রহণ করেন ক্ষেত্রবাবু। বাল্যশিক্ষা বাগবাজার ভার্ণাকুলার স্কুলে। এখানে তাঁর সহপাঠী ছিলেন বেলবাবু। পরবর্তী শিক্ষা আহিরীটোলার যদু পণ্ডিতের পাঠশালায়। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য ফ্রি চার্চ ইনস্টি-টিউশনে ভরতি হন। চিত্রাঙ্কনেও তাঁর পারদর্শিতা ছিল। গবর্নমেন্ট আর্ট স্কুলেও শিক্ষালাভ করেন। ক্ষেত্রবাবুর পিতার নাম ছিল মাধবচন্দ্র গাঙ্গুলী। নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথমা ও দ্বিতীয়া কন্যা ধরাসুন্দরী ও ব্রজ-সুন্দরীর গৃহশিক্ষক ছিলেন ক্ষেত্রবাবু।

ক্ষেত্রবাবুর সুন্দর চেহারা দেখে লীলাবতী নাটকের সময় নগেন্দ্রনাথ ক্ষেত্র-বাবুকে গিরিশচন্দ্রের কাছে নিয়ে যান। গিরিশচন্দ্র এবং নগেন্দ্রনাথ উভয়েই ক্ষেত্র-বাবুর আবৃত্তি শুনে মুগ্ধ হন এবং লীলাবতী নাটকে রাজলক্ষ্মী চরিত্রে নির্বাচন করেন। রাজলক্ষ্মী উচ্চপ্রশংসিত হয়।

নীলদর্পণ নাটকে অভিনয় করেন সরলা চরিত্রে। স্বয়ং দীনবন্ধু মিত্র ন্যাশনাল থিয়েটারে লীলাবতী নাটকে লীলাবতী চরিত্রের অভিনয় দেখে বলেন : 'তুমি আমার নাটকের নায়িকার জীবন দিবার জন্য জন্মিয়াছো।'

ক্ষেত্রবাবু অভিনীত নাটক ও চরিত্র-গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : লীলা-বতী—লীলাবতী ও রাজলক্ষ্মী। নীলদর্পণ—সরলা। নবীন তপস্বিনী—কামিনী। জামাই বারিক—পাঁচি। কৃষ্ণ-কুমারী—কৃষ্ণকুমারী। মৃণালিনী—মনোরমা। কপালকুণ্ডলা—কপালকুণ্ডলা। দুর্গেশনন্দিনী—তিলোত্তমা। নয়শো রূপেয়া—নায়িকা। হেমলতা—হেমলতা। নবনাটক, প্রণয় পরীক্ষা, রুদ্রপাল শত্রু সংহার, পুরুবিক্রম প্রভৃতি আরো বহু নাটকে ক্ষেত্রবাবু উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন।

কৃষ্ণকুমারী নাটকের অভিনয় দেখে মাইকেল ক্ষেত্রবাবুকে যেভাবে অভিনন্দিত করেন, ক্ষেত্রবাবুর নিজের কথাতেই তা এখানে তুলে দিলাম।

'অভিনয়ান্তে ভিতরে আসিয়া তিনি গিরিশবাবুর নাট্যপ্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেন। নগেন, অর্ধেন্দু ও ভুবনবাবুরও (অমৃতলাল) খুব সুখ্যাতি করেন। পরে আমাকে দেখিতে পাইয়া 'কৃষ্ণকুমারী ইউ হ্যাভ ডান টু পারফেকশন' বলিয়া আমাকে কোলে করিয়া নাচিলেন।'

ক্ষেত্রবাবুর অভিনয় সম্পর্কে অবিনাশ-চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন : 'করুণ রসাত্মক চরিত্রে ক্ষেত্রবাবুর অভিনয়ে চোখে জল রাখা যেত না।'

রসরাজ অমৃতলাল লিখেছেন : 'মিষ্ট পার্টগুলির অভিনয়ে ক্ষেত্রবাবু এবং একটু ঝাঁজাল পার্টগুলির অভিনয়ে বেলবাবু অতুলনীয় ছিলেন।'

ঢাকার বেলিয়াটি গ্রামের জমিদার স্বর্গত ব্রজেন্দ্রকুমার রায় বেলিয়াটিতে একটি সখের থিয়েটার স্থাপন করলে ক্ষেত্রবাবুকে ১০০ টাকা মাইনে দিয়ে নিয়ে যান। ক্ষেত্রবাবু সম্প্রদায়কে শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলেন এবং ন্যাশনালে অভিনীত নাটকগুলি অভিনয় করান। প্রতিটি নাটক উচ্চপ্রশংসা লাভ করে। এখানে ক্ষেত্রবাবু দু' বছর ছিলেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যখন যুবরাজরূপে ভারতে আসেন, বাঁকীপুরেও তিনি এই সময় পদার্পণ করেন। তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য বিরাট এক প্যাণ্ডেল নির্মাণ করা হয়। এই প্যাণ্ডেল নির্মাণের চুক্তি পেয়ে-ছিলেন দুর্গাগতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে বাগবাজারের ভবনাথ সেনমশায়। ভবনাথবাবু ক্ষেত্রবাবুকে প্যাণ্ডেলের অঙ্কনকার্যে নিয়োগ করেন। প্যাণ্ডেলটি সকলের প্রশংসার্জন করে। দুর্গাগতি-বাবুর সঙ্গে ক্ষেত্রবাবুর পরিচয় হয়। বাঁকীপুরে ক্ষেত্রবাবুর সহায়তায় দুর্গাগতিবাবু একটি নাট্য সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। এজন্য প্রায় এক বছর ক্ষেত্রবাবুকে বাঁকীপুরে থাকতে হয়। পরে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করলেও অভিনয়ে যোগদান করেন না।

চুনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামে ক্ষেত্র-বাবুর জনৈক আত্মীয় সিমলায় একটি চাকুরী সংগ্রহ করে দেন। এই চাকুরী নিয়ে ক্ষেত্রবাবু সিমলায় যান। পরে তাঁর আর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

—কালীশ মুখোপাধ্যায়

গতবছর অশোককে নিয়ে অনেক টানাটানি চলেছিল কিন্তু নতুন জার্সি আর গায়ে চাপে নি। সন্তোষ ট্রফি অর্থাৎ জাতীয় বাংলার প্রতিনিধিত্ব সর্বপ্রথম করেছেন ১৯৬৯। তারপর থেকে এ পর্যন্ত খেলেই চলেছেন। এশীয় যুব ফুটবল খেলেছেন '৬৬—৬৭ (ব্যাঙ্কক) এবং ৬৭—৬৮ (সিওল)। এশীয় ক্লাব চ্যাম্পিয়নশীপ ফুটবলে আষ্ট্ এফ এ'র হয়ে তেহরানে খেলেছেন ১৯৭০ সালে। ঐ বছর মারদেকা ফুটবলেও অশোক ছিলেন ভারতের অন্যতম খেলোয়াড়।

জীবনের হাসি আর কান্নার দুটি ঘটনা বল না? প্রশ্নটা শুনে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার কলকাতার সদর দপ্তরের বিল সেকসনের (পেয়েবল) ক্লার্ক অশোক ব্যানার্জী একটু হেসে ফেললেন। তারপর মিনিট খানেক ভেবে নিয়ে বলো : 'স্টেজের অ্যাকটর এবং গড়ের মাঠের ফুটবল খেলোয়াড়ের মনে সুখ দুঃখ বলে কোন পদার্থ এখনও আছে কি? হ্যাঁ টিম জিতলে ভাল লাগে, ভাল খেললে ভাল লাগে।' পাশে বসা শংকর ব্যানার্জি, সুকল্যাণ ঘোষদস্তিদার, প্রণব সরকারের দিকে চেয়ে বল্লেন : 'ওঁদেরই জিজ্ঞেস করুন না, সুখ দুঃখ কিছু আছে কি না? মৌসুমের মত মাসের পর মাস খেলেই যাচ্ছি, খেলেই যাচ্ছি। বিশ্রাম নেই, আরাম নেই। তবু মাঝে মাঝে আনন্দের ছোঁয়াও পাই। পর পর পাঁচ বার আমাদের ইস্টবেঙ্গল কলকাতার সিনিয়ার ডিভিসন লীগ চ্যাম্পিয়ন হোল, সবাই অভিনন্দন জানালেন, আনন্দ পেলাম।'

—বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

খেলার জগতে মেয়ে

ওপেনিং ব্যাট—কেয়া রায়

বারাণসীতে মেয়েদের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বাংলা দলের ইনিংসের গোড়াপত্তন করার দায়িত্ব পড়েছিল দমদমের ক্রাইস্টচার্চ স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী কেয়া রায়ের ওপর, সঙ্গী ছিল সন্ধ্যা মজুমদার। কালীঘাট মাঠে ফুটফুটে মেয়ে কেয়ার সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করলুম, ক্রিকেট খেলার ওপর তোমার ঝোঁক হল কি করে? উত্তরে বললে, পাড়ায় দাদারা আর তাদের বন্ধুদের সঙ্গে খেলে খেলে অভ্যাস করি। বাবা অবশ্য এ জন্য খুব বকাবকি করতেন। আমি বাড়ীর ছোট মেয়ে, তাই বাবা আমায় ভালও বাসেন খুব। খবরের কাগজে মেয়েদের ক্রিকেট দল তৈরীর খবর বের হতেই বাবা এখানে নিয়ে এলেন। কেয়ার বাবা স্টেটসম্যানের চীফ ফটোগ্রাফার সুধীর রায়। ওরা তিন ভাই, দু বোন। বারাণসীতে যাবার আগে এখানে দুই প্রশিক্ষক বাদল চন্দ্র এবং সুনীল দাশগুপ্তের কাছে অনুশীলন করে। এতদিনে পুরো-পুরি একটা দলে এভাবে খেলার সুযোগ পেয়ে খুব আনন্দ হল। সেই সঙ্গে আশংকাও হচ্ছিল। অজানা বোলারদের বল কি রকম হবে, কিভাবে তার মোকাবিলা করবে, এই সব ভেবে। তবে, নির্দেশ মত প্রথমে কিছুক্ষণ, জানেন বল দেখে দেখে আস্তে আস্তে হাত জমাবার চেষ্টা করেছি। তারপর বলের তেজ একটু কমতেই সুযোগ মত মেরেছি, বলে কেয়া। কেয়া বলে, খুব সাবধানে লক্ষ্য করেছি বলের লেংথ কি রকম পড়ছে। খোঁচা-টোঁচা মারার চেষ্টাই করিনি। খালি স্ট্রেট ড্রাইভ করেছি।

স্কুলের নানা খেলায় কেয়া যোগ দেয়। ও বলে, মেয়েদের স্কুলে স্কুলে যদি ক্রিকেট খেলার ব্যবস্থা হয়, তাহলে খুব ভাল হয়। খবরের কাগজে ও পত্র-পত্রিকায় ক্রিকেটের নানা খবর, প্রবন্ধ পড়তে কেয়ার খুব ভাল লাগে। অন্য খেলার থেকে ক্রিকেটের ওপরই আগ্রহ সবচেয়ে বেশী। ওর আশা, স্কুল থেকে ও যখন কলেজে উঠবে তখন কলেজে কলেজে ক্রিকেটের চর্চা নিশ্চয়ই বেড়ে যাবে।

বারাণসীর প্রতিযোগিতায় ফাইনালে কেয়াই দলের সর্বোচ্চ রান করে। প্রতি-যোগিতার সব কটি খেলা মিলিয়ে মোট সর্বোচ্চ রান করার কৃতিত্বও কেয়ার।

বাংলা দল বাঙ্গালোরে আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে বসে ঠিক আছে। এই দলে স্থান পাবার জন্য কেয়া খুব আগ্রহী। ভাল করে ব্যাটিং আর ফিল্ডিং অনুশীলন করে নিজেকে বাছাই দলের উপযুক্ত করে তুলতে চায় কেয়া। তাছাড়া ঐ খেলার সাফল্যের সূত্রে আগামী বছর ফেব্রুয়ারীতে ভারত সফরাগত অস্ট্রেলীয় মহিলা ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে খেলারও আশা রাখে। তার আগেই জানুয়ারীতে কলকাতায় সর্বভারতীয় মহিলা ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আসর বসছে। সুতরাং খেলার সুযোগ এখন খুবই। সেই সঙ্গে আন্তরিকভাবে অনুশীলন করার দায়িত্ব আসছে।

ক্রিকেট ছাড়াও কেয়া নাচ ও গান শিখছে। ওর হবি হচ্ছে নানান দেশের ডাক-টিকিট আর মুদ্রা সংগ্রহ করা। অবসর সময়ে রং তুলি নিয়ে বসে ছবি আঁকে। কেয়ার বিশ্বাস,—আমাদের দল এখন সবচেয়ে শক্তিশালী।

খেলাধুলা

ডেরেক আন্ডারউড

পাকিস্তানের বিপক্ষে ২য় টেস্টে ৭১ রানে ১৩টা উইকেট পান (১ম ইনিংসে ২০ রানে ৫ এবং ২য় ইনিংসে ৫১ রানে ৮ উইঃ)

ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তান

দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট

লর্ডস মাঠে ইংল্যান্ড বনাম পাকিস্তানের দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলাটি অমীমাংসিত থেকে গেছে। এই ফলাফলের জন্যে বৃষ্টিই সম্পূর্ণ দায়ী। শেষ পঞ্চম দিনে বৃষ্টির দরুন খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি। খেলার প্রথম চার দিন যে বৃষ্টি পাকিস্তানকে পরাজয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছিল শেষ পর্যন্ত তারই কৃপায় পাকিস্তান এ যাত্রা পরাজয় থেকে খুব জোর বেঁচে গেল। খেলার শেষ দিনে ইংল্যান্ডের জয়লাভের জন্যে মাত্র ৬০ রান করার দরকার ছিল। তাদের হাতে জমা ছিল ১০টা উইকেট।

এখানে উল্লেখ্য, লিডসের প্রথম টেস্টও ঠিক এইভাবে বৃষ্টিতে ভন্ডুল হয়েছিল। বৃষ্টির জন্যে খেলার শেষ দিনের খেলা আরম্ভ করা যায়নি। জয়লাভের জন্যে ইংল্যান্ডের ৪৪ রানের দরকার ছিল এবং তাদের হাতে জমা ছিল ৪টে উইকেট। সুতরাং দু-দুবার ইংল্যান্ডকে জয়লাভের দোরগোড়া থেকে ফিরে যেতে হল।

প্রথম দিনে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং নিজেদের চরম অবস্থার কথা ভেবে পাকিস্তান তাদের প্রথম ইনিংসের ১৩০ রানের (৯ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। উদ্দেশ্য, ভিজে পিচে ইংল্যান্ডকে যতটা কাবু করা যায়। ইংল্যান্ড খেলার বাকি সময়ে প্রথম ইনিংসের একটা উইকেট খুইয়ে ৪২ রান তুলেছিল। বৃষ্টি-ভেজা মাঠে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসের খেলার আরম্ভ ভালই হয়েছিল—কোন উইকেট না খুইয়ে ৭১ রান। প্রথম এক-ঘণ্টার খেলায় তাদের ৫১ রান উঠেছিল। কিন্তু লাঞ্চের পর ইংল্যান্ডের অনুকূলে খেলা ঘুরে যায়। তাদের ৯১ রানের মাথায় ৩টে উইকেট পড়ে—২য়, ৩য় এবং ৪র্থ। ডেরেক আন্ডারউডের বল পাকিস্তানের কাল হয়ে দাঁড়ায়। মাত্র ২০ রান দিয়ে আন্ডারউড ৫টা উইকেট পেয়েছিলেন, গ্রেগ পেয়েছিলেন ৩টে উইকেট ২৩ রানে।

দ্বিতীয় দিনে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ২৭০ রানের মাথায় শেষ হলে তারা পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসের ১৩০ রানের থেকে ১৪০ রানে এগিয়ে যায়। লাঞ্চের সময় ইংল্যান্ডের রান ছিল ১০৬ (৫ উইকেটে)। ইংল্যান্ডের ১১৮ রানের মাথায় ৬ষ্ঠ উইকেট পড়ে যায়। দলের এই দারুণ সংকটে দৃঢ়তার সঙ্গে খেলেছিলেন ৭ম উইকেটের জুটি উইকেট কিপার অ্যালান নট (৮৩ রান) এবং পেস বোলার ক্রিস ওল্ড (৪১ রান)। তারা ৭ম উইকেটের জুটিতে ৯১ রান তুলে ইংল্যান্ডের অনুকূলে খেলার গতি ঘুরিয়ে দেন।

তৃতীয় দিনে পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ১৭৩ রান দাঁড়ায় ৩ উইকেট পড়ে। ফলে পাকিস্তান ১৪০ রানের ঘাটতি পূরণ করে ৩৩ রানে এগিয়ে যায়। তাদের হাতে জমা থাকে দ্বিতীয় ইনিংসের ৭টা উইকেট। অসমাপ্ত ৪র্থ উইকেটের জুটিতে মুস্তাক মহম্মদ (৫৫ রান) এবং ওয়াসিম রাজা (৪৪ রান) ৯৬ রান তুলে অপরাজিত থাকেন।

চতুর্থ দিনে পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস ২২৬ রানের মাথায় শেষ হয়। এইদিন তারা বাকি ৭ উইকেটে মাত্র ৫৩ রান তুলেছিল। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলাতেও পাকিস্তানের কাল হয়ে দাঁড়ান

ছিলেন আণ্ডারউড। চতুর্থ দিনে পাকিস্তানের সাতটি উইকেটের মধ্যে আণ্ডারউড একাই মাত্র ৯ রান দিয়ে ৬টা উইকেট পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি ৫১ রানে ৮টা উইকেট পান। দুই ইনিংসের খেলায় আণ্ডারউড মাত্র ৭১ রান দিয়ে ১৩টা উইকেট পেয়েছিলেন (১ম ইনিংসে ২০ রানে ৫ ও ২য় ইনিংসে ৫১ রানে ৮ উইকেট)। পাকিস্তানের মুস্তাক মহম্মদ একাই যা লড়ে যান। তিনি ৭৬ রান করে আউট হন। চতুর্থ উইকেটের জুটিতে ওয়াসিম রাজা (৫৩ রান) এবং মুস্তাক মহম্মদ (৭৬ রান) দলের অতি মূল্যবান ১১৫ রান তুলেছিলেন। ইংল্যাণ্ড খেলায় জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৮৭ রান তুলতে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং বাকি সময়ের খেলায় কোন উইকেট না খুইয়ে ২৭ রান তুলে নেয়। জয়লাভের প্রয়োজনীয় বাকি ৬০ রান তুলতে হাতে জমা থাকে ১০টা উইকেট এবং পুরো এক দিনের খেলার সময়।

শেষ পঞ্চম দিনে বৃষ্টির জন্যে খেলা আরম্ভ হয়নি। ফলে খেলা অমীমাংসিত থেকে যায়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পাকিস্তান : ১৩০ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। সাদিক মহম্মদ ৪০ এবং মজিদ খান ৪৮ রান। আণ্ডারউড ২০ রানে ৫ এবং গ্রেগ ২৩ রানে ৩ উইকেট)

ও ২২৬ রান (সাদিক মহম্মদ ২৩, মুস্তাক মহম্মদ ৭৬ এবং ওয়াসিম রাজা ৫৩ রান। আণ্ডারউড ৫১ রানে ৮ উইকেট)

ইংল্যাণ্ড : ২৭০ রান (অ্যালান নট ৮৩, উড ৪১ এবং এড্‌রিচ ৪০ রান। আসিফ মাসুদ ৪৭ রানে ৩ উইকেট)

ও ২৭ রান (কোন উইকেট না পড়ে)

ভলভো টেনিস প্রতিযোগিতা

নিউ হ্যামশায়ার ভলভো টেনিস প্রতিযোগিতার সিঙ্গলস ফাইনালে ১নং বাছাই রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৪, ৬-৪ ও ৬-৩ গেমে ২নং বাছাই হ্যারল্ড সলোমনকে (আমেরিকা) হারিয়ে পুরস্কার হিসাবে পেয়েছেন নগদ ৯ হাজার ডলার এবং একটি নতুন ভলভো মোটর গাড়ি। তাছাড়া ডাবলস খেতাব জয়ের সূত্রে তিনি আরও ১২০০ ডলার নগদ পেয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য, রড লেভার টেনিস খেলার ইতিহাসে সর্বাধিক অর্থ উপার্জনকারী খেলোয়াড়। আলোচ্য প্রতিযোগিতার একদিকের সেমি-ফাইনালে লেভার ৬ নং বাছা জন আলেকজাণ্ডারকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন। অপর দিকের সেমি-ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী এবং ৪ নং বাছাই বিজয় অমৃতরাজকে পরাজিত করেন আমেরিকার হ্যারল্ড সলোমন। বিজয় অমৃতরাজ গত বছর এই আসরে সিঙ্গলস খেতাব জয়ের পথে রড লেভার, জন আলেকজাণ্ডার এবং জিমি কোনর্সকে হারিয়ে রাতারাতি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

আমেরিকান ক্লে কোর্ট টেনিস প্রতিযোগিতা

আমেরিকার জাতীয় ক্লে কোর্ট টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলসে জিমি কোনর্স এবং মেয়েদের সিঙ্গলসে কোনর্সের বাগদত্তা কুমারী ক্রিস এভার্ট চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন। কোনর্স এই সিঙ্গলস খেতাব জয়ের সূত্রে নগদ ১৬,০০০ ডলার পেয়েছেন।

এশিয়ান গেমস

তেহরানে সপ্তম এশিয়ান গেমস আগামী ১লা সেপ্টেম্বর বসছে। এই আসরের ১৬ রকমের খেলার মধ্যে ... রকমের খেলায় অংশ গ্রহণ করবে। ভারতীয় দলে প্রতিযোগী সংখ্যা ১৩০ জন; কর্মকর্তা, কোচ, রেফারী, অম্পায়ার প্রভৃতির সংখ্যা ৩৮ জন। ভারতের ১৬৮ জন সদস্যের দলই এশিয়ান গেমসে ভারতের সব থেকে বড় দল। এবার ভারতীয় দলে যে ৭ জন মেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে বাঙ্গালী মাত্র একজন—শ্রীরূপা চ্যাটার্জি। এখানে উল্লেখ্য, অ্যাথলেটিকস যে ২৮ জন (পুরুষ ২২ ও মেয়ে ৬) নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী রূপা চ্যাটার্জি একমাত্র বাঙ্গালী।

বিভিন্ন বিভাগে নির্বাচিত ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের সংখ্যা এইরকম : অ্যাথলেটিকস ২৮ জন (পুরুষ ২২ ও মেয়ে ৬), হকি ১৮, ফুটবল ২০, ভলিবল ..., টেনিস ৩, ব্যাডমিণ্টন ৫, বক্সিং ..., সাইক্লিং ৫, সুটিং ৬, ওয়াটারপোলো ..., কুস্তি ১৫ এবং ভারোত্তোলন ১।

আসন্ন ৭ম এশিয়ান গেমসে ... যোগদানের ফলে অনুষ্ঠানের গুরুত্ব ... বেড়ে গেছে। সুদীর্ঘ ১৬ বছর পর চীন আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদান করছে। সুতরাং তাদের সাফল্য সম্পর্কে আগে থেকে কিছু বলা খুবই শক্ত। এখানে উল্লেখ্য, জাপান এশিয়ান গেমসের প্রতি আসরে প্রথম স্থান পেয়ে এসেছে। কোন দেশ জাপানের সঙ্গে সমানে ... দিতে পারেনি। ১৯৭০ সালের এশিয়ান গেমসে শীর্ষস্থান অধিকারী জাপানের যেখানে মোট পদক সংখ্যা ১৪৪ (স্বর্ণ ৭৪, রৌপ্য ৪৭ ও ... ২৩), সেখানে ২য় স্থান অধিকারী দক্ষিণ কোরিয়ার ছিল ৫৪টি পদক (স্বর্ণ ..., রৌপ্য ১৩ ও ব্রোঞ্জ ২৩) এবং ৫ম স্থান অধিকারী ভারতের মোট পদক ছিল ২৫টি (স্বর্ণ, ৬, রৌপ্য ৯ ও ব্রোঞ্জ ১০)। ভারতের পদক জয়ের খতিয়ান : স্বর্ণ ৬ (অ্যাথলেটিকস ৪, কুস্তি ১, বক্সিং ১), রৌপ্য ৯ (অ্যাথলেটিকস ..., কুস্তি ১, হকি ১, ওয়াটারপোলো ১ ... বক্সিং ১) এবং ব্রোঞ্জ ১০ (অ্যাথলেটিকস ৫, কুস্তি ৩, ফুটবল ১ ও ইয়াটিং ১)

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

যোগ দিন বাজাজ লাইটিং প্রতিযোগিতায় এবং ৫০,০০০ টাকার পুরস্কার জিতুন

আপনাকে যা করতে হবে :

- নিচের দেওয়া ছয়টি বক্তব্য সত্য বা মিথ্যে বিচার করে সেইমত নির্দিষ্ট জায়গায় ✓ চিহ্ন বসিয়ে দিন।
- কেবল ইংরাজী বা হিন্দিতে বাজাজ লাইটিং-এর সম্বন্ধে অনধিক ১০ শব্দের ভেতরে একটি বাক্য লিখুন।
- সম্পূর্ণ প্রবেশ পত্রটি বাজাজ লাইটিং কনটেস্ট পোস্ট ব্যাগ নং ১০১৫৩, বোম্বাই ৪০০ ০০১, ঠিকানায় পাঠান।
- আপনার প্রবেশপত্র হস্তগত হলে বাজাজ লাইটিং উৎপাদনের জন্য আপনাকে একটি ১০% ডিসকাউন্ট কুপন পাঠানো হবে।

এখানে কাটুন

প্রবেশ মূল্য নেই

বক্তব্য	সত্য	মিথ্যা
১। মোটের ওপর ফ্লুয়েসেন্ট টিউবের চেয়ে সাধারণ বাল্বে খরচ কম।		
২। বাজাজ বাল্ব আর টিউব সারা বিশ্বের সেরা জিনিসের সঙ্গে সমভাবে তুলনীয়।		
৩। ২৩০ ভোল্ট মেইনস সাপ্লাইতে ২৩০ ভোল্ট বাল্ব ব্যবহার করলে সবচেয়ে বেশি দক্ষতা অর্জিত হয়।		
৪। বাজাজ নাইট ল্যাম্পে এক ঘণ্টায় শূন্য পাওয়ার খরচ হয়।		
৫। বাজাজের সাদা কোটিং দেওয়া বাল্ব মিল্কি হোয়াইট নামে পরিচিত।		
৬। বাজাজ কেবল লাইটিং উৎপাদন বিক্রেতা।		

এখানে কাটুন

কেবল ইংরাজি বা হিন্দিতে বাক্য লিখুন

বড় অক্ষরে স্পষ্ট করে লিখুন :

নাম ....

ঠিকানা ....

....

....

স্ত্রী/পুরুষ .... বয়স ....

পুরস্কার

৫ ১ম পুরস্কার—বাজাজ স্কুটার
৪ ২য় পুরস্কার—বাজাজ কুকিং রেঞ্জ
২০ ৩য় পুরস্কার—বাজাজ বাহার ডিলাক্স টেবিল পাখা
১০০ সান্ত্বনা পুরস্কার—বাজাজ ডিলাক্স প্রেসার কুকার ৫.৫ লিটার
৬০০ বাজাজ নাইট লিট ল্যাম্প—প্রথম ৬০০ প্রবেশ পত্রের জন্য

নিয়ম

- বাজাজ ইলেকট্রিক্যালস্ লিঃ, তাঁদের বিক্রেতা ও এডভারটাইজিং এজেন্টের কর্মচারী ও আত্মীয়স্বজন এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।
- একজন ব্যক্তি কেবল একটিমাত্র প্রবেশপত্র পাঠাতে পারবেন।
- প্রবেশপত্র হারিয়ে যাওয়ার, নষ্ট হবার বা দেরিতে পৌঁছুনোর জন্য কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা হবে না।
- সর্বশ্রেষ্ঠ বাক্য সম্বন্ধে বিচারকদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- পুরস্কার বিজেতাদের ডাকমারফৎ জানানো হবে।

শেষ তারিখ ৩১শে অক্টোবর ১৯৭৪ বাজাজ

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-3.

AMRITA

Friday 30th August, 1974
Phone 55-5231 (14 lines)

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ /

৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ ॥

মূল্য ৫০ পয়সা

ডেট কাপড় ধোয়ার কেক
অন্যান্য সাবানের তুলনায় ১½ গুণ বেশী কাপড় ধোয়—তা সে জল যে ধরণেরই হোক।
ডেট কাপড় ধোয়ার পাউডার
সাদা কিংবা রঙীন — যে কোন সাইজে পাবেন। কেবল ডেট গোলা জলে ডুবান আর ধুয়ে নিন। এটি আপনার হাতের পক্ষেও নিরাপদ।
এন-ডেট
দাগ ধুয়ে পরিষ্কার করার এনজাইমযুক্ত পাউডার, সক্রিয় কিন্তু ক্ষতিকর নয়।
new det
detergent washing cake
NEW! TRIPLE ACTION
det
WASHES WHITEST
enzyme
det
washes away stubborn stains
না কখনও ছিল, না পাবেন—এমন শুভ্রতা ডেটের উৎকৃষ্ট উৎপাদন
Shilpi HPMA 5A/74 Ben

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানানো হয়। অমনোনীত রচনা সাধারণত ফেরত পাঠান সম্ভব নয়। সেজন্যে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য অমৃতের কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে অমৃতের কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণি-অর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০.০০	টাকা ৩০.০০
ষাণ্মাষিক	টাকা ১২.৫০	টাকা ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬.২৫	টাকা ৮.০০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১৪ বর্ষ

সংখ্যা ১৮
মূল্য—৫০ পয়সা

"ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 6th September, 1974 শুক্রবার, ২০ ভাদ্র, ১৩৮১ 50 Paise

সূচিপত্র

আমলকীই ইহার
প্রধান উপকরণ

কেশের পুষ্টিসাধন ও কেশমূল সুদৃঢ় করে। কেশের সজীবতা ও স্বাভাবিক বর্ণ ফিরিয়ে আনে। কেশপতন ও অকালপক্বতা রোধ ক'রে ঘনকৃষ্ণ সুন্দর কেশোদ্গমে সহায়তা করে। মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ ও কর্মক্ষম রাখে।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা
কলিকাতা-৫

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

ভারতের নতুন রাষ্ট্রপতি

প্রত্যাশিতভাবেই শ্রীফকরুদ্দিন আলি আমেদ শতকরা ৮০ ভাগ ভোট লাভ করে ভারতের পঞ্চম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৬৯ সালে শ্রীগিরি এবং শ্রীসঞ্জীব রেড্ডির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়া এ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সত্যিকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিশেষ হয়নি। কারণ, ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন পরোক্ষভাবে, সংসদ ও বিধানসভার সদস্যদের ভোটে। সর্বত্রই কংগ্রেসের এমন বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা যে অন্য কোনো দলের প্রার্থীর পক্ষে তার কাছাকাছি আসাও কঠিন, জয়লাভের তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তা সত্ত্বেও বিরোধী দলের প্রার্থী শ্রীত্রিদিব চৌধুরী সরকারী ব্যর্থতার বিরুদ্ধে 'রাজনৈতিক প্রতিবাদ' জানাবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। গণতান্ত্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঐতিহ্য অনুযায়ী তিনিই সর্বপ্রথম অভিনন্দিত করেন বিজয়ী শ্রীআমেদকে।

এই নির্বাচনের মাধ্যমে কতকগুলো বিষয় বেশ স্পষ্ট হয়েছে। বিরোধীরা প্রার্থী দিয়েছিলেন, কিন্তু সমস্ত কংগ্রেসবিরোধীরা এই ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেননি। সি. পি. আই কোনো প্রার্থীকেই ভোট দেয়নি। কংগ্রেসপ্রার্থীকে ভোট না দিয়ে তাঁরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করলেন আবার বিরোধী প্রার্থীকেও সমর্থন জানালেন না তাঁরা নীতিগত কারণে। এতে সি. পি. আইয়ের প্রতি কংগ্রেস ও বিরোধী বামপন্থী উভয়েই বিরূপ। তা ছাড়া বামপন্থীদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন যে সহজ নয় এতে তাও বেশ ভালভাবেই বোঝা গেল। কংগ্রেসপ্রার্থীর বিরুদ্ধে তাঁরা দাঁড়ালেন সংগঠন কংগ্রেস, জনসংঘ প্রভৃতি দলের সাহায্য নিয়ে। স্মরণীয় যে, ১৯৬৯ সালের নির্বাচনে এই বামপন্থীরা কংগ্রেসসমর্থিত প্রার্থী শ্রীগিরির পক্ষেই ভোট দিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁদের বিরোধিতার আদর্শগত কারণ তাই আছে কিনা এ নিয়েও সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে।

আরও লক্ষণীয় যে, তামিলনাড়ুর ডি. এম. কে এবং আন্না ডি. এম. কে উভয় দলই শ্রীআমেদকে ভোট দিয়েছে। ভোট দেয়নি সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম লীগ যদিও শ্রীআমেদ একজন মুসলিম। মুসলিম লীগের ভোট না দেওয়ার কারণ সুস্পষ্ট। শ্রীআমেদ আজীবন মুসলিম লীগ রাজনীতির বিরোধিতা করেছেন। দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করে তিনি গান্ধী-নেহরুর আদর্শ অনুসরণ করে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শ্রীআমেদের নির্বাচন ভারতের গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শকেই শক্তিশালী করল। আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা যে কত মজবুত, তার গণতান্ত্রিক কাঠামোকে স্পর্শ করার শক্তি যে কারো নেই নির্বিঘ্ন নির্বাচনের মাধ্যমেই তা আরেকবার প্রমাণিত হল।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিদায় নিলেন। নতুন রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানান হল। বস্তুত এর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সংস্থার ধারাবাহিকতাই সূচিত। ভারতের রাষ্ট্রপতি ঠিক মার্কিন রাষ্ট্রপতির মতো সমস্ত কার্যকরী শক্তির অধিকারী নন। কিন্তু তিনি সমস্ত শক্তির প্রতিভূ। সংসদ ও মন্ত্রিসভার মাধ্যমে তিনি তাঁর সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। তাঁদের পাশ কাটিয়ে বা বাদ দিয়ে তিনি ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারেন না। কিন্তু তা হলেও রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে তাঁর ব্যক্তিত্ব, পরামর্শ এবং অভিজ্ঞতা মন্ত্রিসভার পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। তাই তাঁর পদটিকে শুধু শোভাবর্ধক মনে করার কোনো যুক্তি নেই। বিদায়ী রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরির কাছ থেকে সরকার এবং জাতি বিভিন্ন সময়ে অনেক পরামর্শ পেয়েছেন। সাধারণ মানুষের অনেক সমস্যা তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। সরকার ও জনগণ উভয়কেই তিনি নানা বিষয়ে সতর্ক করেছেন সংকট সময়ে। আমরা আশা করব নতুন রাষ্ট্রপতি সংবিধানের পবিত্রতা এবং জনগণের স্বার্থরক্ষায় তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করতে কখনোই পশ্চাদপদ হবেন না।

ফিরে আসার সময় পাঞ্জাবির বুকে সেণ্ট মাখিয়ে দিয়েছিল অবন্তী।

এখন ঝলমলে আকাশের তলা দিয়ে ছুটে যাচ্ছে ট্রেন। সারা দুপুরে বৃষ্টি গেছে। ট্রেনের সঙ্গে ছুটন্ত দৃশ্যাবলী, মাঠঘাট, গাছগাছালী, বাড়ীঘর এখন বিকেল পাঁচটার নতুন করে ওঠা রোদে ঝলমল। ঝিলের জলে রোদ একঝাঁক রূপালী মাছের মত। দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল শুভময়। দমকা হাওয়ায় অবিন্যস্ত তার একমাথা চুল। চোখের পাতা টানটান করে মেলে রাখতে হচ্ছিল ওকে। হাওয়ায় শুভময়ের বুক থেকে উঠে আসছিল সুগন্ধ।

শুভময় দেখছিল, চোখের সামনে দ্রুত বদলে যাচ্ছে দৃশ্য। দূরের নারকেল গাছের জটলা, এই আছে, চলেছে সঙ্গে সঙ্গে, এই নেই! বয়ে যাচ্ছে ঝিলের ঝিলমিল স্রোত, বইছে, বয়ে যাচ্ছে, নেই! এমনিভাবে দৃশ্যান্তর ঘটছে ঘরবাড়ী থেকে কলাবাগান, লোকালয় থেকে নির্জন মাঠ। শুভময়ের বুকের ভিতরও তেমনি খেলা করে খুশীয়াল অনুভব। সেই খেলায় বারবার ভেসে ওঠে এক মুখ। শ্যামল গায়ের রং, ঝকঝকে চোখ, ঠোঁটের পাশে বাদামী রঙের

কাছেই কোথায় কোকিল

শংকর দাশগুপ্ত

একলা তিল, হাসলে উঁকিদেয়া বাড়তি একটা দাঁত বরফকুঁচির মত। সে মুখ অবন্তীর। শুধু অবন্তীরই।

কি করছে এখন অবন্তী? নতুন কেনা তানপুরাটায় গলা সাধছে? উঠান জুড়ে কাঠকরবীর গন্ধ। বৃষ্টিভেজা ফুল ঝরে পড়েছে বারান্দার কাছাকাছি। সারা দুপুর বৃষ্টির আঘাতে বেজে ওঠা অবন্তীদের বাড়ীর টিনের চাল এখনও মৃদু কাঁপছে কি? কি করছে অবন্তী? বৃষ্টির বিকেলে নিশ্চয়ই ঝাঁপিয়ে পড়েনি সামনের টলটলে পুকুরে। অবন্তী খুব শীতভীতু। বৃষ্টির দুপুরেই সে চাদর গায় দিয়ে গুটিসুটি হয়। কি করছে তবে? রুটি বেলতে বসেছে রান্নাঘরে? উনোনের আঁচে ঝলমলে মুখ অবন্তীর। রুটি বেললে হাতের রঙীন কাঁচের চুড়ি নেমে আসছে ঠুনঠুন হাতের কব্জিতে। কপালের ওপর নেমে এসেছে চুলের মুরলী। সরু আঙুলে সরাচ্ছে অবন্তী নুয়ে পড়া কপালে চুলের দুষ্টুমী। হাতের ওপর তুলে নিচ্ছে রঙীন কাঁচের চুড়ি। না, সে তো সন্ধ্যায়। এখন তো বিকেলই ফুরোয় নি।

শুভময় যখন গিয়েছিল অবন্তীদের বাড়ী, তখন দুপুর। কাঠের দরজার ফাঁক দিয়ে উঠান, উঠানে পড়ে থাকা কাঠকরবী, উঠানের একোণ ওকোণে জমে থাকা বৃষ্টির জল, জলে আকাশের ভাঙ্গাভাঙ্গা ছায়া— এসব কিছুর মধ্যে দিয়ে অবন্তীর ছোট্ট ঘর দেখতে পেয়েছিল শুভময়। 'অবন্তী কি ঘুমিয়ে আছে?' ভাবতে ভাবতে মৃদু কড়া নেড়েছিল শুভময় অবন্তীদের বন্ধ দরজায়।

দরজা খুললো অবন্তীর ছোটভাই। ঘুড়ি সাড়াতে সাড়াতে উঠে এসেছে নীলু। হাতে রঙীন কাগজের টুকরো। বারান্দায় আঠার শিশি, ছেঁড়া ঘুড়িও দেখতে পেলো শুভময়।

—নীলু, দিদি আছে?

—হুঁ, ঘুমুচ্ছে।

—স্কুলে যাও নি, ছুটি?

—ছুটি হয়ে গেছে।

—কেন?

—বৃষ্টির জন্য। কি যেন বলে—

—রেনী ডে?

—হ্যাঁ।

—দিদি ঘুমিয়েছে?

—বোধহয়। ডাকুন, উঠে পড়বে। বেশী ঘুমায়নি

নীলুর কথাটা খুব সুন্দর লাগে শুভময়ের। বৃষ্টির পর শিশুদের মুখ আরো পবিত্র দেখায়। নীলুর একমাথা চুলে আঙুল দিয়ে একটু আদর করে শুভময়। তারপর উঠান পার হয়ে অবন্তীর ঘরের দিকে পা বাড়ায়। কাঠকরবী গাছের পাতা থেকে দু'একফোঁটা বৃষ্টির জল টুপটাপ করে পড়ে শুভময়ের চুলে, চশমার কাচে। যেন বহুদিন পর, এই আসায় কাঠকরবী প্রশ্ন করে 'কেমন আছো? কেমন আছো?

অবন্তীর ঘরে কাঠের দরজার মাঝখানে তারের জাল লাগানো। শুভময় জালের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে ঘরের ভিতর অবন্তীকে খোঁজে। সারা দিনই আজ বৃষ্টি। জাল ঠাণ্ডা লাগে শুভময়ের নাকে। ঘরটা একটু অন্ধকার। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে শুভময়। তারপর অন্ধকার তার চোখে সয়ে যায় একসময়। শুভময় এবার ধীরে ধীরে দেখতে পায়, খাটের ওপর গলা পর্যন্ত চাদরে ঢেকে বৃষ্টির দুপুরের খুব আরামের ঘুম ঘুমাচ্ছে অবন্তী।

'অবন্তী, এই' একটু জোরেই ডাকে শুভময়।

আর ঠিক এক ডাকেই, শুভময় দেখে চোখ খুলেছে অবন্তী। ঘাড় কাত করে কয়েক মুহূর্ত দেখে অবন্তী। একটু হাসে ঘুম-ঠোঁটে। তারপর গায়ের চাদর সরিয়ে উঠে পড়ে খাট থেকে। শাড়ী-টাড়ি ঠিক করে দরজার দিকে এগিয়ে আসে।

বন্ধ দরজার ওপারে অবন্তী, এপারে শুভময়। দরজা খুলতে খুলতে, নীচু হয়ে দরজার ঠাণ্ডা জালের ওপর রাখা শুভময়ের হাতের আঙুলে কুটুস করে কামড়ে দেয় অবন্তী।

চমকে উঠে শুভময়। দেখে, অবন্তীর কালো চোখের তারা দুষ্টুমিতে ঝকমিক। কোন ঘুমটুম নেই সে চোখে। শুভময় বোঝে এতক্ষণ ঘুমাচ্ছিলই না অবন্তী। ঘুমের ভাব করে চাদর মুড়ি দিয়ে গুটিসুটি শুয়েছিল। অবন্তী বুঝেছিল শুভময় এসেছে।

দরজা খুলে দিয়ে নিজের খাটে পা ঝুলিয়ে বসে অবন্তী। পা দোলায় মেঝে ছুঁয়ে ছুঁয়ে। মুখোমুখি চেয়ারে শুভময় বসে। কিছুক্ষণ কোন কথা হয় না। অবন্তীর ছায়াময় ঘর দেখে শুভময়। কোণের দিকে নতুন কেনা সেই তানপুরা। দেয়ালে অবন্তীর হাসিমুখের ছবি। দুর্গা প্রতিমার মুখ মাইকের সামনে ঘাড় ঈষৎ বেঁকিয়ে গান গাইছে অবন্তী ফাংশানে তোলা ছবি—সব ঠিক আগের মত। দেখতে দেখতে, শুভময় দেখে, অবন্তী আর আগের মত পা ঝুলিয়ে বসে নেই খাটে কখন যেন পা মুড়ে, চাদর টাদর গায় জড়িয়ে, দেয়ালে হেলান দিয়ে বেশ আরাম করে বসেছে।

শুভময়ের একটু শীত শীত করছিল। বৃষ্টিতে একটু ভিজেছে ও। সে ভিজে জামা গায়েই শুকিয়েছে। এখন ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটু শীত শীত করে শুভময়ের। হাতে হাত ঘসে শীতের ভাব করল শুভময়। অবন্তীর দিকে চেয়ে বলল 'তোমার কাছে যাবো?'

—কেন? বুঝেও যেন প্রশ্ন করল অবন্তী।

—এক চাদরে দুজন? শীতশীত করছে! শীতকাতুরে গলায় বলল শুভময়।

কিছু না বলে অবন্তী চোখে শাসন করে।

অবন্তীর খাটটা লোভীর মত দেখে শুভময়। তারপর। একসময় বলল

—তুমি ওকে বুকে নিয়ে রোজ ঘুমাও? দুপুরেও!

—কাকে? বুঝতে না পেরে অবাক গলায় প্রশ্ন করে অবন্তী।

চশমার ভিতরে চোখ দুটো একটু কুঁচকায় শুভময়, তারপর ফাজিল গলায় বলল

—ঐ কোলবালিশমশাইকে?

আবার চোখে শাসন আনতে চাইলে অবন্তী পারে না, হেসে ফেলে বলে

—তুমি না, দিনদিন একটা যা-তা হয়ে যাচ্ছো, অসভ্য!

শুভময়ের চোখে পড়ে হাসলে অবন্তীর সেই দাঁতটা স্পষ্ট দেখা যায় ছোট্ট সুন্দর একটা বাড়তি দাঁত আছে অবন্তীর। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন বরফ খেতে গিয়ে দাঁতের ফাঁকে আটকে গেছে ছোট্ট একটা বরফের কুচি। হাসলে ঝকঝকে দাঁতগুলোর মধ্যে বাড়তি এই দাঁতটাও উঁকি দেয়। শুভময়ের দারুণ লাগে...

—অবন্তী কাছে এসো তো।

—কেন?

—ঠোঁট ফাঁক করো একটু। একটু হাসো তো।

—ওমা, কেন?

—তোমার সুন্দর একটা বাড়তি দাঁত আছে।

—সুন্দর?

—ঠিক বরফ কুচির মত।

—তো কি হলো?

—আমি একটা চুমো খাবো অবন্তী।

—ওমা!

—ছোট্ট একটা গরম চুমো খাবো তোমার ঐ বরফ-কুচি দাঁতটা ছুঁয়ে'

—গরম চুমো? ঠাণ্ডা চুমো? ছোট্ট চুমো? হয় নাকি?

—হয়। এখন গরম চুমো, ছোট্ট চুমো খেয়ে তোমার বরফকুচি দাঁতটা গলিয়ে দেবো। অনেক দিনের ইচ্ছে আমার অবন্তী।

—শুধু ইচ্ছে?

—না, লোভও।

পুরোনো ইচ্ছে আর লোভের কাল্পনিক সংলাপগুলো আবার একবার এই অবন্তীর ছায়াময় ঘরে বসে মনে মনে বলে যায় শুভময়। একলা একলাই। অবন্তী জানেও না শুভময়ের এই ইচ্ছের কথা। ভাবতে ভাবতে আপন মনেই বোধহয় একটু হেসে ফেলে। সে হাসি চোখ এড়ায় না অবন্তীর।

—এই তুমি হাসছো কেন শুধু শুধু? অবন্তী ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করে হঠাৎ।

ফস করে মিথ্যে কথা বানিয়ে ফেলে শুভময়। অবন্তীর দিকে তাকিয়ে বলে
—তোমাকে দেখে।

একটু ভুরু কুঁচকায় অবন্তী, বলল 'আমি আবার হাসির কি হলাম?'

এবার অস্পষ্ট হাসি উঠে আসে শুভময়ের গলায়, বলে, অবন্তী তুমি কি রকম হাঁটু মুড়ে বসে আছো, গায়ে চাদর জড়ানো তোমার, টান-টান করে চুল বাঁধো তুমি রোজ বিকেলে, এখন তোমার চুল খোলা।'

—'তাতে কি হল? হাসি পেলো? বিরক্ত প্রশ্ন করে অবন্তী

—তাতে নয় শুভময় অবন্তীর প্রশ্নের অবসরে কথা বানিয়ে বলে, তোমাকে কেমন যেন লাগছে।'
—কেমন?
—'যেন তুমি অবন্তীই নও।'
—তবে কে?
—খুব ভক্তিমতীর পোজে বসে আছো তুমি, যেন সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীমা।

—আর তুমি? প্রশ্ন করতে গিয়ে একটু হেসে ফেলে এবার অবন্তী।
আমি? কপট ভক্তির গলায় বলে শুভময়—'আমি যেন আমি নয়।'
—কে? হেসে প্রশ্ন করে অবন্তী।

—তোমার অনুগত সন্তান, হাত জোড় করে বলল শুভময় 'পায়ের কাছে বসে, তোমার অমৃত কথা শুনছি, আ-হা!' বলতে বলতে হাসি চাপাতে পারে না শুভময়। অবন্তীও হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়ে।

এখন কি করছে অবন্তী? শুভময়কে জানালার ধারে নিয়ে ছুটে যাচ্ছে বিকেল শেষের ট্রেন। একটার পর একটা স্টেশন। বদলে যাচ্ছে চোখের সামনে দৃশ্য। নতুন তানপুরায় গলা সাধছে অবন্তী? চুলটুল বেঁধে হয়তো রুটি বেলতে বসে গেছে রান্নাঘরে; মেঘলা দিনে সন্ধ্যা হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি। একদিন শুভময় খুব সাধারণ এক দৃশ্যের মধ্যে অবন্তীকে খুব সুন্দর দেখেছিল। ডুরে শাড়ী পরনে, টান-টান করে বাঁধা চুল, জ্বলন্ত উনোনের কাছাকাছি বসে রুটি বেলছিল অবন্তী। মাথা ঈষৎ ঝুঁকে পড়ায় পরিষ্কার সিঁথি দেখা যাচ্ছিল অবন্তীর। বারবার হাতের রঙীন কাঁচের চুড়িগুলো নেমে আসছিল হাতের নীচের দিকে। বারবার আঙুল দিয়ে ঠেলে তুলে দিচ্ছিল অবন্তী। কয়েক মুহূর্ত তারপর আবার ঠুনঠুন শব্দ, আবার রঙীন চুড়ির নেমে আসা। ভাঙা দেয়ালের ছোট্ট রান্নাঘর, জ্বলন্ত উনোনে লেগে থাকা হলুদ ডালের শুকনো দাগ, চৌখুপি মেঝে, ছোট্ট জানালা, তার কোণে ঈষৎ ঝুঁকে অবন্তীর সেই রুটি বেলা, চুড়িতে ঠুনঠুন, পরিষ্কার সিঁথি, উনোনের আঁচে অমলিনে অবন্তীর মুখ তুলে তাকানো—প্রিয় এক ছবির মত আজো মনে আছে শুভময়ের। আজও স্পষ্ট।

অবন্তীদের বাড়ী যাওয়ার পথে বহুদিন পর আজ কোকিলের ডাক শুনতে পেয়েছিল শুভময়। কলকাতা শহরে ঋতু বড় অভিমানে চলে যায়। যদিও এখন বসন্তকাল নয় তবু কোকিলের ডাক ভেসে এসেছিল এই মফস্বল শহরের গাছগাছালির মাঝ থেকে। অবন্তীর বাড়ী থেকে ফেরার পথে আবার কোকিলের ডাক শুনতে পেয়েছিল শুভময়। তখন শুভময়ের মন ভাল ছিল।

অবন্তী এক সময় সহজ গলায় বলেছিল
—এই তুমি অবন্তী সেনগুপ্তকে চেনো?
—কে অবন্তী সেনগুপ্ত? প্রশ্ন করেছিল শুভময়
—সেদিন এক বিয়েবাড়ীতে আলাপ হল। আমার নামের নাম, শুধু তফাৎ আমি বন্দ্যোপাধ্যায়, ও সেনগুপ্ত, তাই আলাপ করলাম। মেয়েটার চোখদুটো ভুরু অনেকটা

তোমার মত। আর তোমরা বৈদ্যরা সকলে তো, আত্মীয়, তাই ভাবলাম, অবন্তী সেনগুপ্ত বোধহয় শুভময় সেনগুপ্তের কেউ হবে-টবে?

শুভময় একটু দেখে অবন্তীকে তারপর ঠিক অবন্তীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—আমি কিন্তু এক অবন্তীকে চিনি, অবন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়, সে কিন্তু কথা দিয়েছিল একদিন অবন্তী সেনগুপ্ত হবে।

খুব মজা করে বললেও শুভময় দেখে অবন্তীর মুখে দুঃখের ছায়া চোখ দুটোতেই। দু'এক মুহূর্ত অবন্তী মাথা নীচু করে বসে থাকে, তারপর এক সময় মুখ তুলে তাকায় শুভময়ের দিকে দু' একবার চোখের পাতা থিরথির করে কাঁপে অবন্তীর, বলে

—সে দোষ কি আমার?

কি বলতে গিয়ে থেমে যায় শুভময়। সত্যিই তো! একটা চাকরী জাস্ট যে কোন একটা চাকরী এখনও জোগাড় করতে পারল না সে। গত মাসে ফাংশানে গেয়ে পাওয়া টাকা দিয়ে সুন্দর একটা শান্তিনিকেতনী ব্যাগ কিনে দিয়েছে তাকে অবন্তী। অথচ এত দিনের ভালবাসায় কোন উপহার সে দিতে পারেনি অবন্তীকে। যদিও ভালবাসার উপহার ভালবাসাই, তবু নিজেকে অবন্তীর এই প্রশ্নে কেমন অসহায় আর অপরাধী মনে হয় শুভময়ের।

—বসো তোমার জন্য চা করে নিয়ে আসি। খুব নীচু গলায় বলে ঘরে থেকে চলে যায় অবন্তী।

অবন্তীর ছায়াময় মেঘলা ঘরে বসে নিজেকে হঠাৎ কেমন একা মনে হয় শুভময়ের। সাত সাতটা ইন্টারভিউয়ের রিগ্রেট লেটার যেন নিহত পাখীর মত পায়ের কাছে মুখ থুবড়ে পড়ে। টুপটাপ দুপুর-বৃষ্টির জল ঝরে পড়ে কাঠকরবী গাছের দীঘল পাতা থেকে অবন্তীদের উঠানে। কোকিল ডাকে না। রান্নাঘর থেকে কাপডিসের টুংটাং শব্দ ভেসে আসে শুধু।

এক সময় অবন্তী ঘরে ঢোকে। খোলা চুল কখন হাত খোঁপা বেঁধেছে অবন্তী। মুখে একটু ঘাম। চায়ের কাপ প্লেট এগিয়ে দেয় অবন্তী। প্লেটের পাশে দুটো বিস্কুট।

—নীলু বাড়ী নেই অবন্তী বলে—তোমাকে সিঙ্গারা এনে দিতে পারলাম না।' কথাটা শুনে একটু যেন কেঁপে ওঠে শুভময়। অবন্তী ঠিক মনে রেখেছে শুভময়ের প্রিয় জিনিসের কথা। হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ নিতে নিতে শুভময় বলে—

—তোমার চা?

—তুমি নাও আমি আনছি।

অবন্তী রান্নাঘর থেকে নিজের চা নিয়ে আসে। অবন্তী খুব চা-খোর। কাপে-টাপে হয় না ওর। প্রায় এক কাঁচের গ্লাশ চা নিয়ে অবন্তী এবার জানালার ওপর বসে।

—আমার একটা চাকরী বোধহয় এবার হয়ে যাবে অবন্তী।

শুভময়ের কথায় মুখ তুলে তাকায় অবন্তী। শুভময় বলে, 'আমাদের পাড়ার একটা স্কুলে, আপাতত লিভ ভ্যাকেন্সী।' একটু থামে শুভময়—আমি খুব চেষ্টা করছি অবন্তী, কিন্তু বিশ্বাস করো—

—আমার ক্রিসানথিমাম গাছ, হঠাৎ বলে অবন্তী—'যেটা তুমি শিয়ালদার রথের মেলা থেকে কিনে দিয়েছিলে, জানো সেটাতে কুঁড়ি এসেছে, দুটো কুঁড়ি পাশাপাশি।

প্রথমে ঠিক বোঝে না শুভময়। তার মনেই পড়ে না কবে সে ফুলের গাছ উপহার দিয়েছে অবন্তীকে। তারপর এক সময় মনে পড়ে তার। অবন্তীর বড় শখ ফুলগাছের। গত বছর রথের মেলা থেকে কিনে দিয়েছিল শুভময় অবন্তীকে তার প্রিয় ফুলগাছ। মনেই ছিল না শুভময়ের। এই তুচ্ছ কথায় হঠাৎ কেমন মন ভাল লাগে শুভময়ের। অবন্তীর এই মনে করিয়ে দেয়ায় যেন অন্য কিছু ছিল।

—ভদ্রলোক আর বোধহয় ফিরবেন না। মজার দিয়ে বলে শুভময়।

—ফুল দুটো কয়েক দিনের মধ্যেই ফুটবে। অন্যমনস্ক বলে অবন্তী।

—যে ভদ্রলোকের বদলে আমার চাকরীটা হচ্ছে। শুভময় বলে।

—ফুল দুটো যদি ধবধবে শাদা হয়! অবন্তীর গলায় খুশী উঠে আসে।

—চাকরীটা ক্রমশ পার্মানেন্ট হয়ে যাবে। প্রায় নিশ্চিন্তের মত বলে শুভময়।

—ফুল দুটো ঝরে যেতেই আবার নতুন কুঁড়ি আসবে। ফিসফিস করে অবন্তী।

—চাকরীটা কনফার্মড হয়ে গেলেই—শুভময় তাকায় অবন্তীর দিকে।

—গাছময় ফুল আর ফুল। অবন্তীর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

এইভাবে ছায়াময় মেঘলা ঘরে বসে শুভময় আর অবন্তী স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নের মধ্যে কথা বলে। শুভময় বোঝে তাদের ভালোবাসা প্রথম ফুল ফোটার মত পবিত্র। অবন্তীর অভিমান ভ্রমরের মত দংশন নয় সে অভিমান ফুল ফোটানোর গুঞ্জন শুধু।

ঝমঝম শব্দে ব্রিজ পার হয় শুভময়ের ট্রেন। ফেরে আসার সময় পাঞ্জাবির বুকে সেন্ট মাখিয়ে দিয়েছিল অবন্তী। মনে পড়ে......

—দাঁড়াও।

—কি?

—আমার স্মৃতি।

—কেন? যদি ভুলে যাই? ভয়?

—না যদি ভুল বোঝো। দুঃখ।

শুভময়ের ট্রেন শিয়ালদার কাছাকাছি এসে যায়। পাঞ্জাবির বুকের কাছ থেকে উঠে আসে সুগন্ধ। মনে পড়ে......

—কিসের ভুল?

অবন্তী বন্দ্যোপাধ্যায় অবন্তী সেনগুপ্ত হবে না।

শুভময় তাকায় অবন্তীর দিকে। সুন্দর একটু হাসে অবন্তী। বরফকুঁচির মত বাড়তি দাঁতটা উঁকি দেয়, ঝিকিয়ে ওঠে। বুকের খুব কাছে সুগন্ধের মাঝখানে অবন্তীর হাসিমুখ। শুভময় মুখ নীচু করে।

গম গম শব্দে শিয়ালদা ষ্টেশনে ঢোকে শুভময়ের ট্রেন। মনে পড়ে......

অবন্তীর ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়ালে কাছেই কোথায় যেন কোকিল ডেকেছিল।

হরিষে বিষাদ

ভদ্রমহোদয়গণ, বলতে লজ্জা হয়, খবরের কাগজে সব কথাই ফাঁস করে দিয়েছে। এ আমাদের একটা জাতীয় দুর্ভাগ্য বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। আমরা অনেক দিনের চেষ্টায় বিস্তর কাঠ-খড় পুড়িয়ে একটা পরিকল্পনা আবিষ্কার করি এবং বাঙালির যুগ-যুগ অর্জিত অলসতাকে পরিহার করে কাজেও ঝাঁপিয়ে পড়ি, কিন্তু তার ফায়দা ওঠাবার আগেই তৃতীয় অঙ্কে গদা হস্তে ভীমের প্রবেশ। অর্থাৎ কিনা সবকিছুরই 'সলিল সমাধি' ঘটে।

উদাহরণ? যত্রতত্র ছড়ানো রয়েছে। যেমন ধরুন আজকে সকালবেলাকার এই টাটকা খবরটা।—

কলকাতা ও হাওড়ার কয়েক জায়গায় হানা দিয়ে পুলিশ স্কুল ফাইনাল আর হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষার কিছু জাল মার্কশীট ও সার্টিফিকেট উদ্ধার করেছে—শুনে কি বলব মশাই, আমার তো একেবারে আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে!

পয়লা কথা, পুলিশের কাজ রাস্তাঘাটের গাড়িটাড়ি সামলানো, কিম্বা দিনেদুপুরে কোথাও কিছু হাঙ্গামা-টাঙ্গামা হলে 'ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া' করে শান্তি রক্ষা করা। তারা এইভাবে এডুকেশানাল অ্যাফেয়ার্স নিয়ে মাথা ঘামাবে কেন?

দু'নম্বর আপত্তি, কুটীর শিল্পে হস্তক্ষেপ।

দেখুন ভদ্রমহোদয়গণ, আচার্য প্রফুল্ল রায়ের আমল থেকে অনেক কথাই বলা হয়েছে বাঙালির ব্যবসাবুদ্ধির অভাব নিয়ে। সেই সব বক্তৃতা আর 'এসে' কি একেবারেই অসার? আমি অন্তত তা মনে করি না। ব্যবসা বাঙালিকে করতেই হবে আর ব্যবসা করতে করতেই চাকরিরও স্কোপ বাড়িয়ে যেতে হবে। আর দেখুন, কলকাতা ও হাওড়ার ঐসব বঙ্গসন্তানেরা, (যাঁরা কেউ সেকেন্ডারী বোর্ডে চাকরি করেন, কেউ বা টিউটোরিয়াল হোমের মালিক) তাঁরা তো এই কাজটিই শুরু করেছিলেন মশায়। তাহলে আর আপত্তিটা কোথায়? বাঙালি যে পরশ্রীকাতর, এটা একেবারে বর্ণে-বর্ণে সত্যি!

কিন্তু পুলিশ যদি একটু দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন হতো, কিম্বা অপরাধ ঘটে যাচ্ছে এটা টের পাওয়ার পরও যদি একটু ওভারলুক করত (তা তো তারা অনেক ব্যাপারেই করে থাকে, না হলে মজুতদারী আর কালোবাজারী চলছে কী করে?) তাহলে কী হতো?

হতো এই যে, আরো কয়েক হাজার ছেলেমেয়ে পরীক্ষা-সাগর সাঁতরে পার হয়ে যেতো, এবং তারা অনেকেই গিয়ে কলেজে ভর্তি হতো। ফলে কলেজগুলোতে বেশি-বেশি লেকচারার অ্যাপয়েন্ট করতে হতো, এমপ্লয়মেন্টের স্কোপ বাড়ত। ওদিকে সার্টিফিকেট ম্যানুফ্যাকচারিংও বেশ জোর কদমে চলত, ফলে এমপ্লয়মেন্ট স্কোপ বাড়ত। তারপর যেসব ছেলেমেয়েরা কলেজে ভর্তি হয়েছিল, তারা বি-এ পরীক্ষা দিত। তখন অবশ্যই সার্টিফিকেট ম্যানুফ্যাকচারিং-এর কলেজ বিভাগ খুলতে হতো। তারপর এই প্রক্রিয়ায় এম-এ। ব্যস, একবার এম-এ পাশ করবে নিতে পারলেই খেলা ফতে। তখন সেইসব পাশ-করা নতুন এম-এবৃন্দ দলে দলে গিয়ে আবার লেকচারার হবে। ওদিকে বুঝতেই পারছেন, সার্টিফিকেট ম্যানুফ্যাকচারিংও জোর কদমে চলছে। তাতে আরো হাজার হাজার ছেলেমেয়ে স্কুল ফাইনাল আর হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা পাশ করে যাচ্ছে। ফলে কলেজ একেবারে টইটম্বুর। তার সমানে নতুন পাশ করা এম-এদের অ্যাবজর্ব করে নিচ্ছে। বুঝুন একবার ব্যাপারখানা। একই পরিকল্পনায় পাশ করছে, আর চাকরি পাচ্ছে—একেবারে সাইক্লিক অর্ডারে চলছে। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘটে যাচ্ছে শিক্ষার প্রসার আর ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি।

তারপর বরাত সুপ্রসন্ন হলে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্তিয়ারেও নতুন নতুন ব্রাঞ্চ খোলা যেতো। তারপর চলে যাওয়া যেতো অন্য প্রভিন্সে। জাতীয় সংহতির একেবারে চূড়ান্ত করে ছাড়া যেতো।

তারপর, আহা ভাবতেই রোমাঞ্চ হয়! অক্লেশেই ওপন করতে পারা যেতো—পি-এইচ-ডি বিভাগ। দলে দলে ডক্টরেট করে ছেড়ে দিতে পারা যেতো বাজারে। এবং আমাদের এই 'ডক্টরেট মেড ইন্ডিয়া'-র খ্যাতি এতই ছড়িয়ে পড়ত সারা পৃথিবীতে যে, এ-ব্যাপারে ভারতীয় 'নো-হাউ' আমাদের বৈদেশিক মুদ্রারও সুরাহা করে দিত। ঠিক কিনা বলুন?

কিন্তু হায় হায়, এতবড় একটা ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজের কী শোচনীয় পরিণতি। দেশের যে আজ ঘোরতর দুর্দিন তাতে আর সন্দেহ কি!

—জৈমিনি

আইন-শৃংখলা নিয়ে ভাবনা

এই বাংলায় আইন-শৃংখলার অবস্থা নিয়ে সরকার যদি ভাবিত হয়ে পড়ে থাকেন তবে তা মোটেই অকারণে নয়। সিদ্ধার্থশংকর রায়ের মন্ত্রিসভার একটা গর্ব এই যে, অন্য কোনো ব্যাপারে হয়ত তাঁরা তেমন চমক লাগাবার মতো কিছু করতে পারেন নি, কিন্তু রাজ্যের লোকের মনে নিরাপত্তা আর স্বস্তির ভাব ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন। ডাকাতির দেখে মনে হচ্ছে এখন ঐ গর্বটুকুও বুঝি যায়-যায়। কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের তরুণ ইঞ্জিনিয়ার বিজন বসুর শোচনীয় মৃত্যু নিয়ে খুবই হৈ চৈ হচ্ছে। কিন্তু চলন্ত ট্রেনে গুণ্ডা-বদমায়েসদের হামলার একমাত্র শিকার শুধু তিনিই নন। সরকারি হিসেবেই দেখা যাচ্ছে, গত বছর তিনেকের মধ্যে শহরতলীর ট্রেনের প্রায় ১৪০ জন যাত্রী এইভাবে প্রাণ হারিয়েছেন। ডাকাতি-ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে আড়াই শর বেশি। আর সরকারি হিসেবের বাইরে এই ধরনের কতো ঘটনা যে ঘটেছে, তার সঠিক হিসেব কেই বা রাখে? ব্যাপারটা এখন এতই উদ্বেগের হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, লোকসভায় পশ্চিমবাংলা থেকে নির্বাচিত সদস্যরা পর্যন্ত এ-বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারেন নি।

অবশ্য নিরাপত্তার অভাব শুধু ট্রেনের যাত্রীদেরই নয়। সেদিন ২৪ পরগণা জেলার হাবড়ায় সংগঠন কংগ্রেসের এক নেতা বাসের মধ্যে খুন হলেন। খুন হয়েছেন দুর্গাপুরে ইস্পাত শ্রমিকদের এক নেতাও। আর শুধু খুনো-খুনি নয়, মেয়েদের মান-ইজ্জতও আবার অনেক জায়গায় বিপন্ন। বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে এক তরুণীকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে কাছের এক পোড়ো বাড়িতে তার ওপর অত্যাচার করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ এখনও এ-ব্যাপারে কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে নি। সাধারণ আইন-শৃংখলার যখন এই অবস্থা, তখন পুলিশ সূত্রের খবর হলো নকসালদের দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন ছত্রভংগ হয়ে যাচ্ছে। নকসালরা জড়িত আছে, এমন হিংসাত্মক ঘটনার সংখ্যা কমে আসছে। '৭১ সালে এই ধরনের ঘটনা ঘটে ২৬০২টি, '৭২ সালে ৮৪টি, '৭৩ সালে ৫৪টি আর চলতি বছরে এ পর্যন্ত ৩৪টি।

সাধারণ আইন-শৃংখলার অবস্থা খারাপ হওয়ায় উদ্বিগ্ন হয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র দপ্তর এবং পুলিশের বড় কর্তাদের সংগে ঘন ঘন বৈঠক করছেন। সেনাবাহিনীর কর্তারাও এই আলোচনায় যোগ দিচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট সকলকে হুঁশিয়ার করে বলে দিয়েছেন, ১৯৭০-৭১ সালের দুঃস্বপ্নের দিনগুলো যেন আবার ফিরে না-আসে সেদিকে নজর রাখতে হবে। আর দোষীদের ধরার সময় কংগ্রেসী-দেরও যেন ছেড়ে দেওয়া না-হয়। ট্রেনে চুরি-ছিনতাই-হত্যা বন্ধের জন্যেও মুখ্যমন্ত্রী কয়েক দিন আগে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন।

রেশনে চাল ছাঁটাই

বিধিবদ্ধ রেশনের চালে আবার টান পড়লো। মাথা-পিছু বরাদ্দ ২৫০ গ্রাম করে ছাঁটাই। বদলে মিলবে ঐ পরিমাণ গম। ফলে চাল-গম মিলিয়ে মোট বরাদ্দটা থেকে গেল একই। পেট ভরাতে হয়ত অসুবিধে হবে না। কিন্তু "ভেতো" বাঙালির মুখে এত গম রুচবে কি? তাই আশংকা, খোলা বাজার অর্থাৎ কালোবাজারের চালের দিকে আরো হাত বাড়াবে তারা। ফলে সেখানে দর চড়বে আরো। কেন হঠাৎ এই চালের বরাদ্দ ছাঁটাই? কারণটা হলো, কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্যভাণ্ডার থেকে প্রয়োজন মতো চাল মিলছে না। দরকার মাসে ৫০ হাজার টন। অথচ আগস্টের প্রথম তিন সপ্তাহে পাওয়া গেছে মাত্র আট হাজার টন। এক দিকে এই কম যোগান, তার ওপর রাজ্যের খরা-বন্যা-ঘূর্ণিঝড়পীড়িত এলাকায় ত্রাণের জন্য পাঠাতে হচ্ছে খাদ্যশস্য।

গমের কোটা (মাসে ৯০ হাজার টন) থেকেও কেন্দ্রীয় সরকার কিছু দিন আগে ১৫ হাজার টন ছাঁটাই করেছিলেন। ফলে দেখা দিয়েছিল সংকট। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আবার ২৩ হাজার টন দিতে রাজি করানো গেছে, এই রক্ষে। তা না হলে চাল ছাঁটাইয়ের ফাঁক কি আর [illegible] গম দিয়ে পূরণ করা যেত? এই বাংলার রেশন বা [illegible] যে দিল্লীর যোগানের মুখ চেয়ে থাকে সে কথা দিল্লীও জানে সবচেয়ে ভালো। তবু প্রায়ই চলে এই যোগান নিয়ে টালবাহানা। অবশ্য পশ্চিমবাংলা সরকার যদি নিজেরা যথেষ্ট চাল সংগ্রহ করতে পারতেন তবে তাঁদের এতটা অসহায় অবস্থা হতো না। কিন্তু তাঁরা তো নির্দিষ্ট পাঁচ লাখ টনের মধ্যে পৌনে দু লাখ টনের বেশি সংগ্রহ করতে পারেন নি। শোনা যাচ্ছে, সরকার খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে নতুন ব্যবস্থা নিতে চলেছেন। হয়ত সরকার যে দামে ধান কেনেন তা বাড়িয়ে দেওয়া হবে। ফলে বাজার দরের সংগে ঐ দরের সমতা আসবে। লুকোনো মজুত উদ্ধারের জন্যেও রাজ্য সরকার আসরে নামবেন। সংগে থাকবে কংগ্রেসের ছেলেরা। এই ব্যাপারে কংগ্রেসের সংগে হাত মেলাবে কম্যুনিস্ট পার্টি।

বন্যা-ঝড়ে ক্ষতি

ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতির খবরটা মেদিনীপুর থেকেই দ্রুত এসে পৌঁচেছিল। ২৪ পরগণাও যে একটা বড় ধাক্কা খেয়েছে এটুকু আঁচ করা গিয়েছিল প্রথমেই, কিন্তু ক্ষতির পরিমাণটা ঠিকমতো জানা যায় নি। এখন যে ছবি পাওয়া যাচ্ছে ২৪ পরগণার, তা বেশ ভয়াবহ। ঝড় আর বন্যা একদিকে হিঙ্গলগঞ্জ, কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা জয়নগর

মঙ্গলপুর এবং অন্য দিকে বসিরহাট মহকুমায় অনেক জায়গাতেই বাঁধ ভেঙেছে। সুন্দরবন এলাকায় বাঁধ-ভাঙা নোনা জল চাষের ক্ষেতে ঢুকে পড়ে ঘটিয়েছে সর্বনাশ। এই মাসের গোড়ায় যখন খুব বৃষ্টি হয় তখনই বাঁধগুলোর অবস্থা কাহিল হয়েছিল। তখন সেদিকে কেউ বিশেষ নজর দেয় নি। ঝড়ের সময় তাই সহজেই সেগুলো ভেঙে পড়ে। এখন এইসব বাঁধ মেরামত করতে চার কোটি টাকা লাগবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। কিন্তু এত টাকা আসবে কোথা থেকে সেই একটা ভাবনা।

এদিকে সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এই বাংলায় ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা সম্পর্কে একটা ছবি এখন পাওয়া যাচ্ছে। কম করেও লাখ পনের লোক ক্ষতিগ্রস্ত। তার মধ্যে উত্তর বাংলার জেলাগুলো এবং মুর্শিদাবাদে ন লাখ, ২৪-পরগণায় চার লাখ আর মেদিনীপুরে দু লাখ। উত্তর বাংলা আর মুর্শিদাবাদে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার পরিমাণ প্রায় এগার শ বর্গমাইল। ঘরবাড়ি ধসেছে ৭০ হাজারের বেশি। সাড়ে তিন লাখ একরের বেশি এলাকায় শস্যের ক্ষতি হয়েছে। শুধু এই ক্ষতির পরিমাণই ১৮ কোটি টাকার কাছাকাছি। ২৪-পরগণাতেও তিন লাখ একরের মতো জমিতে শস্যের ক্ষতি হয়েছে। মেদিনীপুরে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামের সংখ্যা চার হাজারের বেশি।

এই যখন অবস্থা, তখন প্রকৃতির হাতে মার-খাওয়া লাখ লাখ মানুষের ত্রাণের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে একটি পয়সাও পাওয়া যাবে না বলে জানা গেছে। এমন কি, বন্যার্ত এলাকা পরিদর্শনের জন্যে দিল্লী থেকে কেউ আসবেনও না। এই মনোভাব বদলের জন্যে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু সেই অনুরোধে কতোটা কাজ হবে তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। রাজ্য সরকার ত্রাণের জন্যে যথাসাধ্য করছেন, কিন্তু সেই সাধ্য খুব বেশি নয়। ত্রাণখাতে বরাদ্দের চেয়ে খরচ ইতিমধ্যেই বেশি হয়ে গেছে। ফলে হাত পড়েছে উন্নয়ন খাতের টাকায়। সেটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু উপায়ই বা কী?

বনের বাঘ আবার বনে

মাসখানেক ধরে অনেক হাঙ্গামার পর ১৫ আগস্ট মাঝরাতে ঝড়খালির সেই আতঙ্ক শেষ পর্যন্ত যখন ধরা দিল তখন দেখা গেল সে সত্যিই বাঘিনী নয়, বাঘ। বন বিভাগের সাধের দেওয়া 'সুন্দরী' নাম তাই তাকে মানায় না। বয়স দু বছরও হয়নি। লম্বায় প্রায় ন ফুট। সুন্দরবনের ঐ এলাকায় বাঘটা শুধু কুকুর-মুরগী-গরুই খায়নি তার থাবার চোটে এক বৃদ্ধাও মারা পড়েন। কিন্তু ভারতের জাতীয় পশুকুলের এই প্রতিনিধিটির রকম-সকম সম্পর্কে খোঁজখবর করে বন বিভাগ সিদ্ধান্তে আসেন যে, এটি মানুষখেকো নয়, সুতরাং এটিকে প্রাণে মারা ঠিক হবে না। তাছাড়া বাঘের বংশ দ্রুত লোপ পাচ্ছে, এই সময় একটি বাঘেরও ভবলীলা সাঙ্গ করে দেওয়া ঠিক নয়। তাই ঠিক হয় বাঘটিকে ভালোভাবে পরীক্ষার জন্যে কোনোভাবে বন্দী করা হবে। এই কাজে রাজ্য সরকারকে সাহায্যের জন্যে এলেন মার্কিন জীববিজ্ঞানী জন জিডেনস্টাইকার। এই দীর্ঘদেহী বিদেশী হাতে বন্দুক নিয়ে ঝড়খালিতে দিনের পর দিন (অথবা রাতের পর রাত) কাটালেন। সঙ্গে রইলেন বিশ্ব বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বোর্ডের মিসেস অ্যান রাইট আর রাজ্য সরকার বন বিভাগের কয়েকজন অফিসার। কিন্তু জিডেনস্টাইকারের বন্দুক সাধারণ বন্দুক নয়, বন্যপ্রাণীকে ঘুম পাড়াবার ওষুধ-ভর্তি সিরিঞ্জ ছোঁড়ার জন্যে এই বন্দুক। শেষ পর্যন্ত ঐ সিরিঞ্জই গিয়ে লাগলো বাঘের কোমরে আর বাঘও ঢলে পড়লো ঘুমের কোলে। পরীক্ষা করে দেখা গেল, না, বাঘটা মানুষখেকো সত্যিই নয় তার কোনো রোগও নেই। ভালোভাবে শিকার করতে শেখার আগেই কোনোভাবে ছিটকে নিজের আস্তানা ছেড়ে চলে এসেছে লোকালয়ে। তাই তাকে খাঁচায় ভরে ছেড়ে দিয়ে আসা হলো বাঘেদের জন্যে সংরক্ষিত গোসাবার অরণ্যে। বনের বাঘ আবার বনে ফিরে গেল, কিন্তু পিছনে রেখে গেল একটা প্রশ্ন—বাঘ নিয়ে ক দিন ধরে এই হৈ-চৈয়ের পিছনে আর কিছু ব্যাপার ছিল না তো? বন বিভাগের অধিকাংশ কর্মী যখন বাঘ নিয়ে ব্যস্ত তখন সেই অবসরে কেউ চোরা-চালান ইত্যাদির কাজ গুছিয়ে নিচ্ছিল না তো?

২৭-৮-৭৪

—দেবদত্ত

কংগ্রেস-সি পি আই-নয় পার্টি আন্দোলনের পূজা-সংখ্যা বের করছে

এবার পশ্চিমবাংলায় প্রাক পূজায় বেশ কয়েক বৎসর পরে আন্দোলনের পূজা-নাম্বার প্রকাশিত হচ্ছে। এই আন্দোলনের পূজা-নাম্বার সম্পাদনের দায়িত্ব নিয়েছেন নয় পার্টি জোট, ছ'টি বামপন্থী কৃষক সংগঠন, সাতটি বামপন্থী ছাত্র সংগঠন। কংগ্রেস, সি পি আই-ও পিছিয়ে নেই, তারাও পূজা-স্পেশালের জন্যে জোর প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছেন। তবে কংগ্রেস ও সি পি আই-এর পূজা-নাম্বার যুগ্ম সম্পাদনায় হবে, না আলাদা আলাদা সম্পাদনায় বের হবে, সেটা এখনও ঠিক হয়নি। এই প্রস্তুতির যে খবর ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে সি পি এম সহ নয়-পার্টি জোট গত ১২ই ও ১৬ই অগস্ট দুটি বৈঠকে মিলিত হয়ে ঠিক করেছেন, (মানে কর্মসূচী নিয়েছেন) তারা রাজ্যের খাদ্য ও অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় জোর আন্দোলন শুরু করবেন। ১৭ই অগস্ট রাজ্যের ছ'টি বামপন্থী কৃষক সংগঠন এক বৈঠকে মিলিত হয়ে ঠিক করেছেন, তারা জবরদস্ত আন্দোলন করবেন। সাতটি বামপন্থী ছাত্র সংগঠন গত ১৮ই অগস্ট পর্যন্ত একাধিক বৈঠক করে ঠিক করেছেন, রাজ্যে তারা জঙ্গী ছাত্র আন্দোলন শুরু করবেন। যদিও এইদিন সাতটি ছাত্র সংগঠন কোনও ঐকামতে আসতে না পেরে চারদল ও তিনদলে ভাগ হয়ে গেছেন, কিন্তু জঙ্গী আন্দোলনের কর্মসূচী ঠিকই আছে। সি পি আই বলতে গেলে আন্দোলন শুরুই করে দিয়েছে। গত ২২শে অগস্ট মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়ের কাছে এক স্মারকলিপি পেশের মাধ্যমে আন্দোলনের সূচনা করেছে। কংগ্রেস, সে-ও বসে নেই। গত ১৮ই অগস্ট ও ২১শে অগস্ট দুটি বৈঠকে মিলিত হয়ে মজুত-উদ্ধার আন্দোলন শুরু করবার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে আবার কংগ্রেস ও সি পি আই নেতাদের গত ২২শে ও ২৭শে আগস্ট দুটি যুক্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে প্রধান আলোচ্য ছিলো, আন্দোলন করা যায় কি-না। ১৯৬৬ সালের পর রাজ্যের বামপন্থীরা প্রাক পূজায় কোনও আন্দোলনে নামেননি। অথচ ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত পূজার আগে খাদ্য আন্দোলন বাৎসরিক ঘটনা ছিলো। প্রথম যুগে এই আন্দোলন হতো দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি ও খাদ্য অভিযান কমিটির নামে আলাদা আলাদা ভাবে। পরে খাদ্য অভিযান কমিটি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি এক হয়ে যায় এবং ১৯৫৭ সাল থেকে রাজনৈতিক দলগুলি দলের নামে ঐক্যবদ্ধ মোর্চায় আন্দোলন করেন। ১৯৬৬ সালে এই খাদ্য আন্দোলন পূজার অনেক আগে মার্চ-এপ্রিল মাসে শুরু হয়ে যায়। বসিরহাটে পুলিশের গুলীচালনায় নরুল ইসলামের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে, পরে কৃষ্ণনগরের আনন্দ হাইতের মৃত্যুর পর এই আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। ১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলন রাজ্য-রাজনীতির পালা বদল করে দেয়। যার কারণে ১৯৬৭ সালে ক্ষমতায় আসে যুক্তফ্রন্ট সরকার। '৬৭ সাল থেকে '৭২ সাল পর্যন্ত বামপন্থী দলগুলির খাদ্য আন্দোলন সৃষ্টির সুযোগ ঘটেনি। আন্দোলন যা হয়েছিলো, সে হয়েছিলো যুক্তফ্রন্ট সরকার পতন ঘটাবার প্রতিবাদে অথবা ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মন্ত্রিসভা অপসারণের দাবীতে। '৭২ সালের নির্বাচনে বামপন্থীদের ভরাডুবি হয়। ফলে গত দু বছর তারা কোনও খাদ্য আন্দোলনের কথা চিন্তা করতেই পারেনি। '৭২ সালের মারে আহত শরীরে প্রলেপ দিতেই কেটে গেছে। '৭৪ সালে পূজার মুখে এসে সকলেই ভাবছেন, এবার আন্দোলনের পূজা সংখ্যাটা বের করা যাক।

নয়-পার্টি তাদের আন্দোলনের যে স্ট্র্যাটিজি ঠিক করেছেন, তা হলো এই, আন্দোলন সৃষ্টির পক্ষে পরিস্থিতি খুবই অনুকূল। মানুষের জীবনে যে সংকট নেমে এসেছে, যে অভাব-অভিযোগ অকটোপাসের মতো সাধারণ মানুষকে পিষ্ট করছে, তাতে আন্দোলনের ডাক দিলে সাড়া পাওয়া যাবে। ছাত্র-যুব, কৃষক-শ্রমিক সর্বস্তরের মানুষের বিক্ষোভ-অসন্তোষ-অগ্নিগর্ভ। বহিঃপ্রকাশের মুখ খুঁজছে। শাসক দলের অন্তর্বিরোধও চূড়ান্ত। তাই এ-হলো সুবর্ণ সুযোগ। ১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলন শুরু হয়েছিলো কেরোসিন তেলকে কেন্দ্র করে। আজ ছাত্রদের কাছে শুধু কেরোসিন তেল নয়, পাঠ্য-পুস্তক, কাগজ, পেন্সিল, কালি—সবই অগ্নিমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য। তাই ছাত্ররাই আন্দোলনের মুখিয়া হবে। ছাত্রদের সঙ্গে থাকবে কৃষক-সংগঠন, শ্রমিক-সংগঠন। ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক ত্রিধারায় বিভক্ত আন্দোলনে মিলিত হবে নয়-পার্টির আন্দোলনের সংগ্রামে। আন্দোলনের লক্ষ্য হবে, সরকার ও প্রশাসক-যন্ত্রকে অচল করে দেওয়া। তার জন্যে আন্দোলনের প্রত্যক্ষ রূপ যা নিতে হোক না কেন, নয়-পার্টি পিছু পা হবে না। নয়-পার্টি বর্তমানে রাজ্যের কংগ্রেস দল ও তার শাখা সংগঠনকে খুব বেশী ভয় করছে না। ভয় করছে না মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়ের পরিচালনায় সরকারের ইমেজকে। কারণ কংগ্রেস দল আজ ১৯৬৯ সালের যুক্তফ্রন্টের চৌদ্দ দলের অবস্থা থেকেও শোচনীয় হয়েছে, আর রাজ্যের বর্তমান সরকার কোনও সমস্যার মৌলিক সমাধান করতে না পেরে লেজে-গোবরে হয়ে নিজেদের সৃষ্ট সংকটেই হাবুডুবু খাচ্ছেন। প্রশ্ন শুধু খাদ্যের নয়, প্রশ্ন শুধু জনগণের দুঃখ—দুর্দশা লাঘবেরও নয় নয়-পার্টির কাছে বিশেষ করে সি পি এম সহ প্রধান দু-চারটি দলের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নও জড়িত। সি পি এম সহ নয়-পার্টি এবার আসরে নামতে চায়। আসর দখলের সুযোগ মাত্র আছে সামনের বারোটি মাস। অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের এই সেপ্টেম্বর-অকটোবর মাস পর্যন্ত তারা যে আবাদ করতে পারবে, তার ওপরেই নির্ভর করছে '৭৬ সালের ফসল। ১৯৭৬ সালে অনুষ্ঠিত হবে লোকসভার নির্বাচন। রাজনীতিবিদরা মনে করেন লোকসভার সঙ্গে বিধানসভারও নির্বাচন হবে। ১৯৭২ সাল থেকে রাজ্যের বামপন্থী দলসমূহ যে দুঃসহ বেকার জীবন যাপন করেছেন, তার পুনরাবৃত্তি কোনও ক্রমেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। সেই বেকারত্ব মেনে নেওয়ার অর্থ আত্মবিলুপ্তি। সেটা অচিন্তনীয়। তাই এবারের আন্দোলন অস্তিত্বরক্ষার আন্দোলন, এবারের আন্দোলন আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন।

—জন আব্দুল হরি লামা

সাইপ্রাস

জেনেভায় সাইপ্রাস সম্পর্কে যে শান্তি আলোচনা চলছিল তা ভেঙে যাওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যে তুর্কী বাহিনী যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভংগ করে পূর্ব ভূমধ্যসাগরের ঐ ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর ব্যাপক হামলা করার ফলে সাইপ্রাস পরিস্থিতি নতুন আকার ধারণ করেছে। জেনেভার আলোচনা বৈঠকে সাইপ্রাসকে তুর্কী ও গ্রীক এলাকায় বিভক্ত করার প্রস্তাবে গ্রীসকে রাজি করাতে না পেরে তুরস্ক জেট বিমান, ট্যাংক ও কামান বন্দুকের সাহায্যে সাইপ্রাসকে কার্যত বিভক্ত করে ফেলেছে। ৭০ ঘণ্টার মধ্যে সিরেসিয়া ও নিকোসিয়ার ঘাঁটি থেকে ফামাগুস্তায় পৌঁছে গিয়ে তুর্কী বাহিনী এই দ্বীপের উত্তর-পূর্বে এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চল অধিকার করে নিয়েছে।

বিশ্বজনমতকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ও রাষ্ট্রসংঘের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব অমান্য করে তুরস্ক এভাবে সামরিক শক্তির সাহায্যে সাইপ্রাসের উপর তার নিজের সমাধান চাপিয়ে দেওয়ায় এই ক্ষুদ্র দ্বীপের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা হরণের চক্রান্তের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বৃত্তটি সম্পূর্ণ হল। আজ যেটা গ্রীক ও তুর্কীদের মধ্যে বিরোধে পরিণত হয়েছে তার সূত্রপাত হয়েছিল গ্রীকের সংগে গ্রীকের বিরোধের মধ্য দিয়ে। অথবা সঠিকভাবে বলতে গেলে সাইপ্রাসের সংগে গ্রীসের বিরোধের মধ্য দিয়ে। গ্রীসের কম্যুনিস্ট-বিরোধী সামরিক শাসকগোষ্ঠীর প্রধান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডিমিট্রিয়স আয়োনিডেস সাইপ্রাসের অবিসম্বাদী নেতা আর্চবিশপ ম্যাকারিওসকে ও তাঁর ঐক্যবদ্ধ, স্বাধীন, ধর্মনিরপেক্ষ ও জোটনিরপেক্ষ নীতিকে বিশ্বাস করতে পারেন নি। রাশিয়ার সংগে আর্চবিশপ ম্যাকারিওসের সাইপ্রাসের ঘনিষ্ঠতাও গ্রীক সামরিক জুন্তার পছন্দ হয় নি। জেনারেল আয়োনিডেস সিপ্রিয়ট বাহিনীর সংগে যুক্ত গ্রীক সামরিক অফিসারদের সাহায্যে আর্চবিশপ ম্যাকারিওসের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের যে চক্রান্ত প্রস্তুত করলেন সেখান থেকেই সাম্প্রতিক সাইপ্রাস-সংবাদের শুরু। জেনারেল আয়োনিডেসের ঐ চক্রান্ত শুধু এই অর্থেই সফল হয়েছে যে, আর্চবিশপ ম্যাকারিওসের সরকারের পতন ঘটেছে এবং তিনি নিজে দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু যে 'এনোসিস' বা গ্রীসের সংগে সাইপ্রাসের সংযুক্তির দিকে লক্ষ্য রেখে এই অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করা হয়েছিল গ্রীসের বাঞ্ছিত সেই 'এনোসিস' হয় নি, বরং তুরস্ক বলতে গেলে একরকম গ্রীসের গালে থাপ্পড় মেরে সাইপ্রাসের এক-তৃতীয়াংশ কেড়ে নিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, আর্চবিশপ ম্যাকারিওসকে উৎখাত করার এই চক্রান্তের ধাক্কায় গ্রীসের সামরিক শাসকরাই চিৎপাত হয়ে পড়েছেন। সেখানে সামরিক শাসনের অবসান ঘটেছে এবং ৬৭ বৎসর বয়স্ক কনস্টান্টাইন কারমানলিসের নেতৃত্বে নতুন অসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মাঝখান থেকে, অন্তত সাময়িকভাবে, ব্যর্থ হয়ে গেছে গ্রীক-তুর্কী বিরোধ ও বৃহৎ শক্তিবর্গের বিরোধ থেকে সাইপ্রাসের স্বাধীন স্বতন্ত্র, জোটনিরপেক্ষ দ্বীপ রাষ্ট্রকে তফাতে রেখে তাকে নিজের সত্তায় বিকশিত করে তোলার জন্য আর্চবিশপ ম্যাকারিওস ও তাঁর অনুগামী জাতীয়তাবাদী সিপ্রিয়টদের প্রয়াস। সাইপ্রাস না চাইলেও সে একদিকে যেমন গ্রীক-তুর্কী বিরোধের সংগে জড়িয়ে পড়েছে অন্যদিকে সে তেমনি বৃহৎ শক্তির বিরোধের সংগে জড়িয়ে পড়েছে।

এই গ্রীক-তুর্কী বিরোধ অবসানের একটা চেষ্টা হয়েছিল জেনেভাতে ছয়দিনব্যাপী বৈঠকে। এই বৈঠক হয়েছিল বৃটেন, তুরস্ক ও গ্রীসের প্রতিনিধিদের মধ্যে। ১৮৭৮ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত সাইপ্রাস ছিল বৃটেনের অধিকারে। ১৯৬০ সালে যে চুক্তি অনুসারে সাইপ্রাসকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল সেই চুক্তি অনুযায়ীই ঐ তিনটি রাষ্ট্র সাইপ্রাসের স্বাধীনতার অভিভাবকরূপে নির্দিষ্ট। জেনেভাতে সাইপ্রাসের অভিভাবকদের এই বৈঠকে আংকারার প্রতিনিধি পররাষ্ট্রমন্ত্রী তুরান গুনেস যখন তুর্কী সিপ্রিয়টদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবিতে সাইপ্রাস বিভাগের কথা তুললেন তখনই এই বৈঠক ভেঙে গেল। এথেন্সের প্রতিনিধি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ মাভ্রোস প্রশ্ন তুললেন, সাইপ্রাসের ৬ লক্ষ ৭০ হাজার অধিবাসীর মধ্যে মাত্র ১৮ শতাংশ যেখানে তুর্কী (বাকি ৮২ শতাংশ গ্রীক) সেখানে তুরস্ক সাইপ্রাসের এক-তৃতীয়াংশ দাবি করছে কি করে? তুর্কী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিহাস করে বললেন, 'আমরা সাইপ্রাসের ৪০ শতাংশ পেলেও রাজি হয়ে যেতে পারি।' তাঁর যুক্তি হল, যেহেতু তুর্কী সিপ্রিয়টরা অধিকাংশই কৃষিজীবী সেহেতু তাদের জন্য ৩০ বা ৪০ শতাংশ জমি চাওয়া অন্যায় নয়। গ্রীস অতীতে সর্বদাই সাইপ্রাস বিভাগের বিরোধিতা করে এসেছে, কারণ তার মতে, সাংস্কৃতিক ও জাতিগত দিক থেকে সাইপ্রাস গ্রীসেরই অংশ, তুর্কী সিপ্রিয়টদের সমস্যা সংখ্যালঘু সমস্যার বেশি আর কিছু নয়। কিন্তু জেনেভা বৈঠকে গ্রীসও শেষ পর্যন্ত তার সুর নরম করেছিল। তবু, তুরস্ক যখন গ্রীক প্রতিনিধিকে তুর্কী প্রস্তাব সম্পর্কে এথেন্সের সংগে পরামর্শ করার জন্য ৩৬ ঘণ্টা সময় দিতে রাজি হল না তখন জেনেভা বৈঠক ভেঙে গেল।

তুরস্ক যা চেয়েছিল সেটা গা[illegible] আদায় করে নিতে তার বেশি সময় লাগল না। সাইপ্রাস থেকে তুরস্কের দূরত্ব যেখানে মাত্র ৪৪ মাইল সেখানে ঐ দ্বীপ থেকে গ্রীসের মূল ভূখণ্ড ৫২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। কি তুলনামূলক সামরিক শক্তি কি ভৌগোলিক অবস্থান, কোন দিক থেকেই গ্রীসের সেই সুবিধা ছিল না যাতে সে তুর্কী আক্রমণ ঠেকাতে পারে অথবা তুরস্কের উপর পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে তাকে বিপদে ফেলতে পারে।

বৃহৎ শক্তির বিরোধের পটভূমিকায় দেখতে গেলে, সাইপ্রাসের এই পরিণাম আমেরিকাকে খুশীই করেছে। আমেরিকার প্রশ্রয়পুষ্ট গ্রীক সামরিক সরকারের চক্রান্ত বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করায় আমেরিকার বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নি। আমেরিকার হিসাবে, ম্যাকারিওসের শাসনাধীন সাইপ্রাসের চেয়ে বিভক্ত সাইপ্রাসই অধিকতর সুবিধাজনক। কারণ, যেহেতু গ্রীস ও তুরস্ক উভয় রাষ্ট্রই ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত অতএব, দ্বিধাবিভক্ত সাইপ্রাসকেও নিশ্চয়ই ন্যাটোর সংগে পাওয়া যাবে। এতে ন্যাটোর পূর্বদ্বারটি আরও সুরক্ষিত করা সহজ হবে।

সাইপ্রাসে আমেরিকার এই হিসাবের খাতায় অবশ্য কিছুটা লোকসানের অংকও জমা পড়েছে। আমেরিকান অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত তুরস্ক নগ্ন আক্রমণ চালাচ্ছে, অথচ আমেরিকা তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করছে না, এতে গ্রীকরা আমেরিকার প্রতি ক্ষুব্ধ। প্রতিবাদে গ্রীস ন্যাটো থেকে তার সামরিক বাহিনী সরিয়ে নিয়ে এসেছে। নিকোসিয়ায় মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে রজার ডেভিসকে তাঁর প্রাণ দিয়ে এই ক্ষোভের মূল্য দিতে হয়েছে। গ্রীসের এই সিদ্ধান্তের ফলে ন্যাটো কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়লেও আমেরিকা ন্যাটোর সংগে তুরস্কের সংযোগকেই অধিকতর মূল্য দেয়। কারণ, তুরস্ক দার্দানেলিস প্রণালী নিয়ন্ত্রণ করে আর এই প্রণালীই রাশিয়া থেকে ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরে যাতায়াতের একমাত্র পথ। তাছাড়া গ্রীস ন্যাটোর সংগে তার সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন করে নি শুধু, ন্যাটো থেকে তার সৈন্যবাহিনী "সরিয়ে" নিয়েছে। অর্থাৎ ফ্রান্সের মত গ্রীসও ন্যাটোর ভিতরে কতকটা স্বতন্ত্র ভূমিকা নিয়ে থাকতে চাইছে। আর তার এই ভূমিকাও, আমেরিকা আশা করে, নিতান্তই সাময়িক।

গত তিন দশকের বেশি সময়ের মধ্যে দুই ইউরোপীয় দেশের মধ্যে এই প্রথম যুদ্ধ (প্রসংগত, এই যুদ্ধ একদিক থেকে মধ্যযুগের ক্রুসেডের কথাও মনে করিয়ে দেয়) ও তার ফলাফল এতদিন সোভিয়েট রাশিয়া কতকটা তফাতে থেকে লক্ষ্য করছিল। কিন্তু এখন সে এ ব্যাপারে আরও ঘনিষ্ঠভাবে নিজেকে জড়াতে চাইছে।

দেশে বিদেশে

রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ

রাষ্ট্রপতি ভবনে এক অনুষ্ঠানে গত ২৪ আগস্ট ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ ভারতের পঞ্চম রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করলেন।

ভারতের প্রধান বিচারপতি তাঁকে শপথ-বাক্য পাঠ করাবার পর একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিয়ে শ্রীআহমেদ ঐক্যবদ্ধ হয়ে ও উদ্দেশ্যের একাগ্রতা নিয়ে দেশের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি এই আশা প্রকাশ করেছেন যে এই দেশের রাজনৈতিক কাঠামো সবল, তার জনগণ বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী এবং তার প্রাকৃতিক সম্পদ অজস্র। এই সব নিয়ে ভারত অবশ্যই একটি ন্যায়পরায়ণ, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলবে।

রাষ্ট্রপতি ভবনের এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে ৬৯ বৎসর বয়স্ক রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ যখন তাঁর এই সম্মানের জন্য জনগণকে ধন্যবাদ দিচ্ছিলেন তখন আবেগে তাঁর গলা বন্ধ হয়ে আসছিল। তিনি মনে করিয়ে দেন যে গান্ধীজী ও তাঁর অনুগামী জওহরলাল নেহরু, সর্দার প্যাটেল, মৌলানা আজাদ প্রভৃতির দ্বারা যে জাতীয় আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল তিনি তারই সৃষ্টি। আবেগ কাটিয়ে বক্তৃতা শেষ করার জন্য শ্রীআহমেদকে কিছুক্ষণ থামতে হয়। সে সময়ে তাঁর পাশে বসে আবিদা বেগমকে রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে দেখা যায়।

শ্রীআহমেদের শপথ গ্রহণের পর বিদায়ী রাষ্ট্রপতি গিরি এগিয়ে এসে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন, তারপর তাঁকে আসন ছেড়ে দিলেন। ৩১ বার তোপধ্বনির দ্বারা ভারতের নতুন রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণের মুহূর্তটি ঘোষণা করা হল।

ঐ দিন বিকালেই শ্রীগিরি দিল্লি থেকে বাঙ্গালোরে রওনা হয়ে গেলেন। সেখানেই তাঁর অবসর জীবন যাপনের কথা আছে।

●

বিদায়ী রাষ্ট্রপতি

শ্রীগিরি বিদায় নেওয়ার প্রাক্কালে পার্লামেন্টের সেন্ট্রাল হলে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে তাঁকে 'জনতার রাষ্ট্রপতি' বলে অভিহিত করেন।

সংসদ সদস্যদের পক্ষ থেকে শ্রীগিরিকে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে স্পীকার জি এস ধীলন বলেন যে, শ্রীগিরি 'এই দুর্দিনে অবিচল পর্বতের মত দাঁড়িয়ে চার পাশে নীরবে সাহস ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন।'

শ্রীগিরি তাঁর প্রত্যাভিভাষণে পার্লামেন্টে ও রাজ্য বিধানসভাগুলির সদস্যদের প্রতি আবেদন জানিয়ে বলেন যে, তাঁরা হৈ-হট্টগোল না করে জনসাধারণের সমস্যাগুলি সমাধান করার চেষ্টা করেন।

সংসদ সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রীগিরি বলেন, 'আমার গলদগুলির কথা আমি জানি। কিন্তু একজন সংকর্মী হিসাবে আমি সব সময়েই আমার সাধ্য ও বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী কর্তব্য করার চেষ্টা করেছি।'

শ্রীগিরি বললেন, জনগণের সমক্ষে তিনি অবাধেই কাজ করে গেছেন, এ বিষয়ে তিনি সংবিধানের সূক্ষ্ম বিচারকে বাধা হয়ে উঠতে দেন নি। সেই কারণেই তিনি এত বার বার তাঁর মত প্রকাশ করেছেন।
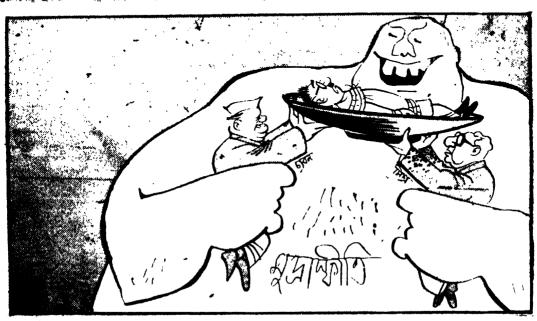
শ্রীগান্ধি বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি যে, সরকারী কাজকর্মের ব্যাপারে আত্ম-সমালোচনা ও দোষত্রুটির নির্মম উদ্ঘাটন হওয়া উচিত। একটি গণতান্ত্রিক সরকার কেবল তখনই শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারে যখন তার কাজকর্মের নিরন্তর যাচাই হয় এবং যখন সতর্ক জনমতের দ্বারা উৎখাত হওয়ার যথার্থ সম্ভাবনা থাকে।

•

ভারত-পাকিস্তান সম্মেলন

আগামী ১২ সেপ্টেম্বর নাগাদ ইসলামাবাদে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বৈঠক হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এই বৈঠকের আলোচ্য বিষয় হবে দুই দেশের মধ্যে টেলি যোগাযোগ ও যাতায়াতের ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তন।

গত ১০ জুন তারিখে এই বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণের ধুয়া তুলে পাকিস্তান ঐ বৈঠক স্থগিত রেখেছিল। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের রাষ্ট্রমন্ত্রী আজিজ আহমেদ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বর্ণ সিংকে সর্বশেষ যে পত্র দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে, ইসলামাবাদ ঐ আপত্তি তুলে নিয়েছে। ভারতের দাবী অনুযায়ী পাকিস্তান ভারত-বিরোধী প্রচারও বন্ধ করতে রাজি হয়েছে।

কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ

শেখ আবদুল্লা শ্রীনগরে হজরৎবাল মসজিদে শাব-এ মিরাজ এর এক জমায়েতে বক্তৃতা দিয়ে দাবী করেছেন যে, কাশ্মীরের ব্যাপারে নয়াদিল্লির সংগে কোন চুক্তি হলে সেই চুক্তির অন্যতম সর্ত হিসাবে কাশ্মীরে নতুন নির্বাচন করতে হবে। তিনি বলেছেন, কাশ্মীর যে কাশ্মীরবাসীদের এবং একমাত্র কাশ্মীরীরাই যে নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবেন সে কথাটা প্রমাণ করার জন্য এই নির্বাচন করতে হবে।

আগামী ২ অকটোবর তিনি কাশ্মীরে শাসনক্ষমতা গ্রহণ করবেন বলে রটনা হচ্ছে শেখ আবদুল্লা সেটা অস্বীকার করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী সৈয়দ মীর কাশিমও এই সংবাদ অস্বীকার করেছেন যে, তিনি শেখ আবদুল্লাকে মুখ্যমন্ত্রীর আসন ছেড়ে দিচ্ছেন।

•

হাইলে সেলাসির ক্ষমতা হরণ

ইথিওপিয়ার সৈনাবাহিনী সেদেশের সম্রাট হাইলে সেলাসীর ক্ষমতা হরণ করে আরও কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। আদ্দিস আবাবা শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত শ্বেতপ্রস্তরনির্মিত জুবিলি প্রাসাদটি ছাড়া সম্রাটের আর সব প্রাসাদকে জাতীয় সম্পত্তি বলে ঘোষণা করা হয়েছে। জুবিলি প্রাসাদ-এর নতুন নামকরণ করা হয়েছে 'ইথিওপিয়ান জনগণের প্রাসাদ।'

সাম্রাজ্যের ১৪টি প্রদেশের অধিকাংশেই সম্রাটের প্রাসাদ ছিল।

সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ যে, পৃথিবীর প্রাচীনতম ক্ষমতাসীন রাজবংশের প্রতিনিধি সম্রাট হাইলে সেলাসী এখন তাঁর সৈনাবাহিনীর হাতে গৃহবন্দী।

•

আফ্রিকা থেকে পর্তুগালের বিদায়

পর্তুগালের নতুন সরকার ঘোষণা করেছেন যে, তাঁরা আফ্রিকায় তাঁদের উপনিবেশ গিনি-বিসাউয়ের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিয়ে সেখান থেকে সরে আসবেন।

আলজিয়ার্সে লিসবনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আফ্রিকার স্বাধীনতা আন্দোলন-সমূহের প্রতিনিধিদের যে গোপন আলোচনা চলছিল তাতে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। পৃথিবীর শেষ উপনিবেশবাদীদের আফ্রিকা থেকে সরে আসার পথে এটা প্রথম পদক্ষেপ।

গিনি-বিসাউয়ের পর আফ্রিকার আর যে দুটি পর্তুগীজ উপনিবেশ অবশিষ্ট থাকল সে দুটি হচ্ছে মোজাম্বিক ও অ্যাঙ্গোলা। এদেরও মুক্তি এখন আসন্ন।

—পুণ্ডরীক

২৭-৮-৭৪

আছো কি, রেসকিউপার্টি? ॥

নবনীতা দেবসেন

আচ্ছা, এমন কি কোনো ঈশ্বর আছেন
আমার বিষয়ে যাঁর কিছুমাত্র আগ্রহ রয়েছে?
আমার পাপের কথা যাঁকে কষ্ট দেবে
আমার পুণ্যাতে যাঁর খুশি?

কোনো কোনো লোকে বলে
ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়া গেছে
এবং সেই সঙ্গে মুক্তিও।

আমার ঈশ্বর যদি খুঁজে পান আমাকে কোথাও
এই যে বিনষ্ট হুতে, অবলুপ্ত আমাকে, কোথাও
তবে তাঁরো মুক্তি মিলে যাবে।

তিনি কি সাবধানে রত

জ্বলে-যাওয়া আয়ুর খনিতে
স্তূপাকার ভস্মরাশি দু'হাতে সরিয়ে
তিনি কি সন্ধানে রত
পাপে পুণ্যে প্রণয়ে প্রশ্রয়ে
আমারি বিস্মৃত মুখ?

তিনি কি চশমার কাচ খুঁটে মুছে নিয়ে
পুনঃ পুনঃ সরাচ্ছেন
ধ্বংসস্তূপ
দিন ... রাত্রি ... দিন ...
বিক্ষত দু'হাতে?

ঘোড়াগুলো ॥ **রত্নেশ্বর হাজরা**

নীল আস্তাবল থেকে ঘোড়াগুলো ছুটে গেছে খুব দ্রুত বেগে
ঘোড়াগুলো শাদা ছিল কালো ছিল হলুদ বেগুনি পিঙ্ক—
মেশামেশি রঙ

এই সব দ্রুতিগুলো বিশ্রামও করেছে গোল ছাতিমের নিচে, তার
চিহ্নগুলো পড়ে আছে প্রবাসের দিকে—পথে—
কোথাও ঝোপের আশেপাশে।

বিভিন্ন বয়সের এই ঘোড়াগুলো—আহ.....
ওদের খুরের রঙ যেরকম—ঠিক সেই আকাশ তখন—।

বিশ্রামের পরে সেই প্রাণীরা আবার দ্রুত ছুটে গেল মধ্যাহ্নের দিকে
মধ্যাহ্নে গিয়েই তারা মুলতানের শব্দ হল—যখন বিকেল
নামল বিকেলে—মাঠে। মাঠে শুধু ফাঁকা—কিছু খড়ের সবুজ
দুপুরের রোদ হয়ে পড়েছিল শিমুলতলায়। শিমুলের
বর্ণহীন ফুলগুলো মাড়িয়ে মাড়িয়ে তারা চলে গেল
একদিন প্রবাসে প্রবাসে—।

ভীষণ সকালে উঠে মাঠের ওপারে গেলে কিছু কিছু দাগ পাওয়া যায়—
প্রতিবেশী ছাতিমের নিচ দিয়ে আমাদের পোষা প্রাণীগুলো
আদর ডিঙিয়ে গেছে—আদর অর্থাৎ কাঁচঘাস
ডিঙিয়ে বিবর্ণ খড় কোথায় রয়েছে হয়তো সেই দিকে গেছে—
আমাদের খুব প্রিয় ঘোড়াগুলো যায়
মিল থেকে নীলে আর নীল থেকে আরেক নিখিলে...

কাল রাতে ॥ **শৈলেন গঙ্গোপাধ্যায়**

কালরাতে আমি যখন ছিলাম না
তুমি বলেছিলে, মাঝরাতে ঝড় এসেছিল,
বৃক্ষে বৃক্ষে শিহরণ তুলে, এবং তাদের
সবুজ ঘন ঘুম চূর্ণ চূর্ণ করে
দিকচক্রবালে ঘুরে ঘুরে
নদীতে কম্পন তুলেছিল।

আজ রাতে তুমি আমি
এক সঙ্গে।
শোন, তোমার আকাশ-বাতাস
বৃক্ষ, তৃণলতা—বিদ্যুতের মত
গতিশীল;
কিন্তু আমি কবরে অবরুদ্ধ
বাতাসের মত শব্দশূন্য,
গতিহীন।
তুমি বলেছিলে, রুদ্ধ শিরার স্রোতে
ঝড়ে ঝন ঝন আনো।

উপন্যাস

মনোজ বসু

সেই সব মানুষ

আট বেহারার পালকি, গলা-ফাটানো ডাক ছাড়ছে। চারিদিক তোলপাড়। সবাই জিজ্ঞাসা করে : কে চললেন হে?

সোনাখড়ির দেবনাথ ঘোষ।

বাইরেবাড়ি পালকি নামাল। ছেলেপুলে দৌড়চ্ছে। মেয়েরা খিড়কির দুয়ারে উঁকি-ঝুঁকি দেয়। ভবনাথ রোয়াক থেকে নেমে পালকির পাশে দাঁড়ালেন।

পালকি থেকে দেবনাথ বেরিয়ে এলেন। ধবধবে ফরসা রং, মাথাজোড়া টাক, লম্বা-চওড়া দেহ। বললেন, গলায় বাঁশ দিয়ে চেঁচাচ্ছিল তোমার বেহারারা, কানে তালা ধরিয়ে দিয়েছে।

ভবনাথ হাসতে লাগলেন। দেবনাথ অনুযোগের কণ্ঠে বলেন, নাগরগোপে পালকি পাঠিয়েছ কেন দাদা? দেড়ক্রোশ পথ হাঁটতে পারব না, এতদূরে অথর্ব হয়ে পড়েছি?

ভবনাথ বললেন, পারলেই যে হাঁটতে হবে তার কোন মানে আছে?

তুমি বড় ভাই হয়ে দশ ক্রোশ পথ কসবা অবধি হাঁটতে পারো—তা-ও একদিন আধদিন নয়, পাঁচ-সাতবার মাসের মধ্যে—

ভবনাথ বলেন, হাঁটি তো সেইজন্যেই। গাড়ি-পালকির ভাড়া দিয়ে ফতুর হব নাকি? এক-আধদিন হলে পায়ে হাঁটি না পালকি চড়ি বিবেচনা করতাম।

ভাইয়ের উপরে হুমকি দিয়ে উঠলেন : বকবকানি থামাও দিকি, কষ্ট করে এলে, জিরিয়ে নাওগে।

সর্দার বেহারা কেদু মোড়ল কোমরের গামছা খুলে ঘাম মুছছে। তাকে দেখিয়ে দেবনাথ বলেন, পালকির খোল থেকে উঠোনে নেমে পড়লাম—আমার কি কষ্ট। কষ্ট ঐ ওদের। পায়ের কষ্টের চেয়ে বেশি কষ্ট গলার। যা চেঁচান চেঁচাচ্ছিল, গলা চিরে রক্ত বেরুবে ভয় হচ্ছিল আমার।

পথে দেবনাথ মানা করেছিলেন : অত চেঁচিও না কেদু।

কেদু বলল, জোরডাক ডাকতে হবে, বড়কর্তা বলে দিয়েছেন। পালকি পাঠানোই সেইজন্যে। ছোটবাবু বাড়ি আসছেন, দশে-ধর্মে জানুক।

চাকরিবাকরি করার আগে দেবনাথও গ্রামে ছিলেন দাদার সঙ্গে কিছুদিন বিষয়-আশয় দেখেছেন। কসবাতেও কোর্টে গিয়েছেন বারকয়েক। দশ ক্রোশ পথ অবাধে তখন হাঁটা চলত, এখন সামান্য দূরে নাগরগোপ থেকে আসতেও পায়ে মাটি ঠেকানো চলবে না। চাকুরে ভাই চুপিসাড়ে বাড়ি আসবে, সে কেমন কথা! পাইতল্লে হৈ-হৈ পড়ে যাক, পুবেরবাড়ির আর সেদিন নেই। শত্রুজনে হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরুক।

এইরকম চিরটা কাল। ভবনাথের ধরণ-ধারণ ও কাজকর্ম অন্য সকলের সঙ্গে বড় একটা মেলে না। বাপ মারা গেলেন, তার অল্পদিন আগে বিয়ে হয়েছে, সন্তানাদি হয়নি, দেবনাথ নাবালক তখন। ভাসলেন তিনি সংসারসাগরে। পৈতৃক দুটো গাঁতি এবং কিছু খামারজমি সম্বল—শরিকেরা নানান ফ্যাকড়া তুলে মামলা জুড়ে দিল। দেওয়ানি-ফৌজদারি উভয় প্রকার। মামলা একটার ফয়শালা হল তো নতুন আবার দুটো জুড়ে দিল। জিতুন না ভবনাথ, কত জিতবেন—জিতিয়ে জিতিয়েই ওঁকে খতম করবে। শরিকেরা এই পণ নিয়ে বসেছিল। তখন মা ছিলেন, ভবনাথকে তিনি কত করে বললেন, তোর জেঠার পায়ে গিয়ে পড়। তাতে অপমান নেই। কখনো না—ভবনাথ গোঁ ধরে বসেছেন : মিথ্যাবাদী ফেরেব্বাজ উনি আবার জেঠা কিসের? পৈতৃক এক-কাঠাও নষ্ট হতে দেননি ভবনাথ, অধিকন্তু বাড়িয়েছেন। আর, এখন তো পাথরে-পাঁচ কল—ভাই মানুষ হয়ে বাইরে থেকে পয়সাকড়ি আনছে। সংসার ভারী হয়েছে, ছেলেমেয়েদেরও বিয়েথাওয়া হয়েছে কতক কতক। গেল শীতকালে বাগের মধ্যে নতুন পুকুর কাটা হয়েছে। কিন্তু যখন স্বপ্নের অতীত ছিল এই সমস্ত—

দেবনাথ তীক্ষ্মবুদ্ধি বাংলা লেখা-পড়াও ভাল শিখেছিলেন। তখনকার দিনে দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যবিধি শিখে উকিল হওয়া যেত। দেবনাথ উকিল হবেন। ভবনাথের বিশেষ ইচ্ছা তাই—ভাই উকিল হয়ে যদি সদরে বসেন, প্রতিপক্ষদের সব মিটিয়ে নাস্তানাবুদ করতে পারবেন। বাড়ি বসে আইনের বই-টই পড়ে দেবনাথ তৈরি হয়েছেন—কলকাতা ছোট আদালতে পরীক্ষা, পাশ করলে সার্টিফিকেট পেয়ে যাবেন। রওনা হচ্ছেন কলকাতা সেই মুখে ঝগড়া। কপোতাক্ষে স্টিমার চালু হয়নি তখন, যশোরের পথে মোটরবাস তো দূরস্থান ঘোড়ার-গাড়িও নেই। গোযান মাত্র সম্বল। কলকাতায় তাড়াতাড়ি পৌঁছানোর উপায় গোটা দুই নদী পার হয়ে ক্রোশ পাঁচ-ছয় মাঠ ভেঙে নপাড়া স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরা। শীতকাল বলেই সম্ভব এটা, বর্ষাকালে জলে ডুবে মাঠ সমুদ্র হয়ে থাকে। দেবনাথ নপাড়াতেই যাবেন। এ-গ্রাম-সে-গ্রাম থেকে আরও চারজন পরীক্ষার্থী—একসঙ্গে যাচ্ছেন। সকলে। হেনকালে ভবনাথ রায় দিলেন : জামা-জুতো খোল, যাওয়া হবে না।

বৃত্তান্ত এই। সকালবেলা কুয়াসার মধ্যে ভবনাথ এজমালি দানা-পুকুরে গেছেন মুখ-টুক ধোবার জন্য। গলদা-চিংড়ি নজরে পড়ল—পাড়ের ঝাঁঝি-বনে দাঁড়ি ভাসান দিয়ে চুপচাপ রয়েছে। বর্ষাকালে বিল আর পুকুর একঢালা হয়ে যায়, তখন এই সমস্ত মাছ ঢোকে। ভবনাথ লাঠি নিয়ে দু-হাতে কষে জলের উপর বাড়ি দেন, চিংড়ি ডুবে যায়, হাতড়া দিয়ে তুলে নেন সেটা। পাড় ঘুরে-ঘুরে এই কায়দায় মেরে বেড়াচ্ছেন। বেশ কতকগুলো হল—তিনটে তার মধ্যে দৈত্যাকার, কত বছর ধরে বড় হয়েছে, কে জানে। গলদা-চিংড়ি কতই তো খায় লোকে, কিন্তু খাওয়া পড়ে থাকুক এমন জিনিস কালেভদ্রে কদাচিৎ চোখে দেখেছে। লাঠির ঘায়ে মাথা ফেটে একটার ঘিলু বেরিয়ে গেছে, বাটিতে ঘিলু তুলে রাখল—হৃষ্টপুষ্ট গাব্দাগোব্দার চেহারা, বাটি ভর্তি হয়ে গেছে একেবারে। পরীক্ষার বাবদে ভাই এ-জিনিসে বঞ্চিত হবে, সেটা কেমন করে হয়? হুকুম হয়ে গেল : যাওয়া তোমার হতেই পারে না আজ।

দেবনাথ আকাশ থেকে পড়লেন : রাত পোহালে পরীক্ষা—বলছ কি দাদা!

ভবনাথ বললেন, পরীক্ষা ছ-মাস বাদে আবার হবে। পুকুরের মিঠাজলের এত বড় চিংড়ি আর মিলবে না। আমি তো দেখিনি, বরদাখুড়ো কোন আদ্যিকালের মানুষ, তিনিও দেখেননি বললেন।

হুকুম ঝেড়ে বাদ-প্রতিবাদের অপেক্ষায় না থেকে ভবনাথ কোন্ কাজে হন-হন করে বেরিয়ে গেলেন। পুবেরবাড়িতে ভবনাথকে ডিঙিয়ে কিছু হতে পারে তেমন চিন্তাও আসে না কারো মনে। পরীক্ষা বাতিল করে দিয়ে দেবনাথকে অতএব চিংড়ি-ভোজনে বাড়ি থেকে যেতে হল। ছ-মাস পরে আবার পরীক্ষা—ধাইপাই জ্বরে ভুগছেন তখন। কাজে একবার বাধা

পড়লে যা হয়—উকিল হওয়া তাঁর ভাগ্যে ঘটল না।

উকিল হলেন না, তবে ভাল একটা চাকরি হল। হীরালাল সম্পর্কে দেবনাথের জ্ঞাতিভাই, সমবয়সী। এক সময়ে দেশে-ঘরে থাকতেন, এখন কলকাতার বাসিন্দা। একবার সোনাখড়ি এসেছিলেন, দেবনাথকে টেনেটুনে নিয়ে চললেন : চলো আমার সঙ্গে, জমিদারি সেরেস্তায় ঢুকিয়ে দেবো। আমার শাশুড়ির এস্টেট। শ্বশুরের নয়—শাশুড়ির, মাতামহের জমিদারি পেয়েছেন তিনি। একজন বিশ্বাসী আইনজ্ঞ লোক খুঁজছেন, তোমায় দিয়ে খাসা হবে।

চাকরি নেবার পরেও দেবনাথ মতলব ছাড়েননি। বিদেশে পড়ে থাকবেন না তিনি, উকিল হয়ে সদরে এসে বসবেন। মাসে একবার-দুবার বাড়ি যেতে পারবেন। যাতায়াতের অসুবিধাও দূর হয়েছে। সদর থেকে পায়ে হাঁটা কিম্বা গরুর গাড়ি ভিন্ন উপায় ছিল না, এখন ঘোড়ার গাড়ি চালু হয়েছে মাদার বকস আর কার্তিক ধরের তিনখানা করে ঘোড়ার গাড়ি, আরও ক'জনের একখানা করে। কলকাতার উপর রয়েছেন দেবনাথ, কার্যবিধি বইগুলো আলিপুর-মুন্সিয়ে নিচ্ছেন, এবারে পরীক্ষা দেবেনই। এবং পাশও হবেন নির্ঘাৎ। কিন্তু আসলে বরবাদ—বাংলা উকিলের রেওয়াজ উঠে গেল সেই বছরেই—এন্ট্রান্স পাশের পর প্লিডারশিপ পাশ না হলে উকিল হওয়া যাবে না। সাধ অতএব চিরতরে ঘুচে গেল, জমিদারি চাকরিতে দেবনাথ কায়েমি হয়ে রইলেন।

চাকরির আগেই ভবনাথ পাশের বছরে ভাইয়ের বিয়ে দিয়ে নবদ্বীপের তরঙ্গিণীকে বউ করে এনেছিলেন। একবার দেবনাথ বাড়ি এলে তরঙ্গিণী এক কাণ্ড করে বসলেন। মেয়ে হয়েছে তখন—বিমলা। শহর কলকাতার নানান আজব গল্প শুনে মনে মনে লোভ হয়েছিল এবং মতিলালদের দৃষ্টান্ত জ্বলজ্বলমান ছিল চোখের উপরে। চুপিচুপি স্বামীর কাছে বললেন, একলা পড়ে থাকো—বাসা করো না কেন কলকাতায়। আমি রেঁধেবেড়ে দিতে পারব, তোমারও যত্ন হবে।

দেবনাথ বললেন : তোমার মেয়ের এবাড়ি বুঝি যত্ন নেই? খুবই অন্যায় কথা। তোমারও নেই বুঝতে পারছি। তখন অল্প বয়স তরঙ্গিণীর স্বামী বিদেশে পড়ে থাকেন, কেউ কিছুই না বোঝেন তাঁকে। নালিশের বস্তা খুলে দিলেন—এর দোষ, ওর দোষ। অমুক এই বলেছিল, তমুক এই করেছিল। শতমুখে বলে গেলেন, বাসা করার পক্ষে ওতে যদি সুবাহা হয়।

চুপ করে শুনছিলেন দেবনাথ। অবশেষে কথা বললেন, তবে তো তোমার তিলার্ধ থাকা চলে না এ সংসারে। কালই একটা এস্পার-ওস্পার করতে হবে।

দেবনাথের স্বর অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর। ভয় পেয়ে গেলেন তরঙ্গিণী। কী কাণ্ড করে বসেন না-জানি ও-মানুষ।

তখন আবার সামলে নিতে যান : তা কেন! মেয়েটাকে কোলেকাঁখে করতে পারিনে, সেই কথা বলছি। সংসারের খাটাখাটনি, সময় পাওয়া যায় না। দুধ খাওয়ানোর গরজে দু-বার-চারবার নিয়ে আসে সেই সময় যা-একটু ধরতে পাই। বিনোর কোলে কোলে ঘোরে, দিদিরও বেশ ন্যাওটা। তাঁরা কি আর যত্ন-আদর করেন না? তেমন কথা কেন বলতে যাব? তাহলেও মায়ের টান আলাদা, পুরুষ হয়ে সে-জিনিস বুঝবে না।

হেসে তরল কণ্ঠে বলেন, নতুন বুলি ফুটেছে মেয়ের—বা-বা বা-বা করে। দু' বছর বয়স হল, বাবাকে চেনেই না মোটে। দেখল কবে যে চিনবে?

তা যে যেমন কথাই বলো, ভবী ভোলবার নয়। রান্নাঘরের দাওয়ায় পরদিন পাশাপাশি দু' ভাই খেতে বসেছে—মেয়ে-বউ সব রাঁধাবাড়া দেওয়া-থোওয়া নিয়ে ব্যস্ত। দেবনাথ বললেন, দাদা, ছোট বউর উপর বাড়ির সবসুদ্ধ বিষম অত্যাচার করছে।

স্তম্ভিত ভবনাথ। বললেন, সে কি রে!

অত্যাচার কি এক-আধ রকম! তার হেনস্থা, মেয়ের অযত্ন—মোটের উপর বাড়ির কেউ দু'চোখে ওদের দেখতে পারে না। বড্ড ঘুম আসছিল তখন, সব কথা আমার মনে নেই। কলকাতায় বাসা করতে বলছে। কিন্তু বাসা হলেও কাউকে বাদ দিয়ে তো হবে না—আশ্রিত-প্রতিপাল্য চাকর-মাহিন্দার সকলকে নিয়ে বাসা। জমিদারের নায়েব হয়ে মত খরচা কোত্থেকে কুলোবে? তার চেয়ে ছোটবউকেই বাপের বাড়ি পাঠানো ভাল। এক মায়ের এক মেয়ে——থাকবে ভাল, খাবে ভাল, মেয়ে নিয়ে চিরকাল আদর-সোহাগ করতে পারবে—

থামো—বলে ভবনাথ ভাইকে থামিয়ে তরঙ্গিণীকে ডাকতে লাগলেন : মা, ওমা—তরঙ্গিণী দরজার আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছেন। দেবনাথের কথা সব কানে গেছে, তিনি তো মরমে মরে আছেন।

ভবনাথ বললেন, আমার সঙ্গে তো কথা বলবে না মা। অসুবিধের কথা শুনলে সমস্ত তোমার বড়জাকে বলো—

দেবনাথ বলে উঠলেন, বউদিদিই তো বড় শত্রু। শত্রু কে নয় এ-বাড়ির মধ্যে? শোন দাদা, হালিডুলি দিয়ে চালানোর অবস্থা আর নেই। দু'দিনের তরে বাড়ি এসেছি—আমার কানে পর্যন্ত উঠেছে, বুঝলে না? ঐ আমি যা বললাম, তাছাড়া ওষুধ নেই।

ভবনাথ হুঙ্কার দিয়ে ভাইকে নিরস্ত করলেন : থাক্। মাতব্বরি করতে হবে না—চিরকেলে মোটাবুদ্ধি তোমার। বউমাকে এ-সংসারে আমি এনেছি। দায়িত্ব আমার—যা করতে হয়, আমি বুঝব সেটা। বাপের বাড়ি পাঠাতে হয়তো সে বড়বউকে। সে আগে এসেছে, বউমা পরে। কেন সে মানিয়ে গুছিয়ে চলতে পারে না।

তরঙ্গিণী মনে মনে ভাবছেন : বয়ে গেছে বাপের-বাড়ি যেতে। বললেই গেলাম আর কি! যিনি পাঠাতে চান, তিনি তো কর্তা নন। আসল কর্তা আমার দিকে। খাও কলা!

এরপর ভবনাথ উমাসুন্দরীকে নিয়ে পড়লেন : মানিয়ে-গুছিয়ে চলতে না পারো তো সংসারের বড় হয়েছ কেন? মাথা আমার হেঁট করে দিলে।

ভয় পেয়ে উমাসুন্দরী বললেন, আমি কি করলাম?

যা-সমস্ত করবার, করোনি তুমি? বাপের বাড়ি তোমারই চলে যাওয়া উচিত। একফোঁটা মেয়ে এনে তোমার সংসারে দিলাম—দশ-দশটা বছরেও বাঁধতে পারলে না, চলে যাবার কথা বলে।

উমাসুন্দরী চোখ মুছলেন। দোষ তাঁরই, কৈফিয়তের কিছু নেই। এর পরে তরঙ্গিণীর ডাক পড়ল। ভাসুরের ঘরে গেলেন না তিনি, দরজার বাইরে দাঁড়ালেন।

ভবনাথ বলেন, স্বয়ং লক্ষ্মী-ঠাকরুণকে খুঁজেপেতে ঘরে এনে প্রতিষ্ঠা করেছি। সংসার উথলে উঠছে সেই থেকে। কিসের ব্যথা আমায় বলো মা। আমি তোমায় এনেছি, কষ্টের আমিই বিহিত করব।

ঘাড় নাড়েন তরঙ্গিণী, কোন ব্যথা নেই। কোন রাগ নেই তাঁর।

দেবনাথের উপর অভিমানে দু' চোখে ধারা গড়াচ্ছে। একটুকু এক কথা থেকে কত বড় বড় জমিয়ে তুললেন বাড়ির মধ্যে। লজ্জায় কারো পানে তিনি মুখ তুলতে পারেন না।

কথাবার্তা বন্ধ দেবনাথের সঙ্গে। রাত্রিবেলাতেও না, আষ্টেপৃষ্ঠে কাপড় জড়িয়ে মেয়ে নিয়ে এক প্রান্তে শুয়ে থাকেন। কাঁচা বয়স তখন দেবনাথের, বারো মাস বিদেশে পড়ে থাকেন, কয়েকটা দিনের জন্য বাড়ি এসেছেন, তার মধ্যে এই বিপত্তি। হাত ধরে কাছে টেনে দুটো খোশামুদির কথা বলবেন, তরঙ্গিণী অমনি ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন।

বিপাকে পড়ে দেবনাথ উমাসুন্দরীকে ধরলেন : ছিঁচকাঁদুনে নিয়ে মুশকিল হল বউঠান। উপায় কি বলো।

উমাসুন্দরীর রাগ আছে, কথা ঝেড়ে ফেলে দিলেন একেবারে : আমি কিছু জানিনে ভাই। কর্তার কাছে লাগানি-ভাঙানি করতে গিয়েছিলে যেমন। এক

বিছানায় শুয়ে মেয়েমানুষে অমন কত কি বলে থাকে। আমরাও বলেছি। ভাইয়ের কাছে পুটপুট করে সমস্ত বলতে হবে, এমন কথনো শুনিনি। বলবার ছিল তো আমায় বলতে পারতে। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে গিয়েছিলে যেমন—হাতে ধরে না হয় তো পা জড়িয়ে ধরোগে যাও। আমি জানিনে।

পুরোনো কথা এমনি বিস্তর আছে। ভবনাথ আর দেবনাথ রাম-লক্ষ্মণ বলে গাঁয়ের লোকে তুলনা দিয়ে থাকে। সৌভাগ্য উথলে উঠছে। তরংগিণীর মেয়ের পর মেয়ে হতে লাগল—পর পর তিনটি। ছেলের আশা সকলে ছেড়ে দিয়েছিল, তা-ও হয়েছে ছেলের নাম কমল—পয়মন্ত ছেলে, জন্মের সংগে সংগেই দেবনাথের পদোন্নতি, সদর-নায়েব থেকে ম্যানেজার। খরার সময় শুরকী প্রাচীন পুকুরের জল খারাপ হয়ে যায়—এবারে শীতকালে বাগের মধ্যে নিজেদের নতুন পুকুর কাটা হয়েছে। কিস্তির খাজনা কালেকটারিতে জমা দিয়ে হাইকোর্টের কিছু মামলা-মোকদ্দমার কাজ সেরে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে দেবনাথ বাড়ি এসেছেন। থাকবেন কিছুদিন, সারা জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে আম-কাঁঠাল খেয়ে তার-পর যাবেন। ভাল ভাল কলমের চারা নিয়ে এসেছেন এক বিখ্যাত লোকের বাগান থেকে—আম, লিচু, গোলাপজাম, জামরুল, সফেদা, বিলাতিগাব—গন্ধমাদন বিশেষ। চারাগুলো কসবা থেকে দুখানা গরুরগাড়ি বোঝাই হয়ে পরম যত্নে আসছে। কাছারির দুজন বরকন্দাজ সংগে এনেছেন, তাদের উপর চারা পৌঁছে দেবার দায়িত্ব, সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছে যাবে তারা। পুকুরের তোলা-মাটিতে গাছ লাগালে ধাঁ-ধাঁ করে বড় হয়ে উঠবে—জমিদারিন শতেক কাজের মধ্যেও সে খেয়াল আছে। বাড়ির কথা দেবনাথ তিলেকের তরে ভুলতে পারেন না। বাড়ি কেন, সারা সোনাখড়ি গ্রাম তাঁর নখদর্পণে। গাঁয়ের লোক পেলে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়শীদের খবরাখবর নেন। একটা এস্টেটের ম্যানেজার নাগরগোপে বাস থেকে নেমে টং-টং করে বাড়ি পর্যন্ত পায়ে হাঁটবে সে কেমন। ভবনাথ অতএব পালকির ব্যবস্থা করলেন। খুব একটা অন্যায় অপব্যয় নাকি হয়ে থাকে হয়েছে, পুবেবাড়ির বড়কর্তা কারো কাছে কৈফিয়তের ধার ধারেন না।

দুই মাহিন্দার আজ মাসখানেক ধরে চারা গাছের ঘের বুনেছে, বাদামতলায় গাদা দেওয়া রয়েছে সেগুলো। সারা বিকাল ভবনাথ ও দেবনাথ দুই ভাই বাগান ও নতুন পুকুরের চারি পাড়ে ঘুরছেন, মাহিন্দার শিশুবর কোদাল নিয়ে সংগে সংগে আছে। আষাঢ়ে চারাপোনা বেচতে আসবে, রুই, কাতলা, মৃগেল, সে তো ছাড়া হবেই। তাছাড়াও এখানটা এই কাঁঠালগাছের পাশ দিয়ে নালা কেটে বিলের সংগে যোগাযোগ রাখা যাক। শিশুবর ক' কোদাল মাটি কেটে নিশানা করে দিকি জায়গাটা। বিলের নিখরচার মাছ নালার পথে পুকুরে এসে ঢুকবে।

চারার গাড়ি এসে পৌঁছানোর পর কোন চারা কোথায় পোঁতা হবে, তারও ভাবনা-চিন্তা বিচার-বিবেচনা হচ্ছে। কোদালের কোপ দিয়ে শিশুবর জায়গা চিহ্নিত করে যাচ্ছে। সকাল থেকেই গর্ত খুঁড়ে পোঁতার কাজ আরম্ভ, চারা কম নয়, এবেলা-ওবেলা সমস্তটা দিন লেগে যাবে।

দেবনাথ বললেন, গোলাপখাস বিলের ধারে দিও না দাদা। কাঁচা থাকতেই আমে লালের ছোপ ধরে যায়—চাষারা লাঙল দিতে এসে, ঢিল আর এড়ো মেরে কাঁচা আমই শেষ করে ফেলবে, পাকা অবধি সবুর সইবে না। গোলাপখাস বাড়ির ধারে ধারে দাও, বরঞ্চ গোপলাধোবা ওখানে। গোপলা-ধোবা পেকে গেলেও বোঝা যায় না, উপরটা কাঁচা থাকে। আর কাঁচামিঠে বাগের ভিতরেই না, উঠোনের এক পাশে। কাঁচা অবস্থায় খেতে হয়, পাকলে বিস্বাদ হয়ে যায়।

[illegible] উপর না থাকলে এ-আমের গপ্পটিই [illegible] কেলাসের মানুষে খণ্ড হতে দেবে না। [illegible] এরকম এনেছি দাদা, বিষম-টোকো—

আমেই ভবনাথ চমক খেলেন, দেবনাথ মিটমিটি হাসছেন।

ভবনাথ বলেন, টোকো আমের অভাব আছে? অজাট কষ্টে ও আবার আনতে গেলে কেন?

দেবনাথ বললেন, নামেই শুধু টক, এমনি টকের ভাজও নেই। ভারি মিষ্টি আম—

গাছে নতুন আম ফললে পাড়ার লোকে নাকি জিজ্ঞাসা করেছিল : কেমন আম, টক না মিষ্টি? মুখ বাঁকিয়ে মালিক জবাব দিয়েছিল : বিষম টক। কোনো লোক তলার দিকে আসবে না, গাছের সবকটি আম নির্বিঘ্নে নিজেরা খাবে—ভয় ধরানো নাম তাই। তারপরে অবশ্য সব জানাজানি হয়ে গেল, আমের নামে তবু কলংক রয়ে গেল 'বিষম টোকো'।

চারা পৌঁছতে বেশি রাত্রি হয়ে গেল। তা হোকগে, রোপণ তো কাল। যোগাযোগটা ভাল, পাঁজির মতে বৃক্ষরোপণের দিনও বটে আগামীকাল। বিকাল তিনটা-পাঁচ থেকে ছ'টা-ছ প্রশ। অঢেল সময়, তিন ঘণ্টারও বেশি। সকালবেলার দিকে গর্ত খোঁড়া সমাধা করে রাখবে। সেই গর্তে নির্দিষ্ট চারা নামিয়ে কিছু বুনো মাটি ভিতরে ছড়িয়ে দিয়ে পরের গর্তে চলে যাবে। বাকি সমস্ত কাজ—গর্ত ভরাট করা, ঘের বসানো মাহিন্দার দুজন শেষ করবে। কঞ্চির বুনানি গোলাকার ঘের বুনে রেখেছে—চারা বেড় দিয়ে বসিয়ে দেবে, গরু-ছাগলে খেতে না পারে। চারা বড় হচ্ছে, ওদিকে রোদ-বৃষ্টি খেয়ে খেয়ে ঘেরও জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তারপরে একদিন ভেঙে পড়বে—চারা তখন গাছ হয়ে গেছে, ঘেরের আর প্রয়োজন নেই।

গাছ পোঁতা এ-ও যেন এক পরব। কবি মনোভাব দেবনাথের—যে-কাজে হাত দেন, কাজটা যেন আলাদা এক চেহারা নিয়ে নেয়। বাড়ির সবাই বাগের মধ্যে এসে জুটেছে। ভবনাথ, দেবনাথ তো আছেনই, ভবনাথের তিন ছেলে—কৃষ্ণময়, কালীময় ও হিরন্ময় এবং মেয়ে নির্মলা, আর দেবনাথের মেয়ে পুটি। পাঁচ-বছরে কমললোচনও পুটির হাত ধরে এসেছে। পুটির উপরের মেয়ে চঞ্চলা শ্বশুরবাড়িতে, মচ্ছবের মধ্যে সে কেবল নেই। আর বউরা গিন্নীরা আসতে পারেন না বাইরের এত মানুষের সামনে। ফাঁকা বাগে গাছ পোঁতার ব্যাপারে কেমন করে আসবেন?

দেবনাথ বলছেন, চারা গর্তে দেবার সময় সবাই একটু করে হাত ঠেকিয়ে দাও একমুঠো করে মাটি দিয়ে দাও গোড়ায়। কেউ বাদ থাকবে না।

কমলের হাত নিয়ে চারায় ঠেকানো হচ্ছে, একটুকু হাত ছুঁইয়ে গর্তে ফেলছে। দেবনাথ বললেন, সকলের হাতের পোঁতা গাছ। নিজের গাছ বলে মমতা হবে, ডালখানা কাটতেও প্রাণে লাগবে। এই কমল ছোট্ট এখন, কোন-কিছু বোঝে না, কিন্তু বড় হয়ে সমস্ত শুনে গাছপালার উপর অপত্যস্নেহ জাগবে।

পাড়ায় চাউর হয়ে গেছে, ব্যাপারটা শুধু আর পুববাড়ির মধ্যে নেই। নিত্য-দিনের খাওয়া-পরার বাড়তি কিছু হলেই গ্রামের মানুষ ঝুঁকে এসে পড়বে। তারিফ করছে সকলে দেবনাথের : শুনে যাও, চেয়ে দেখ। কোন কালে কি হবে, মাথার ভিতরে সেই ততদিনের ভাবনা। বিদেশের ভাল ভাল মানুষের সঙ্গে ওঠা-বসার ফলে এমনি সব চিন্তাভাবনা আছে।

বাগের কলরব বাড়ির মধ্যে দক্ষিণের ঘর অবধি এসেছে। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখে তরংগিণীর দু'চোখ জলে ভরে গেল। কৃষ্ণময়ের বউ অলকা কি কাজে ঘরে এলো। তরংগিণী সামলাবার সময় পান না, দেখে ফেলেছে সে। কাছে এসে প্রশ্ন করে : ছোটমা, কি হয়েছে?

কিছু হয়নি—কী আবার হবে : তুমি যাও।

অলকা নড়ে না। নিজের আঁচলে খুড়-শাশুড়ির চোখ মুছিয়ে দিল। বলে, বলো কেন কাঁদছ, বলো।

একটা জিনিস মনে উঠল। বলে, কাকা-মশায় কিছু বলেছেন নাকি?

তরংগিণী ঝেড়ে ফেলে দিলেন : না না, উনি কি বলবেন। দেখাই বা হল কোথায়?

অলকাকে তারপর সামাল করে দেন : কাউকে এসব বলতে যেও না বউমা, সবাই মিলে ওখানে আনন্দ করছে, আমার চোখে জল। খুবই খারাপ সত্যি।

জেদ ধরে অলকা বলে, কী হয়েছে বলো তবে।

একমুহূর্ত নিঃশব্দে তরংগিণী তাকিয়ে রইলেন। ঠোঁট দুটো অকস্মাৎ কেঁপে উঠল। বললেন, আমার বিমি থাকলেও বাগে গিয়ে কত আহ্লাদ করত।

ধৈর্য হারিয়ে হাউ-হাউ করে তিনি কেঁদে উঠলেন।

সাত বছরেরটি হয়ে মারা গিয়েছিল তরংগিণীর প্রথম সন্তান বিমি—বিমলা। কত কাল হয়ে গেছে। চাকরির ধান্দায় দেবনাথ বাড়ির বার হননি তখনো—ওকালতি পড়েন আর দাদার ভাই হয়ে বিষয়-আশয় দেখাশুনো করেন। আচমকা কেন জানি বিমলা বলেছিল, আমি মরে গেলে মা তোমার উনুনে কাঠ ঠেলে দেবে কে?

তরংগিণী বিষম এক ধমক দিলেন : চোপ। একফোঁটা মেয়ে তার পাকা পাকা কথা শোন।

উঠানে কলাই শুকাতে দেওয়া আছে। আকাশ-ভরা মেঘ—ছড়-ছড় করে বৃষ্টি নামল। অকাল বর্ষা। ভিজে গেল রে সব, ভিজে গেল। ও বিমি—

কোথায় ছিল বিমলা, ছুটে এসে পড়ল। বাতাস বেধে রাঙা শাড়িটুকু ফুলে উঠেছে—পাখনা-মেলা পরীর মতন উড়ে এলো যেন। তরংগিণী কুনকে ভরে দিচ্ছেন, মেয়ে বয়ে বয়ে ঘরে নিচ্ছে। মেজেয় ঢেলে আবার কুনকে নিয়ে আসে।

কাঁথা সেলাই করেন তরংগিণী কাঁথার ডালা নিয়ে। পাশে বসে বিমলাও পুতুলের কাপড় সামান্য এক ন্যাকড়ার টুকরোর উপর ফুল তোলে।

সেই মেয়ের ভেদবমি। কবিরাজ জল বন্ধ করে গেছেন, আর বিমলা 'জল জল' করে আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছে : দাও মা জল, একটুখানি দাও। কবিরাজ টের পাবে না।

সামনে থাকলে এমনি তো করবে অবিরত—তরংগিণী একটু আড়ালে গিয়েছেন, মেয়ে সেই ফাঁকে গড়াতে গড়াতে একেবারে জলের কলসির কাছে। কলসিতে জল কোথা, খালি কলসি টানাটানি করছে।

তরংগিণী অবাক হয়ে বললেন তক্তাপোষ থেকে নেমে পড়েছিস—কেন রে?

জল দাও—

মেয়েকে আলগোছে আবার উপরে তুলে দিয়ে তরংগিণী বললেন, কষ্ট করে একটু থাক মা, সেরে ওঠ। কত জল খেতে চাস, খাবি তখন।

ঘুমাল মেয়ে। মা ঘুরেফিরে আসেন আর গায়ে হাত দেন। ঠান্ডাই তো। চুপচাপ ঘুমুচ্ছে—তবে আর কি! বাগের মধ্যে কুয়োপাখি ডাকছে : কুব-কুব-কুব। অককু পাখি ডেকে জানান দিল দুই প্রহর হয়ে গেছে। ভুতুম ডেকে উঠল বাদাম গাছ থেকে। তরংগিণীর গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ঝিঁঝিঁপোকারা কাঁদছে কেন। জোনাকি আজ বড্ড বেশি।

হাত-পা ঠান্ডা যে মেয়ের। লোকজন ভেঙে এসেছে। সোনার বিমি আমার চোখ মেল, 'মা' বলে ডাক একটিবার তুই—

বিমলার দেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। অল্প অল্প রোদ উঠেছে। মরেছে বিমলা, কে বলবে। গায়ের রং ঝিকমিক করছে। মুখে হাসি লেগে আছে। রোগের যন্ত্রণা নেই, জল তেষ্টা পাচ্ছে না আর—

(ক্রমশঃ)

যুবক যুবতী

যৌনশিক্ষা

শ্রীমতী অলকা বসুমল্লিকের বস্তুনিষ্ঠ চিঠিটির জন্য তাকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আমার ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাসের কারণ আমি নিজে ভুক্তভোগী এবং পাঁচের দশকের প্রথমার্ধের একজন বিজ্ঞানের ছাত্রীও।

নিতান্ত কচি বয়সে পাঠশালার পাঠ্যদশায় যাচ্ছেতাই আমলের কু-অভ্যাসের দীক্ষা সমাজের কাছ থেকেই লাভ করেছিলাম। অভিভাবকদের কুণ্ঠা ও অসাবধানতায় কৈশোরের ভয়-ভাবনায় নিঃসঙ্গ মুখচোরা দিনগুলো হয়ে উঠেছিল অত্যাচারিত ও দুঃসহ। পরবর্তীকালের পরিণত বোধশক্তির বলে বিদ্যালয়ে যৌন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনে জেগেছিল। প্রকৃতি-তাড়িত দুঃসহ অবস্থা থেকে যেদিন মানুষের গড়া শিক্ষা-সংস্কৃতির সুন্দর জগৎটাতে বোধের উত্তরণ ঘটল সেদিন নিজের ভবিষ্যতের চিত্রটাও স্বচ্ছ হয়ে গেল অনেকটাই। বুঝলাম বাঁচার সংগ্রাম একক ভাবে চালাতে হবে, আমার বিড়ম্বিত জীবন দিয়ে আর কারো জীবন বিড়ম্বিত করা চলবে না। কিন্তু আমার সে সাধও পূর্ণ হবার নয়। পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রামে আমি হেরে গেলাম। পঞ্জাপুঞ্জ অন্ধকার নেমে এল। জানি আমার মা-বাবা আমায় পরিত্যাগ করবেন না। কিন্তু তাঁদের শেষ বয়সের শান্তি বিঘ্নিত করার জন্য দায় কার?

আসুন আমরা সেই চেষ্টা করি যাতে স্বাস্থ্যবিধি শিক্ষার মতই সহজ স্বাভাবিক ভাবে আমাদের সুকুমারমতি ছোট ভাই-বোনেরা যৌনশিক্ষাও পেতে পারে। কীটদষ্ট হয়ে অকাল-বিনষ্টির সম্ভাবনামুক্ত পরিবেশে সৌন্দর্যে মাধুর্যে সফলতায় তারা তাদের জীবনপুষ্প সাধ্যমত বিকশিত করার সুযোগ লাভ করুক।

—গীতা মৌলিক
কলি ৫১

(২)

সাপ্তাহিক অমৃতে প্রকাশিত যুবক-যুবতী ফিচারে 'যৌনশিক্ষা' ব্যাপারটা নিয়ে বেশ কয়েকটা চিঠিপত্র প্রকাশিত হওয়ায় এ সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য না করে পারলাম না। যাঁরা বলেছেন যে যৌনশিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট ক্ষেত্র বা পরিবেশ চাই তাঁরা তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে যেসব যুক্তি রাখছেন তার সঙ্গে আমি একমত। যেমন আমেরিকার মতন দেশে যদি যৌন অপরাধের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে তবে আমাদের দেশেও যে বাড়বে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? একেই তো অশ্লীল সিনেমা, পত্রিকা, বিজ্ঞাপন এবং বইয়ের কল্যাণে দেশের তরুণ এবং কিশোর সমাজ

বিপথগামী, তায় আবার এর পক্ষে যুক্ত হয়েছে অর্থনৈতিক সংকট। এর উপর আবার এই শিক্ষা চালু হলে সমাজের কতটা মঙ্গল হবে? যাঁরা বলতে চান যৌন-শিক্ষা আমাদের দেহমনকে সঠিক এবং সুন্দর করে গড়ে তুলবে তাঁদেরকে আমার জিজ্ঞাস্য, আমাদের মা-বাবা প্রভৃতিরা দেহে-মনে সকলেই কি অসুস্থ ছিলেন? নিশ্চয়ই না? কিন্তু তাঁদের যুগে শিক্ষিতদের মধ্যে কয়জন এই শিক্ষা সম্বন্ধে সম্যকভাবে ওয়াকিবহাল? কিন্তু এই শিক্ষার অবশ্যই প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে তার আগে দেশের অশ্লীল সিনেমা, বিজ্ঞাপন, বই প্রভৃতি বন্ধ করতে হবে। প্রতিষ্ঠা হবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের—তবেই আসবে এই শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ। কারণ পৃথিবীর কোন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যৌন অপরাধ দেখা যায় না বোধহয় এইজন্যেই। আর আমাদের শরীর-মন যে অসুস্থ তার জন্য কি নোংরা সামাজিক পরিবেশ দায়ী নয়? কাজেই ঐ নোংরা সামাজিক পরিবেশকে ধ্বংস না করে যৌনশিক্ষা দেওয়ার জন্য এত মাথাব্যথা কেন? নাকি যৌনশিক্ষা চালু হলেই ঐ সামাজিক পরিবেশ ধ্বংস হয়ে যাবে? সাম্প্রতিক অশ্লীল চলচ্চিত্র, বিজ্ঞাপন, বই যে মানুষকে আরও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং যুব সমাজের যৌনবিকার ঘটাচ্ছে তা বলাই বাহুল্য। এই প্রসঙ্গে ১৫ সংখ্যা অমৃতে প্রকাশিত অজিতবাবুর কথা উদ্ধৃত করে বলছি, 'ভাবিয়া করিও কাজ, কাজ করিয়া ভাবিও না।' যেসব দেশের বিদ্যালয়ে যৌনশিক্ষা চালু হয়েছে সেখানে এর ফলাফলের কথা চিন্তা করুন। যৌনজ্ঞান না থাকায় আমাদের যা ক্ষতি হয়েছে বর্তমান পরিবেশে (যা সহজেই যৌনশিক্ষাকে কুপথে নিয়ে যাবে) এ শিক্ষায় ফল হবে তার চেয়েও ভয়ংকর।

এস দাশগুপ্ত
কলিকাতা-৫৪

প্রেম

অমৃত পত্রিকায় যুবক-যুবতী ফিচারে 'প্রেম' সম্পর্কে সাক্ষাৎকারটি পড়লাম। ক্যালকাটা উইমেন্স কলেজের ছাত্রী সুনন্দা ঘোষ বলেছেন, 'ভালবাসার ক্ষেত্রে আমি খুব হিসেবী থাকার চেষ্টা করি।'

সুনন্দা ঘোষ ভালবাসা এবং হিসেবের ব্যাপারটাতে কি বলতে চাইছেন বুঝতে পারলুম না। ভালবাসার সঙ্গে হিসেবের তফাৎ আকাশপাতাল। আমার মনে হয় উনি আজকের দিনের আর্থিক সংকটের প্রসঙ্গে

সারা বাংলা কবি সম্মেলন প্রসঙ্গে প্রকাশিত চিঠির জবাব *

আজকাল তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় নিয়ে সাহিত্যিকরা প্রায়ই সাপ্তাহিক পত্রিকায় লেখনীযুদ্ধ চালান। এ বিষয়টি গৌরবের নয়। আমি খুবই দুঃখিত যে এমনি একটি অভিযোগের ব্যাপারে আমাকেও জড়িয়ে ফেলে একটি চিঠি 'অমৃতে' প্রকাশিত হয়েছে। 'অভিযোগকারী'র ভূমিকাটি ব্যক্তিগতভাবে এড়িয়ে চলতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকি, হঠাৎ একলা আমার নাম উল্লেখ করে তাই কোনো প্রকাশ্য অভিযোগ ছাপানোতে আমার যথেষ্ট রুচিগত আপত্তি আছে। এটা কোনো স্বাক্ষর-অভিযান হলে অন্য কথা ছিল। কয়েক সংখ্যা আগের 'অমৃতে' শ্রীসত্যানন্দ গুহের চিঠিতে আমাকে উদ্ধৃত করে যে একটি অভিযোগ আছে—আমি তার দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত নই। আমার মৌখিক কথা উদ্ধৃত করার আগে তিনি যদি আমার অনুমতি বা পরামর্শ চাইতেন, কল্যাণীয় সত্যানন্দকে আমি 'এ পরামর্শ দিতাম না'।

আমরা বাড়ীতে বসে কত কথাই তো বলি, ভালো-মন্দ। ব্যক্তিগত কথোপকথন ও প্রকাশ্য মন্তব্যের ওজন ও দায়িত্ব এক নয়। ব্যক্তিগত আলাপ যদি প্রকাশ্য ইন্টারভিউ-এর সমান হয়, তাহলে মেপে ছাড়া কথাই বলা চলে না। দিনের প্রতিটি কথা যদি সর্বজনীনভাবে দায়িত্ব নিয়ে উচ্চারণ করতে হয়, তাহলে আমাদের জীবন প্রধানমন্ত্রীর মত দুঃখময় হয়ে উঠবে। শতং বদ কথাটি তাঁদের ক্ষেত্রে অচল। কিন্তু আমাদের মত তুচ্ছ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এ ধরণের সামান্য স্বাধীনতাগুলি মূল্যবান।

সেদিন মফঃস্বলী কবিরা অনেকেই অচিন্ত্যবাবু ও মণীন্দ্রবাবুকে দেখতে পেলেন না বলে আপশোস করছিলেন, শুনতে পেয়েছিলাম। কর্মকর্তাদের বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত কোনোই অভিযোগ নেই। এ ধরণের বড় কাজে কিছু ত্রুটি, কিছু বিশৃঙ্খলা (এবং কিছু মনোমালিন্যও) হয়ে থাকেই। প্রয়াসটিই যেখানে অভিনন্দনযোগ্য, তুচ্ছ ত্রুটিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ না করলেও আমাদের চলে।

[illegible]
কলকাতা—২১।

* চিঠিটি বিলম্বে প্রাপ্ত। আর কোন চিঠি প্রকাশ করা সম্ভব হবে না।

বলতে চাইছেন। কাউকে ভালবাসলে যদি তার আর্থিক সংগতি না থাকে তাহলে সে ভালবাসা ঘর বাঁধার সহায়তা করে না। কিন্তু প্রশ্ন হল, কে কীভাবে ভালবাসায় আটকা পড়েন না তিনি নিজেই জানেন না। কেউ কারও বিশেষ গুণ দেখে মুগ্ধ হয়ে ভালবাসেন কেউ রূপে, কেউ বা মনের গভীরতা বুঝে। লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট যাকে বলা হয় তাতে কোন যুবতীই তার প্রেমিকের আর্থিক সংগতি জেনে ওঠার সুযোগ পান না। প্রথম দিকে সেটা একে অপরের পক্ষে জানা সম্ভবও নয়। পরবর্তী সময়ে ঘনিষ্ঠতা বাড়লে আস্তে আস্তে সব জানা যায়। তাহলে ভালবাসা গড়ে ওঠবার পর একজন প্রেমিকা যদি বোঝেন তার প্রেমিক আর্থিক দিক থেকে সলিড নন, অর্থাৎ ভাল চাকরী-বাকরী কি ব্যবসাপত্র করেন না তখন কি তিনি প্রেমিকের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাবেন? সেটা বোধহয় সত্যিকারের ভালবাসা থাকলে সম্ভব হয় না।

আমার তো মনে হয় কোন যুবতী যদি কোন যুবককে সত্যিকার ভালবাসেন তাহলে আর্থিক অসঙ্গতি নিয়ে বিচ্ছেদ না ঘটিয়ে যৌথভাবে চেষ্টা করবেন চাকরী-বাকরীর এবং নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর। মনের মিল যদি থাকে তাহলে পথ একটা বেরুবেই। এবং যৌথভাবে আর্থিক অনটনের সঙ্গে লড়াই করার মধ্যেই ভালবাসার সার্থকতা। নৈরাশ্য আসবে, কিন্তু তাতে ভালবাসায় চিড় ধরবে কেন?

তবে ইদানীং কালে ভালবাসার ধরন বদলেছে। তার সংখ্যাও খুব কম। শুনেছি অনেক যুবতী আগে-ভাগে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত যুবকের ঠিক-ঠিকানা, আর্থিক অবস্থার খোঁজ-খবর নিয়ে নেন। যদি দেখেন আকাঙ্ক্ষিত যুবকটি শাঁসালো তবেই ঝুলে পড়েন, নাহলে অন্য কোথাও নজর দেন। যেখানে আকাঙ্ক্ষিত যুবকের পায়ের নীচের মাটি শক্ত, সেখানে গাঁটছড়া বাঁধার জন্যে প্রেম-ভালবাসার চেষ্টা চালিয়ে যান। কিন্তু তাতে কি সত্যিকারের ভালবাসার অস্তিত্ব থাকে? মনের সেতুবন্ধ রচনা কি হয়? আমার তো মনে হয় বাইরের জৌলুষ, অর্থানুকূল্য, ভালবাসার পলেস্তারা তৈরী করেই হৃদয়ে হৃদয় যোগ হয় না।

অনেকে হয়ত বলবেন বাউণ্ডুলে প্রেমিকের কাঁধে ভর করেই বা লাভ কি। সারা জীবন তো দারিদ্র্যের সঙ্গে বোঝা-পড়া করতেই চলে যাবে। সুস্থ স্বাভাবিক জীবন কি গড়ে উঠবে?

আগেই বলেছি, অভাব-অনটন ভালবাসার ক্ষেত্রে অসুবিধে সৃষ্টি করে সত্য, কিন্তু যৌথ প্রচেষ্টায় আর্থিক অসুবিধা দূর করতে হবে। একটা মানুষ চিরকালই বেকার থাকবেন এমনটা হয় না। আবার বেকার থাকলেই তাকে বাতিল করতে হবে এমনটাও ঠিক নয়। উভয়ের যে কোন একজন চাকরী পেলেও সমস্যার সমাধান হতে পারে। ভালবাসার ক্ষেত্রে ধৈর্য এবং মানসিক প্রস্তুতি বড় ফ্যাকটর। অভাব-অনটনে একে অপরের প্রতি যদি সহানুভূতিসম্পন্ন না হন তাহলে ভালবাসা টিঁকবে কি করে?

তাই বলছিলুম, হিসেব কল্লে ভালবাসা কথাটা শুনলেই কেমন ব্যবসাদারের ছবি মনে আসে। পরিচ্ছন্ন ভালবাসার ক্ষেত্রে 'হিসেব' কথাটি সুর কেটে দেয়। যাকে বলে আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং, তা থাকলে ভালবাসা মরবে না। কাজেই হিসেবের দাঁড়িপাল্লায় ভালবাসাকে না চড়িয়ে বরং মনের গভীরতাকে বিশ্লেষণ করে দেখা ভাল। যদি দেখা যায় মন ভরছে না তাহলে অর্থের পাহাড়ও শান্তি দিতে পারবে না।

সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়, লখনৌ।

মনের খবর প্রসঙ্গে

একটি পত্রের (৯ শ্রাবণ) লেখক অরুণচন্দ্র ভট্টাচার্য স্কিজোফ্রেনিয়া রোগ সম্পর্কে 'মনের খবর'-এর লেখক তরুণচন্দ্র সিংহকে আলোচনা করতে অনুরোধ করেছেন। আমি আর একটু এগিয়ে আধুনিক পাশ্চাত্যের একজন প্রতিপত্তিশালী মনোচিকিৎসক ডঃ রোনাল্ড লেইঙ-এর ঐ স্কিজোফ্রেনিয়া বিষয়ক মতামতকে তরুণচন্দ্র সিংহ কোন্ দৃষ্টিতে দেখেন, জানতে চাইছি।

তাঁর রচিত বহু গ্রন্থে প্রচারিত ডঃ লেইঙের প্রভাবশালী মতকে অন্য একজন লেখক সংক্ষেপে নিম্নরূপে বিবৃত করেছেন ঃ

'যাদের পাগল বলা হয়, এবং তার ফলে যারা সমাজে অত্যাচারিত হয় (যথা, বৈদ্যুতিক শক দিয়ে বা ট্রাংকুলাইজার ওষুধ দিয়ে, ইত্যাদি ভাবে) তাদের অধিকাংশের সৃষ্টি হয় যখন পরিবার এবং অথবা সমাজের একজনকে বলি দেওয়া অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে, এমন একজন যে তাদের সামগ্রিক আদান-প্রদানের মধ্যে পরিবার এবং/অথবা সমাজের প্রত্যেক সদস্যের উদ্বেগ একটা বিশেষ তীব্রতায় নিজে গ্রহণ করতে সম্মত হবে, এবং কোনোভাবে তার জন্য রোগ ভোগ করবে। এই ভাবে, বলির জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তিটি পরিবার এবং/অথবা সমাজে রুগ্ন বস্তুতে পরিণত হবে, এবং তাদের ষড়যন্ত্রে পরিবার এবং/অথবা সমাজ চিকিৎসকদের জড়িত করবে। ঐ রুগ্ন ব্যক্তিটিকে 'স্কিজোফ্রেনিয়া' রোগাক্রান্ত বলে চিহ্নিত করবার জন্য চিকিৎসকদের নিয়োগ করা হবে, এবং ঐ চিকিৎসকেরা 'মনোচিকিৎসা' নামক দৈহিক ও সামাজিক প্রক্রিয়ার দ্বারা সুসংগঠিত ভাবে ঐ ব্যক্তিকে ধ্বংস করতে অগ্রসর হবেন।'

ডঃ লেইঙের এই মত আমি অনেক রোগীর ব্যক্তিগত জীবনে সত্য হতে দেখেছি। ইংলণ্ডের এই বিশিষ্ট মনোচিকিৎসক ডঃ লেইঙ এপ্রিল ১৯৭২-এ কলিকাতায় এসেছিলেন; এখানকার মনোচিকিৎসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তরুণচন্দ্র সিংহের তাঁর মতবাদ ভালভাবেই জানা সম্ভব এই আশায় এ বিষয়ে তাঁর যুক্তিপূর্ণ মতামত কী তা জানতে চাইছি।

দীপক ভট্টাচার্য
২৪ পরগণা

কাদম্বরী প্রসঙ্গ

'অমৃতের' ১৫ সংখ্যা (১৩৮১) 'পুনশ্চ'-এর যৎসামান্য পুনশ্চ সংযোজন করতে চাই ঃ

তারাশঙ্করের 'কাদম্বরী'র একটি সংস্করণ আমি চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্বে পড়েছিলাম যেটা ছিল মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। সেই সংস্করণের জন্য রবীন্দ্রনাথ একটি চমৎকার ভূমিকা লিখেছিলেন। সেই উপাদেয় লেখাটি রবীন্দ্রনাথের কোন রচনাবলীতে স্থান পেয়েছে কিনা জানি না। বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগের (পঞ্চাশ বর্ষপূর্তি বছরে) কর্তাব্যক্তিদের দৃষ্টি এই বিষয়ে আকর্ষণ করছি। —সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা—২।

রূপসী [illegible] তো

'অমৃতে' এবা[illegible] রূপসীর খাতায় নখ নিয়ে আলোচনা করেছেন বরবর্ণিনী। অনেক মেয়ে বড় বড় নখ রাখেন এবং সেই নখে রং লাগান। এতে সৌন্দর্য কিছু খোলে বলে আমার মনে হয় না। বরং অসুবিধার সৃষ্টি করে। সব সময় নখের দিকে সচেতন থাকতে হয়, কোথাও ঠুক করে লেগে না যায়। অনেককে দেখেছি অসাবধানে শাড়ির মধ্যে নখ ঢুকে যেতে। তাছাড়া সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়ির সব মেয়েদেরই কিছু-না-কিছু সাংসারিক কাজ করতে হয়। সেখানে এত ধরনের বড় নখ কি কাজের অসুবিধা করে না?

স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গে তো বটেই। নখ ঠিকমত পরিষ্কার না রাখলে নখের ভেতরকার ময়লা স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। যাঁরা বড় নখ রাখবেন তাঁদের কাঁটা-চামচে দিয়ে খেতে হবে। মধ্যবিত্ত ঘরের কজন মহিলা নিয়মিত কাঁটা-চামচেতে খান? তাহলে বড় নখ রাখা কেবল বিশেষ এক শ্রেণীর মহিলাদেরই সৌন্দর্যচর্চার জন্যে? সঙ্গতি থাকলেও বিদেশীদের মত অনেকে কাঁটা-চামচে দিয়ে খাওয়ার থেকে হাত দিয়ে খেয়ে বেশী তৃপ্তি পান। মধ্যবিত্ত ঘরে ডাল-ভাত শাক-চচ্চড়ি হাত দিয়ে খেলে যত তৃপ্তি পাওয়া যায় কাঁটা-চামচেতে কি তা পাওয়া যায়?

তপতী ভট্টাচার্য, কলকাতা—৩

শিখা বন্দ্যোপাধ্যায়

খেলা খেলা খেলা খেলা খেলা খেলা

দেশবন্ধু স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র নবাঙ্কুর দত্তকে খেলাধুলো প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করতেই খুব বিষণ্ণ সুরে বললে : 'খেলার জায়গা নেই। আমরা এখন খেলি না।' ওর স্বরে অভিমান। কার প্রতি অভিমান বুঝতে অসুবিধে হয় না। অভিমান ওর যাঁরা বড়, তাঁদের প্রতি, যাঁরা মাঠে মাঠে ঘর-বাড়ি তুলে ওদের খেলা বন্ধ করেছেন, তাঁদের প্রতি। নবাঙ্কুরকে প্রশ্ন করি, 'এই যে জায়গার অভাব—তা কি দিয়ে পূরণ হবে?'

'তা আমরা কি করে বলব?' আর কিছু না বলে ও চুপ করে থাকে।

ক্রিকেট ওর খুব প্রিয় খেলা। প্রসঙ্গ উঠতেই ও গম্ভীর হয়ে গেল। ৪২ রানে ভারতের সব উইকেট পতনের মতো এত বড় পীড়াদায়ক ঘটনা যে ক্রিকেট খেলার জগতে ঘটতে পারে তা ছিল ওর ধারণার বাইরে। বললে, 'এখন খারাপ খারাপ রেকর্ড হবে।'

উনিশের দীর্ঘাঙ্গী ছাত্রী (বি-এ—১ম বর্ষ) শিখা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'খেলাধুলোকে আপনি কতখানি গুরুত্ব দেন?'

'খুব বেশি।'

'আপনি নিজে খেলেন?'

'হ্যাঁ।'

'কি খেলেন?'

'ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল—সুযোগ পেলে হকি খেলার চেষ্টা করি।'

'মেয়েদের খেলাধুলো বিষয়ক চিন্তা-ভাবনা আগের তুলনায় অনেক বেশি লিবারেল হয়েছে, তাই না?'

'অবশ্যই। এখন আমাদের তেমন কোন বাধাই পেরোতে হয় না। তবে অসুবিধে হল অন্য জায়গায়।'

'কি রকম?'

'এদেশে খেলাধুলোর পরিবেশ তৈরি হচ্ছে না। এত অভাব আর দৈন্য, এত উচ্ছৃঙ্খলতার অ্যাটমসফেয়ারে খেলার মাঠকে পরিষ্কার রাখা খুব কঠিন।'

নিজে থেকেই শিখা বলল, 'মেয়েরা আজ অসম্ভব অ্যাডভেঞ্চারে মেতে গেছে। এই দেখুন না, চার-চারটে মেয়ে হুগদেওল শৃঙ্গ জয় করতে গিয়ে মারাই গেল। এতে কি কারো শৃঙ্গ অভিযানের ইচ্ছে কমবে? মোটেই না, বরং আরো বাড়বে।' তবে দুঃখ করে শিখা বললেন, 'কর্তৃপক্ষ এসব ব্যাপারে তেমন উৎসাহ তো দেনই না—বরং একটু বিরক্ত যেন।' খুব গর্ব করেই শিখা টেবিল টেনিস, বাস্কেটবল, ভলিবল ইত্যাদি ক্ষেত্রে রূপা ব্যানার্জি, শ্রীরূপা চ্যাটার্জি, কৃষ্ণা গুহ প্রমুখের নাম করে বোঝালেন, মেয়েরা এগিয়ে চলছে, তার জন্যে যেটুকু উদ্যোগ তা মেয়েদেরই।

'এটা খুব দুঃখের কথা যে, দুঃখ আর সমস্যাজর্জরিত আমাদের দেশের তরুণীরা খেলতে চাইলেও পরিবেশ পায় না।'

তপন চৌধুরী

দক্ষিণ কলকাতা আই টি আই-এর ছাত্র সন্দীপ রায় নিজে খেলোয়াড়। ভালো ফুটবলার। ওর আশা, ভবিষ্যতে আরো বড় খেলোয়াড় হবে। বললেন, 'আমরা যা মনে মনে ভাবতাম—মাঠে-ময়দানে সেইরকমটা আর নেই। এখন 'করকম হয়ে গেছে যেন।'

'কি রকম হয়েছে?'

'একজন প্লেয়ারের সঙ্গে আরেকজন প্লেয়ারের সম্পর্ক হয়েছে আর্টিফিসিয়াল। একই টিমের খেলোয়াড়, অথচ সমঝোতা নেই।'

'এরকম অবস্থা হল কেন?'

'তা বলতে পারবো না। তবে এইটুকু বলতে পারি, শুধু খেলার মাঠেই নয়, সব জায়গায় একই অবস্থা।'

ভারতীয় ক্রিকেট দল সম্পর্কে বলেছেন, 'তদন্ত কমিশন বসানো উচিত—এরকমভাবে হারার কারণ কী?

স্কটিশ চার্চ স্কুলের ছাত্র শ্যামল দাশগুপ্ত বললেন, 'খেলায় হারজিৎ আছেই, তাই নিয়ে যারা চেঁচামেচি করে, তারা খেলোয়াড়ই নয়।'

খেলার মাঠে প্রতিনিয়ত গণ্ডগোল ও অপ্রীতিকর ঘটনা সম্পর্কে সিটি কলেজের (সাউথ) দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র সমর চক্রবর্তীকে প্রশ্ন করলাম। সমর বললেন, 'হবেই তো। একদিন আগে লাইন দিয়েও টিকিট পাওয়া যাবে না, অথচ ব্ল্যাক হবে। যার টাকা আছে সে খেলা দেখবে, যার নেই সে আঙ্গুল চুষবে—এটা কখনও সহ্য হয়? ক্রিকেটের টিকিট পাওয়া তো স্বপ্নের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপর দেখুন, ঘরে-বাইরে কোথাও শান্তি নেই। অর্ধেকের বেশি বই কিনতে পারিনি। এক দাদা বেকার হয়ে আছে। ঘরে সব সময় অশান্তি। আর আমি যখন খেলার মাঠে যাবো শান্ত হয়ে বসে থাকবো, তা কখনও হয়?'

হাবড়া চৈতন্য কলেজের ছাত্র তপন চৌধুরী বললেন, 'বেলবটম আর ববি-র প্রচণ্ড প্রভাবে খেলার মাঠকেও ডোবাতে বসেছে। আজকাল কেউ সময়মতো মাঠে আসে না। প্রেম করছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এদিকে অপর দল ওয়াক-ওভার নিয়ে চলে যাচ্ছে। খেলাটা এখন গৌণ। দুঃখ লাগে। এ-অবস্থা যে কতদিন চলবে!'

'এটা তো একটা দিক—অন্য আরও দিক তো আছে—যে-বিষয়ে বলুন কিছু?' প্রশ্ন করলাম।

'এটা মস্ত বড় দিক। উচ্ছৃংখল হয়ে গেলে ইউথ পাওয়ার নষ্ট হয়ে যায়।'

'এর জন্যে তো কতগুলো ফ্যাকটর দায়ী—তাই না?'

'নিজেরা ঠিক হয়ে চললে কোনকিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।'

—কৃষ্ণা সেনগুপ্ত

এরাও পিছিয়ে নেই

সাইকেল রিক্সা তৈরীর কারখানা

মফঃস্বলের যাত্রী পরিবহণ ব্যবস্থায় সাইকেল রিক্শা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। অথচ এই সাইকেল রিক্শা তৈরীর ব্যবসায় বাঙ্গালীর সংখ্যা ছিল নগণ্য। তবে ইদানীং এই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এই ব্যবসায়ে বেশ কিছু বাঙ্গালী কারিগর ঢুকে পড়েছেন। তাঁরা নিজেরা তো সংসার চালাচ্ছেনই আরও বেশ কিছু পরিবারের অন্ন-সংস্থানও করে দিচ্ছেন।

ঢাকুরিয়ায় সাইকেল রিক্সা তৈরী ও সারাই কারখানা

ঢাকুরিয় ব্রিজের পাশে 'পপুলার সাইকেল স্টোর্সে'র প্রফুল্ল সিকদারের কথাই ধরা যাক। প্রফুল্লবাবু বেশ কয়েক বছর আগে রিক্শা সারাই ও মেরামতের দোকান করেছিলেন। এখন তিনি নিজেই সাইকেল রিক্শা তৈরী করেন এবং বাজারের তুলনায় সস্তা করেই তা বিক্রী করেন। বছর খানেক হল ইউ বি আই থেকে লোন নিয়েছেন—কারখানার সম্প্রসারণ করেছেন—কারিগরের সংখ্যাও বাড়িয়েছেন। নিজের পরিবার ছাড়া আরও পাঁচটি পরিবারের ভরণপোষণ চলছে এই সাইকেল স্টোর্সের মাধ্যমে। গত মাস দশেকের ভেতর প্রফুল্লবাবু প্রায় দুশো রিক্শা তৈরী করেছেন। সেই দুশো চালিয়ে আরও দুশো পরিবার জীবিকা নির্বাহ করছেন। সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ শহরতলীতে বেশ কিছু রিক্শা মেরামতের দোকানও গজিয়ে উঠেছে। আরও সুখের কথা এঁরা সকলেই বাঙ্গালী।

অথচ প্রফুল্লবাবু যখন ব্যবসা শুরু করেন তখন তাঁর সম্বল ছিল মাত্র হাজার দুয়েক টাকা। কর্মচারী ছিল একজন অর্থাৎ জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সর্বকিছু তাঁকেই করতে হত। গত সেপ্টেম্বর মাসে উনি ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ছ' হাজার টাকার ওভার-ড্রাফট নেন। সেই থেকে ওঁর ভাগ্য ফিরে গেছে। এখন মাসে খরচ-খরচা বাদ দিয়ে হাতে থাকে আটশো থেকে হাজার টাকা। দৈনিক গড়ে তিনটে করে সাইকেল রিক্শা তৈরী করেন প্রফুল্লবাবু। এখন প্রায় ১৬ হাজার টাকার মূলধন খাটছে প্রফুল্লবাবুর কারবারে।

প্রফুল্লবাবু যে সব রিক্শা তৈরী করছেন তা বিক্রীও করছেন ব্যাঙ্কের মাধ্যমে। এর ফলে রিক্শাচালকরা সকলেই রিক্শার মালিক হতে পারছেন।

ইউ বি আই'র একজন অফিসার বল্লেন—রিক্শাওয়ালারা ব্যাঙ্কে দৈনিক এক টাকা করে জমা দিচ্ছে। অথচ আগে মহাজনদের দিতে হত আড়াই টাকা করে। কিস্তিতে শোধ হবার পর এখন নিজেরাই গাড়ির মালিক হচ্ছেন। আগের ব্যবস্থায় ওরা কিছুতেই মহাজনদের হাত থেকে রেহাই পেতে পারতেন না।

একজন রিক্শাওয়ালার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি হাসিমুখে বললেন—এখন ডেইলি বাবো থেকে ষোল টাকা ও'র রোজগার হচ্ছে। শুধু তাই নয় প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় উনি ও'র বউকে নিয়ে রিক্শা করে ঘুরে বেড়ান। নিজে রিক্শা চালান আর ও'র 'ওয়াইফ' সেজে-গুজে ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে নিয়ে পেছনে বসে থাকেন।

—কনক মজুমদার

অলৌকিক জলযান

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

উপন্যাস

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হিগিনস বোট থেকে চিৎকার করে বললেন, নো নো। সব কেবিনে লম্ফ জবালতে হবে না। এখানে একটা লম্ফ দিয়ে যাও। গ্যালিতে রাখো একটা আর একটা বোট-ডেকে ঝুলিয়ে রাখো।

বনি নেমে যাবার সময় হঠাৎ দেখল তখন পায়ের কাছে দু তিনটে ফ্ল্যাইং ফিস পড়ে আছে। ওদের বোধ হয় কোনো অতিকায় মাছটাছ তাড়া করেছিল, উড়ে এসে ডেকে পড়েছে। বনি মাছগুলো কুড়িয়ে নেবার আগে এমন চেঁচামেচি লাগিয়ে দিয়েছিল যে ছোটবাবু ভয় পেয়ে লাফ মেরে ছুটেছে সেদিকে। গিয়ে সে অবাক। তিনটে মাছ। রুপোলি লম্বা, এবং বড় পাখনাওয়ালা মাছ। প্রায় পারশে মাছের মতো এবং খেতে বসে ছোটবাবু দেখছে এ-বেলাতেও হিগিনস তার অধিকাংশ খাবার তার পাতে তুলে দিচ্ছেন। মাছ ভাজা সে একটা আস্ত পেয়েছে। বনির কি যে স্বভাব হয়েছে। ওকে খাওয়াতে পারলে বাঁচে। আর কেউ খাবে, সে যেন মনে রাখতে পারে না। ছোটবাবু বুঝতে পারছে না বুড়ো বনির ওপর রাগ করে সব খাবার ওকে দিয়ে দিচ্ছে কিনা। সে ভেবেছিল বনিকে জোর ধমক দেবে—কিন্তু এখন হিগিনস বললেন, ছোটবাবু তুমি খুব ভাগ্যবান হে।

ছোটবাবু বলল, না স্যার, এটা বুঝতে পারি বনির উচিত হচ্ছে না।

হিগিনস বলল, ভারি মজা কি বল!

ছোটবাবু বলল, বনি, সবাইকে সমান দিতে হয়।

বনি, মাত্র মুখে সামান্য মাছ ভাজা পুরেছে, লম্ফের আলোতে ওর মুখ রহস্যময়ী নারীর মতো, চোখে অপার বিস্ময় ছোটবাবু সম্পর্কে এবং হিগিনস ঝুঁকে আছে সামান্য—তখন ছোটবাবু কি যে বাজে বকছে। সে বলল, আমি কি বাবাকে কম দিয়েছি?

হিগিনস বললেন, তোমাকে খুব হিংসে হচ্ছে ছোটবাবু।

বনি বলল, বাবা তোমাকে বলছি, এ-সব আমার সহ্য হয় না। তুমি ওকে দিতে যাও কেন। তুমি খেতে না পার ফেলে দেবে।

ছোটবাবু বলল, বনি কি বকছ আজেবাজে! এতে কারো পেট ভরে। তুমি খাচ্ছ না তিনি খাচ্ছেন না, আমাকে তোমরা সব দিচ্ছ। কি পেয়েছ তোমরা! প্রায় সব ছুঁড়ে ফেড়ে সে উঠে যেতে চাইলে হিগিনস বললেন, কোথায় যাচ্ছ। তুমি না খেলে আমরা খাব ভেবেছ। বুঝলে ছোটবাবু মাঝে মাঝে তুমি ভারি স্বার্থপর হয়ে যাও। তোমার সব ভাল লাগে এটা কিন্তু ভাল লাগে না।

বনির মুখ অপমানে থমথম করছে। যেন সে কথা বললেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলবে। সে মুখ নামিয়ে রেখেছে। খাচ্ছে না। যেন কিছু বলতে পারলে এতটা সে অপমানিত হত না অথবা সে যদি বলতে পারত বাবা, তুমি ওকে আর কতটুকু চিনেছ আমি ওকে হাড়ে হাড়ে চিনি। ও নিজেকে ছাড়া পৃথিবীতে আর কাউকে চেনে না। আমি এমন সুন্দর পোশাক পরে দাঁড়িয়ে থাকি রেলিঙে—কতবার ভেবেছি ও আসছে, আমার পাশে ঠিক দাঁড়াবে, কথা বলবে—কত কিছু আমি আশা করি ওর কাছে—সে আসে না বাবা। একবার বলে না বনি তোমাকে মেয়েলি পোশাকে এমন সুন্দর দেখায় জানতাম না।

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। ছোটবাবু এখনও হাত নামিয়ে রেখেছে। হিগিনস বললেন, খাও। বনির ওপর রাগ কর না। কি ব্যাপার! তোমরা কেউ খাচ্ছ না! আচ্ছা জ্বালা হল দেখছি—ছোটবাবু তোমাকে আমি খেতে বলছি। তুমি না খেলে মেয়েটা আমায় খেতে পারবে ভাবছ!

ছোটবাবু ধীরে ধীরে মুখ নামিয়ে কাঁটা চামচ টেনে নিলে।

হিগিনস ফের বললেন, তুমি ভীষণ ভাগ্যবান হে ছোটবাবু। তোমাকে আমার হিংসে হচ্ছে। সারাজীবন যা চেয়েছি, কত সহজে তুমি ছোটবাবু তা পেয়ে গেছ। এত সহজে তাকে নষ্ট করে দিও না।

স্যালি হিগিনস ফের খেতে খেতে বললেন, আমি পাইনি। কত সহজভাবে তিনি এখন কথা বলছেন! ডাইনিং হলে তেমনি সব বড় বড় তৈলচিত্র। এখন আর ফুলদানিতে কোনো ফুল নেই। অন্ধকারে অস্পষ্ট আলোর ভেতর সেইসব কাপ্তানের ছবি কেমন অর্থহীন। বড় টেবিল, সাদা চাদর, কারুকার্যময় ন্যাপকিন, সব আছে, শুধু সব মানুষগুলো একে একে তাকে ছেড়ে গেছে। তিনি বললেন, তোমাকে হিংসে করতেও আমার ভাল লাগছে। মানুষের জন্য পৃথিবীতে তারপর আর কি দরকার থাকে বুঝি না। তোমরা ঝগড়া করলে আমার ভীষণ খারাপ লাগে।

তারপর যেন ছোটবাবুকে বলার ইচ্ছে ওহে মানবজাতির অপোগণ্ড তুমি বুঝতে পারছ না, সব কিছু হারিয়ে সামান্য একটা জাহাজের ওপর বাজি রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম, দেয়ার লাইজ এ ওয়াইড এ্যাণ্ড প্লেজাণ্ট রোড দ্যাট সিমস রাইট কিন্তু এখন দেখছি দ্যাট এণ্ডস ইন ডেথ। কেউ আমাদের কোনো ডাঙায় পৌঁছে দেয় না ছোটবাবু। নিজেকে সাঁতরে পার হতে হয়।

স্যালি হিগিনস মুখ ন্যাপকিনে মুছে বললেন, তোমরা খাও। আমি উঠছি। কেন ঝগড়া করলে খুব খারাপ হবে। বলে তিনি উঠে গেলেন।

বনি বলল, কি দরকার ছিল শাউট করার!

ছোটবাবু বলল, বেশ করেছি।

স্যালি হিগিনস এলিওয়েতে দাঁড়িয়ে গেলেন। থমকে দিলেন—এবার!

দুজনাই ভীষণ চুপচাপ ফের। কোনো কথা আর কানে ভেসে আসছে না। তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন। নড়তে ইচ্ছে করছে না। সৌরলোকে আর একটা নতুন পৃথিবী তৈরি হয়ে গেছে। দুজনাই সমুদ্রে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্না আলোতে নতুন ডাঙ্গার অনুসন্ধানে আছে। তিনিও ছিলেন আজীবন সেই ডাঙ্গা খুঁজে বেড়িয়েছেন। সামান্য আশ্রয়, প্রেম। বিশ্বাসহীনতায় বেঁচে থাকতে কখনও চাননি। অথচ সংশয় সন্দেহ এবং এক অশুভ প্রভাব যেন কি করে এই এক মহাজীবনে এসে যায়। মনে হয় তিনি এবং তাঁর অস্তিত্ব এক মহামায়ায়, শেষ নেই যার। কোনো অলৌকিক জলযানের মতো নিরুদ্দিষ্ট যাত্রা। অথচ পাশেই আছে জীবনপ্রবাহ—কি তাজা আর খাঁটি! তবু জেনেও তাঁর কেন এখন চোখ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। মনে পড়ে যাবেন ভেবে তিনি উপরে উঠে যাচ্ছেন। একাকী তিনি দাঁড়িয়ে হাউ হাউ করে এভাবে তিনি কার জন্য কাঁদছেন। বুক থেকে কেন সেই অমোঘ বাণী জোরে উঠে আসছে না—কেন জোরে জোরে গাইতে পারছেন না, লোর্ড হ্যালেলুজা, আই এ্যাম অন মাই ওয়ে। অস্ফুট গলায় তবু তিনি কোনোরকমে গাইলেন, গ্লোরি হ্যালেলুজা—আই এ্যাম অন মাই ওয়ে। কেউ দেখছে না, স্যালি হিগিনস অন্ধকার সমুদ্রে ভাঙ্গা জাহাজ-ডেকে দাঁড়িয়ে গাইছেন চোখে অশ্রুপাত—এ করুণ আর অসহনীয় এই শেষ সমুদ্রযাত্রা। তাঁকে সব ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। তিনি তবু সব কিছু তুচ্ছ করে হাঁকলেন, এলিস আমি ক্যাপ্টেন স্যালি হিগিনস বলছি শুনতে পাচ্ছ! এলিস এ-আমাদের শেষ পর্যন্ত কোথায় নিয়ে এলে! কি চাও তুমি! কি চাই তোমার! এলিস, ভগবানের দোহাই, সবার অশুভ প্রভাব থেকে বনিকে বাঁচাও। আমি আর কিছু চাই না এলিস। পৃথিবীতে আমার আর কিছু চাইবার নেই।

গমগম করে সেই অসীম অজানা সমুদ্রে স্যালি হিগিনসের কণ্ঠস্বর ভেসে যাচ্ছিল। দূরদিগন্তে নীহারিকালোকে যেন তিনি তাঁর শেষ বার্তা পৌঁছে দিচ্ছেন। ছোটবাবু, বনি, সারেং বুঝতে পারছিল না স্যালি হিগিনস কোথায় দাঁড়িয়ে এভাবে পাগলের মতো চিৎকার করছেন। ওরা লম্ফ নিয়ে জাহাজ-ডেকে ছুটোছুটি করছে। কোথায় তিনি! বোট-ডেকে নেই, আফটার-পিকে নেই, কেবিনে নেই। শুধু কিছু অস্পষ্ট চিৎকার জাহাজের কোনো দিক থেকে যেন উঠছে। সমুদ্রে ডুবে যাবার আগে যেভাবে একজন আর্ত মানুষ দুহাত তুলে চিৎকার করতে থাকে—স্যালি হিগিনস তেমনি এক মহামান আর্তনাদে ভেঙে পড়ছেন। ছোটবাবু তাঁকে শেষ পর্যন্ত ফরোয়ার্ড-পিকে খুঁজে পেল। উইন্ড-সেলের আড়ালে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। সেই শান্ত মুখ আর নেই। পরনে সোনালি রঙের বাটের পোশাক। একজন সন্ত মানুষের মতো দাঁড়িয়ে সমুদ্রের সঙ্গে চিৎকার করে কথা বলছেন—যেন কোনো রমণীর চেয়েও বেশি রহস্যময়ী সমুদ্রকে তাঁর জীবনের সুখ দুঃখ হতাশার কথা শোনাচ্ছেন। জ্যোৎস্না রাতে সমুদ্রের ভয়ংকর নির্জনতার ভেতর বনি বাবার বুকে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল। বলল, বাবা কি হয়েছে তোমার! কি হয়েছে বল! এমন করছ কেন? এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে কাকে কি বলছ! কি কথা বল না কেন! আমরা কি সত্যি আর ফিরে যেতে পারব না!

স্যালি হিগিনস শান্ত কণ্ঠে শুধু বললেন হুই তো জানিস আমার মাঝে মাঝে এমন হয়। তুই ঘাবড়ে গেলে চলবে কেন! খুব আদর করে মেয়ের কপালে চুমো খেলেন। তারপর লজ্জায় যেন মুখ লুকিয়ে ফেললেন বনির চুলের ভেতর। কি তাজা ঘ্রাণ চুলে। এমন একটা ছেলেমানুষী করে তিনি যেন আর লজ্জায় মুখ তুলতে চাইছেন না। কাউকে আর মুখ দেখাতে চাইছেন না।

বাপ মেয়ে পৃথিবীর যাবতীয় সুখ দুঃখ ভুলে গেছে বুঝি। ওরা পরস্পর কি নিবিড় স্নেহ মমতায় পরস্পরকে জড়িয়ে রেখেছে। ছোটবাবুর কেন জানি বুক বেয়ে এই দৃশ্য মানুষটির জন্য কান্না উঠে আসছিল। হাঁটু গেড়ে প্রায় কোনো মধ্যযুগীয় নাইটদের মতো তার বলার ইচ্ছে হচ্ছিল, আপনি আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেন। তারপর সেই নাটকীয় শব্দগুলো তার কানে প্রায় ভেসে আসছিল স্যার সমুদ্র আর ঈশ্বরের নামে শপথ করছি। যেন তরবারি থাকলে সে এক্ষুনি মাথার ওপরে দুলিয়ে অশুভ প্রভাব জাহাজের কেটে কেটে ফালা ফালা করে দিত। কোনো প্রাচীন ঐতিহাসিক যুবার মতো এই জ্যোৎস্না রাত, নির্জন সমুদ্র, কাঠের ক্রস আর আকাশের অন্তহীন নক্ষত্রমালা ছুঁয়ে ওর শপথ নিতে ইচ্ছে করছিল—আমি আছি, আমি থাকব। আমি কোনো পাপ কাজ করব না। কোনো অশুভ প্রভাব বনিকে পড়ে যেতে দেব না।

সারেং-সাব দেখলেন, ছোটবাবু জ্যোৎস্নায় শুধু সমুদ্র দেখছে। একটা কথা বলছে না। তিনি হিগিনসকে বললেন সাব অনেক রাত হয়েছে।

ওরা তারপর নিঃশব্দে নেমে আসছিল ডেকে। বোট-ডেকে যে যার মতো উঠে গেল। কেউ কোনো কথা বলল না। বোট-ডেকে এখন সবাই থাকে বলে, ক্যাপ্টেন তাঁর কেবিনে, বনি নিজের কেবিনে এবং সারেং-সাব খোলা ডেকে শুয়ে পড়লেন। ছোটবাবু শুয়ে থাকল ও-পাশের বয়-কেবিনে। আর মধ্যরাতে মনে হল তার, কেউ ডাকছে। পোর্ট-হোলে দাঁড়িয়ে ডাকছে। বনির কথা ভেবে কি করবে বুঝতে পারছিল না। কিন্তু চোখ মেলে সে দেখল—পোর্ট-হোল থেকে টর্চের ফোকাস আসছে—সে বলল, বনি তুমি আমাকে পাগল করে দেবে দেখছি। আর তখনই সামান্য জোরে কথা বলছে কেউ। বনির গলা মনে হল না। ক্যাপ্টেন পোর্টহোলে দাঁড়িয়ে ডাকছেন—স্যালি হিগিনস বলছি ছোটবাবু। শিগগির ওঠো। চেঁচামেচি করবে না। ভারি সন্তর্পণে কথা বলছেন।

দরজা খুলে ছোটবাবু বের হয়ে এল। হিগিনস আর একটা কথা বললেন না। সিঁড়ির নিচে সে দেখল, সারেং-সাব দাঁড়িয়ে আছেন। সমুদ্রে তেমনি ছলছল কলকল শব্দ। ঢেউ-এর ওপর জ্যোৎস্না পিছলে যাচ্ছে। দূরে নদীর পাড় ভেঙে পড়ার মতো সহসা সব ভারি শব্দ উঠছে। হিগিনস তখন বলছেন—ভয় পাবে না। বোধ হয় কোনো বড় তিমি-মাছ দূরে কোথাও ডুবছে ভাসছে। —এস। এবং ওরা তিনজন এভাবে সেই কার্পেন্টারের ঘরের দিকে এগোতে থাকলে ছোটবাবু বলল বনি জেগে গেলে ভয় পাবে স্যার। ওকে একা এভাবে ওপরে রেখে আমাদের ঠিক নিচে নামা উচিত হবে না।

স্যালি হিগিনস বললেন, ওপরে অসুবিধা আছে ছোটবাবু।

—কোনো অসুবিধা হবে না। আপনি আসুন। আমরা বরং বোট-ডেকের নিচে বসি। বনি ডাকলেই সাড়া দিতে পারব।

হিগিনস বললেন, বনি জেগে গেলে সব টের পাবে।

—চাচা ওপরে থাকবে তিনি আমাদের খবর দেবেন।

স্যালি হিগিনস যেন নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচলেন। বনির জন্য পৃথিবীতে আর একজন তাঁর চেয়ে কম দুর্ভাবনায় থাকে না। তাঁর ভীষণ ভাল লাগল। তিনি প্রায় ভেতরে পুলক বোধ করলেন। এবং সেই ছেলেমানুষের মতো পুলকে প্রায় শিস দিতে যাচ্ছিলেন। তখন ছোটবাবু বলল, স্যার আপনার কেবিনেও আমরা বসতে পারি।

স্যালি হিগিনস দাঁড়িয়ে গেলেন। ছোটবাবু এবং সারেও দাঁড়িয়ে গেল। ওদের ছায়া স্থির। এবং মনে হচ্ছে জাহাজটাকে বাতাসে সামান্য ভাসিয়ে নিচ্ছে। বাতাস কি সমুদ্রস্রোত ওরা বুঝতে পারছে না। তবু এই মধ্যরাত্রে মনে হচ্ছে জাহাজটা যেন নিয়ত চলছে।

স্যালি হিগিনস বললেন, খুব সাবধানে।

ওরা এবার প্রায় চুপি চুপি উঠে যাচ্ছিল। যাবার সময় টর্চ মেরে ছোটবাবু দেখেছে বনি সাদা চাদর গায়ে ঘুমিয়ে আছে। নীলাভ চুলে ওর মুখ প্রায় ঢাকা। এবং সুন্দর স্তন এই প্রথম সে বুঝতে

পারল ভীষণ ভারি হয়ে উঠেছে। বোধহয় ওর শরীরে রাতের পোশাকও নেই। ছোটবাবুর মাথা ঝিমঝিম করছে।

স্যালি হিগিনস ওপরে দাঁড়িয়ে আছেন। ছোটবাবুর দেরি দেখে বললেন, দ্যাখো তো সারেঙ ছোটবাবু কি করছে।

সারেঙ ঘুরে ও-পাশে নেমে গেলেই ছোটবাবু সতর্ক হয়ে গেল। টর্চের আলো নিভিয়ে দিল। বলল, ঘুমোচ্ছে। বাঁচা গেল। সিঁড়িতে ওঠার মুখে খুব আস্তে বলল স্যার বনি অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আমরা নিশ্চিন্তে এখন বসতে পারি।

স্যালি হিগিনস এবার লম্ফ জ্বালিয়ে দিলেন। একটা বড় নীল রঙের চার্ট বের করলেন পকেট থেকে। সাদা সব দাগ। সেই দাগগুলো বড় একটা কাগজে সোজা কেটে বললেন, ছোটবাবু এদিকে এসে তুমি বোস। তুমি দাঁড়িয়ে থাকলে কেন। বোস।

সারেঙ-সাব বললেন, সাব ঠিক আছে।

ছোটবাবু টেবিলে ঝুঁকে আছে। হিগিনস ঝুঁকে আছেন। তিনি বললেন, ছোটবাবু কাল তোমাদের বোট দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তার আগে সব বুঝে নাও।

—জাহাজে আমরা থাকছি না তবে?

—তোমরা থাকছ না।

—আপনি কি বলছেন।

হিগিনস সহসা ক্ষিপ্ত গলায় বললেন, চেঁচাবে না। বনি ঘুমোচ্ছে। মাঝে মাঝে তোমার হাব-ভাব আমার একদম ভাল লাগে না ছোটবাবু। তুমি চেঁচাবে আমি জানতাম। এ-জন্য নিচে নেমে যেতে চেয়েছিলাম।

ছোটবাবু বলল, কিন্তু স্যার।

—আগে আমার কথা শেষ করতে দাও। আমার বলা শেষ হলে বলবে। কতদিন বলেছি কথার মাঝে কিছু বলবে না। আগে শুনবে তারপর বলবে।

ছোটবাবু বসে পড়ল।

ছোটবাবু, তুমি ভয় পাচ্ছ। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন।

ছোটবাবু বলল, স্যার আস্তে। বনি ঘুমোচ্ছে।

হিগিন্স বসে পড়লেন। তারপর কপাল টিপতে থাকলেন। মাথা ধরেছে বুঝি। এবং চোখের নিচে কালি পড়ে গেছে। তিনি যেন কতদিন না ঘুমিয়ে আছেন।

ছোটবাবু বলল, বোটে আমরা কে কে থাকছি?

—বনি এবং তুমি।

—আপনারা?

—আমরা জাহাজে থেকে যাচ্ছি।

—সবাই নেমে গেলে হত না।

—এই রাসকেল, জাহাজটা তোমার না আমার। জাহাজের কাপ্তান তুমি না আমি। কে নামবে, কে নামবে না তুমি বলবে, না আমি বলব।

ছোটবাবুর এটা ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে বুড়ো অহেতুক রেগে যায়। ভাল কথা বললেও রেগে যায়। কেমন দিশেহারা মানুষের মতো তখন আবোল-তাবোল বলতে থাকে। সে আর একটা কথা বলল না।

আর হঠাৎ কি যে হয়ে যায় হিগিনসের। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, সারেঙ, তুমি ওপরে থাক। আমরা নিচে যাচ্ছি। বনি জেগে গেলে বলবে, আমরা স্টোর-রুমে আছি। তিনি প্রায় দ্রুতগতিতে এবার নেমে যেতে থাকলেন। ছোটবাবুকে একবার বললেনও না, তুমি আমার সঙ্গে এস। অথচ ছোটবাবু প্রায় লেজ তুলে বুড়ো মানুষটার পেছনে ছুটছে।

সিঁড়ি ধরে নিচে নামার সময় ওপরে টর্চ মেরে বললেন, কি পায়ে জোর পাচ্ছ না? খুব জোয়ান। একটা বুড়ো মানুষের ঘাড়ে চেপে থাকতে খুব ভাল লাগছে।

ছোটবাবু বলল, স্যার সমুদ্রের আমি কিছু জানি না।

হিগিনস বললেন, কেউ জানে না। সবাই বড় বড় কথা বলে। সমুদ্রকে জানা বুঝি ইয়ার্কি। বলে লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন নিচে। তারপর হাত নেড়ে অন্ধকারে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ছোটবাবু বলল, স্যার টর্চ জ্বালুন। কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তিনি ফস করে দেশলাই জ্বালিয়ে লম্ফ খুঁজে বের কর-

জেনে। ওটা জেনেছে, দেয়ালে টাঙিয়ে দিয়েছেন। প্রায় খাদের নিচে এখন দুজন মানুষ। দুজন যতই চেঁচামেচি করুক, কেউ টের পাবে না। দুজন মানুষ আর দুটো ছায়া যতক্ষণ থাকবে, ছোটবাবুর ভয় থাকবে না। কারণ, একটা হয়ে গেলেই বুঝতে পারবে হিগিনসের কোনো ছায়া নেই। জাহাজে হিগিনস তবে সত্যি আস্ত শয়তান। জাহাজটার সবই ভুতুড়ে। প্রোপেলারে ফেলে ছোটবাবুকে রেখে দিয়েছে হিগিনস। সে সব সময় হিগিনসের চেয়ে তার ছায়ার প্রতি নজর রাখছিল।

হিগিনস বড় একটা কাঠের বোর্ডে পেরেক পুঁতে দিচ্ছেন। আর অজস্র কথা, ছোটবাবু সমুদ্রে অগ্নিকাণ্ড দেখলে নিজের চোখে দেখেছ। কি কথা বলছ না কেন? আরে আমি মানুষ। শয়তান নই। তোমার চোখ এমন হয়ে যাচ্ছে কেন?

—স্যার বলুন। আমি শুনছি।

—কী মনে হয়েছে। জাহাজ ডুবি ভুতুড়ে ব্যাপার—এমেরিকান অয়েল-ট্যাংকার ভূত সেজে ভয় দেখাচ্ছে। কিছু না। কোথায় কি প্রাকৃতিক কারণে, ঈশ্বরের ইচ্ছেয় কি হচ্ছে আমরা জানি না। আমরা নানাভাবে তাকে বিশ্বাস করতে ভালবাসি। কিছু অবিশ্বাস্য দেখলে ভুতুড়ে ভাবি। বাজে কথা। সব বাজে কথা।

ছোটবাবু কি বলতে যাচ্ছিল, তিনি থামিয়ে দিয়ে বললেন, শেষ করতে দাও।

তিনি এবার লম্ফের আলোতে চার্টের মাথায় কি দেখালেন। কাছে এস। দূরে দাঁড়িয়ে তুমি কি দেখবে। এই দ্যাখো, যদি তুমি সোজা নব্বই ডিগ্রি বরাবর উঠে যাও মনে রাখবে পালে বাতাস পাবে দক্ষিণ-পূবে আয়নবায়ুর। তোমার হাল ঠিক থাকলে, যে কোনো দিকে বোটের মুখ ঘুরিয়ে দিতে পার—একমাত্র সাউথ-ইস্ট বাদে সব দিকে। জুন মাসের এখন মাঝামাঝি সময়। তুমি জুলাই অবধি এই বায়ুপ্রবাহ মনে রাখবে। বাতাস উঠলেই পাল খুলে দেবে। আর সব সময় কম্পাসের কাঁটা নব্বই ডিগ্রি বরাবর। পাঁচ-সাতশ' মাইলের ভেতর তুমি দুটো দ্বীপ দুপাশে পাচ্ছ, যদি কোনো কারণে ভুল, ভুল হওয়া স্বাভাবিক, বরং ঠিক ঠিক উঠে যাওয়া কঠিন, তবে দুটো দ্বীপের ফাঁকে আরও ওপরে চলে যাচ্ছ মনে রাখবে। প্রায় তিনশো তেত্রিশ-চৌত্রিশ হবে, দূরত্ব, এলিস দ্বীপ, এ-দ্বীপগুলোতে সব পলিনেশিয়ানদের বাস। এছাড়া আশেপাশে অজস্র দ্বীপ আছে ভয় পাবে না। হাতে দেড়-দুমাস সময়। বায়ুপ্রবাহ তোমার অনুকূলে। যা খাবার আছে, যদি আধপেটা খাও মাস চালিয়ে দিতে পারবে। জল যতটা দরকার নেবে। সব ফুরিয়ে গেলে ঘাবড়ে যাবে না। সামুদ্রিক সব মাছ দেখবে ঘরে বেড়াচ্ছে একটা তুলে একটু ঝলসে খেয়ে নেবে। আর যদি দ্যাখো ঝড়ে পড়ে গেছে বোট—সি এংকোর ফেলে দেবে সামনে। ছোটবাবু মনে রাখবে—ইউ হ্যাভ এ গুড সোল। জল, খাবার ফুরিয়ে গেলে মরীচিকা দেখবে সব অদ্ভুত রকমের, ভয় পাবে না। দেন প্রেজ দ্য লর্ড। হি ইজ দ্য গ্লোরি অফ হিজ পিপল, প্রেইজ হিম। তারপর তিনি বললেন, ইয়াং ম্যান লিসেন টু মি এজ ইউ উড টু য়োর ফাদার। লিসেন, এ্যান্ড গ্রো ওয়াইজ, ফর আই স্পিক দ্য ট্রুথ। ডোন্ট টার্ন এওয়ে।

ছোটবাবু ওঁর কথা শুনতে শুনতে কেমন আবিষ্ট হয়ে গেছে। সে দেখছে স্যালি হিগিনস তার মাথার ওপরে হাত রেখে যেন দাঁড়িয়ে আছেন। পৃথিবীতে, এই জাহাজ, বনি, স্যারেঙ-সাব এবং বুড়ো মানুষটা বাদে আর কোনো তার অস্তিত্ব আছে—সে ছোটবাবু নয়, সে অতীশ দীপঙ্কর দেবশর্মণঃ, সে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ দেবশর্মণঃ নামক ব্যক্তির জাতক—মা তার দরজায় রাতে শব্দ হলে জেগে যায় আর মনে করতে পারছে না।

তিনি ফের বলছেন, লিসেন টু মি, মাই সান। লার্ন টু বি ওয়াইজ। ডেভেলাপ গুড জাজমেন্ট এ্যান্ড কমনসেন্স। সমুদ্র তোমাকে অযথা তবে ভয় দেখাতে পারবে না।

তিনি এবার ঘুরে দাঁড়ালেন—ছোটবাবু এবার দেখতে পাচ্ছে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন পেছন ফিরে। সে তাঁর মুখ দেখতে পাচ্ছে না। তিনি কি পেছন ফিরে কাঁদছেন। তিনি তাঁর সব সাহস হারিয়ে ফেলেছেন। সে তাঁর সাহস ফিরিয়ে আনার জন্য কিভাবে যে কি করবে বুঝতে পারছে না। ভেতরে ছটফট করছে। এবং লম্ফের আলোতে অতীব অস্পষ্ট এক করুণ অপার্থিব অভিজ্ঞতা। সে কেমন স্থির গলায় তখন স্যালি হিগিনসকে ঈশ্বরের কথা বলে যাচ্ছে। নিজেকে সে বিশ্বাস করতে পারছে না—সে এভাবে বলতে পারে বিশ্বাস করতে পারছে না—সে বলছিল স্যার, উই লিভ উইদিন দ্য শ্যাডো অফ দ্য অলমাইটি, শেলটারড বাই দ্য গড হু ইজ এভার আল গডস। তবে আমরা ভয় পাব কেন। যেখানেই যাই, তাঁর কাছেই আমরা থাকব।

আর তখন হিগিনস প্রায় ঈশ্বরের নামে অশ্রুপাতের মতো ছোটবাবুকে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি চিৎকার করে বলতে থাকলেন—সব বাইবেলের কথা। তুমি জানলে কি করে। বলেই কেমন শান্ত গলায় বললেন, তোমাদের নিশ্চিন্তে বোটে নামিয়ে দিতে পারতাম—আমার বিশ্বাস ছিল, কেউ তোমাদের অনিষ্ট করতে পারবে না। কেউ না। কিন্তু ছোটবাবু, আর্চিকে তুমি খুন করেছ। তিনি তোমাকে ক্ষমা করবেন না। আর তারপরই ঘুরে ঘুরে প্রায় জাহাজডুবির গল্প যেন বলে যাচ্ছেন—সমুদ্রে অতীব মায়ায় পড়ে গেলে মরীচিকা প্রায়, তেষ্টায় যখন বুক ফেটে যাবে, মাঝে মাঝে সমুদ্রে ডুবে স্নান করে নিতে পার ছোটবাবু। ঘামে যা নুন বের হয়ে যাবে, শরীর ঠাণ্ডা হলে তা লাঘব হবে। সামান্য লোনা জল খেয়ে ফেলতে পার। তারপরও দেখবে তৃষ্ণা যাচ্ছে না। চোখ বসে যাচ্ছে, গলা শক্ত হয়ে যাচ্ছে কাঠের মতো। তখন যদি পায় কোনো মাছ শিকার করে য়ো ক্যান সাক হার ব্লাড। এবং মনে রাখবে যা হয়ে থাকে, তখন মানুষ দিকবিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে যায়, সে পাশের লোকটির ওপর ঝাঁপিয়ে তার গলা কামড়ে ধরে। তুমি বনিকে অনায়াসে ধরতে পার। তুমি তাহলে বেঁচে যাবে।

ছোটবাবু বুঝতে পারছিল মাথা ঠিক রাখতে পারছেন না তিনি। মাঝে মাঝে ছোটবাবুকে ভীষণ অবিশ্বাস করছেন। তিনি তবে জানেন, তিনি জানেন সে আর্চিকে খুন করেছে। সে কিন্তু কোনো

পাপ কাজ করেছে বলে মনে করতে পারে না। একটা হত্যাকাণ্ড—এটা সে কেন যে বুঝতে পারে না, শ্বাসরোধ করে মারা হত্যাকাণ্ডের সামিল। অথচ বার বার সে আর্চির মুখ সামান্য কীট-পতঙ্গের মতো দেখেছে। নির্বোধ, অর্থহীন, যাদের চোখে যে মায়া থাকে, তাও পর্যন্ত ছিল না। সে কোনো কীট-পতঙ্গ হত্যার মতো আর্চিকে হত্যা করেছে। হিগিনসের কথায় সে সামান্যতম ব্যাকুল বোধ করল না। বলল শুধু, একটা কথা আমার। যদি রাগ না করেন।

তিনি হাত উঁচিয়ে বললেন, নো। আমার এখনও শেষ হয়নি। সব খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেছ আশা করি। আর একটা কথা। খাবার ফুরিয়ে গেলে সমুদ্রে প্ল্যাংকটন পাবে। ছাঁকনি দিয়ে তুলে নেবে। শ্যাওলার মতো সবুজ। সঙ্গে কুচোচিংড়ির মতো জেলি ফিস থাকবে। সব অণুর মতো। ওগুলো বেছে নেবে। খেতে খুব খারাপ লাগবে না। খাওয়ার অভ্যাস হয়ে গেলে দেখবে, সমুদ্রে তোমার জল এবং খাবার না হলেও চলবে। যতদিন বোট ভেসে থাকবে, তোমরা ততদিন বেঁচে থাকতে পারবে।

ছোটবাবু আবার হাত তুলে কিছু বলতে চাইলে তিনি বললেন—নো। আর কোনো কথা না। তুমি কি বলবে আমি জানি। তুমি আমাকে নিয়ে নামতে চাইবে। সারেঙকে আমি সব খুলে বলেছি। সে আমাকে ছেড়ে যেতে চাইছে না। সেই এক অহংকার। জাহাজটাকে সমুদ্রে ফেলে ডাঙার ফিরে গেলে লোকে হাসাহাসি করবে। বুঝতে পারছ না জাহাজ না নিয়ে আমাদের বন্দরে যাবার নিয়ম নেই। আর সেই বা কি ভাববে?

তারপর তিনি থেমে থেমে বলতে থাকলেন—সিওল-ব্যাঙ্ক আমাকে ছেড়ে দেবে না। আমি সঙ্গে থাকলে সব অশুভ প্রভাব তোমাদের বোটে উঠে যাবে। আমাকে কেউ ছেড়ে দেবে না। সিওল-ব্যাঙ্ক, এলিস, ক্যাপ্টেন লুকেনার এতদিন সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। ওদের হাতে সুযোগ এসে গেছে। সিওল-ব্যাঙ্ক আমার ওপর তার সব বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। সেও আর আমার বিশ্বাসের সম্মান রাখেনি। জাহাজ বিক্রিবাটার কাগজপত্রে আমি সই করেছি। নেমকহারাম আমি।

ছোটবাবু আবার কিছু বলার চেষ্টা করলে চিৎকার করে উঠলেন—যা বলছি শোনো। এটা সেই সমুদ্র, সেই আকাশ, সেই নক্ষত্রমালা যার নিচে এলিসকে আমি হত্যা করেছিলাম ছোটবাবু। এলিস মৃত্যুর পর আমাকে কোথাও ছেড়ে যায়নি। মাঝে মাঝে আমি ওকে দেখতে পেতাম ছোটবাবু। এখন আমার পাশে সেও নেই। তাকে আর দেখতে পাচ্ছি না। সে আমাদের ঠিক তার জায়গায় টেনে এনেছে।

কথা বলতে বলতে হিগিনস কেমন ম্রিয়মাণ হয়ে যাচ্ছেন। করুণ চোখ-মুখ। ভীতু মানুষের মতো ছোটবাবুর দিকে অপলক তাকিয়ে আছেন। আর যেন প্রায় স্বীকারোক্তির মতো তিনি সব বলে যাচ্ছেন। লম্ফটা তেমনি দপদপ করে জ্বলছে।—বুঝলে ছোটবাবু, এলিস আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী। বনি আমার দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান। স্বাভাবিক কারণেই বনির ওপর তার আক্রোশ। এতদিনে বুঝতে পারছি—সে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। সকালে দেখতে পাবে সামান্য একখণ্ড জমি সমুদ্রে দ্বীপের মতো। ওপরে ক্রস। প্রবাল দ্বীপে হয়তো পলি পড়ে পড়ে ক্রসটা আরও মাথার ওপরে উঠে এসেছে। আমার কেন জানি মনে হয় এলিস শুয়ে আছে তার নিচে। মমির মতো শরীর। সারাক্ষণ সমুদ্র তার ওপর আছড়ে পড়ছে। তুমি ভুল দ্যাখোনি। আমিও না। তারপর মুখ নামিয়ে নিলো। আর একটা কথাও বলছেন না।

ছোটবাবুর মনে হল তিনি আর কথা বলবেন না। সে এগিয়ে গেল। এবং ডাকল, স্যার...! তিনি কেমন স্থির আর অস্বাভাবিক রকমের ঠান্ডা।

—আর কথা না ছোটবাবু। কি বলে তিনি লম্ফটা হাতে নিলেন। চার্ট তিনি ছিঁড়ে ফেললেন। এবং সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় সহসা থমকে দাঁড়ালেন। ছোটবাবু বলল, কি হল স্যার?

—বনি জানবে না। বনি জানবে না, তোমাদের সমুদ্রে আমরা ভাসিয়ে দিচ্ছি। তোমরা, কাছে কোথাও ডাঙা আছে সেখানে যাচ্ছ। দু-একদিনের ভেতর লোকালয় পেয়ে যাবে—আমরা আছি জাহাজে। ডাঙা পেয়ে গেলে খবরাখবর পৃথিবীতে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করা হবে। তারপর রেসকিউ—আমরাও ফিরে যাচ্ছি তখন। ঘুম থেকে উঠে বনি চোখ-মুখ দেখে যেন টের পায় আমরা ভাল আছি। আমরা বেঁচে আছি। কারো চোখে-মুখে মরা মানুষের ছবি দেখতে চাই না ছোটবাবু। তারপর ওপরে উঠে যেতে যেতে বললেন, আমার সামনে বনি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মরে যাবে—আর আমি ভাবতে পারছি না ছোটবাবু। আশা করি তুমি ওকে ঠিক পৌঁছে দেবে। তাকে কোনো কষ্ট দেবে না। বলতে বলতে ছোটবাবুর দু' হাত জড়িয়ে ধরলেন। মুখ তাঁর অন্য দিকে। ছোটবাবু বুঝতে পারল, তিনি এখন বালকের মতো কাঁদছেন।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

কবি সুরদাস সম্পর্কে সোভিয়েত গবেষকের রচনা

মস্কো রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশন বিভাগ সম্প্রতি ষোড়শ শতাব্দীর ভারতীয় কবি ভক্ত সুরদাস সম্পর্কে একটি মূল্যবান রচনা প্রকাশ করেছেন। এ বইয়ের রচয়িত্রী নাটালিয়া সাজানোভা। তিনি মস্কো রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সহকারী অধ্যাপিকা। সোভিয়েত ভারততত্ত্ব বিশারদগণের মধ্যে অধ্যাপিকা সাজানোভাই প্রথম যিনি ধর্মীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামের সঙ্গে জড়িত ভারতের বহু মন্দির মঠ আশ্রম নৈষ্ঠিক ভক্ত ও তীর্থযাত্রীদের মতো পায়ে হেঁটে দেখতে গিয়েছিলেন। মথুরা, বৃন্দাবন, বারাণসী এবং রাজস্থান ও হিমাচলের পাদদেশের বহু অঞ্চল তিনি ঘুরে ঘুরে প্রত্যক্ষ করেছেন। ব্রজভূমির বহু ব্যক্তির ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে উপকরণ ও তথ্য সংগ্রহ করেছেন, বহু পণ্ডিতজনের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন এবং তারপর নিজের সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

অধ্যাপিকা সাজানোভার বইখানি দুই পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে 'সুরসাগর' কাব্যের ধারাবাহিক বিশ্লেষণ ও দ্বিতীয় পর্বে ঐ কাব্যের নির্বাচিত অংশের অনুবাদ বিধৃত। অধ্যাপিকা সাজানোভা তাঁর আলোচনায় কবির রচনা ও তাঁর জীবন সম্পর্কে সমস্ত প্রধান রচনাগুলির পর্যালোচনার পরে কবি সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মত ও ধারণা প্রাঞ্জলভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। হিন্দী সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে কবি সুরদাসের নিজস্ব স্থানটি কোথায় এবং তাঁর অবদানের যথার্থ মূল্য যে কি সে সম্পর্কে অধ্যাপিকা তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্তের কথা ব্যক্ত করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর ভারতের সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক ভাবধারার বহুবিচিত্র লক্ষণগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতিস্বরূপে ভক্তিপথে মুক্তির যে উপায় মানুষ খুঁজে পেয়েছিল তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এ বইতে পাওয়া যাবে। লেখিকা বলেছেন: সে যুগের কবিরা লোক-কথা ও কাহিনী এবং লোকসংগীতের সংগ্রহ উপাদান হিসেবে গণ্য করেই তাঁদের রচনায় প্রবৃত্ত হতেন। তাই দেখা যায় সে-যুগের কাব্যে জনগণের ভাষার (অর্থাৎ ব্রজবুলি) স্বাভাবিক প্রভাব।

বহু ভারতীয় লেখক ও সমালোচক সুরদাসের জীবন পর্যালোচনা করেছেন। তবু এ সম্পর্কে কোনও সাধারণভাবে স্বীকৃত তথ্য পাওয়া কঠিন। যেমন সুরদাস জন্মান্ধ ছিলেন কিনা—এ প্রশ্নটি। কেউ বলেন সুরদাস জন্মান্ধ ছিলেন কেউ বলেন—না। এ সম্পর্কে অধ্যাপিকা সাজানোভা বলেন সুরসাগর বিশ্লেষণ করলে লোকনৃত্যের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, বহুবর্ণের যে সমস্ত পোশাক-আশাকের পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকে এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিসংগত যে সুরদাস অবশ্যই ব্রজভূমির গ্রামাঞ্চলের গো-পালকগণের নৃত্যগীত প্রথম জীবনে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তারপর পরবর্তী জীবনে অন্ধ হয়ে পড়লে তিনি স্মৃতিচারণ করে পূর্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগান। আজকের দিনে সুরসাগর-এর বিভিন্ন সংস্করণ দেখা যায়, যার কোন কোনটিতে শ্লোকের সংখ্যা কয়েক হাজার। অধ্যাপিকা সাজানোভা কিন্তু মনে করেন যে খাঁটি সুরদাসী শ্লোকের সংখ্যা কোনমতেই এক হাজারের বেশী হতে পারে না। এ মতের সঙ্গে হয়ত অনেকেই একমত হবেন না—কিন্তু তাতে সামগ্রিকভাবে তাঁর বইয়ের গুরুত্ব কিছুমাত্র কমে যায় না। অধ্যাপিকা সাজানোভা ভক্ত-কবি সুরদাসকে জনগণের কবি আখ্যা দিয়ে বলেছেন তাঁর কাব্য কেবল যে সমকালীন লোকসংগীতের ভাষা ও ছন্দকে নিজস্ব করে নিয়েছে তাই নয় সমসাময়িক দার্শনিক ভাবধারারও আশ্চর্য পরিচয় তাঁর কাব্যে পাওয়া যায়। তাই দেখা যায় ভক্ত-কবি সুরদাসের কাব্য মহাদার্শনিক বল্লভাচার্যের তত্ত্বদর্শন ও সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ভাবাদর্শ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার যোজক হিসেবে অমরত্বের অধিকারী করে তুলেছে।

বিভিন্ন যুগে এদেশে বিভিন্ন কবি কৃষ্ণকে তাঁদের কাব্য ও গীতির আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এ সম্বন্ধে তাবৎ রচনার মধ্যে ভক্তকবি সুরদাসের রচনা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এর কারণ কি? অধ্যাপিকা সাজানোভা বলছেন সুরদাসের কাব্য ও সংগীতের অসাধারণ জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-কল্পনায় তাঁর অনন্যসাধারণ প্রাণবন্ত ছন্দোরীতি ও ঈশ্বরিক বৈরাট্য সপ্রমাণের ঐকান্তিকতা। এ সব জিনিস স্বতঃই মনেপ্রাণে একটা অনির্বচনীয় প্রেরণা জাগায়। মানুষের জন্য নিবিড় প্রেম ও সহৃদয়তা এ কাব্যরীতির মূলে মন্ত্র।...জনতার কবি সুরদাসের কাব্যে স্বাভাবিকভাবেই মানবতাবাদ সম্প্রীতি ও আশাবাদ প্রাধান্য লাভ করেছিল।

চিরায়ত ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম প্রবক্তা ভক্তকবি সুরদাস সম্পর্কে এই ধরনের একখানি গ্রন্থ রচনার জন্য অধ্যাপিকা সাজানোভাকে আমরা শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

কবি ও সমালোচক মোহিতলাল স্মরণে

বিখ্যাত সাহিত্য সংস্থা অন্তরার উদ্যোগে সম্প্রতি কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের স্মরণে এক আলোচনা সভার অনুষ্ঠান হয়ে গেছে। মার্বেল প্যালেস-এ অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক শিল্পী ও সমালোচক উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন বক্তা মোহিতলালের জীবন তাঁর ব্যক্তিত্ব কাব্যশক্তি তথা সমালোচনার বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই সভায় আলোচনা করেন ও তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সমালোচনা-সাহিত্যে মোহিতলালের সৃজনধর্মিতা প্রসঙ্গে আলোচনা করেন অধ্যাপক বার্ণিক রায় ও সনাতন সেন। কবি দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় এক কাব্য-নিবন্ধে মোহিতলালের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি রমেশ চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে মোহিতলালের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের পরিচয়ের স্মৃতিচারণ করেন।

ভারতের প্রকাশন শিল্প ও তরুণ লেখক সম্প্রদায়ের সমস্যা

সম্প্রতি প্রকাশিত এক পরিসংখ্যানে জানা যায় যে সাড়ে পাঁচ কোটি সাক্ষরজনের

দেশ বৃটেনে গড়ে বৎসরে ৩০ হাজার বই প্রকাশিত হয়। আর বৃটেনের দশগুণ জনসংখ্যার দেশ ভারতবর্ষের প্রধান ষোলটি ভাষা মিলিয়ে গড়ে বৎসরে বৃটেনের অর্ধেক বইও আত্মপ্রকাশ করে না। এর থেকেই বোঝা যায় যে আমরা নিজেদের আত্মপ্রশংসায় যতোই মত্ত হই না কেন আসলে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন বৃটেনের তুলনায় অনেক অপরিণত। এ-দেশের ব্যাপক নিরক্ষরতার একটা কথা প্রসঙ্গতঃ উঠতে পারে। কিন্তু সে কথার গুরুত্ব মেনে নিয়েও বোধহয় এ-কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে আমাদের দেশের শিক্ষিত নরনারীদের মধ্যেও বই কিনে পড়বার অভ্যাস নিতান্তই কম। অফিস লাইব্রেরী বা পাড়ার লাইব্রেরী অথবা বিয়ে-পৈতে জন্মতিথি উপলক্ষে পাওয়া বইই সাধারণতঃ আমরা পড়ে পড়ার ক্ষুধা নিবারণ করে থাকি। শিক্ষিত সমাজের এই অভ্যাস এবং মনোভাব দেখেই খুব সম্ভবতঃ প্রকাশকগণ সুপ্রতিষ্ঠিত লেখকগণের রচনা ব্যতীত আর কারো কথা বিবেচনাই করেন না। ফলে দেখা যায় যে, তরুণ লেখক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক উদীয়মান এবং প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন লেখক তাঁদের রচনার পুস্তকাকারে মুদ্রিত রূপ সারা জীবনেও দেখতে পেলেন না। বহু তরুণ লেখক-লেখিকা আত্মপ্রকাশের একটুকু সুযোগের অভাবে ক্ষোভে দুঃখে ক্রোধে লেখাই ছেড়ে দিয়েছেন। এ রকম উদাহরণও আমাদের দেশে খুব বিরল নয়। বাল্য বা কৈশোরের নানা স্বপ্ন তরুণ বা যুবা বয়সে এই যে পরিণতি লাভ করে এটাই সাহিত্যের একটা উপাদান হতে পারে। এবং সত্যি কথা বলতে কি ভালো বা মন্দ যা হক লিখে চলেছেন লেখক কমবেশী নাতিক আছে এ রকম যে কোনো ব্যক্তি অনায়াসে পাঁচ-দশজনের নাম বলতে পারবেন যাঁরা লিখতে পারতেন এবং এক সময়ে লিখতেনও কিন্তু বর্তমানে লিখছেন না। অর্থাৎ স্বেচ্ছায় লেখা ছেড়ে দিয়েছেন লেখা প্রকাশের সুযোগ নেই বলে।

এতোদিন সাময়িক পত্রাদি এবং দৈনিক কাগজগুলির রবিবাসরীয়তে অনেক নতুন নতুন লেখক-লেখিকা তাঁদের নানা বিচিত্র সৃষ্টির মুদ্রিত রূপ দেখতে পেতেন। ইদানীং নিউজ প্রিন্ট সংকটের ফলে তার সম্ভাবনাও লুপ্তপ্রায়। তরুণ লেখক সম্প্রদায় তা হলে কি করবেন? কেউ যদি কন্টেস্টেন্টে কিছু টাকাকড়ি জোগাড় করে নিজের উদ্যমে একখানা বই ছাপানও সে সব বই সাধারণত বিক্রী করা এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকগণ ব্যতীত কারো পক্ষে বিপণনের বন্দোবস্ত করা কার্যতঃ সম্ভব হয় না। আমাদের দেশে সুলভে সদ্‌গ্রন্থ প্রকাশনার উদ্দেশ্যে সংগঠিত কয়েকটি সংস্থা আছে—যেমন ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, সাহিত্য আকাদেমী এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট এজেন্সিগুলি। কিন্তু এদের ক্যাটালগগুলিতেও দেখা যায় কেবল সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক-লেখিকাগণের নাম। তরুণ লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ জোগানোর দায়িত্ব এ'রাও কেউ বহন চান না। তা এই যদি অবস্থা হয় তা হলে এদেশের তরুণ লেখকদের ভবিষ্যৎ কি? প্রকাশন শিল্পেরই বা দশ বৎসর পরে কি দশা হবে ভাবা যায় কি? প্রত্যেক পেশাতেই 'নতুন রক্তের' প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব স্বীকার করা হয় এবং সেজন্য যত্নও নেওয়া হয়—ডাক্তারী, এঞ্জিনীয়ারিং, শিক্ষকতা, অধ্যাপনা, অভিনয় খেলাধুলো—সব পেশার ক্ষেত্রেই কথাটা সত্য। কেবল লেখকদের বেলায়ই এর ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। অবস্থাটার পরিবর্তন হওয়া দরকার। জাতীয় সংস্কৃতির স্বার্থেই এটা প্রয়োজন। এজন্য পত্র-পত্রিকার কর্তৃপক্ষ, সরকার প্রকাশন সংস্থা এবং সাধারণ শিক্ষিত মানুষ সকলেরই সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

প্রবীণ সাংবাদিক সত্যরঞ্জন বকসীর সম্বর্ধনা

আমাদের দেশের সাংবাদিক ইতিহাসে সত্যরঞ্জন বকসী সুপরিচিত নাম। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও বীর সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তাধারার জনপ্রিয়তা সৃষ্টি করা তাকে প্রচার করা ও জনমত গঠন করার জন্য শ্রীবকসীর কৃতিত্ব স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে সর্বসাধারণের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি লাভ করেছিল। দেশবন্ধুর 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার সম্পাদকরূপে তাঁর সম্পাদকীয় স্তম্ভগুলির সেযুগে বৃটিশ শাসককুল রীতিমতো ভয়ের চক্ষে দেখতো। স্বাধীনতার পরেও স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত নেশন পত্রিকার সম্পাদকরূপে তাঁর গঠনমূলক সমালোচনা জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সম্প্রতি 'সতীর্থ' সাহিত্যের বিপ্লবী কর্মিগণ শ্রীবকসীর অশীতিতম জন্মবার্ষিকী পালন করেছেন এক গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশে। এই উপলক্ষে তাঁকে খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি চাদর ও ৫০০১ টাকার একটি তোড়া উপহার দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে আমরাও শ্রীবকসীকে আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

নিঃ ভাঃ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন-এর আসাম অধিবেশনের আয়োজন

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন-এর গৌহাটি শাখার সাধারণ সম্পাদক মণীন্দ্র রায় জানিয়েছেন যে বার্ষিক ভিত্তিতে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসম্ভব আসাম রাজ্যে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। এ সম্পর্কে যোগাযোগের ঠিকানা : পরমেশ দাশগুপ্ত উজানবাজার গৌহাটি—৭।

—শ্রীজয়ংকার

লেখকের লেখক দস্তয়েভস্কি—যজ্ঞেশ্বর রায়। রামায়ণী প্রকাশ ভবন, ১০৬/১ আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলকাতা—৯। কুড়ি টাকা।

গোটা পৃথিবীর ইতিহাসে উনিশ শতক প্রাণ আত্মার উল্লাসের যুগ—বিস্তৃত সৃষ্টিশীলতার যুগ। এই যুগের প্রেক্ষিতে বিখ্যাত রুশ লেখক দস্তয়েভস্কির ষাট বছরের জীবন যেন একটা ক্রম-প্রবাহিত অন্ধকার ঝড়। দস্তয়েভস্কির সমকালে ইউরোপ সমগ্র রুশদেশে আলোড়িত বিক্ষুব্ধ ঝড়ে প্রচলিত জীবনের সংজ্ঞা, দর্শকের বহুদিন আচরিত বিশ্বাস ও শিল্পের গভীর প্রত্যয়ভূমি কেঁপে উঠেছে, ঠিক সেই সময়েই একটি ব্যক্তিজীবনও তার ব্যক্তিগত আচরণভূমি ও শিল্পের প্রত্যয়পিপাসায় ভয়ংকরভাবে নড়ে উঠেছে। সেইরকম একটি জীবনকে নিয়ে শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায় একটি প্রায়-পূর্ণাঙ্গ জীবনী গ্রন্থ বাংলা ভাষায় উপহার দিয়েছেন।

দস্তয়েভস্কি আজ চিরকালের লেখক, গোটা পৃথিবীর বহু বুদ্ধিমান সচেতন লেখকের তিনি আজ পিতা, প্রেরণাও। সুতরাং বাংলা ভাষায় তাঁর একটি সম্পূর্ণ জীবনী যুগোপযোগী ও সাহিত্যিক এবং সাহিত্যরসপিপাসুদের পক্ষে যথেষ্ট প্রয়োজনীয়। 'লেখকের লেখক দস্তয়েভস্কি' সেই প্রয়োজন মেটাবে। দস্তয়েভস্কি ফিওদর মিখাইলোভিচের জীবন, কর্মতৎপরতা সাহিত্যকর্ম, ব্যক্তিমনের উল্লাস ও বিষণ্ণতাকে চিত্রল বর্ণনায় উপস্থাপিত করতে গিয়ে আলোচ্য জীবনীকার মোট পাঁচটি পর্বে তাঁর আলোচনাকে ভাগ করেছেন। প্রথম পর্বে জন্মকাল থেকে গুপ্ত রাজনৈতিক দলে যোগদানের জন্য নির্বাসন প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় পর্বে সাইবেরিয়ার জেল থেকে প্রথম বিবাহ ঘটনা, তৃতীয় পর্বে 'ভ্রেমিয়া' পত্রিকা প্রকাশকাল থেকে তাঁর 'পাপ ও শাস্তি' গ্রন্থরচনার সংবাদদান, চতুর্থ পর্বে দ্বিতীয় স্ত্রী আন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও শেষ জীবনের উপন্যাস আলোচনা এবং পঞ্চম পর্বে 'লেখকের ডায়েরী' রচনা প্রসঙ্গ থেকে দস্তয়েভস্কির মৃত্যুঘটনা উল্লিখিত হয়েছে।

এমন কর্মবহুল গোয়েন্দাগল্পের মত রোমাঞ্চকর লেখক-জীবনকে যজ্ঞেশ্বরবাবু যেভাবে বর্ণনা করেছেন, যে কথাসাহিত্যের রীতিতে সাজিয়ে একটি বিরাট ব্যক্তিত্বের উত্থান-প্রসার-পতনের ট্র্যাজিক মহিমা চিহ্নিত করেছেন, তা বাস্তবিক অর্থেই প্রশংসনীয়।

লেখকের রচনাকালে নিশ্চয়ই হাতের কাছে ছিল দস্তয়েভস্কির ডায়েরী ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, দস্তয়েভস্কি সম্পর্কিত বিভিন্ন লেখক ও ইতিহাসকারের সংগৃহীত তথ্যাদি ও উদ্ধৃতি। আলোচ্য লেখক সেগুলি সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়েছেন। বহু জায়গায় দস্তয়েভস্কির চিঠিপত্র ও ডায়েরীর হুবহু বাংলা অনুবাদ জুড়ে দিয়েছেন, অনেক স্থলে দস্তয়েভস্কি সম্পর্কে তাঁর সমকাল ও উত্তরকালের লেখকরা কি ভেবেছেন, বলেছেন, তারও কখনো অনূদিত অংশ, কখনো ভাবানুবাদ বা ভাববস্তু সংযোজিত করেছেন, কিন্তু যেহেতু যজ্ঞেশ্বর রায় স্বয়ং একজন প্রতিষ্ঠিত ঔপন্যাসিক, সুতরাং তাঁর সংগৃহীত তথ্যাদি ও অনুবাদ ইত্যাদির একত্র সংযোজন কথাসাহিত্যিকের শিল্প-কৃতিত্বেরই পরিচয় দেয়। লেখকের নিষ্ঠা সততা ও বর্ণনাভঙ্গি এ গ্রন্থের মৌলিক কৃতিত্ব। দস্তয়েভস্কিকে এমন সহজগ্রাহ্য করা, সর্বজনগ্রাহ্য করা এবং সর্বোপরি বুদ্ধিমান যে কোন সংলেখকের অনুপ্রেরণা দেওয়ার মত করে পরিবেশন করার চেষ্টাটি অভিনন্দনযোগ্য।

রাশিয়ার সাহিত্যজগতে নানা বিশৃঙ্খলার মধ্যে রুশ-বাস্তববাদের বিকাশ ঘটে। আকসাকভ ও তুর্গেনিভ থেকে শেখভ এবং এমন কি গর্কি থেকে লেনিন পর্যন্ত রুশ-বাস্তববাদীদের বিকাশ আশ্চর্যজনক, স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। দস্তয়েভস্কি এই বাস্তববাদকে এক অন্ধকারের দর্পণে আলোকিত

গল্প উপন্যাসের লেখকরা নানা পরিবেশের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁদের লেখার উপাদান সংগ্রহ করেন। সেই অভিজ্ঞতার সঙ্গে অনেকখানি কল্পনা মেশে, লিপি-চাতুর্য মেশে। লেখক যদি নতুন হন, তাঁর পাণ্ডুলিপি পড়ে প্রকাশক তার বিক্রীর সম্ভাবনা আঁচ করে তবে ছাপার কাজে হাত দেন। আর লেখক যদি পুরনো বা নামী হন প্রকাশক চোখ-কান বুজেই সেটা গিলে বসে থাকেন, অর্থাৎ সোজা প্রেসে পাঠিয়ে দেন।

শেষোক্ত ধরনের বই ছেপে বেঁধে আর চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে বাজারে ছেড়ে দেওয়া ভিন্ন প্রকাশকের আর বিশেষ কিছু করার থাকে না। তারপর তাঁর ভাগ্য আর লেখকের ভাগ্য। গল্প উপন্যাস সম্পর্কে প্রায় সব দেশেই এই একই ধারা চলে আসছে।

কিন্তু আজকের সাহিত্য বলতে গেলে সৃষ্টির সব ক্ষেত্র বেষ্টন করে আছে। গল্প উপন্যাস ছাড়াও বিষয়গত অজস্ররকম চিত্তাকর্ষক বইয়ের একটা বিরাট বাজার গড়ে উঠেছে প্রায় সর্বত্র। এ-ধরনের বইয়ের আত্মপ্রকাশের সঙ্গে প্রকাশকেরও একটা বিরাট যোগ থাকা সম্ভব লেখকের মগজের চিন্তাটাই এ-ক্ষেত্রে সব না-ও হতে পারে। কিছু-দিন আগে আমার এক প্রবীণ জিও-লজিস্ট বন্ধুর কাছে একজন প্রকাশক এসেছিলেন। বন্ধুটির লেখার হাত ভালো। প্রকাশকের তাঁর কাছে প্রস্তাব আপনি তো পাহাড়ে জঙ্গলে ঘোরেন, অনেক দেখেছেন শুনেছেন — আপনার 'সাবজেক্ট' এর পরিধিতেই বেশ একটা চমকপ্রদ বই আমাকে লিখে দিন না।

তিনি গল্প উপন্যাস চান নি, কিন্তু বেশ চমকপ্রদ আর চিত্তাকর্ষক কিছু চেয়েছেন। আমি জানি, জিওলজিস্ট বন্ধুটি তারপর থেকে খুব সীরিয়াসলি ভাবতে শুরু করেছে।

এই প্রসঙ্গ ধরেই এবারে একখানি গ্রন্থ প্রকাশের বিচিত্র নজির দেখানো যেতে পারে। সাম্প্রতিক কালের বই। গল্প বা উপন্যাস নয়, কিন্তু অনায়াসে বেস্ট সেলারের পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। বইটির নাম দি নেকেড এপ। লেখক ডাঃ ডেসমন্ড মরিস। ভদ্রলোক চিড়িয়াখানার স্তন্যপায়ী জন্তুদের কিউরেটার। বইটি মানুষের সঙ্গে জন্তু-জানোয়ারের আচরণের এক কমপ্যারেটিভ স্টাডি। দেখা গেল মানুষের বহু আচরণ, যেমন প্রণয়, প্রতিহিংসা, আক্রমণাত্মক মনোভাব, যূথবদ্ধ হয়ে বাস করা ইত্যাদি বহু ব্যাপারে অনেক জন্তুর সঙ্গে অদ্ভুত একটা বিশ্লেষণগত মিল আছে। এই প্রসঙ্গেই নজিরসহ বিস্তারিত গবেষণা।

কিন্তু 'দি নেকেড এপ' সৃষ্টির মূলে আসলে তার লেখক নাকি 'কেপ' প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও চীফ এডিটর টম ম্যাশলার? ম্যাশলারের সঙ্গে ডেসমণ্ড মরিসের প্রথম দেখা এক পার্টিতে। ডেসমণ্ড মরিস এর আগে আরো খান-কয়েক গবেষণামূলক বই লিখেছেন, তার কোনোটাই চার হাজার কপির বেশী হয় নি। অর্থাৎ লেখক হিসেবে তাঁর কোনই নাম নেই।

ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে ম্যাশলারের ভালো লাগল। বেশ মৌলিক চিন্তাশীল মানুষ মনে হল তাঁকে। ডেসমণ্ড মরিসের পাল্টা আমন্ত্রণে চিড়িয়াখানায় গিয়ে তাঁর মুখ থেকে বানর কতক একটা শব্দ শুনে ম্যাশলার মুগ্ধ! কথাটা হল, 'দি নেকেড

করতে চেয়েছিলেন। ফলে কিছু সত্য, কিছু মিথ্যা মিশিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে বহু বিচার-রহিত পক্ষপাতদুষ্ট অভিযোগ ছিল। স্টাকভ স্পষ্টতই একসময়ে টলস্টয়ের পবিত্রতার উপাসক এবং দস্তয়েভস্কিকে অপবিত্রতার সন্ধানী বলে চিহ্নিত করেছিলেন। দস্তয়েভস্কির সমকালে টলস্টয়, তুর্গেনিভ, গনচারভ ইত্যাদির মত প্রতিষ্ঠিত লেখকরা ছিলেন। এই সমকালের পরিবেশ, দস্তয়েভস্কির বিরুদ্ধে ও স্বপক্ষের নানা অভিযোগ ও খণ্ডন ইত্যাদির নিপুণ সংবাদদাতা এই 'লেখকের লেখক দস্তয়েফ্‌স্কি' গ্রন্থ। দস্তয়েভস্কি তথা সমগ্র রুশসাহিত্যের এদেশীয় গবেষক, পাঠক আজকের যে কোন সৎ বুদ্ধিমান লেখকের পক্ষে যজ্ঞেশ্বর রায় রচিত 'লেখকের লেখক দস্তয়েফ্‌স্কি' গ্রন্থটি অবশ্যপাঠ্য হবে বলেই আমরা মনে করি।

নীরেন্দ্র দত্ত

জন্মনক্ষত্র ও জীবনরহস্য—ননী মিত্র। প্রকাশিকা শ্রীমতী জ্যোৎস্না মিত্র, ১২।১বি, গাঙ্গুলীপাড়া লেন, কলকাতা—২। চার টাকা।

ভারতের জ্যোতিষচর্চা প্রাচীনকালে নানাভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে হত। জ্যোতিষশাস্ত্র বস্তু একটি চিররহস্যাবৃত বিদ্যা। সেই রহস্যময় বিষয়কে অনেকটা সহজভাবে পরিবেশন করেছেন শ্রীননী মিত্র তাঁর 'জন্মনক্ষত্র ও জীবনরহস্য' গ্রন্থে। এই গ্রন্থে রাশিচক্রে জন্মনক্ষত্রের ভূমিকা কি এবং তার ফল মানুষের জীবনে কিভাবে দেখা দেয় তার সুন্দর সহজ ব্যাখ্যা করেছেন জ্যোতিষী লেখক। উৎকল নাড়ীকালের কথা, পাশ্চাত্য মত, প্রাচ্যবিদ্যার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদিও এ গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। সর্বসাধারণের বোঝার পক্ষে শ্রীননী মিত্র রচিত 'জন্মনক্ষত্র ও জীবনরহস্য' গ্রন্থটি যথেষ্ট মূল্যবান।

নিজস্ব সংলাপে আমি (কবিতা)—বিজন ভট্টাচার্য। 'কবিতার জন্যে' ২৫ দিনবাবুর গলি, বহরমপুর, পশ্চিমবঙ্গ। একটাকা।

শ্রীবিজন ভট্টাচার্যের প্রথম কবিতার বই 'নিজস্ব সংলাপে আমি'। মোট আঠারোটি লিরিক কবিতার সংকলন গ্রন্থ এটি। গদ্য কবিতার ঢঙে লেখা কবিতাগুলির মধ্যে কবির নরম মনটিকে ধরা দুঃসাধ্য নয়। প্রেম, স্বপ্ন, ক্ষণিক ভালবাসা, সমকালের অভাব-চেতনা—এই সবই কবিকে কাব্য রচনায় কাঁপিয়ে দিয়েছে। প্রথম সংকলনে কবি বিজন ভট্টাচার্য যথেষ্ট প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন।

পদ্মের বাসনা—জগদীশচন্দ্র দাশ। এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, ২৮ বিধান সরণী, কলকাতা—৬। চার টাকা।

আধ্যাত্মিক ভাবভাবনার গদ্য ও পদ্য সংকলিত হয়েছে জগদীশচন্দ্র দাশ রচিত 'পদ্মের বাসনা' গ্রন্থে। মূলত গভীর দার্শনিক ভাবনাই 'পদ্মের বাসনা'র লেখকের রচনায় বেশী ও একমাত্র স্থান পেয়েছে। বুদ্ধি, যুক্তি, তত্ত্ব ও অভ্যন্তরে সাধনার কিছু কথাও এ গ্রন্থে ব্যক্ত। অনুরাগী পাঠক এ গ্রন্থপাঠে উপকৃত হবেন।

লেখা ও রেখা (অষ্টাদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা) সম্পাদক : ভাস্কর মুখোপাধ্যায়। মিত্রালয়, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বর্তমান সংখ্যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প নিয়ে মূল্যবান আলোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত। ম্যাক্সিম গর্কির 'কমরেড' গল্পটি অনুবাদ করেছেন সাধন চট্টোপাধ্যায়। অন্য যাঁরা লিখেছেন—কৃষ্ণ ধর, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, শচীন বিশ্বাস, জিয়াদ আলি, রবীন সুর, দিলীপ সেনগুপ্ত এবং কয়েকজন।

সীমাবন্ধ। গোবিন্দচন্দ্র রায় এবং সরিৎ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। কলমা কাটকস্বার (বর্ধমান)। পঁচিশ পয়সা।

লিখেছেন সরিৎ চট্টোপাধ্যায় দেব ভট্টাচার্য এবং সুবীর গঙ্গোপাধ্যায়।

এপ'—জন্তুর আলোচনা প্রসঙ্গে একাধিকবার তিনি কথাটা শুনেছেন। এই নামের একখানা বই প্রকাশের চিন্তা এলো চীফ এডিটর ম্যাশলারের মাথায়। এক বছর ধরে ডেসমণ্ড মরিসের সঙ্গে লাঞ্চ আর পাল্টা লাঞ্চের আমন্ত্রণের আদান-প্রদান চলল। ম্যাশলার 'নেকেড এপ' নামে বই ছাপার প্রস্তাব করেন আর ডেসমণ্ড মরিস বলেন, লিখতে হলে অনেক অনুশীলন আর গবেষণা দরকার, এখনো তিনি প্রস্তুত নন। তিন বছর বাদে ম্যাশলার বললেন, প্রস্তুত আর তিনি এ-জীবনে হতে পারবেন না, তার থেকে শুরু করাই ভালো। টোপও ফেললেন 'দি নেকেড এপ' লেখার জন্য হাজার পাউণ্ড থেকে শুরু করে দশ হাজার পাউণ্ড পর্যন্ত আগাম দিতে চাইলেন।

এবারে মরিস লেখার ব্যাপারে গুরুত্ব দিলেন। বেশী লোভ না করে তিন হাজার পাউণ্ড অ্যাডভান্স নিয়ে কাজ শুরু করলেন। ম্যাশলার স্বপ্ন দেখেন তাঁর সব থেকে সফল বইয়ের টাইটেল হবে 'দি নেকেড এপ'। কিন্তু বইয়ের প্রথম খসড়া পেতে তিন বছর গড়িয়ে গেল। তার মধ্যে যে কত লাঞ্চের ব্যবস্থা করতে হয়েছে ঠিক নেই।

পাণ্ডুলিপি হাতে পেয়ে ম্যাশলার উদ্দীপনা আর উত্তেজনায় ভরপুর। কিন্তু রিভিশন আর ছোটখাট সংশোধনের জন্য লেখক মরিসকে আর বসাতেই পারছেন না। আরো এক বছর কেটে যায়। চার হাজার কপি মাত্র যার বই আগে বিক্রি হয়েছে তাঁর উৎসাহ আর কতটুকু হবে? এর থেকে ঢের বেশী পয়সা টেলিভিশনের উপযোগী কিছু লিখতে পারলে। লেখকের মন টানার জন্যেই এবারে এক আশ্চর্য টোপ ফেললেন ম্যাশলার। চেষ্টা করে তাঁকে দিয়ে 'দি নেকেড এপ'এর একটু ছোট সার সংস্করণ লিখিয়ে আমেরিকায় তার স্বত্ব বিক্রী করলেন। কিনলেন ম্যাকগ্র হিল প্রতিষ্ঠান, দাম দিলেন পঞ্চাশ হাজার ডলার। এবারে উৎসাহের অন্ত নেই লেখক ডেসমণ্ড মরিসের। চটপট সংশোধনের কাজ সারলেন। কিন্তু ম্যাশলার একবারেই আসল বইটি প্রকাশ করতে রাজি নন। সানডে মিররের সঙ্গে চুক্তি হল বইটি তাঁরা ধারাবাহিকভাবে আগে ছাপবেন। পারিশ্রমিক দশ হাজার গিনি। ধারাবাহিক প্রকাশনার ফলে একটু হৈ-চৈ পড়ে গেল। তখনো আসল বই ছাপার আগে ম্যাশলার দেশে দেশে তার অনুবাদ স্বত্ব বিক্রী করতে লাগলেন লেখকের হয়ে। তাঁর স্বার্থে প্রচার। তাতেও লাখ দেড়-দুই ডলার ঘরে এলো ডেসমণ্ড মরিসের।

এবারে আসল বই ছাপার তোড়জোড়। বই ছাপার পাঁচ মাস আগে থেকে নগ্নরমণীর পিছন দিকের ছবির পোস্টার ডিসপ্লে করা হল, 'দি নেকেড এপ'। তারপর বই ছেপে বেরুবার মাস দুই আগে বড় বড় গ্রন্থবিক্রেতাদের এক কনফারেন্সে আমন্ত্রণ জানিয়ে লেখক ডাঃ ডেসমণ্ড মরিসকে দিয়ে একটা ভাষণ দেওয়ানো হল। টেলিভিশন প্রোগ্রামও করা হল গুটিকয়েক। ম্যাশলারের সব-কিছুর উদ্দেশ্য পরিবেশ সৃষ্টি।

তারপর?

তারপরের টুকু ইতিহাস।

স্মরণীয় কালের মধ্যে এত বিক্রী খুব বেশী বইয়ের হয় নি। ইনকাম-ট্যাকসের মানুষদের তাড়া খেয়ে 'দি নেকেড এপ'এর লেখক ডাঃ ডেসমণ্ড মরিসকে এক বছরের জন্য মালটায় গিয়ে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছিল।

এতবড় এক সৃষ্টির মূলে প্রকাশক সংস্থার চীফ এডিটর টম ম্যাশলারের আইডিয়া। তাঁর মন বলেছিল, 'দি নেকেড এপ ওয়াজ জাস্ট রাইট ফর ডকটর ডেসমণ্ড মরিস অ্যাণ্ড ডকটর মরিস ওয়াজ জাস্ট রাইট ফর দি নেকেড এপ।'
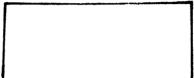
—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মৌজুদ্দিনের উত্তরসূরী

(২৯)

'আরে ভাই, কি রেকর্ডই করেছ' জমিরুদ্দিন খাঁ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন 'আমার রেকর্ডটা ভেঙ্গে ফেলতে হচ্ছে হচ্ছে।'

অনাথনাথ বসু তখন রীতিমত উদীয়মান গায়ক যেমন, তেমনি তবলাসঙ্গীতও। তবে গানের জন্যেই নাম করছেন বেশি। বিশেষ দাদরা ঠুংরি গানে। তাঁর গলাতেই অসাধারণত্ব আছে। তিনি ঠুংরি দাদরা শোনান আশ্চর্য মিষ্টি কণ্ঠে। সেই অনাথ বসুকে জমিরুদ্দিন এইভাবে তারিফ করলেন।

মেগাফোন থেকে তখন অনাথনাথের এই রেকর্ডখানি বেরিয়েছে—

নাহি নাহি যানা সোতন ঘর সে'য়া
কর জোর ত থোঁরি বিনতি করত হুঁ।
আউর লাগু তোরি প'ইয়াঁ।।

মিশ্র দাদরার এই গানটি ভারি ভাল লেগেছিল জমিরুদ্দিনের। অনাথ বসুর সঙ্গে দেখা হতেই তাই এমন প্রশংসা করলেন। এই একই গান তিনি নিজে আগে রেকর্ড করেছিলেন এইচ এম ভি'তে। সে রেকর্ড কি ভাল হয় নি? তা নয়।

তবে অনাথনাথের গানখানি খুব উৎরেছিল। দরদী শিল্পী জমিরুদ্দিন তাই প্রাণের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন আর এক শিল্পীকে। এমনি দিল্-দরাজ শিল্পী-সত্তা জমিরুদ্দিনের। না হলে ঠুংরি দাদরায় তিনি কি কম গুণী? না কলকাতার আসরে আসরে রেডিওতে গ্রামোফোন রেকর্ডে অল্প নাম-ডাক তাঁর? আর বিশেষ করে ঠুংরি দাদরার জন্যেই তাঁর প্রতিষ্ঠা বেশি।...

তিরিশের দশক তখন আরম্ভ হয়ে গেছে। বোধহয় ১৯৩১-৩২ সালের কথা। কলকাতায় সে সময় ঠুংরি দাদরা গানের খুবই চলন। তার আগের দশকেই বিদায় নিয়েছেন আসর-মাতানো মৌজুদ্দিন। প্রথমে কলকাতা থেকে। তার এক বছর পরে ইহজগৎ থেকেও। কিন্তু কলকাতার ঠুংরি দাদরা গানের আসরে তাঁর স্মৃতি তখনো জীবন্ত হয়ে আছে। খেয়ালও তিনি গাইতেন বটে। তাঁরই যোগ্যভাবে গাইতেন। কিন্তু সবাই বেশি মনে রেখেছে তাঁর দাদরা ঠুংরি। বিশ শতকের প্রথম দিক থেকেই তিনি কলকাতায় এসেছেন। দুলিচাঁদ শেঠের দমদমার আসর থেকে দেখা দিয়েছেন নানা আসরে। তাঁর চেয়ে মহত্তর প্রতিভা জগদীপ মিশ্রকে মহাপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞান করেছেন। তখন শ্যামলাল ক্ষেত্রী প্রমুখের চক্রান্তে জগদীপকে ত্যাগ করতে হয়েছে কলকাতা। সুদূর নেপাল দরবারে চলে গেছেন। তারপর থেকে মৌজুদ্দিনের একাধিপত্য কলকাতায়। কাশীর সন্তান হলেও তাঁর সংগীত-জীবনের বেশির ভাগই এখানে কাটে। প্রায় বিশ বছর-মাঝে মাঝে যেতেন বারাণসী কিম্বা অন্যত্র। কিন্তু কলকাতাই তাঁর সংগীত-জীবনের কেন্দ্র হয়ে থাকে। এখানে যত মুজরো পেতেন, যত বেশি দিন থাকেন এমন আর কোথাও না। আর তালিমও এত দেন নি কোথাও। সে সবই তখনকার শ্রেষ্ঠা বাঈজী-দের। আগ্রাওয়ালী মালকা জান, জদ্দন বাঈ, চুলবুলাওয়ালী মালকা জান প্রভৃতি আরো ক'জন। বাঈজীদের সঙ্গে মৌজুদ্দিনের নিত্য সঙ্গ ছিল। আর তাঁর তালিম কিম্বা আসর সবের মধ্যে প্রধান হয়ে থাকে ঠুংরি দাদরা। গণপৎ রাওয়ের ধারার ঠুংরি গানে তাঁর প্রধান শিষ্য মৌজুদ্দিন তখন এই চালের উত্তম উদাহরণ। তিনি বিদায় নেবার পরও তাঁর গানের রেশ কলকাতায় থেকে যায়। এমন মনোহারী করে তিনি গাইতেন আসরে। তাঁর ওস্তাদের ঠুংরির চাল মূর্ত হত তাঁর কণ্ঠে। শিষ্য না হয়েও তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হন। কেউ পান প্রেরণা। কেউ সচেতনভাবে তাঁর অনুষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করে নেন। এমনি নানাভাবে মৌজুদ্দিনের ঠুংরি দাদরার একটি ভূমিকা দেখা গেছে কলকাতায়। যেমন গিরিজাশংকর চক্রবর্তী। বহরমপুরের সন্তান তিনি। সেখানে মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর সংগীত বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর কাছে ধ্রুপদ শেখেন। তারপর কলকাতায় এসে গিরিজা-শংকর পরিচিত হন শ্যামলাল ক্ষেত্রীর সঙ্গে। শ্যামলালজীর হারমোনিয়মে ঠুংরির জগতের সন্ধান পান। আকৃষ্ট হন তাঁর সৌন্দর্যে সেই আসরে এবং দুলিচাঁদের আসরেও তার দৃষ্টান্ত দেখেন মৌজুদ্দিনের কণ্ঠে। বহুদিন ধরে তার রূপায়ণ লক্ষ্য করেন। ক্ষেত্রীজী ও মৌজুদ্দিনের প্রেরণায় ও ধারায় চর্চা আরম্ভ হয় তাঁর ঠুংরি। পরে গিরিজাশংকর রামপুরে ছম্মন সাহেবের কাছে ঠুংরির অনেক কিছু পেয়েছিলেন। কিন্তু মৌজুদ্দিনেরও ছাপ থেকে যায় তাঁর ঠুংরিতে। কিম্বা অনাথনাথ বসু। তিনি ত মৌজুদ্দিনের কাছেই কিছুদিন ঠুংরির তালিম পান। মালকাজানের বাড়িতে কয়েক মাস তিনি যাতায়াত করে শিক্ষা লাভ করেন মৌজুদ্দিনের। পরে, অনাথনাথ ছোটে খাঁ, বান্দর মহম্মদ খাঁ প্রভৃতির কাছে ঠুংরিতে অনেক জ্ঞান লাভ করেছিলেন। কিন্তু মৌজুদ্দিনের গানও প্রভাব রাখে তাঁর ঠুংরি গানে।

তেমনি জমিরুদ্দিনের জীবনে একথা আরো বেশি বলা যায়। তিনি মৌজুদ্দিনের শিষ্য না হয়েও নিয়েছিলেন তাঁর ঠুংরি দাদরা। মৌজুদ্দিনের সঙ্গ জমিরুদ্দিন বহুদিন করেছিলেন। অনেক আসরে শুনতেন তাঁর গান। মৌজুদ্দিনের বাসগৃহেও যাতায়াত করতেন। তাছাড়া মৌজুদ্দিনের তালিম পাওয়া জদ্দন বাঈ প্রভৃতি কোন কোন বাঈজীর সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল জমিরুদ্দিনের। প্রথম জীবনে কিছুকাল সারেঙ্গবাদকও তিনি ছিলেন। গায়ক-গায়িকাদের গানের সঙ্গে সুরের সংগতও করেছেন সে সময়ে। এমনি নানা সূত্রেই তিনি সঞ্চয় করেন ঠুংরি দাদরা। শিল্পী যে কতভাবে কতদিক থেকে সংগ্রহ করতে পারেন তা বাইরে থেকে ধারণা করা যায় না। জমিরুদ্দিন যে মৌজুদ্দিন প্রমুখের গান শুনে আরো নানা সূত্রে আত্মস্থ করে ঠুংরি ইত্যাদি গানের কলাবত হন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ঠুংরি তিনি বিশেষভাবে শেখেন নি কারো কাছে। আগে রীতিমত খেয়ালের তালিম পেয়েছেন। তারও আগে শিখেছেন ধ্রুপদ। দস্তুরমত কণ্ঠসাধনা করেছেন। প্রস্তুত হয়েছেন পেশাদার জীবনের জন্যে। মৌজুদ্দিন প্রমুখের ঠুংরিরূপে প্রেরণা পেয়েছেন। আকৃষ্ট হয়েছেন এই রীতির গীতিতে। তারপরে চর্চা করেছেন ঠুংরি। মনোহারী ঠুংরি ক্রমে তাঁর চিত্তকে অধিকার করে নিয়েছে। তাঁর সংগীত-মানস পরিতৃপ্ত, বিকশিত হয়েছে ঠুংরির অবলম্বনে। প্রাণের স্ফূর্তিতে ঠুংরির আসর করেছেন। নিজের শিল্পী-জীবন ... সার্থক হয়েছে, সেই সঙ্গে সংগীত সমাজের স্বীকৃতি পেয়েছেন ঠুংরি দাদরা গানে। জমিরুদ্দিন খাঁ ঠুংরি দাদরার শিল্পী বলে জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। আসরে, জলসায়, রেকর্ডে বেতারে— সবত্র। আর এক কথায় বলতে গেলে ঠুংরি তিনি শুনে শুনেই শিখেছেন বা সংগ্রহ করেছেন অন্তরের প্রেরণায়। সংগীত কণ্ঠ প্রস্তুত হবার পর স্বভাবের বশেই ঠুংরি-শিল্পী হয়ে উঠেছেন। কারো কাছে বিশেষ করে ঠুংরির শিক্ষা নিতে হয় নি তাঁকে।

জমিরুদ্দিন নিজেও অনাথ বসুকে বলেছিলেন 'সবাই আমার ঠুংরির জন্যে নাম করে। ঠুংরিওয়ালা মেরা নাম হো গিয়া। কিন্তু ভাই ঠুংরির তালিম আমার নেই।'

সত্যি কথা। আসলে তিনি তৈরি হয়েছিলেন ওস্তাদ বদল খাঁর তালিমে। দীর্ঘকাল নিয়মমাফিক তাঁর কাছে তালিম নিয়েছিলেন। কিন্তু সে তালিম খেয়ালের। বদল খাঁর কাছে ঠুংরিও ছিল বটে। কিন্তু তা রঙের ঠুংরি না, যে চালের ঠুংরি গানে জমিরুদ্দিন নাম করেছিলেন। ওস্তাদ বদল খাঁর ছিল পুরনো ধরনের ঠুংরি।

জমিরুদ্দিন তা কোনদিন শেখেন নি এবং গানওনি।

ওস্তাদ গণপৎ রাও যে 'বোল্-বনাও-কি-ঠুংরি'র এখানে প্রচলন করেন, কলকাতায় তা সুপরিচিত হয় মৌজুদ্দিনের মাধ্যমে। জমিরুদ্দিন অনেকখানি সেই ধারাই অনুসরণ করতেন। প্রায় সেই চালেই গাইতেন ঠুংরি দাদরা। মৌজুদ্দিনের সঙ্গে তিনি অবশ্য তুলনীয় নন। মৌজুদ্দিনের সে যাদু ছিল না তাঁর কন্ঠে। তবে তিনি সুকন্ঠ, মরমী, শিল্পী-প্রাণ। অন্তরের প্রেরণায় পেয়েছেন, রসসৃষ্টি করেছেন। সঙ্গীতের সে অনুভব সঞ্চারিত করে দিয়েছেন শ্রোতাদের মনে। মৌজুদ্দিনের তুল্য না হলেও তিনিও গুণী, কৃতী শিল্পী ঠুংরি দাদরা গানে।

এই শতকের প্রথম দিক থেকে বিশের দশকের প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত মৌজুদ্দিন কলকাতায় বেশির ভাগ থেকে গেছেন। তিনি যে ঠুংরির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে যান, পরে তার একদিকে দেখা দেন গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী আর একদিকে জমিরুদ্দিন।

কলকাতার আসরে মৌজুদ্দিনের এক উত্তরসূরী জমিরুদ্দিন।

শুধু ঠুংরি দাদরা গানে নয়। সংগীত-জীবনের অন্য কটি দিকেও দুজনের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। তাঁরা দুজনেই ধ্রুপদ গায়ক পিতার সন্তান। ধ্রুপদী পিতার শিক্ষাধীনেই তাদের সঙ্গীতচর্চা আরম্ভ হয়। দীর্ঘকালের জন্যে না হলেও, ধ্রুপদী ধারায় কন্ঠ সাধনা ও তালিম। তারপর খেয়ালের চর্চাও দুজনেই করেছিলেন। খেয়াল তাঁদের সংগীত-জীবনে ছিল শেষ পর্যন্ত। কিন্তু তাঁরা স্বাভাবিক প্রবণতায় ঠুংরিতেই বেশি স্ফূর্তি লাভ করতেন। ঠুংরিই তাঁদের প্রতিভার যেমন সমধিক বাহন হয় তেমনি দেয় জনপ্রিয়তা। ঠুংরির জন্যেই তাঁদের নাম স্মরণীয় থাকে।

শিল্পী-জীবনের মতন মৌজুদ্দিনের সঙ্গে জমিরুদ্দিনের ব্যক্তি-জীবনেও আছে ঐক্য। একই রকমের চরিত্র তাঁদের। একই প্রকার জীবনযাত্রার ধারা। সমরুচির, সম-প্রবৃত্তির। মৃত্যুর কারণও একই এবং প্রায় সম বয়সেই।

তালিম দেবার বিষয়েও দুজনের মধ্যে এক ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। মৌজুদ্দিন বেশি শিখিয়েছিলেন বাইজীদের। সেইসব গায়িকাদের পল্লীতে তাঁর অন্তরঙ্গ যাতায়াতও ছিল বেশি। মৌজুদ্দিনের পুরুষ শিষ্য নামমাত্র। অনাথনাথ বসু শুধু শেখবার সুযোগ পান কিছুদিন। মালকাজানের বাড়িতে এবং তাঁরই অনুরোধে অনাথ বসু ক'খানি ঠুংরি দাদরা মৌজুদ্দিনের কাছে শেখেন। অমূল্যধন পাল বলে মৌজুদ্দিনের এক শিষ্য ছিলেন যাঁর নাম সংগীতসমাজে তেমনি পরিচিত হয়নি।

জমিরুদ্দিনের পুরুষ শিষ্যও অতি অল্প। তাঁরাও শেখেন গ্রামোফোন রেকর্ডের জন্যে। এইচ এম ভি ও মেগাফোনে জমিরুদ্দিন তখন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক। সে সময়ই তাঁর কাছে জ্ঞান দত্ত, ধীরেন্দ্র দাস, কৃষ্ণচন্দ্র দে ও আব্বাসউদ্দিন রেকর্ড করবার জন্য গান শেখেন। জমিরুদ্দিনের কাছে বেশিদিন শিখেছিলেন ইন্দুবালা, আঙ্গুরবালা, কমলা ঝরিয়া, হরিমতী, বীণাপাণি প্রভৃতি গায়িকারা। তাঁরাও অবশ্য হিন্দী উর্দু গান রেকর্ড করবার জন্যে তাঁর কাছে শেখেন। তবে রেকর্ড ভিন্ন সংগীতশিক্ষও কেউ কেউ করেছিলেন তাঁরা।

পুরুষ শিক্ষার্থীদের মধ্যে জমিরুদ্দিনের সংগে নজরুলের সংসর্গ বেশিদিন ছিল। স্বনামপ্রসিদ্ধ গীতরচয়িতা কাজী নজরুল ইসলাম অন্যতম সংগীতশিষ্য জমিরুদ্দিনের। কাজী সাহেব কিন্তু গায়ক হবার জন্যে জমিরুদ্দিনের কাছে ছাত্র হয়ে যেতেন না। তাঁর ছিল অন্য উদ্দেশ্য। সব্যসাচী সাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায়ের স্মৃতিচারণে তার বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। হেমেন্দ্রকুমারের সংগে জমিরুদ্দিন ও নজরুল দুজনেরই আলাপ পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ। মধ্যবয়সে হেমেন্দ্রকুমার প্রচুর পরিমাণে বাংলা গান রচনা করতেন। তাঁর সে সব গানের বহু রেকর্ড করেন কৃষ্ণচন্দ্র দে। শচীন্দ্র দেববর্মণ প্রমুখ আরো কজন গায়ক-গায়িকাও হেমেন্দ্রকুমারের রচিত গান রেকর্ডে গেয়েছেন। মঞ্চের বহু নাটকে (সীতা, কারাগার, গৈরিক পতকা প্রভৃতি) সবাক চলচ্চিত্রে এবং অজস্র রেকর্ডের জন্যে তখন গান রচনা করতেন হেমেন্দ্রকুমার। সেইসব কালা সংগীতের রচনাকার বলে সে সময় তাঁর সংগীতজগতেও বেশ প্রতিষ্ঠা। নজরুল এবং জমিরুদ্দিন দুজনেই হেমেন্দ্রকুমারকে গান রচয়িতারূপে সমাদর করতেন। সংগীতপ্রেমীরূপেও তাঁর গৃহে সমাগত হতেন তাঁরা। সেসব দিনের প্রসঙ্গে জমিরুদ্দিনের কথায় হেমেন্দ্রকুমার পরে লিখেছেন, 'কয়েক বৎসর কেটে যায়। জমিরুদ্দিনের দেখা বা সাড়া পাই না। এর-তার মুখে খবর পাই, অমুক অমুক ব্যক্তি জমিরুদ্দিনের কাছ থেকে সংগীত শিক্ষা করছেন, তাঁদের কেউ কেউ আজ সুবিখ্যাত হয়েছেন। একদিন শুনলুম নজরুল ইসলাম জমিরের কাছে গান শিখছেন। নজরুল যে গায়ক হবার জন্যে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নি, একথা তখন তিনি বুঝতে পারেন নি, কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছিলুম।

'অনেক দিন পরে গ্রামোফোন কোম্পানীর কার্যালয়ে জমিরুদ্দিনের সঙ্গে দেখা। তখন আমি গান রচনার দিকে ঝোঁক দিয়েছি খুব বেশি মাত্রায়। আমার কলমে এসেছিল গানের বন্যা, প্রত্যহই গান রচনা করি। গ্রামোফোন রেকর্ডে প্রায়ই আমার গান প্রকাশিত হত এবং জমিরুদ্দিন ছিলেন ওখানকার অন্যতম সংগীতশিক্ষক। আমাকে দেখেই ভারি খুসি। আমাকে বললেন, 'দাদা আপনার কথাই ভাবছিলুম।' আমি বললুম, 'সে কি হে, চোরে-কামারে দেখা নেই, আমার কথা

ভাবছিলে মানে?' জমির বললেন, 'উর্দু গানের সুরে আমাকে খান কয় বাংলা গান বেঁধে দিতে পারবেন?' আমি বললুম, 'তা পারব না কেন? কিন্তু উর্দু গানগুলি না শুনলে তো সেই চালে গান লিখতে পারবো না।' তিনি বললেন, 'বেশ, কালকেই আপনাকে গান শুনিয়ে আসবো।'

কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলুম, 'নজরুল এখনো তোমার কাছে গান শেখে কি?'

প্রবল মস্তকান্দোলন করে জমির বললেন, 'না। নজরুলকে আমি আর কখনো গান শেখাবো না।'

জিজ্ঞাসা করলুম, 'হয়েছে কি, এত চটেছো কেন?'

তিনি বললেন, 'দাদা না চটে কি থাকা যায়? নজরুল আমার কাছ থেকে গানের পর গান শিখতে লাগলো। তারপর সে কি করতো জানেন? বাংলা গানে সেই সব গানের সুর বসিয়ে এখানেই এসে শিখিয়ে যেতে লাগলো। বলুন, এর পরেও কি তাকে আর গান শেখানো চলে? শেষটা কি আমার অন্ন মারা যাবে?'

আমি হেসে বললুম, 'নজরুল খুব বেশি অন্যায় করেছে বলে মনে হয় না। সে তো গায়ক হবার জন্যে তোমার কাছে গান শিখতে চায় নি। সে চেয়েছিল কেবল নতুন নতুন সুর শিখতে নিজের কাজে লাগাবে বলে। এটা তোমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।' (যাঁদের দেখেছি, পৃষ্ঠা ১৬৭-১৬৯)।

হেমেন্দ্রকুমারের সংগীত প্রসঙ্গে এখানে একটি তথ্য যোগ করে দেওয়া যায়। প্রথম জীবনে তিনি কিছুদিন ধ্রুপদ গান শিখে-ছিলেন মধুকণ্ঠ ধ্রুপদী মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। হেমেন্দ্রকুমার তখন পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীটের পৈত্রিক বাড়িতে বাস করতেন। সেই অঞ্চলেই লালমাধব মুখার্জী লেন নিবাসী মহীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর নিকট প্রতিবেশী। তাঁর গানও সেই যৌবনকালে হেমেন্দ্রকুমার বহুদিন শোনেন এবং রাগ-সংগীত বিষয়ে কিছু ধারণা তাঁর তখন থেকেই হয়েছিল।...

জমিরুদ্দিনের ঠুংরী গানে আর একজন শিষ্য ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ। কিন্তু তাঁর সংগীতজগতে কোন স্বাক্ষর নেই। এই পর্যন্ত জমিরুদ্দিনের শিষ্য প্রসংগ।

তাঁর শিক্ষাদানের ব্যাপারে একথা জানা যায় যে, তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। অকৃপণ-ভাবে গান ঢেলে দিতেন। প্রাণ ভরে শেখাতেন ঠুংরি।

আসরেও তেমনি ঠুংরি দাদরার প্রেমিক গায়করূপে তাঁকে দেখা যেত। অক্লান্তভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা তিনি গান শোনাতেন দরদ দিয়ে। শ্রোতাদের সংগে নিজেও সংগীতে মেতে উঠতেন। জমিরুদ্দিনের তেমনি দু' একটি আসরের নাম করা যায় এখানে।

সেকালেও কয়েকটি ঘরোয়া আসরে উচ্চ মানের সংগীতচর্চা হত, গত শতকের জের ধরে। এক এক সংগীতপ্রেমীর গৃহের আসর। কিন্তু সেখানে নানা পেশাদার কলাবংরাও গুণপনা দেখাতেন। তাদের বেশির ভাগ ছিল উত্তর ও মধ্য কলকাতায়। তখনো তাদের সংখ্যা বিশেষ অল্প ছিল না। তেমনি দুটি নিয়মিত আসরে মাঝে মাঝেই গান শোনাতেন জমিরুদ্দিন। একটি ছিল মসজিদ বাড়ি স্ট্রীটের (এখন যে অংশটুকুর নাম হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট সে সময় তাও মসজিদ বাড়ি স্ট্রীটের অন্তর্ভুক্ত ছিল সেই অংশে) নরেন্দ্রনাথ বসুর ভবনে এবং বিখ্যাত মল্লবীর ও সংগীতজ্ঞ গোবরবাবুর ৫২ বিডন স্ট্রীটের গৃহে। প্রথম আসরে যাঁদের অনুষ্ঠান হত তাঁদের মধ্যে সরদী করামৎ উল্লা খাঁ, তবলাবাদক দর্শন সিং গয়ার হারমোনিয়াম-গুণী সোনীজী, জমি-রুদ্দিন কৃষ্ণচন্দ্র দে প্রভৃতির নাম করা যায়। গোবরবাবুর আসরেও যোগ দিতেন তাঁরা। তাছাড়া হারমোনিয়ম-শিল্পী রফিক উল্লা খাঁও কলকাতায় এলেই বাজনা শোনাতেন গোবর-বাবুর আসরে। এই দুটি আসরেই জমি-রুদ্দিনের গান হেমেন্দ্রকুমার অনেক বার শোনেন এবং তার বর্ণনা এইভাবে দিয়েছেন,—

'সারাদিন একান্তভাবে সাহিত্যচর্চার শেষে সন্ধ্যার পর মন চাইতো খানিকটা ছুটি পেতে। তাই এখানে-ওখানে যেখানেই গান বাজনার আসর বসতো প্রায়ই সেখানে গিয়ে হাজরা দিয়ে অসাতুম। মনের ছুটিকে সার্থক করে তুলতে সঙ্গীতের মতো আর জুড়ি নেই।

...আমার স্বর্গীয় বন্ধুবর নরেন্দ্রনাথ বসুর দর্জিপাড়ার বাড়িতে প্রতি শনিবার সন্ধ্যাকালে বসতো গান-বাজনার একটি চমৎকার বৈঠক। ...নরেন্দ্রনাথের বৈঠকেই সর্বপ্রথমে গায়ক জমিরুদ্দিন খাঁ ও তবলা-বাদক দর্শন সিংকে দেখি।...তবলায় তাঁর হাতের বোল সৃষ্টি করতো অপূর্ব মাধুর্য। তিনি করমতুল্লা খাঁ-এর সরোদের সংগে এবং জমিরুদ্দিন খাঁ-এর গানের সংগে সংগত করতেন।...

...জমীরুদ্দিনের রঙটি কালো হলেও দেহ-খানি ছিল সুঠাম ও মুখখানিও, সুদর্শন এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল তাঁর ভাব-মধুর চোখ দুটি—রীতিমতো প্রেমিকের চোখ। গানের সময়ে সেই চোখ দুটির ভিতর দিয়েও দেখা যেতো বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি।......

....চমৎকার ঠুংরি গাইলেন তিনি, ভিজিয়ে দিলেন মন সুরধারাপাতে। অপূর্ব গানের গলা, গাম্ভীর্যে ভরপুর হতেও পারে, আবার পেলবতায় তরল হয়েও আসে। তান, মীড়, গিটকিরি কিছুরই অভাব নেই। এবং অভিব্যক্ত হয় উচ্চশ্রেণীর শিল্পীর দরদের ভিতর দিয়ে। হলুম মুগ্ধ।......

......তারপর তাঁর ঘন ঘন দেখা পেতে লাগলুম আমার আর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও বিশ্ববিখ্যাত মল্লযোদ্ধা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র গুহ বা গোবরবাবুর বৈঠকে। সেখানে যাঁরা আসন গ্রহণ করতেন তাঁদের অধিকাংশই সংগীত-খিন, পালোয়ান বা অন্য শ্রেণীর লোক, সাহিত্যিকদের মধ্যে থাকতুম কেবল আমি ও প্রেমাঙ্কুর (আতর্থী)।

...ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে চলত জমীরুদ্দিনের ও দর্শন সিংয়ের তবলা। রাতের পর রাত এই ব্যাপার। রাত যত গভীর হয়, গান তত জমে ওঠে। জমীরুদ্দিনের গানের ভান্ডার যেন অফুরন্ত, প্রতি রাতেই শুনি নূতন নূতন গান—খেয়াল ঠুংরি টপ্পা গজল ভজন। তাঁর কণ্ঠও যেন শ্রান্ত হতে শেখেনি।.....

......দিনে দিনে জমীরুদ্দিনের সংগে আমার আলাপ একটু একটু করে জমে উঠতে লাগলো। তিনি বাংগালী মুসলমান ছিলেন না, বাংলা বর্ণ পরিচয়ও বোধকরি হয়নি তবে বহুকাল এদেশে বাস করে বাংলা বলতে শিখেছিলেন। উচ্চারণে কিছু কিছু ভুল হতো বটে কিন্তু মনের ভাব ব্যক্ত করতে তাঁর অসুবিধা হতো নাই।'...(যাঁদের দেখেছি, পৃষ্ঠা—১৬৫-১৬৭)

জমিরুদ্দিন খাঁর জীবনীর সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এখানে দেওয়া হল।

অল্প বয়স থেকেই জমিরুদ্দিন বাস করেন কলকাতায়। পিতার সংগে সুদূর পাঞ্জাব থেকে তিনি বাল্যকালে এখানে এসেছিলেন। তাঁর তালিমের বেশির ভাগই পেয়েছিলেন এই শহরে। তখন থেকে জীবনের শেষপর্যন্ত তিনি কলকাতাবাসী। এখানকার সংগীতজীবনের সংগে আমৃত্যু

তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কলকাতার সংগীতক্ষেত্রের একজন বলেই তিনি মনে করতেন নিজেকে। তাঁর পিতাও কলকাতায় শেষজীবন কাটিয়ে মানিকতলায় কবরস্থ হন। পূর্বে কলকাতার ৫৪, রিপন স্ট্রীটে পিতা পুত্র বাস করেছিলেন অনেকদিন।.....

তাঁদের আদি নিবাস ছিল পাঞ্জাব প্রদেশের আম্বালায়। সেখানে ১৮৯১ সালে জমিরুদ্দিনের জন্ম। পিতা মসিদ খাঁর পেশাদার গায়ক বলে নাম ডাক ছিল। তিনি ছিলেন আসলে ধ্রুপদী। তবে খেয়াল টপ্পা রীতিও জানতেন। মসিদ খাঁর তালিমে মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে গাইতে হন কোন কোন গায়ক-গায়িকা। যেমন ওয়াজির খাঁ ও হাদো খা। ধ্রুপদ গায়ক পিতার শিক্ষাধীনেই বালক জমীর শুরু করেন সংগীতচর্চা।

জমিরুদ্দিনের সঙ্গীতশিক্ষা কিন্তু একই ধারায় কিংবা সরল পথে হয়নি। অন্তত প্রথম জীবনে। একাধিকবারের ছেদ, সঙ্গীতে বীতরাগ ইত্যাদি বিপত্তি দেখা দেয় তাঁর সংগীতজীবনে। উত্তরজীবনের বিলাসিতা বা প্রমোদপরায়ণতা প্রথম পর্বেও তাঁর চরিত্রে ছায়াপাত করেছিল। কয়েক বারই ব্যাহত হয় তাঁর সংগীতচর্চার অগ্রগতি। অবশেষে তাঁর সংগীতপ্রতিভা বিকাশের পথ খুঁজে পায়।

পিতা ভিন্ন জমিরুদ্দিনের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে আরো সংগীতব্যবসায়ী ছিলেন। কেউ গায়ক কেউ সারেংগবাদক ইত্যাদি। জমিরুদ্দিনকেও বাল্যকাল থেকেই সংগীতশিক্ষা দিতে থাকেন মসিদ খাঁ। জমির শুধু ধ্রুপদ নয়, খেয়াল টপ্পা তেলেনাও শিখতে শুরু করেন। দু বছর এমনি শিক্ষা চলে পিতার কাছে।

কিন্তু তারপর জমির সংগীতশিক্ষার অমনোযোগী হয়ে পড়েন। পিতার অতিরিক্ত আদরে সঙ্গীতচর্চাতেই আলস্য দেখা দেয় তাঁর। সংগীতে উপেক্ষা দেখিয়ে তিনি ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত হতে থাকেন। পুত্রকে সেখান থেকে আয়ত্তে আনতে অপারগ হলেন মসিদ খাঁ।

কিছুদিন এইভাবে নষ্ট হলে জমিরকে নিয়ে তিনি কলকাতায় চলে এলেন। এখানে অন্য কোন ওস্তাদের হেফাজতে পুত্রকে রাখাই তাঁর উদ্দেশ্য। নতুন জায়গায় নতুন কলাবতের কাছে তালিমে জমির যেন প্রস্তুত হতে পারেন গায়কের পেশার জন্যে।

বদল খাঁ সে সময় শেঠ দুলিচাঁদের বাগানবাড়িতে ছিলেন। তাঁর কাছে জমিরের শিক্ষার বন্দোবস্ত করলেন মসিদ খাঁ।

বদল খাঁর কাছে জমির তখন সারংগ বাদন শিখতে আরম্ভ করলেন। ছ মাস কাটল এমনিভাবে। কিন্তু তারপর জমিরুদ্দিনের ব্যবহারে আবার সেই অবাধ্যতা দেখা দিতে লাগল। সঙ্গীত উপেক্ষা করতে লাগলেন আগের মতন। সারঙ্গবাদন বন্ধ করে দিলেন। এমনকি যন্ত্রটিকেও দান করলেন একজনকে। সংগীতের পাট তাঁর জীবন থেকে উঠে গেল। দুর্বিনীত উচ্ছৃংখল হয়ে উঠলেন জমির। বদল খাঁর কথাতেও আর কিছু পরিবর্তন হল না।

পিতার সমস্ত আবেদনও অগ্রাহ্য করে পুরো-দস্তুর যথেচ্ছাচারী হলেন। এমনকি, এখানেও আর রইলেন না।

বদল খাঁর কাছে যাতায়াত শেষ করে দিয়ে জমিরুদ্দিন কলকাতাও ত্যাগ করলেন। ফিরে গেলেন জন্মস্থানে, আম্বালায়। মসিদ খাঁ পুত্রকে কিছুতেই স্ববশে, সংগীতচর্চার মধ্যে আনতে পারলেন না।

আম্বালায় অতি স্থূল আমোদ-প্রমোদে নিমজ্জিত হলেন জমিরুদ্দিন। সঙ্গীতের সংগেও কোন সম্পর্ক রাখলেন না।

মসিদ খাঁও আম্বালায় এসেছিলেন সে সময়। কিন্তু পুত্রের মতিগতি শোধন করতে অক্ষম হলেন। বাল্যে তাঁকে অযথা আদর দিয়ে যে ক্ষতি করেছিলেন আর তা পূরণ হল না। পিতার শৈথিল্যে ছেলেবেলা থেকেই বিলাসিতা মজ্জাগত হয়েছিল জমীরের। উদ্দাম যৌবনে তা অপ্রতিরোধ্য বিলাসব্যসনে পরিণত হল। পিতার সব অনুযোগ উপেক্ষা করতে লাগলেন জমির।

তখন একমাত্র উপায় হিসেবে পুত্রের বিবাহ দিলেন মসিদ। কিন্তু আশানুরূপ ফল কিছু পেলেন না। স্বভাবের বিশেষ পরিবর্তন দেখা গেল না জমিরের। সঙ্গীত-ছুট হয়ে তেমনি আসক্ত রইলেন প্রমোদে ব্যসনে। অবস্থার অতিরিক্ত বিলাসিতা করতে লাগলেন।

তাঁদের সাংসারিক অবস্থা তখন একেবারেই অসচ্ছল। কিন্তু জমিরুদ্দিনকে দেখে তা বলবে কে। পোষাক-পরিচ্ছদে দস্তুরমত সৌখীন। দামী জিনিস ছাড়া কিছুই তাঁর মনে ধরে না, ব্যবহার করেন না। কিন্তু সেসব আছে কোথা থেকে কসে চিন্তা তাঁর নেই। সে দায়িত্ব পিতার।

নিরুপায় মসিদ নিজের ভুলের মাশুল দিতে লাগলেন। এইভাবে কাটল আরো কিছুদিন। মসিদ খাঁ কলকাতায় চলে এলেন; জমিরুদ্দিন রয়ে গেলেন আম্বালায়।

একদিন সাজগোজ করে বেড়াতে বেরিয়েছেন। চকচকে জুতো, চুস্ত পায়জামা জরিদার পিরাণ লোমদার টুপিতে ফিটফাট জমিরুদ্দিন।

এমন সময় পথে জান মহম্মদের সংগে দেখা। তাঁর আত্মীয় জান মহম্মদ। গুণী সারংগ-বাদক আর প্রবীণ বয়সীও। জান মহম্মদ তাঁদের অবস্থা ভাল করেই জানতেন।

জমিরুদ্দিনের আপাদমস্তক একবার তিনি ভাল করে দেখে নিলেন। তারপর ধিক্কার দিতে লাগলেন বেশ জমাটি ভাষায়, 'বাঃ বাঃ, তোফা আরামসে হ্যায়। দিব্য বাবুগিরি করে দিন চলেছে। নিজেকে খুব চালাক ভেবেছ, না? কিন্তু আসলে তুমি তা নও। সঙ্গীত যে কত দামী তা বোঝবার মতন মগজ তোমার নেই। তোমার বাপ এমন ধ্রুপদী। আর তোমাকে লোকে কি বলবে? বেকার ছোকরা একজন। যার কোন গুণ নেই, পরিচয় নেই অথচ তুমি বাপের নাম রেখে একজন কালোয়াৎ বলে নাম করতে পারতে। কিন্তু এমন তোমার আহাম্মকি যে গান বাজনা বন্ধ করে বসে আছ। কাপ্তেনী করে বেড়িয়ে কি খাতির পাবে? লোকে পালটা হাসবে তোমায় দেখে; কারণ তারা তোমার হাঁড়ির হাল জানে। রইস লোক তোমাকে কেউই ভাববে না, যতই না তুমি সাজ-পোষাকের বাহার দেখাও! এখনো শোধরাবার সময় আছে।'

জান মহম্মদের তীব্র তিরস্কারে এবার কাজ হল। এমন মোক্ষম বাক্যে ভাবান্তর ঘটল জমিরুদ্দিনের। একটি কথাও জান মহম্মদকে বলতে পারলেন না। মনের মধ্যে ওলটপালট হয়ে গেল সব। নিজের গলদ চোখের সামনে যেন জ্বলজ্বল করে উঠল। জমিরুদ্দিন মাথা হেঁট করে চলে গেলেন বিনা জবাবে।

সেই দিনই কলকাতায় মসিদ খাঁকে চিঠি পাঠালেন। তালিম নেবার যেন ব্যবস্থা করা হয় বদল খাঁর কাছে। এবার আর কোন গলতি হবে না।

মসিদ খাঁ পত্রপাঠ গেলেন বদল খাঁর কাছে। বদল খাঁ তখন মেছুয়াবাজারে থাকতেন। তাঁর কাছে মাফ চাইলেন পুত্রের জন্যে। তাঁকে তালিম দিতে রাজি করালেন। আর গান-বাজনায় অমনোযোগী হবে না জমির। তার ভার যেন ওস্তাদজী নেন।

এবার কলকাতায় এসে কথা রাখলেন জমিরুদ্দিন। বদল খাঁর কাছে দস্তুরমত খেয়াল গানের তালিম নিতে লাগলেন। কঠোর পরিশ্রমে রিয়াজ আরম্ভ করলেন। বদল খাঁর নির্দেশে চলতে লাগল তাঁর খেয়াল-চর্চা।

এবার জমিরুদ্দিনের একনিষ্ঠ অধ্যবসায় দেখা গেল। এমনিভাবে [illegible] দশ বছর তিনি তালিম নিলেন ব[illegible] খাঁর। বালক বয়সে ধ্রুপদী পিতার কাছে বছর দুয়েক শিখেছিলেন। তারপর এতদিন শিখলেন বদল খাঁর কাছে।

এইভাবে জমিরুদ্দিনের সংগীত-জীবনের প্রস্তুতি হল। বাংলাদেশে বিশেষ করে কলকাতায় তিনি স্থায়ী হবার মনস্থ করলেন। তাঁর পিতাও এখানে বাস কর-ছিলেন আম্বালার ডেরা উঠিয়ে দিয়ে। জমিরুদ্দিন সপরিবারে কলকাতাবাসী হলেন।

এখানে যখন তিনি ওস্তাদ বদল খাঁর তালিম পাচ্ছিলেন তখন সংগীতাসরে বহু প্রসিদ্ধ হয়ে অবস্থান করছিলেন মৌজুদ্দিন।

তাঁর ঠুংরি দাদরাও জমিরুদ্দিন অনেকদিন শোনেন। তাছাড়া মৌজুদ্দিনের তালিম পাওয়া জদ্দন বাই কিংবা আরো শিল্পীদের ঠুংরিও তিনি শুনতেন কলকাতায়। ক্রমে জমিরুদ্দিন ঠুংরি দাদরা গানে বেশি মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হলেন। এই

সুষমাময়ী গীতিরীতির চর্চা আরম্ভ করলেন স্বভাবের বশে। এমনি নানা সূত্রে সঞ্চয়ে আপন প্রেরণায় ও চেষ্টায় জমিরুদ্দিন ঠুংরি দাদরার গায়কও হলেন। ওস্তাদ বদল খাঁর খেয়াল তালিমের অতিরিক্ত তাঁর এই ঠুংরি দাদরার চর্চা।

পেশাদার জীবনের প্রথম দিকে কলকাতার বাইরে, বাংলার অন্যান্য অঞ্চলেও গুণপনা দেখান। যেমন ঢাকা বা রাজশাহী জেলায়। ঢাকার নবাব হবিবুল্লা বাহাদুর তাঁকে স্বর্ণপদক দিয়ে পুরস্কৃত করেন। ওই জেলার বলদার জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ রায়-চৌধুরীর স্বর্ণপদকও লাভ করেছিলেন তিনি। (রাজশাহীর) পুঁটিয়ার রানীর ভ্রাতার সংগীতশিক্ষকও কিছুদিন থাকেন। পরবর্তী জীবনেও জমিরুদ্দিন আসর করতে গেছেন রাজশাহীতে। একবার পাখোয়াজী ভগবান দাসের স্মৃতি উৎসবে সেখানে তাঁর গান গাইবার কথাও জানা যায়।

তবে সংগীতজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর কলকাতাই হয় তাঁর শিল্পীজীবনের বিচরণক্ষেত্র।

তিনি যখন এখানে প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেন, তার আগেই মৌজুদ্দিন চিরবিদায় নিয়ে গেছেন। কালক্রমে তাঁরই আসর পেয়ে গেলেন জমিরুদ্দিন। আগে থেকেই ত তিনি খেয়াল অঙ্গের সঙ্গে ঠুংরি চর্চা আরম্ভ করেছিলেন। এবার ঠুংরি দাদরা অবলম্বনেই তাঁর সংগীতজীবন আরো পুষ্পিত হয়ে উঠল নব নব সৌন্দর্যে, সার্থকতায়।

আসরের শিল্পী থেকে ক্রমে গ্রামোফোন রেকর্ডে আত্মপ্রকাশ করতে লাগলেন। রেকর্ড জগতে প্রসিদ্ধ হয়ে আমন্ত্রিত হলেন বেতার কেন্দ্রে। কলকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের প্রথম যুগ থেকেই জমিরুদ্দিন একজন জনপ্রিয় গায়ক বলে পরিচিত হলেন।

আর গ্রামোফোনের জগতে জমিরুদ্দিন একজন নেতৃস্থানীয় হয়ে থাকেন। সংগীত-শিক্ষক ও সংগীত-পরিচালকের ভূমিকা হয় তাঁর। নানা শিল্পীদের তিনি শিক্ষা দিয়ে গঠিত করে দিতেন। তাঁর নিজেরও কিছু সংখ্যক গানের রেকর্ড হয়েছিল এইচ-এম-ভি ও মেগাফোন থেকে।

রেকর্ড সংগীতের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক ও পরিচালক থাকবার সময়েই জমিরুদ্দিনের সঙ্গে সাহিত্যিক, গানরচয়িতা হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ঘনিষ্ঠতা হয়। এ বিষয়ে তাঁর স্মৃতি-কথা থেকে আরো কিছু উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

জমিরুদ্দিনের সংগীত জীবনে গ্রামোফোনের জগৎ উল্লেখ্য স্থান অধিকার করে আছে।

একাধিক রেকর্ড প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও সংগীত পরিচালকের দায়িত্বপূর্ণ পদে দেখা যায় তাঁকে। এক্ষেত্রেও তিনি একটি স্বকীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। তা হল তাঁর সুরকারের রূপ। বহু রেকর্ডের গানে সুর-সংযোজনায় তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। আর তাও দীর্ঘকাল যাবৎ—প্রায় দশ বছর। তাঁর সংগীতজীবনে সময়টি অল্প নয়। কারণ তাঁকেও অল্পায়ু বলা যায় যেহেতু পঞ্চাশের আগেই গত হয়েছিলেন। যাই হোক, তাঁর গ্রামোফোন জীবনে দুটি বিভাগ। প্রথমে তিনি থাকেন এইচ-এম-ভিতে ও পরে মেগাফোনে। দুটি সংস্থাতেই তিনি সুরকার ও সংগীত-শিক্ষক থাকেন। এক কথায় বলা যায়—সংগীত-পরিচালক। অবশ্য এ বিষয়ে তিনি একমাত্র ভারপ্রাপ্ত না হতে পারেন। তবে তাঁর বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল গ্রামোফোনের ক্ষেত্রে। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের পূর্বোদ্ধৃত বিবরণেও তার আভাস পাওয়া যায়।

জমিরুদ্দিন ১৯২৮ সাল থেকে এসেছিলেন রেকর্ডের জগতে। তারপরই এইচ-এম-ভিতে অন্যতম সুরকার ও সংগীত শিক্ষক হন। তাঁর শিক্ষায় এই সংস্থা থেকে রেকর্ড করেন ইন্দুবালা, আঙ্গুরবালা, বীণাপাণি, আব্বাসউদ্দিন প্রভৃতি গায়ক-গায়িকা। তাঁদের সেসব গানই ছিল হিন্দী ও উর্দু।

জমিরুদ্দিন তারপরে ১৯৩০ থেকে মেগাফোন প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। সেখানেও তাঁর একই ভূমিকা। সেই পদে থেকে অনেক শিল্পীর গান রেকর্ড হয় তাঁর শিক্ষায় ও সুরসংযোজনায়। মৃত্যুর কিছুকাল আগেও জমিরুদ্দিন গ্রামোফোন সংস্থায় যুক্ত ছিলেন।

বেতার প্রতিষ্ঠানে তাঁর জনপ্রিয়তা শুধু কলকাতা কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এই কেন্দ্রের নিয়মিত শিল্পী হলেও দিল্লী, লক্ষ্ণৌ ইত্যাদি কেন্দ্র থেকেও অনুষ্ঠান করেছেন তিনি। বেতারে জমিরুদ্দিন খেয়াল ও ঠুংরি দুই রীতির গানই শোনাতেন।

আর ঠুংরি দাদরার জন্যেই ত তাঁর বিশেষ জনপ্রিয়তা। আসরে গানের সময়ে তাঁর মুদ্রাদোষশূন্য হাবভাব। মনোহারী গায়ন রীতি। সুমিষ্ট কণ্ঠের মীড় মোচড়ে সূক্ষ্ম কারুকর্ম। গীত-শিল্পী জমিরুদ্দিনের নানা সংগীতগুণে শ্রোতারা মুগ্ধ হতেন।

মৌজুদ্দিনের এক উত্তরসূরী জমিরুদ্দিন। শুধু সংগীতের ক্ষেত্রেই নয় ব্যক্তি-জীবনে অর্থাৎ জীবনযাত্রাতেও তাঁর অভিরুচি, ধরণধারণ ছিল মৌজুদ্দিনের মতন। জমিরুদ্দিনের শেষ অধ্যায়ের কথায় সে প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে এসে যায়। আর মনে হয়, কি সুখেরই হত এমনি শুধু আলোকের ঝর্ণাধারায় সে জীবনে যবনিকাপতন হলে। ছায়ানটের আবরণ তার উন্মোচন করতে হত না। গায়কের জীবন-পরিণতি হতে পারত অন্য প্রকার। হয়ত আরো দীর্ঘস্থায়ী গৌরবে মণ্ডিত। কিন্তু শিল্পী জমিরুদ্দিনের দুর্ভাগ্য! সংগীতজীবনে এই প্রতিষ্ঠা, যশ, উপার্জন ও সৌভাগ্যের অন্তরালে আবার ফিরে আসে তাঁর প্রথম যৌবনের চরিত্রশৈথিল্য। কিংবা হয়ত তলে তলে তা অলক্ষিত আকারে ছিল। এখন প্রকট হয়ে উঠল পুনরায় সেই অসংযত ইন্দ্রিয়তন্ত্রতা। এবার তা পানদোষ ও অন্যান্য দুষ্ট আনুষঙ্গিকের সঙ্গে তাঁর চারিত্রিক অবনতি ঘটাতে থাকে। প্রশ্ন হতে পারে—সংগীতশিল্পীর সে অন্ধকার দিকের পরিচয়ে কি প্রয়োজন? শিল্পীর জীবনকাহিনীতে তাঁর অবগুণের প্রসঙ্গ কেন?

তার কারণ সে তমসায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় শিল্পগুণ। তা হয় শিল্পীর অকাল প্রয়াণের উপলক্ষ্য। উত্তরকালের সংগীত-সেবীদের শিক্ষণীয় হতে পারে সে বৃত্তান্ত। বিপরীতে প্রশ্নও করা যায়—শিল্পী কেন আপন সত্তায় পাবেন না সৃজনশীলতার প্রেরণা? কেন বাহ্য উত্তেজক বস্তুর প্রয়োজন হবে সেজন্যে? কেন নিজের অন্তরে জাগবে না শিল্প-সৃষ্টির পাবক? কেন কুশ্রী কামনার ইন্ধন?

[illegible] মতম গীত-শিল্পীর [illegible] এ-সব জিজ্ঞাসা জাগে। [illegible] অপরিনীহিত।

[illegible] অনুরাগী পার্শ্বচর— [illegible] জমিরকে ঘনিষ্ঠভাবে [illegible] তাঁর সঙ্গে যেতেন নানা আসরে [illegible] সম্বর্ধিচত্তে—এই সব [illegible]

'খাঁ সাহেব গলায় না ঢাললে কখনোই গান গাইতে পারতেন না। আসরে যাবার আগে হয় বাড়ি থেকে খেয়ে যেতেন, নয়ত সেখানে থাকত সে বন্দোবস্ত। গ্রামোফোন অফিসে অনেকটা সময় থাকতেন বলে একটি পুরো বোতল নিয়ে যেতেন। আর ফিরতেন সেটি খালি করে। তবে তাঁর এসব ব্যাপার কেউ টের পেত না। এমন কি রেডিওতে গাইতে যাবার সময় পকেটে থাকত ভরা শিশি। রোজ সকালে উঠেই খেতে বসতেন লোকে যেমন চা খায়। ওঃ খুব ভোগ করে গেছেন। রাত্তিরে ত প্রায়ই বাড়িতে থাকতেন না। বেশির ভাগ কাটত হেম-নলিনীর সঙ্গে।'

'হেমানলিনী কে? গান শিখতেন তাঁর কাছে?'

'না না। হেমনলিনী কোন গায়িকা নয়। ওইসব পাড়ার একজন নামকরা মেয়ে-মানুষ। চিৎপুর রোড থেকে যে মসজিদ বাড়ি স্ট্রীট আরম্ভ হয়েছে তার মধ্যে ঢুকে ডান দিকে বাড়ি ছিল হেমনলিনীর। সেখানে খাঁ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে অনেককেই যেতে হত। ওসব দিকে খুব যাওয়া-আসা ছিল জমিরুদ্দিনের।'

'কি অসুখে তাঁর মৃত্যু হয়?'

'লিভার পচে ফেটে গিয়েছিল। অনেক দিনের অভ্যাস ত ছাড়তে পারেন নি। ডাক্তার বার বার সাবধান করে দেন। কিন্তু কোন ফল হয়নি শেষ পর্যন্ত।'

সাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখনীতে জমিরুদ্দিনের দোষেগুণে সুস্পষ্ট একটি চরিত্র-চিত্রণ পাওয়া যায়। গ্রামোফোন কাম্পানিতে তাঁদের দুজনের কথা উদ্ধৃত করা হয়েছিল হেমেন্দ্রকুমারের কাছে তাঁর রচিত গান নিয়ে যাবার প্রসঙ্গে। সেই সূত্র ধরে হেমেন্দ্রকুমারের স্মৃতিচারণের বাকি অংশ এখানে দেওয়া হল: 'একদিন জমির আমার বাড়িতে এসে হাজির। আমাকে কয়েকটি উর্দু গান শোনালেন। গানের কথাগুলি কাগজে টুকে নিয়ে আমি বললুম, হপ্তা-খানেক পরে এসে গান নিয়ে যেও।'

জমীর বললেন, আমি কেবল গান নিতে আসবো না, সেদিন আপনাকে ভালো করে গান শুনিয়েও যাবো। শুনতে পাই আপনার বাড়িতে প্রায়ই গানের আসর বসে [illegible] গাইয়েরা আসেন কিন্তু কোন-দিনই তো আপনি এই গরীবকে স্মরণ করেন না।

জমীরের কণ্ঠে অভিমানের সুর। বললুম, ভাই, বড় গাইয়েদের অনেকেই আমার এখানে এসে গান গেয়ে যান বটে তবে তাঁরা আসেন দয়া করে কেবল ভালো-বাসার খাতিরে। কিন্তু তোমাকে ডাকি কেমন করে, উচিত-মতো দক্ষিণা দেবার ক্ষমতা তো আমার নেই।

জমীর বললেন, কেন দাদা আমিও কি আপনাকে ভালোবাসতে পারি না? আমি কি কেবল টাকার খাতিরেই গান গাই? মনের মতো সমঝদার পেলে টাকার কথা আমার মনেও ওঠে না। এবার থেকে আমিও এখানে গান গাইতে আসবো। কেবল আমাকে একটু রঙ্গীন করে দিলেই চলবে, রঙ্গীন না হলে আমার গান খোলে না।'

তাঁর কথার অর্থ বুঝলুম। তিনি চান সুরাদেবীর প্রসাদ।

আমি হাসতে হাসতে বললুম, বেশ তাই হবে।

তারপর থেকে আমার বাড়িতে হতে লাগলো জমীরুদ্দিনের ঘন ঘন আবির্ভাব। এক একদিন কোন খবর না দিয়েই তিনি এসে পড়তেন এবং সেদিন নিজেই কোন ভালো তবলচীকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন। আসর বসতো সন্ধ্যার সময়ে এবং রাত দুটো কি তিনটের আগে সে আসর আর ভাঙতো না। কোন কোন দিন অন্যান্য গায়করাও থাকতেন এবং শ্রোতার সংখ্যাও বড় কম হতো না। আবার এক-একদিন শ্রোতা হতুম আমি একলাই কিন্তু তবু জমীরের উৎসাহের অভাব হতো না কিছুমাত্র। জ্যোৎস্নাপুলকিত গঙ্গার কল-কল্লোলের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তিনি স্তব্ধ নিশীথের বুকের ভিতরে ঢেলে দিতেন গানের পর গানের ধারা। রাত যত বাড়ে তত বাড়ে সুরার মাত্রা এবং তত বাড়ে তাঁর গাইবার উৎসাহ। কিন্তু এ উৎসাহ মদ্যপের উৎসাহ নয়, এ হচ্ছে শিল্পীর উৎসাহ। নিজেই তিনি ডুবে যেতেন যেন গীতরসধারার মধ্যে। প্রচুর মদ্য পান করেছেন পা টলছে তবু কোনদিন কিছু বেচাল দেখিনি কোনদিন তাল কাটেনি গলা বেসুরো বলেনি।

কিন্তু যে কোন শিল্পীর পক্ষেই মদ্য হচ্ছে দারুণ অভিশাপের মতো। বিশেষতঃ যাঁদের কণ্ঠসঙ্গীত নিয়ে কারবার তাঁদের তো মদ স্পর্শ করাই উচিত নয়। জমীরুদ্দিনের যথেষ্ট সঙ্গীত প্রতিভা ছিল বটে কিন্তু সুরার বিষ নিশ্চয়ই তাঁর দেহের ভিতরটা জীর্ণ করে দিচ্ছিলো ধীরে ধীরে।

একদিন দুপুরবেলায় তিনতলার বারান্দায় বসে রচনা কার্যে নিযুক্ত আছি, হঠাৎ একতলা থেকে জমীরের গলার সাড়া পেলুম—'দাদা দাদা।'

আমি তাকে উপরে আসতে বললুম। তিনি উপরে এলেন কিন্তু কি মূর্তি! অস্নাত চেহারা চক্ষু স্ফীত প্রায় দাঁড়াতে পারেন না, এমন অবস্থা।

বিস্মিত হয়ে বললুম, ব্যাপার কি জমীর?

তিনি ধপাস করে বসে পড়ে বললেন কাল রাতে একটা বড় মাইফেল ছিল, আমার মাত্রা বড় বেশি হয়ে গেল। তারপর সকাল থেকে খাচ্ছি, এখন আপনার এখানে আবার খেতে এসেছি।

আমি বললুম মাপ করো ভাই জমীর তা হয় না। দেখছ ত আমি লিখছি, তোমাকে নিয়ে আমি এখন ব্যস্ত হতে পারবো না।

বাড়ির সামনেকার গঙ্গার দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে জমীর চুপ করে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে চলে গেলেন।

ভেবেছিলুম জমীর রাগ করে আর আমার বাড়িতে আসবেন না। কিন্তু আমার সে ধারণা ভুল। [illegible]তা দুই পরে আবার তাঁর আবির্ভাব। ওষ্ঠাধরে মিষ্ট হাসি, দুই চোখে প্রীতির ভাব।......

......তার অল্পদিন পরেই খবর পেলুম জমীর আর ইহলোকে নেই। এমন একজন উদারপ্রাণ শ্রেষ্ঠ শিল্পীর অকাল মৃত্যুর প্রধান কারণ যে অতিরিক্ত মদ্যপান সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।' (যাঁদের দেখেছি। পৃষ্ঠা ১৬৯—১৭২)

মোজদ্দিনের এই উত্তরসূরীর মৃত্যু হয়েছিল ১৯৩৯ সালে। শেষ জীবনে থাকতেন রাজাবাজার অঞ্চলে।

জমীরুদ্দিনের একমাত্র পুত্র আবদুল করিমও চমৎকার গায়ক হয়ে ওঠেন। তাঁরও প্রতিভা বেশি প্রকাশ পায় খেয়ালের চেয়ে ঠুংরি দাদরা গানে। পিতার তালিমেই তিনি গায়ক হন। তাঁর ডাকনাম ছিল বালি। জমিরুদ্দিন ৩০ মুসলমান পাড়া লেনে একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে-ছিলেন। বালি ছিলেন তার পরিচালক। সুন্দর সুকণ্ঠের জন্যে বালিও যশস্বী হতে আরম্ভ করেন সঙ্গীতজগতে। কিন্তু তাঁরও একই কারণে অকাল মৃ[illegible] ঘটে যায়।

হেমেন্দ্রকুমার [illegible] পুস্তকে সে প্রসঙ্গেও উল্লেখ করেছেন যথাযথ: জমীর প্রায়ই আমাকে বলতেন, দাদা আমার ছেলেও খুব ভালো গাইতে শিখেছে। বেটা বাপের নাম রাখবে। আপনাকে তার গান একদিন শুনিয়ে দেবো।

জমীরের জীবদ্দশায় তাঁর পুত্রের গান আর শোনা হয়নি। কিন্তু বছর তিন আগে একটি আসরে তাঁর গান শুনেছিলুম। অনেকটা বাপের মতোই চেহারা, গলা ও গাইবার ঢং। অল্পদিনেই সে বেশ নাম কিনেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তরুণ বয়সেই সে পিতার সঙ্গীতপ্রতিভার সঙ্গে পিতার দুর্বলতার উত্তরাধিকারী হয়েছিল। অতিরিক্ত মদ্যপানে সেও আজ পরলোকে। ...(ঐ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৭২)।

জমিরুদ্দিন তবু ৪৮ বছর পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। কিন্তু বালির আয়ু শেষ হয়ে যায় ৩০ বছরেই।

এমনিভাবে পিতাপুত্রের অমৃত ঠুংরি-ধারা গরলে হারিয়ে গেল।

—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

উপন্যাস

প্রভাত দেব সরকার

রাজার রাজা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বাবার সামনে আপিসের বড়বাবুকে বসে থাকতে দেখে বিকাশ মনে মনে বিরক্ত হল। পাশ কাটিয়ে ভিতরে যাবার চেষ্টা করলে।

অনন্তবাবু আন্তরিক হবার বাসনায় বললেন, এই যে বিকাশ, এই ফিরলে—অনন্তবাবুর কথাটা ঠিক যেন আপিসের এ্যাটেনডেন্স নেওয়ার মত, দশটা না দশটা পাঁচ তার কৈফিয়ৎ এখানেও।

অনন্তবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কোথাও গিয়েছিলে নাকি?

আরো বিরক্ত হল বিকাশ, ইচ্ছে করলো মুখের ওপর বলে সে-খবরে আপনার দরকার কি! তাড়াতাড়ি কি করতে তাদের বাড়ীতে এসেছেন? বন্ধুরা যা বলে শেষ পর্যন্ত তাই কি সত্যি হল? কি নির্লজ্জ ভদ্রলোক সত্যি সত্যি এসেছেন বিনা নিমন্ত্রণে!

বিকাশ দৃপ্ত কণ্ঠে বললো, হ্যাঁ, আপিসের র‍্যালীতে গিয়েছিলুম—ময়দানে মিটিং ছিল।

অনন্তবাবু এর পর কি বলবেন যেন ভাবতে খানিক সময় নিলেন, ইতিমধ্যে অবনীবাবু বললেন, তোদের আপিসেও র‍্যালী হয়, আমাদের-দাবী মানতে হবে বলে মিছিল করে?

অনন্তবাবু আক্ষেপ করলেন, আর বলেন কেন, আজকাল সব আপিসই সমান! কথায় কথায় আপিস বন্ধ নয় মিছিল, হৈ-হৈ চেঁচামেচি! জ্বালাতন!

বিকাশ বললে, আপনাদেরও তো যাবার কথা ছিল, আপনারা কেউ যান নি, দিব্যেন্দু বলছিল বড়োরা সব পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়েছে! সে তুলনায় আপনাদের বঙ্কিমবাবু ভাল, ভদ্রলোক এখনো ইংরেজের নামে হাত তুলে নমস্কার করেন, কিন্তু আপিসের মিটিং-এ ঠিক এসেছিলেন। বক্তৃতাও দিয়েছেন।

সরকারী আপিসে দাবী আদায়ের জন্যে মিটিং যেন একটা মজার ব্যাপার, একটা ছেলে-খেলা, অনন্তবাবু রহস্য করে বললেন, বঙ্কিম দাস বক্তৃতা দিয়েছে? বল কি! কি বললে আমাদের বঙ্কিম?

ভালই বললে। বললেন যে-সব লোক আপিসের ইউনিয়নে যোগ দেবে না, বা বা পালিয়ে বেড়াবে তাদের চিনে রাখতে হবে—ব্ল্যাক সিপ! তারা জানুক সবার মত না চললে সমূহ ক্ষতি! দিন বদল হয়েছে!

ক্ষতি মানে! অনন্তবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, মারবে নাকি?

বিকাশ বললে, মার নয়, একঘরে করবে বলেছেন!

অনন্তবাবু রেগে বললেন, করুক! কে একঘরে হয় তাই দেখা যাবে। বঙ্কিম বললো আর তাই অমনি ফললো। কত কাজের লোক সব জানা আছে!

অবনীবাবু ছেলেকে বললেন, তুই-ও ঐসব করচিস নাকি? সেদিন যে বললি, আপিসের ঝামেলায় মধ্যে তুই যাস না?

বিকাশ কোন উত্তর দিলে না। অনন্তবাবু বললেন আমিও তো অবাক! কখনো ভাবিনি বিকাশের মত ছেলে এইসব এ্যাজিটেশনের মধ্যে যাবে! কি হে বিকাশ তোমার ব্যাপার কি?

কিছু নয়। সবাই যাচ্ছে, আমিও যাচ্ছি, সবাই শ্লোগান দিচ্ছে আমিও দিচ্ছি, এতে দোষ কি হয়েছে?

অনন্তবাবু বোঝাবার মত করে বললেন, না না ও-সবের মধ্যে তুমি থেকো না। তার চেয়ে সময় করে আপিসের পড়াশোনা কর! যত সময় নষ্ট করবে তত তোমার ক্ষতি! সময়ে না করলে, আর কখনো পারবে না—সব জিনিসের টাইম-ফ্যাক্টর আসল জিনিস!

অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কি হলো মিটিং-এ? তোদের আবার কি দাবী!

বিকাশ যেন বিরক্ত হয়ে বললে, সবার যা আমাদেরও তাই, বাঁচবার মত মাইনে, ভদ্রলোকের মত সার্ভিস কন্ডিশন।

অনন্তবাবু মনে মনে বিদ্রূপ করে বললেন, দাবীর কি শেষ আছে! সময়ে আপিসে আসবো না, ইচ্ছে মত কাজ করবো, যা করবো তার কোন কৈফিয়ৎ দেব না, বড়-ছোট মানবো না, মাসে মাসে মাইনেটা ঠিক নেব!

বিকাশ উত্তরে কি বলবে ভেবে পেল না, ভদ্রলোক নিছক তার বাড়ীতে এসেছেন, না হলে আজ মুখের-মত শুনিয়ে দিত—

দিব্যেন্দু ঠিকই বলে এইসব বড়োগুলো যত দালালি করে, অফিসারদের কান কামড়ায়!

বিকাশ বললে, সুবিধে হলে তখন আপনারাও ভোগ করবেন। ইচ্ছে মত কি, কারো হুকুম মত কাজ হয় তখন বুঝে নেবেন!

অবনীবাবু ছেলের বিরূপ মনোভাব যেন বুঝতে পারলেন, তাড়াতাড়ি বললেন, যাও-ও তুমি ভেতরে যাও, আমি এঁর সঙ্গে আলাপ সেরে নেই।

কি আলাপ সে তো বিকাশ আন্দাজ করতে পেরেছে। শুধু সংকোচ ভরে কিছু বলতে পারছে না। যেতে যেতে শুনতে পেল, অনন্তবাবু তার বাবাকে বলছেন, বিকাশ কিন্তু এ-সবের মধ্যে ছিল না, ওর বন্ধুগুলোই দেখছি ওর মাথাটা খেয়েছে! সরকারী আপিসে এসব করে কি হবে, মাঝখান থেকে ব্ল্যাক লিসটেড!

অবনীবাবু বললেন, আজকালকার ছেলে-ছোকরা কি বলবো বলুন; দেশে কি যে ঢেউ উঠেছে বলবার নয়।

অনন্তবাবু বললেন, আমি যদ্দিন আছি বিকাশের অবশ্য কোন ভয় নেই, কিন্তু বেশি যদি কিছু করে তখন—

অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের আপিসে কি ছিল আজ?

অনন্তবাবু উড়িয়ে বললেন, কিছু নয়! কি সব ইউনিয়ন করেছে তার মহড়া হচ্ছে—কদিন ধরে আপিসে টিকতে দিচ্ছে না, টিফিনের সময় চেঁচাচ্ছে!

অবনীবাবু বললেন, সব জায়গায় গন্ডগোল!

অনন্তবাবু বললেন, ভাল কথা মনে পড়েছে বিকাশকে বারণ করবেন সে যেন এমাসে পে বয়কট না করে! আরে পে বয়কট করলে খাবি কি, তাও যদি জানতুম একেবারে বয়কট করতিস, পয়লা মাইনে নিবি না, দোসরা তো নিবি! সব জানা আছে কার কেমন অবস্থা, এক তারিখের পর দু তারিখেই কাবলীর কাছে ছুটতে হবে!

অবনীবাবু চুপ করে রইলেন, মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হলেন, অফিসের এত ব্যাপার বিকাশ তাকে কোনদিন কিছু

দেন নি, আগামী মাসের পয়লা মাইনে নেবে না সে কথাও জানায় নি। আর মাত্র দু'দিন আছে মাস কাবার হতে। শেষটা বিকাশও কি এইসব গণ্ডগোলের মধ্যে জড়িয়ে পড়ল, আপিসে রাজনীতি আরম্ভ করল! অবনীবাবুর বিশ্বাসে কেমন যেন আঘাত লাগল। অন্তর থেকে বিকাশকে তিনি আলাদা করে রেখেছিলেন, দরকার হলে ভেবেছিলেন তার ওপর নির্ভরও করবেন।

অনন্তবাবু বললেন, আপনি একটু বুঝিয়ে বলবেন, তারপর আমি ম্যানেজ করবো। বড়সাহেব লোক ভাল, আমার কথা শোনেন।

অবনীবাবু বললেন, আপনাদের সাহেব কি বাঙালী?

না, মাদ্রাজী! বাঙালী হলে তো আরো মুশকিল হত! বাঙালীই তো আজকাল বাঙালীর সর্বনাশ করছে! চোখের ওপর দেখতেই পাচ্ছেন কি সব হচ্ছে! দেশটাকে একেবারে রসাতলে না দিয়ে ছাড়বে না! অনন্তবাবু তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলেন।

আজকাল শুনি কোলকাতার কোন সরকারী আপিসে বড়সাহেব বাঙালী নন! কি ব্যাপার বলুন দেখি?

অনন্তবাবু মুখ এগিয়ে নিয়ে বললেন, বাঙালীদের বারোটা বেজে গেছে! অল ইণ্ডিয়া কম্পিটিশনে দাঁড়াতে পারছে না। মাথা হতে গেলে মাথার মত যোগ্যতা চাই তো!

অবনীবাবু চুপ করে রইলেন। এ-সব আপিসের পলিটিকস-এর মধ্যে বিশেষ তিনি যোগ দেন না। চল্লিশ বছর মার্চেন্ট আপিসে কাজ করে যা বুঝেছেন তাতেও ঐ বাঙালীকে যেন সবাই মিলে এক-ঘরে করে দিতে চায়—একটা অনুচ্চারিত অসহযোগের বার্তা যেন চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বাঙালীর সম্বন্ধে একটা ঘৃণার জেহাদও যেন আপিস পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সরকারী আপিস বে-সরকারী আপিস সর্বত্র এক কথা : বাঙালী? কেবল রাজনীতি করে। কাজ করে না! এক কথায় ওয়ার্থলেস!

অনন্তবাবু বললেন, আজকালকার ছোকরাদের তাই তো বলি, বাবা ও-সব ছাড় নিজের কাজ কর, পরীক্ষা দাও ওপরে উঠে যাও!

অবনীবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, আপনিও তো আপিসের পরীক্ষা দিয়েছিলেন?

অনন্তবাবু মুখ নীচু করে বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের সময় এত স্কোপ ছিল না, পাশ করা অনেককে বসে থাকতে হয়েছিল বিশ বছর করে! এখন তো অনেক স্কোপ, আপিস বাড়ছে, পাঁচ-সাত বছরেই অফিসার!

অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আপনার রিটায়ার করতে আর কত দেরী আছে?

বেশ যেন ক্ষুণ্ণ মুখে অনন্তবাবু বললেন, আর তিন বছর, তাই তো সাহেবকে সেদিন বললুম—

কথাটা সম্পূর্ণ হলো না, অবনীবাবু উঠে অন্দরের দরজার কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ নিয়ে এসে অনন্তবাবুর সামনে রাখলেন। অনন্তবাবু হা-হা করলেন, না না, এত রাত্তিরে আবার চা কেন!

অবনীবাবু গ্রাহ্য করলেন না, আবার হাত বাড়িয়ে খাবারের প্লেট এনে সামনে রাখলেন। এবার অনন্তবাবু আরো আপত্তি করলেন, না না, একি কি করছেন! খাবার-দাবার আবার কেন!

অবনীবাবু বললেন, কিছু না সামান্য, অনেকক্ষণ—আপিসের পর—

উভয়ের মধ্যে অপ্রস্তুত ভাবটা যেন কেমন থমকে গেল। অনন্তবাবু ইতস্তত করলেন, ভদ্রলোকের সৌজন্য এবং আপ্যায়নে খুশী হলেন। মনে মনে ভাবলেন যে জন্যে এসেছেন তা সফল হবে। এখন জলযোগ সহযোগে আসল কথাটা পাড়লে কেমন হয়। আপিস নিয়ে বিকাশের চাকরির ভবিষ্যৎ নিয়ে তো অনেক কথা বললেন। হয়তো আত্মীয়তার শুভানুধ্যায়ীর ভাবটা ঠিকই প্রকাশ করতে পেরেছেন মনে হল। এবার কাজের কথাটা বলবেন কিনা ভেবে সিঙ্গাড়ায় কামড় দিলেন।

অবনীবাবু বললেন, আপনি আছেন একটু দেখবেন, আপিসের পরীক্ষা যাতে দেয় বলবেন।

আমি তো রাত-দিন বলছি, ওসব বাজে কাজে মাথা না ঘামিয়ে কাজের কাজ কর বাবা! আমার শ্বশুরমশাই-ও আমাকে বলতেন, দেখ বাজে সময় নষ্ট না করে আপিসের পড়া পড়, কেরানীদের মত তাহলে মাছি-ভ্যান-ভ্যান করতে হবে না! বলতে নেই একটু আগে থেকে যদি শুনতুম তাহলে এ্যাদ্দিনে কবে অফিসার হয়ে যেতুম। সেই পরীক্ষা দিলুম, পাশও করলুম, কিন্তু বড্ড লেট হয়ে গেল! শ্বশুরমশাই দেখে যেতে পারলেন না!

অবনীবাবু চুপ করে ভদ্রলোকের কথা শুনতে লাগলেন।

অনন্তবাবু বলতে লাগলেন, সব জিনিসের একটা সময় আছে, মানে সুযোগ কখনো ছাড়তে নেই! তা পর বয়েস হয়ে গেলে সংসারের কত ঝামেলা তখন কি আর একজামিন টেকজামিন ভাল লাগে!

অবনীবাবু বললেন, আপিসের কথা ও বড় একটা বলে না! কি হয় না হয় জানতেও পারি না। যাহোক আপনি আছেন, আমার ভাবনা নেই! দেখবেন।

সে আর বলতে, আমি সব সময় ওয়াচ রাখছি। বড়সাহেবকে বলে রেখেছি—

এর মধ্যে আবার বড়সাহেবকে বলবার কি আছে অবনীবাবু ভেবে পান না। ভদ্রলোক যেন বিকাশ সম্বন্ধে অতি উৎসাহী, তাহলে কি এই জন্যে এসেছেন, বিকাশের 'ওয়েল উইসার' হিসেবে বলতে এসেছেন আপিসের বর্তমান আবহাওয়ার সঙ্গে যেন ও না মেশে, গার্জেন হিসেবে তাঁর অবহিত হওয়া উচিত!

না, সে-সব কিছু নয়। অবশেষে আসল কথাটা অনন্তবাবু ব্যক্ত করলেন। চা খেয়ে রুমালে মুখ মুছে বললেন, যদি অভয় দেন তো হলে বলি, মানে আপনার কাছে আমার প্রার্থনা—

বেশ সবিনয় ভনিতা শুনে, অবনীবাবু কি বলবেন না বলবেন ভেবে পেলেন না।

অনন্তবাবু ঢোঁক গিলে বললেন, প্রার্থনা মানে আমার বড় মেয়ের সঙ্গে আপনার বড় ছেলে মানে বিকাশ-আ-আ-শ—

অনন্তবাবু প্রস্তাবটা সম্পূর্ণ করবার আগে বাধা পেলেন, বিকাশ উত্তেজিতভাবে ঘরে ঢুকে অবনীবাবুকে ডেকে ভেতরে নিয়ে গেল। অনন্তবাবু কেমন হয়ে গেলেন হঠাৎ হাত ফসকে কিছু পড়ে যাওয়ার মত।

অনন্তবাবু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন, ঠিক বুঝতে পারছেন না ব্যাপারটা কি, দরজার ওপারে কি ঘটেছে যার জন্যে ঝড়ের বেগে বিকাশ ঘরে ঢুকে বাপকে ডেকে নিয়ে গেল। নাকি বিকাশ চায় না অনন্তবাবু তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করুন?

অবনীবাবু ফিরে এলেন। বেশ গম্ভীর গম্ভীর মনে হল ভদ্রলোককে।

অনন্তবাবু উসখুস করে বললেন, আমি বলছিলুম আপনি যদি মত করেন তা হলে শুভ কাজটা [illegible] শীঘ্র সেরে নেওয়া যায়—

অবনীবাবু বললেন দেখুন এ-সব ব্যাপারে আপনাকে [illegible] কি মত দেব বলতে পারছি না, আজকালকার ছেলে সব, ওদের পছন্দ অপছন্দ রুচি আছে, ওরা এ-ব্যাপারে কি বলবে না বলবে জানি না। তবে আপনার কথা আমি বাড়ীতে বলবো, ছেলেকেও বলবো—আমার দিক থেকে কোন কোন ত্রুটি হবে না।

অনন্তবাবু বললেন, সে তো বটে, সে তো বটে! তবে আপনার কথাই থাকবে সে আমি জানি, আপনি যা মত করবেন—

অবনীবাবু ম্লান হেসে বললেন, না সেদিন চলে গেছে! আপনি আমি যা করেছি এরা তা করবে না!

অনন্তবাবু বললেন, তা যা বলেছেন, দিনকালই পাল্টে গেছে। তখন বাবা-মা ঠিক করলেই হতো, কানা হোক খোঁড়া হোক কালো হোক, তাঁদের মতই ফাইনাল। আজকাল মেয়ে দেখানর ব্যাপারটাও কত লং-ড্রন প্রসেস বলুন—বাড়ীর লোক দেখল, পাড়া-পড়শী দেখল, পাত্র দেখল, পাত্রর বন্ধুরা দেখল, মানে একটা প্যারেড আর কি বলুন! উঃ, মেয়েকে কম জায়গায় দেখিয়ে তবে পাত্রস্থ করা যায়! এদিকে মুখে তো কত কথা বলা হয়, কত আইন-কানুনও হয়েছে, পুরোন জিনিস আরো যেন জটিল হয়ে ফিরে এসেছে, সমাজের

বুকে চেপে বসেছে! শুধু কি পছন্দ, আজকাল আরো দাবী-দাওয়ার কথা উঠেছে!

অবনীবাবু রহস্য করে বললেন, আমাদের দাবী মানতে হবে!

অনন্তবাবু হাসলেন, যা বলেছেন! একদিক থেকে আপনি বাঁচোয়া—ভগবান আপনাকে মেয়ে দেন নি, দুটি ছেলে ব্যস-স! (আপনি তো রাজা লোক!)

ঠিক ঐ ইঙ্গিতটা হয়তো অনন্তবাবু করেন নি, কিন্তু অবনীবাবু কি ভাবলেন, বললেন, না মশাই রাজা আমি হতে চাই না, যেমন গরীব আছি তেমনি গরীব থাকবো, ছেলের বিয়ে দিয়ে বড়লোক হবার বাসনা নেই।

অনন্তবাবু তাড়াতাড়ি নিজের উক্তির সংশোধন করে বললেন, না না সে কথা আমি বলিনি, বলছি মেয়ে থাকার অনেক জ্বালা! পাঁচ পাঁচটা মেয়ে কি যে করবো ভেবে পাচ্ছি না, চাকরির মেয়াদও ফুরিয়ে এসেছে, কি যে করি—

অবনীবাবুর একটু যেন মায়া হল, বললেন, ঠিক আছে, আমি বাড়ীতেও বলে দেখি কি হয়, আপনাকে জানাবো।

অনন্তবাবু উঠে পড়লেন, হাত জোড় করে বললেন, দয়া করে একটু দেখবেন! মেয়ে আপনার অপছন্দ হবে না, আপনাদের অযোগ্যও হবে না! লেখাপড়া খুব একটা না করলেও সংসারের সব কাজ জানে,

শ্বশুর-শাশুড়ি দেওর ননদ সবার সংগে মিলে মিশে থাকতে পারবে, সে বিষয়ে উনি খুবই শিক্ষা দিয়েছেন।

অবনীবাবু সদর দরজার গোড়া পর্যন্ত এলেন, অনন্তবাবু ঘুরে দাঁড়িয়ে কাতর কণ্ঠে বললেন, দেখুন আমার ছেলে নেই, জামাই আমার ছেলের মত, আমার সাধ্য মত চেষ্টা করবো—সাহেবকে বললো আমি রিটায়ার করলে যেন—

হঠাৎ বুঝি ভদ্রলোক পায়েই পড়ে যান, অবনীবাবু দু' পা পিছিয়ে এসে বললেন, আহা কি করছেন, না না, এ ভারি অন্যায়—

অনন্তবাবু ভগ্ন স্বরে বললেন, আপনি কথা দিন, অনেক আশা করে এসেছিলুম—

ঠিক ঠিক আছে! অবনীবাবু ভদ্রলোককে ঘরের বাইরে এনে বললেন, আমি বলবো! আপনি বাড়ী যান!

অনন্তবাবু বোধহয় বুঝলেন একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। আজকাল কেনা-বেচার ব্যাপারটা আর পায়ে-পড়া কি হাতে ধরার অপেক্ষা রাখে না। গলির মোড়টা যেন ছুটে পেরিয়ে এলেন অনন্তবাবু। পিছন থেকে বিকাশের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, বাবা! বাবা!...

এখন নন্তুকে নিয়েই যত ভাবনা। তার একটা বন্ধু এসে খবর দিয়ে গেছে আজ সে বাড়ী ফিরবে না। কোথায় গেছে, কি করছে, বন্ধুটি বলতে পারলে না। কেবল বলে গেল নন্তু বাড়ী আসবে না।

এই সংবাদে নন্তুর মা বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়েছেন, বিকাশ বিরক্ত হয়ে মাকে বোঝাচ্ছে বাড়ী আসবে না যখন বলেছে তখন ভাবনার কি আছে। যা পারে করুক, যেখানে খুশি থাকুক!

ছোট ছেলের সম্বন্ধে ভাবনাটাকে ঠিক ওভাবে উড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। রাতে বাড়ী না ফেরার মানে-টা ভয়ংকর একটা দুশ্চিন্তার কারণ সে কথা উমাশশী কি করে বোঝাবেন।

জেরা অবশ্য অবনীবাবু করেছিলেন নন্তুর পরিচিত ছেলেটাকে, কিন্তু তাতে নিভাবনা হবার কারণ বিশেষ খুঁজে পান নি। ছেলেটা একেবারে বেহেড অবাধ্য হয়ে গেছে। কি এমন দরকার পড়ল যে বাড়ী ফেরবার কথা ভুলে গেল। ও ছেলে একটা কান্ড করে বসবে দেখছি! মনে মনে জানলেও অবনীবাবু স্থির হতে পারলেন না বার দুয়েক রাস্তায় এসে ঘুরে গেলেন। সেই গাছতলায় এসে দাঁড়ালেন।

এক সময় বিকাশ রাগ করে বললে, শুনলে সে আসবে না, তবু তুমি বাইরে গিয়ে বার-বার দাঁড়াচ্ছ কেন! এতে ও আরো পেয়ে বসে!

অবনীবাবুও রাগ করে বললেন, ও একলা কেন সবাই পেয়ে বসে। তুমিও কি কম করলে?

বিকাশ বললে, কেন আমি আবার কি করলুম?

অবনীবাবু বললেন, আপিসে গোলমাল করচো, নিজের পায়ে কুড়ুল মারচো!

সে আবার কি! বিকাশ অবাক হয়ে বললে।

বড় হয়েছ তোমাকে নতুন করে কি বোঝাব! ঐ স্ট্রাইক-মাইক র‍্যালী-ফ্যালী করা কি এখন তোমার উচিত?

বিকাশ কোন সাড়া করলে না। বাপের সামনে থেকে সরে গেল। খেতে বসতে উমাশশী এক কান্ড করে বসলেন, বিকাশের হাত ধরে বললেন, বাবা তুই এ-সব কি করচিস! তুই-ই আমাদের আশা-ভরসা তোর ওপর নির্ভর—

কেন কি করছি? মার হাত ছাড়িয়ে বিকাশ বিরক্তির সুরে বললে।

আপিসে গোলমাল করচিস, মিছিল করচিস! ঐ যে ভদ্রলোক কি সব বললেন! বিরক্তির মধ্যে হেসে বিকাশ বললে, ভদ্রলোক তো আসল কথা বলে গেছেন! তোমার বউ করতে এসেছিল!

ভাল তো! ছলছল চোখে উমাশশী বললেন।

নির্লজ্জ বেহায়া কোথাকার, মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিতে পারলে না! মেয়ের বিয়ে! ননসেন্স কোথাকার! বিকাশ যেন ফেটে পড়ল।

অবনীবাবু বললেন, তোমাদের মত ভদ্রতা শিখিনি, তাই দরজাটা মুখের ওপর বন্ধ করে দিতে পারি নি!

তা কেন, ওর কি রাইট আছে আমাদের বাড়ী আসবার! কে বলেছে ওকে আসতে? বিকাশের রাগ যেন কমে না।

অবনীবাবু বললেন, বড় হও বুঝবে, মেয়ে থাকলে আরো বুঝবে।

মার কিন্তু এসব আলোচনায় মন নেই। ছোট ছেলের বাড়ী না-ফেরার জন্যে তিনি বিশেষ আতঙ্কগ্রস্ত উদ্বিগ্ন এবং চিন্তিত। কোথায় গেল নন্তু? রাতে কোথায় রইল? কি দরকার পড়ল?

বড় ছেলের বউ-এর কথা ভাবতে ভাবতে আবার যেন, তার চাকরির ভবিষ্যতের চিন্তা তাঁকে পেয়ে বসে। এই ছোট ছেলে, এই বড় ছেলে, এই তার সংসার সব যেন জড়াজড়ি করে তার মনের মধ্যে চেপে বসে।

উমাশশী এক সময় বললেন, তোর যদি চাকরি যায়, আপিসের সাহেব—

বিকাশ উড়িয়ে দিয়ে বললে, চাকরি অমনি গেলেই হলো! বড়সাহেব কি করবে?

উমাশশী বললেন, যাইহোক তুই তোর বড়বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিস! ভদ্রলোক বলছিলেন—

রাখ রাখ যত সব দালালদের কথা! মেয়ে গছাবার জন্যে মাতব্বরি করছিলেন! তোমরাও অমনি ভয় পেয়ে গেছ দেখছি—

অবনীবাবু বললেন, ভয় কি আর সাধে পাই, তোমাদের ধরন-ধারণ দেখে ভয় পেতে হয়! সরকারী আপিসে চাকরি করচো সেখানেও গোলমাল পাকাচ্ছ! অনন্তবাবু অন্যায় কি বলেছেন?

গোলমাল কি কেবল আমাদের আপিসে, সব সরকারী আপিসেই এ্যাজিটেশন সুরু হয়ে গেছে। শুধু সরকারী বলাস তো আর কর্মচারীদের পেট ভরে না! সেই ব্রিটিশ আমলের মত আমলারা, ওপরে বসে শুধু ঘুস আর স্বজন-তোষণ পোষণ করছে! কেরানীরাই যত দোষের ভাগী হচ্ছে!

এসব কথা কোনদিন ছেলের মুখে শোনেন নি অবনীবাবু। মনে করতেন ছেলে তাঁর মাথা গুঁজে কাজ করে, ডিউটিফুল! আজ এ-সব কথা কি বলছে বিকাশ! অনন্ত-বাবুর কথাই ঠিক, ছোকরার বন্ধুরা ওর মাথা বিগড়ে দিয়েছে! নন্তুর সঙ্গে তাহলে তফাৎ রইল কি, লেখাপড়া শিখে চাকরি করে সেই একই মনোভাব?

যারা মিছিল করে দাবী জানায়, আপিস কারখানায় কাজ বন্ধ করে দেয়, কথায় কথায় মারধোরের (violence) ভয় দেখায় তাদের অবনীবাবু পছন্দ করেন না। ক বছরে বিশৃঙ্খলা যেন কেবল বেড়েই চলেছে, মানা-মানি বাধাবাধি সব চলে গেছে, ছোটবড় উঠে গেছে। কি দিনকাল!

আর তর্ক করে লাভ নেই! ন্যায়-অন্যায় বোধ এখন ভিন্ন। ছেলেদের একরকম, বুড়োদের একরকম! গত তিন-চার বছরে যেন অবস্থাটা উল্টে গেছে। এই সেদিনের কথা, কোথাও কিছু নেই চারদিকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো, কত গুলি-গোলা চললো, পোস্ট-অফিস রেল তছনছ হয়ে গেল। তার ফলও দেখা গেল কংগ্রেস ক্ষমতা পেল না। সেই অশান্তির শুরু, এর কবে যে শেষ কেউ বলতে পারে না।

এই কি পরিবর্তন? এই কি ভাল-হওয়ার নমুনা? সূচনা?

অবনীবাবু খেতে খেতে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন—নিত্য অভাবের মধ্যে এই অশান্তি কি করে সহ্য করবেন ভাবতে পারলেন না। আপিসের আন্দোলনে যদি বিকাশের চাকরি যায়, কি ক্ষতি কিছু হয় সংসার চালাবেন কি করে? বিকাশ কি সে-কথা একবারও ভাবছে না? নন্তুর মত ও-ও বেপরোয়া হয়ে গেল?

কেন তোর ভাবনা কি? তুই তো সরকারী চাকরি করচিস, দুধ-ভাত না হোক ডাল-ভাতের তো ব্যবস্থা হয়েছে, চাই কি চেষ্টা করলে চাকরিতে উন্নতি করতে পারিস, তবে কেন নিজের পায়ে কুড়ুল মারচিস? হুজুগে মাতচিস? ন্যায়, অধিকার ইত্যাদির ভুয়ো কথায় নিজের সর্বনাশ করচিস? তোরা সরকারী কর্মী তোদের কি অমনি সাধারণের মত রাস্তায় নামলে চলে? না না ওসব করিস নি!

কথাগুলো মনে মনে উচ্চারণ করলেও বিকাশের মুখের ওপর অবনীবাবু কিছু বলতে পারলেন না। নীরবে পিতাপুত্র খাওয়া শেষ করে উঠে গেল।

সংসারের কাজকর্ম চুকিয়ে উমাশশী বিকাশের ঘরে এসে কেঁদে পড়লেন: তুই একবার দেখ ছেলেটা কোথায় রইল, কি করলো?

বিকাশ বিরক্ত হয়ে বললে, আমি কি দেখবো! এই রাত্তিরে কোথায় খুঁজবো? কচি ছেলে নাকি?

মা চোখ মুছে বললেন, তুই তো জানিস কোথায় যায় কার সঙ্গে মেশে—সেখানে দেখ না!

না জানি না, সে কি বলে কোথায় যায় কি করে। মাতব্বর হয়ে গেছে! এখন আর আমায় নিয়ে চলে না! দেখগে যাও কোথায় কাদের সঙ্গে মিশে বিপ্লব করছে!

সে কি রে! কবের সঙ্গে মিশছে, কই তুই তো বলিস্ নি?

আমি কি বলবো, আমার কথা কি শোনে! সভা-সমিতি এখন বাবুর পছন্দ নয়! মরুক যা পারে করুক! তোমার এত ভাবনার কি আছে! করুক না বিপ্লব—টের পাবে—বাপ বাপ করে ফিরে আসবে!

উমাশশী খুব কাঁদতে লাগলেন।

বিকাশ শেষপর্যন্ত ভাইকে খুঁজতে রাত দুপুরে বাড়ী থেকে বেরুল। পাড়া নিস্তব্ধ হয়ে গেছে, পথ-কুকুরগুলো পর্যন্ত চুপ হয়ে গেছে। মোড়ের মাথায় আলো জ্বলছে নিরানন্দ পাহারাদারের মত। মোড় পেরিয়ে খানিকটা এসে থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে বিকাশের মনে হল যেন ঘুমের ঘোরে নতুন কোন জায়গায় এসে পড়েছে। বই-এ পড়েছিল sleep-walking! আশ্চর্য, চেনা জায়গাটা নিশীথ নিস্তব্ধতার মধ্যে কেমন অচেনা অচেনা লাগছে, গা-ছম-ছম করছে! সবই ঠিক ঠিক চেনা যাচ্ছে আবাল্য-পরিচিত পরিবেশটা, তবু নির্জনতায় রাত্রির গভীরতার নিঃসঙ্গতার ঘুমন্ত পাষাণপুরীর মত রহস্যময় মনে হচ্ছে। নিজেকে সচেতন এবং সপ্রতিভ করবার জন্যে বিকাশ ফুটের ওপর উঁচু ল্যাম্প পোস্ট ছুঁয়ে চোখ ফিরিয়ে মনে মনে হিসেব করলে, এই তো রাম পালের কয়লার দোকান, ঐ পতিতপাবনের মুদিখানা অমূল্য শা'র রেশনের দোকান! মাংসের দোকানটা কোথায় গেল? মকবুল বোধহয় রাত্রে দোকানে থাকে না! পাড়ায় মাংসের দোকান খোলা নিয়ে খুব হাঙ্গামা হয়েছিল, মাংস খেতে হিন্দুরা ভালবাসলেও মুসলমান মাংসওলাদের সম্বন্ধে বিশেষ ভয় আছে হিন্দুদের! (সন্দেহ করে পাঁটি-ছাগলের সঙ্গে অখাদ্য-কুখাদ্যও কখনো কখনো চালান দেয়!)

বাজারের কাছে এসে বিকাশ যেন বেঁকে দাঁড়াল। না সে যাবে না—কেন যাবে? মা বললেই অমন হলো! সে-ই বা কম কিসে! মা-বাবার তার সম্বন্ধে তো কই ভয় নেই? সেকি কোনদিন নন্তুর মত বাড়ী না-ফেরার ভয় দেখাতে পারে না?

নন্তু নিজের দর বাড়াচ্ছে, দেখাচ্ছে কি বড় নেতা হয়েছে! বিকাশ মুখে ফুৎকার দিলে! মুখখু চেংড়া কোথাকার! বাবা-মাকে ভয় দেখিয়ে লীডারি করছে!

বিকাশ ফিরলো। কিছু নয়, মা'র শুধু শুধু ভয়! অমূলক! ওঁরা স্নেহান্ধ এবং সেই জন্যে অকারণে ভীত! কি যোগ্যতা আছে সমাজবিরোধী বা রাষ্ট্রবিরোধী কিছু করার নন্তুর।

বরং সে-ই কিছু করতে পারে। দিব্যেন্দু বলেছে আপিসের ইউনিয়নে তাকে সাধারণ সম্পাদক করে দেবে, নেক্‌সট ইলেকশনে তাকে দাঁড় করাবে। দিব্যেন্দু যা বলে তাই করে! মনে মনে বিকাশ যেন ছুটতে থাকে—আজ মাঠের মিটিং-এ দিব্যেন্দু বেশ বলেছে—সংগ্রাম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে, জুজুর ভয় কাটাতে হবে কেবল আঘাত করতে হবে—strike!-strike!

উঃ সেকি উত্তেজনা বোধ করেছিল! যেন নতুন এক জীবনে প্রবেশ করেছে। বিকাশও ইউনিয়নের একজন হতে চায়।

মাঝখান থেকে অনন্তবাবুটা এসে সব মাটি করে দিলে। কি দরকার ছিল তোর মাতব্বরি করবার। বয়ে গেছে তোর মেয়েকে বিয়ে করার। আপিসের ছেলেগুলো ঠিক বলে দাঁড়-কাক! ওর মেয়েকে আমি বিয়ে করবো? রামঃ!

অন্যদিন হলে মা নিশ্চয়ই এই নিয়ে যত কথা বলতেন। ভাগ্যিস নন্তু বাড়ী ফিরবে না বলেছিল! খুব ফাঁড়া গেছে!

কিন্তু......একটু যেন নিজের মনে ইতস্তত করলে বিকাশ। আজও মাঠে সেই মেয়েটি এসেছিল, বিকাশ ঠিকই লক্ষ্য করেছে—সব আপিস থেকে এক এক করে মিছিল এসে মাঠে জড় হচ্ছে, মেয়েটি পাশ কাটিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। বিকাশ জানে মেয়েটি কোনো আপিসে কাজ করে না। প্রতিদিন মাঠে আসা ওর একটা অভ্যাস বোধহয়।

বিকাশ ভেবেছিল মিটিং-এর পরে আর দেখা হবে না। কিন্তু না, কি আশ্চর্য মেয়েটি যেন তার জন্যেই অপেক্ষা করে এক-মানুষ উঁচু একটা গাছতলায় দাঁড়িয়েছিল। দূর থেকে কি ভাবলে বিকাশ, চোখটা নামিয়ে নিলে পায়ের গতি মন্দ করলে। তারপর যেন বাসের জন্যে অপেক্ষা করছে, ভাব করলে।

মেয়েটি এগিয়ে এসে যেন কত পরিচয় এমনিভাবে বললে, বাস ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে! ঘাড় ফিরিয়ে চোখ তুলে বিকাশ কেমন যেন হয়ে গেল, মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না।

মেয়েটি সপ্রতিভ কণ্ঠে বললে, যাবেন কি করে?

বিকাশ মৃদুকণ্ঠে বললে, হেঁটে আর কি! মুশকিল!

আমাকে সঙ্গে নেবেন? তেমনি সপ্রতিভ মেয়েটির কণ্ঠস্বর।

বিকাশ না বলতে পারেনি, মন্ত্রমুগ্ধের মত সাথে সাথে পথ হেঁটে এসেছিল।

মেয়েটির নাম মালবিকা, বাবা নেই, মা নেই উপস্থিত বেকার বড় ভাই-এর আশ্রয়ে আছে। কোথায় যেন এক কারখানায় ভাই কাজ করতো, সে কারখানা অনেকদিন লক্-আউট হয়ে আছে। ভাই-এর সংসার আছে বউ আছে, দুই ছেলেমেয়ে আছে? কারখানা কবে খুলবে কে জানে? এদিক ওদিক থেকে দু'চার পয়সা যা রোজগার করে তাতেই সংসার চলে।

কিন্তু কি সে রোজগার, কেমন সে রোজগার! বিকাশ জিজ্ঞেস করেনি। আরো কথায় বিকাশ যা বুঝেছিল তাতে মনে হয়েছে, দাদার বেকারত্বে মেয়েটি পলিটিক্যালি খুব সচেতন। তাকে খুশী মনে হয়েছে সদাশিবের মিনিস্ট্রী চলে যেতে। একটা ওলোট-পালোট আশা করছে।

আশ্চর্য বোধ করেছিল মালবিকার মুখে বর্তমান রাজনীতির কথাবার্তা শুনে! তার জানাশোনা কোন তরুণীকে বিকাশ এ ধরনের কথাবার্তা বলতে কখনো শোনেনি। মেয়ে-ছেলে হলেও কোন যুবক বা প্রৌঢ়ের চেয়ে তা কম দৃঢ়তাব্যঞ্জক নয়। মালবিকা বলেছে রাজ্যপাল অন্যায় করে একটা প্রতিষ্ঠিত সরকারকে বরখাস্ত করেছে, দেশে জনগণের মতকে অগ্রাহ্য করে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করেছে।

বিকাশের মনে হচ্ছে যেন বর্তমান পরিস্থিতিকে সংগ্রামের পথে চালিত করবার জন্যে মালবিকা মাঠে-ঘাটে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিকাশ জানে না আর কেউ তার মত মেয়েটিকে লক্ষ্য করছে কিনা, তার সান্নিধ্য লাভ করে তার দুঃখের কথা শুনেছে কিনা।

বেশ ঘৃণার সঙ্গে একসময় মালবিকা বলেছিল, জানেন ইচ্ছে করে আমরা সবাই মিলে সব পুড়িয়ে ছারখার করে দিই। কি দরকার আছে এই সমাজের যেখানে মানুষ কাজ পায় না, খেতে পায় না, চুরি করে জোচ্চুরি করে—

বিকাশ যা ভেবেছিল মেয়েটি একেবারে তা নয়। সাহায্য হিসাবে টাকা দিতে চাইতে অস্বীকার করে মালবিকা বলেছিল, একদিন আমাকে সাহায্য করে আমার কি দুঃখ আপনি ঘোচাবেন।

ঠিক বোঝা যায়নি মেয়েটিকে, তবে লেগেছে আবার কেমন সন্দেহও হয়েছে, সেই দ্বিতীয় দিনের সাক্ষাতের কথাটা কানে এখনো বাজছে ঃ তাহলে আমি চেঁচিয়ে লোক জড় করতুম! বলতুম......

কে জানে এমন কোন অপরিচিত যুবতী অপরিচিত কোন যুবকের মিলন-আগ্রহকে এভাবে ব্যঙ্গ করতে পারে কিনা।

হ্যাঁ, সাহায্য বিকাশ করতে চায় কিন্তু কিভাবে তা এখনো তাকে ভেবে ঠিক করতে হবে। উভয়ের মধ্যে আরো দেখাসাক্ষাতের আশা রাখে সে।

নন্তুকে খোঁজার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে নির্জন নিস্তব্ধ পথে বাড়ী ফিরতে ফিরতে বিকাশের মনে হল, মালবিকাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলে কেমন হয়, এ সাহায্য নিশ্চয়ই মালবিকা প্রত্যাখ্যান করবে না!

বাড়ী ফিরে তারপর নিজের ছেলেমানুষী, আজগুবি চিন্তায় বিকাশ খানিকটা হেসে নিলে।......

রোজ অফিসের টিফিনের সময় আধ ঘণ্টা করে গেট মিটিং আর শ্লোগান দেওয়া হচ্ছে। দিব্যেন্দুর সঙ্গে বিকাশও বক্তৃতা দিয়ে বর্তমান অসহনীয় অবস্থায় কথা বলছে। তারা একটা সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

অনন্তবাবু বিকাশকে প্রতিনিবৃত্ত করবার চেষ্টা করেছেন। বলেছেন এসব ছেলেমানষী করে কোন লাভ নেই! শ্লোগান মিটিং মিছিল সরকারী আপিসের জন্যে নয়! কর্তৃপক্ষ এখনি কিছু বলছে না বটে, কিন্তু যখন বলবে তখন আর ফেরান যাবে না। সব হেড আপিসে রিপোর্ট হচ্ছে।

বিকাশ কোন জবাব দেয়নি। আর কি বলবে সে ভদ্রলোককে—মুখের ওপর তো বলতে পারে না, আপনার দুর্ভাবনার কোন কারণ নেই বা নিজের চরকায় তেল দিন। বুড়োদের একজনও তাদের এ্যাজিটেশনে যোগ দেয়নি।

তাছাড়া বিকাশের ভারি লজ্জা করে অনন্তবাবু যখন তার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন—বন্ধুরা কি ভাবছে—এত লোক থাকতে তার জন্যে ওর এত ভাবনা কেন? সম্বন্ধের কথাটা বন্ধুরা জেনেছে কিনা কে জানে। ভদ্রলোক আচ্ছা মুস্কিলে ফেলেছেন!

বাড়িতে অবশ্য অনন্তবাবুর মেয়ের সম্বন্ধে কোন কথা হয়নি। অনন্তবাবু নাকি অবনীবাবুকে চিঠি দিয়েছেন, মেয়ে দেখতে যাবার জন্যে অনুরোধ করেছেন: উমাশশী এখন ছোট ছেলের ব্যাপার নিয়ে চিন্তিত বলে বড়ছেলের বিয়ে নিয়ে উৎসাহ বোধ করছেন না। অবনীবাবুকে মেয়ে দেখে আসতে বললেও কোন জেদ করেননি। অবনীবাবু বলেছেন বিকাশের বিয়ে করার মত না জানা পর্যন্ত তিনি অগ্রসর হবেন না। উমাশশী চিঠি পাওয়ার খবরটাই জানিয়েছেন কিন্তু বিকাশকে পেড়াপিড়ি করেননি। নন্তুই সব গোলমাল করে দিয়েছে। সংসারের ভারসাম্য নষ্ট করেছে!

বিকাশ লক্ষ্য করেছে এই ক'মাসে মা যেন কেমন নির্জীব নিরুৎসাহ জড় মত হয়ে গেছেন। কোন কিছুতে যেন তাঁর আর সেই আগের মত আগ্রহ নেই। নন্তু আজকাল প্রায়ই বাড়ী ফেরে না। বাবা মা-ভাই-এর সঙ্গে তার যেন কোন সম্পর্ক নেই। বিকাশ কিছু বললে জবাব দেয় না।

আপিসের উত্তেজনার পর বাড়ী এসে বিকাশের যেন আর ভাল লাগে না। কোনরকমে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ে, সকালে উঠে আবার আপিসে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়। অবনীবাবুও খুব গম্ভীর হয়ে আছেন, বেশ বোঝা যায় ছেলেদের সম্পর্কে তিনি যেন হাল ছেড়ে দিয়েছেন। যা পারে ওরা করুক!

এদিকে নিজের কার্যকলাপ এবং ভাবগতিকে পর্যালোচনা করে বিকাশ যেন উত্তেজনা বোধ করে। আপিসে যে ভয়-ভয় ভাবটা ছিল, এই কয়েকদিনের উত্তেজনায় তা একেবারে গেছে। নিজের মনে বেশ একটা আত্মসচেতন ভাব এসেছে। মনে হচ্ছে এই জীবন, এই তার কর্তব্য! এখন আপিসের অনেক ব্যাপারে অন্যায় অবিচার সে দেখতে পায়! সেই প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক যেন আপিসে ছোটবড় কর্মীর মধ্যে! সাহেব নামে এখনো পুজো চলছে! আপিসের বসবার জায়গা বা আসন ছোটবড়র পদ হিসেবে তৈরী। যিনি বড় সাহেব তার ঘরে তিনখানা পাখা, উঠে হেঁটে শুয়ে বসে থাকবার জন্যে অঢেল জায়গা, আর যারা কেরানী তাদের প্রতি দশজনের জন্যেও একটি পাখা নেই, বসবার জায়গাও দেড়-হাতের কম, ছোট ছোট টেবিল, হাতলভাঙ্গা চেয়ার; বড়সাহেবের মাথায় পাখা, পেছনে পাখা, পাশে পাখা, টেবিল-টেনিস খেলার মাপে টেবিল, অগুনতি চেয়ার, ঝকঝকে আলমারি সোফা-কোচ ডিভান দিয়ে সাজান ঘর! দিবা-নিদ্রার জন্যে আরাম কেদারা!

দিব্যেন্দু সেদিন খুব বলেছে একজন অফিসারকে। অফিসারটি সেকশনে এসে আরো দু-চারটি কেরানীকে গুঁজে দেবার চেষ্টা করেছিলেন।

দিব্যেন্দু বলেছিল, এসব কি পেয়েছেন! দেড়হাত জায়গার মধ্যে আরো লোক ঢোকাতে চান? আমাদের কি মনে করেন গরু-ছাগল? হোলডঅল পেয়েছেন, যত ইচ্ছে মাল ঢোকাচ্ছেন!

কথাটা নিয়ে খুব হৈ-চৈ হয়েছিল, সাহেবদের মারফৎ বোধহয় বড় সাহেবের কানে পৌঁছেছিল। কেয়ারটেকার ছুটে এসে ঠান্ডা করেছিল।

বিকাশের দুঃখ নন্তু তার সংগ্রামী মনোভাবের কোন খবর পেল না, জানতে চাইল না, প্রয়োজনে বিকাশও রাজনীতি করতে পিছপাও না। চাকরি করে বলে সে কারো দাসখৎ লিখে দেয়নি! তার মধ্যেও বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে—

এই বছরখানেক নন্তু যেন হঠাৎ কেমন হয়ে গেছে। পার্টি নিয়ে আর হৈ-চৈ করে না—সবসময় চুপ-চাপ থাকে। কে জানে ভেতরে ও কি মতলব করছে! ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে বিকাশ আলোচনা করতে চেয়েছিল, নন্তু সাড়া দেয়নি।

বেশ গম্ভীর হয়ে নন্তু বললে, কেঁদে-কেটে যে দাবী আদায় তার মেয়াদ বেশিদিন নয়, আবার কাঁদতে হবে দাবী আদায়ের জন্যে, দাবীও মিটবে না, কাঁদাও ঘুচবে না!

ডেমোক্রেসীর এই তো পথ! আন্দোলনের অধিকার সবার আছে, তাকে কান্না বলে না।

নন্তু জোরের সঙ্গে বললে, বাঃ! আজ পাঁচ টাকা চাইবো, কাল ঐ ছিঁচকাঁদুনে আন্দোলন করে হয়তো তিন টাকা পাবে, কিন্তু সত্যিকারের কোন অধিকার পাবে না! অধিকারের জন্যে ক্ষমতা চাই সে ক্ষমতা ডেমোক্রেসি দেবে না! কেড়ে নিতে হবে ক্ষমতা!

বিকাশ বড় ভাইয়ের বিজ্ঞতায় বললে, তুই কি বলছিস? ক্ষমতা কাড়ার মানে কি জানিস?

নন্তু বললে, যা জানি তাই জানি, ধর্মঘট কর আর গো-স্লো কর, তোমাদের দাবী ওরা কোনদিন মেটাবে না!

না বললেই অমনি হল! দেখে নিস মেটায় কিনা!

নন্তু হাসলে, বিকাশ চটে গিয়ে বললে খুব মাতব্বর হয়েছিস বুঝতে পারছি, পেটে কিছু থাকলে আর এমনি করে [illegible] চাকতিস না!

নন্তুও রেগে বললে, ভারি [illegible] শিখেছ তার ফল তো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে! গণতন্ত্র গণতন্ত্র করে চীৎকার করেছো, এদিকে সব ফাঁক হয়ে গেল! তোমাদের তো পেটের আন্দোলন! এ গভর্মেন্টও থাকুক, তোমাদের আন্দোলনও চলুক!

আর চড় মেরে কি গাল দিয়ে ভাইয়ের মত পাল্টান যাবে না। বিকাশের স্থির বিশ্বাস ভাই তার সর্বনাশের পথে নেমে গেছে, মাথাটা একেবারে সাফ হয়ে গিয়েছে।

(ক্রমশঃ)

আর্থিক প্রসঙ্গ

অর্থনীতি ও রাজনীতি

শেষ বয়সে প্লেটো সখেদে উক্তি করেছিলেন : দার্শনিকরা রাজা নন আর রাজারাও দার্শনিক হন না। উক্তিটির মর্মার্থ হল : গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার যাঁদের ওপর তাঁরা কোনমতেই দার্শনিক-পর্যায়ভুক্ত বা বোদ্ধা নন; অপরদিকে যাঁরা দার্শনিক বা বোদ্ধা তাঁদের ওপর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার কখনও অর্পিত হয় না। আজকের দিনে যখন রাজনীতি ও অর্থনীতি পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তখন যে-কোন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের অন্তর্নিহিত অর্থনৈতিক তাৎপর্য থাকতে বাধ্য। অর্থনীতিকে যখন রাজনৈতিক অর্থনীতি—পোলিটিক্যাল ইকনমি—বলে অভিহিত করা হত তখনকার চেয়ে বর্তমানে এই তাৎপর্যের পরিমাণ ও পরিধি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ, আজকের দিনের অর্থনীতিই সত্যি সত্যি রাজনৈতিক অর্থনীতি— বিশ্লেষণ-ব্যবস্থা-মডেলের কোন দামই নেই যদি না রাষ্ট্রনেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ না হয়। আর সমর্থ হবে কিনা তা মোটামুটি নির্ভর করে রাজনীতির ওপর। ফলে রাষ্ট্রনেতারা রাজা আর নেই দার্শনিক না হলেও দার্শনিকমনা হয়ে উঠেছেন—অর্থনীতিবিদ না হলেও গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে চলেছেন। পরামর্শদাতার অভাব অবশ্য নেই, তবে কোন বিশেষ পরামর্শ গ্রহণ করা হবে সে বিচারের - অর্থাৎ নির্বাচনের নিরঙ্কুশ অধিকার রাষ্ট্রনেতাদেরই। এ যেন কয়েকজন নামজাদা চিকিৎসককে ডেকে পৃথক পৃথক ব্যবস্থাপত্র নিয়ে এবং তাদের মধ্যে বাছাই করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। আবার যে-ব্যবস্থাপত্রটি বেছে নেওয়া হল তাও যে অপরিবর্তিত থাকবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই—রাজনৈতিক প্রয়োজন বা চাপে তার প্রায়ই রদবদল করা হয়ে থাকে। এই কারণেও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপত্রে লোক দিন দিন আস্থা হারিয়ে ফেলছে—সন্দেহ করছে ব্যাধি দুরারোগ্য না হলেও নিরাময়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ঠিক অনুসৃত হচ্ছে না।

বিলম্বে হলেও আমাদের দেশে সরকার বর্তমানে মূল্যস্ফীতির বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীচ্যবনের ভাষায় মূল্যস্ফীতিকে সাঁড়াশির মত দু দিক দিয়ে আক্রমণ করা হচ্ছে—একদিকে যেমন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির যোগান বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা হচ্ছে এবং অপরদিকে তেমনি টাকাকড়ির যোগান হ্রাসের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয়োক্ত ব্যবস্থার অনুসরণেই পর পর তিনটি অর্ডিন্যান্স জারি এবং সংসদে অতিরিক্ত বাজেট পেশ করা হয়েছে।

বলা যায়, বিলম্বে হলেও সমস্যার সমাধানে চিরাচরিত ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়েছে। এই চিরাচরিত ব্যবস্থা বা 'পুরাতন ধর্মের' (ওল্ডটাইম রিলিজিয়ম) উপাদান হল ক্রমাব্যয়িকতা, ঘাটতি এবং উদ্বৃত্ত বাজেট এবং টাকাকড়ির যোগান নিয়ন্ত্রণ (মনেটারী রেস্ট্রেইন্ট)। এদের মাধ্যমে ধীরে ধীরে দ্রব্যাদি ও টাকাকড়ির পরিমাণের মধ্যে সমতা এনে দ্রব্যমূল্যে স্থিতিশীলতা আনবার প্রচেষ্টা করা হয়। মূল্যস্ফীতি বলতে যদি 'অত্যল্প দ্রব্যাদির' পশ্চাতে অত্যধিক টাকাকড়ির ধাবিত হওয়ার অবস্থাকে বোঝায় তবে চিরাচরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে একদিকে দ্রব্যাদির পরিমাণ বাড়াতে এবং অপরদিকে টাকাকড়ির পরিমাণকে কমাতেই হবে। সুতরাং প্রচলিত তত্ত্বের দিক দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাই অবলম্বিত হচ্ছে—অন্তত অবলম্বিত হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তবুও কিন্তু অনেকেই সন্দেহ করছেন, এতে ফল ফলবে কি। সন্দেহের কারণ বিবিধ। অনেকের মতে, মূল্যস্ফীতি নামক অর্থনৈতিক ব্যাধির প্রকারভেদ ঘটেছে। সুতরাং নতুন দাওয়াই চাই। আর একটি অভিমত হল পুরোনো ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ বিরূপ হতে পারে—আশঙ্কাজনক মন্দা দেখা দিতে পারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যা নাকি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। কারও কারও আবার সন্দেহ হল যে সরকার ব্যবস্থা কার্যকরকরণে ঠিকমত অগ্রসর হতে পারবেনই না, কারণ জনসাধারণের সমর্থন পাবেন না। রোগী যদি চিকিৎসা-পদ্ধতিতে সহযোগিতা না করে তবে চিকিৎসকের সামর্থ্য কতদূর? শেষোক্ত সন্দেহটি বিশেষভাবে দানা বেঁধেছে কয়েকটি সাম্প্রতিক ঘটনার জন্যে। দেখা গেছে, মূল্যস্ফীতির বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত প্রতিবিধানের প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন দেশে হয়েছে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

মূল্যস্ফীতির রাজনীতি—জাপান

গত জুলাই মাসে জাপানের সংসদের দ্বিতীয় কক্ষ 'হাউস অফ কাউন্সিলারস্'-এর ২৫২টি আসনের মধ্যে ১৩০টিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অধিকাংশ দেশের সংসদের দ্বিতীয় কক্ষ বা সেকেন্ড চেম্বারের মত জাপানের হাউস অফ কাউন্সিলারস্ও মাধ্যমিক স্থানাধিকারী বা সেকেন্ডারী। তবুও কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কাকুই তানাকার উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দল (এল ডি পি) এই নির্বাচনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিল। ঐ কক্ষে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্যে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দলের পক্ষে ১৩০টির মধ্যে অন্তত ৬৩ আসনে জয়লাভ করা প্রয়োজন ছিল। দলটির পক্ষে কিন্তু তাও সম্ভব হয়নি—তারা মাত্র ৬২টি আসন দখল করতে সমর্থ হয়। এর থেকে বোঝা যায়, প্রধানমন্ত্রীর দলের জনপ্রিয়তা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

কারণ তানাকা নিজেই ব্যাখ্যা করেছিলেন। গত বছরে জাপানে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ২৩ শতাংশ। শিল্পোন্নত দেশসমূহের মধ্যে সর্বাধিক। 'এইটেই ছিল আমাদের সর্বপ্রধান সমস্যা'' তানাকা ব্যাখ্যা করেছিলেন। 'লোকে তৈল-সংকটজনিত কারণে বিভ্রান্তিতে বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছিল এবং মূল্যবৃদ্ধির দরুন তাদের ক্রোধ প্রতিফলিত হয়েছিল ভোটদান-পদ্ধতিতে।' মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আপনার সরকার কি প্রতিবিধান অবলম্বন করেছিলেন এবং তা বিশেষ সার্থক হয়নি কেন?—তানাকাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তানাকা উত্তর দিয়েছিলেন : 'মন্দার ভয়ে আমরা শিল্পগোষ্ঠীকে ঠিক চটাতে পারিনি আবার শ্রমিকক্ষোভের ভয়ে আমরা মজুরি বৃদ্ধি বন্ধকরণ (ওয়েজ ফ্রীজ) ইত্যাদির পথেও অগ্রসর হতে পারিনি। মজুরিবৃদ্ধি বন্ধকরণের ব্যবস্থা যে করিনি তার জন্যে শিল্পপতিদের অনেকে আমাদের ওপর বিরূপ হয়ে ভোট ভোগেছিলেন।'

তাহলে দেখা যাচ্ছে মজুরিবৃদ্ধির বন্ধকরণ ইত্যাদি সাধারণের অপ্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে হয়ত তানাকার দল নির্বাচনে জয়ী হতে পারত এবং আগে থেকে জানা থাকলে হয়ত তাইই করত। মোটকথা মূল্যস্ফীতি-রোধ নয়, নির্বাচনে জয়ী হওয়াই হল আসল লক্ষ্য। অর্থাৎ অর্থনীতি হল রাজনীতির পরিচারিকা।

কানাডা :

ঐ জুলাই মাসেই অর্থনীতিকে রাজনীতির পরিচর্যায় নিযুক্ত করে নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন কানাডার উদারনৈতিক দল ও তার নেতা পিয়ের ইলিয়ট ট্রুডো। আগের সংসদে ট্রুডোর দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল

না। তবুও তিনি সংখ্যালঘিষ্ঠ সরকার পরিচালনা করে যাচ্ছিলেন এখন যেমন ব্রিটেনে করছেন শ্রমিক দলের নেতা হ্যারল্ড উইলসন। শেষপর্যন্ত ট্রুডোর সংখ্যালঘিষ্ঠ সরকারের পতন ঘটলে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান ইস্যু ছিল মূল্যস্ফীতি। গত বছর (১৯৭৩-৭৪) সালে কানাডার মূল্যস্ফীতির হার ছিল ১১ শতাংশ। স্ট্যানফিল্ডের নেতৃত্বে রক্ষণশীল এই মূল্যস্ফীতি দমনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়। তাদের প্রস্তাব ছিল ৯০ দিনের জন্যে দামবৃদ্ধি ও মজুরীবৃদ্ধি বন্ধকরণ (প্রাইস অ্যান্ড ওয়েজ ফ্রীজ) নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দ ব্যবস্থা এবং অর্থব্যবস্থাকে শীতল করবার জন্যে অন্যান্য প্রতিবিধান (ইকনমিক্ট কুলিং মেজার্স) অবলম্বন।

ওয়েজ ফ্রীজের কথা শুনেই কানাডার ভোটাররা রক্ষণশীল দলের ওপর বিরূপ হয়ে ওঠে এবং এর সুযোগ নিয়ে ট্রুডো ঘোষণা করেন: আমরা ওয়েজ ফ্রীজের পথে কোনমতেই যাব না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনে এই ব্যবস্থার ফল হয়েছে বিষময়। সুতরাং আমরা জিনিসপত্রের যোগান বৃদ্ধির দিকেই দৃষ্টি দেব। এতে হয়ত মূল্যস্ফীতির গতি রুদ্ধ হবে না তবে শ্লথ যে হবে তাতে কোন সন্দেহই নেই।

মজুরীবৃদ্ধি যে রহিত করা হবে না, এই প্রচারের ফলেই ট্রুডোর উদারনৈতিক দল আগের চেয়ে ৩২টি বেশী আসন সংগ্রহ করে অটোয়ার সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে সমর্থ হয়। সুতরাং তানাকার যুক্তি মেনে নিলে এক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতির প্রতিবিধান সম্পর্কে জনপ্রতিক্রিয়া ছিল জাপানের জনপ্রতিক্রিয়ার ঠিক বিপরীত—জাপানে তানাকার দল হেরেছিল ওয়েজ ফ্রীজের ব্যবস্থা করা হয়নি বলে (অন্ততঃ তানাকার তাই ধারণা) এবং কানাডায় ট্রুডোর দল জিতেছিল ওয়েজ ফ্রীজ করা হবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

ব্রিটেন:

ব্রিটেনে গত বছর মূল্যস্ফীতির হার ছিল ১৩ শতাংশ। মূল্যস্ফীতির হার দুই সংখ্যায় পৌঁছুলেই তৎকালীন রক্ষণশীল হীথ সরকার মজুরী-নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ করে। এর দরুনই শেষ পর্যন্ত জাতীয় খনি শ্রমিক সংঘের (এন ইউ এম) সঙ্গে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং যার পরিণতি হিসেবে অনুষ্ঠিত হয় সাধারণ নির্বাচন, যে নির্বাচনে হীথ সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়।

সিঙ্গাপুর:

এশিয়ার মধ্যে জাপানকে বাদ দিলে সিঙ্গাপুরের মাথাপিছু জাতীয় আয় সবচেয়ে বেশী—১ হাজার ডলারেরও ওপরে। বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয়ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য—২০০ কোটি ডলারের মত। রপ্তানী থেকে সিঙ্গাপুরের আয় হয় বছরে প্রায় ৫০০ কোটি ডলার। আর গত বছর সম্প্রসারণের হার ছিল ১০ শতাংশ যা প্রায় সব দেশেরই ঈর্ষার বস্তু।

সিঙ্গাপুর অতি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র—জনসংখ্যা মোটে ২২ লক্ষ। এই ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রে সবকিছু প্রয়োজনীয় জিনিসই আমদানী করতে হয়। এই কারণে সিঙ্গাপুরকে আর একটি জিনিসও আমদানী করতে হয়েছে—মূল্যস্ফীতি, যাকে বর্তমানে দিনের বিশ্বজনীন ডিলেম্মা বলে অভিহিত করা হয়। ডিলেম্মা বা উভয় সংকট কেন? উত্তর: গোথ বা সম্প্রসারণের পথে চলতে গেলে সরকারী বিনিয়োগ-ব্যয়ের পরিমাণ অব্যাহত রাখতে বা বাড়িয়ে চলতে হয় এবং এর দরুনই ঘটে মূল্যস্ফীতি। এখন যদি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তবে লোকের আর্থিক আয় কমাতে বাধ্য। সিঙ্গাপুরে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বাধ্য, কারণ তার অধিবাসীরা স্বাধীনতার পর থেকে উত্তরোত্তর বর্ধমান আর্থিক আয়েই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ফলে অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে এই রকম: লোকের আর্থিক আয় হ্রাস না করে মূল্যস্ফীতি দমন করা সম্ভব হবে না, অথচ এই পথে চলা সরকারের পক্ষে বিপজ্জনক। তাই সিঙ্গাপুরের লী সরকার কিছুই করবেন না ঠিক করেছেন। সম্প্রসারণের হার যতক্ষণ মূল্যস্ফীতির হারকে অতিক্রম করে ততক্ষণ হয়ত মূল্যস্ফীতিকে উপেক্ষা করা চলে, কিন্তু গতি যদি পরিবর্তিত হয় তখন? তানাকার কথা নিয়ে লী সরকার ভাবছেন না। যাকে রাজনৈতিক দূরদর্শিতা বলা হয় তার স্থায়িত্ব বিশেষভাবে স্বল্পকালীন।

উপসংহার:

দৃষ্টান্তগুলো থেকে বোঝা যাবে যে মূল্যস্ফীতিকে নিয়ে যখন বিভিন্ন দেশে রাজনীতির খেলা চলছে তখন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এর প্রকৃত প্রতিবিধানের সন্ধান করা সম্ভব নয়। এই নিয়ে একটি বিখ্যাত বিদেশী সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে একটি চমৎকার কার্টুন বেরিয়েছে। কার্টুনটা এইরকম: চক্ষুবদ্ধ অবস্থায় সিংহাসনে বসে আছেন রাষ্ট্রনায়ক। তাঁর সামনে দক্ষিণ হস্তের তালু প্রসারিত করে দিয়েছে অর্থব্যবস্থা (দ্য ইকনমি)। তালুতে লেখা 'আমাকে বাঁচান।' চক্ষুবদ্ধ রাষ্ট্রনায়ক পেশাদারী হস্তরেখাবিদের মতই শুধু বলছেন: এবার ভাল দিন আসবে।

কার্টুন বিদেশী পত্রিকার। আমাদের দেশের হলে ব্যঙ্গচিত্রকার রাষ্ট্রনায়ককে দিয়ে হয়ত বলাতেন: মাদুলিটা দিচ্ছি পরে ফেল। ভাল দিন নিশ্চয়ই আসবে।

আর একটি ব্যঙ্গচিত্র—অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড থেকে। গভীর বনে অ্যালিস দুজন খর্বকায় বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করল: এ বনের বাইরে যাবার পথ কি? কোন উত্তর না দিয়ে বৃদ্ধ দুজন পরস্পরের দিকে চেয়ে মুচকি হাসলেন মাত্র।

ব্যঙ্গচিত্রটিতে বনটির গায়ে লেখা 'ইনফ্লেশান' আর বৃদ্ধ দুজনের গায়ে লেখা 'ইকনমিস্ট'। অর্থাৎ মূল্যস্ফীতির গভীর বন থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে পথের নিশানা চাইছে অ্যালিসরূপী সাধারণ নাগরিক জ্ঞানবৃদ্ধ বা অর্থনীতিবিদদের কাছ থেকে এবং ঐ জ্ঞানবৃদ্ধরা কোন উত্তর না দিয়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে মুচকি হাসছেন মাত্র।

মুচকি হাসা ছাড়া উপায় কি? মাদুলিতে বিশ্বাস নেই অথচ দেখছেন যে মাদুলি পরানো হচ্ছে তখন মুচকি না হেসে আর কি করবেন?

—শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

২২-৮-৭৪

অঙ্গনা

উগ্র আধুনিকতায় আমাদের সমাজজীবন

আধুনিকতার সঙ্গে সঙ্গে দু' নৌকোয় পা ফেলে চলার একটা রেওয়াজ বেড়ে গেছে। দু' নৌকোয় পা ফেলতে গিয়ে যে প্রচণ্ডতায় নৌকো দুলে ওঠে তার টাল সামলাতে সমাজজীবনে আবার যে ঝড় উঠছে তার চরিত্র ভয়ানক। বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়ের পছন্দ অপছন্দকে স্বেচ্ছায়ই মেনে নেন। মানবেন এরকম একটা মানসিকতা নিয়ে একে অপরকে গ্রহণ করেন। এমনও বহুল দেখা যায় বিয়ের পর স্বামীর ইচ্ছাকে কার্যকরী করার জন্য স্ত্রী তাঁর অনেক ভাললাগা কাজকে বিসর্জন দেন। অযথা ঝামেলা এড়াতে এবং সংসারের সুখটুকু বজায় রাখতেই স্ত্রী ইচ্ছে করেই অনেক কিছু তাঁর পছন্দকে অপছন্দকে বলে প্রকাশ করেন। আবার স্বামীর ক্ষেত্রেও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। এমনও বহু দেখা বা শোনা যায় স্বামী ভদ্রলোক ক্লাবে খেলা করে, আড্ডা দিয়ে একটু রাত করে বাড়ী ফেরার দীর্ঘদিনের অভ্যাস স্ত্রীর অনিচ্ছায় পরিত্যাগ করেন। তিনি ক্লাবে যান, খেলা করেন, আড্ডা দেন সব বজায় রেখেও যথারীতি রাত না বাড়িয়েও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরেন। যে পরিবারে পরস্পরের সঙ্গে এরকম একটা সুন্দর ও সুষ্ঠু বোঝাপড়া থাকে সেখানে ভাবনা বা অশান্তির কিছু নেই কিন্তু তার ব্যতিক্রম প্রায়ই দেখা যায়।

আজকাল ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখতে গিয়ে হোক বা কর্মস্থলে হোক সর্বত্র একসঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ পাচ্ছেন। এই মেলামেশার সুযোগের জন্য ছেলে-মেয়েরা বিয়ের ব্যাপারেও অনেক সময় নিজেদের নির্বাচন নিজেরাই করে নিচ্ছেন। যেসব ছেলেমেয়েরা নির্বাচনের কাজ নিজেরা করবার সুযোগ পান সেখানে পরস্পরকে ভালভাবে চেনা-জানা-বোঝার একটা সুযোগ থাকে। তাঁরা উভয়ে উভয়ের রুচি এবং মানসিক চাহিদা সম্বন্ধে এক মিল খুঁজে পান যার জন্য বিবাহোত্তর জীবনের প্রস্তুতি আগে থেকেই অনেকটা হয়ে যায়। অবশ্য বহু মেলামেশার পরও পাশাপাশি একত্র বসবাস করার সময়ে দেখা যায় উভয়ের মানসিকতার অনেক কিছু জানার বাকি বা পরস্পরের পছন্দ অপছন্দের বিরাট গরমিল।

বাবা-মা কন্যাকে পাত্রস্থ করার সময়ে সমান সমান ঘর-বরই নির্বাচনের পক্ষপাতী এবং বিয়েও দেন সমানে সমানে। অত্যাধুনিক ছেলের সঙ্গে খুব সরল সাদা রুচির মেয়ের বিয়ে হয় না একথাও বলা যায় না তবুও হওয়ার সংখ্যাটা স্বল্প। কিন্তু ছেলে-মেয়েদের স্বনির্বাচনের ক্ষেত্রে সমান ঘর-বরের কোন প্রশ্ন নেই। সেখানে মনের মিলটাই সর্বপ্রথম। সেই মিলেও আবেগ কাজ করে অনেকটা। যে কোন রকম প্রথায় বিয়ের আবেগের প্রথম ধাপ কেটে গেলে বাস্তবের কঠোরতায় অনেক স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের মধ্যে নানা বিরোধ দেখা যায়। যার কারণ অর্থনৈতিক হলেও সামাজিক দিকটাকেও একেবারে উপেক্ষা করা যায় না।

বিয়ের পর স্বামীর ইচ্ছাকে রূপ দিতে গিয়ে বহু স্ত্রীকে আজ পার্টি কাল ক্লাব পরশু পিকনিক। অনেক সময় স্বামীকে ছাড়াই স্বামীর বন্ধুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষা করতে হয়। স্ত্রীকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়ে স্বামীর এই ইচ্ছা কতদিন কার্যকরী থাকে? বাস্তবক্ষেত্রে তিনি কি আন্তরিকভাবে তাঁর স্ত্রীর অবাধ মেলা-মেশাকে সমর্থন করতে পারেন যতই তিনি উদার ও পশ্চিমী ঘেঁষা হন না কেন? এমন বহুল দেখা যায় স্বামীর এই ইচ্ছাকে কার্যকরী করতে গিয়ে যেসব স্ত্রীরা অবাধে স্বামীর বা নিজের বন্ধুদের সঙ্গে হৈ-হুল্লোড়ে মেতে থাকেন তাঁদের সংসারের আকর্ষণ এবং বন্ধন ক্রমশ শিথিল হতে থাকে। সংসারের প্রতি স্ত্রীর উপেক্ষাকে সোসাইটি ইচ্ছুক স্বামীও মেনে নিতে চান না তার ফলে সংসারের শৃঙ্খলা রক্ষা করা দায় হয়ে পড়ে। সন্তানেরা অবহেলিত হতে থাকে। বাবা মায়ের স্নেহ থেকে ক্রমশ বঞ্চিত হতে হতে তারাও একসময় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। মা-বাবার অনাচার তাদের রক্তে এমন-ভাবে দানা বেঁধে থাকে যে ভবিষ্যৎ জীবনে সন্তানেরাও অন্যায় ফূর্তিতে মেতে উঠতে পারে। স্বামী-স্ত্রীর দুজন না হয়ে একজন যদি উগ্র আধুনিক হন তবে অপরজনের মানসিক অবস্থাটা হয় দুর্বিষহ। একজন মহিলাকে জানি যিনি স্বামীর অনিচ্ছায় কথার ফুলঝুরি ছুটিয়ে পার্টি, ক্লাবঘরকে সব সময় মাতিয়ে রাখেন অথচ স্বামীর মেলামেশায় তাঁর দৃষ্টি অত্যন্ত সজাগ। স্বামী বেচারা স্ত্রীর মত অত দাপট খাটাতে অভ্যস্ত নন। স্ত্রীর কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ বা বিধিনিষেধ করার ক্ষমতা তাঁর নেই অথচ তিনি মনে মনে এর বিরুদ্ধে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। এই ক্ষুব্ধতার ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ বেড়ে চলেছে এবং পরবর্তী পদক্ষেপে ওঁরা যে আইনের শরণাপন্ন হবেন না একথা কখনই বলা যায় না। স্বামীর ইচ্ছাকে কার্যকরী করতে গিয়ে অনিচ্ছুক স্ত্রীকে বহু ক্লেশে অনভ্যস্ত কোমর দোলাতে হয়, এসব ক্ষেত্রেও স্ত্রীর অসন্তোষ কম নয়।

স্বামীর ইচ্ছা ছাড়াও ব্যক্তিস্বাধীনতার ধ্বজা ধরে আধুনিক বহু স্বামী-স্ত্রী আছেন যাঁরা পরস্পরের কার্যকলাপে কোন হস্তক্ষেপ করতে চান না। উভয়ে উভয়ের স্বাধীনতাকে এত বেশী প্রাধান্য দেন যে সারাদিনে পরস্পরের যোগাযোগের কোন নির্দিষ্ট সম্ভাবনা থাকে না। দুজনের অত্যধিক স্বাধীনতার ফলে স্ত্রী তাঁর ইচ্ছেমত আজ এখানে, কাল ওখানে উপরন্তু আমোদ-আহ্লাদে এত বেহিসাবী হয়ে ওঠেন তিনি যে বিবাহিতা একথা কিছুতেই স্মরণ রাখতে পারেন না। অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব, বহু সমাজসেবার কাজের নামে এমন হুল্লোড়ে মেতে থাকেন যে বাড়ী ফেরার কোন নির্দিষ্ট সময় থাকে না। আমাদের সমাজে এধরনের স্ত্রীদের সংখ্যা খুব সামান্য হলেও একেবারে বিরল নয়।

তাঁদের জীবনে সংসারের কোন মাধুর্য নেই। শুধু স্ত্রীকে স্বাধীনতা দিয়ে স্বামী ভদ্রলোক খালাস নন। এই স্বাধীনতাকেও নিজে পুরোপুরি ভোগ করার তাগিদে

তিনিও যথেচ্ছাচার করেন। কাজের অবসর-টুকুকে তিনি এমনভাবে বিনোদন করেন যে ক্লাব পার্টি তাঁর জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িয়ে গেছে। তিনি সংসারে অর্থ ঢেলে খালাস, পুরো দায়দায়িত্ব তুলে দেন অন্যদের হাতে। এভাবে চলতে চলতে সংসারের দায়িত্ব পালন করার বোধটুকু তিনি ক্রমশঃ হারাতে থাকেন। বৃদ্ধ বয়সে এ ধরনের লোকেরা যখন ফূর্তি উপভোগ করতে ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন তখন অতীতের স্বপ্নদিনের সুখী জীবনের কথা রোমন্থন করেই দিন কাটাতে তাঁরা বাধ্য। আমার এই বক্তব্য পাঠের পর স্বভাবতঃই অনেকের মনে এমন এক ধারণা হতে পারে যে আজকের দিনে শুধু খেয়ে পরে কোন-রকমে বাঁচার জন্য লড়াই-এর যেখানে অন্ত নেই, এ সময় এসব চিন্তা শুধু অবাস্তব। তবুও আমাদের সমাজের এ সমস্যা একে-বারেই উপেক্ষণীয় নয়। স্বচ্ছলভাবে জীবন ধারণ করতে না পারলে মানুষ তাঁদের অনেক আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করতে পারেন না। কিন্তু বেশী অর্থ উগ্র স্বাধীনতা আর অত্যাধিক সোসাইটিকে রক্ষা করতে গিয়ে অনর্থের শেষ নেই।

যে পরিবারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে-উভয়ের স্বাধীনতাকে পরম আনন্দে মেনে নেন সেখানে দুজনের অভিযোগ হয়তো খুব বেশী থাকে না। থাকলেও কেউ কাউকে দোষারোপ করে কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাবার কোন যুক্তি নেই। তবু সেই যুক্তি-হীনতার মাঝে ও ক্লান্তির মুহূর্তে তাঁরা যখন শান্তি চান সেটা আর পান না। ব্যক্তি-স্বাধীনতার চরম সমর্থনকারী এক দম্পতির দুজনেই যার যার নিজের বন্ধুদের সঙ্গে আজ দিল্লী কাল বোম্বে হামেশাই করছেন। দুজনে যখন পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হন তখন দেখেন জীবনটা ফাঁকা শূন্য। কারো জন্য কারোরই কোন সহানুভূতি নেই। তাঁদেরই বলতে শুনেছি 'মাঝে মাঝে ভুতে পায় নেশাগ্রস্তের মত কি যে করি নিজেরাই জানি না কারণ চরম স্বাধীনতা মানতে গিয়ে আমরা কেউ কারুর ভালমন্দে কোন কথা বলতে পারি না। রুচিতে বাধে।'

সাধারণ ঘরে এ ঘটনা বিরল। স্বামী-স্ত্রী সাধারণতঃ পরস্পরের রুচিকে সম্মান দিয়ে চলতে বাধ্য কারণ তাঁদের পরি-বেশটাও সেভাবে গড়া। কিন্তু আজকাল সাধারণ পরিবারে অনেকের মধ্যে উচ্চসমাজের এইসব আচারকে অনুসরণ করার একটা ইচ্ছা আছে। ফলে সংসারের বন্ধনটা আলগা হয়ে যাচ্ছে।

ব্যবসায়ী বা চাকুরীজীবী ভদ্রলোকের স্ত্রীকে প্রয়োজনে অনেকসময়ই বাজার করতে বা ব্যাঙ্কে চেক ভাঙ্গাতে দেখা যায়। স্বামীকে স্ত্রী এবং স্ত্রীকে স্বামীর সাহায্য না করার কোন যুক্তি নেই, কিন্তু স্ত্রী বা স্বামী একে অপরের উগ্র কোন রুচিকে কার্যকরী করাতে যাওয়ার ফল প্রায়ই বিষময় হয়। অপরের অপছন্দকে যখন একজন পছন্দ হিসাবে বরণ করেন তখন তার ফলও অত্যন্ত মারাত্মক।

সংসারে বাস করতে হলে সব কাজের মধ্যেই একটা নিয়মশৃঙ্খলা, সংযম রক্ষা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। সেটা কেউ কাউকে শিখিয়ে দেবার নয়, নিজেদের রুচিবোধের তাগিদেই আমরা শৃঙ্খলা মানতে বাধ্য। অত্যাধিক আধুনিকতায় সুখ কতটা বজায় রাখা যায় সন্দেহ আছে কিন্তু মানানসই আধুনিকতাটাই আমাদের জীবনে সুখশান্তি বজায় রাখতে সক্ষম সেটাই বর্তমান আব-হাওয়া প্রতিমুহূর্তে স্মরণ করিয়ে দেয়। একদিকে সংসার অপরদিকে বাইরের জীবনে বাড়াবাড়ি দুয়ে পাড়ে কোন ধর্মই রক্ষা করা সম্ভব নয়। সেকেলে, প্রাচীনপন্থী হয়ে বসে থাকায় কোন গর্ব নেই নিশ্চয়ই তবুও চরম আধুনিকতায় শান্তি কোথায়?

—অঞ্জলি চৌধুরী

রূপসীর খাতা

সুন্দর সুস্থ উজ্জ্বল জীবন তৈরী করতে হলে মন ও পারিপার্শ্বিকের সংগে শরীরেরও যথেষ্ট যত্ন নেওয়া উচিত। আমাদের দেশে (বিশেষ করে) নানান পারিবারিক আর্থিক ভৌগোলিক কারণে মহিলারা খুব তাড়াতাড়ি বয়সের রেখা ফুটিয়ে তোলেন। এমনও শোনা যায় যে বয়সের ছাপ না পড়লে কোন কোন ক্ষেত্রে মহিলারা লজ্জিত হন কিম্বা তাঁদের জোর করে লজ্জা দেওয়া হয়। কিন্তু এই সব পচা পুরোনো ধারণাগুলি থেকে বেরিয়ে কিছু মহিলা জীবন সম্বন্ধে বাঁচার সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হয়েছেন—এ খবর আজকের প্রগতির যুগে খুবই আনন্দের। বাঁচার ইচ্ছা সকলেরই আছে— তাহলে বাঁচার মতন করে বেঁচে থাকার মধ্যে আপত্তি কিসের ? কোমরে বাথা হাতে পায়ে বাত শরীরের ভাঁজে ভাঁজে ক্লান্তির ছাপ—এবং চোখে মুখে বয়েসের কঠিন রেখা না থাকাটাই কি বাঞ্ছনীয় নয় ?

তাই যাঁরা আজ সুন্দর স্বাস্থ্য চকচকে চেহারা নিয়ে বয়সের সংগে হেসে লড়াই করে বেঁচে আছেন বা থাকতে চান তাঁদের প্রশংসা করা উচিত। সেই সংগে তাঁদের কতকগুলি খবরও অবিশ্যি জানাতে চাই। শরীর ও রূপ কেমন করে রাখতে হয়—কি কি করা উচিত ও কেমন করে করা উচিত। এর আগে কিছু কিছু আলোচনা ও ব্যায়ামের কিছু নমুনা লেখা হয়েছে। সেই সংগে আরও বিশদ আলোচনা করার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে। আজকের আলোচনায় আজকের প্রথম বিষয় হচ্ছে— আমাদের জানা উচিত যে শরীরের কোন কোন অংশে প্রথম বয়সের ছাপ পড়ে। তারপর আলোচনা করবো—সেই ছাপ কি করে দূর করা যায়।

বয়সের সংগে সংগে প্রথম যে অংশে তার ছাপ পড়ে তা হল পেছনের দিকটা অর্থাৎ শিরদাঁড়া ও নিতম্বের দিকে। সাধারণত দেখা যায়—চল্লিশোর্ধ্বের মহিলাদের শিরদাঁড়ায় নানা রকমের ব্যথা, হাড়ের স্থানচ্যুত হওয়া ইত্যাদি হয়—ফলে তাদের হাঁটার ও বসার ভঙ্গি বদলে যায় আর একটু বেঁকে যায়। পিঠটান করা মহিলা এই বয়সে বেশ বিরল। এর জন্য সব চেয়ে প্রথমে দরকার মানসিক সচেতনতা। শিরদাঁড়া সোজা রেখে দিনে অন্ততঃ ১০।১৫ মিনিট এক জায়গায় এক ভাবে জোড়আসনে বসে থাকা উচিত। এছাড়া যোগ ব্যায়াম করতে পারলে তা সবচেয়ে ফলপ্রদ হবে। এরপর নিতম্বের কথা। সাধারণতঃ বয়সের সংগে নিতম্ব ভারী ও নীচের দিকে ঝুলে যায়। তারজন্য যে ব্যায়াম প্রয়োজন তা আগেই বলা হয়েছে। এছাড়া প্রতিদিন সকালে অথবা রাত্রে শোয়ার আগে গরম জলে নুন দিয়ে ফুটিয়ে সেই জলে স্নান করলে খুব উপকার হয়। স্টীমবাথ নিতে পারলে আরও ভাল।—বাড়ীতে স্টীমবাথ নেওয়া অনেক সময় অসুবিধা হতে পারে। তখন একটা কাজ করা যায়। পাখা বন্ধ করে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকা এর ফলে ঘাম হয় ও মেদ গলে যায়। তারপর নুন গরম জলে স্নান করে নেওয়া।

দ্বিতীয় স্থান যেখানে বয়স তার হাত রাখে তা হল গলা। এর দুটি কারণ। বেশীর ভাগ মহিলাই গলা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন থাকেন না প্রথমে। অনেকে সাজ-গোজ করেন কিন্তু শুধু মুখটুকু কিম্বা হাত বড় জোর পায়ের দিকে নজর দেন! গলাকে প্রথমে অবহেলা করে থাকেন। এর ফলে গলার চামড়া কুঁচকে যায় আর রেখা পড়ে। দ্বিতীয় কারণ খারাপ ভঙ্গিমায় চলা ফেরা করা। বহু রমণী তাঁদের হাঁটা চলা ও বসার খারাপ ভঙ্গিমার জন্য ঝোলানো থুতনী কিম্বা গলায় বহু রেখার শিকার হন। যেমন ধরুন অনেকের অভ্যাস থাকে মাথা নিচু করে চিবুক গলার সংগে ঠেকিয়ে রাস্তা দেখে চলা এবং এই করে গলায় ভাঁজ ফেলে বসা। এছাড়া গলায় কোন রকম মালিশ না করা। ভাল ভাবে গলায় মালিশ ও নিয়মিত ভাবে মুখের সংগে গলার চামড়ার যত্ন করলে বহু বয়সেও বয়সের রেখা ধরতে পারে না।

বয়সের আক্রমণের তৃতীয় স্থান হচ্ছে হাতের উপরি অংশ। বগল ও কনুই এর মাঝের অংশ বয়সের ধাক্কায় দেখা যায় চামড়া নরম হয় ও একটু চর্বিযুক্ত হয়ে ঝুলে পড়ার মতন দেখায়। এ থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রতিদিন সাধারণ কতকগুলি ব্যায়ামের প্রয়োজন। যেমন প্রতিদিন হাত মাথার উপর সোজা করে অন্ততঃ ৫।৭ মিনিট তুলে রাখা। এ ছাড়া আর একটি ব্যায়াম আছে—সোজা দাঁড়িয়ে দুই হাত পিঠের পেছন দিকে যতটা সম্ভব টান করে নিয়ে যাওয়া তারপর আস্তে আস্তে সামনের দিকে নিয়ে আসা—। এভাবে বেশ ১০।১২ বার করা দরকার।

চতুর্থ ও শেষ ক্ষেত্র মুখ। মুখের চামড়া সর্বক্ষণের রোদ জল ধুলো ময়লার শিকার হয় তাই মুখের চামড়ায় লোমকূপে ধুলো জমে আর লোমকূপের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে চামড়ায় গোটা বা দাগ হয় এবং এতে চামড়ার মসৃণতা নষ্ট হয়। চামড়া মসৃণ ও চকচকে থাকলেই মুখ উজ্জ্বল ও সতেজ থাকে। সতেজ মুখে বয়সের ছায়া পড়ে না। মুখ সুন্দর ও সতেজ নরম রাখতে হলে দরকার হল নিয়মিত এর যত্ন নেওয়া। এ সম্বন্ধে আগে আলোচনা করেছি পরেও আরও বিশদ আলোচনা করবো।

শরীর ও চেহারার জৌলুস রাখতে হলে রূপচর্চা ও শরীর চর্চার সংগে সংগে আর একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন। সেটা হল অমাদের হাঁটা চলা বসা ও শোয়ার মধ্যে সুন্দর ভঙ্গি ও ছন্দ রাখা। অনেক সুন্দরীর হাঁটা চলা বসার ভঙ্গি এতো কুরুচির পরিচয় দেয় যে, তার সব সৌন্দর্যই মাটি হয়ে যায়। শুধু মাত্র দেখতে কুশ্রী লাগে তাই নয় এতে শরীরেরও ক্ষতিও হয়।

যেমন চেয়ারে বসে পা ছড়িয়ে বসা কিম্বা পা দিয়ে হেলে চেয়ার শুন্দ পেছনের দিকে ঝুলে বসা রিকসায় বসে দুই পা দুদিকে ছড়িয়ে পুরুষালি ভঙ্গিতে বসা। এগুলি দৃষ্টিকটু। রিকসায় বা চেয়ারে বসতে হলে সব সময় পা জোড়া করে, একদিকে একটু কোণাচে হয়ে বসা উচিত। একটা হাত যেটি চেয়ারের হাতলের কাছে, সেটা হাতলের ওপর রেখে অপর হাত কোলের ওপর রাখা ভাল। দুই হাত দুই হাতলে রাখলে ভাল দেখায় না। শোয়ার সময় আমরা সাধারণত কাত হয়ে দুমড়ে কিম্বা 'দ'য়ের মতো হয়ে শুয়ে থাকি। এতে দুটো অপকার হয়। যে দিক ফিরে শুয়ে থাকা যায় সেই দিকের শরীরের ভেতরের যন্ত্রগুলিতে চাপ পড়ে, তাছাড়া দুমড়ে শোয়ার ফলে শরীরের ভেতরের যন্ত্রগুলিতে চোট পড়ে ও শিরা উপশিরাগুলি সহজভাবে থাকতে পারে না। সবচেয়ে ভালভাবে শোয়ার ভঙ্গি হল চিত হয়ে সোজা শোয়া অনেকটা 'শবাসনের' ভঙ্গিতে। এতে শরীরের সমস্ত অঙ্গগুলি স্বস্থানে থাকে। ফলে ভেতরের শিরা উপশিরা ও যন্ত্রগুলিও যথাস্থানে শান্ত অবস্থায় থাকে। তাতে সত্যিকারের বিশ্রাম হয় ও রক্ত চলাচলে কোন ব্যাঘাত ঘটে না। রক্ত চলাচলই শরীরের ভেতর ও বাইরের সুন্দরতার প্রধান সহায়। ঠিক মতন রক্ত চলাচল করার জন্য নিয়মিত ব্যায়াম করতে হয়—ঠান্ডা ও গরম বাষ্পের সাহায্যে চামড়া ঠিক রাখার ব্যবস্থা করতে হয়। তাহলে চামড়ার রং ঠিক থাকে এবং সেই সংগে শরীরও সুস্থ থাকে।

এছাড়া এমন কতকগুলি অভ্যাস আছে যা আমাদের করা উচিত। যেমন ধরুন চলতে চলতে হাত থেকে কিছু পড়ে গেল।

—বরবর্ণিনী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অঘোরবাবুর অসুখের সময় তাঁর বাড়ী থেকে শরৎচন্দ্রের চলে যাওয়া সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র নিজে সুরেনবাবুকে যা বলেছিলেন বলে সুরেনবাবু লিখেছেন, সে কথা এবং এ সম্পর্কে গিরীনবাবুর এই বিপরীত কথা, যা এখানে উদ্ধৃত করলাম —এই দুইই অজিতকুমার ঘোষ তাঁর বইয়ে উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে কোন মতামত দিতে পারেন নি। বরং তিনি সুরেনবাবুর লেখাটাকে (যা শরৎচন্দ্র বলেছিলেন বলে সুরেনবাবু লিখে গেছেন) নিয়ে সে সম্বন্ধে ভুল মন্তব্য করে লিখেছেন—'শরৎচন্দ্রের উপরের উক্তি হইতে মনে হয়, তিনি অঘোরনাথের মৃত্যুর আগেই ঐ স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন।...অঘোরনাথ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের উপরের উক্তির মধ্যে যেন একটু শ্রদ্ধার অভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের প্রতি অঘোরনাথের অশেষ উপকারের কথা গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ না করিলে অন্যায় হইবে। ...আত্মীয় স্বজনের অবজ্ঞাত নিঃসহায় শরৎচন্দ্র তাঁহার কাছে যে উপকার পাইয়াছিলেন, তাহার তুলনা নাই।'

সুরেনবাবুর কথা যে অসত্য, অজিতবাবু তা ধরতেও পারেন নি, অধিকন্তু সুরেনবাবুর অসত্য কথাটাকে সত্য বলে ধরে নিয়ে তিনি শরৎচন্দ্রকে অযথা অকৃতজ্ঞরূপে চিত্রিত করেছেন।

(২)

অঘোরবাবুর অসুখের সময় তাঁকে ফেলে শরৎচন্দ্রের চলে যাওয়া সম্বন্ধে সুরেনবাবু যেমন দুবারে দু রকম কথা বলেছেন তেমনি তিনি রেঙ্গুনে তার দাদা মনিবাবু কর্তৃক শরৎচন্দ্রের খোঁজ নেওয়া সম্বন্ধেও দুবার দু রকম কথা বলেছেন। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন—শরৎচন্দ্র পীড়িত হয়ে হাসপাতালে আছেন এবং এমন অসুখ যে সকলের সঙ্গে দেখা করেন না। এই শুনে ধর্মপ্রমুখ মন মনিবাবু শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করার আর চেষ্টাই করলেন না এবং শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে মোটেই ভাল ধারণা পোষণ করলেন না।

সুরেনবাবু তাঁর ঐ বইয়ের অন্যত্র আবার এ সম্বন্ধে লিখেছেন— 'অঘোরনাথের মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্রের মনিমামা উপেন্দ্রনাথের দিদিকে নিয়ে রেঙ্গুন গেলে শরৎচন্দ্রের খোঁজ করে জানতে পারেন যে, তিনি নাকি একটা চীনা হোটেলে পীড়িত হয়ে আছেন। কারুর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে অক্ষম।' (পৃঃ ১৪৭)

সুরেনববাবু এই দু রকম কথার মধ্যে তফাৎটা যা তা হল প্রথমতঃ হাসপাতাল ও হোটেল দুটো ভিন্ন স্থান, কখনই এক নয়। দ্বিতীয়তঃ—জ্বরজ্বালায় আক্রান্ত হয়ে কারও সঙ্গে দেখা করতে অক্ষম হওয়া, আর লজ্জাজনক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে লজ্জায় কারও সঙ্গে দেখা করতে যেতে না পারায় দুটোয় আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

এখন কথা হচ্ছে, সুরেনবাবু তাঁর বইয়ে এক-একটা ঘটনা সম্বন্ধে এই যে পরস্পরবিরোধী এক-এক রকম কথা বলেছেন এর কারণটা কি?

এর কারণ আমার মনে হয়, সুরেনবাবু যখন এ বই লেখেন, তখন প্রথমতঃ বার্ধক্যবশতঃ নানা ভুল করেছেন। দ্বিতীয়তঃ—তখন এক সময় তাঁর মাথায়ও একটু গোলমাল দেখা দিয়েছিল। ঐ সময় সুরেনবাবুর মাথা ঠিক না থাকার কথা, আমি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রবীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে শুনেছি। তাছাড়া আমি নিজেও তখন প্রায় ঐ অবস্থায় তাঁকে দেখেছি। এই কারণেই সুরেনবাবু তাঁর এই বইয়ে যেমন কিছু কিছু উল্টোপাল্টা কথা বলেছেন, তেমনি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিকে একরূপ অকারণেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন।

সুরেনবাবুর বইয়ে যে ভুল আছে, সেকথা অবশ্য তিনি নিজেই তাঁর বইয়ে

এক জায়গায় লিখে গেছেন। তিনি লিখেছেন, 'আমার ভুল ভ্রান্তি হবার বয়স বর্তমানে এসেছে। সেকথা অস্বীকার করলে শুধু ভুল নয়, আহাম্মকি করা হবে বলেই মনে করি।' (পৃঃ ১৫৮)

শুধু এই নয়, শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুন জীবনের কথা সুরেনবাবুর পক্ষে জানা যে সহজ নয়, সেকথাও তিনি তাঁর বইয়ে লিখে গেছেন। তিনি লিখেছেন 'তাঁর জীবনের এই দুটি (দেবানন্দপুর ও রেঙ্গুন) যুগের তথ্য সংগ্রহ করা সহজ নয়। ...শরৎচন্দ্রের নিকটতম হবার অবসর পেয়েও এমন স্পর্ধা নেই যে বলি তাঁকে ঠিক করে জেনেছি।'

এই জন্যই হয়ত সুরেনবাবু তাঁর বইয়ে শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুন যুগের কথা একরূপ বলেনই নি। অঘোরবাবুর বাড়ী থেকে শরৎচন্দ্রের চলে যাওয়া এবং অঘোরবাবুর মৃত্যুর পরে শরৎচন্দ্র কোথায় ছিলেন —এই দুটো কথা দু রকম করে বলা ছাড়া সুরেনবাবু তাঁর বইয়ে আর এক জায়গায় শরৎচন্দ্রের ব্রহ্ম-প্রবাসের সময়ের হিসাব দিয়ে লিখেছেন—শরৎচন্দ্র ব্রহ্মদেশে মোট ১০ বৎসর ছিলেন। এই কথাটাও তিনি দুবার লিখেছেন। সুরেনবাবুর এই লেখাটাও ভুল। কারণ, শরৎচন্দ্র ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী থেকে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল পর্যন্ত ব্রহ্মদেশে ছিলেন। সুরেনবাবুর বইয়ে এইরূপ আরও অনেক ভুল আছে।

মুমূর্ষু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়কে

অকৃতজ্ঞের মত শরৎচন্দ্রের ফেলে চলে যাওয়া সম্বন্ধে সুরেনবাবু দু রকম কথা বললেও, অঘোরবাবুর অপর শুশ্রূষাকারী গিরীন্দ্রনাথ সরকারের লেখা থেকে যেমন দেখছি এ-ব্যাপারে 'সুরেনবাবুর কোন কথাই সত্য নয়; তেমনি আমার মনে হয়, অঘোরবাবুর মৃত্যুর পরে সুরেনবাবুর বর্ণিত শরৎচন্দ্রের যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে থাকা বা অসুস্থ হয়ে চীনা হোটেলে পড়ে থাকা, এর কোনটাই সত্য নয়। কারণ, অঘোরবাবুর মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্র কোথায় কিভাবে ছিলেন, সে সম্বন্ধে অন্য কথা জানতে পারি, শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের বন্ধুদের লেখা থেকে। আর এঁদের লেখা থেকে এটাও জানা যায় যে, অঘোরবাবুর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত শরৎচন্দ্র অঘোরবাবুর বাড়ীতেই ছিলেন।

শরৎচন্দ্রের এই রেঙ্গুনের বন্ধুদের ঐ লেখা নিয়ে আলোচনা করবার আগে আমার শুধু একটা কথা এই যে অঘোরবাবুর মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্র কোথায় ছিলেন, সে সম্বন্ধে সুরেনবাবুর দু রকম কথার মধ্যে একান্তই যদি কোনটাকে গ্রহণ করতে হয়, তাহলে শরৎচন্দ্রের চীনা হোটেলে অসুস্থ হয়ে থাকার কথাটাই গ্রহণ করাই যুক্তি-যুক্ত। কারণ, প্রথমতঃ অঘোরবাবুর মৃত্যুর পর তাঁর চাকর-বাকররা নিশ্চয়ই তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে অঘোরবাবুর স্ত্রী তখন রেঙ্গুনে ছিলেন না। ফলে শরৎচন্দ্রের খাওয়ার, বিশেষতঃ সকালে অফিস যাওয়ার সময় ঠিক সময়ে খেতে পাওয়ার নিশ্চয়ই খুব অসুবিধা হয়েছিল। তাই তিনি হয়ত কোন হোটেলে গিয়ে উঠে থাকতেও পারেন। দ্বিতীয়তঃ অঘোরবাবুর অসুখের সময় দিন-রাত পরিশ্রম করে সেবা করায় এবং দাহকার্য ইত্যাদিতেও পরিশ্রমে হয়ত পরে শরৎচন্দ্র নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শরৎ-পরিচয়' একটা ছোট বই। এই বইয়ে যেসব ভুল ও ওলোট-পালোট কথা আছে তা কি অজিতবাবুর চোখে পড়ে নি? রেঙ্গুনে গিয়ে মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক শরৎচন্দ্রের খোঁজ নেওয়া সম্বন্ধে সুরেনবাবু এই যে, দু জায়গায় দু রকম কথা বলেছেন, এ থেকে খারাপ কথাটা নিয়েই অজিতবাবু শরৎচন্দ্রকে হেয় করে নিজের পক্ষ সমর্থনে লাগিয়েছেন। অথচ অপর কথাটা (চীনা হোটেলে থাকা) যেটা বরং স্বাভাবিক সেটার অজিতবাবু কোথাও উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। এই কি একজন নিরপেক্ষ লেখকের কাজ হয়েছে?

যাক, আমি যে বলেছি, অঘোরবাবুর মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্র হাসপাতালেও ছিলেন না, আর হোটেলেও ছিলেন না, এখন সে সম্বন্ধেই আলোচনা করছি—

রেঙ্গুনে একাউন্টেন্ট জেনারেল অফিসে শরৎচন্দ্রের সহকর্মী হেমেন্দ্রমোহন রায়—(যিনি ৩২ বৎসর একাউন্টেন্ট জেনারেল অফিসে চাকরি করে ডেপুটি একাউন্টেন্ট জেনারেলের পদে উন্নীত হয়েছিলেন) লিখেছেন—'আফটার দি ডেথ অফ মিঃ এ চ্যাটার্জি, ডাঃ চ্যাটার্জি (শরৎচন্দ্র) সেটল্ড ফর সাম টাইম উইথ মিঃ অন্নদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য এ্যান ওভারসিয়ার ইন দি গভর্ণমেন্ট হাউস রেঙ্গুন—শরৎ প্রতিভা।

আর শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের বন্ধু সতীশচন্দ্র দাস লিখেছেন—'অঘোরবাবুর মৃত্যুর পর শরৎদা সহায়-সম্বলহীন হইয়া পড়িলেন। তখন রেঙ্গুনে সামান্য বেতন-ভোগী কেরানীদের কোন সমাজ ছিল না। অডিট অফিসে চাকরি করিতেছিলেন বটে, কিন্তু হোটেলের খরচ যোগাইয়া তার উপরে নিজ খরচ যোগাবার ক্ষমতা তখনো শরৎদার জন্মে নি। অতএব তিনি অডিট অফিসের পাশেই এক কামরা ছোট কাঠের ঘরে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। এমন কি দিনের বেলা দু চার পেয়ালা চা খাইয়াই অনেক সময় কাটাইয়া দিতে লাগিলেন। ক্রমান্বয়ে শরৎদার পাশের পূজারী বামুনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়। এমন কি শরৎদার খাওয়ার কষ্ট দেখিয়া ঠাকুর আগ্রহ করিয়া শরৎদার আহারের বন্দোবস্ত করিলেন নিজের ঘরে।...বামুন ঠাকুরের অত্যন্ত পীড়াপীড়িতে ও অভাব অনটনে শরৎদার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি বামুনের ঘরেই দুবেলা খাইতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে এক নতুন রহস্য উদ্ঘাটন হইয়া পড়িল। বামুনঠাকুরের পাচিকা ছিল, ঠাকুরের রক্ষিতা। যেদিন দুজনে মুখোমুখি ঝগড়া আরম্ভ করিল, শরৎদা হইলেন বিচারক।

এরপর সতীশবাবু শরৎচন্দ্রের সামনে বামুনঠাকুর ও তার রক্ষিতা হরিমতির ঝগড়ার একটা বিবরণ দিয়েছেন। নিম্নে আবার লিখেছেন—

'এ পর্যন্তই সেদিন বাক-বিতণ্ডায় কাটিয়া গেল। কিন্তু এখানেই অভিনয়ের সাঙ্গ হইল না। ক্রমান্বয়েই দিনের পর দিন ঝগড়াঝাঁটি বাড়িয়া চলিল। এমন কি উনুনে হাঁড়ি চাপানও বন্ধ হইতে লাগিল।...

শরৎদা এক-একদিন ভাত না খাইয়া চা খাইয়াই কাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু অখাদ্য খাইতে রাজী হইতেন না। এখানে হাটে বাজারে অলিতে গলিতে এমন কি

চায়ের দোকানেও ভাত তরকারী মাছ মাংস বিক্রী হয়। পয়সা খরচ করিলে যেখানে ইচ্ছা খাওয়া যায়। কিন্তু শরৎদা একমাত্র চা-রুটি ছাড়া অন্য কিছুই খাইতেন না।...

কিছু দিন পরে পূজোরী ঠাকুরের সংগে শরৎদার মুখোমুখি দশ পাঁচটা কথারও বাড়াবাড়ি হইয়া গেল। ঠাকুরও হরিমতির খরচপত্রাদি বন্ধ করিয়া দিল।...

হরিমতি অসহায় অনন্যোপায় হইয়া শরৎদার হাতেপায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িল। শরৎদা স্বীকার করিলেন, জাহাজ খরচের টাকা দিয়া কলিকাতা পাঠাইতে কিন্তু হঠাৎ জ্বর হইয়া চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে হরিমতি দেহত্যাগ করিল। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—প্লেগ।

শরৎদা মহাবিপদে পড়িলেন। তখনো রেঙ্গুনে প্লেগ মহামারীর ভয় কমে নাই।

মৃতদেহ সংকার করিতে ভয়ে কেহই অগ্রসর হইতে স্বীকৃত হইল না। অগত্যা মদ্যপানে বশীভূত করিয়া অতি কষ্টে হরিমতির মৃতদেহ সংকারের পর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়াও সমাপন করিয়া মহাপ্রাণের পরিচয় দিয়া কারখানায় ছোট বড় জাত বেজাতের নিকটে দেবতুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সেদিন হইতে শরৎদা জাত বেজাতের নিকটে যে সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, আজও তাহাদের নিকটে দেবতার ন্যায় চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।' (শরৎপ্রতিভা)

এখানে দেখা যাচ্ছে, হেমেন্দ্রবাবু বলেছেন—অঘোরবাবুর মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্র অন্নদাপ্রসাদ ভট্টাচার্যের বাড়ীতে কিছুদিন ছিলেন। আর সতীশবাবু বলেছেন—অঘোরবাবুর মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্র তাঁর অফিসের পাশে একটা ছোট ঘর ভাড়া নিয়ে ছিলেন।

এ সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, হয়ত এঁদের উভয়ের কথাই ঠিক। অঘোরবাবুর মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্র অসহায় হয়ে প্রথমে পরিচিত বা বন্ধু অন্নদাপ্রসাদের বাড়ীতে কিছুদিন ছিলেন, তারপর সেখান থেকে অফিসের পাশে ঘর ভাড়া করে বাস করেছিলেন।

সতীশবাবু তাঁর লেখায় 'যেদিন দুজনে মুখোমুখি ঝগড়া আরম্ভ করিল, শরৎদা হইলেন বিচারক'—বলে বামুন ঠাকুর ও হরিমতির ঝগড়ায় যে বর্ণনা দিয়েছেন, সেখানে এক জায়গায় লিখেছেন—'এবার হরিমতি শরৎদাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'কি বাবু তুমি যে মাসে মাসে পনেরটা করে টাকা দিচ্ছ, এই টাকাটা হলেই আমাদের খাওয়াটা স্বচ্ছন্দে চলে যায়। মিনসে এমন একচোখো টাকা পড়তে না পড়তেই ছুঁতে দেবে না। বলুন ত, আমি খাওয়াই কোত্থেকে?'

এখানে হরিমতির মুখে বামুনঠাকুরকে মাসে মাসে শরৎচন্দ্রের যে পনেরটা করে টাকা দেওয়ার কথা পাওয়া যাচ্ছে, তা থেকে বলা যেতে পারে—শরৎচন্দ্র বামনঠাকুরের সঙ্গে হরিমতির সম্পর্কের রহস্য জানবার আগে পর্যন্ত বা শরৎচন্দ্রের সামনে বামুনে ঠাকুর ও হরিমতির প্রথম ঝগড়া লাগার আগে পর্যন্ত শরৎচন্দ্র কম করেও অন্তত মাস দুই নিশ্চিন্তভাবে এখানে ছিলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর শরৎ-পরিচয় গ্রন্থে অঘোরবাবুর শ্যালক উপেন্দ্র-নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে শুনে লিখেছেন—অঘোরবাবুর মৃত্যুর দেড় মাস পরে তাঁর স্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী কলকাতা থেকে রেঙ্গুনে ফিরে গিয়েছিলেন। অন্নপূর্ণা দেবী তাঁর স্বামীর মৃত্যুর দেড় মাস পরে যে রেঙ্গুনে গিয়েছিলেন, একথা উপেন-বাবুও তাঁর এক প্রবন্ধে লিখে গেছেন। অন্নপূর্ণা দেবী তাঁর স্বামীর মৃত্যুর দেড় মাস পরেই যান বা তার আগেই যান, আমরা কিন্তু সতীশবাবুর লেখায় দেখছি—শরৎচন্দ্র তখন দিব্যি সুস্থ শরীরে, অফিসের পাশে থেকে অফিস করছেন এবং এক দুঃস্থ পরিবারে মাসে মাসে টাকা দিয়ে নিজের আহারের ব্যবস্থা করে নিয়েছেন।

আর হেমেন্দ্রমোহন রায় যে বলেছেন—শরৎচন্দ্র অঘোরবাবুর মৃত্যুর পর কিছুদিন অন্নদাপ্রসাদ ভট্টাচার্যের বাড়ীতে ছিলেন—ঐ কিছু দিনটা যদি দেড় মাসের মত হয়—তাহলেও বলা যেতে পারে, মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রেঙ্গুনে গিয়ে যখন শরৎ-চন্দ্রের খোঁজ নেন, তখন তিনি অন্নদাপ্রসাদ বাবুর বাড়ীতেই ছিলেন।

শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের বিভিন্ন বন্ধুর লেখা থেকে যেমন জানতে পারি, অঘোর-বাবুর মৃত্যুর সময় শরৎচন্দ্র তাঁর কাছেই ছিলেন, তেমনি শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের বন্ধু-দের লেখা থেকেও বলতে পারি, অঘোর-বাবুর মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্র হাসপাতালেও ছিলেন না বা হোটেলেও ছিলেন না। কারণ, যাঁর ভুল-ভ্রান্তি হওয়ার বয়স হয়েছে, যাঁর পক্ষে শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের তথ্য সংগ্রহ করা সহজ নয়, যিনি মাথায় কিছুটা গোলমালের বশেই একই ঘটনাকে ভিন্ন ভিন্নভাবে বলে-ছেন, যিনি কোন দিন রেঙ্গুনে যান নি, ভাগলপুরবাসী সেই সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গো-পাধ্যায়ের কথা অপেক্ষা, শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কথা যে বিশ্বাস-যোগ্য একথা সকলেই স্বীকার করবেন।

এবার আবার অজিতবাবুর কথায় আসা যাক। সুরেনবাবুর বর্ণিত শরৎচন্দ্রের অসুস্থ হয়ে চীনা হোটেলে থাকার কথাটা এক ত অজিতবাবু ইচ্ছা করেই বাদ দিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ সুরেনবাবুর বর্ণিত যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে শরৎচন্দ্রের হাস-পাতালে থাকার কথাটা যে ভুল অজিতবাবু তা ত ধরতে পারলেনই না অধিকন্তু ঐ ভুলের উপরে নিজের আরও মনগড়া কথা দিয়ে শরৎচন্দ্রকে আরও হেয় করলেন।

অজিতবাবু অঘোরবাবুকে বলেছেন—'অমিত বলশালী, বিরাট দেহ, বজ্রকণ্ঠ পুরুষ'। এ হেন ব্যক্তির বাড়ীতে তাঁর আশ্রিত ও পালিত, দূর সম্পর্কের আত্মীয় কোন গরীব গলগ্রহ যুবক কখনই অত্যন্ত মদ্যাসক্ত ও বেশ্যাসক্ত হতে পারে না। তাই আমি আগে যা বলেছি, সেই কথাই আবার বলছি—অঘোরবাবু যে প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, তাতে তিনি শরৎ-চন্দ্রকে ঐরূপ জানলে বাড়ী থেকে তাঁকে দূর করে দেওয়া বা শুধু চড়-চাপড় নয়, আছাড় মেরেই হয়ত একেবারে শেষ করে দিতেন। অতএব এখন বলা যেতে পারে, সুরেনবাবুর ভুল বর্ণনার উপর ভিত্তি করে অজিতবাবুর ঐ বক্তব্যও সম্পূর্ণ অসত্য।

(ক্রমশঃ)

ঐতিহাসিক গবেষক ও ঔপন্যাসিক রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় প্রচুর গ্রন্থ রচনা করেছেন। সুপণ্ডিত ডঃ সেনের এই সকল গ্রন্থ সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসাও করেছেন বহু বিদগ্ধজন ও সমালোচক। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় দীনেশচন্দ্রের রচনার বিস্ময়কর বৈচিত্র্য। তিনি যেমন বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেছেন তেমনি কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতও রচনা করেছেন। এতদব্যতীত লোক-সাহিত্যের উপর মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার সঙ্গে বাংলার পুরোনারী, সতী বেহুলা, ফুল্লরা প্রভৃতি গ্রন্থগুলিও তাঁর রচনার স্বাতন্ত্র্য ব্যক্ত করে। মোটের উপর জাতীয় ঐতিহ্যের উৎকর্ষ নির্ণয়ে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়।

ইতিপূর্বে ভিন্নপ্রসঙ্গে তাঁর সম্পর্কে 'পুনশ্চ'র মধ্যে একবার আলোচিত হয়েছে। বক্ষ্যমাণ সংখ্যায় তাঁর একটি বিশেষ ধরনের বই যা সর্বকালের নরনারী তথা বিবাহিত নরনারীর পক্ষে অবশ্যপাঠ্য সেই প্রসঙ্গে এখানে আমরা আলোচনা করব। এমন একখানি সচিত্র বই দীনেশচন্দ্র যে লিখতে পারেন তা অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য ছিল। বইখানির নাম 'গৃহশ্রী'। কলিকাতার বিখ্যাত পুস্তক-ব্যবসায়ী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্তৃক ১৩২২ সালে এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানির পরিশিষ্টের মধ্যে তৎকালের কয়েকজন খ্যাতনামা ডাক্তার, কবিরাজ ও বিশেষজ্ঞগণ কয়েকটি অধ্যায়ে নবজাত শিশুর প্রতি কর্তব্য, শিশুদের পীড়া, ঔষধ, আকস্মিক বিপদ ও সংসারের অবশ্য প্রয়োজনীয় নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় বিশেষ যত্ন ও বিচক্ষণতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে যান।

এই গ্রন্থের ভূমিকায় দীনেশচন্দ্র লেখেন, 'বাড়ীর মেয়েদের ঘরকরণা সম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ দিতে ইচ্ছা করিয়া এই পুস্তকের সূত্রপাত করিয়াছিলাম, তখনও ইহা অন্তঃপুরের সীমার বাহির করিয়া প্রকাশ করার সঙ্কল্প করি নাই। কিন্তু লিখিতে লিখিতে পুঁথি বাড়িয়া গেল এবং ইহার অবয়ব দস্তুরমত একখানি বহির মত হইয়া গেল, এজন্য কয়েকজন বন্ধুর আগ্রহে এই পুস্তক প্রকাশ করা হইল। নিজের বহুদর্শিতার ফল ইহাতে দিতে চেষ্টা করিয়াছি, শাস্ত্র ঘাঁটিয়া শ্লোকের অর্থ বাহির করিয়া পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে যাই নাই।'

গৃহশ্রীর সূচীপত্রের মধ্যে প্রধানতঃ আমরা যে পরিচ্ছেদগুলি পাই, তা হল—গৃহিণী গৃহমুচ্যতে, স্ত্রী-শিক্ষা, শিশুদিগের শিক্ষা, একান্নভুক্ত পরিবার, সুগৃহিণীর কর্তব্য, দাস-দাসীর প্রতি ব্যবহার, গুরুজনদের প্রতি ব্যবহার ও অন্যান্য কথা, দাম্পত্য জীবন ও শেষের কথা। অতঃপর বিভিন্ন রোগে, মূলতঃ শিশুদের অ্যালপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও কবিরাজী মতে চিকিৎসার বিষয়, কৃষি-পঞ্জিকা, ভৃত্য ও কর্মচারীদের বেতনের হিসাব, ওজনের হিসাব ও সাংসারিক আয়-ব্যয়ের হিসাব এই গ্রন্থের মধ্যে সুচারুরূপে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

দীনেশচন্দ্রের এই গ্রন্থখানি অধুনা দুষ্প্রাপ্য হলেও, এককালে উপর্যুপরি এর কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, সম্প্রতিকালে নূতন কোন সংস্করণ প্রকাশিত হলে চাহিদার দিক থেকে প্রকাশকের দুশ্চিন্তার কারণ হবে না।

উক্ত গ্রন্থের 'দাম্পত্য জীবন' শীর্ষক পরিচ্ছেদটির অংশবিশেষ আমরা এখানে আমাদের মা-বোনদের অবগতির জন্য এখানে পুনশ্চ মুদ্রিত করে দিলাম।

।। দাম্পত্য-জীবন ।।

বিবাহ জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় ঘটনা। কারণ, বিবাহে শুধু স্বামী ও স্ত্রী সুখী বা অসুখী হন, এমত নহে—তাঁহাদের আত্মীয়েরা তাঁহার সেই সুখ-দুঃখের ভাগ পাইয়া থাকেন। বিবাহের পর কোন গৃহ আনন্দের ছবির মত হইয়া দাঁড়ায়, কোথাও বা সমস্ত স্নেহমায়ার চিতানল জ্বালিয়া গৃহখানি স্বার্থের একটা নরক হইয়া দাঁড়ায়। বিবাহের পর ছেলে ও মেয়ে হয়, তাহাদের চরিত্র, ভাবী জীবন ও ব্যবহার অনেক পরিমাণে পিতামাতার উপর নির্ভর করে। সাত পুরুষ পূর্ব্বে বংশের কোন ব্যক্তি বিবাহ করিয়া যে শুভাশুভের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন এ পর্য্যন্তও সেই বংশ সেই ফলভোগের হাত এড়ায় নাই। আজ বিবাহের সময় আঙ্গিনায় যে শাঁখ বাজিয়া উঠিল, তাহার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি কত যুগ চলিবে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

এই ঘটনার স্রোত যে কেন্দ্র হইতে বহিতে আরম্ভ করিল, সেই ব্যাপারকে শুধু কৌতুক ও রঙ্গরসের বিষয় বলিয়া মনে করা উচিত নহে; ইহা অতি গুরুতর ঘটনা। স্বামী স্ত্রীর রূপ ধ্যান করিতেছেন এবং স্ত্রী স্বামীর মুখখানি কেমন তাহাই ভাবিতেছেন, এই রূপ-লালসা অনেকে আদর্শ দাম্পত্য-প্রেম মনে করেন। কিন্তু যিনি জীবনের সঙ্গিনী তাঁর বাহিরের রূপের কথা ২।৪ বৎসরের মধ্যে স্বামীর মন হইতে চলিয়া যাইবে, তাঁহার চরিত্রের যে রূপ, তাহাই তখন ভাবনার বিষয় হইবে।... সংসারে গুণের আদর বেশী হওয়া উচিত। গুণবান ও গুণবতীর মিলন গুণহীন রূপবান ও রূপবতীর মিলন হইতে শ্রেষ্ঠতর, ইহাতে সন্দেহ নাই।

স্ত্রী সম্বন্ধে স্বামীর অনেক আশা-ভরসা থাকে, এবং স্বামী সম্বন্ধে স্ত্রীর আদর্শও খুব বড় রকমের থাকা আশ্চর্য নহে। যেখানে দুই পক্ষেরই এইরূপ বাড়াবাড়ি রকমের ধারণা থাকে, সেখানে উভয়ের মন ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। দাম্পত্য প্রেম ক্ষমার ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে হইবে; কেবল তাজমহলের স্বপ্ন দেখিলে নিজের কুঁড়ে ঘরের উপর অশ্রদ্ধার ভাব আসিতে পারে। কিন্তু আমাদের এটা জানা উচিত যে, আমাদের স্বপ্ন দেখিয়া সংসার করা মোটেই চলে না। আমাদের কুঁড়ে ঘর যদি সামান্য হয়, তবুও সেইখানেই আমাদের বাস করিতে হইবে; বাঁশ ও বেতের বেড়া না ভাঙ্গে, তাহাই দেখিতে হইবে, ততক্ষণ যাহারা সোনার থামের কল্পনা করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন—তাঁহারা মোটেই সুখী হইতে পারিবেন না।

স্বামীই স্ত্রীর সর্ব্বপ্রকার অবলম্বন। স্বামীর কথা, স্ত্রী বেদ-কোরাণের মত মানিয়া চলিবেন, এইরূপ কতকগুলি চাণক্য-নীতি আমি প্রচার করিতেছি না। কিন্তু হিন্দুর ঘরে যখন স্বামীর উপরেই স্ত্রীর সুখ-দুঃখ সর্ব্ববিষয়েই নির্ভর করে তখন তিনি ঠাকুর-দেবতার স্থানীয় হইয়া আছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু জীবন্ত ঠাকুরের ব্যবহার খারাপ হইলে স্বাভাবিক নিয়মেই স্ত্রীর শ্রদ্ধা কমিয়া আসিতে পারে। প্রকৃত ভালবাসা কোন একটা বড় পদে বসিলেই দৌরাত্ম্য করিয়া আদায় করা যায় না। রাজতক্তে যিনি বসিয়াছেন, তিনি জোর করিয়া প্রজার সর্ব্বস্ব লইতে পারেন, কিন্তু একটা জায়গার উপর তাঁহার কোনই অধিকার থাকে না, তাহা প্রজার হৃদয়, সে জিনিসটা সকল সময়ে সমস্ত ক্ষতি ও ফলাফল অগ্রাহ্য করিয়াও আত্মদান করিতে অস্বীকার করে।...

পুরুষ প্রবল, সুতরাং অনেক সময় স্বামী অত্যাচার করিতে পারেন, স্ত্রী স্বাধীনা নহেন,—সেই অত্যাচারের হাত এড়াইবার জন্য তিনি মিথ্যা কথার আশ্রয় লইতে পারেন; এই দুই-ই স্বাভাবিক। স্বামীর অত্যাচার ভাল নহে, স্ত্রীর মিথ্যাচারণও তদ্রূপ। স্বামীর মন বুঝিয়া তাঁহার অনুকূল পথে স্ত্রী চলিতে চেষ্টা করিবেন, যদি কখনও ভুল হয়, তবে স্বামীর নিকট তাহা গোপন করিবেন না; সত্যবাদিনী স্ত্রীর উপর স্বামীর শ্রদ্ধা হইবে। একবার যদি স্বামী বুঝিতে পারেন, তাঁহার স্ত্রী সত্য কথা বলেন না, তবে সংসারে যে আশ্রয়-তরু বিশ্বাস, তাহার মূলে কুঠারাঘাত পড়িবে।

স্ত্রীলোকের একটা প্রধান কর্ত্তব্য বাক্য-সংযম। স্বামী যদি বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হইয়া কোন কথা বলেন, তবে স্বামীর উত্তেজিত অবস্থা দেখিয়া স্ত্রীর নিরস্ত হওয়া উচিত। কেহ যখন ক্রুদ্ধ হয়, তখন তাহাকে বুঝাইতে যাওয়া নিষ্ফল। যখন ঝড় বহিতে থাকে, তখন বাধা দিলে উহা আরও ভয়ানক হয়। সুতরাং শুধু স্বামী-স্ত্রী

বলিয়া নহে,—কেহ কাহারও প্রতি যখন ক্রুদ্ধ হন—সেই সময় অপর পক্ষের ধৈর্য অবলম্বনই শ্রেয়।...

মোটামুটি ক্ষমা গুণের উপরেই সংসারের প্রীতি ও সদ্ভাব স্থায়ী হইয়া থাকে। স্ত্রীলোক স্বামীর ব্যবহার লইয়া দোষ-অনুসন্ধিৎসু হইবেন না। যাহা দোষ বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাহা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে কেবলই খুঁজিবেন না, কারণ যত দোষ খুঁজিবেন, ততই পাইবেন। বেদেরা যেখান-সেখান হইতে সাপ বাহির করিতে পারে। সেই দোষগুলি বাহির করিয়াও তাহা লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া কি লাভ? তাহার দংশন-জ্বালায় নিজেরাই পুড়িয়া মরিবেন। যে সকল দোষ—যথা স্বামীর উপেক্ষা বা ভালবাসার ত্রুটি—শুধু স্ত্রীরই কষ্টের কারণ; সে সকল দোষ তিনি উপেক্ষা করিবেন, তাহা দেখিয়াও দেখিবেন না। তাহা লইয়া কলহের সৃষ্টি করিলে সে দোষগুলি বাড়িয়া চলিবে। যাহা উপেক্ষা ছিল, তাহা ঘৃণায় পরিণত হইবে। ভালবাসার অধিষ্ঠাত্রী দেবী একেবারেই বক্তৃতা ভালবাসেন না, কেহ কাঁদিয়া-বলিয়া কাহাকেও প্রেম শিখাইতে পারেন নাই। স্বামীর প্রতি কর্তব্য তিনি নীরবে করিয়া যাইবেন, কেহ ইচ্ছা করিলে হাতে স্বর্গ পাইতে পারেন না। স্বামী যদি সেরূপ আদর না করেন, তবে ভগবানের আদরের জন্য লালায়িত হইবেন। তিনি প্রসন্ন হইলে হয়ত স্বামী স্বীয় দোষ নিজেই বুঝিবেন।

অনেক স্ত্রী সন্দিগ্ধ-চিত্ত। স্বামীর ভালবাসা যদি মনের মত না পান, তবেই সন্দেহের কারণ উপস্থিত হয়। কিন্তু সন্দেহ ভাল নহে; কারণ, যাহাকে সন্দেহ করিবেন, তাহাকে কিছুতেই শোধরাইতে পারিবেন না। সন্দেহ অন্ধ; তাহার চক্ষু নাই, সুতরাং আঁধারে রজ্জুকে সর্পভ্রম হওয়া স্বাভাবিক। এইরূপে অনেক সময় যাহা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে, সেই সকল অভিযোগ উপস্থিত করিলে স্বামী নিতান্তই ক্রুদ্ধ হইয়া যাইবেন। যদি বা কোনকালে সেই স্বামী প্রকৃত অপরাধী হইলে তাঁহার অনুতপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে, সন্দেহের বাণে তাহাকে বিদ্ধ করিলে সে সম্ভাবনা থাকিবে না।...

স্বামী যেরূপ ভালবাসেন, স্ত্রীকে যথাসম্ভব সেইরূপে চলিতে হইবে; তাহা যদি ঠিক সঙ্গত না হয়, তথাপি স্ত্রী যদি তাহাতে বিরক্তির সহিত বাধা দেন, তবে অনেক সময় তাহা হইতে আগুন জ্বলিয়া সংসারটি পুড়িয়া ছারখার করিবে। কোন কোন স্বামী অত্যন্ত কৃপণ, তিনি সকলই সহ্য করিতে পারেন, কেবল ব্যয়াধিক্যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হন। যাহা নিতান্ত দরকারী তাহা হইতেও তিনি সংসারকে বঞ্চিত করিয়া রাখেন।...এখন কথা এই যে, স্বামী যদি কৃপণ হন, তবে স্ত্রীর কি করা কর্তব্য? পূর্বেই বলিয়াছি স্ত্রী বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হইয়া স্বামীকে বাধা দিলে সংসারে নিত্য-নিত্যই কলহের সৃষ্টি হইতে পারে। চণ্ডীর নিকট ভক্তের প্রার্থনা এই—'ভার্যাং মনোরমাং দেহি চিত্তবৃত্তানুসারিণীম্'—এখানে সুন্দরী স্ত্রীর জন্য কামনা নাই—তিনি যেন আমার মনে প্রীতি জন্মাইতে পারেন, আমার মনের ভাব যেরূপ তাঁহার প্রবৃত্তি যেন তদনুরূপ হয়, এই প্রার্থনা। সুতরাং কৃপণ স্বামীর স্ত্রীকে কার্পণ্যে দীক্ষিত হইতে হইবে—সংসারের সুখ ও শান্তি যাহাতে থাকে,—তজ্জন্য তাহাকে সর্বতোভাবে চেষ্টা করিতে হইবে, স্বামীর প্রতিকূলে আচরণ করিয়া তিনি তাহা কখনও করিতে পারিবেন না; স্বামী যদি বোঝেন, স্ত্রী তাঁহার অনুকূল, তখন প্রীতি জন্মিবে এবং এই প্রীতির ফলে ধীরে ধীরে স্ত্রী স্বামীর কার্পণ্য সংশোধন করিতে পারিবেন।

স্বামী যদি চরিত্রহীন হন, ইহা স্ত্রীর পক্ষে সাংঘাতিক, সেই পরিবারের পক্ষে সাংঘাতিক; কিন্তু বিপদ পড়িলে অবশ্যই আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে হইবে। যাঁহারা দিবারাত্র এজন্য বিরক্তি বা ক্রোধ প্রকাশ করিবেন—তাহার ফলে স্বামী কখনই শোধরাইবেন না। কেহ বা স্বামীকে জব্দ করিবার জন্য পরের নিকট নিন্দা প্রচার করেন। স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে বাহিরের লোক তামাসাগির ভিন্ন কিছু নহেন। স্ত্রী স্বামীর নিন্দা গাহিয়া এবং পরের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া স্বামীর প্রেমলাভ করিতে পারিবেন না। বরং তিনি তাঁহার মন হইতে ক্রমেই দূরে যাইয়া পড়িবেন। কোন কোন স্ত্রী স্বামীকে প্রীত করিবার জন্য অতিরিক্ত চেষ্টায় নিজে অসংযত হইয়া পড়েন। অসংযতের নিকট অসংযম,—উহা আগুনে ঘৃতাহুতি মাত্র; উহাতে স্বামীর চরিত্রের দোষগুলি আরও বাড়াইয়া তুলিবে। স্ত্রীর এ অবস্থায় তপস্বিনীর মত হইয়া থাকা উচিত। আচারে ব্যবহারে সংযত হইয়া স্বামীকে স্নেহের সহিত উপদেশ দেওয়া এবং অন্য ব্যক্তি তাঁহার নিন্দা করিলে যথাসাধ্য তাঁহার দোষ ঢাকিবার চেষ্টা করা—একমাত্র উপায় আমি জানি।

কোন কোন স্বামীও অনেক সময় অকারণে স্ত্রীকে সন্দেহ করেন—যাঁহার চিত্তবেগ প্রবল ও চরিত্র অতিরিক্ত পরিমাণে আগ্রহশীল তাঁহার স্ত্রী যদি কতকটা উপেক্ষার ভাব দেখান,—তবে তিনি যাহা দিয়াছেন, সেই পরিমাণে স্নেহ পান নাই বলিয়া ক্ষুব্ধ থাকেন।...স্বামীর সন্দেহ-নিবারণের একমাত্র উপায়, স্ত্রী স্বামীর প্রতি বেশী মনোযোগ ও স্নেহ দেখাইবেন।... মিথ্যাচরণ না করিয়া যদি সর্ববিষয়ে স্বামীর প্রতি বেশী মনোযোগী হওয়া যায়, তবে স্বামী প্রীত হইবেন। অনেক সময় অপরের সেবায় এবং স্বীয় উদাসীনতায় সময় ব্যয় না করিয়া, যদি স্বামীর প্রতি যত্নে ও আদরে স্ত্রী আন্তরিক আগ্রহ দেখান, তবে স্বামী বেশী দিন সন্দিগ্ধ থাকিতে পারেন না। সন্দেহ কোন সুখের প্রলোভন দেখাইয়া মানুষকে বিপথে লইয়া যায় না, যাঁহাকে সন্দেহ করা হয়, তিনিও সেরূপ ক্লেশ পান—যিনি সন্দেহ করেন, তিনিও সেইরূপ। উভয়েই মনে মনে উহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন।...স্বামীর মনে যদি এই কথাটা লওয়াইতে পারা যায় যে, স্ত্রী সত্য-সত্যই তাঁহার অনুরাগিণী তবে সন্দেহ বেশীদিন তিষ্ঠিতে পারে না। তাহা না করিয়া স্ত্রী যদি অতিরিক্ত সাবধান হইয়া লোককে দেখাইতে থাকেন যে, তিনি কত সাবধানে চলাফেরা করেন, অথচ স্বামীর সন্দেহ কিছুতে যায় না,—তাহাতে বিশেষ ফলোদয় হইবে না। তাঁহার হৃদয় হইতে উপেক্ষার ভাব দূরে করিয়া স্বামীর প্রতি তিনি বেশী মনোযোগ দিন। তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন তাঁহার স্নেহামৃত-বর্ষণে সন্দেহের বিষ ধুইয়া গিয়াছে।

—ক্ষপণক
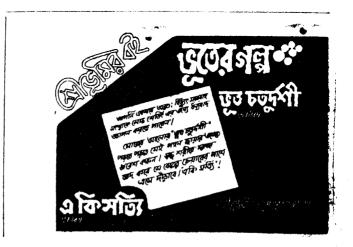
হেমন্ত শেষের সকাল। জানলার ফাঁক নিয়ে নকসাকাটা মিষ্টি রোদ এসে লুটিয়ে পড়েছে মাধবীর পায়ের পাতায়, কোলের কাছে আর শাড়ীর আঁচলে। এ সময়টা অল্প শীতের আমেজ তাই রোদটুকু ভালোই লাগে। আজ সকালেই বাবার চিঠি পেয়েছে। চিঠিখানা একটু একটু করে পড়ে। কত কথা লেখেন বাবা। মাধবী কেমন আছে, মাথার যন্ত্রণাটা অত ঘনঘন হচ্ছে কিনা। এছাড়াও কত খবর। মাধবীর পুষিটা যেন কোথায় চলে গেছে শিউলির চারাটা অনেক বড় হয়েছে এবার তাতে ফুল ফুটিছে। সবটা একসঙ্গে পড়তে কষ্ট হয় মাধবীর। অনেক টাকা খরচ করে বাবা ওকে এই হাসপাতালে রেখেছেন, বাবাই খালি ওর জন্যে ভাবেন, মনে রেখেছেন মাধবী বলে একটা মেয়ে ছিল, যে মেয়েটা—

কপালটা টিপ টিপ করে মাধবীর। সে মেয়েটা কি ? সে মেয়েটা কে ? সব যেন আবার এলোমেলো হয়ে যায়, তবু প্রবল চেষ্টায় নিজেকে বশে আনতে চায় ও। হাত দুখানা মেলে ধরে চোখের সামনে, নিজের বাহু ছুঁয়ে দেখে আলতো হাতে স্পর্শ করে হাঁটুর কাছটা তারপর যেন অপারগ হয়ে এক সময় দুহাত মোচড়াতে থাকে। প্রবল কষ্টে চোখে জল এসে যায়, বুকের মধ্যে একটা আর্ত পাখী যেন ডানা ঝাপটাতে থাকে। একটু পরে সমস্ত কষ্টটা গলে জল হয়ে দুচোখ দিয়ে গড়িয়ে নামে আর ক্লান্ত অবসন্ন মাধবী মাথা রাখে সামনের ছোট্ট টেবিলটার ওপর। একটু পরে দুধের গ্লাস হাতে নিয়ে আসবে আয়া। এসে দেখবে সতেরো নম্বর অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। দুগালে শুকনো চোখের জলের দাগ দেখে নার্সকে জানাবে সতেরো নম্বর আজ আবার কাঁদছিল।

সেদিনও কেঁদেছিল মাধবী সুপ্রিয়র কাছে, মার কাছে দিদির কাছে। দিদি বলেছিল, তোমার ছোট মেয়ের বিয়ে দাও মা, যে বয়েসের যা। সাত বছর বিয়ে হয়ে খুব গিন্নি হয়ে গিয়েছিল মালতী।

তা সেই বিয়ের ব্যবস্থা ত হয়েই বসেছিল। সুপ্রিয় বলত, কি ব্যাপার বলত, তোমার দেখছি কোন তাড়াই নেই, আর কারুকে মন দিয়েছ নাকি ? আমায় বাপু সময় থাকতে নোটিস দিও। খুব হাসি খুসী মানুষ ছিল সুপ্রিয়। সব কিছুতেই খালি হাসি ঠাট্টা।

—দিয়েছিই ত, তুমি এবার কেটে পড় দেখি দুষ্টুমী করে বলত মাধবী। মুখ টিপে হাসলে গালে টোল পড়ত ওর। সুপ্রিয় এবার শক্তহাতে চেপে ধরত ওর ডান হাতখানা।

—এই তোমার বাবাকে বলি এবার, গাঢ়-স্বরে বলত ও।

—আচ্ছা, আমি কে বলত ? হঠাৎ প্রশ্ন করত মাধবী।

—তুমি আমার মাধবী, ওর হয়ত আর একটু চাপ দিত সুপ্রিয়।

—আমি মাধবী কিন্তু মাধবী মানে কি ? মাধবী মানে ঠিক কে ? হঠাৎ সুপ্রিয়র চোখের দিকে লজ্জিত হয়ে চুপ করে যেত ও। তারপর একটু থেমে যেন কৈফিয়তের ভঙ্গীতে বলত, জানো আমার যেন কেমন সব মনে হয়—আমি কে, আমি কোথা থেকে এসেছি আমি মানে কি—আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

সত্যিই গোলমাল হয়ে যেত মাধবীর। সুপ্রিয় ওকে ভালোবাসে, ওকে বিয়ে করতে চায় কিন্তু ও কে তাত জানিতে চায় না, ভাবেও না বোধহয় কখনও। মাধবীও ত বুঝতে পারে না তবু ভাবে। ভেবে ভেবে ক্লান্ত হয়ে এক সময় বাবার ঘরে গিয়ে দাঁড়াত। কত বই বাবার ঘরে। বাবার পিঠ ঘেঁসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকত ও।

—কি মা, লিখতে লিখতেই বাবা প্রশ্ন করতেন এক সময়।

—আচ্ছা বাবা—

—হ্যাঁ। বল ?

—আচ্ছা বাবা একটু থেমে মাধবী তুমি জানো আমি কে ? মুখ তোলেন বাবা, ওকে এক পলকে দেখে নিয়ে বলেন, তুমি মাধবী, আমার লক্ষ্মী মেয়ে।

—কিন্তু বাবা, আমি কেন বুঝতে পারি না আমি কে, আমি মানে কি তুমি আমাকে বুঝিয়ে দেবে, তুমি ত' কত জানো। হাতের কলম আগেই থেমেছিল, এবার নামিয়ে রাখেন দর্শনের অধ্যাপক। মেয়ের মুখের দিকে একটু সময় চেয়ে থাকেন তার পর ধীরে ধীরে বলেন, এটা কেউ কারুকে বুঝিয়ে দিতে পারে না মা, এটা উপলব্ধির জিনিস, এ নিয়ে মন অযথা অশান্ত করো না। সময় যদি আসে তবে একদিন তুমি নিজেই এর উত্তর পেয়ে যাবে।

বাবা কত সহজে ওকে সান্ত্বনা দিলেন সেদিন, কিন্তু মাধবী ত এত দিনেও শান্তি পেলো না। আর কত দিন কতকাল সে অপেক্ষা করবে সেই এক দিনের জন্য ? ও যে আর পারছে না। কেউই ওকে বোঝে না, বুঝতে চেষ্টা করে না কেবল বাবা ছাড়া। মা ভয় পায় কাঁদে সুপ্রিয় রাগ করে অভিমান করে দুদিন আসে না। কি যে এক খেয়াল মাধবীর যত সব উদ্ভট কথা বলে। গোলাপী রং-এর নতুন কেনা তাঁতের শাড়ীখানা পরে সেদিন ভারী সুন্দর লাগছিল ওকে। মুগ্ধ সুপ্রিয় ওর খুব কাছে এসেছিল, বলেছিল, কি সুন্দর তুমি মাধবী।

—আমি সুন্দর ? আমি ? অস্ফুটে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করেছিল। এই শুনে চল পাগলামী কি বকছ—অসহিষ্ণু সুপ্রিয় ওর দু কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিয়েছিল জোরে। ওর রাগী রাগী লাল মুখের দিকে চেয়ে ভয় পেয়েছিল মাধবী বুকের মধ্যে সেই ছোট্ট পাখীটা যেন কেঁপে উঠেছিল। যন্ত্রণায়। কেউ বোঝে না বুঝতে চায় না।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। চুল বাঁধতে গিয়ে হাত থেমে যায় মাধবীর। আয়নায় ছায়া পড়েছে। এত সুন্দর ও। হাতের চিরুনী হাতেই রইল অবাক চোখে চেয়ে থাকে মাধবী। এই কি আমি ? ও ফিসফিস করে বলে আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করে ওর ছায়াকে। আমি মানে কি ? এই চোখ এই ঠোঁট এই হাত পা সব মিলে আমি ? শুধু এই আর কিছু নয় ? তা যদি হয় তবে কেন আমি শান্তি পাই না ? ছটফট করে ওঠে আয়না ছেড়ে জানলার ধারে এসে দাঁড়ায় মাধবী। বাইরে পড়ন্ত রোদে সূর্যমুখী ফুলগুলো কেমন ম্লান দেখায়। পেয়ারা গাছের ডালে দোল খাচ্ছে একটা টুনটুনি পাখী রাস্তা দিয়ে হেঁকে যাচ্ছে বাসন-ওয়ালা। সারা পৃথিবী চলছে নিজের খুসীতে। কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না কেউ জানতে চায় না শুধু মাধবী মরছে মাথা কুটে। কিন্তু ওকে ত জানতেই হবে ওর ত নিস্তার নেই এ প্রশ্নের হাত থেকে।

—কিরে কি বকছিস একা একা ? সন্দিগ্ধ চোখে চায় দিদি।

—আমি জানবই, আমাকে জানতেই হবে—জানলার গরাদ মুঠো করে চেপে ধরে কেমন এক অর্থহীন চোখে চায় মাধবী।

—মা, ওমা, শীগগীর একবার এদিকে এসত —ভয়ার্ত শোনায় মালতীর গলা ডাক্তার দেখাও মা মাধু কি পাগল হয়ে যাচ্ছে ? কেঁদে ফেলে মালতী।

মাধবী কিন্তু অবাক হয়ে যায় দিদির কান্না দেখে। দিদিটা ভারী বোকা। মাও তেমনি। কেন ওরাও ভাবে না। ওরাও ত ভাবতে পারে। সবাই মিলে ভাবলে উত্তরটা কবে বেরিয়ে যেত। মাধবী একদিন জিগেস করেছিল আচ্ছা দিদি তুই কখনও ভাবিস তুই কে ?

—আমি কে ? মালতী অবাক।

—হ্যাঁ তুই কে মাধবী আকাঙ্ক্ষিত গলায় বলেছিল তুই মানে ত খালি তোর এই হাত পাগুলো শুধু নয় এ ছাড়া—

—কি আবোল-তাবোল বকছিস, পাগল হলি নাকি ? ধমক দিয়েছিল দিদি সেদিন তারপর মাকে বলেছিল ওর বিয়ে দাও মা তোমার জামাইও বলছিল—ওর কথাবার্তা বাপু ভালো ঠেকছে না আমার।

বাবা বলেছিলেন মাধু বড় ভাবুক স্বভাবের মেয়ে, ওকে যে ঠিক বুঝবে এমন ছেলেরই সন্ধান করতে হবে। কিন্তু হায়রে মাধবী নিজেই যে নিজেকে বুঝছে না তার কি হবে ? সুপ্রিয়ও যদি বুঝত ওকে। সুপ্রিয় বোঝেনি। অমন হাসিখুসী মানুষ শেষের দিকে খালি রাগই করত হয়েছিল নির্ঘাত মাথা খারাপ হয়েছে তোমার তাই এসব উদ্ভট চিন্তা যত সব পাকামি—

এর পরও অনেক দিন এসেছিল সুপ্রিয় শুকনো মুখে বসে থাকত বারান্দায় চেয়ারে। তারপর আর আসেনি। সবার মত সুপ্রিয়ও হারিয়ে গেল মাধবীর হিসেব থেকে রইল কেবল ও নিজে আর রইলেন বাবা। বাবা এখনও আসেন মাঝে অন্ততঃ একবার করে। অনেক চুল পেকে গেছে কণ্ঠার হাড় ঠেলে উঁচু হয়ে উঠেছে তবু আসেন তিনি। এসে চুপ করে বসে থাকেন, কখনও হাত রাখেন মেয়ের মাথায়। চোখের কোণটা চিকচিক করে দর্শনের অধ্যাপকের। বলেন আমি তোকে কোন সাহায্যই করতে পারলাম না মা আমি কিছুই শিখিনি কিছুই বুঝিনি রে—

মাধবীর বুকের মধ্যে যে পাখীটা ডানা ঝাপটায় তার যন্ত্রণার কান্না শুধু বাবাই শুনতে পান কান পেতে শোনেন আর প্রহর গোনেন। বাবা এখন শুধু অপেক্ষাই করেন কবে মুক্ত হয়ে উড়ে যাবে পাখীটা দূর আকাশের ওপারে যেখান থেকে ও অবশেষে জানিয়ে দেবে মাধবী কি মাধবী কে।

সুরতীর্থের রজত-জয়ন্তী উৎসব

সুরতীর্থ সংগীত ও নৃত্যপ্রতিষ্ঠানের রজত-জয়ন্তী বর্ষপূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্র-সদনে তিনদিনব্যাপী এক উৎসবে যথাক্রমে শ্যামা, চিত্রাঙ্গদা এবং কচ ও দেবযানী মঞ্চস্থ হয়েছিল। পরিকল্পনা ও উপস্থাপনার কৃতিত্ব স্বনামধন্য সংগঠক বাবুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের। প্রযোজনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষা ডাঃ নীহারকণা মুখোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠানের সূচনা 'শ্যামা' দিয়ে। বজ্রসেনের নৃত্যাভিনয়ে সাধন গুহ প্রণয়ের স্বপ্নমদিরতা এবং পৌরুষধর্ম—উভয় দিকটির প্রতিই আলোকপাত করেছেন—প্রধানতঃ কথাকলি আংগিকের ভিত্তিতেই। শ্যামার ভূমিকায় পলি গুহ তাঁর রাজনর্তকীর মতই দেহসৌষ্ঠব, নৃত্যলালিত্য ও অভিব্যক্তির সুষমা দিয়ে শ্যামার ভাবান্তর, স্পন্দন ও হৃদয়বেদনার ছবিখানি হয়ে উঠেছিলেন।

আর উত্তীয়? নীরব আত্মদানের মাধুর্যে ভরা তার করুণ-কোমল রূপটির যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছিলো সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েক মুহূর্তের নৃত্য-ব্যঞ্জনায়। নৃত্যদক্ষ শিবশংকরম (কোটাল), বটু পাল (বন্ধু) নৃত্যাঙ্গের সাফল্যের সহায়ক হয়ে ওঠেন। রাজার ভূমিকায় নিতাই ঘোষ মানানসই। প্রথম দৃশ্যে রাজসভায় ভারতনাট্যমের অবতারণায় নতুনত্ব সৃষ্টির প্রয়াস পরিলক্ষিত কিন্তু দর্শকের দৃষ্টির সামনে পরিবেশিত নৃত্য স্বভাবতই রাজার দৃষ্টির বাইরে থেকে যায় (যদি সামনাসামনি নাচ দেখালেই সঠিক দৃষ্টি-কোণ বলে ধরা হয়)। এক্ষেত্রে রাজসভায় নৃত্য-দৃশ্যের কোনো অর্থ রইলো কি?

বজ্রসেনের গান গাওয়ার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। উত্তীয়ের গানগুলির আবেগঢালা পরিবেশনায় মুগ্ধতার সৃষ্টি করেছেন চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়। জীবন-পাত্র উচ্ছলিয়া'র গভীর ব্যঞ্জনার পরই 'প্রহরী ওগো প্রহরী'-তে অপরাধী সাজার অভিনয়ের মধ্যেও সূক্ষ্ম বেদনার রেখাটি শিল্পীর প্রকাশভঙ্গিতে অনুভূত।

কোটালের কয়েকটি গানেই উপভোগ্য পরিবেশ রচনা করেছেন দেবব্রত বিশ্বাস। বন্ধুর গানগুলি অমিয়াংশু মুখার্জির কণ্ঠে সু-পরিবেশিত।

কিন্তু অবাক করে দিয়েছেন বাণী ঠাকুর শ্যামার গানে। যে-গানে কণিকার ইতিহাস রচনা করেছেন বললেও অত্যুক্তি হয় না, সে-গান তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে বাণী ঠাকুর গাইতে সাহস করেছেন এবং গেয়ে রসিকজনের প্রশংসা আদায় করে নিয়েছেন—এ-খবর নিশ্চয়ই আনন্দের। 'তোমাদের এ কি ভ্রান্তি' অথবা 'তোমার কাছে দোষ করি নাই—দোষী আমি বিধাতার কাছে' গানগুলিতে তিনি নিজেকে অতিক্রম করেছেন। উচ্চাংগ সংগীতে শিবাণী পাল এবং নৃত্য-পরিদর্শনে ছিলেন শ্রীমতী বেলা অর্ণব।

চিত্রাঙ্গদা এবং বিদায় অভিশাপ অবলম্বনে রচিত 'কচ ও দেবযানী' দুটি নৃত্যনাট্যেই নায়কের ভূমিকায় ছিলেন সাধন গুহ। প্রেমিক ও ক্ষত্রিয় যোদ্ধা অর্জুন এবং কর্তব্যনিষ্ঠ কচ দুটি চরিত্রই তাঁর নৃত্যে স্বচ্ছ। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীবৃন্দ। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন সংযুক্তা ঘোষ, স্নিগ্ধা গোস্বামী কৃষ্ণা কর ও সোমাদ্রি সেন (বড় ও ছোট দেবযানী) মধুশ্রী দাস।

কুরূপা ও সুরূপা উভয় চিত্রাঙ্গদার গানেই ঋতু গুহঠাকুরতার মুক্তকণ্ঠ কখনও বিস্ময়ে মধুর, কখনও রূপরিক্ততার বেদনায় কাতর, আবার রূপসমৃদ্ধ সৌন্দর্যের ক্ষণিকতায় বিষণ্ণ। সারা প্রেক্ষাগৃহ যেন সুরের উন্মাদনায় স্তব্ধ হয়েছিলো। অর্জুন ও মদনের গানে নুই সেন (সাগর ও অর্ঘ্য) চাঁপাগানুগ।

কোটালের গানে যে দেবব্রত বিশ্বাস ছিলেন শুধুমাত্র কৌতুক রসস্রষ্টা সেই একই শিল্পী কচের গানের মনোহর-লালিত্য সৃষ্টি করেছেন বুঝি তাঁর বহুমুখীন প্রকাশক্ষমতার উজ্জ্বল নজীর রাখতে। দেবব্রত বিশ্বাস এক্ষেত্রে সত্যই দ্বিতীয়রহিত।

দেবযানীর প্রতিশোধ-কঠোর, অসহায়-কাতর দুটি দিকই গানে গানে মূর্ত করে তোলেন সুমিত্রা সেন ও বাণী ঠাকুর।

সুর ও ছন্দে কিশোর কচের রূপসৃষ্টি করেন অর্ঘ্য সেন ও সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাগসঙ্গীত পরিবেশনায় ছিলেন প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়।

গানের ফাঁকগুলি রবীন্দ্রনাথের অনুপম সংলাপলাবণ্যে ভরে দিয়েছেন পার্থ ঘোষ ও গৌরী ঘোষ। নৃত্যপরিচালনার কৃতিত্ব অসিত চট্টোপাধ্যায়ের। আলোকের দায়িত্ব সুবাহিত হয়েছে কনিষ্ক সেনের কাজে।

ম্যাগসেসে পুরস্কার সম্বর্ধিতা শুভলক্ষ্মী : ১৯৭৮ সালে ম্যাগসেসে পুরস্কারভূষিতা হলেন শ্রীমতী এম, এস, শুভলক্ষ্মী। দেশ ও সমাজের নানান কল্যাণমূলক কাজে ইনি বহুবারই দশ লক্ষাধিক মার্কিনী ডলার সংগ্রহ করে দিয়েছেন হিন্দুস্থানী ও দক্ষিণী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের এবং ভজনের অনুষ্ঠান দিয়ে। ট্রাস্ট বোর্ড জানিয়েছেন সাধারণের হিতার্থে ছাড়াও হাসপাতাল, অনাথ বিদ্যালয়, সঙ্গীত ও সাংবাদিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণার্থে এবং মহাত্মাজীর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে পাঁচটি একক সংগীতের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছেন। মহাত্মাজীর ৭৮তম জন্মদিনে (তাঁর মৃত্যুর কিছু আগে) শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী তাঁরই ইচ্ছেয় বিশেষভাবে তাঁরই জন্য ভজন গেয়েছেন। স্বর্গত সরোজিনী নাইডুর ভাষায় 'শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী। গোল্ডেন ভয়েস ইজ অ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট অফ গ্রেট কজ'। শ্রীমতী শুভলক্ষ্মীর পুরস্কারপ্রাপ্তিতে সেই মহত্ত্বই সম্মানিত হয়েছে।

—চিত্রাঙ্গদা

প্রেক্ষাগৃহ

ঠোক্কর
অলকা
পরিচালনা ঃ দিলীপ বসু

সাম্প্রতিক হিন্দী ছবিতে বিদেশী ছবির প্রভাব

কলকাতায় মুক্তিপ্রাপ্ত সাম্প্রতিক হিন্দী ছবিগুলির পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অধিকাংশ ছবিতে বিদেশী ছবির প্রভাব আছে। কোথাও আংশিক আবার কোথাও পুরোপুরি। একমাত্র ব্যতিক্রম হিসাবে ভি শান্তারামের 'পিঞ্জরা', আনন্দ গাঙ্গুলীর 'কোরা কাগজ', তপন সিংহের 'সাগিনা'। অশোক রায়ের 'চোর মাচায়ে শোর'কে একটি পরিচ্ছন্ন হাসির ছবি হিসাবে মেনে নিলেও এ ছবিতে যেভাবে ক্রাইম ও ভায়োলেন্স-এর দৃশ্যাবলী পরিবেশিত হয়েছে, সেটা বিদেশ থেকে ধার করা বললে অত্যুক্তি হবে না।

নরেন্দ্র বেদীর 'খোটে সিক্কে' ছবিটি দেখবার পূর্বে ধারণা ছিল যে এটা আর একটি ব্যাঙ্ক ডাকাতি ছবির ভারতীয় সংস্করণ। কিন্তু দেখতে গিয়ে একে একে মনে পড়লো ক্লিন্ট ইস্টউড অভিনীত একাধিক ছবির কথা। যেমন 'ফিউ ডলারস মোর', 'দি গুড ব্যাড আগলী' প্রভৃতি। এছাড়া আংশিক এ ছবির পরিচালক অনুপ্রেরণা পেয়েছেন একটি জাপানী ছবি থেকে 'সেভেন সামুরাই' (ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে প্রদর্শিত)। পরিচালক ছিলেন কুরোশোয়া এবং বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তোশিরো মিফুনে। 'খোটে সিক্কে' ছবির নায়ক ফিরোজ খান না হতে পেরেছেন ক্লিন্ট ইস্টউড না পেরেছেন তোশিরো মিফুনে, শুধু ব্যর্থ অনুকরণে ক্লান্ত হয়েছেন। যাঁরা হিন্দী ছবিতে অ্যাকশন দেখতে চান ক্ষিপ্রগতিতে তাঁরা হয়তো দলে দলে ভিড় করবেন। আর অতিরিক্ত আকর্ষণ রেহানা সুলতান, যদিও ওঁকে কেবল কয়েকটি দৃশ্যেই দেখা গেছে।

মদন সিনহা আলোকচিত্রগ্রাহক অর্থাৎ ক্যামেরাম্যান হিসাবে কলকাতায় বিখ্যাত

পিজরা
সন্ধ্যা / শ্রীরাম লাগু

রানী অউর জানী
জয় ললিতা / অনিল ধাওয়ান

হয়েছেন, তাঁর বিভিন্ন ছবির কাজের মাধ্যমে। ওঁর প্রথম পরিচালিত ছবি 'ইমতিহান' দেখতে গিয়ে মনে হয়েছিল ব্রিটিশ ছবি 'টু স্যার উইথ লভ'এর ভারতীয় সংস্করণ। অন্ততপক্ষে নায়ক ও নায়িকার চরিত্র দুটির সঙ্গে বিদেশী ছবির মিল দুর্লক্ষ্য নয়। ছবির শেষে পরিচালক সাংবাদিকদের বললেন উনি 'ইমতিহান' ছবির অনুপ্রেরণা পেয়েছেন তিনটি বিদেশী ছবি থেকে। সেগুলো হল 'টু স্যার উইথ লভ', 'অকুপেশানাল হ্যাজার্ড' এবং 'ওয়াকিং স্টিক'। অধ্যাপকের চরিত্র এসেছে 'টু স্যার উইথ লভ' থেকে, বিন্দুর চরিত্র 'অকুপেশানাল হ্যাজার্ড' (ফরাসী ছবিটি ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে প্রদর্শিত) এবং তনুজার চরিত্র তৈরী করা হয়েছে 'ওয়াকিং স্টিক' থেকে। কিন্তু আমার মনে হয় অধ্যাপক ছাড়াও উনি ঐ ছবিরই লুলু অভিনীত চরিত্র থেকে 'বিন্দুর' চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। ফরাসী ছবিটি না দেখায় পরিচালকের বক্তব্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে পারছি না। উনি ইচ্ছা করলে 'ইমতিহানকে' এভাবে না করে ছাত্র ও অধ্যাপকদের সম্পর্ক দেখিয়ে আরো একটি বলিষ্ঠ ও বাস্তব ছবি তৈরি করতে পারতেন। সম্পূর্ণ বহির্দৃশ্যে গৃহীত আলোকচিত্রগ্রহণ বিশেষ করে পরিবেশানুযায়ী রঙের পরিবর্তনের দৃশ্যগুলি বিস্ময়কর। কাহিনীর অবাস্তবতার জন্যে উনি সার্থক ছবি করতে ব্যর্থ হলেন।

শ্রবণকুমারের 'হাবস' ছবিটিও একাধিক হলিউডের ছবির ব্যর্থ অনুকরণ। এক মোহময়ী বিবাহিতা রমণী, স্বামীর কাছ থেকে কামনা-বাসনার পরিতৃপ্তি না পেয়ে সুন্দর সুবেশী তরুণদের দেখলেই তাঁদের সঙ্গ পাবার জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে একটুও সময় নিতেন না। এখানেই পরিচালক একটা কিছু বলবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পরে উনি গতানুগতিক হিন্দী ছবির মতো ক্রাইম নিয়ে এসেছেন বক্স অফিসের জন্যে। সঙ্গে নৃত্য গীত ক্যাবারে এবং যৌনাবেদন, অর্থাৎ ভারতীয় পরিবেশে একটি মার্কিন ছবি পরিবেশিত হচ্ছে। ছবিতে গিমিক ছাড়া আর কিছুই নেই। আর বিন্দু ছাড়া অভিনয়ে নিতু সিং অনিল ধাওয়ান সবাই ব্যর্থ বলা চলে।

আজ বম্বেতে স্বর্গত বিমল রায়ের মতো পরিচালকের প্রয়োজন আছে। সম্প্রতি শ্রীমতী মনোবীণা রায় (বিমল রায়ের পত্নী) এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন বিমলবাবুর শুরু করা 'চৈতালী' (আশাপূর্ণা দেবীর 'ছাড়পত্র' অবলম্বনে রচিত) বর্তমানে পরিচালনা করছেন হৃষিকেশ মুখার্জি। ছবির শিল্পী ধর্মেন্দ্র, সায়রাবানু, এবং অন্যান্যরা কোনো পারিশ্রমিক নিচ্ছেন না। সংগীতপরিচালক লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল এবং নেপথ্য শিল্পী লতা মুঙ্গেশকারও কোনো পারিশ্রমিক নিচ্ছেন না। ভবিষ্যতে কো-অপারেটিভ প্রথায় আরো পরিচ্ছন্ন হিন্দী ছবি প্রযোজনা করার ইচ্ছা আছে শ্রীমতী রায়ের। সম্ভব হলে কলকাতায় তিনি বিমল রায়ের পুরনো সব ছবি নিয়ে এক পরিবেশন সংস্থা গড়ে তুলবেন।

—চিত্রদূত

এখানে উত্তমকুমারকে একজন ডাক্তারের ূমিকায় দেখা যাচ্ছে। ডাক্তার সুধীর। আরেকজন ডাক্তার আছেন প্রশান্ত, অনিল চট্টোপাধ্যায়। এ'দের দুজনের গুরু ডঃ বসু. তরুণকুমারও উপস্থিত: বলতে গেলে আজ নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওর এই ফ্লোরে ডাক্তারদের ছড়াছড়ি। সেটাই ুব স্বাভাবিক। কেননা সেট পড়েছে একটি ুসজ্জিত আধুনিক নার্সিংহোমের— ফ্লারেন্স নার্সিংহোম। এখনই এর ইনা- ুরেশন হয়েছে। ডঃ বাসু সস্ত্রীক এসেছেন জিট করতে। তাঁর প্রথম কথাই হচ্ছে ফ্লারেন্স নার্সিংহোম বাঃ বেশ চমৎকার নাম তা। জনৈক ডাঃ মৈত্র বলেন, জানো প্রশান্ত ফ্লারেন্স নাইটেঙ্গলের মধ্যে মাত্র দুটি ক্ষর লক্ষ্য করবার মতো এফ আর এন নে ফেম আর নেম—উনি প্রচার চাননি।

তোমাদের আদর্শ যেন ঐ হয়। ..আদর্শের কথা থামিয়ে ডাঃ বাসু বললেন, ওসব কথা শুনতে ভাল বাস্তবে ওর কোন মূল্য নেই।

প্রশান্ত: ঠিক বলেছেন স্যার।

প্রশান্ত মনে মনে খুব খুশী হয়। কারণ ও'র মানসিকতা বিশেষ কোন আদর্শের ধার ধারে না। লক্ষ টাকা রোজগার করা। যেভাবেই হোক। বিলেত থেকে ফিরে এসে প্রশান্ত কেমন যেন বদলে গেছে। সুধীরের মনে পড়ে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা। মুহূর্তে সে ফিরে যায় অতীতে। সেই তার অন্ধকার জীবনে। সুধীর তলিয়ে যাচ্ছিল। অল্প বয়সেই সে আলোর নিশানা হারিয়ে ফেলেছিল। পাড়ার নাম করা গুণ্ডা গোকুলের দলে গিয়ে ভিড়েছিল। একবার এক চুরির ঘটনায় গোকুলকে সাহায্য করার ব্যাপারে সুধীরের জেল হয়ে গেল। তাকে স্থানান্তরিত করা হল। সাধারণ জেল এ নয় বহরমপুরের রিফরমেটরীতে যেখানে এই বয়েসী ছেলেদের শোধরানো হয় অথবা শোধরাবার সুযোগ দেওয়া হয়। ঘটনাচক্রে

তরুণকুমার

পান্থনিবাস
পরিচালনা : মিঠু চ্যাটার্জি

শুভেন্দু চ্যাটার্জি

সুধীর এসে পেয়ে গেল তার বাল্যবন্ধু প্রশান্তকে। তার বাবা মাকে। লজ্জায় মুখ আড়াল করল সুধীর প্রশান্তর বাবা এই জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট স্নেহের দৃষ্টিতে দেখলেন। প্রশান্ত আর সুধীরকে আলাদা করে ভাবলেন না তিনি। সুরু হল সুধীরের নতুন জীবনে উত্তরণ। সুধীরকে মানুষ করার সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে নিলেন দীপ্তেন-বাবু প্রশান্তর বাবা। প্রশান্ত আর সুধীর একসঙ্গে বড় হল। একসঙ্গে ডাক্তারী পাশ করল। আগ্রায় বেড়াতে গিয়ে দুজনেই প্রেমে পড়েছিল। উভয়েই আকৃষ্ট হয়েছিল চন্দ্রাণীর প্রতি। চন্দ্রানীর বেশী ভালো লেগেছিল উজ্জ্বল প্রকৃতির সুধীরকে। সুধীর টের পায় প্রশান্তর দুর্বলতা। নিজেকে সরিয়ে নেয় সে। শেষে চন্দ্রানীর সঙ্গে প্রশান্তর বিয়ে হয়। বিয়ের পর প্রশান্তর বাবা দুজনকেই বিলেতে পাঠাতে চাইলেন। সুধীর এ'দের কাছে আর ঋণী হতে চায় না। কিছু অকাট্য যুক্তি খাড়া করে সে অব্যাহতি পেল। প্রশান্তকে যেতেই হল।

সুখেন-সুস্মিতা/অনুরাগে মেহমান
পরিচালনা : জ্ঞানেশ মুখার্জি

অমানুষ/উত্তমকুমার
পরিচালনা : শক্তি সামন্ত। ফটো : অমৃত
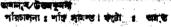
প্রশান্ত চলে যাবার পর দীপেনবাবু মারা গেলেন। তাঁর ইচ্ছে অনুসারে শেষ পর্যন্ত সুধীরকেও বিলেত যেতে হল। বিলেত থেকে একসঙ্গে ফিরে এল দুই বন্ধু। এবার কি করা যায় কি করা যায়—এই ভেবে একটা আধুনিক নার্সিংহোম খোলার পরিকল্পনা করল প্রশান্ত।

রূপায়ণ তো হল। তারপর? তারপর গল্পে প্রচণ্ড মোচড়। আদর্শের বিরোধ। টাকার প্রয়োজন অস্বীকার করে না সুধীর কিন্তু প্রশান্তর মাত্রাতিরিক্ত লোভ আর অতি ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির প্রতিবাদ জানায়। এর মধ্যে আবার মৈত্রেয়ীর আগমন ডাঃ বাসুর যুবতী স্ত্রী। ডাঃ বাসুর অগাধ টাকা পয়সা মৈত্রেয়ীর অর্থ পিপাসা মেটাতে পর্যাপ্ত বটে কিন্তু তার মত দেহসর্বস্ব নারী সুধীরের মতো শক্ত সমর্থ ছেলেকেই খুঁজে নেবে এতে আর আশ্চর্য কি। সুধীর মৈত্রেয়ীর ডাকে সাড়া দেয়। দিনের পর দিন নিখুঁত অভিনয় করতে থাকে সুধীর। অপেক্ষা শুধু উপযুক্ত সুযোগের। অবশেষে সুযোগ এল আর সেই চরম মৈত্রেয়ী বাসুর মুখোস চরম মুহূর্তে খুলে ফেলে দেয় সুধীর।

মৈত্রেয়ীর চরিত্রে রূপদান করেছেন আরতি ভট্টাচার্য। দেখলাম তিনি তাঁর চাহনিতে কথা বলার ভঙ্গিতে এমন সুন্দর একটা ব্যক্তিত্ব বজায় রাখছেন যাতে তাঁকে প্রতি মুহূর্তে অস্পষ্ট মনে হয়। চরিত্র এইটাই ডিমান্ড করছে। ছোট্ট হলেও চরিত্রটি যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা সহজেই অনুমেয়। ডাঃ বাসু এই চরিত্রে তরুণকুমার স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় করছেন তাঁর চোখে মুখে কথা বলায় প্রৌঢ়ত্বের ছাপ যেটা দরকার সহজেই ফুটে উঠেছে। সুধীর এবং প্রশান্তর ভূমিকায় যথাক্রমে উত্তমকুমার ও অনিল চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে বলার কিছু নেই। এ ছবির নায়িকা চন্দ্রানীর ভূমিকায় কাবেরী বসু।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের রচনা 'আমি সে ও সখা'। স্বরচিত চিত্রনাট্যে পরিচালনা করছেন প্রবীণ কুশলী মঙ্গল নির্মিত হচ্ছে। এস ডির এস হচ্ছেন শ্যামল মিত্র এবং ডি দীপেন ভট্টাচার্য।

বলা বাহুল্য এ ছবির সংগীত পরিচালক শ্যামল মিত্র। গান থাকছে মাত্র দুটি। একটি গেয়েছেন শ্রীমিত্র নিজে অন্যটি হৈমন্তী শুক্লা।

জোরজবরদস্তি করে বিয়ে দিয়ে দেয় এই ভয়ে রঞ্জিত মল্লিক বাড়ি থেকে পালিয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে এটা ঘটলে খবরের হেড লাইন হতে পারত কিন্তু না মোটে হচ্ছে না। কারণ তিনি পালিয়েছেন স্রেফ 'রাগ অনুরাগ' ছবির নায়ক শংকর সেনের রূপসজ্জায়। নায়ক গায়কও বটে। মিষ্টি মিষ্টি গান গায়। মেয়েরা খুব পছন্দ করে। তার মানেই তাঁর যথেষ্ট পপুলারিটি আছে। এ হেন শংকর সেন বিনা টিকিটে রেলে চেপে বসল। তাও আবার ফার্স্ট ক্লাশে। কোনক্রমে ঠাঁই মিলল: এই কামরায় চলেছেন এক এস্টেট রাজকুমারী। সে শংকর সেনকে চাক্ষুষ দেখেনি অথচ গানে পাগল। সেটা বোঝা গেল কথোপকথনে এবং টেপ রেকর্ডারে শংকর সেনের গান বাজবার পর। শংকর নিজের নামটা বেমালুম চেপে

পরিচালনা : তপন সিংহ। রাজা/শমিত ভঞ্জ

গেল। ট্রেন পথে ভালই কাটল। শংকরকে বিপদে পড়তে হল না। বিপদে পড়তে হল কালিংম্পং শহরে এসে। বন্ধু বরুণের কাছে এসেছে সে! বিস্তারিত বলেছে। আর যায় কোথায়। বরুণ এস্টেটের খবর নিয়ে আসে। গিয়ে সব রহস্য ফাঁস করে দিতে চায়। শংকর ওকে প্রাণপণে বাধা দেয়। একটু মজা করা যাক এইভাবে শংকর রাজকুমারীর কাছে বরুণকে শংকর সেন নামে চালিয়ে দেয়। খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে...বরুণের মহা ঝামেলা হয়েছে। যখন তখন রাজকুমারী ডেকে পাঠায়। কত মধুর কথা বলে। বরুণ ক্রমশ নার্ভাস হয়। একদিন তো সংজ্ঞা হারাবার উপক্রম যেদিন রাজকুমারী নাছোড়বান্দা শংকর সেনকে এখনই একটা গান গাইতে হবে। কোনরকমে পাশ কাটিয়ে সেদিনের মতো ছাড়া পেল বরুণ। কিন্তু গান তো শোনাতেই হবে। রাজকুমারীকে ইনভাইট করা হল। সমস্ত ব্যবস্থা পাকা। পর্দার আড়ালে একটা টেপ রেকর্ডার রাখা হল। ইতিমধ্যে অনেক বার রিহার্সাল হয়ে গিয়েছে। বরুণ রেডি। গলাটা একটু ঝেড়ে একটু কেশে ঠিকঠাক করে সে আসন্ন লড়াইর জন্য রীতিমত প্রস্তুত।

রাজকুমারী এসে গেলেন। যথানির্দিষ্ট স্থানে বসলেন। ঠিক সময়মত ঘড়ি ধরে টেপ রেকর্ডার চালু হল। বরুণ সুন্দরভাবে লিপ দিতে থাকে। হঠাৎ কোথা থেকে কি হয়ে গেল। টেপ রেকর্ডার বেগড়বাঁই শুরু করল। এখন? এখন কি হবে? কি করে ম্যানেজ করা যাবে? এ যে দেখছি হাটে **হাঁড়ি ভেঙে যাবে...**

হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিলেন অর্পণা সেন রাজকুমারীর বেশে। যেমন চেয়েছেন কাহিনীকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্রনাট্যকার শেখর চট্টোপাধ্যায় এবং পরিচালক চিত্রশিল্পী দীনেন গুপ্ত। হাসি আর গানে ভরা এ ছবির অন্যান্য চরিত্রের শিল্পীদের মধ্যে আছেন অনুপকুমার (বরুণ) সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় শেখর চট্টোপাধ্যায় কাজল গুপ্ত কণিকা মজুমদার রত্না ঘোষাল চিন্ময় রায় এবং রবি ঘোষ। ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে এ ছবির শুটিং দ্রুত এগিয়ে চলেছে। মাসখানেক পরে পরিচালক সদলবলে কালিংম্পং শহরে। সোনালী প্রোডাকসন্সের ব্যানারে নির্মিত হচ্ছে এ ছবি। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ছখানা গান রেকর্ড করা হয়ে গিয়েছে। কন্ঠদান করেছেন আরতি মুখোপাধ্যায় এবং সংগীত পরিচালক স্বয়ং।

—স্টুডিও সংবাদদাতা

বোম্বাই ফিল্মের কড়চা

জীতেন্দ্রর ভাঁওতাবাজি এখন শিশুরাও ধরে ফেলেছে। সেবারও প্রায় একই রকম ঘটনা। মুমু মানে মমতাজের সঙ্গে বিয়ে হয় হয়। রূপ তেরা মস্তানার শুটিং চলছে তখন। মমতার সঙ্গে ছবিতে একটা সাংঘাতিক ইন্টিমেট সিকোয়েন্স ছিল। এই সব ভাঁওতায় যদি কিছু করা যায়। জীতুর মাথায় ফট করে বুদ্ধি খেলে গেল। ওর তখন বাজার খুব মন্দা। মমুকে নিজের দুঃখের কাহিনী শোনাতে শোনাতে প্রস্তাব করল সে। একই ট্রেডের লোক রিলেশন খুব ভাল সাত-পাঁচ ভেবে মুমু রাজী হয়ে গেল। বলল আমার দ্বারা যদি এটুকু উপকার হয় তাহলে আমি কেন করব না। ব্যস সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্পেন শুরু হয়ে গেল। সাংবাদিকরা সব মুমুকে ঘিরে ধরল। সে মুখ টিপে টিপে হাসল শুধু। ধরি মাছ না ছুঁই পানি এইভাবে কিছু প্রশ্নের উত্তর দিল। কিন্তু এভাবে কতদিন চালানো যায়। মুমু লন্ডন ছুটল। বাঁচতে চাইল। দারুণ সুযোগ এসে গেল জীতুর কাছে। জীতু পাড়ি কি মারি করে লন্ডন ছুটল। ব্যাপারটা যাতে আরো জমে তার জন্য চেষ্টা এবং অর্থ ব্যয় করল প্রচুর। কাগজপত্রে ফলাও করে ছাপা হয়ে গেল— যেখানে মুমু সেখানেই জীতু। গতিক সুবিধার নয় দেখে মুমু লন্ডন থেকে বম্বেতে ফিরে এসেই প্রেস কনফারেন্স করল। সেখানেই সে স্পষ্ট জবাব জানিয়ে দিল— 'গুজবে কান দেবেন না, গুজব ছড়াবেন না।' হেমার বিষয়ে ঘটনা অবশ্য বেশীদূর এগোয়নি। শুরু হয় মাসখানেক আগে। হেমা-জীতেন্দ্র সেসময় গুলজারের 'খুশবু' ছবির শুটিং করছে।

সায়রা বানু

সাগিনা

দিলীপকুমার

এই ছবিতে হেমাকে নেয়ার জন্য জীতুর অবদান কম নয়। বলা যেতে পারে বেনামে এটা ওরই প্রোডাকশন। ফলে হেমা খানিকটা ওয়ারিলেটেড হয়ে পড়ে। জীতুর প্রোপোজালে সম্মতি দেয়। এবং তারপর থেকে প্রচারকার্য আরম্ভ হয়ে যায়। এতে হেমার মা খুব অস্বস্তি বোধ করেন। টেলিফোন করে কাগজের লোকজনদের ডেকে এরকম একটা বিবৃতি দেন: জীতেন্দ্র বাড়ির লোকজন আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন তা থেকেই রটেছে। একদম ভিত্তিহীন। আমি এবং হেমা দুজনেই প্রকাশিত খবর অর্থহীন মনে করি।

বম্বেতে বর্তমানে স্টুডিওর বাইরে বেশী শুটিং হচ্ছে। শুটিং হচ্ছে হোটেলের ঘর ভাড়া করে অথবা ফ্ল্যাটবাড়ি ভাড়া করে। স্টুডিওতে ফোর ভাড়া না দিয়ে শিল্পনির্দেশকদের কাজ কমিয়ে বাইরে আন্তর্দৃশ্য গ্রহণের কাজ চলছে। চলছে মানে রমরম করে চলছে। কিন্তু কতদিন চলবে বলা মুস্কিল। হোটেলের মালিক কিম্বা ফ্ল্যাটের মালিকরা বুঝছেন ধীরে ধীরে। আশা হয় অচিরেই হোটেলের ঘরের ভাড়া কিম্বা ফ্ল্যাটের ভাড়া বাড়বে। দেখতে দেখতে স্টুডিও ফ্লোরের ভাড় ছাপিয়ে যাবে।

আমি রাকেশকে ছেড়ে দিলে কি হবে রাকেশ আমাকে ছাড়ছে না। গর্ব করে বলে অমুক মহেন্দ্র। আমো বলে এখন আর আমার একটুও অসুবিধা হয় না। প্রথম প্রথম খুব হত। বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠত রাজেশ আমার রাজ আমাকেই ঠকাল। এসব নিয়ে ভেবে আর কি লাভ। ভাবি না। কিন্তু ও বোধহয় ভাবে খুব ভাবে আমার কথা। রোজ রাতে আমার কাছে একাই একশো হয়ে ছুটে আসে। বসুন না একটু বসুন স্বচক্ষেই দেখে যাবেন একসঙ্গে একশ রাজেশ খান্না। একশোটা ইঁদুর। বাগান থেকে প্রত্যহ রাতে আমার বিছানার চারপাশে ছড়িয়ে থাকে। কথা বলে ওরা, ওদের ভাষায়। আমি ওদের সকলের নাম রেখেছি রাজেশ খান্না।

বম্বের ছবিতে এখন 'সেকস' হচ্ছে প্রধান ব্যাপার। জনান্তিকে শুনলাম 'গুপ্ত জ্ঞান'-এর অনেকগুল পার্ট হবে অর্থাৎ আরো বেশ কয়েকটা এ জাতীয় ছবি হবে কেন না পরিচালক আদর্শ আমাদের আবার জ্ঞান দেবার উদ্যোগ করছেন। যেটুকু দিয়েছেন তাতে নাকি লাভ কিছু হয়নি। দেশের মুষ্টিমেয় কয়েকজন দর্শক বাদ দিলে আদর্শের মতে সেকস-এর প্রকৃত অর্থ কেউ বোঝেনি। 'গুপ্তজ্ঞান' গুপ্তই থেকে গেছে। লুপ্ত যাতে না হয় তার জন্য আরো কয়েকজন প্রযোজক এবং পরিচালক উৎসাহিত হয়েছেন। শুভ সংবাদ।

—অভিজিত

স্টুডিও সংবাদ

মহাশ্বেতা দেবীর 'মোমবাতি' কাহিনী অবলম্বনে যাত্রিক গোষ্ঠী নতুন ছবি শুরু করছেন 'অধিকার'। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পার্থপ্রতিম চৌধুরী। শুটিং শুরু হচ্ছে চলতি সপ্তাহে—কোয়ালিটি পিকচার্সের ব্যানারে। প্রথম পর্যায়ের শিল্পী অনিল চট্টোপাধ্যায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় এবং নবাগত অর্ঘ্য বসু। এ ছবির নায়ক উত্তমকুমার। প্রধান নারী চরিত্রে অবতীর্ণ হবেন খুব সম্ভবতঃ নন্দিতা বসু। চিত্রগ্রহণে আছেন: অনিল গুপ্ত। সঙ্গীত পরিচালনার ভার নিয়েছেন নচিকেতা ঘোষ। এ মাসেই গান রেকর্ড করা হবে।

ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে 'সন্ধ্যায় সূর্য' ছবির শুটিং দ্রুত এগিয়ে চলেছে। রুণু সাহা প্রযোজিত এ ছবিখানি পরিচালনা করছেন: অমৃতাভ মিত্র। নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন: দেবরাজ রায়, রাজশ্রী বসু। অন্যান্য চরিত্রে আছেন: উৎপল দত্ত, বিকাশ রায় এবং গীতা দে। চিত্রগ্রহণ ও শিল্প নির্দেশনায় আছেন যথাক্রমে সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিজয় বসু। এ ছবির সঙ্গীত পরিচালক পি এন সাহা।

ওঁরা বলেন

রণজিৎ মল্লিক

ঃ **আপনার প্রথম ছবি** 'ইণ্টারভিউ'তে এক **জায়গায় বলেছিলেন** 'আমি অভিনেতা **নই।'** আজ আপনার সঙ্গে আমার এই **ইণ্টারভিউয়ে** কি বলবেন?

—আজও আমি একই কথা বলব। অভিনেতা আমি এখনও নই। 'ইণ্টার-ভিউ' ছবিতে আমার সংলাপটা আমার জীবনেও সত্যি বলতে পারেন। অভি-নয়ের ডেফিনেশন কি তাই-ই ঠিক জানি না, অভিনেতা হবো কি করে? আসলে মানুষের চরিত্র স্টাডি করতে আমার খুব ভালো লাগে। ছাত্রজীবন থেকেই এটা আমার অভ্যাস। ফিল্মে কাজ করতে এসে আমার এই অভিজ্ঞতা খুব কাজে লাগাই।

ঃ তাহলে আপনি কি বলতে চান যেসব চরিত্রে আপনি এখন কাজ করছেন—তার সবগুলোই আপনার চেনাশোনার **মধ্যে?**

— না, তা ঠিক বলতে পারব না। তবে 'ছেঁড়া তমসুক'এর প্রভাত, 'রাগ-অনুরাগ' এর শঙ্কর, 'অপরাজিতা'র অরুণ মোটামুটি আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়ে। 'দেবী চৌধুরাণী'র ব্রজেশ্বর বা 'হাতে রইল তিন' এর এক নোংরা জায়গার দালাল চরিত্রগুলোকে আমাকে বুদ্ধি দিয়ে, কল্পনা দিয়ে তৈরী করে নিতে হয়েছে। সব চরিত্র কখনোই অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়ে কি, বলুন না।

ঃ আমাদের টালিগঞ্জে তো অভিনেতা কম নেই, তবুও আপনার ফিল্মে আসার প্রয়োজন ছিল কি?

— কোনো প্রয়োজনের কথা ভেবে আমি ফিল্মে আসিনি। এসেছিলাম নিতান্তই কৌতূহলের বশে। এখন ছবিতে কাজের অফার আসছে, কাজও করছি। বাংলা ফিল্মে আমার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু বা আদৌ আছে কিনা তা আপনারাই বলবেন, দর্শকরা বলবে। তবে এটা তো সত্য আমি না এলে কি বাংলা ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রি থেমে থাকতো, নিশ্চয় না।

ঃ প্রথম ছবিতে এক ইণ্টারভিউর দৃশ্যে আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিল—'বিবর' পড়ছেন, বিবর বাই সমরেশ বোস। আপনি বলেছিলেন—'না'। এখন আবার আমি জিজ্ঞেস করছি—'বিবর' পড়েছেন বাই সমরেশ বোস বা রাত ভরে বৃষ্টি বাই বুদ্ধদেব বোস?'

— (হাসতে হাসতে) সত্যি বলছি এখনও ও দুটোর একটা বইও আমি পড়ে উঠতে পারিনি। ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সুযোগ হয়নি। তাছাড়া আমার একটা ধারণা আছে। ধারণাটা হোল আজকের বই নতুন কথা কি আর লিখবে। আজকের সমাজ-সমস্যার কথাই থাকবে বইতে। আমি নিজে যে সমাজে আছি, যার প্রতিটি কাঁপন আমি অনুভব করছি প্রতিটা মুহূর্তে সে কথা আর নতুন করে কি পড়ব! বরং পুরোনো দিনের বই পড়তেই আমার বেশী ভালো লাগে। বঙ্কিমচন্দ্র-শরৎচন্দ্র যে সময়ে লিখেছিলেন তখনকার একটা সমাজচিত্র পাওয়া যায় তাঁদের রচনায়। আমার কাছে ওগুলো খুব ইণ্টারেস্টিং।

ঃ সারা পৃথিবী জুড়ে সিনেমায়, চিত্র-কলায়, সাহিত্যে প্রায়ই মেয়েদের নগ্ন করার প্রবণতা খুব বেশী। ছেলেদের নগ্ন চেহারা তেমন একটা চোখে পড়ে না কেন?

— সৃষ্টির সময় থেকেই মেয়েদের শারীরিক গড়ন সম্পর্কে একটা লুকোচুরির ব্যাপার আছে। লজ্জার নাম করে শরীরে আবরণ জড়ানো থেকেই এসেছে কৌতূহল। এবং এই কৌতূহলই চলে আসছে আদিকাল থেকে। মেয়েদের শরীর তাই আকর্ষণের বস্তু। মেয়েদের শরীর সম্পর্কে স্বাভাবিক কৌতূহল পুরুষের চিরদিনকার। তবে ছেলেদের নগ্ন করে দেখানো হয় না এটা সত্যি নয়। পুরোনো দিনের বহু বিখ্যাত বিখ্যাত পেইণ্টিংসে দেখবেন পুরুষের নগ্ন ছবি। আর আজকালকার ছবিতে বিশেষ করে বিদেশী ছবিতে পুরুষদেরও জন্ম-দিনের পোশাকে দেখানো হচ্ছে।

ঃ বলা হয় 'সুখের থেকে দুঃখ বড়।' —এটা কি কোনো দর্শন না নিছক মানসিক দুর্বলতা?

— সুখ জীবনে দীর্ঘস্থায়ী নয়, ক্ষণস্থায়ী। সুখের দিনের রেশ তাই বেশীদিন স্থায়ীও হয় না। সুখ আসে, চলে যায়। দুঃখটাই যেহেতু দীর্ঘস্থায়ী তাই দুঃখের দিনগুলো ধিকি ধিকি জ্বলে ভেতরে। এই জ্বলুনিতেও আছে আনন্দ। এ ব্যাপারটা দুর্বলতা বা দর্শন যাই বলা হোক না কেন তথ্যটা সত্যিই।

ঃ আপনার হাসিটাতো দারুন, এই হাসি দিয়ে 'কাউকে' বধ করেছেন কখনও? (করুণ হাসি হেসে) না দাদা—তেমন কোনো সুযোগও আসেনি। দুর্ভাগ্য আমার!

ঃ এই কলকাতাতেই আপনার জন্ম, এখনও আছেন এখানে, থাকবেনও। একবারও ভেবেছেন কি কলকাতার নাম কলকাতা হলো কেন?

কার্শিয়াং স্যানাটোরিয়ামের সাহায্যার্থে আয়োজিত সগিনার চ্যারিটি শো-এ পরিচালক তপন সিংহ, দিলীপকুমার, সুব্রত মুখার্জি অজিত পাঁজা, সায়রা বানু এবং অনিল চ্যাটার্জি। ফটো : অমৃত

— এতো মহাবিপদে ফেললেন মশাই! কলকাতার নাম কলকাতা হলো কেন—এটাতো কখনও ভাবিনি। 'কলকাতার কড়চা' বলে নাকি একখানা বই আছে! দেখবো তো সেটা পড়ে!

: নিজের সমালোচনা আপনি সহ্য করতে পারেন?

— হ্যাঁ—হ্যাঁ নিশ্চয়ই। কাজ যখন করছি সমালোচনা হবে এবং তা সহ্য করতেও হবে। সমালোচনা তো আমার এগিয়ে যাবার পাথেয় বলতে পারেন। নিজের ভুলত্রুটিগুলো তো আমি দেখতে পাই না! অন্য লোক কেউ যদি সেগুলো দেখিয়ে দেন তাতে ক্ষতি কি!

: নায়ক-নায়িকার নামে গুজব ছড়িয়ে আজকাল প্রচারের চেষ্টা হচ্ছে। এটা কি খুব ভালো লাগে আপনার?

গুজব ছড়িয়ে পাবলিসিটি আমি চাই না। তাছাড়া গুজব ছড়াবার মত কান্ড-কারখানাও আমার কিছু ঘটেনি। এ ধরনের হাল্কা ব্যাপার দিয়ে যে পাবলিসিটি সেটা কি খুব লাস্ট করে? আপনি-ই বলুন? করে না? কখনই করতে পারে না। দর্শককে অভিনয় ভালো লাগানোটাই আসল ব্যাপার। লোকের মুখরোচক আলোচনার মশলা আমি হতে রাজী নই।

: দেশবিদেশের ঘটনা সমস্যাদি সম্পর্কে আপনি কতখানি ওয়াকিবহাল?

— কাগজ পড়ে যতটুকু জানতে পারি আর কি! তার চাইতে আর বেশী খবর রাখাতো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। দেশের সমস্যা নিশ্চয়ই আমাকে আলাদা করে ভাবায়। কিন্তু আমার বা আপনার একক প্রচেষ্টায় কি সমাধান হতে পারে বলুন? যৌথভাবে কাজ করতে পারলে সমস্যার সমাধান নিশ্চয়ই হতে পারে। কিন্তু তা আর হচ্ছে কই! আর বিদেশের ঘটনা সম্পর্কে কিছু কৌতূহল থাকেই। যেমন সম্প্রতি সাইপ্রাস নিয়ে হচ্ছে। কিন্তু এসব ব্যাপারগুলোতে আমি মানসিকভাবে রি-অ্যাক্ট করি না। তার প্রধান কারণ ঐসব ব্যাপারে আমি কোনো সমাধান দিতে পারব না। সুতরাং খবরটা জানলাম, দ্যাটস্ এনাফ।

: ফিল্মের নায়ক বলতে আপনার সামনে কি ধরনের ইমেজ আসে?

— ফিল্মের নায়ক বলতে একধরনের লালটুস চেহারা হতেই হবে—তা নিশ্চয়ই নয়। তবে সুন্দর ফিচার, চেহারায় যথেষ্ট ব্যক্তিত্বের ছাপ এবং অভিনয়—এই তিনটে জিনিসই থাকা দরকার নায়কের। সুন্দর চেহারা না হলেও চলবে, কিন্তু ঐ পার্সোন্যালিটি—ডিগনিটি অবশ্যই থাকতে হবে। বিদেশে এমন বহু অভিনেতা আছেন যাঁদের অভিনয় এবং পার্সোন্যালিটিটাই আসল কথা। কন্দর্প-কান্তি রূপ নয়।

: অতীত-বর্তমানের সকল শিল্পীদের জনপ্রিয়তা ছাড়িয়ে যাবেন, এমন আশা কি মনের গোপনে আছে?

— কাকে আমি ছাড়িয়ে যাব না যাব সে-রকম কোনো বাসনা বা মোটিভ আমার নেই। কাজ করে যাচ্ছি, করবও। আমার নিজের কাজ নিয়ে এগিয়ে যাব এটাই আসল কথা। এগোন পেছনোর ব্যাপার নিয়ে কিছু ভাবিনি। তবে ভালো শিল্পী হবার আকাঙ্ক্ষাতো আছেই। সে আকাঙ্ক্ষার আর শেষ কোথায়?

: আপনার কাজের সংগে পারিশ্রমিকের পরিমাণ কিভাবে নির্ভর করে?

— বেঁচে তো থাকতেই হবে। আগে একটা মাঝারি গোছের চাকরী করতাম, সেটাতো ছেড়ে দিয়েছি! সুতরাং বেঁচে থাকার জন্য অর্থের, যতদূর জানি, প্রয়োজন। পরিশ্রমের দামটুকু আমার পেলেই হোল। পেটে গামছা বেঁধে তো আর ছবির কাজ করা যাবে না।

: বিশৃঙ্খলাই যেখানে শৃঙ্খলা, সেখানে বিশৃঙ্খলা না হওয়াকে কি আপনি বোকামি বলবেন?

— আজকের দিনে একথাটা অসত্য বলবো না, কিন্তু আলটিমেটলি সত্যেরই জয় হয় বলে আমার বিশ্বাস, বিশৃঙ্খলা কখনও শৃঙ্খলার জায়গা নিতে পারে না। এখন অবশ্য মানুষের সরলতা—সততাকে বোকামি হিসাবে ট্রিট করা হচ্ছে, কিন্তু চিরদিন কি এমন থাকবে? থাকবে না, থাকতে পারে না।

: আপনি তো দিল্লী সত্ত্বেও ঘুরেছেন, কলকাতায় আছেন ছোটবেলা থেকেই। কলকাতা শহরের কোন জিনিসটা আপনাকে সবথেকে মুগ্ধ করে?

— এখানে ফেলো ফিলিংস ব্যাপারটা আমার ভালো লাগে খুব। প্রতিবেশী পরিজন-বন্ধুবান্ধবদের সংগে এখানে সম্পর্কটা ভয়ানক কর্ডিয়াল। জানি এখানে ঝগড়া-মারামারি, কাটাকাটি—দলাদলি কম নেই তবুও কলকাতা কলকাতা। বম্বে-দিল্লীর সংগে তুলনা চলে না। প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় এখানে। জীবনটা এখানে এখনও মেকানিক্যাল হয়ে যায়নি।

—নির্মল ধর

দেবীচৌধুরাণী
সুচিত্রা সেন/শেখর চট্টোপাধ্যায়
পরিচালনা : দীনেন গুপ্ত

বায়োস্কোপিক

ফিল্মের অনাদি বাঁড়ুয্যেকে চেনেন?

পেশায় ফার্স্টক্লাস প্রোডাকশন ম্যানেজার; এই রকম চৌকস তুখোড় তিকড়মবাজ মানুষ আমি ফিল্ম লাইনে দ্বিতীয়টি দেখিনি। অথচ মুখোমুখি সাক্ষাৎ হলে দেখবেন আহা কত অমায়িক ধীর-স্থির শান্তশিষ্ট লোক, যেন সাত চড়েও রা নেই। মুখে একফালি মধুর হাসি সর্বদাই ঝিলিক হানছে। কোন দিমাগ নেই, অহংকার নেই।

অনাদি বাঁড়ুয্যেকে তাই বলে ভাববেন না— ভেতো-ভাজা; ওর মত রসিক মানুষ আজকাল পাওয়াই দুষ্কর। প্রবল সেন্স অফ হিউমার। আর ওটাই ওর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। একদিন হঠাৎ-ই আমায় বলল, আমি একসময় বিরাট একজন মস্তান ছিলাম—

আমি অবাক।—নাকি?

—আবার নাকি কি? আলবৎ ছিলাম। যৌবনে এক মস্তানি ছাড়া আর যে কিছুই করতাম না। গোটা পাড়াতে একসময়ে আমার যে বিরাট নামডাক ছিল—সে খবর রাখো?

বলে আমার মন্তব্যের অপেক্ষা না করেই বলল—চেহারা দেখে আন্দাজ হয়, অথচ এই অসাধারণ ক্ষমতাটা বুঝতে পারা না গেলে ক্ষতি? বুঝলে?

আমি হাঁ। অনাদি বলল—এটা তাহলেই খানিক বুঝিয়ে দিই—। কিন্তু তখনকার অনাদি ধার ধারত না, নাছোড়বান্দা। অনাদি বলবই। কথার কোন ঠিক নেই, তবে থামলাম...।

—বুঝলে, ঝোঁকটা গোড়াগোড়ি ওই দিকেই ছিল। মস্তান হিসাবে পাড়ায় আমার তখন বেশ নাম-ডাক হয়ে গেছে। লোকে বেশ সমীহ করে কথা বলে। মুখের বাক্যটি খসালেই বেশ চা সিগ্রেট পানটা মাগনায় পাওয়া যায়। বেশ একটা ঘোরের মধ্যে দিনগুলো কাটছে আমার। আসল কাজের মধ্যে রোজ সন্ধ্যের ঝোঁকে পাড়ার মোড়ে দাঁড়িয়ে একটু-আধটু 'খেলা' করি, ব্যাস, তাতেই ভাল কাজ হয়, কম্মো হয়। অথচ এই আমি বাড়ি ঢুকলে আমার ভিন্ন চেহারা। চাকরি-বাকরি বা পড়াশুনো কিছুই করি না। থালা থালা ভাত ওড়াই আর নিঃশব্দে গালমন্দ হজম করি।—ছি ছি ছি, ভদ্রঘরের, বামুনের ঘরের ছেলে, তুই শেষ পর্যন্ত গুণ্ডা-মস্তান হলি? দূর হয়ে যা। একটা পয়সা রোজগারের ক্ষমতা নেই, দু বেলা গিলতে তোর লজ্জা করে না?

বাস্তবিক লজ্জা করে। কিন্তু কি করি! চাকরী চাইলে পাওয়া যায় না। একদিন এক বন্ধুকে বললাম—হ্যাঁরে, একটা চাকরী-বাকরী জোগাড় করে দে ভাই। বাড়িতে যে আর টেঁকা যাচ্ছে না, উঠতে-বসতে খাচ্ছি-তাই গালমন্দ—

বন্ধু হঠাৎ বললে—করবি?

—আলবৎ করব।

—তাহলে জমিদারের বড় তরফের চাকরিটা কর। আমি কথাবার্তা বলে দিচ্ছি—

—ওখানে আবার কিসের চাকরী?

বন্ধু বললে—নামে সরকারের, আসলে চাকরীটা একটু অন্য ধরনের। জমিদারের দু ভাইয়ের মধ্যে মামলা চলছে। হাইকোর্টে সম্পত্তির পার্টিশানের মামলা চলছে। ফলে বুঝতেই পারছিস—শত্রুতাটা শুধু কোর্টের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, বাইরেও চলছে। ছোট ভাইয়ের ভাড়াটে গুণ্ডারা সেদিন বড় তরফের ম্যানেজারকে ধরে ঠেঙিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বড় তরফও অন্যভাবে শোধ তুলেছে। এই-ই চলেছে গত চার-পাঁচ মাস ধরে। বড় তরফ এখনই তাই একজন বিশ্বস্ত লোক খুঁজছে চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে। বড়র সঙ্গে কোর্টে যাবে-আসবে, সোজাসুজি বডিগার্ডের চাকরী। মাইনে এখন নগদ একশো টাকা। থাকা-খাওয়া ফ্রী। পরে টাকা বাড়বে।

অনাদি বাঁড়ুয্যে ভেবে দেখল, আপাতত এই যথেষ্ট।

বললে—ঠিক আছে, আমি রাজী। তুই বরং কথা বল—।

চাকরী এক কথায় হয়ে গেল।

বড় এবার এক নজর অনাদি বাঁড়ুয্যেকে দেখে নিয়ে বললেন—বুঝেছো আশা করি ব্যাপারটা? সওয়ালটা ইজ্জতের।

অনাদি বাঁড়ুয্যে ঘাড় কাৎ করে যথা-সম্ভব বিনয়ের সঙ্গে বলল—বুঝেছি স্যার।

বিরাট জমিদার বাড়ি। ভাগ হয়েছে মাঝখানে একটা পাঁচিল দিয়ে। বড় তরফে পড়েছে ঠাকুরদালান। নাটমন্দির। অনাদি সেই নাটমন্দিরেই থাকে। ব্যায়াম-কসরৎ করে। গুনে গুনে ডন-বৈঠক মারে। সকালে পো-টেক ভেজানো ছোলা খায়। আধ সের-টাক কাঁচা দুগ্ধ সাঁটে। দুপুরে বিড়াল ডিঙোতে পারে না এমন দু-থালা ঝোলভাত ওড়ায় আর ঠাকুর দালানের শীতল পাথরের মেঝেয় বডি ফেলে ভোঁস ভোঁস শব্দে দিবা-নিদ্রা যায়। তারপর বিকালে উঠে একটু ঠান্ডা শরবৎ হয়—আহারে, এবং তারপর একটু ডিউটী।—সেটি কি ব্যাপার? কিছুই না, ছোট তরফের দিকে মুখ করে বার-কয়েক হুঙ্কার ছাড়তে হয়—সাবধান, সা-ব-ধা-ন, বেশী ইয়ে করলে স্রেফ ফেড়ে ফেলব। কিচক বধ করব রে পাষণ্ডের দল! এই সব ডায়লগ আর কি।

বড় তরফ বেশ খুশি।—হ্যাঃ, অ্যাদ্দিনে একটা কাজের মত মানুষ পাওয়া গেছে বটে!

অনাদি বাঁড়ুয্যে একদিন বড়র সঙ্গে কোর্টে বেরোচ্ছে, পথে হঠাৎ বিনয়ের অবতার হয়ে বলল—স্যার একটা কথা বলব?

—বল।

—আমায় ছেড়ে দিন স্যার।

—কেন? বড় অবাক। তোমার কি এখানে কোন অসুবিধা হচ্ছে?

—আজ্ঞে না, বাস্তবিক কোন অসুবিধা হচ্ছে না, তবে জানেন তো স্যার, মাঝে-মধ্যে একটু ঘ্যালা-ফ্যাসাদ না দিতে পারলে মন স্থির থাকে না। অভ্যেসটা বড় খারাপ করে ফেলেছি। তা আপনাদের যা দেখছি, গন্ডগোলের কোন লক্ষণই নেই। আমায় বরং ছেড়ে দিন। জলের মাছ জলে ফিরে যাই—

শুনে গোঁফের ফাঁকে মুচকি মুচকি হাসলেন বড়। অ, এই ব্যাপার? এক হাত লড়তে পারছ না বলে দুঃখ? ঠিক আছে। সে ব্যবস্থা হচ্ছে।

অনাদি বাঁড়ুয্যে উৎসাহের সঙ্গে বলল—হ্যাঁ, যাহোক এট্টা ব্যবস্থা করুন তো। শরীরের মর্চেটা একবার ছাড়িয়ে নিই। খেয়ে আর ঘুমিয়ে পারছি না স্যার—

বড় তরফ মৃদু মন্দ হাসতে লাগলেন। তারপর চব্বিশ ঘণ্টাও কাটে নি, অনাদি বাঁড়ুয্যে যেমন নিত্যকর্ম করে, ডন-বৈঠক সেরে, ছোট-তরফের উদ্দেশ্যে হুহু-হুঙ্কার ছেড়ে সবে স্থির হয়ে ঠাকুর দালানে বসেছে। একটা সিগারেট ধরাব ধরাব ভাবখানা, অথবা হাতে দুধের গ্লাসটি নেব নেব অবস্থা। হেনকালে কোথায় ছিল তারা—হঠাৎ রে-রে শব্দে তেড়ে এসে পড়ল উঠোনে। অনাদি বাঁড়ুয্যে তো অবাক—কিঃ রে বাবা, এঁয়ারা আবার কোত্থেকে এলেন গোছের ভাবখানা তার। ওমা, লোকগুলো তাকে এসেই প্রশ্ন করল—তুম অনাদি হ্যায়?

—হ্যাঁ হ্যায় তো, কিন্তু কেন?

আর কেন—বাঝলে ভাইসকল, কথা নেই বার্তা নেই, ওই ছয়জন মিলে আমায় পটাপট ঠ্যাঙাতে শুরু করে দিল। উঃ, সে কি ধোলাই। কল্পনা করতে এখন আমার গা শিরশির করে। উল্টে পাল্টে, বসিয়ে শুইয়ে—বাপস, এত কিসিমের যে ধোলাই হয়, আমার ধারণাই ছিল না। ব্যাটারা বাক্য বোঝে না। যত বোঝাই আরে এটা রং নাম্বার শোনেই না। ক্ষ্যামা চাইলাম তাও দেয় না।

তারপর ঠ্যাঙাতে ঠ্যাঙাতে যখন আমার মুখে গাঁজলা ওঠার দাখিল, তখন আমায় ছেড়ে দিয়ে ওই শুকর-শাবকের দল পোঁ পোঁ করে হাওয়া হয়ে গেল। উহঃ।

আমার তখন এখন-তখন অবস্থা। দিন দয়েক তো জ্বরের ঘোরেই পড়ে রইলাম। ডাক্তার এসে ঘন ঘন ইঞ্জেকশন করে তবে এটু চাঙ্গা করে তুললেন। শুনলাম, বড় তরফ দৈনিক এসে আমায় দেখে গেছেন এবং মুচকি মুচকি হেসেছেন।

তারপর পায়ে একটু জোর পেতে, একদিন ম্যানেজারবাবুকে বললাম—দাদা, একটু ছুটি দেবেন?

—ছুটি? কেন?

—না মায়ের জন্যে মনটা কেমন কেমন করছে, একটু দেখা করে আসতাম—

—তা যাও।

ব্যাস, এরপর আর কেউ থাকে ও-পাড়ায়? চান্স পেতেই টেনে দে হাওয়া। কুমোরটুলী থেকে গুটিকে এখন এই বালীগঞ্জেই আমি পার্মানেন্ট।

আমি বললাম—তা এই গল্প নিয়ে আমি কি করব?

অনাদি বাঁড়ুয্যে অবাক হয়ে বললে—কেন? কাহিনী লিখবে। ছাপতে দেবে।

আমি তার হাতের বাইসেপের দিকে চেয়ে ভয়ে ভয়ে বললাম তথাস্তু।

শতবর্ষের স্মরণীয়

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ

কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন ঃ যশোহরে লিখিত আমার খণ্ড কবিতায় ও 'পলাশীর যুদ্ধে' স্বাধীনতার জন্য যে নিঃশ্বাস ও মাতৃভূমির জন্য অশ্রু বিসর্জন আছে, তাহা কথঞ্চিৎ শিশিরকুমারের সংসর্গের ও শিক্ষার ফল। তিনি ও তাঁহার পত্রিকাই প্রথম এই দেশে স্বদেশ ভক্তির পথপ্রদর্শক।'

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে যশোহরে বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে 'অমৃতবাজার পত্রিকার' প্রথম প্রকাশ। দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে ইংরেজ সরকার আইন প্রণয়ন করলে অমৃতবাজার কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়—এবং কলকাতা থেকে ইংরেজী দৈনিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হতে থাকে। অধুনা বাংলা দেশস্থিত ঝিকরগাছার চার মাইল উত্তরে পলুয়া মাগুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ। মাতা অমৃতময়ীর নামানুসারে পলুয়া গ্রামে অমৃতবাজার নামে একটি বাজারের প্রতিষ্ঠা করেন এবং পলুয়া মাগুরা গ্রাম অমৃতবাজার নামে খ্যাত হয়ে ওঠে। অমৃতবাজার পত্রিকার নামও অমৃতবাজার থেকে নামাঙ্কিত। সংবাদপত্র সেবা, রাজনীতি চর্চা ও সমাজ সেবা, ধর্ম ও [illegible] সর্বক্ষেত্রে মহাত্মা শিশিরকুমারের প্রতিভার স্ফুরণ দেশ ও জাতিকে নানা দিক দিয়ে মহিমান্বিত করে তোলে। মহাত্মা শিশিরকুমার রচিত অমিয় নিমাই চরিত বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। [illegible]জীতে রচিত 'লর্ড গৌরাঙ্গ' সহজ ভাষার ভাব তরঙ্গে তরঙ্গায়িত। যশোহরে যখন সাপ্তাহিক অমৃতবাজার পত্রিকা নিয়ে সরকার ও সমাজের সর্ব অন্যায় ও অনাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন শিশিরকুমার—সেই বিপদ সঙ্কুল রণভূমিতে দাঁড়িয়েও সংগীতের সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সংগীতের সমস্ত বিভাগই ছিল তাঁর আয়ত্তাধীন। পাখোয়াজে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। কীর্তন—কালোয়াত ও টপ্পা গানের তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় শিল্পী। যশোহরের বড় বড় রাজকর্মচারী থেকে সবাই যেমন শিশিরকুমারের নামে তটস্থ থাকতেন, তেমনি তাঁর সংগীতে বিভোর হয়ে থাকতেন সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত। বিভিন্ন গুণাবলীর বিচিত্র সমাবেশ পরিলক্ষিত হয় মহাত্মা শিশিরকুমারের মধ্যে। মহাত্মা

শিশিরকুমারের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁর আত্মজীবনীর ২৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ 'আমি সেদিন হইতে, সেই প্রথম পরিচয় হইতে তাঁহাকে ভক্তি করিতে শিখিলাম এবং সেই ভক্তি উত্তরোত্তর এক জীবন বৃদ্ধ হয়। আজ তাঁহাকে, — 'অমিয় নিমাই চরিতে'র আদিষ্ট ও আবিষ্ট শিশিরকুমারকে,—আমি দেবতার মত পূজা করি। তাঁহার পায়ে পড়িয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করি।'

বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস গ্রন্থে নাট্য শতবর্ষে মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আমি লিখেছি, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের, অমৃতবাজার পত্রিকা আর ১৯৭২ খৃষ্টাব্দের অমৃতবাজার পত্রিকার সঙ্গে দুস্তর ব্যবধান। বাহ্যত যেন সমুদ্রের অতল জলরাশির সামনে নুনের পুতুল। কিন্তু মূলতঃ তা নয়। সমুদ্রকে শুষে নেবার মত শক্তিধরই মনে হয় নুনের পুতুলকে আদর্শবাদী সাংবাদিকের কাছে। সেদিনের অমৃতবাজার আর তাঁর স্রষ্টা নগন ফকিরকে কোন দিনই কোন কালে কোন আদর্শবাদী সাংবাদিক ভুলে যাবেন না।'

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ প্রতিষ্ঠিত অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিটি পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে জাতীয় জীবনের সর্বাত্মক ইতিহাস। জাতির সামাজিক ও রাষ্ট্রিক চেতনার সঙ্গে [illegible] সাহিত্য, ধর্ম, শিল্প ও সংস্কৃতির [illegible]ধিক বছরের নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস অন্য কোন পত্র-পত্রিকার পক্ষে ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। যে কোন দেশের যে কোন অনুসন্ধানী গবেষক অমৃতবাজার পত্রিকার এক একটি অতীত পৃষ্ঠা থেকে আমাদের অতীত ঐতিহ্যের বিস্মৃতপ্রায় সম্পদ উদ্ধার করে নতুন করে উপহার দিচ্ছেন।

চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে বাংলা তথা হীরালাল সেনের অগ্রাধিকারের দাবী প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হতো না যদি অমৃতবাজার পত্রিকার পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত না হতো। বাংলার নাট্যশালার শতবর্ষের ইতিহাস ধোঁয়াটে ও অপূর্ণ থেকে যেত যদি অমৃতবাজার পত্রিকার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় নাট্যশালা সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রকাশিত না হতো। সর্বোপরি অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ না থাকলে নটগুরু গিরিশচন্দ্রকে আমরা ফিরে পেতাম না পাদপ্রদীপের আলোকমালার সামনে। বাগবাজারের বাসিন্দা ছিলেন মহাত্মা শিশিরকুমার। সধবার একাদশী নাটকের অভিনয়ের পর 'লীলাবতী' নাটক নির্বাচন করে বাগবাজারের বখাটে ছেলের দল যেন ঝিমিয়ে পড়ে। ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই। টাকা কোথায় অভিনয় করার।

শেষ পর্যন্ত চাঁদা তুলে অভিনয়ের আয়োজনে মেতে ওঠেন। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ ও নবগোপাল মিত্র প্রায়ই এদের রিহার্সালে আসতেন। নানান পরামর্শ দিতেন। নানাভাবে উৎসাহিত করতেন। ন্যাশনাল থিয়েটার নামগ্রহণ করে নগেন্দ্রনাথরা যখন টিকেট বিক্রী করে অভিনয় শুরু করলেন, গিরিশচন্দ্র দলত্যাগ করলেন। মহাত্মা শিশিরকুমার গিরিশচন্দ্রকে অনেক বুঝিয়েছিলেন কিন্তু গিরিশচন্দ্র রাজী হন নি। গিরিশচন্দ্রের যুক্তিকে অস্বীকার করতে পারেন নি শিশিরকুমার। তাই তাঁর যুক্তিকেও যেমন সমর্থন করেছেন তেমনি নগেন্দ্রনাথদেরও উৎসাহিত করেছেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় সর্বসহযোগিতা করেছেন। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মহাত্মা শিশিরকুমার সব সময়ই বিশ্বাস করতেন—গিরিশচন্দ্রের মত প্রতিভার বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা নবগঠিত ন্যাশনাল থিয়েটারকে দুর্বল করে দেবে। সভ্যরা যখন গিরিশচন্দ্রের অভাব উপলব্ধি করলেন—তখন সভ্যদের অনুরোধেই গিরিশচন্দ্রকে ন্যাশনাল থিয়েটারের অন্যতম পরিচালকরূপে যোগদানে সম্মত করান শিশিরকুমার। ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ন্যাশনাল থিয়েটারে কৃষ্ণকুমারী নাটকের ভীমসিংহ চরিত্রে অভিনয় করেন। গিরিশচন্দ্রের নাম বিজ্ঞাপিত হয় নি—তাঁর

ইচ্ছানুসারে জনৈক অবৈতনিক বিশেষ শিল্পী হিসাবে তাঁকে তুলে ধরা হয়েছিল।

মহাত্মা শিশিরকুমার রচিত দুখানি নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। শিশিরকুমারের নাট্যপ্রতিভা সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' পুস্তকে মন্তব্য করেছেন : 'সাধারণ দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য সমাজ চিত্র ও সমসাময়িক ঘটনা লইয়া ছোট-বড় নাটক প্রহসন রচিত হইতে লাগিল। এই ধরনের রচনার মধ্যে প্রথম এবং বিশিষ্ট হইতেছে শিশিরকুমার ঘোষের নয়শো রুপেয়া (১২৭৯)। ইনি একটি ছোট্ট প্রহসনও রচনা করিয়াছিলেন বাজারের লড়াই (১৮৭৪)।'

৮ই ফেব্রুয়ারী ১৮৭৩ খৃস্টাব্দে সান্যাল ভবনে ন্যাশনাল থিয়েটার কর্তৃক 'নয়শো রূপেয়া' মঞ্চস্থ হয়। ছাতুলাল-অর্ধেন্দুশেখর মুস্তোফী, রঞ্জন-অমৃতলাল বসু এবং সরলা চরিত্রে ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় অভিনয় করেন।

হিন্দু ন্যাশনাল সম্প্রদায় সম্মিলিতভাবে মৃণালিনী অভিনয় করায় মূলেও ছিলেন শিশিরকুমার। ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৮৭৪ খৃস্টাব্দে শিশিরকুমারের বাজারের লড়াই মঞ্চস্থ হবার পরেই ১৪ই ফেব্রুয়ারীর ১৮৭৪ খৃস্টাব্দে মৃণালিনীর অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।

ব্যক্তিগত উৎসাহ ও সহযোগিতা ছাড়া ন্যাশনাল দলগুলোর মধ্যে সব বিভেদ ভুলে নাট্য সাধনায় রত থাকবার মূলে অন্যতম প্রেরণা ছিলেন শিশিরকুমার। তাঁর এই সদিচ্ছা দুবার ফলবতী হয়েছিল।

স্বীয় অমৃতবাজার পত্রিকায় সব সময় নিরপেক্ষভাবে নাট্যশালা সম্পর্কে সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। ন্যাশনাল থিয়েটারের গঠন-যুগের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষকে কোন দিনই আমরা ভুলতে পারি না—পারবো না। ঠিক এমনি ভূমিকা নিয়ে পরবর্তী যুগে বাংলার নাট্যশালাকে পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় আবদ্ধ করেছেন শিশিরকুমারের সুযোগ্য পুত্র অগ্রজ তুষারকান্তি ঘোষ।

১৮৮৩ খৃস্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটার যখন অভিনেত্রী নিয়ে অভিনয় শুরু করেন —তদানীন্তন কালের বহু পত্র-পত্রিকা অভিনেত্রীদের 'বেশ্যা' বলে অভিহিত করে নিন্দাসূচক অভিমত ব্যক্ত করেন। অমৃতবাজার পত্রিকার ২৮শে আগস্ট ১৮৮৩ খৃস্টাব্দের এ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তিতে কোন বিরূপ মন্তব্য দেখতে পাওয়া যায় না। অভিনেত্রী হিসাবেই তাদের অভিহিত করা হয় এবং অভিনয়ের প্রশংসা করে নিরপেক্ষ সমালোচনা করা হয়। জাতীয় নাট্যশালার মূলে মহাত্মা শিশিরকুমারের অবদান সম্পর্কে অবহিত করাই বর্তমান রচনার উদ্দেশ্য—তাঁর বিরাট জীবনের আলোচনা এখানে করতে চাই নি।

কালীশ মুখোপাধ্যায়

খুব সম্প্রতি বোম্বেতে ক্যানাডিয়ান ছবির এক চলচ্চিত্র উৎসব হয়ে গেল। উৎসবে সর্বমোট সাতটি পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি দেখানো হয়। ছবিগুলির নাম যথাক্রমে : 'ডেথ অফ এ লুম্বারজ্যাক', 'ক্যামোরাস্কা', 'দি ক্রিসমাস মার্টিয়ান' (শিশুচিত্র), 'ওয়েডিং ইন হোয়াইট' 'ট্রু নর্থ', 'রেজিয়্যানে প্যাডোভানি' এবং 'ইসাবেল'।

এই সাতটি ছবির মধ্যে চারটিই 'এ্যাডাল্ট' চিহ্নিত। সব ছবিগুলিই রঙীন। এবং বলতে বাধা নেই প্রত্যেকটিই রঙের সুষম ব্যবহারে ক্যানাডার শীত ও গ্রীষ্মের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয়নাভিরামরূপে উপস্থিত। বিশেষ করে তার স্নিগ্ধ অনুভূতির যেন তুলনা হয় না।

বিশেষ করে শিশুদের জন্য তৈরী ছবি 'দি ক্রিসমাস মার্টিয়ানে'র ফটোগ্রাফী দর্শকদের যেন স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে যায়।

ছবিগুলি সম্পর্কে কিছু বলার আগে ক্যানাডিয়ান ছবির গোড়াঘরের দু' চারটে কথা বলে রাখা বোধকরি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ডকুমেণ্টারী এবং এ্যানিমেশন ছবির ক্ষেত্রে ক্যানাডিয়ান চলচ্চিত্রের খ্যাতি আছে। কিন্তু পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি সে তুলনায় খ্যাতির অধিকারী নয়।

বস্তুত তার বয়স কম বেশী বছর ছয়েক। ১৯৬৮ সালে সরকারী আনুকূল্যে এই প্রচেষ্টার প্রথম সূত্রপাত হয়। ফলে এখন বছরে স্বাভাবিক ডকুমেণ্টারী ও এ্যানিমেশন ছবি তৈরী করার প্রচেষ্টা ছাড়া পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি তৈরী হয় ২০ খানা থেকে ২৫ খানা। ক্যানাডায় এই ছবি তোলার জন্য স্টুডিও আছে মন্ট্রিল এবং টোরোণ্টোতে। ছবি তৈরী হয় দুই ভাষায়—ফ্রেঞ্চ ও ইংরেজিতে। ফরাসী ভাষায় ছবি প্রস্তুত হয় কুইবেকে।

ব্যবসায়িক ভিত্তির দিক থেকে ফরাসী ভাষায় তোলা ছবিগুলি দারুণ সাফল্য লাভ করে। সেই অনুপাতে ইংরেজী ভাষায় তোলা ক্যানাডিয়ান ছবিগুলি মার খায়। তার প্রধান কারণ হোল, হলিউড এবং ব্রিটেন থেকে এত বেশী আকর্ষণীয় ছবি আসে যে ক্যানাডার ৯০ শতাংশ চিত্রগৃহেই এইসব ছবি দেখানো হয়ে থাকে, এবং চলেও দারুণ ব্যবসায়িক সাফল্যে। তার সংগে স্থানীয় ছবি কোনদিক দিয়েই পেরে ওঠে না।

তবুও এবং ক্যানাডিয়ান পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি তৈরীর বয়স খুব বেশী না হলেও

... বিস্ময়ের সঞ্চার করে। বিশেষ ... এর বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং ... ।

উৎসবের ছবির কথায় আসি।

আমার ব্যক্তিগত মত : উৎসবের সেরা ছবি ছোটদের জন্য তোলা 'দি ক্রিসমাস মার্টিয়ান'।

মঙ্গল গ্রহের অধিবাসীর সাজে সজ্জিত দুটি ছেলেমেয়ে উড়ন্ত চাকি চড়ে ক্রিসমাসের উৎসব দেখতে বেরিয়ে হঠাৎ মাঝপথে সেই উড়ন্ত চাকি, অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলে ফ্ল্যাইং সসার, তার যন্ত্র বিগড়ে যাওয়ায় এক জলার সামনে নেমে পড়ায় গ্রামবাসীদের মধ্যে যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং যার ফলে পুলিশ কোর্সকে ঘটনাস্থলে ভীতচকিত অবস্থায় উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়তে হয় ব্যাপারটা সামাল দেওয়ার জন্যে, তাই নিয়েই ছবির গল্প। ব্যাপারটা বিজ্ঞানভিত্তিক এবং যেমন মজাদার তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক। নিশ্চিন্ত এবং মুগ্ধ হয়ে বসে দেখতে হয়। এমন ছবি এ দেশের ছেলেমেয়েদের অবশ্যই দেখানো উচিত। তাতে এদের যেমন কল্পনা-শক্তি বাড়বে, তেমনি তার কৌতূহলও নিবৃত্ত হবে। শিশুরা যেন এই ছবিটি দেখতে দেখতে স্বপ্নের রাজ্যে চলে যাবে।

উৎসবে প্রথম যে ছবিটি দেখানো হয় তার নাম 'ডেথ অফ এ লুম্বেরজ্যাক'। ছবিটি ভারতীয় দর্শকদের মধ্যে উৎসাহ ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। এতে যৌন ব্যাপার এবং ন্যুডিটি অর্থাৎ নগ্নতা একটা প্রধান ভূমিকা জুড়ে থাকে। পরিচালকের মতে (পরিচালক গিলেস কার্লে) সেই সব সভ্য মানুষের মুখোশ এই ছবির মাধ্যমে খুলে দেওয়া হয়েছে যারা সমাজের উঁচু স্তরে বসে নারীদেহকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে সেইসব মেয়েদের পরবর্তী সময়ে মডেলে রূপান্তরিত করে তাদের বেশ্যাবৃত্তির কাছাকাছি ঠেলে দেয়, তাদের বেঁচে থাকার বাধ্যতামূলক পেশায়।

ছবির কয়েকটি দৃশ্য রাজকাপুরের চাঞ্চল্য-সৃষ্টিকারী ছবি 'ববি'র কয়েকটি দৃশ্যকে মনে করিয়ে দেয়।

'ওয়েডিং ইন হোয়াইট' ছবিটির মধ্যে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা ও মানসিকতার মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

হঠাৎ ভাললাগা এবং দেহদানের ফলে যে বিপর্যয় নেমে আসে একটি ফুলের মত সুন্দর কুমারীর জীবনে তাই নিয়েই ছবির গল্প।

'ক্যাম্মোরাঙ্কা' ছবির গল্প উনবিংশ শতাব্দীর। একজন আমেরিকান ডাক্তারের সঙ্গে এলিজাবেথ টাসার প্রণয়োপাখ্যান এর মূল বিষয়বস্তু। ছবিটিতে প্রচুর যৌন ও কিছু নগ্নদৃশ্য থাকায় দর্শকদের উত্তেজনা-চাঞ্চল্যের কারণ ঘটেছে। বলাই বাহুল্য।

ইসাবেলা ও ঐ ধরনের কিছু কিছু দৃশ্যের স্বাক্ষর থাকলেও গল্প বলার গুণে রসোত্তীর্ণ। অতীতকে মুছে ফেলে সুখী বিলাসী জীবন কাটাতে চেয়েছিল একটি মেয়ে, কিন্তু ভাগ্যচক্র তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল বিপরীত প্রান্তে, এই নিয়ে গল্প।

উ-টার্ন একটি অন্য স্বাদের ছবি। চার বছর আগে হঠাৎ দেখে ভাল লাগা একটি মেয়ের অন্বেষণে বেরিয়ে পড়া এক তরুণ আইনজীবীর গল্প বলা হয়েছে এতে।

ডেথ অফ এ লুম্বেরজ্যাক ছাড়া উৎসবে প্রদর্শিত ছবিগুলির মধ্যে বক্তব্যের দিক থেকেই যে ছবিটি বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে তার নাম রেজিয়ানে প্যাডোভানি। এই ছবিতে আধুনিক সমাজে এবং সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে যে ক্ষতিকারক ও অবক্ষয় দেখা দিয়েছে আজ সভ্য পৃথিবী জুড়ে, কানাডার পটভূমিকায় তারই কথা বলেছেন পরিচালক। করাপশানের বাস্তব অর্থ এই ছবিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

উৎসবে প্রদর্শিত ছবিগুলির সংক্ষিপ্তসারই কেবল দেওয়া হোল। আগামী সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য ছবিগুলির (যেমন : ডেথ অফ এ লাম্বেরজ্যাক, ওয়েডিং ইন হোয়াইট, ইসাবেলা, উ-টার্ন—এই চারটি ছবি) গল্প বিস্তৃতভাবে পরিবেশনের ইচ্ছে রইল। গল্প এবং তার বক্তব্য আশা করি পাঠকদের কৌতূহল নিবৃত্তে সহায়ক হবে।

সবশেষে একটি কথা। আমাদের দেশে এই ধরনের ক্যানাডিয়ান ছবির ব্যবসায়িক প্রদর্শনের ব্যবস্থা করলে (সরকারী বা বে-সরকারী পর্যায়ে যে ভাবেই হোক না কেন) তাতে এদেশের দর্শককুল লাভবানই হবেন। এবং আমার অনুমান, তাতে ব্যবসায়িক সাফল্য অনিবার্য। এবং তার বিনিময়ে ভারতীয় ছবিও সে দেশে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করলে রাষ্ট্রীক পর্যায়ে যেমন দু দেশের ভাব ও চিন্তার বিনিময় ঘটবে, সাধারণ একটা আত্মিক সংযোগও গড়ে উঠবে উভয় দেশের মধ্যে।

কারণ, একথা আজ অনস্বীকার্য যে, সেলুলয়েড অর্থাৎ চলচ্চিত্রই হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত দেশকে সব দিক দিয়ে সহজে বোঝার এবং কাছাকাছি পাওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম। যার ভাষার মত আর কোন ভাষাই এমন প্রবল ও সর্বজনগ্রাহ্য নয়।

জানা গেছে, আগামীতে ক্যানাডায়ও ভারতীয় ছবির এক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

—শা. র. চ

বিবিধ সংবাদ

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : গত ২০শে আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ-অর্থনীতি ও মূল্যায়ন শাখা (কৃষি বিভাগ) সাংস্কৃতিক সংস্থার তৃতীয় বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থিয়েটার সেন্টার হলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে প্রবীণ কর্মী শ্রী চন্দ্রমোহন দত্ত এবং উপ-কৃষি অধিকর্তা (পরিসংখ্যান) শ্রীদেবব্রত কাশ্যপ। ... এবং সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন অণিমা সাউ দেবু পাইন এবং দেবদাস রায় ও সম্প্রদায়। অতঃপর উক্ত অফিসের কর্মচারিবৃন্দ কর্তৃক দুটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। মহিলা কর্মচারীবৃন্দ কর্তৃক অভিনীত জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মিলছে না ছন্দ' নাটকটিতে অংশ গ্রহণ করেন দীপ্তি পাল, শিবানী বসু, শিপ্রা দাস, সুতপা বিশ্বাস, গৌরী মুখার্জি, চিত্রা দেব, ঝণ্টু পাল, খুকু চক্রবর্তী এবং গঙ্গা গোস্বামী। পুরুষ কর্মচারিবৃন্দ কর্তৃক অভিনীত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের 'মেস নং ৪৯' নাটকটিতে অংশ গ্রহণ করেন তপন চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিত পাল, ননীগোপাল রায়চৌধুরী, বারীন রায়চৌধুরী, সুনীলকুমার ঘোষ, দীপক চন্দ, গৌরচরণ মুখার্জি, অমল পাল, স্বপন দাস, কালীপদ, শিশির ঘোষ, রঞ্জন বসু, শান্তিরঞ্জন দে, সুবল রায় এবং চিত্রা দেব। প্রথম নাটকটি পরিচালনা করেন গৌরী মুখার্জি এবং দ্বিতীয় নাটকটি পরিচালনা করেন বারীন রায়চৌধুরী। সবশেষে উপস্থিত দর্শকবৃন্দকে জলযোগে আপ্যায়নের তদারকী করেন বিজয়ভূষণ নাগ, কিরণ দত্ত এবং সুধীর ধর। ধন্যবাদ ...

মাঠের নায়ক

বিশ্বজিৎ বেরা

গড়ের মাঠের বড় বড় ক্লাবগুলির বদ্ধমূল ধারণা যে পুরোন চালই ভাতে বাড়ে। আধ মরা হাতি যদি লাখ টাকা দিয়েও কিনতে হয় তাতেও রাজি। বলাবাহুল্য এই ধারনার ফলশ্রুতি হিসেবেই নামী দামী ক্লাবগুলিতে দেখা যায় প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড়দের ভীড়। বিচ্ছিন্নভাবে সামান্য ব্যতিক্রম ঘটলেও মোটামুটিভাবে নবাগত আনকোরা খেলোয়াড়দের ওপর এদের ভরসা ক্ষীণ।

প্রকৃত পক্ষে বড় বড় ক্লাবগুলি চায় একেবারে তৈরী খেলোয়াড়। অথচ ছোট ছোট ক্লাব কর্তৃপক্ষ খুঁজে পেতে তরুণ খেলোয়াড়দের তালিম দিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করবে এবং তারপর ঐ বড় ক্লাবগুলি জাল পেতে উঠতি খেলোয়াড়দের টেনে তুলবে। বর্তমানে গড়ের মাঠের রেওয়াজই হচ্ছে তাই। তরুণেরা যদি বড় ক্লাবে মানিয়ে নিয়ে ভাল খেলে ফেলে তা হলেই কদর মিলবে অন্যথায় পরের মরশুমেই—পথ দেখো এই শব্দ কটি শোনার জন্য তৈরী থাকতে হবে।

ময়দানের অগুন্তি পুরোনো মুখের মিছিলের মধ্যে মাঝে মধ্যে যদি নতুন মুখের হদিশ মেলে তার চেয়ে আনন্দের এবং আশ্বাসের বোধহয় আর কিছুই নেই। এমনি একটি নজীর বিশ্বজিৎ বেরা। বিশ্বজিৎ বলতে গেলে একেবারে আনকোরা মুখ। ময়দান মঞ্চে এসেই নিজের নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের সূত্রে একেবারে পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়াতে পেরেছে। প্রথম আবির্ভাবেই বলতে গেলে প্রায় নাম ভূমিকায়। পরিপুষ্ট দেহ, স্থির চিন্তাশক্তি পরিবেশ মাফিক পরিচ্ছন্ন। পরিকল্পনা স্টপার বিশ্বজিৎকে পরিপূর্ণ খেলোয়াড় হওয়ার পথ পরিক্রমায় সাহায্য করছে। বর্তমানের এই চরিত্র এই মেজাজ যদি সযত্নে ধরে রাখতে পারেন তাহলে বিশ্বজিৎ অচিরেই সার্থকনামা হবেন।

গ্রাম বাংলার ছেলে বিশ্বজিৎ বেরা। আন্তঃ জেলা স্কুল ফুটবল এবং জেলা ফুটবল আসরের মাধ্যমে মেদিনীপুরের এক অজ পাড়া গাঁয়ের ছেলে উঠতির কর্ম-
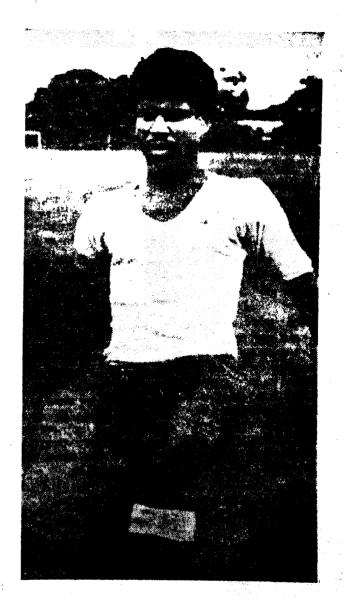
...নজরে পড়ে যান। ফলে গাঁয়ের ... বিশ্বজিতের পরিচয় ঘটে কলকাতার ...। আরও আশ্চর্য এই যে সে ... কিন্তু কখনও স্বপ্নেও ভাবেনি—কলকাতায় খেলবে। খেলবে উয়াড়ীর মত ঐতিহ্য সম্পন্ন ক্লাবে। দেশ বিভাগের পূর্বে এই উয়াড়ীর ওপার বাংলা এপার বাংলায় কি নাম ডাকই ছিল। ফুটবলে ভারত জোড়া নাম আজ যাঁদের তাঁদের কত জনেরই না হাতে খড়ি হয়েছে উয়াড়ী ক্লাবে। সে জাঁক-জমক এখন আর নেই নেই ট্রফি জেতার জন্য হন্যে হওয়া নেই পয়েন্ট দেওয়া নেওয়ার ঢালাও কারবার উয়াড়ীর। এই চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের জনাই বিশ্বজিৎ অনেক ভেবে চিন্তে প্রথম আত্মপ্রকাশের ঠিকানা হিসেবে এই দলকেই বেছে নিয়েছেন।

বিশ্বজিৎ যদিচ এপার বাংলার ছেলে তবু একদা ওপার বাংলায় প্রতিষ্ঠিত উয়াড়ীর ঐতিহ্যের ইতিহাস ঐশ্বর্যের বিস্তারিত ইতিহাস ওঁর নখ দর্পণে। বিশ্বজিৎ জানে এই উয়াড়ীতেই দিকপাল বহু খেলোয়াড় স্ব-স্ব প্রতিভার আলোকে আলোকিত করেছেন। সর্বশ্রী তেজেশ সোম পাখী সেন এস রায় (খোকা) এ নন্দী সুদেব দত্ত তাপস সোম অসীম সোম সুশান্ত ঘোষ পরিমল দে সমরেশ চৌধুরী শন্তু মৈত্র প্রমুখেরা কি প্রতিষ্ঠাই না পেয়েছিলেন ? প্রথম দুজন অবশ্য প্রাক স্বাধীনতা পর্বে অবিভক্ত বাংলা—ঢাকায়। বাকী সব এপার বাংলায় খণ্ডিত ভারতে।

জানে বলেই বা লোক পরম্পরায় জেনেছে বলেই বিশ্বজিৎ বেরার অনু-শীলনের একাগ্রতা এবং নিষ্ঠা এতো প্রবল। দুটি পা-ই সমান কার্যকর বিশ্বজিতের। হেডিং ট্যাকলিং পরিমার্জিত। কভারিং এবং স্টপারের সবচেয়ে বড়গুণে জায়গা নেওয়া (পজিসন্যাল প্লে) এবং সেই সঙ্গে ডিস্ট্রি-বিউসন নজর কাড়ার মত। শুধু তাই নয়, বড় মেজাজও রয়েছে তাঁর। ইস্টবেঙ্গলই হোক মোহনবাগানই হোক বা মহামেডানই হোক—মাঠে নেমে কোন কমপ্লেকসে ভোগে না বিশ্বজিৎ। এবং কমপ্লেকস নেই বলেই—মেদিনীপুরের এই গাঁয়ের ছেলেটির বিরুদ্ধে আত্মবিশ্বাসে টান পড়ে না, ভাঁটা পড়ে না উৎসাহে।

সন্তোষ বসু

বাজারে যেরকম আগুন লেগেছে তাতে মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, আমাদের মত ছা' পোষা পরিবারের সামান্যতম সাধ-আহ্লাদটুকুও ডকে ওঠার জোগাড়। এই আমাদের কথাই ধরুন না। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। ছোটবেলায় দেখতাম, চাল, ডাল, তেল, নুন আসতো খিড়কির দরজা দিয়ে। আজ দেখছি ঐ চাল, ডাল, তেল, নুন, কয়লার আলোচনা নিয়েই সদর দরজা জমজমাট। তাহলেই ভাবুন আমাদের নিম্ন-মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির ছেলেরা রেশনের কথা ভাববো, না ফ্যাসনের? ফুটবলের কথা ভাববো, না সংসার নামক জাহাজটার পেটে কয়লা জোগাবো?

সুতরাং বুঝতেই পারছেন, সংসার চালাবার জন্য আমাদের খাটতে হয়, পড়া-শুনা করতে হয় এবং এরই ফাঁকে ফাঁকে সময় করে খেলার অনুশীলন করতে হয়।

নিজের কথা বলার আগে রাজস্থানের তরুণ গোলরক্ষক সন্তোষ বসুর মুখে ঐ কথাই শুনলাম। সন্তোষ কলকাতার মাঠে এসেছে বছর কয়েক কিন্তু ফুটবল অনু-রাগী মহলের নজর কেড়েছে এবারই। অবশ্য গত বছর জুনিয়ার বাংলা দলের হয়েও সন্তোষ খুব ভাল খেলেছিল কৃষ্ণ-নগরে। এন্টিসিপেসন বেশ ভাল নড়া-চড়ায়ও সপ্রতিভ। সট নেওয়ার আগে প্রতি-পক্ষের পায়ের ওপর বুকে সাহস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বল গ্রিপ করতেও অসাধারণ পটু। এই পটুত্বের, এই নৈপুণ্যের স্বীকৃতি হিসেবে সন্তোষের স্থান হয়েছে বাংলা (জুনিয়র) দলে। বরদলুই ট্রফিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একাদশে, প্রদর্শনী আসরে আই এফ এ টিমে।

সন্তোষের জন্ম ১৯৫৪ সালের ৭ ফেব্রুয়ারী হাওড়ার রামকৃষ্ণপুরে। বাবা শিবপদ বসু টেলিফোন অপারেটর। মা-বাবা, তিন ভাই, তিন বোন নিয়ে পেল্লায় সংসার, প্রায় জাহাজেরই মত। অভাব-অনটন, নানা ঝড়ঝাপটা থাকলেও মা-বাবা, দাদা বিমল বসু ছোটবেলা থেকেই খেলা-ধুলোয় উৎসাহ দিয়েছেন অকুণ্ঠভাবে। বলা বাহুল্য গোটা পরিবারের লোকজনই সন্তোষকে নির্ভরযোগ্য একজন গোল-কীপার হতে সহযোগিতা করছেন। ফুটবল মাঠে—লাস্ট ডিফেন্সের মত গুরুত্বপূর্ণ পজিসনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন হাওড়া সন্ধানী ক্লাবের কোচ মন্টু সরকার। হাওড়া সন্ধানী থেকে সন্তোষ এলো সালকিয়া ফ্রেন্ডসে এবং ১৯৭৮-এ রাজস্থানে। রাজ-স্থানে আসার মূলে পটাদা ও সুবোধ রায়। পটাদাই এখন সন্তোষের ফ্রেন্ড, ফিল-সফার এবং গাইড। কলকাতার বিচিত্র গড়ের মাঠে প্রতিষ্ঠার আগে ১৯৭১-৭২ সালে আন্তঃ জেলা ফুটবলে এবং শেষোক্ত বছর ইম্ফলে জাতীয় স্কুল গেমসে বাংলা দলের প্রতিনিধিত্ব করেছে। ১৯৭৩ সালে হাওড়ার হয়ে খেলেছে আন্তঃ জেলা ফুট-বল প্রতিযোগিতায়। হাওড়াই '৭৩-এর চ্যাম্পিয়ন।

সন্তোষের বয়স কম কিন্তু ঘা খেয়ে খেয়ে মাঠে এবং মাঠের বাইরে সে রীতিমত সিরিয়াস। সব সময়েই গম্ভীর। মনে হয় যেন মুখ-গোমড়া এক টে ছেলে। অনর্থক হাসে না, আবার অনর্থক কাঁদেও না।

বিপদল বন্দ্যোপাধ্যায়

খেলার জগতে মেয়ে

শিরীণ কনট্রাক্টর

পার্শী মেয়ে শিরীনের জন্ম বোম্বাইয়ে। —'কিন্তু খুব ছেলেবেলাতেই বাবা আমায় কলকাতায় নিয়ে আসেন। ডাউ স্কুলে পড়ার সময়েই অ্যান লামসডেনের কাছে হকি খেলার তালিম পাই। এই সঙ্গে বাস্কেটবল আর টেবল টেনিসও খেলতে থাকি। আমাদের পরিবারের সকলেই পড়াশোনা আর খেলা-ধুলোয় উৎসাহী। বাবাই আমাকে খেলায় উৎসাহ দেন, আমি তাঁর একমাত্র কন্যা।' কালীঘাট ক্রিকেট মাঠে সেদিন শিরীন বলছিল। এই সুশ্রী লম্বা ছিপছিপে গড়নের মেয়েটি কলকাতাকেই মাতৃভূমি বলে মনে করে। হকি আর বাস্কেটবল খেলতে শুরু করে ১৯৬৪ সালে। প্রথমে ডাউহিলস দলে এবং পরে ক্যালকাটা পার্শীন দলে খেলে। চোস্ত ইংরেজী ছাড়াও চমৎকার বাংলা বলে শিরীন। বলে, আমিত বাঙালীই। ১৯৭১এ লোরেটো কলেজের ছাত্রী অবস্থায় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় টেবল টেনিসে কলকাতার প্রতিনিধিত্ব করেছে সে। ১৯৬৯তে দিল্লীতে প্রথম এশীয় হকি প্রতিযোগিতায় শিরীন ভারতীয় দলে খেলেছে। এর পর '৭০এ জাপান ও হংকং সফরেও ভারতীয় দলে ছিল। জাপানে ভারতীয় দল সবকটি টেস্টে জয়ী হয়।

বাস্কেটবলেও শিরীনের পটুত্ব কম নয়। এখন তো ও বাংলা দলে অধিনেত্রী। কুয়ালালামপুরে তৃতীয় এশীয় আসরে ও ভারতের হয়ে খেলেছে। পরে বাংলা দলের হয়ে শ্রীলংকায় গেছে আমন্ত্রণমূলক বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় খেলতে। বাংলা দলে খেলছে ১৯৬৮ সাল থেকে। ৭০-এ শারীরিক অসুস্থতার জন্য জাতীয় প্রতি-যোগিতায় খেলতে যায়নি। ভিলাওয়ারায় অনুষ্ঠিত প্রাক-এশীয় বাস্কেটবলে শিরীন বাংলা দলের পক্ষে নেমে ক্রীড়া-চাতুর্যের ফলে ভারতীয় দলে স্থান পায়। ভিলওয়ারায় বাংলা দলই জিতেছিল এবং আগে ৭১-এ শিরীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলের অধিনায়িকা হয়েছিল।

হকিতে ১৯৬৬ সালে বাংলা দলের হয়ে জাতীয় আসরে খেলেছে। সেবার উদ্যোক্তা গোয়ালিয়রের বিরুদ্ধে ফাইনালে তিনটি গোলই করে শিরীন। ত্রিবান্দ্রমে জাতীয় হকির আসরে শিরীন সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ কুশলী মনোনীত হয়।

শিরীন ক্যালকাটা গার্লসে স্কুলের পাঠ শেষ করে লোরেটো কলেজ থেকে স্নাতক হয়েছে। বর্তমানে 'ইউনিয়ন কার্বাইড'-এ চাকরী করছে।

জিজ্ঞাসা করলুম—হকি ও বাস্কেট বলে তোমার আন্তর্জাতিক আসরের অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই ভালরকম হয়েছে? সে উত্তর দিল—তা হয়েছে। হকিতে আমরা ভারতীয় মেয়েরা খুবই ভাল। পাঞ্জাবের কয়েকটি খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত ক্রীড়াচাতুর্য উল্লেখ করার মত। এই ধারা বজায় রাখলে বিশ্ব আসরে আমরা সহজেই শীর্ষস্থানে থাকতে পারবো। পূর্বাঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে হকির প্রচলন খুব বেশী নয়। মুষ্টিমেয় কজন খেলে। বাঙালী মেয়েরা বেশী মাত্রায় হকি খেলতে এলে আমার বিশ্বাস ফল ভাল হবে।'

কিন্তু বাস্কেটবলে শিরীন আমাদের দেশের মেয়েদের সম্পর্কে খুব আশার কথা শোনাতে পারল না। তবে, প্রসঙ্গত জানাতে ভোলেনি যে অন্যান্য দেশে কাঠের কোর্টে বাস্কেটবল খেলা হয়। তাতে অনেক সুবিধা। আমরা মাটির কোর্টে খেলতে অভ্যাস করি বলে আমাদের গতি যথেষ্ট দ্রুত হয় না। এদেশে এইসব আধুনিক কোর্ট এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু না করতে পারলে বিশ্ব আসরে আমরা পিছিয়েই থাকব—এই কথাই বললে শিরীন। বলল, আপনাকে কি বলব, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান বা ফিলিপাইনের মেয়েদের দক্ষতা দেখে আমরা অবাক হয়ে গেছি। যেমন তাদের খেলার চাতুর্য, সপ্রতিভ দ্রুততা, তেমনি তাদের শারীরিক পটুত্ব। আমার তো ধারণা আমাদের ছেলেরাও ওদের কাছে জিততে বেগ পাবে। —অময়

দর্শক

ইংল্যাণ্ড বনাম পাকিস্তান

তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট

ওভালে ইংল্যাণ্ড বনাম পাকিস্তানের শেষ তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলাটিও প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্ট খেলার মত অমীমাংসিত থেকে গেছে। ফলে ইংল্যাণ্ড বনাম পাকিস্তানের ১৯৭৪ সালের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজও অমীমাংসিত থেকে গেল। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান তার প্রথম ইংল্যাণ্ড সফরে গিয়ে এই ওভাল মাঠেই ২৪ রানে ইংল্যাণ্ডকে হারিয়েছিল। ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে পাকিস্তানের একমাত্র জয়। বর্তমানে এই দুই দেশের টেস্ট খেলার ফলাফল দাঁড়াল ঃ খেলা ২৭, ইংল্যাণ্ডের জয় ৯, পাকিস্তানের জয় ১ এবং খেলা ড্র ১৭।

পাকিস্তানের অধিনায়ক ইন্তিখাব আলম আগের দুবারের মত এবারও টসে জিতে প্রথমেই ব্যাট করার দান নিয়েছিলেন। প্রথম দিনের খেলায় পাকিস্তান ২ উইকেটে ৩১৭ রান সংগ্রহ করেছিল। ২য় উইকেটের জুটিতে মজিদ খাঁ এবং জাহির আব্বাস ১০০ রান তুলেছিলেন। মজিদ মাত্র দুই রানের জন্যে সেঞ্চুরী করতে পারেন নি। অসমাপ্ত ৩য় উইকেটের জুটিতে ১৫১ রান তুলে জাহির আব্বাস (১১৮ রান) এবং মুস্তাক মহম্মদ (৬৭ রান) প্রথম দিনের খেলায় অপরাজিত থাকেন। ওভালের পিচ ব্যাটসম্যানদের সহায়ক ছিল। পাকিস্তানের ৩০০ রান উঠেছিল ৩২০ মিনিটে—৮৩'৫ ওভারের খেলায়।

দ্বিতীয় দিনে পাকিস্তান তাদের প্রথম ইনিংসের ৬০০ রানের (৭ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। এই নিয়ে পাকিস্তান ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে তিনবার পাঁচ শতাধিক রানের ইনিংস খেললো। পাকিস্তান প্রথম দিনের ৩১৭ রানের (২ উইকেটে) সঙ্গে আরও ২৮৩ রান যোগ করে ৫ উইকেট খুইয়ে। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে জাহির ও মুস্তাক ১৭২ রান তুলে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে পাকিস্তানের তৃতীয় উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড করেন। আগের রেকর্ড ছিল ১৫৬ রানের (হানিফ মহম্মদ এবং জাভেদ বার্কি, ঢাকা ১৯৬১)

দ্বিতীয় দিনের লাঞ্চের সময় পাকিস্তানের রান দাঁড়ায় ৪৩০ (৩ উইকেটে)। খেলায় অপরাজিত ছিলেন জাহির (১৮৭ রান) এবং আসিফ (২১ রান)। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে আসিফ (২৯ রান) এবং জাহির দলের ৯৩ যোগ করেছিলেন। জাহির ২৪০ রান করে আউট হন। এটি তাঁর দ্বিতীয় টেস্ট সেঞ্চুরী। এখানে উল্লেখ্য তিন বছর আগে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে বার্মিংহামে জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে জাহির ২৭৪ রান করেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় ইংল্যাণ্ড একটা উইকেট খুইয়ে ১৫ রান করেছিল।

তৃতীয় দিনে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস-এর রান দাঁড়ায় ২৯৩ (৪ উইকেটে) খেলায় ইংল্যাণ্ডের ওপনিং ব্যাটসম্যান ডেনিস অ্যামিস ১৬৮ রান করে অপরাজিত থাকেন। টেস্ট খেলায় অ্যামিসের এটি ৮ম সেঞ্চুরী, অপরদিকে পাকিস্তানের বিপক্ষে ৩য় সেঞ্চুরী। ২য় উইকেটের জুটিতে আণ্ডারউড (৪৩ রান) এবং অ্যামিস দলের ১২৯ রান তুলে দিয়ে খেলার ভিত শক্ত করেছিলেন। অ্যামিস এবং এডরিচের ৩য় উইকেটের জুটিতে ৬৬ রান উঠেছিল ৭২ মিনিটের খেলায়। চা-বিরতির সময় ইংল্যাণ্ডের ২ উইকেটে ২০৮ রান দাঁড়ায়। খেলায় অপরাজিত ছিলেন অ্যামিস (১১৫ রান) এবং এডরিচ (২৫ রান)। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে দেখা গেল 'ফলো-অন' থেকে অব্যাহতি পেতে ইংল্যাণ্ডের তখনও ১০৮ রানের প্রয়োজন। হাতে জমা ৬টা উইকেট।

চতুর্থ দিনে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৪৩৮ (৬ উইকেটে)। ফলো-অন থেকে অব্যাহতি পেতে ইংল্যাণ্ডের ৪০১ রানের দরকার ছিল। বৃষ্টির জন্যে নির্দিষ্ট সময়ে খেলা আরম্ভ হয়নি। লাঞ্চের পর খেলা আরম্ভ হয়। ডেনিস অ্যামিস তাঁর ১৭৮ রানের মাথায় সরফরাজের বল হুক করতে গিয়ে মুখে দারুণ আঘাত পান এবং খেলা থেকে অবসর নিতে বাধ্য হন। চা-পান বিরতির সময় ইংল্যাণ্ডের রান দাঁড়ায় ৩৭২ (৪ উইকেটে)। খেলায় অপরাজিত ছিলেন ফ্লেচার (৪১ রান) এবং গ্রেগ (২৬ রান)। ইংল্যাণ্ডের ৩০০ রান পূর্ণ হয় ৬০৮ মিনিটে (,২'২ ওভারের খেলায়)।

শেষ পঞ্চম দিনে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ৫৪৫ রানের মাথায় শেষ হয়। খেলায় ইংল্যাণ্ডের পক্ষে দুটি সেঞ্চুরী করেন—ডেনিস অ্যামিস (১৮৩ রান) এবং কিথ ফ্লেচার (১২২ রান)। ক্রিস ওল্ডের ৬৫ রানও উল্লেখযোগ্য। টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর এই প্রথম অর্ধ সেঞ্চুরী রান। ফ্লেচার দীর্ঘ ৭ ঘণ্টা ৪০ মিনিট খেলে তাঁর সেঞ্চুরী পূর্ণ করেন।

পঞ্চম দিনের বাকি সময়ের খেলায় পাকিস্তান দ্বিতীয় ইনিংসের ৪টে উইকেট খুইয়ে ৯৪ রান সংগ্রহ করেছিল।

ইন্তিখাবের ডবল

চতুর্থ দিনের খেলায় অ্যালান নটের উইকেট পাওয়ার সূত্রে পাকিস্তানের অধিনায়ক ইন্তিখাব আলম টেস্ট ক্রিকেটে ডাবল সম্মান লাভ করেন—হাজার রান এবং শত উইকেট। এখানে উল্লেখ্য, পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের পক্ষে টেস্ট খেলায় এই 'ডাবল' সম্মান লাভ এই প্রথম।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস,২৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩-
হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

গুঁড়া মশলা
Cookme
Fresh & Good Cooking Medium
CURRY POWDER
CONTAINING HALDI
KRISHNA CHANDRA DUTTA (Spice) PVT. LTD.
(Spice Powder Division)
FACTORY: COSSIPORE
আমাদের
অন্য কোন ব্র্যাণ্ড ও
ব্রাঞ্চ নেই

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ/

১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ ॥

১৪ বর্ষ

সংখ্যা ১৯
মূল্য—৫০ পয়সা

"ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ণ নিউজ
পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday 13th September, 1974 শুক্রবার, ২৭ ভাদ্র, ১৩৮১ 50 Paise

সূচিপত্র

এর কোমল স্পর্শে
সৌন্দর্য
বিকশিত হয়
শিশির স্নিগ্ধ সদ্য
প্রস্ফুটিত গোলাপের
পাপড়ির মত কোমল ও
তারুণ্যের আভায় উজ্জ্বল
আমার সুন্দর দেহশ্রী
এই মেখেই তো।
SADHANA
Beauty Snow
সাধনা
বিউটি স্নো
একটি অতি আধুনিক
অঙ্গরাগ
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
কলিকাতা-৫

সূচীপত্র

এ সংখ্যার প্রচ্ছদ : শ্রীনিতাই ঘোষ
গত সংখ্যার প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন : শ্রীইন্দ্রাণী চৌধুরী

সম্পাদকীয়

জয়প্রকাশের আন্দোলন

সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ ও তাঁর আন্দোলন সম্পর্কে কংগ্রেস যেন তাদের মনস্থির করেই উঠতে পারছে না। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির গত অধিবেশনের প্রায় সবটাই জুড়ে ছিল তাঁর এই আন্দোলনের প্রসঙ্গ। সরাসরি শ্রীনারায়ণের নাম না করেও তাঁর নেতৃত্বে বিহারে যে আন্দোলন চলছিল তার বিরুদ্ধে কংগ্রেস কমিটির ঐ অধিবেশনে যথেষ্ট বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছিল। এমনকি ইদানীং কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে শ্রীনারায়ণের বিরুদ্ধে কিছু ব্যক্তিগত কটাক্ষপাত করতেও ছাড়া হয়নি। সম্প্রতি একটা সময় এসেছিল যখন জয়প্রকাশজীকে গ্রেপ্তার করার কথাও নাকি চিন্তা করা হয়েছিল। কংগ্রেসের সাম্প্রতিক যুব সমাবেশের প্রতিনিধিদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ সম্পর্কে আলোচনাকালে সংসদে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উমাশঙ্কর দীক্ষিত এক সময়ে একথাও বলেছেন যে, বিহারে জয়প্রকাশ যুবক ও ছাত্রদের যে উস্কানি দিচ্ছেন তরুণদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা তারই ফল। একদিকে যখন জয়প্রকাশ ও তাঁর আন্দোলন সম্পর্কে কংগ্রেস থেকে এই মনোভাব প্রকাশ করা হচ্ছে তখন সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন চিত্র দেখা গেল সম্প্রতি তিনি যখন উত্তরপ্রদেশে গিয়েছিলেন। লখ্‌নৌর রাজভবনে রাজ্যপাল আকবর আলি তাঁকে আপ্যায়িত করেছেন এবং সেখানে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হেমবতীনন্দন বহুগুণার সঙ্গে ভোজসভায়ও মিলিত হয়েছেন।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম সম্প্রতি পাটনায় জয়প্রকাশজীকে যে 'মহান দেশপ্রেমিক ও মানবতাবাদী' বলে অভিহিত করেছেন তার মধ্য দিয়েও কংগ্রেসের এই দ্বৈত মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর এই বিবৃতি নিয়ে কংগ্রেসের ভিতর কিছুটা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। কংগ্রেস এম পি শ্রীশশিশেখর শ্রীরামের এই বিবৃতির তীব্র নিন্দা করেছেন, আবার আর একদল এম পি শ্রীরামকে সমর্থন করে বিবৃতি দিয়েছেন।

জয়প্রকাশজীর আন্দোলন সম্পর্কে কংগ্রেসের এই দ্বিধাগ্রস্ততার একটা সম্ভাব্য কারণ হল, কংগ্রেসের পক্ষে এই আন্দোলনকে একেবারে উপেক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। এই আন্দোলনের মোকাবেলা করতে গিয়ে বিহারে গফুর মন্ত্রিসভাই টলমল করে উঠছে এবং বিহার বিধানসভার আয়ু ফুরোতেও আর দেরি নেই বলে মনে হচ্ছে। এই অবস্থায় উত্তরপ্রদেশের ছাত্র ও যুবকরা জয়প্রকাশজীর আশীর্বাদ নিয়ে যে আন্দোলন আরম্ভ করতে যাচ্ছেন তার পরিণাম কি হবে বলা যাচ্ছে না। অতএব শ্রীনারায়ণের সঙ্গে বিরোধ আর না বাড়িয়ে তাঁর সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসার চেষ্টা করাই ভাল, কংগ্রেসের মধ্যে এমন একটা দ্বিতীয় চিন্তা দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক

অমিল

হীরক রায়

কেবিনের পর্দা ঠেলে ওরা ঢুকল। ভেতরে যাবার আগে আড়চোখে বৈদেহী একবার বাইরেটা দেখে নিল। সঞ্জয় কোন দিকে না তাকিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে কোণের চেয়ারটায় বসে পড়ল।

—দেখেছো—বৈদেহী ওর পাশে বসতে বসতে যেন চাপাস্বরে গর্জে উঠল।—আমাদের সেই লোকাল গার্জেন বুড়োটা আজও কেমন ড্যাবড়েবে চোখে শাসন করছে।

—ও, করছিল বুঝি।—যেন কথার পিঠে কথার ঠেক দেবার জন্যই সঞ্জয় বলল। আসলে ও তখন মেনুটা ভাল করে পড়ছিল। খাবারের দাম আর ওর পকেটের রেস্তর ওজন মাপছিল।

—তোমার চোখে তো ও-সব পড়ে না। —একটু থামল বৈদেহী। তারপর সঞ্জয়কে আলতো করে ধাককা দিয়ে অনুযোগ করল। —কেন, তুমিও ভদ্রলোকের দিকে দুদন ঘুরে তাকাও না, তাহলে নিশ্চয় ওর এরকম তাকানো বন্ধ হবে। তোমার চোখে কি কিছু-ই পড়ে না নাকি?

—কি করে পড়বে! মেনু থেকে চোখ তুলে একগাল হাসল সঞ্জয়।—দুচোখ জুড়েই তুমি রয়েছ।

—আদিখ্যেতা। কথা শেষ করে আর একটু ঘন হয়ে বসল বৈদেহী।

ওর হাতে হাত বোলাতে বোলাতে সঞ্জয় বলল, জান, আজ তোমার জন্য অপেক্ষা করতে করতে এক কেলেঙ্কারীর মধ্যে পড়েছিলাম আর কি! এক ভদ্রমহিলাকে তুমি মনে করে হাত ধরে টানতে যাবো—এমন সময় দেখি তুমি নও।

কেবিনের বাইরে বৃদ্ধ মানুষটির গলার শব্দ পাওয়া গেল। একটু শব্দ করে তিনি গলা খাঁকারি দিলেন। সেই শব্দ কানে যেতেই সঞ্জয় চোখ তুলে তাকাল বৈদেহীর দিকে। বৈদেহীর চিবুক হল দৃঢ়।

গলায় ঝাঁঝ এনে চাপা গলায় বলল সঞ্জয়, বাপরে বাপ, কি জ্বালায় পড়া গেল। একটু জোরে কথা বললেই বুড়োটা গলা খাঁকারি দেবে!

—আমারও একদম সহ্য হয় না। এর চেয়ে অন্য কোথাও গেলে হয় না? বলল বৈদেহী।

—কোথায় যাবো?—বড় করুণ দেখাল সঞ্জয়ের মুখ—এক্ষণ আর কোন হোটেলের কেবিন জুড়ে বসে থাকা যাবে বল!—কথা শেষ করে সঞ্জয় তাকাল বৈদেহীর দিকে। দুজনের চোখেই ছলকে উঠল চাপা হাসি।

কেবিনের বাইরে বৃদ্ধ মানুষটি সামনে এক কাপ চা রেখে অন্যমনস্কভাবে দেওয়ালের দিকে তাকিয়েছিলেন। আসলে ওটা ভান। উৎকর্ণভাবে প্রতিটি শব্দ প্রতিটি কথা শুনছিলেন।

—যাকগে—সঞ্জয় বলল—পাত্তা দিলেই পাত্তা পায়। ওকে কোন রকম ইম্পর্টেন্স না দিলেই হল। মনে কর না ভারী পর্দার আড়ালে আর কেউ নেই। শুধু আমরা দুজনে একা একা।

—দুজনে একা একা।

—তাই না? ভুল বলেছি? সঞ্জয় কথা শেষ করে বৈদেহীর নাক টেনে দিল।

বৈদেহী উত্তেজনাবশে বলে উঠল, যাঃ, অসভ্য।

অসভ্য কথাটা বাইরের বৃদ্ধ মানুষটিরও কানে গেল। পর্দা ছিঁড়িয়ে সুরুৎ করে তাঁর কানে পেঁছে গেল কথাটা। মাথার কাঁচাপাকা চুলগুলোর মধ্যে তিনি আঙুল চালালেন এলোমেলোভাবে। নিঃশ্বাস পড়ল ঘনঘন। ভাবছিলেন তিনি, করছেটা কি ওরা? ছ্যা, ছ্যা। বেয়ারাটাও তো যে কোন সময় কেবিনে ঢুকে পড়তে পারে। সব জেনেও এমন কেচ্ছায় মেতেছে ওরা!—কেচ্ছা—নিজের মনে ভাবলেন তিনি।—কেচ্ছা তো বটেই। নিশ্চয় কিছু লটঘট করছে। তা নইলে মেয়েটা অসভ্য বলবে কেন?

বৃদ্ধের সামনে একজন মাঝবয়সী লোক এসে বসল। পকেট থেকে সিগারেট বের করল। বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে বলল, কাঠি আছে নাকি? বৃদ্ধের চমক ভাঙ্গল। ভাবনা টুকরো টুকরো হল। ঘাড় নাড়লেন। ডান পকেট থেকে বের করে লোকটিকে দিলেন। ফস করে একটি শব্দ হল। লোকটি একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে একদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।

বৃদ্ধ মানুষটির চোখও সেই দৃষ্টিকে অনুসরণ করল। পর্দার নীচ দিয়ে যেখানটায় পেঁছে দৃষ্টিটা আটকে গেল, সেখানে দেখলেন ছেলেটির পা মেয়েটির পায়ে ওম দিচ্ছে। ছ্যাঃ—মনে মনে বললেন তিনি, অথচ চোখ সরাতে পারছিলেন না। ওরা কেন পা সরাচ্ছে না, কখন পা সরাবে এই চিন্তায় অস্থির হচ্ছিলেন।

কেবিনের ভেতরে ওরা কিন্তু ছিল নির্বিকার। ওরা পাশাপাশি বসে এ ওর পায়ের পাতায় পা রেখেছিল, হাতে হাত বোলাচ্ছিল কখনও এলোমেলো খাপছাড়া, কখনও স্বপ্নভরা, কখনও বা হিসেবী ভালবাসার কথা বলছিল।

সঞ্জয় বৈদেহীর চুলে আঙুল দিয়ে আলতো করে হাত বোলাতে বোলাতে বলল—শোন, একটা কথা রাখবে?

—থামলে কেন, বলই না।—সঞ্জয়-এর বুকে বিলি কাটতে কাটতে বলল বৈদেহী।

—তুমি আমাকে একটা......,

বৃদ্ধ কান খাড়া করে রইলেন। হঠাৎ ওরা ঝলকে ঝলকে হেসে উঠল। বৃদ্ধ গলাখাঁকারি দিয়ে নড়ে চড়ে বসলেন। সামনের লোকটির দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কোঁচকালেন। লোকটি হিসহিস করে হাসল।

ভাবছিলেন বৃদ্ধ—ছেলেটা চাইলো কি? মেয়েটাই বা এমন উছলে উঠল কেন? কি ভয়ানক নির্লজ্জ হয়েছে ওরা। এত জ্বালা কিসের বাবা। যেন যৌবন ছটফট করছে। অসহ্য।

সামনের মানুষটি ভাবছিলেন—এরা কেমন যেন! জোরে জোরে কথা বলে। সবই প্রকাশ করে। এ কেমনধারা প্রেম! এত সোচ্চার কেন? অনুচ্চার অস্ফুট অনুভূতি কৈ?—তিনি ভাবছিলেন।

—এই ফটোটাই চেয়েছিলে তো? বৈদেহী বলল সঞ্জয়কে।

—একটা হলেই হল। তোমার সব ফটোই আমার সুন্দর লাগে।

—আবার বল।

—বললুম তো ভাল লাগে।

—শুধু ফটোই?

সঞ্জয় বৈদেহীর কাঁধে হাত রাখল। বৈদেহীকে আরও কাছে টেনে নিল। বলল—বাকি কথা কি আর বলতে হয়, বুঝতে পার না। তোমার?

—ভীষণ। বৈদেহীর গলা বুজে এল।

আর ঠিক তখুনি পর্দা তুলে বেয়ারা ঢুকল। বেয়াড়া সময়ে এসে পড়াতেও ওরা বিরক্ত হল না। যেমন ছিল তেমনটিই বসে রইল। মুখে বলল—একটু পরে।

বেয়ারাটি বেরিয়ে এল। পর্দা তোলার সময় কেবিনের ওপর দিয়ে তাকিয়ে থাকলেও বৃদ্ধ দেখতে পাচ্ছিলেন ওদের। বুকে মুখ গুঁজে ভেজা ভেজা গলায় মেয়েটিকে কথা বলতে তিনি দেখেছিলেন। দেখে এক বিষাদবোধ আচ্ছন্ন করেছিল তাঁকে। ভাবছিলেন কই বিয়ের পরেওতো এমনধারা করিনি আমরা। প্রথম প্রথম তো ও এতটা ঘোমটা টেনে থাকত। ঘোমটা খোলার জন্য কত সাধ্য-সাধনা করেছি, আমাকে অবশ্য সেবা-যত্ন করেছে। অন্য সবও। কিন্তু এমনভাবে বুকে মুখ রেখে অন্ধকার ঘরেও তো এমন ভিজে গলায় কথা বলেনি।—বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। পলকে মনে পড়ল তাঁর মেয়ের কথা। মনে হল, কে জানে হয়ত সুষমাও এমন কিছু করছে। এ যুগের মেয়ে তো। সবাই প্রায় একরকমের। হয়ত উনিশ বিশ হবে। আবার একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি, হাত দিয়ে কপাল মুছতে মুছতে ভাবলেন—কালের হাওয়া। ঠেকাবে কে?—আবার তখুনি মনে হল, না সুষি কখনও এমন কিছু করতে পারে না। অসম্ভব।

সামনের লোকটি আবার বললেন, দেশলাই আছে? বৃদ্ধ মানুষটি ঘাড় নাড়লেন। পকেট থেকে দেশলাই বের করে টেবিলের ওপর রাখলেন। ফস করে শব্দ হল। লোকটি একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন।

ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক ভস করে একটা দীর্ঘনিশ্বাসও ফেললেন। মেয়েটির একটু আগের কথা তখনও তার কানে

বাজাচ্ছিল। চাপা হাসি খেলে গেল ভদ্রলোকের মুখে। মনে মনে বললেন তিনি, ওহে ছোঁড়া, তুমি একেবারে কাঁচা। আমার মত পোড়-খাওয়া বয়স হলে বুঝতে পারতে তোমার প্রশ্নের পরে হুবহু এই বা এই ধরনের উত্তর মেয়েরা দেয়। দিয়ে থাকে। দিতে হয়। ভদ্রলোক আবার একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন, নাক দিয়েও গড়িয়ে বেরিয়ে এল এক ঝলক ধোঁয়া। মৃদু কাশলেন তিনি। পকেট থেকে রুমাল বের করলেন, মুখ মুছলেন। তারপর রুমালের খুঁটের দিকে নজর যেতেই মৃদু হাসি খেলে গেল তাঁর মুখে। মনে মনে বললেন, কত দেবে তোমাকে! রুমালে নাম লিখে দেবে, সপ্তাহে সপ্তাহে চিঠি দেবে, আফ-টার শেভ লোশন দেবে। সব শেষে দেবে হলুদ রং-এর নিমন্ত্রণের চিঠি—প্রজাপতি আঁকা।

এই অবধি এসেই ভদ্রলোকের ভাবনা হোঁচট খেল। ভাবলেন, না এমনটা তো নাও হতে পারে। আমি আমার সময়ের কথা ভাবছি, তখন মেলামেশা প্রেমপ্রেম ছিল বটে, কিন্তু এত উপভোগ্য তো ছিল না। তখন প্রেম করায় লজ্জা যত না ছিল, তার চেয়েও বেশী ছিল ত্রাস—এই বুঝি ধরা পড়লুম। কই এদের তো কোন ত্রাস নেই। এদের তো দেখে মনে হয় আকণ্ঠ উপভোগ করছে।

উপভোগ—সামনের ফুলদানিটা হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে সরাতে সরাতে ভদ্রলোক মনে মনে আর একবার আওড়ালেন—উপভোগ। দাঁড়াও না, যাদুরা আর কিছু-দিন এমনধারা উপভোগ কর। তারপর দেখবে উপভোগের ছিবড়ে বেড়িয়ে পড়েছে। অবশ্য যদি চড়ামাত্রায় চুটিয়ে নিতে পার তাহলে অবশ্য জাল তোমাদের মাথার ওপরে থাকবেই।

এতকথা থাকতে জালের কথা মনে হতে চমকে উঠলেন তিনি।— জাল হ্যাঁ, তাই তো। জাল ছাড়া আবার কি? রং ফুরুলেই দেখবে ধরা পড়ে গিয়ে, কিংবা আটকে গিয়ে কিংবা ফেঁসে গিয়ে কি ভুলই না করেছ তোমরা। দেখবে কল্পনার রংয়ে ভরা প্রেমের জগত আর প্রাত্যহিক প্রয়োজনের জগতের মধ্যে কি ভীষণ ব্যবধান। যাও বাছাধনেরা! বয়সের চৌকাঠ ডিঙিয়ে আর একটু সামনের দিকে যাও। তখন দেখবে মনে হবে, তোমরা কি ভীষণ বোকামীর খেলায় মেতেছিলে।

ভদ্রলোকের ভাবনা ভাঙল। সামনের দেশলাইটা বৃদ্ধ ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, আপনার দেশলাইটা। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি হাত বাড়িয়ে নিলেন। নিঃশব্দে পকেটে রাখলেন।

বেয়ারা সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, চা দেব?

ওরা দুজনেই একটি করে আঙুল তুললেন।

বেয়ারা কেবিনের সামনে এসে গলা খাঁকারি দিল। ভেতর থেকে ছেলেটির গলা পাওয়া গেল—দু কাপ চা দাও।

—তুমি না অদ্ভুত। ঠিক বুঝতে পার কখন বেয়ারা আসছে। আমার তো ছাই খেয়ালই থাকে না। বৈদেহী বলল সঞ্জয়কে।

ছেলেটি কি বলল স্পষ্ট বোঝা গেল না।

—অ্যাই আবার। বৈদেহীর গলা শোনা গেল।

বাইরে উৎকণ্ঠিত বৃদ্ধটি ভাব ছলেন, আবার কি করছে! ছ্যা, ছ্যা। ছেলেটার মাথা কি একেবারে খারাপ হয়ে গেছে!

—ঠিকই তো বলছি। আমার কথা খেয়াল রাখলে কোন ঝামেলা হয় না।

—ও এই কথা। বৃদ্ধ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

—এই শোন, ঝুমি না তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাইছে। দেখা হলেই তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে। এই চলো না আলাপ করবে। বৈদেহী বলল।

—ঝুমি মানে সেই চুল ফাঁপানো মাটি কাঁপানো মেয়েটা। সঞ্জয় চোখ ছোট করে জিজ্ঞেস করল।

—যাঃ। কাকে কি বলছ! ঝুমি কি সুইট।

বৃদ্ধের সামনের ভদ্রলোকটি ভাবলেন, মেয়েটি কি বোকা! অথবা সরল। অতিরিক্ত সারল্য তো এ-যুগে বোকামিরই আর এক নাম। তা নইলে অত সুইট কোন মেয়ের সঙ্গে ওর ইয়েকে আলাপ করিয়ে দেয়! আরে মূর্খ? সিংহের সামনে কেউ মাংস এগিয়ে দেয়?

উপমাটা মনে হওয়াতে ভদ্রলোক মনে মনে একটু কুঁকড়ে গেলেন। ভাবলেন মধ্য চল্লিশে আছি বলে আমার মনে যেমন মাংস স্পৃহা আছে এমনটা ওর তো নাও হতে পারে। একটু পরেই তাঁর মনে হল, যদি তাই করে তবে বলতে হবে ও বোকা। ঠিক গুছানো স্বভাবের নয়। একটু অসংলগ্ন, কাঁচা, এলোমেলো।

—তুমি যখন বলছ তখন আলাপ করব। কিন্তু দেখো ঐ সব ব্যাটেলিয়ানের সঙ্গে সিনেমায় যেতে পারবো না। ওভাবে সময় নষ্ট না করে তোমার সঙ্গে আড্ডা মারলে কাজ দেবে। সঞ্জয় বলল বৈদেহীকে।

—বাব্বাঃ, এতো! কিছু ধান্দা আছে তোমার মনে হচ্ছে।

—বলব?

—বল।

—বেশ। সঞ্জয় বৈদেহীকে চাপা গলায় কি বলল শোনা গেল না। বৈদেহী বলে উঠল, ধ্যাৎ, অসভ্য।

আবার অসভ্য কথাটা কানে যেতেই ধুরমুর করে উঠে পড়লেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক।

সামনের লোকটি মৃদু হেসে বললেন উঠলেন কেন? আপনার চা এক্ষুনি আসছে।

ও, হ্যাঁ। নিজেকে সামলে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে বসে পড়লেন বৃদ্ধ মানুষটি।

—শোন, কাল বুবুদের বাড়ীতে তুমি সাতটা নাগাদ চলে আসবে। আমি ওখানে মিট করব। তারপরে সবাই একসঙ্গে বিয়েবাড়ী যাবো। সঞ্জয়-এর গলা ভেসে এল।

—বুবুদের বাড়ী! কে কে আছে এখন। বৈদেহীর গলায় জিজ্ঞাসা।

—কে আবার থাকবে? বুবু আছে আর ওর ছোট বোনটা আছে। সময়মতো এস কিন্তু। ওয়েট করতে হলে আমার মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে যায়।

অবাক হলেন মাঝবয়সী ভদ্রলোকটি। ভাবলেন, ছেলেটিও তো কম দুঃসাহসী নয়। ওর এক বন্ধুর বাড়ী একলা মেয়েটিকে যেতে বলছে। এমন এক বাড়ী যেখানে কোন বয়স্ক লোক নেই।—ছেলেটির মূঢ়তাকে মনে মনে ধিককার দিলেন তিনি।

—কেন, কাল দুপুরেই তো একবার দেখা হচ্ছে আমাদের। বৈদেহীর গলা আবার শোনা গেল।

—কি করে?

—বারে, কাল আমাদের গভর্নিং বডির মিটিং আছে না। আমাদের কলেজ থেকে জি-বি-তে আমি আর সীমা যাব। তোমাদের কলেজ থেকে তুমি তো আসছই—তখন দেখা হবে।

ও, এরা তাহলে একসঙ্গে ইউনিয়নও করে। ক্রমশ ভাল লাগতে শুরু করে ছিল মাঝবয়সী মানুষটির। এরা একসঙ্গে মিলে জুলে সবই করছে তাহলে। বাঃ। মন্দ কি। ভাবলেন তিনি।

তাঁর সামনের বৃদ্ধ মানুষটি নাকের ডগায় হাত দিয়ে একদৃষ্টে টেবিলের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলেন, কি আশ্চর্য! কি সব জিবি টিবি বলল। মানেই তো ছাই বুঝলাম না। মনে হল রাজনীতির কোন বুলি আওড়ালো।

রাজনীতি কথাটা মনে হতে আরও চটে উঠলেন তিনি। ন্যায়নীতিই মানছে না ভর সন্ধ্যায় কেবিনের মধ্যে ছ্যা ছ্যা, আবার রাজনীতি। একটু পরে তাঁর মনে হল, এই যে এত কিছু করছে, ছেলেটার সঙ্গে ঘুর ঘুর করছে, হয়তো রাজনীতিও করছে, এসব কথা মন থেকে মুছে ফেলতে পারবে অন্য জায়গায় বিয়ে হবার পরে।

হঠাৎ মনে হল, ওদের তো বিয়েও হতে পারে। সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল, ঘেঁচু। বিয়ে হবে না ঘেঁচু। সব ভার শেষে আবার আমাদেরই গলায় ঝুলবে। পার করতে হবে আমাদেরই।

বেয়ারা চা নিয়ে এল। প্রথমে ভদ্রলোক দু'জনকে দিল। তারপর কেবিনের পর্দা তুলে ওদেরও দিল। আর তখনি বৈদেহীর সঙ্গে বৃদ্ধের চোখাচোখি হল। বেয়ারা কাপ রেখে চলে যেতেই বৈদেহী বলল, দেখেছ, বুড়ো এখনও তাকিয়ে আছে।

ছেড়ে দাও না। ওদের সঙ্গে আমাদের মেলে না।—চায়ে চুমুক দিতে দিতে সঞ্জয় বলল।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি মাঝ-বয়েসী ভদ্রলোকের চোখে চোখ রেখে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, ওদের সঙ্গে আমাদের মেলে না। মান্য-গন্য লজ্জাবোধ সব যেন শেষ হয়ে গেছে।

মাঝবয়েসী ভদ্রলোক মৃদু হাসলেন। বললেন, ওদের সঙ্গে আমাদের মেলে না। চুরি যাওয়া বয়সটাকে আর তো ফিরিয়ে আনতে পারি না।

টেলিফোনের উৎস সন্ধানে
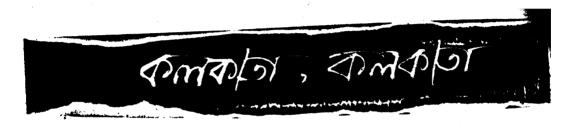
মেজদার কথা মনে আছে? শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্তে' বর্ণিত সেই ডাকসাইটে মেজদার কথা? তিনি একটা স্লিপে ঘন্টা-মিনিট লিখে ছোট তিনটি পড়ুয়া ভাইকে থুথু ফেলা, জল খাওয়া বা বাইরে যাওয়ার ছুটি দিতেন, এবং স্লিপের সঙ্গে ঘড়ির টাইম মিলিয়ে একটা খাতায় টুকে রাখতেন। উদ্দেশ্য অতি মহৎ। কেউ যদি ধরুন শুক্রবারের সন্ধ্যা সাতটা বাইশ মিনিটে জল খাওয়ার ছুটি চায় অমনি সোম থেকে বেস্পতি এই চারদিন সন্ধ্যায় তার কী পরিমাণ জল তেষ্টা পেয়েছিল তার একটা সমীক্ষা করে তবে তাকে ছুটির সময় মঞ্জুর করা হবে। বাস্তবিক স্ট্যাটিসটিকস ব্যাপারটার এমন চুলচেরা প্রয়োগ খুব কমই দেখা গেছে। এবং আমি অকপটে স্বীকার করছি, কেউ যখন কথায় কথায় স্ট্যাটিসটিকস কোট করেন আমার তখন মেজদার কথাই মনে পড়ে।

সেদিনও ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটেছিল, যেদিন কলকাতার টেলিফোন ব্যবস্থার বিষয়ে নানারকম সংখ্যাতাত্ত্বিক বর্ণনা শোনানো হল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে। আমাদের সেই চিরঞ্জীবী মেজদাকেই আবার সগৌরবে আসীন দেখলাম প্রেস কনফারেন্সের চেয়ারে।

কিন্তু সে কথায় আসার আগে গণ্ডারের কাণ্ডটা আগে বলে নিই।

তখন ইংরেজ আমল। লোক গণনা চলছে। প্রতি গ্রামে মানুষের সংখ্যা তার মধ্যে স্ত্রী পুরুষ বিভাগ, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ ইত্যাদির পাশে একটি কলম ছিল গৃহ-পালিত পশুর জন্যে নির্দিষ্ট। তাতে গরু, মোষ ছাগল ইত্যাদির সংখ্যা লেখার কথা। একজন গণনাকারী নাকি প-জেলার এক গ্রামে কার বাড়িতে দুটি রাজহাঁস দেখতে পেয়ে তাদের কথাও লিখেছিলেন। না, তিনি রাজহাঁস-ই লেখেন নি; লেখার কথা ইংরেজিতে, কাজেই তিনি নেসফিল্ডের গ্রামারের ওপর নির্ভর করে লিখেছিলেন 'গ্যাণ্ডার'। এই রিপোর্ট যখন জেলা স্তরে পৌঁছয় তখন সেখানকার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি গ্যাণ্ডার-এর পাঁচিলে মিনিট দুয়েক মাথা-কুটে শেষে দুর্গা বলে ওটাকে গণ্ডারে রূপান্তরিত করেন এবং যেহেতু তিনি এক-জন স্ট্যাটিসটিকস ভক্ত তাই থানা বেসিসে চিন্তা করে গোটা জেলার ওপর ৩৮টি গণ্ডার ধার্য করেন।

যাহোক এই রিপোর্ট রাইটার্সে এল এবং সেখানকার করণিক, অধিকারিক, সচিব ইত্যাদির দ্বারা প্রসেসড হয়ে মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে হাজির হল।

তারপর কোনো এক শুভদিনে তদানীন্তন আইনসভার কোনো এক সদস্যের প্রশ্নের খোঁচায় মন্ত্রীপ্রবর সদর্পে উঠে স্ট্যাটিসটিকস আওড়াতে শুরু করলেন—

প-জেলায় লোকসংখ্যা ৯০৮৭ (ইত্যাদি) পুরুষ ৫১ (ইত্যাদি), নারী ৪৯ (ইত্যাদি) হিন্দু ৭৩ (ইত্যাদি মুসল-মান ২৬ (ইত্যাদি) গৃহপালিত গবাদি পশু ৪৩ (ইত্যাদি) গৃহপালিত গণ্ডার ৩৮টি—

ব্যস আর কথা নেই সমস্ত সভায় হাসির বোমা ফেটে পড়ল। গৃহপালিত গণ্ডার? পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য। একজন সদস্য তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করলেন, সমস্ত জেলাটিকে এক্ষুনি টুরিস্ট সেন্টার হিসেবে ঘোষণা করা হোক অন্য একজন বললেন, প-জেলায় অবিলম্বে গণ্ডার রিসার্চ সেন্টার খোলা হোক। কেউ আবার বললেন, মাননীয় মন্ত্রীকে গণ্ডারোলজির ওপর থিসিস সাবমিট করার জন্যে ওয়াটালু ইউনিভার্সিটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হোক।

তা গণ্ডারোলজি যদি সত্যিই সেদিন চালু হতো দলে দলে আমরা অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গবাসীরা স্নাতক হয়ে আমাদের গাত্রচর্মকে কিঞ্চিৎ ঘাতসহ করে নি পারতাম। যাক কী কথায় কী কথা এসে গেল।

সেদিন কলকাতা টেলিফোনের দিল্লীর বড়কর্তা এবং কলকাতার মেজকর্তা গা বললেন তার স্ট্যাটিসটিকস কলকাতার টেলি-ফোন ব্যবহারকারীরা সানন্দে প্রণিধান করেছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় কথিত সত্য আর ফলিত সত্যের মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক। তাঁরা বলেছেন ১০০টি কল করলে পাওয়া যায় নাকি ৩৮টি। কিন্তু এই ৩৮টির মধ্যে কটি ভুল নম্বর এবং কটিই বা ক্রস কানেকশানে রূপান্তরিত হয় তার স্ট্যাটিসটিকস কি তাঁরা খতিয়ে দেখেছেন? তাঁরা বলেছেন এপ্রিলের আগে পাওয়া যেত শতকরা ২৮টি এবং এই কয় মাস চেষ্টার ফলে সেই সংখ্যা হয়েছে ৩৮টি। কিন্তু তার প্রমাণ? বলা বাহুল্য সেটা আছে মেজদার খাতায়। সেই যে সোম থেকে বেস্পতিবার অবধি কতোটা জলতেষ্টা পেয়ে-ছিল তার নিরিখে শুক্রবারের জলতেষ্টা নির্ধারণের চেষ্টা। অর্থাৎ এপ্রিলে ২৮ থাকলে সে থেকে জুলাই এই তিন মাসে সেটা ১০ নম্বর বেশি হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু প্রশ্ন করতে ইচ্ছে যায় এই প্রক্রিয়ায় তিন মাসে দশ-দশ করে বাড়তে বাড়তে একদিন অদূর ভবিষ্যতেই কি ১০০টি কল করলে ১০০টিই পাওয়া যাবে? আহা, সেই সুখের দিন যে কবে হবে?

কিন্তু কর্মকর্তাদের স্ট্যাটিসটিকস সাপ্লাইয়ের পদ্ধতি যে কতো নির্ভুল (!) তা টের পাওয়া গেছে তাঁদেরই স্বীকৃত একটি তথ্য থেকে। ডায়ালটোন না পাওয়া (শতকরা ৪ ভাগ) ভুল নম্বারে চলে যাওয়া ('৪ ভাগ), ক্রস কানেকশানে হওয়া ('৩ ভাগ ইত্যাদির স্ট্যাটিসটিকস তাঁরা কোন সূত্রে পেয়েছেন প্রশ্ন করায় কর্মকর্তা জবাব দিয়েছেন—মিটারের সাহায্যে। তথাস্তু কিন্তু আবার প্রশ্ন করা হল, ভুতুড়ে বিল ওঠে কী করে? উত্তর এল—মিটারের গোলমালের ফলে।

হায় মিটার, হায় স্ট্যাটিসটিকস অভ্রান্ত সূত্র। তোমার নিজের উকিল তোমাকে পথে বসিয়ে দিয়েছে।

—জৈমিনী

এই বাংলার খবর

জনতার ক্রোধের আগুন

একটুও সময় নষ্ট না-করে বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়ে, তদন্তের জন্যে বিচারপতির নাম ঘোষণা করে, তদন্ত কমিশনের বিচার্য বিষয় স্থির করে এবং শুনানী শুরু করার এক মাসের মধ্যে রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দিয়ে পশ্চিম বাংলার সরকার কোচবিহারের বিস্ফোরণকে যে দ্রুত আয়ত্তে আনতে সফল হয়েছেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেই সঙ্গে কারফু বা সেনাবাহিনীর টহলও নিশ্চয়ই বেশ কিছুটা সাহায্য করেছে। সরকারি বাসের সঙ্গে সি আর পির ভ্যানের সামান্য সংঘর্ষ থেকে যার সূত্রপাত তার যা পরিণতি ঘটলো তা তো দুর্ভাগ্যজনক বটেই। সংঘর্ষের পর সি আর পি'র লোকেরা বাসের চালক আর জনকয়েক যাত্রীর ওপর চড়াও হয় বলে প্রকাশ। স্থানীয় জেনকিনস্ স্কুলের ছাত্রেরা তখন যাত্রীদের পক্ষ নিলে শুরু হয় বচনা। এরই মধ্যে সি আর পির একজন গুলি চালিয়ে বসে। সেই গুলিতে আহত হন একজন শিক্ষক আর একজন ছাত্র। তারপরই ঘটনা মোড় নিল অন্যদিকে। সি আর পির এই গুলি চালানোর প্রতিবাদে ছাত্রেরা এবং স্থানীয় জনসাধারণ ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশ সুপারের অফিসে গেল, কিন্তু সেখানে তাঁদের কাউকেই পেল না। তারপরেই তারা ঐ অফিসের আসবাবপত্র তছনছ করে আর শেষ পর্যন্ত আগুন ধরাতে শুরু করে বলে প্রকাশ। শুধু ঐ অফিসেই নয়, সাগরদীঘি এলাকায় যতো সরকারি অফিস ছিল সব জায়গাতেই এক ব্যাপার ঘটে। পরের দিন আহত শিক্ষক শঙ্কর চক্রবর্তীর মৃত্যু এবং মাথাভাঙ্গায় সি পি এম নেতা রেবতী ভট্টাচার্যের খুন হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাঙ্গামা আরো ছড়িয়ে পড়বে বলে আশংকা দেখা দেয়, কিন্তু সৌভাগ্য-বশত তা আর হয়নি। সেনাবাহিনীর টহল এবং অন্যান্য সরকারি ব্যবস্থাই তার কারণ।

কিন্তু অভিযোগ উঠেছে, ঘটনা [illegible] ঘটে তখন থেকে বেশ কয়েক ঘন্টা কোচবিহারে সরকারি প্রশাসন বলে কিছু ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যদি ঠিকমতো ব্যবস্থা নিতেন তবে জল হয়ত এতদূরে গড়াতো না বলে, অনেকের ধারণা। রাজ্য কংগ্রেসের দুই সাধারণ সম্পাদক কোচবিহার ঘুরে এসে যে-রিপোর্ট দিয়েছেন তাতেও এই ধরনের মন্তব্যই করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত যে-আভাস পাওয়া গেছে তাতে মনে করা হচ্ছে, কোচবিহারের এই গণ-বিক্ষোভ পুরোপুরিই স্বতঃস্ফূর্ত। কোনো রাজনৈতিক দলের যোগাযোগ এর সঙ্গে ছিল না। তবে বামপন্থী দলগুলো যে এই ঘটনার সূত্র ধরে আন্দোলন গড়ে তুলতে চাইবে, এটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। আর এস পি এবং সি পি এম সেই চেষ্টাই করে। তবে সরকারের দ্রুত ব্যবস্থা এবং কংগ্রেসের দুই সাধারণ সম্পাদক আর মন্ত্রী সন্তোষ রায় ও ফজলে হকের উপস্থিতি অবস্থা বিশেষ ঘোরালো হতে দেয়নি।

বিচারপতি তারাপদ মুখোপাধ্যায় এখন তদন্ত করে দেখবেন, ২৭ আগস্ট কীভাবে এই ঘটনা ঘটলো, ক্ষয়ক্ষতি কতোটা হয়েছে, গুলি চালানো ঠিক হয়েছিল কিনা, যদি ঠিক না হয়ে থাকে তবে তার জন্যে দায়ী কে এবং দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়। তাছাড়া অবস্থা সামলাবার জন্যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন কিনা বিচারপতি মুখোপাধ্যায় তাও খতিয়ে দেখবেন।

আর এক (রহস্যজনক) আগুন

কোচবিহারে সরকারি নানা দপ্তরে কীভাবে আগুন লাগে সেটা অনেকেই জানেন। কিন্তু কলকাতায় রাজাবাজারের ট্রাম ডিপোয় যে কী করে আগুন লাগলো আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাওয়ার মতো একে একে ৩৮টা ট্রাম পুড়ে গেল তা এখনও পর্যন্ত কেউ বুঝতে পারছে না। কলকাতার কোনো ট্রাম ডিপোয় আগে যে কখনও আগুন লাগেনি তা নয়। কোনো কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনেও ট্রাম পুড়েছে। কিন্তু এত বড় আগুন লাগার ঘটনা ট্রাম কোম্পানির ইতিহাসে কস্মিনকালেও ঘটেনি। সব মিলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় পাঁচ কোটি টাকার মতো হবে বলে আশংকা। এত বড় আগুনের উৎস কোথায়? রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী জ্ঞানসিং সোহনপাল থেকে শুরু করে অনেকের মতেই এই আগুন লাগার ঘটনা রীতিমতো রহস্যজনক। এর পেছনে কি কোনো নাশকতার ব্যাপার আছে? সে-সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কলকাতার গোয়েন্দা পুলিশ এখন এই রহস্যের তল পাওয়ার চেষ্টা করছেন। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরাও খোঁজখবর করছেন।

কিন্তু নাশকতা না নিছক দুর্ঘটনা, সেটা আপাতত জল্পনার ব্যাপার। যে-ব্যাপারটা খুবই বাস্তব তা হলো, এই মহানগরীতে বড় রকমের আগুন লাগলে তা নেভাবার যথাযথ ব্যবস্থার অভাব। এই বছরেরই গোড়ার দিকে যখন সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের বাড়িতে আগুন লাগে তখনও এই অভাব বেশ ভালোভাবেই মালুম হয়েছিল। প্রথমে শোনা যায়, রাজাবাজার ট্রাম ডিপোর মধ্যে আগুন নেভাবার যে-সব যন্ত্রপাতি থাকে সেগুলো নাকি আগুন লাগার সময় ছিল না। পরে খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে, সবগুলো না হলেও অধিকাংশই সচল ছিল না। পরে খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে, সবগুলো না হলেও অধিকাংশই সচল ছিল। কিন্তু তার যথাযথ ব্যবহার হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। তাছাড়া ঐ যন্ত্রপাতি দিয়ে এত বড় আগুন সামলানোও যায় না। তার জন্যে দরকার দমকল বাহিনীর সাহায্য। দমকল বাহিনীর ডজন দুয়েক গাড়ি ঘন্টা চারেকের চেষ্টায় আগুন

আনতে আনে। কিন্তু তাদের সামনে প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় যথেষ্ট জল যোগাড় করা। বালি দিয়ে আগুন নেভাবার কথা ভাবা হয়। কিন্তু বালিও মেলে না। অথচ ডিপোয় বালি থাকার কথা। আশপাশে কোথাও জল না পেয়ে সেই কলেজ স্কোয়ার থেকে জল এনে কাজ চালাতে হয়। রাস্তার হাইড্রেন্টগুলো প্রায় সবই বুজে এসেছে। তাই সেখানেও জল মেলেনি। এদিকে এই ট্রাম পুড়ে যাওয়ার ফলে যাত্রীদের অবস্থা আরো কাহিল। একেই তো ট্রাম-বাসের সংখ্যা যথেষ্ট নয়, তার ওপর এতগুলো ট্রাম আবার রাস্তায় বেরোতে পারছে না।

তিন মাসের খাদ্যচিন্তা

এই বাংলার খাদ্য সঙ্কট সামলাতে রাজ্য সরকার শেষ পর্যন্ত ভারতরক্ষা বিধির শরণ নিচ্ছেন। মজুত উদ্ধার করতে এবং বেআইনীভাবে চাল বহন আর বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায় কর্ডনিংয়ের আইন লঙ্ঘন রুখতে প্রয়োগ করা হবে এই বিধি। একে সরকার নিজে রাজ্যের মধ্যে যথেষ্ট চাল সংগ্রহ করতে পারেননি, তার ওপর কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছেন চালের 'কোটা' কমিয়ে। বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায় তবুও যা-হয় দু মুঠো মিলছে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলের অবস্থা ভয়াবহ। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদ—নানা জেলা থেকেই আসছে অন্ন সঙ্কটের খবর। অথচ প্রধান যে ফসল আমন তা উঠতে এখনও মাস তিনেক দেরি। এই তিন মাস অবস্থা সামাল দেওয়ার জন্যেই সরকার কয়েকটা ব্যবস্থা নিচ্ছেন। মজুত উদ্ধার অভিযান ছাড়াও বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায় 'খোলা' বাজারে চাল বিক্রি ক্রমশ বন্ধ করে দেওয়া হবে, সামাজিক অনুষ্ঠানে অতিথি আপ্যায়নে তিন মাস তণ্ডুলজাতীয় খাদ্য পরিবেশন করা যাবে না, বর্ধমান বীরভূম মালদহ আর পশ্চিম দিনাজপুর ছাড়া অন্যান্য জেলার আংশিক রেশন এলাকায় 'ক' ও 'খ' শ্রেণীর কার্ডধারীদের মাথা পিছু ৫০০ গ্রাম করে চাল দেওয়া হবে। সরকারি পারমিট ছাড়া ট্রেন-ট্রাক-লরি-নৌকো বা অন্য কোনো যানে চাল বহন নিষিদ্ধ হয়েছে ভারতরক্ষা বিধিবলে। মজুত উদ্ধারের ফলে যে খাদ্যশস্য পাওয়া যাবে তা বিলি করা হবে গরিব লোকেদের মধ্যে। মজুত উদ্ধার অভিযানকে রাজ্য সরকার খুবই গুরুত্ব দিচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এই অভিযানের সাফল্যের ওপরই রাজ্যের আগামী তিন মাসের অবস্থা খুব বেশিরকম নির্ভর করবে।

ওষুধ মিলছে না

কলকাতায় ওষুধের খুবই অভাব দেখা দিয়েছে। শুধু ওষুধেরই নয়, অক্সিজেন বা ইথারেরও। অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে, নিতান্ত জরুরি না হলে হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করা হবে না বলে স্থির হয়েছে। পেনিসিলিনের ব্যবহারও নিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থা হয়েছে। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের তরফ থেকে এই অবস্থায় রীতিমতো উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। কেন এই ওষুধের অভাব? রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বলা হচ্ছে যে, আসলে বাজারে কোনো রকম ওষুধেরই অভাব নেই। অভাব বড় বড় কোম্পানির কয়েকটি বিশেষ নামের (ব্র্যান্ড) ওষুধের। লোকে ঐসব ওষুধই পছন্দ করে। অন্য কোম্পানির একই ওষুধ ভিন্ন নামে বিকোয় বলে লোকে তা কিনতে তেমন আগ্রহী নয়। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি কমিটি সুপারিশ করেছিলেন যে, সব ওষুধের ব্র্যান্ড নাম তুলে দেওয়া হোক। তার বদলে ওষুধের শিশির ওপর মূল [illegible] নাম লিখে রাখা হোক। এই সুপারিশ আজও কার্যকর হয়নি।

একদিকে যখন ওষুধ দুষ্প্রাপ্য, তখন আবার [illegible] তা দুর্মূল্যও হয়ে উঠেছে। আর এর [illegible] অভিযোগও করেছে, ওষুধের দাম বাড়াবার অনুমতি কেন্দ্রীয় সরকারই দিয়েছেন। ওষুধ প্রস্তুতকারকদের যুক্তি হলো, কাঁচা মালের দর হু-হু করে বাড়ছে। সুতরাং তাঁরা আর কী করবেন? অধিকাংশ ওষুধের মূল উপাদান পেট্রোলিয়াম। তা এখন খুবই আক্রা। সরকার এখন নতুন নীতি করেছেন যে, যেসব কোম্পানি বছরে ৫০ লাখ টাকার বেশি ওষুধ বিক্রি করে শুধু তাদের ক্ষেত্রেই মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

পূর্ব ভারতে, বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায় যে একটা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলা দরকার, এ-কথা উঠেছে অন্তত বছর দুয়েক হলো। কিন্তু দিল্লী এখনও সে-কথা কানে তুলছে না। সেদিন কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী আরো একবার জানিয়ে দিলেন, এ-দাবি আপাতত মানা হবে না। দিল্লী এবং পরমাণু শক্তি কমিশনের যুক্তি হলো কয়লাখনি এলাকার খুব কাছাকাছি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের চেয়ে সাধারণ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করাই বেশি লাভজনক। কিন্তু রাজ্য সরকার বলছেন, কয়লাখনি এলাকা থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরত্বে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করলে তার বিদ্যুৎ উৎপাদনের পড়তা খরচ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের পড়তা খরচের সমান হবে। দিল্লী আগে বলছিল, এই দূরত্ব অন্তত ৭০০ কিলোমিটার হওয়া দরকার; এখন বলছে অন্তত ৫০০ কিলোমিটার। এ-বিষয়ে দু পক্ষের আরো এক-দফা আলোচনা হবে এ-মাসেরই শেষে। দেখা যাক, দিল্লীর কর্তাদের টলানো যায় কিনা।

—[illegible]

দেশে বিদেশে

দেশজোড়া খরা

ভারতে এবারকার বর্ষার গতিপ্রকৃতি উদ্বেগের সৃষ্টি করছে। এখন পর্যন্ত যেসব খবর পাওয়া গেছে তাতে মনে হচ্ছে, এবার দেশের বিভিন্ন স্থানে স্বাভাবিকের চেয়ে কম বর্ষণ হয়েছে এবং আগামী কয়েক-দিনের মধ্যে অবস্থার উন্নতি না হলে আনুষ্ঠানিকভাবে ফসলের সম্ভাবনা খুবই নৈরাশ্যজনক।

দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফসল যেখানে হয় সেই তামিলনাড়ুতে এবার স্বাভাবিকের চেয়ে ৮৭ শতাংশ কম বৃষ্টি হয়েছে। ভারতের অন্যান্য যে ২০টি অঞ্চলে ভাল ফসল হয় সেগুলির মধ্যে ১৫টিতেই এবার বর্ষা ভাল হয়নি। এই সব অঞ্চলে বৃষ্টির ঘাটতি গড়ে ৬৪ শতাংশ। মাত্র পাঁচটি অঞ্চলে স্বাভাবিক অথবা স্বাভা-বিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে।

লখনৌ-এর খবরে প্রকাশ, গত কয়েক-দিন যাবৎ উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনাবৃষ্টিতে ধানের ফলন নষ্ট হয়ে যাওয়ার উদ্বেগজনক সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে।

কৃষি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আন্নাসাহেব সিন্ধে রাজ্যসভায় বলেছেন, যেসব অঞ্চলে বৃষ্টি কম হয়েছে, সেগুলির মধ্যে আছে গুজরাট, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূল-বর্তী অঞ্চল, উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল এবং বিহার, মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের কিছু কিছু এলাকা।

শ্রীসিন্ধে অবশ্য ফসলের সম্ভাবনা সম্পর্কে সদস্যদের নৈরাশ্যজনক চিত্র তুলে ধরতে নিষেধ করে বলেছেন, আগামী আট-দশ দিনের মধ্যে খরার অবসান হলে খরিফ শস্যের অবস্থা স্বাভাবিক হবে।

* * *

আমেরিকার ভরসা নেই

এদিকে আমেরিকার সরকারি কর্মচারী-দের মন্তব্য উদ্ধৃত করে 'ওয়াশিংটন পোস্ট' পত্রিকা লিখেছেন, সারা পৃথিবীতে এখন ফসলের আশা মোটামুটি ভাল হলেও, 'প্রধান ব্যতিক্রম' হচ্ছে ভারত। মার্কিন সরকারি কর্মচারিরা মনে করছেন, ভারত আমেরিকার কাছে খাদ্য চাইতে বাধ্য হবে। কিন্তু 'ওয়াশিংটন পোস্ট'কে যাঁরা খবর দিয়েছেন, তাঁরা বলেছেন, ভারত চাইলেও আমেরিকা তাকে খাদ্য দিতে পারবে না। আমেরিকার কোন কোন অঞ্চলে খরায় ভুট্টার যে ক্ষতি হয়েছে, তাতে বিদেশে মার্কিন খাদ্য সাহায্য পাঠাবার আশা নির্মূল হয়ে গেছে।

আমেরিকার একদল অর্থনীতিবিদ ও অন্যান্য চিন্তাশীল মানুষ বলতে আরম্ভ করেছেন, আমেরিকা অভাবগ্রস্ত দেশ-গুলিতে খাদ্য যদি পাঠাতে না পারে তাহলে তারা যাতে আরও বেশি খাদ্য উৎপন্ন করতে পারে সেজন্য সার পাঠাতে পারে। আমেরিকার লন, গোলাপ বাগান গলফের মাঠ, রাস্তার ধারে উঁচু জায়গা ইত্যাদিতে যে ত্রিশ লক্ষ টনেরও বেশি সার ব্যবহার করা হয়, সেটা যদি ভারত ও অন্যান্য অন্নাভাবপীড়িত দেশগুলির জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে অনেক বেশি কাজ হতে পারে। আমেরিকার সার-খাওয়া জমিতে এক টন সার থেকে যে পরিমাণ বাড়তি ফসল পাওয়া যেতে পারে, ঐ এক টন সার থেকে ভারতবর্ষের মত দেশে অনেক বেশি ফসল পাওয়া যেতে পারে।

আমেরিকায় এই ধরনের আন্দোলনের কিছুটা ফল ফলেছে বলে মনে হচ্ছে। আমেরিকার ভিতরে সারের [illegible]বহার কমিয়ে ভারত, বাংলাদেশ ও [illegible] অন্নাভাব-গ্রস্ত দেশকে ঐ সার দেও[illegible] জন্য মার্কিন সিনেটে একটি প্রস্তাব আ[illegible] চেষ্টা হচ্ছে। প্রস্তাবটি ইতিমধ্যে [illegible]জন সিনেটরের সমর্থন লাভ করেছে।

* * *

বিশ্বজোড়া দ[illegible]ক্ষ ?

অন্তর্জাতিক [illegible]্যাতিসম্পন্ন দুজন বিশেষজ্ঞ বিশ্বজোড়া দুর্ভিক্ষ ও অনাহার মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

'সবুজ বিপ্লবের' জনক বলে খ্যাত নরমান বোরলগ বলেছেন, আবহাওয়ার কারণে এবং সেই সঙ্গে সারের অভাবের ফলে এবারে সারা পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ মারা যেতে পারে।

মিঃ বোরলগ বলেছেন, অধিকাংশ সারের প্রধান সূত্র হল পেট্রোলিয়াম এবং অশোধিত তেলের দাম যেভাবে বেড়েছে সেটা ভারতের মত অর্থনীতির পক্ষে বিপর্যয়কর।

ওভারসিজ ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের লেস্টার আর ব্রাউন বলেছেন, মানুষের ইতিহাসের বৃহত্তম খাদ্য ঘাটতি এখন এশিয়ায় প্রকাশ পাচ্ছে।

মিঃ ব্রাউনের সঙ্গে পরামর্শ করে মার্কিন কৃষি বিভাগ অনুমান করেছেন যে, আবহাওয়া ভাল থাকলেও এবার এশিয়ার খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ আগেকার সব হিসাব ছাড়িয়ে ৫ কোটি টনে গিয়ে দাঁড়াতে পারে।

মিঃ ব্রাউন বলেছেন, (পশ্চিমী দেশের) রাজনৈতিক নেতারা এশিয়াকে ভাসিয়ে দিয়ে বলতে পারেন, এটা একটা অত্যন্ত বিরাট ভূখন্ড। তাঁরা বলতে পারেন ঐ পরিমাণ খাদ্যশস্য বাইরে পাঠিয়ে দেওয়ার যে প্রতিক্রিয়া মুদ্রাস্ফীতির উপর পড়বে সেটা অসহনীয়। অথবা রাজনৈতিক নেতারা জনসাধারণের কাছে গিয়ে বলতে পারেন, থার্মোস্টাট যন্ত্র ছয় ডিগ্রি নামিয়ে দিয়ে অথবা সপ্তাহে একদিন খাদ্যতালিকা থেকে মাংস বাদ দিয়ে অথবা সপ্তাহে একবেলা না খেয়ে যতটুকু খাদ্য বাঁচান যায় সেটুকু ত্যাগ স্বীকার করার জন্য তাঁরা জনসাধারণের কাছে আবেদন করতে পারেন।"

* * *

নতুন উপরাষ্ট্রপতি

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রিপাবলিকান দলের এন ই হোরোকে ৫২১—১৪১ ভোটে হারিয়ে ৬২ বছর বয়স্ক কংগ্রেস প্রার্থী বাসাপ্পা দনাপ্পা জেট্টি ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। মফস্বলের একটি ছোট শহরে উকিল হিসাবে জীবন আরম্ভ করে তিনি জামখন্ডি নামক দেশীয় রাজ্যের প্রজা পরিষদে যোগ দিয়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। পরে তিনি ক্রমে ক্রমে জামখন্ডি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, বোম্বাই রাজ্যের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি, মহীশূরের মুখ্যমন্ত্রী পন্ডিচেরির উপ-রাজ্যপাল ও ওড়িশার রাজ্যপাল হন।

নতুন উপ-রাষ্ট্রপতি সাদাসিধা স্বভাবের ছোটখাট মানুষ। তিনি রাজনৈতিক লড়াইয়ে দক্ষ ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ বলে পরিচিত। শৈব ধর্মমত সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ পড়াশুনা আছে।

* * *

'লাইসেন্স কেলেংকারী'

লোকসভার যে একুশজন সদস্যের সুপারিশে ইয়ানাম ও মাহের সাতটি ফার্মকে আমদানী লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল তাঁদের নাম গত ২৭ আগস্ট রাজ্যসভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে বাণিজ্যমন্ত্রী দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রকাশ করে দেওয়ার পর থেকে যে ঝড় উঠেছিল সেটা এখন একটা বড় রকমের কেলেংকারিতে পরিণত [illegible] বলে মনে হচ্ছে। এই সংক্রান্ত [illegible] প্রথম লক্ষ্য ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী [illegible] পাধ্যায়। লোকসভায় ও কংগ্রেস পার্লামে[illegible] পার্টির মধ্যে তাঁকে এই বলে কোণ[illegible] করার চেষ্টা হয় যে, ঐ একুশজন সদস্যে[র] অধিকাংশই সুপারিশে স্বাক্ষর দেওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন এটা জেনেও তিনি রাজ্যসভায় ঐ নামগুলি প্রকাশ করলেন কেন? ২৭ আগস্ট তারিখে শ্রীচট্টোপাধ্যায় যে একুশজনের নাম করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ১৯জন পরদিন লোকসভায় একের পর এক দাঁড়িয়ে উঠে বলেন সুপারিশপত্রে যদি তাঁদের স্বাক্ষর থেকে থাকে তাহলে সেই স্বাক্ষর জাল। প্রশ্ন তোলা হয়, রাজ্যসভায় লোকসভায় সদস্যদের নামে এমন একটা অভিযোগ এনে সভার সম্মান হানি করেছেন কিনা।

এই নামগুলি প্রকাশ করে দিয়ে শ্রীচট্টোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর ধমক খেয়েছেন এমন একটা সংবাদও বেরিয়ে যায়। পরে শ্রীমতী গান্ধী এই সংবাদ অস্বীকার করে শ্রীচট্টোপাধ্যায়কে একটু বিড়ম্বনা থেকে বাঁচান।

সংসদের বিরোধী সদস্যরা এখন এ ব্যাপারে কতগুলি গভীরতর প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁরা বলছেন ঐ সুপারিশপত্রে যেসব স্বাক্ষর ছিল সেগুলি যে জাল সেটা যাচাই করে দেখা হয়েছে কি? সই যদি জাল হয়ে থাকে তাহলে এই জালিয়াতির জন্য দায়ী কে? ১৯৫৫-৫৬ সাল থেকে যে ফার্মগুলির আমদানী লাইসেন্স বাতিল হয়ে ছিল তাদের লাইসেন্স নতুন করে মঞ্জুর করার জন্য এম-পিদের সুপারিশের প্রয়োজন হল কেন? যে একুশজন এম-পির নাম প্রকাশিত হয়েছে তাঁরা সকলেই কংগ্রেসের, তাঁদের মধ্যে তেরোজন বিহার ছয়জন উত্তরপ্রদেশ একজন মধ্যপ্রদেশ ও একজন কাশ্মীরের সদস্য। এঁরা সবাই মিলে পন্ডিচেরি অঞ্চলের একটি ফার্মকে লাইসেন্স পাইয়ে দেওয়ার জন্য উৎসাহী হলেন কেন? এইস[ব] এম-পির মধ্যে অনেকেই তৎকালীন বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রী ললিতনারায়ণ মিশ্রের গোষ্ঠীর লোক, এই যোগাযোগের রহস্যটা বা কি?

এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করা[র] জন্য বিরোধী সদস্যরা একটি সংসদী[য়] অনুসন্ধান কমিটি গঠন করতে চাইছে[ন]। সরকার এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলে[ছেন], সি-বি-আই এখন এ বিষয়ে যে অনুসন্ধান করছেন তার ফলাফল জানা গেলে সংসদীয় অনুসন্ধান কমিটি গঠনের বিষয় বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে।

—পর্যবেক্ষক

নিবেদন

অমৃতের সূচনা থেকেই আমাদের অগণিত পাঠক ও পৃষ্ঠপোষকগণ তাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা দিয়ে আমাদের ধন্য করেছেন। গত চৌদ্দ বছর ধরে আমরাও নিত্য নতুন রচনাসম্ভারে তাঁদের আনন্দ দিতে সচেষ্ট রয়েছি। অমৃত আজ কেবল বাংলার সমস্ত প্রতিষ্ঠিত ও নতুন লেখকের মিলনকেন্দ্রই হয়ে ওঠে নি, সাহিত্য ছাড়াও সিনেমা খেলাধূলা, সংবাদভাষ্য শিল্পকলা এবং সংস্কৃতির সমস্ত দিকেই একটি পরিচ্ছন্ন রুচিশীল পরিবেশ রচনাতেও অগ্রণী হয়ে উঠেছে। অমৃতের পাঠকগণ আমাদের নতুন নতুন প্রচেষ্টার প্রতিটি পর্বে তাঁদের অকৃপণ প্রীতি ও আনুকূল্য দিয়ে আমাদের উৎসাহিত করে চলেছেন, এতে আমরা অত্যন্তই গৌরব বোধ করি।

কিন্তু একথা আজ আমরা সকলেই জানি যে, জিনিষপত্র সবকিছুই এখন অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্য হয়ে উঠেছে। আমাদের প্রধান উপকরণ কাগজের দাম গত এক বছরে টন প্রতি ১৩০০ টাকা থেকে ৩৬৯০ টাকা হয়েছে, এবং ছাপার দামও এই এক বছরে চার গুণ বেড়েছে। এর ফলে ভারতের সমস্ত ভাষার সবরকম পত্র-পত্রিকারই দাম বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করেও গত ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে প্রায় চার বছর ধরে অমৃতের দাম আমরা ৫০ পয়সাই রেখে এসেছি। কিন্তু এখন দুর্মূল্যতা এমন স্তরে পৌঁছেছে যে নিতান্ত নিরুপায় হয়েই অমৃতের দাম আমরা পরবর্তী ২০ সংখ্যা (২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪) থেকে ৬৫ পয়সা করতে বাধ্য হলাম। অবিশ্যি এ দামও যে অনুরূপ অন্যান্য পত্রিকার বর্তমান দামের চেয়ে অনেক কম তা বলাই বাহুল্য। অমৃতের সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ আশাকরি আমাদের নিরুপায়তা এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত দিক বিবেচনা করে আগের মতোই আমাদের প্রতি আনুকূল্য দেখাবেন। আমরাও অমৃতকে বিষয়বৈচিত্র্য ও সাহিত্যসম্ভারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলতে যত্নবান থাকব।

সার্কুলেশন ম্যানেজার,
অমৃত।

পটভূমি

মজুত উদ্ধার প্রকল্পনা

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-সংকট অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, চালের জন্য গ্রাম-বাংলায় এই হাহাকার, কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা আকস্মিক কোনও ঘটনার পরিণতি নয়। সরকারের বন্ধ্যা ও ব্যর্থ খাদ্যনীতি আজ সরকারকে এই বিপাকে ফেলেছে, মানুষকে এই সীমাহীন দুর্ভোগের মধ্যে ফেলেছে। সরকারের ঢিমে-তেতলা, গয়ং গচ্ছ খাদ্য-নীতির প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে রাজ্যের সাধারণ মানুষকে, তিন টাকা-চার টাকা কিলো দরে চাল কিনে। খাদ্য নিয়ে যাঁরা ব্যবসা করেন, সেই চাল-কলের মালিক, আড়তদার, কালোবাজারী ও গ্রামের ধনী কৃষক, জোতদারেরা চালের ব্যবসায় এ-বছর ফুলে-ফেঁপে উঠতে পেরেছেন। সরকার হাতে সুযোগও পেয়েছিলেন, সময়ও পেয়েছিলেন, কিন্তু তখন সরকারের কথা ছিল, ধানের ফলন ভালো হয়েছে, অতএব খাদ্যের কোনও চিন্তা নেই। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে খাদ্য-নীতিও একটা হয়েছিল, সংগ্রহের একটা লক্ষ্যমাত্রাও স্থির হয়েছিল। পাঁচ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য সংগ্রহের জন্য সরকার ময়দানেও নেমেছিলেন কিন্তু বছরের অর্ধেক চলে গেল চাল-কল মালিকদের সঙ্গে দর কষাকষিতে, খাদ্য কর্পোরেশন ও রাজ্য খাদ্য দপ্তরের লড়াইয়ে। বছর শেষে দেখা গেল, সংগ্রহ হয়েছে পাঁচ লক্ষ মেট্রিক টনের জায়গায় মাত্র এক লক্ষ ষাট হাজার মেট্রিক টন। এই সংগ্রহ যখন ব্যর্থ হলো, তখনও কিন্তু সরকারের হুঁশ হলো না, হুঁশ হলো না—লুকানো ধান-চাল খুঁজে বের করবার জন্য।

রাজ্য সরকার ভাবছেন, কোনওক্রমে যদি এক লক্ষ টন চাল মজুত উদ্ধারের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যায়, তাহলে এই সংকট কাটিয়ে ওঠা যাবে। দশ মাসের চেষ্টায় যাঁরা এক লক্ষ ষাট হাজার মেট্রিক টন খাদ্য সংগ্রহ করেছেন, তাঁরা পনেরো দিন-এক মাসে এক লক্ষ টন খাদ্য চোরাকারবারী মজুতদারদের অন্ধ গহ্বর থেকে বের করে আনবেন, সেটা বর্তমান প্রশাসন ও পুলিশী ব্যবস্থা দ্বারা সম্ভব কিনা, ভেবে দেখা দরকার। সরকার যেসব তথ্য পেয়েছেন, তাতে মনে করেন, এখনও বিপণনযোগ্য দশ লক্ষ মেট্রিক টন চাল লুকানো আছে। এই চাল বাজারে আসছে ও আসবে, উচ্চ মূল্যে বিক্রির উদ্দেশ্যে। প্রথমেই প্রশ্ন করতে হয়, সরকার যদি দশ লক্ষ টন বিপণনযোগ্য চাল সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হন, তবে সবার আগে ধরা উচিত তাঁদের, যাঁদের কারণে এই চালের সবটা না হোক কিছুটাও সরকারের হাতে আসেনি। আর যদি সরকার বিশ্বাস করেন যে, দশ লক্ষ টন বিপণনযোগ্য চাল লুকানো আছে তবে মজুত উদ্ধারের লক্ষ্য মাত্র এক লক্ষ টন কেন?—বাকি নয় লক্ষ টন চাল কাদের জন্য রাখা হবে?

মজুত উদ্ধার নিয়ে সরকার বেশ কিছু চিন্তা-ভাবনা করছেন। ইতিমধ্যে জরুরী কিছু কর্মসূচীও ঘোষণা করা হয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেস দপ্তরে সরকারী দল কংগ্রেসের দু'দফায় সভা হয়ে গেছে। সেই সভাতে আগামী খাদ্যনীতি ও মজুত উদ্ধারের জরুরী কর্মসূচী নিয়েও আলোচনা হয়েছে। মজুত উদ্ধার কথাটা কিছু নতুন নয়। গত বছর যখন খাদ্যনীতি রচনা করা হয়, তখন দু'একজন মন্ত্রী মজুত উদ্ধার খাদ্যনীতির আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে রাখবার কথা বলেছিলেন। সেদিন অবশ্য সেকথা অনেকের কানে ভালো লাগেনি। এই সেদিনও প্রদেশ কংগ্রেস দপ্তরে শ্রীসুব্রত মুখার্জি, প্রদীপ ভট্টাচার্য, ডঃ জয়নাল আবেদিন এবং স্বয়ং খাদ্যমন্ত্রী গোপালদাস নাগ মজুত উদ্ধার সম্পর্কে যে মনোভাব ব্যক্ত করলেন, দেখা গেল—জনাব আব্দুস সাত্তার, শ্রীশান্তিমোহন রায় প্রমুখ এখনও বিপদের চিন্তায় রয়েছেন। মজুত উদ্ধার নিয়ে সরকারের মধ্যে এই ভিন্ন মত আজ থেকে নয়, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের আমল থেকে আসছে। ফল হয়েছে এই, কোনও সরকারই মজুত উদ্ধারের মতো কঠিন তিক্ত ও ভয়াবহ-পরিণামী কাজে এক মন হয়ে নামতে পারেননি। অথচ এই মজুত উদ্ধার কর্মসূচীর রূপায়ণ করতে যেমন চাই সাহস, যেমন চাই উদারতা, তেমনি চাই ঝুঁকি নেবার মতো দৃঢ়তা। সাহস চাই,—কারণ—পুলিশকে এই কাজে লাগাতে হবে কঠোরভাবে। পুলিশের সঙ্গে কালোবাজারী, জোতদার ও মুনাফাখোরদের হৃদয়ের বন্ধন সরকারের সঙ্গে বাধ্যবাধকতার বন্ধন থেকে আরও বেশী দৃঢ়। শুনতে খারাপ লাগবে, কিন্তু একথা সত্য, গত দশ মাসে এই খাদ্য নিয়ে পুলিশের অফিসারেরা অনেকে যেভাবে স্ফীত হয়েছেন, তেমন সুযোগ বহুকাল তাঁরা পাননি। শোনা যায় বেশ কয়েকজন অফিসার 'আর দরকার নেই' বলে চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে গেছেন। যা হোক, এখন মজুত উদ্ধার করতে হলে অনেক বেশী গভীরে প্রবেশ করতে হবে। কারণ ধান-চাল আর সাধারণ চোখে পড়ার মতো বা খুঁজে বের করবার মতো জায়গায় নেই। সেই গভীর থেকে ধান-চাল খুঁজে বের করতে হলে পুলিশকে কাজে লাগাতে হবে, যেমন মজুত উদ্ধারের জন্য, তেমনি শান্তি শৃংখলা রক্ষার জন্য। কারণ আজ মজুত উদ্ধার করতে গেলে গ্রামের চাষীরাও বহুক্ষেত্রে লাঠি ধরবে এবং জোতদাররা, যারা এই সব চাষীদেরই ঘরে ধান-চাল লুকিয়ে রেখেছে তাদেরই কাজে লাগাবে। সাহসের সঙ্গে উদারতা চাই, কারণ, এই কাজে শুধুমাত্র সরকারী দল নয়, বিরোধী দলকেও যুক্ত করতে হবে। মূলতঃ যে-তিনটি জেলায় এখন ধান-চাল মজুত আছে, যথা—বর্ধমান মেদিনীপুর ও হুগলী, সেখানে কংগ্রেস দল একক চেষ্টায় মজুত উদ্ধার করতে পারবে কিনা বলা শক্ত, তাই মজুত উদ্ধার কমিটিতে অন্য দল ও গণ-সংগঠনকে রাখতে হবে, যারা কাজ করবে, পুলিশের মাথায় বসে। অর্থাৎ মজুত উদ্ধার কমিটির মানে পুলিশের জন্য খবর সংগ্রহের কমিটি নয়। কমিটি খবর সংগ্রহ করবে এবং নির্দেশ দিয়ে পুলিশকে কাজ করাবে। পুলিশকে যদি মজুত উদ্ধার কমিটির ওপরে রাখা হয়, তাহলে দেখা যাবে, মজুত উদ্ধারের বদলে বহু স্থানে লড়াই বেধে গেছে, বিচিত্র রূপে—যা দেখে সরকারকে বলতে বাধ্য হতে হবে 'ভিক্ষা চাই না, কুকুর ঠেকাও'। একই সঙ্গে নিতে হবে ঝুঁকি, কারণ গ্রামের জোতদার-মহাজনদের চটিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের কি হাল হয়েছিল, সেকথা কারও অজানা নয়। তাই ঝুঁকি আজ নিতে হবে বিষাক্ত সাপের লেজে পা দিয়ে নয়, অথবা তাকে আধমরা করে নয়, ঝুঁকি নিতে হবে সাপের বিষদাঁত ভাঙার।

—জন আব্দুল হরি রামা

উপন্যাস

মনোজ বসু

সেই সব মানুষ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কত কাল গেছে তারপর।

দু বছর আগে এমনি ধারা বৈশাখ মাসের দিনে বাড়িতে বৃহৎ উৎসব। ভবনাথের মেয়ে নিমি আর দেবনাথের দ্বিতীয় মেয়ে চঞ্চলার একই রাত্রে বিয়ে। ঢোল কাঁসি সানাই নিয়ে দেশি বাজনা, জয়ঢাক ব্যান্ড কনেট নিয়ে বিলাতি বাজনা। গ্রাম তোলপাড়। দুড়ুম দুড়ুম গেটে বন্দুক ফুটছে ঘটবাজি সরাবাজি চরকি হাউই দীপকবাজি হরেকরকমের। ভোজের পর ভোজ চলছে, যেন তার মুড়োদাঁড়া নেই। আনন্দ-সমারোহের মধ্যে কারো মনে পড়ল না এক-ফোঁটা বিমির কথা, বেঁচে থাকলে আগেই তার বিয়ে হয়ে যেত! পালকি করে কোলে কাঁধে একটি-দুটিকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে বোনেদের বিয়েয় চলে আসত সে। সবাই বিমিকে ভুলে গেছে, তরঙ্গিণী সেদিনও খুব গোপনে চোখের জল মুছছিলেন—কেউ টের পায় নি। আজকে হঠাৎ ধরা পড়ে গেলেন।

চারা পোঁতা সারা হতে প্রায় সন্ধ্যা। নতুন-পুকুরে তালের গুঁড়ির ঘাটে নেমে দেবনাথ ডুব দিয়ে দিয়ে অবগাহন-স্নান করলেন গায়ের কাদামাটি ধুলেন। দেহ কিন্তু ঠান্ডা হয় না। পুকুরের ধারে কাছে গাছপালা নেই। শুধু কয়েকটা নারকেল-চারা পোঁতা হয়েছে আজ ক'দিন। সারাদিনের খাঁ-খাঁ ...রোদে জল একেবারে আগুন হয়ে আছে। গুমট-গরম, লেশমাত্র হাওয়া নেই, গাছের পাতাটি কাঁপে না।

পাঁচিলের দরজার ডান দিকে তুলসীমঞ্চ। শ্বেততুলসী কৃষ্ণতুলসী দুই রকমের দুটো গাছ, ক্ষুদে ক্ষুদে চারাও আছে। মাটি দিয়ে গোড়া বাঁধানো, লেপাপোঁছা ঝকঝক তকতক করছে। পালেপার্বনে আলপনা দেয়। মাথার উপরে ঝারিদুটো নিচু খুঁটি পুঁতে আড় বেঁধে ছিদ্রকুম্ভ ঝুলিয়ে দিয়েছে, কুম্ভের ভিতরে জল। টপটপ করে অহর্নিশ ফোঁটায় ফোঁটায় তুলসির মাথায় জল পড়ছে: জল এক ফুরিয়ে যায়, কুম্ভ পরিপূর্ণ করে দেয় আবার। সারা বৈশাখ ধরে তুলসি-সেবা চলবে, তাপের ছোঁয়া এতটুকু না লাগে। আদর পেয়ে পেয়ে গাছের বাড়-বৃদ্ধি বিষম, বড় বড় পাতা—পাতায় ডালে ছত্রাকার হয়েছে।

নিমি তুলসীতলায় পিদ্দিম এনে রাখল, ধুপধুনো দিচ্ছে। দেবনাথ ঢুকে পড়ে পিছনটিতে দাঁড়িয়ে পড়লেন। নিঃশব্দে দেখছেন। আঁচলটা গলায় বেড় দিয়ে মাটিতে মাথা রেখে নিমি বিড়বিড় করে কী সব বলছে। মাথা তুলে দেখল, দেবনাথ।

সকৌতুকে দেবনাথ জিজ্ঞাসা করেন: কী মন্তোর পড়ছিলি রে?

শুনবে কাকাবাবু? শোন—
হাসতে হাসতে বলে যাচ্ছে:

তুলসি তুলসি নারায়ণ
তুমি তুলসি বৃন্দাবন
তোমার তলায় দিয়ে বাতি
হয় যেন মোর স্বর্গে গতি।

পিদ্দিম দিয়ে সব মেয়েই এই বলে থাকে, নিমিও বলেছে। দেবনাথের বুকের মধ্যে তবু মোচড় দিয়ে উঠল। একফোঁটা মেয়ের স্বর্গচিন্তা—সংসার বিষিয়ে উঠেছে। আগের দিন হলে কাকা-ভাইঝিতে হাসি-তামাসা হয়তো চলত—আজকে দেবনাথ আর দাঁড়াতে পারলেন না, মুখ ফিরিয়ে ঘরে চলে গেলেন।

দু বছর আগে এমনি বৈশাখ মাসের দিনে আশাসুখে বাড়ির দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন—দেবনাথের নিজের মেয়ে চঞ্চলা, আর ভবনাথের মেয়ে নিমি-নির্মলা। একই তারিখে—নিমির গোধূলিলগ্নে হল, আর চঞ্চলার হল দশটা পঁচিশ মিনিট গতে।

চঞ্চলা শ্বশুরবাড়িতে সুখে স্বচ্ছন্দে আছে—এক দোষ, তারা বউ পাঠাতে চায় না মোটে। তরঙ্গিণী বেয়ানকে দোষেন আর নাককান্না কেঁদে বেড়ান। নিমির বেলা উল্টো একেবারেই তারা বউ নেয় না, এবং এঁদেরও পাঠাতে আপত্তি। ভবনাথ বিয়ের আগে পাত্রের বৈষয়িক খোঁজখবর নিখুঁতভাবে নিয়েছিলেন, কিন্তু খোদ পাত্র নিয়ে তত মাথা ঘামান নি। কানে আপনাআপনি কিছু এসেছিল, তিনি উড়িয়ে দিলেন: জ্ঞাতি-শত্রুরা ভাংচি দিচ্ছে, ওসবে কান দিতে গেলে পল্লীগ্রামে কারোই কোনদিন বিয়ে হবে না। বাহিরটান একটু-আধটু যদি থাকেও—বেটাছেলের অমন থেকে থাকে, সে কিছু ধর্তব্য নয়—বিয়ের পরে শুধরে যায়। বাজিবাজনা করে বিস্তর আড়ম্বরে বিয়ে হয়ে গেল—আর দুটো বছর না যেতেই মেয়েটা যেন যোগিনী হয়ে ঘুরে বেড়ায়। ঠাকুর-দেবতার উপর ভক্তি বেড়ে গেছে, দেবস্থান দেখলেই মাথা খোঁড়ে।

দালানকোঠা দেবনাথের পছন্দ নয়, বাড়ি এসে খড়ের ঘরে থাকেন তিনি। পুব-পশ্চিমে লম্বা ঘর—দেয়াল অবশ্য পাকা, কিন্তু চাল খড়ের মেঝে মাটির। দুদিকে দুটো দাওয়া আছে—দক্ষিণের দাওয়া, উত্তরের দাওয়া। দেবনাথ দক্ষিণের দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে নিয়ে বসলেন। নিমি কোন দিকে ছিল—ছুটে এসে ধবধবে তাকিয়া পিঠের দিকে দিল। তালপাতা-পাখা নিয়ে পাশে বসে বাতাস করছে। সামনে উঠান আছে একটা, ধান উঠলে তখন এই উঠানের গরজ—মলা-ডলা সমস্ত এখানে। এখন ঘাসবন হয়ে আছে। বাঁ-হাতে গোয়াল, ডাইনে কাঠকুটো রাখার চালাঘর আর সামনাসামনি এজমালি কানাপুকুর। দামে ও হোগলায় পুকুর প্রায় আচ্ছন্ন, পাড়ের কাছে খানিকটা অংশে জল পাওয়া যায় বাসন মাজাটা চলে সেখানে। গিন্নি-বউদের কায়ক্লেশে আগে স্নানও সারতে হত, বাগের-পুকুর কাটা হয়ে সে দুঃখের অবসান হয়েছে। বাতাস বন্ধ। কানা পুকুর-পাড়ে ডালপালা-মেলানো প্রাচীন টুয়ে আমগাছ, একটি পাতা নড়ছে না গাছের এখন।

খাওয়াদাওয়া সেরে এবং ভবনাথের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্পগাছা করে দেবনাথ আবার দক্ষিণের দাওয়ায় এলেন। মাদুর তাকিয়া পাখা সেইখানেই আছে। ভিন্ন অবশ্য এখনি। হাওয়া দিচ্ছে ডালপালা দুলছে। চাঁদ উঠে গেছে খানিক আগে। বসা নয়, তাকিয়া মাথায় দিয়ে গড়িয়ে পড়লেন তিনি। গ্রাম নিশুতি এ বাড়ির রান্নাঘরের পাট এখনো বোধহয় কিছু বাকি তরঙ্গিণী ঘরে আসেননি। জোনাকি উড়ছে, গোয়ালের ধারে হাসনুহানার ঝাড়ে জমেছেও বিস্তর—জ্বলছে আর নিভছে। টুয়ে গাছের ছোট ছোট আম, কিন্তু মধুর মতন মিষ্টি, ফলেছেও অফুরন্ত। কন্তু হলে হবে কি—বড় নরম বোঁটা, হাওয়ায় ভর সয় না। হাওয়ায় তো পড়ছেই, আবার বাদুড়ের ঝাঁক ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে পড়ছে আমডালের উপর। টুপ-টুপ করে তলায় পড়ছে আম, কানা-পুকুরের জলের মধ্যেও পড়ছে। হাতড়া দিয়ে যেমন করে জলের মাছ ধরে, পদ্মা গাদের মধ্যে নেমে কাল সকালে তেমনিধারা হাতড়া দিয়ে পাকা আম তুলবে। বিশাল [illegible] গাছ কানাপুকুর-পাড়ে—দেবনাথ

[illegible] থাকে থাকে [illegible] আওয়াজ, ফুটফুটে [illegible] উপর কালো কালো ছায়া [illegible] শিয়াল ডেকে গেল বাঁশবনে। [illegible] ভিতর থেকে গরুর জাবর-কাটা [illegible] ল্যাজের ঝাপটার শব্দ—সাঁজাল নিভে [illegible] মশায় কামড়াচ্ছে অবলা [illegible]। কুয়োপাখি ডাকছে কুবকুব [illegible]। মানকচু-বনে শজারু একটা ছুটে গেল [illegible] আওয়াজে মল বাজিয়ে যাওয়ার [illegible]। অতবড় হাসনুহানার ঝোপ ফুলে [illegible] ঢেকে গেছে, বাতাসে গন্ধ এসে চার-দিক আমোদ করে তুলেছে। সন্ধ্যারাত্রে সব [illegible] নিঝুম হয়েছিল—এবারে মানুষজন ঘুমিয়েছে তো অন্যেরা সব আড়ামোড়া খেয়ে জেগে উঠল।

তরংগিণী ঘরে এসেছেন এদিককার দরজায় চৌকাঠে এসে দাঁড়ালেন। ডাকছেন: ঘরে আসবে না?

দেবনাথ তন্গত হয়ে ছিলেন। ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, আর একটু থাকি। এসো না তুমি, ভারি চমৎকার।

তরংগিনী একটুখানি চুপ করে থাকেন। দেখছেন দেবনাথকে। অন্যের স্বামী আর তরংগিণীর স্বামী একরকম নয়—বারোমাস বিদেশে পড়ে থাকেন, দুর্লভ বস্তু। বয়স হয়েছে কে বলবে—লম্বাচওড়া দশাসই পুরুষ, ধবধবে গায়ের রং প্রশস্ত ললাট মাথাভরা টাক। টাকে যেন আরও রূপ খুলেছে। জ্যোৎস্নার আলো কপালে এসে পড়েছে, আধ-শোয়া হয়ে আছেন—যেন এ জগতের নন, জ্যোতির্ময় লোক থেকে নেমে এসেছেন দাওয়ার উপরে।

নিরুত্তরে তরঙ্গিণী ঘরের মধ্যে খাটের ধারে চলে গেলেন। বড় পিলসুজের উপর রেড়ির তেলের প্রদীপ—একটা সলতেয় টিপ-টিপ করে জ্বলছে। কুমোরের গড়া দোতলা মাটির প্রদীপ—উপরে তেল-সলতে, নিচের খোলটা জলে ভর্তি; নিচে জল থাকায় তেল নাকি কম পোড়ে। কমল বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে। মুখের কাছে প্রদীপ ঘুরিয়ে তরংগিণী দেখে নিলেন একবার। পুঁটি বড়গিন্নির কাছে শোয়। কমল হবার সময় তরংগিণী উঠানের আঁতুড়ঘরে গেলেন, পুঁটির খাওয়া-শোওয়া তখন জেঠাইমার কাছে। সেই জিনিসই চলে আসছে, বড়-গিন্নির বড় নেওটা সে।

দেবনাথ বললেন, বোসো। হাত বাড়িয়ে তরংগিণীকে কাছে টেনে নিলেন একেবারে। কিছুক্ষণ চুপচাপ। কোঠাঘরের দিক থেকে তক্ষকের ডাক আসে: কটর-র-র-তক্ক তক্ক। জ্যোৎস্নার ফিনিক ফুটেছে।

তরংগিণী বললেন, কুসুমপুর যদি অমনি ঘুরে আসতে—

ট্রেনে যশোরে নেমে দেবনাথ ঘোড়ার গাড়িতে নাগরগোপ এসেছেন। কুসুমপুর ক্রোশ দুই পথ যশোর থেকে—চণ্ডলার শ্বশুরবাড়ি সেখানে।

আসল কথায় পড়লেন তরংগিণী এই-বার: তুমি বললে বেহান কখনো 'না' করবেন না। মেয়েটা আম-কাঁঠাল খেয়ে তোমার সঙ্গেই আবার ফিরে যেত।

দেবনাথ বললেন, জামাইষষ্ঠীর সময় জোড়ে এসে দিন চারেক থেকে যাবে. কথা তুলতে গেলে বেহান ধরে পেটাতেন আমায়। বলি, আম-কাঁঠালের অভাব নাকি তাদের বাড়ি? গাঙের ধারে পাঁচ বিঘের উপর ফলস বাগান—ঢুকে পড়লে পথ খুঁজে বেরুনো যায় না।

বললেন, মেয়ের বিয়ে দিয়েছ—আদার মজে আছে এর চেয়ে আনন্দের কথা নেই। বেয়ানের একটা ছেলে—নিতি নিতি তিনি কেন পাঠাবেন বলো। বলেন, একফোঁটা মেয়ে আপনার—কিন্তু একতলা দোতলার এতগুলো ঘর একলাই সে ভরে থাকে। চার-চারটি মেয়ে—তাদের যখন বিয়ে হয়নি, তখনও এমন ছিল না। বউমা না থাকলে বাড়ির মধ্যে তিষ্ঠানো দায়।

তরংগিণী খপ করে বলে উঠলেন আমার কমলের বিয়ে খুব সকাল সকাল দেব।

সেই ভাল। ভাল বুদ্ধি ঠাউরেছ এবার। ওদের বউ না পাঠাল তো ছেলে বিয়ে দিয়ে নিজস্ব বউ এনে দিই।

স্ত্রীর দিকে চেয়ে দেবনাথ হেসে ফেল-লেন: সেই ভাল। ভাল মেয়ে কাদের আছে এখুনি খুঁজতে লেগে যাই। দু-বছরের বর তারই জনায় মাত্তো এক বছরের কনে। হিরু পুঁটি সকলের আগে কমলের বিয়ে। মাইনের চেয়ে উপরি-রোজগারের কদর বেশি, জমিদারি এস্টেটের মানুষ আমরা সেটা ভাল মতন জানি। পরের মেয়ে নাড়তে চাড়তে পেলে নিজের মেয়ে তখন আর মনেও পড়বে না। ঠিক বুদ্ধি ঠাউরেছ ছোটবউ।

খুব ভোরবেলা তখনও অন্ধকার কাটেনি। পাতলা ঘুমের মধ্যে গ্রামবাসী নিত্যদিন গান শুনে থাকে এখন। বৈশাখ মাস ভোর চলবে। করতালের আওয়াজ পেয়ে পুঁটি বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে চোখ মুছতে মুছতে হুড়কোর ধারে গিয়ে দাঁড়াল। আসতেই তো বাড়িতে উঠানে দাঁড়িয়ে দু-এক পদ গেয়ে চলে যাবে—এ মেয়ের তর সয় না। বৈরাগী গাইতে গাইতে আসছেন। ঠাকুর-দেবতাদের গান—হরিকথা, [illegible] কানে নিয়ে দিনের কাজকর্মের আরম্ভ। বৈশাখে হচ্ছে এর পর আবার কার্তিক মাসে—পয়লা তারিখ থেকে সে-ও পুরো মাস। বছরের বারো মাসের মধ্যে দুটো মাস এই প্রভাতী গান। বকুলফুল সারা রাত্রে পথে ঝরেছে, তারই উপর দিয়ে গুটিগুটি আসছেন। কী মধুর গলাখানি, প্রাণ কেড়ে নেয়। আহ্লাদ বৈরাগী, দু-ক্রোশ দূরে হরিহর নদের ধারে মধ্যকুল গ্রামে বাড়ি: সোনাখড়িতে এসে ওঠেন তখনো বেশ রাত্রি—আকাশে তারা ঝিকঝিক করে। আর গ্রাম-পরিক্রমা যখন শেষ হয়, রোদ উঠে যায় দস্তুরমতো। আহ্লাদের বয়স বেশি নয়—কাঁচ কাঁচ মুখ, কিন্তু সমস্ত চুল পেকে গেছে, ভ্রূ অবধি পাকা। অন্ধ—চোখ বুজে পথ চলেন কদাচিত যখন চোখ মেলেন শূন্যদৃষ্টি। এক বৃদ্ধা আগে আগে যাচ্ছেন—আহ্লাদ বৈরাগীর মা। করতাল মা-ই বাজাচ্ছেন, পিছনে বৈরাগী ঠাকুর মায়ের দু-কাঁধে দু-হাত রেখে গাইতে গাইতে চলেছেন। মা আর অন্ধ ছেলে। লহমার তরে গান থামাবেন না বৈরাগী, চলনও থামবে না। দেখেশুনে ভাল পথ ধরে মা নিয়ে চলেছেন—তবু তার মধ্যে গোলমেলে কোন ঠাঁই পড়লে সংকেত করে দিচ্ছেন: ডাইনে বাঁয়ে সামনে......। করতাল বন্ধ করে ছেলের হাত ধরেছেন কখনো-বা। এত সবের মধ্যে গানের কিন্তু তিলেক বিরতি নেই। গ্রামের সব বাড়ি শেষ করে ফকির-রাস্তায় যখন পড়বেন তখনই থামবে।

উমাসুন্দরী সাতসকালে উঠেই আজ ল্যাম্পো নিয়ে গোয়ালে ঢুকে গেছেন। মুংলি গাইটা বড় [illegible] দাপাদাপি করছে শেষরাত থেকে। [illegible] জাল নিভে গেছে, ডাঁশপোকায় কামড় দিচ্ছে বোধ-হয় খুব। কিম্বা কেঁদা ঢুকে গেল কিনা গোয়ালে কে [illegible], কদিন আগে খুব ফেউ ডাকছিল। গিয়ে দেখছেন, ওসব কিছু নয়—পালান ভারী, বাঁট দুধে টনটন করছে। নুলে-বাছুর খোঁয়াড়ে আটকানো, সেইদিকে তাকাচ্ছে ঘন ঘন। বড়গিন্নিকে দেখে হাম্বা ডেকে উঠল। গরু হোক যাই হোক, মা তো বটে। বাঁট ভরা দুধ, বাচ্চাকে খাওয়াতে পারছে না। হাম্বা দিয়ে তাই যেন সকাতর প্রার্থনা জানাল।

উমাসুন্দরী বললেন, উতলা হোসনে মা, একটুকু সবুর কর। রমণীকে ডেকে পাঠাচ্ছি—সকাল সকাল দুয়ে বাছুর ছেড়ে দেবো।

গান তখন উঠানে এসে পড়েছে। উমা-সুন্দরী বলেন, ছোটবাবু বাড়ি এসেছেন। তোমাদের মা-বেটার কাপড় এসেছে, ফেরার সময় নিয়ে যেও।

বৈরাগী তো গান বন্ধ করবেন না, মা বগলা করতাল থামিয়ে বললেন, এখন কেন ঠাকরুন, মাস অন্তে যেদিন বিদায় নিতে আসব, যা দয়া হয় তখন দিয়ে দেবেন।

বৈশাখ গিয়ে জ্যৈষ্ঠমাস পড়বে, প্রভাতী গাওনা তখন বন্ধ। মা আর ছেলে বিদায়

নিজে বাড়ি বাড়ি দেখা দেবেন। পাওনাথোওনা খারাপ নয়—বিছানায় শুয়ে শুয়ে পরোমাস পুণ্যার্জন হয়েছে, গৃহস্থরা যথাসাধ্য চালে ডালে সিধা সাজিয়ে দেয়, নগদ টাকা দেয়। এ বাবদে কেউ বিশেষ কৃপণতা করে না।

ভাক বোষ্টম সুবেলাঞ্চই আরও সব আছে, সোনাখড়িতে প্রভাতী গাওয়ার দরবার করেছিল তারা। চিরদিন এক মুখে কেন নাম শুনবেন—আমরাও তো প্রত্যাশী। কিন্তু কর্তাগিন্নী কাউকে আমল দেন নি : বেশ তো চলছে। ঠাকুরদের নাম কানে যাওয়া নিয়ে কথা—আহ্লাদ বৈরাগিই বা মন্দ হল কিসে? বাবাজিরা অন্যত্র দেখুনগে, অন্যের অন্নজলে নজর দিতে আসবেন না। বগলা বোষ্টমী আর ছেলে আহ্লাদ যদ্দিন সমর্থ আছেন, আমাদের গাঁয়ে কেউ ঢুকতে পাবে না।

সবাই জানে সে দুঃসহ কাহিনী—বগলা বোষ্টমী সকলকে বলেন, আর কপাল চাপড়ান : মা হয়ে আমি ছেলের সর্বনাশ করেছি—মা নই, রাক্ষুসী আমি।

আহ্লাদ বড় মাতৃভক্ত। সে কেঁদে পড়ে : অমন করে বলবিনে তুই মা। আমার অদেষ্ট। তুই তো ভালর তরে ব্যবস্থা করলি জানবি কেমন করে, আমার অদেষ্টে অমৃত আগুন হয়ে উঠবে।

মাথার অসুখ আহ্লাদের। ভীষণ যন্ত্রণা—ছিঁড়ে পড়ে যেন মাথা। কপাল টিপে ধরে আবোল-তাবোল বকে। ভয় হয়, পাগল না হয়ে যায়। সেই সময় এক তান্ত্রিক ঠাকুর এলেন হরিহরের তীর্থবর্তী কালীতলায়। ঠাকুরের পায়ের উপর বগলা বোষ্টমী আছড়ে পড়লেন : বাঁচাও আমার ছেলেকে, আর আমাকেও। নয়তো মায়ে বেটায় বিষ খেয়ে পাদতলে এসে মরে থাকব। মৃতকুমারী এবং আরও কয়েকটা গাছগাছড়ার রসে চিকিৎসা হল কদিন—উপশম হয় না তো শেষটা এক মোক্ষম চিকিৎসা। মাথায় পরেনো ঘি মাখিয়ে আগুনের মালসা দিল তার উপর চাপিয়ে। কী আর্তনাদ রোগীর—ধাক্কা মেরে মাথার মালসা ফেলে দিল। ছটফট করছে কাটা-কুকুরের মতো। খানিকটা ভাং গিলিয়ে চুপ করে থাকতে বলে তান্ত্রিক কালীতলা ফিরলেন।

ঘুম এসে গেল আহ্লাদের গভীর ঘুম। অনেকক্ষণ পরে ঘুম ভাঙল, কিন্তু চোখ মেলে কিছুই যে দেখছেন না—

ও মা, মাগো, চৌদিকে অন্ধকার আমার—

কত রকম চিকিৎসা হল তারপর। মা বুড়ি ভিক্ষেসিক্ষে করে কলকাতার ডাক্তারকেও একবার দেখিয়ে এনেছেন। দৃষ্টি ফিরল না। হলধর কৈয়াগির মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ হচ্ছিল। ভাল অবস্থা হলধরের—নিজের হাল গরুতে বিশ বিঘে জমির চাষ। কিন্তু চক্ষুহীন পাত্রের হাতে কে মেয়ে দেবে। ...

আহ্লাদ বলে এই বেশ ভাল মা। বিষয়-ভোগে ঠাকুরকে ভুলে থাকতাম। মায়ে-পোয়ে কেমন এখন নাম গেয়ে গেয়ে বেড়াচ্ছি।

দেবনাথের সঙ্গে দেখা করতে আসেন সব। বাংলা লেখাপড়াটা ভালই জানেন তিনি, ইংরাজিও জানেন না এমন নয়—অতএব শিক্ষিত ব্যক্তি। এবং চাকরি করে বাইরে থেকে টাকা-পয়সা আনছেন, পুরবাড়ির অবস্থা দেখতে দেখতে ফিরিয়ে ফেলেছেন—সে হিসাবে কৃতীপুরুষও বটেন। যতদিন বাড়ি আছেন, মানুষের আনাগোনা চলতে থাকবে। শুধু সোনাখড়ি বলে কি, বাইরের এ-গ্রাম ও-গ্রাম থেকেও আসবেন।

উত্তরের বাড়ির যজ্ঞেশ্বর এলেন মস্ত একখানা মেটে আলু কলার ছোটায় বেঁধে হাতে ঝোলানো। খন্তা খুঁড়ে খোঁড়া সকাল ধরে মেটে আলু খুঁড়েছেন গায়ে ও কাপড়ে চোপড়ে ধুলোমাটি। বললেন, আলতাপাত আলু—খেয়ে দেখো কী জিনিস। তুলে আনার বড় ঝঞ্ঝাট—গাছ মরে গেছে, মাটির নিচে কোথায় আছে হদিশ হয় না। আন্দাজে এইটুকু জায়গায়, তল্লাট জুড়ে খুঁড়ে মরতে হয়েছে।

দেবনাথ বললেন, ঝঞ্ঝাটের দরকার কি ছিল যজ্ঞেদা?

খাবে তুমি আবার কি। শহুরে ... সোনাস্বর্ণ খেয়ে থাক জানি ... এসব জিনিস পাও না।

দেবনাথ হেসে ঘাড় নাড়লেন : সো কোন দুঃখে খাবো যজ্ঞেদা। ভাল-ভাল খাই। খুঁজলে আপনার মেটে আলুও মিলে যাবে। হেন জিনিস নেই যা কলকাতায় মেলে না।

শশধর দত্তকে দেখা গেল, লাঠি ঠুক ঠুক করে আসছেন। খুনখুনে বুড়ো হলেও পলকে কান খাড়া হল। কলকাতার কথা হচ্ছে—কলকাতা সম্বন্ধে দত্তমশায় যা বলবেন, তাই শেষ কথা, যেহেতু স্ত্রী বাপের বাড়ি ছিল কলকাতায়। এখ ছেলে কালিদাস দত্ত এখনো কলকাতা মেসে থেকে মার্চেন্ট অফিসে চাকরি করে খোলা গলায় দত্তমশায় বলে উঠলেন, উঁহু, ঠিক বললে না বাবাজি। বলি, ডয়াকলা পাও তোমরা কলকাতায়?

চেষ্টা করলে মেলে বই কি।

হা-হা-হা, ডয়াকলার মতন জিনিস তার চেষ্টা করতে হয়। বোঝ তবে যজ্ঞেশ্বর—

এক চোট হেসে নিয়ে যজ্ঞেশ্বরকে শালিস মানেন : কেমন কলকাতা বুঝে দেখ। ডয়াকলা কেউ খায় না—বীচেকলা নাম দিয়ে ঠেলে রেখেছে। বীচিকে ভয়

... আরও একটা ... দিলেন—কী কেন—কী ... ছি ছি ছি.....

... : খাই খায় তোমাদের ...

... জিনিসের আকাল ... ছাড়ছেন না। বলেন, ... যাবে। কালিদাসের সঙ্গে ... দুই বন্ধু এসেছিল সেবার। ... হয়েছে। কাঁঠালগাছে চই উঠেছে, ... টুকরো কেটে এনে মাংসে ছড়া ... অবাক : এ-ও খায় নাকি? ... মা এক কুচি করে তাদের পাতে ... খেয়ে তো শিসিয়ে মরে।

চলল ঐ কলকাতা নিয়ে। তার মধ্যে ... করে যজ্ঞেশ্বর বললেন, তারপরে—হচ্ছে ...বে।

দেবনাথ হেসে বললেন, হলেই হল। ...দা রয়েছেন যখন, না হয়ে উপায় আছে?

কোন বস্তু, বুঝিয়ে বলতে হয় না। ...দেবনাথ বাড়ি এলে গ্রামশুদ্ধ মানুষের এক পাত্ত পড়বেই। ব্যবস্থা ভবনাথের। চাকরে ...ভাইয়ের বাড়ি আসা সকলকে ভাল করে ...জানান দিতে হবে বৈকি। নয়তো রামা-শ্যামা ...যাদো-মোধোর আসার মতোই হয়ে যায় যে। ...গোলার মধ্যে ধানের উপর কয়েক কলসি ...উৎকৃষ্ট দানাগুড় রেখে দিয়েছেন, পায়েসে ...লাগবে। গোয়ালের পিছনে বড় মানকচু রাখা ...আছে, মাছের তরকারিতে দেওয়া হবে। ...ক্ষেতের সোনা মুগ কলাই ভেজে ডাল করা ...হচ্ছে, নতুন পুকুরে রুই-কাতলা আছে। ...ভবনাথের সবই গোছানো, দেবনাথ এখন ...কিছু নগদ ছাড়লেই হল।

যজ্ঞেশ্বর নলডাঙা জমিদারি এস্টেটের ...তহশিলদার। বললেন, জষ্ঠির গোড়ায় ...কাছারির পুণ্যাহ। কটা জরুরি মামলার ...কারণে ছোটবাবু সদর ছাড়তে পারেন নি—...পুণ্যাহে তাই দেরি পড়ে গেল। তোমাদের ...কাজটা এই মাসের মধ্যে সেরে ফেল ভায়া, ...যন ফাঁকিতে পড়ে না যাই।

ভবনাথকে দেখতে পেয়ে দেবনাথ বলে, ...তাড়াতাড়ি সেরে দেবার জন্য যজ্ঞে-দা ...বলছেন। জষ্ঠি পড়লে উনি কাছারি চলে ...যাবেন।

হোক তাই...। ভবনাথ বললেন। জোর ...দিয়ে আবার বলেন, হয়ে গেলেই ভাল--...ঝুইয়ে রেখে লাভ কি। হাটের কিছু কেনা-...কাটা আছে। বুধবারে গঞ্জের হাট করব, ...পরের দিন খাওয়া দাওয়া। বিষ্যুদের রাত্রি-...বেলা।

দেবনাথ শুধালেন : আমার মিতে ...কোথায় এখন, কোন মেয়ের বাড়ি? তাকে ...একটা খবর দেওয়া যায় না?

...বাঁকাবড়শি গাঁয়ের দেবেন্দ্র চক্রবর্তীর ...কথা বলছেন। শৈশবে দেবনাথ কাজেম-গুরুর ...পাঠশালায় পড়তেন, পাততাড়ি বগলে ঐ ...ছেলেটিও মাঠঘাট ভেঙে আসত, ভাবসাব ...তখন থেকেই। নামের খানিকটা মিলের দরুন ... মিতে বলে ডাকেন।

দেবনাথ বলেন, বাড়ি এসেছি খবর পেলে মিতে যেখানে থাকুক, ছুটে এসে পড়বে।

ভবনাথ বলেন, মির্জানগরে ছোট মেয়ের বাড়ি ছিল তো জানি। ফটিককে পাঠাব কাল।

যজ্ঞেশ্বর ঘাড় নেড়ে বলে উঠলেন, মোশেখ মাস যখন, বিষ্টুপুরে বড় মেয়ের বাড়িতেই আছেন। বছরের আরম্ভে উনি বড় থেকেই শুরু করেছেন।

কিছু অবাক হয়ে দেবনাথ প্রশ্ন করে : দৈবজ্ঞের কাজকর্ম একেবারে ছেড়েছে?

যজ্ঞেশ্বর হেসে বলেন : এই তো কাজ এখন,—মেয়েগুলোকে পালা করে পিতৃ-সেবার পুণ্যদান।

শতকণ্ঠে তারিপ করে চলেছেন : পাঁচ-পাঁচটা মেয়ে বহাল তবিয়তে শ্বশুরঘর করছে—দেবেন চক্কোত্তির মতন কপাল কার? অশন-বসন হুঁকো-তামাক বাবদে কানাকড়ির খরচা নেই। এক এক মেয়ের বাড়ি দু মাস হিসেবে ভাগ করে নিয়েছেন। দু মাস পুরলো তো দুর্গা-দুর্গা বলে রওনা—পায়ে চটি, গলায় চাদর, বগলে পাঁজি হাতে ক্যাম্বিসের ব্যাগ। ব্যাগের মধ্যে কাপড়টা-আসটা—তাছাড়া ছক-গুঁটি-পাশা আর জল শূন্য খোলো হুঁকো তামাক-টিকে বাতি-দেশলাই। এই মানুষ কোন দুঃখে খড়ি পেতে এখন আর বিচার-আচার করতে যাবে?

দেবনাথ বলেন, আগের কষ্টটাও ভাবো যজ্ঞে-দা। এতগুলো মেয়ে সুপাত্রে দিয়েছে, তবেই না সুখভোগ এখন।

যজ্ঞেশ্বর বলেন, সুখ বলে সুখ। মেয়েয় মেয়েয় আবার পাল্লাপাল্লি। বড় মেয়ের বাড়ি দা-কাটা তামাক শুনে মেজ মেয়ে সদরে লোক পাঠিয়ে বাপের জন্য অম্বুরি তামাক আনাল। সেই মেজ মেয়ে রাত্রে রুটি দেয় শুনে সেজ মেয়ে লুচির বন্দো-বস্ত করল। ন-মেয়ে তার উপরে টেক্কা দিল—নিত্যি রাত্রে ঘি-ভাত। ছোট মেয়ে ভিন্ন দিক দিয়ে গেল। ছোট জামাই খেলে ভাল, দেওরটাও মোটামুটি চালিয়ে যেতে পারে। চতুর্থ খেড়ি কোথায় আর খুঁজে বেড়াবে—বউ হওয়া সত্ত্বেও নিজে সে শিখে পড়ে নিয়েছে। এক মেয়ে থেকে অন্য মেয়ের বাড়ি যাবার পথে দেবেন স্বগ্রামে পাথর-ঘাটায় এক হপ্তা দু-হপ্তা থেকে জমাজমির তদারক করে যায়—সেই সময় সকলের কাছে সুখের গল্প করে, আর হেসে হেসে খুন হয়। মড়িপোড়া চোয়াড়ে চেহারা ছিল, এখন নেওয়াপাতি গোছের খাসা একখানা ভুঁড়ি নেমেছে।

রাজিবপুরে পোস্টঅফিস, পিওন যাদব বাড়ুয্যে, রান্নায় তিনি ভারি ওস্তাদ। বললে সোনা হেন মুখ করে ভোজের রান্না রেঁধেবেড়ে দিয়ে যাবেন। কিন্তু বাড়ির মধ্য থেকে ঘোরতর আপত্তি : সামান্য একটু কাজে পিওনঠাকুর অবধি যেতে হবে কেন, বলি হাত-রত্ত আমরা কি পুড়িয়ে খেয়েছি? তাঁকে ডেকো যেদিন পাঁচ গাঁয়ের পুরো সমাজ ধরে টান দেবে। গ্রামের কটা মানুষের পাতে ভাত দেওয়া-কাজটুকু স্বচ্ছন্দে আমরা পারব। ব্রাহ্মণ নিয়ে সমস্যা—তিন বামুন-বাড়ি ঝোল আনা সিধে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে।

তরঙ্গিণীর রোখটা সবচেয়ে বেশি। সঙ্গে জুটেছে বিনো আর অলকা। হবে তাই। লুচি-পোলাওর ব্যাপার নয়, শুধুমাত্র সাদা ভাত।

উমাসুন্দরী বললেন, গ্রামের বিধবা কজনকেও বাদ দেওয়া যাবে না। ভোজের দিন নয়, দুটো দিন বাদ দিয়ে—এঁটোকাঁটা সম্পূর্ণ সাফ-সাফাই হয়ে যাবার পর। ছোট বউ তরঙ্গিণী মিত্তিরদের মেয়ে, অলকা বোসেদের। আর বিনো তো এই বাড়িরই। —ঘোষ বংশের। রান্নার মধ্যে যে তিনজন, সবাই কুলীনের মেয়ে। কাপড়-চোপড় ছেড়ে শুদ্ধাচারে রাঁধাবাড়া করবে। কারো আপত্তি হবার কথা নয়।

না, আপত্তি কিসের? বিনোই গ্রাম চক্কোর দিয়ে সকলের মতামত নিয়ে এলো।

চাঁদারডাঙি গঙ্গাপুত্তুরদের (জেলে কথাটা ভাল নয়, ওরা গঙ্গাপুত্র) সর্দার মাধব পাড়ুইকে খবর দেওয়া হয়েছে। বাঁশে জড়ানো দড়া জাল দস্তুর মতো এক বোঝা —বাঁশের দুই মুড়ো দুই জোয়ানে ঘাড়ে নিয়ে আগে আগে যাচ্ছে, পিছনে অন্যেরা। নতুন পুকুরের পাড়ে গ্রামের মানুষ ভেঙে এসে পড়ল।

আমড়াতলায় গা ছড়িয়ে বসেছে মাধব। জড়ানো জাল খুলে আস্ত খান ইট বাঁধছে জালের যে দিকটায় শোলা তার বিপরীতে। শোলায় জালের উপরদিক ভাসিয়ে রাখে, ইঁটের ভারে তলা অবধি টান [illegible] থাকে। তেল মাখছে জেলেরা আ[illegible]। ভবনাথ হেসে বলেন, পাকি এক [illegible]র তেল সাবাড় করলি যে বেটারা। [illegible] একজন বলল, চার আনা সেরের মাগ্গি তেল কেনে তো এক পয়সার দু-পয়সা—খাবে না মাখবে? বাবুর বাড়ি পেয়েছে, বেদরদে মেখে নিচ্ছে।

তেল মেখে ঝপঝপ করে সব জলে পড়ল। বড় জাল নামছে—পাড়ে আর মানুষ ধরে না। মাছ খাওয়ার চেয়ে ধরার সুখ—ধরা দেখতেও সুখ খুব। কমল অবধি চলে এসেছে। বিনো কোলে করে আনছিল—কিন্তু বড় হয়ে গেছে সে? এত মানুষের মধ্যে কোলে উঠে আসবে ছিঃ। নামিয়ে দিয়ে বিনো হাত ধরেছে, পুকুরের একেবারে কিনারে যেতে দিচ্ছে না। কমল টানাটানি করছে তো বিনো ভয় দেখায় : তবে খোকন বাড়ি নিয়ে যাবো তোমায়, মাঝের কোঠায় পুরে শিকলি তুলে দেবো। আর কমলের কথাটি নেই।

জাল অনেক লম্বা—পুকুরের এ-মুড়ো ও-মুড়ো বেড়ায় ঘেরা হয়ে গেল। আস্তে আস্তে টেনে ওপারে নিয়ে চলল—পুকুর ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। একটা দুটো চারা মাছ জালের বাইরে লাফিয়ে পড়ে, হই-হই করে ওঠে অমনি মানুষ। মাধব বলে, চেঁচামেচি

করলে মাছ একটাও জালে থাকবে না, মিছে আমাদের খেটে মরা। জালের গা ঘেঁসে ডুবের পর ডুব দিচ্ছে সে, জাল কোথাও গুটিয়ে গেলে ছাড়িয়ে দিচ্ছে। জলতলে অদৃশ্য হয়ে থাকছেও অনেক ক্ষণ, ভুড়ভুড়ি কাটছে। ডুব দিয়ে দিয়ে চক্ষু দুটো জবা-ফুলের মত রাঙা।

টেনে টেনে জাল পাড়ের কাছে এনেছে, আবার তখন চিৎকার। দেবনাথের গলাই সকলকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। অথচ তাঁর বাড়িতে কাজ—রাত পোহালে মাছের দরকার তাঁরই। এত বড় দরের মানুষ, তা একেবারে ছেলে-পুলের অধম হয়ে গেছেন। দেবনাথ থামিয়ে দিলেন, তারপরে সবশুদ্ধ চেঁচাচ্ছে, পুকুর-পাড়ে ডাকাত পড়েছে যেন। শ্রম বৃথা যায় না— মাছ লাফাচ্ছে খোলা হাঁড়ির ফুটন্ত খইয়ের মতন। রোদে রুপোর মতন ঝিকমিক করছে। লাফিয়ে বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠে জালের বাইরে পড়ছে বেশির ভাগ।

মাধব ব্যস্ত হয়ে বলে, সব মাছ যে পালিয়ে গেল কর্তা।

দেবনাথ বলেন, লোকে কত আমোদ পাচ্ছে তা-ও দেখ। টানো না আর একবার—

মাধব সতর্ক করে দেয় : চেঁচামেচি না হয়, দেখবেন।

দেবনাথ বলেন, একটু-আধটু হবেই। এত মানুষ এসেছে—তুমি কি চাও, পুকুর-পাড়ে এসে সব ধ্যানে বসে যাবে? টেনে যাও না তোমরা—

হিমচাঁদ বলে উঠল, দুটো-চারটে টান না-হয় বেশি লাগবে। ভারী ভারী সব গতর নিয়ে এসেছ—বলে গতরে কি আলু-কচু আর্জে খাবে? লোকে মজা করে দেখছে, হলই বা একটু কষ্ট তোমাদের।

মাঝারি রুই তিন-চারটি রেখে চারামাছ জলে ছুঁড়ে দিল। বড় হোক—এখন ধরবে না ওদের। যেগুলো ধরেছো, তা-ও ডাঙায় তোলা হবে না, কানকোয় দাঁড় দিয়ে খেঁটার সঙ্গে বেঁধে জলে রেখে দিল। খেলা করুক দাঁড়-বাঁধা অবস্থায়। কাজের দিন কাল সকালবেলা তুলবে, কোটা-বাছা হবে তখন।

আবার জাল টানছে। পাড়ের কাছাকাছি হলেই যথাপূর্ব চিৎকার। মাছ লাফাচ্ছে—কী সুন্দর, কী সুন্দর? টানের পর টান চলল দুপুর অবধি। এরই মধ্যে এক কাণ্ড। হিরু ধরে ফেলল—এত লোকের মধ্যে তারই শুধু নজরে এসেছে। চাটালে আমতলায় জলের মধ্যে শোলা বনু-বন- মাধব পাড়ুই ঐখানটায় বড় বেশি বেশি ডুব দিচ্ছে। কোমর জল সেখানে—হাঁটছে জলের মধ্যে পা চেপে। হিরুতে-ঝন্টুতে কি চোখ টেপা-টেপি হল—ভাঁড় থেকে এক এক খাবলা তেল নিয়ে দুজনেই মাথায় মাখছে।

হারু সরকার বলে, জল ঘুলিয়ে দই-দই হয়ে গেছে—চান করবে তো নতুন বাড়ির পুকুরে যাও।

...ক কান্না কথা শোনে, ঝপাঝপ তারা ...পিয়ে পড়ল। সাঁতরে চলে গেল চ্যাটালে-...র কাছবনে, ঠিক যে জায়গায় মাধব পা ...দাপি করছিল। ডুবের পর ডুব দিচ্ছে। ...বের করল কাতলা মাছ একটা—কাদার ...ধ্যে ঠেসে ঠেসে কবর দিয়ে রেখেছে। ...টার পাছ-হল নির্ঘিধ—মাছ-ধরা শেষ হবার পর পুকুর নির্জন হলে কোন এক ফাঁকে ...মাছ তুলত।

...কাদায়-পোঁতা মাছ তুলে ঝপ্ টপাস ...সাকলের মধ্যে ফেলল। আরে সর্বনাশ, ...ডাকাত—সবাই দুষছে, যাচ্ছেতাই করে ...ছে মাধবকে।

দেবনাথ এগিয়ে এসে বললেন, শুধু-হাতে চললে কেন পাড়ুয়ের পো? মাছটা নিয়ে যাও, খাবে তোমরা।

শাস্তি না দিয়ে বখশিস? সকলে স্তম্ভিত। দেবনাথ বলেন, মাছ মারাই তো মানুষ খাওয়ানোর জন্য। কন্যাদায়-পিতৃদায় —কোন রকম দায়দাঁড়ার কারণে নয়, নিতান্তই শখ করে মানুষের পাতে চাট্টি ভাত দেওয়া। ভোজের-পাতে হচ্ছে না তো পাড়ুয়েরা বাড়ি নিয়ে খাক নতুন পুকুরের মাছটা

ভদ্রজনদের তবু মন সরে না : রাজ-পুত্তুরের মতন কাতলা—উঃ!

দেবনাথ মাধবকে বলছেন আশা-সুখে রেখেছিলে—মুখের জিনিস কাড়লে আমাদের পেটে হজম হবে না। জালে জড়িয়ে নিয়ে যাও—সকলে সমান ভাগ করে নিও।

মাছ ধরা সেরে বাড়ি ফিরতে দুপুর গড়িয়ে গেল। পণ্টি-কমল ছটফট করছে। এরপরে তো স্নান, খাওয়া—এবং তারও পরে শোওয়া। বিকাল হয়ে গেছে দেখে শোওয়াটা

দেবনাথ হয়তো বাতিলই করে দেবেন। তা-হলে সর্বনাশ—মোটা রোজগার মাটি। ক'দিন ভাই-বোনে এরা দুপুরবেলা দেবনাথের মাথার পাকা চুল তুলছে। দর ভালই—পয়সায় চারটে করে ছিল, এবারে বাড়ি এসে ছ'টা হয়ে গেল। দেবনাথই আপত্তি তুলেছিলেন : এক পয়সায় এক গণ্ডা—বড্ড মাগ্‌গিরে। চুল এখন মেলা পেকে গেছে—তোদের কাঁচা চোখে এক গণ্ডা চুল বের করা কিছুই না, হাত ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতে পুরো পয়সা রোজগার করে ফেলবি। এবারের রেট পয়সায় দশটা করে—যাকগে যাক, আটটা। অনেক ঝুলোঝুলির পর ছটায় এসে রফা হয়েছে—ছটা পাকাচুল তুলবে, এক পয়সা মজুরি।

পণ্টি-কমলের আগে দেবনাথের মাথা নিমি-চঞ্চলার দখলে। রেট সাংঘাতিক তখন —একগাছি চুল এক পয়সা। দেবনাথ বুঝিয়ে বলেন, রেট দেখলে তো হবে না— মাথা-ভরা কাঁচা চুল যে তখন। একটি সাদা চুল বের করতে চোখের জল বেরুত, সারা বেলাও লাগত। চঞ্চলাটা বেশি বজ্জাত— একই চুল দু-বার তিনবার দেখাত, দেখিয়ে বেশি পয়সা আদায় করত। বুঝতে পেরে দেবনাথ নিয়ম বেঁধে দিলেন, তোলা মাথার চুলটা দিয়ে দিতে হবে— নিজে রাখতে পারবে না। ফাঁকি দেবার আর তখন উপায় রইল না।

মাঝে মধ্যে এরা ভবনাথের মাথার পারে গিয়েও বসে। তাঁর মাথা শনের ক্ষেত— দেদার পাকা চুল, তুলতে পারলেই হল। এক অসুবিধা খাটো খাটো চুল তাঁর মাথায়— দু আঙুলে এঁটে ধরা যায় না। রেটও অতি সস্তা—এক কুড়ি এক পয়সা। কষ্ট করে খুঁজতে হয় না বলে পাকাচুল তোলার মজাও নেই ভবনাথের মাথায়।

কোকিল ডাকছে গাছের উপর ডাল-পালার মধ্যে। মাটির উপরেও তো ডাকে, হুবহু কোকিলের মতো—একটা দুটো নয়, অনেকগুলো—এদিক-সেদিক থেকে। যত বজ্জাত ছেলেপুলে কোকিলের ডাক ভ্যাংচাচ্ছে।

কড়া রোদ, ধূসর আকাশ। এলোমেলো হাওয়া আসে এক-একবার—ধুলো ও শুকনো পাতা উড়ায়। বাতাসে যেন আগুনের হলকা। মাঠ ফেটে চৌচির। দুটো কুকুর মুখোমুখি হাঁ করে জিভ ঝুলিয়ে হা-হা করছে। গরু ঘাস খায় না, আমতলায় শুয়ে ঝিমোয়। নতুন পুকুরের জল আগুন হয়ে যায় চানের সময় অগ্নিকুণ্ডে নামছি। এমনি মনে হবে। কানা পুকুর প্রায় শুকনো, দামের নিচে অল্প জল থাকতে পারে। আশ-শ্যাওড়া ভাঁট আর কাঁটাঝিটকে রাস্তার পগারের উপর ঝুলে পড়ে খানিকটা অংশ একেবারে অদৃশ্য। একটা কোদাল ও একটা মেটে সরা নিয়ে কটা ছোঁড়া ঐ জঙ্গলে নেমে পড়ল। জল আছে পগারের অদৃশ্য ঐ-খানটায় এবং জল থাকলে মাছও আছে।

জঙ্গল মলে দলে এদিকে আর ওদিকে দুটো আল দিয়ে নিল। সরা দিয়ে তারপর ভিতরের জল সেঁচে আলের বাইরে ফেলছে। চাপ পড়ে সদ্য-বানানো আলে জল চোঁয়াচ্ছে, এক কোদাল দু কোদাল মাটি কেটে সঙ্গে সঙ্গে চাপাচ্ছে সেখানে। জল সেঁচা হয়ে গিয়ে কাদার উপরে মাছ খলবল করে। মাছ সামান্যই—পাঁচ-সাতটা নাটা ও কয়েকটা কই-জিয়েল। তবেই লোভে একটা মাছরাঙা এসে বসেছে অদূরের শুকনো সজনে ডালের উপর। মাছ না-ই থাক—কাদা বেশ গভীর ও আঠালো—স্ফূর্তিটা জমল কাদামাখা ও কাদা মাখানোয়। ছোঁড়াগুলোর কোনটাকে কথা না বলা অবধি আলাদা করে চেনবার জো নেই।

পাড়ার সকলের সারা হয়ে গেলে খাঁ-খাঁ দুপুরে কর্মকার পাড়ার বউরা ঘাটে আসে। সব তাদের দেরিতে। দুপুরের খাওয়া খায় বেলা ডুবু ডুবু তখন। পুরুষরা হাটে যায় অন্যেরা যে সময় হাট করে ফিরছে। স্নান করে কর্মকার-বউ ভরা কলসি নিয়ে ঘরে ফিরছে। মেজে মেজে পেতলের কলসী সোনার মতন ঝকঝকে হয়েছে, কলসীর উপরে রোদ ঠিকরে পড়ে। পথের বেলেমাটি রোদে তেতে-পুড়ে আগুন। পা ফেলা যায় না, সেঁক লাগে, পুড়ে ঠোস্কা ওঠার গতিক। বউমানুষ হলেও ফাঁকা জায়গাটা ছুটে পার হয়ে বাঁশতলায় চলে যায়। জল ছলকে কাপড় ভিজে গেল। ভিজে পায়ের দাগ মাটিতে পড়তে না পড়তে শুকিয়ে নিচ্ছে। পাড়ায় ঢোকবার মুখে প্রাচীন বটগাছ-শীতলাতলা। কলসী নামিয়ে বউ একটু জল ঢেলে দেয় বাক দেবতার পায়ের গোড়ায়। মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে, আর বিড়বিড় করে বলে, ভা থাকো মা-জননী গো, ঠাণ্ডা থাকো।

উঠানে তুলসীগাছ মাথার উপর বরা টাঙানো ছিদ্র কুম্ভ থেকে ফুটো বেয়ে অবিরত টপটপ জল ঝরছে। সারা বৈশাখ মাস জুড়ে তুলসীঠাকুর দিবারাত্রি ধারার জলে স্নান করেন। বাইরে ঘরের দাওয়ায় কলসী নামিয়ে তুলসীতলায় বউ গড় হয়ে প্রণাম করে। একটুখানি আড়ালের দিকে গেল, ভিজে কাপড় ছাড়ছে।

নতুন পুকুরের জল খুব ভাল বলে চারিদিকে সুখ্যাতি। বেলা পড়ে এলে কাঁখে কলসি এ-পাড়ার সে-পাড়ার মেয়েরা এসে খাবার জল নিয়ে যায়। অত দূরের পায়রা-ঘাটা গাঁ থেকেও এসেছে, দেবনাথের একদিন নজরে পড়ল। দূরের পথ বলে মেয়েলোক নয়, পুরুষ এসেছে। কলসি একটা নয়, এক জোড়া। কাঁধের উপর বাঁকের শিকেয় ঝোলানো জল-ভরতি কলসী দুটো নাচাতে নাচাতে নিয়ে চলে গেল।

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

প্যারিসে 'অমৃত'-সম্পাদক সম্বর্ধিত

বৃটেন প্রবাসী বাঙালীদের আমন্ত্রণে স্বনামধন্য সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও অমৃত সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে সে-দেশে গিয়েছিলেন সাগর-পারে অনুষ্ঠিত প্রথম বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ও সংস্কৃতির মেলায় অংশগ্রহণের জন্য। দ্বিতীয়বারের জন্য নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন-এর সভাপতি নির্বাচিত হবার পর থেকেই তুঘোষ দেশে এবং দেশের বাইরে যেখানেই কিছু বাঙ্গালী বসবাস করেন—সর্বত্র বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারকল্পে যে প্রয়াস চালাচ্ছেন বৃটেনের বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ছিল তারই প্রত্যক্ষ ফল। বৃটেন-প্রবাসী বাঙ্গালীরা নানাভাবে শ্রীঘোষকে সম্বর্ধনা জানান। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে অনেক ভোজসভায় তাঁকে আপ্যায়িত করা হয়। তারপর তিনি স্বদেশের পথে যাত্রা করেন। এই যাত্রাপথে প্যারিসে এলে ফরাসী সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র শিল্পীরা তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানান। অনুষ্ঠানটি মঁসিয়ে জেমস বারনেট-এর কক্ষে সুসম্পন্ন হয়েছিল। সম্বর্ধনার উত্তরে শ্রীঘোষ ফ্রান্স ও ভারতের পারস্পরিক সাংস্কৃতিক ও আর্থনীতিক সম্পর্কের ক্রমোন্নতি বিষয়ে দৃঢ় আশা ব্যক্ত করেন। তাছাড়া নানা বিষয়ে ভারত সরকারের নীতির ব্যাখ্যা করেও শ্রীঘোষ সকলকে খুশী করেন। এই অনুষ্ঠানে ফ্রান্স-প্রবাসী বহু ভারতীয় ছাত্র, বিজ্ঞানী ও ব্যবসায়ীও উপস্থিত ছিলেন। তারপর শ্রীঘোষ স্বদেশের পথে রোম যাত্রা করেন।

সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ-এ গ্রন্থ-সংগ্রহ দান

অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত বরিশাল জেলার কোটালিপাড়ার অধিবাসী, বিখ্যাত শিল্পপতি স্বর্গত সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্রগণ সর্বশ্রী দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সম্প্রতি কলকাতার সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে মূল্যবান পুস্তক সংগ্রহ দান করেছেন। স্বর্গত ভট্টাচার্য মহোদয়ের ভারতীয় সংস্কৃতি-প্রীতি ও বিদ্যোৎসাহিতা সর্বজনবিদিত। তাঁর এই সংগ্রহে দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য, সমাজ-বিজ্ঞান ও অর্থনীতি বিষয়ে প্রায় ২৫০০ খানা মূল্যবান বই ও পত্রিকা ছিল। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ-এর গ্রন্থাগারে সযত্নে রক্ষিত এই পুস্তক ও পত্রিকা সম্ভার এখন থেকে গবেষক তথা সাধারণ পাঠক ব্যবহারের সুযোগ পাবেন। পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত এই জ্ঞানভাণ্ডার সর্বসাধারণের স্বার্থে দান করবার জন্য স্বর্গত ভট্টাচার্য মহাশয়ের পুত্রগণ শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতিকামী ব্যক্তিমাত্রেরই প্রশংসাভাজন হলেন।

লোকসংস্কৃতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

অ্যাকাডেমি অব ফোকলোর-এর উদ্যোগে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগিতায় বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজের জীবনবিজ্ঞান কেন্দ্রে সম্প্রতি লোক সংস্কৃতি বিষয়ক এক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছিল। গত ৩রা আগস্ট থেকে চার সপ্তাহের এই প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ডঃ মীনেন্দ্রনাথ বসু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট লোক সংস্কৃতিবিদ শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু। উভয়েই তাঁদের ভাষণে আজকের সমাজে লোক সংস্কৃতি চর্চার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।

নিঃ ভাঃ বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির জন্য ভারতীয় বিদ্যাভবনের দান

নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি সম্প্রতি বোম্বাইয়ের ভারতীয় বিদ্যাভবনের নিকট থেকে 'লেখক কানাই-লাল মুন্সী সাহিত্য সংগ্রহ' থেকে একটি আলমারীসহ পঞ্চাশখানা মূল্যবান বই দান হিসেবে লাভ করেছেন। এই বই-গুলি গুজরাটি, সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় রচিত। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ আনুষ্ঠানিকভাবে এই দান গ্রহণ করে স্বর্গত মুন্সীর নানা গুণের কথা আলোচনা করে বলেন, 'মুন্সী ছিলেন ভারতীয় বিদ্যাভবন স্থাপনের প্রধান উদ্যোক্তা।' এই প্রতিষ্ঠান গত দুই যুগ ধরে বিভিন্ন ভাষায় নানা বিষয়ে মূল্য-বান গ্রন্থাদি প্রকাশ করে ভারতীয় সং-স্কৃতির সেবা করে চলেছে। ভারতের বিভিন্ন ভাষা-গোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতি সুদৃঢ় করা এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য। শ্রীঘোষ স্বর্গত মুন্সী মহাশয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য প্রীতির কথা উল্লেখ করে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানান।

পাণিহাটিতে সাহিত্য সম্মেলন-এর আয়োজন

মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'নীলিমা'র উদ্যোগে পাণিহাটিতে সারা বাংলা কবি-সাহিত্যিকদের একটি সম্মেলন-এর আয়ো-জন করা হয়েছে আগামী ২০শে অকটো-বর। 'নীলিমা'র পক্ষ থেকে উৎসাহী লেখক ও লেখিকাগণকে নিচের ঠিকানায় যোগা-যোগের অনুরোধ জানাচ্ছেন : সেখ সদর-উদ্দীন, সম্পাদক, 'নীলিমা', সোদপুর স্টেশন রোড, পোঃ পাণিহাটি, ২৪ পরগণা।

বিজ্ঞান সাধনার জন্য পুরস্কার

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের একটি সাম্প্রতিক বিজ্ঞপ্তিতে জানা গেল, কমিশন অদূর ভবিষ্যতে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর নামে প্রতি বছর দশ হাজার টাকার একটি পুরস্কার প্রবর্তন করবেন। প্রধানত মৌল গবেষণা ও উদ্ভাবনের জন্যেই এই পুর-স্কার দেওয়া হবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি শীঘ্রই প্রচারিত হবে। গুজরাট হরিওং আশ্রম থেকে প্রাপ্ত অর্থে এই পুর-স্কারের ধনভাণ্ডার গঠিত হয়েছে। সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে স্রষ্টা ও সাধক-গণকে নানাভাবে সম্মানিত ও আর্থিক দিক থেকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা বেশ কিছু

কাল থেকেই শুরু হয়েছে, বিলম্বে হলেও বিজ্ঞানের সাধকগণের জন্যও জাতীয় স্তরে অনুরূপ পুরস্কারের ব্যবস্থা হওয়াতে দেশবাসী মাত্রেই খুশী হবেন।

কবি হেমচন্দ্র বাগচীর রচনা প্রকাশের উদ্যোগ

কল্লোল যুগের শক্তিমান কবি দীর্ঘকাল ধরে অসুস্থ। তাঁর সমস্ত প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ও চিঠি-পত্রাদি একত্র করে রচনাবলী আকারে প্রকাশের চেষ্টা চলছে। কৃষ্ণনগর, নদীয়া থেকে শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায় আবেদন জানাচ্ছেন, কারো কাছে কবির কোন রচনা থাকলে তিনি যেন পাঠান অনুলিপি রেখে সেগুলি আবার ফেরত দেওয়া হবে।

পত্রস্মৃতি : পরিমল গোস্বামী। পরিবেশক : রূপা অ্যান্ড কোম্পানী ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম—বাইশ টাকা।

পত্রস্মৃতি পরিমলবাবুর স্মৃতি পর্যায়ের চতুর্থ গ্রন্থ। এর পরে আরও একখানি গ্রন্থ বেরিয়েছে। কিন্তু পত্রস্মৃতির মতো গ্রন্থ বাংলাভাষায় সম্ভবত আর নেই। এর স্বরূপ ও প্রকৃতি অনন্য।

রবীন্দ্রনাথ যেসব চিঠিপত্র লিখেছেন, তা সাহিত্য হয়েছে পরিমলবাবুও প'চাত্তর জন লেখকের তিনশ' পঞ্চাশখানা পত্র বা পত্রাংশ ঘিরে যে স্মৃতি রচনা করেছেন তা সাহিত্যপ্রাণ পেয়েছে। স্মৃতিসাহিত্যে পত্র-স্মৃতি এক অভিনব সৃষ্টি। ভাবতে অবাক লাগে, পরিমলবাবু আজীবন যত চিঠি পেয়েছেন, তা সে হ্রস্বই হোক কি দীর্ঘ, জীবনের এই সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত সব সযত্নে রক্ষা করেছেন—একটিমাত্র ছত্রের চিঠিকেও তিনি অবজ্ঞা করে ফেলে দেননি। এবং এখন, এই পরিণত বয়েসে, পুরনো সব চিঠির ঝাঁপি খুলে বসেছেন। চিঠিগুলো তিনি পড়ছেন আর বলছেন, 'পুরানো প্রিয় গান অনেকদিন পরে শুনলে মনে অনেক সময় বিচিত্র আলোড়ন জাগায়। পুরানো চিঠিও তাই। পড়তে গিয়ে তাই অনেক দেরি হয়ে গেল। কত স্মৃতি জেগে উঠল এক-একখানা চিঠি ঘিরে।'...

স্মরণে

প্রমথ চৌধুরী : বাঙালীর সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে সেপ্টেম্বর মাসটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ, এই মাসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবায় জীবন কাটিয়ে গেছেন এরকম ছয়জন শ্রেষ্ঠ বাঙালীর জন্ম ও মৃত্যু হয়েছিল। কালানুক্রমিক বিচারে আমরা প্রথমেই পাই বাংলায় নতুন গদ্যরীতির প্রবর্তক সুপণ্ডিত ও সুরসিক লেখক প্রমথ চৌধুরীকে (বীরবল)। প্রমথ চৌধুরী পরলোকগমন করেন সেপ্টেম্বর মাসের ২রা (১৯৪৬)। তিনি কেবল তাঁর মাসিক পত্রিকার (সবুজপত্র) মাধ্যমে এক শক্তিশালী লেখক গোষ্ঠী সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হননি। নিজে তিনি যা সৃষ্টি করে গেছেন, পরিমাণে তা স্বল্প হলেও গুণের বিচারে আজও তা অতুলনীয়। চার ইয়ারী কথা, নীল লোহিতের কাহিনী ও সনেট পঞ্চাশৎ এ কথার সাক্ষ্য দেবে।

বিভূতিভূষণ : তারপর আমরা পেয়েছিলাম বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। পথের পাঁচালীর স্রষ্টার জন্ম হয়েছিল এ মাসের ১১ তারিখে (১৮৯৪)। বিভূতিভূষণের গল্প ও উপন্যাসে বাঙালীর মধ্যবিত্ত জীবন ও মানসিকতার যে চিত্র আমরা পেয়েছি তা অনন্য। কারণ এ চিত্রে নিদারুণ দৈন্য-দুঃখের মধ্যেও একটা অনাস্বাদিতপূর্ব স্নেহ, প্রেম, প্রীতি ও পরিচ্ছন্নতার রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। মনে হয়েছে দৈন্যই সব নয়, তার পরও জীবনের অনেক কথাই থাকে, অনেক কিছুই আমরা জীবন থেকে আহরণ করতে পারি। নিঃস্ব কোন ব্যক্তিও যে প্রকৃতির ঐশ্বর্য ও রূপ আস্বাদন করে ও তার সান্নিধ্যে পূর্ণ তৃপ্ত হতে পারে তা বোধকরি একমাত্র বিভূতিভূষণই প্রমাণ করে গিয়েছেন।

শরৎচন্দ্র : অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্মও হয়েছিল এ মাসেই (১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর)। আগামী বৎসর ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে বর্ষব্যাপী তাঁর জন্ম-শতবার্ষিকী পালনের নানা পরিকল্পনার সংবাদ আমরা এ বিভাগে পূর্বেই পরিবেশন করেছি। শরৎচন্দ্র বিভিন্ন শ্রেণীর বাঙালী জীবনের কাহিনী রচনা করে গেছেন। ব্যক্তিক, পরিবারগত তথা গোষ্ঠীগত—নানা পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি মানুষকে বোঝবার চেষ্টা করেছেন। কোন সামাজিক অবস্থাই চিরস্থায়ী নয়। শরৎসাহিত্যে যে সমাজের রূপ আমরা দেখেছি বা পরিবারের ব্যবস্থা পড়ে একসময়ে আমরা মুগ্ধ হয়েছি, আজকের দিনে পরিবার বা সমাজ তা নয়। কিন্তু তবু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে আমরা জানি যে আজও শরৎচন্দ্রের রচনা যে পরিমাণ বিক্রী হয় সে রকমটি অন্ততঃ কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে আর কারোরই হয়না। তাই মনে হয়, অবস্থার বহু পরিবর্তন ঘটে গেলেও শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে যে সার্বকতার ছোঁয়াচ রয়েছে, তার প্রভাবেই আজও তিনি প্রতিদিন আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম।

যতীন্দ্রনাথ : কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এ মাসের ১৭ই তারিখে ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন (১৯৫৪)। পেশাগতভাবে তিনি ছিলেন একজন এঞ্জিনীয়ার, একজন এঞ্জিনীয়ার আবার কবিও, এটা দেখে সে-যুগে অনেকেই অবাক হয়ে যেতেন। কিন্তু তার চাইতেও বেশী বিস্মিত হয়েছি আমরা তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু দেখে। একটা মধুর বিপরীত অনুভূতির প্রকাশ ঘটতো তাঁর কাব্যের ছত্রে ছত্রে—ঠিক সে রকমটি বোধহয় আর কারো রচনাতেই আমরা পাইনি। এদিক থেকে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবি হিসেবে ছিলেন একান্তভাবেই একক ও স্বতন্ত্র।

শিবনাথ : ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা ও স্বনামধন্য সমাজসংস্কারক পণ্ডিতপ্রবর শিবনাথ শাস্ত্রী যে বাংলা ভাষার একজন প্রথম শ্রেণীর লেখকও ছিলেন, একথা হয়ত সাহিত্যের ছাত্র বা পাঠক ব্যতীত অনেকেই স্মরণে রাখেন না। অন্ততঃ চার খানা কবিতার বই তিনি রচনা করেছিলেন—নির্বাসিতের বিলাপ, হিমাদ্রিকুসুম, পুষ্পাঞ্জলি ও ছায়াময়ী পরিণয়। তাঁর রচিত উপন্যাস চারখানি—মেজ বৌ, নয়নতারা ও বিধবার ছেলে। প্রবন্ধের বই তিনখানি—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, প্রবন্ধাবলী ও ধর্মজীবন। এসব ব্যতীত শিবনাথের আত্মচরিত আজও আমাদের ভাষায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ আত্মকাহিনীমূলক রচনা হিসেবে সমাদৃত। শিবনাথের মৃত্যু হয়েছিল সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখে (১৯১৯)।

বিদ্যাসাগর : বাংলা গদ্যের অন্যতম জনক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেপ্টেম্বর মাসের ২৬ তারিখে (১৮২০)। কেবল আমাদের ভাষা বা সাহিত্যই নয়—প্রকৃতপক্ষে আমাদের গোটা সংস্কৃতির এমন শক্তিধর প্রাণপুরুষ আজ পর্যন্ত এদেশে অঙ্গুলিমেয় বললেই হয়। শিক্ষায়, সভ্যতায়, মর্যাদাবোধের তীব্রতায়, স্বাতন্ত্র্যবোধের বৈশিষ্ট্যে তথা ঐকান্তিকতার দৃষ্টান্তে এমন বিরল একজন এদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন একথা মনে হলে আজও অন্তরে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়। যে কোনও মহাকাব্য নাটক বা উপন্যাসের নায়কোচিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী বিদ্যাসাগরের কাছে বাঙালীর ঋণ অপরিশোধ্য।

এঁদের প্রত্যেকের স্মৃতির উদ্দেশে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণতি জানাই।

—অয়স্কান্ত

সেই স্মৃতিগুলো তিনি সম্পন্ন করে সুদৃশ্য ফ্রেমে বাঁধিয়ে প্রকাশ্য স্থানে টাঙিয়ে দিয়েছেন। রসিকজনেরা দেখছেন আর তৃপ্ত হচ্ছেন।

পরিমলবাবু যাঁদের চিঠি নিয়ে এই স্মৃতি রচনা করেছেন তাঁদের অনেকেই হয়তো খ্যাত নন, কিন্তু স্মৃতির ক্ষেত্রে খ্যাত-অখ্যাত কথাটা সম্পূর্ণ অবান্তর। মনের খ্যাতি-বিচারে সবাইকে তিনি সমান মর্যাদা দিয়েছেন। সবার চিঠি নিয়ে যে স্মৃতি তিনি রচনা করেছেন, তা ব্যক্তিগত সমষ্টিগত এবং তারও অতিরিক্ত কিছুর খণ্ডচিত্র হয়ে উঠেছে, এবং তাতে কোথাও আছে কৌতুক, কোথাও বাঙ্গ, কোথাও বৈদগ্ধ্য, আবার কোথাও-বা একটুখানি স্নিগ্ধ বেদনায় স্পর্শ। পরিমলবাবুর সৃষ্টি সাহিত্যরসে পরিপুষ্ট।

এতে সাহিত্য যেমন আছে, আছে তেমনি ইতিহাসও। বিগত অর্ধশতাব্দী যাবৎ বাংলার শিক্ষা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাঁদের দান আছে, তাঁরা স্বমনে ও সরবে উপস্থিত আছেন এই গ্রন্থে। তাই ভাবীকালের ঐতিহাসিকরা এই গ্রন্থ থেকে অনেক উপকরণ সংগ্রহ করতে পারবেন। পারবেন বাংলা সাহিত্যের গবেষকরাও। পরিমলবাবুর ঐ স্মৃতি কেবল তাঁর নিজস্ব সম্পদ হয়ে থাকেনি, তার ওপর অধিকার ব্যাপ্ত হয়েছে গোটা মননশীল সমাজের।

পরিমলবাবুর নিজের মননশীলতাও ফুটে উঠেছে এই গ্রন্থে, যদিও কোথাও তিনি অনাবশ্যক এবং অতিরিক্তভাবে আত্ম-প্রকাশ করেননি। যেখানে যতটুকু দরকার, সেখানে ঠিক ততটুকুই নিজেকে মেলে ধরেছেন তিনি। এই সংযম বড়ো দুর্লভ। পরিমলবাবু এই দুর্লভ সংযমের অধিকারী হয়ে যে শিল্পিমনের পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনা মেলা ভার। তাঁর ভাষা সাবলীল, ভঙ্গি অননুকরণীয়। তাঁর লেখার মাঝে মাঝে যে সূক্ষ্ম মোচড়গুলো দেখা যায় তা বুদ্ধির দীপ্তিতে জাজ্বল্যমান। প্রায় সাড়ে চারশ' পৃষ্ঠার এই বইটার কোথাও নেই একঘেয়ে লাগে না। পড়তে পড়তে সাধ্য কি একটা লাইন থেকে মনোযোগ স্খলিত হয়! এই গ্রন্থ যে স্থায়িত্বের দাবি নিয়ে এসেছে, তাতে সন্দেহমাত্র নেই।

তরুণ কবি অমিত চক্রবর্তীর কাব্য-ভাবনায় যথেষ্ট প্রতিশ্রুতি আছে—ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কবিতা পাঠে আগে তা মনে হত, বর্তমান গ্রন্থ 'আমি চলে যাব' হাতে আসার পর সেই গোপন ধারণা ও প্রত্যয় এখন স্থির হল। বস্তুত আলোচ্য সংকলন-এর কবিতাগুলির বিষয়ভাবনায় কবি অত্যন্ত বলিষ্ঠ। কিছু প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ মেশানো সুস্থ মানবিক বোধ কবিপ্রাণে সক্রিয়। কবি বুঝি চাপা কোন অভিমানে—সে কি আত্মাভিমান—তাতেই মুক্তি পেতে চান—আর তারই জন্য আর্তির নামান্তর এক বলিষ্ঠ ভিক্ষা—ছেড়ে দাও শেকড় দিয়ে পা জড়িয়ে কেঁদো না এভাবে/আমি চলে যাব সব কিছু গুছিয়ে ফেলেছি' ইমেজ ও শব্দ প্রয়োগে কবি অত্যন্ত আন্তরিক।

শেকসপীয়র সমগ্র রচনা সংগ্রহ (১ম খণ্ড) —জ্যোতি প্রকাশন, ২-এ, নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা—৯। কুড়ি টাকা।

ইংরাজী সাহিত্যে শেকসপীয়রকে একাই এক রেনেসাঁর জন্মদাতা বললে বোধহয় অত্যুক্ত হবে না। আমাদের দেশে যেমন চৈতন্যব্যক্তিত্বই ষোড়শ শতকের রেনেসাঁর প্রতীক-প্রতিম ব্যাখ্যার যোগ্য, তেমনি শেকসপীয়রও। অর্থাৎ কবি-নট-নাট্যকার শেকসপীয়ার সারা বিশ্বের বিস্ময়। তাঁর জন্মদিনটির তারিখের সঙ্গে মৃত্যু দিনের তারিখ এক হয়ে গিয়েছিল। তাঁর বিবাহ হয়েছিল আঠারো বছর বয়সে, সাতাশ বছর বয়সের অ্যান হ্যাথওয়ের সঙ্গে। এই শেকসপীয়রকে বাঙালী পাঠকরা আপন করে পাবার সুযোগ সম্প্রতি পাচ্ছেন অনূদিত সমগ্র রচনা সংগ্রহের মাধ্যমে।

কিছুকাল আগে প্রকাশিত হয়েছে শেকসপীয়র সমগ্র রচনা সংগ্রহের প্রথম খণ্ড। ইতিমধ্যে অন্যান্য গ্রন্থাবলীও বেরিয়েছে, কিন্তু বর্তমান রচনা সংগ্রহ

তিন পরী ছয় প্রেমিক (উপন্যাস): জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। জ্যোতি প্রকাশন, ২-এ, নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৯। পাঁচ টাকা।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী নর-নারীর সম্পর্ক, যুবতী নারীর সঙ্গে যুবক ও প্রৌঢ় মানুষের সম্পর্কে তারতম্য, সূক্ষ্ম যৌনতাকে কেন্দ্র করে মানবমনের অবচেতন ক্রিয়াকলাপ--এসব কিছুকে মানুষের বাস্তব সংসারের দিনানুদৈনিক অভাব-অভিযোগের সঙ্গে, দুঃখ-বেদনার সঙ্গে সমন্বিত এক নতুন জীবনকথা, উজ্জ্বল উত্তরণের কথা বলতে নিপুণ। তাঁর জীবন-ভাবনা এভাবেই একাধিক উপন্যাস ও গল্পে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। 'তিন পরী ছয় প্রেমিক' উপন্যাসে সেই জীবন-অভিজ্ঞতা আর একভাবে উপস্থাপিত। এ-উপন্যাসে চরিত্র বেশী, ঘটনা বেশী, মনের জটিল ভাবনার সক্রিয়তা জ্যোতিরিন্দ্রবাবু কাহিনী, ঘটনা, চরিত্রের মধ্যে রেখে স্পষ্ট করতে বেশী উৎসাহী। প্রকাশ চাটুজ্যের তিন পরীর মত সুন্দরী মেয়ে—লাকী, শাকী, জোনাকি। এদের যথাক্রমে দুটি করে প্রেমিক — সুখেন-প্রণব, বংশী-সিদ্ধার্থ পরেশ-সারদা রক্ষিত। বিবেক শ্রেণীভাগে সুখেন-বংশী-পরেশ অনেক নীচের। তুলনায় প্রণব সিদ্ধার্থ সারদা রক্ষিত অনেক প্রতিষ্ঠিত। আর্থিক-সচ্ছল মানুষ। এই সমস্ত চরিত্রের ভিড়ে লেখক মন জটিল জীবন ও তার অমোঘ স্বভাবকে সুন্দর-ভাবে চিত্রিত করেছেন। উপন্যাসের শেষে ট্রাম থেকে পড়ে গিয়ে লাকীর মৃত্যু বর্ণনা থেকে শুরু করে উপন্যাসটির প্রতিটি পাতায় লেখকের মনোরম বর্ণনাভঙ্গি কাব্যময় অনুষঙ্গ অথচ অদ্ভুত নিরাসক্ত এর গদ্যভাবাকে পরিণত ভাবুকতার বাহন করে তুলেছে।

আমি চলে যাব (কাব্য সংকলন)। অমিত চক্রবর্তী। গঙ্গোত্রী প্রকাশনী, ৪।২ আফতাব মসজিদ লেন, কলকাতা-২৭। তিন টাকা।

লিব

'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেহ নাহি দিবে অধিকার—'

'আমি এক তরুণ শিক্ষয়িত্রী, নাম বীণা ঘোষ রায়.' তাঁর কথা দিয়েই শুরু করছি। রবীন্দ্রনাথের লাইনটি নিজেরই খেদোক্তির মতো উচ্চারণ করে বললেন, 'কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্যি।'

মেয়েদের স্বাধীনতা সম্পর্কিত বিষয়টি নতুন নয়। বহুকালের। একালে তো এটি খবরের প্রসঙ্গ। বিশেষ করে বিশ শতকের মাঝখান থেকে দেশে দেশে প্রশাসনে, আইনসভায়, বিশেষ বিশেষ উচ্চপদে, সাংবাদিকতায়, শিক্ষা ও খেলা-ধুলায়—শিল্পে-সাহিত্যে মেয়েদের প্রভাব, অবশ্যই আপন যোগ্যতাবলে বেড়ে যাওয়ায় স্বভাবতই এ-প্রশ্ন উঠতে পারে। কোন-দিকে যখন কম যাই না, তবে আর পরাধীন থাকা কেন? সম্প্রতি মেয়েদের 'লিব' বা 'লিবার্টি' সম্পর্কিত ঝোড়ো প্রশ্নে একটি নারী সম্মেলন হয়ে গেছে নিউজিল্যাণ্ডে। সম্মেলনের প্রস্তাবগুলি যদিও জানা যায়নি, তবে বুঝতে অসুবিধে নেই সম্মেলনের স্থানটি খুবই সরব ছিল। লিবার্টি চাই রব উঠেছিল সেখানে।

এ-লিবার্টি কেমন লিবার্টি, কি-ই বা হওয়া উচিত, আর সব মেয়েই এ-স্বাধীনতা চায় কিনা কলকাতা ও উপকণ্ঠের কয়েকজন যুবতী মহিলা সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন যুবককেও জিজ্ঞেস করলাম। বীণা দত্ত নারী-জীবনটাকে নিয়ে বিব্রত। আপন ভাগ্য জয় করবার অধিকার পাচ্ছেন না বলে ক্ষুব্ধ। বললেন, 'বিয়ের পর নতুন মানুষটা অনেক বড় বড় কথা বলেন,। তারপর যথাসময়ে সেই একটি সন্তান উপহার দেন তারপর ভদ্রলোকের কিছু যায়-আসে না, মরি আমরাই। বন্দী হয়ে যাই চার দেয়ালে।'

জিজ্ঞেস করলাম 'তাহলে সন্তান না এলে আপনি খুশী হন?'

'তা বলছি না। তবে দায়টা কি কেবল আমারই?'

অতঃপর বোঝা গেল, বীণা দত্তরায় পুরুষ মানুষদের মতই সব অধিকার ভোগ করার পক্ষপাতী।

সদ্য বিয়ে করেছেন, অবশ্যই প্রেম করে, এবং তা-ও দীর্ঘ ছ' বছর এখানে-ওখানে গোপন সাক্ষাতের পর। বিষয়টি ওঁরা দুজনেই বেশ ধরে নিলেন। নীলমাধব দত্ত আর ছবি দত্ত-র মধ্যে রীতিমতো বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। ইনি বলেন, আমি আগে বলবো। উনি বলেন, না—আমি আগে। আমি অবশ্য বিনীতভাবে ছবি দত্তকেই ফার্স্ট প্রেফারেন্স দিতে চাইলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'মেয়েদের স্বাধীনতা বলতে আপনি কি বোঝেন?'

'আমার শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ, ইচ্ছার পূরণ আর ব্যক্তিত্বের বিকাশ।'

নীলমাধব দত্ত-ছবি দত্ত

বালীগঞ্জ সারকুলার রোডের তরুণী বধূ

আবার প্রশ্ন করি, 'পুরুষের সঙ্গে দ্বন্দ্বের আশঙ্কা এ-স্বাধীনতা আদায়ে কতখানি?'

'তা পুরুষই জানেন। তবে ওঁরা এত কমপ্লেকস-এ ভোগেন যে সব ব্যাপারেই বিপদ দেখতে পান।'

'তাহলে উপায়?' আবার জানতে চাই।

'উপায় নিজের জায়গায় থেকে নিজের ইচ্ছায় কাজ করে যাওয়া।'

'তাতে যদি বিবাহ-জীবনের সুখ ব্যাহত হয়?'

এবার একটু থামলেন ছবি দত্ত। বেশ একটু মুশকিলে পড়েছেন বলে মনে হল। আমি ভাবছি মার্জনা চাইব কিনা, এমনি সময়ে বলে ফেললেন, 'ওটাই তো বিপদ।' এইটুকু বলেই থেমে গেলেন ছবি দত্ত।

ছবির সদ্যপ্রাপ্ত স্বামীটি বললেন, 'মেয়েদের স্বাধীনতা মানে একজন নাগরিক হিসেবে তার শিক্ষা সংস্কৃতি আর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দান। এটা কোন পৃথক ঘটনা হয়ে থাকতে পারে না।

প্রশ্ন করি, 'স্বামী হিসেবে আপনার স্ত্রীকে আপনি যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতে রাজী আছেন?'

'আছি। তবে যথেষ্ট অর্থে যথেচ্ছাচার না হলে। একজন ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক সে যদি স্বাধীনভাবে নিজের উৎকর্ষ সাধন করে, তবে নিজেকেই নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। স্বাধীনতার যেখানে অভাব সেখানেই জীবনের বিকাশ বিঘ্নিত আর এই অপূর্ণ চরিত্রকে বা মানসিকতাকে জোড়াতালি দিয়ে যুগোপযোগী করতে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। সেই 'নিয়ন্ত্রণ' টুকু পুরুষ বা স্বামী হিসেবে আমি আমার স্ত্রীর ওপর রাখতে চাই।'

[illegible] স্ত্রীকে আপনি সাবেকী [illegible] আপনার অধীন এক নারী মাত্র [illegible] ভাবেন, না বন্ধু বলে মনে করেন?'

'বন্ধু বা নারী [illegible] তা নির্ভর করে স্ত্রী [illegible] নিজের ব্যক্তিত্ব ও সত্তাকে কতটুকু [illegible] করতে পেরেছে। সমভাবাপন্ন না হলে বন্ধু বলা যায় না। জীবনের বিভিন্ন দিকগুলোর অনেকগুলোকেই বাদ দিয়ে সংকীর্ণ ক্ষেত্রে যদি স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে শিক্ষা সংস্কৃতি, রুচি ও চিন্তার ফারাক বেশি হয়।'

বললাম 'একটু বুঝিয়ে বলুন, আপনি কি আপনার স্ত্রীকে স্বীয় ইচ্ছামতো চলতে ফিরতে দেওয়ার প্রশ্ন কতগুলো তত্ত্ব দিয়ে ঢেকে রাখতে চান?'

প্রশ্নটি করার সঙ্গে সঙ্গেই ছবি দত্ত হাততালি দিয়ে উঠলেন। অভিনন্দিত করলেন আমায়।

এর পরে আমি আর কারো সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি।

তালতলার মিনতি দাশগুপ্ত হাসতে হাসতে বললেন, 'পুরুষের কত বড় ক্ষমতা আমাদের ইচ্ছেতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়?'

প্রশ্ন করলাম 'আপনারা যে লিবার্টি চাইছেন, পুরুষ ছাড়া তাতে বাধা দেওয়ার আর কেউ আছে বলে মনে করেন না?'

'নিশ্চয়ই করি। মা-দিদিমা আর এক কাঠি ওপরে। তবে আজকাল মেয়েরা

যেভাবে স্কুল-কলেজবিশ্ববিদ্যালয় বা পথে-ঘাটে বক্তৃতা দেয়, মিছিলে হাঁটে তাতে তাঁরা মোটামুটি একটা রফা করে নিয়েছেন।'

'আর ছেলেরা?'

'আগেই তো বললাম, ওটা আমার কাছে কোন সমস্যাই নয়।'

'আপনি কি এমন লিবার্টির কথা ভাবছেন যা আপনাকে সংঘর্ষে লিপ্ত করবে?' প্রশ্ন করি।

'আগে থেকে বলা মুশকিল। তবে আমি আমার বিয়ের পর কোনক্রমেই আমার স্বামীদেবতার দাসী হয়ে থাকবো না। তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমি যেমন যাবো না, তাকেও এ্যালাউ করবো না আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যেতে।'

'দুটি ইচ্ছের মিলনেই তো দম্পতি—তার কি হবে?'

'ছেঁদো কথায় বিশ্বাস করি না। ধরুন আমি চাই পলিটিক্যাল লিডার হতে বা পুলিশে কাজ করতে। স্বামী বাধা দিলে শুনব কেন?'

'স্বাধীনতা বলতে কি আপনি এই-টুকুই বোঝেন?'

'আপাতত আর কিছু মনে আসছে না।'

স্মরণ চট্টোপাধ্যায় (জয়পুরিয়া কলেজ) বলেন, 'ওরা লিবার্টি চায় এ-প্রশ্নটাই অবান্তর। আমি তো বুঝতে পারছি না কে তাদের বাধা দিতে যাচ্ছে। আসলে নিজেদের তৈরি একটা সমস্যা নিয়ে নিজেরাই ওরা হৈ-চৈ করে মরছে।'

'লিবার্টি মানে ইন্দিরা-সিরিমাভো বা গোল্ডা মেয়ারের মতো ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার ইচ্ছা। আসলে এই তিনজনই এ-যুগে মেয়েদের মাথা খেলে দিয়েছেন।' বলেছেন বিবাহিতা তরুণী সুস্মিতা গুহ। বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে এক বাড়ির দোতলার বারান্দা থেকে তিনি বাইরের শোভা দেখতে দেখতে আরো বললেন, 'এটাই খুব দুঃখের কথা যে মেয়েরা লিবার্টির কথা বললেই ব্যভিচারের কথা ওঠে। আমার তো মনে হয়, আন্দোলনটা হওয়া উচিত এই ধারণারই বিরুদ্ধে।'

জিজ্ঞেস করি, 'ইন্দিরা-সিরিমাভো বা গোল্ডা মেয়ার-এর মতো হতে গেলে ওই যোগ্যতাটুকুর প্রশ্নটিকে এড়িয়ে চলা যায়?'

একটু থেমে সুস্মিতা বললেন 'যোগ্যতা অর্জনের পথে বাধা দূর করার জন্যেই তো মেয়েরা চিৎকার করছে।'

'বাধা কিছু আছে বলে মনে করেন?'

'ওপরে ওপরে দেখলে মনে হয়, নেই, আসলে বেশ বাধা আছে। তা কেবল আমরাই বুঝতে পারি। রোজকার অভিজ্ঞতায়।'

বিডন স্ট্রীটের তরুণ শিক্ষক অসীম সামন্ত বললেন, 'সমাজ বা দেশ কি অবস্থায় চলছে অর্থাৎ সব মিলিয়ে গোটা অবস্থাটা ভেবে দেখলেই দেখা যাবে মেয়েদের লিবার্টি আজ আপনা থেকেই হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ দু-একটা ক্ষেত্রে অন্য-রকম হলেও আজকাল ছেলেদের চিন্তার ক্ষেত্রেই অনেক বদলে গেছে। ঘরের বউ চাকরি করবে, এইটুকুই অনেক শাশুড়ি চান না। কিন্তু ছেলেরা তো চাকরি-করা মেয়ে ছাড়া বিয়েই করতে চায় না। এর মানে কি এই নয় যে, মেয়েদের লিবার্টির ক্ষেত্রটি অবস্থাগুণে আপনা থেকেই তৈরি হয়ে গেছে।'

বেথুন কলেজ-এর (কলা) ছাত্রী প্রিয়া মণ্ডল বললেন একেবারে বিপরীত কথা। তাঁর মতে, 'মেয়েরা যদি আলাদা কোন স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য দাবি তোলে, তবে আমি বলবো ব্যাপারটাকে বেশি প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।'

'কেন?' জানতে চাইলাম।

'তাহলে আর দেখতে হবে না—নারী-পুরুষে তফাৎ থাকবে না। দুঃখজনক ঘটনা ঘটবে।'

'একথা বলছেন কেন?'

'মেয়েদের শরীর ও মানসিকতায় আলাদা একটি সুষমা আছে, তাই নিয়ে সে গর্ববোধ করে, পুরুষকে টানে। লিবার্টির নামে পথে নামতে দিলে বারোটা বেজে যাবে।'

প্রিয়া মণ্ডল বলেন, 'হাই সোসাইটিতে এমনিতেই স্বামী-স্ত্রী আলাদা হয়ে গেছে। মধ্যবিত্ত পরিবারে যেমন একাত্ম, ওরা তেমনি পৃথক। মূলে ওই স্বাধীনতা—আমার ভালো লাগে না।'

স্বপন সেনগুপ্ত বললেন, 'মেয়েরা হচ্ছে পুরুষের এনার্জি—শক্তি। সেটা ওরা ভুলে গেলে চলবে কেন?'

'লিবার্টির সঙ্গে ওর সম্পর্ক কি?'

'এত পাওয়ারফুল ফোর্স-এর আবার ওসবে মাথা ঘামানো কেন?'

—কৃষ্ণা সেনগুপ্ত

এরাও পিছিয়ে নেই

তরুণ গ্রাজুয়েটের মোটর ট্রেনিং স্কুল

টালিগঞ্জের রসা রোড (সাউথ) ফার্স্ট লেনের নিশান মোটর ট্রেনিং স্কুলের অফিস-ঘরে পা দিতে এক দীর্ঘদেহী সঠাম তরুণ আমায় স্বাগত জানিয়ে বল্লেন—আমিই নিশান মোটর ট্রেনিং স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল শংকর ব্যানার্জি। পরনে পাঞ্জাবী-পাজামা, ঠোঁটে সিগারেট, হাতে চায়ের পেয়ালা। দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের ছবি। টেবিলের উপর বিপণন সমীক্ষা এবং ব্যবসা পরিচালন সম্পর্কিত দু'টি ইংরাজী বই। মোটর ট্রেনিং স্কুলের তথাকথিত প্রিন্সিপ্যালদের সম্পর্কে আমার এতদিনে যে ইমেজ গড়ে উঠেছিল, তার সঙ্গে এ'র যেন কোনও মিল নেই।

৩৪ বছরের তরুণ শংকরবাবু এ-লাইনে যে কি করে এলেন তা নিজেও ঠিক করে বলতে পারেননি। '৫৫ সালে স্কুল ফাইনাল পাশ করে ধানবাদে খান স্কুল অব মাইনসে খনি-ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে। এক বছর সেখানে পড়েনও। কিন্তু একটা মর্মান্তিক খনি দুর্ঘটনার জন্য শংকরবাবু আবার কলকাতায় চলে আসেন। কলেজে ভর্তি হয়ে বি-কমও পাশ করেন। এরপর চাকরির জন্যে তাঁকে যথারীতি দরজায় দরজায় ঘুরতেও হল। কিন্তু চাকরি জুটল না। অবশেষে '৬৬ সালে তিন হাজার টাকায় শুরু করলেন নিশান মোটর ট্রেনিং স্কুল। সম্বল শুধু একটি পুরানো মডেলের 'ডজ' ভ্যান। তিনিই প্রিন্সিপ্যাল, তিনিই ট্রেনার—সব-কিছু। এর মধ্যে শংকরবাবু অটোমোবাইল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ এক বছরের ট্রেনিংও শেষ করেছেন।

এখন নিশান বড় হয়েছে। কর্মচারীর সংখ্যা বেড়েছে—ট্রেনিং স্কুলের বেশ কয়েকটি মোটরগাড়ি ও লরি রাস্তায় ছুটছে। শংকরবাবুও তাঁর ডিগ্রীটা বাড়িয়েছেন। এক হাতে স্টিয়ারিং, অন্য হাতে বই—এভাবে আই আই এস ডবলিউ বি এম-এর তিন বছরের ম্যানেজমেন্ট কোর্স সম্পূর্ণ করেছেন। এখন এম-কম'এর জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। সম্প্রতি ইউরোপও ঘুরে এসেছেন শংকরবাবু। মোটর ট্রেনিং স্কুল ছাড়াও শংকরবাবু বাড়তি সময়ে একটি বিশিষ্ট সওদাগরী প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজমেন্ট-কনসালটেন্ট হিসাবে যাতায়াত করেন।

—আপনার ব্যবসায় ক্যাপিটাল কি? আমি প্রশ্ন করি।

—ডিগনিটি অব লেবার। নির্দ্বিধায় শংকরবাবু আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন। আমি যখন স্টিয়ারিং-এ বসি, তখন আমি অন্য মানুষ।

—আপনি যখন প্রথম এ-ব্যবসায়ে নামেন তখন আপনার আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে বাধা আসেনি?

—বাধা যে আসেনি তা নয়। আমার মনেও দ্বন্দ্ব ছিল, কিন্তু আজ সব পরিষ্কার। একটু থেমে শংকরবাবু বল্লেন—লরি আর মোটরের প্রেমে পড়ে গেছি। এখন তো ওদের ছেড়ে চলে যাওয়া যায় না।

—মোটর মেকানিকস জানেন?

—নিশ্চয়। নিজের গাড়ি নিজেই সারাই। ট্রেনার থাকলেও যথাসম্ভব নিজেই ট্রেনিং দিই। এপর্যন্ত শ'খানেক লোককে গাড়ি চালানো শিখিয়েছি। শংকরবাবু বল্লেন—ট্রেনিং স্কুলের সম্প্রসারণ করব ভাবছি। কিন্তু...।

—কিন্তু কি? আমার প্রশ্ন।

—স্পেয়ার পার্টসের দাম অসম্ভব বেড়ে গিয়েছে। পেট্রোলের দাম তো জানেন? অথচ ট্যুইশন-ফি বাড়ানো মুশকিল। কারণ যারা মোটর চালানো শিখতে আসে, তারা সাধারণত অভাবী গরীব পরিবার থেকেই আসে। কিন্তু তবুও বাঙালী যুবকদের এ-লাইনে আরও বেশী করে আসা উচিত। কলকাতায় যে-ক'টি মোটর ট্রেনিং স্কুল চলছে তার প্রায় সবক'টির মালিকই অবাঙালী, ব্যতিক্রম হয়তো এক'টি কি দু'টি।

শংকরবাবু পাঞ্জাবী ছেড়ে একটি ছিটের শার্ট গায়ে দিয়ে বল্লেন—এখনই আমি গাড়ি নিয়ে ট্রেনিং-এ বার হব। লেখাপড়া শিখেছি কোনও কাজকেই ছোট বলে মনে করি না। আর এই চারচাকার গাড়িগুলোই তো আমায় খাওয়াচ্ছে-পরাচ্ছে...।

—কনক মজুমদার

যুবক যুবতী

হিপি মনোভাব

সাপ্তাহিক অমৃত-র যুবক-যুবতী বিভাগটি খুবই মনোগ্রাহী। বিভিন্ন যুব সমস্যা নিয়ে প্রতি সপ্তাহে যে আলোচনা প্রকাশিত হয়, তার উপস্থাপন আমাদের সহজেই আকৃষ্ট করে। ইতিপূর্বে যৌন শিক্ষা ও ফিল্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন তরুণ-তরুণীর মতামত পড়ে ভাল লেগেছে। এই সপ্তাহে (শুক্রবার, ১৩ই ভাদ্র) হিপি মনোভাব সম্বন্ধে তরুণ-তরুণীরা কি কি ভাবছেন তা প্রকাশিত হয়েছে। সে সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য রাখলাম।

বিভিন্নজনের মতামত পড়ে একটা বিষয়ে খুব আশ্চর্য বোধ করছি। সেটি হচ্ছে, প্রত্যেক বক্তার বক্তব্যই হিপি মনোভাবের সপক্ষে। আর তাঁদের বক্তব্য পড়লে মনে হয় যে, জীবনের প্রতি হতাশাবোধই তাঁদের এই মনোভাবের কারণ। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ধারণা, বর্তমানে বাঙালী যুবসমাজের মধ্যে যে হিপি মনোভাব দেখা যায় তা প্রধানত পোষাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। চুল বড় রাখলে বা বেলবটস পরলেই হিপি হয়ে গেলাম—এ ধারণা ভুল। প্রধানত নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যই এসবের প্রতি যুবসমাজের আগ্রহ।

প্রসঙ্গত হাওড়ার গার্লস স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রীর (নাম অজ্ঞাত) উক্তি লক্ষণীয়। তিনি পোষাক ও আচার-আচরণে ঝড় তোলা দরকার বলে মনে করেন। মনে হয়, তাঁর ধারণা পোষাকে বিপ্লব আনলেই সংস্কারের বেড়াজাল ডিঙোনো সম্ভব। (মান্ধাতার আমলের সংস্কার তিনি ভাঙতে চান—কিন্তু নাম প্রকাশে অনিচ্ছা!)

সব্যসাচীবাবু আবার দেশ-কাল-পরিবেশ ভুলে নিজের মত চলতে চান। তাঁর মতে বড় চুল, বেলবটম, ইত্যাদি অপসংস্কৃতি নয়। তাঁর কথা মেনে নিয়েও বলা যায়, অপসংস্কৃতি না হলেও অন্য দেশের সংস্কৃতিকে অপহরণ না করে নিজেদের সংস্কৃতি রক্ষা করার মধ্যেই তো সার্থকতা—তাই নয় কী! শাড়ী পরেও নিজেকে এ যুগের মেয়ে বলে প্রমাণ করা দুঃসাধ্য নয় বলেই মনে হয়।

আসলে আমরা বর্তমানে হিপি হিপিনীদের মত পোষাক-আষাক পরছি ঠিকই—কিন্তু হতাশাবোধই এ সবের মূল, এ ধারণা ভ্রান্ত। আমরা এসব পরছি কিছু না ভেবেই। সব কিছুর পেছনে কারণ খুঁজতে গেলে শেষ পর্যন্ত একটি উত্তর পাওয়াই স্বাভাবিক। সেটি হচ্ছে—হতাশাবোধ। প্রচলিত সংস্কারের প্রতি ক্ষোভ থাকুক, তার জন্য প্রতিবাদের ঝড় উঠুক—

ক্ষতি নেই। কিন্তু সংস্কৃতি ও সংস্কারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে না পারলে সংস্কারের বিরুদ্ধে ঝড় তোলা অসম্ভব।

চন্দ্রাণী ভট্টাচার্য
কলিকাতা-৯।

অমৃত পত্রিকায় 'যুবক-যুবতী' ফিচারটি আগ্রহের সঙ্গে পড়ছি। গত সপ্তাহে ফিল্মের ওপর সাক্ষাৎকারও পড়লাম।

যুবসমাজের ওপর হামেশাই একটা অভিযোগ চাপিয়ে দেওয়া হয়, চটুল হিন্দি সিনেমার ভক্ত হয়ে উঠছে যুবসমাজ।

অভিযোগটি নিয়ে একটু তলিয়ে ভাবা যাক। আজকের যুবসমাজের সামনে কী আদর্শ? তারুণ্যের স্বভাব মেতে ওঠা। মাতিয়ে তোলাও হচ্ছে, কিন্তু সেটা ব্যক্তিগত বা দলগত মুনাফা তোলার প্রয়োজনে। প্রয়োজন মিটে গেলে উচ্ছিষ্ট শালপাতার মত তাদের ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। এইভাবে ব্যবহৃত হতে হতে বেশ কিছু তরুণ পা পিছলে পড়ছেন। যাঁরা পড়ছেন তাঁদের টেনে তোলবার দায় কারো নেই, বরং আরও অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়ার মুরুব্বি আছেন বহু। একটা সময়ে সেই দিশেহারা তরুণরা বিপথগামী হচ্ছেন। শিক্ষিত তরুণদের অবস্থা আরও ভয়াবহ। তাঁরা না পারছেন স্রোতে গা ঢেলে দিতে, না পারছেন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে। ফলে যে বয়েসে পৃথিবী মানুষজন সম্পর্কে সহজ ধারণা গড়ে ওঠার কথা, সেই বয়েসেই তিক্ত অভিজ্ঞতায় নিজেদের বুড়ো করে ফেলছেন।

আমার তো মনে হয় বিভ্রান্ত তরুণ সমাজ হাতের কাছে কোন মহৎ আদর্শের ছবি পাচ্ছেন না বলেই হাল্কা সিনেমা হাল্কা বইকে বেছে নিচ্ছেন মনের ক্ষতের ওপর প্রলেপ দিতে। সমাজের ওপরতলার মানুষেরা একটু সচেতন, একটু সহানুভূতি-সম্পন্ন হলেই তারুণ্যের এই ক্ষয়কে রোধ করতে পারবেন।

হাল্কা আনন্দ উপভোগ করে তরুণ-সমাজ যে খুব সন্তুষ্ট, স্বস্তি পাচ্ছেন, এমনটা ভেবে নিলে ভুল হবে। তরুণ-সমাজকে সত্যিকার ভালবাসবার মত লোক নেই, স্নেহভরা আশ্রয় নেই। প্রয়োজনে মায়ের মত শাসন করতে আবার স্নেহ-মমতা দিয়ে মালিন্য দূর করে দিতে না পারলে সে ছেলে মায়ের মুখ চাইবে কেন! সময় বয়ে যায় নি, ফসল তোলার মত

পাঠ্য বইয়ের আকাল প্রসঙ্গে

গত ২রা আগস্ট অমৃত পত্রিকায় পাঠ্য-বইয়ের আকাল শীর্ষক সম্পাদকীয়তে কাগজসংকটের যে ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা খুবই নৈরাশ্যজনক। কাগজের অভাবে যদি ছাত্রপাঠ্যবইয়ের প্রকাশ বিঘ্নিত হয় তাহলে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা বলা বাহুল্য শিকেয় ওঠা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এমনিতেই আজকাল শিক্ষাক্ষেত্রের নানা সমস্যা ও বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে ছাত্র-সমাজের অভিযোগের অন্ত নেই, তার ওপর পাঠ্যবইয়ের ঘাটতি হলে ত সোনায় সোহাগা। অজুহাত দেখানো হবে, বই নেই পড়াও নেই। অতঃপর দাবী উঠবে বিনা পরীক্ষাতেই প্রমোশন দাও। ভাবতে অবাক লাগছে যে এ ধরনের পরিস্থিতি আর কতদিন চলবে এবং দেশের ছাত্র-সমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের শাসকদের কোনো মাথাব্যথা আছে কিনা!

ইদানিংকালে আমাদের দেশ যে কয়টি প্রধান সমস্যার সম্মুখীন কাগজসংকট তার ভেতরে নিঃসন্দেহে অন্যতম। এই কাগজের অভাবে প্রধান প্রধান সংবাদ-পত্রগুলির কলেবর হ্রাস পেয়েছে। ছাঁটাই করতে হয়েছে সংবাদপত্রগুলি থেকে রবিবাসরীয় ম্যাগাজিন বিভাগ। যার ফলে পাঠক চিত্তাকর্ষক রচনা পাঠে বঞ্চিত। কিন্তু অপরদিকে দেখা যাচ্ছে এই কাগজ-সংকটের ভেতরও অতি রহস্যজনকভাবে নিয়মিত প্রকাশ পাচ্ছে নানান ধরনের কুরুচিকর এবং অশ্লীল পত্র-পত্রিকা। সেগুলির উদ্দেশ্য হোল মেয়েদের নগ্ন-দেহের ছবি এবং অশ্লীল বটতলামার্কা গল্প ও উপন্যাস ছাপানো। হটকেকের মত দিনের পর দিন এদের কেচ্ছাকাহিনী গলাধঃকরণ করছে শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত যুবক বয়স্ক সবাই। কলকাতার প্রধান প্রধান ম্যাগাজিন স্টলগুলিতে একটু চোখ বোলালেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে।

তাই প্রশ্ন যে দেশে ছাত্রপাঠ্যবই বা সংবাদপত্র ছাপাবার কাগজ জোটে না সে দেশে অশ্লীল ও সিনেমা পত্রিকা ছাপাবার কাগজ আসে কোথা থেকে? এগুলির প্রচার বন্ধ করে কাগজের অপচয় কি রোধ করা যায় না?

প্রমথেশ ভট্টাচার্য,
কল্পনা এরিয়া,
ভুবনেশ্বর।

(২০)

আঁধারে কিরণ

নিশান্তের অরুণ রেখা যেন। আবার মেঘের আড়ালে চলে যায় সব রশ্মি। দূরে থেকে ভেসে আসা গানের রেশ যেমন হাওয়ায় হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে থাকে।

অন্ধকার পটে কিরণের কনক লেখা। কখনো আঁধার নিবিড় হয়ে গ্রাস করে অংশুমালা। কখনো ধূসর ছায়ার বুকে দীপ্তি ফুটে ওঠে। হারানো সুর স্ফুটতর হয়ে রূপ ধরে গানের কলি। সঙ্গীত ও বিগ্রহ অঙ্গাঙ্গী এসে দাঁড়ায়। মূর্তিমতী সুদূর অতীত।

অজানা সে অন্ধকারের জগৎ। তার মধ্যে থেকে প্রভাময়ী একটি প্রতিমা জাগে। আলোর জন্যে আকুতি যেন। কিরণময়ীর জীবন আলেয়া। আলো-আঁধারির মায়া খেলা। সে দীপ্তি ছায়ায় ছায়ায় কোন অতলে ডুবে যায়। আলোকে আঁধারে ঘেরা ভাগ্যবিড়ম্বিতা। যশ অপযশের দোলায় বিচিত্র জীবন।

সেই অন্ধ জগতের আজন্ম বাসিন্দা। কিন্তু শুধুই সে ধারায় ত প্রাণ ধারণ নয়। ললিতকলা দেবীর সেবিকা। কলা-লক্ষ্মীর আশীর্বাদে ধন্য জীবন। সঙ্গীত গগনে আলোক-লতা। জ্যোতির তীরে উত্তরণ ঘটেছে। গীতের আসরে রূপ ছন্দের আসরে। গানে গানে প্রাণপ্রতিষ্ঠা। ছন্দে ছন্দে লীলায়িত রূপতনু। শিল্প মানে সার্থক। গুণীজনের স্বীকৃতিতে ধন্য। তবু সে সৌভাগ্য সাময়িক। কারণ সামাজিক অন্তরায়। কিরণময়ী বিগ্রহ আবছায়ায় মুখ ঢাকে, হয়ত আলোর রেখা অস্পষ্ট রেখে। ছায়া গভীর হয়ে রূপ অলক্ষ্যে হারায়।

রূপান্তরের সঙ্গে মেলায় সঙ্গীত। শব্দহীন পারাবারে অস্ফুট সুরের গুঞ্জরণ। তটরেখা পার হয়ে পাড়ি দেয় কোন সুদূরে!...

বিগত কালের সুর-লোক। তার থেকে সে কলাবতীর কিছু কিছু বার্তা ভেসে আসে। খণ্ড, বিচ্ছিন্ন কয়েকটি মাত্র সংবাদ বিস্মৃতির তল থেকে উঠে এসেছে। জন্মসূত্রে পতিতার পূর্ণ বিবরণ ত অপ্রাপ্য! সেই কটি ছিন্ন সূত্রেই গাঁথতে হবে বিনি সুতোর হার।...

সেদিন তারাপ্রসাদ ঘোষের বাড়িতে একটি বড় আসর হয়েছিল। বিডন স্ট্রীটের সঙ্গীতপ্রেমী, সঙ্গীতজ্ঞ তারাপ্রসাদ ঘোষ। কিশোর বয়স থেকেই তিনি সঙ্গীতে আগ্রহী, গুণী সঙ্গ অভিলাষী। তখন বারাণসীতেই তাঁর সঙ্গীত জীবনের সূত্রপাত। কাশী প্রবাসী শ্রীরামপুরের ধ্রুপদী রামদাস গোস্বামীর শিষ্য হয়েছেন। সখের শিক্ষা। অভিজাত ধনী বংশের দুলাল তারাপ্রসাদ। কাশীবাসিনী মাতামহীর সঙ্গে থাকেন আদরের দৌহিত্র। রামনগরের রাজ-দরবারে আছেন তানসেনের পুত্রবংশীয় বড়কু মিঞা। সুরশৃঙ্গারে ভারত-বিখ্যাত কলাবৎ। তাঁর কাছে শিক্ষার্থী হয়ে, শ্রোতা হয়ে যান তারাপ্রসাদ, এক একটি মোহর দক্ষিণা নিয়ে। প্রথম জীবনের এই সঙ্গীতচর্চা উত্তরকালে সঙ্গীতের প্রেমবিলাসে পরিণত হয়। হেদুয়ার উত্তরেই প্রাসাদোপম ভবনে পোষণ করেন নানা সময়ে নানা গুণীজন— সেতার সুরবাহারী এমদাদ খাঁ, ধ্রুপদী দৌলৎ খাঁ, খেয়াল শিল্পী কালে খাঁ সারেঙ্গী ছোটে খাঁ প্রভৃতি। শনিবার রবিবার সে ভবনে কত কলাবতের আসর বসান। 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার' পত্রের প্রবর্তক-সম্পাদক, ইংরেজী কবিতা-রচয়িতা কাশী-প্রসাদ ঘোষের পৌত্র তারাপ্রসাদ তখন সঙ্গীত সমাজে মহামানী ব্যক্তি। তাঁর আসরে শ্রোতা হয়ে আসতেন বনিয়াদী সমাজের অনেক সঙ্গীতরসিক। সেদিনও এসেছিলেন।

তখন আসর শেষে বাইরে আসছেন শ্রোতারা। তাঁদের মধ্যে শোভাবাজারের সুপরিচিত দেব পরিবারের অসীমকৃষ্ণও ছিলেন। তখনো 'কুমার' যোগে আখ্যাত হতেন তাঁরা। রাজা রাজকৃষ্ণের চতুর্থ পুত্র অপূর্বকৃষ্ণের পৌত্র এবং 'হরিদাসের গুপ্তকথা' খ্যাত উপেন্দ্রকৃষ্ণের পুত্র অসীমকৃষ্ণ।

অনুষ্ঠান শুনে ফটকের সামনে অসীম-কৃষ্ণ উপস্থিত হয়েছেন। সঙ্গে কিশোর বয়সী পুত্র হারীতকৃষ্ণ।

এমন সময় একটি মহিলাও বেরিয়ে এলেন আসর থেকে, বাইরে।

অসীমকৃষ্ণ তাঁকে সামনে দেখে দু' হাত তুলে নমস্কার করলেন।

মহিলাও প্রতি নমস্কার জানিয়ে গেলেন যাবার পথে।

হারীতকৃষ্ণ একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'বাবা, আপনি ওঁকে নমস্কার করলেন কেন? কে উনি?'

প্রায়বালক হলেও কিছু কিছু আসরে গায়িকা শ্রেণীর নারী দেখেছিলেন হারীত-কৃষ্ণ। এই মহিলাকেও তাঁর কেমন মনে হয়েছিল সেই ধরনের। তা ছাড়া, সম্ভ্রান্ত কিংবা সাধারণ গৃহস্থ পুরাঙ্গনাকে এমন প্রকাশ্য সমাবেশে দেখা ত সে যুগে অকল্পনীয়। তাই বিস্মিত হারীতকৃষ্ণ পিতাকে প্রশ্ন করেছিলেন।

কুমার অসীমকৃষ্ণ সরলভাবে বললেন, 'কেন নমস্কার করব না?'

তারপর একটু সম্ভ্রমের সঙ্গে জানালেন মহিলাটিকে সম্মান দেখাবার কারণ—'উনি যে আর্টিস্ট। কিরণময়ী।'

'আর্টিস্ট কথাটা সেই প্রথম শুনলুম।' তারাপ্রসাদ ঘোষের সদরে এই কথাবার্তার বিবরণ দিয়ে প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে গল্প করতেন হারীতকৃষ্ণ, 'বাবা সেদিন আমায় বলেছিলেন যে কিরণময়ী উঁচু দরের গাইয়ে। আমি কিরণময়ীকে শুধু ওই একবার দেখেছি। কখনো তাঁর গান শুনিনি। কিন্তু বাবা শুনেছিলেন অনেকবার। আর বাবা যে তাঁকে আর্টিস্ট বলেছিলেন সেজন্যে কিরণময়ীর গানের মান আন্দাজ করতে পারি। কারণ বাবা গান বাজনা খুব ভাল বুঝতেন।'

কথাটা সত্যি। সঙ্গীতের এক রুচিবান বোদ্ধা ছিলেন অসীমকৃষ্ণ। নিজেও কিছু কিছু চর্চা করতেন। হারমোনিয়াম বাজাতে পারতেন খেয়াল গানের সঙ্গতে। তবে তা নিতান্তই সখের বাজনা। পরিশ্রম করে রীতিমত অভ্যাস রাখা নয়। স্বভাবেই তিনি সঙ্গীতের সমঝদার। আর পারিবারিক পরিবেশেই সঙ্গীতজ্ঞ। বৃহৎ দেব পরিবারে বরাবর কলাবিদের আদর। বংশের জীবনচর্যার অঙ্গ ছিল সঙ্গীতের আসর। সংস্কৃতির এক চিহ্ন হিসেবে সে যুগের এই পরিবারে সঙ্গীতচর্চার কদর ছিল। সেই আবহাওয়ায় মানুষ অসীমকৃষ্ণ। পুরুষানুক্রমে পারিবারিক আসরে কিংবা আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের আসরে উচ্চমানের সঙ্গীত শুনেছেন। পরিশীলিত হয়েছেন রাগসঙ্গীতে।

অসীমকৃষ্ণের প্রপিতামহ রাজা রাজকৃষ্ণ দেব। তখন থেকেই বংশে রাগসঙ্গীতের সমাদর। মহাসৌখীন রাজকৃষ্ণের নানা বিলাস ছিল। সঙ্গীত তার মধ্যে একটি প্রধান। তাঁর বিরাট জলসাঘর ছিল কলকাতার এক শ্রেষ্ঠ আসর। সে নাচঘর রাজকৃষ্ণেরই তৈরী করা। পিতা নবকৃষ্ণের জলসা ঘর ত তিনি পান নি। শোভাবাজারের ঠাকুরবাড়ির সামনের দিকে নবকৃষ্ণের সেই নাচঘর। যেখানে বাই নাচ দেখতে রবার্ট ক্লাইভ-ও এসেছেন। পরে যে আসরে নতুন আখড়াই গানের পত্তন করেন কলুই সেন, নিধুবাবুর আত্মীয়। সেই পুরনো আমলের নাচঘর পেয়েছেন নবকৃষ্ণের পোষ্যপুত্র

গোপীমোহন। সেসব কথাও এখানে একটু বলে নেওয়া যায়। রবার্ট ক্লাইভের মুন্সী নবকৃষ্ণ তার অনেক আগে পলাশীর যুদ্ধে ভাগ্য ফিরিয়েছেন। প্রাসাদোপম অট্টালিকা, ঠাকুরবাড়ি, নাচঘর ইত্যাদি করেছেন শোভাবাজারে। মহারাজা হয়েছেন। কিন্তু সাতটি বিবাহ করেও পুত্র পেলেন না নবকৃষ্ণ। তখন দত্তক নিলেন ভ্রাতুষ্পুত্র গোপীমোহনকে। কিন্তু তারপর ১৮৮২-তে একমাত্র পুত্র রাজকৃষ্ণের জন্ম হল। নবকৃষ্ণের সে সময় ৫০ বছর বয়স। আর রাজকৃষ্ণের ১৫ বছর বয়সে নবকৃষ্ণ পরলোকে গেলেন। যথাকালে তাঁর বিপুল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে মামলা বাধল সুপ্রীম কোর্টে। পোষ্যপুত্র গোপীমোহন ও পুত্র রাজকৃষ্ণ দুই বিরুদ্ধ পক্ষ। শেষ পর্যন্ত নবকৃষ্ণের বিষয় দুজনের মধ্যে বিভক্ত হল সমান ভাগে। নবকৃষ্ণ স্ট্রীট নামে পথটির উত্তরাংশের গৃহ সম্পত্তি গোপীমোহন (রাজা রাধাকান্ত দেবের পিতা) পেলেন। আর দক্ষিণভাগের উত্তরাধিকারী হলেন রাজকৃষ্ণ। নবকৃষ্ণের আমলে জলসাঘর গোপীমোহনের অংশে রইল। তখন রাজকৃষ্ণ প্রস্তুত করে নিলেন তাঁর সেই বিরাট নাচঘর। সঙ্গীতপ্রেমী রাজকৃষ্ণ সে আসর নৃত্যগীতে মুখর রেখে দিতেন। তাঁর আট পুত্রের মধ্যে চতুর্থ অপূর্বকৃষ্ণ। সেই নাচঘর অপূর্বকৃষ্ণের পুত্র (উপেন্দ্রকৃষ্ণ) পৌত্রাদি (অসীমকৃষ্ণ) ক্রমে বর্তায়। কিন্তু তখন তা আর জলসাঘর নেই। অংশীভূত পারিবারিক কক্ষের রূপ নিয়েছে। দোতলার বিরাট নাচঘর কালের গতিকে পরিণত হয়েছে অন্দরমহলের কটি কক্ষে। কিন্তু বংশের ধারায় সংগীতের অনুরাগ ও অনুষ্ঠান তখনো অন্তর্ধান করেনি। বিরাট দেউড়ির বাঁদিকে বৈঠকখানায় আসর বসান অসীমকৃষ্ণ। টপ্পা গায়ক বিহারীলাল বসু সেখানে নিয়মিত গান শোনান। আরো নানা গুণী আসেন মাঝে মাঝে। টপ্পাচার্য মহেশ ওস্তাদের শিষ্য বিহারীলাল সাধারণ রঙ্গমঞ্চেও দেখা দিতেন। আর অসীমকৃষ্ণের আসরে তিনি ছিলেন মহারসিক মজলিসী ব্যক্তি। সদা রসিকতার জন্যে তাঁর নাম হয় জ্যাঠা বিহারী। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর একদিন তাঁকে বলেন, 'এঁচোড়ে পাকা।' বিহারী তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, 'কিন্তু মহারাজ, কোয়ায় মিষ্টি।' যতীন্দ্রমোহন সেটি উপভোগ করেছিলেন। অসীমকৃষ্ণের বৈঠকে জ্যাঠা বিহারীর মতন আসতেন রসরাজ—নট, নাট্যকার, নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু। গানের আসরের মতন মজলিসও তখন রসালাপে জমজমাট হয়ে উঠত। অসীমকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর ছিল সরস হৃদ্যতার সম্পর্ক। অমৃতলাল তাঁকে নিয়েও যখন রহস্য পরিহাস করতেন; তিনিও যোগ দিতেন সহাস্যে। তাঁর ইতিহাসচর্চা আর নানা বিষয়ে খেয়াল ইত্যাদির সঙ্গে চিত্রিত করে অমৃতলাল এক প্রহসন লেখেন। তার নাম 'রাজা বাহাদুর'। স্টার থিয়েটারে 'রাজা বাহাদুর' অভিনয়ও হত। অমৃতলালের আমন্ত্রণে তা দেখেনও অসীমকৃষ্ণ। তাঁকে নিয়েই হাস্যরসিকতা তিনি দর্শকদের সঙ্গে বেশ উপভোগ করতেন। আর অমৃতলালকে জানাতেন, 'বাঃ বেশ লিখেছেন ত।'

মজলিসী, সরল, বিদ্যানুরাগী অসীমকৃষ্ণ সঙ্গীতে শুধু অনুরক্ত ছিলেন না। সংগীত বিষয়ে তাঁর ছিল অন্তর্দৃষ্টি। রাজকৃষ্ণের আমলের অন্যান্য অনেক কিছুই লোপ পেয়েছিল। কিন্তু পরিণত, পরিপক্ক সঙ্গীতমানস ছিল অসীমকৃষ্ণের। আর নানা শ্রেষ্ঠ কলাবৎ কলাবতীদের শোনা অভিজ্ঞ কান। নিজের বৈঠক থেকে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়পরিজন সকলের আসরে অর্জিত সঙ্গীতজ্ঞান। তাই তাঁর স্বীকৃতি কিরণময়ীর সংগীতগুণের একটি বড় পরিচিতি মনে করা যায়।

কিরণময়ীর গান যে অসীমকৃষ্ণ শোনেন তা হল বিশ শতকের একেবারে প্রথম দিকের কথা। তখনকার গান-বাজনা হত বিশেষ ঘরোয়া আসরে। কিন্তু সেখানেও বাইজীদের গান সচরাচর শোনা যেত না। পারিবারিক আসরে তখনো জাতে ওঠেন নি বাইজীরা। কলাবৎরাও বাইজীদের সঙ্গে একাসরে অনুষ্ঠান করতেন না। ১৯২৮ সালের 'লালচাঁদ উৎসব'-এর আগে পর্যন্ত তাই ছিল রেওয়াজ। বাইজী ও পুরুষ শিল্পীদের জন্যে আলাদা আসর। কিংবা একই আসরে পৃথক দিন। বাইজীদের আসর হত গৃহপতির বাগানবাড়িতে। তাঁর বাসস্থল থেকে দূরে। 'বাগানবাড়ি' কথাটিরই একটি বিশেষ তাৎপর্য ছিল। কিরণময়ী তেমনি একজন গায়িকা। কিরণময়ীও সেকালের এক প্রসিদ্ধা বাইজী।

বাগানবাড়ি ভিন্ন কয়েকটি গৃহাসরেও বাইজীদের গান হত। যেমন জোড়াসাঁকোর দুনিয়ালাল শীলের ভবন। কিংবা তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীলের সময়েও। দুনিয়ালালের সেই আসরে মুজরো করেছেন কিরণময়ী। তারাপ্রসাদ ঘোষের আসরে কিরণময়ীর গান একবার অনাথনাথ বসু শুনেছিলেন। তিনি সে সময় বাংলার তরুণতম গায়ক। কিরণময়ীর কণ্ঠে অনাথনাথ শোনেন উৎকৃষ্ট টপ্পা ও খেয়াল।......

সেদিন তারাপ্রসাদ ঘোষের আসরে কিরণময়ীর গান শোনেন নি, তাঁকে শুধু দেখেছিলেন অসীমকৃষ্ণের কিশোর পুত্র। পরবর্তীকালে সাহিত্য সংস্কৃতির জগতে সুপরিচিত হারীতকৃষ্ণ দেব। সাহিত্যরথী

প্রমথ চৌধুরীর এক প্রিয় পাত্র, 'সবুজপত্র' গোষ্ঠীর অন্যতম, 'সবুজ পাতার ডাক' লেখক, সঙ্গীতজ্ঞ মজলিসী, বিদগ্ধ বাচনকুশলী হারীতকৃষ্ণ। তাঁর সময়ে রাজা রাজকৃষ্ণের সেই নাচঘরের এক ভগ্নাংশ শয়নকক্ষে পরিণত হয়েছিল। অবিবাহিত হারীতকৃষ্ণ বৃদ্ধ বয়সে কোন কোন দিন স্মৃতিচারণ করতেন সেখানে বসে। এক পাশে অসীমকৃষ্ণের সংগ্রহ ইতিহাস গ্রন্থাবলী। তাঁর পুরনো আমলের অলঙ্কৃত পুস্তকাধার। একদিকের দেওয়ালে সে যুগেরই একটি দেরাজ। তার ওপরের দিকে রাজকৃষ্ণের এক পৌত্র উপেন্দ্রকৃষ্ণের চিত্র। আরো ওপরে রাজকৃষ্ণের আমলের সেই অতি উচ্চ নাচঘরের ঘনবদ্ধ কড়িকাঠ। তারই নিচে হারীতকৃষ্ণের মনোরম স্মৃতিকথনের অনেকখানি জুড়ে থাকত—সঙ্গীত। প্রাসঙ্গিক ভাষণ শুধু নয়। নানা গানও। গাইতেন—নবাব ওয়াজেদ আলী শার রাজ্য হারাবার সেই ঠুংরি—'নিমক হারামে মুলুক বিগাড়া/মেরা মাল মুলোকো সব লুট লিয়া...।' কখনো শোনাতেন যদু ভট্টের দেওয়া সুরে ঝাঁপতালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাফি সিন্ধু গানখানি—'তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে/আর কেহ নাহি যে বিপদ ভয় বারে, আঁধারে যে তারে।।...' কখনো জানাতেন—তাঁর বালক বয়সে ফুলবাগানের (গলিটির পরে নাম হয় হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব লেন) দিকে তাঁদেরই কোন সরিকের আসর থেকে কেমন ভেসে আসত আর এক বিখ্যাত বাইজী যাদুমণির গান..। এমনি কোন সময়ে হয়ত কিরণময়ীর কথা হারীতকৃষ্ণের মনে পড়ে যেত। হেদুয়ার সামনেকার বাড়িতে আসরের শেষে সেই একবার দেখা। তারপর অসীমকৃষ্ণের মুখে কিরণময়ীর গানের বিষয়ে শোনা।...

তেমনি আর এক বিবরণে কিরণময়ীর কথা পাওয়া যায়। তাঁর সঙ্গীতজীবনের কিছু পরিচয়। তাঁর গাওয়া কোন কোন গান, কি কি রাগ তিনি বেশি গাইতেন সে প্রসঙ্গ। ব্যক্তিজীবনের কোন তথ্য নয়, শুধু গানের কথা। গায়িকা কিরণময়ীর কিছু উল্লেখ। আর তাঁর ওস্তাদের নাম পরিচয়। তা ছাড়া শোনা যায়—কিরণময়ীর সঙ্গে তাঁর ভগিনী সুরমার কথাও। কখনো তাঁদের দ্বৈতকণ্ঠে গান হত। সদাপটে খেয়াল শোনাতেন তাঁরা। হারীতকৃষ্ণ যখন কিরণময়ীকে দেখেন তার কিছু পরের কথা এসব। কিরণময়ীর সে সময় একটি আসরে গানের মুজরো হত একশ টাকা। এই সূত্র থেকে জানতে পারা যায়—কিরণময়ী ও সুরমা দুজনেই খেয়াল টপ্পা ইত্যাদির ভাল তালিম পেয়েছেন। তাঁদের ওস্তাদ হলেন রামকুমার মিশ্র। বারাণসীর প্রসিদ্ধ মনোহর ঘরানার সেই বিখ্যাত কলাবৎ, লছমী ওস্তাদের পিতা। কলকাতায় ক'বছর থাকবার সময় যাঁর একটি বাঙ্গালী শিষ্যমণ্ডলী গড়ে ওঠে। সে তালিকায় সকলেই গায়ক। শুধু দুজন গায়িকা—কিরণময়ী ও সুরমা। এমনি কিছু বৃত্তান্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের সূত্রে প্রাপ্ত। রামকুমার মিশ্রের ঘরের এক শিষ্য তুলসীদাস চট্টোপাধ্যায় (খেয়াল টপ্পা গুণী সাতকড়ি মালাকারের প্রথম সঙ্গীতশিক্ষক, বেহালা শিল্পী, নানা স্বরলিপি পুস্তকের রচয়িতা এবং গায়ক)। তাঁর পুত্র হরিদাস চট্টোপাধ্যায়—বেহালাবাদক, টপ্পা ইত্যাদি রীতির গায়ক এবং হিন্দুস্থান রেকর্ড সংস্থার অন্যতম কর্মকর্তা। তাঁর বংশপরিচয়ও উল্লেখ করবার যোগ্য। কলকাতার আদি ধ্রুপদাচার্য এবং যদু ভট্টের সঙ্গীতগুরু গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের (এক পৌত্র তুলসীদাস) অন্যতম প্রপৌত্র হরিদাস।

কিরণময়ীকে হরিদাস একেবারে কিশোর বয়সে দেখেছিলেন। তাঁর গানও শুনেছিলেন সে সময়। হরিদাসের বাল্য থেকেই বাড়িতে গানবাজনার পরিবেশ ছিল। নানা গায়কগায়িকার গান শোনবার তিনি সুযোগ পান নানা সূত্রে। কারণ তাঁদের চারপুরুষের সঙ্গীতজ্ঞ পরিবার। আর কিরণময়ীর গান প্রথম জীবনে শুনলেও মনে রেখেছিলেন। অনেক পরবর্তীকালে, শেষ জীবনেও সেসব স্মরণ করতেন হরিদাস। বর্তমানকালের পটে সে যুগের সঙ্গীত-মনন। ব্যক্তি লুপ্ত হয়ে তখন শুধু জেগে ওঠে গান। শিল্পীসত্তা সঙ্গীতে রূপ দিতে থাকে। তাঁর স্মৃতিধারায় ভেসে ভেসে দূরশ্রুত সুর-নির্ঝরিণী। কিরণময়ীদের কবেকার গাওয়া একেকটি গানের কলি। তারও কিছু হয়ত বাতাসে মিলিয়ে যায়। কিছু প্রতিধ্বনি করে কিরণময়ীর সঙ্গীতস্মরণী। বিভিন্ন গানের ছিন্ন রেশ—বিলীয়মান পটে খণ্ডিত কটি চিত্রাংশ...

ললিতকণ্ঠে সেই সুখরাই কানাড়ার বাণী—

'মধুমাতি কোয়েলিয়া বোলে রে
পাপিয়া নাচত মুরল বোলত...'

কিম্বা হাম্বীরের একটি বিলম্বিত লয়ের ঝুমরা—

'চামেলি ফুলি চম্পা
গুলাল গোধেলা বেলা...'

আর একখান ঝুমরা তালেরই কেদারা—

'চাঁদিনী রাতে......'

কিংবা বিলম্বিত আড়াঠেকা বেহাগটি—

'কমন ঢঙ্গ তেরা......'

এইসব রাগ নাকি বেশি প্রিয় ছিল কিরণময়ীর। বেশি গাইতেন সুখরাই কানাড়া, বেহাগ, হাম্বীর, কেদারা আর দরবারী কানাড়া, মালকোশ, দেশ, শঙ্করা ইত্যাদি।......

হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের বিবরণ এই পর্যন্ত।

কিরণময়ী সম্পর্কে অন্য সূত্রও আছে। আরো কিছু সমাচার। এখানে চিত্র অনেকখানি স্পষ্ট। স্বল্পকালের হলেও কিরণময়ী এখানে যেন নিকটেই। গায়িকার আরো কিছু পরিচয় মেলে। কাছে থেকে দেখা যায় কিরণময়ী সুরমাকে।

দুজনেই তখন নাম-করা বাইজী। সেরা গায়িকাদের মধ্যে কিরণময়ী সুরমার নাম। সঙ্গীত-সমাজে আর বাইজীবিলাসী-সমাজে প্রসিদ্ধা তাঁরা। গানের জন্যেই বেশি। তবে বাইজীদের যেমন দস্তুর—নর্তকীও দুজনে। কথক নৃত্যে পটিয়সী। আর এই পেশার চাহিদা যে বিশেষ সমাজে, সেখানে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। ভাল মুজরো করেন সঙ্গীতবিলাসীদের বাগান বাড়িতে। কিংবা নিজেদের ঘরের আসরে।

সিমলা পল্লীর চন্দ্রমাধব সুর লেন। তার মধ্যে একটি দোতলা বাড়ি। নিচের বড় ঘরখানিতে নাচ-গানের আসর বসে। কখনো সন্ধ্যায় কখনো নিশীথে মুজরো করেন কিরণময়ী সুরমা। নূপুরের ছন্দে, তবলার বোলে, সারঙ্গের ঝঙ্কারে, কলকণ্ঠ গানে রাত্রি সচকিত হয়ে ওঠে। কিরণময়ী সুরমার গানের সঙ্গে সারঙ্গ বাজান ওস্তাদ গৌরীশঙ্কর মিশ্র আর কালী ওস্তাদ। জমজমাট আসর। কিন্তু সাধারণের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। বিশেষ বিশেষ শ্রোতা আসতে পারেন, যাঁরা এক এক রাতের মুজরো দেন। তাঁদের সঙ্গে থাকেন অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব। শুধু তাঁরাই সে রাতের জন্যে অতিথি। কিরণময়ী সুরমার গান শুনে নাচ দেখে আমোদ করে যান।

মুজরোর খরচ যাঁরা করেন সকলেই কি সঙ্গীতের সমঝদার? কে জানে! কিন্তু পেশাদার শিল্পীর বিশেষ বাইজীর তা যাচাই করা চলে না। পেশার প্রয়োজনেই মেনে নিতে হয় সবাইকে। বাইজী জীবনের এই এক ট্র্যাজেডি! পুরুষ শিল্পীদের তুলনায় তা এখনো আরো মর্মান্তিক হয়ে ওঠে। বাই উপায়হীনা।

এমনিভাবেই তখন চন্দ্রমাধব লেনে কিরণময়ী সুরমার দিন চলে।

সে বাড়িরই দোতলায় বাস করেন দুই ভগিনী। সেখান থেকে বাইরেও মুজরো করতে যান। একতলাতেও আসর বসে কোন কোন দিন।

সে সময় বড়বাজারের একজন প্রায়ই আসেন। আহীর পদবীর এক ধনাঢ্য বিলাসী। অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে আসেন। বেশ রাত পর্যন্ত থাকেন আসরে। কখনো একজন কখনো দুজন বাইজীর গান শোনেন। নাচ দেখেন।

বাইজীর গানের সঙ্গে সারঙ্গ বাজাতে আসেন ওস্তাদ গৌরীশঙ্কর মিশ্র। তাঁর কনিষ্ঠ কালী ওস্তাদও সারঙ্গ বাজান।

গৌরীশঙ্কর যেমন গহর জানের সঙ্গতিয়া সারঙ্গী, তেমনি কিরণময়ী সুরমারও। বাংলায় আর দুজন শ্রেষ্ঠা বাইজীকে গৌরীশঙ্কর গান শেখান। তাঁরা হলেন শ্বেতাঙ্গিনী ও কৃষ্ণভামিনী। তাঁদের সঙ্গতকার হয়ে আসরে সারঙ্গও বাজান ওস্তাদজী। কিন্তু কিরণময়ী সুরমাকে তিনি গান শেখান বলে জানা যায়নি। এখানে মিশ্রজী শুধু বাদক বলেই শোনা যায়। তবে তাঁর তুল্য ওস্তাদের কাছে

সংগীত বিষয়ে উপযুক্ত হতে পারেন তাঁরা, শিক্ষা না করেও।

গৌরীশংকরের কাছে সেসময় গান লিখছেন ইন্দুবালা। পরবর্তীকালের বিখ্যাত গায়িকা তিনি। কিন্তু তখন তাঁর প্রথম জীবন। গায়িকা হিসেবে নামও হয়নি। ওস্তাদজীর বালিকা বয়সী এক ছাত্রী মাত্র।

ইন্দুবালাকে গৌরীশংকর একদিন কিরণময়ীর কাছে নিয়ে যান। কিরণময়ীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন ছাত্রী বলে।

ওস্তাদের সঙ্গে ইন্দুবালা কয়েকবারই সে বাড়িতে গেছেন। কিরণময়ী সুরমার নাচ গান দেখেছেন শুনেছেন কাছে বসে।

তখন সেই আত্মীয় ব্যক্তিটির জন্যে আসর করেন কিরণময়ী সুরমা। চন্দ্রমাধব সুর লেনের একতলার ঘরটিতে।

দুই বোনের চেহারায় কোন সাদৃশ্য নেই। দুজন অন্যরকম দেখতে শুনতে।

কিরণময়ী অতি রূপসী। কাঞ্চনবর্ণা এবং মুখশ্রীও সুন্দর। মাঝারি আকারের গড়ন। তন্বী বলা যায় তাকে।

আর সুরমা যেমন দীর্ঘাকৃতি, তেমনি প্রস্থেও। বিশাল শরীর তাঁর। আকৃতির জন্যে তাঁকে কিরণময়ীর চেয়ে জ্যেষ্ঠা মনে হত।

সুরমা আসরে আসবার সময় একদিন গৌরীশংকর সহাস্যে মন্তব্য করেন, 'সামনে পাহাড় চলতি হ্যায়। হাম লোগ সব পেড় হ্যায়।'

বেশ ক্ষুদ্রাকৃতিই ছিলেন গৌরীশংকর। তাঁর তুলনায় সুরমার আকারকে পাহাড় বলা যায় রহস্য করে।

কিন্তু নাচে আশ্চর্য নৈপুণ্য ছিল সুরমার। এমন সাবলীল তাঁর নৃত্যভঙ্গিমা যে দেহের বিরাটত্বের কথা দর্শকদের মনেও থাকত না। সেই শরীরকেই অবাধে যথা ইচ্ছা ছন্দিত দোলায়িত করতেন সুরমা।

কিরণময়ী সঙ্গীতে অতি পারদর্শিনী। সুরমার চেয়ে অনেকাংশেও বটেই। খেয়াল ও টপ্পায় বাংলার এক শ্রেষ্ঠা গায়িকা বলেই তিনি কীর্তিত আছেন। যদিও কণ্ঠ তাঁর ঈষৎ চাপা, আওয়াজ কিঞ্চিৎ ক্ষীণ ছিল, কিন্তু অতি সুরেলা আর সুমিষ্ট। গানে রীতিমত কলাবতী কিরণময়ী। কিন্তু নৃত্যে তাঁর তেমন পটুত্ব ছিল না।

সুরমার কণ্ঠ বলশালী, অনেক দূর পর্যন্ত তাঁর গান শোনা যেত। এমন দরাজ আওয়াজ বেশি ছিল না গায়িকাদের মধ্যে।

সেকালের বাইজীদের যেমন দস্তুর—আসরে তাঁরা সব রীতির গানই গাইতেন। খেয়াল টপ্পা ঠুংরি দাদরা কিংবা কাজরী চৈতী লাউনী ইত্যাদি। তবে আসরে রাগসংগীতের জন্যেই তাঁদের নাম ছিল বেশি এবং সেসবই হিন্দী গান। কিরণময়ী সুরমার বাংলা টপ্পা খেয়াল ধরণের গানের কথা তেমন শোনা যায় না—সমকালীন গায়িকা মানদাসুন্দরী কিংবা বাইজী শ্বেতাঙ্গিনী কৃষ্ণভামিনীর মতন।

সুরমার কিন্তু রাগসংগীত ভিন্ন আরো একটি সংগীত গুণ ছিল। উৎকৃষ্ট কীর্তন গায়িকাও তিনি। ভালভাবে কীর্তন গান শিখেছিলেন এবং পৃথক কীর্তনের আসরে গাইতেন। কীর্তন গায়িকা রূপে সুরমার এমন বিশিষ্ট পরিচয় ছিল যে কীর্তন গানের জগতে অপরিচিত থেকে যায় তাঁর খেয়াল টপ্পা ইত্যাদি গানের কথা।

চন্দ্রমাধব সুর লেনের বাড়িতে সেই আত্মীয় প্রভৃতির জন্যে যেসব আসর হত তা কীর্তন গানের নয়। সুরমার কীর্তনের আসর ছিল আলাদা। সেজন্যে খোল করতাল হারমোনিয়াম ইত্যাদি বাদকদের নিয়ে সুরমার ভিন্ন দল ছিল। শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষ্যে তাঁর কীর্তন হত গৃহস্থ বাড়িতে। সেকালে কীর্তন গায়িকার চলন ছিল সাধারণ গৃহে, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে। অথচ বাড়িতে বাইজীর আসর নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু সেই বাইজীই ছাড়-পত্র পেতেন কীর্তন গায়িকা-রূপে। সুরমাও তেমনি বহু গৃহস্থ ঘরে কীর্তন পরিবেশন করতেন। বিখ্যাত গায়িকা মানদাসুন্দরীও তেমনি একজন। তিনি নর্তকী না হলেও এই সমাজ বহির্ভূতা শ্রেণীরই। তাঁরও কীর্তনের আসর সাধারণ বাড়িতে হয়েছে কিন্তু রাগসংগীতের আসর নয়।

সুরমার সংগীতজীবনের এই দ্বৈত পরিচয়। বাইজী ও কীর্তনীয়া। রাগ-সংগীতের আসরে খেয়াল টপ্পা ইত্যাদি গায়িকা এবং নর্তকী। আর নিজস্ব দল নিয়ে কীর্তন গায়িকা।

তবে রাগসংগীতের গায়িকা বলে দুই ভগিনীর মধ্যে কিরণময়ীর নামই বেশি থেকে যায় শ্রুতি স্মৃতিতে।

আর ভাল কীর্তন গায়িকা হলেও সুরমার নাম বাইজী তালিকাতেই যুক্ত থাকে। কারণ কিরণময়ীর সঙ্গে একাসরে সুরমাও দেখা দেন অনেকদিন। দ্বৈত-কণ্ঠেও আসর করতেন। ওস্তাদ রামকুমার মিশ্রের কাছেই তালিম নিয়েছেন দুজনে। পেশাদার সঙ্গীতজীবনেও দুজনের সহ-যোগিতা দেখা গেছে অনেক সময়েই। জীবনের অনেকাংশ তাঁরা একত্র যাপন করেছেন। তখন একই বৃন্তে দুই পুষ্প যেন।

বাইজী জগতে এবং সংগীতের মজলিসে দুটি নাম একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে। কিরণময়ী ও সুরমা। আরও ঘনিষ্ঠ মহলে—'সারি কিরণ।'...

সেকালের বাংগালীর সঙ্গীত জীবনে একটি বাইজী-চিহ্নিত অধ্যায় ছিল। সংক্ষিপ্ত কিন্তু বর্ণবহুল সেটি। বাংলার সাঙ্গীতিক ইতিহাসে তারও আছে বিশিষ্ট দান। সেই বাইজী ধারার পটে কিরণময়ী সুরমার স্থান কাল এখানে পর্যালোচনা করা হল।

বাংলার বাইজীরা পশ্চিমের তুলনায় সংখ্যায় অল্প। বাইজী অর্থাৎ একাধারে নর্তকী ও গায়িকা। কলকাতাতেও ছিলেন পশ্চিমাঞ্চলের বহু বাইজী। আদ্যন্ত বৌবাজার স্ট্রীট ও সংলগ্ন অঞ্চল জুড়ে তাঁদের বিরাট এলাকা। লক্ষ্ণৌ দিল্লী আগ্রা কাশী এলাহাবাদ প্রতাপগড় চুনার ভাগলপুর ইত্যাদি নানা অঞ্চল থেকে নানা সময়ে তাঁরা কলকাতায় এসেছেন। আর মধ্য কলকাতায় গড়ে উঠেছে পশ্চিমী বাইজী পল্লী। কলকাতার সংগীতপ্রেমী ধনীদের আনুকূল্য যেমন উত্তর ভারতীয় কলাবতরা লাভ করেছেন, তেমনি এই কলা-বতীরাও। কম পক্ষেও তাঁরা শতাধিক বলা যায়। সে হিসাবে কিছু নাম হয়েছে এমন বাংগালী বাইজী কয়েকজন মাত্র। যেমন, বিশ শতকের প্রথম দিকে কুসুম বাইজী, সরলাসুন্দরী বাইজী বসন্ত বাইজী জ্ঞানদা বাইজী, হীরা বাই প্রভৃতি কজন ছিলেন যাঁদের গানের রেকর্ড হয়েছিল। তেমনি আরো কয়েকজন নর্তকী-গায়িকা ছিলেন বটে। কিন্তু বাঙ্গালীদের মধ্যে সব-চেয়ে প্রসিদ্ধা বাইজী এঁরা অবশ্য নন। ঊনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথম পাদকে শ্রেষ্ঠা বাংগালী বাইজী চার-পাঁচজন। প্রথম সারির পশ্চিমী বাইজীদের সমযোগ্যা যাঁরা। তাঁরা হলেন যাদুমণি কিরণময়ী (এবং সুরমা) শ্বেতাঙ্গিনী ও কৃষ্ণভামিনী। গানের সঙ্গে নৃত্যেও পটিয়সী তাঁরা। কিন্তু শুধু গায়িকা মানদাসুন্দরী কিংবা শুধু নর্তকী লীলা প্রমুখের নাম এই তালিকায় দেওয়া যায় না।

বাঙ্গালী বাইজীরা প্রায় সকলেই উত্তর কলকাতা নিবাসিনী। চিৎপুরের ওই চিহ্নিত অঞ্চলে আর কেউ বা সিমলায়। কিরণময়ী সুরমাও অনেকদিন সমলা পল্লীতে থাকেন। তার আগে হাওড়ায়। তবে নাম-ডাক তখন হয়নি। সে প্রসংগ পরের কথা।

বাংলার সবচেয়ে নামী এই ৪।৫ জন বাইজীরা প্রায় সমসাময়িক। তবে বয়সে তারতম্য আছে। যাদুমণির চেয়ে কৃষ্ণ-ভামিনী প্রায় ৩০ বছরের বয়োকনিষ্ঠা। যাদুমণির একেবারে অন্তিম পর্বে কৃষ্ণ-ভামিনী প্রতিষ্ঠা পান। তাঁর সমকালীন শ্বেতাঙ্গিনী বয়সে কিছু বড়। শ্বেতাঙ্গিনী ও যাদুমণির মাঝখানে কিরণময়ী, সুরমা। কিছু বয়োজ্যেষ্ঠা কিরণময়ী সুরমার সঙ্গে শ্বেতাঙ্গিনী কৃষ্ণভামিনী বিখ্যাত বাইজী ছিলেন একই সময়ে। তা হল এই শতকের প্রথম ২০।২৫ বছরের কথা।

পাঁচজনের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠা যাদুমণি। তাঁর জন্ম আনুমানিক ১৮৫৪ সালে। প্রথম জীবনে যাদুমণিকে কিছুদিন গায়িকা অভিনেত্রীও দেখা যায়। বাংলার পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের সেই আদি যুগে। গ্রেট ন্যাশনালের সেই বিখ্যাত গীতিনাট্য 'সতী কি কলঙ্কিনী'তে (১৮৭৪) যখন তিনি রাধিকা সাজতেন। তার দু চার বছর আগে হয়ত জন্ম হয় সুরমা আর

কিরণময়ীর। তারপর দুই সহোদরার চেয়ে ৬।৭ বছরের বয়োকনিষ্ঠা হলেন শ্বেতাঙ্গিনী। তেমনি শ্বেতাঙ্গিনীর কয়েক বছরের কনিষ্ঠা কৃষ্ণভামিনী।

যাদুমণির মৃত্যু সন ১৯১৮। শ্বেতাঙ্গিনীর দেহান্ত হয় ১৯২৩।২৪ সালে। কৃষ্ণভামিনীরও তার কাছাকাছি সময়ে। সুরমা ১৯৩০।৩১ সালেও জীবিত ছিলেন, এই পর্যন্ত শোনা যায় তাঁর বিষয়ে। একেবারে অন্তিম পর্ব অজ্ঞাত। কিরণময়ীর তেমনি মৃত্যুকাল জানা যায়নি। তাঁদের জীবনের অধিকাংশ যেমন ছায়ায় আবৃত হয়ে আছে, তেমনি শেষের সংবাদও। বাংলার শ্রেষ্ঠা বাইজীদের মধ্যে শুধু তাঁদের দুজনেরই বিয়োগ পঞ্জী জানতে পারা যায়নি।

বাংলার এক শ্রেষ্ঠা গায়িকা শিল্পী হয়েও লুপ্ত গৌরব কিরণময়ী। যাদুমণি শ্বেতাঙ্গিনী কৃষ্ণভামিনীর সঙ্গে গানের জন্যে এক পংক্তিতে তাঁর নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। সমাজেও তাঁদেরই মতন অপাংক্তেয়, পতিতা। আলোকিত আসরের বাইরে অন্ধকারের জীব। জীবনের এক দিকে আলোর জগৎ, অন্যদিকে নিবিড় ছায়া। সার্থকতা ও ব্যর্থতা, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, সুখ্যাতি ও অখ্যাতিতে গড়া সে জীবন বৃত্ত। তার বেশির ভাগই নেপথ্যচারী।

সেই আলো আঁধারির মধ্যে থেকে ছিন্ন কটি জীবন-সূত্র লোক-লোচনে এসেছিল। এখানে ধরে দেওয়া হল তার অসম্পূর্ণ কাহিনী।

একশ বছর আগেকার কথা। কিরণময়ী সুরমার জীবন পট তখন প্রথম উন্মোচন হয়েছিল। ঘটনাস্থল কলকাতা নয়, তবে অদূরেই। ভাগীরথীর পশ্চিম পারে হাওড়া। তারই একটি বসতি। যেখান থেকে রামকৃষ্ণপুরের আরম্ভ হয়েছে, কাহিনীরও সূচনা সেইখানে।

গঙ্গাতীরের হাওড়া একালে যেন বৃহত্তর কলকাতারই অংশ। নিরন্তর সংযোগে অবিচ্ছিন্ন। শতাব্দ আগে তেমন ছিল না বটে। তবু রাজধানীর সঙ্গে তখনো যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ, নৌকাসেতুর মাধ্যমে। তারই একটি নিভৃত অঞ্চলে ধীর মন্থর সেযুগের জীবনযাত্রা।

গঙ্গার পশ্চিম তীর থেকে নিকটেই হাওড়া ময়দান। সেই ময়দানের পাশ দিয়ে গ্রান্ড ট্রাংক রোড শিবপুরের দিকে শেষ যাত্রা করেছে। সে পথে কিছু দূরেই একটি বাজার। সারাদিনের বিকিকিনি সেখানে হয় না। অপরাহ্ণ পর্যন্ত তার রুদ্ধ দুয়ার। দিনের আলো নিভে এলেই সে বাজার বসে। আর বেসাতি চলে রাত্রি প্রথম দ্বিতীয় প্রহর পর্যন্ত। পরদিন সকাল থেকে সূর্যাস্ত তার কর্মব্যস্ততা থাকে না। পুনরায় শুরু হয় সন্ধ্যা থেকে। এমনিভাবে দিনের পর দিন। তাই নাম তার সন্ধ্যা বাজার।

সেই শতবর্ষ আগেকার সন্ধ্যা বাজারের পাশেই একটি ছোট অঞ্চল। সংকীর্ণ কটি গলির মধ্যে সারি সারি ঘর। বেশির ভাগই বস্তী। পাকা বাড়ির সংখ্যা খুবই কম। সবই একতলা। এরই মধ্যে বিস্তৃত একটি নিষিদ্ধ পল্লী। এখানে বাসিন্দারা সকলেই পসারিণী। সবাই পণ্যাঙ্গনা।

সেখানেও সন্ধ্যার পর বেসাতি আরম্ভ হয়। কিন্তু সন্ধ্যা বাজারের মতন প্রথম রাতে তার শেষ নয়। সারা রাত্রি সে জীবন্ত হাটের সময়। রজনী যোগেই পল্লীটির জাগরণ। ঘুমন্ত থাকে সারা দিনমান।। দিন সেখানে নিশী থনী। তার সূর্যাস্তের শেষে সবাই জেগে ওঠে। দেখা যায় নিবাসিনীদের। প্রদীপের কিংবা লণ্ঠনের আলোয়। কোন কোন ঘরের দরজায়। কোথাও অন্দরে। ওরই মধ্যে থাকে কিছু কিছু তারতম্য। সমস্তরের নয় সকলে। ধরণ ধারণ রূপ গুণ রুচি মূল্য ইত্যাদিতে নানা রকম। জীবনযাত্রায়ও। সবাই বারবধূ বলে চিহ্নিতা। বেশির ভাগই সাময়িক নর্ম সহচরী থেকে যায়। কিন্তু তার মধ্যেই কেউ এক বা একাধিক সংসর্গে জীবনযাপন করে চলে ঘরণী হয়ে। সমাজ সংসারের বাইরে তাদের নকল পরিবার গড়ে ওঠে।...

সন্ধ্যা বাজারের সে পল্লীতে ছিল এমনি এক শ্রীর সংসার। তার চার কন্যা তখন নিতান্ত শিশু ও বালিকা বয়সী। এ কাহিনীর যখন সূচনা তার আগেই সে দুর্ভাগিনীর মৃত্যু হয়েছে। তার বর্ষীয়সী জননী থাকে সংসারের কর্ত্রী হয়ে। বালিকাদের নাম — হিরন্ময়ী, জ্যোতির্ময়ী, কিরণময়ী ও সুরমা। শেষের দুজনকে শিশু বলা যায়। সে পরিবেশের কোন মালিন্য চারজনকেই স্পর্শ করেনি তখনো।

চারটি পঙ্কজিনীর কাছেই আলোকের বার্তা এসেছিল। ভাগ্যক্রমে, অভাবিত ভাবে।...

সন্ধ্যা বাজারের অনতিদূরে আর একটি জন বসতি। এ লোকালয়ের চরিত্র একেবারে বিপরীত। সামাজিক গৃহস্থ পরিবারের বাস এখানে।

হাওড়া-শিবপুর সরণির বাঁদিকে সন্ধ্যা বাজার। আর সেই পথ থেকে ডান দিকে বাঁক নিয়েছে খুরুট রোড। সেই দিকে। যেখানে পরে হয় কালীবাবুর বাজার, তার পিছনে। মল্লিক ফটক বলেও এলাকাটি পরিচিত। রামকৃষ্ণপুরও এখান থেকে আরম্ভ বলা যায়। সেখান থেকেই আলোর আহ্বান আসে কিরণময়ী সুরমার জীবনে।

মল্লিক ফটকের অঞ্চলে ছিল কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের বাড়ি। সেই শতাব্দ আগেকার কথা, যখন কালীবাবুর বাজার গড়ে ওঠেনি। জনবিরল নিরিবিলি এলাকা। সে সময় সপরিবারে তিনি সেখানে বাস করতেন।

সাহিত্য সংস্কৃতি জগতের সেকালে এক বহু বিখ্যাত ব্যক্তি কৃষ্ণকমল। প্রথমে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক, পরিণত বয়সে রিপণ কলেজের অধ্যক্ষ তিনি। স্বনামধন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' পত্রিকার (১৮৯১) সম্পাদক হন কৃষ্ণকমল এবং ৩০ বছর বয়সী রবীন্দ্রনাথ তার সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সমকালীন বিবৃতি পাওয়া যায়— 'আমাদের হিতবাদী বলে একখানা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বেরোচ্ছে। একটি বড় রকমের কোম্পানী খুলে কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া যাচ্ছে। ২৫,০০০ টাকা মূলধন।...কৃষ্ণকমলবাবুকে প্রধান সম্পাদক আমাকে সাহিত্য সম্পাদক এবং মোহিনীকে রাজনৈতিক সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়েছে। বঙ্কিম, রমেশ দত্ত প্রভৃতি অনেক ভাল। ভাল লোক লেখা দিতে রাজি হয়েছেন। (শ্রাবণ ১৩৪৯ বিশ্বভারতী পত্রিকায় উদ্ধৃত পত্র) 'সাধনা বাহির হইবার পূর্বেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হয়। যাঁহারা ইহার জন্মদাতা ও অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণকমলবাবু, সুরেন্দ্রবাবু, নবীনচন্দ্র বড়ালই প্রধান ছিলেন। কৃষ্ণকমলবাবুও সম্পাদক ছিলেন, সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোট গল্প সমালোচনা ও সাহিত্য প্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোট গল্প লেখার সূত্রপাত ঐখানেই।' (আত্ম পরিচয়)।

বঙ্কিমযুগের বিখ্যাত পজিটিভিস্ট মনীষী, তীক্ষ্ণধী পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। 'আমি positivist. আমি নাস্তিক'— এই তাঁর আত্মপরিচয়। জার্মাণ দার্শনিক কোঁতের শিষ্য তিনি। 'ভারতী' পত্রিকায় (শ্রাবণ, পৌষ ১২৯২) তিনি দুটি প্রবন্ধ লেখেন— 'Positivism কাহাকে বলে?' ও 'প্রামাণিক ধর্ম'। আর দার্শনিক মনীষী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার প্রতিবাদ করেন 'পজিটিবিজম ও আধ্যাত্মিক ধর্ম' প্রবন্ধে। দ্বিজেন্দ্রনাথ সে সময় কৃষ্ণকমল সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসুকে একটি পত্রে লিখেছিলেন, —কৃষ্ণকমল যে সে লোক

He is a terrible fellow. He knows how to write and how to fight and how to slight all things divine......'

এ হেন কৃষ্ণকমলের বাস ছিল হাওড়ার খুরুট রোডের সেই মল্লিক ফটকে। সন্ধ্যা

বাজার থেকে মিনিট পাঁচেকের পথ তাঁর বাড়ি। তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছিল বিডন স্ট্রীটে, মিনার্ভা থিয়েটারের কাছে। তাঁদের বংশ পণ্ডিতের বৃত্তিজীবী। তাঁর পিতা ছিলেন বিডন স্ট্রীটের এক পরিবারের গুরু। তাঁরাই মল্লিক ফটকে নিজেদের একটি বাড়ি কৃষ্ণকমলকে নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করেছিলেন। সেই সূত্রেই তাঁর রামকৃষ্ণপুরে বাস।

ব্যক্তিজীবনে মহাতেজস্বী ছিলেন কৃষ্ণকমল। নিজে যা ন্যায় বিবেচনা করতেন, কারো কথায় তা থেকে নিবৃত্ত হতেন না। সংস্কারের একটি বলিষ্ঠ সত্তা ছিল তাঁর চরিত্রে।

কিভাবে জানা যায় না, সন্ধ্যা বাজারের সেই নবালিকাদের কৃষ্ণকমল গৃহে আসা-যাওয়া হত। হিরণ্ময়ী জ্যোতির্ময়ী তখন নিতান্তই বালিকা। আর কিরণময়ী সুরমা শিশু।

কৃষ্ণকমলের পত্নীও ছিলেন অতি দয়াবতী। পরদুঃখকাতর অন্তর তাঁর। তিনি বালিকাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতেন। স্বামী স্ত্রী দুজনের কাছেই সাহায্য পেত মাতৃহারা চার ভগিনী। তাদের অসামাজিক ভবিষ্যতের কথা হয়ত কৃষ্ণকমল ভেবেছিলেন। এই নিষ্পাপ বালিকারা একদিন তাদের বংশগত গ্লানিময় ব্যবসায়ে লিপ্ত হবে, এই চিন্তায় হয়ত ক্লিষ্ট হয়েছিলেন তিনি। বিদ্যা শিক্ষার মধ্যে তাদের মুক্তির উপায়ের কথাই তাঁর মনে হয়। শুধু অর্থ সাহায্য না করে তাদের পরম মঙ্গলের জন্যেও সচেষ্ট হন তিনি। আর স্থির করেন, যেন তাদের স্থান হয় সুস্থ সমাজজীবনে। কৃষ্ণকমল উদযোগী হয়ে হিরণ্ময়ী জ্যোতির্ময়ীকে সব চেয়ে নামী বালিকা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। কিন্তু তাদের দিদিমার আদৌ মত ছিল না এ বিষয়ে। হিরণ্ময়ী জ্যোতির্ময়ীও বংশের পেশা নিয়ে থাকবে, উপার্জন করবে—এই ছিল তার একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু কৃষ্ণকমল ও তাঁর পত্নী সাহায্য করতেন বলে সে নারী বাধা দিতে পারেনি।

কৃষ্ণকমলের ব্যবস্থাপনায় সেই উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা পেতে থাকে হিরণ্ময়ী ও জ্যোতির্ময়ী। এমনিভাবে কিছুকাল যায়।

কৃষ্ণকমলের যতখানি ইচ্ছা ছিল, তেমন হলনা বটে, কিন্তু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়নি হিরণ্ময়ী জ্যোতির্ময়ী। আর তাদের অভিভাবিকার অভিসন্ধিও চরিতার্থ হতে পারেনি। দুজনের কেউই ফিরে যায়নি সেই গ্লানিময় পেশায়। হিরণ্ময়ীর সব কথা জানা যায় না। কিন্তু জ্যোতির্ময়ী যাপন করেছিল নিষ্কলুষ সংসার জীবন।...

তারপর কনিষ্ঠা দুজনও একটু বড় হল। তখন তাদেরও বিদ্যালয়ে দিতে চাইলেন কৃষ্ণকমল। কিন্তু এবার তিনি ব্যর্থ হলেন। কিরণময়ী সুরমাকে বাইজী হবার ব্যবস্থা করে তাদের দিদিমা। ওস্তাদের কাছে নৃত্যগীত শেখাতে থাকে। অল্প বয়সেই প্রকাশ পায় দুজনের সঙ্গীতকণ্ঠ। আর কর্ত্রী তদের পেশাদার গায়িকা নর্তকীর জন্যে প্রস্তুত করে। বাইজী হয়ে তারা যেন অনেক উপার্জন করতে পারে। লেখাপড়া শিখে কি হবে? চিরাচরিত বংশের ধারা যেমন ছিল, তেমনি চলুক। তাদের দিদিমার এই একমাত্র লক্ষ্য ছিল জীবনে।

তখন কৃষ্ণকমল বিরক্ত হয়ে তাদের সাহায্য বন্ধ করে দিলেন।

কিন্তু তিনি জানতেন না একটি কথা' সুরমা কিরণ তাঁর পরিবারের দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত হয়নি, নাচ গান শেখা আরম্ভ করেও।

কৃষ্ণকমল পরে রামকৃষ্ণপুরে অনেক সময় থাকতেন না। বেশিরভাগ বাস করতেন কলকাতায়। বিডন গার্ডেনের দক্ষিণ পূর্ব কোণে একটি বাসায়। আর তাঁর অজ্ঞাতে কিরণ সুরমাকে তাঁর পত্নী সাহায্য করতেন। মাতৃহীনাদের প্রতি তাঁর দয়া ছিল পূর্ববৎ।...

এইভাবে সন্ধ্যা বাজারের নিষিদ্ধ পল্লীতে দুটি সঙ্গীত শিল্পীর জন্ম হয়েছিল। পঙ্ক পল্বল থেকে যেমন দেখা দেয় কমলিনী। অবজ্ঞাত জগতের বাসিন্দা। তাই সে জীবনের সংবাদ অপ্রাপ্য। কেমন করে সেই পরিবেশে দুটি প্রতিভার বিকাশ হল, কিভাবে দুজনের সঙ্গীত-জীবনের সূচনা বা ওস্তাদ রামকুমার মিশ্রের কাছে তালিমের ব্যবস্থা হয়, তারপর কোন সময় থেকে সঙ্গীতজগতে প্রতিষ্ঠা পান কিরণময়ী সুরমা—এসব তথ্য কিছুই জানা যায় না। কবে কোথায় কত বয়সে দুজনের মৃত্যু হয়েছিল সে সব কথাও অজ্ঞাত। তাঁদের নৃত্যের ওস্তাদের কিংবা সুরমার কীর্তন গানের গুরুর নাম পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

যে বিবরণ জানা গেছে তা অতি সামান্য। হাওড়ায় সেখান থেকে পরে তাঁরা কলকাতা-বাসিনী হয়েছিলেন। সব সময় যে দুজনে একত্র যাপন করতেন, তা নয়। তার মধ্যে এক সময়ে থাকেন সিমলা অঞ্চলে। আর এক সময়ে শ্যামবাজার স্ট্রীট ও শ্যামপুকুর স্ট্রীটের সংযোগস্থলে। এই বাড়িটি নাকি সুরমার নিজস্ব ছিল। এখানে তাঁর কাছে কিছুকাল বাস করতে আসেন কিরণময়ী। তা হল তাঁদের পরিণত বয়সের কথা। সুরমার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ আর কিছুই জানা যায় না। কিন্তু কিরণময়ীর কথা কিছু আছে। একাধিক ব্যক্তির আশ্রয়ে ও সংসর্গে তিনি ছিলেন বিভিন্ন সময়ে। এক কন্যা ও একটি পুত্রের জননী হন। গৃহবধূর জীবনে প্রবেশ করেছিল কন্যাটি। আর কিরণময়ীর পুত্র সন্ন্যাসী হয়ে বিশ্ববিখ্যাত ধর্মীয়. সেবা প্রতিষ্ঠানে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।...

আগেই বলা হয়েছে, দুই ভগিনীর মধ্যে গায়িকা বলে কিরণময়ী বেশী প্রসিদ্ধা হন। তাঁর কয়েকখানি গান রেকর্ড হয় গ্রামো-ফোনের প্রথম যুগে। কিন্তু সেসব রেকর্ডের তালিকা বা কোন পরিচয় ও সন্ধান পাওয়া যায় না। সেকালের গ্রামোফোন জগতে মিস কিরণ বলে এক গায়িকা ছিলেন বেশ নামী। বিভিন্ন রাগে তাঁর অন্তত ১৫ খানি রেকর্ড তালিকা পাওয়া যায়। কিরণময়ীই কি মিস কিরণ? এ প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর দেবে কে? একথা জানবার কোন উপায় আছে কি?

মৌন মহাকাল।...

স্মরণের পারাবারে কিরণময়ীর আ একটি কাহিনী ভেসে আসে। একটি খণ্ড প্রসঙ্গ। ছিন্ন ভিন্ন একটি ঘটনামাত্র। তা উল্লেখ না করতে পারলেই সুখের হত কিন্তু সে যুগে একটি তামস দিক, পতিত জীবনের এক মর্মন্তুদ ট্র্যাজেডি আর এ প্রতিভাময়ী শিল্পীর চরম অবমাননা দৃষ্টান্তস্বরূপ বিবৃত করতে হল এখানে।

১৯০৫।৬ সালের কথা। সেকালে নাগর সমাজের একজন প্রতিনিধি বলা যা তাঁকে। একাধারে তিনি কলকাতার এক মহ ধনীর দৌহিত্র এবং যশোরের জনৈক রাজ উপাধিক ভূস্বামীর পোষ্যপুত্র। ভো বিলাসিতাই তাঁর জীবনচর্যায় প্রধান স্থা নিয়েছিল। আর তার এক মুখ্য উপকর ছিল—বাগানবাড়ি ও রক্ষিতা। সঙ্গীতগুণে জন্যে না রূপ যৌবনের জন্যে, সৌভাগ্য কিংব দুর্ভাগ্যক্রমে জানা যায় না—কিরণময়ী তখ তাঁর আশ্রয়ে বাস করতেন। বেলগাছিয়ার খা পার হয়ে ডান দিকের একটি পথে বাগান বাড়ি। সেখানে তিনি কিরণময়ীকে রাখেন আর মাঝে মাঝেই সেখানে আসতেন সন্ধ্যা পরে। কখনো রাত্রিবাসও করে যেতেন।

একদিন অকস্মাৎ এসে দেখেন—নিভৃ নিকুঞ্জকক্ষে কিরণময়ীর সঙ্গে আর এ ব্যক্তি!

বাইজীর এত বড় চরিত্রচ্যুতি সে ক্রে বরদাস্ত করতে পারলেন না। আপন হাতে শাস্তি দিলেন তদ্দণ্ডেই। চাবুকের আঘাতে কিরণময়ীকে বাগানবাড়ি থেকে বিতাড়িত করে ক্ষান্ত হলেন।

অচিরেই অবশ্য একটি রক্ষিতা এ তিনি পূর্ণ করেছিলেন কিরণময়ীর অভাব-জানা যায় একথা।

কিন্তু জানা যায় নি, কষাঘাতে জর্জরিতা কিরণময়ী সে রাত্রে বেলগাছিয়া থেকে কোথায় গিয়েছিলেন। কার দয়ার পাত্র হয়েছিলেন হতভাগিনী শিল্পী! কিং কেমন করে, কত দিন পরে তাঁর পুনর্বাস হয় তারপর।

আধো-আলো আধো-ছায়ায় ঘেরা সু দুজনের প্রতিমা। জানা অজানার আলো আঁধারে কিরণের লেখা।

—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

দিল, সেই অন্নদাতার একটু সেবা করলে কি তোর মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত? একেবারে নেমকহারাম!

অনেকদিন পরে মন্টেকে ঢুকতে দেখলাম হোটেলে; জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে তাহলে। ওর সঙ্গে দু-চারজন পারিষদ সব সময়েই থাকে। ওদের আবার আমার খাতির করতেই হয়। যা দিনকাল পড়েছে। একটু বুঝে চলাই ভাল। একমুখ হেসে মন্টেকে অভ্যর্থনা করলাম:

'কি গুরু। কবে ফিরলে?'

একটা অশ্লীল বিশেষণ প্রয়োগ করে কালো কালো দাঁতগুলো বার করে মন্টে-গুন্ডা বললো:

'শ্বশুরবাড়ী থেকে ছাড়তে কি আর চায়?

মাসখানেক কাটিয়ে এলাম।'

তারপর সে সবিস্তারে নিজের বাহাদুরির কাহিনীর বর্ণনা দিতে শুরু করলো—কিভাবে এক গাড়িওয়ালাবাবুকে বেশ করে পিটিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়েছিল। ব্যাটারা গাড়ী চড়বে আরাম করে, টাকার গরম আর কি!

ভিটোকে চায়ের ফরমাস দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়েই তীক্ষ্ণ একটা শিস দিয়ে চোখ টিপে একটা অশ্লীল মন্তব্য করলো মন্টে। সঙ্গে সঙ্গে স-পারিষদ হেসে গড়িয়ে পড়লো। ওদের লক্ষ্যস্থলের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আমার হোটেলের পাশের গলির কমলা। বোধহয় অফিস থেকে ফিরছে। টেলিফোনে চাকরী করে মেয়েটি। বেশ সুন্দরী আর শান্ত স্বভাবা। ভালই মনে হয় দেখলে। মন্টের শিস আর বিশ্রী হাসিতে বিরক্ত হয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে তাড়াতাড়ি গলিতে ঢুকে পড়লো কমলা। আশ্চর্য সাহস ভিটোর। চা আনার বদলে ও একেবারে মন্টের টেবিলের পাশে দাঁড়িয়েছে। এ ছোকরাটাও আড্ডাবাজ হয়ে উঠলো নাকি? মন্টে ততক্ষণে টেবিল চাপড়িয়ে একটা হিন্দী গান ধরেছে বিশ্রী হেঁড়ে গলায়। এ পরিস্থিতি অস্বস্তিকর লাগছিলো আমার। তাড়াতাড়ি ভিটোকে ধমকে উঠলাম। মন্টের দিকে আর একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভিটো ভিতর দিকে চলে গেল। চাউনিটা খুব মোলায়েম বলে আমার বোধ হল না।

কিন্তু আমার বোধহয় ভুল হয়েছিল। এরপর ভিটো মন্টের অনুরাগী হয়ে উঠলো। মন্টে রোজ আসা শুরু করলো। আর কারণে অকারণে ওর টেবিলের আশে-পাশেই ভিটোকে ঘোরাফেরা করতে দেখতাম। মন্টে আর তার পার্শ্বচরদের কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনতো। আমার একটা ভয় ধরে গেল। উঠতি বয়সের ছোকরা। যদি কাজকর্ম ছেড়ে মন্টে গুন্ডার দলে ভিড়ে পড়ে, কিছু বলতেও পারবো না মন্টের ভয়ে। কিন্তু এত কম মাইনেতে এত বেশী কাজ আর কারো কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। তাই আমি ভিটো আর মন্টের ওপর চোখ রাখলাম।

দিন দুয়েক মন্টে আসেনি। তারপর যখন এল নতুন এক বাহাদুরির কাহিনী নিয়ে এল। ইদানীং বোধহয় কমলা ওর চোখে পড়ে গিয়ে থাকবে। কমলাকে অনু-সরণ করে ওদের বাড়ী পর্যন্ত গিয়েছিল নাকি কাল রাত্রে। খুব রসিয়ে রসিয়ে মন্টে সাকরেদদের দেখাচ্ছিল, শেষ অবধি কমলা কিভাবে ছুটতে শুরু করেছিল। শেষে বললো, 'দেখবি, ওকে বাগে আমি আনবই। একেবারে ট্যাক্সিতে তুলে হাওয়া হবো তবে আমি মন্টে সামন্ত।' হ্যা হ্যা করে হাসতে লাগলো সে। আমি ভয় পেলাম। বাহাদুরি দেখানোর জন্যে মন্টে সবকিছুই করতে পারে। কোন মেয়েঘটিত কেলেঙ্কারি আমার হোটেলে হোক এটা আমি চাই না। ভদ্রপাড়ার মধ্যে হোটেল। বদনাম হয়ে যাবে। কিন্তু আশ্চর্য আজ ভিটো। মন্টের টেবিলের পাশে একভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তীক্ষ্ণ জ্বলজ্বলে চোখ দুটো মন্টের মুখের ওপর। চা আনতেও ভুলে গেল নাকি?

কমলার বাবাকে এরপর থেকে দেখতাম মেয়ের সঙ্গে। বুড়ো মানুষ। লাঠি ভর দিয়ে দিয়ে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসতেন। বাবা-মেয়ের সংসারে আর কোনো তৃতীয় প্রাণী নেই। ডিউটি থেকে ফিরবার সময় কমলা বাস থেকে নামলেই ভিটোকে দেখতাম তীরের মত ছুটে হোটেল থেকে বেরিয়ে যেতে। কমলার সঙ্গে গলির মধ্যে ঢুকে যেত। যখন ফিরে আসত যথা-রীতি নির্বিকার। ওর সঙ্গে যে কমলার আলাপ আছে ওর হাবভাব দেখে তা বোঝা যেত না। কমলার রুক্ষ চাউনিটাও যেন অনেকটা সহজ হয়ে আসে ভিটোকে দেখলে।

কয়েকদিন ধরে লক্ষ্য করছি ভিটো যেন কি রকম অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। কি চিন্তা করে, আর মাঝে মাঝে চোখ দুটো জ্বলে ওঠে। মন্টেও আসেনি কয়েকদিন। প্রায় পনেরদিন পর মন্টে এক নতুন খবর নিয়ে এল। আমাদের শহরের উপকণ্ঠে যে ঝিল আছে, সেখানে পাখী শিকারে যাওয়া হবে। এই শীতের সময়ে অজস্র পাখী আসে সেখানে। এয়ারগান জোগাড় হয়েছে। আর কেউ না গেলে ও একলাই যাবে। ও যখন গোঁ ধরে, এই রকমই করে। হঠাৎ ভিটো বলে বসলো 'আমাকে নেবেন?' মন্টে বললো, 'সাঁতার জানিস?' ভিটো জানে বলায় বললো, 'আমি আবার জানি না। থাকগে, ভালই হল। মালপত্র বয়ে নিয়ে যেতে পারবি।'

ভিটো কখনও ছুটিছাটা নেয় না। তাই যখন ও মাত্র একদিনের ছুটি চাইল অমত করতে পারলাম না। ওকে চটানো যায় না। বিশেষ করে মন্টে যখন এর মধ্যে জড়িত। মন্টের সঙ্গীরা কেউই গেল না। তাদের এক-একজনের পেশা এক একরকম। সরগরম বাজার ফেলে মন্টের সঙ্গে পাখী শিকারে যাওয়াটা তারা বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলো না। তাই কোন না কোন ছুতোয় তারা কাটিয়ে গেল। কিন্তু মন্টে 'শিকারী' এই খেতাবের বাহাদুরি নেওয়ার লোভে একলাই ভিটোকে নিয়ে রওনা হল।

সে রাত্রিতে ভিটো ফিরলো না। একটু চিন্তিত হলাম। ফিরলো না পরদিন সকালেও। গুন্ডাটার সঙ্গে যেতে না দিলেই হতো। হাজার হোক মা-বাপ মরা ছেলে ছোট থেকে এত বড়টা আমার কাছেই হলো। বিপদ কিছু হলো না তো? মনটা খারাপ হয়ে গেল।

সন্ধ্যে নাগাদ পুলিশের গাড়ী এল ভিটোকে নিয়ে। তাদের কাছেই শুনলাম দুর্ঘটনার কথা। ভিটো আনাড়ীহাতে নৌকো বাইছিল। প্রকাণ্ড ঝিলের মাঝামাঝি চলে এসে একঝাঁক পাখী দেখে মন্টে উঠে দাঁড়িয়ে গুলি করতে গিয়ে টাল সামলাতে পারেনি। নৌকো উল্টে একেবারে গভীর জলে। ভিটো সাঁতরে কোনক্রমে কূলে এসে উঠেছে। কিন্তু মন্টে সাঁতার জানতো না। তার দেহটা এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। ভিটোকে কাঁদতে দেখে স্থানীয় লোকজন পুলিশে খবর দেয়। বেচারী একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর পুলিশ পৌঁছে দিয়ে গেল। এটা নেহাতই দুর্ঘটনা। তাই এই নিয়ে আর হৈ-চৈ হল না।

জীবন আবার আগের মতই স্বাভাবিক-ভাবে চলতে লাগলো। ভিটোও আমার হোটেলে যথারীতি মন দিয়ে কাজকর্ম করছে। শুধু ওর চাউনিটা আর আগের মত তীক্ষ্ণ জ্বলজ্বলে নেই। অনেক কোমল হয়ে এসেছে।

(৩)

অজিতবাবু তাঁর বইয়ে লিখেছেন—'শরৎচন্দ্র যখন রেঙ্গুন হইতে পেগুতে গিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল জীবন-ধারা পুরোপুরি বজায় ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—'তিনি তখন উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিতেছেন। শনি হইতে মঙ্গলবার তাঁহাকে বড় একটা অফিসে পাওয়া যাইত না।'—শরৎ-পরিচয়।'

ব্রজেনবাবুর 'শরৎ-পরিচয়' গ্রন্থের এই লেখার মধ্যে যে ভুল আছে, অজিতবাবু তা ধরতে ত পারেনই নি, অধিকন্তু তিনি ব্রজেনবাবু না বললেও ব্রজেনবাবুর কথার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পেগু যাওয়ার আগের জীবনটাও পুরোপুরি উচ্ছৃঙ্খল ছিল বলে যোগ করে দিয়েছেন।

শরৎচন্দ্রের পেগু যাওয়া, সেখানে থাকা এবং সেখানে তাঁর চাকরির কথা, শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থের একটি অধ্যায় বিস্তৃতভাবেই লিখে গেছেন। গিরীনবাবুর ঐ লেখার মধ্যে এমন কথা কোথাও ঘুণাক্ষরেও নেই যে, শরৎচন্দ্র পেগুতে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতেন। বরং তাঁর লেখা থেকে এইটাই জানা যায় যে, শরৎচন্দ্র পেগুতে ভদ্র বাড়ীতে থেকে ভদ্রভাবেই জীবন যাপন করতেন; আর কিছুদিন একটা অস্থায়ী চাকরি করা ছাড়া বাকি সময়টা চাকরির চেষ্টায়, ধানের ব্যবসায় এবং উকিল হওয়ার আশায় কাটিয়েছিলেন। সাহিত্য-চর্চাও করতেন।

গিরীনবাবুর বইতে দেখা যায়, শরৎচন্দ্র পেগুতে গিয়েছিলেন গিরীনবাবুর সঙ্গেই। শরৎচন্দ্র পেগুতে গিয়ে গিরীনবাবুর সঙ্গেই প্রথমে ছিলেন পেগুর পি-ডবলিউ-ডি বিভাগের আসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার মিঃ সি কে সরকারের বাড়িতে। মিঃ সরকারের বাড়িতে কয়েকদিন থাকার পর শরৎচন্দ্র পেগুর উকিল অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়ে থাকেন। গিরীনবাবু লিখেছেন—'শরৎচন্দ্রের সহিত আলাপ-পরিচয়ে (মিঃ সি কে সরকার) বিশেষ আনন্দিত হইলেন। মিঃ সরকারের আতিথ্যের উপর বিশেষ অত্যাচার হইবে ভাবিয়া শরৎচন্দ্র একটু সংকুচিত হওয়ায় আমি তাঁহাকে অবিনাশবাবুর বাড়িতে রাখিয়া রেঙ্গুনে গেলাম এবং পর সপ্তাহে আবার পেগুতে ফিরিয়া আসিলাম।' সি কে সরকার ও অবিনাশবাবু এঁরা উভয়েই ছিলেন গিরীনবাবুর বন্ধু।

গিরীনবাবু তাঁর বইয়ে অবিনাশবাবুর বাড়ি কোথায় ছিল এবং কিভাবে তিনি শরৎচন্দ্রকে গ্রহণ করেছিলেন, এ সম্বন্ধে কিছু না বললেও, এ বিষয়ে আমি যা জেনেছি তা এই—অবিনাশবাবুর বাড়ি ছিল হুগলী জেলার বৈদ্যবাটী গ্রামে। এই বৈদ্যবাটী ও শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান দেবানন্দপুরের দূরত্ব মাইল বার। তাই পেগুতে সেই বিদেশের অবিনাশবাবু শরৎচন্দ্রকে নিজের দেশের লোক হিসেবে সাদরেই রেখেছিলেন। শরৎচন্দ্র অবিনাশবাবুর বাড়িতে তাঁর কাছে ছিলেন পাঁচ ছ' মাসের মত। এই সময়ই অবিনাশবাবু সি কে সরকারকে বলে তাঁর অফিসে শরৎচন্দ্রের একটা অস্থায়ী চাকরিও করে দিয়েছিলেন। সে চাকরিটা ছিল মাস তিনেকের মত।

অবিনাশবাবু এই সময় কঠিন অসুখে আক্রান্ত হওয়ায় কলকাতায় চিকিৎসা করাবার জন্য বৈদ্যবাটীতে চলে আসেন।

আসবার সময় তিনি তাঁর বাড়িতে ও সেরেস্তায় প্রতিনিধি হিসাবে পেগুর উকিল নৃপেন্দ্রকুমার মিত্রকে রেখে আসেন এবং শরৎচন্দ্র পূর্ববৎ তাঁর বাড়িতেই থাকবেন, একথাও নৃপেনবাবুকে বলে আসেন।

নৃপেনবাবু শরৎচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয়ে ও তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হন এবং তাঁকে নিজের ছোট ভাইয়ের মত দেখতে থাকেন। তিনি শরৎচন্দ্রকে বেকার দেখে তাঁর চাকরির চেষ্টা করেন, কিন্তু চাকরি না পাওয়ায় তাঁকে নাঙ্গলাবিনে নিজের খুড়তুতো ভাই পি কে মিত্রের ধানের ব্যবসায়ে লাগান। ধানের ব্যবসা শরৎচন্দ্রের ভাল না লাগায় তিনি ফিরে আসেন। নৃপেনবাবু নিজ ব্যয়ে শরৎচন্দ্রকে বর্মী ভাষা শেখানোর জন্য একজন গৃহশিক্ষক রেখে তাঁকে উকিল করবারও চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র অত অল্প সময়ে বর্মী ভাষায় পরীক্ষায় পাস করতে পারেন নি। গিরীনবাবু তাঁর বইয়ে এসব কথা পরিষ্কার করে লিখে গেছেন। গিরীনবাবু লিখেছেন—শরৎচন্দ্র নৃপেনবাবুর কাছে প্রায় বছর খানেক ছিলেন

নাঙ্গলাবিনে ধানের ব্যবসা, পেগুতে চাকরি ও ওকালতি কিছুই না হওয়ায় নৃপেনবাবু শেষে তাঁর অপর খুড়তুতো ভাই রেঙ্গুনের একজামিনার পাবলিক ওয়ার্কস অ্যাকাউন্ট অফিসের ডেপুটি একজামিনার মণীন্দ্রকুমার মিত্রকে বলে তাঁর অফিসে শরৎচন্দ্রের চাকরি করে দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে শেষদিন পর্যন্ত এই চাকরিই করেছিলেন।

মণীন্দ্রকুমার মিত্রের সঙ্গে অবিনাশবাবুর বাড়িতেই শরৎচন্দ্রের পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়েছিল। এঁদের এই প্রথম পরিচয়ের কথা গিরীনবাবু বিস্তৃতভাবে তাঁর বইয়ে লিখে গেছেন। গিরীনবাবুর সেই লেখাটা সংক্ষেপে এই—মণিবাবু একবার সস্ত্রীক অবিনাশবাবুর পেগুর বাড়িতে অতিথি হন। শরৎচন্দ্র তখন অবিনাশবাবুর বাড়িতেই থাকেন। অবিনাশবাবু সেদিন রাত্রে নবাগত অতিথিদের সম্মানে বাড়িতে

টা প্রীতিভোজের আয়োজন করেছিলেন।' ই ভোজে অবিনাশবাবু নিজের কয়েকজন বুকেও নিমন্ত্রণ করেন। সেই নিমন্ত্রণ ভায় অবিনাশবাবুর বন্ধু সি কে সরকার জার মজার গল্প বলে সকলকে খুব হাসিয়েছিলেন। তাঁর গল্পের পর রাত্রির অন্ধকারে ঝিঁঝির ডাক, ব্যাঙের কলরব ও বৃষ্টির টাপুর টুপুর শব্দের মধ্যে সুর-শিল্পী শরৎচন্দ্র তাঁর স্বভাবসুলভ মধুর-কণ্ঠে কয়েকটি গান গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করলেন। ভাবুক শরৎচন্দ্রের প্রত্যেক গানটি শ্রোতাদের মর্মস্থল স্পর্শ করল। সঙ্গীতপ্রিয় ণিবাবু শরৎচন্দ্রের গানে যারপরনাই প্রীত হয়ে তাঁকে তাঁর রেঙ্গুনের বাড়িতে খাবার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন।'

অবিনাশবাবু শরৎচন্দ্রকে সুগায়ক জনে যেমন স্নেহ করতেন, তেমনি শরৎ-চন্দ্রের নিজের মুখেই তাঁর বাল্যের সাহিত্য চর্চার কথা জানতে পেরে তাঁকে সাহিত্য-সাধনা করবার জন্যও উৎসাহ দিতেন। শরৎচন্দ্র পেগুতে অবিনাশবাবুর উৎসাহে আবার সাহিত্য-সাধনা শুরুও করেছিলেন। এই সময়েই শরৎচন্দ্র একবার রাত্রে পেগু থেকে রেঙ্গুনে যেতে গিয়ে একটা বইয়ের প্লট ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে স্টেশনে পাশাপাশি দুটি গাড়ি থাকায় ভুল করে রেঙ্গুনের বদলে নাঙ্গলাবিনে চলে গিয়েছিলেন।

অবিনাশবাবু বন্ধুবান্ধব সহ শিকারে বেরোবার সময় শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে নিতেন। তাছাড়া শরৎচন্দ্র অবিনাশবাবুর বাড়িতে এতটা নিজের লোকের মতন হয়ে গিয়েছিলেন যে অবিনাশবাবু সঙ্গে না থাকলেও তিনি অবিনাশবাবুর বন্দুক নিয়েই অন্যের সঙ্গে শিকারে যেতেন। এসব কথাই গিরীনবাবু তাঁর বইয়ে লিখে গেছেন।

অবিনাশবাবু সুস্থ হয়ে পুনরায় বর্মায় ফিরে গেলে, শরৎচন্দ্র তাঁর এই উপকারী ও শ্রদ্ধেয় বন্ধুর সঙ্গে বরাবরই যোগসূত্র রেখেছিলেন। অবিনাশবাবুও শরৎচন্দ্রকে সাহিত্য সাধনার জন্য সব সময়েই উৎসাহ দিতেন। এইজন্যই ১৯২৫ খৃঃ ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বৈদ্যবাটী ইয়ং মেনস এসোসিয়েশন বৈদ্যবাটীতে শরৎচন্দ্রকে যে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন, সেই সম্বর্ধনার উত্তর দিতে গিয়ে তিনি সকৃতজ্ঞ-চিত্তে বৈদ্যবাটীর এই অবিনাশবাবুর কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন —জলধর সেন এবং অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমার পিছনে লেগে না থাকলে আমার মত অলস লোকের পক্ষে এত লেখা সম্ভব হত না।

শরৎচন্দ্রের সেদিনের সেই ভাষণ বৈদ্য-বাটী ইয়ং মেনস এসোসিয়েশনের বার্ষিক বিবরণীর খাতায় আজও লেখা আছে। ১৯৩৪ খৃঃ এই ইয়ং মেনস এসোসিয়েশনের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের সময় যে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, সেই স্মারক গ্রন্থের সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত শরৎচন্দ্রের এই কথাগুলি ঐ স্মারকগ্রন্থেও মুদ্রিত করেছেন।

ব্রজেনবাবু লিখেছেন—শরৎচন্দ্র পেগুতে যে অফিসে চাকরি করেছিলেন, সেখানে তাঁর উপরওয়ালা ছিলেন পূর্বোক্ত মিঃ সি কে সরকার। সি কে সরকার যে অবিনাশবাবুর বন্ধু এবং শরৎচন্দ্রেরও চাকরির আগে থেকেই পরিচিত সে কথা আগেই বলেছি। শরৎচন্দ্র যদি উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে শনি থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত অফিস কামাই করতেন (যেটাকে অজিতবাবু আবার গবেষণা করে বলেছেন, শরৎচন্দ্র ঐ কদিন নিয়মিত পতিতা-লয়ে কাটাতেন) তাহলে সেকথা নিশ্চয়ই সি কে সরকার অবিনাশবাবুকে বলতেন। না বললেও অবিনাশবাবু নিজেও জানতে পারতেন। আর তাহলে তিনি ঐরূপ উচ্ছৃঙ্খল শরৎচন্দ্রকে কখনই নিজের বাড়িতে রাখতেন না।

অতএব এখন বলা যেতে পারে শরৎচন্দ্রের পেগুর জীবন সম্বন্ধে এখানে এই যে আলো-চনা করলাম, এতে পরিষ্কার দেখা গেল শরৎচন্দ্র পেগুতে আদৌ উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করেন নি এবং শনি থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত অফিস কামাই করে চাকরিও খোয়ান নি। তাঁর চাকরিই ছিল কয়েক মাসের টেম্পরারি।

শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের আর এক বন্ধু সতীশচন্দ্র দাসও তাঁর 'শরৎ-প্রতিভা' গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের পেগুর চাকরি জীবনের কথা কিছুটা লিখেছেন। শরৎচন্দ্র পেগুতে গিয়ে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করেছিলেন, সতীশ-বাবুও এমন কথা তাঁর বইয়ে কোথাও লেখেন নি। শুধু পেগুর কথাই বা কেন, পেগু যাওয়ার আগেও শরৎচন্দ্র উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতেন, এমন কথাও গিরীনবাবু সতীশবাবু কেউই কোথাও বলেন নি।

অজিতবাবু গিরীনবাবু ও সতীশবাবুর বই ভালভাবেই পড়েছেন। কেন না, প্রয়োজন-বোধে তিনি এঁদের বই থেকে বহু উদ্ধৃতি তাঁর বইয়ে দিয়েছেন। গিরীনবাবুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পেগু যাওয়ার কাহিনীটিও অজিতবাবু তাঁর বইয়ে বিস্তৃতভাবে এই গিরীনবাবুর বই থেকেই উদ্ধৃত করেছেন। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, পেগুতে শরৎচন্দ্রের চাকরি ও তাঁর অবস্থানের কথাটা লেখবার সময় অজিতবাবু শরৎচন্দ্রের 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' গিরীনবাবুর লেখা সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে শরৎচন্দ্রের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কলকাতাবাসী ব্রজেনবাবুর কাহিনীটি লিখে গেলেন। সেখানে আর গিরীনবাবুর নামও উল্লেখ করলেন না।

ব্রজেনবাবুর লেখা যে ভুল ও অসত্য অজিতবাবু তা ধরতে তো পারলেনই না, অধিকন্তু তিনি ইচ্ছা করেই শরৎচন্দ্রকে হেয় করবার জন্য গিরীনবাবুর কথা বাদ দিয়ে ব্রজেনবাবুর বর্ণিত কথাটাই লিখে গেলেন।

শরৎচন্দ্রের পেগুর জীবনের কথা লিখতে গিয়ে ব্রজেনবাবু যে ভুলটা করেছেন, এখন সেই কথাই বলছি। ব্রজেনবাবু তাঁর 'শরৎ পরিচয়' গ্রন্থে ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্রের চাকরি জীবনের একটা তালিকা দিয়েছেন। ঐ তালিকার মধ্যে এক জায়গায় তিনি লিখে-ছেন—'শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে যাওয়ার দু-তিন মাস পরে অঘোরবাবু বর্মা রেলের এজেন্ট জন সাহেবকে অনুরোধ করে তাঁর অফিসে ৭৫।৮০ টাকার একটি চাকরিও সংগ্রহ

করিয়া দিলেন। ...জেলোজশাহীর মৃত্যুর তিন-চার মাস পরে শরৎচন্দ্র সাহেবের সহিত ঝগড়া করিয়া এজেন্ট অফিসের চাকরিতে ইস্তফা দিয়াছিলেন। তিনি অতঃপর অন্য-সন্ধানে ব্যপদেশে রেঙ্গুন ছাড়িয়া উত্তর ব্রহ্মে গমন করেন। সেখানে আমহার্স্ট জেলার অন্তর্গত মৌলমিন-পেগুতে পি-ডবলিউ-ডির হিসাব বিভাগে সত্তর আশী টাকায় একটি চাকরি জুটিল। কিন্তু দুই তিন মাসের অধিককাল শরৎচন্দ্র ঐ পদে স্থায়ী হইতে পারেন নাই। তিনি তখন উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিতেছেন।' ইত্যাদি

ব্রজেনবাবু কিভাবে, কোথা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে শরৎচন্দ্রের ব্রহ্মদেশের চাকরি জীবনের এই তালিকাটি তৈরি করেন, তা তিনি বলেন নি। শরৎচন্দ্র পেগুতে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতেন এবং ঐ উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য তিনি যে শনি থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত বড় একটা অফিসে যেতেন না, এ কথাই বা তিনি কার কাছ থেকে শুনে লিখেছেন, তাও বলেন নি।

ব্রজেনবাবুর বর্ণিত শরৎচন্দ্রের চাকরি-জীবনের সমস্ত তালিকাটিই যে ভুল তা শরৎচন্দ্রের অফিসের সহকর্মী ও রেঙ্গুনের বন্ধুদের লেখা পড়লেই বেশ বোঝা যায়। এখানে শুধু একটা উদাহরণ দিচ্ছি—ব্রজেনবাবু লিখেছেন—বর্মা রেলওয়ের এজেন্ট জন সাহেবকে ধরে অঘোরবাবু তাঁর অফিসে অর্থাৎ এজেন্ট অফিসে শরৎচন্দ্রের একটা চাকরি করে দিয়েছিলেন। ঐ চাকরিতে মাইনের কথাটাও ব্রজেনবাবু পরিষ্কার বলতে পারেন নি। ব্রজেনবাবু বর্ণিত শরৎচন্দ্রের এজেন্ট অফিসের চাকরিটাকে, শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তিরা—যেমন যোগেন্দ্রমোহন রায়, সতীশচন্দ্র দাস, বিচার-পতি এ এন সেন—বর্মা রেলওয়ের একাউন্টেন্ট কৃষ্ণকুমার বসুকে ধরে বর্মা রেলওয়ের হিসাব বিভাগের অস্থায়ী চাকরি বলেছেন।

এইরূপ আরও বলতে চাই যে ব্রজেন-বাবু শরৎচন্দ্রের পেগুর চাকরি জীবন সম্বন্ধে কার কাছে শুনেছিলেন জানি না, তবে তিনি যার কাছেই শুনুন মিথ্যা সংবাদই শুনেছিলেন। কারণ, মৌলমিন ও পেগু মোটেই আমহার্স্ট জেলার অন্তর্গত নয়। মৌলমিন ও পেগু এরা নিজেরাই দুটি পৃথক জেলা এবং মৌলমিন ও পেগু শহর দুটি যথাক্রমে ঐ দুই জেলারই সদর শহর। এই দুটি শহরের দূরত্ব শতাধিক মাইল।

ব্রজেনবাবু শরৎচন্দ্রের পেগুর কথা লিখতে গিয়ে তাঁর সংবাদদাতার কাছে যেমন 'আমহার্স্ট জেলার অন্তর্গত মৌলমিন-পেগু' এই মিথ্যা কথাটা শোনেন, তেমনি শরৎচন্দ্র উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের জন্য শনি থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত বড় একটা অফিসে যেতেন না—এই মিথ্যা কথাটাও শুনেছিলেন। শরৎচন্দ্র যে পেগুতে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতেন না এবং সেজন্য যে অফিস কামাই করতেন না, সেও শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকারের বিস্তৃত-ভাবে বর্ণিত পেগুর জীবন কাহিনী পড়লেই পরিষ্কার জানা যায়।

অজিতবাবু লিখেছেন — ব্রহ্মদেশে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের সময় শরৎচন্দ্র যে অতিমাত্রায় বেশ্যাসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা সত্য। যে পরিবেশে যেসব লোকেদের সঙ্গে তিনি দিন কাটাইতেন, তাহাতে পতিতা নারীর সংসর্গ লাভ তাঁহার জীবনে অনিবার্য ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উক্তির মধ্যে বারবনিতালয়ে শরৎ-চন্দ্রের নিয়মিত দিন যাপনের ইঙ্গিত রহিয়াছে। 'শনি হইতে মঙ্গলবার তাঁহাকে বড় একটা অফিসে পাওয়া যাইত না।'

পেগুতে শরৎচন্দ্র উচ্ছৃঙ্খল জীবনের জন্য শনি থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত বড় একটা অফিসে যেতেন না, ব্রজেনবাবুর বর্ণিত এই অসত্য কথাটাকে নিয়ে অজিতবাবু তাঁর অতি সহজ গবেষণায় সিদ্ধান্ত করেছেন শরৎচন্দ্র ঐ কদিন নিয়মিত বারবণিতালয়ে কাটাতেন এবং জোর দিয়ে বলেছেন—উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের সময় শরৎচন্দ্র যে অতিমাত্রায় বেশ্যাসক্ত ছিলেন, তাহা সত্য।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—তা যে সত্য, একথা অজিতবাবু আজ দু পুরুষ পরে জানলেন কি করে? শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের বন্ধুরা যাঁরা দিনের পর দিন, বছরের পর বছর শরৎচন্দ্রের সঙ্গে মিশেছেন, তাঁরা ত কই তাঁদের বইয়ে এমন কথা কোথাও ঘুণাক্ষরেও বলেন নি। অজিতবাবু শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের বন্ধুদের কথা বাদ দিয়ে ইচ্ছা করেই শরৎ-চন্দ্রকে হেয় করবার জন্যই যেন ব্রজেনবাবুর ঐ মিথ্যা বর্ণনাটা নিয়ে তার উপর আবার নিজের গবেষণা চালিয়ে এই কথা লিখেছেন।

ব্রজেনবাবু না জেনে বা ভুল শুনে শরৎচন্দ্রের পেগুর জীবনকে উচ্ছৃঙ্খল জীবন বললেও শরৎচন্দ্র তখন যে অতিমাত্রায় বেশ্যা-সক্ত ছিলেন, এমন কথা কিন্তু বলেন নি। ব্রজেনবাবু বর্ণিত 'উচ্ছৃঙ্খল জীবন' কথাটা থেকে টেনে অজিতবাবু তাঁর মন্তব্য করেছেন। কিন্তু কেউ 'উচ্ছৃঙ্খল' হলেই তাকে যে অতিমাত্রায় বেশ্যাসক্ত হতে হবে তাই বা কে বললে? উচ্ছৃঙ্খল বলতে—অনিয়ন্ত্রিত, যথেচ্ছাচারী বা স্বেচ্ছাচারীও ত বলা যেতে পারে! আর বড় একটা অফিসে পাওয়া যেত না বললেই কি বলতে হবে, ঐ কদিন নিয়মিত পতিতালয়ে কাটাতেন?

ব্রজেনবাবু না জেনে শরৎচন্দ্রের পেগুর জীবনকে উচ্ছৃঙ্খল জীবন বললেও শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে মিস্ত্রী পল্লীতে মিস্ত্রীদের মধ্যে যখন ছিলেন, তখন তিনি উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতেন, এমন কথা কিন্তু আদৌ বলেন নি। অজিতবাবু ব্রজেনবাবুর বর্ণিত শরৎ-চন্দ্রের পেগুর উচ্ছৃঙ্খল জীবনের ভুল কথাটা নিয়ে, তাকে আর শুধু পেগুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি, শরৎচন্দ্রের পরবর্তী-কালে রেঙ্গুনে মিস্ত্রীপল্লীতে থাকার সময়-কাল পর্যন্ত টেনে এনেছেন এবং বলতে চেয়েছেন মিস্ত্রীপল্লীতে থাকার সময় মিস্ত্রীদের মত শরৎচন্দ্রও সপ্তাহে নিয়মিত চার দিন পতিতালয়ে থাকতেন।

এই মিস্ত্রীদের কথায় অজিতবাবু তাঁর বইয়ে অন্যত্রও বলেছেন—'তাহাদের (মিস্ত্রী-দের) জীবনধারাও ছিল অতিমাত্রায় নগ্ন ও কদর্য।...এই সব নিন্দনীয় মানুষের সঙ্গে শরৎচন্দ্র নিজের জীবন জড়িত করিলেন, কলুষ ও পঙ্কিলতা হইতে তিনিও মুক্ত হইতে পারিলেন না।...এই কুৎসিৎ পল্লীর কদর্য মানুষগুলির প্রাত্যহিক পঙ্ক-মলিন জীবনযাত্রায় হত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।'

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে চাকরি করার সময় বোটাটং পোজনডং অঞ্চলে মিস্ত্রীদের মধ্যে থাকতেন এবং এখানেই তিনি তাঁর রেঙ্গুন জীবনের অধিকাংশ সময় কাটান। গিরীন্দ্রনাথ সরকার' সতীশচন্দ্র দাস ও যোগেন্দ্রনাথ সরকার—শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের এই ঘনিষ্ঠবন্ধুরা তাঁদের নিজ নিজ বইয়ে মিস্ত্রীপল্লীতে শরৎচন্দ্রের অবস্থানের কথা এবং মিস্ত্রীদের কথাও বিস্তৃতভাবে লিখে গেছেন। মিস্ত্রীপল্লীর প্রসঙ্গে গিরীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর বইয়ে লিখেছেন—'শহর হইতে মাইল দুই দূরে শরৎচন্দ্র যেখানে থাকিতেন, সে স্থানগুলির নাম বোটাটং ও পোজনডং। ...সকল মিস্ত্রী দলবদ্ধ হইয়া এ অঞ্চলে সপরিবারে বাস করিত।...শরৎচন্দ্রের কোনরূপ আত্মাভিমান না থাকায় তিনি মিস্ত্রীদের সহিত অবাধে মেলামেশা করিতেন, তাহাদের চাকরির দরখাস্ত লিখিয়া দিতেন, বিবাদ-বিসংবাদের সালিশ হইতেন, রোগে হোমিও-প্যাথী ঔষধ দিতেন, সেবা-শুশ্রূষা

এল আই. সি. বীমাপত্রের মালিকগণের স্বার্থে প্রচারিত

আপনার এল.আই.সি-র প্রিমিয়াম সময়মতো ও সঠিক অফিসে জমা দিন

এতে দাবীর টাকা দ্রুত মেটানো সম্ভব হয়

ধার্য্য তারিখে জীবন বীমার প্রিমিয়াম জমা দেওয়া আপনার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। বীমা-পত্রের নম্বরটি উল্লেখ করা এবং প্রিমিয়ামটি সংশ্লিষ্ট অফিসে জমা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। সবচেয়ে ভাল হয়, যদি টাকা জমা দেওয়ার সময়ে প্রিমিয়াম নোটিশটি সেই সঙ্গে-জুড়ে দেন—তা না হ'লে প্রিমিয়ামটি সঠিক বীমা-পত্রের খাতে জমা করা এবং যথাযোগ্য রসিদ ইস্যু করা মুস্কিল হয়ে পড়ে। এর ফলে মেয়াদ অন্তে দাবীর টাকা মেটাতে বিলম্ব হয়।

আপনার বীমার দাবীর টাকা পেতে যাতে দেরী না হয়, তার জন্যে আপনার এ সবের দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ: উত্তরাধিকারীর নাম উল্লেখ করুন। বয়সের প্রমাণ দাখিল করুন এবং বীমাপত্রে সেটি প্রমাণিত করে রাখুন। ঠিকানায় পরিবর্তন হলে এল. আই. সি. কে জানান।

আপনি যে এজেন্টের কাছ থেকে বীমা-পত্র নিয়েছেন তাঁর সাহায্য নিন—অথবা নিকটস্থ এল. আই. সি. অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করুন-যাতে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন যে বীমাপত্রটি যথাযথভাবে ও চালু অবস্থায় থাকে।

লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

RADEUS/LIC/AS-2

করিতেন। এই সকল গুণের জন্য ওখানকার সকলেই শরৎচন্দ্রকে যথেষ্ট আন্তরিক ভক্তি করিত।'

রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের অফিসের সহকর্মী যোগেন্দ্রনাথ সরকারও তাঁর 'ব্রহ্ম-প্রবাসে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে এই মিস্ত্রীপল্লীর কথা লিখে গেছেন। তিনি শরৎচন্দ্রের এখানকার বাসায় প্রায়ই যেতেন। তিনি দেখেছেন—পল্লীর লোকেরা শরৎচন্দ্রকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত। আর এও দেখেছেন—যে সব মিস্ত্রী অত্যন্ত মদ খেত, শরৎচন্দ্র তাদের মদ খাওয়াও ছাড়াতেন। সাধু নামে একজন মিস্ত্রীর ঐরূপে মদ ছাড়ানোর কথা, যোগেনবাবু তাঁর বইয়ে বিস্তৃতভাবে লিখে গেছেন।

'শরৎ-প্রতিভা' গ্রন্থের লেখক সতীশচন্দ্র দাস নিজেও এই বোটাটং অঞ্চলেই থাকতেন। তিনি রেঙ্গুনে বি আই এস এন কোম্পানীতে কার্গো সুপারিন্টেণ্ডেন্টের অফিসের কেরাণী ছিলেন। থাকতেন এখানে। তিনি লিখেছেন—'শরৎদা রেঙ্গুনে থাকাকালে আমার সঙ্গে অন্ততঃ ছয় সাত বছরের বন্ধুত্বভাব ছিল। এমন কি কিছুদিন এক-বাড়িতেও বাস করিয়াছি। বোটাটং অঞ্চলে ছিল আমাদের মেস। আমরা থাকতাম তিন-তলায়, শরৎদা থাকতেন চারতলায়। অনেক সময় তিনি আমাদের মেসেই আসিয়া বসিতেন। আমাদের অনুরোধে কখন কখন দু একটা কীর্তন গানও গাইতেন। শরৎদার নিকট হইতে আমি দাবা খেলাও শিখিয়া-ছিলাম।...

বোটাটং-এ অধিকাংশ কারখানার মিস্ত্রীগণ থাকিত। ঘর ভাড়াও কম। সকলেই খেটে খায়, একতা আছে। এই শ্রেণীর লোকের ভিতরে এমন এক প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়, এমন ভালবাসার টান দেখা যায়, আমাদের সভ্য সমাজে তেমন পাওয়া খুবই কষ্টকর। আবার সভ্যসমাজ এ শ্রেণীর ভিতর প্রবেশ করাটাও লজ্জাজনক বিবেচনা করে। কারখানার মিস্ত্রীরা শরৎচন্দ্রকে তাহাদের মধ্যে পাইয়া দেবতার ন্যায় মাথায় তুলিয়া লইল।'

শরৎচন্দ্র সতীশবাবুদের ঐ মেসের বাড়ী যখন ছেড়ে যান, তখনও তিনি এ'দের মেসের অদূরেই একটা কাঠের দুতলা বাড়িতে গিয়ে বহুদিন ছিলেন।

দেখা যাচ্ছে, শরৎচন্দ্রের এই বন্ধুরা কেউই এমন কথা কোথাও বলেন নি, মিস্ত্রী-পল্লীর মিস্ত্রীরা অত্যধিক বেশ্যাসক্ত ছিল এবং তাদের সঙ্গে মিশে শরৎচন্দ্রও অতি-মাত্রায় বেশ্যাসক্ত হয়েছিলেন।

বোটাটং-এ শরৎচন্দ্রের প্রতিবেশী হিসাবে সতীশবাবুর মত শিক্ষিত লোকই শুধু নয়, হাওড়া জেলার আন্দুলের সুরেন্দ্র-নাথ মান্নার মত ভদ্র, গৃহী, হরিভক্তি-পরায়ণ মিস্ত্রীও ছিলেন। সতীশবাবু তাঁর বইয়ে এর কথা বিস্তৃতভাবে বলেছেন।

আর একটা কথা, শরৎচন্দ্র অতিমাত্রায় বেশ্যাসক্ত হয়ে শনি থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত পতিতালয়ে পড়ে থাকলে তাঁর নতুন চাকরিটা থাকত? আর ওপরওয়ালা বন্ধু এর কে মিত্রের কাছে কি মুখ দেখাতে পারতেন?

অতএব শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের এই সব বন্ধুদের লেখা প্রভৃতি থেকে এখন বলা যেতে পারে যে, মিস্ত্রীদের সম্বন্ধে এবং তাদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মেলামেশা সম্বন্ধে অজিতবাবু যে কথা বলেছেন, তা সম্পূর্ণ অসত্য।

শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কথা বাদ দিয়ে, ইচ্ছা করেই কলিকাতাবাসী যে ব্রজেনবাবু শরৎচন্দ্রকে কোনদিন চোখে দেখেছিলেন কিনা সন্দেহ, তাঁর ভুল কথাটা বেছে নেওয়া এবং সেই কথার উপর বিকৃত মন্তব্য করে শরৎচন্দ্রকে এইভাবে হেয় করা, এটা কি কোন নিরপেক্ষ গবেষকের বা জীবনী লেখকের কাজ হয়েছে!

গিরীনবাবু, যোগেনবাবু ও সতীশবাবু ছাড়া শরৎচন্দ্রের আর একজন রেঙ্গুনের বন্ধুর কথা এখানে বলব। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে পাবলিক ওয়ার্কস একাউণ্টস অফিসে চাকরিতে ঢোকার সময় ইনিও তখন ঐ অফিসে চাকরিতে ঢুকে-ছিলেন এবং অফিসে একই ঘরে পাশাপাশি বসে কাজ করতেন। শরৎচন্দ্র মিস্ত্রী-পল্লীতে যাবার আগে যখন মেসে কিছুদিন ছিলেন, তখন সেই মেসে ইনিও ছিলেন। এ'র নাম নগেন্দ্রনাথ সেন। নগেনবাবুর বাড়ি হাওড়া জেলার বেলুড়ে। বেলুড় স্টেশন থেকে শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান দেব পুরের রেল স্টেশন ব্যাণ্ডেলের দূরত্ব অল্পই। তাই অফিসে সহকর্মী ছা প্রায় একই জায়গার লোক বলে বি নগেনবাবুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের খুব ব ছিল।

নগেনবাবু ব্রাহ্ম সমাজের লোক ছি এবং রেঙ্গুনে ব্রাহ্ম সমাজের একজন স্থানীয় ছিলেন। সেকালের সেই 'জ কিন্তু বলব না' প্রবাদের সত্যবাদী নেতার মত ইনিও ছিলেন একজন অত আদর্শবাদী ও নীতিবাগীশ ব্রাহ্ম। জীবনে ধূমপান করেন নি, চা খান মানুষে রিকসা টানে বলে কখনও রিক চাপেন নি, ইত্যাদি। এই নীতিবাগ মানুষটিও শরৎচন্দ্রের মিস্ত্রীপল্লীর বা যেতেন। যেমন—ব্রাহ্ম সমাজে মাঘোৎস সময় ব্রহ্মনাম সংকীর্তনের জন্য একট একটা খোলের দরকার হওয়ায় নগেনব নিজে বন্ধু শরৎচন্দ্রের বাসায় গিয়ে খোল নিয়ে এসেছিলেন এবং নিজেই আবার দি এসেছিলেন। এই কাহিনীটা আমি নগে বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র ডাঃ অমিয়কুমার সে কাছে শুনেছি। অমিয়বাবু আরও বলেন 'শরৎচন্দ্রকে রেঙ্গুনে আমাদের বাড়ি বাবার কাছে আসতে, এসে গল্প করতে এ বাবার সঙ্গে বেড়াতেও আমি অনেকব দেখেছি। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে চ এসেও তাঁর লেখা বই রেঙ্গুনে বা কাছে পাঠাতেন।'

নগেনবাবুর দ্বিতীয় পুত্র অনিলকুমা সেনের কাছেও শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পিতা বন্ধুত্বের কথা অনেক শুনেছি।

৭৭ বৎসর ... বৃদ্ধ অমিয়বাবু এ ৭৫ বৎসর ... অনিলবাবু রেঙ্গুন থেকে এসে বর্তমানে হুগলী জেলার বৈদ্য বাটীতে বাস করছেন।

নগেনবাবু যে অত্যন্ত আদর্শবাদী মানুষ ছিলেন, একথা আমি নগেনবাবুর পুত্রদের কাছে ছাড়া তাঁর দৌহিত্র কলকাতার বিখ্যাত অর্থোপেডিক সার্জন ডঃ সমীর-কুমার গুপ্ত এম-সি-এইচ, অরথ (লিভার-পুল) এফ আর সি এস (ইংলণ্ড)এর কাছেও বহুবার শুনেছি। সমীরবাবু শৈশবে মাতৃ-হারা হয়ে রেঙ্গুনে তাঁর এই মাতামহের কাছেই মানুষ হয়েছিলেন।

এখানে এই আদর্শবাদী ও নীতি-বাগীশ ব্রাহ্ম নগেনবাবুর কথাটা এই জন্য বললাম যে, শরৎচন্দ্র যদি অতিশয় মদ্যাসক্ত ও অতিমাত্রায় বেশ্যাসক্ত হতেন, তাহলে এহেন নগেনবাবু শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কখনই বন্ধুত্ব রাখতেন না। বা তাঁর সঙ্গে অত মেলা-মেশাও করতেন না।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানের কথা

মহাবিশ্বের সংবাদ

আধুনিক কালের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের আশ্চর্য সব নতুন যন্ত্র এসেছে আর সেগুলোর সাহায্যে মহাকাশের অদ্ভুত সব বস্তুর সন্ধান তাঁরা পাচ্ছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে এমন উত্তেজনাপূর্ণ সময় আগে আর কখনো আসেনি। এমনকি মহাবিশ্বের যে-চেহারাটি আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা উপস্থিত করছেন তাও সম্পূর্ণ নতুন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে ও কসমোলজিতে এখন অনেক নতুন ধারণা প্রচলিত।

ভূপৃষ্ঠে স্থাপিত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আলোকচিত্রে, রেডিও টেলিস্কোপের ইলেকট্রনিক সংকেতে, উপগ্রহ ও রকেটের সাহায্যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপরে প্রেরিত যন্ত্রপাতির খবরে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাকাশের এমন সব বস্তুর সন্ধান পাচ্ছেন, পৃথিবীর মানদণ্ড দিয়ে বিচার করলে যেগুলো প্রকৃতই অদ্ভুত।

এমনি একটি বস্তু হচ্ছে পালসার— যাকে বলা যেতে পারে তারকার দগ্ধাবশেষ ও ধ্বংসাবশেষ। এত ঘন যে তার এক ঘন-ইঞ্চি বস্তুর ওজন শত-কোটি টন। অবিশ্বাস্য মাত্রার বেগে বস্তুটি আবর্তিত হচ্ছে।

এমনি আরেকটি হচ্ছে ব্ল্যাক হোল বা কালো বিবর। এই বস্তুটি পালসারের চেয়েও ঘন। বস্তুটি আক্ষরিক অর্থেই অদৃশ্য, কেননা তার মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্রটি এতই জোরালো যে এমনকি আলো পর্যন্ত তার টান ছাড়িয়ে বাইরে আসতে পারে না।

এমনি আরেকটি হচ্ছে কোয়াসার। বস্তুটি তারার মতো, কিন্তু শতকোটি সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল। আর তা থেকে এমন বিপুল পরিমাণ তেজ নিঃসৃত হচ্ছে যে একযুগের গবেষণার পরেও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে তার রহস্য এখনো উদ্ঘাটিত নয়।

* * *

বিষয়টি নিয়ে আরও আলোচনা করার আগে এতদিনকার জানা মহাবিশ্বের সাধারণ চেহারাটি একবার চোখের সামনে তুলে ধরা যাক।

সকলেই জানেন, নটি গ্রহ নিয়ে আমাদের এই সৌরমণ্ডল। এই নটি গ্রহের মধ্যে আকারে আমাদের পৃথিবী মাঝারি। যে সূর্যের চারদিকে এই গ্রহগুলো ঘুরছে সেটি একটি তারা, আরও যে কোটি কোটি তারা রয়েছে তাদের তুলনায় আকারে ও উজ্জ্বলতায় মাঝারি। সূর্যের মতো পনেরো হাজার কোটি তারা নিয়ে গড়ে উঠেছে চাকতির মতো আকারের একটি গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ বা বিশ্ব। এমনি চাকতির মতো আকারের কোটি কোটি ছায়াপথ বা বিশ্ব নিয়ে মহাবিশ্ব। চাকতি বলা হচ্ছে বটে, কিন্তু বিশ্বরূপী এক-একটি চাকতির ব্যাস হচ্ছে প্রায় একলক্ষ আলো-বছর (আলো এক-বছরে যতোটা দূরত্ব অতিক্রম করে তার মাপকে বলা হয় আলো-বছর। আলো প্রতি সেকেণ্ডে অতিক্রম করে ১,৮৬,০০০ মাইল বা ২,৯৭,০০০ কিলোমিটার, তাহলে এক বছরে অতিক্রম করে ৬,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইল বা ৯,৬০০,০০০,০০০,০০০ কিলোমিটার। এক বছরে অতিক্রান্ত দূরত্বের এই মাপ এক আলো-বছর)। সূর্য রয়েছে আমাদের বিশ্বের (যার নাম মিল্কি ওয়ে বা আকাশগংগা) কেন্দ্র থেকে ত্রিশ হাজার আলো-বছর দূরে। দুই পাশাপাশি বিশ্বের মাঝখানকার দূরত্ব কোটি-কোটি আলো-বছর.

আরো একটি ব্যাপার, এই কোটি কোটি বিশ্ব প্রচণ্ডবেগে পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তুলনা করা চলে ফুট ফুট দাগ দেওয়া একটি বেলুনের সঙ্গে, এক-একটি দাগ এক-একটি বিশ্ব, বেলুনটি যতোই ফোলে দাগগুলো ততোই পরস্পর থেকে দূরে সরে যায়। মহাবিশ্বকে তাই বলা হয় এক্সপ্যান্ডিং বা প্রসারণশীল।

* * *

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের আবিষ্কারে আশ্চর্যতম হচ্ছে কোয়াসার। তা শুধু এ-কারণে নয় যে কোয়াসারের ধরনধারণ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা এখনো স্পষ্ট কোনো ধারণা করতে পারেননি। তার চেয়েও বড়ো কারণ, বিজ্ঞানীরা মনে করেন কোয়াসারগুলো রয়েছে মহাবিশ্বের একেবারে কিনার ঘেঁষে। কোয়াসারের আলো ও রেডিও-তরঙ্গ অনুশীলন করে এই বিশ্বাস পোষণ করার কারণ ঘটেছে যে কোয়াসারেই বিশ্বের শেষ, তারপরে আর কিছু দেখার নেই। অর্থাৎ মহাবিশ্বের বহিঃকিনারের সন্ধানটি যেন পাওয়া গেল, এ থেকেই জানা
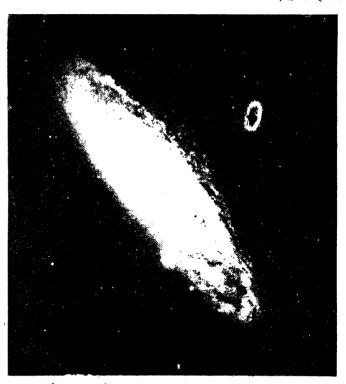
অ্যান্ড্রোমিডার গ্যালাক্সি এম ৩১। আমাদের সূর্য যে গ্যালাক্সিতে, মিল্কি ওয়ে, সেটিও বাইরে থেকে দেখলে এমনটিই দেখাবে। পনেরো হাজার কোটি তারা নিয়ে গঠিত চাকতির মতো আকারের এমনি গ্যালাক্সি আমাদের এই বিশ্বে আছে কোটি কোটি।

জোডরেল ব্যাঙ্কের রেডিও টেলিস্কোপ

সম্ভব মহাবিশ্বের সীমানা ও মহাবিশ্বের উদ্ভব।

মনে হতে পারে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এখন নতুনভাবে ও আরো সঠিকভাবে বুঝতে পারছেন, সম্ভবত ১৩ শতকোটি বছর আগে শুরু হয়ে বিবর্তিত হতে হতে মহাবিশ্ব কিভাবে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। তাঁরা আরো স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছেন, কিভাবে তারার জন্ম, বিবর্তন ও মৃত্যু। বিশ্ব বা গ্যালাক্সির জটিল ইতিহাসের আরো পরিপূর্ণ ছবি তাঁরা পেয়ে গিয়েছেন।

আধুনিক কালে ইলেকট্রনিকস ও রকেট-বিদ্যার অগ্রগতির ফলে যেসব নতুন যন্ত্র তাঁদের হাতে এসেছে সেগুলোর সাহায্য না পেলে এতখানি জ্ঞান কিছুতেই সম্ভব হত না। কিছুকাল আগেও জ্যোতির্বিজ্ঞানী-দের নির্ভর ছিল সেই সতেরো দশকে গ্যালিলিও যা ব্যবহার করেছিলেন মূলত সেই একই কৃৎকৌশল। অর্থাৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে তারা থেকে নিঃসৃত আলো দেখা। কিন্তু দৃশ্যমান আলো হচ্ছে অতি-শক্তিশালী গামা রশ্মি থেকে বেতার তরংগ পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র বিদ্যুৎচৌম্বক বর্ণালীর অতি ক্ষুদ্র এক অংশ মাত্র (আগের একটি সংখ্যায় লেসার নিয়ে আলোচনা করার সময়ে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি)। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সন্দেহ পোষণ করতেন যে মহাকাশের বস্তুপুঞ্জ থেকে সম্ভবত এ ধরনের বিকীরণও নিঃসৃত হয়ে থাকে। কিন্তু তাঁদের হাতে এমন কোনো যন্ত্র ছিল না যা দিয়ে বিকীরণ ধরা সম্ভব।
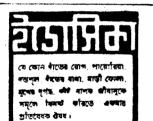
তারপরে ১৯৩১ সালে আমেরিকার বেল ল্যাবরেটরির ইঞ্জিনিয়ার কার্ল ইয়ানস্কি আবিষ্কার করলেন, তাঁর বেতার গ্রাহকযন্ত্রে (অ্যানটেনায়) এমন সংকেত ধরা পড়ছে যার উৎস পৃথিবীর বাইরের, বা মহাকাশে। এমনিভাবে জন্ম নিল বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞান (রেডিও অ্যাস্ট্রনমি)—মহাকাশের বস্তু-পুঞ্জ থেকে নিঃসৃত বেতার তরঙ্গ অনু-শীলনের বিজ্ঞান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরে বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়ে গেল। আজকের দিনে সারা পৃথিবী বিরাট বিরাট পিরীচাকৃতি বেতার গ্রাহকযন্ত্রে (রেডিও টেলিস্কোপে) ছেয়ে গিয়েছে বলা চলে। এই সমস্ত বেতার গ্রাহক-যন্ত্রে মহাকাশ থেকে আগত বেতার তরঙ্গ ধরা পড়ে ও বিশ্লেষিত হয়।

কিন্তু ভূপৃষ্ঠে স্থাপিত বেতার গ্রাহক-যন্ত্রে সব বিকীরণই কি ধরা পড়ে? না। বহু বিকীরণ ভূপৃষ্ঠে পৌঁছবার আগেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল শুষে নেয়—যেমন, একস-রশ্মি, অতিবেগুনী (আলট্রা-ভায়োলেট) রশ্মি, অবলোহিত (ইনফ্রারেড) রশ্মি ইত্যাদি। এই বিকীরণগুলো ধরার জন্য মহাকাশ-গবেষণার যুগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল। আজকের দিনে ভূপৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচু দিয়ে অজস্র যন্ত্রপাতি সমেত বহু উপগ্রহ আবর্তিত হচ্ছে আর এই সমস্ত বিকীরণ তাতে ধরা পড়ছে। ফলে জ্যোতির্বিজ্ঞানে এখন একস্-রশ্মি-জ্যোতি-র্বিজ্ঞান বা অতিবেগুনী রশ্মি-জ্যোতির্বি-জ্ঞান ইত্যাদি নাম নিয়ে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান সংবেদ্ধ হচ্ছে।

আর প্রাপ্ত তথ্যের সাহায্যে জ্যোতি-র্বিজ্ঞানীরা এতকালের বহু দুর্জ্ঞেয় প্রশ্নের জবাব পেয়েছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন ও তার জবাবের বিষয় হচ্ছে মহাবিশ্বের উদ্ভব।

* * *

বিশ্ব যে প্রসারণশীল, এ-তথ্য বিজ্ঞানীদের গোচরে আসে বিশের দশকে। আবিষ্কারটির কৃতিত্ব আমেরিকান বিজ্ঞানী এডউইন পি হাব্‌ল-এর। ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্ট উইলসনে ১০০ ইঞ্চি দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করে তিনি আবিষ্কার করেন যে, প্রায় প্রত্যেকটি তারা ও প্রত্যেকটি গ্যালাক্সি থেকে আগত আলোয় যেন একটা প্রসারণ ঘটছে। আর এই প্রসারণের মাত্রা সরাসরি নির্ভর করছে পৃথিবী থেকে আলোর উৎসের দূরত্বের ওপরে।

কেন এমনটি হয় তার ব্যাখ্যা খুবই সরল। তার মানে আলোর উৎস পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। একই ব্যাপার ঘটে যখন কোনো ইঞ্জিন সিটি বাজিয়ে শ্রোতার কাছ থেকে দূরে সরে যায়। তখনো সিটির শব্দের তরঙ্গে এমনি প্রসারণ, শ্রোতার কানে যা অনেকটা বিলাপের মতো শোনায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ-ব্যাপারটিকে বলা হয় 'রেড শিফ্‌ট' বা লাল-অপসরণ। কেননা, বর্ণালীর যে অংশ চোখে দেখা যায় সেখানে লাল আলোর তরঙ্গই দীর্ঘতম। জ্যোতির্বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে, লালের অপসরণ যতো বেশি তার উৎস পৃথিবী থেকে ততো দূরে।

এই সমস্ত খবর জোড়া লাগিয়ে জ্যোতি-র্বিজ্ঞানী হাবল যে ছবিটি পেলেন তা এক প্রসারণশীল মহাবিশ্বের, যেন একটা বেলুনে ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে তোলা হচ্ছে। এমনি একটি বেলুনের গায়ে কোনো একটি বিন্দু থেকে কেউ যদি তাকায় তার মনে হবে, বেলুনের গায়ের অন্য সমস্ত বিন্দু ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে—যে বিন্দু যতো দূরে সেই বিন্দু ততো জোরে। তারা ও গ্যালাক-সির আলোর লাল-অপসরণ বিশ্লেষণ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানী হাবল মহাবিশ্বকে দেখতে পেলেন এমনি এক ফুঁ-দিয়ে-ফুলিয়ে-তোলা বেলুনের মতো। অর্থাৎ প্রসারণশীল এক মহাবিশ্ব।

কেন এই প্রসারণ? কী কারণে? ১৯২৭ সালে বেলজিয়ান বিজ্ঞানী লেমাটের একটি ব্যাখ্যা উপস্থিত করলেন। ব্যাখ্যাটি এই: দূরে অতীতে মহাবিশ্বের সমস্ত বস্তু একটি পুঞ্জে জমাট হয়ে ছিল—অর্থাৎ যেন অতিবৃহৎ একটি পরমাণু (সুপার-অ্যাটম)। তারপরে এই অতি-পরমাণুর মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটে। পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তু চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছুটতে শুরু করে। এই পুঞ্জগুলো থেকেই কালক্রমে তৈরি হয়েছে মহাবিশ্বের তাবৎ গ্যালাক্সি, তাবৎ তারা ও পৃথিবীর মতো তাবৎ গ্রহ। আদি সেই বিস্ফোরণের ফলে পুঞ্জগুলো প্রচণ্ড বেগে ধাবমান ছিল। এ-কারণে মহাবিশ্বের তাবৎ গ্যালাক্সি এখনো অবিরাম পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আদি এই বিস্ফোরণকে বিজ্ঞানীরা বলেন 'বিগ ব্যাং' বা বাংলায় বলা যেতে পারে 'প্রচণ্ড বিস্ফোরণ'।

তারপরে ১৯৪৮ সালে পাওয়া গেল প্রচণ্ড বিস্ফোরণ তত্ত্বের পালটা আরেকটি তত্ত্ব, যাকে বলা হয় 'স্টেডি স্টেট' বা 'সদা সমাবস্থা তত্ত্ব'। দুজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী এই তত্ত্বের প্রবর্তক—হেরমান বণ্ডি ও টমাস গোলড। কোনো বিশেষ এক মুহূর্তে মহাবিশ্বের জন্ম, একথা নতুন এই তত্ত্বে অস্বীকৃত হল। তত্ত্বের প্রবর্তকরা বললেন মহাবিশ্বের প্রসারণ সবসময়ে ও সমানভাবে হয়ে চলেছে এবং নতুন বস্তু সমভাবে উৎপন্ন হয়ে চলেছে। নতুন বস্তু সমভাবে উৎপন্ন হয়ে চলেছে, একথা যদি অবিশ্বাস্য মনে হয়, তত্ত্বের প্রবর্তকরা বললেন, তাহলে অতি-পরমাণুর বিস্ফোরণও সমান অবিশ্বাস্য।

দুটি তত্ত্বেরই পক্ষে ও বিপক্ষে ওকালতি চলতে লাগল ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত। তারপরে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী একটি সরল মীমাংসার প্রস্তাব করলেন। বললেন, প্রচণ্ড বিস্ফোরণ যদি ঘটেই থাকে তাহলে তার দরুন অবশিষ্ট কিছু বিকীরণ এখনো অন্তঃপ্রবাহী থাকা উচিত। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেল ল্যাবরেটরি থেকে সমর্থনসূচক খবর পাওয়া গেল যে প্রকৃতই এমন একটি বিকীরণের অস্তিত্ব রয়েছে।

এখন মোটামুটি ধরে নেওয়া চলে, প্রচণ্ড বিস্ফোরণের তত্ত্বটিই গ্রাহ্য।

অতঃপর আলোচনা চলছে সমান কৌতূহলোদ্দীপক আরেকটি বিষয় নিয়ে—প্রসারণশীল মহাবিশ্বের শেষ পরিণতি কী?

সম্ভাবনা দুটি। একটি এই যে মহাবিশ্বের প্রসারণ চলতেই থাকবে, চলতেই থাকবে; গ্যালাক্সিগুলো পরস্পর থেকে আরো দূরে সরতেই থাকবে, সরতেই থাকবে। এমনি হতে হতে অসীমে মিলিয়ে যাবার সম্ভাবনা গ্যালাক্সিগুলোর। অপর সম্ভাবনা এই যে প্রসারণ ক্রমে স্তিমিত হবে, স্তিমিত হতে হতে বন্ধ,

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব থেকে কালো-বিবরের ধারণা পাওয়া গিয়েছিল

তারপরে শুরু হবে সংকোচন। শেষে? সংকোচন ঘটতে ঘটতে অবধারিত আরেকটি অতি-পরমাণু।

তবে, যাই ঘটুক না কেন, পরিণতিতে পৌঁছতে সময় লাগবে হাজার হাজার কোটি বছর।

পরিণতি যতোই অবিশ্বাস্য ও অকল্পনীয় মনে হোক একটিকে ধরে নিতেই হয়। কোনটি? জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন, তা নির্ভর করছে অতি সুনির্দিষ্ট একটি তথ্যের ওপরে :

মহাবিশ্বের মোট ভর। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন, মহাবিশ্বের মোট ভর যদি একটি নির্দিষ্ট মাত্রার নিচে হয় তাহলে মহাকর্ষের টানও এমন যথেষ্ট হয় না যে প্রসারণ বন্ধ হতে পারে। কিন্তু মহাবিশ্বের মোট ভর যদি এই নির্দিষ্ট মাত্রায় বেশি হয় তাহলে প্রসারণ একসময়ে বন্ধ হবেই, সংকোচন শুরু হবেই, এবং পুনরায় আরেকটি অতি-পরমাণুতে সবকিছুর শেষ।

কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই যে মহাবিশ্বের মোট ভর এখনো নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। চেষ্টা সমানে চলছে। মহাবিশ্বের মোট ভর নিরূপিত না হলে মহাবিশ্বের পরিণতি সম্পর্কেও বলা সম্ভব নয়।

তবে যুক্তিতর্ক সাজিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্যই করা যেতে পারে। এমনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন প্রিন্সটনের পদার্থবিজ্ঞানী জন হুইলার। তিনি বলেন, মহাবিশ্ব সংকুচিত হতে হতে পরিণত হবে এক অতি-ঘন বস্তুতে যার নাম 'ব্ল্যাক হোল' বা কালো-বিবর। এই কালো-বিবরের কথা প্রথম বলেছিলেন আইনস্টাইন, তাঁর আপেক্ষিকতার তত্ত্বের সূত্রে। কথাটি এই যে আলোর ওপরে মহাকর্ষের ক্রিয়া আছে, অতএব অতি-ঘন বস্তুতে মহাকর্ষের টান এতই বেশি হতে পারে যে আলো আটক পড়ে যায়। আপেক্ষিকতার তত্ত্ব অনুসারে, এমনি বস্তুই প্রকৃত অদৃশ্য বস্তু।

১৯৭০ সাল পর্যন্ত কথাটির ওপরে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তেমন গুরুত্ব দেননি। তারপরে হুইলারের একটি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশিত হবার পরে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আগ্রহী হয়ে ওঠেন। হুইলার বলেন, মহাবিশ্বে কালো-বিবর ধারণাটা কিন্তু মাত্র বিরল ঘটনা নয়। তারার জীবন শেষ হবার পরে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই কালো-বিবর।

এমনটি যে হতে পারে তারার জীবনচক্রের দিকে তাকালে তা মানতেই হয়। এই জীবনের শুরুতে রয়েছে মহাকাশের বিপুল ব্যাপ্তিতে ছড়ানো ঠাণ্ডা গ্যাস—যার বেশির ভাগটাই হাইড্রোজেন—ও ধুলোর মেঘ। তারপরে মহাকর্ষের টানে এই মেঘ জমাট বাঁধতে থাকে। এই অবস্থায় একসময়ে অভ্যন্তরের চাপ ও উত্তাপ এতই বেশি হয়ে যায় যে হাইড্রোজেন পরমাণুর একীভবন (ফিউসন) ঘটতে শুরু করে (যা ঘটে হাইড্রোজেন বোমায়), তৈরি হয় হিলিয়াম পরমাণু ও নিঃসৃত হয় বিপুল পরিমাণ তেজ। এমনিভাবে তারার জন্ম। শত শত কোটি বছর ধরে এই তারার তেজ নিঃসৃত হতে থাকে। কিন্তু একসময়ে না একসময়ে তারার জ্বালানী ফুরিয়ে

[illegible], তখন শুরু হয় তার জীবন শেষ হবার পালা।

আমাদের সূর্যেরও এই একই পরিণতি, সম্ভবত তিনশত থেকে পাঁচশত কোটি বছরের মধ্যে। জীবন ফুরিয়ে আসার গোড়ার দিকে সূর্য আরো বড়ো হবে, গ্রাস করবে পৃথিবীকে, সম্ভবত মঙ্গল-কেও। বিশেষ পরিস্থিতিতে সূর্যের মধ্যে একটা বিস্ফোরণ ঘটে যাওয়াও অসম্ভব নয়, কিছু কিছু বস্তু মহাশূন্যে ছিটকে যাবে। তারপরে সংকোচন এবং সেটি চলতে চলতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যাকে বলেন 'সাদা বামন'—তাই। অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা ও অতিশয় ঘন একটি পিণ্ড।

কিন্তু যে-তারার ভর সূর্যের চেয়ে ৪০ শতাংশ বেশি তার পরিণতি কিন্তু অন্যরকম। বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, লক্ষ-নীয় একটি বিস্ফোরণের ফলে এই তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। একে বলা হয় 'সুপারনোভা' বা মহাতারকা। এই বিস্ফো-রণের দৃশ্য আমাদের গ্যালাক্সির অধিকাংশ এলাকা থেকে দেখা যাবে, আমাদের গ্যালাক্সির বাইরে থেকেও। তারপরে জমাট বাঁধতে বাঁধতে একসময়ে তৈরি হবে অতি-বিপুল ভরবিশিষ্ট একটি বস্তু, যার নাম নিউট্রন তারা।

১৯৬৮ সাল পর্যন্ত নিউট্রন তারার অস্তিত্ব ছিল শুধু কাগজের লেখায়। তারপরে ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে ধরা পড়ল বাইরের মহাকাশ থেকে আগত অতি-তীব্র ও বিস্ময়কর রকমের নিয়মিত তেজের ঝলক। এতই নিয়মিত যে প্রথমে ভাবা হয়েছিল যে অন্য কোনো সভ্য জীব বেতার তরঙ্গে সংকেত পাঠাচ্ছে। তারপরে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখলেন যে বেতার ঝলকের উৎস হচ্ছে নিউট্রন তারা। এই নিউট্রন তারাকেই বলা হয় 'পালসার' (পালসেটিং স্টার থেকে)।

দেখা গেল, মহাকাশে নিউট্রন তারা বা পালসার রয়েছে ডজনে ডজনে। তারা-গুলো লাট্টুর মতো পাক খায়, মিনিটে সম্ভবত ১০০ বার পর্যন্ত।

পালসারের আবিষ্কার থেকেই এসেছে কালো-বিবরের তত্ত্ব। ব্যাপারটির মধ্যে কোনো জটিলতা নেই। হুইলার তাঁর নিবন্ধে বলেছেন, কী হবে তা নির্ভর করে আকারের ওপরে। তারার ভর যদি সূর্যের ভরের চেয়ে তিন বা চার গুণ বেশি হয় তাহলে সেই তারার জীবন শেষ হয়ে আসার সময়ে তেজের নিঃসরণ ভিতরকার মহাকর্ষের টানের সঙ্গে সমতা রাখতে পারে না। শুধু হয় অনিবার্য সংকোচন, হতে হতে প্রথমে সাদা বামনের ঘনত্ব প্রাপ্তি, তারপরে নিউট্রন তারার। তারপরেও আরো বেশি ঘনত্ব—এতই ঘন যে তার মহাকর্ষের টান ছিঁড়ে এমনকি আলো পর্যন্ত নিষ্ক্রান্ত হতে পারে না। ফল? ফল—কালো-বিবর।

অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন, মহা-বিশ্বের শেষ পরিণতি এমনি এক বিরাট কালো-বিবর। তার আগে 'গ্যালাক্সিগুলো পরস্পরের সঙ্গে মিশে যাবে ও ক্রমেই সংবৃদ্ধি হতে থাকবে। অবশ্য প্রক্রিয়াটি শুরু হতে, যদি প্রকৃতই হয়, আরো শত শত কোটি বছর দেরি।

কালো-বিবরেই কি মহাবিশ্বের শেষ? না শেষ নয়—উত্তরণ, একথা বলেছেন কোনো কোনো জ্যোতির্বিজ্ঞানী। এই কালো-বিবরই ক্ষেত্রান্তরে সাদা-বিবর। তাই যদি হয় তাহলে সেখান থেকেই আবার প্রসারণ, এবং, বলা বাহুল্য, কালক্রমে আবার সংকোচন ও কালো-বিবরের পরিসমাপ্তি।

কী হতে পারে কিছুই বলা যায় না। কালো-বিবরের অস্তিত্ব যদিও টের পাওয়া গিয়েছে কিন্তু অনেকখানিই এখনো রহস্য।

তবে, কালো-বিবর যতোই অদ্ভুত হোক, কোয়াসার এখনো পর্যন্ত বিরাট এক রহস্য। ঘটনার সূত্রপাত ১৯৬২ সালে। ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির দুজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কাছে ধরা পড়ল যে একটি গুরুত্বহীন তারা অতি শক্তিশালী রেডিও তরঙ্গের উৎস হয়ে উঠেছে। কিন্তু লাল-অপ-সরণের সাহায্যে যখন তাঁরা সেই তারার দূরত্ব মাপতে চেষ্টা করলেন তখন দেখা গেল দৃশ্যমান বর্ণালীর বিন্যাসের সঙ্গে তারা থেকে নিঃসৃত আলোর তরঙ্গ খাপ খাচ্ছে না। অর্থাৎ, দূরত্ব মাপতে তাঁরা অসমর্থ হলেন।

সমাধান খুঁজে পেতে কয়েক বছর সময় লেগে গেল। তাঁরা আবিষ্কার করলেন, তারাটির লাল-অপসরণ অনেক অনেক বেশি। এত বেশি লাল-অপসরণ এতদিন পর্যন্ত কখনো দেখা যায়নি। তার মানে, এই তারা রয়েছে অন্য সবার থেকে আরো দূরে।

তখন কয়েকটি নতুন সমস্যা দেখা দিল। এত দূরের একটি তারা চোখে দেখতে পাওয়া তখনই সম্ভব যখন তারা থেকে নিঃসৃত তেজ হয় অতি বিরাট—কোটি কোটি সূর্যের সমান। আবার, সপ্তাহে সপ্তাহে তারাটির উজ্জ্বলতা কম-বেশি হতে দেখা যাচ্ছে, তার মানে তারার আয়তন খুবই কম (বেশি হলে উজ্জ্বলতার কম-বেশি হত না, সেক্ষেত্রে এক অংশের কম অন্য অংশের বেশি দিয়ে পূরণ হয়ে যেত)।

এই আবিষ্কারের ফলে তারাটিকে নিজস্ব একটি শ্রেণীতে ফেলতে হল—তারা বলতে যা বোঝায় এটি তা নয়, অন্য কোনো কিছুর মতোই নয়। তারাটিকে বলা হল 'কোয়াসি-স্টেলার রেডিও সোর্স'। সংক্ষেপে কোয়াসার।

আজ পর্যন্ত প্রায় ২০০টি কোয়াসার আবিষ্কার হয়েছে। তাদের লাল-অপসরণ থেকে বোঝা যায়, মহাকাশের অন্য যে-কোনো বস্তু থেকে তারা দূরে। একটি গ্যালাক্সির লাল-অপসরণ হয়ে থাকে ০-২০, অর্থাৎ তার দৃশ্যমান আলো ২০ শতাংশ সরে গিয়েছে। সবচেয়ে দূরের গ্যালাক্সির লাল-অপসরণ হতে পারে ০-৪০। কিন্তু অধিকাংশ কোয়াসারের লাল-অপসারণ হয়ে থাকে ২-০ কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন কি ৩-৫। তার মানে আলোর বেগের আরো কাছাকাছি বেগে এই কোয়াসারগুলো পৃথিবী থেকে দূরের দিকে ধাবমান। তাই যদি হয় তাহলে পৃথিবী থেকে কোয়াসারের দূরত্ব ১২০০ কোটি আলো-বছর।

কোয়াসার ছাড়িয়ে আর কিছু নেই। কোয়াসার রয়েছে মহাবিশ্বের একেবারে প্রান্তে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেন কোয়াসার থেকে যে আলো পাওয়া যাচ্ছে তা বৃহৎ বিস্ফোরণ ঘটার খুব বেশি পরেকার নয়। অর্থাৎ, কোয়াসার হচ্ছে মহাকাশে সবচেয়ে দূরের ও সবচেয়ে প্রাচীন বস্তু। অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানী মনে করেন, গ্যালাক্সি গড়ে ওঠার একটি গোড়ার দিকের পর্ব হচ্ছে এই কোয়াসার।

আবার অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানী মনে করেন, কোয়াসার এমন একটা সম্পূর্ণ নতুন ব্যাপার যার ব্যাখ্যা বা হদিশ আমাদের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়ম দিয়ে পাওয়া সম্ভব নয়। এজন্য চাই নতুন বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের নতুন নিয়ম।

আরো একটি বড়ো প্রশ্ন—কোয়াসারের বিপুল তেজের উৎস [illegible] কেউ বলেন, কোয়াসার হচ্ছে গোটা [illegible] কালো-বিবরের সমষ্টি। কেউ বলেন, তারায় তারায় সংঘর্ষের অবস্থা। কিন্তু কোনোটাই গ্রাহ্য হয়নি।

ব্যাপার দেখে অনেকে বলতে শুরু করেছেন, এই মহাবিশ্বের অনেক কিছুই এখনো আমরা জানি না, আমরা কি প্রকৃতই বলতে পারি, বস্তু ও তেজ কোত্থেকে আসে? হাজার কি দেড় হাজার কোটি বছর আগে সময়ের যখন শুরু তখনকার অবস্থা কেমন ছিল? সময়ের কি শুরু আছে? নাকি যতোই পিছিয়ে যাওয়া যাক সময় পিছিয়েই চলে?

এমনি আরো অজস্র প্রশ্ন। ভবিষ্যৎ কী চেহারা নেবে কেউ বলতে পারে না।

(এই লেখাটি 'আমেরিকান রিভিউ' খণ্ড ১৮ সংখ্যা ৪ গ্রীষ্ম ১৯৭৪ সংখ্যায় প্রকাশিত এডওআর্ড নেডেলসনের প্রবন্ধ অনুসরণে লিখিত। আইনস্টাইনের ছবিটিও উক্ত পত্রিকা থেকে।)

—অয়স্কান্ত

(৫৪)

বনি অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। হিগিনস ভাঙগা যীশুর মূর্তি টেবিলে জোড়া লাগাচ্ছেন। সারেঙ পোর্টহোলে দাঁড়িয়ে আছেন। ফ্যাকাশে চাঁদ সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে' এবং অজস্র চাঁদ এভাবে যেন হাজার লক্ষ চাঁদের প্রতিবিম্ব ভাসছে সমুদ্রে। তারপর অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না। সমুদ্রের তেমনি কল-কল ছল-ছল শব্দ। ছোটবাবু হেঁটে যাচ্ছে ডেক ধরে। সে শেষবারের মতো জাহাজটা ঘুরে ঘুরে দেখছে। সবই মনে পড়ছিল। যেন পাশে দাঁড়িয়ে মৈত্রদা বলছে—কিরে ছোট তোরাও চললি। সে পিছিলের রেলিঙে এসে ঝুঁকে দাঁড়াল। ডাঙগার কাছে এলে মৈত্রদা সে অমিয় জব্বার মনু দাঁড়িয়ে থাকত। —কিরে ছোটবাবু বিফ খেয়েছিস বলে মন খারাপ। পৃথিবীটাকে এত ছোট ভাবিস কেন। আমি বামুনের ছেলে না! আমার জাত নেই বুঝি। অথবা যেন দূরে বোট-ডেকে ডেভিড দাঁড়িয়ে হাঁকছে, ছোটবাবু সামনে আটলান্টিক। এবার আমরা ভারত মহাসাগর পার হয়ে যাচ্ছি। অথবা মৈত্রদার দুটি একটা কথা, হেঁটে যাবার সময় মনে করতে পারছে। গ্যালিতে ভান্ডারিজ্যাটার চর্বি ভাজা চাপাটির গন্ধ একটু নাক টানলেই যেন পেয়ে যাবে। সে পিছিলে এসে গেছে। কত জমজমাট ছিল জায়গাটা। অনিমেষের গলা যেন এখুনি শুনতে পাবে—সে যেন পায়ে ঘুংঘুর বেঁধে গাইছে—ওলো সই ললিতে, যাচ্ছি আমি গলিতে। অথবা গানের সোমে তার গলায় বাজছে—ছোটবাবু ভূত দেখেছে। সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে গেলে অন্ধকারটা আরও চাপ বেঁধে আছে। কোন শব্দ নেই। কেবল স্টিয়ারিং-এনজিনের গোঙানি এখনও বাতাসে কক কক করছে। কাল তাদের জাহাজ ছেড়ে সমুদ্রে ভেসে পড়তে হবে। বনি এত বড় বিপদের কথা বিন্দুমাত্র জানে না। বনি অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। সব ফোকসালের দরজা বন্ধ। দুটো-একটি ইঁদুর ছুটে যাচ্ছে। আর এক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে গেলে তার ফোকসাল। জাহাজে এটাই ছিল তার প্রথম আস্তানা। সে টর্চ জেবলে এবার ভিতরে ঢুকে নিজের বাংকে কিছুক্ষণ বসে থাকল। মৈত্রদা পাশেই আছে মনে হচ্ছিল। যেন বলছে, খাও ছোট-বাবু খাও। সমুদ্রে কারো বাবা-মা থাকে না। আমরাই আমাদের বাবা-মা। বাংকে তেমনি মৈত্রদার বিছানা পাতা। অমিয় যাবার আগে ওর বিছানাটা উল্টে রেখে গেছে। সব হুবহু তেমনি আছে। সবই এখন স্মৃতি। ডেভিড বঙ্কু অনিমেষ, জব্বার কিভাবে সমুদ্রে বেঁচে আছে কে জানে! চুপচাপ অন্ধকারে সে বসে থাকল। সে কিছু আর ভাবতে পারছে না।

ছোটবাবুর এভাবে তন্দ্রার মতো এসে গেছিল। তখন মনে হল সারেঙসাব ডাকছেন। ছোটবাবু বুঝতে পারছে সারেঙ-সাব দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকছেন। হাতে একটা লম্ফ। সারেঙসাবের সাদা পোশাক সাদা চুল সাদা দাড়ি, কোনো কিংবদন্তির পুরুষের মতো অথবা মনে হয় সেই শৈশবের ফকির-সাব যেন—হাতে তাঁর মুর্শকিলাসান। একটা পয়সা লম্ফের ভেতর ফেলে দিলেই তিনি তার কপালে ফোঁটা টেনে দেবেন—মুস্কিলাসান আসান করে—সেই মাঠে লম্ফ জ্বালিয়ে অন্ধকারে শৈশবে সে যেমন দেখেছে একজন মানুষ উঠে আসছে, গলায় মালা তাবিজ গায়ে কালো কাপড়ের অজস্র তালি মারা জোব্বা, হাতে মুস্কিলাসানের লম্ফ—তিনি এখন তেমনি দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছেন। বলছেন—কখন তুই এখানে নেমে এয়েছিস। ভাবলাম ছোট ওদিকে যাচ্ছে কেন! তারপর আর তোর পাত্তা নেই। আমার দিলে ধুকপুক উঠে গেছে। নেমে এলাম। এখানে তুই কি করছিস!

সে বলল, চাচা কাল তো আপনি আমার সঙেগ থাকবেন না।

সারেঙসাবের মুখটা কালো হয়ে গেল।

ছোট বলল, তখন এভাবে কে দেখবে! কে খুঁজে বেড়াবে আমি কোথায় আছি।

তিনি ওপরে হাত তুলে দিলেন। যেন বলার ইচ্ছে, তিনি দেখবেন ছোট। তারপর বললেন, ওপরে চল। কতক্ষণ বসে থাকবি।

ছোটবাবু ঘড়িতে দেখল চারটে বেজে গেছে।

—একটু ঘুমিয়ে নে ছোট।

—সকাল হয়ে যাচ্ছে। ঘুম আসবে না।

—তবু একটু গড়িয়ে নে।

—শুলে আর উঠতে ইচ্ছে করবে না। চলুন ওপরে যাই।

আর ওপরে এসেই ছোটবাবু তাজ্জব। সেই ক্রস, সেই আলো—প্রায় ফসফরাসের

কতো সাদা উজ্জ্বল বর্ণময় আলো ক্রসটা থেকে দপদপ করে জ্বলছে। একেবারে সামনে। মনে হয় আধ মাইলের ভেতর—কি আরও কাছে, কি দূরে, কতদূরে হবে—সে এবং সারেঙসাব বুঝতে পারছে না। আর ফস-ফরাসের আলো কখনও জ্বলছে নিভছে। কখনও নীল, হলুদ অথবা রক্তবর্ণ হয়ে যাচ্ছে—প্রাচীন মোজেসের সেই দৈববাণীর মতো যেন ক্রসটা বিধাতার করুণ অহমিকা। অথবা অট্টহাস্য করছে সমুদ্র। ওরা ছুটে যেতে পারল না। হাত-পা স্থবির হয়ে যাচ্ছে। বোধ হয় ছোটবাবু মূর্ছা যেত। তখনই কাপ্তানের গলা; আমার সঙ্গে এস।

হিগিনস যেতে যেতে সহসা সতর্ক গলায় ধমক দিলেন, তুমি ওদিকে কোথায় গিয়েছিলে!

—ফোকসালে স্যার।

—কি দরকার এখন সেখানে সেখানে যাবার।

—নেমে যাবার আগে...

তখনও তেমনি ক্রসটা আকাশের নিচে জ্বলছে। সমুদ্রে সামান্য ঢেউ আছে। বাতাস বেশ জোরে বইছে। জাহাজটা উঠছে নামছে। তার সঙ্গে দুলছিল ক্রসটা উঠছে নামছে। কখনও আকাশের গায়ে অতিকায় হয়ে যাচ্ছে কখনও সমুদ্রের আড়ালে পড়ে ছোট হয়ে যাচ্ছে।

তিনি ওদের নিয়ে বোট-ডেকে উঠে যাচ্ছেন। কিছু বলছেন না। চুপচাপ। ছোট-বাবু আর না পেরে খুব সতর্ক গলায় বলল, আপনি কিছু বলুন। আমাদের এ কোথায় নামিয়ে দিচ্ছেন।

হিগিনস খুব সহজ গলায় বললেন ক্রসটা দেখে ঘাবড়ে যাবে না। তারপর বললেন, সকাল হয়ে যাচ্ছে। যত সকাল হবে ক্রসটার সব আগুন অথবা লাল নীল ফসফরাস জ্বলা কমে আসবে। দিনের আলোতে কিছু দেখতে পাবে না। বোধ হয় কোনো প্রবালের পাহাড়টাহাড় সমুদ্র থেকে ভেসে উঠে এমন হয়েছে। ঝড় বৃষ্টিতে রোদে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মাথাটা এক অতিকায় ক্রস। যতদিন যাচ্ছে ততই ওটা বড় হয়ে যাচ্ছে। বিশ বছর আগে যা দেখেছিলাম ওটা এখন তার চেয়ে অনেক বড়। ক্রমশ ওটা সমুদ্রের পাতাল থেকে ওপরে উঠে আসছে বুঝি। গায়ে তার অজস্র ফসফরাস জোনাকির মতো আত্মগোপন করে আছে।

এবং সত্যি ছোটবাবু দেখল যত পুবদিক ফর্সা হয়ে যাচ্ছে, যত সমুদ্র আর আকাশ কুসুমে কুসুমে রং ধরছে তত ক্রসটার বিচ্ছুরণ নিস্তেজ হয়ে আসছে। আর সকালে স্পষ্ট দেখল ওটা একটা পাহাড়ের শীর্ষদেশ। একেবেঁকে ক্রসের মতো। ক্ষয়ে গিয়ে চারপাশে চারটা কালো স্তম্ভ। এবং দূর থেকে দেখতে হুবহু একটা লম্বা প্রায় মাস্তুলের মতো উঁচু ক্রস। ছোটবাবু বলল কেমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিল স্যার।

—ওর দোষ কি বল! ওতো উঠে আসতে চাইবেই।

আর চেঁচামেচিতে বনিও উঠে এসেছে। সে খুব অবাক—ওরা তিনজন দাঁড়িয়ে একটা কালো কুচকুচে প্রবালের খাড়া পাহাড় দেখছে। দেখতে দেখতে কেউ কোনো কথা বলতে পারছে না। সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। কাছে যে জল চুঁইয়ে পড়ছে নিচে তাও দেখা যাচ্ছে। সমুদ্রের ঢেউ পাহাড়টাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে।

বনি বলল, বাবা জাহাজটা ওটার গায়ে গিয়ে আবার ধাক্কা খাবে না তো!

কারণ তখন তো জাহাজটাও যে কি কারণে ছুটে যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। কোন-দিকে যাবে—ওটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে না চারপাশে গভীর খাদে নিশ্চিন্ত এক চোরা-স্রোতে পড়ে গেছে জাহাজ বোঝা যাচ্ছে না। তিনি হেসে উঠলেন। বনি, তোমার যা কিছু আছে ঠিক করে নাও। তোমরা নেমে যাবে। পাহাড়টা দেখে সব ঠিক করে ফেলেছি।

বনি বলল কি ঠিক করে নেব?

—তোমার যা কিছু আছে সব।

—কেন বাবা! কি হবে!

—কাছে একটা দ্বীপ পাবে। সেখানে তোমরা যাবে। ছোটবাবুকে আমি সব বুঝিয়ে দিয়েছি। তোমরা খবর পাঠালে আমরা ঠিক উদ্ধার পাব। দ্বীপে মানুষ-জন আছে। একটু থেমে বললেন, সবাইর জাহাজ ছেড়ে যাওয়া ঠিক না। আমি আর সারেঙ থাকলাম।

বনি মাথামুণ্ডু কিছু বুঝছে না। সে কি ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছে! ভাল করে চোখ মুছে দেখল, না সে ঠিকই দেখছে। বাবা তাকে ভীষণ তাড়াতাড়ি করতে বলছেন। আর ছোটবাবুকে ধমক—এই, তোমাকে যে বললাম, বনিকে নিয়ে যাও তুমি কি হে, এত তুমি ভীতু—তোমার কাণ্ড-জ্ঞান নেই কিছু। বয়সে তো আর ছোট নেই, কবে দামড়া হয়ে গেছ।

বনি বলল, কতদূর বাবা?

—এই কাছেই। দু-তিন দিনের ভেতর পেয়ে যাবে। সব বলে দিয়েছি। কমপাসের কাঁটা কত ডিগ্রী বরাবর চালালে তোমরা দ্বীপটা পেয়ে যাবে তাও বলে দিয়েছি। পালে জোর বাতাস লাগলে এক রাত দিনেও পেয়ে যেতে পার। দ্বীপটায় সব কিছু পাবে।

বনি বলল কি মজা! সে ছুটে প্রায় চলে যাচ্ছিল—কিন্তু কি মনে হওয়ায় সে ফের ফিরে এসে বলল, একটু চা করে তোমাদের খাইয়ে যাচ্ছি বাবা।

হিগিনস বললেন, তা মন্দ না, কি বল সারেঙ চা করলে ভালই লাগবে। বনি তাড়াতাড়ি করবে। এই রাসকেল—কি দাঁড়িয়ে থাকলে কেন। হাত লাগাও। বলে তিনি বোটে দু লাফে উঠে গেলেন। ছুড়ে ছুড়ে বললেন, রেশন আগে রাখো। জল রাখো। আর সব কাল আমি ঠিক করে রেখেছি। সব আছে। এই একটা দা রেখে দিয়েছি দ্যাখো। রাত-বিরেতে অকটোপাসের ঠ্যাঙা পা বোটে উঠে এলে দা দিয়ে কোপ মারবে। একজন ঘুমোবে, একজন পাহারায় থাকবে।

বনি নিচে নেমে গেছে। ছোটবাবু বোটে উঠে এসেছে। সারেঙসাব নিচ থেকে রেশন টেনে তুলছেন। ছোটবাবু তার কাপ্তান সব সাজিয়ে রাখছে—যেন হাতে যা সময় পাওয়া যায়—ছোটবাবুকে সমুদ্র সম্পর্কে আরও কিছুটা অভিজ্ঞ করে তোলা। কাল রাতে একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন—মাথা ঠিক ছিল না। এখন বেশ মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজকাম করে যাচ্ছেন। বার-বার তিনি সমুদ্র সম্পর্কে বলে যাচ্ছেন—বুঝলে ছোটবাবু খাবার ফুরিয়ে গেলে প্যাংকটিন সম্বল। প্রাণীজাতীয় উদ্ভিজ্জাতীয় দু রকমেরই পাবে। সমুদ্রে এই সব অনু পরিমাণ মাছ ভেসে বেড়ায়। চোখে ঠিক দেখা যায় না। এই যে দেখছ এটা তোমাদের দিয়ে দিলাম। জলে ফেলে এই বিশ পঁচিশ মিনিট পরে তুললে সামান্য প্যাংকটন উঠে আসবে। বেশ জল সরে গেলে প্রায় সবুজ জেলির মতো দেখাবে। আর মনে রাখবে জল না থাকলে তোমরা কাঁচা মাছ চিবিয়ে খেতে পার। ওতে তেষ্টা নিবারণ হবে। আর শোনো সবসময় দু-চারটা মাছ তুলে ভেতরে গর্ত করে রাখবে—কিছুটা জলের মতো ওখানে চেটে খেলে তেষ্টা নিবারণ হবে। ওয়াটার ওয়াটার এভরিহোয়্যার নট এ ড্রপ টু ড্রিংক—মিথ্যে কথা। ঈশ্বর কোথাও মানুষের আহার রাখেননি তা হতে পারে না। কোলরিজ কিছু জানতেন না। তাঁর কবিতার নায়কেরা মরীচিকা দেখেছে। সব শক্ত হয়ে গেলে তোমরা সমুদ্রকে কলা দেখাতে পারবে! একজন যুবকের পক্ষে সমুদ্রে বেঁচে থাকা খুব কঠিন না।

(ক্রমশ)

অঙ্গনা

বহুদিন আগে আজারবাইজানের লৌকিক প্রথা-পদ্ধতির ওপরে পড়তে গিয়ে জেনেছিলাম সেখানে শিশুর শিক্ষাজীবনে সবকিছুর শুরু হতো বাবাকে শ্রদ্ধা জানানোর মধ্যে। বাবাকে না জানিয়ে কোন ছেলে কোন পারিবারিক সমাবেশে নাচতে বা গাইতে পারবে না, বাবার কোন কথায় সন্তানেরা থাকতে পারবে না। এমন কি বাবার সামনে জামার বোতাম খুলে কোন ছেলে থাকতে খুব লজ্জা পায়।

আমার এক প্রতিবেশিনীর ছেলেকে শাসন করার রীতি দেখে আমার আজারবাইজানের ঘটনা মনে পড়ে গেলো। তিনি সামান্য কারণেও তাঁর ছেলেকে কিছুতেই সামলাতে পারেন না। অযথা হৈ-হট্টগোল করার পর ছেলেকে শাসিয়ে দেন, 'ঠিক আছে তোমার বাবা ফিরুন তারপর এর বিচার হবে।' ছেলে কিন্তু বাবা শব্দেই একেবারে শান্ত হয়ে যায়। মনেই হয় না যে সে একসময় মায়ের অবাধ্যতা করেছিল।

ছেলেটির বাবা অফিস থেকে ফিরে এলে ভদ্রমহিলা তাঁকে চা জলখাবার দেবার আগেই ছেলের দুষ্টুমির কথা এত জটিল করে বলেন যে ভদ্রলোক অল্পেতেই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তিনি অবশ্য মহিলার মত অত চীৎকারে অভ্যস্ত নন। বাবার উপস্থিতি টের পেয়ে ছেলে কিন্তু দিব্যি পড়ার টেবিলে মনোযোগ দিয়ে পড়া তৈরি করতে শুরু করে দেয়। আসলে ভদ্রলোকের উপস্থিতিতে ছেলেটি কখনোই দুরন্তপনা করতে সাহসী হয় না তার ফলে ভদ্রলোক ছেলেটিকে প্রাপ্য শাস্তি কখনোই দিতে পারেন না। এতে মহিলার অসন্তোষ দিন দিন বেড়ে যায় এবং তিনি সেই ছেলের সামনে এমনভাবে দাম্পত্য-কলহ শুরু করেন যা দেখলে ছেলেও বিচলিত না হয়ে পারে না।

স্বামী-স্ত্রীর কলহ হয়তো খুব স্বাভাবিক তবুও তা সন্তানের অপ্রকাশ্যে হওয়াই উচিত। স্বামী সন্তানের সামনে স্ত্রীর মর্যাদা রক্ষা করবেন এবং স্ত্রী স্বামীর মর্যাদা রক্ষা করবেন—এটাই স্বাভাবিক রুচি হওয়া উচিত।

আমার প্রতিবেশিনীর আচরণ সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। তিনি কিন্তু সন্তান শাসনে নিজের অক্ষমতা স্বীকার করতে নারাজ। উপরন্তু ছেলে অত্যন্ত দামাল এই কথাই প্রতিবেশীদের কাছে সবসময় শোনাতে অভ্যস্ত।

ছেলেমেয়েদের সবসময়ের তদারকির দায়িত্ব মায়েদের বেশী অবশ্য ছেলেমেয়েরা স্কুলে ভর্তি হলে কিছু সময় তারা অভিভাবকের দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। মায়ের অবশ্যই কর্তব্য সন্তানের খবর নিতে মাঝে মাঝে স্কুলে যাওয়া। স্কুল ছাড়াও বিকেলের সঙ্গী-সাথীদের সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়াও দরকার। স্কুলে গিয়ে তিনি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে ছেলের সম্বন্ধে কোন অভিযোগ থাকলে তা জেনে নিয়ে অত্যন্ত সহানুভূতি দিয়ে সন্তানকে বোঝাতে পারেন অযথা বকাঝকার পরিণাম অত্যন্ত ভয়ংকর। বকাঝকা এড়াতে ছেলে-মেয়েরা অভিভাবকের চোখের আড়ালের সুযোগে অপরাধ করতে থাকে। বাবা-মায়ের সবসময় কর্তব্য ছেলেমেয়ে যতদিন ছোট থাকবে ততদিন তাদের শখ অনুযায়ী অনিচ্ছারও নানা দ্রষ্টব্য স্থান দেখাতে নিয়ে গিয়ে সে বিষয়ে কৌতূহল বাড়াতে সাহায্য করা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েকে ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান দিতে হবে। এমন অনেক অভিভাবক আছেন যাঁরা বাড়ীর মধ্যে ছেলেমেয়েদের বন্দী রেখে নিজেরা কেনাকাটায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটান। তাতে ছেলেমেয়েদের দুঃখের সঙ্গে এমন এক মনোবিকার হয় যা দমন করা ছোটদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়।

তিনটি ডিমে তৈরি পেঁচা

সন্তানের সঠিক পথে পরিচালনা করা বাবা-মায়ের উভয়ের দায়িত্ব থাকলেও মায়ের সান্নিধ্যেই সন্তানেরা বড় হয়ে ওঠে। সুতরাং নিজের অক্ষমতার কারণ না খুঁজে শুধুমাত্র বাবার ভয়ে সন্তানদের শাসন করতে হলে ছোটরা ঠিকপথে পরিচালিত হতে পারে না। অযথা চীৎকার চেঁচামেচি না করে সন্তানের ইচ্ছাকে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে নিজের মেজাজ সংযত করতে পারলে সব মা-ই তাঁদের সন্তানদের সুপথে পরিচালিত করতে পারেন।

টুকিটাকী

ডিমের একটি পাখী তৈরি করুন। মাঝে-মধ্যে সব পরিবারেই ডিম খাওয়ার রেওয়াজ আছে, ডিম সেদ্ধ না করে খুব যত্ন সহকারে কুসুম বার করতে হবে। ডিমের একপাশে যতদূর সম্ভব ছোট ফুটো করে ভেতরের সব জিনিস বার করে ফেলতে হবে। তারপর ডিমের সেই ফুটো দিয়ে একটু একটু করে মোমের ফোঁটা ফেলে দিন। মোম দিয়ে ডিমের ভেতর পুরো ভরাট করার প্রয়োজন নেই। দুটি মুরগী ও একটি হাঁসের ডিম পরিষ্কার করে ধুয়ে নিতে হবে। প্রথমে একটি ডিম লম্বাভাবে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে। দাঁড় করানো ডিমের নীচের অংশকে এমনভাবে ভাঙতে হবে যেটা মাটির ওপরেই রাখলে কাত হয়ে পড়ে না যায়। এই লম্বাভাবে দাঁড় করানো ডিমটির ওপরে ছবি অনুযায়ী একটি ডিম কাত করে রাখতে হবে। নীচের ডিমের ওপরে যেখানে মাঝের ডিমটি বসানো হলো সেখানে নীচের ডিমের কিছু অংশ অত্যন্ত যত্ন সহকারে ভাঙতে হবে। ডিমের ওপরে ডিম কিন্তু সহজে বসানো যাবে না তা গড়িয়ে পড়বে। সেজন্য আঠা দিয়ে পাতলা কাগজ লাগিয়ে ডিম দুটো জোড়া দিতে হবে। এবার আর একটি ছোট ডিম সবচেয়ে ওপরে আড়াআড়ি বসাতে হবে। এবারও ডিম বসানোর সময় মাঝের ডিমের সঙ্গে ওপরের ডিমটিও আঠা আর কাগজ দিয়ে জুড়তে হবে।

প্রতিটি ডিমকেই পরিষ্কার করে পর পর বসিয়ে আঁকার কাজটা সারতে হবে। অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে একাজ করতে হবে, না হলে ডিমের জোড়া খুলে যাবার সম্ভাবনা থাকে। ডিমের প্যাঁচা তৈরী হলে একধারে তা সাজিয়ে রাখুন।

—অঞ্জলি চৌধুরী

রূপসীর খাতা

মোটামুটি চেহারা ও শরীর সম্বন্ধে হয়তো হল—এখন দরকার সেই শরীরের আবরণীর চর্চা। অর্থাৎ কিভাবে কি রঙের কাপড় গহনা ব্লাউজ ইত্যাদি ব্যবহার করে সাজতে হবে। এই সাজার ব্যাপারে একটা কথা বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার যেমন কাল, অর্থাৎ গ্রীষ্ম বর্ষা বা শীত কোন কাল? দ্বিতীয়, সময়—সকাল বিকেল দুপুর কি রাতে। তৃতীয়, কারণ—অর্থাৎ কোন বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য সাজ কি এমনি বাড়ীতে থাকার জন্য কিম্বা এমনি একটু দেখাশুনা করতে বেরুবার দরকারে।

আমাদের আলোচনা গ্রীষ্মকালের ওপরেই শুরু হোক। আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান। তাই এই কালের বিস্তার বেশী। শুধু তাই নয়—এই কালে মুশকিল যেমন অনেক সুবিধেও তেমনি প্রচুর। এই কালকে বিশেষ করে না জানলে সাজ সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া শক্ত। গরমের সঙ্গে ঘামও প্রচণ্ড হয়। সেই জন্য সাজ নষ্ট হওয়ার বা গায়ে দুর্গন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। রমণী যতো সুন্দরই হোক গায়ে সুগন্ধ না ছড়ালে তার আকর্ষণ তো থাকেই না বরং বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করে। সুতরাং সাজ-সজ্জার আগে গায়ের গন্ধ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হওয়া প্রয়োজন। ভালভাবে স্নান বিশেষ করে গরম কালে, সকলেই করে থাকেন। কিন্তু যাঁরা ঘরে ও বাইরে দুই জায়গাতেই কাজ করে থাকেন—তাঁদের অনেক সময় যত্ন নিয়ে স্নান করা হয় না। এভাবে স্নান করলে শরীর হয়তো সাময়িক ঠাণ্ডা হয় কিন্তু একটু ঘামলেই গন্ধ হয়। কিন্তু সে গন্ধ যদি না থাকে বরং যদি সুগন্ধ থাকে নিজের মনও সুন্দর থাকে। এটা শুধু আমার বিশ্বাস নয় এ বহুজনের বিশ্বাস। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে সুন্দরী সুবেশ রমণীও মনোরঞ্জন করা দূরে থাকুক—মনে বিকৃত ভাবে এনেছেন শুধু মাত্র দুর্গন্ধের জন্য। তবে এও দেখা গেছে অনেকের শারীরিক বিশেষ কোন অসুস্থতার জন্য ঘামে গন্ধ হয়। যেমন লিভার খারাপ থাকলে কিম্বা পেটে এসিড ভাব বেশী থাকলে। সে সব ক্ষেত্রে অবশ্য ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া দরকার। তবে সাধারণত যথেষ্ট খেয়াল না রাখার জন্যেও গায়ে গন্ধ হতে দেখা যায়।

স্নানের সময় গায়ে ও শরীরের ভাঁজগুলিতে ভাল করে সাবান মেখে ধুয়ে নেওয়া দরকার। তারপর যাঁরা শৌখীন বেশী তাঁরা স্নানের পরে কোন ভাল পারফিউম কিম্বা শরীরের 'লোশান' ব্যবহার করে থাকেন। তবে সাধারণত সবাই বডি পাউডার ব্যবহার করেন। গ্রীষ্মকালে এগুলির প্রয়োজন খুবই বেশী। আর একটা বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার ব্লাউজ ও অন্তর্বাসগুলি প্রতিদিন কাচা ও ধোয়া। যাঁরা খুব বেশী ঘামেন তাঁরা যদি নিজেদের সঙ্গে রুমালের ভাঁজে বডি পাউডার রেখে দেন তাহলে সময়ে সময়ে ব্যবহার করে নিজেকে পরিষ্কার ও সুগন্ধী রাখতে পারেন। আর একটা কথা, প্রতি সপ্তাহে অন্তত একদিন স্নানের শেষে এক বালতি জলে একটু ডেটল দিয়ে সেই জল দিয়ে গা ধুয়ে ফেলা ভাল। তাতে করে চর্ম রোগ থেকে বাঁচা যায় ও সেই সঙ্গে শরীর ঝরঝরে লাগে। যাঁরা শৌখীন বেশী বা এই ব্যাপারের খুব বেশী সচেতন তাঁরা শেষ এক বালতি জলে ওডিকোলন মিশিয়ে গায়ে ঢেলে নিতে পারেন।

যাহোক এবার আসা যাক একটু অপ্রিয় কথায়। যাঁরা সাজ-সজ্জা করতে চান বা সুরুচির পরিচয় দিতে চান তাঁদের উচিত বাহুমূল পরিষ্কার রাখা। অনেকে 'শেভ' করে থাকেন কিন্তু তাতে ওখানকার ত্বক কড়া ও সবুজ কিম্বা কালো দেখতে হয়ে যায়। এতে হাতকাটা ব্লাউজ পরলে অশোভন দেখায়। তাই ভালো দেশী কিম্বা বিদেশী 'হেয়ার রিমুভার' ব্যবহার করাই ভাল। তবে যাঁদের খুব অল্প তাঁরা যদি ঠিক মতন পারেন তাহলে পাতলা সরু কাঁচি ব্যবহার করতে পারেন।

এখন আসা যাক পোশাকের ব্যাপারে। পোশাক একজনের শুধু মাত্র রুচির পরিচয়ই দেয় না ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে থাকে। অতি বড় সুন্দরীও হারিয়ে যায় পোশাকের রঙের ওজনে। পোশাক পরা উচিত কিন্তু পোশাক যেন শরীরের ও চেহারার উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে না পারে। পোশাক হল আবরণ ওপরের মোড়ক সেই মোড়ক যদি সঠিকভাবে ব্যবহার না হয় তাহলে শরীরের সৌন্দর্য বিকশিত না হয়ে সেই সৌন্দর্য ঢাকাও পরে যেতে পারে। কাল সময় ও কারণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সাজ করাটাই বুদ্ধির পরিচয় দেয়। প্রচণ্ড গরমে সূর্যের খরখরে তাপে যদি কেউ প্রচুর রংচঙে পোশাক পরে চলেন, তা চোখকে পীড়া দেবে ফলে দেখতে ভাল লাগবে না। কথায় বলে 'নিজের রুচিতে খাওয়া আর পরের রুচিতে পরা'। অর্থাৎ আমরা যখন সেজে বেড়াই তখন অন্যেরা আমাদের দেখে। তাদের চোখে আমাদের সাজ পীড়াদায়ক না হয় এটাই সবচেয়ে আগে দেখতে হবে। আজকাল হিন্দী ছবি ও আধুনিক ফেশন নকল করতে গিয়ে প্রায় সকলেই হিমসিম। এটা আমরা প্রায় অনেক সময় ভুলে যাই যে রূপালী পর্দায় যা মানায় তা আমাদের পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে চলে না। কারণ যে পোশাক পরা হবে তার সঙ্গে বাকী সমস্ত কিছুর মিল থাকা একান্ত দরকার। যেমন মুখের মেকআপ চুলের কায়দা ইত্যাদি। সেইজন্যে কোনো পোশাক পরার আগে কতকগুলি জিনিস বিচার করে দেখা দরকার। যেমন—

১। যিনি পরছেন তাঁর নিজের চেহারা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা।

২। পোশাকের মধ্যে আধুনিকতা যথেষ্ট থাকলে তার সঙ্গে বাকী সব কিছুই আধুনিক মাপ কাঠিতে করা উচিত।

৩। কোন ঋতু?

৪। সময়, অর্থাৎ সেটা সকাল দুপুর বিকেল সন্ধ্যা না রাত্রি?

৫। উপলক্ষ্য, অর্থাৎ কেবলমাত্র বাড়ীতেই থাকা কিম্বা চাকরী করতে যাওয়া, কি বেড়াতে বা বিয়ের পার্টির জন্যে। এগুলি মোটামুটি নজর রেখে সাজ করা উচিত। এমন অনেক সময় দেখা গেছে যে, আজকালকার মিনি বা ম্যাক্সি ড্রেস পরা হয়েছে কিম্বা কোন অতি আধুনিক ডিজাইনের ব্লাউজ পরা হয়েছে কিম্বা নাভির নিচে নিতম্বের ঠিক ওপরে শকুন্তলা স্টাইলে কাপড় পরা হয়েছে অথচ চুল দিয়ে তেল গড়িয়ে সেই ব্লাউজের গলা কালো হয়ে আছে বাহুমূলে পরিষ্কার নেই নোংরা পেটিকোটের তলা দেখা যাচ্ছে কিম্বা পেটে বিচ্ছিরী দাগ ও থলথলে মাংস বেরিয়ে আছে। এসব ক্ষেত্রে ... মহিলাদের হাস্যকর লাগে ও লোকে ...দের নিয়ে হাসাহাসি করে। তাই আমার মনে হয় কোন পোশাক পরার আগে সব দিক দিয়েই যথেষ্ট ওয়াকিবহাল না হয়ে আধুনিক হওয়ার চেষ্টা না করাই উচিত। আজকাল ফ্যাশান প্রায় সব স্তরের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে। দুঃখ শুধু এটাই যে ঠিক মতন সাজ করতে পারছেন না অনেক মহিলাই। তাই আমার মনে হয় এ বিষয়ে আলোচনা করলে আমরা সবাই সবাইকে সাহায্য করতে পারি আর দিন দিন রূপলাবণ্যে পরিপূর্ণ হতে পারি।

এবার বলি গ্রীষ্মকালের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন উপলক্ষে সাজের সম্বন্ধে। গ্রীষ্ম ঋতুর বিশেষত্ব হল উত্তাপ আর উজ্জ্বলতা। এই সময়ে তাই চাই ঠাণ্ডা পোশাক হাল্কা পোশাক আর নরম পোশাক। এই পোশাকেরই হেরফের হবে সময় ও উপলক্ষ অনুযায়ী। রাত্রে ও সন্ধ্যাতে যদি নিমন্ত্রণ থাকে কিম্বা কোন বিদেশী প্রথায় পার্টি থাকে তাহলে এর মধ্যেই কিছু রঙিন পোশাক চালানো যেতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে যে মূল ব্যাপারটা একই থাকবে।

[illegible] । —রূপদর্শিনী

উপন্যাস

প্রভাত দেব সরকার

রাজার রাজা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

একদিন ধর্মতলার মোড়ে অফিস-ফেরৎ বাসের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে বিকাশ দূরে থেকে মালবিকাকে দেখল। দু-একবার ইতস্তত করলে কাছে যাবে কি যাবে না, ভাবলে। অন্যদিনের তুলনায় মালবিকাকে যেন ভিন্ন মনে হল, আজ সাজ-পোষাকটাও ভাল। কি ব্যাপার?

দূরে থেকে মালবিকাও দেখতে পেয়েছিল, নিজে থেকে কাছে এসে মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, বাড়ী ফিরছেন?

তুমি? (বলেই যেন মনে হল তুমি বলাটা অন্যায়) বিকাশ জিজ্ঞেস করলে।

আমি এই এখানে একটু এসেছি, কাজে! মালবিকা বললে।

আজ বোধ হয় মাঠে কোনো মিটিং নেই?

আমি বুঝি কেবল মিটিং শুনে বেড়াই? আপনি শোনেন না?

না। বিকাশ অস্বীকার করলে।

তা হলে আমাকে দেখলেন কি করে?

বিকাশ হাসলে, দুজনেই শুনি তা হলে।

প্রায় মুক্ত-আকাশের নীচে মাঠ-প্রাঙ্গণে দেখা মেয়েটির সংগে আজ যেন মালবিকার মিল নেই। মালবিকা এমনিতেই সপ্রতিভ, কিন্তু তার এই মুহূর্তের সপ্রতিভতার মধ্যে একটা যেন কৃত্রিমতা আছে। বিকাশের মনে হয়েছিল মালবিকা খুব সরল খুব দাপী আবার নিজের সম্বন্ধে বেশ সচেতনও। আজ মনে হচ্ছে মালবিকাকে সে ঠিক চিনতে পারেনি, ওর মধ্যে কোন কিছুই দু'চার দিনের আলাপ-পরিচয়ে বিকাশ ধরতে পারে নি। ও যেন আগাগোড়াই রহস্যাবৃত।

বিকাশ বললে, আপনি কোন দিকে যাবেন?

মালবিকা হেসে বললে, আজ ট্রামবাস চড়ছে আপনাকে ব্যস্ত করবো না। দক্ষিণেই যাব—

বিকাশ বললে, চললেও ভিড় খুব—চলুন না এসকর্ট করে নিয়ে যাই! হাঁটতে হাঁটতে যাওয়া যাবে! আপত্তি আছে?

মালবিকা বললে, না আজ আর হাঁটবো না, একটু বসতে পারলে হয়।

সঙ্গে সংগে বিকাশ বললে, আসুন একটা চায়ের দোকানে বসি। তারপর না হয় দেখেশুনে, ভেবেচিন্তে—

মালবিকা রাজী হল, কিন্তু চোখমুখের এমন ভাব করলে যাতে মনে হল বিকাশের মনোভাবটা সে ধরে ফেলেছে—মানে সান্নিধ্য চান তো কুমারী মেয়ের!

বিকাশ অপ্রস্তুত বোধ করলে।

কেবিনের পর্দাটা টেনে দিয়ে বিকাশ বললে, বলুন চায়ের সংগে আর কি খাবেন?

গম্ভীর হয়ে মালবিকা বললে, শুধু বসবার কথাই ছিল, কিছু খাবার তো কথা ছিল না!

চায়ের দোকানে শুধু বসতে দেয় না।

তা হলে মাঠে গিয়েই বসি চলুন।

বিকাশ যেন ফাঁপরে পড়ল। বললে, এসে সংগে সংগে উঠে যাওয়া ঠিক নয়। বেশ চাই খান!

মালবিকা হাসতে লাগল।

গম্ভীর হয়ে বিকাশ বললে, হাসছেন যে! টা যখন চলবে না তখন চা-ই চলুক!

হেসে মালবিকা বললে, আপনি খুব সরল।

এতে সরলতার কি আছে, না হয় বলেছি শুধু চা খান—

মালবিকা আবার হাসলে চায়ে মুখ দিয়ে বললে, তারপর আপনার খবর কি বলুন? অনেকদিন আপনাকে দেখিনি—

গোলমালটা এখন একটু কম আছে, অফিস ফেরৎ আর হাঁটতে হয় না! মাঠের দিকে গেলে তো দেখা হবে!

কি আশ্চর্য দেখুন, আজকাল গোলমাল ছাড়া মানুষের সংগে মানুষের দেখা-সাক্ষাৎ হয় না, আলাপও নয়—

কথাটা যেন ভালই বলেছে মালবিকা! বিকাশ বেশ বিস্ময়ও বোধ করে। ঠিক এই ধরনের দার্শনিতাপূর্ণ কথাবার্তা মালবিকার পক্ষে সম্ভব বিকাশ ভাবে নি। মেয়েটিকে প্রথম দিন থেকে ভাল লাগলেও তার সম্বন্ধে খুব একটা উঁচু ধারণা বিকাশ করেনি। লেখাপড়ার কথাও কিছু জিজ্ঞেস করেনি। একটা অভাবী, স্বাধীন মেয়ে বলেই মানে। যুবতী মেয়ে বলে যত না তারচেয়ে অধিক ওদের সংসারের দুরবস্থার জন্যে বিকাশ আকৃষ্ট হয়েছে। খুবই ইচ্ছে করেছে কোন-প্রকারে যেন ওদের সাহায্যে আসে। সেদিন টাকা ফেরৎ দিয়ে মালবিকা কিন্তু বিকাশকে তার সম্বন্ধে আরো বেশি সচেতন আর কৌতূহলী করেছে—বিকাশের ধারণা পাল্টে গেছে।

বিকাশকে চুপ করে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে মালবিকা অবাক হলো, বরং যেন আরো বেশি সপ্রতিভ কণ্ঠে বললে, কেমন ঠিক নয়? সেদিন যদি ধর্মতলায় গোলমাল না হতো আপনাকে আমি চিনতুম না, আপনিও আমাকে—

বলতে বলতে মালবিকা থেমে গিয়ে বললে, বারে আমিই কেবল বকছি আপনি বেশ চুপ করে আছেন! কই, কথা বলুন।

বিকাশের যেন সম্বিৎ ফিরে এল, বললে, কেন তোমার কথা শুনি না! বেশ লাগছে—

ভ্রূকুঞ্চিত করে মালবিকা বললে, বেশ মজা! আমিই কেবল বকে যাই!

তারপর দুজনে খানিক চুপ করে রইল। চায়ের সংগে খাবারও এসেছিল, মালবিকার আপত্তি টেকেনি। লক্ষ্য করে বিকাশ বললে, বাঃ কিছু খাচ্ছ না তো? আমি একা খাব নাকি?

মালবিকা হাত লাগিয়ে বললে চা খাবার নাম করে এত খাওয়া কিন্তু ঠিক নয়! শুধু শুধু—

বিকাশ বললে, খাবার যখন এসেছে তখন তার সদ্‌গতি করা বুদ্ধিমানের কাজ! খাবার সামনে রেখে বিচার-বিবেচনা চলে না!

স্মিত মুখে মালবিকা বললে, তাই ভাবছি—

কি ভাবছো? খাবার দেখে এত ভাবনা তো ভাল নয়!

ভাবছি আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম, অযাচিত—

বিকাশের যেন তর সইছে না খাবারের কিছু অংশ প্রায় হাতে গুঁজে দিয়ে বললে, নিন্ নিন্ আরম্ভ করুন!

নিজের কানেই কথাটা লাগল। বিকাশ বুঝতে পারছে না তার মুখ দিয়ে সম্বোধনটা কখনো 'তুমি' কখনো 'আপনি' হয়ে যাচ্ছে কেন।

তারপর হাসি মুখেই মালবিকা খাদ্য গ্রহণ করলে।

বিকাশ জিজ্ঞেস করলে, তোমাদের খবর কি? দাদার আপিস খুললো?

ম্লান হেসে মালবিকা বললে আমাদের আর খবর! ও আর খুলছে না।

বিকাশ বললে, দেখ এবার যদি কিছু হয়! সদাশিবরা গেছে, নতুন যারা আসবে তারা যদি পারে!

বেশ যেন প্রত্যয়ের সঙ্গে মালবিকা বললে, আমাদের বরাতে কিছু হবে না। গোলমালই চলবে কেবল এরপর—

বিকাশের কেমন সন্দেহ হয় মালবিকা সত্যি রাজনীতি করে নাকি, যেভাবে কথা বলছে তাতে মনে হয়—

অশান্তি চিরকাল চলতে পারে না। ইলেকশনে এবার নিশ্চয়ই স্টেবিলিটি আসবে।

গম্ভীর হয়ে মালবিকা বললে দেখুন!

বিকাশ আর কিছু বললে না, এ এই মুহূর্তে দেশের রাজনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করতেও ইচ্ছে হলো না। তাছাড়া একটি যুবতী রমণীর সান্নিধ্য রাজনীতির আলোচনার যোগ্য নয়।

বিকাশ বললে, তোমার দাদা এখন কি করছেন? মানে একটা কিছু—

মালবিকা বললে, কি আর করবেন, আলু বিক্রী করছেন।

বিকাশ সবিস্ময়ে মালবিকার মুখের দিকে চাইলে। না, কথাটা সে কোন কৌতুক করে বলেনি। বেশ সিরিয়াস্!

সত্যি? তেমনি বিস্মিত বিকাশ।

এবার মালবিকা হাসলে ওর থেকে সহজ কিছু আর পাওয়া যায় নি। কেন কাজটা কি খারাপ?

না, তা বলছি না, কিন্তু—

মালবিকার মুখের ভাবটা কেমন যেন ঃ কিন্তুর কিছু নেই। ও'দের আপিসের সবাই নাকি এই রকম কিছু একটা করছেন, সেদিন দেখে এসেছি আপিসের বন্ধ দরজার সামনে ও'রা তেলেভাজা বিক্রী করছেন।

বিকাশ মনে মনে ভাবলে খুব বেঁচে গেছে, সরকারী আপিসে চাকরি করছে, না হলে কে বলতে পারে তারও অমনি অবস্থা হতো না। তেলেভাজা বিক্রী না করুক, আলুমুড়ি বিক্রী করতো।

বিকাশ জিজ্ঞেস করলে ইউনিয়ন থেকে সাহায্য করে না?

কত লোককে সাহায্য করবে? সরকার কিছু না করলে—

সরকার এবং সরকারী কথাটায় বিকাশের নিজেদের আপিসের কথা মনে পড়ে গেল। ক'মাস ধরে কিভাবে না তারা আন্দোলন করছে, কই কিছু হচ্ছে না তো। দিন দিন রক্তচোখ আরো রক্তবর্ণ হয়ে উঠছে। আজই তাদের ওপর হুকুম জারি হয়েছে, টিফিনের সময় শ্লোগান দেওয়া চলবে না আপিসের পর আপিসে কেউ থাকতে পারবে না, আপিস প্রেমিসেসে গোলমাল বরদাস্ত করা হবে না।

বিকাশ যেন সায় দিয়ে বললে, সরকার কিছু করবে না। সরকার মরে গেছে— নিজেদের লড়তে হবে—আদায় করে নিতে হবে।

মালবিকার যেন এতক্ষণে মনে পড়ল জিজ্ঞেস করলে, আপনাদের আপিসে কি সব গোলমাল চলছিল না? প্রায় তো দেখি আপনারা মিছিল করে বেরন*

হেসে বিকাশ বললে, চলছে, চলবে! দেখা যাক—

কি মনে করে মালবিকা প্রশ্ন করলে, পারবেন আপনারা দাবী আদায় করতে?

নিশ্চয়ই! প্রত্যয় দৃঢ় কণ্ঠে বিকাশ বললে।

মালবিকা সপ্রশংস দৃষ্টিতে বিকাশের মুখের দিকে চাইল। তারপর তাদের আপিসের সংগ্রাম নিয়ে কি যে বললে নিজেই যেন খেয়াল করতে পারলে না।

মালবিকা হাত সরিয়ে নিলে না বিকাশ কেমন যেন মোহ[illegible] বললে, দেখবো কি করে ওরা আমাদের জব্দ করে।

যেন ভয়ে ভয়ে মালবিকা বললে, যদি তোমাদের চাকরি যায়? যদি ছাঁটাই করে দেয়?

হেসে বিকাশ বললে, তেলেভাজা বিক্রী করবো! তা বলে সংগ্রাম থেকে—বলতে বলতে বিকাশ থেমে গেল, একি মালবিকার চোখে জল কেন!

বেশ অপ্রস্তুত হয়ে বিকাশ হাত সরিয়ে নিলে।

সজল চোখে মালবিকা বললে, ওসব তুমি করো না। ওদের সঙ্গে তোমরা পারবে না।

বিকাশের পৌরুষে লাগল, টেবিলে ঘুসি মেরে বললে, কি বলচো আমরা পারবো না! দেখো আমরা পারি কিনা পারি!

মালবিকার অশ্রুসিক্ত মুখটা কেমন যেন আকুতিপূর্ণ।

বিকাশ মনে মনে বললে, এতেই তুমি ভয় পেলে মালবিকা! অথচ তোমার সঙ্গে আমার কি বা সম্পর্ক! তোমার দাদার কথা কই ভাবচো না তো!

ব্যাপারটাকে লঘু করবার জন্যে বিকাশ বললে, আরে ধ্যাৎ তোমার ভয় পাবার কি আছে! অসহযোগ অহিংস আন্দোলনে ভয়ের কিছু নেই। আর চাকরি—?

বিকাশ হাসতে লাগল তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে।

বাড়ীতে মা-বাবা আজ খুব খুশী স্বচ্ছন্দ যেন। অন্যদিন বিকাশের বাড়ী ফিরতে ইচ্ছে করে না, মনে হয় সব সময় বাইরে-বাইরে থাকে, এমন নিরানন্দ পরিবেশে ফিরে লাভ কি! বিশেষ করে মা-বাবার মুখের দিকে চাওয়া যায় না, তাঁরা যেন সব সময় গুম হয়ে থাকেন। বিকাশ বেশ বুঝতে পারে বাবা-[illegible] এখন নন্তুর চেয়ে তাকেই যেন বেশি [illegible] দোষেন, আপিসের ব্যাপার নিয়ে সংসা[illegible] ভাবনাকে আচ্ছন্ন করে রাখেন।

আজ অনেকদিন পরে সংসারটা যেন রোগমুক্ত হয়ে উঠছে মা-বাবাকে আবার স্বাভাবিক মনে হচ্ছে।

মা সামনেই ছিলেন, বিকাশের দেরীতে ফেরার জন্যে আজ আর কোন অনুযোগ করলেন না, বরং বললেন, যা হাত-মুখ ধুয়ে আয়!

কেন? হঠাৎ হাত-মুখ ধোয়ার কথা কেন! ইদানিং বড় ছেলের সম্বন্ধে তাঁরা তো কোন ভাবনাই করেন না, সংসারের বরাদ্দ ছাড়া আর কোন বাড়তি বরাদ্দের কথা বলেন না।

বিকাশ গম্ভীর হয়ে বললে, কি ব্যাপার?

মা বললেন, সারাদিন খেটেখুটে এলি---

রোজই তো আসি, নতুন কি! বিকাশ সবিস্ময়ে মার মুখের দিকে চাইলে।

মা তাড়া দিলেন, যা যা, অনেক রাত হয়েছে।

তা তো হয়েছে কিন্তু তোমার তাড়া কেন? মুখে অবশ্য বিকাশ কথাটা বললে না।
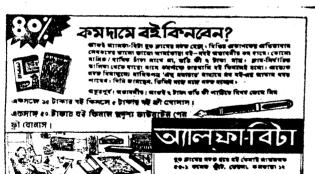
Interpub/BB/46/74 ben
স্মরণীয় মুহূর্তে
বিনী জানে আপনি
কি চান
বিনী
TERENE রেওন
আমরা অনেক অনেক বদলেছি—
আপনার মতই!

কারণটা পরে জানা গেল। বাবা আজ অফিস ফেরৎ অনন্তবাবুর মেয়েকে দেখে এসেছেন, এবং পাত্রী পছন্দ করেছেন। মা-কে বলেছেন ছেলের মত করাবার জন্যে।

শুনে বিকাশ তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো। না সে কিছুতে অনন্তবাবুর মেয়েকে বিয়ে করবে না। (শালা দালাল, অফিসের ইউনিয়ন সম্পর্কে সব কথা বড় সাহেবের কানে তুলে দিয়ে আসে। একদিন আচ্ছা করে—)

আজও অনন্তবাবুকে কম কথা বিকাশ শোনায়নি। কিন্তু লোকটি এমনি নির্লজ্জ যে সে-সব কথা যেন গায়েই মাখেন নি। গণ্ডারের চামড়া! আবার কত কথা, শোন শোন রাগ করছো কেন, তোমার ভালর জন্যেই বলছি, খুব সিরিয়াস্—

বিকাশ চীৎকার করে সবাইকে শুনিয়ে বলেছিল, সে আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনি সাবধান।

অনন্তবাবু তেমনি অমায়িকভাবে বলেছিলেন, তার মানে?

বিকাশ বিকৃত কণ্ঠে বলেছিল, মানেটা ভাল নয়। আপনাকে বলে দিচ্ছি চুকলি খাবেন না।

আশ্চর্য অনন্তবাবু যেন মাটির মানুষ, সে-কথায়ও রাগ করলেন না। কেবল বললেন, বস বস! মাথা ঠান্ডা কর।

বিকাশ তেমনি উত্তেজিত, মাথা আমার ঠান্ডা আছে। ফের যদি শুনি আপনি ইউনিয়নের ব্যাপারে আছেন তাহলে ভাল হবে না বলছি।

আচ্ছা আচ্ছা! যাও নিজের সিটে। অনন্তবাবু গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, এতটা হয়তো উত্তেজিত বিকাশ হতো না, কিন্তু সহকর্মী বন্ধুদের কাছে লোকটির সঙ্গে সম্পর্কহীনতা প্রমাণের জন্যে খানিকটা চেঁচামেচি করেছিল। দেখাতে চেয়েছিল বড়-বাবু বলে কি হবে কিছু বলে সে কাউকে খাতির করে না। তা ছাড়া বন্ধুরা জানুক তাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে যা শুনেছে তা মিথ্যে।

কিন্তু এদিকে বাবা কি করে এলেন? আর অনন্তবাবুই বা কি আপিসে এত কান্ডর পরও তাকেই জামাই করতে চান? বেমালুম অপমান, গালমন্দ চেপে গেছেন। কি নির্লজ্জ লোক রে বাবা!

মাকে বিকাশ বললে, বিয়ে আমি করবো না। আর যদিও করি ওখানে কখনো নয়!

মা জিজ্ঞেস করলেন, নয় কেন?

যার সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করি তার মেয়েকে বিয়ে করা যায় না।

কেন যাবে না? মেয়ে তো খারাপ নয়, দেখতে শুনতে ভাল, একটা পাশ—

ওসব কথা হচ্ছে না! ও'র মেয়েকে আমি বিয়েই করবো না।

উনি কথা দিয়েছেন, বলেছেন—

বিকাশ যেন ক্ষেপে উঠলো, কেন কথা দিয়েছেন, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন?

উমাশশী চুপ করে রইলেন। কি উত্তর দেবেন ভেবে পেলেন না।

বিকাশ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, বিয়ে করবো আমি, আর তোমরা তার ঠিক করবে? কেন?

বড় ছেলের ওপর তাঁদের কর্তৃত্বের জোরটা যেন কখন চলে গেছে, উমাশশী এর উত্তরে কি বলবেন ভাবতে পারছেন না। যেন নতুন কথা শুনছেন ছেলের মুখে।

বিকাশ বললে, বিয়ে বললেই অমনি বিয়ে! দুবেলা পেট ভরে খাবার জন্যে যাদের দিনরাত ভাবতে হয়, চাকরি করেও যাদের মাসের দশদিন চলে না তাদের বিয়ের কথা ভাবা অন্যায়! লজ্জা করে না?

উমাশশী সজল চোখে বললেন, উনি কথা দিয়ে এসেছেন, তোর ভালর জন্যে বলেছেন, তাছাড়া ভদ্রলোক নিজে থেকে বললেন—

আরো যেন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে বিকাশ, বাবাকে বোলো আমার ভালর জন্যে কাউকে কিছু করতে বা ভাবতে হবে না। ভদ্র-লোককে ও'র চেয়ে আমি অনেক বেশি চিনি তোমরা যা ইচ্ছে করবে তাই হবে না! এ বিয়ে আমি কিছুতে করবো না।

উমাশশী ছেলের হাত ধরলেন, বাবা এবারটার মত, ও'র মুখ রাখ! মেয়ে খারাপ নয়, তুই বরং একদিন গিয়ে দেখে আয়, পছন্দ না হয়—

হাত ছাড়িয়ে বিকাশ বললে, ওসব ছেলে-খেলা ছাড়! বাবা কেন আমাকে না বলে কথা দিলেন, বাবা বুঝবেন! আমি সাফ বলে দিচ্ছি বিয়ে আমি করবো না, আর করলেও ঐ লোকের মেয়েকে কখনো নয়!

উমাশশী আর কি বলবেন, ছেলের সামনে থেকে সরে গেলেন। অবনীবাবু পাশের ঘর থেকে ছেলের সব কথা শুনে-ছিলেন। উমাশশী সামনে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর চোখ বেয়ে অশ্রু নামল। বিকাশ যে কোনদিন তাঁদের এমনি অমান্য করবে তা স্বপ্নের অতীত ছিল। বিকাশের ওপর এখনো যে তাদের অনেক আশা, ভরসা!

আজ বিকাশের কথা শুধু অমান্য নয় বাপ-মার প্রতি অশ্রদ্ধাও প্রকাশ পেয়েছে। অবনীবাবু যেন এ অবস্থার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। ম্লান মুখে স্ত্রীকে বললেন, কেঁদে কি করবে! আমাদের যোগ্য শাস্তি হয়েছে। ছেলে ছেলে করে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছি, তার ফল!

ব্যথিত অবনীবাবু ভাবলেন, সংসারে এই বুঝি নিজেকে প্রকাশ করা ছড়িয়ে দেওয়া! যে-বোঝা মাথায় করে চিরকাল বহা গেল সেই বোঝাই তাকে চেপে দিল! ছেলে বড় হয়েছে, রোজগার করছে, তা বলে বাপ-মার ওপর এত কর্তৃত্ব! বাপ-মার কোন দাম নেই, তাঁদের কথারও কোন মূল্য নেই? মনে হল নিজেকে যেন দীর্ণ করে দু টুকরো করে ফেলেছেন অবনীবাবু, চেষ্টা করেও অস্তিত্বের সে দ্বিখন্ডতা আর জোড়া লাগান যাবে না। এত স্বাধীনতা আজকালকার ছেলেদের! এত স্পর্ধা—

হ্যাঁ তাঁর ভুল হয়েছিল, জেনেশুনেও তিনি কেন গিয়েছিলেন ছেলের সম্বন্ধ করতে? এখন তাঁর মান, মর্যাদা রইলো কোথায়!

(ক্রমশঃ)

কুড়িগ্রামের ডাকবাংলোয়

আশ্‌রাফ সিদ্দিকী

কুড়িগ্রামের ডাকবাংলোয় সেই কয়েকটি দিন
মেঘলা রাতের স্বপ্নের মত এখনো ভেসে উঠে
চিলমারীর বন্দরের পথে অচিন গাড়ীয়াল
গানের কমল বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে সেই যে চলেছে
ধরলা নদীর পানি কূল ছাপিয়ে সেই যে বইছে
দিগন্ত চক্রবালে ফেরারী বলাকার দল সেই যে উড়ছে
মনের রূপালী পর্দায় আজও যেন দেখতে পাই

কুড়িগ্রামের ডাকবাংলোয়
সবুজ ঘাসের সমুদ্রে
আর কাশ-শিউলীর আলপনায়
সেই যে কয়েকটি সকাল বিকেল আর রাত
সে-যেন রূপকথার মোহমদির মুহূর্ত
(ধরলা নদীর পানি হয়তো কোনদিনই উজান বইবে না
চিলমারীর বন্দরে গাড়ীয়ালের গান শোনাও
জীবনে সম্ভব হবে না
তুমিও হয়তো এই বয়সে থাকবে না)
কিন্তু প্রথম যৌবনের এই কয়েকটি দিন
তোমার সলজ্জ উপস্থিতি
বাঁশীর সুরকেও ম্লান করা সংগীত
কুড়িগ্রামের এই ডাকবাংলোয়
বেঁচে রইলো

জীবনে বহু নাকাল বহু অসঙ্গতি
কিন্তু কুড়িগ্রামের এই ডাকবাংলো
সে-যেন জীবনের তিনটি দিনের পরিপূর্ণতার
স্বাক্ষর

কুড়িগ্রামের এই ডাকবাংলোয়
তোমরা একবার এসো
প্রাণ খুলে মন খুলে হেসো
কারণ জীবন তো পদ্মপত্রে জল
কুড়িগ্রামের এই ডাকবাংলোর তিনটি দিন
তিনটি চুমোর মতই স্বপ্ন রচনা করে রাখলো
জীবনে বহু নাকাল বহু অসঙ্গতি
তবু তোমায় বেঁচে থাকতে হবে
ঘানি টানতে হবে

এর মধ্যে সময় করে
শরতের কোন এক উদার আকাশের নিচে
সবুজ ঘাসের সমুদ্রে
কাশ-শিউলীর আলপনায়
ধরলা নদীর কল-সংগীতে
দ্বিপ্রহরের গাড়ীয়ালের উদাস করা সুরে সুরে
ঘুঘু টিয়া আর রাঙা শালিখের কলোচ্ছ্বাসে
বিনা কাজে মুখোমুখী বসে যেও
কারণ কুড়িগ্রামের ডাকবাংলো
তোমায় কবি করতে পারবে
তোমায় শান্তি দিতে পারবে
কুড়িগ্রামের ডাকবাংলোর দিনগুলি
কবিতার চেয়েও মাদকতাময়
কুড়িগ্রামের ডাকবাংলোয়
কী-যে হারিয়ে এলাম
কেমন করে বলি।

খেলার জগতে মেয়ে

—আমি ব্যাডমিন্টন, লাঠি ছুরি প্রভৃতি খেলতে পারি। কিন্তু ক্রিকেট খেলার সখ আমার ছেলেবেলা থেকে। পুণাতে যখন মেয়েদের ক্রিকেট ম্যাচ হল, তখন থেকেই আমার উৎসাহ বেড়ে গেল। ওরা যখন ক্রিকেট খেলছে, তখন আমরা বাংলার মেয়েরাই বা কেন পিছিয়ে থাকব? আমাদেরও কেন এ খেলার সুযোগ আসবে না? এই সব নানা চিন্তা আর প্রশ্ন আমার মাথায় ঘুরতে থাকে। এসব প্রশ্ন নিয়ে আমি আপনাদের যুগান্তরের ক্রীড়াবিভাগে অনেক চিঠিও লিখেছি—

কথাগুলি বলছিল গতবারের ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বিজয়ী পশ্চিম বাংলা মহিলা ক্রিকেট দলের অন্যতম প্রারম্ভিক বোলার কুমারী রুণা বসু। গত বছর সেপ্টেম্বরে রুণার বাবার মৃত্যু হওয়ায় শোকের সময় ও নির্দিষ্ট দিনে বাংলা দলের নির্বাচনী অনুশীলনে আসতে পারেনি। তবে বিলম্বে এলেও বাংলার সংগঠনদের নজর কাড়তে পেরেছে। ক্রিকেটকে আমি মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। ক্রিকেটদল গঠন হচ্ছে শুনে কি আনন্দ যে হয়েছিল, তা আর কি বলব? তবে ছেলেরা আমাদের এই খেলাকে খুব গুরুত্ব এখনও দিচ্ছে না। আমি কিন্তু দাদা এবং পাড়ার অন্য সব ছেলেদের সঙ্গে প্র্যাকটিশ করি। মা অবশ্য আমাকে উৎসাহই দেন। তবে আমার পড়াশোনাতেও জোর দিতে হয়। বরানগর বি কে কলেজে আমি বি-এ তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। বারাণসীতে আমার খেলা নিয়ে কলেজেও খুব হৈ-চৈ পড়ে যায়। মেয়েদের ক্রিকেট সুরু হতে আমার আগ্রহ আরও বেড়ে যায়। মন দিয়ে দুই প্রশিক্ষক

আর এক
ওপেনিং বোলার
রুণা বসু

বাদল চন্দ এবং শ্রীসুশীল দাশগুপ্তের উপদেশে সংইংবল খেলায় চেষ্টা করি। ব্যাটে তেমন রপ্ত হতে পারছি না। তবে চেষ্টা করছি। '৭৩-এর নভেম্বরে সুরু হল আমাদের অনুশীলন। দল বাছাই সম্পূর্ণ হলে আমরা বারাণসীর পথে রওনা হলাম। ভাবুন দেখি, কতরকম চিন্তা তখন মনে জট পাকাচ্ছে। একদানেই একেবারে সর্ব-ভারতীয় আসর। এতদিন কেবল ক্রিকেট খেলা দেখেছি আর চিঠিপত্রে খেলার নিয়ম-কানুন—টুকিটাকি নিয়ে শিখেছি বা পত্র-পত্রিকায় পড়েছি। তাই খুব একটা অনিশ্চিত উদ্বেগ নিয়ে বারানসী রওনা হলাম।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অর্থাৎ ম্যাচের দিন-গুলিতে রুণা তার বোলিং কুশলতা সপ্রমাণ করতে পেরেছে। বলের নিশানা ঠিক ছিল, লেংথও ছিল নিখুঁত। কাগজে-কলমে যেরকম পড়েছে বা প্রশিক্ষকদের কাছে যেমন যেমন শিখেছে মাঠে রুণা তা প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছে যথাশক্তি। মহিলা দলের উইকেটরক্ষক (রক্ষাকারিণী?) ইলা রায়-চৌধুরীকেও আমি সেদিন কালীঘাট মাঠে দলের বোলারদের বিষয় জিজ্ঞাসা করে-ছিলুম। ইলাও বললে রুণার বল আউট সুইং করে মাঝে মাঝে, তাছাড়া নিশানা উইকেট লক্ষ্য করে। বলের গতি অনুসারে মিডিয়াম পেসের শ্রেণীতে ফেলা যায়। ঐকান্তিক নিষ্ঠা আর নিজের ওপর দৃঢ় আস্থা নিয়ে রুণা বল করেছে। ফলও পেয়েছে ভালই। সমগ্র প্রতিযোগিতায় বোম্বাই, বুন্দেলখণ্ড, তামিলনাড়ু এবং ফাইনালে কর্ণাটক দলের বিরুদ্ধে জয়লাভের পথে রুণা উইকেট পেয়েছে মোট ষোলটি। শ্রেষ্ঠ বোলিংয়ের মানের জন্য কোলাপুরে প্রতিযোগিতায় বিশেষ পুরস্কার পেলেও সর্বাধিক উইকেট দখলের কৃতিত্ব কিন্তু রুণা বসুরই।

রুণা বলে, এখন কলকাতায় যদি বেশ কতকগুলি মেয়ে ক্রিকেট ক্লাব তৈরী হয়, তাহলে আমরা স্বচ্ছন্দে খেলার সুযোগ পাই। কারণ, ছেলেরা এখনও নানা জায়গায় আমাদের যে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে তখন সেটা কমবে। অনেক খেলাতেই আমাদের মান খুব উঁচু নয়। সুতরাং সেদিকে সবারই নজর দেওয়া দরকার। আমার তো মনে হয়, এই-ভাবে খেলাধুলোর বিভিন্ন ও বিচিত্র আসর সারা দেশে ছড়িয়ে দিলে, তাতে সবাই উপকৃত হবে। তখন আর একে অপরের খেলার মান বা যোগ্যতা নিয়ে ঠাট্টা তামাসা কি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে কারতে পারবে না। মেয়েদের ক্রিকেটকে কিছু লোক 'তামাসা' বলায় ক্রুদ্ধ স্বরে রুণা তার মতামত জানায়।

রুণা বলে বারানসীতে আমাদের এই চার দিনব্যাপী প্রতিযোগিতার প্রত্যেক দিন সিপরা স্টেডিয়ামে ১-৫০ পয়সার টিকিট কিনে বহু লোক এসেছে আমাদের খেলা দেখতে। মেয়ে-পুরুষ বাদ ছিল না। অনেক মেয়ের মনেই যে এই খেলায় যোগদানের আকাঙ্ক্ষা সুপ্ত ছিল এবং আছে বিভিন্ন রাজ্যের মেয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তা বুঝতে পারি। তাই মনে হয় শুধু বাংলায় নয় সারা ভারতে শক্তিশালী মহিলা ক্রিকেট দল তৈরীর সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল।

রুণা সাধারণ বাঙালী মধ্যবিত্ত পরি-বারের মেয়ে। এরা চার বোন, এক ভাই। রুণাই সবার ছোট তাই মায়ের সাদর উৎসাহ আর দাদার সস্নেহ সহযোগিতা পাচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ওর নিজস্ব আগ্রহ ও একাগ্রতা। বাংলার এই ক্রিকেট দলে যারা রয়েছে তাদের প্রায় সবাই এই রকম সাধারণ ঘরের মেয়ে।

রুণার বাবা ছিলেন সেন্ট্রাল একসাইজের একজন সুপারিন্টেন্ডেন্ট। তিনি স্বয়ং ভাল খেলোয়াড় এবং ক্রীড়ানুরাগী ছিলেন। চাকরীর খাতিরে তাঁর সপরিবারে কোচ-বিহারে থাকাকালে রুণা সুনীতি একাডেমী থেকে স্কুল ফাইনাল পাশ করে। ওখানেই ও নানারকম খেলার সুযোগ পায়। এখানে এসে কলেজে অর্থনীতিতে অনার্স নিয়েছিল কিন্তু খেলা আর পড়া একসংগে চালাতে গিয়ে অনার্স ছাড়তে হয়েছে।

প্রশিক্ষণের মূলধনেই আমরা এতটা সাফল্য লাভ করবো এতখানি বোধহয় কেউ আশা করেননি। প্রথমদিকে তো মাঠেই অনেক পুরুষ দর্শক আমাদের উদ্দেশ্যে টিটকারী দিয়েছে। বলেছে এই সব বাচ্চা-মেয়ে এরা কি খেলবে? নানা কাগজে ঠাট্টা মসকরাও কম হয়নি। কিন্তু যাই হোক সর্ব-ভারতীয় আসরে প্রথম আবির্ভাবেই আমরা বিজয়ী আখ্যাতো পেয়েছি। বলুন এ কি কম কথা!

রুণার কথায় সমর্থন জানিয়ে ফিরে এলুম। বুঝলুম একাগ্রতা ও আত্মপ্রত্যয়ের মূলধন থাকলে সাফল্য অর্জন নিশ্চয়ই হয়। বিদায় নেবার সময় রুণাকে শুভেচ্ছা জানাতে ভুলিনি।।

—অময়

মাঠের নায়ক

শিবাজী ব্যানার্জি

সেই যে একটা কথা চালু আছে না—বাপকা বেটা, সিপাহী কা ঘোড়া, কুছ নেহি তো থোড়া থোড়া?

শিবাজীর ক্ষেত্রে ঐ কথাটা চোখ বুঁজে বলে দেওয়া যেতে পারে। শিবাজী অর্থাৎ শিবাজী ব্যানার্জী এখন বাংলার প্রথম সারির ফুটবল গোলকীপার। হাল ঠিকানা—হাওড়া ইউনিয়ন। সামনের বছর আস্তানা কোন তাঁবুতে হবে তা সে নিজেও জানে না। মুক্ত তথা খণ্ডিত ভারতে যাঁদের জন্ম, তাঁরা কেউই শিবাজীর বাবা সুবোধ ব্যানার্জীকে খেলতে দেখেন নি। বয়ঃজ্যেষ্ঠরা সুবোধবাবুকে ফুটবল মাঠে দেখেছেন অসাধারণ একজন গোলরক্ষকের ভূমিকায়। জীবনের সেরা সময়টুকু তিনি কাটিয়েছেন কালীঘাট ক্লাবে। অল্প সময় মোহনবাগানেও। তখনকার দিনের 'ইন্টারন্যাশনাল' (ভারতীয় বনাম ইউরোপীয়) ম্যাচ তো বটেই, ১৯৩৮ সালে চীনা দলের বিরুদ্ধেও তিনি খেলেছেন। প্রৌঢ়ত্বের গণ্ডী পেরিয়ে সুবোধবাবু এখন বার্ধক্যে পা দিলেও ফুটবলের নেশাটি পুরো দস্তুর বর্তমান। মাঠে আসা চাই রোজ, আর ছেলের অর্থাৎ শিবাজীর খেলা থাকলে তো কথাই নেই। এমনও দেখা গেছে, অফিস ঘুরে শিবাজী মাঠে আসার অনেক আগেই সুবোধবাবু মাঠে হাজির। পিতা সুবোধ ব্যানার্জী কি পুত্র শিবাজীর মধ্যে নিজের ছবিটি দেখতে পান? হয়তো বা পান, না হলে এই বয়সেও কোন টানে বেলেঘাটা থেকে গড়ের মাঠে ছুটে আসবেন?

সাত আট বছর বয়স থেকে শিবাজীকে ফুটবলে উৎসাহিত করেন সুবোধবাবু নিজেই। স্বপ্ন ছিল শিবাজীকেও গোল-কীপার তৈরী করবেন। স্বপ্ন যে সার্থক হতে চলেছে, আজ এই মুহূর্তে তা অস্বীকার করার উপায় কি? শিবাজী সুবোধবাবুর ছোট ছেলে। জন্ম ১৯৫২ সালের ২৬ নভেম্বর পূর্ব কলকাতার ওমদা রাজা লেনে (বেলেঘাটা) মামা বাড়ীতে। আদি বাড়ী খুলনার (রহুড়া)।

ফুটবলে শিবাজীর হাতে খড়ি বাবার কাছে। বঙ্গবাসী স্কুলে ফাইভ-সিক্সে পড়ার সময়ই বাবার নির্দেশ মত 'তিন কাঠির' নীচে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। পরের কথা ওঁর নিজের মুখ থেকেই শোনা যাক :

ছোটবেলায় বাবার মুখে অতীত দিনের গোলরক্ষক আর্মস্ট্রং পটার ডোভস মণি তালুকদার ওসমান কে দত্ত প্রমথেশর গল্প শুনেছি। আমার কাছে তখন ঐ গল্প প্রায় রূপ কথারই মত। শুনতাম আর ভাবতাম স্বপ্ন দেখতাম—বড় হবো, বড় হবো, আর্মস্ট্রং ওসমান কে দত্ত এবং আমার বাবার মত বড় হবো। কিন্তু পারলুম কোথায় ওঁদের ছুঁতে? স্কুলে পড়ার সময় শুধু ফুটবলই খেলিনি, অ্যাথ-লেটিকসেও নেমেছি, ক্রিকেটও খেলেছি। ফুটবল, ক্রিকেট ছাড়তে পারি নি, কিন্তু

থলেটিকস শেষ পর্যন্ত ছাড়তে হয়েছে! টবল, ক্রিকেট এবং অ্যাথলেটিকসে গবাসী কলেজে পড়ার সময় কেন্দ্রীয় ক্রামন্ত্রক থেকে স্টারস মেরিট সার্টিফিকেট য়েছিলেন আমাকে। ১৯৬৮ সালে বঙ্গবাসী স্কুল থেকে হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষায় পাশ করার পর ভর্তি হোলাম -এস-সি পড়ার জন্য বঙ্গবাসী কলেজে। মনে পরীক্ষা। ১৯৭০ সালে কলকাতা শ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ড পরিচালিত ন্তঃ কলেজ অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় না বাহুল্য বঙ্গবাসীর হয়েই নেমেছিলাম বং একশো মিটার দৌড়, হাইজাম্প এবং ডজাম্পে ফার্স্ট হয়েছিলাম। ফুটবলের ত ক্রিকেটও খেলি সি এ বি সিনিয়ার লীগে। রু করেছিলাম জুনিয়ার লীগে। গোড়ায় ন্যাশনালে। তারপর সিনিয়ারে এলাম ইউনিয়ন স্পোর্টিংয়ের হয়ে। ইউনিয়ন স্পোর্টিংয়ের পর গ্রীয়ারে খেলেছি, খেলেছি স্টবেঙ্গলে। সি এ বি নক-আউটে সবুজবাগের বিরুদ্ধে এই অধমের সেঞ্চুরীও আছে। আন্তঃ স্কুল ক্রিকেটে মধ্য কলকাতার হয়ে খেলার সময়ই ক্রিকেটে ফুটবলের মত রীতিমত সিরিয়াস হয়ে উঠি। ভাবি, ফুটবলে বাবার কাছ থেকে, কালীঘাটের নবেসুন্দিদার কাছ থেকে, সত্তারদার, অমলদার এবং প্রদীপদার কাছ থেকে যেমন সহযোগিতা, সাহচর্য এবং গাইডেন্স পেয়েছি, ক্রিকেটে তেমনটি পেলে হয়তো রণজি ট্রফিতে খেলতে পারতুম এতদিনে।'

'তবে ক্রিকেটই বলুন, অ্যাথলেটিকসই বলুন, আমার সব কিছু ভেসে গেছে ফুটবলের ভালবাসায়। অবশ্য তার কারণও রয়েছে। বাবা চান আমি ফুটবলই সিরিয়াসলি খেলি, মা (উমা ব্যানার্জি), দিদি, জামাইবাবু চান আমি ফুটবলকেই আঁকড়ে থাকি। মালার ইচ্ছেও তাই (মালা শিবাজীর স্ত্রী)। গোখেলে পড়া মেয়ে। খেলাধুলোয় ভীষণ ইন্টারেস্টেড।'

ঘরোয়া সিনিয়ার ডিভিশন লীগ ফুটবলে শিবাজী প্রথম খেলেছেন ১৯৭০ সালে বাবার পুরোনো ক্লাব কালীঘাটে। ঐ ক্লাবে থাকার সময় ১৯৭১ সালে আসামে আয়োজিত জুনিয়ার জাতীয় ফুটবলে (ডাঃ বি সি রায় ট্রফি) পশ্চিম বাংলার হয়ে শিবাজী খেলেছিলেন। পরের বছর শিবাজীর স্থান হয়ে গেল গোয়ায় সন্তোষ ট্রফি অর্থাৎ জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার আসরে। তখন তিনি হাওড়া ইউনিয়নের গোলকীপার। এই ১৯৭২ সালই সম্ভবত শিবাজীর ফুটবল জীবনের সব চেয়ে উজ্জ্বল বছর। শিবাজী কলকাতা তথা বাংলার ক্রীড়ারসিকদের নজর কাড়েন ১৯৭২ সালে ইস্টবেংগল মাঠে লীগের একটি খেলার মাধ্যমে। পরপর প্রায় ১৪।১৫টি ম্যাচে ইস্টবেংগল (সেবারের অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন) জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে আসছিল। সেদিন প্রতিদ্বন্দ্বী হাওড়া ইউনিয়ন। লীগ কোঠায় হাওড়ার অস্তিত্ব ঐ সময়টায় মোটেই জাঁক করে বলার মত কিছু নয়। সুরু থেকেই ইস্টবেঙ্গল হাওড়া এলাকায় সর্বাত্মক আক্রমণ চালালো। প্রতি মুহূর্তেই গোল হয়, হয় ভাব। ইস্টবেংগলে খেলছেন : অরুণ ব্যানার্জি, সুধীর কর্মকার, চন্দ্রেশ্বর প্রসাদ, অশোক ব্যানার্জি, প্রবীর মজুমদার, মোহন সিং, গৌতম সরকার, স্বপন সেনগুপ্ত, হাবিব, আকবর এবং সমরেশ চৌধুরী। বলতে গেলে গোটা সত্তর মিনিট খেলা হোল ইস্টবেঙ্গল আর হাওড়া ইউনিয়নের গোলকীপার শিবাজী ব্যানার্জির মধ্যে। এক সময় রেফারী শেষের বাঁশীও বাজালেন। ফলাফল গোলশূন্য। সত্যি কথা বলতে কি হাওড়াকে সেদিন বাঁচিয়েছিলেন অথবা ইস্টবেঙ্গলকে বিমুখ করেছিলেন একা একটি ছেলে, নাম শিবাজী ব্যানার্জি। অতীতের সেই মারাঠা নায়কের বিক্রমেই সেদিন গর্জে উঠেছিলেন শিবাজী। সেদিনের একটি ঘটনা শিবাজীর স্মৃতিতে অম্লান। বেলা তখন দুটো হবে। ওমদারাজা লেনের বাড়ী থেকে মাঠের দিকে রওনা হচ্ছেন বাবা-মাকে প্রণাম করে। সদর পর্যন্ত এগিয়ে এলেন সুবোধবাবু। চোখমুখ দেখে মনে হোল, যেন কিছু বলতে চান ছেলেকে। শিবাজী শুধোল : 'কিছু বলবে বাবা?' সুবোধবাবু ছেলের মাথায় হাত রেখে বললেন : 'শিবু, সত্তর মিনিটে দশটা পজিটিভ এ্যাটাক হয়তো হবে। সেই দশটা যদি কনসেনট্রেট করে রুখে দিতে পারো তো কেল্লা ফতে'। বাবার পরামর্শ মত সেদিন কিছু করতে পেরেছিলাম কি না, আপনারাই তা ভালো করে জানেন!'।

হাওড়া ইউনিয়ন-ইস্টবেংগলের খেলা-

টিকে কেন্দ্র করেই শিবাজী ময়দানে প্রতিষ্ঠিত হলেন। ভারত তথা এশিয়ার প্রখ্যাত গোলকীপার পিটার থঙ্গরাজ পাঁচ বছর কলকাতায় ছিলেন [illegible]। শিবাজীকে ইস্টবেঙ্গলে টেনে এনে নিজের হাতে প্রায় মাসখানেক ধরে ট্রেনিং দিলেন। সম্ভবতঃ জহুরী জহর চিনেছিলেন। থঙ্গরাজের এই তালিমের জন্য শিবাজী কৃতজ্ঞ। অনেক নতুন কিছু তিনি শিখতে পেরেছেন, জানতে পেরেছেন। গোল অ্যাঙ্গল ক্লোজ করা, ঠিক মত পজিসন নেওয়া, ফিস্ট করে গোললোভী ফরওয়ার্ডদের মাথার ওপর দিয়ে বল ফিস্ট বা গ্রিপ করার টেকনিক অনেক সংশোধন পিটার থঙ্গরাজ করে দিয়েছেন। থঙ্গরাজের প্রতি এঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা, আস্থা আর ভালবাসা তরুণ বসুর ওপরও। শিবাজীর ভাষায়, 'তরুণের মত গোলকীপার এখন ভারতে নেই, হি ইজ ডেফিনিটলি দি বেস্ট'।

শিবাজী ব্যানার্জি অলরাউন্ডার। চৌকস খেলোয়াড়। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট অ্যাথলেটিকস বা ব্যাডমিন্টনের আসরে শক্ত শক্ত পরিস্থিতির মোকাবিলাতে সে অভ্যস্ত। কিন্তু সম্প্রতি সংসারের বোঝাটা তাঁকে খানিকটা বেকায়দায় ফেলেছে। বাবা সুবোধবাবু কলকাতা কর্পোরেশনের চাকরী থেকে অবসর নিয়েছেন। তাই সংসারের যাবতীয় দায়দায়িত্ব চেপেছে ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন-এর চাকুরে শিবাজী আর তাঁর দাদার ওপর। প্রতিপক্ষের পেনাল্টি শটের সামনেও শিবাজী যেমন ঘাবড়ান না কোনদিন ঠিক তেমনি সাহস হারান না সংসারের ক্রিটিক্যাল পরিস্থিতির মুখেও। ওঁর ধারণা, চাওয়ার শেষ নেই, লোভের সীমা পরিসীমা নেই। লোভকে বশীভূত করতে পারলে সংসারের ঝামেলা অনেক কমে যায়। আমরা দু-ভায়ে মিলে যা রোজগার করি তাতে এখনো পর্যন্ত বেশ স্বচ্ছন্দভাবেই কাটছে। ভবিষ্যতে কি হবে জানি না, যেমন জানি না কলকাতার ফুটবল মাঠের ভবিষ্যৎ।'

[illegible] মাঠের বর্তমান চেহারা দেখে কেউ কি বলতে পারেন যে, আগামী বছর এখানে কি হবে, [illegible] কোনটা থাকে কোনটা হাওয়ায় পাল তুলবে। এই তো [illegible] দিকে তাকিয়ে দুটো দল [illegible] একটা উঠবে। কিন্তু অদৃশ্য প্রভাবে শেষ পর্যন্ত সব বদলা-পালটা হয়ে গেল। সংগঠকদের কোন প্রতিশ্রুতিই ধোপে টিকলো না। সুতরাং স্ট্যান্ডার্ড ভাল করবো, ভাল করবো নামে শুধু বাইরে সোরগোল তুললে কি লাভ হবে? খানিকটা বিরক্ত হয়েই শিবাজী বললেন কথাটা।

শিবাজী সুপুরুষ। টকটকে গায়ের রং। লম্বা, চওড়া, স্মার্ট। টানাটানা চোখ, কোঁকড়া চুল, টিকালো নাক। খেলার মাঠ ছেড়ে [illegible] পাড়ায় [illegible] করলে সিনেমার নায়ক হতে পারতেন। টালিগঞ্জ স্টুডিও পাড়ার [illegible] পাসপোর্ট জোগাড় করা শিবাজীর [illegible] শক্ত হোত না, কারণ শিবাজীর কাকা ঐ মহলে প্রতিষ্ঠিত [illegible]। শিবাজীর কাকার নাম সুশীল [illegible] [illegible] পরিচালক ছিলেন। গত বছর তাঁর অকাল বিয়োগ ঘটেছে। সুশীলবাবুর কিশোর ছেলে [illegible] বাবার মৃত্যুর দু মাস বাদেই [illegible]। এখন কাকীমার কাছে শিবাজীর [illegible]।

বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়

দর্শক

সোবার্সের অবসর

বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ চৌকস টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় গারফিল্ড সোবার্স প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা থেকে তাঁর অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন চলতি ১৯৭৪ সালের ইংলিশ ক্রিকেট মরসুমের শেষে তিনি প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট থেকে অবসর নেবেন। সোবার্স ১৯৬৮ সাল থেকে নটিংহামসায়ার কাউন্টি দলের পক্ষে ইংলিশ কাউন্টি ক্রিকেটে খেলছেন। তাঁর বর্তমান বয়স ৩৮। এই বয়সে একনাগাড়ে পেশাদারী ক্রিকেট খেলায় ক্লান্তি তো আছেই, তার ওপর আছে তাঁর পায়ের সেই পুরোনো ব্যথা।

১৯৫২ সালে ১৬ বছর বয়সে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলের বিপক্ষে সোবার্স বার্বাদোজের হয়ে প্রথম খেলেছিলেন। মাত্র দুটি প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলে তিনি ১৯৫৩-৫৪ সালে স্বদেশের মাটিতে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে মাত্র একটা টেস্টে আহত ভ্যালেনটাইনের শূন্যস্থানে বোলার হিসাবে দলভুক্ত হয়েছিলেন। জীবনের এই প্রথম টেস্ট খেলায় তিনি ৮১ রানে ৪টে উইকেট পান এবং একটা ইনিংসে নটআউট থেকে মোট ৪০ রান করেন। এমন কিছুই নয়। তবে রাতারাতি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন ১৯৫৭-৫৮ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে স্বদেশের মাটিতে টেস্ট সিরিজ খেলে। কিংস্টনে পাকিস্তানের বিপক্ষে এক ইনিংসে নট-আউট ৩৬৫ রান করে তিনি টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের যে বিশ্বরেকর্ড করেন তা আজও অক্ষুণ্ণ আছে। এই সিরিজে তাঁর ব্যাটিং পরিসংখ্যান দাঁড়ায়—খেলা ৫, ইনিংস ৮, নটআউট ২বার, মোট রান ৮২৪, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান নটআউট ৩৬৫, সেঞ্চুরী ৩ এবং গড় ১৩৭·৩৩। টেস্ট খেলায় সর্বাধিক মোট রানের বিশ্বরেকর্ডও তিনি করেছেন—৯৩টি টেস্টে মোট ৮০৩২ রান। টেস্ট খেলায় দুর্লভ ডাবল খেতাব (১০০০ রান ও ১০০ উইকেট) অনেক খেলোয়াড়ই পেয়েছেন। কিন্তু কোন একটি দেশের বিপক্ষে টেস্ট খেলে এই 'ডাবল' খেতাব পেয়েছেন একমাত্র সোবার্স—কেবল ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে টেস্ট খেলে তিনি মোট ৩২১৪ রান করেন এবং উইকেট পান ১২০টি। ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে তাঁর টেস্ট খেলার পরিসংখ্যান দাঁড়িয়েছে : খেলা ৩৬, ইনিংস ৬১, নটআউট ৮বার, মোট রান ৩২১৪, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২২৬ (বার্বাদোজ, ১৯৫৯-৬০), সেঞ্চুরী ১০টি, ক্যাচ ৪০ এবং গড় ৬০·৬৪। বোলিং—৩৩২৬ রানে ১০২টি উইকেট। টেস্টে দুর্লভ 'ডাবল' খেতাব (১০০০ রান ও ১০০ উইকেট) লাভের তালিকায় সোবার্স মোট রান এবং মোট উইকেট পাওয়ার দিক থেকে শীর্ষস্থান পেয়েছেন—মোট রান ৮০৩২ এবং মোট উইকেট ২৩৫। টেস্ট ক্রিকেটে সোবার্সের পরিসংখ্যান : খেলা ৯৩, ইনিংস ১৬০, নটআউট ২১বার, মোট রান ৮০৩২ (বিশ্বরেকর্ড), এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান নট আউট ৩৬৫ (বিশ্বরেকর্ড), সেঞ্চুরী ২৬ (বিশ্বরেকর্ড থেকে ৩টি কম) এবং গড় ৫৭·৭৮। বোলিং বল ২১৫৯৯, মেডেন ৯৭১, রান ৭৯৯৯, উইকেট ২৩৫ গড় ৩৪·০৩ এবং এক ইনিংসে ৫টি উইকেট ৩৬বার।

ব্রিজটাউনে ১৯৩৬ সালের ২৮শে জুলাই সোবার্সের জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন একজন সামান্য বেতনের নাবিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোবার্সের বাবা অকালে মারা যান। পিতৃহীন সোবার্স নিজের প্রতিভা এবং অধ্যবসায় গুণে আজ সমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। সারা বিশ্বজুড়ে তাঁর নাম-ডাক। তার

নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল টেস্ট ক্রিকেট খেলায় অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে 'ওরেল ট্রফি' এবং ইংল্যান্ডের বিপক্ষে উইসডেন ট্রফি জয়ী হয়। এবং তাঁর নেতৃত্বে শক্তিশালী দেশগুলির বিপক্ষে 'রাবার' জয়ের সূত্রে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট খেলায় বে-সরকারীভাবে এক সময় বিশ্ব খেতাব জয় করেছিল।

সোবার্স একজন সহজাত ক্রিকেট খেলোয়াড়। কোনদিন কোচের কাছে তিনি ক্রিকেট খেলার পাঠ নেন নি। বার্বাদোজের ক্রিকেট খেলার অনুকূল পরিবেশ (যে-পরিবেশে বিশ্ববিশ্রুত 'ডবলিউ ত্রয়ী'—উইকস, ওয়ালকট এবং ওরেলের আবির্ভাব) এবং বিভিন্ন দেশের বিপক্ষে ক্রিকেট খেলার সূত্রে বিরাট অভিজ্ঞতা—এই দুই সম্পদ তাঁর খেলোয়াড়-জীবনে বিরাট সাফল্য এনে দিয়েছে। অতি সাধারণভাবেই সোবার্সের টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনের সূচনা। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৬টা, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৪টে এবং নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৪টে—মোট ১৪টা টেস্ট ম্যাচ খেলেও টেস্ট সেঞ্চুরী করতে পারেন নি। তখনও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট খেলার আসরে বিশ্বখ্যাত 'তিন ডবলিউ'—উইকস, ওয়ালকট এবং ওরেলের স্বর্ণ যুগ চলছে। পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৯৫৭-৫৮ সালের টেস্ট সিরিজে তাঁর অসাধারণ সাফল্যের সূত্রেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেটের ইতিহাসে সোবার্স-যুগের সূচনা। পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৯৫৭-৫৮ সালের টেস্ট সিরিজের ৩য় টেস্টে (কিংস্টন) সোবার্স ইংল্যান্ডের লেন হাটনের টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের বিশ্বরেকর্ড (১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ৩৬৪ রান) ভেঙ্গে দিয়ে শেষ পর্যন্ত ৩৬৫ রানে অপরাজিত থাকেন। তাঁর এই প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী। এরপরই ৪র্থ টেস্টের (জর্জটাউনে) উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করেন (১২৫ ও ১০৯ নটআউট)। ফলে টেস্টের উপর্যুপরি তিন ইনিংসে সেঞ্চুরী করার গৌরব লাভ করেন—নটআউট ৩৬৫, ১২৫ ও নটআউট ১০৯ রান। পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৯৫৭-৫৮ সালের টেস্ট সিরিজে তাঁর ব্যাটিং পরিসংখ্যান দাঁড়ায়—খেলা ৫ ইনিংস ৮ নটআউট ২বার, মোট রান ৮২৪, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৩৬৫ নটআউট, সেঞ্চুরী ৩ এবং গড় ১৩৭-৩৩।

সোবার্স খাঁটি ন্যাটা খেলোয়াড়—বাঁ হাতেই ব্যাট এবং বল করেন। বোলিংয়ে তিনি এক নতুন ধারার প্রবর্তক। ইচ্ছামত ফাস্ট মিডিয়াম বোলিং চায়নাম্যানে রূপান্তরিত করতে পারেন—ব্যাটসম্যানের কাছে সে এক ভেল্কির খেলা। এর ওপর হাতের পাঁচ তাঁর লেফট আর্ম স্পিন বোলিং তো আছেই। একজন বোলারের জীবনে বোলিংয়ের এমন সমন্বয় আর দ্বিতীয় নেই।

অস্ট্রেলিয়ার শেফিল্ড শীল্ড এবং ইংল্যান্ডের মাটিতে সেন্ট্রাল ল্যাংকাশায়ার ও কাউন্টি ক্রিকেট লীগের পেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে সোবার্স খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। সোবার্স ১৯৬৪ সালের প্রখ্যাত 'উইসডেন' ক্রিকেট বর্ষপঞ্জিকার বছরের পাঁচজন খেলোয়াড়ের তালিকায় নির্বাচিত হন। ১৯৭৪ সালের 'উইসডেন' বর্ষপঞ্জিকায় সোবার্স সম্পর্কে ৪০ পৃষ্ঠার 'ক্রোড়পত্র' ছাপা হয়েছে। এ এক দুর্লভ সম্মান কারণ তাঁর আগে এত পাতা কোন খেলোয়াড় পান নি।

৩৮ বছর বয়সে সোবার্স সসম্মানে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর নিচ্ছেন। তাঁর খেলা আজও অম্লান আছে। গত আগস্ট মাসেই ইংলিস কাউন্টি ক্রিকেট লীগ খেলায় তিনি তিনটে সেঞ্চুরী করেন—ডার্বিশায়ারের বিপক্ষে ১৩০ সামারসেটের বিপক্ষে ১৯৮ এবং ল্যাংকাশায়ারের বিপক্ষে নট আউট ১৩২ রান। এর মধ্যে ডার্বিশায়ারের বিপক্ষে ৮৩ মিনিটে যে সেঞ্চুরী করেন তা এবছরের ক্রিকেট মরসুমে সব থেকে কম সময়ের সেঞ্চুরী।

সোবার্সের টেস্ট পরিসংখ্যান

বিপক্ষে	টেস্ট	ইনিংস	নট আউট	মোট রান	এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান	সেঞ্চুরী	গড়	ক্যাচ
ইংল্যান্ড	৩৬	৬১	৮	৩২১৪	২২৬	১০	৬০-৬৪	৪০
অস্ট্রেলিয়া	১৯	৩৮	৩	১৫১০	১৬৮	৪	৪৩-১৪	২৭
ভারতবর্ষ	১৮	৩০	৭	১৯২০	১৯৮	৮	৮৩-৪৭	২৭
নিউজিল্যান্ড	১২	১৮	১	৪০৪	১৪২	১	২৩-৭৬	১২
পাকিস্তান	৮	১৩	২	৯৮৪	৩৬৫*	৩	৮৯-৪৫	৪
মোট :	৯৩	১৬০	২১	৮০৩২	৩৬৫*	২৬	৫৭-৭৪	১১০

বিপক্ষে	বল	মেডেন	রান	উইকেট	গড়	এক ইনিংসে ৫ উইঃ
ইংল্যান্ড	৮৭৫৩	৪১০	৩৩২৪	[illegible]	৩২-৫৮	৩
অস্ট্রেলিয়া	৪৮৯৫	১৫৩	২০২৬	৫১	৩৯-৭২	২
ভারতবর্ষ	৪২৭৭	২১৫	১৫১৭	৫৯	২৫-৭২	১
নিউজিল্যান্ড	১৯৯৭	১০৪	৬৮২	১৯	৩৫-৮৪	০
পাকিস্তান	১৩৬৫	৮৯	৪৫৫	৪	১১৩-৭৫	০
মোট :	২১২৮৭	৯৭১	৮০০৪	২৩৫	৩৪-০৫	৬

এশিয়ান গেমস

তেহেরানের আর্যামেহের স্টেডিয়ামে গত ১লা সেপ্টেম্বর এক বর্ণাঢ্য পরিবেশে ইরানের শাহ আনুষ্ঠানিকভাবে ৭ম এশিয়ান গেমসের উদ্বোধন করেছেন। এশিয়ার ২৫টি দেশের তিন হাজার প্রতিযোগী মার্চ-পাস্ট অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। ভারতীয় দলের নেতৃত্ব করেন পারভিনকুমার। ক্রীড়ানুষ্ঠান শেষ হবে আগামী ১৬ই সেপ্টেম্বর।

অস্ট্রেলিয়া সফরে এম সি সি

আগামী শীতকালে মাইক ডেনেসের নেতৃত্বে ইংল্যান্ডের এম সি সি দল অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবে। এই এম সি সি দলে নীচের ১৬ জন খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন। অপ্রত্যাশিতভাবে দলভুক্ত হয়েছেন অফ-ব্রেক বোলার ফ্রেড টিটমাস এখানে উল্লেখ্য, টিটমাস ৬ বছরের বেশী কোন টেস্ট ম্যাচ খেলেন নি।

এখানে উল্লেখ্য, ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলাই পৃথিবীর মাটিতে প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলা—সূচনা ১৮৭৭ সালের মার্চ ১৫, অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ মাঠে।

এপর্যন্ত ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার যে ২১৪টি টেস্ট খেলা হয়েছে তার ফলাফল : অস্ট্রেলিয়ার জয় ৮২, ইংল্যান্ডের জয় ৭০ এবং খেলা ড্র ৬২।

নির্বাচিত খেলোয়াড়বৃন্দ

মাইক ডেনেস (অধিনায়ক), জিওফ বয়কট, ডেনিস অ্যামিস, জন এডরিচ, কিথ ফ্লেচার টনি গ্রিগ ডেভিড লয়েড, জিওফ আর্নল্ড মাইক হেনড্রিক পিটার লেভার ক্রিস ওল্ড ফ্রেড টিটমাস ডেরেক আন্ডারউড, বব উইলিস, অ্যালান নট এবং বব টেলর।

বিশ্ব জুনিয়র দাবা প্রতিযোগিতা

ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত ১৩শ বিশ্ব জুনিয়র দাবা প্রতিযোগিতায় ইংল্যান্ডের এন্টনী জন মাইলস বিশ্ব খেতাব জয়ী হয়েছেন। ইংল্যান্ডের পক্ষে তিনিই এই খেতাব প্রথম পেলেন। মাইলস শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের ছাত্র। বয়স ১৯ বছর। এবারের প্রতিযোগিতায় ২৬টি দেশের খেলোয়াড়রা অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

শতবর্ষের স্মরণীয়

মনোমোহন বসু

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই ৪ পরগণা জেলার ছোট জাগুলিয়া গ্রামে ন্মগ্রহণ করেন নাট্যকার মনোমোহন বসু। ই গ্রামেই পরবর্তীকালের যশস্বী চিত্র মঞ্চাভিনেতা ছবি বিশ্বাসের আদি াসস্থান ছিল। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে নোমোহন বসু পরলোকগমন করেন। ্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পূর্বে এবং রে বাংলার নাট্যান্দোলনের মূলে নোমোহন বসুকে কোন মতেই আমরা ুলতে পারি না।

বাল্যকাল থেকে বাংলা রচনায় অভ্যস্ত ন। প্রভাকর, তত্ত্ববোধিনী প্রভৃতি পত্রিকায় ্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা লিখতে থাকেন। ভাকর নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ রেন। মধ্যস্থ নামে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। মধ্যস্থ ত্রিকার পৃষ্ঠায় বাংলার নাট্যান্দোলন ম্পর্কিত বহু তথ্য লিপিবন্ধ আছে। ামাভিষেক, প্রণয়পরীক্ষা, সতী নাটক, রিশ্চন্দ্র, নাগাশ্রমের অভিনয়, পার্থ পরাজয় াসলীলা আনন্দময় নাটক রচনা করেন। ুলীন নামে একখানা ইতিহাস রচনা করেন। াত্রা থিয়েটার, পাঁচালী প্রভৃতির জন্য বহু ান রচনা করেন। নাট্যকার এবং কবি হসেবে সমান খ্যাত ছিলেন।

ঈশ্বর গুপ্তের অনাতম শিষ্য কবি মনো-মাহন বসু তখন যাত্রা, আখড়াই, হাফ াখড়াইর জন্য সংগীত রচনা করে খ্যাতি ার্জন করেছেন। বহুবাজার বংগ নাট্যালয়ের উদ্যোক্তারা কবি মনোমোহন বসুকে নাটক চনা করে দিতে অনুরোধ জানান। ১৮৬৮ ৃষ্টাব্দে রামাভিষেক নাটক অভিনীত হয়ে ্রসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই ম্প্রদায়ই ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সীতা নাটক অভিনয় করেন। এবং ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১৭ জানুয়ারী নিজস্ব নাট্যগৃহের বারোদ্ঘাটন করেন সতী নাটক দিয়ে।

রামাভিষেক নাটক এতই জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে নাটকটি 'বর্ণ পরিচয়' ামে খ্যাত হয়ে ওঠে।

লীলাবতী নাটকের অভিনয়ের সময় মনোমোহন বসু বাগবাজারের সভ্যদের রিহার্সেলে প্রায়ই আসতেন এবং নানান উপদেশ দিয়ে সাহায্য করতেন। নীলদর্পণ অভিনয়ে উপস্থিত থেকে উৎসাহিত করেন এবং ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যস্থ পত্রিকায় অভিনয়ের প্রশংসাসূচক সমালোচনা প্রকাশ করেন।

মধ্যস্থ পত্রিকা থেকে জানা যায় যে ইংলিশম্যান পত্রিকার মন্তব্যে ভীত হয়ে পরবর্তী অভিনয়ে কিছু অংশ বাদ দিয়ে নীলদর্পণের অভিনয় করা হয়।

১৯ জানুয়ারী, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে গঠিত সালিশী কমিটির অন্যতম সভ্য ছিলেন মনোমোহন বসু।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর সান্যাল ভবনে বার্ষিক উৎসবে মনোমোহনবাবুর বক্তৃতায় বহু তথ্য পাওয়া যায়। তিনি অভিনেত্রী নিয়ে অভিনয় করার বিরুদ্ধে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করে বক্তৃতা করেন। অবশ্য তাঁর পূর্বেই এ বিষয়ে স্বীয় মধ্যস্থ পত্রিকায় কঠোর সমালোচনা করেন।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ আগস্ট বেঙ্গল থিয়েটার প্রথম অভিনেত্রী নিয়ে শর্মিষ্ঠা নাটকের অভিনয় করেন। এ বিষয়ে প্রস্তুতি চলে জানুয়ারী থেকেই। মনোমোহন বসু ১২ ফাল্গুন, ১২৭৯ সালের মধ্যস্থ পত্রিকায় অভিনেত্রী নিয়ে অভিনয় করার বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা এ বিষয়ে উৎসাহ-মূলক মন্তব্য প্রকাশ করলে, মনোমোহন-বাবু অমৃতবাজার পত্রিকার বিরুদ্ধেও বিষোদ্গীরণ করেন। বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস-এর ২৭৬ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়।

১৭ জানুয়ারী, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে গ্রেট ন্যাশনালে মনোমোহনবাবুর প্রণয় পরীক্ষা মঞ্চস্থ হয়। মনোমোহনের বেশীর ভাগ নাটক বিভিন্ন সৌখীন সংস্থা অভিনয় করেন। পেশাদার রংগশালাতেও অভিনীত হয়।

হরিশ্চন্দ্র নাটকে মনোমোহন হিন্দু মেলায় গীত তাঁর জাতীয় সংগীতটির সংযোজনা করেন। মনোমোহন ছিলেন রক্ষণশীল। তবু সামগ্রিকভাবে তাঁর নাট্যপ্রীতি চিরদিন কীর্তিত হবে। অনেকের মতে গিরিশচন্দ্রের ওপর মনোমোহনের যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

ন্যাশনাল থিয়েটার সম্পর্কিত ব্যক্তি-পরিচয় প্রসংগ আপাতত বর্তমান সংখ্যায়ই স্থগিত রাখা হলো। আগামী সংখ্যা থেকে আমি ফিরে যাবো আমার মূল আলোচনায়। অর্থাৎ শতবর্ষের নাট্যশালার ধারা-বাহিকতায়।

ভ্রম সংশোধন

বিগত ১৪ বর্ষ ১৮ সংখ্যায় ৫৫ পৃষ্ঠার প্রথম কলমের শেষ অনুচ্ছেদে ১৮৭৩ সালের জায়গায় ১৮৮৩ সাল ছাপা হয়েছে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

নবগোপাল মিত্র

ন্যাশনাল পেপারের নবগোপাল মিত্রের সংগে বাগবাজারের সম্প্রদায়ের যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর নবগোপাল সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ' নব-গোপাল একটা ন্যাশনাল ধুয়া তুলিল। সে খুব কাজ করিতে পারিত। জাতীয় জাগরণে যেমন নবগোপাল মিত্রকে আমরা ভুলতে পারি না—তেমনি পারি না জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠায়। হিন্দু মেলার তিনি ছিলেন প্রবর্তক। ১২৭২ সালের চৈত্র মাসে (১৮৬৬ মার্চ) নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে প্রথম হিন্দু মেলা অনুষ্ঠিত হয়। গিরিশ-চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ শ্যালক ব্রজেন দেব মশায় তাঁর ঐকতান বাদন নিয়ে এই মেলাতে বাজিয়েছিলেন।

বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার সম্প্রদায় লীলাবতীর অভিনয়ের সময় নতুন নতুন সভ্যদের আগমনে যখন সম্প্রদায়কে নতুন নামে নামাঙ্কিত করতে চাইলেন, তখন নব-গোপাল মিত্র সম্প্রদায়ের নাম রাখেন 'দি ক্যালকাটা ন্যাশনাল থিয়েটার'। মতিলাল সুরের প্রস্তাবক্রমে 'দি ক্যালকাটা' বাদ দিয়ে শেষ পর্যন্ত সম্প্রদায়ের নাম 'ন্যাশনাল থিয়েটার' গৃহীত হয়। এই নামকরণের জন্য বাংলার নাট্যশালা নবগোপাল মিত্রের কাছে কৃতজ্ঞ। মহাত্মা শিশিরকুমারের মত নবগোপাল মিত্র ব্যক্তিগতভাবে এবং তাঁর পত্রিকা মারফৎ নাট্যশালাকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। তিনিও বিভিন্ন প্রয়োজনে নাট্যশালার ডাকে সাড়া দিয়ে-ছেন। 'ন্যাশনাল পেপারে' নাট্যশালা সম্পর্কিত বহু বিজ্ঞপ্তি ও তথ্য পাওয়া যায়।

ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম পর্যায়ের আভ্যন্তরীণ গোলমাল মেটাবার জন্য যে সালিশী কমিটি গঠিত হয়—তার অন্যতম সভ্য ছিলেন নবগোপাল মিত্র। ১৯শে জানুয়ারী ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে এই কমিটি গঠিত হয়। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর সান্যাল ভবনে অনুষ্ঠিত বার্ষিক উৎসবে নবগোপাল মিত্র উপস্থিত থাকেন এবং বক্তৃতা করেন। নবগোপাল মিত্র নাট্যশালার প্রয়োজনে সব সময়ই সাড়া দিয়েছেন—তাঁর উৎসাহ ও উপদেশে সভ্যদের উৎসাহিত করেছেন। গ্রেট ন্যাশনালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে সভাপতিত্ব করেন নবগোপাল মিত্র।

—কালীশ মুখোপাধ্যায়

আমীর গরীব

প্রযোজনা : এম, কে ফিল্মস

বক্স অফিস ফর্মুলায় নির্মিত একটি আনন্দদায়ক চলচ্চিত্র। প্রযোজক পরিচালক মোহনকুমার তাঁর প্রথম ছবি 'আশ কী পঞ্ছী', 'আপ কী পরছাঁই', 'আমন', 'আপ আয়ে বাহার আয়ে' ছবিগুলিতে নতুন কিছু দেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু চিত্রামোদীদের অসহযোগিতার জন্যে সবকটি ছবিই বক্সঅফিসে সাফল্যলাভ করতে পারেনি। এজন্যেই হয়তো প্রযোজক-পরিচালক মোহনকুমার সকলের মনোরঞ্জনের জন্যে, কে এ নারায়ণকে দিয়ে একটি ফরমায়েসী গল্প লিখিয়েছিলেন। যার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন বিদেশী কাহিনী এবং তিনটি বিদেশী কাহিনীভিত্তিক ভারতীয় ছবির নবসংস্করণ থেকে। ছবিগুলি হোল 'জনি মেরা নাম', 'জঞ্জির', 'জুগনু'।

মুন্না, মনি বা মনিমোহন, এবং বগলা ভগৎ একই ব্যক্তি। ছেলেবেলায় অত্যাচারীদের অত্যাচারে নিহত হয় তার পিতা, এবং মাকে কুচক্রীব্যক্তিদের পাল্লায় পড়ে সর্বস্ব ত্যাগ করে গ্রামে গিয়ে একটি অসহায় শিশুকন্যাকে নিয়ে থাকতে হয়। আর এই মেয়েটিই সোনি, যার পিতা ছিলেন একটি বিখ্যাত ফার্মের মালিক; কিন্তু তার অনুপস্থিতিতে

দেবানন্দ
হেমা মালিনী

একজন সাধারণ কর্মচারী লক্ষপতি হয়ে পড়ে এবং মনিবকে তাড়িয়ে দেয় তার একমাত্র শিশুকন্যার কথা চিন্তা না করে। সাময়িক উত্তেজনায় শেঠ দৌলতরাম সেখানেই মারা যান। এবং তাঁরই কন্যা সোনী (সোনিয়া) প্রতিবেশীদের সাহায্যে বড় হতে থাকে। তরুণী হয়ে তাঁর পালিতা মাকে সে নিজের রোজগার করা, অর্থাৎ লোকের পকেটমারের পয়সা দিয়ে কায়ক্লেশে সংসার নির্বাহ করতে থাকে। মনির বাবার মৃত্যুর সময়, সে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে সে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে এবং গরীব ও অসহায় ব্যক্তিদের বিপদ থেকে বাঁচাবে। এখন সে তার পূর্ব প্রতিজ্ঞা রক্ষা করছে 'বগলা ভগৎ'-এর ছদ্মবেশে। অর্থাৎ সে 'রঘু ডাকাত'-এর মতো ধনী শেঠদের অর্থ অপহরণ করে শ্রমিক, মজুর এবং অর্ধ অনাহারীদের সাহায্য করছে। এরপর সে হুমকী এবং ধমক দিয়ে গরীবদের অর্থ-সাহায্য, খয়রাতি দান এবং বোনাস দেবার জন্যে মনমোহনকে 'বগলা ভগতের' নামে শমনও পাঠায়। মনমোহন এবং সোনা দুজনেরই একই ইচ্ছা মনমোহনের উপর পূর্ব অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবে। ক্লাইম্যাক্স এবং এ্যান্টি-ক্লাইম্যাকস্-এর মধ্যে দিয়ে জানা গেল যে সোনিয়ার মা আসলে মনি (মনমোহনের) নিজের মা এবং সোনার বাবা শেঠ দৌলতরাম একদা অত্যাচারী আজকের দৌলতরামের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন। কুচক্রী দৌলতরাম বগলা ভগৎকে গ্রেপ্তারের কাজে লাগাবার জন্যে সোনিয়াকে নিজের বন্ধুর কন্যা হিসাবে জনসমক্ষে উপস্থিত করলেন। সোনিয়া ও মনমোহনের আসল উদ্দেশ্য ছিল অর্থপিশাচ,

স্মাগলার হত্যাপরাধী এবং ভণ্ড এক কুচক্রীকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেওয়া। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে ওরা গেল জেলে, আর বিচারে বগলা ভগতের তিন বছরের জেল হল।

বম্বের চিরতরুণ নায়ক দেবানন্দ মনির ভূমিকায় এবং সোনার চরিত্রে হেমা মালিনীর অভিনয় খুবই উপভোগ্য। মনির বোনরূপী নাজিম, কুচক্রী রনজিৎরূপী রনজিৎ, ওর দিদির ভূমিকায় তনুজা এবং কুচক্রী দৌলতরামের ভূমিকায় প্রেমনাথ এবং পুলিশ অফিসাররূপী সুজিৎকুমার এবং মনির মায়ের ভূমিকায় সুলোচনার অভিনয়কে অবাস্তব বলা চলে না। আবহসংগীত এবং সুরের মাধ্যমে অপূর্ব সুর সংযোজনায় লক্ষ্মীকান্ত পেয়ারেলাল তাঁদের সুনাম রক্ষা করেছেন। লতা ও কিশোরের গানগুলি খুবই জনপ্রিয় হবে।

—চিত্রদূত

কাবেরী বসু

: সেই ১৯৫৬য় তো ছবির কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। আবার এলেন এদ্দিন বাদে। কোনো নতুন কিছু চোখে পড়ছে কি?

—না তেমন তো কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি না। আগেও যেমনভাবে কাজ করতাম, এখনও তাই। মেকআপ রুমে মেকআপ করে ফ্লোরে যাওয়া, কাজ শেষে বাড়ী ফেরা —এটাতো আমাদের রুটিন মাফিক কাজই বলতে পারেন। তবে ইন্ডাস্ট্রির অর্থনৈতিক যেসব পরিবর্তন এসেছে সেগুলির আঁচ এখনও আমার গায়ে লাগে নি। হয়তো আরও কিছুদিন থাকলে বুঝতে পারব। আপাতত: আমার কাছে 'নো চেঞ্জ'।

: এই দীর্ঘ টাইম ল্যাপসের দরুণ আপনার অভিনয়ে কোনো অসুবিধে, ...অসুবিধে ঠিক নয় পরিবর্তন এসেছে বলে মনে হচ্ছে?

—না, তাও না। আমার অভিনয়ে সেই ছাপান্ন সালের মেজাজই আছে। তার জন্য কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

: উত্তমবাবুর সঙ্গে আগে একাধিক ছবি করেছেন। এখনও দুখানা ছবি (নগর দর্পনে ও আমি সে ও সখা) করছেন। ওঁর অভিনয়ে কোনো পরিবর্তন আপনার চোখে পড়ছে?

—হ্যাঁ, পরিবর্তন তো হয়েছেই, উত্তমবাবুর একটা পুরোনো দিনের ছবি দেখুন আর আজকের একটা ছবি দেখুন—পার্থক্যটা আপনারাই বুঝতে পারবেন,

ছবির গতিপ্রকৃতি এবং দর্শকের রুচির তালে তালে উত্তমবাবু এগিয়েছেন এক পাও পিছিয়ে পড়েন নি। তাই ওঁর অভিনয়ে ভয়ানক ম্যাচুরিটি এসেছে এখন।

: পুরোনো দিনের সহশিল্পী-কর্মীদের কেমন লাগছে?

—সত্যি কথা বলতে কি প্রথমটায় আমি একটু অন্যরকমই ভেবেছিলাম, কাজ করতে গিয়ে কিন্তু ধারণা বদলে গেল। আগেও কোনো কারণেই কারও সঙ্গে আমার বিটারনেস ছিল না এখনও নেই। ইন্ডাস্ট্রির সবাই-ই আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন, ভালবাসেন। প্রোডাকশন বয় থেকে শুরু করে প্রোডিউসার পর্যন্ত। এখনও দেখলাম এন-টি —এক নম্বরের সেই বৃদ্ধ দারোয়ান, লাইটম্যান নারানদা, কার্তিকদা সহশিল্পী সকলেই আমাকে মনে রেখেছেন। এইতো কিছুদিন আগে 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে' আউটডোরে কাজ করে এলাম গোমিয়াতে। ওঁরা সবাই-ই ছিলেন। একই ফ্যামিলির লোকের মত কেটেছে কটা দিন।

: দর্শকের মধ্যে কোনো চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছেন?

—তথাকথিত ফ্যানদের চরিত্রে খুব একটা পরিবর্তন আসেনি বটে, কিন্তু সাধারণ দর্শকের মধ্যে বিরাট চেঞ্জ এসেছে। আজকের দর্শকরা রিয়্যালিস্টিক ছবি দেখতে চায়। শুধুমাত্র মেলোড্রামা নিয়ে তাঁরা আজ আর ভুলতে চায় না।

: আপনি এখন চরিত্র নেবার সময় দর্শকের এই পরিবর্তনের কথা মনে রাখেন কি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই রাখি। না রাখলে চলবে কি করে? নিজেও যথেষ্ট খাটি চরিত্রগুলোকে বাস্তব করে তুলতে। তবে এ পর্যন্ত যে ক'টা চরিত্র আমি করেছি যেমন—আমি সে ও সখায় চন্দ্রাণী, নগর দর্পণে'র শ্রীলেখা যে যেখানে দাঁড়িয়ের অঞ্জলি—তিনটি চরিত্রই সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের, প্রত্যেকটাতেই প্রায় আমার চেনা-জানা মানুষের ছাপ রয়েছে। তাই খুব অসুবিধেও হয়নি।

: সত্তর সালের সেই ভয়াবহ দার্জিলিং-এর দুর্ঘটনা এখন আপনার কাছে দুঃস্বপ্ন না বিভীষিকা?

—আমার কাছে ঐ ঘটনা দুঃস্বপ্ন-বিভীষিকা দুটোই। কিন্তু আমি সেদিনের কথা ভুলে থাকতেই চাই। আমার বিবাহিত জীবনের চোদ্দটা বছরের সুন্দর স্মৃতি রয়েছে আমার মনে। কেন ঐ একটা দিনের বীভৎস স্মৃতিটাকে টেনে আনব বার বার। যা হবার ছিল তাতো হয়েছেই ঠেকাতে তো পারিনি। সুতরাং ওসব ভেবে নিজেকে পঙ্গু করার কোনো কারণ আছে বলে মনে হয় না। এজন্য আমাকে ফেটালিস্ট বলতে পারেন। সত্যিই আমি তাই।

: তবুও মনের গতিকে কি আপনি রোধ করতে পারেন?

—না, তা পারি না বটে। কিন্তু চেষ্টা করি। একাজে ছেলেমেয়েরাও আমাকে যথেষ্ট স্ট্রেংথ দিয়েছে। বাবার মৃত্যুকে ওরা ধীরে ধীরে মেনে নিয়েছে। তাছাড়া না মেনে উপায়ই বা কি?

: শুনেছি দুর্ঘটনার দিন নাকি আবহাওয়া এমনিতেই খারাপ ছিল। কেউ কেউ আপনাদের বেড়োতেও বারণ করেছিল।

সুতরাং এ ঘটনার জন্য কি ভাগ্যকেই দায়ী করবেন না অন্য কাউকে?

—নিশ্চয়ই ভাগ্য। তাছাড়া আর কি করবো বলুন। কেউ কেউ বারণ করে ছিল ঠিকই কিন্তু আমাদের গাড়ী যাবার আগে এই রাস্তা দিয়েতো একাধিক গাড়ী গেছে। আমাদের ওভারটেক করেও গেছে কেউ। কই তারা তো দুর্ঘটনায় পড়ে নি। আমরাই পড়লাম। তবে অ্যাপারেণ্টলি ড্রাইভার দায়ী মনে হতে পারে, কিন্তু ভাগ্যের ওপরে আর কিছু নেই।

: আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে আপনি ভগবানে খুব বিশ্বাস করেন?

—হ্যাঁ করি বৈকি! তবে ভগবানকে আমি মন্দিরের দেবতা হিসাবে মানি না। আমার কাছে তিনি আমারই মত এক-জন মানুষ। পার্থক্য শুধু আমি ক্ষমতাহীন আর তাঁর হাতে প্রচুর ক্ষমতা।

: দুর্ঘটনার পর আপনি প্রায় অকর্মণ্য হয়ে পড়েছেন শোনা গিয়েছিল—এত তাড়া-তাড়ি সেরে উঠলেন যে!

—কিছুটা মনের জোর, কিছুটা আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার সুবাদে বলতে পারেন। বিশেষ করে দার্জিলিংয়ে ভিকটোরিয়া হাসপাতালের ডাঃ পাল আর কল-কাতার ডাঃ দে-র অক্লান্ত চেষ্টা আর সেবার কথাইবা ভুলি কি করে! প্রথমটায় আমি যে স্বাভাবিক হবো কোনদিন তাই-ই ভাবতে পারিনি, হয়েছি নেহাৎ ভাগ্যের জোরে। 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র পর খানতিনেক ছবিতে আমার কণ্ট্রাক্ট হয়েছিল। কিন্তু কি হোল জানি না এই অ্যাকসিডেণ্টের খবর শোনা থেকে সেসব প্রোডিউ-সাররা আর আমার কাছে আসেননি। বাজারে তো তখন জোর গুজব—আমি অকর্মণ্য হয়ে পড়েছি, মেণ্টাল ব্যালান্স নেই...আরও কত কি!

: প্রশ্নের মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে যাই এবার—কি বলেন! আচ্ছা সিনেমায় পরিচালক যেমনটি বলেন তেমনটি করতে পারলেই কি অভিনেতা হওয়া যায় না অভিনেতার আলাদা কোনো ক্ষমতার অধিকারী হওয়া দরকার?

—শিল্পীর ফিলিংস না থাকলে তিনি শিল্পী হবেন কিভাবে বলুন? পরি-চালক যা বলেন তা করতে পারার জন্যও কিন্তু অনুভূতির প্রয়োজন। কারণ পরিচালক কি চাইছেন সেটা তো কমপক্ষে বুঝতে হবে শিল্পীকে। সুতরাং যাঁর অনুভূতিক্ষমতা যত বেশী প্রবল, তিনি তত বেশী কুশলী শিল্পী হতে পারেন। তবে এপ্রসঙ্গে একথাও সত্য যে, ভেতরের অনু-ভূতিকে প্রকাশ করার সঠিক উপায়-গুলোও অবশ্য জানা প্রয়োজন। একটা ঘোড়াকে আপনি চাবুক মেরে জোর করে টেনে-হিঁচড়ে জলের ধার পর্যন্ত

নিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু তাকে কি জোর করে জল খাওয়াতে পারবেন? কখনই পারবেন না। অভিনয়ও ব্যাপারটা তাই। পরিচালক আমাকে গাইড করেন, বাকিটুকু তো আমারই ওপর।

: গয়নাগাটির ওপর তো মেয়েদের আকর্ষণ স্বাভাবিক শোনা যায়। আপনার আছে?

—বিন্দুমাত্র না। পোষাক-আসাক, গয়না-গাটি কোনকিছুই আমার ভালো লাগে না। যে জিনিসটার প্রতি আমার প্রচণ্ড আকর্ষণ আছে, যেটা আমার খুউব ভালো লাগে, দুর্ভাগ্যক্রমে আমার নিজেরই সে-জিনিসটা নেই। তা হোল চুল। লম্বা-ঘন-কালো চুল আমার বেশ পছন্দ। কিন্তু কি আর করি বলুন!

: বলা হয় 'লজ্জা নারীর ভূষণ।'—আপনি একমত?

—ঠিক 'লজ্জা' শব্দটা আমি ব্যবহার করতে চাই না। ওর বদলে বরং বলতে পারেন মডেস্টি—মানে সভ্যতা আর কি! সভ্যতা আচার-ব্যবহারে, কথা-বার্তায় সভ্যতা পোষাকে থাকা দরকার মেয়েদের এবং এটা তাদের ভূষণও বটে। একটা কথা—পুরুষদের ক্ষেত্রেও কি এ-ব্যাপারটা অপ্রযোজ্য?

: নারীত্ব কি এবং আপনার কাছে নারীত্বের মূল্যই বা কতটুকু?

—নারীত্বের সঠিক ডেফিনেশন কি বলি বলুন তো! আমার মনে হয়, এই যে আগেই বললাম সভ্যতা। ঐ সভ্যতা ব্যাপারটার সঙ্গে কিছু সেবার ক্ষমতা, সহ্যশক্তি, ও বিনয়টিনয় ব্যাপারগুলো জুড়লেই নারীত্বের একটা চেহারা পাওয়া যেতে পারে। মেয়েদের যে-রূপটা আমরা দেখতে অভ্যস্ত অর্থাৎ শান্ত বিনয়ী, কোমলস্বভাব—এগুলো নিয়েই নারীত্ব। আর আমার কাছে নারীত্বের মূল্যের কথা জানতে চাইলেন না! ওসম্পর্কে নতুন কি আর বলবো! নারীত্ব এবং সভ্যতা—দুটো জিনিসই মেয়েদের [illegible] সুন্দর করে তোলে, তখন কার না ভালো লাগে বলুন! [illegible] বটেই, আমাদেরও [illegible] নয়।

: আপনি [illegible] ধরনের ছবি বেশী দেখেন?

—কোনো বিশেষ [illegible] প্রতি আমার [illegible] সব ছবিই দেখি। এই তো 'ববি' দেখলাম। ছেলেমেয়ে সঙ্গে ছিল। ছেলের তো 'ববি' খুব ভালো লেগেছে। কারণ, ওর স্কুলেই স্যুটিং হয়েছে তো ছবির। 'অ্যান অফ থাউ-জ্যান্ড ডেজ' দেখেছি। বেশ লেগেছে। তবে আজকাল আর বেশী ছবি দেখতে পারি না। সময় বড় কম।

: ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু ভাবছেন?

—এখন তো লেখাপড়া করছে ওরা। করুক না। ভবিষ্যতের কথা পরে। বড় হলে ওরা যা ভালো বুঝবে, করবে। আমি ইণ্টারফেয়ার করব কেন?

—নির্মল বসু

এখন এমন হয়েছে, লোড-শেডিং না হলেই বিশ্রী লাগে: আলো জ্বলছে, পাখা চলছে, শুটিং হচ্ছে ঘন্টার পর ঘন্টা—ভাবাই যায় না। অস্বাভাবিক মনে হয়। সেদিন অবশ্য স্বাভাবিক অবস্থা। ক্যালকাটা মুভি-টোন স্টুডিওতে চিত্রসেবীর 'চূর্ণী' ছবির শুভ সূচনা। এই পরিপ্রেক্ষিতে অনেক লোকজনের আগমন ঘটেছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আড্ডা জমেছে। কোনো রকম সেন-সেশন নেই। আড্ডা হচ্ছে তো হচ্ছেই। সবাই ধরেই নিয়েছিলাম যতক্ষণ না পাওয়ার আসে আড্ডা দিতেই হবে। কিন্তু না, কিছুক্ষণের মধ্যেই চিত্রসেবী গোষ্ঠীর কর্ণধার আলোকচিত্রশিল্পী শক্তি বন্দ্যো-পাধ্যায় এসে জানালেন—আমরা এরই মধ্যে সূচনা করব। মুভিতে সম্ভব হচ্ছে না, সায়লেন্ট ক্যামেরা আনতে পাঠিয়েছি, ব্যাটারী রেডি করা আছে, এও যদি অসম্ভব হয় তাহলে স্টীল ফটোগ্রাফীতে সূচনা হবে। আসুন আপনারা সকলে ফ্লোরে আসুন।

ফ্লোরে এসে দেখি অতিথিদের জন্য আসন প্রায় পূর্ণ। প্রথম সারিতে জাঁকিয়ে বসে আছেন অনুপকুমার পাশেই মেক-আপ নিয়ে এ ছবির নায়িকা সন্ধ্যা রায়। শুটিং জোনের মধ্যে এসে পড়েছেন নায়ক সমিত ভঞ্জ। জোনের একপাশে টেবিল, চেয়ার—বিশেষ অতিথিদের জন্য। টেবিলে পুষ্প-স্তবক। বিশেষ অতিথিদের মধ্যে মৃণাল সেন এবং পদ্মা দেবীকে দেখা গেল। তখনও সায়লেন্ট ক্যামেরা এসে পৌঁছয় নি। স্টীল ক্যামেরা স্ট্যান্ডের পর, তার গলায় জবা ফুলের মালা। অনুষ্ঠান শুরু হল। 'চিত্র-সেবী'র পক্ষ থেকে ইলেকট্রিশিয়ান দিলীপ ব্যানার্জি, মৃণাল সেনকে কিছু বলতে অনু-রোধ করলেন। মৃণালবাবু উঠে দাঁড়াতেই ফ্লোরে অ্যাবসালিউট সায়লেন্স। তিনি বল-লেন—সামনে আমাদের অনেক বাধা বিঘ্ন তবুও এগিয়ে যেতে হবে। ভয়ানক কঠিন সময় আসছে তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সায়লেন্ট ক্যামেরা অথবা স্টীল ক্যামেরায় যেভাবেই ছবির সূচনা হোক না কেন আমি বলব প্রচেষ্টা যদি সৎ হয় তাহলে ছবি হবেই। এইভাবেই ছবি হবে। আজ এর মধ্যে রয়েছে প্রতিবাদের ভাষা। লোড-শেডিং এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ: সায়লেন্ট অথবা স্টীল ক্যামেরায় সূচনা করে কলাকুশলী গোষ্ঠী একটা নজীর সৃষ্টি করছেন। একই কথা আবার বলতে হচ্ছে সামনে অনেক বাধা বিঘ্ন আরও কঠিন সময়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে আমাদের...

ইতিমধ্যে পূর্ণেন্দু পত্রী এসে উপ-স্থিত। তাঁকে কিছু বলতে বলা হলে তিনি ছোট্ট করে বলে গেলেন—প্রচেষ্টা যদি সৎ হয়, সকলের মধ্যে যদি আন্তরিকতা থাকে তাহলে সাফল্য অনিবার্য।'

সায়লেন্ট ক্যামেরা এসে গেল। ছবির নায়ক-নায়িকা ক্যামেরার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন। ক্ল্যাপস্টিক দিলেন মৃণাল সেন ক্যামেরার সুইচ অন করলেন পূর্ণেন্দু পত্রী। ক্যামেরা অপারেট করলেন—কানাই দে। শুধুমাত্র এই শটের জন্য। আসলে এছবির আলোকচিত্রশিল্পী শক্তি বন্দ্যো-পাধ্যায়। শুধু তাই নয় তিনি এ ছবির কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার এবং একজন পরি-চালক। চিত্রসেবী একটি নবগঠিত গোষ্ঠী, অভিজ্ঞ কলাকুশলীদের নিনয়—শক্তিবাবু তার অগ্রভাগে আছেন। অনুষ্ঠান শেষ হলে তিনি আমাকে বিস্তারিত করলেন ঃ গল্প, যাত্রা দলের পটভূমিকায়। আমি এখানে পেশাদারী এবং অ্যামেচার যাত্রা দলের যে বিরোধ—সেটা দেখতে চাইছি। নায়ক, যাত্রা দলের বিবেক। নায়িকা, নায়কের স্ত্রী, সেও এক সময় যাত্রা-দলে যোগ দিচ্ছে। এই নিয়ে জটিলতা আরো বাড়ছে।... নায়িকার নামেই ছবির নাম 'চূর্ণী'। ছবিতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্র আছে। সেটি রূপায়িত করবেন আরতি ভট্টাচার্য। এছাড়া অনুপকুমার, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী প্রমুখ থাকবেন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে। গান হবে এ ছবির অন্যতম মুখ্য ব্যাপার। এখনো ঠিক হয়নি কে সঙ্গীত পরিচালনা করবেন। সম্পাদনা করবেন অনিল সরকার।...শুটিং কবে থেকে চলবে?...আশা করা যাচ্ছে সেপ্টেম্বর মাস থেকে।...শুটিং সবটাই কি ইনডোর-এ হবে?...ইনডোর এবং আউটডোর মিলিয়ে হবে। বেশীর ভাগটাই আউটডোরে, অজ পাড়াগাঁয়ে।

দশ-বারো জন তরুণ একত্রিত হয়ে ইচ্ছে করলে কি না করতে পারেন। মাত্র পাঁচ ঘন্টার মধ্যে ডিসিশান নিয়ে সারা রাত স্ক্রীপ্ট লিখে পরদিন সকাল থেকে শুটিং শুরু করে দিতে পারেন। তা বিলক্ষণ প্রমাণ করেছেন পরিচালক মিঠু চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর সহকর্মীরা। গত কয়েক মাস ধরে

চূর্ণী: সমিত ভঞ্জ-সন্ধ্যা রায়। ফটো অমৃত

অনেক পরিকল্পনা করে মিঠু 'পৌষালী দিন' নামে একটি ছবি স্টার্ট করছেন. অ্যানাউন্স করলেন। সেইমত শুটিং-এর নির্ধারিত দিন এসে গেল। প্রযোজকের খেলাও চালু হয়ে গেল। সেট রেডি, আর্টিস্ট রেডি, মহরৎ শট নেওয়া হল কিন্তু প্রোগ্রাম ক্যান্সেল করা হল। বরং বলা ভাল প্রোগ্রাম ক্যান্সেল করতে বাধ্য করা হল। মিঠু এবং তাঁর সহকর্মীরা ভীষণ হতাশ হলেন। পরক্ষণেই উজ্জীবিত, শুটিং হবে, তবে এ ছবি নয়, অন্য ছবি। এই সেটেই। রেডিমেড প্রযোজক পাওয়া শক্ত। সমস্ত ঘটনা শুনে একজন শুভাকাঙ্ক্ষী এগিয়ে এলেন। ফলে 'পৌষালী দিন'এর সেট রূপান্তরিত হল 'পান্থনিবাস'এ। গোল্ডস্মিথ-এর একটা বিখ্যাত নাকটকে স্ক্রীপ্টে রূপ দিতে দিতে আরম্ভ হয়ে গেল শুটিং। পিতা তরুণকুমার এবং পুত্র শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় মুখোমুখি বসে আছেন। ক্যামেরা ট্রলিতে। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। ফ্রেমে শুধু দুটি মুখ। কথা বলছে ঃ 'তোমার' পর আমি অনেক আশা-ভরসা রাখি'— পিতার এই কথায় পুত্র খুবই স্বাভাবিক ঃ সে তো রাখবেনই।

পিতা এতটা আশা করেন নি ঃ কারণ?

পুত্র তৎক্ষণাৎ হাবাগঙ্গারাম ঃ আজ্ঞে জানি না তো।

পিতা খুব খুশী ঃ কারণ তুমি আমার ব্যাঙ্ক, তুমি আমার ইন্সিওরেন্স, তুমি আমার চিট ফান্ড তুমি আমার সেফ ডিপো-জিট ভল্ট, তুমি আমার...

পুত্র এবার একটু ফাজলামো করে ঃ ইন্ডিয়া গভর্ণমেন্ট।

পিতা লেটে বোঝেন ঃ হ্যাঁ...এ্যাঁ, না অতোটা নয়...ব্ল্যাক মানি।

এই দৃশ্যটি ভিজুয়ালাইজ করলে আপনাদের অবস্থা হবে আমার মতো। অর্থাৎ হেসেই খুন হবেন। আমি খুন হয়েছি তবু জীবিত আছি কেন না এখনই জানাতে হবে এই ছবির মূল সুর হচ্ছে কমেডি। একটু আধটু ব্যঙ্গ থাকবেই। তাছাড়া, এ ছবি শেষ হবে হয়তো কিছু বক্তার মধ্য দিয়ে। এবং সেটা আশা করা খুব একটা অন্যায় হবে না। কারণ এ-ছবি তৈরীর ব্যাপারে সাংঘাতিক স্পিরিট কাজ করছে। একসঙ্গে এতজন তরুণ যখন... সেকথা তো প্রারম্ভেই বলেছি। বলছি এই যে, এ ছবির প্রিপারেশন অনেকটা ড্রামা কার্ভে। কাহিনী, মূলতঃ নাটক। সেই হেতু পরিচালকের ইচ্ছে, সম্পূর্ণ ছবিতে একটা বিশেষ আবহাওয়া বজায় রাখা। যেটা শুধু-মাত্র স্টেজেই লভ্য। ফলে এছবির আগাগোড়া শুটিং সম্ভবতঃ স্টুডিও ফ্লোরেই সারা হবে। এ পর্যন্ত সাফল্যে দু দিনের শুটিং সুসম্পন্ন হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের শুটিং আরম্ভ হবে অক্টোবর মাসে। আশা করা যাচ্ছে এই পর্যায়ে নায়িকার ভূমিকায় মহুয়া রায়চৌধুরীকে দেখা যাবে। এ ছবির অন্যান্য চরিত্রের শিল্পীদের নাম যা জানা গিয়েছে ঃ অনুপকুমার, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য,

আপনাইয়ার পকেটমার ঃ ফরিয়াল

[illegible] মুখোপাধ্যায় এবং সত্য বন্দ্যো-পাধ্যায়।

চিত্রনাট্য রচনা করছেন : অমিতাভ চট্টো-পাধ্যায়।

চিত্রগ্রহণ করছেন : দীপক দাশ। শিল্পনির্দেশনায় আছেন : রবি চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদনা করবেন প্রশান্ত দে। ব্যবস্থাপনায় [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়।

সঙ্গীত পরিচালক অজয় দাশ। এ-মাসেই গান রেকর্ড করা হবে।

ছবি নির্মিত হচ্ছে দুঃখিনী প্রোডাক-সন্সের পতাকাতলে।

—স্টুডিও সংবাদদাতা

স্টুডিও সংবাদ

বর্তমানে কলকাতায় দু'খানি কালার হিন্দি ছবির শুটিং রমরম করে এগিয়ে চলেছে। সুখেন দাস নিবেদিত, গোলাপ পিকচার্সের 'আনজানে মেহমান' (পরিচালনা : জ্ঞানেশ মুখার্জি) ছবির শুটিং হচ্ছে স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ-এ, অধুনা সরকারী স্টুডিও। ট্রেন কম্পার্টমেণ্টের ইন্টিরিয়রের সেট পড়েছিল। ডাকাতি করার দৃশ্য চিত্রায়িত—হল। অংশ গ্রহণ করলেন : সমিত ভঞ্জ, সুখেন দাস, অজয় বন্দ্যো-পাধ্যায়, রবি ঘোষ, মিণ্টু চক্রবর্তী, সবিতা-ব্রত দত্ত এবং সতীন্দ্র ভট্টাচার্য। এ ছবির অন্যান্য চরিত্রের শিল্পীরা—সুব্রতা চট্টো-পাধ্যায়, পদ্মা দেবী, মেনকা দেবী, প্রেমাংশু বসু, মাস্টার পার্থ এবং জ্ঞানেশ মুখো-পাধ্যায়। নায়িকার ভূমিকায় রূপদান কর-ছেন সুমিতা সান্যাল। সুমিতা অনেক দিন পর বাংলা ছবির নায়িকা হয়েছেন। মাঝে তিনি বোম্বাই প্রবাসী ছিলেন। 'আশীর্বাদ' 'আনন্দ' প্রভৃতি ছবিতে কাজ করেছেন। এ-মাসে বোম্বে যাচ্ছেন, অমিতাভ বচ্চনের বিপরীতে একটি ছবিতে অভিনয় করতে। যাই হোক, 'অনজানে মেহমান' ছবির কথায় আবার ফিরে আসা যাক। এই ছবি কল-কাতার শিল্পী ও কলাকুশলীদের নিয়েই। নিউ থিয়েটার্স আমলের পর এই প্রথম। স্মরণ থাকতে পারে এমন একদিন ছিল যখন কলকাতায় তৈরী হিন্দি ছবি সারা ভারত থেকে পয়সা আনত। তখন অবশ্য

প্রেমের ফাঁদে
দিলীপ বসু/নবাগতা শর্মিলা দাস

এমন নোংরা প্রতিযোগিতা ছিল না। সেজন্য রাজ্য সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। কর-মুক্ত করে ব্যাপক প্রদর্শনীর সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারেন এই রাজ্য সরকার। নিয়মিত হিন্দি ছবি তৈরী হলে এখানকার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সংকট অনেকাংশে মোচন করা যাবে একথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বারবার বলেছেন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়।

ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে প্রযো-জক-পরিচালক দয়াশংকর সুলতানিয়া চলতি সপ্তাহে 'কিতনে পাস কিতনে দূর' ছবির জন্য বিরাট ক্যাবারে নাচের দৃশ্য গ্রহণ করলেন। অংশ নিলেন বম্বের নায়িকা হিনা কৌসর এবং কলকাতার নায়ক সমিত ভঞ্জ। প্রচুর অর্থব্যয়ে এই সেটটি নির্মাণ করা হয় শিল্পনির্দেশক বিজয় বসুর তত্ত্বাবধানে। কলকাতা থেকে নির্মীয়মাণ এই কলার হিন্দি ছবির শুটিং অনেকটা হয়ে গিয়েছে। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল এ ছবিতে অভি-নয়ের জন্য বম্বে থেকে প্রাণ ও অশোককুমার আসছেন।

এ [illegible] পরিচালক পূর্ণেন্দু পত্রী আমাকে জানিয়েছেন যে, 'চৈতালী ঘূর্ণী' (রচনা : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়) আপাততঃ ড্রপড। নতুন করে ভাবছি। শুরু হতে হতে জানুয়ারী মাস। স্ক্রীপ্ট করতে সময় তো লাগবেই। জনান্তিকে শোনা, শ্রীপত্রী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন একটি গল্পের চিত্ররূপ দেবেন।

পরিচালক সুশীল মুখোপাধ্যায় 'স্বয়ংসিদ্ধা' পুনর্নির্মাণ করতে চলেছেন। সব ব্যবস্থা পাকা। শুটিং শুরু হবে সেপ্টেম্বর মাসে। প্রধান নারী চরিত্র রূপায়িত করবেন মিঠু মুখোপাধ্যায়। নায়ক চরিত্রে রঞ্জিত মল্লিক। একটি বিশেষ ভূমিকায় অসিত সেন-পুত্র অভিজিৎ সেনকে দেখা যাবে।

পরিচালক সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি সম্প্রতি বিমল মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে 'হাতে রইল তিন' নামে একটি ছবির মহরৎ করেছেন, তিনি আগেই অন্য একটি ছবি আরম্ভ করছেন—জরাসন্ধের 'মসীরেখা', অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় কৃত চিত্রনাট্যে। মুখ্য নারী চরিত্রে সুপ্রিয়া দেবীকে ভাবা হয়েছে। সেপ্টেম্বর মাস থেকে শুটিং চলবে। 'হাতে রইল তিন' ডিসেম্বর মাস থেকে।

সত্যজিৎ রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী খ্যাত অভিনেত্রী কৃষ্ণা বসু এখন কলকাতায়—'ছায়াঘেরা রাত' নামে একটি ছবিতে চুক্তি-বদ্ধ হয়েছেন বিপরীতে নায়ক দীপঙ্কর দে। এ মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে চিত্র গ্রহণের কাজ শুরু হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সাহায্যে অনতিবিলম্বে দুখানি কাহিনী চিত্রের দৃশ্য গ্রহণ শুরু হচ্ছে। তার মধ্যে একটি পরিচালনা করবেন পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত ছোটগল্প 'প্রতিমা'র চিত্ররূপ।

সংবাদদাতা

জিনত আমন বা জিনি বেবী এতদিনে সার বুঝেছে। বুঝেছে এই যে, শুটিং-এর বাইরে নায়ক-নায়িকার মধ্যে সুন্দর আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকা দরকার। এর জন্য ফ্রী মিকসিং একান্ত। এতে হয় কি অভিনয় করতে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়। স্বাভাবিক অভিনয় ফুটে ওঠে। জিনত স্পষ্টই বোঝাতে চেয়েছে—আমি আমার নায়কদের সঙ্গে অত্যন্ত সহজভাবে মিশি। প্রেমের দৃশ্যে অভিনয় করার আগে চুটিয়ে প্রেম ফষ্টিনষ্টি করার ছলেও করি...। এই পরিপ্রেক্ষিতে একজন সাংবাদিকের প্রশ্ন ঃ যদি সহমরণের দৃশ্য থাকে তাহলে সেটাও কি আগেভাগে প্র্যাকটি করে নেবেন? আইমিন, রিহার্সাল করে নেবেন?

বিদেশী ছবি দেখে গপ্পো ঝেড়ে হিন্দি ছবি অনেক হয়েছে, অনেক হবে। কিছুদিন আগে 'খুন খুন' নামে একটা ছবি এসেছিল, শুনেছি সেটা নাকি 'ডার্টি হ্যারি' ছবি থেকে ফ্রেম টু ফ্রেম মেরে দেওয়া এজন্য প্রযোজকদের কম ভোগান্তি হয়নি। কোর্ট কাছারি করতে হয়েছিল। এতেও শিক্ষা হয়নি। এখনও এইভাবে ছবি হচ্ছে। এবারে ঝামেলা হয়েছে অন্যরকম। একই গল্প চুরি করে দুখানা হিন্দি ছবি হচ্ছে 'মজবুর' কোনো একটা বিদেশী ছবি থেকে মারা, পরিচালক বি আর চোপরা একই জায়গা থেকে মেরে 'জমীর' করছিলেন। জানতে পেরে চোপরাসাহেবের মাথায় হাত। আপাততঃ জমীর শিকেয় তোলা হয়েছে। প্রা য়একই ঘটনা, ও পি রলহন 'পাপী' নামে যে ছবিটি তুলছেন তার সঙ্গে সদ্য শুটিং সমাপ্ত 'ওয়ারেন্ট'এর যথেষ্ট মিল। একই গল্প। তাতে রলহন কিন্তু বিন্দুমাত্র দুঃখিত নন। তিনি ছবি শেষ করবেন, রিলিজ করাবেন, 'ওয়ারেন্ট'এর পর। প্রমাণ করবেন একই সাবজেক্টে বেটার ছবিই দর্শকরা নেবেন। তাঁর কম্পিটিশানই তাঁর কাম্য।

রীণা রায়ের বোন বোরখা বড্ড উড়ছিল। উঠেপড়ে লেগেছিল কি করে হিরোইন হওয়া যায়। প্রোডিউসারদের সঙ্গে দহরম-মহরম শুরু করে দিয়েছিল যাতে অনেকেই বিশ্বাস করে ফেলেছিলেন বরখা নায়িকা হচ্ছে। সেগুড়ে বালি। বরখার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে প্রোডিউসাররা আসলে রীণাকেই নিয়েছে। আখেরে লাভ হয়েছে রীণার। এখন বরখার মাথা থেকে ভূত নেমেছে। অনেক ভেবে চিন্তে সে নেমে পড়েছে বী আর ইশারার সঙ্গে। সহকারী হিসেবে। অবজার্ভ করছে, কাজ শিখছে, ভীষণ মন দিয়ে।

'ববি'র হিরো ঋষি কাপুরের বাজার এখন খুব ভাল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে টিন-এজার মেয়েরা লাইন দিয়ে আসছে। ঋষির চামচা দুজন। ফার্স্ট-এ চেক-আপ ওদের কাছে। প্রতিদিন নাকি একজন করে বরাদ্দ হয়। ঋষি নাকি চলে যায় জহুর কাছে একটা হোটেলে। হোটেলের লাউঞ্জে পাহারা দেয় চামচাদ্বয়। এসব জানতে পেরে নীতু সিং বড্ড ক্ষেপে গেছে।

আশা সচদব ধূমপান করে। ফিল্মের অনেক নায়িকাই ধূমপান করে, এটা কোন নতুন কথা নয়। নতুন কথা হচ্ছে এই আশা সকলের সামনে অর্থাৎ ফ্লোরে সতী সেজে থাকে। পনেরো মিনিট অন্তর সিগারেট আর লাইটার নিয়ে আড়ালে আবডালে চলে যায়। ফিরে আসে মিনিট দশেক পর। এইভাবে পঁচিশ মিনিট সময় অপচয় কোন প্রযোজক কতদিন বরদাস্ত করবেন?

—অভিজিত

কোরাস/শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়
পরিচালনা ঃ মৃণাল সেন

এবছরের লোকার্নো চলচ্চিত্র উৎসব
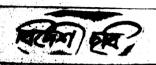
গত মাসের শেষার্ধে লোকার্ণোয় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য। এইবারই বোধহয় প্রথম একটা চলচ্চিত্র উৎসবে ছবি প্রদর্শন নিয়ে গোটা দেশে সোচ্চার প্রতিবাদের ঝড় উঠলো।

উৎসবে এমন কয়েকটি ছবি দেখানো হয় (যার মধ্যে তিনটি মারাত্মক—গল্প এবং যৌনতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে) যা শুধু আপত্তিকরই নয়, সুস্থ চিন্তার ক্ষেত্রে ক্ষতিকারকও বটে। বিশেষ করে জার্মাণ ছবি 'ইমমরাল টেলস' 'বিগার স্প্ল্যাস' এবং নরওয়ের ছবি 'মরস হাস'। এই সব ছবির বক্তব্য এবং তার অবাধ প্রকাশ এত কুৎসিত ও অভাবনীয় যে এর প্রদর্শনের বিরুদ্ধে ওখানকার ধর্মযাজক এবং জনগণ প্রচন্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।

তাদের প্রশ্ন এসব ছবি কি সুস্থ চিন্তার লক্ষণে চিহ্নিত? বাস্তবতার নামে বিকৃতি ও যৌনাচারের যথেচ্ছ ব্যবহার কোন শিক্ষার বাহন?

ছবিওয়ালারা বলেছেন এইসব ছবির মাধ্যমে শিক্ষিত এবং যৌনব্যাধিগ্রস্ত মানুষদের মুখোশ খুলে দেওয়া হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ, যথা শিল্পী, ধর্মযাজক, ব্যবসায়ী ও ছাত্রসমাজের মধ্যে যে ব্যভিচারী মন গোপনে বাসা বেঁধে আছে, সত্যের খাতিরে তাদের মুখোশ টেনে খুলে ফেলে দেখানো হয়েছে। সুস্থ সমাজের পক্ষে এরা ক্ষতিকর।

এই মন্তব্য যেন ঘৃতাহুতির কাজ করেছে। সাধারণ মানুষের বক্তব্য, এ যেন সুস্থ সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। সমকামিতা, পর্ণোগ্রাফীর যথেচ্ছ প্রয়োগ, বিকৃত চিন্তার গল্প এবং সমাজ দেহকে চাবুক মারার নামে পর্দা জুড়ে ব্যভিচারের দৃশ্য ফলাও করে দেখানো আর যাই হোক সুস্থ চিন্তাপ্রসূত নয়।

এখানে দু একটি ছবির বক্তব্য তুলে দিচ্ছি।

'ইমমরাল টেলস'এ শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যে চূড়ান্ত ব্যভিচার এবং নরনারীর যৌনজীবন যে কত ভয়াবহ তাই বলা হয়েছে। ছবিতে সেক্সকে চূড়ান্তভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে। এমন কি এতে হোমো সেক্স, মাষ্টারবেটিং সডোমি কিছুই বাদ যায় নি। যার প্রতিক্রিয়া অবশ্যই হতে বাধ্য।

'বিগার স্প্ল্যাস' ছবিতে এমন একজন প্রখ্যাতনামা জীবিত শিল্পীর চরিত্র আঁকা হয়েছে যে ছেলেদের (অবশ্যই তরুণ অথবা যুবক) খুব ভালবাসত, এবং এই ভালবাসার পেছনে তার প্রধান উদ্দেশ্য সমকামিতা। এই সমকামিতার বিকৃতি কতদূর পর্যন্ত নীচে নামতে পারে পর্দায় তা বিস্তারিতভাবে দেখানো হয়েছে। এবং তা এক এক সময় দর্শকদের চোখ ও মনের কাছে মারাত্মক পীড়াদায়ক হয়ে দেখা দিয়েছে।

নরওয়ের ছবি 'মরস হাস' যেন উপরোক্ত দুটি ছবিকেও দুঃসাহসিকতা ও বক্তব্যের দিক থেকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। এতে এমন এক মা ও সন্তানের কথা বলা হয়েছে যারা যৌন বিকৃতির ক্ষেত্রে গোপন জীবন যাপন করত। এমন নোংরা মনোবৃত্তির কথা আমরা ভাবতেই পারি না। এমন ভাবনার চেয়ে মহাপাপ বোধহয় আর কিছু

বিকেলে ভোরের ফুল
সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়

তিন পথী হয় প্রেমিক
বিকাশ রায়, জয়শ্রী রায় এবং জহর

হয় না। সভ্য কেন, অসভ্য বর্বর মানুষও বোধহয় এমন চিন্তার দোষে দুষ্ট নয়। অথচ একেই শিল্পের নামে, সামাজিক ব্যাভিচারের নামে লোকচক্ষুর সামনে সগৌরবে প্রদর্শন করা হয়েছে। এবং তাতে কোনরকম লজ্জার বেড়াজাল না রেখেই।

(বিস্ময়ের কথা, উৎসবের উদ্যোক্তারাও এই ছবি গৌরবের সঙ্গেই প্রদর্শনের অনুমতি দিয়েছে।)

অথচ এই উৎসবেই হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া রাশিয়া এবং ভারতবর্ষ থেকে প্রেরিত উল্লেখযোগ্য ভাল ছবি দেখানো হয়েছে। এবং তা সাধারণ দর্শক ও সমালোচকদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে।

এছাড়া ফিনল্যান্ড, ম্যাক্সিকো (ভূমিহীন মানুষদের মধ্যে উদ্বৃত্ত ভূমি বন্টন এবং ট্র্যাডিশন ভাঙ্গার কথা বলা হয়েছে ম্যাক্সিকান ছবিতে), সুইস, পূঃ জার্মাণ, পোলিশ এবং আমেরিকান ছবিও উৎসবে প্রদর্শিত হয়। কিন্তু কারুর মধ্যেই এমন, বিকৃত রুচির পরিচয় পাওয়া যায় নি।

চৈতালী : পরিচালক ঋষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে
সায়রাবানু এবং আসরানী

সুইজ্যারল্যান্ডের দর্শকরা এদের ছবি সানন্দেই গ্রহণ এবং উপভোগ করেছে।

দর্শক, সমালোচকরা একবাক্যে উৎসবের যে ছবিটিকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে তার নাম ফেরোসাস। ছবিটি রাশিয়ার কিরখিজ রিপাবলিক থেকে প্রেরিত। পরিচালক ওখিব (এবারের উৎসবের শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসাবে স্বীকৃত। এ'র ইতিপূর্বের ছবিতেও তিনি অনুরূপ অনন্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন।) এ'র সম্পর্কে সমালোচকরা বলেছেন যে, চলচ্চিত্র মাধ্যমে বক্তব্য তুলে ধরার বা গল্প বলার ওপর ওখিবের আশ্চর্য দখল। ফেরোসাসের মূল চরিত্র একটি ছোট্ট ছেলে। একে দিয়ে যেভাবে তিনি অভিনয় করিয়ে নিয়েছেন তা এক কথায় যেমন অবিশ্বাস্য তেমিন বিস্ময়কর। ওখিবের এইসব গুণে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পর্যায়েই পড়ে।

চলচ্চিত্র উৎসব সম্পর্কে সর্বশেষ এবং চমকপ্রদ খবর হোল প্রথমে উল্লিখিত তিনটি ছবির মাধ্যমে মানবতাবোধ ও মানবিক মর্যাদার মূলে কুঠারাঘাতে ক্ষুব্ধ হয়ে উৎসব কমিটিরই কয়েকজন সদস্য তার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং ঐসব ছবি উৎসবে প্রদর্শন না করার জন্য তাদের অধিকার প্রয়োগ করেন। কিন্তু তাদের সেই আবেদন উৎসব কমিটির ডিরেক্টরের মনঃপূত না হওয়ায় তাঁরা উৎসব কমিটি থেকে বেরিয়ে আসেন।

নতুন সূর্য
দিলীপ রায় - দেবিকা মুখার্জি

রাগ-অনুরাগ ঃ অপর্ণা সেন

[illegible] নাটক ঃ সমিত ভঞ্জ - আরতি ভট্টাচার্য

রঙ্গজগতের রঙ্গকথা

পুরুষ না নারী!

শান্যাল ভবনে যখন ন্যাশনাল থিয়েটার অভিনয় করছিল তখন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার উইলিয়ম উইলিয়ম হান্টার সাহেব প্রায়ই টিকেট কেটে অভিনয় দেখতে আসতেন। একদিন হান্টার সাহেবের সঙ্গে কয়েকজন সাহেব সস্ত্রীক ও অন্যান্য মেয়েদের নিয়ে 'লীলাবতী' নাটক দেখতে এসেছেন। হান্টার সাহেব বলেছেন এখানে ছেলেরা মেয়ে সেজে অভিনয় করে। এটাই ছিল তাঁদের অভিনয় দেখার বড় আকর্ষণ।

প্রখ্যাত অভিনেতা ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় অভিনয় করছিলেন লীলাবতী চরিত্রে। ক্ষেত্রবাবু যেমন প্রিয়দর্শন ছিলেন তেমনি তাঁর মেয়েলী-পানা ছিল নিখুঁত। জনৈকা মেমসাহেব হান্টার সাহেবকে বললেন, তুমি আমাদের মিছে কথা বলেছো। কিছুতেই কোন পুরুষ এরূপ হতে পারেন না। নিশ্চয়ই মেয়ে অভিনয় করছেন।'

হান্টার সাহেবের কথা যখন কিছুতেই মেমসাহেব বিশ্বাস করছিলেন না তখন হান্টার সাহেব বললেন ঃ বেশ, তোমাকে গ্রীনরুমে নিয়ে যাবো।' যবনিকাশেষে হান্টার সাহেব মেমসাহেবকে নিয়ে গ্রীন-রুমে এলেন। ক্ষেত্রবাবুকে খবর দিতে সামনে এলেন। তবু মেমসাহেবের বিশ্বাস হচ্ছিল না। হান্টার সাহেবের অনুরোধে ক্ষেত্রবাবু যখন তাঁর পরচুলা খুলে ফেললেন তখন মেমসাহেব হতবাক হয়ে বলে উঠলেন, সরি, আই টুক হিম অ্যাজ অ্যান এডুকেটেড ব্রাহ্ম লেডী।' আমি তাকে একজন শিক্ষিতা ব্রাহ্ম মহিলা মনে করেছিলাম।'

সবাই হেসে উঠলেন।

দেবচালে অভিনয়!

মতিলাল সুর ছিলেন তখনকার একজন প্রখ্যাত অভিনেতা। তিনি একবার ভেবে ভেবে ঠিক করলেন, দেবতা ও রাক্ষসের চরিত্রাভিনয়—মানব চরিত্রাভিনয় থেকে পৃথক হওয়া উচিত। কী করে এই পার্থক্য ফুটিয়ে তুলবেন—তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে করতে ঠিক করলেন কথায় এবং চলনে এই পার্থক্য দেখাবেন।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'আদর্শ সতী' নাটক অভিনীত হচ্ছে। সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী নিয়ে নাটকটি রচিত। যমের চরিত্রে অভিনয় করছিলেন মতিলাল সুর। মতিলালবাবু তাঁর 'দেবচালের' অভিনয় পদ্ধতি প্রয়োগ করলেন। গদা কাঁধে নিয়ে লম্বা লম্বা

ফেলে মতিলালবাবু যখন মঞ্চে প্রবেশ লেন, সবাই মনে করলেন কোন রীরীধ চরিত্রে তিনি অভিনয় করছেন। দেবকণ্ঠে কথা বলতে গিয়ে এমন এক সুরে করলেন যে, প্রথমে সবাই কৌতূহলী য় উঠলেন তারপর হাস্যসম্বরণ করা ঠিন হয়ে উঠলো। মতিলালবাবু হাস্য-নিতে বিচলিত না হয়ে 'দেবচান্দে' ভিনয় করে যেতে লাগলেন। সেদিন য়েকজন সাহেবও অভিনয় দেখতে সেছিলেন। রসরাজ অমৃতলাল তাঁদের ঙ্গে কথা বলে ভেতরে আসতেই তিলালবাবু জিজ্ঞাসা করলেন : সাহেবরা গ্যা? অভিনয় দেখে বলল কি?

মতিলালবাবুকে নিয়ে একটু রঙ্গ রার জন্য অমৃতলাল বললেন : মার্সেল দলোর নাম শোননি? মস্ত বড় পণ্ডিত। মার দেবচান্দের অভিনয় দেখে স্তম্ভিত য়েছেন। বললেন, একটা জিনিয়াস বটে।'

মতিলালবাবু তো মহাখুশী! বললেন : দেশে আর্ট কজন বোঝে? গিরিশবাবু ার তুমি যা বোঝ!

রসরাজ অবশ্য শেষ পর্যন্ত 'দেবচান্দের' লে রহস্যোদ্ঘাটন করে দেন।

ভাল ভাল মাগুলো ছেড়ে দিয়ে গেল!

তখনকার একজন থিয়েটার স্বত্বা-ধিকারী ঐ থিয়েটারেরই জনৈকা অভিনেত্রীর ঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে-ছিলেন। অভিনেত্রীটি আবার ভালবাসতেন জনৈক অভিনেতাকে। গিরিশচন্দ্র তখন থিয়েটারের অধ্যক্ষ। ওই অভিনেতাকে প্রত্যাখ্যাত করার উপায় ছিল না। স্বত্বাধি-কারী সন্দেহ মন নিয়ে সতর্ক থাকতেন। একবার উক্ত থিয়েটারে এমন একটি নাটক অভিনীত হলো যার মধ্যে সংশ্লিষ্ট অভিনেত্রীকে একাধিকবার মাত্ সম্বোধন করতে হবে। স্বত্বাধিকারী এবার মওকা পেলেন। রিহার্সেলের সময় আর একখানা বই নিয়ে উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে পরীক্ষা করে যেতে লাগলেন, সংশ্লিষ্ট অভিনেতা অভিনেত্রীটিকে মাতৃ সম্বোধনে সম্বোধন করেন কিনা।

অভিনেতা পূর্ব থেকেই স্বত্বাধি-কারীর মনোভাব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই মজা দেখবার জন্য তিনি মাতৃ সম্বোধনের স্থলগুলি বাদ দিয়ে যাচ্ছিলেন। স্বত্বাধিকারী অভিনেতাকে এবার মওকায় পেয়ে রেগে উঠলেন এবং প্রথমে নিজেই একটু শাসিয়ে ঝড়ের বেগে গিরিশচন্দ্রের সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন : গিরিশবাবু, 'গিরিশবাবু ম—বাবু 'সব ভাল ভাল মাগুলো' ছেড়ে দিয়ে গেল। আপনি এখনই এর একটা ব্যবস্থা করুন।'

ব্যবস্থা কি করবেন। গিরিশচন্দ্র এবং উপস্থিত যাঁরা ছিলেন সবাই হো—হো করে হেসে উঠলেন।

কালীশ মুখোপাধ্যায়

মঞ্চাভিনয়

শিশিরকুমার ইনস্টিটিউট অ্যাম্বু-লেন্স, নার্সিং ও ক্যাডেট ডিভিশনের ৩৪তম বার্ষিক উৎসব : বিগত ৩০শে আগস্ট, স্টার থিয়েটার রংগমঞ্চে শিশিরকুমার ইনস্টিটিউট এ্যাম্বুলেন্স, নার্সিং ও ক্যাডেট ডিভিসনের ৩৪তম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনু-ষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বিশ্ববন্দিত সাংবাদিক শ্রদ্ধেয় তুষারকান্তি ঘোষ আর প্রধান অতিথিরূপে ভাষণ দেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামী নিখিলানন্দ। কুমারী অঞ্জনা মিত্রের উদ্বোধনী সংগীতের পর সেন্ট জন এ্যাম্বুলেন্স ব্রিগেড শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের এ্যাম্বুলেন্স, নার্সিং ও ক্যাডেট ডিভিসনের সভ্য-সভ্যাবৃন্দ বিশ্ব-বন্দিত সাংবাদিক শ্রদ্ধেয় তুষারকান্তি ঘোষকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করেন। অভিনন্দনটি পাঠ করেন মিহিরলাল গঙ্গো-পাধ্যায়। ডিভিশনাল প্রেসিডেন্ট সংস্থার বিভিন্ন সেবাকার্যের উল্লেখ করে বক্তৃতা করেন। বিভিন্ন সভ্যদের পুরস্কার বিতরণ করেন ডিভিশনাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীপ্রভাত-কুমার বসু। প্রধান অতিথি স্বামী নিখিলানন্দ তাঁর বক্তৃতায় সংস্থার বিভিন্ন সেবা কার্যের ভূয়সী প্রশংসা করে বক্তৃতা দেন। বর্তমান বিশৃঙ্খলতার হাত থেকে দেশের মুক্তির জন্য অধ্যাত্মবাদের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে বলেন।

সভাপতির ভাষণে শ্রদ্ধেয় তুষারকান্তি ঘোষ স্বামীজীকে সমর্থন করেন। শিশির-ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দিত করার জন্য বলেন, আমি ত নিজেদেরই লোক। তবু ভালবেসে আমায় যা দিয়েছেন, তা মাথা পেতে নিলাম। প্রতিষ্ঠানের কর্ম-তৎপরতা সম্পর্কে সবাই অবহিত আছেন। সেবার এই আদর্শে সবাই অনুপ্রাণিত হবেন আশা করি।' কুমারী কাবেরী ঘোষের গীটার বাজনার পর রবীন্দ্রনাথের 'হবু চন্দ্র রাজা ও গবু চন্দ্র মন্ত্রী' এবং শৈলেশ গুহ নিয়োগীর ধ্বংস নাটক অভিনীত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীমিহিরলাল গাঙ্গুলী। শ্রীতুহিনকান্তি ঘোষ, শ্রীতুলসীকান্তি দে-

দ্বিতীয় দৃশ্যে
দিলীপ রায়, মাধবী, জহর, নবাগত সুনাম

বিশ্বাস এবং আরো অনেকেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করেন।

হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী :

নাট্য-উপদেষ্টা : অসীমরতন গাঙ্গুলী, নাট্যরূপ ও মঞ্চ প্রয়োগ : সনৎ মুখোপাধ্যায়। সুর ও আবহ : সলিল মিত্র ও সম্প্রদায়। প্রস্তাবনা যন্ত্রসঙ্গীত : কুনালকান্তি ঘোষ। আলো : বিভাস মুখোপাধ্যায়। নেপথ্য কন্ঠ : অঞ্জনা মিত্র। অভিনয়ে : রাজা—সনৎ দে। মন্ত্রী—সোমনাথ ঘোষ, দূত—অরুপরতন গাঙ্গুলী। জ্যোতিষী—সমর ভড়। বৈদ্য—শিবনাথ দাস, ইংরেজ পন্ডিত—অমিত মিত্র। ফরাসী পন্ডিত—অভিজিৎ ঘোষাল। ব্রাহ্মণ পন্ডিত—কুনালকান্তি ঘোষ। প্রহরীদ্বয়—লক্ষ্মীনারায়ণ নন্দী ও শুভেন্দু কোটাল।

কবি গুরুর 'হিং টিং ছট' কবিতাঅবলম্বনে হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রীর সংক্ষিপ্ত নাট্যরূপ শুধু শিশুদেরই নয়, বড়দের কাছেও অপূর্ব আকর্ষণরূপে দেখা দেয়। শিশু এবং কিশোর শিল্পীরাই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে। প্রতিটি ভূমিকা সুনির্বাচিত এবং প্রতিজন শিল্পী উপদেষ্টার নির্দেশ প্রতিপালন করে অদ্ভুত অভিনয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। সনৎ দে, সোমনাথ ঘোষ কুনালকান্তি ঘোষ-এর নাম তবু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দূতের চরিত্রে সর্বকনিষ্ঠ সভ্য অরুপরতন গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম।

মঞ্চ, আলোক-সম্পাত, পোষাক পরিচ্ছদ এবং আবহ সংগীত সমগ্র অভিনয়কে রসগ্রাহী করে তুলেছিল। শিশিরকুমার ইনস্টিটিউট বড়দের না কাভিনয়ে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন—কিন্তু বর্তমান অভিনয় শিশু আমোদ-প্রমোদ ক্ষেত্রে তাদের এক উল্লেখযোগ্য অবদানরূপেই কীর্তিত হবে।

ফাঁস

পৃষ্ঠপোষক—তুলসীকান্তি দে বিশ্বাস। উপদেষ্টা : মিহিরলাল গঙ্গোপাধ্যায়। নাটক—শৈলেন গুহ নিয়োগী। পরিচালনা—সুধীর মুস্তাফী। আলোক-সম্পাত—বিভাস মুখোপাধ্যায়। আবহ সংগীত : সলিল মিত্র ও সহশিল্পিবৃন্দ। অভিনয়ে : সুধীর মুস্তাফী। মুকুলকান্তি ঘোষ। গৌতম সরকার। সুশীল মুখোপাধ্যায়। প্রতাপ রায়চৌধুরী। অলোক মিত্র। বরুণ দত্ত। তাপস মুখোপাধ্যায়। শৈলেন মুখোপাধ্যায়। অচিন্ত্য মিত্র। শেখর সুর। গীতশ্রী দেবী। রীতা চট্টোপাধ্যায়। শিশির ইনস্টিটিউটের সভ্যরা মহাত্মা শিশিরকুমারের পুণ্য নামের মর্যাদা রক্ষায় বহু ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলার নাট্যান্দোলনের অন্যতম পুরোধা মহাত্মা শিশিরকুমারের নামে নামাঙ্কিত শিশির ইনস্টিটিউট নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে শিশিরকুমারের স্মৃতি রক্ষায় যে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে দেশবাসীর শ্রদ্ধার্জন করেছেন সে কথা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নধর্মী নাট্যোপহারের মধ্যেই সভ্যদের যোগ্যতার কথা নিহিত। কিছুদিন পূর্বে বর্তমান বছরেই 'টিপু সুলতান' ঐতিহাসিক নাটক মঞ্চস্থ করে তাঁরা সুনাম অর্জন করেছিলেন, এখনও আমরা তা ভুলে যাই নি। বর্তমানে ফাঁস কৌতুক নাট্যাভিনয়েও তারা সমান দক্ষতার পরিচয়ে আমাদের মুগ্ধ করেছেন। টিপু সুলতান নাটকের পরিচিত পুরোন বহু শিল্পীদেরই দেখা গেল বর্তমান নাটকে ভিন্নধর্মী চরিত্রে। শিল্পীদের মধ্যে এমন বহু অভিনেতা আছেন—যাঁরা যে কোন নাটকের যে কোন চরিত্রাভিনয়ে যে কোন পেশাদার শিল্পীকে টেক্কা দেবার মত ক্ষমতা রাখেন। সর্বোপরি সামগ্রিক অভিনয় মান, পরিচালন নৈপুণ্য, আলোক-সম্পাত, মঞ্চ-কৌশল ও অন্যান্য প্রতিটি বিভাগের প্রতি এরা এত সতর্ক দৃষ্টি রাখেন যে, মনেই হয় না কোন সৌখীন অভিনয় দেখছি।

বর্তমান হাসির নাটকটির ক্ষেত্রে নাট্যগৃহে তাঁরা হাসির তরংগ তুলে দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন। নাটকটির পরিচালনায় দক্ষ শিল্পী সুধীর মুস্তাফী যেমন দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তেমনি দক্ষতা ফুটে উঠেছে তার ডেপুটির চরিত্রাভিনয়ে। সুপরিচিত মুকুলকান্তি ঘোষ (বিমান), অসীমরতন গঙ্গোপাধ্যায় (সোমনাথ), সুশীল মুখোপাধ্যায় (সুভাষ) সমান হাসিয়েছেন। গৌতম সরকারের কাপ্তেন হিন্দুস্থানী সেপাইরূপেই ফুটে উঠেছে। শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের অঘোর, প্রতাপ রায়চৌধুরীর নবীনকুমার উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য শিল্পীরাও স্ব স্ব চরিত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। গীতশ্রী দেবীর ডেপুটি গিন্নি তরলার অভিনয়ের মধ্যে ডেপুটি-গিন্নিরা ফুটে উঠেছেন। রীতা চট্টোপাধ্যায়ের আরো সপ্রতিভ হওয়া উচিত ছিল। বিভাস মুখোপাধ্যায় দুটি নাটকেই তার অপূর্ব আলোকসম্পাতের মোহজাল বিস্তার করে চমৎকৃত করেছেন। ভূমিকা ও অন্যান্য পরিচিতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

—শীলভদ্র

বিবিধ সংবাদ

শ্রীরামপুর মহিলা শিল্পাশ্রম—'জন্তু' অভিনয় : শ্রীরামপুর মহিলা শিল্পাশ্রম সমিতির বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ প্রসারার্থে শ্রীরামপুর রবীন্দ্রভবনে একটি সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভানেত্রী ভগিনী বিনোদিনী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী রেণু বাগচী সমিতির বিভিন্ন কার্যধারা সবিশেষ ব্যাখ্যা করেন। সভাশেষে ধন্যবাদ জানান শ্রীরামপুরের বিশিষ্ট সমাজসেবিকা শ্রীমতী মলিনা আচার্য।

সভান্তে শ্রীরামপুর প্রেমরোজ মিউজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের শিল্পিবৃন্দ সামাজিক নাটক 'জন্তু' সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি শিল্পীর সু-অভিনয়ে নাটকটির গতি ব্যাহত হয়নি। তবে দু-এক দৃশ্যে অতি-নাটকীয়তার জন্য কিছুটা গতিহীন হয়েছে বলা যায়। কয়েকটি চরিত্রে শিল্পীদের অভূতপূর্ব অভিনয় দর্শকদের মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করে। নাটকটি রচনা ও পরিচালনা করেন শ্রীপরেশ ঘোষ। আলোকসম্পাত ও মঞ্চে—শ্রীরামপদ মাঝি ও অজিত বিশ্বাস। কুমারী চম্পা ভট্টাচার্য উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করেন।

শান্তিনিকেতনে মাইকেল মধুসূদন মহামেলার উদ্বোধনী সভা

গত ৩০ জুলাই শান্তিনিকেতনে মাইকেল মধুসূদন মহামেলার এক উদ্বোধনী সভা পূর্বপল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মূল মহামেলা যে অনুষ্ঠানসূচী গ্রহণ করেছে তার কতটা শান্তিনিকেতনে করা সম্ভব—এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। স্থির হয়, মধুসূদনের বিভিন্ন নাটক মঞ্চস্থ করার চেষ্টা করা হবে কিন্তু পত্রকাব্য 'বীরাঙ্গনা'র নারী চরিত্র অবলম্বন করে নাট্যকাব্য এবং রাধাবিরহ-কাব্য 'ব্রজাঙ্গনার' পদাবলী কীর্তন-গানে পরিবেশন করা হবে।

এজন্য শান্তিনিকেতনে একটি সহায়ক কমিটি গঠিত হয়. এতে বিশ্বভারতীর অধ্যাপকদের মধ্যে আছেন পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, জীবন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। মূল কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সঞ্জীবকুমার বসু, সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, রমা বসু, বাণী মিত্র তপতী গঙ্গোপাধ্যায় ও মহামেলার সাধারণ সম্পাদক সুশীল রায়।

'শ্রাবণ সন্ধ্যা' : সম্প্রতি হাওড়া জেলার বাগনান থানার অন্তর্গত চন্দ্রপুর গ্রামে যান্ত্রিক বিনোদন গোষ্ঠীর পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বর্ষার গান ও কথিকার মাধ্যমে বিশেষ গীতি-আলেখ্য 'শ্রাবণ সন্ধ্যা' অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ঐ অনুষ্ঠানে শ্রীপার্থ ঘোষ ও শ্রীমতী গৌরী ঘোষের আবৃত্তি অন্যতম আকর্ষণ ছিল।

সীমন্ত গুপ্ত - নন্দিতা বসু
পরিচালনা : অমল রায় ঘটক

বি এফ জে এ কার্যনির্বাহক সমিতি
১৯৭৪—১৯৭৫

গত ২৮শে আগস্ট সাধারণ সভায় বি এফ জে এর ১৯৭৪-৭৫-এর কার্যনির্বাহক সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠান হয় আনন্দবাজার পত্রিকার অফিসে। নিম্নলিখিত চলচ্চিত্র সাংবাদিকদের নিয়ে ১৯৭৪-৭৫-এর কার্যনির্বাহক পরিষদ গঠিত হয়।

সভাপতি : শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ, সহ-সভাপতি : শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসেবাব্রত গুপ্ত, সম্পাদক : শ্রীবাগীশ্বর ঝা, কোষাধ্যক্ষ : শ্রীগোপালচন্দ্র পাল, সহ-সম্পাদক : শ্রীঅশোক মজুমদার এবং শ্রীঅরিজিৎ সেন। কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য : শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীজ্যোতির্ময় বসু রায়, শ্রীধীরেন মল্লিক, শ্রীরণধীর সাহিত্যালঙ্কার, শ্রীপি এন উপাধ্যায়, শ্রীশৈলেশ মুখার্জী, শ্রীবি এন

সন্ধ্যার সূর্য
দেবরাজ রায় ও রাজশ্রী

শা, শ্রীরেইসউদ্দিন ফরিদী, শ্রীমইনউদ্দিন আহমেদ, শ্রীতাপস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীনির্মল ধর, শ্রীস্বপন মল্লিক।

ষ্টারে উল্কা : রাধা স্মৃতি সংঘের ৭ম বার্ষিক মিলনোৎসব ষ্টার রঙ্গমঞ্চে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংঘের সহ-সভাপতি ডাঃ সুকান্তি হাজরা উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সভাপতি, প্রধান অতিথি এবং সংঘ সম্পাদকের ভাষণের পর সংঘের সভারা ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'উল্কা' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করলেন। নাটকটি পরিচালনায় মুন্সিয়ানার পরিচয় দেন পরিচালক প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী। সঙ্গীত পরিচালনা করেন বিশু গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে মডার্ণ আর্টিষ্ট সম্প্রদায়।

নাটকটির প্রায় প্রতিটি চরিত্রই সু-অভিনীত। প্রদীপ ভট্টাচার্য, দীনেশ ঘোষ, অনাথ মৈত্র ও মাধব সরকারের অভিনয় এক কথায় অপূর্ব অনবদ্য। দেবাশীষ সরকার, লতিকা বসু ও নমিতা গাঙ্গুলী—এঁদের অভিনয়ও সুন্দর ও প্রশংসার যোগ্য। অন্যান্য ভূমিকায় যাঁরা চরিত্রানুগে অভিনয় করেন, তাঁরা হলেন—দিলীপ পাল, অনিল দাস, জয়দেব দে, মুকুল মিত্র দুর্গাদাস ঠাকুরা মৃত্যুঞ্জয় দাস নীলিমা চক্রবর্তী ও প্রণব ঘোষ, তারক পাল, সিদ্ধেশ্বর সমাদ্দার, রথীন বোস, স্বপন দাস ও অঞ্জলি বর্মণ।

৫ম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলা সম্পর্কে সংবাদিক সম্মেলন : আগামী ২৭ ডিসেম্বর থেকে ১ই জানুয়ারী পর্যন্ত পনরদিনব্যাপী ৫ম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হতে চলেছে নয়াদিল্লীতে। সম্প্রতি উৎসব পরিচালক শ্রীজগৎ মুরারী এসেছিলেন কলকাতায়। তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে উৎসব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

এবারের উৎসবে তিনটি বিভাগ থাকবে। যেমন—মূল প্রতিযোগিতার বিভাগ, ইনফরমেশন বিভাগ ও ফিল্ম মার্কেট বিভাগ। বিভিন্ন বিভাগে সারা পৃথিবীর সেরা ও জনপ্রিয় ছবিগুলিই দেখানো হবে। উৎসব কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করছেন যাতে বিশ্ববিখ্যাত কোনো পরিচালকের সব ছবিগুলি নিয়ে একটি বিশেষ প্রদর্শনী করা যায়। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩৫টি দেশ উৎসবের নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছেন। শ্রীমুরারী জানালেন ছবি যতই আসুক এক নির্বাচনী কমিটি প্রতিযোগিতার জন্য মোট পঁচিশখানি ছবি বেছে নেবে। নয় সদস্য বিশিষ্ট বিচারমন্ডলীতে ভারতীয় সদস্য থাকবেন দুজন। বাকি সাতজনকে নেওয়া হবে ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ থেকে। জুরী বোর্ডের চেয়ারম্যান হচ্ছেন শ্রীসত্যজিৎ রায়। অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দেশের তিনজন করে প্রতিনিধি আসবেন উৎসবে এবং কিছু বিদেশী সাংবাদিকও।

এই চলচ্চিত্র উৎসব যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর হয় সেজন্য শ্রীমুরারী কোন ত্রুটি রাখছেন না। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের চলচ্চিত্রানুরাগী পরিচালক প্রযোজক পরিবেশক – কলাকুশলী সকলের অংশ গ্রহণের ইচ্ছাও প্রকাশ করেছেন।

কোল এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের নাট্যানুষ্ঠান

গত ২১ আগস্ট বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে কোল এমপ্লয়িজ রিক্রয়েশান ক্লাবের উদ্যোগে 'বহ্নিশিখা' নাটকটি দারুণ সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। নাটকের প্রধান দুটি চরিত্র—বিলাসবিহারী ও সুজন সিনহার ভূমিকায় যুগ্মভাবে অভিনয় করেন সত্যব্রত চ্যাটার্জী। বলা বাহুল্য, দারুণ দক্ষতার সঙ্গে উনি এই চরিত্র দুটি মঞ্চে উপস্থিত করেন। বিশেষ করে সুজন সিনহার ভূমিকায় সত্যব্রত চ্যাটার্জীর মর্মস্পর্শী অভিনয় দীর্ঘদিন মনে রাখবার মত। এছাড়া এই নাটকের অন্যান্য চরিত্রে যাঁরা বাস্তবিক প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন সর্বশ্রী অমলেন্দু গুপ্ত, এন কুমার, বাসুদেব নন্দী, এ আর মজুমদার এবং শ্রীমতী মমতা চ্যাটার্জী ও শ্রীমতী মেনকা দাস। নাটকটি পরিচালনা করেছেন নির্মল চ্যাটার্জী। নাট্যানুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং নাট্যকার ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত। সমগ্র অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন শ্রীকে পি মুখার্জী।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

যোগ দিন বাজাজ লাইটিং প্রতিযোগিতায়
এবং ৫০,০০০ টাকার পুরস্কার জিতুন

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ /
২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ ॥
মূল্য ৬৫ পয়সা
NORTH BENGAL STATE LIBRARY
COOCH BEHAR

বিস্কুট ও লজেন্স

জেম, জেলী,
আচার, সস, ভিনিগার,
স্কোয়াশ

নির্মাতা ঃ
কোলে বিস্কুট কোম্পানী
প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৭০০ ০১০

KB-2/74-H

১৪ বর্ষ

সংখ্যা ২০

"ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ণ নিউজ
পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 20th September 1974 শুক্রবার, ৩ আশ্বিন, ১৩৮১

সূচীপত্র

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিতব্য রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। অমনোনীত রচনার খবর দু মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিতব্য রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য অমৃত কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে অমৃত কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণি-অর্ডারযোগে অমৃত কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫·০০	টাকা ৩০·০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১২·৫০	টাকা ১৫·৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬·২৫	টাকা ৮·০০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীতুষার সান্যাল

সম্পাদকীয়

সংসদের সম্ভ্রম

কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞার বাঁধন মানতে যে-সব বিষয় আজও নারাজ, তার মধ্যে আমাদের সংসদের বিশেষ অধিকারের ঠাঁই একেবারে গোড়ার দিকে। ব্যাপারটা যে সত্যিই কতোটা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে তা আরো একবার স্পষ্ট হলো গত কয়েক দিনের ঘটনায়। একদিকে দেখা গেল, সংসদের সম্ভ্রম রক্ষার চেষ্টার সূত্র ধরে বিরোধী পক্ষের জনকয়েক সদস্য লোকসভায় এমন কাণ্ড করলেন যাতে আর যাই হোক অন্তত সংসদের সম্ভ্রম বৃদ্ধি পেল না। অন্যদিকে দেখা গেল, যে-সংসদ বিশেষ করে যে-সরকার পক্ষ সাধারণত নিজেদের অধিকার ও সম্ভ্রমবোধ সম্পর্কে রীতিমতো সজাগ বরং একটু বেশিই সজাগ, সেই সংসদ এবং সেই সরকার পক্ষই চরমতম গালমন্দকেও একরকম হজম করে ফেলতে প্রস্তুত।

কোনো পত্রিকা যদি সংসদকে চোর আর দালালের আড্ডা বলার স্পর্ধা দেখায় তবে সেটা সংসদের পক্ষে নিতান্ত মর্যাদাহানিকর। এই মন্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়ে সদস্যেরা যে-বিষয়টি অধিকার রক্ষা কমিটির কাছে পাঠাতে চাইবেন তা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। এর তুলনায় অনেক নিরীহ ও মোলায়েম মন্তব্যের জন্যে অনেক সম্পাদককে সংসদের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে। আর সেই সব উপলক্ষে সরকার আর বিরোধী পক্ষ অন্য সব মতভেদ ভুলে গিয়ে হাতে হাত মিলিয়েছেন। কিন্তু জর্জ ফার্ণান্ডেজ সম্পাদিত 'প্রতিপক্ষের' বেলাতে দেখা গেল ভিন্ন রকম। সরকার পক্ষ এই পত্রিকার মন্তব্য সম্পর্কে ততোটা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন না। বিরোধীদের গলার জোর যতো বেশি ভোটের জোর ততো নয়। তাঁদের একার সাধ্য কি সরকার পক্ষের সাহায্য ছাড়া কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন? তাঁদের সেই ব্যর্থতার পরিণতিই হলো, অধ্যক্ষের মঞ্চের দিকে ধাওয়া করা, তাঁকে ঘেরাও করে রাখা এবং মাইক কেড়ে নিয়ে সভার কাজ অবৈধ ঘোষণা করা। এই ঘটনায় সেদিন নাকি সংসদে নতুন ইতিহাস তৈরি হয়েছে। তা এক ধরনের ইতিহাস বৈকি! কিন্তু গলা বাড়িয়ে বলার মতো নজির তৈরি হলো কি?

তবে ইতিহাস যদি সত্যিই তৈরি হয়ে থাকে, তবে তা অন্য কারণে। 'প্রতি-পক্ষের' এমন একটা অশালীন মন্তব্যের জন্যে যে তার সম্পাদককে সংসদের কাছ থেকে কোনো সাজা পেতে হলো না, একটি সামান্য নিন্দা প্রস্তাব ছাড়া সংসদ পত্রিকাটির বিরুদ্ধে আর কোনো ব্যবস্থাই নিল না, আসল ইতিহাস তৈরি হলো সেখানেই। ঐ পত্রিকাটির প্রতি শাসক দলের বিশেষ অনুরাগের কোনো কারণ থাকার কথা নয়। তবু যে সরকার পক্ষ তাকে অল্পে রেহাই দিলেন, তার কারণ তাঁদের ভয় ছিল অধিকার ভঙ্গের কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে 'লাইসেন্স কেলেঙ্কারির' সাপ না বেরিয়ে আসে। পণ্ডিচেরির সাতটি প্রতিষ্ঠানকে আমদানি লাইসেন্স দেওয়ার জন্য ২১ জন কংগ্রেসী এম-পি সুপারিশ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। সে-বিষয়ে সংসদীয় তদন্তের দাবি তুলেছেন বিরোধী পক্ষ। সরকার পক্ষের সন্দেহ 'প্রতিপক্ষের' বিরুদ্ধে অভি-যোগটি অধিকার রক্ষা কমিটিতে পাঠালে সেখানে ঐ লাইসেন্স সংক্রান্ত অভিযোগটিই ভিন্নভাবে তোলার চেষ্টা হতো। সে-চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে সরকার পক্ষ নিশ্চয়ই বিড়ম্বনার হাত থেকে রেহাই পেলেন। কিন্তু সংসদের সম্ভ্রম আর অধিকারের ব্যাপারটা হয়ে উঠলো আরো দুর্বোধ্য। সংসদকে 'চোর আর দালালের আড্ডা' বললেও যদি তার অসম্মান না হয় তবে হবে কিসে? অতঃপর কি অন্যান্যরাও সংসদ সম্পর্কে ঐ ধরনের বেপরোয়া মন্তব্য করতে উৎসাহিত হবে না?

কাঁচের জানালা

শান্তি পাল

বারান্দার ছোট ছোট সিঁড়ি বেয়ে থপথপ করে উঠছে ব্যাঙটা, বাচ্চুও অনুরূপ লাফাবার ভঙ্গিতে উঠছে ওর পিছন পিছন। ব্যাঙটা কালো পুঁতির মতন গোল গোল চোখ বার করে যথাসাধ্য সতর্ক থাকার চেষ্টা করছিল। ডালিমের গাছের নীচে বাঁধানো বেদিতে বসে রঙিন পশম বুনতে বুনতে গোপা সরু করে তাকাল একবার বাচ্চুর দিকে।

—ছি, অমন শব্দ করে লাফাতে নেই বাচ্চু।

বাচ্চুর পায়ে মোজা, ভারী শু। সকালে বাগানে বেড়াবার সময় ঘাসের শিশির পড়ে পায়ে লাগে। এমনি জুতো পায়ে কি করে নিঃশব্দে লাফাবে, এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে চিন্তা করল বাচ্চু। গলার কমফর্টারের কোণটা দাঁতে কামড়াতে গিয়েও মায়ের দিকে চেয়ে থমকে গেল। এ সময় দূর থেকে ভেসে এল সেই ট্রেনের বাঁশীটা। ভোর-বেলাকার প্রথম যে প্যাসেঞ্জার ট্রেন এখানকার স্টেশন ছুঁয়ে যায়। ভারী আশ্চর্য লাগে বাচ্চুর। মাত্র কয়েক গজ দূরে দূরে এই বাড়ীটার প্রায় তিন দিক বেষ্টন করে মসৃণ গতিতে ট্রেনটা চলে যায়। বাগানের ঠিক পূর্ব কোণটায় দাঁড়িয়ে থাকলে জানলার ফাঁকে আবছা প্রায় ঘুমন্ত মুখ, দরজার হাতল ধরে দাঁড়ানো কয়েকটি উদাস চেহারা বেশ স্পষ্ট করেই চোখে পড়ে। আশ্চর্য প্রতিটি কামরায় প্রায় একই ধরনের মানুষ, যে কোন ঘোড়া জেব্রা বা উটের মতন সবাই এক রকম দেখতে। এটা কেমন করে হয়, এরা প্রতিদিন কোথায় কোন কাজে নিরুদ্দেশে চলে যায়, ভাবতে ভাবতে বাচ্চু চেয়ে থাকে। শীত-ভোরের শিরশিরে হাওয়ায় অসমতল রুক্ষ বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে গম্ভীর গমগম শব্দ তুলে দূরের দিকে ছুটে যায় ট্রেনটা, তারপর নির্জন কুয়াশার মধ্যে টেলি-গ্রাফের পোস্ট আর রেললাইন পড়ে থাকে পরিত্যক্ত, বিষণ্ণ, উদাসীন। সে সময় বাচ্চুরও কেমন মন খারাপের মতন মনে হয়। বস্তুত বাচ্চু তার সাড়ে পাঁচ বছরের জীবনে এই প্রথম রেলগাড়ী চড়েই বেশ দীর্ঘ জার্ণির পর এরকম একটা নতুন বেড়াবার জায়গায় এসে পড়েছে। এবং দিনের মধ্যে বহুবার এই ছোট্ট বাগানটুকুতে দাঁড়িয়ে কতবার কতরকম ট্রেনের আসা-যাওয়া দেখছে। বিশেষ করে ভোরের নরম আলো যখন কুয়াশার ওপারে স্থির দাঁড়িয়ে থাকে চারিদিক শান্ত নির্জন নিরিবিলি, লাইনের পাশ দিয়ে ক'জন চেঞ্জার ভদ্রলোক বা মহিলা মন্থর পায়ে ভ্রমণ করে যান, কচিৎ বাজারের দিকে দ্রুতগামী ব্যাপারীর দূরাগত চিৎকার আসে—হে...ই, সে সময় মনে হয় এ-রকম ভাল লাগার দিন সব সময় আসে না। বাচ্চু

তাই অপলক দৃষ্টিতে এমনি ছুটে যাওয়া ট্রেন, অপর্যাপ্ত খোলামেলা আকাশ, খাটো পোষাকের দেহাতী মানুষ আর অনেক দূরের দিগন্ত জুড়ে কালো কালো মেঘের গুণ্ঠন ছড়িয়ে থাকা পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে রঙিন স্বপ্নের রাজ্যে ঘুরে বেড়াতে থাকে। মনে হয় আর কোনদিন সেই আড়াই-কুঠুরি বালিগঞ্জী ফ্ল্যাটে ফিরবে না তারা। সেই স্কুল, নিয়মমাফিক পোষাক, উচ্চারণের কায়দা, মায়ের ঠোঁট কামড়ানো বকুনি, বাবার ভাবলেশহীন চোখ, পিঠের ওপর নিষ্প্রাণ হাত, সব কিছুকে এই মুহূর্তে মন থেকে অনেক দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয় বাচ্চু, ওই দূরের পাহাড়গুলোর অন্ধকারের দিকে।

রেললাইনের ওপর থেকে শব্দটা তখনো মিলিয়ে যায় নি, বাচ্চু চিকন গলায় নিজের নাম শুনে ডান পাশে ফিরে তাকাল। গেটের বাইরে মুন্নি। এই বাগানের বুড়ো মালি শিউশরণের নাতনি। মুন্নির গায়ে তেলচিটে সুতীর চাদর হাঁটুর ওপর পর্যন্ত ফুল ছাপা ফ্রক, তারপর ধূলিধূসরিত নিরাবরণ দুটি রোগা রোগা পা। মাথায় রুক্ষ ঝাঁকড়া চুল, মুন্নি অদ্ভুত খুশীতে হাসছিল চোখের ইশারায় কাছে ডাকল বাচ্চুকে। বাচ্চু বড় বড় উল্লাসিত পা ফেলে গেটের কাছে এগিয়ে লোহার ছিটকিনিটা খুলে দিল। মুন্নির দু-হাত চাদরের নীচে জড়ো করা। পা দিয়ে গেট ঠেলে ঢুকে এলো মুন্নি, শিশির ভেজা ঘাস মাড়িয়ে লেবু গাছের ঝোপের দিকে সরে গেল। বাচ্চুও এগোল সম্মোহিতের মতন ওর পিছু পিছু।

—তুমহারে লিয়ে বড়িয়া চীজ লায়া, চাদরের অভ্যন্তরে মুন্নির হাত দুটো ছটফট করতে থাকে। বাচ্চু ওর দেহাতী টানের কথা পরিষ্কার বোঝে না তবু ওর লুকোন চঞ্চল হাত ও খুশী খুশী দৃষ্টি দেখে আন্দাজ করতে পারে। অদেখা উপহারের আশায় অসীম আগ্রহে হাত পেতে দেয়।

মুন্নির ছোট ছোট মুঠোয় ধরে না, এত বড় আকারের দুটো পেয়ারা আবিষ্কৃত হল ওর তেলচিটে চাদরের তলা থেকে। সদ্য গাছ থেকে পেড়ে আনা। সারারাতের হিমে মাখামাখি এখনও, সতেজ সরস। বাচ্চুর চোখ চকচক করতে থাকে, পরম যত্নে ছোট ছোট হাতে বুকে জড়িয়ে নেয় পেয়ারা দুটি, ঠান্ডায় কুঁচকে থাকা হাতের চামড়ায় হিম-সিক্ত পেয়ারাগুলো আরো ঠান্ডা ছড়ায়। এ-রকম ঠান্ডাও যেন ভাল লাগে বাচ্চুর। বালিগঞ্জে ওদের পাশের বাড়ীর ফ্রিজ থেকে বার করা ঠান্ডা ফল ধরে দেখেছে বাচ্চু। বেশিক্ষণ হাতে রাখা যায় না। ভেতর থেকে কেমন একটা গা শিরশির কনকনানি শিরা-উপশিরা বেয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে যায়। ওর ভাল লাগে না সেই হিম শীতলতা। তার চেয়ে এই ভেজা ভেজা সবুজ পেয়ারা বাচ্চু দাঁতে কামড় দিয়ে একটা—আঃ কি দারুণ। মুন্নি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর ভঙ্গি দেখে, খুশীতে উপচে যায় চোখ দুটি। বাচ্চুকে ওর বড় ভাল লাগে।

—কোথায় পেয়েছিস মুন্নি? বাচ্চুর ছোট ছোট দাঁতে হাসি।

—আমাদের গাছের, পিতাজী আভি পেড়ে দিল।

—তোর বাড়ীতে একদিন নিয়ে যাবি তো আমায়? বাচ্চু চাপা ফিসফিস গলায় বলল।

—জরুর, মুন্নি চকচকে চোখে আশ্বাস দেয়।

—বাচ্চু, ডালিম গাছের নীচ থেকে আড়মোড়া ভেঙে দাঁড়িয়ে ওঠে গোপা, বাচ্চুকে ডাক দেয় এদিক ওদিক তাকিয়ে।

বাচ্চু হঠাৎ নিস্পন্দ। এখনো আধখানা পেয়ারাও শেষ করে উঠতে পারে নি। ঝাউ পাতার আড়ালে মায়ের দোলানো আঁচল দেখতে পেল।

—বাচ্চু, গোপা আন্দাজ করে এসে পড়ল কাছাকাছি, আগেই দৃষ্টি গেল মুন্নির ওপর। মুন্নিও থতিয়ে গেছে।

—কি করছ এখানে, গোপা স্বাভাবিক গম্ভীর স্বরে বলতে বলতেই পেয়ারা দেখতে পেয়ে গেল, আর তৎক্ষণাৎ ভ্রূ কেঁপে উঠল তার।

এ কি, সাত সকালে পেয়ারা গিলছ যে বড়! এটা নিশ্চয় ফল খাবার সময় নয় তোমার!

—মুন্নি দিল, বড় বড় ভয়ার্ত চোখে মায়ের দিকে চেয়ে বাচ্চু দোষস্খালনের চেষ্টা করল।

—দিলেই খেতে হবে? আশ্চর্য। গোপা চোখ সরু করে টেনে টেনে উচ্চারণ করল, তোমাকে কতবার বলেছি, সব কিছুরই একটা নিয়ম আছে। মায়ের এই টানা টানা দাঁত চাপা আপাত নিরীহ উচ্চারণের কথাগুলোকে বাচ্চু বড় ভয় করে, শুধু বাচ্চু নয়, সম্ভবত ওর বাপিও, না হলে কতবার বাচ্চু দেখেছে মায়ের এই সরু চোখের দৃষ্টির সামনে ক্রমশ বাপির হাসিমুখ বিমর্ষ গম্ভীর আর ভাবলেশহীন হয়ে উঠেছে; গজার কাছে দীর্ঘশ্বাস চেপে নিথর দাঁড়িয়ে থাকে বাচ্চু, এ সময় মুন্নির দিকে চোখ পড়ল গোপার।

—এই মেয়ে, তোকে বলেছি না, যখন তখন যা তা জিনিস ওর হাতে এনে দিবি না, ওর সবকিছু সহ্য হয় না।

বাচ্চু আড়চোখে চেয়ে দেখে মুন্নির সদ্য-ঘুম-ভাঙা ফুলো ফুলো কালো মুখ এখন ফ্যাকাশে। মাথা নীচু করে দাঁতে নখ কাটে মুন্নি। বাচ্চু হঠাৎ আধখানা পেয়ারা সমেত হাত দুটো বাড়িয়ে দেয় ওর দিকে, মুন্নি আলগোছে ওর হাত থেকে অন্যটো

তুলে নিলে বাচ্চু আর তাকায় না, সটান পেছন ফিরে বাগানের ভেতর দিকে হাঁটতে থাকে। এমন সুন্দর সকাল তার মাথায় তখন অনবরত গম্ভীর শব্দে হট্টগোল শুরু করে দেয়। সদ্য রোদের ছোঁয়া লাগা সোনা রং আকাশ তার সামনে বিমর্ষ কুয়াশার আড়ালে দুলতে থাকে। পেটের মধ্যে সকালের ডিমের পোচ আর ওভালটিন বমি হয়ে বেরিয়ে আসতে চায়। এ-সব সময় বাচ্চুর বাপির কাছে একটু থাকতে ইচ্ছে হয়। বাপির নিঃসাড়, নিস্পন্দ হাতখানা পিঠের ওপর পেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বাচ্চু বাপির ঘরের দিকেও যায় না। পিছনে মায়ের উপস্থিতিটের পেয়ে সোজা চলে যায় বাগানের অন্য প্রান্তে আর পিছনে না তাকিয়েও ও যেন দেখতে পায় মুন্নি হেঁটে যাচ্ছে অনাচ্ছাদিত পায়ে ধুলিমলিন বাঁধানো রাস্তার ওপর দিয়ে ওর মুখ বিষণ্ণ, দৃষ্টি সজল। তেলচিটে চাদরের এক কোণ ঝুলে পড়েছে গোড়ালির ওপর, মুন্নির পায়ে পায়ে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে বাচ্চুর প্রথম ভোরের নির্মল খুশীটুকু।

এখনো হলদে রঙের চিকণ রোদ ছোট ছোট গোলাপ গাছগুলির মাথায় জড়িয়ে আছে। চারিদিকে ঘাস লতাপাতা আর নানা-রকম পাখীর ডাকের মধ্যে বেশ একটা সতেজ স্ফূর্তির ভাব। শীতের অপসৃয়মান দুপুরের নরম আলো মাঠ প্রান্তরে ঝিমঝিম করে। কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে প্রথমে সাজানো বাগান, তারপর বাগানের নীচু পাঁচিল তার ওপারেই অমসৃণ উঁচুনীচু হলুদে প্রান্তর। কাছাকাছি দিয়ে টানা চলে গেছে রেললাইন, ওপারে বেশ কিছু দূরে ছোট্ট ছোট্ট রেলওয়ে কোয়ার্টার তৈরী হচ্ছে কিছু, এখান থেকে ঠিক খেলাঘর মনে হয়। ডানপাশ দিয়ে সোজা নদীর দিকে চলে গেছে পীচের রাস্তা, তার দুপাশে বড় বড় সুসজ্জিত বাগানবাড়ী, যেগুলি শীতের কটা মাস জমজমাট থাকে, তারপর, বছরের অন্য ঋতু-গুলিতে থাকে জনহীন পরিত্যক্ত কেবলমাত্র একক নিঃসঙ্গ দেহাতী মালির দেখাশোনার ওপর নির্ভরশীল। কাঁচের জানলা দিয়ে বাইরের এইসব দৃশ্যের দিকে তাকিয়েছিল সঞ্জয়। তার সামনে টেবিলের ওপর মোটা একটা বই, ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ। সঞ্জয়ের দৃষ্টি দূরমনস্ক। বিদেশে বেড়াতে আসার এই কদিনের মধ্যেই সে এখানকার নিঃশব্দ রুক্ষ গম্ভীর অবাধ প্রকৃতির মধ্যে নতুন করে নিজেকে আবিস্কার করেছে, নির্জন দুপুরে অচেনা পাখীর ডাক শুনতে শুনতে অথবা ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যার কাঁপা আলোয় জীবনটা যেন অনেক বিস্তৃত মনে হয়, অনেক তুচ্ছ লাভ-ক্ষতির ওপারে টেনে নিয়ে যেতে পারে নিজেকে, এখানে আসার পর থেকে সঞ্জয়ের মুখে তাই সবসময় একটা মৃদু অপরিচিত হাসি লেগে থাকে।

—কি হল, তোমার এখনো চায়ের কাপ ভেজানো পড়ে রইল, হন্তদন্ত গোপা হাতের কব্জিঘড়ি চোখের সামনে ধরেই ঘরে ঢুকল।

সঞ্জয় কমুহূর্ত চেয়ে রইল তার সজ্জিত মুখের দিকে। যত্ন করে সাজলে গোপাকে এখনো সেই আগের মতই ভাল লাগে। বয়স ওর শরীরের ওপর তেমন ছাপ ফেলতে পারেনি।

গোপা বলল—দেখছ কি, বেরোবে না?

—আমরা কোথায় যাচ্ছি সেটাই তো জানলাম না এখনো। সঞ্জয় ঠোঁটের ফাঁকে হাসল।

—বিদেশে এলে প্রতিদিন কোথাও না কোথাও বেড়াতেই হয়, মুখ ভার করে ঘরে বসে থাকলে নিজেরও কষ্ট, অন্যেরও অসুবিধে। গোপার গলায় ঝাঁঝ, হাতে পায়ে চঞ্চলতা।

—তবু গন্তব্যস্থানের নামটা জানা থাকলে সুবিধে হয়, সঞ্জয়ের স্বর অধিকতর শান্ত, ভঙ্গিতে অলস শৈথিল্য।

গোপার প্রসাধনের আড়ালে মুখ ক্রমশ লালচে হচ্ছিল। ভ্রু জোড়া ঘন করে এনে সামান্য সময় ভাবল সে, তারপর থেমে থেমে বলল,

—এধর হাঁটতে হাঁটতে নদীর ধার পর্যন্ত গেলাম, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে ফিরে এলাম আবার, এই তো আনন্দ এর আবার গন্তব্য কি।

—বাচ্চু যাচ্ছে না?

—নিশ্চয়ই, ও ছাড়া বিদেশ বিভুঁয়ে সাহস করে একা বেরোবে কে?

—তবে তো ভালই, ও একাই সব দিক ম্যানেজ করতে পারবে। অভিজ্ঞতা আছে যখন, আমার যাবার দরকার লাগবে না।

—তার মানে তুমি যাবে না, গোপার বিস্ফারিত চোখ ফুঁসে উঠল, আমাদের যে কোন আনন্দ বেড়ানো, চারিদিক দেখা-শোনা, কোন কিছুতেই তুমি পার্টিসিপেট করবে না।

—কিছু যায় আসে না গোপা। সঞ্জয় সান্ত্বনার সুরে বলল আসলে তোমার আর বাচ্চুর জন্যেই এই বিদেশে আসা, তোমাদের স্ফূর্তি আনন্দেই আমার সুখ।

—থাক, গোপা ঝঙ্কার দিল, যুক্তি না দেখালেও চলবে পেছন ফিরে গোপা দেখল বাচ্চুকে হাত ধরে নিয়ে চলে এল তাকে ঘরের বাইরে বাচ্চুর খারাপ লাগছিল, তার নিজের মুখে বলতে ইচ্ছে করছিল একবার বাপিকে, বাপি তাদের সঙ্গে বেড়াতে গেলে তার ভীষণ ভাল লাগে। কিন্তু মায়ের রাগত মুখের দিকে চেয়ে বাচ্চু ইচ্ছেটা দমন করল। দালানের দরজা খুলেই ওরা দেখল অভিকাক্ত দারুণ স্মার্ট সেজেগুজে গেটের কাছে চঞ্চল

পায়ে পায়চারি করছে। তার কাঁধে ফ্লাকস, ক্যামেরা, মুখে সিগারেট। গোপাকে দেখেই কাছাকাছি এগিয়ে এল, চোখের ইশারায় সঞ্জয়ের ঘর দেখিয়ে জিজ্ঞাসার ভঙ্গি করল, উত্তরে ঠোঁট ওলটালো গোপাল, ভ্রু, চোখ টান করে বিরক্তি প্রকাশ করল, তারপর দুজনেই হঠাৎ ছোট্ট শব্দ তুলে হেসে উঠল. অর্থাৎ মুখভাবেই কথা আদান-প্রদান হল ওদের, এবং সেটা বাচ্চু সামনে থাকার দরুনেই। বাচ্চু এক মুহূর্ত তাকিয়েছিল ওদের দিকে, তখনি তার মনে পড়ল মুন্নির বিষয়। মুন্নিরও তো যাবার কথা ছিল ওদের সঙ্গে।

সামান্য দূরে ছোট একটা টিলার মতন, তার ওপরে নরম হলুদ পাতা সাজানো ম্যাপলাইন গাছ, মুন্নির দাদুর হাতের পোঁতা গাছ, মুন্নি সেখানে অপেক্ষায় স্থির দাঁড়িয়েছিল, তার হাতে ছোট্ট নাইলনের টুকরি বাচ্চু জানে ওর মধ্যে মাংসের সিঙ্গাড়া আর পুডিং আছে, মা আজ সারা-সকাল যত্ন করে তৈরি করেছে।

মাঝবেলায় পড়ন্ত রোদ চিকচিকে গুঁড়ো গুঁড়ো সোনার মতন ঝরছে চারিপাশে। কাঠ-ঠোকবার তীক্ষ্ণ শব্দ সহসা ভেসে আসে, নির্জনতার মধ্যে দিয়ে গমগম শব্দে মালগাড়ী চলে যায়। শীতের দুপুর শরীরের চারপাশে মধুর আরামে ঝিমঝিম করতে থাকে। অভিজিত আর একবার সঞ্জয়ের ঘরের দিকে তির্যক তাকাল, তারপর গোপার সামান্য ঘনিষ্ঠতার সরে এসে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল,

—লেট'স স্টার্ট নাউ।

—উইথ প্লেজার, গোপা হাসিমুখে সায় দিল, তারপর ওদের দিকে তাকিয়ে খুশী খুশী গলায় বলল,

—আয় বাচ্চু, আয় মুন্নি দেখিস বাস্কেটটা বেশী দোলাসনি যেন, সব একাকার হয়ে যাবে তাহলে।

মুন্নি মাথা নেড়ে সায় দিল, তারপর বাচ্চুর পাশাপাশি চলতে লাগল। মুন্নির গায়ে ফরসা সবুজ ফ্রক, তার ওপরে রং চটে যাওয়া সোয়েটার, আঁচড়ানো চুলে লাল পুরনো ফিতে। মুন্নি জানে আজ সারাক্ষণ এই টুকরিটা বইবার জন্যেই তাকে এই যাত্রায় সঙ্গী করা হয়েছে। তবু মুন্নি বাচ্চুর সঙ্গে যেতে পারছে এই আনন্দেই গোপার প্রতি কৃতজ্ঞ। বাচ্চুর ওপর এই কদিনেই তার কেমন মায়া পড়ে গেছে। ওরা বরাবর এখানে থাকবে না, অন্যান্য চেঞ্জারদের মতনই নির্দিষ্ট সময় ফুরিয়ে গেলে বাচ্চুরা চলে যাবে একথা ভাবলেই মুন্নির কান্না পায়।

দুপাশের বড় বড় বাগানবাড়ীগুলোতে ছায়া-নিবিড় গাছের সারি। তার মাঝখান দিয়ে ধুলোয় ডুবে যাওয়া পাকা রাস্তা। ধুলো-বালির পুরু আস্তরণের ওপর গরুর গাড়ী আর সাইকেলের চাকার দাগ। এ পথে অন্য যানবাহন চলে না। কি রকম অদ্ভুত নিঃশব্দ নিরিবিলি পথটা, চারিদিকে হাওয়ার ফিসফিসানি আর দূরাগত পাখীর ডাকে নির্জনতা আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে জড়িয়ে ধরে। গোপার গায়ে পায়ে ছুটির চঞ্চলতা। একটা ছোট খুশিয়াল পাখীর মতন চঞ্চল পায়ে প্রায় লাফিয়ে চলেছে গোপা, একটু আগেও ভ্রূ কোঁচকানো, লালচে সেই মুখটাকে এখন আর চেনা যাচ্ছে না। অনর্গল হাসছে, কথা বলছে অভিজিতের সঙ্গে। অভির হাঁটা চলা মেজাজী, হাসিখুশী মুখ, গোপার দিকে কেমন নিবিড় চোখে তাকায়। এটা অনেকদিন থেকে লক্ষ্য করেছে বাচ্চু প্রায় তার জ্ঞান হবার পর থেকেই। আগে আগে অভিকাকু বেশ কিছুদিন ছাড়া ছাড়া আসত তাদের বালিগঞ্জের বাড়ীতে। অভিকাকু এলেই মা কিরকম খুশীতে রঙিন হয়ে উঠত, এত কথা বলত না তখন, মার যেটা স্বাভাবিক প্রবণতা সেই উজ্জ্বল ভাব থেকে হঠাৎ ব্রীড়াময়ী হয়ে উঠত। অভিকাকুর সঙ্গে গল্পের ফাঁকে ফাঁকে বাপি মাকে ডেকে পাঠাত, চা, জল-খাবার চাইত অভিকাকুর সঙ্গে গল্প করতে বলত। অভিকাকু নানান রকম খাওয়ার বা তাস খেলার বায়না ধরত। এই তাস খেলা থেকেই মায়ের অনেক কাছে চলে এল অভিকাকু। ক্রমশ সিনেমা থিয়েটার জলসা ছবি তোলা ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্ত ঘনিষ্ঠতার কারণগুলি ঘটে যেতে থেকেছে। আর আশ্চর্য বাপি কেমন ক্রমশ সরে গেছে ওদের কাছ থেকে। ওদের উচ্ছ্বাস, উন্মাদ হৈ হুল্লোড় সব কিছু থেকে নিজেকে অতি সাবধানে গুটিয়ে নিয়ে নিজের সেই নির্জন-বিলাসের মধ্যে ডুবে থেকেছে সারাক্ষণ। আর বাচ্চু? সে নীরব দর্শক। মাসে একবার দুবার কয়েকটি [illegible] অভিকাকু আসে, বাচ্চুর জন্য [illegible] [illegible], মা [illegible]

চর্যায়, অবশ্যই সাংসারিক সব কর্তব্য সেরে, বাচ্চু মনে মনে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় তখন, কখনো দুর্বিনীত হয়ে ওঠে সে, সে সময় অবশ্য অভিকাকুই ভোলায় তাকে: মোটের ওপর অভিকাকুর স্নেহটাকেও সে অস্বীকার করতে পারে না, কতরকম উপহার, খেলনা ও মিষ্টি গল্পে ভরিয়ে দেয় তাকে অভিকাকু। কাকুর আচরণ দেখে মাঝে মাঝে মনে হয় বাচ্চুর প্রতি তার কোথায় একটা সহজাত আকর্ষণ আছে।

—ঐ বাবু তোর নিজের কাকা? মুন্নি ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল বাচ্চুর কানে কানে। একটা চমৎকার বাগানবাড়ির গেটের বোগেনভেলিয়ার ঝাড়ের নীচে দাঁড় করিয়ে তখন অভিজিত গোপার ছবি তুলছিল অভিজিতকে মুন্নি চেনে এখানে যে বাড়ীতে বাচ্চুরা বেড়াতে এসেছে, সেটা অভিজিতের বাবাই কবছর আগে কিনেছিলেন, সে কারণে প্রতি সিজনে একবার করে অভিজিত দেখা-শোনা করতে আসে এখানে বন্ধুবান্ধব নিয়েও আসে, এবার এনেছে বাচ্চুদের।

অভিকাকু বাচ্চুর নিজের কাকু কিনা এ বিষয়ে বাচ্চুকে চিন্তা করতে হল খানিকটা। ততক্ষণে আরো খানিকটা পথ নদীর দিকে এগিয়ে গেল তারা গোপা আর অভিজিত সামনে পিছনে মুন্নি আর বাচ্চু। বাচ্চুর জুতো ধুলোয় বর্ণহীন, মুন্নি হাতের টুকরি সাবধানে দোলাচ্ছে। বাচ্চুর এক কাকু থাকে কানাডায়, মাঝে মাঝে বাচ্চুর নাম লেখে চিঠিতে। বাচ্চু ভেবেচিন্তে মুন্নিকে উত্তর দিল,

—নিজের কাকু না, বাবার বন্ধু।

মুন্নির কপালে ভাঁজ পড়ল শুনে। ওর দাদু শিউশরণ বলে, ছোটবাবু বহুৎ দিলদার আদমি। সেই ছোটাবাবু বাচ্চুকে মাকে নিয়ে এমন লোফালুফি খেলে কেন কে জানে কি রকম যেন ভাষায় কথা বলে ওরা, কি দৃষ্টিতে তাকায়। এর মধ্যে একদিন মুন্নি দেখেছিল, গোপার ব্লাউজের হাতা থেকে একটা সুতো ঝুলছিল বাহুমূলে সেটা হঠাৎ এক টানে ছিঁড়ে নিল অভিজিত, দেখে মুন্নির গা শিরশির করে উঠেছিল কেন কে জানে। মুন্নি তো নিজের মায়ের আদুল গা, এমনকি পিতাজীর সামনেও দেখতে অভ্যস্ত, তবুও গোপার বাহুতে অভিজিতের আঙুলের ছোঁয়ানো মনে পড়লে এখনো গায়ের মধ্যে কেমন যেন করে উঠল।

—এস বাচ্চু, এবার তোমাদের দুজনের একসঙ্গে ছবি তুলব, অভিজিত বাচ্চুকে এনে গোপার কাছে দাঁড় করাল, গোপা সামান্য নীচু হয়ে জড়িয়ে ধরল বাচ্চুকে ভীষণ ভাল লাগল বাচ্চুর ছবি তুলতে এত কম সময় লাগে কেন, ভাবল সে।

গোপা বলল, পথেই এত সময় নষ্ট করলে নদীর ধারে পেঁছব কখন।

—আমাদের লক্ষ্য বোধহয় সমুদ্রে পেঁছুনো, তাই এত দেরী হচ্ছে, অভি উত্তর দিল রহস্য করে।

নদীর ধারে যেতে যেতে আকাশের রং লালচে হয়ে এল। তীরের কাছে অনেকখানি বালির চড়া, দূরে তরঙ্গহীন শীর্ণস্রোত নদীর জলে কুসুম রঙ থিরথির করছে। সমস্ত পশ্চিম আকাশে বিশাল রঙের মহোৎসব। চরাচর জুড়ে সে এক আশ্চর্য বিকেল। অভিজিত বলল,

—অনেকদিন তোমার গান শুনিনি গোপা, একটা শোনাবে?

কিছুক্ষণ নীরব থাকল গোপা। তারপর সেই বর্ণচ্ছটার মাঝখানে আধ ফোটা পদ্মের মত বসে উদাস গলায় গাইল, 'আর কেন দোলিতে দুলাতে বাঁধে বসন্ত সমীরণ।'

কথা ভাল বুঝেছিল না বাচ্চু, তবু সুর শুনে তার কেমন মন খারাপ হয়ে উঠল, মনে হয় মার যেন কোথায় দুঃখ চেষ্টা করলেও সে দুঃখকে কখনো ছুঁয়ে দেখতে পারবে না। মা গাইছে, অভিকাকু নির্নিমেষ চেয়ে আছে তার মুখের দিকে। অভিকাকুর মুখে-চোখে আলোর ছোপ সেই একান্ত [illegible] বাচ্চুর মনে হয় অভিকাকু ঘোর কুচক্রী, পরস্বাপহরণকারী। আর তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল বাপ একলা নির্জন ঘরে বসে আছে, চারদিকে বিশাল ঝিঁঝির শব্দ— বাড়ে, শিউশরণ হয়তো দালানের খাটিয়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে হয়তো বাপির ঘরে আলোটা পর্যন্ত জ্বালাতে ইচ্ছে করেনি। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বাচ্চু চীৎকার করে উঠল, মা, বাড়ী যাবে না—সন্ধে হয়ে গেল যে।

ভোর রাতে ঝিপঝিপ বৃষ্টি হয়ে গেছে। গোলাপ বাগানের সারি সারি এক মাপের গাছগুলি স্নান সেরে উঠল। পোকা-খোকা সাতভাই ফুলের পাপড়িতে এখনো জলের ফোঁটা টলটল করছে। আজ ভোরের বেলা থেকেই গোপার জ্বর, বিছানা থেকে ওঠেনি। জামরুল-গাছের নীচে বাঁধানো বেদিতে বসে বাচ্চুকে পাহারা দেবার প্রশ্ন আসে না আজ। আজ এল বাচ্চু নেট থেকে বাইরে উঁকি দিল। আজকের বৃষ্টিভেজা সকালটা আরো যেন মনোরম, স্থির-নিষ্পন্দ।

আকাশ এখনো পরিষ্কার নয়, কুয়াশার পর্দা ছিঁড়ে আলো এপর্যন্ত প্রখর হতে পারেনি। বাগানের এককোণে রজনীগন্ধা ঝাড়ের নীচে মাটি আলগা করছিল শিউশরণ। সেদিকে একবার চেয়ে আস্তে আস্তে বাইরে এল বাচ্চু। ভোরবেলাকার প্যাসেঞ্জার ট্রেনটার বোধহয় এখনো যাবার সময় হয়নি, দূরে কালো কালো পাহাড়ের সীমারেখা এখন কুয়াশায় ঝাপসা। রেল-লাইনের ধারে একটা শিমুল গাছ বর্ণাঢ্য রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে। বাচ্চু বেড়াতে-আসা গম্ভীর মানুষগুলোর মতন ধীরে-সুস্থে পায়চারি করতে শুরু করেছিল। এ-সময় দূর থেকে দেখল মুন্নিকে, দাদু শিউশরণকে ঘুম ভেঙে উঠে একবার দেখা চাই মুন্নির। শীতের হু-হু হাওয়ায় চাদর মুড়ি দিয়ে মুন্নি হাজির হল।

—বাইরে কি করছিস, বাচ্চু? মুন্নি প্রশ্ন করল।

—একটু বেড়াচ্ছি। বাচ্চু হঠাৎ স্বাধীনতা অর্জন করার মতন গর্বিত গলায় বলল।

—তোর মা কোথায়? মুন্নি এদিক-ওদিক চেয়ে ফিসফিস গলায় বলল।

—মার জ্বর, বিছানায় শুয়ে আছে।

—আজ ভোরে আমাদের ছাগলের একটা বাচ্চা হয়েছে, মুন্নির গলা দারুণ খুশী খুশী। বাচ্চুকে খবরটা দেবার জন্যে সে এতক্ষণ হাঁপিয়ে উঠেছিল সম্ভবত।

—ছাগলের বাচ্চা! বাচ্চু চোখ বড় বড় করল, খুব সুন্দর না? কত বড় রে?

—এতুনা, মুন্নি ছোট ছোট দু-হাত কিছুটা প্রসারিত করে দেখাল, সাদা-কালো রঙ। মুন্নির বলার ভঙ্গি খুব লোভনীয়। বাচ্চু নিজেকে সামলাতে পারছিল না। মুন্নির ধূসর মলিন চাদরের কাছে খুব ঘন হয়ে এসে চুপি চুপি বলল,

—আমাকে দেখাবি?

—তুই যাবি? মুন্নি অবিশ্বাসের সুরে জিজ্ঞাসা করল।

—অনেক দূরে তোদের বাড়ি?

—এই তো, একটুখানি, মুন্নি উৎসাহিত গলায় বলল—তুই তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারবি তো?

মুন্নির চেষ্টা করে টেনেটেনে বলা হিন্দী-বাংলা মিশ্রিত ভাষা বাচ্চু ভাল করে বোঝে না। তবু ওর চোখের উচ্ছ্বসিত আহ্বানেই ওর পিছন পিছন এগিয়ে চলল। অতি সাবধানে রেললাইন পেরিয়ে মুন্নি বাচ্চুকে নিয়ে চলতে লাগল। এ-সময় বাচ্চুর প্রতি তার দায়িত্ব-বোধ প্রখর। ঠিক ছোট ভাইটির মতন বাচ্চুর ছোট হাতটি নিজের হাতে জড়িয়ে রেখে চলছিল মুন্নি।

শীতভোরের বৃষ্টিতে রাস্তাময় স্যাতসেঁতে কাদা। ডানপাশে রেলের কোয়ার্টার, বাজারের পথ—সবই এখনো যেন ঘুমের জড়তায় মাখামাখি হয়ে [illegible] বাগানে হঠাৎ ঘুমন্ত [illegible] ডাকল। দু-

চারটি ঘরবাড়ি ছাড়িয়ে মেঠোপথে এসে পড়ল ওরা। মাটির চালাঘর, পাতকুয়া [illegible] ন্যাকড়া জড়ানো ছেলেমেয়ে, দুপাশে এসব অপরিচিত দৃশ্য দেখতে দেখতে বাচ্চু হঠাৎ ভয় পেয়ে মুন্নির হাত জড়িয়ে ধরল, বলল—

—মুন্নি আমি বাড়ি যাব, এতদূরে এসেছি জানতে পারলে মা বকবে।

—এই তো, আর একটুখানি গেলেই আমাদের ঘর। এখনি তোকে বাড়ি পৌঁছে দেব। মুন্নি অত্যন্ত দ্রুত পায়ে বাচ্চুকে টেনে নিয়ে চলছিল, ছাগলের বাচ্চাটা ওকে না দেখানো পর্যন্ত তার শান্তি নেই। বাচ্চুর ধোপদুরস্ত জামাজুতো-পরা চেহারাটার দিকে সদ্য ঘুম-ভাংগা চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছিল আশপাশের বাচ্চাগুলো, বাচ্চুরও দারুণ অবাক লাগছিল চারদিকের হতশ্রী অবস্থা দেখে, এ-সময় ট্রেনের বাঁশী শোনা গেল দূর থেকে। বাচ্চু বলে উঠল,

—সাড়ে ছটা বেজেছে, অভিকাকু উঠে বাগানে খুঁজবে আমায়। এ-সময় মুন্নি আঙুল দেখিয়ে বলল,

—এই তো আমাদের ক্ষেত, আর ওইটা আমাদের ঘর।

মেঘলা সকালের অনুজ্জ্বল আলোয় ডানপাশে বিস্তীর্ণ ক্ষেত দেখতে পেল বাচ্চু। মুন্নি ওকে বোঝাল, কতটুকু পর্যন্ত আলুগাছ কপি-টোমাটো ইত্যাদি গাছগুলিরই বা সীমানা কতদূর, এসব মুন্নি চোখ বুজে দেখিয়ে দিতে পারে। বাচ্চু এক অদেখা নতুন বিরাট জগতের মুখোমুখি এসে হাঁ করে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তখন মুন্নি বলল,—এ-পাশে আয়, এখানে আমাদের ছাগলের ঘর।

একফালি খোড়ো ঘরে এখনো একজন বিহারী পুরুষ ছাগল ও তার শাবকটির পরিচর্যায় ব্যস্ত। বাচ্চু দূর থেকে দেখল খানিকক্ষণ, ওই লোকটির জন্য কাছাকাছি যেতে সাহস করছিল না। মুন্নি চেঁচিয়ে বলল,—পিতাজী, বাচ্চু আয়া।

বলিষ্ঠ চেহারার লোকটি সম্ভবত ওর নামের সঙ্গে পরিচিত, ওর দিকে তাকিয়ে হাসল।

—অন্দর মে যাও বেটা।

বাচ্চু পায়ে পায়ে সরে এল নিকানো পরিচ্ছন্ন আঙিনার কাছে। মুন্নি একজন ঘোমটা টানা স্ত্রীলোককে দেখাল,

—মেরা মাই, বলে কাছ ঘেঁসে বসে পড়ল তার। বাচ্চু তখন আর একটা দৃশ্য দেখছে। বছর দেড়েকের একটি বাচ্চা কোলে শুয়ে আছে মুন্নির মায়ের, পরম সমাদরে আর নিশ্চিন্ত আরামে তার বুকের দুধ পান করে যাচ্ছে। গলার কাছে কি রকম যেন একটা তুকা দলা পাকিয়ে উঠল তার। এভাবে মায়ের কোলের মধ্যে শুয়ে দুধ খাবার কেমন অনুভূতি তা সে কল্পনাও করতে পারে না। বাচ্চুর মনে হয় কত—কতদিন সে মায়ের গায়ে হাত রেখে শোয় নি, বড় খাটের পাশে ছোট খাটটি বহুদিন ধরে তার আলাদা শোবার জন্যে নির্দিষ্ট,

মায়ের বুকে একবার হাত রাখবার স্বাধীনতা সে কতদিন আগে যেন হারিয়ে ফেলেছে। মুন্নি বা তার মা তার দিকে চেয়ে কি কথা বলছিল, তা কানে ঢুকছিল না তার, তার সামনে সমস্ত কিছু ধূসর, মেঘলা আকাশের মত বর্ণহীন মনে হচ্ছিল, এ সময় পেছনে পরিচিত গলা শুনে আঁতকে উঠল বাচ্চু।

—এই তো, এখানে না বলে চলে আসা হয়েছে, দুষ্টু [illegible], গোপা এসে তার কাঁধের কাছে [illegible] খামচে ধরল।

ভয়ে নীল হয়ে গেল বাচ্চু। মা এই জ্বর গায়ে উঠে তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে, সঙ্গে অভিকাকুকেও আনে নি। শুধু পথ দেখাবার জন্যে শিউশরণ এসেছে সঙ্গে। শিউশরণ এগিয়ে এসে একটা চড় দিল মুন্নির গালে, দেহাতী ভাষায় একটানা বকুনি লাগাল, বাচ্চুকে না বলে নিয়ে আসার জন্যে। মুন্নি মার কোলে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

—ওকে মারছ কেন শিউশরণ, গোপা ঠান্ডা গলায় বলল, আমার নিজের ছেলেই চরম অবাধ্য আর অসভ্য। গোপা খুব ঠান্ডা গলায় বলল কথাগুলো, তারপর সকলের ভীত চকিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে মন্থর পায়ে বাচ্চুর হাত ধরে নিয়ে চলল।

সারাটা পথ গোপা কোন কথা বলল না। বাচ্চু প্রতি মুহূর্তে একটা কিছু শাস্তির আশংকা করছিল, মনে হচ্ছিল মা তাকে মারুক, বকুক, চুল টেনে ছিঁড়ে দিক তবু গোপার সেই জ্বরতপ্ত লালচে থমথমে মুখ থেকে একটা বকুনি পর্যন্ত ছিটকে এল না। নিজেদের বাসায় এসে নিশ্চুপে বাগান, সদর, দালান পেরিয়ে সোজা শোবার ঘরে এসে থামল, বাচ্চুর হাত ছেড়ে দিল এবার। বাচ্চু বিমূঢ় অবস্থায় কাদামাখা জুতো পায়ে ঘরের মাঝখানে স্থির দাঁড়িয়ে রইল। গোপা ম্লান মুখে সরে গেল কাঁচের জানালার কাছে। ভেজা ভেজা গোলাপ গাছ-গুলির দিকে চেয়ে চেয়ে অনর্গল জল পড়তে থাকল তার চোখ থেকে। বাড়ীতে এখন বাপি নেই, অভিকাকু নেই, হয়তো বাজারে গেছে দুজনে। সেই নির্জন বাড়ীতে একা দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে কাঁদছে গোপা বাচ্চুর সামনে। দেখে দেখে বাচ্চুর ভেতরটা গলে যেতে থাকল মোমের মত। তার মনে হল মা বড় দুঃখী। মা চিরকাল ছবির মত গুছিয়ে রাখতে চেয়েছে সবকিছু। তার বাপিকে, তাকে, সবাইকে মনের মত করে সাজিয়ে রাখতে চেয়েছে, চিরকাল চেয়েছে এমনি কাঁচের জানলার ধারে বসে সবাই গোলাপের বাগানের দিকে চেয়ে থাকুক, কিন্তু তা কখনোই আর ঘটে উঠল না। বাপি রইল তার নিজের তৈরী করা জগতে, আর বাচ্চু সুযোগ পেলেই সব ছুঁড়ে ফেলে কোথাও উধাও হতে চায়। মায়ের সোনালী সব স্বপ্ন ভেঙে-চুরে যায় প্রতি মুহূর্তে এমনি করেই। তার মা আফশোষে অভিমানে নিজেকে নিয়ে ছেলেখেলা করে। বুকের ভেতর নিঃশ্বাস চেপে বাচ্চু নিজেই কাদামাটি মাখা জুতোটা খুলতে বসল।

গোয়েন্দাধাঁধা

তিনজন ছাত্র ॥ শার্লক হোমস ॥ স্যার আর্থার কোনান ডায়াল

শার্লক হোমস রেগেমেগে বলল—'আমার একদম সময় নেই।'

কিন্তু হিলটন সোমস নাছোড়বান্দা। কাঁদুনি গাইতে লাগলেন। আজ বাদে কাল পরীক্ষা। মোটা টাকার স্কলারশিপ। প্রশ্নপত্র যদি এখনি ফাঁস হয়ে যায়, কেলেঙ্কারীর শেষ থাকবে না। বাজে ছেলে স্কলারশিপ পটে নিয়ে যাবে, হিলটন সোমস তা হতে দেবেন না। শার্লক হোমস যখন রয়েছেন টাউনে, তখন পাজী ছেলেটাকে ধরে ফেলতে বেশী সময় লাগবে না।

ব্যাপারটা কী? খুবই গুরুতর। হিলটন সোমস যে কলেজে পড়ান, সেখান থেকে

[মো]টা টাকার স্কলারশিপ দেওয়া হয় ফি [বছ]র। কাল সেই পরীক্ষা। আজ প্রশ্নপত্র [এসে]ছিল ছাপাখানা থেকে বিকেল তিনটের [সম]য়ে।

প্রুফের কাগজগুলো যখন টেবিলের [ওপর], তখন ভারতীয় ছাত্র দৌলত রাম [সোম]সের ঘরে এসেছিল বটে। একই বাড়ীতে [থাকে]ন গুরু শিষ্যরা। নীচের তলায় সোমস। [দোত]লায় গিলক্রাইস্ট। ভালো ছাত্র, ভালো [খেলো]য়াড়। হীরের টুকরো ছেলে। তিন-[তলায়] দৌলত রাম। ইন্ডিয়ান, বুদ্ধিমান। [চারত]লায় মাইলস ম্যাকলারেন। দারুণ [মেধা]বী। কিন্তু ভীষণ ফাঁকিবাজ। সোমস [সন্দে]হ করছেন একেই।

প্রুফটা আসবার পর চা খেতে ঘণ্টা-[খা]নেকের জন্যে বেরিয়েছিলেন সোমস ঘরে চাবি দিয়ে। ফিরে এলেন পাশের গেট দিয়ে। এসে দেখলেন, দরজায় চাবি লাগানো রয়েছে। অবাক হলেন সোমস। বুঝলেন, তাঁর চাকর ব্যানিস্টার ভুল করে চাবি লাগিয়ে রেখেছে দরজায়।

চমকে উঠলেন ভেতরে ঢুকে। প্রশ্নের কাগজ তিনটের একটা টেবিলের ওপর, দ্বিতীয়টা মেঝের ওপর। তৃতীয়টা জানলার কাছে।

বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ, কেউ ঘরে ঢুকে প্রশ্ন দেখছিল। টেবিলের ওপর পেলেন একটা কাঠের পাতলা মিহি ধরনের কালো টুকরো, ...জানলার কাছে ছোট টেবিলের ওপর কতকগুলো পেন্সিল কাটা কুচো। বড় টেবিলের ঢাকনা লালরঙের চামড়ায় তিন ইঞ্চি চিরে গেছে। একটা ভাঙা শিসও পড়ে রয়েছে।

প্রথমে সন্দেহ হল ব্যানিস্টারকে। কিন্তু সে প্রশ্ন নিয়ে কি করবে? সোমস ডাক দিলেন তাকে। প্রশ্ন শুনেই সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল জানলার সামনে রাখা চেয়ারে।

সোমস বললেন সবই। ওপরতলার তিন শিষ্যের একজনের কীর্তি। তিনি বেরিয়ে যাওয়ার মিনিট কয়েকের মধ্যেই ঘরে ঢুকেছে। পড়ন্ত আলোয় কপি করতে সুবিধে হবে বলে জানলার সামনে টেবিলে নিয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি লিখতে গিয়ে পেন্সিলের শিস ভেঙে ফেলেছে। পেন্সিল কেটে নিয়েই ফের লিখতে বসেছে। পাজী ছেলেটাকে আজকেই ধরতে চান সোমস। কালকে তাকে পরীক্ষায় বসতে দেবেন না। নইলে গোটা পরীক্ষাটাই মুলতুবী রাখতে হবে। বলতে বলতে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়লেন হিলটন সোমস।

শার্লক হোমস-এর কৌতূহল ততক্ষণে জেগে উঠেছে। উঠে দাঁড়িয়ে কোট গায়ে দিয়ে বললে—'ব্যানিস্টার এখন কোথায়?'

'মুহ্যমানের মত বসে আছে দেখে চলে এসেছি। মিস্টার হোমস, আমাকে বাঁচান! কলেজের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখুন।'

'চলুন। কেসটা সত্যিই ইন্টারেস্টিং! এসো হে ওয়াটসন। একটু মাথার পরিশ্রম করে আসা যাক!'

হিলটন সোমস-এর বাড়ী গিয়েই এক কাণ্ড করল শার্লক হোমস। দরজার দিকে না গিয়ে ডিঙি মেরে জানলা দিয়ে উঁকি-ঝুঁকি মারতে লাগল ঘরের মধ্যে।

তাই দেখে হিলটন সোমস বললেন—'খামোকা সময় নষ্ট করছেন। জানলার একটা কাঁচই ভাঙা। মানুষ ঢুকতে পারে না ওখান দিয়ে।...'

'তাই নাকি! তাই নাকি! বলে অদ্ভুত ভাবে হেসে উঠল হোমস। নিজের মনেই বললে—সাবাস!

ঘরে ঢুকে ঝুঁকে পড়ল মেঝের ওপর। খুঁটিয়ে দেখল কার্পেট। নাঃ, পায়ের ছাপ-টাপ কিসসু নেই।

"মাথা ঘুরে যাওয়ার পর ব্যানিস্টার কোন চেয়ারে গিয়ে বসেছিল, মিস্টার সোমস?" শুধোলো হোমস।

জানলার পাশে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন সোমস।

'দেখি প্রুফের কাগজগুলো। বেশ, বেশ! একটা একটা কাগজ নিয়ে গিয়ে জানলার সামনে বসে টুকলিফাই করেছে ছোকরা। সেই সঙ্গে নজর রেখেছিল মেন গেটে—কিন্তু আপনি ফিরলেন পাশের গেট দিয়ে। আঙুলের ছাপ নেই। ভালো। একটা শিষও ভেঙেগেছে। দেখি পেন্সিল কাটা কাঠের কুচোগুলো। চমৎকার। মিস্টার সোমস, দেড় ইঞ্চি লম্বা একটা সফট পেন্সিল তিনজনের কার কাছে আছে খোঁজ করবেন? পেন্সিলের রং ঘন নীল, গায়ে রুপোলি হরফে মেকারের নাম লেখা আছে। একটা ভোঁতা ছুরিও খুঁজবেন।'

হাঁ হয়ে গেলেন হিলটন সোমস—'সব তো বুঝলাম। কিন্তু পেন্সিলটা যে দেড় ইঞ্চি লম্বা তা বুঝলেন কি করে।'

'খুব সহজ। ওয়াটসন, তুমিও মাথা ঘামাও। কাঠের কুচোগুলোয় কি লেখা রয়েছে? NN মানে কী? Johann Faber নামকরা পেন্সিল মেকার। NN হল Johann -এর অংশ। তার মানে পেন্সিলটা ইঞ্চি দেড়েক বাকী আছে আর।'

বনাতের কাটা দাগটা খুঁটিয়ে দেখল হোমস। তারপর ঢুকল পাশের শোবার ঘরে। এমনভাবে ঢুকল যেন ধাক্কা লাগতে পারে কারও সঙ্গে। আড়ষ্ট হয়ে গেল ভীষণ লম্বা দেহটা।

কিন্তু ঘরে কেউ নেই। আছে শুধু আর একটা তেকোণা মাটির ঢেলা—কাঠের গুঁড়ো লাগানো।

ব্যানিস্টারকে ডাকল হোম্‌স্‌। একথা সেকথার পর জানতে চাইল, ঘরে ঢুকেই সে দাঁড়িয়ে পড়েছিল দরজার কাছে। কিন্তু মাথা ঘুরে উঠতেই সবচেয়ে কাছের চেয়ারটায় না বসে দূরের ঐ চেয়ারটায় বসতে গেল কেন?

আমতা আমতা করতে লাগল ব্যানিস্টার। শার্লক হোমস এরপর ওপরতলার তিনজন ছাত্রের সঙ্গে দেখা করে এল। নানা অছিলায় দেড় ইঞ্চি লম্বা নীল পেন্সিল খুঁজল। গিলক্রাইস্ট আর দৌলতরামের ঘরে। পেল না।

সবচেয়ে খারাপ ব্যবহার করল মাইলস ম্যাকলারেন। ঘরে ঢুকতেই দিল না।

পরের দিন ভোর হতেই কলেজের খেলার মাঠে হাওয়া খেয়ে এল হোম্‌স। তারপর ওয়াটসনকে নিয়ে গেল সোম্‌সয়ের ঘরে। ব্যানিস্টারকে ডেকে বললে—'আমি সব জানি। খুলে বলো কাল কি হয়েছিল এ-ঘরে।

যেন আকাশ থেকে পড়ল ব্যানিস্টার। কিছুই জানে না সে। বলবে কী?

শার্লক হোমস তখন দরবার সাজিয়ে বসল। ব্যানিস্টারকে দাঁড় করিয়ে রাখল ঘরের কোণে। খবর পাঠানো হল গিলক্রাইস্টকে। ওয়াটসন আর সোম্‌স্‌কে নিয়ে বসল চেয়ারে।

গিলক্রাইস্ট ঘরে ঢুকতেই হোমস বললে—"বসুন। আপনার সব কীর্তি আমি জেনে ফেলেছি।"

ব্যানিস্টারের পানে চাইল গিলক্রাইস্ট। চোখে নীরব ভৎর্সনা।

তৎক্ষণাৎ প্রায় আর্তনাদ করে উঠল ব্যানিস্টার—"আমি বলি নি...আমি বলি নি।"

গিলক্রাইস্টকে সামনে দাঁড় করিয়ে শার্লক হোমস বর্ণনা করে গেল, কি-কি ঘটেছিল গতকাল বিকেলে। গিলক্রাইস্ট স্বীকার করল, হ্যাঁ, সব সত্যি। তবে পরীক্ষায় সে আর বসছে না। ব্যানিস্টার তার মন ঘুরিয়ে দিয়েছে। রোডেশিয়ার চাকরী নিয়ে সে চলে যাচ্ছে।

কিন্তু শার্লক হোমস জানল কি করে গিলক্রাইস্ট-ই অপরাধী এবং ব্যানিস্টার কাঁচা মিথ্যে বলছে?

আপনারা চিন্তা করুন কিছুক্ষণ, তারপর সূচীপত্র দেখে সমাধানের পাতায় মিলিয়ে নিন।

[উত্তর ৫৮ পৃষ্ঠা দেখুন]

[সমাধান : পৃষ্ঠা ৫৮]

—অদ্রীশ বর্ধন

বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। যাঁরা লেভি দিচ্ছেন না তাঁদেরও রেহাই দিলে চলবে না। হাস্কিং মেশিনের ক্ষেত্রেও লেভি প্রথা চালু করা হোক। চোরাচালান বন্ধে নেওয়া হোক কড়া ব্যবস্থা।

এদিকে যুব কংগ্রেসের তরফ থেকে শুরু হয়েছে মজুত উদ্ধার অভিযান। উল্টাডাঙ্গা এলাকায় হানা দিয়ে যুব কংগ্রেসের কর্মীরা আটক করেছেন এক লাখ বস্তা ডাল। কয়েকজন ব্যবসায়ীকে কোমরে দড়ি দিয়ে ঘোরাবার পর তাদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, মজুত উদ্ধার অভিযানে কারো পক্ষেই নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়া ঠিক হবে না। বে-আইনী মজুত উদ্ধারের কাজে পুলিশের সাহায্য নিয়ে এগোনোই হবে সঠিক পথ। কম্যুনিস্ট পার্টির উদ্যোগেও চলে প্রত্যক্ষ উদ্ধার অভিযান। এই অভিযান উপলক্ষে রাস্তা অবরোধ করার অভিযোগে কলকাতায় ৬৬ জন কম্যুনিস্ট নেতা ও কর্মী গ্রেপ্তার হন।

কাগজের অভাব

নানা অভাবের মধ্যে এই রাজ্যে কাগজের অভাবও একটা। একে তো আগুন দাম, তাতে মেলে না। মিললেও কালোবাজারে। পত্রপত্রিকার অবস্থা তো কাহিল, প্রকাশন ব্যবসাও রীতিমতো সংকটের মুখে। তবে সবচেয়ে অসুবিধেয় পড়েছে স্কুল-কলেজের ছাত্ররা। তাদের পাঠ্যপুস্তক ছাপা হচ্ছে না, লেখার কাগজও জুটছে না। কাগজ তৈরির কাঁচা মালের দাম চড়ছে, তাই কাগজের দামও আগুন। কাগজ প্রস্তুতকারকেরা বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন, বেশি দাম দিয়ে কাগজ কিনবেন না। কিন্তু ন্যায্য দামে মিলছে কই? স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তক বা লেখার কাগজের জন্যে মোট উৎপাদনের একটা অংশ পৃথক করে রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু সে খাতে যে পরিমাণ কাগজ মিলছে তাতে এই রাজ্যের চাহিদা মোটেই মেটে না। বই ছাপার কাজ যদিও চলে হাজার হাজার স্কুলের চাহিদা মেটাবার ব্যবস্থা মোটেই হবে না। অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী ছাত্র পরিষদের নেতাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে, ছাত্রদের প্রতি মাসে এক দিস্তে করে কাগজ যোগাবার ব্যবস্থা হচ্ছে; স্কুল থেকে কেরোসিন যোগাবার জন্যেও চেষ্টা হবে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে কেরোসিনের অভাবে পড়ুয়াদের খুবই অসুবিধে হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ছাত্র পরিষদ এবং ছাত্র ফেডারেশন কলকাতায় যে ছাত্র আন্দোলন করলেন তার একটা দাবি ছিল সস্তায় কাগজ ও কেরোসিন যোগাতে হবে।

বন্যা ও ত্রাণ

উত্তর বাংলায় আবার প্রবল বৃষ্টি এবং আবার বন্যা। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর আর মালদহ সর্বত্রই আবার বহু এলাকা জলের তলায়। সেই জুন থেকে চলেছে উত্তর বাংলায় বন্যার পালা। বৃষ্টি পড়ে, নদীর জল বাড়ে, দু কূল ছাপায়। তারপর বৃষ্টি কিছু দিন বন্ধ থাকে, নদীর জল কমে, লোকে রেহাই পায়। তারপর আবার আসে বন্যার পালা। এইভাবেই চলছে উত্তর বাংলার গত কয়েক মাস ধরে। আগস্ট মাসের শেষাশেষিই উত্তর বাংলার পাঁচটি জেলা আর মুর্শিদাবাদে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ন' লাখ। নতুন বন্যা আরো কিছু লোককে বিপদে ফেললো।

এই রাজ্যে বন্যার ধ্বংসলীলার দিকে দিল্লীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন রাজ্যের কংগ্রেসী এম পিরা। প্রধানমন্ত্রীর কাছে এক স্মারকলিপিতে তাঁরা অনুরোধ করেছেন, বন্যার (এবং খরার) ফলে রাজ্যের যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা সরেজমিনে দেখার জন্যে একটি কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দল পাঠানো হোক। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, এ-বছর বন্যার্তদের ত্রাণের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোনো সাহায্যই মিলছে না। ষষ্ঠ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রত্যেক রাজ্যকে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে কিছু বেশি টাকা দেওয়া হয়েছে। সেই টাকা থেকেই ত্রাণের কাজ চালিয়ে নিতে বলা হয়েছে। অর্থ কমিশনের মতে, ত্রাণের কাজে টাকা অপচয় না-করে বন্যা নিয়ন্ত্রণের পাকা ব্যবস্থা করাই ভালো। ভালো যে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সুপারিশ করা মাত্রই তা কাজে রূপায়িত করা তো সম্ভব নয়। তাই ত্রাণের দরকার আছেই। অথচ রাজ্য সরকারের হাতে এই খাতে আর টাকা নেই। সর্বশেষ সংবাদ, দিল্লী একটি সমীক্ষক দল পাঠাতে রাজি হয়েছে।

বাঘের পর হাতী

দক্ষিণ বাংলার 'সুন্দর' তার বাঘলীলা সম্বরণ করার পর এখন উত্তর বাংলার বুনো হাতী খবরের কাগজের শিরোনামায় ঠাঁই করে নিয়েছে। অবশ্য উত্তর বাংলায় বুনো হাতীর উপদ্রব একেবারে অভিনব ব্যাপার নয়। গত মাস কয়েক ধরেই ওরা ডুয়ার্স এলাকার মানুষের মনে ত্রাসের সঞ্চার করে চলেছে। আর ওদের তাণ্ডবের তুলনায় ঝড়খালিতে 'সুন্দরের' কাণ্ড-কারখানাকে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বলতে হয়। 'সুন্দরের' থাবার ঘায়ে যেখানে মাত্র একজন বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে, বুনো হাতীর হাতে (না পায়ে) সেখানে মারা গেছে অন্তত জন-বারো লোক। অবস্থা এমনই ঘোরালো হয়ে ওঠে যে, রাজ্য সরকারের বন-বিভাগ চারটি হাতীকে মেরে ফেলার হুকুম দেন। তার মধ্যে একটি মারা পড়েছে, আর একটি জখম। বন কেটে ক্রমাগত বসত করার ফলেই হাতীর পাল তাদের স্বাভাবিক বাসস্থান ছেড়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। তাছাড়া বনের মধ্যে তাদের খাবারও মিলছে না। কেউ কেউ বলছেন, বুনো হাতীর সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে, তাই তাদের মারার ব্যবস্থা করা উচিত। তবে সংখ্যা সত্যিই বাড়ছে কিনা বলা মুস্কিল। কারণ হাতীর সংখ্যা নির্ণয়ের কোনো চেষ্টাই আজ অবধি হয়নি। অনেকের মতে ওদের সংখ্যা বরং কমছে।

এদিকে 'সুন্দরের' মৃত্যুর কারণ এখনও সঠিকভাবে জানা যায়নি। এখন দাবি উঠেছে, 'সুন্দরের' মৃত্যুর কারণ খুঁজে বার করার জন্যে তদন্ত হোক। তবে সেই তদন্ত বিচার বিভাগীয় হতে হবে। এমন দাবি এখনও কেউ করেন নি।

৯।৯।৭৪ —দেবদত্ত

দেশে বিদেশে

সিকিমের নতুন মর্যাদা

আশ্রিত রাজ্য সিকিমকে ভারতের 'সহযোগী রাজ্যের' মর্যাদা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সংবিধানের ৩৬তম সংশোধন করা হয়েছে। সিকিম আইনসভায় গৃহীত প্রস্তাব ও সেদেশের মুখ্যমন্ত্রী কাজী লেনডুপ দোরজির অনুরোধে এই সংশোধন করা হয়েছে। সহযোগী রাজ্য হিসাবে সিকিম থেকে নির্বাচিত একজন প্রতিনিধি লোকসভার সদস্য হবেন এবং সিকিম আইনসভা থেকে নির্বাচিত আর একজন সদস্য রাজ্যসভায় স্থান পাবেন।

সংসদে এই সংশোধন প্রস্তাব আলোচনার সময় সংগঠন কংগ্রেস ও সি পি এম বাদে অন্য সব দলের সদস্যরাই এই প্রস্তাব সাধারণভাবে সমর্থন করেছেন। সংগঠন কংগ্রেস এই বলে আপত্তি করেছে যে এই সংশোধনের ফলে সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ভারতের সংগে সিকিমের সম্পর্ক সেদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হবে। ভারতের আইন সিকিমে প্রযোজ্য হবে না অথচ সিকিমের প্রতিনিধিরা ভারতের প্রতি প্রযোজ্য আইন রচনায় অংশগ্রহণ করবেন, এটাও একটা অসংগত ব্যাপার। সি পি এম-এর বক্তব্য: তাড়াহুড়ো করে এভাবে সিকিমকে ভারতের সংগে যুক্ত করে সিকিমের জনগণের অভিপ্রায়কে বিকৃত করা হচ্ছে। তারা ভারতের সংগে সিকিমের সংযুক্তি চাননি। ভারতের এই সিদ্ধান্ত এদেশের সমালোচকদের ভারতের বিরুদ্ধে 'হিটলারি মনোভাবের' অভিযোগ আনার সুযোগ করে দেবে এবং ক্ষুদ্র প্রতিবেশীদের ভারতের অভিসন্ধি সম্পর্কে সন্দিহান করে তুলবে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং কিন্তু আশ্বাস দিয়েছেন যে, সিকিম ভারতের 'সহযোগী রাজ্য হলেও তার স্বতন্ত্র সত্তা ক্ষুণ্ণ হবে না। সেদেশের জনগণের প্রতিনিধিদের ইচ্ছা অনুযায়ীই এটা করা হয়েছে এবং এর ফলে এই প্রতিবেশী রাজ্যের জনগণের সংগে ভারতের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হবে। সিকিমের নজির দেখিয়ে ভবিষ্যতে কাশ্মীর বা অন্য কোন রাজ্যও 'সহযোগী রাজ্যের' মর্যাদা দাবি করতে পারে এমন আশঙ্কা অমূলক বলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী উড়িয়ে দেন।

ভারতের এই সিদ্ধান্তকে চীন সুনজরে দেখেনি। সে এটাকে ভারতের সম্প্রসারণবাদী নীতির প্রকাশ হিসাবে দেখেছে। নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। সেখানে ভারতীয় দূতাবাস আক্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু নয়াদিল্লী প্রতিবাদ জানাবার পর নেপালের সুর নরম হয়েছে। নেপাল সরকার বলেছেন এ ব্যাপারটা তাঁরা সম্পূর্ণরূপে ভারত আর সিকিমের ব্যাপার হিসাবে গণ্য করছেন।

এদিকে, সিকিমের চোগিয়াল ভারতের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এভাবে সিকিমের স্বাতন্ত্র্য লোপ করার অধিকার ভারতের নেই। অপরপক্ষে রাজা জনগণের ইচ্ছার বিরোধিতা করছেন বলে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার দাবি তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী কাজী লেনডুপ দোরজি।

খরার সংকেত

মৌসুমী বৃষ্টিপাতের সর্বশেষ যে খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে আরও একবার খরায় আমাদের খরিফ ফসলের দারুণ ক্ষতি হবে। ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনাবৃষ্টি ও প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। লোকসভার অধিবেশনে সদস্যরা এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। শ্রীমধু দণ্ডবতে (সমাজতন্ত্রী) তাঁর নিজের রাজ্য মহারাষ্ট্রের অবস্থার প্রতি লোকসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, রাজ্যের চারটি অঞ্চলের মধ্যে তিনটি অঞ্চলই প্রচণ্ড খরার কবলে পড়েছে।
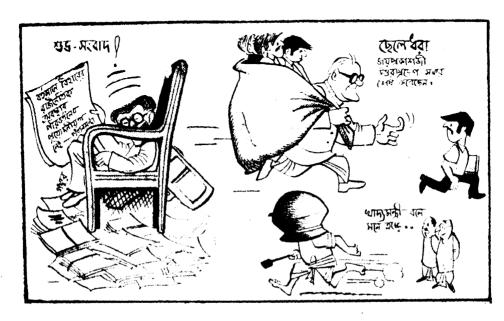
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ পাণ্ডে (জনসঙ্ঘ) বলেছেন, মধ্যপ্রদেশের ছত্তিশগড় অঞ্চলে দুর্গত মানুষ নিজেদের সন্তানদের বিক্রি করে দিচ্ছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। শ্রীহরিপ্রসাদ (কংগ্রেস) বলেছেন, রাজস্থানের ইতিহাসে এই প্রথম সারা রাজ্য খরার কবলে পড়েছে। শ্রীপ্রসন্নভাই মেহতা (সংগঠন কংগ্রেস) গুজরাটে পানীয় জল খাদ্যশস্য ও গবাদি পশুর খাদ্যের তীব্র অভাবের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, এই সমস্যা সমাধানে রাজ্য সরকারের যতটা তৎপর হওয়া উচিত ছিল ততটা তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না।

পশ্চিমবঙ্গের একদল সংসদ সদস্য ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে এই বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে, খাদ্যাভাব পশ্চিমবঙ্গকে একটা বিস্ফোরণের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে।

খাদ্য ও কৃষি বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী আন্নাসাহেব সিন্দে রাজ্যসভায় স্বীকার করেছেন যে বন্যা ও খরার ফলে অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমরা একটা বিপর্যয়ের কিনারায় এসে পড়েছি একথা মানতে তিনি রাজি নন। তিনি বলেন যে, এক পক্ষকালের মধ্যে বৃষ্টি হলেও স্বাভাবিক ফসল পাওয়া যাওয়ার আশা আছে।

সংসদের বর্ষা অধিবেশন

সংসদের এবারকার যে বর্ষা অধিবেশন সদ্য সমাপ্ত হল ঐ অধিবেশনে বিরোধী পক্ষ যে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করেছেন অতীতে আর কখনও তেমন হয়েছে কিনা সন্দেহ। বহু দলে বিভক্ত হয়েও ও ভোটের জোর খুব সামান্য হলেও বিরোধী পক্ষ সরকার পক্ষকে এবার বিশেষভাবে নাস্তানাবুদ করতে সমর্থ হয়েছেন। কার্যবিধি সংক্রান্ত প্রশ্ন তুলে তাঁরা একাধিক অর্থ বিল সাময়িকভাবে আটকে দিতে পেরেছেন। আর তাঁরা সবচেয়ে বেশি লড়েছেন লাইসেন্স কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত প্রশ্নে। পণ্ডিচেরীর সাতটি ফার্মকে আমদানি লাইসেন্স মঞ্জুর করার ব্যাপারে লোকসভার ২১ জন কংগ্রেস সদস্যের নাম জড়িয়ে যাওয়ার ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তদন্তের জন্য সংসদের সদস্যদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনের জন্য তাঁরা কক্ষের ভিতরে হতরকমভাবে সম্ভব চেষ্টা করেছেন। অধিকার রক্ষার প্রস্তাব মুলতুবি প্রস্তাব ও অনাস্থা প্রস্তাব তুলে স্পীকারের আসন ঘেরাও করে, সংসদের আলোচ্য বিষয়সূচী প্রণয়নের কমিটিতে অচলাবস্থার সৃষ্টি করে বিরোধী সদস্যরা এবার সংসদের অধিবেশনের শেষ দিকে প্রায় প্রতিদিনই প্রসঙ্গটি তুলে সংসদকে সরগরম করে রেখেছিলেন। বিরোধী সদস্যরা অবশ্য শেষ পর্যন্ত প্রসঙ্গটিকে সংসদীয় তদন্তের আওতায় আনতে সমর্থ হননি। কারণ সরকারের মতে যেহেতু বিষয়টি নিয়ে এখনও সি বি আই-এর তদন্ত চলছে সেহেতু এ সম্পর্কে সংসদের মাথা ঘামাবার সময় এখনও আসেনি। সরকারের এই মতই শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সংসদকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নেওয়া হয়েছে। তবে বিরোধী সদস্যরা সম্ভবত জনসাধারণের মনে এই ধারণার সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন যে লাইসেন্স কেলেঙ্কারির ব্যাপারে কিছু নোংরা জিনিস চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। কংগ্রেস দলের কিছু সদস্য যে প্রথমে সংসদীয় তদন্তের দাবিতে সামিল হয়ে পরে সরকারী মতে সায় দিতে বাধ্য হন এটাও আর চাপা থাকে নি বিরোধী সদস্যরা বিতর্কটিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার ফলে।

মোজাম্বিকে শ্বেতাঙ্গ বিদ্রোহ

পর্তুগাল ৺ তার আফ্রিকান উপনিবেশ মোজাম্বিককে স্বাধীনতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে এই উপনিবেশের সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। লুসাকা চুক্তি অনুযায়ী লিসবন সরকার মোজাম্বিকের মুক্তি সংস্থা ফ্রেলিমো-র হাতে ক্ষমতা অর্পণ করার যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন শ্বেতাঙ্গ বিদ্রোহীরা সেই সিদ্ধান্তের বিরোধী। তাঁরা বেতার কেন্দ্র দখল করেছেন ও জেল ভেঙে ২০০ বন্দী গোয়েন্দাকে মুক্তি দিয়েছেন। তাঁরা আফ্রিকার দুই সংখ্যালঘু-শ্বেতাঙ্গ-শাসিত দেশ রোডেশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার সমর্থন চেয়েছেন।

লিসবন সরকার এই দক্ষিণপন্থী বিদ্রোহ দমনের সংকল্প ঘোষণা করে জানিয়েছেন যে লুসাকা চুক্তি তাঁরা কখনই খেলাপ করবেন না।

৮।৯।৭৫ —পুণ্ডরীক

তুমি তাবৎ ভুবন ॥

শান্তিকুমার ঘোষ

তুমি তাবৎ ভুবন গড়তে-গড়তে বাতাসের মতো ব'য়ে চলেছ…
দেবতাদের শরীর থেকে বেরিয়ে-আসা তেজোরাশি একঠাঁই হ'য়ে
নিয়েছে জ্বলন্ত পাহাড়ের রূপ।

তোমার তৃণ একটি তুলে নিতে কি দহন করতে পারে—সাধ্য আছে কার;
উঁচু হিমালয়ে নৌবন্ধন ক'রে তুমি বাঁচিয়েছিলে প্লাবনের থেকে,
সেখানকার শরবনে নবজন্ম হ'ল আমাদের।

বলীয়ান হ'য়ে আমরা খেতি করেছি গাঁও বসিয়েছি পাথর কেটে
—পাহাড়ের গায়ে;

তুমি যেন হেনো না খর দৃষ্টি সে সবের উপর—
রাতের অন্ধকারে তুলে নিয়ো না শ্রেষ্ঠ ঘোড়া কি ঘুমন্ত সন্তানদের
—কত আর রোদন করাবে মানুষকে।

কতদিন ঘটেনি সাক্ষাৎকার ॥

অমিতাভ চক্রবর্তী

কতদিন ঘটেনি সাক্ষাৎকার
অথচ দেখা হওয়া আবশ্যক ছিল।
কেননা বর্ষার পর শরৎ
এবং সব শেষে শীত,
আমার আঙিনায় — জানালায়,
উধাও শূন্যতায়,
চুপি-চুপি পাইন্-বৃক্ষের অরণ্য দেখেছিল!

এখন মনে হয়, তুমি বন্ধ্যা বৃক্ষের মতন,
প্রতিবেশীর নব-জাতক সন্তানের প্রতি ঈর্ষা,
আর নিজের রক্তাক্ত নারীত্বের প্রতি ঘৃণায়
পুরুষ হৃদয়টাকে জড়িয়ে ধরা শিহরিত লতা—এক,
কিংবা রাত্রির শেষ প্রহরের বীভৎস চিৎকার!

বহুদিন পর এই সাক্ষাৎকার ঘটেছিল,
আকস্মিক যোগাযোগ, দৈবী ঘটনার সারিবদ্ধ বিজ্ঞাপন
সূর্যের মৃতদেহ দাহ-শেষে রাত্রির
মৃত্যুহীন হাহাকার!

ভালবাসা, নীল নক্ষত্র সিন্ধুর শরীরে ॥

অজয় সেন

এই সত্তর দশকেও তোমাকে বুঝি না, তাই অবুঝ আমি সারাদশক
হতচকিতের মত আছি; স্মৃতি যেন ফেটে পড়ে পুরনো বীজের মতো
ছড়িয়ে যায় চতুর্দিকে—ঐ নীল নক্ষত্রসিন্ধুর দিকে।

দেখে নাও তোমার থেকে সরাসরি কিভাবে সরে যেতে থাকি
শস্য বনরাজির দিকে
যেহেতু তুমি সবুজ প্রেমিকা আমার—ঐ জাহাজের মত
রহস্যময় ছিলে

তবু এই শেষ বসন্তে শিখিয়েছো হতগতি ছলচতুরতা আমাকে,
এই যূথবদ্ধ নীল পিটুলীগাছ আজও অলৌকিক সাক্ষী—

তোমারই সঙ্গে কিশোর সকালে ছিলো রঙীন প্রাতঃরাশ,
ঐ দেখ, হলুদ সর্ষে ক্ষেতে ওড়ে তোমার ভালবাসা
এই সাঁওতাল পরগণায়—আজ;

দক্ষিণের এই ঘরে তুমি থাকো, সারাদিন খোঁজো তামা ও বসন্তকাল
বোঝ কি? আরো এক উদ্‌ভ্রান্ত সকাল উড়ে যায় লালবারান্দার দিকে?
তোমারই জন্যে অবুঝ আমি, হারিয়েছি দিক-নির্দেশক
এই সত্তর দশকে।।

উপন্যাস

মনোজ বসু

[সোনাখাড়ি গ্রামের ভবনাথ ঘোষ আর দেবনাথ দুই ভাই। ভবনাথ বড়ো। অল্প বয়সে বাবা মা'রা যাওয়ার পর জ্ঞাতিদের চক্রান্তকে উপেক্ষা করে ভবনাথ সংসারের হাল টেনেছেন, ভাইকে মানুষ করেছেন। কলকাতা যাবেন দেবনাথ ছোট্ট আদালতে উকিল হওয়ার পরীক্ষা দিতে। সব ঠিকঠাক। যওয়া হোল না। পরে নায়েবীর চাকরী নিলেন বিদেশে এক জমিদারী সেরেস্তায়। পরে কর্মদক্ষতায় হলেন ম্যানেজার। সেই কৃতি ভাই দেবনাথ আট বেহারার পালকিতে সোনাখাড়ি ফিরল......।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এক বিকালে ঘনঘটা আকাশে। দেখতে দেখতে ঝড় উঠল। কাল বৈশাখী। যজ্ঞেশ্বরের ছেলে জল্লাদ ঐদিকে খেজুরতলি গাছের মাথায়, জল্লাদের সর্বক্ষণের সাথী দাও আছে কয়েকটা ডাল নিচে। কী ফলন ফলেছে এবার গাছটায়, ফলের ভারে ডাল ভেঙে পড়বার গতিক। ছিদ্র-করা শামুক জ্ঞাদের গাঁটে, কাগজের মোড়কে নুন। দো-ডালার উপর পা ছড়িয়ে জুত করে বসে কোঁচড়ের কাঁচা আম শামুকে কেটে কেটে নুন মাখিয়ে খাচ্ছে। লোভে লোভে চারি, সুরি পুঁটি আর পালেদের খুকি বেউলাতলায় ছুটে এলো। চারি তাহুন্দ খোসামোদ করছে জল্লাদকে : এত কষ্ট কেন করিস রে। ডালের উপর পা দিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে দে—আম তলায় পড়বে, বঁটিতে কেটে নুনে-ঝালে জারিয়ে এনে দেবো। একটিপ চিনিও দিতে হবে, চিনি না পালে গুড়। কীরকম তার হবে, দেখিস খেয়ে।

জল্লাদ দোনা-মোনা-আম-জারানো সত্যি সত্যি দেবে না ফাঁকি দিয়ে আম পাড়িয়ে নিচ্ছে? ভাবখানা বুঝে নিয়ে চারি বলে, দিয়ে দেখ। একদিনের দিন তো নয়—ফাঁকি দিলে কোনদিন কখনো আর দিসনে—

জল্লাদ দিত নিশ্চয় শেষপর্যন্ত—দেরি করে একটু মান কাড়াচ্ছিল। কোনকিছুর দরকার নেই, ঝড় উঠল কাউকে লাগবে না আর এখন। ঢিবঢাব করে আম পড়ছে এ-তলায়, সে-তলায় মেয়েগুলো ছুটোছুটি করে কুড়োচ্ছে। ধামা ঝুড়ি নিয়ে আরও সব অ ·-তলায় আসছে। চারি বুড়ো আঙুল আন্দোলিত করে জল্লাদকে দেখাচ্ছে : পেড়ে দিলিনে তো বয়ে গেল। এই কলা, এই কলা। আম-জারানো দেখিয়ে দেখিয়ে খাব, এক কুচিও দেবো না। চাইলেও না।

ডালপালা বিষম দুলছে। সুপারি-গাছগুলো এত নুয়ে পড়ছে—ভেঙেই পড়ে বুঝি-বা। পদা সড়াক করে ভুঁয়ে নেমে গেছে। জল্লাদের ভয়ডর নেই, নামবে কি—মজা পেয়ে গেছে, বেয়ে বেয়ে আরও উঁচুতে উঠছে। দোল খাবে। সুরির বয়স এদের মধ্যে বেশি, সে চেঁচামেচি করছে : নেমে আয় ওরে জল্লাদ, পড়ে থেঁতো হয়ে যাবি—

দৌড়ে দৌড়ে মেয়েগুলো এ-তলায় সে-তলায় আম কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। চুল বাঁধা হয়নি এলোচুল উড়ছে তাদের। আঁচলও উড়াচ্ছিল, বেড় দিয়ে কোমরে বেঁধে নিয়েছে। পাতা ঝুর ঝুর করে মাথায় ঝরছে পুষ্পবৃষ্টির মতন। দুম করে বেউলার পিঠে কে ঢিল মারল—উঁহু হু, কে মারল, কৈ? মেরেছে ঢিল নয় আম। পিঠ বাঁকাতে বাঁকাতে বেহুলা আমটা কুড়িয়ে নিল। কে মেরেছে—জল্লাদ ছাড়া কে আবার! ঘাড় তুলে নিরিখ করে দেখে, তা-ও নয়। মেরে যদি কেউ থাকে সে এই গাছ। জল্লাদ নয়। জল্লাদকে এখন নতুন খেলায় পেয়ে গেছে, উঠে যাচ্ছে সে উপরের মগডালে ফনফন করে। ঝড়ের সঙ্গে দুলবে। বটগাছে দড়ির মতন সরু সরু ঝুরি ঝোলে, তারই কয়েকটা গেরো দিয়ে দোলনা বানিয়ে নেয়। ঝুরির দোলনায় বসে একজনে দু-হাতে শক্ত করে ঝুরি ধরে, অন্যে দোল দেয়। এই আকাশে উঠে গেল, আবার এই নেমে এলো ভুঁয়ে। ঝড়ের মধ্যে কিন্তু ভারি সুবিধা, দোল দেবার মানুষ লাগে না। ঝড়ই সে কাজটা মহা বিক্রমে করছে। দে দোল, দে দোল—

তরাসে সুরি ওদিকে সমানে চেঁচাচ্ছে : পড়ে মরবি রে হতভাগা। নেমে আয়—

জল্লাদের দৃকপাত নেই, লম্বা একখানা ডাল জড়িয়ে ধরে আছে। ঘোর বেগে যেন ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে—মজাটা সেই রকম।

সুরি সকরুণ কণ্ঠে বসে নেমে আয় রে, ন্যাগেত্যা করছি। লকপকে ডাল ভেঙে পড়ল বলে। হাত-পা ভেঙে তুইও মারা পড়বি।

সুরির ছটফটানিতে ডালের উপর জল্লাদ হি-হি করে হাসছে। চেঁচিয়ে জবাব দিল : পড়লে তো পাতা সুদ্ধ ডাল ভেঙে নিয়ে পড়ব। তাতে লাগে না। দিব্যি যেন গদিতে শুয়ে নেমে এলাম, সেই রকম ঠেকে।

[illegible] আমেজার, তাই এরকম [illegible]। এমনি সময়ে যেগে বৃষ্টি [illegible]। [illegible] কি হবে, [illegible] নেই আর। চারজনে আবার [illegible] ভারি সুন্দর বেউলো। [illegible] করতে আসছে, পালাচ্ছে [illegible]। তারপরে কবলে পড়ে গেল, ধারা-বর্ষণ মাথার উপরে। ছুটেছে না আর, হাতে হাতে ধরে মনের সুখে ভিজতে ভিজতে যাচ্ছে। কথা বলছে কলকল করে—হাওয়ায় তক্ষুনি কথা উড়িয়ে নিয়ে যায়, একবর্ণ কানে পৌঁছয় না। যাও না বাড়ি? চুল ভিজিয়ে ফেলেছ, বকুনি কারে কয় বুঝবে আজ।

ঘোর হতে না হতে বৃষ্টি-বাতাস একেবারে থেমে গেল। কে বলবে, একটু আগে তোলপাড় করে তুলেছিল। পূব আকাশে খণ্ড চাঁদ দেখা দিয়েছে, ফিকে জ্যোৎস্নায় চারিদিক হাসছে। টপটপ করে গাছ থেকে ফোঁটা পড়ছে এখনো, চাঁদের আলো পড়ে ভিজে পাতা চিকচিক করছে। উঠোনে জল দাঁড়িয়ে গেছে। শিশুবর কোদালে খানিক খানিক মাটি সরিয়ে পথ করে দিল, জল বেরিয়ে গিয়ে উঠোন শুকনো।

অটলা কোথা রে?

আর এক মাহিন্দার অটলের খোঁজ নিচ্ছেন ভবনাথ: আমতলায় আলো ঘুরছে—অটলা বুঝি?

অনতিপরে হাতে লণ্ঠন কাঁধে ঝুড়ি অটল এসে রোয়াকে উঠল। চৌখুপি কাঁচের লন্ঠন, ভিতরে টেমি। ঝুড়ি ভরতি কাঁচা আম হড়াস করে ঢেলে দিয়ে ঝুড়ি খালাস করে নিল। আম ছড়িয়ে পড়ল। ভবনাথ হায় হায় করে উঠলেন: পাকা আম খেতে দেবে না আর এবার। সেই বোল হওয়া ইস্তক অপঘাত চলেছে। কুয়োয় জলে পড়ে গেল এক দফা, শিলাবৃষ্টিতে গুটি সব জখম করে দিয়ে গেল। যা বাকি ছিল মুড়িয়ে শেষ করল আজ।

উমাসুন্দরী কিন্তু খুশী। ডাকে বলছেন, সরষে কোটো এবারে ছোটবউ। ঠাকুরপো বাড়ি এসেছে, এদ্দিনের মধ্যে পাতে একটু কাসুন্দি পড়ল না। 'বউ সরষে কোট' বলে বলে পাখি তো মাথার ঝুঁটি নাড়িয়ে দিল। গাছের কাঁচা আম প্রাণ ধরে পাড়তে পারছিলাম না, আর তোমার ভাসুরও তাহলে রক্ষে রাখতেন না। কালবৈশাখী গোড়েঝেড়ে দিয়ে গেল।

পাখপাখালির ডাকে সকাল হয়। বেলা বাড়ে, কাজকর্মের মধ্যে পাখির ডাক কে আর শুনতে যাবে। এক রকমের ডাক কানে কিন্তু ঢুকবেই—এ ডাক বড় বেশি আজকাল। ছেলেপুলেরা পাখির সঙ্গে হুবহু সুর মিলিয়ে অনুকরণ করে: বউ সরষে কোট, বউ সরষে কোট। ডালপাতার মধ্যে অলক্ষ্য থেকে গৃহস্থবউদের পাখি মনে করিয়ে দিচ্ছে: আমের গুটি বেশ বড় হয়েছে, সরষে-কোটার সময় এখন। আমে পাক ধরলে এর পরে আর হবে না।

বিকালের দিকে রোজই আকাশে ছেঁড়া মেঘের আনাগোনা। মেঘ জমজমাট হয়ে চারিদিক আঁধার করে তোলে। ঝড় হয়, বৃষ্টি হয়। কাঁচা আম পড়ে, জামরুল পড়ে ডাঁই হয় তলায়। কলাবাগানে একটা অখণ্ড পাতা নেই শতচ্ছিন্ন হয়ে ডাঁটার গায়ে নাকড়ার ফালির মতন ওড়ে। শিলাবৃষ্টি হল একদিন—জলের মধ্যে ছুটোছুটি করে মেয়েগুলো শিল কুড়োচ্ছে। হাতে রাখতে পারে না, হাত হিম হয়ে আসে। কুড়িয়েই মুখে ফেলে, আর নয়তো আঁচলের কাপড়ে রাখে। একদিন এর মধ্যে বড় বেশ জোরালো রকম ঝড় হয়ে দেদার বাঁশগাছ ও সুপারিগাছ ফেলে গেল। চলছে এই। সারা দিনমান কড়া রোদ, আগুনের হলকা—সন্ধ্যার মুখে মাঝে মাঝে বৃষ্টি-বাতাস। আর সকাল হতে না হতে পোড়া পাখি গাছে গাছে চেঁচিয়ে মরছে: বউ সরষে কোট, বউ সরষে কোট।

বাড়ি বাড়ি সরষে কুটেছে, কাসুন্দি বানাচ্ছে। এ-ও এক পরব। এক দিন সকালে বাসি কাপড়চোপড় ছেড়ে গায়ে তুলসির জল ছিটিয়ে ঘোল আনা শুদ্ধাচারে চারজন এঁরা কাসুন্দির কাজে ঢেঁকিশালে এলেন। বড়গিন্নি উমাসুন্দরীকে মূল-কারিগর বলা যায়। অলকা-বউ পাড় দিচ্ছে—কুচি কুচি রাঙা সরষে ঢেঁকির গড়ে, তরংগিণী এলে দিচ্ছেন। কাঁচাআম চাকা চাকা করে কেটে আঁঠি ফেলে উমাসুন্দরী ধামায় করে নিয়ে এলেন। সরষে কোটা হয়ে গেল। তো আম কোটা এবারে। আরও সব জিনিসপত্র বিনো বয়ে বয়ে আনছে। হলুদবরণ নতুন তেঁতুল বীচি বের করে ভাঁড়ে করে রেখেছে সেই তেঁতুলের ভাঁড় একটা। বেঁটে সাইজের ছোট ছোট কাসুন্দির ঘট কুমোরেরা এই মরশুমে গড়ে, তাই গোটা আষ্টেক। হলুদগুঁড়ো, লংকাগুঁড়ো। পাথরের খোরা, পাথরের থালা, পিতলের কড়াই, পিতলের কলসিতে জল। বওয়া-বাঁয়ার কাজটা বিনো পারে ভাল। ঢেঁকিশালের চালের নিচে এই চারজন— বাইরের কেউ না উঠে পড়ে দেখো। অনাচার লাগবে। তেমন অবস্থায় কাসুন্দি, বিধবা কি সাত্ত্বিক লোকের পাতে দেওয়া যাবে না।

উমাসুন্দরী এক হাতে বানাচ্ছেন, আর তিনজনে জোগাড় দিচ্ছে। ঢেঁকিশালের উনুনে জল ফুটিয়ে দিল। ফুটন্ত জলে সরষে গুলে পরিমাণ মতো হলুদগুঁড়ো ও লংকাগুঁড়ো মিশিয়ে ঝালকাসুন্দি। তার সঙ্গে কোটা আম মিশাল দিলেন—হল আমকাসুন্দি। পুনশ্চ তার সঙ্গে তেঁতুল চটকে দিয়ে তেঁতুল-কাসুন্দি। মুখে বলছি, আর চট করে অমনি হয়ে গেল—অত সোজা নয়। উপকরণের কমবেশি এবং মাথার কায়দা-কৌশলের উপর কাসুন্দির ভালমন্দ। সব হাতে কাসুন্দি উতরায় না। এ বাবদে পুববাড়ির বড় গিন্নির নাম আছে, তাঁর মাখা কাসুন্দি সকলে তারিফ করে খায়। ব্যঞ্জনে মিশালে একেবারে নতুন স্বাদ। ঝালকাসুন্দি আম-কাসুন্দি বেশি দিন থাকে না, ছাতা ধরে যাবে। তেঁতুলকাসুন্দি ধীরে সুস্থে অনেক দিন ধরে খাওয়া চলবে, আত্মীয়-কুটুম্ব বাড়ি যাবে। আমকাসুন্দি ও তেঁতুলকাসুন্দি বড়গিন্নি ঠেসেঠেসে কয়েকটা ঘটে ভরলেন। বললেন, শিকেয় তুলেপেড়ে রাখো এগুলো। আট-দশ দিন অন্তর রোদে দিতে হবে, খেয়াল থাকে যেন। কাসুন্দি ঠিক রাখা চাট্টিখানি কথা নয়।

কাসুন্দি হচ্ছে দেখে নিমি-পুঁটি ডালা নিয়ে শাক তুলতে বেরিয়েছিল। খুঁটে খুঁটে একরাশ ডাঁটাশাক তুলে ফিরল। শাক-তেল-শাক হবে। শাক-ভাতের সঙ্গে ঝালকাসুন্দি জমে ভাল।

নতুন বাড়ির মেজ ঠাকরুন বিরাজবালা দেবনাথের কাছে নিমন্ত্রণ করতে এসেছে। দেবনাথকে নয়, যে দুজন বরকন্দাজ নিয়ে এসেছেন তাদের। বললেন, আমার ওখানে রেঁধে-বেড়ে খাবেন ওঁরা। আমি তো চিনি

দে তুমি বলে-কয়ে দাও ঠাকুরপো।

দেবনাথ হেসে বললেন, ওদের ভাগ্য খুলল, আর আমরাই বাদ পড়ে গেলাম বউঠান?

আছ তো জষ্ঠিমাস অবধি—বাদ কেন পড়বে ভাই। ও'দের তাড়াতাড়ি—কবে রওনা হয়ে পড়েন—
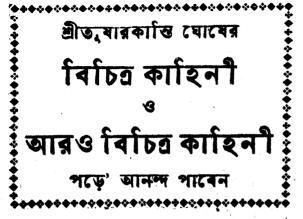
দেবনাথ বললেন, পরশু যাবে। বাংলাদেশের এ রকম গাঁ-গ্রাম দেখিনি কখনো। বললাম, কয়েকটা দিন থেকে যাও তবে। নয়তো আগেই চলে যেত।

মেজঠাকরুন ধরে পড়লেন: পরশু নয়, আরও একটা দিন থেকে যান। যাবেন তরশু। কাল দুপুরে একজনে খাবেন, আর একজনে পরশু। খাওয়া-দাওয়া সারা করে তার পরে পরশুও চলে যেতে পারেন. আমার অসুবিধে নেই।

দেবনাথ বলেন, পরশু কেন আবার? কালই একসঙ্গে দুজনার হয়ে যাক না।

উঁহু—বলে ঠাকরুন ঘাড় নেড়ে দিলেন: তা কেন হবে? এনেছ অবিশ্যি তোমার নিজের কাজে, আমি ফাঁকতালে দুটি বামুন পেয়ে গেলাম। পেয়েছি তো দু দিনের দায় সেরে নেবো। একসঙ্গে খাইয়ে দিলে তা এক দিনেরই কাজ হবে আমার।

দেবনাথের গোলমাল লাগছে। বললেন, বৃত্তান্তটা কি, খুলে বলো বউঠান।

এই বোশেখ মাস জুড়ে ব্রাহ্মণ-সেবা। নিত্যি দিন একটা করে তিরিশ দিনে তিরিশটা। এত বামুন পাই কোথা বলো দিকি। হতচ্ছাড়া গাঁয়ে ধানচালের আকাল নয়, বামুনের আকাল। তিন ঘর আছেন ওরা কুড়িয়ে-বাড়িয়ে কত আর হবেন। সেই ফুলবেড়ে গড়ভাঙা, রাজীবপুর অবধি নেমন্তন্ন পাঠিয়ে হাতে-পায়ে ধরে দুআনা দক্ষিণা কবুল করে আনতে হয়। না এনে উপায় নেই ঠাকুরপো, সংকল্প নিয়েছি—যেমন করে হোক চালিয়ে যেতে হবে।

দেবনাথ বসিয়ে দিলেন একেবারে: বরকন্দাজরা তো বামুন নয় বউঠান। একজন ছত্রি আর একজন গোয়ালা।

ঠাকরুন স্তম্ভিত। তারপর বললেন, তুমি মসকরা করছ ঠাকুরপো। চান করছিলেন, গলায় তখন এই মোটা পৈতে দেখেছি।

পৈতে তো আমাদের কায়স্থরাও কত জায়গায় নিচ্ছে। নাথমশায়রাও পৈতে ধারণ করেন। তাই বলে বামুন হয়ে গেল নাকি? হয়তো ভাল। তেমন বামুন মাসে তিরিশ কেন, তিনশজনকে ধরে ধরে খাওয়াও না।

বিরাজবালা সত্যি বিপদে পড়েছেন। বৈশাখী ভোজনের ব্রাহ্মণ জোটানো দিনকে দিন মুশকিল হয়ে উঠছে। হালের ছোকরারা ইস্কুল কলেজে পড়ছে—শোনা যায়, চুপিসারে শহরের হোটেলে ঢুকে মুরগি মারে, কিন্তু ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষায় গররাজি তারা—ভোজনান্তে হাত পেতে দুআনা দক্ষিণা নিতে ঘোর আপত্তি। ভোজন অবশ্য মেজঠাকরুনের বাড়িতে পোলাও-কালিয়া নয়, সাদামাটা ডাল-চচ্চড়ি-ভাত। বেওয়াবালাতি মানুষ পুণ্যের লোভ যোল আনা আছে, কিন্তু খরচার টানাটানি। তা সে যা-ই হোক, এই সোনাখড়ি গাঁয়ের তিন ব্রাহ্মণ বাড়িতে উপবীতধারী যতগুলি আছেন, সবাইকে এক একদিন করে খেয়ে যেতে হয়। আপত্তি করলে ঠাকরুন পা জড়িয়ে ধরবেন—একফোঁটা বালকেরও পা ধরতে বাধা নেই। বয়স কম হলেও ব্রহ্মণো কেউ খাটো যায় না—কেউটে সাপ বাচ্চা হলেও পুরোদস্তুর বিষ থাকে। ঠাকরুনের হাত এ-তাবত এড়াতে পারেনি কেউ—উঁহু, একবার কেবল, অনিল ভটচাজের বাপ দ্বারিক ভটচাজ মশায়ের বেলা। রাজি হয়ে গিয়ে দিনের দিন ভটচাজমশায় 'না' বলে বসলেন। কেন, কি বৃত্তান্ত? জ্বর হয়েছে কাল রাত্রে, নয়তো কেন আর যাব না বলো। যাচ্ছি তো ফি বছর। কিন্তু ফিবছর আর এ বছরে তফাত আছে, জানেন মেজঠাকরুন। অব্রাহ্মণের বাড়ি অন্নাহার চলবে না, সম্প্রতি কথা উঠেছে—দ্বারিক ঠাকুর হয়তো বা তার মধ্যে গিয়ে পড়েছেন। বিরাজবালাও সহজে ছাড়ার পাত্র নন, দপ করে দ্বারিকের পায়ের উপর আছড়ে পড়লেন: কি করি এখন ঠাকুরমশায়? আপনার কথা পেয়ে অন্য কাউকে নেমন্তন্ন করা হয়নি—ব্রত পণ্ড হয়ে যাবে। একহাতে দ্বারিকের পা জড়িয়ে রয়েছেন, অন্য হাত বুলিয়ে ভাল করে আন্দাজ নিচ্ছেন। ঈষৎ গরম বলে ঠেকে—হতেও পারে জ্বর। তারপরে দ্বারিক ভটচাজ 'ওঠো মা' বলে হাত ধরে তুলে দিলেন, তখন আর সন্দেহ রইল না। জ্বরই বটে, ঠাকুর ছুতো করেন নি। দীনু চক্কোত্তিকে ধরে পেড়ে সেদিনের কাজ সমাধা হল। কিন্তু মনে মনে মেজঠাকরুন শাসিয়ে গেলেন: ছাড়ছি নে ঠাকুর। জ্বর বসে বিছানায় কদিন পড়ে থাকতে পারো দেখি। বোশেখ শেষ হতে এখনো বাইশ দিন বাকি—ভোজনে না বসে যাবে কোথা?

তক্কে তক্কে রইলেন, ঘরের বার হলেই পা জড়িয়ে পড়বেন। কিন্তু কাজলায় পাওয়া গেল না, জরাবিকারে দ্বারিক মারা গেলেন বোশেখের ভিতরেই। আট তারিখ অসুখ করেছিল—তাঁর খাওয়ানোটা আগে সেরে রাখলেই ব্রাহ্মণ সেই বছর অন্তত ফাঁকি দিতে পারতেন না।

বৃদ্ধ দীনু চক্কোত্তি ভোজনে বসে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আর চারটে-পাঁচটা বছর পরে অসুবিধা থাকবে না কাকিমা, গ্রামের ভিতর থেকেই বিস্তর পাবে।

আঙুলের কর গুনে হিসাব করছেন: আমাদের হরি আর অতুল, ভটচাজবাড়ির রমশা নিমু আর গোবরা, আর চাটুজ্জেদের শ্যামাপদ এতগুলোর উপনয়ন হয়ে যাবে। ছয়-ছয়টা আনকোরা ব্রাহ্মণ গাঁয়ের মধ্যে। তারপরেও যা নাজাই থাকল, এত গ্রাম চুঁড়তে হবে না, শুধু এক রাজিবপুর থেকেই হয়ে যাবে।

বিরাজবালা কিন্তু ভরসা পান না। জন্ম যেমন ছয়টি পড়ছে, খরচাও এর মধ্যে কতগুলো হবে কে জানে। ঐ দ্বারিক ভট্টাচার্যের মতো! বয়স তোমারও কম হল না দীনু ঠাকুর—আরও পাঁচটা বছর তুমি নিজে টিকে থাকবে তো বটে!

রাজিবপুর বর্ধিষ্ণু গ্রাম, বিস্তর ঘর ব্রাহ্মণের বসতি। হলে হবে কি—বৈশাখ মাস সেখানেও, এবং নিত্যদিনের ব্রাহ্মণ-সেবী জনআষ্টেক অন্তত আছেন বিরাজবালার মতন। তার মধ্যে আবার চৌধুরী-

[illegible] রয়েছেন। [illegible] রাজিবপুর [illegible] হিসাবে মালিক [illegible] নতুন [illegible] সরকার জোতদারি করে দু হাতে রোজগার করছেন। চৌধুরিগিন্নি আর সরকারগিন্নিতে ঘোর পাল্লাপাল্লি। ইনি আজ কইমাছ খাওয়ালেন তো নির্ঘাত উনি কাল গলদাচিংড়ি খাওয়াচ্ছেন। ইনি পায়েস খাওয়ালেন তো উনি দই-রসগোল্লা। প্রতিযোগিতার দক্ষিণাও বেড়ে যাচ্ছে—দু আনা থেকে উঠতে উঠতে টাকায় পৌঁছে গেছে। এত মজা ছেড়ে রাজিবপুরবাসী কোন হতভাগা বামুন গ্রীষ্মের চড়া রোদের মধ্যে দু ক্রোশ পথ ঠেঙিয়ে সোনাখড়ি অবধি যেতে যাবে?

এই তো অবস্থা। দেবনাথের কথা শুনে মেজোঠাকরুন ঝিম হয়ে আছেন। বরকন্দাজ দুটো ফসকে গেল তবে—পৈতে সত্ত্বেও সত্যিকার-বামুন নয়। ডুবন্ত লোকের তৃণ চেপে ধরার মতন তবু একবার বললেন, মস্করা কোরো না ঠাকুরপো, কত আশা করে এসেছি আমি—

দেবনাথ বললেন, মিথ্যে বলে তোমার পুণ্যি বরবাদ করব, তাই কি ভাল হবে বউঠান?

আচ্ছা, কী জাত আমিই ওদের জিজ্ঞাসা করব—বলে আশাভঙ্গের আঘাতে মেজোঠাকরুন মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন।

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

তরুণ সাহিত্যিকদের সাহায্যের আহ্বান : নিঃ ভাঃ বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন-এর বারাণসী অধিবেশনে শ্রীতুষারকান্তির ভাষণ

গত ২৫ ও ২৬ আগস্ট পুণ্য বারাণসীতে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন-এর পরিচালক পরিষদের একটি অধিবেশন হয়ে গেছে। সম্মেলন-এর সভাপতি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ এই অধিবেশনে উদ্বোধনী ভাষণ দেন। আজকের দিনে তরুণ সাহিত্যসাধকগণ যে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, গভীর মমতার সঙ্গে তিনি সেদিকে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে : 'কাগজ ঘাটতির জন্য সবচেয়ে বেশী অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন নতুন সাহিত্যিকরা। সংবাদপত্রগুলি তথা সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকাগুলি এই তরুণ লেখকগণকে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও যথেষ্ট সাহায্য করতে পারছে না। অথচ এই তরুণ প্রতিভার বিকাশ না ঘটলে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির ধারাটি ব্যাহত হয়ে পড়বে, তাই শ্রীঘোষ বাংলা সাহিত্যকে এই সংকট থেকে রক্ষা করবার জন্য আহ্বান জানিয়ে বলেন যে, সাহিত্যকে যাঁরা ভালোবাসেন এমন অর্থসামর্থসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের উচিত তরুণ লেখকদের সাহায্য করা ও উৎসাহ দান করা, যাতে তাদের সাহিত্য প্রতিভার স্ফুরণ হতে পারে এবং মানব কল্যাণের কাজে তা লাগতে পারে।... তাঁরাই সংকটের হাত থেকে সাহিত্যকে বাঁচাতে পারেন।' এটি ছিল শ্রীঘোষের প্রথম প্রস্তাব। উপস্থিত সকলেই প্রস্তাবটি সমর্থন করেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে শ্রীঘোষ বলেন যে : 'বাংলা সাহিত্যের যে-সমস্ত পুরনো অথচ মূল্যবান পুস্তকাদি আছে সেগুলি উদ্ধার করে যেন সেগুলির পুনরমুদ্রণের ব্যবস্থা করা হয়।' এ প্রস্তাবটিও সকলের সমর্থন লাভ করে। তারপর তিনি তাঁর সাম্প্রতিক বৃটেন সফরের কথা আলোচনা করে বলেন যে, বৃটেনে যে সব বাঙালীরা বর্তমানে রয়েছেন তাঁরা সকলেই নানা প্রকার কাজকর্মে লিপ্ত। কিন্তু তারই মধ্যে তাঁরা যে রকম নিষ্ঠার সঙ্গে বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতির সেবা করে চলেছেন তা সত্যি প্রশংসনীয়।

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন-এর এই বারাণসী অধিবেশনের আহ্বায়ক ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য অধিবেশনে আগত গভর্নিং বডির সদস্যদের স্বাগত জানান। দুই দিনের এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীঘোষ। ত্রিপুরা সরকারের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন আগামী ২৬, ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর ত্রিপুরা রাজ্যেই অনুষ্ঠিত হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাংলার বাইরে যে সব বাঙালীরা রয়েছেন তাদের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে সাফল্যমন্ডিত করে তুলবার জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কলকাতা থেকে দক্ষিণারঞ্জন বসু, তমলুক থেকে বীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, লক্ষ্ণৌ-এর দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল, পাটনার বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং দিল্লীর শচীন্দ্রলাল ঘোষ সম্মেলনের বারাণসী অধিবেশনে যোগদান করে তাকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলেন। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মূর্ত প্রতীক মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহোদয় বহুকাল যাবৎ কাশীবাসী। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও বার্ধক্য হেতু তিনি ব্যক্তিগতভাবে সম্মেলনে যোগদান করতে পারেন নি। তবে এই উপলক্ষে লিখিত তাঁর একটি নিবন্ধ পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এই অধিবেশনে পাঠ করেন।

য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের ৮৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

আমাদের দেশে সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ইতিহাসে কলকাতা য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা সর্বজনস্বীকৃত। কলেজ স্কোয়ারের নিকটে এই সংস্থার প্রেক্ষাগৃহটি বক্তার ভূমিকায় কখনো দেখা গেছে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিম্বা রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকে আবার কখনো বা দেখা গেছে স্যার আশুতোষ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, শ্যামাপ্রসাদ ডঃ বিধানচন্দ্র, ডঃ রাধাকৃষ্ণণ এম এন রায় পন্ডিত জওহরলাল বা ভি কে কৃষ্ণমেননকে। এক কথায় বলা চলে যে এই প্রেক্ষাগৃহ বিগত কয়েক যুগ ধরেই প্রত্যেক যুগে সেই কালের শ্রেষ্ঠ কন্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছে। শিল্পী সাহিত্য সংস্কৃতি ও সামাজিক চেতনায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবার অনেক প্রচেষ্টার ইতিহাসই এর চার দেওয়ালের মধ্যে প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছে। তাছাড়া অসংখ্য সাহিত্য-সভা, নৃত্য-গীত অনুষ্ঠানের আয়োজনও এই প্রেক্ষাগৃহে আমরা হতে দেখেছি। বিগত ৩১ আগস্ট এই সংস্থার ৮৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর উদ্বোধন করেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী শংকর ঘোষ। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শংকরপ্রসাদ মিত্র এই অনুষ্ঠানে তাঁর ভাষণে সমগ্র জাতির স্বার্থে হতাশাগ্রস্ত ছাত্র সমাজকে সংহত ও সংগঠিত করবার জন্য দেশবাসীর নিকট আবেদন জানান। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে তাঁর ভাষণে শিক্ষাকে জীবনমুখী করার প্রচেষ্টায় য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট তার যথাযোগ্য দায়িত্ব পালন করবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

কলকাতার 'ইন্ডিয়ান মিউজিয়ম'-এর দুর্দিন

কলকাতার 'ইন্ডিয়ান মিউজিয়ম' ভারতে এই শ্রেণীর সংস্থাগুলির মধ্যে প্রাচীনতা ও সংগ্রহ-বৈচিত্র্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। শিল্প, প্রত্নতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব এই তিনটি প্রধান শাখায় বিভক্ত এই সুবৃহৎ সংস্থা স্বাধীনতার সময় পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এমন কি ভারতের বাইরে থেকেও প্রাচীন তথ্য সম্পর্কে আগ্রহী ব্যক্তিগণকে আকৃষ্ট করে এসেছে। এটা যথার্থভাবেই যাদুঘরের সুবর্ণ যুগ ছিল। নিত্যনতুন দুষ্প্রাপ্য বস্তুর সংগ্রহে ও সে-সবের সংরক্ষণে এ-সংস্থা বাস্তবিক পক্ষে গোটা এশিয়াতেই এই ধরনের সংস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকেই

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীন এই সংস্থাটির দুর্দিন সুরু হয় এবং বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি একটা দারুণ অর্থ-সংকটের মধ্যে এসে পড়েছে। ১৯৭২-৭৩ আর্থিক বৎসরে কলকাতার 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম' খরচপত্র বাবদ ৯-৬ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে লাভ করেছিল। ঠিক একই সময়ে দিল্লীর 'ন্যাশন্যাল মিউজিয়ম' পেয়েছিল ২২-৫ লক্ষ টাকা। যদিও রাজধানীর ঐ মিউজিয়মটি আয়তনে, সংগ্রহ-বৈচিত্র্যে এবং লোকজনের হিসেবে কলকাতার মিউজিয়মটি অপেক্ষা অনেক ছোট। এর প্রধান কারণ এই যে রাজধানীর মিউজিয়মের কর্মচারীবর্গের বেতনের হার (বিশেষ করে উচ্চপদস্থগণের) কলকাতার মিউজিয়মের কর্মচারীবর্গের তুলনায় অনেক বেশী। ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বৎসরে দিল্লী মিউজিয়ম পরিচালনার জন্য ২০-৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং এই সময়ে কলকাতার মিউজিয়মটির জন্য বরাদ্দ হয়েছে মাত্র এগারো লক্ষ টাকা। '৭৩-৭৪-এ নতুন সংগ্রহের জন্য পেয়েছে তিন লক্ষ টাকা, আর কলকাতা মাত্র ৫৬,০০০ টাকা। এই ধরনের অনাচারের মধ্যে বহুতর দুর্ভোগের বীজ নিহিত আছে বলেই কৃষ্টিবান ভারতীয় মাত্রেরই এ-সবের বিরুদ্ধে অবিলম্বে প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন।

সাহিত্যিক সরোজকুমারের স্মৃতি-তর্পণ

সরোজ সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে সম্প্রতি স্বর্গত সাহিত্যিক সরোজকুমার রায়-চৌধুরীর ৭৩তম জন্মতিথি পালন করা হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন ডঃ প্রতাপ-চন্দ্র চন্দ্র এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন জনপ্রিয় নাট্যকার মন্মথ রায়। সভার উদ্বোধনী ভাষণে কবি-সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেন যে, সরোজকুমার ছিলেন একজন ঐতিহ্যবাহী শিল্পী, তাঁর রচনাই তাঁকে চিরঞ্জীবী করে রাখবে।' মন্মথ রায় তাঁর ভাষণে সরোজকুমারের জীবন ও সাহিত্যের নানা উল্লেখনীয় দিকের উপর তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন। সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তী সরোজকুমারের সমস্ত রচনা শীঘ্র প্রকাশ করার উপর জোর দেন। 'বাংলা সাহিত্যে সরোজকুমার' শীর্ষক আলোচনার সূত্রপাত করেন লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী। ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ ও অসিত গুপ্তও এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

দুটি সাহিত্য পুরস্কার

সরোজকুমারের ৭৩তম জন্মতিথি অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শ্রীজ্যোতি-রিন্দ্র নন্দীকে তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাস 'প্রেমের চেয়ে বড়' রচনার জন্য 'সরোজ সাহিত্য পুরস্কার' প্রদান করা হয়। এই একই অনুষ্ঠানে নাট্যকার অরুণ মুখো-পাধ্যায়কে 'মারীচ সংবাদ' নাটকটি রচনা ও নির্দেশনার জন্য দেওয়া 'লক্ষ্মণ বন্দ্যো-পাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার'। দুটি পুরস্কারই ১৯৭৪ সালের জন্য দেওয়া হয়। পুরস্কার দুটি বিতরণ করেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও অরুণ মুখোপাধ্যায় তাঁদের সংক্ষিপ্ত ভাষণে পুরস্কারের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

'করবী' পত্রিকার উদ্যোগে কবি সম্মেলন

'করবী' পত্রিকার উদ্যোগে ১২নং কৃষ্ণ-পুর রোড, দমদমে সম্প্রতি এক কবি সম্মেলন হয়ে গেছে। এই সম্মেলনে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিরাম মুখো-পাধ্যায়, কল্যাণ সাহা, বিমলেন্দু চক্রবর্তী সুবোধ সাহা অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য কিরণ বাগচী সন্তোষ চক্রবর্তী প্রমুখ কবিগণ তাঁদের স্ব-রচিত কবিতা পাঠ করেন। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত লেখক মণি বাগচী।

শিশিরকুমার ইনস্টিটিউট

শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের নার্সিং ও ক্যাডেট বিভাগের ৩৬তম বার্ষিক উৎসব সম্প্রতি পালিত হয়েছে। এই উৎসবের প্রধান অতিথি ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামী নিখিলানন্দ তাঁর ভাষণে বলেন : 'বর্তমানে দেশের চারিদিকে যে বিশৃংখলা চলছে তার কারণ ভারত তার সংস্কৃতি হারাচ্ছে। ভারতের সংস্কৃতি, ত্যাগ ও ধর্মকে আজ আমরা নিজেরাই উপেক্ষা করে চলেছি। দেশকে আবার পুরাতন মর্যাদায় ফিরিয়ে আনতে হবে। ভারতের এই শাশ্বত আদর্শ সকলকে, বিশেষত আগামী দিনের মানুষকে শেখাতে হবে। তবেই আমরা উন্নতি করতে পারবো। এদেশে অনেক মহামানব জন্মেছেন। তাঁদের আদেশে আমরা নিশ্চয়ই আবার বড় হতে পারবো।' অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ বলেন : 'শিশিরকুমার ইনস্টিটিউট এমন একটি সংস্থা যাঁরা দীর্ঘকাল ধরে মানুষের সেবা করে আসছে। এঁদের একটা সেবার মনোভাব রয়েছে।' সংস্থার সভাপতি সুধীর বসু ইনস্টি-টিউটের আদর্শ ও ঐতিহ্য ব্যাখ্যা করে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে ইনস্টিটিউটের পৃষ্ঠপোষক সাহিত্যিক-সাংবাদিক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের ৭৫ বৎসর পদার্পণের জন্য অভিনন্দন জানানো হয়।

'খাসী' ভাষার সরকারী স্বীকৃতি লাভের সম্ভাবনা

'মেঘালয়' রাজ্যের পাঁচ লক্ষ মানুষের কথা ও লেখা ভাষা 'খাসী'র জন্য সরকারী স্বীকৃতি লাভের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। সাহিত্য আকাদেমী যে-কোনও ভাষার সরকারী স্বীকৃতির জন্য নিম্নরূপ শর্ত আরোপ করেছেন : (১) গঠনের দিক থেকে ভাষাটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কিনা, অর্থাৎ তার নিজস্ব লিপি ও ব্যাকরণ আছে কিনা, (২) যথেষ্ট সংখ্যক নরনারী ঐ ভাষায় কথা বলেন কিনা এবং সাহিত্যের বাহন হিসেবে ভাষাটির উপযোগিতা কতখানি; (৩) ভাষাটি যে রাজ্যের সেই রাজ্য সরকার তার স্বীকৃতি দিয়েছেন কিনা এবং কোনও বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্তৃক সেই ভাষাটিকে এককভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে কিনা; (৪) ভাষাটির ধারাবাহিক ইতিহাস আছে কিনা; (৫) ঐ ভাষাটি কিরূপ সংখ্যক ব্যক্তির কথ্য ভাষা তাও বিবেচনা করে দেখতে হবে। 'খাসী' ভাষা এ-সব কটি শর্তই পূরণ করতে সক্ষম বলে জানা গেছে। প্রসংগতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রথম 'খাসী' ভাষার স্বীকৃতি দেন—১৯১৯ সালে। নর্থ-ইস্টার্ণ হিল য়ুনিভা-র্সিটিও খাসী ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছে বলে জানা গেল। মেঘালয় বিধানসভার স্পীকার ও খাসী ভাষার সুপরিচিত লেখক অধ্যাপক আর এস লিংদ খাসী ভাষাকে পূর্ব ভারতের প্রাচীনতম ভাষাগুলির অন্যতম বলে দাবী করেছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে নর্থ-ইস্টার্ণ হিল য়ুনিভার্সিটি শীঘ্রই খাসী ভাষাকে স্নাতকোত্তর পাঠ্য-সূচীর বাহন হিসেবে স্বীকৃতি দেবেন। বি-এ শ্রেণী পর্যন্ত এ ভাষাকে তাঁরা পূর্বেই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। সাহিত্য আকাদেমী খাসী ভাষাকে অদূর ভবিষ্যতে স্বীকার করে নেবেন বলে অধ্যাপক লিংদ আশা প্রকাশ করেছেন।

—জরৎকার,
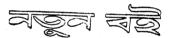
পরবাসে (উপন্যাস)—শংকর মিত্র। গৌতম-ধারা, ১০।১, জি টি রোড, হাওড়া-১। ছয় টাকা।

শ্রীশংকর মিত্র [illegible] কবি এবং একাধিক কবিতা গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ গ্রন্থের লেখক। 'পরবাসে' শ্রী মিত্রের সম্ভবত দ্বিতীয় উপন্যাস। এই উপন্যাসে লেখক কয়েকজন যুবক যুবতীর প্রেম, তার মনস্তত্ত্ব এবং তার সর্বাবয়ব জীবনকেন্দ্রিক সার্থকতা নিয়ে কিছু বক্তব্য রাখতে সচেষ্ট। নায়ক রত্নাকর, তার জীবনে আসে প্রধানত দুটি নারী—তীরু আর রিটা। তীরু রত্নাকরের গভীর গোপন ভালবাসার মনে এক মুক্তি, নীল পরিচ্ছন্ন আকাশ। রিটা তা নয়। তার আকর্ষণ দেহকে ভিত্তি করে আর এক ভালবাসার জগত। এই দ্বিমুখী ভালবাসার আকর্ষণ-বিকর্ষণে আসে নায়ক-নায়িকার পাপ পুণ্য বোধ, জীবন ও জীবনাতিশায়ী বোধের দিক শংকা, নির্জনতা, না-পাওয়ার স্মৃতি বিষণ্ণতা, হয়ত বা সবশেষে সূক্ষ্ম রোমান্টিক রোম-ন্থনের দিক। রত্নাকরের অসহায় বোধের পরিণতি, তীরুর বিবাহ, সন্তান-সন্ততির সংসার,—সমস্ত কিছুই যথার্থ উপন্যাস লেখকের শৈল্পিক ন্যায়বোধে নিয়ন্ত্রিত। 'পরবাসে' উপন্যাসটি শ্রীশংকর মিত্রের

বলিষ্ঠ শিল্প-মানসিকতার পরিচায়ক নিঃসন্দেহে।

নিরুপায় মনের আকাশ (উপন্যাস)। গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। রামায়ণী প্রকাশ ভবন, ১০৬।১, রাজা রামমোহন সরণী, কলকাতা-৯। ছ' টাকা।

শ্রীগৌরীশংকর ভট্টাচার্য এখন একজন প্রতিষ্ঠিত কথাসাহিত্যিক। তাঁর 'নিরুপায় মনের আকাশ' গ্রন্থটি বাস্তবিক অর্থে তাঁর পরিণত মন ও জীবন অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর দেয়। শ্রীভট্টাচার্যের শ্রমিক অঞ্চল ও জীবন নিয়ে লেখা 'ইস্পাতের স্বাক্ষর' আমরা পড়েছি, বাংলা সাহিত্যে তার একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে। 'নিরুপায় মনের আকাশ' সেই শ্রমিক জীবন, পরিবেশ এবং তারই মধ্যেকার এক অসহায় যুবতী নীপা রায়ের কাহিনী। এখানে শ্রমিক-জীবনের বিস্তৃত রূপের থেকে লেখক বরং এক অসহায় বঞ্চিতা শ্রমিক পরিবেশে বর্ধিতা নারীর মনের খবর দিয়েছেন। সে-খবর শ্রমিক-জীবনের প্রেক্ষিতেই দর্পণে বিম্বিত মুখের মত সত্য ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের আঙ্গিক একটি দীর্ঘ পত্রের—সে পত্রটিকেও লেখক কৌশলে অন্য এক অগ্রজ প্রতিষ্ঠিত লোককে লেখা চিঠির মত করে উল্লেখ করেছেন। আঞ্চলিক জীবন ও চরিত্র নিয়ে শ্রীভট্টাচার্য এ-উপন্যাসে যথেষ্ট দরদী ও শিল্পী-জনোচিত সহৃদয়তায় আন্তরিক। নীপা রায় যাকে ভালবাসত, তার কাকার বন্ধু অভিজাত এবং রেজিস্ট্রি করে বিয়েও করল, এই নীপা রায় আধুনিক যুগ-যন্ত্রণাকে প্রত্যক্ষ করায়। শ্রমিক-কন্যা নীপা রায়ের জীবনে অনেক পুরুষ আসে। শেষে অভিজাত মত পুরুষকে পেয়েও সনাতন ঐতিহ্যে বিশ্বাসী নারী-আত্মা সেখানেও ভয়ংকর শূন্যতা দেখে। নীপা রায় চরিত্র সৃষ্টি লেখকের পরিণত জীবন-উপলব্ধির দলিল।

বঙ্গ-চিত্রে—লেখক — পু-ল-দেশপাণ্ডে। প্রকাশক—প-ভ-কুলকারনী। পুণা বিদ্যার্থী গৃহ—প্রকাশন বিভাগ। ১৭৮৬ সদাশিব পেঠ। পুণা—পুণা—৪১১০৩০। দাম ২০ টাকা।

বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন বিখ্যাত মারাঠী সাহিত্যিক 'পু-ল' (পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ দেশপাণ্ডে) কয়েক বছর আগে পশ্চিম-বাংলাতে, বিশেষ করে শান্তিনিকেতনে বেশ কিছুকাল কাটান। উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষা রপ্ত করা, রবীন্দ্রনাথ, বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি আরও ভালভাবে জানা।

পশ্চিমবাংলা থেকে ফিরে এসে বম্বের প্রধান মারাঠী দৈনিক 'মহারাষ্ট্র টাইমস'-এর রবিবাসরীয় সংখ্যায়—'বঙ্গ-চিত্রে' নামে ২৪টি দীর্ঘ রচনা প্রকাশ করেন বঙ্গ সংস্কৃতি, সাহিত্য ভাষা ও বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে, বিচিত্র এক চিত্র তুলে ধরেন এই প্রবন্ধ-মালায়, তাঁর অনবদ্য স্টাইল ও হিউমার দিয়ে।

এইসব লেখা এখন পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত আকারে তাঁর নবতম পুস্তকে প্রকাশিত হল, বিগত ১৫ই আগস্ট। প্রকাশক—'পুণা বিদ্যার্থী গৃহ'—এক বিদ্যালয়ের প্রকাশন বিভাগ দ্বারা। এই পুস্তকের বিক্রী থেকে যা অর্থলাভ হবে, তা এই বিদ্যালয়ের জন্য ব্যয়িত হবে। সেইভাবে 'পু-ল' পুস্তক প্রকাশনার ভার বিদ্যালয়কে অর্পণ করেছেন।

শান্তিনিকেতনে বাংলা সাহিত্য চর্চা-কালে সুযোগ পেলেই, পু-ল ভ্রমণ করছেন আশেপাশের গ্রামাঞ্চলে, অন্যান্য জেলায়, কলকাতায়। তাঁর নানান সব অভিজ্ঞতা, বাঙ্গালী জীবন তিনি যেভাবে দেখেছেন সে-সব সম্বন্ধে নানান খুঁটিনাটি ছোটবড় সব বর্ণনা রয়েছে। পু-ল নিজে প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীতশিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ। এই কারণে বাংলায় পালাকীর্তন, যাত্রা বাউল গান ইত্যাদি সম্বন্ধে খুব সমঝদারীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন, যা পাঠকদের মুগ্ধ করবে।

পু-ল 'বঙ্গ-চিত্রে' মারাঠী পুস্তকটি উৎসর্গ করেছেন তাঁর বন্ধু অমৃতবাজার পত্রিকাগোষ্ঠীর বোম্বাই প্রতিনিধি সলিল ঘোষকে। নিজস্ব বাংলা হাতের লেখায় ব্লক করে উৎসর্গপত্রে পু-ল বলেছেন—'প্রিয় বন্ধু সলিল ঘোষকে যিনি আমার সঙ্গে না থাকলে আমার জীবনে আমি কখনও বঙ্গভাষা ও বঙ্গ সংস্কৃতির সঙ্গে অত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করতে পারতাম না। —পু-ল'।

এই বইটি বাংলায় অনুবাদ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সংকলন\পত্রিকা

ভাঙনের ডিঙা কিংবা হরিণের চোখ (গল্প সংকলন)—কৃষ্ণ মণ্ডল। প্রকাশ : একাল, ২৪, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলকাতা—৩৭। পাঁচ টাকা।

বেশী বড় নয়, ছোট ছোট তেরোটি গল্পের সংকলন গ্রন্থ হল কৃষ্ণ মণ্ডল রচিত 'ভাঙনের ডিঙা কিংবা হরিণের চোখ'। প্রতিষ্ঠা চেয়েছিল জীবনে যে রাজীবদা সেই রাজীবদার অন্তিম পরিণতি লেখক দেখিয়েছেন ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহননে। অস্তিত্বের সংকটকে কাব্যময় ভাষা ও উপমা প্রয়োগ করে চিত্রকল্পকে যথেষ্ট ব্যবহার করে আলোচ্য লেখক নামগল্পটি উপহার দিয়েছেন আমাদের। তত্ত্বের দিকে ঝোঁক বেশী। গদ্যে 'সাথে' ব্যবহার করে গদ্যকে অমার্জিত করেছেন বলে পড়তে খারাপ লাগে। তবু বর্তমান গল্পলেখকের যে কল্পনাশক্তি ও কাব্যিক মন আছে, তা তাঁর রচনার প্রতিশ্রুতি বলেই অন্য কয়েকটি রচনা বেশ ভাল লাগে।

শরৎচন্দ্রের ব্রহ্মদেশের জীবন

গোপালচন্দ্র রায়

(৪)

অজিতবাবু লিখেছেন— '১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে শরৎচন্দ্র তাঁহার বাল্যবন্ধু বিভূতিভূষণ ভট্টকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—বুঝিতে পারি যে আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব সকলেরই আমি ঘৃণার পাত্র।......জানি বিশ্বাসের কোন মূল্য আমি রাখি নাই। চিরপ্রবাসী, দুঃখী, কুৎসিত অচারী আমি কাহারো সম্মুখে বাহির হইতে পারিব না।......সাধু সাজিতেছি না ভাই—এত পঙ্কিল জীবনে সাধুত্বের ভান খাটিবে না।'

শরৎচন্দ্রের নিজের লেখা চিঠি থেকে অজিতবাবু এই যে অংশটা উদ্ধৃত করেছেন, এই উদ্ধৃত অংশটা নিয়ে আলোচনা করবার আগে, এই উদ্ধৃতির আগের ও পরের কিছু কিছু সহ চিঠিটা হল এইরূপ—

পরম কল্যাণীয় পুঁটুভায়া,

......এমনি অদৃষ্ট আমার যে এতদিন বোধহয় মাস চারেক কলিকাতায় থাকিয়াও তোমাদের দেখিতে পাইলাম না।......এখন মনে হইতেছে যে কোনদিন কোন কালেও দেখা হইবে কিনা! একবার আশুর সহিত ও একবার একাই তোমাদের বাড়িতে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলাম, কিন্তু কিরকম লজ্জা লজ্জা করিতে লাগল—আর গেলাম না।

পুঁটু বড় হতভাগ্য জীবন আমার। এমন অর্থহীন নিষ্ফল নীরস দিন মাস ও বৎসরের সমষ্টি যে কেন বহিয়া বেড়াইতেছি, কিছুতেই ভাবিয়া পাই না। ভগবান বাঁশি যদি দিয়াছিলেন, একটু সবুদ্ধি দিলেই ত পারিতেন। যদি না দিলেন ত এত ভালবাসিতে শিখাইয়াছিলেন কেন? ভালবাসিবার একটি মাত্র পাত্র আমাকে দিলেই কি এই বিশ্বরাজ্যে তাঁহার লোকের অভাব ঘটিত! জানি না কেমন বিচার!

বুঝিতে পারি যে আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলেরই আমি ঘৃণার পাত্র। এ বোঝা যে কত মর্মান্তিক তাহা বলিলে লোকে বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু পুঁটু, সবটাই কি আমার নিজের হাতে গড়া। আমার ঘাঁড়ি নীচে জল নাই, আমার তীরের মাথায় ফলা নাই, আমার নৌকায় হাল নাই—এমন 'সোজা চলিতেছি না' বলিয়া যে ধিক্কার দিয়া দুহাত দিয়া ঠেলিয়া দিতেছ, তাহার সবটাই কি আমার দোষে?......

বুড়ির সংবাদও পাই, মনে মনে কত যে আশীর্বাদ করি, কত গৌরব অনুভব করি তাহা আমিই জানি। সে যাহা লেখে একটুখানি অংশ আমি মনে মনে আদায় করিয়া নদীর ধারে জেটির উপর বসিয়া পরিপাক করি এবং কামনা করি যেন বাঁচিয়া থাকিয়া বিশেষ একটু ভাল জিনিষের স্বাদ গ্রহণ করিতে পারি।......

'আমার ইতিহাস একটু শুনিবে? মধ্যে এই রেঙ্গুনে দাম্পত্য-প্রেম চর্চা করিতে গিয়া হঠাৎ দেখিলাম পুরা গৃহী হইয়া পড়িয়াছি। দেড় বৎসরের মধ্যে সেই অসীম অগাধ প্রণয়ের তলা দেখি নাই।...যখন শুনিলাম তিনি রজক-কন্যা, তখন কান মলিয়া, এক হাত নাক-খত দিয়া ঐরাবতীতে স্নান করিয়া আসিলাম।......মাস দুই মদ খাই নি। আর যদি না খাই তো শরীর বেশ সারিয়া যাইবে।'

এই চিঠির মধ্যে—এত ভালবাসিতে শিখাইয়াছিলেন কেন? সোজা চলিতেছি না বলিয়া সবটাই কি আমার দোষে? ইত্যাদি এই যে কথাগুলো আছে, এ থেকে বোঝা যায় শরৎচন্দ্র তাঁর প্রথম জীবনের এক ভালবাসার পাত্রীর কথা বলেছেন এবং সে ভালবাসায় তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। বিভূতিবাবু এসব কথাই জানতেন। আমার 'শরৎচন্দ্র' ১ম খণ্ড—গ্রন্থের 'একটি হৃদয় দৌর্বল্যের কাহিনী' অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে আমি বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

গিরীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন—'গলির ভিতর একটি পুরাতন কাঠের বাড়ীতে শরৎচন্দ্র বাস করিতেন। এই পল্লীর বাঙ্গালী মিস্ত্রীরা বহুকাল হইতে এখানে বাস করে। উহাদের সকলেরই বিবাহিত স্ত্রী সঙ্গে না থাকিলেও, এখানে আপোষের মধ্যে বিবাহাদির আদান-প্রদান করিয়া সপরিবারে বসবাস করে। চট্টগ্রামবাসী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণ এই সকল বিবাহে পৌরোহিত্য করিত।'

মিস্ত্রী পল্লীতে যুবক-যুবতীদের মধ্যে এই যে 'আপোষে' বিবাহ হত এই বিবাহে জাতি ও কুলের খুঁটিনাটি খোঁজ বড় একটা কেউ করত না। আবার অনেক জাত ভাঁড়িয়ে নিজেকে উঁচু জাতের বলেও পরিচয় দিত। শরৎচন্দ্র মিস্ত্রীপল্লীতে থাকাকালে এইরূপ আপোষেই হয়ত বিয়ে করেছিলেন এবং পরে জেনেছিলেন তাঁর বধূটি রজককন্যা।

শরৎচন্দ্র ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে একজামিনার পাবলিক ওয়ার্কস্ একাউন্টস অফিসে চাকরি পান। চাকরি পেয়ে তিনি প্রথমে ডেপুটি একজামিনার এম কে মিত্রের বাড়ীতে কিছুদিন থাকেন। তারপর সেখান থেকে বন্ধু বঙ্গচন্দ্র দে-র মেস থেকে যান ঐ মিস্ত্রীপল্লীতে।

এম কে মিত্রের বাড়িতে এবং বঙ্গচন্দ্র দের মেসে শরৎচন্দ্রের অবস্থানকালটাকে অল্পদিন বলে ধরলে এবং মিস্ত্রীপল্লীতে যাবার কিছুদিন পরেই 'দাম্পত্য-প্রেম চর্চা' আরম্ভ করলে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর অক্টোবর পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের দাম্পত্য প্রেম চর্চায় দেড় বৎসরটা পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্রের চিঠির কথাকে সত্য বলে ধরলে দেখা যায় ঐ আঠার-মাসব্যাপী দাম্পত্যপ্রেম চর্চায় তিনি অসীম, অগাধ প্রণয়ের কোনদিন তলা দেখেন নাই। অতএব, বলা যেতে পারে এত গভীর দাম্পত্য-প্রেমের মধ্যে সপ্তাহে চারদিন করে বেশ্যাবাড়ীতে গিয়ে নিয়মিত পড়ে থাকার কথা আসতেই পারে না।

শরৎচন্দ্রকে অতিমাত্রায় বেশ্যাসক্ত দেখাবার জন্য অজিতবাবু তাঁর সমর্থনে শরৎচন্দ্রের যে সময়কার লেখা এই চিঠিটা উদ্ধৃত করেছেন, সেই সময়ের হিসাব ধরেও বলা যেতে পারে, শরৎচন্দ্র তখন কি একথা ভাবেন নি—এইভাবে অফিস কামাই করে বেশ্যাবাড়ীতে নিয়মিত পড়ে থাকলে উপরওয়ালা ও উপকারী বন্ধু এম কে মিত্রের কাছে মুখ দেখাবেন কি করে? আর অত কামাই করলে তাঁর নতুন চাকরিই বা থাকবে কি করে?

শরৎচন্দ্রের এই চিঠি থেকে তাঁর নিজের বলা যে দুটো কথার উপর অজিতবাবু জোর দিয়েছেন, তাহল ঐ 'কুৎসিত আচারী' ও 'পঙ্কিল-জীবন'।

কুৎসিত-অচারী ও পঙ্কিল-জীবন বললেই তাঁকে অতিরিক্ত বেশ্যাসক্ত হতে হবে

তাই বা কে বললে? মদ্য পান করা এবং রজককন্যাকে নিয়ে 'দাম্পত্য-প্রেমচর্চা' করা এও ত হতে পারে।

অতএব অজিতবাবু যে বলেছেন বেশ্যা-সক্ত মিস্ত্রীদের সংগে মিশে শরৎচন্দ্রও অতি-মাত্রায় বেশ্যাসক্ত হয়ে বেশ্যাবাড়ীতে পড়ে থাকতেন একথা অসত্য।

অজিতবাবু লিখেছেন—'কানাই ঘোষের 'শরৎচন্দ্র' নামক বইতে শরৎচন্দ্রের বিচিত্র পতিতা সংসর্গের চমকপ্রদ বর্ণনা রহিয়াছে। কানাই ঘোষ লিখিয়াছেন—'মাসের মাহিনা হাতে পেলেই বন্ধুদের সঙ্গে পাড়ি দিতেন একটু আধটু আনন্দ লাভের আশায়। নির্দিষ্ট স্থানের কোন সীমা ছিল না, যখন যেখানে খুশী দল বেঁধে যেতেন, হৈ-চৈ করে রাত কাটিয়ে দিয়ে আসতেন বাসায়।'

অজিতবাবু ব্রজেনবাবুর বর্ণিত শরৎ-চন্দ্রের পেগুর জীবনের একটা ভুল কথা নিয়ে তাকে শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনে মিস্ত্রীপল্লীর জীবন পর্যন্তও টেনে এনে বলেছেন—শরৎচন্দ্র প্রতি সপ্তাহে ৪ দিন অফিস কামাই করে নিয়মিত পতিতালয়ে কাটাতেন।

এখানে অজিতবাবু শরৎচন্দ্রকে 'অতি-মাত্রায় বেশ্যাসক্ত' দেখাবার জন্য তাঁর সমর্থনে কানাইবাবুর যে লেখাটা উদ্ধৃত করেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে—শরৎচন্দ্র প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত চারদিন নয়, মাসের প্রথমে মাত্র একবার 'আনন্দ লাভের আশায় পাড়ি দিতেন'।

কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, শরৎচন্দ্র অপেক্ষা বয়সে প্রায় পঞ্চাশ বছরের ছোট কানাই ঘোষ কলকাতায় বসে শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের জীবন সম্বন্ধে এই কথাই বা জানলেন কি করে? তিনি শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের বন্ধুদের কাছে শুনে একথা লেখেন নি। একথা তাঁর নিজেরই মনগড়া। তাই কানাইবাবুর বইয়ে দেখি, শরৎচন্দ্রের দূর ব্রহ্মপ্রবাসের কথা ত দূরের কথা, শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ফেরার পরে যাজে শিবপুরে যখন ছিলেন, তখনকারই কথা লিখতে গিয়েও তিনি কত অদ্ভুত আজগুবি কাহিনী রচনা করেছেন। যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি। কানাইবাবু লিখেছেন—

শরৎচন্দ্রের আগ্রহে, শিবপুরের নীল-রতন মুখোপাধ্যায়, অনুরূপনারায়ণ চট্টো-পাধ্যায় প্রভৃতির উদ্যোগে একবার শিবপুরে রবীন্দ্র জন্মোৎসব হয়। সেই উৎসবে রবীন্দ্রনাথ নিজে গিয়ে সারারাত ধরে লক্ষ্ণৌ থেকে আনা এক বাঈজীর নাচ দেখেছিলেন। সেই বাঈজীর নাচে তবলা বাজিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। পরের দিন বিকালে রবীন্দ্রনাথ নিজে সভায় এসরাজ বাজিয়ে শোনান। এসরাজ বাজানোর পর তিনি শরৎচন্দ্রকে বলেন—এ রসে বোধকরি তুমি বঞ্চিত?

'শরৎচন্দ্রের মিষ্ট মধুর হেসে বললেন—এ অভাগার কিছুতে বঞ্চনা নেই ভারতী। ......অনুরূপ এক নম্বর একস এক্‌টু এনে দাও তো।

অনুরূপ কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এলেন। তিনি সেটুকু গলাধঃকরণ করে এসরাজ কোলে তুলে নিলেন। ঘরটা মূর্ছনায় ভরে উঠল। বহুক্ষণ পরে শরৎ-চন্দ্র সেতারখানা থামিয়ে রাখলেন। কিন্তু শ্রোতৃবর্গের কারও তখনও চমক ভাঙে নি।

ভারতীর তন্ময়তা কাটল বহুক্ষণ পরে। তিনি শরৎচন্দ্রের হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন—সত্যই তুমি সরস্বতীর বরপুত্রই বটে।'

কানাইবাবুর বর্ণিত এই কাহিনীটি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই—'রবীন্দ্রনাথ নিজের জন্মোৎসব সভায় গিয়ে সারারাত ধরে বাঈজীর নাচ দেখলেন এবং পরের দিনও লোকে বিকালে সভায় এসরাজ বাজালেন, আর শরৎচন্দ্রও রবীন্দ্রনাথের সামনে বসে মদ খেলেন—এসব কথা কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোকই বিশ্বাস করবেন না। তাছাড়া রবীন্দ্র জন্মোৎসবের এই কাহিনীটা সত্য কিনা এ সম্বন্ধে এই কাহিনীর নীল-রতনবাবু ও অনুরূপবাবুকে আমি জিজ্ঞাসাও করেছিলাম। তাঁরা বলেছেন—এ কাহিনী সম্পূর্ণ মিথ্যা। এরূপ কোন সভাই হয়নি।

অজিতবাবু নিজ পক্ষ সমর্থনে এহেন বই থেকে যে কি করে উদ্ধৃতি দিলেন সেইটাই আশ্চর্য।

অজিতবাবু লিখেছেন— শরৎচন্দ্রের ব্রহ্মদেশীয় জীবননাট্যের সমাপ্তিকালে রচিত শ্রীকান্তের প্রথম পর্বে শ্রীকান্তের মাধ্যমে শরৎচন্দ্রেরই আত্মকথা অনেকাংশে বিবৃত হইয়াছে। শ্রীকান্ত বলিয়াছে 'আত্মীয় অনাত্মীয় সকলের মুখে শুধু একটানা ছি ছি শুনিয়া নিজেও নিজের জীবনটাকে একটা মস্ত ছি ছি-ছি ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারি নাই।'

শরৎচন্দ্র আত্মীয়স্বজনদের কাছে লাঞ্ছনা কুড়াইয়াছিলেন এবং তাঁহার নিজের স্বীকারোক্তিতেই পরিস্ফুট হইয়াছে যে এই নিন্দা ও লাঞ্ছনা তিনি নিজের প্রকৃতি ও আচরণের দ্বারা অর্জন করিয়াছিলেন।'

শ্রীকান্তকে শরৎচন্দ্র ধরেই নিচ্ছি, অজিতবাবু যে বললেন শরৎচন্দ্র স্বীকারোক্তি করেছেন নিজের প্রকৃতি ও আচরণের দ্বারা আত্মীয়-স্বজনের নিন্দা ও লাঞ্ছনা কুড়াইয়াছিলেন, শরৎচন্দ্রের সেকথা এখানে কই? শরৎচন্দ্র ত শুধু বলেছেন—অনবরত মুখে ছি-ছি শুনে নিজেও নিজের জীবনটাকে ছি-ছি ভেবেছি।

আপনের মধ্যে এই ছি ছি-র মধ্যে নিন্দা থাকতে পারে কিন্তু লাঞ্ছনা ত নাও থাকতে পারে। আর তাছাড়া অজিতবাবু নিজের প্রয়োজনে শ্রীকান্ত থেকে যে বাক্যটা উদ্ধৃত করে এই ছি ছি-র কথা দেখিয়েছেন, ঐ বাক্যের ঠিক পরের বাক্যটিতেই ত অজিত-বাবুর বর্ণিত শরৎচন্দ্রের 'স্বীকারোক্তি'

উক্তো স্বীকারোক্তি দেখাচ্ছি। সেই বাক্যটা এই—

'কিন্তু কি করিয়া যে জীবনের এই সুদীর্ঘ ছি-ছির ভূমিকা চিহ্নিত হইয়া গিয়াছিল, বহু কালান্তরে আজ সেইসব স্মৃতি ও বিস্মৃত কাহিনীর মালা গাঁথিতে বসিয়া যেন হঠাৎ সন্দেহ হইতেছে, এই ছি-ছিটা যতবড় করিয়া সবাই দেখাইয়াছে, হয়ত ঠিক তত বড়ই ছিল না।'

শরৎচন্দ্রের (শ্রীকান্তের) এই স্বীকারোক্তি থেকে দেখা যাচ্ছে—শরৎচন্দ্র অতিরিক্ত বেশ্যাসক্ত ছিলেন এবং সেজন্য তাঁর আত্মীয়স্বজনরাও তাঁকে নিন্দা ও ঘৃণা করত --অজিতবাবুর এই মনগড়া উক্তির কোন কথাই তাঁর 'শ্রীকান্ত' থেকে উদ্ধৃত উদাহরণের মধ্যে কোথাও নেই।

আত্মীয়-স্বজনরা শ্রীকান্তকে কেন যে ছি-ছি করত তারও যেন একটা আভাস পাই, শ্রীকান্ত'র ঐ অংশেই। শরৎচন্দ্র লিখেছেন—'মনে হইতেছে, হয়ত ভগবান যাহাকে তাঁহার বিচিত্র সৃষ্টির ঠিক মাঝখানটিতে টান দেন, তাহাকে ভাল ছেলে হইয়া এক-জামিন পাশ করিবার সুবিধাও দেন নাই। বুদ্ধি হয়ত তাহাদের কিছু দেন, কিন্তু বিষয়ী লোকেরা তাহাকে সুবুদ্ধি বলে না।'......

এ থেকে বরং বলা যেতে পারে—ভাল ছেলে হয়ে একজামিনে পাস না করা এবং বিষয়ী লোকের মত সুবুদ্ধি অর্জন করতে না পারার জন্যই আত্মীয়রা ছি-ছি করত। ভগবান তাঁর বিচিত্র সৃষ্টির ঠিক মাঝখানটিতে টেনেছিলেন বলেই তিনি এসব গ্রাহ্যও করেন নি। অতএব অজিতবাবু শরৎচন্দ্রকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন, তা না হয়ে বরং দেখা গেল শরৎচন্দ্র ভগবানের ইচ্ছাতেই, আত্মভোলা, অবিষয়ী হয়েছিলেন।

এখন আর একটা কথা, শ্রীকান্তের ১ম পর্বে শরৎচন্দ্রের নিজের জীবন অনেকাংশে আছে বলে, অজিতবাবু যে ঐ ছি-ছির উপর এতটা জোর দিয়ে শরৎচন্দ্রের স্বীকারোক্তি বলেছেন—এটা শরৎচন্দ্রের নিজ জীবনের স্বীকারোক্তিই বা হতে যাবে কেন?

শ্রীকান্তের প্রথমেই ত শরৎচন্দ্র লিখেছেন—আমার এই ভবঘুরে জীবনের অপরাহ্ন বেলায় দাঁড়াইয়া ইহারই একটা অধ্যায় বলিতে বসিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে।

'ভারতবর্ষে' শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত যখন প্রথম বেরোয় তখন সত্যই কি শরৎচন্দ্রের জীবনের অপরাহ্ন বেলা ছিল? তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৩৯ বছর।

শরৎচন্দ্র অনেক সময় বুড়ো হওয়ার আগেই নিজেকে বুড়ো বলতেন, জানি—কিন্তু সেও ত মিথ্যা বলা।

আরও একটা কথা। শ্রীকান্তের প্রথমের ঐ ছি-ছিটা উপন্যাসের ভূমিকা বা আরম্ভে বানানো অমনিই একটা কথার কথাও ত হতে পারে। এ সম্বন্ধে একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

শ্রীকান্তে শরৎচন্দ্রের নিজের জীবন কতটা আছে, কবি কালিদাস রায়ের এই প্রশ্নের উত্তরে শরৎচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন—'তা কিছু আছে বৈকি। তবে উপন্যাসে বর্ণিত কোন একটি সময়ের ঘটনাই যে আমারও জীবনের সেই একটা সময়েরই ঘটনা তা নয়। জীবনের বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা খণ্ড খণ্ড অনেক ঘটনাকেই লিখবার সময় এক সময়ের একটি সম্পূর্ণ ঘটনা করে লিখেছি। কোন কাহিনী বা ঘটনাকে সাহিত্যের পর্যায়ে আনতে গেলে, তাকে হয় কল্পনা দিয়ে নয়ত অন্যান্য খণ্ড খণ্ড ঘটনা বা কাহিনী দিয়ে পূরণ করে, সম্পূর্ণ করে তুলতে হয়। তোমাকে দিয়েই একটা উদাহরণ দিচ্ছি: তুমি শিক্ষকতা করছ। ধর তুমি একটি ছেলেকে তার নিজের গ্রাম সম্বন্ধে একটি রচনা লিখতে দিলে। মনে কর ছেলেটির গ্রামে লিখবার মত উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই। গ্রামে নদী নেই, এমনকি একটি দেবমন্দির পর্যন্ত নেই। ছেলেটিকে এখন রচনায় নম্বর পেতে হলে তার আশপাশের গ্রামে দেখা নদী, দেবমন্দির প্রভৃতির কথাও তার নিজের গ্রামের সঙ্গে খাপ খাইয়ে লিখতে হবে। তবেই তো তুমি তাকে নম্বর দেবে, না কি? সাহিত্যের বেলায়ও তাই। একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনী বা চরিত্র সৃষ্টি করতে হলে ঐরূপই করতে হয়।'

কালিদাসবাবু তাঁর শরৎচন্দ্র সম্পর্কীয় একাধিক প্রবন্ধে এই কথাগুলি লিখে গেছেন।

ভাল নম্বর পাওয়ার জন্য, ছাত্রটির নিজের গ্রাম সম্বন্ধে ঐ রচনা লেখার মত, শরৎচন্দ্র তাঁর শ্রীকান্ত উপন্যাসের মুখবন্ধকে সুন্দর; আকর্ষণীয় ও সুখপাঠ্য করবার জন্য ঐরূপ মিথ্যাও ত বলতে পারেন। তাই এটা তাঁর নিজের জীবনের ঘটনার স্বীকারোক্তিই বা হতে যাবে কেন?

অতএব অজিতবাবু শরৎচন্দ্রকে অতিমাত্রায় বেশ্যাসক্ত দেখাবার জন্য তাঁর স্বপক্ষে শরৎচন্দ্রের নিজের স্বীকারোক্তি বলে এই ছি-ছির যে সাক্ষ্য দিয়েছেন, এখানে এই আলোচনার দ্বারা দেখা গেল যে, অজিতবাবুর মনগড়া ঐ উক্তি ও যুক্তি আদৌ সত্য নয়।

এখন পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, শরৎচন্দ্রকে সাধু সাজানো আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার কথা—যা সত্য, তাই প্রচারিত হোক। শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের সম-সাময়িক ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কথা উড়িয়ে দিয়ে, আজ দু-তিন পুরুষ পরে, যা আমরা কেউ জানি না সে সম্বন্ধে অহেতুক কল্পনা দিয়ে একটা কাহিনী খাড়া করা, এবং সেই কল্পিত কাহিনীর সমর্থনে অসত্য সব যুক্তি দেখিয়ে শরৎচন্দ্রকে অকারণে হেয় করা একটা অপরাধ।

অতিমাত্রায় বেশ্যাসক্ত মানুষকে যে সর্বকালের এবং সর্বদেশের কোন মানুষই শ্রদ্ধা করে না, একথা অজিতবাবু ভালরকমই জানেন। তবুও তিনি সঠিক কিছু না জেনে অপরের কয়েকটা অসত্য কথাকে নিয়ে, তার উপর আবার নিজের বানানো কথার রং চড়িয়ে অহেতুক—ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্রের জীবন ছিল কলুষিত, তাঁর চরিত্র ছিল কলুষ-পঙ্কে নিমগ্ন, ইহা সত্য যে তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় বেশ্যাসক্ত ইত্যাদি বলে শরৎচন্দ্রকে যারপরনাই হেয় প্রতিপন্ন করেছেন।

আশ্চর্যের কথা এই যে, অজিতবাবুর এই বই ভারত সরকারের প্রদত্ত টাকায়

প্রকাশিত এবং যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রকে ডি-লিট দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নি, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ই তাঁর পন্ডিত বিচারকদের দ্বারা বিচার করিয়ে এই বইয়ের জন্য অজিতবাবুকে ডি-লিট উপাধি দিয়েছেন।

এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের লেখা এবং আর এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-লিট দেওয়ার জন্য এই বইটি ইতিমধ্যেই ছাত্র, অধ্যাপক ও পাঠক-পাঠিকা মহলে বেশ প্রচারিত হয়ে শরৎচন্দ্রকে যথেষ্ট হেয় করা হয়েছে। তার উপর আবার এই বইয়ের ঐ কাহিনী নিয়ে যদি সিনেমা করা হয়, তাহলে তো আপামর সর্বসাধারণের কাছে শরৎচন্দ্রকে শেষ করে দেবার ব্যাপারে সোনায় সোহাগা হবে।

চিত্রায়ন সংস্থা পৌষ মাসের মধ্যেই যদি ছবির কিছু দৃশ্য তুলে থাকেন, তাহলে বোধ-করি এতদিন তাঁরা আরও অনেক দৃশ্যই তুলেছেন।

গত ৩০শে জুন (১৯৭৪) তারিখের বিভিন্ন সংবাদপত্রে আবার দেখলাম—পশ্চিম-বঙ্গ সরকারও আসন্ন শরৎ-শতবার্ষিকীতে শরৎচন্দ্রের জীবনী নিয়ে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করবেন। এঁরা আবার কার লেখা কাহিনী অবলম্বনে ছবি তৈরি করবেন কে জানে।

কি সাহিত্য আর কি ছায়াচিত্রে, যতটা সম্ভব পূর্ণাঙ্গ অবিকৃত ও নির্ভুল শরৎ-জীবনী প্রচারিত হোক, এইটাই আমরা চাই।

তৃপ্তি সান্যাল

কফি হাউস

প্রায় সকলেই, তা তিনি বিশেষ কোন কাজে নিয়োজিত থাকুন আর না থাকুন কাজের মানুষ হোন আর অকাজেরই হোন, প্রত্যেকেই এমন একটি স্থান খোঁজেন যেখানে অবসর সময়টুকু নির্বিঘ্নে কাটানো যায়। যেখানে তারা পরিজনের সঙ্গে বসে নিরালায় আলাপন চলে। আর সে স্থানটি যদি নানা ধরনের মানুষের ভিড়ে সদা জমজমাট থাকে তা হলে অবসর-যাপন আর মানুষ দেখা দুটোই একসঙ্গে হয়ে যেতে পারে। কে চান, এমন সুযোগ হারাতে? সংযোগ যার আছে, এবং মানসিকতা যাঁর আছে, তাঁরা একে কখনও হেলায় হারাতে পারেন?

এমন একটি স্থান, কলেজ স্ট্রীটের কফি হাউস। ১৯৪২ সালে কফি হাউস যখন তৈরি হল তখন ব্রিটিশ সরকার-এর একটাই উদ্দেশ্য ছিল, তা হল কফিকে জনপ্রিয় করে তোলা। নিশ্চয়ই সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, নইলে এক কাপ কফি, তা-ও দুজনে ভাগাভাগি করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই কফি হাউসে কাবার করে দেন কেন?

১৯৪২ থেকে ১৯৮৭ এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কফি হাউসের প্রশাসনে যা অন্যত্র যতই পরিবর্তন হয়ে থাকুক না কেন, একটি জায়গায় ঠিক আছে। তা হল, নানান জাতের, নানান ধাঁচের, নানান পেশার মানুষের ভিড় এখানে একটুও কমে নি। কলেজ স্ট্রীট-এর কফি হাউস প্রতি হাও মহান। শ্যামবাজারে ইউনাইটেড কফি হাউস উঠে গেল। বসুশ্রী সিনেমা হাউসের দোতলায় কফি হাউস আছে বটে, আড্ডাও হয় সেখানে, কিন্তু কলেজ স্ট্রীটের মতো এমন জমজমাট কফি হাউস শহরে আর দ্বিতীয়টি নেই। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, তরুণ-তরুণী সকলেই আসেন এখানে। কেউ অধ্যাপনা করেন, কেউ সংগীতকার, কেউ ছবি আঁকেন, গল্প-কবিতা লেখেন—আর যুবক-যুবতীর একটা বড় অংশই ছাত্র। নয়তো বেকার।

ইদানিংকালে সমাজ-বিবর্তন এবং সমস্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্রই বাইরে-ভেতরে কিছু রদবদল হয়ে গেছে এবং যাচ্ছেও। কফি হাউসের একটি টেবিলে হাতের কনুই রেখে একাকী তিনি বসে থাকেন, আমার দৃষ্টি পড়ে সেইদিকে। মনে হয়, ভাবছেন কিছু। এই হট্টগোলের মধ্যেও উনি যেন একা। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র (রাষ্ট্রবিজ্ঞান, চতুর্থ বর্ষ) স্বর্ণগোপাল চক্রবর্তীকে জিজ্ঞেস করি, 'একা বসে থাকতে কি আপনার ভালো লাগে?'

'হ্যাঁ' শব্দটি উচ্চারণ করতে গিয়েও করলেন না স্বর্ণগোপাল। ইতস্তত করে বললেন, 'মাঝে মাঝে ভালোই লাগে। এই যে আমার সামনে কতরকম লোক বসে আছেন, হাঁটছেন, বেয়ারাকে ডাকছেন, তা একমনে দেখতে আমার বড় ভালো লাগে।'

'কি মনে হল এঁদের দেখে?'

'অনেক কিছুই মনে হয়।'

স্বর্ণগোপাল চক্রবর্তী

'বলুন না!'

'আমার মনে হয়, একদল আসেন, যাঁরা সত্যি সত্যি কাজের লোক। কিন্তু কতক্ষণ আর কাজ করতে ভালো লাগে? তারপর যে ঘরে ফিরবেন, সে উপায় তাঁদের নেই। ঘর তাঁদের কাছে সুখের আবাস নয়। তাই এখানে এসে সব ভুলে থাকতে চেষ্টা করেন। একটু বেশি কথা বলেন। চিৎকার করেন অকারণে।'

'তারপর?'

'আর একদল আছেন, বিশেষ করে তরুণরা, তাঁদের সমস্যা আছে ঠিকই, কিন্তু যতটা না আছে তার থেকে বাড়িয়ে দেখানো, মুখখানা বিমর্ষ করে বসে থাকা বা দার্শনিক-এর ঢঙ-এ কথা বলা রপ্ত করেন এখানে।'

'আপনি আসেন কেন?'

'আমি অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হতে আর চোখ-কান খুলে মানুষের হাট দেখতে-শুনতে।'

তৃপ্তি সান্যাল, বছর দুয়েক আগে বি-এ পড়তে পড়তে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছেন। তবে কফি হাউস ছাড়েন নি। জিজ্ঞেস করি, 'ঘণ্টার পর ঘণ্টা এখানে ভালো লাগে?'

'দারুন ভালো লাগে। ইশাক, হারাধন সকলের সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে। যতবার জল চাই দিয়ে যায়। এমনকি এখানে টেলিফোন এলেও ডেকে দেয়।'

'এখানে ঘটেছে এমন কোন বিশেষ ঘটনার কথা বলতে পারেন?'

—তেমনই অনেক কিছু ঘটে। প্রেম-বিরহ,

মারামারি সবই ঘটে। বিশেষ কিছু মনে রাখার মতো নেই।'

জিজ্ঞেস করি, 'আজকালকার তরুণ-তরুণীদের সমস্যা সমাধানে কফি হাউস সহায়ক হয়?'

'ওভাবে বলা মুসকিল। তবে একটা বিরাট পরিবেশ। হরেকরকম মানুষের হরেকরকম কথার মধ্যে দিয়ে শেখা যায় অনেক। এই তো বছরখানেক আগে, এইখান থেকে এক ধনী লোকের সঙ্গে আলাপের সূত্রে আমাদের এক জানাশোনা বন্ধুর চাকরি হয়ে গেল।'

'এখানে যাঁরা আসেন তাঁদের কেমন লাগে?'

'ভালো-মন্দ মিশিয়ে লাগে আর কি!'

রুপা ঘটক বললেন, 'হ্যাংলামিটা কমে। এখানে প্রায়ই আসেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। রাস্তায় হলে সব হুমড়ি খেয়ে পড়ত, এখানে সব নির্বিকার।'

'এখানকার লোকগুলো বড় আর্টি-ফিশিয়াল। যে ভঙ্গীতে কথা বলেন তাতে গা জ্বলে যায়। সকলেই নিজেকে একটা কেউকেটা বানাবার চেষ্টা করেন।' বললেন গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। সেলস রিপ্রেস-নটেটিভ তমাল সেনের কাছে স্থানটি হল পার্টি ধরার কেন্দ্র। বললেন, 'আখের গোছাতে কফি হাউসে আসি।'

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যের ছাত্র নবাঙ্কুর দাশগুপ্ত, 'মেয়েদের নিয়ে বসে পাঁচটা কথা বলার সেফ জায়গা কফি হাউস। আজকাল তো নিরাপদ জায়গা নেই বললেই চলে।'

মিনতি সেনগুপ্ত বললেন, 'কফি হাউসটা উঠে গেলে অনেকের আসল রুপটা বেরিয়ে পড়বে। জায়গাটার আশ্চর্য ক্ষমতা, লোকজনকে সুযোগ করিয়ে দিতে পারে। আসলে বেশির ভাগ লোক মেকি—থার্ড ক্লাশ।'

অজয় দাশ বললেন, 'লেখক-শিল্পীকে দেখতে পাই। কত আলোচনা কানে আসে। কফি হাউসের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।'

—কৃষ্ণা সেনগুপ্ত

এঁরাও পিছিয়ে নেই

বেতের জিনিসের কুটীরশিল্প

কলকাতার উপকণ্ঠে ওরা থাকে অথচ ওদের সম্পর্কে আমরা কতটুকুই বা জানি! দক্ষিণ শহরতলীর যাদবপুর এলাকার "দাসপল্লী"র বেত-শিল্পীদের কথা বলছিলাম। এই পল্লীর বাসিন্দারা সকলেই বেতের জিনিসপত্র বানিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। বাড়তি সময়ে এরা পুজোপার্বনে ঢাক বাজিয়ে বাড়তি টাকা উপায় করে। এরকম প্রায় সত্তরটি পরিবারের বসবাস এখানে।

এই সেদিন ওদের হাতের কাজ দেখতে গিয়েছিলাম। এরা এক সময় ছিন্নমূল উদ্বাস্তু হিসেবে ভাগ্যান্বেষণে ওপার থেকে এখানে এসেছিল। তখন এদের কোনও আশ্রয় ছিল না, ছিল না আর্থিক সাশ্রয়ও। কিন্তু এখন এরা সবকিছুই পেতে চলেছে—ঘর সংসার জীবন ও জীবিকা।

কথা হচ্ছিল শচীন দাস, বাসুদেব দাস, সুরেশ দাস, নকুল দাস ও যজ্ঞেশ্বর দাসের সঙ্গে। এরা সকলেই বেতের মোড়া, সুটকেস, ধামা, চেয়ার টেবিল ইত্যাদি রকমারি জিনিসপত্র তৈরী করে সংসার চালায়। এক ব্যাঙ্কের ক্ষুদ্র ব্যবসা উন্নয়ন সংস্থার দক্ষিণ কলকাতা শাখা সম্প্রতি এদের ঋণ দিয়েছেন, তিনশো থেকে পাঁচশো টাকা করে। এখন এদের আয় হয় মাসে পাঁচশো থেকে এক হাজার টাকা করে। লাভের পরিমাণ শতকরা ৬০ ভাগ।

অথচ এক সময় এই বেত-শিল্পীদের অবস্থাটা ছিল দুর্বিষহ। লাভের গুড় পিঁপড়েয় খেয়ে যেত, অর্থাৎ সবকিছুই যেত মহাজনের পেটে। মহাজন বেত কিনে দিত—বেত-শিল্পীরা মজুরে কাজ করতে। লভ্যাংশে ওদের কোনও অধিকার ছিল না।

কিন্তু এখন দিন বদলে গেছে। বেত কিনবার জন্য ব্যাংক ঋণ দিচ্ছে। কারিগররা পেয়েছে দ্বিগুণ উৎসাহ।

তবে এখনও এদের সামনে আছে বহু সমস্যা। বেতের তৈরী জিনিসপত্র বিক্রী ও সস্তাদরে বেত সংগ্রহের সমস্যাটা তলিয়ে না দেখলে সব পরিকল্পনাই রসাতলে যাবে।

ব্যাঙ্কের একজন মুখপাত্র বললেন, বেত-শিল্পীদের নিয়ে এখানে একটি সমিতি গঠন করা হবে। সস্তাদরে কাঁচামাল সংগ্রহ এবং ন্যায্যমূল্যে বেতের তৈরী জিনিসপত্র বিক্রীর ব্যাপারে এই সমিতি সবরকমের সাহায্য করবে। বিদেশেও যাতে রপ্তানী হয় সেদিকে এই সমিতি দৃষ্টি দেবে। একটি গুদামও তৈরী করার কথা হচ্ছে।

জল-কাদা ভেঙে সেদিন যখন দাস-পল্লীতে পৌঁছুলাম তখন বেলা দশটা—বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কর্মযজ্ঞ চলছে। উঠোনে বারান্দায় পরিবারের সকলে মিলে রকমারি জিনিসপত্র তৈরী করে চলেছে। এদের একজন বাবলু দাস, বয়স ১৯, তৃতীয় বার্ষিক বি-এ ক্লাসের ছাত্র। বাবলু দাসের তিন পুরুষ বেতের কাজ করে সংসার চালিয়েছে। ওদের পরিবারের ও-ই প্রথম কলেজে যাচ্ছে। কিন্তু বাবলুর মনে কোনও অহংকার নেই। ও বি-এ পাশ করে বেতশিল্পী হিসেবেই প্রতিষ্ঠা চায়।

বাবলু বলল—কলেজের পড়া শেষ করে বেতের জিনিসের ব্যবসা সুরু করব বড় আকারে। বাংলার বাইরে এমন কি বিদেশেও এ জিনিসের চাহিদা খুব বেশি।

বাবলু একটা বেতের মোড়া এগিয়ে দিয়ে আমায় বলল—দেখুন, এ কাজে আনন্দ আছে যাকে বলা যায় ক্রিয়েটিভ প্লেজার। এ ধরনের কাজের জন্য চাই 'আর্টিস্টিক ন্যাক'। আমার খুব ভাল লাগে।

—কনক [illegible]

শরৎচন্দ্রের ব্রহ্মদেশের জীবন

'অমৃতে' পত্রিকার গত দুই সংখ্যায় শরৎচন্দ্রের ব্রহ্মদেশের জীবন নিয়ে শ্রীগোপালচন্দ্র রায় যে আলোচনা শুরু করেছেন তা আমি দেখেছি। গোপালবাবু শরৎচন্দ্র সম্পর্কে অনেক আলোচনা করেছেন তেমনি ব্রহ্মদেশের জীবনপর্ব সম্পর্কে তিনি হয়তো নূতন তথ্য পরিবেশন করছেন এই আশায় আগ্রহে তাঁর লেখা পড়তে আরম্ভ করেছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় লক্ষ্য করলাম যে, তিনি যেন আমার 'শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার' গ্রন্থখানি সমালোচনা করবার মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়েই আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমার বইতে তথ্যগত কোনো ভুল থাকলে নিশ্চয়ই পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করব কিন্তু যা আমি বলেছি তা বিকৃত করা কিংবা যা আমি বলতে চাইনি তা আমার উক্তি বলে উল্লেখ করা আমার প্রতি একটু অবিচার বলেই মনে করব। শরৎচন্দ্রের জীবনী রচনা করবার সময় আমি সমসাময়িক ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের বিবরণ, তৎকালীন সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে প্রকাশিত তথ্যাদি এবং শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্রের উপরে প্রধানত নির্ভর করেছি। যেখানে দুই পরস্পরবিরোধী মত দেখেছি, সেখানে উভয় মতই উদ্ধৃত করেছি এবং অতি সতর্কভাবে যথাসম্ভব নিরপেক্ষভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে নিজস্ব মন্তব্য প্রকাশ করেছি।

আমার বইতে আমি লিখেছি 'শরৎচন্দ্র যখন অঘোর চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে ছিলেন, তখন হইতেই তাঁহার চরিত্র কলুষপঙ্কে নিমগ্ন ছিল। তাঁহার আত্যন্তিক মদ্যাসক্তি ও অসংযমের ফলও তাঁহাকে ভুগিতে হইল। তিনি ব্রহ্মদেশে পৌঁছিবার কিছুকালের মধ্যেই অসুস্থ হইয়া পড়েন।' শরৎচন্দ্র যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন, এ-কথা আমি বলিনি। গোপালবাবু অঘোর চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে শরৎচন্দ্র মদ্যাসক্ত হয়েছিলেন আমার এই উক্তি অবিশ্বাস্য বলতে চেয়েছেন। কিন্তু শুধু সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় নন অনেকেই তো এই কথা বলেছেন। তাঁদের উক্তি অনুসরণ করেই আমি এই মত প্রকাশ করেছি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎ-পরিচয়ে' লিখেছেন, 'অঘোরনাথের পীড়ার সময় তিনি যে ঘোর পানাসক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সে সংবাদ কলিকাতায় তাঁহার মাসীমার গোচরে আসিয়াছিল'। স্বয়ং গোপালবাবুই তাঁর 'শরৎচন্দ্র' নামক গ্রন্থে লিখেছেন 'শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে গিয়েও মদ খেতেন (পৃঃ ৭১)। শরৎচন্দ্রের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন সম্পর্কে গোপালবাবু বিভিন্ন গ্রন্থে অনেক আলোচনা করেছেন। নরেন্দ্র দেব তাঁর গ্রন্থে ('শরৎচন্দ্র') লিখেছেন, 'কিছুদিন তিনি অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করেন।' গিরীন্দ্রনাথ সরকার শরৎচন্দ্রকে 'সমাজ-বিরোধী উচ্ছৃঙ্খল যুবক' বলেছেন ('ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র')। গোপালবাবু অমৃত পত্রে লিখেছেন, 'মেসোমশাইয়ের বাড়িতে এসেই অতিরিক্ত পরিমাণে মদ খেতে এবং লুকিয়ে বেশ্যাবাড়ি যেতে কখনই সাহসী হতেন না।' এ-উক্তি তাঁর ধারণা অথবা অনুমান মাত্র। কোনো তথ্যের দ্বারা সমর্থিত নয় এবং অন্যান্য জীবনীকার ও তাঁর পূর্বে প্রকাশিত মতের বিরোধী।

অঘোরনাথের মৃত্যুর সময় শরৎচন্দ্র কোথায় ছিলেন সে সম্পর্কে গিরীন্দ্রনাথ সরকার ও শরৎচন্দ্রের মামা সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মত পরস্পর-বিরোধী। গিরীন্দ্রনাথ লিখেছেন শরৎচন্দ্র অঘোরনাথের মৃত্যুর সময় তাঁর শয্যাপার্শ্বে শুশ্রূষারত ছিলেন, আর সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন যে, শরৎচন্দ্র তাঁর কাছে বলেছিলেন, তিনি অঘোরনাথের মৃত্যুর আগেই তাঁর আশ্রয় ত্যাগ করেছিলেন। আমি এই দুইটি মত উদ্ধৃত করে গিরীন্দ্রনাথ সরকারের উক্তিকেই অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলেছি। আমার বইতে আমি লিখেছি, 'শরৎচন্দ্রের উপরের উক্তি হইতে মনে হয় তিনি অঘোরনাথের মৃত্যুর আগেই ঐস্থান হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে গিরীন্দ্রনাথ সরকার এবং অন্যান্য বহু লেখকের উক্তি হইতে মনে হয়, তিনি অঘোরনাথের মৃত্যুর সময় তাঁহার শয্যা-পার্শ্বেই ছিলেন'। গিরীন্দ্রনাথের উক্তির সমর্থনে আমি পাদটীকায় মন্তব্য করেছি (পৃঃ ৮০), 'বিচারপতি এ এন. সেনের উক্তিতেও ইহা সমর্থিত হয়, 'অঘোরবাবুর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর কাছেই বসবাস করেন।' আমার আর একটি উক্তিতেও আমি আভাস দিয়েছি যে, অঘোরবাবুর মৃত্যু পর্যন্ত শরৎচন্দ্র তাঁর আশ্রয়েই ছিলেন, 'শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনে আসিবার ঠিক দুই বৎসর পরে অঘোরনাথের মৃত্যুর ফলে শরৎচন্দ্র নিরাশ্রয় হইয়া পড়েন।' আমি সুরেন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত করেছি কিন্তু সমর্থন করেছি গিরীন্দ্রনাথ সরকারের উক্তি, অথচ গোপালবাবু ৬ই সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় 'অমৃতে' পত্রিকায় লিখলেন, 'সুরেনবাবুর কথা যে অসত্য, অজিতবাবু তা ধরতেও পারেননি, অধিকন্তু সুরেনবাবুর অসত্য কথাটাকে সত্য বলে ধরে নিয়ে তিনি শরৎচন্দ্রকে অযথা অকৃতজ্ঞরূপে চিত্রিত করেছেন।' গোপালবাবু আমার উক্তিকে 'ভুল', 'মনগড়া কথা', 'সম্পূর্ণ অসত্য' প্রভৃতি নানা মিষ্ট-মধুর বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। গোপালবাবুর এ-ধরনের মন্তব্য সম্পর্কে আমি কিছুই বলব না কিন্তু উপরের দুটি বিষয়ে অন্তত আমার উক্তিতে যে কোনো অসঙ্গতি ও অসত্য নেই তা আশা করি, আমার বই যিনি পড়েছেন, তিনিই স্বীকার করবেন।

অজিতকুমার ঘোষ
কলকাতা—৬।

(২)

'অমৃত' ৩০ আগস্ট সংখ্যা থেকে গোপালচন্দ্র রায়ের 'শরৎচন্দ্রের ব্রহ্মদেশের জীবন শুরু হয়েছে। পর পর দুটি সংখ্যায় গোপালবাবু ডঃ অজিত ঘোষের লেখাকে নস্যাৎ করতে চেয়েছেন।

কিন্তু মজার ব্যাপার হল, গোপালবাবু কোথাও প্রামাণ্য প্রকাশিত এবং সর্বজন-সম্মত তথ্যের ভিত্তিতে তাই করতে পারেননি। তিনি তৎকালীন ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ এবং অনুমান ও শোনা কথার ওপরই জোর দিয়েছেন।

ডঃ ঘোষের শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার' গ্রন্থটি আমি পড়েছি। সারা বইটির মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোথাও শরৎচন্দ্রের চরিত্রকে কলঙ্কিত করার প্রয়াস নেই। বরং মানুষ শরৎচন্দ্র ও শিল্পী শরৎচন্দ্র এ দুয়ের অপূর্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাছাড়া যে কোন স্রষ্টার জীবনের দুটি দিক আছে। স্রষ্টা যখন সৃষ্টি করেন তখন তিনি দ্বিতীয় বিধাতা আর স্রষ্টা যখন মানুষ তখন তিনি দোষে গুণে একরকম। একজন স্রষ্টার ব্যক্তিগত চরিত্র যে ধোয়া তুলসীপাতা হতে হবে এমন কোন মানে নেই। কিন্তু লেখকের ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে মাথাব্যথা করে লাভ কি! স্রষ্টা মাত্রেরই জীবন বিচিত্র হয়। বাঁধাধরা ছাঁচে ঘোরা-ফেরা করা কিংবা জীবন কাটানো লেখকের মানসিকতা নয়। কোনো লেখক ব্যক্তিগত জীবনে যতই অমিতচারী হোন না কেন তাঁর সৃষ্টিতে যদি জীবন ফুটে ওঠে, সেইটেই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য। শরৎচন্দ্র যদি অতিশয় মদ্যাসক্ত ও অতি-

...চায় বেশ্যাসক্ত হয়েই থাকেন তাতে ...গোপালবাবুর ফেটে পড়বার কি কারণ ঘটল ...বুঝতে পারছি না।

সুরেনবাবুর প্রকাশিত বইয়ের তথ্যও ...গোপালবাবু মানতে চাইছেন না। ডঃ ঘোষের ...থ্যটির তথ্য ভুল এটা প্রমাণ করবার ...ন্যেই গোপালবাবু শেষ পর্যন্ত সুরেন-...কে পাগল প্রমাণ করতে চাইছেন।

গোপালবাবু লিখেছেন, 'আমার মনে ...সুরেনবাবু যখন এ বই লেখেন তখন ...ত বার্ধক্যবশত নানা ভুল করেছেন। ...তীরত তখন এক সময় তাঁর মাথায়ও ...কটু গোলমাল দেখা দিয়েছিল। ঐ সময় ...রেনবাবুর মাথা ঠিক না থাকার কথা ...মি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রবীন্দ্রনাথ গঙ্গো-...ধ্যায়ের কাছে শুনেছি।'

গোপালবাবু শোনা কথার ওপর নির্ভর ...রে ডঃ ঘোষের তথ্যাকে ভুল বলছেন কি ...রে? সুরেনবাবুর বইয়ের তথ্য ঠিক নয়, ...ঃ ঘোষ দীর্ঘ পরিশ্রম করে বিভিন্ন ...মাণ্য তথ্য থেকে যা উদ্ধার করেছেন তা ...ক নয়। গোপালবাবু কি বলতে চান তাঁর ...নে হওয়াটাই সর্বৈব সত্য? গোপালবাবু ...মাণ্য, প্রকাশিত তথ্য দিয়ে প্রমাণ ...রুন।

অমলেন্দু রায়চৌধুরী
কুচবিহার।

কমল দাশগুপ্ত প্রসঙ্গে

সুরশিল্পী কমল দাশগুপ্ত সম্বন্ধে শ্রীমতী যূথিকা রায়ের লেখাট 'অমৃত'-এর ১৬ই শ্রাবণ সংখ্যায় পড়লাম। কমল দাশগুপ্তের জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রখ্যাত সুরশিল্পী বিমল দাশগুপ্তের নিকট শ্রীমতী যূথিকাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর পিতৃদেব যেদিন গিয়েছিলেন, আমি সেই দিন বিমলবাবুর গৃহে উপস্থিত ছিলাম। যূথিকার বাবা আক্ষেপ করে বিমলবাবুকে বলেছিলেন,—'বহু চেষ্টা করেছি, তবু যূথিকার গান রেকর্ড করবার কোন ব্যবস্থা করতে পারলাম না।' বিমলবাবু হিজ মাস্টার্স ভয়েস ও টুইন রেকর্ড প্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয় সুরশিল্পী। কর্তৃপক্ষের তিনি বিশেষ প্রিয় ও বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি।

বিমলবাবুর খ্যাতি ছিল, তাঁর কাছে কোন গায়ক-গায়িকা যদি একবার অনুরোধ জানাতেন, তাঁরা রেকর্ডে গান করতে উৎসুক, বিমলবাবু তাঁদের সুযোগ দিতেন, সাহায্য করতেন। তিনি সে অনুরোধ কখনো প্রত্যাখ্যান করতেন না। বস্তুত বিমলবাবুর আগ্রহে ও সহায়তায় বহু নতুন শিল্পী রেকর্ডজগতে তাঁদের যথোপযোগী স্থান করে নিতে পেরেছিলেন।

শ্রীমতী যূথিকাকে বিমলবাবু একটি গান করতে বললেন। গান শুনে বিমলবাবু খুবই খুশি। বললেন, 'এমন মিষ্টি গলা। এ মেয়ের গান রেকর্ড হবে না কেন?' পরক্ষণে কমলকে বললেন, কুটু (কমল দাশগুপ্তের ডাকনাম কুটু) যূথিকার দুটি গানের তুই সুর কর। প্রণব গান লিখবে। প্রসঙ্গত প্রণব রায় ও কমল, বিমলবাবুর নির্দেশে কি একটি গানের রচনায় ও সুর-সংযোজনায় তখন ব্যস্ত। ঐ ঘরে বসেই তাঁরা কাজ করছিলেন। প্রণব রায়কে বিমলবাবু বললেন,—'প্রণব, খুব সহজ ও সুন্দর কথায় তুমি দুটি গান লিখবে। যূথিকার গান ত শুনলে। এমন কথা দিও, যা সহজে যূথিকা বলে যেতে পারে।' কমলকে বললেন, তাল লয়ের ঝক্কি থেকে মেয়েটিকে অব্যাহতি দিস। এখনকার মত কণ্ঠই যূথিকার প্রধান সম্পদ। তাই একসপ্লয়েট করবি।'

শ্রীমতী যূথিকার প্রথম দুখানি গান—'আমি ভোরের যূথিকা' আর 'সাঁঝের তারকা আমি' দুই তরুণ গীতিকার প্রণব রায় ও সুরশিল্পী কমল দাশগুপ্তকে রেকর্ড জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছিল—একথা বললে অতিশয়োক্তি করা হবে না।

যূথিকার কণ্ঠমাধুর্যে তাঁর প্রথম গাওয়া এই দুটো গান অভাবনীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

সুরকার বিমল দাশগুপ্ত উদার গুণী ব্যক্তি। তাঁর সহায়তার উল্লেখ শ্রীমতী যূথিকার উক্ত লেখায় কিন্তু বাদ পড়ে গেছে।

প্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত,
কলকাতা—১৯।

যুবক যুবতী

ফিল্ম

প্রথমেই 'অমৃত' পত্রিকায় একটি ...শেষ ফিচার 'যুবক-যুবতী'র জন্য কৃষ্ণা ...বীকে জানাই আমার অভিনন্দন। ৩০শে ...বণ সংখ্যায় এই বিভাগে 'ফিল্ম' সম্বন্ধে ...য়েকজনের সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে। আমি ...ভিজিত রায় ও সমীরচন্দ্র মুখার্জি'র ...ব্যের সামান্য প্রতিবাদ করতে বাধ্য হচ্ছি।

অভিজিতবাবু বলেছেন, 'অধিকাংশ ...ংলা ছবি না পারে আনন্দ দিতে না পারে ...সিরিয়াস কথা বলতে।' সত্যিই কি তাই? ...শনি সংকেত' 'পদাতিক' 'কলকাতা ৭১' ...বং এই ধরনের অজস্র বাংলা ছবি কি ...রেনি কোনো সিরিয়াস কথা বলতে? ...মান পৃথ্বীরাজ', 'গুপি গায়েন বাঘা ...য়েন', 'সাধু যুধিষ্ঠির কড়চা' ইত্যাদি ...ণের বাংলা ছবিগুলো কি পারে নি ...র্শকে আনন্দ দিতে? তাই যদি ...হয় তবে উনি 'আনন্দ' বলতে কি ...ঝাতে চাইছেন? অশ্লীল, নোংরা অবাস্তব ...ছু হিন্দি সিনেমাকে কি? উপরোক্ত ...ক্তে তিনি যদি 'বাংলার' জায়গায় ...হিন্দি' বলতেন তবে প্রতিবাদের কিছুই ...কতো না।

সমীরবাবু বলেছেন, 'ভাল ছবি লোক ...মন দেখতে যাবে না কারণ ভালো আর ...বড় কথা শুনে লোকেরা এখন ক্লান্ত।' তবে কি লোকেরা এখন খারাপ কথা শোনার জন্য খারাপ ছবির পথ চেয়ে বসে আছে? আর বড় বড় কথা থাকলেই কি ছবি ভালো হয়? সত্যিকারের ভালো ছবির কি আজকাল কোনই দাম নেই? এই সম্বন্ধে আমি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সুব্রত বাগচী,
ডবসনগঞ্জ, হাওড়া।

প্রেম

অমৃত পত্রিকায় যুবক-যুবতীতে 'প্রেম' সম্বন্ধে ক্যালকাটা উইমেন্স কলেজের ছাত্রী সুনন্দা ঘোষ যা বলেছেন—'ভালবাসার ক্ষেত্রে আমি খুব হিসেবী থাকার চেষ্টা করি।' দেখে বিস্মিত হলাম।

সুনন্দা দেবী 'সত্তর দশকের' একজন যুবতী। এই দশকে যেখানে আমাদের সব কিছুই হিসেব করে বলতে হচ্ছে, করতে হচ্ছে, সেখানে তিনি হয়ত ভালবাসাটাকেও হিসেবের মধ্যে ধরে ফেলেছেন। কিন্তু তেল ও জল যেমন কখনও একসঙ্গে মেশে না, ভালবাসাও ঠিক তাই। তাই হিসেব বলতে তিনি কি বোঝাতে চাইছেন তা ঠিক স্পষ্ট নয়। আর যদি হিসেবটা ব্যবসায়ভিত্তিক হয় অর্থাৎ যেখানেই মাছ সেখানেই টোপ ফেলবার মত, তাহলে তিনি জানবেন, ব্যবসাদারিতে ভুল-চুক হয়েই থাকে। আর সেই ভুল কখনো কখনো ব্যবসায়ীকে পথে নামিয়ে দেয়। তাই যাকে কেউ ভালবাসার টোপটা গেলাতে চাইবেন সেও যদি পাকা ব্যবসায়ী হয়ে থাকে, তবে কিন্তু সেই ভালবাসাটা হবে কসমেটিকস-এর মত। তাতে থাকবে না ভালবাসার অস্তিত্ব থাকবে শুধুই জৌলুষ।

তাই বলছিলাম, ভালবাসার কোন জাত নেই গোত্র নেই। ভালবাসা হচ্ছে স্বর্গীয়। আর সেই ভালবাসায় হিসেব এনে তাকে সুনন্দা দেবী কলঙ্কিত করতে চাইছেন।

অভাব-অনটন, নৈরাশ্য প্রত্যেকের জীবনেই এসে থাকে আবার সময়ে চলেও যায়। কিন্তু, ভালবাসায় এগুলো আসবে কেন? আর দুজনের আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং অর্থাৎ দুজনের যৌথ প্রচেষ্টায় এই সমস্ত দূর করাই তো ভালবাসার সার্থকতা। তাই দোহাই তাঁকে, তিনি যেন ভালবাসায় হিসেব এনে কলঙ্কিত না করেন।

সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। শেষে সুস্মিতা দেবীর কথা দিয়েই শেষ করছি—'ভালবাসার ক্ষেত্রে ধৈর্য এবং মানসিক প্রস্তুতিই বড় ফ্যাক্টর'।

আশা করি মাননীয় সম্পাদক মহাশয়, এই লেখা পত্রিকায় প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

অজিত দত্ত,
বেদিয়াপাড়া, কলকাতা-৪।

আর্থিক প্রসঙ্গ

আবার ম্যালথাস

বিশ্ব জনসংখ্যা বছর : রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গের জ্যাঠামশাই যৌবনে ম্যালথাস পড়েছিলেন বলে আর দারপরিগ্রহের পথে মাড়ান নি। কারণ পৃথিবীকে আর জনভারে ভারাক্রান্ত না করাই সমাজ-সচেতন ব্যক্তির কর্তব্য বলে তিনি মনে করেছিলেন। বস্তুত ধর্মযাজক অর্থনীতিবিদ টমাস রবার্ট ম্যালথাস (১৭৬৬—১৮৩৪) উদ্বাহবন্ধনকে পরিহার করে অন্তত যথাসম্ভব বিলম্বিত করে জনবিস্ফোরণ নামক প্রকৃতির প্রতিশোধকে এড়াবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রাচীন রোমকদের সময় থেকে কৃত্রিম উপায়ে জন্মশাসন ব্যবস্থা ব্যক্তিগতভাবে অনুসৃত হলেও ম্যালথাসের সময় পর্যন্ত তা সামাজিক স্বীকৃতি এবং ফলে ব্যাপ্তি লাভ করে নি। এমনকি সেদিন পর্যন্ত ফ্রেঞ্চ লেটার বা অনুরূপ কিছুর ব্যবহারকে বাছবিচারহীন যৌনসম্ভোগের (প্রমিসকিউইটি) নিদর্শন বলে ধরে নেওয়া হত। আজ কিন্তু এই সব ব্যবস্থাকে সামাজিক প্রতিরোধ ও নিরাময়ের অঙ্গ বলেই গণ্য করা হচ্ছে। কারণ অতি সরল : সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই আজ এই উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছেন যে, সুষ্ঠু জনপরিকল্পনা করতে সমর্থ না হলে ধ্বংস অনিবার্য। এই উপলব্ধিই হল ১৯৭৪ সালকে 'বিশ্ব জনসংখ্যা বছর' বলে ঘোষণার মূলে প্রেরণা এবং এই পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যেই গত মাসে (আগস্ট) বুখারেস্টে ১২০ দেশের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

ম্যালথাসের সময় এই উপলব্ধি ছিল একমাত্র তাঁরই। অবশ্য তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় প্রচার লাভ হয়ে বেশ কিছুটা চিন্তার খোরাক জুগিয়েছিল, কিন্তু দানা বেঁধে ঠিক বিশ্বাসে পরিণত হয়ে আসন করে নিতে পারে নি। আর পারবেই বা কি করে? তখন ত জনবিস্ফোরণ-সমস্যার অঙ্কুরও দেখা যায় নি। সুতরাং বাস্তবের সঙ্গে সংগতিবিহীন তত্ত্বকে লোকে বড় একটা গুরুত্ব দেয়নি। বিষয়টির ব্যাখ্যার জন্যে কিছুটা পটভূমিকার অবতারণা করা যেতে পারে।

ম্যালথাসের তত্ত্বের পশ্চাদপট :

পৃথিবী নামক এই উপগ্রহের বয়স কত? দশ লক্ষ বিশ লক্ষ বা এক কোটিবছর বা তারও বেশী হতে পারে। সে যাই হোক, ম্যালথাসের মৃত্যুর চার বছর আগে—১৮৩০ সালে—পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছিল মাত্র ১০০ কোটি। এর ঠিক ৩২ বছর আগে—১৭৯৮ সালে ম্যালথাসের জনসংখ্যাতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। তখন পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল নিশ্চয়ই আরও কম, আর ইংল্যান্ডে আশংকা করছিল জনসংখ্যা হ্রাসের। বিখ্যাত সমাজক-সংস্কারক উইলিয়াম পেলী বিলাপোক্তি করেছিলেন : রাষ্ট্রের নামে যদি কিছু অকল্যাণ থাকে তবে তা হল জনশক্তির ক্ষয়...এবং অন্য যেকোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধন মুলতুবী রেখে এদিকেই প্রথম দৃষ্টি দেওয়া উচিত।" এর কিছুদিন পরেই প্রধানমন্ত্রী ইয়াংগার পিট জনসংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পার্লামেন্টে দরিদ্র-ত্রাণ বিল উত্থাপন করেন। বিলটির ব্যবস্থা ছিল যে, প্রত্যেকটি সন্তানসন্ততির জন্যে দরাজ অর্থ সাহায্য করা হবে।

এর কিছুদিন আগে (১৭৯৩) প্রকাশলাভ করেছিল উইলিয়াম গডউইনের বিখ্যাত গ্রন্থ 'পোলিটিক্যাল জাস্টিস', যাতে বর্তমানকে বিশেষ হেয় করা হলেও ভবিষ্যতের জন্যে এক স্বর্গরাজ্যের কল্পনা করা হয়েছিল।

অনেক দিন ধরে এই স্বর্গরাজ্য বা ইউটোপিয়াই ছিল ইংল্যান্ডের অভিজাত সম্প্রদায়ের বৈঠকখানায় অন্যতম প্রধান আলোচ্য

জনৈক। এই রকম এক বৈঠকখানা ছিল ড্যানিয়েল ম্যালথাস নামে একজন ক্যাপ্টেন ভদ্রলোকের। টমাস রবার্ট ম্যালথাস তাঁরই পুত্র। বৃদ্ধ ম্যালথাস রবার্টকে প্রায়ই জাকজমক আলোচনায় যোগদান করতেন। আলোচনার ফলে দেখলেন যে, পুত্র ইউটোপিয়ায় মোটেই বিশ্বাস করে না বরং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তার ধারণা নৈরাশ্যবাদে ভরা। পত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল : মানবে সমৃদ্ধির পথে মোটেই এগুচ্ছে না; অপরিমিত পক্ষে বংশ বৃদ্ধির সহজাত প্রবণতার দরুণ বিরতিবিহীন জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে আছে। প্রকৃতির ভাণ্ডার যতই খোঁজাখুঁজি করা হোক না কেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে দৌড় প্রতি-যোগিতায় খাদ্যের যোগান সব সময়েই পিছিয়ে থাকবে। ফলে বাড়তি জনসংখ্যা অনাহার অর্ধাহার দারিদ্র্যজনিত ব্যাধি ইত্যাদি কবলিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এই হোল প্রকৃতির প্রতিশোধ—অত্যধিক হারে বংশবৃদ্ধির প্রতিশোধ।

স্বর্গরাজ্যের কল্পনা থেকে হঠাৎ যদি এই ধরণের চিত্রে ফিরে আসতে হয় তবে মনের অবস্থাটা কি দাঁড়ায় তা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং ম্যালথাসের গ্রন্থ পাঠের পর কার্লাইল যে অর্থনীতিকে নৈরাশ্যবাদী শাস্ত্র (দ্য ডিসম্যাল সায়েন্স) বলে অভি-হিত করবেন তাতে আর আশ্চর্য কি?

আজকের দিনের পটভূমিকা :

আজকের দিনের পটভূমিকাও হল এক স্বর্গরাজ্য—অন্তত পূর্ববর্তী দশকের শেষ পর্যন্ত অর্থনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনেতারা জন-সাধারণের সম্মুখে এই চিত্রের ওপরই ক্রমাগত রং চড়িয়ে গিয়েছিলেন। অর্থনীতির ভাষায় চিত্রটি হল সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের /—অফ গ্রোথ এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট। অর্থাৎ ধারণা ছিল যে, জাতীয় আয় পর্যাপ্ত হারে বাড়তে থাকলে সকল দিকে কাম্য অর্থনৈতিক পরিবর্তন সূচিত হবে। এই কাম্য অর্থ-নৈতিক পরিবর্তনকেই ডেভেলপমেন্ট বা উন্নয়ন আখ্যা দেওয়া হয়। পাশ্চাত্য ধরণের শিল্পায়নকেই এই সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মূল মন্ত্র বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। এবং এই মূলমন্ত্র জপ করেই উভয় গোলার্ধে বিভিন্ন দেশ অভূতপূর্ব এবং অকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করেছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পশ্চিম জার্মানী ও জাপানের উল্লেখ করা যেতে পারে।

এই ধর্মাচরণের ফলে তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোতেও অনেক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটেছিল কিন্তু উন্নয়নের মাত্রা কোনমতেই সমানুপাতিক হয়নি—এমনকি কাছাকাছিও পৌঁছোয় নি। ব্যাখ্যা করে বলা যায়, এই সব দেশে যে পরিমাণে মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে (যাকে সম্প্রসারণ বা গ্রোথের মাপকাঠি বলে ধরে নেওয়া হয়) জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান সেই পরিমাণে কখনই উন্নত হয় নি। কারণ দ্বিবিধ : (ক) জনবিস্ফোরণহেতু এই সব দেশে মাথাপিছু জাতীয় আয় বিশেষ বৃদ্ধি পায় নি, (খ) সম্প্রসারণ বা বর্ধিত জাতীয় আয়ের ফল জাতীয় সমাজের উচ্চতর শ্রেণীরাই বেশী ভোগ করেছে। ফলে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ হল আর্থিক কল্যাণের হ্রাস।

উক্ত কারণেই আবার এইসব দেশে কাম্য সমাজসেবামূলক কার্যাদির—যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য নিয়োগসংস্থান সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি—প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ ঘটে নি।

এতদিন পর্যন্ত মোটামুটিভাবে ধরে নেওয়া হত যে সমৃদ্ধি—অর্থাৎ মোট জাতীয় আয়ের পর্যাপ্ত বৃদ্ধি ঘটলেই জন্মহার হ্রাস পেয়ে জনসংখ্যাবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হবে। সম্প্রতি এই তত্ত্বের যাথার্থ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে। কারণ, দেখা যাচ্ছে যে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি সত্ত্বেও জনসংখ্যাবৃদ্ধি মোটেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না এবং পরিবার পরিকল্পনার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জনবিস্ফোরণ ঘটে চলেছে—তাও আবার অকাম্য প্রান্তে। অতএব সম্প্রসারণ এবং পরিবার পরি-কল্পনার সংগে সংগে প্রয়োজন দ্রুত সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতি (প্রোগ্রেস)। বিগত বুখারেস্ট সম্মেলনের এই ছিল অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয়।

দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে জনসংখ্যা সমস্যা বিশ্লেষণ সর্বসাই সম্মেলনে বিবেচিত হয়েছে। এখন এই সমস্যার দিকেই দৃষ্টি-পাত করা যাক।

ভবিষ্যতের চিত্র :

দেখা গেছে ১৮৩০ সালে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ১০০ কোটি। পরবর্তী একশ বছরের মধ্যে এই সংখ্যা দ্বিগুণে দাঁড়ায়। এরপর ত্রিশ বছরের মধ্যে (১৯৬০) ধ্বংসাত্মক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সত্ত্বেও বিশ্বের জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৩০০ কোটিতে এবং পনের বছর পর (১৯৭৫) তা ৪০০ কোটিতে পরিণত হবে বলে পরিসংখ্যানবিদদের অনুমান করা হয়েছে। তারপর আরও ত্রিশ বছর পরে—২০০৬ সালে এই উপগ্রহে ৭৬০ কোটি লোকের বসবাসের ব্যবস্থা করতে হবে। ঐ সময়ের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে ১০০ কোটিতে—বর্তমান চীন

ভারতের জনসংখ্যার (৮০ কোটি) চেয়ে ২০ কোটি বেশী। ইতিমধ্যে চীনের জনসংখ্যা নিয়মিত বৃদ্ধি পেলেও ভারত হয়ে উঠবে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনাকীর্ণ দেশ। কারণ, তুলনামূলকভাবে ভারতের ভূখণ্ডের পরিমাণ অনেক কম এবং চীনদেশ ভারতের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করতে সমর্থ হয়েছে। আবার শুধু তাই নয়, সমগ্র বিশ্বের মধ্যে মাত্র যে দুটি দেশ অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন এবং জনসংখ্যাবৃদ্ধির মধ্যে ভারসাম্য আনয়ন করতে পেরেছে চীন দেশ তার অন্যতম। অপরটি হলো সিঙ্গাপুর। এই বিচারের মধ্যে অবশ্য তৈল উৎপাদনকারী দেশগুলোর কথা ধরা হয় নি।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে আগামী শতকের শুরুতেই পৃথিবীর ও আমাদের ভারতের জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণে পৌঁছবে। ম্যালথাসের তত্ত্বের এই ছিল প্রতিপাদ্য বক্তব্য : দুর্ভিক্ষ মহামারী ইত্যাদি স্বাভাবিক পজিটিভ চেকস) কারণে জনসংখ্যার একাংশ নিশ্চিহ্ন না হলে ১৫-৩০ বছরের মধ্যে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। এই ভয়ঙ্কর প্রবণতা প্রতিরোধের জন্যে ম্যালথাস প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা (প্রিভেনটিভ চেকস) অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বর্তমানে প্রায় পৃথিবীর সর্বত্রই পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি নামে ব্যাপক প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। তবুও কিন্তু ম্যালথাসের সেই আতঙ্ক-উৎপাদক তত্ত্বের কোন প্রকারভেদ ঘটে নি কেন? কারণ হলো মানুষ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের স্বাভাবিক কারণসমূহকে অনেকটা নিয়ন্ত্রিত করে ফেলেছে।

স্বাভাবিক ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা :

গত মাসে বিভিন্ন বিদেশী পত্র-পত্রিকায় ভারতে—বিশেষ করে বিহার রাজ্যে বসন্তের প্রকোপের ওপর নানারূপ টিপ্পনী কেটে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। একটি বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকার সংবাদটির শিরোনাম ছিল মা শীতলার সম্মার্জনী—মা শীতলার ঝাঁটা। সংবাদটির সঙ্গে একটি ব্যঙ্গচিত্রও ছিল : তাঁর বাহন রাসভে আরোহণ করে মা শীতলা সম্মার্জনী সঞ্চালন করে চলেছেন। তিনি অদৃশ্য কিন্তু সম্মার্জনী যাদের আঘাত করছে সেই জনসাধারণ সম্পূর্ণ দৃশ্য। সংবাদটির শেষে টিপ্পনী কাটা হয়েছে : এখনও ও দেশের লোক মা শীতলার সম্মার্জনী থেকে নিজেদের বাঁচাতে শেখেনি।

টিপ্পনীটি কঠোর ও কটু হলেও অনেকাংশে সত্যি। উন্নত দেশ থেকে বসন্তকে সম্পূর্ণ নির্মূল করা হয়েছে। অনুরূপভাবে অন্যান্য স্বাভাবিক কারণকেও দমন করা হয়েছে। আমাদের দেশেও যে কিছু করা হয় নি তা নয়। কিন্তু একদিকে যেমন স্বাভাবিক কারণকে যত পরিমাণে দমন করা হবে অপরদিকে তেমনি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলোকে জোরদার করে তুলতে হবে। নইলে নীট ফল কিছুই ফলবে না। প্রায় সমগ্র বিশ্বে এই না ফলার কারবারই চলছে। আমাদের দেশের দৃষ্টান্ত থেকেই বিষয়টিকে পরিস্ফুট করা যেতে পারে।

ভারতের দৃষ্টান্ত :

বুখারেস্ট সম্মেলনে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর করণ সিং ঘোষণা করেছিলেন যে, মাত্র বিগত পাঁচ বছরেই—অর্থাৎ চতুর্থ পরিকল্পনাধীন সময়ে (১৯৭০-৭৪) ভারত প্রতি হাজারে জন্মহার ৩৮ থেকে ৩৫এ নামিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছে, এবং এর ফলে ১ কোটি ৭০ লক্ষ জীবন মোট জনসংখ্যায় যোগ হয় নি। সুতরাং পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প সার্থক হয়েছে। কিন্তু কতটা? এখনও জন্মহার হল ৩ শতাংশের ওপর। যদি 'মা শীতলার দয়া' ইত্যাদিকে অপসারিত করা কাম্য বিবেচিত হয়—সভ্য জীবনের মানদণ্ড বলে ধরা হয় তবে এই জন্মহারে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার ২ শতাংশেরও ওপরে থাকবে, এমন কি আমাদের লক্ষ্য যে আগামী ১০ বছরে জন্মহার প্রতি হাজারে ২৫-এ নিয়ে আসা, তা সাধিত হলেও জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার কমবে না বলেই মনে হয়। কারণ স্বাভাবিক কারণগুলো আরও নিয়ন্ত্রিত হবে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

ধনী ও দরিদ্র দেশ :

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মহার প্রতি হাজারে ১৫। বর্তমানে ঐ দেশে গড়ে দুই শিশুর সংসারের (টু চাইল্ড ফ্যামিলি) আদর্শ প্রচার করা হচ্ছে। এই প্রচারে যদি বিশেষ ফলও ফলে তবুও কিন্তু ঐ দেশে জনসংখ্যাবৃদ্ধির বিশেষ হ্রাস ঘটবে না—চিকিৎসাবিদ্যা ও পরিবেশ উন্নয়নের ফলে লোকের গড় আয়ুষ্কাল আরও বেড়ে যাবে।

তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি সমৃদ্ধ দেশের সমস্যা অন্য প্রকৃতির ও মোকাবিলার যোগ্য। আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর সমস্যার সমাধান কি? পৃথিবীর ৪০০ কোটি লোকের মধ্যে প্রায় ৮৫ শতাংশই দারিদ্র্য সীমার নীচে তাদের বার্ষিক মাথাপিছু আয় ১৫০ ডলারেরও কম। জনবিস্ফোরণের জন্যই তারা যে দরিদ্র তা নয়, দারিদ্র্যও তাদের জনবিস্ফোরণের কারণ। সুতরাং তারা দুরতিক্রম্য চক্রে পতিত।

উপসংহার :

এতদিন পর্যন্ত মনে করা হোত যে, চিরাচরিত পদ্ধতিতে সম্প্রসারণের—অর্থাৎ পশ্চিমী ধরনের শিল্পায়নের মাধ্যমে এই দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব। এই পদ্ধতির কার্যকারিতা যে বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ বর্তমানে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই উঠেছে অন্যান্য দাবি : বিশ্বের সম্পদের ন্যায্য বণ্টনের, বিশ্বজনীন জনসংখ্যা পরিকল্পনার ইত্যাদি। পরবর্তী সংখ্যায় প্রথম দাবিটি সম্পর্কে আলোচনার ইচ্ছা রইল।

—শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়
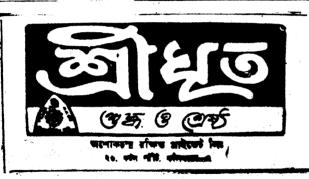
[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

আসলে তিনি ছোটবাবুকে সাহস দিচ্ছিলেন। সমুদ্র সম্পর্কে যতটা জ্ঞান গাম্য আছে—যা তিনি পড়াশোনা করেছেন—এবং কিছুদিন আগে কনটিকি অভিযানের সব পৃথিবী তোলপাড় করা খবর তিনি জানেন এবং সব ঘটনা, অর্থাৎ মহাসমুদ্রে সামান্য মানুষেরা ভেলায় চড়ে হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিলে কি কি অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয় তার একটা নিদারুণ ছবি তিনি ছোটবাবুকে দিতে পারতেন—কিন্তু ইচ্ছে করেই দিলেন না। কেবল বললেন, যদি কোনো অতিকায় হাঙর দেখ পেছন নিয়েছে—তাকে অনিষ্ট করার চেষ্টা করবে না। সমুদ্রের কোনো জীব অহেতুক হত্যা করবে না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাছ সমুদ্র থেকে তুলবে না। ছোট ছোট সব কাঁকড়া এইসব ক্রান্তীয় সমুদ্রে ভেসে বেড়ায়। খেতে বেশ সুস্বাদু। তোমাদের সংগে জল, কয়লা, এবং এই দ্যাখো লোহার উনুন, একেবারে পাটাতনের সংগে ফিট করা সব—সমুদ্রের দুলুনিতে যেন কিছু আবার ছিটকে পড়ে না যায়।

কাল সারাদিন কখন যে সারেংসাব সব করে রেখেছেন! তিনি এতটুকু সময় নষ্ট করেন নি। খেতে পরতে যা লাগে সব তিনি তুলে এনেছেন বোটে।

বনি উঠে আসছিল। চা-এর ট্রে হাতে। কাপ উপুড় করে সন্তর্পণে উঠে আসছে। কালো এপ্রণ, সাদা ফ্রক এবং সে গলায় বেশ সাদা পাথরের মালা পড়েছে। নীলাভ চোখে কি দীপ্তি। ছোটবাবু ইশারা করে বলল, আসছে।

সংগে সংগে হিগিনস প্রায় লাফ মেরে নামলেন নিচে। ছোটবাবুও নিচে নেমে গেল। ওরা বোটে হেলান দিয়ে চা খেতে খেতে তখন কত রকমের কথা বলতে থাকল—বনি, বাবা এবং ছোটবাবুর দিকে তাকিয়ে আছে। দ্বীপটার কি নাম, শহরে ক পাওয়া যায় কাপ্তান সব বানিয়ে বানিয়ে বলে যাচ্ছেন। সব আম জাম নারকেল গাছ আর লেবুর জংগল—আনারসের খেত—ঠিক সামোয়ার মতো দেখতে—সামনে তার দিগন্ত জোড়া বালিয়াড়ি—কি আনন্দ ছোটবাবু। খুব সাবধান আমাদের কথা গিয়ে ভুলে যাবে না। ওখানে পৌঁছে প্রথমে তোমরা খবরের কাগজের অফিসে দেখা করবে—তোমাদের কথা বলবে— আমাদের কথা বলবে—মিসিং জাহাজটায় তোমরা ক্রু ছিলে বলবে। কাপ্তান, বৃদ্ধ সারেঙ জাহাজটায় রয়ে গেছে। ওদের জন্য রেসকু চাই। তিনটে বোট ভেসে গেছে—ওরা ঠিক ঠিক......

বনি বলল, আমার ভাল লাগছে, না বাবা! মনটা আমার কেমন করছে!

—দূর বোকা মেয়ে—স্যালি হিগিনস সহসা যেন মুখ ফিরিয়ে সমুদ্রে ঝুঁকে পড়লেন। বললেন, ছোটবাবু বোটে একটা ক্রস তুলে নাও। অন্য ক্রসটা, এস এদিকে এস। তিনি কাপ বনির হাতে দিয়ে এগুতে থাকলেন।

বনি বলল, বাবা ক্রসটা কেন?

—বুঝতে পারছ না, সমুদ্রে কত রকমের অপদেবতা থাকে। শয়তান থাকে। অশুভ প্রভাব থাকে। তাদের হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করতে হলে আর কি দিতে পারি। ক্রসটা মাঝখানে থাকবে। তিনি বলতে চাইলেন মহাসমুদ্রের অন্তহীন এই যাত্রায় মৃত্যু প্রায় অনিবার্য—তবু শুভ প্রতীকের মতো অথবা ইশ্বরের সেই অমোঘ বাণী খোদিত আছে যেন ক্রসটার গায়ে—সেই কঠিন বিভীষিকায় ভেতর মৃত্যু যত অনিবার্য হয়ে উঠবে—তত এই ক্রস সব অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত রাখবে বনির মৃতদেহ—অর্থাৎ তিনি যেন জানেন, বোট ভাসতে ভাসতে কোথায় চলে যাবে—অযথা পাগল বাতাস লাগলে [illegible] কি জানে এবং যখন কিছু জানা নেই মৃত্যু অনিবার্যতার সামিল এবং সে [illegible] কঠিন মৃত্যুর দশা, চোখের [illegible] দেখার তার সাহস নেই ছোটবাবুকে দিয়ে দূরে পাঠিয়ে তিনি এলিসের ক্রূরতার হাত থেকে রেহাই পেতে চাইছেন। সংগে একটা ক্রস থাকলে কবর ভূমির ওপর কোনো দিন কেউ যদি বনির ক্রসটা পুঁতে দেয়। অথবা ক্রসের নিচে শুয়ে আছে বনি।

তিনি বনির দিকে এখন তাকাচ্ছেন না। যতটা দ্রুত সম্ভব ওদের নামিয়ে দিতে পারলে তিনি বেঁচে যান। জাহাজ এবং সেই পাহাড় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। অথবা সেই অতিকায় ক্রসটা—প্রায় দুটো ষাঁড় লড়ার মুখে মনে হয়। এবং আকাশে খন্ড খন্ড মেঘ। সারেং সব তুলে যা যেখানে দরকার রেখে দিচ্ছেন। কাপ্তান ক্রসটা কাঁধে বয়ে আনলেন। ক্রসটা মাঝখানে শুইয়ে রাখা হল। অন্য ক্রসটা ছোটবাবু এবং কাপ্তান মিলে জাহাজের মাথায় পুঁতে দিচ্ছে। লোহাড় বড় বড় প্যারেক পুঁতে ওটাকে জাহাজে দাঁড় করিয়ে কিছুটা ভয় থেকে মুক্ত হবার মতো তিনি চিৎকার করে ডাকলেন—সারেং।

সারেং কাছে এসে দাঁড়ালে ডাকলেন, বনি!

বনি কাছে এলে বললেন, সব তুলে দিয়েছ।

বনি ফের কেবিনে ঢুকে ওর শেষ সম্বল দুটো বর্শা এবং অক্সিজেন সিলেন্ডার তুলে দিল বোটে। তিনি বললেন, খুব রোদ উঠলে হুড তুলে দেবে। নিচে দুজনের মতো শোবার জায়গা আছে। হুড খুলে দিলে কতটা জায়গা তাও দেখিয়ে দিলেন। কোথায় কি রেখেছেন বনিকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। কোথায় ওদের ক্রাচেস বোট-হুক, প্যাডেল, বাকেট বেলচা সব ঠেলে ঠেলে দেখিয়ে দিলেন। কম্পাস, কুড়োল ল্যাম্প ম্যাচেস কোথায় কিভাবে রেখেছেন দুজনকেই দেখিয়ে দিলেন। পালের মাস্তুল বোটের কিনারায় ঝুলিয়ে রেখে। তবে কিছুটা তোমাদের জায়গা হবে। ছোটবাবুকে [illegible] বললেন, এই দ্যাখো [illegible]

থাকল। মাথায় সি-এংকোর। প্যাকানের মতো এরিয়্যাল-অয়েল রেখে দিয়েছি। হাত-পাম্প কোথায় রাখলাম আবার! তিনি জলের ড্রামের পেছনে উঁকি দিলেন। আরে এখানেই তো রেখেছি! না, সেই দূরের পাহাড় আর কাছে আসছে না। মাথায় জাহাজের ক্রস তুলে দিয়ে তিনি সব অশুভ ভয় থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন। *বেশ নিশ্চিন্তে তিনি খুঁজছেন যেন। --এই তো* হাত-পাম্প। এই হচ্ছে বিস্কুটের টিন, বার্লি চিনি সব ষোল আউন্সের মতো করে আছে। এগুলোতে প্রথমে হাত দেবে না।

ছোটবাবু দেখল, স্যালি হিগিনস নিজের কথায় নিজে ধরা পড়ে যাবেন। সে তাড়াতাড়ি বলল, স্যার সিগনালিং টর্চ কোথায় রেখেছেন।

সারেঙ বললেন, ওপরের দিকে আছে! এই দ্যাখ বলে তিনি সিগনেলিং টর্চ-রকেট-প্যারাসুট, ফ্লাস-লাইট সব এক এক করে তুলে দেখালেন। এখানে ফাস্ট-এড, একটা ছোট কাঠের বাকসের ভেতরে রেখেছেন, কোরামিনের ফাইল। জীবন ধারণের শেষ প্রয়াস এটা খুব যত্নের সঙ্গে কাঠের বাকসে মানুষের আত্মার মতো বন্দী করে রেখেছেন সারেঙ। তিনি বোটে ছুটে ছুটে যাচ্ছিলেন বলে, বোট দুটো ডেবিডের মাথায় বেশ দুলছিল, ডেবিড দুটো কাত করে দিলেই বোট নিচে ঝুলে পড়বে। তারপর উইনচ চালিয়ে শুধু দড়ি ছেড়ে দেওয়া। কপিকলে ঝুলে থাকা বোট ধীরে ধীরে নেমে যাবে। পাল তিনি মাস্তুলে পরিয়ে একেবারে ঠিকঠাক করে শেষবারের মতো নেমে এলেন। এখন বোধহয় বোট নামিয়ে দেওয়া হবে।

সারেঙ-সাব ছোটবাবুকে বললেন, তোর আর কিছু পড়ে থাকল না তো।

ছোটবাবু ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে পড়ছে। সে চোখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত পারছে না। এই ছোট্ট বোট নিয়ে এমন অকূল সমুদ্রে একা ভেসে পড়া—কি যে কঠিন আর ভয়াবহ—তার হাত পা যত সময় এগিয়ে আসছে তত যেন ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে—বনি প্রায় অবলার মতো—এবং সে *একা থাকলে তবু দায়িত্ব কম—নিজের জন্য চিন্তা-ভাবনা তার তত নয়, এই মেয়েটা* ফুলের মতো মাত্র ফুটে ওঠা মেয়েটা জানে না, সামনে কি নিদারুণ সমুদ্র হাঁ করে আছে। তার ভেতর ঢুকে গেলে পৃথিবীর কোনো মানুষের সাধ্য নেই ফের তাকে আবিষ্কার করে—তখন কিনা সারেঙ-সাব তার কি আর পড়ে আছে জিজ্ঞাসা করছেন—সব জেনে কেন এমন করছেন তাঁরা। কি হবে কিছু পড়ে থাকলে। সে দাঁত চেপে বলল, সরুন এখান থেকে, সামনে থেকে সরে যান! সরে যান বলছি! আপনারা আমাকে কি পেয়েছেন।

স্যালি হিগিনস তখন কাঁধে হাত রাখলেন ছোটবাবুর। তাকে খৃস্টের গল্প শোনালেন। বললেন, ছোটবাবু স্ট্রাগল ইজ দা প্লেজার। এত সহজে ভেঙে পড়লে চলবে কেন! বনি আসছে। তিনি মুহূর্তে গলার স্বর পাল্টে ফেললেন। সতর্ক হয়ে গেলেন খুব। ছোটবাবুকে টিপে দিলেন।

ক্যাপ্টেন এবার হাঁকলেন, বনি! বনির দিকে তাকিয়ে আর একটা কথা বলছেন না। বনি কিছুতেই বাবার মুখ দেখতে পাচ্ছে না। সে বলল, এই তো আমি।

—ওপরে উঠে বসো।

—ছোটবাবু!

—দড়ি ধরে নেমে যাবে। আমরা দুজনে বোট হারিয়া করতে পারব না। স্থির এবং ভীষণ গম্ভীর গলা। বনি আর একটা কথা বলতে পারল না। সে লাফ দিয়ে বোটে উঠে বসল। পাটাতনে একটা ম্যাট্রেস পেতে নিতে পার। তিনি বনিকে যেন বলছেন না। অন্য কাউকে। বনি এখনও বাবার মুখ দেখতে পাচ্ছে না। সে সেই দুঃসময়ের মতো, মা চলে যাবার পর যেমন অসহায় গলায় ডাকত, বাবা, তেমনি ডেকে উঠল বাবা।

কিন্তু স্যালি হিগিনস তখন ডেবিডের গোড়ায় গিয়ার খুলে প্রায় ছোটবাবুর সঙ্গে সঙ্গে ডেবিডের মাথা এগিয়ে ধরলেন, ছোটবাবু তখন চিৎকার করছে, বনি শক্ত করে ধরো, না হলে পড়ে যাবে—বোট ভীষণ দুলছে। বনি বোটের একটা দিক ভীষণ জোরে চেপে ধরে আছে। বোট দুলে দুলে নেমে নেমে গেছে সে যেন নিচে না পড়ে যায়। এবং উইনচ ছেড়ে দিলে হড়হড় করে বোট নিচে নেমে যেতে থাকল। বনি তখনও ডাকছে, বাবা বাবা! তুমি আমার সঙ্গে কথা বলছ না কেন! আমার ভীষণ ভয় করছে! এবং ছোটবাবু দেখল বোট জলে নেমে গেছে, সে তাড়াতাড়ি দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল নিচে। দড়ি বেয়ে বেয়ে নেমে যেতে থাকল। বোট সরে যাচ্ছিল—আর সে *চিৎকার করছে, বনি দড়ি টেনে রাখ। আমি* পড়ে যাব সমুদ্রে। বনি তখনও চিৎকার করছে বাবা, তুমি কোথায়? তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন! বনির খেয়াল নেই বোট নিচে নেমেই জাহাজের পাশে থাকছে না। ঢেউ খেয়ে ছিটকে দূরে সরে গেছে। ছোটবাবু তেমনি দড়িতে ঝুলে ডাকল, বনি দড়ি টেনে ধরো প্লিজ। কি করছ তুমি! তোমরা সবাই মিলে আমাকে কি পেয়েছ।

বনি এবার কেমন নিচে তাকালে দেখল ছোটবাবু দড়িতে ঝুলে আছে। পা প্রায় কিছুটা সমুদ্রের জলে ডুবে গেছে। ঢেউ এলে ওর সবটা ডুবে যাবে। সে তাড়াতাড়ি এবার দড়ি টেনে ধরলো বোট ছোটবাবুর কাছে এগিয়ে গেল। ছোটবাবু বোটে লাফ দিয়ে পড়লে বনি অতি করুণ গলায় ডেকে উঠল বাবা তোমরা আমাদের কোথায় পাঠিয়ে দিচ্ছ! বাবা আমি তোমাকে আর দেখতে পাচ্ছি না কেন!

ছোটবাবু আর বিন্দুমাত্র দেরি করল না। সে বোটের গুড়াতে মাস্তুল বসিয়ে দিল। তারপর সব রিং পরিয়ে পাল টানিয়ে দিল বোটে। লাল রংয়ের শালুর তেকোণা পাল, ছাড়ার মতো হাওয়ার টান ধরলেই নিমেষে বোট চঞ্চল হয়ে উঠল। ছোটবাবু এক হাতে দড়ি সামলাচ্ছে, অন্য হাতে বোটের হাল ধরার জন্য ছুটে যাচ্ছে। পালের দড়ি আলগা বলে এক দিকে বোট একেবারে হাওয়ায় কাত হয়ে গেছিল। এবং সে দেখল, বনি প্রায় ছিটকে ওদিকে পড়ে গেছে। এবং এখন ওর এ-সব দেখার সময় নয়। ভীষণ দ্রুত সে দড়ি বোটের হুকে বেঁধে দিতেই এবার বোট সোজা হয়ে গেল। আর তখনই জাহাজ ডেকে স্যালি হিগিনস প্রায় দু' হাত আকাশে তুলে চিৎকার করে উঠলেন, এমমানুয়েল— আমাদের সহিত ঈশ্বর। বনির গলায় সেই অসহায় স্বর আর তিনি শুনতে চান না। বোট যত এগিয়ে যাচ্ছে, দূরে সরে যাচ্ছে তত তিনি চিৎকার করে হেঁকে যাচ্ছেন—এমমানুয়েল, আমাদের সহিত ঈশ্বর এমমানুয়েল, আমাদের সহিত ঈশ্বর বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তিনি হাঁটু মুড়ে রেলিংয়ের ধারে বসে পড়লেন—তারপর হা হা করে হারিয়ে যাওয়া ছোট শিশুর মতো মাঠে বসে কান্না। সব হারিয়ে তিনি হা হা করে কাঁদছেন। সারেং-সাব পাশে মাথা গুঁজে বসে আছেন। তিনি কি বলে সান্ত্বনা দেবেন বুঝতে পারছেন না।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

চন্দ্রকেতুগড়ের যক্ষিণী

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

সুপ্রাচীন চন্দ্রকেতুগড় আজ আর পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। মাটির গভীরে আবিষ্কৃত পুরাকালের মানব-বসতির আশ্চর্যজনক বেসাতি নিয়ে গড়চন্দ্রকেতু বা বারাসাত মহকুমার বেড়াচাঁপা অঞ্চল চব্বিশ পরগণা তথা নিম্ন-গাঙ্গেয় বঙ্গের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় এক অফুরন্ত বিস্ময়।

বিগত অর্ধশতকের বিভিন্ন সময়ে এ-অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে দীর্ঘ অঞ্চল বিস্তৃত প্রাচীন গড় ও সমৃদ্ধ জনপদের ধ্বংসাবশেষ, তথাকথিত গুপ্তযুগে নির্মিত বিশাল মন্দিরের ভিত্তিভূমি, প্রাচীন কালের অজস্র লাঞ্ছনাময় মুদ্রা, বিচিত্র বর্ণ ও আকৃতির কৌশল ও মালাদানা, বিভিন্ন মোটিফযুক্ত অসংখ্য পোড়ামাটির মূর্তি পুতুল ও ফলক।

গড়চন্দ্রকেতু ও সন্নিহিত অঞ্চলে আবিষ্কৃত অসংখ্য মাটির মূর্তি পুতুল ও ফলকগুলির মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল বিভিন্ন পরিচয় ও পরিসরের দেবী-প্রতিম যক্ষিণী মূর্তিগুলি। বিচিত্র সুললিত কবরীবিন্যাস, সলিল-স্বচ্ছ অঙ্গা-বরণ, মেখলাভারে উদ্ভাসিত যৌবনভার বিকচ বরতনু ও সূক্ষ্ম কারুকার্যময় অলংকার-চিহ্নের সমারোহে প্রোজ্জ্বল এ-সকল অনুপমা অপ্সরা বা যক্ষিণী মূর্তি-গুলি গড়চন্দ্রকেতুর প্রাচীন সমাজ ধর্ম ও শিল্পবোধের এক অনন্যসাধারণ অভিব্যক্তি।

এসকল অপূর্ব সুষমামণ্ডিত যক্ষিণী মূর্তি ছাড়া, এ-অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে কয়েকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সুপ্রাচীন মাতৃকা মূর্তি ও টেরাকোটা ফলকে উৎকীর্ণ বিভিন্ন রমণ-ভঙ্গিমায় সম্ভোগরত অজস্র মিথুন-মূর্তি। কোন কোন গবেষকের মতে অসংখ্য যক্ষিণী মূর্তির সঙ্গে এসকল মাতৃকা মূর্তি ও অজস্র মিথুন-ফলকের আবিষ্কার সে ধূসর অতীতে নিম্ন-গাঙ্গেয় বঙ্গের নরসমাজে যক্ষিণী উপাসনার গুরুত্বকে নতুন পরিসরে উদ্ভাসিত করেছে।

চন্দ্রকেতুগড়ে বিভিন্ন সময়ে আবিষ্কৃত যক্ষিণী মূর্তিগুলি দেশ-বিদেশের বহু সংগ্রহশালার গৌরব বৃদ্ধি করে চলেছে। বিভিন্ন সংগ্রহশালায় রক্ষিত এসকল অপূর্ব সুষমামণ্ডিত যক্ষিণী মূর্তিগুলির পরিচয় নির্ণয় বা আঙ্গিক সৌষ্ঠব বিশ্লেষণের বিশেষ কোন প্রচেষ্টা আজও হয়নি। আনন্দকুমার স্বামী, স্টেলা ক্রামরিশ, জন-স্টন প্রমুখ পুরাতত্ত্ববিদরা কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে দেশ ও বিদেশের সংগ্রহশালায় রক্ষিত কয়েকটি যক্ষিণী মূর্তির উপর কিছু কিছু আলোকপাত করেছেন। কিন্তু অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত অজস্র যক্ষিণী মূর্তি অধিকাংশই রয়েছে কিছু কিছু গবেষক ও পুরাবস্তু-সংগ্রহকারীর বা ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায়। এসকল মূর্তির মধ্যে কতগুলি অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য।

চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত যক্ষিণী উৎকীর্ণ অপূর্ব সুষমামণ্ডিত মৃন্ময় ভাস্কর্যগুলি সুঙ্গ-কুষাণ যুগের শিল্পশৈলীর অন্যতম নিদর্শন বলে অনেকে মনে করেন। জনৈক প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে (দ্রঃ অতীতের সমাধি চন্দ্রকেতুগড়—শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত ; গড়-চন্দ্রকেতু কথা, পৃঃ ৪২-৪৩) মৌর্য-

পঞ্চচূড় যক্ষিণী - সুঙ্গযুগ

যক্ষিণী—মৌর্যযুগ

পঞ্চচূড় যক্ষিণী

যক্ষিণী—সুঙ্গ যুগ

যক্ষিণী চন্দ্রপ্রভা

ভাস্কর্যের নারী মূর্তির বেশভূষায় যে 'মর্যাদাবোধ ও সংরক্ষণশীল পারিপাট্য' প্রতিফলিত হয়, তা এসকল সূক্ষ্ম বসনের আবরণে ও মেখলাভারে উদ্ভাসিত সুর-সুন্দরীদের রূপমাধুরীতে অনুপস্থিত। তাছাড়া, তিনি মনে করেন, চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত টেরাকোটা যক্ষিণী ও অপ্সরা মূর্তি-গুলির শিল্পরীতি ও বিশেষ করে কবরী-বিন্যাসে একটি সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। উপরন্তু তাঁর মতে বিভিন্ন যুগ-পরম্পরায় এই প্রেরণায় বৈচিত্র্য দেখা দিলেও মূল অনুভূতিটি যেন সর্বদাই অব্যাহত।' তবে চন্দ্রকেতু-গড়ের শিল্পকর্ম আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর পরস্পরবিরোধী দুটি মন্তব্য প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় অভ্রান্ত বিভ্রান্তিকর ও বিপজ্জনক। তিনি মনে করেন, চন্দ্রকেতু-গড়ের 'যক্ষিণীদের রূপায়ণে প্রদর্শিত হয়েছে দিব্য সৌন্দর্যের অপার্থিবতা' ও প্রতিফলিত হয়েছে 'এক কুণ্ঠাহীন শ্রদ্ধা ও অভীপ্সা'। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, একই আলোচনায় অন্যত্র তিনি অনুমান করেছেন যে, এসকল মূর্তিশিল্পের 'আঙ্গিকগত বিবর্তনে ও সংশ্লিষ্ট সৌন্দর্যানুভূতিতে প্রচ্ছন্ন আছে অতীতের বিলাসিনী নাগরিকা-দের শিল্পমানস ও প্রগতিশীল জীবন-বোধ।'

চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত টেরাকোটা যক্ষিণী মূর্তিগুলির শিল্পরীতি ও সময়কাল নির্ণয় সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে এ-সকল বদ্ধমূল ও বিভ্রান্তিকর ধারণাগুলির তথ্যগত আলোচনা প্রয়োজন।

চন্দ্রকেতুগড়ে আবিষ্কৃত সকল যক্ষিণী মূর্তিই সুঙ্গ-যুগের কিনা তা আজ হলফ করে বলা চলে না। অধিকাংশ মূর্তিগুলি সুঙ্গ-কুষাণ যুগের হলেও, এ-অঞ্চলে প্রাপ্ত যক্ষিণী মূর্তিগুলির কয়েকটিতে মৌর্য যুগের নির্মাণ-কৌশল ও শিল্প-শৈলীর চিহ্ন সুস্পষ্ট। চন্দ্রকেতুগড়ের সূক্ষ্ম বসনাবৃত যৌবনভার বিকচ যক্ষিণী মূর্তিগুলির রূপায়ণে তথাকথিত মৌর্য-ভাস্কর্যের নারীমূর্তির বেশভূষায় প্রতি-ফলিত 'মর্যাদাবোধ' ও 'সংরক্ষণশীল পারিপাট্য' ব্যাহত হয়েছে এমন কথাও ভরসা করে বলা চলে না। দেব-দেবীর ভাব-মূর্তির বাস্তব রূপায়ণে নগ্ন বা নগ্ন-প্রায় দেহসৌষ্ঠব প্রদর্শনের মধ্যে মর্যাদা-বোধের ও সংরক্ষণশীলতার অপ্রতুলতার সন্ধান লাভ করা, ভারতীয় কান্তি-চেতনার বিকৃত উপলব্ধির নামান্তর মাত্র। চন্দ্র-কেতুগড়ের যক্ষিণী মূর্তিগুলির রূপায়ণে, বিশেষ করে কবরীবিন্যাসে, শুধুমাত্র সর্ব-ভারতীয় শিল্পরীতির প্রভাব রয়েছে কিনা তা বিশেষ গবেষণাসাপেক্ষ। চন্দ্রকেতুগড় তথা নিম্ন-গাঙ্গেয় বঙ্গের অন্যান্য প্রত্ন-স্থল, হরিনারায়ণপুর, বোড়াল, আটঘরা, তমলুক, দেউলপোতা প্রভৃতি স্থানে বেশ কয়েকটি যক্ষিণী বা অপ্সরা মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলির কবরীবিন্যাসে সুস্পষ্টভাবে আঞ্চলিক ও মিশরীয় রীতির প্রভাব লক্ষণীয়। তাছাড়া এসকল অঞ্চলে প্রাপ্ত টেরাকোটা যক্ষিণী মূর্তি রূপায়ণে সর্বভারতীয় বা মধ্যপ্রাচ্যের শিল্পরীতির সকল অনুকরণকে অবদমিত করে মূর্তি-দেহের আঙ্গিক সৌষ্ঠব অঙ্গাবরণ ও অলংকার চিহ্নে প্রকটিত হয়েছে বাংলার নিজস্ব শিল্পরীতি। চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত যক্ষিণী বা অপ্সরা মূর্তিগুলির রূপায়ণে 'দিব্য সৌন্দর্যের অপার্থিবতার' সঙ্গে 'বিলাসিনী নাগরিকাদের শিল্পমানস ও প্রগতিশীল জীবনবোধের', অথবা যক্ষিণী মূর্তি রূপায়ণে 'কুণ্ঠাহীন শ্রদ্ধার' প্রতি-ফলনের সঙ্গে 'মর্যাদাবোধের অপ্রতুলতার' সহাবস্থান অহি-নকুল মৈত্রীর মত এক উদ্ভট ফরমুলা।

ভারতীয় ধর্মচেতনায় যক্ষিণী উপা-সনার উদ্ভব নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মত-পার্থক্য থাকা অস্বাভাবিক নয়। তবে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে যক্ষিণী মূর্তি-গুলি প্রজননের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বা উর্বরতার প্রতীক। কোন কোন মূর্তিতত্ত্ব-বিশারদের মতে (দ্রঃ জিতেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যো-পাধ্যায় — 'পঞ্চোপাসনা' — পৃঃ ৬—৮) প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও প্রত্নতত্ত্ব অনুশীলন করে সহজেই অনুমিত হয়, অন্যান্য ব্যন্তর দেব-দেবীর মত যক্ষিণী মূর্তিগুলিও ছিল ইতর সাধারণ জনেরই ভক্তি বা পূজার পাত্র। বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থসমূহে অবৈদিক দেব-দেবীকেই সাধা-রণতঃ 'ব্যন্তর' দেবতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে (দ্রঃ দেবতত্ত্ব গ্রন্থমালা ১ম খণ্ড— 'সরস্বতী' — শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সংকলিত)। প্রাচীন ভারতে অন্যান্য 'ব্যন্তর' দেবদেবী উপাসনার সঙ্গে যক্ষিণী উপাসনারও ব্যাপক প্রচলনের প্রচুর প্রত্ন-তাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। আনু-মানিক খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় বা প্রথম শতকে নির্মিত ভরহুত, সাঁচী প্রভৃতি স্তূপ-বেষ্টনী গাত্রে উৎকীর্ণ দেব-দেবীর মূর্তির মধ্যে বেশ কয়েকটি যক্ষিণী মূর্তিও আছে। খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে রচিত 'মহামায়ূরী' নামক বৌদ্ধ গ্রন্থ অনু-যায়ী ভগবান তথাগতের উপাসনা প্রবর্তনের পর অন্যান্য ব্যন্তর দেব-দেবীর সঙ্গে যক্ষিণী মূর্তিগুলিও বুদ্ধপূজক হিসাবে কল্পিত হত। ভক্তির আদিম রূপ 'তামস ভক্তি'র যে উল্লেখ ভগবদ্‌গীতায় পাওয়া যায় তার উদ্ভব খুব সম্ভবতঃ যক্ষ-যক্ষিণী, নাগ-নাগিণী প্রভৃতি ব্যন্তর দেব-দেবীকে কেন্দ্র করেই। সুঙ্গ-কুষাণ যুগে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে ব্যাপকভাবে যক্ষিণী উপাসনা প্রচলনের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে। ভাব ও রূপভেদে বিভিন্ন প্রকার যক্ষিণী মূর্তির উদ্ভবের পরিচয়ও এ-সময় পাওয়া যায়।

নিম্ন-গাঙ্গেয় বঙ্গের ইতিহাসের সে ধূসর অতীতে চন্দ্রকেতুগড় ও অন্যান্য প্রত্নস্থলের সুপ্রাচীন মানবসমাজে এক-কালে যক্ষিণী উপাসনার যে বহুল প্রচলন দেখা দিয়েছিল, তা নিয়েও বিশেষজ্ঞরা নানা যুক্তির অবতারণা করে থাকেন। কোন কোন গবেষকের মতে তৎকালীন বাংলার লোকবসতির স্বল্পতার জন্যে মিথুন ফলকগুলির মত যক্ষিণী মূর্তি উৎকীর্ণ ফলকগুলিতে ব্যাপক প্রচলনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁদের মতে (দ্রঃ চন্দ্রকেতু-গড়ের মিথুন ভাস্কর্য—গৌরীশংকর দে : গড়চন্দ্রকেতুর কথা—পৃঃ ৫৭) বাংলার ঘরে ঘরে যক্ষিণী উপাসনার ব্যাপক প্রসার অকারণে হয়নি। প্রজননের দেবী যক্ষিণীর উপাসনায় 'সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি পাবে, জাগতিক উন্নতি হবে এই ছিল সেকালের মানুষের বিশ্বাস।' কিন্তু সেকালে জন-সংখ্যা বৃদ্ধির এই সামাজিক কামনার উদ্দেশ্য বিশ্লেষণে এসকল গবেষকগণ দুর্বোধ্য মৌনতা অবলম্বন করেছেন।

প্রাক্-খৃষ্টীয় কাল থেকে খৃষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতক পর্যন্ত নিম্ন-গাঙ্গেয় উপত্যকার বিভিন্ন অঞ্চলে বর্ধিষ্ণু নগর-সভ্যতার সম্প্রসারণের বিস্তৃত নিদর্শন মাটির গভীরে আবিষ্কৃত হয়েছে। বিস্তৃত অঞ্চল অরণ্যমুক্ত করে নগর-সভ্যতার এ-সম্প্রসারণকালে কি জনসংখ্যার স্বল্পতা বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছিল? অথবা সম-কালীন মাগধীয় রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের বিরুদ্ধে, দীর্ঘস্থায়ী ও কার্য-করী প্রতিরোধ সংগঠনে বিপুল জনসংখ্যার প্রয়োজন ছিল? কিংবা সম্পদ ও খাদ্য-প্রাচুর্যের পটভূমিকায় নিছক 'ধনেজনে-পুত্রেপৌত্রে' জমজমাট সংসারের কল্পনায় প্রজননের দেবী যক্ষিণী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন? এ-অঞ্চলে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যক্ষিণী উপাসনার প্রসার হওয়াও বিচিত্র নয়।

বর্তমানে কোন কোন গবেষকের মতে চন্দ্রকেতুগড় প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাপ্ত যক্ষিণী মূর্তি ও মিথুন ফলকগুলি পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। তাঁদের মতে, 'এরা একই সামাজিক উদ্দেশ্য ও উৎস-প্রসূত' এবং এসকল মূর্তি বা ফলকের সাধারণ লক্ষণ হল 'যৌন অকপটতা' (দ্রঃ চন্দ্রকেতুগড়ের মিথুন ভাস্কর্য — গৌরী-শংকর দে)। এসকল গবেষকগণ মনে করেন, 'যক্ষিণী মূর্তিগুলি উর্বরতার প্রতীক, প্রজননের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাই এঁরা ছিলেন সেকালের বাংলার গৃহদেবী। সন্তান বৃদ্ধির কামনায় গৃহস্থ এঁদের পূজো করতো। আর মিথুন ফলকগুলির উদ্দেশ্য হয়ত ছিল যৌনক্রিয়া তথা সন্তান-উৎপাদনকে উৎসাহিত করা।'

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় মহা-সমরোত্তর যুগের তথাকথিত অপসংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে আনুমানিক খৃষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকের এসকল যক্ষিণী মূর্তি ও মিথুন ফলকের উদ্দেশ্য, উৎস ও লক্ষণের সমীকরণ যতই স্বাভাবিক বলে মনে হোক, ভারতীয় মূর্তিতত্ত্বের ইতিহাসে বা সৌন্দর্যতত্ত্বের [illegible] [illegible]-হীন ও বিকৃত চিন্তার কোন সমর্থন

পাওয়া যায় কিনা তা বিশেষ গবেষণা-সাপেক্ষ।

চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত যক্ষিণী মূর্তি ও মিথুন ফলকগুলি একই সামাজিক উদ্দেশ্য ও উৎসপ্রসূত অথবা এসকল মূর্তি বা ফলকের সাধারণ লক্ষণ যৌন অকপটতা, এমন কথা বোধহয় কোন প্রতিষ্ঠিত যুক্তি বা তথ্যের উপর নির্ভর করে বলা চলে না। যক্ষিণী মূর্তিগুলি উর্বরতার প্রতীক, প্রজননের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—এ-বিষয়ে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু সেকালে বাংলার গৃহস্থ শুধুমাত্র সন্তান-বৃদ্ধির কামনায় এঁদের পুজো করতো এমন কোন অকাট্য শাস্ত্রীয় বা প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। উর্বরতা বা প্রজননের প্রতীক বলতে শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনকেই নির্দেশ করে না। সকল প্রকার সৃজনীমূলক শক্তিকেও চিহ্নিত করে। 'সেকালের বাংলার গৃহ-দেবীর উপাসনায় শুধুমাত্র কি সন্তান-সংখ্যাই বৃদ্ধি হত—না ধনে জনে পরিপূর্ণ সংসারের কামনায়, সকল অকল্যাণ প্রতি-রোধে গৃহস্থ দেবীপ্রতিম যক্ষিণী আরা-ধনায় ব্রতী হতেন? যক্ষিণীর উপাসনা শুধুমাত্র সম্পদ ও সন্তান বৃদ্ধির কামনা-তেই হত এমন কথা কি ভরসা করে বলা চলে? তিনি ছিলেন খুব সম্ভবতঃ সৃষ্টি-ধর্মী মননেরও অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ভারতীয় দেব-দেবী মূর্তি কল্পনার বিবর্তনে যক্ষ-যক্ষিণী প্রভৃতি 'কাল্টের' মূল্যবান ভূমিকার কথা নির্দেশ প্রসঙ্গে আনন্দকুমার স্বামী মনে করেন যে, গণেশ, কার্তিকেয় সরস্বতী, ইন্দ্রাণী প্রভৃতি বিগ্রহ যক্ষ-যক্ষিণী উপাসনা হতে আহরিত হয়েছিল। মিথুন ফলকের মত চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত অসংখ্য যক্ষিণী মূর্তিগুলির সাধারণ লক্ষণ 'যৌন-অকপটতা' এমন কথাও ভরসা করে বলা চলে না। নগ্ন বা নগ্নপ্রায় যক্ষিণী মূর্তি-গুলি দেবীপ্রতিম যক্ষিণীর উর্বরতা ও প্রজনন শক্তির সম্পর্ক ভাবমূর্তির বাস্তব রূপান্তর মাত্র। দেবীমহিমার সার্থক বাস্তব রূপায়ণের জন্য দেবী বিগ্রহের বিশেষ অঙ্গ সমূহ পুষ্ট ও বিশিষ্ট রূপে চিহ্নিত হয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গীর অস্বচ্ছতার দরুন মূর্তিকলার এই সিম্বলিক এক্সপ্রেশনটুকু 'যৌন অকপটতা' রূপে দূষিত হয়েছে। যক্ষিণীদেহের পীবর পীনস্তন ও পৃথুল জঘনা যৌন অকপটতাকে প্রকটিত করে না। পীবর পীনস্তন প্রাণপ্রাচুর্য ও পৃথুল জঘনা মাতৃত্ব ও উর্বরতার প্রতীক—

> "The large hips denote maternity, fertility and the breasts the bounty of life".
>
> (দ্রঃ Zimmer — Art of Indian Asia, Page 69).

তা ছাড়া, চন্দ্রকেতুগড়ের মিথুন ফলক-গুলির সঙ্গে যক্ষিণী উপাসনার মত সামাজিক উদ্দেশ্য সন্তান বৃদ্ধি করা বা সন্তান উৎপাদনে উৎসাহিত করার কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ আছে কি না তা সন্দেহ। মিথুন ফলকের মূল উদ্দেশ্য ছিল কামভাব বৃদ্ধি করা ও দেহ-সম্ভোগকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পরিণত করা। এ সকলের সঙ্গে সন্তান উৎপাদনের কোন উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত নয়। চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত মিথুন ফলকগুলির মধ্যে এমন কয়েকটি বিকৃত রুচির রমণ-ভঙ্গিমার পরিচয় পাওয়া যায় যা মোটেই সৃষ্টিধর্মী নয়। এ সকল আসনগুলি নিতান্তই বিকৃত কামাবেগের পরিণতি। চন্দ্রকেতুগড়ের কয়েকটি মিথুন ফলকে 'ঔপরিষ্টক' প্রথার নিদর্শন পাওয়া গেছে (দ্রঃ চন্দ্রকেতুগড়ের মিথুন ভাস্কর্য—গৌরীশংকর দে)।

চন্দ্রকেতুগড়ে আবিষ্কৃত বিভিন্ন পরিচয় ও পরিসরের অসংখ্য টেরাকোটা যক্ষিণী মূর্তিগুলি খুব সম্ভবতঃ শুধুমাত্র দেবী বিগ্রহরূপে অর্চনার জনাই ব্যবহৃত হত না। কয়েকটি যক্ষিণী মূর্তি উৎকীর্ণ ফলকের শীর্ষদেশে বা উভয় পার্শ্বপ্রান্তে বৃত্তাকার ছিদ্র-চিহ্ন বর্তমান। অনুমান করা যায় এ সকল টেরাকোটা ফলকগুলি হয়ত কোন-প্রকার তীক্ষ্ণ শলাকা দ্বারা দেয়ালগাত্রে, দ্বারবাজু বা স্তম্ভগাত্রে সংস্থাপিত হত। একদিকে এ সকল সুন্দর ফলকগুলি যেমন গৃহালংকরণের উপকরণ রূপে ব্যবহৃত হত, তেমনি অন্যদিকে এগুলি ছিল সকল শুভ ও প্রাচুর্যের প্রতীক। টেরাকোটা ফলক ছাড়া, চন্দ্রকেতুগড়ে আবিষ্কৃত অসংখ্য বিচিত্র ও বিভিন্ন মোটিফযুক্ত টেরাকোটা ক্রীড়নকের মধ্যে কতকগুলিতে অন্যান্য দেব-দেবীর মূর্তির মত যক্ষিণী মূর্তিও উৎকীর্ণ দেখা যায়। খুব সম্ভবতঃ এককালে যক্ষিণী উপাসনা সমাজ-জীবনে যে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হয়েছিল ও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এ সকল তারই নিদর্শন।

সুপ্রাচীন চন্দ্রকেতুগড়ে আবিষ্কৃত অসংখ্য টেরাকোটা যক্ষিণী মূর্তিগুলির মধ্যে কতকগুলির বিচিত্র পরিচয় ও আঙ্গিক সৌষ্ঠব যে কোন গবেষককে বিস্মিত ও মুগ্ধ করে। এ সকল মূর্তিগুলির মধ্যে খুবই প্রাচীন একটি মূর্তির নির্মাণ কৌশল ও আঙ্গিক সৌষ্ঠবে মৌর্য শিল্প-রীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। মৃদু রক্তবর্ণ, ত্রিপরিসরাকৃতির এ যক্ষিণী মূর্তিটি শিল্পীর অঙ্গুলি সঞ্চালনে নির্মিত। মূর্তিটির সূচাগ্রপ্রায় পীনোন্নত বক্ষ মূল-দেহকাণ্ডের মৃত্তিকা উত্তোলনে গঠিত। কিন্তু মূর্তিটির কর্ণাভরণ, কণ্ঠহার, মস্তকের পশ্চাৎদেশে এলায়িত কেশদাম ও কণ্ঠহারের উভয় প্রান্তে দুটি মৎস্য চিহ্ন অতিরিক্ত মৃত্তিকা সংযোজনে নির্মিত। পণ্ডিতদের মতে মৎস্য প্রজননের প্রতীক। অর্ধভগ্ন বাহুদ্বয়ের গঠনে মনে হয় হস্তদ্বয় খুব সম্ভবতঃ মূর্তির কটিদেশে সংস্থাপিত ছিল। মূর্তিটির আঙ্গিক সৌষ্ঠবে কিঞ্চিৎ উৎকর্ষতার লক্ষণ প্রতিফলিত, ছবোজ মূর্তিটির সঙ্গে মথুরায় প্রাপ্ত ও বর্তমান বোস্টন চারুকলা সংগ্রহশালায় রক্ষিত (দ্রঃ আরকাইক ইনডিয়ান টেরাকোটাস—এ কে কুমারস্বামী : মার্গ—১৯৫২) একটি মূর্তির খুবই নিকট সাদৃশ্য বিশেষ লক্ষণীয়। তবে বোস্টন সংগ্রহশালায় রক্ষিত মূর্তিটির কণ্ঠ-হারের প্রান্তে কোন মৎস্য চিহ্ন নেই। তাই কোন কোন বিশেষজ্ঞ ঐটিকে অন্তত মাতৃকা মূর্তিরূপে চিহ্নিত করে থাকেন।

চন্দ্রকেতুগড় অঞ্চলে প্রাপ্ত ভিন্ন পরি-চয়ের অন্য এক যক্ষিণী মূর্তির নির্মাণ-কৌশল ও আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যও মৌর্যযুগের টেরাকোটা শিল্পের প্রভাব সুস্পষ্ট বলে মনে হয়। দ্বিপরিসরাকৃতি, অর্ধভগ্ন এ মূর্তিদেহে অলংকারের প্রাচুর্য অনুপস্থিত। যক্ষিণীদেহের সুডৌল বক্ষদেশ সম্পূর্ণ নগ্ন। উভয় স্কন্ধের বাহুমূল থেকে প্রলম্বিত অতি সূক্ষ্ম উত্তরীয় চিহ্ন। মূর্তি-দেহের সামান্য অলংকারের মধ্যে কণ্ঠহার ও কর্ণাভরণের চিহ্ন সুস্পষ্ট। অর্ধ-বৃত্তাকার কণ্ঠহারটি সুপ্রশস্ত ও কারুকার্য-বিহীন। কর্ণাভরণদ্বয় কঠিন উষ্ণমাকৃতির। মূর্তিটির সর্বপ্রধান আকর্ষণীয় ও গুরুত্ব-পূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল বিচিত্র কেশসজ্জা। মস্তকের অস্পষ্ট এলায়িত কেশদামের ঊর্ধ্বে উভয় পার্শ্বে ক্ষীণরেখাযুক্ত বর্তুলাকার বস্তু বা 'চাকতি' শির-ভূষণের শোভা বর্ধন করেছে। মস্তকের উভয় পার্শ্বস্থিত 'চাকতি' হতে দোদুল্যমান গুচ্ছ সম্ভবতঃ এক এক গুচ্ছ শস্যদানা ও মৎস্য। যক্ষিণীর স্মিত আননে উদ্ভাসিত হয়েছে অপূর্ব শান্ত, স্নিগ্ধ এক স্বর্গীয় মাধুর্য। শিরোভূষণের পূর্ণচন্দ্রাকৃতি সাদৃশ্য অলংকারের রূপ-মাধুর্য যেন ম্লান হয়েছে 'চন্দ্রপ্রভা' যক্ষিণীর চান্দ্রবদন স্নিগ্ধতায়। এ যেন অন্নদামঙ্গলের বিদ্যার রূপের জৌলুস—'কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা। পদ-নখে পড়ি তার আছে কতগুলা।।' চন্দ্রকেতু-গড়ে প্রাপ্ত অনুরূপ শিরোভূষণযুক্ত একটি টেরাকোটা নারী মূর্তির চমকপ্রদ কুন্তল বিলাসে আকৃষ্ট হয়ে জনৈক পুরাতত্ত্ববিদ মন্তব্য করেছেন—

> "....a fascinating terracotta head of a female, attired in fantastic discs around the head, which the ultra Parisian deme-mondes sporting latest fashions in coffiure may envy" ('Archaeological Discoveries in Lower Gangetic Valley' — D. P. Ghosh : 'Science & Culture', Vol 23. 1957).

চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত এ যক্ষিণী মূর্তিটির সঙ্গে তমলুকে প্রাপ্ত একটি টেরাকোটা যক্ষিণী মূর্তির অঙ্গাবরণ ও অলংকার-চিহ্নের কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে (স্টেলা ক্রামরিস—আর্ট অফ ইন্ডিয়া থ্রু দি এজেস—প্লেট—৭)। কিন্তু পাটলীপুত্রে প্রাপ্ত আনুমানিক মৌর্যযুগের অন্য একটি নারীমূর্তির সঙ্গে (এ কম্প্রিহেনসিভ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া ভল্যু ২—এডিটেড বাই নীলকান্ত শাস্ত্রী, প্লেট ৫৯) আলোচ্য মূর্তিটির খুবই নিকট সাদৃশ্য লক্ষণীয়। চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত মূর্তিটির সঙ্গে তমলুক বা পাটলিপুত্রে প্রাপ্ত প্রায় অনুরূপ মূর্তির গঠন বৈশিষ্ট্য কিছু ক্ষেত্রে যদিও বা লক্ষ্য করা যায়, ভাবগত দিক কিন্তু তিনটি মূর্তির মধ্যে খুবই নিকট সাদৃশ্য রয়েছে।

প্রাপ্ত চন্দ্রকেতু অঞ্চলে আবিষ্কৃত বিভিন্ন পরিচয়ের টেরাকোটা যক্ষিণী মূর্তিগুলির মধ্যে অধিকাংশই হল তথাকথিত পঞ্চচূড় বা দশচূড় যক্ষিণী। সলিল—স্বচ্ছ বসনের অন্তরালে অন্তর্বাসহীন দেহসৌন্দর্য—পীবর পীনস্তন, ক্ষীণকটি, পৃথুল জঘনা উন্মুক্ত নাভিস্থল, প্রকটযোনী—, সূচীসূক্ষ্ম বিচিত্র অলংকার চিহ্নে প্রোজ্জ্বল ও মেখলাভারে উদ্ভাসিত এ সকল দেবীপ্রতিম যক্ষিণী মূর্তিগুলি সুঙ্গ-কুষাণ কালের মৃৎশিল্প ভাস্কর্যের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্যানুভূতির বিশিষ্ট নিদর্শন। কুন্তল বন্ধনের বিভিন্ন ও বিচিত্র রীতি, অলকচূর্ণের চারু-সমাবেশ, স্বর্ণপট্ট, পুষ্পপট্ট বেণীবৈচিত্র্যে নানা গহনার সজ্জায় মোহিনীময়ী এ সকল মূর্তিগুলির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল অভিনব কবরী বিন্যাসে মাধুর্যময় মস্তকের এক বা উভয় পার্শ্বে পাঁচটি বিভিন্ন আয়ুধের আকৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চূড় বা কাঁটার সংস্থাপন। কোন কোন পুরাতাত্ত্বিক (দ্রঃ অতীতের সমাধি চন্দ্রকেতুগড়—শ্রীপরেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত) এ আয়ুধগুলিকে তরবারি, অঙ্কুশ, কুঠার বাণ ও ত্রিদণ্ডী বলে চিহ্নিত করেছেন। শাস্ত্রীয় পঞ্চায়ুধের সঙ্গে এ চিহ্নিত অস্ত্রের একটু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তরবারি, শক্তি, ধনু: পরশু ও বর্ম—এগুলি হল শাস্ত্রসম্মত পঞ্চায়ুধ। তবে পঞ্চচূড় বা দশচূড় যক্ষিণী মূর্তিগুলির শিরোদেশে সংস্থাপিত এ আয়ুধগুলি সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ তাপন স্তম্ভনের প্রতীক অর্থাৎ মদনদেবের পঞ্চশর বা বাণের প্রতীক হওয়াও আশ্চর্যের কিছু নয়। তমলুক বা প্রাচীন তাম্রলিপ্তে প্রাপ্ত একটি পঞ্চচূড় যক্ষিণীর অনুরূপ শিরোভূষণের বিচিত্র আয়ুধগুলি অধ্যাপক জনস্টন যথাক্রমে অঙ্কুশ, কুঠার ত্রিশূল, ধ্বজা বলে মনে করেন (এস কে সরস্বতী—আর্লি স্কালপচার অফ বেঙ্গল, পৃঃ ৯৯)।

এ ধরনের পঞ্চচূড় বা দশচূড় শোভিত টেরাকোটা যক্ষিণী মূর্তিগুলি নিম্ন-গাঙ্গেয় বঙ্গের বিভিন্ন প্রত্নস্থল হরিনারায়ণপুর, বোড়াল, আটঘরা প্রভৃতি স্থানেও আবিষ্কৃত হয়েছে। তমলুকে আবিষ্কৃত এ ধরনের আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের একটি যক্ষিণীমূর্তি বর্তমানে ইংলন্ডের অক্সফোর্ড সংগ্রহশালায় সযত্নে রক্ষিত আছে। অধ্যাপিকা স্টেলা ক্রামরিশ মূর্তিটিকে মহাভারত ও পুরাণে বর্ণিত সমুদ্র মন্থনে উত্থিত পঞ্চচূড় অপ্সরা বলে সনাক্ত করেছেন (আর্লি স্কালপচার অফ বেঙ্গল—এস কে সরস্বতী পৃঃ ১০১)। কিন্তু অধ্যাপক জনস্টনের মতে অধ্যাপিকা ক্রামরিশের সনাক্তকরণ নিতান্তই ভিত্তিহীন। তাঁর মতে অপ্সরাদের দেহ নিরাবরণ। কিন্তু আলোচ্য মূর্তিদেহে সলিল-স্বচ্ছ অঙ্গাবরণের চিহ্ন সুস্পষ্ট। অধ্যাপক জনস্টনের মতে (দ্রঃ ই এইচ জনস্টন—এ টেরাকোটা ফিগার অ্যাট অক্সফোর্ড—জার্নাল অফ দি [illegible] সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট—ভল্যুম-১০, ১৯৪২, পৃঃ ৯৪—১০২) এ ধরনের বিচিত্র আয়ুধে চূড়শোভিত দেবীপ্রতিম নারীমূর্তিগুলি সুপ্রাচীনকাল হতে নিকট প্রাচ্যের বিস্তৃত অঞ্চলে প্রচলিত মাতৃকামূর্তির একটি বিশেষ রূপ হওয়াও বিচিত্র নয়। তিনি এ অনুমানের সমর্থনে দুটি মূল্যবান তথ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অশ্বঘোষ বিরচিত সৌন্দরানন্দ কাব্যে 'মায়া' ও প্যাপিরাসে 'মাইয়া' নামে দুইটি ভারতীয় মাতৃকা দেবীর বর্ণনা পাওয়া যায়। অধ্যাপক জনস্টনের মতে ইঁহারা অভিন্ন। প্যাপিরাসের 'মাইয়া' ছিলেন গাঙ্গেয় উপত্যকায় উপাসিত বৃষ্টি ও উর্বরতার দেবী। গঙ্গায় প্রবল বান আনয়নের জন্য তাঁর করুণা প্রার্থনা করা হত। জনৈক বিশিষ্ট পুরাতত্ত্ববিদের মতে (এস কে সরস্বতী—আর্লি স্কালপচার অফ বেঙ্গল, পৃঃ ১০২) নিম্ন-গাঙ্গেয় উপত্যকায় এ ধরনের মাতৃকা উপাসনার জনপ্রিয়তার যে প্রচুর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, তা অধ্যাপক জনস্টনের মতের অনুকূল। কিন্তু বিচিত্র আয়ুধে চূড় শোভিত দেবীপ্রতিম নারীমূর্তির উপাসনার প্রচলন শুধুমাত্র নিম্ন-গাঙ্গেয় বঙ্গেই প্রচলিত ছিল, এমন কথা ভরসা করে বলা চলে না। সাঁচী স্তূপ বেষ্টনীর উত্তরদিকের প্রবেশ তোরণ গাত্রে, বুদ্ধগয়ার সুঙ্গযুগে নির্মিত বেষ্টনী প্রাচীরে এ ধরনের যক্ষিণী মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। কৌশাম্বীতে প্রাপ্ত ও বর্তমানে কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরে রক্ষিত একটি টেরাকোটা নারীমূর্তির কেশ সজ্জায় একই ধরনের আয়ুধ চূড়ের সংস্থাপনের পরিচয় পাওয়া গেছে।

চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত অন্য একটি যক্ষিণী মূর্তির কেশ সজ্জায় সুস্পষ্টভাবে মিশরীয় কবরী বিন্যাসের রীতির প্রভাব লক্ষণীয়। প্রাচীন গড়ের ধ্বংসস্তূপের অদূরে সানপুকুর গ্রামের খাঁ পরিবারের জনৈক কিশোরের কাছ হতে বর্তমান লেখক এটি সংগ্রহ করেন। রক্তাভবর্ণের আবক্ষ এ টেরাকোটা মূর্তি পুতুলটির ঘন উন্মুক্ত কেশরাশি, কণ্ঠ ও বক্ষদেশে দোদুল্যমান বিচিত্র অলংকার ও মুখমণ্ডলের গঠন বৈচিত্র্যে মিশরীয় প্রভাব যে কোন গবেষককে বিস্মিত করে। তবে মূর্তিটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল মিশরীয় রীতির অনুগামী কেশসজ্জা। একটি 'ফিতে' দ্বারা উন্মুক্ত কেশরাশি ললাট হতে মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ পর্যন্ত বেষ্টিত। আদিগঙ্গার মজাগর্ভের তটে অবস্থিত নিম্ন-বঙ্গের অন্যতম প্রত্নস্থল বোড়ালেও এ ধরনের একটি ফিতে বাঁধা যক্ষিণী মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। মূর্তিটি বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আশুতোষ সংগ্রহশালায় সযত্নে রক্ষিত। তবে বোড়ালে আবিষ্কৃত মূর্তিটির মুখমণ্ডলে বিজাতীয় ভাব খুব সামান্যই প্রকটিত।

চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত টেরাকোটা ফলকগুলির দু একটিতে অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য অশ্বমুখী যক্ষিণীমূর্তিও উৎকীর্ণ দেখা যায়। একটি [illegible] অলংকৃত অশ্বমুখী যক্ষী মূর্তির নির্মাণ কৌশল ও শিল্পরীতিতে মৌর্য যুগের শিল্পরীতি ও নির্মাণ কৌশলের ছাপ সুস্পষ্ট। অতিরিক্ত মৃত্তিকা সংযোজনে গঠিত অলঙ্কার ভূষিত নগ্ন নারীদেহের স্কন্ধে অশ্বমুখ সংস্থাপিত। অশ্বমুখের কর্ণ, কেশ ও নেত্রযুগল প্রভৃতিও অতিরিক্ত মৃত্তিকা সংযোজনে গঠিত। পাটালীপুত্র, বোধগয়া সাঁচী প্রভৃতি স্থানের প্রস্তর ভাস্কর্যে এ ধরনের অশ্বমুখী যক্ষীর নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। আনন্দকুমার স্বামী বোস্টন চারুকলা সংগ্রহশালায় রক্ষিত ও গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রাপ্ত এ ধরনের একটি অতি প্রাচীন টেরাকোটা যক্ষিণী মূর্তির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন (কুমারস্বামী—আর্কাইক, ইন্ডিয়ান টেরাকোটাস—মার্গ—১৯৫২ খৃঃ)। বৌদ্ধজাতকে (দ্রঃ জাতক ৪৩২) অশ্বমুখী যক্ষীর একটি আকর্ষণীয় কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরাকালে বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্তের স্বৈরাচারিনী প্রধান মহিষী জীবনাবসানের পর অশ্বমুখী যক্ষীরূপে জন্মলাভ করে মনুষ্য সংহারে প্রবৃত্ত হন। পরবর্তী সময়ে যক্ষী প্রেমাবিষ্ট হয়ে এক সুদর্শন ব্রাহ্মণ-তনয়কে পতিরূপে গ্রহণ করেন। তাদের মিলনের ফলে এক বৌদ্ধ জাতকের আবির্ভাব হয়।

এসকল দুষ্প্রাপ্য পরিচয়ের যক্ষিণীমূর্তি ছাড়া চন্দ্রকেতুগড়ে আরও কয়েকটি আকর্ষণীয় টেরাকোটা যক্ষিণীমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আশুতোষ সংগ্রহশালায় সযত্নে রক্ষিত (ডাঃ এ কে সুর—হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার অফ বেঙ্গল—আর্ট প্লেট) এলোকেশী, কাজল-নয়না, স্মিতবদনা, মেখলাভারে উদ্ভাসিত একটি যক্ষিণীমূর্তির দেহসৌষ্ঠব ও ভাব মাধুর্য যে কোন রসিকজনের মর্মোহরণ করে। যক্ষিণীর কৃষ্ণজলদসম উদ্দাম কেশদাম যেন সকল পৌরুষের তেজস্বীয়তাকে আবিষ্ট করে এ যেন 'তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জমেঘে লুকায় অশনি' (রবীন্দ্রনাথ)। এলোকেশী যক্ষিণীমূর্তি ছাড়া চন্দ্রকেতুগড়ে একপ্রকার বিচিত্র পাগড়ী পরিহিতা নারীমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। পাগড়ী শীর্ষে মৎস্য, কৌশী প্রভৃতি অস্পষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান। খুব সম্ভবতঃ এটিও ভিন্ন পরিচয়ের যক্ষিণীমূর্তি। তাছাড়া বেড়াচাপায় প্রাপ্ত মুণ্ডিত-মস্তকে দণ্ডায়মান যক্ষিণীমূর্তির (আর্লি স্কালপচার অফ বেঙ্গল—সরস্বতী, প্লেট ৪৩) ভরুতের স্তূপগাত্রে উৎকীর্ণ খৃঃ পূঃ প্রথম শতকের কুলাকোকা নামধেয়া দেবীমূর্তির গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত 'টিয়াপাখী হাতে' যক্ষিণীমূর্তির সঙ্গে মথুরার স্তম্ভ গাত্রে উৎকীর্ণ (জিমার আর্ট অফ ইন্ডিয়ান এশিয়া আর্ট প্লেট ৭৪-৭৫ (ডি)) একটি যক্ষীমূর্তির ভাবগত সাদৃশ্য অস্বীকার করা যায় না।

(আলোকচিত্র : 'নিম্ন-গাঙ্গেয় উপত্যকা' ইতিহাস অনুসন্ধান প্রকল্প'-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত)

রুণুর জন্যে আমি সব করতে পারি। সব কিছু...সব কিছু। রুণু যদি বলে দেয়, ও আমাকে ভালবাসে, তাহলে কোন কথা-ই নেই। আর ভুলে যেতে বললে, নিজের দুঃখ নিজের কাছে থাক। অবশ্য ও-কথা যাতে ও না বলে, সে-রকম এক আবহাওয়া ওর মনের ভেতরে তৈরি করিয়ে নিতে হবে। প্রয়োজনে আমি নিজে ওর মনে ছায়া ফেলার চেষ্টা করব। এর জন্যে রুণুকে আর যারা ভালবাসে, রুণুকে কেড়ে নিতে চায় কাছ থেকে, তাদের সঙ্গে ঠিক এক হাত লড়ে যাব আমি। কারণ রুণুকে একান্ত করা-ই আমার স্বপ্ন। জোর করে হলেও—তাই।

সবার সঙ্গে যেচে কথা বলে। যে ডাকে, তার গায়ে পড়া স্বভাব। কেউ বেড়াতে নিয়ে যাবার প্রসঙ্গ তুললে, মুখে না নেই রুণুর। বরং খিলখিল করে হাসতে হাসতে সারা শরীরে রংয়ের বাহার ফুটিয়ে তার যে কোন হাত নিজের হাতের ভেতর আপন করে চলে যায়। এ জন্যে আমার মনে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না।

সে আমার রুণু

গিরিধারী কুণ্ডু

... সবাই ... চায়। ... নিজের বলে ভাবে। অন্য ... কেউ ... হাত না ... সে-রকম উৎকণ্ঠা মনের ভেতরে একটু আধটু ঘুরে বেড়ায়।

বিশেষ পছন্দ একবার যখন হয়েছে, তখন রুণুর ওপর আর কটা দিন নজর রাখা ভাল। অন্য কেউ যাতে কেড়ে না নেয় সে-ব্যাপারেও লক্ষ্য রাখতে হবে শকুনের মত ধারাল চোখ ফেলে! আসলে রুণু অন্য কারুর এ-রকম ধারণা করতে কষ্ট হয় খুব।

তুমি আমার ওপর মিছিমিছি রাগ করো না। এবার থেকে যোগাযোগ করব। তোমাকে জানাব।

কথাগুলো কানে পৌঁছতে অংশুমান মুখ তোলে সামান্য। এতক্ষণ সে রুণুর কথা গভীরভাবে চিন্তা করছিল। গভীর ভাবে কিছু ভাববার সময় ওর চোখ দুটো অসম্ভব রকম ছোট হয়ে আসে। অংশুমান বুঝতে পারল, জাহির রুণুর কথা বলতে চাইছে। ওরা সমান ক্লাসে পড়ে। অংশুমান অবশ্য চার ক্লাসের উঁচু ছাত্র। তবু রুণুকে পাবার জন্যে জাহিরকে হাতে রাখার কথা ভেবে রেখেছে সে।

সেদিন জাহির-ই অংশুমানকে একা পেয়ে ক্যানটীনে বলছিল।

—অংশুদা, তুমি আজকেও গিলেছ? ক'খানা? মাথাটাথা খারাপ করবে নাকি? মুখটা কেমন ফ্যাকাশে ফ্যাকাশে। সকলের মুখে আনন্দ, তোমার মুখ-ই শুধু ফ্যাকাশে! চোখে কি রকম ঘুম ঘুম ভাব! কি হয় এসব নেশার বড়ি খেয়ে?

কোন উত্তর দেয় না অংশুমান। আবার জাহির বললে।

—এই ত, এবার রাগ হয়ে গেল তোমার।

—তুমি বুঝবে না জাহির, বুঝবে না! কাল তিনখানা ম্যানড্রেক্স গিলেছি। কালকের নেশাটা এখনও বসে আছে মাথায়। তাই মাথাটা কেমন একটু ঝিমঝিম করছে!

ঘুরছে! বাবা মা ... আমি কি ... বলে ডাকব ছেলে?

—তিনখানা খেয়েছ? বাইরে চলে যাও। বোধ এবার অন্তটার এফেকটের ঠেলা! যাও হোস্টেলে গিয়ে শুয়ে পড় গে। তুমি অসুস্থ!

—আমাকে বাইরে চলে যেতে বলছ জাহির! মোটে-ই আমি অসুস্থ নই। বেশ সুস্থ। মাথাটা-ই যা গন্ডগোল করিয়ে দিচ্ছে। সমানে ঘুরতে চাইছে পেন্ডাম-এর মত।

অংশুমানের কথাগুলো কি রকম বিষণ্ণ-করুণ মনে হয়। গলার স্বর ভীষণ ভাঙ্গা ভাঙ্গা। বেশ একটু জড়ানো। নেশা করলে কথা বলার ধরণ যেমন ছাড়া-ছাড়া, টানা হয়। তেমনি। ম্যানড্রেক্স এতো সস্তার নেশা। ওর মত হতাশার অন্ধকারে বসে থাকা, আঘাত পাওয়া ছেলের কম পয়সায় নেশা করার মোক্ষম জিনিস। সত্যি নেশা হয় এ-সব ট্যাবলেটে? না—নিজে নিজে মনে দুঃখ তৈরী করে নেশার মধ্যে আত্মরক্ষা করার অহেতুক চেষ্টা!

জাহির জোর গলায় বললে।

—বিশ্বাস নেই তিনখানা টপকেছো। আবার হয়ত রুণু রুণু করে মেয়েদের ক্যানটীনের দিকে পা বাড়াবে। নয়ত রুণু আমাকে অপেক্ষা করতে বলেছে, এই বলে সেদিনের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে শুরু করে দেবে।

জাহির আরো কি বলছে, তার দিকে হুঁশ নেই অংশুমানের। কলেজ ফাংশানের কথা মনে করিয়ে দিতে ওই দিনের সব দৃশ্য ছবির পর ছবি হয়ে আবছা আবছা মনে পড়ে।

সেদিনও অংশু নেশা করার বড়ি পেটে ফেলে কলেজে এসেছে। ওর একান্ত চিন্তা-ভাবনাগুলো মাথার ভেতরে ঘূর্ণপাক খাচ্ছিল চরকি হয়ে। এমন সময় রুণুকে ও দেখতে পেল। খোলাচুটে চাউনির মধ্যে অস্পষ্ট দেখা

যাচ্ছিল সব কিছু-ই। তবু এক কলেজের মেয়ে রুণুকে চিনতে ভুল করে নি। মনের ভেতরটা একটু কেঁপে উঠে আবার ঠান্ডা হয়ে গেল। রুণুর খোঁপায় সূর্যমুখী ফুল গোঁজা। ফুলের নরম হলদে পাতারা একটু চকচকে। বেশ তাজা। যেন, সবেমাত্র কোন গাছ থেকে ছিঁড়ে এনে খোঁপায় গুঁজে দিয়েছে।

অংশুমানের দিকে রুণু আসছে। ভেঙে পড়তে চাওয়া শরীরকে অনেক কষ্টে দাঁড় করিয়ে রাখে অংশু। রুণু অংশুর শরীরের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ে ঝরঝরে ভাবে বলে উঠল।

—ও অংশুদা, বড্ড খিদে পেয়েছে! কিছু খাওয়াবেন চলুন। ক্যানটীনের দিকে দ্রুত পা ফেলে এগিয়ে যেতে দেখে সে-ও পেছন নেয়।

ছোট টেবিলের ওপর থাকে থাকে বিভিন্ন ধরনের খাবার সাজানো। রুণু বয় গোছের ছেলেটার দিকে তাকিয়ে চপের গায়ে আলতোভাবে আঙ্গুল ছোঁয়া অবস্থায় বলে ওঠে।

—এটা কিসের চপ?

ছেলেটা বললে।

—ডিমের চপ।

—ডিম দিয়ে তৈরি! ডিম-মাংস আমি খাই না হে!

উত্তর দিয়ে দেয় অংশুমান।

—তাহলে এই যে টোস্ট আছে। তাছাড়া কলা, কমলালেবু চা। এসব তুমি খেতে পার।

ঘাড় দুলিয়ে রুণু বললে।

—তাই খাব।

—ডিম মাংস খাও না কেন? এতে প্রোটিন আছে। প্রোটিনই জীবন। এসব না খেলে শরীর ভেঙ্গে পড়বে। শরীর ভাঙ্গলে তখন আর নিজেকে ... সবার সামনে মেলে ধরতে পারবে না ...!

বাছাবাছি না করে প্লেটে দু পীস মাখন-রুটি আরেক প্লেটে কলা কমলালেবু তুলে নিয়ে রুণু বললে।

—চলুন ওই ঘরে। ওখানে কেউ নেই। একদম ফাঁকা।

কথা বলতে বলতে রুণু এগিয়ে যায় সামনের ছোট ঘরের দিকে। এ পাশের ঘরে দু-চারটে ছেলে। নিচু হয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। ওরা সবাই অংশু-রুণুর দিকে কৌতূহল-ভরা চোখে তাকাল। সামান্য হাসল। এই মুহূর্তে ওদের হাসির অর্থ বোঝার চেষ্টা করে না অংশুমান। শরীর গুটিয়ে ছেলেগুলো আবার নিজেদের কথায় ডুবে যায়।

রুণু আর অংশুমান যে ঘরে এসে একটা খালি বেঞ্চে বসল সে ঘরে তৃতীয় কেউ নেই। খেতে শুরু করে দিয়েছে রুণু। জিগগেস করে অংশুমান।

—তুমি আমার নাম জানলে কি করে?

—একটু আগে আপনার কথা হচ্ছিল। সুব্রতদার কাছে শুনলাম, আপনি খুব একা একা ঘোরেন। আপনি ত সুব্রতদাদের সঙ্গে পড়েন?

—সুব্রত! কোন সুব্রত?

—খুব অবাক হয়ে যাচ্ছেন মনে হয়! হ্যাঁ সুব্রতদা। আমাদের কলেজের জি-এস। আচ্ছা, আপনি আমার নাম জানেন?

—না।

—না।

—না বলতে শুনে চমকে গেল রুণু। মুখ দেখে অংশুমানকেও হঠাৎ দারুণ সীরিয়াস মনে হয়। কলেজশুদ্ধ সকলে রুণুর নাম এখন-তখন জপ করে, আর অংশুদা ওর নাম জানে না। আশ্চর্য হলেও বিশ্বাস কিছুতেই করতে চাইল না সে। অন্যমনস্কের মতন বললে।

—আপনি কোথায় থাকেন?

—মেইন হোস্টেলে। তুমি ত লেডিস্ হোস্টেলে থাকো। তাই না?

পাঁউরুটির অবশিষ্ট অংশটুকু মুখের ভেতর ঠেলে দিয়ে রুণু পালটা জিগগেস করে।

—বেশ মজা ত! আপনি আমার নাম জানেন না, অথচ কোথায় থাকি সে-খবর ঠিকই জানেন দেখছি

একটু থেমে অংশুমান বললে।

—আমি জানতে চাইছিলাম তোমাদের নিজের বাড়ি কোথায়?

—দেশের বাড়ি বলতে বসিরহাট। তবে যাদবপুরেই থাকেন সব। দেখুন না—বাড়ি থেকে এখনও টাকা আসেনি। তাই ধার করে চালাতে হচ্ছে এখন।

খুব আগ্রহ দেখিয়ে অংশুমান বলে ফেলে:

—তোমার কত টাকার প্রয়োজন? আমি দিচ্ছি। আর এখনই টাকার কথা ভাবছ কেন? এখনকার খাবার ত আমিই খাওয়াচ্ছি।

কথা বলা শেষ হতেই কয়েকটা দশ টাকার নোট ওপরের বুক পকেট থেকে বার করে রুণুর চোখের সামনে মেলে ধরলে অংশুমান। অমনি বললে রুণু।

—না, না। আপনি দিতে যাবেন কেন? কাল হয়ত টাকা এসে যাবে। একি, আপনার চা যে ঠান্ডা সরবত হয়ে গেল! নিন, চায়ের কাপ হাতে তুলুন।

ক্যান্টীনের ছেলেটা কখন এসে যে চায়ের কাপ রেখে গেছে তা লক্ষ্যই পড়ে নি। টাকার প্রসঙ্গ ও আর তোলে না।

অংশুমান রুণুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল উন্মুখ হয়ে। রুণুর চোখ দুটো ভীষণ উজ্জ্বল। মুখটা সামান্য গোলাকৃতি। কালো, ঈষৎ চওড়া ভুরুজোড়া চোখকে সরু চাঁদের মত জড়িয়ে রেখেছে ওপর থেকে এসে। গায়ের রং যদিও বা সামান্য কালো, তবু নাভির অনেক নিচে শাড়ির বেড় দেওয়ায় আটাকা তলপেট অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল ওখানকার গায়ের রং বেশ ফরসাই। আংশিক শরীরের অনাবৃত যা কিছু দেখল সেখানে, তা-ই আকুল করে দিল ওর মনকে।

খোঁপা থেকে ফুল খসে পড়বে মনে হতে রুণু মাথায় হাত রাখে। ওই ফুলটোকে ভাল করে আবার গুঁজে দিয়ে হাত নামিয়ে নেয়।

সূর্যমুখী ফুলদুটো নুয়ে পড়েছে। সোজা শরীর দাঁড় করিয়ে নেই আর।

রুণুর গায়ে একেবারে আগুন রং লাল ব্লাউজ। পুষ্ট ভরাট আকর্ষক বুক। ব্যার সাদা রং লাল-রংয়া ব্লাউজের ওপর ফুটে উঠতে চাইছে। সব মিলিয়ে সত্যি এক ফুল ফুল চেহারা।

সারা মুখে লাল আভা। লজ্জায় যেন লাল হয়ে উঠেছে। আরক্ত ওই মুখ ঝাঁকিয়ে অংশুমানকে ডাকে রুণু।

—এই অংশুদা! কি দেখছেন এত?

অংশুও ঠিক লজ্জা পেল এ কথায়' আধা নেশাগ্রস্ত চোখ দুটো রুণুর শরীরের ওপর থেকে ফিরিয়ে নিল। ভাঙা ভাঙা কাঁপা গলায় জানাল।

—কিছু না! এই ফুলদুটো দেখছিলাম।

—ফুল!

—হ্যাঁ, ওই যে তোমার খোঁপায় সূর্যমুখী ফুল গোঁজা, ওগুলোই দেখছিলাম এতক্ষণ।

—আপনি ভীষণ মিথ্যুক। ফুল ত মাথার ওপরে রয়েছে। এদিকে হাঁ করে তাহলে কি দেখছিলেন অমন? চলুন এবার উঠি।

বলেই নিজের বুকের কাছটায় তাকায় আর তারপরই হাত বাড়িয়ে অংশুমানের মুখ ঠেলে দেয় অন্যদিকে।

সেই থেকে নেশা ধরিয়ে দিল রুণু মণ্ডলের উজ্জ্বল শরীর। ঢল আর ঢেউ, এই দুয়ে ভরা ওই শরীরে চিন্তায় ডুব দিয়ে রইল মন। রুণুকে পাবার জন্যে একটা বড় রকমের যুদ্ধ চলল সমানে।

পরের দিন অংশুর সঙ্গে দেখা করবে কথা দিয়েছিল রুণু। রুণুকে ও দেখতেও পেয়েছিল। কিন্তু যে ওর মনে গতকাল একাকী সামনে বসে থেকে নেশা ধরিয়েছিল, সেই রুণুই এখন চুটিয়ে গল্প করছে অপূর্ব আর ওর বন্ধুদের সঙ্গে। মাঝে মাঝে আবেগ ও প্রকাশের ধরণ ভীষণ উজ্জ্বল। ভয়ানক [illegible] এই ভাবভঙ্গি অংশুমানের চোখ সহ্য করতে পারে না। এদিকে চারপাশ ঘুরে জায়গা না পেয়ে একটা ছেলে হাত বাড়িয়ে রুণুকে সরতে বলে গা ঠেকিয়ে বসে পড়ে। অমনি বিরক্ত হওয়া গলায় আরেকজন বললে।

—রুণু, তুই বারণ কর। তোর গায়ে হাত লাগিয়েছে ও।

—হাত লাগিয়েছে ত কি হল? অনেক সময় যে হাত ধরে অনেকে! আসলে, কি বলব, বল?

বেশ, আশ্চর্য হয়ে ছেলেটা বলে এবার।

—হাত লাগা এত সহজ?

অপূর্ব সুন্দর ওই দুই চোখ তুলে রুণুও বলে দেয়।

—আগুন লাগে নি কিন্তু!

এবার ছেলেটা বলে।

—হ্যাঁরে তুই বর্ধমানের বউ হচ্ছিস! রুণু, তুই আমার বউ হবি না?

মাথা নাবিয়ে রাখে রুণু।

—এ কি লজ্জা করছিস্?

একদৃষ্টে সবই দেখল অংশুমান। রুণু সম্পর্কে তিক্ততায় ভরে উঠল মন। এত সহজে বিকিয়ে দিচ্ছে রুণু নিজেকে? একটা শরীর ঘিরে এত লোকের আনাগোনা:

ইশারায় ক্যান্টীনের ছেলেটাকে ডেকে প্যান্টের কোমরের কাছের গোপনীয় ছোট্ট পকেট থেকে সাদা রাংতায় মোড়া তিনখানা ট্যাবলেট * বার করে হাতের তালুর ওপর সাজাল। তারপর এক ঢোক জল মুখে রেখে পটাপট গিলে ফেলল। ম্যানড্রেকস—ওকার সেই নেশায় চুর হয়ে থাকার দাওয়াই।

রুণুরা সব একসঙ্গে বাইরে এসে প্যান্ডেলের দিকে চলে গেল। অংশুমান এক মনে রুণুর চলে যাবার পথের দিকে চেয়ে সিগারেটের পর সিগারেট শেষ করতে লাগল।

রাত্রে জন্য দাঁড়িয়েছে, অংশুমানের খেয়াল নেই। হঠাৎ ওর চোখে জাহিরকে আটকে পড়ে রুণু। রুণু আর ওর এক বান্ধবী কলেজের গেট পেরিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

অংশু ওদের পিছু নিল। খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে যাচ্ছে রুণু আর ওর বান্ধবী। পা কাঁপছে অংশুমানের। উরুতেও কোন স্থিরতা নেই। উরুও কাঁপছে। হাত-পা গোটা শরীর জুড়ে ঝনঝন নি! ও জানে নেশা করা দেহে সাঁই সাঁই করে চললে পর ভূগোলের গ্লোবকে একটু ঘুরিয়ে দিলে অবাধ্যের মতন যেমন ঘুরতে থাকে সেটা তেমনি ওর মাথাও ঘুরবে। এমনিতে এসময় শরীর টেনে নিয়ে যাওয়া কি কষ্ট। এতসব ভেবে অংশু ধীর পায়ে এগিয়ে যেতে থাকে।

রুণুরা পার্ক সার্কাস ময়দানের দিকে চলে যাচ্ছে। শীতকালের রাত। সমস্ত রাস্তা জুড়ে নিঃঝুম নীরবতা। রাস্তায় ভীষণ ধোঁয়াশা। ওদের মুখ অন্ধকার। বড় বড় লম্বা মাথা মুড়োনো গাছপালা স্থির! একটা পাতার গায়েও কোন কম্পন নেই! পিচগোড়া রাস্তায় গাছের ছোপ ছোপ অন্ধকার পড়ে রয়েছে শুধু।

গাছের ধার ঘেঁষে মিশে যায় ওরা। সামনের ধোঁয়াশার ভিতর কি তাড়াতাড়ি হারিয়ে যাচ্ছে!...তবু অংশুমান অনেকটা দূরত্ব রেখে ওদের ওপর চাউনি ফেলে এগিয়ে চলে। ওর গায়ে কোন গরম পোশাক নেই। ভুলেই গেছে শীতকালে গরম জামা গায়ে চাপাবার প্রয়োজনের কথা।

বেশ জোরে জোরে হাতের ফিল্টার সিগারেট টেনে চলেছে। অথচ ফিল্টারটুকু শুধু দুই ঠোঁটের ফাঁকে রেখে। সামনের দিকে তামাক জাতীয় যে অংশ থাকে তা পুড়ে শেষ, সেদিকে অংশুর খেয়াল নেই এটুকু।

এর মধ্যে রাস্তা পার হতে গিয়ে অনেক গাড়িচালকের বিশ্রী ভাষার গালাগালি শুনতে হল। গাড়িটা হুড়মুড় করে কখন ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়েছিল তা ও দেখতে পায়নি।

পার্কের দেয়ালের সীমানা ছুঁয়ে এগুতেই অংশু দেখে—রুণুরা অন্য ফুট-পাথে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। অংশুমান ঠিক চিনতে পারল না, ছেলেটা কে? আর ওদের পেছনে না ঘুরে ঘুরে করে সোজা ফিরে এল রুণুর হোস্টেলের কাছে। ও জানে, একসময় না একসময় রুণুকে এই পথ ছুঁয়ে ফিরে আসতে হবে ঘুমোবার জন্যে। এছাড়া যে এখন উপায়ন্তর নেই।

দেয়াল ধরে পায়ের ওপর পা রেখে নতুন করে সিগারেট ধরায় অংশুমান।

—একি! তুমি এখানে।

জাহিরের হঠাৎ উপস্থিতি একেবারে অভাবিত ঠেকল অংশুমানের কাছে। তবু ভাঙা গলায় বললে।

—ও আমায় কথা দিয়েছে আসবে। তাই অপেক্ষা করছি। হাসতে থাকে জাহির।

—কে! রুণু কথা দিয়েছে তোমাকে? ও ত সকলকেই এরকম কথা দিয়ে ঘোরায়। না! তুমি দেখছি, রুণু রুণু করে পাগল হয়ে যাবে। এখন রাত দুটো প্রায়। ভাগ্যিস, অমরেশদা আমাকে তোমার খোঁজে পাঠিয়েছে। তা না হলে রাতভোর করেও তুমি একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে! চলো এবার হোস্টেলে শোবে গিয়ে। এখানে ঘুরে কি করবে আর।

অংশু কি কারণে যেন নেশার ট্যাবলেট টপকায়নি পরের দিন। জাহিরের কাছে আগামী পরীক্ষার দিন-ক্ষণ জানা ব্যাপারে ব্যস্ত। এমন সময় রুণু সোজা ওদের কাছে এসে বসে পড়ে।

—অংশুদা?

ডাক শুনতে পায়নি এমন ভাব দেখায় অংশুমান।

—ও অংশুদা—প্লিজ, দাদা আমার রাগ করছেন কেন! কালকে আমার সত্যিই মনে ছিল না আপনার সঙ্গে যে পরে দেখা করব বলেছি।

রুণু অংশুর গায়ে গা ঠেকিয়ে দেয়। ডান কাঁধের ওপর ওর নরম হাতখানা কিছু-ক্ষণ ছুঁইয়ে রাখে। অংশুমানের ভেতরটা রুণুর উত্তপ্ত স্পর্শ পেয়ে গরমে পুড়তে আরম্ভ করে দিল অমনি। গতকালের অস্ফুট অভিমান উঁকি মেরেও পালিয়ে গেল যেন!

—ঠিক আছে কি খাবে বল?

—সরি - সরি - সরি। কিছুই খাব না আমি। এই মাত্র হোস্টেল থেকে খেয়ে বেরিয়েছি। আচ্ছা অংশুদা সবাই বলছে—আপনি নাকি কাল আমার জন্যে সারারাত শীতের ভেতর রাস্তায় অপেক্ষা করেছিলেন? ইস্ কি অন্যায় করে ফেলেছি বলুন ত!

অংশুমানের ভিজে গলার স্বর আস্তে আস্তে নেবে আসে।—সে সব কালকের কথা। যা হবার হয়ে গেছে। আজ আর নাইবা মনে করিয়ে দিলে।

—এই রুণু?

ওর সেই বান্ধবী যে কাল ওর সঙ্গে পার্কের দিকে ঘুরছিল সে-ই এখন ডাকতে এসেছে। কানে কানে মেয়েটা কিছু বললে অমনি রুণু ক্যানটীনের দরজা পুরোপুরি খুলে চলে গেল।

—এই অংশুদা অমন মাথা গুঁজে রয়েছ কেন? ঘাড় ভেঙে যাবে যে।

চিন্তার রাশ আলগা করে দেয় জাহিরের এই ডাক। ঝুঁকে পড়া মাথা তোলার চেষ্টা করে অংশুমান। না, ঘাড়টা ওর সত্যি সত্যি প্রচন্ড ব্যথা হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ মাথা ভাঁজ করে রুণুর কথা ভাবছিল ত! জাহির না ডাকলে, বলা যায় না আর কত সময় ধরে ও রুণুর চিন্তায় [illegible] থাকত।

অংশুর চোখ [illegible] চাউনি সিঁড়ির কাছটায় পড়ে।

জাহির বলে ওঠে তক্ষুনি।

—অংশুদা। ওই দ্যাখো—তোমার রুণু চলে যাচ্ছে! এই সুযোগ, যাও এক্ষুনি কথা বল গে মনটা ঠান্ডা হবে।

বাইরে বেরিয়ে আসে অংশুমান। ডাক দেয় ছোট্ট করে।—এই রুণু—রুণু! দাঁড়াও কথা আছে।

রুণু শুনল, ফিরে দাঁড়াল। তারপরই খিলখিল করে হাসতে হাসতে সারা শরীরে রংয়ের বাহার ছড়িয়ে অপূর্বর এক হাত নিজের হাতের ভেতর আপন করে চলে গেল।

অংশু ভাবল—এখন আর রুণুকে প্রত্যাশা করাই অন্যায়! জাহির অংশুর কাছে চলে আসে আবার। গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থেকে বলে—

—চলে গেল রুণু! অংশুদা, পাখিকে সবাই কথা বলাতে পারে? না—পোষ মানাতে পারে!

এই মুহূর্তে অংশুমানের মাথার মধ্যে যেন কেমন সব হয়ে যায়।......তবু ওর চোখ অদৃশ্য রুণুর পায়ের ছাপের ওপরই পড়ে থাকে।
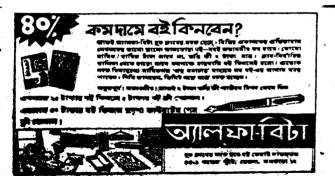
অঙ্গনা

অরুণা মুখার্জির সাক্ষাতে

আইন জগতে আজকাল মেয়েরা অত্যন্ত [illegible]ভরে এগিয়ে গেছেন। তবুও যাঁরা [illegible] প্র্যাকটিশ করছেন তেমন অনেক মহিলাদের মুখেই শুনি এ-জগতটা এত নিয়মকানুনে, আইনের বেড়াজালে ঘেরা সে কোর্টের কাজ শেষ হলেও এ-ভাবনা নিয়ে আমাদের সংসার জীবনে ফিরে যেতে হয়। সেখানে ফিরেও এক-একটা কেসের জটিল চিন্তা মন থেকে সামান্য সময়ের জন্যও সরানো যায় না, তখন মনে হয়, আইনের জগতে মেয়েরা একবার ঢুকে পড়লে সংসার বোধ-হয় তেমন আর মন দিয়ে করা যায় না। কেউ বা বলেন আইন শুধু পড়েই জানা যায় না। প্র্যাকটিক্যালি—আইনের প্রয়োগের ফলেই আইন সম্বন্ধে ধারণাটা পাকাপোক্ত হয়।

মহিলা অ্যাডভোকেট শ্রীমতি অরুণা মুখার্জির কাছে তাই একদিন উপস্থিত হয়ে ছিলাম কতগুলো প্রশ্ন নিয়ে।

প্রঃ আচ্ছা আপনি কত বছর প্র্যাকটিশ করছেন? আইনজগতটাকে নিজের জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করতে কেউ কি আপনাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন?

উঃ ধরুন প্র্যাকটিশ করছি এক যুগ হবে। তবে এতদিন ধরে আইনজগতে যা শিক্ষালাভ করেছি ও বহু বড় বড় মামলাতে যেখানে কমপ্লিকেটেড কোশ্চেন অফ ল জড়িত, সেসব মামলাতে আইনের জটিল ব্যাখ্যার যা শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা হয়েছে, তার জন্য আমি সুপ্রীম কোর্টের একজন বশিষ্ট সিনিয়ার অ্যাডভোকেট শ্রী[illegible]চন্দ্র মত্র মহাশয়ের কাছে ঋণী। তিনি আমার [illegible]বার বিশেষ বন্ধু।

প্রঃ এত বছর আগে নিশ্চয়ই আপনার [illegible]তো মহিলা অ্যাডভোকেটের সংখ্যা অল্প ছল তখন আপনার এ-ধরনের কাজে [illegible]কটা ভয় বা দুশ্চিন্তা ছিল কি?

উঃ প্রথম প্রথম এ-লাইনের পক্ষে আমি [illegible] উপযুক্ত কিনা সেরকম একটা চিন্তা [illegible]ল। তাছাড়া প্র্যাকটিসের শুরুতে ছিল [illegible]নারকম দুশ্চিন্তা। এখন কিন্তু সে-[illegible]র-ভাবনা মনকে কখনও ভাবিয়ে তোলে [illegible]। মনে কোন সংশয়ও নেই। স্বাধীনভাবে [illegible]জ করতে মনে কোন দ্বিধা নেই। [illegible]য়েন্টদের নিয়েও সহজভাবে ডিল করতে [illegible]রি সেটা প্রথমদিকে আমার একটা দারুণ [illegible]স্যা ছিল।

প্রঃ আপনি সাধারণতঃ কি ধরনের কেস [illegible] ডিল করেন?

অরুণা মুখোপাধ্যায়

উঃ প্রধানতঃ অ্যাপেলেট সাইড-এ হাইকোর্টে নানা ধরনের কেস করেছি। এর মধ্যে আছে ম্যাট্রিমোনিয়্যাল কেস অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ জমি বা ঘরবাড়ী সংক্রান্ত মামলা পার্টিশন স্যুট, উইলের প্রোবেট নিতে গিয়ে অপর পক্ষের আপত্তির বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল সংক্রান্ত মামলা, আর্টিকল ২২৬ অব দি কনস্টি-টিউশন অব ইন্ডিয়া-র উপরে মামলা, তাছাড়া কয়েকটি ফৌজদারী আপীলের মামলাও করেছি। এ-লাইনে বহু মানুষের সংগে পরিচয় হয়েছে সত্যি তবুও মানুষের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের একটা প্রায় পূর্ণাঙ্গ চিত্র যেমন পেয়েছি, তেমন বোধহয় অন্য কিছু পাওয়া দুর্লভ।

প্রঃ আপনি আইনজ্ঞ হিসেবে নিজের জীবন কাটাবেন এমন ভাবনা কোথা থেকে এলো?

উঃ আইনজীবী হবার ইচ্ছে বি-এ পাশ করার পরে ছিল না। মনে হতো লেখাপড়া শিখে নতুন কিছু একটা করবো। ঠিক আর পাঁচজন মেয়ের মতো গতানু-গতিক জীবনের মধ্যে কোন আনন্দ কোন-দিনই পাইনি। তবে বারবার মনে হতো সমাজের এতসব মেয়ে নির্যাতিতা হচ্ছে দিনের পর দিন তাদের জন্য অন্ততঃ সাধ্য-মত কিছু করবো। এই কিছু করার বাসনায় সঠিক কি করতে পারি, তখন কোন ধারণা ছিল না। কিন্তু বি-এ পাশের পর জার্না-লিজম ক্লাসে ভর্তি হয়ে মনে হল আইন পড়লে কেমন হয়? আইনের সাহায্যে আমি আমাদের দেশের কিছু কিছু লোকের নিশ্চয়ই কিছু উপকার করতে পারবো। মনে মনে স্থির করে নিলাম আমি আইনজ্ঞ হবো। সাংবাদিকতায় ছেলেমেয়েদের মধ্যে ফার্স্ট ক্লাস ফিফথ ও মেয়েদের মধ্যে ফার্স্ট হয়ে-ছিলাম। মনে মনে কেমন সাহস বেড়ে গেল। এমনি করে আমি আইন অধ্যয়ন সমাপ্ত করি।

প্রঃ আইন পড়তে গিয়ে বাড়ীর কোন আপত্তির সম্মুখীন হয়েছিলেন কি?

উঃ সবচেয়ে বেশী আপত্তি এসেছিল আমার মায়ের কাছ থেকে। তিনি আতংকিত হয়েছিলেন এত শিক্ষিতা মেয়েকে পাত্রস্থ করা মুশকিল হবে ভেবে। নিজের মনের সকল শক্তি ও প্রবল ইচ্ছা দিয়ে সব প্রতি-বন্ধকতা সরিয়ে দিয়েছিলাম।

প্রঃ আপনি কি মনে করেন, আইন [illegible] কোন এক ধরনের মেয়েদের [illegible]

উঃ [illegible] এ-লাইনের [illegible] বা মানসিকতা [illegible] নেই যে, কোন একটা নির্দিষ্ট [illegible] মেয়েরাই ভাল প্র্যাকটিশ করতে পারবেন আইন পড়ে। তবুও বুদ্ধি, এক-নিষ্ঠতা, মনোযোগ, পড়াশুনায় বিশেষভাবে আগ্রহী আর সর্বাপেক্ষা ধৈর্য ও মানসিক ও শারীরিক ক্ষমতাসম্পন্ন মেয়েদের পক্ষে আইন পড়া বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া সিনিয়র অ্যাডভোকেটের শিক্ষা পিছনে থাকলে মেয়েরা নিশ্চয়ই দাঁড়াতে পারে।

প্রঃ এ-লাইন মেয়েদের পক্ষে কতটা উপযোগী?

উঃ আজকাল কোন লাইনই মেয়েদের উপযোগী নয় এ-কথা বলা যায় না। তবুও বাস্তব কিছু অসুবিধা আছে মেয়েদের পক্ষে যেমন কনসালটেশন করতে গিয়ে অনেক সময় বাড়ীর বাইরে মেয়েদের অনেকক্ষণ কাটিয়ে রাত করে ফিরতে হয়, তাতে বিবাহিতা কি অবিবাহিতা সকলের পক্ষে দারুণ অসুবিধা। দাম্পত্যজীবনে অনেক ভুল বোঝাবুঝি ও জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয় এতে।'

প্রঃ এখানে স্ত্রী-পুরুষে মেলামেশার অবাধ সুযোগ রয়েছে তাতে কি বিপথ-গামীর কোন ভয় রয়েছে?

উঃ স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগে সুপথে ও কুপথে চালিত করার ক্ষমতা প্রত্যেক মেয়ের হাতেই আছে তবুও বলবো এই পেশাতে অনেক মেয়েই স্বচ্ছন্দে-ভরা মানসিক জটিলতায় দিন কাটান। অনেক সময় মনে হয়েছে না হতে পেরেছি পুরোপুরি ছেলে কিংবা মেয়ে। মাঝে মাঝে আইনের কাঠিন্যকে বজায় রাখতে নারী-সুলভ কোমলতা কোথায় হারিয়ে যায়। মনে হয়, যুদ্ধে নেমে ন্যায়-নীতিকে বজায় রাখতে সুকুমার বৃত্তির স্থান নেই। কিছুতেই পরাজিত হওয়া চলবে না। তবে এই পেশা মেয়েদের মানসিক বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ সহায়ক ও বাইরের জগতের চলাফেরায় তাকে সজাগ ও সচেতন করে তোলে। সেজন্য এই পেশাকে মনে হয়েছে এক বিশেষ ধরনের ইন্‌টেলেক্‌চুয়্যাল প্রোফেশান।

প্রঃ আপনি ঈশ্বর বিশ্বাস করেন? কোন কেস হাতে নেবার সময় ঈশ্বরকে কি স্মরণ করেন?

উঃ ঈশ্বরবিশ্বাসী মন আমার তাই মনে হয় সবই ঈশ্বরের পূর্বনির্দিষ্ট পরি-কল্পনা। ছুটিছাটার দিনে একটু সময় পেলেই আমি ঈশ্বরের উপাসনা করতে ভালবাসি।

প্রঃ আপনার অল্প সময়েও কোনরকম নেশাকে চরিতার্থ করতে পছন্দ করেন?

উঃ এই পেশাতে পড়াশুনার অত্যধিক চাপ, তাই সময়ও অল্প। ছোটবেলা থেকে সাহিত্যচর্চা করতে ভালবাসি। জার্ণালিজম পড়া শেষ করেছি। সুতরাং সামান্য অবসর বা ফাঁক পেলে সাহিত্যচর্চাই আমার একমাত্র নেশা হয়ে ওঠে। নানা পত্রপত্রিকায় আইন-বিষয়ক লেখা দিয়েছি। আসাম, এলাহা-বাদের পত্রিকাতে অসমীয়া ও হিন্দী ভাষায় আমার লেখা প্রকাশিত হয়েছে। আইন পেশা হলেও সাহিত্যের নেশাকে আমি কোনদিনই ছাড়তে পারবো না।

শ্রীমতি মুখার্জি দীর্ঘদিন আইনজ্ঞ হিসেবে কাজ করছেন। কোর্টের বাইরে বাড়ীতে তাঁর আর এক জীবন। অল্প কয়েকজন মানুষ নিয়ে গড়া তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে সকলের সঙ্গে একটা মধুর সম্পর্ক আছে। অ্যাডভোকেট হবার এক বছর আগেই তিনি মাতৃস্নেহ হতে বঞ্চিতা হন। তাঁর বাবা বৃটিশ যুগে ইনকাম ট্যাক্স-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ছিলেন—এখন তিনি স্বাধীনভাবে প্র্যাকটিশ করছেন। এছাড়া তাঁর পরিবারে রয়েছে দাদা-বৌদি ও একজন ভাইঝি। কোর্টের বাইরে শ্রীমতি মুখার্জি এত ঘরোয়া যে সামান্য সময়ের অবসরে সাহিত্যচর্চা ছাড়াও গল্প করতে ভাল-বাসেন। এই গল্পের ফাঁকেই এক সময় বললেন, 'এ-লাইনে অর্থ উপার্জন সকলের ভাগ্যে কিন্তু সম্ভব নয়। তাই অর্থের জোর যাঁদের থাকে অথবা যাঁদের ওপর কেউ নির্ভরশীল নয় এমন মেয়েদের পক্ষেই এ-কাজে এগিয়ে আসা সবচেয়ে বেশী সুবিধা কারণ এ-লাইনে কোন নির্দিষ্ট আয় নেই।'

—অঞ্জলি চৌধুরী
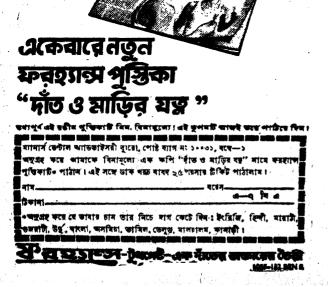
রূপসীর খাতা

এবার গ্রীষ্মকালের সকালের পোশাক সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করব। সাধারণতঃ বাঙালী ঘরে বাড়ীতে সকলে অপরিষ্কার থাকেন। কিছুটা ঘরের কাজকর্ম করার জন্য আর কিছুটা অভ্যাসে। আমি এমন মহিলাদের দেখেছি যাঁরা বেড়াতে গেলে খুব সেজে যান অথচ বাড়ীতে আধ-ময়লা কাপড় পরে অযত্নে নিজেদের রাখেন। এর ফলে শুধু যে তাঁকেই দেখতে খারাপ লাগে তা নয়, বাড়ীর শোভাও নষ্ট হয়। মহিলাদের বাড়ীর লক্ষ্মী বলে বলা হয়। তাঁদের অপরিষ্কার হয়ে থাকাটা অলক্ষ্মীর পরিচয় নয় কি? বিলিতি কায়দায় বা আধুনিক কায়দায় অনেকেই বাড়ীতে কাজকর্মের জন্য ও কাপড় নষ্ট না করার জন্য 'হাউস কোট' বা 'ডাস্টার কোট' ব্যবহার করেন। এটা আবার তথাকথিত বাঙালী মহিলারা নিন্দার দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। এটা কিন্তু ভুল। বিদেশীদের খারাপ জিনিস বর্জন করে যদি এগুলি ব্যবহার করা যায়, তাহলে ভালই হয়। তবে যদি কারুর এসব পোশাকে আপত্তি থাকে তাহলে তাঁরা বাঁধি করে একটি কি দুটি পুরোনো শাড়ী রান্না ও ঘর-সংসারের কাজের জন্য রাখতে পারেন। সেই কাপড়ের ওপর বড় ঝাড়ন কিম্বা তোয়ালে বেঁধে রেখে কাজকর্ম করলে ভাল কাপড় নষ্ট হয় না, আর তেল-হলুদও লাগে না।

সংসারের কাজকর্মের ব্যবস্থা আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। তবে এ-প্রসঙ্গ আসার কারণ এই যে পরিচ্ছন্নভাবে কী করে থাকা যায়—সেইটে বলে নেওয়া। তারপর স্নান সেরে ঘরে-কাচা নরম শাদা বা কোনো হাল্কা রঙের শাড়ী পরে থাকতে পারেন। তবে যাঁরা বাইরের কাজে যান, তাঁদের কথা আলাদা। গ্রীষ্মকালের কাপড়ের মধ্যে সকালের দিকে সিল্ক, জর্জেট বা কোন ভারী কাপড় চলে না। সুতীর কাপড়, হাল্কা ভয়েলের ছাপা শাড়ী, কোটা ইত্যাদি বাইরের তাপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরা বাঞ্ছনীয়।

যাঁরা বাইরে যান তাঁদের প্রসঙ্গ আলোচনা করবো এখন। গ্রীষ্মের সকালে অর্থাৎ ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে বেরোতে হলে কাপড়ের রঙ ফিকে আর হাল্কা হওয়া ভাল। এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুতি কাপড়ের ব্লাউজ। অনেকে দেখা যায় গ্রীষ্মের সকালে কিম্বা দুপুরে লাল, কালো বেগুনী রঙের শাড়ি পরে থাকেন ও সেই সঙ্গে পরেন সিল্ক টাফেটা কিম্বা ওই জাতীয় কোন ভারী কাপড়ের ব্লাউজ। সেগুলি চোখের পক্ষেই শুধু মাত্র পীড়াদায়ক নয়, শরীরেও অস্বস্তি ঘটায়। লাল, কালো, গাঢ় হলুদ ও বেগুনী রঙগুলি গরম টানে ও ধরে রাখে। ফলে কাপড়গুলি গরম হয়ে যায়, আর যিনি পরেন তাঁরও শরীর গরম হয় এবং ঘাম হয়। ফলে সাজের সব সৌন্দর্যই নষ্ট হয়ে যায়। সাজের ব্যাপারে সবচেয়ে লক্ষণীয় হল রুচিবোধ। দামী বা কম দামী পোশাকের জন্য কিছু আসে-যায় না। আসল দরকার সুন্দর রুচিসংগত সাজ। যাই হোক সকালে কিম্বা দুপুরের দিকে বেরোতে হলে রঙ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া ভীষণ দরকার।

গ্রীষ্মের বিকেলে বা সন্ধ্যার একটা বিশেষত্ব আছে—তা হল ফুল। বেল, জুঁই ইত্যাদি ফুলের সুগন্ধে বাতাস মদির থাকে। সেই সুগন্ধ নিজের অঙ্গে জড়িয়ে নিতে পারলে ভালই তো। সামনে একটা ফুল কিম্বা ফুলের মালা রূপশোভা যে কতোটা বাড়াতে পারে তা বলা যায় না। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় আকাশী নীল, হাল্কা বাদামী, কচিকলাপাতা সবুজ, আর সবার উপরে শাদা শাড়ী, যার গায়ে বুটি কিম্বা সুন্দর চওড়া জরি পাড় অথবা নকসা পাড়। শাদা শাড়ী সকালে বা দুপুরে সাধারণত সবাই পরে থাকেন। কিন্তু ঢাকা শাদা ইত্যাদি মোটামুটি পরলেও সকালের চেয়ে এই ধরনের শাদা বিকেলে কিম্বা সন্ধ্যাতে পরলে সবচেয়ে ভাল দেখায়। সকালে বা দুপুরে রোদের শাদাটে উজ্জ্বল রঙ শাদা কাপড়ের উপর পড়ে চোখ ধাঁধায়। এ-রঙ চোখ ঠান্ডা করে বিকেলে কিম্বা সন্ধ্যায়। হাল্কা সুন্দর প্রিন্ট অবশ্য দুবেলাতেই চলে। তবে দিনের আলোতে প্রিন্ট বেশ ভাল দেখায়। একটু বড় প্রিন্ট কিম্বা গাঢ় প্রিন্ট পরতে হলে সন্ধ্যে বা রাত বেছে নেওয়াটাই যুক্তিযুক্ত হবে।

সন্ধ্যার পর অথবা রাত্রে কোনো বিশেষ উপলক্ষ বা নিমন্ত্রণ থাকলে সাধারণত উজ্জ্বল বিদ্যুতের আলো ঝলমলে আসরে যেতে হয়। মহিলাদের একটা বিশেষ প্রবণতা আছে পোশাকের ওজন বা ভারে একটু চড়া রঙ পরার দিকে। কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত যে, আমাদের সাজার মুখ্য উদ্দেশ্য দেখতে ভাল লাগা, এবং অবশ্য সেটা অপরের চোখে। কিন্তু অন্যের চোখকে যদি তা কষ্ট দেয়, তাহলে সাজার সার্থকতা কোথায়? গ্রীষ্মের নিজস্ব তাপ তো থাকেই, তার ওপর আলো, ভিড়, পোশাক গহনা সব মিলিয়ে যে তাপের সৃষ্টি হয়, সেখানে পোশাক যদি সেই অনুপাতে ঠান্ডা না হয়, তাহলে দর্শকদের মোটেই ভাল লাগে না। তাই রঙ ও পোশাকের কাপড় বাছার সময় বিশেষ খেয়াল রাখা দরকার। রাত্রে যে রঙগুলি এসব ক্ষেত্রে পরা যায়, তা হল—গোলাপী নীল, টিয়াসবুজ, হাল্কা বেগুনী, চাঁপা। যাঁরা লাল বা কালো রঙের ভক্ত তাঁদের মনে রাখা ভাল যে, এই রঙগুলি শীতকালে পক্ষেই সবচেয়ে ভাল। আরও একটা কথা, পোশাক খুব ভারী কাপড়ের না হলে শরীর হাল্কা লাগে ও গরমও কম হয়। যেমন, সিফন মটকা, কোটা (দামী), ও সিল্ক পরতে চাইলে মুর্শিদাবাদ ও কাশ্মীরী শাড়ীই ভাল। কারণ এই জাতীয় সিল্ক নরম হয়। বিয়েবাড়ী বা বড় ধরনের কোনো ভোজে যেতে হলে বেনারসী বা ওই জাতীয় মাদ্রাজী ভারী সিল্কের শাড়ী পরার প্রবণতা আমাদের মহিলাদের খুব বেশী। অবশ্য ভেবে দেখলে বোঝা যায় আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তাহলে তো ভাল ভারী দামী শাড়ী পরাই মুশকিল। তবুও যতটা সম্ভব এই জাতীয় শাড়ী খুব ভরা গ্রীষ্মে না পরাই বাঞ্ছনীয়। সে জায়গায় যদি খুব দামী টাঙ্গাইল পরা যায়, তাহলে আমি পরখ করে দেখেছি সবার মাঝে অনেক সুন্দর লাগে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আগ্রহের ঝোঁক বেশী থাকলে আমার অনুরোধ অন্তত রঙ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া ভাল। এবং শাড়ীর ভেতরে অতিরিক্ত জংলা কাজ বা জরীর ওজন না থাকাই ভাল। এইভাবে সাজ ও পোশাক সম্বন্ধে একটু সচেতন হলে, একটু নজর রাখলে সৌন্দর্য প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যাবে—এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত।

—বরবর্ণিনী

রাজার রাজা

[অবনীবাবু-উমাশশীর সংসারে কোন বৈচিত্র্য নেই। দিনগুলো কেটে যায় কোন ছাপ না রেখে। বড় ছেলে বিকাশ চাকরি পায়। ছোট ছেলে নন্তুগোপাল রাজনৈতিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে, সংসারে এক অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। বিকাশের সংগে পরিচয় ঘটে মালবিকার। ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। অফিসের ইউনিয়ন করতে গিয়ে বিকাশের অন্য স্বরূপে দৃষ্ট হতে থাকে। উপার্জনক্ষম ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ করেন অবনীবাবু। আর সে পাত্রী হল বিকাশের অফিসেরই বড়বাবুর মেয়ে। এ সংবাদে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে বিকাশ। ..]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নিজের দার-পরিগ্রহের কথা মনে পড়ে। মনেই পড়ে না আপন ইচ্ছার কতটুকু সে-ব্যাপারে সক্রিয় ছল। বাবাই সেখানে সব ছিলেন। উভয় পক্ষের অভিভাবকরাই সক্রিয় ছিলেন, হতে পারে তখনকার ব্যবস্থা আর এখনকার ব্যবস্থা এক নয় কিন্তু ব্যক্তিগত, পারিবারিক জীবন কি তার জন্যে একেবারে বদলে গেছে? নাকি মা-বাবা ছেলে-মেয়ের সম্পর্ক বিপরীত হয়েছে?......

দুটো ছেলেই যেন কেমন হয়ে গেল। নন্তু আজকাল প্রায়ই বাড়ী ফেরে না, ফিরলেও বেশিক্ষণ থাকে না কোন কথার জবাব দেয় না—যেন তার কারো সংগে কোন সম্বন্ধই নেই। বিকাশ ঠিক অতটা না হলেও আজকাল সংসারের চেয়ে তার আর কোথাও টান বেশি। অনন্তবাবু যা বলেছিলেন তাতে ভয়ের যথেষ্ট কারণ আছে। আপিসের ইউনিয়ন নিয়ে বিকাশ খুব মেতেছে। অনন্তবাবু বলেছেন রিং লিডার! অবশ্য সেই সংগে অভয়ও দিয়েছেন, তিনি যতদিন আপিসে আছেন প্রকৃত ভয়ের কোন কারণ নেই। তিনি ওয়াচ করছেন—ওয়েল উইশার হিসেবে করণীয় সব কিছু করবেন।

এই তো আজই আপিসে তর্কাতর্কি ছোট-বড় নানা কথা হয়েছে। অনন্তবাবু মনে মনে খুবই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু বৈবাহিক সম্বন্ধটা স্মরণ করে এবং অবনীবাবুকে হঠাৎ বাড়ী বয়ে আসতে দেখে সব ভুলে গেছেন। হবু জামাই-এর ঔদ্ধত্য মনে রাখেননি বরং ছেলেমানুষী মাথা গরম ভেবে উড়িয়ে দিয়েছেন। মনে মনে ভেবেছেন বিয়ে হয়ে গেলে ওসব কিছু থাকবে না। ভালয় ভালয় বিয়েটা হয়ে যাক! তারপর—

মায়ের মুখের ওপর ঠিক ওভাবে কথা বলবার ইচ্ছে বিকাশের ছিল না। বিয়ে সে এখন করতে চায় না, বিয়ে করার অবস্থা তাদের নয় এই কথাটা বোঝাতে গিয়ে কেমন যেন হয়ে গেল। বাবা খুবই মনক্ষুণ্ণ দুঃখিত হয়েছেন। কদিন তিনি বিকাশের সামনে আসছেন না। সংসারের কোন কথার মধ্যে যেন থাকতে চান না। এ অভিমান না ক্ষোভ? ছেলেমেয়ের ওপর আধিপত্য নাশের বেদনা?

বিকাশ আবার নিজের দিক থেকে ব্যাপারটা সহজ করবার চেষ্টা করেছে বাবার রাগ বা দুঃখ করার যেন কোন মানে হয় না। তিনি এত বোঝেন আর এটা বুঝতে পারছেন না যে, ছেলের বিয়ে দিয়ে দিলেই তাঁর কর্তব্য শেষ হয়ে যাচ্ছে না। একা সামাজিক সম্পর্ক এত সহজে স্থির ক[...] কি ঠিক? এখনো কি তাঁদের কাল আছে তা ছাড়া তিনি তো বিকাশকে ডেকে বল[...] পারতেন, অনন্তবাবু তাঁর বাড়ীতে আ[...] থেকে তিনি এক রকম স্থিরই করে রেখে ছিলেন ঐখানেই বিয়ে দেবেন, বিকাশ যে[...] অন্যমত না করে।

অনন্তবাবু শ্বশুর হবেন, কথাটা ভাব[...]তেই বিকাশের কেমন ঘেন্না করে। আর কো[...] হলে বিকাশ হয়তো দ্বিতীয়বার চিন্[...] করে দেখতো সংগে সংগে এভাবে প্রত্যাখ্যা[...] করতো না। অনন্তবাবুকেই তার অসহ্য তা ছাড়া—

না বাবাকে ডেকে এসব কথা ব[...] বোঝান যাবে না। তিনি কি বুঝেছেন [...] জানে, ছেলেদের সম্বন্ধে হঠাৎ কেম[...] নিরুৎসাহ, নিরুৎসা[...] হয়ে গেছেন। [...] একদিন ইচ্ছে করে [...] করে বাড়ী ফি[...] বিকাশ দেখেছে [...] আর তার খবর নি[...] ঘর-বার করেন [...] চুপ-চাপ নিজের ঘ[...] এসে বসে থাকে

সেই থেকে শরীরটাও যেন অবনীবাবু[...] ভাল যাচ্ছে না। আপিস করে এসে শুয়ে পড়েন, তারপর একঘুম হয়ে গেলে উঠে কোনরকমে খেয়ে আবার শুয়ে পড়েন বিকাশ লক্ষ্য করে মনে মনে কেমন অপরাধ বোধ করে কি দরকার ছিল নিজের মতটা ওঁদের মুখের ওপর ব্যক্ত করে, চুপ করে থেকে তারপর মাকে বুঝিয়ে বলতে ব্যাপারটা এত গুরুতর হয়তো হত না বাবাও নিশ্চয়ই বুঝতেন। এখন তো ঘরে আরো অশান্তি, মুখে কিছু না বললেও বুঝতে কারো বাকি নেই—ছেলেমেয়ের অবাধ্যতা কোন অভিভাবকই ভাল মনে নেন না। উপায় থাকলে, তাঁরা উচিত শিক্ষাও দেন কখনো তিরস্কার করে কখনো বা বাড়ী থেকে বহিষ্কার করে, সম্বন্ধ কাটছাঁট করে।

একদিন আপিস থেকে ফিরে বাড়ী ঢুকেই বিকাশ বেশ ভয় পেয়ে গেল। পাড়ার কালীডাক্তার ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। কি ব্যাপার? কালীবাবু বললেন একটু হার্টের কমপ্লেন হয়েছে ভাববার কিছু নেই, ওষুধ দিয়ে গেলুম, কদিন রেস্ট নিলে ঠিক হয়ে যাবে।

তাড়াতাড়ি বাবার ঘরে ঢুকে বিকাশ কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল। বাবা চোখ

বুজিয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন মা তাঁর পায়ের দিকে বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছেন, ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনটা বিছানার ওপর উড়ছে। বিকাশের বুকটা শূন্য হয়ে মনে হল, বাবা যদি মারা যান? তাদের কি হবে? কে দেখবে—

অস্ফুটে মা বললেন, আপিস থেকে ফিরে বললেন বুকটা কেমন করছে?

বিকাশ মনে মনে প্রমাদ গুণলে, তা হলে বাবার সেই ভয়ঙ্কর অসুখের সূচনা হল যা আত্মীয়-স্বজনকে রোগীর চিকিৎসা করবার সুযোগ দেয় না—হঠাৎই গলা টিপে ধরে মুহূর্তে সব শেষ করে দেয়?

বিকাশ বললে, ডাক্তারবাবু কি বললেন? মাও বোধহয় বিশ্বাস করেননি বললেন, ও কিছু না—ওষুধ খাওয়ালে সেরে যাবে।

ডাক্তারদের তো তাই বলতে হয়, রোগীর অবস্থা যতই খারাপ হোক তাঁরা কখনো হতাশ করেন না।

বাবার হার্টের গোলমালের কথাটা বিকাশ মার কাছে চেপে গেল। মুখে বললে, তুমি যাও, আমি দেখছি।

বিকাশ বাবার পায়ের কাছে বসে পায়ে হাত বুলতে বুলতে কবার অস্ফুটে ডাকলে, বাবা! বাবা! বাবা!

অবনীবাবু বোধহয় চোখ খোলবার চেষ্টা করলেন, পারলেন না। বিকাশের ইচ্ছে করল এখনই যেন বলে, বাবা তুমি আমার ওপর রাগ করো না, আমি তোমার অবাধ্য হইনি। তোমার অসুখটা সেরে যাক তখন তুমি যা বলবে তাই শুনবো!

কাতর স্বরে আবার ডাকলে, বাবা! বাবা! বাবা!

সেই ছোটবেলায় বুঝি এমনি করে ডাকতো যখন-তখন যে কোন কারণে তারপর যৌবনে বুঝি লজ্জা পেয়ে তেমন করে আর বাবা-ডাক ডাকে নি। জীবনে মাকে যতবার ডেকেছে বাবাকে কি ততবার ডেকেছে? বাবা! বাবা! কত নিশ্চিন্ততা, নির্ভরতা আছে এই ডাকের মধ্যে আজই যেন বিকাশ অনুভব করতে পারে।

কদিন সেবাশুশ্রূষায় বিকাশ নাইবার খাবার সময় পেলে না। ওষুধ-পত্র, পথ্য কোন কিছুর ত্রুটী রাখলে না। বাবাকে ভাল করে তুলবেই এই যেন তার এক জেদ চেপে গেল। বাবা ভাল হয়ে উঠে বুঝবেন, বিকাশ তার অবাধ্য নয়, খুবই বাধ্য, কর্তব্যপরায়ণ ছেলে তাঁর!

ভোর হতে বোধ হয় দেরী ছিল না, কাকের কর্কশ স্বর শোনা যাচ্ছিল। মার উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে বিকাশ ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসল। হঠাৎ মা এমন ব্যস্ত হয়ে ডাকছেন কেন কি হয়েছে।

উমাশশী রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, শিগগীর আয়, উনি কেমন করছেন।

কি হয়েছে? তক্তপোষ থেকে নেমে ব্যস্ত-ভাবে ঘর থেকে বিকাশ বেরিয়ে এল।

উমাশশী বললেন, কি জানি, এই বেশ ঘুমোচ্ছিলেন, হঠাৎ—

বিকাশ দেখলে অবনীবাবু কথা বলতে পারছেন না কেবল উঠছেন, বসছেন, অস্বস্তি বোধ করছেন।

বিকাশ কাছে এসে বার কয়েক বাবা বাবা বলে ডাকলে, অবনীবাবু চোখ তুলে চাইলেন, কিন্তু কোন কথা বলতে পারলেন না। বিকাশ আবার জিজ্ঞেস করলে, কি কষ্ট হচ্ছে?

অবনীবাবু কোন উত্তর করলেন না ছেলের মুখের দিকে সজল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। উমাশশী কাঁদতে লাগলেন। বিকাশ ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। কিন্তু যখন ডাক্তার নিয়ে বাড়ী ফিরলো তখন সব শেষ হয়ে গেছে। পূবে আকাশ বেশ ফর্সা হয়েছে, শহুরে কাক-গুলো প্রাতরাশের আশায় গৃহস্থবাড়ীর চালে বসে চেঁচামেচি শুরু করেছে। পাটনাই ছাগলীর গলায় ঘণ্টা বাজিয়ে ছাগল-দুধ বিক্রী করতে চলেছে।

বাবার মৃত্যুটা যে এত হঠাৎ আসবে বিকাশ ভাবতে পারেনি। অপরাধ বোধের মত তার কেবল মনে হতে লাগল, হয়তো তার জন্যেই বাবা মারা গেছেন। বিয়ের ব্যাপার নিয়ে চেঁচামেচি না করে চুপ করে থাকলেই হতো। কি দরকার ছিল নির্লজ্জের মত—

বাবা শক পাননি তো? বিকাশ হাজার বার নিজেকে প্রশ্ন করেছে, আবার নিজে নিজে তার উত্তরও দিয়েছে— না না, শক পাবেন কেন, রূঢ় সে তো কিছু বলেনি। বরং ওই মতলববাজ লোকটার মেয়েকে বিয়ে করবে না বলেছে—বাবাকে সে সময় মত অনন্তবাবুর চরিত্র সম্বন্ধে বলতো— এ লোকটা একেবারেই সুবিধের নয়। সব ব্যাপারেই কেবল মতলব—

তবু বার বার মনে হয় বাপের মৃত্যুর জন্যে সে-ই দায়ী। ইদানিং পুত্রের কর্তব্যও সে কিছু করেনি। বাপ-মাকে সুখী করার কথা কোনদিন চিন্তা করেনি। তাঁদের অস্তিত্বের কথাও কিছু যেন ভাবেনি। বাবা কি তার জন্যে দুঃখ পেয়ে যাননি? মৃত্যুর পরে কথাগুলো বিশেষ করে মনে হচ্ছে: বাবা হয়তো বড় ছেলের কাছে থেকে আনুগত্য শ্রদ্ধা সম্মান ভক্তি আশা করতেন। একেই কি মুখ-চাওয়া বলে? কে জানে।

মা এমনিই ছেলেদের সম্পর্কে কোন কথা বলতেন না নিজের মত কিছু খাটাতেন না, কেবল ভালবাসা, স্নেহ আর মায়ায় জড়িয়ে থাকতেন, আজ তিনিও যেন কেমন হয়ে গেছেন। মাকে দেখলে বিকাশের বড় কষ্ট হয়, যেন তাঁর একটা মস্ত অবলম্বন চলে গেছে, তিনি আর চলতে ফিরতে উঠতে বসতে পারছেন না। অবনীবাবু খাবতে ছোটছেলের সম্বন্ধে নানা উদ্বেগ আশঙ্কা প্রকাশ করতেন, এখন একেবারে চুপ। নন্তু এখন কদিন বাড়ীতে আছে, মনে হয় পঙ্ক-শ্রাদ্ধ পর্যন্ত থাকবে। বিকাশের সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা হয় না। সব সময় সে মা'র কাছেই থাকে। খুব যেন মাতৃভক্ত হয়েছে পিতৃহীন হয়ে।

এদিকে অনন্তবাবু খুব সহানুভূতি-পরায়ণ হয়ে উঠেছেন আপিসে বিকাশের ছুটির ব্যবস্থা করে প্রায় দুবেলা এসে খোঁজ-খবর নিয়ে যাচ্ছেন। উমাশশীকে সময়োচিত সান্ত্বনা দিচ্ছেন। বিরূপ মনো-ভাবাপন্ন হলেও বিকাশ ভদ্রলোকের সহানুভূতি সান্ত্বনা আত্মীয়তা অস্বীকার করতে পারেনি। যাকে বলে বিপদের সময় করা এ-ও যেন তাই। বিকাশ বেশ সংশয়ের মধ্যে পড়ে। ভদ্রলোককে দেখলে কেমন যেন দুঃখের সঙ্গে বিকাশের বার বার মনে হয়, বাবা কথা দিয়েছিলেন, কি নাম যেন অনন্তবাবুর মেয়ের সরমার সঙ্গে বড় ছেলের বিয়ে দেবেন। কে জানে ভদ্রলোক সেই আশায় তাদের এই সময় করছেন কিনা। সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যায় পিতৃহীন হয়ে— মত, পথ, ইচ্ছা! এক এক সময় বিকাশের মনে হয় যেন বড় অসহায় হয়ে পড়েছে, আর যেন তার কোন কর্মক্ষমতা নেই, আপিসের সংগ্রাম ইত্যাদির ব্যাপারে মনে সে-জোরও যেন নেই।

তা হলে জীবিত বর্তমান পিতাই কি পুত্রের সকল উৎসাহ এবং কর্মক্ষমতার উৎস? পিতৃহীন অতি হতভাগ্য? পিতাই কি পুত্রকে সকল বিপদ থেকে অশুভ থেকে আড়াল করে রাখেন? 'পাহাড়ের আড়াল' কথাটার অর্থ এই?

আপিসের ব্যাপারে পূর্বের মত উৎসাহ উদ্দীপনা সে বোধ করে না, বিকাশ বুঝতে পারে। পিতৃহীন হয়ে কেমন যেন জড়ত্ববোধ করে। প্রতিদিন ঘুম ভেঙে কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা শূন্যতা বোধ হয়। আপিসে যেতে ইচ্ছে করে না। সে-সংগ্রামী মনোভাব কোথায় গেল? কোথা থেকে কেমন করে একটা বোঝা যেন মাথার ওপর চেপে বসেছে।

নন্তুকে বিকাশ একদিন বললে, সংসার দেখার দায়িত্ব এখন আমাদের দুজনের। তোমাকেও কিছু দায়িত্ব নিতে হবে।

নন্তু যেন কথাটা গায়ে মাখলে না। বাবা বেঁচে থাকতে সে সংসারের জন্যে কি করেছে যে এখন তাকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। বিকাশ রেগে বলেছে, আমার বয়ে গেছে, আমিও কিছু দেখতে পারবো না!

নন্তু কোন উত্তর করেনি। বিকাশ লক্ষ্য করেছে, মা কিন্তু আর তাদের মধ্যে পড়ে বিবাদ মেটাবার চেষ্টা করেনি, একেবারে নিশ্চেষ্ট, নীরব হয়ে আছেন।

ভাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বিকাশ বলেছে, আমি কারো দায়িত্ব নিতে পারবো না, আমার কি—মাকে নিয়ে আমি আলাদা থাকবো।

তাতেই বা কি, নন্তুর কোন হেলদোল নেই। বাপের শ্রাদ্ধশান্তির পর বাড়ীতে তাকে আর দেখা গেল না। কোথায় গেল, কি উদ্দেশ্যে কাউকে কিছু বলে গেল না। বিকাশ ভেবেছিল মা তাকে বলবেন নন্তুর খোঁজ-খবর করবার জন্যে—যেমন আগে বলতেন বাবা বেঁচে থাকতে।

কিন্তু না, উমাশশী কোন কথা জিজ্ঞেস করলেন না। তেমনি মুহ্যমানা নীরব হয়ে রইলেন। বেশ বোঝা গেল স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সংসার সম্বন্ধে তাঁর সকল আগ্রহ, উৎসাহ চেতনা যেন লোপ পেয়েছে। বিকাশ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলেন, তুমি যা ভাল বোঝ কর, তোমরা বড় হয়েছ এখন তোমরাই সব করবে।

কিন্তু তোমার ছোট ছেলে?

মা কোন উত্তর দেননি, বিকাশের মুখের দিকে অসহায়ের মত চেয়েছিলেন। অর্থাৎ তাঁর আশা আর কেন?

তবু বড় ভাই হিসেবে মাঝে মাঝেই নিজ গুরুত্বের কথা বিকাশ ভুলতে পারে না। ভাবে হয়তো বড় হিসেবে তার কর্তব্য ভাইকে ফিরিয়ে আনা, আর পাঁচজনের মত সংসারমুখী করে মানুষ করা। নন্তু তার আগেই রাজনীতি করছে, রাজনৈতিক পাণ্ডাদের সঙ্গে চেনা-পরিচয় আছে, শোভাযাত্রা মিটিং বা ঝাণ্ডা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া, শ্লোগান দেওয়া ওর অনেক দিনের অভ্যাস। কিন্তু ইদানিং ও আর ওসবের মধ্যে নেই, গোপনে কোথায় কি করছে কে জানে। সরকারী চাকরীতে বহাল হওয়া পর্যন্ত বিকাশ নন্তুর কার্যকলাপকে ছেলেমানুষী বলে মনে করতো, বাবা রাগ করলে বলতো, একটা কিছু তো করতে হবে, না হলে পেটের ভাত হজম হবে কেন! ও আপনিই একদিন চলে আসবে, যখন বুঝবে চেঁচামেচিই সার!

অবনীবাবুও বিশ্বাস করতেন, এসব ছেলেমানুষী; নেতৃবৃন্দ কেবল অল্পবুদ্ধি ছেলেদের দিয়ে নিজের নাম জাহির করা; যা আছে তা-ই চলবে। বিধান রায় ঠিকই বলেছিলেন, আর পঁচিশ বছর কংগ্রেস রাজত্ব চলবে।

কিন্তু না, তা চলেনি, আর সেই জন্যেই তাঁর ছোটছেলের সম্বন্ধে ভয় ছিল।

বড় ছেলের রাজনৈতিক চেতনা সম্বন্ধে অবশ্য অবনীবাবুর কোন ভয় ছিল না। চাকরী যখন করছে একরকম করে চলে যাবে। আপিসের গোলমাল সম্বন্ধে যা শুনেছিলেন, তাতে বিশেষ ভয়ের কিছু নেই, কেন না ও জিনিস এখন সংক্রামক ব্যাধির মত সর্বত্রই আছে, ধর্মঘট, মারধোর, লক-আউট ঝগড়া আর ক কথা দল বাঁধার জন্যে নানা দলাদলি! স্বার্থসিদ্ধির উপায় মাত্র!

নিজের জীবন একভাবে কেটেছিল, ছেলে দুটোর জন্য অবনীবাবুর যত ভাবনা ছিল। নন্তু তো ঐ বিকাশ আবার চাকরী করতে করতে কিছু না করে বসে। আপিসে গোলমাল হলেই রাজনৈতিক কোন দল এসে আবার মাতব্বরি না করে।

আপিসে সহকর্মী বন্ধুরা একদিন বিকাশকে ডেকে অনুযোগ করলে ইদানিং বিকাশ আপিসের ব্যাপারে নিরুৎসাহ, নিরুৎসাক নিজীব হয়ে পড়েছে, কেমন যেন আড়-আড় ছাড়-ছাড় আপিসের ব্যাপারে। তারা লক্ষ্য করছে পর পর কটা গেট-মিটিং-এ, কমিটি মিটিং-এ, আলোচনা সভায় বিকাশ অনুপস্থিত। এই পরশু দিন বিকাশকে খুঁজে পাওয়া যায় নি, কোথায় ছিল ইত্যাদি।

দিবেন্দু জিজ্ঞেস করলে, কি ব্যাপার [illegible] হঠাৎ যেন মন-মরা হয়ে গেছো!

বিকাশ অসহায়ের মত সবার মুখের দিকে চেয়ে বললে, আমার বাবা মারা গেছেন!

মন[illegible] বা নিরুৎসাহ হওয়ার পক্ষে [illegible] কারণ ঠিকই, কিন্তু সংগ্রামী [illegible]র পক্ষে সবটা বোধ হয় তা নয়। [illegible]রা ভিন্ন অর্থ করছে। সুনীল [illegible] মুখের ওপর বললে, বাবা মরেছে [illegible] ইউনিয়ন ছেড়ে দেবে, না অন্য কোন মতলব আছে?

কথাটা বিকাশের খুব লাগল, বেশ রুক্ষ স্বরে বললে, অন্য মতলব মানে? কি মনে করেছ!

দিবেন্দু থামিয়ে দিয়ে বললে, যাক্ যাক, সুনীল কথাটা তোমার ওভাবে বলা উচিত হয় নি। হি ইজ মোরনিং—

বিকাশ রেগে বললে, আই এ্যাম নট্ এ কাওয়ার্ড! দিবেন্দু গায়ে হাত দিয়ে বললে, না না, ওকথা ভাবো কেন। ও হয়তো ঠাট্টা করে বলেছে।

ঠাট্টার একটা সময় আছে! আজ একমাসও হয় নি আমি পিতৃহীন—

বলতে বলতে বিকাশের কণ্ঠস্বর বাষ্পাকুল হয়ে উঠলো, চোখ দিয়ে যেন জল বেরিয়ে এলো; বন্ধুদের সামনে নিজেকে কেমন অপ্রস্তুতও বোধ বোধ করলে—নিজেকে পিতৃহীন বলে বর্ণনা করাটা কেমন যেন এ ক্ষেত্রে কাপুরুষোচিত।

বন্ধুরা অপ্রস্তুত হলো। দিবেন্দু বললে, এদিকে ব্যাপার শুনেছ তো? আমরা স্ট্রাইক নোটিশ দিয়েছি আগামী কাল কমিটি মিটিং হবে, তুমি এস।

(ক্রমশঃ)

বেকেনবাউয়ার

সকাল দেখে, সারাদিন কেমন যাবে এখন হয়ত সবসময় সঠিক করে নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু বেকেনবাউয়ারের ছেলেবেলায় ক্রীড়াদক্ষতায় সম্ভাবনাময় আলোকজ্জ্বল ভাবীকালের এক খেলোয়াড়ের স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল।

বেকেনবাউয়ারের জন্ম ১৯৪৫ খৃঃ ১১ সেপ্টেম্বর। বাবা জার্মানীর গিসিং-এ মিউনিখ ওয়ার্কিং গ্লাস ডিস্ট্রিক্ট পোস্ট অফিসের একজন সামান্য কর্মচারী। বেকেনবাউয়ার তখন প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র, পড়াশুনার চেয়ে খেলাধুলোয় অধিক অনুরাগী। ক্লাশের ছেলেরা যখন টিফিন করত, বেকেনবাউয়ার তখন স্কুলের চত্বরে ফুটবল পায়ে নিয়ে ড্রিবলিং করত। ফুটবল খেলায় সে ছিল স্কুলের সেরা ছেলে।

প্রাথমিক স্কুলের পড়া শেষ করে বেকেনবাউয়ার চেয়েছিল উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে। কিন্তু ক্রীড়াপ্রতিভা তাকে চালিত করল তার স্বনির্দিষ্ট আশার পথে। জার্মানীর এক দিকপাল ফুটবল খেলোয়াড় বেকেনবাউয়ারের ক্রীড়ানৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে ১৯৫৬ খৃঃ মিউনচেন ফুটবল ক্লাবে নিয়ে যায়। এই ক্লাবের পক্ষে খেলায় তিনি নিয়মিত অংশ গ্রহণ করেন। এইভাবে বেকেনবাউয়ারের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। এরপর তিনি আর কোন স্কুল কলেজের বিদ্যাশিক্ষা গ্রহণ করেননি।

স্বকীয় ক্রীড়াদক্ষতার জোরে বেকেনবাউয়ার মিউনচেন ক্লাবে বিশিষ্ট জায়গা করে নিয়েছিলেন। মিউনচেন জার্মানীর বিখ্যাত ফুটবল ক্লাব। এই ক্লাবে অল্প কিছুকালের মধ্যেই বেকেনবাউয়ার জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। এবং মাত্র একুশ বছর বয়সে জার্মান ফুটবল প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ বিভাগে অর্থাৎ 'ফেডারেল লীগে' অংশগ্রহণ করেন। এই সময় জার্মানীর জাতীয় ফুটবল প্রশিক্ষক হেলমুটের অভিজ্ঞ চোখে বেকেনবাউয়ার ধরা পড়েন। তিনি যোগ্যতার চুলচেরা বিচারে বিচার করে বেকেনবাউয়ারকে জাতীয় ফুটবল দলে গ্রহণ করেন। ১৯৬৬ সালে ব্রিটেনে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ফুটবলে বেকেনবাউয়ার যোগ দেন। চূড়ান্ত খেলায় পশ্চিম জার্মানী অবশ্য ইংলন্ডের বিরুদ্ধে ৪-২ গোলে পরাজিত হয়। ১৯৭০ সালে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপেও বেকেনবাউয়ারের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। তাছাড়াও তিনি দেশ ও বিদেশের মাটিতে বিভিন্ন সময়ে জার্মান জাতীয় ফুটবল দলের অন্যতম সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৯৭২ সালে পঁচিশটি দেশের সাংবাদিকদের এক বিচারে বেকেনবাউয়ারকে ঐ বছরে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ ফুটবলারের সম্মানে ভূষিত করা হয়।

স্বদেশে অনুষ্ঠিত চলতি বছরের বিশ্ব কাপ বেকেনবাউয়ারের খেলোয়াড়ী জীবনের স্মরণীয় বছর। কারণ পশ্চিম জার্মানী এবার বিশ্ব কাপ ফুটবলে বিজয়ী। এবং বেকেনবাউয়ার দলের অধিনায়ক। বিশ্ব-বিজয়ী দলের অধিনায়ক হবার সৌভাগ্য কজনার ভাগ্যে জোটে! সিদ্ধান্ত গ্রহণে উপস্থিত বুদ্ধিতে, দল পরিচালনায় ও সর্বোপরি ক্রীড়ানৈপুণ্যে বেকেনবাউয়ার যোগ্য অধিনায়কের ভূমিকা পালন করেছেন। মাঠে তিনি আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করেছেন। আবার নিজের দলের আক্রমণ রচনার পথ প্রশস্ত করেছেন। আক্রমণকারী সতীর্থদের তিনি নিখুঁত পাশে মাপা বল বাড়িয়েছেন। সত্যি কথা বলতে কি জার্মান দলের অগ্রভাগের দুই স্তম্ভ বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড় জার্ড মুলার ও উলি হোয়েনেস আক্রমণ রচনার ক্ষেত্রে অনেকাংশে দলের অধিনায়কের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। ফাইনালে শক্তিশালী হল্যান্ডের বিরুদ্ধে পশ্চিম জার্মানী ২—১ গোলে জয়লাভ করে। এখানেও বেকেনবাউয়ারের ভূমিকা প্রশংসাযোগ্য। এই বছর নিয়ে বেকেনবাউয়ার তিনবার বিশ্ব কাপ ফুটবলে খেলার সৌভাগ্য অর্জন করলেন। জাতীয় দলে বিভিন্ন খেলায় প্রায় আশীবার অংশ নিয়েছেন বেকেনবাউয়ার।

বেকেনবাউয়ারের পুরো নাম ফ্রানজ বেকেনবাউয়ার। দেশের মানুষের কাছে 'কাইসার ফ্রানজ' নামেও পরিচিত। ফ্রানজ-এর ক্রীড়াখ্যাতি এখন সারা পৃথিবীতে। নানান দেশ থেকে মোটা অংকের বিনিময়ে দলত্যাগের আহ্বান আসছে। দেশের প্রতি বেকেনবাউয়ারের মমত্ব অপরসীম। টাকার অংক যতই হোক না কেন তিনি দেশ ত্যাগের কথা ভাবতেই পারেন না। মনেপ্রাণে খাঁটি 'বেভারিয়ান'।

ফ্রানজ বেকেনবাউয়ার কর্তব্যনিষ্ঠ। তার সারাদিন কাটে ছকে বাঁধা রুটিনে। নিয়মিত অনুশীলন ছাড়া অবসর সময়ে যায় লাইব্রেরিতে। সেখানে পড়েন পৃথিবীর নানা দেশের পত্র-পত্রিকায় খেলাধুলো সংক্রান্ত রচনা। কি করে আরও বিজ্ঞানসম্মত খেলা যায় তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন। পরে চলে তার প্রয়োগ। আর দশ কামরা-ওয়ালা গিসিং-এর বাড়ীতে দরদী স্ত্রী ও তিন ছেলেমেয়ের সান্নিধ্যে বিশ্ববিজয়ী ফুটবল দলের অধিনায়ক ফ্রানজ বেকেনবাউয়ার সে সময় হাস্যে ভোজনে রসিকতায় সময় অতিবাহিত করেন।

—প্রশান্ত দা

খেলার জগতে মেয়ে

জলপরী নাফিসা আলী 'বর্ষারাণী'

গত ২৫ আগস্ট তথ্যকেন্দ্রে পশ্চিমবঙ্গ ক্রীড়াসাংবাদিক ক্লাবের বাৎসরিক শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া-কুশলী বরণ অনুষ্ঠানে বর্ষশ্রেষ্ঠ (৭৩) সাঁতারুর পরিচয় করাবার সময় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় বললেন, আমরা সবাই ম্যাট্রিক ক্লাশের বাংলা সিলেকশনে 'ভারতবর্ষ' গল্পটি পড়েছি। সেই গল্পের লেখক এস. ওয়াজেদ আলীরই পৌত্রী নাফিসা বর্ষের শ্রেষ্ঠ সাঁতারুর পুরস্কার পাচ্ছে।

নাফিসা কিন্তু পিতামহের লেখা 'সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে', কথাটি মিথ্যা প্রমাণ করে দিয়েছে নিজের কৃতিত্বে। হুগলী জেলায় তাজপুরের খানদানি পর্দানসীন মুসলীম পরিবারের মেয়ে। শিশুকাল থেকেই বাবা আমেদ আলীর প্রেরণায় বাড়ীর পুকুরের জলে সাঁতার শেখার সুযোগ পেয়ে উত্তরকালে কলকাতা তথা পশ্চিমবাংলা এবং ভারতের সাঁতারের আসরে সবাইকে মুগ্ধ বিস্ময়ে হতচকিত করে দিয়েছে। নাফিসা বলে, 'বাবা কিন্তু ঠাকুর্দার নামে পরিচিত হবার চেয়ে নিজের কর্মকীর্তির কুশলতায় পরিচিত হবার ওপরই বেশী জোর দেন। তিনি আমাদের দুই ভাইবোনকে সেই শিক্ষাই দিয়েছেন।'

নাফিসার বাবার সঙ্গে দেখা করে একদিন সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলাম। দুপুরের প্রবল বর্ষণ মাথায় নিয়ে নির্ধারিত সময়ে ঝাউতলা রোডের কোমর সমান জল ঠেলে উপস্থিত হলাম ৪৮নং বাড়ীর ফটকে। নাফিসার মা শ্রীমতী আলী দরজা খুলে স্বাগত জানিয়ে নিয়ে গেলেন ডাইনিং হলে। সুসজ্জিত ঘরে বসে আস্তে আস্তে কথাবার্তা শুরু করলাম। শ্রীমতী আলীও মাঝে মাঝে যোগ দিচ্ছিলেন।

শ্রীমতী আলী দেখালেন, নানা পত্র-পত্রিকায় নাফিসার সাঁতার কুশলতার অজস্র সংবাদ আর তার নানা ধরনের ছবি, প্রায় সাত মাস বয়সে বাবা আমেদ আলীর হাতে বসে, নাফিসা দেশের বাড়ীর পুকুরে প্রথম যেদিন জলের স্পর্শ পায়, সে ছবিও। নাফিসা খুব ছেলেবেলা থেকেই জলে নামছে। —'জলে হুটোপাটি করতে কখনও আমার ভয় হয়নি। আমি ছোটবেলা থেকেই জলে অনায়াসে ভেসে থাকি। এমনকি লাফিয়ে লাফিয়ে দৌড়োতেও পারি,' বলে নাফিসা। প্রথমে এই হাসামুখী মেয়েটি খুব সংক্ষেপেই প্রশ্নের দিচ্ছিল; সস্নেহ সংলাপ ও

হাসিঠাট্টায় পরিবেশ হাল্কা করার পর দশম শ্রেণীর ছাত্রী সপ্তদশী নাফিসা সানন্দে কথা বলতে শুরু করলো।

—তোমার এই ক'বছরের সাঁতারু জীবনের কোন একটি স্মরণীয় ঘটনা বা দিনের কথা বলতো?

একটু ভেবে নিয়ে নাফিসা বলল, মাদ্রাজে '৭২এ জাতীয় সাঁতারে প্রথম আবির্ভাবেই ২০০ মিটার বুক সাঁতারে জাতীয় রেকর্ড ভাঙ্গার ব্যাপারটাই আমার কাছে সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা। আমি এ রেকর্ড ভাঙ্গাতে পারব একথা ভাবতেই পারিনি।

তবে কয়েক ধরনের পত্রিকায় অদ্ভুত মন্তব্য আর ফাঁপানো ফোলানো খবর দেখিয়ে একটু বিরক্তি প্রকাশ করে নাফিসা।

—ওরা লিখেছে এই বিরাট বপু নিয়ে এ মেয়ে যার স্ত্রী হবে, তার প্রাণ হবে ওষ্ঠাগত। দেখুন, আমার বয়স এখন সতেরো কাঁধের প্রসার ১৭ ইঞ্চি, লম্বায় ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, কাঁধের বিন্দু থেকে হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত ২৯ ইঞ্চি। হাসির দীপ্তিতে ঘর ভরিয়ে দিয়ে বলল, দেখুন তো লম্বা-চওড়া হলেও আমি কি বেঢপ?

—আমার মা-বাবা, বিশেষ করে মা আমার স্বাস্থ্য ঠিক রাখার দিকে সব সময় যত্ন নজর রেখেছেন। আমি যেখানেই যাই ওঁরা আমার সংগে থাকেন। মা বলেন, সাঁতার এক কঠিন কঠোর এবং সাধনার বিষয়। সেই সংগে পড়াশোনাও নিয়মিত চালাতে হবে; নিয়মিত অনুশীলন করতে হয়। দিনে অন্ততঃ সাত হাজার মিটার সাঁতার কাটি। দেখুন না আমার বিষয় লিখতে গিয়ে একটি পত্রিকা বলেছেন, দৈনিক ২৫ কিলোমিটার সাঁতার না কাটলে চলবে না! তাকি সম্ভব? তাতেই সময় পাচ্ছি না। সারা হয়ে যাচ্ছি। নাফিসার মায়ের পূর্বপুরুষ এদেশে এসেছেলেন স্কটল্যান্ড ও আয়র্ল্যান্ড থেকে।) অনেক পত্রপত্রিকা বড় বাজে কথা লেখে বলে নাফিসা ক্ষোভ প্রকাশ করে। বলে, দেখুন না আমার ফিল্মে নামার ব্যাপার নিয়ে কিরকম বাজে বাজে গল্প ছড়ান হল। অথচ আমার পক্ষে এখন সাঁতার আর পড়া ছেড়ে ফিল্মে যোগ দেওয়া মোটেই সম্ভব নয়। তাই মা-বাবা ও-প্রস্তাব সরাসরি বাতিল করে দিয়েছেন।

জলপরী নাফিসা 'বর্ষারাণী' আখ্যাও জয় করেছে। গতবার ক্যালকাটা সুইমিং ক্লাবের বার্ষিক 'বর্ষারাণী' সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় ও শীর্ষস্থান লাভ করে এই আখ্যা পায়। অষ্টাদশ বসন্তে এখনও পদাপর্ণ করেনি নাফিসা। মনে তার এখনও কিশোরীর চাপল্য রয়েছে।

ড্রিল করার ভংগীতে দুপাশে দুহাত প্রসারিত করে নাফিসা বলে, জানেন এই হাত দুটো দিয়ে আমি নানা জিনিস ভাঙ্গি আর গড়ি।

—তাই বুঝি ক্রমাগত সাঁতারের রেকর্ড ভেঙ্গে চলেছ?

হ্যাঁ, এরি মধ্যে বেশ কয়েকটি রেকর্ড নাফিসা ভেঙ্গেছে। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ১২ বছরের পুরানো রাজ্য রেকর্ড ভাঙ্গার কথা।—১৯৬১ সালে সন্ধ্যা চন্দ্র ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল সাঁতারে ১ মিনিট ২০'১ সেকেণ্ড সময় নিয়ে যে রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছিল, ১২ বছর পরে সেই রেকর্ড ভাঙ্গে নাফিসার ঐ হাতেই। নাফিসা নতুন রাজ্য রেকর্ড করে ১ মিনিট ১৮'৫ সেকেন্ড সময় নিয়ে। এ ছাড়া '৭২এ কলম্বোয় ভারত-সিংহল সাঁতার প্রতিযোগিতায় বাংলার এই জলপরী ২০০ মিটার বুক সাঁতারে ৩ মিনিট ২৪'১ সেকেণ্ড সময় নিয়ে সর্বভারতীয় রেকর্ড গড়ার নজীর সৃষ্টি করে। এছাড়া রাজ্য সাঁতারে একশ মিটার ফ্রিস্টাইল রিলে টানার সময় নাফিসা সময় নিয়েছিল ১ মিনিট ১৬'৫ সেকেন্ড। নাফিসা বর্তমানে ফ্রিস্টাইল, (১০০ মিঃ সময় ১ মিঃ ১৮'৫ সেঃ), বাটার ফ্লাই (১০০ মিঃ ১মিঃ ৩৫সেঃ), বুক সাঁতার (দুশ মিঃ ৩মিঃ ২৫'১সেঃ ও একশ মিটার) একক মেডলী (২০০ মিঃ ৩মিঃ ১৯'২ সেঃ ও ৪০০ মিঃ ৭মিঃ ১৮'৮সেঃ) বিভাগে মোট ছটি রেকর্ডের অধিকারিণী। নাফিসা জলে

নামলেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার উত্তাপ জমে ওঠে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এখন নাফিসার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বিনী হচ্ছে মহারাষ্ট্রের সুমিতা দেশাই। কলম্বোয় সুমিতা আর নাফিসা স্বর্ণপদক পায়। প্রসঙ্গত নাফিসা বলল, ওদের অনেক রকম সুযোগ সুবিধা আছে।

তবে নাফিসা তাঁর প্রশিক্ষক অনিল দাসগুপ্তের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। 'উনি আমার সুবিধা অসুবিধা সহজেই বুঝতে পারেন। এমন প্রশিক্ষক পাওয়া ভাগ্যের কথা, বলে নাফিসা, বাবার কাছে সাঁতার শেখার পর থেকে বহুদিন ও সাঁতারের সুযোগ পায়নি।

'৬৭-৬৮ সালে ক্যালকাটা ক্লাবের শ্রীদেব আমার সাঁতার কুশলতা দেখে শ্রীদাশগুপ্তকে আমার প্রশিক্ষণের ভার নিতে অনুরোধ করেন। তখন থেকেই আমি ইণ্ডিয়ান লাইফ-সেভিং-এ (লেকে) সাঁতার অনুশীলন করি।' এই সময় লা মার্টিনিয়ার স্কুলের ছাত্রীরূপে নাফিসা স্কুল সাঁতারের আসর মাৎ করে দেয়। তারপরই আসে রাজ্য সাঁতারের আসরে। ১৯৭২এ প্রথম আবির্ভাবেই আসর মাৎ। জয়ের পর জয়—সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে চলেছে নাফিসা। ৭৩-এও রাজ্য চ্যাম্পিয়ান। এ-বছর ইতিমধ্যে কয়েকটি আসরে নিজের গড়া রেকর্ড ভাঙতে সুরু করেছে। গত বছর জয়পুরে জাতীয় সাঁতার-এর আসরে নাফিসাই ছিল বাংলার মহিলা-দলের অধিনায়িকা। দুশ মিটার বুক-সাঁতারে স্বর্ণপদক ছাড়াও অনেকগুলি পদক এসেছে তার সংগ্রহে। ৭২এ কয়েক মাস প্রশিক্ষণের পরই মাদ্রাজে জাতীয় সাঁতারের আসরে বাংলার হয়ে প্রথম যোগ দিয়েই নাফিসা পাঁচটি পদক সমেত দুটি বিভাগে স্বর্ণ সংগ্রহ করে। আর এই সঙ্গে সংবাদ শিরোনামায় তার সুনির্দিষ্ট স্থান করে নেয়। বাড়ীর আলমারী অজস্র পদক আর কাপে ভর্তি। এর মধ্যে এথলেটিকসে পাওয়া পুরস্কারের সংখ্যাও কম নয়।

আন্তঃ স্কুল এথলেটিকসে লা মার্টিনিয়ারের পক্ষে গতবার এবং এবার নাফিসা ডিসকাস, হাইজাম্প দুশ মিটার দৌড় ও বর্শা ছোঁড়ায় প্রথম হয়ে চ্যাম্পিয়নশীপ অর্জন করে। স্কুলের বাস্কেটবল দলেও নাফিসা আছে। ও বললে, ওগুলো আমি তেমন সিরিয়াসলি নিইনি, এমনি খুসী হয় তাই—এথলেটিকসে নামি। ডাইভিংটাও করি, তবে ওটাতে এখনও জোর দিইনি। মন ভরপুর হয়ে আছে সাঁতারের চিন্তায়। কিভাবে আরও উন্নতি করা যায়। সাঁতার ছাড়তে হলে তখন বাস্কেটবল আর টেনিসে মন দেব।

হাল্কা চটুল ভঙ্গীতে বলল, 'জানেন, এরি মধ্যে আমার অনেক গুণমুগ্ধ জুটে গেছে। কেউ কেউ আবার আমার কাছে চিঠিতে বিয়ের প্রস্তাবও দেয়। আর [illegible] তো আসে অজস্র।' কিশোরী মনে এসব বেশ কৌতুকের খোরাক যোগায়। ভাইবোনে তাই নিয়ে মজা করে। নাফিসা বলল, আগের সব ছবিতে দেখবেন মাথায় আমার কত বড় চুল ছিল। সাঁতারের সুবিধার জন্য অমন সুন্দর চুল পর্যন্ত ছাঁটতে হল। সাঁতারের জন্য কি না করছি বলুন!

বিদায় দেবার সময় বলল, আমি এই কুকুর চারটে ছাড়াও একটা বড় ছাগল আর কয়েকটা কাঠবিড়ালী পুষেছি। বেড়ালও আমি ভালবাসি কিন্তু আমার এই কুকুর চারটির জন্য পুষতে পারছি না। আমার হবি ফটো তোলা আর রঙ্গীন ছবি আঁকা। মধুর হাসি ছড়িয়ে বলে—'আর সাঁতারে রেকর্ড ভাঙা। সাঁতারই আমার প্রথম প্রেমিক।'

—অমা

গোয়েন্দা ধাঁধার সমাধান

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে শার্লক হোমস দেখল, কতখানি উঁচু হলে জানলার ওপর দিয়ে টেবিলে রাখা প্রুফ দেখা যায় বাইরে থেকে। হোমসের উচ্চতা ছ' ফুট। কিন্তু তাকেও ডিঙি মেরে দেখতে হয়েছে প্রুফকে। তার মানে এমন একজন জানলার বাইরে থেকে প্রুফ দেখেছে, যে মাথায় ছ' ফুটেরও উঁচু। গিলক্রাইস্টই নিশ্চয় সেই লোক! সে মাথায় ঢ্যাঙা, লাফায় ক্যাঙারুর মত।

পরের দিন ভোরবেলা খেলার মাঠে গিয়ে প্রমাণ পেল হোমস। কাঠের গুঁড়ো মিশানো মাটি রয়েছে লঙ জাম্প প্র্যাকটিসের জায়গায়।

সমস্ত ঘটনাটা মনে মনে ছকে ফেলল সেই মুহূর্তেই।

গিলক্রাইস্ট খেলার মাঠে প্র্যাকটিস করে ফিরছিল মাস্টারমশায়ের ঘরের পাশ দিয়ে দেখেছে প্রুফ রয়েছে টেবিলের ওপর। তারপর দেখল, ব্যানিস্টার ভুল করে দরজায় চাবি লাগিয়ে গিয়েছে, লোভ সামলাতে পারল না। ঘরে ঢুকে তাড়াতাড়ি টুকে নিতে লাগল প্রশ্নপত্র। হাতের কাঁটা বুটজোড়া (যা লঙজাম্পে পরতে হয়) রাখল বনাত-মোড়া টেবিলে। প্লাভস রাখল জানলায় সামনে টেবিলের পাশে চেয়ারে। হঠাৎ সোমস্ ফিরে এলেন পাশের গেট দিয়ে—সামনের গেট দিয়ে নয়। প্লাভস নিতে ভুলে গেল গিলক্রাইস্ট। বুটজোড়া তুলে নিয়েই সাঁৎ করে ঢুকে পড়ল শোবার ঘরে। হ্যাঁচকা টানে বুটের কাঁটায় বনাত কেটে গেল—কাটা দাগটা ফেরানো রইল শোবার ঘরের দিকে। বুট থেকে খসে পড়ল কাদামাটির ডেলা টেবিলের ওপর আর শোবার ঘরে। সূত্র ছড়িয়ে রইল ঘরময়—বুঝো সাধু যে জান লক্ষণ!

সোমস্ ঘরে ঢুকলেন। কিন্তু জানলার পাশে ছোট টেবিলের পাশের চেয়ারে রাখা প্লাভস দুটো দেখলেন না। ব্যানিস্টার কিন্তু ঘরে ঢুকেই তা দেখেছে এবং চিনেছে। গিলক্রাইস্টকে বাঁচানোর জন্যে মাথা ঘোরার ভান করে গিয়ে বসে পড়েছে ঐ চেয়ারেই প্লাভসের ওপর। সোমস্ হম্বিতম্বি করে শার্লক হোমসের কাছে দৌড়োতেই গিলক্রাইস্টকে বের করে দিয়েছে শোবার ঘর থেকে।

[পরের সংখ্যায় : 'গ্র্যান্ড মেট্রোপলিটানের হীরে-মাণিক লুঠ'।। হারকুল পয়রট।। আগাথা ক্রিস্টি]

সমরেশ চৌধুরী

মাঠের নায়ক

'ক্যাপ্টেনকে চান, সোজা এইট্থ ফ্লোর—সেন্ট্রাল ডেসপ্যাচ'। রিসেপসনের নির্দেশ পেয়ে পত্রপাঠ লিফ্টের বাকসবন্দী হয়ে গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে ডেসপ্যাচড হয়ে চলে গেলুম ক্যাপ্টেন সমীপে।

ক্যাপ্টেন—সমরেশ চৌধুরী। ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটের ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার পেল্লায় বাড়ীটায় ইস্টবেংগলের অধিনায়ক সমরেশকে দেখলাম তাঁর সহকর্মীরা সবাই ক্যাপ্টেন বলেই ডাকেন। সমরেশও নয়, পিন্টুও নয়, সগর্বে শুধু—ক্যাপ্টেন। সগর্বে উচ্চারণ করার মত নামই বটে, কারণ উপর্যুপরি পাঁচ পাঁচবার ঘরোয়া লীগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গলের ক্যাপ্টেন যে সমরেশ।

ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটের আকাশ-ছোঁয়া ঐ প্রাসাদটি যেন সমরেশের জীবনেরই এক প্রতীক। কোথা থেকে কোথায় যে উঠে গেল সমরেশ? ভাবতে ভাবতে এক এক সময় সমরেশের নিজেরই আশ্চর্য লাগে। অশোকনগরের সেই উদ্বাস্তু অধ্যুষিত অঞ্চল—আর কোথায় এই ইন্দ্রপুরী। কিন্তু কে আনলো কে পৌঁছে দিল এখানে? ফুটবল? নিশ্চয়ই ফুটবল। ফুটবল না হলে আজ নিরঞ্জন চৌধুরীর তৃতীয় পুত্র কোথায় থাকতো?

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ক্যাপ্টেন সমরেশ চৌধুরী তাঁর অফিসের ক্যান্টিনে আমার মুখোমুখি বসে নিজের জীবনকাহিনী শোনাচ্ছিলেন। আশেপাশে দু-চারজন সহকর্মী ঘোরাঘুরি করছিলেন যেন কিছু বলার ইচ্ছে নিয়ে। চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে দাঁড়ালেন সহকর্মীদের মধ্যে।

'কি ডাকস্ ক্যান্, দ্যাখ্তাছো না কথা কইত্যাছি। টিফিন বাকসে কেশা এটা কি আনছস্'। পিন্টুদা, কইছিলা না শুঁটকি মাছ খাবা, বাড়ী থিকা বৌরে দিয়া রান্ধাইয়া লইয়া আইছি চাইখ্যা দেখ'। কথায় স্নেহ, ভালবাসা টইটুম্বুর করছে যেন। সামান্য শুঁটকি মাছ, অমৃতের স্বাদ পেলেন যেন ওর ভেতর সমরেশ। সর্বত্রই সমরেশের এই আচরণ। সবার সঙ্গে, মাঠে এবং মাঠের বাইরে ঘরে কিংবা অফিসে একই ধরন। হেসে খেলে জীবনটা কাটিয়ে দাও দু-দিন বৈ তো নয়!

অথচ ১৯৬৬ সালে ময়দানে যখন বেনিয়াটোলার হয়ে খেলতেন তখন কি মুহূর্তের জন্যও পিন্টু চৌধুরী (সমরেশের ঘরোয়া নাম) ভেবেছিলেন জীবনে স্বীকৃতি মিলবে, মিলবে প্রতিষ্ঠা, কিংবা পুরস্কার। অথবা ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি? মনে হয় জীবনের সবটাই যেন স্বপ্ন। নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে সমরেশ। বাবা মা (স্নেহপ্রভা), পাঁচ ভাই, তিন বোন

... বিরাট সংসার। টালিগঞ্জের শুধু খাবার। আশোকনগরে মাথার উপর একটা আচ্ছাদন ছিল বটে কিন্তু ঐটুকুই। সুতরাং ঐ ঘরের ছেলে ফুটবল খেলবে, ছেঁড়া সংসারে তালি লাগাবে একথা কেউ ভাবতে পারেন? বাড়ীর সবাই বলতেন: 'পিণ্টু চটপট পাশ করে, একটা চাকরী বাকরীতে লেগে যা। সংসারের ভাবনা একটু ভাব'। ব্যতিক্রম ছিলেন বড়দা নিখিলেশ। পিণ্টুকে উৎসাহ দিতেন তিনি। টানাটানির সংসারেও প্রথম বুট কিনে দিয়েছিলেন দাদাই। দাদা ৬৩ সালে যেদিন বুট কিনে দিলেন সেদিন পিণ্টুর সে কি আনন্দ সে কি উল্লাস। উত্তেজনায় রাতভোর চোখের পাতাই এক হোল না।

কলকাতার ময়দানে সমরেশকে যাঁরা খেলতে দেখেছেন, তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করবেন যে তিনি একজন পাক্কা ফুটবলার। প্রথা প্রকরণে নিষ্ঠায় এবং শিষ্টতায় নিখুঁত। ঝড়ঝঞ্ঝায় কিংবা উত্তেজনায় তাঁর মেজাজের রাশ কখনও হাতছাড়া হয় না। অসাধারণ বল কন্ট্রোল, নিখুঁত পজিসন জ্ঞান, পরিপূর্ণ আস্থা, জোরালো সট, সহযোগীদের প্রতি অন্তহীন স্নেহ ভালবাসা সহযোগিতা এ সবই সমরেশকে আদর্শ ফুটবলার হিসেবে নিটোল করে গড়ে তুলেছে। স্বীকৃতি দিয়েছে ঘরের মাঠে, পরের মাঠেও।

কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠা, ঐ স্বীকৃতির জন্যে সমরেশকে কি কষ্টটাই না করতে হয়েছে? আজ যাঁরা সমরেশকে দেখে দুহাত তুলে নাচেন, ক্যাপ্টেন, ক্যাপ্টেন বলে নিজেদেরই কৃতার্থ মনে করেন, তাঁরা কি সমরেশের ডাইরীর পাতা একটা উল্টে দেখেছেন? সেই ১৯৬৬ সালের সেণ্ট্রাল এভিনিউর আস্তানায় মেঝের ওপর শুধু চাদর বিছিয়ে শুয়ে রাত কাটানো, বউবাজার মেসের বাটি মাপা ডাল ভাত তরকারী নামক বিশেষ একটি মিশ্র পদার্থ গলধঃকরণ—সবই তো আজকের সমরেশের স্মৃতির পাতায় জ্বলজ্বল করছে।

ফুটবলের হাতেখড়ি হয়েছিল অশোকনগরে স্কুলের শিক্ষক সঞ্জীব রায়চৌধুরীর কাছে। স্কুলের খেলা তো বটেই, অশোকনগর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে পড়ার সময় সমরেশ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ট্রফিতেও খেলেছে কলকাতায় এসে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে। বহুস্থানেকের মধ্যেই সঞ্জীববাবুর চেষ্টায় বাংলা স্কুল দলেও স্থান হোল সমরেশের। সেবার সর্বভারতীয় শরৎকালীন স্কুল ক্রীড়ার আসর বসেছিল শিলং-এ। ট্রায়ালে এসেই দলে চান্স হয়ে গেল। বাংলা চ্যাম্পিয়নও হোল। তারপর সেই ১৯৬৭ সাল। কালো মেঘের পাশে রুপোলী রেখার হদিশ মিললো। বাঘাদার (তেজেশ সোম) চোখে পড়ে গেলেন সমরেশ।

বাঘাদার কথা বলতে বলতে অমন ডাকসাইটে লিংকম্যান, ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক সমরেশের চোখ আষাঢ়ের জলভরা মেঘ হয়ে উঠলো। ধরা ধরা গলায় বললেন, 'বাঘাদা আমার কাছে ভগবান। অখন লোকে যে চেনে জানে, ক্যাপ্টেন ক্যাপ্টেন কইর‍্যা গ্যালারী গরম করে, বাঘাদা না থাকলে তার কিছুই হইতো না। বাঘাদা আমারে পোলার মত দ্যাখেন, আমি বাঘাদাকে দেখি বাপের মত। দুইজনের মধ্যে কইতে গ্যালে প্রায় বাপ-পোলায় সম্পর্ক। বাঘাদা আমার জন্য কি করেন নাই? থাকা খাওয়া থিকা আরম্ভ কইরা ট্রেনিং বেবাক করছেন। ভুল করলে বকছেন, ভাল করলে বুকে জড়াইয়া ধরছেন। উনি আমার গুরুর গুরু মহাগুরু। ১৯৬৭ সালের কথা শোনেন। উয়াড়ীতে ঢুকছি। প্রাকটিশের লইগ্যা খুব ভোরে অশোকনগর থিকা কইলকাতায় আইতে হইতো। দিন কয়েক চালাইলাম। পরে দেখি আর পারি না। ভয়ে ভয়ে কইলাম একদিন বাঘাদারে অসুবিধার কথা। চুপ কইর‍্যা শোনলেন বাঘাদা আমার কথা। ব্যস তার পরেই ঠিক হইয়া গেল বউবাজারের মেস। মেসে খাইতাম ঠিকই। খাইতাম আবার বাঘাদার বাড়ীতেও। বাঘাদার বাড়ীতে আমার জন্য ছিল রোজ মাংসের ব্যবস্থা। বাঘাদা কইতেন: পরিশ্রম করতাছস, একটু মাংস খাওন লাগবো রোজ। না হইলে শরীর থাকবো না, দুর্বল হইয়া পড়বি'।

ইতিমধ্যে বড় ক্লাবের চোখ পড়ে গিয়েছিল সমরেশের ওপর। সবাই হাত নাড়ছিল ওর চোখের সামনে। বাঘাদা বল্লেন: 'না না, আরও মাজাঘষা হউক, পরে যাবি'। পরে অর্থাৎ ১৯৭০ সালে বাঘাদার বুকভরা আশীর্বাদ নিয়ে সমরেশ চলে এলো ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে, লাল হলুদ জামা তুললো গায়ে। ইস্টবেঙ্গলে ডেকেছিলেন জ্যোতিষ গুহ। ইতিমধ্যে ৬৮ সালে জব্বলপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় জুনিয়ার ফুটবল খেলা সমরেশের হয়ে গেছে। ও তখন বাংলার স্টপার। ৬৮ সালে হায়দরাবাদে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলেও সমরেশ ছিল কলকাতার রক্ষণভাগের অন্যতম খুঁটি।

উপর্যুপরি পাঁচ পাঁচবারের ঘরোয়া সিনিয়ার ডিভিসন ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল দলে সমরেশ অন্যতম সদস্য। এক বিরাট সাফল্যের সার্থক সহযোগীও বটে। তদুপরি পঞ্চমবারের অধিনায়ক। স্বভাবতই এই সাফল্যের জন্য তিনি গর্বিত হতে পারেন। কিন্তু সে গর্ব এককভাবে নয়, দলগতভাবেই। সমরেশের ভাষায়:

'ইস্টবেঙ্গল কখনও একজনের জন্য জেতে না, এগারোজনের জন্যেই জেতে। আবার হারেও এগারোজনের সামগ্রিক গলদেই। ইস্টবেঙ্গলে বিন্দুর কোন সত্তা নেই। বিন্দু মিলে সিন্ধুই হোল ইস্টবেঙ্গল'। নিজের দলের কথা বলতে বলতে সমরেশের 'মুড' এসে গিয়েছিল। দলের জন্য অনেক সময় অনেক স্যাক্রিফাইস করতে হয়। 'এই তো দ্যাখেন আমাকে—টিমে যখন মোহন ছিল তখন মোহন, গৌতম ছিল লিংকম্যান, তার আমাকে খেলাইতম অনভ্যস্ত পজিসন—লেফট আউটে। কিন্তু কি করন যাইবো। আমার একক কোন অস্তিত্ব নাই—টিমের ইন্টারেস্টই সব থিকা বড়। টিমের কথাই ভাবতে হইবে। খেলায় হারজিৎ আছেই, জিতলে আনন্দে লাফালাফি করি, হারলে মাথা গুইজ্যা বইসা থাকি কিন্তু মাথা গরম করি না অস্থিরও হই না। সবটাই স্পোর্টসম্যান স্পিরিটে মানতে হইবো। এই তো দ্যাখেন ৭১ ৭২, ৭৩ সালে সন্তোষ ট্রফি খেলছি, ৭১এ রাশিয়া গেছি ইন্ডিয়া টিমের হইয়া, ৭২-এ রেংগুনে প্রাক-ওলিম্পিক খেলছি, ইস্টবেঙ্গল লগে হংকং গেছি, গেছি বাংলাদেশে কিন্তু এবার এশিয়ান গেমসে যাওয়া হইলো না। বাড়ীতে অসুখ বিসুখ। ভগবানের ইচ্ছা না, আমি যাই। এইটাকেও আমি একটা খেলা মনে করি ভাগ্যের খেলা। বাঘাদাই নিষেধ করছিলেন। কইছিলেন: 'বৌমার শরীর খারাপ। এই সময় তুই বাইরে যাইস না (সম্প্রতি সমরেশের একটি মেয়ে হয়েছে। সমরেশের স্ত্রী স্মৃতি চৌধুরী (পাল) মেয়ের নাম রেখেছেন পিংকি, পাপিয়া। বাঘাদার কথা অমান্য করতে পারি নাই। ট্রেনিং ক্যাম্পে গেলে হয়তো চান্স পাইয়া যাইতাম। কিন্তু বাঘাদার কথা অমান্য করা হইতো। তিনি দুঃখ পাইতেন আর তাঁরে কষ্ট দিয়া আমিও সুখী হইতাম না'। যোগ্য নায়কোচিত কথাই বটে। সু-নায়ক, প্রকৃত খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির জন্য সমরেশ তাই এবার পশ্চিমবঙ্গ ক্রীড়া সাংবাদিক সংস্থা বছরের সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতিতে চিহ্নিত করে অমৃতবাজার পত্রিকা ট্রফি উপহার দিয়েছেন। সমরেশকে সেরা খেলোয়াড় হিসেবে গত বছরও স্বীকৃতি দিয়েছিল ভেটারেন্স ফুটবল ক্লাব। তারও আগে সেরা স্কুল ফুটবলারের স্বীকৃতিও তিনি পেয়েছেন। কিন্তু এত স্বীকৃতি, এত প্রশংসা, এত পাওয়ার মধ্যেও সমরেশ কিন্তু বিনয়ের মধ্যেই ডুবে রয়েছেন। এক হাতে বাঘাদা এবং আর এক হাতে প্রদীপদাকে (পি কে ব্যানার্জি) আঁকড়ে ধরে।

বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়

দর্শক

এশিয়ান গেমস

তেহেরানে ৭ম এশিয়ান গেমস শেষ হতে এখনও সাতদিন বাকি। গত আট-দিনের (সেপ্টেম্বর ২-৯) খেলায় স্বর্ণ পদক পেয়েছে এই আটটি দেশ—জাপান ৫০, চীন ১৮, উত্তর কোরিয়া ১৬, দক্ষিণ কোরিয়া ৯, ইরান ৮ থাইল্যাণ্ড ২, ব্রহ্মদেশ ১ এবং ইস্রায়েল ১। স্বর্ণ পদক জয়ের এই বর্তমান তালিকা দেখে খুব জোর দিয়েই বলা যায়, জাপান বিরাট ব্যবধানে চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকায় শীর্ষস্থান পাবে। ভারত এপর্যন্ত ৪টি পদক পেয়েছে—রৌপ্য ২ এবং ব্রোঞ্জ ২। ভারতের সংসদ সদস্য ডাঃ কার্নি সিং ট্র্যাপ স্যুটিংয়ে রৌপ্য এবং স্কিট স্যুটিংয়ে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন। ব্যাডমিণ্টনের দলগত বিভাগে ভারত ৩—০ খেলায় পাকিস্তানকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ পদক জয়ী হয়েছে। পুরুষ-দের ১০,০০০ মিটার দৌড়ে ভারতের পক্ষে রৌপ্য পদক জয়ী হয়েছেন শিবনাথ সিং।

সাঁতার

জাপান ১৯৭০ সালের মত এবারও সাঁতারে স্বর্ণ পদকের সিংহভাগ পেয়েছে। সাঁতারের মোট ২৫টি স্বর্ণ পদকের মধ্যে জাপান একাই পেয়েছে ২২টি স্বর্ণ পদক। বাকি তিনটি পেয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া (২টি) এবং ইস্রাইল (১টি)। ১৯৭০ সালের সাঁতার প্রতিযোগিতায় মোট ২৮টি স্বর্ণ পদকের মধ্যে জাপান ২৫টি এবং দক্ষিণ কোরিয়া ৩টি স্বর্ণ পদক পেয়েছিল। ১৯৭০ সালের সাঁতারে জাপানের মোট পদক সংখ্যা ছিল ৪৭টি—স্বর্ণ ২৫, রৌপ্য ১৮ এবং ব্রোঞ্জ ৪। এবারও জাপানের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সাঁতারের ঝুড়ি ঝুড়ি রেকর্ড ভেঙে স্বদেশকে সর্বাধিক পদক জয়ে সাহায্য করেছেন। জাপানের ২১ বছরের কলেজ ছাত্রী ইয়োসিমি নিশিগাওয়া ১৯৭০ সালের মত এবারও সাঁতারের পাঁচটি স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছেন। এশিয়ান গেমসের একটি আসরে কোন একজনের পক্ষে পাঁচটি স্বর্ণ পদক জয়ের নজির অপর কারও নেই। এবার কুমারী নিশিগায়া সাঁতারের এই পাঁচটি বিষয়ে নতুন রেকর্ড সময়ে স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছেন : ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইল, ২০০ মিটার ব্যক্তিগত মেড্‌লি, ৪×১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল এবং ৪×১০০ মিটার মেড্‌লি রীলে সাঁতারে।

স্যুটিং প্রতিযোগিতা

স্যুটিং প্রতিযোগিতার মোট ১৮টি স্বর্ণ পদক চারটি দেশ এইভাবে পেয়েছে : উত্তর কোরিয়া ১০, চীন ৪, জাপান ৩ এবং থাইল্যাণ্ড ১। মোট পদক জয়ের তালিকাতে উত্তর কোরিয়া শীর্ষস্থান পেয়েছে। উত্তর কোরিয়ার লক্ষ্যবিদরা ৮টি এশিয়ান রেকর্ড ভাঙেন এবং একটি বিষয়ে এশিয়ান রেকর্ড স্পর্শ করেন। ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে ২টি স্বর্ণ পদক পেয়েছেন একমাত্র উত্তর কোরিয়ার ২৫ বছরের ছাত্র হান ডং কিউ।

ইয়োসিমি নিশিগাওয়া (জাপান) এশিয়ান গেমসের সাঁতারে ৫টি স্বর্ণ পদক জয় করেছেন।

ওয়াটার পোলো

ওয়াটার পোলোতে ৭টি দেশ 'রাউণ্ড-রোবিন' প্রথায় খেলেছিল। ইরান স্বর্ণ, চীন রৌপ্য এবং গতবারের চ্যাম্পিয়ান জাপান ব্রোঞ্জ পদক জয়ী হয়েছে। গতবারের রৌপ্য পদক জয়ী ভারতবর্ষ ৬ষ্ঠ স্থান পেয়েছে। ইরান, চীন এবং জাপান—এই তিনটি দেশই ১০ পয়েণ্ট করে সংগ্রহ করেছিল। শেষ পর্যন্ত গোলের গড় দিয়ে চূড়ান্ত মীমাংসা হয়।

ডাইভিং

ডাইভিংয়ের চারটি স্বর্ণ পদকই পেয়েছে চীন। তাছাড়া তারা দুটি করে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। জাপান পেয়েছে ৩টি পদক (রৌপ্য ১ ও ব্রোঞ্জ ২) এবং দক্ষিণ কোরিয়া একটি রৌপ্য পদক।

জিমন্যাস্টিকস

জিমন্যাস্টিকসে চীন প্রথম এবং জাপান দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে। জাপান তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর দল নিয়ে প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। কারণ তাদের প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়রা আসন্ন বিশ্ব জিমন্যাস্টিকস প্রতিযোগিতার জন্য তেহেরানে যেতে পারেনি।

চীনের পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭ বছরের ছাত্রী চিয়াং সাও মেয়েদের সম্মিলিত অনুষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত বিভাগে ৩টি স্বর্ণ পদক পেয়েছেন।

চূড়ান্ত পদক তালিকা

জিমন্যাস্টিকস

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
চীন	৮	৮	২
জাপান	৪	৩	২
দঃ কোরিয়া	২	০	২
উঃ কোরিয়া	১	৩	৭

স্যুটিং

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
উঃ কোরিয়া	১০	৪	০
চীন	৪	৬	৩
জাপান	৩	৪	৪

বিশ্ব পেণ্টাথলন

মস্কোতে আয়োজিত 'ওয়ার্ল্ড মডার্ন পেণ্টাথলন' প্রতিযোগিতায় রাশিয়ার অ্যাথলীটরা তিনটি পদকই (স্বর্ণ, রৌপ্য, ও ব্রোঞ্জ) জয়ী হয়েছেন। স্বর্ণ পদকটি পেয়েছেন প্যাভেল লেডনিয়ভ (পয়েণ্ট ৫,৩০২)।

জলসা

কমল দাশগুপ্ত স্মরণে

গ্রামোফোন কোম্পানী

অবিস্মরণীয় সুরস্রষ্টা স্বর্গত কমল দাশগুপ্তের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে গত ২৯ আগস্ট সন্ধ্যায় গ্রামোফোন কোম্পানীর পক্ষ থেকে এক শোকসভা আহ্বান করা হয়েছিল কোম্পানীর সতীশ মুখার্জি রোডের রিহার্শ্যাল রুমে। সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে সন্তোষকুমার দে ও গৌরীকেদার ভট্টাচার্য।

কমলবাবু দীর্ঘদিন ধরে বাংলার সংগীতজগতকে সমৃদ্ধ করেছেন গ্রামোফোন কোম্পানী বেতার ও চিত্রজগতের মাধ্যমে। তাঁর সতীর্থ, সহকর্মী ও শিষ্য-শিষ্যাদেরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। অনিবার্য কারণে উপস্থিত থাকতে না পারায় জন্য শোকবার্তা পাঠিয়েছিলেন পংকজ মল্লিক, রাইচাঁদ বড়াল, পবিত্রেশ শীল, মহম্মদ হানিফ, কানন দেবী, যূথিকা রায় ও সুচিত্রা মিত্র। যূথিকা রায় জানিয়েছেন, দীর্ঘ কুড়ি বছরেরও বেশী ইনি তাঁর কাছে সংগীত শিক্ষা নিয়েছেন এবং গ্রামোফোন কোম্পানীর লেবেলে তাঁর সব রেকর্ডই কমল দাশগুপ্তের সুরে ও ভাষায়। সংগীতজগতে তাঁর প্রতিষ্ঠার মূলেও ছিলো কমলবাবুর অকৃপণ অবদান।

স্বর্গত কমলবাবু শুধু সুরকারই ছিলেন না, তিনি সুগায়ক, সংগীত-নির্দেশক এবং বহু হিন্দী ও বাংলা গানের রচয়িতা। উর্দু ভাষার ওপরও তাঁর অসাধারণ দখল ছিলো। কমল দাশগুপ্তের মৃত্যু সংগীতরসিকের কাছে এক অপূরণীয় ক্ষতি।

সুরকার, রচয়িতা, শিল্পী ও সমালোচকদের পক্ষ থেকে স্বর্গত শিল্পীর জীবনদর্শন, সংগীত-ভাবনা ও প্রতিভার স্বরূপের প্রতি আলোকপাত করে ভাষণ দেন—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, পবিত্র চট্টোপাধ্যায়, অমর দত্ত, সন্তোষ সেনগুপ্ত, ভি বালসারা, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, প্রণব রায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, কল্যাণী মজুমদার (দাস), সুপ্রীতি সেন, পবিত্র মিত্র, সন্ধ্যা সেন।

কোম্পানীর পক্ষ থেকে শ্রীবিমান ঘোষ জানান, তাঁর সুরের গানগুলি সংকলন করে কয়েকটি এল পি ডিস্ক প্রকাশিত করবার পরিকল্পনা কোম্পানীর আছে।

ক্যালকাটা মিউজিক সার্কেলের সংগীত সম্মেলন : কলামন্দিরের সুসজ্জিত মঞ্চে, ক্যালকাটা মিউজিক সার্কেলের পাঁচ দিন-ব্যাপী সঙ্গীতোৎসব শুরু হয়েছিলো শ্রীমতী সুলোচনা যজুর্বেদীর গান দিয়ে। প্রথম রাগ পূর্বী। শিল্পীর সুগম্ভীর আওয়াজ, ধ্রুপদী ঢং এবং বোলবিস্তার গানের অস্থায়ী অঙ্গকে ভরিয়ে তুলেছিল তানের অঙ্গে সাপট তানের প্রাধান্যই বেশী। তানবৈচিত্র্য না থাকলেও যে-তানকর্তব প্রদর্শন করেছেন—খুবই তৈরী। মন্দ্রসপ্তকে এঁর কণ্ঠ ভরাট, স্বচ্ছন্দ। কিন্তু তারসপ্তকে একটু কম-জোরী। দ্বিতীয় রাগ ছিলো গৌড়মল্লার, তারপর দাদরাও গেয়েছিলেন। তবে দাদরার চেয়ে খেয়ালেই তাঁর কণ্ঠ বেশী মানানসই। শ্রীমতী সুলোচনার সংগে মেজাজী তবলা-সংগত করে কেরামৎ খাঁ সাহেব এ অনুষ্ঠানকে চিত্তাকর্ষক করে তোলেন।

আগ্রা ঘরাণার প্রবীণ শিল্পী লতাফৎ হোসেন খাঁর কণ্ঠে রঙিলা আঙ্গিকের এক প্রামাণ্য গায়কীর ছবি পাওয়া গেলো। কণ্ঠের দাপট, রাগরূপের প্রাঞ্জলতা, বিস্তারের বৈচিত্র্য—সব মিলিয়ে শিল্পী পরিবেশিত মেঘ ও গৌড়মল্লার অনেকদিন মনে থাকবে।

তরুণ শিল্পী শ্রীজগদীশ প্রসাদের গোরখকল্যাণে আত্মপ্রত্যয়, রাগস্বচ্ছতা ও মেজাজ কোনোটারই অভাব ছিলো না। শুধু আর একটু মাধুর্যসঞ্চারের দিকে যদি মন দিতেন, আরো প্রাণখুলে প্রশংসা করা যেতো।

হিন্দুস্থানী সংগীতের একটি প্রাচীন ধারার ছবিকে মেলে ধরলেন ওস্তাদ মল্লিকার্জুন মনসুর। এঁর গাওয়া বিহাগড়া, রইসী কানাড়া পাণ্ডিত্য ও আবেগের ভারসাম্যতার এক স্মরণীয় নজীর।

গজলের বেগম বেগম আখতারের ঠুংরী কাজরী, গজল ও দাদরা গানও সতেজ, সবুজ ও চিত্তগ্রাহী।

যন্ত্রসঙ্গীতে শোনা গেলো দক্ষিণ ভারতের কুশলী বেহালাবাদক পণ্ডিত লালগুডী জয়রামনের স্মরণীয় অনুষ্ঠান। ইনি পরিবেশন করেছেন যথাক্রমে হংসধ্বনি (বর্ণম), বালাজি কল্যাণবসন্তম, চার-কেশী ও ভৈরবী (তিল্লানা)। স্বল্পপরিসরের মধ্যেও প্রতিটি পরিবেশনায় গীতিকাব্যিক সৌন্দর্য ও সাবলীল বক্তব্যে শিল্পীর পাণ্ডিত্য ও শিল্পবোধের স্পর্শ অনুভূত। রাগরঞ্জক স্বরসমন্বয়, বিশেষ সঞ্চার, অপূর্ব প্রয়োগ তাঁর সম্পদসম্ভার মুগ্ধকারী। মৃদঙ্গে তাঁকে যথাযোগ্য সহায়তা দিয়েছেন আর রামবর্ধন। চারুকেশীর আলাপন যেন সুরের আনন্দস্পন্দন আল্পনা হয়ে উঠেছিলো।

সরোদে আমজেদ আলি খাঁর হাতের দক্ষতা ত প্রশ্নের অতীত। এবারে তাঁর রাগচিত্রণের কুশলতা আরো পরিণত ও চিন্তাশীল। ইমন-কল্যাণের আলাপে কিছু ইতস্ততভাব থাকা সত্ত্বেও রাগের ওজন ও গাম্ভীর্য অনাহত ছিলো। কিন্তু আরো নিটোল ও লাবণ্যসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে 'সাম্ভোগী' রাগের গৎ। কিষণ মহারাজের তবলাসঙ্গতে বাজনার নানা 'ডাইমেনশন' সৃষ্টি করেছে।

ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্যের সেতার যন্ত্র-সঙ্গীতের আর এক উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। মিঞা-কি-মল্লার রাগের আলাপ ও জোড়ের ধ্রুপদী কাঠামোয় আলাউদ্দীন ঘরাণার ঐতিহ্য সুরক্ষিত। এরপরই কনট্রাস্ট ভাবের রিলিফ নিয়ে এলো প্রাণকাড়া জন-সম্মোহিনী রাগের মধুর গত্‌টি। দক্ষিণ ভারতীয় চলনের বৈচিত্র্যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের স্থির 'সৌন্দর্য' সঞ্চারের ইন্দ্রনীলের সাহস শিল্পবোধ [illegible] করবার মতই। শান্তাপ্রসাদের তবলা [illegible] যেন লয়ের নাচনে সারা আসর মাতিয়ে তোলে।

বাহাদুর আলি খাঁর ঢোলক ও শান্তা-প্রসাদের তবলার যুগলবন্দীর উত্তর-প্রত্যুত্তর কয়েক লহমায় এক আনন্দমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করে।

প্রবীণ ধ্রুপদী সংবর্ধনা : পাথুরিয়া-ঘাটার মন্মথনাথ মল্লিক স্মৃতি মন্দির এক ভাবগম্ভীর আরাধনা মন্দির হয়ে উঠেছিলো যখন প্রবীণ ধ্রুপদগুরু সংগীতাচার্য যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৮৪তম জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর ভক্ত ও শিষ্য-শিষ্যাবৃন্দ এক সান্ধ্য আসরের আয়োজন করেন তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের জন্য।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিন ধরে ধ্রুপদ-সাধনা শিক্ষাদানে ব্রতী থেকে ভারতীয় সঙ্গীতের এই প্রাচীন ধারাটিকে প্রবাহিত রেখেছেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এ আসরের একটি বিশেষ মর্যাদা আছে এবং এ আভিজাত্য উদ্যোক্তাদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় সুপরিলক্ষিত হয়েছে।

প্রথমে 'গুরুবরণ' অনুষ্ঠানে ৮৪টি প্রদীপ জ্বালানো হয়। তারপর সংগীতাচার্যকে একে একে মাল্যদান করেন তাঁর শিষ্যবৃন্দ ও সংগীতজগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ।

এছাড়া শিক্ষার্থীদের তরফ থেকে ১১১১ টাকার একটি তোড়া সুখ্যাত পাখোয়াজী রাজীবলোচন দে ব্যক্তিগতভাবে ১০১ টাকার একটি তোড়া এবং ভবানীপুর সংগীত সম্মেলনের পক্ষ থেকে শ্রীবিমল বন্দ্যোপাধ্যায় ১০১ টাকা অর্পণ করেন। এ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয় তাঁর শিষ্যশিষ্যা পরিবেশিত 'গুরুবন্দনা' শীর্ষক ধ্রুপদাংগের সংগীতগুচ্ছ দিয়ে।

অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছিলেন স্বামী প্রজ্ঞানন্দ। ধ্রুপদের এক নিষ্ঠাবান পূজারীকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানিয়ে ইনি বলেন—নিষ্ঠার সংগে এই অনুষ্ঠান পালন করে এ'রা যথাযথভাবে সংগীতরসিকের দায়িত্ব পালন করেছেন: সংগে সংগে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন এই বলে এ উৎসবে উপস্থিত থেকে সাংগীতিক দায়িত্ব পালন করা উচিত ছিলো যাঁদের তাঁরা অনেকেই আসেননি। এই প্রসংগে এখানকার সংগীত সম্মেলনগুলিতে ধ্রুপদ অবহেলিত হচ্ছে বলে স্বামীজী দুঃখ প্রকাশ করেন।

এরপর সংক্ষিপ্ত, সুন্দর ভাষণে সংগীতাচার্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সর্বশ্রী কেশব বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্মথনাথ ঘোষ এবং বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়।

সকলের বিশেষ অনুনয়ে যোগীনবাবু ধ্রুপদ গেয়ে শোনান। সুরু হোলো সেদিনের বর্ষামংগল পরিবেশের সংগে সংগতি রেখে 'জলা সমুদ্র ভবানা যাত্তে'—মিঞা-কি মল্লার রাগে। দাগরবাণী শৈলীর শুদ্ধ সরল ভংগীতে বর্ষার ছবিটি ফুটে ওঠে সুগম্ভীর মহিমায়। এই রাগের সংগেই সংগতি রেখে পরিবেশন করেন পরবর্তী রাগ 'দেশ'। এবং শেষ করেন গৌড় দিয়ে 'ঘুমারে ধুম রংগ বাদর'। বন্দেজের অভিনবত্বে, গায়কীর পাণ্ডিত্য ও শিল্পীর আবেগের ত্রিবেণী সংগমে এ অনুষ্ঠান উপভোগ্য হয়ে ওঠে। শিল্পীর সংগে কণ্ঠসংগতে ছিলেন তাঁর পুত্র জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, শিষ্য তপনকুমার চক্রবর্তী এবং পাখোয়াজ সংগতে চঞ্চল ভট্টাচার্য।

সংগীতানুষ্ঠানের সুন্দর পরিসমাপ্তি ঘটল শ্রীসুবোধরঞ্জন দের 'দরবারী কানাড়া' রাগের ধ্রুপদ দিয়ে। পূর্ণকণ্ঠের আবেগ এক চিত্তস্পর্শী পরিবেশন রচনা করে।

নজরুলগীতির রেকর্ড : গ্রামোফোন কোম্পানী প্রযোজিত নজরুল গীতিগুচ্ছের ডিস্ক সিরিজে এবারে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হোলো সুপারসেভেন ডিস্কে ৬ খানি নজরুলগীতির সুর বাজিয়েছেন কবিপুত্র কাজী অনিরুদ্ধ। কবি-সুরকারের সংগীতমানসের বিভিন্ন দিকের প্রতিফলন ঘটেছে যথাক্রমে পথহারা পাখী, জানি জানি প্রিয়, শুকনো পাতার, অরুণকান্তি, মোর ঘুমঘোরে এবং হায় পলাশী গানগুলিতে। কাব্যি গান ও সুরের সংগে উপরিপাওনা হিসেবে পাওয়া গেছে কবিপুত্রের শিল্পীচিত্রটি। যে যে পর্দায় আঙ্গুল পড়েছে সেই পর্দাগুলি সুরের অনুরণনে উচ্ছল, আকুল হয়ে উঠেছে। যে শিল্পী চিরদিনের জন্য চলে গেলেন দৃষ্টির বাইরে, স্মৃতিতে তিনি রইলেন অমর হয়ে। এইখানেই বুঝি রেকর্ডের সার্থকতা।

অন্যান্য সুপারসেভেনের মধ্যে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া ছ'খানি গানই স্বাদবৈচিত্র্য বহন করছে। এ গান সচরাচর শোনা যায় না। তাই এর স্বাতন্ত্র্য অনস্বীকার্য।

আর একটি সুপারসেভেন ডিস্কে ছ'খানি গান গেয়েছেন জনপ্রিয় তরুণ শিল্পী অনুপ ঘোষাল। পূর্বসূরীদের কয়েকটি গানও ইনি গেয়েছেন। জ্ঞান গোস্বামীর গানটি পরিণত মানের হয়ত নয়, কিন্তু সেই বিরাট শিল্পীকে মনে ত করিয়ে দিয়েছে। এইখানেই এসব গান গাওয়ার সার্থকতা। অন্য গানগুলি তাঁর স্বভাবানুগ প্রাণোচ্ছলতায় পরিবেশিত।

কিন্তু সুপারসেভেন ডিস্কের তালিকায় অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়ের নামটি যুক্ত না হওয়াটা একটা আশ্চর্য ঘটনাই বলব। কারণ নজরুলসংগীতে তাঁর জনপ্রিয়তা ও মুন্সিয়ানা প্রশ্নের অতীত। এস পি ডিস্কের চারখানি গানে ইনি কবির গানের সুর ও ছন্দ দুটি দিকই উদ্ভাসিত করেছেন।

সন্ধ্যা মুখার্জি গীত চারখানি গানেই শিল্পীর উচ্চমান বিঘোষিত। এছাড়া আছে দুজন শিল্পীর একটি করে রেকর্ড। এরই একটিতে আছেন সুমিত্রা রায় ও অধীর বাগচি। রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পী হলেও নজরুলগীতিতেও সুমিত্রার যোগ্যতার স্বাক্ষর বহন করছে 'কে তুমি দূরের সাথী' ও 'আজি এ শ্রাবণনিশি'।

অধীর বাগচির সুনাম অক্ষুণ্ণ আছে 'আগের মত আমার ভালো' ও 'হৃদয় কেনো' গান দুটিতে।

পূরবী দত্ত সুন্দর গেয়েছেন 'ছন্দের বন্যা' ও 'আজো ফোটে না'।

মীরা দাশগুপ্ত ও শংকরলাল মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে শোনা যায় যথাক্রমে 'পিউ পিউ বোলে', 'রেশমী চুড়ির' 'সন্ধ্যামালতী যবে' ও 'ঝরা ফুলদলে'। প্রসংগত উল্লেখ্য, 'ঝরা ফুলদলে' এই সর্বপ্রথম পুরুষকণ্ঠে রেকর্ড হোলো। এর আগের রেকর্ড ছিলো ডাঃ অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়ের, তারও পূর্বসূরী হলেন বহু আগের সুবিখ্যাতা গায়িকা শ্রীমতী হরিমতী।

নীতিশ দত্ত রায় গেয়েছেন 'বনে চলে বনমালী' ও 'এলো ঐ বসন্ত'।

কাজী সব্যসাচীর কণ্ঠে চারখানি কবিতার আবৃত্তি শোনবার মত।

পুজো রেকর্ডিং-এর বড় খবর

এবার পুজোয় সবচেয়ে বড় খবর—লতা মঙ্গেশকর ও কিশোরকুমার পুজোয় গান পরিবেশন করছেন একে অন্যের সুরে। এইচ এম ভির বোম্বাই স্টুডিও-তে ইতিমধ্যেই লতা মঙ্গেশকর দুটি গান রেকর্ড করেছেন। বলা বাহুল্য, তিনি কিশোরকুমারের সুরে এই প্রথম বাংলা গান রেকর্ড করলেন। তেমনি কিশোরকুমার পুজোয় গান রেকর্ড করছেন লতা মঙ্গেশকারের চিত্তগ্রাহী সুরে। সম্ভবত এবারই সর্বপ্রথম লতা সংগীত পরিচালনা করলেন। বর্তমান কালের এই দুই অপ্রতিদ্বন্দ্বী কণ্ঠশিল্পী পরস্পরের সুরে যে গান গেয়েছেন তা সংগীতজগতের পরম সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে। গানগুলি লিখেছেন বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক ও গীতিকার মুকুল দত্ত।

শিল্পীদ্বয়ের অপূর্ব কণ্ঠমাধুর্য এবং সুরবৈচিত্র্যের সংমিশ্রণে যে মণিকাঞ্চন সংযোগ হয়েছে তা রেকর্ড দুটিকে অসামান্য জনপ্রিয়তা এনে দেবে।

—চিত্রাঙ্গদা

ধ্রুপদগুরু যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বর্ধনা

শতবর্ষের স্মরণীয়

বিগত ১৪ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যায় (১৪ই জুন, ১৯৭৪) বাংলার সাধারণ রঙ্গশালার ধারাবাহিক আলোচনা ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থগিত রেখে পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে বিশেষ কয়েকজন নাট্যরথীদের সঙ্গে পাঠকসাধারণের পরিচয় করিয়ে দিয়ে পুনরায় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ধারাবাহিক আলোচনায় আমরা ফিরে যাচ্ছি। নটগুরু গিরিশচন্দ্র, নটশেখর অর্ধেন্দু মুস্তাফী রসরাজ অমৃতলাল বসু এবং নটসম্রাট বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি আরো বহুজনকে বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গেই তুলে ধরবো।

১৮৭৭—৮০ ।। ন্যাশনাল থিয়েটার

তখন কলকাতার বুকে দুটি স্থায়ী মঞ্চে নিয়মিত অভিনয় চলছে। শহর এবং মফস্বলে চলছে সৌখিন অভিনয়। কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে আমন্ত্রিত হয়েও অভিনয় করে আসছেন। পেশাদার প্রথায় মফস্বলে অভিনয় করার রেওয়াজও শুরু হয়েছে। ভুবনমোহন নিয়োগীর পক্ষে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার পরিচালনা করা সম্ভব হলো না। কৃষ্ণধন ব্যানার্জি গ্রেট ন্যাশনাল মঞ্চ লীজ নিয়ে কিছুদিন চালিয়েও সুবিধা করতে পারলেন না। গিরিশচন্দ্রের অগ্রজতুল্য শ্যালক ব্রজেন দেবের মৃত্যু হয়েছে বহু পূর্বেই। কনিষ্ঠ দ্বারকানাথ দেব থিয়েটার পরিচালনায় আগ্রহী হলেন। গিরিশচন্দ্রকে আর্থিক দিক থেকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতি দিলেন দ্বারকানাথ। গিরিশচন্দ্র নিজেকে জানতেন। নিজের ব্যবসায়-বুদ্ধির ওপর নিজেরই বিশ্বাস ছিল না। তাই এ-বিষয়ে আঁর একজন উপযুক্ত ব্যক্তির সন্ধানে ছিলেন। ঘাটেশ্বরের জমিদার কেদার চৌধুরী এসে দাঁড়ালেন গিরিশচন্দ্রের পার্শ্বে। গ্রেট ন্যাশনাল মঞ্চ নিজ নামে লীজ নিয়ে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নতুন নামে নামাকরণ করলেন। কেদার চৌধুরী হলেন পরিচালক। এই কবছরই গিরিশচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন যে, থিয়েটার পরিচালনার জন্য যেমন ব্যবসায় দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন নাটকের আর উপযুক্ত শিল্পীর। তিনটি বিষয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখেই গিরিশচন্দ্র নতুন রূপে ন্যাশনাল থিয়েটার নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন।

বেঙ্গল থিয়েটার থেকে বিনোদিনী এসে যোগ দিলেন। বন্ধুপুত্র অমৃত মিত্রকে আবিষ্কার করলেন। রামতারণ সান্যাল, বেলবাবু, মতিলাল সুর, মহেন্দ্রলাল বসু, কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি—আরো অনেকেই রইলেন শিল্পী সম্প্রদায়ে।

লিখলেন 'আগমনী' নতুন নাটক। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ৬ অকটোবর 'আগমনী' মঞ্চস্থ হলো। জুলাই মাসে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার লীজ নিয়ে অকটোবর মাসে দ্বারোদঘাটন করলেন। সংগীত পরিচালনা ছাড়া গিরিরাজ চরিত্রে অভিনয় অভিনয় করলেন রামতারণ সান্যাল। বিনোদিনী অভিনয় করেন উমা চরিত্রে, আর মহাদেব চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন কেদার চৌধুরী।

১০ অকটোবর গিরিশচন্দ্রের 'অকালবোধন' নাটকে গিরিশচন্দ্র শ্রীরামচন্দ্র আর মতিলাল সুর ইন্দ্র চরিত্রে অভিনয় করেন।

১ ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হলো গিরিশচন্দ্র নাট্য-রূপায়িত মাইকেলের 'মেঘনাদ বধ'। মেঘনাদ বধ নানাদিক দিয়ে সাড়া জাগায়। বেঙ্গল থিয়েটারেও মেঘনাদ বধ অভিনীত হয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মেঘনাদ চরিত্রে অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

ন্যাশনালে মেঘনাদ আর শ্রীরামচন্দ্ররূপে অভিনয় করলেন স্বয়ং গিরিশচন্দ্র। পরবর্তীকালের প্রখ্যাত অভিনেতা অমৃত মিত্রকে দেখা গেল রাবণ চরিত্রে। লক্ষ্মণ—কেদার চৌধুরী, বিভীষণ—মতি সুর। প্রমীলারূপে অভিনয় করলেন নাট্যসম্রাজ্ঞী বিনোদিনী। আরো কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করেন তিনি। অমৃত মুখোপাধ্যায়, লক্ষ্মীমণি, বসন্তকুমারী, কুসুমকুমারী (খোঁদি) আরো অনেকেই রইলেন অন্যান্য চরিত্রে। 'মেঘনাদ বধ' স্মরণীয় নাট্য-নিবেদনরূপে অভিনন্দিত হলো।

৫ জানুয়ারী, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে মঞ্চস্থ হলো গিরিশচন্দ্র নাট্যরূপায়িত নবীনচন্দ্র সেনের পলাশীর যুদ্ধ। মেঘনাদ বধ আর পলাশীর যুদ্ধ বাংলা সাহিত্যে তখন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল বহুদিক থেকে। বাংলার শিশু নাট্যশালাও এই দুইখানি সাহিত্য-কীর্তিকে নাটকের মধ্য দিয়ে উপস্থিত করতে বিন্দুমাত্র শৈথিল্যের পরিচয় দেয়নি।

গিরিশচন্দ্রের ক্লাইভ সর্বশ্রেণীর নাট্যমোদীদের অভিনন্দনে অভিষিক্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু মতিলাল সুরের সিরাজদ্দৌলার অভিনয় কোন কোন মহল থেকে বিরূপ সমালোচনায় ধিকৃত হলো। ভেঙে পড়লেন মতি সুর। গিরিশচন্দ্র তাঁকে নানাভাবে বুঝিয়ে শান্ত করেন। শেষ পর্যন্ত মতি সুরের সিরাজদ্দৌলার অভিনয় নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে পরবর্তী শিল্পীদের কাছে আদর্শ হয়ে ওঠে। বিনোদিনী অভিনয় করেছিলেন ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী চরিত্রে।

মেঘনাদ বধে গিরিশচন্দ্রের অভিনয় দেখে সাধারণী পত্রিকা বঙ্গের গ্যারীকরূপে তাঁকে অভিনন্দিত করেন।

আনন্দ রহো, দোললীলা অভিনীত হবার পরে গিরিশচন্দ্র নাট্যরূপায়িত বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ মঞ্চস্থ হলো ৭ মার্চ। নগেন্দ্রনাথরূপে গিরিশচন্দ্র আর কুন্দনন্দিনী চরিত্রে অভিনয় করলেন বিনোদিনী।

২২ জুন মঞ্চস্থ হলো গিরিশচন্দ্র নাট্যরূপায়িত বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী। প্রথম রজনীর অভিনয়ে কেদার চৌধুরী—জগৎ সিংহ, মতি সুর—কতলু খাঁ, কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ওসমান চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। পরে গিরিশচন্দ্র জগৎসিংহ এবং ওসমান চরিত্রে মতি সুর অভিনয় করেন। আয়েষা চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন বিনোদিনী। তিলোত্তমা চরিত্রেও তিনি অভিনয় করতেন।

দুর্গেশনন্দিনীর পরেই গিরিশচন্দ্র থিয়েটারের লীজ ছেড়ে দেন। লেসী হন কেদার চৌধুরী।

বেঙ্গল থিয়েটারেও ইতিপূর্বে দুর্গেশনন্দিনীর অভিনয় জনপ্রিয়তার্জন করে। শরৎচন্দ্র সিংহ অশ্বারোহণে মঞ্চে প্রবেশ করে চমৎকৃত করতেন। কিন্তু ন্যাশনালের দুর্গেশনন্দিনীর প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। বেঙ্গল আর ন্যাশনালে তখন তীব্র প্রতিযোগিতা। কে কাকে হারায়। গিরিশচন্দ্র মেঘনাদ বধ-এ বেঙ্গলের পদ্ধতিকে অনুসরণ না করে ভিন্ন পদ্ধতিতে অভিনয় করেন।

দুই নাট্যমঞ্চ পরস্পরকে বিভিন্ন 'পঞ্চরং'-এর মধ্য দিয়ে ব্যঙ্গাঘাতে জর্জরিত করতেন।

বেঙ্গল থিয়েটারের অমিত্রাক্ষর ছন্দের অভিনয়-রীতিকে ব্যঙ্গ করে গিরিশচন্দ্র লিখলেন :

'হাত ছুঁড়ে না পা ছুঁড়ে না
ধীর হয়ে চলে।

ব্লাঙ্ক ভার্স পড়ে যেন
নদীর স্রোত জলে।'

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত সমা-সমালোচক ন্যাশনাল তথা গিরিশচন্দ্রের অমিত্রাক্ষর অভিনয়ধারার ভূয়সী প্রশংসা করলেন।

বলতে গেলে গিরিশচন্দ্রের বিভিন্নমুখীন নাট্য-প্রতিভার উন্মেষ ন্যাশনাল থেকেই সূচীত হয়। পরবর্তী কালের নটগুরু ন্যাশনালের মধ্য দিয়েই আত্মপ্রকাশ করেন।

দুর্গেশনন্দিনীর অভিনয়ের সময় মঞ্চে বিদ্যাদিগগজের খেচুরীতে পা পিছলে গিরিশচন্দ্র আহত হন এবং প্রায় তিন মাস অসুস্থ থাকেন।

কেদার চৌধুরীর পক্ষে ন্যাশনাল থিয়েটার পরিচালনা করাও সম্ভব হলো না। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগেই তিনি লীজ হস্তান্তরিত করতে বাধ্য হন। এবার এলেন গোপীচাঁদ শেঠী। এই সময় ন্যাশনালের ম্যানেজার অবিনাশচন্দ্র কর।

প্রেমশাস্ত্র। দেবআনন্দ। বিন্দু

১ জানুয়ারী, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে মঞ্চস্থ হলো কামিনী কুঞ্জ গীতিনাট্য। সমগ্র নাটকে গানের মধ্য দিয়ে প্রশ্ন এবং উত্তর দেওয়া হবে। গীতি নাটকটি রচনা করেন গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। রামতারণ সান্যাল সুরসৃষ্টিতে এবং নায়ক (কৃষ্ণ) চরিত্রে খুবই কৃতিত্বের পরিচয় দেন। নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করেন বনবিহারিণী। বিনোদিনী ছিলেন রাধিকা চরিত্রে। ৮ জানুয়ারী অভিনীত হয় প্রমোদ কানন। ২৬ মে নন্দনকুসুম। অজ এবং ইন্দুমতীর কাহিনী নিয়ে নন্দন কানন রচনা করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আত্মীয়স্থানীয় মনোরঞ্জন দাস।—১৯ এপ্রিল ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে মঞ্চস্থ হলো হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৃত্র-সংহার। এই সময় সুলভ সমাচারে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন নাট্যশালার দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা কোন সময়েই কোন বিরূপ মন্তব্য করেননি। অধিকন্তু অভিনেত্রী নিয়ে অভিনয় করার প্রস্তাবকে প্রথম থেকেই সমর্থন করেন। একজন নিষ্ঠাবান সমাজসেবী হয়েও মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের এই উদারতা চিরদিন নাট্যেতিহাসে কীর্তিত হবে।

বাবু অবিনাশচন্দ্র কর ম্যানেজার হয়ে কয়েকটি নতুন প্রথার প্রচলন করেন। প্রথমে শনিবার অভিনয় হতো। তারপর বুধবার। অবিনাশবাবু রবিবার ২টায় অভিনয় প্রথার প্রবর্তন করেন। শেষ পর্যন্ত ২টার পরিবর্তে এই অভিনয় সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হতে থাকে। রবিবারের অভিনয় খুবই জনপ্রিয়তার্জন করে কিন্তু ন্যাশনালের জনপ্রিয়তা দিনদিনই হ্রাস-প্রাপ্ত হয়।

আগস্ট মাসে অবিনাশবাবু ন্যাশনাল সম্প্রদায় নিয়ে ঢাকায় অভিনয় করতে যান। কিন্তু সেখানেও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়।

ইতপূর্বে ন্যাশনাল এবং হিন্দু ন্যাশনাল নামে যখন (ঢাকায় অভিনয় করতে যান, তখন অভিনেত্রী নিয়ে অভিনয় করার রেওয়াজ ছিল না। এবার স্বভাবতঃই সম্প্রদায়ের সঙ্গে অভিনেত্রীরাও ছিলেন। 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' মঞ্চে ন্যাশনাল থিয়েটার অভিনয় করবেন বলে স্থিরীকৃত ছিল।

৭ আগস্ট ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ পোপের সভাপতিত্বে এখানেই অনুষ্ঠিত হলো অভিনয়-বিরোধী সভা। অনেকে অবশ্য অভিনয়ের সমর্থকও ছিলেন। কিন্তু তীব্র বিরোধিতার মধ্যে অবিনাশবাবু আর্থিক দিক থেকে সুবিধা করতে পারলেন না। ঢাকা থেকে প্রত্যাবর্তন করে ন্যাশনাল সম্প্রদায়ের বাকীপুর বেঁটিয়া প্রভৃতি স্থানে অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাস থেকে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে ঢাকা, বাকীপুর, বেঁটিয়া, কাশী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে প্রদর্শনী দিয়ে ন্যাশনাল সম্প্রদায় কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

গোপীচাঁদ শেঠীর পক্ষে থিয়েটার পরিচালনা করা সম্ভব হলো না। তিনি লীজ ছেড়ে দিলেন। কেদার চৌধুরীর মাতুল কালীদাস মিত্র ১৮৮০ খৃষ্টাব্দেই ন্যাশনাল থিয়েটার লীজ নিলেন। কিন্তু তিনিও মাসদশেকের মধ্যে লীজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। যোগেন্দ্রনাথ মিত্রও কালীদাসবাবুর পর কিছুদিন থিয়েটার চালাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনিও ব্যর্থ হন। এই সময়কার মজার বিষয় হচ্ছে—দর্শকদের মধ্যে এই সময় আংটি ইয়ারিং, চশমা, রুমাল, গন্ধদ্রব্যাদি, সাবান প্রভৃতি বিতরণ শুরু করেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত ফলমূল, তরিতরকারী বিতরণ করেও দর্শকদের ভিড় বাড়ানো সম্ভব হলো না। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের মালিক ভুবনমোহন নিয়োগী হৃতসর্বস্ব হয়ে পড়েছিলেন। মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স বাকী পড়লো। ২৫ হাজার টাকা দেনার দায়ে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার নীলামে বিকিয়ে গেল।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে প্রতাপ জহুরী গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ক্রয় করেন। এর পরই শুরু হলো গিরিশচন্দ্র তথা বাংলা নাট্যশালার গৌরবময় যুগের অভ্যুদয়।

কালীশ মুখোপাধ্যায়

অঙ্গ সে অঙ্গ লাগালে

সতীশ কাউল / শীতল

প্রযোজনা : **শিবকুমার প্রডাকসন্স**

অবাস্তব কাহিনীকেন্দ্রিক এবং পরিচালকের কলাকৌশলসমৃদ্ধ ছবি

ইদানিং বোম্বাই ছায়াজগতের অনেক পরিচালকেরই 'ব্লো হট ব্লো কোল্ড' ছবির অনুকরণে প্রায় নগ্ন এবং উত্তেজক শয্যাদৃশ্য দেখানোর প্রবণতা দেখা দিয়েছে। সাধারণত এই ধরনের দৃশ্যগুলিতে কমার্শিয়াল ছবির শিল্পীদের পাওয়া যায় না—সেকারণেই ডাক পড়ে পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীদের। এ ছবিতেও তাই-ই ঘটেছে। অন্তরঙ্গ এবং শয্যাদৃশ্য দেখানোর প্রয়োজনে পরিচালক ফিল্ম ইনস্টিটিউটের স্নাতক এবং কৃতী আলোকচিত্রশিল্পী সতীশ কাউল এবং ১৯৭১ সালের 'মিস ইণ্ডিয়া' প্রেমা নারায়ণের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। সেন্সর বোর্ডের বিধিনিষেধ যাতে অমান্য না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই প[রি]চালক কখনও ছবিকে ফ্রিজ করেছেন কখনও [ই]ংগিতময়, নেগেটিভ সৃষ্টি করে একই দৃশ্যের মধ্যে অন্তরঙ্গের মধ্যে দিয়ে চটুল নৃত্যগীতের উপস্থাপনা করে বিশেষ ধরনের দর্শকদের আনন্দ দিয়েছেন। অবশ্য বিদেশী কাহিনী এবং যৌনতাকে পরিচালক পরিহার করলেও পারতেন।

ব্যাঙ্গালোরের এক বিখ্যাত ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার রাজনারায়ণের কোষ্ঠীতে ছিল—পুত্রের মুখ দেখলেই তাঁর মৃত্যু হবে। ঘটলও তাই। পুত্রের মুখ দেখতে হাসপাতালে যাওয়ার পথেই হৃদ্‌রোগাহত হলেন তিনি। অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল তাঁকে। সেখানে সন্তানের মুখও দেখলেন তিনি—তারপরই সেই চরম নিয়তি নেমে এল।

ছেলেবেলা থেকে আশা দেবী রাজেশকে এমনভাবে মানুষ করেছিলেন যেন সে মা'র ইচ্ছা বিরুদ্ধ কোন তরুণীকে বিয়ে না করে বসে। আশা

দেবী জানতেন ছেলে তার কলেজের সহপাঠিনী নীলাকে ভালোবাসে এবং তাকে বিয়ে করেই সংসারী হতে চায়। মা সব জানতেন বলেই নীলার সংগে রাজেশের বিয়ের মত দেন না। গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর ছেলে নীলাকে বিয়ে করতে পারে এই আশঙ্কায় চাকরী পেয়ে স্বাবলম্বী হয়ে ছেলে যাতে নীলাকে বিয়ে করার কথা চিন্তা করে এমনি ইঙ্গিত দেন।

ইতিমধ্যে রাজেশ বাবার ব্যাঙ্কেই ম্যানেজারের চাকরী পায়। তারপর একদিন মায়ের সংগে পরিচয় করিয়ে দিতে নীলাকে নিয়ে যায়। আশা দেবী রাজেশের মৃত্যুর কারণ তাঁর ছেলে— এ কথা জেনেই বিয়েতে মত দিতে পারেন না। এই নিয়ে নীলার জামাইবাবুর সংগে রাজেশের মার একটা তিক্ততার সৃষ্টি হল। দু' পরিবারের মেলামেশা বন্ধ হয়ে গেল।

রাজেশ এক পার্টিতে এক মডেল গার্লের সংগে পরিচিত হল। তার মনে তখন প্রচণ্ড দুঃখ। উদ্ভিন্নযৌবনা তরুণীটি নানা ছলাকলায় রাজেশকে ভোলাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। শেষে মায়ের মত নিয়েই রাজেশ-নীলার বিয়ে হল। কিন্তু সন্তান হওয়ার আশঙ্কা রোধ করতে জন্মনিরোধক ব্যবস্থার সাহায্য নিল। এতে আঘাত লাগলো রাজেশের মনে। জামাইবাবুকে বুঝিয়ে 'অপারেশন' করিয়েও নীলা নিষ্কৃতি পেল না। একদিন 'মা' হলো। এক সময় রাজেশ তাঁর ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেই এক জলপ্রপাতের মধ্যে পা পিছলে পড়ে যায়। আহত হওয়ার পর তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হল। ছেলের মৃত্যু কামনায়ই রাজেশ বেঁচে ওঠে। এইভাবেই সে কোষ্ঠীর ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যা প্রমাণিত করল।

কাহিনীর দুর্বলতা এবং অবাস্তবতার কারণেই পরিচালক শিবকুমার শিল্পীদের একক অভিনয় এবং ছবির টেকনিক্যাল গিমিকের ওপর নির্ভর করতে চেয়েছেন। নীলা এবং রাজেশের ভূমিকায় প্রেমানারায়ণ এবং সতীশ কাউল চরিত্রানুযায়ী অভিনয় করেছেন। মডেল গার্লের চরিত্রে শীতল, জামাইবাবুর চরিত্রে অর্জুন বকশীগীল, মায়ের চরিত্রে সুলোচনা এবং মামার চরিত্রে জালাল আগা চিত্রনাট্যের দাবী মিটিয়েছেন। সঙ্গীত রচনায় কৃতিত্ব দেখাতে না পারলেও আবহসংগীত এবং অর্কেস্ট্রাইজেসানে প্রদীপ রায়চৌধুরী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

আলোকচিত্রশিল্পী অরবিন্দ লাড এবং সম্পাদনায় মোহন রাঠোর অনেকেরই প্রশংসা পাবেন। এ ছাড়া অন্যান্য বিভাগের কাজও পরিচ্ছন্ন।

—চিত্রদূত

ইমতিহান। বিন্দু

বায়োস্কোপিক

আমাদের কলকাতার ফিল্ম লাইনের মানুষজন বলতে সবাই তো গোনাগুনতি; দিনে একবার টালীগঞ্জ পাড়ায় পা দিলেই সকলের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা-সাক্ষাৎ হয়ে যায়, কে কি করছে আর না-করছে—সব খবরই টাটকা পাওয়া যায়। আগে আগে একটা রেওয়াজ চালু ছিল, পরস্পরের দেখা-সাক্ষাৎ হলে পদমর্যাদা অনুসারে নমস্কার বা স্যালুট ঠোকা হত, ইদানীং তা আর বড় চোখে পড়ে না। ব্যাপারটা মধ্যযুগীয় বলে পরিত্যক্ত হয়েছে অনুমান করি।

একদিন, আমার বেশ মনে আছে, টালীগঞ্জ ট্রাম ডিপোয় দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল উল্টো দিকের ফুটপাতে আমাদের বলাইদা মানে তপন সিংহ মশায়ের প্রধান সহকর্মী—পরিচালক বলাই সেন একটা ট্যাকসি ধরে রাসবিহারীর দিকে যাবার উদ্যোগ করছেন। আমি এক ছুটে গিয়ে সেই চলন্ত ট্যাকসিতেই পাড়ির্মার করে উঠে পড়লাম। বলাইদা অবাক। আমি অপ্রস্তুত ভাবটা কাটাবার জন্যে তাড়াতাড়ি বললাম—সরি বলাইদা, অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি। অথচ ট্রাম বাস কিছুই নেই, তাই আর কি—

বলাইদা শুধু হাসলেন। কিছু বললেন না। তারপর পাশের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন, নীরবে।

এখন ব্যাপারটা এমন বিচ্ছিরিভাবে আমিই ঘটিয়ে বসেছি যে নিজেরই খুব লজ্জা করছিল। হুট করে দৌড়ে এসে এইভাবে প্রায় চলন্ত ট্যাকসিতে ওঠা—রীতিমত ছেলেমানুষী। তার ওপর বলাইদার নীরবতায় আরও অস্বস্তি হচ্ছিল। তাই আর না ঘাঁটিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যে রাসবিহারীর মোড় এসে গেল।

আমি ট্যাকসি ড্রাইভারকে বললাম, ভাই, বাঁ-দিক করে একটুখানি দাঁড়াও তো, আমি নামব—

গাড়ী দাঁড়াতে আমি দ্রুত নেমে বললাম—হেঁ হেঁ, আপনাকে ট্রাবল দিলাম বলাইদা, কিছু মনে করবেন না—

আশ্চর্য, এবারও বলাইদা নীরব, মুচকি হেসে মুখটি ঘুরিয়ে নিলেন। ট্যাকসি বেরিয়ে গেল। এঃ, তখন নিজের এত খারাপ লাগছিল যে কি বলব:

তারপর সন্ধ্যের ঝোঁকে ঝোঁকে আমি রাসবিহারীর আড্ডায় মজুদ। এটা অ্যাবসলিউট আমাদের ফিল্মের লোকেদের আড্ডা। সেদিন হঠাৎ বলাইদা এসে হাজির! ওঁকে দেখে সবাই খুব হৈ-চৈ করে কিছুক্ষণের মধ্যে ওঁর পকেট খালি করে দিল। ক্যামেরাম্যান মণীশ দাশগুপ্ত অন্যকে টুপি পরাতে বিশেষ পারদর্শী। ও যে ছবিতেই কাজ করে—চেষ্টা করে সে-ছবির নায়িকার সঙ্গে প্রেমে পড়তে। পড়েও ছিল নাকি কয়েকবার। এখন সে-সব ব্যাপার রেফার করলে শুধু হাসে। বলাইদা সেদিন কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করে বললেন—মণীশ, মানুষকে চোট দেওয়াটা তোর স্বভাবে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এটা বদলা—

তা মণীশের বক্তব্য, যে-সব হিরোইন ওর বুকে চোট দিয়ে গেছে বলাই যেন এই জ্ঞানটা তাদেরও একটু দেয়—

এইসব নিয়ে বেশ মস্করা হচ্ছে, বলাইদা তোফা মেজাজে সেদিন। অথচ বিকেলে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করলেন না—কি ব্যাপার ভাই? মণীশকে সব খুলে বলাতে সে একচোট হেসে নিয়ে বললে—হয়েছে। তুই আজ ভিকটিম হয়েছিস—

—কিসের ভিকটিম?

—ট্রেইন। ওঁকে ট্যাকসিতে বলাই না, কানাই। ওরা যমজ ভাই। তুই জানতিস না বুঝি?

আমার তো সেই আকাশ থেকে পড়ার অবস্থা। তখন বলাইদা সহাস্যে বললেন—কানাই তাই ইচ্ছে করেই কথা বলে নি। বললে তুমি পাছে আরও লজ্জা পাও সেটা বিবেচনা করেই আর কি—

এছাড়া আরও দু' জোড়া যমজ আছে আমাদের ফিল্মে। ক্যামেরাম্যান রেজা আর তার ভাই। সে ভদ্রলোকের নাম আমার এক্ষুনি স্মরণ হচ্ছে না। ও দুজনাকে নিয়ে আমাদের এই সেদিন পর্যন্তও গণ্ডগোল হয়েছে, এখন দেখছি ওরা বেশ কেয়ারফুলি, রেজার ভাই একটি পুরুষ্টু গোঁফ রেখে সম্প্রতি আমাদের যেন বাঁচিয়েছে। আর এক জোড়া হচ্ছে ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীর কর্মী বীরেন গুহ বিশ্বাস ও তার ভাই। ধীরেনদের কেসটা আরও জটিল, কারণ ওরা থাকে টালীগঞ্জের খোদ স্টুডিও পাড়াতেই। ফলে ওদের নিয়ে প্রায়ই আমাদের 'কমেডি অফ এরার'-এ ভুগতে হয়।

একদিন ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে 'মা' নামের একটি ছবির শুটিং চলছে। পরিচালক চিত্ত বসু। হাসপাতালের সেট। তা সেটের রিকুইজিশান মিলিয়ে নিতে গিয়ে সহকারী পরিচালক হঠাৎ আবিষ্কার

কম্বল, আসল জিনিসটাই নেই। অর্থাৎ কম্বল। রোগী কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকবে, ডাক্তার এসে তাকে পরীক্ষা-টরীক্ষা করবেন—দৃশ্যটা ছিল মোটামুটি এই রকম।

সহকারী পরিচালক সন্ত্রস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি প্রোডাকশন ম্যানেজার কালুকে গিয়ে ধরল—কি ব্যাপার কালু, কম্বল আনো নি? ওটা না পেলে যে শট-ই আটকে যাবে—

কালু সর্বদাই নিস্পৃহ। একটা উদাসীন ভঙ্গী করে বলল—আনা হয় নি তো কি হয়েছে? এক্ষুনি এনে দিচ্ছি।

—তাই দাও। এর পরের শট হচ্ছে কম্বলের। কম্বল না পেলে চিত্তদা কিন্তু চটে ফায়ার হয়ে যাবেন—

কালু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী করে সাইকেল চেপে গেল পরিচিত এক ভদ্রলোকের বাড়ী। কম্বল আছে? তাঁরা বললেন, না নেই। কালু বলল, বেশ ভাল কথা। তারপর গেল বীরেন গুহ বিশ্বাসদের বাড়ী। দেখে বীরেন স্বয়ং বারান্দায় বিছানা করে একটা কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে আছে, পরিষ্কার ম্যালেরিয়া হয়েছে। কম্বলটি কালুর খুবে পছন্দ হলো।

সাইকেল থেকে নেমে কালু আর কোন কথা নয়, ধাঁ করে কম্বলটি টেনে নিয়ে দে চম্পট। রোগী হতভম্ব। এভাবে কেউ কারো গায়ের কম্বল নিয়ে পালায়, কল্পনাতেও আসে না।

মুহূর্তে খবরটা রটে গেল। কালু রোগীর গায়ের কম্বল উপড়ে নিয়ে এসেছে, দেখো শালা কোন স্টুডিওতে মস্করা করছে।

কালু ততক্ষণে কম্বল সহ স্টুডিওতে পৌঁছেছে। আর কম্বলও ইতিমধ্যে আর্টিস্টের গায়ে চড়ে গেছে, পর পর শটও তোলা হয়ে গেছে কয়েকটা। এই রকম একটা সময় বীরেন নিজে একটা সাইকেলে চেপে স্টুডিওতে এসে হাজির। রাগে অগ্নিশর্মা চেহারা। কালুর একেন বেয়াদপীর শিক্ষা আজ একটা দিতেই হবে।

বীরেনকে সাইকেলে চেপে স্টুডিওয় ঢুকতে দেখে কালু, যার তৎক্ষণাৎ সটকে পড়ারই কথা, সে বরং থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বীরেন সাইকেল থেকে নেমে কালুকে বাক্য দেবে বলে যেই তৈরী হয়েছে, কালু তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল—তুমি জ্বরে কোঁ কোঁ করছিলে না?

বীরেন বলল—সেটা আমি না—

কালুর বক্তব্য—কেন চেপে যাচ্ছ গুরু, তুমি কম্বল চাপা দিয়ে কাঁপছ দেখেই তো কম্বল নিয়ে হাওয়া দিলাম, জানি ইচ্ছে থাকলেও তুমি আমায় ধরতে পারবে না, কিন্তু সেই তুমি কি করে উঠে এলে? অজব ব্যাপার ভাই--

বীরেন বলে, ওরে শালা সে আমি নই। ওসব পরে হবে, এখন কম্বলটা দাও—

প্রিয়বান্ধবী
সুচিত্রা। উত্তম

কালু তত উৎসাহ পায়—নাহ বীরেন, কম্বল এখন আর্টিস্টের কন্টিনিউটী হয়ে গেছে, কল পাবে, সঙ্গে কম্বলের ন্যায্য ভাড়াও পাবে, সে সব অলরাইট, কিন্তু এটা তুমি কি করলে, সামান্য ভাড়ার লোভে রোগ-শয্যা ছেড়ে তুমি সাইকেল চেপে চলে এলে? তুমি দেখছি আচ্ছা পাষণ্ড—

কথা শুনে বীরেনের সে কি ক্রোধ!—শালা এখন তুমি আমায় জ্ঞান দিচ্ছ? আমি পাষণ্ড? লজ্জা করে না একটা রোগীর গা থেকে কম্বল কেড়ে আনতে?

—আহা, বাস্তবিক তো তুমি রোগী নও।

—আমি না হতে পারি—, ওটা আমার ভাই—

কালু টাপরা। অদ্ভুত সন্দিগ্ধ কণ্ঠে,—যাঃ, আবারো গুল ঝাড়ছ।

বীরেনের মাথায় তখন যেন খুনীর রক্ত উঠে গেছে—কালু, মুখ সামলে, ও আমার যমজ ভাই--

কালু গতিক খারাপ দেখে সে-যাত্রা রণে ভঙ্গ দিয়ে বাঁচে আর কি। পরে জেনেছি, বীরেনরা বাস্তবিকই যমজ, কম্বলটা সে বীরেনের ভাইয়ের গা থেকেই টেনেছিল আরে ছিঃ!

এই হচ্ছে প্রোডাকশন কন্ট্রোলার কালু বোস। এই রকম উপস্থিত খচরামো বুদ্ধি, ফিচলেমো কাজে-কারবার এক কালুর ক্ষেত্রে যা দেখেছি, তা আজীবন কাল আমি ভুলতে পারব না।

একটা মজার ঘটনা উল্লেখ করি এই প্রসঙ্গে।

এ রকম হয় না, দুজনেই প্রাণের বন্ধু, অথচ কথায় কথায় খাঁচকা-খাঁচকি লেগে আছে। এ সুযোগ পেলে ওকে তৎক্ষণাৎ এঁটে দিচ্ছে আবার ও সুযোগ পেলে একে এঁটে দিচ্ছে। রেষারেষি আর ফ্রেন্ডশিপ ওদের যুগপৎ লেগেই আছে। একজন হচ্ছে কালু আর একজন বরেন। দুজনেই ফিল্মের কর্মী, কালু প্রোডাকশনের, বরেন সম্পাদনার। একদিন কি একটা সামান্য কথা নিয়ে দুজনের মধ্যে তুমুল একচোট হয়ে গেল। কালু বললে—বরেন, তোকে একদিন এমন জব্দ করব যে আর আমার সঙ্গে লাগবি না।

—যা যাঃ, কত হাতি গেল তল......বরেনের পাল্টা ডায়লগ।

তারপর দিন যায়, হঠাৎ পরিচালক একদিন কালুকে ডেকে বললেন, ওহে কালু, চাটুজ্যেবাবুকে খবর দাও, ছবির রিলিজ কনফার্মড হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি এডিটিং করে ছবিটা রেডি করে ফেলতে হবে—

কালু ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে গেল। তারপর শুরু হল পুরোদমে কাজ। বরেন আবার সে-ছবির সহকারী সম্পাদক। নেগেটিভ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রধানতঃ তার। কালু জ্ঞান দেয়, মন দিয়ে কাজকম্মো করিস বরেন, তুই তো আবার ভালকানা—

বরেন তখন ওকে বৃহৎ বৃহৎ বাক্য দেয়, কালু খিক খিক হেসে কেটে পড়ে। আসলে বরেনকে রাগিয়ে যেটুকু সুখ!

এদিকে ছবির মুক্তির দিন দ্রুত ঘনিয়ে আসছে। অথচ হাতে তখনও প্রচুর কাজ, ছবি রেডি করতে হলে আরও দ্রুতগতিতে কাজ করতে হবে নইলে নির্ধারিত দিনে ছবি রিলিজ করা যাবে না। ফলে উদ্বিগ্ন প্রযোজক সবাইকে ডেকে বললেন—না মশাই, আরও স্পীডের দরকার। আপনারা ডে-নাইট কাজ করুন। বাড়তি খরচ যা লাগে আমি দেখ বরং--

পরিচালক বললেন, অগত্যা—

জীবনে পাপ কীর্তনে দরে হীনা কৌসর। অনুপকুমার

এবার শুরু হল ডে-নাইট শিফট। একটা ছবি রেডি করা—সে তো সোজা ব্যাপার নয়। পরিচালক বরেনকে ডেকে বললেন, কদিন তোমার আর বাড়ী যাওয়া হবে না। কালু খবরটা তোমার বাড়ীতে বরং দিয়ে আসুক।

কালু বললে—তাই যাবো না হয়। রাত্রে এখানে বরেনের থাকার কোন অসুবিধে নেই, ও তো আর বিয়ে-থা করে নি—

সেদিনই সন্ধ্যেবেলায় কালু ঠিকানা খুঁজে খুঁজে বরেনের বাড়ী গিয়ে হাজির। কড়া নাড়তেই এক বিধবা মহিলা বেরিয়ে এলেন। কালু দেখেই বুঝল, বরেনের মা।

দরজা খুলে সামনে একজন অপরিচিত মানুষকে দেখে বরেনের মা অবাক। —কাকে চাই?

মতলব এ'টেই গিয়েছিল কালু। এক-গাল হেসে বলল—আমার নাম কালু, আমি বরেনের সংগে কাজ করি মাসীমা। বরেন বাড়ীতে আছে?

—না তো। বরেন সেই কোন সকালে উঠে স্টুডিওতে গেছে, এখনও ফেরে নি—

কালু যেন কত অবাক।—সে কি? বরেন তো আজ স্টুডিওতে যায় নি। সেই জন্যেই তো আমি ওর খোঁজে এলাম। ওর জন্যে সবাই আমরা বসে আছি।

মা উদ্বিগ্ন হলেন। —কি জানি বাবা, আমায় তো বলে গেল স্টুডিওতে যাচ্ছি—

কালু বলল—দেখুন ওর আক্কেল। ছবি রিলিজ, এখন এইভাবে কেউ ডুব মারে? ওর কাছে আলমারীর চাবি রয়েছে, মালপত্র সবই আলমারীর মধ্যে, ও না গেলে তো কাজকর্ম সব বন্ধ...

মা যেন দায়ে পড়লেন। —বটেই তো। তা ও না ফেরা পর্যন্ত তো কিছুই বুঝতে পারছি নে বাবা—

কালু বিরক্ত মুখে বলল, মাসীমা ফেরা মাত্র বরেনকে স্টুডিওতে পাঠিয়ে দেবেন। ও যেন এক মুহূর্ত দেরী না করে। বলবেন সবাই আমরা হাত গুটিয়ে বসে আছি।...দেখুন তো কি রকম বে-আক্কেল। মানুষ..., এখন চলি মাসীমা, আপনি কিন্তু ওকে ধুলো পায়েই......

রাত ন'টা।

বরেনদের বাড়ীর সদরের কড়া নড়ে উঠল।

মা দরজা খুলে দেখেন কালু নামক সেই লোকটি আবার এসেছে।

হতাশ ভঙ্গী করে মা বললেন, না বাবা খোকা এখনও ফেরে নি—

রাজ্যের দুশ্চিন্তা মুখে, কালু বলল, কি কাণ্ড, ছি ছি ছি, আমরা সবাই নিষ্কর্মা বসে আর বরেন এই রকম করে ডুবিয়ে দিয়ে......

মা বললেন—আমি এলেই ওকে পাঠিয়ে দেব বাবা—

—তা না হয় দেবেন, কিন্তু কোম্পানীর যে মালিক—তিনি ভীষণ ক্ষেপে গেছেন। চাবি দিয়ে এভাবে গা-ঢাকা দেবার কোন মানে হয়। আজ-বাদে-কাল ছবির রিলিজ, ভদ্রলোকের লাখ লাখ টাকার কারবার, এ তো সেই ইচ্ছে করে লাটে তোলার ব্যবস্থা...কি করি বলুন তো মাসীমা? এবার না সবশুদ্ধ আমাদেরও চাকরী যায়!

মায়ের তো অথৈ জলে পড়া। তিনি আমতা আমতা করে বলেন, কি জানি বাবা, কিছুই তো বুঝতে পারছি নে, তবে বরেন তো আমার এ রকম ছেলে নয়, কখনো তো এ রকম শুনি নি—

—সেই তো হয়েছে বিপদ—কালু তৎক্ষণাৎ পাদপূরণ করে—ভীষণ দায়িত্বজ্ঞান ওর, অ্যাদ্দিন ধরে তো দেখছি ওকে কিন্তু আজ যে হঠাৎ কি হল। আচ্ছা, কোন বন্ধুর বাড়ী-টাড়ী যায় নি তো? গিয়ে হয়ত আড্ডা দিচ্ছে। তাস-ফাস খেলছে।

মা অজ্ঞানতার ভঙ্গি করলেন।

কালু বলল—শনিবার হলেও না'হয় একটা কথা ছিল বুঝতাম যে মাঠে গেছে, কিন্তু আজ তো শুক্রবার—আজ তো কোন রেস-টেস নেই।

শুনে মা'র চক্ষুস্থির। কি সব্বোনাশ, ছেলে রেস খেলতে যায়?

কালু ব্যাপারটা হাল্কা করে দেবার চেষ্টা করে—মানে মাঝে মধ্যে যায়-টায় আর কি। সে আর আপনি কি করে ঠেকাবেন ছেলে বড় হয়েছে, বুদ্ধি-শুদ্ধি হয়েছে। তা সে যাই হোক সে-সব পরের ব্যাপার এখন আমরা কি করি বলুন তো? আচ্ছা চাবিটা বাড়ী ফেলে যায়নি তো দেখবেন একটু—

চাবি পাবার কথা নয় পাওয়াও গেল না।

তখন কালু যেন কত মরিয়া বলল, মাসীমা আমি যাচ্ছি। ও এলেই ওকে আপনি ইয়ে করে মানে পত্রপাঠ পাঠিয়ে দেবেন—

মা'র তখন ভয় ধরে গেছে, বললেন তাই দেব—

কালু এলো ল্যাবরেটরীতে। বরেণের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে চোখ নাচাল—কিরে?

বরেণ বলল এখন সিরিয়াস কাজ হচ্ছে কালু, অতএব ইয়ার্কি না মেরে কেটে পড়।

কালু বলল—তোরা রাত জাগবি তা রাতের খাবারের মেনুটা কি করব, চাইনীজ আনবো?

বরেণ বলল—সে তো খুব ভাল কথা। দেখনা প্রোডিউস্যারকে একবার বলে—

কালু বলল—বলতে হবে না। আমি চাইনীজের ব্যবস্থা আগেই করে দিয়েছি। সংগে একভাঁড় ঠাণ্ডা দৈ আনতে বলেছি—

বরেণ মুখ ভেংচে বলল, কালু তুই বাস্তবিক একটা পাঁঠা নইলে চাইনীজের সঙ্গে একপাতে কেউ দৈ দেয়? ছোঃ!

তারপর কালুর সেই বিখ্যাত খিক খিক শুনে বীতশ্রদ্ধ বরেণ তৎক্ষণাৎ সরে পড়ল নিজের কাজে। বরেণের বক্তব্য, হাসিটা শুধু

বিচ্ছিরি নয় হাসিটা রীতিমত অশালীন। ওটা একমাত্র কালুকেই নাকি শোভা পায়।

রাত সাড়ে বারটা।

বরেণদের সদরে কড়া নড়তেই দোতলা থেকে এবার বরেণের দাদার গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল—কে?

—আজ্ঞে আমি কালু।

—কালু! তা কি চাই এত রাত্রে?

—আজ্ঞে বরেণকে। আমি স্টুডিও থেকে আসছি।

এবার সদর দরজা খুলে বরেণের দাদা বেরিয়ে এলেন চাক্ষুষ।

—অ। আপনিই তাহলে এর আগে দুবার এসেছিলেন, বরেণের খোঁজে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মানে আমাকে স্টুডিও থেকে পাঠানো হয়েছে—যথাসম্ভব বিনয়ের সঙ্গে কালু নিবেদন করল। দাদাটিকে ভয়ঙ্কর রাগী মনে হল তার

—কিন্তু সে এখনও বাড়ী ফেরেনি—

কালু যেন আর্তনাদ করে উঠলো—সেকি এখনও ফেরেনি? তাহলে আমাদের কি হবে? আমাদের চাকরী শেষ পর্যন্ত বরেণের জন্যই কি নষ্ট হবে?

কঠিনকণ্ঠে দাদা জানতে চাইলেন— আপনি আমার মাকে বলে গেছেন— বরেণ রেস খেলে?

—এ্যাঁ, না মানে ইয়ে ব্যাপারটা হচ্ছে— কালু আমতা আমতা করে বোঝাতে চাইল যে সেজন্য অত কঠিন আপনারা হবেন না সখ করে খেলা তো, মুখ ফসকে কথাটা আমার নেহাৎ বেরিয়ে গেছে নইলে ছেলে হিসেবে বরেণ খুবই খাঁটী।

—আর কিছু করে কিনা জানেন?

—আজ্ঞে, তা তো ঠিক বলতে পারব না। তবে—আড্ডা-ফাড্ডা দিতে গিয়ে যদি কখনও-সখনও— সে যাই হোক, এখন আলমারীর চাবি না পেলে আমাদের অবস্থাটা মানে বুঝতেই তো পারছেন দাদা—

দাদা কটমট করে কালুর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কালু বলল— দেখি এবার খুঁজে। আচ্ছা চলে যাহোক। মনে হয় কোথাও নেশা ভাঙ-টাঙ করেই পড়ে আছে। এত রাত্তির হল অথচ বাড়ী ফিরছে না, স্টুডিওয় গেল না— নির্ঘাৎ ফেঁসেছে কোথাও। খাবার জিনিস খাবি না কেন? নিশ্চয় খাবি। তাবলে খেয়ে বেহেড হয়ে কোথাও পড়ে থাকবি এটাও তো ভাল কথা নয়—

দাদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছেন, কালু যেন স্বগোতক্তি ঝাড়ছে এমন কায়দায় কথাগুলো বলেই সাইকেলে উঠে দে-পিট্টান। দাদা কিছুক্ষণ গুম মেরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর একটা চাপা ক্রুদ্ধ গর্জন করে সশব্দে দরজা বন্ধ করলেন।

রাত ভোর হচ্ছে।

কালু বলল—ইস বরেণ স্টুডিওতে [illegible] একটা রাত [illegible] অবস্থা [illegible]। [illegible] বাড়ী না [illegible] দাড়ি-গোঁফ কেটে জামাকাপড় বদলে আয়।

[illegible]

সুমিত্রা মুখার্জি। অনুপকুমার

পরিচালনা : [illegible] মুখার্জি

বরেণের চোখ লাল চুল উস্কোখুস্কো।

সম্পাদক সহাস্যে বললেন—তাই যাও বরেণ, আমিও বরং এই ফাঁকে বাড়ীটা ঘুরে আসি। আজও আবার রাত জাগার কাজ রয়েছে—

সম্পাদক চলে গেলেন। অতএব বরেণও গেল।

বাড়ীর কড়া নড়তেই দাদা স্বয়ং নেমে এলেন। দরজা খুলতেই বরেণ পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল দাদা খপ করে কাঁধটা ধরলেন— বলি যাচ্ছ কোথায়?

বরেণ যৎপরনাস্তি অবাক। —কেন, ভেতরে!

—ভেতরে —দাদা যেন বোমার মত ফেটে পড়লেন—হারামজাদা ছেলে তলে তলে তোমার এত গুণ হয়েছে, অ্যাঁ?

ভয়ে ভয়ে বরেণ জানতে চাইল—কেন ব্যাপারটা কি?

কিন্তু তার আগেই তার মুখে হঠাৎ আছড়ে পড়ল দাদার হাতের এক বিরাট থাপ্পড়। —রেস খেলা হচ্ছে, মাল টেনে বেহুঁশ হয়ে থাকা হচ্ছে আর রাজ্যের লোক তোমার খোঁজে ছোটাছুটি করছে— বলি ভেবেছো কি? অ্যাঁ?

হতভম্ব বরেণের তখন কাতর প্রতিবাদ— একি তুমি আমায় মারছ কেন? মাল টানা রেস খেলা কি যা-তা সব বলছ, আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে—

দাদার গর্জন—বদমাশ আবার ঢং করা হচ্ছে, আমি সব খবর পেয়েছি। কাল রাত্রে তুমি কোথায় ছিলে?

—স্টুডিওতে। সারা রাত ওখানে কাজ হয়েছে আমাদের—

—মিথ্যে কথা। কাল তুমি স্টুডিওতেই যাওনি। কালুবাবু অনেকবার তোমার খোঁজে বাড়ী এসেছে আর গিয়েছে। জানোয়ার পাষণ্ড কোথাকার। গেট আউট। গেট-আউট। তোমার আর মুখদর্শনও করতে চাইনে আমরা......

—কালু? বলেই বরেণের হঠাৎ একটা চীৎকার—ব্যাটা কাল এখানে এসেছিল আমার খোঁজ করতে?

দাদা বললেন—নিশ্চয়ই এসেছিল। তার মুখেই তো তোমার সব গুণের পরিচয় পেলাম—

আর কি বরেণের সে কি প্রচণ্ড চীৎকার —আমি ওটাকে আজ ফেড়ে ফেলব টুকরো টুকরো করে ফেলব ওকে খুন করে আমি আজ ফাঁসি যাব—একটা লোহার রড সংগ্রহ করে বরেণ পাঁই পাঁই ছুটল। —ট্যাক্সি ট্যাক্সি...

ট্যাক্সি। ল্যাবরেটরী। দারোয়ান দেখে বিরাট এক ডাণ্ডা হাতে বরেণবাবু ট্যাক্সি থেকে নামছে। দেখেই সে সোজা হাওয়া। বরেণবাবুর এহেন চেহারা ইতিপূর্বে সে কখনও দেখেনি। গোটা ল্যাবরেটরীতে হুলুস্থুলে তোলপাড় কাণ্ড। কিন্তু কালুকে ধারে-কাছে কোথাও পাওয়া গেল না। একজন শুধু বিস্ফারিত চোখে সব দেখে আমতা করে বলল—ইয়ে কালুবাবু আমায় যাবার আগে বলে গেছেন ও'র শরীরটা ইদানিং ভাল যাচ্ছে না [illegible] দিনকতকের জন্য পুরী যাচ্ছেন, বলে গেলেন, বরেণবাবু এলেই যেন কথাটা তাঁকে বলে দেওয়া হয়...

—রঞ্জন মজুমদার

দেবী চৌধুরানী

প্রযোজনা : সঞ্চয়িতা ফিল্মস্‌

সুচিত্রা সেনের অভিনয়সমৃদ্ধ একটি পরম উপভোগ্য চিত্র !

সুচিত্রা সেন
রঞ্জিত মল্লিক
সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়

আজকের দর্শকদের অনেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের অমর উপন্যাস এর পূর্বেকার চলচ্চিত্ররূপ 'দেবী চৌধুরাণী' (পরিচালনা : সতীশ দাসগুপ্ত) এবং তার নামভূমিকায় সুমিত্রা দেবী, ব্রজেশ্বর এর ভূমিকায় প্রদীপকুমার ও ভবানী পাঠকরূপী নীতিশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির অভিনয় দেখেননি। যাই হোক আজকের দর্শকের কথাই বলি। তাঁদের 'দেবী চৌধুরাণী'র আধুনিক সংস্করণ ভালো লাগবে। শ্রীমতী সুচিত্রা সেন যে বিশ্বের অনন্যা অভিনেত্রী তাঁর পরিচয় দিয়েছেন 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' এবং 'সাত পাকে বাঁধা' ছবির মধ্যে দিয়ে। আবার 'দেবী চৌধুরাণী'তেও তিনি আবার প্রমাণ করলেন বাংলার চলচ্চিত্র জগতে এখনও উনি অনন্যা অভিনয়ের মাধ্যমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। সুমিত্রা দেবীর পরে এই ভূমিকায় অন্য কাহাকেও কল্পনা করা যায় না।

অসামান্য রূপবতী অথচ অনাথা তরুণী 'প্রফুল্ল'র দিন কাটে কষ্টের মধ্যে দিয়ে। সম্ভবত রূপের জন্যেই জমিদার হরবল্লভ তাঁর একমাত্র পুত্র ব্রজেশ্বরের সঙ্গে 'প্রফুল্ল'র বিবাহ দেন। কিন্তু বরযাত্রীদের মনমতো খাওয়াতে না পারার জন্যে গ্রামের ব্রাহ্মণরা রাগ করে বিবাহ-বাসর ছেড়ে চলে যায়। তারা প্রফুল্লর মায়ের নামে 'কুলটা'র অপবাদ আনে এবং প্রফুল্লকে বাগদীর মেয়ে হিসাবে পরিচয় দিয়ে যায়। গ্রামবাসীদের কথা বিশ্বাস করে জমিদার হরবল্লভ প্রফুল্লকে পরিত্যাগ করেন। এবং ব্রজেশ্বরের আবার বিবাহ দেন। দারিদ্র্যের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে পাঁচ বছর পরে প্রফুল্ল মাকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ীতে আসে তার অধিকার আদায় করে নিতে। হরবল্লভ 'বাগদী মেয়ে'কে পুত্রবধূ হলেও আর আশ্রয় দিতে রাজী নন, প্রয়োজন হলে চুরি ডাকাতি ভিক্ষা করে জীবন নির্বাহ করতে উপদেশ দেন প্রফুল্লকে। শাশুড়ীর অনুরোধে সে রাত্রের মতো প্রফুল্ল থেকে যায়, ব্রজেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার আশায়। তার সতীন 'সাগরের' সাহায্যেই ব্রজেশ্বরের সঙ্গে রাত্রি কাটানোর সুযোগ পায় সে। স্বামীর কাছ থেকে স্বীকৃতি

শেষে শ্বশুরের আদেশে তাকে ফিরে আসতে হয় গ্রামে। ফিরে এসে দেখে তার মা মারা গেছেন। এর পর প্রফুল্লর একাকীত্বের সুযোগ নিয়ে কুচক্রী সুবল দত্ত তাকে অপহরণ করে পথে ডাকাতের ভয়ে ফেলে পালায়। প্রফুল্ল গহন বনের মধ্যে এক ভাঙা বাড়িতে জনৈক মুমূর্ষু বৈষ্ণবকে জল দিয়ে তার প্রতিদানে তাঁর কাছ থেকে কুড়ি ঘড়া মোহরের গুপ্তধন উপহার পায়। মোহর ভাঙিয়ে জিনিস-পত্র কিনতে গিয়ে প্রফুল্ল ভবানী পাঠকের সাক্ষাৎ পায়। তিনি 'প্রফুল্ল'কে 'দেশব্রতে' দীক্ষা দেন। শিক্ষাদীক্ষা শেষ করে কৃতিত্ব অর্জন করবার জন্যে প্রফুল্লকে ভবানী পাঠক 'দেবী চৌধুরাণী' উপাধি দেন। ভক্তরা ও প্রজারা তাঁকে 'মা' বলে ডাকত। ইংরেজদের অত্যাচার দমন করবার জন্যে ভবানী পাঠকের অন্যতম শিষ্য রঙ্গরাজ ও অন্যান্য ডাকাতরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে 'দেবী'র নেতৃত্বে ইংরেজ-দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পরে একদিন যখন হরবল্লভবাবু পুরস্কারের লোভে দেবীকে ধরিয়ে দেবার জন্যে ইংরেজ কুঠিয়ালদের নিয়ে 'দেবী'র বজরা আক্রমণ করলেন তখন দেবী তার গুরু ভবানী পাঠকের কথা না মেনে 'শাদা পতাকা' দেখিয়ে আত্মসমর্পণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আসলে কিন্তু কৌশলে ইংরেজ কুঠিয়ালদের বন্দী করবার জন্যেই এক নতুন চাল চেলেছিলেন দেবী। এই চালে ইংরেজদের বন্দী করলেও ব্রজেশ্বরের প্রেমের বন্ধনকে অস্বীকার করতে না পেরে আবার নতুন করে স্বামীর ঘরেই ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন দেবী। এর পর তাঁর জীবন শুরু হল আবার প্রফুল্ল হিসাবে।

পূর্ববর্তী ছবির অভিনয়ের সঙ্গে কোন তুলনা না করেও বলা চলে 'দেবী চৌধুরাণী'র ভূমিকায় শ্রীমতী সুচিত্রা সেন অপূর্ব অভিনয় করেছেন। ব্রজেশ্বরের ভূমিকায় রণজিৎ মল্লিক চরিত্রানুগ অভিনয় করেছেন। ভবানী পাঠকের ভূমিকায় বসন্ত চৌধুরী এবং সাগরের ভূমিকায় সুমিত্রা মুখার্জির অভিনয়ও বলিষ্ঠ। রঙ্গরাজ-এর ভূমিকায় এ ছবিতে খুব সুন্দর অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় হরিধন বন্দ্যো-পাধ্যায়, ছায়া দেবী, পদ্মা দেবী, নীলিমা দাস, মঞ্জু ভট্টাচার্য, গীতা নাগ, কাজল গুপ্ত চিত্রনাট্যের দাবী মিটিয়ে-ছেন। সঙ্গীত পরিচালনায় মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। আলোকচিত্রগ্রহণ এবং অন্যান্য কলাকৌশলের কাজ পরিচ্ছন্ন। দীনেন গুপ্তর পরিচালনা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

চিত্রদূত।

নন্দিতা বসু

: শুরু থেকেই শুরু করি, কি বলেন! বাংলা ছবিতে কাজ করতে করতে হঠাৎ ম্যাড্রাস গেলেন কেন ম্যাডাম?

— হঠাৎ ঠিক যাইনি। আমার হাজব্যাণ্ডের সরকারী চাকরী তো, উনি বদলী হলেন ম্যাড্রাসে, আমাকেও তাই যেতে হলো।

: ওখানে গিয়ে ছবিও তো অনেক করেছেন শুনেছি—এ ব্যাপারটা ঘটলো কি করে?

—এটাকে আপনি যোগাযোগ বলতে পারেন। কলকাতার সিনে অ্যাডভান্স কাগজে একজন দক্ষিণ ভারতীয় প্রযোজক নতুন নায়িকার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। এখান থেকেই ঐ কাগজের ম্যাড্রাসের প্রতিনিধি মিঃ সুব্রাহ্মনিয়মকে আমার নাম জানানো হয়েছিল। সেইমত তাঁরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। প্রথমটায় তো আমি অবাকই হয়েছিলাম। মালয়ালাম ছবিতে আমি অভিনয় করবো কি করে? মালয়ালাম ভাষার 'অ'ও জানি না। প্রযোজক ভদ্রলোক কিন্তু আমায় ভীষণ পছন্দ করে ফেলেছেন। ওঁর চোখে আমার অ্যাপিয়ারেন্সে নাকি দারুণ বাঙালীয়ানার ছাপ আছে। ছবির চরিত্রটাও এমন একটা চেহারা চায়। সুতরাং তিনি কিছুতেই ছাড়বেন না। ভাষার অসুবিধের কথা বলতেই বললেন—'ও ব্যাপারে আপনাকে কিসছু ভাবতে হবে না। ডাবিং করে নেব সব। আপনি শুধু ডায়ালগগুলো কোনরকমে উচ্চারণ করে অভিনয় করে যাবেন।' এরকম একটা অ্যাসওরেন্স পেয়ে আমি রাজী হয়েছি।

এ প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলছি আপনাকে। মালয়ালাম চিত্রজগতের সবচাইতে জনপ্রিয় যে অভিনেত্রী, যিনি ছ-ছবার উর্বশী পুরস্কার পেয়েছেন সেই সারদা-ই এখনও ডাবিং করে কাজ করেন। অন্ধ্রের মেয়ে তিনি। যাইহোক, এখন অবশ্য ভাষাটা মোটামুটি রপ্ত করে নিয়েছি।

: সাউথে আপনার প্রথম ছবি কি?

—'পানিতি রাত্ত ভেড়ু' (অসমাপ্ত বাড়ী)। পরিচালক ছিলেন সেতু মাধবন। এ ছবিটি কেরালা রাজ্য সরকারের পুরস্কার পেয়েছে, রাষ্ট্রপতি পুরস্কারও পেয়েছে এই ছবি।

: 'পানিতি রাত্ত ভেড়ু' ছবি দিয়েই কি তাহলে আপনার অভিনয়-সাফল্যের শুরু বলতে পারি?

—হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। তবে গত বছরের 'স্বপ্নম' ছবিখানা আমাকে ফিল্মফেয়ার পুরস্কার এনে দিয়েছে। এ ছবিটাও আমার অভিনয়জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য ছবি।

: এ পর্যন্ত দক্ষিণে ক'খানা ছবি করেছেন, যদি নামগুলো বলেন কাইণ্ডলি?

— খান দশেক ছবি করেছি, হাতেও আছে এখন প্রায় চার/পাঁচখানা ছবি। নামগুলো কিন্তু খ খটোমটো শোনাবে। 'ধর্মাধ্বম', ...নুন্দে নায়ট্টল', 'এণ্ডে ভারদম', ...গন বন্ধুলংগল'। 'চঞ্চলা', 'চেন্ডা' ...র আগে যে দুটো ছবির নাম করলুম 'পানিতি রাত্ত ভেড়ু' ও 'স্বপ্নম' — এসবগুলোই মালায়ালাম। তামিল-তেলেগু ছবি দুটো হচ্ছে 'দাহম' ও 'আল্লুরি সীতারাম রাজু'।

: হিন্দীতে কোনো কাজ করেন নি কেন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হিন্দীতে করেছি তো! 'অ্যায়সা ভি হোতা হ্যায়' নামে একটা ছবি করেছি। আরও দু/তিনটের কথাবার্তা চলছে।

: এতগুলো মালয়ালাম ছবিতে অভিনয় তো করলেন, ছবি ও ছবির চরিত্রগুলো আপনার কেমন লেগেছে?

— মালয়ালাম ছবি সম্পর্কে একটা কথা বলি কয় বাংলা ছবির সঙ্গে ওদের এক জায়গায় মিল আছে। রিয়্যালিটিকে নিয়ে ওরা ছবি করেন সামাজিক ও বাস্তবজীবন ওঁদের বেশীর ভাগ ছবির বিষয়বস্তু। ফলে হয়াকি ছবির চরিত্রগুলোও জীবন্ত হয়, ন্যাচারল হয়। অভিনয়-ধারাতেও বাংলার সঙ্গে খুব বেশী মিল আছে। যে কারণে আমার খুব একটা অসুবিধে হয়নি। ছবিগুলো এত বেশী বাস্তব হয় যে সংলাপও

থাকে খুব কম, অভিনয় দিয়েই বোঝাতে হয় সবটা। সেজন্যই বোধহয় ভাল্লাগাছে মালয়ালাম ছবিতে কাজ করতে। ডাবিং করে করলেও চরিত্রগুলো বড় ইন্টারেস্টিং, উদ্ভট নয়।

ম্যাড্রাস ছেড়ে আবার কলকাতায় এলেন কাজ করতে, কি ব্যাপার?

এটাও যোগাযোগের ফল বলতে পারেন। গত বছর মেয়ের স্কুলের ছুটিতে একদিন স্যুটিং দেখতে এসেছি স্টুডিওতে। পরিচালক দিলীপ মুখার্জি (যাত্রিক) নাকি 'নগর দর্পণে'র জন্য আমাকেই খুঁজছিলেন। আমাকে হাতের কাছে পেয়ে আর ছাড়তে চাইলেন না। আর আমারও প্রচন্ড ইচ্ছে ছিল বাংলা ছবিতে কাজ করার। মাতৃ-ভাষায় ছবি করতে কার না ইচ্ছে করে বলুন! আমিও সুযোগের অপব্যবহার করিনি। তারপর 'নগরদর্পণ' শেষ হতে না হতেই দিলীপবাবুর পরবর্তী ছবি 'মোমবাতি'র জন্যও তিনি আমাকে বললেন। এখনতো 'রং নাম্বার'-এর সেটে বসে কথাই বলছি বলা বাহুল্য এ ছবিরও নায়িকা আমি।

কলকাতার চাইতে দক্ষিণে আপনার জনপ্রিয়তা অনেক বেশী এবং কাজও করেছেন বেশী, তাই প্রশ্নগুলো আমার দক্ষিণকে কেন্দ্র করেই হচ্ছে বেশী। আচ্ছা, আপনি ওখানে কি ধরনের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছেন?

প্রতিযোগিতা কোথায় নেই? সব জায়গাতেই কম্পিটিশন। মালয়ালাম ছবিতে নায়িকা বলতে আছেন জয়া ভারতী সারদা, আর আমি। সুতরাং কম্পিটিশন আমাদের তিনজনের মধ্যেই। তবে কোনো নোংরামি নেই—এটুকু বলতে পারি।

আপনাদের পারস্পরিক রিলেশন কি রকম?

একসঙ্গে কাজ করতে গেলে রিলেশন খারাপ হলে চলে কি? রিলেশন ভালোই। জয়া ভারতীর সঙ্গে আমি ছবিও করেছি। সারদার সঙ্গে এখনও সুযোগ আসেনি। অনেকে বলেন, সারদার সঙ্গে ফিচারে নাকি আমার খুব মিল আছে। একবার স্টুডিওতে সারদার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। খুবই নর্ম্যাল ছিল ব্যাপারটা। কিন্তু জয়া ভারতী অত্যন্ত উচ্ছল মেজাজী মহিলা।

ওখানে জনপ্রিয়তার বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়েছে কখনো?

বিড়ম্বনা ব্যাপারটা, সত্যি বলতে কি, ওখানে নেই। ফ্যানরা আমাদের ভালো-বাসেন, শ্রদ্ধা করেন, চোখের দেখা দেখার জন্য আকুলি-বিকুলি করেন, কিন্তু অধৈর্য হয়ে পড়েন না কখনো। একবার গেছি কি ত্রিবান্দ্রমে আমি গেছি একটা

দোকানের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে। তখন ওখানে আমার দুখানা ছবিও চলছে। যেমনি দর্শকরা জানতে পেরেছেন আমি ঐ দোকানে আছি অমনি দলে দলে লোক এসে হাজির। আমাকে তাঁরা দেখবেন। বাইরে তখন প্রচন্ড বৃষ্টি। আমায় না দেখে তাঁরা যাবেন না। ভিজেও তাঁরা অপেক্ষা করছেন। সুতরাং আমাকে দেখা দিতেই হোল। ব্যালকনিতে এসে সবাইকে আমার নমস্কার জানাতে তাঁরা সবাই চলে গেলেন। কোথাও কখনও কটুকাটব্য বা মন্তব্য কিছু শুনিনি। এটাই ভালো লাগে।

: কলকাতা - ম্যাড্রাস — কোন শহরটা আপনার ভালো লাগছে, আর কেনইবা লাগছে?

— ভালো-মন্দ লাগা ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে মানসিক অবস্থার ওপর। আমার তো দুটো শহরই ভালো লাগে। প্রথমটায় যখন ম্যাড্রাস গিয়েছিলাম, বেশীর ভাগ সময়ই একা থাকতাম। বাড়ীটাও একবারে সমুদ্রের ধারে। আস্তে আস্তে সয়ে গেছে ব্যাপারটা। আমার মনে হয় সবার ক্ষেত্রেই এ ব্যাপারটা ঘটে। তবে কিনা কলকাতায় সব আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব রয়েছে, মনটা অনেক সময় এখানেই পড়ে থাকে।

: কয়েক বছর বাদে তো কলকাতায় এলেন। কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ছে কি?

—পরিবর্তন তো হয়েছেই। আপনারা তো কলকাতায় সবসময়ই আছেন পরিবর্তন আপনার চোখে লাগছে না? আমার চোখে তো আরও বেশী লাগছে। জীবন এখন আরও জটিল হয়েছে, যান্ত্রিক হয়ে গেছে, সমস্যা বেড়েছে প্রচুর।

: অভিনয় করছেন বলেই শুধু নয় দক্ষিণের বাসিন্দা হিসাবে ওখানকার মানুষগুলোর বিশেষ কোন গুণটা আপনার মন কেড়েছে?

— ওঁদের ধর্মবিশ্বাস ও আর নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি ওঁদের আন্তরিক নিষ্ঠা। সাউথ ইন্ডিয়ানদের ধর্ম-বিশ্বাসকে অনেকে গোঁড়ামির পর্যায়েও ফেলতে পারেন। কোনো জায়গায় মন্দির বা দেবতা মাহাত্মার কথা শুনলেই ওঁরা প্রণাম করতে শুরু করেন। আমরা, বাঙালীরা মুক্তি বুদ্ধি দিয়ে কাণিকের জন্যও অন্তত ভাবি। ওঁদের সে ব্যাপারটা নেই। এরকম বিশ্বাস থাকাটা আমার তো মনে হয় খারাপ নয়। আর নিজেদের সংস্কৃতিকে যে কতখানি ওঁরা ভালোবাসেন তা ওঁদের ছবি দেখলে কিছুটা আন্দাজ করতে পারবেন। পোশাক-আশাক, ভাষা, চালচলন সব-দিক থেকে নিজেদের বৈশিষ্ট্য আর ঐতিহ্যকে ওঁরা তুলে ধরতে চান। দুঃখের কথা আমরা বাঙালীরা আজ বোধহয় সেই নিষ্ঠার অভাবে পেছনে পড়ে থাকছি।

: সাউথ ইন্ডিয়ানদের রান্নাবান্নায় তো টক আর ঝালের পরিমাণটা বেশী। অসুবিধে হয় না খেতে? ওঁদের কোন খাবারটা আপনার খুব পছন্দ?

— রসম চাটনী দিয়ে ধোসাটা খেতে তো খারাপ লাগে না। ভালোই তো! তবে বাড়ীতে কি আর সবসময় সাউথ ইন্ডিয়ান খানা খাই। সেখানে ভাত মাছই খাই। স্যুটিংয়ের সময় মাঝে মধ্যে বাড়ী থেকে খাবার আসে। বাইরে স্যুটিং করতে গেলে ইউনিটের সকলকে এক-সঙ্গে বসে খেতে হবে। এবং খাবারও সবার এক। এটা ওখানকার নিয়ম। কারও জন্য আলাদা খাবার বিশেষ কোনো হোটেল থেকে আসে না। তখন সকলের সঙ্গে বসেই খাই। অসুবিধে কি?

: আপনার স্বামী তো শুনেছি সরকারী অফিসার। আপনার অভিনয় করার ব্যাপারে তাঁর দান বা সহযোগিতা কতটুকু?

— তিনি ঘোর সংসারী মানুষ হলেও আমার অভিনয় করাকে কখনই খাটো চোখে দেখেন না। বরং আমাকে ইনস্পায়ার করেন। মালায়ালাম ছবিতে কাজ করার ব্যাপারে তিনিই আমাকে সবচাইতে বেশী উৎসাহ দিয়েছেন। বাংলা ছবিতে কাজ করছি—করব— এটা তো তিনি সব সময়ই চান।

: বিবাহিত জীবনের আনন্দ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আপনি কিছু বলতে চান কি?

— না, ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কখনই কিছু আলোচনা আমি করিনি করতে চাইও না। অভিনয় করছি—করব—এটাই প্রথম এবং শেষ কথা।

—নির্মল ধর

মিঠুকে একদম গাইয়াঁ দেখাচ্ছে। মিঠু, মিঠু মুখার্জী, উনিশ কিম্বা কুড়ি, ডাগর ডাগর দুটি চোখ, বাংলা ছবির উঠতি নায়িকা আপনার সামনে, ঠিক এখনই ইন্দ্রপুরী স্টুডিও-র মেক-আপ রুমে। ফ্লোর থেকে ডাক পড়েছে, তাড়াতাড়ি... তাড়াতাড়ি। কিন্তু তাড়াতাড়ি কি করে হবে—চুল নিয়ে নাজেহাল, বেচারী! পার্ক স্ট্রীটের নামী দোকানের দামী হেয়ার-ড্রায় এই গরমে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে চাইছে। দূর বাবা আর পারি না। এই বলে মিঠু চুলগুলো গোছাবার চেষ্টা করল। উঁহু ঠিক হচ্ছে না। ছুটে এলেন মেক-আপম্যান আরে করেন কি, করেন কি—গ্রামের মেয়ে আপনি, শ্যাম্পু করা বোঝা গেলে আমি তো মারা যাব ম্যাডাম। চুল থাকবে পরিপাটি তেল চপচপে, মা লক্ষ্মীদের যেমন থাকে। মিঠু এই শুনে হেসেই কুটিপাটি পেশ মলেছেন। মা-লক্ষ্মীদের যেমন থাকে। কথা তো অনেক হল এখন কি হবে। চুল যে কিছুতেই বাগ মানে না।' হচ্ছে হচ্ছে আপনি একটু স্থির হয়ে বসুন তো। ওদিকে যে পরিচালক মশায় অধৈর্য হয়ে উঠছেন। ...সত্যি তো...এই দেখুন একেবারে স্থির। একটুও নড়ছি না।...চুল ঠিক হতে হতে মিঠু চুপচাপ চরিত্রের মধ্যে চলে গেল। ব্যাস্ সঙ্গে সঙ্গে অন্যমনস্ক। কেউ কথা বললে উত্তর দেয় না, শুধু সিনেমার হাসি হাসে। ফ্লোরে পা দিয়ে পরিচালকের কাছে চলে গেল সোজা। একমনে শুনে নিল তাকে কি কি করতে হবে। এল শুটিং জোন-এ। মালক্ষ্মীই বটে। রাজাবাবু সশরীরে এসেছিলেন চন্ডীর বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে, এসে দর্শন করলেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী প্রতিমা। চটপট বুদ্ধি খেলে গেল তাঁর মাথায়। শাস্তি চরম শাস্তি দিতে হবে। করালী কবিরাজ ভয়ে তটস্থ। তার পরে রাজবাবুর আগমন। বাঁদর মেয়েটার জন্যে। শাস্তি নিশ্চয়ই নিতে হবে, মাথা পেতে নিতে হবে। কবিরাজ মশায়ের জীর্ণ কুটিরে রাজাবাবুর অঙ্গীকার ঘোষিত হল—'আমি আপনার কন্যাকে বন্দী করে রাখতে চাই, সারা জীবন। আমি ওকে পুত্রবধূ করে আমার ঘরে নিয়ে যেতে চাই। রাজাবাবু মনে মনে বললেন, হ্যাঁ এই মেয়ে আমার চাই। অশান্ত পুত্রকে শায়েস্তা করবার জন্যে এই হচ্ছে উপযুক্ত মেয়ে।' কবিরাজ বিশ্বাস করতে চাইলেন না। কি করে করবেন! রাজাবাবুর পুত্রবধূ হবার যোগ্যতা কি তার মেয়ের আছে। বাঁদর মেয়ে! আজ এর বাগানের আম পেড়ে আনে, কাল ওর বাগানের। অন্যায় করলে নিজ হাতে শাস্তি দেয়। শিশুদের নিয়ে বেশীর ভাগ সময় মশগুল থাকে মাসে মাসে শিশুসভা করে। বাড়িতে থাকে না মোটেই। গেছো মেয়ে। ফলে প্রতিদিনই কবিরাজ মশায়কে নালিশ শুনতে হয়। নালিশ শুনতে শুনতে তাঁর কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। রাজাবাবু সমর অপচয় করেন না। তিনি মেয়েকে আশীর্বাদ করে রেখে চান। শাঁখের ফুঁ, উলুধ্বনি ইত্যাদি—মহাসমারোহে আশীর্বাদপর্ব শেষ হল। দৃশ্যও এখানে শেষ। এইবার বলি শুনুন ছবির নাম হচ্ছে 'স্বয়ংসিদ্ধা' পরিচালনা করছেন সুশীল মুখোপাধ্যায়। স্মরণ থাকতে পারে এই নিয়ে ইতিপূর্বে একাধিকবার ছবি হয়েছে। সুতরাং পুনর্নির্মাণ বা রি-মেক বলাই শ্রেয়। প্রায় বিগত যুগে মানলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই রচনার চিত্ররূপ দান করেছিলেন নটশেখর নরেশ মিত্র। নায়িকা সেজেছিলেন দীপ্তি রায়; তাঁর অভিনয় আজো অনেকের স্মৃতিপটে অক্ষয় হয়ে আছে। নতুন 'স্বয়ংসিদ্ধা'র নায়ক রঞ্জিত মল্লিক এবং খল নায়ক অভিজিৎ সেন—বম্বের অভিনেতা অসিত সেনের পুত্র এবং পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ডিপ্লোমা হোল্ডার। সেসময় নায়ক চরিত্রে রূপদান করেছিলেন গুরুদাস এবং খল নায়ক শিবশঙ্কর। ভাগ্যের কি অদ্ভুত পরিহাস সেই গুরুদাস নতুন স্বয়ংসিদ্ধাতে আছেন পার্শ্বচরিত্রে। তিনি এই পর্যায়ের শুটিং-এ অংশ নিলেন। আর অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে করালী কবিরাজের ভূমিকায় কালী ব্যানার্জী রাজাবাবুর ভূমিকায় সত্য ব্যানার্জী ছায়া দেবী, রসরাজ চক্রবর্তী ভানু ব্যানার্জীকে প্রভৃতিকে দেখা গেল। চিত্রগ্রহণ করছেন কানাই দে। শিল্প নির্দেশনায় আছেন প্রসাদ মিত্র।

অবসরে পরিচালকের সঙ্গে কথা হল। তিনি জানালেন আগের স্বয়ংসিদ্ধা-এর সঙ্গে এই ছবির অমিল সামান্যই। শুরু এবং শেষটা নতুনভাবে ভাবা হয়েছে। শুরুতে দেখানো হচ্ছে মেয়েটা দুর্দান্ত। তার কার্যকলাপ রীতিমত রোমাঞ্চকর। এক কথায় ডানপিটে মেয়ে। কিন্তু চোখের সামনে অন্যায় হচ্ছে সহ্য করে না। রুখে দাঁড়ায়। এই তার স্বভাব। বিয়ের পর মেয়েটির পরিবর্তন দেখানো হচ্ছে। পরিবর্তন হচ্ছে ধীরে ধীরে। শেষে সে তার নিজস্ব মূর্তি ধারণ করছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে। ক্লাইম্যাক্স দৃশ্যে কিডন্যাপিং, ফাইটিং—বম্বের ছবিতে যেমন থাকে। আশুতোষ দর্শকদের মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের জীবন এবং জীবিকার কথা ভেবে এই ছবি তৈরী করতে এগিয়ে এসেছি আমি। চিত্রনাট্য রচনা করে আমাকে সাহায্য করেছেন শ্যামল গুপ্ত।

চিত্রাঞ্জলি প্রযোজিত এই ছবির সংগীত পরিচালক নচিকেতা ঘোষ।

●

একটা পিস্তল। তার ওপর হাত রাখলেন দিলীপ রায় এবং সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়। দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে থাকলেন অনুক্ষণ। নীরব কয়েকটি মুহূর্ত এখানে অবশ্য চোখের ভাষাই প্রধান। সায়লেন্ট শট টেক করলেন পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, 'অগ্নিশ্বর' ছবির

অগ্নিশ্বর / দিলীপ রায় ও সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়। পরিচালনা : অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়
ফটো : অমৃত

জন্য। স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপরেটিভ-এর বিরাট ফ্লোর জুড়ে তৎকালীন কলকাতার ফিরিঙ্গিপাড়া, বর্ণনা করলেন অন্যতম প্রযোজক উদয় সামন্ত। এখানে সমাজের অধঃপতিত মানুষদের বাস। আমার প্রশ্ন, এখানে রায়বাহাদুরের মেয়ে সুছন্দা কেন আসে? উদয় বললেন : আপনার স্মরণে আছে নিশ্চয়ই, কিছুদিন আগে নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওতে সেট পড়েছিল তখন দেখেছিলেন সুছন্দা ডাক্তার অগ্নিশ্বরের কাছে এসে রবীন্দ্রনাথের ঘরে-বাইরে বইটা রেখে গেল। বইটা পড়ে তার মনে ঝড় উঠেছিল বোঝা গেল অনেক পরে যখন সে তার নাম যুক্ত করেছে কোনো রাজনৈতিক দলের সংগে। মুক্তিকামী রাজনৈতিক দল। স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে তারা। লড়াই করতে করতে সর্বস্বান্ত হয়েছে। এদের মধ্যে সুছন্দা একজন। সে নিজেকে নিঃশেষ করেছিল দেশের সেবায়। দলের জন্য সে বিশৃংখল জীবনযাপন শুরু করেছিল। অবৈধ জীবন...। মৃত্যু বরণ করেছিল ডাক্তার অগ্নিশ্বরের কাছে এসে। অসুস্থ অবস্থায় সুছন্দা ডাক্তারের কাছে একটা টিনের বাক্স রেখে বলে প্রয়োজন হলে খুলে দেখতে পারেন। এটা আপনার কাছেই রেখে দেবেন। কিছুদিনের মধ্যে খগেন নামে এক যুবক আসবে, নিয়ে যাবে বাকসটা। সুছন্দার মৃত্যুর পর ডাক্তার খুলে দেখেননি। খগেন এলো একদিন বাকসটা নিয়ে যেতে। তখনই খোলা হল। অগোছালো কিছু জিনিসপত্র। তার মধ্যে একটা পিস্তল, একটা ছবি ডাক্তার অগ্নিশ্বরেরই আঁকা। একটি মেয়ে—হাত দুটি বাঁধা। অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত তার মুখ। খগেন পিস্তলটা তুলে ধরে। মনে পড়ে সেদিনের কথা। পিস্তলের 'পরে হাত রেখে শপথ করেছিলো সে আর সুছন্দা। দুজনে দুজনের দিকে চেয়েছিল অনুক্ষণ। নীরব কয়েকটি মুহূর্ত...

বনফুলের এই মর্মস্পর্শী কাহিনী, চিত্রনাট্য এবং দেওয়া পরিচালক স্বয়ং। নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন উত্তমকুমার। অন্যান্য চরিত্রের শিল্পী : মাধবী মুখোপাধ্যায়, অসীমকুমার, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, অসিতবরণ এবং পার্থ মুখোপাধ্যায়। চিত্রশিল্পী বিজয় ঘোষ। শিল্প নির্দেশক : সুনীতি মিত্র। সঙ্গীত পরিচালক : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত : রচয়িতা—রবীন্দ্রনাথ এবং অতুল প্রসাদ।

—স্টুডিও সংবাদদাতা

স্টুডিও সংবাদ

...দিন পর এই দৃশ্য দেখা গেল। ...র পাঁচটি স্টুডিওই কর্মচঞ্চল। ...ও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ-এ 'রং...' ছবির চতুর্থ পর্যায়ের শুটিং ...। ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনালের ছবি।

স্বয়ংসিদ্ধা

রঞ্জিত মল্লিক / মিঠু মুখার্জি

পরিচালনা : সুশীল মল্লিক। ফটো : অমৃত

প্রেমের গল্প, কাহিনীকার এবং পরিচালক নবাগত অমল রায় ঘটক। চিত্রনাট্যকার : অঞ্জন মুখোপাধ্যায়। এই পর্যায়ের দৃশ্যগ্রহণে দেখা গেল একটি আধুনিক রেস্তরাঁ। শিল্প নির্দেশক সূর্য চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে প্রায় নিখুঁত নির্মিত। এই সেটে ছবির বিশেষ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য গৃহীত হল। গ্রহণ করলেন আলোকচিত্রশিল্পী দীপক দাস। অভিনয় অংশ গ্রহণ করলেন : সমিত ভঞ্জ, নন্দিতা বসু, কালী ব্যানার্জী, হারাধন ব্যানার্জী, মলিনা দেবী এবং নবাগত নন্দী চৌধুরী। ইতিমধ্যে ছবির সিকস্টি পার্সেন্ট শুভার। পরবর্তী পর্যায় এ মাসেই। গান পিকচারাইজ করা হবে। দিলীপ ভট্টাচার্যের সুরে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং মান্না দের গাওয়া দুটি গান।

নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওতে 'সেই চোখ'। কাহিনীকার চিত্রনাট্যকার এবং পরিচালক সলিল দত্ত। এখানেও প্রধান চরিত্রের শিল্পী উত্তমকুমার। কিন্তু সেটে অনুপস্থিত। এখন তাঁর অংশ গ্রহণ নেই। এখন এখানে আছেন বাসবী নন্দী, মহুয়া রায়চৌধুরী, অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, শেখর মুখোপাধ্যায়, তরুণকুমার, শিউলি মুখোপাধ্যায় সোমা মুখোপাধ্যায়, শ্রাবণী বসু এবং সুলতা চৌধুরী—ছবির অন্যান্য চরিত্রের শিল্পীরা। চিত্রগ্রাহক : বিজয় ঘোষ। এই পর্যায়ে গানও পিকচারাইজ করা হচ্ছে। নচিকেতা ঘোষ সুরারোপিত মান্না দে'র গাওয়া গান।

ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে তরুণ পরিচালক অমিতাভ মিত্র 'সংসার সীমান্তে' ছবির শুটিং করছেন। প্রযোজনা করছেন শ্রীমতী রুণু রাহা। এ ছবির প্রধান দুটি চরিত্রের শিল্পী : দেবরাজ রায় এবং রাজশ্রী বসু। অন্যান্য চরিত্রে আছেন : উৎপল দত্ত, বিকাশ রায়, গীতা দে প্রভৃতি। চিত্রশিল্পী : সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়। শিল্প নির্দেশক : বিজয় বসু। সঙ্গীত পরিচালক : পি এন সাহা।

বোম্বাই ফিল্মের কড়চা

কেটি মিরজা নামে একটি পার্শী মেয়ে বম্বেতে দারুণ হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছে। এসেছে সদ্য লন্ডন থেকে। এতদিন মডেলিং করেছে। প্লে-বয় পত্রিকায় ওর ন্যুড ছবি ছাপা হয়েছে। আপনাদের নিশ্চয়ই জানা আছে প্লে-বয় সারা পৃথিবী থেকে জোগাড় করা সুন্দরী মেয়েদের ন্যুড ছবি ছেপে ব্যবসা চালায়। কেটি ওদেরই কালেকশন। ওখানে কাজ শেষ করে সে ভারতে এসেছে সিনেমায় নামবে, এই অভিপ্রায়ে। হিন্দি জানে, তাই সে সোজা বম্বেতে এসে উঠেছে। এসেই বম্বের বাজারে কয়েকটা সিনেমা পত্রিকায় বুক খোলা, উরু দেখানো প্রায় ন্যুড ছবি ছাপিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ফলে বম্বের অনেক প্রযোজক লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। কেউ অফার দিয়েছেন এক সঙ্গে চারখানা ছবি কেউ বা একসক্লুসিভ কন্ট্রাক্ট। কেটি এখনও কোনো ডিসিশানে আসতে পারে নি। ইতিমধ্যে হঠাৎ তার মাথায় ঢুকেছে সতী সাবিত্রী মার্কা ভারতীয় নারী সাজতে হবে। সে রকম রোল চাইছে। প্রযোজকরা ভাবতেই পারছেন না। বিন্দু কিম্বা অরিয়ালের সাবস্টিটিউট ভাবা যায়—জিনত কিম্বা পারভিনের নয়। কেটিকে কে বোঝাবে একথা। তার ধারণা কাপড় চোপড় খোলা অবস্থায় তাকে ভালো দেখাবে না কারণ ফিগার তত ভাল নয়। এই কথা শুনে রাজকাপুর মন্তব্য করেছেন : 'ফিগারটা কেটির কাছে কোনো ফ্যাক্টরই নয়। ওসব পরোয়া করে না ও। টাকা রোজগারের জন্য কি না করতে পারে।' প্রসংগত জানাই লন্ডনে রাজের সংগে কেটির আলাপ এবং দহরম মহরম। কেটি বলে : তখন রাজের কাছে আমি খুব ভাল মেয়ে, লক্ষ্মী মেয়ে—এখন খারাপ মেয়েছেলে।

রেখা একই সংগে দুজনের সংগে সমান তালে প্রেম চালিয়ে যাচ্ছে। ওর চক্করে পড়েছে দুই পুরুষ সিংহ—বিনোদ মেহ্‌রা এবং কিরণকুমার। দুজনেই লড়ে যাচ্ছে রেখার জন্য। রেখা মাঝে মাঝে বিনোদের পর বেশী ঝুঁকছে। বিনোদও তার জন্য কম ঝুঁকি নিচ্ছে না : সে স্টুডিও থেকে শুটিং করতে করতে মাঝে মাঝেই পালাচ্ছে অন্য স্টুডিওতে যেখানে রেখা শুটিং করছে। একদিন রেখা ওর সংগে খুব খারাপ ব্যবহার করে বিনোদ চার-পাঁচ বার চেষ্টা করে দেখা পায় না। সম্প্রতি বদলা নিয়েছে বিনোদ। সে আচ্ছা করে টাইট করেছে রেখাকে। মোহন স্টুডিওতে ছবির শুটিং করছিল বিনোদ। কাছেই নটরাজ স্টুডিওতে রেখার শুটিং হচ্ছিল। রেখা চার পাঁচ বার এলো, বিনোদ দেখা করলো না।

আই এস জোহর-এর মেয়ে অম্বিকা জোহর বিখ্যাত হবার জন্য বাড়ি ছেড়ে ফ্ল্যাট ভাড়া করে আছে। প্রচার করেছে বাবা-মা বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে কেননা ইনানীং সে একটু বেশী নেশা করছে। বেশী রাত হচ্ছিল বাড়ি ফিরতে। তাই স্বাধীন জীবন যাপন করতে সে বাড়ি ছেড়ে এসেছে। ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। দেখা যাচ্ছে অম্বিকা, বিখ্যাত হবার কায়দা-কানুন রপ্ত করে ফেলেছে। সেটা আরো স্পষ্ট হবে আই এস জোহরের ফাইভ রাইফলস ছবিতে।

অশোককুমারের মেয়ে ভারতী প্রত্যাগত প্রীতি গাঙ্গুলী বম্বেতে বর্তমানে দাপটের সংগে অভিনয় করছে এবং প্রেমও করছে। সে ভিলেন চরিত্রে অভিনয় করছে। প্রেম করছে দিল্লীর এক চরিত্রবান যুবকের সঙ্গে।

—অভিজিত

যে যেখানে দাঁড়িয়ে
দীপঙ্কর দে এবং কাবেরী বসু

বিদেশী ছবি

ক্যানাডার ছবি নিয়ে ইতিপূর্বের এক সংখ্যায় ভারতে অনুষ্ঠিত ফেস্টিভেলের ছবি-গুলি সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে জানিয়ে ছিলাম যে, উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছবির কাহিনী আগামীতে পাঠক পাঠিকাদের উপহার দেবো।

এই সংখ্যায় সেই সব উল্লেখযোগ্য ছবির কাহিনীর সারাংশ নিবেদন করছি। যার মধ্যে ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক মেজাজ লক্ষ্য করা যাবে।

ওয়েডিং ইন হোয়াইট

ছবিটিতে মূলত পারিবারিক পটভূমিতে তোলা এক সামাজিক বিপর্যয় বিধৃত হয়েছে। এর মূল সুরের সঙ্গে মানসিকতার দিক থেকে ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার কোথায় যেন একটা অদৃশ্য সূত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায় এবং আমাদের শরৎচন্দ্রের কাহিনীর যেন খুবই কাছাকাছি এর গল্পাংশ।

ওয়েডিং ইন হোয়াইট-এর গল্পের মূলে

বক্তব্য একটি কুমারী মেয়ের দুর্বল মুহূর্তের ভুলের ফলে তার জীবনে যে বিপর্যয় নেমে এলো এবং সমাজ ও লোকলজ্জার ভয়ে তাকে [illegible] হাতের ক্রীড়নক হতে হোল তাই নিয়ে।

মেয়েটির ভাই মিলিটারীতে কাজ করে। একদিনের ছুটিতে সেই ভাইয়ের সঙ্গে তার এক সৈনিক বন্ধুও বেড়াতে এলো তাদের বাড়িতে। সেখানেই ছেলেটির সঙ্গে মেয়েটির আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা এবং তারই মধ্যে এক দুর্বল মুহূর্তে মেয়েটি ছেলেটির কাছে দেহ দিল। ফলে কিছুকাল পরেই ধরা পড়ল যে মেয়ে [illegible]। [illegible] মেয়েটির মা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল আর তার পিতা রাগে উত্তেজনায় আর কিছু ভেবে না পেয়ে মেয়েকে ধরে প্রচন্ড প্রহার করল। কিন্তু সেটা তো বিপদ থেকে উদ্ধারের পথ নয়।

তখন ছেলেটিকেও ধরা সম্ভব নয়, কারণ সে তখন কোন্ প্রান্তে কোন্ রণাঙ্গনে। ফলে পরিবারের লোককে অন্য পন্থা ভাবতে হোল। ঠিক এমনি সময় তার পিতার এক বৃদ্ধ বন্ধু এগিয়ে এসে তাদের এই লজ্জাকর বিপদ থেকে উদ্ধারের নিমিত্ত মেয়েটিকে বিয়ে করতে রাজী হোল।

ছবিতে সৈনিক জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা সমাজের মাথাওলা ব্যক্তিদের সমাজ রক্ষার নামে লোভ পরিবারের সামাজিক মর্যাদা রাখার জন্য যে খেসারত দিতে হয় বাধ্যতামূলকভাবে তাই বলা হয়েছে। ঘটনার সময়কাল ১৯৪৩ সাল।

এই সমাজবেষ্টনীর হাত থেকে কি আমরা ভারতীয়রাই আজও নিষ্কৃতি পেয়েছি?

উ-টার্ন

জর্জ কাকজেন্ডারের ছবি 'উ-টার্ণ'ও একাধারে কৌতূহলোদ্দীপক ও আকর্ষণীয়।

এই ছবির নায়ক তরুণ আইনজীবী। সে খুঁজতে বেরিয়েছে এমন একটি মেয়েকে যার সঙ্গে চার বছর আগে এক ফেরীঘাটে তার দেখা হয়েছিল, এবং এক নজরেই তাকে [ভা]লবেসেছিল।

এই চার বছরে ছেলেটি বহু মেয়ের [সা]ন্নিধ্যে এসেছে কিন্তু কারুর মধ্যেই তার [ম]নের মানুষটিকে খুঁজে পায়নি। এইসব [মে]য়েরা তাকে তার সন্ধান দিতে পারেনি। [য]া মেয়েটি তাকে সত্যি সত্যি ভালবেসেছিল, [এ]বং বিয়ে করতে চেয়েছিল তাকেও নায়ক [অ]বহেলা করেছিল সেই চার বছর আগের [এক নজ]রের দেখা মেয়েটিকে ভুলতে না পারার [জন্য]।

[illegible] তরুণ আইনজীবী নায়ক অনেক বিচিত্র [অভি]জ্ঞতা এবং বিলম্বের পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত [illegible] তার ভাললাগা মেয়েটির সন্ধান পেল [illegible] সে একটি সন্তান নিয়ে বৈধব্য জীবন [যাপ]ন করছে এক ছোট্ট দ্বীপে।

সেই চার বছর আগের রোমান্টিক স্বপ্ন [illegible] যেত ছেলেটি মনে মনে খুবই নিরাশ [হল]ও এক সময় মেয়েটির সঙ্গে পুনরায় [ঘনিষ্ঠ] হোল। কিন্তু সেই স্বপ্নও স্থায়ী হোল না। একদিন তাই সে দ্বীপ ছেড়ে ফিরে চলল তার নিজের ঠিকানায় যেখানে একটি কুমারী মেয়ে তার পথ চেয়ে বসে আছে।

গল্পটা যেমন কাব্যমন্ডিত তেমনি হৃদয়স্পর্শী। মুগ্ধ হয়ে বসে দেখতে হয়।

—শা. র. চ

কলকাতা থেকে রজনীগন্ধা

'এক গোছা রজনীগন্ধা' ফুল বাংলাদেশে পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত কলকাতা থেকে বিমানে করে এ ফুল এনে 'সুরের বাঁধন' ছবির সুটিং নাকি সারতে হলো!

সত্যি, রজনীগন্ধার কি কপাল!

জানা গেছে, ঐ এক গোছা রজনীগন্ধা ফুলের জন্য উক্ত ছবির স্যুটিং বন্ধ ছিল। কিন্তু প্রশ্ন, বাংলাদেশের কোথাও কি রজনীগন্ধা ফুল নেই?

অথ সুচন্দা কথা

না, নিখোঁজ পরিচালক জহীর রায়হানের দ্বিতীয় অভিনেত্রী স্ত্রী সুচন্দা রায়হান অভিনয় ছাড়বেন না।

তিনি আবার নতুন করে অভিনয় শুরু করবেন বলে জানা গেছে।

কিছুদিন আগে এক ঘোষণায় সুচন্দা জানিয়েছিলেন, না, আর অভিনয় করব না।'

এবং এ ঘোষণার পর অনেক পরিচালক প্রযোজক চেষ্টা করেও নাকি তাঁকে দিয়ে আর নতুন কোন ছবিতে সই করাতে পারেননি।

কিন্তু অতি সম্প্রতি সুচন্দা আবার অভিনয়ের জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানা গেছে।

তিনি জানিয়েছেন, 'আমি আবার অভিনয়ে মনোযোগ দিচ্ছি।'

তিনি জানিয়েছেন এখন থেকে তিনি নাকি বেছে বেছে চরিত্র নেবেন এবং অভিনয় করবেন।

ভারতের চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলাদেশ

আগামী ডিসেম্বর মাসে ভারতে আন্তর্জাতিক 'স্বর্ণময়ূর' চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত অনুষ্ঠানে 'বাংলাদেশসহ অন্য অন্যান্য বহু দেশকে অংশ গ্রহণের জন্য আহবান জানানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, বাংলাদেশও উক্ত অনুষ্ঠানে অংশ নেবে।

কিন্তু প্রশ্ন, অতীতে ভারতে, তাসখন্দে ও মস্কোতে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্র উৎসবে' ছবি ও চলচ্চিত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে কর্তৃপক্ষ যে 'একচোখা' নীতি গ্রহণ করেছিল, এবারও কি তেমনটাই গ্রহণ করা হবে?

তেমনটা যেন না হয়, তাই বাংলাদেশ চলচ্চিত্র মহল কর্তৃপক্ষের কাছে আশা করছেন।

জহীর চৌধুরীর প্রত্যাবর্তন

বাংলাদেশে নির্মিত হাতে গোনা কয়েকটি ভাল ও পরিচ্ছন্ন ছবির একটির নাম 'পরশমণি'।

আজ থেকে ছ' বছর আগে জহির চৌধুরী পরিচালিত 'পরশমণি' বাংলাদেশের সুস্থ চলচ্চিত্র দর্শকদের মুগ্ধ ও বিস্মিত এবং আশাবাদী করে তুললেও দীর্ঘ ছ' বছর জহির চৌধুরী দ্বিতীয় কোন ছবি পরিচালনার সুযোগ পাননি। সম্প্রতি, তিনি দীর্ঘ ছ' বছর পর 'আশীর্বাদ' নিয়ে দর্শকদের সামনে আসছেন।

অন্তরাল
ইকবাল / ববিতা

'পরশমণি' যেহেতু একটি পরিচ্ছন্ন ও একটি বলিষ্ঠ বক্তব্যের ছবি, সেহেতু ছবিটির প্রশংসা করলেও ছবিটি 'আর্থিক সফলতা' অর্জনে দারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছিল।

...লাফল, জহীর চৌধুরীর দীর্ঘ দু' বছর চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকা। ...তে ফিরে যাওয়া। দীর্ঘ দু' বছর পরে তিনি আবার আমাদের মাঝে ফিরে আসছেন চিত্রকলা প্রোডাকসনের প্রথম ছবি 'আশীর্বাদের' মাধ্যমে।

'আশীর্বাদে'র শিল্পী নির্বাচন চূড়ান্তভাবে এখনো হয়নি বলে জানা গেছে।

নার্গিসের বিবাহ

না, বিয়ে নয়, বিচ্ছেদ।

গত ১৮ই এপ্রিলে গোপনে চিত্রনায়িকা নার্গিস ও কামরুল সেলিমের বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু নার্গিসের বাবা জামাল উদ্দীন মোল্লা এ বিয়ে স্বীকার করলেন না। অনেক কেলেঙ্কারীর পর নার্গিস কামরুলের বিয়ে বিচ্ছেদে রূপ নিল।

—আনওয়ার অ:হ্মদ
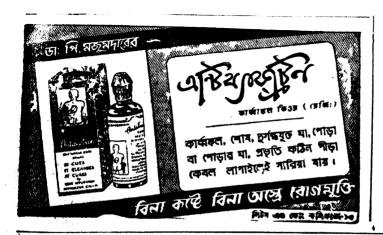
বিবিধ সংবাদ

হাজারীবাগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠা

সম্প্রতি হাজারীবাগে দুটি সাংস্কৃ অনুষ্ঠান হয়েছে। প্রথম অনুষ্ঠান রব পাঠচক্র-র প্রযোজনায় বর্ষাসঙ্গীত ও গ আলেখ্য। 'গীতাঞ্জলি' সঙ্গীত শিক্ষায়ত শিল্পীরা একক, দ্বৈত ও সম্মিলিত বিভিন্ন পর্যায়ের ১২টি বর্ষাসঙ্গীত প বেশন করেন যেগুলি বিশেষ প্রাণস্প হয়।

দ্বিতীয় অনুষ্ঠান প্রখ্যাত শি প্রতিষ্ঠান মাউণ্ট কারমেল স্কুলের র জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ২৭ জুলাই সাংস্কৃ অনুষ্ঠানে 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্য বয়ে সুপরিবেশিত দৃশ্য। প্রধান উদ্যোক্তা ছি শ্রীমতী কৃষ্ণা মৈত্র। সঙ্গীত ও নৃত্য প চালনা ... যথাক্রমে রথীন সান্যাল কৃষ্ণা মৈ...

...চীর শ্রাবণী : 'শ্রাবণী' শী গীতি...টি পরিবেশন করলেন উদ শিল্প...ষ্ঠী ১৮ আগষ্ট সন্ধ্যায়। অনু...টি পরিচালনা করেন শৈলেশ

প্রবাসে বাংলা নাটক প্রতিযোগি

বেঙ্গলী ক্লাব ও যুবক সমিতি, ল কর্তৃক আয়োজিত প্রকাশচন্দ্র ঘোষ স্ম সর্বভারতীয় পূর্ণাঙ্গ দ্বাদশ বার্ষি বাংলা নাট্য প্রতিযোগিতা অন্যান্য বছ ন্যায় এবারেও ক্লাবের অতুল নাট্য অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ৭ই ডিসে '৭৪'এ প্রতিযোগিতার শুভ সূচনা দি শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার পুরস্কার ৫০১ ট দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার ২৫১ টাকা তৃতীয় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার ১০১ টা তাছাড়া অন্যান্য পুরস্কারও আছে। প্রতি যোগিতায় আবেদন পাঠাবার শেষ তা আগামী ৩১শে অকটোবর, '৭৪। ভার যে কোন নাট্য দলই প্রতিযোগিতায় দিতে পারবেন। নিয়মাদির জন্য যোগা করুন:—সাধারণ সম্পাদক বেঙ্গলী ও যুবক সমিতি, ১০ শিবাজী মা লক্ষ্মৌ ২২৫০০১ ফোন : ২৭৯২০।

মজিলপুর দত্তবাড়ীর জন্মাষ্টমী উৎসব

প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও মজি পুর দত্তবাড়ীতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্ট উৎসব গোপালজিউর প্রাঙ্গণে পালিত হ

এই উপলক্ষ্যে প্রথমদিনে কলকাত (রসরঙ্গ) সভ্যগণ কর্তৃক শ্রীমা কীর্তনগা অভিনয় হয় ও স্থানীয় জয়নগর মজিলপ সংগীত সমাজ কর্তৃক মন্মথ রা 'কারাগার' অভিনীত হয়। দ্বিতীয়দি শরৎচন্দ্রের 'দেনাপাওনা' অভিনয়ও হয়।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।